উপন্যাস সমগ্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

উপন্যাস সমগ্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
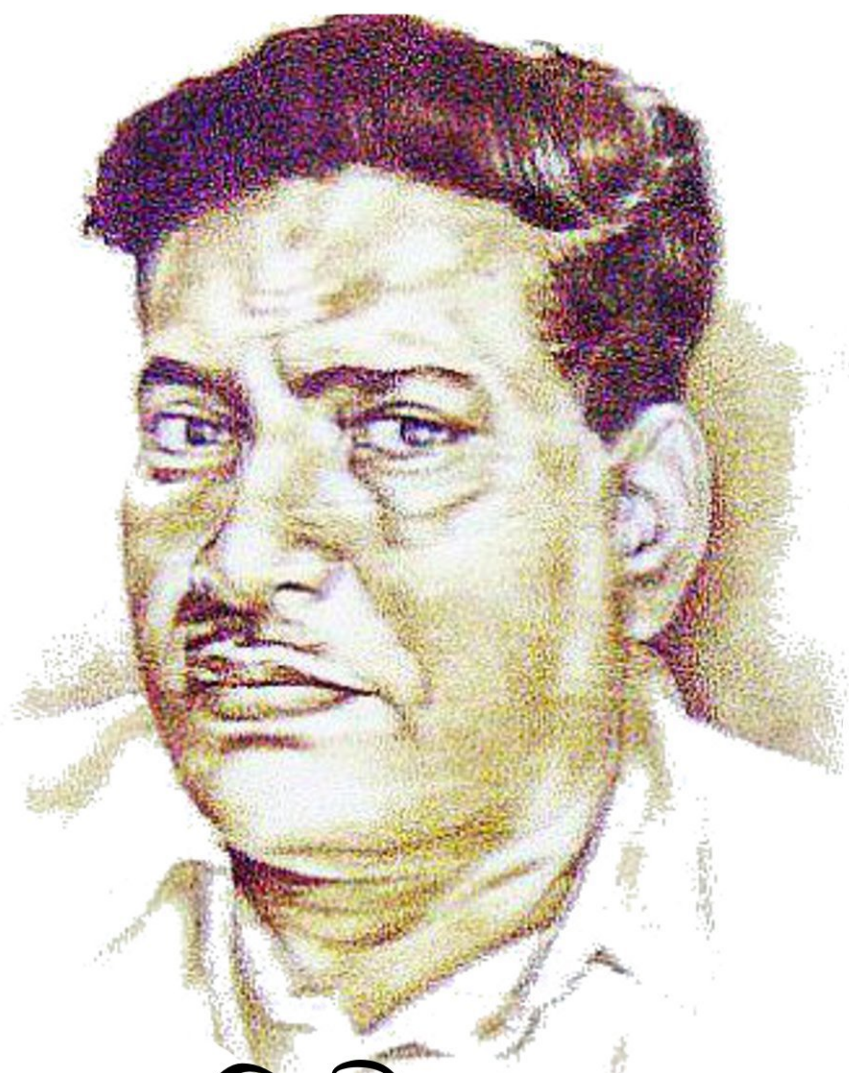
দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

দম্পতি

চুয়াডাঙ্গা যাইবার বড় রাস্তার দু'পাশে দুইখানি গ্রাম--দক্ষিণ-পাড়া ও উত্তর-পাড়া। দক্ষিণ-পাড়ায় মাত্র সাত-আট ঘর ব্রাহ্মণের বাস, আর বনিয়াদী কায়স্থ বসু-পরিবার এ-গ্রামের জমিদার। উত্তর-পাড়ার বাসিন্দারা বিভিন্ন জাতির। ইঁহাদের জমিদারও কায়স্থ। উপাধি—বসু। উভয় ঘরই পরস্পরের জ্ঞাতি। বসুগণ গ্রামের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের কাহারও মধ্যে সদ্ভাব নাই। রেষারেষি ও মনোমালিন্য লাগিয়াই আছে।

দক্ষিণ-পাড়ার নীচে 'কুসুম বাম্‌নীর দ' নামে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন জলাশয়ের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া উভয়-ঘরের মধ্যে আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। বড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসু একদিন সকালে লোকজন লইয়া সেখানে মাছ ধরিতে গিয়া দেখিলেন, ছোট-তরফের গদাধর বসু অপর পাড়ে তাঁহার পূর্ব্বেই আসিয়া, জেলে নামাইয়া মাছ ধরিতেছেন। সত্যনারায়ণ বসু কৈফিয়ৎ চাহিলেন—তিনি বর্ত্তমানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গদাধরের এমন আচরণের হেতু কি? গদাধর তদুত্তরে যাহা বলিলেন, সত্যনারায়ণ বসুর পক্ষে তা সম্মানজনক নয়। কথার মধ্যে একটা শ্লেষ ছিল, সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলে কলিকাতায় লেখাপড়া করিতে যাইয়া বকিয়া গিয়াছিল—তাহার শখের দেনা মিটাইতে সত্যনারায়ণকে সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় কোবালা করিয়া, চুয়াডাঙ্গায় কুণ্ডুদের গদি হইতে প্রায় হাজার দুই টাকা সংগ্রহ করিতে হয়।

বসু-বংশের এই শৌখীন ছেলেটির কথা ঘুরাইয়া গদাধর এমনভাবে বলিলেন যাহাতে সত্যনারায়ণের মনে বড় বাজিল। দুজনের মধ্যে সেই হইতে মনোমালিন্যের সূত্রপাত;—তারপর উভয়-তরফে ছোটবড় মামলা-মোকদ্দমা, এমন কি, ছোট-খাটো দাঙ্গা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখাদেখি অনেকদিন হইতে বন্ধ।

গদাধর বসুর বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। ম্যালেরিয়াগ্রস্থ চেহারা, রং শ্যামবর্ণ, তবে বসু-বংশের দৈহিক ধারা অনুযায়ী বেশ দীর্ঘাকৃতি। ম্যালেরিয়ায় বছরের মধ্যে ছ'মাস ভুগিলেও গদাধরের শরীরে খাটিবার শক্তি যথেষ্ট। উভয়-তরফের মধ্যে তাঁহারই অবস্থা ভালো। আশপাশের গ্রাম হইতে সুবিধা দরে পাট কিনিয়া মাড়োয়ারী মহাজনদের নিকট বেচিয়া হাতে বেশ দু'পয়সা করিয়াছেন। এই গ্রামেরই বাহিরের মাঠে তাঁহার টিনের চালাওয়ালা প্রকাণ্ড আড়ত। গ্রামের বাহিরে মাঠে আড়ত করিবার হেতু এই যে, আড়তটি যে-স্থানে, সেটি দুটি বড় রাস্তার সংযোগস্থল। একটি চুয়াডাঙ্গা যাইবার ডিষ্ট্রিক বোর্ডের বড় রাস্তা, অপরটি লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা, সেটি বাণপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। চুয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণনগরগামী পাটের গাড়ী এখান দিয়াই যায়—পথের ধারে গাড়ী ধরিয়া পাট নামাইয়া লইবেন—এই উদ্দেশ্যেই এই উভয়-রাস্তার সংযোগস্থলে আড়ত-ঘর তৈরী।

গদাধর বসু বৎসরে বিস্তর পয়সা রোজগার করেন—অর্থাৎ কলিকাতার হিসাবে বিস্তর না হইলেও পাড়াগাঁ হিসাবে দেখিতে গেলে, বৎসরে পাঁচ-ছ' হাজার টাকা নিট্ মুনাফা সিন্দুকজাত করার সৌভাগ্য যাহার ঘটে—প্রতিবেশি-মহলে সে ঈর্ষার ও সম্ভ্রমের পাত্র।

গদাধরের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ী বট-অশ্বত্থ গাছ গজাইয়া, খিলান্ ফাটিয়া, কার্নিশ ভাঙিয়া

নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেকালের অনেক জানালা-দরজায় চাঁচের বেড়া বাঁধিয়া আবরু রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত। তবু সেই বাড়ীতেই গদাধর পুত্র-পরিবার লইয়া চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছেন। টাকা হাতে থাকা সত্ত্বেও গদাধর বাড়ী মেরামত করেন না কেন, বা নিজের পছন্দমত নতুন ছোট-বাড়ী আলাদা করিয়া তৈরী করেন না কেন ইত্যাদি প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক; বিশেষতঃ যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে জিনিসটা দেখিবেন। ইহার কারণ আর যাহাই হউক, গদাধরের কৃপণতা যে নয়—ইহা নিশ্চিত। কারণ, গদাধর আদৌ কৃপণ নহেন। প্রতি বৎসর তিনি জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গোৎসব ও কালীপূজা করিয়া গ্রামের শূদ্র-ভদ্র তাবৎ লোককে ভোজন করাইয়া থাকেন—গরীবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করেন, সম্প্রতি 'কুসুম বাম্নীর দ'র উত্তরপাড়ে একটি বাঁধানো স্নানের ঘাট করিয়া দিয়াছেন—তাহাতে মিত্র-পক্ষের মতে প্রায় তিনশত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে—তবে শত্রুপক্ষ বলে মেজ-তরফ নির্ব্বংশ হইয়া যাওয়ায় উভয় ঘরের সুবিধা হইয়াছে—ভিটার পুরাতন ইটগুলি সত্যনারায়ণ ও গদাধর মিলিয়া দশহাত বাড়াইয়া লুঠ চালাইতেছে। বিনামূল্যে সংগৃহীত পুরাতন ইটের গাঁথুনি বাঁধা-ঘাটে আর কত খরচ পড়িবে?…ইত্যাদি।

যাক্, এসব বাজে কথা।

আসল কথা, গদাধর গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিশালী ও সাহসী লোক। একবার গদাধরের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। গদাধর হাঁকডাক করিয়া লোকজন জড় করিয়া, নিজে রামদা হাতে লইয়া হৈ-হৈ শব্দে গ্রাম মাতাইয়া ছুটিয়া ছিলেন, কিন্তু ডাকাতদের টিকিও দেখা যায় নাই।

একদিন গদাধর আড়তে বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতেছেন, কাছে পুরাতন মুহুরী ভড় মহাশয় বসিয়া কাগজপত্র লিখিতেছেন, আজ গদাধরের মনটা খুব প্রসন্ন, কারণ, এইমাত্র কলিকাতার মহাজন বেলেঘাটার আড়ত হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছে যে, তাঁহার পূর্ব্বের পাটের চালানে মণ-পিছু মোটা লাভ দাঁড়াইবে।

গদাধর মুহুরীকে বলিলেন—ভড়মশায়, চালানটা মিলিয়ে দেখলেন একবার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সাড়ে-সাত আনা খরিদ-দরের ওপর টাকায় দু'পয়সা আড়তদাড়ি, আর গাড়ীভাড়া দু'আনা এই ধরুন আট আনা—দশ আনা…

—ওরা বিক্রি করেচে কততে?

—সাড়ে-চোদ্দ—ওদের আড়তদারি বাদ দিন টাকায় এক আনা…

—ওইটে বেশী হচ্চে ভড়মশায়। সিঙ্গিমশায়দের একটা চিঠি লিখে দিন, আড়তদারিটার সম্বন্ধে…

—বাবু, ও-নিয়ে আরবারে কত লেখালেখি হলো জানেন তো? ওরা ওর কমে রাজী হবে না—আমরাও অন্য-কোনো আড়তে দিয়ে বিশ্বাস করতে পারবো না। সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখলে বাবু ও-আড়তদারি আমাদের না দিয়ে উপায় নেই। ওদের চটালে কাজ চলবে না। পুজোর সময় দেখলেন তো?

—বাদ দিন ও-কথা। কত মণের চালান?

—সাড়ে-পাঁচশো আর খুচরো সাতাশি…

বাহির হইতে আড়তের কয়াল নিধু সা আসিয়া বলিল—মুহুরীমশায়, কাঁটা ধরাবো? মাল নামচে গাড়ী থেকে।

ভড় মহাশয় বলিলেন—ক'গাড়ী?

দু'গাড়ী, এলো-পাট—কালকের খরিদ।

—ভিজে আছে?

—তা তো ছাখলাম না—আসুন না একবার বাইরে।

গদাধর ধমক দিয়া কহিলেন—মুহুরীমশায়ের না গেলে, ভিজে কি শুক্‌নো পাট দেখে নেওয়া যায় না? দেখে নাওগে না—কচি খোকা সাজচো যে দিন-দিন!

নিধু সা কাঁচা কয়াল নয়, কয়ালী কাজে আজ ত্রিশ বছর নিযুক্ত থাকিয়া মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিল। কাঁটায় মাল উঠাইবার আগে মালের অবস্থা যাচাই করাইয়া লওয়ার কাজটা আড়তের কোনো বড় কর্ম্মচারীর দ্বারা না করাইলে ভবিষ্যতে ইহা লইয়া অনেক কথা উঠিতে পারে—এমন কি, একবার দেখাইয়া লইলে. পরে বিক্রেতার সহিত যোগসাজশে মণ-মণ ভিজা পাট কাঁটায় তুলিলেও আর কোনো দায়িত্ব থাকে না—তাহাও সে জানে। বাবুরা ইহার পর আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। তবুও সে গদাধরের কথার প্রতি সমীহ করিয়া বিনীত-ভাবে বলিল—তা যা বলেন বাবু, তবে মুহুরীবাবু পাট চেনেন ভালো, তাই বলছিলাম।

গদাধর বলিলেন—মুহুরীমশায় পাট চেনে, আর তুমি চেন না? আর এত পাট চেনা-চেনির কি কথাই-বা হলো? হাত দিয়ে দেখ'লে বোঝা যায় না, পাট ভিজে কি শুক্‌নো?

নিধু কয়াল দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

মুহুরীর দিকে চাহিয়া গদাধর বলিলেন—ভড়মশায়, নিধেটা দিন-দিন বড় বেয়াদব হয়ে উঠচে—মুখোমুখি তর্ক করে।

ভড় মহাশয় তাহার উত্তরে মৃদু হাস্য করিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। ইহার কারণ, গদাধরের চণ্ডালের মত রাগে ইন্ধন যোগাইলে, এখুনি চটিয়া লাল হইয়া নিধু কয়ালকে বরখাস্তও করিতে পারেন তিনি। কিন্তু ভড় মহাশয় জানেন, নিধু সা চোর বটে, তবে সত্যই কয়ালী কাজে ঝুনা লোক—গেলে অমনটি হঠাৎ জুটানো কঠিন।

সন্ধ্যা হইয়া গেল।

এই সময় কে একজন বাইরে কাহাকে বলিতেছে শোনা গেল—না, এখন দেখা হবে না, যাও এখন।

গদাধর হাঁকিয়া বলিলেন—কে রে?

নিধু কয়ালের গলার উত্তর শোনা গেল—কে একজন সন্নিসি ফকির, বাবু।

কথার শেষ ভালো করিয়া হইতে-না-হইতে একজন পাঞ্জাবী-সাধু ঘরে ঢুকিল—হলদে

পাগড়ী পরা, হাতে বই—সে-ধরণের সাধুর মূর্ত্তির সঙ্গে পরিচয় সকলেরই আছে আমাদের। ইহারা সাধারণতঃ রামেশ্বর তীর্থে যাইবার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া বাংলাদেশে আসিয়া গৃহস্থের ঘরে ঘরে হাত দেখিয়া বেড়ায় ও প্রবাল, পাকা-হরিতকী, দুর্লভ ধরণের শালগ্রাম ইত্যাদি প্রত্যেক ভক্তকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া, পাথেয় ও খোরাকী বাবদ পাঁচ টাকার কম লয় না।

গদাধর বলিলেন—কি বাবাজী? কাঁহাসে আস্‌তা হ্যায়?

সাধু হাসিয়া বলিল—কলকত্তা—কালিমায়ীকি থান সে। হাত দেখলাও।

—বোসো বাবাজি।

গদাধর হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন—সাধু বলিল—অঙ্গুঠি উতার লেও—

মুহুরী বলিলেন—আংটি খুলে নিতে বলছে হাত থেকে।

গদাধর তখুনি সোনার আংটিটি খুলিয়া হাতের আঙুল প্রসারিত করিয়া সাধুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

সাধু বলিল—চাঁদি ইয়ানে সোনা হাত মে রাখ্‌সো? হাত্‌মে চাঁদি রাক্‌খো! নেই তো হাত কেইসে দেখেগা?

এ-কথা শুনিয়া বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া হাতে রাখিয়া গদাধর সাধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সাধু হাতখানা ভালো করিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—তেরা বহুৎ বুরা দিন আতা—ইন্‌সাল ইয়ানে দুসর্ সাল-সে বহুৎ কুছ্‌ গড়বড় হো যায়গা।

গদাধর ভালো হিন্দী না বুঝিলেও মোটামুটি জিনিসটা বুঝিলেন। কিন্তু তিনি আবার একটু নাস্তিক-ধরণের লোক ছিলেন, কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখা যাক্।

সাধু বলিল—কেয়া?

—কিছু না ··বল্‌তা হায়, বেশ।

সাধু বলিল—কুছ যাগ করনে হোগা। পরমাত্মাকা কৃপা-সে আচ্ছা হো যায়গা—করোগে?

—ওসব এখন হোগাটোগা নেই বাবাজি, আবি যাও।

—তেরা খুশি!

বলিয়া খপ্‌ করিয়া হাতের টাকাটি তুলিয়া লইয়া বেমালুম ঝুলির মধ্যে পুরিয়া সাধু বলিল—আচ্ছা, রাম-রাম বাবু।

গদাধর একটু অবাক হইয়া বলিলেন—টাকাটা নিলে যে?

—দাচ্ছিনা তো চাহিয়ে্‌ বেটা। নেহি দচ্ছিনা দেনে-সে কোই কাম আচ্ছা নেহি বন্‌তা!

সাধু আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গদাধর বেকুবের মত বসিয়া রহিলেন।

ভড় মহাশয় বলিলেন—টাকাটা দিব্যি কেমন নিয়ে গেল !

গদাধর রাগত স্বরে বলিলেন—সব জোচ্চোর ! সাধু না হাতী ! একটা টাকার ঘায়ে জল দিয়ে গেল বিকেলবেলা ! আরও বলে কি না, তোমার খারাপ হবে।

দু-একজন বলিল—তাই বললে নাকি বাবু ?

—শুনলে না, কি বললে ? তাই তো বললে !

তারপর ও-প্রসঙ্গ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টায় গদাধর মুহুরীর দিকে চাহিয়া জোরগলায় বলিলেন—তারপর ভড়মশায়, বেলেঘাটার গদিতে একখানা চিঠি মুসোবিদে ক'রে ফেলুন চট্ ক'রে !

—কি লিখবো ?

—ওই আড়তদারির কথাটা নিয়ে প্রথমে লিখুন—হারাধন সিঙ্গিকেই চিঠিখানা লিখুন, যে, নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং, আপনাদের এত নম্বর চালান যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে—আপনারা এতবার লেখালেখি সত্ত্বেও টাকায় এক আনা করিয়া আড়তদারি বজায় রাখিয়াছেন দেখিয়া—

এইসময় গদাধরের পত্তনী মৌজা সুন্দরপুরের একটি প্রজা ঝুড়িতে কয়েকটি ছোট-বড় কপি আনিয়া গদির আসনে নামাইতে, চিঠিলেখানো বন্ধ করিয়া গদাধর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কিরে রতিকান্ত ? ভালো আছিস্ ? এতে কি ?

—আজ্ঞে, কয়েকখানি কপি আপনার জন্যি এনেলাম—এবার দশ কাঠা জমিতে কপি হয়েছে, তা বিষ্টির অবানে সে বাড়তি পারলো না বাবু। তার ওপর নেগেচে কাঁচকুমুরে পোকা—পাতা কেটে-কেটে ফ্যালায় রোজ সকালে-বিকালে এত-এত—

রতিকান্ত হাত দিয়া কীট দ্বারা কর্ত্তিত পাতার পরিমাণ দেখাইল।

গদাধর বলিলেন—না, তা ফুল মন্দ হয় নি তো বাপু, বেশ ফুল বেঁধেচে। যা বাড়ীতে দিয়ে এসে একটু গুড়-জল খেয়ে আয় গে বাড়ী থেকে।

ভড় মহাশয় বলিলেন—তারপর আর কি লিখবো বাবু ?

—আজ থাক ভড়মশায়। সন্দে হয়ে এলো। আমার একটু কাজ আছে মুখুয্যে-বাড়ী। রতিকান্ত, আয় আমার সঙ্গে—ভড়মশায়, কপি একটা রাখুন।

—না, না বাবু, আপনার বাড়ীতে থাক্—আমি আবার কেন—

—তাতে কি ? আমরা কত খাবো ? রতিকান্ত, দাও একখানা ভালো দেখে ফুল নামিয়ে। নিয়ে যান না !

রতিকান্তকে লইয়া চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে গদাধর বলিলেন—ক্যাশটা তা'হলে আপনি নিয়ে যাবেন সঙ্গে ক'রে ? না, আমি নিয়ে যাবো ?

—তাহ'লে বাবু আর-একটু বসতে হয়। ক্যাশ বন্ধ করি এবার, মিলিয়ে দিই।

—বসি।

—বাবু, ওবেলা ও আট আনা হাওলাতে কার নামে লিখবো ?

—ও যা হয় করুন, ঢুলি-খরচ ব'লে লিখুন না ? ঢোল শহরৎ তো করতেই হবে—আজ না হয় কাল !

—আর, এবেলার এই এক টাকা ?

—কোন্ এক টাকা ?

—এই যে সাধু নিয়ে গেল ?

—ও ! ওটা আমার নামে খরচ লিখুন। ব্যাটা আচ্ছা ধাপ্পাবাজি ক'রে টাকাটা নিয়ে গেল !

—ওইজন্তেই আংটি খুলতে বলেছিল বাপু, এইবার বোঝা যাচ্ছে।

সেই তো। কারণ, সোনা তো আংটিতে রয়েচে, আবার চাঁদি কি হবে যদি বলি ? আঙুটি তো আর আঙুল থেকে টেনে খুলে নিয়ে সটকান্ দেওয়া যায় না ! ডাকাত একেবারে ! এদের কথা সব মিথ্যে !

কথাগুলো গদাধর যেরূপ জোর দিয়া বলিলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি তাঁহার বোকামির জন্ত নিজে যেমন লজ্জিত হইয়াছেন, সাধু সম্বন্ধে ভড় মহাশয়ের নিকট হইতেও কটূক্তি শুনিতে পাইলে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হন। ভড় মহাশয় কিন্তু দেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তিমান বৃদ্ধ ব্যক্তি। মনিবের মন যোগাইবার জন্যও তিনি সাধুর প্রতি অবিশ্বাসসূচক কোন কথা বলিতে রাজী নন্। সুতরাং তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে গদাধর বাড়ী ফিরিলেন।

স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী রান্নাঘরে ছিল, স্বামীর সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—আজ সকাল-সকাল যে ? কি ভাগ্যি !

—কাজ মিটে গেল তাই এলাম ! একটু চা খাওয়াবে ?

—ভাতটা চড়েছে—নামিয়ে ক'রে দিচ্ছি।

—তুমি রাঁধচো নাকি ?

—হ্যাঁ। আজ তো পিসিমার সন্দের পর থেকেই ভীষণ জর এসেচে। তিনি উঠতেই পারেন না, তা রাঁধবেন কি ?

—তাইতো। কাল একবার ডাক্তার ডাকি—প্রায়ই তো ওঁর জর হোতে লাগলো···

—উনি ডাক্তারি-ওষুধ তো খাবেন না—ডাক্তার ডাকিয়ে কি করবে ?

—তুমিই বা ক'দিন এরকম রাঁধবে ?

—তা ব'লে কি হবে ? যে ক'দিন পারি। বাড়ীর লোক কি না খেয়ে থাকবে ?

গদাধর আর কোনো কথা না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন—কিছুক্ষণ পরে চাকর তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। এই চাকরটির ইতিহাস বেশ নতুন ধরণের। ইহার নাম—গৈবি। বাড়ী—নেপাল। গদাধরের বাবার আমলে একদিন সে এ-গ্রামে আসিয়া ইহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে আজ সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। সেই হইতেই গৈবি এখানে থাকে এবং কথাবার্ত্তায় সে পুরা বাঙালী। তাহাকে বর্ত্তমানে নেপালী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই।

গদাধর বলিলেন—গৈবি, কাল একবার শরৎ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। পিসিমার জ্বর হয়েচে! বড্ড ভুগচেন, এবার নিয়ে বার-পাঁচেক জ্বরে পড়লেন।

গৈবি বলিল—পিসিমা কারো কথা শুনবে না বাবু! আমি বলি, তুমি পুকুরে ছেন কোরবে না, করলেই তোমায় জ্বরে ধরবে। তা, কারো কথা শুনবার লোক নয়। এখন যে জ্বরটি হলো, এখন কে ভুগবে? হ্যাঁ!

—ঠিক। তুই কাল সকালেই যাবি ডাক্তারের কাছে।

—সকালে কেনো, এখুন বল্লে এখুনই যেতে পারি—হ্যাঁ!

—না, থাক্, এখন যেতে হবে না। তুই যা।

—বাবু, ভাল কথা—এক সাধুবাবাজি আপনার আড়তে গিয়েছিলো?

—হ্যাঁ গিয়েছিল। কেন বল্‌তো?

—ও তো এখানে আগে এলো। বলে, বাবু কোথায়? বাবুর সাথে ভেট্ করবো। আমি ব'লে দিলাম, বাবু আড়তে আছে—সত্য গিয়েছিলো ঠিক তাহোলে?

—তা আর যাবে না? একটা টাকার ঘাড়ে জল দিয়ে গেল!

—এক টাকা! কি হলো বাবু?

—হবে আবার কি? ফাঁকি দিয়ে জোর ক'রে নিয়ে গেলে যা হয়!

এই সময় অনঙ্গ চায়েরবাটি হাতে করিয়া ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিল—কে গা? কে দিলে ফাঁকি?

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ঠকবার মজা কি জানো? যে ঠকে সে তো ঠকেই—আবার উপরন্তু পাঁচজনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে প্রাণ যায়!

অনঙ্গ অভিমানের সুরে বলিল—বেশ, তাহ'লে দিও না কৈফিয়ৎ। কে চায় শুনতে?

—না, না, শোনো।

—শুনি তো আমার বড় দিব্যি!

—না যদি শোনাই, তবে আমারও অতি-বড় দিব্যি।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—বলো, কি হলো শুনি?

গদাধর সাধুর ব্যাপার বলিলেন। অনঙ্গ শুনিয়া কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল, পরে কি ভাবিয়া বলিল—তুমি যদি সাধুকে বাড়িতে আনতে তো বেশ হতো।

—কেন?

—আমার হাতটা দেখাতাম।

—তোমার হাত কি দেখবে আবার? দিব্যি তো আছো।

—দেখালে দোষ কি?

—ওরা কি জানে? আমার বিশ্বাস হয় না।

—তুমি নাস্তিক ব'লে সবাই তো নাস্তিক নয়!

—কি দেখাবে? আয়ু?

—তাও দেখাতাম বৈকি। দেখাতাম, তোমার আগে মরি কি না—

—এ শখ কেন ?

—এ-শখ কেন, যদি মেয়েমানুষ হতে, তবে বুঝতে।

—যখন তা হই নি তখন আপসোস ক'রে লাভ নেই। এখন চা-টা খাবে ? জুড়িয়ে যে জল হয়ে গেল !

বলিয়া গদাধর চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিলেন।

স্বামীর কথায় চা-টুকু শেষ করিয়া অনঙ্গ ঘরের বাইরে যাইবার উপক্রম করিতেই গদাধর বলিলেন—একটু দাঁড়াও না ছাই।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—বসলে চলে ? রান্না-বান্না সবই বাকী।

—তা হোক, বোসো একটু।

অনঙ্গ স্বামীর সংস্পর্শ হইতে বেশ-কিছু দূরে বসিয়া বলিল—এই বসলাম।

অর্থাৎ সে এখন শুচি-বস্ত্র পরিয়া রান্না করিতেছে—নাস্তিক গদাধরের আড়ত-বেড়ানো কাপড় পরনে, সে এখন স্বামীর সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি করিতে রাজি নয়।

গদাধর মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ছুঁয়ে দিই ?

—তাহ'লে থাকলো হাঁড়ি উনুনে চড়ানো—সে হাঁড়ি আর নামবে না।

—ভালোই তো। কারো খাওয়া হবে না।

—কারো খাওয়ার জন্যে আমার দায় পড়েচে ভাববার। ছেলেমেয়েরা কষ্ট পাবে না খেয়ে সেটাই ভাবনার কথা।

—ও, বেশ।

আমার কাছে পষ্ট কথা—পষ্ট কথার কষ্ট নেই।

—সে তো বটেই।

অনঙ্গ হাসিতে লাগিল। তাহার বয়স এই সাতাশ- আটাশ—প্রথম যৌবনের রূপ-লাবণ্য কবে ঝরিয়া গেলেও অনঙ্গ এখনও রূপসী। এখনও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। রং যে খুব ফর্সা তা নয়, উজ্জ্বল শ্যাম বললেই ভালো হয়, কিন্তু অনঙ্গর মুখের গড়নের মধ্যে এমন একটা আলগা চটক আছে, চোখ এমন টানা-টানা, ভুরি দুটি এমন সরু ও কালো, ঠোঁট এমন পাতলা, বাহু দুটির গড়ন এমন নিটোল, মাথার চুলের রাশ এমন ঘন ও ঠাস্-বুনানো, হাসি এমন মিষ্ট যে, মনে হয়, সাজিয়া-গুজিয়া মুখে স্নো-পাউডার মাখিয়া বেড়াইলে এখনও অনঙ্গ অনেকের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিতে পারে !

নারীর আদিম শক্তি ইহার মধ্যে যেন এখনও নির্ব্বাপিত আগ্নেয়-গিরির গর্ভে সুপ্ত-অগ্নির মতই বিরাজমান।

গদাধর বলিলেন—সাধু আজ আমার হাত দেখে কি বলেচে জানো ?

—কি গা ?

—আমার নাকি শীগগির খুব খারাপ সময় হবে।

অনঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—ওমা, সে কি গো !

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—তাই তো বললে !

—আচ্ছা, তোমার সব-তাতে হাসি আমার ভালো লাগে না ! তুমি যেমন কিছু জানো না, বোঝো না—সবাই তো তোমার মত নয় ! কি-কি বললে সাধুবাবা শুনি ?

—ওই তো বললাম।

—সত্যি, এই কথা বলেচে ?

—হঁ্যা, ভড়মশায় জানে, জিজ্ঞেস্ কোরো।

—ওমা, শুনে যে হাত-পা আসচে না !

—হ্যাঃ—তুমি রেখে দাও। ভণ্ড সাধু সব কোথাকার, ওদের আবার কথার ঠিক !

অনঙ্গ ঝাঁঝের সহিত বলিল—ওই তো তোমার দোষ। কাকে কি চটিয়েচো, কি ব'লে গিয়েচে। ওরা সব করতে পারে, তা জানো ? ওদের নামে অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে আছে ? ওই দোষেই তোমার ভুগতে হবে, দেখচি। সাধুকে কিছু দাওনি ?

গদাধর হাসিয়া উঠিয়া হাতে চাঁদি-বসানো এবং সাধুর টাকা তুলিয়া লওয়ার বর্ণনা করলেন।

অনঙ্গ বলিল—হেসো না। যাক্, তবুও কিছু দক্ষিণা-প্রণামী পেয়ে গিয়েচেন তো তিনি ! আমার এখানে আগে এসেছিলেন—তখন যদি জানতাম, আমি ভাল ক'রে সেবা ভোগ দিতাম—মনটা খুশী ক'রে দিতাম বাবার···ওঁরা সব পারেন।

বলিয়া অনঙ্গ হাত জোড় করিয়া কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল।

গদাধরের দোষ এই, স্ত্রীর কাছে গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারে না। অনঙ্গর কাণ্ড দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখা গদাধরের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা হাসি চাপিতে গিয়া শেষকালে ফল ভালো হইল না—ঘরের মধ্যে মনে হইল যেন একটা হাসির বোমা বুঝি-বা ফাটিয়া পড়িল !

অনঙ্গ রাগে ফরফর করিতে-করিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

গদাধরের তখন আর-এক পেয়ালা হইলে মন্দ হইত না—কিন্তু স্ত্রীকে চটাইয়াছেন, সে-আশা বর্ত্তমানে নির্ম্মূল।

তিনি ডাকিলেন—গৈবি···

গৈবি বাহির-বাড়ী হইতে উত্তর দিল—যাই বাবু।

—ওরে, শোন এদিকে, একটু তামাক দে—আর একবার দেখে আয়, কলকাতা থেকে নির্ম্মলবাবু এসেচে কিনা···মুখুয্যেবাড়ীর।

—এখনি যাবো, বাবু ?

—তামাক দিয়ে তারপর গিয়ে দেখে আয়। যদি আসে তো ডেকে নিয়ে আস্বি !

এই সময় অনঙ্গ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কেন, নির্ম্মলবাবুকে ডাকচো কেন, শুনি ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

—দরকার আছে। নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে তোমাকে মিশতে দেবো না আমি।

—আমি কি ছেলেমানুষ ?

—ছেলে-বুড়োর কথা নয়। সে এসে কেবল টাকা ধার করে আর দেয় না। গাঁয়ের সকলের কাছেই নিয়েছে, এমন কি মিনির বাপের কাছ থেকেও সাতটা টাকা নিয়ে গিয়েচে। তোমার কাছ থেকে তো অনেক টাকাই নিয়েছে। কিছু দিয়েচে ?

—দিক না-দিক, তোমার সে-সব খোঁজে দরকার কি ? তুমি মেয়েমানুষ—বাইরের সব কথায় থেকো না, বলচি !

নির্ম্মলের ব্যাপার লইয়া সেদিন ভড়মশায় আড়তেও গদাধরকে দু'একটা কথা বলিয়াছিল। গদাধর জেদী লোক—যাহাকে লইয়া ঘরে-বাহিরে তাঁর উৎপীড়ন, তাহাকে তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না—করিবেনও না। আসলে নির্ম্মল মুখুয্যে এ-গ্রামের ৺হরি গাঙ্গুলির জামাই। শ্বশুরকুল নির্ম্মূল হওয়াতে বর্ত্তমানে শ্বশুরের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখল করিতেছে। লোকটি সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্ত, এ-কথাও ঠিক—কারণ, আয়ের অনুপাতে তাহার ব্যয় বেশি।

নির্ম্মল মুখুয্যে আসিয়া বাহির হইতে হাঁকিল—গদাধর, আছো না কি হে ! আসবো ?

গদাধর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অনঙ্গ বলিল—উত্তর দাও তো দেখিয়ে দেবো মজা !

গদাধর হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—তোমার সব তাতেই ভয় ! জবাব দিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে না তো !

দৃঢ় চাপা-কণ্ঠে অনঙ্গ বলিল—না।

—ভদ্রলোকের ছেলে বাড়ীতে এসেছে···

—আসুক।

ইহাদের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল মুখুয্যে একেবারে ঘরের দোরের কাছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

—কি গো বৌ-ঠাকরুণ, আমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে যে—রাগ করলে না কি গরীবদের ওপর ?

অনঙ্গ নির্ম্মলের কথার ভাবে হাসিয়া বলিল—কেন, রাগ করবো কেন ?

—কাজ দেখেই লোক লোকের বিচার করে—তোমার কাজ দেখেই বলচি।

—না, রাগ করি নি।

—শুনে মনটা জুড়ুলো।

—থাক্, আর ঠাট্টায় কাজ নেই !

—এটা ঠাট্টা হলো বৌ-ঠাকরুণ ? যাক্, এখন কি খাওয়াবে খাওয়াও তো সন্দেবেলা···

—সন্দেবেলা মানে, রাত্তিরে !

—রাত এক বলে না। এর নাম—সন্দে।

—কি আর খাওয়াবো ? ঘরে কি-বা আছে ! আচ্ছা বসুন, দেখি।

গদাধর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন ! দু'জনের মধ্যে একটা মিটমাট হইতে দেখিয়া

নির্মলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি মনে ক'রে, এখন বলো? তোমার সঙ্গে অনেক কাল দেখা নেই।

—ব্যস্ত ছিলাম ভাই, আমাদের খেটে খেতে হয়।

—আমাদেরও উঠোনে পয়সা ছড়ানো থাকে না—খুঁজে নিতে হয়।

—আমাদের যে খুঁজলেও মেলে না, সেই হয়েচে মুসকিল!

—সন্ধেবেলাটা বড় কাজ প'ড়ে গিয়েচে আজকাল, নইলে তোমার ওদিকে যেতাম।

—আমারও তাই। নইলে আগেতো প্রায়ই আসতাম।

—ছাখো ভাই নির্মল, একটা কথা তোমায় বলি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে তোমার তো লোক আছে—আমায় কিছু কাজ পাইয়ে দাও না?

—নিজের কাজ ফেলে আবার পরের কাজ করতে যাবে কেন? তাছাড়া ওতে বড় ঝঞ্ঝাট।

—ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে আর কি—টাকা রোজগার নিয়ে বিষয়। ওতে আমার অসুবিধে হবে না। তুমি চেষ্টা করো না?

নির্মল কিছু ভাবিয়া বলিল—কিছু টাকা গোড়ায় ছাড়তে পারবে?

—কি রকম?

—তোমার কাছে আর ঢাকাঢাকি কি? কিছু টাকা পান খাওয়াতে হবে, এই…বোঝো তো সব।

—কত?

—সে তোমায় বলবো। আন্দাজ, শ' পাঁচেক—কিছু বেশীও হতে পারে।

গদাধর সাগ্রহে বলিলেন—তুমি ছাখো ভাই নির্মল। এ-টাকা আমি দেবো—তবে আমার আবার পুষিয়ে যাওয়া চাই তো! .বুঝলে না, ঘর থেকে তো আর দেবো না!

—আমি সব বুঝি। সে হয়ে যাবে। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণে।

—কবে আমায় জানাবে? ওরা কিন্তু টেণ্ডার কল্ করেচে—পনেরোই তারিখের পরে আর টেণ্ডার নেবে না।

—তাহলে কাল আমি একবার যাই—গিয়ে দেখে আসি। কি বলো?

—বেশ ভাই, তাই যাও। যাতে হয় বুঝলে তো? তোমাকে আর বেশি কি বলবো?

এই সময় অনঙ্গমোহিনী ছু'খানি রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা ও হালুয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া ছু'জনের সামনে রেকাবি ছুটি রাখিল।

নির্মল হাসিমুখে বলিল—এই তো! এতেই তো আমি বৌ-ঠাকরুণকে বলি—চোখ পালটাতে নাপালটাতে এত খাবার তৈরী হয়ে গেল!…তা,এত লুচি কেন আমার রেকাবিতে।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—খান, ও ক'খানা আপনি পারবেন এখন খেতে। চা খাবেন তো?

—তা এক পেয়ালা হলে মন্দ হয় না।

স্বামীর দিকে চাহিয়া অনঙ্গ বলিল—তোমার কিন্তু ছু' পেয়ালা হয়ে গিয়েচে। তোমাকে আর দেবো না।

গদাধর বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—তা যা হয় করো। তবে না হয় আধ পেয়ালা দিও।

—কিছু না—সিকি পেয়ালাও না। রাত্রে তারপর ঘুম হবে না—মনে নেই ?

অনঙ্গ মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—টাকাটার তাহলে যোগাড় ক'রে রেখো।

—শ'-পাঁচেক তো ? ও আর কি যোগাড় করবো, গদির ক্যাশ থেকে নিলেই হবে।

—নিজনামে হাওলাত লিখে।

—তাহলে কাল একবার যাই, কি বলো ?

—হ্যাঁ যাবে বই কি—নিশ্চয় যাবে।

অনঙ্গ চা লইয়া আসিল। গদাধরের জন্য আনে নাই, শুধু নির্ম্মলের জন্য। গদাধর জানেন তাঁহার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খুঁটিনাটি লইয়া স্ত্রী বড়ই নির্ম্মম—এখানে হাজার চাহিলেও চা মিলিবে না। সুতরাং তিনি এ-বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। নির্ম্মল বলিল—চলো বৌ-ঠাকরুণ, একদিন সবাই মিলে আড়ংঘাটায় 'যুগলকিশোর' দেখে আসি।

—বেশ তো, চলুন না।

গদাধর বলিলেন—সে এখন কেন ? জষ্টি মাসে দেখতে হয় তো।—

যুগল দেখিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে
পতিসহ থাকে স্বর্গবাসে।

স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—অতএব তোমার যদি আমার সঙ্গে স্বর্গবাসে মন থাকে, তাহলে—

অনঙ্গ সলজ্জ মুখে বলিল—যাও, সব-তাতেই তোমার ইয়ে ! আমরা এখুনি যাবো—চলো না। পরে আবার জষ্টি মাসে গেলেই হবে। আমি কখনো দেখিনি—জষ্টি মাস পর্য্যন্ত বাঁচি কি মরি !

নির্ম্মল বলিল ও আবার কি অলুক্ষুণে কথা ! মরবেন কেন ছাই ! বালাই…ষাট্…

অনঙ্গ হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—আমিও ভাই এবার চলি, কাজ আছে, একবার শিবুর মায়ের কাছে যাবো। বুড়ী আজ ক'দিন ধ'রে রোজ ডেকে পাঠাচ্চে, তার ছেলের সন্ধান ক'রে দিতে হবে। দেখি গিয়ে।

—ভালো কথা, তার আর কোনো সন্ধান পাও নি ?

—সন্ধান আর কি পাবো ? কলকাতাতেই আছে, চাকরি খুঁজতে গিয়েচে। দুদিন পরে এসে হাজির হবে। এক্ষেত্রে যা হয়। মামার তাড়ায় আর বকুনিতে দেশ ছেড়ে পালিয়েচে। যেমন মামা, তেমনি মামি।—এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্ !

—মাঝে প'ড়ে শিবুর মা'র হয়েচে বিষম দায়। ভাইয়ের বাড়ী প'ড়ে থাকে, সহায় সম্পত্তি নেই—এই বয়সে যায়ই বা কোথায় ? তার ওপর ছেলেটির ওই ব্যাপার !

—আচ্ছা, তাহলে আসি ভাই !

—দাঁড়াও, দাঁড়াও।

দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া গদাধর নির্মলের হাতে তিনটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

—এ আবার কেন, এ আবার কেন ? বলিতে বলিতে নির্মল টাকা ক'টি ট্যাঁকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল—গায়ে সে জামা দিয়া আসে নাই—মাত্র গেঞ্জি গায়ে আসিয়াছিল।

গদাধর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিলেন, অনঙ্গ তখনও বসিয়া বসিয়া একরাশ লুচি ভাজিতেছে। একটু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—এ কি গো, এত লুচির ঘটা কেন আজ বলো তো ?

—কেন আর, আমি খাবো। আমার খেতে নেই ? এ সংসারে শুধু খেটেই মরবো, ভালো মন্দ খাবো না ?

—না, আজ এত কেন—তাই বলচি।

অনঙ্গ টানিয়া-টানিয়া বলিল—তুমি খাবে, আমি খাবো, ভড়-মশায় খাবেন,—সবাইকে যে নেমন্তন্ন করেচি আজ, জানো না ?

বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখে চাহিতেই গদাধর বুঝিলেন, স্ত্রীর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। স্ত্রীর এই বিশেষ ভঙ্গিটি তিনি আজ তেরো বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন—কৌতুক করিয়া মিথ্যা বলিবার পরে ভঙ্গিটি করিয়াই অনঙ্গ নিজের মিথ্যা নিজে ধরাইয়া আসিতেছে চিরকাল—অথচ খুব সম্ভব সে নিজে তাহা বুঝিতে পারে না।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ভালোই তো। আমি কি বারণ করেচি ?

—না গো না। আজ শিবুর মাকে রাত্রে এখানে খেতে বলেচি। আহা, বুড়ীর বড় কষ্ট ! ছেলেটা অমনি হলো, ভাই-বউয়ের যা মুখ-ঝংকার ! ক্ষুরে নমস্কার, বাবা ! বুড়ীকে দাঁতে পিষতে শুধু বাকি রেখেচে ! না দেয় দুটো ভালো ক'রে খেতে, না দেয় পরনে একখানা ভালো কাপড়—কি ক'রে যে মানুষ অমন পারে !

—তা বেশ, ভালো, ভালো। খাওয়াও না। আমায় আগে বললে না কেন ? একদিনের জন্যে যখন খাওয়াবে, তখন একটু ভালো করেই খাওয়াতে হয়। রাধানগর থেকে সন্দেশ মিষ্টি আনিয়ে দিতাম—হলো-বা একটু দই···

—দই ঘরে পেতেচি। খাসা দই হয়েছে। খেও একটু—পাতে দেবো এখন। মিষ্টি তো পেলাম না—নারকোলের সঙ্গে ক্ষীর মিশিয়ে সন্দেশ করবো, ভাবচি।

—এখনও করবে, ভাবচো ? কত রাত্রে বুড়ীকে খেতে দেবে ?

—সব তো হয়ে গেল। লুচি ক'খানা ভাজা হয়ে গেলেই নারকোল কুরে বেটে সন্দেশ চড়িয়ে দেবো। ক্ষীর করে রেখেচি—ওগো, আমায় একটু কপ্‌পুর আনিয়ে দাও না !

—এখন কি কপ্‌পুর পাওয়া যাবে ? আগে থেকে সব বলো না কেন ? এ কি কলকাতা শহর ? রাধানগর ভিন্ন জিনিস মেলে ? দেখি, বিশুর দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েচে কিনা। যদি পাওয়া যায়, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গদাধরের পৈতৃক-আমলের ছোট একখানি তালুক ছিল। সেখানে ইহাদের একটি কাছারিঘর ও বহুকালের পুরানো গোমস্তা বিদ্যমান।

বেশ শীত পড়িয়াছে—একদিন গদাধর স্ত্রীকে একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিলেন—ওগো, আজ সকাল-সকাল রান্না করে ফেল তো—আমপাড়া-ঢবঢবির গোমস্তা পত্র লিখেচে। কিছু আদায়-তশিল দেখে আসি।

অনঙ্গ পছন্দ করে না, স্বামী কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকে। কথা শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কতদিন থাকবে?

—তা ধরো যে ক'দিন লাগে। দিন-ছ'সাত হবে বোধ হচ্চে।

—এত দিন তো কোনোকালে থাকো না। আমপাড়া-ঢবঢবি শুনেচি অতি অজ-পাড়াগাঁ। খাবে-দাবে কি? থাকবে কোথায়?

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—সে ভাবনা তোমার চেয়ে আমার কম নয়, কারণ আমি সেখানে থাকবো। আমাদের সেখানে কাছাড়িবাড়ী আছে, ভাবনা কি? গাঙ্গুলিমশাই বহুকালের গোমস্তা। সব ঠিক ক'রে রাখবেন।

অনঙ্গ চিন্তিত মুখে বলিল—এই সেদিন অমন সর্দ্দি-কাশি গেল, এখনো তেমন সেরে ওঠো নি। ভারি তোমাদের কাছারিঘর! টিনের বেড়া, খড়ের ছাউনি। গল্‌গল্‌ করে হিম আসে। কি ক'রে কাটাবে, তাই ভাবচি। এখন না গেলেই নয়?

—কি ক'রে না গিয়ে পারা যায়? পৌষ-কিস্তির সময় এসে পড়লো, যেতেই হবে।

—আজই কেন? কাল যেও।

—যখন যেতেই হবে, তখন আজ আর কাল ক'রে কি লাভ? বরং যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়···

—আমায় নিয়ে চলো।

গদাধর বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—তোমাকে! ঢবঢবির কাছারি-বাড়িতে? সে জায়গা কেমন তুমি জানো না, তাই বলচো। পুরুষমানুষে থাকতে পারে—মেয়েমানুষ থাকবে কোথায়? একখানা মোটে ঘর। সে হয় কি ক'রে।

—অতদিন লাগিও না, দু'তিন দিনের মধ্যে এসো তবে।

—কাজ শেষ হ'লে আমি কি সেখানে ব'সে থাকবো? চলে আসবো।

গদাধর বেলা দুইটার পরে গরুরগাড়ী যোগে আমপাড়া রওনা হইলেন। ছ'সাত ক্রোশ পথ—মাঠ ও বিলের ধার দিয়া রাস্তা—ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার দিকে বেশ শীত করিতে লাগিল।

গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—সামনে তো কাপাসডাঙ্গা, তারপর নদী পেরুবি কি ক'রে? জল কত?

—জল নেই। হেঁটে পার হওয়া যায়।

নদীর ধারে ছোট্ট দোকান। অনঙ্গ পাঁচ ছ'দিনের মত চাল, ডাল, মশলা, তেল, ঘি কিছুই দিতে বাকী রাখে নাই—তবু ও গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—দেখ্‌ তো, সোনা-

মুগের ডাল আছে কি না দোকানে?

জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া গাড়োয়ান জানাইল, ডাল নাই।

—তবে দেখ্, ভালো তামাক আছে?

জানা গেল, তামাক আছে—তবে চাষী লোকের উপযুক্ত। ভদ্রলোক সে তামাক খাইতে পারিবে না।

গদাধর বিরক্ত-মুখে বলিলেন—পার হ দেখি—সাবধানে গাড়ী নামা নদীতে। আমি কি নেমে যাবো?

—নামবেন কেন বাবু? গাড়ীতে ব'সে থাকুন। ভয় নেই।

গাড়ী পার হইয়া ওপারে গেল। লম্বা শিশু-গাছের সারি···তলা দিয়া রাস্তা।

অন্ধকার নামিয়া আসিল। গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—হুঁশিয়ার হয়ে চল্, এ পথ ভালো নয়।

গাড়োয়ান পিছন ফিরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই আবার সামনের দিকে মুখ ফিরাইয়া গরুর লেজ মলিতে-মলিতে বলিল—কোন্ ভয়ডার কথা বলচেন বাবু? ভূতির, না মানুষির?

—ভূতটুত নয় রে বাপু। মানুষের ভয়ই বড় ভয়।

—কোনো ডর করবেন না বাবু—সে-সব এদানি আর নেই।

—তুই তো সব জানিস্! আর-বছর চত্তির মাসে এ-পথে রাধানগরের সাতকড়ি বসাককে খুন করে, মনে নেই?

গাড়োয়ান চুপ করিয়া রহিল। তাহাতে গদাধর যেন বেশি ভয় পাইলেন, বলিলেন—কি, কথা বলচিস্ নে যে বড়?

—কথাডা মনে পড়েচে, বাবু।

—তবে? হুঁশিয়ার হয়ে চল্।

—চলুন বাবু, যা কপালে থাকবার, হবে!

—বুঝলাম। নে, একটু তামাক সাজ দিকি। চকমকি আছে, সোলা আছে, নে···

সত্যই ঘোর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। গদাধরের হাতে টাকাকড়ি নাই সত্য—কিন্তু সোনার আংটি আছে, বোতাম আছে—সামান্য দশ-বারো টাকা নগদও আছে। পল্লীগ্রামে লুটেরা-ডাকাতের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ইহার অপেক্ষা অনেক কম অর্থের জন্যও তাহারা মানুষ খুন করিয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে।

গাড়োয়ানটা কথা বলে না কেন? গদাধর বলিলেন—কি রে, জাল্‌লি?

—আজ্ঞে বাবু, সোলা ভিজে!

—তোর মুণ্ডু। দে, আমার কাছে দে দিকি।

গদাধরের আসল উদ্দেশ্য তামাক খাওয়া নয়, কথাবার্তায় ও হাতের কাজ লইয়া ভয়ের চিন্তা ভুলিয়া অন্যমনস্ক থাকা। তামাক ধরাইয়া নিজে খাইয়া গাড়োয়ানকে কলিকা দিবার

সময় যেন তাঁহার মনে হইল রাস্তার পাশেই গাছের সারির মধ্যে সাদামত কি নড়িতেছে।

গাড়োয়ানকে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিলেন—কি রে গাছের পাশে?

গাড়োয়ান ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল—ও কিছু না বাবু। আপনি ভয় পাবেন না—এ-পথে গাড়ী চালিয়ে চালিয়ে বুড়ো হয়ে মরতি গ্যালাম, ভয়-ভীত কিছু নেই বাবু। শুয়ে পড়ুন ছইয়ের ভেতর।

কিন্তু গাড়োয়ানের কথায় গদাধরের ভয় গেল না। তিনি ছইয়ের ফাঁক দিয়া একবার এদিক, একবার ওদিক দেখিতে-দেখিতে দূর হইতে সোনামুড়ির ডোমপাড়ার আলো দেখিলেন। আর ভয় নাই, সোনামুড়িতে লোকজনের বাস আছে—মধ্যে একটা বড় মাঠ—তারপরই ঢবঢবির বিল চোখে পড়িবে।

সোনামুড়ি গ্রামে ঢুকিতেই দেখা গেল, তাঁহার কাছারির পিয়াদা মানিক শেখ লণ্ঠন হাতে আসিতেছে তাঁহাদের আগাইয়া লইতে।

মানিক সেলাম করিয়া বলিল—বাবু আসচেন?

—হ্যাঁ রে…গোমস্তামশায় কোথায়?

—কাছারিতে ব'সে আছেন। বাবুর খাওয়ার যোগাড় করতি পাঠালেন মোরে—দুধের বন্দোবস্ত করতি এয়েলাম ডোমপাড়ায়।

—চ গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে।

কাছারি পৌঁছিয়া গাড়ী রাখা হইল। গদাধর নামিয়া কাছারির মধ্যে ঢুকিতেই গোমস্তা গাঙ্গুলিমশায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—আসুন বাবু, আসুন! আপনার জন্যে সন্দে থেকে 'ব'সে আছি। এই আসেন, এই আসেন! বড্ড দেরি হয়ে গেল বাবুর। খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ক'রে রেখেচি।

—নমস্কার গাঙ্গুলিমশায়। ভালো আছেন?

—কল্যাণ হোক। বসুন। ওরে, বাবুর হাত-পা ধোয়ার জল এনে দে বাইরে।

গদাধর হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া আদায়পত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। রাত বেশি হইল, নিকটেই ব্রাহ্মণপাড়ায় গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী হইতে খাবার আসিল। আহারাদি সারিয়া শুইবার সময় গদাধর বলিলেন—রাত্রে এখানে মানিক শেখকে থাকতে বলুন গাঙ্গুলিমশায়। একা থাকা, মাঠের মধ্যে কাছারি…

গাঙ্গুলিমশায় হাসিয়া বলিলেন—কোনো ভয়-ভীত নেই এখানে। মানিকও থাকবে-এখন—আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে শুয়ে পড়ুন।

গদাধর গৃহস্থ মানুষ। নিজের বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র শুইতে খুব বেশি অভ্যস্ত নহেন, তাঁহার কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। এ-ধরণের ঘরে মানুষ শুইতে পারে? টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়া হিম আসিতেছে দস্তুরমত। অনঙ্গ কাছে নাই। ছেলে-মেয়ের কথা মনে পড়িয়া বিশেষ করিয়া কষ্ট হইতে লাগিল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এপাশ ওপাশ করিবার পরে গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশ হইল। শেষরাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথায় শুইয়া আছেন?

ঢবঢবির কাছারিবাড়ীতে। কেমন একটু ভয়-ভয় হইল। ডাকিলেন—মানিক, ও মানিক···

মানিক সম্ভবতঃ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সাড়া পাওয়া গেল না।

গদাধর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভোর হইলে গদাধর উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া কাছারিতে বসিলেন। প্রজাপত্র আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ একটা পাঁঠা, কেহ-বা গোটাকতক ডিম, কেহ বড় একটা লাউ প্রভৃতি আনিয়াছে জমিদারবাবুকে ভেট্ দিতে—নানাবিধ জিনিসপত্রে কাছারি-ঘর ভরিয়া গেল—তার মধ্যে তরি-তরকারিই বেশি। বেলা এগারোটার মধ্যে প্রায় সাতশত টাকা আদায় হইল।

গাঙ্গুলিমশায় বলিলেন—বাবু আপনি এসেছেন ব'লে এই আদায়টা হলো। নইলে এ টাকা আদায় হতে একমাস লাগতো। আপনাদের নামে যা হবে, আমার হাজার-বার তাগাদাতেও তা হবে না।

—আজ বাড়ী ফিরতে পারি তো?

—আরও ক'দিন থাকুন। হাজার-তিনেক টাকা এবার আদায় হয়ে যাবে। প্রজার অবস্থা এবার ভালো।

গদাধর প্রমাদ গণিলেন। একটা রাত যে-কষ্টে কাটাইয়াছেন প্রবাসে, আরও কয়েক রাত কাটাইতে হইলেই তো তিনি গিয়াছেন। এমন ঘরে বেশি দিন বাস করা যায়? বিশেষ এই শীতকালে? গদাধরের পিতাঠাকুর বৎসরে দু'বার করিয়া এখানে তাগাদায় আসিতেন—তিনি এই বছর-পাঁচেক পরলোকগত হইয়াছেন—ইহার মধ্যে গদাধর আসিয়াছেন বছর-দুই পূর্ব্বে একবার, আর একবার এই এখন। গোমস্তা পত্র লিখিয়া আসিতে পীড়াপীড়ি না করিলে তিনি বড়-একটা এখানে আসিতে চাহেন না। আরামে মানুষ হইয়াছেন, এমন ধরণের কষ্ট তাঁহার সহ্য হয় না!

আরও তিন দিন কাটাইয়া প্রায় দেড় হাজার টাকা আদায় হইল। গাঙ্গুলি-মশায় খুব খুশী। কাছারিতে একদিন ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। মাতব্বর প্রজারা জমিদারের নিমন্ত্রণে কাছারিবাড়ী আসিয়া পাত পাড়িয়া খাইয়া গেল। গদাধর নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের খাওয়ানোর তদারক করিতে লাগিলেন।

সব মিটিয়া গেলে গদাধর গাঙ্গুলি-মশায়কে ডাকিয়া বলিলেন—তাহলে আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন এবার।

—আজ হয় না বাবু, আজ রাত্রে আমার বাড়ী সত্যনারায়ণ পুজো—আপনাকে একবার সেখানে যেতে হবে।

—বেশ, তবে কাল সকালেই গাড়ীর ব্যবস্থা রাখবেন।

—কাল আপনি যাবেন, সঙ্গে আমিও যাবো। অতগুলো টাকা নিয়ে আপনাকে একলা যেতে দেবো না, বাবু।

সন্ধ্যার পরে গাঙ্গুলি-মশায়ের বাড়ী বেশ-সমারোহের সহিত সত্যনারায়ণের পূজা হইল।

গ্রামের সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ শেষ করিয়া গাঙ্গুলি-মশায় উঠানে গ্রাম্য তর্জ্জা-দলের আসর পাতিয়া দিলেন। ঘুমে চোখ ভাঙিয়া আসা সত্ত্বেও গদাধরকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত বসিয়া তর্জ্জা শুনিতে হইল—পাঁচ টাকা বকশিশও করিতে হইল—জমিদারী চাল বজায় রাখিতে।

সকালে রওনা হইয়া গদাধর বেলা দশটার মধ্যে বাড়ী পৌছিয়া গেলেন। পাঁচ দিন মাত্র বাহিরে ছিলেন—যেন কতকাল বাড়ী ছাড়িয়াছেন, যেন কতকাল দেখেন নাই স্ত্রী-পুত্রকে। ছোট ছেলে টিপুকে দেখিয়া কাছে বসাইয়া আদর করিয়া তবে মনে হইল, নিজের বাড়ীতেই আসিয়াছেন বটে—কতকাল পরে যেন।

অনঙ্গ আসিয়া বলিল—এতদিন থাকতে হবে ব'লে গেলে না তো! ভালো ছিলে? আমি কাল-পরশু কেবল ঘর-বার করেচি,—এই তুমি আসছো…এই তুমি আসচো! তা, একটা খবরও তো দিতে হয়!

দুজনে কেহ কখনও কাহাকে ফেলিয়া দীর্ঘদিন থাকে নাই, থাকিতে অভ্যস্ত নয়—নিতান্ত ঘরকোণা গৃহস্থ বলিয়া—পাঁচ দিনের অদর্শন ইহাদের পরস্পরের পক্ষে পাঁচ মাসের সমান!

অনঙ্গ এই পাঁচ দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। সেখানে কি-রকম খাওয়া-দাওয়া, কে রাঁধিল, থাকার জায়গায় সুবিধা কেমন—ইত্যাদি। গদাধরও সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন এই পাঁচ দিনের ব্যাপার—যেন তিনি কাশ্মীর ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া ফিরিলেন!

অনঙ্গ বলিল—ক'দিন ভালো খাওয়া-দাওয়া হয় নি, আজ কি খাবে, বলো?

—যা হয় হবে, আগে একটু চা।

—এত বেলায়? সেখান থেকে চা খেয়ে বেরোও নি—গা ছুঁয়ে বলো তো!

—ওই অমনি এক পেয়ালা।

—এখন আর চা খায় না।

—ওই তোমার দোষ। গরুর গাড়ীতে এলাম শরীর ব্যথা ক'রে,—একটু গরম চা না হোলে…

—আচ্ছা, তবে আধ-পেয়ালা দেবো, তার বেশি কক্ষনো পাবে না।

গদাধর এ-কথা বলিলেন না যে, গত পাঁচ-দিন কাছারি বাড়ীতে মনের সাধ মিটাইয়া এবেলা চার পেয়ালা, ওবেলা চার পেয়ালা প্রতিদিন চালাইয়াছেন! আজও সকালে আসিবার আগে দুটি পেয়ালা উজাড় করিয়া তবে গাড়িতে উঠিয়াছিলেন।

অনঙ্গ চা আনিয়া দিয়া বলিল—নির্ম্মল তোমায় খুঁজে-খুঁজে হয়রান্।

—কেন?

—তা আমায় বলে নি, রোজ এসে বলে—বৌদি, আজ এ খাওয়াও, বৌদি, আজ ও খাওয়াও—বিরক্ত করেচে!

—তাতে কি হয়েছে ! বন্ধুলোক—খাবে না ? আদর ক'রে কেউ খেতে চাইলে···

—সে আমি জানি গো, জানি। তোমার বন্ধু খেতে পায় নি, তা নয়। আমি তেমন বাপের মেয়ে নই। খেতে চেয়ে কেউ পায় না, এমন কখনো হয় নি আমার কাছে।

—সে কথা যাক্। এখন আমাকে কি খেতে দেবে, বলো ?

—অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—এখন বলবো না, খেতে ব'সে দেখবে !

—কি, শুনি না ?

—পিঠে-পুলি, পায়েস।

—খুবভালো—সেখানেব'সে-ব'সে ভাবতাম,শীতকালে, একদিনপিঠে মুখেওঠেনি এখনও।

—যত খুশী খেও-এখন।

স্ত্রীর সেবা-যত্নের হাত ভালো। অনঙ্গ কাছে বসিয়া স্বামীকে যত্ন করিয়া খাওয়াইল—পান সাজিয়া ডিবায় আনিয়া বিছানার পাশে রাখিয়া বলিল—ঘুমোও একটু। গাড়ীতে আসতে বড্ড কষ্ট হয়েচে, না ?

গদাধর আদর বাড়াইবার জন্য বলিলেন—পিঠটায় যা ব্যথা হয়েচে—একেবারে শির-দাঁড়ায়। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে···

অনঙ্গ ব্যস্ত হয়ে বলিল—এতক্ষণ বলো নি ? দাঁড়াও, তেল গরম করে আনি।

—এখন থাক্। ঘুমিয়ে উঠি, তারপর।

—আমি যাই, মশারি ফেলে দিয়ে আসি। মাছি লাগবে।

গদাধরের ঘুম ভাঙিল বৈকালের দিকে। সত্যই গায়ে ব্যথা হইয়াছে বটে, তিনি যে স্ত্রী-কে নিতান্ত মিথ্যা বলিয়াছেন—এখন দেখা যাইতেছে, তাহা নয়। সেদিন সন্ধ্যার দিকে গদাধরের জ্বর আসিল। রাত্রে কিছু খাইলেন না—অনঙ্গ ডাক্তার ডাকাইল। কুইনাইনের ব্যবস্থা হইল। কারণ, ডাক্তারের মতে এটা খাঁটি ম্যালেরিয়া-জ্বর ছাড়া আর কিছু নয় !

পরদিন সকালে নির্ম্মল দেখা করিতে আসিল। অনঙ্গ তখন সেখানে ছিল না, গদাধর বলিলেন—ওদিকে কিছু হলো ?

—এবার কিছু টাকা ছাড়ো···হয়েছে একরকম।

—কত —

—তা আমি অনেক কষ্টে শ'পাঁচেক দাঁড় করিয়েছি।

—কাজ কেমন পাওয়া যাবে ? টেণ্ডার পাঠিয়ে দিয়েচি।

—হাজার পাঁচ-ছয় টাকার কাজ হবে, মনে হচ্ছে !

—তাহ'লে একরকম পোষাতে পারে। তবে একটা কথা, তোমার বৌদিদি যেন না টের পায় !

নির্ম্মল ধূর্ত্তের হাসি হাসিয়া বলিল—আমি এত কাঁচা ছেলে, তুমি ভেব না। কাক-পক্ষীতে জানতে পারবে না।

—কাল বিকেলের দিকে এসো। টাকা যোগাড় ক'রে রেখে দেবো।

দুই

মাসখানেক কাটিয়া গেল।

একদিন গদিতে গদাধর উপস্থিত আছেন, ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ তো সব বিলি হয়ে গেল বাবু, আজ আমার শালার কাছে খবর পেয়েচি। আপনার কিছু হয়েচে ?

—হয়েচে, তবে খুব বেশি নয়। হাজার-দুই টাকার কাজ পাওয়া গিয়েচে।

—যাহয় তবু কিছু আসবে-এখন।

গদাধর অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—তা তো বটেই।

ইতিপূর্ব্বেই তিনি মনে-মনে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—এ-কাজে তাঁহার বিশেষ কোনো লাভ হইবে না। পাঁচশত টাকা ঘুষ দিয়াও নির্ম্মল ইহার বেশি কাজ যোগাড় করিতে পারে নাই—সে যত বলিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক কাজও পাওয়া যায় নাই।

নির্ম্মল নিজেও সেজন্য খুব লজ্জিত। কথাটা অবশ্য গদাধর কাহাকেও বলেন নাই—নির্ম্মল বন্ধুলোক, সে যদি চেষ্টা করিয়াও কাজ না পাইয়া থাকে তবে তাহার আর দোষ কি ?

কিন্তু চতুর ভড়মহাশয় একদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো,ভাবচি। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি, বলুন ?

—নির্ম্মলবাবুকে কি কিছু টাকা দিয়েছিলেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজের জন্যে ?

—না, কে বললে ?

—আমি এমনি জিগ্যেস্ করচি বাবু। তা'হলে কথাটা সত্যি নয় ? যাক্, তবে আর ও-কথার দরকার নেই।

গদাধর চাহেন না, ইহা লইয়া নির্ম্মলকে কেহ কিছু বলে। এ কথা শুনিলে অনেকে অনেক রকম কথা বলিবে, তিনি জানেন—সুতরাং এ-বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। ভড়মহাশয়ও নিজের হিসাবের খাতায় মনোনিবেশ করিলেন।

গদাধর অভাবগ্রস্ত লোক হইলে হয়তো এ-সব কথায় তাঁহার খট্‌কা লাগিত। কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় এই পল্লীগ্রামে বসিয়া তাঁহার মাসে চার-পাঁচশো টাকা আয়। পল্লীগ্রামের পক্ষে এ-আয় কম নয়। সংসারে খরচও এমন কিছু বেশি নয়—কিছু দান-ধ্যানও আছে। টাকার যে মূল্য অপরে দিয়া থাকে, গদাধরের কাছে টাকার হয়তো তত মূল্য নাই !

অনঙ্গ একদিন বলিল—আচ্ছা, এবার আমাদের বাসন্তীপূজাটা করলে হয় না ?

—গদাধর বলিলেন—তোমার ইচ্ছা হয় তো করি।

—আমার কেন ? তোমার ইচ্ছে নেই ?

—পূজা-আচ্ছা বিষয়ে তুমি যা বলো। আমি একটু অন্যরকম, জানোই তো।

—পুজো হোক্, আর কাঙালী-ভোজন করানো যাক্, কি বলো?

—তাতে আমার অমত নেই।

—ভালো কারিগর এনে ঠাকুর গড়াও···কেষ্টনগরের কারিগর আনালে কেমন হয়?

—তুমি যা বলো! বলেচি তো, ও-বিষয়ে আমি কোনো কথা বলবো না।

গদাধর জানেন, স্ত্রীর ঝোঁক আছে এদিকে। লোককে খাওয়াইতে-মাখাইতে সে ভালোবাসে। এ-পর্যন্ত তাঁহাদের বাড়ী অতিথি আসিয়া ফেরে নাই—যত বেলাতেই আসুক না কেন, অনঙ্গ অনেক সময় মুখের ভাত অতিথিকে খাওয়াইয়া, মুড়ি খাইয়া একবেলা কাটাইয়াছে। কারণ অত বেলায় কে আবার রান্নার হাঙ্গামা করে? এ-সব বিষয়ে গদাধর কোন কথা বলিতেন না। স্ত্রী যা করে, করুক।

অনেকদিন আগের কথা।

অনঙ্গ তখন ছেলেমানুষ—সবে নববধূ-রূপে এ-বাড়ীতে পা দিয়াছে। একদিন কোথা হইতে দুটি ভিক্ষুক আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল। বেলা তখন দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গদাধরের মা বলিয়া পাঠাইলেন, এমন অসময়ে এখানে কিছু হইবে না।

অনঙ্গ শাশুড়ীকে বলিল—মা, একটা কথা বলবো?

—কি বৌমা?

—আমার ভাত এখনও রয়েচে। মাথাটা বড্ড ধরেচে, আমি আর এবেলা খাবো না, ভাবচি। ওই ভাত ওদেরকেই দিয়ে দিন না?

বধূর এ-কথায় শাশুড়ী কিন্তু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—ও আবার কি কথা বৌমা? মুখের ভাত ধ'রে দিতে হবে কোন্ জগন্নাথ-ক্ষেত্তরের পাণ্ডা আমার এসেচেন! রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে। এবেলা না খাও, ওবেলা খাবে, ঢেকে রাখো, মিটে গেল।

কিন্তু অনঙ্গ পুনরায় বিনীতভাবে বলিল—তা হোক না, আপনার পায়ে পড়ি। ওদের দিয়ে দিই। আমার খিদে নেই—সত্যি।

শাশুড়ী অগত্যা বধূর কথামত কার্য্য করিলেন।

গদাধর অনঙ্গকে এ-সব বিষয়ে কখনো বাধা দেন নাই, তবে অতিরিক্ত উৎসাহও কখনো দেন নাই—তাহাও ঠিক। নিজে তিনি ব্যবসায়ী লোক, অর্থাগম ছাড়া অন্য-কিছু বড় বোঝেন না—আগে-আগে পড়াশুনার বাতিক ছিল, কারণ গদিয়ান ব্যবসাদার হইলেও তিনি গোয়াড়ি কলেজ হইতে আই. এ. পাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি টাকা উপার্জ্জনের নেশায় জীবনের অন্য সব বাতিক ধামা-চাপা পড়িয়াছে।

অনঙ্গ নিজেও বড়-ঘরের মেয়ে। তাহার পিতা নফরচন্দ্র মিত্র একসময়ে রাধানগর পরগণার মধ্যে বড় তালুকদার ছিলেন। ভূসিমালের ব্যবসা করিয়াও বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষের দিকে বড় ছেলেটি উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির হইয়া নানারকম বদখেয়ালে টাকা নষ্ট করিতে থাকে, বৃদ্ধও মনের দুঃখে শয্যাগত হইয়া পড়েন। ক্রমে একদিকের অঙ্গ

পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায়। গত বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অনঙ্গ তাহার এই দাদাকে খুব ভালবাসিত। নানারকমে তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াও শেষ-পর্য্যন্ত কিছুই হইল না—তাই সে এখন মনের দুঃখে বাপের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। তাহার দাদাও ভগ্নীপতির গৃহে কালে-ভদ্রে পদার্পণ করে।

গদাধর বোঝেন ব্যবসা, পয়সা উড়াইবার মানুষ তিনি নহেন! কোনো প্রকার শৌখিনতাও নাই তাঁহার। এমন কি, হাতে পয়সা থাকা সত্ত্বেও বাড়ী-ঘর কেন সারাইতেছেন না—ইহা লইয়া ঘরে-পরে বিস্তর অনুযোগ সহ্য করিয়াও তিনি অটল। তাঁর নিজের মত এই যে, চলিয়া যখন যাইতেছে, তখন এই অজ পাড়াগাঁয়ে ঘর-বাড়ীর পিছনে কতকগুলা টাকা ব্যয় করিয়া লাভ নাই!

একদিন তাঁহার এক আত্মীয় কী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ী-ঘর দেখিয়া বলিল—গদাধর, বাড়ী-ঘর এমন অবস্থায় রেখেচো কেন?

—কেন বলো তো?

—জানালা নেই—চট টাঙিয়ে রেখেচো, দেওয়াল প'ড়ে গিয়েচে, দরমার বেড়া—তোমার মত অবস্থার লোকে কি এরকম করে?

—তুমি কি বলো?

—ভালো ক'রে বাড়ী করো, পুজোর দালান দাও, বৈঠকখানা ভালো ক'রে করো—তবে তো জমিদারের বাড়ী মানাবে।

—হ্যাঃ, পাগল তুমি! কতকগুলো টাকা এখানে পুঁতে রাখি!

—তা, বাস করতে গেলে করতে হয় বইকি। এতে লোকে বলে কি?

—যা বলে বলুকগে। তুমিই ভেবে ছ্যাখো না ভাই, এই বাজারে কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে এখানে ওসব ধুমধামের কি দরকার আছে?

—এই বাড়ীতে চিরকাল বাস করবে? পৈতৃক-বাড়ী ভালো ক'রে তৈরি করো—দশ-জনের মধ্যে একজন হয়ে বাস করো।

—এখানে আর বড় বাড়ী ক'রে কি হবে? চলে তো যাচ্ছে। সে টাকা ব্যবসায়ে ফেললে কাজ দেবে। ইট গেড়ে টাকা খরচ করা আমার ইচ্ছে নয়।

তবে গদাধরের একটা শৌখিনতা আছে এক বিষয়ে। পায়রা পুষিতে তিনি খুব ভালো-বাসেন—ছাদে বাঁশ চিরিয়া পায়রার জায়গা করিয়া রাখিয়াছেন—নোটন পায়রা, ঝোটন পায়রা, তিলে খেড়ি, গিরেবাজ—শাদা, রাঙা, সবুজ সব রংয়ের পায়রার দিন রাত ডানার ঝাপট, উড়ন্ত পালকের রাশি ও অবিশ্রান্ত বক্‌বকম্ শব্দে গদাধরের ভাঙা অট্টালিকার কার্নিশ, থামের মাথা ও ছাদ জমাইয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার বিশ্বাস, পায়রা যেখানে, লক্ষ্মী সেখানে বাঁধা!

পায়রার শখে বছরে কিছু টাকা খরচ হইয়াও যায়। পায়রার প্রধান দালাল নির্ম্মল—সে কলিকাতা হইতে ভালো পায়রার সন্ধান মাঝে-মাঝে আনিয়া, টাকা লইয়া গিয়া কিনিয়া

আনে। অনঙ্গ এজন্য নির্ম্মলের উপর সন্তুষ্ট নয়। সে পায়রার কিছু বোঝে না, ভাবে, নির্ম্মল ফাঁকি দিয়া স্বামীর নিকট হইতে টাকা আদায় করে।

দুপুরের দিকে অনঙ্গ স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল—তুমি আজকাল আমার সঙ্গে কথাও বলো না···

—কে বলেচে, বলিনে?

—দেখতেই পাচ্চি। কাছে বসলে বিরক্ত হও!

—ওটা বাজে কথা। আসল কথাটা বলো, কি? মতলবটা কি?

—আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দাও।

—অনেকক্ষণ বুঝেছি, এইরকম একটা কিছু হবে।

—দেবে?

—কি হবে, শুনি?

—তা বলবো না।

গদাধর হাসিয়া স্ত্রীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন—তবে যদি আমিও বলি, দেবো না?

অনঙ্গ ডান হাতে ঘুষি পাকাইয়া তক্তপোশের উপর কিল মারিয়া বলিল—আলবৎ দিতেই হবে।

—কখন দরকার?

—আজই। এক জায়গায় পাঠাবো।

গদাধর বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—পাঠাবে? কোথায় পাঠাবে?

অনঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও বিমর্ষভাবে বলিল···দাদার কাছে।

গদাধর আর কোনো কথা কহিলেন না। শুধু বলিলেন—আচ্ছা, গদিতে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো-এখন।

তাঁহার এই বড় শালাটি মানুষ নয়, টাকা ওড়াইতে ওস্তাদ। বাপের অতবড় বিষয়টা নষ্ট করিয়া ফেলিল এই করিয়া। ছোট বোনের কাছে মাঝে মাঝে হয়তো অভাব জানায়—স্নেহময়ী অনঙ্গ মাঝে-মাঝে কিছু দেয় দাদাকে—ইহা লইয়া গদাধর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চান না।

কিন্তু একদিন এমন একটি ব্যাপার ঘটিল, যাহা গদাধর কখনো কল্পনা করেন নাই! বৈকালের দিকে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি গদির দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে একখানি গরুর গাড়ী তাঁহার বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া, পিছনে ফিরিয়া সেখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী তাঁর বাড়ীর সামনে থামিল। দূর হইতে তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন—একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিল—পুরুষটিকে তাঁহার বড় শালা বলিয়া বোধ হইল—কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে? বড় শালা তো বিপত্নীক আজ বছর-দুই···ও-বয়সের

অন্য কোনো মেয়েও তো শ্বশুরবাড়ীতে নাই।

গদাধর একবার ভাবিলেন, বাড়ীতে গিয়া দেখিবেন নাকি? পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া গদির দিকে চলিলেন। দরকার নাই ওসব হাঙ্গামার মধ্যে এখন যাওয়ার। গদিতে গিয়াই লোক দিয়া পঞ্চাশটি টাকা স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

গদির কাজ শেষ হইতে এক রাত হইয়া গেল। গদাধর বাড়ী ফিরিবার পথে ভাবিলেন, যদি শালাটি বাড়িতে থাকে, তবে তো মুশকিল! বড় শালাটি তাঁহার মধ্যে মধ্যে আসে বটে, কিন্তু গদাধরের সঙ্গে তার তত সদ্ভাব নাই। থাকিলেও আতিথ্যের খাতিরে কথাবার্তা বলিতে হইবে—কিন্তু তিনি সেটা অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তার চেয়ে নির্ম্মলের বাড়ী বেড়াইয়া একটু রাত করিয়া ফেরা ভালো।

নির্ম্মল বলিল—কি ভাই, বড় ভাগ্যি যে আমার বাড়ী তুমি এসেছো!

—একটু দাবা খেলবে?

—খেলো। চা খাবে?

—নিশ্চয়ই। চা খাবো না কি-রকম?

নির্ম্মলের অবস্থা ভালো নয়। পাঁচিল-ঘেরা উঠানের তিনদিকে তিনখানি খড়ের ঘর, একখানি ছোট রান্নাঘর—পিছনদিকে পাতকুয়া ও গোয়াল। ঘরের আসবাবপত্রের অবস্থা হীন, তক্তপোশের উপর ময়লা কাঁথাপাতা বিছানা। এতখানি রাত হইয়া গিয়াছে অথচ এখনও বিছানা কেহ পাট করিয়া পাতে নাই—সকালবেলার দিকে যে লেপখানা উল্টাইয়া ফেলিয়া বিছানা ছাড়িয়া লোক উঠিয়া গিয়াছে—সেখানা এত রাত পর্য্যন্ত সেই একই অবস্থায় পড়িয়া। ইহাতে আরও মনে হয়, বাড়ীর মেয়েরা, বিশেষ গৃহকর্ত্রী অগোছালো।

গদাধরকে সেই তক্তপোশেরই একপাশে বসিতে হইল।

নির্ম্মল বলিল—ওহে, একটা কথা শুনেচো? মঙ্গলগঞ্জের কুঠী-বাড়ী বিক্রি হচ্ছে!

—কোথায় শুনলে!

—রাধানগর থেকে লোক গিয়েছিল আজ কোর্টের কাজে—সেখানে কার মুখে শুনেচে।

—বেচবে কে?

—মালিকের ছেলে স্বয়ং। কিনে রাখো না, বাড়ীখানা!

—হ্যাঃ! আমি অত বড় বাড়ী কিনে কি করবো। তার ওপর পুরানো বাড়ী। একবার ভাঙতে শুরু হ'লে, সারাতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে! লোক নেই, জন নেই—নির্জ্জন জায়গায় বাড়ী। ভূতের ভয়ে দিনমানেই গা ছম্‌ছম্‌ করবে।

—আরে, না না—নদীর ওপর অমন খোলা আলো-বাতাসওয়ালা চমৎকার জায়গা। কিনে রাখো। সস্তায় হবে। আমার লোক আছে।

—কি রকম?

—মালিকের ছেলের সঙ্গে আমার মামাতো-ভাই শচীনের খুব আলাপ। তাকে দিয়ে ধরতে পারি।

—কত টাকায় হতে পারে, মনে হয় ?

—তা এখন কি ক'রে বলবো ? তুমি যদি বলো, তবে জিগ্যেস্ করি।

এই সময় নির্ম্মলের স্ত্রী সুধা চা ও বাটিতে তেল-মাখা মুড়ি লইয়া আসিল। গদাধর বলিলেন —এই যে সুধা বৌঠাকরুণ, আজকাল আমাদের বাড়ীর দিকে যাও-টাও না তো ?

সুধা একসময়ে হয়তো দেখিতে মন্দ ছিল না—বর্ত্তমানে সংসারের অনটনে ও খাটা-খাটুনিতে, তার উপর বৎসরে-বৎসরে সন্তান প্রসবের ফলে যৌবনের লাবণ্য ঝরিয়া গিয়া দেহের গড়ন পাকসিটে ও মুখশ্রী প্রৌঢ়ার মত দেখিতে হইয়াছে—যদিও সুধার বয়স এই ত্রিশ। সুধা হাসিয়া বলিল—কখন যাই বলুন ? সংসারের কাজ নিয়ে সকাল থেকে সন্দে পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলতে পারিনে ! শাশুড়ী মরে গিয়ে অবধি দেখবার লোক নেই আর কেউ। আপনার বন্ধুটি তো উঁকি মেরে দেখেন না, সংসারের কেউ বাঁচলো না মলো ! এত রাত হয়ে গেল—এখনও রান্না-চড়াতে পারি নি, বিছানা গোছ করতে পারিনি ! আপনি এই বিছানাতেই বসেচেন ! আমার কেমন লজ্জা করচে।

—না, না, তাতে কি, বেশ আছি।

—মুড়ি এনেছি, কিন্তু আপনার জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। আপনি কি তেলমাখা মুড়ি খাবেন ?

—কেন খাবো না ? আমি কি নবাব খান্‌জা খাঁ এলাম নাকি ? বৌ-ঠাকরুণ দেখছি হাসালে !

—তা নয়, একদিন মুড়ি খাইয়ে শরীর খারাপ করিয়ে দিলে, অনঙ্গ-দি আমায় ব'কে রসাতল করবে !

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—দোহাই বৌ-ঠাকরুণ, তাকে আর যাই বলো বলবে—কিন্তু এই চা খাওয়ানোর কথাটা যেন ককখনো তার কানে না যায়, দেখো। তাহ'লে তোমারও একদিন—আমারও একদিন !

আরো ঘণ্টাখানেক দাবা খেলিবার পরে গদাধর বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ীর চারিধারে বাঁশবনের অন্ধকারে ভালো পথ দেখা যায় না। বাড়ী ঢুকিবার পথে সেই গরুর গাড়ীখানা দেখিতে পাইলেন না।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলেন, অনঙ্গ বসিয়া-বসিয়া সেলাই করিতেছে—ঘরে কেহ নাই গদাধর বলিলেন—রান্না হয়ে গিয়েচে ?

অনঙ্গ মুখ তুলিয়া বলিল—এসো। অত রাত ?

—নির্ম্মলের বাড়ী দাবা খেলতে গিয়েছিলুম।

—হাত-মুখ ধোবার জল আছে বাইরে, দোরটা বন্ধ ক'রে দাও। বড্ড শীত।

গদাধর আড়চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার অনাহূত অতিথির চিহ্নও নাই কোনো দিকে ! তবে কি চলিয়া গেল ? কিংবা বোধহয় পাশের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে ! কিন্তু বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অছিলায় পাশের ঘরে গিয়া, সেখানেও কাহাকে দেখিলেন না।

অনঙ্গ ডাকিল—খাবে এসো।

গদাধর এ-সন্দ ও-সন্দ করিতে-করিতে খাইয়া গেলেন। নিজ হইতে তিনি কোনো কথা তুলিলেন না, বা অনঙ্গও কিছু বলিল না। আহারাদি শেষ করিয়া গদাধর শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ব্যাপারখানা কি? বড় শালা কাহাকে লইয়া বাড়ীতে আসিল···সে গেলই-বা কোথায়···তাহার আসিবার উদ্দেশ্যই-বা কি···অনঙ্গ কিছু বলে না কেন?

সে রাত্রি এমনি কাটিয়া গেল।

পরদিন গদাধর চা খাইতে বসিয়াছেন সকালে, অনঙ্গ সামনে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—ওগো, একটা কাজ ক'রে ফেলেচি—বকবে না, বলো?

—কি?

—আগে বলো, বকবে না?

—তা কখনো হয়? যদি মানুষ-খুন করে থাকো, তবে বকবো না কি-রকম?

—সে-সব নয়। কাল দাদা এসেছিল, তার একশো টাকার নাকি বড্ড দরকার! তোমাকে লুকিয়ে দিতে বলে। আমি তোমাকে লুকিয়ে কখনো কোনো কাজ করেচি কি? এ-টাকাটা আমি দিয়েছি কিন্তু।

—খুব অন্যায় কাজ করেচো। এ-টাকা সেই পঞ্চাশ টাকা বাদে?

—হ্যাঁ—না—হ্যাঁ, তা বাদেই!

গদাধর আশ্চর্য হইয়া গেলেন। পঞ্চাশ টাকা তিনি স্বেচ্ছায় দিয়ে গেলেন, ইহাই যথেষ্ট। আবার তাহা বাদে আরও একশো টাকা লোকটা ঠকাইয়া আদায় করিয়া লইয়া গেল! তিনি গরুরগাড়ী হইতে শালাকে নামিতে দেখিয়া তখনই ফিরিয়া আসিলে পারিতেন—তাহা হইলে এই একশো টাকা আক্কেল-সেলামি দিতে হইত না। বলিলেন—সে গুণ্ডাটা একা ছিল?

—ও আবার কি-ধরণের কথা দাদার ওপর? অমন বলতে নেই, ছিঃ! হাজার হোক, আমার দাদা, তোমার গুরুজন। আমাদের আছে, আত্মীয়-স্বজনের বিপদে-আপদে হাত পেতে যদি কেউ চায়, দিতে দোষ নেই। দাদার সম্বন্ধে অমন বলতে আছে? তার বুঝ সে বুঝবে—আমরা ছোট হতে যাই কেন?

গদাধর আরও রাগিয়া বলিলেন—টাকা আমার গুণ্ডাবদমাইশদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্যে হয় নি তো? কেন বলবো না, একশোবার বলবো। এ কেমন অত্যাচার, শুনি? আছে বলেই ভগ্নিপতির কাছ থেকে তার সিন্দুক ভেঙে টাকা নিয়ে যাবে?

—সিন্দুক ভেঙে তো নেয় নি—কেন মিছে চেঁচামেচি করচো!

—আমি এসব পছন্দ করি নে। সৎকাজে টাকা ব্যয় করতে পারা যায়—তা ব'লে এই সব জুয়োচোর আর গুণ্ডাকে···

—আবার ওই সব কথা দাদাকে? ছি, অমন বলতে নেই। টাকা গেল-গেল, তবু তো লোকের কাছে ছোট হলাম না।

—এ আবার কেমন বড় হওয়া ? তোমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়ে গেল টাকাটা ! আমি থাকলে…

—যাক্, আর কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বার কোরো না ! হাজার হোক, আমার দাদা… ।

—একা ছিল ?

—কেন ?

—বলো না ।

—সে কথা বললে আরও রাগ করবে । সঙ্গে কে একজন মাগী ছিল, আমি তাকে চিনিনে । আমার মনে হলো, ভালো নয় । আমি তাকে ঘরে-দোরে ঢুকতে দিই নি । অমন ধরণের মেয়েমানুষ দেখলে আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করে । সে বাইরে এসেছিল । ভদ্রতার খাতিরে চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলাম—বাইরে ব'সে খেলে ।

—কোত্থেকে তাকে জোটালে তোমার দাদা ?

—কি ক'রে জানবো ? তবে আমার মনে হলো, টাকাটা ওই মাগীকেই দিতে হবে দাদার । ভাবে তাই মনে হলো । দাদা দেনদার, মাগী পাওনাদার—দাদার মুখ দেখে মনে হলো, টাকা না দিলে তাকে অপমান হতে হবে ।

—ওসব ঢং অনেক দেখেচি ! ছি-ছি, আমার বাড়ীতে এই সব কাণ্ড ! আর তুমি কি না…

—লক্ষীটি, রাগ কোরো না । আমার কি দোষ, বলো ? আমি কি ওদের ডেকে আনতে গিয়েছি ? আমি তাই দেখে দাদাকে এখানে থাকতে খেতে পর্য্যন্ত অনুরোধ করি নি ! টাকা পেয়ে চ'লে গেল, আমি মুখে একবারও বলি নি যে, রাতটা থাকো ! আমার গা-কেমন করছিল, সত্যি বলচি, মাগীটাকে দেখে !

—যাক্, খুব হয়েচে । আর কোনোদিন যেন তোমার ওই দাদাটিকে…

—আচ্ছা সে হবে । তুমি কিন্তু কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বার কোরো না, পায়ে পড়ি । চুপ ক'রে থাকো ।

গদাধর আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন ।

এক সপ্তাহের মধ্যে মঙ্গলগঞ্জের কুঠী সম্বন্ধে নির্ম্মল কয়েকবার তাগাদা করাতে একদিন তিনি নৌকাযোগে কুঠীবাড়ী দেখিতে গেলেন— সঙ্গে রহিল নির্ম্মল । নৌকাপথে দুই ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা কুঠীবাড়ীর ঘাটে গিয়া পৌছিলেন । সে-কালের আমলের বড় নীলকুঠী—ঘাট হইতে উঠিয়া দু'ধারে ঝাউ গাছের সারি, মস্ত বাঁধানো চাতাল—বাঁ-ধারে সারি সারি আস্তাবল ও চাকর-বাকরদের ঘর । খুব বড়-বড় দরজা জানলা । ঘর-দোরের অন্ত নাই । ঘোড়দৌড়ের মাঠের মত সুবিস্তীর্ণ ছাদে উঠিলে অনেকদূর পর্য্যন্ত নদী, মাঠ, গ্রাম সব নজরে পড়ে ।

দেখিয়া-শুনিয়া গদাধর বলিলেন—জায়গা খুব চমৎকার বইকি ।

—দেখলে তো ?

—সে-বিষয় কোনো ভুল নেই যে, পাঁচ হাজারের পক্ষে বাড়ী খুব সস্তা।

—এর দরজা জানলা যা আছে, তারই দাম আজকালকার বাজারে দেড় হাজার টাকার ওপর—তা ছাড়া কড়ি বরগা, লোহার থাম, এসব ধ'রে···

—সবই বুঝলুম, কিন্তু এখানে কোনো গ্রাম নেই নিকটে, হাট নেই, বাজার নেই—এখানে বাস করবে কে ? এত ঘর-দোর যে, গোলকধাঁধার মত ঢুকলে সহজে বেরুনো যায় না—এখানে কি আমাদের মত ছোট গেরস্ত বাস করতে পারে ? দাসদাসী চাই, দারোয়ান-সইস চাই, চারিদিকে জমজমাট চাই, তবে এখানে বাস করা চলে। নীলকুঠীর সাহেবদের চলেছে—তা ব'লে কি আমার চলে, না, তোমার চলে ?

নির্ম্মল যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—তাহ'লে—নেবে না ?

—তুমিই বুঝে দেখ না। নিয়ে আমার সুবিধে নেই। ভাড়াও চলবে না এখানে।

—তবু একটা সম্পত্তি হয়ে থাকতো !

—নামেই সম্পত্তি। যে-সম্পত্তি থেকে কিছু আসবার সম্পর্ক নেই, সে আবার সম্পত্তি, রেখে দাও তুমি।

কুঠীবাড়ী হইতে ফিরিবার পথে নির্ম্মল এমন একটা কথা বলিল, যাহা গদাধরের খুব ভালো লাগিল। অনেক বাজে কথার মধ্যে নির্ম্মল এবার এই একটা কাজের কথা বলিয়াছে বটে !

গদাধরের কি একটা কথার উত্তরে নির্ম্মল বলিল—ব্যবসা তাহ'লে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে চলো, সেখানে বাড়ী করো। ভাড়া হবে—থাকাও চলবে।

কোন্ সময়ে কি কথায় কি হয়, কিছু বলা যায় না। নির্ম্মল হয়তো কথাটা বিদ্রূপের ছলেই বলিল ; কিন্তু গদাধরের প্রাণে লাগিল কথাটা। গদাধর নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, মঙ্গলগঞ্জের কুঠীবাড়ী একগাদা টাকা দিয়া কিনিতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার এ-কথা বোঝা উচিত ছিল যে, এখানে টাকা ঢালা আর টাকা জলে ফেলা সমান। কিন্তু, কলকাতায় অনায়াসেই বাড়ীও করা যায়···ব্যবসাও ফাঁদা যায়। এখানে এই ম্যালেরিয়া জ্বরে বারোমাস কষ্ট পাওয়া—একটা আমোদ নেই, দুটো কথা বলবার লোক নেই ··তার চেয়ে কলকাতায় যাওয়া ভালো। সেখানে ব্যবসা ফাঁদলে দু'পয়সা সত্যিকার রোজগার হয়।

নির্ম্মল বলিল—তাহ'লে কুঠীবাড়ী ছেড়ে দিলে তো ?

—হ্যাঁ, এ একেবারে নিশ্চয়।

সারাপথ নির্ম্মল ক্ষুণ্ণমনে ফিরিল।

বাড়ী ফিরিলে অনঙ্গ আগ্রহের সুরে বলিল—হ্যাঁ গো, হলো ? কি-রকম দেখলে কুঠীবাড়ী ?

—বাড়ী খুব ভালো। তবে সে কিনে কোনো লাভ নেই। মস্ত বাড়ী, কাছে লোক

নেই, জন নেই। আর সে অনেক ঘর-দোর, আমরা এই ক'টি প্রাণী সে-বাড়ীতে টিম্-টিম্ করবো—লোক-লশকর, চাকর-বাকর নিয়ে যদি সেখানে বাস করা যায়, তবেই থাকা চলে।

অনঙ্গ বলিল—সেখানে বাস করবার জন্যই ও বাড়ী কিনছিলে নাকি? তা কি ক'রে হয়? এখানে সব ছেড়ে কোথায় মঙ্গলগঞ্জে বাস করতে যাবো! এমন বুদ্ধি না হ'লে কি আর ব্যবসাদার? আমি ভেবেচি, কুঠীবাড়ী সস্তায় কিনে রাখবে! তা ভালোই হয়েচে, তোমার যখন মত হয় নি, দরকার নেই।

গদাধর ভাবিয়া-চিন্তিয়া কথা বলেন! হঠাৎ কোনো কাজ করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নয়। রাত্রে তিনি স্ত্রীকে কলিকাতায় যাওয়ার কথাটা বলিলেন।

অনঙ্গ বিস্ময়ের সুরে বলিল—কলকাতায় যাবে। এসব ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় সুবিধে হবে?

—কেন হবে না? ব্যবসা সেখানে ভালো জমবে।

—বাসও করবে সেখানে?

—এখানে বাড়ীসুদ্ধ ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরচি, বছরে তিনচার মাস সবাই ভুগে মরি। ছেলেদের লেখাপড়া শেখা, মানুষের মত মানুষ হবার সুবিধা, আমার মনে হয়, সেই ভালো। কাল আমি কলকাতায় ওদের আড়তে চিঠি লিখি, তারপর দু'এক দিনের মধ্যে নিজে গিয়ে একবার দেখে আসি।

—যা ভালো বোঝো, করো। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো?

—কি?

—এ গ্রামের বাস ছেড়ে আমাদের কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বাপ-পিতেমোর আমলের বাস এখানে···

—বাপ-পিতেমোর ভিটে আঁকড়ে থাকলে চলবে না তো! সবদিকে সুবিধে দেখতে হবে। এখানে টাকা থাকলেও, খাটাবার সুবিধে নেই। ছেলেরা বড় হলে ওদের লেখাপড়া শেখানো—তাছাড়া অন্যরকম অসুবিধেও আছে। আমার মনে লেগেচে নির্ম্মলের কথাটা। সেই প্রথমে এ কথা তোলে।

—নির্ম্মল-ঠাকুরপোর সব কথা শুনো না—এ আমি তোমায় অনেকদিন ব'লে দিয়েচি। বড্ড ওর পরামর্শে তুমি চলো।

—কই আর শুনলুম, তা'হলে তো ওর কথায় কুঠীবাড়ীই কিনে ফেলতুম। মিথ্যে অপবাদ দিও না, বলচি।

অনঙ্গ হাসিয়া ফেলিল।

বছর কাটিয়া গিয়া বৈশাখ মাস পড়িল।

বছরের শেষে পাট ও তিসির দরুণ হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, প্রায় নিট্ ছ'হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ভড়মহাশয় হিসাব করিয়া মনিবকে লাভের অঙ্কটা বলিয়া দিলেন।

আড়তে একদিন কর্মচারীদের বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হইল।

অনঙ্গ বলিল—একদিন গ্রামের বিধবাদের ভালো ক'রে খাওয়ানো আমার ইচ্ছে—কি বলো ?

গদাধর খুশী হইয়া বলিলেন—ভালোই তো। দাও না খাইয়ে। কি-কি লাগবে, বলো ?

সে-কার্য্য বেশ সুচারুরূপেই নিষ্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-বিধবা যাঁরা তাঁরা গদাধরের বাড়িতে খাইবেন না—অন্যত্র তাঁহাদের জন্য জিনিসপত্র দেওয়া হইল—তাঁহারা নিজেরা রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইবেন। বাকী সকলের জন্য অনঙ্গ নিজের বাড়ীতেই ব্যবস্থা করিল।

সেই রাত্রেই গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—সব ঠিক ক'রে ফেলি, বলো—তুমি কথা দাও।

অনঙ্গ বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি ঠিক করবে ? কি কথা ?

—এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে আড়ত খুলি। ছাখো, এবারকার লাভের অঙ্ক দেখে আমার মনে হচ্ছে, এই আমাদের ঠিক সময়! সামনে আমাদের ভালো দিন আসচে। পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে থাকলে ছোট হয়ে থাকতে হবে। কলকাতায় যেতেই হবে।

—আচ্ছা, এ পরামর্শ কে দিলে বলো তো সত্যি করে ?

—অবিশ্যি নির্ম্মল বলছিল, তাছাড়া আমারও ইচ্ছে।

—তুমি যা ভালো বোঝো করবে, এতে আমার বলবার কিছু নেই—কিন্তু গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে চ'লে যাবে, তাই বলছিলুম! এই ছাখো না কেন, আজ সব এ-পাড়ার ও-পাড়ার বিধবারা এখানে খেলেন, কি খুশীই সব হ'লেন খেয়ে! ধরো ওই মাস্তীর মা, খেতে পায় না—স্বামী গিয়ে পর্য্যন্ত দুর্দ্দশার একশেষ। তার পাতে গরম-গরম লুচি দিয়ে আমার যেন মনে হলো, এমন আনন্দ তুমি আমায় হাজার থিয়েটার যাত্রা দেখালেও পেতুম না! আহা, কি খুশী হলো খেয়ে! দেখে যেন চোখে জল আসে। এদের ছেড়ে যাবো—কোথায় যাবো, সেখানে গিয়ে কিভাবে থাকবো, তাই কেবল ভাবচি!

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—নতুন কাজ করতে গেলে, সাহস করতে হয় মনে, নইলে কি হয় ? এতে ভাবনার কিছু নেই। আমি একটা ছোট-খাটো বাড়ীর সন্ধান পেয়েছি, বায়না ক'রে ফেলি, তুমি কি বলো ?

—যা তোমার মনে হয়। যদি বোঝো, তাতে সুবিধে হবে, তাই করো।

পরদিন নির্ম্মলকে কলকাতায় গিয়া বাড়ী বায়না করানোর জন্য গদাধর পাঠাইয়া দিলেন এবং বৈশাখ মাসের শেষে এখান হইতে কলিকাতায় যাওয়ার সব ঠিকঠাক হইয়া গেল।

ভড়মহাশয় একদিন বলিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো ?

—কি বলুন ?

—আমার এতদিনের চাকরিটা গেল ?

—কেন, গেল কি-রকম ?

—এখানে আড়ত রাখবেন না তো ?

—তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু আপনি তো কলকাতায় যাবেন।

—ঐখানে আমায় মাপ করতে হবে বাবু। কলকাতায় গিয়ে আমি থাকতে পারবো না। অভ্যেসই নেই বাবু—মাঝে মাঝে আপনার কাজে বেলেঘাটা-আড়তে যাই—চ'লে আসতে পারলে যেন বাঁচি!

—কেন বলুন তো ভড়মশায়?

—ওখানে বড় শব্দ দিন-রাত। আমার জন্মে অভ্যেস নেই বাবু, অত শব্দের মধ্যে থাকা। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, ওখানে থাকা কি আমাদের পোষায়? আমার বেয়াদবি মাপ করবেন বাবু, সে আমার দ্বারা হবে না।

নির্মল আসিয়া একদিন বলিল,—ওহে তাহ'লে দু-খানা লরি ক'রে মালপত্র ক্রমশঃ পাঠাই কলকাতায়।

গদাধর বলিলেন—কিন্তু তোমার বৌ-ঠাকরুণ বলচেন, এখানে কিছু জিনিস থাক। এ-বাড়ীর বাস একেবারে উঠিয়ে দিচ্ছিনে তো আর! মাঝে মাঝে আসবো-যাবো···

—সে তো রাখতেই হবে। তবে সামান্য কিছু রাখো এখানে। জিনিসপত্র এখানে থাকলে দেখবার লোকের অভাবে নষ্ট হবে বইতো নয়!

—তাই বলছিল তোমার বৌ-ঠাকরুণ। এখানেও পৈতৃক বাড়ী বজায় রাখা আমারও মত।

শুভদিন দেখিয়া সকলে কলিকাতায় রওনা হইলেন। নির্মল সঙ্গে গেল। ঠিক হইল, ভড়মহাশয় আপাততঃ কয়েক মাসের জন্য কলিকাতার আড়তে থাকিয়া কাজকর্ম গুছাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিবেন—তবে উপস্থিত নয়। মাসখানেক পরে আড়তের কাজ অল্প একটু চালু হইলে তার পর।

তিন

লালবিহারী সা রোডে ছোট্ট দোতলা বাড়ী। চারখানা ঘর, এ-বাদে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার-ঘর আছে।

গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—বাড়ী কেমন হয়েছে?

—ভালোই তো। কত টাকায় হলো?

—সাড়ে দশ হাজার টাকা। বন্ধক ছিল—খালাস করতে আরও দু'হাজার লেগেছে।

—এত টাকা বাড়ীর পেছনে এখন খরচ না করলেই পারতে।

—কিন্তু কলকাতায় বাড়ী···একটা সম্পত্তি হয়ে রইলো, তা ভুলে যেও না।

—আমি মেয়েমানুষ কি বুঝি, বলো? তুমি যা বোঝো, তাই ভালো।

গদাধরের আড়তের কাজও এখন ভালো চলে নাই।

ভড়মহাশয় পুরানো লোক,—তিনি একদিন বলিলেন—এখানে কাজ দাঁড়াবে ভালো বাবু।

ভড়মহাশয়কে গদাধর বিশ্বাস করিতেন খুব বেশি, তাঁর কথার উপর নির্ভর করিতেন অনেকখানি। উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—দাঁড়াবে ব'লে আপনার মনে হয় ভড়মশায়?

—আমার কথাটা ধরেই রাখুন বাবু—চুল পাকিয়ে ফেললাম এই কাজ ক'রে। মুখপাতেই জিনিস বোঝা যায়, মুখপাত দেখা দিয়েচে ভালো।

—আপনি বললে অনেকটা ভরসা পাই।

—আমি আপনাকে বাজে-কথা বলবো না বাবু।

কলিকাতায় আসিয়া অনঙ্গ খুব আনন্দে দিনকতক কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া কাটাইল—দক্ষিণেশ্বরে দু'দিন মন্দির দর্শন ও গঙ্গাস্নান করিল—দূর সম্পর্কের কে এক পিসতুতো ভাই ছিল এখানে, তাহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কি-একটা পাতাইয়া আসিল···বৌবাজারের দোকান হইতে আসবাবপত্র আনাইয়া মনের মত করিয়া ঘর সাজাইল।

ছেলে দুটিকে কাছের এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল; বাড়ীতে পড়ানোর জন্ম মাস্টার রাখা—এক কথায় ভালো করিয়াই এখানে সংসার পাতিয়া বসা হইল।

একদিন নির্ম্মল আসিয়া আড়তে দেখা করিল। প্রায় মাসখানেক দেখাই হয় নাই তার সঙ্গে। গদাধর খুশী হইয়া বলিলেন—আরে এসো, নির্ম্মল! দেশ থেকে এলে এখন? খবর ভালো?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি অনেকদিন, তাই এলাম একবার।

—খুব ভলো করেচো। যাও, বাড়ীতে যাও—তোমার বৌ-ঠাকরুণ আছেন, গিয়ে ততক্ষণ চা-টা খাওগে, আমি আসচি।

নির্ম্মল নীচু-গলায় বলিল—কিন্তু তোমার কাছে এসেছিলাম আর-এক কাজে। আমার কিছু টাকার বড়ো প্রয়োজন, ভাই।

—কেন, হঠাৎ টাকার কি প্রয়োজন হলো?

—বাকি খাজনার দায়ে পৈতৃক জমি বিক্রি হতে বসেচে—দেখাবো এখন সব তোমায়।

—কত টাকা?

—শ'তিনেক।

—কবে চাই?

—আজই দাও। তোমাকে হ্যাণ্ডনোট দেবো তার বদলে।

—কিছুই দিতে হবে না তোমায়। যখন সুবিধে হবে, দিয়ে দিও।

নির্ম্মল যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। করিবারই কথা। সে-দিনটা গদাধরের বাড়ীতে থাকিয়া আহারাদি করিয়া সন্ধ্যাবেলা বলিল—চলো গদাই, তোমাকে বায়োস্কোপ

দেখিয়ে আনি।

গদাধর বিশেষ শৌখীন-প্রকৃতির লোক নহেন। এতদিন কলিকাতায় আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও এক দিনের জন্ম কোনো আমোদ-প্রমোদের দিকে যান নাই—নিজের আড়তে কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। নির্ম্মলের পীড়াপীড়িতে সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা বায়োস্কোপ দেখিতে .গলেন। 'প্রতিদান' বলিয়া একটা বাংলা ছবি···গদাধরের মন্দ লাগিল না। অনেকদিন তিনি থিয়েটার বা বায়োস্কোপ দেখেন নাই, বাংলা ছবি এমন চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্ধানই তিনি রাখেন না।

বায়োস্কোপ হইতে বাহির হইয়া নির্ম্মল বলিল—চা খাবে ?

—তা মন্দ হয় না।

—চলো, কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ী, তোমায় আলাপ করিয়ে দিই।

মিনিট-পাঁচেক-রাস্তা-দূরে একটা গলির মোড়ে বেশ বড় একখানা বাড়ীর সামনে গিয়া নির্ম্মল বলিল—দাঁড়াও, আমি আসচি।

কিছুক্ষণ পরে একটি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে নির্ম্মল ফিরিয়া আসিল। হাসিয়া বলিল—এই যে, আলাপ করিয়ে দিই, এঁরই নাম গদাধর বসু, বাড়ী—

গদাধর অবাক হইয়া চাহিয়া বলিলেন—আরে শচীন যে! তুমি এখানে ?

—এসো ভাই, এসো। ··নির্ম্মল আমাকে বললে, 'কে এসেচে ছাখো!' তুমি যে দয়া ক'রে এসেচো···আমি ভাবলুম না-জানি কে ? তা তুমি! সত্যি ?

—এটা কাদের বাড়ী ?

—আরে, এসোই না! অনেকদিন দেখাশুনা নেই—সব কথা শুনি।

সম্পর্কে শচীন তাঁহার জ্যাঠতুতো ভাই,—অর্থাৎ বড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলে—আর বারে 'কুসুম-বামনীর দ'র ভাগবাঁটোয়ারার সময় ইহারই উদ্দেশে শ্লেষ করিয়া কথা বলিয়াছিলেন গদাধর। শচীন বকিয়া গিয়াছে, এ-কথা গ্রামের সকলেই জানিত—তবে গদাধর শুনিয়াছিলেন, আজ-কাল সে ভালো হইয়াছে—কলিকাতায় থাকিয়া কি চাকুরি করে।

গদাধর বলিলেন—নির্ম্মলের সঙ্গে তোমার দেখাশুনো হয় নাকি ?

শচীন হাসিয়া বলিল—কেন হবে না ? তুমি তো আর দেশের লোকের খোঁজ নাও না। শুনলুম, বাড়ী করেচ কলকাতায়···

—হ্যাঃ, সে আবার বাড়ী! কোনো রকমে ওই মাথা গোঁজবার জায়গা···

—বৌদিদিকে এনেচো নাকি ?

—অনেকদিন।

—আমাদের তো আর যেতে বললে না একদিন! সন্ধানই কি রাখো!

—আমি কি ক'রে সন্ধান রাখি, বলো ? নির্ম্মল নিয়ে এলো তাই তোমাকে চক্ষে দেখলুম এই এতকাল পরে। তুমি তো গ্রামছাড়া আজ তিন বছরের ওপর।

শচীনের সঙ্গে গদাধর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। বাহিরের ঘর পার হইয়া ছোট একটি হলঘর। হলঘরের চারিপাশে কামরা—সামনে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। একটা বড় ক্লক-ঘড়ি হলের একপাশে টিক্‌টিক্‌ করিতেছে, কাঠের টবে বড়-বড় পামগাছ। শচীন উহাদের লইয়া দোতলার সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে ডাক দিল—ও শোভা, কাদের নিয়ে এলুম, দেখ। শচীনের ডাকে একটি মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইল, তার পরনে সাদাসিদে কালোপাড় ধুতি, অগোছালো চুলের রাশ পিঠের উপরে পড়িয়াছে, মুখে-চোখে মৃদু কৌতূহল। মুখে সে কোনো কথা বলিল না। ত্রিশের বেশি বয়স কোনোমতেই নয়—খুব রোগা নয়, দোহারা গড়ন—রং খুব ফর্সা।

শচীন বলিল—বলো তো শোভারাণী, কে এসেচে?

মেয়েটি বলিল—কি ক'রে জানবো!

আশ্চর্য্য এই যে, মেয়েটি কাহাকেও অভ্যর্থনাসূচক একটা কথা বলিল না বটে, তবু তাহাকে অভদ্র বলিয়া মনে হইল না গদাধরের। এমন মুখশ্রী তিনি কোথায় যেন দেখিয়াছেন! দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, বেশ চমৎকার মুখ! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলেন কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না।

সকলে উপরে উঠিলেন। বারান্দায় বেতের চেয়ার খানকতক গোল করিয়া পাতা—মাঝখানে একটা বেতের টেবিল। সেখানে শচীন তাঁহাদের বসাইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—ইনি শ্রীযুক্ত গদাধর চন্দ্র বসু, আমার খুড়তুতো ভাই—আমাদের বয়স একই, দু-এক মাসের ছোট-বড়। মার্চেণ্ট। গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ী।

গদাধর অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন। নির্ম্মল ও শচীন এ কোথায় তাহাকে আনিল? শচীনের কোনো আত্মীয়ের বাড়ী হইবে হয়তো! মেয়েটি কে? গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়ে কি সকলের সামনে এভাবে ডাক দিলে বাহির হইয়া আসে? তিনি নিজের গ্রামে তো দেখেন নাই—তবে কলিকাতার ব্যাপারই আলাদা।

শচীন বলিল—পরিচয় করিয়ে দিই এঁর সঙ্গে—ইনি প্রখ্যাতনামা 'স্টার'—শোভারাণী মিত্র—নাম শোনো নি?

নির্ম্মল বলিল—এইমাত্র দেখে এলে, 'প্রতিদান' ফিল্ম, সেই ফিল্মের কমলা!

গদাধর এতক্ষণ পরে বুঝিলেন। সেইজন্যই তাঁহার মনে হইতেছিল, মেয়েটির মুখ বড় পরিচিত—কোথায় যেন দেখিয়াছেন! মেয়েটি 'ফিল্ম-স্টার' শোভারাণী মিত্র—'প্রতিদান' ফিল্মে যে কমলা সাজিয়াছে! গদাধর ব্যবসায়ী মানুষ, ফিল্ম-স্টারদের নামের সঙ্গে তাঁর খুব পরিচয় নাই, তবে এবার কলিকাতায় আসিয়া অবধি বাড়ীর দেওয়ালে পাঁচিলে যততত্র প্রতিদান ছবির বিজ্ঞাপন এবং সেই সঙ্গে বড়-বড় অক্ষরে শোভারাণী মিত্রের নাম গদাধর দেখিয়াছেন বটে!

গদাধর একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহারা গেঁয়ো লোক, ফিল্ম-স্টারদের সঙ্গে কথা বলিবার কি উপযুক্ত! নির্ম্মলের কাণ্ড দেখ, তাঁহাকে কোথায় লইয়া আসিল!

সঙ্গে-সঙ্গে কৌতূহল হইল খুব। ফিল্ম-স্টাররা কি-ভাবে কথা বলে, কেমন চলে, কি খায়, কি করে—সাধারণ লোকে ইহার কিছুই জানে না। তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তিনি সে স্থযোগ পাইয়াছেন। গিয়া অনঙ্গকে গল্প করিবার একটা জিনিস পাইলেন বটে। অনঙ্গ শুনিয়া অবাক হইয়া যাইবে।

মেয়েটি এবার বেতের টেবিলের ওপারে দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল—কোনো কথা বলিল না।

নির্ম্মল বলিল—বস্থন মিস্ মিত্র।

মেয়েটি উদাসীন ভাবে বলিল—হঁ্যা, বসি! আপনাদের বন্ধু চা খান তো? ও রসি···রসি!

গদাধর বলিতে গেলেন, তিনি এখন আর চা খাইবেন না—কিন্তু সঙ্কোচে পড়িয়া কথা বলিতে পারিলেন না। মেয়েটির আহ্বানে একটি ছোকরা চাকর আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। মেয়েটি বলিল—ওরে রসি, চা—এক, দুই, তিন পেয়ালা।

হাসিয়া নির্ম্মল বলিল,—কেন, চার পেয়ালা নয় কেন?

মেয়েটি বলিল—আমি একবারের বেশি চা খাইনে তো। আমার হয়ে গিয়েচে বিকেলে।

কর্ত্তৃত্বের এমন দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের স্থরে কথা বাহির হইয়া আসিল মেয়েটির মুখ হইতে, যে, তাহার প্রতিবাদে আর কোনো কথা বলা চলে না। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল এবং নিজের হাতে দু'খানি প্লেটে কেক্, বিস্কুট, কমলালেবু ও সন্দেশ আনিয়া বেতের গোল টেবিলটিতে রাখিয়া বলিল—একটু খেয়ে নিন!

শচীন বলিল—আমার?

মেয়েটির মুখে হাসি কম—আধ-গম্ভীর মুখেই বলিল—দু-বার হয়ে গিয়েচে। আর হবে না।

নির্ম্মল বলিল—এই আমরা ভাগ করে নিচ্চ···এসো শচীন।

নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল—না, ভাগ করতে হবে না, আপনারা খেয়ে নিন—চা আনি।

গদাধর ভাবিলেন, এ-ধরণের মেয়ে তিনি কখনো দেখেন নাই। বিনয়ে গলিয়া পড়ে না, অথচ কেমন ভদ্রতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান! কিন্তু শচীনের উপর এতটা আধিপত্য কেন? বোধহয় অনেক দিনের আলাপ—বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। সে-ক্ষেত্রে এরকম হওয়া সম্ভব, স্বাভাবিক বটে।

সেই ছোকরা চাকরটি চা আনিয়া দিল—ট্রে'র উপর বসানো তিনটি পেয়ালা—মেয়েটি নিজের হাতে ট্রে হইতে উঠাইয়া পেয়ালাগুলি টেবিলে সাজাইয়া দিল—আগে গদাধরের সামনে, তারপরে নির্ম্মলের ও সবশেষে শচীনের সামনে।

গদাধরকে বলিল—চিনিটা দেখুন তো? আমি দু'চামচ ক'রে দিতে বলি সব পেয়ালায়—

যদি কেউ বেশি খান, আবার দেওয়া ভালো।

গদাধর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, মেয়েটির ডাগর চোখের পূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর। কি সুন্দর মুখশ্রী, অপূর্ব্ব লাবণ্যভরা ভঙ্গি ঠোঁটের নীচের অংশে। গদাধরের সারা দেহ নিজের অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিল। নামজাদা অভিনেত্রী শোভারাণী মিত্র···তাঁহাকে—গদাধর বসুকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছে! বিশ্বাস করা শক্ত!

গদাধর তখনই চোখ নামাইয়া লইলেন। বেশীক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ছবিতে এইমাত্র যাহাকে দেখিয়া আসিলেন—সেই নির্য্যাতিতা মহীয়সী বধূ কমলা রক্তমাংসের জীবন্ত দেহ লইয়া, তাহার অপূর্ব্ব মুখশ্রী লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে··· তাঁহাকেই···গদাধর বসুকে! বলিতেছে—আপনার চায়ে কি চিনি কম হয়েচে?

এমন ঘটনা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তিনি কল্পনা করিতে পারিতেন না!

অথচ চিনি আদৌ ঠিক ছিল না। চিনির অভাবে চা তেতো বিস্বাদ। চায়ে চার চামচের কম চিনি তিনি কখনো খান না বাড়ীতে। ইহা লইয়া অনঙ্গ তাঁহাকে কত ক্ষেপাইত— 'তোমার তো চা খাওয়া নয়, চিনির শরবৎ খাওয়া! চিনির রসে কাপের সঙ্গে ডিসের সঙ্গে এঁটে জড়িয়ে যাবে, তবে হবে তোমার ঠিকমত চিনি।"

কিন্তু এ তো আর অনঙ্গ নয়! এখানে সমীহ করিয়া চলিতে হইবে বৈ কি!

শচীন বলিল—তোমরা এদিকে গিয়েছিলে কোথায়?

হাসিয়া নির্ম্মল বলিল—আমরা এইমাত্তর 'প্রতিদান' দেখে ফিরলুম।

—কেমন লাগলো?

—বেশ লেগেচে—বিশেষ ক'রে এঁর পার্ট—ওঃ!

মেয়েটি গদাধরের দিকে চাহিয়া সরাসরিভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কেমন লাগলো?

গদাধর সঙ্কুচিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন ধরণের সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য ঘটা দূরের কথা—এর আগে এমন মহিলা তিনি চক্ষেও দেখেন নাই! শিক্ষিতা নিশ্চয়, কারণ, ওই ছবির মধ্যে এঁর মুখে যে সব বড়-বড় কথা আছে, যেমন সব গান ইনি গাহিয়াছেন, যেমন ইঁহার চমৎকার উচ্চারণের ভঙ্গি, কথা বলিবার কায়দা, হাত-পা নাড়ার ধরণ ইত্যাদি দেখা গিয়াছে—শিক্ষিত না হইলে অমনটি করা যায় না। গদাধর পল্লীগ্রামে বাস করেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।

তিনি বলিলেন—খুব ভালো লেগেছে। ওই যে নির্ম্মল বললে, আপনার পার্ট—ওরকম আর দেখিনি।

—কোন্ জায়গাটা আপনার সব চেয়ে ভালো লেগেছে বলুন তো? দেখি, আপনারা বাইরে থেকে আসেন, আপনাদের মনে আমাদের অভিনয়ের এফেক্টটা কেমন হয়, সেটা জানা খুব দরকার আমাদের।

শচীন অভিমানের সুরে বলিল—কেন, আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? আমাদের মতের কোনো দাম···

—সেজন্যে নয়। আপনারা সর্ব্বদা দেখচেন আর এঁরা গ্রামে থাকেন, আজ এসেচেন—কাল চ'লে যাবেন। এঁদের মতের দাম অন্যরকম।

গদাধর আরও লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, না না, আমাদের আবার মত! তবে আমার খুব ভালো লেগেচে, যখন আপনাকে—মানে, কমলাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো—আপনার সেই গানখানা গাছতলার পুকুর-পাড়ে স্বামীর ঘরের দিকে চোখ রেখে—ওঃ, সেই সময় চোখের জল রাখা যায় না! আরও বিশেষ ক'রে ওই জায়গাটা ভালো লাগে—ওইখানটাতেই আপনার পরনের শাড়ী · আপনার চোখের ভঙ্গি… কেমন একটা অসহায় ভাব…সব মিলিয়ে মনে হয়, সত্যিই পাড়াগাঁয়ের শাশুড়ীর অত্যাচারে ঘরছাড়া হয়েচে, এমন একটি বৌকে চোখের সামনে দেখচি! বায়োস্কোপে দেখচি, মনে থাকে না। ওখানে আপনি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেচেন!

শচীন উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, ইয়ার্কির সুরে বলিল—বারে আমাদের গদাই, তোমার মধ্যে এত ছিল, তা তো জানিনে—একেবারে 'আনন্দ বাজার'-এর 'ফিল্‌ম্‌-ক্রিটিক' হয়ে উঠলে যে বাবা!

মেয়েটি একমনে আগ্রহের সঙ্গে গদাধরের কথা শুনিতেছিল—শচীনের দিকে গম্ভীর মুখে চাহিয়া ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বলিল—কি ও? উনি প্রাণ থেকে কথা বলচেন…আমি বুঝেচি উনি কি বলচেন। আপনার মত হালকা মেজাজের লোক কি সবাই?

মুখ ম্লান করিয়া শচীন আগেকার সুরের জের টানিয়া বলিল—বেশ, বেশ, ভালো হ'লেই ভালো। আমার কোনো কথা বলবার দরকার কি? ব'লে যাও হে…

গদাধর সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রহিলেন, কোনো কথা বলিলেন না।

মেয়েটি আবার গদাধরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—হ্যাঁ, বলুন, কি বলছিলেন…

গদাধর বিনীত ও লজ্জিত-হাস্যে বলিলেন—আজ্ঞে, ওই। আমাদের মত লোকের আর বেশি কি বলবার আছে, বলুন? তবে শেষ-দিকটাতে, যেখানে কমলা কাশীর ঘাটে আবার স্বামীর দেখা পেলো, ও জায়গাটা আরও বিশেষ ক'রে ভালো লেগেচে।

—আর ওই যে কি বললেন…

—মানে, কমলার পরনের কাপড় ঠিক একেবারে পাড়াগাঁয়ের ওই ধরণের গেরস্ত-ঘরের উপযুক্ত—বাহুল্য নেই এতটুকু!

আনন্দে ও গর্ব্বের সুরে হাত নাড়িয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—দেখুন, ওই কাপড় আমি জোর ক'রে ম্যানেজারকে ব'লে আমদানি করি স্টুডিওতে। আমি বলি, স্বামী তো ছেড়ে দিয়েছে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এমন ধরণের পাড়া-গাঁয়ের মেয়ের পরনে জম্‌কালো রঙীন্ ব্লাউজ বা শাড়ী থাকলে ছবি ঝুলে যাবে। এজন্যে আমায় দস্তুরমত ফাইট্ করতে হয়েচে, জানেন শচীনবাবু? আর দেখুন, ইনি পাড়াগাঁ থেকে আসচেন—ইনি যতটা জানেন এ-সম্বন্ধে…

সায় দিবার সুরে নির্ম্মল বলিল—তা তো বটেই!

শচীন বলিল—যাক, ওসব নিয়ে তর্কের দরকার নেই, শোভা, একটা গান শুনিয়ে দাও ওকে!

গদাধর পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবেই বলিল—তা যদি উনি দয়া ক'রে শুনিয়ে দেন···

মেয়েটি কিন্তু এতটুকু ভদ্রতা না রাখিয়াই তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ, যখন-তখন গান করলেই কি হয়? শচীনবাবু যেন দিন দিন কি হয়ে উঠচেন!

গদাধর নির্ব্বোধ নন, তিনি লক্ষ্য করিলেন, শচীন মেয়েটির এ-কথার উপর আর কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না, যেন একটু দমিয়া গেল। এবার কি মনে করিয়া গদাধর সাহস দেখাইলেন। তিনি ব্যবসাদার মানুষ, পড়্তি-বাজারে চড়াদামের মাল বায়না করিয়া অনেকবার লাভ করিয়াছেন—তিনি জানেন, জীবনে অনেক সময় দুঃসাহসের জয় হয়। সুতরাং তিনি আগেকার নিতান্ত বিনয়ের ভাব ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ় অনুরোধের সুরে বলিলেন—আপনি হয়তো মেজাজ ভালো হ'লে গান গাইবেন, কিন্তু আমি আর তা শুনতে পাবো না। শচীনের কথা এবারটা রাখুন দয়া করে—একটা গান শুনিয়ে দিন।

পাকা ও অভিজ্ঞ ব্যবসাদার গদাধর ভুল চাল চালেন নাই। মেয়েটি আগেকার চেয়ে নরম ও সদয় সুরে বলিল—আপনি শুনতে চান সত্যি? শুনুন তবে।

ঘরের একপাশে বড় টেবিল-হারমোনিয়ম। মেয়েটি টুলে বসিয়া ডালা খুলিয়া, পিছনদিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল···কি শুনবেন? হিন্দি? না, ফিল্মের গান?

গদাধর কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—কমলার সেই গানখানা করুন দয়া ক'রে। সেই যখন বাড়ী ছেড়ে···

মেয়েটি এক-মনে গানটি গাহিল। গানের মধ্যে—আকাশ, বেদনাভরা বীণাধ্বনি, রুদ্র, জ্যোৎস্না, পথ-চলা প্রভৃতি অনেক সুমিষ্ট কথা ছিল এবং আরও অনেক ধোঁয়া-ধোঁয়া ধরণের শব্দ যার অর্থ পাটের আড়তদার গদাধর ঠিকমত অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তবু তিনি তন্ময় হইয়া গানটি শুনিলেন—ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? এই মাত্র ছায়াছবিতে যে নির্য্যাতিতা বধূটিকে দেখিয়া আসিলেন, সেই মেয়েটিই রক্তমাংসের দেহে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছে!

গান শেষ হইলে গদাধর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—চমৎকার! চমৎকার!

নির্ম্মল বলিল—বাস্তবিক! যাকে বলে, ফার্স্ট ক্লাস!

শচীন কোনো কথা বলিল না।

মেয়েটি হারমোনিয়মের ডালা সশব্দে বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল, কিন্তু গান সম্বন্ধে একটি কথা বলিল না। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে ভালো করিয়াই জানে, সে যাহা গাহিবে, তাহা ভালো হইবেই—এ বিষয়ে কতকগুলি সঙ্গীত-সম্বন্ধে অজ্ঞ, অর্ব্বাচীন ব্যক্তির মত জিজ্ঞাসা করিয়া মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করিতে সে চায় না!

গদাধর হঠাৎ দেখিলেন, কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন রাত্রি হইয়া ঘরে ইলেকট্রিক আলো জলিয়া উঠিয়াছে,—তিনি এতক্ষণ খেয়াল করেন নাই।

এইবার যাওয়া উচিত—আর কতক্ষণ এখানে থাকিবেন ? মেয়েটি কিছু মনে করিতে পারে ! কিন্তু বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেই শচীন বলিল—আহা ব'সো না হে, একসঙ্গে যাবো—আমিও তো এখানে থাকবো না।

গদাধর বলিলেন—না, আমার থাকলে চলবে না, অনেক কাজ বাকী। রাত হয়ে যাচ্ছে।

নির্মলও বলিল—আর-একটু থাকো। আমিও যাবো।

উহাদের বসাইয়া রাখিয়া মেয়েটি পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিকে চাঁপা রংয়ের জর্জ্জেট পরিয়া, মুখে হাল্‌কা-ভাবে পাউডারের ছোপ দিয়া, উঁচু-গোড়ালির জুতো পায়ে ঘরে ঢুকিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—এবার চলুন সবাই বেরুনো যাক্।

শচীন বিস্ময়ের স্বরে বলিয়া উঠিল—কোথায় যাবে আবার, সেজেগুজে এলে হঠাৎ ?

—সব কথা কি আপনাকে বলতে হবে ?

—না, তবু জিগ্যেস করচি। দোষ আছে কিছু ?

—স্টুডিওতে পার্টি আছে সাড়ে-আটটায়।

—তুমি এখন সেই টালিগঞ্জে যাবে, এই রাত্রে ?

—যাবো।

অগত্যা সকলে উঠিল। শচীনের মুখ দেখিয়া বেশ মনে হইল, সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এ-স্থান ত্যাগ করিতেছে। মেয়েটি আগে-আগে, আর সকলে পিছনে চলিল। বারান্দায় যাইবার বা সিঁড়ি দিয়া নামিবার পথে মেয়েটি কাহারও সহিত একটি কথা বলিল না—রাণীর মত গর্ব্বে কাঠের সিঁড়ির উপর জুতার উঁচু গোড়ালির খট্-খট্ শব্দ করিতে-করিতে চঞ্চলা হরিণীর মত ক্ষিপ্রপদে নামিয়ে গেল—কেবল অতি মৃদু সুমিষ্ট একটি সুবাস বারান্দা ও সিঁড়ির বাতাসে মিশিয়া তাহার গমনপথ নির্দ্দেশ করিল মাত্র।

গদাধর বাড়ী ফিরিয়া সে-রাত্রে হিসাবের খাতা দেখিলেন প্রায় রাত বারোটা পর্য্যন্ত। কিন্তু অনঙ্গ যখন কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন কি জানি কেন, শোভারাণী মিত্র ফিল্ম্-স্টারের যে গল্পটা জমাইয়া বলিবেন ভাবিয়াছিলেন—সেটা কিছুতেই জিহ্বাগ্রে আনিতে পারিলেন না।

এই কথাটা গদাধর পর-জীবনে অনেকবার ভাবিয়াছিলেন। যে-গল্প অনঙ্গর কাছে করিবার জন্য কতক্ষণ হইতে তাঁহার মন আকুলি-বিকুলি করিতেছিল—এত-বড় মুখরোচক ও জম্‌কালো ধরণের একটা গল্প,—অথচ কেন সেদিন সে-কথা স্ত্রীর কাছে বলিতে পারিলেন না ?

কি ছিল ইহার মধ্যে ?

সেদিন হয়তো কিছুই ছিল না, কিংবা হয়তো ছিল ! গদাধর ভালো বুঝিতে পারিতেন না।

অনঙ্গ বলিল—আজ কি শোবে, না, খাতাপত্র নিয়ে ব'সে থাকবে? রাত ক'টা, খেয়াল আছে?

গদাধর হঠাৎ অনঙ্গর দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন। অনঙ্গও মেয়েমানুষ—দেখিতেও মন্দ নয়—কিন্তু কি ঠকাই ঠকিয়াছেন এতদিন! সত্যিকার মেয়ে বলিতে যা বোঝায়, তা তিনি এতদিন দেখেন নাই। আজই অন্যত্র তাহা দেখিয়া আসিলেন এইমাত্র।

বলিলেন—এই যাই।

—আজ তো খেলেও না কিছু! শরীর ভালো আছে তো?

অনঙ্গ সুকণ্ঠী নয়। গলার স্বর আরও মোলায়েম হইলেও ক্ষতি ছিল না। মেয়েদের কণ্ঠস্বর মিষ্টি হইলেই ভালো মানায়—কিন্তু সব জিনিসের মধ্যেই আসল আছে, আবার মেকি আছে।

মশারি গুঁজিতে গুঁজিতে অনঙ্গ বলিল—আজ কোথাও গিয়েছিলে নাকি? রাত ক'রে ফিরলে যে!

—হ্যাঁ, ওই বায়োস্কোপ দেখে এলুম কিনা!

অনঙ্গ অভিমানের সুরে বলিল—তা যাবে বৈকি। আমায় নিয়ে গেলে না তো! কি দেখলে?

—একটা বাংলা ছবি···সে আর একদিন দেখো।

অনঙ্গ আবদারের সুরে বলিল—কি ছবি, বলো না? বলো না গো গল্পটা!

সেই পুরানো অনঙ্গ। বহুদিনের সুপরিচিত সেই আবদারের সুর। কতবার কত গল্প এই স্ত্রীর সঙ্গে···রাত একটা-দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকা গল্প করিতে করিতে! কিন্তু গদাধর বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলেন, আজ অনঙ্গর সঙ্গে গল্পগুজব করিবার উৎসাহ যেন তিনি নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছেন না!

খাতাপত্র মুড়িয়া ঈষৎ নীরস-কণ্ঠে গদাধর বলিলেন—কি এমন গল্প! বাজে!

—হোক বাজে,—কি দেখলে···বলো না···লক্ষ্মীটি।

—বড় খাটুনি গিয়েচে আজ, কথা বলতে পারচি নে।

অনঙ্গ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—তা পারবে কেন? খাতাপত্র ঘাঁটবার সময় খাটুনি হয় না।···লক্ষ্মীটি, বলো না, কি দেখলে?

—কাল সকালে শুনলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না! সত্যি, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

অনঙ্গ রাগ করিল বটে, সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মিতও হইল। স্বামীর এমন ব্যবহার যে ঠিক নূতন, তাহা নহে। ঝগড়াও কতবার হইয়া গিয়াছে দু-জনের মধ্যে—কিন্তু সে ঝগড়ার মধ্যে সত্যিকার ঔদাসীন্য বা তিক্ততা ছিল না। আজ গদাধর ঝগড়ার কথা কিছু বলিতেছেন না—খুব সাধারণ কথাই! অথচ তার নারীচিত্ত যেন বুঝিল, ওই সামান্য সাধারণ অতি-তুচ্ছ প্রত্যাখানের পিছনে অনেকখানি ঔদাসীন্য এবং তিক্ততা বিদ্যমান।

অনঙ্গ চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

গদাধর কিন্তু শুইয়া-শুইয়া,—ফিল্ম-অভিনেত্রী শোভারাণীর ভাবনা ভাবিতেছিলেন, এ-কথা বলিলে তাঁহার উপর ঘোর অবিচার করা হইবে। সত্যিই তিনি এক-আধবার ছাড়া তার কথা ভাবেন নাই। মেয়েদের কথা বেশিক্ষণ ধরিয়া ভাবিবার মত মন গদাধরের নয়! তিনি ভাবিতেছিলেন অন্য কথা।

তিনি ভাবিতেছিলেন—জীবনটা তাঁর বৃথায় গেল! মেকি লইয়া কাটাইলেন, আসল নারী কি বস্তু, তাহা কোনো দিন চিনিলেন না। আর একটি ছবি অন্ধকারে আধ-ঘুমের মধ্যেও বার-বার তাঁর চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল···

নির্য্যাতিতা সুন্দরী বধূ কমলা শ্বশুরবাড়ী হইতে বিতাড়িতা হইয়া থরথর-কম্পিত দেহে পুকুরপাড়ে একদৃষ্টে স্বামীর ঘরের জানালার দিকে চাহিয়া আছে।···

চার

দিন-দুই পরে গদাধরকে দেশের আড়তের কাজে যাইতে হইবে, ভড়মহাশয়ও সঙ্গে যাইবেন। অনঙ্গ স্বামীকে বলিল, সেও সঙ্গে যাইবে। গদাধর বলিলেন, চলো, ভালো কথাই তো। ছেলেরাও যাবে—গিয়ে স্কুল কামাই হবে, উপায় নাই। তোমায় কিন্তু ছেলেদের নিয়ে একলা থাকতে হবে ক'দিন। পারবে তো?

—কেন, তুমি কোথায় থাকবে?

—আমি যাচ্ছি মোকামে পাটের সন্ধানে। নারানপুর, আশুগঞ্জ, ঝিকরগাছা—এসব জায়গা ঘুরতে হবে। পাঁচশো গাঁট সাদা পাট অর্ডার দিয়েছে ডগলাস জুট মিল। এদিকে মাল নেই বাজারে—যা আছে, দরে পোষাচ্ছে না,—আমি দেখিগে যাই এখন মোকামে-মোকামে ঘুরে। মাথায় এখন আগুন জ্বলছে, বাড়ী ব'সে থাকবার সময় আছে?

—বাড়ীতে মোটে আসবে না?

—সেই মঙ্গলবারের দিকে যদি আসা ঘটে—তার আগে নয়।

অনঙ্গ যাইতে চাহিল না। শুধু ছেলেদের লইয়া একা সে দেশের বাড়ীতে গিয়া কি করিবে? স্বামী থাকিলে ভালো লাগিত। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা তার অভ্যাস নাই—বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে নাই—একা থাকিতে অনঙ্গর মন হু-হু করে। ছেলেদের লইয়া মনের শূন্যতা পূর্ণ হইতে চায় না।

ভড়মহাশয়কে লইয়া গদাধর চলিয়া গেলেন। বিভিন্ন মোকামে ঘুরিয়া সমস্ত পাটের যোগাড় করিতে সারাদিন লাগিয়া গেল। ফিরিবার পথে একবার গ্রামের বাড়ীতে গেলেন। ব্যবসায়-সংক্রান্ত কিছু খাতাপত্র এখানে পূবের ঘরের আলমারীতে ছিল। ক-মাস দেশ-ছাড়া—ইহার মধ্যেই বাড়ীর উঠানে চিড়চিড়ে ও আমরুল গাছের জঙ্গল বাঁধিয়া গিয়াছে, ছাদের-কার্নিসে বনমূলার চারা দেখা দিয়াছে, ঘরের মধ্যে চামচিকার দল বাসা বাঁধিয়াছে।

গ্রামের একটি বোষ্টমের মেয়েকে মাঝে-মাঝে ঘর-বাড়ী দেখিতে ও ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখিতে বলিয়াছিলেন—প্রতি মাসে দুটি করিয়া টাকা এজন্য সে পাইবে, এ ব্যবস্থা ছিল—অথচ দেখা যাইতেছে সে কিছুই করে নাই।

ভড়মহাশয় বলিলেন—সে বিন্দি বোষ্টুমি তো একবারও ইদিকে আসেনি ব'লে মনে হচ্চে বাবু, তাকে একবার ডেকে পাঠাই। এই ও-মাসেও তার টাকা মণিঅর্ডার ক'রে পাঠানো হয়েছে! ধর্ম্ম আর নেই দেখচি কলিকালে! পয়সা নিবি অথচ কাজ করবি নে!

সন্ধান লইয়া জানা গেল, বিন্দি বোষ্টুমি আজ কয়দিন হইল ভিন্-গাঁয়ে তাহার মেয়ের বাড়ী গিয়াচে। পাশের বাড়ীর সিধু ভট্টাচার্য্যির মেয়ে হৈম আসিয়া বলিল—মা ব'লে পাঠালেন, আপনি কি এখন চা খাবেন কাকা?

—এই যে, হৈম মা, ভালো আছো? তোমাদের বাড়ীর সব ভালো? বাবা কোথায়?

—হ্যাঁ, সব একরকম ভালো। বাবা বাড়ী নেই। কাকীমাকে আনলেন না কেন?

—এ তো মা, আড়তের কাজে একদিনের জন্যে আসা। আজই এখুনি চ'লে যাবো।

—তা হবে না। মা বলেচে, আপনি আর ভড়-জ্যাঠা এবেলা আমাদের বাড়ী না খেয়ে যেতে পাবেন না। মা ভাত চড়িয়েচে। আমায় ব'লে দিলে—তোর কাকা চা খাবে কিনা জিগ্যেস ক'রে আয়।

—তা যাও মা, নিয়ে এসোগে।

বৈকালে তিনটার ট্রেনে কলিকাতা যাওয়ার কথা—দুপুরে সিধু ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দু'জনে খাইতে গেলেন। হৈমর মা হাসিমুখে বলিল—কি ঠাকুরপো, এখন শহুরে হয়ে প'ড়ে আমাদের ভুলে গেল নাকি? বাড়ীটা যে জঙ্গল হয়ে গেল—ওর একটা ব্যবস্থা করো! অনঙ্গকে নিয়ে এলে না কেন?

—আনবো কি বৌদি, একবেলার জন্য আসা! তাও এখানে আসবো ব'লে আসিনি, ঝিকরগাছায় এসেছিলাম আড়তের কাজে। সে আসতে চেয়েছিল!

—এবার একদিন নিয়ে এসো ঠাকুরপো। কতদিন দেখিনি, দেখতে ইচ্ছে করে।

—তার চেয়ে আপনি কেন চলুন না বৌদিদি, শহর ঘুরে আসবেন, দেখা-শোনাও হবে?

—আমাদের সে ভাগ্যি যদি হবে, তবে হাঁড়ি ঠেলবে কে দু'বেলা? ওকথা বাদ দাও তুমি—যেমন অদেষ্ট করে এসেছিলাম, তেমনি তো হবে। তবে একবার কালীঘাটে গিয়ে মা'কে দর্শন করার ইচ্ছে আছে। বোশেখ মাসের দিকে, দেখি কতদূর কি হয়!

—আমায় বলবেন, আমি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো, আমার ওখানে গিয়ে পায়ের ধুলো দেবেন।

বৈকালের ট্রেনে দুজনে কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামীকে দেখিয়া অনঙ্গ বড় খুশী হইল। কাছে বসিয়া চা ও খাবার খাওয়াইতে-খাওয়াইতে বলিল—উঃ, তুমি আলো মা—কি

কষ্ট গিয়েছে যে! গ্রামে হয়, তবুও এক কথা! এ ধরো, নিজের বাড়ী হলেও বিদেশ—এখানে মন ছট্‌ফট্‌ করে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাকে একদিন শচীন ঠাকুরপো খুঁজতে এসেছিল—কি একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েচে।

—কই, কি চিঠি, দেখি?

অনঙ্গ একখানা খামের চিঠি আনিয়া স্বামীর হাতে দিল। গদাধর চা খাইতে খাইতে খাম খুলিয়া পড়িলেন। লেখা আছে—তোমার দেখা পেলাম না এসে। শুনলাম নাকি আড়তের কাজে বার হয়েচো। দেশ থেকে বাবা চিঠি লিখেছেন, তাঁর শরীর অসুস্থ—একবার দেশে যেতে হবে। একটা কথা, শোভারাণী তোমার কথা সেদিন জিগ্যেস করছিল—সময় পেলে একদিন এসো না? আমার ওখানে এসো, আমি নিয়ে যাবো। নির্ম্মল এখনও কোন্নগর থেকে ফেরে নি। সে একটা গুরুতর কাজ ক'রে গিয়েচে, সেজন্যে শোভারাণীর সঙ্গে একবার তোমার দেখা করা জরুরী দরকার। এলে সব কথা বলবো। সেইজন্যেই শোভা তোমার খোঁজ করেচে।

চিঠি পড়িয়া গদাধর বিস্মিত হইলেন। শচীন কখনো তাহার বাড়ী আসে না, আসার রেওয়াজ নাই। সে আসিয়া এমন একখানি জরুরী চিঠি দিয়া গেল! নির্ম্মল কি করিয়াছে? শোভারাণী মস্ত-বড় অভিনেত্রী—তাঁর সঙ্গে নির্ম্মলের কি সম্বন্ধ? তাহাকেই-বা তাঁহার নিজের দরকার—ব্যাপার কি?

স্বামীর মুখ দেখিয়া অনঙ্গ কৌতূহলের সহিত বলিল—কি চিঠি গা?

—য়্যাঁ চিঠি! হ্যাঁ, ও একটা···

—কোনো খারাপ খবর নয় তো?

—নাঃ। এ অন্য চিঠি।···আচ্ছা, আমি চলে গেলে নির্ম্মল এখানে এসেছিল আর?

—একদিন এসেছিল বটে। কেন বলো তো? তার কিছু হয়েচে নাকি?

—না, সে-সব নয়। সে বাড়ী যায় নি কিনা···

—সুধাদের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

—না, আমার সময় কোথায়? কখন যাই ও-পাড়ায় সুধাদের বাড়ী?

—খেলে কোথায়?

—সিধুদা'দের বাড়ী। হৈম এসে ডেকে নিয়ে গেল।

গদাধরের কিন্তু এসব কথা ভালো লাগিতেছিল না। কি এমন ঘটিল, যাহার জন্য শোভারাণী খোঁজ করিয়াছেন! নির্ম্মল গ্রামে ফিরে নাই, অথচ তিনদিনের মধ্যেই তাহার ফিরিবার কথা।

শোভারাণীই বা তাহার খোঁজ করিলেন কেন? তাহার সহিত এসব ব্যাপারের সম্পর্ক কি?

গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—ক'টা বাজলো দেখ তো?

—এই তো দেখে এলাম সাতটা বাজে। কেন, এখন আবার বেরুবে নাকি?

—এক জায়গায় যেতে হবে এখুনি। আড়তের কাজ—ফিরতে দেরি হতে পারে।

আড়তের কাজ শুনিয়া অনঙ্গ আপত্তি করিল না—নহিলে ক্লান্ত স্বামীকে সে কিছুতেই এখনি আবার বাহিরে যাইতে দিত না।

গদাধর প্রথমে শচীনের বাসায় আসিয়া শুনিলেন, সে বাহির হইয়া গিয়াছে, কখন আসিবে, ঠিক নাই। গদাধর ঘড়ি দেখিলেন, আটটা বাজে। একা এত রাত্রে শোভারাণীর বাড়ী যাওয়া কি উচিত হইবে? অথচ নির্ম্মল কি এমন গুরুতর কাজ করিয়াছে, তাহা না জানিলেও তো তাহার স্বস্তি নাই।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাধর একাই শোভারাণীর বাড়ী যাইবেন স্থির করিলেন। বাড়ীর নম্বর তিনি সেদিন দেখিয়াছেন,—নিশ্চয় বাহির করিতে কষ্ট হইবে না।

বাড়ীর যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বুকের মধ্যে ভীষণ ঢিপ্-ঢিপ্ করিতে সুরু করিল, জিভ যেন শুকাইয়া আসিতেছে, কান দিয়া ঝাল বাহির হইতেছে—বুকের ভিতরে তোলপাড় কিছুতে শান্ত হয় না! এমন তো কখনো হয় নাই! গদাধর খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা ভীত হইয়া উঠিলেন।

অনেকখানি আসিয়া ঠিক করিলেন, থাক্ আজ, সেখানে শচীনের সঙ্গে যাওয়াই ভালো। মহিলাদের সঙ্গে তেমন করিয়া আলাপ করা তাঁহার অভ্যাস নাই, কখনো করেন নাই—বড় বাধো-বাধো ঠেকে। তাছাড়া তিনি যদি কিছু মনে করেন?

কিন্তু গদাধর ফিরিতে পারিলেন না। উত্তেজনা ও ভয়ের পিছনে মনের গভীর গহনে একটা আনন্দের ও কৌতূহলের নেশা—সেটা চাপিয়া রাখা অসম্ভব।

বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়া গদাধর খানিকক্ষণ বন্ধ-দরজার সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। কড়া নাড়িবেন কি নাড়িবেন না? চলিয়া যাওয়াই বোধহয় ভালো! একবার চলিয়া যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং মরীয়া হইয়া সজোরে কড়া নাড়া দিলেন। প্রথম দু'একবার নাড়াতে কেহ সাড়া দিল না। মিনিট তিন-চার পরে ছোকরা চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল—কাকে চান আপনি?

গদাধর বলিলেন—মিস্ শোভারাণী মিত্র আছেন?

তাঁহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

চাকর বলিল—হ্যাঁ, আছেন। আপনার কি দরকার?

—আমার বিশেষ দরকার আছে, একবার দেখা করবো।

—কি নাম বলবো?

—বলো, গদাধরবাবু,—শচীনের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন।

একটু পরে চাকর আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল—চলুন ওপরে।

উপরের হল-ঘর পার হইয়া সেদিনের সেই কামরাতে চাকর তাঁহাকে লইয়া গেল। গদাধর গিয়া দেখিলেন, শোভা একটা ঈজিচেয়ারে শুইয়া কি বই পড়িতেছে—পাশে টিপয়ের উপর পেয়ালা ও ডিস, বোধহয় এইমাত্র চা-পান শেষ করিয়াছে।

গদাধর একটি সাহসের কাজ করিলেন। বিনীতভাবে বলিলেন—একটা কথা বলি—কিছু মনে করবেন না।

শোভা বলিল—কি, বলুন ?

—আপনার টাকার দরকার বলছিলেন,...ও টাকাটা আমি কাল সকালেই আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নির্মলের কাছ থেকে চেকের টাকা আমি আদায় ক'রে নেবো।

—আপনি ? না, না, আপনি কেন দেবেন ?

—আজ্ঞে তা হোক। আপনি যদি কিছু মনে না করেন...

শোভা আর কোনো তর্ক না করিয়া বেশ নির্ব্বিকার-কণ্ঠে বলিল—বেশ, দেবেন।

গদাধর কৃতার্থ হইয়া গেলেন যেন। বলিলেন—কাল সকালে কি থাকবেন ?

—আমি এগারোটা পর্য্যন্ত আছি।

—তাহ'লে আমি নিজেই ওটা নিয়ে আসবো।

—আপনি আবার কষ্ট ক'রে আসবেন কেন—কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন না হয়।

গদাধর দেখিলেন, এ জায়গায় অন্য কাহাকেও চেক্ দিয়া পাঠানো চলিবে না—নতুবা ভড়মহাশয়কে পাঠাইয়া দিলে চলিত। ভড়মহাশয় বা অন্য কেহ মুখে কিছু না বলিলেও, নানারকম সন্দেহ করিতে পারে—কথাটা পাঁচ-কান হওয়াও বিচিত্র নয় সে-অবস্থায়। সুতরাং তিনি বলিলেন—তাতে কি, কষ্ট করবার কি আছে এর মধ্যে! আমি নিজেই আসবো-এখন।

—কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন ?

—আজ্ঞে, লালবিহারী সা রোড, মানিকতলা।

—নির্ম্মলবাবুকে চিনলেন কি ক'রে ?

—আমার গাঁয়ের লোক...এক গাঁয়ে বাড়ী।

গদাধরের অত্যন্ত কৌতূহল হইল, শোভারাণীর সঙ্গে নির্ম্মলের কি ভাবে পরিচয় হইল জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ আবার দু'জনেই চুপ। গদাধর অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন, এবার বোধ হয় যাওয়া ভালো—বেশিক্ষণ থাকা হয়তো বেয়াদপি হইবে। কিন্তু হঠাৎ ওঠেনই বা কি বলিয়া!

শোভাই হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চা খাবেন ?

গদাধর জানাইলেন, এখন তিনি চায়ের জন্য কষ্ট দিতে রাজী নন্—এইমাত্র খাইয়া আসিলেন, শোভারাণী আবার চুপ করিল।

কিছুক্ষণ উসখুস্ করিয়া গদাধর বলিলেন—তাহলে আমি এবার যাই,—রাত হয়ে গেল।

শোভা বলিল—আচ্ছা,—আসুন তবে।

গদাধর উঠিলেন, এবার শোভা এমন একটি ব্যাপার করিল, তার মত গর্ব্বিতা মেয়ের নিকট গদাধর যাহা প্রত্যাশা করেন নাই—শোভা ঈজিচেয়ার হইতে উঠিয়া সিঁড়ির মুখ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। গদাধর সমস্ত দেহে এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ অনুভব করিলেন। নেশার মত সেটা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল সারা পথ! গদাধরের পক্ষে এ

অনুভূতি এত নূতন যে, তিনি নিজের এই পরিবর্ত্তনে কেমন ভীত হইয়া পড়িলেন!

স্বামীকে সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়া অনঙ্গ বলিল—বাপরে! এত দেরি করবে তা তো ব'লে গেলে না—আমি ব'সে-ব'সে ভাবচি।

—ভাবার কি দরকার আছে? ছেলেমানুষ তো নই যে, পথ হারিয়ে যাবো!

হঠাৎ সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি যেন ধাক্কা খাইয়া চুরমার হইয়া গেল। সাধারণ মানুষের মতই দৈনন্দিন একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে গদাধর খাইতে বসিলেন।

পরদিন সকালে আটটার পরে গদাধর শোভারাণীর বাড়ী গিয়া কড়া নাড়িলেন। ছোকরা চাকরটি দরজা খুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং উপরে লইয়া গিয়া বারান্দার বেতের চেয়ারে বসাইয়া বলিল—মাইজি নাইবার ঘরে—আপনি বসুন।

একটু পরে ভিজে এলো-চুলের রাশি পিঠে ফেলিয়া সদ্যস্নাতা শোভা সিমলের সাদা সাড়ী পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এই যে, এসেচেন! নমস্কার! খুব সকালেই এসে পড়েচেন। বসুন, আমি আসচি।

শোভা পাশের ঘরে ঢুকিয়া দুখানা মাসিকপত্র, একখানা লেটারপ্যাড্ ও একটা ফাউন্টেন পেন লইয়া ঈজিচেয়ারটিতে আসিয়া বসিল এবং চেয়ারের চওড়া হাতলের উপর সেগুলি রাখিয়া গদাধরের দিকে চাহিয়া বলিল—তারপর?

তার মুখও অন্যান্য দিনের মত উদাসীন অপ্রসন্ন নয়। বেশ প্রফুল্ল। এমন কি, ঈষৎ মৃদু হাসিও যেন কখনো অধরপ্রান্তে আসিতেছে, কখনও মিলাইয়া যাইতেছে!

গদাধর পকেট হইতে চেক-বই বাহির করিতে-করিতে বলিলেন—সেই চেক্‌খানা···

শোভা হাসিমুখে বলিলেন—বসুন, চা খান, আমি এখনও চা খাই নি। স্নান না ক'রে কিছু খাই না। আপনার তাড়া নেই তো?

—আজ্ঞে না, তাড়া নেই। চা কিন্তু একবার খেয়ে—

—সেটা উচিত হয় নি। এখানে যখন সকালে আসছেন। কোনো আপত্তি নেই তো?

গদাধর তটস্থ হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে না, আপত্তি কি?

শোভা বলিল—ওরে, নিয়ে আয়, ও লালচাঁদ!

গদাধর দেখিলেন, এ অন্য-একজন চাকর। শোভারাণীর অবস্থা তাহা হইলে বেশ ভালো। তিন জন চাকর আছে, ঝিও একটা ঘুরিতেছে—ঠাকুর নিশ্চয়ই আছে। 'স্টার'-অভিনেত্রী শোভারাণী নিশ্চয় নিজের হাতে রান্না করেন না!

লালচাঁদ ট্রেতে দু-পেয়ালা চা, আর দুখানা প্লেটে ডিমভাজা, টোস্ট্ ও দুটি করিয়া কলা লইয়া দুটি টিপয়ে সাজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শোভা বলিল—নুন দেয় নি দেখচি। আপনাকেও দেয় নি? আঃ, এদের নিয়ে—ও লালচাঁদ!

—আপনি তো অনেক বেলায় চা খান! এখন ন'টা বাজে।

—আমি? হ্যাঁ, তাই হয়। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়, প্রায় সাড়ে-সাতটা—এক-একদিন তার বেশিও হয়। স্টুডিওতে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাজ হচ্চে আজকাল—রাত এগারোটা হয় এক-একদিন ফিরতে।

গদাধর স্টুডিও কি ব্যাপার ভালো জানিতেন না, কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, সেখানে কি হয়? ছবি তৈরী হয় বুঝি?

শোভা বিস্ময়ের সহিত বলিল—আপনি জানেন না? দেখেন নি কখনো? টালিগঞ্জের ওদিকে কখনো—ও!··

—আজ্ঞে, আমরা হলাম গিয়ে পল্লীগ্রামের লোক, আড়তদারি ব্যবসা নিয়েই দিন কেটে যায়। সত্যি কথা বলতে, কখনই-বা সময় পাবো, আর কখনই-বা সেই টালিগঞ্জে গিয়ে স্টুডিও—

হাসিয়া শোভা বলিল—তা তো বটেই। বেশ, চলুন না একদিন—আমার গাড়ীতে যাবেন আমার সঙ্গে, স্টুডিও দেখে আসবেন।

গদাধর কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, আমার গাড়ী! মানে? তাহা হইলে মোটরও আছে। গদাধর যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহা নয়, এ মেয়েটির অবস্থা হয়তো তাঁহার অপেক্ষাও ভালো। কলিকাতার লোককে বাহিরে দেখিয়া চেনা যায় না। তিনি এতদিন পাটের ব্যবসা করিয়া পাটের ফেঁসো খাইয়া মরিলেন, মোটর গাড়ীর মুখ দেখিতে পাইলেন না। অথচ মেয়েটি এই অল্পবয়সে—দেখ একবার! বিনীতভাবে তিনি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, তা গেলেই হয়, আপনি যদি—তা বরং একদিন···

—আর এক পেয়ালা চা?

—আজ্ঞে না, আর···

—আমার কিন্তু দু'পেয়ালার কমে হয় না। সারাদিনের মধ্যে দশ-বারো বার হয়ে যায়—স্টুডিওতে তো খালি চা আর খালি চা—নাহলে পারিনে, হাঁপিয়ে পড়ি—যেমন পরিশ্রম, তেমনি গরম—

চাকর এক পেয়ালা চা আনিয়া শোভার পাশের টিপয়ে রাখিয়া তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিল। শোভা তাহাকে বলিল—না, এখন যা—আপনি সত্যিই নেবেন না আর-এক—

—আজ্ঞে না, আমার শরীর খারাপ হয় বেশি চা খেলে। তেমন অভ্যেস নেই তো!

—আপনার শরীর দেখে মনে হয় বোধহয় ম্যালেরিয়া হয় মাঝে-মাঝে?

—আগে হয়ে গিয়েচে, এখন কলকাতায় আর হয় না।

—বাড়ী করেচেন তো এখানে? বেশ, এখানেই থাকুন। শচীনবাবু আপনার ভাই হয় সম্পর্কে? ও জানেন, আমাদের স্টুডিওতে কাজ করে। আমার সঙ্গে আজ দেখা হবে-এখন—বলবো আপনার কথা।

—শচীন স্টুডিওতে কাজ করে, তা তো জানতুম না।

—জানতেন না নাকি? বেশ। সেই নিয়েই তো আমার সঙ্গে জানাশোনা হ'লো—এখানে আসে যায় মাঝে মাঝে। আমার গানগুলো একবার সুর দিয়ে ওর সঙ্গে সেট্ ক'রে নিই।

শচীন বাজাইতে পারে, গদাধর আগেই জানিতেন—সখের যাত্রার দলে বাঁশি বাজাইয়া বেড়াইয়া লেখাপড়া শিখিল না, কখনো বিষয়-আশয় দেখাশুনা করিল না। সে যে কলিকাতায় আসিয়া এত-বড় 'বাজিয়ে' হইয়া উঠিয়াছে, ফিল্ম্ তোলার স্টুডিওতে চাকরি করে—এত খবর তিনি রাখিতেন না। শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন।

চা পান শেষ হইলে গদাধর দু'এক কথার পর পুনরায় চেক্-বই বাহির করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—তাহ'লে ক্রশ চেক্ দেবো কি? আপনার পুরো নামটা—

—ও চেক্খানা? ও আপনাকে দিতে হবে না।

গদাধর এমন বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহার মনে হইল, তিনি কথার অর্থ ঠিক বুঝিতেছেন না। শোভার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—না, মানে আমি বলচি, আপনার নামটা চেকে লিখে ক্রস্ ক'রে দেব কিনা?

শোভা এবার বেশ ভাল ভাবেই হাসিল। মৃদুহাসি নয়, সত্যিকার আমোদ আর কৌতুকের হাসি। গদাধর মুগ্ধ হইয়া গেলেন সেই অতি অল্প দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যেই। হাসিলে, যে সব মেয়ে যথার্থ সুন্দরী, তাদের চোখে-মুখে কি সৌন্দর্য ও মোহ ফুটিয়া উঠে—গদাধর পাটের বস্তা ওজন করিয়া মোকামে মোকামে ঘুরিয়া কাল কাটাইয়াছেন এতদিন—কখনো দেখেন নাই!

হাসিতে-হাসিতে শোভা বলিল—আপনি ভারি মজার লোক—বেশ লাগে আপনাকে—শুনতে পেলেন না, কি বলচি? ও চেক্ দিতে হবে না আপনাকে।

—কেন বলুন তো?

—আপনার বন্ধু নিয়ে গেল টাকা আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে—আপনি কেন দণ্ড দেবেন? গেল, যাক্গে, আমারই গেল।

—না না, তা কখনও হয়? আমার তো বন্ধু, ও অভাবী লোক, ঠিক যে ঠকিয়ে নিয়েছে, তা নয়। ও টাকা আমি আদায় করবো। নিন্ আমার কাছ থেকে—আপনার পুরো নামটা—

শোভার মুখশ্রী ও চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সদয় হইয়া আসিয়াছে—সে গর্বিত ও উদাসভাব আর ওর মুখে-চোখে নাই। দুই হাত অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিতে সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া সে বলিল—না, আমি বলচি, কেন দুশো টাকা মিথ্যে দণ্ড দেবেন? যদি আদায় করতে পারি, আমিই করবো। আমি ফিল্মে কাজ করি। অনেক লোকের সঙ্গে মিশি রোজ—মানুষ চিনি। আপনার বন্ধুটি আপনার মত ভালমানুষ লোককে কখনো টাকা শোধ করবে না—কিন্তু আমার কাছে করবে। চেক্-বইটা পকেটে ফেলুন।

গদাধর চুপ করিয়া রহিলেন, আর কিছু বলা ভদ্রতা-সঙ্গত হইবে না হয়তো। জোর করিয়া কাহাকেও টাকা গছাইতে আসেন নাই তিনি।

শোভা বলিল—কিছু মনে করেন নি তো?

—আজ্ঞে না, এর মধ্যে মনে করার কি আছে? তবে···

—শচীনবাবুকে কিছু বলবার থাকে তো বলুন—স্টুডিওতে দেখা হবে।

—আমি এখানে এসেছিলুম এই কথাই বলবেন, তাছাড়া আর কি! তাহ'লে আমি উঠি আজ। নমস্কার।

গদাধর সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়, এবারও শোভা সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা দিয়া বাহির হইবার সময় গদাধর দৈবাৎ একবার উপরের দিকে চাহিতেই শোভার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। গদাধর ভদ্রলোক, লজ্জিত হইলেন। অমনভাবে চাওয়া উচিত হয় নাই। কি উনি মনে করিলেন?

মেয়েটি অদ্ভুত! কাল বলিয়া দিল টাকা আনিতে, অথচ আজ কিছুতেই লইতে চাহিল না! টাকা এভাবে কে ফিরাইয়া দেয় আজকালকার বাজারে? বিশেষ তিনি যখন যাচিয়াই দিতে গিয়াছিলেন!

সেদিন সারাদিন আড়তের কাজকর্মের ফাঁকে মেয়েটির মুখ কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। সেই সদ্যস্নাতা মূর্ত্তি, হাসি-হাসি সুন্দর মুখ, দয়ার্দ্র ডাগর চোখ দুটি! ছবির সেই বধূ—কমলা!

বৈকালে চা ও লুচি খাইতে দিয়া অনঙ্গ বলিল—হ্যাঁ গো, নির্ম্মল ঠাকুরপো কোথায়?

—কেন? কি হয়েছে বলো তো?

—সুধা আমায় একখানা চিঠি লিখেচে—তাতে সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েচে, লিখেচে, নির্ম্মল-ঠাকুরপোর কোনো পাত্তা নেই—এতদিন দেশ থেকে এসেচে···

—কি ক'রে বলবো, বলো? ওসব কথার কি উত্তর দেবো? সে তো আমায় বলে যায়নি?

স্বামীর বিরক্তির সুর অনঙ্গ লক্ষ্য করিল। আজকাল যেন কি হইয়াছে, কথা বলিলে সব সময় রাগ-রাগ ভাব! কলিকাতায় আসিয়া এই কিছুদিন হইল এরূপ হইয়াছে স্বামীর। আগে সে কখনো এমন দেখে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নরম-সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল—আজ রাত্রে কি খাবে?

গদাধর স্পষ্টই বিরক্ত হইলেন। এসব জাতীয় মেয়েদের মুখে অন্ত কোন কথা নাই—কেবল খাওয়া আর খাওয়া! কি কথাই-বা জানা আছে যে বলিবে? উত্তর দিলেন—সে হলো রাতের কথা—যা হয় হবে-এখন, তা নিয়ে এখন মাথাব্যথা কিসের?

অনঙ্গ এবার রাগ করিল; বলিল—সব-তাতেই অমন খিঁচিয়ে ওঠো কেন আজকাল, বলো তো? মিষ্টি কথায় উত্তর দিতে ভুলে গেলে নাকি? এমন তো ছিলে না দেশে! কি হয়েচে আজকাল তোমার?

গদাধর এ-কথার উত্তর দিলেন না। সংসার হঠাৎ তাঁহার কাছে নিতান্ত বিস্বাদ মনে হইল। অনঙ্গ আধ-ময়লা একখানা শাড়ী পরিয়া আছে, মাথার চুল এখনও বাঁধে নাই, কেমন যেন আগোছালো ভাব—তাছাড়া ওর মুখ দেখিলেই মনে হয়, এই বয়সে বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে যেন!

কিসের জন্য তিনি এসব করিয়া মরিতেছেন? কাহার জন্য পাটের দালালি আর দুপুরের রোদে-রোদে মোকামে-মোকামে ঘুরিয়া পাটের কেনা-বেচা। সত্যিকার জীবনের আমোদ কি তিনি একদিনও পাইয়াছেন? পুরুষমানুষের মন যা চায় নারীর কাছে—অনঙ্গ কেন, কোনো মেয়ের কাছেই কি এতদিন তা পাইয়াছেন? জীবনে তিনি কি দেখিলেন, কি-বা পাইলেন! এই কলতলায় এঁটো বাসনের স্তূপ, ওই আধময়লা ভিজে-কাপড়ের রাশি, ওই কয়লা-কাঠের গাদা, আলু-বেগুনের চুবড়িটা—এই সংসার? এই জীবন? ইহাই তিনি চিরকাল দেখিবেন ও জানিবেন?

শচীনকে গ্রামের লোকে নিন্দা করে, কিন্তু শচীন তাঁহার চেয়ে ভালো। সে জীবনকে ভোগ করিয়াছে। তিনি কি করিয়াছেন? কিছুই করেন নাই!

অনঙ্গ বলিল—বড় ঠাণ্ডা পড়েচে, আজ আর কোথাও বেরিও না সন্ধ্যের পর।

—সন্ধ্যের এখন অনেক দেরি। আড়তের কাজ মেটে নি, সেখানে যেতে হবে এখুনি।

—কখন আসবে?

—তা কি ক'রে বলি? কাজ মিটে গেলেই আসবো।

—ভড়মশায় কি রাত্রে এখানে খাবেন?

—কেন, সে খাচ্চে কোথায়? ওবেলা আসে নি?

—আজ দুদিন তো আসেন না। একটু জিগ্যেস্ কোরো তো। দুদিন ভাত রান্না রইলো, অথচ লোক এলো না! আর তুমিও দেরি কোরো না।

কথা শেষ করিয়াই অনঙ্গ আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল—সত্যি, আমার ওপর তুমি রাগ করো নি? আজ তুমি সকাল-সকাল এসো। গাঁয়ে গেলে, কি-রকম দেখলে না-দেখলে কিছুই শুনি নি। শুনবো-এখন। এসো সকাল-সকাল—কেমন তো?

গদাধর আড়তে যাইবার পথে ভাবিলেন—কি বিশ্রী জীবন! একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। আর ভালো লাগে না এ।

সেই রাত্রেই সন্ধ্যার পরে গদাধর শোভারাণীর বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়িলেন। চাকর আসিয়া বলিল—কে?

—মিস্ মিত্র আছেন?

—মাইজি স্টুডিও থেকে ফেরেননি।

—কখন আসেন?

—আজ সকাল-সকাল আসবেন ব'লে গিয়েছেন—এই আটটা…

—ও! আচ্ছা, থাক, তবে।

—কিছু বলতে হবে, বাবু?

—না—আচ্ছা—না, থাক্। আমি অন্য একসময় বরং···

বলিতে-বলিতে দরজার সামনে শোভারাণীর মোটর আসিয়া দাঁড়াইল এবং মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া গদাধরকে দেখিয়া শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনি এখন? কি বলুন তো?

গদাধর হঠাৎ যেন সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া গেলেন। কেন এখানে আসিয়াছেন, তাহার কি উত্তর দিবেন? নিজেই কি তাহা ভালো বুঝিয়াছেন? বোঝেন নাই। কিন্তু তিনি কোনো-কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শোভা অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিল—আসুন, চলুন ওপরে। আপনি যে-রকম মানুষ, তাতে পাটের আড়তদার হওয়া উচিত ছিল না, উচিত ছিল কবি হওয়া। আসুন।

এইদিন হইতে গদাধর আড়ত হইতে সন্ধ্যার পরে প্রায়ই দেরিতে বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন। অনঙ্গ প্রথম-প্রথম কত বকিত, রাগ করিত, এত রাত হইবার কারণ কি—শরীর খারাপ হইলে টাকায় কি হইবে? এত পরিশ্রম শরীরে সইবে কেন? ইত্যাদি। গদাধর প্রায়ই কোনো উত্তর দিতেন না। যখন দিতেন, তখন নিতান্তই সংক্ষেপে। কি যে তার অর্থ, তেমন পরিষ্কার হইত না। বাড়ী ফিরিয়া গদাধর সব দিন খাইতেনও না, না খাইয়া শুইয়া পড়িতেন। অনঙ্গ নিজেদের শোবার ঘরে খাবার আনিয়া যত্ন করিয়া জাল দিয়া ঢাকা দিয়া, জাগিয়া বসিয়া থাকে, স্বামী কখন আসিয়া কড়া নাড়িবেন—কারো সাড়া না পাইলে রাগ করিয়া বসিবেন হয়তো!

শীত চলিয়া গেল। ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ।

এবার পাটের কাজে বেশ লাভ হইয়াছে—গদাধর সেদিন কথায় কথায় প্রকাশ করিয়াছেন স্ত্রীর কাছে।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি। অনঙ্গ বাড়িতে সত্যনারায়ণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—পূজা হইবার পরে আড়তের লোকজন খাওয়ানো হইবে, আশেপাশের দু'চারজন প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আড়তের কর্ম্মচারীদের বসাইয়া লুচি খাওয়ানো হইবে, বাকী সকলকে সত্যনারায়ণের প্রসাদ ও ফলমূল মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্বারা জলযোগ করানো হইবে।

অনঙ্গ সারাদিন উপবাস করিয়া আছে, স্বামী ফিরিলে পূজা আরম্ভ হইবে এবং তাহার পর সকলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। পাশের গলিতে সিধুর মা নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বিধবা খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করেন, তাঁহার একটি মাত্র ছেলে সামান্য মাহিনার চাকরি করে। অনঙ্গ তাঁহাকে এবেলা খাইতে বলিয়াছে, তিনি আসিয়া পূজার নৈবেদ্য ইত্যাদি গুছাইয়া দিয়াছেন—অনঙ্গ তাঁহাকে একটু অনুরোধ করিয়াছিল সন্ধ্যার পরে একটু জলযোগ করিতে,

তিনি বলিয়াছেন—এখন কেন মা, পুজো-আচ্চা হয়ে যাক্, বিধবা মানুষ, একেবারে সকলের শেষে যাহয় কিছু মুখে দেবো। তুমি রাজ-রাণী হও ভাই, তোমার বড্ড দয়া গরীবের ওপরে! আমার ছেলে তো মাসিমা বলতে অজ্ঞান।

সন্ধার পরে পূজা আরম্ভ হইল। লোকজন একে-একে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকেরাও আসিলেন। এখনও গদাধর আসেন নাই—তিনি আসিলেই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো শুরু হইবে।

অনঙ্গ আজ খুব ব্যস্ত। নিজে সে রান্নার তদারক করিয়াছে বৈকাল হইতে। সব দিকে চোখ রাখিয়া চলিতে হইয়াছে, যাহাতে কেহ কোন ত্রুটি না ধরে। পূজা শেষ হইয়া রাত পড়িল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গৃহস্বামী এখনও আসেন নাই! দু'একজন তাগাদাও দিলেন, তাঁহাদের সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিতে হইবে, কাজ আছে অন্যত্র।

হরিয়া চাকরকে ডাকিয়া অনঙ্গ বলিল—ছাখ তো, আড়ত থেকে কেউ এসেচে?

হরিয়া বাহিরের ঘর দেখিয়া আসিয়া বলিল—চার পাচজন এসেচে মাইজি। তবে ভড়মশায় আসেন নি এখনো।

সিধুর মাকে ডাকিয়া অনঙ্গ বলিল—কি করবো দিদি, সব খেতে বসিয়ে দিই, কি বলেন? উনি বোধ হয় কাজে আটকে পড়েছেন। ভড়মশায় যখন আসেন নি—তখন দু'জনে কাজ শেষ ক'রে চাবি দিয়ে একসঙ্গে আসবেন। এদের বসিয়ে রেখে কি হবে?

সিধুর মা বলিলেন—তাই বসিয়ে দাও। আমি সব দিয়ে আসচি গিয়ে—আমায় সাজিয়ে দাও।

বাহিরের লোক সব প্রসাদ খাইয়া চলিয়া গেল। আড়তের লোকদের খাওয়াইতে বসানো হইল না, গদাধর ও ভড়মশায়ের অপেক্ষায়। রাত ক্রমে দশটা বাজিল। তখন আর কাহাকেও অভুক্ত রাখিলে ভালো দেখায় না, সিধুর মার পরামর্শে তাহাদেরও বসাইয়া দেওয়া হইল।

তাহাদের খাওয়া শেষ হইল, রাত তখন প্রায় এগারোটা, পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রি—গ্যাস ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় বাধা ঠেলিয়াও এখানে-ওখানে স্ব-মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এমন সময় ভড়মশায় আসিলেন—একা।

অনঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া ভড়মশায়কে বলিল—উনি কই? এত দেরি কেন আপনাদের?

ভড়মশায় বলিলেন—আমি হাটখোলায় তাগাদায় বেরিয়েছি ন'টার আগে। উনি তো তখুনি বেরুলেন—আমি ভাবচি এতক্ষণ বুঝি এসেছেন।

ভড়মশায়ের গলার স্বর গম্ভীর। তিনি কি একটা যেন চাপিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অনঙ্গ ব্যস্ত ও ভীতকণ্ঠে বলিলেন—তাহ'লে উনি কোথায় গেলেন, তাঁর খবরটা একবার নিন্—সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল নাকি?

ভড়মশায় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না, সে-সব ছিল না। ভয় নেই কিছু। নইলে কি আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকি বৌমা? তিনি হারিয়েও যান নি বা অন্য কোনো কিছু না।

অনঙ্গ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—যাক্, তবুও বাঁচা গেল। কাজে গিয়ে থাকেন, আসবেন-এখন—তার জন্যে ভাবনা নেই, কিন্তু এত রাত হয়ে গেল, বাড়ীতে একটা কাজ, তাই বলচি।

ভড়মশায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—একটা কথা মা, বলি তবে। ভেবেছিলাম, বলবো না—কিন্তু না বলেও তো পারিনে।

অনঙ্গ ভড়মশায়ের মুখের ভাবে ভীত হইয়া বলিল—কেন, কি হয়েচে? কি কথা?

—আমি বলেচি, এ-কথা যেন বাবুর কানে না ওঠে। আপনাকে মেয়ের মত দেখি, তেরো বছরের মেয়ে যখন প্রথম ঘর করতে এলেন, তখন থেকে দেখে আসচি, কথাটা না বলেও পারিনে। উনি আর সে বাবু নেই। এখন কোথায় গিয়ে যে রাত পর্য্যন্ত থাকেন, সকাল-সকাল আড়ত থেকে বেরিয়ে যান -সন্দের আগেই চলে যান এক-একদিন। তারপর শুধু তাই নয়, এ-সব কথা না বললে, বলবেই-বা কে, আমি হচ্চি পুরোনো লোক…এক-কলমে আজ পঁচিশ বছর আপনাদের আড়তে কাজ করচি আপনার শ্বশুরের আমল থেকে। আজ-কাল ব্যাঙ্কের টাকা-কড়িরও উনি গোলমাল করচেন। সেদিন একটা একহাজার টাকার চেক্ ভাঙাতে গেলেন নিজে—কিন্তু খাতায় জমা করলেন না। নিজের নামে হাওলাত-খাতে লেখালেন। এই ক'মাসের মধ্যে প্রায় সাড়ে ছ'হাজার টাকা হাওলাত লিখেচেন নিজের নামে। এসব ঘোর অব্যবস্থা। উনি যেন কি হয়েচেন, সে বাবু আর নেই—এখন কথা বলতে গেলেই খিঁচিয়ে ওঠেন, তাই সাহস ক'রে কিছু বলতেও পারি নে।

অনঙ্গ পাংশুমুখে সব শুনিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভড়মশায় বলিলেন—আমার মনে হয় বৌমা, আমাদের সেই গাঁয়েই আমরা ছিলাম ভালো। বেশী টাকার লোভে কলকাতা এসে ভালো করি নি।

অনঙ্গ উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলিল—এখন উপায় কি বলুন ভড়মশায়—যা হবার হয়েচে, সে-কথা ছেড়ে দিন।

—আমি তলায়-তলায় সন্ধান নিচ্চি। এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি, উনি কোথায় যান, কি করেন! তবে লক্ষণ ভালো নয় সেই দিনই বুঝেচি, যেদিন বড়-তরফের শচীনবাবু ওর সঙ্গে মিশেচে। শচীন আর মাঝে-মাঝে আসে নির্ম্মল।

—তবেই হয়েচে! আপনি ভালো ক'রে সন্ধান নিন্ ভড়মশায়—আমার এ কলকাতা শহরে কেউ আপনার জন নেই—এক আপনি ছাড়া। আপনি নিজে বুঝে-সুঝে ব্যবস্থা করুন। আমিও দেখচি ক'মাস ধ'রে উনি অনেক রাত্রে বাড়ী আসেন, আমি কাউকে সে কথা বলি নি। তা আমি ভাবি, আড়তের কাজ বেড়েচে, তাই বুঝি রাত হয়। মেয়েমানুষ কি বুঝি বলুন? আসুন, আপনি আর কতক্ষণ ব'সে থাকবেন, খেয়ে নেবেন চলুন। ভগবান যা করবেন, তার ওপর হাত নেই—অদেষ্টে যা আছে, ও আর ভেবে কি করবো!

চোখের জলে অনঙ্গ কথা শেষ করিতে পারিল না।

ঠিক সেই রাত্রে বাগমারী রোড ছাড়াইয়া খাল-ধারের বাগান বাড়ীতে জলসা বসিয়াছে। গদাধর সেখানে আটকাইয়া পড়িয়াছেন। এই কয় মাসের মধ্যেই শচীনের মধ্যস্থতায় আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে গদাধরের আলাপ হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কথা কহিয়া গদাধরের মন ভরিয়া ওঠে। মনে হয়, এত কাল গ্রামে পাটের বস্তা লইয়া কি করিয়াই না দিন কাটাইয়াছেন! যৌবনের দিনগুলো একেবারে নষ্ট হইয়াছে!

এখানে এই বিলাসের জগতে ইহারা মায়া-বিভ্রম জাগাইয়া তোলে। মনে হয় ব্যবসায় যদি করিতে হয় তো এই ফিল্মের ব্যবসায়! কতকগুলো ম্যানেজার, গোমস্তা সরকার, দারোয়ান কুলির কোনো সংস্রব নাই—এমন সব কিশোরী…তাহাদের সঙ্গে আলাপ, গানের ঝর্ণাধারা…এমন অন্তরঙ্গতা করিতে জানে, মনে হয়, পৃথিবী যেন মায়াপুরী হইয়া ওঠে! ওই শচীন খুব আল্‌গাভাবে কানে মন্ত্র দেয়—পাটের কারবার তো করেচো—পয়সা পিটছো খুবই। চালু কারবার—পাকা মুহুরি গোমস্তা আছে—সে-কাজ তারা অনায়াসে দেখতে পারে—আমি বলি কি ফিল্মের ব্যবসায় যদি নেমে যাও—এ ব্যবসায় সারা পৃথিবী কি-টাকাটা অনায়াসে রোজগার করছে! এ কারবারে লোকসানের কোনো ভয় নাই, শুধু লাভ আর লাভ! তাছাড়া এই সব মেয়ে—তোমাকে একেবারে—

শচীন ওস্তাদ মানুষ…মানুষ চরাইয়া খায়। জানে, কোন্ টোপে কোন্ মানুষকে গাঁথা যায়।…শচীন বলে—কিছু না, সামান্য পুঁজি ফেলো—নিজে গ্যাঁট্ হইয়া সেখানে বসিয়া থাকো। দিনের কাজের হিসাব রাখো। স্টুডিও ভাড়া পাওয়া যায়—ফিল্মের রোল ধারে যত চাও—গাঁট হইতে কিছু টাকা ছাড়ো—ছবির তিন-ভাগ চার-ভাগ তোলা হইবামাত্র—ডিষ্ট্রিবিউটর আসিয়া কম্‌সে-কম্ আগাম ষাট-সত্তর হাজার টাকা নিজের তহবিল হইতে বার করিয়া দিবে,—তার পাঁচ গুণ টাকা আদায় হইয়া আসিবে—ছবি তৈয়ার হইলে সে ছবি ঘুরিবে সারা বাঙলা মুল্লুকে—তার হিন্দী করো, হোল ইণ্ডিয়া। একখানা ছবির বাঙলা-হিন্দী দু-ভার্সনে এক বছরে নিট লাভ বিশ-পঁচিশ লাখ হইবে। দু-চারিটা দৃষ্টান্তও শচীন দিল—ঐ সব কোম্পানির মালিক ফিল্ম কোম্পানির অফিসে কেরানীগিরি করিত দেড়শো-দুশো টাকা মাহিনায়। এদিকে নজর রাখিয়া চলিত—ফস করিয়া মাড়োয়ারি ক্যাপিটালিস্ট ধরিয়া আজ অত বড় কোম্পানির মালিক! মোটর ছাড়া পথ চলে না—কি প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়াছে আলিপুরে! টাকার কুমীর বনিয়াছে! কি মান, কি ইজ্জৎ ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়াছে…নিরেট ছেলে একবার বিলাত ঘুরিয়া আসিলেই—ব্যস্!

গদাধর শোনেন। গদাধরের মনে হয়, কারবার—ব্যবসা—লাভ—শুধু তা নয়, এমন মধুর সংসর্গ! নাচ-গান…হাসি-গল্প…এ সবের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না…! সেদিন শোভারাণী একটা গান গাহিতেছিল…সে গানের কটি লাইন তাঁহার কানে-মনে সবসময়ে বাজিতেছে—

বসন্ত চলে গেল হায় রে,—
চেয়েও দেখিনি তার পানে।

গদাধরের কেবলি মনে হয়—ও গান তাঁহারি মনের কথা। জীবনের কতখানি কাটিয়া গেল…পৃথিবীতে এমন রূপ-রস-গন্ধ—তার কোনো পরিচয় তিনি পাইলেন না!

এখনো…এখনো যদি কিছু পান।

আজ এ আসরে শচীন তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।—বলিয়াছে, ফিল্মের সকলে আসিবে।—সকলের সঙ্গে আলাপ করো—মেলামেশা করো—ভালো করিয়া দেখো, শুধু ব্যবসার দিক দিয়া। শচীনের সঙ্গে কত বার কত স্টুডিওয় তিনি গিয়াছেন।

আরো কজন ফিল্ম স্টারের সঙ্গে গদাধরের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। তাহাদের সকলকেই কত ভালো লাগে! তাহারা যেন অন্য লোকের জীব! গান আর সুর দিয়া তৈরী!

তাহারা সকলেই আছে। দোল-পূর্ণিমার রাত। বারোমাস খাটিয়া একটা দিন আমোদ না করিলে চলে? এখানে আজ স্টুডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আনন্দ-সম্মেলন। আজ রাত্রে এইখানেই গদাধরের ফিল্ম স্টুডিও খুলিবার কথাবার্ত্তা হইবে, ঠিক আছে।

বাগানটা বেশ বড়। বনেদী বহুকালের পুরানো প্রমোদ-কানন। মাঝখানে যে বাড়ী আছে—সেটা দোতলা। অনেকগুলি ঘর ওপরে নীচে, মেঝে মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো। দেওয়ালে বিবর্ণপ্রায় বড় বড় অয়েলপেণ্টিং—অধিকাংশই নগ্ন নারী-মূর্ত্তির ছবি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কোনো বিলাসী ধনীব্যক্তি শখ করিয়া বাগান-বাড়ী করাইয়া থাকিবেন! সে অতীত ঐশ্বর্য্য ও শৌখীনতার চিহ্ন এর প্রতি ইষ্টকখণ্ডে। বাগান-বাড়ীর একটা ঘর তালাবন্ধ। তার মধ্যে অনেক পুরানো বাসনপত্র, ঝাড়, কার্পেট, কৌচ, কেদারা, আয়না প্রভৃতি গাদা করা। প্রবাদ এই, সেই ঘরে মাঝে-মাঝে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ৺আনন্দনারায়ণ ঘোষকে চোগাচাপকান ও শাম্‌লা পরিয়া একতাড়া কাগজ হাতে ঘুরিতে-ফিরিতে দেখা গিয়াছে। সেকালের বিখ্যাত এটর্নি আনন্দনারায়ণ ঘোষের নাম এখনও অনেকে জানেন।

পুকুর-ধারে শচীন বসিয়া ছিল—পাশে গদাধর এবং রেখা বলিয়া একটি মেয়ে।

রেখা বলিতেছিল—আমাদের স্টুডিওতে আপনি রোজ বলেন যাবো,—যাবো—কৈ, একদিনও গেলেন না তো!

গদাধর হঠাৎ জড়িতস্বরে বলিলেন—আড়ত থেকে বেরোই আর তোমাদের স্টুডিও বন্ধ হয়ে যায়—যাই কখন বলো, রেখা?

—না, আমার পার্টটা না দেখলে আপনি আমায় নেবেন কি ক'রে?

—আরে, তোমায় এমনিই নিয়ে নেবো, পার্ট দেখতে হবে না। চমৎকার চেহারা তোমার, তোমায় বাদ দিলে কি ক'রে হবে?

—সুষমা দিদিকেও নিতে হবে।

—নেবো। তুমি যাকে যাকে বলবে, তাদের সবাইকে নেবো।

—সুষমা দিদির মত গান কেউ গাইতে পারবে না, দেখলেন তো সেদিন, রুক্মিণীর গানে কেমন জমালে ?

—চমৎকার গান—অমন শুনি নি।

শচীন পাশ হইতে বলিল—তুমি যা শোনো, সব চমৎকার ! গানের তুমি কি বোঝো হে ? আজ সুষমার গান শুনো-এখন, বুঝতে পারবে। সত্যি, ওকে বাদ দিয়ে ছবির কাজ চলবে না। একটু বেশি মাইনে চাইচে, তা দিয়েও রাখতে হবে। নীলা, দীপ্তি ··ওদেরও ভাখো—এখানে ডাক দাও না সব—মিনি, সুবালা, বড় হেনা, ছোট হেনা ··

গদাধর ব্যস্তভাবে বলিলেন—না, না, এখানে ডেকে কি হবে ? থাক্ সব, আমি যাচ্চি।

পাঁচ

বাগানের বাড়ীটার সামনেই পুকুর। পুকুরের ওপারে কলমের আমগাছ অনেকগুলি—ওদিকের অংশটা তারের জাল দিয়া ঘেরা। কারণ, এখন আমের বউলের গুটির সময় আসিতেছে—ইজারাদার ঘিরিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কলমবাগান ও পুকুরের মাঝখানে এখনও বেশ ভালো-ভালো গোলাপ হয়। এখানে বাঁধানো চবুতারায় একটা দল ভিড় করিয়া বসিয়া গল্পগুজব ও হল্লা করিতেছে।

শচীন বলিল—অঘোরবাবুকে তাহ'লে ডাকি। আজ দোল-পূর্ণিমা, শুভ দিন—একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল ! যেমন কথা আছে।

—অঘোরবাবু এসেচেন ?

—এই তো মোটরের শব্দ হলো,—এলেন বোধহয়। স্টুডিওর মোটর আনতে গিয়েছিল কিনা !

—বেশ, ক'রে ফেল সব ব্যবস্থা।

প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক শৌখীন প্রৌঢ় লোক, রঙ শ্যামবর্ণ, বেঁটে, একহারা চেহারা—মাথার চুলে এই বয়সেও ব্রিলেণ্টাইন্ মাখানো, মুখে সিগারেট—আসিয়া ঘাটের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—এই যে, সব এখানে।

শচীন ও গদাধর দু'জনে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আসুন, আসুন। অঘোরবাবু, আপনার কথা হচ্ছিল।

রেখার দিকে চাহিয়া অঘোরবাবু বলিলেন—তাই তো, আমাদের একটা কথা ছিল। না হয় চলুন ওদিকে।

রেখা অভিমানের সুরে বলিল—বললেই হয় যে, উঠে যাও, অমন ক'রে ভণিতা করবার

কি অধিকার আপনার আছে মশাই ?

হাসিয়া অঘোরবাবু বলিলেন—না রেখা বিবি, অধিকার কিছু নেই, জানি! এখন লক্ষ্মীটি হয়ে দু'পা একটু কষ্ট ক'রে এগিয়ে গিয়ে, ওই চাতালে ব'সে যারা স্ফূর্তি করচে, ওখানে যাও না। আমরা একটু পাতলা হয়ে বসি।

রেখা রাগ করিয়া বলিল—অমন রেখা-বিবি, রেখা-বিবি বলবেন না বলচি। ও কেমন কথা! না, আমি অমন সব ধরণের কথা ভালবাসি নে।

রেখা উঠিয়া ফড়ফড় করিয়া চলিয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিলেন—তারপর, আপনি তো এই আছেন দেখচি। একটা ব্যবস্থা তাহলে হয়ে যাক্। আজ শুভদিন—দোলযাত্রা—পূর্ণিমা তিথি।

শচীন বলিল—আর এদিকে পূর্ণিমের চাঁদের ভিড়ও লেগে গিয়েচে ঘোষেদের বাগান-বাড়ীতে—আমার মত যদি নাও তবে···

অঘোরবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—অহো, তোমার সব-তাতে ঠাট্টা আর ইয়ার্কি ভালো লাগে না। শোন না, কি কথা হচ্চে।

গদাধর বলিলেন—আপনি হিসেবটা করেচে মোটামুটি ?

—হ্যাঁ, এখন এগার হাজার আন্দাজ বার করতে হবে আপনাকে। সব হিসেব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজ চেক-বই এনেচেন ? পাঁচ হাজার আজই দরকার। বাগানটার লিজ রেজিস্ট্রি হবে সোমবারে—সেলামীর টাকা আর এক বছরের ভাড়া আজ জমা দিতেই হবে। অনেকখানি জমি আছে—স্টুডিওর উপযুক্ত জায়গা বটে! আর একটা কাজ করতে হবে আজ—সব মেয়েদের আজ কিছু কিছু বায়না দিয়ে হাতে রাখা চাই। এই ধরুন, রেখা আছে, খুব ভাল নাচ অর্গানাইজ করে। ওকে রাখতে হবে। তারপর ধরুন সুষমা—ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম স্টুডিওতে এখনও কাজ করে, ওকে আগে আটকাতে হবে। একবার ওদের সব ডাকিয়ে এনে যার-যার নাচ-গান দেখে-শুনে নেবেন নাকি ?

শচীন বলিল—না, না, সেটা ভালো হয় না। ওরা সবাই নামজাদা আর্টিস্ট—ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কাজ করচে, কেউ-বা করেচে—ওদের নাম কে না জানে ? এই ধরুন, সুষমা···

অঘোরবাবু আঙুলে টাকা বাজাইবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—আরে রেখে দাও আর্টিস্ট—সবাই আর্টিস্ট! আমিই কি কম আর্টিস্ট ? টাকা খরচ করতে হবে যেখানে, সব বাজিয়ে নেবো—এই রকম ক'রে বাজিয়ে নেবো। আমি বুঝি, কাজ। এই অঘোরনাথ হালদার সাতটা ফিল্ম কোম্পানি এই হাতে গড়েচে, আবার এই হাতে ভেঙেচে। ও কাজ আর আমায় তুমি শিখিও না।

গদাধর বলিলেন—যাক্, ওসব বাজে কথায় কান দেবেন না। আপনি যা ভালো বুঝবেন, করুন। কত টাকা চাই এখন বলুন ?

—তাহ'লে ওদের সব ডাকি। পৃথক্-পৃথক্ কন্ট্রাক্ট হোক্—সোমবার সব রেজিস্ট্রি হবে—লিজের সেলামী দু'হাজার আর ভাড়া পাঁচশো—এ টাকাটি আলাদা ক'রে রেখে

বাকি ওদের দিয়ে দেবো।

—ওদের টাকা এখন দিতে হবে কেন? কণ্ট্রাক্ট রেজিষ্ট্রি হবার সময় টাকা দিলেই চলবে।

—না, না, এ তো বায়না। অঘোর হালদার অত কাঁচা কাজ করে না স্যর।

—বেশ।

রেখার ডাক পড়িল পুকুর-ঘাটে। অঘোরবাবু বলিলেন—রেখা বিবি, লেখাপড়া জানো তো? ফর্ম সই করতে হবে এখুনি।

—আবার রেখা বিবি?

—বেশ, কি ব'লে ডাকতে হবে, শিখিয়ে দাও না হয়!

—কেন, রেখা দেবী…পোস্টারে লেখা থাকে দেখেন নি কখনো? রেখা বিবি বললে আমি জবাব দিই নে।

বলিয়া রেখা নাক উঁচু করিয়া গর্ব্বিতভাবে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া চমৎকারভাবে সপ্রমাণ করিল যে, সে একজন সুনিপুণ অভিনেত্রী—যদিও ভঙ্গিটা বিলিতি ছবির অভিনেত্রীদের হুবহু নকল।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখানে সই করো, বেশ পষ্ট ক'রে লেখো—

রেখা নিজের ব্লাউজের বুকের দিকটা হইতে ছোট একটা ফাউণ্টেন পেন বাহির করিতেই অঘোরবাবু বলিয়া উঠিলেন—আরে, বলো কি! তোমার আবার ফাউণ্টেন পেন বেরুলো কোথা থেকে…য়্যাঁ! তুমি দেখচি কলেজের মেয়ে কি ইস্কুলের মাস্টারনী বনে গেলে! বলি, কালি-কলমের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক, জিজ্ঞেস্ করি? টাকাটা লেখো, টাকা!

—কত টাকা? যথেষ্ট অপমান তো করলেন।

—মাছের মায়ের পুত্র-শোক! অপমান কিসের মধ্যে দেখলে? সত্তর টাকার মধ্যে বায়না আজ পাঁচ টাকা।

রেখা রাগ করিয়া কলম বন্ধ করিয়া বলিল—পাঁচ টাকা? চাই না, দিতে হবে না। পাঁচ টাকা এ্যাডভান্স্ নিয়ে যারা কাজ করে, তারা এক্‌স্ট্রা ভিড়ের সিনে প্লে করে—আর্টিস্ট নয়। আমাদের অপমান করবেন না।

—কত চাও রেখা দেবী, শুনি?

—অর্দ্ধেক—পঁয়ত্রিশ টাকা—থার্টি-ফাইভ্ রুপিজ্।

—থাক্ থাক্, আর ইংরিজি বলতে হবে না। দিচ্চি আমি, তাই দিচ্চি। আমাদের একটু নাচ দেখাবে তো? লেখো টাকাটা।

—পরে হবে-এখন।

—এখনই হবে, ক্যাপিটালিস্ট দেখতে চাচ্ছেন—ওঁর ইচ্ছে এখানে সকলের বড়।

রেখা দ্বিরুক্তি না করিয়াই পেশাদার নর্ত্তকীর সহজ ও বহুবার-অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পুকুর-ঘাটের চাওড়া চাতালের উপর আধুনিক প্রাচ্য-নৃত্য শুরু করিল। রেখা কৃশাঙ্গী মেয়ে। নাচের উপযুক্ত দেহের গড়ন বটে—জ্যোৎস্না রাত্রে নৃত্যরতা তরুণীর বিভিন্ন লাস্যভঙ্গি দেখিয়া গদাধর

ভাবিলেন—টাকা সার্থক হয় এই ব্যবসায়। খরচ করেও সুখ, লাভ যদি পাই তাতেও সুখ! যে বয়সের যা—আমার বয়েস তো চলে যায় নি এ-সবের!

অল্প একটু বিশ্রাম করিয়া রেখা বলিল—কথাকলি দেখবেন? সেবার এম্পায়ারে এসেছিলেন সত্যভামা দেবী—মাদ্রাজী মেয়ে, অমন কথাকলি আর কখনো···কি পোজ্ এক-একখানা! আমরা স্টুডিও সুদ্ধু নাচিয়ের দল এম্পায়ারে দেখতে গিয়েছিলুম কোম্পানির খরচে। দেখবেন?

—তুমি একবার দেখেই অমনি শিখে নিলে?

—কেন নেবো না—আমরা আর্টিস্ট্ লোক!

—আচ্ছা, থাক্ এখন কথাকলি। সুষমা দেবী কই? তাঁকে ডেকে ফর্মটা সই ক'রে নেওয়া দরকার।

ডাক দিতে সুষমা আসিল। দেখিতে ভালো নয়, দোহারা চেহারা—গলার স্বর বেশ মিষ্ট। বেশি কথা বলে না, তবে সে আসিয়া সমস্ত জিনিসটা একটা তামাশার ভাবে গ্রহণ করিল।

অঘোরবাবু বলিলেন—টাকাটা লিখুন আগে—চল্লিশ টাকা।

সুষমা কোনো কথা না বলিয়া নাম সই করিয়া চেক্ লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অঘোরবাবু বলিলেন—উঁহু, গান গাইতে হবে একটা—

সুষমা হাসিয়া বলিল—সে কি? এখন কখনো গান হতে পারে?

—ক্যাপিটালিস্ট বলচেন,—ওঁর কথা রাখতে হবে। গান করুন একটা।

গদাধর মোলায়েম ভাবে বলিলেন—না, না, থাক্। উনি নামকরা গায়িকা—সবাই জানে। ওঁকে আর গান গাইতে হবে না। ও নিয়ম সকলের জন্যে নয়।

রেখা কাছেই ছিল, সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—নিয়মটা তবে কি আমার মত বাজে লোকদের জন্যে তৈরী? এ তো রীতিমত অপমানের কথা। না, এ কখনো···

ইহাদের কি করিয়া চালাইতে হয়, অঘোরবাবু জানেন। তিনি রেখার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া বলিলেন—রেখা বি—মানে দেবী, চটো কেন? গান আমরা সর্ব্বদা গ্রামোফোনে শুনচি, রেডিওতে শুনচি। কলকতায় তো গান শোনবার অভাব নেই—কিন্তু নাচ আমরা সর্ব্বদা দেখি নে—তোমার মত আর্টিস্টের নাচ দেখার একটা লোভও তো আছে—বুঝলে না?

গদাধরের বেশ লাগিতেছিল। বাড়িতে থাকিলে এতক্ষণ তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—নয়তো বসিয়া গদির হিসাবপত্র দেখিতেছেন। এ তবু পাঁচজনের মুখ দেখিয়া আনন্দে আছেন—বিশেষ করিয়া এমন সঙ্গ, এমন একটা রাত! একবার তাঁহার মনে হইল, অনঙ্গ আজ একটু সকাল-সকাল ফিরিতে বলিয়াছিল, বাড়ীতে যেন কি পূজা হইবে। তা তিনি গিয়া কি করিবেন? ভড়মশায় আছে, নিতাই আছে—দু'জন চাকর আছে—তাহারাই সব দেখাশুনা করিতে পারিবে এখন। তাঁহার অত গরজ নাই।

একে-একে অনেকগুলি মেয়ের কণ্ট্রাক্ট-ফর্ম সই করা হইয়া গেল। তাহারা পুকুরের সামনের পাড়ে—যেখানে সাবেক কালের গোলাপবাগ, সেদিক হইতে আসে—আসিয়া সই করিয়া আবার গোলাপবাগে ফিরিয়া যায়—যেন একগাছি ফুলের মালা ঢল হইয়া গিয়াছে—এক-একটি করিয়া ফুল সরিয়া-সরিয়া সুতার এদিক হইতে ওদিকে নাচের ভঙ্গিতে চলিতেছে···

গদাধর কি একটা ইঙ্গিত করিলেন একজন চাকরকে।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখন আর না স্যর, যদি আমায় মাপ করেন। কাজের সময় ইয়ে ওটা বেশি না খাওয়াই ভালো।—হ্যাঁ, আর-একটা কথা স্যর—যদি বেয়াদবি হয়, মাপ করবেন। আপনি ক্যাপিটালিস্ট, মালিক—একটু রাশভারি হয়ে চলবেন ওদের সামনে। ওরা কি জানেন, 'নাই' যদি দিয়েচেন, তবে একেবারে মাথায় উঠেচে! ধমকে রাখুন, ঠিক থাকবে। 'নাই' ওদের কখনো দিতে নেই। ওই রেখা···আপনার সামনে অত-সব কথা বলতে সাহস করবে কেন? আমি এর আগে ছিলাম বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম-এ—ক্যাপিটালিস্ট ছিল দেবীচাঁদ গোঠে, ভাটিয়া মার্চেণ্ট। ক্রোড়পতি। গোঠে যখন স্টুডিওতে ঢুকতো—তার গাড়ীর আওয়াজ পেলে সব থরহরি লেগে যেতো। ওই শোভা মিত্তিরের মত—নাম শুনেচেন তো? অমন দরের বড় আর্টিস্টও গোঠেজির সামনে ভালো ক'রে চোখ তুলে কথা বলতে সাহস করতো না। শোভারাণী মিত্তিরের কাছে রেখা-টেখা এরা সব কি? শোভা এখন এদের এই কোম্পানিতে কাজ করে শুনচি।

গদাধর চুপ করিয়া শুনিলেন।

চাকর আসিয়া এই সময় জানাইল, খাবার জায়গা হইয়াছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—সব ডেকে নিয়ে যা। আমি আর ইনি এখন না—পরে হবে।

চাকর বলিল—জী আচ্ছা।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখন খেতে বসলে, ওদের সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে হবে—সেটা ঠিক হবে না মশাই। নিজের চাল বজায় রেখে, নিজেকে তফাৎ রেখে চলতে হবে, তবে ওরা মানবে, ভয় করবে।

গোলাপবাগের মধ্যে যে দলটি ছিল, তাহারা হল্লা করিতে-করিতে খাইতে গেল। রাত দেড়টার কম নয়। একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, চাঁদের আলোয় বাগানের পুরানো চাতাল, হাতভাঙা পরীর মূর্ত্তি, হাতলখসা লোহার বেঞ্চি, শুক্‌নো ফোয়ারা ইত্যাদি এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ এমন একটা জগৎ, সেখানে যে-কোনো অসম্ভব ঘটনা যেন যে-কোন মুহূর্ত্তে ঘটিতে পারে! এখন হঠাৎ যদি চোগা-চাপকান-পরা শামলা মাথায় ৺আনন্দনারায়ণ ঘোষ মহাশয় একতাড়া কাগজ হাতে, তাঁহার উনবিংশ শতাব্দীর গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া ওই হাতভাঙা পরীর মূর্ত্তিটার আড়াল হইতে ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসেন—তবে যেন কেহই বিস্মিত হইবে না।

গদাধর বলিলেন—আর কত টাকা লাগবে?

—আরও দু'হাজার তো কালই চাই—মজুত রাখবেন স্যর; তাহলে আপনার হলো

এগারো হাজার।

—আমার সঙ্গে দেখা হবে কোথায় ?

—আপনার গদিতে।

—না। আমার গদিতে এখন যাবার দরকার নেই। এ ব্যাপারটা একটু প্রাইভেট রাখতে চাই।

—তাহলে ওই দু'হাজারের চেক্‌টা !···

—কাল আমায় ফোন্ করবেন—ব'লে দেবো, কোথায় গিয়ে নিতে হবে।

—যে আজ্ঞে, স্যর। আপনি যেমন আদেশ দেবেন, সেইভাবে কাজ হবে। আমার কাছে কোনো গোলমাল পাবেন না কাজের, আপনি টাকা ফেলবেন, আমি গ'ড়ে তুলবো। এই আমার কাজ—এজন্যে আপনি আমায় মাইনে দেবেন, শেয়ার দেবেন—আপনি কাজ দেখে নেবেন। আমায় তো এমনি খাটাচ্চেন না আপনি ?

চাকর আসিয়া বলিল—আসেন বাবুজী, আপনাদের চৌকা লাগানো হয়েছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—কোথায় রে ?

—হল-ঘরের পাশের কামরামে।

– চলুন তবে স্যর, রাত অনেক হলো, খেয়ে আসা যাক্। তবে একটা কথা বলি। আপনি এদের অনেককে ভাঙিয়ে নিচ্চেন, এদের স্টুডিওর লোকেরা যেন না জানতে পারে। আজ তো ওদেরই পার্টি—শচীনবাবুকে বলবেন কথাটা গোপন রাখতে।

—না, কে জানবে ? শচীন খেতে গিয়েছে···এলেই ব'লে দেবো।

রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গদাধর দেখিলেন, এখন আর বাড়ী যাওয়া চলে না। গদিতে গিয়া অবশ্য শুইতে পারিতেন, সেও এখন সম্ভব নয়। ভড়মশায় গদিতে রাত্রে থাকে··· সে কি মনে করিবে ?

সুতরাং বাকি রাতটুকু অঘোরবাবুর সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতে হইবে।

অঘোরবাবুও দেখা গেল গল্প পাইলে আর কিছুই চান না···কিংবা হয়তো তাঁহারও বাড়ী ফিরিবার উপায় নাই এখন।

সকাল হইয়া গেল।

গদাধর বাগানের পুকুরে স্নান সারিয়া চা-পান করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। স্টুডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল শেষরাত্রের দিকে সব চলিয়া গিয়াছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—তবে আমি যাই স্যর, বাড়ী গিয়ে একটু ঘুমোবো।

—চলুন, আমিও যাবো। শচীনকে দেখচি নে, সে বোধহয় রাত্রে চলে গিয়েছে।

গদাধর বাগান-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু নিজের বাড়ী বা গদিতে না ফিরিয়া, শোভারাণীর বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। শোভা সবে স্নান সারিয়া, চা পানের উদ্যোগ করিতেছে, গদাধরকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আপনি কি মনে ক'রে ? এত সকালে ?

গদাধর আগের মত লাজুক ও নিরীহ পল্লীগ্রামের গৃহস্থটি আর এখন নাই। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি প্রথমেই শোভার কথার কোনো উত্তর না দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। কোনোদিকে কেহ নাই। তখন স্বর নীচু করিয়া তিনি বলিলেন—আমায় দেখে রাগ করেচো, না খুশী হয়েচো শোভা ?

মুখ ঘুরাইয়া শোভা বলিল—ওসব ধ্যানের কথা এখন থাক্। আমার নষ্ট করবার মত সময় নেই হাতে···কোনো কাজ আছে ?

গদাধর হাসি-হাসি মুখে বলিলেন···না কোনো কাজ নয়, তোমায় দেখতে এলাম।

—হয়েছে, থাক্।

—রাগ কিসের ?

—রাগের কথা তো বলিনি—সোজা কথাই বলচি।

এইসময় ভৃত্য শুধু শোভার জন্য চা ও খাবার আনিয়া, টি-পয় আগাইয়া শোভার ঈজি-চেয়ারের পাশে বসাইয়া দিল। শোভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—বাবুর কই ?

—আপনি তো বললেন না, মাইজি !

—যত সব উল্লুক হয়েচো ! বলতে হবে কি ? দেখতে পাচ্চো না ?

গদাধর ব্যস্ত হইয়া বলিতে গেলেন—আহা, থাক্, থাক্, আমার না হয়—আমি আর এখন চা খাবো না শোভা।

শোভা নিস্পৃহ-কণ্ঠে বলিল—তবে থাক্। সত্যিই খাবেন না ?

—না, না—আমি—এখন থাক্।

শোভা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজেই চা পান শুরু করিয়া দিল।

গদাধর গলা ঝাড়িয়া বলিলেন—কাল সব কণ্টাক্ট হয়ে গেল শোভা। আমার অনুরোধ, তোমায় আমার কোম্পানিতে আসতে হবে—কাল রেখা আর সুষমা কণ্ট্রাক্ট করলে।

শোভা চায়ে চুমুক দিতে যাইয়া, চায়ের পেয়ালা অর্দ্ধপথে ধরিয়া, গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোথায় হলো ?

—কাল রাত্রে, ঘোষেদের বাগান-বাড়ীতে।

—অঘোরবাবু ছিল ?

—হ্যাঁ, সেই তো সব যোগাড় করচে।

শোভা আর কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে চা খাইয়া চলিল—উদাসীন, নিস্পৃহভাবে। কোনো বিষয়ে অযথা কৌতূহল দেখানো যেন তাহার স্বভাব নয় ! চা শেষ করিয়া সে পাশের ঘরে কোথায় অল্পক্ষণের জন্য উঠিয়া গেল, যাইবার সময় গদাধরকে কিছু বলিয়াও গেল না। পুনরায় যখন ফিরিল, তখন হাতে দু'খানা গ্রামোফোনের রেকর্ড। একখানা গদাধরের হাতে দিতে-দিতে বলিল—এই দেখুন, আমার গান বেরিয়েচে, এইচ. এম. ভি—কাল এনেচি।

গদাধর পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন—তাই তো। বেশ ভালো গান ?

—শুনবেন নাকি ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা মন্দ কি। বাজাও না।

শোভা রেকর্ডখানা গদাধরের হাত হইতে লইয়া পাশের ঘরে বড় ক্যাবিনেট্ গ্রামোফোনে চড়াইয়া দিয়া আসিল। গদাধর গানের বিশেষ-কিছু বোঝেন না, ভদ্রতার খাতিরে একমনে শুনিবার ভান করিয়া বসিয়া রহিলেন। রেকর্ড শেষ হইলে মুখে কৃত্রিম উৎসাহের ভাব আনিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ, ভারি চমৎকার। ওখানাও দাও, শুনি।

শোভা কিন্তু নিজে একবারও জিজ্ঞাসা করিল না, গান কি-রকম হইয়াছে। বোধহয় গদাধরের নিন্দা বা সুখ্যাতির উপর সে কোনো আস্থা রাখে না। রেকর্ড বাজানো শেষ হইয়া গেল। শোভা একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। গদাধর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। এইবার বোধহয় শোভা উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, দশটা প্রায় বাজে। অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে বলিতে হইল—আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি।

—আসুন।

—আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তো ?

—কি কথা, বুঝলাম না।

—আমার ফিল্ম্ কোম্পানিতে কণ্ট্রাক্ট করার।

শোভা গম্ভীর মুখে বলিল—আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করুন, এ-কথা আমি আপনাকে বলচি নে। তবুও কণ্ট্রাক্ট করার আগে আমায় বললে পারতেন। আপনার টাকা গেল, তাতে আমার কিছুই নয়। আপনার টাকা আপনি খরচ করবেন, তাতে আমার কি বলার থাকতে পারে ! কিন্তু আপনি যে-কাজ জানেন না, সে-কাজে না নামাই আপনার উচিত ছিল। অবিশ্যি আমি এমনি বললাম। আপনাকে বাধাও দিচ্ছি নে, বা বারণও করচি নে। আপনার বিবেচনা আপনি করবেন।

—তোমার কি মনে হয়, এ-ব্যবসা লাভের হবে না ?

—আমার কিছুই মনে হয় না। আমায় জড়াচ্চেন কেন এ-কথায় ?

—না, বললে কিনা কথাটা, তাই বলচি।

—আমার যা মনে হয়, তা আপনাকে আমি বললাম। ফিল্ম্ কোম্পানি খুলে সকলে যে লাভবান হয়, লক্ষপতি হয়, তা নয় বলেই ধারণা। অঘোরবাবু অবিশ্যি দু-তিনটে ফিল্ম্ কোম্পানিতে ছিলেন, কাজ বোঝেন—তবে অনেস্ট কিনা জানি না। আপনি করেন অন্য ব্যবসা, এর মধ্যে আপনি না নামলেই ভালো করতেন !

—তুমি বড় নিরুৎসাহ ক'রে দাও কেন লোককে ! নামচি একটা শুভ কাজে—তুমি আসবে কিনা বলো।

—দোহাই আপনার গদাধরবাবু, আমি কিছু নিরুৎসাহ করি নি। আপনি দমবেন না। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমার আসা হবে না।

—এই উত্তর শোনবার জন্যে আজ সকালে তোমার এখানে এসেছিলাম আমি? মনে বড় কষ্ট দিলে শোভা। আমার বড় আশা ছিল, তোমাকে আমি পাবোই।

শোভা রাগের সুরে বলিল—আপনি পাটের ব্যবসা ক'রে এসেছেন, অন্য ব্যবসার কথা আপনি কি বোঝেন যে যা-তা বলতে আসেন? প্রথম আমি তো ইচ্ছে করলেই যেতে পারি নে—এদের স্টুডিওতে আমার এখনও এক-বছরের কণ্ট্রাক্ট রয়েছে। তাছাড়া আমি একটা নিশ্চিত জিনিস ছেড়ে অনিশ্চিতের পেছনে ছুটবো, এত বোকা আমায় ঠাউরেচেন?

—আমার কোম্পানি অনিশ্চিত?

—তা না তো কি? আপনি ও-কাজ বোঝেন না। পরের হাতে খেলতে হবে আপনাকে। এক ব্যবসায় টাকা রোজগার ক'রে অন্য এক ব্যবসাতে ঢালচেন—কারো সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। ওতে আমার যেতে সাহস হয় না—এক কথায় বললাম।

—আচ্ছা, আমি যদি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতাম, কি পরামর্শ দিতে?

—সে-কথার দরকার নেই। কারো কথার মধ্যে আমি কখনো থাকি নে গদাধরবাবু, আমায় মাপ করবেন। বিশেষ ক'রে এর মধ্যে রেখা, সুষমা রয়েচে—ওরা সকলেই আমার বন্ধুলোক, এক স্টুডিওতে কাজ করেচি অনেক দিন। অঘোরবাবুকে আমি কাকাবাবু ব'লে ডাকি। উনিও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। অতএব আমি এ কথার মধ্যে থাকবো না।

—তা হচ্চে না, আমার কথার উত্তর দাও—তুমি কি পরামর্শ দিতে?

শোভা ধমকের সুরে বলিল—ফের আবার ওই কথা! ওর উত্তর আমার কাছে নেই। আচ্ছা, আমাকে কেন আপনি এর মধ্যে জড়াতে চান, বলতে পারেন? আমি কারো কথায় কখনো থাকি নে। তবুও আমি কখনও আপনাকে এ-পরামর্শ দিতাম না।

—দিতে না?

—না। ব্যস, আপনি এখন আসুন। আমি এক্ষুনি উঠবো, অনেক কাজ আছে আমার।

গদাধর কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন।

ছয়

ইহার দুইদিন পরে ভড়মশায় গদিতে বসিয়া কাজ করিতেছেন, গদাধর বলিলেন—তেরো তারিখে একটা চেক্ ডিউ আছে ভড়মশায়, ছ'হাজার টাকা জমা দিতে হবে ব্যাঙ্কে।

ভড়মশায় মনিবের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—ছ'হাজার টাকা এই ক'দিনের মধ্যে? টাকা তো মোকামে আটকে আছে—এখন এত টাকা এই ক'দিনের মধ্যে কোথায় পাওয়া যাবে বাবু?

—তা হবে না! চেষ্টা দেখুন, পথ হাতড়ান।

—অত টাকার চেক্ কাকে দিলেন বাবু ?

অন্য কর্ম্মচারী হইলে মনিবকে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না হয়তো—কিন্তু ভড়মশায় পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, ঘরের লোকের মত—তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র অধিকার। কথাটা এড়াইবার ভঙ্গিতে গদাধর বলিলেন—ও আছে একটা—ইয়ে—তাহ'লে কি করবেন বলুন তো ?

ভড়মশায় চিন্তিত-মুখে বলিলেন—দেখি, কি করতে পারি। বুঝতে পারচি নে !

কিন্তু কয়দিন নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভড়মশায় বারো তারিখে মনিবকে কথাটা জানাইলেন। মোকামে টাকা আবদ্ধ আছে, এ-কদিনের মধ্যে কাঁচা মাল বেচিয়া টাকা যোগাড় করা সম্ভব নয়। তিনটি মিলের পাটের মোটা অর্ডার কন্ট্রাক্ট করা আছে, তিন মোকাম হইতে সেই অর্ডার-মাফিক পাট ক্রয় চলিতেছে—সে টাকা অন্যক্ষেত্রে ঘুরাইয়া আনিতে গেলে, মিলে সময়মত পাট দেওয়া যায় না।

গদাধর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চেক্ ব্যাঙ্ক হইতে ফিরিয়া গেলে লজ্জার সীমা থাকিবে না। অবশ্য অন্য কোনো গদি হইতে টাকাটা ধার করা চলিত—কিন্তু তাহাতে মান থাকে না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাধর সেদিন রাত ন'টার পরে শোভার বাড়ী গেলেন। এদিকে ভড়মশায় চিন্তাকুল মুখে আছেন দেখিয়া খাইবার সময় অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে ভড়মশায় ? মুখ ভার-ভার কেন ?

—না, কিছু না।

—বলুন না কি হয়েচে—বাড়ীর সব ভালো তো ?

—না, সে-সব কিছু না। একটা ব্যাপার ঘটেচে—আপনাকে না ব'লে থাকাও ঠিক না। বাবু কোথায় আগাম চেক্ দিয়েচেন মোটা টাকার। ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে নয়, তাহ'লে আমার অজানা থাকতো না। তাহ'লে উনি কোথায় এ-টাকা খরচ করচেন ? কথাটা আপনাকে জানানো আমার দরকার। তবে আমি বলেচি, এ-কথা যেন বলবেন না বাবুকে।

অনঙ্গ চিন্তিত-মুখে বলিল—তাই তো ভড়মশায়, আমি কিছু ভাবগতিক তো বুঝচি নে—মেয়ে-মানুষ কি করবো বলুন ? কিন্তু ওঁর ভাব যে কত বদ্‌লেচে সে আপনাকে কি বলি ! বড় ভাবনায় পড়েচি ভড়মশায়। আপনাকে বলব একদিন পরে ! উনি আজ-কাল রাতে প্রায়ই বাড়ী আসেন না। দোল-পূর্ণিমের দিন দেখলেনই তো !

—হ্যাঁ, সে-কথা বাবুকে জিগ্যেস করেছিলেন ?

—করেছিলাম। বললেন, ব্যবসার কাজ ছিল। আজকাল আমার ওপর রাগ-রাগ ভাব—সব-সময় কথা বলতে সাহস পাই নে। উনি কেমন যেন বদলে গিয়েচেন—কখনো তো উনি এরকম ছিলেন না ! এখন ভাবচি, আমাদের কলকাতায় না এলেই ভালো ছিল। বেশ ছিলাম দেশে। কালীঘাটের মা-কালীর কাছে মানত করেচি, জোড়া পাঁটা দিয়ে পূজো দেবো—ওঁর মতি-গতি যেন ভালো হয়ে ওঠে। বড় ভাবনায় আছি। আর কার কাছে কি

বলবো বলুন, এখানে আমার কে আছে এক আপনি ছাড়া !

অনঙ্গ আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিল।

ভড়মশায় চিন্তিত-মুখে বলিলেন—তাই তো, আমাকে বললেন মা—ভালো হলো। এত কথা তো আমি কিছুই জানতাম না। এখন বুঝতে পারচি নে কি করা যায়। আমারও তো যাবার সময় হলো।

অনঙ্গ বলিল—আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না ভড়মশায়। কলকাতায় আপনার যত অসুবিধাই হোক, ওঁকে এ-অবস্থায় ফেলে আপনি যেতে পাবেন না। আমার আর কেউ নেই ভড়মশায়—কে ওঁকে দেখে ! এখানে ওই শচীন ঠাকুরপো হয়েচে ওঁর শনি। আর ওই নির্ম্মল—ওদের সঙ্গে মিশেই এ-রকম হয়েচেন—আমাকে এ-আথান্তরে ফেলে আপনি চলে যাবেন না।

—আচ্ছা বৌ-ঠাকরুণ, এ-সব কথা আর কারো কাছে আপনি বলবেন না। আমি না হয় এখন দেশে না যাবো—আপনি কাঁদবেন না। চোখের জল মুছে ফেলুন—সতীলক্ষ্মী আপনি, হাতে ক'রে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেচি—মেয়ের মত দেখি। আপনাদের ফেলে গেলে ধর্ম্মে সইবে না। দেখি, কি হয়—অত ভাববেন না।

ভড়মশায় বিদায় লইলেন।

গদাধর শোভার বাড়ী গিয়া শুনিলেন, সে এই মাত্র স্টুডিও হইতে ফিরিয়া খাইতে বসিয়াছে। সুতরাং তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে শোভা ঢুকিয়া একটা প্লেটে গোটাকয়েক সাজা পান গদাধরের সামনে টিপয়ে রাখিয়া, তাহা হইতে একটা পান তুলিয়া মুখে দিল। কোনো কথা বলিল না।

গদাধর বলিলেন—বোসো শোভা, তোমার কাছে একটা কাজে এসেছিলাম।

শোভা নিজের ইজিচেয়ারটাতে বসিয়া বলিল—কাজ কি, তা তো বুঝতে পেরেচি, তার উত্তরও দিয়েচি সেদিন।

—সে কাজ নয় শোভা। বড় বিপদে প'ড়ে এসেচি তোমার কাছে। একজনকে চেক দিয়েচি ছ'হাজার টাকার—কাল ব্যাঙ্কে চেক দাখিল ক'রে ভাঙাবার তারিখ—অথচ টাকা নেই ব্যাঙ্কে। কালই ছ'হাজার টাকা বেলা দশটার সময় জমা দিতে হবে—অথচ আমার হাতে নেই টাকা ! সব টাকা মোকামে আবদ্ধ। এখন কি করি—কাল মান যায়, তাই তোমার কাছে এসেচি !

শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমি কি করবো ?

—টাকাটা এক মাসের জন্য ধার দাও—আমি হ্যাণ্ডনোট্ দিচ্চি—মোকাম থেকে টাকা এলে শোধ ক'রে দেবো। এই উপকারটা কর আমার। বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেচি।

শোভা বলিল—আমি তো হ্যাণ্ডনোটের ব্যবসা করি নে—মহাজনী কারবারও নেই

আমার। আমার কাছে এসেছেন টাকা ধার নিতে, বেশ মজার লোক তো আপনি! আপনার কলকাতায় বাড়ী আছে, মর্টগেজ রাখলে যে-কোন জায়গা থেকে ধার পাবেন। ব্যাঙ্ক থেকেই তো ওভারড্রাফ্‌ট্‌ নিতে পারেন!

গদাধর দুঃখিতভাবে বলিলেন—সে-সব করা তো চলে, কিন্তু তাতে বাজারে ক্রেডিট থাকে না ব্যবসাদারের। ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্‌ট্‌ নেওয়া চলবে না—বাড়ী বন্ধক দেওয়াও নয়। আছে অনঙ্গর গহনা, তা কি এখন বিক্রি করতে যাবো?

শোভা নিস্পৃহ ভাবে বলিল—কিন্তু আমি সেজন্যে দায়ী নই। আমার কাছে কেন এসেছেন? আপনার বোঝা উচিত ছিল আমার কাছে আসবার আগে, যে, আমি পোদ্দার নই, টাকা ধারের ব্যবসাও করি নে।

—তা হোক, তুমি দাও, ও-টাকাটা তোমার আছে খুবই। আমার বড় উপকার করা হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিল। শোভা কিছুতেই টাকা দিবে না, গদাধরও নাছোড়বান্দা। অবশেষে বহু অনুময়-বিনয়ের পরে শোভা চার হাজার টাকা দিতে নিমরাজিগোছের হইল—বাকি টাকা দিতে সে পারিবে না, স্পষ্ট বলিল—গদাধর অন্য যেখান হইতে পারেন, সে টাকা যোগাড় করুন—

গদাধর বলিলেন—তবে চেক্‌খানা লিখে ফেল—আমি হ্যাণ্ডনোট্‌ লিখি—সুদ কত লিখবো?

—সাড়ে বারো পার্সেণ্ট।

—ওটা সাড়ে-নয় ক'রে নাও। তুমি তো আর সুদখোর মহাজন নও? উপকার করবার জন্যে তো দিচ্চো—সুদের লোভে দিচ্চো না তো!

—টাকা ধার দিচ্চি যখন, তখন ন্যায্য সুদ নেবো না তো কি! উপকার করচি, কে আপনাকে বলেচে? কারো উপকার করার গরজ নেই আমার। সাড়ে-বারো পার্সেণ্টের কমে পারবো না। ওর চেয়েও বেশি সুদ অপরে নেয়।

গদাধর অগত্যা সেই হিসাবেই হ্যাণ্ডনোট্‌ লিখিয়া, চেক লইয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে অনঙ্গ স্বামীকে বলিল,—হ্যাঁগা, একটা কথা বলবো, শুনবে?

—কি?

—তোমার টাকার দরকার হয়েচে বলচেন ভড়মশায়, কত টাকার দরকার?

—কেন?

—বলো না, কত টাকার?

—দু'হাজার টাকার—দেবে?

—আমার গহনা বাঁধা দাও—নয় তো বিক্রি করো। নয় তো আর টাকা কোথা থেকে পাবে! কিন্তু এত টাকা তোমার দরকার হলো কিসের?

—সে-কথা এখন বলবো না। তবে জেনে রেখো যে, ব্যবসার জন্যেই দরকার। ভড়মশায় জানেন না সে-কথা।

—দেখ, আমি মেয়েমানুষ—কিই-বা বুঝি? কিন্তু আমার মনে হয়, ভড়মশায়কে না জানিয়ে তুমি কোনো ব্যবসাতে নেমো না—অন্ততঃ পরামর্শ কোরো তাঁর সঙ্গে।—পাকা লোক—আর আমাদের বড় হিতৈষী—আমায় না হয় নাই বললে, কিন্তু ওঁকে জানিও।

—এ নতুন ব্যবসা। ভড়মশায় সেকেলে লোক—উনি এর কিছুই বোঝেন না। থাক্, এখন কোনো পরামর্শ করবার সময় নেই কারো সঙ্গে—যথাসময়ে জানতে পারবে। তুমি এখন খেতে দেবে, না, বক্‌বক্ করবে?

ধমক খাইয়া অনঙ্গ আর কোনো কথা না বলিয়া স্বামীর ভাত বাড়িতে গেল। স্বামীর চোখে ভালোবাসার দৃষ্টি সে আর বহুদিন হইতেই দেখে না—আগে-আগে রাগের কথা বলিলেও স্বামীর চোখে থাকিত প্রেম ও স্নেহের দৃষ্টি—এখন ভালো কথা বলিবার সময়েও সে দৃষ্টির হদিস পাওয়া যায় না। অনঙ্গ যেন স্বামীর মন হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। কেন এমন হইল, কিছুতেই সে ভাবিয়া পায় না।

পরের মাসে অবস্থা যেন আরও খারাপ হইয়া আসিল। গদাধর প্রায় শেষরাত্রের দিকে বাড়ী ফেরেন, অনঙ্গ সন্দেহ করিতে লাগিল। গদাধর মাঝে-মাঝে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফেরেন না! আসিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়েন, কারো সঙ্গে কথা বলেন না—বিছানা হইতে উঠিতে দশটা বাজিয়া যায়। গদির কাজও নিয়মমত দেখাশুনা করেন না। ভড়মশায় ইহা লইয়া দু-একবার বলিয়াও বিশেষ কোনো ফল লাভ করিলেন না।

শ্রাবণ মাসের দিকে হঠাৎ একদিন গদাধর ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাড়ী আসিয়া বলিলেন—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি, হয়তো কিছু দেরি হতে পারে ফিরতে—খরচপত্র গদি থেকে আনিয়ে নিও—ভড়মশায়কে বোলো, যদি কখনো দরকার হয়।

অনঙ্গ উৎকণ্ঠিত-দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—কোথায় যাবে? ক'দিনের জন্যে—এমন হঠাৎ···

—আছে, আছে, দরকার আছে। দরকার না থাকলে কি বলচি!

—তা তো বুঝলাম—কিন্তু বলতে দোষ কি, বলেই যাও না। তুমি আজকাল আমার কাছে কথা লুকোও—এতে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি তোমাকে কখনো বারণ করিনি বা বাধা দিইনি,—তবে আমায় বললে দোষ কি?

—হবে, সে পরে হবে। মেয়েমানুষের কানে সব কথা তুলতে নেই।

অনঙ্গ স্বামীর মেজাজ বুঝিত। বেশি রাগারাগি করিলে তিনি রাগ করিয়া না খাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবেন। আজকালই যে এমন হইয়াছে তাহা নয়—চিরকাল অনঙ্গ এইরকম দেখিয়া আসিতেছে। তবে পূর্ব্বে অনঙ্গ ইহাতে তত ভয় পাইত না—এখন ভরসাহারা হইয়া পড়িয়াছে—স্বামীর উপর সে-জোর যেন সে ক্রমশঃ হারাইতেছে।

গদাধর একমাসের মধ্যে বাড়ী আসিলেন না, ভড়মশায়কে ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠি দিতেন—

তাহা হইতে জানা গেল, জয়ন্তী-পাহাড়ে ভোটান ঘাট নামক স্থানে তিনি আছেন। অনঙ্গ চিঠি দিল খুব শীঘ্র ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিয়া। গদাধর লিখিলেন, এখন তিনি কাজে ব্যস্ত, শেষ না করিয়া যাইতে পারিবেন না। অনঙ্গ কাঁদিয়া-কাটিয়া আকুল হইল।

একদিন পথে হঠাৎ শচীনের সঙ্গে ভড়মশায়ের দেখা। ভড়মশায় শচীনকে গদাধরের ব্যাপার সব বলিলেন।

শচীন বলিল—তা আপনারা এত ভাবচেন কেন? সে কোথায় গিয়েচে আমি জানি।

—কোথায় বলুন—বলতেই হবে। আপনার বৌদিদি ভেবে আকুল হয়েচেন—জানেন তো বলুন।

—আমার কাছে শুনেচেন, তা বলবেন না। সে তার কোম্পানির সঙ্গে শুটিংএ গিয়েচে জয়ন্তী-পাহাড়ে। পাহাড় ও বনের দৃশ্য তুলতে হবে—ভোটান ঘাটে শুটিং হচ্চে।

—সে কি, বুঝলাম না তো! শুটিং কি ব্যাপার?

—আরে, ফিল্ম্ তৈরী হচ্চে মশাই—ফিল্ম্ তৈরী হচ্চে। গদাধর ফিল্ম্ কোম্পানি খুলেচে—অনেক টাকা ঢেলেচে—নিজের আছে, আর একজন অংশীদার আছে। তাই ওরা গিয়েচে ওখানে—কিছু ভাববেন না। আমার কাছে শুনেচেন বলবেন না কিন্তু।

ভড়মশায় শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। মনিব পাটের গদির ক্যাশ ভাঙিয়া ছবি তৈরির ব্যবসায় লাগিয়াছেন, এ ভালো লক্ষণ নয়। সে নাকি যত নটী লইয়া কারবার, তাহাতে মানুষের চরিত্র ভালো থাকে না, থাকিতে পারে না কখনও! বৌ-ঠাকরুণ সতীলক্ষ্মী, এখন দেখা যাইতেছে, তাঁহার আশঙ্কা তবে নিতান্ত অমূলক নয়!

অনঙ্গকে তিনি এ-কথা কিছু জানাইলেন না।

আরও দুই মাস আড়াই মাস কাটিয়া গেল, গদাধর ফিরিলেন না, এদিকে একদিন গদির ঠিকানায় গদাধরের নামে এক পত্র আসিল। মনিবের নামের পত্র ভড়মশায় খুলিতেন—খুলিয়া দেখিলেন, শোভারাণী মিত্র বলিয়া কে একটি মেয়ে তাহার পাওনা চার হাজার টাকার জন্য কড়া তাগাদা দিয়াছে! ভড়মশায় বড়ই বিপদে পড়িলেন—কে এ মেয়েটি—মনিব তাহার নিকট এত টাকা ধার করিতেই-বা গেলেন কেন—এ-সব কথার কোনো মীমাংসাই ভড়মশায় করিতে পারিলেন না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া ঠিক করিলেন, মেয়েটির সঙ্গে নিজেই একবার দেখা করিবেন।

চিঠিতে ঠিকানা লেখা ছিল, ভড়মশায় একদিন ভয়ে-ভয়ে গিয়া দরজায় কড়া নাড়িলেন। চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়াই বলিল—ও, তুমি আড়তের লোক?

ভড়মশায় বলিলেন—হঁ্যা।

—মাইজি ওপরে আছেন, এসো।

ভড়মশায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না—এ চাকরটি কি করিয়া জানিল, তিনি আড়তের লোক?

উপরে যে-ঘরে চাকরটি তাঁহাকে লইয়া গেল, সে ঘরে একটি সুন্দরী মেয়ে চেয়ারে হেলান

দিয়া বসিয়া অন্য-একটি মেয়ের সহিত গল্প করিতেছিল—দেখিয়া ভড়মশায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দরজা হইতে সরিয়া যাইতেছিলেন, মেয়েটি বলিল—কে ?

ভড়মশায় বিনয়ে ও সঙ্কোচে গলিয়া বলিলেন—এই—আমি—

চাকর পিছন হইতে বলিল—আড়তের লোক্।

মেয়েটি বলিল—ও, আড়তের লোক ! তা তোমাকে ডেকেছিলাম কেন জানো—এবার ওরকম চাল দিয়েচো কেন ? ও চাল তুমি ফেরত নিয়ে যাও এবার—আর এক মণ কাটারি ভোগ পাঠিয়ে দিও—এখনি—বুঝলে ?

ভড়মশাই ভয়ে-ভয়ে বলিলেন, তিনি চালের আড়ত হইতে আসেন নাই, গদাধর বসুর গদি হইতে আসিয়াছেন।

মেয়েটি কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তাই নাকি ! ও, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েচে। কিছু মনে করবেন না, বসুন আপনি। গদাধরবাবু এখন কোথায় ?

—আজ্ঞে, তিনি ভোটান ঘাট···

—ও, শুটিং হচ্ছে শুনেছিলাম বটে। এখনও ফেরেন নি ?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, ঠিকানাটা দিয়ে যান আপনি। একটু চা খাবেন ?

—আজ্ঞে না, মাপ করবেন মা-লক্ষ্মী, আমি চা খাই নে।

—শুনুন, আপনি আমার চিঠিখানা পড়েচেন তাহ'লে ? নইলে আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন ? আমার পাওনা টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকদিন হলো। এক মাসের জন্যে নিয়ে আজ তিন মাস···

—আজ্ঞে, বাবু এলেই তিনি দিয়ে দেবেন। আপনি আর কিছুদিন সময় দিন দয়া ক'রে।

—আচ্ছা, আপনি ভাববেন না। এলে যেন একবার উনি আসেন এখানে, বলবেন তাঁকে।

ভড়মশায় অনেক-কিছু ভাবিতে-ভাবিতে গদিতে ফিরিলেন। কে এ মেয়েটি ? হয়তো ভালো শ্রেণীর মেয়ে নয়, কিন্তু বেশ ভদ্র। যাহাই হউক, ইহার নিকট কর্ত্তা টাকা ধার করিতে গেলেন কেন, বৃদ্ধ তাহাও কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। একবার ভাবিলেন, বৌ-ঠাকরুণকে সব খুলিয়া বলিবেন—শেষে ঠিক করিলেন, বৌ-ঠাকুরুণকে এখন কোনো কথা না বলাই ভালো হইবে। কি জানি, মনিব যদি শুনিয়া চটিয়া যান ?

ইহার মাসখানেক পরে শোভারাণী একদিন একদিন হঠাৎ গদাধরকে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সকালবেলা। শোভারাণীর প্রাতঃস্নান এখনও সম্পন্ন হয় নাই। আলুথালু চুল, ফিকে নীল রংয়ের সিল্কের শাড়ী পরনে, হাতে ভোরের খবরের কাগজ। শোভা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গদাধর বলিলেন—এই যে, ভালো আছো শোভা ? এই ট্রেন থেকে নেমেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। এখনও বাড়ী যাই নি।

—আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উত্তর দিতুম, কিন্তু চলে আসবো কলকাতায়, ভাবলুম আর চিঠি দিয়ে কি হবে, দেখাই তো করবো।

—আমার টাকার কি ব্যবস্থা করলেন ?

—টাকার ব্যবস্থা হয়েই রয়েচে। ছবি তোলা হয়ে গেল—এখন চালু হলেই টাকা হাতে আসবে।

—তার আগে নয় ?

—তার আগে কোথা থেকে হবে বলো ? সবই তো বোঝো। কলকাতার বাড়ীও মর্টগেজ দিতে হয়েছে বাকী বারো হাজার টাকা তুলতে। এখন সব সার্থক হয়, যদি ছবি ভালো বিক্রি হয় !

—ওসব আমি কি জানি ? বেশ লোক দেখছি আপনি ! কবে আমার টাকা দেবেন, ঠিক ব'লে যান।

—আর দুটো মাস অপেক্ষা করো। তোমার এখন তাড়াতাড়ি টাকার দরকার কি ? সুদ আসচে আসুক না। এও তো ব্যবসা।

শোভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—বেশ মজার কথা বললেন যে ! আমার সুদের ব্যবসাতে দরকার নেই। টাকা কবে দেবেন, বলুন ? তখন তো বলেন নি এত কথা—টাকা নেবার সময় বলেছিলেন, এক মাসের জন্যে !

গদাধর মিনতির সুরে বলিলেন—কিছু মনে কোরো না শোভা। এসময় যে কি সময় আমার, বুঝে ছ্যাখো। ক্যাশে টাকা নেই গদিতে। মিলের নতুন অর্ডার আর নিই নি—এখন পুঁজি যা-কিছু সব এতে ফেলেচি।

—কত দিনের মধ্যে দেবেন ? দু'মাস দেরি করতে পারবো না।

—আচ্ছা, একটা মাস ! এই কথা রইলো। এখন তবে আসি। এই কথাটা বলতেই আসা

—বেশ, আসুন।

দুই মাস ছাড়িয়া তিন মাস হইয়া গেল।

গদাধর বড় বিপদে পড়িয়া গেলেন। ডিস্ট্রিবিউটার ছবি তৈরী করিতে অগ্রিম অনেকগুলি টাকা দিয়াছে, ছবি বিক্রির প্রথম দিকের টাকাটা তাহারাই লইতে লাগিল। ছবি ভাড়া দেওয়া বা বিক্রয় করার ভার তাদের হাতে, টাকা আসিলে আগে তাহারা নিজেদের প্রাপ্য কাটিয়া লয়—গদাধরের হাতে এক পয়সাও আসিল না এই তিন মাসের মধ্যে। অথচ পাওনাদাররা দুবেলা তাগাদা শুরু করিল। যে-পরিমাণে তাহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় তাহারা প্রদর্শন করিতে লাগিল টাকার তাগিদ দিতে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখাইয়া মারকোনি বেতার-বার্তা পাঠাইবার কৌশল আবিষ্কার

করিয়াছিলেন, বা প্রখ্যাতনামা বার্ণার্ড পেলিসি এনামেল করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এরূপ অমানুষিক অধ্যবসায় দেখাইয়াও কোনো ফল হইল না—গদাধর কাহাকেও টাকা দিতে পারিলেন না!

ছবি বাজারে চলিল না, কাগজে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে লাগিল—তবুও গোলা-দর্শকরা মাস-দুই ধরিয়া বিভিন্ন মফঃস্বলের শহরে ছবিখানা দেখিল। কিন্তু ডিষ্ট্রিবিউটারের অগ্রিম দেওয়া টাকা শোধ করিতেই সে টাকা ব্যয় হইল—গদাধরের হাতে যাহা পড়িল—তাহার অনেক বেশি তিনি ঘর হইতে বাহির করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া গদাধর পাইলেন সাত হাজার টাকা। তেইশ হাজার টাকা লোকসান।

ইতিমধ্যে আরও মুশকিল হইল।

পুনরায় একখানা ছবি তোলা হইবে বলিয়া আর্টিস্টদের সঙ্গে, যে-বাগান-বাড়ী ভাড়া লইয়া স্টুডিও খোলা হইয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে এবং মেসিন-বিক্রেতাদের সঙ্গে এক বৎসরের কণ্ট্রাক্ট করা হইয়াছিল—ছবি তুলিবার দেরি হইতেছে দেখিয়া তাহারা চুক্তিমত টাকার তাগাদা শুরু করিল। কেহ-কেহ অন্যথায় নালিশ করিবার ভয়ও দেখাইল।

গদাধর যে সাত হাজার টাকা পাইয়াছিলেন—তাহার অনেক টাকাই গেল এই দলের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপাততঃ শান্ত করিতে। শোভার টাকা শোধ দেওয়ার কোনো পন্থাই হইল না। বাজারেও এখন প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দেনা।

অঘোরবাবু উপদেশ দিলেন, ইহার একমাত্র প্রতিকার নতুন একখানা ছবি তৈরি করা। আরও টাকা চাই—গদাধর ডিষ্ট্রিবিউটারদের সঙ্গে কথা চালাইলেন। তাহারা এ ছবিতে বিশেষ লোকসান খায় নাই, নিজেদের টাকা প্রায় সব উঠাইয়া লইয়াছিল—তাহারা বাকি ত্রিশ হাজার টাকা দিতে রাজী হইল—কিন্তু গদাধরকে ত্রিশ হাজার বাহির করিতেই হইবে। ষাট হাজার টাকার কমে ছবি হইবে না।

অঘোরবাবু উৎসাহ দিলেন, ছবি করিতেই হইবে। দু'একখানা ছবি অমন হইয়া থাকে।

সাত

সামনের হপ্তাতেই কাজ আরম্ভ করা দরকার—কিছু টাকা চাই।

গদাধর ভড়মশায়কে বলিলেন—ক্যাশে কত টাকা আছে?

—হাজার-পনেরো।

—আর, মোকামে?

—প্রায় সাত হাজার।

—ক্যাশের টাকাটা আমাকে দিতে হবে। আপনি বন্দোবস্ত করুন—দু'চার দিনের মধ্যে দরকার!

ভড়মশায় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ক্যাশের টাকা দিলে মিলের অর্ডারী মাল কিনবো কি দিয়ে বাবু? ক্যাশের টাকা হাতছাড়া করা উচিত হবে না। মিলওয়ালাদের দু'হাজার গাঁটের অর্ডার নেওয়া হয়েছে—মোকামে অত মাল নেই। নগদ কিনতে হবে। এদিকে মহাজনের ঘরে আর বছরের দেনা শোধ হয় নি—তাদেরও কিছু দিতে হবে।

—হাজার-পাঁচেক রেখে, হাজার-দশেক দিন আমায়।

ভড়মশায় আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে-মনে প্রমাদ গণিলেন। ক্যাশের টাকা ভাঙিয়া বাবু কি সেই ছবি তোলার ব্যবসায়ে ফেলিবেন? এবার যে ছবি তোলা হইল, তাহাতে যদি লাভ হইত, তবে পুনরায় টাকার দরকার হইবে কেন বাবুর? এ কি-রকম ব্যবসা? ভড়মশায় গিয়া অনঙ্গকে সব খুলিয়া বলিলেন।

অনঙ্গ কাঁদিয়া বলিল—কি হবে ভড়মশায়? তাও যায় যাক—আমরা দেশে ফিরে নুন-ভাত খেয়ে থাকবো। আপনি ওঁকে ফেরান।

সেদিন অনঙ্গ স্বামীকে বলিল—ছাখো, একটা কথা বলি। আমি কোনো কথা এতদিন বলি নি, বা তুমিও আমার কাছে কিছু বলো নি। কিন্তু শুনলুম, তুমি টাকা নিয়ে ছবি তৈরির ব্যবসা করচো—তাতে লোকসান খেয়েও আবার তাই করতে চাইচো! এ-সব কি ভালো?

গদাধর বলিলেন—তুমি বুঝতে পারচো না অনঙ্গ। এ-সব কথা তোমায় বলেচে ওই বুড়োটা—না? ও এ-সবের কি বোঝে যে, এর মধ্যে কথা বলতে যায়! ছবিতে লোকসান হয়েচে সত্যি কথা—কিন্তু আর-একখানা দিয়ে আগের লোকসান উঠিয়ে আনবো। ব্যবসার এই মজা। ব্যবসাদার যে হবে, তার দিল চাই খুব বড়— সাহস চাই খুব। পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে ব্যবসায় বড় হওয়া যায় না অনঙ্গ···হারি বা জিতি! আমার কি বুদ্ধি নেই ভাবচো? সব বুঝি আমি। এ-সবের মধ্যে তুমি মেয়েমানুষ, থাকতে যেও না।

—বোঝো যদি, তবে লোকসান খেলে কেন!

—হার-জিৎ সব কাজেরই আছে, তাতে কি? বলেচি তো তুমি এ-সব বুঝবে না!

অনঙ্গ চোখের জল ফেলিয়া বলিল—আমাদের মেলা টাকার দরকার নেই—চলো, আমরা দেশে ফিরে যাই। বেশ ছিলাম সেখানে—এখানে এসে অনেক টাকা হয়ে আমাদের কি হবে? সারাদিনের মধ্যে তোমার একবার দেখা পাই নে, সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকো—দুটো খেতে আসবার সময় পর্য্যন্ত পাও না! সেখানে থাকলে তবুও দু'-বেলা দেখতে পেতাম তোমাকে—আমার মন যে কি হু-হু করে, সে কথা···

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—অত ঘরবোলা হয়ে ছিলুম বলেই সেখানে ব্যবসাতে উন্নতি করতে পারিনি অনঙ্গ। ও ছিল গেরস্ত আড়তদারের ব্যবসা। দিন কেনা, দিন বেচা—লোকসানও নেই, লাভও বেশী নেই। ওতে বড়মানুষ হওয়া যায় না।

—বড়মানুষ হয়ে আমাদের দরকার নেই। লক্ষ্মীটি—চলো, গাঁয়ে ফিরে যাই। আমরা কি কিছু কম সুখে ছিলাম সেখানে, না, খেতে পাচ্ছিলাম না?

গদাধর এইবার স্পষ্টই বিরক্ত হইলেন—কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়—চুপ করিয়া রহিলেন।

অনঙ্গ বলিল—ওগো, আমায় একবার দেশে নিয়ে চলো না—একদিনের জন্যে।

—কেন? গিয়ে কি হবে এখন?

—দশঘরার বন-বিবির থানে পূজো মানত ছিল—দিয়ে আসবো।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—অর্থাৎ তোমার পূজো মানত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এরি মধ্যে?

—সে জন্যে না। তুমি অমত কোরো না ··লক্ষ্মীটি···সামনের মঙ্গলবার চলো দেশে যাই—দু'দিন থাকবো মোটে!

—পাগল! এখন আমার সময় নেই। ওসব এখন থাক গে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গদাধর শোভারাণীর বাড়ী গেলেন—ফোন করিয়া পূর্ব্বেই যাইবার কথা বলিয়াছিলেন।

শোভা বলিল—কি খবর?

—অনেক কথা আছে। খুব বিপদে প'ড়ে এসেচি তোমার কাছে। তুমি যদি অভয় দাও···

—অত ভণিতে শোনবার সময় নেই আমার। কি হয়েচে বলুন না!

গদাধর নিজের অবস্থা সব খুলিয়া বলিলেন। কিছু টাকার দরকার এখনই। কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না?

বলিলেন—একটা-কিছু করতেই হবে শোভা। বড় বিপদে প'ড়ে গিয়েছি। আর একটা অনুরোধ আমার, এ-ছবিতে তোমাকে নামতে হবে, না নামলে ছবি চলবে না। তোমার টাকা আমি দেবো, আমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করো—যা তোমার দাম দর হবে, তা থেকে কিছু কমাবো না।

শোভা সব শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। কোনো কথা বলিল না।

—কি? একটা যা হয় বলো আমায়।

—কি বলবো, বলুন? ছবি মার খেয়ে যাবে আমি আগেই জানতাম।

—সে তো বুঝলুম! যা হবার হয়েচে—এখন আমায় বাঁচাও।

—আমি কি করতে পারি যে আমার কাছে এসেচেন?

—আরও কিছু টাকা দাও, আর এ ছবিতে নামো।

—কোনোটাই হবে না আমার দ্বারা। আমায় এত বোকা পেয়েছেন?

—কেন হবে না শোভা? আমায় উদ্ধার করো। প্রথম ছবি—তেমন হয়নি হয়তো। সে-ছবি থেকে অনেক কিছু বুঝে নিয়েছি—আর একটি বার···

শোভা এবার রাগ করিল। গলার সুর তাহার কখনো বিশেষ চড়ে না, একটু চড়িলেই

বুঝিতে হইবে, সে রাগ করিয়াছে। সে চড়া গলায় বলিল—আমাকে টাকা ফেলে দিন, মিটে গেল—আমি উদ্ধার করবার কে? আমার কথা শুনেছিলেন আপনি? আমি বলি নি যে ফিল্ম কোম্পানি চালানো আপনার কর্ম্ম নয়? আপনি যার কিছু বোঝেন না, তার মধ্যে…

গদাধর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁরও গলায় রাগের সুর আসিয়া গেল। হয়তো রাগের সঙ্গে দুঃখ মেশানো ছিল!

বলিলেন—বেশ, তুমি দিও না টাকা! না দিলেই-বা কি করতে পারি আমি? তবে আমি ছবি একখানা করবোই। দেখি অন্য জায়গায় চেষ্টা—আচ্ছা, আসি তাহ'লে।

গদাধর বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইবেন—শোভা ডাকিয়া বলিল—বা রে, চলে গেলেই হলো? শুনে যান—আমার টাকার একটা ব্যবস্থা করুন।

—হবে, হবে, শীগ্‌গির হবে।

—শুনুন, শুনুন!

—কি?

—কোম্পানি করবেনই তবে? আপনার সর্ব্বনাশ হোলেও শুনবেন না?

গদাধর বোধহয় খুব চটিয়া গিয়াছিলেন। সিঁড়ি বাহিয়া তরতর করিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন—না, সে তো বলেচি অনেকবার। কতবার আর বলবো? ও আমি না বুঝে করতে যাচ্চি নে। আমায় কারো শেখাতে হবে না।

গদাধর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

শোভা অন্যমনস্ক হইয়া কতক্ষণ সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে এমন এক-ধরণের মানুষ দেখিল, যাহা সে সচরাচর দেখে না! অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল।

একটু পরে শচীন একখানা বড় মোটর-ভর্ত্তি বন্ধুবান্ধব লইয়া হাজির হইল। সকলে কোলাহল করিতে-করিতে উপরে উঠিয়া আসিল। ইহাদের মধ্যে একজনকে শোভা চেনে—উড়িষ্যার কোনো এক দেশীয়-রাজ্যের রাজকুমার, পূর্ব্বে একদিন শোভাদের স্টুডিও দেখিতে গিয়াছিলেন। পৈতৃক অর্থ উড়াইবার তীর্থস্থান কলিকাতা ধামে গত পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে কুমার-বাহাদুর প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা অন্তরীক্ষে অদৃশ্য করিয়া দিয়া স্বীয় দরাজ-হাতের ও রাজোচিত মনের পরিচয় দিয়াছেন!

কুমার-বাহাদুর আগাইয়া আসিয়া পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন—নমস্কার, মিস্ মিত্র, কেমন আছেন? এলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

শোভা নিস্পৃহভাবে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালো আছি।

শচীন পিছন হইতে বলিল—কুমার-বাহাদুর এসেছিলেন তোমায় নিয়ে যেতে—উনি মস্ত বড় পার্টি দিচ্ছেন ক্যাসানোভায়—আজ সাতটা থেকে। এখন একবার সবাই মিলে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের…

শোভা বলিল—আমার শরীর ভালো নয়।

কুমার-বাহাদুর বেশ সুপুরুষ, তরুণবয়স্ক, সাহেবি পোষাকপরা, কেতাকায়দা-দুরস্ত সাহেবিয়ানাকে যতদূর নকল করা সম্ভব একজন অর্দ্ধশিক্ষিত দেশী লোকের পক্ষে—তাহার ত্রুটি তিনি রাখেন নাই। অসুখের কথা শোভার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তিনি তটস্থ হইয়া বলিলেন—আপনার অসুখ হয়েছে, মিস্ মিত্র? গাড়ীতে ক'রে যেতে পারবেন না?

শোভা বিরক্তির সুরে বলিল—আজ্ঞে না, মাপ করবেন।

শচীন দলবল লইয়া অগত্যা বিদায় লইল।

দিন-দুই পরে শোভা নিজের স্টুডিওতে হঠাৎ গদাধর ও রেখাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। প্রথমে তাহার মনে হইল, তাহারই জন্য উহারা আসিয়াছে। শেষে দেখিল, তাহা নয়, অন্য কি-একটা কাজে আসিয়া থাকিবে—অন্য কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাছে। শোভা সেটে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে সাজগোজ করিয়াছে, মাথায় মুকুট, হাতে সেকেলে তাড়, বালা, চূড়—বাহুতে নিমফল-ঝোলানো রাংতার গিল্টি-করা বাজু—পৌরাণিক চিত্রের ব্যাপার। তবুও সে একজন ছোকরা চাকরকে বলিল—এই, ওই বাবু আর মাইজিকে ডেকে নিয়ে আয় তো!

তাহার বুকের মধ্যে একটি অনুভূতি, যাহা শোভা কখনো অনুভব করে নাই পূর্ব্বে! রেখাকে গদাধরের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়াই কি এরূপ হইল? সম্ভব নয়। উহারা যাহা খুশি করিতে পারে, তাহার তাহাতে কিছুই আসে-যায় না। তবে লোকটির মধ্যে তেজ আছে, সাহস আছে—বেশির ভাগ পুরুষই তাহার কাছে আসিয়া কেমন যেন হইয়া যায়; মেরুদণ্ডবিহীন মোমের পুতুলদের দুদণ্ড নাচানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই, জয়ের গর্ব্ব সেখানে বড়ই ক্ষণস্থায়ী। শাণিত ছোরার আগার সাহায্যে কচুগাছের ডগা কাটা! ছোরার অপমান হয় না তাতে?

গদাধরবাবুর কাছে গিয়া চাকরটি কি বলিল, গদাধরকে আঙুল দিয়া তাহার দিকে দেখাইল চাকরটা—এ পর্য্যন্ত শোভা দেখিল। তাহার বুকের মধ্যে ভীষণ ঢিপ-ঢিপ শুরু হইল অকস্মাৎ—বুকের রক্ত যেন চল্‌কাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। ঠিক সেই সময় ডাক পড়িল—গদাধরের সঙ্গে শোভার আর দেখা হইল না সেদিন।

মাস পাঁচ ছয় কাটিল। পুনরায় পূজা আসিল, চলিয়াও গেল। কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন শচীন কথায়-কথায় বলিল—শুনচো, গদাধর আমাদের বড় বিপদে পড়েচে।

শোভা জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে?

—ওর সেই ছবি অর্দ্ধেক হয়ে আর হলো না—কতকগুলো টাকা নষ্ট হলো। এবার একেবারে মারা পড়বে।

—কেন কি হলো?

—রেখা ঝগড়া ক'রে ছেড়ে দিয়েচে। তার সঙ্গে নাকি কোনো লেখাপড়া ছিল না

এবার। সে সুবিধে পেয়ে গেছে—এখন নাকি শুনচি, রেখা বিয়ে করবে কাকে, সব ঠিক হয়ে গিয়েচে। যাকে বিয়ে করবে, রেখাকে সে ছবিতে নামতে দেবে না—নানা গোলমাল। রেখা চলে গেলে তার সঙ্গে সুষমাও চলে আসবে। ডিষ্ট্রিবিউটার অনেক টাকা ঢেলেচে—তারা নালিশ করবে গদাধরের নামে, বেচারী এবার একেবারে মারা যাবে তাহ'লে—বাজার সুদ্ধ দেনা।

শোভা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—গদাধরবাবু এখন কোথায় ?

—সেই বাড়ীতেই আছে। তবে শুনচি নাকি, বাড়ি বন্ধক। বাড়ী থাকবে না, যতদূর মনে হচ্চে !

—ও !

—বড্ড চাল বাড়িয়েছিল, এবার একেবারে ধনে-প্রাণে গেল। মানে, তুই ছিলি বাবু পাটের আড়তদার, করতে গেলি ফিল্মের ব্যবসা, যাকে যা না সাজে—বোকা পেয়ে পাঁচজনে মাথায় হাত বুলিয়ে—বুঝলে ?

শোভা একটু অন্যমনস্ক হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া ছিল, শচীনের শেষদিকের কথার মধ্যে কতকটা মজা দেখিবার উল্লাসের সুর ধ্বনিত হওয়ায় সে হঠাৎ ঝাঁঝিয়া উঠিয়া তীব্র বিরক্তির সুরে বলিল—আ—আঃ,—কেন মিছিমিছি বাজে বকচেন একজনের নামে ? আপনার গাঁয়ের লোক, আত্মীয় না ? এত আমোদ কিসের তবে ?

শচীনের কণ্ঠ হইতে আমোদের সুর এক মুহূর্ত্তে উবিয়া গেল, সে শোভার দিকে চাহিয়া বলিল—না, তাই বলচি, তাই বলচি—লোকটার মধ্যে যে কেবল নিছক বেকুবি···

—আবার ওই সব কথা ? লোকটার মধ্যে যাই থাকুক, সে-সব আলোচনা এখানে করবার কোনো দরকার নেই।

শোভার গলার সুরে রাগ বেশ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

ইহার পর শচীন এ-সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতে আর সাহস করিল না—কিন্তু সে আশ্চর্য হইল মনে-মনে। সে জানিত, শোভা একগাদা টাকা ধার দিয়াছে গদাধরকে, সে-ধারের একটা পয়সা এখনও সে পায় নাই···!

তাহাদের স্টুডিওর সঙ্গে টেক্কা দিয়া গদাধর ছবি তুলিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছে—বিশেষতঃ রেখার পূর্ব্ব-ইতিহাস যাহাই হউক, এখন যে অভিনয়ক্ষেত্রে সে শোভার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া উঠিতেছে দিন-দিন—এ-সব বিবেচনা করিয়া দেখিলে গদাধরের দুর্দ্দশা তো পরম উপভোগ্য বস্তু—নিতান্ত মুখরোচক গল্পের উপকরণ !

কি জানি, মেয়েমানুষের মেজাজ সে কখন কি, শচীন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা আজও বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরো ভীষণ অবাক হইয়া গেল সে, দিনকতক পরে একটি কথা শুনিয়া।

একদিন তাহাদের স্টুডিওর একটি মেয়ে, শোভার বিশেষ বন্ধু, শচীনকে ডাকিয়া বলিল —শুনুন, আপনাকে একটি কথা বলি।

—এই যে অলকা দেবী—ভালো তো? কি কথা?

—কথাটা খুব গোপনে রাখবেন কিন্তু। আপনি শোভাকে জানেন অনেকদিন থেকে, তাই আপনার কাছে বলচি, যদি আপনার দ্বারা কিছু কাজ হয়।

শচীন বিস্ময়ের সুরে বলিল—শোভার সম্বন্ধে কথা? আমায় দিয়ে কি উপকার—বুঝতে পারচি নে।

—শোভা এ স্টুডিও ছেড়ে ভারতী ফিল্ম্‌ কোম্পানিতে ঢোকবার চেষ্টা করচে—জানেন না? সেখানে চিঠি লিখেচে।

শচীন মূঢ়ের মত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাসের সুরে বলিল—'ভারতী ফিল্ম্‌ কোম্পানি'? সে তো আমাদের গদাধরের।

—সে-সব জানি নে মশাই, ওই যে যাদের 'ওলট-পালট' ব'লে ছবিটি একেবারে মার খেয়ে গেল।

—বুঝেচি, জানি—তারপর? সেখানে যেতে চাইচে শোভা?

—যেতে চাইচে মানে, চিঠি লিখেচে···দরখাস্ত করেচে···যাকে বলে মশাই—যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেচে!

—তার মানে?

—আমি কিছু বুঝতে পারচি নে। সেইজন্যেই আপনার কাছে বলা।

—এখানে ডিরেক্টরের সঙ্গে ঝগড়া হলো নাকি?

—সে-সব না। ওর সঙ্গে আবার ঝগড়া হবে কার? আমি কিছু বুঝচি নে। ভারতী ফিল্ম্‌ কোম্পানি একটা ফিল্ম্‌ বার ক'রে যা নাম কিনেচে—তাতে ওদের ছবি বাজারে চলবে না! যতদূর আমি জানি, ওদের পয়সা-কড়িরও তেমন জোর নেই—ওখানে শোভা কেন যেতে চাইচে, এ আমার মাথায় আসে না কিছুতেই।

—আপনি বুঝিয়ে ব'লে দেখুন না, অলকা দেবী?

—আমি কি না বুঝিয়েচি? অনেক বারণ করেচি। ওর ব্যাপার জানেন তো? যখন যা গোঁ ধরবে, তা না ক'রে ছাড়বে না! খেয়ালী-মেজাজের মেয়ে—এখানে ওর কণ্ট্রাক্ট রয়েচে এক বছরের। এরা নালিশ ক'রে দেবে, তখন কি হবে?

—সে তো জানি!

—আবার বুঝে-সুঝে চলতেও ওর জোড়া নেই! যেখানে, যখন বুঝতে চাইবে সেখানে অঙ্ক কষবে—অথচ কেন অবুঝ হলো এমন যে···

—হুঁ।

—আপনি একবার বুঝিয়ে বলুন না শচীনবাবু। আমার মনে হয়···

—আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়।

শচীন মুখে বলিল বটে, কিন্তু সে সাহস করিয়া শোভার কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিল না—আজ কাল করিয়া প্রায় দিনপনেরো কাটিল। শোভা কিন্তু স্টুডিও ছাড়িয়া কোথাও গেল না। দিনের পর দিন রীতিমত চাকুরী করিয়া যাইতে লাগিল। তবে শচীন লক্ষ্য করিল, শোভার মুখ ভার-ভার, সে কোনোখানেই তেমন মেলামেশা করে না লোকের সঙ্গে, তবু আগে যাহাও একটু-আধটু করিত, এখন একেবারেই তা করে না। নিজের গাড়ীতে স্টুডিওতে ঢোকে, কাজ শেষ করিয়া গাড়ীতেই বাহির হইয়া যায়।

সেদিন তাহার সঙ্গে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল অলকার। গাড়ীতে উঠিতে যাইবে শোভা, সামনে অলকাকে দেখিয়া সে একটু অপেক্ষা করিল।

অলকা বলিল—কি, আজকাল যে বড় ব্যস্ত, কেমন আছো শোভা ?

—ভালোই আছি। তুই যাস নে কেন আমার ওখানে ?

—একটু ব্যস্ত ছিলাম ভাই—যাবো শীগ্‌গির একদিন। যাক্‌, আর ক'দিন আছো আমাদের এখানে ?

শোভা হাসিয়া বলিল—বরাবর আছি। ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে !

অলকা খুশী হইয়া বলিল—নেমেচে ? সত্যি নেমেচে ভাই ?

—নেমেচে। আচ্ছা, চলি তবে।

শচীন অলকার মুখে সংবাদটা শুনিয়া নিতান্তই খুশী হইয়া উঠিল। সেইদিনই সে শোভার ওখানে গেল। মনের উল্লাস চাপিতে না পারিয়া কথায়-কথায় বলিল—তারপর, একটা কথা আজ অলকা গুপ্তার মুখে শুনে বড় আনন্দ হলো শোভা !

—কি কথা ? কার সম্বন্ধে ?

—তোমার সম্বন্ধেই।

শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমার সম্বন্ধে ? কি কথা, শুনি ?

—যদিও আমি জানি নে তুমি কেন ঝোঁক ধরেছিলে, 'ভারতী ফিল্মে যাবার জন্যে—তবুও শুনে সুখী হলাম যে, সে ভূত তোমার ঘাড় থেকে নেমে গিয়েচে।

শোভা গম্ভীর মুখে বলিল—ভূত নামে নি নামিয়ে দিয়েছে—জানেন ?

শচীন বুঝিতে না পারার ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিল—মানে ?

—মানে, এই দেখুন চিঠি।

শোভা শচীনের হাতে যে চিঠিখানা দিল, সেখানা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—টাইপ-করা ইংরেজি চিঠি। তাতে 'ভারতী ফিল্ম স্টুডিও'র কর্তৃপক্ষ দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছেন যে শোভারাণী মিত্রকে বর্তমানে তাঁহাদের স্টুডিওতে লওয়া সম্ভব হইবে না !

শচীন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ফিল্ম্‌ গগনের অত্যুজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে তারকা মিস্ শোভারাণী মিত্র দীনভাবে চিঠি লিখিয়া চাকুরী প্রার্থনা করিতে গিয়াছিল ভারতী ফিল্ম্‌ কোম্পানির মত তৃতীয় শ্রেণীর চিত্র প্রতিষ্ঠানে, আর তাহারা কিনা…

ব্যাপারটা শচীন ধারণা করিতেই পারিল না। শোভারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া সে আর

কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। তাহার মনে হইল, শোভা এ-সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক। তবুও এ এমনই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যাহা মন হইতে যাইতে চায় না।

শচীন বাসায় ফিরিবার পথে কতবার জিনিসটা মনের মধ্যে নড়াচাড়া করিল। শোভার মত তেজী মেয়ে, সচ্ছল অবস্থার অভিনেত্রী রূপসী তরুণী—কি বুঝিয়া কিসের জন্য এ হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করিতে গেল? কোনো মানে হয় ইহার? যার পায়ের ধূলা পাইলে ভারতী স্টুডিওর মত কতশত ছবি-তোলা কোম্পানি কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইত—তাহাকে কিনা চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিল, এখানে তোমাকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হইবে না!

সাহস করিয়া স্টুডিওর বন্ধুবান্ধবের কাছেও এমন মজার কথাটা শচীন বলিতে সাহস করিল না। শোভার কানে উঠিলে সে চটিবে।

ভড়মশায় পাটের কাজ ভালো ভাবেই চালাইতেছিলেন। আড়তের ক্যাশ হইতে মাসে মাসে টাকা যদি তুলিয়া না লওয়া হইত, তবে ভড়মশায়ের সুনিপুণ পরিচালনায় আড়তের কোনোই ক্ষতি হইত না। কিন্তু গদাধর বারবার টাকা তুলিয়া আড়তের খাতা শুধু হাওলাতী-হিসাবে ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন। কাজে মন্দা দেখা দিল।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম। নতুন পাট কিনিবার মরসুমে পাঁচ ছ'হাজার টাকা বিভিন্ন মোকামে ছড়ানো ছিল—এইবার সেখান হইতে মাল আনিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এইসময় ভড়মশায় একটা মোটা অর্ডার পাইলেন মিল হইতে—মাল যোগান দিতে পারিলে দু'পয়সা লাভ হইবে—কিন্তু টাকা নাই। ভড়মশায় নানাদিকে বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে অনঙ্গর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। গত চার-পাঁচ মাস তিনি অনঙ্গকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনো কাজ করেন না! অনঙ্গ যে এত ভালো ব্যবসা বোঝে, ভড়মশায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বৌ-ঠাকরুণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে। অনঙ্গ শুনিয়া বলিল—ব্যাঙ্ক থেকে কিছু নেওয়া চলবে না?

—তা হবে না বৌ-ঠাকরুণ, অনেক নেওয়া আছে, আর দেবে না?

—মোকাম থেকে পাট আনিয়ে নিন, আর আমার গহনা যা আছে বিক্রি করুন!

—তোমার যা গহনা এখনও আছে, বৌ-ঠাকরুণ, তাতে আর আমি হাত দিতে চাই নে। পাটের ব্যবসা—জুয়ো খেলা, হেরে গেলে তোমার গহনাগুলো যাবে।

কিন্তু অনঙ্গ শুনিল না। সেও নিতান্ত ভীতু-ধরণের মেয়ে নয়, এখন তাহার পিতৃবংশের যদিও কেহই নাই—কেবল এক বখাটে ভাই ছাড়া—একসময়ে তাহার বাবাও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন—ব্যবসাদারের দিল আছে তাহার মধ্যে। সে জোর করিয়া গহনা বিক্রয় করাইয়া সেই টাকায় মালের যোগান দিল। কিছু টাকাও লাভ হইল।

যেদিন মিলের চেক ব্যাঙ্কে ভাঙানো হইবে, সেদিন গদাধর আসিয়া এক হাজার টাকা চাহিয়া বসিলেন। তিনি আজকাল বাড়ীতে বড়-একটা আসেন না। কোথায় রাত কাটান,

কি ভাবে থাকেন, ভড়মশায় বা অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। এবার কিন্তু ভড়মশায় শক্ত হইয়া বলিলেন—বাবু, এ টাকা বৌ-ঠাকরুণের গহনা-বেচা টাকা। এ থেকে আপনাকে দিতে গেলে, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তাঁর হুকুম ভিন্ন দিতে পারি নে।

গদাধর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—আড়ত আমার নামে, আপনার বৌ-ঠাকরুণের নামে নয়। আমার আড়তে অপরের টাকা খাটে কোন হিসেবে?

—সে কথাটা বাবু আপনি গিয়ে তাঁকে বলুন—আমি এর জবাব দিতে পারবো না।

—আপনি টাকা দিয়ে দিন, আমার বড্ড দরকার, পাওনাদারে ছিঁড়ে খাচ্চে। আমি এখন যাই, কাল সকালে আবার আসবো।

ভড়মশায় অনঙ্গকে গিয়া কথাটা জানাইলেন। অনঙ্গ টাকা দিতে রাজী হইল না। তাহার ও তাহার ছেলেদের দশা কি হইবে, সে-কথা স্বামী কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ওই দেড় হাজার টাকা ভরসা। বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না—তাই এক-রকমে সংসার চলিবে কিছুদিন ওই টাকায়।

পরদিন অনঙ্গ দুপুরে কলতলায় মাছ ধুইতেছে, হঠাৎ স্বামীকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। গদাধর কাছে আসিয়া বলিলেন—কেমন আছো?

অনঙ্গ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। অনেকদিন দেখে নাই—প্রায় পনেরো-ষোলো দিন। স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো হইয়াছে, চেহারায় গেঁয়ো-ভাবটা অনেকদিন হইতেই দূর হইয়াছিল—বেশ চমৎকার চেহারা ফুটিয়াছে।

তবুও অভিমানের নীরসতা কণ্ঠে আনিয়া সে বলিল—ভালো থাকি আর না থাকি, তোমার তাতে কি? দেখতে এসেছিলে একদিন, মরে গিয়েছে বাড়ীসুদ্ধ, না বেঁচে আছে?

—তুমি আজকাল বড় রাগ করো। আমি কাজ নিয়ে বড় ব্যস্ত আছি, স্টুডিওতে খাই, স্টুডিওতেই শুই—তাই সময় পাই নে—কিন্তু ভড়মশায়ের কাছে রোজই খবর পাচ্চি ফোনে —রোজ ফোন্ করি গদিতে।

—বেশ করো। না করলেই-বা কি ক্ষতি?

—কার কথা বলছো—তোমার, না আমার?

—দুজনেরই। যাক্, এখন কি মনে ক'রে অসময়ে? খাওয়া হয় নি, তা মুখ দেখেই বুঝতে পারচি। ঘরে গিয়ে বসো, আমি মাছ ক'টা ধুয়ে আসচি।

একটু পরে অনঙ্গ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্বামী ছেলেদের লইয়া গল্প করিতেছেন। অনঙ্গ বলিল—চা খাবে নাকি? এখনও রান্নার দেরি আছে কিন্তু।

গদাধর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আমার দেরি করলে চলবে না। চা বরং একটু ক'রে দাও—আর আমি এসেছিলাম যে জন্যে…

অনঙ্গ বলিল—সে আমি শুনেচি। সে হবে না।

—টাকা তুমি দেবে না অনঙ্গ? লক্ষ্মীটি, বড্ড বিপদে পড়েচি। একটা মেশিনের কিস্তির টাকা কাল দিতে হবে, নইলে তারা মেশিন উঠিয়ে নিয়ে যাবে—স্টুডিওর কাজ বন্ধ

হয়ে যাবে তাহ'লে। লক্ষ্মীটি, অমত কোরো না। বড় আশা ক'রে এসেচি।

গদাধরের চোখে মিনতির দৃষ্টি! অনঙ্গর মন এতটুকু দমিত না, বা টলিত না, যদি স্বামী তম্বি-গম্বি করিত বা রাগঝাল দেখাইত। কিন্তু স্বামীর অসহায় মিনতির দৃষ্টি তাহার মতিভ্রম ঘটাইল। সে নিজেকে দৃঢ় রাখিতে পারিল না।

গদাধর টাকা আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই টাকা দেওয়ার মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য অনঙ্গকে পরে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

মাসখানেক পরে আদালতের বেলিফ্‌ আসিয়া বাড়ী শিল করিয়া গেল। বন্ধকী বাড়ী, পাছে বেনামী হস্তান্তর হয়, তাই মহাজন ডিগ্রীর আগেই কোর্ট হইতে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

গদাধরের অবস্থা যে কত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, ভড়মশায় তাহা ইদানীং বেশ ভালো করিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন। আড়তের ঠিকানায় বহু পাওনাদার আসিয়া জুটিতে লাগিল। ভড়মশায় পাকা লোক—তাহাদের ভাগাইয়া দিলেন। এ ফার্ম্মের সঙ্গে ও-সব দেনার সম্বন্ধ কি? অনেকে শাসাইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু যেদিন খবর পাওয়া গেল যে, আদালতের বেলিফ্‌ বাড়ী শিল করিবে, সেদিন ভড়মশায় অনঙ্গকে গিয়া সব খুলিয়া বলিলেন। অনঙ্গ বলিল—আমাদের কি উপায় হবে?

—একটা ভাড়াটে-বাড়ী আজ রাত্রের মধ্যেই দেখি, কাল সেখানে উঠে যাওয়া যাক।

—তার চেয়ে চলুন, দেশে ফিরে যাই ভড়মশায়। সেখানে গেলে আমার মন ভালো থাকবে।

—এই অবস্থায় সেখানে যাবেন বৌ-ঠাকরুণ? লোকে হাসবে না?

—হাসুক ভড়মশায়। আমার স্বামীর, আমার শ্বশুরের ভিটেতে আমি না খেয়ে একবেলা প'ড়ে থাকলেও আমার কোনো অপমান নেই। সেখানে সজনে-শাক সেদ্ধ ক'রে খেয়েও একটা দিন চলে যাবে, এখানে তা হবে না। আপনি চলুন দেশে।

—আমারও তাই মত বৌ-ঠাকরুণ। আপনার যদি তাতে মন না দমে, আজই চলুন না কেন?

আট

অনেকদিন পরে অনঙ্গ আবার দেশের বাড়ীতে ফিরিল।

গত চার বছরের বর্ষার জল পাইয়া দু'খানা ছাদ বসিয়া গিয়াছে, উঠানে ভাঁটশেওড়ার বন; পাচিলে ও কার্নিসে বনমূলা ও চিচ্চিড়ের ঝাড়, রোয়াকে ও দেওয়ালের গায়ে প্রতিবেশীরা ঘুঁটে দিয়াছে। দু'একজোড়া জানালার কবাট কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে বেওয়ারিশ

মাল বিবেচনায়। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অনঙ্গ চোখের জল রাখিতে পারিল না।

একটা কুলুঙ্গিতে অনঙ্গর শাশুড়ী লক্ষ্মীর বাটা রাখিতেন, শাশুড়ীর নিজের হাতের সিঁদুরের কৌটার পুতুল এখনও কুলুঙ্গির ভিতরে আঁকা। যে খাটে অনঙ্গ নববধূরূপে ফুলশয্যার রাত্রি যাপন করিয়াছিল, পশ্চিমের ঘরে সে প্রকাণ্ড সেকেলে কাঁঠাল কাঠের তক্তপোশখানা উইয়ে-খাওয়া অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান।

বাড়ী আসিয়া নামিবার কিছু পরে, পাশের বাড়ীর বড়-তরফের কর্ত্রী-ঠাকরুণ এ-বাড়ী দেখিতে আসিলেন। অনঙ্গ তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ভালো আছো দিদি? বট্‌ঠাকুর ভালো, ছেলেপিলে সব···

—হ্যাঁ তা সব এক-রকম—কিন্তু বড্ড রোগা হয়ে গেছিস ছোটবৌ। আহা, শচীনের (ইনি শচীনের মা) কাছে সব শুনলাম। তা ঠাকুরপো যে কলকাতায় গিয়ে এ-রকম ক'রে উচ্ছন্নে যাবে, তা কে জানতো। শুনলাম নাকি এক মাগী নাচওয়ালী না কি ওই বলে আজকাল—তাকে নিয়ে কি ঢলাঢলি, কি কাণ্ড! একেবারে পথে বসিয়ে দিলে তোদের ছোটবৌ, কিছু নেই, বাড়ীখানা পর্য্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল গো! আহা-হা···

অনঙ্গর চিত্ত জ্বলিয়া গেল বড়বৌয়ের কথার ধরণে। সহানুভূতি দেখাইবার ছুতায় আসিয়া এ একপ্রকার গায়ের ঝাল ঝাড়া আর কি! বড়-তরফ যখন যে গরীব সেই গরীবই থাকিল, ছোট-তরফের তখন অত বাড় বাড়িয়া কলকাতায় বাড়ী কেনা, আড়ত ও ছবি তুলিবার কোম্পানী খোলা—এসব কেন? কথায় বলে, 'অত বার বেড়োনাকো ঝড়ে ভেঙে যাবে'—এখন কেমন?

অনঙ্গ ঝগড়াটে স্বভাবের মেয়ে কোনোদিনই নয়। ভগবান যখন পাঁচজনকে দেখিতে দিয়াছেন—দেখুক।

কলিকাতার বাড়ীর জন্য ডবল পালঙ্ক, কয়েকখানা সোফা ও একটা বড় কাঁচ-বসানো আলমারি অনঙ্গ শখ করিয়া কিনিয়াছিল—এত কষ্টের মধ্যেও সেগুলি সে বেচিয়া বা ফেলিয়া আসিতে পারে নাই—সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। গত সুখের দিনের স্মৃতিচিহ্ন এগুলি—অনঙ্গ এখানকার ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বড়বৌ সেগুলি দেখিয়া বলিলেন—এসব আর এখন কি হবে ছোটবৌ, বিক্রি ক'রে দিয়ে এলে তবুও দু-দিন চলতো সেই টাকায়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। বলিস তো খাট-আলমারির খদ্দের দেখি,—ওই মুখুজ্যেদের গিন্নি বলছিল একখানা খাট ওর দরকার।

অনঙ্গ বলিল—আচ্ছা দিদি, আমি তোমায় জানাবো দরকার বুঝে। এনেছি যখন, এখন থাকুক—জায়গার তো অভাব নেই রাখবার, কারো ঘাড়েও চেপে নেই।

দিন যাহা হউক একপ্রকার কাটিতে লাগিল! অনঙ্গর মনে কিন্তু বড় দুঃখ, স্বামী তাহার পর হইয়া গেল। এত কষ্টের ও পরের টিটকারীর মধ্যেও যদি স্বামীকে সে কাছে পাইত, এসব দুঃখ-কষ্টকে সে আমল দিত না। পুরানো বাড়ীর কার্নিসের ফাঁকে গোলা-পায়রার ঝাঁক আর পুরানো দিনের মত ডানা ঝট্‌পট্ করে না, সুখের পায়রা অন্য কোন সুখী

গৃহস্থের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে বাড়ীর কানাচে রাত্রিবেলা পেঁচার কর্কশ স্বর শোনা যায় রাত দুপুরে, আমড়া গাছের মাথায় চাঁদ ওঠে, একা-একা ছেলে দুটি লইয়া এই শতস্মৃতিভরা বাড়ীতে থাকিতে তাহার বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, প্রতিদিন কলকাতা হইতে আনা সেই পালঙ্কে শুইবার সময়।

রাত্রি নির্জ্জন—বাড়ীটা ফাঁকা—কেহ কোথাও নাই আজ। দিনের বেলায় তবু কাজ লইয়া ভুলিয়া থাকা যায়, রাতের নির্জ্জনতা যখন বুকে চাপিয়া বসে—তাহার বুক হু হু করে, শত্রু হাসাইবার ভয়ে যে কান্নার বেগ দিনমানে চাপিয়া রাখিতে হয়—রাতে তাহা আর বাধা মানে না।

হাতে বিশেষ পয়সা আর নাই—ভড়মশায়ের সাহায্যে সে ছোট-খাটো খুচরা ব্যবসা চালাইতে লাগিল। মূলধন নাই, হাটবারে রাস্তার ধারে পাটের ফেটি কিনিয়া কোনদিন একমণ, কোনদিন-বা কিছু বেশী মাল কুণ্ডুদের আড়তে বিক্রি করিয়া নগদ আট আনা কি বারো আনা লাভ হয়, হাত-খরচটা একরূপে চলিয়া যায় তাহা হইতে।

মূলধনের অভাবে বেশি পরিমাণে খরিদ-বিক্রি করা চলিল না, দুর্দ্দিনের বন্ধু ভড়মশায় অনেক চেষ্টা করিয়াও কোথাও বেশী পুঁজি জুটাইতে পারিলেন না।

একদিন নির্ম্মল দেখা করিতে আসিল।

অনঙ্গ সন্তুষ্ট ছিল না নির্ম্মলের উপর—তবুও জিজ্ঞাসা করিল—ওঁর খবর জানো ঠাকুরপো?

—কলকাতাতেই আছে, শচীনের কাছে শুনেচি।

—তুমি জানো ঠিকানা ঠাকুরপো? বাড়ীতে একবার আসতে বলো না ওঁকে। যা হবার হয়েচে, তা ভেবে আর কি হবে। বাড়ীতে এসে বসুন, আমি চালাবো, ওঁকে কিছু করতে হবে না।

—পাগল হয়েচো বৌদি? গদাধরদাকে চেনো না? বলে, মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার! সে এসে ব'সে তোমার ওই পাটের ফেটির ব্যবসা করবে? তা ছাড়া তার এখনো রাজ্যের দেনা। কলকাতা ছেড়ে আসবার জো নেই।

—কত টাকা দেনা, ঠাকুরপো?

—তা অনেক। নালিশ হয়েছে তিন-চারটে—জেলে যেতে না হয়!

অনঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বলো কি ঠাকুরপো! এত দেনা হল কি ক'রে? ছবি চললো না?

—সে নানা গোলমাল। যে মেয়েটির ওপর ভরসা ক'রে ছবি তৈরী করা হচ্ছিলো, তার হয়ে গেল বিয়ে। সে আর ছবিতে নামলো না, অন্য একটি মেয়েকে দিয়ে সে পার্ট করানো হতে লাগলো—ছবি একরকম ক'রে হয়ে গেল। কিন্তু সকলেই জেনে গিয়েছিল যে, রেখা দেবী—মানে, সে মেয়েটি এ-ছবিতে শেষ পর্য্যন্ত নেই—ছবি তেমন জোরে চললো না। গদাধর বড্ড ভুল করলে—একটি খুব নামজাদা অভিনেত্রী ইচ্ছে ক'রে ছবিতে নামতে চেয়েছিল,

গদাধর তাকে নেয় নি—শচীনের মুখে শুনলাম।

—কেন?

—তা কি ক'রে বলবো? বোধ হয় মন-কষাকষি ছিল।

—আগে থেকে জানা ছিল নাকি তার সঙ্গে?

নির্মল হাসিয়া বলিল—খু-ব। কেন, তুমি কিছু জানো না বৌ-ঠাকরুণ? তার কাছে তো গদাধর অনেক টাকা ধার করেছিল, সেও তো একজন বড় পাওনাদার। তার নাম শোভারাণী। আমি শচীনের কাছে শুনেচি, ভড়মশায় একবার সে দেনার সম্পর্কে মেয়েটির বাড়ী গিয়েছিল।

—তারপর কি হলো?

—টাকা কি কেউ ছাড়ে? সেও নালিশ করেচে শুনচি। তারও তো রাগ আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনঙ্গ বলিল—এত কথা আমি জানিনে তো ঠাকুরপো। আমাকে কেউ বলেওনি। আমি না হয় গহনা বেচে তার দেনা শোধ করতাম।

নির্মল হাসিয়া বলিল—সে অনেক টাকা দেনা বৌ-ঠাকরুণ। তোমার গহনা ইদানীং যা ছিল, তা বেচে অত টাকা হবে কোথা থেকে? সে শুনেচি, হাজার চার-পাঁচ টাকা।

অনঙ্গ আকুল কণ্ঠে বলিল—হোক্‌গে যত টাকা, তুমি একটা কাজ করো ঠাকুরপো—তুমি তাকে যে ক'রে পারো একবার এখানে এনে দাও। দেখিনি কতদিন। আমার মন যে কি হয়েচে, সে শুধু তুমি বলেই বলচি। এই উপকারটা করো তুমি। দেনা আমি যে ক'রে হোক্, জমি-জায়গা বেচে হোক্, শোধ ক'রে দেবো—আমি নিজে এখন ব্যবসা বুঝি—করচিও তো।

নির্মল হাসিয়া বলিল—তুমি জানো না বৌদি, তোমার ধারণা নেই। তুমি যা ভাবচো, তা নয়। দেনা বিশ হাজারের কম নয়—সে তুমি তোমার ওই সামান্য ব্যবসা ক'রেও শোধ করতে পারবে না, জায়গাজমি বেচেও পারবে না।

—তাহ'লে কি হবে ঠাকুরপো!

—কি হবে, কিছুই বুঝতে পারচি নে। আর কিছুদিন না গেলে···

নির্মল চলিয়া গেল। অনঙ্গ বসিয়া-বসিয়া কত কি ভাবিল। সেদিন আর তাহার মুখে ভাত উঠিল না। ভড়মশায়কে ডাকাইয়া পরামর্শ করিতে বসিল। ভড়মশায় পাকা বিষয়ী লোক, সব শুনিয়া বলিলেন—এর তো কোনো কূলকিনেরা পাচ্চি নে বৌ-ঠাকরুণ!

অনঙ্গ চিন্তিতমুখে বলিল—আপনার হাতে এখন কত টাকা আছে?

অনঙ্গর মুখের দিকে চাহিয়া ভড়মশায় হাসিয়া বলিলেন—আন্দাজ শ'দুই-আড়াই। কি করতে চান্ বৌ-ঠাকরুণ? ওতে বাবুর দেনা শোধ যাবে না।

—আপনি একবার কলকাতায় যান ভড়মশায়, নির্মল ঠাকুরপো বলছিল, তাঁর নাকি দেনার দায়ে জেল হবে, একবার আপনি নিজের চোখে দেখে আসুন ভড়মশায়—আমি স্থির থাকতে পারচি নে যে একেবারে, এ-কথা শুনে কি আমার মুখে ভাতের দলা ওঠে? আপনি আজ কি কাল সকালেই যান একবার।

—আজ হবে না বৌ-ঠাকরুণ, আজ হাটবার। টাকা-পঞ্চাশেক হাতে আছে, ও টাকাটায় ওবেলা পাট কিনতে হবে। যা হয় দুপয়সা তো ওই থেকেই আসচে।

পরদিন সকালে অনঙ্গ একপ্রকার জোর করিয়া ভড়মশায়কে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে দিল একখানা লম্বা চিঠি আর একশোটা টাকা। ভড়মশায় টাকা দিতে বারণ করিয়াছিলেন, ইহা শুধু সংসার খরচের টাকা নয়, এই যে সামান্য ব্যবসায়ের উপর কষ্টেসৃষ্টেও যা হোক একরকম চলিতেছে, এ টাকা সেই ব্যবসার মূলধনের একটা অংশও বটে। অনঙ্গ শুনিল না। তিনি বিপদের মধ্যে আছেন, যদি তাঁর কোনো দরকারে লাগে!

নয়

ভড়মশায় সটান গিয়া শোভারাণীর বাড়ী উঠিলেন। চাকরের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলেন, গদাধরবাবু বহুদিন যাবৎ এখানে আসেন না।...মাইজী? না, মাইজী এখন স্টুডিওতে। এসময় তিনি বাড়ী থাকেন না কোনোদিন।

শচীনের কাছে সন্ধান মিলিল। দক্ষিণ-কলিকাতার একটা মেসের বাড়ীর ক্ষুদ্র ঘরে কেওড়া-কাঠের তক্তপোশে বসিয়া মনিব বিড়ি খাইতেছেন, এ অবস্থায় ভড়মশায় গিয়া পৌঁছিলেন।

গদাধর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—কি খবর ভড়মশায় যে! আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?

—প্রণাম হই বাবু।

বলিয়াই ভড়মশায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

—আরে-আরে, বসুন-বসুন, কি হয়েছে—ছিঃ! আপনি নিতান্ত...

চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ভড়মশায় বলিলেন—বাবু, আপনি বাড়ী চলুন।

—বাড়ী যাবার জো নেই এখন ভড়মশায়। সে-সব অনেক কথা। সকল কথা শুনেও দরকার নেই,—আমার এখন বাড়ী যাওয়া হয় না।

—বৌ-ঠাকরুণ কেঁদে-কেটে...

—কি করবো বলুন, এখন আমার যাবার উপায় নেই—বসুন। ঠাণ্ডা হোন। খাওয়া দাওয়া করুন এখানে এবেলা।

ভড়মশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো?

—কি বলুন।

—আপনাকে সংসারের ভার নিতে হবে না। আমি কেষ্টি পাটের কেনাবেচা ক'রে একরকম যা হয় চালাচ্চি—আপনি গিয়ে শুধু বাড়ীতে ব'সে থাকবেন।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ভড়মশায়, আমি এখন গাঁয়ে গেলে যদি চলতো, আমি যেতুম।

আমার সঙ্গে-সঙ্গে সমনজারি করতে পেয়াদা ছুটবে দেশের বাড়ীতে, আর বড়-তরফের ওরা হাসাহাসি করবে! সে-সব হবে না—তাছাড়া আমি আবার একটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি।

ভড়মশায় বলিলেন—আপনার জন্যে বৌ-ঠাকরুণ কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার কাছে আছে।

ভড়মশায় দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন যে, মনিব টাকার কথা শুনিয়া বিশেষ-কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না! নিস্পৃহ ভাবে বলিলেন—কত?

—আজ্ঞে, পঞ্চাশ টাকা।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ওতে কি হবে ভড়মশায়? আমায় হাজার-তিনেক টাকা কোনরকমে তুলে দিতে পারেন এখন? তাহলে কাজের খানিকটা অন্ততঃ মীমাংসা হয়।

—না বাবু, সে সম্ভব হবে না। ফেটি পাট কিনি ফি হাটে যাট-সত্তর…বড় জোর একশো টাকার। তাই গণেশ কুণ্ডুর আড়তে বিক্রি ক'রে কোনো হাটে পাঁচ, কোনো হাটে চার—এই লাভ। এতেই বৌ-ঠাকরুণকে সংসার চালাতে হচ্চে। তাঁরই পুঁজি—তিনি যে এই পঞ্চাশ টাকা দিয়েচেন—তাঁর সেই পুঁজি ভেঙে। আমায় বললেন,—বাবুর কষ্ট হচ্চে ভড়মশায়, আপনি গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসুন। অমন লক্ষ্মী মেয়ে…

গদাধর অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন—আচ্ছা, থাক্। আপনি ও টাকাটা দিয়েই যান আমায়। অন্ততঃ যে ক'দিন জেলের বাইরে থাকি, মেস খরচটা চলে যাবে।

জেলের কথা শুনিয়া ভড়মশায় রীতিমত ভয় পাইয়া গেলেন। মনিব জেলে যাইবার পথে উঠিয়াছেন—সে কেমন কথা? এ-কথা শুনিলে বৌ-ঠাকরুণ কি স্থির থাকিতে পারিবেন! এই মেসেই ছুটিয়া আসিবেন দেখা করিতে হয়তো। সুতরাং এ-কথা সেখানে গিয়া উত্থাপন না করাই ভালো। তিন হাজার টাকার যোগাড় করিতে না পারিলে যদি জেলে যাওয়ার মীমাংসা না হয়, তবে চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ, সে টাকা কোনোরকমেই এখন সংগ্রহ করা যাইতে পারে না।

পঞ্চাশটি টাকা গুনিয়া মনিবের হাতে দিয়া ভড়মশায় বিদায় লইলেন। দেশে পৌছিতে পরদিন সকাল হইয়া গেল। অনঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি, কি-রকম দেখলেন ভড়মশায়? দেখা হলো? ওঁর শরীর ভালো আছে? কবে বাড়ী ফিরবেন বললেন?

—বলচি বৌ-ঠাকরুণ—আগে আমায় একটু চা ক'রে যদি…

—হ্যাঁ, তা এক্ষুণি দিচ্চি। বলুন আগে—উনি কেমন আছেন? দেখা হয়েচে?

—সব হয়েছে। ভালো আছেন।

—আছেন কোথায়? টাকা দিয়েচেন?

—আছেন একটা কোন্ মেসের বাড়ীতে। দিব্যি আলাদা একটা ঘর! আমায় যেতেই খুব খাতির…বেশ চেহারা হয়েচে।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই অনঙ্গ খুশিতে গলিয়া গিয়া বলিল—আচ্ছা, বসুন, আমি এসে সব

শুনচি, আগে চা ক'রে আনি আপনার জন্যে।

ভড়মশায় ডাকিয়া বলিলেন—হ্যাঁ বৌমা…এই কিছু বিস্কুট আর লেবেঞ্চুস খোকাদের জন্যে…এটা রাখো।

কিছুক্ষণ পরে অনঙ্গ চা আনিয়া রাখিল, তার সঙ্গে একবাটি মুড়ি। সে হঠাৎ বন্য হরিণীর ন্যায় চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—হাতে-পায়ে বল ও মনে নতুন উৎসাহ পাইয়াছে। ভড়মশায় সব বুঝিলেন, বুঝিয়া একমনে চা ও মুড়ি চালাইতে লাগিলেন।

—হ্যাঁ, তারপর বলুন ভড়মশায়।

—হ্যাঁ, তারপর তো সেই মেসের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

—মেসের বাড়ীতে উঠলেন কেন? চেহারার কথা বলছিলেন—মানে, শরীরটা…

—সুন্দর চেহারা হয়েচে। কলকাতায় থাকা…তার ওপর আজকাল একটু অবস্থা ফিরতির দিকে যাচ্চে…আমায় বললেন—মানে একটু স্ফূর্তি দেখা দিয়েচে কিনা!

—টাকা দিয়ে এলেন তো?

ভড়মশায় লংক্লথের আধময়লা কোটের সুবৃহৎ ঝোলা-সদৃশ পকেট হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা—টাকা সব নিলেন না। পঞ্চাশটি নিয়ে বললেন, এখন আর দরকার নেই, বাড়ীতে তো টানাটানি যাচ্চে…তা—এই সেই বাকি টাকাটা একটা খামের মধ্যে—সামনের হাটে এতে…

কথাটা শুনিয়া অনঙ্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। স্বামী যখন টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন—তখন নিশ্চয়ই তাঁর অবস্থা ভালোর দিকে যাইতেছে। বাঁচা গেল, লোকে কত কি বলে, তাহা শুনিয়া তাহার যেন পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়া যায়। মা সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন এতদিন পরে।

সে একটু সলজ্জ-কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, আমাদের—আমার কথা-টথা কিছু—মানে, কেমন আছিটাছি…

ভড়মশায় তাহার মুখের কথা যেন লুফিয়া লইয়া বলিলেন—ঐ ছাখো, বুড়োমানুষ বলতে ভুলে গিয়েচি। সে কত কথা…অনেকক্ষণ ধ'রে বললেন তোমাদের কথা বৌ-ঠাকরুণ। তোমার সম্বন্ধেও…

—ও! কি বললেন? এই কেমন আছি, মানে…

নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠে ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সুর আসিয়া গেল।

ভড়মশায় মৃদু-মৃদু হাসিমুখে বলিলেন—এই সব বললেন—একা ওখানে থেকে মনে শান্তি নেই তাঁর। অথচ এ-সময়টা দেশে আসতে গেলে, কাজের ক্ষতি হয়ে যায় কিনা! তোমার কথা কত-ক্ষণ ধ'রে বললেন। আসবার সময় ঐ বিস্কুট লেবেঞ্চুস তো তিনিই কিনে দিলেন!

—আপনাকে শেয়াল-দ' ইস্টিশানে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন বুঝি?

—হ্যাঁ, তাই তো। উঠিয়েই তো দিয়ে গেলেন—সেখানেও তোমার কথা…

অনঙ্গ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল গোপন করিল।

ভড়মশায় চলিয়া আসিলেন। এভাবে বেশীক্ষণ চালানো সম্ভব নয়, হয়তো-বা কোথায় ধরা পড়িয়া যাইবেন। বৌ-ঠাকরুণের বুদ্ধির উপর তাঁর শ্রদ্ধা আছে। তবে স্বামীর ব্যাপার লইয়া কথাবার্ত্তা উঠিলে বৌ-ঠাকরুণ সহজেই ভুলিয়া যান—এই রক্ষা।

ভড়মশায় কি সাধে মনিবকে বাকি পঞ্চাশটি টাকা দেন নাই?

বৌ-ঠাকরুণ বা ছেলেদের কথা তো একবারও লোকে জিজ্ঞাসা করে—এতদিন পরে যখন? অমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী, ছেলেরা বাড়ীতে—তাহাদের সম্বন্ধে একটা কথা নয়? সেখানে ভড়মশায় দিতে যাইবেন—টাকা? তা তিনি কখনো দিবেন না।

শরৎকাল চলিয়া গেল। আবার হেমন্ত আসিল।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনঙ্গ প্রতিদিনই আশা করিয়াছে—স্বামী হঠাৎ আজ হয়তো আসিয়া পড়িবেন। কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হয় নাই!

ভড়মশায় আসিয়া বলেন—বৌ-ঠাকরুণ, টাকা দিতে হবে।

—কত?

—ছত্রিশ টাকা দাও আজ, পাট আর আসচে না হাটে। ওতেই কাজ চলে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা লাভের দু'তিন টাকা-সুদ্ধ টাকাটা আবার ফিরাইয়া দিয়া যান। একদিন শশী বাগদিনী অনঙ্গকে পরামর্শ দিল—হলুদের গুঁড়ার ব্যবসা করিতে। উহাতে খুব লাভ, আস্ত হলুদ বাজার হইতে কিনিয়া বাগদি-পাড়ায় দিলে, তাহাদের ঢেঁকিতে তাহারাই কুটিয়া দিবে—মজুরী বাদেও যাহা থাকে, তাহা অনঙ্গ হিসাব করিয়া দেখিল নিতান্ত মন্দ নয়। আজকাল সে ব্যবসায় বুঝিতে পারে, ব্যবসা বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে।

ভড়মশায়কে কথাটা বলিতে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

—হুঁ:—ফু:! গুঁড়ো হলদির আবার ব্যবসা?

অনঙ্গ বলিল—না ভড়মশায়, আমি হিসেব ক'রে দেখেচি—আপনি আমায় হলুদ কিনে দিন দিকি, আমি বাগদি-পাড়া থেকে কুটিয়ে আনি···

দু'তিনবার হলুদের গুঁড়ো কেনাবেচা করিয়া দেখা গেল, পাটের খুচরো কেনাবেচার চেয়েও ইহাতে লাভের অঙ্ক বেশি।

আর একটা সুবিধা, এ-ব্যবসা বারোমাস চলিবে। বৌ-ঠাকরুণের বুদ্ধির উপর ভড়মশায়ের শ্রদ্ধা জন্মাইল। টাকা বসিয়া থাকে না, অনঙ্গ নানা বুদ্ধি করিয়া এটা-ওটার ব্যবসায়ে খাটাইয়া যতই সামান্য হউক, তবুও কিছু কিছু আয় করে।

কিন্তু বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছে।

অনঙ্গ একদিন জ্বরে পড়িল। জ্বর লইয়াই গৃহকর্ম্ম করিয়া রাত্রের দিকে জ্বর বেশ বাড়িল। আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল বিছানায়—উঠিবার শক্তি নাই। অতবড় বাড়ী, কেহ কোথাও নাই—কেবল এই ঘরখানিতে সে আর তাহার দুটি ছেলে-মেয়ে।

বড় খোকা আট বছরে পড়িয়াছে। সে বলিল—মা, আমাদের এবেলা ভাত দেবে কে?

অনঙ্গ জরের ঘোরে অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সে প্রথমটা কোনো উত্তর দিল না। পরে বিরক্ত হইয়া ছেলেকে বকিয়া উঠিল। খোকা কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ আরও বকিয়া বলিল—কানের কাছে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করিস্ নে বলচি খোকা—খাবি কি তা আমি কি বলবো? আপদগুলো মরেও না যে আমার হাড় জুড়োয়! তোদের মানুষ করচে কে, জিগ্যেস্ করি? কে ঝক্কি পোয়ায়? যা, বাসিভাত হাঁড়িতে আছে, বেড়ে নে।

পরদিন ভড়মশায় আসিয়া দেখিলেন, ছেলে দুটি রান্নাঘরের সামনে ভাতের হাঁড়ি বাহির করিয়া একটা থালায় তাহা হইতে একরাশ পান্তা ভাত ঢালিয়া এঁটো হাতে সমস্ত মাখামাখি করিয়া ভাত খাইতেছে। অনঙ্গ আবার একটু শুচিবাইগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে আজকাল—তাহার বাড়ীতে এ কি কাণ্ড! ছেলে দুটো এঁটো-হাতে রান্নার হাঁড়ি লইয়া ভাত তুলিয়া খাইতেছে কি-রকম?

আশ্চর্য্য হইয়া ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি খোকা? ও কি হচ্চে? মা কোথায়?

খোকা ভড়মশায়কে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাতের দলা তুলিতে গিয়া হাত গুটাইয়াছিল। মুখের দু'পাশের ভাত ক্ষিপ্রহস্তে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—মা'র জর। আমরা কাল রাত্রে কিছু খাই নি, তাই পলুকে ভাত বেড়ে দিচ্চি। মা কাল বলেছিল, হাঁড়ি থেকে নিয়ে খেতে।

সে এমন ভাব দেখাইল যে, শুধু ছোট ভায়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাহার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। তাহার খাওয়ার উপর বিশেষ কোনো স্পৃহা নাই।

—বলো কি খোকা! জর তোমার মা'র? কোথায় তিনি?

খোকা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—বিছানায় শুয়ে। কথা বলচে না কিচ্ছু—এত ক'রে বললাম, আমি নুন পাড়তে পারি নে, পলুকে কি দেবো, তা মা···

ভড়মশায় ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া উঁকি মারিলেন। অনঙ্গ জরের ঘোরে অভিভূত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার কোনো সাড়া-সংজ্ঞা নাই—লেপখানা গা হইতে খুলিয়া একদিকে বিছানার বাহিরে অর্দ্ধেক ঝুলিতেছে!

ভড়মশায় ডাকিলেন—ও বৌ-ঠাকরুণ! বৌ-ঠাকরুণ!

অনঙ্গ কোনো সাড়া দিল না।

—কি সর্ব্বনাশ! এমন কাণ্ড হয়েচে তা কি জানি? ও বৌ-ঠাকরুণ!

দু'তিনবার ডাকাডাকি করার পরে অনঙ্গ জরের ঘোরে—'অ্যাঁ—করিয়া সাড়া দিল। সে সাড়ার কোনো অর্থ নাই। তাহা অচেতন মনের বহুদিনব্যাপী অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাহার পিছনে বুদ্ধি নাই···চৈতন্ত নাই।

ভড়মশায় ছুটিয়া গিয়া গিরীশ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া বলিল—কোনো চিন্তা নাই, সাধারণ ম্যালেরিয়া জর, তবে একটু সাবধানে রাখা দরকার। ভড়মশায়ের নিজের স্ত্রী বহুদিন পরলোকগত—এক বিধবা ভাইঝি থাকে বাড়ীতে, তাহাকে

আনাইয়া সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন—প্রতিবেশীরা বিশেষ কেহ উঁকি মারিল না।

চৌদ্দ-পনেরো দিন পরে অনঙ্গ সারিয়া উঠিয়া রোগ-জীর্ণ-মুখে পথ্য করিল। কিন্তু তখন সে অত্যন্ত দুর্ব্বল—উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই।

ভড়মশায় এতদিন জিজ্ঞসা করিবার অবকাশ পান নাই, আজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌ-ঠাকরুণ, টাকা কোথায়?

—টাকা সিন্দুকে আছে।

—চাবিটা দাও, দেখি।

এদিক-ওদিক খুঁজিয়া চাবি পাওয়া গেল না। বালিশের তলায় তো থাকিত, কোথায় আর যাইবে, এখানে কোথাও আছে। সব জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, ছেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, অবশেষে কামার ডাকাইয়া তালা ভাঙিয়া দেখা গেল, সিন্দুকে কিছুই নাই। টাকা তো নাই-ই, উপরন্তু অনঙ্গর হাতের দু'গাছা সোনা-বাঁধানো হাতীর দাঁতের চুড়ি ছিল, তাহাও উবিয়া গিয়াছে। আর গিয়াছে গদাধরের পিতামহের আমলের সোনার তৈরী ক্ষুদ্র একটি শীতলা-মূর্ত্তি। ক্ষুদ্র হইলেও প্রায় ছ'সাত ভরি ওজনের সোনা ছিল মূর্ত্তিটাতে।

বহুকষ্টে অর্জ্জিত অর্থের সঙ্গে শীতলা-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধানে, নানা অমঙ্গল-আশঙ্কায় অনঙ্গ মাথা ঠুকিতে লাগিল।

ভড়মশায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আজ এক বৎসরের বহু কষ্টে সঞ্চয়-করা যৎসামান্য পুঁজি যাহা ছিল, কোনোরকমে তাহাতে হাত-ফেরতা খুচরা ব্যবসা চালাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল।

অবলম্বনহীন, সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় এখন ইহাদের কি উপায় দাঁড়াইবে?

ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বাড়ীতে কে-কে আসতো?

অনঙ্গ বিশেষ কিছু জানে না! তাহার মনে নাই। জ্বরের ঘোরে সে রোগের প্রথমদিকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত—কে আসিয়াছে, গিয়াছে, তাহার খেয়াল ছিল না। প্রতিবেশিনীরা মাঝে-মাঝে তাহাকে দেখিতে আসিত—শচীনের মা একদিন না দুদিন আসিয়াছিলেন, স্বর্ণ গোয়ালিনী একদিন আসিয়াছিল মনে আছে—আর আসিয়াছিলেন, মুখুয্যে-গিন্নী। তবে ইহাদের বেশির ভাগই অশুচি হইবার ভয়ে রোগীর ঘরের মধ্যে ঢোকেন নাই, দোরে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া, ডিঙাইয়া-ডিঙাইয়া উঠান পার হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার একটি ন্যায্য কারণ যে না ছিল তাহা নয়। বাড়ীর ছেলে দুটি মায়ের শাসনদৃষ্টি শিথিল হওয়ায় মনের আনন্দে যেখানে-সেখানে ভাত ছড়াইয়াছে, এঁটো থালাবাসন রাখিয়াছে, যাহা খুশি তাহাই করিয়াছে—সেখানে কোনো জাতিজন্মবিশিষ্ট হিন্দুর ঘরের মেয়ে কি করিয়া নির্ব্বিকারমনে বিচরণ করিতে পারে, ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। শুধু লোকের নিন্দা করিয়া লাভ নাই।

চুরির কোনো হদিস্ মিলিল না। উপরন্তু অনঙ্গ বলিল—ভড়মশায়, আমার যা গিয়েছে,

গিয়েচে—আপনি আর কাউকে বলবেন না চুরির কথা। শত্রু হাসবে, সে বড় খারাপ হবে। উনি শত্রু হাসাবার ভয়ে আজ পর্য্যন্ত গাঁয়ে ফিরলেন না—আর আমি সামান্য টাকার জন্যে শত্রু হাসাবো? তিনি এত ক্ষতি সহ্য করতে পারলেন—আর আমি এইটুকু পারবো না, ভড়মশায়?

সুতরাং ব্যাপার মিটিয়া গেল।

ভড়মশায় কলিকাতায় মেসের ঠিকানায় দু'তিনখানা চিঠি দিয়া কোনো উত্তর পাইলেন না। অবশেষে সব কথা খুলিয়া লিখিয়া একখানি রেজেষ্ট্রি চিঠি দিলেন—চিঠি ফেরত আসিল, তাহার উপর কৈফিয়ৎ লেখা—'মালিক এ ঠিকানায় নাই'।

অনঙ্গর হাতে দু'গাছা সোনা-বাঁধানো শাঁখা ছিল। খুলিয়া তাহাই সে বিক্রয় করিতে দিল। সেই যৎসামান্য পুঁজিতে হলুদের গুঁড়ার ব্যবসা করিয়া কোনো হাটে বারো আনা, কোনো হাটে-বা কিছু বেশি আসিতে লাগিল। অকূল সমুদ্রে সামান্য একটা ভেলা হয়তো—কিন্তু জাহাজ যেখানে মিলিতেছে না, সেখানে ভেলার মূল্যই কি কিছু কম?

অনঙ্গ এখনও পায়ে বল পায় নাই। কোনক্রমে রান্নাঘরে বসিয়া দুটি রান্না করে, ছেলে দুটিকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া রোয়াকের একপ্রান্তে মাদুর পাতিয়া রৌদ্রে শুইয়া থাকে, কোনদিন বা একটু ঘুমায়। দুবেলা রান্না হয় না, হাঁড়িতে ওবেলার জন্য ভাত-তরকারি থাকে, সন্ধ্যার পরে ছেলে-মেয়েরা খায়।

একটু চুপ করিয়া শুইয়া দেখে, ধীরে-ধীরে উঠানের আতাগাছটা লম্বা ছায়া ফেলিতেছে দোরের কাছে, পাঁচিলের গাছে আমরুল শাকের জঙ্গলে একটি প্রজাপতি ঘুরিতেছে, খোকার বাজনার টিনটা কুয়াতলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, পাশের জমিতে শচীনের সেওড়াতলী আম-গাছটার মগ্‌ডালের দিকে রোদ উঠিতেছে ক্রমশঃ, নাইবার চাতালে গত-বর্ষায় বন-বিছুটির গাছ গজাইয়াছে—অনেকদিন আগে গদাধর কুয়াতলায় বসিয়া স্নানের জন্য শখ করিয়া একটি জলচৌকি গড়াইয়াছিলেন—সেখানা একখানা পায়া ভাঙা অবস্থায় কাঠ রাখিবার চালাঘরের সামনে চিত হইয়া পড়িয়া আছে! তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

বড় খোকাকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁরে, ও চৌকিখানা ওখানে অমন ক'রে ফেলেছে কে রে?

খোকা এদিকে-ওদিকে চাহিতে-চাহিতে জলচৌকিখানা দেখিতে পাইল। বলিল—আমি জানিনে তো মা? আমি ফেলিনি।

—যেই ফেলুক, তুই নিয়ে এসে দালানের কোণে রেখে দে। কেউ না ওতে হাত দেয়।

তারপর সে আবার দুর্ব্বলভাবে বালিশে ঢলিয়া পড়ে। মনেও বল নাই, হাত-পায়েও জোর নাই যেন। তাহার ভালো লাগে না, একা-একা এ বাড়ীতে যে থাকিতে পারে না। জীবন যেন তার বোঝা হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া এই শীতের সন্ধ্যাবেলা মনের মধ্যে কেমন হু হু করে! সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ! কেহ নাই যে, একটি কথা বলিয়া আদর করে, মুখের দিকে চায়! কত কথা মনে পড়ে—এমনি কত শীতের ঠাণ্ডা-রোদ সেওড়াতলী আমগাছটার

মগ্‌ডালে উঠিয়া গিয়াছে আজ চৌদ্দ বছর ধরিয়া, চৌদ্দ বছর আগে এমনি এক শীতের মধ্যাহ্নে সে নববধূরূপে এ-গৃহে প্রথম প্রবেশ করে। ওই অতি পরিচিত ঠাণ্ডা রোদ-মাখানো আম-গাছটার দিকে চাহিলে কত ভালো দিনের কথা মনে পড়ে, কত আনন্দ-ভরা শীতের সন্ধ্যার স্মৃতিতে হৃদয় ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া ওঠে।

চিরকাল কি এমনি কাটিবে?

মা মঙ্গলচণ্ডী কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না?

ভড়মশায় হাটের টাকা লইয়া দরজার কাছে আসিয়া সাড়া দেন—বৌ-ঠাকরুণ আছো? বৌ-ঠাকরুণ?

—হ্যাঁ, আসুন। নেই তো আর যাচ্চি কোথায়?

—এগুলো গুণে নিও।

অনঙ্গ গুনিয়া বলিল—সাড়ে তের আনা? আজ যে বেশি?

—হল্‌দির দর চড়ে গিয়েচে বাজারে। সামনের হাটে আরও হবে—আর কিছু বেশি টাকা হাতে আসতো এ-সময় তো একটা থোক লাভ করা যেতো হলুদ থেকে।

—আচ্ছা ভড়মশায়?

অনঙ্গর গলায় সুরের পরিবর্ত্তনে ভড়মশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি? কি হলো?

—আচ্ছা, একবার আপনি কলকাতায় যাবেন?

—কলকাতায়? তা···

—তা নয় ভড়মশায়। অনেকদিন কোনো খবর পাইনি, আমার মনটা···আপনি একবার বরং···

স্বামীর কথা বলিতে গেলেই কোথা হইতে কান্না আসিয়া কেন যে গলার স্বর আট্‌কাইয়া লোকের সামনে লজ্জায় ফেলে এমন ধারা!

ভড়মশায় চিন্তিত মুখে বলেন—তা—তা—গেলেও হয়।

—তাই কেন যান না আজই। একবার দেখে আসুন। আজ কত-দিন হলো, কোনো খবর পাইনি—শরীর-গতিক কেমন আছে, কি-রকম কি করচেন, আপনি নিজের চোখে দেখে এলে ··

ভড়মশায় কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন। যাইতে অবশ্য এমন কি আপত্তি, তা নয়। তবে পয়সা খরচের ব্যাপার। এই নিতান্ত টানাটানির সংসারে এমনি পাঁচটা টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে যাতায়াতে। বৌ-ঠাকরুণ সে টাকা পাইবেনই-বা কোথায়?

মুখে বলিলেন—আচ্ছা, দেখি।

—তাহ'লে কোন্ গাড়িতে যাবেন আপনি?

—আজ কাল তো হয় না। হাটবার আসচে সামনে।

—হাটবার লেগেই থাকবে। আমি এক-রকম ক'রে চালিয়ে নেবো এখন, আপনি যান

—আমার কাছে তিনটে টাকা আছে, তুলে রেখে দিইচি, তাই নিয়ে যান।

সপ্তাহের শেষে অনঙ্গ আবার জ্বরে পড়িল। তবে এবার জ্বরটা খুব বেশি নয়, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, এসময় পাড়াগাঁয়ের ঘরে-ঘরেই এমন জ্বর লাগিয়া আছে, তাহাতে ডাক্তারও আসে না, বিশেষ কোন ঔষধও পড়ে না। তবুও ভড়মশায় ডাক্তার ডাকানোর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অনঙ্গ কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিল—হ্যাঁ, আবার ডাক্তার কি হবে? বরং ডাকঘরের কুইনিন এক প্যাকেট কিনে দিন, তাই খেয়েই যাবে এখন—ভারি তো জ্বর!

সে জ্বরে তিন-চারদিন ভুগিয়া তখনকার মত গেল বটে, কিন্তু দুঁদিন অন্ন পথ্য করিতে না করিতে আবার জ্বর দেখা দিল। একেই সে ভালো ভাবে সারিয়া উঠিতে পারে নাই প্রথম অসুখের পর, এভাবে বার-বার ম্যালেরিয়ায় পড়াতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িল, রক্তহীনতার দরুন মুখ হলদে ফ্যাকাসে-রংএর হইয়া আসিল, শরীর রোগা, মাথার সামনের চুল উঠিয়া সিঁথির কাছটা কুশ্রী ধরণের চওড়া হইয়া গেল, ভাতে রুচি নাই, একবার পাতের সামনে বসে মাত্র, মুখে কিছু ভালো লাগে না।

সংসারে বেজায় টানাটানি চলিতেছিল, শীত পড়ার মুখে হলুদের দর একটু চড়াতে, হাটে-হাটে আগের চেয়ে আয় কিছু বাড়িল। অনঙ্গ আজকাল ব্যবসা বেশ বোঝে, সে নিজে অসুখ শরীরে শুইয়া-শুইয়া একদিন মুখুজ্যে-বাড়ী হইতে শুকনো পিপুল কিনিয়া আনাইল এবং সেগুলি হাটে পাঠাইয়া পাঁচ-ছ টাকা লাভ করিল।

একদিন সে আবার ভড়মশায়কে ধরিল কলিকাতা যাইবার জন্য।

ভড়মশায় বলিলেন—বেশ!

—বড় দেরি হয়ে যাচ্চে যাই-যাই ক'রে, কাজ তো আছেই, আপনি কালই যান। টাকা সকালে নেবেন, না এখন নেবেন?

—এখন পাঁচ জায়গায় ঘুরবো নিজের কাজে, কোথায় হারিয়ে যাবে। কাল সকালে বরং…

উৎসাহে অনঙ্গ মাদুর ছাড়িয়া ঠেলিয়া উঠিল বিকালে। পরদিন সকালে ভড়মশায় টাকা নিতে আসিলে, অনঙ্গ তাঁহার হাতে একটি বেশ ভারি-গোছের পোঁটলা দিয়া বলিল—এটা ওঁকে দেবেন।

কাল সারাদিন ধরিয়া গুছাইয়াছে সে, ভড়মশায় দেখিলেন, তাহার মধ্যে হেন জিনিস নাই যা নাই। গোটাকতক কাঁচা পেঁপে, এমন কি একটা মানকচু পর্যন্ত। তা ছাড়া গাছের বরবটি, আমসত্ব, পুরানো তেঁতুল, পোস্তদানার বড়ি…

ভড়মশায় মনে-মনে হাসিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

অনঙ্গ আঁচল হইতে খুলিয়া আরও তিনটে টাকা বাহির করিয়া বলিল—ভাড়া বাদে একটা টাকা নিয়ে যান, যাবার সময় হরি ময়রার দোকান থেকে নতুন গুড়ের সন্দেশ সের-দুই নিয়ে যাবেন।

ভড়মশায় দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া বলিলেন—চিঠি-টিটি কিছু দেবে না?

—না, চিঠি আর দিতে হবে না, মুখেই বলবেন। একবার অশিগ্গির ক'রে যেন আসেন এরই মধ্যে, বলবেন।

ভড়মশায় দরজার বাইরে পা ভালো করিয়া বাড়ান নাই, এমন সময় অনঙ্গ পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল—শুনুন, বাড়ী আসবার কথা বলবেন। বুঝলেন তো?

—আচ্ছা, বৌ-ঠাকরুণ, নিশ্চয় বলবো।

—এরই মধ্যে যেন আসেন—বুঝলেন?

ভড়মশায় ঘাড় হেলাইয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন যে, তিনি বেশ ভালোই বুঝিয়াছেন। কোনো ভুল হইবে না তাঁহার।

—আর যদি সঙ্গে ক'রে আনতে পারেন···

—বেশ বৌ-ঠাকরুণ! সে চেষ্টাও করবো।

দশ

ভড়মশায় দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ভড়মশায় মনিবের পুরানো মেসে গেলেন। সংবাদ লইয়া জানিলেন, বহুদিন হইতেই গদাধরবাবু সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মেসের ম্যানেজার কোনো ঠিকানা বা সন্ধান দিতে পারিল না। তাহা হইলে কি জেলই হইল? তাহাই সম্ভব।

কিন্তু সে-কথা তো আর যাকে-তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না?

ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি শচীনের বাসায় গেলেন। শচীনেরও দেখা পাইলেন না। এখন একমাত্র স্থান আছে, যেখানে মনিবের সন্ধান হয়তো মিলতেও পারে—সেটি হইল শোভা-রাণীর বাড়ী। কিন্তু সেখানে যাইতে ভড়মশায়ের কেমন বাধো-বাধো ঠেকিতে লাগিল। অনেকদিন সেখানে যান নাই, হয়তো তাহারা তাঁহাকে চিনিতেই পারিবে না, হয়তো বাড়ীতে ঢুকিতেই দিবে না। তাছাড়া সেখানে যাইতে প্রবৃত্তিও হয় না তাঁহার। তবুও যাইতে হইল। গরজ বড় বালাই!

দরজায় কড়া নাড়িতেই যে চাকরটি দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইল, ভড়মশায় তাহাকে চিনিলেন না। চাকর বলিল—কাকে দরকার?

—মাইজী আছেন?

—হ্যাঁ, আছেন।

—একবার দেখা করবো, বলো গিয়ে।

চাকর কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—এখন দেখা হবে না।

ভড়মশায় অনুনয়ের স্বরে বলিলেন—বড্ড দরকার। একবার বলো গিয়ে।

—কি দরকার? এখন কোনো দরকার হবে না। ওবেলা এসো।

—আচ্ছা, গদাধরবাবুর কোনো সন্ধান দিতে পারো? আমি তাঁর দেশের লোক, যশোর জেলার কাঁইপুর গ্রামে বাড়ী, থানা রামনগর…

চাকর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দাঁড়াও, আমি আসচি।

দুরুদুরু বক্ষে ভড়মশায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি না-জানি বলে! চাকরটা নিশ্চয় মনিবকে চেনে, অন্ততঃ নামও শুনিয়াছে।

এবার আবার দরজা খুলিল। চাকর মুখ বাড়াইয়া বলিল—আপনার নাম কি? মাইজী বললেন, জেনে এসো।

—আমার নাম, মাখনলাল ভড়। আমি বাবুর সেরেস্তার মুহুরী। বলো গিয়ে, যাও।

কিছুক্ষণ পরে চাকর পুনরায় আসিয়া ভড়মশায়কে উপরে লইয়া গেল।

ভড়মশায় উপরে গিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এ সে মেয়েটি নয়—সেবার যাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ইহার বয়স বেশি, গায়ের রং তত ফরসা নয়।

মেয়েটি বলিল—আপনি কাকে চান?

ভড়মশায় অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্মুখে কথা বলিতে অভ্যস্ত নন, কেমন একটা আড়ষ্টতা ও অস্বস্তি বোধ করেন এসব ক্ষেত্রে। বিনীতভাবে সসঙ্কোচে বলিলেন—আজ্ঞে, গদাধর বসু, নিবাস যশোর জেলায়।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—বুঝেচি, তা এখানে খোঁজ করচেন কেন?

—এখানে আগে যিনি থাকতেন, তিনি এখন নেই?

—কে? শোভা মিত্তির?

—আজ্ঞে হাঁ। ওই নাম।

—সে এখান থেকে উঠে গিয়েচে। তাকে কি দরকার?

—তাঁর সঙ্গে আমাদের বাবুর জানাশোনা ছিল, একবার তাই এসেছিলাম।

—গদাধর বসু। ন্যাশনাল সিনেমা কোম্পানীর জি, বসু তো?

—আজ্ঞে হাঁ, উনিই আমার বাবু। কিন্তু…

মেয়েটি বলিল—তা আপনি বলচেন গদাধরবাবুর মুহুরী দেশের—কিন্তু আপনি তাঁর কলকতার ঠিকানা জানেন না কেন?

ভড়মশায় পাকা লোক। ইহার কাছে ঘরের কথা বলিয়া মিছামিছি মনিবকে ছোট করিতে যাইবেন কেন? সুতরাং বলিলেন—আজ্ঞে, তাঁর সেরেস্তায় চাকরি নেই আজ বছরাবধি। তাঁকে একটু বলতে এসেছিলাম, যদি চাকরিটা আবার হয়, গরীব মানুষ, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বড় বিপদে পড়েচি, তাই।

—আপনি টালিগঞ্জে গিয়ে স্টুডিওতে দেখা করুন, ঠিকানা কাগজে লিখে দিচ্চি—বাড়ীতে এখন তাঁর দেখা পাবেন না।

ভড়মশায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, আনন্দে হাতে-পায়ে যেন বল পাইলেন। বাঁচা গেল, মনিবের তাহা হইলে জেল হয় নাই! সেই ছবি-তোলার কাজেই লাগিয়া আছেন, বোধহয় চাকরী লইয়া থাকিবেন।

মেয়েটি একটুকরা কাগজে ঠিকানা লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—ট্রাম থেকে নেমে বাঁ-দিকের রাস্তা ধ'রে খানিকটা গেলেই পাবেন। দেখবেন, লেখা আছে ন্যাশনাল ফিল্ম্ কোম্পানীর নাম, গেটের মাথায় আর দেয়ালের গায়ে।

রাস্তায় পড়িয়া পথ হাঁটিতে-হাঁটিতে কিন্তু ভড়মশায়ের মনে আনন্দের ভাবটা আর রহিল না। মনিব জেলে যান নাই—আবার সেই ছবি-তোলার কাজই করিতেছেন, অথচ এই এক বৎসরের মধ্যে একবার স্ত্রীপুত্রের খোঁজ-খবর করেন নাই, এ কেমন কথা? এস্থলে আনন্দ করিবার মত কিছু নাই, বরং ইহার মূলে কি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া যাওয়াটা দরকার। ভড়মশায়ের মন বেশ দমিয়া গেল।

দমিয়া গেলেও, সেই মন লইয়াই অগত্যা পথ চলিতে-চলিতে একসময় তিনি ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। ট্রাম যথাসময়ে টালিগঞ্জ-ডিপোয় আসিয়া পৌঁছিল। অন্যান্য সহযাত্রীরা একে-একে নামিয়া যাইতেছে দেখিয়া ভড়মশায়ের হুঁশ হইল, তাঁহাকেও এবার নামিতে হইবে। ভড়মশায় ট্রাম হইতে রাস্তায় নামিয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিলেন।

মেয়েটির নির্দ্দেশমত বাঁ-দিকের পথ ধরিয়া হাঁটিবার সময় দেখিলেন, ভিন্ন-ভিন্ন ছোট-ছোট দল যে সব কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিয়াছে ঐ পথে, তাহাদের মৃদুগুঞ্জনে বেশ বুঝা যাইতেছে যে তাহারা সকলেই এখন ভড়মশায়ের লক্ষ্য-পথের পথিক। যে কোনো কাজের জন্যই যাক্ না কেন, তাহারাও চলিয়াছে ঐ স্টুডিওর উদ্দেশে।

কিছু পথ যাইতেই চোখে পড়িল, সামনে অনেকখানি জায়গা করোগেট টিন দিয়া ঘেরা মস্ত বাগান, আর সেই বাগানের কাছে পৌঁছিয়াই তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, তাঁহার ঈপ্সিত স্থানে আসিয়া গিয়াছেন। ঐ বাগানের ফটক। ফটকের দুইদিকে থামের মাথায় অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে লোহার ফ্রেমে সোনালী অক্ষরে জলজ্বল করিতেছে—'ন্যাশনাল ফিল্ম্ স্টুডিও'।

মা-কালীকে স্মরণ করিয়া গেটের মধ্যে সবে পা দিয়াছেন, এমন সময় পিছন হইতে কোমরে আঁকশি দিয়া কে যেন টানিয়া ধরিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, ইয়া গালপাট্টা-ওয়ালা পশ্চিমা-পহলবানের মত এক দীর্ঘবপু দরওয়ানজী হাঁকিয়া বলিতেছে,—কাঁহা যাতা?

ভড়মশায় বলিলেন—হাঁহা আমার বাবু আছেন।

দরওয়ানজী হাঁকিল—গেট-পাশ হ্যায়?

—হাঁ হ্যায়। আমার বাবুর কাছ থেকে এখুনি নিয়ে আ তা হ্যায়, এনে তোমায় দিয়ে দেবো।

—পহেলা ল্যাও, লে-আয়কে অন্দরমে ঘুসো।

—বেশ, এখুনি এনে দিচ্ছি, তোমারা কোনো চিন্তা নেই হ্যায়।

কথাটা বলিয়া ভড়মশায় অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই আবার পশ্চাৎদিক হইতে শব্দের আকর্ষণ···কেঁউ, বাত মানেগা নেহি ? মত যাও···লৌট্‌কে আও···

অগত্যা ভড়মশায়কে ফিরিতে হইল। এই বয়সে শেষে কি একজন খোট্টার কাছে অপমানিত হইবেন ?

ওই দেখা যায় একটা সুপারি গাছ···তার পাশেই মস্ত বড় পুকুর। পুকুরের ওপারে টিনের ছাদ-আঁটা মস্ত একটা গুদামের মতো। সেখানে কত লোক চলিতেছে ফিরিতেছে··· সকলেই যেন খুব ব্যস্ত। ভড়মশায় ভিতরে ঢুকিতে না পাইয়া নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চিত বুঝিলেন যে, ঐখানেই ছবি তোলার কাজ হইতেছে। তার-পর দ্বারবানের নিকটে আসিয়া সে কি আকুতি! দ্বারবান ভিতরে যাইতে দিবে না; ভড়মশায়কেও যাইতেই হইবে। মিনতি যখন কলহে পরিণত হইবার উপক্রম, এমন সময় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভড়মশায়কে দেখিয়া লোকটি বলিল—কাকে চান? ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

—আজ্ঞে, আমি গদাধর বসুমহাশয়কে খুঁজচি—নিবাস কাঁইপুর, জেলা···

—বুঝেচি! আপনি ওখানে যাবেন না। ওখানে সেট্ সাজানো হচ্চে—ওখানে যেতে দেবে না আপনাকে। মিঃ বোসের আসবার সময় হয়েচে—এখানে আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন, মোটর এসে এখানে থামবে।

—আজ্ঞে, আপনার নাম ?

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বলিলেন—কোনো দরকার আছে ? শান্তশীল রায়কে খুঁজে নেবেন এর পরে—আমার সময় নেই, যাই, আমাকে এখুনি সেটে যেতে হবে।

ভড়মশায় সেখানে বোধহয় পাঁচ মিনিটও দাঁড়ান নাই, এমন সময়—একখানা মাঝারি গোছের লালরঙের মোটর আসিয়া তাঁহার সামনে লাল কাঁকরের রাস্তার উপর দাঁড়াইল।

ভড়মশায় তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলেন, কিন্তু দেখিলেন, মোটর হইতে নামিল দুটি মেয়ে, হাতে তাদের ছোট ছোট ব্যাগ—তাহারা নামিয়াই দ্রুতপদে পুকুরের পাড়ে চলিয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে আর-একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। এবার ভড়মশায়ের বিস্মিত ও বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে নামিলেন, গদাধর ও তাঁহার সঙ্গে একটি সুবেশা মহিলা। ভড়মশায় চিনিলেন, মেয়েটি সেই শোভারাণী মিত্র। ড্রাইভারের পাশের আসন হইতে তকমা-পরা এক ভৃত্য নামিয়া তাঁহাদের জন্য গাড়ীর দোর খুলিয়া সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে এবার একটা ব্যাগ হাতে তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

ভড়মশায় আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—বাবু, বাবু···

কিন্তু পিছনের ভৃত্যটি একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র, গদাধর ও মহিলাটি ততক্ষণে দ্রুতপদে পুকুরের পাড়ের রাস্তা ধরিয়াছে, বোধ হয় ভড়মশায়ের ডাক তাঁহাদের কানে পৌঁছিল না।

ভড়মশায় কি করিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময় পূর্ব্বের সেই তরুণ বয়স্ক ভদ্রলোকটিকে এদিকে আসিতে দেখিতে পাইলেন।

ভড়মহাশয়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কাছে আসিয়া বলিলেন—কি, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে? দেখা হয়নি? এই তো গেলেন উনি।

ভড়মশায় নিরীহমুখে বলিলেন—আজ্ঞে, দেখা হয়েচে। ওই মেয়েটি কে বাবু?

ভদ্রলোক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ভড়মশায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—চেনেন না ওঁকে? উনিই শোভারাণী—মস্ত বড় ফিল্‌ম্‌স্টার—ওই। মিঃ বোসের কপাল খুব ভালো। দু'খানা ছবি মার খেয়ে যাবার পরে—আশ্চর্য্য মশাই, শোভারাণী নিজে এসে যোগ দিয়েচে—চমৎকার ছবি হচ্চে—ডিষ্ট্রিবিউটারেরা খরচের সব টাকা দিয়েচে। শোভারাণীর নামের গুণ মশাই—মিঃ বোস এবার বেশ-কিছু হাতে করেছেন, শোভারাণীর সঙ্গে—ইয়ে—খুব মাখামাখি কিনা? এক সঙ্গেই আছেন দু'জনে। আপনি কাজ খুঁজছেন বোধ হয়? তা, ধরুন না গিয়ে ম্যানেজারকে—আমি মশাই, বড় ব্যস্ত। গাড়ী নিয়ে যাচ্ছি একটা জিনিস আনতে, শোভারাণীর বাড়ীতেই···ভুলে ফেলে এসেচেন—নমস্কার!

ভড়মশায় হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কেদার রাজা

এক

দুপুর বেলায় নীলমণি চাটুজ্জে বাড়ি ফেরবার পথে গ্রামের মুদির দোকানে জিজ্ঞেস করলেন, হঁ্যা গো ছিবাস, কেদার রাজাকে দেখেছিলে আজ সারাদিন ?

ছিবাস আলকাতরার পিপে থেকে আলকাতরা বার করতে করতে জিজ্ঞেস করলে, কেন চাটুজ্জে মশায়, তেনার খবরে কি দরকার ?

নীলমণি বললেন, আরে, খাজনার অংশ নিয়ে গোলমাল বেধেছে বড্ড। বাটুল নাপিতের দরুন আমার অংশে আমি চার আনা করে বছরশাল খাজনা পাই, তা গাঁয়ের শুদ্দুর ভদ্দর কে না জানে ? এ বছরের খাজনা কেদার রাজা দিব্যি আদায় করে নিয়ে বসে আছে। দ্যাখো তো কি উৎপাত !

ছিবাস মুদীর মন তখন ছিল আলকাতরার পিপের মুখের ফাঁদলের দিকে। সে আপন মনে কি বললে, ভাল বোঝা গেল না। নীলমণি ছিবাসের সহানুভূতি না পেয়ে বোকার মত মুখখানা করে বাঁড়ুজ্জে পাড়ার দিকে অগ্রসর হলেন—উদ্দেশ্য, বন্ধু বিশ্বেশ্বর বাঁড়ুজ্জের বাড়ির সান্ধ্য পাশার আড্ডায় গিয়ে একবার খোঁজ নেওয়া।

পথেই একজন মধ্যবয়স্ক লোকের সঙ্গে দেখা।

নীলমণি চাটুজ্জে বললেন, আরে এই যে কেদার খুড়ো, তোমাকেই খুঁজছি।

লোকটি বললে, কেন বলো তো হে ?

নীলমণি যতটা জোরের সঙ্গে ছিবাসের দোকানে কথা বলেছিলেন, এখানে কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে অত জোরের সুর বের হ'ল না।

—সেই বাটুল নাপিতের ভিটের খাজনা বাবদ কয়েক আনা পয়সা—

—সে পয়সা তুমি কোত্থেকে পাবে খুড়ো ?

নীলমণি ভ্রূ কুঁচকে বললে, কেন পাবো না ?

—ও তোমার নীলাম-খরিদা জমি নয়।

নীলমণি রাগের সুরে বললেন, নেই বললে সাপের বিষ থাকে না তো জমি কোন্ ছার। তবে সেটেলমেণ্টের কাগজপত্রে তাই বলে বটে।

—ভুল বলে নীলমণি খুড়ো।

—সেটেলমেণ্টের পড়চা ভুল বলে ?

নীলমণির বড় ছেলে হাজুকে এই সময় সাইকেলে চড়ে সতেজে যেতে দেখা গেল।

নীলমণি হেঁকে বললেন, ও অজিত—ও অজিত—

ছেলেটি সাইকেল থেকে নেমে বললে, বাবা, তুমি এখানে ?

—দরকার আছে, তুই একবার তোর দাদুর সঙ্গে যা দিকি ওর বাড়ি। খুড়ো, আমাদের অংশের খাজনা ক' আনা পয়সা অজিতের সঙ্গে দিয়ে দাও গিয়ে—

—কোথা থেকে দেবো এখন ? আজ পাঠিও না, যদি কাগজ-পত্র দেখে মনে হয় তোমার জমি ওর মধ্যে আছে—

নীলমণি বাধা দিয়ে বললেন, আলবাৎ আছে, হাজার বার আছে, ওর বাবা আছে—

লোকটা বললে, চটো কেন নীলু খুড়ো, থাকে পাবে। তবে এখন হাতে টানাটানি—

—টানাটানি তা আমার কি ? আমার তো না হলে চলে না। ওসব শুনলে আমার কাছারীর খাজনা মাপ করবে কি জমিদারে ?

গ্রামের পথ। চেঁচামেচি শুনে দু-চার জন লোক জড় হয়ে পড়ল।

—কি, কি, খুড়ো কি ?

—এই দ্যাখো না ক্যাদার খুড়োর কাণ্ডটা—নিজের অংশ আমার অংশ গিলে খেয়ে বসে আছে, এখন উপুড় হাত করবার নামটি নেই।

লোকে কিন্তু এ ঝগড়ায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলে না, দু-একবার ঘাড় নেড়ে সরে পড়ল অনেকে। যারা দাঁড়িয়ে রইল, তারাও নীলমণি চাটুজ্জের পক্ষে কথা না বলে বরং এমন সব মতামত প্রকাশ করলে, যা কি না তাঁর বিরুদ্ধেই যায়।

নীলমণি অগত্যা অন্য দিকে চলে গেলেন। দু-একজন লোকে বললে, পথের মধ্যে এ রকম চেঁচামেচি কি ভাল ? ছিঃ—সামান্য কয়েক আনা পয়সার জন্যে—আর ও'র সঙ্গে ? কেউ সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, ক্যাদার জ্যাঠা আপনি বাড়ি যান চলে—

তিনিও চলে গেলেন।

নবাগত দু-একজন লোক জিজ্ঞেস করলে জনতাকে—কি হয়েছে, কি ?

—ওই নীলু খুড়ো ক্যাদার রাজাকে পথের মধ্যে ধরেছে, আমার খাজনা শোধ করো, ভারি তো খাজনা, ক'আনা পয়সা—হুঃ—

—ক্যাদার রাজা কি বললে ?

—বলবে আর কি, সবাই জানে ওর অবস্থা কি। দিতে পারে যে দেবে এখুনি ? পয়সা ট্যাঁকে করে এনেছে নাকি।

—কেদার রাজা এসব গোলমালের ভেতর থাকতে চান না, কখনও পছন্দ করেন না। নির্বিবাদী লোক। নীলু খুড়োর যা লোভ !

জনতা ক্রমে ভেঙে গেল।

যাঁর নাম কেদার রাজা, তিনি নিজের বাড়ি ঢুকলেন যখন, তখন বেলা প্রায় একটা। কেদারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, ইদানীং তাঁর সে চোখ-ধাঁধানো রূপের সামান্য কিছু অবশেষ যা ছিল তাতেও অপরিচিত চোখ তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। তাঁর মৃত্যু হয়েছে আজ এই বছর দুই।

বাড়িতে আছে শুধু মেয়ে শরৎসুন্দরী। মেয়ে মায়ের অতটা রূপ পায় নি বটে, তবুও এ গ্রামের মধ্যে তার মত সুন্দরী মেয়ে আর নেই।

—এত বেলা অবধি কোথা ছিলে ?…তোমায় নিয়ে আর পারিনে—তেল মাখো, নেয়ে এসো।

কেদার রাজা একটু অপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকলেন। মেয়ে ভাত রেঁধে বসে আছে, তিনি আগে খেয়ে না নিলে সে-ও খেতে পারে না—হয়তো তার কষ্টই হচ্ছে। মুখ ফুটে তো কিছু বলতে পারে না ! না, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

শরৎ বাবাকে তেল দিয়ে গেল। বললে, এত বেলায় আর নদীতে যেও না। জল তুলে দিচ্ছি, বাড়িতেই নাও।

এই কষ্টের ওপর আবার শরৎকে জল তুলতে হবে কুয়ো থেকে ? কেদার প্রতিবাদ করে বললে, না, আমি নদীতেই যাই। ডুব দিয়ে না নাইলে কি আর নাওয়া হ'ল ; চললাম, দে গামছাখানা—

শরৎ পাথরের খোরায় বাবার ভাত বাড়তে গেল। কাঁসার জিনিসপত্র ছিল বড় সিন্দুক বোঝাই—সব গিয়েছে একে একে—অভাবের তাড়নায় বিক্রী হয়ে, নয় তো বাঁধা দিয়ে। আর উদ্ধার করা যায় নি।

শরৎ বাবার খাবার জায়গা করে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ নেই কেদার রাজার

সংসারে—এই বিধবা মেয়ে শরৎ ছাড়া। মানে, এখন এই গ্রামের বাড়িতে নেই। কেদার রাজার একমাত্র পুত্র বহুদিন যাবৎ নিরুদ্দেশ। কোন সন্ধানেই তার পাওয়া যায় নি গত দশ বৎসরের মধ্যে।

কেদার স্নান সেরে এসে খেতে বসলেন। পাথরের খোরায় বুকড়ি কালো আউশ চালের ভাত ও ডাঁটা চচ্চড়ি। খোরার পাশে একটা ছোট কাঁসার বাটিতে কাঁচা কলাইয়ের ডাল। কেদার নাক সিঁটকে বললে, কি ছাই-রাই-ই রাঁধিস রোজ, তোর রান্না নিত্যি খাওয়া এক ঝকমারি।

শরৎ চুপ করে রইল।

নীরবে কয়েক গ্রাস উদরস্থ করে ক্ষুধার প্রথম দিকের জ্বালাটা খানিকটা মিটিয়ে কেদার মেয়ের দিকে তিরস্কারসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আহা, কি ডাল রাঁধবার ছিরি! আর এই একঘেয়ে ডাঁটা চচ্চড়ি, এ রোজ রোজ তুই পাস কোথায় বাপু!

—আমার কি দোষ, আমি কি বাজারে যাই না কি? যা পাই হাতের কাছে তাই রাঁধি। কে এনে দিচ্ছে বল না—

কেদার মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, তার মানে?

তার মানে কি শরৎ বাবাকে ভাল ভাবেই বুঝিয়ে বলতে পারত, ঝগড়ায় সে-ও কম যায় না—কিন্তু বাবার মেজাজ সে উত্তমরূপে জানে, এখুনি রাগ করে ভাতের থালা ফেলে উঠে যাবেন এখন। সুতরাং চুপ করেই গেল সে।

কেদার পাতের চারিদিকে ডাল-মাখা ভাত ফেলে ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মত অগোছালো ভাবে আহার সম্পন্ন করে অপ্রসন্ন মুখে উঠে যাবার উদ্যোগ করতে শরৎ বললে—বসো বাবা, উঠো না, কিছু তো খেলে না, একটু তেঁতুল দিয়ে খেয়ে নাও—

কেদার রেগে বললেন, তোর মুণ্ডু দিয়ে খাবো অকর্ম্মার ঢেঁকি কোথাকার—অমন ছাই না রাঁধলেই না—

শরৎও প্রত্যুত্তরে বললে, তাই খাও, আমার মুণ্ডু খাও না—আমার হাড় জুড়ুক, আর সহ্যি হয় না—

মাঝে মাঝে পিতাপুত্রীতে এমন দ্বন্দ্ব বাধা এদের সংসারে সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কেদার খারাপ জিনিস খেতে পারেন না, অথচ এদিকে সংসারের সচ্ছলতার যে রূপ, তাতে আউশ চালের ভাত জোটানোই দুষ্কর। এক পোয়া সর্ষের তেল কলুবাড়ি থেকে ধারে আসে, মাথায় মাখা সমেত সেই তেলে তিন দিন চালাতে হয়—সুতরাং তরকারিতে জল-আছড়া দিয়ে রান্না ছাড়া অন্য উপায় নেই। তরকারি মুখরোচক হয় কোথা থেকে?

অথচ শরৎ বাবাকে সে কথা বলতে পারে না। বড়ই রূঢ় শোনায় সেটা। বাবার অর্থ উপার্জ্জনের অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাতে। এক যদি তিনি নিজে বুঝতেন, তবে সব মিটেই যেত। কিন্তু বাবা ছেলেমানুষের মত অবুঝ, তিনি দেখেও কিছু দেখেন না, বুঝেও বোঝেন না—প্রৌঢ় পিতার এই বালস্বভাবের প্রতি স্নেহ ও করুণা-বশতঃই শরৎ কিছু বলতে পারে না তাঁকে।

তার পর সে বাবার পাতেই খেতে বসে গেল।

দিবানিদ্রা কেদার রাজার অভ্যাস নেই, দুপুরে খাওয়ার পর তিনি আটদশগাছা ছিপ—নানা আকারের, পুঁটি মাছ থেকে রুই কাৎলা ধরা পর্য্যন্ত, সুতো—বঁড়শি বাঁধা, মাছধরা ভাঁড়, চারকাঠি, মশলা প্রভৃতি মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিষ্কর্ম্মার কর্ম্ম।

ওপাড়ার গণেশ মুচি একাজে তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু। গণেশ এসে বললে, বাবাঠাকুর, তৈরী ?

—সব ঠিক আছে, কোথায় যাবি, গড়ের পুকুরে না নদীতে ?

—চারকাঠি বেঁধেছ কোথায়?

কেদার রাজা চোখে-মুখে স্বীয় কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার আত্মপ্রসাদসূচক একখানি হাস্য বিস্তার করে বললেন, ওরে বেটা, আজ ত্রিশ বছর বর্শেলাগিরি করছি এটুকু আর বুঝিনে ? ঘোলার শেষের গাঙ, সেখানে চারকাঠি না বেঁধে বাঁধব কি না পুকুরে ?···হ্যা-হ্যা হ্যা—

গণেশ কেদার রাজার ছিপ ও সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে চলল নিজের ছিপগুলোর সঙ্গে।

গড়ের পুকুরের ধারে বেতস ও কণ্টকগুল্মের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। গত বর্ষার জলে সে জঙ্গল বেড়ে মধ্যেকার অন্ধকার সুঁড়ি পথটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে—তার মধ্যে দিয়ে দুজনে সন্তর্পণে চলল, পায়ের পাতায় কাঁটা না মাড়িয়ে ফেলে।

পাড়ের ওপারে যেখানে জঙ্গলটা একটু পাতলা হয়ে এসেচে, সেখানে পেঁছে গণেশ বললে, আমার কিন্তু বাবাঠাকুর, জোড়া দেউলের নীচে চারকাঠি পোঁতা, দেখে যাবো না একবারটি ?

কেদার বললেন, উঃ, ব্যাটা বড় চালাক তো! ওখানে পুঁতেছিস্ তা আমাকে বলিস নি মোটেই ? চল দেখি—

গড়ের দীঘির বাঁ পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে থেকে সেকালের ভাঙা প্রকাণ্ড দেউলের চূড়া যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তারই নীচে দীঘির জলে গণেশ গিয়ে নামল।

দীঘিটা এত বড় যে এপার থেকে ওপারের গাছপালা যেন মনে হয় ছোট। অনেকগুলো দেউল এখানে আছে গড়ের দীঘির গভীর জঙ্গলের মধ্যে—কোনো কোনো মন্দিরের গায়ে কালো স্লেট পাথরের ওপর মন্দির-নির্মাতার নাম ও সন তারিখ লেখা। একটার ওপর সন লেখা আছে ১০২৪। এ থেকে দেউলগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা কঠিন হবে না।

গণেশ বললে, ভাল মাছ লেগেছে বাবাঠাকুর, এখানেই বসবা এসো—

—আরে না না, চল গাঙে—এখেনে আবার মাছ—

—আপনি নেমে দ্যাখোই না—আমি কি মস্করা করছি তোমার সঙ্গে ?

দুজনে পুকুরের ধারেই মাছ ধরতে বসে গেল। কেদার রাজা যা হুকুম করেন, গণেশ মুচি তখনই তা তামিল করে, যদিও কার্যতঃ সে কেদার রাজার ইয়ার।

—তামাক সাজ গণ্শা, আর পাতা ভেঙে নিয়ে বসবার জায়গা করে দে দিকি!

গণেশ পাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে বন-ডুমুরের বড় বড় কচি পাতা ভেঙে এনে বিছিয়ে দিলে। গণেশ নিজে কিন্তু সেখানে বসল না—বললে, আমি এই বাঁধাঘাটের সানে গিয়ে বসি বাবাঠাকুর—

একটু দূরে প্রাচীন দিনের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট যেখানে ছিল, এখন সেখানে পুকুরপাড়ে সোপানশ্রেণীর চিহ্ন দেখা যায় মাত্র। ঘাট ব্যবহার করা চলে না, তবে ভাঙা চাতালে বসে মাছ ধরা চলতে পারে এই পর্যন্ত।

দীঘির চার ধারে বড় বড় বট, শিমুল, ছাতিম গাছের বহুকালের বন। ঘাটের ওপরকার বৃদ্ধ বট গাছটা দীঘির ঘাটের বাঁধা সোপানশ্রেণীর ফাটলে ফাটলে শিকড় চালিয়ে যদি তার কয়েকটা ধাপকে না ধরে রাখতো, তবে প্রাচীন দিনের ঘাটের একখানা ইঁটও আজ খুঁজে পাওয়া যেতো কি না সন্দেহ। এর প্রধান কারণ এই সব ধ্বংসস্তূপের পোড়ো ইঁট দিয়ে এ গ্রামের বহু গৃহস্থের বাড়ি তৈরি হয়ে আসছে আজ একশো বছর ধরে।

ঘণ্টা-দুই পরে নিবিড় ছায়া নামল দীঘিটার চার পাশ ঘিরে। চার ধারেই বন, বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে এ বিচিত্র কথা কিছু নয়। কেদার হেঁকে বললেন, ওরে গণ্শা শীত শীত করছে, একটু ভাল করে তামাক সাজ্, ইদিকে আয় তো—

গণেশের ছিপের ফাৎনা বড় মাছে দু-দুবার নিতলি করে নিয়ে গেছে সবে মাত্র, তার এখন ছিপ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও কেদারের আদেশ সে অমান্য করতে পারল না। বিরক্ত মুখে উঠে এসে বললে—কিছু হচ্ছে-টচ্ছে বাবাঠাকুর ?

—তোর কি হল ?

—অই অমনি—তেমন কিছু নয় !

বড় মাছের ঘাই মারার কথা গণেশ বললে না, কোনো বর্শেলই বলে না, যদি বাবাঠাকুর এখান থেকে উঠে গিয়ে ওখানে বসে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কেদারের ছিপে দৈবক্রমে একটা বড় রুই মাছ টোপ গিলে ফাৎনা ডুবিয়ে একেবারে নির্তাল হয়ে গেল। বহু ধস্তাধস্তি করে সুতো লম্বা করে ছেড়ে মাছটাকে অনেক খেলিয়ে কেদার সেটা ডাঙায় তুললেন।

গণেশ ছুটে এসেছিল তাঁকে সাহায্য করতে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গণেশের সাহায্য তাঁর দরকার হ'ল না। কেদার হাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাছটার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, তিনি বললেন—তোল্ রে গণ্শা, ক'সের বলে মনে হয় দ্যাখ তো ?

গণেশ কানকো ধরে মাছটাকে তুলে বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, তা তিনসের চোদ্দ-পোয়া হবে বাবাঠাকুর, আপনাদের বরাত—আমার ছিপে ঘাই মেরেই পুকুরের মাছ নিউদ্দিশ হয়ে গেল—

নিরুদ্দেশ হওয়ার তুলনাটি কেদারের ভাল লাগল না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর পুত্রের কথা। আজ দশ বৎসর···হাঁ, প্রায় দশ বৎসর যাবৎ সে-ও নিরুদ্দেশ।···কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কে বলবে ? সচ্ছল অবস্থার লোক যারা, তারা এ অবস্থায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, কত খোঁজখবর করে। দরিদ্র কেদারের সে সব করবার সঙ্গতি কৈ ? —নীরবে ও নিশ্চেষ্ট ভাবে সব সয়ে থাকতে হয়েছে।

কি করবেন উপায় নেই।

কেদার নিজের অলক্ষিতে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নিয়ে চল্ রে গণেশ, পেঁাছে দে মাছটা বাড়িতে। একেবারে কেটে দিয়ে তুইও কিছু নিয়ে যা—চল্।

সন্ধ্যার অন্ধকার গড়ের পুকুরের বনে দিব্যি ঘনিয়েছে—হেমন্তের প্রথম, ছাতিম ফুলের উগ্র গন্ধে ভরা অন্ধকার বনপথ বেয়ে দুজনে বাড়ির দিকে ফিরলে।

দুই

শরৎ বাবার সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করে বসে ছিল, কিন্তু কেদার এখনও ফেরেন নি। বাইরের দোরের কাছে খুটখাট্ শব্দ শুনে শরৎ ডেকে বললে, কে ? বাবা নাকি ?

শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। শরৎ চেঁচিয়ে বললে, দেখে আসি আবার কে, বাবার এখনও দেখা নেই—কোথায় গিয়ে বসে আছে তার ঠিক কি ? হাড় ভাজাভাজা হয়ে গেল আমার—

দরজার কাছে কেউ কোথাও নেই। শরৎ মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির রোয়াকে এসে বসল।

খানিকটা পরে আবার বাইরের দরজায় খুট্খুট্ শব্দ। এবার যেন বেশ একটু জোরে

জোরে। শরৎ এবার পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে বাইরের দরজার খিলটা খুলে ফেলল। বাইরে বেশ অন্ধকার, কিন্তু কোথায় কে ?

শরতের ভয় ভয় করতে লাগল। তবুও সে খুব সাহসী মেয়ে—এই জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ চারিদিকে, কত কাণ্ড সেখানে ঘটে—একা শরৎ কত রাত্রি পর্য্যন্ত বাবার ভাত নিয়ে বসে থাকে। ভয় করলে চলে না তার। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘটনাও ঘটে।

ঘটনা অন্য বেশী কিছু নয়, খুট্‌খাট্‌ শব্দ, একা রান্নাঘরে যখন শরৎ রাঁধছে—বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা, তখন কে কোথায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলে ওঠে—বেশ কি একটা কথা বললে সেটা বোঝা যায়, কিন্তু কথাটা কি, তা বোঝা যায় না।

এ-সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে শরতের।

শরৎ বাপের বাড়িতেই আছে আজীবন, মধ্যে বিয়ের পর বছর-তিনেক শ্বশুরবাড়ি ছিল। শিবনিবাসে ওর শ্বশুরবাড়ি, রাণাঘাটের কাছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যায় নি, তার কারণ মায়ের মৃত্যুর পর পিতার সংসারে লোক নেই, কে এই বয়সে তাঁকে দুটি রেঁধে দেয়, কে একটু জল দেয়—এই ভাবনা শরতের সব চেয়ে বড় ভাবনা। শরতের শ্বশুরবাড়ির অবস্থা নিতান্ত খারাপ নয়, অন্ততঃ এখানকার চেয়ে অনেক ভাল—কিন্তু দরিদ্র পিতাকে একা ফেলে রেখে সে সেখানে গিয়ে থাকতে পারে কি করে ?

তার শ্বশুর বলে পাঠিয়েছিলেন, এখানে যদি না আস বৌমা, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে আমি দায়ী থাকব না।

শরৎ তার উত্তরে বলে দেয়—আপনার সম্পত্তি আপনি যা খুশি করবেন, আমার কি বলার আছে সে সম্বন্ধে ? বাবাকে ফেলে আমার স্বর্গে গিয়েও সুখ হবে না।

আজ বছর দুই আগে মা মারা যান, এই দু-বছরের মধ্যে শ্বশুর সাত বার লোক পাঠিয়েছিলেন।

শরৎ জানে, বাবার অবর্ত্তমানে এ-গাঁয়ে তার চলা-চল্‌তির মহা অসুবিধে। বাবা সামান্য কিছু খাজনা আদায় করেন, দু-তিন বিঘে ধান করেন,—কষ্টেসৃষ্টে একরকম চলে। কিন্তু সে একা থাকলে এ দুটি আয়ের পথও বন্ধ। গ্রামে লোক নেই, থাকলেও সবাই নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত, শরতের মুখের দিকে চেয়ে কেউ নিজের কাজের ক্ষতি করে শরতের কাজ করে দেবে—তেমন প্রকৃতির লোক এ গাঁয়ে নেই।

সব জেনে শুনেও শরৎ এখানেই রয়ে গিয়েছে। তার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

সন্ধ্যার পর দেড় ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কেদারের সংকোচমিশ্রিত কাশির আওয়াজ এই সময় বাইরের উঠানে পাওয়া গেল।

শরৎ বললে, কে ? বাবা ?

—হ্যাঁ—ইয়ে—এই যে আমি—

শরৎ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল—হ্যাঁ, তুমি যে তা তো বেশ বুঝলাম। এত রাত পর্য্যন্ত এই জঙ্গলের মধ্যে একা মেয়েমানুষ বসে আছি, তা তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই—জিজ্ঞেস করি ?

কেদার কৈফিয়তের সুরে বলতে গেলেন, তাঁর নিজের কোন দোষ নেই—তিনি এক ঘণ্টা আগেই আসতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চানন বিশ্বাস তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একটা গুরুতর বিষয়ের পরামর্শের জন্যে—সেখানেই দেরি হয়ে গেল।

শরৎ বললে—তোমার সঙ্গে কিসের পরামর্শ ? ভারি পরামর্শদাতা তুমি কি না ? তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করলে তাদের কাজ আটকে গিয়েছে ভারি—

কেদার নীরবে হাত পা ধুয়ে ঘরে উঠলেন, মেয়ের সঙ্গে বেশি তর্কাতর্কি করে ঝগড়া

বাধাতে তিনি এখন ইচ্ছুক নন—নির্বিরোধী লোক কেদার।

মেয়ে আহ্নিকের জায়গা করে বসে আছে দেখে কেদার একটু বিপদে পড়লেন—সেদিকে চেয়ে বললেন—সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এখন আবার—

—তোমার যত সব ছুতো—সন্ধ্যে উৎরে গেলে বুঝি আহ্নিক করে না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, পরকালের কাজটা এখন থেকে করো একটু—

কেদার অপ্রসন্ন মুখে আহ্নিক করতে বসলেন।

বাইরে থেকে কে ডাকল—ও শরৎদি—আলো ধরো, উঠোনে যে জঙ্গল করে রেখেছ—

হাসতে হাসতে একটি ষোল-সতেরো বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে ঘরে ঢুকল। কেদারকে দেখে সংকোচের সঙ্গে গলার সুর নীচু করে শরৎকেই বললে, জ্যাঠামশায় ফিরেছেন কখন? আমি ভাবলাম বুঝি একা—

—বাবার কথা আর বলিস্ নে ভাই—তিনটের সময় বেরিয়েছিলেন, আর এই এখন এসে আহ্নিক করতে বসলেন—

নবাগত মেয়েটি হাসিহাসি মুখে চুপ করে রইল।

কেদার দায়-সারাগোছের অবস্থায় সন্ধ্যাহ্নিক সাঙ্গ করে বললেন, আছে নাকি কিছু?

—হ্যাঁ, বোসো। বাতাবী লেবু খাবে? মিষ্টি লেবু, ফকিরচাঁদের মা দিয়ে গেল আজ ওবেলা। আর এই নারকোলের নাড়ু দুটোও দিয়ে গেল, জল খেয়ে নাও—

জলযোগান্তে কেদার একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, তা হলে রাজলক্ষ্মী তো আছিস মা, আমি ততক্ষণ একটুখানি—বরং—ওই হরি বাঁড়ুজ্জের ওখান থেকে—

—না, যেতে হবে না বাবা। বোসো। রাজলক্ষ্মী দুপুর রাত পর্যন্ত আমায় আগলে বসে থাকবার জন্যে এসেছে নাকি? ও এখুনি চলে যাবে—

—আমি যাবো আর আসবো মা—এই আধ ঘণ্টার মধ্যে—

—না, তোমার আধ ঘণ্টা আমি খুব ভাল জানি—যেতে হবে না, বোসো তুমি। তার চেয়ে বসে একটা গল্প করো—

রাজলক্ষ্মীও আবদারের সুরে বললে, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, বলুন না একটা গল্প। আপনার মুখে কতকাল গল্প শুনি নি। সেই আগে আগে বলতেন—

অগত্যা কেদারকে বসতে হ'ল। খাপছাড়া ভাবে একটা গল্পের খানিকটা বলে তিনি কেমন উসখুস করতে লাগলেন। মন ঠিক গল্পে নেই তাঁর, এটা বেশ বোঝা যায়। শরৎ বললে—কোথায় যাবে বাবা? বিশ্বেসকাকার ওখানে কি বড্ড বেশি দরকার তোমার?

কেদার উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, বিশেষ জরুরী, দুবার লোক পাঠিয়েছে—জমিজমা নিয়ে একটা গোলমাল বেধেছে, তাই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায় কি না? তাই—

শরৎ মুখে কিছু বললে না। পঞ্চানন বিশ্বাস ঘুণ বিষয়ী ব্যক্তি, সে লোক তার বাবার মত ঘোর অবৈষয়িক লোকের সঙ্গে পরামর্শ করবার আগ্রহে দু-দুবার লোক পাঠিয়েছিল, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তা নয়, আসলে বাবা বারুইপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলের আখড়ায় গিয়ে এখন বেহালা বাজাবেন, এই তাঁর বৈষয়িক কাজ। যদি কেউ লোক পাঠিয়ে থাকে, সেখান থেকেই পাঠানো সম্ভব।

রাজলক্ষ্মী বললে, দিদি, উনি যান তো একটু ঘুরে আসুন—

শরৎ বললে, হ্যাঁ উনি গেলে রাত এগারোটার কম ফিরবেন না, আমি একা কি করে এখানে বসে থাকি বল্ তো? থাকবি তুই আমার সঙ্গে—বাবা না আসা পর্যন্ত? বলছিস্ তো খুব যেতে—

কেদার বিব্রত ভাবে বলে উঠলেন, আরে না-না, ওর থাকার দরকার হবে না, আমি যাব আর আসব, এই ধর গিয়ে ঘণ্টাখানেক, দেরি কিসের? যাই তা হলে—?

শরৎ বললে, ন'টার মধ্যে যদি না ফিরে আস, তবে আমি কি রকম রাগ করি দেখো এখন আজ—রাজলক্ষ্মী এখন রইল, তুমি এলে তবে যাবে—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে, বেশ ভালই তো জ্যাঠামশাই, যান আপনি—আমি ততক্ষণ দিদির কাছে থাকি। আসবেন তো শীগ্‌গিরই—?

কেদার আর দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে গেলেন। শরৎ ঠিক বুঝতে পারে নি, কৃষ্ণযাত্রার দলে বেহালা বাজাতে তিনি যাচ্ছিলেন না।

কেদারের বাড়িটার ধারে ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাঙা ও পুরোনো বাড়ি, সবগুলো ভাঙা নয়, তবে পরিত্যক্ত এবং সাপখোপের বাস হয়ে আছে বর্ত্তমানে। চার-পাঁচ রশি কি তা ছাড়িয়েও একটা পুরোনো আমলের উঁচু সদর দেউড়ির ভগ্নাবশেষ আজও বর্ত্তমান। এটা পার হয়ে দুধারে সেকালের আমলের নীচু লম্বা কুঠুরির সারি, কোন কালে এর নাম ছিল কাছারিবাড়ি, এখনও সেই নাম চলে আসছে। এর অর্দ্ধেকখানি এখন মাটির ভেতর বসে গিয়েছে, দেওয়াল সেকালে হয়তো চুণকাম করা ছিল, এখন শেওলা ছাতা ধরে সবুজ রং দাঁড়িয়েছে। কোনও একটা ঘরেও ছাদ নেই—মেজেতে বনজঙ্গল, শালকাঠের বড় বড় কড়ি আর ভাঙা ইঁটের স্তূপের ওপর বড় গাছ—এমন কি দেউড়ির ঠিক পাশেই এক কাছারিবাড়ির একটা অংশে প্রকাণ্ড এক তিন-পুরুষে বটগাছ—যার বয়স কোনক্রমেই একশ বছরের কম হবে না, বেশিও হতে পারে।

কাছারিবাড়ি পার হয়ে আর একটা দেউড়ি—এর নাম নহবৎখানা—বর্ত্তমানে—কিছুই অবশিষ্ট নেই—দুটি মাত্র উঁচু থাম ও তাদের মাথায় একটা ফাটা খিলান ছাড়া। থামের একপাশে এক সারি সিঁড়ি খানিকটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—বিছুটি গাছের জঙ্গলে থাম আর সিঁড়ির ধাপগুলো ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ কোন নবাগত লোক এসব জায়গায় সন্ধ্যার পর এলে তার দস্তুরমত ভয় হওয়ার কথা, কিন্তু কেদার নির্ব্বিকার ভাবে এসব পার হয়ে গিয়ে বড় একটা খালের মধ্যে নামলেন।

এই খালটাকে এখানে গড়ের খাল বলে, কিন্তু এতে জল নেই, খানিকটা খুব নাবাল জমি মাত্র, পশ্চিম কোণের এক জায়গায়—সদর দেউড়ি থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে—এই খালের খানিকটায় জল আছে—কচুরি পানায় ভর্ত্তি।

পূর্ব্বদিকের বাহু ধরে এলে গড়ের খালের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বিরাট ধ্বংসস্তূপ সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলাবৃত, দিনমানে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে এমন ঘন কাঁটা আর বেত বন, বন্যশূকরের ভয়ে সে দিকে বড় কেউ একটা যায় না।

গড়ের এই দিকটায় বিস্তর বড় বড় ছাতিম গাছ—মানুষের হাতে পোঁতা গাছ নয়, বন্য বৃক্ষের বীজের বিস্তারে উৎপন্ন।

যেখানে এখনও একটু জল আছে, সেখানকার উঁচু পাড়ে বসে দেখলে এই অংশের দৃশ্য মনে কেমন এক ধরনের ভয়-মিশ্রিত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। কেদার অবিশ্যি এসবের দিকে নজর না দিয়েই খালের নাবাল জমি পেরিয়ে ওধারে গিয়ে উঠলেন এবং আরও খানিকটা হেঁটে ছিবাস মুদির দোকানে উপস্থিত হলেন।

ছিবাস মুদির চালাঘরে ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে, কারণ এমন গাঁয়ে এই রাতে খরিদ্দার কেউ আসবে না—কিন্তু ঘরের ভেতরে চার-পাঁচ জন লোক বসে। ছিবাস বললে, আসুন বাবাঠাকুর, আপনার জন্য সব বসে—বলি, বলে গেলেন আসচেন তা দেরি হচ্চে কেন—আসুন বসুন—

এখানে এখন গান-বাজনা হবে—শরৎসুন্দরী ঠিকই আন্দাজ করেছিল, তবে বারুইপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলে নয়, এই যা তফাৎ। সবাই সরে বসে কেদারকে বসবার জায়গা করে দিলে।

কেদার মহানন্দে বেহালা ধরলেন, তাঁর বেহালা বাজানোর নাম আছে এ গ্রামে। অনেকক্ষণ ধরে গান-বাজনা চলল, আরও দু-তিনজন লোক এসে গান-বাজনায় যোগ দিলে—তবে গ্রামের ভদ্রলোক কেউ আসে নি।

কেদার বেহালায় কসরৎ দেখালেন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে, তার পর আবার গান শুরু হল। রাত আন্দাজ এগারটার সময় কি তারও বেশী যখন, গানের আড্ডা তখন ভাঙল।

একজন বললে, বাবাঠাকুর, আলো এনেছেন কি, না হয় চলুন আলো ধরে দিয়ে আসি খাল পার করে—

কেদারের হুঁশ হল এতক্ষণ পরে, বাইরে এসে বললেন, তাই তো, চাঁদ অস্ত গেল কখন? বড্ড অন্ধকার দেখছি যে—

পঞ্চমীর চাঁদের অবিশ্যি যতক্ষণ থাকা সাধ্য ততক্ষণ সে বেচারী আকাশে ছিল, তার কোন কসুর নেই। কেদার রাজার জন্যে দুপুর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার সাধ্যাতীত।

দাসু কুমোর বললে—আমার সঙ্গে যদি কেউ আসে আমি বাবাঠাকুরকে খাল পার করে দিয়ে আসি—

দু-তিনজন যেতে রাজী হল—একা রাত্রে কেউ ওদিকে যেতে রাজী হয় না, গড়ের মধ্যে আছে অনেক রকম গোলমাল। এ অঞ্চলে সবাই তা জানে। কেদার কিন্তু নির্ভীক লোক, তিনি কোন লোক সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী নন—দরকার নেই কিছু। তিনি এমনিই বেশ যাবেন।

তবুও জন চারেক লোক পাঁকাটির মশাল জ্বালিয়ে তাঁকে গড়ের খাল পার করে দিয়ে এল। এত রাত হয়েছে কেদার সেটা পূর্বে বুঝতে পারেন নি, তা হলে এত দেরি করতেন না, ছিঃ, কাজ বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে!

কেদার বাড়ি ঢুকে দেখলেন মেয়ে খিল বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শুয়ে। মেয়েকে একা এত রাত পর্যন্ত এই বনে ঘেরা নির্জন বাড়িতে ফেলে বাইরে ছিলেন বলে মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন, তবে কিনা এ অনুতাপ তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর মজা এই যে প্রতিরাত্রে ফিরবার সময়েই এই অনুতাপ মনের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়, এর আসা আর যাওয়া দুই-ই অদ্ভুত ধরনের আকস্মিক, ন্যায়শাস্ত্রের 'বেগবেগা' জাতীয় পদার্থ, আসবার সময় যত বেগে আসে, ঠিক তত বেগেই নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়—মনে এতটুকু চিহ্নও রেখে যায় না।

শরৎ উঠে বাবাকে দোর খুলে দিলে, ভাত বেড়ে খেতে দিলে। তার মনে রাগ অভিমান কিছুই নেই—সে জানে এতে কোনো ফলও নেই—বাবা যা করবেন তা ঠিকই করবেন। ওঁর ঘাড়ে ভূত আছে, সে-ই ওঁকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, উনি কি করবেন?

কিন্তু কেদারের ঘাড়ে সত্যিই ভূত চেপে আছে বটে। খাওয়াদাওয়ার পরে অত গভীর রাত্রেও বাবাকে বেহালার লাল খেরোর খোল খুলতে দেখে সে আর কথা না বলে থাকতে পারলে না। বাবা এখন আবার বেহালা বাজাতে বসলেই হয়েছে!

কেদার ব্যাপারটাকে সহজ করবার চেষ্টা করলেন। বেহালা যে তিনি ঠিক বাজাতে চাইছেন এখন তা নয়, তবে একটা সুর মাথার মধ্যে বড় ঘুরছে—সেইটে একবারটি সামান্য একটু ভেঁজে নিতে চান।

শরৎ বললে, না বাবা, তোমার ঘুম না আসতে পারে, তোমার খিদে নেই, তেষ্টা নেই, শরীরের ক্লান্তি নেই, ঘুম নেই—সব জয় করে বসে না হয় আছ, কিন্তু আমি এই সারাদিন খাটছি, তুমি এখন রাতদুপুরে বেহালা নিয়ে কোঁকর কোঁকর জুড়ে দিলে কানের কাছে আমার চোখে ঘুম আসবে?

কেদার বললেন, আমি—তা—না হয় দেউড়িতে গিয়ে বসি মা—তুই ঘুমো—

—না তা হবে না। আমি মাথা কুটে মরবো, এই এত রাত্রে অন্ধকারে সাপখোপের মধ্যে তুমি এখন জঙ্গলের মধ্যে দেউড়িতে বসে বেহালা বাজাবে? রাখ ওসব—

কেদার অগত্যা বেহালা রেখে দিলেন। মেয়েমানুষদের নিয়ে মহা মুশকিল। এরা না বোঝে সঙ্গীতের কদর, না বোঝে কিছু। তাঁর মাথায় সত্যিই একটা চমৎকার সুর খেলছিল, এই দুপুর নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রি, সুরটা বেহাগ—রক্তমাংসের শরীরে এ সময় তারের ওপর ছড় চালানোর প্রবল লোভ সামলানো যায়?

মেয়েমানুষ কি বুঝবে?

কেদার বিকেলবেলা গেঁয়োখালির হাটে যাবার পথে সাধু সেকরার দোকানে একবারটি ঢুকলেন, উদ্দেশ্য তামাক খাওয়াও বটে, অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল না যে এমন নয়। সাধু সেকরার বয়েস হয়েছে, নিজে সে একটি হরিনামের ঝুলি নিয়ে একটা জলচৌকিতে বসে মালাজপ করে, তার বড় ছেলে নন্দ দোকান চালায়। ব্রাহ্মণসজ্জনে সাধুর বড় ভক্তি—কেদারকে দেখে সে হাত জোড় করে বললে—আসুন, ঠাকুরমশায়, প্রণাম হই—ওরে টুলটা বার করে দে—ব্রাহ্মণের হুঁকোতে জল ফেরা—

কেদার বললেন—তার পর, ভাল আছ সাধু? তোমার কাছে এসেছিলাম একটা কাজে—আমার কিছু টাকার দরকার—তোমার এ বছরের খাজনাটা এই সময়—

সাধুর অবস্থা ভালই, কিন্তু মুখে মিষ্ট হলেও পয়সাকড়ি সম্বন্ধে সে বেজায় হুঁশিয়ার। কেদারকে যা হয় কিছু বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন নয় তা সে বিলক্ষণ জানে—সে বিনীত ভাবে হাত জোড় করে বললে, বড্ড কষ্ট যাচ্ছে ঠাকুরমশায়, ব্যবসার অবস্থা যে কি যাচ্ছে, সোনার দর এই উঠচে এই নামচে, সোনার দর না জোয়ারের জল! আর চলে না ঠাকুরমশাই—এই সময়টা একটু রয়ে বসে নিতে হচ্ছে—আপনি রাজা লোক, আপনার খেয়েই মানুষ—

কেদার চক্ষুলজ্জায় পড়ে আর খাজনা চাইতে পারলেন না। হাটে ঢুকে আরও দু-এক-জনের কাছে প্রাপ্য খাজনা চাইলেন—সকলেই তাদের দুঃখের এমন বিস্তারিত ফর্দ দাখিল করলে যে কেদার তাদের কাছেও জোর করে কিছু বলতেই পারলেন না।

হাটের জিনিসপত্রও সুতরাং বেশী কিছু কেনা হ'ল না—হাতে পয়সাকড়ি বিশেষ নেই।

সতীশ কলুর দোকানে ধারে তেল নিয়েছিলেন ওমাসে—এখনও একটি পয়সা শোধ দিতে পারেন নি, অথচ সর্ষের তেল না নিয়ে গেলে রান্না হবার উপায় নেই, মেয়ে বলে দিয়েছে।

সতীশ বললে, আসুন দাদাঠাকুর, তেল দেবো নাকি?

সতীশের দোকানে কোণের দিকে যে ঘাপটি মেরে বৃদ্ধ জগন্নাথ চাটুজ্জে বসেছিলেন, তা প্রথমটা কেদার দেখতে পান নি, এখন মুশকিল জগন্নাথ চাটুজ্জে লোক ভাল নয়, গাঁয়ের গেজেট, তার সামনে সতীশকে ধারের কথা বলতে কেদারের বাধল—অথচ না বললেও নয়। জগন্নাথ উঠলে না হয় বলবেন এখন। জগন্নাথ চাটুজ্জে হেঁকে বললেন, ওহে কেদার রাজা, এস এস, এদিকে এস ভায়া—তামাক খাও—

কেদার বললেন, জগন্নাথ দাদা যে! ভাল সব?

—ভাল আর কই, আবার শুনেছ তো ওপাড়ার নীলমণি গোঁসাইয়ের বাড়ির ব্যাপার? শোন নি? তা শুনবে আর কোথা থেকে—শুধু মাছ ধরা নিয়ে আছ বই তো নয়—সরে এস ইদিকে বলি—ঘোর কলি হে ভায়া ঘোর কলি, জাতপাত আর রইল না গাঁয়ের বামুনের—

জগন্নাথ চাটুজ্জের কথা শোনবার কোন আগ্রহ ছিল না কেদারের—পরের বাড়ির কুৎসা ছাড়া তিনি থাকেন না। কিন্তু এঁকে এখান থেকে সরাবার উপায় না দেখলে তো তেল

নেওয়া হয় না। কেদার অগত্যা জগন্নাথের কাছে গেলেন। জগন্নাথ গলার স্বর নীচু করে বললেন, কাল রাত্তিরে নীলু গোঁসাইয়ের মেয়েটা আফিম খেয়েছিল, জানো না?

কথাটা প্রথম থেকেই কেদারের ভাল লাগল না। তবুও তিনি বললেন, আফিম? কেন?...

জগন্নাথ চোখ মুখ ঘুরিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললেন, আরে, এর আবার কেন কি কেদার রাজা! বিধবা মেয়ে, সোমত্ত মেয়ে, বাপের বাড়ি পড়ে থাকে—কোনো ঘটনা-টটনা ঘটে থাকবে। কথায় বলে—

কেদারের নিজের বাড়িতেও ওই বয়সের বিধবা মেয়ে, গল্প শুনবেন কি, জগন্নাথ চাটুজ্জের কথার গূঢ় ইঙ্গিত, শ্লেষ ও ব্যঞ্জনা শুনে কেদার ভেতরে ভেতরে ভয়ে ও সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করলেন। তেল কিনতে এসে এমন বিপদে পড়বেন জানলে তিনি না হয় আজ তৈলবিহীন রান্নাই খেতেন।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন, আমি শুনলাম কি করে বলি শোনো তবে। কাল আমি ক্ষেত্র ডাক্তারের বাড়িতে ডাক্তারের স্ত্রীর ব্রত উদ্‌যাপনে নেমন্তন্ন খেতে যাই, তাদের পরিবেশনের লোক হয় না, আমি আবার খাওয়ার পরে নিজে পরিবেশন করতে লাগলুম। রাত প্রায় বারোটা হয়ে গেল। তখন ক্ষেত্র ডাক্তার বললে, এখানেই আমার বাইরের ঘরে বিছানা পেতে দিক, এখানেই শুয়ে থাকুন—এত রাত্তিরে আর বাড়ি যায়না—

শুয়ে আছি, রাত প্রায় তিনটের সময় নীলু গোঁসাইয়ের বড় ছেলে ধীরেন এসে ডাক্তারকে ডাকলে। আমি জেগে আছি, সব শুনছি শুয়ে শুয়ে। ধীরেন কাঁদকাঁদ হয়ে বললে, শীগগির যেতে হবে ক্ষেত্রবাবু, মীনা আফিম খেয়েছে—

ডাক্তার বললে, কতক্ষণ খেয়েছে? ধীরেন বললে, কখন যে খেয়েছিল তা তো জানা যায় না। নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিল, এখন গোঙানি ও কাতরানির শব্দ শুনে সবাই গিয়ে দেখে, এই ব্যাপার।

সেই রাত্রে ক্ষেত্র ডাক্তার ছুটে যায়। কত করে তখন বাঁচায়। তা ওরা ভাবে যে কাক-পক্ষীতে বুঝি টের পেলে না, কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র ডাক্তারের বাইরের ঘরে শুয়ে তা তো কেউ জানে না। সোমত্ত বিধবা মেয়ে মীনা, কি জানি ভেতরের ব্যাপারটা কি—কাল পড়েছে খারাপ কিনা—বলে আগুন আর ঘি—আরে উঠলে যে, বোসো।

বারে বারে বিধবা মেয়ের উল্লেখ কেদারের ভাল লাগছিল না—তা ছাড়া জগন্নাথ চাটুজ্জে কি ভেবে কি কথা বলছে তা কেউ বলতে পারে না। লোক সুবিধের নয় আদৌ। সর্ষের তেলের মায়া ছেড়ে দিয়েই কেদার উঠে পড়লেন, জগন্নাথ চাটুজ্জের সামনে তিনি ধারের কথা বলতে পারবেন না সতীশকে।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন, তা হ'লে নিতান্তই উঠলে কেদার রাজা, বাড়ি থাকো কখন হে —একবার তোমাদের বাড়িতে যাব যে—ভাবি যাব, কিন্তু গড়ের খাল পার হতে ভয় হয়, আর যে বনজঙ্গল গড়ের দিকটাতে! তা ছাড়া আবার সেই তিনি আছেন—

জগন্নাথ চাটুজ্জে হাত জোড় করে কার উদ্দেশে দু-তিনবার প্রণাম করলেন।

কেদার বলে উঠলেন, আরে ও কখনো কেউ দেখে নি, এই তো শরৎ রোজ সন্ধ্যের সময় উত্তর দেউলে পিদিম দিতে যায়—একাই তো যায়—কিছু তো কখনো কই—

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেই কেদার বুঝলেন কথাটা বলা তাঁর উচিত হয় নি—। জগন্নাথ চাটুজ্জের পেটে কোন কথা থাকে না—এর কথা ওর কাছে বলে বেড়ানোই তাঁর স্বভাব—এ অবস্থায়—মেয়ের কথা তোলাই এখানে ভুল হয়েছে—

কিন্তু জগন্নাথ অন্য দিক দিয়ে গেলেন পাশ কাটিয়ে। বললেন, তুমি বলছো কেদার

রাজা কিছু নেই, আমরা বাপ-দাদাদের মুখ থেকে শুনে আসছি চিরকাল—নেই বলে উড়িয়ে দিলেই—অবিশ্যি তোমার মেয়ে ঐ নিবান্দা পুরীর মধ্যে একা থাকে, সাহস বলিহারি যাই—আমাদের বাড়ির এরা হলে দিনমানেই থাকতে পারত না—

এদের কথাবার্ত্তার এই অংশটা সতীশ কলুর কানে গিয়েছিল, সে খদ্দেরকে তেলম্মেপে দিতে দিতে বললে, এখন অবেলায় ও কথাডা বন্ধ করুন বাবাঠাকুর, দরকার কি ওসব কথায় ? চেরকাল শুনে আসছি, বাপ পিতেমো পুজন্ত বলে গিয়েছে—গড়ের বাড়িই পড়ে আছে কতকাল অমনি হয়ে তার ঠিক ঠিকানা নেই—আমার বয়েস এই তিন কুড়ি চার যাচ্ছে, আমি তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি ঠিক অমনি ধারা—কেদার দাদাঠাকুরের বয়েস আমার চেয়ে কত কম—আমি ওনাকে এট্টুকখানি দেখেছি—

জগন্নাথ চাটুয্যে বললেন, আরে তোমার তো মোটে চৌষট্টি সতীশ, আমার ঠাকুরদা মারা গিয়েছিলেন আমার ছেলেবেলায়, তিনি বলতেন তাঁর ছেলেবেলায় তিনিও গড়বাড়ি অমনি ধারা জঙ্গল আর ইটের ঢিবি দেখে আসছেন, তাঁর মুখেও আমি উত্তর দেউলের ওকথা শুনেছি —কেদার রাজা কি জানে ? ও কত ছোট আমাদের চেয়ে।

কেদার বলে উঠলেন, ছোট বড় নই দাদা, এই তিপ্পান্ন যাচ্ছে—

জগন্নাথ বললেন,—আর আমার এই খাঁটি ষাট কি একষট্টি—তা হলে হিসেব করে দেখো কতদিন হ'ল, আমার যখন পনেরো তখন ঠাকুরদা মারা যান, তখন তাঁর বয়েস নব্বুইয়ের কাছাকাছি—এখন হিসেব করে দেখ ঠাকুরদাদার ছেলেবেলা, সে কত দিনের কথা—কত দিনের হিসেব পেলে দেখো—

কেদার তেলের আশা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন—কোনো উপায় নেই। কারো সামনে তিনি ধারের কথা বলতে পারবেন না—বিশেষ করে জগন্নাথ চাটুয্যের সামনে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েছে। গেঁয়োখালির হাট থেকে ফিরবার পথে গড়ের সদর দেউড়ির দিকে গেলে ঘুর হয় বলে পূর্ব্বদিক দিয়েই ঢুকলেন কেদার—যে দিকটাতে খালে এখনও জল আছে। এদিকটাতেই বড় বড় ছাতিম গাছ আর ঘন বন। এক জায়গায় মাত্র হাঁটু জল খালে, কার্ত্তিক মাসে কচুরি পানার নীলাভ ফুল ফুটে সমস্ত খালটা ছেয়ে ফেলেছে—এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও—অন্ধকার সন্ধ্যাতেও শোভা যেন আরো খুলেছে।

খাল পেরিয়ে উঠে গড়ের মধ্যে ঢুকেই ছাতিম বনের ওপারে ডান দিকে এক জায়গায় ধ্বংসস্তূপের থেকে একটু দূরে গোলাকৃতি গম্বুজের মত ছাদওয়ালা ছোট গোছের মন্দির—এরই নাম এ গাঁয়ে উত্তর দেউল। কেন এ নাম তা কেউ জানে না, সবাই শুনে আসছে চিরকাল, তাই বলে।

উত্তর দেউলের পাশ দিয়ে ছোট্ট পায়ে-চলার পথ বাদুড়নখী কাঁটার ঝোপের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ছাতিম ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বাদুড়নখী ও জংলী বনমরচে ফুলের ঘন সুবাস। বন বাঁ-ধারে বেশ ঘন আর অন্ধকার। গড়ের এখানকার দৃশ্যটি সত্যিই ভারী সুন্দর।

কেদার একবার গম্বুজাকৃতি মন্দিরটার দিকে চাইলেন। আজ কেন যেন তাঁর গা ছমছম্ করতে লাগল। অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সামান্য মৃদু প্রদীপের আলো—শরৎ এই সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনের মত সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে—এটা কেদার রাজার বংশের নিয়ম, আজন্ম দেখে আসছেন তিনি, উত্তর দেউলে বাতি দিয়ে এসেছেন চিরকাল কেদারের মা, ঠাকুরমা এবং সম্ভবত প্রপিতামহী। কেদারের আমলেও দেওয়া হয়।

তিন

শরৎ বাবাকে বললে, তুমি আজও তো কোথাও খাজনা আদায় করতে বেরুলে না—কি করে কি হবে আমি জানি নে। ঘরে কাল থেকে চাল বাড়ন্ত, কোনো কাজের কথা বললে, সে তোমার কানে যায় না, আমি বলে-বলে হার মেনে গিয়েছি—

কেদার বললেন, তা যাবো তো ভাবছি। তুই না বললেও কি আর আমি বাড়ি বসে থাকতাম? একটু বেলা হোক—

শরৎ গৃহকর্ম্মে মন দিলে। কেদার মোটা চাদরখানা গায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে বেরুবার উদ্যোগ করতেই শরৎ বললে, না খেয়ে বেরিও না বাবা—আহ্নিক করে একটু জল মুখে দিয়ে যাও—

কিছু খেতে অবিশ্যি কেদারের অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানটির কথা শরৎ উল্লেখ করলে, তাঁর যত আপত্তি সেখানে। এত সকালে তিনি আর ও হাঙ্গামার মধ্যে যেতে রাজী নন। সুতরাং তিনি বললেন, আমি এখন আর খাবো না, এসে বরং—সবাই বেরিয়ে যাবে কিনা এর পরে—

তাঁদের গ্রামের পাশে রাজীবপুর চাষাদের গাঁ। এখানে কেদারের তিন-চারটি প্রজা আছে। আজ কয়েক মাস যাবৎ কেদার তাদের কাছে খাজনার তাগাদা করে আসছেন, কিন্তু জোর করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না বলে একটি পয়সাও আদায় হয়নি।

প্রথমেই কেদার গেলেন একঘর মুসলমান প্রজার বাড়ি। দুখানি মাত্র খড়ের ঘর, উঠোনে ধানের মরাই আছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাতে ধান নেই। আরও দিন পনেরো পরে মাঠ থেকে ধান আসবে। মুরগী চরছে ধানের মরাইয়ের তলায়।

বছর দুই আগে এই বাড়ির মালিকের মৃত্যু হয়েছিল। ছেলে আর ছেলের বৌ ছিল—গত চৈত্র মাসে ছেলেটির সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে—এখন শুধু আছে বিধবা পুত্রবধূ আর একটি মাত্র শিশু পৌত্র। সামান্য জমার জমির ধান আর রবিশস্য থেকে কোনো রকমে সংসার চলে এদের।

কেদার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললেন, বলি, ও আবদুলের মা, কোথায় গেলে? বাড়িতে কেউ ছিল না সম্ভবতঃ। দু-একবার ডেকে কারো সাড়া না পেয়ে কেদার ধানের মরাইয়ের ছায়ায় একখানা কাঠ পেতে বসে পড়লেন। একটু পরে একটি অল্পবয়সী বৌ কলসীকক্ষে উঠানে পা দিতেই কেদারকে দেখে জিব কেটে একহাতে ঘোমটা টেনে ক্ষিপ্রপদে উঠোন পার হয়ে ঘরে উঠল।

একটু পরে বৌটি একখানা পিঁড়ি নিয়ে এসে কেদারের বসবার জায়গা থেকে হাত দশেক দূরে মাটির ওপর রেখে চলে গেল। কেদার সেখানা টেনে এনে তাতে বসলেন।

মেয়েটি আরও প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ঘোমটা দিয়ে ঘরের বার হয়ে ছাঁচতলায় নেমে দাঁড়াল। কোনো কথা বললে না।

কেদার বললেন, আর বছরের দরুণ এক টাকা পাঁচ আনা আর এ বছরের সমস্ত খাজনা—মোট সাড়ে চার টাকা তোমার কাছে বাকি, টাকাটা আজ দিয়ে দাও—বুঝলে?

মেয়েটি নম্রসুরে বললে, বাপজী—

কেদার চমকে উঠলেন। কখনো বৌটি তাঁর সঙ্গে কথা বলে নি—তা ছাড়া ওর মুখের ডাকটি তাঁর বড় ভাল লাগল। শরতের চেয়েও বৌটির বয়েস কম।

কেদার বললেন—কি ?

—টাকা তো যোগাড় করতে পারি নি আজও, কলাই বিক্রী না করে টাকা দিতে পারবো না।

কেদার দ্বিরুক্তি না করে সেখান থেকে উঠলেন। ওর মুখের 'বাপজী' ডাকের পর আর কখনো তাকে কড়া তাগাদা করা চলে ?

আর এক বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তাদের বাড়িসুদ্ধ সব ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে। শুধু রোগের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সেখান থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

পথে বেলা বেশি হয়েছে। এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বিষয়কর্ম করা হ'ল—বেশি খাটতে তিনি রাজী নন—বাড়ির দিকে ফিরবার জন্যে সড়কে উঠেছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল।

বৃদ্ধ লোকটির পরনে আধময়লা থান, গায়ে চাদর, হাতে একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ। তাঁকে দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ মশাই, গড়শিবপুর যাবো কি এই পথে ?

—গড়শিবপুরে কোথায় যাবেন ?

—ওখানকার রাজবাড়ির অতিথিশালা আছে—শুনলাম, সকলে বললে। অনেক দূর থেকে আসছি, অতিথিশালায় গিয়ে আজ আর কাল থাকবো।

—গড়শিবপুরের রাজবাড়ি ? কে বলে দিয়েছে ? আচ্ছা, চলুন নিয়ে যাই, আমার সঙ্গে চলুন—

কেদারের বাড়ির অতিথিশালা পূর্ব্বপুরুষদের আমল থেকেই আছে—সেই নামডাকেই এখনও গ্রামে অপরিচিত বিদেশী লোক এলে কেদারের বাড়ি অতিথি হতে আসে। নিজে খেতে না পেলেও পূর্ব্ব-আভিজাত্যের গৌরব স্মরণ করে কেদার তাদের থাকবার খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসছেন বরাবর। কখনও তাদের ফিরিয়ে দেন নি এ-পর্য্যন্ত। থাকবার জায়গার অসুবিধা বলে কেদার কাছারীবাড়ির উঠানে অতিথির জন্যে একখানা ছোট্ট দো-চালা খড়ের ঘর তৈরী করে দিয়েছেন অনেক দিন থেকে। খড় পুরানো হয়ে জল পড়তে শুরু করলে কেদার নিজেই চালে উঠে নতুন খড়ের খোঁচ দেন। এই ঘরখানার নামই অতিথিশালা। কেদারকে বিপন্ন হয়ে পড়তে হয় যখন হঠাৎ অতিথি এসে জোটে অতিথিশালায়, হয়তো নিজের ঘরেই সেদিন চাল বাড়ন্ত—কিন্তু অতিথিকে যোগান দিতেই হবে। অনেক সময় গ্রামের লোক দুষ্টুমি করেও কেদারের অতিথিশালায় অতিথি পাঠিয়ে দেয়, সকলেই জানে কেদারের অবস্থা—মজা দেখবার লোভ সামলানো যায় না সব সময়।

সাধারণ অতিথিকে দিতে হয় এক বোঝা কাঠ ও এক সের চাল, সামান্য কিছু নুন আর তেল। তরকারী হিসাবে দু-একটা বেগুন। এর বেশী কিছু দেবার নিয়ম নেই পূর্ব্বকাল থেকেই—কেদারও তাই দিয়ে আসছেন।

তবে ভদ্র-অতিথি এলে অন্যরকম ব্যবস্থা। নিয়ম আছে দুধ, ঘি, সৈন্ধব লবণ, মিছরিভোগ, আতপ চাল, মুগের ডাল ইত্যাদি তাকে যোগাতে হবে। কেদারের বর্ত্তমান অবস্থায় সে-সব কোথায় পাওয়া যাবে—কাজেই নিজের ঘরে রেঁধে তাদের খাওয়াতে হয়—যতই অসুবিধা হোক, উপায় নেই। মাসের ভিতর পাঁচদিনও শরৎকে অতিথিসেবা করতেই হয়। আজ কেদার একটু অসুবিধায় পড়লেন।

ঘরে এমন কিছু নেই যা অতিথিশালায় পাঠাতে পারেন। লোকটি কি শ্রেণীর তা এখনও তিনি বুঝতে পারেন নি, সাধারণ শ্রেণীর বলেই মনে হচ্ছে। অন্ততঃ আধসের চালও তো দিতে হয়, কি করা যাবে সে-সম্বন্ধে পথ হাঁটতে হাঁটতে কেদার সেই কথাই ভাবতে লাগলেন।

বৃদ্ধ বললে, কতদূরে মশাই গড়শিবপুর ?

—এই বেশী নয়, ক্রোশখানেক হবে। আপনাদের বাড়ি কোথায় ?

—বাড়ি অনেকদূর, মেহেরপুরের কাছে, নদে জেলায়।

—কোথায় যাবেন ?

—দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। যেদিকে যখন ইচ্ছে, তখন সেদিকেই যাব—

—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, অভিনন্দ ঠাকুরের সন্তান, খড়দ মেল—আমার নাম শ্রীগোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

কেদারের বয়স হয়েছে, সুতরাং তিনি জানেন ব্রাহ্মণদের পরিচয় দেবার এই প্রথাই ছিল আগের কালে। তাঁর ছেলেবেলায় তিনি দেখে এসেছেন বটে। এমন লোককে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় না, নিজের ঘরে রেঁধে খাওয়াতে হয়।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে ব্রাহ্মণ বললে, রাজবাড়ি দেখিয়ে দিয়ে আপনি চলে যান, আমার সঙ্গে অনেকদূর তো এলেন—আর কষ্ট করতে হবে না আপনার—

—চলুন, আমিও সেই বাড়ি যাব, সেই বাড়ির লোক—

—আপনি রাজবাড়ির লোক.বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি—ইয়ে—

গড়ের খাল পেরিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিস্ময়ের চোখে দু-ধারের জঙ্গলে ভরা ধ্বংসস্তূপগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বললে—রাজবাড়ি কতদূর ?

কেদার কৌতুকের সঙ্গে বললেন, দেখতেই পাবেন, চলুন না—

দেউড়ির ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে নিজের চালাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেদার বললেন, এই রাজবাড়ি—আসুন—

বৃদ্ধ কেদারের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইলে।

কেদার হাসিমুখে বললেন, আমিই রাজবাড়ির রাজা—আমারই নাম কেদার রাজা—

ইতিমধ্যে শরৎ বার হয়ে বাবাকে কি বলতে এল, সকালে উঠে সে স্নান সেরে নিয়েছে, ভিজে চুলের রাশি পিঠময় ছড়ানো, গায়ের রঙের সুগৌর দীপ্তি রোদে দশগুণ বেড়েছে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে এই সুন্দরী মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল।

কেদার বললেন, আমার মেয়ে, ওর নাম শরৎসুন্দরী। প্রণাম করো মা, ব্রাহ্মণ অতিথি—

শরৎসুন্দরী বাবাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, তার পর, নিয়ে তো এলে, এখন উপায় ? ঘরে তো এক দানা চাল নেই। বেলাও হয়েছে, কি করি বলো ?

কেদার বললেন, যা হয় করো মা তুমি। আমি কিছু জানি নে—ওবেলা আমি বরং—

শরৎসুন্দরী রাগ করে নিজের গালে চড় মারতে লাগল। ফর্সা গাল রাঙা হয়ে গেল। মেয়ে এরকম প্রায়ই করে থাকে বেশী রাগ হলে—কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন, ও কি করো মা, ছেলেমানুষি ! না—ছিঃ—অমন করতে নেই।

শরৎ জলভরা চোখে রাগের ও ক্ষোভের সুরে বললে, আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিয়ে কি মাথায় ইঁট ভেঙে মরি, আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্যি হয় না বাবা। বেলা দুপুরের সময় তুমি এখন নিয়ে এলে ভদ্রলোক অতিথি, নিজেদের নেই খাবার যোগাড়—কি করবো—বলো বুঝিয়ে আমায়। নিত্যি তোমার এই কাণ্ড—কত বার না তোমায় বলেছি ?

কেদার চুপ করে রইলেন, বোবার শত্রু নেই। শরৎ তাঁর সামনে থেকে চলে গেলে তিনি অতিথির সঙ্গে এসে বসে গল্প করতে লাগলেন, কারণ শরৎ যে একটা যা হয় কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবেই এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। শরৎ রাগী তেজী মেয়ে বটে, কিন্তু

সব কাজে ওর ওপর বড় নির্ভর করা চলে অনায়াসে। খুব স্থিরবুদ্ধি মেয়ে।

শরৎ কোথা থেকে কি করলে তিনি জানেন না, আহারের সময় অতিথির সঙ্গে খেতে বসে দেখলেন, ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ হয় নি। এত বেলায় মাছও যোগাড় করে ফেলেছে মেয়ে।

আহারাদির পর কেদার বললেন, আচ্ছা গোপেশ্বরবাবু, চলুন একটু বিশ্রাম করবেন—

তারপর তিনি অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে অতিথিশালার দো-চালা ঘরখানাতে এলেন। এখানে একখানা কাঁঠাল কাঠের সেকেলে ভারি তক্তপোশ পাতা আছে অতিথির জন্যে। পাতার জন্যে একখানা পুরানো মাদুর ছাড়া অন্য কিছু নেই চৌকিখানার ওপর—দেবার সঙ্গতিও নেই তাঁর।

বৃদ্ধ বললেন, বসুন আপনিও। একটু গল্পগুজব করি আপনার সঙ্গে।

—আপনার গান-বাজনা আসে?

—সামান্য এক-আধটু। সে কিছুই নয়—

কেদার উৎসাহে উঠে পড়লেন চৌকি ছেড়ে। গানবাজনা জানে এ ধরণের লোকের সঙ্গ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এরকম লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া ভাগ্যের কথা।

বললেন, কি বাজনা আসে আপনার?

—কিছু না, তবলা বাজাতে পারি এক-আধটু—

—তা হলে আজ ওবেলা আপনাকে যেতে দেবো না গোপেশ্বরবাবু—আমাদের আড্ডায় আজ সন্ধ্যাবেলা আপনাকে নিয়ে একটু আমোদ করা যাবে—

—তা আপনি যখন বলছেন, আমায় থাকতে হবে রাজামশায়। আপনার অবস্থা এখন যাই হোক, আপনি গড়শিবপুরের রাজবংশের বড় ছেলে, এখানকার রাজা। আমি সব শুনেছি আসবার পথে। আপনার অনুরোধ না রেখে উপায় কি বলুন। আর আমার কোনো তাড়া নেই, দেশ দেখতেই তো বেরিয়েছি—

—পায়ে হেঁটে?

—পয়সাকড়ি কোথায় পাবো বলুন। পায়ে হেঁটে যত দূর হয় দেখছি। কখনো দূর দেশে যাই নি, কিছু দেখি নি ছেলেবেলা থেকে, অথচ বেড়াবার শখ ছিল। ভাবলুম বয়েস ভাঁটিয়ে গেল, এইবার বেরুনো যাক, হেঁটেই দেশ দেখবো। পয়সা কোন দিনই হবে না আমাদের হাতে। তা ধরুন ইতিমধ্যে নদীয়া জেলা সেরে ফেলেছি, এবার আপনাদের জেলায়—

—আপনার বয়েস হয়েছে, এরকম হেঁটে পারেন এখনও?

—বয়েস হলেও মনটা তো এখনও কাঁচা। কখনও কিছু দেখি নি বলেই যা দেখছি তাই ভাল লাগে। ভাল লাগলে হাঁটতে কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু আপনাকে দেখে আজ এত অবাক হয়ে গিয়েছি আমি, আর আপনাকে এত ভাল লেগেছে যে কি বলবো। সত্যিকার রাজদর্শন ভাগ্যি ছাড়া হয় না, আমার তাই হল আজ। আমিও আমুদে লোক রাজামশায়, আমোদ ভালবাসি বলেই বেরিয়েছি এই বয়সে।

—বেশ তো, এখানে দুচারদিন থেকে যান। আমোদ করা যাবে এখন। আপনার মত লোক পেলে—

—কি জানেন, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে নেনজার হয়ে পড়লুম রাজামশাই। দেশ ভ্রমণের শখ ছিল এন্তক লাগাৎ। কিন্তু যেতে পারিনে কোথাও—মনটা মাঝে মাঝে এমন হাঁপাতো! এই আমার বাষট্টি-তেষট্টি বছর বয়েস হয়েছে—আর বছর মেয়ে দুটিকে পাত্রস্থ করার পরে সংসারের ঝঞ্ঝাট অনেকটা মিটলো। তাই বলি কখনও কোথাও

যাই নি—বেড়িয়ে আসি একবার। এক বছর পথে পথে থাকবো—

—লাগছে ভাল এরকম হেঁটে বেড়ানো ?

—আহা, বড্ড ভাল লাগছে রাজামশায়। নদীর ধার, বটগাছের তলা, মাঠে যবের ক্ষেত, মেয়েদের ক্ষার-কাচা পিঁড়ির ওপরে, হয়তো কোন পুকুরের পাড়—যা দেখি তাতেই অবাক হয়ে থাকি। বড় ভাল লেগেছে আমার। যেখানে নদে জেলা শেষ হ'ল সেখানে একটা বড় শিমুল গাছ আছে রাস্তার ধারে। জেলার শেষ কখনো দেখি নি—হাঁ করে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম কতক্ষণ। বেশ রুদ্দুর তখন মাঠে, আকাশে বড় বড় চিল উড়ছে, কেউ কোনদিকে নেই। আমার এক বন্ধু ছিল, মারা গিয়েছে অনেক কাল, নাম ছিল কেশব—সেও দেশ দেখতে ভালবাসতো বড়। তার কথা মনে পড়লো—

কেদার বিস্ময়ে ও কৌতূহলের সঙ্গে বৃদ্ধের গল্প শুনছিলেন। তিনিও বেশীদূর কোথাও যান নি, অবস্থার জন্যেও বটে—তাছাড়া সংসার ফেলে নড়তে পারেন না। তাঁর বড় ইচ্ছে হ'ল মনে, নদে জেলা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই শিমুল গাছের তলাটাতে গিয়ে একবার দাঁড়ান। কখনও তিনি দেখেন নি জেলা কি করে শেষ হয়। বৃদ্ধের বর্ণনা শুনে মনে মনে অনেক দূরের সেই অদেখা শিমুল গাছের তলায় চলে গিয়েছে তাঁর মন।

জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা গোপেশ্বরবাবু, সেই যেখানে শিমুল গাছ, তার এপারে ওপারে তো দুই জেলা ? একহাত তফাতেই নদীয়া, এধারে আবার যশোর। ধরুন আমার যদি একখানা বেগুনের ক্ষেত থাকে সেখানে, একটা বেগুন গাছ থাকবে নদে জেলায়, আর দুহাত তফাতের বেগুন গাছটা হবে যশোর জেলায় ! ভারি মজা তো ? সেখানে এমন জমি আছে ?

বৃদ্ধ হেসে বললে, কেন থাকবে না ? ওদিকের জমি হবে কেষ্টনগর সদরের তৌজিভুক্ত, আর এদিকের জমি হবে যশোর বনগাঁ মহকুমায়—

—বাঃ বাঃ চমৎকার !

কেদারের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিস্ময়ে ও কৌতুহলে। তাঁর ইচ্ছে হ'ল জায়গাটা এখান থেকে কতদূর হবে জিজ্ঞেস করে নেন। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়লো বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার যো নেই তাঁর, শরৎকে একা এই বনের মধ্যে রেখে একদিনও তাঁর নড়বার উপায় আছে কোথাও ? ছেলেমানুষ শরৎ···

জেলার সীমা দেখা তাঁর ভাগ্যে নেই।···

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধকে নিয়ে কেদার ছিবাস মুদির দোকানে গিয়ে হাজির হলেন। রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে পুরোদমে গান-বাজনা চললো। সকলেই বৃদ্ধের হাতে তবলা বাজানোর প্রশংসা করলে। খুব দ্রুত এবং খুব মিঠে হাত। সেই আড্ডাতেই আবার এসে জুটলো জগন্নাথ চাটুজ্জে। কোন দিন আসে না, আজ কি ভেবে এসে পড়েছে কে জানে।

জগন্নাথ চাটুজ্জে মন দিয়ে খানিকক্ষণ গোপেশ্বরের বাজনা শুনে কেদারের কানে কানে বললে, ওহে কেদার রাজা, এ ভদ্রলোকটি বেশ গুণী দেখছি। এঁকে জোটালে কোথা থেকে হে ?

কেদার পরিচয় দিলেন। জগন্নাথ শুনে খুব খুশী। তাঁর ইচ্ছে কেদারের বাড়িতে এসে লোকটির সঙ্গে কাল সকালে আরও আলাপ জমান। কেদার বললেন, তা বেশ তো দাদা, আসুন না সকালে—

বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে গেল। রাত্রের আহারের ব্যবস্থা শরৎ ভালই করেছে। মেয়ের ওপর ভার দিয়ে কেদার নিশ্চিন্ত থাকেন কি সাধে ? কোথা থেকে সে কি করে, কেদার কোনদিন খবর রাখেন নি। সে রাগ করুক, ঝাল করুক, সংসারের কাজকর্ম্ম সব ঠিকমত করে যাবে, সে বিষয়ে তার ত্রুটি ধরবার উপায় নেই। ঠিক ওর মায়ের মত।

কেদার বোধ হয় একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন কি ভেবে।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে কেদারের সঙ্গে বাড়ির চারদিক বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেন। গড়ের এপারে ওপারে যে সব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ বনের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে, তার সবগুলির ইতিহাস কেদারেরও জানা নেই।

একটা পাথরের হাত-পা ভাঙা মূর্ত্তির চারিদিকে নিবিড় বেতবন।

গোপেশ্বর বললেন, এ কি মূর্ত্তি?

কেদার বলতে পারলেন না। বিভিন্ন মূর্ত্তি চিনবার বিদ্যা নেই তাঁর। বাপ-পিতামহের আমল থেকে শুনে আসছেন এখানে যে মূর্ত্তি আছে, অনেক দিন আগে মুসলমানদের আক্রমণে তার হাত পা নষ্ট হয়—কেউ বলে কালাপাহাড়ের আক্রমণে;—এ সব কিছু নয়, আসল কথা কেউ কিছু জানে না। বিস্মৃত অতীত কোন ইতিহাস লিখে রেখে যায় নি গ্রামের মাটির বুকে—সময় যে কি সুদূরপ্রসারী অতীত ও ভবিষ্যৎ রচনা করে মানুষের স্মৃতিতে, সে গহন রহস্য এসব গ্রামের লোকের কল্পনাহীন মনে কখনও তার উদার ছায়াপাত করে নি, পঞ্চাশ বছর আগে কি ঘটেছিল গ্রামে, তাও তারা যখন জানে না—তখন ঐতিহাসিক অতীতের কাহিনী তাদের কাছে শুনবার আশা করা যায় কি করে?

গড়ের বাইরে এসে কেদার একটা প্রাচীন বটগাছ দেখালেন। কেদারের বাড়ি থেকে জায়গাটা অনেক দূরে। গাছটার তলায় প্রাচীন আমলের বড় বড় শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্ট, মকরমুখ পয়োনালা ইত্যাদি এখানে ওখানে পড়ে আছে স্মরণাতীত কাল থেকে—গ্রামের কেউ বলতে পারে না সে-সব কোথা থেকে এল। বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জে এসব দেখে সেই ধরণের আনন্দ পেল, অধিকতর সচ্ছল অবস্থার ভ্রমণকারী দিল্লী আগ্রার মুঘলের কীর্ত্তি দেখে যে আনন্দ পায়।

কেদারকে বললে, রাজা মশায়, যা দেখলাম আপনার এখানে, জীবনে কখনও দেখি নি। দেখবার আশাও করি নি—এসব জিনিস কতকালের, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুনের সময়কার বোধ হয়। পাণ্ডবদের রাজ্য ছিল এখানে—না?

সেই রাত্রে বৃদ্ধের জ্বর হ'ল। পরদিন সকালে কেদার অতিথিশালায় এসে দেখলেন বিছানা থেকে উঠবার ক্ষমতা নেই বৃদ্ধের। সারাদিন জ্বর ছাড়ল না—সন্ধ্যার পরে তার ওপর আবার ভীষণ কম্প দিয়ে জ্বর এল। কেদার পড়ে গেলেন মুশকিলে। তাঁর বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সর্ব্বদা রোগীর কাছে থাকতে হয়, কখনও তিনি কখনও শরৎ।

সাতদিন এভাবে কাটল। কেদার পাশের গ্রাম থেকে সাতকড়ি ডাক্তারকে এনে দেখালেন, বৃদ্ধের জ্ঞান নেই—তার বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একখানা চিঠি দেবেন তার আত্মীয়-স্বজনকে, তার সুযোগ পেলেন না কেদার। শরৎ যথেষ্ট সেবা করলে এই বিদেশী অতিথির। ঠিক সময়ে দুটি বেলা বৃদ্ধের পথ্য প্রস্তুত করে নিজের হাতে তাকে খাইয়ে আসা, বাপের স্নানাহারের সুযোগ দেবার জন্যে নিজে রোগীর পাশে বসে থাকা, নিজের বাবার অসুখ হলেও শরৎ বোধ হয় এর চেয়ে বেশী করতে পারত না।

ন'দিনের পর বৃদ্ধের জ্বর ছেড়ে গেল। পথ্য পেয়ে আরও এক সপ্তাহ বৃদ্ধ রয়ে গেল অতিথিশালায়—কেদার কিছুতেই ছাড়লেন না, এ অবস্থায় তিনি অতিথিকে পথে নামতে দিতে পারেন না। বাড়িতে চিঠি দিতে চাইলে বৃদ্ধ ঘোর আপত্তি তুললে। বললে, কেন মিছে ব্যস্ত করা তাদের? স্ত্রী নেই, মেয়ে নেই—থাকবার মধ্যে আছে ছেলে দুটি আর ছেলের বৌয়েরা—তাদের অবস্থা ভালও নয় বিশেষ, তাদের বিব্রত করতে চাই নে।

পরের সপ্তাহে বৃদ্ধ বিদায় নিয়ে চলে গেল। শরৎ পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে

বৃদ্ধের চোখে জল দেখা দিল। শরতের মাথায় হাত দিয়ে বললে, এমন সেবা আমার আপনার লোক কখনো করে নি। আমার পয়সা নেই, পয়সা থাকলে হয়তো তারা করতো। তুমি যে বড় বংশের মেয়ে তা তোমার অন্তর দেখেই বোঝা যায়। তুমি আমার যা করলে, কখনো তা পাই নি কারো কাছ থেকে। তোমায় আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো মা, ভগবান যেন তোমায় দেখেন।

কেদার বললেন, আপনি কি এখন বাড়ি যাবেন?

—না রাজামশায়—বেরিয়ে পড়েছি যখন, তখন ভাল করে সব দেখে নিই। অনেক কিছু দেখলাম আরও অনেক কিছু দেখব। আপনাকে আর মাকে যা দেখলাম এই তো আমার কাছে একেবারে নতুন। বাড়ি থেকে না বেরুলে কি আপনাদের মত মানুষের দর্শন পেতাম? ফেরবার পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে যাবো না।

অনেক দিন পরে বাড়ি থেকে বেরুবার অবকাশ পেলেন। বৃদ্ধের অসুখ সেরে গেলেও রুগ্ন অতিথিকে একা ফেলে কেদার কোথাও যেতে পারতেন না বড় একটা। সর্ব্বদা কাছে বসে কথাবার্ত্তা বলতেন। আজ একটা বড় দায়িত্বের বোঝা যেন ঘাড় থেকে নেমে গেল।

ছিবাস মুদির দোকানের আড্ডায় জগন্নাথ চাটুজ্জে বললে—আরে এই যে কেদার রাজা, এসো এসো—কি হ'ল, অতিথি চলে গেল? যাক্, বাঁচা গিয়েছে—আচ্ছা অতিথি জুটিয়েছিলে বটে! বাপরে, একেবারে একটি মাসের মত জুড়ে বসলো—যাবার নামটি করে না।

কেদার হেসে বললেন, কি করে যায় বলো—বেচারী এসেই পড়ে গেল অসুখে। লোক বড় ভাল, তার কোনো ত্রুটি নেই। তার পর, জগন্নাথ-খুড়ো—এখানে কি মনে করে? তোমাকে তো দেখিনে এখানে আসতে?

জগন্নাথ বললে, মাঝে মাঝে আসি আজকাল। একা বাড়ি বসে থাকি আর ওই একটু সতীশের দোকান নয় তো পঞ্চানন বিশ্বেসের বাড়ি—কোথায় যাই বলো আর? একটু বেহালা ধরো দিকি হে বাবাজী—তোমার বাজনা শুনি নি অনেক দিন।···

শরৎ সন্ধ্যাবেলায় উত্তর দেউলে প্রতিদিনের মত প্রদীপ দিতে গেল। দীঘির পশ্চিম পাড় ঘুরে সেই বড় বড় ছাতিম গাছতলা দিয়ে প্রায় তিন রশি পথ যেতে হয়—বড্ড বন এখানটাতে। বাদুড়নখীর জঙ্গলে শুকনো বাদুড়নখী ফল আঁকড়ে ধরে রোজ শরতের পরনের কাপড়। রোজ ছাড়াতে হয়।

যে গম্বুজাকৃতি মন্দিরটার নাম 'উত্তর দেউল', সেটা একেবারে এই পায়ে চলা সরু পথের পাশেই, গড়ের খালের ধারের ধ্বংসস্তূপ থেকে একটু দূরে, স্বতন্ত্র ভাবে দণ্ডায়মান। বাদুড়নখীর কাঁটাজাল ভেঙে পথটা এসে একেবারে মন্দিরের ভাঙা পৈঠায় উঠেছে। মাটি থেকে খুব উঁচু রোয়াক, তার ওপর গোল গম্বুজাকৃতি মন্দির—দুটি কুঠুরি পাশাপাশি। কি উঁচু ছাদ!—শরতের মনে হয় মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই। চামচিকের বাসা—দোর খুলতেই খোলা দরজা দিয়ে একপাল চামচিকে উড়ে পালালো। ভেতরের কুঠুরিতে বেশ অন্ধকার। গা ছমছম করে সাহসিকার, তবুও তো ওর হাতে মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্ জ্বলছে, আঁচল দিয়ে আড়াল করে আনতে হয়েছে পাছে বাতাসে নেবে। আলো হাতে ভয় কিসের?

হঠাৎ যেন পাশের কুঠুরিতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল অন্ধকারে। শরতের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল—তবুও সে সাহসে ভর করে কড়া-সুরে হেঁকে বললে—কে ওখানে?

ওর হাত কাঁপছে!···

কোনো সাড়া না পেয়ে শরৎ সাহসে ভর করে আর একবার ডেকে বলল—কে পাশের

ঘরে ? সামনে এসো না দেখি ?

ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পাশের কুঠুরির ওদিকের কবাটবিহীন দোর দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল—বাইরের চাতালে তার পায়ের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা গেল।

শরৎ মন্দিরের মেঝেতে মাটির পিলসুজে বসানো প্রদীপটা জ্বালাতে জ্বালাতে আপন মনে বকতে লাগল—দোগেছের শ্মশান তোমাদের ভুলে রয়েছে ? মুখপোড়া বাঁদরের দল—বাড়িতে মা-বোন নেই ?

ওর আগের ভয়টা একেবারে সম্পূর্ণ কেটেছে। ব্যাপারটা অপ্রাকৃতের শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বাস্তবের গণ্ডির মধ্যে এসে পেঁচিছে। দু-পাঁচ মাস অন্তর, কখনো বা উপরি উপরি দু-তিন মাস ধরে—এক-একদিন এরকম কাণ্ড উত্তর দেউলে সন্ধ্যাবেলা আলো দিতে এসে ঘটেই থাকে। গ্রামের বদমাইশ কোনো ছেলে-ছোকরার কাণ্ড। এমন কি, কার কাণ্ড শরৎ খানিকটা মনে মনে সন্দেহও করতে পারে—তবে সেটা অবিশ্যি সন্দেহ মাত্রই।

শরৎ এসবে ভয় খায় না, ভয় খেতে গেলে তার চলেও না। দরিদ্রের ঘরে সুন্দরী হয়ে যখন জন্মেছে, তখন এ রকম অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হবে, সে জানে। বাবার তো সে-সব জ্ঞান নেই, সেই যে বেরিয়েছেন কখন তিনি ফিরবেন তার ঠিকানা আছে ? একাই এই নিবান্দা পুরীর মধ্যে যখন থাকা, তখন ভয় করে কি হবে ? আসুক না কার কত সাহস, বঁটি নেই ঘরে ? বঁটি দিয়ে নাক যদি কেটে দুখানা না করে দিই তবে আমি গড়শিবপুরের রাজবংশের মেয়ে নই ! পাজি, বদমাইশ সব কোথাকার !

প্রদীপ দেখিয়ে যখন সে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালে—তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভাল করে নেমেছে। ওই দীঘির পাড়ের ছাতিমবনটা বড্ড অন্ধকার হয়ে পড়ে এ সময়—ওখানটাতে ভয় যে না করে এমন নয়। শরৎ যে-প্রদীপটা হাতে করে এনেছিল, সেই প্রদীপটা প্রাণপণে আঁচল দিয়ে বাঁচিয়ে বাদুড়নখীর কাঁটাজঙ্গলের পথ বেয়ে চলে গেল—শুকনো ফলের থোলো নাড়া পেয়ে ঝম্‌ঝম্‌ করছে—দু-একবার ওর কাপড় পেছন থেকে টেনেও ধরলে বাদুড়নখী ফলের বাঁকা ঠোঁট—দু-একবার ও ছাড়িয়েও নিলে।

বাড়ি পেঁছে যদি রাজলক্ষ্মীকে দেখতে পেতো, খুব খুশী হ'ত সে, কিন্তু সে পোড়ারমুখী আসে নি। শরৎ রান্নাঘরে ঢুকে উনুন জেলে রান্না চড়িয়ে দিলে।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে ছিল এতদিন, শরতের বেশ লাগতো। বাপের বয়সী বৃদ্ধকে সেবা করে আনন্দ পেতো সে—কেদার সে-রকম নন, তিনি সেবা তেমন কখনও চান না। তা ছাড়া নির্জন পুরীতে দু-একজন মানুষের মুখ যদি দেখা যায়, সে ভালই।

শরৎ সেবা করতে ভালবাসে, পছন্দ করে। জীবনে যেটা সে চেয়েছিল, তাই তার হ'ল না। স্বামীর কথা তার ভাল মনে হয় না, সেদিক থেকে আর মন শূন্য—সে মন্দিরের সোপান-বেদীতে কোনো দেবতা নেই—তাদের গড়ের উত্তর দেউলের মতই।

সেজন্যে শরৎ স্বাধীন আছে এখনও— সম্পূর্ণ স্বাধীন। মনের দিগন্তে এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে।

বেশী রাত এখনও হয় নি, শরৎ ডাল সবে নামিয়েছে—এমন সময় কেদার বাড়ি এলেন।

শরৎ হাসিমুখে বললে, এত সকালে যে বাড়ি ফিরলে ? আবার যাবে বুঝি ?

কেদার শান্তভাবে বললেন, না আর যাবো না—তবে—

—না বাবা, আজ আর যেও না—

কেদার একটু অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন। ওর গলার সুরের মধ্যে বোধ হয় কি পেলেন।

—কেন বলো তো মা ?

—এমনি বলছি—থাকো না বাড়িতে। সকাল সকাল খেয়ে নাও—রান্না হয়ে গেল, একটু চা করে দেবো নাকি ?

কেদার চা খেতে তেমন অভ্যস্ত নন, মেয়েও এত আদর করে তাঁকে চা খেতে বলে না কোনোদিন। ইতস্ততঃ করে বললেন, তা কর না হয়—খাওয়া যাক। তুইও খা একটু—

—আজ একটা গল্প করো না বসে আমার কাছে ? করবে ? ভাল কথা, সন্ধ্যে-আহ্নিকটা সেরে নাও দিকি ? জায়গা করে দিই।

মেয়ে মুশকিলে ফেললে দেখা যাচ্ছে। কেদার একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি আসলে এসেছিলেন খানিকটা রজন সংগ্রহ করতে বেহালার ছড়ে দেবার জন্যে। ছিবাস মুদির আড্ডায় রজন ছিল, ফুরিয়ে গিয়েছে কিংবা হারিয়ে গিয়েছে। এত রাত্রে এ গ্রামের আর কোথাও ও জিনিস পাওয়া গেলে কেদার কখনই বিপদের মুখে পা দিতেন না। করাই বা যায় কি ? অগত্যা কেদার সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গও করে ফেললেন। তার পর তিনি ভাবছেন এখন কি ভাবে বাইরে যাওয়া যায়। শরৎ আবার আবদারের সুরে বললে—বাবা, বল একটা গল্প—আজ তোমাকে যেতে দেবো না—

কেদারের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। আজ শরৎ যেন ছেলেমানুষের মত হয়েছে। কতদিন শরতের গলায় এমন আবদারের সুর তিনি শোনেন নি। এমনি অন্ধকার রাত্রে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীমণি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিল গরুর গাড়ি করে। শরৎ তখন ছ-মাসের শিশু। কেদার চিরদিনই এক রকম বাইরে বাইরে ফেরেন—বাড়িতে কেদারের আপন বৃদ্ধা জ্যাঠাইমা ছিলেন—তিনি কানে অত্যন্ত কম শুনতেন। লক্ষ্মীমণি ও তার বাপের বাড়ির গাড়োয়ান অনেক ডাকাডাকি করেও বৃদ্ধার ঘুম ভাঙাতে পারে নি। অগত্যা তার ঘরের দাওয়াতেই বসে ছিল কেদারের আগমনের অপেক্ষায়।···

রাত এগারটার সময় কেদার গানবাজনার আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন এই কাণ্ড। কেদারের মনে আছে, লক্ষ্মীমণি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর কোলে ছ-মাসের মেয়েকে তুলে দিয়েই কৌতুকে আমোদে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

—কেমন, বড্ড যে মেয়েকে ঘেন্না করতে !···মেয়ে যেন হয় না, হলে গড়ের পুকুরে ডুবিয়ে মারব !···ইস, মার না দেখি ডুবিয়ে ?

সেই নবযৌবনা রূপবতী স্ত্রীর মুখের হাসি আজও মাঝে মাঝে যেন কানে বাজে···তখন পৃথিবী ছিল তরুণ, তিনি ছিলেন তরুণ, লক্ষ্মীমণি ছিল তরুণী। আর একজন এসেছিল তারপর···কিন্তু থাক, তার কথা কেদার এখন ভাববেন না।

সেই মেয়ে শরৎ—সেই ছোট্ট শিশু ! কি সুখে তাকে রেখেছেন কেদার ?

শরৎ চা করে এনে দিলে।

—শুধু চা খেও না, দাঁড়াও কি আছে দেখি।

—দুটো বড়ি ভেজে কেন দ্যাও না, সে বেশ লাগে আমার—

শরৎ একটু আচারনিষ্ঠ মেয়ে, ভাতের শকড়ি কড়াতে সে বড়ি ভেজে এখন চায়ের সঙ্গে দিতে রাজী নয় বাবাকে। বাবা নিতান্ত নাস্তিক, তাঁর না আছে ধর্ম্ম—না আছে কর্ম্ম—বাবার ওসব ম্লেচ্ছাচার শরৎ পছন্দ করে না আদৌ।

—বড়ি আবার এখন কি খাবে, হেঁসেলের জিনিস—দুটি মুড়ি মেখে দিই তার চেয়ে।

কেদার অগত্যা মুড়ির বাটি নিয়ে বসলেন।

না, আজ আর আড্ডায় যাওয়া গেল না। শরৎ তাঁর মনকে বড় অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। ভাল রজন নিতে এসেছিলেন তিনি !

—আচ্ছা বাবা, উত্তর দেউলের কথা যে লোক বলে—তুমি কিছু জানো ?

—বলে, শুনে আসছি এই পর্যন্ত, নিজে কিছু দেখিও নি, কিছু শুনিও নি। তবে বাবার মুখেও শুনেছি, ঠাকুরদাদাও বলতেন—আমাদের বংশেও প্রবাদ চলে আসছে চিরদিন থেকে—

—বল না বাবা, কি কথা—

—তুমি তো জানো, সবই তো শুনে আসছ আজন্ম। থাক ও কথা এখন এই রাত্তির বেলা। কেন বল্‌তো মা, উত্তর দেউলের কথা উঠল কেন মনে হঠাৎ ?

—কিছু না, এমনি বলছি—

—আজ পিদিম দিয়ে এসেছ তো ?

—ওমা, তা আবার দেবো না ! কবে না দিই। এমনি মনে হ'ল তাই বলছি—

আজকার সন্ধ্যার ব্যাপারটা বাবার কাছে বলা উচিত কি না শরৎ অনেকবার ভেবেছে। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করে ফেলেছে বাবাকে কিছু বলবে না। বাবা ঐ এক ধরনের লোক, বালকের মত আমোদপ্রিয়, সরল লোক—সংসারের কোন কিছু গায়ে মাখেন না—মাখা অভ্যেসও নেই। তিনি শুনবেন, শুনে ভয় পাবেন, উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারবেন না। দুদিন পরে আবার সব ভুলে যাবেন। তাঁকে বলে কোনও লাভ নেই।

তা ছাড়া একথা প্রকাশ হলেও এ-সব পাড়াগাঁয়ে অনেক ক্ষতি আছে। কে কি ভাবে নেবে তার ঠিক কি ? এ থেকে কত কথা হয়তো ওঠাবে লোকে। বাবা পেটে কথা রাখতে পারেন না, এখুনি গিয়ে ছিবাস কাকার দোকানে গল্প করবেন এখন। দরকার কি সে-সব গোলমালে ?

কেদার অবশেষে একটা গল্প বললেন—মেয়ের আব্দার রাখার জন্যেই। এ গল্প এদেশে অনেকে জানে। তাঁর নিজের বংশের ইতিহাসেরই হয়তো—কেদার কিছু খোঁজ রাখেন না। কোন পাঁজি-পুঁথিতে কিছু লেখা নেই।

গড়ের বড় দীঘিটার নাম কালো পায়রার দীঘি। এ বাদে আরও দুটো দীঘি আছে ছাতিমবনের ওপারে—একটার নাম রাণীদীঘি—একটার নাম চালধোয়া পুকুর। ও দুটো পুকুরেই অনেক পদ্মবন আছে—কালো পায়রার দীঘি অর্থাৎ যেটাতে কেদার প্রায়ই গণেশ মুচির সঙ্গে মাছ ধরে থাকেন—সেটাতে কোন ফুল নেই পাটা-শেওলার দাম ছাড়া।

বহুকাল আগে—কতকাল আগে কেদারের কোন ধারণাই নেই—তাঁর কোন পূর্বপুরুষের সঙ্গে মুসলমান ফৌজদারের দ্বন্দ্ব বাধে। চাকদহের নিকট যশড়া ও হাট জগদলের যে যুদ্ধের প্রবাদ আজও ছড়ার আকারে এই সব গ্রাম-অঞ্চলে প্রচলিত, কেদার শুনেছেন সে ছড়ার মধ্যে উল্লিখিত রাজা দেব রায় ও ভুমিপাল রায় তাঁরই বংশের পূর্বপুরুষ।

হাট জগদলে পানি প্যালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—
দেবরায়ের সেপাই যে ভাই যমদূতের চ্যালা
ভুঁইপালের তীরন্দাজে দেয় বড় ঠ্যালা—
(ও ভাই) হাট জগদলে পানি প্যালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—

বিপদে পড়ে রাজা দেব রায় গৌড়ে যান দরবার করতে, বাড়িতে বলে গিয়েছিলেন যদি মঙ্গলের সংবাদ থাকে তবে সঙ্গের শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু যদি অশুভ কিছু ঘটে, তবে কৃষ্ণ পারাবত উড়ে আসবে। সংবাদ শুভ হলেও কার ভুলক্রমে কৃষ্ণ পারাবত উড়িয়ে দেওয়া হয়। মহারাণী অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে গড়ের মধ্যের বড় দীঘির জলে আত্মবিসর্জন করে বংশের সম্মান রক্ষা করেন।

রাজা জয়ী হয়ে ফিরে এসে যখন দেখলেন তাঁর অসতর্কতার পরিণাম—তিনি আর রাজকর্ম্ম পরিচালনা করেন নি, ভাইয়ের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে তিনি নাকি উত্তর দেউলে বারাহী দেবীর বেদীমূলে বসে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন।

এ অঞ্চলে প্রবাদ, উত্তর দেউলে এক বিশালকান্তি পুরুষকে কখনো কখনো নাকি দেখা গিয়েছে—হাতে তাঁর বেত্রদণ্ড, মুখে তর্জ্জনী স্থাপন করে তিনি চিত্রার্পিতের মত উত্তর দেউলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এসব শোনা-কথা মাত্র। কেউ এমন কথা বলতে পারে না যে, সে নিজের চোখে কিছু দেখেছে।

অথচ গ্রাম্য লোক ভয় পায়, সন্ধ্যার পর উত্তর দেউলের ওদিকে কেউ বড় একটা যাতায়াত করে না।

কেদারও কিছু জানেন না, অপর পাঁচ জনে যা জানে, তিনি তার বেশী কিছু জানেন না, জানবার কোন চেষ্টাও করেন নি। আর কে-ই বা বলবে ?

শরৎ বললে, বাবা, এসব কত দিনের কথা ?

—তা কি করে বলবো রে পাগলী ? আমি কি দেখেছি ?

—রাণীর নাম কি ছিল বাবা ?

—কি করে বলবো মা ?...ইয়ে তা হলে আমি এখন—

—আচ্ছা বাবা, তিনি আমার সম্পর্কে কেউ নিশ্চয় হতেন—আমাদেরই বংশের তো—

কেদার একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—এখনও যদি ছিবাস মুদির দোকানে গিয়ে পেঁছুতে পারেন—রাত বেশী হয় নি এখনও।

তিনি অধীর ভাবে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবেন বৈকি—তোমার ঠাকুরমা-টাকুরমা হতেন আর কি—

শরৎ হেসে বললে, ঠাকুরমা কি বাবা, সে হ'ল কোন্ যুগের কথা—তোমার মা-ই তো আমার ঠাকুরমা হতেন।

কেদারের মন এখন অত কুলজী-নির্ণয়ের দিকে নেই। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ রান্নাটা নামিয়ে রাখো—আমি আসছি চট্ করে—

—এত রাত্তিরে তোমায় বাবা আর যেতে হবে না। না, থাকো আজ—

—কেন, তোর ভয় করছে নাকি মা ?

—হ্যাঁ তাই। থাকো আজকে—

কেদার একটু আশ্চর্য্য হলেন, শরৎ কোনোদিন এমন করে বাধা দেয় না। গল্প-টল্প শুনে ভয় পেয়েছে ছেলেমানুষ। থাক, আজ আর তিনি যাবেন না। রজন্ আনতে বাড়ি এসে যে ভুল তিনি করে ফেলেছেন, তার আর চারা নেই।

শরৎ বললে, বাবা, সেই কলসীটার কথা মনে আছে ?

—হ্যাঁ খুব আছে। কলসীটা কোথায় রে ?

—রাজলক্ষ্মীদের বাড়িতে চেয়ে নিয়েছিল দেখবার জন্যে। সেখানেই আছে।

—নিয়ে এসে রেখে দিও, নিজের জিনিস বাড়িতে রাখাই ভালো।

আজ বছর ছ'সাত আগে একটা মাটির কলসী গড়ের খাতের মধ্যে এক জায়গায় পাওয়া যায়—কলসীটার ওপরে নানারকম ছক্ কাটা, নক্সা আঁকা—কেদারই কলসীটা প্রথমে দেখতে পান, টাকাকড়ি পোঁতা আছে হয়তো পূর্ব্বপুরুষের—প্রথমটা ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষে কলসীটা খুঁড়ে বের করে আধ খুঁচিটাক কড়ি পান তার মধ্যে।

গ্রামের হীরু ও সাধন কুমোর দেখে বলেছিল—এ পোড়ের কলসী আজকাল আর হয় না,

এমন ধরনের আঁকাজোকা কলসীর গায়ে। এসব বাবাঠাকুর অনেক কাল আগের জিনিস। এ পোড়ই আলাদা—খুব ওস্তাদ কুমোর না হলে এমন পোড় হবে না বাবাঠাকুর।

গড়ের খালের খুব নিচের দিকে, যেখানে জল প্রায় মজে এসেছে, সেখানে একদিন মাছ ধরতে বসে কেদার কলসীটা দেখতে পেয়েছিলেন। ওঃ, টাকার কলসী পেয়ে গিয়েছেন বলে কি খুশি কেদারের! শরতের মা লক্ষ্মীমণি তখনও বেঁচে।

লক্ষ্মী ছুটে এল—কি গা কলসীটাতে?

এর আগে কেদার বলে গিয়েছিলেন যে একটা কলসীর কানা বেরিয়েছে গড়ের খালের পাড়ে। অনেক নিচের দিকে পাড়ের।

কেদার হাসতে হাসতে বললেন, এক হাঁড়ি মোহর—নেবে এসো—

লক্ষ্মীর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেখাতো পঁচিশ বছরের যুবতীর মত। গায়ের রঙের জলুস এই দু-বছর আগেও মরণের দিনটি পর্যন্ত ছিল অম্লান। এই মেয়ে হয়েছে ওর মায়ের মত অবিকল—কিন্তু লক্ষ্মীর মত অত জলুস নেই গায়ের রঙের—তার কারণ কেদার নিজে তত ফর্সা নন—শ্যামবর্ণ।

লক্ষ্মী এসে হাসিমুখে কড়িগুলো নিয়ে গেল। বললে, জানো না লক্ষ্মীর কড়ি, পয়মন্ত কড়ি—আমাদের বংশের কেউ হয়তো পুঁতে রেখে থাকবে কতকাল আগে—যত্ন করে তুলে রেখে দিই—

কেদার জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে—ভালো কথা, কলসীর সেই কড়িগুলো কোথায় আছে?

—লক্ষ্মীর হাঁড়ির মধ্যে মা-ই তো রেখে গিয়েছিল, সেখানেই আছে।

কেদারের মনটা আজ হঠাৎ কেমন আর্দ্র হয়ে উঠেছে, আশ্চর্যের ব্যাপার বটে! তিনি একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, দেখে এসো না মা, আছে তো ঠিক—যাও না—

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শরৎ মুখের হাসি গোপন করলে, আহা, হাসিও পায়, দুঃখও হয় বাবার জন্যে। মা মারা যাবার পরে বাবা মায়ের কোন জিনিস ফেলতে পারেন না, মায়ের ভাঙা চিরুনিখানা পর্যন্ত। তবে সব সময় তো খেয়াল থাকে না, ভোলা মহেশ্বরের মত বাইরে বাইরে ঘোরেন কিন্তু মাঝে মাঝে হয়তো মনে পড়ে যায়। শরতের বয়স হ'ল পঁচিশ-ছাব্বিশ—সে সব বোঝে।

বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই বিশেষ করে শরৎ উঠে গেল লক্ষ্মীর হাঁড়ি দেখতে—সে ভালরকমই জানে—কড়িগুলো আছে ওর মধ্যে। কিন্তু বাবার ছেলেমানুষের মত স্বভাব, যখন যা ধরবেন তাই।

সে দেখে ফিরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কেদার জিজ্ঞেস করলেন, রয়েছে দেখলি?

শরৎ আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললে, হ্যাঁ বাবা, রয়েছে।

—আর সেই কলসীটা কালই নিয়ে আয় ওদের বাড়ি থেকে। সেখানে এতদিন ফেলে রাখে? তোর জিনিসপত্রের যত্ন নেই।

—তুমি ভেবো না বাবা, কালই আনবো।

আজ বাবার হঠাৎ খেয়াল চেপেছে তাই, নইলে আজ পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে কোনো দিন কলসীটার কথা বাবা তো এক দিনও বলেন নি। আজও তো সে-ই আগে তুলেছিল ওকথা, তাই এখন বাবার বড্ড দরদ কলসীর ওপর, কড়ির ওপর। কেদার নিশ্চিন্ত হয়ে এক ছিলিম তামাক ধরালেন। কলসীর কথা ওঠাতে তাঁর মনে পড়লো, বনে-জঙ্গলে ঘোরেন তিনি এই বিশাল গড়ের হাতার মধ্যে, খালের এপারে বা ওপারে জলের মধ্যে আরও দু-একটা জিনিস দেখেছেন, যার অর্থ তিনি করতে পারেন নি।

যেমন একবার, আজ দশ-পনেরো বছর আগে, গড়ের বাইরে যে বড় মজা দীঘির নাম চালধোয়া পুকুর, তার ধারে কি করতে গিয়ে কেদার একটা বাঁধা-ঘাটের চিহ্ন দেখতে পান। কত কাল আগের বাঁধাঘাট কে বলবে ? কয়েকটা মাত্র ধাপ তার অবশিষ্ট আছে—বাকীটা হয়তো মাটির মধ্যে পোঁতা।

একবার তিনি কিছু পুরোনো ইট বিক্রি করেন, গড়ের খালের এপারের একটা বড় পাঁচিলের ইট। বহুকাল থেকে স্তূপাকার হয়ে পড়ে ছিল—তার ওপরে গজিয়েছিল বন-গাছের জঙ্গল। ইটের ঢিবি খুঁড়তে খুঁড়তে যখন সব ইটের স্তূপ শেষ হয়ে গেল—তখন সমতল মাটির আরও হাত-তিনেক নিচে আর কতকগুলো ইটের সন্ধান পাওয়া গেল। সে জায়গাটা খুঁড়ে দেখা গেল মাটির নিচে একটা মন্দিরের খানিকটা অংশ যেন চাপা পড়ে আছে।

তখন সে ইটগুলোও খুঁড়ে তোলবার জন্যে বন্দোবস্ত করা হ'ল। আরও হাত-দুই খুঁড়ে খুব বড় একটা পাথরের মাথা বেরিয়ে পড়ল। আর খোঁড়া হয় নি—এখন সে-সব আবার বনে ঢেকে গিয়েছে। কেদারের মনে হয়েছিল, ওখানে একটা মন্দির ছিল বহুকাল আগে—কতকাল আগে তা অবিশ্যি তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি। অনেকগুলো নক্সাকাটা ইট বেরিয়েছিল ওখান থেকে। কিসের মন্দির তাও কেউ জানে না।

ওই বাড়ির চারিপাশে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কত দীঘি, দেউল, ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে আত্ম-গোপন করে আছে আজ কত কাল কত যুগ ধরে, দুর্ভেদ্য বেতবনের আড়ালে, জগডুম্বুর গাছের আঁকাবাঁকা শেকড়ের নিচে; দুশো বছরের সঞ্চিত চামচিকের নাদির মধ্যে থেকে বিরাট শিবলিঙ্গ কোথাও মাথাটি মাত্র জাগিয়ে আছেন—হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি ছাতিমবনের নিবিড় ছায়ায় অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে কতকাল।

শরৎ এসব জানে। নিজের চোখেও দেখে আসছে আবাল্য, রাজলক্ষ্মীর ঠাকুরদাদা বৃদ্ধ শ্রীনাথ চাটুজ্জের মুখে সে অনেক কথা শুনেছে, যা তার বাবাও কোনদিন বলেন নি। শ্রীনাথ চাটুজ্জে অনেক খবর রাখতেন।

—ভাত দিই বাবা, রাত হয়ে গিয়েছে অনেক—

—কেমন গল্প শুনলি, হল তো ?

—উত্তর দেউলের কথা ভুলে গিয়েছ দিব্যি।

—ভুলবো কেন, ওই যে বললাম—

—দেবীমূর্ত্তির কথা বললে না যে—

—সেও তো শোনা কথা। কালাপাহাড় না কে…দেবীর মূর্ত্তি ভেঙেচুরে মন্দির থেকে ফেলে দেয় টান মেরে—।

—ভাদ্র মাসের অমাবস্যেতে দেবীমূর্ত্তি নাকি—

—কে দেখতে গিয়েছে মা ? চোখে কেউ দেখেছে ? ওসব গুজব। পাষাণের অতবড় মূর্ত্তিটা অমনি জাগ্রত হয়ে ঠেলে উঠে চলতে শুরু করে—হ্যাঃ—

শরৎ সাহসিকা মেয়ে, তবুও বাবার কথায় যে ছবি তার মনে জাগলো—তাতে সে শিউরে উঠলো, কারণ সে শুনে এসেছে সে-সময় যে সঞ্চরণশীল জাগ্রত পাষাণ মূর্ত্তির সামনে পড়ে, তার সেদিন বড়ই দুর্দ্দিন।

না, ওসব কথায় তার ভয় হয়; তাড়াতাড়ি সে বাবাকে বললে, থাক থাক বাবা, ওসব কথায় আর দরকার নেই। তোমার কি, রাতদুপুর পর্য্যন্ত ফেলে রেখে যাবে, মরতে আমিই মরি আর কি।

মশা বিন্‌বিন্‌ করছে জঙ্গলের মধ্যে। খালি গায়ে ঘরের মধ্যে বসা কষ্ট। কলাবাদুড়

ঝুলছে তালকাঠের আড়া থেকে। বাইরের বাতাসে কি বনফুলের সুগন্ধ!

কেদার আহারে বসে অভ্যাসমত এ-তরকারী ও-তরকারীর দোষ খুঁত বার করতে করতে খেতে লাগলেন। কাঁচকলা রান্না বড় শক্ত কথা, বেগুনের তরকারীতে অত ঝাল দেওয়া সে কোথা থেকে শিখেছে ইত্যাদি। খেয়ে উঠে তামাক সাজতে গিয়ে কেদার দেখলেন তামাক একদম ফুরিয়ে গিয়েছে। মেয়ে আজকাল অত্যন্ত অমনোযোগী, কাজকর্মে আর আগের মত মন নেই—যদি থাকতো তবে তামাক ফুরিয়ে যাওয়ার একদিন আগে লক্ষ্য করে নি কেন? এখন তিনি তামাক কোথায় পান এত রাত্রে?

শরৎ বললে, আচ্ছা বাবা, তোমার তামাক খেতে পেলেই তো হ'ল? কল্‌কেটা দাও—

—কোথায় পাবি তামাক?

—তোমার সে খোঁজে দরকার কি? দেখি কল্‌কেটা—

অসময়ের জন্যে সে প্রতিদিনের তামাক থেকে একটু একটু নিয়ে একটা ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বাবার কাণ্ড তার জানতে বাকী নেই, এই রকম রাতদুপুরে তামাক ফুরিয়ে যাবে হঠাৎ। বকুনি খেতে হবে সে-সময় তাকেই। বকুনির চেয়েও তার দুঃখ হয় যখন বাবার কোনো জিনিসের অভাব ঘটে—কোনো কিছুর জন্যে তিনি কষ্ট পান।

শরৎ তামাক সেজে এনে দিলে। কেদার তামাক পেয়েই সন্তুষ্ট, মেয়েকে আর বিশেষ জেরা করলেন না এ নিয়ে। রাত অনেক হয়েছে—আর এখন শয্যা আশ্রয় করলেই তিনি বাঁচেন। শরৎ সারাদিন খাটে, রাত্রে বিছানায় একবার শুয়ে পড়লে তার জ্ঞান থাকে না। আর এক ছিলিম তামাক চেয়ে রাখলে হ'ত ওর কাছ থেকে, কিন্তু কেদার ভরসা পেলেন না।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে শরতের মনে হয়, আর সে ভাঙাচোরা গড় নেই, কি সুন্দর রাজবাড়ি, পদ্মদীঘিতে শ্বেতপদ্ম ফুটে জল আলো করেছে—দেউড়িতে দেউড়িতে পাহারা পড়ছে, ছাদে লাল সাদা নিশান উড়ছে—গড়ের এপারে ওপারে কত বাড়ি, কত অতিথিশালা, কত হাতী-ঘোড়ার আস্তাবল···উত্তর দেউলে প্রকাণ্ড বারাহী মূর্ত্তির পুজো হচ্ছে, ধুপ-ধুনো-গুগ্‌গুলের সুবাসে চারিদিক আমোদ করছে, কাড়া-নাকাড়ার বাদ্যিতে কান পাতা যায় না।

যেন এক রাণী এসে তার শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, ওঁর সুন্দর মুখে প্রসন্ন হাসি, কপালে চওড়া করে সিঁদুর পরা, রূপের দীপ্তিতে ঘর আলো হয়ে উঠেছে···তিনি সস্নেহ সুরে যেন বলছেন—খুকী, আমার বংশের মেয়ে তুই, বংশের মান বাঁচাবার জন্যে আমি দীঘির জলে ডুবে মরেছিলাম, তুইও বংশের মর্য্যাদা বজায় রাখিস্, পবিত্র রাখিস্ নিজেকে।

ঘুমের মধ্যেও শরতের সর্ব্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে।

কেদার পাশের গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করে ফিরছেন, এমন সময় ছিবাস মুদি রাস্তায় তাঁকে ডাকলে—চলুন আমার দোকানে—দাদাঠাকুর, একটু তামাক খেয়ে যাবেন—

রাস্তার ধুলোতে কিসের দাগ দেখে কেদার বললে, এ কিসের দাগ হে ছিবাস?

—এ মটোর গাড়ির চাকার দাগ—প্রভাস বাড়ি এসেছে যে মটোরে চড়ে—

—বেশ, বেশ। তা গাড়ি তো দেখতে হয় ছিবাস—

—কখনো দেখেন নি বুঝি দাদাঠাকুর? আমি সেবার যোগে গঙ্গাচানে গিয়ে নবদ্বীপে দেখে এইচি—

—দূর, মটোর গাড়ি দেখবো না কেন, সেদিনও তো কেষ্টনগরে সদর খাজনা দাখিল করতে গিয়ে চার-পাঁচখানা দেখে এলাম। বড়লোকেরা কেনে, কেষ্টনগরে বড়লোকের অভাব আছে নাকি? তবে আমাদের গাঁয়ে মটোর গাড়ি নতুন কথা কি না—

—তা হবে না কেন দাদাঠাকুর। আজকাল প্রভাসের বাবার অবস্থা কি! কলকাতায় দুখানা বাড়ি, কারবার চলছে তোড়ে—রমারম টাকা আসছে। বলে লক্ষ্মী যখন যারে দ্যান, ছাপ্পড় ফুঁড়ে টাকা আসে—ওদেরই তো এখন দিন—এ কি আর আপনি আমি ?

—তা ভালোই তো। গাঁয়ে সবাই গরীব, দু-একজন যদি বড় হয়, অন্ততঃ গাঁয়ের রাস্তা-ঘাটগুলো তো ভাল হবে। দুদিন মটোরে করে এলেই তখন রাস্তার দিকে নজর পড়বে—

—হুঁ্যা, দুদিন মটোরে এসেই তোমার গাঁয়ের রাস্তা অমনি পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে গ্যাংট্যাং রোড করে ফেলছে। তুমিও যেমন পাগল দাদাঠাকুর! ছাড়ান দ্যাও ওসব কথা।

প্রভাস যে মোটরখানা এনেছে, সাতকড়ি চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে সেখানা কাঁঠালতলার ছায়ায় দাঁড় করানো। চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে আট-দশ জন লোকের ভিড়।

কেদার সামনের রাস্তায় কালো চকচকে গাড়িখানার পাশে দাঁড়িয়ে ভাল করে জিনিসটা দেখতে লাগলেন। কেমন একটা গরম গন্ধ, কিসের গন্ধ কেদার ঠিক বুঝতে পারেন না। ঝকঝক করছে পেতলের না কিসের ডাণ্ডা, হ্যাণ্ডেল—আরও কি সব যন্ত্রপাতি।

বেশ জিনিস।

এত কাছে দাঁড়িয়ে কেদার কখনও মোটর গাড়ি দেখেন নি। রাস্তায় যেতে যেতে গাড়ি-খানার ওধারে আরও দু-একজন পথচলতি চাষাভুষো লোক দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি দেখতে।

কেদার তাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, কালে কালে কত কাণ্ডই দেখা গেল—য়্যাঁ—কি বলো মোড়লের পো ? তাই না কি, বলো ঠিক করে ? দশ বছর আগে দেখেছিলে কেউ ?

একজন চাষীলোক স্টিয়ারিংয়ের চাকা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এখানডাতে চাকা একটা আবার কেন, হ্যাদে ও দা'ঠাউর ?

কেদার বিজ্ঞভাবে বললেন, ও হ'ল হ্যাণ্ডোলর চাকা। ওটা ঘোরায়।

লোকটির নিকট সব ব্যাপারটা এক মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে হাসিমুখে বললে, দেখুন দিখি দা'ঠাউর, বললেন আপনি, তবে আমি বোঝলাম। না বলে দিলে কি আমরা বুঝতি পারি ?

সে কি বুঝলে তা অবিশ্যি সে-ই জানে।

এই সময় কেদারকে দেখতে পেয়ে কে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ডেকে উঠল—ও কেদার রাজা, ওহে ও কেদার রাজা—শোন শোন, এদিকে এস না একবার—

প্রভাসকে ঘিরে গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে। জগন্নাথ চাটুজ্জেও আছে ওদের মধ্যে, কেদারকে ডাক দিয়েছে সে-ই।

চণ্ডীমণ্ডপের মালিক সাতকড়ি চৌধুরী বললেন, কেদার-দা যে! আরে এস, এস—বসতে দাও হে—কেদার-দা'কে বসাও—

জগন্নাথ বললে, আরে ভায়া কেদার রাজা, এসে পড়েছ ঠিক সময়ে—তোমার কথাই হচ্ছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন—আমার কথা!

তাঁর কথা কোথাও মজলিসে আলোচিত হবার মত গুণ তাঁর কি আছে ? কেদার ভেবে পেলেন না। কখনও আলোচিত হয়ও নি।

জগন্নাথ বললে, তোমার কথা কেন, সকলেরই কথা। প্রভাস, চিনতে পেরেছ কেদার ভায়াকে ? রাজবাড়ির কেদার-রাজা। এ হ'ল প্রভাস—আমাদের গাঁয়ের রাসু বিশ্বেসের নাতি—

কেদার বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। তবে সেই ছেলেবেলায় হয়তো দু-একবার দেখে থাকব, বাবাজি তো আস না গাঁয়ে বড় একটা—কাজেই এদানীং দেখি নি আর।

প্রভাসের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, মাথায় কোঁকড়া চুলে টেরি কাটা, গায়ে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, জরিপাড় ধুতি পরনে। সকলেই জানে প্রভাস চরিত্রহীন ও বওয়াটে, কিন্তু বড়লোকের ছেলের কাছে স্বার্থ অনেকের অনেক রকম, মুখে কিছু বলতে সাহস করে না।

সাতকড়ি চৌধুরী বললেন—প্রভাসকে আমরা ধরেছি, আমাদের পুবপাড়ার ইস্কুলটার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করুক। ওদের হাত ঝাড়লে পব্বোত।

কেদার এক পাশে গিয়ে বসলেন। ব্যাপারটা কিছুক্ষণ পরে বুঝলেন, এ গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুলের বাড়িটা পাকা করে দেবার জন্যে সবাই প্রভাসকে ধরেছে, শ-চার-পাঁচ টাকা ব্যয় করলে আপাততঃ বাড়িটা এক রকম দাঁড়িয়ে যায়।

প্রভাস বলছিল—তা যখন আপনারা বলছেন, তখন দিয়ে দেব, তবে টাকা আপাততঃ এখন আনি নি, আপনারা যদি কেউ আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে—

—আহা সে-জন্যে ভাবনা কি? তুমি যখন হয় পাঠিয়ে দিও। তুমি বললেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই। তোমার ভরসা পেলে আমরা করতে পারিনে এমন কি কাজ আছে? কি বল হে জগন্নাথ খুড়ো?

জগন্নাথ চাটুজ্জে সাতকড়ির কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে কেদারের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কথা কি হচ্ছিল বলি। ইস্কুলটার জন্যে তোমার গড়বাড়ির পুরোনো ইট কিছু দিতে হবে।

কেদার দ্বিরুক্তি না করে বললেন—নিও।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়।

—তা হলে সব কথা তো মিটে গেল হে সাতু, কেদার রাজার ইট আর প্রভাসের টাকা, ইস্কুল বাড়ি তো পাকা হয়ে রয়েছে। এক ছিলিম তামাক খাও—বসো কেদার রাজা।

প্রভাস উঠতে চাইলে—কিন্তু সাতকড়ি চৌধুরী বাধা দিলেন। চা হচ্ছে বাড়ির মধ্যে তার জন্যে, না খেয়ে যাবার যো নেই।

কেদারের একটু চা খাবার ইচ্ছে ছিল না এমন নয়, সুতরাং তিনিও চেপে বসলেন। জগন্নাথ চাটুজ্জে তাঁর সঙ্গে তার নিজের সংসারের ঝঞ্ঝাটের গল্প শুরু করলে। মেজ ছেলেটার জ্বর হচ্ছে আজ এক মাস, রোজ বিকেলে জ্বর আসে, কত রকম কি করলেন, কিছুতেই জ্বর যাচ্ছে না। ও-পাড়ার যতীশ চক্কত্তির সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ চলেছে গেঁয়োহাটিতে। জগন্নাথ বলে জমি আমার, যতীশ বলে আমার। প্রজারা ফলে খাজনা বন্ধ করেছে, দু-পক্ষের কাউকেই খাজনা দেয় না।

কেদার বললেন, কেন জমির পড়চা দেখলেই তো মিটে যায়—কার জমি লেখাই তো আছে—

—আরে তা কি আর দেখা হয় নি ভাবছ কেদার রাজা? পড়চা দৃষ্টে জমি সনাক্ত করতে হবে না?

—পড়চা দেখে যদি জমি সনাক্ত করতে না পারো, তা হলে আমীন ডেকে মীমাংসা করে নাও। সেটেলমেণ্টের ম্যাপ আছে, তাই দেখে আগে মেপে নেবার চেষ্টা কর না কেন?

—তুমি একদিন এসো না ভায়া। তুমি ম্যাপ দেখে একটা মীমাংসা দাও না করে? জমিজমার কাজ তুমি তো খুব ভাল বোঝ।

—কেদার-দা সত্যিই ভাল জানে জমিজমা-সংক্রান্ত কাজ—কিন্তু মন এদিকে দিতে চায় না

একেবারেই। নিজের অনেক জমি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বেহাতি হয়ে গেল, দেখেও দেখে না, ঐ হয়েছে ওর দোষ।

একথা বললেন সাতকড়ি চৌধুরী। অনেক দিন আগে তাঁর নিজের জমিজমার দলিল-সংক্রান্ত কি একটা জটিল ব্যাপারের ভাল মীমাংসা করে দেন কেদার, সেই থেকে কেদারের বৈষয়িক কাজকর্ম্মের প্রতি সাতকড়ি চৌধুরীর যথেষ্ট শ্রদ্ধা।

এই সময়ে চা এল। এখানে আর কেউ চা খায় না বলে বোধ হয় চা এসেছে শুধু প্রভাসের জন্যেই। শুধু চা নয়, খানকতক গরম পরোটা আর একটু আলু-চচ্চড়িও এসেছে। সকলেই নানা অনুযোগ অনুরোধ করে প্রভাসকে খাওয়াতে লাগল। কেদার চা খাবেন কি না এ কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে না, সুতরাং চা পানের ইচ্ছা আপাততঃ কেদারকে দমন করতে হ'ল।

প্রভাস চা পান শেষ করে উঠে পড়ল। সকলে গিয়ে তাকে তার মোটরে উঠিয়ে দিলে।

সাতকড়ি বললেন, এখন যাবে কোথায় প্রভাস?

—এখন একবার রাণীনগর যাবো কাকা, হারাণ কাপালীর কাছে একখানা তিনশো টাকার হ্যাণ্ডনোট আছে, তামাদির মুখে দাঁড়িয়েছে, বাবা বলে দিয়েছেন একবার গিয়ে তাগাদা দিতে।

—ওবেলা একবার এসো। গড়ের ইট কেদার-দা দিতে চেয়েছেন, তোমায় দেখিয়ে আনবো। কি বলো জগন্নাথ খুড়ো? তুমি টাকা দেবে, ইটগুলো তুমি দেখে নাও। এই, সব সরে যা গাড়ির কাছ থেকে, তোদের এত ভিড় কেন?

প্রভাসের গাড়ির চারিধারে বহু ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হয়েছিল। সকলকে সরিয়ে সাবধান করে দু-চারবার হর্ন দিয়ে প্রভাস গাড়ি ছেড়ে দিলে।...

জগন্নাথ চাটুজ্জে পথের বাঁকে দ্রুতবিলীয়মান গাড়িখানার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সব টাকা রে বাপু, টাকা। ওর ঠাকুর-দা এই গাঁয়ের পুবপাড়ার কামারের দোকান করতো, হেঁই-ও হেঁই-ও করে হাতুড়ী পেটাতো, আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি। সাতু বাবাজি, রাসু বিশ্বেসকে মনে আছে নিশ্চয়ই।

সাতকড়ি চৌধুরীর বয়স আসলে চল্লিশের বেশী নয়। তার চেয়ে অন্তত পঁচিশ বছর বেশী বয়সের লোক জগন্নাথ চাটুজ্জে তাঁকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করছে দেখে তিনি ক্ষুণ্নমুখে বললেন—আমার কি করে মনে থাকবে জগন্নাথ খুড়ো, আমি দেখিই নি...

কেদার বললেন, তোমার যে কাণ্ড জগন্নাথ-দাদা। ও দেখবে কোথা থেকে? আমারই ভাল মনে হয় না।

জগন্নাথ বললেন—তা সে যাই হোক, মোটের ওপর পয়সা করেছে বটে। ব্যবসা না করলে কি আর বড়লোক হওয়া যায়? ওই রাসু কামারের ছেলে—আমরা রাসু কামার বলেই জানতাম ছেলেবেলায়—সেই রাসুর ছেলে হারাণ কলকাতায় গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি সারানোর ছোট্ট দোকান খুললে বৌবাজারে। ক্রমে দোকানের উন্নতি হতে লাগল—মাথা খুলে গেল, তখন পুরোনো গাড়ি কিনে তাই সারিয়ে বেচতে লাগল। তার পর দ্যাখো আজকাল ওদের অবস্থা। কলকাতায় চারখানা বাড়ি।

সাতকড়ি চৌধুরী বললেন, আজকাল প্রভাসই কর্ত্তা। ও-ই বলছিল ওর বাবা বাতে পঙ্গু, উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে না। প্রভাসই দেখাশুনো করে।

একজন কে বললে—তবে প্রভাস নাকি বাপের পয়সা বিস্তর উড়িয়েছে।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন—তা ওড়াবে না কেন? হারাণ বিশ্বেস কম টাকা করে নি তো? ছেলে যদি না ওড়াবে তবে ওড়াবে কে বলো না? ঘোর বওয়াটে আর মাতাল—

সাতকড়ি চারিদিকে চেয়ে বললেন, থাক, থাক, ওকথা থাক খুড়ো। সে-সব কথায় দরকার কি তোমার আমার? যার ছাগল তার লেজের দিকে সে কাটুক না—বাদ দাও। ওরা হল আজকাল বড়লোক, এদিগরে সাত-আটখানা গাঁয়ের মহাজন হ'ল ওরা। ওদেরই খাতির। টাকার দরকার হলে হারাণ বিশ্বেসের কাছে—কলকাতায় গিয়ে হ্যাণ্ডনোট' লিখে কর্জ না করলে যখন উপায় নেই, তখন তার ছেলে কি করে না করে সে-সব কথার আলোচনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে না করাই ভালো।

বেলা বেড়েছে। কেদার বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পথে প্রভাসের গাড়ির সঙ্গে আবার দেখা—বেজায় ধুলো উড়িয়ে আসছে, কেদার এক পাশে দাঁড়ালেন। ধুলোর পাহাড় সৃষ্টি করে হর্ন বাজিয়ে মোটরখানা সবেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পেট্রল ও গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে। কেদার ধুলোর মধ্যে চোখ মিট্ মিট্ করতে করতে প্রশংসমান দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

সকালে উঠেই সেদিন কেদার খাজনা আদায় করতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন, এমন সময় জগন্নাথ চাটুজ্জে এসে ডাকলে, ওহে কেদার রাজা, বাড়ি আছ নাকি ভায়া?

কেদার বললেন, এসো জগন্নাথ দাদা, বসো। কি মনে করে?

—ওরা সব আসছে, ইট কোথা থেকে নেবে দেখিয়ে দেবে চলো।

কেদার বললে, ও আর দেখিয়ে দেওয়া কি, তুমি তো জানো—যেখান থেকে হোক—

জগন্নাথ জিভ কেটে বললে, তা কি হয় ভায়া? তোমার জিনিস না বলে দিলে কি আমরা নিতে পারি? চলো তুমি। প্রভাস নিজে আসবে এখুনি—আরও সব আসছে।

—ততক্ষণ বসবে এসো দাদা। ওরে শরৎ, তোর জ্যাঠামশায়ের জন্যে বসবার কিছু দে।

শরৎ একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে বললে, জ্যাঠামশায় তো এদিকে আসা ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। বসুন ভাল হয়ে। চা খাবেন?

জগন্নাথ চাটুজ্জে এক গাল হেসে বললে, তা মা, দে না হয় করে।

নিজের বাড়িতে জগন্নাথের চা খাওয়ার পাট নেই কোন কালে, তবে পরের বাড়িতে হলে কোন কিছু খাওয়াতেই আপত্তি নেই জগন্নাথের।

কেদার বললেন, তারপর, তোমাদের ইস্কুলের বাড়ি আরম্ভ হবে কবে?

—জিনিসপত্র যোগাড় হলেই হবে। প্রভাস টাকা দিলেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই। একটু তামাক সাজো ভালো করে ভায়া। চা-টা তোমার এখানেই খাওয়া যাক।

কিছুক্ষণ পরে শরৎ এসে দু-পেয়ালা চা সামনে রাখল। সে সকালেই স্নান সেরে নিয়েছে, পরনে সরুপাড় ফর্সা ধুতি, একরাশ ভিজে এলো চুল পিঠে ফেলা—গায়ের রং ফুটেছে স্নান করে—লম্বা পাতলা দেহ, সুন্দর ভুরু, বড় বড় চোখ—প্রতিমার মত সুশ্রী।

চা নামিয়ে বললে, জ্যাঠামশায়, বসুন, একটা জিনিস খাওয়াবো। খাবেন তো?

—কি মা?

—সে এখন বলছি নে। আনি আগে, তখন দেখবেন?

শরৎ একটা পাথরের খোড়া ভর্তি বাসি পায়েস এনে জগন্নাথের সামনে রাখলে। হাসিমুখে বললে, খান। বাবা বড় ভালবাসেন বলে কাল রাত্রে করেছিলুম—তা আজ সকালে অনেকখানি রয়েছে দেখলাম। বাবা চেয়েছিলেন খেতে কিন্তু ওঁকে এখন আর দেবো না, দুপুরে ভাতের সঙ্গে দেবো বলে রাখলাম খানিকটা।

এমন সময় গ্রামের আরও অনেকের সঙ্গে প্রভাসকে দূরে আসতে দেখে কেদার বললেন, ও শরৎ, আরও সবাই আসছে। চা আর হবে নাকি?

শরৎ বললে, ক' পেয়ালা ?

—চার-পাঁচ পেয়ালার মত হোক না হয়।

—তা হবে না, দুধ নেই। কাল রাত্রে একটু দুধ রেখেছিলাম, তাই দিয়ে তোমাদের করে দিলাম। এক পেয়ালার মত একটুখানি পড়ে আছে।

—তবে প্রভাসের জন্যে শুধু এক পেয়ালা করে দে। ও গাঁয়ে কখনো আসে না, ওকে দেওয়া উচিত আগে। আর সব তো ঘরের লোক।

ওরা কিন্তু কেউই বাড়ির কাছে এল না। অতিথিশালার কাছে এসে সাতকড়ি চৌধুরী ডাক দিয়ে বললেন,—ও কেদার দাদা, এসো এদিকে প্রভাস এসেছেন—আর কে বসে ওখানে—জগন্নাথ খুড়ো ?

কেদার বললেন, তুমি বসে পায়েস খাও দাদা, আমি যাই দেখি।

সাতকড়ি বললেন, কোথা থেকে ইট দেবে হে ? চলো নিয়ে।

—চলো, কালো পায়রার দীঘির পাড়ে জঙ্গলে অনেক ইট আছে। দুটো মন্দিরের ভাঙা ইটের রাশি। তাই নিও—কি বলো ?

প্রভাস চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। সে এ-গ্রামে ইতিপূর্বে কয়েকবার এলেও কেদারের বাড়ি কখনো আসে নি বা গড়ের মধ্যেও কখনো ঢোকে নি। এত বড় বড় ভাঙা ঘরদোর ও মন্দির যে এখানে আছে সে তা জানতো না। আগে জানলে সে ক্যামেরাটা নিয়ে আসতো কলকাতা থেকে।

কেদার তাকে বললেন, চলো প্রভাস, ওখানে জগন্নাথদা বসে আছেন, তুমিও একটু চা খাবে এসো। এসো সাতু ভায়া, তুমিও এসো।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে চা পান করতে অভ্যস্ত নয় কেউই, সাতকড়িও না। সুতরাং প্রভাস ছাড়া আর কেউ চা খেতে গেল না।

সাতকড়ি বললেন, ঘুরে এসো প্রভাস, দেরি না হয়—আমরা এখানেই আছি।

প্রভাসকে ঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে কেদার মেয়েকে চা দিতে বললেন। শরৎ এসে চা দিয়ে যাবে, কিন্তু অপরিচিত প্রভাসের সামনে হঠাৎ আসতে সঙ্কোচ বোধ করে পেয়ালা হাতে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কেদার বললেন, ওকে দেখে লজ্জা করতে হবে না, বুঝলি মা। ও আমাদের গাঁয়ের ছেলে—এখনই না হয় থাকে কলকাতায়। ও পর নয়। দিয়ে যাও চা।

শরৎ এসে প্রভাসের সামনে চা রাখলে। প্রভাস শরৎকে কখনো দেখে নি বলা বাহুল্য—চা দেবার সময় সে মৃদু কৌতূহলের সঙ্গে প্রথমটা একবার শরতের দিকে চাইলে···কিন্তু শরৎকে দেখবার পরক্ষণেই প্রভাসের চোখমুখ যেন অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখের চেহারা যে বদলে গেল অতি অল্পক্ষণের জন্যে, এ যে-কেউ দেখলেই বলতে পারতো।

প্রভাস আশা করে নি এত সুন্দরী মেয়েকে আজ সকালে এই ভাঙা-ইটের-স্তূপে-ঘেরা জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র বাড়িতে এ ভাবে দেখতে পাবে। এত রূপ আছে, এই সব পাড়াগাঁয়ে !

প্রভাস থতমত খেয়ে চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিলে।

কেদার বললেন, তোমাদের কলকাতায় কোথায় থাকা হয় বাবাজি ?

প্রভাস অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল, কেদারের প্রশ্নে যেন চমকে উঠে বললে, আমায় বলছেন ? আপার সারকুলার রোড।

—তোমার বাবার শরীর কেমন ?

—আছে ভাল, তবে উঠতে হাঁটতে পারেন না। বয়েস তো হ'ল কম নয়। সাহেব ডাক্তার দেখছে—তবে এ বয়েসের রোগ—

—তোমার একটি ছোট ভাই আছে শুনেছিলাম, সে কি করে ?

—সেও দোকানে বেরোয়। খুব ছোট নয়, তার বয়েস এই সাতাশ বছর হল।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললে, বাবাজি বিয়ে করেছ কোথায় ?

—কই, আমি বিয়ে তো করি নি এখনও।

কেদার জানতেন না যে প্রভাস অবিবাহিত। প্রভাসের সম্বন্ধে এ কথা তিনি কারো মুখে শোনেন নি।

তিনি বিস্ময়ের সুরে বললেন, বিয়ে করো নি! তা তো জানতাম না।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন, আমিও জানতাম না। বাবাজির বয়েস অবিশ্যি এখনও—বয়েসটা কত হ'ল বাবাজি ?

—আজ্ঞে, একত্রিশ যাচ্ছে।

—ওঃ, একত্রিশ। যথেষ্ট সময় আছে। তোমাদের এখনো যথেষ্ট—

—সে জন্যে নয় কাকাবাবু, বিয়ে আমার করবার ইচ্ছে নেই।

—বলো কি বাবাজি! তোমাদের রাজার মত সম্পত্তি, বাড়িঘর, বিয়ে করবে না কি রকম ?

প্রভাস হাসি-হাসি মুখে চুপ করে রইল।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললে, রাসু-দাদা কিছু বলেন না এ নিয়ে ?

—অনেক বড় বড় সম্বন্ধ এনেছেন। হুগলী বালিতে একবার পঁচিশ হাজার টাকা দেবে আর হীরে জহরতের জড়োয়া—বাবা কিছুতেই ছাড়বেন না। বাবাকে বললাম, অমন সম্বন্ধ এর পরে জোটবার অভাব হবে না, যদি আমি বিয়েই করি। বাবা তাদের জানিয়ে দিলেন, কিন্তু তবুও তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল এমন যে, আমি ওয়ালটেয়ার পালিয়ে গেলাম—সেখানে আমাদের বাড়ি আছে কি না! বছর পাঁচ-ছয় হ'ল বাবা হাইকোর্টের সেলে কিনেছিলেন।

কেদার বললেন, কি জায়গাটা বললে বাবাজি—কোথায় সেটা ?

—ওয়ালটেয়ার। সমুদ্রের ধারে।

সমুদ্র কোন্ দিকে কত দূরে, কেদারের সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল, কিন্তু জগন্নাথ চাটুজ্জের জামাই রেলে কাজ করে, সে গত পুজোর সময় সস্ত্রীক পাশ নিয়ে পুরী গিয়েছিল। জগন্নাথ চাটুজ্জের জানা আছে মাত্র এইটুকু যে পুরী নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানটি সমুদ্রের ধারে—সে সমুদ্র যত দূরেই হোক বা যে দিকেই হোক। সুতরাং সে জিজ্ঞেস করলে—পুরীর কাছে বাবাজি ?

—না, পুরী থেকে অনেক নিচে।

বলা বাহুল্য, পুরীর নিচে বা ওপরে কি ভাবে আর একটা জায়গা থাকতে পারে এ কথা জগন্নাথ বা কেদার কারো কাছেই তেমন পরিস্ফুট হ'ল না। সে দিক থেকে বরং সমস্যা জটিলতর হয়ে দাঁড়াতো এদের কাছে, কিন্তু শরৎ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্ত্তা শুনছিল, সে তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললে—পুরীর আরও দক্ষিণে হ'ল তা হলে—না বাবা ?

কেদার বিপন্নমুখে বললেন, হাঁ—দক্ষিণে ?—তাই—ইয়ে দক্ষিণেই তো তা হলে গিয়ে—

প্রভাস হঠাৎ শরতের মুখের দিকে একটু বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়েই তখনই আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জগন্নাথের দিকে চেয়ে বললে, ঠিক বলেছেন উনি। দক্ষিণেই হ'ল।

এবার সকলে পুকুরের পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো ইট দেখবার জন্যে। ছাতিম-বনের

তলায় এদিক ওদিক ছড়ানো ভাঙা ঘরবাড়ি ও প্রাচীন দেউলগুলির ধ্বংসস্তূপ সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট করে তুললো। বেতের দুর্ভেদ্য ঝোপের আড়ালে কতদূর পর্যন্ত ছড়ানো বড় বড় ইটের স্তূপ, পাথরের কড়ি, পাথরের চৌকাঠ, নক্সা করা প্রাচীন ইট, ভাঙা থামের মাথা, সকলেরই মনে বর্ত্তমানের বহুদূর পিছনকার এক লুপ্ত বিস্মৃত অতীতের রহস্যময় বার্ত্তা ক্ষণকালের জন্যে বহন করে নিয়ে এল—যাতে জগন্নাথ চাটুজ্জের মত কল্পনাশূন্য নিরেট ব্যক্তিকেও বলতে শোনা গেল—বাস্তবিক! এসব দেখলে মন কেমন করে—কি বলো সতে বাবাজি?

সাতকড়ি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, তা আর করে না?

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়ান্বিত হয়েছে প্রভাস—তা তার মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল। প্রভাস এ-সব কোনোদিন দেখে নি—বা তাদের গ্রামে যে এরকম আছে তা শুনলেও সেটা যে এই ধরণের ব্যাপার তা জানত না।

সে বিস্ময়ের সুরে বললে, ওঃ এ তো অনেক কাল আগেকার! এ-সব কীর্ত্তি ছিল কাদের?

সাতকড়ি বললেন, এই আমার কেদার দাদার পূর্ব্বপুরুষের—আবার কার? এঁরাই গড়শিবপুরের রাজবংশ। কেন তুমি জানতে না বাবাজি? যাক্ দেখে নাও দিকি ক'গাড়ি ইট হবে বা কোন্ দিক থেকে খুঁড়বে।

প্রভাস চুপ করে রইল। জগন্নাথ চাটুজ্জে বললে, যেখান থেকে হয় হাজার দশেক ইট আপাততঃ নাও না। কেদার ভায়ার কোনো আপত্তি নেই তো?

কেদার নির্ব্বিকার মানুষ—কোনো প্রকার ভাব বা অনুভূতির বালাই নেই তাঁর। তিনি বললেন, না আমার আপত্তি কি? ইট তো পড়েই রয়েছে।

সাতকড়ি বললেন, কিন্তু এ ইটের দাম কিছু দিতে পারবো না কেদার দাদা, তা আগে থেকেই বলে রাখছি।

কেদার ক্ষুদ্র মনের পরিচয় কোনোদিন দেন নি—তিনি দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ সবাই জানে। বললেন, কিছু বলবার দরকার নেই সে-সব। নিয়ে যাও না ভায়া—আমি কি তোমায় বলেছি দামদস্তুরের কথা?

ইতিপূর্ব্বেও কেদারের অবৈষয়িকতা ও ঔদার্য্যের সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু লোক গড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে বিনামূল্যে গাড়ি গাড়ি ইট নিয়ে গিয়েছে ঘরবাড়ি তৈরী বা মেরামতের জন্যে—অর্থকষ্ট যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেদার কারো কাছে মূল্য চাইতে পারেন নি বা কাউকে বিমুখও করেন নি কোনোদিন, অথচ যেখানে পুরোনো ইটের হাজার-করা দর পাঁচ টাকা করে ধরলেও কেদার ইট বিক্রি করেই অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা নিট্ দাম আদায় করতে পারতেন।

কিন্তু তা কখনো করবেন না কেদার। রাজবংশের ছেলে হয়ে পূর্ব্বপুরুষের ভিটের ইট বিক্রী করে টাকা রোজগার? ছিঃ?...এমনি দেবেন। লোকের উপকার হয়, হোক না।

সাতকড়ি বললেন, তা হলে প্রভাস বাবাজি, কাল থেকে লোক লাগিয়ে দিই—কি বল?

প্রভাস বললে, বেশ, নিয়ে যান—আমি তো বলেছি কাজ আরম্ভ করুন।

ক্ষণকালের সে ভাবান্তর কেটে গিয়েছে সকলের মন থেকেই। এরা অন্য ধাতের মানুষ, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাস্তব ছাড়া অন্য কোনো জগতের সঙ্গে এদের বিশেষ পরিচয় নেই।

কেদার দেখিয়ে দিলেন কোন্ পথে ইটের গাড়ি আসতে পারে, কারণ তিনি ভিন্ন গড়ের জঙ্গলের আন্ধি-সান্ধি বড় কেউ একটা জানে না।

কাজ মিটে গেল। সাতকড়ি বললেন, চলো সবাই জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাই—মশার কামড়ে মলাম।

বনের মধ্যে একটু যেন ভিজে ভিজে এখনও গাছপালা—বেলা বেশী হয়েছে বটে, কিন্তু ঘন ছাতিম-বনের আবরণ ভেদ করে সূর্য্যকিরণ এখনও বনের তলায় পড়ে নি। কি একটা বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধ ঠাণ্ডা বাতাসে।

প্রভাস সমস্ত পথ ঘোর অন্যমনস্ক ভাবে চলে এল। সে আজ যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

গড়বাড়ি থেকে বার হয়ে গ্রামে ঢুকবার মুখে সে কেদারকে বললে, আপনি বাড়ি থাকেন না কোথাও চাকরি করেন?

কেদার বললেন, না বাবাজি, চাকরি-টাকরি কখনো আমাদের বংশে করে নি কেউ। বাড়িই থাকি।

—আসুন না একবার কলকাতায়? আমাদের বাড়ি রয়েছে—দয়া করে সেখানে গিয়ে—

—আমার কখনো কোথাও যাওয়া হয় না—বাড়ি ফেলে, তাছাড়া মেয়েটা একলা বাড়িতে—ইয়ে হ্যাঁ। এই সব কারণে যেতে পারি নে কোথাও। আর ধরো গিয়ে আমার বাড়ি একেবারে গাঁয়ের বাইরে। মানুষজন নেই। ফেলে যাই কি করে?

এ কথার প্রভাস বিশেষ কোনো জবাব দিলে না।

কেদার আবার বললেন, তুমি এখন ক-দিন থাকবে?

প্রভাস বললে, না আমি কালই যাবো বোধ হয়। কলকাতায় অনেক কাজ রয়েছে পড়ে। পরশু তারিখের একটা পোস্ট-ডেটেড্ চেক্ রয়েছে মোটা টাকার—আমি না গেলে সেখানা ব্যাঙ্কে প্রেজেণ্ট করা হবে না।

কেদার আদৌ বুঝলেন না জিনিসটা কি। ব্যাঙ্ক জিনিসটা তিনি জানেন, শুনেছেন বটে—কিন্তু পোস্ট-ডেটেড্ চেক্ কথার অর্থ কি, বা সে কি ব্যাপার—এ সব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই তাঁর। তিনি শুধু বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললেন, ও! ঠিক ঠিক।

ওরা চলে গেল সবাই। কেদার এত বেলায় অন্য কোথাও যাওয়া উচিত না বিবেচনা করে বাড়ির দিকেই ফিরছেন এমন সময় গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র কাপালির সঙ্গে দেখা। সে গড়ের খাল পার হয়ে তাঁর বাড়ির দিক থেকেই আসছে। কেদার বললেন, কি হে ক্ষেত্র, আমার ওখানে গিয়েছিলে নাকি?

—প্রাতপেন্নাম দা-ঠাকুর। মোদের গাঁয়ে ওবেলা যাতি হবে একেবারে ভুলে গিয়ে বসে আছো। দা-ঠাকুর আমাদের একেবারে বোম্ ভোলানাথ। মনে নেই আজ আমাদের যাত্তারার দলের আখড়াই? আপনি গিয়ে বেয়ালা না ধরলি আসর জমবে, না আসরে ঢোলক বাজবে? চলো দা-ঠাকুর—তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম, তা মা-ঠাকরুণ বললেন তিনি কোথায় গিয়েছেন বেরিয়ে।

—ভালই তো—তা ক্ষেত্র, তুমিও দুটো খেয়ে যাও আমার বাড়ি, চলো না? বেলা হয়ে গিয়েছে, চলো।

ক্ষেত্র কাপালি রাজী হ'ল না। সে চলে গেল, যাবার সময় কেদারকে তাদের গ্রামে যেতে বলে গেল বার বার করে।

কেদার বাড়ি ফিরে দেখলেন শরৎ রান্না সেরে বসে আছে। বললে, বাবা, নেয়ে নাও, ভাত হয়ে গিয়েছে কতক্ষণ। ওরা সব চলে গেল, ইট নিয়েছে?

—হ্যাঁ। ইট কাল গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।

—গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র এসেছিল তোমার খোঁজে। দেখা হয়েছে?

—এই তো গেল। ওবেলা ওদের আখড়াই বসবে তাই ডাকতে এসেছিল কিনা? খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবো—তার পর যাবো ওদের গাঁয়ে। তেল দাও।

ঘুমিয়ে উঠে বেলা তিনটের সময় কেদার গেঁয়োহাটি রওনা হবার উদ্যোগ করছেন, এমন

সময় ভাঙা দেউড়ির রাস্তায় প্রভাসকে আসতে দেখে হঠাৎ বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—আরে, এসো এসো বাবাজি এসো! কি মনে করে?···

প্রভাস একা এসেছে। ওবেলার সাজ আর এবেলা নেই গায়ে—সাদা সিল্কের একটা শার্ট পরেছে, হাতে ও গলায় সোনার বোতাম, পরনে জরিপাড় ধুতি, পায়ে নতুন ফ্যাশনের খুঁজিকাটা জুতো। হাতের পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে তিন আঙ্গুলে পাথর-বসানো আংটি রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করছে।

—ও শরৎ, মা এদিকে এসো—প্রভাসকে একটা বসার জায়গা দাও। চা খাবে তো প্রভাস? হ্যাঁ, খাবে বৈকি, বোসো বোসো।

প্রভাস বললে, আপনাদের এখানে মোটর আসবার রাস্তা নেই। গাড়িখানা গড়ের খালের ওপারে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

শরৎ একটা আসন বার করে প্রভাসকে বসতে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে সম্ভবতঃ চা করতে গেল। প্রভাস বসে চারিদিকে তাকিয়ে বললে, আমি এর আগে কখনো গড়বাড়িতে আসি নি, খুব কাণ্ড ছিল তো এক সময়! দেখে শুনে সত্যিই অবাক হয়ে যাবার কথা বটে। কি ছিল, তাই ভাবি! মন কেমন যেন হয়ে যায়। না, কাকা?

কেদার এ ধরণের কথা অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক বার শুনেছেন, শুনে আসছেন তাঁর বাল্যকাল থেকে। এই সব ইট-পাথরের ঢিবি আর জঙ্গলের মধ্যে লোকে কি যে দেখতে পায়, তিনি ভেবেই পান না। পয়সা থাকলেই বোধ হয় মানুষের মনে এ-সব অদ্ভুত ও আজগুবী মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়—কে জানে? কেদারের কৌতুক হয় এ ধরণের কথা শুনলে। থাকে সব কলকাতায় বড় বড় বাড়িতে, ইলেকট্রিক আলো আর পাখার তলায়, এই সব পাড়াগাঁয়ে এসে যা দেখে তাই ভাল লাগে—আসল কথাটা হ'ল এই। একবার অনেক দিন আগে মহকুমার হাকিম এসেছিলেন এই গ্রামে কি একটা মোকদ্দমার তদারক করতে। যেমন সকলেই আসে, তিনি এলেন গড়শিবপুরের রাজবাড়ি দেখতে। কেদারের ডাক পড়ল। কেদার তো সংকোচে জড়সড় হয়ে হাকিমের সামনে হাজির হলেন। হাকিম-হুকুমকে বিশ্বাস নেই, কাঁচা-খেকো দেবতা সব।

হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গড়শিবপুরের রাজবংশের লোক?

—আজ্ঞে, হুজুর।

—আপনাকে দেখে আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে জানেন? আপনি কে আর আমি কে! আপনি এ পরগনার রাজা—আর আমি—আপনার একজন কর্ম্মচারীর সমান।

কেদার সম্ভ্রম দেখিয়ে নীরব রইলেন। বড়লোক খেয়াল-খুশিতে অনেক কিছু বলে—সব কথার জবাব দিতে নেই।

শরৎ তখন মাত্র পনেরো বছরের মেয়ে, উদ্ভিন্ন-যৌবনা, অপূর্ব্ব সুন্দরী। হাকিম তাকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, মাকে আমি নিয়ে যেতাম, যদি আজ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হতাম, আমার সে সৌভাগ্য নেই। আমার ছেলেটি এবার বি-এ পাশ করেছে। কিন্তু বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে তো আপনি কাজ করবেন না। মা আমার রাজবংশের মেয়ে বটে! ওর সেবা পাবো, সে ভাগ্য কি আর করেছি?

শরৎ মুখ নীচু করে রইল লজ্জায় ও সংকোচে।

দশ-এগারো বছর আগেকার কথা।

শরৎ প্রভাসের সামনে চা এনে দিলে। সে খুব সরুপাড় একখানা ধুতি পরেছে, হাতে দু-গাছা সোনার চুড়ি—মায়ের হাতের বালা ভেঙে ক-গাছা চুড়ি হয়েছিল, এই দু-গাছা তার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। জড়িয়ে এলো-খোঁপা বাঁধা, দেখলে ওকে উনিশ-কুড়ি বছরের

বেশি বলে কিছুতেই মনে হয় না, এমনি লাবণ্যভরা মুখশ্রী।

প্রভাসের দিকে চেয়ে বললে, দেখুন তো আর চিনি দেব কি না—

প্রভাস চায়ে চুমুক দিয়ে একটু সংকোচের সুরে বললে, আজ্ঞে না। আমি চিনি কম খাই—

কেদার বললেন, তার পর, কি মনে করে বাবাজি?

প্রভাস যেন আমতা আমতা করে উত্তর দিলে—ইয়ে—এই কিছু না—এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না!…তাই—

—বেশ বেশ। বোসো বাবাজি—

প্রভাস চা পান করে বসে রইল বটে, তবে একটু উশখুশ করতে লাগল। বসে থাকাটা তার পক্ষে যেন বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে উঠছে। অথচ মুখেও কোনো কথা যোগায় না। এমন অবস্থায় সে কখনো পড়ে নি।

কেদার বললেন, তুমি কালই তো কলকাতায় যাবে—না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল দুপুরে রওনা হবো খেয়ে-দেয়ে।

আবার সে একটু উশখুশ করতে লাগল।

তার এ ভাবটা বুদ্ধিমতী শরতের চোখ এড়ালো না। তার মনে হ'ল প্রভাস কিছু বলবার জন্যে এসেছে—কিন্তু তা বলতে পারছে না। সে একটু বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহলের দৃষ্টিতে প্রভাসের দিকে চেয়ে রইল।

পরক্ষণেই প্রভাস পকেট থেকে একটা ছোট মখমলের বাক্স সসংকোচে বার করে বললে, এইটে এনেছিলাম দিদির জন্যে—

কেদার বিস্ময়ের স্বরে বললেন, কি ওটা?

—এই গিয়ে—একটা আংটি—

—শরতের জন্যে এনেছ?

—হ্যাঁ—ভাবলাম, কখনো আসিনে—যখন আলাপ হয়েই গেল আপনাদের সঙ্গে, তাই—

কেদার হাত বাড়িয়ে মখমলের বাক্স হাতে নিয়ে বললেন, দেখি? বাঃ বাক্সটি বেশ! আংটিটা—এ যে দেখছি বেশ দামী জিনিস! এ তুমি আনলে কোথা থেকে?

—ওবেলা মোটরে চলে গিয়েছিলাম রাণাঘাট। সেখান থেকে কিনে এনেছি—আমার জানাশুনো দোকান, এ জিনিস বাইরে শো-কেসে সাজিয়ে রাখে না। আমাকে চেনে বলে বার করে দিলে।

—কত দাম নিয়েছে?

প্রভাস সলজ্জভাবে বললে, সে কথা আর কেন জিজ্ঞেস করছেন কাকাবাবু। দাম আর কি, অতি সামান্য—আপনাদের দেওয়ার মত কিছু না—

কেদার আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি বেশ পয়সা খরচ করেছ। এ পাথরখানা তো বেশ দামী, হীরে বোধ হয়—না?

প্রভাস একটু উৎসাহের সুরে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। দেড় রতি ওজন, আসল পাথর। তবে দামদস্তুরের কথা এখনও সেকরার সঙ্গে কিছু হয় নি—

কেদার বাক্সটা প্রভাসের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কেন এত খরচপত্র করতে গেলে অনর্থক? এ তুমি নিয়ে যাও বাবাজি। এ দরকার নেই।

প্রভাসের মুখে যেন কে কালি লেপে দিল। সে ভয়ে ভয়ে বললে—এনেছিলাম দিদিকে দেবো বলে—খুব আশা করেছিলাম—যদি অপরাধ না নেন—

—না বাবাজি—শরৎ বিধবা মানুষ, ও আংটি-টাংটি পরে না তো। ও বড় গোঁড়া ধরণের

মেয়ে। এতদিন চুল কেটে ফেলতো, শুধু আমার ভয়ে পারে না।

প্রভাস কিছু কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল। কেদারের মনে কেমন একটু সহানুভূতি জাগলো প্রভাসের প্রতি—বেচারী যেন বড়ই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে আংটির বাক্স ফেরত দেওয়ায়। নাঃ, এদের সব ছেলেমানুষি কাণ্ড!

মেয়ের দিকে চাইতে গিয়ে কেদার দেখলেন শরৎ কখন সেখান থেকে সরে গিয়েছে। ডাকলেন—ও শরৎ, শোনো মা—

শরৎ ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিলে—কি বাবা?

—হ্যাঁরে, প্রভাস একটা আংটি দিতে চাচ্ছে তোকে—কি করবি? রাখবি?

শরৎ আড়াল থেকেই বললে—আমি কি জানি? তুমি যা ভাল বোঝো।…আংটি আমি তো পরি নে—তবে উনি যখন হাতে করে এনেছেন থাক জিনিসটা।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললে—দেখি?

প্রভাস জিনিসটা কেদারের হাতে দিলে—তিনি মেয়ের হাতে তুলে দিলেন সেটা। প্রভাস শরতের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল—কিন্তু শরৎ তখন বাক্সটি খুলে আংটি নেড়েচেড়ে দেখছে—তার চোখ অন্যদিকে ছিল না।

কেদার হাসিমুখে বললেন—পছন্দ হয়েছে তোর? তা পছন্দ হবার জিনিস বটে। আমি শুধু বলছি প্রভাসকে যে এত খরচ করবার কি দরকার ছিল? এখান থেকে সাত ক্রোশ তফাৎ রাণাঘাটের বাজার। মটোর গাড়ি আছে তাই যেতে পেরেছিলে বাবাজি।

প্রভাসের মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সে বললে, দিদিকে একটা সামান্য জিনিস দিলাম—এতে খরচপত্রের কি আর—কিছুই না। অতি সামান্য জিনিস—

শরৎ বললে, বসুন আপনি। আমি খাবার করছি, খেয়ে যাবেন। ততক্ষণ বাবা একটু গল্প করো না প্রভাসবাবুর সঙ্গে।

কেদার আসলে খুব সন্তুষ্ট নন, তিনি একটু বিরক্তই হয়েছেন প্রভাস আসাতে। বেলা পড়ে আসছে, এখন তাঁর বেরুবার সময়—গেঁয়োহাটির আখড়াইয়ের আসরে বেহালা না বাজালে আখড়াই জমবে না, ক্ষেত্র কাপালি বলে গিয়েছে ওবেলা।

আর ঠিক এই সময়ে এসে কিনা জুটলো প্রভাস!

একে তো মেয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না, তার ওপর যদি প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত বাদ সাধে, তবে তিনি বাঁচেন কি করে!

শরৎ ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছে খাবার করতে—কেদার আর কিছুক্ষণ বসে প্রভাসের সঙ্গে অন্যমনস্কভাবে একথা ওকথা বললেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মন নেই কথাবার্ত্তার দিকে—গেঁয়োহাটিতে একটা ছিটের বেড়ার দেওয়াল দেওয়া চালাঘরে এতক্ষণ কত লোক জুটেছে—সবাই তাঁর আগমন-পথের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—তিনি না গেলে আখড়াইয়ের আসর একেবারে মাটি।

বেলা বেশ পড়ে এসেছে। এখান থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা গেঁয়োহাটি—অনেক দূর।

হঠাৎ তিনি উঠে পড়ে বললেন, মা, প্রভাস বাবাজি রইলেন বসে। তুমি খাবার করে খাইয়ে দিও। আমার বিশেষ দরকার আছে—গেঁয়োহাটিতে খাজনার তাগাদা আছে। প্রভাসের দিকে চেয়ে বললেন—বোস তুমি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না—

মেয়েকে কোনো রকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়েই তিনি দাওয়া থেকে নেমে উঠোন পার হয়ে ভাঙা দেউড়ির দিকে হন্ হন্ করেই হাঁটতে শুরু করলেন। অনেক সময় এ-রকম ক্ষেত্রে মেয়ে ছুটে এসে পথ আটকায়—পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা থেকে কেদার এ জানেন কি না।

শরৎ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, যেও না বাবা—শোনো বাবা—খেয়ে যাও খাবার

—শোনো ও বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে সে খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে নিচু চালের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে চেয়ে দেখলে, কেদার ভাঙা দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েছেন।

তার লজ্জা করতে লাগল, প্রায় অপরিচিত প্রভাস যে বসে সামনে—নইলে সে এতক্ষণ দেখিয়ে দিতো বাবা জোরে হেঁটে কতদূর পালান। গড়ের খালে নামবার আগেই সে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতো বাবার হাত।

—ছিঃ, কি অন্যায় বাবার!

প্রভাসের দিকে চেয়ে বললে, একটু বসুন, কেমন তো? আমি মোহনভোগ চড়িয়ে এসেছি কড়ায়—আসছি নামিয়ে—

প্রভাস খানিকক্ষণ একা বসে থাকবার পরে শরৎ কাঁসার কানা-উঁচু রেকাবিতে মোহনভোগ এনে ওর সামনে রাখলে, আর এক গেলাস জল।

—কেমন হয়েছে বলুন তো প্রভাসদা?

শরতের স্বর সম্পূর্ণ নিঃসংকোচ—আত্মীয়তার সহজ হৃদ্যতায় মধুর ও কোমল।

প্রভাস একটু অবাক হয়ে গেল ওর 'দাদা' ডাকে।

শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনি কি করে জানলেন আমি আপনার চেয়ে বড়?

শরৎ মৃদু হাসিমুখে জবাব দিলে—আমি জানি।

—কি করে জানলেন?

—বারে, ভুলে গেলেন? ওবেলা তো জগন্নাথ জ্যেঠাকে বললেন এখানে বসে আপনার বয়সের কথা।

এইবার প্রভাসের মনে পড়ল। ওবেলা এ-কথা উঠেছিল বটে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, বেশ হ'ল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—

শরৎ সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে, কেমন হয়েছে মোহনভোগ বললেন না যে?

—খু-ব ভাল হয়েছে। সত্যি বলছি চমৎকার হয়েছে—

—মা খুব ভাল করতে পারতেন, তেমনটি আমার হাতে হয় না।

—আমার একটা অনুরোধ রাখুন। আংটিটা পরুন আমার সামনে—

শরৎ বাক্সটা খুলে আংটিটা হাতে নিয়ে আঙুলে পরে বললে, বেশ হয়েছে। এই দেখুন—

প্রভাস আনন্দে গলে গিয়ে বললে, কি চমৎকার মানিয়েছে আপনার আঙুলে।

শরৎ ছেলেমানুষের মত খুশিতে নিজের আঙুলের দিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগল।

প্রভাস বললে, আচ্ছা, আপনি একা থাকেন, কাকা বেরিয়ে গেলে ভয় করে না আপনার?

—ভয় করলেই বা করছি কি বলুন—উপায় তো নেই। বাবা লুকিয়ে পর্য্যন্ত পালিয়ে যান, পাছে আমি আটকে রাখি। ওঁর ছেলেমানুষি স্বভাব—দেখে আসছি এতটুকু বেলা থেকে। মা বেঁচে থাকতেও ঠিক অমনি করতেন—

—আচ্ছা, আপনি কখনো কলকাতা দেখেছেন?

শরৎ ঠোঁট উল্টে হেসে বললে, কলকাতা! উঃ—তা আর জানি নে! কখনো জীবনে গোয়াড়ি কেষ্টনগর কি নবদ্বীপ দেখলাম না, তার কলকাতা। আমি এই গড়ের খালের জঙ্গলে কাটালাম সারা জীবনটা প্রভাসদা—সত্যি বলছি ভাল লাগে না।

প্রভাস যেন বড় উৎফুল্ল হয়ে উঠল—পরক্ষণেই আবার সে ভাবটা চেপে সহজ তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, এ আর কি কঠিন আপনার কলকাতা দেখা! যেদিন মন করবেন, সেদিনই হতে পারে।

শরৎ হর্ষদীপ্ত স্বরে বললে, আপনি নিয়ে যাবেন প্রভাসদা?

প্রভাস সোৎসাহে বললে, কেন নিয়ে যাব না ? বলুন না আপনি কবে যাবেন ? মোটর তো রয়েছে—টানা মোটরে বেড়িয়ে আসবেন কলকাতা ।

—খুব ভাল কথা প্রভাসদা । যাব এর মধ্যে একদিন । একঘেয়েমি বরদাস্ত হয় না আর।

প্রভাস একহাত জমি শরতের দিকে এগিয়ে বসল উৎসাহের ঝোঁকে । বললে—আপনাকে আজ নতুন দেখছি চটে, কিন্তু মনে হয় যেন আপনার সঙ্গে আমার আলাপ আজকের নয়, অনেক পুরোনো ।

কি জানি কেন, এ কথা শরতের কানে ভাল শোনালো না—সে নিজেকে কিছু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল । প্রভাসের কথার কোন উত্তর সে দিলে না ।

প্রভাস বোধ হয় শরতের এ ভাব লক্ষ্য করলে । সে সুর বদলে বললে—আপনার বাবা বড় ভাল লোক, ওঁকে আমার নিজের বাবার মত ভাবি ।

বাবার প্রশংসা শুনে শরতের মন আহলাদে পূর্ণ হয়ে গেল । তার বাবাকে গ্রামের কেউ প্রশংসা করে না, অন্ততঃ সে তো বড়-একটা শোনে নি কখনো কারো মুখে, এক রাজলক্ষ্মী ছাড়া । কিন্তু রাজলক্ষ্মী বালিকা মাত্র, তার মতামতের মূল্য কি ?

শরৎ বললে, বাবার মত মানুষ একালে হয় না । একেবারে সাদাসিদে, কিছুই বোঝেন না ঘোরপ্যাঁচ, গাঁয়ের লোক কত রকম কি বলে, মজা দেখবার জন্যে ওঁকে নাচিয়ে দিয়ে কত রকম কি করে—সে-সব দিকে খেয়াল নেই । দেখুন প্রভাসদা, আমাদের অতিথিশালা আছে বলে গাঁয়ের লোক ইচ্ছে করে বাইরের লোক এনে বাবার ঘাড়ে চাপাবে । আমাদের অবস্থা অথচ সবাই জানে—কিন্তু বাবাকে জব্দ করা তো চাই । আমার এত দুঃখু হয় সময়ে সময়ে !

—আপনি বলেন না কেন কাকাকে বুঝিয়ে ?

—আমার কথা উনি শোনেন, না কখনো শুনেছেন ? মাকেই বড় গেরাহ্যি করতেন, আর আমি ! যা খেয়াল ধরবেন, তাই করবেন ।

—আচ্ছা, আজ উঠি তা হলে । আর এক দিন আসবো এখন । কলকাতা যাওয়ার কথা মনে আছে তো ? একদিন নিয়ে যেতে আসবো কিন্তু ।

প্রভাস চলে গেলে শরৎ গৃহকর্ম্ম শেষ করে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালল । চারিদিকে বন-বাদাড়ে ঘেরা উঠোন, বেশ একটু শীত পড়েছে—হেমন্ত কাল শেষ হতে চলেছে ।

শরৎ উত্তর দেউলে প্রদীপ দিয়ে এসে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো । বাবা কত রাত্রে ফিরবেন, ঠিক নেই—সে রান্না শেষ করে বসে থাকবে । একলা থেকে থেকে ভাল লাগে না সত্যই—এই নিবান্দা পুরীতে, এই বন-বাদাড়ের মধ্যে ।

তার মন চায় একটু মানুষ জনের সঙ্গ, কারো সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যায়, কেউ একটা মজার গল্প বলে । তবুও কলকাতা থেকে প্রভাসদা এসেছিল, খানিকটা সময় কাটলো ।

এই সময় যদি একবার রাজলক্ষ্মী আসতো !

রান্না করতে করতে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে গল্প করা যেতো তা হলে । মুখটি বুজে কি করে মানুষ থাকতে পারে সারাদিন ?

রান্না চড়িয়ে শরৎ আপন মনে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে লাগল—

দাদা, কে বা কার পর কে কার আপন !
কালশয্যা পরে
মোহনিদ্রা ঘোরে
দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন—

এই গ্রামেই বারোয়ারির যাত্রায় শোনা গান। শরতের গলার সুর এক সময়ে খুব ভাল ছিল—এখন আর কিশোরীর বীণানিন্দিত সুকণ্ঠ নেই—তবুও সে বেশ ভালই গায়। তবে রাজলক্ষ্মী ছাড়া তার গান আর কেউ শোনে নি কখনও, এই যা দুঃখ। এমন কি কেদারও শোনেন নি।

এক বার সে বাইরে বেরুলো—বেশ জ্যোৎস্না আজ। শীতের আমেজ দিয়েছে বাতাসে—বাইরে এলে গা সিঁর-সির করে। ছাতিম-বনে আর ছাতিম-ফুলের সুগন্ধ নেই—উত্তর দেউলে প্রদীপ দিতে গিয়ে সে দেখেছে।

মনে কত সব অস্পষ্ট ইচ্ছা জাগে, কত কি করবার ইচ্ছে হয়, কত কি দেখবার ইচ্ছে হয়, এই বনের মধ্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই অবস্থায় থেকে মন হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ এও সে জানে অন্য কোথাও গিয়ে সে বেশী দিন থাকতে পারবে না।

তাদের গড়ের খালের দু-পাশে বনে ভরা, ঘরবাড়ি ভাঙা ইটের আর কাঠের স্তূপ। কিন্তু শরতের সমস্ত অস্তিত্ব এই ভিটেটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর দেউলে যখন সে প্রদীপ দেখাতে যায়—তখন বাদুড়নখীর জঙ্গল, ছাতিমগাছের সারি, অন্ধকার কালো পায়রার দীঘি, ভাঙা মন্দির—এরা যেন তার জীবনে একটা স্থায়ী শান্ত অস্তিত্বের বাণী বহন করে আনে, যে অস্তিত্বটা শরতের কাছে একান্ত সত্য ও বাস্তব।

নীল আকাশের তলায় দুপুরের ঝম্‌ঝম্‌ রোদে কালো পায়রার দীঘিতে সে কতদিন নেমেছে ক্ষার কাচতে, কিংবা কুলের থলে মেলে দিয়েছে উঠানের মাচানের ওপর—বাবা হয়তো ঘরে ঘুমিয়ে, কিংবা হয়তো বাড়ি নেই—সেই সময় কতবার তার মনে হয়েছে নানা অদ্ভুত কথা—বহুদূরের কোনো নাম-না-জানা দেশ থেকে সে জন্মেছে এসে এই গড়বাড়ির রাজবংশে—যে রাজবংশে সে আর তার বাবা চলে গেলে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। সে রাজবংশের মেয়ে—রূপকথার রাজকন্যা, রুক্ষ চুলে তেলের অভাব তখন তার মনে থাকে না, ভাঁড়ারের চালডালের দৈন্য, ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি বাঁশের আড়ার ওপর—এসব সে ভুলে যায়।

সে রাজার মেয়ে—রাজকন্যা।

ঐ নীল আকাশ, ঐ ছাতিম-বনের সারি, ঘুঘু-কোকিলের দল, সারা দেশ, সারা পৃথিবী তার অস্তিত্বের দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে কিসের অপেক্ষায়—গভীর রহস্যভরা তার মহিমান্বিত অস্তিত্বের দিকে।

আবার এক এক সময় ভুল ভেঙে যায়।

সে তখন বড় ছোট হয়ে পড়ে।

যখন রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি চুপি চুপি কাঠা হাতে চাল ধার করতে যেতে হয়, কলুর তাগাদাকে হজম করতে হয়, পয়সার অভাবে ঘর্মাক্ত মুখে হেঁইও হেঁইও করে সাবানদেওয়া ময়লা কাপড়ের রাশি কাচতে হয় নির্জন দীঘির ঘাটে—তখন সে হয় নিতান্ত গরীবের ঘরের মেয়ে, হয়তো বাগ্‌দী কিংবা দুলে—তার কোনো লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, অপমান নেই—নিজের জন্যে নয়, নিজের কষ্ট সে কোনোদিন গ্রাহ্য করেও নি, কিন্তু বাবার জন্যে সে করতে পারে না এমন কাজই নেই···বাবার এতটুকু কষ্ট সে দেখতে পারবে না কোনোদিন···

তার নিঃসন্তান মাতৃত্বের সবটুকু স্নেহ গিয়ে পড়েছে বাবার ওপরে। বাবা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, সব জিনিস হয়তো ঠিক মত বুঝতে পারেন না—তাঁকে আগলে বেড়ানো উচিত সব সময়।

মা যখন নেই, তখন তাকেই করতে হবে বাবার সব কাজ। তাঁর সব সুখ-সুবিধে তাকেই

দেখতে হবে। বাবাকে ফেলে তার মরেও সুখ নেই।

এ অভাবের সংসারে সে যে কত জায়গা থেকে জিনিসপত্র জুটিয়ে আনে, বাবা কি তার কোনো খবর রাখেন ?

তিনি দুবেলা ঠিক খাবার সময় এসে বললেন—শরৎ ভাত হয়েছে ? ভাত দে মা। চাল যে কতদিন বাড়ন্ত থাকে, তেল নুনের অভাবে রান্না হয় না—বাবা কখনো রেখেছেন সে সন্ধান ?

রাজকন্যার গর্ব্ব তখন খসে পড়ে, রাজকন্যা তখন এক গরীব গৃহস্থের ছেঁড়াশাড়ী-পরা মেয়ে হয়ে কাঠা হাতে তেলের বাটি হাতে ছোটে ধর্ম্মদাস কাকাদের বাড়ি, রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি···সাজিয়ে বানিয়ে কত মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা সেখানে বলে, মানকে জলে ভাসিয়ে দেয়, চক্ষুলজ্জাকে আমল দিতে চায় না।

যখন আরও বয়স কম ছিল, মাঝে মাঝে কিন্তু সত্যিকার রাজকন্যা হতে তার ইচ্ছে জাগতো মনে। গড়বাড়ির পুকুরপাড়, বন, জংলী লতায় ঢাকা ইটের স্তূপ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে, তার স্বাস্থ্য-ভরা দেহের প্রতি পদক্ষেপে গর্ব্ব ও আনন্দ, প্রাণে অফুরন্ত গানের ঝঙ্কার, মুকুলিত প্রথম যৌবনের অপরিসীম স্বপ্ন তার চোখের চাউনিতে—তখন একদিন এক দেশের রাজপুত্র এলেন ঘোড়ায় চেপে, তার রূপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে যে—না এসে কে থাকতে পারবে ?

—বিয়ে তোমায় আমি করবো না রাজপুত্তুর—

—ওমা, সে কি সর্ব্বনাশ ! তুমি বলো কি রাজকন্যে, আমার ঘোড়ার দিকে চেয়ে দেখ, ঘেমে উঠেছে। কন্দুর থেকে ছুটে আসছি যে তোমার জন্যে—আর তুমি বলো কি না—

—বাজে কথা বলে লাভ কি রাজপুত্তুর। ফিরে যাও—

—কেন বলো না ? কি হয়েছে ?

—আমরা মস্ত বড় বংশ, তার ওপরে ব্রাহ্মণ—তোমার কোন্ দেশে ঘর, কি বংশ তার নেই ঠিকানা—আমায় কত হীরেমোতির গহনা দিতে হবে জানো ? আমার বাবাকে এক গাদা টাকা দিতে হবে জানো ?···বাবা দোকান করবেন।

—এই কথা ! কত টাকা দিতে হবে তোমার বাবাকে ? কিসের দোকান করবেন তিনি ?

—দাও দু হাজার পাঁচ হাজার। চাল-ডাল-ঘি-তেলের প্রকাণ্ড মুদিখানার দোকান—ছিবাস কাকার দোকানের চেয়ে অনেক, অনেক বড়—বাবার কষ্ট যে দূর করবে, সে আমায় নিয়ে যাবে—

কেদার এসে ডাক দিলেন—ও মা, ওঠ্—ও শরৎ—উঠে পড়ো—

আঁচল বিছিয়ে কখন শরৎ উনুনের সামনে রান্নার পিঁড়ির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবার ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

—নাঃ, তুই কোন্ দিন পুড়ে মরবি দেখছি, আচ্ছা, রাঁধতে রাঁধতে অমন করে উনুনের সামনে শোয় ? যদি আঁচলখানা উড়ে পড়তো আগুনে ? ঘুম ধরলে তোর আর জ্ঞানকাণ্ড থাকে না—

শরৎ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে ?···আঁচল উড়ে পড়তো তো বেশ ভালই হ'ত। তোমার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে স্বর্গে চলে যেতাম—বাবাঃ—রাত্তিরে একটু ঘুমুবারও যো নেই—বেশ যাও—

কথা শেষ করেই শরৎ আবার তখুনি মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল।

কেদার জানেন, মেয়ের ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নি—এই রকমই হয় প্রায় প্রতিদিন, তিনি দেখে এসেছেন। ভারী ঘুমকাতুরে মেয়ে।

তিনি আবার ডাক দিলেন—ও শরৎ—মা আমার ওঠো—এই যে আমি বাড়ি এইচি—ও মা—ওঠো, লক্ষ্মী-মা আমার—বুঝলি ? উঠে চোখে জল দে দিকি ? ঘুম কেটে যাবে এখন—

শরৎ এবার সত্যিই উঠল।

কেদার বললেন, যা চোখে জল দিয়ে আয়—তোরি যা ঘুম। রাত আর এমন কি হয়েছে ? এই তো সবে রাত দশটার গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল, যখন গড়ের খাল পার হই।

শরৎ বাবাকে খাবার ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বাড়তে বসল।

খানিকটা পরে খাওয়াদাওয়া সেরে কেদার তামাক খেতে খেতে বললেন—ভাল কথা, প্রভাস কখন গেল রে ? বেশ ছেলেটি। ওকে এবার একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। তোরও একটা কিছু দেওয়া উচিত।

—কি দেব বাবা ? আমিও তা ভেবেছি।

—একটা কিছু বুনে-টুনে দে না। আসন-টাসন গোছের। শুধু হাতে কারো কাছে কিছু নিতে নেই তো ? দিস্ একটা কিছু করে। আংটিটা কই দেখি ?

শরৎ মৃদু হাসিমুখে বললে, সে নেই বাবা।

কেদার অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, নেই ! কি হ'ল ?

শরৎ মুখ নিচু করে হাসি-হাসি মুখেই বললে, সে বাবা আমি দীঘির জলে ফেলে দিয়ে এসেছি। রাগ করো নি বাবা !

—সে কি রে ? কখন ?

—উত্তর দেউলে পিদিম দিতে যাওয়ার সময়। কি হবে বাবা বিধবা মানুষের হীরের আংটি পরে ?

কেদার মেয়ের সঙ্গে তর্ক করলেন না। মেয়েকে চিনতে তাঁর বাকী নেই। সুতরাং তিনি চুপ করে রইলেন। কেবল তাঁর মনে দুঃখ হচ্ছিল অমন দামী আংটিটা যদি রাখবিই নে বাপু, তবে সে বেচারীর কাছ থেকে নেওয়া কেন ?

এমন খামখেয়ালি মেয়ে !

দুপুরে রাজলক্ষ্মী এল শরতের কাছে। কেদার খেয়ে হাট করতে বেরিয়ে গিয়েছেন—আজ গেঁয়োহাটির হাটবার।

রাজলক্ষ্মী দেখতে বেশ মেয়েটি। নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, কখনো শহরের মুখ দেখে নি, তবে শহরের কথা অনেক জানে। তার দুই মামাতো ভগ্নীপতি এখানে মাঝে মাঝে আসে। কলকাতায় কাজ করে তারা—শহরের অনেক গল্প সে শুনেছে ওদের মুখে।

রাজলক্ষ্মী বললে, হাঁ শরৎদি, প্রভাসবাবু বুঝি কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ি এসেছিল ? কি বললে ?

—বলবে আর কি, বৈকেলে এসেছিল, সন্দের আগে চলে গেল। গল্পগুজব করলে বসে —চা করে দিলাম। বেশ লোক প্রভাসদা। আমাদের বলেছে এক দিন কলকাতায় নিয়ে যাবে—বাবাকে আর আমাকে।

—কবে শরৎ দিদি ?

—তার কিছু ঠিক আছে ? তবে প্রভাসদা বলেছে যেদিন আমি মনে করবো সেদিনই নিয়ে যাবে।

—রেলে ?

—না, মটোর গাড়িতে। এখান থেকে সমস্ত পথ মটোরে যাবে—কেমন মজা হবে, কি বলিস ? তুই চড়েছিস্ কখনো মটোর গাড়িতে ?

রাজলক্ষ্মী উদাস নয়নে অন্য দিকে চেয়েছিল। শরৎদিদির কথায় তার মনে কত অদ্ভুত ছবি জেগে উঠেছে। আজ বছর দুই আগে পিসেমশায় একটি বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন তার জন্য—ছেলেটি কলকাতায় চাকরি করতো। চল্লিশ টাকা মাইনে। বেড়ে নাকি হতে পারে একশো টাকা। তাদের পৈতৃক বাড়ি কোন্নগর, চাকরি উপলক্ষে কলকাতায় আছে অনেক দিন।

সম্বন্ধটা রাজলক্ষ্মীর মনে ধরেছিল। ছেলেটিও দেখতে নাকি ভালই ছিল। কি দেনা-পাওনার গণ্ডগোলে সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে।

মাস দুই ধরে কথাবার্ত্তা চলবার ফলে রাজলক্ষ্মীর মন অনেকবার নানা রঙীন স্বপ্ন বুনেছিল সেটাকে ঘিরে। কখনো যে কলকাতা সে দেখে নি এবং হয়তো দেখবেও না কখনো ভবিষ্যতে—সেই কলকাতা শহরের একটা বাড়ির দোতলার ঘরে খাট টেবিল চেয়ার সাজানো তাদের ঘরকন্না, দালানের এক কোণে ছোট্ট একটি খাঁচায় টিয়া কি ময়না পাখী, মাটি-দেওয়া টিনের টবে তুলসী গাছ, একটা ঘেরাটোপ-মোড়া সেলাইয়ের কল টেবিলের এক পাশে—নিস্তব্ধ দুপুরে বসে সে হয়তো কিছু একটা বুনছে কি সেলাই করছে—উনি গিয়েছেন আপিসে—বাসায় শ্বশুর-শাশুড়ী বা ও ধরণের কোনো ঝামেলা নেই—সে আছে একাই—নিজেকে কত মনে মনে সেই কল্পনীয় ঘরকন্নাটিতে ডুবিয়ে দিয়েছে সে, সে ঘরের খুঁটিনাটি কত কি পরিচিত হয়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে—দেখলেই যেন চিনে নিতে পারতো ঘরটা—কিন্তু কোথায় কি হয়ে গেল, সে ঘরে গিয়ে ওঠা তার আর ঘটে উঠল না।

শরৎ দিদির কথায় সে অল্পক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, শেষের দিকের প্রশ্নের মানে সে ভাল করে না বুঝে শূন্যদৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি বললে শরৎদি? মজা?···ও, মজা হবে না আবার? খুব হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এখান থেকে যেখানে বেরুবে সেখানেই ভাল লাগবে। একঘেয়ে দিন যেন আর কাটতে চায় না। অসহ্য হয়ে উঠছে দিন দিন। দুপুরে যে তোমার এখেনে নিশ্চিন্দি হয়ে বসবো তার উপায় নেই। এতক্ষণ কাকীমা ঘুম থেকে উঠলেন, যদি দেখেন এখনও এঁটো বাসন মাজা হয় নি, রান্নাঘর ধোয়া হয় নি, তবে সন্দে পর্য্যন্ত বকুনি চলবে।

শরৎ হাসিমুখে বললে, তা হলে তুই ঝগড়া করে এসেছিস্ বাড়ি থেকে, ঠিক বললাম। হ্যাঁ কি না বল্?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল।

শরৎ বললে, তাই বুঝলাম এতক্ষণ পরে। নইলে ঠিক দুপুর বেলা তুমি আসবার মেয়েই আর কি! ভাত খেয়ে এসেছিস না আসিস নি, সত্যি কথা বল্—আমার মাথার দিব্যি—আমার মরা মুখ দেখিস—

—না তা নয়। তেমন ঝগড়া নয়। ভাত খেয়েছি বৈকি—

—সত্যি বলছিস্?

—মিথ্যে কথা বলবো না শরৎদি, তুমি যখন অমন দিব্যি দিলে। না, সে খাওয়ার কথা নিয়ে নয়—ঝগড়া নিয়েও নয়, সত্যিই এত একঘেয়ে হয়ে উঠেছে এখানে—ইচ্ছে হয় যেদিকে দু-চোখ যায় ছুটে যাই—

—সত্যি, যা বলিল ভাই, আমারও বড় একঘেয়ে লাগে। সেই সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত একই হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে নাড়ছি, আর একই দীঘির ঘাটে সতেরো বার দৌড়ুচ্ছি, তার পর কেবল নেই আর নেই—

কিন্তু তরুণী রাজলক্ষ্মীর মন যা চায়, যে জন্যে ব্যাকুল—শরৎ তা ঠিক বুঝতে পারে নি। রাজলক্ষ্মীও ঠিকমত বোঝাতে পারে না, তাই নিয়েই তো আজ বাড়িতে কাকীমার

বকুনি খেতে হ'ল। সে সম্বর্দা নাকি থাকে অন্যমনস্ক, কি তাকে বলা হয় নাকি তার কানে যায় না—ইত্যাদি, তার বিরুদ্ধে বাড়ির লোকের অভিযোগ। শরৎ বুঝতে পারে না ওর দুঃখ। ঘরকন্না করে করে শরতের মন বসে গিয়েছে এই সংসারেই, যেমন তাদের বংশের পুরোনো আমলের পাথরের থাম আর ভাঙা মূর্ত্তিগুলো ক্রমশঃ মাটির ওপর চেপে বসতে বসতে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে!

উঠোনের রোদ এইসময় একটু পড়ল। রাজলক্ষ্মী বললে—চলো শরৎ-দি, একটু গিয়ে দীঘির ঘাটে বসি, বেশ ছায়া আছে গাছের—বেশ লাগে।

শরৎ বললে, আমায় তো যেতেই হবে এঁটো বাসন মাজতে। চল্ ওখানে বসে গল্প করিস্—আমার কি হয়েছে জানিস—মুখ বুজে থেকে থেকে আরও মারা গেলুম। আচ্ছা তুই বল্ রাজলক্ষ্মী, ভাল লাগে সকাল থেকে রাত দশটা অবধি? কার সঙ্গে দুটো কথা কই যে!—বাবা তো সব সময়েই বাইরে—

—তুমি তো আবার এমন জায়গায় থাকো যে গাঁয়ের কেউ আসতে পারে না।—এত দূরে আর এই বনের মধ্যিখানে। জানো শরৎ-দি, গাঁয়ের বৌ-ঝি এদিকে আসতে ভয় পায়, সাধনের বৌ সেদিন বলছিল গড়বাড়িতে নাকি ভূত আছে—

—সাধনের বৌয়ের মুণ্ডু—দূরে!

—তোমার নাকি সয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া সে ভূতে তোমায় কিছু বলবে না। তুমি তো এই বংশের মেয়ে—রাজার মেয়ে। আমাদের মত গরীব-গুরবো লোকদেরই বিপদ—হি—হি—

—মরবি কিন্তু মার খেয়ে আমার কাছে—

কালো পায়রা দীঘির সান-বাঁধানো ভাঙা ঘাটের নিচু ধাপে বড় বড় গাছের ছায়া এসে পড়েছে পুকুরের জলে আর ঘাটের রানাতে। ঘাটে ছাতিম আর অন্য অন্য গাছের ছায়া। বাঁ-দিকে দূরে উত্তর দেউল, যদিও এখান থেকে দেখা যায় না—সামনে সেই ইটের ঢিবিটা। প্রভাস যেখান থেকে ইট নিয়ে গিয়েছে গ্রামের স্কুলের জন্যে। সামনে প্রকাণ্ড দীঘিটার নিথর কালো জল—জলের ওপর এখানে-ওখানে পানকলস আর কলমির দাম, কোণের দিকে রাঙা নাললতার পাতা ভাসছে, যদিও এখন ওর ফুল নেই।

শরৎ এ সময় রোজ বসে একাই বাসন মাজে। আজ রাজলক্ষ্মীকে পেয়ে ভারি খুশী হয়েছে সে।

এই ঘাটে বসে শরৎ কত স্বপ্ন দেখেছে—রোজ এই বাসন মাজবার সময়টি একা বসে বসে। নীল আকাশের তলায় ঠিক দুপুরের অলস স্তব্ধতাভরা ছাতিম-বন, ভাঙা ইটের রাশ আর কালো পায়রা দীঘির নিথর কালো জল—হয়তো কখনো কাক ডাকে কা-কা—কিংবা যেমন আজকাল ঘুঘু সারাদুপুর ধরে ডাকের বিরাম বিশ্রাম দেয় না। কি ভালই যে লাগে!

জীবনের যে একঘেয়েমির কথা রাজলক্ষ্মী বললে, শরৎ তা কখনো হয়তো সেভাবে বোঝে নি। এই গ্রামে এই গড়বাড়ির ইটের ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে জন্মেছে—এরই বাইরের অন্য কোন জীবনের সে কল্পনা করতে পারে না। অন্ততঃ করতে পারতো না এতদিন।

কিন্তু কি জানি, সম্প্রতি তার মনে কোথা থেকে বাইরের হাওয়া এসে লেগেছে—কালো দীঘির নিস্তরঙ্গ শান্ত বক্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

প্রথমে এল তাদের অতিথিশালায় সেই বুড়ো বামুন, তার বাবার কাছে যে জেলার সীমানা দেখবার অপূর্ব্ব গল্প করেছিল। যা ছিল স্থাণুবৎ অচল, অনড়—সেই নির্ব্বিকার অতি শান্ত অস্তিত্বের মূলে কোথায় যেন সে কি নাড়া দিয়ে গেল। তার এবং তার বাবার।

বামুনজ্যাঠা কত গল্প করতো তার রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে বসে। বাইরের ঘরকন্না,

কত সংসারের কথা, কত ধরণের সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান, যা তাদের গড়ের বাগানের চেয়েও অনেক বড়, পঞ্চাশ বিঘের কলমের আমবাগান; কত বড় বাড়ি, তাদের মেয়েদের বৌদের কথা, দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছের সারি, শেওড়াবন, শিরীষের ফল পেকে ফেটে কালো বীচির রাশি ছড়িয়ে আছে; উইয়ের ঢিবির পাশে বনধুতুরার ঝোপ। শরৎ তন্ময় হয়ে শুনতো।...

অন্য এক জীবন, অন্য এক অস্তিত্বের বার্ত্তা বহন করে আনতো এ সব গল্প। আজ সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে—তার হাত-পা বাঁধা, কোথাও যাবার উপায় নেই, কিছু দেখবার উপায় নেই—তার ওপর রয়েছেন বাবা, বৃদ্ধ, সদানন্দ বালকের মত সরল, নির্ব্বিকার।

তার পরে এল প্রভাসদা।

প্রভাসদা এল আর এক জীবনের বার্ত্তা নিয়ে। শহরের সহস্র বৈচিত্র্য ও জাঁকজমক আছে সে কাহিনীর মধ্যে। মানুষ যেখানে থাকে অত অদ্ভুত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ডুবে—নিত্য নতুন আনন্দের মধ্যে যেখানে দিন কাটে, দেখতে ইচ্ছে হয় শরতের সে দেশ কেমন। খুব বড় একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা শরতের মনে জেগেছে প্রভাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে।

তার পরে এই রাজলক্ষ্মী, ষোল বছরের কিশোরী মেয়ে তো মোটে—এরও নাকি একঘেয়ে লাগছে আজকাল গড়শিবপুরের জীবন। ওর বয়সে শরৎ শুধু শিবপুজো করেছে বসে বসে দীঘির ঘাটে বোধনের বেলতলায়, অত সে বুঝতও না, জানতও না।

কিন্তু আজকালের মেয়েদের মন আলাদা। শরৎ যে কালের মেয়ে, সে কাল কি আছে?

রাজলক্ষ্মী শরতের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল—সত্যি শরৎদি—

শরৎ মুখ নিচু করে বাসন মাজছিল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে, কি রে?

—আচ্ছা, তোমার চেহারা দেখলে কে বলবে তোমার বয়স হয়েছে! তোমাকে দেখে, আমি মেয়েমানুষ, আমারই চোখের পলক পড়ে না শরৎদি—সত্যি-সত্যি বলছি। রাজকন্যে মানায় বটে।

শরৎ সলজ্জ হাসি হেসে বললে, দূর—বাঁদরী!

—মিথ্যে বলি নি শরৎদি—এতটুকু বাড়িয়ে বলছি নে—

—কেন নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝি কথা বলিস্ নে?

—আর লজ্জা দিও না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। অনেক তাকিয়ে দেখেছি, কাজেই ওকথা মনে সর্ব্বদাই জেগে থাকে। ওকথা তুলে আর কেন মন খারাপ করিয়ে দ্যাও?

শরৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্ততঃ করে বললে—একটা কথা বলবো রাজলক্ষ্মী?

—কি শরৎদি?

—আমায় অমন কথা আর বলিস্ নে। কে কোথায় থেকে শুনবে আর কি ভাববে। এ গাঁ বড় খারাপ হয়ে উঠেছে ভাই।

—কেন শরৎদি এ কথা বললে?

—তোকে এতদিন বলি নি, কাউকে বলি নি বুঝলি? কিন্তু যখন কথাটা উঠলই, তখন তোর কাছে বলি।

—কি কথা বলে ফেল না ঝাঁ করে। হাঁ করে তোমার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকবো—

—এ গাঁয়ের কতকগুলো পোড়ারমুখো ড্যাকরা জুটেছে, তাদের মা বোন জ্ঞান নেই—সেগুলোর জ্বালায় আমার সন্দের সময় উত্তর দেউলে পিদিম দিতে যাবার যদি জো থাকে—সেগুলো কবে যাঁড়াতলার ঘাটসই হবে তাই ভাবি—

রাজলক্ষ্মী অবাক হয়ে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, বলো কি শরৎদি! এ কথা তো কোন দিন শুনি নি তোমার মুখে! কবে দেখেছ? কি করে তারা?

—কি করে আবার—উত্তর দেউলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, ছাতিমবনের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে। রোজ নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই করে। এই কালও তো করেছিল।

—কাল?

—কালই। প্রভাসদা উঠে চলে গেল, তখন প্রায় বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। আমি উত্তর দেউলে গেলাম সন্দে দেখাতে, আর অমনি শুনি মন্দিরের পশ্চিম গায়ে দেওয়ালের ওপাশে কার পায়ের শব্দ অন্ধকারে—

—বলো কি শরৎদি! আমার শুনে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। তোমার ভয় করলো না?

—আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে ভাই। আর বছর সারা বর্ষাকাল অমনি করে মরেছে পোড়ারমুখোরা—তাদের যমে ভুলে আছে—আবার শুরু করেছে এই ক'দিন—

—তার পর, কি হল?

—কি আর হবে, সাহস নেই এক কড়ার। হেই করলে কুকুরের মত পালিয়ে যায়। একবার যদি দেখতে পাই—তবে দেখিয়ে দিই কার সঙ্গে তারা লাগতে এসেছে। বঁটি দিয়ে নাক কেটে ছাড়ি—

—জ্যাঠামশায়কে বলো না কেন?

—বাবাকে? পাগল! উনি কিছু করতে পারবেন না, মাঝে পড়ে গাঁয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াবেন। মন্দ লোকে পাঁচ কথা বলবে।

—বাবাকে কি ধর্ম্মদাসকে বলবো তবে?

—না ভাই কাউকে বলবি নে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা ওঠাবে। গাঁয়ের লোক বড় খারাপ, জানো তো সবই। কাকারা করতে যাবেন ভালো ভেবে, হয়ে যাবে উল্টো। তা ছাড়া তাঁরা করবেনই বা কি? চোখে তো কাউকে দেখি নি।

—আচ্ছা সন্দেহ হয় কারো ওপরে শরৎদি?

শরৎ চুপ করে নিচু মুখে বাসন মাজতে লাগল।

রাজলক্ষ্মী বললে, বলো না শরৎদি, কাউকে সন্দেহ কর?

—কার ভাই নাম করবো—যখন চোখে দেখি নি। তবে সন্দেহ আমার হয় কার ওপর তা বলতে পারি, তুই কিন্তু কারো কাছে কিছু বলতে পারবি নে। কীর্ত্তি মুখুজ্জের ভাগ্নে অনাদি ছোঁড়াটার চালচলন, অনেক দিন থেকে খারাপ দেখছি। রাস্তাঘাটে যখন দেখা হয়—তখন কেমন হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, শিস্‌ দেয়—আর ওই বটুক মুখপোড়াটাকেও আমার সন্দেহ হয়।

—বটুক-মামা? তার তো বয়েস হয়েছে অনেক—তবে—

—বয়েস হয়েছে তাই কি? আমিও তো দাদা বলে ডাকি। ও লোক কিন্তু ভাল না।

—সে আমিও একটু একটু না জানি এমন নয় শরৎ দিদি—একদিন হয়েছে কি শোনো তবে বলি। আমি আসছি হারান চক্কত্তিদের বাড়ি থেকে—ঠিক দুপুর বেলা, ঘোষেদের কাঁটাল বাগানে এসে বটুক মামার সঙ্গে দেখা—

শরৎ বাধা দিয়ে বললে, থাকগে—ওসব কথা আর শুনে কি করবো? ওসব শুনলে রাগে আমার সর্ব্বশরীর রি রি করে জ্বলে। তবে ওরা এখনও আমায় চিনতে পারে নি। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই আমার। শাস্তি যেদিন দেবো, সেদিন নিজের হাতে দেবো। মুখপোড়াদের শিক্ষে সেদিন ভাল করেই হবে। তবে একটা কথা বলি—যাদের নাম করলাম, তাদের সন্দেহ করি এই পর্যন্ত। ওরা কি না, আমি ঠিক জানি নে—চোখে তো দেখতে

পাই নি কাউকে। অন্যায় দোষ দিলে ধর্ম্মে সইবে না।

রাজলক্ষ্মী প্রশংসমান দৃষ্টিতে শরতের সুগঠিত সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—সে যদি কেউ পারে, তবে তুমিই পারবে শরৎদি, তা আমি জানি। তোমায় দেখলে আমাদের মনে সাহস আসে।

শরৎ দুষ্টুমির হাসি হেসে রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে সুন্দর ভঙ্গিতে চেয়ে বলল—ইস্! বলিস্ কি রে! সত্যি? সত্যি নাকি?

রাজলক্ষ্মীও উৎসাহের সুরে হাসিমুখে বললে, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় শরৎ দিদি? কি চমৎকার ভাবে চাইলে? আমারই মন কেমন করে ওঠে, তবুও আমি মেয়েমানুষ।

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, আবার! বারণ করে দিলাম না? ওসব কথা বলবি নে। মেয়ের এদিকে নেই ওদিকে আছে? চল্ বাসনগুলো কিছু নে দিকি হাতে করে—
—বেলা আর নেই। এখন ছিষ্টির কাজ বাকি!

বাড়ি ফিরে রাজলক্ষ্মী বললে, চলে যাই শরৎ দিদি—সন্দে হলে যেতে ভয় করবে।

শরৎ তাকে যেতে দিলে না। বললে—ও কিরে! তোকে কিছু খেতে দিলাম না যে? তা হবে না। এইবার চা করি, আর কিছু খাবার করি।

—না শরৎদি, পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও আজ। আর একদিন এসে খাবো এখন।

শরৎ কিছুতেই শুনলে না—কখনো সে রাজলক্ষ্মীকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দেয় না, নিজে সে গরীব, গরীব ঘরের মেয়ে রাজলক্ষ্মীর দুঃখ ভাল করেই বোঝে। বাড়িতে হয়তো বিকেলে খাবার কিছুই জোটে না—আসে এখানে, গল্প করে—ওকে খাওয়াতে পারলে শরতের মনে তৃপ্তি হয় বড়। শরৎ চা করে দিলে ওকে, নিজের জন্যে একটা কাঁসার গ্লাসে ঢেলে নিলে। হালুয়া করে ওকে কিছু দিয়ে বাকিটা বাবার জন্য রেখে দিলে।

রাজলক্ষ্মী বললে, ওকি শরৎদি, তুমি নিলে না?

—আমি একেবারে সন্দের পরই তো খাবো। এখন খেলে আর খিদে পায় না, তুই খা।

রাজলক্ষ্মী চা ও খাবার পেয়ে একটু খুশীই হল। বললে, কি সুন্দর হালুয়া তুমি করো শরৎদি—

—যাঃ, আমার সবই তো তোর ভালো।

—তা ভালো লাগলে ভালো বলবো না? বা রে—তোমার সবই আমার যদি ভালো লাগে, তবে কি করি বলো না?

—আমারও ভাল লাগে তুই এলে, বুঝলি? এই নিবান্দা পুরীর মধ্যে একা মুখটি বুজে সদাসর্ব্বদা থাকি, কেউ এলে গেলে বড় ভাল লাগে। বাবা তো সব সময় বাড়ি থাকেন না—তোর সঙ্গে বেশ একটু গল্পগুজব করে বড় আমোদ পাই।

—আমারও, শরৎদি! গাঁয়ের আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশে তেমন আমোদ পাই নে, তাই তো তোমার কাছে আসি।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহের বয়স পার হয়েছে—কিন্তু বাপ-মায়ের পয়সার জোর না থাকায় এখনও কিছু ঠিকঠাক হয়নি। শরতের মনে এটা সর্ব্বদাই ওঠে, যেন তার নিজেরই কন্যাদায় উপস্থিত।

কেদারকে দিয়ে শরৎ দু-এক জায়গায় কথাবার্ত্তা তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পয়সাকড়ির জন্যে সে-সব সম্বন্ধ ভেঙে যায়। আজ দিন দশ-বারো হল, কেদার আর একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন—শরতেরও শুনে মনে হয়েছে সেখানে হলে ভালই হয়। পূর্ব্বে এ নিয়ে

একবার দুই সখীর মধ্যে কথাবার্তাও হয়েছে।

আজও শরৎ বললে—ভালো কথা, রাজলক্ষ্মী—আসল ব্যাপারের কি করবি বল—

রাজলক্ষ্মী না বুঝতে পারার ভান করে বললে—কি ব্যাপার আসল ?

—তোকে যে-কথা সেদিন বললাম। সাঁতরা পাড়ার সেই সম্বন্ধটা—

রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। মুখে বললে—যাঃ, আর ও-সবে দরকার নেই। বেশ আছি। কেন তাড়িয়ে দেবে শরৎদি ?

—না ও-সব চালাকি রাখ দিকি। এখন আমায় বল, বাবাকে কি বলবো।

যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উঠেছে তার সম্বন্ধে সব কথা রাজলক্ষ্মী ইতিপূর্বে দুবার শুনেছে শরতেরই মুখে—তবুও তার ইচ্ছে হল আর একবার সেকথা শোনে।

শুনতে লাগে ভালই। তবুও কিছু নূতনত্ব।

সে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, ভারি তো সম্বন্ধ ? ছেলে কি করে বলেছিলে ?

শরৎ বললে, নৈহাটিতে পাটের কলে চাকরি করে, শুনেছি মাকে নিয়ে নৈহাটিতেই বাসা করে থাকে।

রাজলক্ষ্মী ঠোঁট উলটে বললে, পাটের কলে আবার চাকরি ! তুমিও যেমন !···

রাজলক্ষ্মী কথাটা বললে বটে, কিন্তু তার মনে হল এ সম্বন্ধ খারাপ নয় ! ছেলেটির বিষয়ে আরও কিছু জানবার তার খুব কৌতূহল হল, কেমন দেখতে, কত টাকা মাইনে পায়, বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা।

শরৎ কিন্তু সে দিক দিয়েও গেল না। বললে, তা তো বুঝলাম, তোর খুব উঁচু নজর। কিন্তু জজ মেজেস্টার পাত্র এখন পাওয়া যাচ্ছে কোথায় বল্ ? অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা ? কি মত তোর ?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে থেকে বললে, ভেবে বলবো শরৎদিদি—আচ্ছা কি পাশ বলেছিলে যেন সেদিন ?

খানিকক্ষণ এ-সম্বন্ধে কথা চলে যদি, বেশ লাগে।

—শরৎ বলে ম্যাট্রিক পাশ।

—মোটে !

—অমন কথা বলিস্ নে। দু-তিনটে পাশ পাত্র কি পাওয়া সহজ ? এতগুলো টাকা চাইবে।

—আচ্ছা, পাটের কল কি রকম শরৎদি ?

শরৎ হেসে বললে, আমি তো আর দেখি নি কখনো। তোরও পরের মুখে ঝাল খাওয়ার দরকার কি, একেবারে নিজের চোখেই তো দেখবি।

—যাঃ, শরৎদি যেন কি !

শরৎ হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা শোন, তুই যে বলছিস ম্যাট্রিক পাশ কিছুই না—দু-তিনটে পাশ ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলে তুই কথা বলতে পারবি তার সঙ্গে ?

—কেন পারবো না, দেখে নিও—

গল্পে দুজনে উন্মত্ত, কখন ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, বাইরে বেশ অন্ধকার নেমেছে, ওরা খেয়ালই করে নি। ছাতিমবনে শেয়াল ডেকে উঠলে ওদের চমক ভাঙলো।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, ও শরৎদি, একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল যে ! আমি কি করে যাবো ?

—বোস্ না। বাবা এলে তোকে বাড়ি দিয়ে আসবেন এখন।

—না শরৎদি আমি যাই, তুমি গড়ের খাল পার করে দিয়ে এসো আমায়—বাকী পথ ঠিক

যাবো। আমার যত ভয় এই গড়ের মধ্যে।

—আর আমি একলাটি এখন কতক্ষণ পর্য্যন্ত বসে থাকবো তার ঠিক আছে? বাবা যে কখন ফিরবেন! তুই থাকলে বড্ড ভাল হত। থাক্ না লক্ষ্মীটি—আর একটু চা খাবি? •

কিন্তু রাজলক্ষ্মী আর থাকতে চাইল না। বেশি রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকলে মা ভারি বকবে। একলাটি অন্ধকারে যেতে ভয়ও করে। কেদার-জ্যাঠার আসবার ভরসায় থাকতে গেলে দুপুররাত হয়ে যাবে, বাপ রে!

কেরোসিনের টেমি ধরে শরৎ গড়ের খাল পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিল। রাজলক্ষ্মী খাল পার হয়ে ওপারের রাস্তায় উঠে বললে, তুমি যাও শরৎদি, গোয়ালাদের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে—আর ভয় নেই।

যেতে যেতে সে ভাবছিল, নৈহাটি কেমন জায়গা না জানি।

সংসারে বেশী ঝামেলা না থাকাই ভালো।

ম্যাট্রিক পাশ ছেলে মন্দ নয়।

ছেলের রংটা কালো না ফর্সা?

চার

শীত কমে গিয়েছে—বসন্তের হাওয়া দিতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সজনে গাছে থোকা থোকা ফুল দেখা দিয়েছে।

কেদার নিজের গ্রামেই একটি কৃষ্ণযাত্রার দল খুলেছেন। সম্প্রতি এ অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রার একটা হিড়িক এসে পড়েছে—গত পুজোর সময় থেকে এর সূত্রপাত ঘটে, বর্ত্তমানে মহামারীর মত গ্রামে গ্রামে হুজুক ছড়িয়ে পড়েছে। কেদার হটবার পাত্র নন, তাঁর গ্রামকে ছোট হয়ে থাকতে দেবেন কেন—জেলেপাড়া, কামারপাড়া এবং কুমোরপাড়ার লোকজন জুটিয়ে তিনিও এক দল খুলে মহা উৎসাহে মহলা আরম্ভ করেছেন। স্নানাহারের সময় নেই তাঁর, ভারি ব্যস্ত। সম্প্রতি তাঁর দলের গাওনা হবে চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পুজার দিন, গ্রামের বারোয়ারি তলায়। বেশি দেরি নেই, দেড় মাস মাত্র।

সীতানাথ জেলের বাড়ির বাইরে বড় ছ-চালা ঘর। যাত্রার দলের মহলা এখানেই রোজ বসে। অন্য সকলের আসতে একটু রাত হয়, কারণ সবাই কাজের লোক—কাজকর্ম্ম সেরে আসতে একটু দেরিই হয়ে পড়ে। কেদারের কিন্তু সন্ধ্যা হতে দেরি সয় না, তিনি সকলের আগে এসে বসে থাকেন।

সীতানাথ বাড়ি নেই—শীতকালের মাঝামাঝি নৌকো করে এখান থেকে পাঁচ দিনের পথ চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে—এখনও দেশে ফেরে নি।

সীতানাথের বড় ছেলে মানিক বাড়িতে থাকে ও গ্রামের নদীতেই মাছ ধরে স্থানীয় হাটে বিক্রী করে সংসার চালায়। আজ পুরো মহলা হবে বলে সে সকাল সকাল নদী থেকে ফিরে এসে বাইরের ঘরে বড় বড় খানকতক মাদুর ও চট পেতে আসর করে রেখেছে।

কেদারকে বললে, বাবাঠাকুর, তামাক কি আর এক বার ইচ্ছে করবেন?

—তা সাজ না হয় একবার। হ্যাঁরে মানকে, এরা এখনো সব এল না কেন?

—আসছে বাবাঠাকুর, সবাই কাজ সেরে আসছে তো, একটু দেরি হবে।

—তুই তামাক সেজে একবার দেখে আয় দিকি বিশু কুমোরের বাড়ি। ওর ছেলেটাকে না হয় ডেকে আন। সে রাধিকা সাজবে, তার গানগুলো ততক্ষণ বেহালায় রপ্ত করে দিই—

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জন দুই অভিনেতা ঘরে ঢুকলো—একজন ছিবাস মুদি আর একজন হৃষিকেশ কর্ম্মকার।

কেদার খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আরে ছিবাস যে! এই যে রিষিকেশ এসো এসো—তোমরা না এলে তো রিয়্যাশাল আরম্ভ হয় না। বেশ ভাল করেছ—বসো।

মানিক ততক্ষণ তামাক সেজে কেদারের হাতে দিয়ে বললে, তামাক ইচ্ছে করুন!

কেদারের মনে অকস্মাৎ তুমুল আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। বাইরের ঝিরঝিরে মিঠে ফাল্গুনের হাওয়ায় আমের বউলের সুঘ্রাণ, একটা আঁকোড় ফুলের গাছের সাদা ফুল ধরেছে—সামনে এখন অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত গানবাজনার গমগমে আসর, কত লোকজন, ছেলে-ছোক্‌রা আসবে, মানুষের জীবনে এত আনন্দও আছে!

তামাক খেতে খেতে কেদার খুশির আতিশয্যে বলে উঠলেন, ওহে রিষিকেশ, এদিক এসে—ততক্ষণ তোমার আয়ান ঘোষের পাটটা একবার মুখস্ত বলে যাও শুনি—

কেদারের হুকুম অমান্য করবার সাধ্য নেই কারো এ আসরে। হৃষিকেশ কর্ম্মকার দু-একবার ঢোক গিলে দু-একবার ঘরের আড়ার দিকে তাকিয়ে বিপন্ন মুখে বলতে শুরু করলে—'অদ্য পৌর্ণমাসী রজনী, যমুনা পুলিনের কি অদ্ভুত শোভা! কিন্তু অহো! আমার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিকদংশনের মত এরূপ মর্ম্মঘাতী জ্বালা অনুভব করিতেছি কেন?—কোকিলের কুহু ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে—'

—আঃ দাঁড়াও দাঁড়াও, অমন নামতা মুখস্ত বলে গেলে হবে না। থেমে দমক দিয়ে দিয়ে বলো—কাঠের পুতুলের মত অমন আড়ষ্ট হয়ে থাকার মানে কি? হাত-পা নড়ে না?

এই সময় কয়েকজন লোক এসে ঢুকলো। কেদারের ঝোঁক গানবাজনার দিকে, শুধু বক্তৃতার তালিম তাঁর মনে পুরো আনন্দ দিতে পারে নি এতক্ষণ, নবাগতদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর পালের ছেলে নন্দকে দেখে তিনি হঠাৎ অতিমাত্রায় খুশী হয়ে উঠলেন।

—আরে ও নন্দ, এত দেরি করে এলি বাবা, তবেই তুই রাধিকা সেজেছিস! বারোখানা গান তোমার পার্টে, আজই সব তালিম দেওয়া চাই নইলে আর কবে কি হবে শুনি? বোস, বেয়ালা বেঁধে নি—গানগুলো আগে হয়ে যাক।

দু-এক জন ক্ষীণ আপত্তি তুলবার চেষ্টা করলে। ছিবাস মুদির নন্দ ঘোষের পার্ট, সে বললে, এ্যাক্‌টোর সঙ্গে সঙ্গে গান চললে একানে গানগুলো ভালো রপ্ত হয়ে যেতো বাবাঠাকুর—নইলে এ্যাক্‌টো আড়ষ্ট মেরে যাবে যে!

কেদার মুখ খিঁচিয়ে বললে, থামো না ছিবাস। বোঝ তো সব বাপু—কিসে কি হয় সে আমি খুব ভাল জানি। একানে গান আগে না তালিম দিয়ে নিলে শেষকালে এ্যাক্‌টোর সময় গান গাইতে গেলে ভয়েই গলা শুকিয়ে যাবে। তুমি তোমার নিজের পাট দ্যাখো গিয়ে বাইরে বসে—

ছিবাস ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে গেল। এর পরে আর কেউ কোন প্রকার প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না, কেদারের মুখের ওপর প্রতিবাদ কখনো বড় একটা করেও না কেউ।

সুতরাং গান-বাজনা চললো পুরোদমে।

ক্রমে সব লোক এসে জড় হয়ে গেল—ঘরে বসবার জায়গা দিতে পারা যায় না। বাইরের দাওয়ায় গিয়ে অনেকে বসলো। বাইরে যাবার আরও একটা কারণ এই, এদের মধ্যে বেশির ভাগ ছেলেছোকরা ও বাইশ-তেইশ থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক, এরা কেদারের সামনে বিড়ি বা তামাক খায় না—অথচ বেশীক্ষণ ধূমপান না করে তারা থাকতেও পারে না, বাইরের দাওয়া আশ্রয় করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই।

গানে বাজনায় বক্তৃতায় গল্পে এবং সঙ্গে সঙ্গে তামাক ও বিড়ির ধোঁয়ায় মহলাঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় দূরে কিসের চীৎকার শোনা গেল।

কে একজন বললে, ও ছিবাস জ্যাঠা—চৌকিদার হাঁকছে যে বামুনপাড়ায়, অনেক রাত হয়েছে তবে !

দু-এক জন উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললে, তাই তো, রাতটা বেশী হয়ে গিয়েছে। বাবাঠাকুর, আজ বন্ধ করে দিলে হত না ? আপনি আবার এতটা পথ যাবেন—

বিশু কুমোরের ছেলে এ পর্য্যন্ত গোটা আষ্টেক গানের তালিম দিয়ে এবং কেদারের কাছে বিস্তর ধমক খেয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—সে করুণ দৃষ্টিতে কেদারের দিকে চাইলে।

কেদার বললেন, ঘুম আসছে, না ? তোর কিছু হবে না বাবা। কুমোরের ছেলে, চাক ঘোরাবি, ভাঁড় আর তিজেল হাঁড়ি গড়বি, তোর এ বিড়ম্বনা কেন বল্ দিকি বাপু ? সেই সন্দে থেকে তোকে পাখীপড়া করছি, এখনও একটা গানও নিখুঁত করে গলায় আনতে পারলি নে—তোর গলায় নেই সুর তার কোত্থেকে কি হবে ? বেসুরো গলা নিয়ে গান গাওয়া চলে ?

আসলে তো একথা ঠিক নয়। বিশু ছেলেটি বেশ সুকণ্ঠ গায়ক, সবাই জানে, কেদারও তা ভালই জানেন—কিন্তু তিনি বড় কড়া মাস্টার এবং তাঁর কথা বলবার ধরনই এই। ছেলেটির এ রকম তিরস্কার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, সুতরাং সে কেদারের কথায় দুঃখিত না হয়ে বললে—দাদাঠাকুর, বাড়িতে মার অসুখ—বাবা সকাল সঁকাল যেতি বলে দিয়েল—

—তা যা যা। আজ তবে থাক এই পর্য্যন্ত, কাল সবাই সকালে সকালে আসা হয় যেন। চল হে ছিবাস, চল হে রিষিকেশ—

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেদার উঠে পড়েলন, হুঁশ না করিয়ে দিলে তিনি আরও কতক্ষণ এখানে থাকতেন কে জানে।

কিন্তু মহলা-ঘরের বাইরে পা দিয়ে তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন, একি, হ্যাঁ ছিবাস, জ্যোৎস্না উঠে গিয়েছে যে !

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তাই তো দেখছি—

—তাই তো হে, আজ নবমী না ? কৃষ্ণপক্ষের নবমী, ওঃ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তা হলে।

পথে কিছুদূর পর্য্যন্ত এক সঙ্গে এসে বিভিন্ন পাড়ার দিকে একে একে সবাই বেরিয়ে গেল কেদারকে ফেলে। দু-তিনজন কেদারকে বাড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইলে—কিন্তু কেদার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একাই বাড়ির দিকে চললেন। গড়ের খাল পার হবার সময় নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নালোকিত বন-ঝোপের দিকে চেয়ে চেয়ে কেদারের বেশ লাগল। কেদারের পিতামহ রাজা বিষ্ণুরামের স্বহস্তে রোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রচুর বউল এসেছে এবার—তার ঘন সুগন্ধে মাঝরাত্রির জ্যোৎস্নাভরা বাতাস যেন নেশায় ভরপুর, ভারি আনন্দে জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে মোটের উপর তাঁর। সকাল থেকে এত রাত পর্য্যন্ত সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা তিনি বুঝতেই পারেন না।

কি চমৎকার দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায় এই গড়বাড়ির জঙ্গল, ভাঙা ইট-পাথরের ঢিবিগুলো ! সবাই বলে নাকি অপদেবতা আছে, তিনি বিশ্বাস করেন না ! সব বাজে কথা !

কই এত রাত পর্য্যন্ত তো তিনি বাইরে থাকেন, একাই আসেন বাড়ি, কখনো কিছু তো দেখেন নি ! বাল্যকাল থেকে এই বনে-ঘেরা ভাঙা বাড়িতে মানুষ হয়েছেন, এর প্রত্যেক ইটখানা, প্রত্যেক গাছটি, বনের লতাটি তাঁর প্রিয় ও পরিচিত। তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে এরা জড়ানো, তিনি যে চোখে এদের দেখেন, অন্য লোকে সে চোখ পাবে কোথায় ?

কষ্ট হয় শরতের জন্যে।

ওকে তিনি কোনো সুখে সুখী করতে পারলেন না। ছেলেমানুষ, ওর জীবনের কোন সাধ পুরলো না। সারাদিনের কাজকর্ম্ম ও আমোদ-প্রমোদের ফাঁকে ফাঁকে শরতের মুখখানা

যখন তাঁর মনে পড়ে হঠাৎ তখন বড় অন্যমনস্ক হয়ে যান কেদার! যেখানেই থাকুন, মনে হয় এখনি ছুটে একবার তার কাছে চলে যান।

আহা, এত রাত পর্য্যন্ত মেয়েটা একা এই জঙ্গলে-ঘেরা বাড়ির মধ্যে থাকে, কাজটা ভাল হচ্ছে না—ঠিক নয় কেদারের এতক্ষণ বাইরে থাকা!

দোরে ঘা দিয়ে কেদার ডাকলেন, ও শরৎ, মা ওঠো, দোর খোলো—

দু-তিনবার ডাকের পর শরতের ঘুমজড়িত কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়া পাওয়া গেল।

—উঠে দোর খুলে দে—ও শরৎ—

শরৎ বিরক্তিভরা মুখে দোর খুলতে খুলতে বললে, আমি মরবো মাথা কুটে কুটে তোমার সামনে বাবা। পারি নে আর—সন্দে হয়েছে কি এ যুগে! রাত কাবার হয়ে গেল—এখন তুমি বাড়ি এলে! পুবে ফর্সা হবার আর বাকি আছে?

—না না, আরে এই তো বামুনপাড়ায় চৌকিদার হেঁকে গেল—রাত এখনও অনেক আছে। আর বকিস নে, এখন ভাত দে দিকি। খিদে পেয়েছে যা—

কেদার খেতে বসলে শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—কোথায় আর থাকবো? আমাদের দলের মহলা হচ্ছে, সেখানে আমি না থাকলেই সব মাটি। যেদিকে আমি না যাবো সেদিকেই কোনো কাজ হবে না।

শরৎ একটু নরম সুরে বললে, যাত্রা কোথায় হবে? আমি কিন্তু যাবো তোমার সঙ্গে।

—তা ভালই তো। বাড়ির মেয়েদের জন্যে চিক দিয়ে দেবে, যাবি তো ভালই।

শরৎ একটু চুপ করে থেকে বললে, বাবা, আজ প্রভাসদা এসেছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, কোথায়? কখন?

—তুমি বেরিয়ে চলে গেলে তার একটু পরেই। এখানে এসে বসলো। তার সঙ্গে আর একজন ওর বন্ধু। দু-জনকে চা করে দিলাম—খাবার কিছু নেই, কি করি—একটুখানি ময়দা পড়েছিল, তাই দিয়ে খানকতক পরোটা ভেজে দিলাম।

—বেশ বেশ। কতক্ষণ ছিল?

—তা অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাতিনেক। সন্ধ্যা হবার পরও খানিকক্ষণ ছিল।

—কি বলে গেল?

—বেড়াতে এসেছিল। প্রভাসদা'র বন্ধু কলকাতার কোন বড়লোকের ছেলে, বেশ চেহারা। নাম অরুণ মুখুজ্জে। আমাদের গড়বাড়ির গল্প শুনে সে এসেছিল প্রভাসদা'র সঙ্গে দেখতে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলে।

—বড়লোকের কাণ্ড, তুইও যেমন! ঘরে পয়সা থাকলেই মাথায় নানা রকম খেয়াল গজায়। তার পর, দেখে কি বললে?

—খুব খুশী। আমাদের এখানে এসে কত রকম কথা বলতে লাগল, অরুণবাবু আবার আসবে, ফটোগ্রাফ নিয়ে যাবে! কি লিখবে নাকি আমাদের গড়বাড়ি নিয়ে। আমায় তো একেবারে মাথায় তুললে।

—ওই তো বললাম, বড়লোকের যখন যেটি খেয়াল চাপবে। কলকাতায় মানুষের অভাব নেই—আমাদের মত দুঃখ-ধান্দা করে যদি খেতে হত—

শরতের হাসি পেল বাবার দুঃখ-ধান্দা করে খাবার কথায়। জীবনে তিনি তা কখনো করেন নি। কাকে বলে তা এখনও জানেন না। কিসে কি হয় তা শরৎ ভাল করেই জানে।

যেমন আজকের দিনের কথা। শরৎ হুবহু সত্য কথা বলে নি। ঘরে কিছুই ছিল না। ওরা গেল ভাঙা ইট কাঠ দেখতে, গড়বাড়ি ঘুরতে—সেই ফাঁকে শরৎকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হল রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি ময়দা ও ঘি ধার করতে। সেখানে পাওয়া গেল তাই মান রক্ষে।

সব দিন আবার সেখানেও পাওয়া যায় না।

রাজলক্ষ্মী ওদের কথা শুনে দেখতে এসেছিল। সে-ই চা ও খাবার পরিবেশন করেছিল প্রভাস ও তার বন্ধুকে।

আর একটা কথা শরৎ বলে নি বাবাকে। প্রভাস ওকে একটা মখমলের বাক্স দিয়ে গিয়েছে। কেমন চমৎকার বাক্সটা। তার মধ্যে গন্ধতেল, এসেন্স, পাউডার আরও সব কি কি! না নিলে প্রভাসদা কি মনে করবে, সে বাক্সটা হাত পেতে নিয়েছিল—কলকাতার ছেলে, ওরা হয়তো বোঝে না যে বিধবা মানুষের ওসব ব্যবহার করতে নেই। তার যে কোনো বিষয়ে কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই, সব বিষয়ে সে নিস্পৃহ, উদাসী—কেমন এক ধরণের। এ বয়সেই মেয়ের সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি—তার বাবার ভাল লাগে না। শরৎ তা জানে। বাবাকে বলে কি হবে বাক্সটার কথা, যখন সেটা সে রাখবে না।

কেদার আহারান্তে তামাক খেতে বসলেন বাইরের দাওয়ায়।

শরৎ বলল, বাইরে কেন বাবা, ঘরে বসে খাও না তামাক, আজকাল রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডা যত অসুখের কুটি।

গভীর রাত্রি।

বিছানায় শুয়ে একটা কথা তার মনে হল বার বার। এর আগেও অনেক বার মনে হয়েছে। প্রভাস-দার বন্ধু অরুণবাবুর চেহারা বেশ সুন্দর, অবস্থাও ভাল। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া যেত!

রাজলক্ষ্মী এল তিনদিন পরে।

সে গড়ের-বনে সজনে ফুল কুড়ুতে এসেছিল, কোঁচড় ভর্ত্তি করে ফুল কুড়িয়ে বাড়ি ফিরবার পথে শরতের রান্নাঘরে উঁকি মেরে বললে, ও শরৎদি, সজনে ফুল রাখবে নাকি? কত ফুল কুড়িয়েছি দ্যাখো—তোমাদের ওই পুকুরের কোণের গাছে।

শরৎ রান্না চড়িয়েছিল, ব্যস্তভাবে খুশির সুরে বললে, ও রাজলক্ষ্মী আয় আয়, দেখি কেমন ফুল? আয় তোকে আমি খুঁজছি ক'দিন। কথা আছে তোর সঙ্গে।

একটা ছোট চুবড়ি এনে বললে, দে এতে চাট্টি ফুল। বেশ কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলগুলো, ভাজবো এখন। বাবা বড্ড খেতে ভালবাসেন।

—শরৎদি, আমাদের ওদিকে তুমিও তো যাও নি ক'দিন?

—না ভাই, বাবার পায়ে বাত মত হয়ে ক'দিন কষ্ট পেলেন। তাঁর তাপসেঁক—আবার এদিকে সংসারের ছিষ্টি কাজ, এর পরে সময় পাই কখন যে যাবো বল্। চা খাবি?

—না শরৎদি, বেলা হয়ে গেল—আর বেশীক্ষণ থাকলে এবেলা ফুলগুলো ভাজা হবে কখন? এ বেলা যাই—ও বেলা বরং আসবো।

—দাঁড়া, তোর জন্যে একটা জিনিস রেখে দিয়েছি, নিয়ে যা—

শরৎ মখমলের বাক্সটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললে, দ্যাখ্ তো কেমন? খুলে দ্যাখ্—

অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও বিস্ময়ে রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এক মুহূর্ত্তে। বাক্সটা খুলতে খুলতে বললে, কোথায় পেলে শরৎদি?

—প্রভাসদা দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রাজলক্ষ্মী শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা তুমি রাখলে না?

শরৎ মৃদু হেসে বললে, ওর মধ্যে দ্যাখ্ না কত কি—সাবান, পাউডার, মুখে মাখবার ক্রিম্—আমি কি করবো ও সব। তুই নিয়ে গিয়ে রাখলে আমার আনন্দ হবে।

রাজলক্ষ্মী কিছু ভেবে বললে, যদি মা জিজ্ঞেস করে কোথায় পেলি ?

—বলিস্ আমি দিয়েছি !

'—এ নিয়ে কেউ কিছু বলবে না তো ? জানো তো নিমু ঠাকরুণকে, গাঁয়ের গেজেট। প্রভাসবাবুর কথা বলবো না—কি বলো ?

—সত্যি কথা বলছি, এতে আর ভয় কি ? নিমু ঠানদি এতে বলবে কি ? বলিস প্রভাসবাবু দিয়েছিল শরৎদিকে।

—ভারি খারাপ মানুষ সব শরৎদি। তুমি যত সহজ আর ভালো ভাবো সবাইকে, অত ভালো কেউ নয়।.আমার আর জানতে বাকী নেই। সেবার যে এখানে প্রভাসবাবু এসেছিল, এ কথা গাঁয়ে রটনা হয়ে গিয়েছে। কাল যে এসেছিল আবার—তা নিয়েও কাল কথা হয়েছে।

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে, বলিস্ কি রে ? কি কথা হয়েছে ?

—অন্য কথা কিছু নয় শরৎ দিদি। শুধু এই কথা যে প্রভাসদা তোমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করছে আজকাল। তুমি না হয়ে অন্য মেয়ে যদি হত, তা হলে অনেকে অন্য রকম কথাও ওঠাতো—নিমু ঠাকরুণ, আমার জ্যাঠাইমা, হীরেন কাকার মা, জগন্নাথ দাদু—এরা। কিন্তু তুমি বলেই কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

শরৎ যাত্রার দলের সুর নকল করে টেনে টেনে হাত নেড়ে বললে, দেশের রাজকন্যার নামে অপকলঙ্ক রটাবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা ? সব তা হলে গর্দান নেবো না দুরাচারদের ?

রাজলক্ষ্মী হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি ! মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে হাসতে বললে, উঃ, এত মজাও তুমি করতে জানো শরৎদি ! হাসিয়ে মারলে—মাগোঃ—

শরৎ হাসিমুখে বললে, তবে একটু বসে যা লক্ষ্মী দিদি আমার। দুটো মুড়ি খেয়ে যা—

রাজলক্ষ্মী দুর্বল সুরের প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না শরৎদি—ফুল ভাজা হবে কখন তা হলে এবেলা ? আমায় আটকো না—

—বোস্। আমিও খাচ্ছি দুটো মুড়ি—নারকোল-কোরা দিয়ে। তুইও খাবি। যেতে দিলে তো ? সজনে ফুলের দুর্ভিক্ষ লাগে নি গড়শিবপুরে—

খানিক পরে শরৎ মুড়ি খেতে খেতে বললে, শোন রে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। অরুণবাবু এসেছিল প্রভাসদা'র সঙ্গে, দেখেছিস তো ? ওর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাড়বো প্রভাসদা'র কাছে ? অরুণবাবুরা বেশ অবস্থাপন্ন। বেশ ভালো হবে।

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ দৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি যে তুমি বলো শরৎদি ! এক-এক সময় এমন ছেলেমানুষ হয়ে যাও !

—ছেলেমানুষ হওয়া কি দেখলি ?

—ওরা আমায় নেবে কেন ? আমার কি রূপগুণ আছে বলো ! তুমি যে চোখে আমায় দ্যাখো—সকলে কি সে চোখে দেখবে ?

—সে ভাবনার তোর দরকার নেই। তুই শুধু আমায় বল্ প্রভাসদা'র কাছে কথা আমি পাড়বো কি না। অরুণবাবুকে পছন্দ হয় ?

—দূর—কি যে বলো ? শরৎদি একটা পাগল—

—সোজা কথাটা কি বল্ না ?

—ধরো যদি বলি হয়—তুমি কি করবে ?

—তাই বল্। আমি প্রভাসদা'র কাছে তা হলে কথাটা পেড়ে ফেলি।

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। শরৎ বললে, বাড়িতে বা অন্য কারো কাছে বলিস্ নে কোনো কথা এখন।

রাজলক্ষ্মী হাত নেড়ে বললে, হঁ্যা, আমি বলে বেড়াতে যাই, ওগো আমার বিয়ের সম্বন্ধ

হচ্ছে সবাই শোনো গো। একটা কথা, জ্যাঠামশাইকে যেন বোলো না শরৎদি।

—বাবাকে? ও বাপ রে! এখুনি সারা গাঁ পরগনা রটে যাবে তা হলে। পাগল তুই, তা কখনো বলি?

রাজলক্ষ্মী বিদায় নিয়ে বাড়ি যাবার পথে গড়ের খাল পার হয়ে দেখলে কেদার একটা চুপড়িতে আধ-চুপড়ি বেগুন নিয়ে হন্ হন্ করে আসছেন।

ওকে দেখে বললেন, ও বুড়ি, ওঃ কত সজনে ফুল রে!—কোত্থেকে? তা বেশ। শরতের সঙ্গে দেখা করে এলি তো?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়, শরৎদির সঙ্গে দেখা না করে আসবার জো আছে? আর না খাইয়ে কখনো ছাড়বে না।

—হ্যাঃ, ভারি তো খাওয়া! কি খেতে দিলে?

—মুড়ি মাখলে, ও খেলে, আমি খেলাম।

—তা যা মা—বেলা হয়ে গেল আবার—

রাজলক্ষ্মী দূর থেকে কেদারকে আসতে দেখে মখমলের বাক্সটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল—সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। কথা শেষ করে কেদারের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলো সে।

কিন্তু কিছু দূর যেতেই সে শুনলে কেদার তাকে পেছন থেকে ডাকছেন—ও বুড়ি, শুনে যা। একটু দাঁড়িয়ে যা—

—কি জ্যাঠামশায়?

—এই বেগুন ক'টা আনলাম গেঁয়োহাটির তারক কাপালীর বাড়ি থেকে। তুই নিয়ে যা দুটো। সজনে ফুলের সঙ্গে বেশ হবে এখন—

রাজলক্ষ্মী বিব্রত হয়ে পড়ল। এক হাতে সে বাক্সটা ধরে আছে, অন্য হাতে ফুলে ভর্ত্তি আঁচল। বেগুন নেয় কোন্ হাতে? কিন্তু কেদার সদাই অন্যমনস্ক, কোনোদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখবার সময় নেই। কোনো রকমে গোটা চারেক বেগুন রাজলক্ষ্মীর সামনে নামিয়ে রেখে তিনি চলে যেতে পারলে যেন বাঁচেন এমন ভাব দেখালেন।

রাজলক্ষ্মী ভাবলে—জ্যাঠামশায় বড় ভাল। এ গাঁয়ে ওদের মত মানুষ নেই। শরৎদি কি ভালই বাসে আমায়। এ গাঁ থেকে যদি বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাই, শরৎদিকে না দেখে কি করে থাকবো তাই ভাবি! পাছে বাড়িতে জ্যাঠাইমা টের পায়, এজন্যে রাজলক্ষ্মী বাক্সটা সন্তর্পণে লুকিয়ে বাড়ি ঢুকলো। মাকে ডেকে বললে, এই দ্যাখো মা—

রাজলক্ষ্মীর মা বাক্সটা হাতে নিয়ে বললে, বাঃ দেখি, দেখি—কোথায় পেলি রে? শরৎ দিলে? চমৎকার জিনিসটা। আমরা বাপু সেকেলে লোক, কখনো চক্ষেও দেখি নে এসব। শরৎ কোথায় পেলে রে?

রাজলক্ষ্মী বললে, ওকে প্রভাসদা কাল দিয়েছিল। তা ও তো এসব মাখবে না—জানো তো ওকে। তাই আমায় বললে, তুই নিয়ে যা। এ কথা কাউকে বোলো না কিন্তু মা।

দু-দিন পরে কেদার একদিন সকালে বললেন, শরৎ মা, আমি আজকে একবার তালপুকুর যাবো খাজনা আদায় করতে, আমার আসতে একদিন দেরি হতে পারে, একটু সাবধানে থেকো।

শরৎ বলল, বেশি দেরি কোরো না বাবা, তুমি যেখানে যাও আসবার নামটি করতে চাও না তো! আমি একলা থাকবো মনে কোরো।

কেদার একবার বাড়ির বার হলে ফিরবার কথা ভুলে যান একথা শরৎ ভালভাবেই জানে। মুখে বললেও শরৎ জানে বাবা এখন দিন দু-তিনের মত গা-ঢাকা দিলেন। সেদিন সে

রাজলক্ষ্মীকে বলে পাঠালো একবার দেখা করতে।

দুপুরের পর রাজলক্ষ্মী এসে বললে, কি শরৎ দিদি, ডেকেছিলে কি জন্যে ?

—বাবা গিয়েছেন তালপুকুরে খাজনা আদায় করতে, আমাদের বাড়ি দু-দিন রাত্রে শুবি ?

রাজলক্ষ্মী বললে, মা থাকতে না দিলে তো থাকা হবে না। আচ্ছা, বলে দেখবো এখন।

—এইখানেই খাবি কিন্তু এবেলা—

—ওই তো তোমার দোষ শরৎদি, কেন বাড়ি থেকে খেয়ে আসতে পারি নে ?

—পারবি নে কেন। তবে দুজনে মিলে খেলে বেশ একটু আনন্দ পাওয়া যায়। খাবি ঠিক বললাম কিন্তু।

দুপুরের অনেক পরে রাজলক্ষ্মী এসেছে। বেলা প্রায় গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। পুকুর-ঘাটে ছাতিমবনের দীর্ঘ ছায়া পড়ে গিয়েছে, যখন ওরা দুজনে পুকুরঘাটে এসে বসলো।

মুখে বিদেশে যাবার যত ইচ্ছেই ওরা প্রকাশ করুক, এই গ্রাম ওদের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এর ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাস নিয়ে, ঘুঘু ও ছাতারে পাখীর ডাক নিয়ে, প্রথম হেমন্তে গাছের ডালে ডালে আলকুশী ফলের দুলুনি নিয়ে—এর সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে। শরৎ যখনই এই দীঘির বাঁধা ঘাটের পাড়ে বসে ছাতিমবনের দিকে তাকায়, তখন মনে হয় ওর, সে কত যুগ থেকে এই গ্রামের মেয়ে, তার সমস্ত দেহমন-চেতনাকে আশ্রয় করে আছে এই ভাঙা গড়বাড়ি, এই কালো পায়রার দীঘি, এই পুরনো আমলের মন্দিরগুলো, এই ছাতিমবন, ইটের স্তূপ।

ঋতুতে ঋতুতে ওদের পরিবর্ত্তনশীল রূপ ওর মন ভুলিয়েছে। শরৎ অত ভাল করে বোঝে না, ঋতুর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তার মন তত সজাগ নয়, তবুও ভাল লাগে। বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও অন্য একটা অনুভূতি দিয়ে তার মন এর সৌন্দর্য্যকে নিতে পারে।

শরৎ পুকুরপাড়ে বাসন নামিয়েই বললে, রাজলক্ষ্মী, পাতাল-কোঁড় তুলে আনবি ? ওই উত্তর দেউলের ওদিকের জঙ্গলে সেদিন অনেক ফুটেছিল—চল্ দেখে আসি।

—এখন বর্ষাকাল নয়, এখন বুঝি পাতাল-কোঁড় ফোটে ?

—ফুটে বনের তলা আলো করে আছে, বলে ফোটে না ! চল্ না দেখবি—

—আমার বড্ড ভয় করে শরৎদি ও বনে যেতে, তুমি চলো আগে আগে—

বাসন সেখানেই পড়ে রইল। গড়শিবপুরে এ পর্যন্ত কোন জিনিস ফেলে রাখলে চুরি যায় নি। কতদিন এমন দীঘির ঘাটে এঁটো বাসন জলে ডুবিয়ে রেখে চলে যায়, সারা রাত হয়তো পড়ে থাকে—তার পরদিন সকালে সে-সব বাসন মাজা হয়—একটা ছোট তেলমাখা বাটিও চুরি যায় নি। শরৎদি'র ঘরে বেশি জায়গা নেই বলে কত জিনিসপত্র বাইরেই পড়ে থাকে দিনরাত। শুধু গড়ের মধ্যে বলে যে এমন তা নয়, এ-সব পল্লী অঞ্চলে চোরের উপদ্রব আদৌ নেই।

ঘন নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকে রাজলক্ষ্মীর গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। শরৎদি শক্ত মেয়েমানুষ, ওর সাহস বলিহারি—ও সব পারে। বাবাঃ, এই বনে মানুষ ঢোকে পাতাল-কোঁড়ের লোভে ?

—ও শরৎ দিদি, সাপে খাবে না তো ? তোমাদের গড়ের ইটের ফাটলে ফাটলে সাপ বাবা—

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, অমন করে আমার বাপের বাড়ির 'নিন্দে করতে দেবো না তোকে—আমাদের এখানে যদি সাপ থাকতো তবে আমায় এতদিন আস্ত থাকতে হত না। আমার মতো বনে-জঙ্গলে তো তুমি ঘোরো না ! কি বর্ষা, কি গরমকাল, ঝড় নেই, বৃষ্টি

নেই, অন্ধকার নেই—একলাটি বনের মধ্যে দিয়ে যাবো উত্তর দেউলে সন্দে পিদিম দিতে—তা ছাড়া এই বনে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াই, বাবা কি যোগাড় করে দেন ?

এক জায়গায় রাজলক্ষ্মী থমকে দাঁড়িয়ে বললে, দ্যাখো দ্যাখো শরৎ দিদি, কত পাতাল-কোঁড়—বেশ বড় বড়—

শরৎ তাড়াতাড়ি এসে বললে, কই দেখি ?

পরে হেসে বলে উঠল—দূর ! ছাই পাতাল-কোঁড়—ও সব ব্যাঙের ছাতা, অত বড় হয় না পাতাল-কোঁড়—ও খেলে মরে যায় জানিস্ ? বিষ—

—সত্যি শরৎদি ?

—মিথ্যে বলছি ? ব্যাঙের ছাতা বিষ—

—আমি খেলে মরে যাবো—

—বালাই ষাট—কি দুঃখে ?

—বেঁচে বা কি সুখ শরৎদি ? সত্যি বলছি—

—কেন, জীবনের উপর এত বিতেষ্টা হল যে হঠাৎ ?

—অনেকদিন থেকেই আছে। এক এক সময় ভাবি আমাদের মত মেয়ের বেঁচে কি হবে শরৎদি ? না আছে রূপ, না আছে গুণ—এমনি করে কষ্টেস্রেষ্ট করে ঘুঁটে কুড়িয়ে আর বাসন মেজেই তো সারাজীবন কাটবে ?

—সুখ যদি জুটিয়ে দিই ? তা হলে কিন্তু—

—তোমার সেই সেদিনের কথা তো ? তুমি পাগল শরৎদি—

—তুই রাজী হয়ে যা না !

—সেই জন্যে আটকে রয়েছে ! তোমার যেমন কথা—

—এবার প্রভাসদাকে বলবো দেখিস্ হয় কি না—

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎকর্ণ হয়ে বললে, চুপ শরৎদি, বনের মধ্যে কারা আসছে—

শরতের তাই মনে হল। কাদের পায়ের শব্দ বনের ওপাশে। শরৎ রাজলক্ষ্মী একটা গাছের আড়ালে লুকুলো। দুজন লোক বনের মধ্যে কি করছে। কিসের শব্দ হচ্ছে যেন। শরৎ চুপি চুপি বললে, কারা দেখতে পাচ্ছিস ?

—না শরৎদি, চলো পালাই—

—পালাবো কেন ? বাঘভাল্লুক তো না—তুই দাঁড়া না—

একটু সরে শরৎ আবার বললে, দেখেছিস্ মজা ? রামলাল কাকার ছেলে সিদু আর ওপাড়ার জীবন শুঁড়ির ভাই হরে শুঁড়ি।

হঠাৎ শরৎ কড়া গলার সুর চড়িয়ে বললে, কে ওখানে ?

দুপ দুপ দ্রুত পদশব্দ। তারপর সব চুপচাপ।

শরৎ বললে, আয় তো গিয়ে দেখি—কি করছিল মুখপোড়ারা—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে দেখলে শরতের যেন রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। ভয় ও সংকোচ এক মুহূর্ত্তে চলে গিয়েছে তার চোখমুখ থেকে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেয়ে বললে, ও শরৎদি, ওদিকে যেও না—পরে শরৎ নিতান্তই গেল দেখে সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে চললো। খানিকদূর গিয়ে দুজনেই দেখলে যেখানে উত্তর দেউলের পূব কোণে একটা ভাঙা পাথরের মূর্ত্তি পড়ে আছে ঘন লতাপাতার ঝোপের মধ্যে—সেখানে একটা লোহার শাবল পড়ে আছে, কারা খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়েছে আর কতকগুলো মাটিতে পোঁতা ইট সরিয়েছে।

শরৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, মুখপোড়াদের বিশ্বাস গড়ের জঙ্গলে সর্ব্বত্র ওদের জন্যে টাকার হাঁড়ি পোঁতা রয়েছে। গুপ্তধন তুলতে এসেছিল হতচ্ছাড়া ড্যাকরারা, এরকম

দেখে আসছি ছেলেবেলা থেকে। কেউ এখানে খঁড়েছে, কেউ ওখানে খঁড়েছে—আর সব খঁড়বে কিন্তু লুকিয়ে। পাছে ভাগ দিতে হয়! যাক—শাবলখানা লাভ হয়ে গেল। চল্ নিয়ে চল্—

রাজলক্ষ্মীও হেসে কুটিপাটি। বললে, ভারি শাবলখানা নিয়ে পালাতে প্যারলে না। তোমার গলা শুনেই পালিয়েছে—তোমাকে সবাই ভয় করে শরৎদি—

বনের পথ দিয়ে ওরা আবার যখন দীঘির ঘাটে এসে পেঁছিলো, তখন বেলা বেশ পড়ে এসেছে। আর রোদ নেই ঘাটের সিঁড়িতে, তেঁতুল গাছের ডালে দু-একটা বাদুড় এসে ঝুলতে শুরু করেছে। ওরা তাড়াতাড়ি বাসন মেজে নিয়ে বাড়ির দিকে চললো।

শরৎ বললে, এবার কিছু খা—তার পর বাড়ি গিয়ে বলে আয় খুড়ীমাকে এখানে থাকবার কথা রাতে।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্তভাবে বললে, না শরৎদি, সন্দের আর দেরি নেই। আমি আগে বাড়ি যাই। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, মা হয়তো ভাবছে—

—বোস্ আর একটু—একটু চা করি, খেয়ে যা—

শাবল ফেলে ওদের পালানো ব্যাপারটাতে শরৎ ও রাজলক্ষ্মী খুব মজা পেয়েছে। তাই নিয়ে হাসিখুশি ওদের যেন আর ফুরোতে চায় না।

রাজলক্ষ্মী বললে, তোমার সাহস আছে শরৎ দিদি, আমি হলে পালিয়ে আসতাম—

—ওই রকম না করলে হয় না, বুঝলি? সব সময় ভীতু হয়ে থাকলে সবাই পেয়ে বসে—আর কখনো ওরা আসবে না দেখিস্।

—যদি আমার না আসা হয়, একলা থাকতে পারবে শরৎদি?

শরৎ হেসে বললে, কতবার তো থেকেছি। এমনিতেই বাবা এত রাত করে বাড়ি ফেরেন, এক একদিন আমার একঘুম হয়ে যায়। বাবার কি কোন খেয়াল আছে নাকি?

তার পর সে ঈষৎ লাজুক মুখে মুখ নিচু করে বললে, বাবার জন্যে মন কেমন করছে—

—ওমা, সে কি শরৎ দিদি! আজ তো জ্যাঠামশায় সবে গেলেন—

—সে জন্যে না। বিদেশে কোথায় খাবেন কোথায় শোবেন, উনি বাড়ি থেকে বেরুলেই আমার কেবল সেই ভাবনা!

—জলে তো আর পড়ে নেই? লোকের বাড়ি গিয়েই উঠেছেন তো—

—তুই জানিস্ নে ভাই—ওঁর নানান্ বাচবিচার। এটা খাবে না ওটা খাবে না—দুনিয়ার আদ্ধেক জিনিস তাঁর মুখে রোচে না। আমায় যে কত সাবধানে থাকতে হয়, তা যদি জানতিস্। পান থেকে চুণ খসলেই অমনি ভাতের থালা ফেলে উঠে গেলেন। আমার হয়েছে ওঁকে নিয়ে সব চেয়ে বড় ভাবনা। একেবারে ছেলেমানুষের মত।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে, তোমার বুড়ো ছেলেটি শরৎ দিদি—আহা, কোথায় গেল, মায়ের প্রাণ, ভাবনা হবে না?

শরতের চোখ ছলছল করে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, তাই এক এক সময় ভাবি, ভগবান আমায় যেন এর মধ্যে টেনে নিও না। বুড়ো বয়সে বাবা বড় কষ্ট পাবেন। ওঁকে ফেলে আমার স্বর্গে গিয়েও সুখ হবে না—উনি মারা যান আগে, তার পর আমি কষ্ট পাই দুঃখ পাই, যা থাকে আমার ভাগ্যে।

—আমি এবার যাই শরৎদি—সন্দের আর দেরি কি?

—তুই কিন্তু আসবি ঠিক—খুব চেষ্টা করবি, কেমন তো? একলা আমি থাকতে পারি, সেজন্যে না। দুজনে থাকলে বেশ একটু গল্পগুজব করা যেতো—মুখ বুজে এই নিবান্ধা পুরীর মধ্যে থাকতে বড় কষ্ট হয়।

রাজলক্ষ্মী চলে গেলে শরৎ সলতে পাকাতে বসলো—তার পর শাঁখ বাজিয়ে চৌকাঠে জলের ধারা দিয়ে তার অভ্যাস মত ছোট্ট একটি মাটির প্রদীপ জেলে নিয়ে উত্তর দেউলে সন্ধ্যাদীপ দিতে চলল। সঙ্গে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেউলে বসে প্রদীপ জ্বালাও চলে বটে, কিন্তু এদের বংশের নিয়ম ঘরের সন্ধ্যাদীপ থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে হয় মন্দিরের প্রদীপ। তবে যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে পথে সেটা নিবে যায়, অগত্যা সেখানে বসেই জ্বালাতে হয়—উপায় কি ?

উত্তর দেউলের পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল, আবার হয়তো সেইখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে। সে একবার গিয়ে দেখবে নাকি ? তা হলে বেশ মজা হয়—

কথাটা মনে আসতেই শরৎ আপন মনেই হি-হি করে হেসে উঠল।

—উঃ, শাবল ফেলেই ছুট দিলে! এ গুপ্তধন না তুললে নয় মুখপোড়াদের! ওদের জন্যে আমার বাপ ঠাকুরদাদা কলসী কলসী মোহর পুঁতে রেখে গিয়েছে। যদি থাকে তো আমরা নেবো আমাদের জিনিস—তোরা মরতে আসিস্ কেন হতভাগারা ?

শরৎ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল এবং একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে একটা নতুন সিগারেটের বাক্স পড়ে আছে উত্তর দেউলের পৈঠার ওপরেই। এ বনের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা সিগারেট খেয়েছে কে ? এখানকার লোকে সিগারেট খাবে না, তাদের তামাক জোটে না সিগারেট তো দূরের কথা। বাক্সটা হেলাগোছা ভাবে ফেলা নয়, কে যেন তার যাবার পথে ইচ্ছে করে রেখেছে।

প্রদীপ দেখিয়ে এসে ও সিগারেটের বাক্সটা হাতে তুলে নিলে, খালি বাক্স অবিশ্যি।

রাংতাটা আছে ভেতরে। বেশ পাওয়া গিয়েছে। সিগারেটের রাংতা বেশ জিনিস। তবে এ গাঁয়ে মেলে না, কে আর সিগারেট খাচ্ছে !

শরতের হাত থেকে সিগারেটের বাক্সটা পড়ে গেল। তার মধ্যে একখানা চিঠি! শরৎ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে পড়ে দেখলে, লেখা আছে—

> "আমি তোমার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা মন্দিরের পেছনে কতক্ষণ বসেছিলাম। তুমি এলে না। তোমাকে কত ভালবাসি, তা তুমি জানো না। যদি সাহস দাও লক্ষ্মীটি, তবে কালও এই সময় এইখানেই থাকবো।"

শরৎ খানিকটা অবাক হয়ে থেকে চারিদিকে চেয়ে চেঁচিয়েই বললে, আ মরণ চুলোমুখো আপদগুলো! আচ্ছা, আবার চিঠি লেখা পর্যন্ত শুরু করেছে—হ্যাঁ ? এ-সব কি কম খ্যাংরার কাজ ? কাল এসো, থেকো না জঙ্গলের মধ্যে, থেকো। বঁটি দিয়ে একটা নাক যদি কেটে না নিই, তবে আমার নাম নেই—যমে ভুলে আছে কেন তোমাদের, ও মুখপোড়ারা ?

রাগে গরগর করতে করতে শরৎ বাড়ি এসে দেখলে রাজলক্ষ্মী বসে আছে। বাড়ি থেকে সে একটা লণ্ঠন নিয়ে এসেছে। শরৎ খুশী হয়ে বললে, এসেছিস ভাই!

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, না, একেবারে আসি নি শরৎ দিদি। মা বললে, বলে আয়, রাত্তিরে থাকা হবে না।

—সত্যি ?

—সত্যি শরৎদি। আমি কি বাজে কথা বলছি ?

—তবে তুই আর কষ্ট করে এলি কেন ?

—কথাটা বলতে এলাম শরৎ দিদি। তুমি আবার হয়তো কি মনে করবে, তাই। রাজকন্যে তুমি।

রাজলক্ষ্মীর কথা বলার ধরনে শরতের সন্দেহ হল। সে হেসে বললে, যাঃ আর চালাকি করতে হবে না। আমি আর অত বোকা নই—বুঝলি ?

রাজলক্ষ্মী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, কিন্তু তোমায় প্রথমটা কেমন ভাবিয়েছিলাম, বলো না ?

শরৎ বললে, যাঃ, আমি গোড়া থেকেই জানি। খুড়ীমা এখানে রাত্তিরে থাকতে না দিলে তোকে আলো নিয়ে আসতে দিতেন না। ও রাজলক্ষ্মী···একটা মজা দেখবি ভাই ?

বলেই শরৎ চিঠিখানা রাজলক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বললে, পড়ে দ্যাখ—

রাজলক্ষ্মী পড়ে বললে, এ কোথায় পেলে ?

—উত্তর দেউলের সিঁড়ির ওপর একটা সিগারেটের খোলের মধ্যে ছিল।

—আশ্চর্য, আচ্ছা কে লিখলে বলো তো শরৎদি ?

—তাই যদি জানবো তা হলে তো একেবারে শ্রাদ্ধের চাল চড়িয়ে দিই তাদের—

—তুমি আগে যাদের কথা বলেছিলে—

—তারাই হবে হয়তো। নাও হতে পারে। সিগারেট খাবে কে এ গাঁয়ে ?

—কাউকে দেখলে, কি পায়ের শব্দ শুনলে ?

শরৎ সুর বদলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, বাদ দে ও-সব কথা! বাবা নেই কিনা বাড়িতে, বাবা না থাকলেই ওদের বিশ্ব বাড়ে আমি জানি। যদি দেখতে পেতাম তবে না কথা ছিল!

রাজলক্ষ্মী বললে, আচ্ছা যদি আমি না আসতাম, তবে তুমি ভয় পেতে না শরৎদি, এই সব চিঠি পেয়ে—জ্যাঠামশায় নেই বাড়ি—?

—দূর, কি আর ভয়! আমার ও-সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে—

—একলাটি তো থাকতে হত ?

—থাকিই তো। ভয় করে কি করবো ? চিরদিনই যখন একা —

—তোমার বলিহারি সাহস শরৎদি! এই অরণ্যি বনের মধ্যে—

—ঘরে বঁটি আছে, দা আছে—এগুক দিকি কে এগুবে শরৎ বামনীর সামনে—ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবো না ? কি খাবি বল্ রাত্রে—ও কথা যাক। ভাত না রুটি ?

—যা হয় করো। তুমি তো ভাত খাবে না, তবে রুটিই করো—দুজনে মিলে তাই খাবো।

বাইরে বসে আটাটা মেখে ফেলি—

—তুমি যাও শরৎদি, আমি মাখছি আটা—

দু'জনে গল্পগুজবে রাঁধতে খেতে অনেক রাত করে ফেললে। তার পর দোর বন্ধ করে দু'জনে যখন শুয়ে পড়ল, তখন খুব সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। বেশী রাত্রে শরৎ ঘুম ভেঙে উঠে রাজলক্ষ্মীর গা ঠেলে চুপি চুপি বললে, ও রাজলক্ষ্মী, ওঠ্—বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন —

রাজলক্ষ্মী ঘুমে জড়িত কণ্ঠে ভয়ের সুরে বললে, কোথায় শরৎদি ?

—চুপ, চুপ, ওই শোন্ না—

রাজলক্ষ্মী বিছানায় উঠে বসে উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পেলে না!

শরৎ উঠে আলো জ্বাললে। তার ভয় ভয় করছিল। তবু সে সাহস করে আলো হাতে দোর খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করাতে রাজলক্ষ্মী ছুটে এসে ওর হাত ধরে বললে, খবরদার বাইরে যেও না শরৎদি, কার মনে কি আছে বলা যায় না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

শরৎ কিন্তু ওর কথা না শুনেই দোর খুলে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না, কেউ কোথাও নেই! তবুও তার স্পষ্ট মনে হল খানিক আগে কেউ এখানে ঘুরে

বেড়াচ্ছিল, তার কোন ভুল নেই।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, আজ ত্রয়োদশী তিথি।

তাদের এখানে প্রবাদ আছে, বারাহী দেবীর পাষাণ-মূর্ত্তি ত্রয়োদশী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত তিন দিন, গভীর রাত্রিকালে নিজের জায়গা থেকে নড়ে চড়ে বেড়ায় গড়বাড়ির নিৰ্জ্জন বনজঙ্গলের মধ্যে। সেই সময় যে সামনে পড়ে, তার বড় অশুভ দিন।

শরতের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

যদি সত্যিই তাই হয়?

যদি সত্যিই বারাহী দেবীর বুভুক্ষু ভগ্ন পাষাণ-বিগ্রহ রক্তের পিপাসায় তাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে শিকার খুঁজে বেড়াতে বার হয়ে থাকে?

শরৎ ভয় পেলেও মুখে কিছু বললে না। ধীরভাবে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

রাজলক্ষ্মী কলসী থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছিল, বললে, কিছু দেখলে শরৎদি?

—না কিছু না। তুই শুয়ে পড়।

পরদিন বৈকালের দিকে প্রভাস ও আর একটি তরুণ সুদর্শন যুবক হঠাৎ এসে হাজির।

রাজলক্ষ্মী তখন সবে কি একটা ঘরের কাজ সেরে দীঘির ঘাটে শরতের কাছে যাবার যোগাড় করছে—এমন সময় ওদের দেখে জড়সড় হয়ে উঠল।

প্রভাস বললে, খুকী, তুমি কি এ বাড়ির মেয়ে? না, তোমাকে তো কখনো দেখি নি? বাড়ির মানুষ সব গেল কোথায়?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জমুখে বললে, শরৎদি দীঘির পাড়ে। ডেকে আনছি।

—হ্যাঁ, গিয়ে বলো প্রভাস আর অরুণবাবু এসেছে।

শেষের নামটা উচ্চারিত হতে শুনে রাজলক্ষ্মীর মুখ তার নিজের অজ্ঞাতসারে রাঙা হয়ে উঠল। সে জড়িত পদে কোন রকমে ওদের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আড়ালে এনে এক ছুটে ঘাটের পাড়ে গিয়ে খবরটা দিল শরৎকে।

শরৎ অবাক হয়ে বললে, তুই দেখে এলি?

—ও মা, দেখে এলাম না তো কি; এসো না—

শরৎ ব্যস্তভাবে দীঘির ঘাট থেকে উঠে এল। প্রভাস ততক্ষণ নিজেই মাদুর পেতে বসে পড়েছে ওদের দাওয়ায়। হাসিমুখে বললে, আবার এসে পড়লাম। এখন একটু চা খাওয়াও তো দিদি—

—বসুন প্রভাসদা। এক্ষুনি চা করে দিচ্ছি—

প্রভাস পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে বললে, ভাল চা এনেছি। আর এতে আছে চিনি—

—আবার ও-সব কেন প্রভাসদা? আমরা গরীব বলে কী একটু চা দিতে পারি নে আপনাদের?

—ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। সে ভেবে আনি নি, এখানে সব সময় ভাল চা তো পাওয়া যায় না পয়সা দিলেও। আর এ চিনি সে চিনি নয়, এ চায়ে খাওয়ার আলাদা চিনি। দ্যাখো না—এ পাড়াগাঁয়ে কোথায় পাবে এ চিনি?

শরৎ হাতে করে দেখলে চৌকো চৌকো লেবেঞ্চুসের মত জিনিসটা। এ আবার কি ধরণের চিনি! কখনো সে দেখেই নি। শহর বাজারে কত নতুন জিনিস আছে!

প্রভাস বললে, কাকাবাবু কোথায় গেলেন?

—বাবা গিয়েছেন খাজনার তাগাদায়। দু-তিন দিন দেরি হবে ফিরতে।

প্রভাস হতাশ মুখে বললে, তিনি বাড়ি নেই! এঃ, তবে তো সব দিকেই গোলমাল হয়ে গেল।

—কেন, কি গোলমাল?

—আমি এসেছিলাম তোমাদের কলকাতা ঘুরিয়ে আনতে। মোটর ছিল সঙ্গে। সেই ভেবেই অরুণকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—তাই তো, সে এখন কি করে হয়?

—নিতান্তই আমার অদৃষ্ট।

—সে কি, আপনার অদৃষ্ট কেন প্রভাসদা, আমাদের অদৃষ্ট।

—তা নয় দিদি, মুখে যাই বলো, প্রাচীন রাজবংশের মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে বেড়ানোর মধ্যে যে আনন্দ আছে—তা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে শরৎদি? বিশেষ করে তুমি আর কাকাবাবু যখন কখনো কলকাতাতে যাও নি।

—কোথাও যাই নি—তার কলকাতায়।

অরুণ এবার কথা বললে। সে অনেকক্ষণ থেকে একদৃষ্টে শরতের দিকে চেয়ে ছিল। শরতের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ জিভ ও তালুর সাহায্যে একপ্রকার খেদসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললে, ও, ভাবলে একদিকে কষ্ট হয়, একদিকে আনন্দ হয়। আপনার এই সরলতার তুলনা নেই। অভিজ্ঞতা সব জায়গাতেই যে পুজো পাবে তা পাবে না। অনভিজ্ঞতার মূল্য অনেক সময় অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি।

প্রভাস বললে, তাই তো, বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।

—ভাবনা আর কি, অন্য এক সময় নিয়ে যাবেন প্রভাসদা।

প্রভাস কিছুক্ষণ বসে ভেবে ভেবে বললে, আচ্ছা, কোনো রকমেই এখন যাওয়া হয় না? ধরো তুমি আর কাউকে নিয়ে না হয় আমাদেরই সঙ্গে গেলে—

—আমি একাও আপনার সঙ্গে যেতে পারি প্রভাসদা। আমার মন তেমন নীচ নয়। কিন্তু সেজন্যে নয়—বাবার বিনা অনুমতিতে কোথাও যেতে চাই নে। যদিও আমার মনে হয় আপনি নিয়ে গেলে বাবা তাতে অমত করবেন না।

অরুণ এবার বললে, তবে চলুন না কেন, গাড়ি রয়েছে—কাল সকালে বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে কলকাতা পেঁাছে যাওয়া যাবে। ইচ্ছে করেন, কাল রাতেই আবার আপনাকে এখানে পেঁাছে দেবো। কি বলেন প্রভাসবাবু?

প্রভাস ঘাড় নেড়ে বললে, তা তো বটেই। তাই চলো যাওয়া যাক—অবিশ্যি যদি তোমার মনের সঙ্গে খাপ খায়। কাল সকালে আমরা আসবো এখন আবার—

এরা উঠে গেলে রাজলক্ষ্মী দেখলে শরৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কি যেন ভাবছে আপন মনে। কিছুক্ষণ পরে শরৎ নিজেই বললে, তুই তো সব শুনলি, তোর কি মনে হয়—যাবো ওদের সঙ্গে? খুব ইচ্ছে করছে। কক্ষনো দেখিনি কলকাতা শহর—

—তোমার ইচ্ছে শরৎদি। তুমি আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী।

—তুই যাবি?

—আমার যেতে খুব ইচ্ছে—কিন্তু আমার যাওয়া হবে না শরৎদি। বাবা মা যেতে দেবে না।

—আমার সঙ্গে যাবি, এতে আর দোষ কি?

—তুমি যদি যাও, লোকে কোনো কথা ওঠাতে সাহস করবে না শরৎদি। কিন্তু আমায় কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। শেষকালে বাপ-মা মুশকিলে পড়ে যাবে বিয়ে দেবার সময়।

—বাবাঃ, এর মধ্যে এত কথা আছে? ধন্যি সব মন বট।

—তুমি থাকো গাঁয়ের বাইরে। তা ছাড়া তুমি যে বংশের মেয়ে, তোমার নামে এ অঞ্চলের লোকে কিছু রটাতে সাহস করবে না। আমার বেলায় তা তো হবে না!

আরও কিছুক্ষণ পরে রান্না শেষ হয়ে গেল। শরৎ রাজলক্ষ্মীকে খেতে দিয়ে নিজে একটা বাটিতে চিঁড়ে ভাজা তেল-নুন দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে বসলো।

রাজলক্ষ্মী খেতে খেতে বললে, ও সাত-বাসি চিঁড়ে-ভাজা কেন খাচ্ছ শরৎদি? আমার জন্যে তো সেই কষ্ট করলেই; রান্না করলে, এখন নিজের জন্যে না হয় খানকতক পরোটা কি রুটি করে নিলেই পারতে?

শরৎ সলজ্জ হেসে বললে, ময়দা আর ছিল না। প্রভাসদা আর অরুণবাবুকে তখন দুখানা করে পরোটা করে দিলাম—যা ছিল সব ফুরিয়ে গেল।

—আমায় বললে না কেন শরৎদি? ওই তোমার বড় দোষ। আমায় বললে আমি বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম।

—থাক গে, খাওয়ার জন্যে কি? এখন কলকাতায় যাওয়ার কি করা যায় বল্। আর শোন্ ওই অরুণবাবু, দেখলি তো? পছন্দ হয়? এবার তবে কথাটা পাড়ি প্রভাসদা'র কাছে?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিতে একটু ইতস্ততঃ করে সংকোচের সঙ্গে বললে, তা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু ও আমাদের কখনো হয়? বলে বামন হয়ে চাঁদে হাত—

—যদি ঘটিয়ে দিতে পারি?

রাজলক্ষ্মী মনে মনে ভাবলে, শরৎদি'র বয়সই হয়েছে আমার চেয়ে বেশি, কিন্তু এদিকে সরলা। অনেক জিনিসই আমি যা বুঝি, ও তাও বোঝে না। চিরকাল গাঁয়ের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে বাস করে এলো কি না।

সে মুখে বললে, দিতে পারো ভালই তো। বেশ কথা।

—ঘটকালির বখশিশ দিবি কি?

—যা চাইবে শরৎদি।

—দেখিস্ তখন যেন আবার ভুলে যাস্ নে—

রাজলক্ষ্মীর খাওয়ার প্রবৃত্তি চলে গিয়েছিল শরৎকে বাসি চিঁড়ে ভাজা খেতে দেখে। তার ওপর যখন আবার শরৎ গরম দুধের বাটি এনে তার পাতের কাছে নামতে গেল, সে একেবারে পিঁড়ির ওপর থেকে উঠে পড়ল। দুধটুকু থাকলে তবুও শরৎদি খেতে পাবে।

—ও কি, উঠলি যে?

রাজলক্ষ্মী ভাল করেই চেনে শরৎকে। সে যদি এখন আসল কথা বলে, তবে শরৎ ও দুধ ফেলে দেবে, তবু নিজে খাবে না। সুতরাং সে বললে, আর আমার খাওয়ার উপায় নেই শরৎদি, পেট খুব ভরে গিয়েছে। মরবো নাকি শেষে একরাশ খেয়ে?

—দুধ যে তোর জন্যে জ্বাল দিয়ে নিয়ে এলাম? কি হবে তবে?

রাজলক্ষ্মী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কি হবে তা কি জানি। না হয় তুমি খেয়ে ফেল ওটুকু। আমার আর খাওয়ার উপায় দেখছি নে। জানোই তো আমার শরীর খারাপ, বেশী খেতে পারি নে।

অগত্যা শরৎকেই দুধটুকু খেয়ে ফেলতে হল।

পরদিন সকালেই প্রভাস ও অরুণ আবার এসে হাজির।

প্রভাস বললে, কি ঠিক করলে দিদি?

—ও এখন হয়ে উঠবে না প্রভাসদা। আপনারা যাবেন না, বসুন। চা আর খাবার করে দি, বসে গল্প করুন।

শরৎ কাল রাত্রে ভেবে ঠিক করেছে রাজলক্ষ্মীর বিবাহের প্রস্তাবটা সে আজই প্রভাসের কাছে উত্থাপিত করে দেখবে কি দাঁড়ায়। রাজলক্ষ্মীকে এজন্যে সে সরিয়ে দেবার জন্যে বললে, ভাই, তোদের বাড়ি থেকে এত ক'টা আটা কি ময়দা দৌড়ে নিয়ে আয় তো? কাল রাত্রে আমাদের ময়দা ফুরিয়েছে। প্রভাসদা ও অরুণবাবুকে চায়ের সঙ্গে দুখানা পরোটা ভেজে দিই।

প্রভাস যেন একটু হতাশার সুরে বললে, তা হলে যাওয়া হল না তোমার? এবার গেলেই বেশ হত।

শরৎ বললে, না এবার হবে না।

—তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে চলো না কেন?

—কে? রাজলক্ষ্মীর কথা বলছেন? আচ্ছা, একটা কথা বলবো? রাজলক্ষ্মীকে কেমন লাগল আপনাদের?

প্রভাস একটু বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন বলো তো? ভালই লেগেছে।

—গরীব বাপ-মা, বিয়ে দিতে পারছে না। ওর জন্যে একটা পাত্র দেখে দিন না কেন প্রভাসদা? বড্ড উপকার করা হবে। একটা কথা শুনুন প্রভাসদা—

প্রভাস শরতের পিছু পিছু বাড়ির পিছনদিকে গেল।

শরৎ বললে, আচ্ছা প্রভাসদা, অরুণবাবুর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিয়ে দিন না কেন জুটিয়ে? পাল্টি ঘর। চমৎকার হবে—

প্রভাস যেন ঠিক এ ধরণের কথা আশা করে নি শরতের মুখ থেকে। সে আশাহতের সুরে বললে, তা—তা দেখলেও হয়।

শরতের যদি কিছুমাত্র সাংসারিক ও সামাজিক জ্ঞান থাকতো তবে প্রভাসকে চিনে নিতে সে পারতো এই এক মুহূর্ত্তেই। কিন্তু শরৎ যদিও বয়সে যুবতী, সারল্যে ও ব্যবহারিক অনভিজ্ঞতায় সে বালিকা। সুতরাং সে প্রভাসের স্বরূপ ধরতে পারলে না।

সে আরও আগ্রহের সঙ্গে বললে—তাই দেখুন না প্রভাসদা? আপনি করলে অনেক সহজ হয়ে যায় কাজটা—

প্রভাস অন্যমনস্কভাবে কি একটা কথা ভাবছিল। দু-একবার যেন কোনো একটা কথা বলবার জন্যে শরতের মুখের দিকে চাইলেও—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বললে না।

দুজনকে চা করে দিয়ে শরৎ পথের দিকে চেয়ে আছে—এমন সময় দেখা গেল রাজলক্ষ্মী ফিরে আসছে। সে দাওয়া থেকে নেমে রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বললে—এনেছিস্ ময়দা? দে আমার কাছে।

—আমি যাই শরৎদি, মা বলে দিয়েছে বাড়ি ফিরতে—

—কেন বল্ তো? প্রভাসদারা এখানে বসে আছে বলে?

রাজলক্ষ্মী অপ্রতিভ মুখে বললে—তাই শরৎদি, জানোই তো, আমরা গরীব, এখানে ওদের সঙ্গে বসে থাকলে হয়তো কথা উঠবে। মা বড় ভয় করে ওসব।

—তাহলে তুই যা—গিয়ে মান বজায় রাখ্—

রাজলক্ষ্মী হাসতে হাসতে চলে গেল।

প্রভাসদের খাবার করে দিতে বেলা প্রায় আটটা বেজে গেল। ওরা উঠতে যাবে এমন সময় শরৎ গড়ের খালের দিকে চেয়ে আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠল—বাবা আসছেন। প্রভাস ও অরুণ দুজনেই যেন চমকে উঠে সেদিকে চেয়ে দেখলে। ওদের মুখ দেখে মনে হবার কথা নয় যে কেদারের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনে তারা খুব খুশী।

তবুও প্রভাস এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে কেদারের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। কেদার আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন—এই যে প্রভাস কখন এলে? ভালো সব?···আমি—হঁ্যা—তাই বেরিয়েছিলাম বটে। সাংকিনী ও মাকড়ার বিলে বাচ্ হচ্ছে খবর পেলাম পথেই। খাজনা আদায় করতে যখন যাওয়া—আর সবই জেলে প্রজা—বাচ্ শেষ না হলে কাউকে বাড়ি পাওয়া যাবে না তাও বটে—আর মস্ত কথা হচ্ছে বাচ্ না মিটে গেলে ওদের হাতে পয়সা আসবে না। তাই ফিরে এলাম।

প্রভাস বললে, ভালই হল। শরৎ তো ছোটবোনের মত —আপনাদের কলকাতা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো বলে মোটর এনেছি এবার। আপনি ছিলেন না বলে একটু মুশকিল ছিল। শরৎদি বলেছিল যাবে। আমার সঙ্গে যাবে এ আর বেশি কথা কি? নিজের দাদার মত—তবুও আপনি এলেন—বড় ভালই হল। কাল সকালে চলুন কাকাবাবু কলকাতায়।

শরৎ প্রভাসের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে ভাবলে—কই, সে কখন প্রভাসদা'র সঙ্গে কলকাতায় যাবে বললে? প্রভাসদা'র ভুল হয়েছে শুনতে—কিন্তু সে তো আজ দুবার তিনবার বলেছে তার যাওয়া হবে না।

কেদার বললেন, তা বেশ কথা। চলো না, ভালই তো। অনেককাল থেকে কলকাতায় যাবো যাবো ভাবি তা হয়ে ওঠে না। মন্দ কি?

প্রভাস ও অরুণ একসঙ্গে খুশির সঙ্গে বলে উঠল—কাল সকালেই চলুন তবে! সে কথা তো আমরাও বলছি।

—কখন গিয়ে পেঁছিবে?

—বেলা বারোটার মধ্যে। কোন কষ্ট হবে না আপনাদের, যাতে সব রকম সুবিধে হয়—

—এখানে কাল সকালে তোমরা খাবে—খেয়ে গাড়িতে ওঠা যাবে।

শরৎ বাবার অনুরোধে যোগ দিয়ে বললে, হ্যাঁ প্রভাসদা, অরুণবাবুকে নিয়ে কাল সকালে এখানেই খাবেন। না, কোনো কথা শুনবো না। এখানে খেতেই হবে—

প্রভাস বললে, রাজলক্ষ্মী বলে সেই মেয়েটি যাবে নাকি? তারও জায়গা হয়ে যাবে। বড় গাড়ি।

শরৎ বললে, না, তার যাবার সুবিধে হবে না। আমায় সে বলে গেল এই মাত্র।

প্রভাস বললে, তা হলে কাকাবাবু কাল সকালেই আসবো তো?

—হঁ্যা, এখানে তোমরা খাবে যে সকালে। তারপর রওনা হওয়া যাবে। অরুণকেও নিয়ে এসো—

দুপুরের পরে রাজলক্ষ্মী এল। শরৎ দাওয়ায় বসে পুরানো টিনের তোরঙ্গটা থেকে তার ও বাবার কাপড় বার করতে ব্যস্ত। রাজলক্ষ্মীকে দেখে বললে, এই যে আয় রাজলক্ষ্মী, সব কাপড়ই ছেঁড়া, যেটাতে হাত দিই। আমার তবু দুখানা বেরিয়েছে, বাবার দেখছি আস্ত কাপড় বাক্সে একখানাও নেই। কি নিয়ে যে যাবেন কলকাতায়—

—তা হলে যাচ্ছ সত্যিই শরৎদি? কাকাবাবু কোথায়?

—যাই, একবার বেড়িয়েই আসি। বসে বসে বাবার কাপড়গুলো এখন সেলাই করবো—কেনবার পয়সা নেই যে নতুন একজোড়া ধুতি কিনে নেবো—বেশী ছেঁড়া নয়, একটু আধটু সেলাই করলে কেউ টেরও পাবে না। বাবা নেই বাড়ি। এই মাত্র পাড়ার দিকে গেলেন।

শরতের মনে খুব আনন্দ হয়েছে বাইরে বেড়াতে যাবার এই সুযোগ পেয়ে। সে বসে বসে কেবল সেই গল্পই করতে লাগল রাজলক্ষ্মীর কাছে। কতকাল আগে তার শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল—ভাল মনেও পড়ে না—সে-ও তো বেশী দূরে নয়, টুঙি-মাজদে গ্রামের কাছে

বল্লভপুরের ভাদুড়ীদের বাড়ি। মাজদিয়া স্টেশনে নেমে তিন ক্রোশ গরুর গাড়িতে গিয়ে কি একটা ছোট্ট নদীর ধারে। তাদেরও অবস্থা খারাপ, আগে একসময় ও অঞ্চলের ভাদুড়ীদের নামডাক ছিল, সে নাকি অনেককাল আগে। এখন সতেরো সরিকে ভাগ হয়ে আর সবাই মিলে বাড়ি বসে খেয়ে বেজায় গরীব হয়ে পড়েছে।

রাজলক্ষ্মী বললে, সেখানে তোমায় নিয়ে যায় না শরৎদি ?

—কে নিয়ে যাবে ভাই ?

—তোমার দেওর ভাশুর নেই ?

—আপন ভাশুরই তো রয়েছেন। হলে হবে কি, তাঁর বেজায় পুরী পাল্লা—সাত মেয়ে, পাঁচ ছেলে—নিজেরগুলো সামলাতে পারেন না—খেতে দিতে পারেন না—আমাকে নিয়ে যাবেন! আজ তেরো বছর কপাল পুড়েছে, কখনও একখানা থান কাপড় দিয়ে খোঁজ করেন নি। আর খোঁজ করলেও কি হত, আমি কি বাবাকে ফেলে সেখানে গিয়ে থাকতে পারি ? সে গাঁয়ে আমার মনও টেঁকে না।

—যদি এখন তারা নিতে আসে শরৎদি ?

—আমি ইচ্ছে-সুখে যাইনে—তবে ভাশুর যদি পেড়াপীড়ি করেন—না গিয়ে আর উপায় কি ?

—কতদিন থাকতে পারো ? বলো না শরৎদি ?

—কেন বল্ তো, আজ আবার তুই আমার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পড়লি কেন ?

রাজলক্ষ্মী মুখে আঁচল দিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠল। তার পর বললে, দাও গুছিয়ে দিই কি জিনিসপত্তর আছে—মা বলছিল—

—কি বলছিলেন খুড়ীমা ?

—ভাগ্যিস কাকাবাবু এসে গিয়েছেন তাই। নইলে তোমার একা যাওয়া উচিত হত না প্রভাসবাবুর সঙ্গে—

শরতের চোখ দুটি যেন ক্ষণকালের জন্যে জ্বলে উঠল। মুখের রং গেল বদলে—রাজলক্ষ্মী জানে শরৎ দিদি রাগলে ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে আগে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেল মনে মনে, হয়তো তার এ কথা বলা উচিত হয় নি, কিন্তু বলতে তাকে হবেই শরৎদির ভালোর জন্যে। না বলে সে পারে না। কতবার তার মনে হয়েছে—শরৎ দিদি তার ছোট বোন, সে-ই এই সংসারানভিজ্ঞা বালিকাপ্রকৃতির দিদিকে সব বিপদ থেকে, কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

শরৎ কড়া সুরে বললে, কেন উচিত হত না, একশো বার হত। খুড়ীমাকে গিয়ে বোলো রাজলক্ষ্মী, শরৎ যেখানে ভাল ভাবে সেখানে আপনার লোকের মতই ব্যবহার করে—পর ভাবে না। তার মন যেখানে সায় দেয় সেখানে যেতে তার এতটুকু ভয় নেই—আমি কারো কথা—

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বললে, ওকি শরৎদি, তোমার পায়ে পড়ি শরৎদি, অমন চলে যেও না, ছিঃ—

—তবে তুই এমন কথা বলিস্ কেন, খুড়ীমাই বা কেন বলেন ? তিনি কি ভাবেন—

—শোনো আমার কথা। মা সে কথা বলে নি। কিন্তু একা মেয়েমানুষ যদি বিপদে পড় তখন তোমায় দেখবে কে ? সেই কথাই মা বলছিল। তুমি যত ভাল ভাবো লোককে সকলেই অত ভাল নয়। তুমি সংসারে কি বোঝ ? মার বয়েস তোমার চেয়ে তো কত বেশী—সেদিক থেকে মা যা বলেছে মিথ্যে বলে নি। লক্ষ্মী দিদি, অমন রাগে না, রাগলে সংসারে কাজ চলে ? আমি তোমায় কত ভালবাসি, মা কত ভালবাসে—তা তুমি বুঝি জানো না ? মা আমায় গাঁয়ে কারোর বাড়ি যেতে দেয় না—কিন্তু তোমাদের বাড়ি আসতে চাইলে

কখনো কোনো আপত্তি করে নি।

শরতের রাগ ততক্ষণ চলে গিয়েছে। সে রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে বললে, কিছু মনে করিস নে রাজী—

—না, মনে তো করি নে, আমি জানি শরৎদি ছেলেমানুষের মত, এই রেগে উঠল, এই জল হয়ে গেল। রাগ তোমার বেশীক্ষণ শরীরে থাকে না—গঙ্গাজলে ধোয়া মন যে! সাধে কি বড়বংশের মেয়ে বলে তোমাকে শরৎদি?

শরৎ সলজ্জ-মুখে বললে, যা যা বকিস্ নে—থাম তুই।

এই সময় দূরে থেকে কেদারকে আসতে দেখে রাজলক্ষ্মী বললে, কাকাবাবু আসছেন, শরৎদি—ও-সব কথা থাক, কি কি কাজ করতে হবে, কি গুছিয়ে দিতে হবে বলে দাও।

—কি আর গুছিয়ে দিবি! দু-পাঁচ দিনের জন্যে তো যাওয়া। হ্যাঁ রে, উত্তর দেউলে সন্দে-পিদিম দেওয়ার জন্যে বামী বাগ্দীকে ঠিক করে দিতে পারবি? আমি এসে তাকে চার আনা পয়সা দেবো।

রাজলক্ষ্মী বললে, বলে দেখবো—কিন্তু সে রাজী হবে না। সন্দে বেলা সে ঘেঁষবে উত্তর দেউলের অরণ্যি বিজেবনে? বাপ্‌রে! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না কেন? আমি তোমার সন্দে দেবো রোজ রোজ—

শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুই দিবি সন্দে-পিদিম—উত্তর দেউলে?

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কেন হবে না? পানুকে সঙ্গে নিয়ে আসবো—আর সন্দের এক ঘণ্টা আগে আলো জেবলে রেখে চলে যাবো। তোমাদের ঘরবাড়িও তো দেখাশুনো করতে হবে আমায়? অমনি দিয়ে যাবো পিদিম জেবলে।

—তা হলে তো বেঁচে যাই রাজলক্ষ্মী। ওই একটা মস্ত ভাবনা আমার তা জানিস? মনে মনে ভাবি, আমি বেঁচে থাকতে পূর্ব্বপুরুষের দেউলে আলো জবলবে না—তা কখনই হতে দেবো না প্রাণ ধরে। আর একটা কথা শিখিয়ে দি, যখন পিদিম হাতে নিয়ে দেউলে যাবি তখন বেতবনের জঙ্গলে বারাহী দেবীর যে ভাঙা মূর্ত্তি আছে সেখানটাতে একবার উদ্দেশ্যে পিদিমটা তুলে দেখাবি।

রাজলক্ষ্মীর মুখে কেমন ভয়ের ছায়া নামলো—সে বললে, ওমা, ওই ভাঙা কালীর মূর্ত্তি! ওখানে যেতে ভয় করে।

—কালী নয়—ও বারাহী বলে এক পুরোনো আমলের দেবীমূর্ত্তি। বহুকাল পুজোও হয় নি। কেমন চড়কের সময় সন্নিসিরা একবার ওখানে এসে নেচে যায় দেখিস্ নি?

—তা যাক নেচে। আমি ওখানে যেতে পারবো না শরৎদি। মাপ করো।

—তুই যদি না পারিস্—তবে আমার যাওয়া হবে না। আমি বারাহী দেবীকে ফেলে রেখে যেতে পারবো না।

রাজলক্ষ্মী বললে, না দিদি, সত্যি কিছু ভাল লাগছে না। তুমি চলে যাবে, আমার মন কাঁদবে সত্যিই। তাই বলছিলাম পারবো না, যদি তোমার যাওয়ায় বাধা দিতে পারি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, এ কাজ ভাল না। শরৎ দিদি কখনো কোনো জায়গায় যায় না, কিছু দেখে নি—ও-ই যাক্। ঘুরে আসুক।

কেদার গামছা পরে পুকুর থেকে স্নান করে এসে বললেন, ওমা শরৎ, একটা ডাব খাওয়াতে পারবি?

—না বাবা, একটা ছোট্ট ডাব ওবেলা ঠাকুরদের দিয়েছি—এবেলা আর কিছু নেই। পুণ্য বাগ্দীকে ডেকে নিয়ে আসবো?

—না থাক্ মা, সব গুছিয়ে নিয়ে রাখো—রাজলক্ষ্মী মা এলি কখন ? তা তুই একটু সাহায্য কর না !

—ও তো করছেই বাবা। ও উত্তর দেউলে পিদিম দেবে পর্যন্ত বলছে। এ গাঁয়ের মধ্যে আর কেউ এতদূর আসেও না, খোঁজখবরও নেয় না। ও আছে তাই, তবু মানুষের মুখ দেখতে পাই।

•

পরদিন প্রভাসের মোটর সামনের বারুইদ'র বিল পার হয়ে যাওয়ার পরে কেদারের মুখে প্রথম কথা ফুটলো। পেছনের সিটে তিনি মেয়েকে নিয়ে বসেছেন—সামনের সিটে বসেছে অরুণ ও প্রভাস—অরুণ গাড়ি চালাচ্ছে।

কেদার মাঝে মাঝে বিস্ময়সূচক দু-একটা রব করছিলেন এতক্ষণ, এইবারে মেয়েকে সম্বোধন করে প্রথম কথা বললেন।

—ও শরৎ, কি জোরে যায় বটে মটোর গাড়ি, বারুইদ'র বিল গড়শিবপুর থেকে পাক্কা চার ক্রোশ রাস্তা। হেঁটে আসলে দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার কম পেঁছুনো যায় না—আর এই দ্যাখো, চোখের পাতা পাল্টাতে না পাল্টাতে এসে হাজির বারুইদ'র বিলে—

—হাজির কি বাবা, বিল পেরিয়েও তো গেল !

—ও, মানুষ না পাখী ? কি জোরেই যায় তাই ভাবছি।

—হ্যাঁ বাবা, কলকাতা কতদূর বললে প্রভাসদা ?

—বেলা বারোটা কি একটার মধ্যে যাবো বলছে। ত্রিশ ক্রোশ হবে এখান থেকে কলকাতা।

প্রভাস সামনের সিটে বসে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বললে, কাকাবাবু কখনো কলকাতায় এসেছিলেন ?

কেদার বললেন, তা দু-বার এর আগে আমি কলকাতা ঘুরে এসেছি। তবে সে অনেক দিন আগের কথা। প্রায় দু-যুগ হল।

অরুণ বললে, সে কলকাতা আর নেই, গিয়ে দেখবেন। শরৎদি, আপনি কখনো যান নি কলকাতায় এর আগে ?

—নাঃ, আমি কোথাও যাই নি।

—কলকাতাতেও না ?

—কলকাতা তো কলকাতা ! বলে কখনো রাণাঘাট কি রকম শহর তাই দেখি নি ! রাজী হয়ে গেল বাবা তাই, নইলে আমার আসা হত না। পিদিম দেখানোর জন্যেই তো যত গোলমাল।

আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য। ধর্ম্মদাসপুরে এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে ছায়ায়। এখনি এল ধর্ম্মদাসপুরে ! কেদার খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছেন সকালে—বেলা এগারোটার কমে ধর্ম্মদাসপুরে পেঁছুতে পারেন নি। আর সেই ধর্ম্মদাসপুর পার হয়ে গেল বড় জোর চল্লিশ মিনিটে। কি তারও কমে।

শরৎকে বললেন, মা, এই দ্যাখো ধর্ম্মদাসপুর গেল, সেই যে একবার ওল এনেছিলাম মনে আছে ? সে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কি জোরে যাচ্ছে একবার ভেবে দ্যাখো দিকিন্ ?···হ্যাঁ, গাড়ি বের করেছে বটে সায়েবরা !

শরৎ ক্রমাগত ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করতে লাগল, বাবা—আর কত দেরি আছে কলকাতা ? কতক্ষণে আমরা কলকাতা পেঁছুবো ?

প্রায় ঘণ্টা চারেক একটানা ছোটার পরে একটা শহরে বাজারের মত জায়গায় গাড়ি

ঢুকলো। কেদার বললেন, এটা কি জায়গা?

প্রভাস বললে, এটা বারাসাত। আর বেশী দূর নেই কলকাতা। এখান থেকে একটু চা খেয়ে নেবেন কাকাবাবু?

কেদার বললেন, কেন এখানে কি তোমার কোনো জানাশুনো লোকের বাড়ি আছে নাকি? চা খাবে কোথায়?

—না, জানাশুনো কেউ নেই। দোকানে খাবো। চায়ের দোকান আছে অনেক—

—না বাপু। তোমরা খাও, আমি দোকানের চা কখনও খাই নি, ও আমার ঘেন্না করে। আমি বরং একটু তামাক ধরিয়ে খাই। অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয় নি।

দোকানের চা শরৎও খেলে না। অরুণ ও প্রভাস নিজেরা গাড়ির কাছে চা আনিয়ে খেলে। কেদার আরাম করে হুঁকো টানতে টানতে বললেন, চা ভালো?

প্রভাস ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, কেন, মন্দ না! খাবেন, আনবো?

—না, আমি সেজন্যে বলছি নে। আমি দোকানের চা কখনো খাই নি, ও খাবোও না কখনো। তোমরা খাও। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের কত বাচবিচার।

গাড়ি ছেড়ে যশোর রোড দিয়ে অনেকখানি এসে একটা বড়লোকের বাগানবাড়ির মধ্যে ঢুকলো। ফটক থেকে লাল সুরকির রাস্তা সামনের সুদৃশ্য অট্টালিকাটির গাড়িবারান্দাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। পথের দু-ধারে এরিকা পামের বড় বড় চারা গাছ, ক্রোটন, শেফালি, চাঁপা, আম, গোলাপজাম প্রভৃতি নানারকম গাছ।

প্রভাস বললে, আপনারা নামুন—এবেলা এখানে থাকবেন আপনারা। এটা অরুণদের বাগানবাড়ি, ওর দাদামশায়ের তৈরি বাড়ি এটা।

কেদার ও শরৎ দুজনেই বাড়ি দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে নিশ্বাক হয়ে গেলেন। এমন বাড়িতে বাস করবার কল্পনাও কখনো তাঁরা করেন নি। মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেজে, ছোট বড় আট-দশটা ঘর। বড় বড় আয়না, ইলেকট্রিক পাখা, আলো, কৌচ, কেদারা। তবে দেখে মনে হয় এখানে যেন কেউ বাস করে নি কোন দিন, সব জিনিসই খুব পুরোনো —দু একটা ঘর ছাড়া অন্য ঘরগুলোতে ধুলো, মাকড়সার জাল বোঝাই।

কেদার কথাটা বললেন প্রভাসকে।

প্রভাস বললে, ওর দাদাবাবু শৌখীন লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন আজ বছর কয়েক। এখন মাঝে মাঝে অরুণেরা আসে—সব সময় কেউ থাকে না।

শরৎ বললে, এটাই কলকাতা প্রভাসদা?

—না, এটাকে বলে দমদম। এর পরেই কলকাতা শুরু হ'ল। তোমরা বিশ্রাম করো—ওবেলা কলকাতা বেড়িয়ে নিয়ে আসবো। এখুনি ঝি আসবে, যা দরকার হয় বলে দিও ঝিকে—সব গুছিয়ে এনে দেবে। ঠাকুর আসবে এখন—

শরৎ বললে, কি ঠাকুর?

—রান্না করতে আসবে ঠাকুর!

—বাবা ঠাকুরের হাতে রান্না খেতে পারবেন না প্রভাসদা, ঠাকুর আসবার দরকার নেই। আমি আছি তবে কি জন্যে?

—কলকাতায় এলে, একটু বেড়াবে না, বসে বসে রান্না করবে গড়শিবপুরের মত? বাঃ—

—তা হোক্ গে। আমার রান্না করতে কতক্ষণ যাবে বলুন তো? ক'জন লোকের রান্না করতে হবে?

প্রভাস ও অরুণ শরতের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললে। প্রভাস বললে—ক'জন লোকের রান্না আবার! তোমাদের দুজনের, আবার কে আসবে তোমার এখানে খেতে? তুমি তো আর

র‍াঁধুনী বামনী নও যে দেশ সুদ্ধ লোকের রেঁধে বেড়াবে ? আচ্ছা, আমরা এখন আসি কাকাবাবু, বিকেলে ছ'টার সময় আবার আসবো। মলঙ্গা লেনে আমাদের যে বাড়ি আছে সেখানে নিয়ে যাবো ওবেলা।

ওরা গাড়ি নিয়ে চলে গেলে কেদার আর একবার তামাক সাজতে বসলেন।

শরৎ চারিদিকে বেড়িয়ে এসে বললে, বাঃ চমৎকার জায়গা। ওদিকে একটা বাঁধা ঘাট-ওয়ালা পুকুর। দেখবে এসো না বাবা! তোমার কেবল তামাক খাওয়া আর তামাক খাওয়া ! এই তো একবার খেলে বারাসাত না কি জায়গায় !

কেদার অগত্যা উঠে মেয়ের পিছু পিছু গিয়ে পুকুর দেখে এলেন। বাঁধা ঘাট অনেক দিনের পুরোনো—কতকাল এ ঘাট যেন কেউ ব্যবহার করে নি। পুকুরের ওপারেও বাগান, কিন্তু ওদিকটাতে আগাছার জঙ্গল বড় বেশি।

শরৎ বললে, বাবা, খিদে পেয়েছে ?

—নাঃ—

—ঠিক পেয়েছে বাবা। উড়িয়ে দিলে শুনবো না। ভাঁড়ারে জিনিসপত্র সব আছে দেখে এসেছি—হালুয়া আর লুচি করে আনি।

কেদার চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন, মেয়ের কাজে বাধা দেবার বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রকাশ করলেন না অবিশ্যি। শরৎ কিন্তু অল্প একটু পরে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে—বাবা, মুশ্‌কিল বেধেছে—

—কি রে ?

—এখানে তো দেখছি পাথুরে কয়লা জ্বালানো উনুন। কাঠের উনুন নেই। কয়লা কি করে জ্বালতে হয় জানি নে যে বাবা ? ঝি না এলে হবেই না দেখছি।

শরৎ ছেলেমানুষের মত আনন্দে বাগানের সব জায়গায় বেড়িয়ে ফুল তুলে ডাল ভেঙে এ গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে ও গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে বসে উৎপাত করে বেড়াতে লাগল। বেশ সুন্দর ছায়াভরা বাগান। কত রকমের ফুল—অধিকাংশই সে চেনে না, নামও জানে না। কেদার মেয়ের পীড়াপীড়িতে এক জায়গায় গিয়ে লোহার বেঞ্চিতে খানিকটা বসে কলের পুতুলের মত দু-একবার মাথা দুলিয়ে বলতে লাগলেন—বাঃ, বেশ—বাঃ—

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেছে, তখন প্রভাস মোটর নিয়ে এসে বললে—আসুন কাকাবাবু, চলো শরৎ—কাকাবাবুকে কিছু খাইয়েছ ?

শরৎ হেসে বললে, তা হয় নি। ঝি তো মোটেই আসে নি।

—তুমি তো বললে তুমিই করবে ? জিনিসপত্র তো আছে।

—কয়লার উনুনে জ্বাল দিতে জানি নে, কয়লা ধরাতে জানি নে। তাতেই তো হল না।

প্রভাস চিন্তিতমুখে বলল, তাই তো। এ তো বড় মুশকিল হল !

কেদার বললেন, কিছু মুশকিল নয় হে প্রভাস। চলো তুমি, ফিরে এসে বরং জলযোগ করা যাবে—

প্রভাস বললে, যদি নিকটের ভাল দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে আনি, তা আপনার চলবে না কাকাবাবু ?

শরৎ হেসে বললে, বাবা ও-সব খাবেন না প্রভাসদা, তা ছাড়া আমি তো খেতেও দেবো না। কলকাতা শহরে শুনেছি বড় অসুখ-বিসুখ, যেখান সেখান থেকে খাবার খাওয়া ওঁর সইবে না।

অগত্যা সকলে মোটরে উঠে বসলেন, গাড়ি ছাড়লো।

প্রথমে যশোর রোডের দু-ধারে বাগানবাড়ি ও কচুরীপানা-বোঝাই ছোট বড় জলা ছাড়িয়ে বেলগেছের মোড়ের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য দেখে পিতাপুত্রী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে পড়ল। ওদের দুজনের মুখে আর কোনো কথা নেই। গাড়ি ওখান থেকে এসে পড়ল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে—এবং দু-ধারে দোকান পসার, থিয়েটার, সিনেমা, ইলেকট্রিক আলোর বিজ্ঞাপন, দোকানের বাইরে শো-কেসে বহুবিচিত্র কাপড়, পোশাক, পুতুল, আয়না, সেণ্ট, সাবান, স্নো প্রভৃতির সুদৃশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে গাড়ি এসে পড়ল হ্যারিসন রোডের মোড়ে এবং এখান থেকে গাড়ি ঘুরে গেল হাওড়ার পুলের ওপর, ও পার হয়ে হাওড়া স্টেশনের গাড়িবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

পুল পার হবার সময় প্রভাস বললে, এই দেখুন হাওড়ার পুল, নিচে গঙ্গা—আমরা যাচ্ছি হাওড়া স্টেশনে।

এবারও কেদার বা শরৎ কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না।

প্রভাস গাড়ি থামিয়ে বললে, কাকাবাবু, চলুন স্টেশনের রেস্টোরেণ্ট থেকে আপনাকে চা খাইয়ে আনি—খাবেন কি?

কেদারের কোনো আপত্তি ছিল না—কিন্তু মেয়ে বাপের পরকালের দিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে—বাবা নাস্তিক মানুষ—ওঁর এ বয়সে কোনো অশাস্ত্রীয় অনাচারের সংস্পর্শে কখনো সে আসতে দেবে না কেদার তা ভাল জানতেন। তিনি মেয়ের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন বটে, কিন্তু শরৎ তাঁর মুখের দিকে ভাল করে না চেয়েই বললে, চলুন প্রভাসদা, উনি ওখানে খাবেন না—

অগত্যা প্রভাস আবার গাড়ি ছেড়ে হাওড়ার পুলের ওপর এল এবং আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওই দেখুন সব জাহাজ, শরৎদি দ্যাখো সমুদ্রে যে সমস্ত জাহাজ যায়, ওই দাঁড়িয়ে আছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে গাড়ি এল আউট্রাম ঘাটে। ওদের দুজনকে নামিয়ে নিয়ে প্রভাস আউট্রাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে একখানা বেঞ্চিতে বসলো। সামনের গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় স্টীমার বাঁশি বাজিয়ে চলেছে, বড় বড় ভড় ও বজরা ডাঙার দিকে নোঙর করে রেখেছে, সার্চলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল একখানা বড় স্টীমার আস্তে আস্তে যাচ্ছে নদীর মাঝখান বেয়ে, সুবেশা নরনারীরা জেটির ওপর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—চারিদিকে একটা যেন আনন্দ ও উৎসাহের কোলাহল।

একটা বড় বয়া ঢেউয়ের স্রোতে দুলছে দেখে শরৎ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওটা কি?

প্রভাস বললে, জাহাজ বাঁধে ওই আংটাতে, বয়া বলে ওকে। আরও অনেক আছে নদীতে—

এতক্ষণে ওদের দু-জনের কথা যেন ফুটলো। কেদার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাপ্ রে, এ কি কাণ্ড! হ্যাঁ, শহর তো শহর, বলিহারি শহর বটে,বাবা!

শরৎ বললে, সত্যি বাবা, এমন কখনো ভাবি নি। এ যেন জাদুকরের কাণ্ড! আচ্ছা, এখানে জলের ওপর ঘর কেন?

প্রভাস বুঝিয়ে দিয়ে বললে, শরৎদি, কাকাবাবুকে এবার চা খাওয়ানো চলবে এখানে? খুব ভাল বন্দোবস্ত।

শরৎ রাজী হল না। বাবাকে পরকালে যমের বাড়ি সে কখনো পাঠাতে পারবে না। যা নাস্তিক উনি, এমনি কি গতি হয় ওঁর কে জানে। তার ওপর রাশ আল্‌গা দিলে কি আর রক্ষা আছে? বাবা ধেই ধেই করে নৃত্য করে বেড়াবেন এই কলকাতা শহরে।

প্রভাসের নির্বন্ধাতিশয্যে শরৎ একটু বিরক্তই হল। সে যখন বলছে বাবা যেখানে

সেখানে খাবেন না, তখন তাঁকে অত প্রলোভন দেখাবার মানে কি ?

বললে, আচ্ছা প্রভাসদা, ও'কে খাইয়ে কেন বাবার জাতটা মারবেন এ ক'দিনের জন্যে ? ও কথাই ছেড়ে দিন।

এবার কিন্তু কেদার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললেন, হ্যাঁঃ, যত সব ! একদিন কোথাও চা খেলেই একেবারে নরকে যেতে হবে। নরক অত সোজা নয়, পরকালও অমন ঠুনকো জিনিস নয় ! চলো সবাই মিলে চা খেয়ে আসা যাক হে—

শরৎ দৃঢ়স্বরে বললে, না, তা কখনো হবে না। যাও দিকি ! সন্দে-আহ্নিক তো করো না কোনোকালে, আবার ছত্রিশ জাতের জল না খেলে চলবে না তোমার বাবা ?

কেদারের সাহসের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রভাসও আর অনুরোধ করলে না, তিনিও আর যেতে চাইলেন না। ওখান থেকে সবাই এল ইডেন গার্ডেনে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা, বহু সুসজ্জিত সাহেব-মেমকে বেড়াতে দেখে শরৎ তো একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এত সাহেব-মেম একসঙ্গে কখনো দেখা দূরে যাক, কল্পনাও করে নি কোন দিন। শরৎ হাঁ করে একদৃষ্টে এরিকা পামের কুঞ্জের মধ্যে বেঞ্চিতে উপবেশন-রত দুটি সুবেশ, সুদর্শন সাহেব ও মেমের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ কি ভেবে তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তেই আঁচল দিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে সে মুছে ফেললে। শরতের মনে পড়ল, গ্রামের লোকের দুঃখদারিদ্র্য, কত ভাগ্যহত, দীনহীন ব্যক্তি সেখানে কখনো জীবনে আনন্দের মুখ দেখলে না। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে ব্যাণ্ড বাজছিল অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ অনেকক্ষণ বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনলে। কিন্তু ওর ভাল লাগল না। সবাই যেন বেসুরো, তার অনভ্যস্ত কানে পদে পদে সুরের খুঁৎ ধরা পড়ছিল।

প্রভাস বললে, সিনেমা দেখবে তো বলো নিয়ে যাই।

শরৎ কখনো না দেখলেও সিনেমা সম্বন্ধে গড়শিবপুরে থাকতেই শহর-প্রত্যাগত নববিবাহিতা বালিকা কিংবা বধূদের মুখে অনেক গল্প শুনেছে। বাবাকে এমন জিনিস দেখাতেই হবে, সে নিজে দেখুক না দেখুক কিন্তু আজ আর নয়—বাবার কিছু খাওয়া হয় নি বিকেল থেকে। একবার তার মনে হ'ল বাবা চা খেতে চাইছেন, খান বরং কোনো ভাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোকানে বসে ! কি আর হবে ! বাবা যা নাস্তিক, এত বয়েস হ'ল একবার পৈতেগাছটা হাতে করে গায়ত্রী জপটাও করেন না কোনদিন, পরকালে ও'র অধোগতি ঠেকাবার সাধ্যি হবে না শরতের—সুতরাং ইহকালে যে ক'দিন বাঁচেন, অন্ততঃ সুখ করে যান। ইহকালে পরকালে দু-কালেই কষ্ট করে আর কি হবে ?

শরৎ বললে, বাবাকে চা খাইয়ে নিই কোনো দোকানে বসে। ভাল দোকান দেখে—ব্রাহ্মণের দোকান নেই ?

কেদার অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলেন। প্রভাস বিপন্ন মুখে বললে, ব্রাহ্মণের দোকান —তাই তো—ব্রাহ্মণের দোকান তো এদিকে দেখছি নে—আচ্ছা, হয়েছে—এক উড়ে বামুন ঘড়া করে চা বেচে ওই মোড়টাতে, ভাঁড়ে করে দেয়—সেই সবচেয়ে ভালো। চলুন নিয়ে যাই।

চা পান শেষ করে ওরা আবার মোটরে চৌরঙ্গী পার হয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত গেল। এক জায়গায় এসে কেদার বললেন, এখানটাতে একটু নেমে হেঁটে দেখলে হত না প্রভাস ? বেশ দেখাচ্ছে—

গাড়ি এক জায়গায় রেখে ওরা পায়ে হেঁটে চৌরঙ্গীর চওড়া ফুটপাথ দিয়ে আবার ধর্ম্মতলার মোড়ের দিকে আসতে লাগল। দোকান হোটেলগুলির আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তর ও শো-কেসগুলির পণ্যসজ্জা ওদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে—শরৎ তো একেবারে বিস্ময়বিমুগ্ধ।

কতকাল মেয়েমানুষ হয়েও সে জিনিসপত্রের লোভ করে নি। জিনিসপত্র অধিকার করে রাখবার মেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চেপে চেপে রাখে মনের মধ্যে, শরতের সে-সব বহুদিন চলে গিয়েছিল মন থেকে মুছে—কিন্তু আজ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তারা।

একটা দোকানে ক্রিস্ট্যালের চমৎকার ফুলদানি দেখে শরৎ ভাবলে—আহা, একটা ওইরকম ফুলদানি কেনা যেত!—বুনোফুল কত ফোটে এই সময় কালো পায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে, সাজিয়ে রাখত সে রোজ রোজ। একটা চমৎকার পুতুল সাদা পাথরের, একটা কি অদ্ভুত কাঁচের বল তার মধ্যে বিজলির আলো জ্বলছে···কি চমৎকার চমৎকার শাড়ী একটা বাঙালীর দোকানে, রাজলক্ষ্মীর জন্যে ওইরকম শাড়ী একখানা যদি নিয়ে যাওয়া যেত! জন্মে সে এরকম রঙের আর এরকম পাড়ের শাড়ী কখনো দেখে নি।

প্রভাস বললে, এটাকে বলে নিউমার্কেট। চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এলাম—চলুন শরৎদির জন্যে কিছু ফল কিনি।

শরৎ বললে, না, আমার জন্যে আবার কেন খরচ করেন প্রভাসদা? ফল কিনতে হবে না আপনার।

প্রভাস ওদের কথা না শুনে ফলের দোকানের দিকে সকলকে নিয়ে গেল। এর নাম ফলের দোকান! শরৎ ভেবেছিল, বুঝি ঝুড়িতে করে তাদের দেশের হাটের মত কলা, পেঁপে, বাতাবী নেবু বিক্রি হচ্ছে রাস্তার ধারে—এরই নাম ফলের দোকান। কিন্তু এ কি ব্যাপার! এত স্তূপীকৃত বেদানা, কমলালেবু, কিশমিশ, আনারস, আঙুর যে এক-জায়গায় থাকতে পারে, এ কথা সে জানত এখানে আসবার আগে? তবুও তো এগুলো তার পরিচিত ফল, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—অন্য কত শত প্রকারের ফল রয়েছে যা সে কখনো চক্ষেও দেখে নি—নামও শোনে নি।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, কাগজে জড়ানো জড়ানো ওগুলো কি ফল প্রভাসদা?

—ও আপেল। কালিফোর্নিয়া বলে একটা দেশ আছে আমেরিকায়, সেখান থেকে এসেছে। তোমার জন্যে নেবো শরৎদি? আর কিছু আঙুর নিই। কাকাবাবু আনারস ভালবাসেন?

একটা বড় ঠোঙায় ফল কিনে ওরা নিউমার্কেটের বিভিন্ন দিকে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় এল—সেখানে একটা আস্ত বাঘের হাঁ-করা মুণ্ডু মেঝের ওপর দেখে শরৎ চমকে উঠে বাবাকে দেখিয়ে বললে, বাবা, একটা বাঘের মাথা!

কেদারও অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

প্রভাস বললে, এরা জন্তুর চামড়া আর মাথা এরকম সাজিয়ে বিক্রি করে। এদের বলে ট্যাক্সিডারমিস্ট। এরকম অনেক দোকান আছে।

এইবার সত্যি সত্যি একটা জিনিস পছন্দ হয়েছে বটে শরতের। ওই বাঘের মুণ্ডু সুদ্ধ ছালখানা। তার নিজের শাড়ীর দরকার নেই, গহনার দরকার নেই—সে-সব দিন হয়ে গিয়েছে তার জীবনে। কিন্তু এই একটা পছন্দসই জিনিস যদি সে নিজের দখলে নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখতে পারত, তবে সুখ ছিল পাঁচজনকে দেখিয়ে, নিজে পাঁচবার দেখে, পাঁচজনকে ওর গল্প করে। ডেকে এনে পাঁচজনকে দেখাবার মত জিনিস বটে।

মুখ ফুটে সে প্রভাসকে দামটা জিজ্ঞেস করলে। প্রভাস দোকানে ঢুকে বললে, ওটা বিক্রির জন্যে নয়।—দোকান সাজাবার জন্যে। তবে ওরকম ওদের আছে,—আড়াই শো টাকা দাম।

অরুণ বললে, এখন কোথায় যাওয়া হবে?

প্রভাস বললে, কেন সিনেমায় ? কি বলেন কাকাবাবু—

শরতের যদিও সিনেমা দেখবার আগ্রহ খুবই প্রবল, তবুও সে যেতে রাজী হ'ল না। বাবা সেই কোন্ সকালে দুটো খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন গিয়ে রান্না না চড়িয়ে দিলে আবার তিনি কখন খাবেন ?

অগত্যা সকলে মোটরে আলোকোজ্জ্বল কলিকাতা নগরীর বিরাট সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে এল আবার সেই বেলগেছের পুলের মুখে।

শরৎ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার বললে, বাবাঃ, কত বড় শহর ? কুলও নেই, কিনারাও নেই।

প্রভাস হেসে বললে, শরৎদি, এ কি আর তুমি ধর্ম্মদাসপুর পেয়েছ ? গড়শিবপুর থেকে ধর্ম্মদাসপুর যত বড়—ততখানি লম্বা হবে কলকাতা। আজ চলো, কাল আবার ভাল করে দেখো। আমাদের মলঙ্গা লেনের বাড়িতেও নিয়ে যাব।

বেলগেছের পুল ছেড়ে দু-ধারের দৃশ্য যেন অনেকটা পাড়াগাঁয়ের মত। বড় বড় বাগান-বাড়ির ঘন বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে দু-চারটি বিজলি বাতি, কোনো কোনো বাগানবাড়ি একদম অন্ধকার। এখানে এক পশলা বৃষ্টি আসতে গাড়ির জানলার কাঁচ উঠিয়ে দেওয়া হ'ল হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে—খাড়া সোজা পথ তীব্র হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে চোখের সামনে—দ্রুতগামী মোটর লম্ফে লম্ফে যেন সে সুদীর্ঘ পথটার খানিকটা করে অংশ এক এক কামড়ে গিলে খাচ্ছে। শরৎ হাঁ করে চেয়ে রইল।

ওদের বাগানবাড়িটার ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকল ভেতরে।

এ বাগানটা যেন আরও অন্ধকার। তবে সব ঘরেই বিজলি বাতির বন্দোবস্ত।

প্রভাস কি টিপলে—পুটুস্ পুটুস্—এ ঘরে আলো জ্বলে উঠল সবুজ কাঁচের বড় চিমনির মধ্যে দিয়ে—বারান্দায় পুটুস্ পুটুস্—দীর্ঘ বারান্দায় এদিক থেকে ওদিকে তিনটে আলো জ্বলে উঠল।

শরৎ বললে, আমায় দেখিয়ে দিন প্রভাসদা কি করে জ্বালতে হয়—

পুটুস্—বাতি নিবে গেল—একদম অন্ধকার।

—এইটে হাত দিয়ে টেপো শরৎদি—এই দেখো—এই জ্বললো—আবার উঠিয়ে দাও—এই নিবে গেল—

শরৎ বালিকার মত খুশিতে বার বার সুইচ টিপে আলো একবার জ্বালিয়ে একবার নিবিয়ে দেখতে লাগল।

—বাবা, দ্যাখো কি রকম, তুমি এরকম দ্যাখো নি—

কেদার তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, ওসব তুমি দ্যাখো মা। আমি এর আগেও এসেছি, ওসব দেখে গিয়েছি—

শরৎ বললে, সে কবে বাবা ? তুমি আবার কবে কলকাতায় এসেছিলে শুনি ?

—তুই তখন জন্মাস্ নি। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলত। তোর মার জন্যে বড়বাজার থেকে ভাল তাঁতের ডুরে-শাড়ী কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই দেখে তোর মার কি আহ্লাদ !...তখন ইলেকট্রির আলো সব রাস্তায় ছিল না, দু-একটা বড় রাস্তায় দেখেছিলাম। লোকের বাড়িতে তখন গ্যাস জ্বলত—

প্রভাস বিস্ময়ের সুরে বললে, সত্যি কাকাবাবু, আপনি যা বলছেন ঠিক তো। আমি বাবার মুখেও শুনেছি প্রথম হ্যারিসন রোডে ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলে, তখন—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে রাস্তা বললে, ওখানেই আমি দেখেছি—অনেক দিনের কথা।

ইতিমধ্যে ঝি এসে জানাল, উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। শরৎ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের

দিকে গেল—যাবার সময় বলে গেল, বোসো বাবা, ভাল করে চা করে আনি—প্রভাসদা, অরুণবাবু যাবেন না চা না খেয়ে।

রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে রান্না-বাড়া সাঙ্গ করে শরৎ বাবাকে খাওয়ার ঠাঁই করে দিলে। প্রভাস ও অরুণ তার অনেক আগে চা পান করে বিদায় নিয়েছে।

শরৎ মাথা দুলিয়ে বললে, ভাত কিন্তু নয় বাবা—লুচি—

—যা হয় দাও মা। লুচি কেন?

—লুচির বন্দোবস্ত দেখি করে রেখেছে। ঘি, আটা—চা'ল আনে নি—

—বেশ ভালই হ'ল—তুই খেতে পাবি এখন—

—বোসো, গরম গরম আনি—

পরম তৃপ্তির সহিত প্রায় বিশ-বাইশখানা লুচি অনর্গল খেয়ে যাওয়ার পরে কেদারের মনে পড়ল, আর বেশি খাওয়া ঠিক হবে না—মেয়ের লুচিতে টান পড়বে।

শরৎ আবার যখন দিতে এল, বললে, নাঃ, আর না, থাক্।

—কেন দিই না এই দুখানা গরম গরম—

—তোমার জন্যে আছে তো?

—ওমা, সে কি? প্রায় আধসেরের ওপর আটা—এক পোয়া আটার লুচি আমি খেতে পারি না, তুমি পারো?

—খুব পারি। ওকথা বলো না মা—এক সময়ে…

—তোমার তো বাবা কেবল এক সময়ে আর এক সময়ে। এখন পারো না তো আর?

—খুব পারি—

—পারলেও আর দেবো না। খেয়ে ওঠো—বিদেশ বিভুঁই জায়গা—দাঁড়াও দইটা নিয়ে এসে দিই—দই আছে, মিষ্টি আছে—

আহারাদি সেরে পরিতৃপ্তির সহিত তামাক টানতে টানতে কেদার মেয়েকে বললেন, প্রভাস ছোকরা ভালো। বেশ যোগাড় আয়োজন করেছে খাওয়ার—কি বলিস্ মা?

—চমৎকার, আবার কি করবে?

—ফলগুলো কেটেছিস্ নাকি?

—না বাবা, কাল সকালে কাটবো। তোমায় দেবো। আজ তো লুচি ছিল, তাই খেলাম।

—বড্ড নির্জ্জন বাগানটা—না?

—গড়ের জঙ্গলের চেয়ে নির্জ্জন নয় তা বলে। ওই তো রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি যাচ্ছে, আর গড়ের জঙ্গলে যে-সময়ে শেয়াল ডাকে, বাঘ বের হয়!

—তা যা বলিস্ বাপু, সেখানে যতই জঙ্গল হোক, জন্মভূমি তো বটে। সেখানে ভয় হয়? তুই সত্যি করে বল্ তো?

—ভয় হলে কি থাকতে পারতাম বাবা? ছেলেবেলা থেকে কাটালাম কি করে তবে?

—কিন্তু এখানে কেমন যেন ভয় করে মা। কলকাতা শহর বড় যেমন, তেমন গুণ্ডা বদমাইশের জায়গা।

সারাদিন মোটর ভ্রমণের ক্লান্তির ফলে রাত যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল।

পরদিন সকালে শরৎ বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিয়ে বাবার জন্যে চা আর খাবার করতে বসল। অনেক দিন পরে সে বাবাকে ভাল করে খাওয়ানোর সচ্ছল উপকরণ হাতের কাছে পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কেদার বললেন, প্রভাস আর অরুণের জন্যে খাবার করে রাখো মা, যদি ওরা সকালে এসে পড়ে ?

কিন্তু তারা সকালের দিকে এল না।

দুপুরের পর কেদার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর দিবানিদ্রা অভ্যাস নেই—অথচ রাস্তাঘাট না চেনার দরুন কোথাও যেতেও পারেন না। এই বাগানবাড়ির চতুঃসীমায় বন্দী-জীবন যাপন করার মত লোক নন তিনি।

শরৎকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ মা, গঙ্গা কোন্ দিকে ঝিকে জিজ্ঞেস করো তো ?

শরৎ ঘুরে এসে বললে, গঙ্গা নাকি এখান থেকে দুক্রোশ পথ, বাবা। কেন, গঙ্গা কি হবে ?

—না, একটু বেরিয়ে আসতাম গঙ্গার ধারে।

বেলা তিনটের পর প্রভাস একা মোটর হাঁকিয়ে এল।

বললে, ওবেলা কাজ ছিল জরুরী—আসতে পারলাম না। কোন অসুবিধে হয় নি তো কাকাবাবু ?

—নাঃ, অসুবিধে কি হবে ? অরুণ এল না ?

—তার সঙ্গে দেখাই হয় নি আজ সারাদিন। তবে সেও কাজে ব্যস্ত আছে মনে হচ্ছে। নইলে নিশ্চয় আসত।

—তুমি চা খেয়ে নাও, শরৎ মা, তোমার প্রভাসদাকে—

আধ ঘণ্টার মধ্যে কেদার চা পান শেষ করে মেয়েকে নিয়ে মোটরে উঠলেন। বললেন, কলকাতার দিকে না গিয়ে এবার চলো না বেশ গঙ্গার ধারে নির্জ্জন জায়গায়—

—পেনেটিতে দ্বাদশ শিবের মন্দিরে যাবেন ?

শরৎ আগ্রহের সুরে বললে, তাই চলো প্রভাসদা, দেখি নি কখনো।

কেদার শিবমন্দির দেখবার কোনো আগ্রহ দেখালেন না—তীর্থ দর্শনে পুণ্য অর্জ্জন করবার ওপর লোভ জীবনে তাঁর কোনো দিনই দেখা যায় নি।

বারাকপুর ট্রাংক রোডে পড়ে মোটর তীরবেগে পেনিটির দিকে ছুটল। রাস্তার দুধারে কত বিচিত্র উদ্যানরাজি, কত সুন্দর বাড়ি—কলকাতার বড় লোকেদের ব্যাপার। পেনিটির দ্বাদশ শিবের মন্দির দেখে শরৎ খুব খুশী। সামনে গঙ্গা, ওপারে কত কলকারখানা, মন্দির ঘরবাড়ি। এপারে সারি সারি বাগানবাড়ি—বিকেলের নীল আকাশ গঙ্গার বিশালবক্ষে ঝুঁকে পড়েছে—নৌকো স্টীমারের ভিড়।

শরৎ অবাক হয়ে গঙ্গার বাঁধাঘাটে রানার ওপর দাঁড়িয়ে দেখে দেখে বললে—এমন কখনো দেখি নি বাবা, ওপারের দিকটা কি চমৎকার।

প্রভাস বললে, ভাল লাগছে, শরৎদি ?

—উঃ, ইচ্ছে করে এখানেই সব সময় থাকি আর গঙ্গাস্নান করি—ভাল কথা, প্রভাসদা, কাল গঙ্গা নাওয়াও না কেন ?

—বেশ ভালোই তো। কোন্ সময়ে আসবো বলো—কোথায় নাইবে ?

—এখানেই এসো। এ জায়গা আমার ভারি ভালো লেগেছে—

—এখানই আসবে, না কালীঘাটে ? কাকাবাবু কি বলেন ?

—তুমি যেখানে ভাল বোঝো। বাবার কথা ছেড়ে দাও—উনি ওসব পছন্দ করেন না।

সন্ধ্যার আগে অস্ত-দিগন্তের চিত্রবিচিত্র রঙীন আকাশের ছায়া গঙ্গার জলে পড়ে যে মায়ালোক সৃষ্টি করল, শরৎ সে-রকম দৃশ্য জীবনে কোনোদিন দেখে নি। গড়শিবপুর জলের দেশ নয়—এত বড় নদী, জলের বুকে এমন রঙীন মেঘের প্রতিচ্ছায়া সে এই প্রথম

দেখল। রাজলক্ষ্মীর জন্যে মনটা কেমন করে উঠল শরতের—সে বেচারী কিছু দেখতে পেলে না জীবনে, আজ সে সঙ্গে থাকলে আনন্দ অনেক বেশী হত।

বাড়ি ফিরে শরৎ রান্নাঘরে ঢুকল—প্রভাস কিছুক্ষণ বসে কেদারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগল।

কথায় কথায় কেদার বললে, হ্যাঁ হে, এখানে কোথাও গান-টান হয় না ?

আসলে কেদারের এসব খুব ভাল লাগছিল না—শহর, দেবমন্দির, গঙ্গা, দোকান, ট্রাম—এসব খুব ভাল জিনিস। কিন্তু তিনি একটু গান-বাজনা চান, চিরকাল যা করে এসেছেন। শরৎ ছেলেমানুষ, তার ওপর মেয়েমানুষ—ও শহর বাজার, ঠাকুর দেবতা দেখে খুশী থাকতে পারে—কেদারের এখন সে বয়েস নেই। মেয়েমানুষও নন যে পুণ্যের লোভ থাকবে।

প্রভাস বললে, কি রকম গান-বাজনা বলুন ?

—এই ধরো কোনো গান-বাজনার আড্ডা—শুনেছি তো কলকাতায় অনেক বড় বড় গানের মজলিস বসে বড়লোকের বাড়ি। একদিন সে-রকম কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারো ?

প্রভাস একটু ভেবে বললে, তা বোধ হয় পারব—দেখি সন্ধান নিয়ে। কাল বলব আপনাকে—

—অনেক শুনেছি বড় বড় ওস্তাদ আছে কলকাতায়। কোথায় থাকে জানো ? তাদের গান শোনবার সুবিধে হয় ?

—আমি দেখব কাকাবাবু। অরুণকে জিগ্গেস করি কাল—ও অনেক খোঁজ রাখে—

প্রভাস মোটর নিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় শরৎ এসে বললে—ও প্রভাসদা, যাবেন না—

—কেন শরৎদি ?

—আপনার জন্যে একটা জিনিস তৈরি করছি—

—কি বলো না ?

—এখন বলছি নে—আসুন, খাবার সময় দেবো—

—খুব দেরি হয়ে যাবে শরৎদি—

—কিছু দেরি হবে না, হয়ে গেল—গরম গরম ভেজে দেবো—

কিছুক্ষণ পরে শরৎ একখানা রেকাবিতে খানকতক মাছের কচুরি এনে বললে—খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে। এবেলা ঝি ভাল পোনা মাছ এনেছে প্রায় আধসের। অত মাছ রান্না করে কে খাবে ? তাই ভাবলাম বাবার জন্যে খান-কতক কচুরি ভাজি—

প্রভাস বললে, কাকাবাবুকে দিলে না ?

—তাঁকে এখন না। এখন খেলে রাত্রে আর খেতে পারবেন না। তখন একেবারে দেবো—

প্রভাস খাওয়া শেষ করে বিদায় নেওয়ার আগে বললে—কাল শরৎদি, গঙ্গা নাওয়াবো তোমায়। ভেবে রেখো কালীঘাট না পেনিটি কোথায় যাবে।

কেদার বললেন, আমার কথাটা যেন মনে থাকে, প্রভাস। ভাল গান-বাজনার সন্ধান পেলেই খবর দেবে—

—সে আমার মনে আছে কাকাবাবু।

পরদিন সকালে উঠে কেদার দেখলেন মেয়ে তাঁর আগেই উঠে বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে। বাবাকে দেখে বললে—ওঠো বাবা, আমি আজ পুজো করব ভেবে ফুল তুলছি। কি চমৎকার চমৎকার ফুল ফুটে আছে পুকুরের ওপাড়ে। তুমি চেনো এসব ফুল ? বিলিতি না কি ফুল—দেখিই নি কখনো—

কেদার বললেন, বেশ বাগান-বাড়িটা, না মা শরৎ ? কিন্তু—

—কিন্তু কি বাবা ?

—এখানে বেশীদিন মন টে'কে না। আমাদের গড়শিবপুরের সেই জঙ্গলা ভালো—না মা ?

—যা বলেছ বাবা। বাগানের পুকুরটা দেখে আমার এইমাত্র কালো পায়রার দীঘির কথা মনে পড়ছিল—

—আর কত দিন থাকবে এখানে ? প্রভাস কিছু বলেছে ?

—তুমি যে ক'দিন বলো বাবা। এখনও কালীঘাট দেখি নি, বায়স্কোপ দেখি নি—দেখি সেগুলো ? আর কি কি আছে দেখবার বাবা ?

—চিড়িয়াখানাটা আমার সেবারও দেখা হয় নি—এবার দেখবো।

—সেবার মানে কি বাবা ? হয়তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমার জন্মাবার অনেক আগে—না ?

—হ্যাঁ—তা হবে। তোমার মায়ের জন্যে একখানা শাড়ী, বেশ ভাল ডুরে শাড়ী কিনে নিয়ে যাই, মনে আছে।

—তুমি হাত ধুয়ে নাও বাবা, আমি চা করে আনি—খাবার কি খাবে ?

এমন সময় গেটের পথে মোটরের শব্দ শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসের মোটর এসে বারান্দার সামনের লাল কাঁকরের পথের ওপর এরিকা-পাম কুঞ্জের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল। প্রভাস নেমে এসে বললে, চলুন কাকাবাবু, কালীঘাটে নিয়ে যাই—শরৎদি তৈরী হয়ে নাও।

শরৎ খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বললে, সে বেশ হবে প্রভাসদা, চলো বাবা, চা করে নিয়ে এলাম বলে, বসো সব।

সত্যিই এ ক'দিন অদ্ভুত উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে শরতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কেদার বৃদ্ধ হয়েছেন, নতুন জায়গা এখন আর তাঁর মনে তেমন ধাক্কা দেয় না, জীবনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে গড়শিবপুরের ভাঙা রাজ-দেউড়ি ও বনজঙ্গলে ঘেরা গড়খাই সেখানে পূর্ণ অধিকারের আসন পেতেছে, আর আছে ছিবাস মুদির দোকান, ওপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার আখড়াইয়ের আসর—তার সঙ্গে হয়তো সতীশ কলুর দোকান—তাদের ছোট্ট খড়ের বাড়িখানা। এ বয়সে নতুন কোন জিনিস জীবনে স্থান দখল করতে পারে না। জীবনের বৃত্ত পরিধিকে শেষ করে ওদিকের বিন্দুতে মিলবার চেষ্টায় রয়েছে—নব অনুভূতিরাজির সঞ্চার এ বয়সে সম্ভব কবি ও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে, প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে, কেদার সে দলে পড়ে না।

প্রভাসের মোটর এবার স্ট্র্যান্ড রোড ধরে চলল হ্যারিসন রোড দিয়ে পড়ে। প্রভাস বললে, ইডেন গার্ডেনটা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই আপনাদের।

কেদার বললেন, সেটা কি বাবাজি ?

—আজ্ঞে একটা বাগান, বেশ ভাল, সবাই বেড়াতে আসে।

—ও বাগান-টাগান আমরা আর কি দেখব, বন বাগান তো দেখেই আসছি, তুমি বরং আমাদের কালীঘাটটা নিয়ে চল।

কালীঘাটে কালী মন্দিরের সামনের চত্বরে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে শরৎ খুশীর সুরে বললে—বাবা, ওই অরুণবাবু, ডাকুন না প্রভাসদা ?

প্রভাস বললে, এখানে আমাদের সঙ্গে মিশবার কথা ছিল ওর। ও অরুণ—এই যে।

শরৎ কালী-গঙ্গায় স্নান সেরে মন্দিরে দেবী দর্শন করে এল। সঙ্গে রইল প্রভাস। কেদার মোটরে বসে চারিপাশের ভিড় দেখতে লাগলেন। অরুণ একটা ছোট ঘর ভাড়ার চেষ্টায় গেল, কারণ প্রভাস ও অরুণ দুজনে শরৎকে বিশেষ করে ধরেছে, এখানে চড়ুইভাতি করতে হবে।

শরতের বড় অস্বস্তি বোধ করে একটা ব্যাপারে। এখানকার লোকে এমন ভাবে তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে কেন? শহরের লোকের এমন খারাপ অভ্যাস কেন? আজ ক'দিন থেকেই সে লক্ষ্য করছে। অপরিচিতা মেয়েদের দিকে অমন ভাবে চেয়ে থাকা বুঝি ভদ্রতা? শরতের জানা ছিল কলকাতার লোকে শিক্ষিত, তাদের ধরনধারন খুব ভদ্র হবে, তাদের দেখে গড়শিবপুরের মত পাড়াগাঁয়ের লোকেরা শিখবে। এখন দেখা যাচ্ছে তার উল্টো।

অরুণ বাড়ি ঠিক করে এসে কেদারকে বললে, এরা কই? চলুন এবার, সব ঠিক করে এলাম।

একটু পরে প্রভাসের সঙ্গে শরৎ মন্দির থেকে ফিরল। ওরা সবাই মিলে ভাড়াটে ঘরে গিয়ে শতরঞ্জি পেতে বসল। হোগলার ছাওয়া, দরমার বেড়া দেওয়া সারি সারি অনেকগুলো খুপরির মত ঘর। ছোট্ট একটুখানি নিচু দাওয়ায় মাটির উনুন। প্রভাস মোটরের ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রচুর বাজার করে নিয়ে এল, এমন কি প্রসাদী মাংস পর্যন্ত। কেদার খুব খুশী। মেয়েকে বললেন—ভাল করে মাংসটা রাঁধিস মা, একটু ঝাল দিস্।

—সে কি বাবা, ঝাল যে তুমি মোটে খেতে পারো না?

—তা হোক, কচি পাঁটার মাংস ঝাল না দিলে ভাল লাগে না।

রান্না খাওয়া মিটতে বেলা তিনটে বাজলো। অরুণদের আবার কে একজন বন্ধু এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলে। লোকটি এসেই বলে উঠল—এই যে প্রভাস, আরে অরুণ, এনেছিস্। তো জুত করে? ভাল চীজ বাবা, তোদের সাহস আছে বলতে হবে।

প্রভাস তাড়াতাড়ি তাকে চোখ টিপে দিলে, শরৎ দেখতে পেলো। সে কিছু বুঝতে পারলে না, লোকটা অমন কেন, এসেই চীৎকার করে কতকগুলো কথা বলে উঠল—যার কোনো মানে হয় না। কলকাতা শহরে কত রকম মানুষই না থাকে!

কি জানি কেন, লোকটাকে শরতের মোটেই ভাল লাগল না। মোটা মত লোকটা, নাম গিরীন, বয়সে প্রভাসের চেয়েও বড়, কারণ কানের পাশের চুলে বেশ পাক ধরেছে।

তিনটের পরে ওখান থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে গিয়ে প্রভাস একটা বাগানের সামনে গাড়ি রেখে বললে—এই চিড়িয়াখানা কাকাবাবু, নেমে দেখুন এবার—

শরৎ সব দেখে শুনে সমস্ত দিনের কষ্ট ও শ্রম ভুলে গেল। কেদারও এমন এমন একটা জিনিস দেখলেন, যা তাঁর মনে হ'ল না দেখলে জীবনে একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেত। পৃথিবীতে যে এত অদ্ভুত ধরণের জীবজন্তু থাকতে পারে, তার কল্পনা কে করেছিল? কেদার তো ভাবতেই পারেন না। পিতা পুত্রীতে মিলে সমবয়সী বালক-বালিকার মত আমোদ পশুপক্ষী দেখে বেড়াল। এ ওকে দেখায়, ও একে দেখায়। কী ভীষণ ডাক সিংহের? জলহস্তী? এর নাম জলহস্তী? ছেলেবেলায় 'প্রাণী-বৃত্তান্ত' বলে বইয়ে কেদার এর কথা করে পড়েছিলেন বটে। ওই দ্যাখো শরৎ মা, ওকে বলে উটপাখী।

—কতবড় ডিম বাবা উটপাখীর! আচ্ছা ও খায়, প্রভাসদা? বিক্রী হয়?

ফেরবার সময় গেটের কাছে এসে গিরীন, প্রভাস ও অরুণের সঙ্গে কি সব কথা বললে। প্রভাস এসে বললে, কাকাবাবু এবার চলুন সিনেমা দেখে আসি, মানে বায়স্কোপ। কাছেই আছে—

কেদার বললেন, তা চলো, যা ভাল হয়।

বাইরে এসে ওরা একটা ফাঁকা মাঠের ধারে মোটর থামিয়ে রেখে কেদার ও শরৎকে নেমে হাওয়া খেতে বললে। এরই নাম গড়ের মাঠ। সেদিনও নেমেছিল শরৎ। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে—রাস্তার ধারে গ্যাসের আলো এক-একটা করে জেলে দিচ্ছে। শরৎ

জিজ্ঞাসা করলে—সে বায়স্কোপ কতক্ষণ দেখতে হবে? প্রভাস বললে, এই সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত।

শরৎ ভেবে দেখলে অত রাত্রে গিয়ে রান্না চড়ালে বাবা খাবেন কখন? তা ছাড়া বাবা আজ সারাদিন এখানে ওখানে বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন—বুড়ো বয়সে অত অনিয়ম করলে যদি শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে বিদেশে—তখন ভুগতে হবে তাকেই। সে বললে, আজ থাক প্রভাসদা, আজ আর বায়স্কোপ দেখে দরকার নেই। বাবার খেতে দেরি হয়ে যাবে।

গিরীন তবুও নাছোড়বান্দা। সে বললে, কিছু ক্ষতি হবে না—মোটরে যেতে আর কতটুকু লাগবে? আজই দেখা যাক।

শরৎকে অত সহজে ভোলানো যাবে তেমন প্রকৃতির মেয়ে নয় সে। নিজের বুদ্ধিতে সে যা ঠিক করে, ভাল হোক, মন্দ হোক, তার সে সঙ্কল্প থেকে নড়ানো গিরীনের কর্ম্ম নয়—গিরীন শীঘ্রই তার পরিচয় পেলে। প্রভাসকে সে ইংরেজীতে কি একটা কথা বললে, প্রভাস ও অরুণ দুজনে অনুচ্চস্বরে কি বলাবলি করল।

প্রভাস বললে, কাকাবাবু কি বলেন?

কেদার নিজের মত অনুসারে চলবার সাহস পান গড়শিবপুরে, এখানে মেয়ের মতের বিরুদ্ধে যেতে তাঁর সাহসে কুলোয় না। সুতরাং তিনি বললেন, ও যখন বলছে, তখন আজ না হয় ওটা থাকগে প্রভাস, কাল যা হয় হবে।

অগত্যা প্রভাস ওদের নিয়ে মোটরে উঠল—কিন্তু বেশ বোঝা গেল ওদের দল তাতে বিরক্ত হয়েছে।

পাঁচ

পর দিন প্রভাসের দলের কেউই বাগানবাড়িতে এল না। শরৎ সন্ধ্যার দিকে বাগানে আপন মনে খানিকটা বেড়িয়ে বাবাকে ডেকে বললে, বাবা খাবে নাকি?

কেদার বললেন, আজ এরা কেউ এল না কেন রে শরৎ?

—তা কি জানি বাবা। বোধ হয় কোনো কাজ পড়েছে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু যা দেখবার দেখে নিতে পারলে হ'ত ভাল। আবার বাড়ি ফিরতে হবে সংক্রান্তির আগেই—

কেদারের আর তেমন ভাল লাগছিল না বটে, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন মেয়ের এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবার ইচ্ছে নেই—তার এখন দেখবার বয়স, কখনো কিছু দেখে নি, আছে আজীবন গড়শিবপুরের জঙ্গলে পড়ে। দেখতে চায় দেখুক—তিনি বাধা দিতে চান না।

শরৎ বললে, পেঁপে খাবে বাবা? বাগানের গাছ থেকে পেড়েছি, চমৎকার গাছ-পাকা। নিয়ে আসি দাঁড়াও—

কেদার বললেন, আশপাশের বাগানবাড়িতে লোক থাকে কিনা জানিস্ কিছু মা?

—চলো না, তুমি পেঁপে খেয়ে নাও—দেখে আসি।

মিনিট পনেরো পরে দুজনে পাশের একটা অন্ধকার বাগানবাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন খোট্টা দারোয়ান ফটকের পাশের ছোট্ট একটা গুমটি ঘর থেকে বার হয়ে বললে, কেয়া মাংতা বাবুজি?

কেদার হিন্দী বলতে পারেন না। উত্তর দিলেন, এ বাগানে কি আছে দারোয়ানজি?

—বাবুলোক হ্যায়—মাইজি ভি হ্যায়—যাইয়ে গা?

—হ্যাঁ, আমার এই মেয়েটি একবার বাগান দেখতে এসেছে—

—যাইয়ে—

বেশ বাগান। প্রভাসদের বাগানের চেয়ে বড় না হলেও, নিতান্ত ছোট নয়। অনেক রকম ফুলের গাছ, ফুল ফুটেও আছে অনেক গাছে—সানবাঁধানো পুকুরের ঘাট, খানিকটা জায়গা তার দিয়ে ঘেরা তার মধ্যে হাঁস এবং মুরগী আটকানো। খুব খানিকটা এদিক-ওদিক লিচুতলা ও আমতলায় অন্ধকারে বেড়ানোর পরে ওরা একেবারে বাগানবাড়ির সামনের সুরকি বিছানো পথে গিয়ে উঠল। বাড়ির বারান্দা থেকে কে একজন প্রৌঢ়কণ্ঠে হাঁক দিয়ে বললেন, কে ওখানে ?

কেদার বললেন, এই আমরা। বাগান দেখতে এসেছিলাম—

একটি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধপধপে সাদা কোঁচানো কাপড় পরে খালি গায়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আসুন—সঙ্গে মা রয়েছেন, তা উনি বাড়ির মধ্যে যান না ? আমার স্ত্রী আছেন—

শরৎ পাশ পাঁচিলের সরু দরজা দিয়ে অন্দরে ঢুকলো। কেদার রোয়াকে উঠতেই ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে উপরে চেয়ারে বসালেন। বললেন, কোন্ বাগানে আছেন আপনারা ?

—এই দুখানা বাগানের পাশে। প্রভাসকে চেনেন কি বাবু ?

—না, আমি নতুন এ বাগান কিনেছি, কারুর সঙ্গে চেনা হয় নি এখনও। তামাক খান কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তা খাই—তবে আমার আবার হ্যাঙ্গামা আছে—ব্রাহ্মণের হুঁকো না থাকলে—

—আপনি ব্রাহ্মণ বুঝি ? ও, বেশ বেশ। আমিও তাই, আমার নাম শশিভূষণ চাটুজ্জে—'এঁড়েদার' চাটুজ্জে আমরা। ওরে ও নন্দে, তামাক নিয়ে আয়—

দুজনে কিছুক্ষণ তামাক খাওয়ার পরে চাটুজ্জে মশাই বললেন, আচ্ছা মশাই—এখানে টেক্স এত বেশী কেন বলতে পারেন—আমার এই বাগানে কোয়ার্টারে আট টাকা টেক্স। আপনি কত দেন বলুন তো ? না হয় আমি একবার লেখালেখি করে দেখি—কলকাতায় আপনারা থাকেন কোথায় ?

কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন, আমার বাগান নয়—আমাদের বাড়ি তো কলকাতায় নয়। বেড়াতে এসেছি দু-দিনের জন্যে—কলকাতায় থাকি নে—

—ও, আপনাদের দেশ কোথায় ? গড়শিবপুর ? সে কোন্ জেলা ? ও, বেশ বেশ।

—বাবু কি এখানেই বাস করেন ?

—না, আমার স্ত্রীর শরীর ভাল না, ডাক্তারে বলেছে কলকাতার বাইরে কিছুদিন থাকতে। তাই এলাম—যদি ভাল লাগে আর যদি শরীর সারে তবে থাকবো দু-তিন মাস ! বেশ হ'ল মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে। আপনার গানটান আসে ?

কেদার সলজ্জ বিনয়ের সুরে বললেন, ওই অল্প অল্প।

—তবে ভালই হ'ল—দুজনে মিলে বেশ একটু গান-বাজনা করা যাবে। কাল এখানে এসে বিকেলে চা খাবেন। বলা রইল কিন্তু···বাজাতে পারেন ?

—আজ্ঞে, সামান্য।

—সামান্য-টামান্য না। গুণী লোক আপনি দেখেই বুঝেছি। এখন খালি গলায় একখানা শুনিয়ে দিন না দয়া করে ? তার পর কাল থেকে আমি সব যোগাড়যন্ত্র করে রাখবো এখন।

কেদার একখানা শ্যামা বিষয় গান ধরলেন, কিন্তু অপরিচিত জায়গায় তেমন সুবিধে

করতে পারলেন না, কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল—সতীশ কলুর দোকানে বসে গাইলে যেমনটি হয় তেমনটি কোনোখানেই হয় না। চাটুজ্জে মশাই কিন্তু তাই শুনেই খুব খুশী হয়ে উঠে বললেন, বাঃ বাঃ, বেশ চমৎকার গলাটি আপনার। এসব গান আজকাল বড় একটা শোনাই যায় না—সব থিয়েটারি গান শুনে শুনে কান পচে গেল, মশাই। বসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি—

কেদার ভদ্রলোককে নিরস্ত করে বললেন, চা খেয়ে বেরিয়েছি, আমি দুবার চা খাইনে সন্দের পর, রাতে ঘুম হয় না, বয়েস হয়েছে তো—এবার আপনি বরং একটা—

চাটুজ্জে মশায়ও দেখা গেল বিনয়ের অবতার। তিনি গান গাইলেন না, কারণ তিনি বললেন, একে তিনি গান গান না, কারণ গানের গলা নেই তাঁর—যাও বা একটু আধটু হুঁ হুঁ করতেন, কেদারের মত গুণী লোকের সামনে তাঁর গলা দিয়ে কিছুই বেরুবে না। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর চাটুজ্জে মশায় একটা রামপ্রসাদী গেয়ে শোনালেন—কেদারের মনে হ'ল তাঁদের গ্রামের যাত্রাদলের তিনকড়ি কামার এর চেয়ে অনেক ভাল গায়।

এ সময় শরৎ বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চলো বাবা, রাত হয়ে গেল।

চাটুজ্জে মশায় বললেন, এটি কে? মেয়ে বুঝি? তা মা যে আমার জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত ঘর আলো করা মা দেখছি। বিয়ে দেন নি এখনও?

—বিয়ে দিয়েছিলাম চাটুজ্জে মশাই—কিন্তু বরাত ভাল নয়, বিয়ের দু-বছর পরেই হাতের শাঁখা ঘুচে গেল। চলো মা, উঠি আজ চাটুজ্জে মশাই, নমস্কার। বড় আনন্দ হ'ল—মাঝে মাঝে আসবো কিন্তু।

—আসবেন বৈকি, রোজ আসবেন আর এখানে চা খাবেন। মাকেও নিয়ে আসবেন। মায়ের কথা শুনে মনে বড় দুঃখ হ'ল—উনি আমার এখানে একটু মিষ্টিমুখ করবেন একদিন। নমস্কার।

পথে আসতে আসতে শরৎ বললে, গিন্নী বেশ লোক বাবা। আমায় কত আদর করলে, জল খাওয়ানোর জন্যে কত পীড়াপীড়ি—আমি খেলাম না, পরের বাড়ি খেতে লজ্জা করে—চিনি নে শুনি নে। আমায় আবার যেতে বলেছে।

—আমারও ভাল হ'ল, কর্ত্তা গান-বাজনা ভালবাসে, শখ আছে—এখানে সন্দেটা কাটানো যাবে—

ওরা নিজেদের বাগান-বাড়িতে ঢুকেই দেখলে বাড়ির সামনে প্রভাসের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পর বাড়ি পেঁছেই প্রভাসের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বাড়ির সামনে গোল বারান্দায় বসে ছিল, বোধ হয় এদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায়। কাছে এসে বললে, কোথায় গিয়েছিলেন কাকাবাবু? আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। কিন্তু আজ যে বড্ড দেরি করে ফেললেন—সিনেমা যাবার সময় চলে গেল। সাড়ে ন'টার সময় যাবেন? প্রায় বারোটায় ভাঙবে।

শরৎ বললে, না প্রভাসদা, অত রাত্রে ফিরলে বাবার শরীর খারাপ হবে। থাক না আজ, আর একদিন হবে এখন—

কেদার বললেন, তাই হবে এখন প্রভাস, আজ বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তুমি তো আজ ও-বেলা এলে না—এ-বেলাও আমরা সন্দে পর্য্যন্ত দেখে তবে বেরিয়েছি। কাল বরং যাওয়া যাবে এখন। বসো চা খাও।

—না কাকাবাবু, আজ আর বসবো না। কাল তৈরি থাকবেন, আসবো বেলা পাঁচটার মধ্যে। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না?

—না না অসুবিধে কিসের? তুমি সেজন্য কিছু ভেবো না।

পর দিন একেবারে দুপুরের পরই প্রভাস মোটর নিয়ে এল। শরৎ চা করে খাওয়ালে প্রভাসকে—তারপর সবাই মিলে মোটরে গিয়ে উঠল। অনেক বড় বড় রাস্তা ও গাড়ি মোটরের ভিড় পেরিয়ে ওদের গাড়ি এসে একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়াল। প্রভাস বললে, এই হলো সিনেমা ঘর—আপনারা গাড়িতে বসুন, আমি টিকিট করে আনি—

শরৎ বাড়িটার মধ্যে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কত উঁচু ছাদ, ছাদের গায়ে বড় বড় আলোর ডুম, গদি-আঁটা চেয়ার বেঞ্চি ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করছে, কত সাহেব-মেম বাঙালীর ভিড়।

কেদার বললে, এ জায়গাটার নাম কি হে প্রভাস?

—আজ্ঞে এ হ'ল এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস—একটা পার্শি কোম্পানীর।

—বেশ বেশ। চমৎকার বাড়িটা—না মা শরৎ? থাকি জঙ্গলে পড়ে, এমন ধারাটি কখনো দেখি নি—আর দেখবোই বা কোথায়? ইচ্ছে হয় সতীশ কলু, ছিবাস এদের নিয়ে এসে দেখাই। কিছুই দেখলে না ওরা, শুধু তেল মেপে আর দাঁড়ি-পাল্লা ধরেই জীবনটা কাটালে।

সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কেদার বলে উঠলেন—ও প্রভাস, এ কি হ'ল? ওদের আলো খারাপ হয়ে গেল বুঝি?

প্রভাস নিম্নস্বরে বললে, চুপ করুন কাকাবাবু, এবার ছবি আরম্ভ হবে।

সামনে সাদা কাপড়ের পর্দ্দাটার ওপরে যেন জাদুকরের মন্ত্রবলে মায়াপুরীর সৃষ্টি হয়ে গেল, দিব্যি বাড়িঘর, লোকজন কথা বলছে, রেলগাড়ী ছুটছে, সাহেব মেমের ছেলেমেয়েরা হাসি খেলা করছে, কাপড়ের পর্দ্দার ওপরে যেন আর একটা কলকাতা শহর।

কিন্তু ছবিতে কি করে কথা বলে? কেদার অনেক বার ঠাউরে দেখবার চেষ্টা করেও কিছু মীমাংসা করতে পারলেন না। অবিশ্যি এর মধ্যে ফাঁকি আছে নিশ্চয়ই, মানুষের পেছন থেকে কথা বলছে কৌশল করে, মনে হচ্ছে যেন ছবির মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে—কিন্তু কেদার সেটা ধরে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হতে পারলেন না। একবার একটা মোটর গাড়ির আওয়াজ শুনে কেদার দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলেন। মানুষে কি মোটর গাড়ির আওয়াজ বের করে মুখ দিয়ে? বোধ হয় কোনো কলের সাহায্যে ওই আওয়াজ করা হচ্ছে। কলে কি না হয়?

হঠাৎ সব আলো একসঙ্গে আবার জ্বলে উঠল। কেদার বললেন, শেষ হয়ে গেল বুঝি?

প্রভাস বললে, না কাকাবাবু, এখন কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে—তারপর আবার আরম্ভ হবে। চা খাবেন কি? বাইরে আসুন তবে?

শরৎ বললে, প্রভাসদা, দোকানের চা আর ওঁকে খাওয়ানোর দরকার নেই—সত্যিক জাতের এঁটো পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে—থাকগে। ওমা, ওই যে অরুণবাবু—উনি এলেন কোথা থেকে?

অরুণ কেদারকে প্রণাম করে বললে, কেমন লাগছে আপনার, ওঁর লাগছে কেমন? চলুন আজ সিনেমা ভাঙলে দমদমা পর্য্যন্ত আপনাদের পেঁাছে দিয়ে আসব—

কেদার বললেন, বেশ, তা হলে আমাদের ওখানেই আজ খেয়ে আসবে দুজনে—

—না আজ আর না, আর একদিন হবে এখন বরং।

এই সময় গিরীন বলে সেই লোকটিও ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রভাসকে সে কি একটা কথা বললে ইংরিজীতে।

প্রভাস বললে, কাকাবাবু, শরৎ দিদিকে আমার এই বন্ধু ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে বলছেন।

কেদার বললেন, বেশ তো। আজই ?

—হ্যাঁ আজ, বায়োস্কোপের পরে।

ছবি ভাঙবার পরে সবাই মোটরে উঠল। গিরীন ও প্রভাস বসেছে সামনে, কেদার, অরুণ আর শরৎ পেছনের সিটে। একটা গলির মধ্যে ঢুকে একটা ছোট বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গিরীন নেমে ডাক দিলে—ও রবি, রবি ?

একটি ছেলে এসে দোর খুলে দিলে। গিরীন বললে, তোমার এই পিসীমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাও—আসুন কেদারবাবু, বাইরের ঘরে আলো দিয়ে গিয়েছে।

সে বাড়িতে বেশীক্ষণ দেরি হ'ল না। বাড়ির মধ্যে থেকে সেই ছেলেটাই সকলকে চা ও খাবার দিয়ে গেল বাইরের ঘরে। একটু পরে শরৎ এসে বললে, চলো বাবা।

আবার দমদমার বাগানবাড়ি। রাত তখন খুব বেশী হয় নি—সুতরাং কেদার ওদের সকলকেই থেকে খেয়ে যেতে বললেন। হাজার হোক, রাজবংশের ছেলে তিনি। নজরটা তাঁর কোনো কালেই ছোট নয়। কিন্তু ওরা কেউ থাকতে রাজী হ'ল না—তবে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে যেতে কেউ বিশেষ আপত্তি করলে না।

কেদার জিজ্ঞেস করলেন রাত্রে খেতে বসে—ওই ছেলেটির বাড়িতে তোকে কিছু খেতে দেয় নি ?

—দিয়েছিল, আমি খাই নি। তুমি ?

—আমায় দিয়েছিল, আমি খেয়েছিলাম।

—তা আর খাবে না কেন ? তোমার কি জাতজন্মো কিছু আছে ? বাচবিচের বলে জিনিস নেই তোমার শরীরে।

—কেন ?

—কেন ? ওরা জাতে কি তার ঠিক নেই। বামুন নয়, কায়েতও নয়। আমি পরের বাড়ি গিয়ে কি করে তোমাকে বারণ করে পাঠাই ?

—কি করে জানলে ?

—ও মা, সে যেন কেমন। দু-তিনটি বৌ বাড়িতে। সবাই সেজেগুজে পান মুখে দিয়ে বসে আছে। যে ছেলেটা দোর খুলে দিলে, তাকে ও বাড়ির চাকর বলে মনে হ'ল। কেমন যেন—ভাল জাত নয় বাবা। একটি বৌ আমায় বেশ আদর-যত্ন করেছে। বেশ মিষ্টি কথা বলে। আবার যেতে বললে। আমার ইচ্ছে হয় মাথা খুঁড়ে মরি বাবা, তুমি কেন ওদের বাড়ি জল খেলে ? আমায় পান সেজে দিতে এসেছিল, আমি বললাম, পান খাই নে।

—তাতে আর কি হয়েছে ?

—তোমার তো কিছু হয় না—কিন্তু আমার যে গা-কেমন করে। আচ্ছা, গিরীনবাবুর বাড়ি নাকি ওটা ?

—হ্যাঁ, তাই তো বললে।

—অনেক জিনিসপত্র আছে বাড়িতে। ওরা বড়লোক বলে মনে হ'ল। হারমোনিয়ম, কলের গান, বাজনার জিনিস—বেশ বিছানা-পাতা চৌকি, বালিশ, তাকিয়া—দেওয়ালে সব ছবি। সেদিক থেকে খুব সাজানো-গোজানো।

—তা হবে না কেন মা, কলকাতার বড়লোক সব। এ কি আর আমাদের গাঁয়ের জঙ্গল পেয়েছ ?

—তুমি আমাদের গাঁয়ের নিন্দে করো না অমন করে।

কেদার বললেন, তোদের গাঁ বুঝি আমাদের গাঁ নয় পাগলী ? আচ্ছা, বল তো তোর

এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে, না গ্রামে ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে ?

—এখন দুদিন এখানে থেকে দেখতে ইচ্ছে হয় বৈকি বাবা। আমার কথা যদি বলো—আমার ইচ্ছে এখানে এখন কিছুদিন থেকে সব দেখি শুনি—গাঁ তো আছেই, সে আর কে নিচ্ছে বলো।

পরদিন সকালে চাটুজ্জে মশায় কেদারকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গানের মজলিশ হবে সন্ধ্যায়। কেদারকে আসবার জন্যে যথেষ্ট অনুরোধ করলেন তিনি। মজলিশে শুধু শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকলে চলবে না, কেদারকে গান গাইতে হবে।

কেদার বললেন, আজ্ঞে, আমি বাজাতে পারি কিছু কিছু বটে—কিন্তু মজলিশে গাইতে সাহস করি নে।

—খুব ভাল কথা। কি বাজান বলুন ?

—বেহালা যোগাড় করতে পারেন বাবু ?

—বেহালা ওবেলা পাবেন। আনিয়ে রাখবো। সেদিন তো বলেন নি আপনি বেহালা বাজাতে পারেন! আপনি দেখছি সত্যিই গুণী লোক। ওবেলা এখানে আহার করতে হবে কিন্তু। বাড়িতে মাকে বলে আসবেন।

—আমার মেয়ে যেখানে সেখানে আমায় খেতে দেয় না, তবে আপনার বাড়িতে সে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি করবে না। তাই হবে।

—আপত্তি ওঠালেও শুনবো না তো কেদারবাবু ? মার সঙ্গে নিজে গিয়ে ঝগড়া করে আসবো। আচ্ছা তাঁকে—

—সে কোথাও খায় না। তাকে আর বলার দরকার নেই।

—বিকেলে চাও এখানে খাবেন—

বৈকালে কেদার সবে চাটুজ্জে মশায়ের বাগানবাড়িতে যাবার জন্যে বার হয়েছেন, এমন সময় প্রভাসের গাড়ি এসে ঢুকলো ফটকে। প্রভাস গাড়ি থেকে নেমে বললে, কাকাবাবু কোথায় যাচ্ছেন ?

কেদারের উত্তর শুনে প্রভাস হতাশের সুরে বললে, তাই তো, তা হলে আর দেখছি হ'ল না—

—কি হ'ল না হে ?

—শরৎ দিদিকে আজ একবার অরুণের বাড়ি আর আমার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম, ওখান থেকে একেবারে নিউমার্কেট দেখিয়ে—

—চলো একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে—এসো—

শরৎ ছুটে বাইরে এসে বললে, প্রভাসদা! আসুন, আসুন—অরুণবাবু এসেছেন নাকি? বসুন প্রভাসদা, চা খাবেন।

কেদার বললেন, বড় মুশকিল হয়েছে মা, প্রভাস নিতে এসেছিল, এদিকে আমি যাচ্ছি চাটুজ্জেবাবুদের গানের আসরে। না গেলে ভদ্রতা থাকে না—ওবেলা বার বার বলে দিয়েছেন—

প্রভাসও দুঃখ প্রকাশ করলে। শরৎ দিদিকে সে নিজের বাড়ি ও অরুণের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল—কিন্তু কাকাবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন—

শরৎ বললে, বাবা আমি যাই নে কেন প্রভাসদার সঙ্গে ? যাবো বাবা ?

কেদার খুশির স্বরে বললে, তা বরং ভালো বাবা। তাই যাও প্রভাস—তুমি শরৎকে নিয়ে যাও—তবে একটু সকাল সকাল পেঁৗছে দিয়ে যেও—

প্রভাস বললে, আজ্ঞে, তবে তাই। আমি খুব শীগ্‌গির দিয়ে যাবো। সে বিষয়ে

ভাববেন না।

প্রভাসের গাড়ি একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রভাস নেমে দোর খুলে বললে, আসুন শরৎদি, ভেতরে আসুন।

শরৎ বললে, এটা কাদের বাড়ি প্রভাসদা ?

—এটা ? এটা অরুণদেরই বাড়ি ধরুন—তবে অরুণ এখন বোধ হয় বাড়ি নেই—এলো বলে।

শরৎকে নিয়ে গিয়ে প্রভাস একটা সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে ডাক দিলে—ও বৌদি, বৌদি, কে এসেছে দ্যাখো—

শরৎ চেয়ে দেখলে ঘরটার মেজেতে ফরাস বিছানা পাতা, দেওয়ালে বেশির ভাগ বিলিতি মেম-সাহেবের ছবি, একদিকে একটা ছোট তক্তপোশের ওপর একটা গদি পাতা বিছানা—তাতে বালিশ নেই, গোটা দুই ডুগি-তবলা এবং একটা বেলো-খোলা বড় হারমোনিয়াম বিছানার ওপর বসানো। একটা খোল-মোড়া তানপুরা, দেয়ালের কোণের খাঁজে হেলান দেওয়ানো। খুব বড় একটা কাঁসার পিকদানি তক্তপোশের পায়াটার কাছে। একদিকে বড় একটা কাচের আলমারি—তার মধ্যে টুকিটাকি শৌখীন কাচের ও মাটির জিনিস, গোটাকতক ছোট মত বোতল, আরও কি কি। একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি।

শরৎ ভাবলে—এদের বাড়িতে গান-বাজনার চর্চা খুব আছে দেখছি। বাবাকে এখানে এনে ছেড়ে দিলে বাবার পোয়া বারো—

একটি সুবেশা মেয়ে এই সময় ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে, এই যে এসো ভাই—তোমার কথা কত শুনেছি প্রভাসবাবু ও অরুণবাবুর কাছে। এসো এই খাটের ওপর ভাল হয়ে বোসো ভাই—

মেয়েটিকে দেখে বয়স আন্দাজ করা কিছু কঠিন হ'ল শরতের। ত্রিশও হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে—কম হবে না, বরং বেশিই হবে। কিন্তু কি সাজগোজ ! মা গো, এই বয়সে অত সাজগোজ কি গিন্নিবান্নি মেয়েমানুষের মানায় ? আর অত পান খাওয়ার ঘটা !

পেটো-পাড়া চুলে ফিরিঙ্গি খোঁপা, গায়ে গহনাও মন্দ নেই—বাড়িতে রয়েছে বসে এদিকে পায়ে আবার চটিজুতো—মখমলের উপর জরির কাজ করা। কলকাতার লোকের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা।

শরৎ গিয়ে খাটের ওপর বসলো বটে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে—কিন্তু তার কেমন গা ঘিন ঘিন করছিল। পরের বিছানায় সে পারত-পক্ষে কখনো বসে না—বিছানার কাপড় না ছাড়লে সংসারের কোনো জিনিসে সে হাত দিতে পারবে না—জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারবে না। কথায় কথায় বিছানায় বসা আবার কি, কলকাতার লোকের আচার-বিচার বলে জিনিস নেই।

বৌটি তেমনি হাসিমুখে বললে, পান সাজবো ভাই ? পানে দোক্তা খাও নাকি ?

শরৎ মৃদু হেসে জানালে যে সে পান খায় না।

—পান খাও না—ওমা, তাই তো—আচ্ছা, দাঁড়াও ভাজা মশলা আনি—

—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার ওসব কিছু লাগবে না।

প্রভাস বললে, শরৎদি, বৌদি খুব ভাল গান করেন, শুনবেন একখানা ?

শরৎ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, শুনবো বৈকি, ভাল গান শোনাই তো হয় না—উনি যদি গান দয়া করে—

বাবার গান ও বাজনা শরৎ শুনছে বাল্যকাল থেকেই, কিন্তু লণ্ঠনের তলাতেই অন্ধকার, বাবার গান-বাজনা তার তেমন ভাল লাগে না। এমন কি বাবা ভাল গাইতে পারেন বলেও মনে হয় না শরতের। অপরে শুনে বাবার গানের বা বাজনার কেন অত প্রশংসা করে শরৎ

তা বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে কেদার বলতেন গড়শিবপুরের বাড়িতে—শরৎ শোনো মা এই মালকোষখানা —বেহালার সুরের মূর্চ্ছনায় রাগিণী পর্দ্দায় পর্দ্দায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতো—বাবার ছড় ঘুরানোর কত কায়দা, ঘাড় দুলুনির কত তন্ময় ভঙ্গি—কিন্তু শরৎ মনে মনে ভাবতো বাবার এসব কিছুই হয় না। এ ভালই লাগে না, বাবা হয়তো বোঝেন না, লোকে শুনে হাসে...

প্রভাস ওর বৌদিদির দিকে চেয়ে হেসে বললে, শুনিয়ে দাও একটা—

মেয়েটি মৃদু হেসে হারমোনিয়মের কাছে গিয়ে বসল—তার পরে নিজে বাজিয়ে সুকণ্ঠে গান ধরল—

"পাখী এই যে গাহিলি গাছে,
চুপ দিলি কেন ঝোপে ডুবে গেলি যেমন এসেছি কাছে।"

শরৎ মুগ্ধ হয়ে শুনলে, এমন কণ্ঠ এমন সুর জীবনে সে কখনও শোনে নি। গড়শিবপুরের জঙ্গলে এমন গান কে কবে গেয়েছে? আহা, রাজলক্ষ্মীটা যদি আজ এখানে থাকত! রাজলক্ষ্মী কত দুঃখদিনের সঙ্গিনী, তাকে না শোনাতে পারলে যেন শরতের অর্দ্ধেক আমোদ বৃথা হয়ে যায়। সুখের দিনে তার কথা এত করে মনে পড়ে।

গান থেমে গেলে শরতের মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল—কি চমৎকার!

মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে হেসে হেসে কি একটা বলতে যাবে—এমন সময় একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে দোরের কাছে এসে বললে, আজ এত গানের আসর বসল এত সকালে, কে এসেছে গো তোমাদের বাড়ি? আমি বলি তুমি—

শরতের দিকে চোখ পড়াতে মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ঘরে না ঢুকে সে দোরের কাছে রইল দাঁড়িয়ে।

মেয়েটির পরনে লাল রঙের জরিপাড় শাড়ী, খোঁপায় জরির ফিতে জড়ানো, নিখুঁত সাজ-গোজ, মুখে পাউডার। শরৎ ভাবলে, মেয়েটি হয়তো কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যাবে, কুটুম-বাড়ি, তাই এমন সাজগোজ করেছে।

প্রভাসের বৌদি বললে, এই যে গানের আসল লোক এসে গিয়েছে। কমলা, এঁকে তোমার গান শুনিয়ে দাও তো ভাল—

কমলা বিষণ্ণমুখে বললে, তাই তো, আমার ঘরে যে এদিকে হরিবাবু এসে বসে আছে—

—আজ আবার দিন বুঝে সকাল সকাল—

প্রভাস ওকে চোখ টিপলে মেয়েটি চুপ করে গেল।

প্রভাসও বললে, না তোমার একখানা গান না শুনে আমরা ছাড়ছি নে—এদিকে এসো কমলা—

কমলাও হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরলে। থিয়েটারি গান ও হালকা সুর—কলকাতার লোক বোধ এই সব গান পছন্দ করে। অন্য ধরনের গান তারা তেমন জানে না, কিন্তু গড়শিবপুরে ঠাকুরদেবতা, ইহকাল পরকাল, ভবনদী পার হওয়া, গৌরাঙ্গ ও নদীয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত গানের প্রাদুর্ভাব বেশি। বাল্যকাল থেকে শরৎ বাবার মুখে, কৃষ্ণযাত্রার আসরে, ফকির-বোষ্টমের মুখে এই সব গান এত শুনে আসছে যে কলকাতায় প্রচলিত এই সব নূতন সুরের নূতন ধরনের গান তার ভারি সুন্দর লাগল। জীবনটা যে শুধু শ্মশান নয়, সেখানে আশা আছে, প্রাণ আছে, আনন্দ আছে—এদের গান যেন সেই বাণী বহন করে আনে মনে। শুধুই হতাশার সুর বাজে না তাদের মধ্যে।

শরৎ বললে, বড় চমৎকার গলা আপনার, আর একটা গাইবেন?

বিনা প্রতিবাদে মেয়েটি আর একটা গান ধরলে, গান ধরবার সময় ঘরের মেজেতে বসানো এক জোড়া বাঁয়াতবলার দিকে চেয়ে প্রভাসকে কি বলতে যাচ্ছিল, প্রভাস আবার চোখ টিপে বারণ করলে। আগের চেয়েও এবার চড়া সুর, দু-একটা ছোটখাটো তান ওঠালে গলায় মেয়েটি, দ্রুত তালের গান, শিরায় শিরায় যেন রক্ত নেচে ওঠে সুরে ও তালের মিলিত আবেদনে।

গান শেষ হলে প্রভাস বললে, কেমন লাগল শরৎদি ?

—ভারি চমৎকার প্রভাসদা, এমন কখনও শুনি নি—

কমলা এতক্ষণ পরে প্রভাসের বৌদিদির দিকে চেয়ে বললে, ইনি কে গা ?

প্রভাসের বৌদিদি বললে, ইনি ? প্রভাসবাবুদের দেশের—

শরৎ এ কথায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে, প্রভাসদার বৌদিদি তাকে 'প্রভাসবাবু' বলছেন কেন, বা যেখানে 'আমার শ্বশুরবাড়ির দেশের' বলা উচিত সেখানে 'প্রভাসবাবুদের দেশের'ই বা বলছেন কেন ? বোধ হয় আপন বৌদিদি নন উনি।

কমলা বললে, বেশ, আপনার নাম কি ভাই ?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে, শরৎসুন্দরী—

—বেশ নামটি তো।

প্রভাস বললে, উনি এসেছেন কলকাতা শহর দেখতে। এর আগে কখনও আসেন নি—

কমলা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, সত্যি ? এর আগে আসেন নি কখনও ?

শরৎ হেসে বললে, না।

—আপনাদের দেশ কেমন ?

—বেশ চমৎকার। চলুন না একবার আমাদের দেশে—

—যেতে খুব ইচ্ছে করে—নিয়ে চলুন না—

—বেশ তো, আপনি আসুন, উনি আসুন—

মেয়েটি আর একটি গান ধরলে। এই মেয়েটির গলার সুরে শরৎ সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল —সে এমন সুকণ্ঠী গায়িকার গান জীবনে কখনও শোনে নি—প্রভাসের বৌদিদির বয়স হয়েছে, যদিও তাঁর গলা ভালো তবুও এই অল্পবয়সী মেয়েটির নবীন, সুকুমার, কণ্ঠস্বরের তুলনায় অনেক খারাপ। শরতের ইচ্ছে হল, কমলার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে।

গান শেষ করে কমলা বললে, আসুন না ভাই, আমাদের ঘরে যাবেন ?

—চলুন না দেখে আসি—

প্রভাস তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না, উনি এখনই চলে যাবেন, বেশীক্ষণ থাকবেন না— এখন থাকগে—

কিন্তু শরৎ তবুও বললে, আসি না দেখে প্রভাসদা ? এখুনি আসছি—

প্রভাস বিব্রত হয়ে পড়ল যেন। সে জোর করে কিছু বলতেও পারে না অথচ কমলার সঙ্গে শরৎ যায় এ যেন তার ইচ্ছে নয়। এই সময় হঠাৎ একটা লোক ঘরে ঢুকে অস্পষ্ট ও জড়িত স্বরে বলে উঠল—আরে এই যে, কমল বিবি এখানে বসে, আমি সব ঘর ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে বাবা—বলি—প্রভাসবাবুও যে আজ এত সকালে—

প্রভাস হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠে তাকে কি একটা বলে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেল। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে—লোকটা পাগল নাকি ? অমন কেন ?

সে প্রভাসের বৌদিদিকে বললে, উনি কে ?

—উনি—এই হ'ল গে—আমাদের বাড়ির—বাইরের ঘরে থাকেন—

—কমলার সম্পর্কে কে ?

—সম্পর্কে—এই ঠাকুরপো—

কমলার ঠাকুরপো কি রকম শরৎ ভাল বুঝল না। লোকটির বয়স চল্লিশের কম নয়—তা হলে কমলার দোজবরে কি তেজবরে স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে নাকি ? না হলে অত বড় ঠাকুরপো হয় কি করে ? কমলার ওপর কেমন একটু করুণা হ'ল শরতের। আহা, এমন মেয়েটি ! কমলাও একটু অবাক হয়ে প্রভাসের বৌদিদির দিকে চাইলে। সে যেন অনেক কিছুই বুঝতে পারছে না।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, আপনি প্রভাসদার কে হন ?

কমলা কিছু বলবার আগে প্রভাসের বৌদিদি উত্তর দিলে, ও আমার পিসতুতো বোন হয়। এখানে থেকে পড়ে।

হঠাৎ শরৎ কমলার সিঁথির দিকে চাইলে। সত্যই তো, ওর এখনও বিয়ে হয় নি। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নি। তবে আবার ওর ঠাকুরপো কি রকম হ'ল। শরতের বড় ইচ্ছে হচ্ছিল এসব গোলমেলে সম্পর্কের একটা মীমাংসা সে করে ফেলে—এদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ! কিন্তু দরকার কি পরের বাড়ির খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস করে।

একটু পরে প্রভাস বাইরে থেকে ডাকলে, কমলা, তোমায় ডাকছেন—শুনে যাও—

কমলা চলে যাবার আগে হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করে শরৎকে বললে, আচ্ছা, আসি ভাই—

—কেন, আপনি আর আসবেন না ?

—কি জানি যদি কোন কাজ পড়ে—

—কাজ সেরে আসবেন—যাবার আগে দেখা করেই যাবেন—

—আপনি কতক্ষণ আছেন আর ?

প্রভাসের বৌদি বললেন, উনি এখনও ঘণ্টাখানেক থাকবেন—

কমলা বললে, যদি পারি আসবো তার মধ্যে—

ও চলে গেলে শরৎ প্রভাসের বৌদিদির দিকে চেয়ে বললে, বেশ মেয়েটি—

—কমলা তো ? হ্যাঁ ওকে সবাই পছন্দ করে—

—বড় চমৎকার গলা—

—গানের মাস্টার এসে গান শিখিয়ে যায় যে ! এখন বোধ হয় সেই জন্যেই উঠে গেল। আপনি বসুন চায়ের দেখি কি হ'ল—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, আপনি যাবেন না। আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি—

—বেরুলেন বা। তা কখনও হয়? একটু মিষ্টিমুখ—

—না না—আমি এসময় কিছুই খাই নে—

—বসুন, আমি আসছি।

—বসছি কিন্তু খাওয়ার যোগাড় কিছু করবেন না যেন। আমি সত্যিই কিছু খাব না।

প্রভাস বললে, থাক বরং বৌদি, উনি এসময় কিছু খান না। ব্যস্ত হতে হবে না।

এই সময় অরুণ ও গিরীন বলে সেই লোকটা ঘরে ঢুকল। শরৎ হাসিমুখে বললে, এই যে অরুণবাবু আসুন—

—দেখুন মাথায় টনক আছে আমার। কি করে জানলুম বলুন আপনি এখানে এসেছেন—

গিরীন প্রভাসকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললে, কি ব্যাপার ?

প্রভাস বিরক্ত মুখে বললে, আরে, ওই হরি সা না কি ওর নাম, সব মাটি করে দিয়েছিল

আর একটু হলে—এমন বেফাঁস কথা হঠাৎ বলে ফেললে—আমি বাইরে নিয়ে গিয়ে ধমকে দিলাম আচ্ছা করে। ভাগ্যিস পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিছু বোঝে না তাই বাঁচোয়া। কমলা বিবি আবার ঘর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল ওর, কত কষ্টে থামাই। দেখলেই সব বুঝে না ফেলুক, সন্দেহ করতো।

—তার পর?

—তার পর তোমরা তো এসেছ, এখন পথ বাংলাও—

—লেমনেড্ খাওয়াতে পারবে না?

—চা পর্যন্ত খেতে চাইছে না—তা লেমনেড্।

—ও এখানে থাকুক—চলো আমরা সব এখান থেকে সরে পড়ি।

—মতলবটা বুঝলাম না।

—এখানে দু-দিন লুকিয়ে রাখো। তার পর ওর বাবা ওকে আর নেবে না—ওর গ্রামে রটিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দাও যে কোথায় ওকে পাওয়া গিয়েছে। পাড়াগাঁয়ের লোক, সমাজের ভয়ে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

—তাই করো—কিন্তু মেয়েটিকে তুমি জানো না। যত পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে ভাবছো, অতটা নয় ও। বেশ তেজী আর একগুঁয়ে মেয়ে। তোমার যা মতলব, ও কতদূর গড়াবে আমি বুঝতে পারছি নে। চেষ্টা করে দেখতে পারো।

—তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখ আমি কি করি—টাকা কম খরচ করা হয় নি এজন্যে—মনে নেই?

—হেনাকে ডাকো একবার বাইরে। হেনার সঙ্গে পরামর্শ করো। তাকে সব বলা আছে, সে একটা পথ খুঁজে বার করবেই। কমলাকেও বোলো।

ওর বৌদিদি শরৎকে পাশের ঘরের সাজসজ্জা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। একটা খুব বড় ড্রেসিং টেবিল দেখে শরৎ খুশী হয়ে বললে, বেশ জিনিসটা তো? আয়নাখানা বড় চমৎকার, এর দাম কত ভাই?

—একশো পঁচিশ টাকা—

—আর এই খাটখানা?

—ও বোধ হয় পড়েছিল সত্তর টাকা—আমার ধীরেনবাবু—মানে আমার গিয়ে বাপের বাড়ির সম্পর্কে ভাই—সেই দিয়েছিল।

—বিয়ের সময় দিয়েছিলেন বুঝি? এ সবই তা হলে আপনার বিয়ের সময় বরের যৌতুক হিসেবে—

—হ্যাঁ তাই তো।

—আপনার স্বামী এখনো বাড়ি আসেন নি, আফিসে কাজ করেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—আপনার শাশুড়ী বা আর সব—ওঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল না।

—এ বাড়িতে আর কেউ থাকেন না। এ শুধু মানে আমাদের—উনি আর আমি—

—আলাদা বাসা করেছেন বুঝি? তা বেশ।

—হ্যাঁ। আলাদা বাসা। আফিস কাছে হয় কিনা। এ অনেক সুবিধে।

—তা তো বটেই।

—আপনি এইবার কিছু মুখে না দিলে সত্যিই ভয়ানক দুঃখিত হবো ভাই।

বারবার খাওয়ার কথা বলাতে শরৎ মনে মনে বিরক্ত হ'ল। সে যখন বলছে খাবে না, তখন তাকে পীড়াপীড়ি করার দরকার কি এদের? সে যে বিধবা মানুষ, তা এরা নিশ্চয়ই

বুঝতে পেরেছে, বিধবা মানুষ সব জায়গায় সব সময় খায় না—বিশেষ করে সে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, তার অনেক কিছু বাছবিচার থাকতে পারে, সে জ্ঞান দেখা যাচ্ছে—কলকাতার লোকের একেবারেই নেই।

শরৎ এবার একটু দৃঢ়স্বরে বললে, না আমি এখন কিছু খাবো না, কিছু মনে করবেন না আপনি।

প্রভাসের বৌদিদি আর কিছু বললে না এ বিষয়ে। শরৎ ভাবলে, এদের সঙ্গে ব্যবহারে হয়তো সে ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পারবে না, কিন্তু কি করবে সে, কেন এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করা? খাবে না বলেছে ব্যস্ মিটে গেল—ওদের বোঝা উচিত ছিল।

—আরও দু-পাঁচ মিনিট শরৎকে এ ছবি, ও আলমারি দেখানোর পরে প্রভাসের বৌদিদি ওর দিকে চেয়ে বললে, ভাল, একটা অনুরোধ রাখো না কেন—আজ এখানে থেকে যাও রাতটা।

শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, এখানে? কি করে থাকবো?

—কেন, এই আলাদা ঘর রয়েছে। উনি বোধ হয় আজ আর আসবেন না। এক-একদিন রাত্রে কাজ পড়ে কিনা! সারারাত আসতে পারেন না। একলা থাকতে হবে, তার চেয়ে তুমি থাকো ভাই, দুজনে বেশ গল্প-গুজবে রাত কাটিয়ে দেবো, তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে।

কথা শেষ করে প্রভাসের বৌদিদি শরতের হাত ধরে আবদারের সুরে বললে, কথা রাখো ভাই, কেমন তো? তা হলে প্রভাসবাবুকে—ইয়ে ঠাকুরপোকে বলে দিই আজ গাড়ি নিয়ে চলে যাক্—তাই করি, বলি ঠাকুরপোকে।

শরৎ বিষণ্ণ মনে বলে উঠল—না না, তা কি করে হবে? আমি থাকতে পারবো না। বাবার পাশের বাড়িতে চাটুজ্জে মহাশয়ের ওখানে আজ রাত্রে নেমন্তন্ন আছে, তাই রান্না নেই, এতক্ষণ আছি সেই জন্যে। নইলে কি এখনও থাকতে পারতাম! বাবা একলাটি থাকবেন, তা কখনো হয়? তা ছাড়া তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন যে! আমি তো আর বলে আসি নি যে কারো বাড়ি থাকবো, ফিরবো না। আর সে এমনিই হয় না। আপনার স্বামী যদি এসেই পড়েন—হঠাৎ—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, এসে পড়লে কিছুই নয়। তিনটে ঘর রয়েছে এখানে, তোমাকে ভাই এই ঘরে আলাদা বিছানা করে দেবো, কোনো অসুবিধে হবে না—থাকো ভাই, প্রভাসকে বলি গাড়ি নিয়ে চলে যাবার জন্যে। বোসো তুমি এখানে—

—না, সে হয় না! বাবাকে কিছু বলা হয় নি, তিনি ভীষণ ভাববেন—

—প্রভাস কেন গাড়িতে করে গিয়ে বাবার কাছে খবর দিয়ে আসুক না যে তুমি আমাদের এখানে থাকবে—তা হলেই তো সব চেয়ে ভাল হয়—তাই বলি—এই বেশ সব দিক দিয়ে সুবিধা হ'ল—তোমার পায়ে পড়ি ভাই, এতে অমত করো না।

শরৎ পড়ে গেল বিপদে। একদিকে তার অনুপস্থিতিতে তার বাবার সুবিধে অসুবিধের ব্যাপার, অন্যদিকে প্রভাসের বৌদিদির এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ - কোন্ দিকে যে যায়? অবিশ্যি একটা রাত এখানে কাটানো আর তেমন কি, সম্ভবতঃ ওর স্বামী আজ আফিসের কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে পারবেন না বলেই ওকে সঙ্গে রাখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে—শোয়ারও অসুবিধে কিছু নেই, থাকলেই হ'ল—কিন্তু একটা বড় কথা এই যে, সে বাড়ি না ফিরলে বাবা কি ভাবনাতেই পড়ে যাবেন! তবে বাবাকে যদি প্রভাসদা এখুনি খবর দিয়ে দেন—সে আলাদা কথা।

সে সাতপাঁচ ভেবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে কমলা এসে ঘরে ঢুকে বললে,

বা রে, এখানে সব যে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—

প্রভাসের বৌদিদি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, বেশ সময়ে এসে পড়েছ কমলা—আমি ওকে বোঝাচ্ছি ভাই যে আজ রাত্তটা এখানে থেকে যেতে। উনি আজ আফিস থেকে আসবেন না, জানোই তো—দুজনে বেশ একসঙ্গে গল্পগুজবে—কি বলো?

প্রভাস এবং তার দলবল একটু আগে বাইরে কমলার সঙ্গে কি কথা বলেছে। সেই জন্যই তার এখানে আসা, যতদূর মনে হয়।

সে বললে, আমিও তাই বলি ভাই, বেশ সবাই মিলেমিশে—একটা রাত আপনাকে নিয়ে আমোদ করা গেল—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আর বড্ড ভাল লেগেছে তোমাকে তাই বলছি। কি বলো কমলা?

—তা আর বলতে! আমি তো ভাবছি একটা কিছু সম্বন্ধ পাতাবো—

এই মেয়েটিকে সত্যিই শরতের খুব ভাল লেগেছিল—বয়সে এ তার সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কিছু বড় হবে, দেখতে শুনতে রূপসী মেয়ে বটে। সকলের ওপরে ওর গান গাইবার গলা…অনেক জায়গায় গান শুনেছে শরৎ—কিন্তু এমন গলার স্বর—

শরৎ আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, বেশ সম্বন্ধ পাতাও না ভাই—আমি ভারী সুখী হবো—

—কি সম্বন্ধ পাতাবেন বলুন?

—আপনি বলুন—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, গঙ্গাজল? পছন্দ হয়?

কমলা উৎসাহের সুরে ঘাড় নেড়ে বললে, বেশ পছন্দ হয়। আপনারও হয়েছে তো?… তবে তাই—কিন্তু আজ রাত্রে—

শরৎ আপন মনেই বলে গেল—তোমাকে ভাই আমাদের দেশে নিয়ে যাবো, যাবে তো? তোমার বয়সী একটি মেয়ে আছে রাজলক্ষ্মী, বেশ মেয়ে। আলাপ করিয়ে দেবো। আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবে। তবে হয়তো অত অজ-পাড়াগাঁ তোমার ভাল লাগবে না—

—কেন লাগবে না, খুব লাগবে—আপনাদের বাড়ি থাকবো—

—জানো না তাই বলছো। আমাদের বাড়ি তো গাঁয়ের মধ্যে নয়—গাঁয়ের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে—

কমলা আগ্রহের সুরে বললে, কেন, জঙ্গলের মধ্যে কেন?

—আগে বড় বাড়ি ছিল, এখন ভেঙে-চুরে জঙ্গল হয়ে পড়েছে, যেমনটি হয়—

—বাঘ আছে সেখানে?

শরৎ হেসে বললে, সব আছে, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভূতও আছে—

কমলা ও প্রভাসের বৌদিদি একসঙ্গে বলে উঠল—ভূত! আপনি দেখেছেন?

—না, কখনো দেখি নি, ওসব মিথ্যে কথা। কিংবা চলো তোমরা একদিন, ভূত দেখতে পাবে।

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আচ্ছা, সে জঙ্গলে না থেকে কলকাতায় এসে থাকো না কেন ভাই। এখানে কত আমোদ-আহ্লাদ—তুমি এখানে থাকলে কত মজা করবো আমরা—তোমাকে নিয়ে মাসে মাসে আমরা থিয়েটারে যাবো, বায়স্কোপে যাবো—খাবো দাবো—কত আমোদ ফুর্তি করা যাবে। গঙ্গার ইস্টিমারে বেড়াতে যাবো, যাও নি কখনো বোধ হয়? চমৎকার বাগান আছে, ওই শিবপুরের দিকে, সেখানে কত গাছপালা—

শরতের হাসি পেলো। গাছপালা দেখতে ইস্টিমারে চেপে গঙ্গা বেয়ে কোথায় যেন যেতে হবে কতদূর কলকাতায় এসে—তবে সে গাছপালা দেখতে পাবে। হায় রে গড়শিব-

পুরের জঙ্গল—এরা তোমাকে দেখে নি কখনো তাই এমন বলছে। সেখানে গাছ দেখতে রেলেও যেতে হয় না, ইস্টিমারেও যেতে হয় না—ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছে জানালা দিয়ে. চাইলেই দেখতে পাবে জঙ্গলের ঠ্যালা।

কমলাও বললে, তাই করুন—কলকাতায় চলে আসুন, কেমন থাকা যাবে —

প্রভাসের বৌদিদি বললে, এই আমাদের বাড়িতেই থাকবে ভাই! মানে—আমাদের বাড়ির কাছেও বাসা করে দেওয়া যাবে এখন। এমনি সাজিয়ে গুজিয়ে বেশ চমৎকার করে দেওয়া যাবে। কি ভাই সেখানে পড়ে আছ জঙ্গলে, কলকাতায় এসে বাস করে দেখো ভাই, আমোদ ফুর্ত্তি কাকে বলে বুঝতে পারবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে, একসঙ্গে বেড়াবো, দেখবো শুনবো, সে কি রকম মজা হবে বলো দিকি ভাই? তোমার মত মানুষ পেলে তো—

কমলাও উৎসাহের সুরে বললে, আপনাকে পেয়ে আর ছাড়তে ইচ্ছে করছে না বলেই তো—

শরতের খুব ভাল লাগছিল ওদের সঙ্গ। এমন মন-খোলা, আমুদে, তরুণী মেয়েদের সঙ্গ পাড়াগাঁয়ে মেলে না, এক আছে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু সেও এদের মত নয়—এদের যেমন সুশ্রী চেহারা, তেমনি গলার সুর, এদের সঙ্গে একত্রে বাস করা একটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু ওরা যা বলছে, তা সম্ভব হবে কি করে? এরা আসল ব্যাপারটা বোঝে না কেন?

সে বললে, ভাল তো আমারও লেগেছে আপনাদের। কিন্তু বুঝছেন না? কলকাতায় বাবা থাকবেন কি করে? তেমন অবস্থা নয় তো তাঁর? এই হ'ল আসল কথা।

প্রভাসের বৌদিদি হেসে বললে, এই! এজন্যে কোনো ভাবনা নেই তোমার ভাই। এখন দিনকতক আমাদের বাসাতে থাকো না—তার পর বাসা একটা দেখে শুনে নিলেই হবে এখন। আর তোমার বাবা? উনি যে অফিসে কাজ করেন, সেখানে একটা কাজটাজ—

—সে কাজ বাবা করতে পারেন না। ইংরিজি জানেন না—উনি জানেন গান-বাজনা, বেশ ভাল বেহালা বাজাতে পারেন—

প্রভাসের বৌদিদি কথাটা যেন লুফে নিয়ে বলল, বেশ, বেশ—তবে তো আরও ভাল। নরেশবাবু থিয়েটারেই তো কাজ করেন—তিনি ইচ্ছে করলে—

শরৎ বললে, নরেশবাবু কে?

—নরেশবাবু!—এই গিয়ে—ওঁর একজন বন্ধু। আমাদের বাসায় প্রায়ই আসেন-টাসেন কিনা।

শরৎ একটুখানি কি ভেবে বললে, কিন্তু বাবা কি গাঁ ছেড়ে থাকতে পারবেন? আমার শহর দেখা শেষ হয় নি বলে তিনি এখনও বাড়ি যাবার পেড়াপীড়ি করছেন না—নইলে এতদিন উদ্ব্যস্ত করে তুলতেন না আমাকে! নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় পড়ে কিছু বলতে পারছেন না। তিন টিকবেন শহরে? তবেই হয়েছে!

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আচ্ছা, এক কাজ করো না কেন?

—কি?

—তুমিই কেন থাকো না এখন দিনকতক? এই আমাদের সঙ্গেই থাকো। তোমার বাবা ফিরে যান দেশে, এর পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমাদের বাড়িতে আমাদের বন্ধু হয়ে থাকবে, টাকাকড়ির কোনো ব্যাপার নেই এর মধ্যে—তোমায় মাথায় করে রেখে দেবো ভাই। বড্ড ভাল লেগেছে তোমাকে, তাই বলছি। কি বলিস্ কমলা? তুই কথা বলছিস্ নে যে—বল্ না তোর গঙ্গাজলকে।

কমলা বললে, হ্যাঁ, সে তো বলছিই—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, সে-সব গেল ভবিষ্যতের কথা। আপাততঃ আজ রাত্রে তুমি

এখানে থাকো। প্রভাস গিয়ে খবর দিয়ে আসুক তোমার বাবাকে। রাজী?

শরৎ দ্বিধার সঙ্গে বললে, আজ? তা—না ভাই আজ বরং আমায় ছেড়ে দাও—কাল বাবাকে বলে—

—তাতে কি ভাই! প্রভাস ঠাকুরপো গিয়ে এখুনি বলে আসছে। যাবে আর আসবে—ডাকি প্রভাসবাবুকে—তুমি আর অমত কোরো না। বসো আমি আসছি—তুমি থাকলে কমলাকে দিয়ে সারারাত গান গাওয়াবো।

শরৎ এমন বিপদে কখনো পড়ে নি।

কি সে করে এখন? এদের অনুরোধ এড়িয়ে চলে যাওয়াও অভদ্রতা—যখন এতটাই পীড়াপীড়ি করছে তার থাকার জন্যে, থাকলে মজাও হয় বেশ—কমলার গান শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অন্যদিকে বাবাকে বলে আসা হয় নি, বাবা কি মনে করতে পারেন। তবে প্রভাসদা যদি মোটরে করে গিয়ে বলে আসে, তবে অবিশ্যি বাবার ভাববার কারণ ঘটবে না। তবুও কি তার নিজের মন তাতে শান্তি পাবে? কোথায় বাগানের মধ্যে নির্জন বাড়ি, সেখানে একলাটি পড়ে থাকবেন বাবা, রাত্রে যদি কিছু দরকার পড়ে তখন কাকে ডাকবেন, কে তাঁকে দেখে?

সে ইতস্ততঃ করে বললে, না ভাই, আমার থাকবার জো নেই—আজ ছেড়ে দাও, বাবাকে বলে কাল আসবো।

হঠাৎ প্রভাসের বৌদিদি উঠে হাত বাড়িয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললে, যাও দিকি কেমন করে যাবে ভাই? কক্ষনও যেতে দেবো না—কই, যাও তো কেমন করে যাবে? এমন আমোদটা আমাদের মাটি করে দিয়ে গেলেই হ'ল!

শরৎ তার কাণ্ড দেখে হেসে ফেললে।

এমন সময় বাইরে থেকে প্রভাসের গলা শুনতে পাওয়া গেল—ও বৌদিদি—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, দাঁড়াও ভাই আসছি—ঠাকুরপো ডাকছে—বোধ হয় চা চান, বন্ধু-বান্ধব এসেছে কিনা? ঘন ঘন চা—

সে বাইরে যেতেই প্রভাস তাকে বারান্দার ও-প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বললে, কি হ'ল?

তার সঙ্গে অরুণ ও গিরীনও ছিল। গিরীন ব্যস্তভাবে বললে, কতদূর কি করলে হেনা?

—বাবাঃ—সোজা একগুঁয়ে মেয়ে! কেবল বাবা আর বাবা। এত বোঝাচ্ছি, এত কাণ্ড করছি এখনও মাথা হেলায় নি—কমলা আবার ঢোক মেরে চুপ করে রয়েছে। আমি একা বকে বকে মুখে বোধ হয় ফেনা তুলে ফেললাম। ধন্যি মেয়ে যা হোক। যদি পারি, আমায় একশো কিন্তু পুরিয়ে দিতে হবে। কমলা কিছুই করছে না—ওর টাকা—

গিরীন বিরক্তির সুরে বললে, আরে দূর, টাকা আর টাকা! কাজ উদ্ধার করো আগে—একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে সন্দে থেকে ভুলোতে পারলে না—তোমরা আবার বুদ্ধিমান, তোমরা আবার শহুরে—

প্রভাসের বৌদিদি মুখনাড়া দিয়ে বলে উঠল—বেশ, তুমি তো বুদ্ধিমান, যাও না, ভজাও গে না, কত মুরোদ। তেমন মেয়ে নয় ও—আমি ওকে চিনেছি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, আমরা চিনি মেয়েমানুষ কে কি রকম। ও একেবারে বনবিছুটি—তবে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, আর কখনো কিছু দেখে নি—তাই এখনও কিছু সন্দেহ করে নি, নইলে ওকে কি যেমন তেমন মেয়ে পেয়েছ?

প্রভাস বিরক্ত হয়ে বললে, যাক্, আর এক কথা বার বার বলে কি হবে? সোজা কাজ হলে তোমাকেই বা আমরা টাকা দিতে যাবো কেন হেনা বিবি, সেটাও তো ভাবতে হয়—

হেনা বললে, এবার যেন একটু নিমরাজি গোছের হয়েছে - দেখি—

হেনা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই হাসিমুখে বার হয়ে এসে বললে, কই ফেল তো দেখি টাকা?

ওরা সবাই ব্যস্ত ও উৎসুক ভাবে বলে উঠল—কি হ'ল। রাজী হয়েছে?

হেনা হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে বাহাদুরির সুরে বললে, এ কি যার তার কাজ? এই হেনা বিবি ছিল তাই হ'ল। দেখি টাকা? আমি যাকে বলে—সেই যাই পাতায় পাতায় বেড়াই—তাই—

গিরীন বিরক্তির সুরে বললে, আঃ, কি হ'ল তাই বলো না? গেলে আর এলে তো?

—আমি গিয়েই বললাম, ভাই, প্রভাস ঠাকুরপোকে বলে এলাম তোমার বাবাকে খবর দিতে। সে গাড়ি নিয়ে এখুনি যাচ্ছে বললে। আমি জোর করে কথাটা বলতেই আর কোন কথা বলতে পারলে না। কেবল বললে, প্রভাসদা যাবার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়—বাবাকে কি বলতে হবে বলে দেবো—কমলা কিন্তু কিছু করছে না, মুখ বুজে গিন্নি-শকুনির মত বসে আছে।

গিরীন বললে, না প্রভাস, তুমি এখান থেকে সরে পড়ো, হেনা গিয়ে বলুক তুমি চলে গিয়েছ—তুমি এসময় সামনে গেলে একথাও বলতে পারে যে আমিও ওই গাড়িতে বাবার কাছে গিয়ে নিজেই বলে আসি। তা ছাড়া তোমার চোখমুখ দেখে সন্দেহ করতে পারে—হেনার মত তুমি পারবে না—ও হ'ল অ্যাক্ট্রেস্, ও যা পারবে, তা তুমি আমি পারতে—

হেনা বললে, বঙ্গরস থিয়েটারে আজ পাঁচটি বছর কেটে গেল কি মিথ্যে মিথ্যে? ম্যানেজার সেদিন বলেছে, হেনা বিবি, তোমাকে এবার ভাবছি সীতার পার্ট দেবো—সেদিন আমার রানীর পার্ট দেখে ও কি ওই কমুলির কাজ? অনেক তোড়জোড় চাই—

গিরীন বললে, যাক্ ও সব কথা, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে। এত পরিশ্রম সব মাটি হবে। খসে পড়ো প্রভাস—তোমাকে আর না দেখতে পায়—মন আবার ঘুরে যেতে কতক্ষণ, যদি বলে বসে—না, আমি প্রভাসদার মোটরে বাবার কাছে যাবো। আর কে যাচ্ছে এখন এত রাত্রে সেই পাগলা বুড়োটার কাছে?

প্রভাস ইতস্ততঃ করে বললে, তবে আমি যাই?

—যাও—তোমায় আর না দেখতে পায়—পায়ের বেশী শব্দ করো না।

—তোমরা? তোমাদেরও এখানে থাকা উচিত হবে না, তা বুঝছ?

—আমরা যাচ্ছি। তুমি আগে যাও—কারণ তুমি চলে গেলে ওর হাতের তীর ছাড়া হয়ে যাবে, আর তো ও মত বদলাতে পারবে না?

হেনা বললে, আজ রাত্তিরটা কোনো রকম বেতাল না দেখে ও। তোমরা ওই হরি সা লোকটাকে আগলে রাখো—

অরুণ বললে, কোথায় সে?

প্রভাস বললে, আমি তাকে কমুলির ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। কিন্তু এখন যা আছে, আর দু-ঘণ্টা পরে তো থাকবে না। ওকে চেনো তো? চীনেবাজারের অত বড় দোকানটা ফেল করেছে এই করে। বোকা তাই রক্ষে। ওকে সরিয়ে দাও বাবা, আজ রাত্তিরের মত—

গিরীন বললে, যাও না তুমি? কেন দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করছো?

প্রভাস চলে যেতে উদ্যত হলে গিরীন তাকে বললে, কোথায় থাকবে?

—আজ বাড়ি চলে যাই—বাবা সন্দেহ করবেন, বেশী রাত্তিরে বাড়ি ফিরলে—

—ভাল কথা, তোমার বাবার সঙ্গে তো ওর বাবার খুব আলাপ, সেখানে গিয়ে সন্ধান নেবে না তো বুড়ো?

প্রভাস হেসে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললে—হুঁ হুঁ বাবা—সে গুড়ে বালি! অত কাঁচা ছেলে আমি নই। বাবা তো বাবা, বাড়ির কেউই ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। বাবাও কেদারকে ভুলে গিয়েছেন, দুজনের দেখাশুনো নেই কতকাল। দেখলে কেউ হঠাৎ হয়তো চিনতে পারবে না। তার ওপর আমাদের বাড়ি কেদার বুড়ো জানবে কি করে? ঠিকানা জানে না, নম্বর জানে না—কোনদিন শোনেও নি। আর এ কলকাতা শহর, বুড়ো না চেনে বাড়ি না চেনে রাস্তাঘাট। সেদিকে ঠিক আছে।

প্রভাস সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে গেল।

অরুণ একটু দ্বিধার সুরে বললে, কাজটা তো এক রকম যা হয় এগুলো—শেষে পুলিসের কোন হাঙ্গামায় পড়বো না তো?

—কিসের পুলিসের হাঙ্গামা? নাবালিকা তো নয়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ধাড়ি—আমরা প্রমাণ করবো ও নিজের ইচ্ছেয় এসেছে। ওকে এ জায়গায় কেন পাওয়া গেল এ কথার কি জবাব দেবে ও? আমি বুঝি নি বললে কেউ বিশ্বাস করবে? নেকু?

—তা ধরো ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সত্যিই ওর বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু এসব কিছু জানে না, বোঝে না। দেখতেই তো পেলে—একটু সন্দেহ জাগলে ওকে রাখতে পারত হেনা? তা জাগে নি। এমন জায়গাও কখনো দেখে নি, জানে না। যদি এই সব কথা প্রমাণ হয় আদালতে?

গিরীন আত্মম্ভরিতার সুরে বললে, শুধু দেখে যাও আমি কি করি। গিরীন কুণ্ডুকে তোমরা সোজা লোক ঠাউরো না—

অরুণ বললে, আর একটা কথা। সে না হয় বুঝলাম—কিন্তু ওসব ঘরের মেয়ে, যখন সব বুঝে ফেলবে, তখন আত্মহত্যা করে বসে যদি? ওরা তা পারে।

গিরীন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, হ্যাঁ—রেখে দাও ওসব। মরে সবাই—দেখা যাবে পরে—

—আজ চলো আমরা এখান থেকে যাই—

—এখন?

—আমার মনে হয় তাই উচিত। কোনো সন্দেহ না জাগে মনে—এটা যেন মনে থাকে।

হেনাকে সন্তর্পণে বাইরে আনিয়ে গিরীন বললে, আমরা চলে যাচ্ছি হেনা বিবি। রেখে গেলাম কিন্তু—

হেনা বললে, আমি বাবু পুলিসের হ্যাঙ্গামে যেতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি। কাল দুপুর পর্য্যন্ত ওকে এখানে রাখা চলবে। তারপর তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে যেও—আমার টাকা চুকিয়ে দিয়ে।

গিরীন বললে, কেন, আবার নতুন কথা বলছো কেন? কি শিখিয়ে দিয়েছিলাম?

—সে বাপু হবে না। ও বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে। আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়—ও শুধু বুঝতে পারে নি তাই এখানে রয়ে গেল। নইলে রসাতল বাধাত এতক্ষণ। আর একটা কথা কি, কিছুতেই খাচ্ছে না, এত করে বলছি, নানারকম ছুতো করছে, পাড়াগাঁয়ের বিধবা মানুষ, ছুঁচিবাই গো, ছুঁচিবাই। কেন খাচ্ছে না আমি আর ওসব বুঝি নে? আমি মানুষ চরিয়ে খাই—

অরুণ বললে, মানুষ চরাও নি কখনো হেনা বিবি, ভেড়া চরিয়েছ। এবার মানুষ পেয়েছ, চরাও না দেখি। বুঝলে?

ওরা দুজনে নিচে নেমে গেল।

চাটুজ্জে মশায়ের বাড়ির গানের আসর ভাঙলো রাত এগারোটায়। তার পরে খাওয়ার

জায়গা হ'ল, প্রায় ত্রিশজন লোক নিমন্ত্রিত, আহারের ব্যবস্থাও চমৎকার। যেমন আয়োজন, তেমনি রান্না। কেদার এক সময়ে খেতে পারতেন ভালই, আজকাল বয়স হয়ে আসছে, তেমন আর পারেন না—তবুও এখনও যা খান, তা একজন ওই বয়সের কলকাতার ভদ্রলোকের বিস্ময় ও ঈর্ষার বিষয়।

বাড়ির কর্তা চাটুজ্জে মশায় কেদারের পাতের কাছে দাঁড়িয়ে তদারক করে তাঁকে খাওয়ালেন। আহারাদির পরে বিদায় চাইলে বললেন, আবার আসবেন কেদারবাবু, পাশেই আছি—আমরা তো প্রতিবেশী। আপনার বাজনার হাত ভারি মিঠে, আমার স্ত্রী বলছিলেন —উনি কে? আমি বললাম, আমাদের পাশের বাগানেই থাকেন—এসেছেন বেড়াতে। আহা, আজ যদি আপনার মেয়েটিকে আনতেন—বড় ভাল হ'ত, আমার স্ত্রী বলছিলেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা তো বটেই। তার এক দাদা এসে তাকে নিয়ে গেল বেড়াতে কিনা? মানে গ্রাম-সম্পর্কের দাদা হলেও খুব আপনা-আপনি মত। কলকাতায় তাদের বাড়ি আছে—সেখানেই নিয়ে গেল। মটোর গাড়ি নিয়ে এসেছিল। তা আর একদিন নিয়ে আসবো—

—আনবেন বৈকি, মাকে আনবেন বৈকি,—বলা রইল, নিশ্চয় আনবেন—আচ্ছা নমস্কার, কেদারবাবু—

কেদারের সঙ্গে চাটুজ্জে মশায় একজন লোক দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেদার তা নিতে চান নি। তিনি গানের আসরের শেষ দিকে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মেয়ে এসে একা থাকবে বাগানবাড়িতে। গাঁয়ে গড়বাড়ির বনের মধ্যে মেয়েকে ফেলে রেখে যেতেন প্রায় প্রতি রাত্রেই, সে কথা ভেবে এখন তাঁর কষ্ট হ'ল। তবুও সে নিজের গ্রাম, পূর্ব-পুরুষের ভিটে, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র।

গেট দিয়ে ঢোকবার সময় কেদার দেখলেন, কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। শরৎ তা হলে হয়তো সারাদিন ঘুরে ফিরে এসে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, কত আর ওর বয়স, কাল তো এতটুকু দেখলেন ওকে—দেখুক শুনুক, আমোদ করুক না!

বাড়ির রোয়াকে উঠে ডাকলেন, ও শরৎ—মা শরৎ উঠে দোরটা খোলো, আলোটা জ্বালো—

সাড়া পাওয়া গেল না।

কেদার ভাবলেন—বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি—বড্ড ঘুম-কাতুরে, গড়শিবপুরে এক-একদিন এমন ঘুমিয়ে পড়তো—ছেলেমানুষ তো হাজার হোক্—হুঁ—

পুনরায় ডাক দিলেন—ও মা শরৎ, ওঠো, আলো জ্বালো—

ডাকাডাকিতে ঝি উঠে আলো জেলে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে এসে বললে, কে—বাবু? কই দিদিমণি তো আসেন নি এখনও—

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, আসে নি? বাড়ি আসে নি? তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি, জানিস্ নে হয়তো—দ্যাখ্—সে হয়তো আর ডাকে নি—চল্ ঘরে, আলো জ্বাল্—

ঝি বললে, চাবি দেওয়া রয়েছে যে বাবু, এই আমার কাছে চাবি। দোর খুলবে, আমার কাছ থেকে চাবি নেবে, তবে তো ঢুকবে ঘরে। কি যে বলো বাবু!

তাই তো, কেদার সে কথাটা ভেবে দেখেন নি। চাবি রয়েছে যখন ঝিয়ের কাছে, তখন শরৎ দোর খুলবে কি করে!

ঝি বললে, আমি সন্ধে থেকে বসে ছিনু এই রোয়াকে, এই আসে, এই আসে—বলি মেয়েমানুষ একা থাকবে? এসব জায়গা আবার ভাল না। বাগানবাড়ি, লোকজনের গতাগম্যি নেই—রাত্তির কাল। আমি শুয়ে থাকবোখন দিদিমণির ঘরে—রান্নাঘরে আটা

এনে রেখেছি, ঘি এনে রেখেছি, যদি এসে খাবার করে খায়—

কেদার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—ঝিয়ের দীর্ঘ উক্তির খুব সামান্য অংশই তাঁর কর্ণগোচর হ'ল। ঝিয়ের কথার শেষের দিকে প্রশ্ন করলেন—কে খাবার করে খেয়েছে বললে?

—খায় নি গো খায় নি, যদি খায় তাই এনে রাখনু সব গুছিয়ে। আটা ঘি—

কেদার বললেন, তাই তো ঝি, এখনও এল না কেন বল্ দেখি? বারোটা বাজে—কি তার বেশীও হয়েছে—

—তা কি করে বলি বাবু।

—হ্যাঁ ঝি, থিয়েটার দেখতে যায় নি তো? তা হলে কিন্তু অনেক রাত হবে। না?

—তা জানি নে বাবু।

রাত একটা বেজে গেল—দুটো। কেদারের ঘুম নেই, বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছেন। বাগানবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে অত রাতেও দু-একখানা মোটর বা মাল-লরীর যাতায়াতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে; কেদার অমনি বিছানার ওপর উঠে বসেন। এই এতক্ষণে এল প্রভাসের গাড়ি! কিছুই না।

আবার শুয়ে পড়েন।

নয়তো উঠে তামাক সাজেন বসে বসে, তবুও একটু সময় কাটে।

হলের ঘড়িটা টং টং করে তিনটে বাজলো।

কত রাত্রে কলকাতার থিয়েটার ভাঙে! কারণ এতক্ষণে তিনি ঠিক করেই নিয়েছেন যে প্রভাস ওকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গিয়েছে, প্রভাস এবং অরুণের বাড়ির সবাই গিয়েছে, মানে মেয়েরা। তাদের সঙ্গেই—তা তো সব বুঝলেন তিনি, কিন্তু থিয়েটার ভাঙে কত রাত্রে? কাকে জিজ্ঞেস করেন এত রাত্রে কথাটা! আবার শুয়ে পড়লেন। একবার ভাবলেন, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কি দেখবেন? শেষ রাত্রে কখন ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে তাঁর অজ্ঞাতসারে, যখন কেদার ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন, উঃ, এ যে দেখছি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে।

ডাকলেন—ও ঝি—ঝি—

ঝি এসে বললে, আমি বাজারে চলনু বাবু, এর পর মাছ মিলবে না, ওই মুখপোড়া ইটের কলের বাবুগুলো হন্নে শেয়ালের মত—

—হ্যাঁরে, শরৎ আসে নি?

—না বাবু, কই? এলে তো তখুনি উঠে দরজা খুলে দিতাম বাবু। আমার ঘুম বড্ড সজাগ ঘুম।

ঝি বাজারে চলে গেল। কেদারের মনে এখন আর ততটা উদ্বেগ নেই। তিনি এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। অনেক রাত্রে থিয়েটার ভেঙে গেলে প্রভাসের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে শরৎ তাদের বাড়িতে গিয়ে শুয়েছে—এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। রাত্রের অন্ধকার মানুষের মনে ভয় ও উদ্বেগ আনে, দিনের আলোয় তাঁর মনের দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে। মিছিমিছি ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই এর মধ্যে। কলকাতার জীবন-যাত্রা প্রণালী গড়শিবপুরের সঙ্গে এক নয়—এ তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কেদার নিজেই জল ফুটিয়ে চা করে খেলেন, ঝি দোকান থেকে খাবার নিয়ে এল—আটটা ন'টা দশটা বাজলো, কেদার ঝিকে বলে দিয়েছিলেন কি কি আনতে হবে, মেয়ে এসে মাছ রাঁধবে বলে ভাল মাছও আনতে দিয়েছেন—ঝি বাজার থেকে ফিরে এল, অথচ এখনও শরতের সঙ্গে দেখা নেই। বাজার পড়ে রইল, ঝি জিজ্ঞেস করল—দিদিমণি তো এখনও এলো না, মাছ কি কুটে রাখবো?

—রেখে দে। হয়তো গঙ্গাচ্চান করে আসবে।

যখন বারোটা বেজে গেল, তখন ঝি এসে বললে, বাবু, রান্নাটা আপনিই চড়িয়ে দিন না কেন? আমার বোধ হয় দিদিমণি এবেলা আর এলেন না। না খেয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন!

কিন্তু কেদার বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

আজ একটা ব্যাপার তাঁর কাছে আশ্চর্য্য ঠেকেছিল, সেটা এই, শরৎ যত আমোদের মধ্যেই থাকুক কেন না, বাবাকে ভুলে—তাঁর জন্যে রান্নার কথা ভুলে—সে কোথাও থাকবে না। জীবনে সে কখনও তা করে নি। যতই কালীঘাটেই যাক আর গঙ্গাস্নানই করুক বাবার খাওয়া হবে না দুপুরে, এ চিন্তা তাকে বৈকুণ্ঠের দোর থেকেও ফিরিয়ে আনবে।

অথচ এ কি রকম হ'ল!

মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন কেদার।

প্রভাসের বাড়ির ঠিকানা জানেন না তিনি যে খোঁজ নেবেন। এমন তো হতে পারে কোনো অসুখ করেছে শরতের। কিন্তু প্রভাসও খবর দিতে এল না একবার, এই বা কেমন কথা!

ঝি এসে দাঁড়াল, আবার ভাত চড়াবার কথাটা বলতে।

একটু ইতস্ততঃ করে বলল, বাবু, একটা কথা বলবো কিছু মনে কোরো নি, দিদিমণি যেনার সঙ্গে গিয়েছেন, তিনি কি রকম দাদা!

ঝিয়ের কথার সুর ও বলবার ধরন কেদারের মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ধারালো অস্ত্রের বিষম ও নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে তাঁর সরল মনকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলে।

তিনি পাংশু মুখে ঝিয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কেন মেয়ে? কেন বলো তো?

—না বাবু, তাই বলছি। বলি, যেনার সঙ্গে তিনি গিয়েছেন, তিনি নোক ভালো তো? শহর-বাজার জায়গা, এখানে মানুষ সব বদমাইশ কিনা, দিদিমণি সোমত্ত মেয়ে তাই বলছি। তবে আপনি বলছিলে দাদার সঙ্গে গিয়েছে, তবে আর ভয় কি। তা বাবু, ভাতটা চড়িয়ে—

কেদার রান্না চড়াবেন কি, ঝির কথা শুনে তাঁর কেমন একটা ভয়ে সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল, হাতে পায়ে যেন বল নেই। এসব কথা তাঁর মনেও আসে নি। ঝি নিতান্ত অন্যায় কথা তো বলে নি। প্রভাসকে তিনি কতটুকু জানেন? তাঁর সঙ্গে মেয়েকে যেতে দেওয়া হয়তো তাঁর উচিত হয় নি।

হঠাৎ মনে পড়ল, পাশের বাগানে গিয়ে চাটুজ্জে মশাইকে সব জানিয়ে এ বিপদে তাঁর পরামর্শ নেওয়া দরকার—বিশাল কলকাতা শহরের মধ্যে তিনি আর কাউকে জানেন না, চেনেন না। ঝিকে বসিয়ে রেখে বাড়িতে, তিনি চাটুজ্জে মশায়ের বাগানবাড়িতে গেলেন। চাটুজ্জে মশায়কে সামনের চাতালেই চাকরে তেল মাখাচ্ছিল, কেদারকে এমন অসময়ে আসতে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হয়ে কাপড় গুছিয়ে পরে উঠে বসলেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আসুন কেদারবাবু, ওরে বাবুকে টুলটা এগিয়ে দে—

কেদার বললেন, বড় বিপদে পড়ে এসেছি চাটুজ্জে মশায়—আপনি ছাড়া আমি তো আর কাউকে জানি নে চিনিও নে—কার কাছেই বা যাবো—

চাটুজ্জে মশায় সোজা হয়ে বসে বিস্ময়ের সুরে বললেন, কি বলুন দিকি? কি হয়েছে?

কেদার ব্যাপার সব খুলে বললেন।

চাটুজ্জে মশাই শুনে একটু চুপ করে ভাবলেন। তার পর বললেন, আপনি ঠিকানা জানেন না?

—আজ্ঞে না—

—প্রভাস কি?

—দাস—ওরা কর্ম্মকার।

—আহা দাঁড়ান, টেলিফোন গাইডটা দেখি। কিন্তু আপনি তো বলছেন ঠিকানা জানেন না, তবে তাতে কি হবে? ওই নামে পঞ্চাশ জন মানুষ বেরুবে—আচ্ছা, আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি স্নানটা সেরে নি চট্ করে, বেলা হয়েছে। আপনাকে নিয়ে একবার থানায় যাবো কি না ভেবে দেখি। পুলিসের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

পুলিসের নাম শুনে নিব্বিরোধী কেদার ভয় পেয়ে গেলেন। পুলিসে যেতে হবে, ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াবে কি? নাঃ। হয়তো মন্দির-টন্দির দেখতে বেরিয়েছে মেয়ে, ফিরে আসতে একটু বেলা হচ্ছে! একেবারে পুলিসে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কেদার বললেন, আচ্ছা, আপনি স্নানাহার সেরে নিন—আমি ততক্ষণ একবার দেখে আসি এল কি না। আপনি খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসছি—

বাগানবাড়িতে ফিরে কেদার এঘর ওঘর খুঁজলেন, ঝিকে ডাকলেন, শরৎ আসে নি। ঘড়িতে বেলা দুটো। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে মন শান্ত করার চেষ্টা করলেন—পুলিসে খবর দেবার আগে বরং একটু দেরি করা ভাল। ঘড়িতে আড়াইটে বাজল।

এমন সময়ে ফটকের কাছে মোটরের হর্ন শোনা গেল। কেদার উৎকর্ণ হয়ে রইলেন—সকাল থেকে একশো মোটর গাড়ির বাঁশি শুনেছেন তিনি। কিন্তু মনে হ'ল - না, এই তো, গাড়ির শব্দ একেবারে বাগানের লাল কাঁকরের পথে। বাবাঃ, বাঁচা গেল। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন ঝাল বেরিয়ে গেল কেদারের।

ঝি ছুটে এসে বললে, বাবু মোটর ঢুকছে ফটক দিয়ে - দিদিমণি এসেছে—

কেদার প্রায় ছুটেই বাইরে গেলেন। মোটর সামনে এসে দাঁড়াল—তা থেকে নামল প্রভাস ও গিরীন। শরৎ তো গাড়িতে নেই!

ওরা এগিয়ে এল।

কেদার ব্যস্ত ভাবে বললে, এসো বাবা প্রভাস—শরৎ আসে নি? এত দেরি করলে, তাকে কি বাড়িতে—

প্রভাস ও গিরীনের মুখ গম্ভীর। পাশেই ঝিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গিরীন বললে, শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। ওদিকে চলুন—

ঝি হঠাৎ বলে উঠল, হ্যাঁ গা বাবু, দিদিমণি ভাল আছে তো?

গিরীন নামতা মুখস্থ বলার মত বললে, হ্যাঁ, আছে—আছে—আসুন, চলুন ওই ওদিকে। তুই যা না কেন, হাঁ ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে কি—?

ওদের রকম-সকম দেখে কেদার উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলেন, কি—কি হয়েছে? শরৎ ভাল আছে তো?

প্রভাস বললে, হ্যাঁ, ভাল আছে। সেজন্য কিছু নয়, তবে একটা ব্যাপার হয়েছে, তাই আপনার কাছে—

কেদার জিনিসটা ভাল বুঝতে না পেরে বললেন, তা শরৎকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হ'ত বাবাজি—তাকে আর কেন বাড়িতে রেখে এলে?

গিরীন বললে, আজ্ঞে না, তাঁকে নিয়েই তো ব্যাপার—সেই বলতেই তো—

কেদারের প্রাণ উড়ে গেল—শরতের নিশ্চয় অসুখ-বিসুখ হয়েছে, এরা গোপন করছে—তা ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব? তিনি অধীর ভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, গিরীন এগিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বললে, আপনাকে বলতেই তো আমাদের আসা। কিন্তু কি করে যে বলি, তাই বুঝতে পারছি নে। আসল কথাটা কি জানেন, আপনার মেয়েকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না—মানে এখন পাওয়া গিয়েছে। তবে—

এদের কথাবার্ত্তার গতি কেদার বুঝতে পারলেন না, একবার বলে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, আবার বলে পাওয়া গিয়েছে—গিয়ে যদি থাকে, তবে কি তাকে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ? নইলে এরা তার পরে আবার 'কিন্তু' বলে কেন ? মুহূর্ত্তের মধ্যে কেদারের মনে এই কথাগুলো খেলে গেল—কিন্তু তাঁর হতবুদ্ধি ওষ্ঠাধর বাক্যে এর রূপ দেওয়ার পূর্ব্বেই গিরীন আবার বললে—হয়েছিল কি জানেন, আপনার মেয়ে—বল না হে প্রভাস !

প্রভাস বললে, বলবো কি, আমারও হাত-পা আসছে না। আপনার সামনে একথা বলতে, অরুণের সঙ্গে কাল শরৎ-দি কোথায় চলে গিয়েছিল—কাল রাত্রে তারা সারারাত আসে নি। আজ সকালে—মানে—

গিরীন ওর কাছ থেকে কথা লুফে নিয়ে বললে, মানে আমরা কাল সারারাত খোঁজাখুঁজি করেছি—পাই নি। আপনার কাছেই বা কি বলি, কার কাছেই বা কি বলি—তার পর আজ সকালে একটা কুশ্রেণীর মেয়ের বাড়িতে এদের দুজনকে পাওয়া গিয়েছে। এসব কথা বলতে আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়। প্রভাস তো বলেছিল, আমি কাকাবাবুর কাছে গিয়ে এসব বলতে পারবো না। আমি বললাম - না চলো, বলতেই যখন হবে আমিই বলবো এখন। তিনিও তো ভাববেন। তাই ও এল, নইলে ও আসতে চাইছিল না।

কেদার নির্ব্বোধের মত ওদের মুখের দিকে চেয়ে সব কথা শুনছিলেন—কিন্তু কথাগুলোর অর্থ তাঁর তেমন বোধগম্য হয় নি বোধ হয়—কারণ কিছুমাত্র না ভেবেই তিনি প্রশ্ন করলেন, তাকে তোমরা আনলে না কেন ? তার অসুখ-বিসুখ হয় নি তো ?

গিরীন হাত নেড়ে একটা হতাশাসূচক ভঙ্গি করে বললে, সে চেষ্টা করতে কি আর আমরা বাকি রেখেছিলাম ? আসতে চাইলেন না।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, আসতে চাইলে না।

—তবে আর বলছি কি ছাই আপনাকে। আমি আর প্রভাস গিয়ে আজ সকাল থেকে কত খোশামোদ। তা বললেন, আমি যাবো না। এখানে বেশ আছি। কুশ্রেণীর দুটো মেয়ে আছে সে বাড়িতে, দিব্যি দেখলুম সাজিয়েছে। আমায় বললেন, দেশে আর সে জঙ্গলে ফেরবার আমার ইচ্ছে নেই। এই বেশ আছি। অরুণ তাঁকে সুখে রাখবে বলেছে। কলকাতা শহর ফেলে তিনি আর জঙ্গলে ফিরতে চান না, এই গেল আসল কথা। বললেন, আমি সাবালিকা, আমার বয়স হয়েছে, আমি এখন যা খুশি করতে পারি। আমি যাবো না। এখন যেমন ব্যাপার বুঝছি অরুণের সঙ্গে ওর—মানে মনের মিল হয়ে গিয়েছে—বয়েসও তো এখনও—বুঝলাম যতদূর তাতে—

কেদার অধীর ভাবে বললেন, আমার কথা বলেছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই জিজ্ঞেস করুন না প্রভাসকে। সকাল থেকে ঝুলোঝুলি করেছি আমরা। কিছু কি আর বাদ রেখেছি—কাল থেকে কলকাতা শহর তোলপাড় করে বেড়িয়েছি। ওদিকে অরুণের সঙ্গে ওখানে গিয়ে উঠেছেন তা কি করে জানবো ? তা আপনার কথা বলতে বললেন, বাবাকে দেশে ফিরে যেতে বলুন। আমার এখন সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই—এই জিজ্ঞেস করুন না প্রভাসকে ?

প্রভাস বিষণ্ণ মুখে বললে, সে-সব কথা আর কি বলি ? কত রকম করে বোঝালুম। তা ওই এক বুলি মুখে ! আমি আর ফিরবো না দেশে, বাবাকে গিয়ে বলো গে যাও। আমি এখানে বেশ আছি। এসব কথা কি আপনার কাছে বলবার কথা, লজ্জায় মাথা কাটা যায়—কি করি বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করেছি কাকাবাবু ? এখন এক

উপায় আছে পুলিসে খবর দেওয়া। আপনার সঙ্গে সেই পরামর্শ করতেই আসা। আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, জোড়াসাঁকো থানায় গিয়ে পুলিসের কাছে এজাহার করে দেওয়া যাক—

গিরীন চিন্তিত মুখে বললে, তাতেই বা কি হবে? সেই ভাবছি। ছেলেমানুষ নয়, বয়েস হয়েছে ছাব্বিশ-সাতাশ, বিধবা—সে মেয়ে যা খুশি করতে পারে। পুলিস হস্তক্ষেপ করতে চাইবে না। তার ওপরে ওঁদের মানী বংশ, পুলিসে কেস্ করতে গেলেই এ নিয়ে খবরের কাগজে একটা লেখালেখি হবে, ওঁদের ছবি বেরুবে। একটা কেলেংকারীর কথা—ভাল কথা তো নয়? চারিদিকে ছি ছি পড়ে যাবে। এ সবই ভাবছি কি না! তা উনি যে-রকম বলেন সে-রকম করতে হবে। চলুন না হয় এখুনি তবে পুলিসে যাই—পুলিসে খবর দিলেই এখুনি প্রথম তো ওঁর মেয়েকে বেঁধে চালান দেবে—যদি অবিশ্যি পুলিসে এ কেস্ নেয়। তাঁকেই আসামী করবে—

গিরীন ধীরে ধীরে যে চিত্রপট কেদারের সামনে খুলে ধরলে, নিরীহ কেদার তাতে শিউরে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না না—পুলিসে যাওয়ার দরকার নেই।

গিরীন বললে, না কেন? আমার মনে হয় পুলিসে একবার যাওয়া উচিত। আমাদের মোটরে আসুন জোড়াসাঁকো থানায়। আপনি গিয়ে এজাহার করুন। আদালতে আপনাকে সব খুলে বলতে হবে এর পর। হয় কেস্ হোক্। আপনার মেয়ে যখন এ পথে গিয়ে পড়েছেন, তখন তাঁরও একটু শিক্ষা হয়ে যাক না! তিনটি বছর জেল ঠুকে দেবে এখন। ও অরুণকেও ছাড়বে না—আপনার মেয়েকেও ছাড়বে না। যা হয় হবে, আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে জোড়াসাঁকো থানায়। চলুন—কি বলো প্রভাস?

প্রভাস বললে, হ্যাঁ, তা যেতে হবে বৈকি। যা থাকে কপালে। শরৎদিকে আসামী হয়ে ডকে দাঁড়াতে হবে বলে আর কি করা, চলুন আপনি। আমার গ্রামের লোক আপনি। আমি এর একটা বিহিত না করে—

গিরীন বললে, না, বিহিত করাই উচিত। খারাপ পথে যখন পা দিয়েছে, তখন ওদের শাস্তি হয়ে যাওয়াই উচিত। জেল হলেই বা আপনি করবেন কি? আসুন, উঠুন গাড়িতে, আপনার আহারাদি হয়েছে?

কেদার যেন অকুলে কুল পেয়ে বললেন, না এখনও হয় নি। ভাত চড়াতে যাচ্ছিলাম—

—কি সর্ব্বনাশ! খাওয়া হয় নি এখনও? আপনি রান্না খাওয়া করে নিন—আমরা ততক্ষণ একটু অন্য কাজ সেরে আসি।

কেদার ব্যস্তভাবে বললেন, তোমরা যেন আমায় না বলে থানায় যেও না বাবাজি।

গিরীন বললে, আপনি না থাকলে তো পুলিসে এজাহার করাই হবে না। আমরা কে? আপনিই তো ফরিয়াদী—আপনার মেয়ে। আমরা বাইরের লোক—আমাদের কথা নেবেই না পুলিস। আপনাকে না নিয়ে গেলে তো কাজই হবে না। আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন, আমরা বেলা চারটের মধ্যে আসব।

প্রভাস ও গিরীন মোটর নিয়ে চলে গেলে কেদার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলেন। ঠিকমত ভাববার শক্তিও তখন তাঁর নেই—মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। জীবনে কখনো এ-ধরনের ভাবনা ভাবেন নি তিনি—নির্ব্বিরোধী নিরীহ মানুষ কেদার—শখের যাত্রাদলে গানের তালিম দিয়ে আর গ্রাম্য মুদির দোকানে বসে হাসিগল্প করেই চিরদিন কাটিয়ে এসেছেন। এমন জটিল ঘটনাজালের মধ্যে কখনো পড়েন নি, এমন ধরনের চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক অভ্যস্ত নয়।

একটা কথাই শুধু বার বার তাঁর মাথায় খেলতে লাগল—পুলিসে গেলে তাঁকে মেয়ের বিরুদ্ধে এজাহার করতে হবে, তাতে তাঁর মেয়ের জেল হয়ে যেতে পারে।

শরতের জেল হয়ে যেতে পারে!

আর এ মোকদ্দমার তিনিই হবেন ফরিয়াদী! আদালতে দাঁড়িয়ে মেয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে তাঁকে!

ঝি এসে বললে, বাবু ওনারা চলে গেল। দিদিমণির কথা কি বলে গেল বাবু? কখন আসবেন তিনি?

কেদারের চমক ভাঙলো ঝিয়ের কথায়। বললেন, হ্যাঁ—এই—কি বললে? ও, শরৎ? না, তার এখন আসবার দেরি আছে।

—তা আপনি আজ ভাত চড়াবেন না বাবু? দিদিমণির খবর তো পাওয়া গেল—এখন দুটো ভাতে ভাত যা হয় চড়িয়ে—

—না মেয়ে, এখন অবেলায় আর ভাত—দুটো চিঁড়ে এনে দেবে?

—ও মা, চিঁড়ে খেয়ে থাকবেন আপনি? তা দেন, পয়সা দেন্—নিয়ে আসি।

বাগানের পথে দিব্যি বাতাবিলেবু গাছের ছায়া পড়েছে, প্রায় বিকেল হতে চলল।

ঘণ্টা দুই পরে প্রভাস ও গিরীন মোটর নিয়ে ফিরে এসে দেখলে ঝি গাড়িবারান্দার সামনের রোয়াকে বসে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল কেদার কোথায় চলে গিয়েছেন, বাজার থেকে চিঁড়ে কিনে নিয়ে এসে সে আর তাঁকে দেখতে পায় নি। কেদারের কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলিটাও সেই সঙ্গে দেখা গেল নেই।

গিরীন বাগানের বাইরে এসে হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—কেমন বাবাঃ! বললাম যে সব আমার হাতে ছেড়ে দাও—গিরীন কুণ্ডুর মাথার দাম লাখ টাকা বাবা। ও পাড়াগেঁয়ে বুড়োর কানে এমন মন্তর ঝেড়েছি যে, এ-পথে আর কোন দিন হাঁটবে না। বলি নি তোমায়?

—আচ্ছা, বুড়োটা গেল কোথায়?

—কোথায় আর যাবে? গিয়ে দেখ গে যাও তোমাদের সেই কি পুর বলে, তার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে কাল সকাল লাগাৎ ঠেলে উঠেছে। লজ্জায় এ-কথা কারো কাছে এমনিই বলতে পারত না--তার ওপর যে পুলিসের ভয় দিইছি ঢুকিয়ে বুড়োর মাথায়—দেখবে যে রা কাটবে না কারো কাছে। এক ঢিলে দুই পাখী সাবাড়।

দমদমার বাগানবাড়ি থেকে বার হয়ে কেদার পুঁটুলি হাতে হন্‌হন্ করে পথে চলতে লাগলেন। হাতে পয়সার সচ্ছলতা নেই—খরচের দরুন যা কিছু ছিল, তা নিতান্তই সামান্য। তা ছাড়া কেদার এখনও কোথায় যাবেন না যাবেন ঠিক করে উঠতে পারেন নি—এখন তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, তাঁর ও কলকাতা শহরের মধ্যে অতি দ্রুত ও অতি বিস্তৃত একটি ব্যবধান সৃষ্টি করা। এই ব্যবধান যত বড় হবে, যত দূরে গিয়ে তিনি পড়তে পারবেন—তাঁর মেয়ে তত নিরাপদ।

সুতরাং পিছন ফিরে না চেয়ে এখন শুধু হেঁটেই যেতে হবে···হেঁটেই যেতে হবে। মেয়ের বিপদ না ঘটে···শুধু হাঁটতেই হবে। কিসের বিপদ মেয়ের, তা কেদারের ভাবার সময় বা অবসর নেই। মেয়ে যে খুব নিরাপদ আছে কি নেই—সে-সব ভাবনারও সময় নেই এখন। শুধু হাঁটতে হবে, কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে পড়তে হবে। প্রভাস ও গিরিন যেমন রেগে গিয়েছে, ওরা শোধ তুলে হয়তো ছাড়বে অরুণের ওপর। মোটরে করে এসে তাঁকে রাস্তা থেকে জোর করে ধরে নিয়ে না যায়।

ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই—ক্লান্তি নেই, পরিশ্রম নেই, শুধু পথ বেয়ে চলা—যতদূর

যাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সময় দমদমা থেকে সাত মাইল দূরে যশোর রোডের ধারে গাছতলায় বসে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখে দু-চারজন পথিকের ভিড় জমে গেল।

একজন বললে, কি হয়েছে মশায় ?

আর একজন বললে, বাড়ি কোথায় আপনার ? কি হয়েছে ?

লোকজনের মধ্যে বেশির ভাগ চাষী লোক, দুজন দমদমায় এইচ-এম-ভি গ্রামোফোন কোম্পানীর কারখানায় কাজ করে, ছুটির পর সাইকেলে গ্রামে ফিরছিল। তাদের একজন এগিয়ে এসে বললে—কি হয়েছে মশাই ? আমিও ব্রাহ্মণ, আসুন আমার বাড়ি—এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে নেমে গিয়ে গরানহাটি কেশবপুরে আমার বাড়ি—

কেদার বললেন, না ও কিছু না—আমি এখন হেঁটে যাবো—

—কাঁদছেন কেন, কি হয়েছে আপনার বলতেই হবে—আসুন আপনি দয়া করে। এ অন্ধকার রাত্রে একা যাবেন কোথায় ?

কেদার কাকুতি মিনতির সুরে বললেন, না বাবু, আমি যাবো না। আমার কিছুই হয় নি—এই গিয়ে মাঝে মাঝে পেটে ফিক্ ব্যথা ধরে কি না। ও কিছু নয়, এক্ষুনি সেরে যাবে—সেরে গিয়েছে অনেকটা।

কেদার পুঁটুলি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে উঠে বারাসাতের দিকে রওনা দিলেন পথ ধরে।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

ওদের মধ্যে একজন মুচকি হেসে বললে, পাগল—পাগল ও. দেখেই চেনা যায়। পাগল—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে পথে রাত এল। অন্ধকার রাত। কেদারের দৃক্‌পাত নেই—কোথায় যাচ্ছেন তা তিনি এখনও জানেন না। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ন বাজে পেছন থেকে, মাল বোঝাই লরি যশোর রোড বেয়ে বারাসাত কি বনগাঁয়ে মাল নিয়ে চলেছে—কেদার হর্ন শুনলেই পথের ধারের গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়েন, প্রভাসদের মোটর তাঁর সন্ধানে পুলিস নিয়ে বেরিয়েছে কি না কে জানে। সারাদিন পেটে কিছু যায় নি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেদার এখন আহারের কোন প্রয়োজন পর্য্যন্ত অনুভব করছেন না। শরীর এবং মন যেন তাদের সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে একটি মাত্র অনুভূতিতে পর্য্যবসিত হয়েছে, সেটা সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তীক্ষ্ন ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অন্য কিছু নয়—কন্যার উপর তাঁর গভীর স্নেহ ও একটি অদ্ভুত করুণা। শরৎ যেন ছাব্বিশ বছরের যুবতী নেই, তাঁর মনোরাজ্যে সে কখন শিশু মেয়েটি হয়ে ফিরে এসেছে, যে গড়শিবপুরের বাড়িতে জঙ্গলের ধারে কুচফল তুলে খেলা করতো—তার খেলাঘরে ধুলোর ভাত ও পাথরকুচি পাতা মাছ খেতে হয়েছে বসে বসে। তার এখনও কি বুদ্ধিই বা হয়েছিল, চিরকাল পাড়াগাঁয়ে কাটানোর ফলে শহরের ব্যাপার কি বা সে বোঝে !

একবার ভাবলেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে পাশের বাগানের চাটুজ্জে মশায়ের কাছে সব কথা ভেঙে বলে তাঁর সাহায্য চাইলে কেমন হয়। কিন্তু পুলিসের আইন বড় কড়া। সেখানে চাটুজ্জে মশায় কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন ? বিশেষ করে এমন একটা কথা তিনি কি চাটুজ্জে মশায়কে খুলে বলতে পারবেন ? তবে কথা গোপন থাকবে না। ওই ঝিটা এতক্ষণ কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র করেছে—ঝি কি আর এতক্ষণ এ কথা না জেনেছে। ওই প্রভাস ও গিরীনই তাকে সব কথা প্রকাশ করে বলেছে এতক্ষণ। না, সেখানে আর ফিরবার উপায় নেই—এখন তো নয়ই, এর পর—কত পরে তা তিনি এখনও জানেন না—যা হয় একটা কিছু করবেন তিনি।

বারাসাতের বাজারে পেঁছে কেদারের ইচ্ছে হ'ল এখানে চা কিনে খান দোকান বেছে—

রাস্তার ধারেই অনেকগুলো চায়ের দোকান। আজ শরৎ নেই সঙ্গে—যে তাঁকে দোকানের চা খেতে বাধা দেবে, যে তাঁকে ইহকালের অনাচার থেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর পরকালের মুক্তির পথ খোলসা করবার জন্যে সচেষ্ট ছিল চিরদিন—আজ সে নির্ম্মমভাবে সমস্ত অনাচারের স্বাধীনতা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে—সুতরাং অনাচার তিনি করবেনই। যা হয় হবে, পরকাল তিনি মানেন না। আরও জোর করে, ইচ্ছে করে তিনি যা খুশি অনাচার করবেন। কে দেখবার আছে তাঁর?

রাস্তার ধারের দোকান থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে কেদার আবার হনহন করে রাস্তা হাঁটতে লাগলেন—সারা রাত ধরে পথ চলে সকালের দিকে দত্তপুকুর থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামে এসে পথের ধারেই বসে পড়লেন। আর তিনি ক্ষুধা ও পথশ্রম-ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারছেন না।

জনৈক গ্রাম্য লোক সকালে গাড়ু হাতে মাঠ থেকে ফিরে আসছিল, তাঁকে এ অবস্থায় দেখে বললে—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে বারাসাত থেকে।

কেদার একটু মিথ্যে কথার আমদানি করলেন, লোককে সন্ধান দেওয়ার দরকার কি, তিনি কোথা থেকে আসছেন?

লোকটি আবার বললে, তা এখানে বসে এমন ভাবে?

—একটু বসে আছি, এইবার উঠি।

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—আজ্ঞে, প্রাতঃপ্রণাম। আমার নাম হরিহর ঘোষ, কায়স্থ—আপনি যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা বলি! আমার বাড়ি এবেলা দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে দুটি সেবা করে যান। আমরাও প্রসাদ পাবো এখন। চলুন উঠুন।

কেদার কিছুতেই প্রথমটা রাজী হন নি—কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে লোকটার কেমন দয়া ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল, সে পীড়াপীড়ি করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। কেদার দেখলেন লোকটি সম্পন্ন অবস্থার গ্রাম্য গৃহস্থ, বাইরে বড় চণ্ডীমণ্ডপ, অনেকগুলো ধানের মরাই, বাড়ির সামনে একটা পানাভরা ডোবা। সেই ছোট পানাভরা ডোবার আবার একটা ঘাট বাঁধানো দেখে দুঃখের মধ্যেও কেদার ভাবলেন—এদের দেশে এর নাম পুকুর, এর আবার বাঁধা ঘাট! এদের নিয়ে গিয়ে গড়ের কালো পায়রার দীঘিটা একবার দেখিয়ে দিতে হয়—

ভাল লাগল জায়গাটা তবুও। কেদার সারাদিন রইলেন, সন্ধ্যার সময় বিদায় নিতে চাইলে গৃহস্বামী আপত্তি করে বললে—তা হবে না ঠাকুরমশায়। সামনে অন্ধকার রাত, আপনাকে কি ছেড়ে দিতে পারি এখন? থাকুন না এখানে দুদিন।

ইতিমধ্যে কেদার নিজের একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি গরীব ব্রাহ্মণ। গোবরডাঙার জমিদার বাড়িতে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে চলেছেন।

লোকটা তাই বললে, দুদিন থাকুন, দেখি যদি আমাদের এখান থেকে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি! আমি দুপুরবেলা দু-একজনকে আপনার কথা বলেছি—সকলেই কিছু কিছু দিতে রাজী হয়েছে।

কেদার বিপদে পড়লেন। তিনি গড়শিবপুরের রাজবংশের লোক, কারো কাছে হাত পেতে কখনো কিছু নিতে পারবেন না ওভাবে—যতই অভাব থাকুক। নিজেকে গরীব ব্রাহ্মণ বলে তিনি যে মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন।

রাত্রিটা অগত্যা থেকে যেতে হ'ল। পরদিন সকালে তিনি যখন আবার বিদায় চাইলেন, গৃহস্বামী তিনটি টাকা তাঁর হাতে দিতে গেল। বললে—এই উঠেছে ঠাকুরমশায়, মিত্তির মশায় দিয়েছেন এক টাকা আর আমি সামান্য কিছু—এই নিয়ে যান—

কেদার বিনীত ভাবে বললেন, আমি ও নিতে পারবো না—

ঘোষ মশায় আশ্চর্য হয়ে বললে, নেবেন না? কেন?

—আজ্ঞে—ইয়ে—ও আমার দরকার নেই।

ঘোষ মশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, এর চেয়ে বেশী উঠলো না যে ঠাকুর মশায়? না হয় আমি আর একটা টাকা—

কেদার বললেন, না—না—আপনি অতি মহৎ লোক, যা করেছেন তা কেউ করে না। কিন্তু আমি—আমি নিতে পারবো না। আমি আপনাকে এমনিই আশীর্বাদ করছি—আপনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হোন—ভগবান আপনাদের সুখে রাখুন—

কেদারের চোখে জল দেখে গৃহস্বামী বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল, তার পরে উঠে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা, আপনি ঠিকমত পরিচয় দেন নি বোধ হয়। এ বাজারে চার টাকা ছেড়ে দেয় এমন লোক আমি দেখি নি—বলুন আপনি কে—কি হয়েছে আপনার—

কেদার উদ্গত অশ্রু কোনোমতে চেপে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় উঠতে উঠতে বললেন—কিছু হয় নি, কিছু হয় নি। আমি আসি, আমার বিশেষ দরকার আছে—কিছু মনে করবেন না—

গৃহস্বামী টাকাটা হাতে করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন সারাদিন অনবরত পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার পর কেদার গড়শিবপুর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে হলুদপুরের বাজারে পেঁছিলেন। এখানে কেউ তাঁকে চিনতো না। চার ক্রোশ দূরের এ বাজারে তাঁর যাতায়াত বিশেষ ছিল না। না চেনে সে খুব ভালো। একটা পুকুরের বাঁধা ঘাটের চাতালে এসে বসলেন, এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছেন কিসের ঝোঁকে, কিছু বিবেচনা না করেই, এই বার তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো—কোথায় যাবেন তিনি? গাঁয়ে ফেরা কি উচিত হবে? মেয়ের কথা লোকে জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবেন তিনি? কেদারের উদ্‌ভ্রান্ত মন এ দু-দিন এসব কথা ভাববার অবকাশ পায় নি।

ছয়

রাত্রে শরতের ভাল ঘুম হ'ল না, অচেনা জায়গা ভাল ঘুম হবার কথা নয়, দেশের বাড়ি ছেড়ে এসে পর্যন্তই তার ঘুম তেমন হয় না। কিন্তু কাল রাত্রে কি জানি কেমন হ'ল, বাবার কথা মনে হয়েই হোক্‌ বা অন্য যে কারণেই হোক্‌—শরৎ প্রথম দিকে তো চোখের পাতা একটুও বোজাতে পারে নি।

প্রভাসের বৌদিদি তার পাশে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। এত শব্দ এত আওয়াজের মধ্যে মানুষ পারে ঘুমুতে? মোটর গাড়ি যাচ্ছে, লোকজনের কথাবার্তা চলেছে—ভাল রকম অন্ধকার হয় না, জানলা দিয়ে কোথা থেকে আলো এসে পড়েছে দেওয়ালের গায়ে—আর সারারাতই কি লোক-চলাচল করবে আর গান-বাজনা চলবে? এখানে এতও গানবাজনা হয়! ডুগি-তবলার শব্দ, হারমোনিয়মের আওয়াজ, মেয়ে-গলার গান চলেছে আশেপাশের সব বাড়ি থেকে। দমদমার বাগানবাড়িতে থাকতে সে বুঝতে পারে নি আসল কলকাতা

শহর কি। এখন দেখা যাচ্ছে এখানকার তুলনায় দমদমার বাগানবাড়ি তাদের গড়শিবপুরের জঙ্গলের সমান।

ভোরে উঠে সে গঙ্গাস্নান করে আসবে—এখান থেকে গঙ্গা কতদূর কে জানে? প্রভাস-দাকে বললে মোটরে নিয়ে যাবে এখন। সকালে প্রভাসের বৌদিদির ডাকে তার ঘুম ভাঙল। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছে নাকি তবে? ওর মুখে কেমন ধরনের ভয় ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রভাসের বৌদিদির চোখ এড়ালো না।

সে বললে, ভাবনা কি দিদি, দেরিতে উঠেছ তাই কি? তোমায় উঠে আপিস করতে হচ্ছে না তো আর। মুখ ধুয়ে নাও, চা হয়ে গিয়েছে—

শরৎ লজ্জিত মুখে জানালে এত সকালে সে চা খায় না। তার চা খাওয়ায় কতকগুলো বাধা আছে—স্নান করতে হবে, কাপড় ছাড়তে হবে—সে-সব হাঙ্গামায় এখন কোন দরকার নেই, থাক্ গে। গঙ্গা এখান থেকে কতদূর? এক বার গঙ্গায় নাইতে যাবার বড় ইচ্ছে তার। প্রভাসদা কখন আসবে?

প্রভাসের বৌদি বললে, গঙ্গা নাইবে? চল না আমাদের—আচ্ছা, দেখি বোসো। ওরা আসুক সব—

—কখন আসবে? আসতে বেশী দেরি করবে না তো প্রভাসদা?

—কি জানি ভাই। তবে দেরি হওয়ার কথা নয় তো। এখুনি আসবে—

—গঙ্গা নেয়ে এসে আমি বাবার কাছে যাবো—আমায় রেখে আসুক—

—সে কি ভাই? এ-বেলাটা থাকবে না এখানে? থেকে খাওয়াদাওয়া করে ওবেলা—

শরৎ চিন্তিত মুখে বললে, কাল রাতে গেলাম না, বাবা কত ভেবেছেন। আমার কি থাকবার জো আছে যে থাকব?

প্রভাসের বৌদিদি বললে, ওবেলা চলো ভাই সিনেমা দেখে দুজনে—

—কি দেখে?

—সিনেমা—মানে বায়োস্কোপ - টকি—

—ও—

—দেখে চলো আমরা যশোর রোড দিয়ে মটোরে বেড়িয়ে আসবো। চাঁদের আলো আছে—

শরৎ হেসে বললে, মোটে একাদশী গেল বুধবারে, এরই মধ্যে চাঁদের আলো কোথায় পাবেন? আপনারা কলকাতার লোক, আপনাদের সে খবরে কোনো দরকার নেই—ওখানে সারারাতই গ্যাসের আলো—ইলেকট্রিক আলো—

ঈষৎ অপ্রতিভের সুরে প্রভাসের বৌদিদি বললে, তা বটে ভাই, যা বলেছ। ওসব খেয়াল থাকে না।

এমন সময় পাশে কমলাদের ঘর থেকে জড়িত স্বরে কে বলে উঠল—আরে ও হেনা বিবি এদিকে এসো না চাঁদ, আলোর সুইচটা যে খুঁজে পাচ্ছি নে—ও হেনা বিবি—

প্রভাসের বৌদিদি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, আ মরণ, বেলা সাড়ে সাতটা বাজে—উনি আলোর সুইচ খুঁজে বেড়াচ্ছেন এখন—

শরৎ বললে, কি হয়েছে, কে উনি?

—কে জানে কে? মাতালের মরণ যত—পাশের বাড়ির এক বুড়ো। রোজ ভাই অমনি করে—

শরৎও হেসে ফেললে মাতাল বুড়োটার কথা ভেবে। বললে, ডাকছে কাকে? ও যেন পাশের ঘর থেকে কথা বললে বলে মনে হ'ল—না?

—ওই পাশের বাড়ি, দোতলার জানলাটা খোলা রয়েছে দেখছ তো, ওই ঘর। দাঁড়াও আসছি—

শরৎ শুনলে বুড়ো মাতালটা হঠাৎ 'এই যে হেনা বিবি বলিহারি যাই! বলি সাসি' জানলা বন্ধ করে'—এই পর্যন্ত চেঁচিয়ে বলে উঠেই চুপ করে গেল। কে যেন তার মুখে থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে কমলাও ঘরে ঢুকল। শরৎ হাসিমুখে বলে উঠল—এসো ভাই গঙ্গাজল এসো—তোমাকেই খুঁজছি—গঙ্গা নাইতে চলো না কেন যাই সবাই মিলে?

কমলা সত্যিই সুন্দরী মেয়ে। ঘুম ভেঙে সদ্য উঠে এসেছে, আলুথালু চুলের রাশ খোঁপার বাঁধন ভেঙে ঘাড়ে পিঠে এলিয়ে পড়েছে, বড় বড় চোখে অলস দৃষ্টি, মুখের ভাবেও জড়তা কাটে নি—বেশ ফর্সা নিটোল হাত দুটি কেমন চমৎকার ভঙ্গিতে ঘাড়ের পেছনে তুলে ধরে এলোচুল বাঁধবার চেষ্টা করছে। আসলে বাঁধার ছলে একটা কায়দা মাত্র, চুল বাঁধবার চেয়ে ওই ভঙ্গিটা দেখাবার আগ্রহটাই ওখানে বেশি। শরতের হাসি পায়—ছেলেমানুষ কমলা!

শরৎ এসব বোঝে। সেও এক সময়ে সুন্দরী কিশোরী ছিল, ওই কমলার মত বয়সে, সে জানে, নিজেকে ভাল দেখানোর কত খুঁটিনাটি আগ্রহ অকারণে মেয়েদের মনে জাগে। তারও জাগত। এসব শিখিয়ে দিতে হয় না, বলে দিতে হয় না মেয়েদের। আপনিই জাগে। শরতের কেমন স্নেহ হয় কমলার ওপর। স্নেহের সুরেই বলে—ভাই, চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায় গঙ্গাজল—

—সত্যি?

—সত্যি বলছি।

কমলার মুখে লজ্জার আভাস নেই, সে যে পথে পা দিয়েছে, সে পথের পথচারিণীরা লজ্জাবতী লতা নয়, বনচাঁড়ালের পাতা—টুসি দিলে নাচে। কমলা হেসে বললে, আপনার ভাল লাগে?

—খুব, ভাই।—খুব—

—তবে তো আমার ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো- এদিকে আবার গঙ্গাজল পাতিয়েছি—

কমলার কথার নির্লজ্জ সুর শরতের কানে বাজল। সে মনে মনে ভাবলে, মেয়েটি ভালো, কিন্তু অল্প বয়সে একটু বেশী ফাজিল হয়ে পড়েছে। আমি ওর চেয়ে কত বড়। মা না হলেও কাকী খুড়ীর বয়িসী—আমার সঙ্গে কেমন ধরনের কথা বলছে দ্যাখো—

কমলা বললে, আপনি চা খেয়েছেন?

শরৎ হেসে বললে, না ভাই, আমি বিধবা মানুষ, নাই নি, ধুই নি—এখুনি চা খাবো কি করে? চা খাওয়ার কোনো তাড়াতাড়ি নেই আমার। এখন গঙ্গা নাইবার কি ব্যবস্থা হয় বলো তো?

—চলুন না হেঁটে গিয়ে নেয়ে আসি। এই তো আহিরীটোলা দিয়ে গেলে সামনেই গঙ্গা—

প্রভাসের বৌদিদি ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল; এমন সময়ে পেছন থেকে গিরীন ডাকলে—ও হেনা বিবি—

হেনা দাঁড়িয়ে গিয়ে পেছন ফিরে বললে, কখন এলে? কি ব্যাপার? ওদিকে—

গিরীন চোখ টিপে বললে, আস্তে।

হেনা এবার গলার সুর নিচু করে বললে, কি হ'ল?

—এখনো হয় নি কিছু। আমরা এখনো বুড়োর কাছে যাই নি। বেশী বেলা হলে যাবো। এদিকের খবর কি?

হেনা রাগের সুরে বললে, তোমরা আমায় মজাবে দেখছি। এখনও সে কিছু খায় নি, এ বাড়ি এসে পর্য্যন্ত দাঁতে কুটো কাটে নি। না খেয়ে ও কতক্ষণ থাকবে, ও আপদ যেখানে পারো বাপু তোমরা নিয়ে যাও। আমার টাকা আমায় চুকিয়ে দাও, মিটে গেল গোলমাল। না খেয়ে মরবে নাকি শেষটা—তার পর এদিকে হরি সা যা কাণ্ড বাধিয়েছিল! হেনা বিবি বলে ডাকাডাকি। সারারাত কমুলির ঘরে বসে মদ খেয়েচে—এই একটু আগে কি চেঁচামেচি! মেয়েটা যাই একটু সরল গোছের, কোনোরকমে তাকে বুঝিয়ে দিলাম, পাশের বাড়িতে একটা মাতাল আছে তারই কাণ্ড, বিশ্বাস করেছে কিনা কে জানে—

গিরীন হাসিমুখে বললে, ভয় কি তোমার হেনা বিবি, রাত যখন এখানে কাটিয়েছে তখন ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। ওর সমাজ গিয়েছে, ধর্ম্ম গিয়েছে। ওর বাবার কাছে সেই কথাই বলতে যাচ্ছি—

—কি বলবে ?

—সে-সব বুদ্ধি কি তোমাদের আছে ? গিরীনের কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করে চলতে হয় সব ব্যাটাকে।

—গালাগাল দিও না বলছি—

—গালাগাল তোমাকে তো দিই নি হেনা বিবি, চটো কেন ? তার পর শোনো। সন্দে অবধি রেখে দাও। সন্দের আগে আবার আমরা আসবো।

—টাকা নিয়ে এসো যেন।

—অত অবিশ্বাস কিসের হেনা বিবি ? নতুন খদ্দেরের কাছে তাগাদা করো, আমাদের কাছে নয়।

—আচ্ছা, কথায় দরকার নেই—যাও এখন। আমি দেখি গে কমুলিটা ছেলেমানুষ—কি বলতে কি বলে বসে—ওকে সামলে নিয়ে চলতে হচ্ছে আবার—

হেনা ঘরে ঢুকে দেখলে শরৎ ও কমলা চুল খুলে তেল মাখতে বসেছে। বললে—ও কি ? নাইতে যাবে নাকি ভাই ?

কমলা বললে, গঙ্গাজলকে নিয়ে নেয়ে আসি—

হেনা প্রশংসার দৃষ্টিতে শরতের সুদীর্ঘ কালো কেশপাশের দিকে চেয়ে বললে, কি সুন্দর চুল ভাই তোমার মাথায় ? এমন চুল যদি আমাদের মাথায় থাকতো—

কমলা বললে, আমিও তাই বলছিলাম গঙ্গাজলকে—

শরৎ সলজ্জ স্বরে বললে, যান, কি যে সব বলেন ! গঙ্গাজলের মাথায় চুল কি কম সুন্দর ? দেখুন দিকি তাকিয়ে ? তা ছাড়া আমার লম্বা চুলের কি দরকার আছে ভাই ? বাবা কিছু পাছে মনে করেন তাই—নইলে ও চুল আমি এতদিন বঁটি দিয়ে কেটে ফেলতাম। শুধু বাবার মুখের দিকে চেয়ে পারি নে। তাঁর চোখ দিয়ে যাতে জল পড়ে, তাতে আমার ধর্ম্ম নেই।

হেনা এ পথের পুরাতন পথিক, তার মন কোমল হৃদয়-বৃত্তির ধার ধারে না অনেক দিন থেকে—যা কিছু ছিল তাও পাষাণ হয়ে গিয়েচে চর্চ্চার অভাবে, শরতের কথায় তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত হ'ল না—কিন্তু কমলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হেনা বললে, কমলা, এঁকে গঙ্গায় নিয়ে যাবি ? কেন, বাড়িতে চান কর না ? বেলা হয়ে যাবে।

শরতের দিকে চেয়ে বললে, সে তুমি যেও না ভাই, ও ছেলেমানুষ, পথ চেনে না—কোথায় যেতে কোথায় নিয়ে যাবে।

কমলা বললে, বা রে, আমি বুঝি আর—সেবার তো আমি—

হেনা কমলাকে চোখ টিপে বললে, থাম বাপু তুই। তুই ভারি জানিস্ রাস্তা-ঘাট। তার পর দিদিকে নিয়ে যেতে একটা বিপদ হোক রাস্তায়! যে গুণ্ডা আর বদমাইশের ভিড়—

শরৎ বললে, সত্যি নাকি ভাই, বলুন না?

—আমি কি আর মিথ্যে কথা বলছি—ও ছেলেমানুষ, কি জানে?

এইবার কমলা বললে, না—তা—হ্যাঁ আছে বটে।

—কি আছে ভাই গঙ্গাজল?

কমলাকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই বললে, কি নেই কলকাতা শহরে বলতে পারো? সব আছে। আজকাল আবার সোলজারগুলো ঘুরে বেড়ায় সর্ব্ব জায়গায়।

—সে আবার কি?

—সোলজার মানে গোরা সৈন্য। এরা যে অঞ্চলে আছে, তার ত্রিসীমানায় মেয়েমানুষের যাওয়া উচিত নয়। না, তুমি যেও না ভাই। আমি তোমায় যেতে দিতে পারি নে। তোমার ভাল-মন্দর জন্যে আমি দায়ী যখন। প্রভাস-ঠাকুরপো আমার হাতে তোমায় যখন সঁপে দিয়ে গিয়েছে।

কমলা বললে, আমরা তেল মাখলাম যে।

—তেল মেখে বাড়ির বাথরুমে ওঁকে নিয়ে চান্ করো। মিছিমিছি কেন ওঁকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া?

আড়ালে নিয়ে গিয়ে কমলাকে হেনা খুব বকলে। প্রভাসের কাছ থেকে সেও টাকা নেবে যখন, তখন এতটুকু বুদ্ধি নিয়ে কাজ করলে কি চলে না? বাড়ির মধ্যেই ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, একবার বাইরের রাস্তায় পা দিলে আর সামলানো যাবে না ওকে। এত কম বুদ্ধি কেন কমলার! হরি সা লোকটাকে কাল রাত্রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে কি কোম্পানীর রাজ্য অচল হ'ত? সামলে না নিলে সব কথা ফাঁস হয়ে যেতো যে আর একটু হলে? ঘটে বুদ্ধি হবে কবে তার?···ইত্যাদি।

কমলা গুরুজন-কর্ত্তৃক-তিরস্কৃতা-বালিকার ন্যায় চুপ করে রইল।

হেনা বললে, তুমি আর ওঘরে যেও না। আমি করছি যা করবার—তুমি যাও। হরি সা যেন এখন আর না ঢোকে—

হেনা ঘরে ঢুকে শরৎকে বললে, গঙ্গায় যাওয়া হবে না ভাই। পথে আজকাল বড় গোলমাল, তুমি বাথরুমে নেয়ে নাও, আমি সব যোগাড় করে রেখে এলাম—

স্নান করে আসবার কিছু পরে হেনা শরৎকে বললে, তোমার খাওয়ার কি করবো ভাই? আমাদের রান্না চলবে না তো?

—আমার খাওয়ার জন্যে কি ভাই! দুটো আলো চাল আনুন, ফুটিয়ে নেবো।

—মাছমাংস চলে না—না? গাঁ থেকে এসেছ, এখন চলুক না, কে আর দেখতে আসছে ভাই?

প্রভাসের বৌদিদির এ কথায় শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয় বটে, কিন্তু হিন্দু তো—সে একজন ব্রাহ্মণের বিধবাকে একথা বলতে পারলে কি করে? অন্য জায়গায় এ ধরনের কথা বললে শরৎ নিজেকে অপমানিতা বিবেচনা করত, তবে এরা কলকাতার লোক, এদের কথা স্বতন্ত্র।

শরৎ গম্ভীর মুখে বললে, না ও-সব চলে না। ও কথাই বলবেন না আর—

হেনা মনে মনে বললে, বাপ রে, দেমাক দ্যাখো আবার! কথা বলেছি তো ওঁর গায়ে ফোস্কা পড়েছে। তোমার দেমাক আমি ভাঙবো, যদি দিন পাই—কত দেখলাম ওরকম, শেষ পর্য্যন্ত টিকল না কোনটা।

শরৎ বিকেল থেকে কেবল দমদমায় ফেরবার জন্যে তাগাদা করতে লাগল। হেনা ক্রমাগত বুঝিয়ে রাখে, ওরা এখনো আসছে না, এলেই পাঠিয়ে দেবে। শরৎ তো জলে পড়ে নেই—এর জন্যে ব্যস্ত কি ?

কমলার দেখা নেই অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ বললে, গঙ্গাজল কই, তাকে দেখছি নে—

হেনা কমলাকে সরিয়ে দিয়েছিল, কাঁচা লোক, কখন কি বলে বসবে, করে বসবে—সব মাটি হবে। তা ছাড়া কমলার ঘরে এমন সব জিনিসপত্র আছে, যা দেখলে শরতের মনে সন্দেহ হতে পারে। হরি সা'র একটা বিছানা, আলমারিতে তার দাড়ি কামানোর আসবাব, বড় নল লাগানো গড়গড়া ইত্যাদি। মদের বোতলগুলো না হয় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে না বুঝতে পারলে—কিন্তু পুরুষের বাসের এসব চিহ্নের জবাবদিহি দিয়ে মরতে হবে হেনাকে!

বিকেলের দিকে হেনা বললে, চলো ভাই টকি দেখে আসি—

—সে কোথায় ?

—চৌরঙ্গীতে বলো, শ্যামবাজারে বলো—

—বাবার কাছে কখন যাবে ? ওরা কখন আসবে ?

—চলো, টকি দেখে দমদমায় তোমায় রেখে আসবো—

শরৎ তখুনি রাজী হয়ে গেল। টকি দেখবার লোভ যে তার না হয়েছিল তা নয়। বিশেষ করে টকি দেখেই যখন বাবার কাছে যাওয়া হচ্ছে তখন আর গোলমাল নেই এর ভেতর।

কিন্তু হেনার আসল উদ্দেশ্য কোনো রকমে ওকে ভুলিয়ে রাখা। টকি দেখবার জন্যে গাড়ি ডাকতে গিয়েছে বলে দেরি করিয়ে সে প্রায় সন্ধ্যা করে ফেললে। শরৎ ব্যস্ত হয়ে কেবলই তাগাদা দিতে লাগল—কখন গাড়ি আসবে, কখন যাওয়া হবে। হেনাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, এদের কারো দেখা নেই—পোড়ারমুখো গিরীনটা লম্বা লম্বা কথা বলে, তারও তো চুলের টিকি দেখা যাচ্ছে না, গিয়েছে সেই সকাল বেলা। যা করবি কর্‌গে বাপু, টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে এ আপদ তোরা যেখানে পারিস্ নিয়ে যা, তার এত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি ? এদিকে একে আর বুঝিয়ে রাখা যায় না।

সন্ধ্যার পরে গিরীন এসে নিচের তলায় হেনাকে ডেকে পাঠালে।

হেনা তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে, কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করি তোমাদের ? আমার ঘাড়ে যে চাপিয়ে দিয়ে গেলে এখন আমি করি কি ? ও যে থাকতে চাইছে না মোটে। কোথায় নেবে নিয়ে যাও না, আমি কতকাল ভুলিয়ে রাখবো ? আমার থিয়েটার আছে কাল। কাল ওকে কার কাছে রাখবো ? ওদিকে কন্দুর করলে ?

গিরীন তুড়ি দিয়ে গর্ব্বের সুরে বললে, সব ঠিক।

—কি হ'ল ?

—বুড়োকে ভাগিয়েছি। সে বলবো এখন পরে। সে পুঁটুলি নিয়ে বুঝলে—হি-হি-হি—

—কি বলো না ?

—পুঁটুলি নিয়ে ভেগেছে হি-হি—ঝি চিঁড়ে আনতে গিয়েছে আর সেই ফাঁকে হি-হি—পুলিসের এ্যায়সা ভয় দেখিয়ে দিইছি, বুড়োটা আর এ মুখো হবে না।

—বেশ, এখন নিয়ে যাও—

—দ্যাখো, ওকে একটু ভুলোও-টুলোও। পাড়াগাঁয়ে গরীব ঘরে থাকতো, সুখ আমোদ-আহ্লাদের মুখ দেখে নি। গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড়ের লোভ দেখাবে—

—ওরে বাপ রে, বলেছি তো ও মেয়ে তেমন না। একটুখানি মাছমাংস খাওয়ার কথা

বলেছিলাম তো অমনি ফোঁস করে উঠল—আর কেবল হা বাবা যো বাবা—

—তবে আর তোমার কাছে দিয়েছি কেন হেনা বিবি ? পাকা লোকের কাছে রেখেছি, আজ রাতটা রেখে দাও, রেখে যা পারো করো। আজ আর নিয়ে যাই কোথায় ? এখনো কিছু ঠিক করি নি। প্রভাসের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, প্রভাস বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না। অরুণ আজ নাইট-ডিউটি করবে আপিসে। আমি একা—

—কেন তুমি একাই একশো বলে যে বড্ড গোমর করো। লম্বা লম্বা কথা বলবার সময় হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা - এখন কাজের সময়ে হেনা বিবি তুমি করো। আরও টাকা চাই তা বলে দিচ্ছি—

—যাহোক, যা বললাম আজকার রাতটা তো রাখো—

—ও টকি দেখতে যাবে বলছিল, নিয়ে যাবো ?

—দরকার নেই। বাড়ির বার করবার হ্যাঙ্গামা অনেক। ভুলিয়ে রাখো—

—কাল সকালে এসো বাপু। কাল আমার থিয়েটার, আমার দ্বারা কাল কোনো কাজ হবে না বলে দিচ্ছি।

হেনা মুখ চুন করে শরতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, বড় মুশকিল। প্রভাস-ঠাকুরপোর বাবার বড় অসুখ, এখন যান তখন যান। হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়েছে। এই মাত্তর খবর দিয়ে পাঠিয়েছে।

শরৎ উদ্বেগের সুরে বললে, অসুখ ! তা বয়সও তো হয়েছে—বাবা বলেন তাঁর চেয়ে দশ-বারো বছরের বড় !

—তা তো বুঝলুম। এদিকে এখন উপায় !

—আজ কি দমদমা যাওয়া হবে না ?

—কি করে আর যাওয়া হচ্ছে বলো ভাই। প্রভাস-ঠাকুরপোর গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না তো—

—কেন ভাড়াটে গাড়ি ?

—কে নিয়ে যাবে ? তুমি আমি দুই মেয়েমানুষ। ভাড়াটে গাড়িতে ভরসা করে যাওয়া চলবে না। কাল সকালেই যা হয় ব্যবস্থা হবে।

শরৎদি অগত্যা রাজী হ'ল। না হয়ে উপায় যখন নেই।

সন্ধ্যার পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে হেনা গিয়ে ছাদে উঠল। চারদিকে আলোর কুরকুট্টি, নিচের রাস্তা দিয়ে সারবন্দী গাড়ি ঘোড়া, মোটর, কর্মব্যস্ত জনস্রোত, ফিরিওয়ালারা কত কি হেঁকে যাচ্ছে, বেলফুলের মালাওয়ালা—'চাই বেলফুলের গোড়ে' বলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁকছে, শরৎ মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

বললে, সত্যি, শহর বটে কোলকাতা। জায়গার মত জায়গা একথা ঠিক। কি লোকজন, কি আলোর বাহার ! আমাদের গাঁ এতক্ষণ অন্ধকার হয়ে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে জঙ্গলে।

হেনা অবসর বুঝে অমনি বললে, আমিও তো তাই বলি, এখানেই কেন থেকে যাও না ? সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। সুখে থাকবে, খাও-দাও, আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াও—

শরৎ হেসে বললে, তা তো বুঝলাম। আমার ইচ্ছে করে না যে তা নয়। কিন্তু চলবে কি করে ? বাবা গরীব মানুষ—

হেনা উৎসাহের সুরে বললে, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে এখন। তুমি রাজী হয়ে যাও ভাই—

কি বন্দোবস্ত হবে ? বাবার চাকরি করে দিতে পারা যায় যদি, তবে সব হয়। গড়শিব-পুরের জঙ্গলে থেকে আমার প্রাণও হাঁপিয়ে উঠেছে—দুদিন এখানে থেকে বাঁচি—

—বেশ কথা তো! কলকাতার মত জায়গা আছে ভাই? এখানে নিত্য আমোদ, লোকজন—ইচ্ছে হ'ল আজ শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে গেলাম—ইচ্ছে হ'ল আজ জু'তে গেলাম—

—সে আবার কি?

—মানে চিড়িয়াখানা। যখন যেখানে যেতে চাও গেলে, যা খাবার ইচ্ছে হয় খেলে, এই তোমার বয়েস! হেসে খেলে যদি এখন না বেড়ালে তবে কবে আর কি করবে? মানব-জীবনে এই সবই তো আসল। জঙ্গলে থাকলাম আর আলোচাল খেলাম—এজন্যে কি আসা জগতে?

—কি করব বলুন। অল্প বয়সে কপাল পুড়েছে যখন, তখন কি আর উপায় আছে—ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের? বাবাও টাকার মানুষ নন যে কলকাতায় বাসা করে রাখবেন।

—তুমি ইচ্ছে করলেই সব হয়। কলকাতায় থাকতে চাও, বাসা কেন--খুব ভাল ভাবে থাকতে পারবে এখন—স্টাইলে থাকবে। রেডিও রাখবে এখন বাড়িতে—

—সে কি?

—বেতার। ওই শোনো বাজছে—ওই যে দোকানের সামনে লোক জমেছে? গান গাইছে না? তার পর গ্রামোফোন মানে কলের গান—

—জানি।

—সে কলের গান রাখো—মটর পর্য্যন্ত হয়ে যাবে। আজ এখানে বেড়াও, কাল ওখানে বেড়াও। ইচ্ছে হ'ল আজ কাশী বেড়াতে যাবে, কাল এলাহাবাদ কি দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাবে—

শরৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে, আপনি যে রূপকথার গল্প আরম্ভ করে দিলেন দেখছি। আমি মুখে বললেই সব হবে—এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের—যাক্ গে, সত্যি হোক না হোক—ভেবে তো নিলাম—বেশ লোক কিন্তু আপনি!

—আমি মোটেই গল্পকথা বলি নি ভাই। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়—

—আমি কি আর ইচ্ছে করলে বাবার চাকরি করে দিতে পারি? অবিশ্যি আমিও বুঝতে পারি বাবার যদি থিয়েটারে চাকরি হয়, তবে সব হয়। বাবা যে কি চমৎকার বেহালা বাজান, সে আপনি শোনেন নি—কলকাতার থিয়েটারে সে-রকম পেলে লুফে নেয়। যেমনি বাজান, তেমনি গাইতে পারেন।

হেনার হাসি পাচ্ছিল। পাড়াগেঁয়ে একটা বুড়ো এমন বেহালা বাজায় যে তাকে কলকাতার বড় থিয়েটারে লুফে নিয়ে এত টাকা মাইনে দেবে যে তাতে ওদের বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, ঢাক, ঢোল সব হয়ে যাবে। শোনো কথা! বাঙাল কি আর গাছে ফলে?

হেনা চুপ করে ভাবলে। আর বেশী বলা কি উচিত হবে একদিনে? অনেকদূর সে এগিয়েছে—অনেক কথা বলে ফেলেছে। মাগী কি সত্যিই বোঝে না—না ঢং করছে? কিন্তু যদি সত্যি ও বুঝতে পেরে থাকে তার কথার মর্ম্ম—তবে আর না বলাই ভালো। ভয় করে বাবা, এখনি ফোঁস্ করে উঠে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারে। বাঙালনীকে বিশ্বাস নেই।

শরৎ বললে, কই বললেন না আমি ইচ্ছে করলে কি করতে পারি?

এ কথার জবাবে হেনা খপ্ করে বলে ফেললে, তুমি বুঝতে পারছো না ভাই সত্যিই আমি কি বলছি?

এই পর্য্যন্ত বলেই হেনার হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। চোখ বুজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার দরকার নেই—আপাততঃ সাহসও নেই তার। কথা সামলে নেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একই নিশ্বাসে সে কণ্ঠস্বরকে লঘু ও হাস্য-তরল করে এনে বললে, বুঝলে এবার? একটু ঠাট্টা করছি

তোমায়। তাই কি কখনো হয়? তুমি আমি বললে কি হবে বলো। এমনি বলছিলাম। চলো নিচে যাই—রাত্রে কি খাবে?

—কিছু না। আমি কিছু খাইনে রাত্রে।

—বেশ, একটু দুধ একটু মিষ্টি খেতে আপত্তি আছে?

—আমি কিছুই খাবো না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

হেনা মনে মনে বললে, তুমি না খেয়ে মরো না, আমার কি? এমন একগুঁয়ে বালাই যদি আর কখনো দেখে থাকি। যা বলবে তাই। 'না' বললে আর 'হাঁ' করাবার জো নেই।

এই সময় নিচের তলায় খুব একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। কে জড়িত স্বরে চীৎকার করছে, কে গালাগালি করছে।

শরৎ ভীতমুখে বললে, ও কি ভাই? কে চেঁচাচ্ছে? আমাদের বাড়িতে না?

হেনা পাংশু মুখে বললে, না, ও আমাদের বাড়ি নয়।

হরি সা মদ খেয়ে কমলার ঘরে ঢুকে নিত্যকার মত উপদ্রব শুরু করেছে। সর্ব্বনাশ।

এই সময় নিচে মারধরের শব্দ শোনা গেল। এও নতুন নয়, হরি সা মদ খেয়ে এসে কমলাকে ঠেঙায় মাঝে মাঝে—পয়সার খাতিরে গায়ের কালশিরে ঢেকে আবার হাসতে হয় কমলাকে। কিন্তু—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না, দেখুন, আমাদের বাড়িতে নিচের ঘরেই। কমলার ঘরের দিকে মনে হচ্ছে। যান, যান, আপনি শীগ্‌গির যান—দেখুন—চলুন যাই আমরা। কে হয়তো বদমাইশ ঘরে ঢুকেছে—

চেঁচামেচি বাড়ল। আর রক্ষা হ'ল না। হরি সা গর্দ্দভের মত চেঁচানি জুড়েছে। হরি সা যে একদিন মাটি করে দেবে সব, হেনা তা জানতো। সেই লম্বা কথাওয়ালা গিন্নীন এই সময় আসুক না দেখা যাক্।

কমলার গলার কান্না মেশানো আর্ত্ত সুর শোনা গেল—ও দিদি, তোমরা এসো, আজ আমায় মেরে ফেললে মুখপোড়া—আর পারি নে দিদি—উঃ আর রক্ষা হয় না।

তবুও অ্যাকট্রেস হেনা মরীয়া হয়ে শেষ চাল চাললে। মুখে দিব্যি শান্ত হাসি এনে বললে, ও আমাদের বাড়ি না, পাশের বাড়ির সেই বুড়ো মাতালটা। ছাদ থেকে মনে হয় যেন আমাদের বাড়ি। রোজই শুনছি। যাবেন না নিচে—জানলা দিয়ে ওদের ঘরটা দেখা যায় কি না? আমাদের দেখলে আবার গালাগালি করবে। আমি তো এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামি নে—

সাত

ওদিকে কমলার চীৎকার তখনও শোনা যাচ্ছে।

শরৎ বললে, ও তো পষ্ট গঙ্গাজলের গলা—আপনি কি বলছেন?

তার পর সে নিজে এগিয়ে গিয়ে কমলার ঘরে ঢুকলো। গিয়ে যা দেখলে তাতে সে অবাক হয়ে গেল। কমলা মেঝেতে পড়ে কাঁদছে, একটা কালো মোটা-মত লোক তক্তপোশের ওপর বসে, তার হাতে একখানা পাখা। পাখার বাঁটের দিকটা উঁচিয়ে বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে সে কমলাকে মেরেছে, কারণ পাখাখানা উল্টো করে ধরা রয়েছে লোকটার হাতে।

শরৎকে দেখে কমলা দিশাহারা ভাবে বললে, আমায় মারছে গঙ্গাজল—আমায় বাঁচাও—

শরৎ কমলার হাত ধরে বললে, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে—

মোটামত লোকটা গর্জ্জন করে বলে উঠল, ও কোথায় যাবে ?

পরক্ষণেই সে শরতের দিকে ভাল করে চেয়ে, সুর নরম করে ইতরের মত রসিকতার সুরে বললে, তুমি আবার কে চাঁদ ?

শরৎ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কমলার হাত ধরে তাকে ঘরের বাইরে আনতে গেল।

বুড়ো লোকটা বললে, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ চাঁদ ? ওকে আমার দরকার আছে—তুমিও এখানে বসো না একটু—কোন্ ঘরে থাকো ?

পরে কমলার দিকে চেয়ে কড়া সুরে বললে, এই, যাবি নে। বোস বলছি ?

শরৎ বললে, আপনি একে মারছেন কেন ?

—আমার ইচ্ছে—তুমি কে হে আমার কাজের কৈফিয়ৎ নিতে এসো ? আমার নাম হরি সা। বৌবাজারে আমার দোকানে ছাপ্পান্ন হাজার টাকার জল বিক্রী হয় মাসে—শুধু জল, বুঝলে চাঁদ। বোতলভরা জল—

শরৎ ততক্ষণে কমলার হাত ধরে ঘরের বাইরে এনেছে। কমলার পিঠের কাপড় তুলে দেখলে, পিঠেও অনেক জায়গায় লম্বা লম্বা মারের দাগ। হেনা কখন এসে নিঃশব্দে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। শরৎ তার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন ওই কে একজন লোক কি রকম মার মেরেছে—কে ভাই উনি তোমার ?

কমলা চুপ করে রইল, তখন সে নিঃশব্দে কাঁদছে।

এ কথার উত্তর দিলে স্বয়ং হরি সা। কমলার পিছনে পিছনেই সে ঘরের বাইরে এসে বললে—আমি কে ওর ? শুধু ওকে জিজ্ঞেস করো ওর পেছনে কত টাকা খরচ করেছি আমি। হাড়কাটা গলির দোকানখানাই উড়িয়ে দিয়েছি ওর পেছনে—আমার—আচ্ছা আমি বসছি গিয়ে ঘরের মধ্যে। ও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরে আসুক—

শরৎ এতক্ষণও খুব খারাপ কোনো সন্দেহ করে নি। কমলার কোনো গুরুজন হবে এতক্ষণ ভেবেছিল—যদিও লোকটার কথাবার্ত্তার ধরনে সে রাগ করেছিল খুব। কিন্তু এবার তার বুকের মধ্যেটা হঠাৎ ধ্বক্ করে উঠল, এ কোন্ সমাজে সে এসে পড়েছে যেখানে দাদামশায়ের বয়সী বৃদ্ধ নাতনীর বয়সী মেয়ের সম্বন্ধে এ ধরনের কথাবার্ত্তা বলে ? সে কোথায় এসে পড়েছে ! বুড়ো লোকটার সঙ্গে কমলার সম্পর্ক কি ?

প্রভাসের বৌদিদিই বা তাকে এত মিথ্যে বলতে গেল কেন ?

সে হেনার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আপনি জেনেশুনে আমায় কি সব কথা বলছিলেন এতক্ষণ ? আমায় আপনারা কোথায় এনেছেন ? এ সব কি কাণ্ড !

হেনা ঠোঁট উল্টে বললে, ন্যাও ন্যাও গো রাইমণি। অমন সতীপনা অনেককে করতে দেখেছি—প্রথম প্রথম যারা আসে, সবাই অমনি সতী থাকে ! কত দেখলুম, কত হ'ল আমাদের এ চক্ষের সামনে—

শরৎ রাগের সুরে বললে, তার মানে ? কি বলছেন আপনি ?

—যা বলছি তা বলছি, ভেবে দ্যাখো। আর ঢং দেখাতে হবে না তোমাকে। বেরিয়ে এসেছ তো প্রভাসের আর গিরীনের সঙ্গে—কোথায় এসে পড়েছ বুঝতে পারছ না ? তোমার একুল ওকুল দুকুল গিয়েছে। এখন যেখানে এসে উঠেছ সেখানেই থাকো—সুখে থাকবে। তোমার বাবা এখানে নেই—চলে গিয়েছে কাল। তুমি এখানে ওদের সঙ্গে পালিয়ে এসে উঠেছ শুনে—

শরতের মুখ থেকে হঠাৎ সব রক্ত চলে গিয়ে সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে হাঁ করে হেনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখ দিয়ে কোন কথা বার হ'ল না, শুধু তার ঠোঁট

দুটো কাঁপতে লাগল।

ওর অবস্থা দেখে হেনার ভয় হ'ল।

বাঙালনীর ঢং দ্যাখো আবার! ফিট-টিট হবে নাকি রে বাবা! আঃ কি ঝঞ্জাটেই তাকে ফেলে গেল ওই কথার ঝুড়ি গিরীনটা। এসে সামলাক্ এখন তাল।

সে কাছে এসে বললে, তা ভাই তুমি তো আর জলে নেই? ভয় কিসের? আমি তো বলছিলাম তোমার সব হবে। থাকো না এখানে আমাদের এই বাড়িতে। তোমায় মাথায় করে রেখে দেবে এখন ওরা। মটোর বলো, কালই মটোর হবে। রেডিও হবে, কলের গান হবে—যা আমি বলেছি। আপাদমস্তক জড়োয়া দিয়ে মুড়ে দেবে—ভয় কিসের তোমার? চাকর-চাকরাণীর মাথায় পা দিয়ে বেড়াও। মুখের কথা খসাও, কাল থেকে সব ঠিক করে দেবো—কি হবে সেই ধাবুধাড়া গোবিন্দপুরের জঙ্গলে—

শরৎ এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বললে, এমন লোক আপনারা—তা আমি ভাবি নি। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমি জানতাম না, সরল বিশ্বাস করেছিলাম প্রভাস দাদার ওপর। ভাইয়ের মত দেখতাম। আপনাদের ভেবেছিলাম ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার বোকামির শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে—

কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

হেনার মন যে পথকে আশ্রয় করে পোক্ত হয়েছে, সেই পথেরই সংকীর্ণ দৃষ্টি ওর মনুষ্যত্বকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। পাপের পথে যে মনে মনে ঝানু হয়ে পড়ে, পুণ্যের আলো প্রবেশ করবার বাতায়ন-পথ তার নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

হেনার মন গলবার নয়।

সে বললে, কেন কান্নাকাটি করছো ভাই? প্রথম প্রথম অবিশ্যি একটু কষ্ট হয়—কিন্তু জগতে এসে সুখের মুখ যদি না দেখলে তবে করলে কি? এখানে দিব্যি সুখে থাকো—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাও—সব সয়ে যাবে।

শরৎ বললে, আপনি দয়া করে আর কিছু বলবেন না। আমি গরীব লোকের মেয়ে, বাসন মেজে ভাত রেঁধে কাঠ চ্যালা করে সংসার করে এসেছি এতকাল, এক দিনের জন্যেও ভাবি নি যে কষ্টে আছি। আপনাদের সুখ নিয়ে থাকুন আপনারা—

এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে দুপ্ দুপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল গিরীন।

তাকে দেখে হেনা যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। তার দিকে ফিরে বললে, এই যে! বাপরে বাপ! এত ঝক্কি পোয়াবার জন্যে আমি রাজী হই নি, তা বলে দিচ্ছি। ওই নাও, সব খুলে বলেছি—যা বোঝো করো।

গিরীন বললে, কি, ও বলে কি?

—জিজ্ঞেস করো, তোমার সামনেই তো বিরাজ করছে সশরীরে—

গিরীন শরতের দিকে ফিরে বললে, কি? বলছ কি তুমি? তোমার বাবা তোমার কথা সব শুনে পালিয়েছে। এখানে থাকো পরম সুখে থাকবে—

শরৎ বললে, আপনি আমায় কোন কথা বলবেন না। আমায় ছেড়ে দিন দয়া করে—আমি গাঁয়ে চলে যাবো বাবার কাছে—

গিরীন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, সে গুড়ে বালি। এতক্ষণ গাঁয়ে রটে গিয়েছে সব। কোথায় দু-দিন দুরাত কাটিয়েছ গাঁয়ের সবাই জেনে গিয়েছে। আর ঘরে জায়গা নেই তোমার—এখন যা বলছি তাতে রাজী হও চাঁদ—

শরৎ হঠাৎ তীব্র, পরুষ কণ্ঠে বলে উঠল, খবরদার! আমাকে যা তা বলবার কোনো এক্তার নেই আপনার জানবেন—সাবধানে কথা বলুন—

গিরীন কৃত্রিম ভয়ের ভান করে হেনার পেছনে লুকোবার অভিনয় করলে। বললে—ও বাবা, শূলে দেবার না ফাঁসিতে লটকাবার হুকুম হয়ে গেল বুঝি! তাল সামলাও হেনা বিবি—

শরৎ বললে, সে দিন নেই, আজ আমার বাবা গরীব, আমরা গরীব—নইলে আপনাদের মত ছোটলোককে শূলে ফাঁসে দেওয়া খুব বেশী কথা ছিল না গড়শিবপুরে—যাক্, আমায় যেতে দিন, আমি চলে যাবো—

গিরীন বললে, কোথায় যাবে চাঁদ? সে পথ বন্ধ—আমি তো—

শরৎ বলে উঠল, আবার ওই ইতরের মত কথা! আমি কোনো কথা শুনবার আগে আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান—ভদ্রলোক বলে ভুল করে ঠকেছি—

শরতের কথাবার্ত্তার ভঙ্গীর মধ্যে ও কণ্ঠস্বরে এমন কি একটা জিনিস ছিল যাতে গিরীন কুণ্ডু যেন সাময়িক ভাবে ভয় পেয়ে চুপ করল।

হেনা ওকে আড়ালে চুপি চুপি বললে, কেন ও বাঙালনীকে রাগাচ্ছ। রাগিয়ে কাজ পাবে না ওর কাছে।

—বাপরে! কেবলই যে ফোঁস ফোঁস করে? আজ ওকে এখানে রাখো—

—আমি পারবো না, আমার থিয়েটার আজ—

—তুমি নিয়ে যাও কমলাকে। হরি সাকে আমি নিয়ে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে যাচ্ছি। থাকুক এখানে চাবি দেওয়া আটকানো—

হেনা ফিরে গিয়ে বললে, তোমার কথা হ'ল। বাড়ি যাবে কোথায়? সেখানে সব রটে গিয়েছে—গাঁয়ে যাবে কোন্ মুখে? এখানে সুখে থাকবে।

—সে ভাবনা আপনি ভাববেন না। আমার যে দিকে দু-চক্ষু যায় চলে যাবো। মা-গঙ্গা তো আছেন, শেষ পর্য্যন্ত। এমন কি করেছি আমি যাতে মা আমায় কোলে স্থান দেবেন না?

শরতের গলা আবার কান্নার বেগে আটকে গেল। বললে—লোককে বিশ্বাস করে আজ আমার এই দশা—কি করে জানবো যে মানুষের পেটে এত থাকে!

হেনা বললে, আচ্ছা, তাই হবে। না হয় মোটরে করে তোমাকে ইস্টিশানে রেখে আসুক—দেখে আসি নীচে—

সে চলে গেল। কমলাকে গিরীন কি বলতে নিয়ে গেল পাশে। শরৎ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেনার ওপরে উঠে আসবার অপেক্ষা করলে। তার পর তার দেরি হচ্ছে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখলে বাইরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে ওরা তালা দিয়েছে।

শরৎ আবার ওপরে উঠে এল। একবার মনে করলে তালা দেয় নি, ওরা গাড়ির সন্ধানে গিয়েছে। আনতে দেরি হচ্ছে হয়তো।

শরৎ এসে চুপ করে ওপরে অনেকক্ষণ বসে রইল।

বাড়ি নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ। জলতেষ্টা পেয়েছে বড়, জল আছেও কিন্তু এ বাড়িতে সে জল-স্পর্শ করবে না, জলতেষ্টায় মরে গেলেও না। প্রভাসদার বাবার কি সত্যিই অসুখ? হয়তো সব মিথ্যে কথা ওদের। কথাতে কথাতে বিশ্বাস করেই আজ তার এই দশা। প্রভাসও লোক ভাল নয় নিশ্চয়ই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ আসে না। শরৎ জানলা দিয়ে পাশের বাড়িতে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে। কোন লোক দেখা গেল না। দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কেটে গেল, শরৎ বসে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। সম্পূর্ণ অসহায়, কেউ তাকে জানে না, কেউ চেনে না। কি সে এখন করে?

শেষ পর্য্যন্ত সে ভাবলে, এও ভালো, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালও ভালো। ওরা না

আসুক, সে এখানে না খেয়ে মরবে—মরতে তার ভয় নেই। একবার আশা ছিল বাবার সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলে—কিন্তু বাবার দর্শনলাভ অদৃষ্টে বোধ হয় নেই।

বিকেল হয়ে আসছে। পাশের বাড়ির গায়ে লম্বা ছায়া পড়েছে। শরৎ বসে বসে একটা উপায় ঠিক করলে। সে যেই দেখবে পাশের বাড়ির জানলায় লোক, তাকে সে নিজের অবস্থার কথা জানাবে। তার কথা শুনে দয়া হবে না কি ওদের? বাড়ির চাবিটা খুলিয়ে দেবে না তারা?

হঠাৎ সে দেখলে পাশের বাড়ির জানলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

সে চেঁচিয়ে বললে, শুনুন, এই যে এদিকে—

মেয়েটি ওর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আমায় বলছো—কি ভাই?

-আমায় এ বাড়িতে আটকে রেখেছে। আমি পাড়াগাঁ থেকে এসেছি—আমায় দোরটা খুলে দিন দয়া করুন আমার ওপর।

—এ তো হেনা দিদির বাড়ি। হেনা নেই?

—হেনা কে জানি নে। তবে কেউ এখন এ-বাড়িতে নেই। আমায় তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে চলে গিয়েছে—

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে। গড়শিবপুর বলে একটা গাঁ—যশোর জেলা—

—এখানে কার সঙ্গে এসেছ?

—প্রভাস আর অরুণ বলে দুজন লোক—আমাদের গাঁয়ের—

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, তার পর ঝগড়া হয়েছে বুঝি? থাকো ভাই, থাকো। এসেছে যখন, তখন যাবে কোথায়?

শরৎ ব্যগ্রস্বরে বললে, না না—আপনি বুঝতে পারছেন না। ওরা আমায় ঠকিয়ে এনেছে, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে। আমায় দোর খুলে দিন কাউকে বলে দয়া করে—আমায় বাঁচান—আমার সব কথা শুনুন—

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বললে, সবাই বলে ঠকিয়ে এনেছে। তবে এসেছিলে কেন? ওসব আমি কিছু করতে পারবো না—কে হ্যাঙ্গামা পোয়াতে যাবে বাপু তোমার জন্যে? যারা এনেছে, তাদের কাছে বোঝাপড়া করো গে—

কথা শেষ করে মেয়েটি জানলা থেকে সরে গেল। শরৎ জানত না যে এ পাড়ায় আশ-পাশের বাড়িতে যে-সব স্ত্রীলোক বাস করে, তারা কেউ ভদ্রঘরের নয়, মনে, চরিত্রে, পেশায় তারা হেনারই সগোত্র। এদের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা নিষ্ফল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বিকেল বেশ ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে শরৎ তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরের বারান্দায় এসে দেখতে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে একা কমলা। ওর পেছনে কেউ নেই। ওকে দেখে কমলা হাসিমুখে বললে—কি ভাই গঙ্গাজল?

তার পর তাড়াতাড়ি দু-তিনটে সিঁড়ি একলাফে ডিঙিয়ে এসে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, গঙ্গাজল—কি কষ্ট ওরা তোমাকে দিলে! কোনো ভয় নেই ভাই, আমি যখন এসে গিয়েছি। তুমি পালাও—আমি লুকিয়ে দেখতে এসেছিলাম তোমার কি দশা হচ্ছে—হয়তো এতক্ষণে একটা উপায় হয়েছে ভেবেছিলাম। তুমি চলে যাও—আমার কাছে এ বাড়ির একটা চাবি থাকে, তাই রক্ষে।

এতক্ষণ শরৎ কথা বলবার অবকাশ পায় নি, এত তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা ঘটল।

সে এইবার বললে, ভগবান আছেন গঙ্গাজল, তাই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাই—

আমার তো আর কেউ ছিল না—

কমলা বললে, তুমি ভাই তাড়াতাড়ি নেমে চলো, জিনিসপত্র কিছু এনেছিলে - সুটকেস কি পুঁটুলি—নেই ? —এসো নেমে। গিন্নীরা এসে পড়তে পারে। আমায় দেখলে গোলমাল করবে। হেনাদি থিয়েটারে গিয়েছে সে আজ এখুনি আসবে না।

শরৎ ওর সঙ্গে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল।

কমলা বললে, ভাই, তুমি এখন কোথায় যাবে ?

—যেদিকে দু চোখ যায়—ভগবান আমার হাত ধরে যে পথে নিয়ে যাবেন। আমাদের গড়ের ভাঙা দেউলে সন্দে পিদিম দিয়েছি জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত— তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন আমায়। পথ না হয়, মা-গঙ্গা আর কোল থেকে ঠেলে ফেলবেন না।

কমলার চোখ ভরে উঠল। সে বললে, আমরা নরকের কীট ভাই, তোমার মত মেয়ের পায়ের ধুলো পড়ে আমাদের পাপের বাসা পবিত্র হয়ে গেল। একটু সাবধানে থেকো, তোমার রূপ যে কি তুমি নিজে জানো না। আমাদের মাথা ঘুরে যায়—পুরুষের দোষ কি দেবো ? তার পর সে আঁচল খুলে পাঁচটা টাকা নিয়ে শরতের হাতে দিয়ে বললে—এই টাকা কটা সঙ্গে রাখো দিদি। দরকার হবে, ছোট বোনের কাছ থেকে নিতে লজ্জা নেই। সুসময় আসে, অনেক রকমে শোধ দিতে পারবে।

শরৎ বললে, তুমিও কেন চলো না আমার সঙ্গে ? এই কষ্ট সহ্য করে মার খেয়ে কেন এখানে পড়ে থাকো ? চলো দুই বোনে পথে বেরুই ভগবানের নাম করে। তিনি নিরুপায়ের উপায়, একটা কিছু করে দেবেনই তিনি—

কমলা বিষণ্ণ মুখে বললে—না দিদি। আমার তা হবার নয়। আমার মা এখানে—মার বয়েস হয়েছে—তাঁকে ফেলে যেতে পারবো না। তা ছাড়া, আরও অনেক কাল এই পথের পথিক—এক পুরুষে নয়, অনেক পুরুষে। আমাদের উদ্ধার নেই—আমি যাবো বললেই যাওয়া হবে না। বাঁচি মরি এখানে থাকতে হবে। গোবরের গাদাতে জন্মেছি, গোবরের গাদাতেই মরতে হবে।

শরৎ কমলার চিবুক ধরে আদর করে বললে, না ভাই, গোবরের গাদায় তুমি পদ্মফুল—

কমলা অশ্রুসজল চোখে মাথা নিচু করে বললে, একটু পায়ের ধুলো দাও দিদি। ছোট বোন বলে মনে রেখো যেখানে থাকো —আমার আর দেরি করবার জো নেই—

কমলা বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

কমলা চলে গেলে শরৎ বড় একা মনে করল নিজেকে। এতক্ষণ তবুও একটা অবলম্বন ছিল, তাও গেল। এখন থেকে সে সম্পূর্ণ একা, নিঃসহায়। কখনো এমন অবস্থায় পড়ে নি জীবনে। কোথায় সে এখন যায় ? বেলা পড়ে এসেছে—এই বিশাল অপরিচিত শহর সামনে। সুনির্দ্দিষ্ট পথে চিন্তাধারাকে চালিত করবার শিক্ষা ওর নেই—যারা এ বিষয়ে আনাড়ি, তাদের চিন্তা যেমন খাপছাড়া ধরনের, ওর বেলাতে তার ব্যতিক্রম হ'ল না। শরৎ ভাবলে—কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হই—যা কিছু পাপ, যদি ঘটে থাকে কিছু, গঙ্গায় ডুব দিয়ে কেটে যাবে এখন—

একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। গাড়োয়ান এ পাড়াতেই থাকে এ পাড়ার স্ত্রীলোকদের সে চেনে—সওয়ারি খুঁজবার চেষ্টায় বললে, গাড়ি চাই ?

শরৎ যেন অকুলে কুল পেলে। গাড়ি ডেকে নিজে চড়তে পারতো না—কি করে গাড়ি ডাকতে হয়, কি বলতে হয়, এসবে সে অনভ্যস্ত। সে বললে, আমায় কালীঘাটে নিয়ে যাবে ?

—কেন যাবো না বিবিজান ? চলো—

—কত ভাড়া দিতে হবে ?

—তিন টাকা দিও, তোমাদের এ পাড়ার ভাড়া তো বাঁধাই আছে। ওই খেঁদি বিবি যায়, বড় পারুল বিবি সেদিন গেল—তিন টাকা দিলে। আমি যাস্তি লেবো না।

শরৎ দরদস্তুর করতে জানে না। দু টাকার জায়গায় তিন টাকা ভাড়ায় সওয়ারি পেয়ে গাড়োয়ান মনের আনন্দে গাড়ি ছুটিয়ে দিলে। গড়ের মাঠ দিয়ে যখন গাড়ি চলেছে, তখন শরতের মনে হ'ল একটা বিশাল জনস্রোতের মধ্যে সেও একজন। প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে দিয়ে কত রাস্তা, কত গাড়ি ঘোড়া, ট্রাম গাড়ি, লোকজন ছুটেছে, চলেছে—দূরে গঙ্গাবক্ষে বড় বড় জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। সকলের ওপর উপুড় হওয়া নীল আকাশের কতটা দেখা যাচ্ছে, মুচুকুন্দ চাঁপাগাছের সারির নিচে সাহেবদের ছেলেমেয়েদের ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ঠ্যালা গাড়িতে—জীবনটা ছোট নয়, সংকীর্ণ নয় - এত বড় জগতে যদি সবাই বেঁচে থাকে নিজের নিজের পথে— সেও থাকবে। ভগবান তাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

গাড়িতে বসে গতির বেগে মন যখন পুলকিত, তখন অনেক কথা এমন অল্প সময়ের জন্যে মাথায় আসে, শরীরের জড়তার সুদীর্ঘ অবসরে নিষ্প্রভ ও অলস মন যা কখনো কল্পনা করতে পারে না।

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই শরৎ অনেক কথা ভেবে ঠিক করলে। সে আর গড়শিবপুরে ফিরবে না।

বাবা সেখানে গিয়ে আছেন, হয়তো তিনি গিয়ে বলেছেন মেয়ে তাঁর মারা গিয়েছে। সে গেলেই গ্রামে কলঙ্ক রটবে। সে কলঙ্কের হাত থেকে বাবাকে সে রক্ষা করবে।

কোথায় সে যাবে ? তা সে জানে না আজ, যদি কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তা না করে থাকে জীবনে, কখনো অন্যায় না করে থাকে— তবে সে-সবের জোর নেই জীবনে ?

কালীঘাটে পেঁছে সে গঙ্গায় ডুব দিলে, তার পর আর কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে সে কালী-মন্দিরের সামনে চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হ'ল। কত মেয়ে সাজগোজ করে আরতি দেখতে এল। তার মধ্যে ও চুপ করে বসে বসে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। কত বৃদ্ধা এসে দোরের কাছে ওর পাশে বসলো। রাত্রি বেশী হ'ল। ও ভাবলে কোথায় যাবে এখন। কোনো জায়গা নেই যাবার। এত বড় বিশাল শহরে অসহায়, তরুণী নারীর পক্ষে নিরাপদ স্থান কোথায় এই দেবমন্দির ছাড়া। সুতরাং সে বসেই রইল। বসে বসে মনে পড়লো বাবার কথা। গড়শিবপুরের জঙ্গল-ঘেরা বাড়িতে বাবাকে একা হয়তো এতক্ষণ হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হচ্ছে। আনাড়ি মানুষ, কোন দিন জীবনে কুটোটা ভেঙে দুখানা করার অভ্যেস নেই, বেহালা বাজিয়ে আর গান গেয়েই নিশ্চিন্ত দিনগুলো কাটিয়ে এসেছেন বাবা—শরৎ তাঁর গায়ে আঁচটুকুও লাগতে দেয় নি। আজ সে থেকেও নেই, বাবার কি কষ্টই হচ্ছে! তার কথা মনে ভেবে বাবার কি শান্তি আছে ?

শরতের চোখে জল এল। বাবার কথা মনে পড়লে মন হু-হু করে। সে কিছুতেই চুপ করতে পারে না, ইচ্ছে হয় সে এখুনি ছুটে চলে যায় সেই গড়শিবপুরের ভাঙা বাড়িতে, বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িখানা বাবাকে পেতে দেয় রান্নাঘরের কোণে—একটা চটা-ওঠা কলাই-করা পেয়ালায় বাবাকে চা করে দিয়ে ছোট্ট খুকীর মত বাবার মুখের দিকে চেয়ে বসে বসে গল্প শোনে।

মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে একজন সন্ন্যাসীনি ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে—ওর নজর পড়লো। তার চারিপাশ ঘিরে অনেক মেয়েছেলে জড়ো হয়ে কেউ হাত দেখাচ্ছে, কেউ ওষুধ নিচ্ছে, কেউ শুধু বা কথা শুনছে। শরৎ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই দেবমন্দিরের

পবিত্রতা অনুভব করতে চাইছিল—যে ঘরে সে আজ দুদিন কাটিয়ে এসেছে তার সমস্ত গ্লানি, অপবিত্রতা, পাপ—এই দেবায়তনের ধূপধূনার সৌরভে, শংখঘণ্টার ধ্বনিতে, সমবেত ভক্ত-মণ্ডলীর প্রাণের নিবিড় আগ্রহে যেন ধুয়ে যায়, মুছে যায়, শুভ্র হয়ে ওঠে, নির্ম্মল হয়ে ওঠে। কালীঘাটের মন্দিরের সেবকদের লোভ যেখানে উগ্র, পূজার্থীদের অর্থ শোষণ করবার হীন আকাঙ্ক্ষা সব ছাপিয়ে যেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে—পূজার মধ্যে ব্যবসা এসে ঢুকেছে, বৈষয়িকতা এসে ঢুকেছে—সে সব দিক পল্লীবাসিনী শরতের জানা নেই। তার মুগ্ধ মনের ভক্তি ওর চোখে যে অঞ্জন মাখিয়েছে, তার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সংস্কারপূত বাহান্ন পীঠের এক মহাপীঠস্থান জাগ্রত হয়ে উঠেছে ওর মনে, বুদ্ধদেবের সেই অমর বাণী 'মনই জগৎকে সৃষ্টি করে'—শরতের মনে মহারুদ্রের চক্রছিন্ন দক্ষকন্যা সতীর দেহাংশ সতী নারীর তেজ ও পাতিব্রত্যের প্রতীক স্বরূপ এখানকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। এই মাটি তার মনে তেজ ও বল দিক। সন্ন্যাসিনীর সামনে বসে সারারাত কাটিয়ে দিলে সে। কিছু কিছু কথাও হ'ল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। সামান্য কিছু ফলমূল কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলে।

সন্ন্যাসিনী বললে, বাড়ি কোথায় তোমার?

—গড়শিবপুরে।

—এখানে কোথায় থাকো?

—কোথাও না মা। মন্দিরেই আছি এখন। আশ্রয় নেই কোথাও।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড়ঘরের মেয়ে। কে আছে তোমার? কি করে এখানে এলে মা? একটা কথা জিজ্ঞেস করি কিছু মনে কোরো না—কারো সঙ্গে—মানে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল?

কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই শরতের সরল, তেজোদৃপ্ত মুখের সুকুমার রেখার দিকে, তার ডাগর, কালো, নিষ্পাপ চোখ দুটির দিকে চেয়ে সন্ন্যাসিনী এ প্রশ্ন করার জন্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল।

শরৎ মুখ নিচু করে বললে, না, মা। ও সব নয়। তবে সব তো বোঝেন, মেয়েমানুষের অনেক শত্রু— বিশেষ করে মা, যে সকলকে বিশ্বাস করে তার শত্রু এখন দেখছি চারিদিকেই। ভুলিয়েই এনেছিল বটে মা তবে আমি ভুলে আসি নি। বুঝলেন মা।

—তোমার বয়েস কত মা?

– সাতাশ বছর।

—কিন্তু তোমার রূপ এই বয়েসে যা আছে, তা কুড়ি বছরের যুবতীরও থাকে না—তোমার বড় বিপদ এই কলকাতা শহরে। আমার এখানে থাকো—কোথাও গেলে তোমার বিপদ ঘটতে দেরি হবে না মা।

শরতের চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এই তো মা সতী রাণী তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ঠাকুর-দেবতার মাহাত্ম্য কলিকালে তবে নাকি নেই? বাবা তো নাস্তিক, সন্দে-আহ্নিকটা পর্য্যন্ত করবেন না। সে কত বকুনির পর জোর করে আসন পেতে বাবাকে আহ্নিকে বসাত। বাবার কথা মনে পড়তে শরতের চোখের জল আর থামে না। বাবা কি আর সন্দে-আহ্নিক করছেন? উত্তর দেউলে এই সন্ধ্যায় বাদুড়নখীর জঙ্গল ঠেলে কে সন্দে-পিদিম দিচ্ছে আজকাল? কেউ না।

বহুদূরে থেকে সে দেখতে পায়, ভগ্ন দেবীমূর্ত্তির পায়ের চিহ্ন বনে-জঙ্গলে নির্দ্দেশহীন কালো নিশীথ রাত্রে এখনও অমনি পড়ে যাচ্ছে, ভয়ে শিউরে উঠে কুটীরের ঘরে অর্গলবন্ধ করবার জন্যে সে আর সেখানে নেই। রাজলক্ষ্মী? সে কি আছে—সে আর সেখানে আসে না। কেনই বা আসবে?

শরৎ সেখানেই রইল সেদিনটা। সন্ধ্যার পরে অনেকগুলি মেয়ে আসে—রোজ শাস্ত্রকথা হয়। শরৎ বড় ভালবাসে শাস্ত্রকথা শুনতে, একদিন নকুলেশ্বরের মন্দিরে কথকতা হ'ল। আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে সেখানে শরৎ গেল। কথকতার পর প্রসাদ বিতরণের পালা। সকলের সঙ্গে শরৎও শালপাতা পেতে বাতাসা, শসা, ছোলা ভিজে, ফলমূল নিয়ে এল। সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণের মেয়ে তিনি স্বপাক ভিন্ন খান না, নিজে রান্না করেন, শরৎকে শাল-পাতে ভাত বেড়ে দেন। সারাদিন খাওয়া হয় না—সন্ধ্যার পর রান্না চড়ে।

তিন-চার দিন পরে একটি বড়লোকের গৃহিণী এলেন সন্ন্যাসিনীর কাছে। স্নানের ঘাটে যেতে শরৎকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দুপুরে। বোধ হয় সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তাঁর কিছু কথা হয়ে থাকবে শরতের সম্বন্ধে। বললেন—তোমাকে দেখে আমার বড় ভাল লেগেছে। তোমার নাম কি?

—শরৎসুন্দরী।

—কতদিন সন্ন্যাসিনীর কাছে আছো?

—বেশী দিন না।

—আমাদের সঙ্গে যাবে?

—কোথায় মা?

—আমরা বেরিয়েছি কাশী, গয়া করবো বলে। মুখে বলতে নেই—এখন হবে কি না তা জানি নে। ইচ্ছে তো আছে। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে লক্ষ্নৌ। সেখানে গিয়ে একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবো। আমি যাচ্ছি আর আমার দুই মেয়ে, ছোট ছেলে আর কর্ত্তা। একটা লোক আমাদের দরকার। বয়েস হয়েছে—একা ভরসা করি নে সব ঝক্কি নিতে বিদেশে। তুমি চলো না, কেন আমার সঙ্গে? মাইনে-টাইনে সব ঠিক করে দেবো এখন—কোনো অসুবিধে হবে না। গৌরী-মা বলেছিলেন তোমার কথা। কথা কি জানো, যে সে মেয়ে নিতে ভরসা হয় না। স্বভাব-চরিত্তির কার কি রকম না জেনে বাপু নেওয়া তো যায় না। গৌরী-মা যখন তোমার সম্বন্ধে বললেন—তখন আমার নিতে কোন আপত্তি নেই।

মহিলাটির প্রস্তাব ভালই—তবুও শরৎ বলল, ভেবে দেখি মা—আপনাকে আমি বলবো এখন সন্দেবেলা। গৌরী-মার কথকতা আপনি আসবেন তো শুনতে সন্দেবেলা?

তার পর মন্দিরে ফিরে এল ওরা স্নান সেরে।

গিন্নী বললেন, আমি এখন যাচ্ছি মনোহরপুকুর রোডে আমার মেজ জামাইয়ের বাড়ি। নাতির অসুখ, তাকে গৌরী-মার কাছে নিয়ে এসে মাদুলী ধারণ করাবো। জামাই খ্রীষ্টান মানুষ, ওসব মানে না। মেয়েকে বলে রেখেছি জামাই আপিসে বেরুলে নাতিকে মোটরে নিয়ে আসবো। যাবে আমার সঙ্গে?

শরতের যাবার কৌতূহল হ'ল। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি করে ওরা অনেক রাস্তা গলি পার হয়ে একটা ছোট দোতলা বাড়ির সামনে এসে নামলে। শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে, কলকাতার বড় লোক; দেখি ওদের বাড়ি-ঘর কি রকম—

প্রথমে এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে নেমে এসে দোর খুলেই চেঁচিয়ে বলে উঠল—ও মা, কে এসেছে দ্যাখো—

একটি সুন্দরী মেয়ে ওপর থেকে নেমে এসে গিন্নীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, মা কবে এলে? কখন এলে? চিঠি তো লিখলে না আজ আসছো? এ কে মা?

—ওকে নিয়ে এলাম। আমাদের সঙ্গে যাবে। গৌরী-মার কাছে এসেছে—সেখানে থাকে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি—কোন্ জায়গায় গো?

শরৎ বলল—যশোর জেলায় গড়শিবপুরে।

মেয়েটি বলল, এসো ওপরে এসো।

ওপরের ঘর বেশ চমৎকার সাজানো। শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে। বড় বড় গদি-আঁটা চেয়ার, মেঝের উপর বড় বড় শতরঞ্জির মত আসন পাতা। তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সবাই, তবে আসন পাতা কেন? এক কোণে একটি ছোট পাথরের মূর্ত্তি, মেয়েটি বলল, তার শ্বশুরের চেহারা। বড় ডাক্তার ছিলেন, আজ ছ-বছর মারা গিয়েছেন। ফুল-দানীতে বড় বড় রজনীগন্ধার ঝাড়। রান্নাঘরের মধ্যে কল, রান্না করতে করতে কল টিপলেই জল, ভারী সুবিধে। ছ-সাতটা বড় কাঠের আলমারি-ভর্ত্তি মোটা মোটা বই। সেগুলো দেখিয়ে মেয়েটি বলল, শ্বশুর ডাক্তার ছিলেন বড়, নাম করতে পারি নে। তাঁর ডাক্তারি বই এগুলো—আরও সাত আলমারি বোঝাই বই আছে, নিচের ঘরে—শ্বশুরের শোবার ঘরে।

মেয়েটি শরৎকে কিছু মিষ্টি ও ফল খেতে দিলে।

তার পর গিন্নী মেয়ে ও নাতি সঙ্গে তাদের বড় মোটরে আবার এলেন কালীমন্দিরে। বেলা প্রায় তিনটে। শরৎ বলল, মা, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি, বড্ড গরম—

আসল কথা গরম নয়। গঙ্গাহীন দেশের মেয়ে শরৎ, গঙ্গাকে কাছে পেয়ে সর্ব্বদা ডুব দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ দমন করতে পারে না। কিন্তু স্নান করে উঠে আসবার সময় শরৎ মহা বিপদের সামনে পড়ে গেল। স্নান করে উঠে কৃষ্ণকালী লেনের মুখে এসেছে, বাঁ দিকেই মনসাতলা ও কৃষ্ণকালীর মন্দিরে একবার দর্শন করে আসবে—হঠাৎ দেখলে তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে গিরীন, প্রভাস ও আরও দুটো অজানা লোক। তারা চারিদিকে কি যেন খুঁজছে।

ওর সঙ্গে গিরীনের একেবারে চোখোচোখি হয়ে গেল। গিরীন আঙুল দিয়ে তার সঙ্গীদের ওর দিকে দেখিয়ে বলল—এই যে! তার পর সবাই মিলে এসে ওকে ঘিরে ধরলে। গিরীন বলল, তার পর? রাগ করে ঝগড়া করে পালিয়ে এসে এখানে আছ? চল বাড়ি চলো—

সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল, কেমন বলেছি কি না যে ঠিক কালীঘাটে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজীর গাড়োয়ান দেখ ঠিক সন্ধান দিয়েছিল। বাবা, এ সব ডিটেক্‌টীভগিরি কি তোমাদের কম্মো?

প্রভাস বলল, চলো শরৎ দিদি, ফিরে চলো—রাগ কেন? আর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়?

ওদের কথাবার্ত্তার সুরে এমন একটা সহজ ভাব নিয়ে এসে ফেলেছে যেন শরৎ ওদের বহুদিনের ন্যায্য অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করে নিজের একগুঁয়েমি এবং বদমেজাজের দরুন নিজে চলে এসেছে। ওরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে এসেছে। গিরীন বলল, নাও হয়েছে, কোথায় বাসা নিয়েছ চল দেখি—জিনিসপত্র কিছু আছে-টাছে? প্রভাস একখানা গাড়ি ডেকে আনো—এসো—

শরৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, আপনি আবার এসেছেন এখান পর্য্যন্ত? কেন এসেছেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবই বা কেন? আপনাদের সাহস তো খুব।

প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল, আর প্রভাসদা, আপনাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মত জ্ঞান করতাম—তার সাজা খুব দিয়েছেন। এত খারাপ হয় লোকে তা আমি বুঝি নি। বাবা কোথায়? বাবার খবর কিছু আছে?

গিরীন ওদের দিকে সাট করে চোখ টিপে বলল—আরে আছেই তো। তিনি তো কাল থেকে এসে আমাদের ওখানে প্রভাসদের বাড়ি বসে। সেই জন্যেই নিতে আসা—চলো।

শরৎ বলল, মিথ্যে কথা। বাবা কখনো আসেন নি। হ্যাঁ প্রভাসদা সত্যি? বাবা এসেছেন সত্যি বলুন—

প্রভাস বলল, মিথ্যে বলে লাভ? এসো দেখবে চলো। গাড়ি আনি।

—গাড়ি আনতে হবে না প্রভাসদা। বাবা কখনো আসেন নি। এলে আপনাদের সঙ্গে এখানে আসতেন।

—আমাদের কথা বিশ্বাস হ'ল না? যাবে কি না তাই বলো।

কলকাতা শহরের রাস্তা—একটি তরুণী মেয়েকে ঘিরে তিন-চারজন লোককে কথা-কাটাকাটি করতে দেখে দু-একজন লোক জমতে শুরু করল। একজন ছোকরা এগিয়ে এসে বলল, কি হয়েছে মশাই?

গিরীন কুণ্ডু ঈষৎ সলজ্জ সুরে বলল, ও আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার মশাই। আপনারা যান।

আর একজন বলল, ইনি কে? কি বলছেন? আপনারা নিয়ে যেতে চাইছেন কোথায়?

প্রভাস বলল, উনি আমাদের লোক—

গিরীন বলল, মশাই আপনারা ভদ্দর লোক, চলে যান। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে—সে-সব কথা শুনে আপনাদের লাভ কি? আমাদের মেয়েমানুষ ঝগড়া হয়ে রাগ করে চলে এসেছে, তাই নিয়ে যেতে এসেছি।

কে একজন বাইরে থেকে বলে উঠল—ওহে চলে এসো না—ওসবের মধ্যে থাকবার দরকার নেই, ও বুঝতে পেরেছি। এসব জায়গায় ওরকম কত কাণ্ড নিত্যি ঘটছে।—

শরৎ অবাক, স্তম্ভিত। এমন সহজ ভাবে এমন নির্লজ্জ মিথ্যা কথা কেউ যে বলতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। সে এর প্রতিবাদ করতেও পারলে না, প্রকাশ্য রাজপথে অপরিচিত পুরুষ বেষ্টিতা অবস্থায় কথা-কাটাকাটি করা, চীৎকার করে ঝগড়া করা তার ঘটে লেখা নেই, তার স্বভাবজ শোভনতা-বোধ মুখে যেন হাত চাপা দেয়। সে মরে যাবে তবুও পথে দাঁড়িয়ে ইতরের মত ঝগড়া করতে পারবে না।

লোকজন চলে যেতে শুরু করলে। শরৎ এগিয়ে যেতে চাইল, গিরীন কুণ্ডু এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, নাও চলো—খুব ঢলান ঢলালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এতগুলো ভদ্দরলোক জুটিয়ে ফেললে চারিদিকে—এখন ফিরে চলো আমাদের সঙ্গে—রাগ অভিমান করে কি পালিয়ে এলে চলে চাঁদ?

গিরীন যেন রাস্তার লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে এ কথাগুলো চেঁচিয়েই বলল।

শরতের হঠাৎ বড় রাগ হ'ল, গিরীনের মিথ্যা কথায়, ধূর্তামি ও শেষের কথার ইতর সম্বোধনে।

সে বলল, আবার ঐ কথা মুখে? আপনার সাধ্য নেই এখান থেকে আমায় নিয়ে যান। আমি এখানে চলে এলাম—এখানেও আপনারা এলেন? পথ ছেড়ে দিন বলছি—

শরৎ তখনই মনে ভেবে দেখলে এই দল যদি তার সঙ্গে যায় বা যে মহিলাটির আশ্রয় সে পেয়েছে তারা যদি এখন এখানে এসে পড়ে, তবে এদের সাজানো মিথ্যে কথায় তাদের মনে সন্দেহ জাগবে এবং তারা তাকে কুচরিত্রা ভেবে তখনই পরিত্যাগ করে চলে যাবে। তা হলে সে একেবারে অসহায়—এই সব শুনলে গৌরী-মা কি তাকে জায়গা দেবেন আর?

যাক্, যদি কেউ আশ্রয় না দেয়, গঙ্গা তো কেউ কেড়ে নেবে না?

গিরীন আবার বলল, দাঁড়াও এখানে গাড়ি ডাকি—মিছে রাগ করে কি হবে বলো!

সুর নিচু ও নরম করে বলল, চলো—কেন মিথ্যে পথে পথে ঘুরে কষ্ট পাও। এখানে আছ কোথায় বলো তো? খুব সুখে থাকবে। আমাদের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। প্রভাস

মাসে পঞ্চাশ টাকা দেবে—আমি আর অরুণ পঞ্চাশ। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাও, পাবে—হেনার বাড়িতেও থাকতে পারো। নেক্‌লেস আর চুড়ি সামনের হপ্তাতেই পাবে। ঘর সাজিয়ে দেবো দুশো টাকা খরচ করে। কলের গান কিনে দেবো। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে, যা যখন হুকুম করো ইচ্ছামত—

শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আবার ওই সব কথা ? চলে যান আপনারা ! আপনাদের দেখলেও পাপ হয়। আমি এই পথে বসে থাকবো, মা কালী আমায় আশ্রয় দেবেন—

গিরীন জানতো রাস্তার ওপর কোনো জোর করতে গেলেই লোক ছুটে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেবে, পুলিস আসবে—সব পণ্ড হবে। মিষ্টি কথায় কাজ হাসিল হ'ল না দেখে সে ভয় দেখাতে আরম্ভ করল। চোখ রাঙিয়ে বললে, সহজে না যাও—জানো আমি কি করতে পারি ? আমার নাম গিরীন কুণ্ডু—থানায় এজাহার করবো তুমি হেনা বিবির হার চুরি করে এনেছ। এক্ষুনি চালান দিয়ে দেবো জানো ? হেনা সাক্ষী দেবে—আজ রাতেই হাজতে বাস করতে হবে। ও বাঙালের বাঙালগিরি কি করে ঘোচাতে হয়, সে আমি জানি—তুমি এখানে আছ কোথায় শুনি ?

শরৎ বলল, বেশ তাই করুন। ভগবান জানেন আমি কোনো অপরাধ করি নি। এখনও চন্দ্র সূর্য উঠছে—আমি জীবনে পরের কুটো গাছটাতে কখনো হাত দিই নি। তিনি কখনো আমায় মিছিমিছি শাস্তি—

হঠাৎ নিজের অসহায় অবস্থা কল্পনা করে এবং ভগবানের উপর নির্ভরতার অনুভূতিতে শরতের চোখে জল এসে পড়ল—সে কেঁদে ফেললো।

ক্রন্দনরতা মেয়ে পথের ওপর, তখনই কৌতূহলী জনতা জমতে আরম্ভ করল আবার।

একজন ষণ্ডা গোছের তোয়ালে-কাঁধে লোক এগিয়ে এসে বললে, কি হয়েছে ? কে আপনি ? উনি কাঁদছেন কেন মশাই ?

ভিড়েরই একজন বলল, তা কি জানি ? আপনার সঙ্গে কে আছেন মা ? হয়েছে কি ?

আর একজন বলল, আপনি কোথায় যাবেন ? কি হয়েছে আপনার বলুন তো মা ?

এরা গিরীনের দলকে ঠাওর করতে পারে নি—সুতরাং তাদের সঙ্গে জনতার কথা বিনিময় হ'ল না। জনতার সুর ক্রমশঃ উত্তেজিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখে গিরীন বুঝলে এখানে কথা বলতে যাওয়া মানেই বিপদ টেনে আনা। এরা কোনো কথা শুনবে না, সকলেরই সহানুভূতি ক্রন্দনরতা নারীর দিকে। মার খেতে হবে বেশী কথা বললে। বাতাসের মোড় হঠাৎ এমন ভাবে ঘুরে যাবে, তা ওরা ভাবে নি।

গিরীন কুণ্ডু আর যাই হোক, নির্বোধ নয়। বেগতিক বুঝে সে দলবল নিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

শরৎ যখন নাটমন্দিরে ফিরে এল, তখন বেলা পাঁচটা।

গৌরী-মা বললেন, এত দেরি হ'ল যে মা ? এসে একটু প্রসাদ খেয়ে নাও। ওরাই পুজো দিয়ে গেল। কাল যাবে তো ওদের সঙ্গে ?

শরৎ বলল, যাবো মা, আপনি যা বলেন।

শরৎ ইতিমধ্যে পথে আসতেই ঠিক করে ফেলেছে সে ওদের সঙ্গে যাবে। এখানে থাকলে তার সমূহ বিপদ। আজ উদ্ধার পেয়েছে, কিন্তু যদি গিরীন তোড়জোড় করে আর একদিন আসে—আসবেই সে, তখন হয়তো জোর করেই নিয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা গৌরী-মার কথকতা শুনতে গিন্নী এলেন, সব ঠিক হয়ে গেল—কাল বেলা তিনটার সময় শরৎ তৈরী থাকবে। কালই রওনা হতে হবে ওদের সঙ্গে।

রাত্রিটা নিতান্ত ভয়ে ভয়ে কেটে গেল। সকালে উঠে শরৎ গৌরী-মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান

করে এল। তাও তার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, কোন দিক থেকে ওরা এসে পড়ে নাকি। ভগবান কাল বড় বাঁচিয়ে দিয়েছেন! মানুষ এত খল হতে পারে, এমন নয়-কে হয় করতে পারে, হাসিমুখে নির্জলা মিথ্যে বলতে পারে—গ্রাম্য মেয়ে শরতের তা জানা ছিল না। বিশেষ করে সে যে বাপের মেয়ে! কেদারের মেয়ে তাঁরই মত সরল।

গৌরী-মা বললেন, নকুলেশ্বর তলায় গিয়ে একটু প্রসাদী বেলপাতা নিয়ে এসো। তোমার যাত্রার দিন, ওদের যাত্রার দিন। মায়ের ফুল বেলপাতা আমি মন্দির থেকে এনে দেবো।

যাবার সময় গৌরী-মার চোখে জল এল, বললেন—তিনদিনের মায়া, তাতেই তোমায় ছেড়ে দিতে মন কেমন করছে। আবার এসো, দেশে ফেরবার সময় এখান দিয়েই হয়ে যাবে সরলারা।

শরৎ চোখের জলে ভেসে গৌরী-মার পায়ের ধুলো নিলে, বলল—অনেকদিন মাকে হারিয়েছি, আবার সেই মায়ের কথা আমার আপনাকে দিয়ে মনে পড়লো। আশীর্বাদ করুন মা।

হাওড়া স্টেশন। মস্তবড় জায়গা। লোকজন গমগম করছে। লম্বা লম্বা রেলগাড়ি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে। আলোয় আলো চারিদিকে। ঘরের মধ্যে এসে রেলগাড়ি দাঁড়ায় কেমন করে?

সে সত্যিই চললো তবে? কোথায় চললো?

বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কোথায় পড়ে রইল তার আবাল্য-পরিচিত গড়-শিবপুর! যেখানকার গড়ের জঙ্গলে, তাদের কালো পায়রার দীঘির জলে, চৈত্র মাসে তুলো-ওড়া বড় শিমুল গাছটার ছায়ায়, উত্তর দেউলের নির্জন পথে বাদুড়নখীর শুকনো খোলের ঝুমঝুমির শব্দে তার যে জীবনের শুরু, সেই মাটিতেই—সেখানকার জ্যোৎস্নার মধ্যে, বর্ষার দিনের মেঘের ছায়ায় যে জীবন সুখেদুঃখে আপন পথ ধরে চলে এসেছিল এতদিন—সে জীবনের সঙ্গে আজ চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

শরৎ জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দিল। চোখের জলে দ্রুত পলায়নপর টেলিগ্রাফের তারের খুঁটি, গাছপালা, ঘরবাড়ি সব ঝাপ্‌সা। কামরার মধ্যে শরৎ চেয়ে দেখলে অবাক হয়ে। কাদের সঙ্গে সে আজ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে? কারা এরা? ওই মোটামত ফর্সা রঙের গিন্নী, এই চৌদ্দ বছরের মেয়ে, ওই তিন চারটি ছোট বড় খুকি, কর্ত্তা আছেন পুরুষগাড়িতে—এদের তো সে চেনে না।

বাবা গান গাইতেন—'দিয়ে মায়াবেড়ি পদে ফেলেচ বিপদে।'

কত যে তার সাধ ছিল দেশবিদেশে বেড়াতে। গড়শিবপুরের জঙ্গল ভাল লাগে না। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সে কত গল্প! আজ তো সে-সব সফল হতেই চললো—কিন্তু এ ভাবে সর্ব্বস্ব ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে গড়শিবপুর জন্মের মত ছেড়ে যেতে হবে, জন্মজন্মান্তরের গভীর চেতনা দিয়ে যে গড়শিবপুর তার মন আঁকড়ে ধরে ছিল, তা সে কি কোনদিন ভাবতো?

আর সে ফিরবে না। বাবাকে সে কলঙ্কের হাত থেকে—লোকের টিটকিরি থেকে মুক্ত রাখবে। তার ভাগ্যে পরের বাড়ির দাসী হয়ে চিরকাল বিদেশে নির্ব্বাসন—যা ঘটে ঘটুক—বুড়ো বয়সে বাবার মুখ হাসাতে পারবে না। বাবা হয়তো দেশে গিয়ে বলেছেন, মেয়ে মরে গিয়েছে। খুব ভাল। আর সে দেখা দেবে না। দেশের কাছে মৃত হয়েই থাকবে যতদিন বাঁচবে সে।

রাতের অন্ধকারে বাংলা মুছে গেল। কামরাটা ছোট—ধামা, লণ্ঠন, পেঁটরা, বিছানা, জলের কুঁজোতে একটা দিক ঠাসা, অন্য দিকে শরৎ গৃহিণীর জন্য বিছানা পেতে দিলে

বেঞ্চিতে। তার স্বাভাবিক সেবা-প্রবৃত্তি এখানেও সজাগ আছে।

গিন্নী বললেন, কোন্ ইস্টিশান রে মিনু?

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে বললে, ব্যাণ্ডেল জংশন—

—সব শুয়ে পড় তোরা। শরৎ ওদের বিছানা করে দাও—

মিনু তাড়াতাড়ি বলল, আমি বিছানা পেতে নিচ্ছি মা—আমার পাতাই আছে।

শরৎ অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে চাইল। বাঃ, বেশ মেয়েটি। এতক্ষণ চুপ করে লাজুকের মত আপন মনে বসে ছিল।

পথে তার পর মেয়েটির সঙ্গে ওর বড় ভাব হয়ে গেল। ওর ভাল নাম মৃণাল, মৃদু স্বভাব, হৃদয়বতী। ও শরৎকে কি চোখে দেখে ফেলেছে, দিদি বলে ডাকে, লুকিয়ে হাতের কাজ কেড়ে নেয়।

জামালপুরে বদল করে ওরা গেল প্রথমে মুঙ্গেরে। সেখানে গিন্নীর ছোট ঠাকুর-পো চাকরি করে। গঙ্গার ধারে বেশ ভাল বাসা। তিন দিন ধরে ওরা কাটাল সেখানে, শরৎ মিনুকে সঙ্গে নিয়ে কষ্টহারিণীর ঘাটে রোজ স্নান করে আসে। গৃহিণীর বাতের ধাত, তিনি বাথরুমে স্নান করেন।

কষ্টহারিণীর ঘাটে প্রথমে যে দিন গিয়ে দাঁড়াল, শরতের মন অভিভূত হয়ে পড়ল—গঙ্গার রূপ দেখে। একদিকে জামালপুরের মাবক পাহাড়ের লম্বা টানা সুনীল রেখা, সামনে প্রশস্ত পুণ্যতোয়া জাহ্নবী, দু-একখানা পালতোলা নৌকা নদীবক্ষে, কত স্নানার্থীর যাতায়াত।

পৃথিবীতে এমন সুন্দর জায়গাও আছে?

আবার চোখে জল আসে, শরৎ দেখে নি কখনো এসব।

মিনু বললে, দিদি চেয়ে দ্যাখো—এই যে ভাঙা পাঁচিল না?—এখানে মীরকাসিমের দুর্গ ছিল। ওই যে ফটক দিয়ে এলাম—দেখলে তো?

—তোর দিদি মুখ্যু মেয়ে, তোরা এ কালের ইস্কুলে পড়া মেয়ে—দিদিকে একটু শিখিয়ে নে। মীরকাসিমের দুর্গ বললে তো—কে ছিল সে?

—আহা দিদি, তুমি কিচ্ছু জান না। শোনো বলি—

তার পর মিনু বিজ্ঞভাবে স্কুলে সদ্য-অধীত ইতিহাসের বিদ্যা সবিস্তারে জাহির করে।

শরৎ চোখ বড় বড় করে বলল—ও!

দিন বেশ কেটে যায়। একদিন সবাই মিলে চণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিতে গেল, আর একদিন গেল সীতাকুণ্ড। মুঙ্গের থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে গমের ক্ষেত, ছোলার ক্ষেতের পাশের পথ দিয়ে গিয়ে, কত ছোট বড় বস্তি ছাড়িয়ে কতখানি বেড়িয়ে এল সবাই মিলে।

পাহাড় জিনিসটা শরতের কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু।

প্রথম যেদিন মিনু ওকে দেখালে ঐ দ্যাখো দিদি জামালপুরের পাহাড়—শরৎ অপলক চোখে চেয়ে রইল সেদিকে। তারপর আরো ভাল করে দেখলে যেদিন মুঙ্গের থেকে ওরা বখ্তিয়ারপুর রওনা হ'ল। কাজরা স্টেশনের কাছে এবং স্টেশন ছাড়িয়ে বাঁদিকে সে কি লম্বা, উঁচু পাথরের পাহাড়—এত বড় বড় পাথর যে আবার হয়, তার এত বড় স্তূপ হয়—এ কথা কে আবার কবে ভেবেছিল?

কিউলের কাছাকাছি এসে দূরে দূরে কত নীল পাহাড়—শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। দেখে মনে আনন্দ হয়, দুঃখও হয়—কেবলই মনে হয় বাবাকে এসব সে যদি আজ দেখাতে পারত!

রেলে যেতে যেতে একটা চমৎকার জায়গা সে দেখেছে- মনের মধ্যে গে‍ঁথে গেল জায়গাটা। কাজরা পাহাড়ের একটা কি সুবৃহৎ গাছের ছায়ায় অনেকটা যেন পাথরের সান বাঁধানো রোয়াক, চারিধারে শুধু পাহাড়, নিকটেই একটা ঝর্ণা ঝিরঝির করে পাহাড় থেকে বয়ে নেমে এসেছে। কি শান্তি পাহাড়ের ওপর সান-বাঁধানো রোয়াকের মত পাথরটাতে। কি ছায়া!

ট্রেনের এককোণে সে বসে বসে ভাবে বাবাকে নিয়ে সে ওইখানে একটা ছোট ঘর বাঁধবে। মাঝে মাঝে গড়শিবপুর থেকে বাবা আর সে ওখানে এসে বাস করবে দু-মাস, তিনমাস। জ্যোৎস্না রাতে এদিকের সেই যে পাথরখানা, বাবা ওটার ওপর বসে বেহালা বাজাবেন, তাঁর সেই প্রিয় গানটি গাইবেন—

"তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকিব বল্"—

ভাবতে বেশ লাগে। যদিও সে জানে, এসব ভাবনা আকাশকুসুম, কোথায় বা বাবা, কোথায় কে? এত দূরে দূরে সব জায়গা আছে তা হলে? গড়শিবপুর থেকে, কলকাতা থেকে? সত্যি পৃথিবীটা কত বড়—না মিনু?

মিনু হেসে খিল্ খিল্ করে গড়িয়ে পড়ে বলল—দিদি, তুমি বড় ছেলেমানুষ। কিচ্ছু জানো না।

—মুখ্যু যে তোর দিদি—তোরা আজকাল কত পড়িস্ বোন, কত জানিস্—

—দিদি, তোমাদের বাড়ির যে বড় গড়টা আর সেই ভাঙা কি কি পাথরের মূর্ত্তি সেই বলেছিলে?

—বারাহী দেবীর মূর্ত্তি।

—সেই অন্ধকারে চলে বেড়ায় জঙ্গলের মধ্যে—না?

—হ্যাঁ ভাই মিনু।

—সামনে যে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন বুঝি?

—এই রকম সবাই বলে। গড়ের জঙ্গলে সেই তিথিতে কেউ যায় না প্রাণের ভয়ে।

—সব দিন বুঝি নয়?

—তিথির দিনে।

—আচ্ছা দিদি—কখনো এরকম হতে দেখেছ তুমি? তোমাদেরই তো গড়—

শরৎ গড়শিবপুরের জঙ্গল থেকে বহু দূরে থেকেও যেন ভয়ে শিউরে উঠে বললে—না দিদি, আমি কিছু দেখি নি চোখে। তবে পায়ের দাগ দেখেছে অনেকে—আমিও দেখেছি ছোটবেলায়—

—কিসের পায়ের দাগ?

—বারাহী দেবীর পাথরের পায়ের ছাপ—

—সত্যি?

—সত্যি ভাই মিনু। তোর গা ছুঁয়ে বলছি—

শরৎ যুবতী হলে কি হবে, ছেলেপুলে হয় নি, একা নির্জ্জন গ্রাম্য সংসারে চিরদিন কাটিয়েছে, বালিকা-স্বভাব তার যায় নি। যায় নি বলেই সে বালিকাদের সঙ্গে নিজেকে যত মিশ খাওয়াতে পারে, বড়দের দলে তেমন পারে না। মিনুর সঙ্গে তাই তার মিলছিল ভালই—যেমন গাঁয়ে থাকতে মিলেছিল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে।

বখ্তিয়ারপুর থেকে ওরা গেল রাজগীর। কর্ত্তার শরীর ভাল নয়, গিন্নীর বাতের ধাত—রাজগীরের উষ্ণ-কুণ্ডে স্নান করে বাত ভাল করতে চান। মিনু ও শরৎ বাসা থেকে বেরিয়ে রাজগীরের বৌদ্ধ মঠ পার হয়ে বাজার ও উষ্ণ-কুণ্ডকে ডাইনে রেখে বেণুবন ও বৈভার

পর্ব্বতের ছায়ায় ছায়ায় সোন ভাণ্ডার গুহা পর্য্যন্ত বেরিয়ে আসে সরস্বতী নদীর ধারের পথ বেয়ে। ওদের ডাইনেই থাকে সেই গৃধ্রকূট পর্ব্বত ও সেই সুপবিত্র বেণুবন, বুদ্ধদেব যেখানে শিষ্য আনন্দকে উপদেশ দিয়েছিলেন। হাজার বছর ধরে পার্ব্বত্য সরস্বতী নদীর বাতাসে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন-পূত করণ্ড ও বেণুবন ধ্বনিত হয়, হাজার হাজার বছরের জ্যোৎস্না লোকে বৈভার পর্ব্বতের শিখরদেশ উদ্ভাসিত হয়—ছেলেমানুষ মিনু ও অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে শরৎ লোকেত্তর কিছুই খবর রাখে না। তবুও মিনু তার স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের জ্ঞানকে আশ্রয় করে বলল—এই যে রাজগীর দেখছো দিদি, এর নাম রাজগৃহ। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ—জরাসন্ধের নাম জানো তো দিদি? এখানে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল—

মগধের খবর রাখে না শরৎ, কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারত ও গ্রাম্য যাত্রার কল্যাণে জরাসন্ধের নাম তার অপরিচিত নয়।

শরতের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়। জরাসন্ধের রাজ্যে এসে গিয়েছে তারা—পুরাণের সেই জরাসন্ধ? কতদূরে এসে পড়েছে আজ ··কত দূর বিদেশে?

এখানে প্রতিদিন ওরা উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করে, গিন্নীকে ধরে এনে রোজ স্নান করাতে হয়, শরৎ অত্যন্ত যত্নে নিয়ে আসে, অত্যন্ত যত্নে নিয়ে যায়। গিন্নী শরতের ওপর খুব সন্তুষ্ট—সেবাপরায়ণা শরৎ প্রাণ দিয়ে আশ্রয়দাত্রীর সেবা করে। সে সেবার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি নেই।

রাজগীর থাকতেই গিন্নীর এক জা কোন্ জায়গা থেকে ছেলেপুলে নিয়ে ওদের ওখানে হাওয়া বদলাতে এলেন। ইনি নাকি বেশ বড়লোকের মেয়ে, স্বামী পশ্চিমের কোন্ শহরে ইন্‌জিনিয়ার, মোটা পয়সা রোজগার করে। সঙ্গে দুটি ছেলেমেয়ে, একজন আয়া এসেছে। সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা—গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না। দোহারা গড়ন, রং খুব ফর্সাও নয়, খুব কালোও নয়। দাম্ভিক মুখশ্রী।

প্রথম দিন থেকেই মিনুর কাকীমা শরতের ওপর ভাল ব্যবহার করত না। যে দিন গাড়ি থেকে নামল—সেই দিনই বিকেলে মিনু ও শরৎ রাজগীরের বাজার ছাড়িয়ে সরস্বতী নদীর ধারে বেড়িয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরল। মিনুর কাকী অমনি শরৎকে বলে উঠল, ছেলে দুটোকে একটু কোথায় ধরবে, না কোথা থেকে এখন বেড়িয়ে ফিরলো—বামুনী, ও বামুনী, খোকাদের কাপড় ছাড়িয়ে গা-হাত ধুইয়ে দাও—

তার পর থেকে প্রত্যেক সময় সে শরৎকে ডাকে 'বামুনী' বলে। শরৎ নিজের হাতেই দুবেলার রান্নার ভার নিয়েছিল। বাড়ির পাচিকাকে যে চোখে দেখা উচিত, মিনুর কাকী সেই চোখেই দেখতো ওকে।

একদিন মিনুকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে, বামুনীকে নিয়ে রোজ রোজ যাস্ কোথায়?

—কে? দিদি? দিদির সঙ্গে বেড়াতে যাই—

—দ্যাখ্, তোকে বলে দিই মিনু! চাকর-বাকরের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করা ভাল নয়। সেবার তো দেখি নি, ওকে কোথা থেকে আনলি?

—মা কলকাতা থেকে এনেছে এবার।

—ক'টাকা মাইনে ঠিক হয়েছে জানিস্?

—আমি জানি নে কাকীমা। তবে আমার মার যিনি গুরু-মা, কালীঘাটে থাকেন, তিনিই দিয়েছেন।

—যাক্‌গে, ওদের সঙ্গে এত মেশামেশি ভাল নয় বাপু। ওদের নাই দিলেই মাথায় চড়ে বসবে, চাকর-বাকরকে কখনো নাই দিতে নেই। অমনি একদিন বলে বসবে দু-টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও—ওসব করিস্ নে।

—উনি কিন্তু তেমন নয় কাকীমা—বড় ভাল, কি কথাবার্ত্তা, ওঁদের দেশে মস্ত বড় বাড়ি ছিল, এখন পড়ে গিয়েছে—গড় ছিল বাড়িতে—কেমন দেখতে দেখছো তো? বড় বংশের মেয়ে—

মিনুর কাকীমা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। একটু সামলে নিয়ে বললে, তোকে এইসব গল্প করে বুঝি? কলকাতা থেকে এসেছে, ওই বয়েস—যাই হোক, ওরা লোক ভাল হয় না। সে-সব তোর শোনার দরকারও নেই—মোট কথা তুই ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে অত মেলামেশা করো না—বারণ করলুম।

তার পর থেকে মিনুর সত্যিই শরতের সঙ্গে বেড়ানো বন্ধ হয়ে গেল, কাকীমার হুকুমে।

একদিন মিনুর কাকীমা শরৎকে ডেকে বললে, ওগো বামুনী, শোনো এদিকে। আগে কোথায় কাজ করতে?

শরৎ এই বৌটির পাশ কাটিয়ে চলতো—এ পর্য্যন্ত সামনেই এসেছে কম, উত্তর দিলে—কাজ বলছেন? কাজ—কলকাতাতেই—

—কোথায় বলো তো? আমরা কলকাতার লোক। সব চিনি। কোথায় ছিলে?

—কালীঘাটে গৌরী-মার কাছে।

—না না, আমি বলছি কাজ করতে কোথায়?

—কাজ করি নি কোথাও।

—তবে যে খানিক আগে বললে কাজ করতে! বাড়ি কোথায় তোমার?

—যশোর জেলার গড়শিবপুর—

—আচ্ছা, তোমার নাম কি বলো। কি পোস্টাফিস তোমার গাঁয়ের, আমরা চিঠি লিখবো। তোমাকে সেখানে কেউ চেনে কিনা দেখা দরকার। অজানা লোককে রাখা ঠিক নয় কিনা! তোমার কেউ আছে, সেই কি নাম বললে, সেই গাঁয়ে?

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। সে সত্য কথা বলে বিপদে পড়ে যাবে এমন তো ভাবে নি। কথা বানিয়ে বলা তার অভ্যাস নেই—তার বাবাও যেমন চিরকাল সোজা সরল কথা বলে এসেছেন, সেও তাই শিখেছে। এখন কি করা যায়, দেশে চিঠি লিখলে তো সব ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু এর মধ্যে একটা সত্য কথা বলবার ছিল, ডাকঘরের নাম তার জানা নেই। আগে ডাকঘর ছিল কুলবেড়ে। সে ডাকঘর উঠে গিয়েছে, বাবার কাছে সে শুনেছিল—তাদের কস্মিনকালে চিঠিপত্র আসে না, কেই-বা দেবে, ডাকঘর যে কোথায় হয়েছে।

সে বললে—ডাকঘর কোথায় জানি নে—

—ওমা, সে কি কথা—ডাকঘর জানো না কোথায়—কে আছে তোমার?

—কেউ নেই মা—

কথাটা বলবার সময়ে শরতের গলা ধরে গেল, মিনুর কাকীমা সেটা লক্ষ্য করলে। গিন্নীকে গিয়ে বললে—দিদি লোক দেখে রাখতে হয়। বামুনীর বাড়িঘর আজ জিজ্ঞেস করলুম তা বলতে চায় না। আমি তো ভাল বুঝছি নে। ওকে তাড়াও—

গিন্নী বললেন, গৌরী-মা ওকে দিয়েছেন, তাঁর কাছে থাকত। ভাল মেয়ে বড্ড—কোনো বদচাল তো দেখি নি। ওর আর কেউ নেই, তখনি জানি। ওকে তাড়াতে পারবো না।

আট

মিনুর কাকীমার এ খুঁটিনাটি জেরার পরদিন থেকে শরৎ ভয়ে আর সামনে বেরুতে চায় না সহজে। সে জানত না গিন্নীর কাছে তার সম্বন্ধে লাগানোর কথা। কিন্তু আবার কোনদিন বাপের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে হয়তো বসবে বৌটি - হয়তো যে আশ্রয়টুকু আছে, তাও যাবে। তার চেয়ে সামনে না যাওয়া নিরাপদ।

কিন্তু শরৎ এড়িয়ে যেতে চাইলেও মিনুর কাকীমা অত সহজে শরৎকে রেহাই দিতে রাজী নয় দেখা গেল। শরৎকে সে পছন্দও করে না—অথচ পছন্দ না করার মধ্যেই শরৎ সম্বন্ধে ওর কেমন এক ধরনের উগ্র কৌতূহল।

একদিন শরৎকে ডেকে বললে, ও বামুনী—শোনো—

শরৎ কাছে গিয়ে বললে, কি বলছেন?

—তোমার হাতের রান্না বেশ ভালো। কোন্ জেলায় বাপের বাড়ি বললে সেদিন যেন—

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। এই বুঝি আবার—

সে বললে—যশোর জেলা।

—যশোর জেলা। বাঙাল দেশের নিরিমিষ্যি রান্না বাপু তোমাদের ভালোই। তোমার বয়েস কত?

—সাতাশ বছর।

—না, তার চেয়ে বয়েস বেশী। বত্রিশ-তেত্রিশের কম না। তোমাদের হিসেব থাকে না।

শরৎ চুপ করে রইল। এর কোন উত্তর নেই।

—তোমার বিয়ে হয়েছিল কোথায়?

—আমাদের গাঁয়ের কাছেই।

—কতদিন বিধবা হয়েছ?

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে শরতের মনে বড় কষ্ট হয়। যা ভুলে গিয়েছে, যা চুকেবুকে গিয়েছে কতদিন আগে, সে-সব দিনের কথা, সে-সব পুরোনো কাসুন্দি—এখন আর ঘেঁটে লাভ কি?

—তবু সে বললে, অনেকদিন আগে। আমার তখন আঠার বছর বয়েস।

—সেই থেকে বুঝি কলকাতায়—মানে, চাকরি করছ?

—না। দেশেই ছিলাম।

শরৎ খুব সতর্ক ও সাবধান হ'ল। তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

—কলকাতায় কতদিন আগে এসেছিলে?

—বেশীদিন না।

—গাঁ থেকে কার সঙ্গে—মানে কলকাতায় আনলে কে?

শরতের জিব ক্রমশঃ শুকিয়ে আসছে। তার মুখে কথা আর যোগাচ্ছে না। কাঁহাতক বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে সে?

—কালীঘাট এসেছিলাম মা—গৌরী-মার কাছে সেই থেকে ছিলাম।

সেদিন মিনু এসে পড়াতে তার কাকীমার জেরা বন্ধ হ'ল। শরৎ মুক্তি পেয়ে সামনে থেকে সরে গেল।

পরদিন বাসার সকলে মিলে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে গেল। শরৎ ছেলে-মেয়েদের সামলে নিয়ে পেছনে পেছনে চলল। মিনুর মা সেদিন যান নি। মিনুর কাকীমার সঙ্গে যে আয়া এসেছিল, সে যেন এখানে এসে ছুটি পেয়েছে—খাটুনি যত কিছু শরতের ঘাড়ে। কাকীমার দুটি ছেলেমেয়ে যেমন দুষ্ট তেমনি চঞ্চল—তাদের সামলাতে সামলাতে শরৎ হয়রান হয়ে পড়ে।

মিনুর কাকীমা বলে, ও বামুনী, ওই মিণ্টুকে চার পয়সার গরম জিলিপি কিনে এনে দাও তো বাজার থেকে—

বাজারে সকলের সামনে দোকান থেকে জিনিস কেনা শরতের অভ্যেস নেই। চুপি চুপি মিনুকে বললে, মিনু দিদি, যাবি আমার সঙ্গে?

মিনু সব সময়েই তার দিদিকে সাহায্য করতে রাজী।

বললে, চলো দিদি—

জিলিপি কিনে ফিরে আসতেই মিনুর কাকীমা বললে, চলো কুণ্ডীতে কাপড়গুলো নিয়ে—সাবানের বাক্স নেও। নেয়ে আসি—

মিনু পেছন থেকে এসে সাবানের বাক্স নিজেই নিয়ে চলল।

স্নান শেষ হয়ে গেল। সিক্ত বসনে সবাই উঠে এসে মেয়েদের কাপড় ছাড়বার ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকল। শরৎও স্নান করে এল। সে লক্ষ্য করল, মিনুর কাকীমা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। পশ্চিমের জলহাওয়ার গুণে হয়তো শরতের স্বাস্থ্য আরও কিছু ভাল হয়ে থাকবে, তার গৌর তনুর জলুস আরও খুলে থাকবে, সিক্তবসনা দীর্ঘদেহা সে তরুণীর মূর্ত্তি এমন মহিমময়ী দেখাচ্ছিল—যে রাস্তার কত লোক তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মিনু অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে ভাবলে—দিদি যে বলে তাদের রাজার বংশ, মিথ্যে নয় কথাটা। ওই তো কাকীমা অত সেজেগুজে এসেছেন, দিদির পাশে দাঁড়াতে পারেন না—

মিনুর কাকীমাও বোধ হয় শরতের অদ্ভুত রূপে কিছুক্ষণের জন্যে মুগ্ধ না হয়ে পারলে না—কারণ সেও খানিকটা শরতের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন এক ধরনের ভাব হ'ল মনে—সেই পুরাতন মনোভাব, সুন্দরী নারীর প্রতি সাধারণ নারীর ঈর্ষা।

সে ধমকের সুরে বললে, একটু হাত চালিয়ে কাপড় টাপড়গুলো কেচে-টেচে নাও না বাপু, তোমার সব কাজেই ন্যাড়া-ব্যাড়া—

যেন শরতকে খাটো করে অপমান করে ওর নিজের মর্য্যাদা আভিজাত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলে।

ফিরবার পথে মিনুর কাকীমা বললে, তুমি একটু আগে হেঁটে যাও বাপু, আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি—তোমাকে আবার গিয়ে দিদির গরম জল চড়াতে হবে—কাপড়গুলো নিয়ে গিয়ে রোদে দাও গে—

বড় এক বোঝা ভিজে কাপড় শরতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কাকীমা মিনুকে ও নিজের ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে পিছিয়ে পড়ল। মিনু বলল, দিদিকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছিল নেয়ে উঠে, না কাকীমা?

কেন মিনু হঠাৎ একথা বললে? মিনুর কাকীমাও বোধ হয় ওই ধরনের কোন কথাই ভাবছিল। হঠাৎ যেন চমকে উঠে মিনুর দিকে চেয়ে রইল অল্প একটু সময়ের জন্যে। পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, পরের ঘি-দুধ খেলে অমন সবারই হয় বাপু—তুই চল্, নে—

বিকেলে আবার বৌটি ডাকলে শরতকে। বৌ নিজে স্টোভ ধরিয়ে চা করে এক পেয়ালা মুখে তুলে চুমুক দিচ্ছে, আর একটা ধুমায়মান পেয়ালা সামনে বসানো মেঝের ওপর। শরতকে বললে, ও বামুনী, দিদিকে চা-টা দিয়ে এসো তো?

তার পরের কথাতে শরৎ বড় চমৎকৃত হয়ে গেল কিন্তু।

বৌটি বললে, তোমার জন্যেও এক পেয়ালা আছে, ওটা দিদিকে দিয়ে এসো—এসে তুমি খাও—

শরৎ অগত্যা ফিরে এসে কলাইকরা পেয়ালাটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে, বৌটি

বললে, এখানে বসে খাও না গো। তাড়াতাড়ি কি আছে?

শরৎ বসে চা খেতে লাগল কিন্তু কোন কথা বললে না।

মিনুর কাকীমা আবার বললে, তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি। দিদির কাছ থেকে তোমায় যদি আমি নিয়ে যাই, তুমি মাইনে নেবে কত?

শরৎ আরও অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমাকে?

—হ্যাঁ গো—তোমাকে। বলো না মাইনে কত নেবে?

—গিন্নীমা যেতে দেবেন না আমায়।

মিনুর কাকীমা মুখ নেড়ে বললে, সে ভাবনা তোমার না আমার? আমি যদি বলে কয়ে নিতে পারি! মানে আর কিছু না, যেখানে থাকি খোট্টা বামুনে রাঁধে, বাঙালীর মুখে সে রান্না একেবারে অখাদ্য। আমার নিজের ওসব অভ্যেস নেই—হাঁড়ি হেঁসেল কখনো করি নি, বাপের বাড়িতেও না, শ্বশুরবাড়িতে এসে তো নয়ই। তোমাদের বাঙাল দেশের রান্না ভাল—তাই বলছিলাম—বুঝলে?

শরতের মুখ চুন হয়ে গেল।

এমন একটা আশ্রয় পেয়ে সে যে কোথাও যেতে রাজী নয়, এদের ছেড়ে, মিনুকে ছেড়ে। কিন্তু সে এখনও পরের দয়ার পাত্রী, তার কোন ইচ্ছে বা দয়া এসব স্থলে খাটবে না, সে ভালই বোঝে।

সে চুপ করে রইল।

মিনুর কাকীমা ভুল বুঝে বললে, আচ্ছা তাই তবে ঠিক রইল। মাইনের কথা একটা কিন্তু ঠিক করে ফেলা ভালো—তা বলছি। তখন যে বলবে—

শরৎ মিনুকে নিরিবিলি পেয়ে বললে, মিনু বেড়াতে যাবি?

—চলো দিদি—কোন্ দিকে যাবে?

—সোন ভাণ্ডারের গুহার দিকে চল—

নদীর ধারে ধারে বনাবৃত পথ গৃধ্রকূট শৈলের ছায়ায় ছায়ায় সোন ভাণ্ডার ছাড়িয়ে রাজগীরের প্রাচীনতর অঞ্চলে জরাসন্ধের মল্লভূমির দিকে বিস্তৃত। ওরা সেই পথে চলল। কত পাথরের নুড়ি পড়ে আছে পাহাড়ের তলায়, নদীর পাড়ে। সমতলবাসিনী শরৎ এখনও এই সব রঙচঙে নুড়ির মোহ কাটিয়ে ওঠে নি, দেখতে পেলেই কুড়িয়ে আঁচলে সঞ্চয় করে।

মিনু বললে, তুমি একটা পাগল দিদি। কি হবে ওসব?

—বেশ না এগুলো? দ্যাখ এটা কেমন—

—কি করবে?

—ইচ্ছে কি করে জানিস্। ওসব দিয়ে ঘর সাজাই—কিন্তু ঘর কোথায়?

—জড়ো করেছ তো একরাশ।—তাতেই সাজিও—

—জানিস মিনু, তোর কাকীমা কি বলেছে?

—কি দিদি?

—আমায় নিয়ে যেতে চায় ওদের বাড়ি।

—তোমার যাওয়া হবে না, আমি মাকে টিপে দেবো!

—আমি তোদের ফেলে কোথাও যেতে চাই নে মিনু। যখন আশ্রয় পেয়েছি, যতদিন বাঁচি এখানেই থাকব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতেই হ'ল মিনুর কাকীমার সঙ্গে। মিনুর মা বললেন—যাও মা, ওরা কাশীতে যাচ্ছে, তোমার তীর্থ করা হবে এখন। আমি এর পরে তোমায় কাছে নিয়ে আসবো।

মিনুর কাকীমা সগর্বে অন্যান্য বোঁচকা, ট্রাংক, আয়া ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শরৎকেও নিয়ে গিয়ে কাশী নামল দিন-দশেক পরে। মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ি, ছোট্ট সংসার, স্বামী-স্ত্রী আর এক দেওর। দেওর লাহোর মেডিকেল ইস্কুলে পড়ে, এবার পাশ দেবে। নিচে একঘর গরীব লোক থাকে ওদের ভাড়াটে।

শরৎ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে তার এত খারাপ লাগছিল। একটা কথা বলবার লোকও নেই। মিনুর কাকীমা চাকর-বাকরকে আমল দেয় না, ছেলেমেয়েদেরও তার ভাল লাগে না। যেমন দুষ্ট, তেমনি একগুঁয়ে এগুলো। যা ধরবে তাই।

একদিন মিনুর কাকীমা বললে—ও বামুনী, এই ডালটুকু ওই নিচের তলার পটলের মাকে দিয়ে এসো—চেয়েছিল আমার কাছে, গরীব লোক—

শরৎ ডাল দিতে গিয়ে দেখল একটি বৌ রান্নাঘরে বসে ওর দিকে পিছন ফিরে রান্না করছে। ওর কথায় বৌটি ওর দিকে ফিরতেই শরৎ বললে, উনি ডাল পাঠিয়ে দিয়েছেন—রাখুন—

তার পরেই বৌয়ের চোখ দুটোর দিকে চেয়ে শরতের মনে কেমন খট্‌কা লাগল।

বৌটি হেসে বললে, তোমার গলা নতুন শুনছি। তুমি বুঝি ওদের এখানে নতুন ভর্তি হয়েছ? বলছিলেন কাল দিদি। বসো ভাই। আমি চোখে দেখতে পাইনে—বাটিটা রাখ এই সিঁড়ির কাছে।

ও, তাই অমন চোখের চাউনি।

শরতের বুকের মধ্যে যেন কোথায় ধাক্কা লাগল।

বৌটি আবার বললে, তোমার নাম কি ভাই? তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে বয়েস বেশী নয়।

—আমার নাম শরৎ। বয়েস আপনার চেয়ে বেশীই হবে বোধ হয়—

—না ভাই আমার বয়েস কম নয়। তা আমাকে তুমি আপনি আজ্ঞে কোরো না। আমি একা থাকি এই ঘরে—উনি তো বাইরের কাজেই ঘোরেন। তুমি এসো, দুজনে গল্প করব।

—বেশ ভাই। তাহলে তো বেঁচে যাই—

শরতের মনের মধ্যে কাশী আসবার কথা শুনে একটু আগ্রহ না হয়েছিল এমন নয়। মিনুর মার কাছে এজন্যে সে না আসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি। কাশী গয়া ক'জন বেড়াতে পারে? তাদের গাঁয়ের নীলমণি চাটুজ্জের মা শরতের ছেলেবেলায় কাশীতে এসে তীর্থ করে যান—সে গল্প বুড়ীর এখনো ফুরলো না। আর বছরও সে গল্প বুড়ীর মুখে শরৎ শুনেছে। সেই কাশীতে যদি এমনি যাওয়া হয়—হোক!

কাশী এসে কিন্তু মিনুর কাকীমার ফরমাশ আর হুকুমের চোটে এতটুকু সময় পায় না শরৎ। সকালে উঠে হেঁসেলের কাজ শুরু। একদফা ছোটদের দুধ বার্লি, একদফা বড়দের চা খাবার, বাজল বেলা আটটা। তার পরে রান্নার পালা শুরু হ'ল এবং খাওয়ানো-দাওয়ানোর কাজ মিটতে বেলা দেড়টা। ওবেলা তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে আবার চা খাবারের পালা। সন্ধ্যার সময় বাবুর বন্ধুরা বৈঠকখানায় এসে বসে, রাত নটা পর্যন্ত বিশ পেয়ালা চা-ই হবে।

দুপুরবেলা কাজকর্ম চুকিয়ে ফাঁক পেলে শরৎ এসে বসে একতলায় অন্ধ বৌটির কাছে। শরৎ তার পরিচয় নিয়েছে—ওর নাম রেণুকা, ওর বাবা কাশীতেই স্কুল-মাস্টারি করতেন। মা নেই, ভাই নেই, আজ কয়েক বছর আগে ওর বিয়ে দিয়েই বাবা মারা যান। ওরা ব্রাহ্মণ, স্বামী সামান্য মাইনেতে কি একটা চাকরি করে। সন্ধ্যার সময় ভিন্ন বাড়ি আসতে পারে না—সারাদিন রেণুকাকে একা থাকতে হয় বাসাতে।

শরৎ বলে, তুমি বাংলা দেশে যাও নি কখনো ?

—না ভাই, এখানেই জন্ম, বিশ্বনাথের চরণ ছেড়ে আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই।

—দেশ ছিল কোথায় বাবার মুখে শোনো নি ?

— হালিশহর বলুদেঘাটা। এখনো আমার কাকারা সেখানে আছেন শুনেছি।

দুজনে বসে সুখদুঃখের কথা বলে। রেণুকার অনেক কাজ শরৎ করে দেয়। বড় ভাল লাগে এই অন্ধ মেয়েটিকে। মন বড় সরল, অল্পেই সন্তুষ্ট, জীবন ওকে বেশী কিছু দেয় নি, যা দিয়েছে তাই নিয়েই খুশী আছে।

রেণুকা বলে, একদিন আমার বাড়ি কিছু খাও ভাই—

—বেশ আমি কি খাবো না বলছি ?

—রান্না তো খেতে পারবে না। নিরিমিষের হাঁড়ি নেই—সব একাকার। রান্না করে খাবে আলাদা ?

—না ভাই, সে হাঙ্গামাতে দরকার নেই—তুমি ফল খাইও বরং—

রেণুকার স্বামী ছানা, ফলমূল মিষ্টি কিনে রেখে গিয়েছিল। একদিন বিকেলে রেকাবি সাজিয়ে রেণুকা ওকে খেতে দিলে। চোখে দেখতে পায় না বটে—কিন্তু কাজকর্ম্ম সবই করে হাতড়ে হাতড়ে।

শরৎ একদিন মিনুর কাকীমাকে বলে কয়ে বিশ্বনাথ দর্শনের ছুটি নিলে। ওদের আয়া সঙ্গে গেল মন্দিরের পথ দেখানোর জন্যে। শরৎ রেণুকাকে হাত ধরে নিয়ে গেল।

বিশ্বনাথের গলির মধ্যে কি লোকের ভিড় ! কত বৌ-ঝি, কত লোকজন। শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে, তার কাছে সব কিছু নতুন, সবই আশ্চর্য্য। মন্দির থেকে বার হয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে বসলো বিকেল বেলা। নিত্য উৎসব লেগেই আছে সেখানে। নৌকো আর বজরাতে কত লোক সাজগোজ করে বেড়াতে বেরিয়েছে।

রেণুকা বললে, আমি এসব জায়গা দেখেছি ছেলেবেলায়। চৌদ্দ বছর বয়েস থেকে অসুখে চোখ হারিয়েছি। এখনো সেইরকম আছে, কানে শুনে বুঝতে পারি।

—ভারী ভাল জায়গা ভাই। কলকাতা শহর দেখে ভাল লেগেছিল বটে—কিন্তু সেখানে শান্তি পাই নি এমন। এখানে মন জুড়িয়ে গেল।

—একদিন গঙ্গায় নাইতে এসো—

—সময় পাই নে, আসি কখন। কাল একবার বলবো—

শরৎ আর রেণুকা একটু তফাৎ হয়ে বসে। চারিদিকের জন-কোলাহল ও সম্মুখে পুণ্য-তোয়া জাহ্নবীর দিকে চেয়ে শরতের নতুন চোখ ফোটে। সত্যই সে বড় শান্তি পেয়েছে মনে।

আয়া বললে, একদিন তোমাকে কেদার ঘাটে নিয়ে যাবো—

শরৎ চমকে উঠে বললে, কি ঘাট ?

—কেদার ঘাট। ওই দিকে—আমার সঙ্গে যেও—

শরতের মন স্বপ্নঘোরে একমুহূর্ত্তে কোন্ পথে চলে গেল পাহাড় পর্ব্বত বন-বনানীর ব্যবধান ঘুচিয়ে। গরীব বাবা কত কষ্টে চাল যোগাড় করে, নুন তেল যোগাড় করে এনে বলতেন ভাল করে রাঁধো, বাবা যে ছেলেমানুষের মত, ঘরে কিছু নেই, তা বুঝবেন না—ভাল খাওয়াটি হওয়া চাই—নইলে অবুঝের মত রাগ করবেন, অভিমান করবেন। এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারেন না বাবা। কোথায় গেলেন বাবা ! জানবার জন্যে বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে, তিনি এখন কোথায় কি ভাবে আছেন ! এমন জায়গা কাশী, সেই কতকাল আগের গল্পে শোনা বিশ্বনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট সব দেখা হ'ল—কিন্তু মনের মধ্যে সব সময় একথা আসে কেন, বাবা যে এসব কিছু দেখলেন না, বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর

এখন তীর্থধর্ম্ম করবার সময়, অথচ বাবার অদৃষ্টে জুটলো না কিছু! তিনি গোয়াল-পাড়া বাগদিপাড়ায় বেহালা বাজিয়ে, গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন, ফিরে এসে অবেলায় হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছেন কিম্বা তাও খাচ্ছেন না, কে তাঁকে দেখছে, কে মুখের দিকে চাইবার আছে তাঁর!

কাশী গয়া সব তুচ্ছ—কিছু ভাল লাগে না।

শরৎ বলে, আচ্ছা রেণুকা, কাশীতে দুজন লোকের কত হলে চলে?

রেণুকা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা কুড়ি টাকার কম তো কোনো মাস যেতে দেখলাম না। আমরা তো দুটো মানুষ থাকি। কেন ভাই?

শরৎ কি ভেবে কি কথা বলছে সে নিজেই জানে না। রেণুকা ভাবে, শরৎ হঠাৎ কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেল, না কি—আর ভাল করে কথা বলছে না কেন?

বাড়ি ফিরে মিনুর কাকীমার কড়া ফাইফরনাশ ও হুকুমের মধ্যে রান্নাঘরে রাঁধতে বসে সে ভাবে তার কোন্ জীবনটা সত্যি, গড়শিবপুরের ভাঙা গড়-বাড়ির বনের সেই জীবন, না পরের বাড়ির হাঁড়ি-হেঁসেলের এ জীবন?

নয়

মিনুর কাকীমা শরৎকে প্রায়ই বেরুতে দেন না। আজ তিনি যাবেন মিছরীপোখরায় তাঁর বন্ধুর বাড়ি, শরৎকে বাড়ি আগলে বসে থাকতে হবে, কাল তিনি লক্সাতে মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, শরৎ ছেলেমেয়ে সামলে বাড়ি বসে থাকবে।

একদিন মিনুর কাকীমা বললে, পটলের বউয়ের ওখানে অত ঘন ঘন যাও কেন?

—কেন?

—আমি পছন্দ করি নে। ওরা গরীব লোক, আমাদের ভাড়াটে, অত মাখামাখি করা ভাল না।

—আমি মিশি, আমিও তো গরীব লোক। এতে আর দোষ কি বলুন?

—তুমি বড় মুখে মুখে তর্ক করতে শুরু করেছ দেখছি। পটলের বউ মেয়ে ভাল নয়—তুমি জানো কিছু?

শরৎ এতদিন মিনুর কাকীমার কোনো কথার প্রতিবাদ না করে নীরবে সব কাজ করে এসেছে, কিন্তু অন্ধ রেণুকার নামে কটু কথা সে সহ্য করতে পারলে না। বললে—আমি যতদূর দেখেছি কোনো বেচাল তো দেখি নি। আমি যদি যাই আপনাকে তাতে কেউ কিছু বলবে না তো!

—না, আমি চাই আমার বাড়ির চাকরবাকর আমার কথা শুনবে—যাও, রান্নাঘরের দিকে দ্যাখো গে—

শরৎ মাথা নামিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়েই সে ক্ষুণ্ণ অভিমানে কেঁদে ফেললে। আজ সে এ-কথার জবাব দিতো মিনুর কাকীমার, একবার ভেবেছিল দিয়েই দেবে উত্তর, যা থাকে ভাগ্যে।

তবে মুখে জবাব না দিলেও কাজে সে দেখালে, মিনুর কাকীমার অসঙ্গত হুকুম সে মানতে রাজী নয়। রেণুকার বাড়ি সেই দিনই বিকেলের দিকে সে আবার গেল।

রেণুকা ওকে পেয়ে সত্যিই বড় খুশী হয়। বললে—ভাই, আজ চলো আমরা নতুন কোনো জায়গায় যাই—

—কোথায় যাবে ?

—আমি রাস্তাঘাট চিনি নে, তুমি বাঙালীটোলায় আমার এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে ?

—কেন পারবো না, চলো।

—ছ' নম্বর ধ্রুবেশ্বরের গলি—জিজ্ঞেস করে চলো যাওয়া যাক।

একে ওকে জিজ্ঞেস করে ওরা ধ্রুবেশ্বরের গলিতে নির্দ্দিষ্ট বাসায় পেঁছিলো। তারাও খুব বড়লোক নয়, ছোট দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রী, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বাড়ি অনেক দিন আগে ছিল ঢাকা জেলায় কি এক পাড়াগাঁয়ে, বাড়ির কর্ত্তা বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির কেরানী, সেই উপলক্ষে এখানে বাস।

বাড়ির গিন্নীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি ওদের যত্ন করে বসালেন, চা করে খেতে দিলেন।

তাদের বাড়িতে একটি চার-পাঁচ বছরের খোকা আছে, নাম কালো। দেখতে কি চমৎকার, যেমন গায়ের রং, তেমনি মুখশ্রী, সোনালি চুল, চাঁচাছোলা গড়ন।

শরৎ বললে, এমন সুন্দর ছেলের নাম কালো রাখলেন কেন ?

গিন্নী হেসে বললেন, আমার শ্বশুরের দেওয়া নাম। তাঁর প্রথম ছেলে মারা যায়, নাম ছিল ওই। তিনিই জোর করে কালো নাম রেখেছেন।

প্রথম দর্শনেই খোকাকে শরৎ ভালবেসে ফেললে।

বললে, এসো খোকা, আসবে ?

খোকা অমনি বিনা দ্বিধায় শরতের কাছে এসে বসলো।

শরৎ বললে, আমি কে হই বলো তো খোকন ?

খোকা হেসে শরতের মুখের দিকে চোখ তুলে চুপ করে রইল।

খোকার মা বললেন, মাসীমা হন, মাসীমা বলে ডাকবে—

খোকা বললে, ও মাসীমা—

—এই যে বাবা, উঠে এসে কোলে বসো—

খোকার মা বললেন, সেই ছড়াটা শুনিয়ে দাও তোমার মাসীমাকে খোকন ?

খোকা অমনি দাঁড়িয়ে উঠে বলতে আরম্ভ করলে—

. এই যে গঙ্গা পুণ্য ঢারা
বিমল মুরটি পাগলপারা
বিশ্বনাটের চরণটলে বইছে কুটুহলে—

খোকা 'ত' এর জায়গায় 'ট' বলে, 'ধ' এর জায়গায় 'ঢ' বলে—শরতের মনে হ'ল খোকার মুখে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে যেন। অভাগিনী শরৎ সন্তানস্নেহ কখনো জানে নি, কিন্তু এই খোকাকে দেখে তার সুপ্ত মাতৃহৃদয় যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। কত ছেলে তো দেখলে এ পর্য্যন্ত, মিনুর কাকীমারই তো এ বয়সের ছেলে রয়েছে, তাদের প্রতি স্নেহ তো দূরের কথা —শরৎ নিতান্তই বিরক্ত। এ ছেলেটির ওপর এমন ভাবের কারণ কি সে খুঁজে পায় না। কিন্তু মনে হ'ল এ খোকা তার কত দিনের আপনার, একে দেখে, একে কোলে করে বসে ওর নারীজীবন যেন সার্থক হ'ল।

শরৎ সেদিন সেখান থেকে চলে এল বটে, কিন্তু মন রেখে এল খোকার কাছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার মন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

গড়বাড়ির জঙ্গলে তাদের পুরানো কোঠা।

বাবা বাড়ি নেই।

—ও খোকন, ও কালো—

—কি মা ?

—বেড়িও না এই রোদ্দুরে হটর হটর করে—ঘরে শোবে এসো—

খিল খিল করে দুষ্টুমির হাসি হেসে খোকা ছুটে পালায়।

হাঁড়ি-হেঁসেলের অবসরে নতুন আলাপী খোকনকে ঘিরে তার মাতৃহৃদয়ের সে কত অলস স্বপ্ন। যে সাধ আশা কোনোকালে পূর্ণ হবার নয়, ইহজীবনে নয়, মন তাকেই হঠাৎ যেন সবলে আঁকড়ে ধরে।

দিন দুই পরে সে রেণুকাকে বলে—চল ভাই, কালোকে দেখে আসি গে—

কিন্তু সেদিন রেণুকার যাবার সময় হয় না। স্বামী দুজন বন্ধুকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন, রান্নাবান্নার হাঙ্গামা আছে।

আরও দিন কয়েক পরে আবার শরতের অবসর মিললো—এবার রেণুকাকে বলে কয়ে নিয়ে গেল ধ্রুবেশ্বরের গলি। দূর থেকে বাড়িটা দেখে ওর বুকের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ উথলে উঠল—বড় বড় পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ যেন উদ্দাম গতিতে দূর থেকে ছুটে এসে কঠিন পাষাণময় বেলাভূমির গায়ে আছড়ে পড়ছে।

খোকা দেখতে পেয়েছে, সে তাদের বাড়ির দোরে খেলা করছিল। সঙ্গে আরও পাড়ার কয়েকটি খোকাখুকি।

শরতের বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল—খোকা যদি ওকে না চিনতে পারে!

কিন্তু খোকা তাকে দেখেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুধে-দাঁত বার করে একগাল হেসে ফেললে।

শরতের অদৃষ্টাকাশের কোন্ সূর্য্য যেন রাশিচক্রের মধ্যে দিয়ে পিছু হঠতে হঠতে মীন-রাশিতে প্রবিষ্ট হলেন, যার অধিপতি সর্ব্বপ্রকার স্নেহপ্রেমের দেবতা শুক্র!

—চিন্‌তে পারিস্ খোকা? আয়—

শরৎ হাত বাড়িয়ে দিলে ওকে কোলে নেবার জন্যে। খোকা বিনা দ্বিধায় ওর কোলে এসে উঠল, বললে—মাছীমা—

—তাহলে তুই দেখছি ভুলিস নি খোকা—

খোকার মা ছুটে এসে বললেন, যাক, এসেছ ভাই? ও কেবল মাসীমা মাসীমা করে, একদিন ভেবেছিলাম রেণুকাদের বাড়ি নিয়েই যাই—দাঁড়াও ভাই, পাশের বক্‌সীদের বাড়ির বড় বউ তোমাকে দেখতে চেয়েছে, ডেকে আনি—

বক্‌সীদের বাড়ির দুই বউ একটু পরে হাজির। দুজনেই বেশ সুন্দরী, গায়ে গহনাও মন্দ নেই দুজনের। বড় বউ প্রণাম করে বললে—ভাই, আপনার কথা সেদিন দিদি বলছিলেন, তাই দেখতে এলুম—

—আমার কথা কি বলবার আছে বলুন?

—দেখে মনে হচ্ছে, বলবার সত্যিই আছে। যা নয় তা কখনো রটে ভাই? রটেছে আপনার নামে—

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। কি রটেছে তার নামে? এরা কি কেউ গিরীন প্রভাসের কথা জানে নাকি? সে বললে, আমার নামে কি শুনেছেন?

বড় বউ হেসে বললে, না, তা আর বলবো না।

শরতের আরও ভয় হ'ল। বললে, বলুনই না?

—আপনার চেহারার বড় প্রশংসা করছিলেন দিদি। আমায় বললেন, ভাই রেণুকাদের বাড়িও'লাদের বাড়িতে তিনি এসেছেন রান্না করতে, কিন্তু অনেক বড় ঘরে অমন রূপ নেই।

সে যে সামান্য বংশের মেয়ে নয়, তা দেখলে আর বুঝতে বাকী থাকে না। তাই তো ছুটে এলাম, বলি দেখে আসি তো—

শরৎ বড় লজ্জা পায় রূপের প্রশংসা শুনলে। এ পর্যন্ত তা সে অনেক শুনেছে—রূপের প্রশংসাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল জীবনে, আজ এই দশা কেন হবে নইলে? কিন্তু সে-সব কথা বলা যায় না কারো কাছে, সুতরাং সে চুপ করেই রইল।

কালোর মা বললেন, খোকা তো মাসীমা বলতে অজ্ঞান। তবু একদিনের দেখা। কি গুণ তোমার মধ্যে আছে ভাই, তুমিই জানো—

বকসীদের বড় বউ বললে, একটু আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিতে হবে ভাই—

—এখন কি করে যাবো বলুন, ছুটি যে ফুরিয়ে এলো—

—তা শুনবো না, নিয়ে যাবো বলেই এসেছি—দিদিও চলুন, রেণুকা ভাই তুমিও এসো—

খোকাকে কোলে নিয়ে শরৎ ওদের বাড়ি চলল সকলের সঙ্গে।

বড় বউ বললে, ভাই তোমার কোলে কালোকে মানিয়েছে বড় চমৎকার। ও যেমন সুন্দর, তুমিও তেমন। মা আর ছেলে দেখতে মানানসই একেই বলে—

ওদের বাড়ি যে জলযোগের জন্যেই নিয়ে যাওয়া একথা সবাই বুঝেছিল। হ'লও তাই, শরতের জন্যে ফলমূল ও সন্দেশ—বাকি দুজনের জন্যে সিঙ্গাড়া কচুরির আমদানিও ছিল। বউ দুটির অমায়িক ব্যবহারে শরৎ মুগ্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বসে গল্পগুজবের পর শরৎ বিদায় চাইলে।

বড় বউ বললে, আবার কিন্তু আসবেন ভাই, এখন যখন খোকার মাসীমা হয়ে গেলেন, তখন খোকাকে দেখতে আসতেই হবে মাঝে মাঝে—

—নিশ্চয়ই আসবো ভাই—

খোকা কিন্তু অত সহজে তার মাসীমাকে যেতে দিতে রাজী হ'ল না। সে শরতের আঁচল ধরে টেনে বসে রইল, বললে—এখন টুমি যেও না মাছীমা—

—যেতে দিবি নে?

—না।

—আবার কাল আসবো। তোর জন্যে একটা ঘোড়া আনবো—

—না, টুমি যেও না।

শরৎ মুগ্ধ হয় শিশু কত সহজে তাকে আপন বলে গ্রহণ করেছে তাই দেখে। যেন ওর কতদিনের জোর, কতদিনের ন্যায্য অধিকার। সব শিশু যে এমন হয় না, তা শরতের জানতে বাকী নেই।

খোকা ওর ছোট্ট মুঠি দিয়ে শরতের আঁচলে কয়েক পাক জড়িয়েছে। সে পাক খুলবার সাধ্য নেই শরতের, জোর করে তা সে খুলতে পারবে না, চাকরি থাকে চাই যায়। শরতের হৃদয়ে অসীম শক্তি এসেছে কোথা থেকে, সে ত্রিভুবনকে যেন তুচ্ছ করতে পারে এই নবার্জিত শক্তির বলে, জীবনের নতুন অর্থ যেন তার চোখের সামনে খুলে গিয়েছে। যখন অবশেষে সে বাড়ি চলে এল, তখন সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই। মিনুর কাকীমা মুখ ভার করে বললেন, রোজ রোজ তোমার বেড়াতে যাওয়া আর এই রাত্তিরে ফেরা! উনুনে আঁচ পড়লো না এখনও, ছেলেমেয়েদের আজ আর খাওয়া হবে না দেখছি। আটটার মধ্যেই ওরা ঘুমিয়ে পড়বে—

—কিছু হবে না, আমি ওদের খাইয়ে দিলেই তো হ'ল—

—তোমার কেবল মুখে মুখে জবাব। এ বাড়িতে তোমার সুবিধে দেখে কাজ হবে না—আমার সুবিধে দেখে কাজ হবে, তা বলে দিচ্ছি। কাল থেকে কোথাও বেরুতে পারবে না।

মুখোমুখি তর্ক করা শরতের অভ্যেস নেই। সে এমন একটি অদ্ভুত ধরনের নির্বিকার, স্বাধীন ভঙ্গীতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, একটা কথাও না বলে—যাতে মিনুর কাকীমা নিজে যেন হঠাৎ ছোট হয়ে গেল এই অদ্ভুত মেয়েটির ধীর, গম্ভীর, দর্পিত ব্যক্তিত্বের নিকট।

মিনুর কাকীমা কিন্তু দমবার মেয়ে নয়, শরতের সঙ্গে রান্নাঘর পর্যন্ত গিয়ে ঝাঁজালো এবং অপমানজনক সুরে বললে, কথার উত্তর দিলে না যে বড়? আমার কথা কানে যায় না নাকি?

শরৎ রান্নাঘরের কাজ করতে করতে শান্তভাবে বললে, শুনলাম তো যা বললেন—

—শুনলে তো বুঝলাম। সেই রকম কাজ করতে হবে। আর একটা কথা বলি। তোমার বেয়াদবি এখানে চলবে না জেনে রেখো। আমি কথা বললাম আর তুমি এমনি নাক ঘুরিয়ে চলে গেলে, ও-সব মেজাজ দেখিও অন্য জায়গায়। এখানে থাকতে হলে—ও কি, কোথায় চললে?

—আসছি, পাথরের বাটিটা নিয়ে আসি ওঘর থেকে—

মিনুর কাকীমার মুখে কে যেন এক চড় বসিয়ে দিলে। সে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। এ কি অদ্ভুত মেয়ে, কথা বলে না, প্রতিবাদ করে না, রাগঝালও দেখায় না—অথচ কেমন শান্ত, নির্বিকার, আত্মস্থ ভাবে তুচ্ছ করে দিতে পারে মানুষকে। মিনুর কাকীমা জীবনে কখনো এমন অপমানিতা বোধ করে নি নিজেকে।

শরৎ ফিরে এলে তাই সে ঝাল ঝাড়বার জন্যে বললে, কাল থেকে দুপুরের পর বসে বসে ডালগুলো বেছে হাঁড়িতে তুলবে। কোথাও বেরুবে না।

মিনুর কাকা তাঁর স্ত্রীর চীৎকার শুনে ডেকে বললেন, আঃ, কি দুবেলা চেঁচামেচি করো রাঁধুনীর সঙ্গে? অমন করলে বাড়িতে চাকরবাকর টিকতে পারে?

—কেন গো, রাঁধুনীর উপর যে বড্ড দরদ দেখতে পাই—

—আঃ, কি সব বাজে কথা বল! শুনতে পাবে—

—শুনতে পেলে তো পেলে—তাতে ওর মান যাবে না। ওরা কি ধরনের মানুষ তা জানতে বাকি নেই—আজ এসেছে এখানে সাধু সেজে তীর্থ করতে।

—লোককে অপ্রিয় কথাগুলো তুমি বড্ড কট কট করে বলো। ও ভাল না—

মিনুর কাকীমা ঝাঁজের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, আমায় তোমার পাদ্রী সাহেবের মত মর্ম্মজ্ঞান শিখিয়ে দিতে হবে না—থাক্—

মিনুর কাকাটিকে শরৎ দূর থেকে দেখেছে। সামনে এ পর্যন্ত একদিনও বার হয় নি। লোকটি বেশ নাদুস্-নুদুস্ চেহারার লোক, মাথায় ঈষৎ টাক দেখা দিয়েছে, সাহেবের মত পোশাক পরে আপিসে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে কখনো চেঁচামেচি হাঁকডাক করে না, চাকর-বাকরদের বলাবলি করতে শুনেছে যে লোকটা মদ খায়। মাতালকে শরৎ বড় ভয় করে, কাজেই ইচ্ছে করেই কখনো সে লোকটির ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

সেদিন আবার তার মন উতলা হয়ে উঠল খোকাকে দেখবার জন্যে। খোকাকে একটা ঘোড়া দেবে বলে এসেছিল, হাতে পয়সা নেই, এদের কাছে মুখ ফুটে চাইতে সে পারবে না, অথচ কি করা যায়?

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খোকাকে খেলনা দেবার টানই বড় হ'ল। সে মিনুর কাকীমাকে বললে—আমায় কিছু পয়সা দেবেন আজ?

মিনুর কাকীমা একটু আশ্চর্য হ'ল। শরৎ এ পর্যন্ত কখনো কিছু চায় নি।

বললে—কত?

—এই—পাঁচ আনা—

মিনুর কাকীমা মনে মনে হিসেব করে দেখলে শরৎ পাঁচ মাস হ'ল এখানে রাঁধুনীর কাজ করছে, এ পর্য্যন্ত তাকে মাইনে বলে কিছু দেওয়া হয় নি, সেও চায় নি। আজ এতদিন পরে মোটে পাঁচ আনা চাওয়াতে সে সত্যিই আশ্চর্য হ'ল।

আঁচল থেকে চাবি নিয়ে বাক্স খুলে বললে, ভাঙানো তো নেই দেখছি, টাকা রয়েছে। ও বেলা নিও—

শরৎ ঠিক করেছিল আজ দুপুরের পরে কাজকর্ম্ম সেরে সে খোকার কাছে যাবে। মুখ ফুটে সে বললে, টাকা ভাঙিয়ে আনলে হয় না? আমার বিকেলে দরকার ছিল।

—কি দরকার?

—ও আছে একটা দরকার—

—বলোই না—

—একজনের জন্যে একটা জিনিস কিনবো।

—কে?

শরৎ ইতস্ততঃ করে বললে রেণুকা জানে—পটলের বউ—

মিনুর কাকীমা মুখ টিপে হেসে বললে, আপত্তি থাকে বলবার দরকার নেই, থাক গে। নিও এখন—

শরৎ রেণুকাকে নিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ঘোড়া কিনতে গেল। এক জায়গায় লোকের ভিড় ও কান্নার শব্দ শুনে ও রেণুকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দেখতে গেল। একটি আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালীর মেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে, আর তাকে ঘিরে কতকগুলো হিন্দুস্থানী মেয়েপুরুষ খেপাচ্ছে ও হাসাহাসি করছে।

মেয়েটি বলছে, আমার গামছা ফেরত দে—ও মুখপোড়া, যম তোমাদের নেয় না, মণিকর্ণিকা ভুলে আছে তোদের? শালারা, পাজি ছুঁচোরা—গামছা দে—

শরৎকে দেখে ভিড় সসম্ভ্রমে একটু ফাঁক হয়ে গেল। কে একজন হেসে বললে, পাগলী, মাইজী—আপলোক হঠ্ যাইয়ে—

মেয়েটি বললে, তোর বাবা মা গিয়ে পাগল হোক্ হারামজাদারা—মণিকর্ণিকায় নিয়ে যা ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে, পুড়ুতে কাঠ না জুটুক—দে আমার গামছা—দে—

যে ওকে পাগলী বলেছিল সে তার পুণ্যশ্লোক পিতামাতার উদ্দেশে গালাগালি সহ্য করতে না পেরে চোখ রাঙিয়ে বললে, এইয়ো—মু সামহালকে বাত বোলো—নেই তো মু মে ইটা ঘুষা দেগা—

মেয়েটির পরনে চমৎকার ফুলন পাড় মিলের শাড়ি, বর্ত্তমানে অতি মলিন—খুব এক মাথা চুল তেল ও সংস্কার অভাবে রুক্ষ ও অগোছালো অবস্থায় মুখের সামনে, চোখের সামনে, কানের পাশে পড়েছে, হাতে কাঁচের চুড়ি, গায়ের রং ফর্সা, মুখশ্রী একসময়ে ভাল ছিল, বর্ত্তমানে রাগে, হিংসায়, গালাগালির নেশায় সর্ব্বপ্রকার কোমলতা-বর্জ্জিত, চোখের চাউনি কঠিন, কিন্তু তার মধ্যেই যেন ঈষৎ দিশাহারা ও অসহায়।

শরতের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। রাজলক্ষ্মী? গড়শিবপুরের সেই রাজলক্ষ্মী? এর চেয়ে সে হয়তো দু-তিন বছরের ছোট—কিন্তু সেই পল্লীবালা রাজলক্ষ্মীই যেন। বাঙালীর মেয়ে হিন্দুস্থানীদের হাতে এভাবে নির্য্যাতিতা হচ্ছে, সে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে এই বিশ্বনাথের মন্দিরের পবিত্র প্রবেশপথে?

শরৎ সোজাসুজি গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে বললে, তুমি বেরিয়ে এসো ভাই—আমার সঙ্গে—

মেয়েটি আগের মত কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার গামছা নিয়েছে ওরা কেড়ে—আমি

রাস্তায় বেরুলেই ওরা এমনি করে রোজ রোজ—তার পরেই ভিড়ের দিকে রুখে দাঁড়িয়ে বললে, দে আমার গামছা, ওঃ মুখপোড়ারা, তোদের মড়া বাঁধা ওতে হবে না—দে আমার গামছা—

ভিড় তখন শরতের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে কিছু অবাক হয়ে ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হয়েছে। দু-একজন হি হি করে মজা দেখবার তৃপ্তিতে হেসে উঠল। শরৎ মেয়েটির হাত ধরে গলির বাইরে যত টেনে আনতে যায়, মেয়েটি ততই বার বার পিছনে ফিরে ভিড়ের উদ্দেশে রুদ্রমূর্ত্তিতে নানা অশ্লীল ও ইতর গালাগালি বর্ষণ করে।

অবশেষে শরৎ তাকে টানতে টানতে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে নিয়ে এল, যেখানে মনোহারী দোকানের সামনে সে রেণুকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল।

রেণুকা চোখে না দেখতে পেলেও গোলমাল ও গালাগালি শুনেছে; এখনও শুনছে মেয়েটির মুখে—সে ভয়ের সুরে বললে, কি, কি ভাই? কি হয়েছে? ও সঙ্গে কে?

—সে কথা পরে হবে। এখন চলো ভাই ওদিকে—

মেয়েটি গালাগালি বর্ষণের পরে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যেন। সে কাঁদো কাঁদো সুরে বলতে লাগল—আমার গামছাখানা নিয়ে গেল মুখপোড়ারা—এমন গামছাখানা—

শরৎ বললে, ভাই রেণুকা, দোকান থেকে গামছা একখানা কিনে দিই ওকে—চল তো—

মেয়েটি গালাগালি ভুলে ওর মুখের দিকে চাইলে। রেণুকা জিজ্ঞেস করলে, তোমার নাম কি? থাকো কোথায়?

মেয়েটি কোনো জবাব দিলে না।

গামছা কিনতে গিয়ে দোকানী বললে, একে পেলেন কোথায় মা?

শরৎ বললে, একে চেন?

—প্রায়ই দেখি মা। গণেশমহল্লার পাগলী, গণেশমহল্লায় থাকে—ও লোককে বড় গাল-গালি দেয় খামকা—

পাগলী রেগে বললে, দেয়! তোর পিণ্ডি চটকায়, তোকে মণিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়ে মুখে নুড়ো জেবলে দেয় হারামজাদা—

দোকানী চোখ রাঙিয়ে বললে, এই চুপ! খবরদার—ওই দেখুন মা—

শরৎ ছেলেমানুষকে যেমন ভুলোয় তেমনি সুরে বললে, ওকি, অমন করে না ছিঃ—লোককে গালাগালি দিতে নেই।

পাগলী ধমক খেয়ে চুপ করে রইলো।

—গামছা কত?

—চোদ্দ পয়সা মা—আমার দোকানে জিনিসপত্তর নেবেন। এই রাস্তায় বাঙালী বলতে এই আমিই আছি। দশ বছরের দোকান আমার। হুগলী জেলায় বাড়ি, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যাই নে, এই দোকানটুকু করে বাবা বিশ্বনাথের ছিচরণে পড়ে আছি—আমার নাম রামগতি নাথ। এক দামে জিনিস পাবেন মা আমার দোকানে—দরদস্তুর নেই। মেড়োদের দোকানে যাবেন না, ওরা ছুরি শানিয়ে বসে আছে। বাঙালী দেখলেই গলায় বসিয়ে দেবে। এই গামছাখানা মেড়োর দোকানে কিনতে যান—চার আনার কম নেবে না।

দোকানীর দীর্ঘ বক্তৃতা শরৎ গামছা হাতে দাঁড়িয়ে একমনে শুনলে, যেন না শুনলে দোকানীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অসৌজন্য দেখানো হবে। তার পর আবার রাস্তায় উঠে পাগলীকে বললে, এই নেও বাছা গামছা—পছন্দ হয়েছে?

পাগলী সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, খিদে পেয়েছে—

শরৎ বললে, কি করি রেণু, ছ'টা পয়সা সম্বল, তাতেই যা হয় কিনে খাক গে—

রেণুকা বললে, আমার হাঁড়িতে বোধ হয় ভাত আছে।

—তাই দেখি গে চলো,—

পাগলীকে ভাত দেওয়া হ'ল, কতক ভাত সে ছড়ালে, কতক ভাত ইচ্ছে করে ধুলোতে মাটিতে ফেলে তাই আবার তুলে তুলে খেতে লাগল, অর্ধেক খেলে ভাত, অর্ধেক খেলে ধুলো মাটি।

শরতের চোখে জল এসে পড়ে। মনে ভাবলে—আহা, অল্প বয়সে, কি পোড়া কপাল দেখো একবার! মুখের ভাত দুটো খেলেও না—

বললে, ভাত ফেলছিস্ কেন? থালায় তুলে নে মা—অমন করে না—

ঠিক সেই সময় রাজপথে সম্ভবতঃ কোনো বিবাহের শোভাযাত্রা বাজনা বাজিয়ে ও কলরব করতে করতে চলেছে শোনা গেল। শরৎ তাড়াতাড়ি সদর দরজার কাছে ছুটে এসে দেখতে গেল, এসব বিষয়ে তার কৌতুহল এখনও পল্লীবালিকার মতই সজীব।

সঙ্গে সঙ্গে পাগলীও ভাতের থালা ফেলে উঠে ছুটে গেল শরৎকে ঠেলে একেবারে সদর রাস্তায়—

শরৎ ফিরে এসে বললে, ওমা, একি কাণ্ড, ভাত তো খেলেই না, গামছাখানা পর্য্যন্ত ফেলে গেল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও পাগলীর আর দেখা পাওয়া গেল না।

দশ

পরদিন শরৎ আবার খোকাদের বাড়ি ধ্রুবেশ্বরের গলিতে গিয়ে হাজির, সঙ্গে পটলের বউ।

খোকার মা বললেন, দু-দিন আস নি ভাই, খোকা 'মাসীমা মাসীমা' বলে গেল।

খোকার জন্যে আজ সে এসেছে শুধু হাতে, কারণ পাগলীকে পয়সা দেবার পরে ওর হাতে আর পয়সা নেই। মিনুর কাকীমার কাছে বার বার চাইতে লজ্জা করে।

খোকা শরতের কোল ছাড়তে চায় না।

শরৎ যখন এদের বাড়ি আসে, যেন কোন নূতন জীবনের আলো, আনন্দের আলোর মধ্যে ডুবে যায়। আবার যখন মিনুর কাকীমাদের বাড়ি যায়, তখন জীবনের কোন্ আলো-আনন্দহীন অন্ধকার রন্ধ্রপথে ঢুকে যায়, দূর দিক্‌চক্রবালে উদার আলোকোজ্জ্বল প্রসার সেখান থেকে চোখে পড়ে না।

খোকা বলে, এসো, মাছীমা—খেলা করি—

খোকার আছে দুটো রবারের বল, একটা কাঠের ভাঙা বাক্স, তার মধ্যে 'মেকানো' খেলার সাজ-সরঞ্জাম। শেষোক্ত জিনিসটা ছিল খোকার দাদার, এখন সে বড় হয়ে তার ত্যক্ত সম্পত্তি ছোট ভাইকে দিয়ে দিয়েছে।

খোকা বলে, সাজিয়ে দাও মাছীমা।

শরৎ জীবনে 'মেকানো'র বাক্স দেখে নি, কল্পনাও করে নি। সে সাজাতে পারে না। খোকাও কিছু জানে না, দুজনে মিলে হেলাগোছা করে একটা অদ্ভুত কিছু তৈরী করলে।

খোকার মা শরতের জন্যে খাবার করে খেতে ডাকলেন।

শরৎ বললে, আমি কিছু খাবো না দিদি—

—তা বললে হয় না ভাই, খোকার মাসীমা যখন হয়েছ, কিছু মুখে না দিয়ে—

—রোজ রোজ এলে যদি খাওয়ান তা হলে আসি কি করে?

—খোকনকে তুমি বড় হলে খাইও ভাই। শোধ দিও তখন না হয়—

বক্সীদের বড় বউ খবর পেয়ে এসে শরতের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

সে বললে, কি ভাল লেগেছে ভাই তোমাকে, তুমি এসেছ শুনে ছুটে এলাম—একটা কথা বলবে ?

—কি, বলুন ?

—তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ভাই ?

—গড়শিবপুর, যশোর জেলায়।

—শ্বশুরবাড়ি ?

—বাপের বাড়ির কাছেই—

—বাবা মা আছেন ?

শরৎ চুপ করে রইল। দু চোখ বেয়ে টস্-টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল বাবার কথা মনে পড়াতে। সে তাড়াতাড়ি চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বললে, ওসব কথা জিজ্ঞেস করবেন না দিদি—

বক্সীদের বউ বুদ্ধিমতী, এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না তখন। কিছুক্ষণ অন্য কথার পরে শরৎ যখন ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসছে, তখন ওকে আড়ালে ডেকে বললে, আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে চাই নে ভাই—কিন্তু আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয়, জানিও—তা যে করে হয় করবো। তোমাকে যে কি চোখে দেখেছি !

শরৎ অশ্রুভারনত চোখে বললে, আমার ভাল কেউ করতে পারবে না দিদি। যদি এখন বাবা বিশ্বনাথ তাঁর চরণে স্থান দেন, তবে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

—তুমি সাধারণ ঘরের মেয়ে নও কিন্তু—

—খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে দিদি। ভালবাসেন তাই অন্যরকম ভাবেন। আচ্ছা এখন আসি।

—আবার এসো খুব শীগ্গির—

শরৎ ও পটলের বৌ পথ দিয়ে চলে আসতে সেদিনকার সেই পাগলীর সঙ্গে দেখা। সে রাস্তার ধারে একখানা ছেঁড়া কাপড় পেতে বসেছে জাঁকিয়ে—আর যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, তাকেই বলছে—একটা পয়সা দিয়ে যাও না ?

শরৎ বললে, আহা, সেদিন ওর কিছু খাওয়া হয় নি, পয়সা আছে কাছে ভাই ?

পটলের বউ বললে, পাঁচটা পয়সা আছে—

—ওকে কিছু খাবার কিনে দিই—এসো।

নিকটবর্তী একটা দোকান থেকে ওরা কিছু খাবার কিনে নিয়ে ঠোঙাটা পাগলীর সামনে রেখে দিয়ে বললে, এই নাও খাও—

পাগলী ওদের মুখের দিকে চেয়ে কোন কথা না বলে খাবারগুলো গোগ্রাসে খেয়ে বললে—আরও দাও—

শরৎ বললে, আজ আর নেই—কাল এখানে বসে থেকো বিকেলে এমনি সময়। কাল দেবো।

পটলের বৌ বললে, ভাই, আমাদের বাড়ি থেকে দুটো রেঁধে নিয়ে এসে দেবো কাল ?

—বেশ এনো। আমি একটু তরকারী এনে দেবো। আমার যে ভাই কোন কিছু করবার যো নেই—তা হলে আমার ইচ্ছে করে ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে পেট ভরে খাওয়াই। দুঃখ-কষ্টের মর্ম্ম নিজে না বুঝলে অপরের দুঃখ বোঝা যায় না। বাঙালীর মেয়ে কত দুঃখে পড়ে আজ ওর এ দশা—তা এক ভগবান ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

আমিও কোনদিন ওই রকম না হই ভাই—

—বালাই ষাট, তুমি কেন অমন হতে যাবে ভাই ?···ধরো, আমার হাত ধরো ভাই, বড্ড উঁচু-নীচু—

এই অন্ধ পটলের বউ। এর ওপরও এমন মায়া হয় শরতের! কে আছে এর জগতে, কেউ নেই—পটল ছাড়া। আজ যদি, ভগবান না করুন, পটলের কোন ভালমন্দ হয়, তবে কাল এই নিঃসহায় অন্ধ মেয়েটি দাঁড়ায় কোথায় ?

আবার ওই রাস্তার ধারের পাগলীর কথা মনে পড়ে।

জগতে যে এত দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট আছে, শরৎ সেসব কিছু খবর রাখতো না। গড়শিবপুরের নিভৃত বনবিতান শ্যামল আবরণের সংকীর্ণ গণ্ডী টেনে ওকে স্নেহে যত্নে মানুষ করেছিল—বহির্জগতের সংবাদ সেখানে গিয়ে কোনোদিনও পেঁাছোয় নি।

শরৎ জগৎটাকে যে-রকম ভাবত, আসলে এটা সে রকম নয়। এখন তার চোখ ফুটেছে, জীবনে এত মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যে দিয়েই তবে সে উদার দৃষ্টি লাভ হয়েছে তার, এক-একদিন গঙ্গার ঘাটে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে শরতের মনে ওঠে এসব কথা।

আগেকার গড়শিবপুরের সে শরৎ যে আর সে নেই—সেটা খুব ভাল করেই বোঝে। সে শরৎ ছিল মনেপ্রাণে বালিকা মাত্র। বয়স হয়েছিল যদিও তার ছাব্বিশ—দৃষ্টি ছিল রাজলক্ষ্মীর মতই, সংসারের কিছু বুঝত না, জানত না। সব লোককে ভাবত ভাল, সব লোককে ভাবত তাদের হিতৈষী।

সেই বালিকা শরতের কথা ভাবলে এ শরতের এখন হাসি পায়।

শরৎ মনে এখন যথেষ্ট বল পেয়েছে। কলকাতা থেকে আজ এসেছে প্রায় দেড় বছর, যে ধরনের উদ্‌ভ্রান্ত, ভীরু মন নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় পালিয়ে এসেছিল কলকাতা থেকে—এখন সে মন যথেষ্ট বল সঞ্চয় করেছে। দুনিয়াটা যে এত বড়, বিস্তৃত—সেখানে যে এত ধরনের লোক বাস করে, তার চেয়েও কত বেশী দুঃখী অসহায়, নিরাবলম্ব লোক যে তার মধ্যে রয়েছে, এই সব জ্ঞানই তাকে বল দিয়েছে।

সে আর কি বিপদে পড়েছে, তার চেয়েও শতগুণে দুঃখিনী ওই গণেশ-মহল্লার পাগলী, এই অন্ধ পটলের বউ। এই কাশীতে সেদিন সে এক বুড়ীকে দেখেছে দশাশ্বমেধ ঘাটে, বয়স তার প্রায় সত্তর-বাহাত্তর, মাজা ভেঙে গিয়েছে, বাংলা দেশে বাড়ি ছিল, হাওড়া জেলার কোন এক পাড়াগাঁয়ে। কেউ নেই বুড়ীর, অনেক দিন থেকে কাশীতে আছে, ছত্রে ছত্রে খেয়ে বেড়ায়।

সেদিন শরৎকে বললে, মা, তুমি থাকো কোথায় গা ?

—কাছেই। কেন বলুন তো ?

—তোমরা ?

—ব্রাহ্মণ।

—আমায় দুটো ভাত দেবে একদিন ?

—আমার সে সুবিধে নেই মা। আমি পরের বাড়ি থাকি। আপনার মত অবস্থা। কেন, আপনি খান কোথায় ?

—পুঁটের ছত্তরে খেতাম, সে অনেকদূর। অত দূর আর হাঁটতে পারি নে-—আজকাল আবার নিয়ম করেছে একদিন অন্তর মাদ্রাজীদের ছত্তরে ডাল ভাত দেয়। তা সে-সব তরকারী নারকোল তেলে রান্না মা। আমাদের মুখে ভাল লাগে না। আজ এক জায়গায় ভোজ দেবে, সেখানে যাবো—ওই পাঁড়েদের ধর্ম্মশালায়—চলো না, যাবে মা ?

—কতদূর ?

—বেশি দূর নয়। এক হিন্দুস্থানী বড়লোক কাশীতে তীর্থধর্ম্ম করতে এসেছে মা। লোকজন খাওয়াবে—আমাদের সব নেমন্তন্ন করেছে। চলো না ?

—না মা, আমি যাবো না।

—এতে কোনো লজ্জা নেই, অবস্থা খারাপ হলে মা সব রকম করতে হয়। আমারও দেশে গোলাপালা ছেল, দুই ছেলে হাতীর মত। তারা থাকলে আজ আমার বেন্ধ বয়েসে কি এ দশা হয় ?

বুড়ীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

শরৎ ভাবলে, দেখেই আসি, খাবো না তো—যা জিনিস দেবে, নিয়ে এসে পাগলীকে কি পটলের বউকে দিয়ে দেবো।

তাই সেদিন সে মনোমোহন পাঁড়ের ধর্ম্মশালায় গেল বুড়ীর সঙ্গে। ধর্ম্মশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অনেক বৃদ্ধ বাঙালী ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জড়ো হয়েছে—মেয়েমানুষও সেখানে এসেছে, তবে সংখ্যা খুব বেশী নয়।

যারা ভোজ দিচ্ছে, তারা বাংলা জানে না—হিন্দীতে কথাবার্ত্তা কি বলে, শরৎ ভাল বুঝতে পারে না। তারা খুব বড়লোক, দেখেই মনে হ'ল। শরৎকে দেখে আলাদা ডেকে তাদের একটি বউ বললে, তুমি কি আলাদা বসে খাবে, মাইজি ?

—না মা—আমি নিয়ে যাবো।

—বাড়িতে লেড়কালেড়কি আছে বুঝি ?

শরৎ মৃদু হেসে বললে, না।

—আচ্ছা বেশ নিয়ে যাও—এখানে থাকো কোথায় ?

—একজনদের বাড়ি। রান্না করি।

—বাঙালী রান্না করো ?

—হ্যাঁ মা !

একটু পরে ভোজের বন্দোবস্ত হ'ল। অন্য কিছু নয়, শুধু হালুয়া, তিল তেলে রান্না। প্রকাণ্ড চাদরের কড়াইয়ে প্রায় দশ সের সুজি, দশ সের চিনি—আর ছোট টিনের একটিন তিল তেল ঢেলে হালুয়া তৈরী হচ্ছে, শরৎকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হিন্দুস্থানী বৌটি সব দেখালে। অভ্যাগত দরিদ্র নরনারীদের বসিয়ে পেট ভরে সেই হালুয়া খাওয়ানো হ'ল—যাবার সময় দু-আনা করে মাথাপিছু ভোজন দক্ষিণাও দেওয়া হ'ল। শরৎকে কিন্তু একটা পুঁটুলিতে হালুয়া ছাড়া পুরী ও লাড্ডু অনেক করে দিলে ওরা।

খাবারগুলো পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে এসে শরৎ পটলের বউকে দিয়ে দিলে। বললে, আজ আর পাগলীর দেখা নেই। আজ খেতে পেতো, আজই নিরুদ্দেশ।

পটলের বউ বললে, পাগলীর জন্যে রেখে দেবো দিদি ?

—কেন মিথ্যে বাসি করে খাবে ? কাল যে আসবে তারই বা মানে কি আছে ? খাও তোমরা।

—তুমি খাবে না ?

—আমি খাবো না, সে তুমি জানো। ওরা কি জাত তার ঠিক নেই, ওদের হাতে রান্না—

—কাশীতে আবার জাতের বিচার—

—কেন কাশী তো জগন্নাথ ক্ষেত্তর না, সেখানে নাকি জাতের বিচার নেই—

এমন সময় ওপর থেকে ঝি এসে বললে—ওগো বামুনঠাকরুন, মা ডাকছেন—

ওপরে যেতেই মিনুর কাকীমা এক তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। মোগলসরাই থেকে তার ভাইপোরা এসেছে, রাত আটটার গাড়িতে চলে যাবে, অথচ বামুনীর দেখা নেই, মাইনে

যাকে দিতে হচ্ছে সে সব সময় বাড়ি থাকবে। বিধবা মানুষের আবার অত শখের বেড়ানো কিসের, এতদিন কোনো কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় নি শরতের গতিবিধির, কিন্তু ব্যাপার ক্রমশঃ যে-রকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে কৈফিয়ৎ না নিলে চলে না।

শরৎ বললে, আমি তো জানতাম না ও'রা আসবেন। আমি আটটার অনেক আগে খাইয়ে দিচ্ছি—

—তুমি রোজ রোজ যাও কোথায় ?

—পটলের বউয়ের সঙ্গে তো যাই—

—কোথায় যাও ?

—৬ নম্বর ধ্রুবেশ্বরের গলি। হরিবাবু বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি—

—সেখানে কেন ?

—পটলের বউ বেড়াতে নিয়ে যায়। ওদের জানাশুনো।

—আজ কোথায় গিয়েছিলে ?

—একটা ধর্ম্মশালা দেখতে।

—ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি—কোথাও বেরুতে পারবে না কাল থেকে। ডুবে ডুবে জল খাও, আমি সব টের পাই। একশো বার করে কর্ত্তাকে বললাম পটলদের তাড়াও নীচের ঘর থেকে। এগারো টাকার জায়গায় এখুনি পনেরো টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। তা কর্ত্তার কোন কথা কানে যাবে না—পটলের বউয়ের স্বভাবচরিত্র আমার ভাল ঠেকে না—

বেচারী অন্ধ পটলের বউ, তার নামে মিথ্যে অপবাদ শরতের সহ্য হ'ল না। সে বললে, আমার নামে যা হয় বলুন, সে বেচারী অন্ধ, তাকে কেন বলেন ? আমায় না রাখেন, কাল সকালেই আমি চলে যাবো—

—বেশ যাও। কাল সকালেই চলে যাবে—

শরৎ নিশ্বির্বকার চিত্তে রান্নাবান্না করে গেল। লোকজনকে খাইয়ে দিলে। রাত ন'টার পরে মিনুর কাকীমা বললে, তোমার কি থাকবার ইচ্ছে নেই নাকি ?

—আপনিই তো থাকতে দিচ্ছেন না। পটলের বউয়ের নামে অমন বললেন কেন ? আমি মিশি বলে সে বেচারীও খারাপ হয়ে গেল ?

—তোমার বড্ড তেজ—কাশী শহরে কেউ জায়গা দেবে না। সে কথা ভুলে যাও—

—আমার কারো আশ্রয়ে যাওয়ার দরকার নেই। বিশ্বেশ্বর স্থান দেবেন। আমি আপনাদের বাড়ি থাকতে পারবো না। সকালে উঠেই চলে যাবো, যদি বলেন তো রে'ধে দিয়ে যাবো, নয় তো খোকাদের খাওয়ার কষ্ট হবে।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মিনুর কাকা সব শুনলেন। সেই রাত্রেই তিনি শরৎকে ডেকে বললেন, তুমি কোথাও যেতে পারবে না বামুন-ঠাকরুন। ও যা বলেছে, কিছু মনে করো না।

শরৎ মিনুর কাকার সামনে বেরোয় না, কথাও বলে না। ঝিকে দিয়ে বলালে, তিনি যদি যেতে বারণ করেন, তবে সে কোথাও যাবে না। কারণ গৌরী-মা তাকে যাঁর হাতে স'পে দিয়েছিলেন—তাঁর অর্থাৎ মিনুর মা'র বিনা অনুমতিতে সে এ সংসার ছেড়ে যেতে পারবে না।

আরও দিন পনের কেটে গেলে। একদিন বিশ্বেশ্বরের গলির মুখে সেই বুড়ীর সঙ্গে আবার দেখা। বুড়ী বললে, কি গা, যাচ্ছ কোথায় ? কোন্ ছত্তরে ?

শরৎ অবাক হয়ে বললে, আমি ছত্তরে খাই নে তো ? আমি লোকের বাড়ি থাকি যে।

—চলো, আজ কুচবিহারের কালীবাড়িতে খুব কাণ্ড, সেখানে যাই। নাটকোটার ছত্তর চেন?

—না মা, আমি কোথাও যাই নি—

—চলো আজ সব দেখিয়ে আনি—

সারা বিকেল তিন-চারটি বড় বড় ছত্রে শরৎ কাঙালী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন দেখে বেড়াল। বাঙালীটোলা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট কালীবাড়ি ও ছত্র কুচবিহার মহারাজের। কালী মন্দিরের দেওয়ালে কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র, কি চমৎকার বন্দোবস্ত অনাহূত রবাহূত গরীব, নিরন্ন সেবার! মেয়েদের জন্যে খাওয়ানোর আলাদা জায়গা, পুরুষদের আলাদা, ব্রাহ্মণদের আলাদা। এত অকুণ্ঠ অন্নদান সে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি।

শরৎ বললে, হ্যাঁ, মা, এখানে যে আসে তাকেই খেতে দেয়?

—কুচবিহারের কালীবাড়িতে তা দেয় গো। তবুও আজকাল কড়াকাড়ি করেছে। হবে না কেন, বাঙাল দেশ থেকে লোক এসে সব নষ্ট করে দিয়েছে।

—আমি নিজে যে বাঙাল—হ্যাঁ, মা—

শরৎ কথা বলেই হেসে ফেললে। বুড়ী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, হ্যাঁ গো, বাঙাল না ছাই, তোমার কথায় বুঝি বোঝা যায় কিছু, চলো চলো—নাটকোটার ছত্তর দেখিয়ে আনি—

নাটকোটার ছত্রে যখন ওরা গেল, তখন সেখানকার খাওয়া-দাওয়া শেষ। বাইরের গরীব লোকেরা ভাত নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ।

শরৎ বললে, এ কাদের ছত্র মা?

—তৈলিঙ্গিদের ছত্তর। এখানে খেতে এসেছিলুম একদিন, ডালে যত বা টক্, তত বা লংকা। সে মা আমাদের পোষায় না। তুণ্ডুমুণ্ডুদের পোষায়, ওদের মুখে কি সোয়াদ আছে মা?

শরৎ হেসে কুটি কুটি। বললে, তুণ্ডুমুণ্ডু কারা মা?

—আরে ওই তৈলিঙ্গিদের কথাবার্ত্তা শোনো নি? তুণ্ডুমুণ্ডু না কি সব বলে না?

—আমি কখনো শুনি নি। আমায় একদিন শোনাবেন তো।

—একদিন খাওয়া-দাওয়ার সময় নাটকোটার ছত্তরে নিয়ে আসবো—দেখতে পাবে—

—আর কি ছত্তর আছে?

—এখনো রাজরাজেশ্বরী ছত্তর, পুঁটের ছত্তর, আমবেড়ে—অহিল্যেবাই—

—সব দেখবো মা, আজ সব দেখে আসবো—

সমস্ত ঘুরে শেষ করতে ওদের প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। বুড়ী বললে, কাশীতে ভাতের ভাবনা নেই, অন্নপুন্নো মা দু-হাতে অন্ন বিলিয়ে যাচ্ছেন—

শরৎ বাসায় ফিরে এসে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তার সকলের চেয়ে ভাল লেগেছে কাশীর এই অন্নদান। এমন একটা ব্যাপারের কথা সত্যিই সে জানত না। ডাল ভাত উনুনে চাপিয়ে দিয়ে সে শুধু ভাবে ওই কথাটা। তার আর কিছু ভাল লাগে না। কাল সকাল সকাল এদের খাইয়ে-দাইয়ে দিয়ে সে আবার বেরুবে ছত্র দেখতে। ছত্রে খাওয়ানোর দৃশ্য সে মাত্র দেখলে কুচবিহারের কালীবাড়িতে। অন্য ছত্রে যখন গিয়েছিল তখন সেখানকার খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে দেখতে চায় দুচোখ ভরে এই বিরাট অন্নব্যয়, অকুণ্ঠ সদাব্রত—যেখানে গণেশমহল্লার পাগলীর মত, ওই অন্ধ রেণুকার মত, তার নিজের মত, ওই সত্তর বছরের মাজা-ভাঙা বুড়ীর মত—নিরন্ন, নিঃসহায় মানুষকে দুবেলা খেতে

দিচ্ছে। ওই দেখতে তার খুব ভাল লাগে—খুব—খুব ভাল লাগে—ওই সব ছত্রেই বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা প্রত্যক্ষ বিরাজ করেন বুভুক্ষু অভাজনদের ভোজনের সময়—মন্দিরে তাঁদের দেখার চেয়েও সে দেখা ভালো। অনেক, অনেক ভালো।

ঝি এসে বলে, ও বামুন-ঠাকরুন, মাছের ঝোল দিয়ে বাবুকে আগে ভাত দিতে হবে। খেয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবেন—

—ও ঝি শোনো—পাঁচফোড়ন মোটে নেই, বাজার থেকে আগে এনে দাও—

ঝি চলে যায়। মাছের ঝোল ফোটে। নিভৃত রান্নাঘরের কোণে গোলমাল নেই—বসে শরৎ স্বপ্ন দেখে, সে প্রকাণ্ড ছত্র খুলেছে, কেদার ছত্র, বাবার নামে। কত লোক এসে খাচ্ছে—অবারিত দ্বার। বাবার ছত্র থেকে কোনো লোক ফিরবে না, অনাহারে কেউ ফিরে যাবে না। সে নিজে দেখবে শুনবে—সকলকে খাওয়াবে। সে দু-হাতে অন্নদান করবে। সকলকেই—ব্রাহ্মণ শুদ্র নেই, তুণ্ডুমুণ্ডু নেই, বাঙাল ঘটি নেই—সকলেই হবে তার পরম সম্মানিত অতিথি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়াবে সে।

শরতের মাথার মধ্যে কি যেন নেশা জমেছে।···

রান্নাবান্না সেরে সে মিনুর কাকীমাকে বলল, আজ একবারটি বাইরে যাবো ?

—কোথায় ?

শরৎ হঠাৎ সলজ্জ হেসে বললে—সে বলবো এখন এসে।

শরতের হাসি দেখে মিনুর কাকীমার মনে সন্দেহ হ'ল। সে বললে, কোথায় না বললে চলে ? সব জায়গায় যেতে দিতে পারি কি ? রাগ করলে তো চলে না—বুঝে দেখতে হয়।

—ছত্তর দেখতে। রাজরাজেশ্বরী ছত্তরে অনেক বেলায় খাওয়া-দাওয়া হয়, পুঁটের ছত্তরেও হয়—দেখে আসি একটিবার—

মিনুর কাকীমা শরতের মনের উত্তাল উদ্বেল সমুদ্রের কোনো খবর রাখে না—সেবা ও অন্নদানের যে বিরাট আকূতি ও আগ্রহ তার কোনো খবর রাখে না—বললে, কেন ছত্তর দেখতে কেন ? সে আবার কি ?

—দেখি নি কখনো। যেতে দিন আজ আমায়—

শরতের কণ্ঠে সাগ্রহ মিনতির সুরে মিনুর কাকীমা ছুটি দিতে বাধ্য হ'ল, তবে হয়তো শরতের কথা সে আদৌ বিশ্বাস করলে না।

শরৎ এসে বললে, ও রেণু পোড়ারমুখী—কি হচ্ছে ?

—ও, আজ যেন খুব ফুর্ত্তি, তোমার কি হয়েছে শুনি ?

—কি আবার হবে, তোর গুণ্ডু হবে। চল্ ছত্তরে যাই, খাওয়া দেখে আসি।

রেণু অবাক হয়ে বললে, কেন ?

—কেন, তোর মাথা। আমি যে কাশীতে ছত্তর খুলছি জানিস্ নে ?

—বেশ তো ভাই। আমাদের মত গরীব লোকে তাহলে বেঁচে যায়। দু-বেলা তোমার ছত্তরে পেট ভরে দুটো খেয়ে আসি। হাঁড়ি-হেঁসেলের পাট উঠিয়ে দিই। কি নাম হবে, শরৎসুন্দরী ছত্র ?

—না ভাই। বাবার নামে—কেদার ছত্তর। কেমন নাম হবে বল্ তো ?

—যাই বলো ভাই, শরৎসুন্দরী ছত্র শুনতে যেমন, তেমনটি কিন্তু হ'ল না।

রাজরাজেশ্বরী ছত্রে ওরা যেতেই ছত্রের লোকে জিজ্ঞেস করলে—আপনারা আসুন, মেয়েদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত আছে—

শরৎ বললে, চল ভাই রেণু, দেখি গে—

—যদি খেতে বলে ?

—জোর করে খাওয়াবে না কেউ, তুমি চলো।

মেয়েদের মধ্যে সবাই বুড়ো-হাবড়া, এক আধ জন অল্পবয়সী মেয়েও আছে—কিন্তু তারা এসেছে বুড়ীদের সঙ্গে, কেউ নাতনী, কেউ মেয়ে সেজে। বুড়ীরা বড় ঝগড়াটে, পাতা আর জলের ঘটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়েছে। শরৎ বললে, মা বসুন, আমি জল দিচ্ছি আপনাদের—

একজন জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি জেতের মেয়ে গা ?

—বামুনের মেয়ে, মা।

—কাশীতে এলে সবাই বামুন হয়। কোথায় থাকো তুমি ?

—বাঙালীটোলায় থাকি মা—কিছু ভাববেন না আপনি।

ছত্রের পরিবেশনকারিণী একটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে শরতকে বললে, তোমরা বসছো না বাছা ?

—আমি খাবো না মা।

সে অবাক হয়ে বললে, তবে এখানে কেন এসেছ ?

—দেখতে।

রেণুকা বললে, উনি বড়লোকের মেয়ে, ছত্তর খুলবেন কাশীতে। তাই দেখতে এসেছেন কি রকম খাওয়া-দাওয়া হয়।

এক মুহূর্ত্তে যে-সব বুড়ী খেতে বসেছে এবং যারা পরিবেশন ও দেখাশুনো করছে, সকলেরই ধরন বদলে গেল। যে বুড়ী শরতের জাতি-বর্ণের প্রশ্ন তুলেছিল, সে-ই সকলের আগে একগাল হেসে বললে, সে চেহারা দেখেই আমি ধরেছি মা, চেহারা দেখেই ধরেছি। আগুন কি ছাই চাপা থাকে ? তা দ্যাখো রাণীমা, একটা দরখাস্ত দিয়ে রাখি। আমার এই নাতনী, অল্পবয়সে কপাল পুড়েছে, কেউ নেই আমাদের। আপনার ছত্তর খুললে এর দুটো বন্দোবস্ত যেন সেখানে হয়। ভগবান আপনার ভাল করবেন। কুচবেহার কালী-বাড়িতেও আমাদের নাম-লেখানো আছে মাসে পনেরো দিন। বাকী পনেরো দিন আমবেড়েয় আর এই ছত্তরে—

আর চার-পাঁচজন নিজেদের দুরবস্থা সবিস্তারে এবং নানা অলঙ্কার দিয়ে বর্ণনা করছে, এমন সময় পায়েস এসে হাজির হ'ল। একটা ছোট পিতলের গামলার এক গামলা পায়েস, খেতে বসেছে প্রায় জন ত্রিশ-বত্রিশ, বেশি করে কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়—অথচ প্রত্যেকেই নির্লজ্জভাবে অনুযোগ করতে লাগল তার পাতে পায়েস কেন অতটুকু দেওয়া হ'ল, রোজই তে পায়েস কম পায়, তাকে আজ একটু বেশী করে দেওয়া হোক্। কেউ কেউ ঝগড়াও আরম্ভ করলে পরিবেশনকারিণীর সঙ্গে।

শরৎ রেণুকাকে নিয়ে বাইরে চলে এল। বললে, কেন ওরকম বললি ? ছিঃ—ওরা সবাই গরীব, ওদের লোভ দেখাতে নেই।

তার পর অন্যমনস্কভাবে বললে, ইচ্ছে করে ওদের খুব করে পায়েস খাওয়াই। আহা, খেতে পায় না, ওদের দোষ নেই—ছত্তরে বন্দোবস্ত ঠিকই আছে, একটু পায়েস দেয়, একটু ঘি দেয়—তবে ছিটেফোঁটা।

রেণুকা বললে, বাবা, বুড়ীগুলো একটু পায়েসের জন্যে কি রকম আরম্ভ করে দিয়েছে বল্ তো ? খাচ্ছিস্ পরের দয়ায়—আবার ঝগড়া ! ভিক্ষের চাল কাঁড়া-আঁকাড়া !

—আহা ভাই—কত দুঃখে যে ওরা এমন হয়েছে তা তুমি আমি কি জানি ? মানুষে কি সহজে লজ্জা-শরম খোয়ায় ? ওদের বড় দুঃখ। সত্যি ভাই, আমার ইচ্ছে করছে আজ যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, বাবার নামে ছত্তর দিতাম। আর তাতে নিজের হাতে বড় কড়ায়

পায়েস রেঁধে ওদের খাওয়াতাম। সেদিন যেমন কড়ায় হালুয়া রেঁধে দিল সেই ছত্তরটা—তুই দেখিসু নি—চাদরের মস্ত বড় কড়া।

—নে চলু আমার হাত ধরু—

—ওই পাগলীকে নিজের হাতে রেঁধে একদিন পেট ভরে খাওয়াবো। তোর বাড়িতে—

—বেশ তো।

—আমি মাইনে বলে কিছু চাইলে ওরা দেবে না?

—দেওয়া তো উচিত। তবে গিন্নীটি যে রকম ঝানু—তুমি তো ভাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবে না—

—মরে গেলেও না। তবে একবার বলে দেখতে হবে। বেশী লোককে না পারি, একজনকেও তো পারি।

ওরা খানিক দূরে এসেছে, ছত্রের উত্তর দিকের উঁচু রোয়াক থেকে পুরুষের দল খেয়ে নেমে আসছে, হঠাৎ তাদের মধ্যে কাকে দেখে শরৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বার হ'ল—পরক্ষণেই সে রেণুকার হাত ছেড়ে দিয়ে সেদিকে এগিয়ে চলল।

বিস্মিতা রেণুকা বললে, কোথায় চললে ভাই? কি হ'ল?

পুরুষের ভিড়ের মধ্যে এঁটো হাতে নেমে আসছেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিন বৎসর আগে যিনি পদব্রজে দেশভ্রমণে বেরিয়ে গড়শিবপুরে শরৎদের বাড়ির অতিথিশালায় কয়েকদিন ছিলেন।

শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে। কোনো ভুল নেই—তিনিই। সেই গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়!

সে প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করছিল—কিন্তু তখনি দ্বিধা ও সংকোচ ছেড়ে কাছে গিয়ে বললে, ও জ্যাঠামশাই? চিনতে পারেন?

সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই বটে। শরতের দিকে অল্পক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে তিনি আগ্রহ ও বিস্ময়ের সুরে বললেন—মা, তুমি এখানে?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই। আমি এখানেই আছি—

—কতদিন এসেছ? রাজামশায় কোথায়? তোমার বাবা?

—তিনি—তিনি দেশে। সব কথা বলছি, আসুন আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে—ওকে ডেকে নিই। আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন জ্যাঠামশায়।

পথে বেরিয়েই গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন—তারপর মা, তুমি এখানে কবে এসেছ? আছো কোথায়?

—সব বলবো। আপনি আগে বসুন, আপনি কবে এসেছেন?

—আমি সেই তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে আরও দু-এক জায়গায় বেড়িয়ে বাড়ি যাই। বাড়িতে বলেছি তো ছেলের বউ আর ছেলেরা। তাদের অবস্থা ভাল না। কিছুদিন বেশ রইলাম—তার পর এই মাঘ মাসে আবার বেরিয়ে পড়লাম—একেবারে কাশী।

—হেঁটে?

—না মা, বুড়ো বয়সে তা কি পারি! ভিক্ষে-সিক্ষে করে কোনোমতে রেলে চেপেই এসেছি। ছত্তরে ছত্তরে খেয়ে বেড়াচ্ছি। মা অন্নপূর্ণোর কৃপায় আমার মত গরীব ব্রাহ্মণের দুটো ভাতের ভাবনা নেই এখানে। চলে যাচ্ছে এক রকমে। আর দেশে ফিরবো না ভেবেছি মা।

রেণুকাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে শরৎ বললে, চলুন জ্যাঠামশায়, দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে বসি।

দুজনে গিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের রানায় বসলো।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, তার পর মা, তোমার কথা বলো। কার সঙ্গে এসেছো কাশীতে? ও মেয়েটি বুঝি চোখে দেখতে পায় না? ও কেউ হয় তোমাদের?

শরতের কোন দ্বিধা হ'ল না এই পিতৃসম স্নেহশীল বৃদ্ধের কাছে সব কথা খুলে বলতে। অনেক দিন পরে সে এমন একজন মানুষ পেয়েছে, যার কাছে বুকের বোঝা নামিয়ে হাল্‌কা হওয়া যায়। কথা শেষ করে সে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জে সব শুনে কাঠের মত বসে রইলেন।

...এসব কি শুনছেন তিনি? এও কি সম্ভব?

শেষে আপন মনেই যেন বললেন, তোমার বাবা রাজামশায় তা হলে দেশেই—না?

—তা জানি নে জ্যাঠামশায়, বাবা কোথায় তা ভেবেছিও কতবার—তবে মনে হয় দেশেই আছেন তিনি—যদি এতদিন বেঁচে থাকেন—

কান্নার বেগে আবার ওর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

—আচ্ছা, থাক মা, কেঁদো না। আমিও বলছি শোনো—গোপেশ্বর চাটুজ্জে যদি অভিনন্দ ঠাকুরের বংশধর হয়, তবে এই কাশীর গঙ্গাতীরে বসে দিব্যি করছি তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবোই। তুমি তৈরি হও মা—কালই রওনা হয়ে যাবো বাপে-ঝিয়ে—তুমি কোন্ বাড়ি থাকো—চল দেখে যাই। তুমি কি মেয়ে, আমার তা জানতে বাকী নেই। নরাধম পাষণ্ড ছাড়া তোমার চরিত্রে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। আমার রোগ থেকে সেবা করে তুমি বাঁচিয়ে তুলেছিলে—তা আমি ভুলি নি—আমার আর জন্মের মা-জননী তুমি। তোমায় এ অবস্থায় এখানে ফেলে গেলে আমার নরকেও স্থান হবে না যে।

এগারো

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জেকে সঙ্গে নিয়ে শরৎ ফিরল নিজের বাসায়।

বৃদ্ধ বললেন, এই বাড়ি? বেশ। কাল তুমি তৈরি হয়ে থেকো। তোমার এই বুড়ো ছেলের সঙ্গে কাল যেতে হবে তোমায়। পয়সাকড়ি না থাকে, সেজন্যে কিছু ভেবো না—ছেলের সে ক্ষমতা আছে মা-জননী।

রেণুকা এতক্ষণ কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিল, শরৎকে চুপি চুপি বললে, উনি কে ভাই?

—আমার জ্যাঠামশাই—

—তোমাকে দেশে নিয়ে যাবেন?

—তাই তো বলছেন।

—হঠাৎ কালই চলে যাবে কেন, এ মাসটা থেকে যাও না কাশীতে। বলো তোমার জ্যাঠামশাইকে। খোকার সঙ্গে একবার দেখাও করতে হবে তো? আমাকে এত শীগ্‌গির ফেলে দিয়েই বা যাবে কোথায়?

শরৎ বৃদ্ধকে জানাল। কালই যাওয়া মুশকিল হবে তার। যেখানে কাজ করছে, যারা এতদিন আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল, তারা একটা লোক দেখে নিলে সে যাবার জন্যে তৈরী হবে।

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জে তাতে রাজী হলেন। পাঁচ দিনের সময় নিয়ে শরৎ রোজ রান্না-বান্নার পরে রেণুকাকে সঙ্গে নিয়ে খোকনদের বাড়ি যায়। কাশী থেকে কোন্ অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে সে যাত্রা শুরু করবে তা সে জানে না—কিন্তু খোকনকে ফেলে যেতে তার সব চেয়ে কষ্ট হবে তা সে এ ক'দিনে হাড়ে হাড়ে বুঝছে। খোকনের মা ওর যাবার কথা

শুনে খুবই দুঃখিত।

শরৎ বলে, ও খোকন বাবা, গরীব মাসীমাকে মনে রাখবি তো বাবা?

খোকন না বুঝেই ঘাড় নেড়ে বলে—হুঁ। তোমাকে একটা বল কিনে দেবো মাসীমা—

—সত্যি?

—হ্যাঁ মাসীমা, ঠিক দেবো।

—আমায় কখনো ভুলে যাবি নে? বড় হলে মাসীমার বাড়ি যাবি, মুড়কী নাড়ু দেবো ধামি করে, পা ছড়িয়ে বসে খাবি।

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে—হুঁ।

বক্সীদের বড় বউ ওর নাম ঠিকানা সব লিখে নিলে, খোকনের মার কাছে ওর নাম ঠিকানা রইল।

ফেরবার পথে শরৎ গণেশমহল্লার পাগলীর সন্ধানে ইতস্ততঃ চাইতে লাগল, কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেল না। রেণুকাকে বললে, ওই একটা মনে বড় সাধ ছিল, পাগলীকে একদিন ভাল করে রেঁধে খাওয়াবো—তা কিন্তু হ'ল না। আমি মাইনে বলে কিছু চেয়ে নেবো মিনুর কাকীর কাছ থেকে, যদি কিছু দেয় তবে তোর কাছে রেখে যাবো। আমার হয়ে তুই তাকে একদিন খাইয়ে দিস্—

রেণুকা ধরা গলায় বলে—আর আমার উপায় কি হবে বললে না যে বড়? তোমার ছত্র কবে এসে খুলছো কাশীতে—শরৎসুন্দরী ছত্র? গরীব লোক দুটো খেয়ে বাঁচি।

শরৎ হেসে ভঙ্গি করে ঘাড় দুলিয়ে বললে, আ তোমার মরণ! এর মধ্যে ভুলে গেলি মুখপুড়ী? শরৎসুন্দরী নয় কেদার ছত্তর—

—ও ঠিক, ঠিক। জ্যাঠামশায়ের নামে ছত্র হবে যে! ভুলে যাই ছাই—

—না হলেও তুই যাবি আমাদের দেশে। মস্ত বড় অতিথিশালা আছে। রাজারাজড়ার কাণ্ড! সেখানে বারো মাস খাবি, রাজকন্যের সখী হয়ে—কি বলিস?

—উঃ, তা হলে তো বর্তে যাই দিদি ভাই। কবে যেন যাচ্ছি তাই বলো, জোড়ে না বিজোড়ে?

—তা কি কখনো হয় রে পোড়ারমুখী? জোড়ের পায়রা জোড় ছাড়া করতে গিয়ে পাপের ভাগী হবে কে?

মিনুর কাকীমাকে শরৎ বিদায়ের কথা বলতেই সে চমকে উঠল প্রায় আর কি। কেন যাবে, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে যাবে—নানা প্রশ্নে শরৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। তার কোনো কথাই অবিশ্যি মিনুর কাকীমার বিশ্বাস হ'ল না। ওসব চরিত্রের লোকের কথার মধ্যে বারো আনাই মিথ্যে।

শরৎ বললে, আমায় কিছু দেবেন? যাবার সময় খরচপত্র আছে—

—যখন তখন হুকুম করলেই কি গেরস্তর ঘরে টাকাকড়ি থাকে? আমি এখন যদি বলি আমি দিতে পারবো না?

—দেবেন না। আপনারা এতদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন এই ঢের! পয়সাকড়ির জন্যে তো ছিলাম না. গৌরী-মা বলে দিয়েছিলেন, সব ঠিক করে দিয়েছিলেন—তাই এখানে ছিলাম। আপনাদের উপকার জীবনে ভুলবো না।

মিনুর কাকীমা শরতের কথা শুনে একটু নরমও হ'ল। বললে, তা—তা তো বটেই। তা আচ্ছা দেখি যা পারি দেবো এখন।

বিদায়ের দিন শরৎ মিনুর কাকীমাকে অবাক করে দিয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু-না-কিছু খেলনা ও খাবার জিনিস কিনে নিয়ে এল। রেণুকাকে তার ঘরে একখানা লালপাড়

শাড়ি দিতে গিয়ে চোখের জলের মধ্যে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হ'ল।

রেণুকা বললে, এ শাড়ি আমার পরা হবে না ভাই, মাথায় করে রেখে দেবো—

—তাই করিস মুখপুড়ী।

—কেন আমার জন্যে খরচ করলে! ক'টাকা দাম নিয়েছে?

—তোর সে খোঁজে দরকার কি? দিলাম, নে। মিটে গেল। জানিস আমি রাজকন্যে, আমাদের হাত ঝাড়লে পর্বত?

রেণুকা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে—তুমি আমায় ভুলে গেলে আমি মরে যাবো ভাই।

শরৎ মুখে ভেংচি কেটে বললে, মরে ভুত হবি পোড়ারমুখী! ভুত না তো, পেত্নী হবি। রাত্রে আমায় যেন ভয় দেখাতে যেয়ো না।

শরতের মুখে হাসি অথচ চোখে জল।

আবার কলকাতা শহর।···

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, এখানে বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে আমাদের গাঁয়ের একজন লোক থাকে বাসা করে, আপিসে চাকরি করে। চলো সেখান গিয়ে উঠি দুজনে।

খুঁজতে খুঁজতে বাসা মিললো। বাড়ির কর্ত্তা জাতিতে মোদক, স্বগ্রামের প্রবীণ ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। মাথায় রাখে কি কোথায় রাখে, ভেবে যেন পায় না। বললে—মা-ঠাকরুণ কে?

—আমার ভাইঝি, গড়শিবপুরে বাড়ি ওদের। তুমি চেনো না। মস্ত লোক ওর বাবা।

—তা চাটুজ্জে মশাই, সব যোগাড় আছে ঘরে। দিদি-ঠাকরুণ রান্নাবান্না করুন, ওরা সব যুগিয়ে দেবে এখন। আমার আবার আপিসের বেলা হয়ে গেল—দশটায় হাজির হতেই হবে। আমি তেল মাখি—কিছু মনে করবেন না।

বাড়ির গৃহিণী শরৎকে যথেষ্ট যত্ন করলেন। তাকে কিছুই করতে দিলেন না। বাটনা বাটা, কুটনো কোটা সবই তিনি আর তাঁর বড় মেয়ে দুজনে মিলে করে শরৎকে রান্না চড়িয়ে দিতে ডাক দিলেন।

শরতের জন্যে মিছরী ভিজের শরবৎ, দই সন্দেশ আনিয়ে তার স্নানের পর তাকে জল খেতে দিলেন।

আহারাদির পর শরতের বড় ইচ্ছে হ'ল একবার কালীঘাটে গিয়ে সে গৌরী-মার সঙ্গে দেখা করে। বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জে শুনে বললেন, চলো না মা, আমারও ওই সঙ্গে দেবদর্শনটা হয়ে যাক্।

বিকেলের দিকে ওরা কালীঘাটে গেল। বাড়ির গৃহিণী তাঁর বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওদের সঙ্গিনী হলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিস্তৃত নাটমন্দিরে দু-তিনটি নূতন সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গৌরী-মা তাঁর পুরোনো জায়গাটিতেই ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। শরৎকে দেখে তিনি প্রায় চমকে উঠলেন। বললেন, সরোজিনীরা কি কলকাতায় এসেছে?

শরৎ তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সব খুলে বললে।

গৌরী-মা বললেন, তোমার জ্যাঠামশাই? কই দেখি—

বৃদ্ধ চাটুজ্জে মহাশয় এসে গৌরী-মার কাছে বসলেন, কিন্তু প্রণাম করলেন না, বোধ হয় সন্ন্যাসিনী তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ব'লে। বললেন—মা, আমি আপনার কথা শরতের মুখে সব শুনেছি। আপনি আশীর্বাদ করুন আমি ওকে যেন ওর বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারি। আপনার আশীর্বাদ ছিল ব'লে বোধ হয় আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল কাশীতে।

গৌরী-মা বললেন, তাঁর কৃপায় সব হয় বাবা, তিনিই সব করছেন—আপনি আমি নিমিত্ত মাত্র।

বাসায় ফিরে আসবার পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি কমলার সঙ্গে একবারটি পথেঘাটে কোথাও দেখা হয়ে যেতো, কি মজাই হ'ত তা হলে! কলকাতার মধ্যে যদি কারো সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রাণ কেমন করে—তবে সে সেই হতভাগিনী বালিকার সঙ্গেই আবার সাক্ষাতের আশায়।

কাশীতে গিয়ে এই দেড় বৎসরে সে অনেক শিখেছে, অনেক বুঝেছে। এখন সে হেনাদের বাড়ি আবার যেতে পারে, কমলাকে সেখান থেকে টেনে আনতে পারে, সে সাহস তার মধ্যে এসে গিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে হেনাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না, শহর বাজারে ঘরবাড়ির ঠিকানা বা রাস্তা না জানলে বের করতে পারা যায় না, আজকাল সে বুঝেছে।

কলকাতায় এসে আবার তার বড় ভাল লাগছে। কাশী তো পুণ্যস্থান, কত দেউল দেবমন্দির, ঘাট, যত ইচ্ছে স্নান কর, দান কর, পুণ্য কর—স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথের সেখানে অধিষ্ঠান। কিন্তু কলকাতা যেন ওকে টানে, এখানে এত জিনিস আছে যার সে কিছুই বোঝে না—সেজন্যেই হয়তো কলকাতা তার কাছে বেশী রহস্যময়। এত লোকজন, গাড়িঘোড়া, এত বড় জায়গা কাশী নয়।

শরৎ বলে, জ্যাঠামশায় আপনি কোন্ কোন্ দেশে বেড়ালেন?

—বাংলা দেশের কত জায়গা পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি মা, বর্দ্ধমানে গিয়েছি, বৈঁচি, শক্তিগড়, নারানপুর গিয়েছি। রাঢ় দেশের কত বড় বড় মাঠ বেয়ে সন্দেবেলা সুমুখ আঁধার রাত্তিরে একা গিয়েছি। বড় তালগাছ ঘেরা দীঘি, জনমানব নেই কোথাও, লোকে বলে ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের ভয়—এমন সব দীঘির ধারে সারাদিন পথ হাঁটবার পরে বসে চাট্টি জলপান খেয়েছি। একদিন সে কথা গল্প করবো তোমাদের বাড়ি বসে।

—বেশ জ্যাঠামশায়।

—বেড়াতে বড় ভাল লাগে আমার। আগে বাংলাদেশের মধ্যেই ঘুরতাম, এবার গয়া কাশীও দেখা হ'ল—

—আমারও খুব ভাল লাগে। বাবা কোনো দেশ দেখেন নি, বাবাকে নিয়ে চলুন আবার আমরা বেরুবো—

—খুব ভাল কথা মা। চলো এবার হরিদ্বারে যাবো—

—সে কতদূর? কাশীর ওদিকে?

—সে আরও অনেক দূরে শুনেছি। তা হোক, চলো সবাই মিলে যাওয়া যাক্—বৃন্দাবন হয়ে যাবো—তোমার বাবাও চলুন।

—জ্যাঠামশায়?

—কি মা?

—বাবার দেখা পাবো তো?

—আমি যখন কথা দিয়েছি মা, তুমি ভেবো না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্দি থাকো।

পরদিন গোপেশ্বর চাটুজ্জে শরৎকে কলকাতায় তাঁর স্বগ্রামবাসী কৃষ্ণচন্দ্র মোদকের বাসায় রেখে দুদিনের জন্যে গড়শিবপুরে গেলেন। শরৎকে আগে হঠাৎ গ্রামে না নিয়ে গিয়ে ফেলে সেখানকার ব্যাপার কি জানা দরকার। গড়শিবপুরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে কিন্তু তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল, যা শুনলেন সেখানে। গ্রামের লোকে বললে, কেদার রাজা বা তাঁর মেয়ে আজ

প্রায় দেড় বৎসর দু-বৎসর আগে গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে যান। সেখান থেকে তাঁরা কোথায় চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। কলকাতায় তাঁরা নেই একথাও ঠিক। যাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তারাই ফিরে এসে বলেছে।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে গ্রামের অনেককেই জিজ্ঞেস করলেন, সকলেই ওই এক কথা বলে। সেবার যে সেই মুদির দোকানে কেদারের সঙ্গে বসে বসে গান-বাজনা করেছিলেন সেখানেও গেলেন। কেদার গাঁয়ে না থাকায় গানবাজনার চর্চ্চা আর হয় না, মুদি খুব দুঃখ করলে। গোপেশ্বরকে তামাক সেজে খাওয়ালে। অনেকদিন কেদার বা তাঁর মেয়ের কোনো সন্ধান নেই, আর আসবেন কিনা কে জানে।

বৃদ্ধ তামাক খেয়ে উঠলেন।

গ্রামের বাইরের পথ ধরে চিন্তিত মনে চলেছেন, শরতের বাপের যদি সন্ধান না-ই পাওয়া যায়, তবে উপস্থিত শরতের গতি কি করা যাবে? কাশী থেকে এনে ভুল করলেন না তো?

এমন সময় পেছন থেকে একজন চাষা লোক তাঁকে ডাক দিলে—বাবাঠাকুর—

গোপেশ্বর চাটুজ্জে ফিরে চেয়ে দেখে বললেন—কি বাপু?

—আপনি ক্যাদার খুড়ো ঠাকুরের খোঁজ করছিলে ছিবাস মুদির দোকানে। আমিও সেখানে ছেলাম। আপনি কি তাঁর কেউ হও?

—হ্যাঁ বাপু। আমি তাঁর আত্মীয়, কেন তুমি কিছু জান নাকি?

—আপনি কারো কাছে বলবেন না তো?

—না, বলতে যাবো কেন? কি ব্যাপার বলো তো শুনি। আমি তাঁর বিশেষ আত্মীয়, আর আমার দরকারও খুব।

লোকটা সুর নীচু করে বললে—তিনি হিংনাড়ার ঘোষেদের আড়তে কাজ করছেন যে। হিংনাড়া চেনেন? হলুদপুকুর থেকে তিন ক্রোশ। আমি পটল বেচতে যাই সেবার মাঘ মাসে। আমার সঙ্গে দেখা। আমায় দিব্যি দিয়ে দিয়েলেন, গ্রামের কাউকে বলতে নিষেধ করে দিলেন। তাই কাউকে বলি নি। আপনি সেখানে যাও, পুকুরের উত্তর পাড়ে যে ধান-সর্ষের আড়ত, সেখানেই তিনি থাকেন। আমার নাম করে বলবে, গেঁয়োহাটির ক্ষেত্তর সন্ধান দিয়েছে। আমাদের গাঁয়ের শখের যাত্রার দলে কতবার উনি গিয়ে বেয়ালা বাজিয়েছেন। আমায় বড্ড স্নেহ করতেন। মনে থাকবে? গেঁয়োহাটির ক্ষেত্তর কাপালী।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে আশা করেন নি এভাবে কেদারের সন্ধান মিলবে। বললেন, বড্ড উপকার করলে বাপু। কি নাম বললে? ক্ষেত্র? আমি বলবো এখন তাঁর কাছে—বড় ভালো লোক তুমি।

সেই দিনই সন্ধ্যার আগে গোপেশ্বর চাটুজ্জে হিংনাড়ার বাজারে গিয়ে ঘোষেদের আড়ত খুঁজে বার করলেন। আড়তের লোকে জিজ্ঞেস করলে, কাকে চান মশাই? কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—গড়শিবপুরের কেদারবাবু এখানে থাকেন?

—হ্যাঁ আছেন। কিন্তু তিনি মালঞ্চার বাজারে আড়তের কাজে গিয়েছিলেন—এখনও আসেন নি। বসুন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় কে তাঁকে বললে—মুহুরী মশায় ঐ যে ফিরছেন—

গোপেশ্বর চাটুজ্জে সামনে গিয়ে বললেন, রাজামশায়, নমস্কার। আমায় চিনতে পারেন?

গোপেশ্বরের দেখে মনে হ'ল কেদারের বয়স যেন খানিকটা বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু হাবভাবে সেই পুরানো আমলের কেদার রাজাই রয়ে গিয়েছেন পুরোপুরিই।

কেদার চোখ মিটমিট করে বললেন, হ্যাঁ, চিনেছি। চাটুজ্জে মশায় না?

—ভাল আছেন ?

—তা একরকম আছি।

—এখানে কি চাকরি করছেন ? আপনার মেয়ে কোথায় ?

—আমার মেয়ে ? ইয়ে—

কেদার যেন একবার ঢোক গিলে তার পর অকারণে হঠাৎ উৎসাহিতের সুরে বললেন, মেয়ে কলকাতায়—তার মাসীমার—

গোপেশ্বর চাটুজ্জে সুর নিচু করে বললেন, শরৎ-মাকে আমার সঙ্গে এনেছি। সে আমার কাছেই আছে—কোনো ভয় নেই।

এই কথা বলার পরে কেদারের মুখের ভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটলো। নিতান্ত নিরীহ ও নির্ব্বোধ লোক ধমক খেলে যেমন হয় তাঁর মুখ যেন তেমনি হয়ে গেল। গোপেশ্বর চাটুজ্জের মনে হ'ল এখুনি তিনি যেন হাত জোড় করে কেঁদে ফেলবেন।

বললেন, আমার মেয়েকে—আপনি এনেছেন ? কোথায় সে ?

—কলকাতায় রেখে এসেছি। কালই আনবো। বসুন, একটু নিরিবিলি জায়গায়—সব বলছি। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, কোনো ভয় নেই রাজামশায়। চলুন ওদিকে—বলি সব খুলে।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, আপনার মেয়ে আগুনের মত পবিত্র—

কেদার হা-হা করে হেসে বললেন, ও কথা আমায় বলার দরকার হবে না হে গোপেশ্বর। আমার মেয়ে, আমাদের বংশের মেয়ে—ও আমি জানি।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, রাজামশায় শেষটাতে কি এখানে চাকরি স্বীকার করলেন ?

কেদার অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন, ভুলে থাকবার জন্যে, স্রেফ্ ভুলে থাকবার জন্যে দাদা। এরা আমার বাড়ি যে গড়শিবপুরে তা জানে না। বেহালা বাজাই নি আজ এই দেড় বছর—বেহালার বাজনা যদি কোথাও শুনি, মন কেমন করে ওঠে।

—চলুন, আজই কলকাতায় যাই—

—আমার বড় ভয় করে। ভয়ানক জায়গা—আমি আর সেখানে যাব না হে, তুমি গিয়ে নিয়ে এস মেয়েটাকে। আজ রাতে এখানে থাকো—কাল রওনা হয়ে যাও সকালে। আমার কাছে টাকা আছে, খরচপত্র নিয়ে যাও। প্রায় সওয়া-শো টাকা এদের গদিতে মাইনের দরুন এই দেড় বছরে আমার পাওনা দাঁড়িয়েছে। আজ ঘোষ মশায়ের কাছে চেয়ে নেবো।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে পরদিন সকালে কলকাতায় গেলেন এবং দুদিন পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে স্বরূপপুর স্টেশনে নেমে নৌকাযোগে বৈকালে হিংনাড়া থেকে আধক্রোশ দূরবর্ত্তী ছুতোরঘাটায় পেঁছে কেদারকে খবর দিতে গেলেন। শরৎ নৌকাতেই রইল বসে।

সন্ধ্যার কিছু আগে কেদার এসে বাইরে থেকে ডাক দিলেন—ও শরৎ—

শরৎ কেঁদে ছইয়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সে যেন ছেলেমানুষের মত হয়ে গেল বাপের কাছে। অকারণে বাপের ওপর তার এক দুর্জ্জয় অভিমান।

কেদার বড় শক্ত পুরুষমানুষ—এমন সুরে মেয়ের সঙ্গে কথা বললেন, যেন আজ ওবেলাই মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, যেন রোজই দেখাসাক্ষাৎ হয়।

—কাঁদিস্ নে মা, কাঁদতে নেই, ছিঃ ! কেঁদো না। ভাল আছিস ?

শরৎ কাঁদতে কাঁদতেই বললে, তুমি তো আর আমার সন্ধান নিলে না ? বাবা তুমি এত নিষ্ঠুর ! আজ যদি মা বেঁচে থাকতো, তুমি এমনি করে ভুলে থাকতে পারতে ?

দুজনেই জানে কারো কোনো দোষ নেই, যা হয়ে গিয়েছে তার ওপর হাত ছিল না বাবা বা মেয়ের কারো—রাগ বা অভিমান—সম্পূর্ণ অকারণ !

কেদার অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, তা কিছু মনে করিস নে তুই মা। আমার কেমন ভয় হয়ে গেল—আমায় ভয় দেখালে পুলিস ডেকে দেবে, তোমায় ধরিয়ে দেবে সে আরও কত কিছু। আমার সব মনেও নেই মা। যাক্, যা হয়ে গিয়েছে, তুমি কিছু মনে করো না। চলো চলো আজই গড়শিবপুরে রওনা হই। দেড় বছর বাড়ি যাই নি।

গড়শিবপুরের রাজবাড়ি এই দেড় বছরে অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে।

চালের খড় গত বর্ষায় অনেক জায়গায় ধ্বসে পড়েছে। বাঁশের আড়া ও বাতা উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। বাড়ির উঠোনে একহাঁটু বনজঙ্গল—আজ গোপেশ্বর চাটুজ্জে ও কেদার অনবরত কেটে পরিষ্কার করেও এখনও সাবেক উঠোন বের করতে পারেন নি।

নিড়ানি ধরে সামনের উঠোনের লম্বা লম্বা মুথো ঘাস উপড়ে তুলতে তুলতে কেদার বললেন, ও মা শরৎ, আমাদের একটু তামাক দিতে পারো?

গোপেশ্বর চাটুজ্জে উঠোনের ওপাশে কুক্‌শিমা গাছের জঙ্গল দা দিয়ে কেটে জড়ো করতে করতে বলে উঠলেন—ও কি রাজামশায়, না না, মেয়েমানুষদের দিয়ে তামাক সাজানো—ওরা ঘরের লক্ষ্মী—না ছিঃ—তামাক আমি সেজে আনছি গিয়ে—

ততক্ষণ শরৎ তামাক ধরিয়ে কলকেতে ফুঁ পাড়ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া ঈষৎ দীর্ঘতর হয়েছে। বাতাসে সদ্য কাটা বনজঙ্গলের কটুতিক্ত গন্ধ। ভাঙা গড়বাড়ির দেউড়ির কার্নিসে বন্য পাখীর কাকলী।

কাশীতে যখন ছিল তখন ভাবে নি আবার সে দেশে ফিরতে পারবে কখনো, আবার সে এমনিতর বৈকালে বাবাকে নিড়ান হাতে উঠোনের ঘাস পরিষ্কার করতে দেখবে, বাবার তামাক আবার সাজবার সুযোগ পাবে সে।

তামাক দিয়ে শরৎ বললে, বাবা, হিম হয়ে বসে থেকো না—এবেলা একটা তরকারী নেই যে কুটি, ব্যবস্থা আগে করো।

কেদার কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে বললেন, কেন পুকুরপাড়ে ঝিঙে দেখে এলাম তো তখন!

কালোপায়রা দীঘির পাড়ে বাঁধানো ঘাটের পাশের ঝোপের মাথায় বন্য ঝিঙে ও ধুঁধুলের লতা বেড়ে উঠেছে, কেদারের কথার লক্ষ্যস্থল সেই বুনো ধুঁধুলের গাছ।

—শুধু ঝিঙে বাবা?

—তাই নিয়ে এসে ভাতে দে—কি বল হে দাদা? হবে না?

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বনজঙ্গল কাটতে কাটতে একটা ঝালের চারা দায়ের মুখে উপড়ে ফেলেছিলেন, সেটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কিছুক্ষণ থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন—খুব, খুব। রাজভোগ ভেসে যাবে।

কেদার বললেন—তবে তাই করো মা শরৎ। তাই নিয়ে এসো।

শরৎ কালোপায়রা দীঘির ধারে জঙ্গলে এল ঝিঙে খুঁজতে।

আজই দুপুরবেলা ওরা গরুর গাড়ি করে এসে পেঁাছেছে এখানে। বাপ ও জ্যাঠামশায় সেই থেকে বনজঙ্গল পরিষ্কার নিয়েই ব্যস্ত আছেন। সে নিজে ঘর দোর পরিষ্কার করছিল—এই মাত্র একটু অবসর মিলেছে চোখ মেলে চারিদিকে চাইবার। কালোপায়রা দীঘির টলটলে জলে রাঙা কুমুদ ফুল ফুটেছে গড়বাড়ির ভগ্নস্তূপের দিকটাতে। এই তো বাঁধাঘাট। ঘাটের ধাপে শেওলা জমেছে, কুক্‌শিমার জঙ্গল বেড়েছে খুব—কতকাল বাসন মাজে নি ঘাটটাতে বসে। কাল সকালে আসতে হবে আবার।

ছাতিম বনের ছায়ার দিকে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাতিম বনের ওপরে ওই দেউলের গম্বুজাকৃতি চুড়োটা বনের আড়াল থেকে মাথা বার করে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া ওপার থেকে এপারে এসে পেঁাছেছে, চাতালের যে কোণে বসে শরৎ বাসন মাজত, এপারের

বটগাছটার ডাল তার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। শরৎ যেন কতকাল পরে এসব দেখছে, জন্মান্তরের তোরণদ্বার অতিক্রম করে এ যেন নতুন বার পৃথিবীতে এসে চোখ মেলে চাওয়া বহুকালের পুরোনো পরিচয়ের পৃথিবীতে। কালোপায়রা দীঘির ধারের এমনি একটি সুপরিচিত বৈকালের স্বপ্ন দেখে কতবার চোখের জল ফেলেছে কাশীতে পরের বাড়ি দাসত্ব করতে করতে। দশাশ্বমেধ ঘাটের রানায় সন্ধ্যাবেলা রেণুকার সঙ্গে বসে। রাজগিরিতে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ছায়াবৃত পথে মিনুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে।

সে শরৎ নেই আর। শরৎ নিজের অনভূতিতে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল। নতুন দৃষ্টি, নতুন মন নিয়ে ফিরেছে শরৎ। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা যে শরৎসুন্দরীর দৃষ্টি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল, আজ বহির্জগতের আলো ও ছায়া, পাপ ও পুণ্যের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে যেন শরতের মন উদারতর, দৃষ্টি নবতর দর্শনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

ঝিঙে তুলে রেখে শরৎ বার বার দীঘির ঘাটের ভাঙা চাতালে প্রাচীন বটতলায় নানা কারণে অকারণে ছুটে ছুটে আসতে লাগল শুধু এই নতুন ভাবানুভূতিকে বার বার আস্বাদ করবার জন্যে। একবার উপরে গিয়ে দেখলে গ্রামের জগন্নাথ চাটুজ্জে কার মুখে খবর পেয়ে এসে পেঁাছে গিয়েছেন। বাবা ও জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছেন।

ওকে দেখে জগন্নাথ বললেন, এই যে মা শরৎ, তা কাশী গয়া অনেক জায়গা বেরিয়ে এলে বাবার সঙ্গে আর গোপেশ্বর ভায়ার সঙ্গে? ভালো—প্রায় দেড় বছর বেড়ালে।

বুদ্ধিমতী শরৎ বুঝল এ গল্প জ্যাঠামশায়ই রচনা করেছেন তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ নির্দ্দেশ করার জন্যে। শরৎ জগন্নাথ চাটুজ্জের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

—এসো, এসো মা, থাক্। চিরজীবী হও—তা কোন্ কোন্ দেশ দেখলে?

কেদার বললেন, দেড় বছর ধরে তো বেড়ানো হয় নি। আমি মধ্যে চাকরি করেছিলাম হিংনাড়ার বাজারে ঘোষেদের আড়তে। এই গোপেশ্বর দাদা সপরিবারে পশ্চিমে গেলেন, শরৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন—

শরৎ বললে, চা খাবেন জ্যাঠামশায়, যাবেন না বসুন। আমি বাসনগুলো ধুয়ে আনি পুকুরঘাট থেকে।

আবার সে ছুটে এল কালোপায়রা দীঘির পাড়ে ছাতিম বনের দীর্ঘ, ঘনশীতল ছায়ায়। পুরোনো দিনের মত আবার রোদ রাঙা হয়ে উঠে গিয়েছে ছাতিম গাছের মাথায়। বেলা পড়ে এসেছে। এমন সময়ে দূর থেকে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে সে হঠাৎ লুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজলক্ষ্মীর হাতে একটি প্রদীপ, তেল সলতে দেওয়া।

দুজনেই দুজনকে দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা।

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, মানুষ না ভূত, দিদি?

—ভূত, তোর ঘাড় মটকাবো।

তারপর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলে।

—শুনিস নি আমরা এসেছি?

—কারো কাছে না। কে বলবে? আমি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে এই আসছি—

—কোথায় চলেছিস রে এদিকে?

তোমাদের উত্তর দেউলে পিদিম দিচ্ছি আজ এই দেড় বছর। বলে গিয়েছিলে মনে নেই?

—সত্যি ভাই?

—না মিথ্যে!

—আর জন্মের বোন্ ছিলি তুই, এই বংশের মেয়ে ছিলি কোন্ জন্মে।

—এতদিন কোথায় ছিলে তোমরা দিদি ?

—কাশীতে। সব বলবো গল্প তোকে। চল—

—আজ পিদিম তুমি দেবে দিদি ?

—নিশ্চয়! ভিটেয় যখন এসেছি, তখন তোকে আর পিদিম দিতে হবে না। তবে আমার সঙ্গে চল—

বারো

কালোপায়রা দীঘির ওপারের ছাতিমবন নিবিড় হয়েছে, তার ছায়ায় ছায়ায় উত্তর দেউলের যাবার পথে বাদুরনখী গাছের জঙ্গল তেমনি ঘন, যেমন শরৎ চিরকাল দেখে এসেছে, তবে এখন গাছ শুকিয়ে যায় নি—সবে বেগুনে রঙের ফুল ধরেছে বড় বড় সবুজ পাতার আড়ালে। শরৎ আগে আগে প্রদীপ হাতে, রাজলক্ষ্মী পেছনে। কত পরিচিত পুরোনো পথ, সারা জীবনই যেন অতীব শান্ত ও নিরুপদ্রব আরামে এই বাদুড়নখী গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে সে, তার পিতৃগৃহের পুণ্য আবেষ্টনী তার জীবনের পাথেয় যুগিয়ে এসেছে—যে জীবনের না আছে রাত্রি, না আছে অরুণোদয়—শুধু এমনি চাপা গোধূলি, হৈচৈহীন কর্ম্ম-কোলাহলহীন !

প্রদীপ দিয়ে ওরা আবার ফিরল। পথের দুপাশে পুষ্পশ্রীর লীলায়িত চেতনা ওর আগমনে যেন আনন্দিত। কতকাল পরে রাজকন্যা বাড়ি ফিরেছে !

রাজলক্ষ্মী বলে, এঃ দিদি, এ ঘরে বসে রাঁধবে কি করে ? জল পড়ে মেজে যে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—পিঁড়ি পেতে নেবো এখন। তুই আমার বাপের ভিটের নিন্দে করিস নি বলে দিচ্ছি—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, সেই ছেলেমানুষি স্বভাব এখনও যায় নি শরৎদি—

—চা খাবি ?

—তা খাচ্ছি—এখন বলো এতকাল কোথায় ছিলে তোমরা !

—রাজারাজড়ার কাণ্ড, একটু হিল্লিদিল্লি বেড়িয়ে আসা গেল।

—সে তো বুঝতেই পারছি।

—আজ রাত্তিরে এখানে খাবি রাজলক্ষ্মী। কিন্তু কিছু নেই বলছি, শুধু ধুঁধুল ভাতে, ধুঁধুল ভাজা।

ভাঙা ঘরে এই দুই তরুণীতে বসে বহুকাল পরে আবার আসর জমালে—ওদিকে দুই বৃদ্ধ উঠোনে দুই কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি পেতে বসে অনেক রকম রাজা-উজীর বধের গল্প করছিলেন। জগন্নাথ চাটুজ্জে ইতিমধ্যে চলে গিয়েছেন।

ভাই, জ্যাঠামশায় আর বাবাকে চাটুকু দিয়ে আয় তো—

রাজলক্ষ্মী চা দিতে গেলে কেদার বললেন, আরে আমার মা-লক্ষ্মী যে ? আয় আয়—কতকাল পরে দেখলাম, ভাল ছিলি ?

গোপেশ্বর চাটুজ্জেও বললেন, হ্যাঁ এ খুকিকে তো দেখেছি বটে এখানে—কি নাম যেন তোমার মা ?

রাজলক্ষ্মী দুজনের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে রান্নাঘরে চলে গেল।

কেদার বললেন, দাদা, এবার এখানে কিছুদিন থেকে যাও। একসঙ্গে দিনকতক কাটানো যাক্—

—শরৎ-মা বলছিল—তীর্থভ্রমণে একবার চলুন, বেরুনো যাক রাজামশায়—

কেদার নিশ্চিন্ত আরামে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, আর কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না দাদা। বিদেশে বড় গোলমাল—শুনলে তো সবই। আমাদের এই জায়গাটাই ভালো—বাইরে নানারকম ভয়। কেন এখানে ওখানে বেরুনো—আমার হাতে এখনো যা টাকা আছে, এ বছরটা হেসে খেলে চলে যাবে। খাজনাপত্তর কেউ দেয় নি দুটি বছর—কাল থেকে আবার তাগাদা শুরু করি।

শরৎ নিজে তামাক সেজে আনতেই গোপেশ্বর চাটুজ্জে হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

—তুমি কেন মা—তুমি কেন? আমাকে বললেই তো হ'ত—এসব আমি পছন্দ করি নে, মেয়েদের দিয়ে তামাক সাজানো। রাজামশায়ের তামাক আমি সাজবো।

কেদার বললেন, তুমি আমার বয়সে অনেক বড়, দাদা। আর যে উপকার তুমি করেছ, তার ঋণ আমি বা আমার মেয়ে কেউ শুধ্‌তে পারবো না। আমার এ বাড়িতে যত দিন ইচ্ছে থাকো, তোমার বাড়ি তোমার ঘর-দোর। আমার মেয়ে তোমার আমার তামাক সাজবে এ আর বেশি কথা কি দাদা?

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, আচ্ছা রাজামশাই, ওই কালোপায়রা দীঘির ওপারের বন কেটে বেশ আলু হয়—কিছু বীজ এনে—

—না দাদা, ওসব আমাদের বংশে নেই। চাষকাজ করে চাষা লোকেরা। আমার দরকার হয় গড়ের জঙ্গল থেকে মেটে আলু তুলে আনবো। সোজা মেটে আলুটা হয় গড়ের জঙ্গলে? সে বছর উত্তর দেউলের গায়ের বন থেকে আলু তুলেছিলাম এক একটা আধমণ ত্রিশ সের। আলুর অভাব কি আমার?

হঠাৎ জগন্নাথ চাটুজ্জেকে পুনরায় আসতে দেখে উচ্চকণ্ঠে বললেন, ও শরৎ, জগন্নাথ খুড়ো আসছেন—আর একটু চা পাঠিয়ে—

জগন্নাথ চাটুজ্জে আসতে আসতে বললেন, তুমি বাড়ি এসেছ শুনে অনেকে দেখা করতে আসছে কেদার রাজা। আমি গিয়ে সাতকড়ির চণ্ডীমণ্ডপে খবরটা দিয়ে এলাম—সেই জন্যেই গিয়েছিলাম। ওঃ, একটু তেল আনতে বলো তো শরৎকে। বিছুটি যা লেগেছে গায়ে—বড্ড বিছুটির জঙ্গল বেড়েছে গড়ের খালের পথটাতে। ছিলে না অনেক দিন, চারিধারে বনজঙ্গল হয়ে—

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, কাল আমি সব কেটে সাফ্ করে দেবো—দেবেন তো দেখিয়ে জায়গাটা।

জগন্নাথ চাটুজ্জে এসেছেন এদের সব খবর সংগ্রহ করতে। একটু পরেই তিনি বড় বেশী আগ্রহ দেখাতে লাগলেন, একা এতদিন কোথায় ছিলেন, কি ভাবে কাটলো সে-সব খবর জানতে। জগন্নাথ বললেন, তুমি কি বরাবর হিংনাড়ায় ছিলে এই দেড় বছর—না আর কোথাও—

—না, আমি—গিয়ে হিংনাড়াতেই—

—কাদের আড়তে বললে—

—ঘোষেদের আড়তে। বিপিন ঘোষ বিনোদ ঘোষ দুই ভাই—ওদেরই—

—মাট্‌সের বিনোদ ঘোষ?

—মাট্‌সে তো ওদের বাড়ি নয়, শত্রুঘ্নপুর—

—সে আবার কোন্ দিকে? নাম তো শুনি নি—

—শত্রুঘ্নপুর বাজিতপুর—রামনগর থানা।

কেদার ক্রমশঃ অস্বস্তি বোধ করছিলেন জগন্নাথ চাটুজ্জের জেরায়। এত খুঁটিনাটি

জিজ্ঞেস করবার কি দরকার তিনি বুঝতে পারলেন না। জগন্নাথ চাটুজ্জে পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করে জীবন কাটিয়ে দিলেন কি না, তাই ভয় হয়।

গোপেশ্বরকে দেখিয়ে জগন্নাথ বললেন, ইনি সেই একবার তোমার এখানে এসেছিলেন না? চমৎকার হাত তবলার। একদিন শুনতে হবে আবার।

—হ্যাঁ।

—শরৎ বুঝি এঁর পরিবারের সঙ্গে তীর্থ করে এল?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ।

জগন্নাথ চাটুজ্জে হঠাৎ বললেন, ভাল কথা কেদার ভায়া, শুনেছ বোধ হয় প্রভাসের বাবা হারান বিশ্বেস মারা গিয়েছে আজ বছরখানেক হ'ল। প্রভাসদের কলকাতার বাড়িতে তোমরা তো প্রথম যাও—না?

কেদারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জগন্নাথ চাটুজ্জে কতটা জানে বা না জানে আন্দাজ করা শক্ত। কি ভেবে ও কি কথা বলছে, তাই বা কে জানে? হঠাৎ প্রভাসের কথা তোলার মানে কি?

তবুও সত্য কথার মার নেই ভেবে তিনি বললেন, প্রভাসদের বাড়িতে তো ছিলাম না আমরা; একটা বাগানবাড়িতে আমাদের থাকবার জায়গা করে দিয়েছিল।

—কতদিন সেখানে ছিলে তোমরা?

—বেশি দিন নয়—দিন পনেরো।

—তার পর কোথায় গেলে?

এইবার জবাব দিলেন গোপেশ্বর চাটুজ্জে। বললেন, তার পর একদিন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করলাম বাগানবাড়িতে গিয়ে তার পরদিন সকালে। আমার বাড়ির সকলে তীর্থ করতে বেরিয়েছিল—সেই সঙ্গে শরৎকে নিয়ে গেলাম। রাজামশাই দেশে চলে আসছেন, হিংনাড়ার বাজারে ঘোষেদের আড়তের একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে ওঁর চেনা ছিল—সে নিয়ে গিয়ে চাকরি জুটিয়ে দিলে। এই হ'ল মোট ব্যাপার। কেমন, এই তো রাজামশাই?

—হ্যাঁ, ওই বৈকি।

দুপুরবেলা। কেউ কোথাও নেই। গোপেশ্বর কালোপায়রার দীঘিতে মাছের চার করতে গিয়েছেন, আহারাদির পর কেদারকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবেন।

শরৎ বাবাকে একা পেয়ে বললে, আচ্ছা বাবা, আমার খোঁজ করলে না কেন?

কেদার এ কথার কি উত্তর দেবেন? এ সব ব্যাপারকে তিনি এড়িয়ে চলতে চান—জীবনের সব চেয়ে বড় ধাক্কাকে তিনি ভুলে যেতে চেষ্টা করে আসছেন—তাঁর সব চেয়ে ভয় মেয়ে পাছে আবার ঐসব কথা তোলে।

আমতা আমতা করে বললেন, তা—খোঁজ করি কোথায়? আমার—

—তোমাকে ওরা বলেছিল আমি ইচ্ছে করেই তোমার সঙ্গে দেখা করি নি—না? বলো বাবা, তা যদি বিশ্বাস করে থাকো আমি তোমার সামনেই দীঘির জলে ডুবে মরবো।

এবার কেদার যেন একটু বিচলিত হলেন, তাঁর অনড় আত্মস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ এইবার একটু ধাক্কা খেলে। মেয়ের মুখের দিয়ে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, তাই তুই বিশ্বাস করিস্ যে আমি ওসব ভাবতে পারি? দে—একটু তেল দে মাখবার—দেখি আবার গোপেশ্বর ভায়া মাছের চারের কতদূর কি করলে। তোর রান্না হ'ল?

—বেশ বাবা, কি নিশ্চিন্দিই থাকতে পারো তুমি, তাই শুধু আমি ভাবি। ঘরে আগুন লাগলেও বোধ হয় তোমার সাড়া জাগে না—মানুষে যে কি ক'রে তোমার মত—আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি—উত্তর দেবে ?

কেদার বিষণ্ণ মুখে বললেন, কি ?

—প্রভাসের নামে তোমাকে কেউ কিছু বলেছিল তো ? সেই মুখপোড়া গিন্নীনই বলে থাকবে। তুমি পুলিসে খবর দিলে না কেন ?

—তারাই বললে পুলিসে খবর দেবে তোর নামে। তাতেই তো আমি পালিয়ে এলাম।

পুলিসের কাছে নালিশে কে আসামী কে ফরিয়াদী হয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নেই শরতের—ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপার। সে চুপ করে রইল।

কেদার বললেন, কষ্ট পেয়েছিস্ না মা ?

—যাও, তোমাকে আর—

—না মা ছিঃ, রাগ করতে নেই। কি রাঁধছিস ? বেগুন এনে দেবো এখন ওবেলা। গেঁয়োহাটি যাবো তাগাদা করতে, ব্যাটারা আজ দু-বছর খাজনার নামটি করে নি।

—করবে কি ? তুমি ছিলে এ চুলোয় ? মেয়েকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও ভেসে পড়েছিলে। কি নির্বিকার পুরুষমানুষ তুমি তাই শুধু ভাবি বাবা।

শরতের এ মেজাজকে কেদারের চিনতে বাকি নেই। এ সময় ওর সামনে থাকতে যাওয়া মানে বিপদ টেনে আনা। কেদার তেল মেখে সরে পড়লেন। বাবাকে যতক্ষণ দেখা গেল শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে, তারপর তিনি কালোপায়রা দীঘির পাড়ের বন-ধুঁধুলের লতাজালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে শরৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তার বাবা, তাদের বনজঙ্গলে ঘেরা এত বড় গড়বাড়ি, কত পুরানো ভাঙা মন্দির, উত্তর দেউল, বারাহী দেবীর ভগ্ন পাষাণমূর্ত্তি, ওই ছায়ানিবিড় ছাতিমবন—এসব ফেলে তাকে কোথায় চলে যেতে হয়েছিল ভাগ্যের বিপাকে ! আর যদি সে না ফিরতো, আর যদি বাবাকে না দেখতো, গড়বাড়ির মাটির পুণ্যস্পর্শলাভের সৌভাগ্য যদি আর না ঘটতো তার ?

কার পায়ের শব্দে সে মুখ তুলে দেখলে রাজলক্ষ্মী একটা বাটি হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠছে। এই আর একটি মানুষ—যাকে দেখে শরৎ এত আনন্দ পায় ! দেড় বছরের মধ্যে কত জায়গা সে বেড়াল, কত নতুন নতুন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল—কিন্তু এমন কি একটা দিনও গিয়েছে যেদিন সে এই গরীব ঘরের মেয়েটার কথা ভাবে নি ?

—কি রে ওতে ?

—তোমাদের জন্যে একটু সুক্তুনি—মা বললেন জ্যাঠামশায়কে দিয়ে আয়—

—খাওয়া হয়েছে ?

—পাগল ! এখুনি খাওয়া হবে ? তোমাদের এখান থেকে গিয়ে নাইবো—তার পর—

—আর বাড়ি যায় না, এখানেই খা—

—না না শরৎদি—

—খেতেই হবে। আচ্ছা, কেন অমন করিস্ বল্ তো ? কতকাল দুই বোনে বসে একসঙ্গে খাই নি তা তোর মনে পড়ে ? মোটে কাল আর আজ যদি হয়—সত্যি ভাই, বিশ্বাস এখনও যেন হচ্ছে না যে, আমি আবার গড়শিবপুরের ভিটেতে বসে আছি। একযুগ পরে আবার এ মাটিতে—

রাজলক্ষ্মীকে শরৎ এখনও সব কথা খুলে বলে নি। রাজলক্ষ্মীও ওকে খুঁটিনাটি কিছুই জিজ্ঞেস করে নি প্রথম আনন্দের উত্তেজনায়। শরৎ মনে মনে ঠিক করে রেখেছে রাজলক্ষ্মীকে সে অবসর সময়ে সব খুলে বলবে। বন্ধুত্বের মধ্যে দেওয়াল তুলে রাখা তার পছন্দ হয় না।

শরৎ বললে, এই দেড় বছরে গাঁয়ের খবর বল্—কিছুই তো জানি নে।

—চিন্তে বুড়ী মরে গিয়েছে জানো?

—আহা, তাই নাকি? কবে মোলো?

—ফাল্গুন মাসে। গুরুপদ জেলের সেই হাবা ছেলেটা মরে গিয়েছে আষাঢ় মাসে। ম্যালেরিয়া জ্বরে।

—আহা!

—পাঁচী গয়লানীর বাড়ি চোর ঢুকে সব বাসন নিয়ে গিয়েছিল। থানার দারোগা এল, এর নাম লিখলে, ওর নাম লিখলে—কিছুই হ'ল না শেষটা।

—ভাল কথা, ওপাড়ার সেজখুড়ীমার ছেলেপিলে হবে দেখে গিয়েছিলাম—

—একটা ছেলে হয়েছে—বেশ ছেলেটি। দেখতে যাবে কাল?

—বেশ তো চল না। সাতকড়ি চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে?

—কেন হবে না? হাতে পয়সা আছে—মেয়ের বিয়ে বাকি থাকে?

শরৎ হেসে বললে, কেন রে, তোর বুঝি বড় দুঃখু—বিয়ে না হওয়ায়?

—কার না হয় শরৎদি, যদি সত্যি কথা বলা যায়। যেমনি মা হিম হয়ে বসে আছে, তেমনি মেজখুড়ীমা হিম হয়ে বসে আছে—আমার এদিকে আঠারো পেরুলো, লোকের কাছে বলে বেড়ান পনেরোতে নাকি পা দিইছি। এমন রাগ ধরে!

শরৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—ওমা, তুই হাসালি রাজলক্ষ্মী! আজকালকার মেয়ে সব হ'ল কি? সত্যি রে তোর মনে কষ্ট হয়?

—ঐ যে বললাম দিদি, সত্যি কথা বললে হাসবে সবাই। তুমি বললে, তাই বললাম।

—আমি দেখবো রে তোর সম্বন্ধ?

—না, হাসি না শরৎদি। এতদিন তুমি ছিলে না—আমার মন পাগল-পাগল হয়ে উঠত। এই গাঁয়ে একঘেয়ে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায় না তুমিই বলো? তার চেয়ে মনে হয়—যা হয় একটা দেখে-শুনে দে, একঘেয়েমির হাত থেকে নিস্তার পাই। জন্মালাম গড়শিবপুর, তো রয়েই গেলাম সেই গড়শিবপুরে। এই যে তুমি কত দেশ বেড়িয়ে এলে শরৎদি, কেন বেড়িয়ে এলে? নতুন জিনিস দেখবার জন্যে তো?

শরৎ গম্ভীর সুরে বললে, আমার কপাল দেখে হিংসে করিস্ নে ভাই। তোকে সব খুলে বলবো সময় পেলে।

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন শরৎদি?

—সে কথা এখন না ভাই—বাবা আসছেন, সরে আয়—

কেদার গামছায় মাথা মুছতে মুছতে বললেন, কে ও? রাজলক্ষ্মী? বেশ মা বেশ। হ্যাঁ ভাল কথা শরৎ—মনে পড়ল নাইতে নাইতে—তোর মায়ের সেই কড়িগুলো কোথায় আছে মা?

শরৎ হেসে বললে, কোনো ভয় নেই বাবা। লক্ষ্মীর হাঁড়িতেই আছে। প্রথম দিন এসেই আমি আগে দেখে নিয়েছি। ঠিক আছে।

—ও, তা বেশ। আর—ইয়ে—তোর মার সেই ভাঙা চিরুনিখানা?

—সেই গোল তোরঙ্গের মধ্যে রেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই আছে। সেও দেখে নিয়েছি সেদিন।

—ইয়ে, ডাকি তবে গোপেশ্বর দাদাকে? রান্না হয়েছে তো?

কেদার আবার গেলেন পুকুরপাড়ে গোপেশ্বর চাটুজ্জেকে ডাকতে। শরৎ মৃদু হেসে

রাজলক্ষ্মীকে বললে, দুটি নিষ্কর্ম্মা আর নিশ্চিন্দ লোক এক জায়গায় জুটেছে, জ্যাঠামশায় আর বাবা—দুই-ই সমান। দুটিতে জুড়ি মিলেছে ভালো।

কেদার বলতে বলতে আসছিলেন, বেহালা বাজাই নি আজ দেড় বছর দাদা। তারগুলো সব ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ ওবেলা ছিবাসের ওখানে আসর করা যাক্ গিয়ে। তোমার তবলাও অনেক দিন শোনা হয় নি।

তেরো

দিন দশ-পনেরো কেটে গেল।

এ দিনগুলো কেদার ও গোপেশ্বরের কাটলো খুব ভালই। ছিবাস মুদির দোকানে প্রায়ই সন্ধ্যার পর ছেঁড়া মাদুর আর চট পেতে আসর জমে, কেদার এসেছেন শুনে তাঁর পুরানো কৃষ্ণযাত্রা দলের দোহার, জুড়ি, একানে গায়কেরা কেউ জাল রেখে, কেউ লাঙল ফেলে ছুটে আসে।

—রাজামশাই? ভাল ছেলেন তো? এট্টু পায়ের ধুলো দ্যান—

—বাবাঠাকুর, এ্যাদ্দিন ছেলেন কনে? মোদের দল যে একেবারে কানা পড়ে গেল আপনার জন্যি!

গেঁয়োহাটি কাপালী পাড়ার মধু কাপালী, নেত্য কাপালী এসে পীড়াপীড়ি—গেঁয়োহাটিতে একবার না গেলে চলবে না। সবাই রাজামশাইকে একবার দেখতে চায়। এদের ওপর কেদারের যথেষ্ট আধিপত্য, অন্য সময় যে কেদার নিতান্ত নিরীহ—এদের দলের দলপতি হিসাবে তিনি রীতিমত কড়া ও উগ্র মেজাজের শাসক।

মধুকে ডেকে বললেন, তোর যে সেই ভাইপো দোয়ার দিতো সে কোথায়?

—আজ্ঞে সে পাট কাটছে মাঠে—

কেদার মুখ খিঁচিয়ে বলেন, পাট তো কাটছে বুঝতে পারছি, চাষার ছেলে পাট কাটবে না তো কি বড় গাইয়ে হবে? কাল একবার ছিবাসের এখানে পাঠিয়ে দিও তো? বুঝলে?

—যে আজ্ঞে রাজামশাই—

—আর শশীকে খবর দিও, দু-বছরের খাজনা বাকী। খাজনা দিতে হবে না? নিষ্কর জমি ভোগ করতে লাগল যে একেবারে—

নেত্য কাপালী এগিয়ে এসে বললে, বাবাঠাকুর, আপনি যদি বাড়ি থাকতেন, তবে সবই হত। তারা খাজনা নিয়ে এসে ফিরে গিয়েল—

কেদার ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর্—তোকে ফোপর-দালালি করতে বলেছে কে?

কেদারের নামে বহু লোক জড়ো হয় ছিবাসের দোকানে—কেদারের বেহালার সঙ্গে মিশেছে ওস্তাদ গোপেশ্বরের তবলা। পাড়াগাঁয়ে নিঃসঙ্গ দিনে রাত্রে সময় কাটাবার এতটুকু সূত্রও যারা নিতান্ত আগ্রহে আঁকড়ে ধরে—তাদের কাছে এ ধরনের গুণী-সম্মেলনের মূল্য অনেক বেশী। দু-তিনখানা গ্রাম থেকে লোকে লণ্ঠন হাতে লাঠি হাতে জুতো বগলে করে এসে জোটে। সেই পুরোনো দিনের মত অনেক রাত্রে দুজনেই অপরাধীর মত বাড়ি ফেরেন।

শরৎ বলে, এলে? ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে—

গোপেশ্বর আমতা আমতা করে বলেন—আমি গিয়ে বললাম মা রাজামশায়কে—যে শরৎ বসে থাকবে হাঁড়ি নিয়ে—তা হয়েছে কি, উনি সত্যিকার গুণী লোক, ছড়ে ঘা পড়লে আর স্থির থাকতে পারেন না। জ্ঞান থাকে না মা—

কেদার গোপেশ্বরের পেছনে দাঁড়িয়ে মনে মনে কৈফিয়ৎ তৈরী করেন।

শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আপনি জানেন না জ্যাঠামশায়, বাবার চিরকাল একরকম গেল আর যাবেও। আজ বলে না, কোন কালে ও'র ছিল জ্ঞান, ও'কেই জিজ্ঞেস করুন না?

গোপেশ্বর মিটমাটের সুরে বলেন, না না, কাল থেকে রাজামশাই আর দেরি করা হবে না। শরতের বড্ড কষ্ট হয়, কাল থেকে আমি সকাল সকাল নিয়ে আসবো মা, রাত করতে দেবো না—

এই দুই বৃদ্ধের ওপর শাসনদণ্ড পরিচালনা ক'রে শরৎ মনে মনে খুব আমোদ পায় এবং এ'দের সংকোচজড়িত কৈফিয়তের সুরে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করে—কিন্তু কোনো তর্জ্জন-গর্জ্জনেই বিশেষ ফল হয় না, প্রতি রাত্রেই যা তাই—সেই রাত একটা। নির্জ্জন গড়বাড়ির জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকার গভীর আওয়াজের সঙ্গে মিশে শরতের শাসনবাক্য বৃথাই প্রতি রাত্রে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

শরৎ বলে—আজ কিছু নেই বাবা, কি দিয়ে ভাত দেবো তোমাদের পাতে? হাট না, বাজার না, একটা তরকারি নেই ঘরে, আমি মেয়েমানুষ যাবো তরকারি যোগাড় করতে? ওল তুলেছিলাম কালোপায়রার পাড় থেকে একগলা জঙ্গলের মধ্যে—তাই ভাতে আর ভাত খাও—এত রাত্তিরে কি করবো আমি?

কেদার সংকুচিত ভাবে বললেন, ওতেই হবে—ওতেই হবে—

—তুমি না হয় বললে ওতেই হবে। জ্যাঠামশায় বাড়িতে রয়েছেন, ও'র পাতে শুধু ওল ভাতে দিয়ে কি করে—

গোপেশ্বর তাড়াতাড়ি বলেন, যথেষ্ট মা যথেষ্ট। তুমি দাও দিকি। ভেসে যাবে—কাঁচালঙ্কা দিয়ে ওল ভাতে মেখে এক পাথর ভাত খাওয়া যায় মা—

—তবে খান। আমার আপত্তি কি?

—কাল গেঁয়োহাটির হাট থেকে আমি ঝিঙে পটল আনবো দুটো—মনে করে দিও তো?

শরতের কি আমোদই লাগে! কতদিন পরে আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি চলছে—আবার যে প্রতি নিশীথে গড়বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে তাদের ভাঙা বাড়িতে সে একা শুয়ে থাকবে। বাবা এসে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলবেন—ও মা শরৎ দোর খুলে দাও মা,—এসব কখনো হবে বলে তার বিশ্বাস ছিল?

সেই সব পুরানো দিন আবার ঠিক সেই ভাবেই ফিরে এসেছে···

—জ্যাঠামশায়ের জন্যে একটু দুধ রেখেছি—ভাত ক'টা ফেলবেন না জ্যাঠামশায়—

গোপেশ্বর ব্যস্তভাবে বললেন, কেন, আমি কেন—রাজামশায়ের দুধ কই?

—বাবার হবে না। দু-হাতা দুধ মোটে—

—না না সে কি হয় মা? রাজামশায়ের দুধ ও থেকেই—

কেদার ধীরভাবে বললেন, আমার দুধের দরকার নেই। আমরা রাজা-রাজড়া লোক, খাই তো আড়াইসের মেরে একসের করে খাবো। ও দু-এক হাতা দুধে আমাদের—

কথা শেষ না করেই হা হা করে প্রাণখোলা উচ্চ হাসির রবে কেদার রান্নাঘর ফাটিয়ে তুললেন।

এইরকম রাত্রে একদিন গোপেশ্বর ভয় পেলেন কালোপায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে। বেশী রাত্রে তিনি কি জন্যে দীঘির পাড়ের দিকে গিয়েছিলেন—সেদিন আকাশে একটু মেঘ ছিল, ঘুম ভেঙে তিনি রাত কত তা ঠিক আন্দাজ করতে পারলেন না। দীঘির জঙ্গলের দিকে একাই গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোথায় যেন পদক্ষেপের শব্দ তাঁর কানে গেল—গুরুগম্ভীর পদক্ষেপের শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ শুনে গোপেশ্বরের মনে হ'ল তাঁরই কাছাকাছি গভীর বনঝোপের মধ্যে কে যেন সাবধানের সঙ্গে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেছে—

তাঁর দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে নাকি? চোর-টোর হবে কি তা হলে? না কোনো ছাড়া গরু বা ষাঁড়—

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হ'ল এ পায়ের শব্দ মানুষের নয়—গরু বা ষাঁড়েরও নয়। পদশব্দের সঙ্গে কোনো কঠিন জিনিসের যোগ আছে—খুব ভারি ও কঠিন কোনো জিনিস।

এক-একবার শব্দটা থেমে যায়—হয়তো এক মিনিট···তার পরেই আবার···

হঠাৎ গোপেশ্বরের মনে হ'ল শব্দটা যেন—তাঁকেই লক্ষ্য করে হোক বা নাই হোক—মোটের ওপর খুব কাছে এসে গিয়েছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকতেই পাশের বিছানা থেকে কেদার জেগে উঠে বললেন, কি, কি—অমন করছ কেন দাদা?

—ইয়ে, একবার বাইরে গিয়েছিলাম—কিসের শব্দ—তাই ছুটে চলে এলাম—কেমন যেন গা ছম্ ছম্—

—শব্দ? ও শেয়াল-টেয়াল হবে—

—না দাদা, মানুষের পায়ের শব্দের মত, ভারি পায়ের শব্দ—যেন ইঁট পড়ার মত—

কেদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হুঁ। আজ কি তিথি?

—তা কি জানি, তিথি-টিথির কোন খোঁজ রাখি নে তো—

—হুঁ। নাও শুয়ে পড় দাদা···একটা কথা বলি। অমন একা রাত্তির বেলা যেখানে-সেখানে যেও না—দরকার হয় ডাক দিও!

রাজলক্ষ্মী দুপুরবেলা হাসিমুখে একখানা চিঠি হাতে করে এসে বললে, ও শরৎদি, তোমার নামে কে চিঠি দিয়েছে দ্যাখো—

শরৎ সবিস্ময়ে বললে, আমার নামে! কে আনলে?

—দাদার সঙ্গে পিওনের দেখা হয়েছিল বাজারে—তাই দিয়েছে—

—দেখি দে—

—কোথাকার ভাবের মানুষ চিঠি দিয়েছে দ্যাখো খুলে—

বলে রাজলক্ষ্মী দুষ্টুমির হাসি হাসলে।

শরৎ ভ্রূকুটি করে বললে, মারবো খ্যাংরা মুখে যদি ওরকম বলবি—তোর ভাবের মানুষেরা তোকে চিঠি দিক্ গিয়ে—জন্মজন্ম দিক্ গিয়ে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শরৎদি, তাই বলো—তাই যেন হয়।

—ওমা, অবাক করলি যে রে রাজি? সত্যি তাই তোর ইচ্ছে নাকি?

—যদি বলি তাই?

—ও মা আমার কি হবে!

—অমন বোলো না শরৎদি। তুমি এক ধরণের মানুষ তোমার কথা বাদ দিই—কিন্তু মেয়েমানুষ তো, ভেবে দ্যাখো। আমার বয়েস কত হয়েছে হিসেব রাখো?

শরৎ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না যেদিন ফুল ফুটবে বুঝলি রাজি? কাকাবাবুর হাতে পয়সা থাকলে কি আর এতদিন—ফুল যেদিন ফুটবে—

—ফুল ফুটবে ছাতিমতলার শ্মশান-সই হলে—নাও, তুমিও যেমন! খোলো চিঠিখানা দেখি—

শরৎ চিঠি খুলে পড়ে বললে, কাশী থেকে রেণুকা চিঠি দিয়েছে—বাঃ—

—সে কে শরৎদি?

—সে একটা অন্ধ মেয়ে। বিয়ে হয়েছে অবিশ্যি। গরীব গেরস্ত, এ চিঠি তার বরের হাতে লেখা, সে তো আর লিখতে—

—কাশীতে থাকে? কি করে ওর বর?

—চাকরি করে কোথায় যেন—

—দেখতে কেমন?

—কে দেখতে কেমন? মেয়েটা না তার বর?

—দুই-ই

—রেণুকা দেখতে মন্দ নয়, বর তার চেয়েও ভাল—ছোকরা বয়েস, লোক ভালই ওরা। দ্যাখ না চিঠি পড়ে।

—অন্ধ মেয়েরও বিয়ে আটকে থাকে না, যদি কপাল ভাল হয়—

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোর আর বকামি করতে হবে না—পড় চিঠি—

রেণুকা অনেক দুঃখ করে চিঠি লিখেছে। শরৎ চলে গিয়ে পর্য্যন্ত সে একা পড়েচে, আর কে তার ওপর দয়া করবে, কে তার হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাবে? ওঁর মোটে সময় হয় না। তার মন আকুল হয়েচে শরৎকে দেখবার জন্য, রাজকন্যা কবে এসে কাশীতে 'কেদার ছত্র' খুলছে? এলে যে রেণুকা বাঁচে—ইত্যাদি।

চিঠি পড়ে শরৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অসহায়া অভাগী রেণুকা! ছোট বোনটির মত কত যত্নে শরৎ তাকে নিয়ে বেড়াতো—কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট, জলে ভাসমান নৌকো ও বজরার ভিড়, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সান্ধ্য আরতির ঘণ্টা ও নানা বাদ্যধ্বনি।···রেণুকার করুণ মুখখানি। এখানে বসে সব স্বপ্নের মত মনে হয়। খোকা—খোকনমণি! রেণুকা খোকনের কথা কিছু লেখে নি কেন? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল রেণুকাকে কে বকসীদের বাড়ি নিয়ে যাবে হাত ধরে অত দূরে? তাই লিখতে পারে নি।

রাজলক্ষ্মী কৌতূহলের সঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগল কাশী ও সেখানকার মানুষ-জন সম্বন্ধে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে। শরৎ বিরাট অন্নসত্রগুলোর গল্প করল, রাজরাজেশ্বরী, আমবেড়ে, কুচবিহারের কালীবাড়ি।

হেসে বললে, জানিস্ এক বুড়ী তৈলঙ্গিদের ছত্তরকে বলতো তুণ্ডুমুণ্ডুদের ছত্তর!

—তৈলঙ্গি কারা?

—সে আমিও জানি নে—তবে তাদের দেখেছি বটে।

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বাইরের জগৎ মস্ত একটা স্বপ্ন। জীবনে কিছুই দেখা হ'ল না, একেবারে বৃথা গেল জীবনটা। শরৎদির ওপর হিংসে না হয়ে পারে?

চৌদ্দ

কেদার ও গোপেশ্বর দুজনে মিলে খেটে বাড়ির উঠানটা অনেকটা পরিষ্কার করে তুলেছেন, কেদার তত নন, বলতে গেলে গোপেশ্বরই খেটেছেন বেশী। শরৎকাল পড়েছে, পূজার দেরি নেই, গোপেশ্বর একদিন উঠানের এক ধার খুঁড়ে কতকগুলো কচুর চারা পুঁতছেন, কেদার মহাব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, দাদা, এসো—ওসব ফেলে রাখো—

—কি রাজামশায়?

—আরে একটা নতুন রাগিণীর সন্ধান পেয়েছি একজনের কাছে। মুখুজ্জে-বাড়িতে জামাই এসেছে—ভাল গায়ক। দেওগান্ধার ওর কাছে আদায় করতে হবে। থাকবে এখন কিছুদিন এখানে, চলো দুজনে যাই—

—দেবে কি রাজামশাই ? ওসব লোক বড় কষ্ট দেয়। আমি কাশীতে এক ওস্তাদের কাছে বড় আশা করে যাই। একখানা ভীমপলশ্রীর আস্তাই দিলে অতি কষ্টে তো মাসাবধি অন্তরা আর দেয় না। কত খোশামোদ, কেবল বলে, অন্তরা এক মিনিটে নাকি হয়ে যাবে। হায়রান হয়ে গেলাম হাঁটাহাঁটি করে।

—পেলে ?

—কোথায় পেলাম ? আদায় করা গেল না শেষ পর্যন্ত। সেই থেকে নাকে-কানে খৎ—ওস্তাদের কাছে আর যাবো না।

—যা হোক চলো দাদা। এ আমাদের গাঁয়ের জামাই—ওকে নিয়ে একদিন মজলিশ করা যাক্—অনেক দিন থেকে দেওগান্ধারের খোঁজ করছি। ধরা যাক্ চলো—ওখানে কি হচ্ছে ?

—মানকচুর চারা লাগিয়ে রাখলাম গোটাকতক। সামনের বছরে এক একটা কচু হবে দেখবেন কত বড় বড়। আপনার ভিটের এ জমিতে একটা মানকচু—

—জানি দাদা। ও এখন রাখো, হবে পরে। ও শরৎ—

শরৎ রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে বললে, কি বাবা ?

—আমাদের দুজনকে একটু তেল দ্যাও মা। রান্নার কতদূর ?

—ওলের ডালনা চড়েছে—নামিয়ে ভাত চড়াবো। তা হলেই হয়ে গেল—

—হ্যাঁ মা, রাজলক্ষ্মী এসেছে ?

—না আজ আসে নি এখনো। কেন ?

—না বলছিলাম, মুখুজ্জে-বাড়ি জামাই এসেছে, ভদ্রেশ্বর বাড়ি, কেমন লোক তাই তাকে জিজ্ঞেস করতাম।

—সে খোঁজে তোমার কি দরকার ? সে ভাল হোক মন্দ হোক—

—তুই তা বুঝবি নে, বুঝবি নে। অন্য কাজ আছে তার কাছে। যদি এর মধ্যে রাজলক্ষ্মী আসে—

—মুখুজ্জে-বাড়ির কোন্ জামাই বাবা ? আশাদিদির বর ? আশাদিদির শ্বশুরবাড়ি তো ভদ্রেশ্বর—

—তাই হবে।

—সে তো বুড়ো মানুষ। আশাদিদিকে বিয়ে করেছে দোজপক্ষে—

—তোর সে-সব কথায় দরকার কি বাপু ? বুড়ো হয়, আরও ভালো।

—বলো না, কেন বাবা—

—নাঃ, সে শুনে কি করবি ?

—না আমি শুনবো—

—শুনবি ? রাগিণী ভূপালী, বাদী গান্ধার, বিবাদী মধ্যম আর নিখাদ—সম্বাদী ধৈবত—আরও শুনবি ? রাগিণী আশাবরী—বাদী—

—থাক্ আর শুনে দরকার নেই—নেয়ে এসে ভাত খেয়ে আমায় খোলসা করে দিয়ে যত ইচ্ছে রাগিণী শেখো—

বেলা পড়ে গেল। ঘরের তালকাঠের আড়াতে কলাবাদুড় ঝুলছে যেমন শরৎ আবাল্য দেখে এসেছে। কেদার ও গোপেশ্বর আহারাদি সেরে অন্তর্হিত হয়েছেন, মধ্যরাত্রে যদি ফেরেন তবে শরতের সৌভাগ্য। রাজলক্ষ্মীর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকে সে। তবুও দুজনে গল্প করে সময় কাটে। রোজ রোজ বাবার এই কাণ্ড। ভালও লাগে!

এমন সময় কে বাইরে থেকে ডাকল—ও শরৎ, শরৎ—

শরৎ বাড়ির দাওয়ায় উঁকি মেরে দেখে বললে—কে ? ও বটুক-দা, ভাল আছেন ? আসুন।

বটুককে শরৎ কোনো কালেই ভাল চোখে দেখতো না। সেই বটুক, যে এক সময় শরতের প্রতি অনেক অসম্মানজনক ব্যবহার করেছিল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে যে বটুকের সম্বন্ধে সে যুগে কলকাতায় যাবার পূর্বে শরৎ আলোচনা করেছিল একবার।

বটুক একটু ইতস্ততঃ করে বললে, শুনলাম তোমরা এসেছ—কাকা এসেছেন, তাই একবার দেখা করতে—

শরৎ আগেকার মত নেই—জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অনেক সাহসী ও সহিষ্ণু করে দিয়েছে। আগেকার দিন হলে শরৎ বটুকের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথাও বলতো না এ নিশ্চয়ই। আজ শরৎ দাওয়ায় একখানা পিঁড়ি পেতে বটুককে বসতে বললে।

বটুক একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, শরতের কাছ থেকে এ আদর সে আশা করে নি এখানে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে অবশেষে বসলো। শরৎ তাকে চা করে খাওয়ালে। বললে, দুটি মুড়ি খাবে বটুকদা ? আর তো কিছু নেই ঘরে। তুমি এলে এতদিন পরে—

—থাক্, থাক্, সে জন্যে কিছু নয় ! আমি দেখতে এলাম, বলি দেখা হয় নি কত দিন। আচ্ছা শুনলাম নাকি কত দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে এলে ?

—তা বেড়ালাম বৈকি। রাজগীর, কাশী।

—কাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি ?

—জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম—ঐ যিনি আমাদের এখানে আছেন—

—তা বেশ, বেশ।

এই সময় দূরে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে বটুক তাড়াতাড়ি উঠে বিদায় নিলে। শরৎ বললে—আর একদিন এসো, বাবার সঙ্গে তো দেখা হ'ল না। বাবা থাকতে এসো একদিন—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে বললে—ও এখানে কি জন্যে এসেছিল ! বটুকদা তো লোক ভাল না—

—কি মতলব নিয়ে এসেছিল কি করে বলব বল্ ? এলো—বসতে দিলাম, চা করে দিলাম—

—না না শরৎদি, জানো তো—ওসব লোকের সঙ্গে কোনো মেলামেশা না করাই ভালো। তুমি তো জানো না ওর কাণ্ড। তোমরা চলে যাওয়ার পর ও গাঁয়ে যে-সব কাণ্ড করেছে, সে শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। অতি বদ লোক। কি মতলব নিয়ে এসেছিল কে জানে !

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার বাড়ি এলো, আমি কি বলে না বসাই ? তা তো হয় না। আমায় আমার কাজ করতেই হবে।

—সেই যে প্রভাস কামার তোমাদের মোটরে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল, সে লোকটাও ভাল না, পরে শুনলাম। বটুকদা প্রভাসের খুব বন্ধু ছিল আগে—তবে এখন অনেক দিন আর তাকে এ গাঁয়ে দেখি নি। তোমরা চলে গেলে একবার এসেছিল যেন।

শরতের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লে একথা চাপা দিয়ে। বললে—চল্। দীঘির পাড় থেকে গোটাকতক ধুঁধুল পেড়ে আনি—কিছু তরকারি নেই, বাবাকে বলা না বলা দুই সমান—

রাজলক্ষ্মী বললে, আর কোথাও যেও না শরৎদি, দুটি বোনে এই গাঁয়ে কাটিয়ে দিই জীবনটা। আমারও যা হবে, সে বেশ দেখতেই পাচ্ছি। তুমি থাকলে বেশ লাগে।

—খারাপ কি বল্ না ? আমি কত জায়গায় গেলাম, কিন্তু তোকে ছেড়ে—কালো-পায়রার দীঘি ছেড়ে—

—যা বলেছ শরৎদি। তুমি এসেছ আমি আর কোথাও যেতে চাই নে, স্বর্গেও না।

দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করি—

—আর চাল-ছোলা ভাজা খাই—না রে? ভাজি দুটো চাল-ছোলা?

—না না শরৎদি। ঐ তোমার পাগলামি—

—পাগলামি নিয়েই জীবন। আয় আমার সঙ্গে রান্নাঘরে, তার পর আবার দুজনে এসে বসবো।

রাজলক্ষ্মী আজকাল সর্ব্বদা শরতের সঙ্গে থাকতে ভালবাসে। সন্ধ্যার আগে একাই বাড়ি চলে যায়, শরৎ দিদির মুখে বাইরের জগতের কথা শুনতে ওর বড় আগ্রহ, যে একঘেয়ে জীবন আবাল্য সে কাটাচ্ছে গড়শিবপুরে, যার জন্যে তার মনে হয় এ একঘেয়েমির চেয়ে যে কোনো জীবন বাঞ্ছনীয়, যে কোনো ধরনের—শরৎ দিদি আজ কিছু দিন হ'ল বিদেশ থেকে ফিরে সেই একঘেয়ে আবেষ্টনীর মধ্যে যেন আগ্রহ ও নতুনত্বের সঞ্চার করেছে। তা ছাড়া জীবনে শরৎ দিদিই তার একমাত্র ভালবাসার লোক, ও দূরে চলে যাওয়াতে রাজলক্ষ্মীর জীবন শূন্য হয়ে পড়েছিল, এখন আবার গড়বাড়িতে এসে, ওর সঙ্গে বসে গল্প করে, ওর সামান্য কাজকর্ম্মে সাহায্য করে রাজলক্ষ্মীর অবসর-ক্ষণ ভরে ওঠে।

শরৎ বললে, রেণুকার চিঠির জবাব দিলাম অনেক দিন, উত্তর তো এল না?

—আসবে। অত ব্যস্ত কেন? দিন দশেক হ'ল মোটে জবাব গিয়েছে। ঠিকানা লেখা ঠিক হয়েছিল তো?

—ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশায়। উনি কি আর ভুল করবেন? আমার বড় মন কেমন করে খোকনমণির জন্যে। সে যদি চিঠি লিখতে পারতো আমায় নিজের হাতে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, একেই বলে মায়া। কোথাকার কে তার ঠিক নেই—

শরৎ ব্যথা-কাতর কণ্ঠে বললে, অমন বলিস্ নে রাজি। তুই জানিস নে, সে আমার কি। কেন তাকে ভুলতে পারি নে তাই ভাবি। কখনো অমন হয় নি আমার, কাশীতে থাকবার শেষ একটা মাস যা হয়েছিল। খোকাকে না দেখলে পাগলের মত হয়ে যেতাম, বুঝলি? কষ্টও যা গিয়েছে! আচ্ছা বল তো, সত্যিই সে আমার কে? অথচ মনে হ'ত কত জন্মের আপনার লোক সে, তার মুখ দিনান্তে একবার না দেখলে—ভালই হয়েছে রাজি, সেখানে বেশিদিন থাকলে মায়ায় বড্ড জড়িয়ে পড়তাম। আর তেমনি ছিল মিনুর মা!

—সে কে শরৎদি?

—যাদের বাড়ি ছিলাম, সে বাড়ির গিন্নী। বলবো তোকে সব কথা একদিন। এখন না—

—কাশীর কথা শুনতে বড্ড ভাল লাগে তোমার মুখে—কখনো কিছু দেখি নি—যেন মনে হয় এখানে বসে দেখছি সব—আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, না শরৎদি?

—তা হেমন্তকাল এসে পড়েছে, একটু শীত পড়বার কথা। একটা নারকেল কুরুতে হবে —দা-খানা খুঁজে দ্যাখ ততক্ষণ—আমি ছোলাগুলো ততক্ষণ ভেজে ফেলি—

—কেন অত হাঙ্গামা করছো শরৎদি? দাঁড়াও আমি নারকোল কুরে দিই—

শরৎ বললে, দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করবো আর চালভাজা—কি বলিস্?

ছেলেমানুষের মত উৎসাহ ও আগ্রহভরা কণ্ঠস্বর তার। এই জন্যই শরৎ দিদিকে রাজলক্ষ্মীর এত ভাল লাগে। এই পাড়াগাঁয়ে সব লোক যেন ঘুমুচ্ছে, তাদের না আছে কোনো বিষয়ে আগ্রহ, না শোনা যায় তাদের মুখে একটা ভাল কথা। অল্প বয়সে বুড়িয়ে যেতে হয় ওদের মধ্যে থাকলে। শরৎ দিদি এসে বাঁচিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ মনে পড়বার সুরে বললে, ভাল কথা, বলতে মনে নেই শরৎদি, টুঙি-মাজদে থেকে তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল একবার—

শরৎ চমকে উঠে বললে—টুণ্ডি-মাজদে! কই সে চিঠি?

—আছে বোধ হয়, বাড়িতে খুঁজে দেখবো। তোমরা তখন এখানে ছিলে না—আমি রেখে দিয়েছিলাম—

—কতদিন আগে?

—তা ছ-সাত মাস কি তার বেশিও হবে। গত বোশেখ মাসে বোধ হয়। আচ্ছা শরৎদি, ওখানে তোমার শ্বশুরবাড়ি—নয়?

শরৎ অন্যমনস্কভাবে বললে, হাঁ।

একটুখানি চুপ করে কি ভেবে বললে, কে দিয়েছিল জানিস্?

—খামের চিঠি। আমি খুলে দেখি নি—কে আছে তোমার সেখানে?

শরৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, নিয়ে আসিস্ চিঠিখানা দেখবো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রাজলক্ষ্মী বললে, খাও শরৎদি, সন্দে হয়ে আসছে—

—হুঁ—

—নারকোল কেটে দেবো আর একটু?

—না, তুই খেয়ে নে। উত্তর দেউলে সন্দে দেখিয়ে আস্‌তে হবে—

—এখনও রোদ রয়েছে গাছের ডগায়, অনেক দেরি এখনো। খেয়ে নাও না—

—আমি আর খাবো না এখন।

—তুমি না খেলে আমার এই রইল—

—না, না, আচ্ছা খাচ্ছি আমি—নে তুই। কাঁচা লঙ্কা একটা নিয়ে আসি—

উত্তর দেউল থেকে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরছিল। কালোপায়রা দীঘির ওপাড়ের ঘন জঙ্গলে সেখানে ছাতিম ফুল ফুটে হেমন্তসন্ধ্যার বাতাস সুবাসিত করে তুলেছে। শ্যামলতার লম্বা কালো ডাঁটায় কুচো কুচো সুগন্ধ ফুল প্রত্যেক বর্ষাপুষ্ট ঝোপের মাথায়। পায়ে চলার পথ গত বর্ষার ঘাসে ঢেকে আছে, ভাঙা ইঁটের স্তূপে শেওলা জমেছে, গড়ের জঙ্গল ঘন কালো দেখাচ্ছে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে। রাজলক্ষ্মীকে বাড়ি ফিরতে হবে বলে ওরা সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর কাজ বেলা থাকতে সেরে এল।

শরৎ বললে, অনেক মেটে আলু হয়ে আছে বনে, আজ দু-বছর এদিকে আসি নি—

—তুলবে একদিন শরৎদি? আমিও আসবো—

বাড়ি গিয়ে শরৎ বললে, চল্ তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—গড়ের খাল পর্যন্ত যাই। জল নেই তো খালে?

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কোথায়? বর্ষায় সামান্য জল হয়েছিল, শুকিয়ে গেছে।

—থাক না কেন আজ রাতটা? একা থাকবো?

—বাড়িতে বলে আসি নি যে শরৎদি—নইলে আর কি। আচ্ছা কাল রাত্রে বরং থাকবো। বাড়িতে বলে আসতে হবে কিনা?

রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার পথে শরৎ একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসলো। হেমন্তের সান্ধ্য বাতাস কত কি বন্য পুষ্প, বিশেষতঃ বনমরচে ও শ্যামলতার পুষ্পের সুবাসে ভারাক্রান্ত। দেউড়ির ভাঙা ইঁটের ঢিবির সর্বত্র এ-সময় বনমরচে লতায় ছেয়ে গিয়েছে, পুরোনো রাজবাড়ি, লক্ষ্মীছাড়া দৈন্য তাদের শ্যামশোভায় আবৃত করে রেখেছে। রাজকন্যার সম্মান রেখেছে ওরা সেভাবে।

কি হবে এখুনি ঘরে ফিরে? বেশ লাগে বাইরের বাতাস। ভয় নেই ওর মনে, যা ছিল তাও চলে গিয়েছে। তা ছাড়া ভয় কিসের? সবাই বলে ভুত আছে, অপদেবতা আছে।

তার পূর্ব‌পুরুষের অভ্যুদয়ের দিনের শত পুণ্য অনুষ্ঠানে এ বাড়ির মাটি পবিত্র, এ বাড়ির সে মেয়ে, আবাল্য যে এ-সব এইখানেই দেখে এসেছে—তার ভয় কিসের ?

উত্তর দেউলের দেবী বাহারী তাদের মঙ্গল করবেন।

সে ঘরে ফিরে ডুমুরের চচ্চড়ি রান্না করবে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের জন্যে। জ্যাঠামশায় অনেক ডুমুর পেড়ে এনেছেন আজ কোথা থেকে। জ্যাঠামশায় বেশ লোক। ওঁকে সে আর কোথাও যেতে দেবে না। উনি না থাকলে কে তাকে আনতো কাশী থেকে ? বাবার সঙ্গে কে আবার দেখা করিয়ে দিত ? যতদিন উনি বাঁচেন, সে ও'র সেবা-যত্ন করবে মেয়ের মত।

শরতের হঠাৎ মনে পড়ল, রাজলক্ষ্মীকে তার শ্বশুরবাড়ির সে পুরানো চিঠিখানা আনবার জন্যে মনে করিয়ে দেওয়া হয় নি আর একবার। টুঙি-মাজদিয়া! কত দিন সেখানে যাওয়া হয় নি। কে-ই বা আছে আর সেখানে ? চিঠি লিখেছেন বোধ হয় খুড়শাশুড়ী। তাই হবে—তা ছাড়া আর কে ? সেখানকার সব কিছু যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন ভাল জ্ঞানই হয় নি শরতের। এক উৎসব-রজনীর চাঁপাফুলের সুগন্ধ আজও যেন নাকে লেগে আছে। কত কাল আগে বিস্মৃত মুহূর্ত্তগুলির আবেদন—আজও তাদের ক্ষীণ বাণী অস্পষ্ট হয়ে যায় নি তো! বিস্মৃতির উপলেপন দিয়ে রেখেছে চলমান কাল, সেই মুহূর্ত্তগুলির ওপর। তবে সে ভালবাসে নি, ভালবাসলে কেউ ভোলে না। তখনও বোঝবার, জানবার বয়স হয় নি তার।

টুঙি-মাজদে তার শ্বশুরবাড়ি। ওখানকার ভাদুড়ীরা তার শ্বশুরবংশ—এক সময়ে নাকি ভাদুড়ীদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখন—তাদেরই মত।

টুঙি-মাজদে! নামটা সে ভুলেই গিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী আবার মনে করিয়ে দিলে।

বনের মধ্যে কোথায় গম্ভীর স্বরে হুতুম প'্যাচা ডাকছে, শুনলে ভয় করে—যেন রাত্রিচর কোনো অপদেবতার কুস্বর। শরৎ অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে ধরে গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলে।

অনেক রাত্রে কেদার এসে ডাকাডাকি করেন—ও মা শরৎ, দোর খোলো—ওঠো—

দিন দশেক পরে একদিন রাজলক্ষ্মী এসে বললে, চললাম শরৎদি—

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে, কি রে ? কোথায় চললি ?

—সব ঠিক। আমার বিয়ে হচ্ছে সতেরোই অঘ্রাণ—জানো না ?

—তোর ? সত্যি ?

—সত্যি না তো মিথ্যে ?

—বল্ শুনি—সত্যি ? কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী বেশী কিছু জানে না বোঝা গেল। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে দশঘরা বলে অজ এক পাড়াগাঁয়ে। যার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে, তার বয়েস নাকি তত বেশী নয়, বিশেষ কিছু করে না, বাড়িতেই থাকে।

শরৎ বললে, তোর পছন্দ হয়েছে ?

—পছন্দ হলেও হয়েছে, না হলেও হয়েছে—

—তার মানে ?

—তার মানে বাবার যখন পয়সা নেই, আমি যদি বলি আমার বর হাকিম হোক, হুকুম হোক, দারোগা হোক, তা হলে তো হবে না। যা জোটে তাই সই।

—এখন যা হয় হলে বাঁচি, না কি ?

—তোমার মুণ্ডু।

তার পর ওরা বনের মধ্যে মেটে আলু তুলতে গিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত রইল। বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা পাথরের থামের ভাঙা মুন্ডুটা মাটিতে অর্দ্ধেক পোঁতে আছে। রাজলক্ষ্মী সেটার ওপরে গিয়ে বসলো। পাথরের গায়ে সামুদ্রিক কড়ির মত বিট কাটা, মাঝে মাঝে পদ্মফুল এবং একটা দাঁড়ি। আবার কড়ি, পদ্ম ও দাঁড়ি—মালার আকারে সারা থামটা ঘুরে এসেছে। নিচের দিকে একরাশ কেঁচোর মাটি বাকী অংশটুকু ঢেকে রেখেছে।

রাজলক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে বললে, এই নক্সাটা কেমন চমৎকার শরৎদি? বুনলে ভাল হয়—দেখে নাও—

শরৎ বললে, এর চেয়েও ভাল নক্সা আছে ওই অশ্বত্থ গাছটার তলায়—একটা খিলেন ভেঙে পড়ে আছে, তার ইঁটের গায়ে। কিন্তু বড্ড বন ওখানে—আর কাঁটা গাছ।

—তোমাদেরই সব তো—একদিন শুনেছি গড়বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল। না?

—কি জানি ভাই, ও-সবের খবর আমি রাখি নে। আজকাল যা দেখছি, তাই দেখছি। তেল জোটে তো নুন জোটে না, নুন জোটে তো চাল জোটে না।

তার পর শরৎ কি ভেবে আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বললে, সত্যি রাজি, খুব খুশী হয়েছি তোর বিয়ের কথা শুনে। কত যে ভেবেছি, কাশীতে থাকতে কতবার ভাবতাম, ভাল সম্বন্ধ পাই তো রাজির জন্যে দেখি। একবার দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা চমৎকার ছেলে দেখে ভাবলাম, এর সঙ্গে যদি রাজির বিয়ে দিতে পারতাম, তবে—

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। সে যেন কি ভাবছে।

শরৎ বললে, প্রভাসদার দেওয়া সেই মখমলের বাক্সটা আছে রে?

—হুঁ। স্নোটা সব খরচ হয়ে গেছে—আর সব আছে। দ্যাখো শরৎদি, সত্যি সত্যি একটা কথা বলি, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না তোমায় ছেড়ে—আমি একবার বলেছি, আবার বলছি। মনের কথা আমার।

তার পর রাজলক্ষ্মী উঠে ধীরে ধীরে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, শরৎদি, তুমি আমায় ভালবাসো?

শরৎ তাকে ঠেলে দিয়ে হেসে বললে, যাঃ—

রাজলক্ষ্মীর চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর করে জল পড়ল। সে অশ্রুসিক্ত স্বরে বললে, তুমি ভালোবাসো বলেই বেঁচে আছি শরৎদি। তুমি গরীব হতে পারো, আমার কাছে তুমি গড়বাড়ির রাজার মেয়ে, এই দেউল, মন্দির, দীঘি, গড়, ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি সব তোমাদের, আমি তোমাদের প্রজার মেয়ে, একপাশে পড়ে থাকি—তুমি সুনজরে দ্যাখো বলে বার বার আসি—

শরৎ কৌতুকের সুরে বললে, খেপলি নাকি, রাজি? কী হয়েছে আজ তোর?

রাজলক্ষ্মী চলে যাবার কিছু পরে বটুক এসে ডাকলে, ও শরৎ—বাড়ি আছ?

শরৎ তখন স্নান করতে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে, বটুককে দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মুখে বললে, এসো বটুকদা—

—হ্যাঁ, এলাম। তুমি বুঝি—

—নাইতে বেরিয়েছি বটুকদা। রাজির সঙ্গে বন থেকে মেটে আলু তুলতে গিয়েছিলাম কি না! না ডুব দিয়ে ঘরে-দোরে ঢুকবো না—

—ও, তা আমি না হয় অন্য সময়—

—কোনো কথা ছিল?

—হ্যাঁ, না—কথা—তা একটু ছিল—তা—

বটুকের অবস্থা দেখে শরতের হাসি পেল। মনে মনে বললে, কি বলবি বল্ না—বলে চলে যা—কাণ্ড দ্যাখো একবার!

মুখে বললে, কি বটুকদা? কি কথা?

বটুক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্ততঃ করে তার পর মরীয়ার সুরে বললে, প্রভাস এসেছিল কাল কলকাতা থেকে।

বলে সে শরতের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

শরতের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। তার সমস্ত শরীর কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে বললে, তা আমায় এ কথা কেন? আমি কি করবো?

বটুক মাথা চুলকে বললে, না—তা—এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়। প্রভাসের সঙ্গে গিরীনবাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিল। এই গিয়ে তারা বলছিল—

এই পর্য্যন্ত বলে বটুক একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

শরৎ দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন টলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে বললে, কি বলছিল?

—বলছিল যে—

—বলো না কি বলছিল?

—মানে, ওরা—তোমার সঙ্গে একবার লুকিয়ে দেখা করতে চায়। নইলে গাঁয়ে সব কথা নাকি প্রকাশ করে দেবে।

—হুঁ—তোমাকে তারা চর করে পাঠিয়েছে বুঝি?

শরতের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বটুক ভয় খেয়ে গেল। সুর নরম করে বললে—আমার ওপরে অনর্থক রাগ করছো তুমি। আমায় তারা বললে, তোমাকে কথাটা বলতে—কেউ টের পাবে না, গড়ের জঙ্গলের ওদিকে হোক্ কি রাণীদীঘির পাড়ে হোক্—কি তারা বলবে তোমায়। আমায় বললে, বলে এসো। তারা কলকাতায় চলে গিয়েছে, আবার আসবে। নয় তো কলকাতায় কি হয়েছিল না হয়েছিল, সব গাঁয়ে প্রকাশ করে দিয়ে যাবে—

শরৎ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কোনো কথা নেই তার মুখে। তার মূর্ত্তি দেখে বটুকের ভয় হ'ল। সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় শরৎ স্থির গলায় বললে, বটুকদা, তোমার বন্ধুদের বোলো আমি লুকিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা কোনোদিন করবো না। তাদের সাহস থাকে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের সামনে এসে যেন দেখা করে। আমরা গরীব আছি তাই কি? আমাদেরও মান আছে। না হয় তারা বড়লোকই আছে।

বটুক বললে, না—এর মধ্যে আর গরীব বড়লোকের কথা কি?

—আর একটা কথা বটুকদা! তুমি না গাঁয়ের ছেলে? তোমার উচিত কলকাতার সেই সব বখাটে বদমাইশদের তরফ থেকে আমায় এ-সব কথা বলা? আমি না তোমার ছোট বোনের মত? তোমায় না দাদা বলে ডাকি? তুমি এসেছ চর সেজে?

বটুক আমতা আমতা করে বললে, আমি কি করবো, আমি কি করবো—তোমার ভালোর জন্যেই—

শরৎ পূর্ব্ববৎ স্থির কণ্ঠেই বললে, আমার বাড়ি তুমি এসেছ—আমার বলতে বাধে, তবুও আমি বলছি—আমার এখানে তুমি আর এসো না—আমার ভালো তোমায় করতে হবে না।

বটুক ততক্ষণ ভগ্ন দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েছে।

পনেরো

শরৎ কাঠের পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কতক্ষণ—এখন সে কি করবে? গড়শিবপুরের রাজবংশে সে কি অভিশাপ বহন করে এনেছে, তার বংশের নাম বাবার নাম ডুবতে বসেছে আজ তার জন্যে!

মানুষ এত খারাপও হয়!

এই পল্লীগ্রামের বনে বনে হেমন্তকালের কত বনকুসুম, লম্বা লতার মাথায় থোবা থোবা মুকুল ধরেছে বন্য মাখম-সিম ফুলের, শিউলির তলায় খই-ছড়ানো শুভ্র পুষ্পের সমারোহ, সুমুখ জ্যোৎস্না রাতের প্রথম প্রহরে ছাতিমবনের নিবিড়তায় চাঁদের আলোর জাল-বুনুনি। ছাতিম ফুলের সুবাস—এ সবের আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রভাসের মত, বটুকের মত ভয়ানক প্রকৃতির লোক, যাদের অসাধ্য কাজ নেই, যাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই। এত কষ্ট দিয়েও ওদের মনোবাঞ্ছা মিটলো না? এতদিন পরে আবার এখানেও এসে জুটলো তার জীবনে আগুন জ্বালাতে?

আচ্ছা, সে কি করেছে যার জন্যে তার এত শাস্তি?

সে কি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু করেছে? সে কি স্বেচ্ছায় কমলাদের পাপপুরীর মধ্যে ঢুকেছিল? হতে পারে সে নির্ব্বোধ, কিছু বুঝতে পারে নি, অত খারাপ কাউকে ভাবতে পারে নি বলেই তার মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি, যখন সন্দেহ সত্যই জাগলো—তখন ওরা তো তাকে বেরুতে দিল না। অথচ সে যদি সব কথা খুলে বলে গ্রামে, কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

প্রভাসের ও গিরীনের বদমাইশির কথা শুনে ওদের কেউ শাস্তি দেবে না? ভগবান সত্যের দিকে দাঁড়াবেন না?

না হয়—সে কালোপায়রা দীঘির জলে ডুবে মরে বাবার ও বংশের মুখ রক্ষা করবে। তা সে এখুনি করতে পারে—এই দণ্ডে।

শুধু পারে না বাবার মুখের দিকে চেয়ে।

আচ্ছা, সে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে দু'দিনের জন্যে? টুঙি-মাজদে গ্রামে খুড়শাশুড়ীর আশ্রয়ে এখন থাকবে গিয়ে কিছুদিন? কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়? জ্যাঠামশায় বা বাবাকে এসব কথা বলতে বাধে।

তার চেয়ে জলে ডুবে মরা সহজ।

সকলে মিলে অমন ভাবে তাকে যদি জ্বালাতন করে, বনের মেটে আলু, বুনো সিম-ভাতে-ভাত এক বেলা খেয়েও যদি শান্তিতে থাকতে না দেয়, তবে মায়ের মুখে শোনা তারই বংশের কোন্ পুরোনো আমলের রাণীর মত—তারই কোন্ অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহীর মত নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কালোপায়রা দীঘির শীতল জলের তলায় আশ্রয় নিয়ে সব জ্বালা জুড়ুতে হবে, যদি তাতে হতভাগারা শান্তিতে থাকতে দেয়।…চোখের জলে শরতের গালের দু-পাশ ভেসে গেল।

কতক্ষণ পরে তার যেন হুঁশ হ'ল—কত বেলা হয়েছে! রান্না চড়ানো হয় নি—বাবা জ্যাঠামশায় এসে ভাত চাইবেন এখুনি।

উঠে সে স্নান করে এল—তেল আগেই মেখে বসে ছিল। বটুক আসবার আগেই।

রান্না চড়িয়ে দিয়ে আবার সে ভাবতে বসলো। সব সময়েই ভাবছে, বটুক চলে যাবার পর থেকে। কতবার চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, কতবার আঁচল দিয়ে মুছেছে। কি সে করে এখন?

তার কি কেউ নেই সংসারে?

কেউ তার দিকে দাঁড়িয়ে, তার হয়ে দুটো কথা বলবে না? প্রভাস ও গিরীন যদি তার নামে কুৎসা রটিয়ে দেয় গ্রামে, তবে তাদের কথাই সবাই সত্য বলে মেনে নেবে? তার কথা কেউ শুনবে না?

এমন সময় কেদার ও গোপেশ্বর এসে পৌঁছে গেলেন।

তাঁরা মুখুজ্জে-বাড়ির জামাই সোমেশ্বরের কাছে নতুন রাগিণীর সন্ধানে গিয়েছিলেন, বোধ হয় খানিকটা কৃতকার্য্যও হয়েছেন, তাঁদের মুখ দেখলে সেটা বোঝা যায়।

গোপেশ্বর খেতে খেতে বললেন—গলাটা ভাল লোকটার।

—বেশ। ভৈরবীখানা গাইলে, বড় চমৎকার—অবরোহীতে একবার যেন ধৈবৎ ছুঁয়ে নামলো—

—না না। আমার কানে তো শুনলাম না। কোমল ধৈবৎ তো লাগবেই অবরোহীতে—

—সেটা আমার খুব ভাল জানা আছে—শুনবে? এই শোন না—আচ্ছা খেয়ে উঠি। অবরোহীতে কোমল নিখাদ, তার পরেই কোমল ধৈবৎ আসছে। যেমন—

শরৎ বললে, বাবা খেয়ে নাও দিকি। এর পর ওর অনেক সময় পাবে।

—এটা কিসের চচ্চড়ি মা?

—মেটে আলু। রাজলক্ষ্মী আর আমি তুলে এনেছিলাম আজ ওই বনের দিক থেকে—

—রাজলক্ষ্মী এসেছিল নাকি?

—কতক্ষণ ছিল। এই তো খানিকটা আগে গেল—

—ওর বিয়ের কথা শুনে এলাম কিনা—তাই বলছি—

—আমার সঙ্গে অত ভাব, ও চলে গেলে গাঁয়ের আর কেউ এদিকে মাড়াবে না। ওকে একটা কিছু দিতে হবে বাবা—

—কি দিবি?

—তুমি বলো বাবা—

—আমি ওসব বুঝি নে। যা বলবি, কিনে এনে দেবো—ওসব মেয়েলি কাণ্ডকারখানার আমি কোনো খবর রাখি নে—

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে দুজনে হাটে চলে গেলেন, আজ পাশের গ্রামে হাট। পূর্ব্বে হাট ছিল না, দুই জমিদারে বাদাবাদির ফলে আজ বছরখানেক নতুন হাট বসেছে। হাটের খাজনা লাগে না বলে কাপালীরা তরিতরকারী নিয়ে জমা হয়—সস্তায় বিক্রি করে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়েছে। অথচ এবার শীত এখনও তেমন পড়ে নি। বাবা ও জ্যাঠামশায় চলে গেলে শরৎ রোদে পিঠ দিয়ে বসে আবার সেই একই কথা ভাবতে লাগল।

গড়ের খাল পার হয়ে দেখা গেল রাজলক্ষ্মী আসছে। ওর জীবনে যদি কেউ সত্যিকার বন্ধু থাকে তবে সে রাজলক্ষ্মী, ও এলে যেন বাঁচা যায়, দিন কাটে ভাল।

রাজলক্ষ্মী আসতে আসতে বললে, আজ একটু শীত পড়েছে শরৎদি—না?

—আয় আয়, তোর কথাই ভাবছি—

—কেন—

—তুই চলে গেলে যেন ফাঁকা হয়ে যায়, আয় বোস্—

শরৎ ভাবছিল বটুকের কথাটা বলা উচিত হবে কি না। কিন্তু তা হলে অনেক কথাই ওকে এখন বলতে হয়—রাজলক্ষ্মী তাকে কিছু যদি মনে করে সব শুনে? শরৎ তা হলে মরে যাবে—জীবনের মধ্যে দুটিমাত্র বন্ধু সে পেয়েছে—অন্ধ রেণুকা আর এই রাজলক্ষ্মী।

এদের কাউকে সে হারাতে প্রস্তুত নয়।

আর একটি মেয়ের কথা মনে হয়—হতভাগিনী কমলার কথা—কে জানে সেই পাপপুরীর মধ্যে কি ভাবে সে দিন কাটাচ্ছে ?

সরলা শরৎ জানত না—পাপে যারা পাকা হয়ে গিয়েছে, তাঁদের পাপপুণ্য বলে জ্ঞান অল্প দিনেই তারা হারিয়ে ফেলে, পাপে ও বিলাসে মত্ত হয়ে বিবেক বিসর্জন দেয়। কোনো অসুবিধাতে আছে বলে নিজেকে মনে করে না। পুণ্যের পথই কণ্টকসঙ্কুল, মহাদুঃখময়—পাপের পথে গ্যাসের আলো জ্বলে, বেলফুলের গড়ে মালা বিক্রি হয়, গোলাপ জলের ও এসেন্সের সুগন্ধ মন মাতিয়ে তোলে। এতটুকু ধুলো কাদা থাকে না পথে। ফুলের পাপড়ির মত কোঁচা পকেটে গুঁজে দিব্যি চলে যাও।

রাজলক্ষ্মী বললে, দিন ঘনিয়ে এল, তাই তো তোমায় ছাড়তে পারি নে—

—হুঁ—

—কি ভাবছো শরৎদি ?

শরৎ চমক ভেঙে উঠে বললে—কই না—কিছু না। হ্যাঁ রে, তুই আশাদিদির বরের গান শুনেছিস্ ? খুব নাকি ভাল গায় ? বাবা আর জ্যাঠামশায় সেখানে ধন্না দিয়ে পড়ে আছেন আজ ক'দিন থেকে। দিন দশেক থেকে দেখছি—

—ও। তাই শরৎদি ! মুখুজ্জে-বাড়ির দিকে যেতে দেখেছি বটে ওঁদের আজ সকালে—

—রোজ সেখানে পড়ে আছেন দুজনে—কি সকাল, কি বিকেল—কেমন গান গায় রে লোকটা ?

—হিন্দী-মিন্দি গায়—কি হা হা করে, হাত-পা নাড়ে, আমার ও ভাল লাগে না।

দুজনে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত গল্প করলে, সন্ধ্যার আগে প্রতিদিনের মত রাজলক্ষ্মী চলে গেল, শরৎ এগিয়ে দিতে গেল। অল্প অল্প অন্ধকার হয়েছে, ভারি নির্জন গড়বাড়ির জঙ্গল। শরৎ ভয় পায় না একটুও, বরং এতকাল পরে তার বড় ভাল লাগে। এসব জিনিস তার হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সে ফিরে পেয়েছে। চিরদিনের গড়বাড়ির জঙ্গল তার পল্লব-প্রচ্ছায় বীথিপথে কত কি বনপুষ্পের সুবাস ও বনবিহঙ্গের কলকাকলী নিয়ে বসে আছে, পিতৃপিতামহের পায়ের দাগ আজও যেন আঁকা আছে সে পথের ধুলোয়, মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহদৃষ্টি কোন্ কোণে সেখানে যেন লুকিয়ে আছে আজও—তাই তো মনে হয়, তার যদি কোনো পাপ হয়ে থাকে নিজের অজ্ঞাতে—সব কেটে গিয়েছে এখানে এসে, ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহে বেশী ধুমধাম হবে না, গ্রামের সকলকে ওরা বিবাহ-রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে পারবে না বলে বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করছে। কেদার ও গোপেশ্বর দুজনেই অবিশ্যি নিমন্ত্রিত—এসব খবর কেদারই আনলেন।

শরৎ বললে, বাবা, ওর বিয়েতে কি একটা দেওয়া যায় বলো না—

—তুই যা বলবি, এনে দেবো।

—তুমি যা ভাল ভাবো, এনো।

—আমি তো তোকে বললাম, ওসব মেয়েলি ব্যাপারে আমি নেই—

—টাকা আছে ?

—আড়তে চাকরি করার দরুন টাকা তো খরচ হয় নি। সেগুলো আছে একজনের কাছে জমা। কত চাই বলে দে—

—আইবুড়ো ভাতের একখানা ভাল শাড়ি দাও আর এক জোড়া দুল—ও আমায় বড় ভালবাসে, আমার ছোট বোনের মত। আমার বড় সাধ—

—তা দেবো মা। কখনো তোর কাউকে কিছু হাতে করে দেওয়া হয় না—তুই হাতে করে দিয়ে আসিস্—হরি সেকরাকে আজই দুলের কথা বলে দিই—

বিবাহের দু-তিন দিন আগে কেদার শাড়ি ও দুল এনে দিলেন। শরৎ কাপড়ের পাড় পছন্দ না করাতে দুবার তাঁকে ও গোপেশ্বরকে ভাজনঘাটের বাজারে ছুটোছুটি করতে হ'ল। শরৎ নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে রাজলক্ষ্মীকে আইবুড়ো ভাতের নিমন্ত্রণ করে এল। সকাল থেকে শাক, সুক্তুনি, ডালনা ঘণ্ট অনেক কিছু রান্না করলে। গোপেশ্বর চাটুজ্জে এসব ব্যাপারে শরৎকে কুটনো কোটা ফাইফরমাশ—নানা রকম সাহায্য করলেন।

শরৎ বললে, জ্যাঠামশায়কে বড় খাটিয়ে নিচ্ছি—

—তা নেও মা। আমি ইচ্ছে করে খাটি। আমার বড় ভাল লাগে—এ বাড়ি হয়ে গিয়েছে নিজের বাড়ির মত। নিজে যা খুশি করি—

ইতিমধ্যে দুবার গোপেশ্বর চাটুজ্জে চলে যাবার ঝোঁক ধরেছিলেন, দুবার শরৎ মহা আপত্তি তুলে সে প্রস্তাব না-মঞ্জুর করে।

শরৎ বললে, সেই জন্যেই তো বলি জ্যাঠামশায়, যতদিন বাঁচবেন, থাকুন এখানে। এখান থেকে যেতে দেবো না।

—সেই মায়াতেই তো যেতে পারি নে—সত্যি কথা বলতে গেলে যেতে ভালও লাগে না। সেখানে বৌমারা আছেন বটে, কিন্তু আমার দিকে তাকাবার লোক নেই মা—তার চেয়ে আমার পর ভাল—তুমি আমার কে মা? কিন্তু তুমি আমার যে সেবা যে যত্ন করো তা কখনো নিজের লোকের কাছ থেকে পাই নি—বা রাজামশায় আমায় যে চোখে দেখেন—

শরৎ ধমকের সুরে বললে, ওসব কথা কেন জ্যাঠামশায়? ওতে পর করে দেওয়া হয়। সত্যিই তো আপনি পর নন?

রাজলক্ষ্মী খেতে এল।

শরৎ বললে, দাঁড়া কাপড় ছাড়তে হবে—

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন শরৎদি?

—কারণ আছে। ঘরের মধ্যে চল্—

পরে কাগজের ভাঁজ খুলে শাড়ি দেখিয়ে বললে—পর্ এখানা—পছন্দ হয়েছে?—তোর কান মলে দেবো—কান নিয়ে আয় এ দিকে—দেখি—

—দুল? এসব কি করেছ শরৎদি?

—কি করলাম! ছোট বোনকে দেবো না? সাধ হয় না?

রাজলক্ষ্মী গরীবের মেয়ে, তাকে এমন জিনিস কেউ কোনোদিন দেয় নি। সে অবাক হয়ে বললে, এই সব জিনিস আমায় দিলে শরৎদি! সোনার দুল—

শরৎ ধমক দিয়ে বললে, চুপ। বলিনি আমাদের রাজারাজড়ার কাণ্ড, হাত ঝাড়লে পর্বত—

রাজলক্ষ্মীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। নীরবে সে শরতের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। বললে, তা আজ দিলে কেন? বুঝেছি শরৎদি—তুমি যাবে না বিয়ের রাতে।

—যাবো না কেন—তা যাবো—তবে পাড়াগাঁ জায়গা বুঝিস তো—

—তোমার মত মানুষ আমার বিয়েতে গিয়ে দাঁড়ালে আমার অকল্যাণ হবে না শরৎদি। এ তোমায় ভাল করেই জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি না গেলে আমার মনে বড্ড কষ্ট হবে। আর তুমি গেলে যদি অকল্যাণ হয়, তবে অকল্যাণই সই—

—ছিঃ ছিঃ—ওসব কথা বলতে নেই মুখে—আয়, চল্ রান্নাঘরে—কেমন গোটা দিয়ে

সন্ধ্যুনি রেঁধেছি খেয়ে বলবি চল্—

বিকেলের দিকে শরৎ পুকুর থেকে গা ধুয়ে বাড়ি গিয়ে দেখলে রান্নাঘরের দাওয়ায় ইট-চাপা একখানা কাগজের কোণ বেরিয়ে রয়েছে। একটু অবাক হয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে দেখলে, তাতে লেখা আছে—

"আজ সন্ধ্যার পরে রানীদিঘীর পাড়ে ডুমুরতলায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিবা। নতুবা কলিকাতায় কি হইয়াছিল প্রকাশ করিয়া দিব। হেনা বিবি আমাদের সঙ্গে আছে ভাজন-ঘাটের কুঠির বাংলায়। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। দেখা করিলে তোমার ভাল হইবে। এ চিঠির কথা কাহাকেও বলিও না। বলিলে যাহা হইবে দেখিতেই পাইবে। সাবধান।"

শরৎ টলে পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলে। মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। আবার সেই হেনা বিবি, সেই পাপপুরীর কথা—যা মনে করলে শরতের গা ঘিন্ ঘিন্ করে! এ চিঠিখানা ছুঁয়েছে, তাতেই তাকে নাইতে হবে এই অবেলায়।

এরা তাকে রেহাই দেবে না? তাদের গড়বাড়িতে কলকাতার লোকের জোর কিসের?

সব সমস্যার সে সমাধান করে দিতে পারে এখুনি, এই মুহূর্তেই কালোপায়রা দীঘির অতল জলতলে।

কিন্তু বাবার মুখের অসহায় ভাব মনে এসে তাকে দুর্বল করে দেয়। নইলে সে প্রভাসেরও ধার ধারতো না, গিরীনেরও না। নিজের পথ করে নিতো নিজেই। তাদেরই বংশের কোন্ রানী ঐ দীঘির জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন মান বাঁচাতে। সেও ঐ বংশেরই মেয়ে। তার ঠাকুরমারা যা করেছিলেন সে তা পারে।

বাবাকে এ চিঠি দেখাবে না। বাবার ওপর মায়া হয়, দিব্যি গানবাজনা নিয়ে আছেন, ব্যস্ত হয়ে উঠবেন এখুনি। গোপেশ্বর জ্যাঠামশায়কে দেখাতে লজ্জা করে। থাক্ গে, আজ সে এখুনি রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি গিয়ে কাটিয়ে আসবে অনেক রাত পর্যন্ত। উত্তর দেউলে পিদিম আজ সকাল সকাল দেখাবে।

রাজলক্ষ্মীর মা ওকে দেখে বললেন, এসো এসো মা—শরৎ, আচ্ছা পাগলী মেয়ে, অত পয়সাকড়ি খরচ করে রাজিকে দুল আর শাড়ি না দিলে চলতো না?

রাজলক্ষ্মীর কাকীমা বললেন, গরীবের ওপর ওদের চিরকাল দয়া অমনি—কত বড় বংশ দেখতে হবে তো? বংশের নজর যাবে কোথায় দিদি?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে, ওসব কথা কেন খুড়ীমা? কি এমন জিনিস দিয়েছি—কিছু না—ভারি তো জিনিস—রাজি কোথায়?

রাজলক্ষ্মীর মা বললেন, এই এতক্ষণ তোমার কথাই বলছিল, তোমার দেওয়া কাপড় আর দুল দেখতে চেয়েছেন গাঙ্গুলীদের বড় বউ, তাই নিয়ে গিয়েছে দেখাতে। শরৎদি বলতে মেয়ে অজ্ঞান, তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ! বলে, মা—শরৎদিকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে সুখ পাবো না। বসো, এলো বলে—

একটু পরে গাঙ্গুলী-বউকে সঙ্গে নিয়ে রাজলক্ষ্মী ফিরলো, সঙ্গে জগন্নাথ চাটুজ্জের পুত্রবধূ নীরদা। নীরদা শরতের চেয়ে ছোট, শ্যামবর্ণ, একহারা গড়নের মেয়ে, খুব শান্ত প্রকৃতির বউ বলে গাঁয়ে তার সুখ্যাতি আছে।

গাঙ্গুলী বউ বললেন, এই যে মা-শরৎ, তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি যে শাড়ি দিয়েছ, দেখতে নিয়েছিলাম—ক'টাকা নিলে? ভাজনঘাটের বাজার থেকে আনানো? বট্ঠাকুর কিনেছেন বুঝি?

শরৎ বললে, দাম জানি নে খুড়ীমা, বাবা ভাজনঘাট থেকেই এনেছেন। দুবার ফিরিয়ে দিয়ে তবে ঐ পাড় পছন্দ—

নীরদা বললে, দিদির পছন্দ আছে। চলুন দিদি, ও ঘরে একটু তাস খেলি আপনি আমি রাজলক্ষ্মী আর ছোট খুড়ীমা—

রাজলক্ষ্মীর মা শরৎকে পাশের ঘরে নিয়ে বললেন, মা, কাল তুমি আসতে পারো আর না পারো, আজ সন্দের পর এখান থেকে দুখানা লুচি খেয়ে যেও—রাজলক্ষ্মী আমায় বার বার করে বলেছে—

সবাই মিলে আমোদ স্ফূর্ত্তিতে অনেকক্ষণ কাটলো—বেলা পড়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিয়ে-বাড়ির ভিড়, গ্রামের অনেক ঝি-বউ সেজেগুজে বিকেলের দিকে বেড়িয়ে দেখতে এল। মুখুজ্জে-বাড়ির মেজ বউ পেতলের রেকাবে ছিরি গড়িয়ে নিয়ে এলেন। রাজলক্ষ্মীর মা বললেন, বরণ-পিঁড়ির আল্‌পনাখানা তুমি দিয়ে দ্যাও দিদি—তুমি ভিন্ন এসব কাজ হবে না—এক হৈমদিদি আর তুমি—তারকের মা তো স্বর্গে গেছেন—আল্‌পনা দেবার মানুষ আর নেই পাড়ায়—তারকের মা কি আল্‌পনাই দিতেন!

শরৎ বললে, বাবাকে একটু খবর দিন খুড়ীমা, কালীকান্ত কাকার চণ্ডীমণ্ডপে গানের আড্ডায় আছেন। যাবার সময় আমাকে যেন সঙ্গে নিয়ে যান এখান থেকে। অন্ধকার রাত, ভয় করে একা থাকতে।

পরদিন সকাল আটটার সময় শরৎকে আবার রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি থেকে ডাকতে এল। নিরামিষ দিকের রান্না তাকে রাঁধতে হবে, গাঙ্গুলীদের বড় বউয়ের জ্বর কাল রাত্রি থেকে। তিনিই রান্না করে থাকেন পাড়ায় ক্রিয়াকর্ম্মে।

রাজলক্ষ্মী প্রায়ই রান্নাঘরে এসে শরতের কাছে বসে রইল।

শরৎ ধমক দিয়ে বলে—যা রাজি, দধিমঙ্গলের পরে হটরু হটরু ক'রে বেড়ায় না। এখানে ধোঁয়া লাগবে চোখে মুখে—অন্য ঘরে বসগে যা—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কারো ধমকে আর ভয় খাই নে। এই বসলাম পিঁড়ি পেতে—দেখি তুমি কি করো।

নীরদা এসে বললে, শরৎদি, একটা অর্থ বলে দাও তো?

আকাশ গম গম পাথর ঘাটা
সাতশো ডালে দুটি পাতা—

শরৎ তাকে খুন্তি উঁচিয়ে মারতে গিয়ে বললে, ননদের কাছে চালাকি—না? দশ বছরের খুকিদের ওসব জিজ্ঞেস্ করগে যা ছুঁড়ি—

গরীবের বিয়ে-বাড়ি, ধুমধাম নেই, হাঙ্গামা আছে। সব পাড়ার বউ-ঝি ভেঙে পড়ল সেজেগুজে। প্রথম প্রহরের প্রথম লগ্নে বিবাহ। শরৎ সারাদিন খাটুনির পরে বিকেলের দিকে নীরদাকে বললে, গা হাত পা ধুয়ে আসবো এখন। বাড়ি যাই—কাউকে বলিস নে—

বাড়ি ফিরে সে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাতে গেল। শীতের বেলা অনেকক্ষণ পড়ে গিয়েছে, রাঙা রোদ উঠে গিয়েছে ছাতিমবনের মাথায়, ঈষৎ নীলাভ সাদা রঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ছোট এড়াঞ্চির ফুল শীতের দিনে এই সব বনঝোপকে এক নির্জ্জন, ছন্নছাড়া মূর্ত্তি দান করেছে। শুকনো বাদুড়নখী ফল তাদের বাঁকানো নখ দিয়ে কাপড় টেনে ধরে। থমথমে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার রাত্রি।

এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ সে ভয়ে ও বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটি লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে উত্তর দেউলের পথ থেকে সামান্য দূরে বাদুড়নখী জঙ্গলের মধ্যে। শরৎ কাছে দেখতে গিয়ে চমকে উঠল—কলকাতার সেই গিরীনবাবু!

মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ওর ঘাড়টা যেন শক্ত হাতে কে মুচড়ে দিয়েছে পিঠের দিকে, সেই মুণ্ডুটা ধরের সঙ্গে এক অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে। গিরীনের দেহটা যেখানে পড়ে, তার পাশেই মাটিতে ভারি ভারি গোল গোল কিসের দাগ, হাতীর পায়ের দাগের মত।···শরতের মাথা ঘুরে উঠল, সে চিৎকার করে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিটকে পড়ল বাদুড়নখীর জঙ্গলে।

* * * *

এই অবস্থায় অনেক রাত্রে কেদার ও গোপেশ্বর তাকে বিয়ে-বাড়ি থেকে ডাকতে এসে দেখতে পেলেন। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়া হ'ল।

লোকজনের হৈ হৈ হ'ল পরদিন। পুলিস এল, রাণীদীঘির জঙ্গলে এক চালকবিহীন মোটর গাড়ি পাওয়া গেল। কি ব্যাপার কেউ বুঝতে পারলে না! সবাই বললে গড়বাড়ির সবাই সারা রাত বিয়ে-বাড়িতে ছিল। মৃতদেহের ঘাড়ে শক্ত, কঠিন পাঁচটা আঙুলের দাগ যেন লোহার আঙুলের দাগের মত, ঘাড়ের মাংস কেটে বসে গিয়েছে। গোল গোল হাতীর পায়ের মত দাগগুলোই বা কিসের কেউ বুঝতে পারলে না।

* * * *

গড়ের জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। সন্ধ্যাবেলা। কেদার ঘোর নাস্তিক, কি মনে করে তিনি হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তির কাছে মাথা নিচু করে দণ্ডবৎ করে বললেন, গড়ের রাজবাড়ি যখন সত্যিকার রাজবাড়ি ছিল, তখন শুনেছি তুমি আমাদের বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলে। আমাদের অবস্থা পড়ে গিয়েছে, অনেক অপরাধ করেছি তোমার কাছে, কিন্তু তুমি আমাদের ভোল নি। এমনি পায়ে রেখো চিরকাল মা—অনেক পুজো আগে খেয়েছ সে কথা ভুলে যেও না যেন।

উর্মিমুখর

অনেকদিন এবার গ্রামে আসি নি। প্রায় মাস-তিনেক হোল। এবার দেশে গরমও খুব। একটুকু বৃষ্টি নেই কোনদিকে। দুপুরের দিকে হাওয়া যেন আগুনের হলকার মত লাগে।

এবার গ্রামে এসে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখি সলতেখাগী আমগাছটা ঝড়ে ভেঙে গিয়েচে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। সলতেখাগী ঝড়ে ভেঙে গেল! ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড় জড়ানো নানাদিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়না-কাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।

সলতেখাগীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানী করবে এবার হাজারী কাকা। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ অনুভব করলুম।

গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সলতেখাগী যে ভেঙে গেল, তা নিয়ে আমাদের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনি নি।

পথের পাঁচালীতে সলতেখাগীর কথা লিখেচি। লোকে হয়তো মনে রাখবে ওকে কিছুদিন।

খুকুদের কাল আসবার কথা গিয়েচে দু-ধার থেকে। আজও এল না, বোধহয় আবার জ্বর হয়ে থাকবে।

আজ বিকেলে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে বার হয়েচি, পথে গিয়ে বসেচি গঙ্গাচরণের দোকানে, কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে গল্পসল্প করচি, এমন সময়ে কি মেঘ করে এল সুন্দরপুরের দিক থেকে! গঙ্গাচরণ বললে, খুব বৃষ্টি এল। আমি ওর দোকান থেকে বার হয়ে যেমন এসে বাঁওড়ের ধারের পথে পা দিয়েচি, অমনি বেলেডাঙার ওপারের বাঁশ বনের মাথার ওপর কালবৈশাখীর মেঘের নীল নিবিড় রূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথা থেকে আবার একসারি বক সেই সময় নীল মেঘের কোলে কোলে উড়ে চলেচে—সে কি অপরূপ রচনা! এদিকে মনে ভয় হচ্চে যে তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরতে হবে, ঝড় মাথায় মাঠের মধ্যে থাকা ভাল নয়, অথচ যাবো তার সাধ্যি কি! পা কি নাড়াতে পারি? তারপর সোঁদালী ফুলের-ঝাড়-দোলা বনের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলাম আমাদের ঘাটে। সেখানে স্নান করে যখন আমাদের গুয়াতেলির তলা দিয়ে যাচ্চি—হাজরী জেলেনী সেখানে আম কুড়ুচ্চে—বড় চারার তলাতেও রথযাত্রার ভিড়। বৃষ্টি এল দেখে পালিয়ে বাড়ি এসে ঢুকলাম।

সলতেখাগী আমগাছটা একেবারে কেটে ফেলে করাতীর দল তক্তা তৈরী করচে। হাজারী ঘোষ রোডসেস নীলামে বাগান কিনেচে—ওই এখন তো কর্ত্তা। ও কি জানে সলতেখাগীর সঙ্গে আমার বাল্য জীবনের কি সম্পর্ক!

কাল বিকেলে গোপালনগরে গিয়ে হাজারীর বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে ছিলুম। তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে ফর্দ্দ ইত্যাদি করা হচ্চে, সকলে খুব ব্যস্ত। এমন সময়ে অনেকদিন আগেকার দেখা সেই ভদ্রলোকটি, হলুদিবাড়িতে যাঁর পাটের ব্যবসা ছিল, তিনি এলেন। আজ প্রায় পনেরো বছর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি যখন কলেজে পড়তুম—ইনি তখন এই গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ই মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। মতি দাঁয়ের দোকানের বাইরের বারান্দায় বসে এঁর সঙ্গে কত কি আলাপ হোত। তখন এঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ, এখন পঁয়ষট্টি। কিন্তু তখন ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, ঘোর তার্কিক ছিলেন, অনেক ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতেন। এখন হয়ে পড়েচেন একেবারে অন্য রকম। আর কিছুতে উৎসাহ

নেই, নানারকম বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেচেন। একটা প্রধান বাতিক তার মধ্যে এই দেখলুম যে ও'র বিশ্বাস, ও'র শরীর খারাপ হয়ে গিয়েচে আর সারবে না। আমি কত বোঝালুম, বললুম, 'আপনার বয়েস হয়েচে, তার তুলনায় আপনার শরীর ঢের ভাল। কেন মিছে ভাবচেন ?' ভদ্রলোকের ছেলে আমার সঙ্গে গোপালনগর স্কুলে পড়তো অনেক দিন আগে। সে ছেলেটি শুনেচি মারা গিয়েচে। আমি সে কথা জিজ্ঞেস্ করিনি।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে খানিকদূর এলেন। আমি তাঁকে বোঝাতে বোঝাতে এলুম। তুঁত্‌তলায় স্কুলের কাছে তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েচে, মাথার ওপর বৃশ্চিক উঠেচে, জ্বল্ জ্বল্ করচে নক্ষত্রগুলো—বাঁওড়ের মাথার ওপরে উঠেচে সপ্তর্ষি। এতক্ষণ বিয়ের বড়লোকী-ফন্দর্‌রূপ বন্ধ হাওয়ার মধ্যে থেকে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, এইবার এসে আকাশের দিকে মুক্ত বহুদূর নাক্ষত্রিক জগতের দিকে সেটা ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচলুম।

হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। বেলা খুব পড়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের নির্মেঘ অপরাহ্নের শোভা এত সুন্দর যে যার অভিজ্ঞতা নেই তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে বসে কত কথাই মনে আসে!

হাজার বছর কেটে যাবে—এই রঙীন মেঘমালা, এই গায়কপাখীর দল, এই সব নরনারী, গাছপালা—কোথায় ভেসে যাবে কালস্রোতে; কিন্তু মানুষ তখন থাকবে। নতুন ধরনের কি রকম মানুষ আসবে, কি রকম হবে তাদের সভ্যতা, কি জ্ঞানের আলো তারা পৃথিবীতে জেলে দেবে—এই সব ভাবি।

নদীতে স্নান করতে নেমেচি, পুঁটি দিদি তখনও ঘাটে। বৃশ্চিক রাশির একটা নক্ষত্র খুব জ্বল্ জ্বল্ করচে। নদীর ওপারে সাঁই বাবলা গাছগুলোতে অস্তদিগন্তের রঙীন্ মায়া-আলো পড়েচে।

সারা রাত কাল আম কুড়িয়েচে লোকে লণ্ঠন ধরে। আমার মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে, মাঝে মাঝে দেখি সবাই আম কুড়ুচ্চে।

কাল করুণার সঙ্গে আকাইপুরে গেলুম যেমন প্রতি বৎসর যাই। করুণার মায়ের মুখে সেখানের গল্প শুনে বড় তৃপ্তি পাই। সহায়হরি ডাক্তারের দ্বিতীয় বিবাহের কথা আবার শুনলুম। সে এক করুণ কাহিনী। তারপর শুনলুম মধু মুখুয্যে ও প্রেমচাঁদ মুখুয্যের বাড়ির ডাকাতির গল্প। এ গল্প অবিশ্যি আমি ছেলেবেলায় শুনেচি, তবুও আবার ভাল করে শুনলুম। করুণাদের বাড়ির অতিথি-সেবা ও তার বাপের টাকা ওড়ার গল্প বড় মজার। টাকা আদায় করে নিয়ে আসছিল গোমস্তা। ২৫০ টাকার হিসাব দিলে না। বললে, কর্ত্তা মশায়, মাঠে ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, টাকাগুলো উড়ে গিয়েচে, আর পেলুম না। ওর বাবা তাদের রেহাই দিলেন। মরবার আগে সবাইকে ডেকে বন্ধকী খত ছিঁড়ে ফেললেন। ও'র ছেলেরা কার নামে নালিশ কর্ত্তে যাচ্ছিল, করুণার মা বললেন—শোন্, তা তো হবে না, কর্ত্তা বারণ করে গিয়েচেন মরবার সময়ে। ওদের পীড়ন করতে পারবে না। যা দেয় নাও গে যাও।

একদিকে যেমন করুণার বাবা, অন্যদিকে তেমনি সহায়হরি ডাক্তার। সহায়হরির মত অর্থপিশাচ মানুষ পাড়াগাঁয়ে বেশী নেই। খতে টাকা উশুল দিয়ে নেয় না, অথচ আদায়ী টাকার জন্যে খাতকের নামে নালিশ করে। চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের এক আধলা রেহাই দেবে না খাতককে।

বিকেলে একটু মেঘ করেছিল। গঙ্গাচরণের দোকানে কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলুম। আমি বললুম—কি রাঁধলেন, কবিরাজ মশাই ?—কণ্টিকারীর ফল ভাজা আর ভাত। এই কবিরাজটি বড় অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় সত্তর হবে, কিন্তু সদানন্দ, মুক্তপ্রাণ লোক। কোন্ দেশ থেকে এদেশে এসেচে কেউ জানে না। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তবুও আছে, বলে—এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েচে। সোঁদালি ফুল দিয়ে একটা বালিশ তৈরী করেচে, সেই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে।

একটু পরে ঘন মেঘ করে এল। বেলেডাঙার ওপারে বাঁশবনের মাথার ওপরকার আকাশে যে কি সুনীল নিবিড় মেঘসজ্জা ! মেঘের কোলে আবার একসারি বক উড়ল। কি রূপ যে হোল, আমি বৃষ্টির ভয়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখে আর নড়তে পারি নে। কে একটি মেয়ে নদীর এপারে কালো চুলের রাশি খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি চমৎকার ছবিটি !

আজ বেশ মনের আনন্দ নিয়েই সকাল সকাল বেলডাঙা গিয়েছিলুম। তখনও চারটের গাড়ি যায় নি। গঙ্গাচরণের দোকান খোলে নি। আইনদ্দির বাড়িতে তেল-পড়া নেবার জন্যে পাঁচী পাঠিয়েছিল আবার সঙ্গে জগোকে ও বুধোকে। আইনদ্দির বাড়িতে ছেলেবেলাতে একবার গিয়েছিলুম, ওর ছেলে আহাদ মণ্ডল তখন বেঁচে ছিল। আইনদ্দির বাড়িটা কি চমৎকার স্থানে ! সেখান থেকে দূরের মেঘভরা আকাশের নীচে প্রাচীন বট অশ্বত্থের সারি কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল ! আইনদ্দি চকমকি ঠুকে সোলা ধরিয়ে তামাক সাজলে ও একটা সোলা ফুটো করে আমায় তামাক খেতে দিলে। তারপর সে কত গল্প করলে বসে বসে। ১২৯২ সালে সে প্রথম এদেশে এসে বাস করে। তখন তার বয়েস বিয়াল্লিশ বছর। সে বছর বন্যার জল উঠেছিল তার উঠোনে। মরা গাঙ তখন ইছামতী ছিল, একথা কাল মতি মণ্ডল ওজলের ওপর দাঁড়িয়ে আমায় বলেছিল। আইনদ্দি বললে—বড্ড ফুর্ত্তি করেচি মশাই, যাত্রার দলে গাওনা করেচি, বহুরূপী সেজেচি, বেহালা বাজিয়েচি। আপনাদের শাস্তরটা খুব পড়েচি। ধরো গিয়ে বেরুষোকেতু, সীতার বনবাস, বিদ্যেসুন্দর সব আমার মুখস্ত। তারপর সে 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে খানিকটা মুখস্থ বলে গেল। মহাভারত থেকে 'দাতাকর্ণ' খানিকটা বললে। এখন ওর বয়েস নব্বইয়ের কাছাকাছি, এই বয়সেও সে নিজে চাষবাস দেখে। সে হিসাবে আমি তো এখন নব্য যুবক। আমার সামনে এখন কত সময় পড়ে আছে। মনে করলে কত কাজ করতে পারি। কাল মতি মণ্ডলকে ঘুনি তুলতে দেখেও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

আইনদ্দির বাড়ি থেকে সুন্দরপুরের পথে খানিকটা বেড়াতে গেলুম। মরাগাঙের বাঁকে দাঁড়িয়ে আরামডাঙার ওপারের চক্রাকার আকাশের নীলমেঘের সজ্জার দৃশ্য যেন মনকে কতদূরে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল।

পথে আসতে আসতে একটা করুণ দৃশ্য দেখে সন্ধ্যাবেলাটা মন বড় খারাপ হয়ে গেল। গোয়ালাদের একটা ছোট মেয়েকে তার মা ঘরের উঠোনে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারচে, আর মেয়েটা কাঁদচে। আহা, নিজের সন্তানের ওপর অত নিষ্ঠুরভাবে হাত ওঠায় কি করে তাই ভাবি ! কি করবো, আমার কিছুই করবার নেই। এদিকে বৃষ্টি পড়চে টিপ্ টিপ্ করে, সঙ্গে দুটো ছোট ছোট ছেলে, তাড়াতাড়ি কুঠীর মাঠের বনের পথ দিয়ে আমাদের আর বছরের চড়ুইভাতির জায়গাটা বুধোকে আর জগোকে একবার দেখিয়ে—তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলুম।

আজ দিনটা মেঘে মেঘে কেটেচে ! কিন্তু সকালবেলায় একটু সূর্য্যের মুখ দেখে ছিলুম। মেঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। দুপুরে ঘুমুচ্চি, জগো এসে ওঠালে। একটু পরে খুকুও এল। জানলার গরাদটা ধরে দাঁড়িয়ে তার নানা গল্প। তার মাথা নেই, লেখাপড়া কি করে হবে…এই সব কথা। আমার কর্ত্তব্য হিসাবে তাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলুম। তারপর পাঁচীকে আর ওকে রোয়াকে বসে সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বললুম। খুকু বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনলে। বললে, এ আমার বেশ ভাল লাগে। সূর্য্য সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না। আরও বলবেন একদিন।

তারপর আমি বেলেডাঙ্গার মাঠে বেড়াতে বার হোলাম। কি সুন্দর বিকেলটা আজ! ঠাণ্ডা অথচ পথঘাট শুকনো খট্‌খট্ করচে। মাঠের গাছপালাতে সোনালী রোদ পড়েচে। কুঠীর মাঠে যেতে যেতে প্রত্যেক সোঁদালি গাছ, ঝোপঝাপ, বাঁশবন আমার মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করেচে। নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে তাই মনের আনন্দ জানালুম। কুঠীর মাঠে ঘাসের ওপর এখনও জল বেধে আছে।

কবিরাজ ও গঙ্গাচরণ পথের ধারে মাদুর পেতে বট অশ্বত্থের ছায়ায় বসে গল্প করচে। কাপড় কেটে কবিরাজ নিজেই জামা সেলাই করচে। শুকনো ভেষজ পাতালতা কলকাতায় চালান দেবে, তারই মতলব আঁটচে। বড় ভাল লাগল বিশেষ করে আজ ওদের গল্পসল্প। আসবার সময় ছাতা নিয়ে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েচে, আমাদের ঘাটে যখন নাইতে নেমেচি, আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে।

ক-দিন মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ। বিশেষ করে যখনই কুঠীর মাঠে যাবার সময় হয়, তখনই সেটা বিশেষ করে হয়। কাল যখন বিকেলে ঘন নীলকৃষ্ণ মেঘ করল, তার কোলে বক উড়ল, তখন আমি সেদিকে চেয়ে এক জায়গায় বসে আছি। আবার যখন পুলের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াই অস্ত-আকাশের পটভূমিতে সবুজ বাঁশবনের দিকে চেয়ে থাকি, তখন আমি যেন শত যুগজীবী অমর আত্মা হয়ে যাই—সেদিন যেমন হয়েছিল, আজও তাই হোল। বেলেডাঙার ওদিকে মোড় থেকে চক্রাকৃতি দিগ্‌বলয়লীন শ্যাম বেণুবনের অপূর্ব্ব শোভায় মেঘধূসর আকাশতলে মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন এই শুকনো মরাগাঙে আবার ইছামতী বইবে, তখন আমি কোন্ নক্ষত্রে রইবো—কত কাল পরে—কে জানে সে খবর? বাবলার সোনালী ফুল দোলানো গাছের তলা দিয়ে সেই পথ। ভাবতে ভাবতে চলে এলুম। পুলের ওপর খানিকটা দাঁড়াই। সেই কত কালের প্রাচীন বট অশ্বত্থ, কত কালের আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ি ও বাঁশবনের সারি। মনে এ কয়দিনই সেই অপূর্ব্ব অনুভূতিটা আছে। পুলের পাশে একটা হেলা বাবলা গাছে ফুলের কি বাহার! যখন নদীর ঘাটে এসে নামলুম স্নান করতে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শুধু বৃশ্চিকের একটা নক্ষত্র অস্পষ্টভাবে জ্বলচে। মাথার ওপর দ্যুতিলোক, চারিদিকে নীরব অন্ধকার, নদীজল ও গাছপালার দিকে চেয়ে মনে যে ভাব এল, তা মানুষকে অমরতার দিকে নিয়ে যায়। বুড়ো ছকু পাড়ুই এই সময় তার স্ত্রী আদাড়িকে সঙ্গে করে নদীতে গা ধুতে এল। সে অন্ধকারে চোখে দেখতে পাবে না বলে স্ত্রী ওর সঙ্গে এসেচে।

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আজ বড় আনন্দ পেলাম। দুপুরে পাটশিমলে রওনা হওয়া গেল পায়ে হেঁটে। কবিরাজ মশায় পাঠশালায় ছেলে পড়াচ্চেন, তাঁর কাছে বসে একটু গল্প করে বট অশ্বত্থের ছায়াভরা পথ দিয়ে মোল্লাহাটির খেয়া ঘাটে গিয়ে পার হলাম। কেউটে পাড়ার কাছে গিয়েচি, এক জায়গায় অনেকগুলো বেলগাছ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে।

সেখানে বড় বৃষ্টি এল। পূর্বদিকের আকাশ বৃষ্টিধোয়া, নীল, পরিষ্কার সেই ইন্দ্র নীল রং-এর আকাশের পটভূমিতে দূর গ্রামের তাল খেজুরের সারি, বাঁশবনের শীর্ষ, কি চমৎকার দেখাচ্চে। আর এদিকে ঘন কালো বর্ষার মেঘ জমেচে। গোবরাপুরের মোড় বেঁকে কুঁদীপুরের বাঁওড়ের ওপারের রানীনগর বলে ছোট একটা চাষা-গাঁয়ের দৃশ্য ঠিক যেন ছবির মত। এখানে একজন বৃদ্ধাকে পথ জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন—তোমার নাম বিভূতি? সাতবেড়েতে একবার গিয়েছিলে না? আমি বললুম—হ্যাঁ। আপনি কি করে চিনলেন? তিনি নিজের পরিচয় দিলেন না। গোবরাপুরের একটা দোকানে মণীন্দ্র চাটুয্যের, ভট্টাচায্যির সঙ্গে দেখা। সেখানে বসে একটু গল্প করেই আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। কি ঘন বন পথের দু-ধারে। বড় বড় লতা কালো কালো গাছের গুঁড়ির গায়ে উঠেচে—এই কয়দিনের বৃষ্টিতেই গাছের তলায় বনের ছোট ছোট গাছপালার জঙ্গল বেধে গিয়েচে। 'বৌ-কথা-কও' ডাকচে চারিধারে। কেউটে পাড়ার গায়ে পথের ধারের একটা সোঁদালি ফুল গাছে এই আষাঢ় মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়েও অজস্র ফুল দেখেছি। পাটশিমলের মধ্যে কি ভীষণ tropical forest-এর রাজত্ব! ছোট ছোট জাম ফলে আছে বুনো জামগাছে—বড় বড় লতা-বনের মধ্যেটা মিশ-কালো। পাটশিমলের মোহিনী কাকার সঙ্গে বাঁওড়ের ওপারে একটা চাষাগাঁয়ে দেখা হোল। তিনি আমার সঙ্গে গেলেন প্রায় বাগান গাঁ পর্যন্ত। পিসিমার বাড়ি গেলুম তখন সন্ধ্যা হয়েচে। পিসিমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। দু-জনে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করা গেল। সকালে কোদলার জলে নাইতে দিয়ে দেখি যে টলটলে জল আর নেই নদীর—কচুরি পানায় নদী মজে গিয়েচে, জল রাঙা, ঘোলা—সেইটুকু জলে সব লোকে নাইচে, গোরু বাছুরের গা ধোয়াচ্চে।

পরদিন সকালে খাওয়া দাওয়া করে বৃষ্টি মাথায় আবার বাড়ি রওনা হই। সারাপথটা বর্ষা আর বাদলা—কিন্তু খুব ঠাণ্ডা দিনটা। আমার সেই ঘন বন—পাটশিমলে থেকে গোবরাপুরের পথে দু-জন চাষা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলুম। আবার সেই ঘন tropical forest-এর মত বন, বড় বড় কাছির মত লতা—পথ নির্জন, টুপটাপ করে জল ঝরে পড়ছে গাছের মাথা থেকে, আরণ্যশোভা কি অদ্ভুত! রানীনগরের এপারে একটা সাঁকোর ওপর কতক্ষণ বসে বসে নীল আকাশের পটভূমিতে আঁকা গ্রামসীমার বাঁশবনের দিকে চেয়ে রইলুম। মোল্লাহাটির ঘাট যখন পার হই, তখনও খুব বেলা আছে। আজ মোল্লাহাটির হাটবার, হাটে গিয়ে একটা আনারসের দর করলুম। সুন্দরপুরের গোয়ালাদের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হোল। মনে পড়ছিল আজ ওবেলা যখন আসছিলুম পাটশিমলের ঘন ক্ষুদে জামবনের মধ্যের সেই পথটা দিয়ে—মনে হচ্ছিল আমি একজন বন্ধনহীন মুক্ত পথিক, দেশে দেশে এই অপূর্ব রূপলোকের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই আমার জীবনের পেশা। কি আনন্দ যে হয়েছিল, কি অপূর্ব পুলক, মুক্তির সে কি অমৃতময়ী বাণী! কেন মানুষে ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটরে কি রেলের গাড়িতে বেড়ায়? পায়ে হেঁটে পথ চলার মত আনন্দ কিসে আছে? সে একমাত্র আছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ আমি জানি। তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না।

মোল্লাহাটির হাট ছাড়িয়েচি, পথে আমাদের গাঁয়ের গণেশ মুচি নকফুল গ্রামে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্চে। ওকে দেখে বড় আনন্দ হয়—শান্ত, সরল, সাধুপ্রকৃতির লোক বলে বাল্যকাল থেকে ওকে আপনার-জনের মত দেখি।

বেলা যাব-যাব হয়েচে দেখে একটু জোর-পায়ে পথ হাটতে শুরু করলুম। খুব রাঙা রোদ উঠেচে চারি ধারে। খাবরাপোতা ছাড়লুম, সামনে আইনদ্দির বাড়ির পেছনের

প্রাচীন বটগাছটা, আইনদ্দির বাড়ির মোড় থেকে দেখতে পাওয়া সেই দূরপ্রসারী দিগবলয়—আজ আবার মেঘভাঙা রাঙা অস্ত সূর্যের রোদ পড়েচে দূরের সেই সব বাঁশবন, শিমুলবনের মাথায়, ঝিঙে খেতে ফুল ফুটেচে, বৈশাখের গায়ক পাখী পাপিয়া আর 'বৌ-কথা-কও' চারিদিকে ডাকচে, বেলেডাঙার হাজারী ঘোষ গোরুর পাল নিয়ে নতিডাঙার খড়ের মাঠ থেকে বাড়ি ফিরচে, মেয়েরা মরগাঙের ঘাট থেকে কলসী করে জল নিয়ে যাচ্চে,—কি সুন্দর শান্ত গ্রাম্য দৃশ্য, একবার মনে হ'ল পাটশিমলের সেই কালীবাড়ি ও দেবোত্তর বাঁশঝাড়ের কথা। আজ দুপুর বেলা সেখানে ছিলাম, কালীবাড়ির পেছনের এক গৃহস্থের বাড়ির বৌ প্রতিবেশিনীকে ডেকে বলছিল—ও সেজ বৌ, একটু তরকারী দেবো, খুকীকে দিয়ে বাটি পাঠিয়ে দ্যাও তো!

সন্ধ্যার আগে কতদূর এসে গিয়েচি। সন্ধ্যাও হল, বাড়ি এসে পা দিলাম, আমার পথ চলাও ফুরুল।

আজ শরতের অপূর্ব দুপুরে পাগল করেচে আমায়। অনেক দিন লিখি নি—নানা গোলমালে অবসাদে মনটা ভাল ছিল না—আজ রবিবার দিনটা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠেচি—কি পরিপূর্ণ ঝলমলে শরতের দুপুর। এর সঙ্গে জীবনের কি যে একটা বড় যোগ আছে—ভাদ্রমাসের এই রোদভরা দুপুর কেন যে আমায় পাগল করে তোলে। বনে বনে মটরলতার কথা মনে পড়ে, ইছামতীর ঘোলা জল, পাখীর ডাক—মনটা যেন কোথায় টেনে নিয়ে যায়! সব কথা প্রকাশ করা যায় না—কারণ আনন্দের সবটা কারণ আমারই কি জানা আছে? কি করচে খুকু এই শরৎ দুপুরে, বকুলতলায় ছায়ায় ছায়ায়, একথাও মনে এসেছে। ওর কথা ভেবে কষ্ট হয় যে, ওর লেখাপড়া হ'ল না।

কাল দিনটি বড় সুন্দর কেটেচে, তাই আজ মনে হচ্চে আজ সকালটিও বড় চমৎকার। অনেকদিন কলকাতায় একঘেয়ে জীবনযাত্রার পরে কাল বাড়ি গিয়েছিলুম। প্রথমেই তো খয়রামারি মাঠে দুপুরের রোদে বেড়াতে গিয়ে সবুজ গাছপালা লতাপাতার গন্ধে নতুন জীবন অনুভব করলুম। হাওয়াতেও একটা তাজা গন্ধ আছে যা কিন্তু শহরে নেই। ঝোপে থোলো থোলো মাখম শিমের নীলফুল ফুটেচে, মটরলতার সবুজ ফল ও সোঁদালি গাছের কাঁচা সুঁটি বন-জঙ্গলের শোভা কত বাড়িয়েচে—তাদের ওপর আছে শরতের মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ, আর আছে তপ্ত সূর্য্যালোক। প্রতিবারই দেখেচি নতুন যখন কলকাতা থেকে আসি এমন একটা আনন্দ পাই! মনে হয় এই তো নীলাকাশ আছে মাথার ওপর, চারিপাশে বেষ্টন করে রয়েছে ঘন সবুজ গাছপালার ঝোপ, পাখীর ডাক আছে, বনফুলের দুলুনিও আছে—এ থেকে তো এতই আনন্দ পাচ্চি—তবে কেন মিথ্যে পয়সা খরচ করে দূরে যাই! দূর আমায় কি দেবে, এমন কি দেবে যা এখানে আমি পাচ্চি নে? আসল কথা দূরও কিছু নয়, নিকটও কিছু নয়—প্রকৃতি থেকে আনন্দ সংগ্রহ করবার মত মনের অবস্থা তৈরী হয়ে যদি যায় তবে যে কোনো জায়গায় বসে দুটো গাছপালা, একটুখানি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, দুটো বন্য পক্ষীর কলকাকলী, বনফুলের শোভাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায়।

কাল বারাকপুরে গেলুম সকাল বেলা। দুপুরে ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে সত্যি বড় আনন্দ পেয়েচি। কূলে কূলে ভরা নদী, দু-ধারে অজস্র কাশফুল, আরও কত কি লতা ঝোপ, বর্ষার জলে সব ঘনসবুজ—চকচক করচে কালো কচুর পাতা, মাখম শিমের নীল ফুল ফুটেচে—একটা গাছে সাদা সাদা বড় বড় ঢোল-কলমীর ফুলও দেখলুম।

বৈকালে যখন, খুকু, আমি আর কালো নৌকোতে বনগ্রামে আসি, তখনও দেখলুম দু-ধারে গাছপালার কি অপরূপ রূপ, বনের ফুলের কি শোভা !

ছকু মাঝিকে জিজ্ঞেস্ করলুম—ওটা কি ফুল ছকু ? ছকু বললে—কোয়ারা···

খুকুকে কাশফুল দিয়ে একটা বাংলা সেন্টেন্স তৈরী করতে দিলাম !

রাঙা-রোদ বৈকালটি মেঘমুক্ত আকাশে, নদীতীরে অপূর্ব শোভা বিস্তার করচে।

কাল রাত্রের ট্রেনে তারাভরা আকাশের তলা দিয়ে যখন এলুম, সেও বেশ লাগছিল।

আজ স্কুলের ছুটি হবে। সুন্দর প্রভাতটি।

আজ সকালটি বড় সুন্দর ! গুয়া নদীতে হাতমুখ ধুয়ে এসে বটতলায় এসেচি—দূরে সবুজ পাহাড়শ্রেণী—সকালের হাওয়ায় একটু যেন শীতের আমেজ। কাল ঘন জঙ্গলের পথে আমরা অনেকদূর গিয়েছিলুম, পথে পড়ল দুখানা সাঁওতালী গ্রাম। বরমডেরা কুলামাতো। আর বছর যে রাস্তা ধরে সার্টাকিটা গ্রামে যাই, এবার সে রাস্তায় না গিয়ে চললুম সোঝা ধনঝরি পাহাড়ের দিকে। বামে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি। সামনে ডাইনে পিছনে চারিদিকেই পাহাড়। নীলঝরণার ওদিকের পাহাড়ের বড় বড় সামনের চাইগুলি নীল আকাশের পটভূমিতে লেখা আছে। ছোট একটি পাহাড়ী ঝরনা এক জায়গায়। ঝরনা পার হয়ে দু-ধারে শাল, মহুয়া, তমালের বন, বুনো শিউলি গাছও আছে। একটা ভাল জায়গা দেখে নিয়ে আমরা চা খাবো ঠিক করলুম। বন সামনের দিকে ক্রমেই ঘন হচ্চে, ক্রমে একধারে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, বড় বড় বনের গাছে ভরা, আর বাঁ দিকে অনেক নিচে একটা ঝরণা বয়ে যাচ্চে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার মধ্য দিয়ে। আমরা দূরে থেকে ওর জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। সবাই মিলে নেমে গিয়ে বড় বড় গাছ ও মোটা কাছির মত লতা দিয়ে তৈরী প্রকৃতির একটি ছায়াশীতল ঘন কুঞ্জবনে একখানা বড় চৌরস কালো শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বসে চা পান করা গেল। টাঙি হাতে একজন সাঁওতাল জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে যাচ্ছে, বললে—বেশী দেরি করবেন না, একটু পরে এখানে বুনো হাতী জল খেতে নামবে। গাছপালার মাথায় মাথায় শরতের অপরাহ্নের রাঙা রোদ। সামুনে পেছনে বড় বড় পাথর, একখানার ওপর আর একখানা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে—ওদিকে আরও ঘন জঙ্গলের দিকে ঝরনার পথ ধরে খানিকটা বেড়িয়েও এলুম। বেলা পড়লে রওনা হয়ে ছায়াভরা পার্ব্বত্যপথে হেঁটে আমরা এলুম নীলঝরনার উপত্যকার মুখ পর্য্যন্ত। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি মাথা খাড়া করে আছে। আশেপাশের বন্য সৌন্দর্য্য সন্ধ্যার ছায়ায় আরও সুন্দরতর হয়েচে—সেইদিনই যে সুদূর পথে ইছামতীতে আসবার সময় আমাদের ভিটেটাতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখেছিলুম—সে কথা মনে পড়চে। নীরদবাবু ও আমি নীল ঝরনা বেড়িয়ে অনেক রাত্রে বাংলোতে ফিরি।

সকালে উঠে সুবর্ণরেখার পুলের ধারে মাছ কিনতে এলুম। সকালটি বড় চমৎকার, নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে চাইলে কত কালের কত সব কথা যেন মনে পড়ে। পুল থেকে চারি ধারে চেয়ে দেখি মাছ বা জলের সম্পর্কও নেই কোনো ধারে। নিচে নেমে ছায়ায় একটা শিলাখণ্ডে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—ভাবচি সুপ্রভার পত্রের আজ একটা উত্তর দেব। ওখান থেকে ফিরে এসে বাংলোর পেছনে যে পাহাড়ী নদী—তাতে নাইতে গেলুম আমি আর শংকর। সুন্দর নদীর ঘাটটি, পাথর একখানা বড় ঘাটে ফেলা আছে, জলের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে জলজ লিলি ফুটে। সামনে থৈ থৈ করচে পাহাড়শ্রেণী, ঘন সবুজ তার সানুদেশ। দূরে Governor's pool-এর কাছে একটা গাছের আঁকাবাঁকা মাথা সবুজ পাহাড়ী ঢালুর পটভূমিকে দেখা যায়। এ ক-দিনের প্রখর সূর্য্যালোক আর বছরের এ সময়ের বর্ষা-বাদলের

কথা মনে করিয়ে দেয়···সূর্য্যের আলো না থাকলে এসব পাহাড় শ্রেণী, এ পাহাড়ী নদী, এই গাছপালা—এই প্রসারতা এত ভাল লাগত ? এই এখন বসে আছি বাংলোর বারান্দাতে, দূরে দূরে কালাঝোর ও অন্যান্য পাহাড় শ্রেণী অপরাহ্ণের পড়ন্ত রোদে কি সুন্দরই না দেখাচ্চে ! দুপুরে মহুলিয়ার পোস্ট মাস্টার এসেছিল, কেষ্ট আবার এসেছিল—ওরা বললে সেদিন যে হাতীঝরনায় গিয়ে চা খেয়েছিলুম, তার ওদিকে বাঁকাই বলে গ্রাম আছে, গভীর জঙ্গল তার ওপারে—ধান পাকলে নিত্য হাতীর দল বার হয়। বাসাডেরা ও ধাড়াগিরির পথ এখন নিরাপদ নয়, কেষ্ট বলছিল। সেদিকে এখন জঙ্গলও খুব ঘন, তাছাড়া বড় বাঘের ভয় হয়েচে, অনেকগুলো মানুষ-গরুকে বাঘে নিয়েচে এ বছর। সাতগুড়ুমের পথেও বাঘের উপদ্রব হয়েছে এ বছর।

পোস্ট মাস্টার বললে—আপনার জন্যে জমি রেখে দিলে বিষ্টু প্রধান, আর আপনি মোটে এলেন না। নেন যদি, জমি এখনও আছে।

বিজয়ার দিন মহুলিয়া যাবো, সেখান থেকে টাটানগর ও চাঁইবাসা।

এইমাত্র পাহাড়ের সানুদেশে বসে হালুয়া তৈরী করে চা খাওয়া গেল। মাথার ওপর অষ্টমীর চাঁদ, আকাশে দু-দশটা তারা, সামনে অরণ্যাবৃত পাহাড়ের অন্ধকার সীমারেখা, দূরে বামদিকে অরণ্য আরও গভীর, মৃদু জ্যোৎস্নালোকে পাহাড়, উপত্যকা, সানুদেশস্থ বনানী অদ্ভুত হয়েচে দেখতে। আজই পট্টনায়েকবাবু বলেছিলে ৪নং shift-এ বাঘ আছে, সেজন্যে সন্ধ্যার পরে আমাদের সকলের গা ছম্‌ছম্ করচে। রামধন কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেচে পাছে বাঘভাল্লুক আসে সেই ভয়ে। কেবলই মনে পড়তে থাকে আজ মহাষ্টমীর সন্ধ্যা, বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামে এই সময়টিতে পুজোর চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর আরতি হচ্চে শঙ্খঘণ্টা রবের মধ্যে, ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে নতুন কাপড় পড়ে ঘুরচে—আর আমরা সিংভুমের এক নির্জ্জন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত পাহাড়ের মধ্যে বসে গল্প করচি ও প্রকৃতির শোভা দেখচি।*

ওখান থেকে ফিরচি, রুথামের মুদীর দোকানের সামনে সাঁওতালী নাচ হচ্চে, মাদল বাজার তালে তালে। আমাদের একটা কম্বল পেতে দিলে, আমরা অষ্টমীর চাঁদের নিচে পাহাড়ের সামনের ছোট গ্রামে খাঁটি সাঁওতালী নাচ দেখে বড় আনন্দ পেলুম। কবিরাজের সঙ্গে বসে একটু গল্প করা গেল। তার বাংলোর সামনে কবে রাত্রে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়েছিল। সাঁওতালদের গোরস্থানে সেবারে ভুত দেখেছিল, ইত্যাদি কত গল্প।

মহুলিয়াতে আজ সারা দুপুর ঘুরে বেড়িয়েচি। বাদলবাবুর বাংলো থেকে কালাঝোরের দৃশ্যটি বেশ লাগল। বলরাম সায়েবের ধারে সেই গাছটি, নানারকমের পটভূমিতে দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্য্যালোকে কি অদ্ভুত যে দেখাচ্ছিল ! তিনটের ট্রেনে গেলাম টাটানগর। বাসে কাশিডি নেমে আশুর বাসা খোঁজ করে বার করি। সে একটা গন্ধরাজ ফুলগাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দু-জনে সন্ধ্যার পরে নিউ এলু-টাউনে প্রতিমা দেখে এলাম। লোক-জনের ভিড়, মেয়েদের ভিড়, তারপর ওল্ড এলু-টাউনের প্রাইমারি স্কুলে ঠাকুর দেখি। একবার আশু বাড়ি এল মোটর লরি দেখতে—পাওয়া গেল না, তারা সব বর্ম্মা জিঙ্কে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। হেঁটে বর্ম্মা জিঙ্ক যাবার পথে ডুপ্লে প্ল্যাণ্ট ও slug ঢালার সময়কার রক্ত আভা থেকে মন হ'ল আগ্নেয়গিরি কখনো দেখি নি, বোধ হয় এই ধরনের জিনিস হবে। ওই সাদা আগুনের স্রোতের মতই তার উষ্ণ লাভা-স্রোত। বর্ম্মা মাইনসের ঠাকুর সাজিয়েচে খুব ভাল, আবার তার সামনেই একটা কৃষ্ণলীলার ছবি সাজিয়েচে। বাসে স্টেশনে জুগসলাই ও

* এই অংশটি ৪নং shift-এর বসে লেখা।

বিষ্ণুপুর ঘুরে কাশিডি এলাম। পথে বাস হাঁকছে, টিনপ্লেট, বর্ম্মা জিংক, যেমন কলকাতায় হাঁকে 'ভবানীপুর', 'আলিপুর'।

সকালে টাটানগর থেকে প্যাসেঞ্জারে বাসায় নামলুম। শ্যামপুর গ্রামখানা পাহাড়ী নদীর ঠিক ওপারে, কাঁকুরে জমি, কাছেই এদেশের ধরনের বনজঙ্গল। পথে সিংভুমের প্রকৃত রূপ দেখলুম, অর্থাৎ উচ্চাবচ ভূমি, পাথরের চাঁই, শাল ও কেঁদ গাছ, রাঙা মাঠ। তিনটের ট্রেনে মহুলিয়া থেকে বাদলবাবু, বিশ্বনাথ বসু প্রভৃতি অনেকে এল। অশ্বত্থ তলায় বসে চা খাওয়া গেল। বেলা পড়ে এসেচে। দুটো বাজে। সে সময় আমি একা গেলুম পাহাড়ী নদীর ধারে শালচারার জঙ্গলে—একা বসতে। সামনে পাহাড় শ্রেণী থৈ থৈ করচে, দূরে কালাঝোরের নীল সীমারেখা নীল আকাশের কোলে। ঐ দিকে আজ বাংলাদেশে আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারে আড়ং বসেচে, কত দোকানদারের কত বেচাকেনা, কত নতুন কাপড়-পরা ছেলেমেয়েদের ভিড়। পাথরের ওপর অপরাহ্নের ঘনায়মান ছায়ায় এক জায়গায় বসে চারিধারের মুক্ত প্রসারতা দেখে কেবলই বাংলা-জোড়া বিজয়া দশমীর উৎসব ও কত হাজার হাজার ছেলে-মেয়েদের হাসিমুখ মনে পড়ল। দূ-দিনের বিজয়া দশমীর কথা আনার মনে আছে ছেলেবেলাকার।...যুগল কাকা সেদিন এসে রান্নাঘর ও বড় ঘরের মাঝখানে উঠোনেতে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রণাম করলেন।...আর যেদিন গঙ্গা বোষ্টমকে আমরা আশুদের চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্মণ ভেবে ভুলে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিলুম।

আজকার দিনে যেখানে যত লোককে ভালবাসি সকলের কথাই মনে পড়ল, তাদের মধ্যে কাছে কেউই নেই, অনেকে পৃথিবীতেই নেই, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে আমার এ প্রীতিনির্দ্দেশ হয়তো বা ব্যর্থ যাবে না।

গালুডির হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে অনেককাল পরে আজ দেখা। সে গিয়েছিল ধলভুমগড়ের রাজবাড়িতে রোগী দেখতে, আমরা এখানে আছি শুনে বাদলবাবুদের সঙ্গে এখানে ট্রেন থেকে নেমেচে; তার সঙ্গে জ্যোৎস্নাফুল্ল সন্ধ্যায় পাহাড়ী নদীর ধারে তপ্ত শীলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলুম। অমনি যেন অন্য এক জগতে এসে পড়েচি মনে হ'ল। দূরে নদীর কুলুকুলু জলস্রোত, ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র পাহাড় শ্রেণী, খুব একটি আঁকাবাঁকা কি গাছ, আর এক প্রকারের বন্যফুলের মিষ্টি সুবাস—মাথার ওপরের নক্ষত্রবিরল আকাশ—সবগুলো মিলে আমায় এমন এক রাজ্যে নিয়ে গেল যে চুপ করে সেদিকে চেয়ে বসেই থাকি, হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা আর আমার হয় না, কথা বলবার মত মনও নেই, কেমন যেন হয়ে গেলুম। দু-জনেই চুপচাপ, কতক্ষণ বসে থেকে রাত দশটার কাছাকাছি বাংলোতে ফিরি।

বৈকালে নীলঝরনা বেড়াতে গেলুম কিন্তু বেলা গিয়েছিল বলে বেশীক্ষণ নীলঝরনার উপত্যকায় বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। পাহাড়ের ওপারে উৎরাই-এর পথে বনতুলসীর জঙ্গলে ঘন ছায়া নেমেচে, তার মধ্যে বড় বড় কেঁদ গাছ, সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথায় অস্তমান সূর্য্যের আভা একটু। ঝরনা পেরিয়ে বরমু-ডেরার পথে খানিকটা গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় পাথরের স্তূপ খুঁজচি, জনকয়েক লোক কুলামাতোর দিক থেকে আসচে, ওদের সঙ্গ নিলুম। ওরা বললে, তুই এখানে কি করচিস রে? বললাম পাথর কিনতে এসেচি।

৪নং shift-এর কাছে এসেচি তখনও জ্যোৎস্না ওঠে নি, মুদীর দোকানটা আজ বন্ধ, রাধাচূড়া গাছে যে ফুলের লতাটা সেদিন দেখেছিলুম, তাতে আজ আর ফুল নেই। এঞ্জি-নিয়ারের বাংলোতে লোক খাটচে কারণ ডেপুটি কন্‌জারভেটর অফ ফরেস্টস্ এখানে এক-

মাসের মধ্যে এসে বাস করবে। পট্টনায়েক যে বাংলো দেবে বলেছিল, সেটা দেখলাম। বড় বড় গাছের মধ্যে বাংলোটা, বারান্দায় বসে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির দৃশ্য উপভোগ করা যায়। নিকটেই নীলঝরনা, জলের কষ্ট হবে না।

কবিরাজ নেই, ডাক্তারও নেই ওদের বাংলোতে। কবিরাজ গিয়েচে টাটানগর; ডাক্তার গিয়েছে মহুলিয়া, কাজেই বিজয়ার সম্ভাষণ এদের আর জানানো গেল না। ফিরবার পথে আমি গুররা নদীর ধারের পুলের ওপর বসে রইলুম অনেকক্ষণ। দূরে কালাঝোর জ্যোৎস্না রাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। পাহাড়ী নদীর কুলুকুলু শব্দ যেন সঙ্গীতের মধুর শোনাচ্চে। তামা পাহাড়ের মাথার ওপর দু-একটা তারা মনকে নিয়ে যায় অনেক দূরে, কতদূরে, পৃথিবী পার করিয়ে অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

একটু পরে পট্টনায়েক এল পুলের ওপরকার কাঠ ধরে। আমি বসে আছি দেখে বললে, চলুন আমার বাসায়। একটু বিজয়ার মিষ্টিমুখ করবেন।

আমি বললুম—হেঁটে ক্লান্ত আছি, আজ আর নয়।

তারপর সে অনেকক্ষণ বসে নানা গল্প করলে। রাত নটার সময় বাড়ি ফিরি।

পশুপতিবাবু আজ আসবেন কথা ছিল, এলেন না, সেজন্যে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আমি আর নীরদবাবু বেরুলাম সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে। যাওয়ার পথে অপরাহ্ণের ঘন ছায়া নেমে এসেছে পাহাড়ের অধিত্যকায়, তার কোলে-কোলে এদিকে ওদিকে চারিদিকে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। সমস্ত দিনের অবসাদ একমুহূর্ত্তে কেটে গেলে যেন, সেদিকের অপরূপ সন্ধ্যার পানে চাইলুম। ওখান থেকে এসে নীলঝরনার দিকে চলি। তামা পাহাড়ের ওপর উঠলুম পিয়ালতলা দিয়ে। বড় বট গাছটাতে একরাশ জোনাকী জ্বলচে, ওধারে উঠেচে ত্রয়োদশীর চাঁদ, তামা পাহাড়ের বিরাট অধিত্যকার গায়ে পূব থেকে পশ্চিমে দীর্ঘ বড় বড় ছায়া পড়েচে। আমরা দু-ধারে পাহাড়ের গিরিপথটা পার হয়ে নামলুম ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র উপত্যকায়। বনতুলসীর জঙ্গল আর তার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শাল ও তমাল। চারিধারে রূপ যেন থৈ থৈ করচে। পাহাড়ের মাথায় এদিকে ওদিকে দু-চারটি নক্ষত্র। নীলঝরনার জল পার হয়ে বরমুডেরার পথে একজন পাহাড়ী লোকের সঙ্গে দেখা।

সে একা একটা লাঠি হাতে গান গাইতে গাইতে চলেচে কুলামাতোর দিকে। তাকে বললাম—অত জঙ্গলে এত রাত্রে একা যাবি, যদি বাঘের হাতে পড়িস্।

সে বললে—খেদিয়ে দিব বাবু!

অর্থাৎ সে লাঠি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেবে। আমরা আর একটু এগিয়ে যেতেই চারিধারের পাহাড়ী অধিত্যকার নির্জ্জনতায় জ্যোৎস্না-ধৌত সৌন্দর্য্যে যেন কেমন হয়ে গিয়েচি। একটা ভারি আশ্চর্য্য জিনিস দেখা গেল। দূরে ধঞ্জরী শৈলমালার গায়ে একটা নক্ষত্র জ্বলছিল, খানিকক্ষণ থেকে সেটা আমরা দেখচি। আর আমি মাঝে মাঝে দেখচি ডাইনের রুখাম পাহাড়ের দিকে, বাংলা দেশের আলো ছায়া ভরা কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রের কথা ভাবচি, এমন সময় নক্ষত্রটা যেন টুপ করে খসে গেল পাহাড়ের ঢালু থেকে। আর সেটা দেখা গেল না। আমরা দু-জনেই অবাক হয়ে রইলুম।

সবুজ ঝরনার কাছে এসে বসলুম, ওখানে একটি সুবৃহৎ শিমুল গাছের শাখা নত হয়ে আছে। ঝরনার জলের ওপর কুলুকুলু ক্ষীণ শব্দ হচ্চে ঝরনার জলধারার, জ্যোৎস্না রাত্রে ঝরনার জল চিক্‌চিক্ করচে, বড় শিমুল গাছের মাথায় একরাশ জোনাকী জ্বলচে, সে এক অপরূপ ছবি। ছবিটা বহুদিন মনে থাকবে। তারপর রুখামের পাহাড়ের একেবারে মাথায় একটা বড় শিলাখণ্ডের ওপরে উঠে বসি। যেদিকে চাই, জ্যোৎস্নাবিধৌত বনরাজি-

শোভিত শৈলমালা, দূরে টাটার কারখানার রক্ত-আভা যেন বহুদূরের কোন অজানা আগ্নেয়গিরি অগ্নি-গহ্বরের রক্তশিখার আভা বলে মনে হচ্ছে। পিছন দিকের ঢালুটা সহজ বলে মনে হ'ল, সেখানেই নেমে জঙ্গলের মধ্যে পথ ঠিক করতে পারচি নে। নারীকণ্ঠে বললে কে, এদিক দিয়ে বাবু। চেয়ে দেখি নিচে একটা সাঁওতালদের ঘর। নেমে এলুম তাদের উঠোনে। দুটি মেয়ে ও একটি পুরুষ উঠোনে আগুন জেলে সম্ভবতঃ আগুন পোয়াচ্চে।

আমরা তাদের জিজ্ঞেস করলুম—এই বনে পাহাড়ের নিচে আছিস্ কেমন করে, হাতী নামে না?

তারা সবাই দেখলুম অদৃষ্টবাদী। বললে—বাবু, ভয় করে কি হবে? যেদিন বাঘে নেবে সেদিন নেবেই।

রুথাম থেকে আমাদের বাংলো প্রায় দু-মাইল, এদিকে রাত হয়েচে, ন-টা বাজে। আর বেশীক্ষণ এ সব জায়গায় থাকা ভাল নয় বুঝে দু'জনে বেশ জোর পায়ে হেঁটে রাত পৌনে দশটায় পরিপূর্ণ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে বাংলোতে পেঁছে গেলাম।

আজকার রাতের জ্যোৎস্নাটি আমাকে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কেন এত? Shuqul সাহেবের বাগানের মধ্যের গাছগুলো ঠিক যেন ইস্মাইলপুর কাছারীর চারিপাশের সেই বনঝাউ গাছ। আহারাদির পরে বাংলোর সামনে বসে গল্প করচি, একটা প্রকাণ্ড উল্কা জ্বলতে জ্বলতে অত জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও ঠিক যেন হাউই বাজির মত আগুনের রেখা সৃষ্টি করে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

ভারি সুন্দর ভুমিশ্রী সিংভূমের, ভারি চমৎকার জ্যোৎস্না-রাত্রিটা আজ! অনেককাল এদের কথা মনে থাকবে।

রাখামাইন্‌স্ থেকে এসেও যখন বারাকপুরের এই গাছগুলোর গন্ধ, ছায়া ও শ্যামলতা আমাকে এত মুগ্ধ করেচে তখন আমাদের এ অঞ্চলের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমার মত আরও দৃঢ় হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সকালে একটু রোদ উঠলে যখন গাছপালায় ঝোপে, ছায়ায় ছায়ায় বেড়ান যায় তখন যে বনলতার কটুতিক্ত সৌরভ, বনফুলের সুবাস পাই, পাখীর যে কলকাকলী শুনি, কোথায় এর তুলনা? পাহাড় শ্রেণী না থাকলে রাখামাইন্‌স্ তো মরুভূমি। তবে পাহাড়ের ওপরকার বন সকালের ছায়ায় ভাল হয় কিন্তু কেন জানি না সেখানে এ ধরনের কোমলতা নেই, স্নিগ্ধ নয় রুক্ষ। শাল তমাল গাছের বৈচিত্র্য নেই, তারা মোহ সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের বনে লতা নেই, প্রাকৃতিক কুঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে এমন পুষ্পিত বৃক্ষ বা লতা নেই। এই সব জন্যেই তো প্রথম হেমন্তে দেশের বন এত ভাল লাগে। সুস্মিত জ্যোৎস্না রাতে কোথায় এমন পুষ্পিত তৃণপর্ণের মন মাতান সৌরভ!

কাল বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে কুঠির মাঠের বনশোভা দেখে আরও বেশী করে আমার থিওরীটার সত্যতা উপলব্ধি করলুম অর্থাৎ আমাদের এ অঞ্চলের গাছপালার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য সিংভূম সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ার অরণ্যের শোভার অপেক্ষা অনেক বেশী। কত কি লতা, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ধরণের পত্রবিন্যাস—এত বৈচিত্র্য কোথায় ওসব দেশের অরণ্যে? আমি রাখামাইনস্ থেকে বারো মাইল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সবটাই হেঁটে মুসাবনি রোড পর্য্যন্ত গিয়েচি, সিংভূমের বিখ্যাত সারেণ্ডা ফরেস্ট দেখেচি, গবর্নমেণ্ট প্রোটেক্টেড্ ফরেস্টের মধ্যে গিয়েচি। সেখানে বন খুব ঘন ও বহুবিস্তৃত বটে কিন্তু বনশোভা নিম্নবঙ্গের বনের মত নয়। ও অঞ্চলের বড় বড় গাছের মধ্যে শাল, কেঁদ, আসান, পলাশ ও মাঝে মাঝে আমলকী ও বন্য শেফালি এই কটি প্রধান। বন্যলতা আমার চোখে অন্ততঃ পড়ে নি। কোন কোন স্থানে শিমুল বৃক্ষ আছে। সারবান কাঠ বাংলাদেশের বনে তত নেই যত ওদেশে

আছে কিন্তু আমার বলবার উদ্দেশ্য বাংলা দেশটাতে যদি আজ সারেন্ডা রিজার্ভ ফরেস্টের মত একটা অরণ্য গড়ে উঠত, তার বনবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য এবং নিবিড়তা অনেক বেশী হ'ত—শ্রীনগরের ও ছঘরের পথের ধারের বন দেখে এ ধারণা আমার মনে আরও বদ্ধমূল হয়েছে। তবে বাংলার বনে পাহাড়ী নদী বা ঝরণা নেই, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড নেই—তেমনি ও সব বনের পথে এত পাখী নেই, বিচিত্র বর্ণের বনপুষ্পের সুবাস নেই।

এ আমি স্বীকার করি যদি বাংলা দেশের বনভূমির পিছনে থাকত দূরবিস্তৃত নীল গিরিমালা, মাঝে মাঝে যদি কানে আসত পাহাড়ী ঝরনার কুলকুল শব্দ, শিলাসন আবৃত থাকত স্নিগ্ধ ছায়া ঝোপের নিচে, চরত ময়ূর, চরত হরিণ-নন্দন—উপলাকীর্ণ বন্য নদীর শিলাময় দুই তটে স্তবকে স্তবকে সুবাসভরা বনকুসুম ফুটে থাকত—গিরি-সানুদেশে থাকত ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশবন—তবে এ বন আরও সুন্দর হ'ত।

কল্পলোক ছাড়া সে বন কোথায়—যেখানে এত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ সম্ভব? অন্ততঃ আমি তো দেখি নি।

যদি কোথাও এমন থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে তবে আমার সন্দেহ হয় তা আছে বা থাকা সম্ভব গোদাবরী তীরের অরণ্যে, রাজমহেন্দ্রী থেকে গোদাবরীর উজান পথে গিয়ে উতকামন্দ ও কোদাই কানাল অঞ্চলে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের রিজার্ভ ফরেস্টে, হিমালয়ের নিম্ন অধিত্যকায়, আসামের বনে। যদিও এদেশের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করচি তা আছে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল। জগো আর গোপালকে সঙ্গে নিয়ে বন-ফুলের সুবাসভরা বনপথ দিয়ে বেলেডাঙার আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ি গেলাম। অইনদ্দি যত্ন করে বসালে—ও নিজে কত গ্রামে পরিচিত সে গল্প করলে। 'বহুরূপী সেজেচি বাপু, কাটামুণ্ডুর খেলা খেলেচি—নাগরদোলা ঘুরিয়েচি।'

আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বললুম—চাচা তোমাকে অনেক দূরের লোকে জানে।

ও বড় খুশি হ'ল। বললে—শোন তবে আমায় কত গাঁয়ের লোকে জানে। এই কাটকোমরা, ইচ্ছেপুর, মেটিরি, শুলকো হানিডাঙা···

ওর তালিকা আর শেষ হয় না।

বললে—তা লাঠিতে বা বন্দুকে মরব না, আমার গুরুর কৃপায়। আগুন খাব। শূন্যে উড়ে যাব। মুণ্ডু কেটে আবার জোড়া দেব।

আমি বিস্ময়ের সুর বললাম···বল কি চাচা?

হ্যাঁ, তোমাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে, গুণ কিছু ছেল শরীলে! ওই যেখানে চটকা-তলায় সায়ের ছেল, ওখানে এক সন্নিসি এসে আস্তানা বাঁধে আজ চল্লিশ বছর আগে। আমার তখন অনুরাগ বয়েস। তিনিই আমার ওস্তাদ।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে দেখে উঠলুম। জগো, গোপাল ও আমি ঘন বনের পথে আবার ফিরি। তখন কুঠীর মাঠের জঙ্গলে অন্ধকার বড্ড ঘন হয়েচে। ওরা বাঘের ভয়ে বনের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলে না। আমি যত সাহস দিই, ওরা তত ভয় করে।

আমাদের ঘাটে যখন এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নদীচরের ওপরকার আকাশে অগণ্য দ্যুতিলোক—বনশিমের ফুল ফোটা ঝোপটি ঘাটের ওপর নত হয়ে আছে, জোনাকী ঝাঁক জ্বলচে অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে।

বাড়ি এসে দেখি সবাই বাড়ির চারিদিকে মাটির প্রদীপ জেলেচে, কারণ আজ দীপ দান করবার নিয়ম! ক্ষুদুদের বোধনতলায়, আমার লেখবার ঘরের সামনে, পুঁটিদিদিদের

রোয়াকে, খিড়কীর পথে, বাঁশবনে—সর্ব্বত্র প্রদীপ জ্বলচে।

ন-দি হেসে বললে—এই দ্যাখো, এবার তোমাদের কলকাতার হ্যারিসন রোড হয়ে গিয়েচে। না?

ক-দিনই বড় আনন্দে কাটল। আজ দুপুরে একটা মালো এলো সাপ খেলাতে। আমতলায় চেয়ার পেতে আমরা সবাই বসে সাপ খেলানো দেখি। ন-দি, খুড়ীমা, ক্ষুদু, পাঁচী, জগো, গোপাল—সাপ খেলা দেখে সবাই খুব খুশি। এবার পুজোর ছুটিতে যত গান শুনেচি দুটো গান আমার মনে বড় ছাপ রেখে গিয়েচে, গানের সুরের জন্যে নয়, যে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ অবস্থায় সেই গান দুটি গাওয়া হয়েছিল তার জন্যে। সেদিন পাহাড় পেরিয়ে এসে রুথামের মুদীর দোকানে একটা ছোকরা যে গাইছিল ঃ—

হায় হায় শিশুকালে ছিলাম সুখে···

এ গানটার এই পর্য্যন্ত মনে আছে। আর একটা আজকার সাপুড়ের গানটা ঃ—

সোনার বরণ লখাই আমার হয়ে গেল কালো
(ওগো) কি সাপে দংশেচে তারে তাই আমাকে বলো।

সাপুড়ে উচ্চারণ করলে—'ডুংশেচে'—তাই যেন আরো মিষ্টি লাগলো।

তার পরেই রোদ পড়ল। কুঠীর মাঠে বন ঝোপের ধারে কেলেকোঁড়ার লতায় ফুলের সুগন্ধে বৈকালের বাতাস ভারাক্রান্ত। তারই মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলুম, বেড়ালুম। ছেলেমানুষের মত প্রকাণ্ড মাঠটার এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে বেড়িয়ে আবার যেন বাল্যের আমোদ ফিরিয়ে পেলুম। ভাগ্যে ওদিকে কেউ লোকজন থাকে না তাহলে আমাকে হয়তো ভাবতো পাগল।

পল্লীপ্রান্তের বনশোভা ও বনপুষ্পের সুবাস আর এবারকার অপ্রতিহত পরিপূর্ণ তপ্ত সূর্য্যালোক—তার ওপর সব সময়ের জন্যে মাথার ওপরকার ঘন নীল আকাশ—আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েচে। দিনরাত এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাস করেও যেন আমার আশ মেটে না—রাত্রির নক্ষত্ররাজি কি জ্বলজ্বলে, কত রকমের, দিক্‌বিদিকে কতদূরে ছড়ানো।

বেজায় শীত পড়লো শেষ রাত্রে। অকালে নদীর ঘাট থেকে ফিরচি, আমাদের ঘাটের পথে গাবতলায় সাত-আটখানা বড় বড় মাকড়সার জাল পাতা। রোদ পড়ে বিচিত্র ইন্দ্রধনুর রং-এর সৃষ্টি করেচে। আমগাছের এডালে ওডালে টানা বেঁধে উঁচুতে নিচুতে কেমন জাল বুনেচে। প্রত্যেক জালেতে গোটাকতক মশা মরে রয়েচে। একটা মাকড়সা জাল গুটিয়ে একটা মাত্র টানা সুতোতে পর্য্যবসিত করলে—সেই সুতোটা বেয়ে ছোট্ট মাকড়সাটা গাবগাছের ডালে উঠে গেল। বনে বনে এই সব দেখে বেড়ালেও কত শিক্ষা হয়। আমাদের দেশে কত ফুল, ফল, দামী ঝোপঝাপ, কীট পতঙ্গ। এদের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে যে আনন্দ পাওয়া যায়—একরাশ প্রাণী-বিজ্ঞানের বই ঘাঁটলেও তা হয় না।

"We live too much in books and not enough in nature, and we are very like that simpleton of a Pliner the younger who went on studying a Greek author while before his very eyes Vesuvius was overwhelming fine cities beneath the ashes."

তারপর কতক্ষণ দুপুরে মানুষের বাড়ি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিমন্ত্রণে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসে গল্প করলুম। কে বলেছিল 'অন্ধ নাচার বাবা' ক্ষুদু খুব উৎসাহের সঙ্গে সে গল্প করলে। আমি বনপথ দিয়ে তালুঘাট গেলাম। সেখানে নিরাপদদের বাড়ি চা খেয়ে কতক্ষণ গল্প করি। নিরাপদ এক অদ্ভুত লোক। সে বলে নাকি ভুত দেখে। মাঠে-ঘাটে সর্ব্বদাই

ভূত বেড়াচ্চে সরু সুতোর মত।

আমি বললুম—বলেন কি ?

—হঁ্যা, বিভূতিবাবু। ওরা আবার তারা ধরে নামে। আমি সকালে উঠে দেখেচি বনের সব তারা পড়ে আছে। সূর্য্য ওঠবার আগে তারার ঝাঁক আপনিই আকাশে উঠে যায়। কেবল যেগুলো শিশিরে খুব ভিজে যায়, সেগুলো ঝোপের তলায় খুব ভোরে পড়ে থাকে। ভিজে ভারি হয়ে যায় কিনা, তাই আর উঠতে পারে না।

আমি খুব অবাক-মত মুখখানা করে নিরাপদর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও নাকি সূর্য্যালোক থেকে তাপ সংগ্রহ করে দেশের কাজ করবে, সেজন্যে সূর্য্যকে জয় করচে। রোজ মাঠে বসে সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

ঘন অন্ধকার। বড় বড় গাছের মাথায় অগণ্য নক্ষত্রদল জ্বলজ্বল করচে—কি অসীম দ্যুতিলোক পৃথিবীর চারিধার ঘিরে। টর্চ্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেচে বলে একরকম অন্ধকারেই চলে আসতে হোল। নিরাপদ সঙ্গে খানিকদূর এল গল্প করতে করতে—রাস্তার ধারে সাঁকোর ওপর দু-জনে কতক্ষণ বসলুম। আমি গল্প করি আর মাথার ওপর চেয়ে চেয়ে নক্ষত্র দেখি, একবার চারিধারের অন্ধকার বনানী দেখি।

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে একটা চমৎকার সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করলুম। আর সেই বন ঝোপের সুগন্ধ। এ গন্ধটা আমায় বড় মুগ্ধ করে রেখেচে। এদের ছেড়ে কলকাতা চলে যাবার দিন নিকটবর্ত্তী হয়েচে মনে ভাবলেই মনটা খারাপ না হয়ে পারে না, কিন্তু এখানে নানা কারণে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠচে না—প্রথম কথা, সঙ্গে বই নেই—আমার নোটবই-গুলো নেই। এমন কি লেখবার উপযুক্ত খাতা বা কাগজপত্র পর্য্যন্ত বেশী আনি নি। বই ভিন্ন আমি থাকতে পারি নে। বই উপযুক্ত সংখ্যায় না আনা একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েচে এ ছুটিতে। এমন ভুল আর কখনো হবে না। দুটো ছোট গল্প লিখেচি—এবারকার পুজোতে তার বেশী কিছু হ'ল না।

আমাদের পাড়ার সবাই কাল সকালে সাত-ভেয়ে কালীতলায় যাবে। অভিলাষের নৌকো ব'লে ওই পথে অমনি সইমাদের রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম। কতকাল পরে যে ওদের রান্নাঘরে গেলাম! নলিনীদিদি যত্ন করে বসালে—চা আর খাবার দিলে, তারপর কতকালের এ গল্প ও গল্প, কত ছেলেবেলার কথা, নলিনীদিদির বিয়ের সময়কার ঘটনা। ওর স্বামী উত্তর আফ্রিকায় ছিলেন সে সব গল্প। সোনার মেয়ে হয়েচে, কি সুন্দর টুকটুকে মেয়েটি, কি চমৎকার মুখখানি, বছর দুই বয়েস হবে। আমায় দেখে কেমন ভয় পেলে, কিছুতেই আমার কোলে আসতে চাইলে না।

টেঁপি দিদিকে দেখলুম আজ সকালে বছর পনেরো পরে। একেবারে বুড়ী হয়ে গিয়েচে। সেই ফর্সা রঙ, সুন্দর চোখমুখের আর কিছু নেই। মানুষের চেহারা এত বদলেও যায় কালে! যা হোক, ষোল বছর পরে যে ওরা আবার দেশে এসেচে এই একটা বড় আনন্দের বিষয়।

আমাদের গ্রামের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড় খারাপ। পরস্পর ঝগড়াদ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পারিবারিক কলহ, জ্ঞাতিবিরোধ, সন্দেহ, কুসংস্কার এতে একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া বা সৎচর্চ্চার বালাই নেই কারো। Æschylus-এর কথায়:

"They live like silly ants
In hollow caves unsunned;
To them comes no sun, no moon,

No Stars, no music, no spring
Flower-perfume…"

আজ সকালে আমরা নৌকোয় সাত-ভেয়ে কালীতলায় গেলাম। পথে চালতেপোতার বাঁকে কত রকমের ফুল যে ফুটেচে—সেই আর বছরের কুচো কুচো হলদে ফুলগুলি, নীল ঘাসের একরকম ফুল, কলমীর ফুল—সকলের চেয়ে বেশী ফুটেচে তিতপল্লার ফুল, যে ঝোপের মাথা দেখি—সর্বত্র আলো করে রয়েচে ওই ফুলে। বেলা একটার সময় কালীতলায় গিয়ে পেঁাছনো গেল। তারপর আমরা গেলুম রেলের পুলে বেড়াতে। বটতলায় রান্না করে খাওয়া হোল। ক্ষুদু ছুটে গেল আমাদের সঙ্গে রেলের রাস্তায়। আমরা পুরোনো বনগাঁয়ের দিকে যাচ্চি—রামপদ সইকেল নিয়ে এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল। খাবার পরে আবার একটু রেল লাইনে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সময় নৌকোয় উঠে নৌকো ছাড়ি। পথে কত কি গল্প করতে করতে চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রির মায়া যেন আমাদের পেয়ে বসল। তখন চালতেপোতার বাঁকে এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নির্জন সুগন্ধ বনের চরে কাটা চাঁদের শিশির-পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ও নক্ষত্রলোকের শোভা যেন সমস্ত নদী ও বনকে মায়াময় করেচে মনে হোল। চাঁদ-ডোবা অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঘাটে এসে নৌকা লাগল।

তবুও মনে হয় এ সব জায়গায় বারো মাস আসা আমাদের মত লোকের চলে না। কারণ জীবন নদীর স্রোতধারা এখানে মন্দ গতিতে প্রবহমান—সক্রিয়, উন্নতিশীল, বেগমান জীবন এখানে অজ্ঞাত। বন্ধ জলে পানা-শেওলা জমে, জলকে শীঘ্র দূষিত করে ফেলে। যে চায় জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে, যাকে তার উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা নিয়ে ভগবান সৃষ্টি করেচে, যাকে dull, bore এবং stupid করে সৃষ্টি করেন নি, যার জীবনের পুঁজি অনেক বেশী, তার জন্যে এসব জায়গা নয়। কিছুকাল এসে বেশ কাটানো যায় বা আসাও উচিত। কিন্তু চিরদিন এখানে যে কাটাবে তাকে তাহলে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সেবাব্রতে দীক্ষিত হতে হবে, যে বলবে, আমার নিজের কিছু চাই নে, দেশের ছেলেদের জন্যে স্কুল খুলব, তাদের পড়াব, দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করব, ম্যালেরিয়া তাড়াব ইত্যাদি—সে রকম মানুষ হাসিমুখে সমস্ত অসুবিধা ও অন্ধকারকে বরণ করে নিয়ে এখানে এসে চিরকাল বাস করতে পারে।

আজ শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে একবার বাইরে এলুম, মনে হোল খুব মৃদু জ্যোৎস্নালোক ঘরের দাওয়ায়—চাঁদ তো অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েচে তবে এখন কিসের জ্যোৎস্না? ক্ষীণ হলেও এটা জ্যোৎস্নালোক সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, কারণ খুঁটির ছায়া পড়েচে, বেড়ার কঞ্চির ছায়া পড়েচে, আমার নিজের ছায়া পড়েচে।* দূর আকাশে এক সময় হঠাৎ নজর পড়ল—দেখি শুইতে তারা উঠেচে। শুক্র-জ্যোৎস্না এত স্পষ্ট কখনও দেখি নি জীবনে—সত্যি কথা বলতে কি স্পষ্টই কি বা অস্পষ্টই কি—শুক্র-জ্যোৎস্নাই দেখিনি কখানো। এমন অবাক হয়ে গেলুম, এত কথা মনে আসতে লাগল যে ঘুম আর হোল না। আমার মন পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যোমপথে গেল উড়ে—আমি যে গ্রহলোকের জীব, আমার বাসস্থান যে বিশাল শূন্যের মধ্যে, অন্য আরও গ্রহ ও অগণ্য তারাদলের মধ্যে কত কোটি সূর্য্য সেখানে দীপ্যমান, কত নীহারিকা পুঞ্জ, কত দৃশ্য অদৃশ্য শক্তি, বিদ্যুৎ, কসমিক রে,—এদের সঙ্গে আমার আত্মা যেন এক হয়ে গেল। আমার অর্থলিপ্সু বৈষয়িক আত্মা মুক্তিলাভ করলে অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে, ওই শুক্র তারার আলোর পথ বেয়ে উড়ে চলে গেল অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

কাল এখান থেকে চলে যাব। তাই যেন সব কিছুর ওপর মায়া হচ্চে। ছায়াঘন

অপরাহ্নে আমাদের পোড়ো ভিটেয় পেছনকার বাঁশবনে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় খানিকটা চুপ করে বসে রইলুম। রাঙা রোদ পড়েচে ওদিকের একটা বাঁশঝাড়ের গায়ে। সেই রাঙা রোদ মাখানো বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে সমস্ত জীবনের গভীর রহস্যের অনুভূতি যেন মনে এসে জমল। কতকাল আগে এমন কার্ত্তিক মাসের দিনে মামার বাড়ি থেকে বাবার সঙ্গে এসে প্রথম এ গাঁয়ে উঠেছিলুম আমার বাল্যকালে। চুপ করে ভাবলে সে দিনের হেমন্তদিনের কটুতিক্ত বনলতা-ফুলের গন্ধভরা দিনগুলির স্মৃতি আজও আমার মনে আসে—কেমন একটা মধুর, উদাস ভাব নিয়ে আসে ওরা। তারপর কত পথ চলেচি, কখনও কণ্টকাকীর্ণ আরণ্যপথ বেয়ে, কখনও রৌদ্রদগ্ধ মরুবালুর বুক চিরে, কখনও কোকিল-কুজিত পুষ্পসুরভিত কুঞ্জবনের মধ্যে দিয়ে, চলেচি···চলেচি···কত সঙ্গী-সাথীর হাসি-অশ্রুভরা নিবেদন আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হোল, কাউকে পেলাম চিরজীবনের মত, কাউকে হারালুম দু-দিনেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্যই দেখলুম জীবনের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য। সুখ দুঃখ দু-দিনের —তাদের স্মৃতি চিরদিনের, তারাই থাকে। তারাই গভীরতার ও সার্থকতার পাথেয় আনে জীবনে। আজ এই শুকনো বাঁশের খোলা বিছানো, পাখী-ডাকা, রাঙা রোদমাখানো বাঁশ-বনের ছায়ায় বসে সেই কথাই মনে হোল। সেই বাঁশের শুকনো খোলা! মামার বাড়ি থেকে প্রথম যেদিন এ গ্রামে আসি তখন দুপুরে আমাদের বাড়ির দরজার সামনে ধুলোর ওপর যে বাঁশের খোলা নিয়ে রাজলক্ষ্মী ও পটেশ্বরীকে খেলা করতে দেখেছিলুম ত্রিশ বছর আগে। আজ কোথায় তারা?

ইছামতীর ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেচি। বেলা গিয়েচে। দু-ধারের অপূর্ব্ব বনঝোপে রাঙা রোদ পড়েচে। কত কি ফুলের সুগন্ধ। কিন্তু চালতেপোতার ডান ধারে যে সাঁই ব্যবলার নিভৃত পাখী-ডাকা বন ছিল, মনি গাঁয়ের নতুন কাপালীরা এসে সব নষ্ট করে কেটে পুড়িয়ে ফেলে পটল করেচে। আমার যে কি কষ্ট হোল! পুত্রশোকের মত কষ্ট। কত তিৎপল্লার ফুল ফুটে থাকত, বন কলমীর বেগুনী ফুল ফুটে থাকত—আর বছরও দেখেচি। কত কচি কচি জলজ ঘাসের বন, তার মাথায় নীল ফুল—এবার ডান ধার এরা সাফ করে ফেলেচে। আমার নৌকোর মাঝি সীতানাথ বলচে—'দা-ঠাকুর, বড্ড পটল হবে, চারখানা পটলে একখানা গেরস্তের তরকারি হবে। আমার জ্ঞানে কখনও এখানে কেউ আবাদ করে নি।' কুলঝুটির ফুল আর বন শিমের ফুল এবার অজস্র। এই দস্যি কাপালীরা, এই Destroyers of Beauty, কোথা থেকে এসে যে জুটল, ইছামতীর পাড়ের রূপ এরা কি নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট করে ফেলচে।

রোদ একেবারে সিঁদুরে হয়ে বাঁশঝাড়ের মাথায় উঠেচে। অপরাহ্নের বাতাস নানা অজ্ঞাত বনফুলের মিষ্ট গন্ধে ভারাক্রান্ত। নদীপথে বিকেলে ভ্রমণের মত আনন্দ আর কিসে আছে? কি গভীর শান্তি, কি বন-শোভা, কি অস্ত আকাশের মায়া!

ছুটীর দিন। কলকাতা ভাল লাগচে না। এই ক-দিনেই কলকাতা যেন বিস্বাদ হয়ে গিয়েচে। আজ বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে থ্যাকারের দোকানে গিয়ে একখানা বই পড়ছিলুম কার্জ্জন পার্কের সামনের জানলায় দাঁড়িয়ে। সেখানে থেকে মাঠে একটা জায়গায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। একটা বেঞ্চে বসে আছি, দেখি ডাঃ পি. সি. রায় সামনে দিয়ে যাচ্চেন। দু-জনে গল্প করতে করতে বেড়ালুম অনেকদূর পর্য্যন্ত। উনি বেশীর ভাগ বললেন 'প্রবাসী'র কথা। যোগেশ বাগল 'প্রবাসী' ছেড়ে গিয়েচে সেজন্যে দুঃখ করলেন। গিরিশবাবুও দেখি বিছানা পেতে লর্ড রবার্টসের প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠে বসে আছেন। আমরাও গিয়ে জুটলাম। আজ রাত্রে মাদ্রাজ মেলে ডাঃ রায় বাঙ্গালোর যাবেন, সে কথা হচ্ছিল। তাঁর গাড়িতে ফিরে এলাম। Nineteenth Century Review থেকে ক'টা ভালো ভালো

কবিতা তুলেচি :—

Beyond the East the Sunrise, beyond the West the sea,
And East and West wander-thirst that will not let me be.
And come I may, but go I must, if men ask you why.
You may put the blame on the stars and the sun, on tha white
cloud and the sky.

'To scorn all strife and to view all life
With the curious eyes of a child.'
'To travel hopefully is better than to arrive.'

'To love Nature for the sake of what it brings forth, for its beauty, for its harmony will help you a little nearer to perfection.'

'To feel love for humanity in the sweetness of spiritual communion. in the joy of helping one another, in the happiness of playing a part together in the everlasting work of the farm of worlds 'aud universe, will bring you all the nearer to the goal of evolution.'

আজ আশুতোষ হলে জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির বক্তৃতা শুনতে গেলুম। চিত্রকর হিরোসিকের কতকগুলি ছবি, প্রধানতঃ ল্যাণ্ডস্কেপ, বড় ভাল লাগল—বিশেষতঃ অর্দ্ধচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, নানারকমের চাঁদের রূপ। প্রধানতঃ পল্লীদৃশ্য, ঝরনা, বাঁশঝাড়, গ্রাম্য নদী ইত্যাদি। হকুসাই ও হিরোসিকে এ দু-জনের শক্তিই এ বিষয়ে খুব অসাধারণ বলে মনে হয়েছে আমার। নোগুচির বক্তৃতাও বেশ সুন্দর—সকলের চেয়ে আমার ভাল লাগল ঐ কথাটা—'In the twilight when the vision awakes'; আমি ত আমার জীবনে কতবার এটা দেখেচি বলেই আমার কথাটা বড় মনে ধরেচে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক ভালো কথাই যে বোঝা যায় না, আমাদের দেশের অনেক Self-styled সমালোচক সেই সব বোঝেন না। সেদিন বাঁশবাগানের রাঙা রোদ পড়ে যে দৃশ্যটার সৃষ্টি করেছিল, আজ পনেরো-ষোল দিন হয়ে গেল এখনও এই নোগুচির বক্তৃতা শুনতে শুনতে সেই কথাটা মনে হোল। সে আনন্দ মনের গোপন মন্দিরে এখনও সেই রকম সতেজ ও নবীন আছে। ওই দৃশ্যটা মনে এলেই আনন্দটাও আসে সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতিকে দেখবার চোখ না খুললে মানুষের জীবনে সত্যিকার আনন্দ নেই, একথা কতবার বলেচি আমার নানা লেখার মধ্যে—কিন্তু আমাদের দেশের লোকে সব এক জোটে চোখ বন্ধ করে আছে। চোখ খোলায় সাধ্য কার? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হার মেনে গিয়েচেন। অনুর্ব্বর মরু বালুতে বীজ বপন করে ফল পাওয়ার আশা তো আকাশ কুসুম হতে বাধ্য।

আজ রবিবার দিনটা দমদমার ওপারে একটা বাজে বাগান বাড়িতে গিয়ে নষ্ট হোল। আমার এ ধরনের Outing মোটে পছন্দ হয় না—কি করি, দলে পড়ে যেতে হোল—বিশেষ করে মহিলাদের কথা ঠেলতে পারা যায় না; কিন্তু একটা কপির ক্ষেতের সামনে বসে সতরঞ্চি বিছিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে সদলবলে চা খাওয়ায় যে কি আনন্দ আছে, আমি তা বুঝলুম না। আর কি মশা! কলকাতার উপকণ্ঠে এই শীতকালে যেমন ভয়ঙ্কর মশার উপদ্রব, পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালেও এর সিকি নেই। অথচ শহরের লোকে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে শহরের উপকণ্ঠে—এই ধরনের সাজানো-গোছানো বাগান বাড়ি করে—মাঝে মাঝে সেখানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হল্লা করে। এই সব insipid ধরনের Outing-এর সংসর্গ

আমায় ছাড়তে হবে এবার।

সার অলিভার লজের পত্রাবলীর মধ্যে সেদিন পড়লুম এই বিশাল বিশ্বের আকৃতি, গঠন প্রসারতা (Structure and extent of the Universe) তাঁকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে —তাই এক জায়গায় তিনি বলেচেন দেখলুম—'Universe is the body of God—this is one of His modes of manifestations,' তাঁর রচিত বিশ্বের আকাশ, নক্ষত্র, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মানুষ, জীবজন্তু—সব মিলেই তিনি। তিনি এই ভাবে পদার্থের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করচেন। তাই উপনিষদ বলেচে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। একই আছে, দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

ঈশোপনিষদের—'ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'

আজ সন্ধ্যায় দমদমার বাগান বাড়ি থেকে ফিরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নক্ষত্র জগতের পানে চেয়ে চেয়ে ঐ সব কথাই মনে হচ্ছিল। সেদিনকার সেই গানটা—'The home I was born.' আমার কানে এখনও যেন বাজচে—তা থেকেই কথাটা মনে এল। এ রকম যে কতবার হয়েচে! একটা অনুভূতি পেলে মন শীঘ্র চলে যায় আর এক শ্রেণীর অনুভূতিতে।

শুক্রবারে বিকেলে বনগাঁয়ে গেলাম। সেখানে নেমে বাসায় গিয়েই খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলুম তখন চাঁদ উঠেচে—মাটির সোঁদা সোঁদা সুগন্ধ ভুর ভুর করচে বাগানে। কেলেকোঁড়ার ফুল এখনও আছে বটে, সুগন্ধ নেই।

দু-দিন বনগাঁয়ে থেকে আজ বিকেলের ট্রেনে এলুম কলকাতায়—জাপানী কবি নোগুচিকে P. E. N.-এর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। প্রথমেই হোটেলের হলে ঢুকে দেখি তখনও সবাই আসে নি, কেবল মণীন্দ্র বসু ও দু-পাঁচজন এখানে ওখানে আছে। কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে গালুডি ও ঘাটশিলা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলচি, এমন সময়ে পবিত্র এসে বললে, তোমাকে ডাকচে, নলিনী পণ্ডিত তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে কে একজন তোমার সম্পর্কে পত্র লিখেচে সেজন্যে।

বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, মণীন্দ্র এসে টেনে নিয়ে গেল। তারপর সবাই টেবিলে যে যার বসে গেল। সুরমা বসু ও ক্ষীরোদের স্ত্রী, আমি এবং নির্ম্মল বসু এক টেবিলে। চা পরিবেশন হওয়ার পরে স্যাণ্ডউইচ চলেচে সেই সময় নোগুচি এলেন। কালিদাস নাগ নিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী কবি-সম্মেলন থেকে। রামানন্দবাবু উঠে তাঁর ষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। নরেন দেব আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন চারু রায়ের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করতে। চারু রায় কেন যে সাহেবী পোশাক পরে এসেচেন, এ আমি বুঝতে অক্ষম, যেখানে নোগুচি নিজে এসেচেন জাপানী পোশাকে। তারপর নোগুচি নিজের জাপানী কবিতা পাঠ করলেন এবং তারপর ইংরেজী অনুবাদ পড়লেন। কালিদাস নাগ আন্তর্জাতিক P. E. N.-এর সভাপতি H. G. Wells-এর একখানা চিঠি পড়লেন। আমাদের বঙ্গীয় P. E. N.-এর প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র। জাপানী কনসাল জেনারেল কিছু বললেন, কিন্তু তা কেউ বুঝতে পারলে না। যখন এ পর্য্যন্ত হয়েচে—তখন চপলা দেবীর ভাই ফণী চক্রবর্ত্তী এসে আমাদের টেবিলে বসল। সুরমা বসু তাকে চা করে দিলেন। ফণীর সঙ্গে মণীন্দ্র বসু আমার আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিল—ফণী হেসে বললে অনেক কালের আলাপ আছে, আলাপ করিয়ে দিতে হবে না। তারপর জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে সে কিছু কিছু নিজের মত জানালে, বিশেষতঃ নোগুচির কবিতা সম্বন্ধে। আমি, নির্ম্মলবাবু ও ফণী তিনজনেই তখন মজে গিয়েচি। সুরমা বসুকে ইউরোপীয় সঙ্গীত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলুম। কারণ তিনি মিউনিকে বেহালা শিখতে গিয়েছিলেন এবং জার্ম্মান ক্লাসিকাল

মিউজিক সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন। ক্ষীরোদের স্ত্রীও বেশ মেয়ে।

নোগুচি জাপানী কবিতা পড়লেন, রামানন্দবাবু সামান্য কিছু বক্তৃতা করলেন—তারপর আমরা মীরা গুপ্তের দলে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে নীরদবাবু ও সোমনাথবাবুর সঙ্গে মোটরে ময়রা স্ট্রীটে এলুম। ও'রা একটু পরে গেলেন Regal-এ A mid summer Night's Dream দেখতে। আমি বাড়ি চলে এলুম।

•

আজ সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকান থেকে বার হয়ে গোলদীঘিতে গিয়ে যখন বসেচি, তখন রাত সাতটা। ধোঁয়া এত বেশী যে আকাশে সপ্তমীর চাঁদকে ঢেকে ফেলেচে; ট্রামের আলো, বাড়ির আলো, রাস্তার আলো, ধোঁয়ার জালের মধ্যে মিটমিট করচে। মনে পড়ল ১৯১৪ সালের এমন দিনের কথা। আজ একুশ বছর আগেকার ব্যাপার। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, সবে কলকাতায় এসেচি—এই রকম ধোঁয়া দেখে মন তখন দমে যেত। নতুন এসেচি গাছপালা ও ইছামতী নদীর সংসর্গ ছেড়ে। তারপর কতদিন কেটে গেল—কত বিপদ, আনন্দ, দুঃখ ও আশার মধ্য দিয়ে। তখন আমরা সবাই তরুণ। The world was very young then—মামাদের তখনও বিয়ে হয় নি। এই বৈশাখে ছোটমামার বিয়ে হোল। এখন মন পরিণত হয়েচে—কত ভুল শুধরে নিতে পেরেচি, অপরের মত সহ্য করবার ক্ষমতা অভ্যাস করেচি—আমার মনে হয় জীবনে এই জিনিসটাই সব চেয়ে বড়। Intolerence-এর চেয়ে বড় শত্রু জীবনে আর কিছু নেই। ইউনিভার্সিটির আলোগুলোর দিকে চেয়ে সেই সব দিনের কথাই মনে পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও পেলুম খুব। জীবনের একটা গভীরতার দিক আছে, সেটা সব সময় আমাদের চোখে পড়ে না—এই রকম নির্জনে বসে না ভাবলে।

•

কাল মতিলাল ও আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে কার্জন পার্কে অনেকক্ষণ বেড়ালুম ও গল্প করলুম, মতিলাল আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, ও কলেজ থেকে বার হয়ে কিন্তু বিবাহ বা চাকরি করলে না, পৈতৃক কিছু টাকা আশ্রয় করে আজ ষোলো বছর ধরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়চে—জানবার জন্যে যে, মানুষের আত্মা সত্যিই অমর কি না।

ও বললে, মা মারা যাওয়ার পরে এ প্রশ্ন আমার মনে জাগে—তারপর ঢুকলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, নিজেও অনেক বই কিনেচি।

বললুম—কি সিদ্ধান্তে উপনীত হলে ?

ও বললে—মানুষের আত্মা অমর। আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

—তা তো হোল, কিন্তু জীবনটাকে দ্যাখো এইবার। পড়াশুনো করেই জীবন কাটালে, এবার সংসার কর। জীবনের অভিজ্ঞতা কোথায় তোমার ?

মতিলাল বললে—এবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ছাড়বো। একখানা বই লিখচি এ বিষয়ে। সেখানা শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই। এবার ছাড়বো।

তারপর ওখান থেকে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে দেখি শেরিফ বড়লাটকে যে গার্ডেন-পার্টি দিচ্ছে সেই উপলক্ষে বাগানে চমৎকার আলো দিয়ে সাজিয়েচে—গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে যখন ঝিলের ধারে ফুটন্ত ফুলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওখান থেকে গিয়ে মাঠের মধ্যে ক্লাবের সাদা বেঞ্চির ওপর বসলুম—সামনেই পূর্ণিমার চাঁদ। স্থানটা নির্জন—কেবল আধজ্যোৎস্না অন্ধকারের মধ্যে একজন অশ্বারোহী পুলিস এল, গেল। আধঘণ্টা পরে লর্ড রবার্টস-এর প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠে গিয়ে দেখি শুধু গিরিশ বোস এসে শুয়ে আছেন, ডাঃ রায়ের চাদর পাতা, কিন্তু তিনি বালিগঞ্জে গিয়েচেন এখনও আসেন নি।

তাঁর আসতে একটু দেরিই হোল। সোয়েন হেডিনের তাকলা-মাকান মরুভূমি পার হওয়ার গল্প করলুম—ওঁরা খুব মন দিয়ে শুনলেন।

সকালে বীরেশ্বরবাবু এলেন। তারপর বালিগঞ্জে অন্নদা দত্তের বাসায় গেলাম, দুপুরে নিমন্ত্রণ ছিল। অন্নদাবাবুর শরীর খুব খারাপ—পূর্ব্বে দেশের জন্যে খুব করেচেন—এখন কেউ মানে না, পোঁছে না—অথচ চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের জন্যে উনি কি ভয়ানক পরিশ্রমই না করেচেন। আমি সব জানি। ১৯২২-২৩ সালের কাউন্সিলে উনি চট্টগ্রামের প্রথম M. L. C. ছিলেন। আমি ওঁর কাগজপত্র আমাদের League Office থেকে টাইপ করে এনে দিতুম। অন্নদাবাবুর মেয়ে মণির সঙ্গে পনেরো বছর পরে দেখা। ওর ভাল নাম যে মণিকুন্তলা তা আমি আজ এতকাল পরে ওর মুখে শুনলুম। মণি তখন ছোট মেয়ে ছিল, —আমি যখন ১৯২২ সালে অন্নদাবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলুম চট্টগ্রামে। আমার মুখে গল্প শুনতে ও ভালবাসত। মণি যে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক ও আই-এ পাস করেছিল—সে সব খবর আমি আজই প্রথম জানলুম। ওর ছোট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে রইলুম—বেশ চার মাসের ছোট খুকীটি। পৃথিবী অদ্ভুত, জীবন অদ্ভুত। কে ভেবেছিল যে আজ এত বছর পরে মণির সঙ্গে বালিগঞ্জে এভাবে আবার দেখাশোনা হবে! মণির মুখে শুনলুম সুপ্রভা মণিদের নিচে পড়ত এবং দু-জনে এক সঙ্গে দেশে যেত।

ওখান থেকে বার হয়ে আমি আর বেগুন এলুম মণীন্দ্র বসুর বাড়ি। সেখান থেকে সুরমা বসুর বাড়ি,—রামমোহন রায় রোডে। বেশ সাজানো বাড়ি, সাজানো ড্রয়িং রুম। সুরমা বসু ও তাঁর একটি বোন গান গাইলেন বড় চমৎকার। মেয়েটি মিউনিকে ছিলেন, ইউরোপীয়ান মিউজিক শিখতেন।

দেখে মনে হোল এই সব মেয়ে, মণি, সুরমা বসু কেমন চমৎকার ঘর বর পেয়েচে, বেশ আছে। কিন্তু যার আরও বেশী ভালভাবে এ সব জিনিস পাওয়া উচিত ছিল—সে কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে, তার কিছুই হোল না। জীবনে এমন ট্র্যাজেডি কতই যে হচ্চে প্রতিনিয়ত। অথচ সে কি বুদ্ধিতে, কি বিদ্যায়—কোন অংশে এদের চেয়ে কম তো নয়ই—বরং অনেক বেশী। ভেবে সত্যিই বড় কষ্ট হয়।

সুরমা বসুর সুন্দর গান শুনবার সময়ে আরও মনে হোল পল্লীগ্রামের সেই সব অভাগিনী মেয়েদের কথা, যারা জীবনে কোন সুখই কোনদিন পেলে না। এমন কত আছে, জীবনে তাদের সঙ্গে কত ভাবে কত পরিচয়। আজ সন্ধ্যায় তাদের সবারই করুণ মুখ মনে পড়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল।

আজ সাতভেয়ে তলায় আমাদের বনভোজন গেল। বনগাঁয়ের আমাদের বন্ধুবান্ধব উকীল মোক্তার সকলেই ছিল, তা ছাড়া সাবরেজিস্ট্রার ও ডাক্তার। বেলা দশটার সময়ে নৌকো করে আমরা গান করতে করতে নদীপথে চলেচি—পুরনো বনগাঁ ও শিমুলতলার সবাই ভাবচে এ আবার বাবুদের কি খেয়াল! তারপর বটতলায় গিয়ে মাদুর পেতে বসে আমরা সবাই খুব গল্পগুজব করলুম। আমরা ধূমপান করতে পারি নি, কারণ প্রবীণের দল সর্ব্বদা কাছে কাছে রয়েচে। সতীশ মামাকে অনেক কৌশল করে সরিয়ে একটু আমাদের সুবিধে করে নেওয়া গেল। এর আগেও গত পুজোর ছুটিতে একদিন সাতভেয়ে তলায় এসে খুদু, খুড়ীমা, ন-দি আমরা সবাই বনভোজন করে খেয়েছিলুম। এত বড় বটগাছ এখানে আর কোথাও নেই,—এক রাজনগরের বট ছাড়া। নদীর দু-ধারে এড়াঞ্চির ফুল ফুটে আছে—কিন্তু কুঠীর মাঠের সে শোভা নেই এখানে। রামায়ণে সেই শ্লোকটা মনে পড়ল—

সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটী বনে।
সরযূ বিচ্ছেদ শোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ ॥

পঞ্চবটি ও দণ্ডকারণ্যে তো কত নদনদী বর্ত্তমান, কিন্তু সরযূ বিরহ দুঃখ কি রামচন্দ্র সহ্য করতে পারেন?

আমার মনে হয় বারাকপুরের ওদিকের বনশোভা নেই এই অঞ্চলে। মাঠে এদিকে চাষ অত্যন্ত বেশী, পোড়ো জমি কোথায় যে যদৃচ্ছবিস্তৃত বনভুমি গড়ে উঠবে? অরণ্য-প্রকৃতি এখানে মানুষের সংস্পর্শে এসে ভীতা, সঙ্কুচিতা তার সে উদ্দাম স্বাধীনতা নেই।

রান্না শেষ হবার কিছু আগে আমরা নদীর ধারে রোদ্রে বসে তেল মেখে সাঁতার দিয়ে স্নান করলুম। আমি তো তেল মাখলুম বোধহয় তিন বৎসর পরে। সাঁতার দেবার সময়ে খুব আনন্দ হোল। ওপারে কাঁচ মটরের ক্ষেতে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেচে—এই দলের মধ্যে গাছপালা ভালবাসে দেখলাম কেবল একমাত্র সাবরেজিস্ট্রার। আর কারো সেদিকে খেয়াল নেই।

বেলা তিনটের সময় আমরা সবাই খেতে বসলুম। নিশিবাবু ও সুরেনবাবু পরিবেশন করলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ করে খাওয়া হয়ে গেল কিছু বেশী। সন্ধ্যার সময় সেই ঝোঁকে আমরা গল্প করতে করতে ফিরলুম।

সন্ধ্যার সময় যতীন ডাক্তারের দোকানে, আমার বাল্যবন্ধু নিতাই পাড়ুইয়ের সঙ্গে যতীনদার দোকানের অংশ নিয়ে খুব ঝগড়া হোল। নিতাই নিজের জিনিসপত্র লেপ বালিশ, দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ছোট ছেলের হাত ধরে অন্ধকার রাত্রে বাড়ি চলে গেল। যতীনদা ওর প্রাপ্য টাকা দিলে না, আরও বললে, তুমি দোকানের তালের মিছরি খেয়েচ, তোমার ছেলে দুধ খেয়েচে,—টাকা আমার যখন খুশি হবে তখন দেব। কার যে দোষ তা দু-পক্ষের কেউই বুঝতে দিলে না—এ বলে ওর দোষ, ও বলে এর দোষ। বাঙ্গালীর ব্যবসায় এই রকম করেই নষ্ট হয়ে যায়।

র‍্যাঙ্কোর পল্ ভারলেনের জীবনী পড়ছিলুম। নিচের লাইন কটি বড় চমৎকার!

Et je m'cn vais	And I going
Au vent man vais	Born by blowing
Qui us' cmporte	Wind and grief
Deac, deta	Flutter here and there
Parcil a la	As on the air
Feville morte	The dying leaf.

শেষের ছত্র কয়টির ছন্দ ও সুর এত মধুর যে বার বার পড়লেও তৃপ্তি হয় না।

ওর প্রথম দুটো stanzas

Le Sanglots longs	Long sobbing wind
Des violins	The violins of a autumn drove
De l'automre	Wounding my heart
D'une Languer	With languor as smart
Monotone.	In monotone.
Fout suffo quant	Choking and hale
Et leteme, quand	When on the gale
Sonne l'heune	The hours sound deep
Je me Son viens	I call to mind

Des jours anciens — Dead year behind
Et je pleune — And I weep.

Verlain-এর বিষয়ে এ কথাটা ঠিকই মনে হয় যে, লেখক বর্ত্তমান যুগের লোককে মজাতে না পারলে সে কোন যুগের লোককেই মজাতে পারবে না। Bernard Shaw তাঁর Sanity of Art-এ যে কথা লিখেচেন, ভারি সত্যি।

The writer who aims at producing the platitudes which are 'not for this age but for all time' has his reward in being unreadable in all ages. Whilst Plato and Aristophanes peopling Athens with living men and women, Shakespeare peopling with Elizabethan Mechanics and Warwickshire hunts, Carpaccio painting the life of St. Ursula exactly as if she were a lady living in the street next to him, are still alive and at home everywhere among the dust and ashes of thousands of academic, punctilious, archaeologically correct men of letters and art.

Montaign সম্বন্ধে একটি কথা বড় ভাল লাগলো। 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living'.

অনেক দিন আগে ঠিক এই দিনে আজমাবাদ কাছারী থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে কলবলিয়া পার হয়ে কাটারিয়া পুলের ওপরে সূর্য্যাস্ত দেখেছিলুম। মেসে বসে আজ ডালহাউসি স্কোয়ার ঘুরে বেরিয়ে এসে সে কথা মনে পড়ল ডায়েরী দেখে। কি উন্মুক্ত জীবনের পরে কি বদ্ধ জীবন যাপন করেচি এখানে। ঠিক সেই বিকেলেই আজ বইয়ের গুদামে বসেছিলুম!

আজ সারাদিনটা অত্যন্ত ঘোরা হয়েচে, বেলা সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত। আমার মেস থেকে বেরিয়ে নীরদ চৌধুরীর বাড়িতে চা খেয়ে পশুপতিবাবুর বাড়ি গিয়ে পেনেটীর বাগান-বাড়ি যাবার কথা বলি। বন্ধুদের নতুন বাসায় যাই, তার আগে একবার নতুন পত্রিকার আপিসেও যাই। বেশী আড্ডা দিলে একটা অবসাদ আসে—শারীরিক ও মানসিক, যদিও আমি তা আজ অনুভব করি নি, তবুও আমার মনে হয় এতে কোনো আনন্দ নেই। তবে সপ্তাহে একদিন এমন বেড়ানো যেতে পারে—যদি অন্য সব ক'টা দিন নিজের কাজ করা যায়।

লেখাপড়া সম্বন্ধেও দিনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়া খুব খারাপ। এক বিষয়ে মনোনিবেশ অভ্যাস করতে হয়, এবং যে এক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, সে হয়তো আরও পাঁচটা জিনিস থেকে বঞ্চিত আছে, কিন্তু সে সৃষ্টি করতে পারে।

অনেকদিন পরে পানিতর গেলুম। রাত্রে ইটিন্ডা ঘাটে নেমে একজন লোক পাওয়া গেল। সে আবার ইটিন্ডা বাজারের ডাক্তার। হাটের ভিড় ঠেলে রাত্রে পানিতর গিয়ে পেঁাছাই। উপেনবাবুর বাড়ি বেড়াতে গেলুম, বৃদ্ধ শয্যা আশ্রয় করেছেন। পুটীর সঙ্গে দেখা করলুম বাড়ির মধ্যে গিয়ে, ওরা জল-খাবার খাওয়ালে। নরেনের বাড়িতেও আবার খাবার খেলুম। তারপর পানিতরের ওপরের ঘরে (দোতলার উপরের ঘরে) রাত্রে শুলুম। কোণে সেই খাটখানা পাতা আছে, প্রথম পানিতরে গিয়ে ঐ খাটখানাতে আমি শুয়েছিলুম মনে আছে। ঠিক সেই পুরানো জায়গাতে খাটখানা এখনও পাতা। রাত্রে কত কথা মনে পড়ল। আজ কত দিনের কথা যেন সে সব। জাঙ্গিপাড়ার দিনের কথা, সেই অন্ধকারময়

দুঃখের দিন। তখন কি ছেলেমানুষ ছিলুম আর কি নির্বোধই ছিলুম তাই এখন ভাবি। তখন বি-এ পাস করে, কি না জানি ভাবতাম নিজেকে।

আমি খেয়া পার হয়ে বাসে উঠে আসচি, শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে পথে দেখা। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আবার বসিরহাট এলুম ও'দের নতুন বাসায়। দিদি ও পাঁচী ওখানে আছেন। দিদিকে দেখলে চেনা যায় না এমন নয়, তবুও সে দিদি আর নেই—কি যেন নেই মুখে যা তখন ছিল। একথা বলা বড় কঠিন। বয়েস হলে মানুষের মুখের কি যেন চলে যায়, এর উত্তর কে দেবে? পাঁচীকে তো চেনাই যায় না। দেড়টার গাড়িতে পাঁচীর সঙ্গে এক গাড়িতে কলকাতায় এলুম।

ঠাকুরমায়ের শ্রাদ্ধের পর সেই মার্টিন লাইনের গাড়িতে বসিরহাট থেকে এসেছিলুম, তখন আমি জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকরি করি। কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম চাকরিতে ঢুকেচি। আর আজ এই সতেরো-আঠারো বছর পরে মার্টিনের গাড়িতে চড়ে বসিরহাট থেকে এলুম। সতেরো-আঠারো বছরের আগের আমি আর আজকার আমার চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা, জীবনের outlook সব বিষয়ে কি ভয়ানক বদলে গিয়েচে তাই ভাবচি।

দিদি তাঁর মেয়ে মানীর বিয়ের জন্যে ট্রেনে উঠবার সময় পর্যন্ত বললেন। বললেন—ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে দেখা হোল না, এখানে যখন এলুম, তখন দেখা হবে তোমার সঙ্গে। কিন্তু এ কথায় তেমন আনন্দ পেলুম না। আগে হলে দিদির কথায় কত খুশি হ'তাম কিন্তু আজ—মানুষের মন কি বদলেই যায়! মন যে কি বহুরূপী দেবতা, কি বিচিত্র রহস্যময় তার প্রকৃতি, ভেবে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বন্ধুর বাসায় গিয়ে চা খেয়ে একটু গল্পগুজব করলুম রাত নটা পর্যন্ত। আসবার সময় ১০নং রুটের বাসে অনেকদিনের অচল একটা টাকা চলে গেল। গত পুজোর সময় টাটানগরে খাঁদা টাকাটা আমায় নোট ভাঙ্গানি দিয়েছিল, কিছুতেই এতদিন চলে নি।

আজ সকাল থেকে কত ছবি চোখের সামনে এল গেল। ইটিণ্ডার পথ, চাঁদা কাঁটার বন ইচ্ছামতীর ধারে। বিস্তৃত ইচ্ছামতী, ইটিণ্ডার ঘাটে লোকে সব বসে রোদ পোয়াচ্চে, ইন্দুবাবুর ছেলে অনাদি, নরেনের ছেলে, দিদি, দিদির মেয়ে মানী, পাঁচী। ছোট লাইনে আসবার পথে মনে পড়ল, আগে রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করতুম 'এবার আমায় সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়'। কবিতাটি বড় প্রিয় ছিল তখন।

কাল সারাদিন যে বসিরহাট পানিতর অঞ্চলে কাটিয়েছি, আজ যেন সে সব স্বপ্নের মত মনে হচ্চে। ইচ্ছামতীর তীরের চাঁদা কাঁটার বনের পথে, ওই স্রোতাপসারিত কর্দমাক্ত তীর-ভুমির সঙ্গে প্রথম যৌবনের যে সব স্মৃতি জড়িত, তা কাল একটু একটু অস্পষ্ট মনে এল। প্রসাদকে কাল বড় ভাল লেগেচে—আর প্রসাদের বাবাকে।

আজ সকালে উঠে রমাপ্রসন্নের বাড়ি গিয়ে শুনি সে গিয়েচে আপিসে। বাসায় ফিরেই হঠাৎ গিরীনবাবু এসেচে দেখলুম। সে বললে, রাজা নাকি মারা গিয়েচেন শুনেচেন। আমি অবিশ্যি জানতুম পঞ্চম জর্জ খুব অসুস্থ, কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি মারা যাবেন, তা ভাবি নি। খবরের কাগজ মেসে আসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—তাতে মাত্র এই খবর দেখা গেল 'King's life is peacefully drawing a close'—একজন গিয়ে পাশের বাসা থেকে স্টেটস্‌ম্যান দেখে এসে বললে রাজা মারা গিয়েছেন বাস্তবিকই।

স্কুলে গিয়ে তখনি ছুটি হয়ে গেল। নতুন একটি প্রকাশক আমার কাছে ঘুরছিল বই নেবার জন্যে, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলুম শৈলজাবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে বিচিত্রা

আফিসে, সেখান থেকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর বাড়ি। রাত দশটায় বাড়ি ফিরলুম।

সম্রাট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং গত ১৯২৮ সালে অত বড় অসুখ থেকে উঠে কাবু হয়েও পড়েছিলেন। মনে পড়ে ১৯১২ সালের কথা, যখন তাঁর দরবার উপলক্ষে আমাদের স্কুলে ভোজ হয়েছিল, আমি তখন বনগ্রাম স্কুলের ছাত্র। সেই উপলক্ষে জীবনে প্রথম বায়োস্কোপ দেখলুম বনগ্রামে ডেপুটিবাবুর বাসার প্রাঙ্গণে। সে সব বাল্যস্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়েচে—তারপর দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কেটে গেল। জীবনের পথে আমিও কতদূর অগ্রসর হয়ে এসেচি। বর্ত্তমান প্রিন্স অফ ওয়েলসকে বালক দেখেছি (ফটোতে অবিশ্যি), দেখতে দেখতে তাঁর বয়স এখন হোল তেতাল্লিশ বছর।

জীবন, বছর, আয়ু হুহু করে কেটে যাচ্চে। বিরাট স্রোতস্বতী এই রহস্যময়ী জীবনধারা, কে জানে একে ? ডিসরেলী বলেছিলেন জীবন সম্বন্ধে 'youth is a blunder, maturity is a struggle and old age is a regret' —চমৎকার বিশ্লেষণ ও summing up; তাই সত্যি কিনা কে জানে ?

কাল রাজপুরে অনেকদিন পরে বেশ কাটল। বেলা পড়লে আমি ও ভোম্বল ধুনি ডাক্তারের বাড়ি বসে গল্প করে বোসপুকুরে বেড়াতে গেলুম। তখন কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, বোসপুকুরের ওপারের নারকেল গাছগুলোর কি রূপ ফুটেচে ! ফিরবার পথে একটা বাঁধানো পুকুরের ধারে দু-জনে বসে গল্প করলুম। বাঁধা ঘাটটা বড় সুন্দর। এই রাস্তাটার ধার দিয়ে একবার আমি কিশোরী বসুর বাড়ি থেকে বোসপুকুরে বেড়াতে এসেছিলুম, তখন মা আছেন,—ওখানে পুকুরঘাটে একটা ছেলে এসে জুটল, সে থাইসিসে ভুগছিল বলে তার বাড়ির লোকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তাকে নৈনিতালে রেখেছিল। সে এসে বললে—এদেশে কোন কিছু ভাল বিষয়ের চর্চ্চা নেই, এখানে বসে মন টিকচে না। তারপর আমরা গেলুম খুকীদের বাড়ি, সেখানে আহারাদির পরে খুজী পাড়ার লোকের নানা দুঃখের কাহিনী বললে : মহেন্দ্রবাবুর পনেরো বছরের নাতনীটি বিধবা হয়েছে, তার মাও বিধবা, জায়ের ছেলের গলগ্রহ, কারণ ধীরেন (ওই ছেলেটির নাম, এক সময়ে ও আমার ছাত্র ছিল) বাড়ির মধ্যে একমাত্র রোজগারে লোক। ধীরেনের মায়ের কটূক্তির জ্বালায় ওদের মা ও মেয়ের জীবন অতিষ্ঠ হয়েচে। তারপর মেয়েটি আবার অন্তঃসত্ত্বা। মা বলে মেয়েকে, তুই বিষ খেয়ে মরে যা, আমি তোকে নিয়ে কি করি। একাদশীর দিন মেয়েটা মরে যাওয়ার যোগাড় হয়। তার ওপর পেটের ছেলে টান ধরে, জলতেষ্টায় ও খিদেতে, একাদশীতে বড় কষ্ট পেয়েচে। সবাই বলেছিল জল খেতে দাও, মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও দেবী দু-জনেই বলেচে, একে তো বাড়ির দুই ছেলে (মহেন্দ্রবাবুর মেজো ও সেজো ছেলে) এর আগে মারা গিয়েচে, একাদশীতে বাড়ি বসে বিধবা জল খেলে, পাছে আরও কোন অকল্যাণ হয় ! দেবী বলেচে, আমার তো ওই বাচ্চা, আমার সে সাহস হয় না বাবু, জল খাওয়াতে হয় ও মেয়েকে নিয়ে তুমি অন্যত্র যাও।

কাজেই মেয়ের জল খাওয়া হয় না।

এরা একটা কথা ভুলে যাচ্চে—

'By day and by night, year in and year out, century after century, there is going out a colossal broadcast of power which gives real life to all who will enter into it. Normal function of the organism is to act as a receiving set for Life Power. Clear out hatred, malice, lust, fear and all other frictions and you will find that entirely without any other effort

on your part, there will pervade your being and your life that hitherto unheard wave of spiritual power.'

আমরা আরও ভুলে যাই যে, পাপ জিনিসটাতে ভগবান রাগ করুন বা না করুন—

'Sin should be synonymous with bad radio production. A bad man is known by its poor reproduction of God's life.'

'When we began to deny ourselves for the good of others it was a highly important step in the soul's development and destined to lead on to increasing concern for others' good. Then we begin to realise God with a personal interest in our life and we decide to consider his wishes.'

আরও কথা আছে। টাকা রোজগারই তো সংসারের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের চরম সার্থকতা আসবে মনের পথ ধরে। কিন্তু সময় আসে যখন মনে হয় ভগবান জীবনের কেন্দ্র, তাঁর কাছ থেকে সব মঙ্গল আসবে। 'It is well to have a clear-cut aim. Unless we are striving to attain, our policy is drift, and drift will not bring us the lost things. The lost things have to be thought for, prayed for, worked for and the supermost thing in earthly life is the development of soul qualifilcation for a spacious and satisfying activity when entering the Beyond.'

'It is the outermost or highest sphere. Life there is realised more impersonally. One's whole work and activity on that sphere would be solely for the good of others. There would be no personal bias, selfiish aims of ambitions would be impossible.'

আজ বেশ একটা অভিজ্ঞতা হোল। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল সকাল স্কুল বন্ধ হবার পরে গেলুম কার্জন পার্কে ডালিয়া ফুল ফোটা দেখতে। সেখান থেকে বেরিয়ে একবার ভাবলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে কিছু একটা পড়ব। সাত পাঁচ ভেবে সামনেই একখানা টালিগঞ্জের ট্রাম দেখে উঠে পড়লুম তাতে। টালিগঞ্জ ডিপোতে নেমে একটু ফাঁকা মাঠ কি পাড়াগাঁ খুঁজে নেবার জন্যে হেঁটে চলেচি, কালী ফিল্মের স্টুডিও পার হয়ে একটা খাল পেলাম। খালে খেয়া আছে, আধপয়সা করে তার পারানি। খাল পেরিয়ে যাচ্চি। একটা লোক আমার আগে যাচ্ছিল, তার মুখে শুনলুম যে নিকটে কোন গ্রামে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষে কি একটা মেলা হয়। সেখানে চলেচে সে। আমি তার সঙ্গ নিলুম। ভাবলুম দেখাই যাক কি রকমের মেলা। চলেচি তো চলেইছি, দিব্যি পাড়াগাঁ, বাঁশঝাড়, শিমুল গাছে রাঙা ফুল ধরেচে, ঘেঁটুবনে মুকুল দেখা দিয়েচে, সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে, দু-একটা কোকিলও ডাকচে। ক্রমে দূর থেকে লোকজনের কলরব শোনা গেল। দু-একটা দোকান বসেচে, অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কাছে গিয়ে দেখলুম। একটা নীচু পাঁচিলে ঘেরা বাগান-বাড়ি মত জায়গায় অনেকগুলি মেয়ের ভিড়—প্রায় চার পাঁচ শো মেয়ে। পুরুষ তত বেশী নয়, সবাই মহা ব্যস্ত, ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করচে, ছেলেমেয়ে কাঁদচে, চীৎকার করচে। বাগান-বাড়িতে ঢুকে দেখি ছোট্ট একটা একতলা বাড়ির সামনের উঠোনে গাছতলায় প্রায় দু-তিনশো মেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে শালপাতা পেতে বসে আছে। শুনলুম তারা খেতে বসেচে কিন্তু আগের দল খিচুড়ি সব খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে। খিচুড়ি চড়েচে, আবার না নামলে এদের খেতে দেওয়া যাবে না। মেয়েরাই সেখানে কর্ত্রী, তারাই সবাইকে দিচ্চে থুচ্চে,

আদর-আহ্বান করচে, কাউকে বা শাসন করচে। একটা ছোট ঘরের মধ্যে সবাই ভিড় করে ঠাকুর দেখতে ঢুকচে দেখে আমিও ঢুকলুম। ছোট্ট কালী প্রতিমা, নাম সুশীলেশ্বরী। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, এখানে একজন বৃদ্ধা থাকেন, তিনিই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেচেন। একটু পরে সেই বৃদ্ধাকেও দেখলুম, সবাই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করচে। আর তিনি সবাইকে মিষ্টি কথায় বলচেন—না খেয়ে যেও না যেন বাবা। একটা ইট বাঁধানো চৌবাচ্চায় খিচুড়ি ঢালা হচ্চে, পাশেই আর একটা চৌবাচ্চায় কপির তরকারি। সকাল সকাল খাবার জন্যে সবাই উমেদারী করচে—অনেক দূর যাব, মেয়েছেলে নিয়ে এসেচি, ভাড়াটে গাড়ি, প্রসাদ দিয়ে দিন।

আমাকে একটা ঘরে খাওয়াতে বসালে। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হোল এখানে কি খাওয়ায় না দেখে যাবো না। তাই একটি মেয়েকে বলতেই সে আমায় ঐ ঘরটায় নিয়ে একখানা পাতা করে বসিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে আমার বসবার আসনের কাছেই আর একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বসে খাচ্ছে আর তার ছোট ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে খিচুড়ি মুখে তুলে খাওয়াচ্চে। যে মেয়েটি আমায় পাতা করে বসিয়ে দিয়েছিল সে কোথায় চলে গেল। আর একজন আমায় পরিবেশন করলে। খিচুড়ি, চচ্চড়ি, আলুর দম, কপির তরকারি, বেগুন ভাজা, চাটনি, পায়েস, দই, মুড়কী ও রসগোল্লা। তা খুব দিলে, পাতে ঘি দিলে। এটা নেবে, ওটা নেবে জিজ্ঞেস করে খাওয়ালে। কেমন যত্ন করলে যেন বাড়ির ছেলের মত, অথচ আমাকে তারা জীবনে এই প্রথম দেখলে। মেয়েদের এই একটা গুণ, খাওয়াতে মাখাতে যত্ন করতে ওদের জুড়ি মেলে না।

খাওয়া শেষ হোল, আর একটি মেয়ে আবার সাজা পান দিলে। এমন মচ্ছবের খাওয়ায় যেখানে রবাহূত অনাহূত কত আসচে যাচ্চে তার ঠিকানা নেই, এখানে কে আবার খাওয়ার পরে পান দেয়! এ আমি এই প্রথম দেখলুম।

দেখে কষ্ট হোল আমি যখন খাওয়া শেষ করে বাইরে এলুম, তখন সেই অল্প বয়সের বধূটি রোয়াকের সামনে পাত পেতে বসে আছে—তখনও তাদের কেউ খেতে দেয় নি। এদের জিনিসপত্র বেশী কিন্তু লোক কম। খাওয়ার সময়ে পরিবেশনকারিণী মেয়েরা বলাবলি কচ্ছিল—আর পারি নে বাপু। সকাল থেকে খাটচি, আর রাত বারোটা পর্যন্ত কত খাটি? আসচে বছর আর এখানে আসা চলবে না দেখচি।

ওখান থেকে বার হয়ে একটা বাঁশবনের মধ্যের পথ ধরে অনেকটা হেঁটে গেলুম, বেলা পড়ে এসেচে, বাঁশবনে বেশ ঘন ছায়া, এক জায়গায় সাতটা ভাঙা শিব মন্দির সারি সারি, অনেকগুলো শিমুল গাছ। ফুলে ফুলে রাঙা। বড় মাঠে বসে খানিকটা বিশ্রাম করলুম—তারপর এসে ট্রাম ধরে চৌরঙ্গির মোড়ে নামলুম। সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে হেঁটে সুধীরবাবুর দোকানে এসে ভাবলুম সরোজকে গল্পটা করব, দেখি সরোজ বেরিয়ে গিয়েচে।

কি একটা অবর্ণনীয় আনন্দ পেয়েছি আজ! অথচ কেন যে সে ধরনের আনন্দ এল, এর কোন কারণ খুঁজে পাই নে। নীরদবাবুর বাড়ি যখন বসে আছি, তখনই এটা প্রথম অনুভব করলুম, কিন্তু তখনই পশুপতিবাবু ফোন করলেন এখুনি আসুন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে প্রমথ বিশীর নাটক হচ্ছে। নীরদ যেতে পারলে না, আমি মিসেস দাসগুপ্তকে নিয়ে ওদের মোটরে ইন্‌স্টিটিউটে এলুম। সেখানে পরিমল গোস্বামী, প্রমথ বিশী এবং সবাই হাজির। পরিমল বললে, আপনার 'দৃষ্টিপ্রদীপ' পড়েচি, কাল রাত্রে। বড় ভাল লেগেচে। আরও গল্পগুজব চলল। আমি গিয়ে বৌঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করে এলুম। তারপর ওখান থেকে পার্ক সার্কাসে মণীন্দ্র বসুর বাড়িতে চা-পার্টিতে এলুম, কারণ সেখানে জ্যোৎস্নার

বিবাহের কথা হবে অন্নদাশঙ্করের আত্মীয়ের সঙ্গে এবং আমিই তার ঘটক। পার্ক সার্কাসের বাস থেকে নেমে যখন মণীন্দ্র বসুর বাড়ি যাচ্চি, তখন ছিন্নভিন্ন বাদলা মেঘের অন্তরালে প্রতিপদের চাঁদ উঠেচে, সে যে কি এক সৌন্দর্যভরা ছবি, না দেখলে বোঝানো যাবে না। তখনই আমার বিহারের জঙ্গলের ও তার হতভাগ্য দরিদ্র নরনারীদের কথা কি জানি হঠাৎ মনে পড়ল, তাদের মধ্যে ছ-বছর থেকেচি, তাদের সব অবস্থাতে দেখেচি, জানি। আর সেই নির্জন বনানী!

রাত্রে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না উঠেচে যখন বিছানাতে এসে শুই; মণীন্দ্রবাবুর বাড়িতে চারু রায়, সুরেন্দ্র মৈত্র এঁদের সঙ্গে spiritualism নিয়ে ঘোর বাদানুবাদ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। তারপর হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে আর একপালা বাদানুবাদ।

আজ ট্রামে স্কুল থেকে গেলুম গঙ্গার ধারে। গিরিজাপ্রসন্ন সেনের কবিরাজি ডিসপেন্সারির মধ্যে অয়েল-পেণ্টিংখানা ঠিক সেই জায়গাটিতে আছে—বাবার সঙ্গে কতবার ভগবতীপ্রসন্ন কবিরাজের কাছে আসতুম। বাড়িটা সেইরকমই আছে, তবে খুব পুরোনো হয়ে পড়েচে। ভাবলুম আজ এই যে এই ঘরে ঢুকলুম, জীবনে যা কিছু সব হয়েচে, সেবার এই ঘর থেকে বার হবার ও এবার পুনরায় ঢুকবার মধ্যে, সেই যে ছেলেবেলায় কিশোর কাকা সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়তেন তাও,...যুগল কাকাদের ঢেঁকশেলে আমি, ভরত, নেড়া বাদলার দিনে খেলা করতাম তাও, বাবার সঙ্গে আমি হুঁকোর দোকানে বসে লুচি খেয়েছিলুম তাও, প্রথম যেদিন ধানবনের মধ্যে দিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হতে যাই বনগাঁয়ে তাও, সব কিছু,—সব কিছু, কত কথা মনে হোল, সারা জীবনটা যেন এক চমকে দেখতে পেলুম গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বড় অয়েল পেণ্টিংটার সামনে বসে।

তারপর গিরিজাবাবুর সঙ্গে ওদের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। কত পুরোনো আমলের ছবি টাঙানো, যে সব ছবি আর এখন মেলে না। উঠোনের সেই জায়গাটি যেখানে বসে বাল্যে একদিন মধুছন্দার অভিনয় দেখেছিলুম ভূষণ দাসের যাত্রার দলে, সব সেই রকমই আছে তবে যেন বড় পুরোনো হয়ে গিয়েচে।

বারাকপুরে শৈশবে যাপিত কত রাঙা সন্ধ্যা, পাখীর ডাক ও মায়ের মুখ মনে পড়ল—বাড়ির পিছনে বাঁশবনের কত দিনের কত ছায়া গহন, রাঙা রোদ গাছের মাথায় মাখানো সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যা, যে শৈশব, যে বারাকপুর আর কখনও ফিরে আসবে না আমার জীবনে।

ওখান থেকে বার হয়ে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের পৈঠায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

কালোর বৌভাতে শনিবার বাড়ি গিয়েছিলুম। দুপুরে খয়রামারির মাঠে যেমন বেড়াতে যাই,—গিয়েচি। একটি ঝোপের ধারে বৈঁচি গাছে কচি বৈঁচি পাতা গজিয়েছে, মাথার ওপর নীল আকাশ, কি ঘন নীল, বাতাসে যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র, মাঠের সর্ব্বত্র ছড়ানো শিমুল গাছ ফুলে রাঙা হয়ে রয়েচে। ট্রেনে আসতে কাল শনিবারে রাঙা শিমুল ফুলের শোভা মুগ্ধ হয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেচি, মনে মনে ভাবি প্রতি বৎসর দেখচি আজ চল্লিশ বছর কিন্তু এরা তো পুরোনো হোল না, কেন পুরোনো হোল না—কেন প্রতি বৎসর শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়, তা কে বলবে?

গত শুক্রবারে আবার বসিরহাট গিয়েছিলাম। মাঠে মাঠে শিমুল গাছগুলি রাঙা হয়ে উঠেচে ফুলে ফুলে, বৈঁচি ফুল ফুটেচে বাঁশবনের শুকনো ঝরা লতার মধ্যে, বাতাবী লেবু

ফুলের গন্ধও মাঝে মাঝে পাচ্চি। বসিরহাটে নামলুম বিকেলবেলা, প্রসাদের সঙ্গে বাঁধানো জেটির ঘাটে গিয়ে বসে রাঙা রোদ মাখানো ইছামতীর ওপারের দৃশ্যটি দেখলুম। এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে একদিন গৌরী বলেছিল—'গাড়িতে কেমন কলের গান হচ্ছিল, শুনছিলাম মজা করে'। সে কথাটি বললুম প্রসাদকে। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিদির সঙ্গে গল্প করলুম। পরদিন সকালে অর্থাৎ শনিবার কবি ভুজঙ্গভুষণ রায় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বয়স চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছর হয়েচে, কিন্তু মাথায় একটা চুলও পাকে নি, আমায় দুখানা বই দিলেন, চা খাওয়ালেন। গীতার কাব্যানুবাদ করচেন পড়ে শোনালেন, বেশ লোক।

এই দিন বিকেলের ট্রেনে ফিরলুম কলকাতায়, ওপথে গাছপালার সৌন্দর্য্য তেমন নয়, একটি মেয়ে ট্রেনে কেমন গান করে শোনালে। সন্ধ্যার সময় নীরোদবাবুর বাড়িতে সাহিত্য সেবক সমিতির অধিবেশনে যেতে যেতে নিৰ্জ্জন অক্‌ল্যান্ড স্কোয়ারে বসে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পেলুম, দু-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে। এ আমার অতি সুপরিচিত পুরাতন আনন্দ। ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আসচি, এতে অবিশ্যি আশ্চর্য্যের কথা কিছু নেই। অনেকে আমার এ আনন্দটা বোঝে না, কিন্তু তাতে কিই বা যায় আসে—আনন্দের উপলব্ধিটুকু তো আর মিথ্যে নয়।

বাইরে কোথাও ভ্রমণের একটা পিপাসা আবার জেগে উঠেচে। ভাবচি আফ্রিকা যাব, শম্ভু আজ এসেছিল, সে বললে, তার কে একজন আত্মীয় ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির আপিসে কাজ করে, তারই সাহায্যে যদি কিছু হয় দেখবে ও চেষ্টা করে। আজ সারাদিন স্কুলেও ওই কথাই ভেবেচি, বেশীদূর কোথাও যেতে চাই নে। কিন্তু জগতের খানিকটা অন্ততঃ দেখতে চাই।

সেদিন P. E. N. Club-এ যে মধ্যাহ্ন ভোজ হোল বোটানিক্যাল গার্ডেনে—সেখানে অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হোল। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী, অক্সফোর্ড থেকে এম্-এ পাস করে এসেচে।

পরের বৃহস্পতিবারে ইদের ছুটিতে বাড়ি এলুম। আসার উদ্দেশ্য এই ফাগুনে বাংলার বনে, মাঠে অজস্র ঘেঁটুফুল ফোটে—অনেকদিন ঘেঁটুফুলের মেলা দেখিনি, তাই দেখব। তাই আজ সকালে এঞ্জিনিয়ার ও সাবডেপুটীবাবুর সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গেলুম চৌবেড়ে। সেখানে ওদের ইউনিয়ন বোর্ডের এক কাজ ছিল, মিটিয়ে সবাই মিলে যাওয়া হোল দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি। ভাঙা সেকেলে পুরোনো কোঠা, বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েচে—তাঁর জন্মস্থান দেখলুম—দীনবন্ধু মিত্রের এক জ্ঞাতি ভাইপো বাড়ির পিছনে একটা সজনে তলা দেখিয়ে বললেন—ঐ গাছতলায় তখনকার আমলে আঁতুড় ঘর ছিল—ওইখানে দীনবন্ধু কাকা জন্মেছিলেন। আমি ও মনোরঞ্জনবাবু সার্কেল অফিসার স্থানটিতে প্রণাম করলুম। তারপর ঘেঁটুফুলের বন দেখতে দেখতে মাঠে মাঠে অনেকগুলো চাষাদের গ্রাম ঘুরে বেড়ানো গেল—চৌবেড়ে, ন'হাটা, সনেকপুর, দমদমা, মামুদপুর ইত্যাদি। বেলা একটার সময় এলুম কালীপদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি। সেখানে কালীপদ খুব খাতির করলে। ওখান থেকে বার হয়ে আমি নামলুম চালকী। সেখানে খাওয়া দাওয়া করলুম। চালকীর পিছনের মাঠে কি ঘেঁটুবনের শোভা! দিদিদের বাড়ি বসে ঘটুর বিয়ের বড়মানুষি গল্প শুনলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে বনগাঁয়ে গিয়ে খয়রামারির মাঠে ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর কতক্ষণ বসে রইলুম। দূরে গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠেচে—মাথার ওপর দু-চারটা তারা। মনের কি অপূর্ব্ব আনন্দ! কাছে ছিল একখানা বই—বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা। সেখানে ঐ রকম স্থানে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে বসে পড়ে যেন একটা মসৃণ

অনুভূতি নিয়ে ফিরলুম।

ঘোষপাড়ার দোলে এলুম অনেকদিন পরে। আজ সকালে বনগাঁ থেকে নটার ট্রেনে বার হয়ে রানাঘাটে সাড়ে দশটায় শান্তিপুর লোকাল ধরলুম, দোলের মেলায় আসতে হোল বেলা সাড়ে বারোটা। ছোট মাসীমা খেয়েদেয়ে ওপরে শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন, আমি আসতে চা করে দিলেন। দুপুরের রোদে বাঁশবাগান আমার বড় ভাল লাগে—আর এই সব বাঁশবনের সঙ্গে আমার আশৈশব সম্বন্ধ। বিকালে একটু ঘুমিয়ে উঠে মেলায় গিয়ে একটি বড় সাংঘাতিক ঘটনা চোখের ওপর ঘটতে দেখলুম। একজন গুণ্ডা জনৈক যাত্রীর পকেট কেটেছিল, পাশেই ছিল একজন হিন্দুস্থানী ভলাণ্টিয়ার, সে যেমন ধরতে গিয়েচে, আর গুণ্ডাটি ওকে মেরে দিয়েচে ছুরি। আমি যখন গেলুম, তখন আহত লোকটাকে ওদের তাঁবুতে এনে শুইয়েচে, খুব লোকের ভিড়। একটু পরেই সে মারা গেল। ওদিকে সেই গুণ্ডাটিকেও পুলিশে ধরে ধরে ফেলেচে—তাকেও লোকে মেরে আধ-মরা করেছে। মেলাসুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত—সবাই বলচে, এমন কাণ্ড কেউ কখনও এমন স্থানে ঘটতে দেখে নি! আমি আরও খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে চলে এলুম। রায়বাড়ির পাশের একটা ঘন বনের-মধ্যের পথ দিয়ে ঢুকে একটা শুকনো পুকুরের পাড়ে ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ফিরে যখন আসচি তখন একটা শিমুল গাছের বাঁকা ডালপালার পেছনে পূর্ণচন্দ্র উঠচে—স্থানটি আফ্রিকা হতে পারতো, কি নির্জ্জন, আর কি ভীষণ জঙ্গল—বাংলাদেশের গ্রামে এমন জঙ্গল আছে, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে? কি মহিমময় দৃশ্য সেই উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের, সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে, আঁকাবাঁকা শিমুল গাছের ফাঁকে। আজ আমার ঘোষপাড়ার দোলে বেড়াতে আসা সার্থক হোল মনে হচ্চে শুধু এই দৃশ্যটা দেখবার সুযোগ পেলুম বলে। সেদিনের সেই খয়রামারির মাঠে শুকনো ডালের ওপর বসে থাকা ঘেঁটুবনের মধ্যে, আর আজকার কামারপুকুরের পাড়ের জঙ্গলে এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়—এবারের দোলের ছুটির মধ্যে এই দুটো ঘটনা জীবনের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্যে আসন পেতে পারে।

তারপর মাসীমা ছাদে বসে চা করে দিলেন, লুচি ভাজলেন, আমি কাছে বসে গল্প করলুম। অনেকদিন আগের কথা তুললেন, আমি, গৌরী, মণি ও মাসীমা ছাদে বসে কত তাস খেলতুম। আমি তো ভুলেই গেছলুম, এতদিন পরে আবার সেকথা মনে এল। সুপ্রভার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

এর মধ্যে একদিন কাঞ্জর্ন পার্কে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে জনৈক জাপানী চোরের আত্মকাহিনী পড়ছিলুম। বইখানাতে আছে, সে নিজে ভয়ানক বদমাইশ থেকে যীশুখৃষ্টের বাণীর প্রভাবে কেমন করে হঠাৎ ভাল লোক হয়ে পড়ল। আমার ডাইনে এক গাছে ফুটেচে চেরী ফুল, সামনে লাটসাহেবের বাড়ির কম্পাউণ্ডে সারি সারি দেওদার গাছে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে—সেদিন ভুলে গেলুম যে কলকাতায় বসে আছি—ট্রাম, বাস আসচে যাচ্ছে, সে যেন আমার চোখেই লাগে না—আমি যেন বহুদূরে হিমালয়ের কোন অরণ্যে বসে আছি—সে গম্ভীর হিমারণ্যের নিস্তব্ধতা শুধু ভঙ্গ করচে তুষার নদীমুক্ত স্রোতধারা আর দেওদারের শাখা-প্রশাখার মধ্যে বায়ুর স্বনন।

তারপরেই একদিন গেলুম রাজপুরে। সন্ধ্যার সময় গিয়ে মাঠের ধারে বসলুম, মাথার ওপরে এক আধটা নক্ষত্র উঠেচে, হুহু দক্ষিণ হাওয়া বইচে, সামনে একটা বটগাছ, দূরবিসর্পী দিকচক্রবাল সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হোল—গত শনিবারে শার্লি টেম্পলের ছবি দেখে যেমন আনন্দ পেয়েছিলুম, এ যেন তার চেয়েও বেশী—যদিও শার্লিকে আমার খুবই ভাল লাগে এবং ঐ ছোট্ট মেয়েটির ছবি

থাকলেই আমি দেখি।

"To those who have some feeling that the natural world has beauty in it, I would say, cultivate this feeling and encourage it in every way you can. Consider the seasons, the joy of spring, the splendour of the summer, the sunset colours of the autumn, the delicate and graceful bareness of winter tress, the beauty of snow, the beauty of light upon water, what the old Greek called the unnumbered smiling of the sea."

'In the feeling for that beauty, if we have it, we possess a pearl of great price.'

—Lord Grey of Falloden

এ দিনটি প্রথম এক বাণ্ডিল পরীক্ষার কাগজ সুনীতিবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম। কথা ছিল মণিকুন্তলারা আজ রাজপুরে যাবে পিক্‌নিক করতে, ৮।৫৪ লোকাল ট্রেনে। আমিও ওদের সঙ্গে যাব, কিন্তু স্টেশনে যেমনি পা দেওয়া অমনি ট্রেন গেল চলে। পরের ট্রেনে গেলাম। বেগুনের মা খুব রান্না-বান্না করেছেন গিয়ে দেখি। মণিকুন্তলাকে বললুম—দু-দিন তোমার ওখানে গিয়ে দেখা পাই নি, এখানে এসেচ ভালই হয়েচে। আমরা খুব আনন্দ করে চা ও কলার বড়া খেলাম। মণির বোন রেণুর সঙ্গে আলাপ হোল, বেশ মেয়েটি, বুদ্ধিমতী খুব। রেণু যে ভাল নাচতে পারে, এ আমি এই প্রথম শুনলুম মণির মুখে। রেণু আমার কাছে এসে বললে—গল্প বলুন। ছেলেমানুষ—দু-একটি ভুতের গল্প শোনালুম। তারপর সে আর আমার কাছছাড়া হয় না। যেখানে আমি যাব সে সেইখানেই আছে উপস্থিত।

বললে—আপনাকে আমার বড় ভাল লাগচে। তারপর সবাই মিলে বোসপুকুরে নাইতে গেলুম। খুকীকে ডেকে নিলাম ওর বাড়ি থেকে। বোসপুকুরে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গেলাম। তারপর আর একটা পুকুরে নাইলাম।

রেণু বললে—এক একজনকে কেমন হঠাৎ বড় ভাল লাগে, আপনাকে যেমন লেগেচে। দেখচেন না সব সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে আচি।

তারপর বাড়ি এসে আমার আঙুলগুলো মটকাতে লাগল। বললে আর-জন্মে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল।

আমি বললুম—আমি তোর বাবা হব, আমার মেয়ে হবি ?

সে বললে—তাহলে মেয়ের মতই দেখুন। বলে—পাশে এসে আমার কাঁধে মাথা রেখে বসল।

মণিকুন্তলা গান গাইলে আর ও নাচলে।

'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমো, নমো নমো'

বাবার শোকে রেণু নাকি পূর্বজন্মে আত্মহত্যা করেছিল, ওকে কে বলেচে নাকি। অদ্ভুত মেয়ে! ওর দিদি জ্ঞানবাবুর বাড়ি গেল—ও গেল না। বললে—ওরা মোটরে যাক্, আপনি আর আমি যাব হেঁটে।

সারা পথ ট্রেনে দু-বোনে গান গাইলে। বালিগঞ্জে জোর করে আমায় নামিয়ে নিলে। একটা গন্ধরাজ ফুল কোথা থেকে তুলে নিয়ে এসে আমায় দিলে। চেয়ারের পাশে জ্যোৎস্নায় বসে রইল সব সময়। বললে—ঠিকানা দেবেন, বাড়ি গিয়ে পত্র দেব। দুঃখ এই যে শীগ্‌গির

চলে যাচ্ছি। আগে কেন ভাব হোল না।…ইত্যাদি। অদ্ভুত মেয়ে বটে! ভারী ভাল লাগে ওকে, সব সময়ে 'বাবা' বলে ডাকবে আমাকে।

রেণুর কথাটা কেমন এক ধরণের আনন্দে আমায় ক-দিন যেন ডুবিয়ে রেখেচে। এমন একটা মনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল—যার সন্ধান পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। তাই সবাইকে গল্প করে বেড়াচ্চি। আজ বিকেলে নীরদবাবু, বউঠাকরুন, পশুপতিবাবু, মিসেস দাশগুপ্ত সবাই মিলে গড়িয়ার মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে হারমোনিয়াম গিয়েছিল, স্টেশনে নেমে মাঠের মধ্যে বসে আমরা গান গাইলুম। আমি হালুয়া তৈরী করলুম উনুন জেলে। চা খাওয়ার পরে গল্পগুজব হোল। আমার কিন্তু রেণুর কথা বার বার মনে হয়ে বিকালটা কি রকম হয়ে গেল। কেবলই মনে হয়, আহা, রেণু থাকলে বেশ হত! ওদের কাছে কথাটা বললুম। ওরা তো শুনেই বললে, আগে কেন বললেন না, আমরা গিয়ে তাকে নিয়ে আসতুম।

কাল রেণুদের বাড়ি গিয়েছিলুম। যেমন গিয়েচি ও তখনই দৌড়ে একখানা পাখা নিয়ে আমায় বাতাস করতে বসল, বললে,—শরবৎ করে নিয়ে আসি, দাঁড়ান। তারপর সব সময়েই মণি, আমি আর ওর বাবা গল্প করচি, রেণু আমার পাশে জানলার ধারে বসে রইল। লক্ষ্মীপুজো গিয়েচে কাল ওদের বাড়িতে, তা ও ভুলেই গিয়েচে। ওর বাবা বলে, আপনি এসেচেন আর ও সব ভুলে গিয়েচে। বাইরের বারান্দাতে জ্যোৎস্নায় মণি ওর কলেজ-জীবনের কত কথা বললে। রেণু বললে—আপনার জন্যে রজনীগন্ধা রেখেছিলুম, শুকিয়ে গিয়েচে, পদ্ম আছে, দেব এখন? আসবার সময় নিচু পর্য্যন্ত নেমে এল সঙ্গে, আর কেউ নয়, মণি এসেছিল, কিন্তু ওর বাবা ডাকলেন বলে আমি আবার ওপরে গেলাম উঠে, তাই মণি এবার আর আসে নি কিন্তু রেণু দু-বারই এল। আমার কোলের কাছটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি বুধবারে আসবেন তো? আমি পথের দিকে চেয়ে থাকি, কখন আসবেন। কি সুন্দর মেয়ে!

ছ-বছর পরে খুদুদের ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে দুপুর বেলাতে মনে বেশ আনন্দ হোল, কারণ পথে পথে নতুন-পাতা-ওঠা গাছ, কোকিলের ডাক। রাত দশটার পরে জ্যোৎস্না উঠেচে, চেয়ার পেতে বাইরে বসে দেখি আর ভাবি, কাল ঠিক জ্যোৎস্না উঠতে দেখে মণি আমার সঙ্গে তর্ক করলে যে এটা নাকি শুক্লপক্ষ—ওদের বাড়ির ছাদে। তারপর, তিনু আর আমি খয়রামারির মাঠে গেলুম বেড়াতে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—পথে ঝোপেঝাড়ে কত কি ফুলের সুগন্ধ। এই গ্রীষ্মকালে বনঝোপে রাত্রে নানারকম বনফুল ফোটে—তার মধ্যে বনমল্লিকা বেশী। মনে এমন একটা অদ্ভুত আনন্দ ও উত্তেজনা আসে যে মনে হয় খয়রা-মারির মাঠেই সারারাত বসে থাকি। খুকুর কথা ও রেণুর কথা যত মনে হয় আর তত আনন্দ বেশী পাই। মাথার ওপরে কেমন নক্ষত্র উঠেচে, এই জ্যোৎস্না রাত্রে সারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে যে প্রীতি ও ভালবাসা উৎসারিত হচ্চে, পবিত্র প্রাণের অবলম্বনে তারা আমার জন্যে, তোমার জন্যে, সেই প্রীতি ভালবাসার কিছু অংশ homely ভাবে পরিবেশন করবে। কতরাত্রে ফিরে এলুম, তবুও ঘুম আসে না। একে গরম, তাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে, কি করে ঘুমোই? জীবনে আজকাল বড় বেশী আনন্দ পাচ্চি, খানিকটা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থেকে।

নৌকো করে সকালে বারাকপুর যাচ্চি। এ সময়টা আর কখনও ইছামতীতে নৌকো

করে যাই নি, বর্ষাকালের চেয়ে প্রকৃতি এখন আরও সবুজ—সত্যিই আরও সবুজ। গাছে গাছে নতুন শোভা। চারিদিকে পাখী ডাকচে পিড়িং পিড়িং, কোকিল ডাকচে, ঠ্যাং উঁচু করে বকগুলি শেওলার দামে বসে আছে—শিমুল গাছগুলোর রূপ কি অদ্ভুত! শিমুল ষাঁড়া আর বাব্‌লা গাছে নদীর শোভা বাড়িয়েচে। আমি বসে কাগজ দেখচি মেয়েদের, প্রায়ই সব পাস করিয়ে দিচ্চি—মেয়েদের ফেল করাতে মন সরে না—আর রেণুর কথা ভাবচি, কাল খুদু বলেছিল বিকেলে—'আপনার সঙ্গে কথা বলে যেমন অদ্ভুত আনন্দ পাই, এমন আর কারও সঙ্গে কথা বলে পাই নে' সেই কথা ভাবচি। খুদু কাল যেতে বলে দিয়েচে কিন্তু আজ রাত্রেই আমি যাব চলে, সুতরাং কাল কি করে তার সঙ্গে আর দেখা করব? এ ক-দিনই কি অদ্ভুত আনন্দে কাটচে।

আমাদের ঘাটে গিয়ে নৌকো লাগল। এবার বন জঙ্গল কেটে দেশের শোভা অনেকটা নষ্ট করে ফেলেচে। দুপুর হয়ে গিয়েছিল, আমি কুঠীর মাঠের দিকে একটু বেড়াতে গেলুম—পুঁটি দিদিদের বাড়ি ব্যাগ রেখেই। বাঁশবনে পাতা পুড়িয়েচে—চারিদিক যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। স্নান করতে গেলুম ঘাটে, সেই বননিমের ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে, খুকু আর আমি সেই ঘাটে নাইতে আসতুম, খুকু ওর তলায় দাঁড়িয়ে থাকত—মনে হোল যেন কত কাল হয়ে গেল। খেয়ে বিশ্রাম করে চড়ক-তলায় গেলুম। উমা এসেচে অনেকদিন পরে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। মণিকুন্তলার পত্রখানা ও আবার দেখলে। চড়কতলায় এসে কতযুগ পরে কাদামাটি দেখি। সোনা, নলিনীদির মেয়ে তাকেও দেখলুম কতকাল পরে। পাগ্‌লা জেলে সন্ন্যাসী সেজেচে, ওকে কত ছোট দেখেচি। অজয় মণ্ডল বড় বুড়ো হয়ে গিয়েচে। সে জিজ্ঞেস করলে আমার বাড়ির কথা, আমার ভাই কেমন আছে।

চালতেপোতার বাঁধ দিয়ে যেতে যেতে এখন এই অংশটা লিখচি। কি অপূর্ব গাছপালার শোভা,—বারাকপুরের পুলে,—আর এই চালতেপোতার পুলে। নদীর জলের ও হাক্‌রা বনের এই যে সুগন্ধ এটা আমাদের ইছামতীর নিজস্ব। এবার গুড ফ্রাইডের ছুটিটা সম্পূর্ণরকমে বড় আনন্দেই কাটল। এত আনন্দ জীবনে অনেক দিনই পাই নি।

রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ডাইনে চালকীর পথের ধারে কচি পাতা ওঠা শিমুল গাছটায় চাইলে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। যখন এ সব দৃশ্য দেখি, তখন অনর্থক অর্থব্যয় করে দেশভ্রমণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। এর চেয়ে ভাল কোন দেশ আছে! এত বিচিত্র বনশোভা কি ট্রপিক্যাল আফ্রিকার? একটা পাপ্‌ড়ি ফাটা শিমুল গাছের কি শোভা হয়েচে। পাপ্‌ড়ি ফেটে তুলো বেরিয়ে আছে আঁকাবাঁকা গাছের ডালে ডালে। নদীর জলে মাঝে মাঝে কচ্ছপ ভেসে উঠে, মুখ বার করে 'ভু-উ-উস্‌' শব্দে নিশ্বাস নিচ্চে।

আজ অনেকদিন পরে জালিপাড়ার সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু-চারজন আছে বাল্য জীবনের আলাপী, তাদের সঙ্গে যখন পথে ঘাটে এইভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তখন বড়ই আনন্দ হয়। একজন আমাদের 'আচ্চার-দা', একজন হচ্চে চালকীর শশিবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছিল মোল্লাহাটীতে আম কিনতে সেই যে ছোক্‌রা, যাকে আমি ও ছোটমামা আমাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলুম, আর একজন হচ্চে পেরুর কন্‌সাল ডন মটয়াস্‌কি, যাকে পায়েস খাইয়েছিলুম, বনগাঁয়ের বাসা থেকে তৈরি করে। এই বছরটাতে কি যোগ আছে জানি নে, যত সব পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আবার—যেমন ধরি মণিকুন্তলাদের সঙ্গে, এই বছরই বিশেষ করে আবার যোগ পুনঃস্থাপিত হয়েচে রাজপুরের অন্নপূর্ণাদের সঙ্গে, রমাপ্রসন্নদের সঙ্গে, সুরেনদের সঙ্গে। মিনুও সেদিন আমার কথা গ্রামে এসে বলেছিল বুড়োর কাছে, বুড়ো বল্‌লে, সেদিন রাত্রের ট্রেনে

বনগাঁ থেকে আসবার সময়ে। এই বছরেই কতকাল পরে দেখা হয়ে গেল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে—সেদিন রাণাঘাট স্টেশনে। আচার্য্যরদার সঙ্গে রাণাঘাট মেডিকেল মিশনে, চড়কের দিন দেখা হোল। উমার সঙ্গেও বারাকপুরে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে। এই বছরেই ডাঃ পি. সি. রায়েদের আড্ডাতে আবার যাচ্চি ১৯১৪ সালের ছাত্র-জীবনের মত। এই বছরেই বনগাঁয়ে মিনুদের বাসায় গিয়ে রোজ গান শুনি, সেখানে ১৯১৮ সালের পরে আর কোনদিন পদার্পণ করি নি। আবার এই গত গ্রীষ্মাবসানেই বাগান গাঁয়ে রাখালী পিসীমার বাড়ি গিয়েছিলুম, তের বছর পরে। এই বছরেই এই সেদিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সেই ডিসপেনসারি ঘরটাতে গিয়ে গিরিজাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে কথা বলে এলুম—যেখানে আমার ন-বছর বয়সের শৈশবে শেষ বার গিয়েছিলুম। এ সবের চেয়েও বড় ও আমার কাছে সকলের চেয়ে মধুর—এই বছরেই এই সেদিন শনিবার গিয়ে পানিতরে সেই ওপরের ঘরটাতে রাত্রিযাপন করলুম বহুকাল পরে, আমার বিয়ের পরে যে ঘরটাতে আমি ও গৌরী থাকতুম। ওদের সঙ্গেও আবার একটা যোগ স্থাপিত হয়েচে এই বছরেই; জীবনে কখনোও যে আবার যাব তার আশা ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে ওদের বাড়িটার পিছনে কি আছে জানতুম না—তা এবার জেনেচি। বহুকাল পরে মুরাতিপুরে মামার বাড়ির ওপরের ও নিচের ঘরে এবার দোলের সময় আবার রাত্রি কাটিয়ে এসেচি। আন্নির সঙ্গে দেখা হয়েচে এবছরে, দিদির সঙ্গে দেখা হয়েচে তাও এবছরে।

অপূর্ব ১৩৪২ সাল কেটে গেল আমার পক্ষে। পুরোনো বন্ধুদের হারাতে চাই নে, বড় কষ্ট হয়। যে যেখানে আছে, যাদের কতভাবে, কতরূপে পেয়েচি—সব ভাল থাকুক, মাঝে মাঝে তাদের যেন দেখতে পাই।

ওঃ সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে কি আনন্দই পেয়েছিলুম আজ বিকেলে। ভাল কথা—লিখতে ভুল হয়ে গিয়েচে, এই কালই বিকেলে ভাগলপুরের যতীন বাবুর মেয়ে সত্যপ্রিয়ার সংবাদ পেয়েচি।

কেবল দুটি কষ্ট মনে রয়েচে—ঊষার সঙ্গে দেখা হয় নি বহুকাল—ভাবচি গরমের ছুটিতে, কি পুজোর ছুটিতে একবার এলাহাবাদে যাব। আবার একদিন রাজপুরের বিন্দুদের শ্বশুরবাড়িতে গেলুম রাধানাথ মল্লিকের লেনে। বিন্দু বড় ভাল মেয়ে, ভারি আদরযত্ন করলে। একে ছোট অবস্থায় দেখেছিলুম—আবার দেখলুম এই বছরই প্রথম। আবার বড়মামার ছেলে গুলুকে আজ আট বছর পরে এই বছরই দেখলুম। কত বছর পরে কুসুমের সঙ্গেও দেখা হয় গত ২৫ই মে। রেণুদের বাড়ি আর একদিন গিয়েছিলুম। ওরা ছেলেমানুষ, ভুতের গল্প শুনে খুব খুশি। আমায় আবার একটা লেবেঞ্চুষের কৌটা উপহার দিলে রেণু। বললে, আপনি আমাদের মত ছেলেমানুষ, তাই এটা দিলাম আপনাকে। ওরা কাল রবিবারে চাটগাঁ চলে গেল, আমি সকালে তুলে দিতে গেছলুম, ওরা ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিতে বললে। রেণুর তো কথাই নেই, সে জেতনকে বললে, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

রেণুর পত্র পেয়েচি। সে গিয়েই পত্র লিখেচে, আর তাতে লিখেচে, 'আসুন শীগগির একবার চাটগাঁয়ে।' আমি আর একদিন রাজপুরে গিয়েছিলাম। যদুনাথ ও খুকী বলছিল, রেণু আর একদিন ওখানে গিয়েছিল বেড়াতে, সেদিন আমি ছিলাম না তাই শুধুই আমার নাম করেচে।…ওইখানে বাবা শুয়েছিলেন, এখানে বসে বাবার সঙ্গে কত গল্প করেছিলুম… শুধু এই সব কথাই হয়েচে। সেদিন রাজপুর থেকে ফিরবার পথে জ্যোৎস্নালোকিত প্ল্যাটফর্মে বসে বসে কেবল এই সব ভেবেচি।

আজ একটি অদ্ভুত তালজাতীয় গাছের কথা পড়লুম, নাম Microzeminar Plum। অস্ট্রেলিয়ার Tambourine mountain-এ বিস্তর রয়েচে। এই গাছ নাকি বহুকাল বাঁচে। সেখানে পনেরো হাজার বছর একটা গাছ বেঁচে ছিল, সেটা দুশো ফুট উঁচু হয়। Prof. Chamberlain সেখানে অত উঁচু গাছ দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। পনেরো হাজার বছর বয়সী প্রাচীন গাছটা কে সেদিন কেটে ফেলে দিয়েচে, তাই নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে হৈ হৈ পড়ে গিয়েচে, ব্রিসবেনের টেলিগ্রামে প্রকাশ (রয়টার, ৮ই মে, ১৯৩৫, অমৃত বাজার পত্রিকাতে পড়লুম) বাকী গাছ যা সব আছে, তার মধ্যে একটার বয়েস এগারো হাজার বছর, বাকীগুলি তিন-চার হাজার বছরের শিশু।

কাল স্কুলের ছুটি হবে। আজ ছেলেরা খুব খাওয়ালে। আমি নানা জায়গায় ঘুরে টরুকে সঙ্গে নিয়ে রমাপ্রসন্নদের বাড়ি গেলুম। কুসুমের সন্ধান করে তার ঠিকানা পেলুম। টরুকে সঙ্গে নিয়ে তেত্রিশ বছর পরে গিয়ে কুসুমের সঙ্গে দেখা করলুম। আমার ন-বছর বয়সে কুসুম আমায় কত গল্প বলত। এখন তার বয়স ষাট-এর কম নয়—গরীব, লোকের বাড়ির ঝি। সে চেহারাই আর নেই। ওর সে চেহারা আমার মনে আছে। মানুষের চেহারার কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়।

তপুর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েচে, আজ দিন তিনেক আগে। তাকে দেখেছিলুম ছ-বছরের ছেলে—এখন তার বয়েস তের-চোদ্দ বছর। এ বছরটিতে পুরোনো আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হচ্চে।

আজ এ বছর গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম দিন এখানকার। বাড়িতে কেউ নেই, পাড়া নির্জ্জন। একমাত্র পাঁচী ও ন-দিদি আছে। বকুলতলায় দুপুরে অনেকক্ষণ বসে Valia গল্পটি পড়ছিলুম। একটা দাঁড়াশ সাপ সুপুদের নারকেল গাছটাতে উঠে পাখীর বাসায় পাখীর ছানা খুঁজচে। আর পাখীগুলো তাকে ঠুকরে কি বিরক্তই করচে। গঙ্গাহরি, তুলসী, হাজু সবাই আমার কাছে এল। দুপুরের পরে একটু ঘুমিয়েচি, নির্জ্জন মেঘমেদুর অপরাহ্ন, বাঁশবনের দিকে গরু চরচে, মেজ খুড়ীমার বাড়ির দিক থেকে মেজ খুড়ীমার গলার সুর পাওয়া যাচ্চে। বাবার একটা শ্লোকের খানিকটা মনে এল ঘুমের ঘোরে। এত স্পষ্ট মনে এল যেন বাবার সঙ্গে বসে আমি কবিতা আবৃত্তি করচি বাল্যদিনের মত। কথাটি এই —'নীচৈস্তর্বিভরুচিঃ' এই টুকরোটুকু যেন উদ্ভট শ্লোকে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। আমাদের ভিটের পিছনের বাঁশবাগানে গেলুম বেড়াতে ও আমগাছের ফল গুনতে। ওখান থেকে বেলেডাঙার মাঠ। কুঠীর মাঠের বাড়ির দু-ধারে বন কেটে উড়িয়ে দিয়েচে—সেই লতাবিতান সেই ঝোপ-ঝাপ এবার কোথায় উড়ে গিয়েচে। দেশময়ই দেখচি এই অবস্থা। বেলেডাঙ্গার পথের ধারে একটা কামারের দোকানে দশ-বারো জন লোক বসে আছে—তার মধ্যে বিরাশি বছরের সেই হরমোতীও বসে আছে। বহু বছর আগের মোল্লাহাটী কুঠীর সাহেবদের গল্প সে করলে। পুলের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালুম—এক ফকির সেখানে গোয়ালপাড়ায় একটা মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করচে। আমায় আবার সে ভক্তি করে একটা বিড়ি খাওয়ালে। আমি তাকে একটা পয়সা দিলাম। হরমোতী এসে বললে—'বাবু, দুঃখের কথা বলব কি, আমার ছেলেডা বলে, তোমাকে আর ভাত দেব না। বিরাশি বছর বয়স আমার, কোথায় এখন যাই আমি এই বেদ্ধ বয়সে ?'

সন্ধ্যাবেলা ন-দির সঙ্গে রেণুর গল্প করি। রাত্রে এখন ঢোল বাজচে, জিতেন কামারের বাড়ি নাকি মনসার ভাসান হচ্ছে। একবার ভাবচি যাই, কিন্তু বাড়িতে আমি একা, তার ওপর

আজ অমাবস্যার রাত—জিনিসটা-পত্রটা আছে, ফেলে রেখে ভরসা করে যেতে পারচি নে।

রোয়াকে বসে লিখচি ভারী আরামে, বকুলগাছে, কুলগাছে কত কি পাখী ডাকচে—বিল্বপুষ্পের মধুর গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে—দুটো বিড়ালছানা আমার মাদুরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করচে, সামনের রাস্তা দিয়ে ছেলেরা আম পাড়তে যাচ্চে, জেলেরা মাছ নিয়ে যাচ্চে। একবার পটল যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললুম—ও পটল, উমা চলে গিয়েচে? পটল বড় লাজুক মেয়ে। পেয়ারাতলা পর্য্যন্ত এসে নিচুমুখে দাঁড়িয়ে বললে—দিদি ২৭শে জ্যৈষ্ঠ চলে গিয়েচে, দাদা।

ছেলেবেলার সেই বুড়ো আকন্দ গাছটায় থোলো-থোলো ফুল ফুটেচে। পাখীর ডাক আর পুষ্পের সুবাসে স্থানটা মাতিয়ে রেখেচে।

বিকেলে হাটে গেলাম। এ বছর গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম হাট। পথেই আফ্‌জলের সঙ্গে দেখা, সে হাটে পটল বেচতে যাচ্চে। তুঁততলার স্কুলের ভিটে দেখিয়ে বললে—দা-ঠাকুর, এখেনে মোরা পড়িচি, কত আনন্দই করিচি এখেনে, মনে আছে?

তা আছে। তুঁততলার স্কুলের কথায় হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের কথা উঠল, আর কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো, সে কথাও উঠল।

অনেকদিন পরে গোপালনগরের হাটে গিয়েচি। সেই আশ্বিন মাসের পুজোর ছুটির পর আর আসি নি। সবাই ডাকে, সবাই বসতে বলে। মহেন্দ্র সেক্‌রার দোকান থেকে আরম্ভ করে সব্‌জির গোলা পর্য্যন্ত। হাটে কত ঘরামী ও চাষী জিজ্ঞেস করে—কবে এলেন বাবু?

ওদের সকলকে যে কত ভালবাসি, কত ভালবাসি ওদের ওই সরল আত্মীয়তাটুকু, ওদের মুখের মিষ্টি আলাপ। যুগল বৈষ্ণব এসে আমার ছেলেবেলার গল্প করলে, আশু ঠাকুর এসে আমায় অনুযোগ করতে বসলো, আমি বিয়ে করচি না কেন এই বলে। ব্রজেন মাস্টার নতুন লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে গেল, মনু রায় তার বিড়ির দোকানে ডেকে নিয়ে বসিয়ে বিড়ি খাওয়ালে, যুগল ময়রা নতুন তৈরী দোকান ঘরে বসিয়ে তামাক সেজে দিলে—এদের যত্ন—আত্মীয়তার ঋণ কখনো শুধতে পারবো না। গৌর কলুর দোকানে চা কিনতে গেলাম, সে আর আমায় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সেও আমার এক সহপাঠী, ওই তুঁততলার স্কুলে ১৩১০-১১ সালে তার সঙ্গেও পড়েচি। সে সেই কথা ওঠালে, আবার একবার হিসেব হোল কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো। একবছর পরে দেশে যখন আসি, সবাই আমায় পেয়ে আবার সেই পুরানো কথাগুলো ঝালিয়ে নেয়।

এ বছরটা কলকাতায় বড় কর্ম্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েচি। এই একটা মাস এদের সরল সাহচর্য্য, সুপ্রচুর গাছপালার সান্নিধ্য, নদী, মাঠ বনের রূপবিলাস আমার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ জুড়িয়ে দেয়। গত দেড় মাস রোজ রাত সাড়ে তিনটার সময় উঠে ইলেক্‌ট্রিক লাইট জেলে খাতা দেখতে বসেচি, সেই কাজ শুরু করেচি আর রাত বারোটা পর্য্যন্ত চলেচে নানা কাজ, চাকরি, লেখা, পার্টি, টাকার তাগাদা, বক্তৃতা করা ও শোনা, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি দেখা করতে যাওয়া, আমার এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা—সমানে চলেচে। এদিকে শুয়েচি রাত সাড়ে বারোটা—আবার ওদিকে উঠেচি রাত সাড়ে তিনটাতে। এখানে এসে বেঁচেছি একটু মন ছড়িয়ে বিশ্রাম করে।

হাট থেকে এসে নদীর ধারের মাঠে বেড়াতে গিয়ে এই কথাই ভাবছিলুম। ঝির-ঝির করচে হাওয়া, সোঁদালি ফুল ফুটেচে নদীর ধারে। কোকিল ডাকচে—বেলা পড়ে গিয়েচে এক-বারে—কি সুন্দর যে লাগছিল। আর উঠতে ইচ্ছে যায় না নদীর ধার থেকে, কি অদ্ভুত শান্তি!

এখন বসে লিখচি, অনেক রাত হয়েচে। বাঁশজঙ্গলের মাথায় বিশাল বৃশ্চিক রাশি অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করচে। অনেক দূরে একটা কি পাখী একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একঘেয়ে কুস্বর করে ডাকচে। নায়েব-বাড়ির দিকে একপাল কুকুর অকারণে ঘেউ ঘেউ করচে।

আজ সকালে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গেলুম সকালের গাড়িতে। অনেক জায়গায় গেলুম, কারণ বাবার সঙ্গে সেই ছেলেবেলায় একবার গিয়েছিলুম, আজ সাতাশ বছর আগে। আবার সেই রাজবাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হোল জীবনের যে সব স্মরণীয় ঘটনা ঘটেচে এর পরে। সেই ব্রাহ্মসমাজ, A. V. School, সেই লীলাদিদিদের বাড়ি। লীলাদির সঙ্গে দেখা হোল না।

বিকেলে আজ সইমাদের বাড়ি বেড়াতে গেলাম। বীণাকে দেখলুম অনেকদিন পরে, সে এত মোটা হয়েচে যে তাকে আর চিনতে পারা যায় না। তার দুটি সতীনঝিও এসেচে, ছেলেমানুষ—কিন্তু একজন আবার ওদের মধ্যে বিধবা। আমাদের দেশে বিধবা হবার যে কি কষ্ট তা অন্নপূর্ণার মুখে, ধীরেনের খুড়তুত বোনের গল্প শুনে বুঝতে পারি।

তারপর গেলুম কুঠীর মাঠে বেড়াতে। যেতে যেতে দেখি নদীর ধারে মাধবপুরের চরের গাছপালার গায়ে মেঘে চাপা হলুদে রোদ পড়েচে—তার নিছক সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ, অভিভূত করলে। বেলা সাড়ে ছ-টা হবে, সন্ধ্যার দেরি নেই, সেই শান্ত গ্রীষ্মের অপরাহ্নে উষ্ণমণ্ডলের বনপ্রকৃতি, সূর্য্য, আকাশ, নদী, মাঠ, তার সমস্ত ইন্দ্রজাল, সমস্ত রূপ-বিভব আমার চোখের সামনে মেলে ধরেচে। শুধু শিমুল গাছের ডালগুলোর আঁকা-বাঁকা সৌন্দর্য্যময় রূপ, মেঘপর্ব্বতের পাশ দিয়ে বলাকা সারির ভেসে যাওয়া, শুধুই বনফুলের দেবলোকের দুলুনি, আর বন্যপাখীর গান। কতবার দেখেচি, আজ বত্রিশ বছর ধরে দেখে আসচি। কিন্তু এরা কখনো পুরোনো হোল না আমার কাছে। কখনো যেন হয়ও না, এই প্রার্থনা করি, এদের আসন যেন মৃত্যুঞ্জয় হয় আমার জীবনে।

অতি ভয়ানক দুর্য্যোগ, ভয়ানক বর্ষা। আজ ক-দিন চলেচে এমন। খানা ডোবা সব ভর্ত্তি, জলে থৈ থৈ করচে। এমন ভয়ানক বর্ষা জ্যৈষ্ঠমাসে দেখেছিলুম কেবল সেইবার, যেবার কলকাতা থেকে আবার ফিরে এলুম বেলাদের তত্ত্ব নিয়ে, যেবার খুকুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, ১৯৩২ সালে। তারপর কত পরিবর্ত্তনই না হয়ে গেল জীবনে! ১৯৩২ সালের সেই সময়ের এবং ১৯৩৬ সালের এই আমিতে বহু তফাত হয়ে গিয়েচে।

বিলবিলের ডোবাতে ব্যাঙ্‌ ডাক্‌চে। বুধো, কেতো এরা এই ভয়ানক দুর্য্যোগ অগ্রাহ্য করে ভিজতে ভিজতে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে। সাবি ওদের বাড়ি থেকে বিড়ি নিয়ে এল আমার জন্যে, কারণ ওবেলা ওর ভাইকে বলেছিলুম এনে দিতে। মনোর মা আবার দুটো কলমের আম এনেছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলে। আমি পাঁচীর বাড়ি গেলুম মাংসের ভাগ নিতে, কারণ ওখানে পাঁঠা কাটা হয়েচে সকালে। পাঁচী চা করে দিলে, শম্ভুর অসুখের জন্যে অনেক দুঃখ করলে।

সবাই ওকে ঘৃণা করে আমাদের গাঁয়ে। কিন্তু আমি দেখি ও ঘৃণার পাত্রী নয়, অনুকম্পার পাত্রী। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল, তখন ওর বয়েস ছিল মোটে তের বছর—কি বা বুঝত বিয়ের? সে স্বামী মারা গেল, তখন ওর বয়েস বছর পনেরো। ওদের ওই গরীব সংসার, ভাইগুলো অপদার্থ, কেউ এক পয়সা রোজগার করে না। ভাইয়ের ছেলেমেয়েগুলো একবেলা খায়, একবেলা খায় না। ওদের এই দুঃখ ঘুচোতে ও এই কাজ

করেচে কিনা তাই বা কে জানে ? কারণ হরিপদ দাদার টাকা আছে সবাই জানে। ও আজ কাঁদতে কাঁদতে সে কথার কিছু আভাস দিলে। এই ব্যাপারের পর ওর সঙ্গে এই প্রথম আমি দেখা করলাম,—যতটা খারাপ লোকে ওকে মনে করে, আমি ততটা ভাবতে পারলাম না। তবে একটা কথা ঠিকই যে, সমাজের পক্ষে এই আদর্শটা বড় খারাপ। গ্রামের বাইরে গিয়ে যা খুশি কর বাপু, গ্রামের মধ্যে কেন ? গৃহধর্ম্মের আদর্শ ক্ষুন্ন করে লাভ কি ?

আবার সজোরে বৃষ্টি এল।

তারপর বেলা পাঁচটা থেকে ভীষণ ঝড় উপস্থিত হোল। গাছপালায় বেধে ক্রমবর্দ্ধমান ঝটিকার সে কি ভীষণ শব্দ ! আমি ভাবলাম যে রকম কাণ্ড, একটা সাইক্লোন না হয়ে আর যায় না। গতিক সেই রকমই দেখাতে লাগল বটে। সন্ধ্যার আগে এমন ভয়ানক বাড়ল যে আমি আর ঘরে থাকতে না পেরে বাঁশবাগানের পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম নদীর দিকে। দেখব ঝড়ের দৃশ্যটা। আমাদের বাড়ি যেতে বড় একটা বাঁশ পড়েচে—পাড়ার শ্যামাচরণ দাদাদের বাগানেও বড় বাঁশ পড়েচে। গাছপালা, বাঁশবনে ঝড়ের কি শব্দ—আর সে কি দৃশ্য ! প্রত্যেক গাছতলায় আম পড়ে তলা বিছিয়ে আছে ঠিক যেন পিটুলি ফলের মত, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে আর এই ভয়ানক দুর্যোগ মাথায় জনপ্রাণী বাড়ির বার হয় নি। আমি যা পারলাম কুড়িয়ে নিলাম· কিন্তু কোন পাত্র সঙ্গে আনি নি, আম রাখি কিসে ? মাঠের মধ্যে নদীর ধারে গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারি নে। যে-দিকে যাব, সে-দিক্ থেকেই ঝড় উড়িয়ে আনছে বৃষ্টির ধারা, ঠিক যেন বন্দুকের ছররার বেগে। ধোঁয়ার মত বৃষ্টির ঢেউ উড়ে চলেচে। গাছপালা মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়েচে। ঝড়ের শব্দে কান পাতা যায় না। সে দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করল। অনেকদিন প্রকৃতির এ রূপ দেখি নি, কেবল শান্ত সুন্দর রূপই দেখে আসচি।

তারপর মনে হোল আমিই বা কম কি ? এই ঝড়ের বেগ আমার নিজের মধ্যে আছে। আমি একদিন উড়ে যাব মুক্তপক্ষে ওই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জের পাশ দিয়ে, ওই বিষম ঝটিকা ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ করে ওদের চেয়েও বহু গুণ বেগে। আমি সামান্য হয়ে আছি—তাই সামান্য। এই কথাটা যখন ভাবি, তখন আমার মধ্যে যেন কেমন একটা নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়। সে শক্তি কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, সেদিন সেখানেই শেষ।

কাল সুপ্রভার চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়ে আজ সকালে বাগান-গাঁয়ে পিসিমার বাড়ি যাব বলে বেরিয়ে পড়েচি। আজ দিনটা সকাল থেকে মেঘ ও বৃষ্টি, পথ হাঁটার পক্ষে উপযুক্ত দিন, রোদ নেই, অথচ বৃষ্টি খুব বেশীও হচ্চে না। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বইচে মাঝে মাঝে। কুঠীর মাঠে আসতেই আমাদের ঘাটের পথে শুয়োখালী আমগাছে অনেকগুলো আম পড়ল টুব্‌টাব্‌ করে। গোটাকতক আম কুড়িয়ে পথের ধারে বসেই খেলাম। কারণ যেতে হবে প্রায় তের চোদ্দ মাইল পথ, কখন গিয়ে পেঁছুব তার নেই ঠিকানা। কুঠীর মাঠ দিয়ে, বৃষ্টিধোয়া বনঝোপের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কি আনন্দই পেলাম। পথ হাঁটতে আমার বড় আনন্দ। এই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েচি, পথে পথে অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে চলেচি, এতেই আমার আনন্দ। কাঁচি-কাটার পুল পার হয়ে একটা লতা-ঝোপওয়ালা সুন্দর বাবলা গাছ ভেঙে পড়েচে রাস্তার ওপরে, এ রকম সুন্দর গাছ ভাঙলে আমার বড় কষ্ট হয়। বড় বড় বট অশত্থ গাছের ঘন ছায়া, পথের দু-ধারে বুনো খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর দুলচে, 'বউ-কথা-কও' পাখী ডাকচে—বাংলা দেশের রূপ যদি কেউ দেখতে চায়, তবে এই সব গ্রাম্য পথে যেন প্রথম বর্ষার দিনে পায়ে হেঁটে বহুদূর গ্রামের উদ্দেশ্যে যায়, তবেই সে বাংলাকে চিনবে, পাখী আর বনসম্পদ, তার

পুষ্পরাজি, তার মেয়েদের দেখবে, চিনবে, ভালও বাসবে। আমি এই নেশাতেই প্রতি বৎসর এই সময় বেরিয়ে পড়ি।

বাগানগাঁয়ের পথে বড় একটা বট গাছের তলায় বসে লিখচি। চারি ধারে মাঠ, বৃষ্টি পড়চে ঝর ঝর করে, বেলা কত হয়েচে মেঘে আন্দাজ করা যায় না, জোলো হাওয়ায় আউশের ভুঁই থেকে ধানের কচি জাওলার মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসচে, বট গাছের ডালে কত কি পাখী ডাকচে, মাঠের মধ্যে অসংখ্য খেজুর গাছ। চাষারা ক্ষেতে নিড়েন দিচ্চে, তামাক খাচ্চে, নীল মেঘের কোলে বক উড়চে।

কাঁচিকাটা পুল পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। তার বয়েস ষাট-বাষট্টি হবে, রঙটা বেজায় কালো, হাতে একটা পোঁটলা, কাঁধে ছাতি। আমি বললুম—কোথায় যাবে হে? সে বললে—আজ্ঞে দাদাবাবু, ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা যাব। বাড়ি শান্তিপুর গোঁসাইপাড়া।

লোকটা বললে—একটা বিড়ি খান দাদাবাবু।

বেশ লোকটা। ও রকম লোক আমার ভাল লাগে। সহজ সরল মানুষ, এমন সব কথা বলে যা আমি সাধারণতঃ শুনি নে।

সুন্দরপুরে আসতে প্রমথ ঘোষ সাইকেল চেপে কোথায় যাচ্চে দেখলুম। আমি আর আমার সঙ্গী দু-জনে মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে পার হই। সুন্দর মেঘাচ্ছন্ন সকাল বেলা নদীজল শান্ত, ওখানে সবুজ কষাড় বন। খেয়া পার হয়ে কেউটে পাড়া, মড়িঘাটা ছাড়িয়ে আমরা গোবরাপুর এলুম। আর বছর বাজারের যে দোকানে তামাক খেয়েছিলাম, সেখানে আমরা তামাক খাবার জন্যে বসতে গিয়ে দেখি গোবরাপুরের জজ্‌বাবুর সেজছেলে মল্লিনাথ বসে আছে। সে আমাকে দেখে টানাটানি করতে লাগল তাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। অন্ততঃ চা খেয়েও যেন যাই। তার দাদা রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসী, অনেকদিন পরে বাড়ি এসেচেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তিনি নাকি আমার বই-এর খুব অনুরাগী ইত্যাদি বলে বাড়ি নিয়ে গেল। আমার সঙ্গীকেও সে নিমন্ত্রণ করলে। ওদের মস্ত বড় বাড়ি, আর কত যে ছেলে মেয়ে! সব ভাইগুলি বড় চাকরি করে বিদেশে, এবার বাড়িতে ওদের সন্ন্যাসী ভাই এসে রামকৃষ্ণ-উৎসব করচেন সেই উপলক্ষে সবাই এসেচে। ওপরের ঘরে মেয়েরা গান গাইচে, বাইরের বৈঠকখানায় ছেলেরা তাস খেলচে—হৈ হৈ কাণ্ড। আমরা চা খাবার খেয়ে ভদ্রতা বজায় রাখার উপযুক্ত একটু গল্পগুজব করে তখনি আবার পথে বার হলুম। পথে বার হয়ে কোথাও একদণ্ড থাকতে আমার ভাল লাগে না। আমার সঙ্গীটি যাবে পাশেরই গ্রামে তার জামাই-বাড়িতে। ওরা আচার্য্য বামুন, এতক্ষণ নিজের মেয়ের ভাসুরের কথা বলতে বলতে আসছিল। সেই ব্যক্তিটি ঘরে খুব সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্বেও পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ছেলে না হওয়ার অজুহাতে, আজ দু-মাস হোল পুনরায় দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করেচে। সেই গল্প সে আমাকে নানাভাবে শোনাচ্ছিল। হঠাৎ জজ্ বাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে আমার ওপর অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠল। জজ্ বাবুদের বাড়িতে আমার আদর-যত্ন দেখেই বোধ হয় ওর মনের ভাবের এ পরিবর্ত্তনটুকু হোল। বললে, দাদাবাবু, আপনাকে এতক্ষণ চিনতে তো পারি নি। আপনি মাথা থেকে বের করে এমন একখানা বই লিখেচেন যার অত বড় দামী দামী লোকে এত সুখ্যাতি করলেন, তখন তো আপনি সাধারণ মানুষ নন।

সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় তার সুর গদ্‌গদ্ হয়ে উঠেচে, তারপর বললে, তবে বাবু যদি অনুমতি করেন, আমিও নিজের পরিচয়টা দিই। এতক্ষণ দিই নি, কারণ বিদেশে, পথঘাটে, নিজের পরিচয় না দেওয়াই ভাল। দিয়ে কি হবে? আমার নাম নদে শান্তিপুর থেকে আরম্ভ করে

কলকাতা পর্য্যন্ত সবাই জানে, আপনার শ্রীগুরুর চরণকৃপায়, হেঁ হেঁ। কৌতূহলের সহিত ওর মুখের দিকে চাইলুম। কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষের সঙ্গে এতক্ষণ আমার ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য ঘটেচে না জানি।

লোকটা বললে—আমার নাম, দাদাবাবু, হাজারী পরটা।

আমি অবাক হয়ে বললুম—হাজারী—?

—আজ্ঞে, হাজারী পরটা।

—হাজারী পরটা?

—আজ্ঞে, সেই আমিই এই অধীন।

বলে সে আমার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবার জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধ হয় আমার বিস্ময়কে পূর্ণ বিকাশের সময় দেওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি তখনও সেই অবাক ভাবে চেয়ে আছি দেখে বললে, দাদাবাবু, যদিও আমরা ভট্চার্য্যি কিন্তু আমার উপাধি পরটা। মানে এমন পরটা আর কেউ তৈরি করতে পারতো না নদে-শান্তিপুরের মধ্যে। পাঁচ সের ওজনের একখানা খাস্তা পরটা—যেখানে ধরুন খসে আসবে। আমার দোকান ছিল গ্রাম চাঁদপাড়ায়, দৈনিক দশ-বারো টাকা বিক্রি, পরটা, লুচি, আলুর দম, ডিম, মাংস। আমার দোকানে যে একবার খেয়েচে দাদাবাবু, সে আপনাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে কখনো ভুলতো না। কলকাতা পর্য্যন্ত আমার নাম-ডাক। খুঁদা মিত্তিরের বাড়ি রুশুই করেচি এক হাতা-বেড়ীতে পাঁচ বছর।

তার গল্প তখনও ভাল করে শেষ হয় নি, একজন ডেকে বললে,—এই যে, বেয়াই মশাই যে! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার। নমস্কার, নমস্কার।

হাজারী পরটা স্মিতহাস্যে বললে—নমস্কার। তা আপনারা তো খোঁজ করবেন না, মেয়েটা আছে পড়ে, বলি এই একবার—আচ্ছা দাদাবাবু, আসুন একটু পায়ের ধুলো নিই।

বলেই লোকটা ঝুঁকে পড়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বসলো। তারপর তার বেয়াই-এর দিকে চেয়ে বললে—দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েই বুঝেচি উনি মহৎ লোক। ওঁর সঙ্গে জজ্ বাবুর বাড়িতে গিয়ে খাসা আম, উৎকৃষ্ট সন্দেশ, চা কত কি খেলাম। কি আদর সেখানে ওঁর। শুনেই তার বেয়াই আমায় বিনীত ভাবে অনুরোধ করতে লাগলো, সেখানে দুপুরে থাকবার জন্যে। ভাবলে, জজ্ বাবুরা যখন খাতির করেচে, তখন আমিই বা কোন্ ডেপুটি কি অন্ততঃ পক্ষে একজন পুলিসের দারোগা না হব? আমি আমার অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তারা সকলে যতক্ষণ আমাকে দেখতে পায়, আমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং আমার সম্বন্ধে কি সব কথা বলাবলি করতে লাগলো।

আমি বেরিয়ে এসে মাঠে পড়লুম। দু-ধারে আউশ ধানের ক্ষেত। একটা বৃহৎ জিউলি গাছের তলায় যখন পৌঁছেচি, তখন জোর বৃষ্টি আসাতে গাছের নিচে বসলুম। মাটি ভিজে গিয়েচে, আর প্রকাণ্ড ডালগুলোর সর্ব্বত্রই আঠার ঝুরি ঝুলচে—অথচ কাল সুপ্রভার চিঠি আঁটবার জন্যে বারাকপুরে একটু জিউলির আঠা খুঁজে পাই নি।

কি সুন্দর লাগছিল উন্মুক্ত মাঠের হাওয়া, দু-ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, বর্ষাস্নাত গাছপালায় ঝোপঝাড়। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ মাঠের মধ্যে, তার তলায় অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করলুম বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত। ট্যাংরা সুন্দরপুর, কমলাপুর প্রভৃতি গ্রাম পার হয়ে একটা সুন্দর জলাশয়ের তীরে এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় কলের গান হচ্চে দেখে সেখানে গেলাম। অনেক গ্রাম্য লোক জড় হয়েচে। গ্রামবধূরা ওপারের ঘাট থেকে গান শুনচে। জন-দুই পথ-চলতি লোক কলের গান নিয়ে যেতে যেতে এখানে বট গাছের তলায় শ্রান্তি দূর করবার জন্যে বসে কল বাজাচ্চে। আমিও গিয়ে দুটো রেকর্ড বাজাতে বললুম।

তারা আমায় খাতির করে বসালে, বিড়ি খেতে দিলে, রেকর্ডের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বললে,—বলুন বাবু, কোন্ গান আপনার পছন্দ!

সামনের জলাশয়টা শুনলাম জামুদার বাঁওড়ের আগড়। কি সুন্দর যে তার দৃশ্য সেই বটতলা থেকে! বাঁওড় অর্থাৎ মজা নদী। তার ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায় বড় বড় নিবিড় বাঁশবন জলের ওপর ঝুঁকে পড়েচে—পদ্মফুল আর পদ্মপাতায় জল দেখা যায় না, আরও ওদিকে শেওলার দাম বেধে গিয়েচে। আমি গান শুনতে শুনতে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। মনে একটা অপূর্ব মুক্তির সুখ। বেলা সাড়ে দশটা কি এগারোটা,—কলকাতা হলে এতক্ষণ ছুটতে হোত স্কুলে। রুটিন বাঁধা জীবন স্বপ্ন বলে মনে হুচ্চে এই সুদূর পল্লীগ্রামের পদ্মফুলে ভরা জলাশয়ের তীরে প্রাচীন বটতলায় বসে।

পিসিমার বাড়ি বেলা একটার সময় এসে পেঁছে দেখি পিসিমা খেতে বসেচেন। আমিও স্নান করে এসে খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করলুম। পিসিমার ঘরটাতে কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ পাওয়া যায়। ১৩০০ সালের পরে আর এঘরে নতুন পাঁজি আসে নি (১৩০০ সালে পিসেমহাশয় মারা গিয়েছিলেন)। সেকালের গন্ধে, সেকালের আবহাওয়ায় ঘরটা ভর্ত্তি। কড়ির আলনা, সেকালের কাঁথা, কড়ির চুবড়ি, কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক, গড়ুর মূর্ত্তি বসানো পেতলের ঘণ্টা, বেতের প্যাঁট্‌রা—যে সব জিনিস একালে কোনও বাড়িতে দেখা যায় না। একখানা কাশীদাসী মহাভারত আছে ১২৭৬ সালে ছাপা। অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে সেই সব প্রাচীন দিনের বাতাসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিলাম, কত পুরোনো দিনের কথা মনে হয়,···যেদিন মেনকা পিসিমা আমার বাল্যে বাবার ওপর রাগ করে এখানে চলে এসেছিলেন, বাবা এসে একবার কথকতা করেছিলেন।

বিকেলে হাটতলায় এক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হোল। ডাক্তারটি অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত। একটা বাঁশের মাচায় মলিন শয্যা, একখানা ভাঙা টেবিল, গোটা বিশ-পঁচিশ শিশি, অন্যদিকে আর একটা মাচাতে এক বস্তা তামাক। একটুখানি বসবার পরই তিনি নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। আজ চার মাস থেকে এখানে এক পয়সা রোজগার নেই। হাটখোলার মুজিবর মিঞার দোকানে চালডাল ধার নিয়ে আজ চার পাঁচ মাস চলচে। এদিকে বাড়িতে মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল চৌঠো জ্যৈষ্ঠ। টাকা যোগাড় না করতে পারায় বিয়ে ওদিনে হয় নি। তারপর বললেন—দেখুন এখানে একঘর বামুন আছে, বেশ বড় গাঁতিদার, তাদের বাড়ির এক বৌ আজ চার মাস শয্যাগত, তা মশায় একবার ডাকে না। বলে ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়ে কি হবে, আমরা ফকির দেখাচ্চি।

হাটখোলার এক দোকানে এক মৌলবী সাহেব আমাদের ডাকাডাকি করলেন বলে গেলাম,—এখানকার মক্তবে তিনি নতুন মৌলবী হিসেবে এসেচেন। মাসে বারোটা টাকা পাবেন, হাটখোলাতে একটা মুসলমানদের দরগা ঘর আছে, সেখানেই আপাততঃ থাকবেন। তাঁর মুখে মধুবাবু সাব-ইনস্পেক্টরের গল্প শুনলাম। মধুবাবু আমাদের কালে, আমরা যে পাঠশালায় পড়তাম, সেখানে গিয়ে আমায় একবার 'গ্রন্থ' বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে ১৯০৫ সালের কথা হবে।

সন্ধ্যার পরেই বৃষ্টি এল। আমি হাটখোলা থেকে চলে এলাম। রাত্রে একটা গোয়ালার ছেলে অনেক গল্পগুজব করলে।

সকালে স্নান করে পিসিমার কাছে বিদায় নিয়ে পাটশিমুলে মোহিনী কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রওনা হোলাম। আজ খুব রোদ উঠবে, আকাশ নীল, সকালের হাওয়ায় বিলের জল আর ধানের জাওলার গন্ধ। হাটখোলার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করে মাঠের পথে হাঁটি। এদেশে যেখানে সেখানে আমগাছের তলায়, পিটুলি ফলের মত, দিব্যি বড় বড়

রাঙা রাঙা আম তলাবিছিয়ে পড়ে রয়েচে, কেউ কুড়োয় না দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম—তোমাদের এখানে আম কুড়োয় না কেন? সে বললে—বাবু, এখানে এক পয়সা আমের পণ বিক্রি হয়—এত আম এখানে। কে কত খাবে! পাটশিমুলে ঢুকতেই একপাশে একটা বড় বন, একটা উঁচু শিমুল গাছ বনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—তার ডালে পাতা মুড়ে পিঁপড়ে বাসা বেঁধেছে। দৃশ্যটা দেখে আমার মনে হোল এই সব সত্যিকার বাংলার বনের দৃশ্য, ট্রপিক্যাল বনানীর দৃশ্য না দেখলে বাংলাকে চিনব কি করে? শহরের লোকের শহরেই জন্ম, শহরেই বিবাহ, শহরেই মৃত্যু—তারা সত্যিকার বাংলার রূপ কখনও দেখে? যে বাংলার মাটির বৈষ্ণব কবিতা, গ্রাম্য সঙ্গীত, ভাটিয়ালি গান, কীর্ত্তন, শ্যামাসঙ্গীত, পাঁচালি, কবি—এরা সে বাংলাকে কখনও দেখলে না। যে-বাংলার শিল্প কাঁথা, শীতলপাটী, মাদুর, কড়ির আলনা, কড়ির চুবড়ী, খাগড়াই পিতল-কাঁসার জিনিস সে বাংলাকে এরা কখনও জানলে না। অথচ সমস্ত জাতিটার যোগ রয়েচে যার সঙ্গে—আর সে কি গভীর যোগ রয়েচে, তা এই পল্লীপথে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আমি খুব ভাল বুঝতে পারচি।

পাটশিমুলে ঢুকে একটা ক্ষুদে জাম গাছতলায় শিকড়ের গায়ে বসে এই কথা কটা লিখচি, চারিধারে পাটশিমলের বন। আমার মনে হয় সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে যদি কোথাও বন জঙ্গল ও বাঁশবনকে যথেচ্ছা বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হোত—তবে এই ধরনের নিবিড়, দুর্ভেদ্য বনানীর সৃষ্টি হোত দেশে। এর প্রকৃতি মালয় উপদ্বীপের বা সুমাত্রা, যবদ্বীপের ট্রপিক্যাল (Rain forest)-এর সমান না গেলেও বিহার, সাঁওতাল পরগণা বা মধ্যভারতের অরণ্যের চেয়ে স্বতন্ত্র। ট্রপিক্যাল রেন্ ফরেস্টের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে লতা জাতীয় উদ্ভিদের প্রাদুর্ভাবে। এত নানা আকারের লতার প্রাচুর্য্য শুধু উষ্ণমণ্ডলের বনানীরই নিজস্ব সম্পদ। এই জন্যে এই সব বনের রূপ স্বতন্ত্র। এত বুশ আণ্ডারগ্রোথ্ (Bush undergrowth)-ও নেই সিংভুম বা মধ্যভারতের বনে। অল্প জায়গার মধ্যে এত বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের সমাবেশও সে সব বনে নেই।

মোহিনী কাকাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে দেখছিলুম—সামনের বৃষ্টিবিধৌত বনপত্রসম্ভারের শোভা, নির্ম্মল নীল আকাশ, সেই আকাশ অনেকদিন পরে মেঘশূন্য, আশ্চর্য্য মরকত-শ্যাম পত্রপুঞ্জের ওপর ঝলমলে পরিপূর্ণ সূর্য্যালোক। চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে একটা তরুণ নারকোল বৃক্ষের শাখাপত্রের স্পন্দন বড় ভাল লাগচে। প্রাচীন কালের ছোট ইঁটের ভাঙা বাড়ি, ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপ, ছাদভাঙা পুজোর দালান পূর্ব্বেকার সম্পন্ন গৃহস্থের বর্ত্তমান শ্রীহীনতার সুপরিচিত চিহ্ন চারিদিকে।

দুপুরের একটু পরেই পাটশিমুলে থেকে বার হই। দুধারে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়, আর-বছরে দেখা সেই কালীবাড়ির বাঁশঝাড়টা। বাঁশ না কাটলে কি ভাবে বাড়তে পারে তা কালীবাড়ির বাঁশঝাড় না দেখলে বোঝা যাবে না। বাঁশের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এ বাঁশ কালীপুজোর দিন ভিন্ন এবং ঠাকুরের প্রয়োজন ভিন্ন কেউ কাটতে পারে না, এ গ্রামের এই রীতি। এ গ্রামেও সর্ব্বত্র আম গাছের তলায় যথেষ্ট আম পড়ে আছে, কেউ কুড়োয় না।

মাঠে পড়লুম, অতি ভীষণ রৌদ্র আজ, তবু একটু হাওয়া আছে তাই ঠাণ্ডা। রাস্তায় এসে ছায়া পাওয়া গেল, কিন্তু দুধারে যেমনি জঙ্গল, তেমনি মশা। এক জায়গায় একটা লাল টুকটুকে আম কুড়ুতে একটুখানি দাঁড়িয়েচি, অমনি মশাতে একেবারে ছেঁকে ধরেচে। সাঁড়াপোতার বাজার ছাড়িয়ে কল্যকার সঙ্গী সেই হাজারী পরটার বেয়াই বাড়ি গেলুম। হাজারী পরটা বাইরে বসে তামাক খাচ্ছিল, আমায় দেখে লাফিয়ে উঠল, 'আসুন, দাদাবাবু, মহা সৌভাগ্য যে আপনি এলেন, এঃ, মুখ যে লাল হয়ে গিয়েচে রোদে—(মুখ লাল হওয়ার

যদিও আমার কোনো উপায় নেই, আমার কালো রং-এ) আসুন, বসুন। তারপর সে নিজেই একখানা পাখা নিয়ে এল ছুটে। বাতাস দিতে আরম্ভ করলে নিজেই, তার বেয়াইকে ডেকে নিয়ে এল, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে—মহা খাতির। অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে গল্প করে সেখান থেকে বার হই। ওরা আবার একটু জলযোগ করালে, কিছুতেই ছাড়লে না। আবার রাত্রেও থাকতে বললে। আমি অবিশ্যি তাদের সে অনুরোধ রাখতে পারলাম না। গোবরাপুরের বাজারের কাছে এসে দেখি মণীন্দ্র চাটুয্যে যাচ্ছেন। মণীন্দ্রবাবু প্রথমে আমায় চিনতে পারেন নি, নাম বলতে চিনতে পারলেন, বললেন—চল আমার বাড়ি। আমি বললুম—বাড়ি গিয়ে তো থাকতে পারব না, সুতরাং গিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি কেমন আছেন বলুন। তারপর দু-জনে পথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। মণীন্দ্রবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে একজন মানুষের মত মানুষ। অমন উদারহৃদয় পরোপকারী, সদাশয় বৃদ্ধ এ সব দেশে নেই। আমি ও'র কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সে কথা এখানে আর ওঠাতে চাই নে। তিনিও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ করলেন না। বললুম, শনিবারে আসতেই হবে আমাদের এখানে উপেন ভট্চাজের মেয়ের বিয়েতে, সেদিন আবার কথাবার্ত্তা হবে। আজ আসি।

আর কোথাও দাঁড়ালুম না। সূর্য্য হেলে পড়েচে। রোদ নিস্তেজ হয়ে আসচে। আমায় যেতে হবে এখনও সাত মাইল পথ।

কেউটে পাড়ার পথে এক বুড়ী জিজ্ঞেস করলে—বাবু, এত রোদে বেরিয়েচ কেন?

বললুম—যাব অনেকদূর পথ।

বুড়ীটি টিকে বেচতে যাচ্চে গোবরাপুরের বাজারে। মোল্লাহাটির খেয়া যখন পার হই, তখন সূর্য্য হেলে পড়েচে। মোল্লাহাটির হাট বসেচে, আজ আর-বছরের মত হাটে গেলুম। খুব আমের আমদানি। বেলা গিয়েচে দেখে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। মোল্লাহাটি থেকে খাবরাপোতা পর্য্যন্ত আসতে রোদটুকু একেবারেই গেল। কিন্তু পথের পাশের আরামডাঙ্গার খড়ের মাঠের দৃশ্য মনে হোল আমাদের এ অঞ্চলটি সুন্দর বেশী। এত নদী বাঁওড়ের সমাবেশ অন্যত্র নেই।

আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ির পিছনে সেই বাঁকে এসে খানিকটা বসে বিশ্রাম করি। এই জায়গাটা বড় ভাল লাগে আমার। মরাগাঙ্ চক্রবৃত্তে ঘুরে গিয়েচে, বাঁশবনের শীর্ষ অপরাহ্ণের ছায়ায় আর নীল আকাশের তলায় বেশ দেখাচ্চে। পুল পার হয়ে এসে দেখি গঙ্গাচরণের দোকানে তালা, দোকান নাকি উঠে গিয়েচে স্টেশনের ধারে। কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি পেঁছিই। খুদুরা আসে নি, আসবার কথা ছিল কাল। ঊষার চিঠি এসেচে, দেখি খাটের ওপরে পড়ে আছে। চার বছর পরে ওর খবর পেলাম।

আবার বৃষ্টি নামল, খুব ঠাণ্ডা পড়ল—কিন্তু কি জানি সারারাত আমার ভাল ঘুম হোল না। শেষ রাত্রের দিকে একটু ঘুম এল।

এসেই ঊষার চিঠি পেলুম, আর একখানা হাওড়ার রমেন ভট্টাচার্য্যের। তার পত্রখানার উত্তর দিতে হবে। ঊষা এসেচে কলকাতায় বহুদিন পরে, এর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা করতে হবে।

একটা শিমুল গাছের গুঁড়িতে বসে কত কথা ভাবলুম। বাল্যে ওই সব বাদলার দিনে কেমন নৌকো বেয়ে একা বেড়াতুম, ওদিকে চালতেপোতার বাঁক, চট্কা তলার খালের নাম রেখেছিলুম Oysterbrook (অস্টারব্রুক)—তখন সমুদ্রভ্রমণের নানা বই পড়তুম, সর্ব্বদা সেই স্বপ্ন দেখতুম। সেই সমুদ্র ও আমাদের এই ছোট্ট ইছামতী, তার জল একই কালো

জল। সন্ধ্যায় একটা তারা উঠল মাধবপুরের নির্জন চরের একটা অতি সুন্দর তরুণ সাঁই-বাবলা গাছের মাথায়। কত অদ্ভুত চিন্তা মনে আসে তারাটার দিকে চেয়ে!

বড় ভাল লাগে এই দূরবিসর্পিত আউশ ধানের ক্ষেত, বাঁশঝাড়ের সারি—বসে বসে এই সুখদুঃখময় ভাবনা। কলকাতায় ফিরে এসব দিনের কথা বড় মনে হবে। এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে, কলকাতায় মন থাকে উপবাসী প্রকৃতির উপভোগের দিক থেকে, এখানে দুদিন এসে বাঁচি।

তবুও তো এবার রোদ না ওঠার জন্যে ছুটির শেষের দিকটা মন বড় ভাল নয়। নীল আকাশ দেখা এবার ভাগ্যে বড় একটা জুটবে না।

মুসলমান মাস্টারটি এল। দু-জনে গিয়ে পাঠশালার পেছনে মরাগাঙের ধারে বসব, এমন সময়ে এল ঝোড়ো কালো মেঘের রাশি, বারাকপুরের দিক থেকে উড়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম্ বর্ষার বৃষ্টি।

দৌড়, দৌড়, সবাই মিলে ছুটে গিয়ে পাঠশালার ঘরে আশ্রয় নিলুম। সেখানে বসে ও অম্বিকাপুরের মিটিং-এর কথা বলতে লাগল, আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চায় তারা,—কবে আমার যাবার সুবিধে হবে ইত্যাদি।

আধঘণ্টা পরে থামল বৃষ্টি। দু-জনে গিয়ে বসলুম পাঠশালার পেছনে মাঠে মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙার চরের এপারে।

মুসলমান মাস্টারটির বাড়ি বরিশাল জেলা। অনেকদিন থেকে সে এদেশে আছে। তার খেয়াল গ্রামে গ্রামে চাষাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা। অম্বিকাপুর, মামুদপুর, শচীনন্দনপুর, মহৎপুর, হুদো, মানিককোল, বউজুড়ি, সর্পরাজপুর—এসব গাঁয়ে সে পাঠশালা বসিয়েচে, নিজে দেখাশুনো করে, চাষামহলে তার খুব খাতির। নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে ব্রতী উদার ধরনের যুবক। তাই ওকে বড় ভাল লাগে। বললে—আসুন, বেশ জায়গাটা, বসে একটু গল্প করি। বিড়ি নেই পকেটে—মুশকিল হয়েচে, কাকে দিয়ে আনাই বলুন তো।

আমি গামছা পাতলাম বৃষ্টিসিক্ত কচি ভেদ্‌লা ঘাসের ওপর। ওকে বললুম—বসুন।

ও বললে—আপনার গামছায় বসব?

জোর করে তাকে বসালুম।

তারপরে সে একটা গল্প ফাঁদলে।

বললে—শুনুন, সেদিন অম্বিকাপুরে একটা বড় করুণ ব্যাপার হয়ে গিয়েচে। অম্বিকাপুরে আমার যে পাঠশালা আছে, সেখানে একটি মুসলমান মেয়ে পড়ত, তার নাম মোমেনা, ও-বছর উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাস করেচে। চাষার মেয়ে, কিন্তু চাষার ঘরে অমন রূপ কেউ দেখে নি। এই টক্‌টকে গায়ের রং, এই পটল-চেরা চোখ, এই স্বাস্থ্য, এই গড়ন—সবদিক থেকে মেয়েটি যেন আপনাদের বামুন কায়স্থের ঘরের সুন্দরী মেয়ের মত। তার ওপর তার লেখাপড়ার খুব ঝোঁক, গান জানে, শিল্পকাজ শিখেচে স্কুলে, বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

মেয়েটির এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই বছরেই বিধবা হয়। উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষা দেবার পর যখন পাসের খবর বেরুল, তখন তার দেওর তার বাপ মার কাছে যাতায়াত শুরু করলে তাকে বিয়ে করবার জন্যে। মেয়েটির বাপ মা রাজি হয়ে গেল। কিন্তু মেয়ের তাতে ঘোর আপত্তি। তার দেওর নিতান্ত মূর্খ চাষা। স্বাস্থ্য অতি খারাপ, চেহারা কালো। মেয়েটি ওই গ্রামেরই একটা ছেলেকে ভালবাসে, মুসলমানেরই ছেলে, থার্ড

ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল রাণাঘাট স্কুলে, এখনও বাড়িতে বই, খবরের কাগজ আনিয়ে পড়ে। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, সুশ্রীও বটে, মেয়েটির বয়েস সতেরো। মেয়ে বাপ-মাকে নাকি গোপনে বলেছিল,—যদি তোমরা আমার বিয়ে দিতেই চাও, তবে অমুকের সঙ্গে দিও, আমার দেওরকে আমি বিয়ে করব না।

বাপ মা তাতে ঘোর গররাজি। দেওরদের নাকি খুব ধানের গোলা আছে, ক্ষেত খামার আছে, এ ছোকরার কিছুই নেই।

মেয়েটির কথা কেউই শুনলে না। তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে তার দেওরের সঙ্গে। বিয়ের সময় আমাদের মুসলমানদের প্রথা আছে বিবিকে মোল্লা জিজ্ঞেস করবে, তুমি একে বিয়ে করতে সম্মত আছ তো ?

মোল্লা সে কথা মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেই মেয়ের ফিট হয়ে গেল সেই বিয়ের আসরে।

ভাবুন, কতটা দুঃখ সে বুকে চেপে রেখেছিল নীরবে মুখ বুজে।

আমি বললুম—বিয়ের কি হোল ?

সে বললে—বিয়ে কি আটকে আছে ? হয়ে গেল। তারা শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গেল। —বড় লক্ষ্মী মেয়ে, কিন্তু তার জীবনটা—

The usual story—অনেক শুনেচি এমন ধরনের গল্প। কিন্তু কেন এমন হয়, তা কে জানে ?

সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। বাবুই পাখীদের অত্যাচার বড় বেড়ে গিয়েচে। জোলো ধানের ক্ষেতে বেজায় পটপটির আওয়াজ ও ভাঙা টিনের বাজনা ! ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের আকাশে যেন একটা কালো আভা লেগেচে।

অমন সুন্দর স্থান, অমন মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙ্গার চরের এপারে, অমন ইন্দ্রনীল আকাশের নীচে বসে গল্পটা বড়ই করুণ লাগল।

হয়ত গল্পটা কিছু নয়—মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি—সেটাই আসল জিনিস। আইভ্যান বুনিনের কথায় বলি :—

'Then what is Art ? It is the prayer, the music, the song of the human soul'—এই কথাটা আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকদের বুঝতে দেরি লাগবে। শুধু teller of tales হওয়া আর প্রাণের ভাষার ব্যঞ্জনা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, আমাদের অনেকে বলে—গল্প তো বলা হয়ে গেল, আর কেন ? পাঠকে বুঝে নিক না বাকীটুকু।···পাঠকে বুঝবে কাঁকুড় !

রোজই যখন হাট করে ফিরি, তখন আমার চোখে পড়ে বটগাছ, বাঁশবন, আমবন, বড় বড় কুকুরে-আলুর লতা গাছের গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেচে। পানের মত তার চক্‌চকে সবুজ পাতা, গাছে-গাছে কাঁঠাল ঝুলচে, নারকেলগাছ, কলাগাছ, পেঁপেগাছ, ঘন আগাছার জঙ্গল, বাঁওড়ের চর, কচুরিপানার দাম, কোকিল ও 'বৌ-কথা-কও' পাখীর ডাক, কুঁচ ঝোপ, শিমুলগাছ, সোনালী-ফুল-দোলানো বাবলাগাছ, উলঙ্গ শিশুর দল, মাছ ধরা দোয়াড়ী, কুমোর পাড়ায় হাঁড়ি পোড়াবার পণ, কলসী কাঁখে গ্রামবধূর দল—ট্রপিক্‌সের কোনও একটা দেশের পরিচিত দৃশ্য। যেমন দেখা যায় যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, মালয় উপদ্বীপে, বোর্ণিও ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এদের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, শিল্প, খাদ্য, পরিচ্ছদ, দেশের দৃশ্য। আমরা বলি আমাদের ভাল, ওরা বলে ওদের ভাল। ওদের বিজ্ঞান আছে, কলকব্জা আছে, সাহস আছে, অধ্যবসায় আছে—আমাদের দর্শন আছে, প্রাচীন ঋষিরা আছেন, পাঁজিপুঁথি বিস্তর আছে···আমরা বলিই

আমরাই বা কম কি ?

আমি তো দেখি এসব কিছুই নয়। এবার ট্রপিক্‌সের কোনও দেশে (যদিও বাংলা ওর মধ্যে পড়ে না) জন্মেচি, দূর কোনও জন্মান্তরে যাব ইউরোপে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা বৃহস্পতি কি অন্য কোথাও গ্রহান্তরে, কি কোন্ দূর নক্ষত্রে—আমি অমর আত্মা, আমি দেশকালের অতীত—কোন্ দেশ আমার, কোন্ দেশ পর ? সকলকেই ভালবাসতে চাই স্বদেশ বিদেশ নির্বিশেষে, সকলের সব ভালটুকু নিতে চাই—এই আমার, এই তোমার—এ সংকীর্ণতা যেন থাকে না। এই দেশে জন্মেচি, মানুষ হয়েচি, কিন্তু এদেশের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মিশিয়ে দিলেও যেন খানিকটা আছি কৌতূহলী দর্শকের মত, যেন এই বৃক্ষলতাবহুল সবুজ দেশে এসে দেখে এবার আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, প্রতিদিন দেখচি আজ চল্লিশ বছর ধরে, তবু তৃপ্তি নেই, এ নিত্য নতুন আমার কাছে, কোনও দিন বুঝি এর রূপ একঘেয়ে লাগবে না।

সাতবেড়ের একটি ছেলে গল্প ও কবিতা লিখে মাঝে মাঝে আমার হাতে দেয়। গত দু-তিন বছর থেকে দিচ্ছে। গরীবের ছেলে, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে নি, কিন্তু লেখে মন্দ নয়। গল্পের হাত আছে, তবে টেক্‌নিকের ওপর তেমন দখল নেই, থাকবার কথাও নয়—টেক্‌নিক জিনিসটা কতকটা আসে এমনি, কতকটা আসে ভাল লেখকদের গল্পের রচনারীতি দেখে। তার জন্যে পড়াশুনোর দরকার হয়। এ ছেলেটির সেরূপ বই পড়বার সুযোগ কোথায় ?

মুচি-বাড়ির সামনে বটতলায় তার সঙ্গে দেখা। সে আমার সঙ্গে আলাপ করবে বলেই ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল, বললে। কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—আর-বছরের সেই লেখাগুলো কি দেখেছিলেন ?

ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় বছরে একবার, এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে। সেই সময় ও আমার কাছে ওর লেখা দেয়, ইচ্ছেটা এই যে কলকাতার কোনও কাগজে ছাপিয়ে দেবো। কিন্তু কাগজে ছাপাবার উপযুক্ত হয় না ওর লেখা। তবুও আমি প্রতি বৎসর উৎসাহ দিই, এবারও দিলাম। মিথ্যে করে বললুম, তোমার গল্প বেশ ভাল হয়েছিল, কলকাতার অনেকে পড়ে খুব সুখ্যাতি করেচে। ও আগ্রহের সঙ্গে বললে—কোন্ গল্পটা ? আমার নাম মনে নেই ওর কোনও গল্পেরই, কাগজগুলোও কোন্ কালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। ভেবে চিন্তে বললুম—সেই যে একটা মেয়ে ; বলতেই ও তাড়াতাড়ি বললে—ও বিয়ের কনে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও বিয়ের কনে।

একটা মিথ্যে কথা পাঁচটা মিথ্যে কথা এনে ফেলে। কাঁচিকাটার পুল পর্য্যন্ত বটতলার ছায়ায় ছায়ায় ও আমার সঙ্গে সঙ্গে অতীব আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে শুনতে এল, কলকাতার কোন্ কোন্ বড় লোক ওর গল্পের কি রকম সুখ্যাতি করেচে—কোন্ কাগজের সম্পাদক বলেচে যে, আর একটু ভাল লেখা হোলেই তারা তাদের কাগজে ছাপাবে, তার কবিতা পড়ে কোন্ মেয়ের খুব ভাল লেগেছিল বলে হাতের লেখা কবিতাটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রেখে দিয়েচে কাছে। সন্ধ্যার দেরি নেই, আমি বললুম—তবে আজ যাই, আবার ফিরে নদীর ধারে মাঠে বেড়াতে যাবো। কি করো আজকাল ! ও বললে—বাড়ি বসে তো আর চলে না, তাই ওই পথের ধারে ধান চালের আড়তে কাজ নিইচি। আজ এই তিন মাস কাজ করচি। সকালে আসি আর সন্দের সময় ছুটি পাই।

তারপর একটু লজ্জামিশ্রিত সঙ্কোচের সঙ্গে বললে—আসচে হাটে আপনাকে আর

গোটাকয়েক গল্প ও কবিতা দেবো—পড়ে দেখবেন কেমন হয়েচে। কলকাতার ওই বাবুদেরও দেখাবেন। আমি উৎসাহের সঙ্গে বলি—নিশ্চয়ই। বাঃ চমৎকার লেখা তোমার। পড়ে সেখানে সবাই কি খুশি! তা এনো। আসচে হাটবারেই এনো। তার আর কথা কি!

ও বললে—ফিরবেন তো এমন সময়? আমি লেখা নিয়ে এই বটতলায় বসে থাকবো। আসবেন একটু সকাল-সকাল যদি পারেন—দু-একটা লেখা একটু পড়ে শোনাবার ইচ্ছে—

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম—শোনাবে নাকি? বাঃ তবে তো বেশ দিনটা কাটবে। নিশ্চয়ই আসবো। তোমার কথা কত হয় কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে।

বেচারীকে সত্যি কথা বলে লাভ নেই। ওতেই ওর সুখ, আমরা সবাই জীবনে মিথ্যের স্বর্গ রচনা করে রেখেচি, উনিশ না হয় বিশ। মিথ্যে বলে যদি ওই দরিদ্র, অসহায় পল্লী-যুবককে এতটুকু আনন্দ দিতে পারি ভালই। ওর মিথ্যে স্বর্গ আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অক্ষয় হোক্।

আজ ঘুম থেকে উঠে যখন হাটে যাই, তখন মেঘলা করে এসেচে, বেশ লাগলো। বনে বনে কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ফলে আছে, পানপাতার মত বড় বড় লতা উঠেচে গাছে গাছে—ঘন কালো বর্ষার মেঘ করেচে নৈর্ঋত কোণে। গোপালনগর পেঁছিতেই রাধাবল্লভ নিয়ে গেল ওদের বাড়ি। রাধাবল্লভের স্ত্রী পাঁচী আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলা করেচি বকুলতলায়—বিলবিলের ধারে, যুগল বোষ্টমের কামরাঙা তলার পথে। ওরা জাতে জেলে। ওর বিয়ের পর ওকে আমি এই প্রথম দেখলুম বোধ হয় বাইশ-তেইশ বছর পরে। দেখে বড় স্নেহ হোল—জড় হয়ে এসে প্রণাম করল। কথাবার্ত্তা খুব বিনীত, নম্রসম্র। একটু ভয়ে ভয়ে কথা বললে।

আমি ব্রাহ্মণ, ওর বাড়িতে গিয়েচি, পাছে আমার কোনও অসম্মান হয়, এই ভয়েই তটস্থ। ওর ছেলেকে দিয়ে একটু সন্দেশ ও জল পাঠিয়ে দিলে। তাও ভয়ে ভয়ে। ভাবলে আমি খাবো কি না। নিজের হাতে সাহস করে নিয়ে আসতে পারলে না। আমি ওকে দেখিয়ে সে সন্দেশ ও জল খেলুম, ওর মনে দ্বিধা ও সংকোচের কোনও অবকাশ দিলুম না।

ও পড়ে গিয়েছে বড় বিপদে। এর বড় মেয়ের বয়স প্রায় কুড়ি। মেয়েটি দেখতে শুনতে বড় ভাল, লেখাপড়াও শিখেচে। ওদের জাতে ভাল ছেলে বড় একটা পাওয়া যায় না—অনেক খুঁজে পেতে বাপে বিয়ে দিয়েছিল ওরই মধ্যে একটু আধটু শিক্ষিত একটি ছেলের সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে ওর ওপর বড় খারাপ ব্যবহার করে বলে, বাপ মেয়েকে আর সেখানে পাঠাতে চায় না। সে জামাই আবার বিয়ে করচে। এই সব নিয়ে গোলমাল। ওরা জেলেপাড়ার মধ্যে বাস করে, ভাল কোঠা বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ওর স্বজাতিরা সেজন্যে ওদের দু-চোখ পেতে দেখতে পারে না। তার ওপর মেয়েটা নাকি সর্ব্বদা বই পড়ে। কি সর্ব্বনাশ! জেলের মেয়ে বই পড়বে কি? ওদের পাড়ার লোক ষড়যন্ত্র করে একরাত্রে ওদের ঘরে ঢুকে কিছু টাকা কাপড়চোপড় চুরি করে নিয়ে গিয়েচে, আর এক বাক্স ভাল ভাল বই সব ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েচে।

পাঁচী লেখাপড়া জানে না, কিন্তু বইগুলোর শোক ওর লেগেচে খুব। আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আসুন তো দাদা, দেখুন দিকি, আপনি তো লেখাপড়া জানেন, আমার এক বাক্স বই, খুড়শ্বশুরের কেনা—বইগুলো ছিঁড়ে ছুটে তার আর কিছু রেখেচে দাদা?

গিয়ে দেখলুম একটা আমকাঠের সিন্দুকে অনেকগুলো পুরোনো বই, বেশ ভাল বাঁধানো। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কিছু সেকেলে বাজে বটতলার উপন্যাস, মডেল-ভগিনী, কঙ্কাবতী, পুরোহিত দর্পণ (ওদের বাড়ি পুরোহিত দর্পণে কি কাজ জানি নে.), রামায়ণ, হরিবংশ এই সব বই। মেয়েটা সেই সব বই পড়তো বলে পাড়ার কারও সহ্য হতো

না। তাই বইগুলোর ওপরে ঝাল ঝেড়েচে।

আমি বললুম—যদি ওকে শ্বশুর বাড়ি না পাঠাও, তবে ওর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করো।

পাঁচীর কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। কতকাল আগে বাল্যে এক সঙ্গে খেলা করেচি, ওদের পর ভাবতে পারি নে।

হাট থেকে যখন ফিরি, তখন বেলা গিয়েচে, রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। মাঠে নদীর ধারে একটু বসে ওপারের মেঘস্তূপ লক্ষ্য করি, তারপর জলে নামি স্নান করতে। অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, ওপারের চরে সাঁইবাবলা গাছের বন, আর সেই প্রতিদিনের উজ্জ্বল তারাটি উঠেচে, দেখতে বড় চমৎকার হয় ও তারাটা।

সকালে বসে যখন লিখচি, মনোরমা এসে বই চাইলে—পাঁচীর মেয়ে মনোরমা। ও আমার কাছে একখানা বই চেয়েছিল এবার, কিন্তু নানা গোলমালে সুবিধে হয় নি। বললুম, কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দোবো, মা।

বেশ মেয়েটি মনোরমা, জেলের মেয়ে বলে ওকে বোঝাই যায় না।

ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাবার সময় নড়াইল থেকে একখানা নৌকো আসচে দেখি, যাবে গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরতে, দু-দিন হোল ইছামতী নদীতে পড়েচে। তারা জিজ্ঞেস করলে—ইছামতীর মুখ আর কত দূরে?

ঘাটের কেউ জানে না। আমি বললুম—আরও দুদিন লাগবে চূর্ণি নদীতে পড়তে। সেখান থেকে আর একদিন।

বৈকালে বেলেডাঙার পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করলুম। আরামডাঙা, নতিডাঙা, সদানন্দপুর, চিত্রাঙ্গপুর, নতুনপাড়া, পাঁচপোতা প্রভৃতি সাত-আটখানা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছিল। সদানন্দপুরের সৈয়দ আলি মোল্লাকে সভাপতি করে আমি এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লাম সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। ছেলেরা গান গাইলে, ফুলের মালা গলায় দিলে। হৈ হৈ ব্যাপার। তারপর উপস্থিত লোকেদের মধ্যে বেছে বেছে এক কার্য্যকরী সমিতি গঠন করি। নূর মহম্মদ মাস্টারের আগ্রহেই এ সব হোল। সে লোকটা নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ, গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোক যোগাড় করা, সকলকে খবর দেওয়া, এসব সে-ই করেচে। মিটিং-এর পরে বৈকালে নীল আকাশের বিচিত্রবর্ণ মেঘস্তূপের তলে মরাগাঙের ধারে সবুজ ঘাসভরা মাঠের মধ্যে বসে গ্রামের লোক কত দুঃখের কথা আমার কাছে বলতে লাগল। গাঁয়ে জলের কষ্ট, কচুরিপানায় পচা জল খাচ্ছে, বেলে জমিতে ফসল হয় না, ক-বছর অজন্মা, মোল্লাহাটির খেয়াঘাটের ঘাটওয়ালাদের জুলুম।'

তাদের বুঝিয়ে দিলাম, এই পল্লীমঙ্গল সমিতি থেকে গ্রামে এসব অভাব অভিযোগ দূর করবার চেষ্টা করা হবে। তোমরা চাইতে জানো না, তাই পাও না। অন্য গাঁয়ে দুটো টিউবওয়েল হয় দু-পাড়ায়, তোমাদের গোটা গাঁয়ে একটাও হয় না।

সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে রওনা হলুম যখন, তখন মাথায় সেই উজ্জ্বল তারাটি উঠেছে। বাড়ি এসেই ঊষার পত্র পেলুম।

ছুটি শেষ হয়ে আসচে আর আমার মন খারাপ হয়ে আসচে। এই মুক্ত নদীর চর, নীল উদার আকাশ, বর্ষাশ্যাম তৃণভুমি, আষাঢ়ের টলটলে কালো জল ইছামতী, জোনাকীর ঝাঁক, 'বৌ-কথা-কও' পাখীর ডাক, এসব ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।

জীবনের বেগ যেন মন্দীভুত না হয়। আমাদের দেশে, আমাদের জাতীয় জীবনে তার আশঙ্কা খুব বেশী। পেট্রার্ক সম্বন্ধে যেমন উক্ত হয়েচে—'It is a noble Florentine

profile, the whole aspect suggesting abundance of thought and life…'

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কার সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়?

রাত্রে মনু রায়ের বাড়িতে সামাজিক দলাদলির মিটিং হোল রাত একটা পর্য্যন্ত। গাঁয়ের সবাই ছিল, কিছুতেই আর মেটে না। নানা কথা ওঠে, এ রাগ করে চলে যায়, ও রাগ করে চলে যায়। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই মীমাংসা হোল না। আমায় দু-বার ডাকতে এল, আমি যাই নি।

সারাদিন বর্ষার বৃষ্টি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথে ঘাটে জল বেধেচে। বৈকালে বৃষ্টি একটু ধরেছিল, সন্ধ্যায় আবার মেঘ এল ঘনিয়ে। আমি সেই সময় নদীর জলে নেমেচি নাইতে—মাধবপুরের পারের ওপরে সেই মেঘনীল দিগ্বলয়ের পটভূমিতে একটা শিমুল গাছ কি সুন্দর দেখাচ্চে। এই ইছামতী, এই মেঘমালা, এই বর্ষার সবুজ বনভূমি এমনি থাকবে—অথচ আমরা চলে যাবো আমাদের সকল সুখ-দুঃখ নিয়ে, আজকের এই মেঘ-মেদুর সন্ধ্যার সকল অনুভূতি নিয়ে। ঘাটের ওপর ওই বনসিম লতার কোলের নিচে খুকুর সে ছবিটা ক্রমে বহুদূরের হয়ে পড়েচে, এই পল্লীনদীটির শ্যামতীরে বাঁশ ও বনসিম লতার ছায়ায় অক্ষয় হয়ে থাকবে সে ছবি, এর আকাশে বাতাসে মিলিয়ে, কিন্তু তাকে চিনে নেবার লোক থাকবে না কেউ, কেউ এমন থাকবে না যার মনে ও ছবি বেঁচে থাকবে।

বারাসাত গেলুম পশুপতিবাবুর কাছে। উনি সকালেই যেতে লিখেছিলেন। কিন্তু শরীরটা একটু খারাপ ছিল। বারাসাত নেমে দেখি এ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে—অথচ কলকাতায় এক ফোঁটাও জল নেই। হাসপাতালে গিয়ে দেখি পশুপতিবাবু জেল দেখতে গিয়েচেন। আমি বসে রইলুম, তারপর পশুপতিবাবু এলেন। আমায় পেয়ে খুব খুশি। দু-জনে হাসপাতাল দেখতে গেলুম, গোবরডাঙ্গা থেকে এসেচে একটা জখম রোগী। তার মাথায় দু-তিনটা বড় বড় গর্ত্ত। তার বড় ভাই নাকি বিষয়ের ভাগ দিতে হবে বলে তার মাথায় ওই রকম মেরেচে। পশুপতিবাবু বললেন, লোকটা বাঁচবে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলি, গোবরডাঙার কাছে বেড়গুমি গ্রামে বাড়ি। হাসপাতালের কালো, মোটা মত একটা নার্স ওকে যত্ন করচে দেখলুম।

তারপর জেল দেখতে গেলুম। তখন কয়েদীরা সব খেতে বসেচে। খাবার বন্দোবস্ত দেখে মনে হোল জেলের মধ্যে ওরা বেশ সুখেই থাকে। দিব্যি সাদা চালের ভাত, তরকারিটা রেঁধেচে তার বেশ সদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে, ডালটাও বেশ ঘন। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংস দেয়। ওরা নিজেদের বাড়িতে অমন খাদ্য প্রতিদিন তো দূরের কথা কালেভদ্রে খেতে পায় কি না সন্দেহ। একজন কয়েদী ভদ্রলোকশ্রেণীর, তাকে বললুম, আপনার কি হয়েছিল, কতদিনের জেল? বললে, চিটিং কেস মশাই, পনেরো মাসের জেল। আর একটা ছোকরাকে বসিরহাট অঞ্চল থেকে ধরে এনেচে। তার বিচার এখনও হয় নি। জিজ্ঞেস করলুম—কি করেছিলে?

বললে—একটা মেয়েকে খুন করেচি।

—কেন খুন করলে?

—বাবু, চারদিন খাইনি। ওর গায়ে গয়না ছিল, সেই লোভে মেরেচি।

আমরা বললুম—বাপু। ওরকম বোলো না, পুলিসের কাছেও না বিচারের সময়ও না। বললে মারা পড়বে।

তারপর এসে একটা বড় পুকুরের ধারে বসলুম। তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েচে। পুকুরের

ওপারের আকাশে মেঘপুঞ্জ, তবে কি আর দেশের মত ভাল লাগছিল, তা নয়। কলকাতার চেয়ে ভাল বটে। একটা ছোট মেয়ে পশুপতিবাবু বলাতে, অনেকগুলো যুঁই ফুল তুলে এনে দিলে। পশুপতিবাবুর বাসায় বারান্দাতে বসে চা খেয়ে অনেক গল্প করা গেল।

রাত্রে ফিরবার সময় মিনুদের বাড়িটা দেখলুম। বাড়িটা ভালই, তবে বারাসাতে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া বলে ও'রা এখানে থাকতে পারেন না।

আজ রাধাকান্তদের বাড়ি গেলুম তার বৌভাতের নেমন্তন্নে। অনেকদিন যাই নি ওদের বাড়ি, ওরাও খুব ভালবাসে। বাইরের ঘরে খুব ভিড় থাকা সত্ত্বেও রাধাকান্ত, খিচু, ভীম, বাঁটুল সবাই এসে গল্পগুজব ও আপ্যায়িত করলে। ভীম ও বাঁটুলের সে কি আনন্দ আমি গিয়েচি বলে! রাধাকান্ত খাবার সময়ে হাত ধরে ওপরে নিয়ে গেল ওর বোন লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মীকে বললে—এ'কে আলাদা জায়গা করে খেতে দে। লক্ষ্মীর ছোট বোনটা বেশ বড় হয়ে উঠেচে দেখলুম। আমি একবার পুজোর সময় জাহ্নবীর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলুম, ওর আগের পক্ষের খুড়ীমা তাকে পুতুল দিয়েছিলেন—সে সব কথা বললে।

বাঁটুল একটা ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে বৌ দেখালে—ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভিড়। সোনারবেনের মেয়েরা অত্যন্ত গহনা, পরে এক একটি মেয়ের আপাদমস্তক গহনায় মোড়া, নাকের নথও বাদ যায় নি। আজকাল যে এত গহনা পরার রেওয়াজ আছে, বিশেষ এই কলকাতা শহরে—সে আমার ধারণা ছিল না।

রাধাকান্তের বোন লক্ষ্মী অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েচে। শিবু যখন আর একবার দোতলার ঘরে বৌ দেখাতে নিয়ে গেল তখন সে একখানা লুচি হাতে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল, কিন্তু ও যেন বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েচে।

রাধাকান্ত ছেলেটি আমায় খুব ভালবাসে এ আমি বরাবরই দেখে আসচি—শিবুর চেয়ে, ভীমের চেয়েও। ওর মধ্যে কপটতা নেই।

কলকাতায় বড় একটা আনন্দ পাওয়া যায় না; কিন্তু কাল সন্ধ্যা ছ-টার সময় বাসায় ফিরে এসে বারান্দাতে বসে আছি, হঠাৎ মনে আপনা-আপনিই আনন্দ এল। সকলের কথা মনে এল। দেখলুম ভেবে নিরাকার ভগবানকে আমি বুঝি নে, তাঁর ধারণাও করতে পারি নে—God as pure spirit তাঁকে বুঝতে পারবো না যতক্ষণ তাঁর রূপ না পাচ্ছি। যখন তিনি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে আসবেন, তখন তাঁকে আমরা ভক্তি করতে পারি। কেন না মানুষ নিরাকার নয়। এমন সে কখনও জীবের কল্পনা করতে পারবে না যার প্রাণ আছে, মন আছে, অথচ আকার নেই। নিরাকার ভগবানের উপাসনা কি সোজা ব্যাপার?

কিন্তু এসব কথা অবান্তর। আমার মনে উঠল একটা অন্য ভাব। খুকুদের কাছে একটা বার-তের বছরের ছোট মেয়ে খেলে বেড়াচ্চে। মেয়েটি ভারী সুন্দরী, নীলাম্বরী শাড়ি পরনে, বিদ্যুতের মত ছুটে ছুটে খেলে বেড়াচ্চে। মাথার খোঁপাটিতে যেমন ঘন কালো চুল, তেমনি পারিপাটী করে বাঁধা। ওকে দেখলেই মনে হোল Out of clay ভগবান এমন সুন্দর ছাঁচে গড়েচেন, এমন আকারে গড়েচেন—আর তিনি নিজে নিরাকার, এ কেমন করে ভাবতে ভাল লাগে? কি অদ্ভুত রসায়ন যার বলে মাটি থেকে অমন সুন্দরী মেয়েটির মত চেহারা তৈরি হয়েচে! তিনি নিজেও ইচ্ছা করলে সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশ হতে পারেন নিজে, যে দেশের লোকে যা ভালবাসে সেই মূর্ত্তিতে। যেমন ধরা যাক, আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে গলে বনমালা, মাথায় শিখিপুচ্ছ, হাতে বেণু এই শ্রীকৃষ্ণের কিশোর মূর্ত্তির প্রচলন, তাও দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে কেউ চায় না—সে সময় তিনি নিশ্চয় প্রৌঢ় হয়েছিলেন যদি

সত্যি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন—কিন্তু চাইবে সবাই বৃন্দাবনের সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে। সুতরাং আমাদের দেশের লোকের রক্তে ওই শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের রূপ নৃত্য করচে—আমাদের দেশের হাওয়ায় তাঁর বাঁশি বাজে, পাখীরা তাঁর নাম করে—এদেশের মাটিতে তাঁর চরণচিহ্ন সর্ব্বত্র। এদেশে ভগবানের সাকার মূর্ত্তির কথা ভাবতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই এসে পড়ে মনে। যে ভালবাসে ওই মূর্ত্তিকেই ভালবাসে, যে না ভালবাসে সেও পাকে-চক্রে ওই মূর্ত্তির কথাই ভাবে, শেষে ভালবাসা এসে পড়ে মনে কোন্ অলক্ষ্য দ্বারপথ বেয়ে।

কলকাতা শহরের একটা অদ্ভুত রূপ আছে, যেটাকে দেখতে হলে বিকেল ছ-টা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত জনবহুল স্কোয়ার, সাধারণ পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার, ভাল ক্লাব প্রভৃতি ঘুরে বেড়ানো দরকার। কোনও পার্টিতে গিয়ে স্থাণুবৎ অচল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে শহরের এ ঐশ্বর্য্য, রূপ হারিয়ে ফেলতে হয়। এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকলে হয় না—ট্রামে বা বাসে ঘুরে বেড়াতে হয়, মোটর যদি না থাকে। আলো না জ্বললে শহরের রূপ খোলে না। আজ ভোরে বেরিয়েছিলুম একখানা ট্রামের all day ticket কেটে। কারণ নানা জায়গায় ঘুরতে হচ্চে, রবিবার ভিন্ন সুবিধে হয় না। কমলাদের হোস্টেল হয়ে মণীন্দ্রলালের ওখানে গিয়ে দেখি পুরো আড্ডা বসেচে—পরেশ সেন বিলেতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করচে, ভুপতি, মহিম, নরেনদা সবাই উপস্থিত। সেখানে ঠিক হোল ওবেলা ছ-টার সময় 'বিজলী'তে সবাই মিলে 'She' দেখতে যাওয়া হবে। মণি বর্দ্ধনের নাচ হবে আজই ইন্স্টিটিউটে, আমায় মণি বর্দ্ধন একখানা কার্ড দিয়েচে সে-কথা বললুম। ওরা উড়িয়ে দিলে। তখন ঝমঝম্ বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টি মাথায় ট্রামে ও বাসে সাঁতরাগাছি গিয়ে পেঁছিই ননীর বাড়ি। ননীরা বাসা বদলে আর একটা বাড়িতে এসেচে।

'বিজলী'তে এসে দেখি শুধু পরেশ সেন এসেচে। একটু পরে মণীন্দ্র ও ভুপতি এল। আমরা সবাই ফিল্ম দেখলুম। 'বিজলী'তে এমন একটা atmosphere আছে সেখানে বসে ফিল্ম দেখে সুবিধে হয় না। ভাল সঙ্গ, ভাল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন যেখানে সেখানে বসে, ছবি বা থিয়েটার বা যে কোনও আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে না। আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ, সুবেশা তরুণীর দল, পারিপাটী আসন—এ সবের খুব বড় একটা স্থান আছে ছবি বা থিয়েটার দেখাতে। ওখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে আলিপুর ও খিদিরপুর হয়ে বাসায় ফিরলুম। পথের বৃষ্টিস্নাত গাছপালার ওপর শ্যাওলা পড়ে বেশ দেখতে হয়েচে, কার্জ্জন পার্কে ফুল ফুটে আছে, নরনারীর চিত্র—বেশ লাগল। কলকাতার এই প্রমোদসজ্জা অতি চমৎকার। এত বড় একটা শহরের এ রূপ ভাল করে দেখবার জিনিস।

পরদিনই বিকেলে তরুদের বাড়ি গেলুম শ্যামবাজারে, সেখান থেকে সন্ধ্যায় রঙমহলে বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাটক দেখতে গেলুম 'কালের মন্দিরা বাজে' ও 'অতি আধুনিক'। নাটক দুখানা কিছুই নয়, অতি বাজে, তবে গান ও variety show হিসেবে অনেকগুলো গুণী লোককে একত্র করেচে বটে, নাটকের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। হেমেনদা এসে এক কোণে চুপ করে বসে আছেন। দেখা করে এলাম। সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে খুব জমিয়ে আড্ডা দিতে দিতে থিয়েটার দেখা গেল।

গত শুক্রবারে শ্রীরামপুরে দিদির মেয়ে প্রভার বিয়ে হোল। আমি প্রথমে গেলুম লীলাদিদিদের বাড়ি। লীলাদিদির শরীর প্রথমে খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন কিছু সেরেচে। অমিয় কলেজ থেকে এল রমেশ কবিরাজকে সঙ্গে করে। ওখানে অল্পক্ষণ বসেই দিদির বাড়ি গেলুম। ওরা সকলে মিলে স্ত্রী-আচারের সময়ে বরকে ঘিরে আলো নিয়ে প্রদক্ষিণ করলে।

আমি ওদের সকলকে অনেকদিন পরে একজায়গায় দেখলুম,—বড় ভাল লাগছিল। রাত দশটার ট্রেনে কলকাতায় এলুম।

পরদিন শনিবার বনগাঁ যাব, ঠিক দুপুরবেলা থেকে ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হোল—অতি কষ্টে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তো ট্রেন ধরলুম। বৃষ্টিস্নাত ঘন সবুজ গাছপালা, ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ট্রেন বনগাঁ গিয়ে পৌঁছল। খয়রামারিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেলুম।

তার পরদিন সকাল থেকে কি বিশ্রী বাদলা। নদীর জলে ঘোলা এসেচে, ঘাস পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েচে, এত জল বেড়েচে নদীতে। এখন তো খুবই ভাল, মুশকিল বাধবে সেই কার্ত্তিক মাসে যখন হাঁটুভ'র কাদা হবে নদীর ধারের সর্ব্বত্র!

সোমবার বৈকালে চলে এলুম কলকাতায়। দিনটা পরিষ্কার ছিল, নীল আকাশ, রৌদ্রও উঠেচে। মনে হোল ওই প্রজাপতির দলের উড়ে বেড়ানোর দিকে চেয়ে সারাদিন যদি বসে থাকি, চমৎকার গল্পের প্লট মনে আনতে পারি। এই আলো ছায়ার খেলাতেই মনের ভাব নতুন ধরনের হয়—মাটির সঙ্গে, প্রস্ফুটিত ভায়োলেট রঙের বনকলমী ফুলের শোভা বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের রূপে।

আজ স্কুলের ছাদ থেকে দুপুরের চনমনে রোদে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে পড়ল—

'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে।
ওগো, ঘরে ফিরে চল কনককলসে জল ভরে'॥

এই গানের ছত্র দুটির সঙ্গে আমার আঠার বৎসর পূর্ব্বেকার প্রথম যৌবনের জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চেয়ে চেয়ে মনে হোল বর্ষাসতেজ সবুজ গাছপালা বনঝোপে ঘেরা কোন একটি নিভৃত পল্লীভবনে তারা এখনও সব কিশোরই রয়ে গিয়েচে কত বৎসর আগের সেই এক প্রথম শরতের দিনগুলির মত। কোথায় যে তারা ছায়াছবির মত মিলিয়ে গিয়েচে রজনীর মধ্যযামে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ যেমন মিলিয়ে যায়, এ কথা ভুলেই গেলুম ক্ষণকালের জন্যে। পেট্রার্কের সম্বন্ধে যে কথা হয়েচে, বড় সত্যি সে কথা। 'Know that for a lofty soul death is but a release from prison, that she frightens only those who look for their whole happiness in this poor earth.' ইত্যাদি।

প্রায় ছ-বছর পরে আবার রামরাজাতলায় গিয়েছিলুম রামরাজা ঠাকুরের ভাসান দেখতে। ননীদের বাড়ি গিয়ে উঠলুম, জতু খুব খুশি হোল, জতুর মাকে দেখলুম আজ বহুকাল পরে। অনেক সব পুরোন কথা হোল। সাঁতরাগাছি গ্রাম সম্বন্ধে ননী এমন সব গল্প করলে যাতে জায়গাটার ওপরে আমার কোন শ্রদ্ধা রইল না। একজন লোকের স্ত্রী একটু পাগল মত, সে লোকটা নাকি তার স্ত্রীকে প্রায়ই এমন মারে যে দু-তিন দিন বেচারী আর উঠতে পারে না। অথচ সেই লোকটি এখানে নাকি একজন সমাজপতি! কলকাতার এত কাছে অথচ কালচার বলে কোনও জিনিস নেই এখানে, লোকে বোঝে দশটায় খেয়ে আপিসে ছোটা, আর রবিবার দিন ভাল করে বাজার করে দুপুরে ঠেসে খাওয়া। গ্রামটাও অত্যন্ত নোংরা, চারিদিকে খোলা ড্রেন, জঙ্গাল, দুর্গন্ধ, নোংরা জল গড়িয়ে চলেচে রাস্তার পাশ দিয়ে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় আর কি।

রামরাজার মিছিল বার হবার আগে আমি আর ননী দু-জনে পথের ধারে একখানা গরুর গাড়ির ওপর গিয়ে বসলুম। প্রথমে বাকসাড়া ও ব্যাতড়ের নবনারী কুঞ্জর বেরুল, সঙ্গে অনেক সঙ, কাগজের এরোপ্লেন, রাক্ষসী ইত্যাদি। পেছনে এল রামরাজার মিছিল। শেষের

মিছিলটাই বড় কিন্তু এমন কিছু দেখবার কি আছে বুঝলুম না। রাস্তার দু-পাশে, ছাদে, বারান্দায়, পথের ধারে হাজার হাজার মেয়েমানুষের ভিড়। এ মেয়েদেরই দেখবার জিনিস। ওরা আজ এখানে আসে রামরাজাতলার সিঁদুর দিতে ও মিছিল দেখতে। সব মেয়েরই কপালে অনেকটা করে সিঁদুর লেপা। ভিড়ের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের কিশোরী কাকার ছেলে সন্তোষ আর জীবনের সঙ্গে দেখা হোল। সন্ধ্যার সময় আবার ননীদের বাড়ি ফিরে এসে চা খেলুম। আজ ৩২শে শ্রাবণ বলেই মনটা মাঝে মাঝে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল, অনেক দিন আগেকার এই সন্ধ্যা-গোধূলির একটা ছবি পর-পর আমার মনে আসছিল। জতু দেখলুম মনে করে রেখেচে, সে ননীকে বললে—কোন্ গানটা গাওয়া যেত না বিভূতির সামনে, মনে আছে? ননীরও মনে আছে। সে বললে—জানি: 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে' এই গানটা। আমি হাসলুম। এরা বেশ লোক। আমার জীবনের কতদিন আগেকার কথা এরা কেন মনে রেখেচে, কি দরকার এদের! বিশেষ করে জতু মেয়েটি বড় ভাল, এত স্নেহশীলা! সন্ধ্যার পরে চলে এলুম, বাসে ভয়ানক ভিড়, মল্লিকের ফটক বন্ধ, বাস্ ঘুরে এল জামতলা দিয়ে। সারাদিন পরে কলকাতার মুক্ত হাওয়ায় এসে এখন বাঁচলুম। জতু বার বার বললে—আজ রাতটা থেকে যান না, পাঁপর ভাজবো এখন। আমার থাকবার জো নেই, লেখা আছে।

বললুম—আর একদিন এসে রাত্রে থাকব।

স্পেনের বিদ্রোহ কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করচে। বাড়াজোজ শহর বিদ্রোহীরা অধিকার করেচে, রাস্তায় রাস্তায় barricade এবং প্রত্যেক barricade-এর গায়ে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে, আর স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা মৃতদেহের স্তূপ খুঁজে নিজেদের বাপ, ভাই ছেলে স্বামীর দেহ বার করতে ব্যস্ত। মানুষ এখনও কত আদিম-যুগে পড়ে রয়েচে তা এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জার্ম্মানিতে বিদ্রোহের সময়েও ঠিক এই ধরনের নিষ্ঠুর কাণ্ড এই সেদিন ঘটে গিয়েচে, Ernest Toller-এর বই পড়লে তা জানা যায়। মানুষের প্রতি মানুষ এমন senseless নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান কি করে করতে পারে ভেবেই পাই নে।

এর মধ্যে বড় মানুষও জন্মেচে বৈকি! Ernest Toller-এর ভাষায় বলি:—

In the war there lined a man among millions Karl Liebkrecht; his was the voice of truth and of freedom. Even the prison groove could not silence that voice.

এদের ideal যে কি তা বুঝি নে। স্পেনে socialist ও communist-রা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণতন্ত্র স্থাপন করলে, খুব ভাল কথা। এ পর্য্যন্ত বুঝি। আবার এল Fascists-এর দল, এরা বিদ্রোহ করচে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে socialist-দের শাসনের বিরুদ্ধে, কিন্তু কি ভীষণ রক্তারক্তি আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্চে, ভাবলে বর্ত্তমান সভ্যতার ওপরে মানুষের আস্থা থাকে না। দলে দলে যুদ্ধের বন্দীদের পুড়িয়ে মারচে, বিষাক্ত গ্যাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করচে।

দার্শনিক সত্যিই বলেচে—An easily realizable ideal quickly loses its power of stimulating, nothing lets a man down with such a pump into listless disillusionment as the discovery that he has achieved all his ambition and realized all his ideals. One actually seizes the peach which turns out to be a Dead Sea fruit.

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে কলকাতায় এবার গ্রীষ্মের ছুটির পর এসে বিশেষ করে

নানারকম অভিজ্ঞতা হচ্চে। এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে। জীবনটাকে এভাবে দেখাও বড় দরকার বলে মনে করি। তবে পার্টিতে জীবন দেখার চেয়ে আমি যে লোকজনের বাসায় গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে মিশি, ওতে আরও ভাল করে ওদের দেখা হয়, যেমন রামপ্রসাদের বাড়ি, বঙ্কুদের বাড়িতে বিনুর পাগল হয়ে যাওয়া রাতের দৃশ্য, রমা যখন আমাদের কাছ থেকে চলে গেল মীরাট, তার সেই আকুল কান্নার দৃশ্য, রাজপুরে তেঁতুলের বৌয়ের অসুখের জন্যে চান্দ্রায়ণ করবার ব্যাপার ইত্যাদি।

অনেকদিন আগে কামাখ্যা ছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের একজন চাঁই; থিয়েটারের সময়ে মেয়েদের পার্ট সে-ই করতো, এবং আমাদের সময়ে বেশ নামও করেছিল তাতে। কাল ইনস্টিটিউটে আর একটি ছেলেকে 'মানময়ী গার্লস স্কুলে' নীহারিকার পার্ট করতে দেখলুম—এত চমৎকার মানিয়েছিল তাকে যে কোথায় লাগে মেয়েদের। যেমন রূপসী, তেমনি কমনীয় কান্তি, তেমনি গলার সুর ও গান! হায় কামাখ্যা, তুমি এখন কোথায় তাই ভাবি! সে ভাল লেখাপড়া শেখে নি, থিয়েটার করে বেড়াতো, বোধহয় বি. এ. পাসটাও করেছিল। কোন পাড়াগাঁয়ে এতদিন ছেলেমেয়ে পরিবৃত হয়ে দাবাপাশা ও দলাদলির চর্চা করচে। এখন তার মনের সে স্ফূর্ত্তি নেই, চোখের জলুস কমেচে, চুলে পাক ধরেচে, মুখশ্রীর সে কমনীয়তা আর নেই। এখন যে নীহারিকার পার্ট করল, সে ছেলেটি সে সময়ে হয়তো ছিল তিন-চার বছরের শিশু।

'মানময়ী গার্লস স্কুল' দেখতে দেখতে হঠাৎ আজ কামাখ্যার কথা মনে পড়ল কেন কি জানি।

একদিন মাত্র কলকাতা থেকে বেরিয়েচি অমনি কি ভালই লাগচে। আজ সকালে উঠে অশোক গুপ্তের বাড়ি গেলুম, সেখান থেকে খেয়ে দুজনেই যতীশবাবুদের গাড়িতে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে হাওড়া স্টেশনে। বসুমতীর সেই পুরোনো বাড়িটা, বাবার সঙ্গে যেখানে বাল্যে একদিন এসেছিলুম, সেটা সেই রকমই আছে। কুসুম বলে বাল্যে যে মেয়েটিকে জানতুম, এখন সে বুড়ী হয়েচে, ছেলেবেলায় আমায় তার ছেলের মত ভালবাসতো, সে থাকে কাছেই ওই বাড়িটাতে। ট্রেনে ভিড় নেই, কারণ পুজোর সময় তো আর নয়। দিব্যি আরামে বেঞ্চিতে বিছানা পেতে নিলুম। সাঁতরাগাছি স্টেশনে উঠলো কিশোর কাকার ছেলে সন্তোষ, তাকে উঠিয়ে দিতে এল জীবন। আজ দিনটা বাদলা, জোলো হাওয়া দিচ্চে। কোলাঘাটে রূপনারায়ণের কি রূপ, কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি তীরবেগে ছুটেচে। সেই অন্তরীপ মত জায়গাটা, যেটা প্রতিবারই মনে করিয়ে দেয় পুজোর সময়, সেটা কেমন চমৎকার দেখাচ্চে। রেলের বাঁধের ধারে ঘন বনঝোপে কত কি ফুল ফুটেচে। এসব গাছের নাম জানি নে। এ অঞ্চলে গাছগুলি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, একমাত্র বনকলমী ফুল ছাড়া। হলদে কাপাস তুলোর গাছের বড় ফুল, ঘেঁটুকোল ফুলের মত বড় বড় ফুল, সাদা সাদা কুচো ফুল, আরও কত কি! এবার জল বেজায় বেড়েচে, সব গ্রামের বাড়িঘরের চারিধারে জল ভর্ত্তি, ডোবা, বিল, পুকুর। কোলাঘাটে গাড়ি একঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল লাইন বন্ধ ছিল বলে। খড়্গপুর ছাড়িয়েচি, সেই সময় আবার মেঘ করে এল। ঝাড়গ্রামে থামবার কিছু আগে সন্তোষ গ্রামের কথা উপলক্ষে বললে—গণেশ মুচির ছোট ছেলেটি মারা গিয়েচে। শুনে খুবই দুঃখিত হলুম, গণেশ বুড়ো হয়েচে, ওই ছেলেটিকে বড় ভালবাসতো। আর একটা খবর বললে—হরিদাদার মেয়ে কনকের বিয়ে হয়েচে এক বুড়ো বরের সঙ্গে। আরও দুঃখিত হলুম, কনক মেয়েটি বড় সুন্দরী, তার জন্যে তার বাবা ওর চেয়ে

ভাল বর জোটাতে পারলে না কেন জানি নে, কারণ তার বাবা গরীব নয়, ইচ্ছে করলে দু-পয়সা খরচ তো করতে পারতো।

এইবার ঘন মেঘ করে বৃষ্টি এল। গাড়ি এখন শালবনি ছাড়িয়ে গিড়্নি স্টেশনে এসে পেঁছেচে। বড় ইচ্ছে ছিল বাকুড়ি যাবো, কিন্তু যাওয়া হোল না।

সুবর্ণরেখার ধারে এসে ঘন ছায়াভরা বৈকালে শালবনের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। ওই দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরী, যার মাথায় উঠে বনে চিঁড়ে দই খেয়েছিলুম, যার মাথায় উঠে শিলাখণ্ডে নাম লিখে রেখেছিলুম।

চারিধারে শ্যামল বনানী, প্রান্তর ধানবন, শালগাছ। ওই ওপারে প্রকাণ্ড দীর্ঘ পাহাড়-শ্রেণী। সামনে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা, তীরে ছোট বড় শিলাখণ্ড, শাল চারার জঙ্গল। সন্ধ্যা নেমে আসচে, পাহাড়শ্রেণী নীরব, বনানী নীরব, মেঘলা, সুবর্ণরেখার কুলুকুলু শব্দ ছাড়া অন্য কোনই শব্দ নেই। গত শনিবারে এমন সময় ইছামতীর ধারে বসে আছি।

এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে পেছনের শালবনের মাথার ওধার দিয়ে পূর্বদিকে চেয়ে দেখলুম, দূরে এমনি ইছামতী নদী বয়ে যাচ্চে, বাংলাদেশের এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ের কোল দিয়ে। সেই নদীর ধারে একটা গাঁয়ের ঘাটে এক জায়গায় একটা বনসিমের ঘন ঝোপ নত হয়ে আছে ঘাটের পথের ওপরে। একটি মেয়ের ছবি সেই বনসিমের লতার ঝোপের তলায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে আছে। ছবিটি মনে পড়তেই অপূর্ব আনন্দে ও মাধুর্যে এই সন্ধ্যা ভ'রে উঠলো, বাতাস আরও মধুর হোল।

আমার ঘরে গত জ্যৈষ্ঠমাসে একদল রামছাগল উঠে উপদ্রব করছিল, আমি হাট থেকে এসে 'দূর দূর' করে ছাগলের দল তাড়িয়ে দিলুম, সেই কথা মনে পড়লো। এই রামছাগলের দল তাড়ানোর সঙ্গে আমার সেদিনের একটা বড় মধুর ঘটনা মেশানো আছে, কেউ তা জানে না—তা আমি এখানে লিখবও না। এটুকু লিখে রাখলুম এজন্যে যে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে এই বর্ষাসন্ধ্যায় সেই ঘটনাটা আমার মনে এসেছিল।

সুপ্রভা কত দূরে আছে, তার কথাও মনে হোল এ সন্ধ্যায়। বড় ভাল মেয়ে সে, তার মতো মেয়ে কখনো দেখি নি।

এই ডায়েরীটি শেষ হয়ে গেল। আমার জীবনে এই দেড় বছর বড়ই আনন্দের। পরিপূর্ণ আনন্দের। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত—কত নতুন বন্ধু লাভ, কত অভিজ্ঞতা। কত পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হোল বহুদিন পরে এই দেড় বছরের মধ্যে, এই ১৯৩৬ সালে। যেমন মণিকুন্তলা তার মধ্যে একজন। ভগবানকে এজন্যে ধন্যবাদ জানাই।

কত কি পেলুম এই দেড় বছরে। সব কথা ডায়েরীতে লেখা যায় না। যা এখানে লিখলুম না, তা রইল আমার মনের গভীর গোপন তলে। কর্ম্মহীন অবকাশ-মুহূর্ত্তে তাদের চিন্তা আমায় আনন্দ দেবে। কত জায়গায় বসেই কত ডায়েরী লিখলুম, ভাগলপুরে, ইশ্মাইলপুর দ্বিয়ারায়, আজমাবাদ কাছারীতে, কাশীতে, রাখামাইনসে, নাগপুরে, কলকাতায়।*

চাঁদের পাহাড়

চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত।

তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, রোসিটা ফরব্‌স্ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে, এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারস্‌-ভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী, এবং ডিঙ্গোনেক (রোডেসিয়ন মনস্টার) ও বুনিপের প্রবাদ জুলুল্যাণ্ডের বহু আরণ্যঅঞ্চলে আজও প্রচলিত।

সেণ্টফ্র্যান্সো সৌর স্তোত্রের অনুবাদটি স্বর্গীয় মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত।

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর, যশোহর

১লা আশ্বিন ১৩৪৪

এক

শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ্. এ পাশ দিয়ে এসে গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া। সারা বৈশাখ এভাবে কাটবার পরে একদিন তার মা ডেকে বললেন—শোন্ একটা কথা বলি শঙ্কর। তোর বাবার শরীর ভাল নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনো হবে কি করে? কে খরচ দেবে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা দেখ্।

মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ ক'মাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। অথচ করবেই বা কি শঙ্কর? এখন কি তাকে কেউ চাকরি দেবে? চেনেই বা সে কাকে?

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার এতটা খারাপ্ ছিল না। শঙ্করদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটীতে পাটের কলে চাকরি করতেন। শঙ্করের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকরির কথা বলে এলেন। যাতে তিনি স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্যে পাটের কলে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ী বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকরির জন্যে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।

শঙ্কর সাধারণ ধরনের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বরাবর খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেছে। সেবার মহকুমার এক্‌জিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেণ্টার ফরওয়ার্ড ও অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিংএ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই. এম. সি. এ.-তে সে রীতিমত বক্সিং অভ্যাস করেছে। এই সব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভাল করতে পারে নি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড় বড় ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কষতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যে-সব নক্ষত্রমণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে—ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক, কোন্ মাসে কোন্‌টা ওঠে, কোন্ দিকে ওঠে—সব ওর নখদর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশী ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময়ে সে একরাশ ওই সব বই কিনে এনেছে, নির্জ্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কি ভাবে ওই জানে। তার পর এল তার বাবার

অসুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকুরি নেওয়ার জন্যে অনুরোধ। কি করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা-বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকরি নিতে হবে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তা'হলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয়! ফুটবলের নাম-করা সেণ্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন, নামজাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু? নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে—আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা—ওদিকে সেই ছ'টার ভোঁ বাজলে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে! ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকড়া গাড়ী টানতে যাবে?...সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জ্জনে বসে বসে শঙ্কর এই সব কথাই ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে—শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যান্‌লির মত, হ্যারি জন্‌স্টন্, মার্কো পোলো, রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মত। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরী করেছে—যদিও এ কথা ভেবে দেখে নি অন্যদেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালীর ছেলের পক্ষে তা ঘটা এক রকম অসম্ভব। তারা তৈরী হয়েছে কেরানী, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান ভূপর্য্যটক আণ্টন্ হাউপ্টমান্ লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্ব্বত—মাউন্‌টেন্ অফ্ দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ! কত বার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের্ হাউপ্টমানের মত সেও একদিন যাবে মাউন্‌টেন্ অফ্ দি মুন্ জয় করতে। স্বপ্ন! সত্যিকার চাঁদের পাহাড়ের মতই দূরের জিনিস হয়ে থাকবে চিরকাল।... চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে?

সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলে সে। ··

চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতীর দল মড়্ মড়্ করে বাঁশ ভাঙছে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বতে উঠছে; চারিধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টমানের লেখা মাউন্‌টেন্ অফ্ দি মুনের দৃশ্যের মত। সেই ঘন বাঁশবন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড় বড় গাছ, নীচে পচাপাতার রাশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা—আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সাদা ধব্‌ধবে চিরতুষারে ঢাকা পর্ব্বত-শিখরটি - এক একবার দেখা যাচ্ছে, এক একবার বনের আড়ালে চাপা পড়ছে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতীর গর্জ্জন শুনতে পেলে। সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল...এত বাস্তব বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল!

বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েছে, জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেছে।

উঃ, কি স্বপ্নটাই দেখেছে সে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়! বলে তো অনেকে।

অনেকদিন আগেকার একটা ভাঙা পুরোনো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বারভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার জামাই মদন রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরী করেন। এখন মদন রায়ের বংশে কেউ নেই। মন্দির ভেঙেচুরে গিয়েছে, অশথ গাছ, বট গাছ গজিয়েছে কার্নিসে—কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদী, তার ওপরের খিলেনটা এখনও ঠিক আছে। কোন মূর্ত্তি নেই, তবুও শনি-মঙ্গলবারে পুজো হয়, মেয়েরা বেদীতে সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়, সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত—যে যা মানত করে তাই হয়। শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরের একটা বটের ঝুরির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কি প্রার্থনা জানিয়ে এল।

বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্ব্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, কাছেই একটা পোড়ো বাড়ী; এদের বাড়ীতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে—সেই থেকে বাড়ীর মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন। সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়। একা বড় কেউ এদিকে আসে না। শঙ্করের কিন্তু এই নির্জ্জন মন্দির-প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভাল লাগে!

ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েছে। এই বনের মধ্যে বসে শঙ্করের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল—সেই মড়্‌মড়্‌ করে বাঁশঝাড় ভাঙছে বুনোহাতীর দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতালতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্ব্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করছে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেছে জীবনে—এত সুস্পষ্ট ছবি স্বপ্নে সে দেখে নি কখনো—এমন গভীর রেখাপাত করে নি কোনো স্বপ্ন তার মনে।···

সব মিথ্যে। তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকরি করতে। তাই তার ললাট-লিপি নয় কি?···

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে।

শঙ্করের জীবনেও এমন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল।

সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়ীতে পা দিয়েছে, এমন সময়ে ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুজ্জের স্ত্রী একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বল্লেন—বাবা শঙ্কর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেক দিন পরে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়ীতে চিঠি দিয়েছে, কাল পিণ্টু সেখান থেকে এসেছে, এই ঠিকানা তারা লিখে দিয়েছে। পড় তো বাবা?

শঙ্কর বললে—উঃ, প্রায় দু-বছরের পর খোঁজ মিল্‌ল ! বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে কি ভয়টাই দেখালেন ! এর আগেও তো একবার পালিয়ে গেছলেন—না ? তার পর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগাণ্ডা রেলওয়ে হেড্ অফিস, কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ ডিপার্টমেণ্ট, মোম্বাসা, পূর্ব্ব আফ্রিকা।

শঙ্করের হাত থেকে কাগজের টুক্‌রোটা পড়ে গেল। পূর্ব্ব আফ্রিকা ! পালিয়ে মানুষে এতদূর যায় ? তবে সে জানে ননীবালা দিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরনের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের আলাপও হয়েছিল—শঙ্কর তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে সবে উঠেছে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালই জানে, তবে কোন একটা চাকরিতে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্ম্মা না কোচিন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড়দাদার সঙ্গে কি নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাড়ী থেকে পালিয়েছিল—এ খবর শঙ্কর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদবাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেছে একেবারে পূর্ব্ব আফ্রিকায় !

রামেশ্বর মুখুজ্জের স্ত্রী ভালো বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কতদূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদবাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শঙ্করকে তাঁর মনে আছে কি ? তাঁর শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের ছেলে সে। এবার এফ. এ. পাশ দিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। তিনি কি একটা চাকরি করে দিতে পারেন তাঁদের রেলের মধ্যে ? যতদূরে হয় সে যাবে।

দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে চিঠির উত্তর-প্রাপ্তি সম্বন্ধে—তখন একখানা খামের ছিঠি এল শঙ্করের নামে। তাতে লেখা আছে—

মোম্বাসা
২নং পোর্ট স্ট্রীট

প্রিয় শঙ্কর,

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কব্জির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সে কথা ভুলি নি। তুমি আসবে এখানে ? চলে এসো। তোমার মত ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে, তবে কে আর বেরুবে ? এখানে নতুন রেল তৈরী হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পারো, এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি।

তোমাদের—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি। যৌবনে তিনিও নিজে ছিলেন ডানপিটে ধরনের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকরি করতে যাবে তাঁর এতে মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব অনটনের দরুনই শঙ্করের মায়ের মতে সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর মাসখানেক পরে শঙ্করের নামে এক টেলিগ্রাম এল ভদ্রেশ্বর থেকে। সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শঙ্কর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবার মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শঙ্করকে তা হলে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে যেতে পারেন।

দুই

চার মাস পরের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষ।

মোম্বাসা থেকে রেলপথ গিয়েছে কিসুমু-ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের ধারে—তারই একটা শাখা লাইন তখন তৈরী হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে তিনশো মাইল পশ্চিমে। ইউগাণ্ডা রেলওয়ের মুড্‌স্‌বার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে শঙ্কর কনস্ট্রাক্‌শন্ ক্যাম্পের কেরানী ও সরকারী স্টোর্‌কিপার হয়ে এসেছে। থাকে ছোট একটা তাঁবুতে। তার আশে-পাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়িঘর তৈরী হয় নি বলে তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো—তাদের চারিধারে ঘিরে বহু দূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড় বাওবাব্ গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শঙ্কর কতবার ছবিতে দেখেছে, এবার সত্যিকার বাওবাব্ দেখে শঙ্করের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শঙ্করের তরুণ তাজা মন—সে ইউগাণ্ডার এই নির্জ্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলে। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়তো—যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে বেড়াতে বার হত—পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা লম্বা ঘাস, কোথাও মানুষের মাথা সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু।

কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শঙ্করকে ডেকে বললেন—শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পাও যেও না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পারো। পথ হারিয়ে লোক এসব জায়গায় মারাও গিয়েছে জলের অভাবে। দ্বিতীয়, ইউগাণ্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েছে—কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান। এসব অঞ্চল মোটেই নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরের পরে কাজকর্ম্ম বেশ পুরোদমে চলছে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপার কি দেখতে। শঙ্করও ছুটল—ঘাসের জমি পাতি-পাতি করে খোঁজা হল—কিছুই নেই সেখানে।

কিসের চীৎকার তবে?

এঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলীদের নাম-ডাকা হল, দেখা গেল একজন কুলী অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কি কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখে নি।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ঘাসের বনের বাইরে বালির ওপরে কঁটা সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে পায়ের দাগ দেখে দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলীর রক্তাক্ত দেহ বার করলেন।

তাকে তাঁবুতে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চীৎকারে সে শিকার ফেলে পালিয়েছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কুলীটা মারা গেল।

তাঁবুর চারিপাশের লম্বা ঘাস অনেকদূর পর্য্যন্ত কেটে সাফ্ করে দেওয়া গেল পরদিনই। দিনকতক সিংহের কথা ছাড়া তাঁবুতে আর কোনো গল্পই নেই। তার পর মাসখানেক পরে ঘটনাটা পুরানো হয়ে গেল, সে কথা সকলের মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম্ম আবার বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ল। কুলীদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েছে। সেখানে তাঁবুর সবাই গোল হয়ে গল্পগুজব করছে। শঙ্করও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনছে এবং অগ্নিকুণ্ডের আলোতে 'কেনিয়া মর্নিং নিউজ' পড়ছে। খবরের কাগজখানা পাঁচদিনের পুরোনো। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে তবু এখানেতে বাইরের দুনিয়ার যা কিছু একটু খবর পাওয়া যায়।

তিরুমল আপ্পা বলে একজন মাদ্রাজী কেরানীর সঙ্গে শঙ্করের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিরুমল তরুণ যুবক, বেশ ইংরেজী জানে, মনেও খুব উৎসাহ। সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে য়্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশায়। শঙ্করের পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশের কথা, তার বাপ-মায়ের কথা, তার ছোট বোনের কথা বলছে। ছোট বোনকে সে বড় ভালবাসে। বাড়ী ছেড়ে এসে তার কথাই তিরুমলের বড় মনে হয়। একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস-দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব ?

ক্রমে রাত বেশি হল। মাঝে-মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলীরা তাতে কাঠ-কুটো ফেলে দিচ্ছে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরে-ধীরে দূর দিগন্তে দেখা দিল—সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারে লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া।

শঙ্করের ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য্য। কুলীদের ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সে সমুদ্রের বিশাল জনহীন তৃণভূমির আলো-আঁধার-মাখা রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবছিল। ওই বাওবাব্ গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্য্যন্ত বিস্তৃত—মধ্যে পড়বে কত পর্ব্বত অরণ্য, প্রাগৈতি-হাসিক যুগের নগর জিম্বারি—বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ!

একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্য্যটক যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন—সেটা হাতে তুলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা মেশানো রয়েছে। সে জায়গায় বড একটা সোনার খনি বেরিয়ে পড়ল। এ ধরনের কত গল্প সে পড়েছে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হীরের দেশ—কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসেব রেখেছে?

কত কি ভাবতে-ভাবতে শঙ্কর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেছে। ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না দিনের মত পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডের আগুন গিয়েছে নিবে। কুলীরা সব কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের ওপরে শুয়ে আছে। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শঙ্করের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে—এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল! সে কোথায়? তা হলে হয়তো সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে।

শঙ্করও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে অল্প দূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জ্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে যেন তাঁবু কেঁপে উঠল সে রবে। কুলীরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। শঙ্কর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জ্জন—সেই দিক-দিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জ্জন যে কি এক অনির্দ্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে!—তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় ও জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলী ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক মেরেছে। লোক না মারলে এমন গর্জ্জন করবে না।

তাঁবুর ভেতর থেকে তিরুমলের সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। সে তাঁবুর মধ্যে কোথাও নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শঙ্কর নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনি কুলীরা আলো জেলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবুগুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চীৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে—তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়ে ছিল, সেখানটাতে ভাল করে দেখা গেল তখন। একটা কোনো ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির ওপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কারো দেরি হল না। বাওবাব্ গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুক্‌রো পাওয়া গেল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে আগে চললেন, শঙ্কর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলীরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠে চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল, তিরুমলের দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহগর্জ্জন

শোনা গেল—কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চীৎকার।

মাসাই কুলীটা বললে—সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেকগুলো মানুষ ও ঘাল্ না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে সিংহ একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

রাত যখন তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার এই অংশে পাখী বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখীর ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে স্বর অপার্থিব ধরনের মিষ্ট। এইমাত্র সেই পাখী কোন্ গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্ত্তে উদাস করে দেয়। শঙ্কর ঘুমুতে গেল না। আর সবাই তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল—কারণ পরিশ্রম কারো কম হয় নি। তাঁবুর সামনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা গেল। শঙ্কর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশ্যি পারলে না—এরকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানালা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কি এক অদ্ভুত ভাব! তিরুমলের অদৃষ্টলিপি এই জন্যেই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল। তাকেই বা কি জন্যে এখানে এনেছে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর! দেখতে বাব্‌লা বনে ভর্ত্তি বাংলাদেশের মাঠের মত দেখালে কি হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল! যেখানে সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা···পরমুহূর্ত্তে কি ঘটবে, এ মুহূর্ত্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেছে—তরুণ হিন্দুযুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা যায় না। মানুষ-খেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার! যেমন সে ধূর্ত্ত তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশিদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড় বড় আগুনের কুণ্ড করা হয়, কুলীরা আগুনের কাছ ঘেঁষে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করে। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক হাতে রাত্রে তিন-চার বার তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে পাহারা দেন, ফাঁকা আওয়াজ করেন—এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলীকে সিংহ নিয়ে পালালো তিরুমলকে মারবার ঠিক দুদিন পরে সন্ধ্যারাত্রে। তার পরদিন একটা সোমালী কুলী দুপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের ঢিবিতে পাথর ভাঙতে গেল—সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শঙ্কর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরছে, লোকজন কেউ বড় একটা বাইরে নেই, সকাল সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে, কেবল এখানে ওখানে

দু-একটা নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকছে—শেয়ালের ডাক শুনলেই শঙ্করের মনে হয় সে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে—চোখ বুজে সে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি-আমড়া গাছটা ভাববার চেষ্টা করে—আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে।

কি চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়ীতে জানালার কাছে তক্তপোশে শুয়ে? বিলিতি-আমড়া গাছটার ডালপালা চোখ খুললেই চোখে পড়বে? ঠিক? দেখবে সে চোখ খুলে?

শঙ্কর ধীরে ধীরে চোখ খুললে।

অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড় বাওবাব্ গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকাবে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনের একটা ছাতার মত গোল খড়ের নীচু চালের ওপর একটা কি যেন নড়ছে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চাল থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত্ত করবার চেষ্টা করছে ও মাঝে মাঝে নাকটা চালের গর্ত্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কিসের যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে!

তার কাছ থেকে চালাটার দূরত্ব বড় জোর বিশ হাত।

শঙ্কর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে—শঙ্করকে সে এখনও দেখতে পায়নি। তাঁবুর বাইরে কোথাও লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশী রাত্রে কেউ বাইরে থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছা লাঠি পর্য্যন্ত নেই হাতে।

শঙ্কর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক মিনিট···দু মিনিট···নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর যে তার এত কর্ত্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শঙ্কর জানতো না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর পর্দ্দা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখল সাহেব টেবিলে বসে তখনও কাজ করছে। সাহেব ওর রকম-সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ও বললে—সাহেব, সিংহ!···

সাহেব লাফিয়ে উঠল—কৈ? কোথায়?

বন্দুকের র‍্যাকে একটা '৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফ্‌ল্ ছিল—সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শঙ্করকে আর একটা রাইফ্‌ল্ দিলে। দুজনে তাঁবুর পর্দ্দা তুলে আস্তে আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলী লাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার ওপর কোথায় সিংহ? শঙ্কর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই মাত্র দেখে গেলাম্ স্যার। ঐ চালার ওপর সিংহ থাবা দিয়ে খড় খোঁচাচ্ছে।

সাহেব বললে—পালিয়েছে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা শোরগোল পড়ে গেল। লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলীর

দল হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল—খোঁজ খোঁজ চারিদিকে, খড়ের চালে সত্যিই ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েছে। আগুনের কুণ্ডে বেশী করে কাঠ ও শুকনো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হল। সে রাত্রে অনেকেরই ভাল ঘুম হল না, কিন্তু তাঁবুর বাইরেও বড় একটা কেউ রইল না। শেষ রাত্রের দিকে শঙ্কর নিজের তাঁবুতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা মহা শোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মাসাই কুলীরা 'সিম্বা' সিম্বা' বলে চীৎকার করছে। দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল। শঙ্কর তাঁবুর বাইরে এসে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম করে গিয়েছে—এই মাত্র। সবাই শেষ রাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোক্‌রা কুলীকে তাঁবুর একশো হাতের মধ্যে থেকে সিংহে নিয়ে গেল। দিন চারেক পরে আর একটা কুলীকে নিলে বাওবাব্ গাছটার তলা থেকে।

কুলীরা আর কেউ কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলীদের অনেক সময়ে খুব ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয়—তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশি দূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলেরই মনে ভয়—প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলীরা অবিচলিত রইল—তারা যমকে ভয় করে না। তাঁবু থেকে দু-মাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের দেখাশুনা করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। কত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বললে—সিংহ একটা নয়, অনেকগুলো—ক'টা মেরে ফেলা যাবে? সাহেব বললে—মানুষ-খেকো সিংহ বেশী থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ।

একদিন সাহেব শঙ্করকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলীদের একবার দেখে আসতে। শঙ্কর বললে—সাহেব, তোমার ম্যান্‌লিকারটা দাও।

সাহেব রাজী হল। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে চড়ে রওনা হল। তাঁবু থেকে মাইল খানেক দূরে এক জায়গায় একটা ছোট জলা। শঙ্কর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েছে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনো দিকে নেই, রোদের ঝাঁঝ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শঙ্করের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্ছে। একটু পরে পাশের ঝোপে কি যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেলে না। সে অশ্বতর থেকে নামল। তবুও অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শঙ্করের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্য ওৎ পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এরকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপঝাপের মধ্যে

লুকিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জ্জন স্থানে সুবিধা বুঝে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তাই হয়? শঙ্কর অশ্বতর নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে, এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কি একটা নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সিংহগর্জ্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ সশব্দে অশ্বতরের ওপর এসে পড়ল। শঙ্কর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে। সে তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে উপরি উপরি দুবার গুলি করলে। গুলি লেগেছে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শঙ্কর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিন্নভিন্ন, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সেটা ছট্‌ফট করছে। শঙ্কর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে।

তার পর সে তাঁবুতে ফিরে এল। সাহেব বললে, সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুরমত জখম তাকে হতেই হবে কিন্তু গুলি লেগেছিল তো? শঙ্কর বললে—গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল, এই মাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে দু-তিন দিনেও কোন আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতকটা সিংহের উপদ্রবের জন্যে, কতকটা বা জলাভূমির সান্নিধ্যের জন্যে অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শঙ্করকে আর কন্‌স্ট্রাক্‌শন তাঁবুতে থাকতে হল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট স্টেশনে সে স্টেশন মাস্টারের কাজ পেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল।

তিন

নতুন পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শঙ্কর যখন স্টেশনটাতে এসে নামল, তখন বেলা তিনটে হবে। স্টেশন ঘরটা খুব ছোট। মাটির প্ল্যাটফর্ম্ম, প্ল্যাটফর্ম্ম আর স্টেশন ঘরের আশপাশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্টেশন ঘরের পিছনে তার থাকবার কোয়ার্টার। পায়রার খোপের মত ছোট। যে ট্রেনখানা তাকে বহন করে এনেছিল, সেখানা কিসুমুর দিকে চলে গেল। শঙ্কর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ল। এত নির্জ্জন স্থান সে জীবনে কখনো কল্পনা করে নি।

এই স্টেশনে সে একমাত্র কর্ম্মচারী। একটা কুলী পর্য্যন্ত নেই। সে-ই কুলী, সে-ই পয়েন্টস্‌ম্যান, সে-ই সব।

এরকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে যে এসব স্টেশন এখনও মোটেই আয়কর নয়। এর অস্তিত্ব এখনও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। এদের পেছনে রেল-কোম্পানী বেশী খরচ করতে রাজী নয়। একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল—আর সারা দিন-রাত ট্রেন নেই।

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। চার্জ্জ বুঝে নিতে হবে এই যা একটু কাজ। আগের স্টেশন মাস্টারটী গুজরাটী, বেশ ইংরেজী জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল। চার্জ্জ বোঝাবার বেশী কিছু নেই। গুজরাটী স্টেশন মাস্টার তাকে পেয়ে খুব খুশি। ভাবে বোধ হল সে কথা বলবার সঙ্গী পায় নি অনেকদিন। দুজনে প্ল্যাটফর্ম্মের এদিক ওদিক পায়চারি করলে।

শঙ্কর বললে—কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন?

গুজরাটী ভদ্রলোকটি বললে—ও কিছু নয়। নির্জ্জন জায়গা—তাই।

শঙ্করের মনে হল কি একটা কথা লোকটা গোপন করে গেল। শঙ্করও আর পীড়াপীড়ি করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক রুটি গড়ে শঙ্করকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে। খেতে বসে হঠাৎ লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যাঃ, ভুলে গিয়েছি।

—কি হল?

—খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে গিয়েছি।

—সে কি? এখানে খাবার জল কোথাও পাওয়া যায় না?

—কোথাও না। একটা কুয়ো আছে, তার জল বেজায় তেতো আর কষা। সে জলে বাসন মাজা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে দিয়ে যায়।

বেশ জায়গা বটে। খাবার জল নেই, মানুষ-জন নেই। এখানে স্টেশন করেছে কেন তা শঙ্কর বুঝতে পারলে না।

পরদিন সকালে ভূতপূর্ব্ব স্টেশন মাস্টার চলে গেল। শঙ্কর পড়ল একা। নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের সময় প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়ে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে কি বড় টেবিলটাতে শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করে।

স্টেশনের চারিধার ঘিরে ধূ ধূ সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউক', বাব্‌লা গাছ—দূরে পাহাড়ের সারি সারা চক্রবাল জুড়ে! ভারী সুন্দর দৃশ্য।

গুজরাটী লোকটি ওকে বারণ করে গিয়েছিল—একা যেন এই সব মাঠে সে না বেড়াতে বার হয়।

শঙ্কর বলেছিল -কেন?

সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাটী ভদ্রলোকটির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার উত্তর অন্য দিক থেকে সে রাত্রেই মিলল।

সকাল-রাতেই আহারাদি সেরে শঙ্কর স্টেশন ঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরী লিখছে—স্টেশন ঘরেই সে শোবে—সামনের কাচ-বসানো দরজাটি বন্ধ আছে—কিন্তু আগল দেওয়া নেই—কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে—দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ! শঙ্কর কাঠের মত বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের ওপর কেবল কাঠের রুলটা মাত্র আছে।

সিংহটা কিন্তু কৌতূহলের সঙ্গে শঙ্কর ও টেবিলের কেরোসিন বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ

করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশীক্ষণ ছিল না, হয়তো মিনিট দুই—কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে আর সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পরে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পর সিংহ ধীরে ধীরে অনাসক্ত ভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিলে।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে স্টেশনের চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া কেন আছে! কিন্তু শঙ্কর একটু ভুল করেছিল—সে আংশিক ভাবে বুঝেছিল মাত্র, বাকী উত্তরটা পেতে দু-একদিন বিলম্ব ছিল।

সেটা এল অন্য দিক থেকে।

পরদিন সকালের ট্রেনের গার্ডকে সে রাত্রের ঘটনাটা বললে। গার্ড লোকটি ভাল, সব শুনে বললে—এসব অঞ্চলে সর্ব্বত্রই এমন অবস্থা। এখান থেকে বারো মাইল দূরে আর একটা তোমার মত ছোট স্টেশন আছে—সেখানেও এই দশা। এখানে তো যে কাণ্ড—

সে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা বন্ধ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে গেল, বেশ সাবধানে থেকো সর্ব্বদা—

শঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়ল—এরা কি কথাটা চাপা দিতে চায়? সিংহ ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি? যাহোক, সেদিন থেকে শঙ্কর প্ল্যাটফর্ম্মে স্টেশনে ঘরের সামনে রোজ আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে স্টেশন ঘরে ঢোকে—অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে পড়াশুনো করে বা ডায়েরী লেখে। রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্ম্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক একদিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জ্জন শুনতে পাওয়া যায়—অদ্ভুত জীবন।

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রক্তে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা—এই তো জীবন! শান্ত নিরাপদ জীবন নিরীহ কেরানীর জীবন হতে পারে—তার নয়—

সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের কোয়ার্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে খুঁটির গায়ে কি একটা দেখে সে তিন হাত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল—প্রকাণ্ড একটা হল্‌দে খড়িশ গোখরো তাকে দেখে ফণা উদ্যত করে খুঁটি থেকে প্রায় এক হাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে। আর দু সেকেণ্ড পরে যদি শঙ্করের চোখ সেদিকে পড়ত—তা হলে—না, এখন সাপটাকে মারবার কি করা যায়? কিন্তু সাপটা পরমুহূর্ত্তে খুঁটি বেয়ে উপরে খড়ের চালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বেশ কাণ্ড বটে। ঐ ঘরে গিয়ে শঙ্করকে এখন ভাত রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে দরজা বন্ধ করে আগুন জেলে রাখবে। খানিকটা ইতস্ততঃ করে শঙ্কর অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকল এবং কোনরকমে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সন্ধ্যা হবার আগেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে স্টেশন ঘরে এল। কিন্তু স্টেশন ঘরেই বা বিশ্বাস কি? সাপ কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

পরদিনের সকালের ট্রেনে গার্ডের গাড়ী থেকে একটা নতুন কুলী তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল। সপ্তাহে দুদিন মোম্বাসা থেকে চাল আর আলু রেলকোম্পানী এই সব নির্জ্জন স্টেশনের কর্ম্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়—মাসিক বেতন থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়।

যে কুলীটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ইণ্ডিয়ান, গুজরাট অঞ্চলে বাড়ী। সে বস্তাটা নামিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চাইলে শঙ্করের দিকে, এবং পাছে শঙ্কর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়ল।

কুলীর সে দৃষ্টি শঙ্করের চোখ এড়ায় নি। কি রহস্য জড়িত আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ করতে চায় না—প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কি?

দিন দুই পরে ট্রেন পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে—আর একটু হলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল আর কি! সেই খড়িশ গোখরো সাপ। পূর্ব্বদৃষ্ট সাপটাও হতে পারে, নতুন একটা যে নয় তারও কোনো প্রমাণ নেই।

শঙ্কর সেই দিন স্টেশনঘর, নিজের কোয়ার্টার ও চারধারের জমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে। সারা জায়গা মাটিতে বড় বড় গর্ত্ত, কোয়ার্টারের উঠানে, রান্নাঘরের দেওয়ালে, কাঁচা প্ল্যাটফর্ম্মের মাঝে মাঝে সর্ব্বত্র গর্ত্ত ও ফাটল আর ইঁদুরের মাটি। তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না।

একদিন সে স্টেশন ঘরে ঘুমিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর অন্ধকার—হঠাৎ শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা কোন্ ইন্দ্রিয় যেন মুহূর্ত্তের জন্যে জাগরিত হয়ে উঠে তাকে জানিয়ে দিলে যে সে ভয়ানক বিপদে পড়বে। ঘোর অন্ধকার, শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ টর্চটা তার হাতে ঠেকল এবং কলের পুতুলের মত সে সামনের দিকে ঘুরিয়ে টর্চটা জ্বাললে।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে টর্চটা ধরে বিছানার ওপরই বসে রইল।

দেওয়াল ও তার বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় মাথা উঁচু করে তুলে ও টর্চের আলো পড়ার দরুন সাময়িক ভাবে আলো-আঁধার লেগে থ' খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রুর ও হিংস্রতম সর্প—কালো মাম্বা! ঘরের মেজে থেকে সাপটা প্রায় আড়াই হাত উঁচু হয়ে উঠেছে—সেটা এমন কিছু আশ্চর্য্য নয় যখন ব্ল্যাক মাম্বা সাধারণতঃ মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে। ব্ল্যাক মাম্বার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একপ্রকার পুনর্জ্জন্ম তাও শঙ্কর শুনেছে।

শঙ্করের একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে, বিপদে তার সহজে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না—আর তার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর সে ঘোর বিপদেও কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

শঙ্কর বুঝলে হাত যদি তার একটু কেঁপে যায়—তবে যে মুহূর্ত্তে সাপটার চোখ থেকে

আলো সরে যাবে—সেই মুহূর্ত্তে ওর আলো-আঁধারি কেটে যাবে এবং তখুনি সে করবে আক্রমণ।

সে বুঝলে তার আয়ু নির্ভর করছে এখন দৃঢ় ও অবিকম্পিত হাতে টর্চটা সাপের চোখের দিকে ধরে থাকার ওপর। যতক্ষণ সে এরকম ধরে থাকতে পারবে ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যদি টর্চটা একটুও এদিক ওদিক সরে যায়—?

শঙ্কর টর্চ ধরেই রইল। সাপের চোখ দুটো জ্বলছে যেন দুটো আলোর দানার মত। কি ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মত খাড়া উদ্যত তার কালো মিশমিশে সরু দেহটাতে!…

শঙ্কর ভুলে গেল চারিপাশের সব আসবাব-পত্র, আফ্রিকা দেশটা, তার রেলের চাকরি, মোম্বাসা থেকে কিসুমু লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা-মা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের ওই দুটো জ্বলজ্বলে আলোর দানায় পরিণত হয়েছে…তার বাইরে সব শূন্য। অন্ধকার। মৃত্যুর মত শূন্য, প্রলয়ের পরের বিশ্বের মত অন্ধকার।

সত্য কেবল ওই মহাহিংস্র উদ্যত-ফণা সর্প, যেটা প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং দেবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে।…

শঙ্করের হাত ঝিম্‌ঝিম্ করছে, আঙুল অবশ হয়ে আসছে, কনুই থেকে বগল পর্য্যন্ত হাতের যেন সাড়া নেই। কতক্ষণ সে আর টর্চ ধরে থাকবে? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের চোখ নয়…জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র…কিংবা ‥

টর্চের ব্যাটারির তেজ কমে আসছে না? সাদা আলো যেন হলদে ও নিস্তেজ হয়ে আসছে না? কিন্তু জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমনি জ্বলছে। রাত না দিন? ভোর হবে, না সন্ধ্যা হবে?

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিলে। ওই চোখ দুটোর জ্বালাময়ী দৃষ্টি তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। সে সুজাগ থাকবে। এ তেপান্তরের মাঠে চেঁচালেও কেউ কোথাও নেই সে জানে—তার নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করছে তার জীবন। কিন্তু সে পারছে না যে, হাত যেন টন্‌টন্ করে অবশ হয়ে আসছে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে থাকবে? সাপে না হয় ছোবল দিক্ কিন্তু হাতখানা একটু নামিয়ে নিলে সে আরাম বোধ করবে এখন।

তার পরেই ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজলো। ঠিক রাত তিনটে পর্য্যন্তই বোধ হয় শঙ্করের আয়ু ছিল, কারণ তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠে নড়ে গেল—সামনের আলোর দানা গেল নিভে। কিন্তু সাপ কৈ? তাড়া করে এল না কেন?

পরক্ষণেই শঙ্কর বুঝতে পারলে সাপটাও সাময়িক মোহগ্রস্ত হয়েছে তার মত। এই অবসর বিদ্যুতের চেয়েও বেগে সে টেবিল থেকে এক লাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে। ‥

সকালের ট্রেন এল। শঙ্কর বাকী রাতটা প্ল্যাট্‌ফর্মেই কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার। গার্ড বললে—চলো দেখি স্টেশন ঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কোথাও

সাপের চিহ্নও পাওয়া গেল না। গার্ড লোকটা ভালো—বললে, বলি তবে শোনো। খুব বেঁচে গিয়েছ কাল রাত্রে। এতদিন কথাটা তোমায় বলি নি, পাছে ভয় পাও। তোমার আগে যিনি স্টেশন মাস্টার এখানে ছিলেন—তিনিও সাপের উপদ্রবেই এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দুজন স্টেশন মাস্টার এই স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেছে। আফ্রিকার ব্ল্যাক্ মাম্বা যেখানে থাকে, তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। বন্ধু ভাবে কথাটা বললাম, ওপরওয়ালাদের বলো না যেন, যে আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেছ। ট্রান্সফারের দরখাস্ত কর।

শঙ্কর বললে—দরখাস্তের উত্তর আসতেও তো দেরি হবে, তুমি একটা উপকার করো। আমি-এখানে একেবারে নিরস্ত্র, আমাকে একটা বন্দুক কি রিভলভার যাবার পথে দিয়ে যাও। আর কিছু কার্ব্বলিক য়্যাসিড্। ফিরবার পথেই কার্ব্বলিক য়্যাসিড্টা আমায় দিয়ে যেও।

ট্রেন থেকে সে একটা কুলীকে নামিয়ে নিলে এবং দুজনে মিলে সারাদিন সর্ব্বত্র গর্ত্ত বুজিয়ে বেড়ালে। পরীক্ষা করে দেখে মনে হল কাল রাত্রে স্টেশন ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে একটা গর্ত্ত থেকে সাপটা বেরিয়েছিল। গর্ত্তগুলো ইঁদুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইঁদুর খাবার লোভে গর্ত্তে ঢুকেছিল হয়তো। গর্ত্তটা বেশ ভাল করে বুজিয়ে দিলে। ডাউন ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্ব্বলিক য়্যাসিড্ পাওয়া গেল—ঘরের সর্ব্বত্র ও আশেপাশে সে য়্যাসিড্ ছড়িয়ে দিলে। কুলীটা তাকে একটা বড় লাঠি দিয়ে গেল। দু-তিন দিনের মধ্যে রেল কোম্পানী থেকে ওকে একটা বন্দুক দিলে।

চার

স্টেশনে জলের বড় কষ্ট। ট্রেন থেকে জল দেয়, তাতে রান্না-খাওয়া কোনো রকমে চলে—স্নান আর হয় না। এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে। একদিন সে শুনলে স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে, সেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, মাছও আছে।

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে একদিন সে সকালের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল সঙ্গে একজন সোমালি কুলী, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরবার সাজ-সরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আনিয়ে নিয়েছিল। জলাশয়টা মাঝারি গোছের, চারিধারে উঁচু ঘাসের বন, ইউকা গাছ, নিকটেই একটা অনুচ্চ পাহাড়। জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা-দুই ছিপ ফেলে ট্যাংরা জাতীয় ছোট ছোট মাছ অনেকগুলি পেলে। মাছ অদৃষ্টে জোটে নি অনেক দিন কিন্তু আর বেশী দেরি করা চলবে না - কারণ আবার বিকেল চারটের মধ্যে স্টেশনে পৌছুনো চাই—বিকেলের ট্রেন পাস করাবার জন্যে।

প্রায়ই সে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায়, কোনো দিন সঙ্গে লোক থাকে—প্রায়ই একা যায়। স্নানের কষ্টও ঘুচেছে।

গ্রীষ্মকাল ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম—বেলা ন'টার পর থেকে আর রৌদ্রে যাওয়া যায় না। এগারোটার পর থেকে শঙ্করের মনে হয় যেন দিকবিদিক দাউ দাউ করে জ্বলছে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে শুনলে মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার গরমের কাছে এ নাকি কিছুই নয়।

শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শঙ্করের জীবনের গতি মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল। একদিন সকালের দিকে শঙ্কর মাছ ধরতে গিয়েছিল। যখন ফিরছে তখন বেলা তিনটে। স্টেশন যখন আর মাইলটাক্ আছে, তখন শঙ্করের কানে গেল সেই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় অস্ফুট আর্তস্বরে কি বলছে। কোন্ দিক থেকে স্বরটা আসছে, লক্ষ্য করে কিছুদূর যেতেই দেখলে একটা ইউকা গাছের নীচে স্বল্পমাত্র ছায়াটুকুতে কে একজন বসে আছে।

শঙ্কর দ্রুতপদে তার নিকটে গেল। লোকটা ইউরোপীয়ান – পরনে তালি দেওয়া ছিন্ন ও মলিন কোট্‌প্যাণ্ট। একমুখ লাল দাড়ি, বড় বড় চোখ, মুখের গড়ন বেশ সুশ্রী, দেহও বেশ বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সম্ভবতঃ রোগে, কষ্টে ও অনাহারে বর্ত্তমানে শীর্ণ। লোকটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে অবসন্ন ভাবে পড়ে আছে। তার মাথার মলিন সোলার টুপিটা একদিকে গড়িয়ে পড়েছে মাথা থেকে—পাশে একটা খাকি কাপড়ের বড় ঝোলা।

শঙ্কর ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কোথা থেকে আসছো ?

লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে জলপানের ভঙ্গি করে বললে —একটু জল। জল !

শঙ্কর বললে—এখানে তো জল নেই। আমার ওপর ভর দিয়ে স্টেশন পর্য্যন্ত আসতে পারবে ?

অতি কষ্টে খানিকটা ভর দিয়ে এবং শেষের দিকে এক রকম শঙ্করের কাঁধে চেপে লোকটা প্ল্যাটফর্মে পৌছুলো। ওকে আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল ; বিকেলের ট্রেন ওর অনুপস্থিতিতেই চলে গিয়েছে। ও লোকটাকে স্টেশন ঘরে বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে সুস্থ করলে, কিছু খাদ্যও এনে দিলে। সে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শঙ্কর দেখলে লোকটার ভারী জ্বর হয়েছে। অনেক দিনের অনিয়মে, পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে সে সুস্থ হবে না।

লোকটা একটু পরে পরিচয় দিলে। তার নাম ডিয়েগো আল্‌ভারেজ—জাতে পর্টুগীজ, তবে আফ্রিকার সূর্য্য তার বর্ণ তামাটে করে দিয়েছে।

রাত্রে ওকে স্টেশনে রাখলে শঙ্কর। কিন্তু ওর অসুখ দেখে সে পড়ে গেল বিপদে - এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই—সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের ট্রেনে গার্ড রোগীকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাত কাটতে এখনো অনেক দেরি। বিকেলের গাড়ীখানা স্টেশনে এসে যদি পাওয়া যেত, তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

শঙ্কর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল। লোকটির শরীরে কিছু নেই। খুব সম্ভব কষ্ট ও অনাহার ওর অসুখের কারণ। এই দূর বিদেশে ওর কেউ নেই—শঙ্কর না দেখলে ওকে দেখবে কে?…বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে—শঙ্কর যেভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো আপনার লোক ওর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারতো না।

উত্তর-পূর্ব্ব কোণের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর পেছন থেকে চাঁদ উঠছে যখন সে রাত্রে—ঝম্ ঝম্ করছে নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি—তখন হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ সিংহ-গর্জ্জন শোনা গেল। রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল—সিংহের ডাকে সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। শঙ্কর বললে—ভয় নেই—শুয়ে থাকো। বাইরে সিংহ ডাকছে। দরজা বন্ধ আছে।

তার পর শঙ্কর আস্তে আস্তে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্ম্মে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চারিধারে দেখবামাত্রই যেন সে রাত্রির অপূর্ব্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেললে। চাঁদ উঠছে দূরের আকাশ-প্রান্তে—ইউকা গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে পূব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময় নিস্পন্দ। সিংহ ডাকছে স্টেশনে কোয়ার্টারের পেছনে প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ডাক আজকাল গা-সওয়া হয়ে উঠেছে—ওতে আর আগের মত ভয় পায় না। রাত্রির সৌন্দর্য্য এত আকৃষ্ট করেছে ওকে, যে ও সিংহের সান্নিধ্য যেন ভুলে গেল।

ফিরে ও স্টেশন ঘরে ঢুকল। টং টং করে ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলে রোগী বিছানায় উঠে বসে আছে। বললে—একটু জল দাও, খাবো।

লোকটা বেশ ভাল ইংরিজি বলতে পারে। শঙ্কর টিন থেকে জল নিয়ে ওকে খাওয়ালে।

লোকটার জ্বর তখন যেন কমেছে। সে বললে—তুমি কি বলছিলে? আমার ভয় করছে ভাবছিলে? ডিয়েগো আল্‌ভারেজ ভয় করবে? ইয়াং ম্যান, তুমি ডিয়েগো আল্‌ভারেজকে জানো না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মিশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিলে। সে অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে শঙ্করের মনে হল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল শঙ্করের। বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা আঙুল—দাড়ির মত শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দড়ির নীচে চিবুকের ভাব শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জ্বর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসছে যেন ধীরে ধীরে।

লোকটা বললে—সরে এসো কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশী করতে পারতো না। তবে একটা কথা বলি—আমি বাঁচবো না। আমার মন বলছে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইণ্ডিয়ান? এখানে কত মাইনে পাও? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আজ তোমাকে যে-সব কথা বলবো—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তা তুমি কারো কাছে প্রকাশ করবে না?

শঙ্কর সেই আশ্বাসই দিলে। তারপর সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশঃ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এমন এক আশ্চর্য্য, অবিশ্বাস্য ধরনের আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়ে গেল—যা সাধারণতঃ উপন্যাসেই পড়া যায়। •

ডিয়েগো আল্‌ভারেজের কথা

ইয়্যাং ম্যান্, তোমার বয়েস কত হবে? বাইশ?...তুমি যখন মায়ের কোলে শিশু—আজ বিশ বছর আগের কথা, ১৮৮৮।৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়েস ছিল কম, দুনিয়ার কোনো বিপদই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

বুলাওয়েও শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে একাই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল দুটি গাধা, জিনিসপত্র বইবার জন্যে। জাম্বেজী নদী পার হয়ে চলেছি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শুধু ছোটখাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে মাঝে কাফিরদের বস্তি। ক্রমে যেন মানুষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গায় উপস্থিত এসে পৌছানো গেল, যেখানে এর আগে কখনো কোনো ইউরোপীয়ান আসে নি।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি কিংবা পাহাড় দেখি—সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি। লোকে কত কি পেয়ে বড়মানুষ হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, এ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনীই শুনে এসেছিলুম—সেই সব গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল। কিন্তু বৃথাই দু বৎসর ধরে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ালুম। কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করলুম এই দু বছরে। একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালুম।

সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিক। তাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লুম দুপুর বেলা—কারণ দুপুরের রোদে পথ চলা সে-সব জায়গায় একরকম অসম্ভব—১২৫° ডিগ্রী থেকে ১৩০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাগ্ ঠিক হয় না। কত এদিক ওদিক খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না। কাছেই একটা পাথরের ঢিবি, তার গায়ে সাদা সাদা কি একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। ঢিবিটার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে বেছে তারই একটা দানা সংগ্রহ করে ঘষে মেজে নিয়ে আপাততঃ সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম। তার পর বৈকালে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েছি, কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম সে কথা ক্রমে ভুলেই গিয়েছি।

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেও আমার মত সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে দুজন মাটাবেল কুলী ছিল। পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম, তার

নাম জিম্ কার্টার, আমারই মত ভবঘুরে, তবে তার বয়স আমার চেয়ে বেশী। জিম্ একদিন আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আমায় বললে —বন্দুকের মাছি তোমার এ রকম কেন? তারপর আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে—তুমি বুঝতে পারো নি এ জিনিসটা খাঁটি রূপো, খনিজ রূপো! এ যেখানে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেখানে রূপোর খনি থাকে। আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্ততঃ ন'হাজার আউন্স রূপো পাওয়া যাবে। সে জায়গাতে এক্ষুনি চলো আমরা যাই। এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাবো।

সংক্ষেপে বলি। তারপর কার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে আবার গেলাম। কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা, কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কতবার বিরাট দিক-দিশাহীন মরুভূমিবৎ ভেল্ডের মধ্যে পথ হারিয়ে, মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত পৌছেও, কিছুতেই আমি সে স্থান নির্ণয় করতে পারলাম না। যখন সেখান থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছিলাম, অত লক্ষ্য করি নি জায়গাটা। আফ্রিকার ভেল্ডে কোনো চিহ্ন বড় একটা থাকে না, যার সাহায্যে পুরোনো জায়গা খুঁজে বার করা যায়—সবই যেন একরকম। অনেকবার হয়রান হয়ে শেষে আমরা রূপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম। জিম্ কার্টার আমাকে আর ছাড়লে না, তার মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই ছিল। তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়।

তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সব কষ্টের চেয়ে বেশী বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ ধরে চলবো, এই স্থির করা গেল। বনের জন্তু শিকার করে খাই, আর মাঝে মাঝে কাফির বস্তি যদি পাই, সেখান থেকে মিষ্টি আলু, মুরগী প্রভৃতি সংগ্রহ করি।

একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা কাফির বস্তীতে আশ্রয় নিয়েছি, সেই দিন দুপুরের পরে কাফির বস্তীর মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা দেখতে গেলাম—পাচ-ছ' বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে—তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যথা। সবাই কাঁদছে ও দাপাদাপি করছে। মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেছে—ওকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে গিয়েছিল—তারপর থেকে তাকে ভূতে পেয়েছে। আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের ফল বেশী পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো বনের ফল সে খেয়েছিল কিনা? সে বললে—হ্যাঁ, খেয়েছিল। কাঁচা ফল? মেয়েটা বললে—ফল নয়, ফলের বীজ। সে ফলের বীজই খাদ্য।

এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল। গ্রামে আমাদের খাতির হয়ে গেল খুব। পনেরো দিন আমরা সে গ্রামের সর্দ্দারের অতিথি হয়ে রইলাম। ইলাণ্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফিরদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ

করি। বিদায় নেবার সময় কাফির সর্দ্দার বললে—তোমরা সাদা পাথর খুব ভালবাস—না? বেশ খেলবার জিনিস। নেবে সাদা পাথর? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। একটু পরে সে একটা ডুমুর ফলের মত বড় সাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে। জিম্ ও আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম—জিনিসটা হীরক!…খনি বা খনির ওপরকার উপলাকীর্ণ মৃত্তিকাস্তর থেকে প্রাপ্ত পালিশ-না-করা হীরক খণ্ড!

কাফির সর্দ্দার বললে এটা তোমরা নিয়ে যায়। ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখছো, ধোঁয়া-ধোঁয়া—এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌছে যাবে। ঐ পাহাড়ের মধ্যে এ রকম সাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেছি। আমরা কখনো যাই নি, জায়গা ভাল নয়, ওখানে বুনিপ বলে উপদেবতা থাকে। অনেক চাঁদ আগেকার কথা, আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারো বারণ না শুনে ঐ পাহাড়ে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। আর একবার একজন তোমাদের মত সাদা মানুষ এসেছিল, সেও অনেক, অনেক চাঁদ আগে। আমরা দেখি নি, আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়ে আর ফেরে নি।

কাফির গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম—দূরের ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে রিখ্‌টারসভেল্ড পর্ব্বতশ্রেণী—দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা বন্য, অজ্ঞাত, বিশাল ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল। কোন সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করে নি—দু-একজন দুর্দ্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্ব্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কি আছে কেউ বলতে পারে না।

জিম্ কার্টার ও আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল—আমরা দুজনেই তখনি স্থির করলাম ওই অরণ্য ও পর্ব্বতমালা আমাদেরই আগমন প্রতীক্ষায় তার বিপুল রত্নভাণ্ডার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেছে। আমরা ওখানে যাবোই।

কাফির গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে আমরা পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশের নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম।

পূর্ব্বেই বলেছি দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফির বস্তি পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। জঙ্গল দেখে মনে হল কাঠুরিয়ার কুঠার আজ পর্য্যন্ত এখানে প্রবেশ করে নি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌছেছিলাম। জিম্ কার্টারের পরামর্শ মত সেখানেই আমরা রাত্রের বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালাম। জিম্ জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে—আমি লাগলুম রান্নার কাজে। সকালের দিকে একজোড়া পাখী মেরেছিলাম, সেই পাখী ছাড়িয়ে তার রোস্ট্ করবো এই ছিল মতলব। পাখী ছাড়ানোর কাজে একটু ব্যস্ত আছি—এমন সময় জিম্ বললে—পাখী রাখো। দু পেয়ালা কাফি করো তো আগে।

আগুন জ্বালাই ছিল। জল গরম করতে দিয়ে আবার পাখী ছাড়াতে বসেছি, এমন সময় সিংহের গর্জ্জন একেবারে অতি নিকটে শোনা গেল। জিম্ বন্দুক নিয়ে বেরুল, আমি

বললাম—অন্ধকার হয়ে আসছে, বেশী দূর যেও না। তার পরে আমি পাখী ছাড়াচ্ছি—কিছু দূরে জঙ্গলের বাইরেই দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। একটুখানি থেমে আবার আর একটা আওয়াজ। তার পরেই সব চুপ। মিনিট দশ কেটে গেল, জিম্ আসে না দেখে আমি নিজের রাইফেল্‌টা নিয়ে যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল সেদিকে একটু যেতেই দেখি জিম্ আসছে—পেছনে কি একটা ভারী মত টেনে আনছে। আমায় দেখে বললে—ভারী চমৎকার ছালখানা! জঙ্গলের ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় করে দেবে। তাঁবুর কাছে টেনে নিয়ে যাই চল।

দুজনে টেনে সিংহের প্রকাণ্ড দেহটা তাঁবুর আগুনের কাছে নিয়ে এসে ফেললাম। তার পর ক্রমে রাত হল। খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে সিংহের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিংহ ডাকছে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক কত দূরে! আমি রাইফেল্ নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। জিম্ শুধু একবার বললে—সন্ধ্যাবেলার সেই সিংহটার জুড়ি।

বলেই সে নির্ব্বিকারভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দেখি আগুন নিবে গিয়েছে। পাশে কাঠকুটো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর আগুন জ্বাললাম। তার পরে আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে জনকয়েক কাফিরের সঙ্গে দেখা হোল। তারা হরিণ শিকার করতে এসেছে। আমরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলাম।

তারা বললে—তোমরা জানো না তাই ও কথা বলছ। এ জঙ্গলে মানুষ আসে না। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। ঐ পাহাড়ের শ্রেণী অপেক্ষাকৃত নীচু, ওটা পার হয়ে মধ্যে খানিকটা সমতল জায়গা আছে, ঘন বনে ঘেরা, তার ওদিকে আবার এর চেয়েও উঁচু পর্ব্বতশ্রেণী। ঐ বনের মধ্যের সমতল জায়গাটা বড় বিপজ্জনক, ওখানে বুনিপ্ থাকে। বুনিপের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাবো মরতে! ভালো চাও তো তোমরাও যেও না।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বুনিপ্ কি?

তারা জানে না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, বুনিপ্ কি না জানলেও সে কি অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভাল রকমই জানে।

ভয় আমাদের ধাতে ছিল না, জিম্ কার্টারের তো একেবারেই না। সে আরও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে—হীরা পাই বা না পাই। মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টানছে, তখনও যদি বুঝতে পারতাম।

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্করের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এ ধরনের কথা সে কখনও আর শোনে নি। মুমূর্ষু ডিয়েগো আল্‌ভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু-জোড়ার নীচেকার ইস্পাতের মত নীল দীপ্তি-

শীল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে, শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় ভরে উঠল।

সত্যিকার মানুষ বটে একজন!

আল্‌ভারেজ বললে—আর এক গ্লাস জল—

জল পান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলে—

হঁ্যা, তার পরে শোনো। ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। কত বড় বড গাছ, বড় বড় ফার্ন, কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড্ ও লায়ানা, স্থানে স্থানে সে বন নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য। বড বড় গাছের নীচেকার জঙ্গল এতই ঘন, বঁড়শির মত কাঁটা গাছের গায়ে, মাথার ওপরকার পাতায় পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্য্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের উৎপাত জঙ্গলের সর্বত্র, বড় গাছের ডালে দলে দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানা রকমের বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়—দু-একটা বুড়ো সর্দ্দার বেবুন সত্যিই হিংস্র প্রকৃতির, হাতে বন্দুক না থাকলে তারা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করত। জিম্ কার্টার বললে—অন্ততঃ আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে।

সাত-আটদিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। জিম্ কার্টার ঠিকই বলেছিল, প্রতিদিন একটা করে বেবুন আমাদের খাদ্য যোগান দিতে দেহপাত করত। উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের নানা স্থানে ছোট-বড় ঝরণা নেমে এসেছে, সুতরাং জলের অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল। একটা ঝরনার ধারে দুপুরবেলা এসে আগুন জেলে বেবুনের দাপ্‌না ঝলসাবার ব্যবস্থা করছি, জিম্ গিয়ে তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝরনার জল পান করলে। তার একটু পরেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমি একটু বিজ্ঞান জানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝরণার জল পরীক্ষা করে দেখি, জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। ওপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে ঝরনা নেমে আসছে নিশ্চয়ই। হোমিওপ্যাথিক বাক্স থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম্ সুস্থ হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে মাঝে দু-একটা বিষধর সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নি। পাখীর কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম। কারণ এই সব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিত্র বর্ণের ও শ্রেণীর পাখী ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বন্যজন্তু বলতে যা বোঝায়, তারা সে পর্য্যায়ে পড়ে না।

প্রথমেই রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পর্ব্বতশ্রেণীর একটা শাখা পর্ব্বত আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্ব্বতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীচু। সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেমে তাঁবু ফেললাম। একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হল, এই সব

নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়!

নদীর নানা দিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই, কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একটা রেণু পর্য্যন্ত নেই নদীর বালিতে। আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লুম। তখন প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন কেটে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় কফি খেতে খেতে জিম্ বললে, দেখ, আমার মন বলছে এখানে আমরা সোনার সন্ধান পাবো। থাকো এখানে আর কিছুদিন।

আরও কুড়িদিন কাটল। বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যন্ত অরুচিকর হয়ে উঠেছে। জিমের মত লোকও হতাশ হয়ে পড়ল। আমি বললাম—আর কেন জিম্, চল ফিরি এবার। কাফির গ্রামে আমাদের ঠকিয়েছে। এখানে কিছু নেই।

জিম্ বললে—এই পর্ব্বতশ্রেণীর নানা শাখা আছে, সবগুলো না দেখে যাবো না।

একদিন পাহাড়ী নদীটার খাতের ধারে বসে বালি চালতে চালতে পাথরের নুড়ির রাশির মধ্যে অর্দ্ধপ্রোথিত একখানা হল্‌দে রঙের ছোট পাথর আমি ও জিম্ একসঙ্গেই দেখতে পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে তুললাম। আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিম্ বললে—ডিয়েগো, পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল—চিনেছ তো?

আমিও বুঝেছিলাম। বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু নদীস্রোতে ভেসে আসা জিনিসটা। খনির অস্তিত্ব নেই এখানে।

পাথরখানা দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হল্‌দে রঙের হীরকের জাত। অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছিল না, কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর কোনো অজ্ঞাত, দুর্গম অঞ্চলে হল্‌দে হীরকের খনি আছে। নদীস্রোতে ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো। সে মূল খনি খুঁজে বার করা অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সাহস-সাপেক্ষ।

সে পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্য্যের অভাব আমাদের ঘটত না, কিন্তু যে দৈত্য ঐ রহস্যময় বনপর্ব্বতের অমূল্য হীরকখনির প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাধা দিলে।

একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম করছি, আমাদের সামনে পরিষ্কার জায়গাতে একটা তালগাছ, তালগাছের তলায় গুঁড়িটা ঘিরে খুব ঘন বন-ঝোপ। হঠাৎ আমরা দেখলাম কিসে যেন অত বড় তালগাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তার ওপরকারের শুকনো ডালপালাগুলো খর্ খর্ করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় লাগলে। গাছটাও সেই সঙ্গে নড়ছে।

আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বাতাস নেই কোনোদিকে, অথচ তালগাছটা নড়ছে কেন? আমাদের মনে হল কে যেন তালগাছের গুঁড়িটা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। জিম্ তখুনি ব্যাপারটা কি দেখতে গুঁড়ির তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলো।

সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল্ নিয়ে ছুটে গেলুম—ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি জিম্ রক্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে আছে—কোন

ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে বুক পর্য্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফেঁড়ে ফেলেছে—যেমন পুরানো বালিশ ফেঁড়ে তুলো বার করে তেমনি। জিম্ শুধু বললে—সাক্ষাৎ শয়তান—মূর্ত্তিমান শয়তান—

হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললে—পালাও—পালাও—

তার পরেই জিম্ মারা গেল। তালগাছের গায়ে দেখি যেন কিসের মোটা ও শক্ত চোঁচ্ লেগে আছে। আমার মনে হল কোন ভীষণ বলবান জানোয়ার তালগাছের গায়ে গা ঘষছিল, গাছটা ওরকম নড়ছিল সেই জন্যেই। জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না। জিমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে আমি রাইফেল হাতে ঝোপের ওপারে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি মাটির ওপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, তার মোটে তিনটে আঙুল পায়ে—কিছুদূর গেলুম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা গিয়ে একটা গুহার মুখে পদচিহ্নটা ঢুকে গেল। গুহার প্রবেশ-পথের কাছে শুকনো বালির ওপরে ওই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বড় বড় তিন-আঙুলে থাবার দাগ রয়েছে।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্ব্বত-বেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করছি। ডাইনে চেয়ে দেখি প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসাল্টের দেওয়াল খাড়া উঠেছে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে বনে নিবিড়, খুব উঁচুতে পর্ব্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ—কিম্বা হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকবে।

ভাবলাম, এ সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না। জিমের দেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জেলে রাইফেল্ তৈরী রেখে বসে রইলুম।

পরদিন জিমকে সমাধিস্থ করে আবার ওই জানোয়ারটার খোঁজে বার হলাম। কিন্তু মুশকিল এই যে, সে গুহা এবং সেই তালগাছটা পর্য্যন্ত অনেক খুঁজেও কিছুতেই বার করতে পারলুম না। ও রকম অনেক গুহা আছে পর্ব্বতের নানা জায়গায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন্ গুহা দেখেছিলাম কে জানে?

সঙ্গীহীন অবস্থায় সেই মহাদুর্গম রিখ্‌টারসভেল্ড পর্ব্বতশ্রেণীর বনের মধ্যে থাকা চলে না। পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফির বস্তিতে পৌছলাম। তারা চিনতে পারলে, খুব খাতির করলে। তাদের কাছে জিমের মৃত্যু-কাহিনী বললুম।

শুনে তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল—ছোট ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠল। বললে—সর্ব্বনাশ! বুনিপ্! ওই ভয়েই ওখানে কেউ যায় না।

কাফির বস্তি থেকে আর পাঁচ দিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধারে একখানা ডাচ্ লঞ্চ পেলাম। তাতে করে এসে সভ্য জগতে পৌছুলাম।

আমি আর কখনো রিখ্‌টারসভেল্ড পর্ব্বতের দিকে যেতে পারি নি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ এসে পড়ল। যুদ্ধে গেলাম। আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে

অনেকদিন রইলাম। তার পর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতদিন ছিলাম।

বছর চার-পাঁচ শান্ত জীবন যাপন করবার পরে ভালো লাগলো না, তাই আবার বার হয়েছিলাম। কিন্তু বয়েস হয়ে গিয়েছে অনেক, ইয়ংম্যান্, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুরুবে।

এই ম্যাপখানা তুমি রাখো। এতে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পর্ব্বত ও যে নদীতে আমরা হীরা পেয়েছিলাম, মোটামুটি ভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে সেখানে যেও, বড়মানুষ হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা বড় হীরার খনি বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা যেখানে হীরা পেয়েছিলুম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেও তুমি।

ডিয়েগো আল্‌ভারেজ গল্প শেষ করে আবার অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার গুণে ডিয়েগো আল্‌ভারেজ সেযাত্রা সেরে উঠল এবং দিন পনেরো শঙ্কর তাকে নিজের কাছেই রাখলে। চিরকাল যে পথে পথে বেড়িয়ে এসেছে, ঘরে তার মন বসে না। একদিন সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শঙ্কর নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল। বললে, চল—তোমার অসুখের সময় যে-সব কথা বলেছিলে, মনে আছে? সেই হলদে হীরের খনি?

অসুখের ঝোঁকে আল্‌ভারেজ যে-সব কথা বলেছিল, এখন সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে না। বেশীর ভাগ সময় চুপ করে কি যেন ভাবে। শঙ্করের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বললে—আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখেছি তা মনে কোরো না। কিন্তু আলেয়ার পেছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার?

শঙ্কর বললে—আছে কি না দেখতে দোষ কি? আজই বলো তো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি।

আল্‌ভারেজ কিছু না ভেবেই বললে—কর তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখো, যারা সোনা বা হীরা খুঁজে বেড়ায় তারা সব সময় তা পায় না। আমি আশী বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনো কিছু পায় নি—তবে প্রতিবারই বলতো, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাবো! আজীবন অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে প্রস্‌পেক্‌টিং করে বেড়িয়েছে।…

আরও দিন দশেক পরে দুজনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়াগ্রা হ্রদে স্টীমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ান্‌জার দিকে যাবে ঠিক করলে।

পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাজার হাজার জেব্রা, জিরাফ্ হরিণ চরতে দেখে শঙ্কর

তো অবাক। এমন দৃশ্য সে আর কখনো দেখে নি। জিরাফগুলো মানুষকে আদৌ ভয় করে না, পঞ্চাশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

আল্‌ভারেজ বলল—আফ্রিকার জিরাফ মারবার জন্যে গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে সে মারতে পারে না। সেজন্য মানুষকে ওদের তত ভয় নেই।

হরিণের দল কিন্তু বড় ভীরু, এক এক দলে দু-তিনশো হরিণ চরছে, ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে, তার পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই চার পা তুলে দৌড়।

কিস্থমু থেকে স্টীমার ছাড়ল—এটা ব্রিটিশ স্টীমার, ওদের পয়সা নেই বলে ডেক্‌-এ যাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলেমেয়ে বেঁধে মুরগী নিয়ে স্টীমারে উঠেছে। মাসাই কুলীরা ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে—সঙ্গে নাইবেরি শহর থেকে কাঁচের পুঁতি, কম দামের খেলো আয়না, ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস।

স্টীমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে। ভিক্টোরিয়া হ্রদের যে বন্দরে ওরা নামলে—তার নাম মোওয়ানজা—এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পৌঁছে কয়েক দিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের তীরবর্ত্তী উজিজি বন্দরে।

এই পথে যাবার সময় আল্‌ভারেজ বললে—টাঙ্গানিয়াকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। এখানে এক রকম মাছি আছে, তা কামড়ালে স্লিপিং সিক্‌নেস্‌ হয়। স্লিপিং সিক্‌নেসের মড়কে টাঙ্গানিয়াকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। মোওয়ানজা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বেশী। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার এই অঞ্চলও 'সিংহের রাজ্য' বলা চলে।

শহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোট খড়ের বাংলো। সেখানে এক ইউরোপীয় শিকারী আশ্রয় নিয়েছে। আল্‌ভারেজকে সে খুব খাতির করলে। শঙ্করকে দেখে বললে—একে পেলে কোথায়? এ তো হিন্দু! তোমার কুলী?

আল্‌ভারেজ বললে—আমার ছেলে।

সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে বললে—কি রকম?

আল্‌ভারেজ আনুপূর্ব্বিক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের কথা, শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার কথা। কেবল বললে না কোথায় যাচ্ছে ও কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

সাহেব হেসে বললে—বেশ ভালো। ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুইই আছে। ঈস্ট ইণ্ডিজের হিন্দুরা লোক হিসেবে ভালোই বটে। একবার ইউগাণ্ডাতে একজন শিখ আমার প্রতি এমন সুন্দর আতিথ্য দেখিয়েছিল, তা কখনো ভুলতে পারবো না। আজ তোমরা এসো, রাত সামনে, আমার এখানেই রাত্রি যাপন করো। এটা গবর্নমেণ্টের ডাকবাংলো। আমিও তোমাদের মত সারাদিন পথ চলে বিকেলের দিকে এসে উঠেছি।

সাহেবের একটা ছোট গ্রামোফোন আছে, সন্ধ্যার পরে টিনবন্দী বিলাতী টোমাটোর

ঝোল ও সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্প-চেয়ারে শুয়ে রেকর্ড শুনে যাচ্ছে, এমন সময় অল্প দূরে সিংহের গর্জ্জন শোনা গেল। বোধ হল মাটির কাছে মুখ নামিয়ে সিংহ গর্জ্জন করছে— কারণ মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সাহেব বললে—টাঙ্গানিয়াকায় বেজায় সিংহের উপদ্রব আর বড় হিংস্র এরা। প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষখেকো। মানুষের রক্তের আস্বাদ একবার পেয়েছে, এখন মানুষ ছাড়া আর কিছু চায় না।

শঙ্কর ভাবলে খুব সুসংবাদ বটে। ইউগাণ্ডা রেলওয়ে তৈরী হবার সময়ে সে সিংহের উপদ্রব কাকে বলে খুব ভালই দেখেছে।

পরদিন সকালে ওরা আবার রওনা হল, সাহেব বলে দিলে সূর্য্য উঠে গেলে খুব সাবধান থাকবে। স্লিপিং সিক্‌নেসের মাছি রোদ উঠলেই জাগে। গায়ে যেন না বসে।

দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। আল্‌ভারেজ বললে—খুব সাবধান, এই সব ঘাসের বনেই সিংহের আড্ডা। বেশী পেছনে থেকো না।

আল্‌ভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা। আর একটা ভরসা এই যে, আল্‌ভারেজ যাকে বলে 'ক্র্যাক্ শট্' তাই। অর্থাৎ তার গুলি বড় একটা ফস্‌কায় না। কিন্তু অত বড় অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারীর সঙ্গে থেকেও শঙ্কর বিশেষ ভরসা পেলে না, কারণ ইউগাণ্ডার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সিংহ যখন যাকে নেবে, এমন সম্পূর্ণ অতর্কিতেই নেবে যে পিঠের রাইফেলের চামড়ার স্ট্র্যাপ্ খোলবার অবকাশ পর্য্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রাত্রের বিশ্রামের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করে নিতে হল। আল্‌ভারেজ বললে—সামনে কোন গ্রাম নেই—অন্ধকারের পর এখানে পথ চলা ঠিক নয়।

একটা সুবৃহৎ বাওবাব্ গাছের তলায় দু টুকরো কেম্বিস্ ঝুলিয়ে ছোট্ট একটু তাঁবু খাটানো হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রের খাবার তৈরী করতে বসল শঙ্কর। তারপর সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর দুজনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে আল্‌ভারেজ ডাকলে—শঙ্কর, ওঠো।

শঙ্কর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

আল্‌ভারেজ বললে—কি একটা জানোয়ার তাঁবুর চারিপাশে ঘুরছে—বন্দুক বাগিয়ে রাখো।

সত্যিই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাতলা কেম্বিসের পর্দ্দার বাইরেই শোনা যাচ্ছে বটে। তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে আগুন করা হয়েছিল—তার স্বল্পাবশিষ্ট আলোকে সুবৃহৎ বাওবাব্ গাছটা একটা ভীষণদর্শন দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে।

পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর পর্দ্দার ভেতর থেকেই আল্‌ভারেজ পর পর দুবার রাইফেল ছুঁড়লে। শব্দটা লক্ষ্য

করে শঙ্করও সেই মুহূর্ত্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু শঙ্কর ঘোড়া টেপবার আগে আল্‌ভারেজের রাইফেল আর একবার আওয়াজ করে উঠল।

তার পরেই সব চুপ।

ওরা টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দেখলে, তাঁবুর পূবদিকের পর্দ্দার বাইরে পর্দ্দাটা খানিকটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ।

সেটা তখনও মরে নি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। আরও দুবার গুলি খেয়ে সেটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

আল্‌ভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বললে—রাত এখনো অনেক। ওটা এখানে পড়ে থাক্। চলো আমরা আমাদের ঘুম শেষ করি।

দুজনেই এসে শুয়ে পড়ল—একটু পরে শঙ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আল্‌ভারেজের নাসিকা-গর্জ্জন শুরু হয়েছে। শঙ্করের চোখে ঘুম এল না।

আধঘণ্টা পরে শঙ্করের মনে হল, আল্‌ভারেজের নাসিকা-গর্জ্জনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে টাঙ্গানিয়াকা অঞ্চলের সমস্ত সিংহ যেন একযোগে ডেকে উঠল। সে কি ভয়ানক সিংহের ডাক!···আগেও শঙ্কর অনেকবার সিংহগর্জ্জন শুনেছে, কিন্তু এ রাত্রের সে ভীষণ বিরাট গর্জ্জন তার চিরকাল মনে ছিল। তা ছাড়া ডাক তাঁবু থেকে বিশ হাতের মধ্যে।

আল্‌ভারেজ আবার জেগে উঠল। বললে—নাঃ, রাত্রে দেখছি একটু ঘুমুতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধান থাকো। বড় পাজী জানোয়ার।

কি দুর্যোগের রাত্রি! তাঁবুর আগুনও তখন নিবু-নিবু। তার বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাতলা কেম্বিসের চটের মাত্র ব্যবধান—তার ওদিকে সাথীহারা পশু। বিরাট গর্জ্জন করতে করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূরে যায়, আবার কাছে আসে, কখনও তাঁবু প্রদক্ষিণ করে।

ভোর হবার কিছু আগে সিংহটা সরে পড়ল। ওরাও তাঁবু তুলে আবার যাত্রা শুরু করলে।

ছয়

দিন পনেরো পরে শঙ্কর ও আল্‌ভারেজ উজিজি বন্দর থেকে ষ্টীমারে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের বক্ষে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে আলবার্টভিল্ বলে একটা ছোট শহরে কিছু আবশ্যকীয় জিনিস কিনে নিল। এই শহর থেকে কাবালো পর্য্যন্ত বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্টের রেলপথ আছে। সেখান থেকে কঙ্গো নদীতে ষ্টীমারে চড়ে তিনদিনের পথ সান্‌কিনি যেতে হবে, সান্‌কিনি নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে দক্ষিণ মুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও মরুভূমির দেশে প্রবেশ করতে হবে।

কাবালো অতি অপরিষ্কার স্থান, কতকগুলো বর্ণসঙ্কর পর্টুগীজ ও বেলজিয়ামের আড্ডা। ষ্টেশনের বাইরে পা দিয়েছে এমন সময় একজন পর্টুগীজ ওর কাছে এসে বললে—হ্যালো,

কোথায় যাবে? দেখছি নতুন লোক, আমায় চেন না নিশ্চয়ই। আমার নাম আল্‌বুকার্ক!

শঙ্কর চেয়ে দেখলে আল্‌ভারেজ তখনও স্টেশনের মধ্যে।

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ, তেমনি কদাকার। কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের প্রত্যেকটি মাংসপেশী গুনে নেওয়া যায় এমনি সুদৃঢ় ও সুগঠিত।

শঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

লোকটা বললে—তুমি দেখছি কালা আদমি, বোধ হয় ঈস্ট ইণ্ডিজের। আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চলো।

শঙ্কর ওর কথা শুনে চটেছিল, বললে—তোমার সঙ্গে পোকার খেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করতে চায়। পোকার একরকম তাসের জুয়াখেলা—শঙ্কর নাম জানলেও সে খেলা কখনো জীবনে দেখেও নি, নাইরোবিতে সে জানতো বদমাইশ জুয়াড়ীরা পোকার খেলার ছল করে নতুন লোকের সর্ব্বনাশ করে। এটা এক ধরনের ডাকাতি।

শঙ্করের উত্তর শুনে পর্টুগীজ বদমাইশটা রেগে লাল হয়ে উঠল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে চাইল। সে আরও কাছে ঘেঁষে এসে দাঁতে দাঁত চেপে অতি বিকৃত স্বরে বললে—কি? নিগার, কি বললি? ঈস্ট ইণ্ডিজের তুলনায় তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখছি। তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে তোকে জানিয়ে দিই যে, তোর মত কালা আদমিকে আল্‌বুকার্ক এই রিভলভারের গুলিতে কাদাখোঁচা পাখীর মত ডজনে ডজনে মেরেছে। আমার নিয়ম হচ্ছে এই শোন্। কাবালোতে যারা নতুন লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার খেলবে, নয়তো আমার সঙ্গে রিভলভারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে।

শঙ্কর দেখলে এই বদমাইশ লোকটার সঙ্গে রিভলভারের লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অনিবার্য্য। বদমাইশটা হচ্ছে একজন ক্র্যাক্-শট গুণ্ডা। আর সে কি! কাল পর্য্যন্ত রেলের নিরীহ কেরানী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করে যদি পোকারই খেলে তবে সর্ব্বস্ব যাবে।

হয়তো আধমিনিট কাল শঙ্করের দেরি হয়েছে উত্তর দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলস্টার্ থেকে নিমেষের মধ্যে রিভলভার বার করে শঙ্করের পেটের কাছে উঁচিয়ে বললে—যুদ্ধ না পোকার?

শঙ্করের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভীরুর মত সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নীচু করবে না, হোক্ মৃত্যু।

সে বলতে যাচ্ছে যুদ্ধ, এমন সময় পেছন থেকে ভয়ানক বাঁজখাই স্বরে কে বললে—এই সামলাও, গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল! দুজনেই চমকে উঠে পেছনে চাইলে। আল্‌ভারেজ তার উইস্‌চেস্টার রিপিটারটা বাগিয়ে উঁচিয়ে পর্টুগীজ বদমাইশটার মাথা লক্ষ্য করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর সুযোগ বুঝে চট্ করে পিস্তলের নলের উল্টোদিকে ঘুরে গেল। আল্‌ভারেজ বললে—বালকের সঙ্গে রিভলভার ডুয়েল? ছোঃ! তিন বলতে

পিস্তল ফেলে দিবি—এক—তুই—তিন—

আলবুকার্কের শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল।

আল্‌ভারেজ বললে—বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি, না?

শঙ্কর ততক্ষণ পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। আলবুকার্ক একটু বিস্মিত হল, আল্‌ভারেজ যে শঙ্করের দলের লোক তা সে ভাবেও নি। সে হেসে বললে—আচ্ছা মেট্, কিছু মনে কোরো না, আমারই হার। দাও আমার পিস্তলটা দাও ছোক্‌রা। কোনো ভয় নেই, দাও। এসো হাতে হাত দাও। তুমিও মেট্। আল্‌বুকার্ক রাগ পুষে রাখে না। এসো কাছেই আমার কেবিন, এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে যাও।

আল্‌ভারেজ নিজের জাতের লোকের রক্ত চেনে। ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আল্‌বুকার্কের কেবিনে গেল। শঙ্কর বিয়ার খায় না শুনে তাকে কফি করে দিলে। প্রাণ-খোলা হাসি হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয় নি।

শঙ্কর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা যে এমন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমান হয়েছে তাদেরই সঙ্গে এমনিধারা দিল-খোলা হেসে খোশগল্প করতে পারে, পৃথিবীতে সে ধরনের লোক বেশী নেই।

পরদিন ওরা কাবালো থেকে স্টীমারে উঠল কঙ্গোনদী বেয়ে দক্ষিণমুখে যাবার জন্যে। নদীর দুই তীরের দৃশ্যে শঙ্করের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এরকম অদ্ভুত বনজঙ্গলের দৃশ্য জীবনে কখনো সে দেখে নি। এতদিন সে যেখানে ছিল, আফ্রিকার সে অঞ্চলে এমন বন নেই—সে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানতঃ ঘাসের বন, মাঝে মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ। কিন্তু কঙ্গোনদী বেয়ে স্টীমার যত অগ্রসর হয়, দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা মোটা লতা, বনের ফুল; বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, আপনার সৌন্দর্য্যে ও নিবিড় প্রাচুর্য্যে আপনি মুগ্ধ।

শঙ্করের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ভাবুক মনটি ছিল, (হাজার হোক্ সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আল্‌ভারেজের মত শুধু কঠিনপ্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রস্‌পেক্টর নয়) এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে রাঙা অপরাহ্নে ও দুপুর রোদে আপন মনে কত কি স্বপ্নজাল রচনা করে।

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী বন্য প্রকৃতি তখন যেন জেগে উঠেছে—জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে আসে, শঙ্করের চোখে ঘুম নেই, এই সৌন্দর্য্য-স্বপ্নে ভোর হয়ে, মধ্য আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে।

ঐ জলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল—আকাশে অনেক দূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেছে, ওই রকম এক ফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রির চাঁদও। সে-সব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে সে এসে পড়েছে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কি এর পরিণতি কে জানে?

দুদিন পরে বোট এসে সান্‌কিনি পৌঁছুলো। সেখান থেকে ওরা আবার পদব্রজে রওনা হল—জঙ্গল এদিকে বেশী নেই, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী জনমানবহীন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, অধিকাংশ পাহাড় রুক্ষ ও বৃক্ষশূন্য, কোনো কোনো পাহাড়ে ইউফোবিয়া জাতীয় গাছের ঝোপ। কিন্তু শঙ্করের মনে হল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড় অপরূপ। একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, সূর্য্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া এই দেশকে রাত্রে, অপরাহ্নে রূপকথার পরীরাজ্য করে তোলে।

আল্‌ভারেজ বললে—এই ভেল্ড্‌ অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে একরকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশী।

কথাটা যেদিন বলা হল, সেদিনই এক কাণ্ড ঘটল। জনহীন ভেল্ডে সূর্য্য অস্ত গেলে ওরা একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু খাটিয়ে আগুন জাললে—শঙ্কর জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে আল্‌ভারেজের বন্দুকটা নিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র দুটি টোটা। আধঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে বেলাটুকু গেল, পাতলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে ধীরে আবৃত করে দিলে। শঙ্কর শপথ করে বলতে পারে, সে আধঘণ্টার বেশী হাঁটে নি। হঠাৎ চারিধারে চেয়ে শঙ্করের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল, যেন কি একটা বিপদ আসছে, তাঁবুতে ফেরা ভালো। দূরে দূরে ছোট-বড় পাহাড়, একই রকম দেখতে সব দিক, কোনো চিহ্ন নেই, সব একাকার।

মিনিট পাঁচ-ছয় হাঁটবার পরই শঙ্করের মনে হল সে পথ হারিয়েছে। তখন আল্‌ভারেজের কথাটা তার মনে পড়ল। কিন্তু তখনও সে অনভিজ্ঞতার দরুন বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলে না। হেঁটেই যাচ্ছে—একবার মনে হয় সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় ডাইনে। তাঁবুর আগুনের কুণ্ডটা দেখা যায় না কেন? কোথায় সেই ছোট পাহাড়টা?

দু-ঘণ্টা হাঁটবার পরে শঙ্করের খুব ভয় হল। ততক্ষণে সে বুঝেছে যে, সে সম্পূর্ণরূপে পথ হারিয়েছে এবং ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। একা তাকে রোডেসিয়ার এই জনমানবশূন্য, সিংহসঙ্কুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে,—অনাহারে এবং এই কন্‌কনে শীতে বিনা কম্বলে ও বিনা আগুনে। সঙ্গে একটা দেশলাই পর্য্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাঁড়ালো যে, পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরে, উদ্‌ভ্রান্ত, তৃষ্ণায় মুমূর্ষু শঙ্করকে ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে একটা ইউফোবিয়া গাছের তলা থেকে আল্‌ভারেজ উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে এল।

আল্‌ভারেজ বললে—তুমি যে পথ ধরেছিলে শঙ্কর, তোমাকে আজ খুঁজে বার করতে না পারলে তুমি গভীর থেকে গভীরতর মরুপ্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়ে কাল দুপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে। এর আগে তোমার মত অনেকেই রোডেসিয়ার ভেল্ডে এভাবে মারা গিয়েছে! এ-সব ভয়ানক জায়গা। তুমি আর কখনও তাঁবু থেকে ওরকম বেরিও না, কারণ তুমি আনাড়ী। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই। ডাহা মারা পড়বে।

শঙ্কর বললে—আল্‌ভারেজ, তুমি দুবার আমার প্রাণরক্ষা করলে, এ আমি ভুলবো না।

আল্‌ভারেজ বললে—ইয়াং ম্যান ভুলে যাচ্ছ যে, তার আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।

তুমি না থাকলে ইউগাণ্ডার তৃণভূমিতে আমার হাড়গুলো সাদা হয়ে আসতো এতদিন।

মাস দুই ধরে রোডেসিয়া ও এঙ্গোলার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড্ অতিক্রম করে, অবশেষে দূরে মেঘের মত পর্ব্বতশ্রেণী দেখা গেল। আল্‌ভারেজ ম্যাপ মিলিয়ে বলল—ওই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থান, রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পর্ব্বত, এখনও এখান থেকে চল্লিশ মাইল হবে। আফ্রিকার এই সব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়।

এ অঞ্চলে অনেক বাওবাব্ গাছ। শঙ্করের এ গাছটা বড় ভাল লাগে—দূর থেকে যেন মনে হয় বট কি অশ্বত্থ গাছের মত, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায়, বাওবাব্ গাছ ছায়াবিরল অথচ বিশাল, আঁকা-বাঁকা সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল কি আব্ বেরিয়েছে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুব্জ দৈত্য। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখানে ওখানে প্রায় সর্ব্বত্রই দূরে নিকটে বড় বড় বাওবাব্ গাছ দাঁড়িয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলার দুর্জ্জয় শীতে তাঁবুর সামনে আগুন করে বসে আল্‌ভারেজ বললে—এই যে দেখছ রোডেসিয়ার ভেল্ড্ অঞ্চল, এখানে হীরে ছড়ানো আছে সর্ব্বত্র, এটা হীরের খনির দেশ। কিম্বার্লি খনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আরও অনেক ছোটখাটো খনি আছে, এখানে ওখানে ছোট বড় হীরের টুকরো কত লোকে পেয়েছে, এখনও পায়।

কথা শেষ করেই বলে উঠল—ও কারা?

শঙ্কর সামনে বসে ওর কথা শুনছিল। বললে, কোথায় কে?

কিন্তু আল্‌ভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকের গুলির মতই অব্যর্থ, একটু পরে তাঁবু থেকে দূরে অন্ধকারে কয়েকটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি এদিকে এগিয়ে আসছে, শঙ্করের চোখে পড়ল। আল্‌ভারেজ বললে—শঙ্কর, বন্দুক নিয়ে এসো, চট্ করে যাও, টোটা ভরে—

বন্দুক হাতে শঙ্কর বাইরে এসে দেখলে, আল্‌ভারেজ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করছে, কিছু-দূরে অজানা মূর্ত্তি কয়টি এখনও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আসছে। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়ালো। শঙ্কর চেয়ে দেখলে আগন্তুক কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, —তাদের হাতে কিছু নেই, পরনে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—সুগঠিত চেহারা, তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল যেন কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি।

আল্‌ভারেজ জুলু ভাষায় বললে—কি চাও তোমরা?

ওদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চলল, তার পরে ওরা সব মাটির ওপর বসে পড়ল। আল্‌ভারেজ বললে—শঙ্কর, ওদের খেতে দাও—

তার পরে অনুচ্চস্বরে বললে—বড় বিপদ। খুব হুঁশিয়ার, শঙ্কর!

টিনের খাবার খোলা হল। সকলের সামনেই খাবার রাখলে শঙ্কর। আল্‌ভারেজও ওই সঙ্গে আবার খেতে বসলো, যদিও সে ও শঙ্কর সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ আহার শেষ করেছে। শঙ্কর বুঝলে আল্‌ভারেজের কোনো মতলব আছে, কিংবা এদেশের রীতি অতিথির সঙ্গে খেতে হয়।

আল্‌ভারেজ খেতে খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে গল্প করছে, অনেকক্ষণ পরে

খাওয়া শেষ করে ওরা চলে গেল। চলে যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট দেওয়া হল।

ওরা চলে গেলে আল্‌ভারেজ বললে—ওরা মাটাবেল্‌ জাতির লোক। ভয়ানক দুর্দ্দান্ত, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। শয়তানকে ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেছে আমরা ওদের দেশে এসেছি হীরের খনির সন্ধানে। আমরা যে জায়গাটায় আছি, এটা ওদের একজন সর্দ্দারের রাজ্য। কোনো সভ্য গবর্নমেণ্টের আইন এখানে খাট্‌বে না। ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারবে। চলো আমরা তাঁবু তুলে রওনা হই।

শঙ্কর বললে—তবে তুমি বন্দুক আনতে বললে কেন?

আল্‌ভারেজ হেসে বললে—ত্যাখো, ভেবেছিলুম যদি ওরা খেয়েও না ভোলে, কিংবা কথাবার্ত্তায় বুঝতে পারি যে, ওদের মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুলি করবো। এই ত্যাখো রিভলভার পেছনে রেখে তবে খেতে বসেছিলাম। এ কটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আল্‌ভারেজ, আমিও একসময়ে শয়তানকেও ভয় করতুম না, এখনও করি নে। ওদের হাতের মাছ মুখে পৌছোবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

আরও পাঁচ-ছ' দিন পথ চলবার পরে একটা খুব বড় পর্ব্বতের পাদমূলে নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওরা প্রবেশ করলে। স্থানটি যেমন নির্জ্জন, তেমনি বিশাল। সে বন দেখে শঙ্করের মনে হল, একবার যদি সে এর মধ্যে পথ হারায়, সারাজীবন ঘুরলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার হবে না। আল্‌ভারেজও তাকে সাবধান করে দিয়ে বললে—খুব হুঁশিয়ার শঙ্কর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে পদে পদে এই সব বনে পথ হারাবে। অনেক লোক বেঘোরে পড়ে বনের মধ্যে মারা পড়ে। মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ হারিয়ে ঘুরেছিলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনিই পথ হারাতে পারো। কারণ এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো চিহ্ন নেই। ভাল বুশ্‌ম্যান না হলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। বন্দুক না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটিও যেন মনে থাকে। মধ্য আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।

শঙ্করকে তা না বললেও চলতো, কারণ এসব অঞ্চল যে শখের পার্ক নয়, তা এর চেহারা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে। সে জিজ্ঞেস করলে—তোমার সেই হলদে হীরের খনি কতদূরে? এই তো রিখ্‌টারসভেল্ড্‌ পর্ব্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে।

আল্‌ভারেজ হেসে বললে—তোমার ধারণা নেই বললাম যে। আসল রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডের এটা বাইরের থাক্‌। এ রকম আরও অনেক থাক্‌ আছে। সমস্ত অঞ্চলটা এত বিশাল যে পুবে সত্তর মাইল ও পশ্চিমদিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্য্যন্ত গেলেও এ বন ও পাহাড় শেষ হবে না। সর্ব্বনিম্ন প্রস্থ চল্লিশ মাইল। সমস্ত জড়িয়ে আট ন' হাজার বর্গমাইল সমস্ত রিখ্‌টারস্‌-ভেল্ড্‌ পার্ব্বত্য অঞ্চল ও অরণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোন্‌খানটাতে এসেছিলুম আজ সাত আট বছর আগে, ঠিক সে জায়গাটা খুঁজে বার করা কি ছেলেখেলা, ইয়্যাং ম্যান্‌?

শঙ্কর বললে—এদিকে খাবার ফুরিয়েছে, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ুভক্ষণ ছাড়া উপায় নেই।

আল্‌ভারেজ বললে—কিছু ভেবো না। দেখছো না গাছে গাছে বেবুনের মেলা? কিছু না মেলে বেবুনের দাপ্‌না ভাজা আর কফি দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাবো কাল থেকে। আজ আর নয়, তাঁবু ফেল, বিশ্রাম করা যাক্।

একটা বড় গাছের নীচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বাললে। শঙ্কর রান্না করলে, আহারাদি শেষ করে যখন দুজনে আগুনের সামনে বসেছে, তখনও বেলা আছে।

আল্‌ভারেজ কড়া তামাকের পাইপ টানতে টানতে বললে—জানো শঙ্কর, আফ্রিকার এই সব অজানা অরণ্যে এখনও কত জানোয়ার আছে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না? খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেছে। ওকাপি বলে যে জানোয়ার সে তো প্রথম দেখা গেল ১৯০০ সালে। এক ধরনের বুনো শূওর আছে, যা সাধারণ বুনো শূওরের প্রায় তিনগুণ বড় আকারের। ১৮৮৮ সালে মোজেস্ কাউলে, পৃথিবী পর্য্যটক ও বড় শিকারী, সর্ব্বপ্রথম এই বুনো শূওরের সন্ধান পান বেলজিয়াম কঙ্গোর লুয়ালাবু অরণ্যের মধ্যে। তিনি বহু কষ্টে একটা শিকারও করেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত মিউজিয়মে উপহার দেন। বিখ্যাত রোডেসিয়ান্ মনস্টারের নাম শুনেছ?

শঙ্কর বললে—না, কি সেটা?

—শোন তবে। রোডেসিয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড জলাভূমি আছে। ওদেশের অসভ্য জুলুদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূমিতে মাঝে মাঝে দেখেছে। ওরা বলে তার মাথা কুমীরের মত, গণ্ডারের মত তার শিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মত লম্বা ও আঁশওয়ালা, দেহটা জলহস্তীর মত, লেজটা কুমীরের মত। বিরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকৃতিও খুব হিংস্র। জল ছাড়া কখনো ডাঙায় এ জানোয়ারকে দেখা যায় নি। তবে এই সব অসভ্য দেশী লোকের অতিরঞ্জিত বিবরণ বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু ১৮৮০ সালে জেম্‌স্ মার্টিন বলে একজন প্রস্‌পেক্টর রোডেসিয়ার এই অঞ্চলে বহুদিন ঘুরেছিলেন সোনার সন্ধানে। মিঃ মার্টিন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এডিকং ছিলেন, নিজে একজন ভাল ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ববিদও ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরীর মধ্যে রোডে-সিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর থেকে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। তিনিও বলেন, জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপের মত ও বেজায় বড়। কিন্তু তিনি জোর করে কিছু বলতে পারেন নি, কারণ খুব ভোরের কুয়াশার মধ্যে কোভিরাণ্ডো হ্রদের সীমানায় জলাভূমিতে আবছায়া ভাবে তিনি জানোয়ারটাকে দেখেছিলেন। জানোয়ারটার ঘোড়ার চিঁহিঁ ডাকের মত ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গের জুলু চাকর-গুলো ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাতে পালাতে বললে—সাহেব পালাও, পালাও, ডিঙ্গোনেক্! ডিঙ্গোনেক্! ডিঙ্গোনেক্ ঐ জানোয়ারটার জুলু নাম। দু-তিন বছরে এক আধবার দেখা দেয় কি না দেয়, কিন্তু সেটা এতই হিংস্র যে তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের পক্ষে ভীষণ ভয়ের

ব্যাপার। মিঃ মার্টিন বলেন, তিনি তাঁর '৩০৩ টোটা গোটা দুই উপরি উপরি ছুঁড়েছিলেন জানোয়ারটার দিকে। অতদূর থেকে তাক্ হল না, রাইফেলের আওয়াজে সেটা সম্ভবতঃ জলে ডুব দিলে।

শঙ্কর বললে—তুমি কি করে জানলে এসব? মিঃ মার্টিনের ডায়েরী ছাপানো হয়েছিল নাকি?

—না, অনেকদিন আগে বুলাওয়েও ক্রনিক্ল্ কাগজে মিঃ মার্টিনের এই ঘটনাটা বেরিয়েছিল। আমি তখন সবে এদেশে এসেছি। রোডেসিয়া অঞ্চলে আমিও প্রস্পেক্টিং করে বেড়াতুম বলে জানোয়ারটার বিবরণ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। কাগজখানা অনেকদিন আমার কাছে রেখেও দিয়েছিলুম। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। ওরাই নাম দিয়েছিল জানোয়ারটার—রোডেসিয়ান্ মনস্টার।

শঙ্কর বললে—তুমি কোনো কিছু অদ্ভুত জানোয়ার ছাখো নি?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেছে। সেই আবছায়া আলো-অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মনে হল—হয়তো শঙ্করের ভুল হতে পারে—কিন্তু শঙ্করের মনে হয় সে দেখলে আল্ভারেজ, দুর্দ্ধর্ষ ও নির্ভীক আল্ভারেজ, দুঁদে ও অব্যর্থলক্ষ্য আল্ভারেজ ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো—এবং—এবং সেইটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য—যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আল্ভারেজ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চারিপাশের জনমানবহীন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা দুরারোহ পর্ব্বতমালার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, কোন কথা বললে না। যেন এই পর্ব্বতজঙ্গলে বহুকাল পরে এসে অতীতের কোনো বিভীষিকাময়ী পুরাতন ঘটনা ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে, যে স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আল্ভারেজ ভয় পেয়েছে!

অবাক্! আল্ভারেজের ভয়! শঙ্কর ভাবতেও পারে না। কিন্তু সেই ভয়টা অলক্ষিতে এসে শঙ্করের মনেও চেপে বসলো। এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময়ী বনানী, এই বিরাট পর্ব্বতপ্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ যুগ ধরে গোপন করে আসছে—যে বীর হও, যে নির্ভীক হও, এগিয়ে এসো সে—কিন্তু মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সে গহন রহস্যের সন্ধান। রিখ্টারসভেল্ড্ পর্বতমালা ভারতবর্ষের দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়—এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্ব্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।

সাত

তার পর দিন দুই কেটে গেল। ওরা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উৎরাই, মাঝে মাঝে কর্কশ ও দীর্ঘ টুসক্ ঘাসের বন, জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, ঝরনা এক-আধটা যদিও বা দেখা যায়, আল্‌ভারেজ তাদের জল ছুঁতেও দেয় না। দিব্যি স্ফটিকের মত নির্ম্মল জল পড়ছে ঝর্‌না বেয়ে, সুশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত্ত লোকের পক্ষে সে লোভ সম্বরণ করা বড়ই কঠিন - কিন্তু আল্‌ভারেজ জলের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে না। জলের তৃষ্ণা ঠাণ্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্ণার কষ্টই সব চেয়ে বেশী কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল শঙ্করের। একস্থানে টুসক্ ঘাসের বন বেজায় ঘন। তার ওপরে ওদের চারিধারে ঘিরে সেদিন কুয়াশাও খুব গভীর। হঠাৎ বেলা উঠলে নীচের কুয়াশা সরে গেল—সামনে চেয়ে শঙ্করের মনে হল, খুব বড় একটা চড়াই তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে, কত উঁচু সেটা তা জানা সম্ভব নয়, কারণ নিবিড় কুয়াশা কিংবা মেঘে তার ওপরের দিকটা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। আল্‌ভারেজ বললে—রিখ্‌টারসভেল্ডের আসল রেঞ্জ্।

শঙ্কর বললে—এটা পার হওয়া কি দরকার ?

আল্‌ভারেজ বললে—এইজন্যে দরকার যে সেবার আমি আর জিম্ দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলুম এই পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে, কিন্তু আসল রেঞ্জ্ পার হই নি। যে নদীর ধারে হলদে হীরে পাওয়া গিয়েছিল, তার গতি পূব থেকে পশ্চিমে। এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দক্ষিণে। সুতরাং পর্ব্বত পার হয়ে ওপারে না গেলে কি করে সেই নদীটার ঠিকানা করতে পারি ?

শঙ্কর বললে—আজ যে রকম কুয়াশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক্ না কেন ? আর একটু বেলা বাড়ুক।

তাঁবু ফেলে আহারাদি সম্পন্ন করা হল। বেলা বাড়লেও কুয়াশা তেমন কাটল না। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই। চোখ মুছতে মুছতে তাঁবুর বাইরে এসে সে দেখলে, আল্‌ভারেজ চিন্তিত-মুখে ম্যাপ খুলে বসে আছে। শঙ্করকে দেখে বললে—শঙ্কর, আমাদের এখনও অনেক ভুগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখ।

আল্‌ভারেজের কথার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোগে পড়ল। কুয়াশা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখ্‌টারসভেল্ড্ পর্ব্বতের প্রধান থাক্ ধাপে ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্য্যের রাঙা আলোয় দেব-লোকের কনকদেউলের মত বহুদূর নীলশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সামনের পর্ব্বতাংশ সম্পূর্ণ দুরারোহ—শুধুই খাড়া খাড়া উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—কোথাও একটু ঢালু নেই। আল্‌ভারেজ বললে—এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শঙ্কর। দেখেই

বুঝেছ নিশ্চয়। পাহাড়ের কোলে কোলে পশ্চিম দিকে চল। যেখানে ঢালু এবং নীচু পাবো, সেখান দিয়েই পাহাড় পার হতে হবে। কিন্তু এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কোথায় সে-রকম জায়গা আছে, এ খুঁজতেই তো এক মাসের ওপর যাবে দেখছি।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পশ্চিম দিকে যাওয়ার পরে এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে পর্ব্বতের গা বেশ ঢালু, সেখান দিয়ে পর্ব্বতে ওঠা চলতে পারে।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্ব্বতারোহণ শুরু হল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ছ'টা। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে জায়গাটা দিয়ে তারা উঠছে—সেখানে পর্ব্বতের চার মাইলের মধ্যে উঠেছে ছ'হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কী ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া যতই ওপরে উঠছে অরণ্য ততই নিবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারিদিক, বেলা হয়েছে, রোদ উঠেছে, অথচ সূর্য্যের আলো ঢোকে নি জঙ্গলের মধ্যে—আকাশই চোখে পড়ে না তায় সূর্য্যের আলো!

পথ বলে কোনো জিনিস নেই। চোখের সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেছে। কোথা থেকে জল পড়েছে কে জানে, পায়ের নীচের প্রস্তর আর্দ্র ও পিচ্ছিল, প্রায় সর্ব্বত্রই পাথরের ওপর শেওলা-ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নীচের দিকে বহুদূর চলে গিয়ে তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে।

শঙ্কর বা আল্‌ভারেজ কারো মুখে কথা নেই। এই উত্তুঙ্গ পথে ওঠবার কষ্টে দুজনেই অবসন্ন, দুজনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। শঙ্করের কষ্ট আরও বেশী, বাংলার সমতলভূমিতে আজন্ম মানুষ হয়েছে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসই নেই কখনো।

শঙ্কর ভাবছে, আল্‌ভারেজ কখন বিশ্রাম করতে বলবে। সে আর উঠতে পারছে না, কিন্তু যদি সে মরেও যায়, একথা আল্‌ভারেজকে সে কখনই বলবে না যে, সে আর পারছে না। হয়তো তাতে আল্‌ভারেজ ভাববে, ঈস্ট্‌ ইণ্ডিজের মানুষগুলো দেখছি নিতান্ত অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্ব্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি—এমন কোন কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোট হয়ে যায়।

বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য, মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝরনা বনের মধ্যে দিয়ে খুব ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে নানা রঙের টিয়াপাখী চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ঘাসের মাথায় সাদা সাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলছে গাছের ডালের গায়ে, গুঁড়ির গায়ে।

হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে মাঝে লম্বা দাড়ি-গোঁপওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মত ও কারা বসে রয়েছে। তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজনোচিত গাম্ভীর্য্যে ভরা। ব্যাপার কি?

আল্‌ভারেজ বললে—ও কলোবাস্ জাতীয় মাদী বানর। পুরুষ জাতীয় কলোবাস্ বানরের দাড়ি-গোঁপ নেই, স্ত্রী জাতীয় কলোবাস্ বানরের হাতখানেক লম্বা দাড়ি-গোঁপ গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ্ছ।

ওদের কাণ্ড দেখে শঙ্কর হেসেই খুন।

পায়ের তলায় মাটিও নেই, পাথরও নেই—তাদের বদলে আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গুঁড়ির স্তূপ। এই সব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি ঝরছে, পচে যাচ্ছে, তার ওপরে শেওলা পুরু হয়ে উঠছে, ছাতা গজাচ্ছে, তার ওপরে আবার নতুন-ঝরা পাতার রাশি, আবার পড়ছে গাছের ডাল-পালা, গুঁড়ি। জায়গায় জায়গায় ষাট-সত্তর ফুট গভীর হয়ে জমে রয়েছে এই পত্রস্তূপ।

আল্‌ভারেজ ওকে শিখিয়ে দিলে, এসব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষে চলতে চলতে ওই ঝরা পাতার রাশির মধ্যে ভুস্ করে ঢুকে ডুবে যেতে পারে, যেমন অতর্কিতে পথ চলতে চলতে প্রাচীন কূপের মধ্যে পড়ে যায়। উদ্ধার করা সম্ভব না হলে সে-সব ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য্য।

শঙ্কর বললে—পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা যাচ্ছে না, বড় ঘন হয়ে উঠছে।

ক্ষুরের মত ধারালো চওড়া এলিফ্যাণ্ট্ ঘাসের বন—যেন রোমান্ যুগের দ্বি-ধার তলোয়ার। তার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দুজনের কেউই নিরাপদ বলে ভাবছে না নিজেকে, দু-হাত তফাতে কি আছে দেখা যায় না যখন, তখন সব রকম বিপদের সম্ভাবনাই তো রয়েছে। থাকতে পারে বাঘ, থাকতে পারে সিংহ, থাকতে পারে বিষাক্ত সাপ।

শঙ্কর লক্ষ্য করছে মাঝে মাঝে ডুগ্‌ডুগি বা ঢোল বাজনার মত একটা শব্দ হচ্ছে কোথায় যেন বনের মধ্যে। কোনো অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্ছে নাকি? আল্‌ভারেজকে সে জিজ্ঞেস করলে।

আল্‌ভারেজ বললে—ঢোল নয়, বড় বেবুন কিংবা বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম শব্দ করে। মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে?

শঙ্কর বললে—তুমি যে বলেছিলে এ বনে গরিলা নেই?

—গরিলা সম্ভবতঃ নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেলজিয়ান্ কঙ্গোর কিছু অঞ্চল, রাওয়েন্‌জরী আল্পস্ বা ভিরুঙ্গা আগ্নেয় পর্ব্বতের অরণ্য ছাড়া কোথাও গরিলা আছে বলে তো জানা নেই। গরিলা ছাড়াও অন্য ধরনের বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম আওয়াজ করতে পারে।

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের ওপর উঠেছে। সেদিনের মত সেখানেই রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হল। একটা বিশাল সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের রাত্রিকালীন শব্দ এত বিচিত্র ধরনের ও এত ভীতিজনক যে সারারাত শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। শুধু ভয় নয়, ভয় মিশ্রিত একটা বিস্ময়।

কত রকমের শব্দ—হায়েনার হাসি, কলোবাস্ বানরের কর্কশ চীৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক—প্রকৃতির এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে কেউ ঘুমোয় না। সমস্ত অরণ্যটা এই গভীর রাত্রে যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে। বছর কয়েক আগে খুব বড় একটা সার্কাসের দল এসে ওদের স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল,

তাদের জানোয়ারদের চীৎকারে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা রাত্রে ঘুমুতে পারতো না—শঙ্করের সেই কথা এখন মনে পড়ল। কিন্তু এসবের চেয়েও মধ্যরাত্রে একদল বন্য হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি তাঁবুর অত্যন্ত নিকটে শুনে শঙ্কর এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আল্‌ভারেজকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠালে। আল্‌ভারেজ বললে—আগুন জ্বলছে তাঁবুর বাইরে, কোনো ভয় নেই, ওরা ঘেঁষবে না এদিকে।

সকালে উঠে আবার ওপরে ওঠা শুরু। উঠছে, উঠছে—মাইলের পর মাইল বন্য বাঁশের অরণ্য, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁদিকের বাঁশবনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তীযূথ কচি বাঁশের কোঁড় মড় মড় করে ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল।

পাঁচ হাজার ফুট ওপরে কত কি বন্য পুষ্পের মেলা—টক্‌টকে লাল ইরিথ্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেছে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমী ফুলের মত কিন্তু রঙটা অত গাঢ় বেগুনি নয়। সাদা ভেরোনিকা ঘন সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেছে। বন্য কফির ফুল, রঙীন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে মাঝে সাদা বেলুনের মত মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে এসে আটকাচ্ছে—কখনও বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্চে।

সাড়ে সাত হাজার ফুটের ওপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এই পর্য্যন্ত উঠতে ওদের আরও দু'দিন লেগেছে। আর অসহ্য কষ্ট, কোমর পিঠ ভেঙে পড়ছে। এখানে বনানীর মূর্ত্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে—সে শেওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মত হয়েছে—বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, তার ওপর কোথাও সূর্য্যের আলো নেই, সব সময়ই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা—বাতাস বইছে তারও শব্দ নেই পাখীর কূজন নেই সে বনে—মানুষের গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোন্ অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা।

সেদিন অপরাহ্ণে যখন আল্‌ভারেজ তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার হুকুম দিলে—তখন তাঁবুর বাইরে বসে এক পাত্র কফি খেতে খেতে শঙ্করের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে নি, যে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাটকায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বনজঙ্গলের নিবিড় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতো—সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাবে সে যেন কোন্ জাদুমন্ত্রের বলে ফিরে গিয়েছে—

সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হল। তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেছে—সেই .আলোর মণ্ডলীর বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। এ বনের আশ্চর্য্য নিস্তব্ধতা শঙ্করকে বিস্মিত করছে। বনানীর সেই বিচিত্র নৈশ শব্দ এখানে স্তব্ধ কেন? আল্‌ভারেজ চিন্তিত মুখে ম্যাপ দেখছিল। বললে—শোনো শঙ্কর, একটা কথা ভাবছি। আট হাজার ফুট উঠলাম, কিন্তু এখনও পর্ব্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না যেটা দিয়ে আমরা রেঞ্জ্ পার

হয়ে ওপারে যাবো। আর কত ওপরে উঠবো? যদি ধরো এই অংশে স্যাড্‌ল্‌টা নাই থাকে?

শঙ্করের মনেও এ খট্‌কা যে না জেগেছে তা নয়। সে আজই ওঠবার সময় মাঝে মাঝে ফিল্ড্‌ গ্লাস্‌ দিয়ে ওপরের দিকে দেখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঘন মেঘে বা কুয়াশায় ওপরের দিকটা সর্ব্বদাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিই তো, তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যদি না পাওয়া যায়? আবার নীচে নামতে হবে, আবার অন্য জায়গা বেয়ে উঠতে হবে। দফা সারা।

সে বললে—ম্যাপে কি বলে?

আল্‌ভারেজের মুখ দেখে মনে হল ম্যাপের ওপর সে আস্থা হারিয়েছে। বললে—এ ম্যাপ অত খুঁটিনাটি ভাবে তৈরী নয়। এ পর্ব্বতে উঠেছে কে যে ম্যাপ তৈরী হবে? এই যে দেখছো—এখানা সার ফিলিপো ডি ফিলিপির তৈরী ম্যাপ, যিনি পর্টুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার ফার্ডিনাণ্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে বিখ্যাত পর্ব্বত আরোহণকারী পর্য্যটক ডিউক অফ আব্রুৎসির অভিযানেও যিনি ছিলেন। কিন্তু রিখ্‌টারস্‌-ভেল্ডে তিনি ওঠেন নি, এ ম্যাপে পাহাড়ের যে কন্‌টুর আঁকা আছে, তা খুব নিখুঁত বলে মনে তো হয় না। ঠিক বুঝছি নে।

হঠাৎ শঙ্কর বলে উঠল—ও কি?

তাঁবুর বাইরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, এবং পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল—যেন থাইসিসের রোগী খুব কষ্টে কাতর ভাবে কাশ্‌ছে। একবার…দুবার… তার পরেই শব্দটা থেমে গেল। কিন্তু সেটা মানুষের গলার শব্দ নয়, শোনবামাত্রই শঙ্করের সে কথা মনে হল।

রাইফেল নিয়ে সে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বার হতে যাচ্ছে, আল্‌ভারেজ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলে।

শঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে বললে—কেন, কিসের শব্দ ওটা?

কথা বলে আল্‌ভারেজের দিকে চাইতেই ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আল্‌ভারেজের মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। শব্দটা শুনেই কি!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে নিবিড় অন্ধকারে একটা ভারী অথচ লঘুপদ জীব যেন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে বেশ মনে হল।

দুজনেই খানিকটা চুপচাপ, তার পরে আল্‌ভারেজ বললে—আগুনে কাঠ ফেলে দাও। বন্দুক দুটো ভরা আছে কি না দেখ। ওর মুখের ভাব দেখে শঙ্কর ওকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

রাত্রি কেটে গেল।

পরদিন সকালে শঙ্করেরই আগে ঘুম ভাঙল। তাঁবুর বাইরে এসে কফি করবার আগুন জ্বাল্‌তে সে তাঁবু থেকে কিছুদূরে কাঠ ভাঙতে গেল। হঠাৎ তার নজর পড়ল ভিজে মাটির

ওপর একটা পায়ের দাগ—লম্বায় দাগটা এগারো ইঞ্চির কম নয়, কিন্তু তিনটে মাত্র পায়ের আঙুল। তিন আঙুলেরই দাগ বেশ স্পষ্ট। পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল—আরও অনেকগুলো সেই পায়ের দাগ আছে, সবগুলোতেই সেই তিন আঙুল।

শঙ্করের মনে পড়ল ইউগাণ্ডার স্টেশন ঘরে আলভারেজের মুখে শোনা জিম্ কার্টারের মৃত্যুকাহিনী। গুহার মুখে বালির ওপর সেই অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ারের তিন আঙুলওয়ালা পায়ের দাগ। কাফির গ্রামের সর্দ্দারের মুখে শোনা গল্প।

আল্‌ভারেজের কাল রাত্রের বিবর্ণ মুখও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। আর একদিনও আল্‌ভারেজ ঠিক এই রকমই ভয় পেয়েছিল, যেদিন পর্ব্বতের পাদমূলে ওরা প্রথম এসে তাঁবু পাতে।

বুনিপ্! কাফির সর্দ্দারের গল্পের সেই বুনিপ্। রিখ্‌টারসভেল্ড্ পর্ব্বত ও অরণ্যের বিভীষিকা, যার ভয়ে শুধু অসভ্য মানুষ কেন, অন্য কোনো বন্য জন্তু পর্য্যন্ত এই আট হাজার ফুট ওপরকার বনে আসে না। কাল রাত্রে কোনো জানোয়ারের শব্দ পাওয়া যায় নি কেন, এখন তা শঙ্করের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আল্‌ভারেজ্ পর্য্যন্ত ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর গলার শব্দ শুনে। বোধ হয় ও শব্দের সঙ্গে আল্‌ভারেজের পূর্ব্ব পরিচয় ঘটেছে।

আল্‌ভারেজের ঘুম ভাঙতে সেদিন দেরি হল। গরম কফি এবং গরম কিছু খাদ্য গলাধঃ-করণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সেই নির্ভীক ও দুর্দ্ধর্ষ আল্‌ভারেজ, যে মানুষকেও ভয় করে না, শয়তানকেও না। শঙ্কর ইচ্ছে করেই আল্‌ভারেজকে ঐ অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালে না—কি জানি যদি আল্‌ভারেজ বলে বসে—এখনও পাহাড়ের স্যাড্‌ল্ পাওয়া গেল না, তবে নেমে যাওয়া যাক্!

সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। পর্ব্বতের ঢালু বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নীচে নামছে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, এতটা উঠেছে ওরা কিন্তু প্রতি হাজার ফুট ওপর থেকে নীচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতলভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হচ্ছে—কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কতটুকুই বা উঠেছি, ঐটুকু তো।

বৃষ্টি সেদিন থামলো না—বেলা দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে আল্‌ভারেজ্ ওঠবার হুকুম দিলে। শঙ্কর এটা আশা করে নি। এখানে শঙ্কর কর্ম্মী শ্বেতাঙ্গচরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন এই বৃষ্টিতে মিছে মিছে বার হওয়া? একটা দিনে কি এমন হবে? বৃষ্টি-মাথায় পথ চলে লাভ?

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন ওরা সারাদিন উঠল। উঠছে, উঠছে, উঠছেই—শঙ্কর আর পারে না। কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র, তাঁবু সব ভিজে একশা, একখানা রুমাল পর্য্যন্ত শুকনো নেই কোথাও—শঙ্করের কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্ব্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে

একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল, ওর তখন মনে হল—এই অজানা দেশে অজানা পর্ব্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দ্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে সে চলেছে কোথায়? আল্‌ভারেজ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরার খনিতে তার দরকার নেই। বাংলা দেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখীদের কাকলী—সে-সব যেন কতদূরের কোন্ অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি তাদের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্ম্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাংলা বলে কোনো দেশ নেই। সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে—সে আর কোথাও ফিরতে চায় না, হীরা চায় না - পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু উর্দ্ধে এক কৌমুদী-শুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী, তার চারিধারে যে সৌন্দর্য্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা কখনো দেখে নি। সে গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোনো মানুষ অনুভব করে নি। জনমানবহীন বিশাল রিখ্‌টারসভেল্ড্ পর্ব্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যান-স্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে।

সেই রাত্রে ঘুম থেকে ও ধড়মড়িয়ে উঠল আল্‌ভারেজের ডাকে। আল্‌ভারেজ ডাকছে—শঙ্কর, শঙ্কর, ওঠো বন্দুক বাগাও।

—কি-বি—

তার পর ও কান পেতে শুনলে—তাঁবুর চারিপাশে কে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোর নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েছে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারই বেশী, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনও একটু একটু জ্বলছে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর জ্যোতিও ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না।

হুড়্‌মুড় করে একটা শব্দ হল—গাছপালা ভেঙে একটা ভারী জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালালো যেন। যেন তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেছে, এখন আর অতর্কিত শিকারের সুবিধে হবে না, বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেছে।

জানোয়ারটা যাই হোক না কেন, তার যেন বুদ্ধি আছে, বিচারের ক্ষমতা আছে, মস্তিষ্ক আছে।

আল্‌ভারেজ রাইফেল হাতে টর্চ জ্বেলে বাইরে গেল। শঙ্করও গেল ওর পেছনে পেছনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, তাঁবুর উত্তর-পূর্ব্ব কোণের জঙ্গলের চারা গাছপালার ওপর দিয়ে যেন একটা ভারী স্টীম রোলার চলে গিয়েছে। আল্‌ভারেজ সেই দিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বার দুই ফ্যাওড় করলো।

কোনো দিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

তাঁবুতে ফেরবার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনের কুণ্ডের অতি নিকটেই একটা পায়ের দাগ তুজনেরই চোখে পড়ল। তিনটে মাত্র আঙুলের দাগ ভিজে মাটির ওপর সুস্পষ্ট।

এতে প্রমাণ হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় না। শঙ্করের মনে হল, যদি ওদের ঘুম না ভাঙতো, তবে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একটুও দ্বিধা করতো না—এবং তার পর কি ঘট্‌ত তা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই। আল্‌ভারেজ বললে—শঙ্কর, তুমি তোমার ঘুম শেষ করো, আমি জেগে আছি।

শঙ্কর বললে—না, তুমি ঘুমোও আল্‌ভারেজ।

আল্‌ভারেজ ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—পাগল, তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না, শঙ্কর। ঘুমিয়ে পড়ো, ঐ দেখ দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আবার ঝড়বৃষ্টি আসবে, রাত শেষ হয়ে আসছে, ঘুমোও। আমি বরং একটু কফি খাই।

রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘ-গর্জ্জন। সে বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শঙ্করের মনে হল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ হয়েছে শুরু, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেছেন বুঝি। বৃষ্টির বহর দেখে আল্‌ভারেজ পর্য্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবার নাম মুখে আনতে ভুলে গেল।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকেল পাঁচটা। বোধ হয়, বৃষ্টি না থামলেই ভাল ছিল, কারণ অমনি আল্‌ভারেজ চলা শুরু করবার হুকুম দিলে। বাঙালী ছেলের স্বভাবতঃই মনে হয়—এখন অবেলায় যাওয়া কেন? এত কি সময় বয়ে যাচ্চে? কিন্তু আল্‌ভারেজের কাছে দিন, রাত, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, অন্ধকার সব সমান। সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্যে দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় তুজনে উঠছে, উঠছে—এমন সময় আল্‌ভারেজ পেছন থেকে বলে উঠল—শঙ্কর দাড়াও ঐ দেখ—

আল্‌ভারেজ ফিল্ড গ্লাস্ দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে বাঁ পাশের পর্ব্বতশিখরের দিকে চেয়ে দেখছে। শঙ্কর ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। হ্যাঁ, সমতল খাঁজটা পাওয়া গিয়েছে। বেশী দূরেও নয়, মাইল তুইয়ের মধ্যে, বাঁদিক ঘেঁষে।

আল্‌ভারেজ হাসিমুখে বললে—দেখেছ স্যাড্‌লটা? থামবার দরকার নেই, চল আজ রাত্রেই স্যাড্‌লের ওপর পৌছে তাঁবু ফেলবো। শঙ্কর আর সত্যিই পারছে না। এ তুর্দ্ধর্ষ পর্টুগিজ্‌টার সঙ্গে হীরার সন্ধানে এসে সে কি ঝকমারি না করেছে! শঙ্কর জানে অভিযানের নিয়মানুযায়ী দলপতির হুকুমের ওপর কোনো কথা বলতে নেই। এখানে আল্‌ভারেজই দলপতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে না। কোথাও আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, পৃথিবীর ইতিহাসের বড় বড় অভিযানে সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। সেও মানবে।

অবিশ্রান্ত হাঁটবার পরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে স্যাড্‌লে যখন উঠল—শঙ্করের তখন আর এক পাও চলবার শক্তি নেই।

স্যাড্‌লটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা তুশো ফুট খাড়া উঠছে, কখনো বা

চার-পাঁচশো ফুট নেমে গেল এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড় বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাঁশ, বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের অর্কিডের ফুল ডালে ডালে। বেবুন ও কলোবাস্ বানর সর্বত্র।

আরও দুদিন ধরে ক্রমাগত নামতে নামতে ওরা রিখ্‌টারসভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে পদার্পণ করলো। শঙ্করের মনে হল, এদিকে জঙ্গল যেন আরও বেশী দুর্ভেদ্য ও বিচিত্র। আট্‌লান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে সমুদ্রবাষ্প উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পর্ব্বতে, বাকিটা আটকায় বিশাল রিখ্‌টারসভেল্ডের দক্ষিণ সানুতে—সুতরাং বৃষ্টি এখানে হয় অজস্র, গাছপালার তেজও তেমনি।

দিন পনেরো ধরে সে বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকাব সর্ব্বত্র দুজনে মিলে খুঁজেও আল্‌ভারেজ বর্ণিত পাহাড়ী নদীর কোনো ঠিকানা বার করতে পারলে না। ছোটখাটো ঝরনা দু একটা উপত্যকার ওপর দিয়ে বইছে বটে—কিন্তু আল্‌ভারেজ কেবলই ঘাড় নাড়ে আর বলে—এসব নয়।

শঙ্কর বলে—তোমার ম্যাপ গ্যাখো না ভালো করে? কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, আল্‌ভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্‌ভারেজ বলে—ম্যাপ কি হবে? আমার মনে গভীর ভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি—সে একবার দেখতে পেলেই তখুনি চিনে নেবো। এ সে জায়গাই নয়, এ উপত্যকাই নয়।

নিরুপায়। খোঁজো তবে।

এক মাস কেটে গেল। পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ্চ মাসের প্রথমে। সে কী ভয়ানক বর্ষা! শঙ্কর তার কিছু নমুনা পেয়ে এসেছে রিখ্‌টারসভেল্ড্ পার হবার সময়ে। উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে নানা বড় বড় পার্ব্বত্য ঝরনার জলধারায়। তাঁবু ফেলবার স্থান নেই। একরাত্রে হঠাৎ অতিবর্ষণের ফলে ওদের তাঁবুর সামনে একটা নিরীহ ক্ষীণকায়া ঝরনাধারা ভীমমূর্ত্তি ধারণ করে ওদের তাঁবুসুদ্ধ ওদের সুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিল—আল্‌ভারেজের সজাগ ঘুমের জন্যে সে-যাত্রা বিপদ কেটে গেল।

কিন্তু দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শঙ্কর একদিন ঘোর বিপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সে বিপদটাও বড় অদ্ভুত ধরনের।

সেদিন আল্‌ভারেজ রাইফেল্ পরিষ্কার করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল। শঙ্কর রাইফেল্ হাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।···

আল্‌ভারেজ বলে দিয়েছে তাকে এ বনে খুব সতর্ক হয়ে সাবধানে চলাফেরা করতে—আর বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে। আর একটা খুব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, সেটা এই—বনের মধ্যে বেড়াবার সময় হাতের কব্জিতে কম্পাস্ সর্ব্বদা বেঁধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথের ধারে গাছপালায় কোনো চিহ্ন রেখে যাবে, যাতে ফেরবার সময় সেই সব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পারো। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

এদিন শঙ্কর স্প্রিংবক্ হরিণের সন্ধানে গভীর বনে চলে গিয়েছে। সকালে বেরিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এক জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় সে একটু বিশ্রামের জন্য বসল।

সেখানটাতে চারিধারেই বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির মেলা, আর সব গাছেই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একপ্রকারের বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট পাতা দিয়ে এমনি নিবিড় ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে গাছগুলোকে জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রং দেখা যায় না। কাছেই একটা ছোট্ট জলার ধারে ঝাড়ে ঝাড়ে মারিপোসা লিলি ফুটে রয়েছে।

খানিকটা সেখানে বসবার পরে শঙ্করের মনে হল তার কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কি ধরনের অস্বস্তি তা সে কিছু বুঝতে পারলে না—অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে হল না—সে ক্লান্তও বটে, আর জায়গাটাও বেশ আরামেরও বটে।

কিন্তু এ তার কি হল! তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ কোথা থেকে এল? ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল নাকি?

অবসাদটা কাটাবার জন্যে সে পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বার করে ধরালে। কিসের একটা মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ বাতাসে—শঙ্করের বেশ ভাল লাগছে গন্ধটা। একটু পরে দেশলাইটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হল, হাতটা যেন তার নিজের নেই—যেন আর কারো হাত, তার মনের ইচ্ছায় সে হাত নড়ে না।

ক্রমে তার সর্ব্বশরীর যেন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল। কি হবে আর বৃথা ভ্রমণে, আলেয়ার পিছু পিছু বৃথা ছুটে, এই রকম বনের ঘন ছায়ায় নিভৃত লতাবিতানে অলস স্বপ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সুখ আর কি আছে?

একবার তার মনে হল, এই বেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাক্, নতুবা তার কোনো একটা বিপদ ঘটবে যেন। একবার সে ওঠবার চেষ্টাও করতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দেহমনব্যাপী অবসাদের জয় হল। অবসাদ নয়, যেন একটা মৃদুমধুর নেশার আনন্দ। সমস্ত জগৎ তার কাছে তুচ্ছ। সে নেশাটাই তার সারাদেহ অবশ করে আনছে ক্রমশঃ।

শঙ্কর গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে ভাল করেই শুয়ে পড়ল। বড় বড় কটন্ উড্‌গাছের ডালে শাখায় আলোছায়ার রেখা অস্পষ্ট, কাছেই কোথাও বন্য পেচকের ধ্বনি অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে যেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তারপরে কি হল শঙ্কর আর কিছু জানে না।···

আল্‌ভারেজ যখন বহু অনুসন্ধানের পর ওর অচৈতন্য দেহটা কটন্ উড্ জঙ্গলের ছায়ায় আবিষ্কার করলে, তখন বেলা বেশী নেই। প্রথমটা আল্‌ভারেজ মনে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই সর্পাঘাত—কিন্তু দেহটা পরীক্ষা করে সর্পাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ মাথার ওপরকার ডালপালা ও চারিধারে গাছপালার দিকে নজর পড়তেই অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী আল্‌ভারেজ ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে। সেখানটাতে সর্ব্বত্র অতি মারাত্মক বিষ-লতার বন (Poison Ivy), যার রসে আফ্রিকার অসভ্য মানুষেরা তীরের ফলা ডুবিয়ে নেয়।

যার বাতাস এমনি বেশ সুগন্ধ বহন করে, কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশী মাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হতে পারে, মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য্য নয়।

তাঁবুতে এসে শঙ্কর দু-তিন দিন শয্যাগত হয়ে রইল। সর্ব্বশরীর ফুলে ঢোল। মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে আর সর্ব্বদাই তৃষ্ণায় গলা কাঠ। আল্‌ভারেজ বলে—যদি তোমাকে সারা রাত ওখানে থাকতে হতো—তা হলে সকালবেলা তোমাকে বাঁচানো কঠিন হতো।

একদিন একটা ঝরনার জলধারার বালুময় তীরে শঙ্কর হলদে রঙের কি দেখতে পেলে। আল্‌ভারেজ পাকা প্রস্‌পেক্টর, সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে—কিন্তু তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হল না। সোনার পরিমাণ এত কম যে মজুরি পোষাবে না—এক টন বালি ধুয়ে আউন্স তিনেক সোনা পাওয়া হয়তো যেতে পারে।

শঙ্কর বললে—বসে থেকে লাভ কি, তবু যা সোনা পাওয়া যায়, তিন আউন্স সোনার দামও তো কম নয়!

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিস বলে মনে করেছে, অভিজ্ঞ প্রস্‌পেক্টর্ আল্‌ভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। তা ছাড়া শঙ্করের মজুরির ধারণাব সঙ্গে আল্‌ভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্য্যন্ত ও কাজ শঙ্করকে ছেড়ে দিতে হোল।

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে বেড়ালে। আজ এখানে ত্বু'দিন তাঁবু পাতে, সেখান থেকে আর এক জায়গায় উঠে যায়, সেখানে কিছুদিন তন্ন তন্ন করে চারিধার দেখবার পরে আর এক জায়গায় উঠে যায়। সেদিন অরণ্যের একটা স্থানে ওরা নতুন পৌছে তাঁবু পেতেছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে দু-একটা পাখী শিকার করে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসে দেখলে, আল্‌ভাবেজ বসে চুরুট টানছে, তার মুখ দেখে মনে হল সে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।

শঙ্কর বললে—আমি বলি আল্‌ভারেজ, তুমিই যখন বার করতে পারলে না, তখন চলো ফিরি।

আল্‌ভারেজ বললে—নদীটা তো উড়ে যায় নি, এই বন পর্ব্বতের কোনো না কোনো অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে।

—তবে আমরা বার করতে পারছি নে কেন?

—আমাদের খোঁজা ঠিকমত হচ্ছে না।

—বল কি আল্‌ভারেজ, ছ'মাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছি, আবার কাকে খোঁজা বলে?

আল্‌ভারেজ গম্ভীর মুখে বললে—কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছে কোথায় জানো, শঙ্কর? তোমাকে এখনও কথাটা বলি নি, শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় পাবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এসো আমার সঙ্গে।

শঙ্কর অধীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর পেছনে পেছনে চললো। ব্যাপারটা কি?

আল্‌ভারেজ একটু দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে—শঙ্কর, আমরা আজই এখানে এসে তাঁবু পেতেছি, ঠিক তো?

শঙ্কর অবাক হয়ে বললে—এ কথার মানে কি? আজই তো এখানে এসেছি না আবার কবে এসেছি?

—আচ্ছা, এই গাছের গুঁড়ির কাছে সরে এসে ছাখো তো?

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুঁড়ির নরম ছাল ছুরি দিয়ে খুদে কে 'D A' লিখে রেখেছে —কিন্তু লেখাটা টাট্‌কা নয়, অন্ততঃ মাসখানেকর পুরোনো।

শঙ্কর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে না। আল্‌ভারেজের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আল্‌ভারেজ বললে—বুঝতে পারলে না? এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার নামের অক্ষর ছুটি খুদে রাখি। আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝতে পারো না, তোমার কাছে সব বনই সমান। এর মানে এখন বুঝেছ? আমরা চক্রাকারে বনের মধ্যে ঘুরছি। এসব জায়গায় যখন এরকম হয়, তখন তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শক্ত।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝলে ব্যাপারটা। বললে—তুমি বলতে চাও মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসেছিলাম?

—ঠিক তাই। বড় অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। একে বলে death circle, আমার মনে মাসখানেক আগে প্রথমে সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমরা death circle-এ পড়েছি। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই গাছের ছালে ঐ অক্ষর খুদে রাখি। আজ বনের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ল।

শঙ্কর বললে—আমাদের কম্পাসের কি হল? কম্পাস থাকতে দিক্ ভুল হচ্ছে কি ভাবে রোজ রোজ?

আল্‌ভারেজ বললে—আমার মনে হয় কম্পাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। রিখ্‌টার্‌স্‌ভেল্ড্‌ পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক ঝড় ও বিদ্যুৎ হয়, তাতেই কি ভাবে ওর চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—তা হলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো?

—আমার তাই ধারণা।

শঙ্কর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, কম্পাস অকেজো, তার ওপর ওরা পড়েছে এক ভীষণ দুর্গম গহনারণ্যের মাঝে বিষম মরণ ঘূর্ণিতে। জনমানুষ নেই, খাবার নেই, জলও নেই বললেই হয়, কারণ যেখানকার সেখানকার জল যখন পানের উপযুক্ত নয়। থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম্ কার্টার এই অভিশপ্ত অরণ্যানীর মধ্যে রত্নের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কারো মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না।

আল্‌ভারেজ কিন্তু দমে যাবার পাত্রই নয়। সে দিনের পর দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূলকিনারা পায় না শঙ্কর, আগে যাও বা ছিল, ঘূর্ণিপাকে তারা ঘুরছে শোনা অবধি, শঙ্করের দিক্ সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে।

দিন তিনেক পরে ওরা একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হল, সেখানে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডের

একটি শাখা আসল পর্ব্বতমালার সঙ্গে সমকোণ করে উত্তরদিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। খুব কম হলেও সেটা ৪০০০ হাজার ফুট উঁচু। আরও পশ্চিমদিকে একটা খুব উঁচু পর্ব্বতচূড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকা তিন মাইল বিস্তীর্ণ হবে এবং এই উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা।

বনে গাছপালার যেন তিন চারটে থাক। সকলের ওপরের থাকে শুধুই পরগাছা ও শেওলা, মাঝের থাকে ছোট বড বনস্পতির ভিড, নীচের থাকে ঝোপঝাপ, ছোট ছোট গাছ। সূর্য্যের আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে।

আল্ভারেজ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু ফেলতে বললে। সন্ধ্যার সময় ওরা কফি খেতে খেতে পরামর্শ করতে বসল যে, এখন কি করা যাবে। খাবার একদম ফুরিয়েছে, চিনি অনেকদিন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আর দু-এক দিন পরে কফিও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনও আছে—কিন্তু আর কিছুই নেই। ময়দা এই জন্যে আছে, যে ওরা ও জিনিসটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান ভরসা বন্য জন্তুর মাংস কিন্তু সঙ্গে যখন ওদের গুলি-বারুদের কারখানা নেই, তখন শিকারের ভরসাই বা চিরকাল করা যায় কি করে?

কথা বলতে বলতে শঙ্কর দূরের যে পাহাডের চূড়াটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে, সেদিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল। এই সময়ে অল্পক্ষণের জন্যে মেঘ সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। চূড়াটার অদ্ভুত চেহারা, যেন একটা কুলপী বরফের আগার দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেছে।

আল্ভারেজ বললে—এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বুলাওয়েও কি সল্স্বেরী চারশো থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে। মধ্যে শ-দুই মাইল মরুভূমি। পশ্চিম দিকে উপকূল তিনশো মাইলের মধ্যে বটে, কিন্তু পর্টুগিজ্ পশ্চিম আফ্রিকা অতি ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সেদিকের কথা বাদ দাও। এখন আমাদের উপায় হচ্ছে, হয় তুমি নয় আমি সল্স্বেরী কি বুলাওয়েও চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কিনে আনি। কম্পাসও চাই।

আল্ভারেজের মুখের এই কথাটা বড শুভক্ষণে শঙ্কর শুনেছিল। দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা মানুষে কি সব সময়ে বোঝে? দৈবক্রমে 'বুলাওয়েও' ও 'সল্স্বেরী' দুটো শহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিক ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শঙ্করের কানে গেল। এর পর যে কতবার মনে মনে আল্ভারেজকে ধন্যবাদ দিয়েছিল, এই নাম দুটো বলবার জন্যে।

কথাবার্ত্তা সেদিন বেশী অগ্রসর হল না। দুজনেই পরিশ্রান্ত ছিল, সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করলে।

আট

মাঝ রাত্রে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। কি একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কি একটা কাণ্ড কোথায় ঘটছে বনে। আল্‌ভারেজও বিছানায় উঠে বসেছে। দুজনেই কান-খাড়া করে শুনলে—বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কি হচ্ছে বাইরে?

শঙ্কর তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে বাইরে আসছিল, আল্‌ভারেজ বারণ করলে। বললে—এসব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ওরকম তাড়াতাড়ি তাবুর বাইরে যেও না, তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায়?

তাঁবুর বাইরে রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে—

বন্য জন্তুর দল গাছপালা ভেঙে উর্দ্ধশ্বাসে উন্মত্তের মত দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পূবদিকে পাহাড়টার দিকে চলেছে। হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। দুটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁষে ছুটে পালালো। আরও আসছে ···দলে দলে আসছে···ধাড়ী ও মাদী কলোবাস্ বাঁদর দলে দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেছে। সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটছে!···আর সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে—চাপা, গম্ভীর, মেঘগর্জ্জনের মত শব্দটা—কিংবা দূরে কোথাও হাজারটা জয়ঢাক যেন একসঙ্গে বাজ্‌ছে!

ব্যাপার কি! দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলে। দুজনেই অবাক্। আল্‌ভারেজ বললে—শঙ্কর, আগুনটা ভাল করে জ্বালো—নয়তো বন্যজন্তুর দল আমাদের তাঁবুসুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথার ওপরেও পাখীর দল বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা স্প্রিংবক্ হরিণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওরা দুজনে তখন এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ব্যাপার দেখে যে, এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল। এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনো দেখে নি!

শঙ্কর আল্‌ভারেজকে কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাবে, তার পরেই—প্রলয় ঘট্‌ল। অন্ততঃ শঙ্করের তো তাই বলেই মনে হলো। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন নিকটেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাট্‌লো।

আল্‌ভারেজ মাটি থেকে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে বললে—ভূমিকম্প!

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হল, রাত্রির অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে, পঞ্চাশ হাজার বাতির এমন বিজ্‌লি আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে!

তারপর তাদের নজর পড়ল, দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েছে। রাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুন-রাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠছে পাহাড়ের চূড়ো থেকে দু-হাজার আড়াই

হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচুতে—সঙ্গে সঙ্গে কি বিশ্রী গন্ধকের উৎকট নিঃশ্বাস-রোধকারী গন্ধ বাতাসে!

আল্‌ভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে বলে উঠল—আগ্নেয়গিরি। সাণ্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা!

কিন্তু অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না ওরা খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি একসঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রঙমশালে একসঙ্গে আগুন দিয়েছে, শঙ্করের মনে হল। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে মাঝে নীচু হয়ে যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, অমনি দপ্‌ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেই সঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটার আওয়াজ।

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপছে, যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কেবল টলে টলে পড়তে হয়। শঙ্কর তো টলতে টলতে তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকলো—ঢুকে দেখে একটা ছোট কুকুর-ছানার মত জীব তার বিছানায় একসঙ্গে গুটিসুটি হয়ে ভয়ে কাঁপছে। শঙ্করের টর্চের আলোয় সেটা থতমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটো মণির মত জ্বলতে লাগল। আল্‌ভারেজ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বললে—নেকড়ে বাঘের ছানা! রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েছে যখন প্রাণের ভয়ে।

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখে নি, তা থেকে বিপদ আসতে পারে ওদের জানা নেই—কিন্তু আল্‌ভারেজের কথা ভাল করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ কি প্রচণ্ড ভারী জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের জ্বলন্ত কয়লার মত রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের ওপর এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটাও জ্বলে উঠেছে—তখন আল্‌ভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে—পালাও, পালাও, শঙ্কর—তাঁবু ওঠাও—শীগ্‌গির—

ওরা তাঁবু ওঠাতে ওঠাতে আরও দু-পাঁচখানা আগুন-রাঙা জ্বলন্ত ভারী পাথর এদিকে ওদিকে সশব্দে পড়ল। নিঃশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনি ঘন গন্ধকের ধূম বাতাসে ছড়িয়েছে।

দৌড়…দৌড়…দৌড়। দু-ঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক টেনে হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে পূবদিকের সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌঁছুলো। সেখানে পর্য্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করলে। ওরা পাহাড়ের ওপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড় গাছের তলায়, দুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল।

সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের সে ভীষণ সৌন্দর্য্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর-পড়া যেন বাড়লো। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিহি ধূসরবর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়ছে…গাছপালা লতাপাতার ওপর দেখতে দেখতে পাত্‌লা একপুরু ছাই জমে গেল।

সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চললো—আবার রাত্রি এল। নিম্নের উপত্যকা ভূমির অত বড় হেমলক্ গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তরবর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য্য, কতদূর পর্য্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে পর্ব্বতের অগ্নিকটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেছে। কিন্তু সেই রাঙা আগুনভরা বাষ্পের মেঘ তখনও সেই রকমই দীপ্ত হয়ে আছে।

রাত দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুণ্ডটা উড়ে গিয়েছে—নীচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিলে। আল্‌ভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল। ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পেছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শঙ্কর ভাবছিল—এই জনহীন অরণ্য অঞ্চলে এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেতো না, যদি তারা না থাকতো। সভ্য জগৎ জানেও না আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েছে। কুল্‌পী বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েছে।

আল্‌ভারেজ ম্যাপ দেখে বললে—এটা আগ্নেয়গিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবত বহু বৎসর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শঙ্কর বললে—কি নাম ?

আল্‌ভারেজ বললে—এর নাম লেখা আছে 'ওল্‌ডোনিও লেঙ্গাই'—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে 'অগ্নিদেবের শয্যা'। নামটা দেখে মনে হয়, এ অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের কাছে এ পাহাড়ের আগ্নেয়-প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধ হয় তার পর দু-একশো বছর কিংবা তারও বেশীকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব, প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন, এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা। আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।

নয়

আগ্নেয় পর্ব্বতের অত কাছে বাস করা আল্‌ভারেজ উচিত বিবেচনা করলে না। ওল্‌ডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধূমায়িত শিখরদেশের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, তারা আরও পশ্চিম ঘেঁষে চলতে লাগল। সেদিকের গহন অরণ্যে আগুনের আঁচটিও লাগে নি, বর্ষার জলে সে অরণ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট গাছপালার ও লতাঝোপের সমাবেশে। ছোট বড় কত ঝরনাধারা ও পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেছে—তাদের মধ্যে একটাও আল্‌ভারেজের পূর্ব্ব-পরিচিত নয়।

এইবার এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হল, যেখানে চারিদিকেই চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড় ও প্রত্যেক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের গুহা। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য রিখ্‌টারসভেল্ডের সাধারণ দৃশ্য থেকে একটু অন্যরকম। এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্তু খুব বড় বড় গাছ চারিদিকে, আর যেখানে সেখানে পাহাড় ও গুহা।

একটা উঁচু ঢিবির মত গ্রানাইটের পাহাড়ের ওপর ওরা তাঁবু ফেলে রইল। এখানে এসে পর্য্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েছে জায়গাটা ভাল নয়। কি একটা অস্বস্তি, মনের মধ্যে কি একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভাল করে নিজে বুঝতে, না পারে আল্‌ভারেজকে বোঝাতে।

একদিন আল্‌ভারেজ বলল—সব মিথ্যে শঙ্কর, আমরা এখনও বনের মধ্যে ঘুরছি। আজ সেই গাছটা আবার দেখছি, সেই D. A. লেখা। অথচ তোমার মনে আছে, আমরা যতদূর সম্ভব পশ্চিমদিক ঘেঁষেই চলেছি আজ পনেরো দিন। কি করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পারি?

শঙ্কর বললে—তবে এখন কি উপায়?

—উপায় আছে। আজ রাত্রে একটা বড় গাছের মাথায় উঠে নক্ষত্র দেখে দিক্‌নির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে থেকো।

শঙ্কর একটা কথা বুঝতে পারছিল না। তারা যদি চক্রাকারে ঘুরছে, তবে এই অনুচ্চ শৈলমালা ও গুহার দেশে কি করে এল? এ অঞ্চলে তো কখনো আসে নি বলেই মনে হয়। আল্‌ভারেজ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাম খোদাই দেখে সে আর কখনো তার পূর্ব্বে আসবার চেষ্টা করে নি। পূর্বদিকে মাইল দুই এলেই এই স্থানটাতে ওরা পৌঁছুতো।

সে রাত্রে শঙ্কর একা তাঁবুতে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ছিল। এই একখানাই বাংলা বই সে দেশ থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পড়লেও সময় পেলেই আবার পড়ে।

কতদূরে ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোগল-রাজপুতের বিবাদ। এই অজানা মহাদেশের অজানা মহা অরণ্যানীর মধ্যে বসে সে-সব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।

তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শঙ্কর প্রথমটা ভাবলে, আল্‌ভারেজ গাছ থেকে নেমে ফিরে আসছে বোধ হয়—কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ মানুষের স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ দু-পায়ে থলে জড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষে ঘষে টেনে টেনে চললে যেন এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব। আল্‌ভারেজের উইন্‌চেস্টার রিপিটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেটা তাঁবুর দরজার দিকে বাগিয়ে বসলো। বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল—পরেই আবার তাঁবুর দক্ষিণ পাশ থেকে বাঁদিকে এল। একটা কোনো বড় প্রাণীর যেন ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল—ঠিক যেমন পর্ব্বত পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটেছিল, ঠিক এই রকমই। শঙ্কর একটু ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেল ছুঁড়ে বসলো। একবার·· দুবার—

সঙ্গে সঙ্গে মিনিট দুই পরে দূরের গাছের মাথা থেকে প্রত্যুত্তরে দুবার রিভল্‌ভারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আল্‌ভারেজ মনে ভেবেছে, শঙ্করের কোনো বিপদ উপস্থিত, নতুবা রাত্রে খামোকা বন্দুক ছুঁড়বে কেন? বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমেই আসছে।

এদিকে চারিদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজে জানোয়ারটা বোধ হয় পালিয়েছে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। শঙ্কর টর্চ্চ জেলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবলে, আল্‌ভারেজকে সঙ্কেতে গাছ থেকে নামতে বারণ করবে, এমন সময় কিছুদূরে বনের মধ্যে হঠাৎ আবার দুবার পিস্তলের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

শঙ্কর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। কিছুদূরে গিয়েই দেখলে বনের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় আল্‌ভারেজ শুয়ে। টর্চ্চের আলোয় তাকে দেখে শঙ্কর শিউরে উঠল ভয়ে বিস্ময়ে—তার সর্ব্বশরীর রক্তমাখা, মাথাটা বাকী শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে, গায়ের কোটটা ছিন্নভিন্ন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। ডাকলে—আল্‌ভারেজ! আল্‌ভারেজ!

আল্‌ভারেজের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার যেন নড়ে উঠল, কি যেন বলতে গেল; সে শঙ্করের দিকে চেয়েই আছে, অথচ সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই; অথবা কেমন যেন নিস্পৃহ, উদাস দৃষ্টি।

শঙ্কর ওকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল। মুখে জল দিল, তার পর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে, গলার নীচে কাঁধের দিকে খানিকটা জায়গার মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। সারা পিঠটার সেই অবস্থা। কোন এক অসাধারণ বলশালী জন্তু তীক্ষ্ণধার নখে বা দন্তে পিঠখানা চিরে ফালা ফালা করেছে।

পাশেই নরম মাটিতে কোনো জন্তুর পায়ের দাগ।

তিনটে মাত্র আঙুল সে পায়ে।

সারারাত্রি সেই ভাবেই কাটল, আল্‌ভারেজের সাড়া নেই, সংজ্ঞা নেই। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এল। শঙ্করের দিকে বিস্ময়ের ও অচেনার দৃষ্টিতে

চেয়ে দেখলে, যেন এর আগে সে কখনো শঙ্করকে দেখে নি। তার পরে আবার চোখ বুজল। দুপুরের পর খুব সম্ভবতঃ নিজের মাতৃভাষায় কি সব বকতে শুরু করল, শঙ্কর এক বর্ণও বুঝতে পারলে না। বিকেলের দিকে সে হঠাৎ শঙ্করের দিকে চাইলে। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের মনে হল, সে ওকে চিনতে পেরেছে। এইবার ইংরেজীতে বললে—শঙ্কর! এখনও বসে আছ? তাঁবু ওঠাও—চল যাই—। তার পর অপ্রকৃতিস্থের মত নির্দ্দেশহীন ভঙ্গিতে হাত তুলে বললে—রাজার ঐশ্বর্য্য লুকোনো রয়েছে ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে—তুমি দেখতে পাচ্ছ না—আমি দেখতে পাচ্ছি। চল আমরা যাই—তাঁবু ওঠাও—দেরি কোরো না।

এই আল্‌ভারেজের শেষ কথা।

* * * *

তার পর কতক্ষণ শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যা হল, একটু একটু করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

শঙ্করের তখন চমক ভাঙ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আগে আগুন জ্বাললে, তার পর দুটো রাইফেলে টোটা ভরে, তাঁবুর দোরের দিকে বন্দুকের নল বাগিয়ে, আল্‌ভারেজের মৃতদেহের পাশে একখানা শতরঞ্চির ওপর বসে রইল।

তার পর সে রাত্রে আবার নামলো তেমনি ভীষণ বর্ষা। তাঁবুর কাপড় ফুঁড়ে জল পড়ে জিনিসপত্র ভিজে গেল। শঙ্কর তখন কিন্তু এমন হয়ে গিয়েছে যে, তার কোন দিকে দৃষ্টি নেই। এই ক'মাসে সে আল্‌ভারেজকে সত্যিই ভালবেসেছিল, তার নির্ভীকতা, তার সঙ্কল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব – শঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। সে আল্‌ভারেজকে নিজের পিতার মত ভালবাসতো। আল্‌ভারেজও তাকে তেমনি স্নেহের চোখেই দেখতো।

কিন্তু এসবের চেয়েও শঙ্করের মনে হচ্ছে বেশী যে, আল্‌ভারেজ মারা গেল শেষকালে সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটারই হাতে। ঠিক জিম্ কার্টারের মতই।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তার মন ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সম্মুখে ভীষণ অজানা মৃত্যুদূত—ঘোর রহস্যময় তার অস্তিত্ব। কখন সে আসবে, কখন বা যাবে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। ঘুমে ঢুলে না পড়ে, শঙ্কর মনের বলে জেগে বসে রইল সারা রাত।

ওঃ সে কি ভীষণ রাত্রি! যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ রাত্রির কথা সে ভুলবে না। গাছে গাছে, ডালে ডালে, হাজারধারায় বৃষ্টি-পতনের শব্দে ও একটানা ঝড়ের শব্দে অরণ্যানীর অন্য সকল নৈশ শব্দকে আজ ডুবিয়ে দিয়েছে, পাহাড়ের ওপর বড় গাছ মড়্ মড়্ করে ভেঙে পড়ছে। এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে সে একা এই ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে! কালো গাছের গুঁড়িগুলো যেন প্রেতের মত দেখাচ্ছে, অত বড় বৃষ্টিতেও জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে। সম্মুখে বন্ধুর মৃতদেহ। ভয় পেলে চলবে না। সাহস আনতেই হবে মনে, নতুবা ভয়েই সে মারা যাবে। সাহস আনবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে রাইফেল্ দুটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে।

একটা উইন্‌চেস্টার, অপরটি ম্যান্‌লিকার—দুটোরই ম্যাগাজিনে টোটা ভর্ত্তি। এমন কোনো শরীরধারী জীব নেই, যে এই দুই শক্তিশালী অতি ভয়ানক মারণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে আজ রাত্রে অক্ষতদেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে।

ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শঙ্কর সারারাত সজাগ পাহারা দিল। পরদিন সকালে আল্‌ভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড় গাছের তলায় সমাধিস্থ করলে এবং দুখানা গাছের ডাল ক্রুশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির ওপর তা পুঁতে দিলে।

আল্‌ভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টো খনি-বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আল্‌ভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওর কথাবার্ত্তায় অনেক সময়ই শঙ্করের সন্দেহ হতো যে, সে নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী, ভবঘুরে নয়।

লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনহীন, গহন অরণ্যে ক্লান্ত আল্‌ভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হল। তার মত লোকেরা রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গায় চিরকাল আট্‌কে রাখতে পারতো না।

দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির ওপর। সিংহ, গরিলা, হায়েনা সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবারই ওপরে, সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্‌ পর্ব্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।

দশ

সেদিন·সে-রাত্রিও কেটে গেল। শঙ্কর এখন দুঃসাহসে মরীয়া হয়ে উঠেছে। যদি তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে না। দু-দিন সে কোথাও না গিয়ে তাঁবুতে বসে মন স্থির করে ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কি করবে! হঠাৎ তার মনে হল, আল্‌ভারেজের সেই কথাটা—সল্‌স্‌বেরি···এখান থেকে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আন্দাজ পাঁচ-ছশো মাইল······

সল্‌স্‌বেরি!···দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানী সল্‌স্‌বেরি। যে করে হোক, পৌছুতেই হবে তাকে সল্‌স্‌বেরিতে। সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে, তার জন্মকোষ্ঠীতে লেখা আছে। এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না।

* * * *

শঙ্কর ম্যাপগুলো খুব ভাল করে দেখলে। পর্টুগিজ গবর্নমেণ্টের ফরেস্ট্‌ সার্ভের ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল মেরিন্ সার্ভের তৈরী উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আল্‌ভারেজের হাতে আঁকা ও জিম্ কার্টারের সইযুক্ত একখানা জীর্ণ বিবর্ণ খসড়া নক্সা। আল্‌ভারেজ বেঁচে থাকতে সে এই সব ম্যাপ বুঝতে একবারও ভাল

করে চেষ্টা করে নি, এখন এগুলো বোঝার ওপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সল্‌স্‌বেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে। এ স্থান থেকে তার অবস্থিতি-বিন্দুর দিক্ নির্ণয় করতে হবে, রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ অরণ্যের এ গোলকধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে—সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে।

অনেক দেখবার শোনবার পরে ও বুঝতে পারলে এই অরণ্য পর্ব্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই—এক আল্‌ভারেজের ও জিম কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া। তাও এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে, শঙ্করের পক্ষে তা প্রায় দুর্ব্বোধ্য। কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায়।

চতুর্থ দিন শঙ্কর সে-স্থান ত্যাগ করে আন্দাজ মত পূর্ব্বদিকে রওনা হল। যাবার আগে কিছু বনের ফুলের মালা গেঁথে আল্‌ভারেজের সমাধির ওপর অর্পণ করলে।

'বুশ্ ক্র্যাফ্‌ট্' বলে একটা জিনিস আছে। সুবিস্তীর্ণ, বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময়ে এ বিদ্যা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আল্‌ভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোরাঘুরি করার ফলে, শঙ্কর কিছু কিছু 'বুশ্ ক্র্যাফ্‌ট্' শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জ্জন করেছে? শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভাল হয় বন পার হতে পারে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয়—মৃত্যু।

দুটো তিনটে ছোট পাহাড সে পার হয়ে চলল। বন কখনো গভীর, কখনো পাতলা। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির আর শেষ নেই। শঙ্করের জানা ছিল যে, দীর্ঘ এলিফ্যাণ্ট্ ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে বনের প্রান্তসীমায় পৌছানো গিয়েছে। কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এলিফ্যাণ্ট্ বা টুসক্ ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যাণ্ট্ ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে—শুধুই বনস্পতি আর নীচু বনঝোপ।

প্রথম দিন শেষ হল এক নিবিড়তর অরণ্যের মধ্যে। শঙ্কর জিনিসপত্র প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসেছিল, কেবল আল্‌ভারেজের ম্যান্‌লিকার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের বোতল, টর্চ্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একখানা কম্বল ও সামান্য কিছু ঔষধ সঙ্গে নিয়েছিল —আর নিয়েছিল একটা দড়ির দোল্‌না। তাঁবুটা যদিও খুব হাল্‌কা, কিন্তু তা সে বয়ে আনা অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে।

দুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে সে দড়ির দোল্‌না টাঙালে এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছতলায় আগুন জ্বালালে। দোল্‌নায় শুয়ে বন্দুক হাতে জেগে রইল কারণ ঘুম অসম্ভব। একে ভয়ানক মশা, তার ওপর সন্ধ্যার পর থেকেই গাছতলার কিছুদূর দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত শুরু করলে। গভীর অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা; শঙ্কর টর্চ্চের আলো ফেলে, পালিয়ে যায়, আবার আধঘণ্টা পরে ঠিক সেই-খানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। শঙ্করের ভয় হল, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো বা লাফ

দিয়ে দোল্‌নায় উঠে আক্রমণ করবে। চিতাবাঘ অতি ধূর্ত্ত জানোয়ার। কাজেই সারারাত্রি শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। তার ওপর চারিধারে নানা বন্য জন্তুর রব। একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালকবালিকার খিল্‌খিল হাসির রবে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ও চমকে জেগে উঠল। ছেলেমেয়েরা হাসে কোথায়? এই জনমানবহীন অরণ্যে বালকবালিকাদের যাতায়াত করা বা এত রাত্রে হাসা উচিত নয় তো? পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একজাতীয় বেবুনের ডাক ঠিক ছেলেপুলের হাসির মত শোনায়, আল্‌ভারেজ একবার গল্প করেছিল। প্রভাতে সে গাছ থেকে নেমে রওনা হল। বৈমানিকেরা যাকে বলেন 'ফ্লাইং ব্লাইণ্ড্'—সে এইভাবে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, দু চোখ বুজে। এই দুদিন চলেই সে সম্পূর্ণভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে—আর তার উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম জ্ঞান নেই। সে বুঝলে কোনো মহারণ্যে দিক্ ঠিক রেখে চলা কি ভীষণ কঠিন ব্যাপার! তোমার চারিপাশে সব সময়েই গাছের গুঁড়ি, অগণিত, অজস্র, তার লেখাজোখা নেই। তোমার মাথার ওপর সব সময় ডালপালা লতাপাতার চন্দ্রাতপ। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন গোধূলি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, ঐ একই ব্যাপার। এদিকে কম্পাস অকেজো, কি করে দিক ঠিক রাখা যায়?

*　　　*　　　*　　　*

পঞ্চম দিনে একটা পাহাড়ের তলায় এসে সে বিশ্রামের জন্যে থামল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে এঁকে বেঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

অত বড় গুহা কখনো না দেখার দরুন, একটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই সে জিনিসপত্র বাইরে রেখে গুহার মধ্যে ঢুকলো। গুহার মুখে খানিকটা আলো—ভেতরে বড় অন্ধকার, টর্চ্চ জেলে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে, সে ক্রমশঃ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছুলো, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আর দুটো মুখ। ওপরের দিকে টর্চ্চ উঠিয়ে দেখলে, ছাদটা অনেকটা উঁচু। সাদা শক্ত নুনের মত ক্যালসিয়াম কার্ব্বোনেটের সরু মোটা ঝুরি ছাদ থেকে ঝাড়লণ্ঠনের মত ঝুলছে।

গুহার দেওয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণধারায় ঝরে পড়ছে। শঙ্কর ডাইনের গুহায় ঢুকলো, সেটা ঢুকবার সময় সরু, কিন্তু ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে পাথর নয়, ভিজে মাটি। টর্চ্চের আলোয় ওর মনে হল, গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের ভূমির এক কোণে আর একটা গুহামুখ। সেটা দিয়ে ঢুকে শঙ্কর দেখলে সে যেন দুধারে পাথরের উঁচু দেওয়াল-ওয়ালা একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে এসেছে। গলিটা আঁকাবাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলেছে—শঙ্কর অনেক দূর চলে গেল গলিটা ধরে।

ঘণ্টা দুই এতে কাটলো। তার পর সে ভাবলে, এবার ফেরা যাক্। কিন্তু ফিরতে গিয়ে

সে আর কিছুতেই সেই ত্রিভুজাকৃতি গুহাটা খুঁজে পেল না। কেন, এই তো সেই গুহা থেকেই এই সরু গুহাটা বেরিয়েছে, সরু গুহা তো শেষ হয়েই গেল—তবে সে ত্রিভুজ গুহা কৈ?

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শঙ্করের হঠাৎ কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে গুহার পথ হারিয়ে ফেলে নি তো? সর্ব্বনাশ!

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে—না, ভয় পেলে তার চলবে না। স্থির বুদ্ধি ভিন্ন এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। মনে পড়ল, আল্‌ভারেজ তাকে বলে দিয়েছিল, অপরিচিত স্থানে বেশীদূর অগ্রসর হবার সময়ে পথের পাশে সে যেন কোন চিহ্ন রেখে যায়, যাতে আবার সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে। এ উপদেশ সে ভুলে গিয়েছিল। এখন উপায়?

টর্চ্চের আলো জ্বালতে তার আর ভরসা হচ্ছে না। যদি ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তবে নিরুপায়। গুহার মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য। সেই দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথ খুঁজে বার করা তো দূরের কথা।

সারাদিন কেটে গেল—ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটা। এদিকে টর্চ্চের আলো রাঙা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ভীষণ গুমট গরম গুহার মধ্যে, তা ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথরের দেওয়াল বেয়ে যে জল চুঁয়ে পড়ছে, তার আস্বাদ—কষা, ক্ষার, ঈষৎ লোনা। তার পরিমাণও বেশী নয়। জিব দিয়ে চেটে খেতে হয় দেওয়ালের গা থেকে।

বাইরে অন্ধকার হয়েছে নিশ্চয়ই, সাড়ে সাতটা বাজলো। আটটা, নটা, দশটা। তখনও শঙ্কর পথ হাতড়াচ্ছে—টর্চ্চের পুরোনো ব্যাটারি জ্বলছে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবার সে এত ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে, শঙ্কর ভয়ে আরও উন্মাদের মত হয়ে উঠল। এই আলো যতক্ষণ, তার প্রাণের ভরসাও ততক্ষণ—নতুবা এ রৌরব নরকের মত মহা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই—স্বয়ং আল্‌ভারেজও পারতো না।

টর্চ্চ নিবিয়ে ও চুপ করে একখানা পাথরের ওপর বসে রইল। এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতেও পারতো, যদি আলো থাকতো—কিন্তু অন্ধকারে সে কি করে এখন? একবার ভাবলে, রাত্রিটা কাটুক না, দেখা যাবে এখন। পরক্ষণেই মনে হল—তাতে আর কি সুবিধে হবে? এখানে দিন রাত্রি সমান।

অন্ধকারেই সে দেওয়াল ধরে ধরে চলতে লাগলো—হায়, হায়, কেন গুহায় ঢুকবার সময় দুটো নতুন ব্যাটারি সঙ্গে নেয় নি! অন্ততঃ একটা দেশলাই!

ঘড়ি হিসেবে সকাল হল। গুহার চির অন্ধকারে আলো জ্বললো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে ওর। বোধ হয়, এই গুহার অন্ধকারে ওর সমাধি অদৃষ্টে লেখা আছে, দিনের আলো আর দেখতে হবে না। আল্‌ভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রক্ততৃষ্ণা মেটে নি, তাকেও চাই।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। শঙ্কর জুতোর সুকতোলা চিবিয়ে খেয়েছে, একটা

আরসুলা, কি ইঁদুর, কি কাঁকড়াবিছে—কোনো জীব নেই গুহার মধ্যে যে সে ধরে খায়। মাথা ক্রমশঃ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আসছে, তার জ্ঞান নেই সে কি করছে বা তার কি ঘটছে—কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞান রয়েছে যে তাকে এ গুহা থেকে যে করে হোক বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন নির্জীব দেহেও অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়েই বেড়াচ্ছে, মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ওইরকমই হাতড়াবে।

একবার সে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে সে জেগে উঠল, তা সে জানে না; দিন, রাত্রি, ঘণ্টা, দণ্ড, পল মুছে গিয়েছে এই ঘোর অন্ধকারে। হয়তো বা তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে, কে জানে?

ঘুমোবার পরে সে যেন একটু বল পেল। আবার উঠল, আবার চলল, আল্‌ভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত-পা কোলে করে বসে কখনই মরবে না।...সে পথ খুঁজবে, খুঁজবে, যতক্ষণ বেঁচে আছে।

আশ্চর্য্য, সে নদীটাই বা কোথায় গেল?...গুহার মধ্যে গোলকধাঁধাঁয় ঘোরবার সময়ে জলধারাকে সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। নদী দেখতে পেলে হয়তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে পারে, কারণ তার এক মুখ যেদিকেই থাক্, একটা মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা, একটা অতি ক্ষীণ জলধারার সঙ্গেও আজ তিন দিন পরিচয় নেই। জল অভাবে শঙ্কর মরতে বসেছে, কষা, লোনা, বিস্বাদ জল চেটে চেটে তার জিব ফুলে উঠেছে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েছে ছাড়া কমে নি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শঙ্কর খুঁজতে লাগল, ভিজে দেওয়ালের গায়ে কোথাও শেওলা জন্মেছে কি না—খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। না, তাও নেই! পাথরের দেওয়াল সর্ব্বত্র অনাবৃত—মাঝে মাঝে ক্যাল্‌সিয়াম্ কার্ব্বোনেটের পাতলা সর পড়েছে। একটা ব্যাঙের ছাতা, কি শেওলাজাতীয় উদ্ভিদও নেই। সূর্য্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে না।

আরও একদিন কেটে রাত এল। এত ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না। ওর মনে হতাশা ঘনিয়ে এসেছে। আরও সে কি চলবে, কতক্ষণ চলবে? এতে কোনো ফল নেই, এ চলার শেষ নেই। কোথায় সে চলেছে এই গাঢ় নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে, এই ভয়ানক নিস্তব্ধতার মধ্যে! উঃ, কি ভয়ানক অন্ধকার, আর কি ভয়ানক নিস্তব্ধতা! পৃথিবী যেন মরে গিয়েছে, সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য্য নিভে গিয়েছে, সেই মৃত পৃথিবীর জনহীন, শব্দহীন, সময়হীন শ্মশানে সে-ই একমাত্র প্রাণী বেঁচে আছে।

আর বেশীক্ষণ এ-রকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

এগারো

শঙ্কর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়, কিম্বা হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকবে। মোটের ওপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ঘড়িতে বারোটা—সম্ভবতঃ রাত বারোটাই হবে। ও উঠে আবার চলতে শুরু করলে। এক জায়গায় তার সামনে একটা পাথরের দেওয়াল পড়ল—তার রাস্তা যেন আটকে রেখেছে। টর্চ্চের রাঙা আলো একটিবার মাত্র জ্বালিয়ে সে দেখলে, যে দেওয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাচ্ছিল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে এ দেওয়ালটা আড়াআড়ি ভাবে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে কান খাড়া করলে· অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?

হ্যাঁ···ঠিক, জলের শব্দই বটে···কুলু, কুলু, কুলু, কুলু—ঝরনা-ধারার শব্দ—যেন পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে বেধে জল বইছে কোথাও। ভাল করে শুনে ওর মনে হল, জলের শব্দটা হচ্ছে এই পাথরের দেওয়ালের ওপারে। দেওয়ালে কান পেতে শুনে ওর সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। দেওয়াল ফুঁড়ে যাবার উপযুক্ত ফাঁক আছে কিনা, টর্চ্চের রাঙা আলোয় সন্ধান করতে করতে এক জায়গায় খুব নীচু ও সংকীর্ণ প্রাকৃতিক রন্ধ্র দেখতে পেলে। সেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেকলো। সন্তর্পণে ওপরের দিকে হাত দিয়ে বুঝলো, সেখানটাতে দাঁড়ানো যেতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা যেতেই, স্রোতযুক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেল।···

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নীচু হয়ে, ও প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল পান করে নিলে। তার পর টর্চ্চের ক্ষীণ আলোয় জলের স্রোতের গতি লক্ষ্য করলে। এ ধরনের নির্ঝরের স্রোতের উজান দিকে গুহার মুখ সাধারণতঃ হয় না। টর্চ্চ নিবিয়ে সেই মহা নিবিড় অন্ধকারে পায়ে পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে চললো। নির্ঝর চলেছে এঁকে বেঁকে, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। এক জায়গায় যেন সেটা তিন-চারটে ছোট বড় ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গিয়েছে, ওর মনে হল।

সেখানে এসে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। টর্চ্চ জ্বেলে দেখলে স্রোত নানামুখী। আল্‌ভারেজের কথা মনে পড়ল, পথে চিহ্ন রেখে না গেলে, এখানে আবার গোল পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নীচু হয়ে চিহ্ন রেখে যাওয়ার উপযোগী কিছু খুঁজতে গিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ, নির্ম্মল জলধারায় এপারে ওপারে দুপারেই এক ধরনের পাথরের নুড়ি বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের পাথরের নুড়ির ওপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেছে।

অনেকগুলো নুড়ি পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখাটা শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে, দুটো নুড়ি ধারার পাশে রাখতে রাখতে গেল। একটা স্রোত থেকে খানিকদূর গিয়ে আবার

অনেকগুলো ফেকড়ি বেরিয়েছে। প্রত্যেক সংযোগ-স্থলে ও নুড়ি সাজিয়ে একটা 'S' অক্ষর তৈরী করে রাখলে।

অনেকগুলো স্রোতশাখা আবার ঘুরে শঙ্কর যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকেই যেন ঘুরে গেল। পথে চিহ্ন না রেখে গিয়েই শঙ্করের মাথা গোলমাল হয়ে যাবার যোগাড় হল। একবার শঙ্করের পায়ে খুব ঠাণ্ডা কি ঠেকতেই, সে আলো জ্বেলে দেখলে, জলের ধারে এক প্রকাণ্ডকায় অজগর পাইথন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পাইথন ওর স্পর্শে আলস্য পরিত্যাগ করে মাথাটা উঠিয়ে কড়ির দানার মত চোখে চাইতেই টর্চ্চের আলোয় দিশাহারা হয়ে গেল—নতুবা শঙ্করের প্রাণ-সংশয় হয়ে উঠতো। শঙ্কর জানে অজগর সর্প অতি ভয়ানক জন্তু —বাঘ সিংহের মুখ থেকেও হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, অজগর সর্পের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একটিবার লেজ ছুঁড়ে পা জড়িয়ে ধরলে আর দেখতে হতো না।

এবার অন্ধকারে চলতে ওর ভয়ানক ভয় করছিল। কি জানি, আবার কোথায় কোন্ পাইথন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে! দুটো তিনটে স্রোতশাখা পরীক্ষা করে দেখবার পরে ও তার কৃত চিহ্নের সাহায্যে পুনরায় সংযোগস্থলে ফিরে এল। প্রধান সংযোগস্থলে ও নুড়ি দিয়ে একটা ক্রুশচিহ্ন করে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে মনে হল, সেটা ধরে চলতে গিয়ে দেখলে সেও সোজামুখে যায় নি। তারও নানা ফেকড়ি বেরিয়েছে কিছুদূরে গিয়েই। এক-এক জায়গায় গুহার ছাদ এত নীচু হয়ে নেমে এসেছে যে কুঁজো হয়ে, কোথাও বা মাজা দুমড়ে, অশীতিপর বৃদ্ধের ভঙ্গিতে চলতে হয়।

হঠাৎ এক জায়গায় টর্চ্চ জ্বেলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও শঙ্কর বুঝতে পারলে, গুহাটা সেখানে ত্রিভুজাকৃতি—সেই ত্রিভুজ গুহা, যাকে খুঁজে বার না করতে পেরে, মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল। একটু পরেই দেখলে বহুদূরে যেন অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র জ্বলছে। গুহার মুখ! এবার আর ভয় নেই। এ-যাত্রার মত সে বেঁচে গেল।

*   *   *   *

শঙ্কর যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন রাত তিনটে। সেখানটায় গাছপালা কিছু কম, মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ দেখা যায়। রৌরবের মহা অন্ধকার থেকে বার হয়ে এসে রাত্রির নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ অন্ধকার তার কাছে দীপালোকখচিত নগরপথের মত মনে হল। প্রাণভরে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে, এ অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে।

ভোর হল। সূর্য্যের আলো গাছের ডালে ডালে ফুটলো। শঙ্কর ভাবলে এ অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ডও সে থাকবে না। পকেটে একখানা পাথরের নুড়ি তখনও ছিল, ফেলে না দিয়ে গুহার বিপদের স্মারক স্বরূপ সেখানা সে কাছে রেখে দিলে।

পরদিন এলিফ্যান্ট্ ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল। রাত্রে শঙ্কর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে। সামনে যে মুক্ত প্রান্তরবৎ দেশ পড়ল, এখান থেকে সেটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসী

নদীর তীর পর্য্যন্ত। এই তিনশো মাইলের খানিকটা পড়েছে বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায় ১৭৫ মাইল, অতি ভীষণ, জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। মিলিটারি ম্যাপ থেকে আল্‌ভারেজ নোট করেছে যে, এই অঞ্চলের উত্তরপূর্ব্ব কোণ লক্ষ্য করে একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে, মাঝামাঝি পার হতে যাওয়াব মানেই মৃত্যু। ম্যাপে এর নাম দিয়েছে 'তৃষ্ণার দেশ' (Thirstland Trek)। রোডেসিয়া পৌঁছুতে পারলে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সে-সব স্থানে মানুষ আছে।

শঙ্কর এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলে। পথের এই ভয়ানক অবস্থা জেনে-শুনেও সে দমে গেল না, হাত-পা-হারা হয়ে পড়ল না। এই পথে আল্‌ভারেজ একা গিয়ে সল্‌স্‌বেরি থেকে টোটা ও খাবার কিনে আনবে বলেছিল। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ যা পারবে বলে স্থির করেছিল, সে তা থেকে পিছিয়ে যাবে ?

কিন্তু সাহস ও নির্ভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিক্ নির্ণয় করার ক্ষমতা শঙ্করের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে কিছুই বোঝে না। মিলিটারি ম্যাপগুলোতে দুটো মরুমধ্যস্থ কূপের অবস্থান-স্থানের ল্যাটিচিউড্ লঙ্গিচিউড্ দেওয়া আছে, 'ম্যাগ্‌নেটিক্ নর্থ' আর 'ট্রু নর্থ' ঘটিত কি একটা গোলমেলে অঙ্ক কষে বার করতো আল্‌ভারেজ, শঙ্কর দেখেছে কিন্তু শিখে নেয় নি।

সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি ? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই শঙ্কর এই দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হল। ফলে, দুদিন যেতে না যেতেই শঙ্কর সম্পূর্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ম্যাপ-দৃষ্টে যে কোনো অভিজ্ঞ লোক যে জলাশয় চোখ বুজে খুঁজে বার করতে পারতো—শঙ্কর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার জল ফুরিয়ে এসেছে, নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে জীবন বিপদাপন্ন হবে।

প্রথমতঃ শুধু প্রান্তর আর পাহাড়, ক্যাক্‌টাস্ ও ইউফোবিয়ার বন, মাঝে মাঝে গ্রানাইটের স্তূপ। তার পর কি ভীষণ কষ্টের সে পথ-চলা! খাদ্য নেই, জল নেই, পথ ঠিক নেই, মানুষের মুখ দেখা নেই। দিনের পর দিন শুধু সুদূর, শূন্য-দিগ্বলয় লক্ষ্য করে সে হতাশ পথ-যাত্রা—মাথার ওপর আগুনের মত সূর্য্য, পায়ের নীচে বালি পাথর যেন জলন্ত অঙ্গার, সূর্য্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে—নক্ষত্র উঠছে, চাঁদ উঠছে—আবার অস্ত যাচ্ছে। মরুভূমির গিরগিটি একঘেয়ে সুরে ডাকছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে—সন্ধ্যায়, গভীর নিশীথে।

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল অতিক্রম করা হল তার হিসেব নেই। খাদ্য দু-একটা পাখী, কখনো বা মরুভূমির বুজার্ড শকুনি, যার মাংস অর্থর ও বিস্বাদ। এমন কি একদিন একটা পাহাড়ী বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে, যার দংশনে মৃত্যু—তাও যেন পরম সুখাদ্য, মিললে মহা সৌভাগ্য।

দুদিন ঘোর তৃষ্ণায় কষ্ট পাবার পরে পাহাড়ের ফাটলে একটা জলাশয় পাওয়া গেল। কিন্তু জলের চেহারা লাল, কতকগুলো কি পোকা ভাসছে জলে—ডাঙায় একটা কি জন্তু মরে পচে ঢোল হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে শঙ্কর প্রাণ বাঁচালে।

দিনের পর দিন কাটছে—মাস গেল, কি সপ্তাহ গেল, কি বছর গেল, হিসেব নেই। শঙ্কর রোগা হয়ে গিয়েছে শুকিয়ে। কোথায় চলেছে তার কিছু ঠিক নেই—শুধু সামনের দিকে যেতে হবে এই জানে। সামনের দিকেই ভারতবর্ষ—বাংলা দেশ।

তার পর পড়ল আসল মরু, কালাহারি মরুভূমির এক অংশ। দূর থেকে তার চেহারা দেখে শঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠলো। মানুষ কি করে পার হতে পারে এই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তর! শুধুই বালির পাহাড়, তাম্রাভ কটা বালির সমুদ্র। ধূ-ধূ করে যেন জলছে দুপুরের রোদে। মরুর কিনারায় প্রথম দিনেই ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রী উত্তাপ উঠল থার্মোমিটারে।

ম্যাপে বার বার লিখে দিয়েছে, উত্তর-পূর্ব্ব কোণ ঘেঁষে ছাড়া কেউ এই মরুভূমি মাঝামাঝি পার হতে যাবে না। গেলেই মৃত্যু, কারণ সেখানে জল একদম নেই। জল যে উত্তরপূর্ব্ব ধারে আছে তাও নয়, তবে ত্রিশ মাইল, সত্তর মাইল ও নব্বুই মাইল ব্যবধানে তিনটি স্বাভাবিক উণুই আছে—যাতে জল পাওয়া যায়, ঐ উণুইগুলি প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, খুঁজে বার করা বড়ই কঠিন। এইজন্যে মিলিটারি ম্যাপে ওদের অবস্থান স্থানের অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে।

শঙ্কর ভাবলে, ওসব বার করতে পারবো না। সেক্সটাণ্ট্ আছে, নক্ষত্রের চার্ট আছে কিন্তু তাদের ব্যবহার সে জানে না। যা হয় হবে, ভগবান ভরসা। তবে যতদূর সম্ভব উত্তর-পূর্ব্ব কোণ ঘেঁষে যাবার চেষ্টা সে করলে।

তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উণুই দেখতে পেল। জল কাদাগোলা, আগুনের মত গরম, কিন্তু তাই তখন অমৃতের মত দুর্লভ। মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে উঠল। কোন প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে গেল। আগে রাত্রে আলো জ্বাললে দু-একটা কীটপতঙ্গ আলোয় আকৃষ্ট হয়ে আসতো, ক্রমে তাও আর আসে না।

দিনে উত্তাপ যেমন ভীষণ, রাত্রে তেমনি শীত। শেষ রাত্রে শীতে হাত-পা জমে যায় এমন অবস্থা, অথচ ক্রমশঃ আগুন জ্বালাবার উপায় গেল, কারণ জ্বালানি কাঠ একেবারেই নেই। কয়েক দিনের মধ্যে সঞ্চিত জল গেল ফুরিয়ে। সে সুবিস্তীর্ণ বালুকা-সমুদ্রে একটি পরিচিত বালুকণা খুঁজে বার করা যতদূর অসম্ভব, তার চেয়ে অসম্ভব ক্ষুদ্র এক হাত-দুই ব্যাসবিশিষ্ট জলের উণুই বার করা।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণার কষ্টে শঙ্কর উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণে শঙ্কর বুঝেছে যে, এ ভীষণ মরুভূমি একা পার হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার শামিল। সে এমন জায়গায় এসে পড়েছে, যেখান থেকে ফেরবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির ওপর উঠে সে দেখলে, চারিধারে শুধুই কটা বালির পাহাড়, পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমে সূর্য্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ সূর্য্যাস্তের আভায় লাল। কিছুদূরে একটা ছোট ঢিবির মত পাহাড় এবং দূর থেকে মনে হল একটা গুহাও আছে। এ ধরনের গ্রানাইটের ছোট ঢিবি এদেশে সর্ব্বত্র—ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায়

এদের নাম 'Kopje' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। রাত্রে শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শঙ্কর সেই গুহায় আশ্রয় নিলে।

এইখানে এক ব্যাপার ঘটল।

বারো

গুহার মধ্যে ঢুকে শঙ্কর টর্চ জেলে (নতুন ব্যাটারি তার কাছে তখনও ডজন-দুই ছিল) দেখলে গুহাটা ছোট, মেঝেটাতে ছোট ছোট পাথর ছড়ানো, বেশ একটা ছোটখাটো ঘরের মত। গুহার এক কোণে ওর চোখ পড়তেই অবাক হয়ে রইল। একটা ছোট্ট কাঠের পিপে! এখানে কি করে এল কাঠের পিপে!

এগিয়ে দু-পা গিয়েই চম্‌কে উঠল। গুহার দেওয়ালের ধার ঘেঁসে শায়িত অবস্থায় একটা সাদা নরকঙ্কাল, তার মুণ্ডটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো। কঙ্কালের আশে-পাশে কালো কালো থলে-ছেঁড়ার মত জিনিস, বোধ হয় সেগুলো পশমের কোটের অংশ। দুখানা বুট জুতো কঙ্কালের পায়ে এখনও লাগানো। একপাশে একটা মরচে-পড়া বন্দুক।

পিপেটার পাশে একটা ছিপি-আঁটা বোতল। বোতলের মধ্যে একখানা কাগজ। ছিপিটা খুলে কাগজখানা বার করে দেখলে, তাতে ইংরিজিতে কি লেখা আছে।

পিপেটাতে কি আছে দেখবার জন্যে যেমন সে সেটা নাড়াতে গিয়েছে, অমনি পিপের নীচে থেকে একটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনে ওর শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু হয়ে ঠেলে উঠল। বোধ হয়, ছোবল মারবার আগে সাপটা এক সেকেণ্ড দেরি করেছিল। সেই এক সেকেণ্ডের দেরি করার জন্যে শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হল। পরমুহূর্ত্তেই শঙ্করের '৪৫ অটোমেটিক কোল্ট্ গর্জ্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অতবড় ভীষণ বিষধর 'স্যাণ্ড্ ভাইপার'-এর মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে, রক্ত-মাংস খানিকটা পিপের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেওয়ালে ছিটকে লাগল। আল্‌ভারেজ ওকে শিখিয়েছিল, পথে সর্ব্বদা হাতিয়ার তৈরী রাখবে। এ উপদেশ অনেকবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

অদ্ভুত পরিত্রাণ। সব দিক থেকে। পিপেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একটু জল তখনও আছে। খুব কালো শিউ গোলার মত রং বটে, তবুও জল। ছোট পিপেটা উঁচু করে ধরে, পিপের ছিপি খুলে ঢক্ ঢক্ করে শঙ্কর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মত জল আকণ্ঠ পান করলে। তারপর সে টর্চ্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে। পুরো পাঁচ হাত লম্বা সাপটা, মোটাও বেশ। এ ধরনের সাপ মরুভূমির বালির মধ্যে লুকিয়ে শুধু মুণ্ডটা ওপরে তুলে থাকে—অতি মারাত্মক রকমের বিষাক্ত সর্প!

এইবার বোতলের মধ্যের কাগজখানা খুলে মন দিয়ে পড়লে। যে ছোট পেন্সিল দিয়ে

এটা লেখা হয়েছে—বোতলের মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল। কাগজখানাতে লেখা আছে "

"আমার মৃত্যু নিকট। আজই আমার শেষ রাত্রি। যদি আমার মরণের পরে, কেউ এই ভয়ঙ্কর মরুভূমির পথে যেতে যেতে এই গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে সম্ভবতঃ এই কাগজ তাঁর হাতে পড়বে।

আমার গাধাটা দিন দুই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা গিয়েছে। এক পিপে জল তার পিঠে ছিল, সেটা আমি এই গুহার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি, যদিও জ্বরে আমার শরীর অবসন্ন। মাথা তুলবার শক্তি নেই। তার ওপর অনাহারে শরীর আগের থেকেই দুর্ব্বল!

আমার বয়স ২৬ বৎসর। আমার নাম আত্তিলিও গাত্তি। ফ্লোরেন্সের গাত্তি বংশে আমার জন্ম। বিখ্যাত নাবিক রিওলিনো কাভালকান্তি গাত্তি—যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে তুর্কীদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তিনি আমার একজন পূর্ব্বপুরুষ।

রোম ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভবঘুরে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায়,—যা আমাদের বংশগত নেশা।

ডাচ্ ইণ্ডিজ যাবার পথে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ-ডুবি হল।

আমরা সাতজন লোক অতিকষ্টে ডাঙা পেলাম। ঘোর জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রিকার এই পশ্চিম উপকূল! জঙ্গলের মধ্যে শেফুজাতির এক গ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় দু-মাস সেখানে থাকি। এখানেই দৈবাৎ এক অদ্ভুত হীরার খনির গল্প শুনলাম। পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত ও ভীষণ আরণ্য অঞ্চলে নাকি এই হীরার খনি অবস্থিত।

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হীরার খনি যে করে হোক, বার করতে হবেই। আমাকে ওরা দলের অধিনায়ক করলে—তারপর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পার্ব্বত্য অঞ্চলে। সে গ্রামের কোন লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হল না। তারা বলে, তারা কখনও সে জায়গায় যায় নি, কোথায় তা জানে না, বিশেষতঃ এক উপদেবতা নাকি সে বনের রক্ষক। সেখান থেকে হীরা নিয়ে কেউ আসতে পারবে না।

আমরা দমবার পাত্র নই। পথে যেতে যেতে ঘোর কষ্টে বেঘোরে দুজন সঙ্গী মারা গেল। বাকী চারজন আর অগ্রসর হতে চায় না। আমি দলের অধ্যক্ষ, গাত্তি বংশে আমার জন্ম, পিছু হটতে জানি না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, এগিয়ে যেতে হবে এই জানি। আমি ফিরতে চাইলাম না।

শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। আজ রাত্রেই আসবে সে নিরবয়ব মৃত্যুদূত। বড় সুন্দর আমাদের ছোট্ট হ্রদ সেরিনো লাগ্রানো, ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ, কাস্টেলি রিওলিনি। এতদূর থেকেও আমি সেরিনো লাগ্রানোর তীরবর্তী কমলালেবুর বাগানের লেবুফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি। ছোট যে গির্জ্জাটি পাহাড়ের নীচেই, তার রূপোর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি।

না, এসব কি আবোল-তাবোল লিখছি জ্বরের ঘোরে! আসল কথাটা বলি। কতক্ষণই বা আর লিখবো?

আমরা সে পর্ব্বতমালা, সে মহাদুর্গম অরণ্যে গিয়েছিলাম। সে খনি বার করেছিলাম। যে নদীর তীরে হীরা পাওয়া যায়, এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে নদীর উৎপত্তি স্থান। আমি সেই গুহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তীরে ও জলের মধ্যে পাথরের নুড়ির মত অজস্র হীরা ছড়ানো দেখতে পাই। প্রত্যেক নুড়িটি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল, স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ ; লণ্ডন ও আমস্টার্ডামের বাজারে এমন হীরা নেই।

এই অরণ্য ও পর্ব্বতের সে উপদেবতাকে আমি এই গুহার মধ্যে দেখেছি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয়, দূর থেকে আবছায়া ভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা। জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘেঁষে নি। এই গুহাতেই সে সম্ভবতঃ বাস করে। হীরার খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সেই জন্যেই বোধ হয় হয়েছে।

কিন্তু কি কুক্ষণেই হীরার সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কি কুক্ষণেই সঙ্গীদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম। ওদের নিয়ে আবার যখন সে গুহায় ঢুকি, হীরার খনি খুঁজে পেলাম না। একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না, তার ওপরে বহুমুখী নদী, কোন্ স্রোতটার ধারা হীরার রাশির ওপর দিয়ে বইছে, কিছুতেই বার করতে পারলাম না আর।

আমার সঙ্গীরা বর্ব্বর, জাহাজের খালাসী। ভাবলে, ওদের ফাঁকি দিলাম বুঝি। আমি একা নেবো এই বুঝি আমার মতলব। ওরা কি ষড়যন্ত্র আঁটলে জানি নে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা চারজনে মিলে অতর্কিতে ছুরি খুলে আমায় আক্রমণ করলে। কিন্তু তারা জানতো না আমাকে, আত্তিলিও গাত্তিকে। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইছে, আমার পূর্ব্বপুরুষ রিওলিনি কাভালকান্তি গাত্তির—যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু বর্ব্বরকে নরকে পাঠিয়েছিলেন। সান্টা কাটালিনার সামরিক বিদ্যালয়ে যখন আমি ছাত্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ Fencer এণ্টোনিও ড্রেফুসকে ছোরার ডুয়েলে জখম করি। আমার ছোরার আঘাতে ওরা দুজন মরে গেল, দুজন সাংঘাতিক ঘায়েল হল, নিজেও আমি চোট পেলাম ওদের হাতে। আহত বদমাইশ দুটোও সেই রাত্রেই ভবলীলা শেষ করল। ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গোলকধাঁধার ভেতর থেকে খনি খুঁজে হয়তো বার করতে পারবো না। তা ছাড়া আমি সাংঘাতিক আহত, আমায় সভ্যজগতে পৌঁছুতেই হবে। পূর্ব্বদিকের পথে ডাচ্ উপনিবেশে পৌঁছবো বলে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে পারলুম না। ওরা তলপেটে ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে। সেই সঙ্গে জ্বর। মানুষের কি লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা আমাকে মারলে? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের ফাঁকি দেওয়ার কথা আমার মনে আসে নি!

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হীরকখনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেছি। যিনি আমার এ লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ ও খ্রীস্টান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি যেন খ্রীস্টানের উপযুক্ত কবর দেন। এই অনুগ্রহের বদলে ঐ খনির স্বত্ব আমি তাঁকে দিলাম। রাণী শেবার ধনভাণ্ডারও এ খনির কাছে কিছু নয়।

প্রাণ গেল, যাক্, কি করবো? কিন্তু কি ভয়ানক মরুভূমি এ! একটা ঝিঁঝিঁ পোকার

ডাক পর্য্যন্ত নেই কোনদিকে! এমন সব জায়গাও থাকে পৃথিবীতে! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে, পপ্‌লার ঘেরা সেরিনো লাগ্রানো হ্রদ আর দেখবো না, তার ধারে যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গির্জ্জাটা, তার সেই বড় রূপোর ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনি, পাহাড়ের ওপরে আমাদের যে প্রাচীন প্রাসাদ কাস্টোলি রিওলিনি, মুরদের দুর্গের মত দেখায়···দূরে আম্‌ব্রিয়ার সবুজ মাঠ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে···যাক্, আবার কি প্রলাপ বকছি!

গুহার দুয়ারে বসে আকাশের অগণিত তারা প্রাণভরে দেখছি শেষ বারের জন্যে।···সাধু ফ্রাঙ্কোর সেই সৌর স্তোত্র মনে পড়ছে—স্তুত হোন প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়ু তরে, ভগিনী মেদিনী তরে, নীল মেঘ তরে, আকাশের তরে, তারকা-সমূহ তঁরে, সুদিন-কুদিন তরে, দেহের মরণ তরে।

আর একটা কথা। আমার দুই পায়ের জুতোর মধ্যে পাঁচখানা বড় হীরা লুকানো আছে, তোমায় তা দিলাম হে অজানা পথিক বন্ধু। আমার শেষ অনুরোধটি ভুলো না। জননী মেরী তোমার মঙ্গল করুন।

কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গাত্তি

১৮৮০ সাল। সম্ভবতঃ মার্চ্চ মাস।"

* * * *

হতভাগ্য যুবক!

তার মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর চলে গিয়েছে, এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ পথে হয়তো কেউ যায় নি, গেলেও গুহাটার মধ্যে ঢোকে নি। এতকাল পরে তার চিঠিখানা মানুষের হাতে পড়ল।

আশ্চর্য্য এই যে কাঠের পিপেটাতে ত্রিশ বছর পরেও জল ছিল কি করে?

কিন্তু কাগজখানা পড়েই শঙ্করের মনে হল, এই লেখায় বর্ণিত ঐটেই সেই গুহা—সে নিজে যেখানে পথ হারিয়ে মারা যেতে বসেছিল! তার পরে সে কৌতূহলের সঙ্গে কঙ্কালের পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই পাঁচখানা বড় বড় পাথর বেরিয়ে পড়ল। এ অবিকল সেই পাথরের নুড়ির মত, যা এক-পকেট কুড়িয়ে অন্ধকারে, গুহার মধ্যে সে পথে চিহ্ন করেছিল এবং যার একখানা তার কাছে রয়েছে। এ পাথরের নুড়ি তো রাশি রাশি সে দেখেছে গুহার মধ্যের সেই অন্ধকারময়ী নদীর জলস্রোতের নীচে, তার দুই তীরে! কে জানতো যে হীরার খনি খুঁজতে সে ও আল্‌ভারেজ সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার হয়ে এসে, ছ'মাস ধরে রিখটার্‌স্‌ভেল্ড পার্ব্বত্য অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়েছে—এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সেখানে গিয়ে পড়বে! হীরা যে এমন রাশি রাশি পড়ে থাকে পাথরের নুড়ির মত—তাই বা কে ভেবেছিল! আগে এসব জানা থাক্‌লে, পাথরের নুড়ি সে দু-পকেট ভরে কুড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসতো!

কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গিয়েছে যে, সে রত্নখনির গুহা যে কোথায়, কোন

দিকে তার কোনো নক্সা করে আনে নি বা সেখানে কোনো চিহ্ন রেখে আসেনি, যাতে আবার তাকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সেই সুবিস্তীর্ণ পর্ব্বত ও আরণ্য অঞ্চলের কোন্ জায়গায় সেই গুহাটা দৈবাৎ সে দেখেছিল, তা কি তার ঠিক আছে, না ভবিষ্যতে সে আবার সে জায়গা বার করতে পারবে? এ যুবকও তো কোনো নক্সা করে নি, কিন্তু এ সাংঘাতিক আহত হয়েছিল রত্নখনি আবিষ্কার করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। হয়তো এ যা বার করতে পারতো নক্সা না দেখে—সে তা পারবে না।

হঠাৎ আল্ভারজের মৃত্যুর পূর্ব্বের কথা শঙ্করের মনে পড়ল। সে বলেছিল—চলো যাই, শঙ্কর, গুহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার লুকানো আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি।...

শঙ্কর তার পরে গুহার মধ্যেই নরকঙ্কালটা সমাধিস্থ করলে। পিপেটা ভেঙে ফেলে তারই দুখানা কাঠে মরচে-পড়া পেরেক ঠুকে ক্রুশ তৈরী করলে ও সমাধির ওপর সেই ক্রুশটা পুঁতলে। এ ছাড়া খ্রীস্টধর্ম্মাচারীকে সমাধিস্থ করবার অন্য কোন রীতি তার জানা নেই। তার পরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, এই মৃত যুবকের আত্মার শান্তির জন্য।

এসব শেষ করতে সারাদিনটা কেটে গেল। রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন আবার সে রওনা হল। কঙ্কালের চিঠিখানা ও হীরাগুলি যত্ন করে সঙ্গে নিল।

তবে তার মনে হয়, ও অভিশপ্ত হীরার খনির সন্ধানে যে গিয়েছে, সে আর ফেরেনি। আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা মরেছে, জিম কার্টার মরেছে, আল্ভারেজ মরেছে। এর আগেই বা কত লোক মরেছে, তার ঠিক কি? এইবার তার পালা। এই মরুভূমিতেই তার শেষ, এই বীর ইটালিয়ান যুবকের মত।

তেরো

দুপুরের রোদে যখন দিকে দিগন্তে আগুন জলে উঠল, একটা ছোট্ট পাথরের ঢিবির আড়ালে সে আশ্রয় নিলে। ১৩৫° ডিগ্রি উত্তাপ উঠেছে তাপমান যন্ত্রে, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ উত্তাপে পথ হাঁটা চলে না। যদি সে কোন রকমে এই ভয়ানক মরুভূমির হাত এড়াতে পারতো, তবে হয়তো জীবন্ত মানুষের আবাসে পৌছুতেও পারতো। সে ভয় করে শুধু এই মরুভূমি, সে জানে কালাহারি মরু বড বড় সিংহের বিচরণভূমি, কিন্তু তার হাতে রাইফেল আছে—রাতদুপুরেও একা যত সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে না—কিন্তু ভয় হয় তৃষ্ণা-রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। দুপুরে সে দুবার মরীচিকা দেখলে। এতদিন মরুপথে আসতেও এ আশ্চর্য্য নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে নি, বইয়েই পড়েছিল মরীচিকার কথা। একবার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, একবার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, দুই মরীচিকাই কিন্তু প্রায় এক রকম—অর্থাৎ একটা বড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বা গির্জ্জা, চারিপাশে খর্জ্জুরকুঞ্জ, সামনে বিস্তৃত জলাশয়। উত্তর-পূর্ব্ব কোণের মরীচিকাটা বেশী স্পষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে দূরদিগন্তে মেঘমালার মত পর্ব্বতমালা দেখা গেল। শঙ্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না। পূর্ব্বদিকে একটাই মাত্র বড় পর্ব্বত, এখান থেকে দেখা পাওয়া সম্ভব, দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রান্তবর্তী চিমানিমানি পর্ব্বতমালা। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, সে বিশাল কালাহারি পদব্রজে পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেছে। না ও-ও মরীচিকা ?

কিন্তু রাত দশটা পর্য্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রে সে দূর-পর্ব্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেল। অসংখ্য ধন্যবাদ হে ভগবান, মরীচিকা নয় তবে। জ্যোৎস্নারাত্রে কেউ কখনো মরীচিকা দেখে নি।

তবে কি প্রাণের আশা আছে ? আজ পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নখনির মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে সে তার স্বত্ব অর্জ্জন করেছে। দরিদ্র বাংলা মায়ের বুকে সে যদি আজ বেঁচে ফেরে !

দুদিনের দিন বিকালে সে এসে পর্ব্বতের নীচে পৌছুলো। তখন সে দেখলে, পর্ব্বত পার হওয়া ছাড়া ওপারে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই। নইলে পঁচিশ মাইল মরুভূমিতে পাড়ি দিয়ে পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আসতে হবে। মরুভূমির মধ্যে সে আর কিছুতেই যেতে রাজি নয়। সে পাহাড় পার হয়েই যাবে।

এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে। সে ভুলে গেল যে সাড়ে বারো হাজার ফুট একটা পর্ব্বতমালা ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পার হওয়ার মতই শক্ত। তার চেয়েও শক্ত, কারণ সেখানে আল্‌ভারেজ ছিল, এখানে সে একা।

শঙ্কর ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না, ফলে চিমানিমানি পর্ব্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসলো, ভীষণ প্রজ্বলন্ত কালাহারি পার হতে গিয়েও সে অমন ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয় নি।

চিমানিমানি পর্ব্বতের জঙ্গল খুব বেশী ঘন নয়। শঙ্কর প্রথম দিন অনেকটা উঠল—তার পর একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে কোনদিকে যাবার উপায় নেই। কোন্ পথটা দিয়ে উঠেছিল সেটাও আর খুঁজে পেলে না—তার মনে হল, সে সমতলভূমির যে জায়গা দিয়ে উঠেছিল, তার ত্রিশ ডিগ্রী দক্ষিণে চলে এসেছে। কেন যে এমন হল, এর কারণ কিছুতেই সে বার করতে পারলে না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল, কখনও উঠছে, কখনও নামছে, সূর্য্য দেখে দিক ঠিক করে নিচ্ছে, কিন্তু সাত-আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতদিন লাগছে কেন ?

তৃতীয় দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল। তার আগের দিন একখানা আল্‌গা পাথর গড়িয়ে তার পায়ে চোট লেগেছিল। তখন তত কিছু হয় নি, পরদিন সকালে আর সে শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাঁটু ফুলেছে, বেদনাও খুব। দুর্গম পথে নামা-ওঠা করা এ অবস্থায় অসম্ভব। পাহাড়ের একটা ঝরনা থেকে ওঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনেছিল, তাই একটু একটু করে খেয়ে চালাচ্ছে। পায়ের বেদনা কমে না যাওয়া পর্য্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। বেশীদূর যাওয়া চলবে না। সামান্য একটু-আধটু চলাফেরা

করতেই হবে খাদ্য ও জলের চেষ্টায়, ভাগ্যে পাহাড়ের এই স্থানটা যেন খানিকটা সমতলভূমির মত, তাই রক্ষা।

এই সব অবস্থায়, এই মনুষ্যবাসহীন পাহাড়ে বিপদ তো পদে পদেই। একা এ পাহাড় টপকাতে গেলে যে কোনো ইউরোপীয় পর্যটকেরও ঠিক এই রকম বিপদ ঘটতে পারতো।

শঙ্কর আর পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে কি একটা রোগ হয়েছে, একটু হাঁটলেই ধড়াস্ ধড়াস্ করে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় ধাক্কা মারে। অমানুষিক পথশ্রমে, দুর্ভাবনায়, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, কখনও বা অনাহারের কষ্টে, ওর শরীরে কিছু নেই।

চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। খাদ্য নেই কাল থেকে। রাইফেল্ সঙ্গে আছে, কিন্তু একটা বন্য জন্তুর দেখা নেই। দুপুরে একটা হরিণকে চরতে দেখে ভরসা হয়েছিল, কিন্তু রাইফেলটা তখন ছিল পঞ্চাশ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে হরিণটা পালিয়ে গেল। জল খুব সামান্যই আছে, চামড়ার বোতলে। এ অবস্থায় নেমে সে ঝরণা থেকে জল আনবেই বা কি করে? হাঁটুটা আরও ফুলেছে। বেদনা এত বেশী যে, একটু চলাফেরা করলেই মাথার শির পর্য্যন্ত ছিঁড়ে পড়ে যন্ত্রণায়।

পরিষ্কার আকাশতলে আর্দ্রতাশূন্য বায়ুমণ্ডলের গুণে অনেকদূর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিক্‌চক্রবালে মেঘলা করে ঘিরেছে নীল পর্ব্বতমালা দূরে দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ কালাহারি। দক্ষিণে ওয়াহকুহকু পর্ব্বত, তারও অনেক পেছনে মেঘের মত দৃশ্যমান পল ক্রুগার পর্ব্বতমালা—সল্‌স্‌বেরির দিকে কিছু দেখা যায় না, চিমানিমানি পর্ব্বতের এক উচ্চতর শৃঙ্গ সেদিকে দৃষ্টি আট্‌কেছে।

আজ দুপুর থেকে ওর মাথার ওপর শকুনির দল উড়েছে। এতদিন এত বিপদেও শঙ্করের যা হয় নি, আজ শকুনির দল মাথার ওপর উড়তে দেখে শঙ্করের সত্যই ভয় হয়েছে। ওরা তাহলে কি বুঝেছে যে শিকার জোটবার বেশী দেরি নেই?

সন্ধ্যার কিছু পরে কি একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, পাশের শিলাখণ্ডের আড়ালে একটা ধূসর রঙের নেকড়ে বাঘ—নেকড়ের লম্বা ছুঁচালো কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, সাদা সাদা দাঁতের ওপর দিয়ে রাঙা জিবটা অনেকখানি বার হয়ে লক্ লক্ করছে। চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট্ করে পাথরের আড়াল থেকে সরে দূরে পালালো।

নেকড়ে বাঘটাও তাহলে কি বুঝেছে? পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে।

হাড়ভাঙা শীত পড়লো রাত্রে। ও কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে। অগ্নিকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার বাইরে ঘন অন্ধকার।

কি একটা জন্তু এসে অগ্নিকুণ্ড থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে দেহ মিশিয়ে চুপ করে বসলো। কোয়োট্, বন্যকুকুর জাতীয় জন্তু। ক্রমে আর একটা, আর দুটো, আর তিনটে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দশ-পনেরোটা এসে জমা হল। অন্ধকারে তার চারিধার ঘিরে

নিঃশব্দে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে।

কি সব অমঙ্গলজনক দৃশ্য!

ভয়ে ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সত্যিই কি এতদিনে তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে!

এতদিন পরে এল তা হলে! সে-ও পারলে না রিখ্‌টার্‌স্‌ভেল্ড্‌ থেকে হীরে নিয়ে পালিয়ে যেতে!

উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে। হীরের খনি বাদ যাক্‌, তার সঙ্গে যে ছখানা হীরে রয়েছে, তার দাম অন্ততঃ দু-তিন লক্ষ টাকা নিশ্চয় হবে। তার গরীব গ্রামে, গরীব বাপ-মায়ের বাড়ী যদি এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারতো·· কত গরীবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারতো, গ্রামে কত দরিদ্র কুমারীকে বিবাহের যৌতুক দিয়ে ভাল পাত্রে বিবাহ দিত, কত সহায়হীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শেষ দিন ক'টা নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারতো···

কিন্তু সে-সব ভেবে কি হবে, যা হবার নয়? তার চেয়ে এই অপূর্ব্ব রাত্রির নক্ষত্রালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল পর্ব্বত ও মরুভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রূপ, মৃত্যুর আগে শঙ্করও চায় চোখ ভরে দেখতে, সেই ইটালিয়ান্‌ যুবক গাত্তির মত। ওরা যে অদৃষ্টের এক অদৃশ্য তারে গাঁথা সবাই, আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা, জিম্‌ কার্টার, আল্‌ভারেজ, সে

রাত গভীর হয়েছে। কি ভীষণ শীত!···একবার সে চেয়ে দেখলে, কোয়োটগুলো এরই মধ্যে কখন আরও নিকটে সরে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগুলো জ্বলছে। শঙ্কর একখানা জলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই ওরা সব দূরে সরে গেল—কিন্তু কি নিঃশব্দ ওদের গতিবিধি আর কি অসীম তাদের ধৈর্য্যও! শঙ্করের মনে হল, ওরা জানে শিকার ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলায় সেই ধূসর নেক্‌ড়ে বাঘটাও দু-দুবার এসে কোয়োটদের পেছনে অন্ধকারে বসে দেখে গিয়েছে।

একটুও ঘুমুতে ভরসা হল না ওর। কি জানি কোয়োট্‌ আর নেক্‌ড়ের দল হয়তো তা হলে জীবন্তই তাকে ছিঁড়ে খাবে মৃত মনে করে। অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে তাকে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসলেও উপায় নেই। মাঝে মাঝে কোয়োট্‌গুলো এগিয়ে এসে বসে, ও জলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সবে যায়···দু-একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিলে···হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কি ভীষণ জ্বলছে!

কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়েছে। জনবিরল বর্ব্বর দেশের জনশূন্য পর্ব্বতের সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে সে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় বসে···গভীর রাত, ঘোর অন্ধকার···সামান্য আগুন জ্বলছে···মাথার ওপর জলকণাশূন্য শুষ্ক বায়ুমণ্ডলের গুণে আকাশের অগণ্য তারা জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে যেন ইলেক্‌ট্রিক আলোর মত···নীচে তার চারিধার ঘিরে অন্ধকারে মাংসলোলুপ নীরব কোয়োট্‌, হায়েনার দল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এটাও মনে হল, বাংলার পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ায় ধুঁকে সে মরছে না। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু। পদব্রজে কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছে সে—একা। মরে

গিয়ে চিমানিমানি পর্ব্বতের শিলায় নাম খুদে রেখে যাবে। সে একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক। অত বড় হীরের খনি সে-ই তো খুঁজে বার করেছে! আল্‌ভারেজ মারা যাওয়ার পরে, সেই বিশাল অরণ্য ও পর্ব্বত অঞ্চলের গোলকধাঁধা থেকে সে একাই পার হতে পেরে এতদূর এসেছে! এখন সে নিরুপায়, অসুস্থ, চলৎশক্তি-রহিত। তবুও সে যুঝছে, ভয় তো পায় নি, সাহস তো হারায় নি! কাপুরুষ, ভীরু নয় সে। জীবন-মৃত্যু তো অদৃষ্টের খেলা। না বাঁচলে তার দোষ কি?

* * * *

দীর্ঘ রাত্রি কেটে গিয়ে পুবদিকে ফরসা হল। সঙ্গে সঙ্গে বন্য জন্তুর দল কোথায় পালালো। বেলা বাড়ছে, আবার নির্ম্মম সূর্য্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে শুরু করেছে দিক্‌বিদিক্। সঙ্গে সঙ্গে শকুনির দল কোথা থেকে এসে হাজির। কেউ মাথার ওপর ঘুরছে, কেউ বা দূরে দূরে গাছের ডালে কি পাথরের ওপরে বসেছে। খুব ধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে। ওরা যেন বলছে—কোথায় যাবে বাছাধন? যে ক'দিন লাফালাফি করবে, করে নাও। আমরা বসি, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমাদের!

শঙ্করের খিদে নেই। খাবার ইচ্ছেও নেই। তবুও সে গুলি করে একটা শকুনি মারলে! রৌদ্র ভীষণ চড়েছে। আগুন-তাতা পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না। এ পর্ব্বতও মরুভূমির শামিল, খাদ্য এখানে মেলে না, জলও না। সে মরা শকুনিটা নিয়ে আগুন জ্বেলে ঝলসাতে বসলো। এর আগে মরুভূমির মধ্যেও সে শকুনির মাংস খেয়েছে। এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, আজ ও খাচ্ছে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে। শকুনিগুলো এসে আবার মাথার ওপর জুটেছে।

তার নিজের ছায়া পড়েছে পাথরের গায়ে, সে নির্জ্জন স্থানে শঙ্করের উদ্‌ভ্রান্ত মনে ছায়াটা যেন আর একজন সঙ্গী মনে হল। বোধ হয়, ওর মাথা খারাপ হয়ে আসছে···কারণ বেঘোর অবস্থায় ও কতবার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল···কতবার পরক্ষণের সচেতন মুহূর্ত্তে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে সামলে নিলে।

সে পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? জ্বর হয়নি তো? তার মাথার মধ্যে ক্রমশঃ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। আল্‌ভারেজ্···হীরের খনি···পাহাড়, পাহাড়, বালির সমুদ্র···আত্তিলিও গাত্তি · কাল রাত্রে ঘুম হয় নি···আবার রাত আসছে, সে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

কিসের শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ আসছে কোন্ দিক থেকে। কোন পরিচিত শব্দের মত নয়। কিসের শব্দ? কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ কাছে আসছে সেটা।

হঠাৎ আকাশের দিকে শঙ্করের চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল···তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের পথে বিকট শব্দ করে একটা জিনিস যাচ্ছে। ওই কি এরোপ্লেন? সে বইয়ে ছবি দেখেছে বটে।

এরোপ্লেন যখন ঠিক মাথার ওপর এল,·শঙ্কর চীৎকার করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছের

ডাল ভেঙে নাড়লে, কিন্তু কিছুতেই পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। দেখতে দেখতে এরোপ্লেনখানা সুদূরে ভায়োলেট্ রঙের পল্ ক্রুগার পর্ব্বতমালার মাথার ওপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো আরও এরোপ্লেন যাবে এ পথ দিয়ে। কি আশ্চর্য্য দেখতে এরোপ্লেন জিনিসটা! ভারতবর্ষে থাকতে সে একখানাও দেখে নি।

শঙ্কর ভাবলে, আগুন জালিয়ে কাঁচা ডাল পাতা দিয়ে সে যথেষ্ট ধোঁয়া করবে। যদি আবার এ পথে যায়, পাইলটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে। একটা সুবিধে হয়েছে, এরোপ্লেনের বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোন্ দিকে ভেগেছে।

সেদিন কাট্‌ল। দিন কেটে রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের দুর্ভোগ হল শুরু। আবার গত রাত্রির পুনরাবৃত্তি। সেই কোয়োটের দল আবার এল। আগুনের চারিধারে তারা আবার তাকে ঘিরে বসলো। নেক্‌ড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই দূর থেকে একবার দেখে গেল। গভীর রাত্রে আর একবার এল।

কিসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? আওয়াজ করতে ভরসা হয় না—টোটা মাত্র দুটি বাকী। টোটা ফুরিয়ে গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। মরতে তো হবেই, তবে দুদিন আগে আর পিছে; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

কিন্তু আওয়াজ তাকে করতেই হল। গভীর রাত্রে হায়েনাগুলো এসে কোয়োট্‌দের সাহস বাড়িয়ে দিলে। তারা আরও এগিয়ে সরে এসে তাকে চারিধার থেকে ঘিরলে। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারলে আর ভয় পায় না।

একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—বসে বসেই ঢুলে পড়েছিল। পরমুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেকড়ে বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপে টিপে তার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে। ওর ভয় হল; হয়তো ওটা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভয়ের চোটে একবার গুলি ছুঁড়লে, আর একবার শেষ রাত্রের দিকে ঠিক এরকমই হল। কোয়োটগুলোর ধৈর্য্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে মাত্র, কিছু বলে না। কিন্তু নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খুঁজছে।

রাত ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হয়ে গেল কোয়োট্, হায়েনা ও নেকড়ের দল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আগুনের ধারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা কিসের শব্দে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল।

খানিকটা আগে খুব বড় একটা আওয়াজ হয়েছে কোনো কিছুর। শঙ্করের কানে তার রেশ এখনও লেগে আছে।

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেছে? কিন্তু তা অসম্ভব। এই দুর্গম পর্ব্বতের পথে কোন্ মানুষ আসবে?

একটিমাত্র টোটা অবশিষ্ট আছে। শঙ্কর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সেটা খরচ করে একটা আওয়াজ করলে। যা থাকে কপালে, মরেছেই তো। উত্তরে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আনন্দে ও উত্তেজনায় শঙ্কর ভুলে গেল যে তার পা খোঁড়া, ভুলে গেল যে সে একটানা বেশীদূরে যেতে পারে না। তার আর টোটা নেই—সে আর বন্দুকের আওয়াজ করতে পারলে না—কিন্তু প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল, গাছের ডাল ভেঙে নাড়তে লাগল, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোর সন্ধানে চারিদিকে আকুল-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

* * *

ক্রুগার ন্যাশন্যাল পার্ক জরীপ করবার দল, কিম্বার্লি থেকে কেপ টাউন যাবার পথে, চিমানিমানি পর্ব্বতের নীচে কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা ডবল টায়ার ক্যাটারপিলার চাকা বসানো মোটর গাড়ি। এদের দলে নিগ্রো কুলী ও চাকর-বাকর বাদে ন'জন ইউরোপীয়। জনচারেক হরিণ শিকার করতে উঠেছিল চিমানি-মানি পর্ব্বতের প্রথম ও নিম্নতম থাকটাতে।

হঠাৎ এ জনহীন অরণ্যপ্রদেশে সভ্য রাইফেলের আওয়াজে ওরা বিস্মিত হয়ে উঠল। কিন্তু ওদের পুনরায় আওয়াজের প্রত্যুত্তর না পেয়ে ইতস্ততঃ খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেলে, সামনের একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চূড়া থেকে, এক জীর্ণ ও কঙ্কালসার কোটরগতচক্ষু প্রেতমূর্ত্তি উন্মাদের মত হাত পা নেড়ে তাদের কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। তার পরনে ছিন্নভিন্ন অতি মলিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ।

ওরা ছুটে গেল। শঙ্কর আবোল-তাবোল কি বকলে, ওরা ভাল বুঝতে পারলে না। যত্ন করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের নীচে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ওর জিনিসপত্রও নামিয়ে আনা হয়েছিল। তখন ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এই ধাক্কায় শঙ্করকে বেশ ভুগতে হল। ক্রমাগত অনাহারে, কষ্টে, উদ্বেগে, অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণের ফলে, তার শরীর খুব জখম হয়েছিল—সেই রাত্রেই তার বেজায় জ্বর এল।

* * *

জ্বরে সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ল—কখন যে মোটর গাড়ী ওখান থেকে ছাড়লো, কখন যে তারা সল্‌স্‌বেরিতে পৌছলো শঙ্করের কিছুই খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় পনেরো দিন সে সল্‌সবেরির হাসপাতাতে কাটিয়ে দিলে। তারপর ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়ালো।

চোদ্দ

সল্‌স্‌বেরি! কত দিনের স্বপ্ন।···

আজ সে সত্যিই একটা বড় ইউরোপীয় ধরনের শহরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বড় বড় বাড়ী, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দোকান, পিচ্‌ঢালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম চলেছে, জুলু রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা টানছে, কাগজওয়ালা কাগজ বিক্রী করছে। সবই যেন নতুন, যেন এসব দৃশ্য জীবনে কখনো দেখে নি।

লোকালয়ে তো এসেছে, কিন্তু সে একেবারে কপর্দ্দকশূন্য। এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তার নেই। কাছে একটা ভারতীয় দোকান দেখে তার বড় আনন্দ হল। কতদিন যে দেখেনি স্বদেশবাসীর মুখ! দোকানদার মেমন্ মুসলমান, সাবান ও গন্ধদ্রব্যের পাইকারী বিক্রেতা। খুব বড দোকান। শঙ্করকে দেখেই সে বুঝলে এ দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত। নিজে দু টাকা সাহায্য করলে ও একজন বড ভারতীয় সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলে।

টাকা দুটি পকেটে নিয়ে শঙ্কর আবার পথে এসে দাঁড়ালো। আসবার সময় বলে এল— অসীম ধন্যবাদ টাকা দুটির জন্যে, এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমার হাতে পয়সা এলে আপনাকে কিন্তু এ টাকা নিতে হবে। সামনেই একটা ভারতীয় রেস্টুরেণ্ট। সে ভাল কিছু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। কতদিন সভ্য খাদ্য মুখে দেয় নি! সেখানে ঢুকে এক টাকার পুরী, কচুরী, হালুয়া, মাংসের চপ, পেট ভরে খেলে। সেই সঙ্গে দু-তিন পেয়ালা কফি।

চায়ের টেবিলে একখানা পুরানো খবরের কাগজের দিকে তার নজর পড়ল। তাতে একটা জায়গায় বড় বড় অক্ষরে হেড্ লাইনে লেখা আছে—

National Park Survey Party's Singular Experience

A lonely Indian found in the desert

Dying of thirst and Exhaustion

His strange story

শঙ্কর দেখলে, তার একটা ফটোও কাগজে ছাপা হয়েছে। তার মুখে একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্পও দেওয়া হয়েছে। এ রকম গল্প সে কারো কাছে করে নি।

খবরের কাগজখানার নাম 'সল্স্‌বেরি ডেলি ক্রনিক্‌ল্'। সে খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। তার চারিপাশে ভিড় জমে গেল। ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল। সেখানে চিমানিমানি পর্ব্বতে পা-ভেঙে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো তুলতে দিয়ে শঙ্কর পঞ্চাশ টাকা পেলে। ও থেকে সে আগে সেই সহৃদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা দুটি দিয়ে এল।

ওদের দৃষ্ট আগ্নেয়গিরিটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখলে। তাতে আগ্নেয়-গিরিটারও নামকরণ করলে মাউণ্ট্ আল্‌ভারেজ। তবে মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যে লুকানো একটা এত বড় আস্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির এই গল্প কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। অবিশ্যি রত্নের গুহার বাষ্পও সে কাউকে জানতে দেয় নি। দলে দলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে।

তার পরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে সে একরাশ ইংরেজি বই ও মাসিক পত্রিকা কিনলে। বই পড়ে নি কতকাল! সন্ধ্যায় একটা সিনেমায় ছবি দেখলে। কতকাল পরে রাত্রে হোটেলের ভাল বিছানায় ইলেকট্রিক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে সে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে নীচের প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর স্ট্রীটের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ট্রাম যাচ্ছে নীচে দিয়ে, জুলু রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় কফিখানায়

ঠুন্ ঠুন্ করে ঘণ্টা বাজছে, মাঝে মাঝে দু-চারখানা মোটরও যাচ্ছে। এর সঙ্গে মনে হল আর একটা ছবি—সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদূরে বৃত্তাকারে ঘিরে বসে আছে কোয়োট্ ও হায়েনার দল। ওদের পিছনে নেকড়েটার দুটো গোল গোল চোখ আগুনের ভাঁটার মত জল্‌ছে অন্ধকারের মধ্যে।

কোন্‌টা স্বপ্ন ?···চিমানিমানি পর্ব্বতে যাপিত সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি, না আজকের এই রাত্রি ?

ইতিমধ্যে সল্‌সবেরিতে সে একজন বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। রিপোর্টারের ভিড়ে তার হোটেলের হল্ সব সময় ভর্ত্তি। খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাবার কণ্ট্রাক্ট করতে, কেউ আসে ফটো নিতে।

আত্তিলিও গাত্তির কথা সে ইটালিয়ান্ কনসাল্ জেনারেলকে জানালে। তাঁর আপিসের পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেল, আত্তিলিও গাত্তি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান যুবক ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে পর্টুগীজ পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজডুবি হবার পরে নামে। তার পর যুবকটির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় নি। তার আত্মীয়-স্বজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্য্যন্ত তারা তাদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধানের জন্যে পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার কনস্যুলেট্ আপিসকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করাও হয়েছিল তার সন্ধানের জন্যে। ১৮৯৫ সাল থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

পূর্ব্বোক্ত মুসলমান দোকানদারটির সাহায্যে সে ব্ল্যাকমুন স্ট্রীটের বড় জহুরী রাইডাল ও মর্সবির দোকানে চারখানা পাথর সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রী করলে। বাকী দুখানার দর আরও বেশী উঠেছিল, কিন্তু শঙ্কর সে দুখানা পাথর তার মাকে দেখাবার জন্যে দেশে নিয়ে যেতে চায়। এখন বিক্রী করতে তার ইচ্ছে নেই।

* * * *

নীল সমুদ্রে !···

বম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পর্টুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারিকেল-বনশ্যাম তীরভূমিকে মিলিয়ে যেতে দেখতে দেখতে, শঙ্কর ভাবছিল তার জীবনের এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা। এই তো জীবন, এই ভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু মানুষের জীবনের ভুল মাপকাঠি। দশ বৎসরের জীবন উপভোগ করেছে সে এই দেড় বছরে। আজ সে শুধু একজন ভবঘুরে পথিক নয়, একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ-আবিষ্কারক। মাউণ্ট আল্‌ভারেজকে সে জগতে প্রসিদ্ধ করবে। দূরে ভারত মহাসমুদ্রের পারে জননী জন্মভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জন্য এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মনটি উৎসুক হয়ে আছে, কবে দূর থেকে দৃশ্যমান বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চুড়োটা মাতৃভূমির উপকূলের সান্নিধ্য ঘোষণা করবে · তার পর বাউলকীর্ত্তনগান-মুখরিত বাংলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল ছোট পল্লী·· সামনে আসছে বসন্ত কাল···পল্লীপথে যখন একদিন সজ্‌নে ফুলের দল পথ-বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বৌ-

কথা-ক ডাকবে ওদের বড় বকুল গাছটায় · নদীর ঘাটে গিয়ে লাগবে ওর ডিঙি।

বিদায়! আল্ভারেজ বন্ধু!·· স্বদেশে ফিরে যাওয়ার এই আনন্দের মুহূর্ত্তে তোমার কথাই আজ মনে হচ্চে। তুমি সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা পৃথিবী যাদের পায়ে চলার পথ—আশীর্ব্বাদ কোরো তোমার মহারণ্যের নির্জ্জন সমাধি থেকে, যেন তোমার মত হতে পারি জীবনে, অমনি সুখ-দুঃখ নিস্পৃহ, অমনি নির্ভীক।

বিদায় বন্ধু আত্তিলিও গাত্তি। অনেক জন্মের বন্ধু ছিলে তুমি।

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চীন দেশে প্রচলিত সেই প্রাচীন ছড়াটির সত্যতা—

ছাদের আল্সের দিব্যি চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো।

* * * *

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন জন্মভূমির টান বড় টান। জন্মভূমির কোলে এখন সে কিছুদিন কাটাবে। তার পর দেশেই সে কোম্পানী গঠন করবার চেষ্টা করবে—আবার সুদূর রিখ্টার্স্‌ভেল্ড পর্ব্বতে ফিরবে রত্নখনির পুনর্ব্বার অনুসন্ধানে—খুঁজে সে বার করবেই।

ততদিন—বিদায়!

পরিশিষ্ট

সল্‌স্‌বেরি থাকতে সে সাউথ রোডেসিয়ান্ মিউজিয়ামের কিউরেটার প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ডঃ ফিট্জেরাল্ডের সঙ্গে দেখা করেছিল, বিশেষ করে বুনিপের কথাটা তাঁকে বলবার জন্যে। দেশে আসবার কিছুদিন পরে ডঃ ফিটজেরাল্ডএর কাছ থেকে শঙ্কর নিম্নলিখিত পত্রখানা পায়।

The South Rhodesian Museum
Salisbury. Rhodesia
South Africa
January 12. 1911

Dear Mr. Choudhuri,

I am writing this letter to fulfil my promise to you to let you know what I thought about your report of a strange three-toed monster in the wilds of the Richtersveldt Mountains. On looking up my files I find other similar accounts by explorers who had been to the region

before you, specially by Sir Robert McCulloch, the famous naturalist, whose report has not yet been published, owing to his sudden and untimely death last year. On thinking the mater over, I am inclined to believe that the monster you saw was nothing more than a species of anthropoid ape, closely related to the gorilla, but much bigger in size and more savage than the specimens found in the Ruwenzori and Virunga Mountains. This species is becoming rarer and rarer every day, and such numbers as do exist are not easily to be got at on account of their shyness and the habit ot hiding themselves in the depths of the high-altitude rain forests of the Richtersveldt. It is only the very fortunate traveller who gets glimpses of them, and I should think that in meeting them he runs risks proportionate to his good luck.

Congratulating you on both your luck and pluck,

I remain
Yours Sincerely
J. G. Fitzgerald

চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল স্টীমার ছাড়চে। বহু লোকজনের ভিড়। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই। বর্মা প্রবাসী দু'চারজন বাঙালী পরিবার রেঙ্গুনে ফিরচে। কুলীরা মাল-পত্র তুলচে। দড়াদড়ি ছোঁড়াছুঁড়ি, হৈ হৈ। ডেকযাত্রীদের গোলমালের মধ্যে জাহাজ ছেড়ে গেল। যারা আত্মীয়-স্বজনকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা তীরে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগলো।

সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসেনি। কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই। সবে চাকরিটা পেয়েচে, একটা বড় ঔষধ-ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যান্‌ভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।

সুরেশ্বরের বাড়ী হুগলী জেলার একটা গ্রামে। বেজায় ম্যালেরিয়ায় দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়ো বাড়ীর ইট স্তূপাকার হয়ে পথে যাতায়াত বন্ধ করেচে, সন্ধ্যার পর সুরেশ্বরদের পাড়ায় আলো জ্বলে না।

ওদের পাড়ার চারিদিকে বনজঙ্গল ও ভাঙা পোড়ো বাড়ীর মধ্যে একমাত্র অধিবাসী সুরেশ্বররা। কোনো উপায় নেই বলেই এখানে পড়ে থাকা—নইলে কোন্ কালে উঠে গিয়ে শহর-বাজারের দিকে বাস করতো ওরা।

সুরেশ্বর বি এসসি. পাশ করে এতদিন বাড়িতে বসে ছিল। চাকরি মেলা দুর্ঘট আর কে-ই বা করে দেবে—এই সব জন্যেই সে চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। তার বাবা সম্প্রতি পেন্‌সন্ নিয়ে বাড়ি এসে বসেছেন, খুব সামান্যই পেন্‌সন্—সে আয়ে সংসার চালানো কায়ক্লেশে হয়; কিন্তু তাও পাড়াগাঁয়ে। শহরে সে আয়ে চলে না। বছর খানেক বাড়ী বসে থাকবার পরে সুরেশ্বর গ্রামে আর থাকতে পারলে না। গ্রামে নেই লোকজন। তার সমবয়সী এমন কোনো ভদ্রলোকের ছেলে নেই যার সঙ্গে দু'দণ্ড কথাবার্ত্তা বলা যায়। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়াই গ্রামের নিয়ম। তারপর কোনোদিকে সাড়া শব্দ নেই।

ক্রমশঃ এ জীবন সুরেশ্বরের অসহ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে কলকাতায় এসে টুইশানি করেও যদি চালায়, তবুও তো শহরে সে থাকতে পারবে এখন।

আজ মাস পাঁচ-ছয় আগে সুরেশ্বর কলকাতায় আসে এবং দেশের একজন পরিচিত লোকের মেসে ওঠে। এতদিন এক আধটা টুইশানি করেই চালাচ্ছিল, সম্প্রতি এই চাকরিটা পেয়েচে, তারই এক ছাত্রের পিতার সাহায্যে ও সুপারিশে। সঙ্গে তিন বাক্স ঔষধ-পত্রের নমুনা আছে বলে তাদের ফার্মের মোটর গাড়ী ওকে চাঁদপাল ঘাটে পৌছে দিয়ে গিয়েছিল।

এই প্রথম চাকরি এবং এই প্রথম দূর বিদেশে যাওয়া—সুরেশ্বরের মনে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা বিষাদ মেশানো এক অদ্ভুত ভাব। একদল মানুষ আছে, যারা অজানা দূর বিদেশে নতুন নতুন বিপদের সামনে পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে—সুরেশ্বর ঠিক সে দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুণো ও নিরীহ ধরনের মানুষ—তার মত লোক নিরাপদে

চাকরি করে আর দশজন বাঙালী ভদ্রলোকের মতো নির্ব্বিঘ্নে সংসার-ধর্ম্ম পালন করতে পারলে সুখী হয়।

তাকে যে বিদেশে যেতে হচ্ছে—তাও যে সে বিদেশ নয়, সমুদ্র পারের দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে—সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। নইলে চাকরি থাকে না! সে চায় নি এবং ভেবেও রেখেছে এইবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারলে অন্য চাকরির চেষ্টা করবে।

কিন্তু জাহাজ ছাড়বার পরে সুরেশ্বরের মন্দ লাগছিল না। ধীরে ধীরে বোটানিক্যাল গার্ডেন, দুইতীর-ব্যাপী কলকারখানা পেছনে ফেলে রেখে প্রকাণ্ড জাহাজখানা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভোর ছ'টায় জাহাজ ছেড়েছিল, এখন বেশ রৌদ্র উঠেছে, ডেকের একদিকে অনেকখানি জায়গায় যাত্রীরা ডেক-চেয়ার পেতে গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, স্টীমারের একজন কর্ম্মচারী সবাইকে বলে গেল পাইলট নেমে যাওয়ার আগে যদি ডাঙায় কোনো চিঠি পাঠানো দরকার হয় তা যেন লিখে রাখা হয়।

বয় এসে বল্লে—আপনাকে চায়ের বদলে আর কিছু দেবো ?

সুরেশ্বর সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, সে চা খায় না, এ খবর আগেই জানিয়েছিল এবং কিছু আগে সকলকে চা দেওয়ার সময়ে চায়ের পেয়ালা সে ফেরৎ দিয়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—না, কিছু দরকার নেই।

বয় চলে গেল।

এমন সময় কে একজন বেশ মার্জ্জিত ভদ্র সুরে ও পেছনের দিক থেকে জিজ্ঞেস করলে—মাপ করবেন, মশায় কি বাঙালী ?

সুরেশ্বর পেছনে ফিরে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে এইমাত্র একজন নব আগন্তুক যাত্রী তার ডেকচেয়ার পাতবার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে ও তাকে প্রশ্ন করছে। তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়, একহারা, দীর্ঘ সুঠাম চেহারা, সুন্দর মুখশ্রী, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—সবসুদ্ধ মিলিয়ে বেশ সুপুরুষ।

সুরেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই সে লোকটি হাসিমুখে বল্লে—কিছু মনে করবেন না, একসঙ্গেই কদিন থাকতে হবে আপনার সঙ্গে, একটু আলাপ করে নিতে চাই। প্রথমটা বুঝতে পারি নি আপনি বাঙালী কি না।

সুরেশ্বর হেসে বল্লে—এ আর মনে করবার কি ? ভালই তো হোল আমার পক্ষেও। সেকেণ্ড ক্লাসে আর কি বাঙালী নেই ?

—না, আর যাঁরা যাচ্ছেন—সবাই ডেকে। একজন কেবল ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। আপনি কতদূর যাবেন—রেঙ্গুনে ?

—আপাততঃ তাই বটে—সেখানে থেকে যাবো সিঙ্গাপুর।

—বেশ, বেশ, খুব ভাল হোল। আমিও তাই। সরে এসে বসুন এদিকে, আপনার সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমিয়ে নিই। বাঁচলুম আপনাকে পেয়ে।

সুরেশ্বর শীঘ্রই তার সঙ্গীটির বিষয়ে তার নিজের মুখেই অনেক কথা শুনলে। ওর নাম

বিমলচন্দ্র বসু, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে ডাক্তারী করবার চেষ্টায় সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। বিমলের বাড়ী কলকাতায়, ওদের অবস্থা বেশ ভালই। ওদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের বন্ধু সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করেন, তাঁর নামে বিমল চিঠি নিয়ে যাচ্ছে।

কথাবার্ত্তা শুনে সুরেশ্বরের মনে হোল বিমল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী। নতুন দেশে নতুন জীবনের মধ্যে যাবার আনন্দেই সে মশগুল। সে বেশ সবল যুবকও বটে। অবশ্যি সুরেশ্বর নিজেও গায়ে ভালই শক্তি ধরে, এক সময়ে রীতিমত ব্যায়াম ও কুস্তি করতো, তারপর গ্রামে অনেকদিন থাকার সময়ে সে মাটি-কোপানো, কাঠ-কাটা প্রভৃতি সংসারের কাজ নিজের হাতে করতো বলে হাত পা যথেষ্ট শক্ত ও কর্ম্মক্ষম।

ক্রমে বেলা বেশ পড়ে এল। সুরেশ্বর ও বিমল ডেকে বসে নানারকম গল্প করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল বল্লে—আমি একবার কেবিন থেকে আসি, আপনি বসুন। ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়েছে, এখুনি পাইলট নেমে যাবে। আমার চিঠিপত্র দিতে হবে ওর সঙ্গে। আপনি যদি চিঠিপত্র দেন তবে এই বেলা লিখে রাখুন।

সাগর-পয়েণ্টের বাতিঘর দূর থেকে দেখা যাওয়ার কিছু আগেই কলকাতা বন্দরের পাইলট জাহাজ থেকে নেমে একখানা ষ্টীমলঞ্চে কলকাতার দিকে চলে গেল।

সাগর-পয়েণ্ট ছাড়িয়ে কিছু পরেই সমুদ্র—কোনো দিকে ডাঙা দেখা যায় না—ঈষৎ ঘোলা ও পাটকিলে রঙের জলরাশি চারি ধারে। সন্ধ্যা হয়েছে, সাগর পয়েণ্টের বাতিঘরে আলো ঘুরে ঘুরে জলছে, কতকগুলো সাদা গাঙচিল জাহাজের বেতারের মাস্তুলের ওপর উড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করছে বলে বিমল কেবিন থেকে ওভার-কোটটা আনতে গেল, সুরেশ্বর ডেকে বসে রইল।

জ্যোৎস্না রাত। ডেকের রেলিং-এর ধারে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, সুরেশ্বরের মন এই সন্ধ্যায় খুবই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ বাড়ীর কথা ভেবে, বৃদ্ধ বাপমায়ের কথা ভেবে, আসবার সময়ে বোন প্রভার অশ্রুসজল করুণ মুখখানির কথা ভেবে।

পূর্ব্বেই বলেছি সুরেশ্বর নিরীহ প্রকৃতির ঘরোয়া ধরনের লোক। বিদেশে যাচ্ছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চাকরির খাতিরে। বিমল যদিও সুরেশ্বরের মত ঘরকুণো নয়, তবুও তার সিঙ্গাপুরে যাবার মধ্যে কোন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল না। সে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে পরিচিত বন্ধুর নিকট থেকে সেখানকার লোকের নামে, তারা ওকে সন্ধান বলে দেবে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে; তারপর বিমল সেখানে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মত ডাক্তারী আরম্ভ করে দেবে—এই ছিল তার মতলব। যেমন পাঁচজনে দেশে বাস করছে, সে না হয় গিয়ে করবে সিঙ্গাপুরে।

কিন্তু দুজনেই জানতো না একটা কথা।

তারা জানতো না যে নিরুপদ্রব, শান্তভাবে ডাক্তারী ও ওষুধের ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না—তাদের অদৃষ্ট তাদের দুজনকে এক সঙ্গে গেঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদসঙ্কুল

পথযাত্রায় এবং তাদের দুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে।

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে। বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

একদিন দুপুরে বিমল সুরেশ্বরকে উত্তেজিত স্বরে ডাক দিয়ে বল্লে—চট্ করে চলে আসুন, দেখুন, কি একটা জন্তু!

জন্তুটা আর কিছু নয়, উড্ডীয়মান মৎস্য। জাহাজের শব্দে জল থেকে উঠে খানিকটা উড়ে আবার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সুরেশ্বর উড্ডীন মৎস্য দেখলে; ছেলেবেলায় চারুপাঠে ছবি দেখেছিল বটে।

মাঝে মাঝে অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রায়ই কলিকাতাগামী জাহাজ।

ওরা জাহাজের নাম পড়ছে—ওরা কেন, সবাই। এ অকূল জলরাশির দেশে অন্য একখানা জাহাজ ও অন্য লোকজন দেখতে পাওয়া যেন কত অভিনব দৃশ্য! শত শত যাত্রী ঝুঁকে পড়েছে সাগ্রহে রেলিংয়ের ওপর, নাম পড়ছে, কত কী মন্তব্য করছে। ওরাও নাম পড়লে—একখানার নাম ড্যালহাউসি, একখানার নাম ইরাবতী, একখানার নামের কোন মানে হয় না—কিলাওয়াজা—অন্ততঃ ওরা তো কোন মানে খুঁজে পেলে না। একখানা জাপানী এন. ওয়াই. কে লাইনের জাহাজ হিদ্‌জুমারু, উদীয়মান সূর্য্য আঁকা পতাকা ওড়ানো।

দুদিনের দিন রাত্রে বেসিন লাইট হাউসের আলো ঘুরে ঘুরে জলতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর সমুদ্র-পীড়ায় কাতর হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিমল ঠিক খাড়া আছে, যদিও তার খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়েছে। সুরেশ্বর তো কিছুই খেতে পারে না, যা খায় পেটে তলায় না, দিনরাত কেবিনে শুয়ে আছে, মাথা তুলবার ক্ষমতা নেই।

জাহাজের স্টুয়ার্ড এসে দেখে গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

কি বিশ্রী জিনিস এই পরের চাকরি! এত হাঙ্গামা পোয়ানো কি ওর পোষায়? দিব্যি ছিল, বাড়ীতে খাচ্ছিল দাচ্ছিল। চাকরির খাতিরে বিদেশে বেরিয়ে কি ঝকমারি দেখো তো!

বিমল আপন মনে ডেকে বসে বই পড়ে, স্ফূর্তিতে শিস্ দেয়, গান করে। সুরেশ্বরকে ঠাট্টা করে বলে—হোয়াট্ এ গুড সেলার ইউ আর!

তিন দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত জাহাজে চলবার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এলিফ্যাণ্ট পয়েণ্টের লাইট হাউস দেখা গেল।

বেলাভূমি যদিও দেখা যায় না, তবুও সমুদ্রের জলের ঘোর নীল রং ক্রমশঃ সবুজ হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল যে ডাঙা বেশী দূরে নেই। ডাঙার গাছপালা মাঝে মাঝে জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন্ বেজে উঠল, রয়েল মেলের নিশান উঠিয়ে দেওয়া হোল মাস্তুলে। সন্ধ্যাকাশ তখনও

যেন লাল। সন্ধ্যা তারার সঙ্গে চাঁদ উঠেছে পশ্চিমাকাশে—ইরাবতীবক্ষে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

জাহাজ কিছুদূর গিয়ে নোঙর ফেললে। রাত্রে ইরাবতী নদীতে বড় জাহাজ চালানোর নিয়ম নেই। রেঙ্গুনের পাইলট্ রাত্রে জাহাজে থাকবে, সকালে ইরাবতীবক্ষে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ভোরবেলায় কেবিন থেকে ঘুম-চোখে বেরিয়ে এসে সুরেশ্বর দেখলে জাহাজ চলছে ইরাবতীর দুই তীরের সমতলভূমি ও ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোখ যায় নিম্ন বঙ্গের মত শস্যশ্যামলা ঘন সবুজ ভূমি, কাঠের ঘর বাড়ী। তারপরেই রেঙ্গুনে পৌছে গেল জাহাজ।

সুরেশ্বর বা বিমল কেউই রেঙ্গুনে নামবে না। সুরেশ্বরের রেঙ্গুনে কাজ আছে বটে কিন্তু সে ফিরবার মুখে। ওরা দুজনেই এ জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে ওদের জিনিসপত্র রেখে শহর বেড়াতে বেরুল।

বেশী কিছু দেখবার সময় নেই। দুপুরের পরেই সিঙ্গাপুরের জাহাজ ছাড়বে, জাহাজের 'পার্সার' বলে দিলে বেলা সাড়ে বারোটার আগেই ফিরে আসতে।

নতুন দেশ, নতুন মানুষের ভিড়। ওরা যা কিছু দেখছে, বেশ লাগছে ওদের চোখে। লেক্, পার্ক ও সোয়েডাগোং প্যাগোডা দেখে ওরা জাহাজে ফিরবার কিছু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে।

আবার অকূল সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি।

একদিন সুরেশ্বর বিমলকে বল্লে—দেখ বিমল, কাল রাত্রে বড় একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি।

এ কয়েকদিনের মেলামেশায় তাদের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা 'তুমি'তে পৌচেছে।

—কি স্বপ্ন ?

—তুমি আর আমি ছোট একটা অদ্ভুত গড়নের বজরা নৌকা করে সমুদ্রে কোথায় যাচ্ছি। সে ধরনের বজরা আমি ছবিতে দেখেছি, ঠিক বোঝাতে পারছি নে এখন। তারপর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, খালি ধোঁয়া—বিশ্রী কালো ধোঁয়া—

—আমরা বাঁচলাম তো ! না খসলাম ?

কথা শেষ করে বিমল হো হো করে হেসে উঠলো। সুরেশ্বর চুপ করে রইল।

বিমল বল্লে—আমি একটা প্রস্তাব করি শোনো। চলো দুজনে সিঙ্গাপুর গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ডাক্তারখানা খুলি। তুমি তোমার কোম্পানীকে বলে ওষুধ আনাবে। বেশ ভাল হবে। আমি ডাক্তারী করবো।

রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ছেড়ে দুই দিন দুই রাত অনবরত যাওয়ার পরে চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল। রেঙ্গুনের মত সমতলভূমি নয়, উঁচু নীচু, যেদিকে চাও সেদিকে পাহাড়। উপকূলের চতুর্দ্দিকেই মাছ ধরবার বিপুল আয়োজন, বড় বড় কালো রঙের খুঁটি দিয়ে ঘেরা, জাল ফেলা। জেলেদের থাকবার টিনের ঘর। পালতোলা জেলে-ডিঙিতে অহরহ তীর আচ্ছন্ন।

পিনাং বন্দরে জাহাজ ঢুকবামাত্রই অসংখ্য সাম্পান এসে জাহাজের চারিধারে ঘিরলে। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান।

ওরা সাম্পানে করে বন্দরে নেমে শহর দেখতে বার হোল। ঘণ্টা হিসাবে দুজনে একখানা রিক্শা করলে—ঘণ্টা-পিছু কুড়ি সেণ্ট্ ভাড়া।

পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরে একটু সমতলভূমি, চারিদিকেই পাহাড়, অনেকগুলো ছোট নদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর চীনা মঠ দেখতে গেল। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, বাগান পুরোহিতের ঘর, দেবমন্দির স্তরে স্তরে উঠেছে। বাগানের চারিদিকে নালায় ঝরণায় স্রোতে কত পদ্ম গাছ। মন্দিরের মধ্যে টেওস্ট ধর্ম্মজ দেবমূর্তি।

এদের মধ্যে একটি মূর্ত্তি দেখে সুরেশ্বর চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কোন চীনা দেবতার মূর্ত্তি, ভ্রূকুটি-কুটিল, কঠিন, রুক্ষ মুখ। হাতে অস্ত্র, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত।

বিমল বল্লে—কি, দাঁড়ালে যে?

—দেখছো মূর্ত্তিটা? মুখচোখের কি ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাব দেখেছো?

মন্দিরের পুরোহিতদের জিগ্যেস করে জানা গেল ওটি টেওস্ট রণ-দেবতার মূর্ত্তি।

হঠাৎ সুরেশ্বর বল্লে—চল, এখান থেকে চলে যাই।

বিস্মিত বিমল বল্লে—ওকি। পাহাড়ের উপরে যাবে না?

সুরেশ্বর আর উঠতে অনিচ্ছুক দেখে বিমল ওকে নিয়ে জাহাজে ফিরলো।

পথে বল্লে—তোমার কি হল হে সুরেশ্বর? ও রকম মুখ গম্ভীর করে মনমরা হয়ে পড়লে কেন?

সুরেশ্বর বল্লে—কই না, ও কিছু নয়, চলো।

জাহাজে ফিরে এসেও কিন্তু সুরেশ্বরের সে ভাব দূর হল না। ভাল করে কথা কয় না, কি যেন ভাবছে। নৈশভোজের টেবিলে ও ভাল করে খেতেও পারলে না।

রাত ন'টার পরে পিনাং থেকে জাহাজ ছাড়লে সুরেশ্বর যেন কিছু স্বস্তি অনুভব করলে। পিনাং বন্দরের জেটির আলোকমালা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওরা ডেকে এসে বসেছে নৈশভোজের পরে।

হঠাৎ সুরেশ্বর বলে উঠলো—উঃ, কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম ওই চীনাদেবতার মূর্ত্তিটা দেখে!

বিমল হেসে বল্লে—আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু, সত্যি তুমি এত ভীতু তা তো জানি নে! স্বীকার করি মূর্ত্তিটা অবিশ্যি কমনীয় নয়, তবুও—

সুরেশ্বর গম্ভীর মুখে বল্লে—আমার মনে হচ্ছে কি জানো বিমল? আমরা যেন এই দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছি। সব সময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ঐ চীনে মন্দিরে গিয়ে ভাল কাজ করিনি।

পিনাং থেকে ছাড়বার তিন দিন পরে জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌঁছুলো।

দূর থেকে সিঙ্গাপুরের দৃশ্য দেখে বিমল ও সুরেশ্বর খুব খুশী হয়ে উঠলো। শুধু মালয় উপদ্বীপ কেন, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি প্রধান বন্দর, বন্দরে ঢুকবার সময়েই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় জলের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাদের ওপর সুদৃশ্য ঘর-বাড়ী—চারিদিকে পিনাংএর মত মাছ ধরবার প্রকাণ্ড আড্ডা। নীল রংএ চিত্রিত চক্ষু ড্রাগন ঝোলানো পাল-তোলা সেই চীনা জাঙ্ক ও সাম্পানে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বন্দরে ঢুকবার মুখেই একখানা বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রায় মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করে আছে কয়লা নেবার জন্যে। তার প্রকাণ্ড ফোকরওয়ালা দুই কামান ওদের দিকে মুখ হাঁ করে আছে যেন ওদের গিলবার লোভে। আরও নানা ধরনের জাহাজ, স্টীমলঞ্চ, সাম্পান, মালয়। নৌকার ভিড়ে বন্দরের জল দেখা যায় না। যে দিকে চোখ পড়ে শুধু নৌকো আর জাহাজ, বিমলের মনে হলো কলকাতা এর কাছে কোথায় লাগে? তার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বড় বন্দর।

চারিধারেই বারসমুদ্র, বন্দরের মুখে ছোট-বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে আর দু'খানা বড় যুদ্ধ-জাহাজ ওদের চোখে পড়লো। বন্দরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তিন মাইলের পরে বিখ্যাত নৌ-বহরের আড্ডা। দূর থেকে দেখা যায়, বড় বড় ইস্পাতের খুঁটি, বেতারের মাস্তলে সেদিকটা অরণ্যের সৃষ্টি করেছে।

জাহাজের কয়লা নেবার একটা প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুর। পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে পূর্ব্বগামী সব রকম জাহাজকেই এখানে দাঁড়াতে হবে কয়লার জন্যে। এর বিপুল ব্যবস্থা আছে, বহুদূর ধরে পর্ব্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হয়েছে, যেন সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে।

বন্দরে জাহাজ এসে থামলে সুরেশ্বর ও বিমল চীনে কুলি দিয়ে মালপত্র এনে দুখানা রিকশা ভাড়া করলে। ওরা দুজনেই একটা ভারতীয় হোটেল দেখে নিয়ে সেখানে উঠলো। বিকালের দিকে সুরেশ্বর তার ওষুধের ফার্মের কাজে কয়েক জায়গায় ঘুরে এল, বিমল যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরেশ্বর জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে? অমনভাবে বসে কেন?

বিমল বল্লে—ভাই এতদূরে পয়সা খরচ করে আসাই মিথ্যে হোল। আমি যা ভেবে এখানে এলুম তা হবার কোনো আশা নেই। যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিলাম, তাঁর নিজের ভাগ্নে ডাক্তার হয়ে এসে বসেছে। আমার কোনো আশাই নেই।

সুরেশ্বর বল্লে—তাতে কি হয়েছে? এতবড় সিঙ্গাপুর শহরে দু'জন বাঙালী ডাক্তারের স্থান হবে না? ক্ষেপেছ তুমি? আমি ওষুধের দোকান খুলছি, তুমি সেখানে ডাক্তার হয়ে বোসো। দেখো কি হয় না হয়।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে হলো তাদের ঘরের বাইরে জানলার কাছে কে যেন একজন ওদের কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

বিমল বল্লে—ও কে ?

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তার মনে হলো একজন যেন বারান্দার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে ফিরে এসে বল্লে—ও কিছু না, কে একজন গেল।

তারপর ওরা দু'জনে অনেক রাত পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একখানা ওষুধের দোকান খুলবার সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করলে। বিমল হাজারখানেক টাকা এখন ঢালতে প্রস্তুত আছে, সুরেশ্বর নিজেদের ফার্মকে বলে ওষুধের যোগাড় করবে।

বড় ডাকঘরের ক্লক্ টাওয়ারে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজলো। হোটেলের চাকর এসে দু'জনের খাবার দিয়ে গেল। শিখের হোটেল, মোটা মোটা সুস্বাদু রুটি ও মাংস, আস্ত মাসকলায়ের ডাল ও আলুর তরকারী—এই আহার্য্য। সারাদিনের ক্লান্তির পরে তা অমৃতের মত লাগলো ওদের।

আহারাদি সেরে সুরেশ্বর শোবার যোগাড় করতে যাচ্ছে, এমন সময় বিমল হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

সুরেশ্বর বল্লে—কি ?

বিমল ফিরে এসে বিছানায় বসলো। বল্লে—আমার ঠিক মনে হোল কে একজন জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কাউকে দেখলুম না কিন্তু—

সুরেশ্বরের কি রকম সন্দেহ হোল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, নানা রকম বিপদের আশঙ্কা এখানে পদে পদে। সে বল্লে, সাবধান থাকাই ভালো। দরজা বেশ করে বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়। রাতও হয়েছে অনেক।

সুরেশ্বরের ঘুম ছিল সজাগ। তাই অনেক রাত্রে একটা কিসের শব্দে ও ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসলো সন্দিগ্ধ মন নিয়ে।

বিছানার শিয়রের দিকে জানালাটা খোলা ছিল। বিছানা ও জানলার মধ্যে একটা ছোট টেবিলের দিকে নজর পড়াতে সুরেশ্বর দেখলে টেবিলটার ওপর ঢিল জড়ানো একটুকরো কাগজ। এটাই বোধ হয় একটু আগে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে, তার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘরে আলো জ্বালাই ছিল। কাগজের টুকরোটা ও পড়লে, তাতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে—

আপনারা ভারতীয়! যতদূর জানতে পেরেছি সিঙ্গাপুরে আপনারা নবাগত ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। কাল দুপুর বেলা বোটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিডের ঘরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যে বড় ডুরিয়ান্ ফলের গাছ আছে, তার নীচে অপেক্ষা করবেন দুজনেই। আপনাদের দুজনের পক্ষেই লাভজনক কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। আসতে ইতস্ততঃ করবেন না।

লেখার নীচে নাম-সই নেই।

বিমলও কাগজখানা পড়লে।

ব্যাপার কি ? এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

সুরেশ্বরই প্রথমে কথা বল্লে। বল্লে—কেউ তামাশা করেছে বলে মনে হচ্ছে, কি বলো? কিন্তু তাই বা করবে কে, আমাদের চেনেই বা কে?

বিমল চিন্তিত মুখে বল্লে—কিছু বুঝতে পারছি নে। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?

—কি খারাপ উদ্দেশ্য? আমরা যে খুব বড় লোক নই, তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া হোটেল বা এম্পায়ার হোটেলে না উঠে এখানে উঠেছি। টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়েও যাচ্ছিনে। সুতরাং কি করতে পারে আমাদের?

সে রাত্রের মত ত্বু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে বিমল বল্লে—চল যাওয়াই যাক। এত ভয় কিসের? বোটানিক্যাল গার্ডেন তো আর নির্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই। ত্বু'জনকে খুন করে দিনের আলোয় টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এত ভরসা কারু হবে না।

ত্বপুরের পর হোটেল থেকে বেরিয়ে কুয়ালা জোহোর স্ট্রীটের মোড় থেকে একখানা রিক্‌শা ভাড়া করলে। ম্যাসিডন্ কোম্পানীর সোডাওয়াটারের দোকানের সামনে একজন চীনা ভদ্রলোক ওদের রিক্‌শা থামিয়ে চীনে রিক্‌শাওয়ালাকে কি জিগ্যেস করলে। তারপর উত্তর পেয়ে লোকটি চলে গেল। বিমল রিক্‌শাওয়ালাকে ইংরিজীতে জিগ্যেস করলে—কি বল্লে তোমাকে হে?

রিক্‌শাওয়ালা বল্লে—জিগ্যেস করলে সওদাগরী কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—তুমি কি বল্লে?

—আমি কিছু বলিনি। বলবার নিয়ম নেই আমাদের। সিঙ্গাপুর খারাপ জায়গা, মিস্টার।

বোটানিক্যাল গার্ডেন শহর ছাড়িয়ে প্রায় ত্বু'মাইল দূরে। শহর ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড একটা কিসের কারখানা। তারপর পথের ত্বু'ধারে ধনী মালয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাগান-বাড়ী। এমন ঘন সবুজ গাছপালার সমাবেশ ও শোভা, বিমল ও সুরেশ্বর বাংলাদেশের ছেলে হয়েও দেখেনি—কারণ বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী এই সব স্থানের মত উদ্ভিদ সংস্থান ও প্রাচুর্য্য পৃথিবীর অন্য কোথাও হওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে রবারের বাগান।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌছে ওরা রিক্‌শাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করলে। প্রকাণ্ড বড় বাগান। কত ধরনের গাছপালা, বেশির ভাগই মালয় উপদ্বীপজাত। বড় বড় রুটিফলের গাছ, ডুরিয়ান্ পাকবার সময় বলে ডুরিয়ান্ ফলের গাছের নীচে দিয়ে যেতে পাকা ডুরিয়ান্ ফলের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নারিকেলকুঞ্জ একটি অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় স্থান। এত উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের এমন ঘন সন্নিবেশ ওরা কোথাও দেখে নি। নিস্তব্ধ দুপুরে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় কি পাখী ডাকছে সুস্বরে, আকাশ সুনীল, জায়গাটা বড় ভাল লাগলো ওদের। অর্কিড হাউস্ খুঁজে বার করে তার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সত্যই খুব বড় একটা

ডুরিয়ান ফলের গাছ দেখা গেল। সে গাছেরও ফল পেকে যথারীতি দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

বিমল বললে—একটু সতর্ক থাকো। দেখা যাক না কি হয়!

সবুজ টিয়ার ঝাঁক গাছের ডালে ডালে উড়ে বসছে। একটা অপূর্ব্ব শান্তি চারিদিকে—ওরা দুজনে ডুরিয়ান গাছের ছায়ায় শুক্‌নো তালপাতা পেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। মিনিট-তিনও হয় নি, এমন সময় কিছুদূরে এক মাদ্রাজী ও একজন চীনা ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর ও বিমল দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো।

ওরা কাছে এসে অভিবাদন করলে। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুবেশ, তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরেজীতে বললেন—আপনারা ঠিক এসেছেন তাহলে। ইনি মিঃ আ-চিন্ স্থানীয় কন্‌সুলেট অপিসের মিলিটারী অ্যাটাসে। আমার নাম সুব্বা রাও।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় শেষ হবার পর চারজনই সেই ডুরিয়ান গাছের তলায় বসলো। সমগ্র বোটানিকেল গার্ডেনে এর চেয়ে নির্জ্জন স্থান আছে কিনা সন্দেহ।

সুব্বা রাও বললেন—প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করি—আপনারা দুজনেই উপাধিধারী ডাক্তার তো? সুরেশ্বর বললে, সে ডাক্তার নয়, ঔষধ-ব্যবসায়ী। বিমল পাশকরা ডাক্তার।

এ কথার উত্তরে আ-চিন্ বললে—দুজনকেই আমাদের দরকার। একটা কথা প্রথমেই বলি, আমাদের দেশ ঘোর বিপন্ন। আমরা ভারতের সাহায্য চাই। জাপান অন্যায়ভাবে আমাদের আক্রমণ করছে, দেশে খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। আমরা গোপনে ডাক্তারি ইউনিট গঠন করে দেশে পাঠাচ্ছি। কারণ আইনতঃ বিদেশ থেকে আমরা তা সংগ্রহ করতে পারি না। আপনারা বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা আপনাদের মন্ত্রশিষ্য। আমাদের সাহায্য করুন। এর বদলে আমাদের দরিদ্র দেশ দুশো ডলার মাসিক বেতন ও অন্যান্য খরচ দেবে। এখন আপনারা বিবেচনা করে বলুন আপনাদের কি মত?

সুরেশ্বর বললে—যদি রাজী হই, কবে যেতে হবে।

—এক সপ্তাহের মধ্যে। লুকিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন হংকং যাবার পাশপোর্ট আপনারা পাবেন না। আমার গভর্নমেণ্ট সে ব্যবস্থা করবেন ও আপনাদের এখানে এই এক সপ্তাহ থাকার খরচ বহন করবেন। আপনারা যদি রাজী হন, আমার গভর্নমেণ্ট আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সুব্বা রাও বললেন—জবাব এখুনি দিতে হবে না। ভেবে দেখুন আপনারা। আজ সন্ধ্যাবেলা জোহোর স্ট্রীটের বড় পার্কের ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের কাছে আমি ও আ-চিন্ থাকবো। কিন্তু দয়া করে কাউকে জানাবেন না।

ওরা চলে গেলে বিমল বল্লে—কি বল সুরেশ্বর, শুনলে তো সব ব্যাপার?

সুরেশ্বর বল্লে—চল যাই। এখন আমাদের বয়স কম, দেশবিদেশে যাবার তো এই সময়। একটা বড় যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল ইউনিটে থাকলে ডাক্তার হিসেবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে। চীনদেশটাও দেখা হয়ে যাবে পরের পয়সায়।

বিমল বল্লে—আমার তো খুবই ইচ্ছে, শুধু তুমি কি বল তাই ভাবছিলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ওরা এসে জোহোর স্ট্রীটের পার্কের ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কোণে আ-চিন্ ও সুব্বা রাওয়ের সাক্ষাৎ পেলে। ওদের সব কথাবার্ত্তা শুনে আ-চিন্ বল্লে—তা হলে আপনাদের রওনা হতে হবে কাল রাত্রে। ক'দিন আপনাদের হোটেলের বিল যা হয়েছে তা কাল বিকেলেই চুকিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন। বাকী ব্যবস্থা আমি করবো। আর এই নিন্—

কথা শেষ করে বিমলের হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে আ-চিন ও সুব্বা রাও চলে গেলেন।

বিমল খুলে দেখলে কাগজখানা একশো ডলারের নোট্।

পরদিন সকাল থেকে ওরা বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা, কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রইল। বৈকালে নির্দ্দেশমত আবার ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কোণে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরেই আ-চিন্ এলেন। বিমলকে জিগ্যেস কল্লেন—

—আপনাদের জিনিসপত্র?

—হোটেলে আছে।

—হোটেলে রেখে ভাল করেন নি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র তুলে এখানে নিয়ে আসুন। আমি এখানেই থাকি। পার্কের কোণে ছোট রাস্তাটার ওপর গাড়ী দাঁড় করিয়ে হর্ন দিতে বলবেন। আপনাদের আর কিছু লাগবে?

—না, ধন্যবাদ। যা দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিমল ও সুরেশ্বর ট্যাক্সিতে ফিরে পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতে লাগলো।

আ-চিন্ এসে ওদের গাড়ীতে উঠে মালয় ভাষায় ড্রাইভারকে কি বল্লেন। সে ট্যাক্সি বড় পোস্ট আফিসের সামনে এসে দাঁড় করালো।

বিমল বল্লে—এখানে কি হবে?

বিমলের কথা শেষ হতে না হতে ওদের ট্যাক্সির পাশে একখানা নীল রংয়ের হুইপেট গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ষ্টিয়ারিং ধরে আছে একজন চীনা ড্রাইভার।

আ-চিন্ বল্লেন—উঠুন পাশের গাড়ীতে।

পরে তাঁর ইঙ্গিত-মত দু'জন ড্রাইভারে মিলে জিনিসপত্র সব নতুন গাড়ীখানায় তুলে দিলে। গাড়ী যখন তীরবেগে সিঙ্গাপুরের অজানা বড় রাস্তা বেয়ে চলেছে, তখন বিমল বল্লে—অত সদরে দাঁড়িয়ে ও ব্যবস্থা করলেন কেন? কেউ যদি টের পেয়ে থাকে?

আ-চিন্ বল্লেন—কেউ করবে না জানি বলেই ঐ ব্যবস্থা। এ সময়ে চীনা ডাক নিতে রোজ কনস্যুলেট্ আপিসের লোক ওখানে আসবে সকলেই জানে। আমার পরণে কনস্যুলেট্ ইউনিফর্ম, আমি লুকিয়ে কোন কাজ করতে গেলেই লোকে সন্দেহের চোখে দেখবে। সদরে কেউ কিছু হঠাৎ মনে করবে না।

একটু পরেই সমুদ্র চোখে পড়লো—নারিকেল শ্রেণীর আড়ালে। শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা নিভৃত স্থানে এসে গাড়ী একটা বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো। পাশেই নীল সমুদ্র।

আ-চিন্ বল্লেন—এখানে নামতে হবে।

বাংলোর একটা ঘরে ওদের বসিয়ে আ-চিন্ বল্লেন—আমি যাই। এখানে নিশ্চিন্তমনে থাকুন। কোনো ভয় নেই। যথাসময়ে আপনাদের খাবার দেওয়া হবে। বাকী ব্যবস্থা সব রাত্রে।

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে জনৈক চীনা ভৃত্য ছোট ছোট পেঁয়ালায় সবুজ চা ও কুমড়োর বিচির কেক্ নিয়ে ওদের সামনে রাখলে।

বিমল বল্লে—এ আবার কি চিজ বাবা? ইঁদুর ভাজা-টাজা নয় তো?

সুরেশ্বর বল্লে—ইঁদুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঁদুর খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে থাকতে হবে চীন দেশে।

কিন্তু কেক্‌গুলো ওদের মন্দ লাগলো না। চা পানের পরে ওরা বাংলোর চারিধারে একটু ঘুরে বেড়ালে। সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে নির্জ্জন স্থানে সমুদ্রতীরে বাংলোটি অবস্থিত। সমুদ্রের দিকে এক সারি ঝাউ অপরাহ্নের বাতাসে সোঁ সোঁ করছিল। দূরে সমুদ্রবক্ষে অস্তসূর্য্যের আভা পড়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

সুরেশ্বর ভাবছিল হুগলী জেলার তাদের সেই গ্রাম, তাদের পুরনো বাড়ী—বাপ মায়ের কথা। জীর্ণ, সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটের পৈঠা বেয়ে মা পুকুরে গা ধুতে নামছেন এতক্ষণ।

জীবনে কি সব অদ্ভুত পরিবর্ত্তনও ঘটে! তিন মাস মাত্র আগে সেও এমনি সন্ধ্যায় ঐ গ্রামের খালের ধারটিতে একা পায়চারি করে বেড়াতো ও কি ভাবে কোথায় গেলে চাকরি পাওয়া যায় সেই ভাবনাতে ব্যস্ত থাকতো। আর আজ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে।

বিমল মুগ্ধ হয়েছিল এই সুদূর-প্রসারী শ্যামল সমুদ্র-বেলার সান্ধ্যশোভার দৃশ্যে। সে ভাবছিল কবি ও ঔপন্যাসিকদের পক্ষে এমন বাংলো তো স্বর্গ—মাথার ওপরকার নীল আকাশ—এই সবুজ ঝাউয়ের সারি—ঐ সমুদ্রবক্ষের ছোট ছোট পাহাড়—সত্যিই স্বর্গ—

গভীর রাত্রে আ-চিন্ এসে ওদের ওঠালেন। একখানা মোটরে আধ মাইল আন্দাজ গিয়ে সমুদ্রতীরের একটা নির্জ্জন স্থানে ওরা জিনিসপত্র সমেত ছোট একটা জালি বোটে উঠলো। দূরে বন্দরের আলোর সারি দেখা যাচ্ছে—অন্ধকার রাত্রি, নির্জ্জন সমুদ্রবক্ষ। কিছুদূরে একটা চীনা জাঙ্ক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল—জালিবোট গিয়ে জাঙ্কের গায়ে লাগলো।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওরা জাঙ্কে উঠলো।

পাটাতনের নীচে একটা ছোট কামরা ওদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কামরাতে একটা চীনা মাদুর বিছানো, বেতের বালিশ, চীনা লণ্ঠন, রঙীন গালার পুতুল, কাঁচকড়ার ফুলের টবে নার্সিসাস ফুলগাছ—এমন কি ছোট খাঁচাসমেত একটি ক্যানারি পাখী।

আ-চিন্ বল্লেন—কামরা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো ?

সুরেশ্বর বল্লে—সুন্দর সাজানো কামরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আ-চিন্ গম্ভীর ভাবে বল্লেন—ধন্যবাদ আপনাদের। আমাদের বিপন্ন দেশকে দয়া করে আপনারা সাহায্য করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে অজানা ভবিষ্যতের দিকে চলেছেন। ভগবান বুদ্ধের দেশের লোক আপনারা—সব সময়েই আপনারা আমাদের নমস্য। ভগবান বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।

সুরেশ্বর বল্লে—আপনি তো সঙ্গে যাবেন না—এ নৌকো ঠিক জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে তো ?

—সে বিষয় ভাববেন না। এ চীন গবর্নমেণ্টের বেতনভোগী জাঙ্ক্। তিন দিন পরে একখানা চীনা জাহাজ আপনাদের তুলে নেবে। কারণ সামনে দুস্তর চীন সমুদ্র। জাঙ্কে সে সমুদ্র পার হওয়া তো যাবে না।

আ-চিন্ বিদায় নেবার পরে নৌকা নোঙর ওঠালে। জাঙ্কের সুসজ্জিত কামরায় মোমবাতির আলো জ্বলছে। অনুকূল বায়ুভরে চীন সমুদ্র বেয়ে নৌকা চলেছে—ঘন অন্ধকার, কেবল আলোকোৎক্ষেপক ঢেউগুলি যেন জোনাকির ঝাঁকের মত জ্বলছে।

বিমল বল্লে—এখান থেকে হংকং সতেরোশো আঠরোশো মাইল দূর। একে ভীষণ চীনসমুদ্র—আর এই জাঙ্ক তো এখানে মোচার খোলা। প্রাণ নিয়ে এখন ডাঙ্গায় পা দিতে পারলে হয়।

সুরেশ্বর বল্লে—এসে ভাল করনি, বিমল। ঝোঁকের মাথায় তখন দুজনেই আ-চিনের কথায় ভুলে গেলুম কেমন—দেখলে ? এই জাঙ্কে যদি তোমায় আমায় খুন করে এরা জলে ভাসিয়ে দেয়, এদের কে কি করবে ? কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি। কেউ একটা খোঁজ পর্য্যন্ত করবে না।

বিমল বল্লে—ও সব কথা ভেবে কেন মন খারাপ কর ? বাইরে গিয়ে সমুদ্রের দৃশ্যটা একবার দেখ। ফস্‌ফোরেসেণ্ট ঢেউগুলো কি চমৎকার দেখাচ্চে ?

মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে। ওগুলো কি ? ওরা কাউকে কিছু বলতে পারে না, ইংরাজি ভাষা কে জানে নৌকায়, তা ওদের জানা নেই। রাত্রে ওদের ঘুম হোল না। ক্রমে পুবদিক ফর্সা হয়ে এল, রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরে সূর্য্য উঠল।

সকাল থেকে নৌকা ভয়ানক নাচুনি ও দুলুনি শুরু করে দিল। চীন সমুদ্র অত্যন্ত বিপজ্জনক, সর্ব্বদা চঞ্চল, ঝড় তুফান লেগেই আছে। ওরা সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। আহার বিহারে রুচি রইল না।

সেদিন বিকেলে এক মস্ত ঢেউয়ের মাথায় একটি কাটল্ ফিশ এসে পড়ল জাঙ্কের পাটাতনে। সেটা তখনও জ্যান্ত, পালাবার আগেই চীনা মাঝিরা ধরে ফেললে।

জাঙ্কে যা খাবার দেয়, সে ওদের মুখে ভাল লাগে না। ভাত ও স্ঁটকি মাছের তরকারী। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত দুটি বাঙালী যাত্রীর পক্ষে চীনা ভাত তরকারী খাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সুরেশ্বর বল্লে—ঝকমারি করেছি এসে, ভাই। না খেয়ে তো দেখছি আপাততঃ মরতে হবে।

তৃতীয় দিন দুপুরে দূরে দিগ্বলয়ে একখানা বড় ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা গেল। ওরা দেখলে জাঙ্কের সারেঙ্ দূরবীন দিয়ে সেদিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে কি আদেশ দিলে, মাঝিমাল্লারা পাল নামিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আবার উল্টোদিকে যাবে নাকি? ব্যাপার কি?

সুরেশ্বর সারেঙ্‌কে জিগ্যেস্ করলে—নৌকা ঘোরাচ্ছ কেন?

সারেঙ্ দূরের অস্পষ্ট জাহাজটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বল্লে—ইংলিশ ক্রুজার, মিস্টার, ভেরি বিগ্ ক্রুজার—বিগ্ গান—

সুরেশ্বর বল্লে—তাতে তোমার ভয় কি? ওরা তোমাদের কিছু বলতে যাবে কেন?

কিন্তু সুরেশ্বর জানতো না সারেঙএর আসল ভয়ের কারণ কোনখানে। চীনা সমুদ্রে চীনা বোম্বেটের উপদ্রব নিবারণের জন্যে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ সর্ব্বপ্রকার চীনা নৌকা, জাহাজ ও জাঙ্কের ওপর—বিশেষ করে বন্দর থেকে দূরে বার-সমুদ্র দিয়ে যে সব যায়—তাদের ওপর খরদৃষ্টি রাখে। ওদের জাঙ্ককে দেখে সন্দেহ হোলেই থামিয়ে খানাতল্লাস করবে। তা হোলে এ জাঙ্কে যে বেআইনি আফিম রয়েছে পাটাতনের নীচে লুকোনো—তা ধরা পড়ে যাবে।

চীনা মাঝিগুলো অতিশয় ধূর্ত্ত। যুদ্ধজাহাজ দূর থেকে যেমনি দেখা, অমনি জাঙ্ক মাঝ সমুদ্রে ঝুপ করে নোঙর নামিয়ে দিলে ও পাটাতনের নীচে থেকে মাছ ধরার জাল বার করে সমুদ্রে ফেলতে লাগলো—দেখতে দেখতে জাঙ্কখানা একখানি চীনা জেলে-ডিঙিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।

বিমল বল্লে—উঃ, কি চালাক দেখেছ!

সুরেশ্বর বল্লে—চালাক তাই রক্ষে—নইলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এসে যদি আমাদের ধরতো—! বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ করার অপরাধে তোমায় আমায় জেল খাটতে হবে, সে হুঁশ আছে?

ধূসরবর্ণের বিরাটকায় ব্রিটিশ ক্রুজারখানা ক্রমেই নিকটে এসে পড়ছে। এখন তার বড় ফোকরওয়ালা কামানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে একটা ধূসরবর্ণের পর্ব্বত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

যদি কোনো সন্দেহ করে একটি বড় কামান তাদের দিকে দাগে—আ'র ওদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে?

চীনা মাঝিমাল্লাগুলো মহা উৎসাহে ততক্ষণ জাল ফেলে মাছ ধরছে। সুরেশ্বর ও বিমলের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে উদ্বেগে ও উত্তেজনায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যুদ্ধজাহাজখানা ওদের দিকে লক্ষ্যই করলে না। ওদের প্রায় একমাইল দূরে দিয়ে সোজা পূর্ণবেগে সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেল।

জাঙ্ক সুদ্ধ লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

দুপুরের পরে দূরে একটি ছোট দ্বীপ দেখা গেল।

জাঙ্ক্ গিয়ে ক্রমে দ্বীপের পাশে নোঙর করলে। বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে নৌকার জল ফুরিয়ে গেছে—এবং এখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায়।

ওরা সেখানে থাকতে থাকতে আর একখানা বড় জাঙ্ক্ বিপরীত দিক থেকে এসে ওদের কাছেই নোঙর করলে।

বিমলদের জাঙ্কের মাঝিরা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়লো নবাগত নৌকাখানা দেখে। সকলেই ঘন ঘন চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চায়—যদিও ভয়ের কারণ যে কি তা সুরেশ্বর বা বিমল কেউ বুঝতে পারলে না।

কিন্তু একটু পরে সেটা খুব ভাল করেই বোঝা গেল।

ও নৌকা থেকে দশ-বারোজন গুণ্ডা ও বর্ব্বর আকৃতির চীনেম্যান এসে ওদের জাঙ্ক্ ঘিরে ফেললে। সকলের হাতেই বন্দুক, কারো হাতে ছোরা।

ওদের জাঙ্কের কেউ কোনো রকম বাধা দিলে না—দেওয়া সম্ভবও ছিল না। দস্যুরা দলে ভারী, তাছাড়া অত বন্দুক এ নৌকায় ছিল না। সকলের মুখ বেঁধে ওরা নৌকায় যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের জাঙ্কে ওঠালে। বিমল ও সুরেশ্বরের কাছে যা ছিল, সব গেল। আ-চিন্ প্রদত্ত একশো ডলারের নোট্‌খানা পর্য্যন্ত—কারণ সেখানা ভাঙাবার দরকার না হওয়ায় ওদের বাক্সেই ছিল।

চীন সমুদ্রের বোম্বেটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিমল ও সুরেশ্বর অনেক কথা শুনেছিল। সিঙ্গাপুরে আরও শুনেছিল যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় সমস্ত নৌকো-জাহাজ হংকংএর নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে জড় হচ্ছে—এদিকে সুতরাং বোম্বেটেদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

চীনা ও মালয় জলদস্যুরা শুধু লুঠপাট করেই ছেড়ে দেয় না—যাত্রীদের প্রাণ নষ্টও করে। কারণ এরা বেঁচে ফিরে গিয়ে অত্যাচারের সংবাদ সিঙ্গাপুর বা হংকংএ প্রচার করলেই চীন ও ও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কড়াকড়ি পাহারা বসাবে সমুদ্রে। 'মরা মানুষ কোনো কথা বলে না'—এ প্রাচীন নীতি অনেক ক্ষেত্রেই বড় কাজ দেয়।

দেখা গেল বর্ত্তমান দস্যুরা এ নীতি ভাল ভাবেই জানে। কারণ জিনিসপত্র ওদের জাঙ্কে রেখে এসে ওরা আবার ফিরে এল বিমলদের নৌকায়—যেখানে পাটাতনের ওপর মাঝিমাল্লার দল সারি সারি মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

বিমল ছিল নিজের কামরায়। সুরেশ্বর কোথায় বিমল তা জানে না। একজন বদমাইসকে ছোরা হাতে ওর কামরায় ঢুকতে দেখে বিমল চমকে উঠলো।

লোকটা সম্ভবতঃ চীনাম্যান্। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, সার্কাসের পালোয়ানের মত জোয়ান—নীল ইজের আর একটা বুক কাটা কোর্ত্তা গায়ে। মুখখানা দেখতে খুব কুশ্রী নয়, কিন্তু কঠিন ও নিষ্ঠুর। ওর হাতে অস্ত্রখানা বিমল লক্ষ্য করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপদ্বীপে যাকে 'ক্রিস্' বলে তাই। যেমনি চক্‌চকে তেমনি সেখানা ক্ষুরধার বলে মনে হোল!

সে ক্রিস্‌খানা বিমলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বল্লে—আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে করো না।

বিমলের মুখ বাঁধা, সে কি কথা বলবে ?

লোকটা পকেট থেকে একটা চামড়ার থলি বার করে সেটার মুখ খুলে বিমলের চোখের সামনে মেলে ধরলে। শুকনো আমচুরের মত কতকগুলো কি জিনিস তার মধ্যে রয়েছে। বিমল অবাক হয়ে ভাবছে এ জিনিসগুলো কি, বা তাকে এগুলি দেখানোর সার্থকতাই বা কি —এমন সময় লোকটা একটা শুকনো আমচুর বার করে ওর নাকের সামনে ধরে বল্লে— চিনতে পারলে না কি জিনিস ?

বিমল এতক্ষণে জিনিসটা চিনতে পারলে এবং চিনে ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠলো। সেটা একটা কাটা শুকনো কান, মানুষের কান! লোকটা হা হা করে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্লে—বুঝেছ এবার? হ্যাঁ, ওটা আমার একটা বাতিক—মানুষের কান সংগ্রহ করা। তোমাকেও তোমার কান দুটির জন্যে একটুখানি কষ্ট দেবো। আশা করি মনে কিছু করবে না। এসো, একটু এগিয়ে এসো দখি।

বিমল নিরুপায় মুখ দিয়ে একটা কথা বার করবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই তার। এক মুহূর্ত্তে তার মনে হোল হয়তো সুরেশ্বরের সমানই অবস্থা ঘটেছে, এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দ্দশা হচ্ছে এই পীতবর্ণ বর্ব্বরদের হাতে।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকে এরা বেশ আয়ত্ত করেছে বটে!

লোকটা সময়ের মূল্য বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই বিচিত্র নমুনাটি চকচকে ক্রিস্‌খানা হাতে করে এগিয়ে এল—বিমলের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল—মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ বার হতে চেয়েও হোল না, সে প্রাণপণে দুই চোখ বুজলে।···

তীক্ষ্ণ ক্রিসের স্পর্শ খুব ঠাণ্ডা—কতটা ঠাণ্ডা, খু-উব ঠাণ্ডা কি? ক্রিসের স্পর্শ এল না, এল তার পরিবর্ত্তে দূর থেকে একট অস্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ—প্রস্তরময় কূলে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল বেগে আছড়ে পড়ার শব্দের মত গম্ভীর।

কতকগুলো ব্যস্ত মানুষের সম্মিলিত দ্রুত পদশব্দ বিমলের কানে গেল—বিস্মিত বিমল চোখ খুলে চেয়ে দেখলে লোকটা ছুটে কামরার বাইরে চলে গেল—চারিদিকে একটি সাড়া শোরগোল, কাঠের পাটাতনের ওপর অনেকগুলো পলায়নপর মানুষের দ্রুত পায়ের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

কি ব্যাপার? এ আবার কি নতুন কাণ্ড?

পরক্ষণেই বিমলের মনে হোল তাদের জাঙ্কখানা একটা প্রকাণ্ড দুলুনি খেয়ে একেবারে কাৎ হয়ে পড়বার উপক্রম করেই পরমুহূর্ত্তে ঢেউয়ের তালে যেন আকাশে ঠেলে উঠলো— নোঙরের শিকলে কড়্ কড়্ শব্দে টান ধরলো—মজবুত শেকল না হোলে সেই হেঁচকা টানে ছিঁড়ে যেতো নিশ্চয়ই। একটু পরে বিমলদের নৌকার একজন জোয়ান মাঝি ওর কামরায় ঢুকে হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিলে।

তখনও পাশে কোথায় খুব হৈ চৈ হচ্ছে।

বিমল বল্লে—ব্যাপার কি বল তো? আমার বন্ধুটি কোথায়?

মাঝি বল্লে—সে ভালই আছে।

বলেই সে বাইরে চলে গেল। বেশী কথা বলে না এদেশের লোক।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে এসে দেখলে সামনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। নবাগত বোম্বেটে জাঙ্কখানা কঠিন প্রস্তরময় ডাঙ্গায় ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েচে। আর অল্প দূরেই সমুদ্র-বক্ষে এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে যা জীবনে কখনও দেখে নি।

আকাশ থেকে কালো মোটা থামের মত একটা জিনিস নেমে সমুদ্রের জলে মিশে গিয়েছে—সে জিনিসটা আবার চলনশীল—হালকা রবারের বেলুন বা ফানুসের মত অত বড় কালো মোটা থামটা বায়ুর গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে চলেছে।

এই সময় সুরেশ্বর ও জাঙ্কের সারেং এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো।

সারেং বল্লে—উঃ, কত বড় জোড়া জলস্তম্ভ, মিস্টার! চীন সমুদ্রে প্রায়ই জলস্তম্ভ হয় বটে কিন্তু এমন জোড়া জলস্তম্ভ আমি কখনো দেখি নি! ঐ জলস্তম্ভটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে!

ঐ কালো মোটা থামের মত ব্যাপারটা তাহলে জলস্তম্ভ। ছবিতে দেখেছে বটে। কিন্তু বিমল বা সুরেশ্বর জীবনে এই প্রথম জিনিসটা দেখলে।

কিন্তু ব্যাপারটা ওরা ঠিকমত বুঝতে পারে নি। জলস্তম্ভ ওদের জীবন বাঁচাল কী করে?

বেশী দেরি হোল না ব্যাপারটা বুঝতে। যখন ওরা দেখলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ সারেং নোঙর উঠিয়ে জাঙ্কখানা ডাঙা থেকে প্রায় একশো গজ এনে ফেলেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তীর ও সমুদ্র উভয়ের ব্যবধান বাড়ছে। সারেং ও মাঝিদের মুখে শোনা গেল এই জলস্তম্ভের জোড়াটি দ্বীপের অদূরে ভেঙে গিয়ে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে—তাতে বোম্বেটেদের জাঙ্কখানাকে উর্দ্ধে উঠিয়ে সবেগে আছাড় মেরেছে ডাঙার গায়ে। জাঙ্কখানা জখম তো হয়েছেই এবং বোধ হচ্ছে ওদের কতকগুলি লোককেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে।

সারেং বললে—জলস্তম্ভ ভয়ানক জিনিস, মিস্টার। অনেক সময় জাহাজ পর্য্যন্ত বিপদে পড়ে যায়—বড় বড় জাহাজ দূর থেকে কামান দেগে জলস্তম্ভ ভেঙে দেয়। আর বিশেষ করে এই চীন সমুদ্রে, সপ্তাহে দু-একটা বালাই লেগেই আছে।

দ্বীপ ছেড়ে জাঙ্কটা বহুদূরে চলে এসেছে।

আবার অকূল সমুদ্র!

বোম্বেটে জাহাজ ও জলস্তম্ভ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্ত-বিস্তৃত নীলিমার মধ্যে। সুরেশ্বর ও বিমল চুপ করে সমুদ্রের অপরূপ রঙের দিক্ চেয়ে বসে আছে।

সারেং এসে বললে,—মিস্টার, আমরা হংকং থেকে আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু হংকং যাবো না।

সুরেশ্বর বললে—কোথায় যাবো তবে?

—হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল আন্দাজ দূরে ইয়ান্-চাউ বলে একটা ছোট দ্বীপ আছে।

সেখানে আপনাদের নামিয়ে দেবার আদেশ আছে আমার ওপর। হংকং-এর কাছে গেলে বৃটিশ মানোয়ারী জাহাজ আমাদের নৌকো তল্লাস করবে। তোমরা ধরা পড়ে যাবে মিস্টার।

পরদিন দুপুরের পরে ইয়ান্-চাউ পৌঁছে গেল ওদের নৌকো। ক্ষুদ্র দ্বীপ। আগাগোড়া দ্বীপটি যেন একটা ছোট পাহাড়, সমুদ্রের জল থেকে মাথা তুলে জেগে রয়েছে। এখানে চীন গবর্নমেণ্টের একটা বেতারের স্টেশন আছে।

সমস্ত দ্বীপে আর কোন অধিবাসী নেই। ঐ বেতারের স্টেশনের জনকয়েক চীনা কর্ম্মচারী ছাড়া।

দুদিন ওরা সেখানে বেতারের আড্ডায় কর্ম্মচারীদের অতিথি হয়ে রইল। তৃতীয় দিন খুব সকালে ক্ষুদ্র একখানা জাঙ্কে ওদের দশ মাইল দূরবর্ত্তী উপকূলে নিয়ে যাওয়া হোল।

বেতারে এই রকম আদেশই নাকি এসেছে।

এই চীন দেশ! যদি ঢেউ-খেলানো ছাদ-আঁটা চীনা বাড়ী না থাকতো, তবে চীন দেশের প্রথম দৃশ্যটা বাংলা দেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেতো না।

উপকূল থেকে পাঁচ মাইল দূরে রেলওয়ে স্টেশন। অতি প্রচণ্ড কড়া রৌদ্রে পদব্রজেই ওদের স্টেশনে আসতে হোল। এদেশে ওদের জামাই-আদরে কেউ রাখবে না, কঠিন সামরিক জীবন যে এখন থেকেই শুরু হোল ওদের—এ কথাটা সুরেশ্বর ও বিমল হাড়ে হাড়ে বুঝলে সেই ভীষণ রোদে বিশ্রী ধুলোভরা রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

তার ওপর বেতারের কর্ম্মচারীটি ওদের সঙ্গে ছিল, তার মুখেই শোনা গেল এ সব অঞ্চল আদৌ নিরাপদ নয়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে চোর ডাকাত ও গুণ্ডার দল যা-খুশি শুরু করেছে। তারা দিনদুপুরও মানে না। স্বদেশী বিদেশীও মানে না। কারো ধন-প্রাণ নিরাপদ নয় আজকাল। দেশ একপ্রকার অরাজক।

শীঘ্রই এর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল পথের মধ্যেই। ওরা একদলে আছে মাত্র চারজন। রৌদ্রে সুরেশ্বরের জল-তেষ্টা পেয়েছিল—চীনা কর্ম্মচারীটিকে ও ইংরাজীতে বল্লে—জল কোথাও পাওয়া যাবে?

রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বা বস্তি। খানকতক খড়ের ঘর এক জায়গায় জড়ো করা মাত্র। সেই চীনা কর্ম্মচারীর পিছু পিছু ওরা বস্তির দিকে গেল। বিমলের মনে হোল একবার বৈদ্যবাটীর গঙ্গার চরে সে তরমুজ কিনতে গিয়েছিল—এ ঠিক যেন বৈদ্যবাটীর চড়ার চাষী-কৈবর্ত্তদের গাঁ-খানা। একখানা গরুর গাড়ী সামনেই ছিল—তফাতের মধ্যে চোখে পড়লো সেটার গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। গরুর গাড়ীর অত মোটা চাকা বাংলাদেশে হয় না।

ওদের আসতে দেখেই কিন্তু বস্তির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হোল। মেয়ে পুরুষ যে-যার ঘর ছেড়ে ছুটে বেরুলো—এদিক ওদিক দৌড় দিল। চীনা কর্ম্মচারীও তৎপর কম নয়—সেও ছুটে গিয়ে একটি ধাবমানা স্ত্রীলোকের পথ আগলে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে জড়সড় হয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। ব্যাপারটা কি? সুরেশ্বর ও বিমল অবাক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীলোকের বিপন্ন কণ্ঠের আর্ত্তনাদ বিমল সহ্য করতে পারলে না। ও চেঁচিয়ে বল্লে—ওকে কিছু ব'লো না, মিঃ চংপে—

ততক্ষণ ওদের সঙ্গী চীনা ভাষায় কি একটা বল্লে স্ত্রীলোকটিকে। কথাটা এই রকম শোনাল ওদের অনভ্যস্ত কানে।

—হি চিন্-কিচিন্—চিন্-চিন্ —

স্ত্রীলোকটি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে বল্লে—ই চিন্, কি চিন্, সি চিন—

—কি চিন্, ফি চিন্?

—সি চিন্, লি চিন্।

সুরেশ্বর ও বিমল ওদের কথা শুনে হেসেই খুন। কথাবার্ত্তাগুলো যেন ঐ রকমই শোনাচ্ছিল।

তারপর ওরা স্ত্রীলোকটির কাছে পায়ে পায়ে গেল। আহা, যেন মূর্তিমতী দারিদ্র্যের ছবি! ভারতবর্ষীয় লোকে তবুও স্নান করে, গায়ে মাথায় তেল দেয়, এরা তাও করে না—গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথা রুক্ষ, শরীর অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহা চীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ! দুজনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,—গুরু শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান।

বিমলের মনে মনে এই দরিদ্রা নারী,—এই দরিদ্র, হতভাগ্য, উৎপীড়িত মহা চীনের এই ভয়ার্ত্ত, অসহায় কুঁড়েঘরবাসী চাষীমজুর—এদের প্রতি একটা গভীর অনুকম্পা ও সহানুভূতি জাগলো। মানুষ যখন দুঃখকষ্ট পায়, সব দেশে সর্ব্বকালে তারা এক। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে।

এই অভাগিনী ভয়ব্যাকুলা দরিদ্রা নারী সমগ্র চীন দেশের প্রতীক।

বিমল এসেছে এক হতভাগ্য দেশ থেকে—এই হতভাগ্য দেশকে সাহায্য করতে। সে তা যথাসাধ্য করবে। দরকার হোলে বুকের রক্ত দিয়েও করবে।

স্ত্রীলোকটি যখন বুঝতে পারলে যে এরা ডাকাত নয় বা বিদ্রোহী রেড্ আর্মির লোকও নয়, তখন সে উঠে ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়ালে।

ধাতুপাত্র বা চীনা মাটির পাত্র নেই বাড়ীতে, এত গরীব সাধারণ লোক। লাউয়ের খোলায় জল রেখেছে।

চীনের বিশ্ববিখ্যাত মাটির বাসন, মিং রাজত্বের অপূর্ব্ব প্রাচীন শিল্প, পুতুল, খেলনা, বুদ্ধ, দানব, এসব এই গরীবদের জন্যে নয়।

রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খুব ভিড়। একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন সিন্‌কিউ থেকে সাংহাই যাচ্ছে—প্রত্যেক স্টেশনে আবার নতুন ভর্ত্তি-করা সৈন্যদের ওই ট্রেনেই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুরেশ্বর বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ট্রেনের ছাদের দিকে।

সব কামরার ছাদে কাঁচা ডালপালা চাপানো—কোনোটায় শুক্‌নো খড় বিচালি ছাওয়া।

বিমল বল্লে—এরোপ্লেন পাছে বোমা ফেলে ট্রেনে, তাই ওরকম করেছে বলে মনে হয়!

সাংহাই ৪৫০ মাইল দূরে।

হঠর হঠর করে করে সারাদিন ট্রেন কৃষিক্ষেত্র, অনুচ্চ পাহাড়, গ্রাম আর বস্তি পার হয়ে চলেছে, চলেছে। ট্রেনের গতি মন্দ নয়, পুরোনো আমলের এঞ্জিন বদলে নতুন এঞ্জিন কেনা হয়েছে, বেশ জোরেই ট্রেন যাচ্ছে।

ওদের কামরাতে সাধারণ সৈন্যদল নেই অবিশ্যি। মাত্র জন আষ্টেক লোক, সবাই অফিসার শ্রেণীর, কিন্তু কেউ ইংরিজী জানে না। মহা অসুবিধেয় পড়ে গেল ওরা—কিছু দরকার হলে চাওয়া যায় না, নতুন কিছু দেখলে জিগ্যেস করা যায় না যে সেটা কি।

দুপুরের দিকে একটা ছোট্ট শহরে গাড়ী দাঁড়াল এবং ওদের কামরাতে একজন সাদা সরু একগুচ্ছ লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক উঠলেন, সঙ্গে তাঁর এগারোটি তরুণ যুবা। এদের সবারই বেশ সুন্দর কমনীয় চেহারা।

বিমল বল্লে—গুড্‌ মর্নিং স্যার।

বৃদ্ধের মুখ দেখে মনে হয় জগতে তাঁর আপন-পর কেউ নেই। তিনি সবাইর ওপর সন্তুষ্ট, জীবনে সবাইকে ভালবেসেছেন।

তিনি হাসিমুখে ইংরিজিতে বল্লেন—গুড মর্নিং, আপনারা কোথায় যাবেন।

বিমল বল্লে—সাংহাই। আপনারা কি অনেকদূর যাবেন?

—আমরাও যাচ্ছি সাংহাই। আমি এখানকার কলেজের প্রোফেসর। আমার নাম লি। আমি সেখানে যাচ্ছি যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। এদেরও নিয়ে যাচ্ছি, এরা সবাই আমার ছাত্র। সদানন্দ বৃদ্ধ কথা শেষ করে গর্ব্বিত দৃষ্টিতে তাঁর এগারোটি তরুণ ছাত্রের দিকে চাইলেন। বিমল ও সুরেশ্বরের বড় অদ্ভুত মনে হোল। এই ভয়ানক দিনে ইনি মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চলেছেন সাংহাইতে, এতগুলি বালকের জীবন বিপন্ন করে।

একটু পরে বৃদ্ধের একটি ছাত্র একটি বেতের বাক্স থেকে কি সব খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলে। বৃদ্ধ সুরেশ্বর ও বিমলকেও তাঁদের সঙ্গে খেতে আহ্বান করলেন।

সুরেশ্বর নিম্নস্বরে বল্লে—খেও না বিমল। ইঁদুর ভাজা কিম্বা আরসুলা-চচ্চড়ি বোধ হয়।

কিন্তু সে সব কিছু নয়। শরবতী লেবুর রস দেওয়া কুমড়োর বীচি ভাজা আর শসার আচার।

বিমল বল্লে, 'প্রোফেসর লি, আপনি সাংহাইতে কোথায় উঠবেন? আমাদের সঙ্গে থাকুন না, আমরা যেখানে থাকবো?' হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজ কানে গেল—গাড়ীসুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জানলার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করলে কোন দিক থেকে আওয়াজটা আসছে।

ছ'খানা এরোপ্লেন সারবন্দী হয়ে উড়ে পূব থেকে পশ্চিমের দিকে আসছে। ট্রেনখানার

বেগ হঠাৎ বড় বেড়ে গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু এরোপ্লেনের সারি ট্রেনের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে চলে গেল শান্তভাবেই।

প্রোফেসর লি দিব্যি নির্ব্বিকার ভাবেই বসে ছিলেন। তিনি বল্লেন—আমাদের গভর্ণমেণ্টের এরোপ্লেন।

একটা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে নারীকণ্ঠের কান্না শুনে বিমল ও সুরেশ্বর মুখ বাড়িয়ে দেখলে, কতকগুলি সৈন্য একটি দরিদ্রা স্ত্রীলোকের চারিধারে ঘিরে হাসছে—স্ত্রীলোকটির সামনে একটা শূন্য ফলের ঝুড়ি—এদিকে সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা খরমুজ।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, আমরা তো নতুন এদেশে এসেছি, কিছু বুঝি নে এ দেশের ভাষা। বোধ হয় খরমুজওয়ালীর সব ফল এরা কেড়ে নিয়ে দাম দিচ্ছে না। আপনি একবার দেখুন না।

বৃদ্ধ তাঁর এগারোটি ছাত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বাধা দিলেন সৈন্যদের। চীনা ভাষায় তুবড়ি ছুটলো উভয় পক্ষেই।

বৃদ্ধের ছাত্রগণও তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দরকার হোলে মারামারি করবে। মারামারি একটা ঘটতো হয়তো, কিন্তু সেই সময় জনৈক চীনা সামরিক অফিসার গোলমাল দেখে সেখানে উপস্থিত হতেই সৈন্যরা খরমুজ রেখে যে যার কামরায় উঠে বসলো। খরমুজওয়ালী গোটাকতক ফল লি ও তাঁর ছাত্রদের খেতে দিলে—বৃদ্ধ তার দাম দিয়ে দিলেন, খরমুজ-ওয়ালীর প্রতিবাদ শুনলেন না।

সন্ধ্যার সময় ট্রেন ফু-চু পৌছুলো।

ফু-চু থেকে অনেকগুলি সৈন্য উঠলো। ট্রেন কিন্তু ছাড়তে চায় না—খবর পাওয়া গেল, সামনের রেলপথে কি একটা গোলমালের দরুন ট্রেন ছাড়বার আদেশ নেই।

এ দেশে সময়ের কোনো মূল্য নেই। চার পাঁচ ঘণ্টা ওদের ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদল নেমে যে যার খুশি-মত স্টেশনে পায়চারি করছে, তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশের বাজারের মধ্যে ঢুকে হল্লা করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোট ছেলে তারের একরকম যন্ত্র বাজিয়ে গাড়ীতে গাড়ীতে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। প্রোফেসর লি তাকে ডেকে কি জিগ্যেস্ করলেন, তাকে কিছু খাবার দিলেন। তাঁরই মুখে বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে ছেলেটি অনাথ, স্থানীয় আমেরিকান মিশনে প্রতিপালিত হয়েছিল—এখন সেখানে আর থাকে না।

সন্ধ্যার আগে ট্রেন ছাড়লো। সারা রাতের মধ্যে যে কত স্টেশন পার হোল, কত স্টেশনে বিনা কারণে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল—তার লেখাজোখা নেই। এই রকম ধরনের রেলভ্রমণ বিমল ও সুরেশ্বর কখনো করেনি।

ভোরের দিকে ট্রেনখানা এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

বিমল ঘুমুচ্ছিল—ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেনখানা দাঁড়াতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল দেখলে দুধারের মাঠে ঘন কুয়াশা হয়েছে, দশহাত দূরের জিনিস দেখা যায়

না—সামনের দিকে লাইনের ওপর আর একখানা ট্রেন যেন দাঁড়িয়ে—কুয়াশায় তার পেছনের গাড়ীর লাল আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছে।

প্রোফেসর লি-ও ইতিমধ্যে উঠেছেন।

তিনি বল্লেন—ব্যাপারটা কি?

বিমল বল্লে—সামনে দুখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে—এই তো দেখছি। ঘোর কুয়াশা, বিশেষ কিছু দেখা যায় না।

ট্রেন থেকে লোকজন নেমে দেখতে গেল সামনের দিকে এগিয়ে। খুব একটা গোলমাল যেন শোনা যাচ্ছে সামনে।

সুরেশ্বরও উঠেছিল, বল্লে—চলো বিমল, এগিয়ে দেখে আসি।

প্রোফেসর লি-ও নামলেন ওদের সঙ্গে। দুখানা ট্রেনকে ঘন কুয়াশার মধ্যে অতিক্রম করে রেললাইনের সামনে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তা যেমন বীভৎস, তেমনি করুণ।

সেখানে আর একখানা ছোট সৈন্যবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে—কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানাকে ট্রেন বলে চিনে নেওয়ার উপায় নেই বল্লেই হয়। ছাদ উড়ে গিয়েছে, মোটা মোটা লোহার দণ্ড বেঁকে দুমড়ে লাইনের পাশের খাদে ছিটকে পড়েছে—জানলা-দরজার চিহ্ন বড় একটা নেই। কেবল ইঞ্জিনের কিছু হয় নি। শোনা গেল ট্রেনখানার ওপর বোমা পড়েছে এই কিছুক্ষণ আগে—কিন্তু সুখের বিষয় গাড়ীখানা একদম খালি যাচ্ছিল। এখানা কোনো টাইমটেব্‌ল্‌ভুক্ত যাত্রী বা সৈন্যবাহী ট্রেন নয়। খালি ট্রেনখানা ফু-চু থেকে সাংহাই যাচ্ছিল, ডাউন লাইনে বড় গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এর কামরাগুলো এই উদ্দেশ্যে। গার্ড ও ড্রাইভার বেঁচে গিয়েছে। কোনো প্রাণহানি হয় নি।

লাইন পরিষ্কার করতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। মাত্র পনেরো মাইল দূরে সাংহাই, সেখানে পৌছুতে বেজে গেল একটা।

সাংহাই নেমে বিমল ও সুরেশ্বর বুঝলে এ অতি বৃহৎ শহর; সাংহাইএর রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও আধুনিক ধরনে তৈরী, বড় বড় বাড়ী, দোকান, হোটেল, আপিস, স্কুল, কলেজ—চীনা ও ইংরাজী ভাষায় নানা সাইনবোর্ড চারিদিকে, মোটরের ও রিকশা-গাড়ীর ভিড়, রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য, চায়ের দোকান, চীনা ভাতের দোকানে ছোট বড় ইঁদুর ভাজা ঝোলানো রয়েছে, ফলওয়ালী রাস্তার ধারে বসে ফল বিক্রী করছে—এত বড় শহরের লোকজন ও ব্যবসাবাণিজ্য দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে এই সাংহাই শহরের ওপর বর্ত্তমানে জাপানী সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে পিকিং থেকে।

কিছু বদলায় নি যেন, মনে হয় প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সহজ ও উদ্বেগশূন্য ভাবেই চলেছে।

এখানে প্রোফেসর লি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। খুব বড় ধূসর রংয়ের সামরিক লরীতে চড়ে ওরা একটা বড় লম্বামতো বাড়ীর সামনে নীত হোল।

বাড়ীটা সামরিক বিভাগের একটা বড় দপ্তরখানা, এ ওদের বুঝতে দেরি হোল না—

ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদল ও অফিসারে ভর্ত্তি। প্রতি কামরায় চীনা ভাষায় সাইনবোর্ড আঁটা। অফিসার দল ঢুকছে বেরুচ্ছে, সকলের মুখেই ব্যস্ততার ভাব, উদ্বেগের চিহ্ন।

দু তিন জায়গায় ওদের নাম লেখা হোল—ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যে চীনা অফিসার, সে প্রত্যেক জায়গায় একটা লম্বা হল্‌দে চীনা ভাষায় লিখিত কাগজ খুলে ধরলে টেবিলের ওপর।

তবুও আইনকানুন শেষ হোল না—অবশেষে একটা কামরার সামনে ওদের দাঁড় করালে। কামরার মধ্যে নিশ্চয় কোনো বড় কর্ম্মচারীর আড্ডা, কারণ কামরার সামনে দর্শনপ্রার্থী সামরিক অফিসার ও অন্যান্য লোকের ভিড় লেগেছে।

ভিড় ঠেলে একটু কাছে গিয়ে বিমল পড়লে দরজার গায়ে পিতলের ফলকে ইংরিজীতে লেখা আছে—জেনারেল চু-সিন্‌-টে, অফিসার কমাণ্ডিং, নাইন্‌টিন্‌থ্‌ রুট্‌ আর্মি। ওদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি—জেনারেল সাহেবের কামরায় শীঘ্রই ডাক পড়লো। বড় টেবিলের ওপাশে এক সুশ্রী, সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত যুবা বসে, ইনিই জেনারেল চু-টে, পূর্ব্বে বিদ্রোহী কমিউনিস্ট সৈন্যদলের নেতা ছিলেন, বর্ত্তমানে জেনারেল চিয়াং-কৈ-শাক-এর বিশিষ্ট সহকর্ম্মী।

হাসিমুখে জেনারেল চু-টে মার্জ্জিত ইংরিজীতে বল্লেন—গুড্‌ মর্নিং, আপনাদের কোনো কষ্ট হয় নি পথে?

এরাও হাসিমুখে কিছু সৌজন্যসূচক কথা বল্লে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমি ভারতবর্ষের লোকদের বড় ভালবাসি। আপনারা আমাদের পর নন।

বিমল বল্লে—আমরাও তাই ভাবি।

—মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন? ঐ একজন মস্ত লোক আপনাদের দেশের!

জেনারেল চু-টে'র মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে বিমল ও সুরেশ্বর দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তবে মহাত্মা গান্ধী তো আর ওদের বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং তাঁর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওদের কোন জ্ঞান নেই—তার ওপর ওরা আজ দু'মাস দেশ ছাড়া।

—ভালই আছেন। ধন্যবাদ।—

—মিঃ জহরলাল নেহেরু ভাল আছেন? আমি তাঁকে শীগ্‌গির একটা চিঠি লিখছি আমাদের দেশের জন্য ভারতের সাহায্য, কংগ্রেসের সাহায্য চেয়ে।

বিমল ও সুরেশ্বরের বুক গর্ব্বে ফুলে উঠলো। একজন স্বাধীন দেশের বীর সেনানায়কের মুখে তাদের দরিদ্র ভারতের নেতাদের কথা শুনে, চীনদেশ ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী একথা শুনে ওরা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমার একসময় অত্যন্ত ইচ্ছে ছিল ভারতে বেড়াতে যাবো। নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। ভারতে ভাল বৈমানিক তৈরী হচ্ছে? এরোপ্লেন চালাবার ভাল স্কুল কোথাও স্থাপিত হয়েছে?

বিমলেরা এ খবর রাখে না। দমদমায় একটা যেন ঐ ধরণের কিছু আছে—তবে তার বিশেষ কোনো বিবরণ ওরা জানে না।

চু-টে বল্লেন—আপনাদের ধন্যবাদ, এদেশকে আপনারা সাহায্য করতে এসেছেন। আপনাদের ঋণ কখনো চীন শোধ দিতে পারবে না। আপনারা পথ দেখিয়েছেন। আপনাদের প্রদর্শিত পথে দুই দেশের মিলন আরও সহজ হোক্ এই কামনা করি।

বিমল বল্লে—এখন কি আমাদের সাংহাইতে থাকতে হবে?

—কিছুদিন। বৈদেশিক মেডিকেল ইউনিট আমেরিকান্ ডাক্তার ব্লুমফিল্ডের অধীনে। এখন আপনাদের থাকতে হবে মার্কিন কন্‌সেশনে—সাধারণ শহরে নয়। আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে চীন গবর্নমেণ্ট আপনাদের জীবনের জন্য দায়ী। সাধারণ শহরে বোমা পড়বে, হাতাহাতি যুদ্ধ হবে—এখানে কারো জীবন নিরাপদ নয়। আন্তর্জ্জাতিক কন্‌সেশনে আমরা হাসপাতাল খুলেছি। সেখানে আপনারা কাজ করবেন।

—ইওর এক্সেলেন্সি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, যদি বেয়াদবি না হয়!

—বলুন?

—সাংহাই কি জাপানীরা আক্রমণ করবে বলে আপনি ভাবেন?

জেনারেল চু-টে বল্লেন—এ তো আন্দাজের কথা নয়—সাংহাইএর দিকেই তো ওরা পিপিং থেকে আসছে। সেন্‌সি হচ্ছে লুংহাউ রেলের শেষপ্রান্ত। সেখানে আমরা সৈন্য জড় করছি ওদের বাধা দিতে। যাতে উত্তর-পশ্চিম চীনে আর না এগুতে পারে। তবে সাংহাইতে একটা বড় যুদ্ধ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। মেডিকেল ইউনিটের আরও সেইজন্যে সাংহাইতেই এখন দরকার।

সুরেশ্বর ও বিমল অভিবাদন করে বিদায় নিলে।

সৈন্যবিভাগের দপ্তরখানা থেকে বার হয়ে ওরা মোটরে চড়ে আন্তর্জ্জাতিক কন্‌সেশনে পৌছুলো। বিমল ও সুরেশ্বর লক্ষ্য করলে ব্রিটিশ প্রজা হোলেও ওদের ব্রিটিশ কন্‌সেশনে না নিয়ে গিয়ে ফরাসী কন্‌সেশনে নিয়ে যাওয়া হোল। ওদের সঙ্গে দু'জন চীনা সামরিক কর্ম্মচারী ছিল, আবশ্যকীয় কাগজপত্র তারাই দেখালে বা সই করালে।

প্রকাণ্ড ব্যারাক। কড়া সামরিক আইন কানুন। হুকুম না নিয়ে কন্‌সেশনের সীমার বাইরে যাবার নিয়ম নেই, ঢোকবারও নিয়ম নেই। ফরাসী সান্ত্রী রাইফেল হাতে সর্ব্বদা পাহারা দিচ্ছে। ফরাসী জাতীয় পতাকা উড়ছে ব্যারাকের পতাকা-মন্দিরে। ওদের যাবার দুদিন পরে একদল আমেরিকান্ যুবক কন্‌সেশনে এসে পৌছুলো—এরা বেশীর ভাগ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। এসেছে চীন গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করতে, নিজেদের সুখ-সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়ে, প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করে। এদের মধ্যে তিনটি তরুণী ছাত্রীও ছিল, এরা এল সেদিন সন্ধ্যাবেলা। এদের কন্‌সেশনে ঢোকানো নিয়ে চীনা গবর্নমেণ্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

একটি মেয়ের নাম এ্যালিস্ ই. হুইট্‌বার্ন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিমলের সঙ্গে

সে যেচে আলাপ করলে। যেমনি সুশ্রী তেমনি অদ্ভুত ধরণের প্রাণবন্ত, সজীব মেয়ে। কুড়ি একুশ বয়েস—চোখেমুখে বুদ্ধির কি দীপ্তি!

বিমল তাকে বল্লে—মিস্ হুইটবার্ন, তুমি কি ডাক্তারীর ছাত্র ছিলে?

মেয়েটি বল্লে—না। আমি নার্স হবো আন্তর্জ্জাতিক রেডক্রসে কিংবা চীনা সামরিক বিভাগের হাসপাতালে।

—তোমার বাপ-মা আছেন?

—আছেন। আমার বাবা ঘোড়ার শিক্ষক। খুব নাম-করা লোক আমাদের কাউন্টিতে।

—তাঁরা তোমাকে ছেড়ে দিলেন?

—তাঁদের বুঝিয়ে বল্লাম। জগতের এক হতভাগা জাতি যখন এত দুর্দ্দশা ভোগ করছে, তখন পড়াশুনো বা বিলাসিতা কি ভাল লাগে? আমি আমার সেন্ট আর পাউডারের টাকা জমিয়ে, টকির পয়সা জমিয়ে, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এদের সাহায্যের জন্যে মার্কিন রেড ক্রস্ ফণ্ডে। তারপর নিজেই না এসে পারলুম না—তুমিই বলো না মিঃ বোস্, পারা যায় থাকতে?

বিমল মুগ্ধ হয়ে গেল এই বিদেশিনী বালিকার হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পেয়ে। স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে! সংস্কারের পুঁটুলি নয়।

মেয়েটা বল্লে—আমাকে এ্যালিস্ বলে ডেকো। একসঙ্গে কাজ করবো, অত আড়ষ্ট ভদ্রতার দরকার নেই। আমার একখানা ফটো দেবো তোমায়, চলো তুলিয়ে আনি দোকান থেকে।

কন্‌সেশনের মধ্যে প্রায়ই সব আমেরিকান দোকান। মেয়েটি বল্লে—চলো সাংহাই শহরের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি—কোনো চীনা দোকানে ফটো তুলবো। ওরা দু পয়সা পাবে।

অনুমতি নিয়ে আসতে আধঘণ্টা কেটে গেল, তারপর বিমল আর এ্যালিস্ কন্‌সেশনের বড় ফটক দিয়ে সাংহাইয়ে যাবার রাস্তার ওপর উঠে একখানা রিক্‌শা ভাড়া করলে।

কন্‌সেশনে রাস্তাঘাটের নাম ইংরাজীতে ও ফরাসী ভাষায়। সাংহাই শহরে চীনা ভাষায়। কিছু বোঝা যায় না। ঢলঢলে নীল ইজের ও স্ট্র হ্যাট পরে চীনা রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা টানছে, কিন্তু এ অংশেও বহু বিদেশী লোক ও বিদেশী দোকান-পসারের সারি। সাংহাইএর আসল চীনাপল্লী আলাদা—রাস্তা সেখানে আরও সরু সরু—একথা বিমল ইতিমধ্যে চীনা অফিসারদের মুখে শুনেছিল।

এ্যালিস্ বল্লে—চল, চীনাপাড়া দেখে আসি, মিঃ বোস্।

রিক্‌শাওয়ালাকে চীনাপাড়ার কথা বলতেই সে বারণ করলে। বল্লে—সেখানে কেন যাবে? এ সময় সে সব জায়গা ভালো নয়। বিপদে পড়তে পারো। তোমাদের সেখানে নিয়ে গেলে আমায় পুলিসে ধরবে।

এ্যালিস্ ভয় পাবার মেয়েই নয়। বল্লে—চল, মিঃ বোস্, আমরা হেঁটেই যাবো। ওকে বিপদে ফেলতে চাই নে। ওর ভাড়া মিটিয়ে দিই।

বিমল রিক্‌শাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দিলে, এ্যালিস্‌কে দিতে দিলে না। কিন্তু রাস্তা দুজনে কেউই জানে না।

বিমল বল্লে—একখানা ট্যাক্সি নিই, এ্যালিস্! সে অনেকদূর, রাস্তা না জানলে ঘুরে হায়রান হবো।

হঠাৎ এ্যালিস্ ওপরের দিকে চেয়ে বল্লে—ও কি ও, মিঃ বোস্? এরোপ্লেনের শব্দ শুনছো? অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে আসছে যেন। কোন্‌দিকে বলো তো?

বিমলও শুনলে। বল্লে—গবর্নমেণ্টের এরোপ্লেন।

কিন্তু চক্ষের নিমেষে একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হোল, যা বিমলের অভিজ্ঞতার বাইরে!

সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ওপর বিকট এক আওয়াজ হোল—বাজ পড়ার আওয়াজের মত—সঙ্গে সঙ্গে এদিকে, ওদিকে, সামনে, পিছনে, পর পর সেই রকম ভীষণ আওয়াজ। ইট, চূণ, টালি চারিদিকে ছুটতে লাগলো। বিরাট শব্দ করে সামনের সেই বাড়ীটার তেতলার ছাদ ধ্বসে পড়লো ফুটপাথের ওপর। বাড়ীধ্বসা চূণ স্বরকির ধুলোয় ও কিসের ঘন শ্বাসরোধ-কারী ধোঁয়ায় বিমল ও এ্যালিস্‌কে ঘিরে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠলো মানুষের গলার আর্ত্ত চীৎকার, গোলমাল, গোঙানি, কাতর কাকুতি, অনুনয়ের শব্দ, দুড়দাড় শব্দে ছুটে চলার পায়ের শব্দ, কান্নার শব্দ, সে এক ভয়ানক কাণ্ড!

বিমল প্রথমটা বুঝতে না পেরে সেই ঘন ধূম আর ধূলির মধ্যে হতভম্বের মত খানিক দাঁড়িয়ে রইল—ব্যাপার কি? তারপরেই বিদ্যুৎ-চমকের মত তার মনে এল এ জাপানী এরোপ্লেনের বোমা বর্ষণ!

এ্যালিস্ কই? একহাতের দূরের মানুষ চোখে পড়ে না, সেই ধোঁয়া ধূলো আর গোলমালের মধ্যে। ওর কানে গেল এ্যালিসের উচ্চ ও সশঙ্ক কণ্ঠস্বর—মিঃ বোস, এসো—আমার হাত ধরো—বোমা পড়ছে—দৌড় দাও!

অন্ধকারের মধ্যে বিমল এ্যালিসের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বল্লে—কোথাও নড়ো না এ্যালিস্, নড়লেই মারা যাবে। দাঁড়াও এখানে।

কিন্তু তখন আর ছুটবার বা পালাবার পথও নেই। পরবর্তী পাঁচ মিনিট কালের ঠিক হিসেব বিমল দিতে পারবে না। সে নিজেও জানে না। বাঁশঝাড়ে আগুন লাগলে যেমন গাঁটওয়ালা বাঁশ ফট্‌ফট্ করে একটার পর একটা ফাটে তেমনি চারিদিকে দুম্ দাম্ শুধু বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ।

পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে, টলছে—ভূমিকম্পের মত—ধোঁয়া, বাড়ী ধ্বসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আর্ত্তনাদ—তারপরে সব চুপচাপ, বোমার আওয়াজ থেমে গেল। বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনগুলো মাথার ওপরে চক্রাকারে দুবার ঘুরে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল—বেশ যেন নিরুপদ্রব, শান্ত ভাবেই।

ধোঁয়ায় মিনিট দুই তিন কিছু দেখা গেল না—যদিও গোলমাল, চীৎকার লোক জড় হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিসের তীব্র হুইসল্ বেজে উঠলো একবার—দুবার, তিনবার।

ক্রমে ধীরে ধীরে ধুলো আর ধোঁয়ার আবরণ কেটে যেতেই এ্যালিস্ বল্লে—চলো এগিয়ে গিয়ে দেখি, মিঃ বোস্—

সামনে এক জায়গায় ফুটপাথের ওপর বেজায় লোক জড় হয়েছে। একটা বাড়ী পড়েছে ভেঙ্গে। অতি বীভৎস দৃশ্য ফুটপাথের ওপর। অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানটায়। বাড়ীটা বোধহয় একটা চীনা স্কুল ছিল—বেলা এগারোটা, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছিল, কতক ছিল স্কুল বাড়ীর মধ্যে। বাড়ীখানা একেবারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার খানিকদূর পর্য্যন্ত।

হর্ন বাজিয়ে দুখানা রেড্‌ক্রশ এ্যাম্বুলেন্স এল। একটা ছোট ছেলে এখনও নড়ছে—এ্যালিস্ ছুটে তার পাশে গিয়ে বসলো। বিমল এক চমক দেখেই বল্লে—কোনো আশা নেই মিস্ হুইটবার্ন—ও এখুনি যাবে।

বিমলের গা তখনও কাঁপছে। জীবনে এ রকম দৃশ্য কখনো দেখবার কল্পনাও সে করেনি। যুদ্ধ না শিশুপাল বধ!

এ্যালিস্ বিমলের কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আহত কেউ ছিল না—সবাই মৃত।

সব শেষ হয়ে যাবার পরে বিমল বল্লে—এ্যালিস্, এখন কি করবে? আর কি চীনে পল্লীতে যাবে এখন?

এ্যালিস্ বল্লে—যেতাম কিন্তু এই যে বোমা-ফেলা হয়ে গেল, এর শোরগোল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে তো। কন্‌সেশনের সবাই আমাদের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়বে। সুতরাং চলো ফেরা যাক।

কিছুদূরে যেতেই দেখলে হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স ছুটোছুটি করছে। চীনা গবর্নমেণ্টের এ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ কামানগুলো চারদিক থেকে ছোঁড়া হতে লাগলো—কিন্তু তখন জাপানী বিমান কোথায়? আকাশের কোনো দিকেই তার পাত্তা নাই।

ওরা কন্‌সেশনে ফিরে এল। সুরেশ্বরের কাছে বিমল খুব বকুনি খেল, তাকে ফেলে যাওয়ার জন্যে।

এ্যালিস্ বল্লে—ওকে বকচো কেন—আমি ভেবেছি আজ বিকেলে আবার চীনাপাড়ায় যাবার চেষ্টা করবো। তুমি চলো না, সুরেশ্বর?

এবার ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে যাবে বল্লে। এ্যালিসের সঙ্গে পড়তো, নাম তার মিনি—মিনি বেরিংটন।

বিকেলে ওরা ট্যাক্সি আনালে। ওদের ট্যাক্সি কন্‌সেশনের গেট্ পর্য্যন্ত এসেছে—এমন সময় একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্ম্মচারী ওদের ট্যাক্সিখানা থামালে।

বল্লে—আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বল্লে—শহর বেড়াতে।

—যাবেন না। আমরা গুপ্ত খবর পেয়েছি, জাপানী যুদ্ধজাহাজ বন্দরের বাইরের সমুদ্র

থেকে লম্বা পাল্লার কামানে গোলাবর্ষণ শুরু করবে আজ সন্ধ্যার সময়ে—সেই সঙ্গে জাপানী উড়ো জাহাজও যোগ দেবে বোমা ফেলতে।

—ধন্যবাদ। আমরা একটু ঘুরে এখুনি চলে আসবো।

একথা বল্লে এ্যালিস্—কাজেই বিমল বা সুরেশ্বর কিছু বলতে পারলে না। শহরের মধ্যে এসে দেখলে, পুলিস সকলের হাতে চীনা ভাষায় মুদ্রিত এক এক টুকরো কাগজ বিলি করছে। চীনা ছাত্রদের একটা লম্বা দল পতাকা উড়িয়ে মুখে কি বলতে বলতে শোভাযাত্রা করে চলেছে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর। এত বড় শহর বিমল দেখে নি—সুরেশ্বরও না। কলকাতা এর কাছে লাগেই না।

চীনাপল্লীর নাম চা-পেই। সে জায়গাটায় রাস্তাঘাট কিন্তু অপরিষ্কার নয়—তবে বড় ঘিঞ্জি বসতি। প্রত্যেক মোড়ে খাবারের দোকান, ছোট বড ইঁদুর ভাজা ঝুলছে। বাঁকে করে ফিরিওয়ালা ভাত তরকারী বিক্রী করছে।

বিমলের ভারী ভালো লাগলো এই চীনাপাড়ার জীবনস্রোত। এক জায়গায় একটা বুড়ী বসে ভিক্ষে করচে - টাকা-পয়সার বদলে সে পেয়েছে ভাত তরকারী, ওর মুখে এমন একটি উদার.ভালবাসার ভাব, চোখে সন্তোষ ও তৃপ্তির দৃষ্টি। বোধ হয় আশাতীত ভাত তরকারী পেয়েছে বলে এত খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ সরল সন্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে।

হঠাৎ আকাশে কি একটা অদ্ভুত ধরণের শব্দ শুনে ওরা মুখ তুলে চাইলে। একটা চাপা 'সোঁ-ও-ও' শব্দ। মিনি সর্ব্বপ্রথমে বলে উঠল—এ শেলের শব্দ! সর্ব্বনাশ, এ্যালিস্, চলো আমরা ফিরি --জাপানী যুদ্ধজাহাজের কামান থেকে শেল ছুঁড়ছে!

দুম্! দুম্!—দূরে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ শোনা গেল।

কাছেই কোথায় একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ হোল সঙ্গে সঙ্গে। লোকজন চারিধারে ছুট্‌তে লাগলো—ওরাও ছুটলো তাদের পিছু পিছু। বসতি যেখানে খুব ঘিঞ্জি, সেখানে একটা বাড়ীতে গোলা পড়েছে। বাড়ীটার সামনের অংশ হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে—ইট, চুণ, টালিতে সামনের রাস্তাটা প্রায় বন্ধ—কে মরেছে না মরেছে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে লোকজনের বেজায় ভিড়।

আবার সেই রকম 'সোঁ—সোঁ—ও—ও' শব্দ!

কাছেই আর একটা জায়গায় গোলা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সারবন্দী একদল এরোপ্লেন দেখা গেল। তারা অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, পাছে চীনা বিমানধ্বংসী কামানের গোলা খেতে হয় এই ভয়ে।

এ্যালিস্ বল্লে—ওরা পাল্লা ঠিক করে দিচ্ছে যুদ্ধজাহাজের গোলন্দাজদের। চলো এখানে আর থাকা নয়—এই চীনা পাড়াটা ওদের লক্ষ্য।

কিন্তু ওদের যাওয়া হোল না। এ্যালিসের কথা শেষ হোতে না হোতেই, যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পে, পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল এবং একসঙ্গে দু'তিনটি শেলের বিস্ফোরণের

বিকট আওয়াজ ও সেই সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ও বিশ্রী শ্বাসরোধকারী কর্ডাইট-এর উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। তুমুল হৈ চৈ, আর্ত্তনাদ, কলরব ও পুলিসের হুইস্‌লের মাঝে এ্যালিসের হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে স্বরেশ্বর, কিন্তু পালাবার পথ নেই তখন কোনো দিকেই। ওদের ট্যাক্সিখানা দাঁড়িয়ে আছে বটে, ট্যাক্সিওয়ালার সন্ধান নেই—সে বোধ হয় পালিয়েছে।

চা-পেই পল্লীর ওপর কেন বিশেষ লক্ষ্য জাপানী তোপের, এ কথা বোঝা গেল না, কারণ এখানে চীনা গৃহস্থদের বাড়ীঘর মাত্র, কোনো সামরিক ঘাঁটি তো নেই এখানে। দেখতে দেখতে বাড়ীঘর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়ে সামনের পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন আগে যা কিছু ম্যরা পড়েছিল—এখন সবাই পালিয়েছে, কেবল যারা ভাঙা বাড়ীর মধ্যে আটকে পড়েছে তাদেরই আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

একটা ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেন ছোট ছেলের কান্নার শব্দ। এ্যালিস বল্লে—দাঁড়াও বিমল—এখানে সবাই দাঁড়াও।

গোলাবর্ষণ তখনও চলছে, কিন্তু চীনাপল্লীর অন্য অঞ্চলে। এদিকে এখন শুধু গোঙানি, চীৎকার, হৈ-চৈ, কলরব ও কাতরোক্তি।

এ্যালিস্ আগে চড়লো গিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপরে। পেছনে মিনি ও স্বরেশ্বর। বিমল নীচে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কড়িকাঠ সরিয়ে ওরা তিনজনে একটা দরজা পেলে। তারপর একটা ছোট ঘর। এ্যালিস্ অতি কষ্টে ঘরে ঢুকলো—স্বরেশ্বর ওকে সাহায্য করলে। একটা ন-দশ মাসের শিশু সেই ঘরের মেঝেতে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

এ্যালিস্ তাকে সন্তর্পণে মেঝে থেকে তুলে স্বরেশ্বরের হাতে দিলে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঘরটার মধ্যে অন্ধকার। তিনজনে ঘরের মধ্যে থেকে ইটকাঠের স্তূপটার ওপরে উঠে শুনলে, বিমল উত্তেজিত ভাবে ডাকছে—আঃ, কোথায় গেলে তোমরা? চট্ করে নেমে এসো—বড় বিপদ!

চারিদিকের গোলা ফাট্‌বার আওয়াজ ও ছুটন্ত শেলের চাপা 'সোঁ—ও—ও' রব খুব বেড়েছে। একটা একটা শেল মাঝে মাঝে আকাশেই সশব্দে ফেটে তারাবাজির মত অনেকখানি আকাশ আলো করে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ্যালিস্ বল্লে—কি হয়েছে?

বিমল বল্লে—জাপানী সৈন্যদল যুদ্ধজাহাজ থেকে নেমেছে শহরে—তারা শহর আক্রমণ করছে শুনছি। এইদিকেই আসছে। তাদের হাতে পড়া আদৌ আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে না—তোমার হাতে ও কি?

মিনি বল্লে—একটা ছোট্ট ছেলে। একে কোথায় রাখি বলো তো এখন?

স্বরেশ্বর একজন ব্যস্ত ও উত্তেজিত পুলিসম্যানকে জিগ্যেস করে জানলে—সমুদ্রের ধারে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। জাপানীরা নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে।

এ্যালিস বল্লে—আমরা এখন ছোট ছেলেটিকে কোথায় রাখি বলো না? কনসেশনের

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ওর বাপ-মা এই অঞ্চলের অধিবাসী। ছেলের সন্ধান পাবে না কন্‌সেশনে নিয়ে গেলে।

বিমল বল্লে—পুলিসম্যানদের জিম্মা করে দাও না।

এ্যালিস্ ও মিনি তাতে রাজি হোল না। এই সব চীনা পুলিসম্যান দায়িত্বজ্ঞানহীন, ওদের হাতে ছোট্ট ছেলেকে ওরা দেবে না।

সমস্ত গলিটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—লোকজন অন্ধকারে তার মধ্যে কি সব খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময় পাশের একটা স্তূপে দু'তিনটি হারিকেন লণ্ঠন ও টর্চ জ্বালিয়ে একদল ছোকরা একটি মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে বার করছে দেখা গেল।

বিমল উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো প্রোফেসর লি! প্রোফেসর লি!

তারপরেই সে ছুটে গেল ছোকরার দলের দিকে। সুরেশ্বর দেখলে ছোকরার দলের নেতা হচ্ছেন, দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ—এবং তিনি তাদের পূর্ব্বপরিচিত প্রোফেসর লি।

সেই মুমূর্ষুদের আর্ত্তনাদ ও পথের লোকের চীৎকারের মধ্যে তিনজনের ব্যাকুল প্রশ্ন বিনিময় হোল। প্রোফেসর লি তাঁর ছাত্রদল নিয়ে নিকটেই এক সরাইখানায় ছিলেন—হঠাৎ এই বোমাবর্ষণের দুর্য্যোগ—এখন তিনি সেবাব্রতী, ছাত্রদের নিয়ে হতাহতদের টেনে বার করা ও তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ্যালিস্ ও মিনির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হোল।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, এই ছোট ছেলেটির কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?

সদানন্দ সৌম্য বৃদ্ধ হাত পেতে বল্লেন—আমায় দাও। তোমরা ওর বাপ-মায়ের সন্ধান করতে পারবে না, আমি পারবো। আর কি জানো ছেলে অনেকগুলো জমেছে—চ্যাং, এদের নিয়ে চলো তো? দেখবে এসো তোমরা—

যাবার পথে একটু দূর গিয়েই বিমল বলে উঠলো—আঃ, কি ব্যাপার দেখ!

সকলেই দেখলে, সে দৃশ্য যেমন বীভৎস তেমনি করুণ। সেই বৃদ্ধা ভিখারিণী ঠ্যাং ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে—সেই জায়গাতেই। একখানা হাত প্রায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—পাশেই তার ভিক্ষালব্ধ ভাত-তরকারিগুলো রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে। আশার জিনিসগুলো—মুখেও দিতে পারে নি হয়তো!

এ্যালিসের চোখে জল এল। বিমল ও সুরেশ্বর মাথার টুপি খুলে বসল। মিনি চোখে রুমাল দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। কেবল অবিচলিত রইলেন প্রোফেসর লি। তিনি ছাত্রদের বল্লেন, এই মড়াটাকে একটা কিছু ঢাকা দাও তো হে! এ আর কি? আমাদের দেশের এ তো রোজকার ব্যাপার! এতে বিচলিত হোলে চলে না মাদাম।

নিকটেই একটা ঘরের মধ্যে প্রোফেসর লি ওদের নিয়ে গেলেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সে ঘরের মেঝেতে পাঁচ-ছয়টি নয় দশ মাসের কি এক বছরের শিশু অনাবৃত মেঝের ওপর পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে!

এ্যালিস্ ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—ও' ইউ পুওর ডিয়ারিজ্!

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—সন্ধ্যা থেকে এতগুলো উদ্ধার করেছি স্তূপ থেকে। আপনাদেরটিও দিন। আমার দুটি ছাত্র এখানে পাহারা দিচ্ছে—আমরা খুঁজে এনে এখানে জড়ো করছি—রাখো এখানে।

গোলমাল ও ভিড় এখন একটু কমেছে।

প্রোফেসর লি সকলকে বল্লেন- আসুন, একটু চা খাওয়া যাক—রাত্রে আর ঘুম হবে না আজ, সারারাত এই রকম চলবে দেখছি—

যে ঘরে শিশুগুলিকে জড়ো করা হয়েছে, তার পাশেই একটা ছোট বাড়িতে লি থাকেন তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিয়ে। দুজন ছাত্রকে শিশুদের কাছে রেখে বাকী সকলে ওদের নিয়ে গেল তাদের সেই বাসায়।

ছোট ছোট পেয়ালায় দুধ-চিনি-বিহীন সবুজ চা, শসার বিচি ভাজা, শরবতী লেবুর টুকরো এবং বাঙালী মেয়েদের পাঁইজোরের মত দেখতে, শূয়োরের চর্ব্বিতে ভাজা একপ্রকার কি খাবার।

সুরেশ্বর ও বিমল শেষোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কি এক ধরনের বিশ্রী গন্ধ খাবারে!

প্রোফেসর লি বল্লেন—আপনারা বিদেশী। আমাদের দেশকে সাহায্য করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখনও কিছুই দেখেন নি, দেখলে আপনাদের দয়া হবে। এত গরীব দেশ আর এমন হতভাগ্য—

মিনি বল্লে—আমাদের সব দেখাবেন দয়া করে প্রোফেসর লি। দেখতেই তো এসেছি—

এ্যালিস্ বল্লে—আর একটা দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুঃস্থ ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।

বিমল এ্যালিসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইলে—বড় ভাল লাগলো এই বিদেশিনী বালিকার এই নিষ্কপট নিঃস্বার্থ সহানুভূতি তার দরিদ্র স্বদেশের জন্যে।

এ্যালিস্ বল্লে—শিশুগুলির কে আছে? পুওর লিট্‌ল মাইট্‌স্। আমায় একটা খোকা দেবেন প্রোফেসর লি?

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—কি করবে মিস্—

এ্যালিস্ বল্লে—আমাদের নাম ধরে ডাকবেন প্রোফেসর লি, ওর নাম মিনি, আমার নাম এ্যালিস্। আমরা আপনাকে দাদু বলে ডাকবো - কেমন?

এই সদানন্দ উদার, সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধকে এ্যালিসের বড় ভাল লেগে গেল। কিউরিও দোকানে বিক্রি হয় যে চিনে মাটির হাস্যমুখ বৃদ্ধ—বৃদ্ধের মুখখানা ঠিক যেন তেমনি পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও প্রেমের ভাব মাখানো।

প্রোফেসর লি'র মুখ উদার হাসিতে ভরে গেল। বল্লেন—বেশ তাই হবে।

একটা বড় রকমের আওয়'জের দিকে এই সময় প্রোফেসর লি'র জনৈক ছাত্র ওদের

সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলে।

বিমল বল্লে—বন্দরের দিকে এখনও গোলাবর্ষণ চলছে, হাতাহাতি যুদ্ধও চলছে—

ঠিক এই সময় পুলিসম্যান ঘরের দোরের কাছে এসে চীনা ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে—লোকটা যেন খুব ব্যস্ত ও উত্তেজিত—সে চলে গেলে প্রোফেসর বল্লেন—ও বলে গেল খাওয়া দাওয়া শেষ করে কেউ যেন আজ ঘরের বার না হয়—বিশেষতঃ মেয়েরা। জাপানীরা বেওনেট চার্জ করেছিল—আমাদের সৈন্যরা হটিয়ে দিয়েছে শেনস্ প্রাচীরের পূর্ব্ব কোণে। কিন্তু আজ রাত্রে আবার ওরা গোলা মারবে, বোমাও ছুঁড়বে।

চা পান শেষ হোল। বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, মেয়েরা রয়েছেন সঙ্গে, আজ যাই। কন্‌সেশনে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

এ্যালিস্ বল্লে—দাদু, আমার একটা খোকা?

প্রোফেসর লি এ্যালিসের মাথায় হাত দিয়ে খেলার ছলে সস্নেহে বল্লেন—বেওয়ারিশ যদি কোনো খোকা থাকে, পাবে এ্যালিস্। কিন্তু কি করবে চীনা ছেলে নিয়ে?

এ্যালিসের এ হাস্যকর অনুরোধ শুনে মিনি তো হেসেই খুন।

—চল চল এ্যালিস্, কন্‌সেশনে একটা জ্যান্ত খোকা নিয়ে তোমায় ঢুকতেই দেবে কি?

ওরা যখন ফিরে আসছে, দূরে মাঝে মাঝে দুমদাম বিস্ফোরণের শব্দ এবং সাহায্যকারী এরোপ্লেনের হাউইয়ের শাদা অগ্নিময় ধূম দেখা যাচ্ছিল। তবে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

সেই রাত্রে কিসের বিষম আওয়াজে বিমলের ঘুম ভেঙে গেলে—সে ধড়মড় করে উঠে বিছানার ওপর বসলো—কর্ডাইটের শ্বাসরোধকারী ধূমে ও বিশ্রী গন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে।

ও ডাকলে—সুরেশ্বর—সুরেশ্বর—ওঠো—কন্‌সেশনে বোমা পড়ছে!

সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট হৈ চৈ উঠলো চারিদিকে।

বোমা! বোমা!

ওরা জানলা দিয়ে দেখলে, যে-ঘরের মধ্যে ওরা শুয়ে ছিল—তার পূর্বদিকে আর একটা ঘরের দেওয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে এ্যালিস্ ছুটতে ছুটতে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলে—বিমল! বিমল!

বিমল বল্লে—এই যে এ্যালিস্, তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি? মিনি কোথায়?

বলতে বলতে মিনিও ঘরে ঢুকলো। বল্লে—বাইরে এসো, দ্যাখো শিগগির—চট্ করে এসো—

ওরা বাইরে গেল। কন্‌সেশনের পুলিসের ডেপুটি মার্শাল এসে পৌঁছেছেন দুর্ঘটনার স্থানে। সবাই আকাশের দিকে চাইলে, দুখানা এরোপ্লেন চলে যাচ্ছে—আলো নিবিয়ে। জনৈক ফরাসী কর্ম্মচারী দেখে বললে—কাওয়াসাকি বম্বার!

বিমল বল্লে—এ্যালিস্, কি করে চেনা গেল জিগ্যেস করো না?

মিনি বল্লে—আমি জানি। নীচের দিকে উইং-এ কালো আঁজি কাটা ছুঁচোমুখ প্লেন্ এই

হোল জাপানীদের বিখ্যাত বোমা ফেলবার প্লেন কাওয়াসাকি বম্বার। কিন্তু কন্‌শেসনে বোমা! এরকম তো কখনো—

সে রাত্রে আর কারো ঘুম হোল না। বিমল খুব খুশী না হয়ে পারলে না, তার মঙ্গলা-মঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে। সেই রাত্রে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস্ সকলের আগে এসেছে তাকে দেখতে, সে কেমন আছে!

শেষ রাত্রের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু শোরগোলে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

ভীষণ গোলাবর্ষণের শব্দ আসছে—সাংহাই শহরে জাপানী যুদ্ধজাহাজ ও এরোপ্লেন থেকে একযোগে গোলা ও বোমা বৃষ্টি হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই শহর থেকে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে পালিয়ে আসছে কন্‌শেসনে—বাক্স তোরঙ্গ, পোঁটলা পুঁটুলি নিয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। এদের সবারই মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন—এদের চক্ষু উদ্বেগে ও রাত্রি জাগরণে রক্তবর্ণ, চুল রুক্ষ, পাশব বলের কাছে মানুষের কি শোচনীয় পরাজয়!

বেলা দশটার মধ্যে ব্রিটিশ কন্‌শেসনের হাসপাতাল ও মার্কিন রেডক্রশের বড় হাসপাতাল আহতের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কি ভীষণ আওয়াজ ও গোলমাল পেন্‌স্থ প্রাচীরের দিকে, সমুদ্রের থেকে মাইল দুই দূরে পূর্ব্ব কোণে। সেখানে চীনা টেম্থ-রুট্ আর্মির সঙ্গে জাপানী নৌ-সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে। কন্‌শেসন থেকে যুদ্ধস্থলের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল, বিমল জিজ্ঞেস করে জানলে। এ ছাড়াও গোলাবর্ষণ চলছে শহরের বিভিন্ন স্থানে।

টেলিফোনে অর্ডার এল মেডিকেল ইউনিটের বড় ডাক্তারের কাছে থেকে—বিমল, সুরেশ্বর, এ্যালিস্ ও মিনিকে চ্যাং-লীন এ্যাভিনিউতে চীনা সামরিক হাসপাতালে যাবার জন্যে।

ওরা আমেরিকান রেডক্রস মোটরে সামরিক হাসপাতালের দিকে ছুটলো। ড্রাইভার খুব বড় একটা রেডক্রশ পতাকা গাড়ীর বনেটে উড়িয়ে দিলে—এ ছাড়া গাড়ীর ছাদের বাইরের পিঠে সারা ছাদ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড লাল ক্রস আঁকা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ড্রাইভার বল্লে—যদি আপনারা হাসপাতালে পৌছতে পারেন, সে খুব জোর-বরাত বুঝতে হবে আপনাদের।

সুরেশ্বর ও বিমল একযোগে বল্লে কেন?

— কন্‌শেসন বা রেডক্রস কিছুই মানছে না। জাপানী বোমারু প্লেন কালও আমাদের রেড্‌ক্রস ভ্যানে বোমা ফেলেছে—শোনেন নি আপনারা সে কথা?

সেকথা না শোনাই ভাল। ওদের মোটর কন্‌শেসন থেকে বার হয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে তীর বেগে ছুটলো। বিমল দেখলে ড্রাইভার মাঝে মাঝে উপরের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে কি দেখছে।

বিমল বল্লে—কি দেখছো?

—বোমারু প্লেন আসছে কিনা দেখছি! এখন আপনাদের পৌঁছে দিতে পারবো কিনা জানি নে—তবে চেষ্টা করবো—

বলতে বলতে একখানা এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। বিমলের মুখ শুকিয়ে গেল—সামনে উদ্যত মৃত্যুকে কে না ভয় করে? সবাই ওপরের দিকে চাইলে। ড্রাইভার এ্যাক্‌শিলারেটর পা দিয়ে চেপে স্পীড তুললে হঠাৎ বেজায়।

বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনখানা যেন আরও নীচে নামলো—কিন্তু ভাগ্যের জোরেই হোক্‌ বা অন্য কারণেই হোক্‌—শেষ পর্য্যন্ত সেখানা ওদের ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

ড্রাইভার বল্লে—জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার—ভীষণ জিনিস—নিচু হয়ে দেখলে এ গাড়ীতে চীনেম্যান আছে কিনা, থাকলে বোমা ফেলতো।

সুরেশ্বর বল্লে—উঃ, কানের কাছ দিয়ে তীর গিয়েছে।

এতক্ষণ যেন গাড়ীর সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল, এইবার একযোগে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখলে সেখানে এত আহত নরনারী এনে ফেলা হয়েছে যে কোথাও একটুকু জায়গা নেই। এদের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা। যুদ্ধের সৈন্যও আছে—তবে তাদের সংখ্যা তত বেশী নয়।

একটি দশ-এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর মুখ বালকের একখানা পা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে—আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে এবং কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে থাকলেও এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করছে। বিমলের ওয়ার্ডেই সে বালকটি আছে। এ্যালিস্‌ সেই ওয়ার্ডেই নার্স।

এ্যালিস্‌ পেশাদার নার্স নয়, বয়সেও নিতান্ত তরুণী, চোখের জল রাখতে পারলে না ছেলেটির যন্ত্রণা দেখে। বিমলকে বল্লে—একে মরফিয়া খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো না?

বিমল বল্লে—তা উচিত হবে না। ওকে এখুনি ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান করে পা কেটে ফেলতে হবে। অপারেশন টেবিল একটাও খালি নেই, সব ভর্ত্তি। একটা টেবিল খালি পেলেই ওকে চড়িয়ে দেবো।

এ্যালিস্‌ বালকটির শিয়রে বসে কতরকমে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে—কিন্তু ওদের সবারই মুশকিল চীনা ভাষা সামান্য এক আধটু বুঝতে পারলেও বলতে আদৌ পারে না।

সুরেশ্বর হাসপাতালের ঔষধালয়ে সহকারী কম্পাউণ্ডার হয়েছে। সে দুখানা চীনা বর্ণপরিচয় কোথা থেকে যোগাড় করে এনে ওদের দিয়েছে। এ্যালিস্‌ বল্লে—সুরেশ ঠিক বলছিল সেদিন, এসো তুমি, আমি, মিনি ভালো করে চীনে ভাষা শিখি, নইলে কাজ করতে পারবো না—

আর্ত্ত বালকটির শয়নশিয়রে এ্যালিস্‌কে যেন করুণাময়ী দেবীর মত দেখাচ্ছে, বিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এ্যালিসের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠলো।

সন্ধ্যা সাতটার সময় টেবিল খালি হোল।

বালকটিকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েচে, কতকগুলি ডাক্তারী ছাত্র কিছুদূরে একটা গ্যালারিতে বসে আছে, হাসপাতালের সহকারী সার্জন চীনাম্যান, তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে কি বলছেন আর একজন ছাত্র ক্লোরোফর্ম পাম্প করছে। বিমল ও এ্যালিস্ সার্জনকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। সার্জন হেসে বললেন, সকাল থেকে অপারেশন টেবিলে মরেছে একুশটা, টেবিল থেকে নামাবার তর সয় নি—গরম জলটা সরিয়ে দাও নার্স—

এমন সময় মাথার ওপরে কোথায় এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

বাইরে যারা ছিল, তারা দৌড়ে ভেতরে এল, একটা ছুটোছুটি শুরু হোল চারিদিকে।

কে একজন বল্লে—জাপানী বম্বার!

এ্যালিস্ বল্লে—রেডক্রসের লাল আলো জ্বলছে বাইরে—হাসপাতাল বলে বুঝতে পারবে—

সার্জন হেসে বল্লে—নার্স, ওরা কি কিছু মানছে?—শক্ত করে ধরে থাকো তুলোটা—

বালক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সার্জন ক্ষিপ্র ও কৌশলী হাতে ছুরি চালাচ্ছেন। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বুম্-ম্-ম্-ম ম!—বিকট বিস্ফোরণের শব্দ কোথাও কাছেই। তুমুল গোলমাল হৈ-চৈ, আর্ত্তনাদ, হাসপাতালের বাঁ দিকের অংশে বোমা পড়েছে। উগ্র ধোঁয়া ও নাইট্রোগ্লিসিরিনের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সার্জন, বিমল বা এ্যালিসের দৃষ্টি কোনোদিকে নেই—ওরা একমনে কাজ করছে। সার্জন দৃঢ় অবিকম্পিত হস্তে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন তাঁর অপারেশন টেবিলের থেকে এক শো গজের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে নি, যেন তিনি মোটা ফি নিয়ে বড়-লোক, রোগীর বাড়ী গিয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত : গরম জলের পাত্রে ডোবানো ছুরি, ফরসেপ ছুঁচ ক্ষিপ্রহস্তে একমনে সার্জনকে যুগিয়ে চলেছে এ্যালিস্, একমনে ব্যাণ্ডেজের সারি গুছিয়ে রাখছে, পাতলা লিণ্ট-কাপড়ে মলম মাখাচ্ছে। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বাইরে বিকট শব্দ—হুড়মুড় করে হাসপাতালের বাঁ দিকের উইং-এর ছাদ ভেঙে পড়লো। মহাপ্রলয় চলেছে সেদিকে—

সার্জন বল্লেন—নাড়ীর বেগ কত?

বিমল—সত্তর।

কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—স্যার, বাঁদিকের উইং গুঁড়ো হয়ে গোটা সেপ্‌টিক ওয়ার্ডের রোগী চাপা পড়েছে—এদিকেও বোমা পড়তে পারে—তিনখানা বম্বার—

সার্জন বল্লেন—পড়লে উপায় কি? নার্স বড় ফরসেপটা—

উগ্র ধোঁয়ায় সবারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আর একটা শব্দ অন্য কোন্‌দিকে হোল—আর একটা বোমা পড়েছে—বেজায় ধোঁয়া আসছে ঘরে।

বিমল বল্লে—স্যার, ধোঁয়ায় রোগী দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে? ক্লোরোফর্মের রোগী, এ ভাবে কতক্ষণ রাখা যাবে?

সার্জন ছুরি ফেলে বল্লেন—হয়ে গিয়েছে। লিণ্ট্ দাও, নার্স!

বিমল বল্লে—স্যার, রোগীর নাড়ী নেই। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল!

সার্জন এসে নাড়ী দেখলেন। এ্যালিস্ নীরবে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নাড়ী থেকে হাত নামিয়ে সার্জন গম্ভীর মুখে বল্লেন—বাইশটা পুরলো।

এ্যালিস্ নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে বল্লেন—চলো নার্স, স্ট্রেচারওয়ালারা এসে লাশ নিয়ে যাবে—এখন সবাই বাইরে চলো যাই—

ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে বিমল আগে এ্যালিসের কাছে এল এবং তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে ধূম্রলোক থেকে উদ্ধার করে ডানদিকের বড় দরজা দিয়ে কম্পাউণ্ডের খোলা হাওয়ায় নিয়ে এল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেই এ্যালিস্‌কে বল্লে—ঐ দেখ এ্যালিস্, তিনখানা জাপানী বম্বার!—

এগারো ঘণ্টা সমানে ডিউটিতে থাকবার পরে বিমল, এ্যালিস্, সুরেশ্বর ও মিনি বাইরের ফুটপাথে পা দিলে।

চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউ প্রসিদ্ধ দেশনায়ক চ্যাং সো লীনের নামে হয়েছে—রেড শার্টদের প্রভাবে। সাংহাইয়ের মধ্যে এটা একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুটপাথে শামিয়ানার নিচে চা ও শূওরের মাংসের দোকান। লোকজনের বেজায় ভিড়।

এই এ্যাভিনিউয়ের ধারেই গভর্নমেণ্ট হাসপাতাল। ওরা যখন ফুটপাথে পা দিলে, তখন হাসপাতালের বাঁ অংশে মহা হৈ চৈ চলছে। সেপ্‌টিক্-ওয়ার্ড জাপানী বোমায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—সম্ভবতঃ একটা রোগীও বাঁচে নি সে ওয়ার্ডের।

মিনি দেখতে যাচ্ছিল—বিমল বারণ করলে।

—ওদিকে গিয়ে দেখে আর কি হবে মিনি? চলো আগে কোথাও একটু গরম চা খাওয়া যাক।

বোমা-ফেলা ও হত্যা ব্যাপারটা দেখে দেখে কদিনে ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের নয়, সাংহাইএর লোকজন, দোকানী, পথিকদেরও। নতুবা গত আধঘণ্টা ধরে হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণ চলছে, চোখের সামনে এই ভীষণ প্রলয় লীলা ও মাথার ওপরে চক্রাকারে উড়নশীল তিনখানা জাপানী বম্বারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউর চায়ের দোকান, মাংসের দোকান, ভাত-তরকারীর দোকান সব খোলা। লোকজনের দিব্যি ভিড়।

রাত পৌনে আটটা।

হঠাৎ এ্যালিস্ জিগ্যেস্ করলে—ছেলেটি মারা গেল, তখন ক'টা?

বিমল বল্লে—ঠিক সাড়ে সাতটা। ওকথা ভেবো না এ্যালিস্। চল আর একটু এগিয়ে। এক্ষুনি লাশ নিয়ে যাওয়ার ভ্যান্ আসবে হাসপাতালে। আমরা একটু তফাতে যাই।

একটা শামিয়ানার নীচে ওরা চা খেতে বসলো।

দোকানের মালিক একজন রোগা চেহারার চীনা স্ত্রীলোক। সে এসে পিজিন ইংলিশে বল্লে—কি দেবো?

বিমল বল্লে—খাবার কি আছে?

—ভাজা মাছ, রুটি, মাখন আর ব্যাঙের—

—থাক্ থাক্, রুটি মাখন ভাজা মাছ নিয়ে এসো—

রুটি-মাখন অন্যত্র চীনা দোকানে পাওয়া যায় না; তবে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউর দোকানগুলো কিছু শৌখিন ও বিদেশী-ঘেঁষা। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিমল একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে। সুরেশ্বর তো গোগ্রাসে রুটি ও মাখনের সদ্ব্যবহার করতে লাগলো, খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই।

মিনি বল্লে—একটা গল্প বলি শোনো সবাই। আমি তখন স্কুলে পড়ি, মেণ্টোনে, কালিফোর্ণিয়ায়। আমার বাবা আমায় একটা চিন্‌চিলা কিনে দিয়েছিলেন—

সুরেশ্বর বল্লে—সে কি?

মিনি হেসে বল্লে—জানো না? একরকম ছোট কাঠবিড়ালির চেয়ে একটু বড় জানোয়ার, খুব চমৎকার লোম গায়ে—লোমের জন্যে ওদের শিকার করা হয়। তারপর আমার সেই পোষা চিন্‌চিলাটা—

বুম্—ম্—ম্!—বিকট আওয়াজ!

সবাই চম্‌কে উঠলো। তিনখানা বাড়ীর পরে একটা বাড়ীর ওপরে জাপানী বম্বার ঘুরছে দেখা গেল—কিন্তু ধোঁয়া উড়ছে বাড়ীটার সামনের রাস্তা থেকে। লোকজন দেখতে দেখতে যে যেখানে পারলে আড়ালে ঢুকে পড়লো। একটু পরে একখানা রিক্‌শা টেনে দুজন লোককে সেদিক থেকে ওদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল রিক্‌শায় আধশোয়া আধ-বসা অবস্থায় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার মুখটা থেঁৎলে রক্ত গড়িয়ে বুকের সামনে জামাটা রাঙিয়ে দিয়েছে।

শামিয়ানার নীচে আরও তিনটি চীনা খদ্দের বসে চা খাচ্ছিল। তারা উত্তেজিত ভাবে চীনা ভাষায় দোকানীকে কি বল্লে। দোকানীও তার কি জবাব দিলে, তারপরে ওদের মধ্যে একজন একটা সিগারেট ধরালে।

জাপানী বোমারু প্লেন ঘর্ ঘর্ শব্দ করে যেন ওদের মাথার ওপরে ঘুরছে। বিমল একবার চেয়ে দেখলে। নাঃ, একটু দূরে বাঁদিকে। ঠিক মাথার ওপরে নয়।

মিনি বল্লে—তারপর শোনো, আমার সেই চিন্‌চিলাটা—

এ্যালিস্ অধীরভাবে বল্লে—আঃ মিনি, থাক চিন্‌চিলার গল্প। খাও এখন ভাল করে। আমার তো বেজায় ঘুম পাচ্ছে! বিমল, দোকানীকে জিগ্যেস্ করো না, স্যাণ্ডউইচ রাখে না?

বিমল বল্লে—ব্যাঙের মাংসের স্যাণ্ডউইচ বলছে এ্যালিস্—দিতে বলবো?

সুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলো হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জাপানী বম্বারখানা থেকে রাস্তার যে অংশে ওরা বসে চা খাচ্ছে, সেদিকে সার্চলাইট্ ফেলেছে।

দোকানী চীনা স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে উঠে কি বললে।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ শব্দ—তিনজন চীনা খদ্দের ও রাস্তার পথিকদের মধ্যে জন-দুই ছুটে এসে বিমলদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়লো।

মিনি বল্লে—আঃ, এগুলো কি বোকা! টেবিলের তলায় বাঁচবে এরা? আমার পেয়ালাটা উল্টে ফেলে দিলে মাঝ থেকে—

এ্যালিস্ বল্লে—আমারও। দোকানী, তোমার চায়ের দাম নিয়ে নাও, আমরা অন্য জায়গায় চা খেতে যাই—এ কি রকম উপদ্রব?

বিমল বল্লে—ঠিক তো। মহিলাদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে উৎপাত! বোমা খাবি রাস্তায় দাঁড়িয়ে খা ভদ্রলোকের মত—

মিনি হঠাৎ আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে বল্লে—ঐ দেখো, দেখো—

তিনখানা চীনা এরোপ্লেন তিন দিক থেকে জাপানী বম্বারখানাকে তাড়া করছে। একখানা চীনা প্লেন্ বম্বারখানার খুব কাছে এসে পড়েছে—একটু পরেই সেখানা থেকে মেসিন্‌গানের পট্ পট্ আওয়াজ শোনা গেল—পিছনের আর একখানা চীনা সাহায্যকারী প্লেন্ ওদের ওপরে নীলাভ তীব্র সার্চলাইট্ ফেলতেই জাপানী বম্বারখানা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

ততক্ষণ সবাই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে আকাশের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা দেখছে। আরও দুজন চীনা খদ্দের অন্য টেবিলে চা খেতে বসে গেল। দোকানী স্ত্রীলোকটি তাদের খাবার দিলে। মিনি তাদের টেবিলের দিকে চেয়ে বল্লে—ওই ওরা ব্যাঙের স্যাণ্ড্-উইচ খাচ্ছে—

মেসিনগানের আওয়াজ তখন বড় বেড়েছে। জাপানী প্লেনখানা পাক দিয়ে ঘুরছে। হঠাৎ পালাবে না।

বিমল বল্লে—না; একটু নিরিবিলি চা খেতে এলাম আর অমনি মাথার ওপরে চীন-জাপানের যুদ্ধ বেধে গেল—পোড়া বরাত এম্‌নি—

একজন ফিরিওয়ালা এসে শামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে বল্লে—মোমের ফুল—খুব চমৎকার মোমের ফুল—গোলাপ, ক্রিসেন্‌থিমাম্, গাঁদা—ভারী সস্তা মোমের ফুল—

এমন সময়ে একজন খবরের কাগজওয়ালা 'সাংহাই ডেলি নিউজ্' বলে হেঁকে যাচ্ছে দেখে বিমল ডেকে একখানা কাগজ কিনলে। এ কাগজের একদিকে চীনা ভাষায় ও অন্যদিকে ইংরেজি ভাষায় লেখা খবর—চীনাদের পরিচালিত।

রাস্তায় লোক ভিড় করে কাগজ কিনছে, কাগজ এইমাত্র বেরিয়েছে, এ বেলার যুদ্ধের খবর নিয়ে—সবাই যুদ্ধের খবর জানতে চায়।

এ্যালিস্ বল্লে—যুদ্ধের খবর কি ?

তারপর সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা পড়ে দেখতে লাগলো। শেন্‌সু প্রাচীরের কাছে জাপানী সৈন্য চীনাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে হটে গিয়েছে। জাপানীদের বহু সৈন্য মারা পড়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—সর্ব্বৈব মিথ্যা। জাপানীরা জিত্‌ছে। ভুল খবর দিচ্ছে আমাদের, পাছে শহরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখছো না বোমা ফেলবার কাণ্ড ? চীনারা জিতছে! ফুঃ—

ওদের অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হোল, মাত্র তিন মাইল দূরে শেন্‌সু প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে, অথচ ওদের খবরের কাগজ পড়ে জানতে হচ্ছে যুদ্ধের ফলাফল, যেমন কলকাতায় বসে বা আমেরিকায় বসে লোকে জেনে থাকে। তিন মাইল দূরে থেকেও বোঝবার কোনো উপায় নেই যুদ্ধের আসল খবরটা কি। চীনা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে সংবাদ পাঠাচ্ছে সেই সংবাদই ছাপা হচ্ছে। এই রকমই হয় সর্ব্বত্রই, অথচ খবরের কাগজের পাঠকেরা তা জেনেও জানে না। খবরের কাগজে লিখিত সংবাদ বাইবেল বা পুরাণের মত অভ্রান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয়, এইটেই আশ্চর্য্য। এ সম্বন্ধে ওদের অভিজ্ঞতা আরও পরে যা হয়েছিল তা আরও অদ্ভুত।

কাগজের এক কোণে একটি সংবাদের দিকে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে। মার্শাল চিয়াং কৈ শাক্ চা-পেই পল্লীর বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসবেন রাত ন'টার সময়ে।

মিনি হাতঘড়ি দেখে বল্লে—এখন পৌনে ন'টা।

বিমল বল্লে তা হোলে হাসপাতালেও যাবেন, চল আমরা হাসপাতালে ফিরি। মার্শাল চিয়াংকে কখনও দেখি নি, দেখা যাবে এখন!

এমন সময় ওদের সামনের রাস্তায় একটা হৈ-চৈ উঠলো। রাস্তার দুধারে লোকজন সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চীনা পুলিসম্যান রাস্তার মাঝখানের লোক হটিয়ে দিলে। এক মিনিটের মধ্যে পর পর ছ'খানা মোটরকার দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনতা চীনা ভাষায় চীৎকার করে বলে উঠলো—'মহাচীনের জয়! মার্শাল চিয়াংএর জয়। টেন্‌থ রুট্ আর্মির জয়!'

এ্যালিস্ বল্লে—এই মার্শাল চিয়াং গেলেন!

বিমল বল্লে—তবে আর হাসপাতালে এখন ফিরে কি হবে ? চল কন্‌শেসনে ফিরি। রাত হয়েছে, এ অঞ্চল এখন রাত্রে বেড়াবার পক্ষে নিরাপদ নয়। জাপানী বোমা তো আছেই, তা ছাড়া তার চেয়েও খারাপ চীনা দস্যুদের উপদ্রব। সঙ্গে মেয়েরা—

সুরেশ্বর বল্লে—তা ছাড়া ঘুমুতেও তো হবে। কাল সকাল থেকে আবার ডিউটি—

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

কন্‌শেসনে ফিরবার পথে ওদের এক বিপদ ঘটলো।

কন্‌শেসনে ফিরবার পথে ওরা চ্যাং সো লীন্ এ্যাভিনিউ দিয়ে খানিকটা এসে পড়লো একটা জনবহুল পাড়াতে। সেখানে দু'খানা রিকশাভাড়া করে ওরা তাদের কন্‌শেসনে যেতে

বল্লে। তারপর ওরা গল্প ও গুজবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—যখন ওরা আবার রাস্তার দিকে নজর করলে তখন দেখলে রিকশা একটা নির্জ্জন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। দুধারে দরিদ্র লোকেদের কাঁচা মাটির খাপ্‌রা-ছাওয়া ঘর। রাস্তা জনশূন্য—দূরে দূরে খোলা মাঠের মধ্যে কি যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে।

বিমল বল্লে—এ কোথায় নিয়ে এসে ফেল্লে হে?

সুরেশ্বর পিজিন্ ইংলিশে একজন রিকশাওয়ালাকে বল্লে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্ রে? এ পথ তো নয়?

রিকশাওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়েই জোরে ছুটতে লাগলো।

বিমলের মনে সন্দেহ হলো। সে বল্লে—এর মনে কোনো বদমাইশি মতলব আছে মনে হচ্ছে। আমরা তো একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে—

মিনি ও এ্যালিস্ তখন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরাও বল্লে—আর গিয়ে দরকার নেই—চীনা গুণ্ডা এই সময় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। নামো এখানে সব।

দুখানা রিক্‌শাই পাশাপাশি যাচ্ছিল। এবার মিনিদের রিক্‌শাখানা এগিয়ে গেল এবং বিমল কিছু বলবার পূর্ব্বেই রিক্‌শাখানা হঠাৎ পথের মোড় ঘুরে পাশের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো!

বিমলদের রিক্‌শাখানা কিন্তু তখন সোজা রাস্তা বেয়েই দ্রুত চলেছে। বিমলের ও সুরেশ্বরের চীৎকার সে আদৌ কর্ণপাত করলে না।

বিমল লাফ দিয়ে রিক্‌শাওয়ালার ঘাড়ে পড়লো রিক্‌শা থেকে। রিক্‌শাখানা উল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সুরেশ্বর রিক্‌শার সঙ্গে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। রিক্‌শাওয়ালাটা সেখানে বসে পড়লো—ওর ওপর বিমল!

রিক্‌শাওয়ালাটা একটু পরেই গা ঝেড়ে উঠে, চীনা ভাষায় কি একটা দুর্ব্বোধ্য কথা বলে উঠে, ওদের দিকে এগিয়ে এল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো—সুরেশ্বর, সাবধান!

রিক্‌শাওয়ালার হাতে একখানা বড় চকচকে ছোরা দেখা গেল।

সুরেশ্বর পিছন থেকে তাকে জোরে এক ধাক্কা লাগালে। সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আবার বিমলেরই উপর। বিমলের সঙ্গে তার ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হোল। বিমলের রীতিমত শরীরচর্চ্চা করা ছিল। মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যে রিক্‌শাওয়ালাকে মাটিতে ফেলে, বিমল তার হাত মুচ্‌ড়ে ছোরাখানা টান দিয়ে ফেলে বল্লে—ওখানা তুলে নাও সুরেশ্বর—তারপর এই বদ্‌মাইশটার গলায় বসিয়ে দাও—

ছোরা হাত থেকে খসে যাওয়াতে বদ্‌মাইশটা নিরুৎসাহ ও ভীত হয়ে পড়লো—এইবার ছোরা বসানোর কথা শুনে, সে বিমলের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলে। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল পাঁচ-ছ'মিনিটের মধ্যে।

বিমল ঝেড়ে উঠে একটু দম নিয়ে বল্লে—সুরেশ্বর, মেয়েদের গাড়ীখানা!

তারপর ওরা দুজনেই ছুটলো সেই গলিটার দিকে—যেটার মধ্যে মিনিদের রিক্‌শাখানা ঢুকেছে। গলিটা নিতান্ত নোংরা, দুধারে কাঁচা টালির ছাদওয়ালা নীচু নীচু বাড়ী—কিছু দূরে একটা সাধারণ স্নানাগার—এখানে নীচশ্রেণীর মেয়ে পুরুষে সাধারণতঃ স্নান করে না—করলেও রাত্রে করে। স্নানাগারের সামনে দু-জন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখে, বিমল তাদের পিজিন ইংলিশে জিজ্ঞেস করলে—একখানা রিক্‌শা কোন্ দিকে গেল দেখেছ?

তাদের মধ্যে একজন বল্লে—ওই বাড়ীটার সামনে একখানা রিক্‌শা দাঁড়িয়েছিল একটু আগে।

বিমল ও সুরেশ্বর বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বিমল বল্লে—চল বাড়ীর মধ্যে ঢুকি—

ঘরটায় ঢুকেই ওদের মনে হোল, এটা একটা চণ্ডুর আড্ডা। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটা চীনাবাঁশের চেয়ার, একদিকে একটি নীচু বাঁশের তক্তপোশ। চণ্ডু খাবার লম্বা নল, ছিটেগুলি গালার বড় পাত্রে, চণ্ডুর আড্ডার সব জিনিসই মজুদ। দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষণ প্রতিকৃতি। ঘরটি লোকশূন্য, নির্জ্জন। এ ধরণের চণ্ডুর আড্ডা ওরা সিঙ্গাপুরে দেখেছে। কিন্তু বাড়ীর লোকজন কোথায়? বিমল ও সুরেশ্বর বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা বড় ঘরের মধ্যে অনেকগুলো লোক বসে মা জং খেলছে। বিমল বুঝতে পারলে, জায়গাটা শুধু চণ্ডু নয়, নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীদের আড্ডাও বটে। ওদের দেখে দুজন লোক উঠে দাঁড়ালো! ওদের মধ্যে একজন কর্কশ কণ্ঠে পিজিন ইংলিশে বল্লে—কি চাই? কে তোমরা? বিমলের মাথায় চট্ করে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে কর্ত্তৃত্বের গ্রামভারী চালে বল্লে, আমরা ব্রিটিশ কন্‌শেসনের পুলিশের লোক। আমাদের সঙ্গে দশজন কন্‌স্টেবল গলির মোড়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ও রিভলবার আছে। দুজন মেমসাহেবকে এই আড্ডায় গুম্ করা হয়েছে—বার করে দাও, নইলে আমরা জোর করে ভেতরে ঢুকে সন্ধান করবো। দরকার হলে গুলি চালাবো।

এবার একজন প্রৌঢ় লম্বা ধরণের লোক এক কোণ থেকে বলে উঠলো—আমরা কন্‌শেসন পুলিশ মানি নে—সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের সই করা ওয়ারেণ্ট দেখাও—

বিমল বল্লে—তুমি জানো এটা যুদ্ধের সময়! আমরা জোর করে ঢুকবো এবং দরকার হোলে এই মা জংএর জুয়ার আড্ডার প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে সাংহাই পুলিশের হাতে দেবো—এর জন্যে যদি কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় পুলিস মার্শালের কাছে আমরা দেবো—তুমি মেমসাহেবদের বার করে দেবে কিনা বলো—

লোকটা বল্লে—কোন্ মেমসাহেবের কথা বলছো? মেমসাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমি ভাবছিলাম, তুমি জুয়া আর চণ্ডুর আড্ডা হিসেবে বাড়ী সার্চ করবে বলছো।

বিমল বল্লে—বেশি কথায় সময় নষ্ট করতে চাইনে—তাহোলে আমাদের জোর করতে হোলো—সুরেশ্বর কন্‌স্টেবলদের ডাকো—

হঠাৎ চীৎকার করে সে বলে উঠলো—মাথা নীচু করে বসে পড়—বসে পড় সুরেশ।

সাঁ করে একটা শব্দ হোল এবং ঝক্‌ঝকে কি একটা জিনিস ওদের চোখের সামনে এক ঝলক খেলে গেল—ওরা তখন দুজনেই বসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছন দেওয়ালে একটা ভারী জিনিস ঠক্ করে লাগবার শব্দ হোল।

সুরেশ্বর পিছন ফিরে চকিতে চেয়ে দেখলে—একখানা বাঁকা ধারালো চক্‌চকে চীনে-ছোরা, ছুঁড়ে-মারা ছোরা, ছুঁড়ে মারবার জন্যেই এগুলি ব্যবহৃত হয়—ছোরাখানা সবেগে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে, আধখানা ফলাসুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে গেঁথে গিয়েছে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠলো—ওরই গলা লক্ষ্য করে ছোরাখানা ছোঁড়া হয়েছিল।

ওদের সঙ্গে সত্যিই হাতাহাতি বাধলে বা সবাই একযোগে আক্রমণ করলে, নিরস্ত্র বিমল ও সুরেশের কি দশা হোত বলা যায় না, কিন্তু বিমল মাটি থেকে উঠেই দেখলে ঘরের মধ্যে আর একজন লোকও নেই।

পালায় নি—হয়তো বা ওরা লোক ডাকতে গিয়েছে! সুরেশ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, খানিকটা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। বিমল গিয়ে তার হাত ধরে টেনে তুলে বল্লে—সুরেশ্বর, এইবেলা উঠে বাড়ীটা খুঁজি এস—এখুনি সব চলে আসতে পারে। একটা ঘর বন্ধ ছিল—বাইরে থেকে তালা দেওয়া। আর সব ঘর খোলা—সেগুলি জনশূন্য। সুরেশ্বর ও বিমল দুজনেই একযোগে ঘরের দরজায় লাথি মারতে লাগলো।

—মিনি—মিনি—এ্যালিস্—এ্যালিস্—

ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বিমল বল্লে—কি ব্যাপার! ঘরের মধ্যে কেউ নেই নাকি?

দুজনের সম্মিলিত লাথির ধাক্কাতেও দরজার কিছুই হোল না। বেজায় মজবুত সেগুন কাঠের দরজা। হঠাৎ বিমলের চোখ পড়লো ঘরের দেওয়ালের ওপরের দিকে। সেখানে একটা ছোট ঘুলঘুলি রয়েছে। কিন্তু অত উঁচুতে ওঠা এক মহা সমস্যা। বিমল খুঁজতে খুঁজতে একটা জলের টব আবিষ্কার করলে। সেটা উপুড় করে পেতে, মা জং খেলার ঘর থেকে বাঁশের চেয়ার এনে, তার ওপর চাপিয়ে উঁচু করে, বিমল অতি কষ্টে তার ওপর উঠলো। সার্কাসের খেলোয়াড় না হোলে ওভাবে ওঠা এবং নিজেকে ঠিকমত দাঁড় করিয়ে রাখা অতীব কঠিন ব্যাপার।

সুরেশ্বর টবটা ধরে রইল—বিমল সন্তর্পণে উঠে ঘুলঘুলির কাছে মুখ নিয়ে গেল। নীচে থেকে সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলে—কি দেখছ? কেউ আছে?

—ঘোর অন্ধকার—কিছু তো চোখে পড়ছে না।

—ওদের পরনে নার্সের সাদা পোশাক আছে, অন্ধকারেও তো খানিকটা ধরা যাবে—ভাল করে দেখ—

বিমল ভাল করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে বলে—উঁহু, কিছুই তো তেমন দেখছিনে—সাদা তো কিছুই নেই—সব কালোয় কালো। আমার মনে হচ্ছে ঘরটায় কিছুই নেই—

—উপায়?

—দাঁড়াও আগে নামি। উপায় ভাবতে হবে, তার আগে দরজা ভেঙে ফেলতে হবে, যে করেই হোক্।

নীচে নেমে বিমল গম্ভীর মুখে বল্লে—সুরেশ্বর, মিনি বা এ্যালিস্‌কে এভাবে হারিয়ে আমরা কন্‌শেসনে ফিরে যেতে পারবো না। দরকার হোলে এজন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ—খুঁজে তাদের বার করতেই হবে। তবে তারা যে এই বাড়ীতেই বা এই ঘরেই আছে তারও তো কোনো প্রমাণ আমরা পাই নি। তবুও এই ঘরের দরজা ভেঙে, ভেতরটা না দেখে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবো না। তুমি এক কাজ করো। আমি এখানে থাকি—তুমি বাইরে যাও, চীনা পুলিসকে খবর দাও। তাদের বলো কন্‌শেসনে টেলিফোন করতে। দরকার হোলে কন্‌শেসনের পুলিস আসুক। আজ রাতের মধ্যেই তাদের খুঁজে বার করতেই হবে—নইলে তাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। তুমি দেরি করো না, চট্ করে বাইরে চলে যাও।

সুরেশ্বর বল্লে—তোমাকে একা ফেলে যাবো? ওরা যদি দল পাকিয়ে আসে? তুমি নিরস্ত্র।

—সেজন্যে ভেবো না। মিনি ও এ্যালিস্ তার চেয়েও অসহায়। সকলের আগে ওদের কথা ভাবতে হবে আমাদের।

সুরেশ্বর চলে গেল।

বিমল একা বাড়ীটাতে। উত্তেজনার প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে বিমল এইবার ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে। মিনি আর এ্যালিস্ নেই। গুণ্ডারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওর মনে হোল, কন্‌শেসনের ডাক্তার বেড্‌ফোর্ড বলেছিলেন—চীনা-সাংহাইতে মধ্য-এসিয়ার বর্ব্বরতার সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা মিলেছে। এখানে কন্‌শেসনের বাইরে মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধ-দুর্দ্দিনের সময়ে, দেশে আইন নেই, পুলিস নেই - প্রত্যেক সবল মানুষ নিজেই পুলিস। সাবধানে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

কি ভুলই করেছে অত রাত্রে অজানা রাস্তায় অজানা চীনে রিক্‌শাওয়ালার গাড়ীতে চড়ে, —সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে! তার চেয়েও ভুল, সঙ্গে রিভলবার নিয়ে না বেরুনো!

এখন উপায় কি? যদি ওদের সন্ধান না-ই মেলে! কন্‌শেসনে, সে আর সুরেশ্বর মুখ দেখাবে কেমন করে?

স্তব্ধ নির্জ্জন বাড়ীটা। সাড়াশব্দ নেই কোনো দিকে। মা জং খেলার ঘরে একটা চীনে লণ্ঠন ঝুলছে। আধ-আলো অন্ধকারে বিকট-মূর্ত্তি চীনা দেবতার ছবিটা যেন এক হিংস্র দৈত্যের প্রতিকৃতি মত দেখাচ্ছে—সেই একমাত্র আলো সারা বাড়ীটাতে। বাকীটা অন্ধকার। আশ্চর্য্য, কোথায় কলকাতার শাঁখারিটোলা লেন, আর কোথায় সাংহাইএর এক নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীর আড্ডা! অবস্থার ফেরে কোথা থেকে মানুষকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলে!

এ্যালিস্ চমৎকার মেয়ে, মিনিও চমৎকার মেয়ে; ওদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হোলে সে

নিজেকে ক্ষমা করবে না। ওদের জন্যে বিমলই দায়ী! হাসপাতাল থেকে বার হয়ে কন্‌শেসনে ফেরা উচিত ছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। সুরেশ্বরের দেখা নেই। সে কি কন্‌শেসনে ফিরে গিয়েছে নিজেই খবর দিতে?

বিমল আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটলো। রাস্তার আলো হঠাৎ যেন নিবে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এ আবার কি কাণ্ড!

মিনিট পাঁচ-ছয় কি দশ পরে বাইরে থেকে কে একজন উত্তেজিত গলায় চীনা ভাষায় কি বললে—কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বল্লে। ঠিক যেন কাউকে ডাকছে।

বিমল অবাক হয়ে ভাবছে গুণ্ডারা ফিরে এল না কি!

হঠাৎ দুজন চীনা ইউনিফর্মপরা পুলিসম্যান বাড়ীর মধ্যে খানিকটা ঢুকে রাগের ও গালাগালির সুরে চেঁচিয়ে কি কথা বলে উঠলো।

বিমল ভাবলে সুরেশ্বরের আনীত পুলিসম্যান বাড়ী খুঁজতে এসেছে। ও এগিয়ে যেতে পুলিসম্যান দুজন একটু আশ্চর্য্য হোল। তারপর পিজিন ইংলিশে উত্তেজিত কণ্ঠে মা জং খেলার ঘরের আলোর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে— আলো এখুনি নিবোও। আমাদের বাঁশি শুনতে পাওনি? আলো জেলে রেখেছ কেন?

বিমল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বল্লে—আলো জেলে রেখেছি কেন?

– হ্যাঁ, আলো জ্বালিয়ে রেখেছ কেন? আলো, আলো, লণ্ঠন—যা থেকে আলো বার হয়, অন্ধকার দূর করে সেই আলো—

—আমি তো জেলে রাখি নি। এ আমার বাড়ী নয়।

চীনা পুলিসম্যান দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। এ বাড়ীর যে এ লোক নয়, তারা সেকথা আগেই বুঝেছিল।

বিমল এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বল্লে—দাঁড়াও, তোমরা যেও না। প্রথমে বলো আলো নিবিয়ে দেবো কেন?

—মিস্টার, সাংহাই পুলিস-মার্শালের নোটিশ দেখো নি? রাত এগারটার পরে শহরের সব আলো নিবিয়ে দিতে হবে। ব্ল্যাক্‌-আউট। বোমা ফেলছে জাপানীরা। তোমার কি বাড়ী?

—আমার এ বাড়ী নয়। সব বলছি, আমি কন্‌শেসনের লোক—যুদ্ধের ডাক্তার, ভারতবর্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমরা চারজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই পথে রিক্‌শা করে যাচ্ছিলুম—সঙ্গে ছিলেন দুটি মার্কিন মহিলা। রিক্‌শাওয়ালা তাঁদের নিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমাদের রিক্‌শা অন্যপথে নিয়ে গেলে আমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে সন্ধান পাই এই বাড়ীটার সামনে রিক্‌শাটা মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা বাড়ীতে ঢুকে দেখি, এটা মা-জং জুয়াড়ীদের ও চণ্ডুর আড্ডা। ওদের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোথায় পালিয়েছে। আমার বন্ধু পুলিস ডাকতে গিয়েছে। তোমরা

এসেছ ভালই হয়েছে, এই তালা-বন্ধ ঘরটা খোলো—আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে মহিলা দুটিকে আটকে রেখেছে।

পুলিসম্যান দুজন আবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে। তারা যে বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছে, মা জং খেলার ঘরে চীনে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়ও ওদের মুখ দেখে বিমলের সেটা বুঝতে দেরি হোল না। যেন ওরা কখনো ওদের ক্ষুদ্র পুলিস জীবনে এমন একটা আজগুবী ব্যাপারের সম্মুখীন হয় নি—ভাবখানা এই রকম।

একজন পুলিস চৌকিদার এগিয়ে বন্ধ ঘরের তালাবন্ধ দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—এই ঘর? কই, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?

—না, সাড়া দেবে কে? ধরো অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছে!

পুলিসম্যান দুটির মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের মত অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না, আমার তা মনে হয় না মিস্টার। তুমি জানো না এই-সব জুয়াড়ী ও চণ্ডুর আড্ডাধারী বদমাইশদের। এ ঘরে ওদের রাখে নি। ওদের গায়ে গহনা ছিল?

—একজনের গলায় একটা ঝুটো মুক্তোর মালা ছিল—দুজনের হাতে দুটো সোনার হাত ঘড়ি আর সোনার পাতলা বালা—

এমন সময় বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বাড়ীতে ঢুকলো—আগে-আগে সুরেশ্বর, পেছনে একদল চীনা পুলিশ, সঙ্গে একজন কন্‌শেসন পুলিশ।

সুরেশ্বর ঢুকেই বল্লে—টেলিফোন করে দিয়েছি কন্‌শেসনে—পুলিস মার্শালকে জানানো হয়েছে। এই একজন কন্‌শেসনের পুলিসম্যানকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে আনলুম। এদিকে মহা মুশকিল, শহরে ব্ল্যাক-আউট, আলো জ্বালবার জো নেই—সব ঘুটঘুটে অন্ধকার।

—ভাঙো দরজা সবাই মিলে।

সকলের সমবেত চেষ্টায় ও ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়লো।

বিমল সকলের আগে ঘরে ঢুকলে। পিছনে ছ'টা পুলিশ টর্চ জেলে ঢুকলো। তিনটি বড় বড় জালা ছাড়া ঘরে কিছু নেই। মানুষের চিহ্ন তো নেই-ই।

একজন পুলিস উঁকি মেরে জালার মধ্যে দেখলে। জালাতে মানুষ তো দূরের কথা, একবিন্দু জল পর্য্যন্ত নেই। খালি জালা।

মাথার ওপর আকাশে আবার অনেকগুলো এরোপ্লেনের ঘর্ ঘর্ আওয়াজ শোনা গেল। দুজন পুলিসম্যান উঠোনে গিয়ে হেঁকে বল্লে—আলো নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, জাপানী বম্বার—

সুরেশ্বর বল্লে—আরে, এরা বেশ তো! সারা সন্ধেবেলা জাপানীরা বোমা ফেল্লে, তখন 'ব্ল্যাক-আউট' করলে না—আর এখন এদের হুঁশ হোল -

বিমল উপরের দিকে মুখ তুলে বললে—হুঁ, জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার। মিনি চিনিয়ে দিয়েছিল কন্‌শেসনে—মনে আছে?

সমস্ত সাংহাই শহর অন্ধকার। সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে—কারণ নক্ষত্রের

আলো সাংহাইয়ের পুলিস মার্শালের আদেশ মানে নি—জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, তাও সব সময় নয়। মাঝে মাঝে যেন সেগুলো কোন্ দিকে চলে যায়, আবার খানিক পরে মাথার ওপরে আসে।

বিমল ভাবছিল, জাপানী বম্বার থেকে আর বোমা ফেলছে না তো!

সুরেশ্বরকে কথাটা বলতে সে বল্লে—ব্ল্যাক-আউটের জন্যে নিশ্চয়। সবাই লুকিয়েছে। রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। কোনো দিকে কোনো শব্দ আছে?

দুজন চীনা পুলিস বল্লে—তোমরা বোঝ নি মিস্টার। ওরা বোমা ফেলবে না, এখন সুবিধে খুঁজছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার। সেই বোমা ফেলে লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে, যেমন সব ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরুবে কি পালাতে যাবে, অমনি গ্যাসের বোমা ফেলবে। এখন গ্যাসের বোমা ফেল্লে তো মানুষ মরবে না, কারণ সব ঘরের মধ্যে জানলা দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে ওদের আগে বার করবে রাস্তায়—পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বোমা ছাড়বে, এ-ই করে আসছে দেখছি আজ ক'দিন থেকে—

একটু পরে কন্‌শেসনের পুলিস এলো, চীনা পুলিসের ডেপুটি মার্শাল স্বয়ং এলেন বহু লোকজন নিয়ে। ওদের দিয়ে চণ্ডুর ও জুয়াড়ীদের আড্ডার ছোট্ট উঠানটা ভরে গেল।

ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—শহরে ব্ল্যাক আউট, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিধারে—এক্ষুনি জাপানীরা হাইএক্সপ্লোসিভ্ বম্ব্ ফেলবে, তারপরে ফস্‌পেন্ গ্যাসের বোমায় বিষ ছাড়বে। এ অবস্থায় কি করা যায়? মেয়ে দুটিকে কোথায় আটকে রেখেছে, কি করে খুঁজি?

কন্‌শেসন পুলিসের কর্ম্মচারীরা বল্লেন—আপনার এলাকায় যত বদমাইশের আড্ডা আছে, সব হানা দিই চলুন।

—কিন্তু তাতে সময় নেবে। এখুনি যে সব ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে ছুটে বেরিয়ে পড়বে। দেখছেন না ওপরকার অবস্থা? ওদের প্ল্যান ঠিক করে নিতে যা দেরি! আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়। মেয়ে দুটিকে গুণ্ডারা আটকে রেখেছে, মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের প্রাণের ভয় বর্ত্তমানে নেই একথা ঠিকই। সাংহাইতে এ রকম অনবরত হচ্ছে। এই ভদ্রলোক দুটি এত রাতে মেয়েদের নিয়ে চা-পেই পল্লীতে বেরিয়ে বড় বিবেচনার অভাব দেখিয়েছেন। যত গুণ্ডা আর বদমাইশের আড্ডা এই পাড়ায়।

পুলিসের লিস্ট দেখে কাছাকাছি দুটি বদমাইশের আড্ডায় হানা দেওয়া হোল—কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিললো না।

তারপর—রাত তখন দেড়টা—এমন এক ভীষণ ব্যাপারের সূত্রপাত হয়ে গেল যে, এর আগে যে সব বোমা ফেলার কাণ্ড সুরেশ্বর ও বিমল দেখেছে—এর কাছে সেগুলো সব একেবারে ম্লান হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে মুছে গেল।

বিমল আর সুরেশ্বরের মনে হোল, আকাশ থেকে চারিধারে একসঙ্গে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পড়তে শুরু হয়েছে—অসংখ্য। অনেক, অনেক—গুনে শেষ করা যায় না! সঙ্গে

সঙ্গে বিষম বিস্ফোরণের আওয়াজ, ইট টালি ছোটার শব্দ, দেওয়াল পড়ার ছাদ পড়ার শব্দ—মানুষের কলরব, হৈ-চৈ, কান্না, পুলিসের হুইস্‌ল্‌, মাথার ওপর ঘর্ঘর শব্দ—সবসুদ্ধ মিলিয়ে একটা সুপ্ত দৈত্যপুরীর দৈত্যরা যেন হঠাৎ জেগে উঠে উন্মাদ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে !

ডেপুটি মার্শাল অর্ডার দিলেন, সব কন্‌স্টেবল একত্র হয়ে গেল। কন্‌শেসন পুলিসের কর্ম্মচারীরা সাহায্য করতে চাইলে, হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেই অন্ধকারের মধ্যে টর্চ জ্বেলে অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করে আহত ও চাপা-পড়া মানুষের সন্ধান চলতে লাগলো। কাজ এগোয় না। ভাঙা বাড়ীর ইটের রাশি পদে পদে ওদের বাধা দিতে লাগলো। একটা চীনা মন্দিরের কাছে চারজন লোক মরে পড়ে আছে। দুটি ছোট বাড়ী চুরমার হয়ে সেখানে এমন ভাবে রাস্তা আটকেছে যে, মৃতদেহগুলো টেনে বার করবার উপায়ও রাখে নি। ইটের স্তূপের ওপর উঠে আবার ওদিক দিয়ে নেমে যেতে হোল—তবে জায়গাটা পার হওয়া সম্ভব হোল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো—সামনে প্রকাণ্ড বোমার গর্ত্ত, সাবধান।

সবাই চেয়ে দেখলে আন্দাজ ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত একটা প্রকাণ্ড গহ্বর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে—এবং গর্ত্তের ধারে এখনও ছট্‌কানো ধাতুর খোলা-ভাঙা টুক্‌রো পড়ে আছে, বিমল টুক্‌রোটা হাতে তুলে নিয়েই ফেলে দিলে—গরম আগুন !

কর্ডাইটের উগ্র গন্ধ জায়গাটায়। ওরা সবাই অবাক হয়ে সেই ভীষণ গর্ত্তটার দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময়ে দেখা গেল, ছ'খানা জাপানী প্লেন সার-বন্দী হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে আসছে—ওদের মাথার উপর। বোধ হয় ওদের টর্চের আলো দেখেই আসছে। চীনা পুলিসের ডেপুটি মার্শাল হেঁকে বল্লেন—সাবধান—! বোমার গর্ত্তে লাফ দাও !

সবাই বুঝলে এ অবস্থায় ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত এবং আন্দাজ প্রায় পনেরো ফুট গভীর বোমার গর্ত্তটাই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান, সারা চা-পেই পল্লী অঞ্চলের মধ্যে।

ঝুপ্‌ঝাপ্‌ ! দু সেকেণ্ডের মধ্যে ওপরে আর কেউ নেই—সবাই গর্ত্তটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিমলও ওদের সঙ্গে লাফ দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটু পর্য্যন্ত পাঁকে পুঁতে গেল, গর্ত্তটার মধ্যে কাদা আর জল—কাদার সঙ্গে বোমার ভাঙা টুকরো মেশানো—সবাই কোনো রকমে জলকাদার মধ্যে মাথা গুঁজে রইল ধার ঘেঁষে—কারণ মাঝখানে থাকলে অনেকখানি নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার আকাশ দেখা যায়—তখন আর নিজেকে খুব নিরাপদ বলে মনে হয় না।

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকান পুলিসম্যান ওদের বোঝাচ্ছিল যে, এ অবস্থায় কোন এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেললে ওদের লাগবার কথা নয়—সে নাকি মাঞ্চুকুও রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানে—বোমার গর্ত্তই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আর একজন বল্লে—কেন, যদি মেসিনগান চালায় ?

আগের লোকটা বল্লে—ফুঃ! মেসিনগান! এই অন্ধকারে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সেই ছ'খানা প্লেন ঠিক ওদের গর্তের ওপর এসে চক্রাকারে উড়ছে এবং ক্রমে নীচু হয়ে নামছে যেন।

কে একজন বল্লে—আমাদের টের পেলে নাকি!

মুখের কথা সবারই ওষ্ঠাগ্রে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে—বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমাট বেঁধে গেল সকলের। কেবল আগের পুলিসম্যানটি বলতে লাগলো—কোনো ভয় নেই—ওরা মেসিনগান ছুঁড়ে কিছু করতে পারবে না—কাওয়াসাকি বম্বারের মেসিনগানের তরিবৎ সুবিধের নয়—হোত যদি জার্মান হেঙ্কেল্ ফিফ্‌টিওয়ান, কি স্কুল্‌জ্-ব্যাঙ্ক একশো এগারো—

সবাই চাপা গলায় বিষম রাগের সঙ্গে এক সঙ্গে বলে উঠলো—আঃ—চুপ! সঙ্গে সঙ্গে প্লেনগুলো অনেকখানি নেমে এল এবং অকস্মাৎ এক তীব্র সার্চলাইটের আলোয় ওদের বোমার গর্ত্ত এবং চারিপাশের আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো—ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে পট্‌কা বাজির মত মেসিনগান ছোঁড়ার শব্দে ওদের কানে তালা ধরবার উপক্রম হলো।

একজন ফিস্ ফিস্ করে বল্লে—যদি বাঁচতে চাও তো সবাই মড়ার মত পড়ে থাকো—ভান করো যে সবাই মরে গিয়েছো—

আগের সেই মার্কিন পুলিসম্যানটি যুক্তিতর্কে অদম্য। সে বলে উঠলো—কিছু হবে না দেখো—হাঁ হোত যদি হেঙ্কেল্ ফিফ্‌টিওয়ান—কিংবা—

—আবার!

সেই কাদাজলের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে বিমল অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো কথা ভাবছিল না। তার চিন্তা শুধু বর্ত্তমানকে আশ্রয় করে। সংসার নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ—শুধু সে আছে, আর আছে—এই দুর্দ্ধর্ষ, বিভীষণ, নিষ্ঠুর বর্ত্তমান। যে কোনো মুহূর্ত্তে মেসিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত চৈতন্যের অবসান করে দিতে পারে, সারা দুনিয়া ওর কাছ থেকে মুছে যেতে পারে এক মুহূর্ত্তে—যে কোনো মুহূর্ত্তে। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে ও পড়ে রইল—ওর পাশে সবাই সেই ভাবেই আছে—বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই. বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর নেই—খোঁয়াড়ের শুয়োরের দলের মত ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা—এর নাম বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ! ওরা আজ দেশপ্রেমিক বীর সৈনিক দল হোলেও এর বেশী কিছু করতে পারতো না—এই একই উপায় অবলম্বন করতেই হোত—অন্য গত্যন্তর ছিল না। অন্য কিছু করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কানের এত কাছে এরোপ্লেনের শব্দ বিমল কখনও পায়নি, এরোপ্লেনের বিরাট আওয়াজ কানে একেবারে তালা ধরালো যে! ওর ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে চোখ চেয়ে দেখে, এরোপ্লেনগুলো গর্ত্তটার কত ওপরে এসেছে।

আওয়াজ—আওয়াজ—এরোপ্লেনের আওয়াজ, মেসিনগানের আওয়াজ! কিন্তু আওয়াজ

যত হোলো, কাজ ততো হলো না। মেশিনগানের একটা গুলিও বোমার গর্ত্তের মধ্যে পড়লো না। দু-তিনবার প্লেনগুলো গর্ত্তের দিকে নেমে এলো পুরো দমে, কিন্তু কিছু করতে পারলে না। আওয়াজ, কেবলই আওয়াজ। ক্রমে প্লেনগুলো সরে গেল গর্ত্তের ওপর থেকে, হয়তো দেখে ভাবলে গর্ত্তের লোকগুলো সব মরে গিয়েছে। মড়ার ওপর মেশিনগানের দামী গুলি চালিয়ে বৃথা অপব্যয় করা কেন?

ওরা সবাই গর্ত্ত থেকে উঠে এল। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলে, কি অদ্ভুত কাদা-মাখা চেহারা হয়েছে সকলকার! পুলিশের স্মার্ট ইউনিফর্ম একেবারে কাদায় আর ঘোলা জলে নষ্ট হয়ে ভিজে-কাঁথা হয়ে গিয়েছে। মার্কিন পুলিশম্যানটি গর্ত্ত থেকে ঠেলে উঠেই বল্লে—বলি নি তোমাদের, এরা মেশিনগান ছুঁড়ে সুবিধে করতে পারে না ও এরোপ্লেন থেকে? স্কুল্‌জ্‌ ব্যাঙ্কস্‌ একশো এগারো যদি হোত, তবে দেখতে একটা প্রাণীও আজ বাঁচতাম না।

মিনিট পনেরো কেটে গেল! বোমারু প্লেনগুলো আকাশের অন্যদিকে চলে গিয়েছে। কি ভীষণ আওয়াজ! বিমলের মনে পড়লো, এ্যালিস্‌ তার নরম সাদা হাত দুটি তুলে কান ঢেকে বস্‌তো—হোয়াট্‌-এ্যান-অ-ফুল্‌ রকেট! এ্যালিসের সেই ভঙ্গিটা, তার মুখের কথা মনে পড়তেই বিমলের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো।

এ্যালিস্‌—মিনি—বেচারী এ্যালিস্‌!—কি ভীষণ কাল-রাত্রি আজ ওদের পক্ষে। সাংহাইয়ের এই দুর্যোগের রাত্রির কথা বিমল কি কখনো ভুলবে জীবনে? কোথায় সে সিঙ্গাপুরে ডাক্তারী করবে বলে বাড়ী থেকে রওনা হোল—অদৃষ্ট তাকে কোথায় কি অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেছে!

হঠাৎ পিনাংএর মন্দিরে সেই নিষ্ঠুর মূর্ত্তি চীনা রণদেবতার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ মনে পড়লো ওর।—রণদেবতা ওদের তাঁর ফাঁদে ফেলেছেন—

একটা প্লেন দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটা বস্তির ওপরে দুটো বোমা ফেললে—ভীষণ আওয়াজ হোল—অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের শিখার চমক দেখা গেল, কিন্তু লোকজনের চেঁচামেচি শোনা গেল না। মার্কিন পুলিসম্যানটি বল্লে—পঞ্চাশ পাউণ্ডের বোমা! দেখেছ কি কাণ্ডটা করলে বস্তিতে! লোক সব নিশ্চয় পালিয়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—ওই দেখ, আর একদল বম্বার দেখা দিয়েছে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে—

অন্তত বারোখানা সারবন্দী হয়ে এগিয়ে আসছে। এরা যে এলোমেলো ভাবে বোমা ফেলছে না, তা বেশ বোঝা গেল—এদের ধ্বংস-লীলার মধ্যে প্ল্যান আছে, শৃঙ্খলা আছে, সমস্ত শহরটা এবং তার প্রান্তস্থিত এই দরিদ্র পল্লী চা-পেই ও অন্যান্য ছড়ানো গ্রামগুলোকে ওরা যেন কতকগুলো কাল্পনিক অংশে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিয়ম করে প্রত্যেক অংশে বোমা ফেলছে—কোন অংশ পরিত্রাণ না পায়!

বিমল লক্ষ্য করলে অন্ধকারের মধ্যে বস্তির লোকজনেরা খানা-নালার মধ্যে অনেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—একটা লোক একটা গাছের গুঁড়িতে প্রাণপণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না—মেয়ে কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, যেন ভীত, সন্ত্রস্ত প্রেতমূর্ত্তি। সন্ধ্যাবেলার সেই বেপরোয়া ভাব আর নেই।

একমুঠো ছড়ানো নক্ষত্রের মত কতকগুলো বোমা পডলো দূরের একটা পাড়ায়—সাংহাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র সে জায়গাটা—পুলিশম্যানগুলো বলাবলি করছে। ওদিকে সেই প্লেনগুলো আবার আসছে, তবে এবার সার্চলাইট জ্বালায় নি, অন্ধকারেই আসছে। কাছেই একটা পল্লীতে ওরা ছ'টা বোমা ফেল্লে, আন্দাজ এক একটা পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের। পুলিশের ডেপুটি মার্শালের আদেশে ওরা সবাই সেদিকে ছুটলো। সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, ভয়ের চোটে সতর্কতা ভুলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীঘর চুরমার, আয়না, মাদুর, টেবিল, ছবি সব ছিটকে রাস্তায় এসে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে—তারই মধ্যে এক জায়গায় একটা প্রৌঢ়া মহিলার ছিন্নভিন্ন বিকৃত মৃতদেহ। কিছুদূরে একটি সুন্দরী বালিকার দেহ দু টুক্‌রো হয়ে পড়ে আছে, তলপেটের নাড়িভুঁড়ি খানিকটা বেরিয়ে ধুলোতে লুটিয়ে পড়েছে।

এই সব বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে এক জায়গায় একটা ছোট মেয়ে ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে চোখ বুজে ছুটে একটা ছোট মাঠ পার হয়ে পালাচ্ছিল—পুলিশের লোক ওকে ধরে ফেল্লে। মেয়েটির বয়স ন' বছর—সে ভয়ে এমনি দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলে না।

ওর হাতে একটা পুঁটুলি। পুঁটুলির মধ্যে কিছু শুকনো শূওরের মাংসের টুক্‌রো আর গোটাকতক কিশমিশ। তাকে খানিকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করার পরে জানা গেল তাদের বাড়ীতে বোমা পড়বার পরে বাড়ী ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কে কোথায় গিয়েছে তা সে জানে না। সে কিছু খাবার সংগ্রহ করে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে—তার বিশ্বাস, চোখ বুজে ছুটে পালালে বোমা ফেলে যাবা, তারা ওকে দেখতে পাবে না। তাকে ডেকে নিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার মৃতদেহ দেখানো হোল।

খুকী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, ওই তার মা। পাশের বালিকাটি তার দিদি। ডেপুটি মার্শাল পাড়ার একজন লোক ডেকে মেয়েটির নাম ধাম, বাপের নাম ঠিকানা জেনে নিলেন, কারণ ছেলেমানুষ পুলিশের প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দিতে পারবে না। মেয়েটি পুলিশের জিম্মাতেই রইল—কারণ শোনা গেল ওর বাবা বছর-তিন মারা গিয়েছেন, বিধবা মা আর দিদি ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ ছিল না।

একদল লোককে দেখা গেল ভাঙা বাড়ীগুলো থেকে জিনিসপত্র, মৃতদেহ টেনে বার করছে। ওরা টর্চ জেলে টর্চের মুখ নীচের দিকে নামিয়ে মৃতদেহ কি জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাছে ওপর থেকে বোমারু প্লেনগুলো টের পায়।

বিমল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে। সাগ্রহে সে ছুটে গেল—প্রোফেসর লি, প্রোফেসর লি—

অন্ধকারের মধ্যে বিমলকে উনি চিনলেন। বল্লেন—আমি আমার ছাত্রের দল নিয়ে

বেরিয়েছি, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার মেয়েরা কোথায় ?

এই সৌম্যদর্শন, পরহিতব্রতী বৃদ্ধের স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। বল্লে—সে অনেক কথা। আমার মনে হয় আপনি এবং আপনার দলই এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

প্রোফেসর লি হাসিমুখে বল্লেন—যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব আলোচনা করতে এসেছিলুম জানেন তো ? এর চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায় পাবো সে আলোচনার ?

হঠাৎ একটা প্লেন মাথার ওপর এল। সবাই কথা বন্ধ করে ওপর দিকে চাইলে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি চেঁচিয়ে উঠল—কভার ! কভার !

কোথায় আর আশ্রয় নেবে, সেই ভাঙা বাড়ীর ইটকাঠের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ছাড়া। সবাই সেই দিকে ছুটলো। বিমলও চীনা খুকীটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো সেই দিকে।

প্লেন থেকে বোমা পড়ল না। পড়লো কতকগুলো চকচকে রূপোর বাতিদানের মত লম্বা লম্বা জিনিস। প্লেনটা চলে গেলে ওরা সেগুলো দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখলে। সরু সরু রূপোর নলের মত জিনিস, হাত খানেক লম্বা। ঝকৃঝকে সাদা। মার্কিন পুলিশম্যান একটা হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—ইন্‌সেনডিয়ারি বম্ব্—আগুন লাগাবার বোমা—এলুমিনিয়ম আর ইলেক্ট্রনের খোল, ভেতরে এলুমিনিয়ম পাউডার আর আয়রন অক্সাইড ভর্ত্তি। এই দেখ ছ'টা করে ফুটো টিউবের গোড়ার দিকে। এই দিয়ে আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসবে। এ আগুন নিবোনা যায় না।

জাপানীদের মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার পর লোকজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পালাবে, তখন ওরা শহরে ইন্‌সেনডিয়ারি বম্ব্ ফেলে আগুন লাগিয়ে দেবে, আগুন নিবোতে কে এগোবে তখন ।

কি ভীষণ ধ্বংসের আয়োজন ! বিমল সেই ঝকৃঝকে পালিশ করা সরু টিউবটা হাতে নিয়ে শিউরে উঠলো। এই টিউবের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিদেব এখুনি জেগে উঠে এই এত বড় সাংহাই শহরটা জালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, তারই আয়োজন চলছে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি বল্লে—পঁয়ষট্টি গ্রাম এলুমিনিয়াম পাউডার আর পঁয়ত্রিশ গ্রাম আয়রন অক্সাইড। আমাদের মার্কিন নৌবহরের উড়োজাহাজে আজকাল এর চেয়েও ভালো বোমা তৈরী হচ্ছে—আয়রন অক্সাইডের বদলে দিচ্ছে—

কাছেই আরও দু তিনটা রূপোর বাতিদান পড়লো।

দিনের বেলায় ওরা পরস্পরের ধুলো কাদা মাখা চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রোফেসর লি তখনও কাজে ব্যস্ত, চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে লোকজন টেনে বার করে বেড়াচ্ছেন, তিনি আর তাঁর ছাত্রেরা। পুলিশও এসেছে, দুটো রেড্ ক্রসের হাসপাতাল গাড়ীও এসেছে। আকাশে জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর চিহ্ন নেই।

রাত্রিটা কেটে গিয়েছে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত। বেলা এখন দশটা—এখনও সে

দুঃস্বপ্নের জের মেটে নি। বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার তাণ্ডব যে চলতে পারে তা এর আগে, ভারতবর্ষে থাকতে বিমল কখনো ভেবেছিল ?

কন্‌শেসনে সেই সবজান্তা আমেরিকান্ পুলিশটা বলছিল—দেখবেন ওরা ইন্‌সেনডিয়ারি বোমা ফেলে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করবে। এখানে অনেক বাড়ীই কাঠের। তাতে আবার বোমার আগুন জলে নেবে না। বালি ছড়াতে হয় একরকম কল দিয়ে। প্রথম অবস্থায় বোমাটাকে বালি বোঝাই থলে দিয়ে চেপে ধরলেও আর স্পার্ক ছোটে না—কিন্তু সে সব করে কে ?

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—কিন্তু সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমায়। কাল সন্ধ্যা ও রাতের বোমা ফেলার দরুন চা-পেই পাড়া ও সাংহাইয়ের চ্যাং সো লীন এভিনিউতে সাত আটশো বাড়ীর চিহ্ন নেই—মানুষ মারা পড়েছে তিনশোর ওপর, মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে প্রায় পাঁচশো। তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বাঁচবার আশা নেই।

প্রোফেসর লি বল্লেন—আমাদের সব চেয়ে ভীষণ শত্রু যে এই বোমারু প্লেনগুলো, তা ক'দিনের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারছি। তবুও তো এখনো ওরা সমবেত ভাবে আক্রমণ করে নি—করলেও একশোখানা প্লেনের প্রত্যেক প্লেনখানা থেকে দু টন বোমা ফেললে পাঁচ হাজার লোক কালই মেরে ফেলতো।

সবজান্তা পুলিশম্যানটি বল্লে—জাপানী বম্বারগুলো এক একখানা দু টন বোমা বইতে পারে না মশায়—সে পারে জার্মান ডর্নিয়েরর কিংবা ইটালির কাপ্রোণি—কিংবা—

ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—আহা হা, ও সব এখন থাক্—ও তর্কে কি লাভ আছে ? এখন আমাদের দেখতে হবে যে দুটি মার্কিন মহিলাকে কাল রাত্রে গুণ্ডারা নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের উদ্ধারের কি উপায় করা যায়, বোমা এখন এবেলা অন্ততঃ আর পড়বে না—

এমন সময়ে একজন চীনা পুলিশ সার্জেন্ট্ মোটর সাইকেলে ছুটে এসে সংবাদ দিলে, কন্‌শেসন অঞ্চলে চীনা পলাতক নরনারীদের সঙ্গে কন্‌শেসন পুলিশের ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। ওরা ইয়াংসিকিয়াং-এর ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছিল, কন্‌শেসন পুলিশ ব্রিজের ওমুখে মেশিনগান বসিয়েছে—তারা বলছে এত পলাতক লোক জায়গা দেবার স্থান নেই কন্‌শেসনে। খাবার নেই, জল নেই। গেলে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে।

প্রোফেসর লি বল্লেন—কত লোক পালাচ্ছিল ?

—তা বোধ হয় দশ হাজারের কম নয়। অর্দ্ধেক সাংহাই ভেঙ্গে মেয়ে-পুরুষ সব পালাচ্ছে কন্‌শেসনের দিকে। আপনারা সব চলুন, একটু বোঝান ওদের। রাত্রির ব্যাপারে সব ভয় খেয়েছে বড্ড।

কন্‌শেসনের পুলিশদলকে চলে যেতে উদ্যত দেখে বিমল বল্লে—আজই মেয়ে দুটির ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে—দেরি হোলে ওদের খুঁজে বার করা শক্ত হবে হয় তো।

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—সে বিষয়ে ওঁরা কিছু সাহায্য করতে পারবেন না।

আমাদের বদমাইশদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে। আমি আজ এখুনি এর ব্যবস্থা করছি। ব্যস্ত হবেন না—বিদেশী গবর্নমেণ্টের কাছে এজন্যে আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী।

সেদিন সারাদিন ওরা হাসপাতালে গেল না। ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে দিলে মিনি ও এ্যালিসের বিপদের কথা। কন্‌শেসনে যাবার জন্যে দুবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হোল না। সে পথ লোকজনের ভিড়ে বন্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া ইয়াংসিকিয়াংয়ের পুলের ওপারের মুখে মেশিনগান বসানো।

সারাদিন ধরে কি করুণ দৃশ্য সাংহাইয়ের বাইরের বড় বড় রাজপথগুলিতে! লোকজন মোট-পুঁটুলি নিয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে—সাংহাই থেকে হোনান্ যাবার রাজপথ পলাতক নরনারীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভয়ানক গরমে এই ভিড়ে অনেকে সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়ে মারাও পড়ছে।

দুখানা হাসপাতালের গাড়ী ওদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে গাড়ী দুখানা শহরের উপকণ্ঠে এক জায়গায় পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। একখানা গাড়ীর চার্জ নিয়ে বিমল সেখানে রয়ে গেল। সুরেশ্বর রইল তার সহকর্ম্মী হিসাবে।

শীঘ্রই কিন্তু কি ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল দুজনেই। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিল এই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে জাপানী প্লেন যদি বোমা ফেলে তবে যে কি কাণ্ড হবে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

বেলা দুটো বেজেছে। একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্ম্মচারী মোটরবাইকে সাংহাইয়ের দিক থেকে এসে ওদের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর সামনে নামলো। বল্লে—আপনারা এখান থেকে সরে যান—

বিমল বল্লে—কেন?

—জাপানী সৈন্য শহরের বড় পাঁচিল ডিনামাইট্ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে—এখনো দুটো পাঁচিল বাকী—কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে ওরা সমুদ্রের ধারে সমস্ত দিকটা দখল করবে। আর আমরা খবর পেয়েছি পঞ্চাশখানা বোমারু প্লেন্ একঘণ্টার মধ্যে শহরের ওপর আবার বোমা ফেলবে।

—এই লোকগুলোর অবস্থা তখন কি হবে?

—চীনের মহা দুর্ভাগ্য, স্যার্। আপনারা বিদেশী, আপনাদের প্রাণ আমরা বিপন্ন হতে দেবো না। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই। আপনারা সরে যান এখান থেকে।

একটি গাছের তলায় একটি বৃদ্ধা বসে। সঙ্গে একটা পুঁটুলি, গোটা-কতক মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি। মুখে অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন।

সামরিক কর্ম্মচারীটি কাছে গিয়ে বল্লে—কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সৈনিকটির দিকে চাইলো কিন্তু চুপ করে রইলো। উত্তর দিলে না। সৈনিকটি আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবে তুমি? তোমার সঙ্গে কে আছে?

এবারও বুড়ী কিছু বল্লে না।

বিমল বল্লে—বোধ হয় কানে শুনতে পায় না। দেখছ না ওর বয়েস অনেক হয়েছে। চেঁচিয়ে বল।

তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী বৃদ্ধার নাতির বয়সী। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বল্লে—ও দিদিমা, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কোথায় আর যাবো? সবাই যেখানে যাচ্ছে।

—এখানে বসে থেকো না। বোমা পড়বে এক্ষুনি। সঙ্গে কেউ নেই?

বোমার কথা শুনেই বুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট হোল, ওপরের দিকে চাইলে। বল্লে—আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার আর কেউ নেই, আমাকে তোমরা একখানা গাড়ীর ওপর উঠিয়ে দাও।

বিমল বল্লে—আমি ওকে এ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড বয়েস হয়েছে, এতখানি পথ ছুটোছুটি করে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে।

দুজনে ওকে ধরাধরি করে গাড়ীতে এনে ওঠালে।

এক জায়গায় একটি গৃহস্থ পরিবারের ঠিক এই অবস্থা। গৃহিণীর বয়েস প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ, সাত আটটি ছেলেমেয়ে, সকলের ছোটটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, বাকী সব দুই, চার, পাঁচ, সাত এমনি বয়েসের। সঙ্গে একটিও পুরুষ নেই। ওরাও হাঁটতে না পেরে বসে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল বাড়ীর কর্ত্তা জাহাজে কাজ করেন—জাহাজ আজ কুড়ি দিন হোল বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে। এদিকে এই বিপদ! কাজেই মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ী থেকে—কোথায় যাবেন ঠিক নেই।

এদের অসহায় অবস্থা দেখে বিমলের খুব কষ্ট হোল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। কত লোককে সে হাসপাতাল গাড়ীতে জায়গা দেবে?

সেদিন শহরের এমন ভয়ানক অবস্থা গেল যে কে কার খোঁজ রাখে। মিনি ও এ্যালিসের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই হোল না। সারা দিনরাত এমনি করে কাট্‌লো।

রাত্রি শেষে জাপানী নৌসেনা সাংহাই শহরের দক্ষিণ অংশ অধিকার করলে। বিমল ও সুরেশ্বর তখন হাসপাতালে। ওরা কিছুই জানতো না। তবে ওরা এটুকু বুঝেছিল যে অবস্থা গুরুতর। সারারাত্রি ধরে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ থেকে গোলা বর্ষণ করলে। বোমারু প্লেন-গুলোর তেমন আর দেখা নেই, কারণ শহর প্রায় জনশূন্য। পথে ঘাটে লোকজনের ভিড় নেই বললেই চলে।

রাত তিনটে। এমন সময় ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য ঢুকতে দেখে বিমল প্রথমটা বিস্মিত হোল; তারপরই ওর মনে হোল এরা চীনা নয়, জাপানী সৈন্য। ক্রমে পিল্‌পিল্‌ করে বিশ ত্রিশজন জাপানী সৈন্য হাসপাতালের বড় হলটার মধ্যে ঢুকলো। চারিদিকে শোরগোল শোনা গেল। রোগীর দল অধিকাংশই বোমায় আহত নাগরিক,

তারা ভয়ে কাঠ হয়ে রইল জাপানী সৈন্য দেখে।

বিমল একা আছে ওয়ার্ডে। হাসপাতালের বড় ডাক্তার খানিকটা আগে চলে গিয়েছেন। ওই এখন কর্ত্তা। দুজন চীনা নার্স ভয়ে অন্য ওয়ার্ড থেকে ছুটে এসে বিমলের পেছনে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একজন জাপানী সৈন্য বন্দুক তুলে জমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ধরলে—রাইফেলের আগার ধারালো বেয়নেট ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠলো। চক্ষের নিমেষে সে এমন একটা ভঙ্গি করলে তাতে মনে হোল বিমলদের দেশে সিঁটকি জালে মাছ ধরবার সময় জালের গোড়ার দিকের বাঁশটা যেমন কাদাজলের মধ্যে ঠেলে দেয়—তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক আর্ত্তনাদ শোনা গেল। পাশের বিছানায় একটা চীনা যুবক রোগী শুয়ে ভয়ে ভয়ে ওদের দিকে চেয়ে ছিল—বেওনেট্‌ তার তলপেটটা গিঁথে ফেলেছে। চারিদিকে রোগীরা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো। রক্তে ভেসে গেল বিছানাটা। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

বিমলের মাথা হঠাৎ কেমন বেঠিক হয়ে গেল এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখে। সে এগিয়ে এসে ইংরাজিতে বল্লে—তোমরা কি মানুষ না পশু?

জাপানী সৈন্যেরা ওর কথা বুঝতে পারলে না—কিন্তু ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি ও গলার সুর শুনে অনুমান করলে মানে যাই হোক্, প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা তা নয়।

অমনি সব ক'জন সৈন্য ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুললে।

বিমল চোখ বুজলে—ও-ও বুঝলে এই শেষ।

সেই দুজন চীনা তরুণী নার্স, যারা ওর পেছনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। হাসপাতালের সবাই বিমলকে ভালবাসতো।

এমন সময় বিমলের কানে গেল পেছন থেকে একটা সামরিক আদেশের ক্ষিপ্র, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ সুর। জাপানী ভাষায় হোলেও তার অর্থ যেন কোন অদ্ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে চোখ চাইলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী, লেফ্‌টেনণ্টের ইউনিফর্ম পরা। সৈন্যেরা ততক্ষণ বেওনেট নামিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছে।

জাপানী অফিসারটি এগিয়ে এসে জাপানী ভাষাতেই কি প্রশ্ন করলে। তিন চারজন সৈন্য একসঙ্গে ওর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে কি বল্লে।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভাঙা ইংরিজিতে বল্লে—তুমি আমার সৈন্যদের গালাগালি দিয়েছ?

বিমল বল্লে—তোমার সৈন্যরা কি করেছে তা আগে দেখ। এটা রেড্‌ক্রস্‌ হাসপাতাল। এখানে কেউ যোদ্ধা নেই। অকারণে তোমার সৈন্যরা আমার এই রোগীটিকে খুন করেছে বেওনেটের ঘায়ে।

জাপানী অফিসার একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রক্তাক্ত বিছানা ও মৃত রোগীর দেহটার দিকে চেয়ে দেখলে এবং তারপর সম্ভবত ভর্ৎসনার সুরে সৈন্যদের কি বল্লে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি কোন্‌ দেশের লোক?

—ভারতীয়।

—রেড্‌ক্রসের ডাক্তার?

—না, আমি চীনা মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার।

—ও, চীনেদের সাহায্য করতে এসেছ ভারতবর্ষ থেকে?

—হাঁ।

—আমার সৈন্যদের অপমান করতে তুমি সাহস কর?

—আমার সামনে আমার রোগী খুন করলো ওরা, তার প্রতিবাদ মাত্র করেছি।

হঠাৎ জাপানী অফিসারটি ঠাস্‌ করে একটা চড় মারলে বিমলের গালে। পরক্ষণেই সেই ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট সামরিক আদেশের সুর গেল ওর কানে—রাগে অপমানে, চড়ের প্রবল ঘায়ে দিশাহারা ওর কানে। সব ক'জন সৈন্য মিলে তক্ষুনি ওকে ঘিরে ফেল্লে চক্ষের নিমেষে। দুজন ওকে পিছমোড়া করে বাঁধলে চামড়ার কোমরবন্ধ দিয়ে। তারপরে ওকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে চললো রাইফেলের কুঁদোর ধাক্কা দিতে দিতে। চীনা নার্স দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল।

বিমলকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হোল, সেখানটা একটা ছোট মাঠের মত। একদিকে একটা নীচু বাড়ী।

মাঠের এক পাশে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার পেতে জনৈক জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী বসে। তার চারিপাশে সশস্ত্র জাপানী সৈন্যের ভিড়। কিছুদূরে দেওয়াল থেকে পনেরো হাত দূরে একসারি রাইফেলধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে। আরও অনেক জাপানী সৈন্য মাঠটার মধ্যে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলছে।

এ জায়গাটাতে কি হচ্ছে বুঝতে পারলে না।

ওকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কিছু দূরে দাঁড় করালে সৈন্যরা, তখন ও চেয়ে দেখলে দুজন চীনাকে জাপানী সৈন্যরা ঘিরে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট জাপানী অফিসারটি কি জিজ্ঞেস করছে সৈন্যদের। চীনা দুটি সৈন্য নয়, সাধারণ নাগরিক—বিমল ওদের দেখেই বুঝলে। একটু পরেই জাপানী অফিসারটি কি একটা আদেশ দিয়ে হাত নেড়ে চীনাদুটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বল্লে।

জাপানী সৈন্যেরা তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওদিকে যে বাড়ীটা, তার দেওয়ালের গায়ে নিয়ে দাঁড় করালে।

চীনা লোক দুটির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে—তারা কলের পুতুলের মত জাপানীদের সঙ্গে চললো বটে, কিন্তু তাদের চোখের অবাক ভাব দেখে মনে হয় তারা বুঝতে পারে নি কেন তাদের দেওয়ালের গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে।

বিমলও প্রথমটা বুঝতে পারে নি, সে বুঝলে—যখন দশজন জাপানী সৈন্যের সারি এক যোগে রাইফেল তুল্লে।

একটা তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সামরিক আদেশ বাতাস চিরে উচ্চারিত হোল, সঙ্গে সঙ্গে দশটি রাইফেলের এক যোগে আওয়াজ। বিমল চোখ বুজলে।

যখন সে আবার চোখ চাইলে, তখন প্রথমেই যে কথা তার মনে উঠলো, স্থান ও অবস্থা হিসেবে সেটা বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলতে হবে। তার সর্বপ্রথম মনে হোল—জাপানী রাইফেলের ধোঁয়া তো খুব বেশী হয় না! কেন একথা তার মনে হলো এই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে—জীবনের এই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে, কে তা বলবে?

তারপরই বিমল দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা দুটি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দুজন জাপানী সৈন্য তাদের মৃতদেহের পা ধরে হিঁচড়ে টেনে একপাশে রেখে দিলে। তারা পাশাপাশি পড়ে রইল এমন ভাবে, দেখে বিমলের মনে হোল ওরা কোনো ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে।

মানুষকে মানুষ যে এমন ভাবে হত্যা করতে পারে, বিমল তা আজ প্রথম দেখেছে হাসপাতালে, আর দেখলে এখন।

এবার বিমলের পালা, বিমল ভাবলে।

কিন্তু চেয়ে দেখলে আর চারজন চীনাকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এসে জাপানী সৈন্যেরা টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এবারও পূর্ব্বের মতো কথা-কাটাকাটি হলো জাপানী অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে।

তারপর আবার পূর্ব্বের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি! এই চীনা চারজনও উপুড় হয়ে পড়লো দেয়ালের সামনে আগের দুজনের মত।

চীনা ভাষা যদিও বা কিছু কিছু শিখেছে বিমল, জাপানী ভাষার তো সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। কেন যে এদের গুলি করে মারা হচ্ছে, কি অপরাধে এরা অপরাধী, কিছু বোঝা গেল না। আর এখানে জাপানীরাই কথাবার্ত্তা বলছে, চীনাদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

বিমল ভাবছিল—এই দূর বিদেশে এখনি তার প্রাণ বেরুবে। মা বাবার সঙ্গে আর দেখা হলো না, হয়তো তারা জানতেও পারবেন না যে তার কি হয়েছে। শুধু একখানা চিঠি যাবে তাঁদের কাছে, তাতে লেখা থাকবে, ছেলে তাঁদের 'মিসিং'—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!··· কিন্তু এ্যালিসের কি হলো! এ্যালিসের সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এ্যালিস্‌কে বড় ভাল লেগেছিল। কোথায় যে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে! বেচারী এ্যালিস্! বেচারী মিনি!

কিন্তু বিমলের পালা আসতে বড় দেরি হতে লাগলো।

দলে দলে চীনা নাগরিকদের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো চলতে লাগলো। তারপর তাদের হত্যা করাও সমানভাবে চলছে।

মৃতদেহ ক্রমেই স্তূপাকার হয়ে উঠছে।

এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা-দৃশ্য আর দেখা যায় না চোখে।

বিমলকে এইবার দুজন জাপানী সৈন্য নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। বিমল অনুভব করলে তার ভয় হচ্ছে না মনে—কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে।

জ্বর আসবার আগে যেমন গা বমি-বমি করে, ওর ঠিক তেমনি হচ্ছে শরীরের মধ্যে।

মাথাটা যেন হঠাৎ বড় হাল্কা হয়ে গিয়েছে, আর কেমন যেন বমির ভাব হচ্ছে।

জাপানী সামরিক অফিসারটি ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস্ করলে—তুমি রাস্তায় কি করছিলে?

বিমল ইংরিজিতে বল্লে—রাস্তায় সে কিছু করেনি। হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে এনেছে।

—কোন্ হাসপাতাল?

—চীনা রেড্ক্রস্ হাসপাতাল।

—তুমি সেখানে কি করছিলে?

—আমি ডাক্তার। ডিউটিতে ছিলাম, জাপানী সৈন্যেরা একজন চীনা রোগীকে অকারণে বেওনেটের খোঁচায়—

পিছন থেকে দুজন জাপানী সৈন্য ওকে রুক্ষ স্বরে কি বল্লে, বিমলের মনে হলো তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

জাপানী অফিসারটি বল্লে—থামলে কেন? বলে যাও—

বিমল হাসপাতালের হত্যাকাণ্ডের কথা সংক্ষেপে বলে গেল।

জাপানী অফিসার চারিপাশের জাপানী সৈন্যদের দিকে চেয়ে জাপানী ভাষায় কি প্রশ্ন করলে। বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি সেই সৈন্যকে চিনতে পারবে?

—না। অত ভাল করে দেখিনি তার চেহারা, তখন মাথার ঠিক ছিল না, তা ছাড়া জাপানী সৈন্যেরা সবাই আমার চোখে একই রকম দেখায়। দেখতে অভ্যস্ত নই বলে।

—তুমি সিঙ্গাপুরের লোক?

—আমি ভারতবাসী।

—চীনা হাসপাতালে চাকুরি করো?

—হ্যাঁ।

—সরাসরি এসেছ চীনে?

এ প্রশ্ন করবার কারণ বিমল একটু একটু বুঝতে পারলে। এখানে সে একটা মিথ্যে কথা বল্লে। এই একমাত্র ফাঁক, এই ফাঁক দিয়ে সে এবারের মত গলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো করবে। তারপর যা হয় হবে। সে বল্লে—সরাসরি আসি নি। আন্তর্জাতিক কন্‌শেসনে এসেছিলাম; ব্রিটিশ কনস্যুলেট আপিসে আমার নাম রেজেষ্ট্রি করা আছে।

এই সময় একজন জাপানী সৈন্য কি বল্লে অফিসারটিকে। তার হাতে তিনটে জরির ব্যাণ্ড, দেখে মনে হয় সে একজন করপোরাল কিম্বা কম্প্যানি কম্যাণ্ডার।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে ভ্রূকুটি করে বল্লে—তুমি একজন গুপ্তচর।

—আমি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আমি ডাক্তার। তোমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই জানে আমি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলাম, ওরা ধরে এনেছে।

—আঙ্গুলের টিপসই দাও দুটো এখানে।

বিমল দুখানা কাগজে টিপসই দিলে। তারপর জাপানী অফিসার কি আদেশ করলে

জাপানী ভাষায়, ওকে তুজন জাপানী সৈন্য ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরে একটা কামানের গাড়ীর উপর বসালে। চারিধারে বহু জাপানী সৈন্য গিজ গিজ করছে। সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত। কোথায় যাবার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র উৎসুক।

বিমল দেখলে তাকে এরা ছেড়ে দিলে না। মুক্তি যে দিয়েছে তা নয়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? জাপানী ভাষার সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না। মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ করে কামানের গাড়ী টানতে লাগলো একখানা মোটর লরি। ওর তুদিকে সাঁজোয়া গাড়ী চলেছে সারি দিয়ে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর, এর আর যেন শেষ নেই, ঘণ্টা দুই চলবার পরে শহরের বাড়ী ঘর ক্রমে কমে আসতে লাগলো। ফাঁকা মাঠ আর ধানের ক্ষেত। চীনদেশের এ অংশের দৃশ্য ঠিক যেন বাংলাদেশ, তবে এখানে কাছাকাছি নীচু পাহাড় শ্রেণী চোখে পড়ে।

কিছুদূরে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপারে ঘন ধেঁায়া। রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ আসছে।

এক জায়গায় মাঠের মধ্যে পাইন বন। সেখানে কামানের গাড়ী দাঁড়ালো। বিমল দেখলে একটা উঁচু ঢালু মত জায়গায় লম্বা সারি দিয়ে জাপানী সৈন্যরা উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেল ধরে ছুঁড়ছে, এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাটটা রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে।

ওপাশ থেকেও তার জবাব আসছে ; এটা যে যুদ্ধক্ষেত্র এতক্ষণ পরে বিমল বুঝতে পারলে! ওদিকে চীনা নাইন্‌থ্ রুট আর্মি জাপানীদের বাধা দিচ্ছে—চীনা সৈন্যবাহিনী সাংহাই ছেড়ে হটে গিয়েছে বটে, কিন্তু জাপানীদের আর এগোতে দেবে না।

আর একটু পরে বিমল লক্ষ্য করে দেখলে, পাইন বনের একপাশে গাছের তলায় একরাশ মৃতদেহ জাপানী সৈন্যের। স্ট্রেচারে করে বিমলের চোখের সামনে আরও তুজন মরা কি জ্যান্ত সৈন্যকে নিয়ে এল, বিমল বুঝতে পারলে না। একটু পরে আহতদের আর্তনাদ কানে যেতেই চিকিৎসক বিমল চঞ্চল হয়ে উঠলো। পাশের একজন জাপানী সৈন্যকে বল্লে পিজিন ইংলিশে —আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমি ডাক্তার, ওদের দেখবো।

সব মানুষের তুঃখই সমান। তুঃখপীড়িত মানুষের জাত নেই—তারা চীনা নয়, জাপানীও নয়। একটু পরে জাপানী অফিসারের সম্মতিক্রমে বিমল হতাহত সৈন্যদের কাছে গেল দেখতে, যদি তার দ্বারা কোন সাহায্য হয়। যদি মড়ার গাদায় জড়ো করা সৈন্যদের মধ্যে তু-একজন সাংঘাতিক আহত লোক বার হয়—কারণ আর্তনাদ সেই গাদার মধ্যে থেকেই আসছিল।

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

একটা শান্ত পাইন বন, গোটা তিনেক কামানের গাড়ী, রাইফেল হাতে কতকগুলি সৈন্য উপুড় হয়ে আছে—ওপারে পাহাড়ের ওপর কিছু ধোঁয়া।—

কেবল সম্মুখের হতাহত জাপানী সৈন্যগুলি পরিচয় দিচ্ছে যে বিমল কোনো শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই—যেখানে সে রয়েছে সেখানে মানুষের জীবন মরণের সঙ্গে সম্পর্ক বড় বেশী।

কিন্তু ওষুধপত্র কিছু নেই যা দিয়ে এই সব আহত সৈনিকদের চিকিৎসা চলে। এমন কি খানিকটা আইডিন পর্য্যন্ত বিমল অনেককে বলেও জোটাতে পারলে না। এদের হাসপাতাল শিবির অনেক দূরে—সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

জাপানী সৈন্যেরা কিন্তু দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপারে চীনা সৈন্যদের রাইফেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ যে কি, কিছু বুঝলে না।

আবার কামানের গাড়ীতে চড়ে সৈন্যবেষ্টিত হয়ে যাত্রা।

এবার জাপানীরা বিমলের সঙ্গে খানিকটা ভাল ব্যবহার করলে, কারণ আহত জাপানী সৈনিকদের ও যথেষ্ট সেবা করেছে। ও যে সাধারণ সৈনিক বা স্পাই নয়, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার—এই বিশ্বাস জন্মেছে সকলেরই।

পাহাড়ের ওপারে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সৈন্যশিবির। ওর মধ্যে ঢুকেই বিমল বুঝতে পারলে, এটা চীনা আর্মির হাসপাতাল—প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল এখানে—এখন কিছু নেই, চীনা সৈন্য সব সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়েছে, কেবল একটা বড় দস্তার টব পড়ে আছে—আর কিছু ব্যাণ্ডেজের তুলো। হাসপাতাল শিবির থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক গাছের তলায় এক চীনা সৈন্যকে পাওয়া গেল—হতভাগ্য গুরুতর আহত। রাইফেলের গুলি বোধহয় জাপানীদের, তার শরীরের দুই জায়গায় বিঁধেছে—রক্তে তার ইউনিফর্ম ভিজে উঠেছে। এ-কে যে ওর বন্ধুরা কেন শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছে কিছু বোঝা গেল না।

একজন জাপানী সৈন্য ওর পা ধরে খানিকটা হেঁচড়ে নিয়ে চললো। লোকটার বেশ জ্ঞান রয়েছে—সে যন্ত্রণায় অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করে উঠতেই পেছন থেকে একজন জাপানী অফিসার এগিয়ে গেল তাকে দেখতে।

ওদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে জাপানী ভাষায় কি বলাবলি হোল, বিমল বুঝলে না—হঠাৎ অফিসারটি রিভলভার বার করে আহত সৈনিকের মাথায় প্রায় নল ঠেকিয়ে গুলি করলে।

লোকটা যেন রিভলভার ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়লো। ওর সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

বিমল শিউরে উঠলো—চোখের সামনে এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা দেখতে সে এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। মাইল তিন দূরে একটা চীনা গ্রাম—যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁদিক ঘেঁষে। ডানদিকে একটা অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে জাপানী অফিসারটির ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখছে সবাই, সেদিকে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে—বিমল বুঝলে ওই পাহাড়টা বর্ত্তমানে চীনা নাইন্থ্ রুট্ আর্মির দ্বিতীয় ঘাঁটি। প্রথম ঘাঁটি ছিল পূর্ব্বোক্ত পাইন বনের সামনের পাহাড়—তা গিয়েছে।

একস্থানে একদল জাপানী সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের পাশ দিয়ে বিমলদের দল কামানের গাড়ী নিয়ে চলে গেল। ওরা যেন খুব উত্তেজিত হয়ে কি বলাবলি করছে, বিমল বুঝতে পারলে না। একজন পিজিন ইংলিশ জানা জাপানী সৈন্যকে জিজ্ঞেস

করলে—ওখানে কি হচ্ছে ? সৈন্যটি বল্লে—শোনো নি তুমি ? সাংহাই শহর এখন আমাদের হাতে। আজ সকালে আমাদের হাতে এসেছে।

—এত বড় সাংহাই শহর তোমাদের হাতে সবটা এসেছে ?

—সব। ওরা এইমাত্র ফিল্ড্ টেলিফোনে খবর পেয়েছে।

—যুদ্ধ হোল কখন ?

—কাল সারারাত প্রায় দুশো বম্বার প্লেন্ বোমা ফেলেছে—শুন্‌ছি বিস্তর লোক মরেছে সাংহাইতে—

—সকলেই সাধারণ নাগরিক বোধ হয় ?

—বেশীর ভাগ। হাজার দুই তো শুধু চা-পেইতেই মরেছে—আর শুন্‌ছি কন্‌শেসনে বোমা ফেলে ছ'শো পলাতক চীনাকে মারা হয়েছে। ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে—হবেই তো—আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। সাংহাই কি, সারা এশিয়া আমরা দখল করবো—তোমাদের ভারতবর্ষ তো বটেই। দেখে নিও তুমি—নাও, এগিয়ে চল।

বিমল ভাবছিল সুরেশ্বর কি বেঁচে আছে ! বোধ হয় নয়। চা-পেই পল্লীর অত্যন্ত কাছে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউতে চীনা রেড্‌ক্রস্ হাসপাতাল। জাপানী বম্বারগুলোর বিশেষ দৃষ্টি হাসপাতালের ওপর। কাল রাত্রেই সুরেশ্বরের ডিউটি থাকবার কথা। সম্ভবতঃ হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে—রোগী, ডাক্তার, নার্স সুদ্ধু। ভাগ্যে এ্যালিস্ আর মিনি ওখানে ছিল না !

কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনে বোমা ফেলে আশ্রয়হীন চীনা নরনারীদের মেরেছে, এ কথাটা বিমলের ভাল বিশ্বাস হলো না। আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনে বোমা ফেলতে সাহস করে কখনো ? ওটা নিতান্ত বাজে কথা বলছে।

ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনের সম্পর্কে বিমলের এ অলৌকিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব দূর হয়েছিল—সাংহাই অধিকার করার পূর্ব্বে ও পরে জাপানী বম্বার প্লেনগুলো সে কন্‌শেসনের পবিত্রতা মানে নি—এ সংবাদ বিমল আরও ভাল জায়গা থেকে এর পরে শুনেছিল।

পথের মধ্যে একটা চীনা গ্রাম। বড় বড় ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে। তখন সন্ধ্যা হবার বেশী দেরি নেই। পূর্ব্বোক্ত পাহাড় ও পাইনবন থেকে অন্ততঃ পাচ মাইল তখন আসা হয়েছে। জাপানী সৈন্যের একটা দল গ্রামটা দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলো—এবং সবাই তক্ষুনি হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে, চুপি চুপি অগ্রসর হোতে লাগলো গ্রামখানার দিকে। বিমল শুধু ভাবছিল,. ভগবান করেন—গ্রামটাতে লোক না থাকে—সব যেন পালিয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তা হোল না। এ গ্রামের লোক যুদ্ধের বিশেষ কোন খবর রাখতো না—সাংহাই থেকে অন্ততঃ পনেরো যোল মাইল দূরে এই গ্রামখানা। এরা বেশ নিশ্চিন্ত ছিল যে চীনা নাইন্‌থ্-রুট্ আর্মি তাদের রক্ষা করছে। হঠাৎ যে নাইন্‌থ্-রুট্ আর্মি ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছে—তা ওরা সম্ভবতঃ জানতো না।

জাপানী সৈন্যরা গ্রামখানাকে আগে চুপি চুপি গোল করে ঘিরে ফেল্লে। গ্রামে অনেকগুলো সাদা সাদা খোলার ঘর, খড়ের ঘর। শস্যের গোলা, দোকান-পত্রও আছে। বেশ করে ঘেরার পরে জাপানীরা হঠাৎ একযোগে ভীষণ পৈশাচিক চীৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত নরনারী ঘুম ভেঙে বাইরে এসে অনেকে দাঁড়ালো—অনেকে ব্যাপারটা কি না বুঝতে পেরে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে জানলা খুলে চেয়ে দেখতে লাগলো।

তারপর যে দৃশ্যের সূচনা হোল তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানুষিক। বিমলের চোখের সামনে বর্ব্বর জাপানী সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগলো, এবং বিনা দোষে বেওনেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত আট-জনকে একদম মেরে ফেললে। ছুতো এই যে, তারা নাকি বাধা দিয়েছিল। বাকীগুলোকে এক জায়গায় জড় করে দাঁড় করিয়ে রাখলে—চারিধারে বেওনেট্-চড়ানো রাইফেল হাতে জাপানী সৈন্যের দল।

দু-তিনখানা খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দুটো ছোট ছোট বাছুরকে ভয় দেখিয়ে মজা করতে লাগলো, একটা পিচ্ গাছের ডালগুলো অকারণে ভেঙে গাছটাকে ন্যাড়া করে দিলে। তবুও বিমল সবটা দেখতে পাচ্ছিল না—একে অন্ধকার, গ্রামটাও লম্বায় বড়, ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে জানে না—তার সামনে যেগুলো ঘটছে সেগুলো সে কেবল জানে। তবে নারী ও শিশুকণ্ঠের চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওদিকের জাপানী সৈন্যেরা ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবৃত্তি করছে না। মিনিট কুড়ি পচিশ এমনি চললো—বেশীক্ষণ ধরে নয়। তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে, কেবল জ্বলন্ত ঘরের চালের আলোয় সামনেটা আলোকিত।

হঠাৎ বিমলের যেন হুঁশ হোল—সে তার আশেপাশে চেয়ে দেখলে তার খুব কাছে কোনো জাপানী সৈন্য নেই—লুঠপাটের লোভে সবাই গ্রামের ঘর-দোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে জটলা করছে।

বিমল একবার পিছনের দিকে চাইলে—সেদিকে একখানা কামানের গাড়ী দাঁড়িয়ে। গাড়ীর কাছে সৈন্য নেই। গাড়ীখানা থেকে পঞ্চাশ গজ আন্দাজ দূরে একটা প্রাচীন সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভ। চীনদেশের অনেক পাড়াগাঁয়ে সহমৃতা বিধবার এমন পুরোনো আমলের স্মৃতিস্তম্ভ সে আরও দু-একটা দেখেছে। ততদূর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের আলোয়, কিন্তু তার ওপারে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না।

বিমল আস্তে আস্তে পিছনে হট্‌তে হট্‌তে দশ বারো পা গিয়ে হঠাৎ পেছনে ফিরে ছুট্ দিয়ে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার আড়ালে একটা অন্ধকার স্থানে এসে দাঁড়ালো।

ওর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। যদি জাপানীরা তাকে এখন ধরে, তবে এখুনি গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হয়ে এভাবে থাকার চেয়ে মৃত্যুপণ করেও মুক্তির চেষ্টা তাকে করতে হবে।

স্মৃতিস্তম্ভটার গায়ে একটা ডোবা। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হোল ডোবাটায় বেশ জল

আছে। বিমল তাড়াতাড়ি ডোবার জলে নামলো—তার কেমন মনে হলো জলে নেমে সে যদি গলা ডুবিয়ে থাকে, তবেই সব চেয়ে নিরাপদ—ডাঙ্গায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে বেশীদূর যেতে না যেতেই সে ধরা পড়বে।

এই ডোবায় নামবার জন্যেই যে এ যাত্রা বেঁচে গেল—সেটা সে খানিকটা পরেই বুঝতে পারলে।

অল্পক্ষণ—বোধ হয় দশ বারো মিনিটের পরেই ভীষণ চীৎকার ও বহু রাইফেলের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা গেল। খুব একটা হৈ চৈ দুপ্ দাপ্ পালানোর শব্দ, আবার চেঁচামেচি – একটা ঘোর বিশৃঙ্খলার ভাব!

বিমল তখন ডোবার জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। যদি ডাঙ্গায় থাকতো তবে অন্ধকারে ছুটন্ত রাইফেলের গুলিতে হয়তো তার প্রাণ যেতো।

ব্যাপারটা কি? বিমল দেখাল সেই জাপানী কামানের গাড়ীটা ঘিরে একটা খণ্ডযুদ্ধ ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার ওপারে। হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ ফাটাবার ভীষণ আওয়াজে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যেন কেঁপে উঠলো। একটা—দুটো—তিনটে। জাপানী কামানের গাড়ীর কাছ থেকে জাপানী সৈন্যেরা হটে যাচ্ছে একটা বাগানের দিকে।

বিমল এবার ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝলে। চীনা সৈন্যের একটা দল জাপানীদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। জাপানীরা ফিল্ড গানগুলো একেবারে ছুঁড়তে পারলে না—দুটোর একটাও না। চীনারা বুদ্ধি করে আগেই সে দুটো কামানই ঘেরাও করে দখল করলে। চীনা সৈন্যের এই দলটা হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ ছুঁড়ে জাপানীদের দলের জটলা ভেঙে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে রাইফেলের ও হ্যাণ্ড্গ্রিনেডের আওয়াজ থেমে গেল। জাপানীরা কামানের গাড়ী ও বন্দীদের ফেলে পালিয়েছে। বিমল বেশ দেখতে পেলে কাছাকাছি কোথাও জাপানী সৈন্য একটাও নেই। কাদামাখা পোশাকে সতর্কতার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে ডোবার জল থেকে উঠলো ডাঙায়।

একজন সৈনিকের চড়া আওয়াজ তার কানে গেল—কে ওখানে?

বিমল আশ্চর্য্য হোল এ পুরুষের গলা নয়—মেয়েমানুষের মত সরু গলা। বিমল কথার উত্তর দেবার আগে দুজন রাইফেলধারী চীনা সৈনিক ওর দিকে এগিয়ে এল ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চ হাতে। তারা ওকে দেখে যেমন অবাক হোল, বিমলও ওদের দেখে তেমনি অবাক হয়ে গেল।

এরা পুরুষ মানুষ নয়, দুজনেই মেয়ে; বয়েসও বেশী নয়। কুড়ি পঁচিশের মধ্যে। বেশ সুশ্রী দুজনেই—সৈন্যবিভাগের আঁট-সাঁট খাকী পোশাকে এদের দেহের লাবণ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি।

তারা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল গ্রামের সদর রাস্তার ওপরে।

অবাক কাণ্ড! সকলেই মেয়ে সৈনিক! এদের মধ্যে পুরুষ মানুষ নেই একজন। এই সুশ্রী তরুণীর দল এতক্ষণ হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ ছুঁড়ছিল এবং এরাই জাপানী ফিল্ড্ গান্ দুটো ঘেরাও করে দখল করেছে।

বিমলের মনে পড়লো চীনা নাইন্‌থ্‌-রুট্‌ আর্মির সঙ্গে একটি নারী বাহিনী আছে—সে সাংহাই চীনা রেড্‌ক্রস্‌ হাসপাতালে শুনেছিল বটে।

এরাই সেই চীনা মেয়ে-যোদ্ধার দল।

এদের কম্যাণ্ডাণ্ট্‌ কিন্তু মেয়ে নয়—পুরুষ। একটা পাইনকাঠের পুরোনো ভাঙ্গা টেবিলের সামনে সম্ভবতঃ একটা উপুড় করা কলসী বা ওই রকম কোন হাস্যকর জিনিস পেতে খুব লম্বা গোঁপ-ওয়ালা কম্যাণ্ডাণ্ট্‌ বসে ছিলেন। মেয়েরা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল সেখানে।

বিমলের মনে হোল সমগ্র নারী বাহিনীর মধ্যে এই লোকটি ইংরাজী জানে এবং বেশ ভাল আমেরিকান্‌ টানের ইংরাজী বলে।

বিমলের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে প্রশ্ন করলে—তুমি জাপানীদের লোক?

– না। আমি চীনা হাসপাতালের ডাক্তার।

—কোথাকার হাসপাতাল?

—সাংহাইয়ের রেড্‌ক্রস্‌ হাসপাতাল। আমাকে ওরা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল।

—তুমি কোন্‌ দেশের লোক?

—ভারতবর্ষের। চীনা মেডিকেল ইউনিটের আমি সভ্য।

কম্যাণ্ডাণ্ট্‌ বিস্ময়ের সুরে বল্লে—ও! তা ডোবার জলে কি করছিলে? বিমল লজ্জিত হোল। এতগুলি মেয়ের সামনে!

বল্লে—লুকিয়ে ছিলুম। ওদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওদের হাত থেকে পালিয়ে ডোবার জলে লুকিয়েছিলুম। তার পর হঠাৎ হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেডের আওয়াজ আর চীৎকার শুনলাম, তখনই ভাবলাম চীনা সৈন্য আক্রমণ করেছে ওদের।

কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময়ে গ্রামের পথে কি একটা গোলমাল উঠলো। কম্যাণ্ডাণ্ট্‌কে ঘিরে যারা ছিল, তারা চমকে উঠে সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার কি জাপানী সৈন্যের দল আক্রমণ করেছে?

বিমল চেয়ে দেখল জনকয়েক সৈন্য যেন কাউকে ধরে আনছে—তাদের পেছনে পেছনে অনেক সৈন্য মজা দেখতে আসছে।

ব্যাপার কি? হয়তো কোন জাপানী সৈন্য ওদের হাতে ধরা পড়েছে, তাকে সকলে মিলে ধরে আনছে—নিশ্চয়ই।

কিন্তু দলটি কম্যাণ্ডাণ্টের কাছে এসে পৌছে যখন ওদের প্রথামত সামরিক অভিবাদন করে দুজন বন্দীকে এগিয়ে নিয়ে দাঁড় করাল কম্যাণ্ডাণ্টের সামনে—বিমল চমকে উঠে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। কারণ কিছুক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুলো—এ্যালিস্‌! মিনি! সামনের শীর্ণকায়া মূর্ত্তি দুটি এ্যালিস্‌ ও মিনি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ওদের হাত পা বাঁধা—মুখে কাপড় দিয়ে বাঁধা। এমন শক্ত করে বাঁধা যে ওদের কথা বলবার উপায় নেই।

ভয়ানক রাগ হোল বিমলের এক মুহূর্ত্তে এই চীনা নারী-বাহিনীর ওপর। মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার! ওদের এমন করে বেঁধে আনার অর্থ কি? ওরা ছিলই বা কোথায়?

কমাণ্ডাণ্ট্ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। ইতিমধ্যে এ্যালিস্ ও মিনির হাত-পা মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হোল। ব্যাপারটা ক্রমশঃ যা জানা গেল তা হোল এই—

চীনা নারী সৈন্যেরা এদের গ্রামের একটা ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে এই অবস্থাতেই পায়। বাইরে থেকে ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল—কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজে সন্দেহ করে ওরা দরজা ভেঙে দেখতে পায় এদের। ওরা বুঝতে পেরেছে যে এরা ইউরোপীয় বা আমেরিকান্ মহিলা। কিন্তু চীনের এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে একটা অন্ধকার ঘরের কোণে এদের কে এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তা না বুঝতে পেরে সবাই মহা বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

হঠাৎ বিমল বলে উঠলো—এ্যালিস্! মিনি!

প্রথমে চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে এ্যালিস্। বিমলকে দেখে সে যেন প্রথমটা চিনতে পারলে না—তারপর প্রায় ছুটে ওর কাছে এসে বিস্মিত চকিত আনন্দভরা কণ্ঠে বল্লে—তুমি এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে মিনিও ছুটে এল। মিনির চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে নানা কষ্টে, উদ্বেগে, এবং খুব সম্ভবতঃ অনাহারেও বটে। সে বল্লে, তোমার বন্ধু কই?

ঘণ্টা কয়েক পরে।

একটা রিচ গাছের তলায় বসে মিনি, এ্যালিস্ ও বিমল কথা বলছিল। এখনও রাত আছে, তবে পূর্ব্ব আকাশে শুকতারা উঠেছে—ভোর হওয়ার বেশী দেরি নেই।

মিনি ও এ্যালিস্ তাদের গল্প বলে যাচ্ছিল। ওদের ভাল করে খেতে দেওয়া হয়েছে, কারণ ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেট ভরে খাওয়া ওদের অদৃষ্টে অনেকদিন ধরে জোটেনি।

বিমল বল্লে—এখানে তোমরা কি করে এলে?

এ্যালিস্ বল্লে—এখনও ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু বড্ড খুশী হয়েছি তোমায় দেখে, বিমল। আমরা তো আশঙ্কা করছিলাম জাপানীরা আক্রমণ করেছে—এইবার ঘর জ্বালিয়ে আমাদের বন্দী অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে—কে আর উদ্ধার করবে আমাদের? আর আমাদের অস্তিত্ব জানেই বা কে?

—কবে তোমরা এ গ্রামে এসেছ?

—আজ তিন দিন হোল খুব সম্ভব—কারণ দিনরাত্রির জ্ঞান আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—কে তোমাদের আনে?

—কয়েকজন চীনা দস্যু।

—সাংহাইয়ের চণ্ডুর আড্ডায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল ধরে?

এ্যালিস্ বিস্ময়ের সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি কি করে জানলে?

বিমল হেসে বল্লে—আমি আর সুরেশ্বর সেই চণ্ডুর আড্ডাতে যাই তোমাদের খুঁজতে।

কিন্তু বড় বিভ্রাট বেধে গেল সে রাত্রে। জাপানী বম্বারগুলো সেই রাত্রে ভীষণ বোমা বর্ষণ শুরু কল্লে। মিনি বল্ল, আমরা খুব জানি। আমরা তখন হাতমুখ বাঁধা অবস্থায় একটা গরুর গাড়ীর মধ্যে শুয়ে। একটা বোমা তো আমাদের গাড়ির পাশেই পড়লো।

এ্যালিস্ বল্লে—তারপর ওরা আমাদের নানা জায়গায় ঘোরালে। দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ না দিলে আমাদের ছাড়বে না। দেশের বাপমায়ের কাছে চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়েছিল—আমরা দিইনি। আজ ওরা আমাদের শাসিয়েছিল জাপানী সৈন্যেরা গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে—ঠিকানা যদি না দিই তবে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে পালাবে—আমরা নিঃশব্দে পুড়ে মরবো। করেছিলও তাই। চীনা মেয়ে-সৈন্যেরা না এলে জাপানীরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। আমরাও পুড়ে মরতাম।

বিমল বল্লে—কি সর্ব্বনাশ!

এ্যালিস্ বল্লে—সর্ব্বনাশ আর কি, পুড়ে মরতাম এর আর সর্ব্বনাশ কি? কতই তো মরছে! কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে, বিমল?

—আমাকে হাসপাতাল থেকে জাপানীরা বন্দী করে এনেছিল। আমি নাকি স্পাই। এতদিন গুলি করেই মারতো যদি একথা ওদের না বলতুম যে ব্রিটিশ কনস্যুলেট আপিসে আমার নাম রেজেষ্ট্রি করা আছে।

মিনি বল্লে—সুরেশ্বর কোথায় গেল একটা খোঁজ করতে হয়। আর আমেরিকান কনস্যুলেটে আমাদের বিষয়ে একটা খবর দিতে হয়—চলো কমাণ্ডাণ্ট্‌কে বলি।

জনকয়েক তরুণী চীনা মেয়ে-সৈন্য ওদের হাসিমুখে ঘিরে দাঁড়ালো। এদের হাস্যদীপ্ত সুন্দর চেহারা বিমলের বড় ভাল লাগলো, এমন একটা জিনিস নতুন দেখছে সে—বহুশতাব্দীর জড়তা দূর করে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী—রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার মধ্যে। দেশের দুর্দ্দিনে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে তারা আজ মস্ত বড় হোতা—মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করে ফেলেছে টেনে।

একটি মেয়ে ইংরেজিতে বল্লে—তোমরা হ্যাংচাউতে রাজকুমারী তাংএর দেউল দেখেছ?

এ্যালিস্ বল্লে—না, সে কি?

—পাঁচশো বছর আগে মিং রাজবংশের একজন রাজকুমারী ছিলেন তাং। তাঁর পুণ্যচরিত্র এখনও আমাদের দেশের লোকের মুখে মুখে আছে। এখান থেকে বেশী দূর নয়—দেখে যেও।

বিমল বল্লে—তুমি বেশ ইংরেজি বলতে পারো তো?

মেয়েটি এমন হাসলে যে তার তেরচা চোখ দুটো বুজে গিয়ে দুটো কালো রেখার মত দেখাতে লাগলো।

—ভাল ইংরিজি বলছি? তবুও এ ইয়াংকি ইংরিজি। মিশনারী স্কুলে পাঁচ বছর পড়েছিলুম একসময়ে। ইংরিজি গান পর্য্যন্ত গাইতে পারি—শুনবে?

হঠাৎ বিউগল বেজে উঠলো। সবাই ব্যস্ত হয়ে কম্যাণ্ডাণ্টের তাঁবুর দিকে চললো। এখনি

মার্চ শুরু করতে হবে। খবর পাওয়া গিয়েছে জাপানীদের বড় একটা দল এখানে আসছে।

বিমল বাঁ দিকে চেয়ে দেখলে।

একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মত লম্বা ঢিবির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে যেন সাদা ধোঁয়া বার হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌ফট্‌ শব্দ হচ্ছে। শব্দটা অনেকটা যেন বিমলদের দেশের লিচু-বাগানে পাখী তাড়াবার জন্যে চেরা বাঁশের ফটাফট্‌ আওয়াজের মত।

রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলে শব্দ হয় খুব কম—বিমল জানতো।

সবাই বল্লে—মাথা নীচু করো—মাথা নীচু করো—

জাপানী সৈন্যরা আক্রমণ করে ওই ঢিবিটাতে আড়াল নিয়েছে—কিন্তু হয়তো এখুনি বেওনেট্‌ চার্জ করবে কিংবা হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্‌ নিয়ে ছুটে আসবে।

চক্ষের নিমেষে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেলের মুখ ঢিবিটার দিকে ফেরালে। একটি মেয়ে হঠাৎ অস্পষ্ট চীৎকার করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে গেল—তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে পড়লো। আর একটি মেয়ের পিঠের ওপরে—সে কিছু দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বন্দুক বাগিয়ে। এ্যালিস্‌ ছুটে উঠে গিয়ে মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে নিলে—আশ-পাশের মেয়েরা বল্লে—মাথা নীচু—মাথা নীচু—শুয়ে পড়ো—

বিমল শঙ্কিত চোখে অল্পক্ষণের জন্যে এ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলে—তারপর সেও উঠে গিয়ে এ্যালিসের পাশে বসলো। আহত মেয়ে-সৈনিকের হাতের নাড়ী দেখে বল্লে—এ শেষ হয়ে গিয়েছে। এঃ, এই হ্যাখো গলায় লেগেছে গুলি—তোমার কাপড় যে রক্তে ভেসে গেল।

এ্যালিস্‌কে এক রকম জোর করে টেনে বিমল তাকে আবার উপুড় করে শোয়ালে। বিমল ভাবছিল, এখুনি যদি দুর্দ্দান্ত জাপানী গ্রিনেডিয়ারেরা হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্‌ নিয়ে ছুটে আসে ঢিবিটা ডিঙিয়ে, তবে এই শায়িতা নারী-সৈনিকের দল একটাও টিকৃবে না। জাপানী হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেডের বিস্ফোরণের ফল অতি সাংঘাতিক, এদের কমাণ্ডাণ্ট্‌ কি ভরসায় এদের এখনো শুইয়ে রেখেছে? মরবে তো সবগুলোই মরবে। যা করে করুক, ওদের সৈন্য ওরা বাঁচাতে হয় বাঁচাক, নয় তো যা হয় করুক। কিন্তু মিনি ও এ্যালিসের জীবন আবার বিপন্ন হোল।

ফটাফট্‌—ফটাফট্‌—

আবার একটা অস্ফুট শব্দ! তারপর বিমল চেয়ে দেখলে চীৎকার না করেও সারির মাঝামাঝি দুটি মেয়ে উপুড় অবস্থাতেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। হাতের শিথিল মুঠিতে তখনও রাইফেল ধরাই রয়েছে। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ থেকে রক্ত বার হয়ে সামনের মাটি রাঙা হয়ে গিয়েছে। আর একটি মেয়েও দেখতে দেখতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। আঃ—কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড! পুরুষদের এরকম অবস্থায় দেখলে সহ্য করা হয় তো যায়—কিন্তু এই ধরণের নারী-বলির দৃশ্যটা বিমলের কাছে অতি করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠলো!

বিমল বল্লে—এ্যালিস্! কমাণ্ডাণ্ট্‌টি কেমন লোক? এদের দাঁড়িয়ে খুন করাচ্ছে কেন? হঠে যাবার অর্ডার না দেওয়ার মানে কি? জাপানীরা বেওনেট্‌ কি হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্‌ চার্জ করলে একজনও বাঁচবে?

এ্যালিস্ বিমলের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে—তার ওদিকে মিনি।

মিনি বল্লে—কমাণ্ডাণ্টের এ-রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোন মানে আছে।

মানে কি আছে তা জানবার আগেই আরও দুটি মেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল—এদের এই নিঃশব্দ মৃত্যু বিমলের কাছে বড় মর্ম্মস্পর্শী বলে মনে হোলো। হঠাৎ একটা লম্বা কাশীর পেয়ারার আকারে বস্তু শায়িতা মেয়েদের সারির অদূরে এসে পড়লো—বিমল ও এ্যালিস্ দুজনেই বলে উঠলো—গ্রিনেড্‌!

কিন্তু হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্‌টা ফাট্‌লো না। বোধ হয় এবার জাপানীরা চার্জ করবে। এ্যালিস্ ও মিনির জন্যে বিমল শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময় কমাণ্ডাণ্ট্‌ ওদের হঠবার অর্ডার দিলে।

পেছনের সারি শুয়ে-শুয়ে পিছুদিকে হঠতে লাগলো। সামনের সারিগুলো ততক্ষণ রাইফেল বাগিয়ে তাদের রক্ষা করছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনের সারিও হঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা চার্জ করলে। দলে দলে ওরা ঢিবিটা পেরিয়ে 'বানজাই' বলে ভীষণ বাজখাঁই চীৎকার করতে করতে ছুটে এল—এদিকে নারী-বাহিনীর সব বন্দুকগুলো একসঙ্গে গর্জ্জন করে উঠলো। এখানে ওখানে জাপানী সৈন্য ধুপ-ধাপ করে মুখ থুব্‌ড়ে পড়তে লাগলো। তবুও ওদের দল এগিয়ে আসছে।

সব পেছনের সারি উঠে দাঁড়িয়ে একযোগে সাত আটটা হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্‌ ছুঁড়লো, চার পাঁচটা ফাটলো। আরও কতকগুলো জাপানী সৈন্য মাটিতে পড়ে গেল। তিন জন মাত্র জাপানী এদের দলের মধ্যে এসে পৌছেছিল। তাদের মধ্যে দুজন বেওনেটের ঘায়ে সাংঘাতিক আহত হোল—বাকী একজনের মাথায় গুলি লেগে সাবাড় হোল।

ততক্ষণ নারী-বাহিনী প্রায় একশো দেড়শো গজ দূরে চলে গিয়েছে। এতদূর থেকে হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্‌ কোন কাজে আসবে না—কেবল কার্য্যকরী হতে পারে মিল্‌স্-বম্ব্‌ জাতীয় বোমা। সে কোন দলের কাছেই নেই, বেশ বোঝা গেল।

কমাণ্ডাণ্ট্‌ বিমলকে ডেকে বল্লেন—এরকম কেন করেছি, আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছেন। আর কিছু দূরে মিং-চাউএর রেল স্টেশন। দুটো সৈন্যবাহী ট্রেন পর পর চলে যাবার কথা। জাপানীরা রেল স্টেশন আক্রমণ করতো। আমি ওদের বাধা দিয়ে এখানে আটকে রাখলাম। টাইম অনুসারে ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। এখন আর আমাদের সৈন্যদের মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনাবশ্যক। জাপানীরাও তা বুঝেছে, ওরাও আর আসবে না। ওদের লক্ষ্যস্থল আমরা নই—সেই ট্রেন দুখানা।

—কিন্তু এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে?

—আমার ঘাঁটি পার করে দিলাম নিরাপদে—তারপর অন্য এলাকার লোক গিয়ে

বুঝুক সে কথা।

মিং-চাউয়ের রেল স্টেশনে পৌছে সবাই খাওয়া-দাওয়া করবার হুকুম পেলে। বিমল ব্যস্ত হয়ে পড়লো মিনি ও এ্যালিস্‌কে কিছু খাওয়াতে। খাবার কিছুই নেই। অন্ততঃ সভ্য খাদ্য কিছু নেই। কমাণ্ডাণ্ট্‌কে বলে কিছু চাল যোগাড় করে একটা গাছতলায় এ্যালিস্ একটা পুরানো সস্‌-প্যানে ভাত চাপিয়ে দিলে তিন জনের মত।

বেলা প্রায় বারোটা! রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু গরম নেই, বেশ শীত।

ভাত প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দলে দলে ছোট্ট শীর্ণকায় ছেলেমেয়ে গাছতলায় নীরবে এসে দাঁড়ালো। তারা ক্ষুধার্তের ব্যগ্র দৃষ্টিতে সস্‌-প্যানের দিকে চেয়ে রইল। জনৈক মেয়ে সৈনিক বল্লে—এরা আশপাশের গ্রামের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ছেলেমেয়ে; আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে। ওরা খাবার লোভে এসেছে।

এ্যালিস্ বল্লে—পুওর লিট্‌ল ডিয়ারস্!···ওদের কি খেতে দিই, বিমল?

বিমল মুশকিলে পড়ে গেল। নিজের খাওয়ার জন্যে নয়—মিনি ও এ্যালিস্ কত দিন পেট ভরে খায়নি বলেই ও ওদের খাওয়াতে ব্যগ্র ছিল। নিজে না হয় না খাবে, কিন্তু এ্যালিস্ যেমন মেয়ে নিজের মুখের ভাত সব এক্ষুনি তুলে দেবে এখন এদের।

সুখের বিষয় একটা সমাধান হোল। ওরা চীনা ছেলে-মেয়ে, চীনা খাবার খেতে আপত্তি নেই। অন্য অন্য মেয়ে-সৈনিকরা ওদের দেশীয় খাদ্য কিছু কিছু দিলে। তারা চলে গেল তাই খেয়ে। এ্যালিসের ইচ্ছে ওদের মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে নিয়ে যায়। বল্লে—বিমল, বলো না ওদের মধ্যে কাউকে আমার সঙ্গে যাবে। আমি খুব যত্ন করবো। বিমল হাসলে, তা কি কখনো হয়?

একটু পরে একখানা ট্রেন এল। তাতে সব খোলা ট্রাক্‌, কয়লার গাড়ীর মত। কমাণ্ডাণ্টের আদেশে সবাই তাতে উঠে পড়লো। ট্রেনের গার্ডের মুখে শোনা গেল জাপানীরা এখান থেকে বাইশ মাইল ডাউন লাইনে একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

ট্রেন ছাড়লো। গার্ড বল্লে—ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা। ওরা প্রত্যেক সৈন্যবাহী ট্রেনের ওপর কড়া লক্ষ্য রেখেছে। পৌছে দিতে পারবো কিনা নিরাপদে তার ঠিক নেই।

মাইল ত্রিশেক দুধারে ফাঁকা মাঠ, ধানের ক্ষেত, গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, রোদ নেই। মাঠে ঘন ছায়া পড়ে এসেছে। এমন সময় একটা পরিচিত আওয়াজ শুনে বিমলের বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠলো। মুখ উঁচু করে দেখতে গিয়ে দেখলে ট্রেনের সবাই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। অনেকগুলি এরোপ্লেনের সম্মিলিত ঘর্‌-ঘর আওয়াজ। ট্রেন যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে জোরে চলতে লাগলো।

মিনি বল্লে—ওই দেখো বিমল এরোপ্লেনের সারি! বম্বার!—

চক্ষের নিমেষে এরোপ্লেন সারি নিকটবর্ত্তী হোল—কিন্তু ট্রেনখানাকে গ্রাহ্য না করেই যেন এরোপ্লেনগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ একখানা বম্বার দল ছেড়ে বেশ নীচু

হয়ে এলো। ট্রেনের সকলের মুখ শুকিয়েছিল আগেই—এখন যেন বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমে গেল। এই ফাঁকা মাঠে বোমা ফেললে ট্রেনের চিহ্ন খুঁজে মিলবে না। তার ওপরে ছাদ-খোলা ট্রাক্ গাড়ী বোঝাই সৈন্য, কারও মৃত-দেহ এর পর সনাক্ত পর্য্যন্ত করা যাবে না। এ্যালিস্ ও মিনিকে বাঁচানো গেল না শেষ পর্য্যন্ত।

এরোপ্লেনখানা নীচে নেমে ছোঁ-মারা চিলের মত একটা বোমা ফেলেই তখনি ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ! সমস্ত ট্রেনখানা কেঁপে নড়ে উঠলো যেন, কিন্তু ট্রেনের বেগ কমলো না। বিমল চেয়ে দেখলে রেললাইন থেকে দশ গজ দূরে একটা জায়গায় বিশাল গর্ত্তের স্থষ্টি করে মাটি, ধুলো, ঘাস, বালি, অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ হাত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে কালো ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে বোমাটা সমাধি লাভ করেছে। বোমারু তাগ্ ঠিক করতে পারে নি।

আর মাইল পাঁচ ছয় পরে একটা রেলস্টেশন। গাড়ীখানা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই দেখা গেল স্টেশন থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে—লোকজন ছোটাছুটি করছে—একটা হট্টগোল, কলরব, ব্যস্ততার ভাব। ট্রেনখানা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতেই বোঝা গেল জাপানী বিমান থেকে বোমা ফেলে স্টেশনটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিনের ছাদ দুম্‌ড়ে বেঁকে ছিট্‌কে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে, একপাশে আগুন লেগে গিয়েছে—গোটা প্ল্যাটফর্মে মানুষের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ, কারো হাত, কারো পা, কারো মুণ্ড।

নিকটে একখানা গ্রাম। গ্রামের চিহ্ন রাখেনি বোমারুর দল। ইন্‌সেনডিয়ারি বোমা ফেলে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ট্রেন থেকে সবাই নেমে সাহায্য করতে ছুটলো। গ্রামের লোক বেশী মরে নি—তবুও বিমল দেখলে গ্রামের পথে চার-পাঁচটা বীভৎস মৃতদেহ পড়ে আছে। এরোপ্লেনগুলোর চিহ্ন নেই আকাশে, তাদের কাজ শেষ করে তারা চলে গিয়েছে। গ্রামের নরনারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে পালিয়েছিল, যদিও বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, একটি মেয়ে একটা ভাঙা ঘরের সামনে ভাঙাচোরা হাঁড়িকুড়ি বেতের পেটরা কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে আর কাঁদছে। একজন মেয়ে-সৈন্য তার কাছে গিয়ে চীনা ভাষায় কি জিজ্ঞেস্ করলে। বিমলের দল গ্রামের অন্য অন্য লোকজনের সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

একটু পরেই সেখানে ভারী একটি অদ্ভুত দৃশ্য সবারই চোখে পড়লো।

গ্রামের পাশে একটা ছোট্ট মাঠ—তারই এক গাছতলায় জনৈক বৃদ্ধ গ্রামের লোকজনকে চারিপাশে নিয়ে কি বলছেন বক্তৃতার ধরণে। বিমল চিনলে—প্রোফেসর লি!

এ্যালিস্ সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—ড্যাডি! চিনতে পারো?

সৌম্য মূর্ত্তি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে ওর দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন—তোমরা কোথা থেকে?

এ্যালিস্ হেসে বল্লে—এই ট্রেনে নামলাম। আর একটু হোলে আমাদের কাউকে দেখতে

পেতে না—আমাদের ট্রেনেও বোমা পড়েছিল।

বিমল বল্লে—গুড্ মর্নিং, প্রোফেসর লি। আপনার দলবল কোথায়? আপনি কি করছেন এখানে?

বৃদ্ধ বল্লেন—দলবল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর একখানা বোমায় বিধ্বস্ত গ্রামে সাহায্য করছে। আমি এদের উপদেশ দিচ্ছি এরোপ্লেন বোমা ফেলতে এলে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা কিছুই জানে না—দাঁড়িয়ে মরছে, নইলে দেখ গ্রামের অধিকাংশ লোক ফাঁকা মাঠে ছুটে পালায়?

—আপনাকে তো সর্ব্বত্রই দেখি, প্রোফেসর লি। পরের সাহায্য করতে এমন আর ক'জন লোক চীনদেশে আছেন জানি না। আপনাকে দেখে আপনার দেশের ওপর ভক্তি আমার অনেক বেড়ে গেল।

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—আমার দেশ অতি হতভাগ্য, আমরা অতি প্রাচীন সভ্য জাতি কিন্তু জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি। ভগবান নদীর এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়েন। জাপান আজ উঠছে—আবার আমাদের দিন আসবে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, যে ক'দিন বাঁচি, মূঢ়তা ও বর্ব্বরতার দ্বারা অত্যাচারিত দেশের সেবা করে দিন কাটিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমার দ্বারা আর কতটুকু উপকারই বা হবে?

বিমল বল্লে—বড় ইচ্ছে হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথা অনুসারে আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আপনি কি অনুমতি করবেন? বৃদ্ধ মহাচীন যেন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন আপনার মূর্ত্তিতে।

বিমলের দেখাদেখি মিনি, এ্যালিস্ এবং আরও কয়েকটি মেয়ে-সৈনিক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে হাসিমুখে।

ট্রেন হুইস্‌ল্ দিলে। কমাণ্ডাণ্টের হুকুম শোনা গেল—ট্রেনে গিয়ে উঠে পড়।

এ্যালিস্ বল্লে—ড্যাডি, তোমার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে? আমরা দুটি মেয়ে এবং আমার এই ভারতবর্ষীয় বন্ধুটি তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই—অনুমতি দেবে ড্যাডি?

বৃদ্ধ বল্লেন—এখন তোমরা যাও খুকীরা—শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে দেখা হবে। এ কাজ তোমাদের নয়।

ট্রেন আবার চললো।

দুধারে শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ধোঁয়ায় কালো অগ্নিদগ্ধ গ্রাম। জাপানী বোমারু বিমানের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।

এ্যালিস্ বল্লে—বিমল, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? প্রোফেসর লি-কে আবার আমাদের মধ্যে পেতে। এত ভাল লেগেছে ওঁকে! আমার নিজের বাবা নেই, ওঁকে দেখে সেই বাবার কথা মনে আসে।

বিমল দেখলে এ্যালিসের বড় বড় চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

মিনি বল্লে—আমারও বড় ভক্তি হয় সত্যি! ভারি চমৎকার লোক।

বিমল বল্লে—অথচ কি ভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ তা জানো? আমি যখন প্রথম চীনদেশে আসি—আজ প্রায় একবছর আগের কথা—তখন হ্যাং-চাউ রেলস্টেশনে উনি ওঁর ছাত্রদল নিয়ে উঠলেন—বল্লেন, যুদ্ধের সময় ওখানকার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন। শুনে আমারও হাসি পেয়েছিল।

এ্যালিস্ বল্লে—তখন কি জানতে উনি একজন মহাপুরুষ লোক! উনি যুদ্ধ-উপদ্রুত অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন এটা ঠিকই—কিন্তু পরের দুঃখ দেখে সে সব ওঁর ভেসে গেল। People such as these are the salts of the Earth—নয় কি?

বিমল মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

একটি নদীর পুল বোমায় ভেঙে দিয়েছে! আর ট্রেন যাবার উপায় নেই। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্ম্মচারীরা দিনরাত খাটছে যদি পুলটা কোন রকমে মেরামত করে কাজ চালানো যায়।

কাছেই একটা তাঁবু। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। এটা ফীল্ড হাসপাতাল।

ট্রেন থেকে মেয়ে-সৈন্যদের পথেই নামিয়ে দেওয়া হোল। ট্রেনখানা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবে বলে পিছু হটে চলে গেল। কোনো বড় স্টেশনে গিয়ে এঞ্জিনখানা সোজা করে জুড়ে নেবে। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। যেন অনেকটা পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় জলা-অঞ্চলের মত। ফসলের ক্ষেত নেই—সামনে একটা বিল কিংবা ঐ ধরণের জলাশয়—দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাসের বন জলের ধারে। দূরে দূরে মেঘের মত নীল পাহাড়। জায়গাটার নাম সিং-চাং। বিমল নেমে চারিদিক দেখে অবাক হয়ে গেল।

ট্রেনে করে এতদূরে এসে এখানে আবার যুদ্ধক্ষেত্র কি করে এল।

বিমলের ধারণা ছিল জাপানীদের আসল ঘাঁটি কোন্‌কালে পার হয়ে আসা গিয়েছে।

কিন্তু কমাণ্ডাণ্ট্ তাকে বুঝিয়ে বল্লেন এখান থেকে আরও প্রায় পঁচিশ মাইল দূর হ্যাং কাউ শহর পর্য্যন্ত ওদের সৈন্য-রেখা বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূল ভাগে অনেক দূর অবধি ওরা নিজেদের লাইন ছড়িয়ে রেখেছে। মাটিতে একটা নক্সা এঁকে বুঝিয়েও দিলেন।

বিমল একটা অনুচ্চ টিবির ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

কিছুদূরে একটা গ্রাম—পাশে কাদের অনেকগুলো ছোট বড় তাঁবু—সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধ হয় রান্নাবান্না চলছে। পশ্চিম দিকে একটা বড় শস্যক্ষেত্র, তার ধারে লম্বা লম্বা কি গাছের সারি। মোটের ওপর সবটা নিয়ে বেশ শান্তিপূর্ণ পল্লীদৃশ্য।

এ কি ধরণের যুদ্ধক্ষেত্র?

কিন্তু বিমলদের সেখানে উপস্থিত হবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ছ'জন আহত সৈন্যকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতাল তাঁবুতে আনা হোল। সকলেই রাইফেলের গুলিতে আহত।

বিমল জিজ্ঞেস করে জানল যুদ্ধক্ষেত্র যে বেশীদূর তাও নয়—ওই গাছের সারির পাশেই,

এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে। একটা ক্ষুদ্র গ্রাম জাপানীরা দখল করে সেখানে ঘাঁটি করেছে—চীন সৈন্য ওদের সেখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।

কমাণ্ডাণ্টের আদেশে মেয়ে-সৈনিকরা রান্নাবান্না করে খাবার আয়োজন করতে লাগলো—কারণ অনেকক্ষণ তারা বিশেষ কিছু খায়নি। বিমল বল্লে—খাইয়ে নিয়ে এদের কি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে? কমাণ্ডাণ্ট্ বল্লে—না, এরা পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ হয় না—ওদের অন্ততঃ দশঘণ্টা বিশ্রাম করতে দেবো।

—তারপর?

—তারপর যুদ্ধে পাঠাতে পারি—রিজার্ভ রাখতে পারি। এখান থেকে সাত মাইল দূরে হ্যান্‌কাউ-ক্যাণ্টন রেলের ধারে একটা গ্রামে নাইন্‌থ্-রুট্ আর্মির এক ঘাঁটি। সেখানে জেনারেল মাও-সি-তুং আছেন—তাঁর হুকুম মত কাজ হবে।

—হুকুম আসবে কি করে?

—ঘোড়ার পিঠে যায় আসে ডেস্‌প্যাচ্ দল। আমাদের ফিল্ড্ টেলিফোন নেই।

কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বিমল হাসপাতাল তাঁবুতে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার কাজে মন দিল। তিনটি হতভাগ্য সৈনিক কোনোপ্রকার সাহায্য পাবার পূর্ব্বেই মারা গেল। বাকী কয়েকজনের করুণ আর্ত্তনাদে হাসপাতাল মুখরিত হয়ে উঠলো। কি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যাপার এই যুদ্ধ! একথা বিমলের মনে না এসে পারলো না।

এ্যালিস্ এসে বল্লে—এদের জন্যে বৃথা চেষ্টা। এদের একজনও বাঁচবে না।

বিমল বল্লে—তাই মনে হয়। না আছে ওষুধ, না আছে যন্ত্রপাতি, কি দিয়ে চিকিৎসা করবো?

—বিমল, এদের জন্যে আমেরিকান রেড্‌ক্রসে লিখে কিছু জিনিস আনার চেষ্টা করবো?

—লেখো না। নইলে সত্যি বলছি আমাদের খাটুনি বৃথা হবে।

—ঠিকই তো? এটা কি একটা হাসপাতাল? কি ছাই আছে এখানে?

—মিনি কোথায় গেল?

—সে রাঁধছে। খেতে হবে তো? রাঁধবারও কোন বন্দোবস্ত নেই। দুটি চাল ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

—টিনবন্দী খাবার কিছু সাংহাই থেকে আনিয়ে নিই। ও খেয়ে তোমরা বাঁচবে না।

—একটা কথা শোনো। তুমি একবার সাংহাই যাও—মিনি সুরেশ্বর সম্বন্ধে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে আমায় বলছিল। ও আমায় কাল থেকে বলচে তোমায় বলতে।

—আমিও যে তা না ভেবেছি এমন নয়। কিন্তু সাংহাই পর্য্যন্ত কোনো ট্রেন এখান থেকে যাচ্চে না তো? আচ্ছা, কাল কমাণ্ডাণ্ট্‌কে বলে দেখি।

আবার চারজন আহত সৈনিককে ষ্ট্রেচারে করে আনা হোল। একজনের মাথার খুলি অর্দ্ধেকটা উড়ে গিয়েছে বল্লেই হয়। বিমল বল্লে—এ তো গেল! একে এখানে কেন এনেছে?

কিন্তু অদ্ভুত জীবনীশক্তি চীনা সৈনিকটির। মাথার ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দুবার ব্যাণ্ডেজ বদলাতে হোল, তবুও সৈনিকটি মারা গেল না—বিমল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে।

একজন সৈনিক ডেস্‌প্যাচ রাইডার হাসপাতালে ঢুকে বল্লে—আমাদের তাঁবু ওঠাতে হবে এখান থেকে—শত্রু খুব নিকটে এসে পড়েছে। রেললাইনের ওপর ওদের লক্ষ্য কিনা! রেললাইনটি দখল করবে। আমাদের সৈন্য প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে কিন্তু আজ সারাদিনে জাপানীরা প্রায় এক মাইল এগিয়েছে। দেখবে এসো।

তারপরে সৈনিকটি একটা ফীল্ড্‌গ্লাস বা'র করে বিমলের হাতে দিয়ে বল্লে—পূর্ব্বদিকে ওই যে গাঁ-খানা দেখা যাচ্ছে ওদিকে চেয়ে দেখ—বিমল একখানা গ্রাম বেশ স্পষ্ট দেখছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু না। সৈনিকটি বল্লে—ওই গ্রামখানির পেছনেই শত্রুর লাইন। গ্রামখানা দখল করতে ওরা আজ ক'দিন চেষ্টা করছে—ওখানেই আমরা বাধা দিচ্ছিলাম। আজ গ্রামের অর্দ্ধেকটা দখল করেছে। স্নুতরাং বোধ হয় কাল কি পরশু রেললাইনে এসে পৌছবে।

—গ্রামে লোকজন আছে?

—পাগল! কবে পালিয়েছে। পশ্চিমদিকে একটা নদী আছে—তার ওপারে পলাতক গৃহহারাদের একটা বস্তি বসে গেছে। আট দশখানা গ্রামের লোক জড় হয়েছে ওখানে।

—খাবার দিচ্ছে কে?

—কে দেবে? অনাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুর্দ্দশা দেখলে বুঝবে বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ কি নিষ্ঠুর ব্যাপার।

বিমল কথায় কথায় জানতে পারলে, ডেস্‌প্যাচ-রাইডার সৈনিকটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান—পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—পূর্ব্বে স্কুল মাস্টারি করতো, যুদ্ধ বাধবার পর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

বিমল বল্লে—তুমি আমাকে ওই গ্রামে নিয়ে চলো না?

—এমনিই তো যেতে হবে। বোধহয় ওখানেই হাসপাতাল উঠে যাবে—কারণ শত্রুর লাইন থেকে, জায়গাটা দূরে।

—এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে বারণ করেছে কে?

—কেউ না। সে তো সর্ব্বত্রই ফেলছে। তবে একটা পাইনবনের তলায় এ বস্তি—জাপানী প্লেন্ হঠাৎ সন্ধান পাবে না। ভয়ে ওরা রান্না করে না—পাছে ধেঁায়া দেখে বোমারু প্লেন্ সন্ধান পায়।

সৈনিকটি চলে গেলে বিমল এ্যালিস্‌কে ডেকে কথাটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্রেনের শব্দ শোনা গেল দূরে।

এ্যালিস্ তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে এসে বল্লে—ট্রেন আসছে, না এরোপ্লেন? বিমল বল্লে—ট্রেনই। বোধহয় আরও সৈন্য আসছে। চল দেখি গিয়ে। অনেকে রেললাইনের ধারে জড় হোল। এখানে স্টেশন নেই। একজন লোক নিশান হাতে অপেক্ষা করছিল—নিশান দেখিয়ে ট্রেন দাঁড় করাবে। ট্রেন এসে পড়লো। সারি সারি খোলা মাল-গাড়ীতে

সৈন্য বোঝাই—অন্য সাধারণ যাত্রীও আছে। কতকগুলো ছাদ-আঁটা মাল-গাড়ী পেছনের দিকে—তাতে সৈন্যদের রসদ বোঝাই।

গাড়ী থেকে দলে দলে সৈন্য নামতে লাগলো। জাপানী সৈন্যদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এরা আসছে ক্যাণ্টন থেকে। রসদ বোঝাই মাল-গাড়ীগুলো থেকে রসদ নামানোর ব্যবস্থা করা হতে লাগলো—কারণ বেশীক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে এখুনি কোনদিক থেকে জাপানী বিমান আকাশ পথে দেখা দেবে হয়তো। হঠাৎ এ্যালিস্ উত্তেজিত স্বরে বল্লে—বিমল, বিমল—ও কে? প্রোফেসর লি না?

তারপরই সে হাসিমুখে সামনের দিকে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল—ড্যাডি—ড্যাডি—

সত্যিই তো—হাস্যমুখ বৃদ্ধ একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ভিড় ঠেলে বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন।

বিমল এগিয়ে গিয়ে বল্লে—নমস্কার প্রোফেসর লি—ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আপনি কোথা থেকে?

এ্যালিস্ ততক্ষণ গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ তার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বিমলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—তোমরা এখানে আছ? বেশ বেশ। আমি এসেছি পলাতক গ্রামবাসীদের যে বস্তি আছে নদীর ওপারে—সেখানে কয়েক পিপে আপেল বিলি করতে। আমেরিকান জুনিয়র রেড্ক্রস্ দুশো পিপে ভাল কালিফোর্নিয়ার আপেল পাঠিয়েছে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের খাওয়াবার জন্যে। আমার ঠিকানাতেই পাঠিয়েছিল। আর সব বিলি করে দিয়েছি অন্য অন্য স্থানে—দশ পিপে মজুত আছে এখনও। তা তোমরা আছ ভালই হয়েছে—তোমরা সাহায্য করো এখন।

এ্যালিস্ তো বেজায় খুশী। বল্লে—ড্যাডি, খুব ভাল কথা। তা বাদে আরও অনেক কাজ হবে যখন তুমি এসে পড়েছো। চলো, আপেলের পিপে সব নামিয়ে নিই।

এমন সময় মিনি ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যস্ত ভাবে বল্লে—শীগগির এসো বিমল, শীগগির এসো এ্যালিস্—সুরেশ্বর নামছে ওই দেখ ট্রেন থেকে—

সুরেশ্বর সত্যিই নামছে বটে—তার সঙ্গে দুজন চীনা ডাক্তার, এদেরও বিমল চেনে—সাংহাই চীনা রেড্ক্রস্ হাসপাতালে এরা ছিল।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি—একটু আমায় ক্ষমা করুন, পাঁচমিনিটের জন্যে আসছি।

সুরেশ্বর তো ওদের দেখে অবাক্। বল্লে—তোমরা এখানে! মিনি আর এ্যালিস্ই বা এখানে কি করে এল! সাংহাইতে বেজায় গুজব এদের চীনা গুণ্ডারা গুম করেছে—আর বিমল তুমি জাপানীদের হাতে বন্দী। মিনি কেমন আছে?

বিমল বল্লে—সে সব কথা হবে এখন। চলো এখন সবাই মিলে তাঁবুতে গিয়ে বসা যাক্। অনেক কথা আছে। প্রোফেসর লি'কে ডেকে আনি—উনিও আমাদের সঙ্গে আসুন। তোমরা এগিয়ে চলো ততক্ষণ। আমি ওঁর আপেলের পিপেগুলো নামবার কি ব্যবস্থা হোল দেখে আসি।

কিছুক্ষণ পরে দুঃস্থ চীনা নরনারীদের তাঁবুতে সুরেশ্বর, বিমল, এ্যালিস্ ও মিনি আপেল-বিলি কাজে প্রফেসর লি'র সাহায্য করছিল। এ জায়গা ঠিক তাঁবু নয়, একটা পাইন বন, তার মাঝে মাঝে পুরোনো ক্যাম্বিস, চট, মাদুর, ভাঙা টিন প্রভৃতি জোড়াতালি দিয়ে আশ্রয় বানিয়ে তারই মধ্যে হতভাগ্য গৃহহারার দল মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুর্দ্দশা দেখে বিমলের কঠিন মনেও দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হোল। ছোট ছোট উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত্ত, কাদামাটিমাখা শিশুদের ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আপেল বিলি করবার সময় সময় এ্যালিসের চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখলে বিমল। নাঃ—বড় ছেলেমানুষ এই এ্যালিস্!···এ্যালিসের প্রতি একটা কেমন অকারণ স্নেহে ও মমতায় বিমলের মন গলে যায়। কি সুন্দর মেয়ে এ্যালিস্ আর কি ছেলেমানুষ!

হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। আপেল বিলি করতে করতে প্রোফেসর লি এক সময় একটা আপেলের পিপের মধ্যে ঘাড় নীচু করে দেখে বল্লেন—চারটে আপেল আর বাকী আছে। আমি কালিফোর্নিয়ার আপেল কখনো খাইনি—একটি আমি খাবো।

বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ বালকের মত আনন্দে একটা আপেল তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। বিমল অবাক, সে যেন একটা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলে। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তার মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইল বৃদ্ধের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরণের ভালবাসা এসে তার মনে উপস্থিত হোল, বৃদ্ধের প্রতি। এঁকে ছেড়ে আর সে থাকতে পারবে না—অসম্ভব! যেমন সে আর এ্যালিস্‌কে ছেড়ে কখনো থাকতে পারবে না। চীনদেশে তার আসা সার্থক হয়েছে এই দু'জনের সাক্ষাৎ পেয়ে। এই যুদ্ধের বর্ব্বরতা, হত্যা, বোমাবর্ষণ, রক্তপাত, অনাহার, দারিদ্র্য, এই চারিদিকের বীভৎস নরবলীর হৃদয়হীন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রোফেসর লি আর এ্যালিস্ (অবশ্য মিনিও আছে)—এদের আবির্ভাব দেবতার আবির্ভাবের মতই অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর।

এ্যালিস্ ও মিনি ছুটে গেল ছেলেমানুষের মত।

—ড্যাডি, ড্যাডি, আমাদের একটা আপেল দেবে না?···

বৃদ্ধ হাসিমুখে বল্লেন—মেয়েদের না দিয়ে কি বুড়ো বাবা খায়? দুটি রেখে দিয়েছি তোমাদের দুজনের জন্যে—আর একটি বাকী আছে, কে নেবে?

বিমল বল্লে—সুরেশ্বর নাও।

সুরেশ্বর বল্লে—বিমল, তুমি নাও, আমি আপেল খাই না।

এ্যালিস্ বল্লে—খাও, সুরেশ্বর, আমি আমার আধখানা বিমলকে দিচ্ছি।

মিনি বল্লে—তা নয়, বিমল খাও, আমি আধখানা সুরেশ্বরকে দেবো।

প্রোফেসর লি মীমাংসা করে দিলেন—একটা আপেল ভাগাভাগি করে খাবে বিমল ও সুরেশ্বর। মেয়েরা আস্ত আপেল খাবে। তাঁর কথার ওপর আর কেউ কথা বলতে সাহস করলে না।

সেই সৈনিক ডেসপ্যাচ-রাইডারটি এসে খবর দিলে, হাসপাতাল তাঁবু এখানেই উঠে

আসছে—পাইনবনের মাঝখানে। সামনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কমাণ্ডাণ্ট্ খবর পাঠিয়েছেন। ডেসপ্যাচ-রাইডার আরও এক করুণ সংবাদ দিলে—আজ সকালে জাপানীদের হ্যাণ্ড্ গ্রিনেড্ চার্জে নারীবাহিনীর সতেরোটি তরুণী একদম মারা পড়েছে। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দেহ—হাত, পা, মুণ্ড, আঙুল—ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে।

মিনি শিউরে উঠে বল্লে—ও হাউ সিম্পলি ড্রেড্ফুল!

কেন জানি না এই দুঃসংবাদে বিমলের মন এ্যালিসের প্রতি মমতায় ভরে উঠলো। এ্যালিসের মতই উদার, নিঃস্বার্থ সতেরোটি তরুণী—কত গৃহ অন্ধকার করে, কত বাপমায়ের হৃদয়-শূন্য করে চলে গেল!—মানুষ মানুষের ওপর কেন এমন নিষ্ঠুর হয়?

হঠাৎ পলাতকদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত্ত শোরগোল উঠলো। সবাই ছুটছে, গাছের তলায় গুঁড়ি মেরে বসছে, ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে—একটা হুড়োহুড়ি, এ ওকে ঠেলছে, দু একজন উর্দ্ধশ্বাসে খোলা মাঠের দিকে ছুটছে।

ডেসপ্যাচ-রাইডার সৈনিক যুবকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্লে—নীচু হয়ে বসে পড়ুন—সবাই শুয়ে পড়ুন—জাপানী বম্বার!

আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশই স্পষ্ট হয়ে উঠলো···বিমল চোখ তুলে দেখলে পাইনবনের মাথার ওপর আকাশে দুখানা কাওয়াসাকি বম্বার···নিজের অজ্ঞাতসারে সে তখনি এ্যালিসের হাত ধরে তাকে একটা গাছের তলায় নিয়ে দাঁড় করালে।

—প্রোফেসর লি—প্রোফেসর লি—এদিকে আসুন—

ভীষণ একটা আওয়াজ···বিদ্যুতের মত আলোর চমক··ধোঁয়া, মাটি পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো ভূমিকম্পের মত··সবারই কানে তালা···চোখ অন্ধকার···জাপানী বম্বার বোমা ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আর্ত্তনাদ কান্না···গোঁঙানি··নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত্ত চীৎকার।

আবার একটা···বিমলের মনে হোল পৃথিবীর প্রলয় সমাগত··পৃথিবী দুলছে, আকাশ দুলছে···কেউ বাঁচবে না; মিনি, এ্যালিস্, সে, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি, সবাই এই প্রলয়ের অনলে ধ্বংস হবে।

তার পর ক'টা বোমা পড়লো এরোপ্লেন থেকে—তা আর গুণে নেওয়া সম্ভব হোল না বিমলের পক্ষে। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও মনুষ্য-কণ্ঠের আর্ত্তনাদের একটা একটানা শব্দপ্রবাহ তার মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে চলেছে—একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করে নেওয়া শক্ত।

তারপর হঠাৎ যখন সব থেমে গেল, এরোপ্লেন চলে গিয়েছে—যখন বিমল আবার সহজ বুদ্ধি ফিরে পেল—তখন দেখলে এ্যালিসের একখানা হাত শক্ত করে তার নিজের মুঠোর মধ্যে ধরা।—মিনি, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি সকলে মাটিতে শুয়ে—হয়তো সবাই মারা গিয়েছে—সে-ই একমাত্র রয়েছে বেঁচে।

প্রথমে মাটি থেকে ঝেড়ে উঠলো এ্যালিস্। তারপর প্রোফেসর লি, তারপর সুরেশ্বর।—মিনি মূর্চ্ছা গিয়েছে—অনেক কষ্টে তার চৈতন্য সম্পাদনা করা হোল। হঠাৎ এ্যালিস চমকে

উঠে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখিয়ে প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

সেই তরুণ ডেস্‌প্যাচ-রাইডারের দেহ অস্বাভাবিক ভাবে শায়িত কিছু দূরে। রক্তে আশপাশের মাটি ভেসে গিয়েছে—একখানা হাত উড়ে গিয়েছে—বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে চাওয়া যায় না।

কিন্তু দেখা গেল পলাতক গৃহহীন ব্যক্তিদের খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এবং একটি বৃদ্ধ জখম হয়েছে মাত্র। পাইনবনের পাতার আড়ালে ছিল এরা—ওপর থেকে বোমার লক্ষ্য ঠিকমত হয়নি।

প্রোফেসর লি'র সঙ্গে এ্যালিস্ ও মিনি আহতদের সাহায্যে অগ্রসর হোল।

সন্ধ্যার পরে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়াল। নাইন্থ্-রুট্ আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন ট্রেন থেকে নামলো—এরা এসেছে রেলপথ রক্ষা করতে এবং দুটো সাঁকো পাহারা দিতে।

বিমল সুরেশ্বরকে বল্লে—আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বলতে গেলে একরকম বাস করচি, অথচ লড়াই যে কোন্‌দিকে হচ্ছে—কি ভাবে হচ্ছে—তা কিছুই জানি নে, চোখেও দেখতে পাচ্ছি নে।

রাত্রে কমাণ্ডাণ্টের সারকুলার বেরুলো—রেললাইনের প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে—আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আক্রমণ করবে—সকলে তৈরী থাকো, যারা সৈন্য নয় যুদ্ধ করছে না—এমন শ্রেণীর লোক দূরে চলে যাও।

রাত প্রায় বারোটা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুরেশ্বর বর্ষাতি কোট গায়ে বাইরে থেকে হাসপাতাল তাঁবুতে ঢুকে বল্লে—আমাদের আয়ু মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে। সারকুলার দেখেছ?

বিমল বল্লে—গতিক সেই রকমই বটে। জাপানীরা হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্ চার্জ করলে কেউ বাঁচবে না।

—আমি ভাবছি মেয়েদের কথা—

—প্রোফেসর লি'কে কথাটা বলা ভালো। উনি কি বলেন দেখি।

প্রোফেসর লি'কে ডাকতে গিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য বিমলের চোখে পড়লো। হাসপাতাল তাঁবুর পাশে একটা ছোট্ট চটে-ছাওয়া তাঁবুতে এ্যালিস্ ও মিনি কি রান্না করছে আগুনের ওপর—বৃদ্ধ লি ওদের কাছে উনুন ঘেঁষে বসে বুড়ো ঠাকুরদাদার মত গল্প করছেন।

এ্যালিস্ বল্লে—তোমার বন্ধু কোথায় বিমল—খেতে হবে না তোমাদের আজ? ড্যাডি আমাদের এখানে খাবেন। উঃ—কি সত্যি কথা। গোলমালে তার মনেই নেই যে সন্ধ্যা থেকে কারো পেটে কিছু যায় নি! বিমল সুরেশ্বরকে ডেকে নিয়ে এল। খাবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু ভাত ও শুক্‌নো সিঙ্গাপুরী কাঁচকলা, চর্ব্বিতে ভাজা।

একজন ডেস্‌প্যাচ-রাইডার ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এসে বিমলকে ডাক দিলে। তার হাতে একখানা ছোট্ট সিল-করা খাম।

—আপনি হাসপাতালের ডাক্তার? আপনার চিঠি। ট্রেন এখুনি একখানা আসছে,

টেলিগ্রামে অর্ডার দিয়ে আনানো হচ্ছে। আপনি আপনার নার্স ও রোগী নিয়ে হ্যান্‌কাউতে এই ট্রেনে যাবেন : আপনাকে একথা বলার আদেশ আছে আমার ওপর। গুড্‌ নাইট।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। কেন হঠাৎ এ আদেশ জানেন?

—আমরা এই রেলের জন্যে আর লোক ক্ষয় করবো না। জেনারেল চু-টে'র আদেশ এসেছে হেড্‌ কোয়ার্টার্স থেকে। পরবর্ত্তী যুদ্ধ হবে এর দশ মাইল দূরে। আর এখুনি আপনারা তৈরী হোন। আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আড্ডা দখল করবে। তার আগে হয়তো গোলা ছুঁড়তে পারে।

প্রোফেসর লি কাছেই দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলেন। তিনি বল্লেন—আমি এই ট্রেনে গরীব গ্রামবাসীদের উঠিয়ে নিয়ে যাবো। নইলে জাপানী বোমা থেকে যাও বা বেঁচেছে, গোলা আর হ্যাণ্ড্‌গ্রিনেড্‌ খেলে তাও যাবে! আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধ কমাণ্ডাণ্ট্‌কে জানিয়ে আমায় খবর দিয়ে যাবেন?

ডেস্‌প্যাচ্‌-রাইডার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হোল।

আরও দেড়ঘণ্টা পরে এল ট্রেন। ট্রেনখানা প্রায় খালি। তবে পেছনের গাড়ীগুলো সুঁটকি মাছ বোঝাই—বিষম দুর্গন্ধ। বিমল হাসপাতালের সব লোকজন নিয়ে ট্রেনে উঠলো—মিনি, এ্যালিস্‌, দুটি চীনা নার্স, সাত আটটি রোগী। প্রোফেসর লি ইতিমধ্যে তাঁর দলবল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু ট্রেনের সামরিক গার্ড কমাণ্ডাণ্টের বিনা আদেশে তাঁর দলবল গাড়ীতে উঠাতে চাইলে না।

এ্যালিস্‌ বল্লে—বিমল, ওদের বলো তাহোলে আমরাও যাবো না। ওঁকে ফেলে আমরা যাবো না! ট্রেনের সামরিক গার্ড বল্লে—আমার কোন হাত নেই। আপনারা না যান, পনেরো মিনিট পরে আমি গাড়ী ছেড়ে দেবো।

এ্যালিস্‌ ও মিনি নামলো। চীনা নার্স দুটিও এদের দেখাদেখি নামলো। ট্রেনের গার্ড বল্লে—রোগীরা কাদের চার্জে যাবে? একজন ডাক্তার চাই। আমি রিপোর্ট করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে। আপনারা হাসপাতালের কর্ম্মচারী, সামরিক আদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য।

বিমল বল্লে—সে এঁরা নন্‌—এই মেয়ে দুটি। এঁরা আমেরিকান রেড্‌ক্রস্‌ সোসাইটির। চীনা পার্লামেণ্টের হাত নেই এঁদের ওপর।

এদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময়ে ডেসপ্যাচ-রাইডারটিকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পরে প্রোফেসর লি তাঁর দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়লেন। ট্রেনও ছেড়ে দিল।

দিন পনেরো পরে।

হ্যান্‌কাউ শহরের উপকণ্ঠে পবিত্র ফা-চিন্‌ মন্দির। মিং রাজবংশের রাজকুমারী ফা-চিন্‌ তাঁর প্রণয়ীর স্মৃতির মান রাখবার জন্যে চিরকুমারী ছিলেন—এবং একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠে দেহত্যাগ

করেন একষট্টি বছর বয়সে। তাঁর দেহের পুণ্য ভস্মরাশির ওপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে অতি মনোরম উদ্যান ও ফোয়ারা।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এ্যালিস্ ও বিমল মার্বেলের চৌবাচ্চায় মন্দিরের অতি বিখ্যাত লালমাছ দেখছিল। অনেক দূর থেকে লোকে এই লালমাছ দেখতে আসে—আর আসে নব-বিবাহিত দম্পতি—তাদের বিবাহিত জীবনের কল্যাণ কামনায়।

একটা গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে এ্যালিস্ ক্লান্তভাবে বসলো।

বিমল বল্লে—মিনিরা কোথায়?

—মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। এখানে বসো। কেমন সুন্দর লাল মাছ খেলা করছে দেখো। আমি কি ভাবছি বিমল জানো, এমন পবিত্র মন্দির, এমন সুন্দর শান্তি, এই প্রাচীন পাইন গাছের সারি—সব জাপানী বোমায় একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধের এই পরিণাম, প্রাচীন দিনের শান্তি ও সৌন্দর্য্যকে চুরমার করে বর্ব্বরতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

—এ্যালিস্, আর কতদিন চীনে থাকবে?

—যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, যতদিন একজন আহত চীন সৈনিকও হাসপাতালে পড়ে থাকে। যতদিন ড্যাডি লি তাঁর সাহায্যকারিণী মেয়ের দরকার অনুভব করেন।

এ্যালিস্ বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—কিন্তু বিমল ততদিন তোমাকেও তো থাকতে হবে—তোমাকে যেতে দেবো না।

পাইনগাছের ওদিকে নিকটেই প্রোফেসর লি'র প্রাণখোলা হাসি ও কথাবার্ত্তার আওয়াজ শোনা গেল।

এ্যালিস্ বল্লে—ওরা এদিকেই আসছে।

এ্যালিসের ভুল হয়েছিল, মিনি আর সুরেশ্বর এল না—এলেন প্রোফেসর লি। এই বয়সেও তাঁর চোখের অমন অদ্ভুত দীপ্তি যদি না থাকতো, তবে তাঁকে জনৈক বৃদ্ধ চীনা রিক্‌শাওয়ালা বলে ভুল করা অসম্ভব হয় না—এমনি সাদাসিধে তাঁর পরিচ্ছদ।

প্রোফেসর লি বল্লেন—হ্যান্‌কাউ শহরে এসে আমার গরীব গ্রামবাসীরা আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তৈরী মাটির নীচের ঘরে লুকিয়ে থাকলে আমার চলবে না এ্যালিস্, আমি কালই এখান থেকে গ্রামে চলে যাবো।

এ্যালিস্ বল্লে, কেন?

—দক্ষিণ চীনে সর্ব্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ। লোক না খেয়ে মরছে, তার সাথে বোমা আছে। মড়ক লেগেছে। আমার এখানে বসে থাকলে চলে? আমি আবেদন পাঠিয়েছি আমেরিকায় মার্কিন রেড্‌ক্রস্ সোসাইটির মধ্যস্থতায়। তারাই আপেল পাঠিয়েছিল এদের খাওয়াতে। যতদূর জানা গিয়েছে, ওরা কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে। টাকাটা শীগগির আসবে।

এ্যালিস্ বল্লে—ড্যাডি, আমার একটা প্রস্তাব শুনবেন? আমার মাসীমা নিঃসন্তান, বিধবা, অনেক টাকার মালিক। আমায় তিনি উইল করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন,

টাকাটা আমি চাইলেই পাবো। সেই টাকা আপনাকে দিচ্ছি—হ্যান্‌কাউ শহরে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের জন্যে একটা 'হোম' খুলুন। আপনি লেখালেখি করলে গবর্নমেণ্টও কিছু সাহায্য করবে। আমি আর মিনি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করবো।

প্রোফেসর লি বল্লেন—তোমায় ধন্যবাদ, এ্যালিস। অতি দয়াবতী মেয়ে তুমি, কিন্তু তোমার টাকা নেবো না। তা ছাড়া, এমন কোনো বড় আশ্রয়স্থল আমরা গড়তে পারবো না, যাতে সকল দুঃস্থ বালক-বালিকাদের আমরা জায়গা দিতে পারি। সারা দক্ষিণ-চীন বিপন্ন, কত ছেলেমেয়েকে আমরা পুষতে পারি? মাঝে পড়ে তোমার টাকাগুলো যাবে।

বিমল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এ্যালিসের ওপর প্রোফেসর লি'র স্নেহ নিজের সন্তানের ওপর পিতার স্নেহের মতই। উনি চান না এ্যালিসের টাকাগুলো খরচ করিয়ে দিতে। নইলে উনি 'হোম' গঠনের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখালেন, সেটা এমন কিছু জোরালো নয়। সব দুঃস্থ লোকদের আশ্রয় দিতে পারছিনে বলে তাদের মধ্যে কাউকেও আশ্রয় দেবো না?

এমন সময় সুরেশ্বর ও মিনি এসে বল্লে—এসো এ্যালিস, এসো বিমল, একটা জিনিস দেখে যাও।

ওরা বাগানের বেঞ্চি থেকে উঠে মন্দিরের উঁচু চত্বরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখলে ওদের আগে আগে দুটি চীনা তরুণ-তরুণী মন্দিরে উঠছে। তাদের হাতে ছোট ছোট ধ্বজা, মোমবাতি ও ফুল।

মিনি বল্লে—ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ছেলেটি বেশ ইংরাজী জানে। ওর ডাক পড়েছে যুদ্ধে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই মেয়েটিকে কাল বিয়ে করেছে; অনেকদিন থেকে মেয়েটি ওর বাগদত্তা। ফা-চিন্ মন্দিরে আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছে—

বিমল ও এ্যালিস নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিউরে উঠলো। বর্ত্তমান যুগের ভীষণ মারণাস্ত্রের সামনে যুদ্ধ। আয়ু ফুরিয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্ত্তে। একটা বোমার অপেক্ষা মাত্র। তরুণীর বয়স অল্প—ষোল সতেরো।

চীন দেশে সম্ভ্রান্ত-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নেই।

তরুণ-তরুণীর মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময়। কোন দিকে ওদের লক্ষ্য নেই। মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে মোমবাতি জ্বলছে। ওরা খোদাই-করা কাঠের চৌকাট পার হ'য়ে রাজকুমারী ফা-চিন-এর কৃত্রিম সমাধির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলে, ফুল ছড়িয়ে দিলে, দুজনে পাশাপাশি বসে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর ওরা উঠলো—ঘর থেকে বাইরে এসে মন্দিরে চত্বরে দাঁড়ালো, দুজনে দুজনের হাত ধরে আছে—দুজনের হাসি-হাসি মুখ।

এ্যালিস বল্লে—মিনি, ওঁদের এখানে দাঁড়াতে বলো না? আমাদের অনুরোধ—

মিনি বল্লে—আপনারা একটু দয়া করে যদি দাঁড়ান—মন্দিরের চত্বরে—

যুবক ওদের দিকে হাসিমুখে চাইলে, তারপর মেয়েটিকে চীনাভাষায় কি বল্লে। তরুণীও অল্প হাসিমুখে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নীচু করলে।

যুবক হাসিমুখে বল্লে—ফটো নেবে বুঝি? আলো নেই মোটে—ফটো উঠবে?

এ্যালিস এই সময় মন্দিরের বাইরের ফুলের দোকান থেকে একরাশ ফুল কিনে নিয়ে এল। বৃদ্ধ লি'কেও সে ডেকে এনেছে বাগান থেকে। হাসিমুখে বল্লে—ড্যাডি, এই ফুল নিয়ে ওদের আশীর্ব্বাদ করুন—তোমরাও সবাই ফুল নাও।

যুবকের সঙ্গে প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় কি কথাবার্ত্তা বল্লেন, তারপর সকলে অর্দ্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো নবদম্পতীকে।

প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় গম্ভীর স্বরে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করে ওদের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিলেন—তারপর সকলে ফুল ছড়ালে ওদের ওপর। এ্যালিস ও মিনির কি হাসি ফুল ছড়াতে ছড়াতে!

তরুণ-তরুণী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো—সন্ধ্যা নেমেছে। কোথাও আর রোদ নেই—এই পবিত্র, প্রাচীন ফা-চিন মন্দির, পাইন বন, লাল মাছের চৌবাচ্চা, শান্ত গভীর সন্ধ্যা—এই কলহাস্যমুখরা বিদেশিনী মেয়ে দুটি,—এই নবদম্পতী। দেখে মনেও হয় না এই পবিত্র স্থানের তিন মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে বিষবাষ্প দিয়ে, বোমা দিয়ে, কলের কামান দিয়ে। যুদ্ধ বর্ব্বরের ব্যবসায়। অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ দম্পতীর কত আশা, উৎসাহ!

এ্যালিস ঠিকই বলেছে। সব যাবে—কাল সকালেই হয়তো যাবে, জাপানী বোমায়। পবিত্র ফা-চিন্ মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি যাবে, লালমাছ যাবে, এই তরুণ দম্পতী যাবে, সে যাবে, মিনি, এ্যালিস, সুরেশ্বর, বৃদ্ধ লি—সব যাবে। যুদ্ধ বর্ব্বরের ব্যবসায়।

ফুল ছড়ানো শেষ হয়েছে! মন্দিরের বাঁকানো ঢালু ছাদে পোষা পায়রার দল উড়ে এসে বসেছে। পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে ভর্ত্তি। নবদম্পতী তখন হাসছে—এ একটা ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের ব্যাপার হয়েছে তাদের কাছে। ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর,—মৃত্যুর ওপর,—মানুষের জয়লাভ। মহাচীনের নবজন্ম হয়েছে এই তরুণ-তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চিন্-এর পবিত্র অমর আত্মা ওদের আশীর্ব্বাদ করুন।

এ্যালিস্ এসে বিমলের হাত ধরলো।

—চল যাই বিমল। হাসপাতালে ডিউটি রয়েছে—তোমার আমার এক্ষুনি—

***

মিসমিদের কবচ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্যামপুর গ্রামে সেদিন নন্দোৎসব।

শ্যামপুরের পাশের গ্রামে আমার মাতুলালয়। চৌধুরী-বাড়ীর উৎসবে আমার মামার বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—সুতরাং সেখানে গেলাম।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা একটা শতরঞ্চি পেতে বৈঠকখানায় ব'সে আসর জমিয়েচেন। আমার বড় মামা বিদেশে থাকেন, সম্প্রতি ছুটি নিয়ে দেশে এসেচেন—সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করলে।

—এই যে আশুবাবু, সব ভালো তো? নমস্কার!

—নমস্কার। একরকম চলে যাচ্ছে—আপনাদের সব ভালো?

—ভালো আর কই? জ্বরজাড়ি সব। ম্যালেরিয়ার সময় এখন, বুঝতেই পারচেন।

—আপনার সঙ্গে এটি কে?

—আমার ভাগ্নে, সুশীল। আজই এসেচে—নিয়ে এলাম তাই।

—বেশ করেচেন, বেশ করেচেন, আনবেনই তো। কি করেন বাবাজি?

এখানে আমি মামাকে চোখ টিপবার সুবিধে না পেয়ে তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলি টিপে দিলাম। মামা বল্লেন—আপিসে চাকরি করে—কলকাতায়।

—বেশ, বেশ। এসো বাবাজি, বসো এসে এদিকে।

মামার আঙুল টিপবার কারণটা বলি। আমি কলকাতার বিখ্যাত প্রাইভেট-ডিটেক্‌টিভ নিবারণ সোমের অধীনে শিক্ষানবিশি করি। কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না আমার।

নন্দোৎসব এবং আনুষঙ্গিক ভোজনপর্ব্ব শেষ হলো। আমরা বিদায় নেবার যোগাড় করচি, এমন সময় গ্রামের জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার মামাকে ডেকে বল্লেন—কাল আপনাদের পুকুরে মাছ ধরতে যাবার ইচ্ছে আছে। সুবিধে হবে কি?

—বিলক্ষণ! খুব সুবিধে হবে! আসুন না গাঙ্গুলিমশায়, আমার ওখানেই তাহ'লে দুপুরে আহারাদি করবেন কিন্তু।

—না না, তা আবার কেন? আপনার পুকুরে মাছ ধরতে দিচ্চেন এই কত, আবার খেয়ে বিব্রত করতে যাবো কেন?

—তাহোলে মাছ ধরাও হবে না ব'লে দিচ্চি। মাছ ধরতে যাবেন কেবল ওই এক শর্ত্তে।

গাঙ্গুলিমশায় হেসে রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে হরিশ গাঙ্গুলিমশায় মামার বাড়ীতে এলেন। পল্লীগ্রামের পাকা ঘুঘু মাছ-ধরায়, সঙ্গে দু'গাছা ছোট-বড় ছিপ, দু'খানা হুইল লাগানো—বাকি সব বিনা হুইলের, টিনে ময়দার চার, কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম, তামাক খওয়ার সরঞ্জাম, আরও কত কি।

মামাকে হেসে বল্লেন—এলাম বড়বাবু, আপনাকে বিরক্ত করতে। একটা লোক দিয়ে গোটাকতক কঞ্চি কাটিয়ে যদি দেন—কেঁচোর চার লাগাতে হবে।

মামা জিজ্ঞেস করলেন—এখন বসবেন, না, ওবেলা ?

—না, এবেলা বসা হবে না। মাছ চারে লাগতে দু'ঘণ্টা দেরি হবে। ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া যায়। একটু সকাল-সকাল যদি আহারের ব্যবস্থা…

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব হয়ে গেছে। আমিও জানি, আপনি এসেই খেতে বসবার জন্যে তাগাদা দেবেন। মাছ যারা ধরে, তাদের কাছে খাওয়া-টাওয়া কিছুই নয় খুব জানি। আর ঘণ্টা-খানেক পরেই জায়গা ক'রে দেবো খাওয়ার।

যথাসময়ে হরিশ গাঙ্গুলি খেতে বসলেন এবং একা প্রায় তিনজনের উপযুক্ত খাদ্য উদরসাৎ করলেন।

আমি কলকাতার ছেলে, দেখে তো অবাক্!

আমার মামা জিজ্ঞেস করলেন—গাঙ্গুলিমশায়, আর একটু পায়েস ?

—তা একটুখানি না হয়……ওসব তো খেতে পাইনে! একা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই। বাড়ীতে মেয়েমানুষ নেই, বৌমারা থাকেন বিদেশে আমার ছেলের কাছে। কে ওসব ক'রে দেবে ?

—গাঙ্গুলিমশায় কি একাই থাকেন ?

—একাই থাকি বইকি। ছেলেরা কলকাতায় চাকরি করে, আমার শহরে থাকা পোষায় না। তাছাড়া কিছু নগ্দী লেন-দেনের কারবারও করি, প্রায় তিনহাজার টাকার ওপর। টাকায় দু'আনা মাসে সুদ। আপনার কাছে আর লুকিয়ে কি করবো ? কাজেই বাড়ী না থাকলে চলে কৈ ? লোকে প্রায়ই আসচে টাকা দিতে-নিতে।

গাঙ্গুলিমশায় এই কথাগুলো যেন বেশ একটু গর্ব্বের সঙ্গে বল্লেন।

আমি পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ না হোলেও আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দিলে। টাকা-কড়ির কথা এ-ভাবে লোকজনের কাছে ব'লে লাভ কি! বলা নিরাপদও নয়—শোভনতা ও রুচির কথা যদি বাদই দিই।

গাঙ্গুলিমশায়কে আমার বেশ লাগলো।

মাছ ধরতে-ধরতে আমার সঙ্গে তিনি অনেক গল্প করলেন।

…থাকেন তিনি খুব সামান্য ভাবে—কোনো আড়ম্বর নেই—খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও কোনো ঝঞ্ঝাট নেই তাঁর।…এই ধরণের অনেক কথাই হোলো।

মাছ তিনি ধরলেন বড়-বড় দুটো। ছোট গোটা-চার-পাঁচ। আমার মামাকে অর্দ্ধেক-গুলি দিতে চাইলেন, মামা নিতে চাইলেন না। বল্লেন—কেন গাঙ্গুলিমশায় ? পুকুরে মাছ ধরতে এলেছেন, তার খাজনা নাকি ?

গাঙ্গুলিমশায় জিব কেটে বল্লেন—আরে রামো! তাই ব'লে কি বলচি ? রাখুন অন্তত গোটা-দুই!

—না গাঙ্গুলিমশায়, মাপ করবেন, তা নিতে পারবো না। ও নেওয়ার নিয়ম নেই আমাদের।

অগত্যা গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলেন। আমায় ব'লে গেলেন—তুমি বাবাজী একদিন আমার ওখানে যেও একটা ছুটিতে। তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় আনন্দ হোলো আজ।

কে জানতো যে তাঁর বাড়ীতে আমাকে অল্পদিনের মধ্যেই যেতে হবে; তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে—অন্য উদ্দেশ্যে।

গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে খোশগল্প করার জন্যে নয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলে আমি মামাকে বল্লাম—আপনি মাছ নিলেন না কেন? উনি দুঃখিত হোলেন নিশ্চয়।

মামা হেসে বল্লেন—তুমি জানো না, নিলেই দুঃখিত হোতেন—উনি বড় কৃপণ।

—তা কথার ভাবে বুঝেচি।

—কি ক'রে বুঝলে?

—অন্য কিছু নয়, বৌ-ছেলেরা কলকাতায় থাকে, উনি থাকেন দেশের বাড়ীতে। একটা চাকর কি রাঁধুনী রাখেন না, হাত পুড়িয়ে এ-বয়সে রেঁধে খেতে হয় তাও স্বীকার। অথচ হাতে দু'পয়সা বেশ আছে।

—আর কিছু লক্ষ্য করলে?

—বড় গল্প বলা স্বভাব। আমার ধারণা, একটু বাড়িয়েও বলেন।

—ঠিক ধরেচো। মাছ নিইনি তার আর-একটা কারণ, উনি মাছ দিয়ে গেলে সব জায়গায় সে গল্প ক'রে বেড়াবেন, আর লোকে ভাববে আমরা কি চামার—পুকুরে মাছ ধরেচে ব'লে ওঁর কাছ থেকে মাছ নিইচি।

—না মামা, এটা আপনার ভুল। এ-কথা ভাববার কারণ কি লোকদের? তা কখনো কেউ ভাবে?

—তা যাই হোক, মোটের ওপর আমি ওটা পছন্দ করিনে।

—উনি একটা বড় ভুল করেন মামাবাবু। টাকার কথা অমন ব'লে বেড়ান কেন?

—ওটা ওঁর স্বভাব। সর্ব্বত্র ওই করবেন। যেখানে বসবেন, সেখানেই টাকার গল্প। ক'রেও আজ আসচেন বহুদিন। দেখাতে চান, হাতে দু'পয়সা আছে।

—আমার মনে হয় ও-স্বভাবটা ভালো নয়—বিশেষ ক'রে এইসব পাড়াগাঁয়ে। একদিন আপনি একটু সাবধান ক'রে দেবেন না?

—সে হবে না। তুমি ওঁকে জানো না। বড্ড একগুঁয়ে। কথা তো শুনবেনই না—আরও ভাববেন, নিশ্চয়ই আমার কোনো মতলব আছে।

আমি সেদিন কলকাতায় চলে এলাম বিকেলের ট্রেনে। আমার ওপর-ওয়ালা নিবারণবাবু লিখেছেন, খুব শীগ্‌গির আমায় একবার এলাহাবাদে যেতে হবে বিশেষ একটা

জরুরী কাজে। অপিসে যেতেই খবর পেলাম, তিনি আর-একটা কাজে দু'দিনের জন্য পাটনা গিয়েচেন চলে— আমার এলাহাবাদ যাবার খরচের টাকা ও একখানা চিঠি রেখে গিয়েচেন তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে।

আমার কাছে তাঁর ড্রয়ারের চাবি থাকে। ড্রয়ার খুলে চিঠিখানা প'ড়ে দেখলাম, বিশেষ কোনো গুরুতর কাজ নয়—এলাহাবাদ গবর্নমেণ্ট থাম্ব-ইম্‌প্রেশন্‌-ব্যুরোতে যেতে হবে, কয়েকটি দাগী বদমাইশের বুড়ো-আঙুলের ছাপের একটা ফটো নিতে।

মিঃ সোম বুড়ো-আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এলাহাবাদের কাজ শেষ করতে আমার লাগলো মাত্র একদিন, আট-দশদিন রয়ে গেলাম তবুও।

সেদিন সকালবেলা হঠাৎ মিঃ সোমের এক টেলিগ্রাম পেলাম। একটা জরুরী কাজের জন্য আমায় সেইদিনই কলকাতায় ফিরতে লিখেচেন। আমি যেন এলাহাবাদে দেরি না করি।

ভোরে হাওড়ায় ট্রেন এসে দাঁড়াতেই দেখি, মিঃ সোম প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটু অবাক্ হয়ে গেলাম, কারণ, এরকম কখনো উনি আসেন না।

আমায় বল্লেন—সুশীল, তুমি আজই মামার বাড়ী যাও। তোমার মামা কাল দু'খানা আর্জেণ্ট্-টেলিগ্রাম করেছেন তোমায় সেখানে যাবার জন্যে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম—মামার বাড়ী কারো অসুখ? সবাই ভালো আছে তো?

—সে-সব নয় বলেই মনে হলো। টেলিগ্রামের মধ্যে কারো অসুখের উল্লেখ নেই।

—কোনো লোক আসে নি সেখান থেকে?

—না। আমি তার ক'রে দিয়েচি, তুমি এলাহাবাদে গিয়েচো। আজই তোমার ফিরবার তারিখ তাও জানিয়ে দিয়েচি।

আমি বাসায় না গিয়ে সোজা শেয়ালদ' স্টেশনে চলে এলাম মামার বাড়ী যাবার জন্যে।

মিঃ সোম আমার সঙ্গে এলেন শেয়ালদ পর্যন্ত—বার-বার ক'রে ব'লে দিলেন, কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটলে তাঁকে যেন খবর দিই—তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন।

মামার বাড়ী পা দিতেই বড় মামা বল্লেন—এসেছিস সুশীল? যাক্, বড্ড ভাবছিলাম?

—কি ব্যাপার মামাবাবু? সবাই ভালো তো?

—এখানকার কিছু ব্যাপার নয়। শ্যামপুরের হরিশ গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছেন। সেখানে এখুনি যেতে হবে।

আমি ভীত ও বিস্মিত হয়ে বল্লাম—গাঙ্গুলিমশায়! সেদিন যিনি মাছ ধরে গেলেন! খুন হয়েচেন?

—হ্যাঁ, চলো একবার সেখানে। শীগ্‌গির স্নানাহার ক'রে নাও। কারণ, সারাদিনই হয়তো কাটবে সেখানে।

বেলা দুটোর সময় শ্যামপুরে এসে পৌঁছুলাম। ছোট্ট গ্রাম। কখনো সেখানে কারো একটা ঘটি চুরি হয়নি—সেখানে খুন হয়ে গিয়েচে, সুতরাং গ্রামের লোকে দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেছে। গ্রামের মাঝখানে বারোয়ারি-পূজা-মণ্ডপে জড় হয়ে সেই কথারই আলোচনা করছে সবাই।

আমার মামা এখানে এর পূর্ব্বে অনেকবার এসেছিলেন এই ঘটনা উপলক্ষে, তা সকলের কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা গেল। আমার কথা বিশেষ কেউ জিগ্যেস করলে না বা আমার সম্বন্ধে কেউ কোনো আগ্রহও দেখালে না। কেউ জানে না, আমি প্রাইভেট-ডিটেক্‌টিভ মিঃ সোমের শিক্ষানবিশ ছাত্র—এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে ওঁর নামই কেউ শোনে নি—আমাকে সেখানে কে চিনবে?

মামা জিগ্যেস করলেন—লাশ নিয়ে গিয়েছে?

ওরা বল্লে—আজ সকালে নিয়ে গেল। পুলিস এসেছিল।

আমি ওদের বল্লাম—ব্যাপার কি ভাবে ঘটলো? আজ হোলো শনিবার। কবে তিনি খুন হয়েচেন?

গ্রামের লোকে যে রকম বল্লে তাতে মনে হোলো, সে-কথা কেউ জানে না। নানা লোক নানা কথা বলতে লাগলো। পুলিসের কাছেও এরা এইরকমই ব'লে ব্যাপারটাকে রীতিমত গোলমেলে ক'রে তুলেচে।

আমি আড়ালে মামাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লাম—আপনি কি মনে ক'রে এখনে এনেচেন আমায়?

মামা বল্লেন—তুমি সব ব্যাপার শুনে নাও, চলো, অনেক কথা আছে। এই খুনের রহস্য তোমায় আবিষ্কার করতে হবে—তবে বুঝবো মিঃ সোমের কাছে তোমায় শিক্ষানবিশ করতে দিয়ে আমি ভুল করিনি। এখানে কেউ জানে না তুমি কি কাজ করো—সে তোমার একটা সুবিধে।

—সুবিধেও বটে, আবার অসুবিধেও বটে।

—কেন?

—বাইরের বাজে লোককে কেউ আগ্রহ ক'রে কিছু বলবে না। গোলমাল একটু থামলে একজন ভালো লোককে বেছে নিয়ে সব ঘটনা খুঁটিয়ে জানতে হবে। গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে কোথায়?

—সে লাশের সঙ্গে মহকুমায় গিয়েছে। সেখানে লাশ কাটাকুটি করবে ডাক্তারে, তারপর দাহকার্য্য ক'রে ফিরবে।

—লাশ দেখলে বড্ড সুবিধে হোতো। সেটা আর হোলো না।

—সেইজন্যেই তো বলছি, তুমি কেমন কাজ শিখেচো, এটা তোমার পরীক্ষা। এতে যদি পাশ করো তবে বুঝবো তুমি মিঃ সোমের উপযুক্ত ছাত্র। নয়তো তোমাকে আমি আর ওখানে রাখবো না—এ আমার এক-কথা জেনো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী গেলাম।

গিয়ে দেখি, যেখানটাতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী—তার দু'দিকে ঘন-জঙ্গল। একদিকে দূরে একটা গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা, একদিকে একটি হচ্ছে বাড়ী।

আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের কথা জিগ্যেস ক'রে জানলাম, সে এখনও মহকুমা থেকে ফেরে নি। তবে একটি প্রৌঢ়ার সঙ্গে দেখা হোলো—শুনলাম তিনি গাঙ্গুলিমশায়ের আত্মীয়া।

তাঁকে জিগ্যেস করলাম—গাঙ্গুলিমশায়কে শেষ দেখেছিলেন কবে?

—বুধবার।

—কখন?

—বিকেল পাঁচটার সময়।

—কিভাবে দেখেছিলেন?

—সেদিন হাটবার ছিল—উনি হাটে যাবার আগে আমার কাছে পয়সা চেয়েছিলেন।

—কিসের পয়সা?

—সুদের পয়সা। আমি ওঁর কাছে দুটো টাকা ধার নিয়েছিলাম ও-মাসে।

—আপনার পর আর কেউ দেখেছিল?

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর ঠিক পশ্চিম গায়ে যে বাড়ী, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে প্রৌঢ়া বল্লেন—ওই বাড়ীর রায়-পিসি আমার পরও তাঁকে দেখেছিলেন।

আমি বৃদ্ধা রায়-পিসির বাড়ী গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই বৃদ্ধা আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে একখানা পিঁড়ি বার ক'রে দিয়ে বল্লেন—বোসো বাবা।

আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে বল্লাম—আপনি একা থাকেন নাকি এ বাড়ীতে।

—হ্যাঁ বাবা। আমার তো কেউ নেই—মেয়ে-জামাই আছে, তারা দেখাশুনো করে।

—মেয়ে-জামাই এখানে থাকেন?

—এখানেও থাকে, আবার তাদের দেশ এই এখান থেকে চার ক্রোশ দূর সাধুহাটি গাঁয়ে, সেখানেও থাকে।

—গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি বুধবার কখন দেখেন?

—রাত্তিরে যখন উনি হাট থেকে ফিরলেন—তখন আমি বাইরের রোয়াকে বসে জপ করছিলাম। তারপর আর চোখে না দেখলেও ওঁর গলার আওয়াজ শুনেচি রাত দশটা পর্য্যন্ত—উনি ওঁর রান্নাঘরে রাঁধছিলেন আলো জেলে, আমি যখন শুতে যাই তখন পর্য্যন্ত।

—তখন রাত কত হবে?

—তা কি বাবা জানি? আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—ঘড়ি তো নেই বাড়ীতে। তবে

তখন ফরিদপুরের গাড়ী চলে গিয়েচে। আমরা শব্দ শুনে বুঝি কখন কোন্ গাড়ী এলো গেল।

—একা থাকতেন, আর রাত পর্য্যন্ত রান্না করছিলেন—এত কি রান্না?

—সেদিন মাংস এনেছিলেন হাট থেকে। মাংস সেদ্ধ হতে দেরি হচ্ছিলো।

—আপনি কি ক'রে জানলেন?

—পরে আমরা জেনেছিলাম। হাটে যারা ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে মাংস কিনেছিল—তারা বলেছিল। তাছাড়া যখন রান্নাঘর খোলা হোলো—বাবাগো!

ব'লে বৃদ্ধা যেন সে দৃশ্যের বীভৎসতা মনের পটে আবার দেখতে পেয়ে শিউরে উঠে কথা বন্ধ করলেন। সঙ্গে যে প্রৌঢ়া আত্মীয়াটি ছিলেন গাঙ্গুলিমশায়ের, তিনিও বল্লেন—ও বাবা, সে রান্নাঘরের কথা মনে হোলে এখনও গা ডোল দেয়!

আমি আগ্রহের সঙ্গে ব'লে উঠলাম—কেন? কেন?—কি ছিল রান্নাঘরে?

বৃদ্ধা বল্লেন—থালার চারদিকে ভাত ছড়ানো—মাংসের ছিবড়ে আর হাড়গোড় ছড়ানো। বাটিতে তখনও মাংস আর ঝোল রয়েচে—ঘরের মেঝেতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন—তিনি খেতে বসেছিলেন এবং তাঁর খাওয়া শেষ হবার আগেই যারা তাঁকে খুন করে তারা এসে পড়ে।

প্রৌঢ়াও বল্লেন—হ্যাঁ বাবা, এ সবাই দেখেচে। পুলিসও এসে রান্নাঘর দেখে গিয়েচে। সকলেরই মনে হোলো, ব্রাহ্মণের খাওয়া শেষ হবার আগেই খুনেরা এসে তার ওপর পড়ে।

—আচ্ছা বেশ, এ গেল বুধবার রাতের ব্যাপার। সেদিনই হাট ছিল তো?

—হ্যাঁ বাবা, তার পরদিন সকালে উঠে আমরা দেখলাম, ওঁর ঘরের দরজা বাইরের দিকে তালা-চাবি দেওয়া। প্রথম সকলেই ভাবলে উনি কোথাও কাজে গিয়েচেন, ফিরে এসে রান্না-বান্না করবেন। কিন্তু যখন বিকেল হয়ে গেল, ফিরলেন না—তখন আমরা ভাবলাম, উনি ওঁর ছেলেদের কাছে কলকাতায় গেছেন।

—তারপর?

—বিষ্যুদবার গেল, শুক্রবার গেল, শুক্রবার বিকেলের দিকে বন্ধ-ঘরের মধ্যে থেকে কিসের দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলো—তাও সবাই ভাবলে, ভাদ্রমাস, গাঙ্গুলিমশায় হয়তো তাল কুড়িয়ে ঘরের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন তাই পচে অমন গন্ধ বেরুচ্চে।

—শনিবার আপনারা কোন্ সময় টের পেলেন যে, তিনি খুন হয়েচেন?

—শনিবারে আমি গিয়ে গ্রামের ভদ্রলোকদের কাছে সব বললাম। অনেকেই জানতো না যে, গাঙ্গুলিমশায়কে এ ক'দিন গাঁয়ে দেখা যায়নি। তখন সকলেই এলো। গন্ধ তখন খুব বেড়েচে! পচা তালের গন্ধ ব'লে মনে হচ্ছে না!

—কি করলেন আপনারা?

—তখন সকলে জানলা খোলবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু সব জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। দোর ভাঙাই সাব্যস্ত হোলো। পরের ঘরের দোর ভেঙে ঢোকা ঠিক নয়—এরপর যদি তা নিয়ে কোনো কথা ওঠে? তখন চৌকিদার আর দফাদার ডেকে এনে তাদের সামনে দোর ভাঙা হোলো।

—কি দেখা গেল ?

—দেখা গেল, তিনি ঘরের মধ্যে মরে প'ড়ে আছেন ! মাথায় ভারি জিনিস দিয়ে মারার দাগ। মেজে খুঁড়ে রাশীকৃত মাটি বার করা, ঘরের বাক্স-প্যাট্‌রা সব ভাঙা, ডালা খোলা—সব তচ্‌নচ্‌ করেচে জিনিসপত্র।...তারপর ওঁর ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হোলো।

—এ-ছাড়া আর কিছু আপনারা জানেন না ?

—না বাবা, আর আমরা কিছু জানিনে।

গাঙ্গুলিমশায়ের প্রতিবেশিনী সেই বৃদ্ধাকে জিগ্যেস করলাম—রাত্রে কোনোরকম শব্দ শুনেছিলেন ? গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী থেকে ?

—কিছু না। অনেক রাত্তিরে আমি যখন শুতে যাই—তখনও ওঁর রান্নাঘরে আলো জ্বলতে দেখেচি। আমি ভাবলাম, গাঙ্গুলিমশায় আজ এখনও দেখি রান্না করচেন !

—কেন, এরকম ভাবলেন কেন ?

—এত রাত পর্য্যন্ত তো উনি রান্নাঘরে থাকেন না ; সকালরাত্তিরেই খেয়ে শুয়ে পড়েন। বিশেষ ক'রে সেদিন গিয়েছে ঘোর অন্ধকার রাত্তির—অমাবস্যা, তার ওপর টিপ্‌-টিপ্‌ বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে থেকেই।

—তখন তো আর আপনি জানতেন না যে, উনি হাট থেকে মাংস কিনে এনেচেন ?

—না, এমন কিছুই জানিনে।...হ্যাঁ বাবা, ..যখন এত ক'রে জিজ্ঞেস করচো, তখন একটা কথা আমার এখন মনে হচ্চে—

কি, কি, বলুন ?

—উনি ভাত খাওয়ার পরে রোজ রাত্তিরে কুকুর ডেকে এঁটো পাতা, কি পাতের ভাত তাদের দিতেন, রোজ-রোজ ওঁর গলার ডাক শোনা যেতো। সেদিন আমি আর তা শুনি নি।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হয়তো।

—না বাবা, বুড়ো-মানুষ—ঘুম সহজে আসে না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকি বিছানায়। সেদিন আর ওঁর কুকুরকে ডাক দেওয়ার আওয়াজ আমার কানেই যায় নি।

ভালো ক'রে জেরা করার ফল অনেক সময় বড় চমৎকার হয়। মিঃ সোম প্রায়ই বলেন—লোককে বারবার ক'রে প্রশ্ন জিগ্যেস করবে। যা হয়তো তার মনে নেই, বা, খুঁটিনাটির ওপর সে তত জোর দেয় নি—তোমার জেরায় তা তারও মনে পড়বে। সত্য বার হয়ে আসে অনেক সময় ভালো জেরার গুণে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিনই আমার সঙ্গে গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের দেখা হোলো। সে তার পিতার দাহকার্য্য শেষ ক'রে ফিরে আসছে কাছাগলায়।

আমি তাকে আড়ালে ডেকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলাম। শ্রীগোপালের চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে জল পড়তে লাগলো। সে আমাকে সব-রকমে সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিলে।

আমি বল্লাম—কারো ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

—কার কথা বলবো বলুন। বাবার একটা দোষ ছিল, টাকার কথা জাহির ক'রে বেড়াতেন সবার কাছে। কত জায়গায় এ-সব কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কে এ-কাজ করলে কি ক'রে বলি?

—আচ্ছা, কথা একটা জিগ্যেস করবো—কিছু মনে করবেন না। আপনার বাবার কত টাকা ছিল জানেন?

—বাবা কখনো আমাদের বলতেন না। তবে, আন্দাজ, দু'হাজারের বেশি নগদ টাকা ছিল না।

—সে টাকা কোথায় থাকতো?

—সেটা জানতাম। ঘরের মেজেতে বাবা পুঁতে রাখতেন—কতবার বলেচি, টাকা ব্যাঙ্কে রাখুন। সেকেলে লোক, ব্যাঙ্ক বুঝতেন না।

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর পর বাড়ী এসে আপনি মেজে খুঁড়ে কিছু পেয়েছিলেন?

—মেজে তো খুঁড়ে রেখেছিল যারা খুন করেচে তারাই। আমি এক পয়সাও পাই নি—তবে একটা কথা বলি—দু'হাজার টাকার সব টাকাই তো মেজেতে পোঁতা ছিল না—বাবা টাকা ধার দিতেন কিনা! কিছু টাকা লোকজনকে ধার দেওয়া ছিল।

—কত টাকা আন্দাজ?

—সেদিক থেকেও মজা শুনুন, বাবার খাতাপত্র সব ওই সঙ্গে চুরি হয়ে গিয়েচে। খাতা না দেখলে বলা যাবে না কত টাকা ধার দেওয়া ছিল।

—খাতাপত্র নিজেই লিখতেন?

—তার মধ্যেও গোলমাল আছে। আগে নিজেই লিখতেন, ইদানীং চোখে দেখতে পেতেন না ব'লে একে-ওকে ধ'রে লিখিয়ে নিতেন।

—কাকে-কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন জানেন?

—বেশির ভাগ লেখাতেন সদ্‌গোপ-বাড়ীর ননী ঘোষকে দিয়ে। সে জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করে—তার হাতের লেখাও ভালো। বাবার কথা সে খুব শুনতো।

—ননী ঘোষের বয়েস কত?

—ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

—ননী ঘোষ লোক কেমন? তার ওপর সন্দেহ হয়?

—মুশ্‌কিল হয়েচে, বাবা তো একজনকে দিয়ে লেখাতেন না! যখন যাকে পেতেন, তখন তাকেই ধ'রে লিখিয়ে নিতেন যে! স্কুলের ছেলে গণেশ ব'লে আছে, ওই মুখুয্যেবাড়ী থেকে পড়ে—তাকেও দেখি একদিন ডেকে এনেছেন। শুধু ননী ঘোষের ওপর সন্দেহ ক'রে কি করবো?

—আর কাকে দেখেচেন ?

—আর মনে হচ্চে না।

—আপনি হিসাবের খাতা দেখে ব'লে দিতে পারেন, কোন্ হাতের লেখা কার ?

—ননীর হাতের লেখা আমি চিনি। তার হাতের লেখা বলতে পারি—কিন্তু সে খাতাই-বা কোথায় ? খুনেরা সে খাতা তো নিয়ে গিয়েচে !

—কাকে বেশী টাকা ধার দেওয়া ছিল, জানেন ?

—কাউকে বেশী টাকা দিতেন না বাবা। দশ, পাঁচ, কুড়ি—বড়জোর ত্রিশের বেশি টাকা একজনকেও তিনি দিতেন না।

শ্যামপুরের জমিদার-বাড়ী সেবেলা খাওয়া-দাওয়া করলাম।

একটা বড় চত্বর, তার চারিধারে নারিকেল গাছের সারি, জামরুল গাছ, বোম্বাই-আমের গাছ, আতা-গাছ। বেশ ছায়াভরা উপবন যেন। ডিটেক্‌টিভগিরি ক'রে হয়তো ভবিষ্যতে খাবো—তা ব'লে প্রকৃতির শোভা যখন মন হরণ করে—এমন মেঘমেদুর বর্ষা-দিনে গাছপালার শ্যামশোভা উপভোগ করতে ছাড়ি কেন ?

বসলুম এসে চত্বরের একপাশে, নির্জ্জন গাছের তলায়।

ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলুম :

...কি করা যায় এখন ? মামা বড় কঠিন পরীক্ষা আমার সামনে এনে ফেলেচেন ?

মিঃ সোমের উপযুক্ত ছাত্র কি-না আমি, এবার তা প্রমাণ করার দিন এসেচে।

কিন্তু ব'সে-ব'সে মিঃ সোমের কাছে যতগুলি প্রণালী শিখেচি খুনের কিনারা করবার—সবগুলি পাশ্চাত্ত্য-বৈজ্ঞানিক-প্রণালী—স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভের প্রণালী। এখানে তার কোনটিই খাটবে না। আঙুলের ছাপ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা হয় নি—সাত-আটদিন পরে এখন জিনিসপত্রের গায়ে খুনীর আঙুলের ছাপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে।

পায়ের দাগ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।

খুন হবার পর এত লোক গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে ঢুকেচে—তাদের সকলের পায়ের দাগের সঙ্গে খুনীর পায়ের দাগ একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েচে। গ্রামের কৌতূহলী লোকেরা আমায় কি বিপদেই ফেলেচে ! তারা জানে না, একজন শিক্ষানবিশ-ডিটেক্‌টিভের কি সর্ব্বনাশ তারা করেচে !

আর-একটা ব্যাপার, খুনটা টাটকা নয়, সাতদিন আগে খুন হয়ে লাশ পর্য্যন্ত দাহ শেষ—সব ফিনিশ্—গোলমাল চুকে গিয়েচে।

চোখে দেখি নি পর্য্যন্ত সেটা—অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন-টিহ্নগুলো দেখলেও তো যা হয় একটা ধারণা করা যেতো। এ একেবারে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া ! ভীষণ সমস্যা !

মিঃ সোমকে কি একখানা চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাবো ? এমন অবস্থায় পড়লে তিনি নিজে কি করতেন জানাতে বলবো ?

কিন্তু তাও তো উচিত নয়!

মামা যখন বলেচেন, এটা যদি আমার পরীক্ষা হয়, তবে পরীক্ষার হলে যেমন ছেলেরা কাউকে কিছু জিগ্যেস ক'রে.নেয় না—আমায় তাই করতে হবে।

যদি এর কিনারা করতে পারি, তবে মামা বলেচেন, আমাকে এ-লাইনে রাখবেন—নয়তো মিঃ সোমের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবেন, নিয়ে হয়তো কোনো আর্টিস্টের কাছে রেখে ছবি আঁকতে শেখাবেন, বা, বড় দরজির কাছে রেখে শার্ট তৈরী, পাঞ্জাবী তৈরী শেখাবেন।

তবে শিক্ষানবিশের প্রথম পরীক্ষা-হিসেবে পরীক্ষা যে বেশ কঠিন, এতে কোন ভুল নেই।...

ব'সে-ব'সে আরও অনেক কথা ভাবলুম:

...হিসেবের খাতা যে লিখতো, সে নিশ্চয়ই জানতো ঘরে কত টাকা মজুত, বাইরে কত টাকা ছড়ানো। তার পক্ষে জিনিসটা জানা যত সহজ, অপরের পক্ষে তত সহজ নয়।

এ-বিষয়েও একটা গোলমাল আছে। গাঙ্গুলিমশায় টাকার গর্ব্ব মুখে ক'রে বেড়াতেন যেখানে-সেখানে। কত লোক শুনেচে—কত লোক হয়তো জানতো।

একটা কথা আমার হঠাৎ মনে এলো।

কিন্তু, কাকে কথাটা জিগ্যেস করি?

ননী ঘোষের বাড়ী গিয়ে ননী ঘোষের সঙ্গে দেখা করা একবার বিশেষ দরকার। তাকেই এ-কথা জিগ্যেস করতে হবে। সে নাও বলতে পারে অবিশ্যি—তবুও একবার জিগ্যেস করতে দোষ নেই।...

ননী ঘোষ বাড়ীতেই ছিল। আমায় সে চেনে না, একটু তাচ্ছিল্য ও ব্যস্ততার সঙ্গে বল্লে—কি দরকার বাবু? বাড়ী কোথায় আপনার?

আমি বল্লাম—তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে। ঠিক উত্তর দাও। মিথ্যে বল্লে বিপদে প'ড়ে যাবে।

ননীর মুখ শুকিয়ে গেল। দেখলাম সে ভয় পেয়েচে। বুঝেচে যে, আমি গাঙ্গুলিমশায়ের খুন-সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছি—নিশ্চয়ই পুলিসের সাদা পোশাক-পরা ডিটেক্‌টিভ।

সে এবার বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বল্লে—বাবু, যা জিগ্যেস করেন, করুন।

—গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা তুমি লিখতে?

ননী ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে—তা ইয়ে—আমিও লিখিচি দু' একদিন—আর ওই গণেশ ব'লে একটা স্কুলের ছেলে আছে, তাকে দিয়েও—

আমি ধমক দিয়ে বল্লাম—স্কুলের ছেলের কথা হচ্ছে না—তুমি লিখতে কিনা?

ননী ভয়ে-ভয়ে বল্লে—আজ্ঞে, তা লেখতাম।

—কতদিন লিখচো? মিথ্যে কথা বল্লেই ধরা প'ড়ে যাবে। ঠিক বলবে।

—প্রায়ই লেখতাম। দু'বছর ধ'রে লিখচি।

—আর কে লিখতো ?

—ওই যে স্কুলের ছেলে গণেশ—

—তার কথা ছেড়ে দাও, তার বয়েস কত ?

—পনের-ষোলো হবে।

—আর কে লিখতো ?

—আর, সরফরাজ তরফদার লিখতো, সে এখন—

—সরফরাজ তরফদারের বয়েস কত ? কি করে ?

—সে এখন মারা গিয়েছে।

—বাদ দাও সে-কথা। কতদিন মারা গিয়েচে ?

—দু'বছর হবে।

—এইবার একটা কথা জিগ্যেস করি—গাঙ্গুলিমশায়ের কত টাকা বাইরে ছিল জানো ?

—প্রায় দু'হাজার টাকা।

—মিথ্যে বোলো না। খাতা পুলিসের হাতে পড়েচে—মিথ্যে বল্লে মারা যাবে।

—না বাবু, মিথ্যে বলিনি। দু'হাজার হবে।

—ঘরে মজুত কত ছিল ?

—তা জানিনে।

—আবার বাজে কথা ? ঠিক বলো।

—বাবু, আমায় মেরেই ফেলুন আর যাই করুন—মজুত টাকা কত তা আমি কি ক'রে বলবো ? গাঙ্গুলিমশায় আমায় সে টাকা দেখায় নি তো ? খাতায় মজুত-তবিল লেখা থাকতো না।

—একটা আন্দাজ তো আছে ? আন্দাজ কি ছিল ব'লে তোমার মনে হয় ?

—আন্দাজ আর সাত-আট শো টাকা।

—কি ক'রে আন্দাজ করলে ?

—ওঁর মুখের কথা থেকে তাই আন্দাজ হোতো।

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর কতদিন আগে তুমি শেষ খাতা লিখেছিলে ?

—প্রায় দু'মাস আগে। দু'মাসের মধ্যে আমি খাতা লিখিনি—আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলচি। তাছাড়া খাতা বেরুলে হাতের লেখা দেখেই তা আপনি বুঝবেন।

—কোনো মোটা টাকা কি তাঁর মরণের আগে কোনো খাতকে শোধ করেছিল ব'লে তুমি মনে কর ?

—না বাবু! ঊর্দ্ধসংখ্যা ত্রিশ টাকার বেশি তিনি কাউকে ধার দিতেন না, সেটা খুব ভালো করেই জানি। মোটা টাকা মানে, দু'শো একশো টাকা কাউকে তিনি কখনো দেননি।

—এমন তো হতে পারে, পাঁচজন খাতকে ত্রিশ টাকা ক'রে শোধ দিয়ে গেল একদিনে ? দেড়শো টাকা হোলো ?

—তা হতে পারে বাবু, কিন্তু তা সম্ভব নয়। একদিনে পাঁচজন খাতকে টাকা শোধ দেবে না। আর-একটা কথা বাবু। চাষী-খাতক সব—ভাদ্রমাসে ধান হবার সময় নয়—এখন যে চাষী-প্রজারা টাকা শোধ দিয়ে যাবে, তা মনে হয় না। ওরা শোধ দেয় পৌষ মাসে—আবার ধার নেয় ধান-পাট বুনবার সময়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এ-সময় লেন-দেন বন্ধ থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কোনো কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না ননীর কাছে। তবুও আমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে গেল না। ননী হয় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, নয়তো সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত। মিঃ সোম একটা কথা সব-সময়ে বলেন, "বাইরের চেহারা বা কথাবার্ত্তা দ্বারা কখনো মানুষের আসল রূপ জানবার চেষ্টা কোরো না—করলেই ঠকতে হবে। ভীষণ চেহারার লোকের মধ্যে অনেক সময় সাধুপুরুষ বাস করে—আবার অত্যন্ত সুশ্রী ভদ্রবেশী লোকের মধ্যে সমাজের কণ্টকস্বরূপ দানব-প্রকৃতির বদমাইশ বাস করে। এ আমি যে কতবার দেখেচি!"

ননীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর পেছনটা একবার ভালো ক'রে দেখবার জন্যে গেলাম।

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীতে একখানা মাত্র খড়ের ঘর। তার সঙ্গে লাগাও ছোট্ট রান্নাঘর। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে যাওয়া যায়। এসব আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।

তাকে বল্লাম—আপনার পিতার হত্যাকারীকে যদি খুঁজে বার করতে পারি, আপনি খুব খুশী হবেন?

সে প্রায় কেঁদে ফেলে বল্লে—খুশী কি, আপনাকে পাঁচশো টাকা দেবো।

—টাকা দিতে হবে না। আমায় সাহায্য করুন। আর-কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে।

—নিশ্চয় করবো। বলুন কি করতে হবে?

—আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন আপাততঃ। তারপর বলবো যখন যা করতে হবে। আচ্ছা, চলুন তো বাড়ীর পিছন দিকটা একবার দেখি?

—বড্ড জঙ্গল, যাবেন ওদিকে?

—জঙ্গল দেখলে তো আমাদের চলবে না—চলুন দেখি।

সত্যিই ঘন আগাছার জঙ্গল আর বড়-বড় বনগাছের ভিড় বাড়ীর পেছনেই। পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়ে থাকে—বিশেষ ক'রে এই শ্যামপুরে জঙ্গল একটু বেশি। বড়-বড় ভিটে লোকশূন্য ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বহুকাল থেকে। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে দেশ উৎসন্ন গিয়েছিল বিশ-ত্রিশ বছর আগে। এখন পাড়ায়-পাড়ায় নলকূপ হয়েচে জেলাবোর্ডের অনুগ্রহে, ম্যালেরিয়াও অনেক কমেচে—কিন্তু লোক আর ফিরে আসেনি!

জঙ্গলের মধ্যে বর্ষার দিনে মশার কামড় খেয়ে হাত-পা ফুলে উঠলো। আমি প্রত্যেক

স্থান তন্নতন্ন ক'রে দেখলাম। সাত-আটদিনের পূর্ব্বের ঘটনা, পায়ের চিহ্ন যদি কোথাও থাকতে পারে—তবে এখানেই তা থাকা সম্ভব।

কিন্তু জায়গাটা দেখে হতাশ হোতে হোলো।

জমিটা মুথো-ঘাসে ঢাকা—বর্ষায় সে ঘাস বেড়ে হাতখানেক লম্বা হয়েচে। তার ওপর পায়ের দাগ থাকা সম্ভবপর নয়।

আমার মনে হোলো, খুনী রাত্রে এসেছিল ঠিক এই পথে। সামনের পথ লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে—কখনই সে-পথে আসতে সাহস করে নি।

অনেকক্ষণ তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখেও সন্দেহজনক কোনো জিনিস চোখে পড়লো না—কেবল এক জায়গায় একটা সেওড়াগাছের ডাল ভাঙা অবস্থায় দেখে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলেকে বল্লাম—এই ডালটা ভেঙে কে দাঁতন করেছিল, আপনি?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে আশ্চর্য হয়ে বল্লে—না, আমি এ-জঙ্গলে দাঁতন-কাঠি ভাঙতে আসবো কেন?

—তাই জিগ্যেস করচি।

—আপনি কি ক'রে জানলেন, ডাল ভেঙে কেউ দাঁতন করেচে?

—ভাল করে চেয়ে দেখুন। একরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুচ্‌ড়ে ভেঙেচে ডালটা—তাছাড়া এতগুলো সেওড়া-ডালের মধ্যে একটিমাত্র ডাল ভাঙা। মানুষের হাতে ভাঙা বেশ বোঝা যাচ্চে। দাঁতনকাঠি সংগ্রহ ছাড়া অন্য কি উদ্দেশ্যে এভাবে একটা ডাল কেউ ভাঙতে পারে?

—আপনার দেখবার চোখ তো অদ্ভুত! আমার তো মশাই ও চোখেই পড়তো না!

—আচ্ছা, দেখে বলুন তো, কত দিন আগে এ-ডালটা ভাঙা হয়েচে?

—অনেক দিন আগে।

—খুব বেশি দিন আগে না। মোচ্‌ড়ানো-অংশের গোড়াটা দেখে মনে হয়, ছ'সাতদিন আগে। এর চেয়েও নিখুঁতভাবে বলা যায়। ঐ অংশের সেলুলোজ্‌ অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে ধরা পড়বে। আমি এই গাছের ভাঙা-ডালটা কেটে নিয়ে যাবো, একটা দা' আনুন তো দয়া ক'রে?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের মুখ দেখে বুঝলাম সে বেশ একটু অবাক হয়েচে। ভাঙা-দাঁতন-কাঠি নিয়ে আমার এত মাথাব্যথার কারণ কি বুঝতে পারচে না।

সে পিছন ফিরে দা' আনতে যেতে উদ্যত হোলো—কিন্তু দু'চার পা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ঘাসের মধ্যে থেকে কি একটা জিনিস হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—এটা কি?

আমি তার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে দেখলাম, সেটা একটা কাঠের ছোট্ট গোলাকৃতি পাত। ভালো করে আলোয় নিয়ে এসে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, পাতের গায়ে একটা খোদাই কাজ। একটা ফুল, ফুলটার নীচে একটা শেয়ালের মত জানোয়ার।

শ্রীগোপাল বল্লে—এটা কি বলুন তো?

আমি বুঝতে পারলাম না, কি জিনিস এটা হতে পারে তাও আন্দাজ করতে পারলাম না।

জিনিসটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। যাবার আগে সেওড়াগাছের ভাঙা-ডালের গোড়াটা কেটে নিয়ে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন থানায় গিয়ে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি আমায় সমাদর ক'রে বসালেন—আমায় বল্লেন, তাঁর দ্বারা যতদূর সাহায্য হওয়া সম্ভব, তা তিনি করবেন।

আমি বল্লাম—আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু তদন্ত করেচেন?

—তদন্ত করা শেষ করেচি। তবে, আসামী বার-করা ডিটেকটিভ ভিন্ন সম্ভব নয় এক্ষেত্রে!

—ননী ঘোষকে আমার সন্দেহ হয়।

—আমারও হয়, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ হবে না।

—ওকে চালান দিন্ না, ভয় খেয়ে যাক্! খুনের রাত্রে ও অনুপস্থিত ছিল। কোথায় ছিল তার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারে নি।

—আপনি ওকে চালান দিতে পরামর্শ দেন?

—দিলে ভালো হয়। এর মধ্যে আর-একটা উদ্দেশ্য আছে—বুঝেচেন নিশ্চয়ই।

দারোগাবাবু হেসে বল্লেন—এতদিন পুলিসের চাকরি ক'রে তা আর বুঝিনি মশায়? ওকে চালান দিলে সত্যিকার হত্যাকারী কিছু অসতর্ক হয়ে পড়বে এবং যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তবে বেরিয়ে আসবে—এই তো?

—ঠিক তাই—যদিও ননী ঘোষকে আমি বেশ সন্দেহ করি। লোকটা ধূর্ত্ত-প্রকৃতির।

—কাল আমি লোকজন নিয়ে গ্রামে গিয়ে ডেকে বলবো—ননীকে কালই চালান দেবো।

—চালান দেওয়ার সময় গ্রামের সব লোকের সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার।

দারোগাবাবু বল্লেন—দাঁড়ান, একটা কথা আছে। হিসেবের খাতার একখানা পাতা সে-দিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে। পাতাখানা একবার দেখুন।

একখানা হাতচিঠে-কাগজের পাতা নিয়ে এসে দারোগাবাবু আমার হাতে দিলেন।

আমি হাতে নিয়ে বল্লাম—এ তো ননীর হাতের লেখা নয়!

—না, এ গণেশের হাতের লেখাও নয়।

—সরফরাজ তরফদারও নয়। কারণ, সে মারা যাওয়ার পরে এ লেখা। তারিখ দেখুন।

—তবে, খুনের অনেকদিন আগে এ লেখা হয়েচে—চার মাসেরও বেশী আগে।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিল হয়ে পড়চে মশায়। আমি একটা জিনিস আপনাকে ভবে দেখাই।

দারোগাবাবুর হাতে কাঠের পাতটা দিয়ে বল্লাম—এ জিনিসটা দেখুন।

দারোগাবাবু সেটা হাতে নিয়ে বল্লেন—কি এটা?

—কি জিনিসটা তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর পেছনের জঙ্গলে এটা কুড়িয়ে পেয়েচি। আর-একটা জিনিস দেখুন।

ব'লে সেওড়াডালের গোড়াটা তাঁর হাতে দিতেই তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—এ তো একটা শুকনো গাছের ডাল—এতে কি হবে?

—ওতেই একটা মস্ত সন্ধান দিয়েচে। জানেন? যে খুন করেচে, সে ভোর রাত পর্য্যন্ত গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী ছাড়ে নি। ভোরের দিকে রাত পোহাতে দেরি নেই দেখে সরে পড়েচে। যাবার সময় অভ্যাসের বশে সেওড়াডালের দাঁতন করেচে।

দারোগামশায় হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লেন—আপনারা যে দেখচি মশায়, স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন! এত কল্পনা ক'রে পুলিসের কাজ চলে? কোথায় একটা দাঁতনকাঠির ভাঙা গোড়া!

—আমি জানি আমার গুরু মিঃ সোম একবার একটা ভাঙা দেশলাইয়ের কাঠিকে সূত্র ধ'রে আসামী পাক্‌ড়েছিলেন।

দারোগাবাবু হাসতে-হাসতে বল্লেন—বেশ, আপনিও ধরুন না দাঁতনকাঠি থেকে, আমার আপত্তি কি?

—যদি আমি এটাকে এত প্রয়োজনীয় মনে না করতাম, তবে এটা এতদিন সঙ্গে নিয়ে বেড়াই? যে দুটো জিনিস পেয়েচি, তাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে—এও আমার বিশ্বাস।

—কি রকম?

—যে দাঁতনকাঠি ভেঙেচে—তার বা তাদের দলের লোকের এই কাঠের পাতখানাও!

—পাতখানা কি?

—সে-কথা পরে বলবো। আর-একটা সন্ধান দিয়েচে এই দাঁতনকাঠিটা।

—কি?

—সেটা এই: দোষীর বা দোষীর দলের কারো দাঁতন করবার অভ্যেস আছে। দাঁতন করবার যার প্রতিদিনের অভ্যেস নেই—সে এরকম দাঁতন নিপুণভাবে মোচড় দিয়ে ভাঙতে জানবে না। এবং সম্ভবত সে বাঙালী এবং পল্লীগ্রামবাসী। হিন্দুস্থানীরা দাঁতন করে, কিন্তু দেখবেন, তারা সেওড়াডালের দাঁতন করতে জানে না—তারা নিম, বা বাব্‌লাগাছের দাঁতন-কাঠি ব্যবহার করে সাধারণত। এ লোকটা বাঙালী এ-বিষয়ে ভুল নেই।

সেইদিনই আমি কলকাতায় মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা করলাম। সেওড়াডালের গোড়াটা আমি তাঁকে দেখাই নি—কাঠের পাতটা তাঁর হাতে দিয়ে বল্লাম—এটা কি ব'লে আপনি মনে করেন?

* * *

তিনি জিনিসটা দেখে বল্লেন—এ তুমি কোথায় পেলে ?

—সে-কথা আপনাকে এখন বলবো না, ক্ষমা করবেন।

—এটা আসামে মিস্‌মি-জাতির মধ্যে প্রচলিত রক্ষাকবচ। দেখবে ? আমার কাছে আছে।

মিঃ সোমের বাড়ীতে নানা দেশের অদ্ভুত জিনিসের একটা প্রাইভেট মিউজিয়াম-মত আছে। তিনি তাঁর সংগৃহীত দ্রব্যগুলির মধ্যে থেকে সেই রকম একটা কাঠের পাত এনে আমার হাতে দিলেন।

আমি বল্লাম—আপনারটা একটু বড়। কিন্তু চিহ্ন একই—ফুল আর শেয়াল।

—ওটা ফুল নয়, নক্ষত্র—দেবতার প্রতীক, আর নীচে উপাসনাকারী মানুষের প্রতীক—পশু!

—কোন দেশের জিনিস বল্লেন ?

—নাগা পর্ব্বতের নানা স্থানে এ-কবচ প্রচলিত—বিশেষ ক'রে ডিব্রু-সদিয়া অঞ্চলে।

আমি তাঁর হাত থেকে আমার পাতটা নিয়ে তারপর বল্লাম—এই সেওড়াডালটা ক'দিনের ভাঙা ব'লে মনে হয় ?

তিনি বল্লেন—ভালো ক'রে দেখে দেবো ? আচ্ছা, বোসো।

সেটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু পরে ফিরে এসে বল্লেন—আট ন'দিন আগে ভাঙা।

আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম নিজের বাসায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার মনে একটা বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠচে। গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করতে এবং খুনের পরে তাঁর ঘরের মধ্যে খুঁড়ে দেখতে খুনীর লেগেছিল সারারাত। যুক্তির দিক থেকে হয়তো এর অনেক দোষ বার করা যাবে—কিন্তু আমি অনেক সময় অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে অগ্রসর হয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছি।

কিন্তু ননী ঘোষকে আমি এখনও রেহাই দিই নি। শ্যামপুরে ফিরেই আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমায় দেখে ননীর মুখ শুকিয়ে গেল—তাও আমার চোখ এড়ালো না।

বল্লাম—শোনো ননী, আবার এলাম তোমায় জ্বালাতে—কতকগুলো কথা জিগ্যেস করবো।

—আজ্ঞে, বলুন!

—গাঙ্গুলিমশায় যেদিন খুন হন, সে-রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে ?

ননীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বল্লে, আজ্ঞে…

—বলো কোথায় ছিলে। বাড়ী ছিলে না—

—আজ্ঞে না। সামটায় শ্বশুরবাড়ী যেতে-যেতে সেদিন দেবনাথপুরের হাটতলায় রাত কাটাই।

—কেউ দেখেচে তোমায় ?

ননী বল্লে—আজ্ঞে, তা যদিও দেখে নি—

—কেন দেখে নি ?

—রাত হয়ে গেল দেখে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন কেউ সেখানে ছিল না।

—খেয়াঘাট পার হওনি দেবনাথপুরে ?

—হ্যাঁ বাবু। অনেক লোক একসঙ্গে পার হয়েছিল। আমায় তো পাটনি চিনে রাখে নি!

—বাড়ী এসেছিলে কবে ?

—শনিবার দুপুরবেলা।

—গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েচেন কার মুখে শুনলে ?

—আজ্ঞে, গাঁয়ে ঢুকেই মাঠে কাপালিদের মুখে শুনি।

—কার মুখে শুনেছিলে তার নাম বলো।

—আজ্ঞে, ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধ হয় হীরু কাপালি—

—তার কাছে গিয়ে প্রমাণ ক'রে দিতে পারবে ?

ননী ইতস্তত ক'রে বল্লে—আজ্ঞে, ঠিক তো মনে নেই ; যদি হীরু না হয় ?

ননীর কথায় আমার সন্দেহ আরো বেশী হোলো। সে-রাত্রে ও ঘরে ছিল না, অথচ কোথায় ছিল তা পরিষ্কার প্রমাণও দিতে পারছে না। গোপনে সন্ধান নিয়ে আরও জানলাম, ননী সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিল। আজ দু'দিন হোলো এসেচে। ননীকে জিগ্যেস ক'রে কোনো লাভ নেই, ও সত্যি কথা বলবে না। একটা কিছু কাণ্ড ও ঘটাচ্চে নাকি তলে-তলে ? কিছু বোঝা যাচ্চে না।

দু'দিন পরে শ্রীগোপাল এসে আমায় খবর দিলে, গ্রামের মহীন্ সেকরাকে সে ডেকে এনেচে—আমার সঙ্গে দেখা করবে, বিশেষ কাজ আছে।

মহীন্ সেকরার বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর। নিতান্ত ভালোমানুষ গ্রাম্য-সেকরা, ঘোরপেঁচ জানে না বলেই মনে হোলো।

শ্রীগোপালকে বল্লাম—একে কেন এনেচ ?

—এ কি বলচে শুনুন।

—কি মহীন্ ?

—বাবু, ননী ঘোষ আমার কাছে এগারো ভরি সোনার তাবিজ আর হার তৈরী ক'রে নিয়েচে—আজ তিন-চারদিন আগে।

—দাম কত ?

—সাতাশ টাকা ক'রে ভরি, হিসেব করুন।

—টাকা নগদ দিয়েছিল ?

—হ্যাঁ বাবু।

—সে টাকা তোমার কাছে আছে ? নোট, না নগদ ?

—নগদ। টাকা নেই বাবু, তাই নিয়ে মহাজনের ঘর থেকে সোনা কিনে এনে গহনা গড়ি !

—দু' একটা টাকাও নেই ?

—না বাবু।

—তোমার মহাজনের কাছে আছে ?

—বাবু, রাণাঘাটের শীতল পোদ্দারের দোকানে কত সোনা কেনা-বেচা হচ্চে দিনে। আমার সে টাকা কি তারা বসিয়ে রেখেচে ?

—শীতল পোদ্দার নাম ? আমার সঙ্গে তুমি চলো রাণাঘাটে আজই।

বেলা তিনটের ট্রেনে মহীন্ সেকরাকে নিয়ে রাণাঘাটে শীতল পোদ্দারের দোকানে হাজির হোলাম। সঙ্গে মহীন্‌কে দেখে বুড়ো পোদ্দারমশায় ভাবলে, বড় খরিদ্দার একজন এনেচে মহীন্। তাদের আদর-অভ্যর্থনাকে উপেক্ষা ক'রে আমি আসল কাজের কথা পাড়লাম, একটু কড়া—রুক্ষস্বরে।

বল্লাম—সেদিন এই মহীন্ আপনাদের ঘরে সোনা কিনেছিল এগারো ভরি ?

পোদ্দারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো ভয়ে—ভাবলে, এ নিশ্চয়ই পুলিসের হাঙ্গামা! সে ভয়ে-ভয়ে বল্লে—হ্যাঁ বাবু, কিনেছিল।

—টাকা নগদ দেয় ?

—তা দিয়েছিল।

—সে টাকা আছে ?

—না বাবু, টাকা কখনো থাকে ? আমাদের বড় কারবার, কোথাকার টাকা কোথায় গিয়েচে !

আমিও ওকে ভয় দেখানোর জন্যে কড়া সুরে বল্লাম—ঠিক কথা বলো। টাকা যদি থাকে আনিয়ে দাও—তোমার ভয় নেই। চুরির ব্যাপারে নয়, মহীনের কোনো দোষ নেই। তোমাদের কোনো পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে না—কেবল কোর্টে সাক্ষী দিতে হতে পারে। টাকা বার করো।

মহীন্‌ও বল্লে—পোদ্দারমশায়, আমাদের কোনো ভয় নেই, বাবু বলেচেন। টাকা যদি থাকে, দেখান বাবুকে।

পোদ্দার বল্লে—কিন্তু বাবু, একটা কথা। টাকা তো সব সমান, টাকার গায়ে কি নাম লেখা আছে ?

—সে-কথায় তোমার দরকার নেই। নাম লেখা থাক্ না থাক্—টাকা তুমি বার করো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শীতল পোদ্দার টাকা বার ক'রে নিয়ে এলো একটা থলির মধ্যে থেকে। বল্লে—সেদিনকার তহবিল আলাদা করা ছিল। সোনা বিক্রির তহবিল আমাদের আলাদা থাকে, কারণ, এই নিয়ে মহাজনের সোনা কিনতে যেতে হয়। টাকা হাতে নিয়ে দেখবার আগেই শীতল একটা কথা বল্লে—যা আমার কাছে আশ্চর্য ব'লে মনে হোলো। সে বল্লে—বাবু, এগুলো পুরোনো টাকা, পোঁতা-টোতা ছিল ব'লে মনে হয়, এ চুরির টাকা নয়।

আমি প্রায় চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। মহীন্ সেকরার মুখ দেখি বিবর্ণ হয়ে উঠেচে।

আমি বল্লাম—তুমি কি ক'রে জানলে এ পুরোনো টাকা?

—দেখুন আপনিও হাতে নিয়ে! পুরোনো কলঙ্ক-ধরা রূপো দেখলে আমাদের চোখে কি চিনতে বাকি থাকে বাবু! এই নিয়ে কারবার করচি যখন!

—কতদিনের পুরোনো টাকা এ?

—বিশ-পঁচিশ বছরের।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, বিশ বৎসরের পরের কোনো সালের অঙ্ক টাকার গায়ে লেখা নেই। বল্লাম—মাটিতে পোঁতা টাকা ব'লে ঠিক মনে হচ্চে?

—নিশ্চয়ই বাবু। পেতলের হাঁড়িতে পোঁতা ছিল। পেতলের কলঙ্ক লেগেচে টাকার গায়ে।

আচ্ছা, তুমি এ-টাকা আলাদা ক'রে রেখে দাও। আমি পুলিস নই, কিন্তু পুলিস শীগ্‌গির এসে এ-টাকা চাইবে, মনে থাকে যেন।

শীতল পোদ্দার আমার সামনে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বল্লে—দোহাই বাবু, দেখবেন, যেন আমি এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি। কোনো দোষে দুষী নই বাবু, মহীন্ আমার পুরোনো খাতক আর খদ্দের, ও কোথা থেকে টাকা এনেচে তা আমি কেমন ক'রে জানবো বাবু, বলুন?

মহীন্‌কে নিয়ে দোকানের বাইরে চলে এলাম। দেখি, ও ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেচে। বল্লাম—কি মহীন্ তোমার ভয় কি? তুমি গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করো নি তো?

মহীন্ বল্লে—খুন? গাঙ্গুলিমশায়কে? কি যে বলেন বাবু!

দেখলাম ওর সর্ব্বশরীর যেন থরথর ক'রে কাঁপচে।

কেন, ওর এত ভয় হোলো কিসের জন্যে?

আমরা ডিটেক্‌টিভ, আসামী ধরতে বেরিয়ে কাউকে সাধু ব'লে ভাবা আমাদের স্বভাব নয়। মিঃ সোম আমার শিক্ষাগুরু—তাঁর একটি মূল্যবান্ উপদেশ হচ্ছে, যে-বাড়ীতে খুন হয়েচে বা চুরি হয়েচে—সে-বাড়ীর প্রত্যেককেই ভাববে খুনী ও চোর। প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখবে, তবে খুনের কিনারা করতে পারবে—নতুবা পদে-পদে ঠকতে হবে।

ননী ঘোষ তো আছেই এর মধ্যে, এ সন্দেহ আমার এখন বদ্ধমূল হোলো। বিশেষ

ক'রে টাকা দেখবার পরে আদৌ সে-সন্দেহ না থাকবারই কথা।

কিন্তু এখন আবার একটা নতুন সন্দেহ এসে উপস্থিত হোলো।

এই মহীন্ সেকরার সঙ্গে খুনের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

কথাটা ট্রেনে ব'সে ভাবলাম। মহীন্‌ও কামরার একপাশে ব'সে আছে। সে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি—জানলা দিয়ে পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে ভীত চোখে বাইরের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মহীনের যোগাযোগে ননী ঘোষ খুন করে নি তো? দুজনে মিলে হয়-তো এ-কাজ করেচে। কিংবা এমনও কি হতে পারে না যে, মহীন্‌ই খুন করেচে, ননী ঘোষ নির্দ্দোষী?

তবে একটা কথা, ননী ঘোষের হাতেই খাতাপত্র—কত টাকা আসচে-যাচ্চে, ননীই তো জানতো, মহীন্ সেকরা সে খবর কি ক'রে রাখবে!...

তখুনি একটা কথা মনে পড়লো। গাঙ্গুলিমশায় ছিলেন সরলপ্রাণ লোক, যেখানে-সেখানে নিজের টাকা-কড়ির গল্প ক'রে বেড়াতেন, সবাই জানে।

মহীন্‌কে বল্লাম—তোমার দোকানে অনেকে বেড়াতে যায়, না?

মহীন্ যেন চমকে উঠে বল্লে—হ্যাঁ বাবু।

—গাঙ্গুলিমশায়ও যেতেন?

—তা যেতেন বইকি বাবু।

—গিয়ে গল্প-টল্প করতেন?

—তা করতেন বইকি বাবু।

—টাকাকড়ির কথা কখনো বলতেন তোমার দোকানে ব'সে?

—সেটা তো তাঁর স্বভাব ছিল—সে-কথাও বলতেন মাঝে মাঝে।

—ননী ঘোষের সঙ্গে তোমার খুব মাখামাখি ভাব ছিল?

—আমার দোকানে আসতো গহনা গড়াতে। আমার খদ্দের। এ থেকে যা আলাপ—তাছাড়া সে আমার গাঁয়ের লোক। খুব মাখামাখি ভাব আর এমন কি থাকবে? যেমন থাকে।

—তুমি আর ননী দু'জনে মিলে গাঙ্গুলিমশায়কে খুন ক'রে টাকা ভাগাভাগি ক'রে নিয়েচো—কেমন কি না?

এই প্রশ্ন ক'রেই আমি ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম। ভয়ের রেখা ফুটে উঠলো ওর মুখে! ও আমার মুখের দিকে বড়-বড় চোখ ক'রে বল্লে—কি যে বলেন বাবু! আমি ব্রহ্মহত্যার পাতক হবো টাকার জন্যে! দোহাই ধর্ম্ম, আপনাকে সত্যি কথা বলচি বাবু!

কিছু বুঝতে পারা গেল না। কেউ-কেউ থাকে, নিপুণ ধরণের স্বাভাবিক অভিনেতা। তাদের কথাবার্ত্তা, হাবভাবে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়—এ আমি কতবার দেখেচি।

শ্যামপুরে ফিরে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দেখা করলাম।

শ্রীগোপাল বল্লে—থানা থেকে দারোগাবাবু আর ইন্‌স্পেক্টরবাবু এসেছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন।

—তুমি গহনার কথা কিছু বল্লে নাকি তাঁদের?

—না। আমি কেন সে-কথা বলতে যাবো? আমাকে কোন কথা তো ব'লে দেন নি?

—বেশ করেচো।

—ওঁরা আপনার সেই কাঠের তক্তামত-জিনিসটা দেখতে চাইছিলেন।

—কেন?

—সে-কথা কিছু বলেন নি।

—তাঁরা ও দেখে কিছু করতে পারেন, আমি তাঁদের দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁরা পারবেন ব'লে আমার ধারণা নেই।

বিকেলের দিকে আমি নির্জ্জনে ব'সে অনেকক্ষণ ভাবলাম।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিস্‌মি-জাতির কাষ্ঠনির্ম্মিত রক্ষাকবচের সঙ্গে এই খুনীর যোগ আছে। সেই রক্ষাকবচ প্রাপ্তি এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে, আমার কাছে সেটা রীতিমত সমস্যা হয়ে উঠচে ক্রমশ।

ননী ঘোষের সঙ্গেও এর সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে উঠেচে, যেটা আর কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। শীতল পোদ্দারের দোকানের টাকার কথা যদি পুলিসকে বলি, তবে তারা এখুনি ননীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সে-দিক থেকে মস্ত বাধা হচ্ছে, সে-টাকা যে ননী ঘোষ দিয়েছিল মহীন্‌কে, তার প্রমাণ কি?

মহীনের কথার উপর নির্ভর করা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রমাণ নেই।

শীতল পোদ্দারও তো ভুল করতে পারে।

হয়তো এমনও হোতে পারে, মহীন্ সেকরাই আসল খুনী। তার দোকানে ব'সে গাঙ্গুলি-মশায় কখনো টাকার গল্প ক'রে থাকবেন—তারপর সুবিধে পেয়ে মহীন্ গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করেছে, পোঁতা-টাকা পোদ্দারের দোকানে চালিয়ে এখন ননীর ওপর দোষ চাপাচ্ছে...

ননী ঘোষের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা করলাম।

ওকে দেখেই কিন্তু আমার মনে কেমন সন্দেহ হোলো, লোকটার মধ্যে কোথায় কি গলদ আছে, ও খুব সাচ্চা লোক নয়। আমাকে দেখে প্রতিবারই ও কেমন হয়ে যায়!

লোকটা ধূর্ত্তও বটে। ওর চোখ-মুখের ভাবেও সেটা বোঝা যায় বেশ।

ওকে জিগ্যেস করলাম—তুমি মহীনের দোকান থেকে তাবিজ গড়িয়েছ সম্প্রতি?

ননী বিবর্ণমুখে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—হাঁ্যা—তা—হাঁ্যা বাবু—

—অত টাকা হঠাৎ পেলে কোথায়?

—হঠাৎ কেন বাবু! আমরা তিনপুরুষে ঘি-মাখনের ব্যবসা করি। টাকা হাতে ছিল, তা ভাবলাম, নগদ টাকা পাড়াগাঁয়ে রাখা—

—টাকা নগদ দিয়েছিলেন, না, নোটে?

—নগদ।

—সব টাকা তোমার ঘি-মাখন বিক্রির টাকা?

—হ্যাঁ বাবু।

ননীকে ছেড়ে দিয়ে গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেরুলাম। ননী অত্যন্ত ধূর্ত্ত লোক, ওর কাছ থেকে কথা বার করা চলবে না দেখা যাচ্চে।

বেড়াতে-বেড়াতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর কাছে গিয়ে পড়েছি, এমন সময় দেখি কে একজন ভদ্রলোক গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইচেন।

আমাকে দেখে শ্রীগোপাল বল্লে—এই যে! আসুন, চা খাবেন।

—না, এখন খাবো না। ব্যস্ত আছি।

—আসুন, আলাপ করিয়ে দিই···ইনি সুশীল রায়, আর ইনি জানকীনাথ বড়ুয়া, আমাদের পাড়ার জামাই—আমার বাড়ীর পাশের ওই বুড়ি-দিদিমার জামাই। উনিও একটু—একটু—মানে—ওঁকে সব বলেছিলাম।

আমি বুঝলাম, জানকী বড়ুয়া আর যাই হোক্‌, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর-একজন প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ। মনটা হঠাৎ যেন বিরূপ হয়ে উঠলো শ্রীগোপালের প্রতি। সে আমার ওপর এরই মধ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে এবং কোথা থেকে আর-একজন গোয়েন্দা আমদানি ক'রে তাকে সব ঘটনা খুলে বলছিল, আমাকে আসতে দেখে থেমে গিয়েচে।

আমি জানকীবাবুকে বল্লাম—আপনি কি বুঝচেন?

—কি সম্বন্ধে?

—খুন সম্বন্ধে।

—কিছুই না। তবে আমার মনে হয়—

—কি, বলুন?

—এখানকার লোকই খুন করেচে।

—আপনি বলছেন—এই গাঁয়ের লোক?

—এই গাঁয়ের জানাশোনা লোক ভিন্ন এ-কাজ হয় নি। ননী ঘোষের সম্বন্ধে আপনার মনে কি হয়?

আমি বিস্মিতভাবে জানকীবাবুর মুখের দিকে চাইলাম! তাহোলে শ্রীগোপাল দেখচি ননী ঘোষের কথাও এই ভদ্রলোকের কাছে বলেচে! ভারি রাগ হোলো শ্রীগোপালের ব্যবহারে।

আমার ওপর তাহোলে আদৌ আস্থা নেই ওর দেখচি।

একবার মনে হোলো, জানকীবাবুর কথার কোনো উত্তর আমি দেবো না। অবশেষে ভদ্রতা-বোধেরই জয় হোলো। বল্লাম—ননী ঘোষের কথা আপনাকে কে বল্লে?

—কেন, শ্রীগোপালের মুখে সব শুনেচি।

—আপনি তাকে সন্দেহ করেন?

—খুব করি! তার সঙ্গে এখুনি দেখা করা দরকার। তার হাতেই যখন টাকার হিসেব লেখা হোতো···

—দেখুন না, ভালোই তো।

হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বল্লেন—আচ্ছা, আপনি ঘটনাস্থলে ভালো ক'রে খুঁজেছিলেন ?

—খুঁজেছিলাম বই কি।

—কিছু পেয়েছিলেন ?

আমি জানকীবাবুর এ-প্রশ্নে দস্তুরমত বিস্মিত হোলাম। যদি তিনি নিজেও একজন গোয়েন্দা হন, তবে তাঁর পক্ষে অন্য-একজন সমব্যবসায়ী লোককে এ-কথা জিগ্যেস করা শোভনতা ও সৌজন্যের বিরুদ্ধে, বিশেষত যখন আগে-থেকেই এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত আছি।

আমি নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলাম—না, এমন বিশেষ কিছু না।

জানকীবাবু পুনরায় জিগ্যেস করলেন—তাহোলে কিছুই পান নি ?

—কিছুই না তেমন।

কাঠের পাতের কথাটা জানকীবাবুকে বলবার ইচ্ছে হোলো না। জানকীবাবুকে ব'লে কি হবে ? তিনি কি বুঝতে পারবেন জিনিসটা আসলে কি ? মিঃ সোমের সাহায্য ব্যতীত কি আমারই বোঝার কোনো সাধ্য ছিল ? মিঃ সোমের মত পণ্ডিত ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা খুব বেশী নেই এদেশে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

জানকীবাবু চলে গেলে আমি শ্রীগোপালকে বল্লাম—তুমি এঁকে কি বলেছিলে ?

—কি বলবো।

—ননী ঘোষের কথা বলেচো ?

—হ্যাঁ, তা বলেছি।

আমি ওকে তিরস্কারের সুরে বল্লাম—আমাকে তোমার বিশ্বাস না হোতে পারে—তা ব'লে আমার আবিষ্কৃত ঘটনা-সূত্রগুলো তোমার অন্য ডিটেক্‌টিভকে দেওয়ার কি অধিকার আছে ?

শ্রীগোপাল চুপ ক'রে রইলো। ওর নির্ব্বুদ্ধিতায় ও অবিবেচকতায় আমি যারপরনাই বিরক্তি বোধ করলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি মহীন্ সেকরার সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলাম। মহীন্ আমায় দেখে ভয়ে-ভয়ে একটা টুল পেতে দিলে বসবার জন্যে।

আমি বল্লাম—মহীন্, একটা সত্যি কথা বলবে ?

—কি, বলুন।

—তোমার সঙ্গে ননীর ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল কিছুকাল আগে ?

মহীন্ আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে বল্লে—ননী বলেচে বুঝি? সব মিথ্যে কথা ওর বাবু, সব মিথ্যে।

আমি কড়াসুড়ে বল্লাম—ঝগড়া হয়েছিল তাহোলে? সত্যি বলো!

মহীন্ চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে-আস্তে বল্লে—হয়েছিল বাবু, কিন্তু আমার তাতে কোনো দোষ···

—আমি সে-কথা বলি নি—ঝগড়া হয়েছিল কিনা জিগ্যেস করচি।

—হ্যাঁ বাবু।

—কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, বলো এবার!

—সোনার দর নিয়ে বাবু।

—আচ্ছা, তুমি শ্রীগোপালের কাছে ননী ঘোষের তাবিজ গড়ানোর কথা এইজন্যে বলেছিলে—কেমন, ঠিক কিনা?

—হ্যাঁ বাবু।

—তুমি তখন ভেবেছিলে যে, ননী ঘোষই খুন করেচে?

—তা—না—

—ঠিক বলো।

—না বাবু।

—তাহোলে তুমিও যে দোষী হবে আইনত; তাই ভাবচো বুঝি?

—মহীন্ সেকরা ভয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো, বল্লে—বাবু, তা—তা—

—তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্যে থানায় খবর দেবো!

মহীন্ আমার পা জড়িয়ে ধরে বল্লে—দোহাই বাবু, আমার সব কথা শুনুন আগে। আপনি দেশের লোক—আমার সর্ব্বনাশ করবেন না বাবু—কাচ্চা-বাচ্চা মারা যাবে।

—কি, বলো!

—তখন আমিও লুটের টাকা ব'লে সন্দেহ করি নি। কি ক'রে করবো! বলুন বাবু, তা কি সম্ভব?

—তবে, কখন সন্দেহ করলে?

—বাবু, শ্রীগোপালই আমায় বল্লে, আপনি ননী ঘোষকে সন্দেহ করেন। তখন আমি ভাবলাম, গহনার কথাটা প্রমাণ না করলে আমি মারা যাবো এর পরে। তাই বলেছিলাম।

শ্রীগোপালের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখচি নানা দিক থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। যদি ওর বাবার খুনের আসামী ধরা না পড়ে, তবে সেটা ওর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যেই ঘটবে।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাটা শ্রীগোপালকে বলবার জন্যে তার বাড়ীর দিকে চল্লাম।

রাস্তাটা বাড়ীর পেছনের দিকে—শীগ্‌গির হবে ব'লে 'শর্ট-কাট' করতে গেলাম বনের মধ্যে দিয়ে। সেই বন—যেখানে আমি সেদিন মিস্‌মি-জাতির কবচ ও দাঁতনকাঠির গোড়া সংগ্রহ করেছিলাম।

অন্ধকারেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা সাদা-মত কি কিছুদূরে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিনিসটা নড়চে-চড়চে আবার। অন্ধকারের জন্যে ভয় যেন বুকের রক্ত হিম ক'রে দিলে।

এই বনের পরেই গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী—গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত নাকি রে বাবা!

হঠাৎ একটা টর্চ জ্বলে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে কে কড়া-গলায় হাঁকলে, কে ওখানে?

—আমিও তো তাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম—কে আপনি?

—ও

আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো একটা মনুষ্যমূর্ত্তি এবং টর্চের আলো-আঁধার কেটে গেলে দেখলাম, সে জানকীবাবু ডিটেক্‌টিভ!

বিস্ময়ের সুরে বল্লাম—আপনি কি করছিলেন অন্ধকারে বনের মধ্যে?

জানকীবাবু অপ্রতিভ সুরে বল্লেন—আমি এই—এই—

—ও, বুঝেচি। কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এখানে।

—না না, কিছু না।

তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলি এগিয়ে। ভদ্রলোক শুধু অপ্রতিভ নয়, যেন হঠাৎ ভীত ও ত্রস্তও হয়ে পড়েচেন। কি মুশকিল! এসব পাড়াগাঁয়ে শহরের মত বাথরুমের বন্দোবস্ত না থাকাতে সত্যিই অনেকের বড়ই অসুবিধে হয়।

জানকী বড়ুয়া প্রাইভেট-ডিটেক্‌টিভ্‌কে এই অন্ধকারে গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত ব'লে মনে হয়েছিল ভেবে আমার খুব হাসি পেলো। ভদ্রলোককে কি বিপন্নই ক'রে তুলেছিলাম!

সেদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীগোপালের বাড়ী ব'সে চা খাচ্ছি, এমন সময় জানকীবাবু আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁকেও চা দেওয়া হোলো। জানকীবাবু দেখলাম বেশ মজলিসি লোক, চা খেতে-খেতে তিনি নানা মজার-মজার গল্প বলতে লাগলেন। আমায় বল্লেন—আমি তো মশায় গাঁয়ের জামাই, আজ চোদ্দ বছর বিয়ে করেচি, কাকে না চিনি বলুন গ্রামে, সকলেই আমার আত্মীয়।

আমি বল্লাম—আপনি এখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন? তাহোলে তো হবেই আত্মীয়তা!

—আমার স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ বছর তিনেক। তারপর আমি প্রায়ই আসি না। তবে শাশুড়ীঠাকরুণ বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, আমার আসার জন্যে চিঠি লেখেন, না এসে পারিনে।

—ছেলেপুলে কি আপনার ?

—একটি ছেলে হয়েছিল, মারা গিয়েচে। এখন আর কিছুই নেই।

—ও।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা, গাঙ্গুলি-মশায়ের খুন সম্বন্ধে পুলিস কোনো সূত্র পেয়েছে ব'লে আপনার মনে হয় ?

—কেন বলুন তো ?

—আমার বিশেষ কৌতূহল এ-সম্বন্ধে। গাঙ্গুলিমশায় আমার শ্বশুরের সমান ছিলেন। বড় স্নেহ করতেন আমায়। তাঁর খুনের ব্যাপারের একটা কিনারা না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। আমার মনে কোনো অহঙ্কার নেই মশায়। আমি এ খুনের কিনারা করি, বা আপনি করুন, বা পুলিসই করুক, আমার পক্ষে সব সমান। যার দ্বারা হোক কাজ হলেই হোলো। নাম আমি চাইনে।

—নাম কে চায় বলুন ? আমিও নয়।

—তবে আসুন-না আমরা মিলে-মিশে কাজ করি ? পুলিসকেও বলুন।

—পুলিস তো খুব রাজী, তারা তো এতে খুব খুশী হবে।

—বেশ, তবে কাল থেকে—

—আমার কোন আপত্তি নেই।

—আচ্ছা, প্রথম কথা—আপনি কোনো কিছু সূত্র পেয়েচেন কিনা আমায় বলুন। আমি যা পেয়েচি আপনাকে বলি।

—আমি এখানে এখন বলবো না। পরে আপনাকে জানাবো।

—ননী ঘোষের ব্যাপারটা আপনি কি মনে করেন ?

—সেদিন তো আপনাকে বলেচি। ওকে আমার সন্দেহ হয়। আপনি ওকে সন্দেহ করেন ?

—নিশ্চয় করি।

—আপনি ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেয়েচেন ?

—সেই গহনার ব্যাপারটাই তো ওর বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

—তা আমারও মনে হয়েচে, কিন্তু ওর মধ্যে গোলমালও যথেষ্ট।

—মহীন্ সেকরাকে নিয়ে তো ? আমি মহীন্‌কে সন্দেহ করিনে।

—কেন বলুন তো ?

—মহীন্ তো খাতা লিখতো না গাঙ্গুলিমশায়ের। ভেবে দেখুন কথাটা।

—সে-সব আমিও ভেবেচি। তাতেও জিনিসটা পরিষ্কার হয় না।

—চলুন না, দু'জনে একবার ননীর কাছে যাই।

—তার কাছে আমি গিয়েছিলাম। তাতে কোন ফল হবে না।

—হিসাবের খাতাখানা কোথায় ?

—পুলিসের জিম্মায়।

—আপনি ভালো ক'রে দেখেচেন খাতাখানা?

—দেখেচি বলেই তো ননীকে জড়াতে পারিনে ভালো ক'রে।

—কেন?

—শুধু ননীর হাতের লেখা নয়, আরও অনেকের হাতের লেখা তাতে আছে।

—কার কার?

জানকীবাবু ব্যগ্রভাবে এ-প্রশ্নটা ক'রে আমার মুখের দিকে যেন উৎকণ্ঠিত-আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলেন। আমি মৃত-মুসলমান ভদ্রলোকটির ও স্কুলের ছাত্রটির কথা তাঁকে বল্লাম। জানকীবাবু বল্লেন—ও, এই! সে তো আমি জানি—শ্রীগোপালের মুখে শুনেচি।

—যা শুনেচেন, তার বেশি আমারও কিছু বলবার নেই।

পরদিন সকালে ননী ঘোষ এসে আমার কাছে হাজির হোলো। বল্লে—বাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি?

—জানকীবাবু এ গাঁয়ের জামাই ব'লে খাতির করি। কিন্তু উনি কাল রাতে আমায় যে-রকম গালমন্দ দিয়ে এসেচেন, তাতে আমি বড় দুঃখিত। বাবু, যদি দোষ ক'রে থাকি, পুলিসে দিন—গালমন্দ কেন?

—তুমি বড় চালাক লোক ননী। আমি সব বুঝি। পুলিসে দেবার হোলে, তোমাকে একদিনও হাজতের বাইরে রাখবো ভেবেচো?

—বাবুও কি আমাকে এখনও সন্দেহ করেন?

লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-খুন যে-ই করুক, ননী তার মধ্যে নিশ্চয়ই জড়িত। অথচ ও ভেবেচে যে, আমার চোখে ধুলো দেবে!

বল্লাম—সে-কথা এখন নয়। এক মাসের মধ্যেই জানতে পারবে।

—বাবু, আপনি আমাকে যতই সন্দেহ করুন, ধর্ম্ম যতদিন মাথার উপর আছে—

ধূর্ত্ত লোকেরাই ধর্ম্মের দোহাই পাড়ে বেশি! লোকটার উপর সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

সারাদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

সন্ধ্যার পরে আহারাদি সেরে অনেকক্ষণ বই পড়লাম। তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে নিদ্রা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেন জানি না—অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম হোলো না এবং বোধহয় সেই জন্যই সে রাত্রে আমার প্রাণ বেঁচে গেল।

ব্যাপারটা কি হোলো খুলে বলি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেও এক কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকার রাত্রি। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়চে আবার থেমে যাচ্চে, অথচ গুমট কাটে নি। আমার ঘরটার উত্তরদিকে একটা মাত্র কাঠের গরাদে দেওয়া জানলা, জানলার সামনাসামনি দরজা। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে জানলা নেই—একটা ঘুল-ঘুলি আছে মাত্র।

রাত প্রায় একটা কি তার বেশি। আমার ঘুম আসে নি, তবে সামান্য একটু তন্দ্রার ভাব এসেচে।

হঠাৎ বাইরে ঘুলঘুলির ঠিক নীচেই যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল! গরু কি ছাগলের পায়ের শব্দ হওয়া বিচিত্র নয়—বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না।

তারপর শব্দটা সেদিক থেকে আমার শিয়রের জানলার কাছে এসে থামলো। তখনও আমি ভাবচি, ওটা গরুর পায়ের শব্দ। এমন সময় আমার বিস্মিত-দৃষ্টির সামনে দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে কার একটা সুদীর্ঘ হাত একেবারে আমার বুকের কাছে —ঠিক বুকের ওপর পৌঁছলো—হাতে ধারালো একখানা সোজা-ছোরা, অন্ধকারেও যেন ঝক্‌ঝক্ করচে!

ততক্ষণে আমার বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গিয়েচে।

আমি তাড়াতাড়ি পাশমোড়া দিয়ে ছোরা-সমেত হাতখানা ধরতে গিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য একটা বাঁশের লাঠিকে চেপে ধরলাম।

পরক্ষণেই কে এক জোর ঝট্‌কায় লাঠিখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে। সঙ্গে-সঙ্গে ছোরার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে আমার হাতের কব্জি ও বুকের খানিকটা চিরে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ জ্বেলে দেখি, বিছানা রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েচে। তখুনি নেকড়া ছিঁড়ে হাতে জলপটি বেঁধে লণ্ঠন জ্বাললাম।

লাঠির অগ্রভাগে তীক্ষ্ণাগ্র ছোরা বাঁধা ছিল—আমার বুক লক্ষ্য ক'রে ঠিক কুড়ুলের কোপের ধরনে লাঠি উঁচিয়ে কোপ মারলেই ছোরা পিঠের ওদিক দিয়ে ফুঁড়ে বেরুতো। তারপর বাঁধন আল্‌গা ক'রে ছোরাখানা আমার বিছানার পাশে কিংবা আমার ওপর ফেলে রাখলেই আমি যে আত্মহত্যা করেচি, এ-কথা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য লোককে ভুল করে বোঝানো চলতো।

আমি নিরস্ত্র ছিলাম না—মিঃ সোমের ছাত্র আমি। আমার বালিশের তলায় ছ' নলা অটোমেটিক ওয়েব্‌লি লুকোনো। সেটা হাতে ক'রে তখুনি বাইরে এসে আলো ধ'রে ঘরের চারিদিকে সর্ব্বত্র খুঁজলাম—জানলার কাছে জুতো-সুদ্ধ টাট্‌কা পায়ের দাগ!

ভালো ক'রে টর্চ ফেলে দেখলাম।

কি জুতো?...রবার-সোল, না, চামড়া?...অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না।

এখুনি এই জুতোর সোলের একটা ছাঁচ নেওয়া দরকার। কিন্তু তার কোনো উপকরণ দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমার কাছে নেই।

আমার মনে কেমন ভয় করতে লাগলো, আকাশের দিকে চাইলাম। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর মেঘান্ধকার রজনী।

এমনি রাত্রে ঠিক গত কৃষ্ণপক্ষেই গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছিলেন।

আমি শ্রীগোপালের বাড়ী গিয়ে ডাকলাম—শ্রীগোপাল, শ্রীগোপাল, ওঠো—ওঠো!

শ্রীগোপাল জড়িত-কণ্ঠে উত্তর দিলে—কে?

—বাইরে এসো—আলো নিয়ে এসো—সব বলচি।

শ্রীগোপাল একটা কেরোসিনের টেমি জ্বালিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিস্মিতমুখে বার হয়ে এসে বল্লে—কে? ও, আপনি? এত রাত্রে কি মনে ক'রে?

—চলো বসি—সব বলচি। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো দেখি!

—চা খাবেন? স্টোভ আছে। চা-খোর আমি, সব মজুত রাখি—ক'রে দিই।

চা খেয়ে আমি আর বসতে পারচি না। ঘুমে যেন চোখ ঢুলে আসচে! শ্রীগোপাল বল্লে—বাকি রাতটুকু আমার এখানেই শুয়ে কাটিয়ে দেবেন এখন।

ব্যাপার সব শুনে শ্রীগোপাল বল্লে—এর মধ্যে ননী আছে ব'লে মনে হয়। এ তারই কাজ।

—না।

—না? বলেন কি?

—না, এ ননীর কাজ নয়।

—কি ক'রে জানলেন?

—এখানকার লোক ছোরার ব্যবহার জানে না—বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে ছোরার ব্যবহার নেই।

—তবে?

—এ-কাজ যে করেচে সে বাংলার বাইরে থাকে। তুমি কাউকে রাতের কথা বোলো না কিন্তু!

—আপনাকে খুন করতে আসার উদ্দেশ্য?

—আমি দোষী খুঁজে বার করবার কাজে পুলিসকে সাহায্য করচি—এছাড়া আর অন্য কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

ভোর হোলো। আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম।

জানলার বাইরে সেই পায়ের দাগ তেমনি রয়েচে। রবার-সোলের জুতো বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। ক' নম্বরের জুতো তাও জানা গেল।

বিকেলে আমি ভাবলাম, একবার মামার বাড়ী যাবো। এ-গ্রামে ডাক্তার নেই

ভালো—মামার বাড়ী গিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে ওষুধ দিয়ে নিয়ে আসবো। ঘরের মধ্যে জামা গায়ে দিতে গিয়ে মনে হোলো—আমার ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকেছিল।

কিছুই থাকে না ঘরে। একটা ছোট চামড়ার সুটকেস্—তাতে খানকতক কাপড়-জামা। কে ঘরের মধ্যে ঢুকে সুটকেসটা মেজেতে ফেলে তার মধ্যে হাতড়ে কি খুঁজেচে—কাপড়-জামা, বা, একটা মনিব্যাগে গোটা-দুই টাকা ছিল সেগুলো ছোঁয় নি। বালিশের তলা—এমন কি, তোশকটার তলা পর্য্যন্ত খুঁছেচে।

আমি প্রথমটা ভাবলাম, এ কোনো ছিঁচকে চোরের কাজ। কিন্তু চোর টাকা নেয় নি—তবে কি, রিভলভারটা চুরি করতে এসেছিল? সেটা আমার পকেটেই আছে অবিশ্যি—সে উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয়।

জানকীবাবুকে ডেকে সব কথা বল্লাম। জানকীবাবু শুনে বল্লেন—চলুন, জায়গাটা একবার দেখে আসি।

ঘরে ঢুকে আমরা সব দিক ভাল ক'রে খুঁজে দেখলাম। সব ঠিক আছে। জানকীবাবু আমার চেয়েও ভালো ক'রে খুঁজলেন, তিনিও কিছু বুঝতে পেরেচেন ব'লে মনে হোলো না।

বল্লাম—দেখলেন তো?

—টাকাকড়ি কিছু যায় নি?

—কিছু না।

—আর কোনো জিনিস আপনার ঘরে ছিল?

—কি জিনিস?

—অন্য কোনো দরকারি—ইয়ে—মানে—মূল্যবান?

—এখানে মূল্যবান জিনিস কি থাকবে?

—তাই তো!

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়লো। মিস্‌মিদের সেই কবচ আর দাঁতনকাঠির টুকরোটা আমি এই ঘরে কাল পর্য্যন্ত রেখেছিলাম, কিন্তু কাল কি মনে ক'রে শ্রীগোপালের বাড়ী যাবার সময় সে জিনিস দু'টি আমি পকেটে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম—এখনও পর্য্যন্ত সে দু'টি আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কথাটা জানকীবাবুকে বলি-বলি ক'রেও বলা হোলো না।

জানকীবাবু যাবার সময় বল্লেন—ননীর ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

—হয় খানিকটা।

—একবার ওকে ডাকিয়ে দেখি।

—এখন নয়। আমি মামার বাড়ী যাই, তারপর ওকে ডেকে জিগ্যেস করবেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি জানকীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মামার বাড়ী চলে এলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমার মামার বাড়ীর পাশে সুরেশ ডাক্তারের বাড়ী। সে আমার সমবয়সী—গ্রামে প্র্যাক্‌টিশ করে। মোটামুটি যা রোজগার করে, তাতে তার চলে যায়। ওর কাছে ক্ষতস্থান ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে আবার শ্রীগোপালদের গ্রামেই ফিরলাম। জানকীবাবুর সঙ্গে পথে দেখা। তিনি বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েচেন। আমায় বল্লেন—আজই ফিরলেন?

তাঁর কথার উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়লো, মিস্‌মিদের কবচখানা আমার পকেটেই আছে এখনও—সামনে রাত আসচে আবার, ও-জিনিসটা সঙ্গে এনে ভালো করিনি, মামার বাড়ি রেখে আসাই উচিত ছিল বোধ হয়।

জানকীবাবুর পরামর্শটা একবার নিলে কেমন হয়, জিনিসটা দেখিয়ে?

কিন্তু ভাবলাম, এ-জিনিসটা ওঁর হাতে দিতে গেলে এখন বহু কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওঁর সঙ্গে। হয়তো তিনি জিনিসটার গুরুত্ব বুঝবেন না—দরকার কি দেখানোর?

জানকীবাবুর শ্বশুরবাড়ী শ্রীগোপালের বাড়ীর পাশেই।

ওঁর বৃদ্ধা শাশুড়ী, দেখি বাইরের রোয়াকে ব'সে মালা জপ করচেন। আমি তাঁকে আরও কিছু জিগ্যেস করবার জন্যে সেখানে গিয়ে বসলাম।

বুড়ী বল্লে—এসো দাদা, বসো।

—ভালো আছেন, দিদিমা?

—আমাদের আবার ভালোমন্দ—তোমরা ভালো থাকলেই আমাদের ভালো।

—আপনি বুঝি একাই থাকেন?

—আর কে থাকবে বলো—আছেই-বা কে? এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েচে।

—তবে তো আপনার বড় কষ্ট, দিদিমা!

—কি করবো দাদা, অদেষ্টে দুঃখ থাকলে কেউ ঠ্যাকাতে পারে?

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বুড়ীর সামনের গোয়ালের ছিটেবেড়ায় একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েচে—জিনিসটা হচ্চে, খুব বড় একটা পাতার টোকা। পাতাগুলো শুকনো তামাক-পাতার মত ঈষৎ লাল্‌চে। পাতার বোনা ও রকম টোকা, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে কখনো দেখি নি।

জিগ্যেস করলাম—দিদিমা, ও জিনিসটা কি? এখানে তৈরি হয়?

বৃদ্ধা বল্লেন—ওটা এ-দেশের নয় দাদা।

—কোথায় পেয়েছিলেন ওটা?

—আমার জামাই এনে দিয়েছিল।

—আপনার জামাই? জানকীবাবু বুঝি?

—হ্যাঁ দাদা। ও আসামের চা-বাগানে থাকতো কিনা, ও-ই আর বছর এনেছিল।

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগলো…আসাম!…চা বাগান! এই ক্ষুদ্র

গ্রামের সঙ্গে সুদূর আসামের যোগ কিভাবে স্থাপিত হতে পারে—এ আমার নিকট একটা মস্ত-বড় সমস্যা। একটা ক্ষীণ সূত্র মিলেচে।

আমি বল্লাম—জানকীবাবু বুঝি আসামে থাকতেন?

—হ্যাঁ দাদা, অনেকদিন ছিল। এখন আর থাকে না। আমার সে মেয়ে মারা গিয়েচে কিনা! তবুও জামাই মাঝে-মাঝে আসে। গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বড় ভাব ছিল। এলেই ওখানে ব'সে গল্প, চা খাওয়া—

—ও!

—বুড়ো খুন হয়েছে শুনে জামাইয়ের কি দুঃখু!

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর ক'দিন পরে এলেন উনি?

—তিন-চার দিন পরে দাদা!

—আপনার মেয়ে মারা গিয়েচেন কতদিন হোলো দিদিমা?

—তা, বছর-তিনেক হোলো—এই শ্রাবণে।

—মেয়ে মারা যাওয়ার পর উনি যেমন আসছিলেন, তেমনই আসতেন, না, মধ্যে কিছুদিন আসা বন্ধ ছিল?

—বছর-দুই আর আসে নি। মন তো খারাপ হয়, বুঝতেই পারো দাদা! তারপর এলো একবার শীতকালে। এখানে রইলো মাসখানেক। বেশ মন লেগে গেল। সেই থেকে প্রায়ই আসে।

আমি বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সেদিন আর কোথাও বেরুলাম না। পরদিন সকালে উঠে স্থির করলাম একবার থানায় দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। বিশেষ আবশ্যক।

পথেই জানকীবাবুর সঙ্গে দেখা। আমায় জিগ্যেস করলেন—এই যে! বেড়াচ্ছেন বুঝি?

আমি বল্লাম—চলুন, ঘুরে আসা যাক একটু। আপত্তি আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন না যাই।

—আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন?

—হ্যাঁ, খানিকটা করিও বটে, খানিকটা না-ও বটে। কেন বলুন তো?

—আমার নিজের ওতে একেবারে বিশ্বাস নেই। তাই বলচি। আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেচেন, আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার চোখের সামনে এমন একটা কাণ্ড করলেন, যাতে আমি স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্যে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কাণ্ডটা এমন কিছুই নয়, খুবই সাধারণ।

জানকীবাবু পথের পাশে ঝোপের জঙ্গলের দিকে চেয়ে বল্লেন—দাঁড়ান, একটা দাঁতন ভেঙে নি। সকালবেলাটা…

তারপর তিনি আমার সামনে পথের ধারে একটা সেওড়াডাল ঘুরিয়ে ভেঙে নিলেন দাঁতন-কাঠির জন্যে।

আমার ভাবান্তর অতি অল্পক্ষণের জন্যে।

পরক্ষণেই আমি সামলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্ত্তা বলতে শুরু করলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুরে এসে আমি ভাঙা-সেওড়াডালটা ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখি, সঙ্গে সেদিনকার সেই দাঁতনকাঠির শুক্‌নো গোড়াটা এনেছিলাম,— যে বিশেষ ভঙ্গিতে আগের গাছটা ভাঙা হয়েচে, এটাও অবিকল তেমনি ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাঙা!

কোনো তফাৎ নেই।

আমার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। আসাম, দাঁতনকাঠি—দুটো অতি সাধারণ, অথচ অত্যন্ত অদ্ভুত সূত্র।

জানকীবাবুর এখানে গত এক বছর ধ'রে ঘন ঘন আসা-যাওয়া, পত্নীবিয়োগ সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ী আসার তাগিদ, গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব!

মিঃ সোম একবার আমায় বলেছিলেন, অপরাধী ব'লে যাকে সন্দেহ করবে, তখন তার পদমর্য্যাদা বা বাইরের ভদ্রতা—এমন কি, সম্বন্ধ, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদিকে আদৌ আমল দেবে না।

জানকীবাবুর সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ জাগলো মনে।

একটা সূত্র এবার অনুসন্ধান করা দরকার। অত্যন্ত দরকারী একটা সূত্র।

সকালে উঠে গিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করলাম থানায়।

দারোগাবাবু আমায় দেখে বল্লেন—কি? কোনো সন্ধান করা গেল?

—ক'রে ফেলেচি প্রায়। এখন—যে খাতার পাতাখানা আপনার কাছে আছে, সেই-খানা একবার দরকার।

—ব্যাপার কি, শুনি?

—এখন কিছু বলচিনে। হাতের লেখা মেলানোর ব্যাপার আছে একটা।

—কি রকম!

—গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা লিখতো যে-ক'জন—তাদের সবার হাতের লেখা জানি, কেবল একটা হাতের লেখার ছিল অভাব—তাই না?

—সে তো আমিই আপনাকে বলি।

—এখন সেই লোক কে হতে পারে, তার একটা আন্দাজ ক'রে ফেলেচি। তার হাতের লেখার সঙ্গে এবার সেই পাতার লেখাটা মিলিয়ে দেখতে হবে।

—লোকটার বর্ত্তমান হাতের লেখা পাওয়ার সুবিধে হবে?

—যোগাড় করতে চেষ্টা করচি। যদি মেলে, আমি সন্দেহক্রমে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবো।

—আমায় বলবেন, আমি গিয়ে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আসবো। ওয়ারেন্ট বের করিয়ে নিতে যা দেরি।

—বাকিটুকু কিন্তু আপনাদের হাতে।

—সে ভাববেন না, যদি আপনার সংগৃহীত প্রমাণের জোর থাকে, তবে বাকী সব আমি ক'রে নেবো। এই কাজ করচি আজ সতেরো বছর।

আমি গ্রামে ফিরে একদিনও চুপ ক'রে ব'সে রইলাম না। এ-সব ব্যাপারে দেরি করতে নেই, করলেই ঠকতে হয়। জানকীবাবুর শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করলাম। শুনলাম, জানকীবাবু মাছ ধরতে গিয়েচেন কোথাকার পুকুরে—আর মাত্র দু'দিন তিনি এখানে আছেন—এই দু'দিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেলতে হবে।

আমি বল্লাম—দিদিমা, জানকীবাবু আপনাকে কিছু-কিছু টাকা পাঠান শুনেচি?

—না দাদা, ও-কথা কার কাছে শুনেচো? জামাই তেমন লোকই নয়।

—পাঠান না?

—আরও উল্টে নেয় ছাড়া দেয় না। মেয়ে থাকতে তবুও যা দিতো, এখন একেবারে উপুড়-হাতটি করে না কোনোদিন।

—যাক্, চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজখবর নেন্ তো—তাহোলেই হোলো।

—তাও কখনো-কখনো। বছরে একবার বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে একখানা লেখে।

—খাম, না পোস্টকার্ড?

—হ্যাঁ, খাম না রেজিস্টারি চিঠি। তুমিও যেমন দাদা। মেয়ে বেঁচে না থাকলেই জামাই পর হয়ে যায়। তার উপর কি কোনো দাবী থাকে দাদা? দু'লাইন লিখে সেরে দেয়।

—কই, দেখি? আছে নাকি চিঠি?

—ওই চালের বাতায় গোঁজা আছে, ছাখো না।

খুঁজে-খুঁজে নাম দেখে একখানা পুরনো পোস্টকার্ড চালের বাতা থেকে বের ক'রে বৃদ্ধাকে প'ড়ে শোনালুম। বৃদ্ধা বললেন—ওই চিঠি দাদা।

আরও দু'একটা কথা ব'লে চিঠিখানা নিয়ে চলে এলাম সঙ্গে ক'রে। জানকীবাবু যদি এ-কথা এখন শুনতেও পান যে, তাঁর লেখা চিঠি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেচি, তাতেও আমার কোনো ক্ষতির কারণ নেই।

থানায় দারোগার সামনে ব'সে হাতের লেখা দুটো মেলানো হলো।

অদ্ভুত ধরণের মিল। দু'একটা অক্ষর লেখার বিশেষ ভঙ্গিটা উভয় হাতের লেখাতেই একই রকম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দারোগাবাবু বল্লেন—তবুও একজন হাতের লেখা-বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া দরকার নয় কি?

—সে তো কোর্টে প্রমাণের সময়। এখন ওসব দরকার নেই। আপনি সন্দেহক্রমে চালান দিন।

—আমায় অন্য কারণগুলো সব বলুন।

—একে-একে সব বলবো—তার আগে একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার।

মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা করলাম কলকাতায়। সব বললাম তাঁকে খুলে।

তিনি বল্লেন—একটা কথা বলি। তোমাদের সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ-সূত্রাদির চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে। এটা সূত্র ধ'রে অপরাধী বের করতে বড্ড সাহায্য করে। অন্তত আমায় তো অনেকবার যথেষ্ট সাহায্য করেচে। সেটা হলো—অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক, chanceএর আঁক কষে বোঝা যায় যে, একজন লোক যে আসামে থাকে বলবে, অথচ দাঁতন করবে, অথচ তার হাতের লেখার সঙ্গে যাকে সন্দেহ করা হচ্চে তার হাতের লেখার হুবহু মিল থাকবে, এ-ধরণের ব্যাপার হয়তো তিন হাজারের মধ্যে একটা ঘটে। এক্ষেত্রে যে সে-রকম ঘটেচে, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই—সুতরাং ধ'রে নিতে হবে এ সেই লোকই।

সেদিন কলকাতা থেকে চলে এলাম। আসবার সময় একবার থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বল্লেন, আপনি লোক পাঠালেই আমি সব ব্যবস্থা করবো।

—ওয়ারেণ্ট বার হয়েচে?

—এখনও হস্তগত হয়নি, আজ-কাল পেয়ে যাবো।

গ্রামে ফিরে দু'দিন চুপচাপ বসে রইলাম শ্রীগোপালের বাড়ীতে। খবর নিয়ে জানলাম, জানকীবাবু দু'একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবেন। থানার দারোগার কাছে চিঠি দিয়ে আসতে ব'লে দিলাম।

পকেটে মিস্‌মিদের কবচখানা রেখে আমি জানকীবাবুর সন্ধানে ফিরতে থাকি এবং একটু পরে পেয়েও যাই। জানকীবাবুকে কৌশল ক'রে নির্জ্জনে গাঁয়ের মাঠের দিকে নিয়ে গেলাম।

আজ একবার শেষ পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার!

জানকীবাবু বল্লেন—আপনার কাজ কতদূর এগুলো?

—এক পাও না। আপনি কি বলেন?

—আমি তো ভাবচি, ননীর সম্বন্ধে থানায় গিয়ে বলবো।

—সন্দেহের কারণ পেয়েচেন?

—না পেলে কি আর বলচি?

—আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি বুঝি আসামে ছিলেন?

—কে বল্লে?

—আমি শুনলাম যেন সেদিন কার মুখে।

—না, আমি কখনো আসামে ছিলাম না। যিনি বলেচেন, তিনি জানেন না।

আমার মনে ভীষণ সন্দেহ হোলো। জানকীবাবু এ-কথা বলতে চান কেন? তবে কি তিনি মিস্‌মিদের কবচ' হারানোর এবং বিশেষ ক'রে সেখানে যদি আমার হাতে পড়ে বা পুলিসের কোনো সুযোগ্য ডিটেক্‌টিভের হাতে পড়ে তবে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত?

আমি তখন আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলেচি। বল্লাম—মানে, অন্য কেউ বলে নি, আপনার দেওয়া একটা পাতার টোকা সেদিন আপনার শ্বশুরবাড়ীতে দেখে ভাবলাম এ-টোকা আসাম সদিয়া অঞ্চল ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না—মিস্‌মিদের দেশে অমন টোকার ব্যবহার আছে।

—আপনার ভুল ধারণা।

আমি তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে পকেট থেকে মিস্‌মিদের কাঠের কবচখানা বের ক'রে তাঁর সামনে ধ'রে বল্লাম—দেখুন দিকি এ জিনিসটা কি?…চেনেন? যে-রাত্রে গাঙ্গুলি-মশায় খুন হন, সে-রাত্রে তাঁর বাড়ীর পেছনে এটা কুড়িয়ে পাই। আসামে মিস্‌মিজাতের মধ্যে এই ধরণের কাঠের কবচ পাওয়া যায় কিনা—তাই।

আমার খবরের সঙ্গে সঙ্গে জানকীবাবুর মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল—কিন্তু অত্যন্ত অল্প-কালের জন্যে। পরমুহূর্ত্তেই ভীষণ ক্রোধে তাঁর নাক ফুলে উঠলো, চোখ বড়-বড় হোলো। হঠাৎ আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন বাঘের মত এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবচ-সুদ্ধ হাতখানা চেপে' ধ'রে জিনিসটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দু'হাতেই আমার গলা চেপে ধরলেন পাগলের মত।

আমি এর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।

বরং জানকীবাবুই আমার যুযুৎসুর আড়াই-পেঁচির ছুটের জন্যে তৈরি ছিলেন না।

তিনি হাতের মাপের অন্তত তিন হাত দূরে ছিট্‌কে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

আমি হেসে বল্লাম—এ লাইনে যখন নেমেচেন, তখন অন্তত দু'একটা প্যাঁচ জেনে রাখা আপনার নিতান্ত দরকার ছিল জানকীবাবু! কবচ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন না। কবচ আপনাকে ছেড়ে দিয়েচে। এখন এটা আমার হাতে। এখন ভাগ্যদেবী আমায় দয়া করবেন।

—কি বলচেন আপনি?

—এ-কথার জবাব দেবেন অন্য জায়গায়। দাঁড়ান একটু এখানে।

থানার দারোগাবাবু কাছেই ছিলেন, আমার ইঙ্গিতে তিনি এসে হাসিমুখে বল্লেন—দয়া ক'রে একটু এগিয়ে আসুন জানকীবাবু! খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম …এই, লাগাও!

কনস্টেবলরা এগিয়ে গিয়ে জানকীবাবুর হাতে হাতকড়ি লাগালো।

জানকীবাবু কি বলতে চাইলেন। দারোগাবাবু বল্লেন—আপনি এখন যা কিছু বলবেন, আপনার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হবে, বুঝেসুঝে কথা বলবেন।

জানকীবাবুর বিরুদ্ধে পুলিস আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করে। গাঙ্গুলিমশায় খুন হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে তিনি জেলার লোন্-আফিস্ ব্যাঙ্কে সাড়ে ন'শো টাকা জমা রেখেচেন, পুলিসের খানা-তল্লাসীতে তার কাগজ বার হয়ে পড়লো।

তারপর বিচারে জানকীবাবুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একটা বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল জানবার। জানকীবাবুর সঙ্গে আমি জেলের মধ্যে দেখা করলাম। তখন তাঁর প্রতি দণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েচে।

আমাকে দেখে জানকীবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছেন জানকীবাবু?

—ধন্যবাদ! কোনো কথা জিগ্যেস করতে হবে না আপনাকে।

—একটু বেশী রাগ করেচেন ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমায় কর্ত্তব্য পালন করতে হয়েচে, তা বুঝতেই পারচেন।

—থাক ওতেই হবে।

—দেখুন জানকীবাবু, মনের অগোচর পাপ নেই। আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন, আপনি কতদূর হীন কাজ করেচেন। একজন অসহায়, সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—যিনি আপনাকে গাঁয়ের জামাই জেনে আপনার প্রতি আত্মীয়ের মত—এমন কি, আপনার শ্বশুরের মত ব্যবহার করতেন, আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে তাঁর টাকাকড়ির হিসেব আপনাকে দিয়ে লেখাতেন—তাঁকে আপনি খুন করেচেন। পরকালে এর জবাবদিহি দিতে হবে যখন, তখন কি করবেন ভাবলেন না একবার?

—মশায়, আপনাকে পাদ্রি-সায়েবের মত লেক্‌চার দিতে হবে না। আপনি যদি এখনই এখান থেকে না যান—আমি ওয়ার্ডারকে ডেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেবো—বিরক্ত করবেন না।

লোকটা সত্যিই অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। নররক্তে হাত কলুষিত করেচে, অথচ এখনও মনে অনুতাপের অঙ্কুর পর্য্যন্ত জাগে নি ওর।

আমি বল্লাম—আপনি সংসারে একা, ছেলেপুলে নেই, স্ত্রী নেই। তাঁরা স্বর্গে গিয়েচেন, কিন্তু আপনার এই কাজ স্বর্গ থেকে কি তাঁরা দেখবেন না আপনি ভেবেচেন? তাঁদের কাছে মুখ দেখাবেন কি ক'রে?

জানকীবাবু চুপ ক'রে রইলেন এবার। আমি ভাবলুম, ওষুধ ধরেচে। আগের কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে বললাম। জানি না আজও জানকীবাবুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে তাঁর পরলোকগত স্ত্রী-পুত্রের জন্য এতটুকু স্নেহপ্রীতি জাগ্রত আছে কিনা! কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তাঁর মনের সে দিকটাতে আঘাত দেবার চেষ্টা করলাম—বহুদিনের মরচেপড়া হৃদয়ের দোর যদি এতটুকু খোলে!

বল্লাম—ভেবে দেখুন জানকীবাবু, আপনার কাছে কত পবিত্র স্মৃতির আধার হওয়া উচিত যে গ্রাম, সেই গ্রামে ব'সে আপনি নরহত্যা করেচেন—এ যে কত পাপের কাজ তা যদি আজও বোঝেন, তবুও অনুতাপের আগুনে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অনুতাপে মানুষকে নিষ্পাপ করে, মহাপুরুষেরা বলেচেন। আপনি বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, মহাপুরুষদের বাণী তা ব'লে মিথ্যা হয়ে যাবে না।

জানকীবাবু আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—মশায়, আপনি কি কাজ করেন? এই কি আপনার পেশা?

—খারাপ পেশা নয় তা স্বীকার করবেন বোধহয়!

—খারাপ আর কি?

—দোষীকে প্রায়শ্চিত্ত করবার সুবিধে ক'রে দিই, যাতে তার পরকালে ভালো হয়।

—আচ্ছা, এ আপনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চয়ই করি।

—তবে শুনুন বলি, বসুন।

—বেশ কথা, বলুন।

—আমার দ্বারাই এ-কাজ হয়েচে।

—অর্থাৎ গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি···

—ও-কথা আর বলবেন না।

—বেশ। কেন করলেন?

—সে অনেক কথা। আমার উপায় ছিল না।

—কেন?

—আমি ব্যবসা করতুম শুনেচেন তো? ব্যবসা ফেল প'ড়ে কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলাম, চারিদিকে দেনা। লোভ সামলাতে পারলাম না।

—আপনার সান্ত্বনা আপনার কাছে। কিন্তু এটা লাগ্‌সই কৈফিয়ৎ হোলো না।

—আমি তা জানি। দুর্ব্বল মন আমাদের—কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে বড় ইচ্ছে হয়।

—স্বচ্ছন্দে বলুন।

—আপনি ওই কবচখানা পেয়েছিলেন যেদিন, সেদিন আপনি বুঝতে পেরেছিলেন ওখানা কি?

—না!

—কবে পারলেন?

—আমার শিক্ষাগুরু মিঃ সোমের কাছে কবচের বিষয় সব জেনেছিলাম। আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করবো?

—বলুন।

—আপনি কেন আবার এ-গ্রামে এসেছিলেন, খুনের পরে?

—আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝেচেন।

—আন্দাজ করেছি। কবচখানা হারিয়ে গিয়েছিল খুনের রাত্রেই—সেখানা খুঁজতে এসেছিলেন।

—ঠিক তাই।

—সেদিন গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ীর পেছনের জঙ্গলে অন্ধকারে ওটা খুঁজছিলেন কেন, দিনমানে না খুঁজে?

—দিনেই খুঁজতে শুরু করেছিলাম, রাত হয়ে পড়লো।

—ওখানেই যে হারিয়েছিলেন, তা জানলেন কি ক'রে?

—ওটা সম্পূর্ণ আন্দাজি-ব্যাপার! কোনো জায়গায় যখন খুজে পেলাম না তখন মনে পড়লো, ওই জঙ্গলে দাঁতন ভেঙেছিলাম, তখন পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে! তাই—

আমি ওঁর মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে দেখলাম। বল্লাম—সব কথা খুলে বলুন। আমি এখনও আপনার সব কথা শুনিনি! তবে আপনার মুখ দেখে তা বুঝতে পারচি!

জানকীবাবু ফিস্‌ফিস ক'রে কথা বলতে লাগলেন, যেন তাঁর গোপনীয় কথা শুনবার জন্যে জেগে সেই ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে কেউ লুকিয়ে ওৎ পেতে বসে রয়েচে। তাঁর এ ভাব-পরিবর্ত্তনে আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ভয়ে দুঃখে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?

আমায় বল্লেন—ওখানা এখন কোথায়?

—একজিবিট্ হিসেবে কোর্টেই জমা আছে।

—তার পর কে নিয়ে নেবে?

—আপনার সম্পত্তি, আপনার ওয়ারিশান কোর্টে দরখাস্ত করলে—

জানকীবাবু ভয়ে যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে-নাড়তে বল্লেন—না না, আমি ও চাইনে, আমার ওয়ারিশান কেউ নেই, ও আমি চাইনে—ওই সর্ব্বনেশে কবচই আমাকে আজ এ-অবস্থায় এনেচে। আপনি জানেন না ও কি!

এই পর্য্যন্ত বলেই তিনি চুপ ক'রে গেলেন। যেন অনেকখানি বেশি ব'লে ফেলেচেন—যা বলবার ইচ্ছে ছিল তার চেয়েও বেশি। আর তিনি কিছু বলতে চান না বা ইচ্ছে করেন না।

আমি বল্লাম—আপনি যদি না নিতে চান, আমি কাছে রাখতে পারি।

আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বল্লেন—আপনি সাহস করেন?

—এর মধ্যে সাহস করবার কি আছে? আমায় দেবেন।

—আপনি আমায় পুলিসে ধরিয়ে দিয়েচেন, আপনি আমার শত্রু—তবুও এখন ভেবে দেখচি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েচেন আপনি! আপনার ওপর

আমার রাগ নেই। আমি আপনাকে বন্ধুর মত পরামর্শ দিচ্চি—ও-কবচ আপনি কাছে রাখতে যাবেন না।

—কেন ?

—সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বল্লাম—ও-জিনিসটা দূরে রেখে চলবেন।

আমি যেজন্যে আজ জানকীবাবুর কাছে এসেছিলাম, সে উদ্দেশ্য সফল হতে চলেচে। আমি এসেছিলাম আজ ওঁর মুখে কবচের ইতিহাস কিছু শুনবো ব'লে। আমার ওভাবে কথা পাড়বার মূলে ওই একটা উদ্দেশ্য ছিল। অনুনয়ের সুরে কোনো কথা ব'লে জানকীবাবুর কাছে কাজ আদায় করা যাবে না এ আমি আগেই বুঝেছিলাম। সুতরাং আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লাম—আমার কোনো কুসংস্কার নেই জানবেন।

জানকীবাবু খোঁচা খেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বল্লেন—কুসংস্কার কাকে বলেন আপনি ?

—আপনার মত ওইসব মন্ত্র-তন্ত্র-কবচে বিশ্বাস—ওর নাম যদি কুসংস্কার না হয়, তবে কুসংস্কার আর কাকে বলবো ?

জানকীবাবু ক্রোধের সুরে বল্লেন—আপনি হয়তো ভালো ডিকেক্‌টিভ হতে পারেন, কিন্তু দুনিয়ার সব জিনিসই তা ব'লে আপনি জানবেন ?

আমি পূর্ব্বের মত তাচ্ছিল্যের সুরেই বল্লাম—আমার শিক্ষাগুরু একজন আছেন, তাঁর বাড়ীতে ওরকম একখানা কবচ আছে।

—কে তিনি ?

—মিঃ সোম, বিখ্যাত প্রাইভেট্-ডিকেক্‌টিভ।

যিনিই হোন, আমার তা জানবার দরকার নেই। একটা কথা আপনাকে বলি। যদি আপনি তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তবে অবিলম্বে তাঁকে বলবেন সেখানা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে। কতদিন থেকে তাঁর সঙ্গে সেখানা আছে, জানেন ?

—তা জানিনে, তবে খুব অল্পদিনও নয়। দু'তিন বছর হবে।

—আর আমার সঙ্গে এ-কবচ আছে সাত বছর। কিন্তু থাক্‌গে।

ব'লেই জানকীবাবু চুপ করলেন। আর যেন তিনি মুখই খুলবেন না, এমন ভাব দেখালেন।

আমি বল্লাম– বলুন, কি বলতে চাইছিলেন ?

—অন্য কিছু নয়, ও-কবচখানা আপনি আপনার গুরুকে টান মেরে ভাসিয়ে দিতে বলবেন —আর, এখানাও আপনি কাছে রাখবেন না।

—আমি তো বলেচি আমার কোনো কুসংস্কার নেই !

—অভিজ্ঞতা দ্বারা যা জেনেচি, তাকে কুসংস্কার ব'লে মানতে রাজী নই। বেশি তর্ক আপনার সঙ্গে করবো না। আপনি থাকুন কি উচ্ছন্ন যান, তাতে আমার কি ?

—এই যে খানিক আগে বলছিলেন, আমার ওপর আপনার কোন রাগ নেই ?

—ছিল না, কিন্তু আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা আর দেমাক দেখে রাগ হয়ে পড়েছে।

—দেমাক দেখলেন কোথায়? আপনি তো কোনো কারণ দেখান নি। শুধুই ব'লে যাচ্ছেন—কবচ ফেলে দাও। আজকালকার কোনো দেশে এসব মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস করে ভেবেচেন? একখানা কাঠের পাত মানুষের অনিষ্ট করতে পারে ব'লে, আপনিও বিশ্বাস করেন?

—আমিও আগে ঠিক এই কথাই ভাবতাম, কিন্তু এখন আমি বুঝেছি। কিন্তু বুঝেছি এমন সময় যে, যখন আর কোনো চারা নেই।

—জিনিসটা কি, খুলে বলুন না দয়া ক'রে!

—শুনবেন তবে? ওই কবচই আমার এই সর্ব্বনাশের কারণ।

আমি বুঝেছিলাম এ-সম্বন্ধে জানকীবাবু কি একটা কথা আমায় কাছে চেপে যাচ্ছেন। আগে একবার বলতে গিয়েও বলেন নি, হঠাৎ গুম্ খেয়ে চুপ ক'রে গিয়ে অন্য কথা পেড়েছিলেন। এবার হয়তো তার পুনরাবৃত্তি করবেন।

সুতরাং, আমি যেন তাঁর আসল কথার অর্থ বুঝতে পারি নি এমন ভাব দেখিয়ে বল্লাম—তা বটে। একদিক থেকে দেখতে হোলে, ওই কবচখানাই তো আপনার বর্ত্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী!

জানকীবাবু আমার দিকে কৌতুহলের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—আপনি কি বুঝেছেন, বলুন তো? কিভাবে দায়ী?

—মানে, ওখানা না হারিয়ে গেলে তো আপনি আজ ধরা পড়তেন না—যদি ওখানা পকেট থেকে না প'ড়ে যেতো?

—কিছুই বোঝেন নি।

—এ-ছাড়া আর কি বুঝবার আছে?

—আজ যে আমি একজন খুনী, তাও জানবেন ওই সর্ব্বনেশে কবচের জন্যে। কবচ যদি আমার কাছে না থাকতো তবে আজ আমি একজন মার্চ্চেণ্ট—হতে পারে ব্যবসাতে লোকসান দিয়েছিলাম—কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান কার না হয়? আমার বুকে সাহস ছিল, লোকসান আমি লাভে দাঁড় করাতে পারতাম। কিন্তু ওই কবচ তা আমায় করতে দেয় নি। ওই কবচ আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেচে!

জানকীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, গল্প বলবার আসন্ন নেশায় তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেচেন। চুপ ক'রে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জানকীবাবু বল্লেন—আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি সদিয়া-অঞ্চলে ব্যবসা করচি। পরশুরামপুর-তীর্থের নাম শুনেছেন?

—খুব।

—ঘন জঙ্গলের পাশে ওই তীর্থটা পড়ে। ওখান থেকে আরও সত্তর মাইল দূরে ভীষণ দুর্গম বনের মধ্যে আমি জঙ্গল ইজারা নিয়ে পাটের ব্যবসা শুরু করি। ওখানে দফ্‌লা, মিরি, মিস্‌মি এইসব নামের পার্বত্য-জাতির বাস। একদিন একটা বনের মধ্যে কুলিদের নিয়ে

ঢুকেছি, জায়গাটার একদিকে ঝর্ণা, একদিকে উঁচু পাহাড়, তার গায়ে ঘন বাঁশবন। ওদিকে প্রায় সব পাহাড়েই বাঁশবন অত্যন্ত বেশি। কখনো গিয়েচেন ওদিকে?

আমি বল্লাম—না, তবে খাসিয়া পাহাড়ে এমন বাঁশবন দেখেছি, শিলং যাওয়ার পথে।

জানকীবাবুর গল্পটা আমি আমার নিজের ধরণেই বলি।

সেই পাহাড়ী-বাঁশবনে বন কাটবার জন্যে ঢুকে তাঁরা দেখলেন, এক জায়গায় একটা বড় শালগাছের নীচে আমাদের দেশের বৃষ-কাষ্ঠের মত লম্বা ধরণের কাঠের খোদাই এক বিকট-মূর্ত্তি দেবতার বিগ্রহ!

কুলিরা বল্লে—বাবু, এ মিস্‌মিদের অপদেবতার মূর্ত্তি, ওদিকে যাবেন না।

জানকীবাবুর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, তাঁর শখ হোলো মূর্ত্তিটার ফটো নেবেন। কুলিরা বারণ করলে, জানকীবাবু তাদের কথায় কর্ণপাত না ক'রে ক্যামেরা তেপায়ার উপর দাঁড় করিয়েছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধ মিস্‌মি এসে তাদের ভাষায় কি বল্লে। জানকীবাবুর একজন কুলি সে ভাষা জানতো। সে বল্লে—বাবু, ফটো নিও না, ও বারণ করচে।

অন্য-অন্য কুলিরাও বল্লে—বাবু, এরা জবর জাত—সরকারকে পর্য্যন্ত মানে না। ওদের দেবতাকে অপমান করলে গাঁ-সুদ্ধ তীর-ধনুক নিয়ে এসে হাজির হয়ে আমাদের সবগুলোকে গাছের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে। ওরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, কারো তোয়াক্কা রাখে না—ওদের দেবতার ফটো খিঁচ্‌বার দরকার নেই।

জানকীবাবু ক্যামেরা বন্ধ করলেন—এতগুলো লোকের কথা ঠেলতে পারলেন না। তারপর নিজের কাজকর্ম্ম সেরে তিনি যখন জঙ্গল থেকে ফিরবেন, তখন আর একবার সেই দেবমূর্ত্তি দেখবার বড় আগ্রহ হোলো।

সন্ধ্যার তখন বেশি দেরি নেই, পাহাড়ী-বাঁশবনের নিবিড় ছায়া-গহন পথে বন্য-জন্তুদের অতর্কিত আক্রমণের ভয়, বেণুবনশীর্ষে ক্ষীণ সূর্য্যালোক ও পার্ব্বত্য-উপত্যকার নিস্তব্ধতা সকলের মনে একটা রহস্যের ভাব এনে দিয়েচে, কুলিদের বারণ সত্ত্বেও তিনি সেখানে গেলেন।

সবাই ভীত ও বিস্মিত হয়ে উঠলো যখন সেখানে গিয়ে দেখলে, কোন্ সময় সেখানে একটি শিশু বলি দেওয়া হয়েচে! শিশুটির ধড় ও মুণ্ড পৃথক-পৃথক প'ড়ে আছে, কাঠে-খোদাই বৃষ-কাষ্ঠ জাতীয় দেবতার পাদমূলে! অনেকটা জায়গা নিয়ে কাঁচা আধ-শুকনো রক্ত।

সেখানে সেদিন আর তাঁরা বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না···

জানকীবাবু বল্লেন—আমার কি কুগ্রহ মশায়, আর যদি সেখানে না যাই তবে সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু তা না ক'রে আমি আবার পরের দিন সেখানে গিয়ে হাজির হোলাম। কুলীদের মধ্যে একজন লোক আমায় যথেষ্ট নিষেধ করেছিল, সে বলেছিল, 'বাবু, তুমি কলকাতার লোক, এসব দেশের গতিক কিছু জানো না। জংলী-দেবতা হোলেও ওদের একটা শক্তি আছে—তা তোমাকে ওদের পথে নিয়ে যাবে, তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে—ওখানে অত যাতায়াত কোরো না বাবু।' কিন্তু কারো কথা শুনলাম না, গেলাম শেষ পর্য্যন্ত। লুকিয়েই গেলাম, পাছে কুলিরা টের পায়।

কেন যে জানকীবাবু সেখানে গেলেন, তিনি তা আজও ভালো জানেন না।

কিংবা হয়তো রক্ত-পিপাসু বর্ব্বর দেবতার শক্তিই তাঁকে সেখানে যাবার প্রয়োচনা দিয়েছিল ...কে জানে!

জানকীবাবু বল্লেন— ক্যামেরা নিয়ে যদি যেতাম, তাহোলে তো বুঝতাম ফটো নিতে যাচ্ছি —তাই বলছিলাম, কেন যে সেখানে গেলাম, তা নিজেই ভালো জানিনে!

আমি বল্লাম—সে-মূর্ত্তির ফটো নিয়েছিলেন?

—না, কোনোদিনই না। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ করেছিলাম, এখন তা বুঝতে পারচি।

জানকীবাবু যখন সেখানে গেলেন, তখন ঠিক থম্‌থম্ করচে দুপুরবেলা, পাহাড়ী-পাখীদের ডাক থেমে গিয়েচে, বনতল নীরব, বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে শুক্‌নো বাঁশের খোলা পাতা পড়বার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

দেবমূর্ত্তির একেবারে কাছে যাবার অত্যন্ত লোভ হোলো—কারণ, কুলিরা সঙ্গে থাকায় এতক্ষণ তা তিনি করতে পারেন নি।

গিয়ে দেখলেন, শিশুর শবের চিহ্নও সেখানে নেই। রাত্রে বন্যজন্তুতে খেয়েই ফেলুক, বা, জংলীরাই নিজেরা খাবার জন্যে সরিয়ে নিয়ে যাক্। অনেকক্ষণ তিনি মূর্ত্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন—কেমন এক ধরণের মোহ, একটা সুতীব্র আকর্ষণ! সত্যিকার নরবলি দেওয়া হয় যে দেবতার কাছে, এমন দেবতা কখনো দেখেন নি বলেই বোধ হয় আকর্ষণটা বেশি প্রবল হোলো, কিংবা অন্য-কিছু তা বলতে পারেন না তিনি।

সেই সময় ওই কাঠের কবচখানা দেবমূর্ত্তির গলায় ঝুলতে দেখে জানকীবাবু কিছু না ভেবে—চারিদিকে কেউ কোথাও নেই দেখে - সেখানা চট ক'রে মূর্ত্তিটার গলা থেকে খুলে নিলেন।...

আমি বিস্মিতস্বরে বল্লাম—খুলে নিলেন! কি ভেবে নিলেন হঠাৎ?

—ভাবলাম একটা নিদর্শন নিয়ে যাবো এদেশের জঙ্গলের দেবতার, আমাদের দেশের পাঁচ-জনের কাছে দেখাবো! নরবলি খায় যে দেবতা, তার সম্বন্ধে যখন বৈঠকখানা জাঁকিয়ে ব'সে গল্প করবো তখন সঙ্গে-সঙ্গে এখানাও বার ক'রে দেখাবো। লোককে আশ্চর্য্য ক'রে দেবো, বোধহয় এইরকমই একটা উদ্দেশ্য তখন থেকে থাকবে। কিন্তু যখন নিলাম গলা থেকে খুলে, তখনই মশায় আমার সর্ব্বশরীর যেন কেঁপে উঠলো! যেন মনে হোলো একটা কি অমঙ্গল ঘনিয়ে আসচে আমার জীবনে। ও-ধরণের দুর্ব্বলতাকে কখনোই আমল দিই নি—সেটা খুলে নিয়ে পকেটজাত ক'রে ফেললাম একেবারে। মিস্‌মিদের অনেকে এ রকম কবচ গলায় ধারণ করে, সেটাও দেখেচি কিন্তু তারপরে। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময় বিশেষ ক'রে এ-কবচ তারা পরবেই।

—তারপর?

—তারপর আর কিছুই না। সাতবছর কবচ আছে আমার কাছে। জংলী-জাতের

জংলী-দেবতার কবচ, ও ধীরে-ধীরে আমায় নামিয়েচে এই সাত বছরে। এক-একটা জিনিসের এক-একটা শক্তি আছে। আমায় দিয়ে জাল করিয়েচে, পাওনাদারের টাকা মেরে দেবার ফন্দি দিয়েচে—শেষকালে মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে দিলে পর্য্যন্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যবসাদার ছিলুম মশায়— আজ কোথায় এসে নেমেছি দেখুন! এ-প্রবৃত্তি জাগাবার মূলে ওই কবচখানা! আমি দেখেচি, যখনই ওখানা আমার কাছে থাকতো, তখনই নানারকম দুষ্টবুদ্ধি জাগতো মনে—কাকে মারি, কাকে ফাঁকি দিই। লোভ জিনিসটা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠতো। গাঙ্গুলিমশায়ের খুনের দিনের রাত্রে আমি দশটার গাড়ীতে অন্ধকারে ইস্টিশানে নামি। কেউ আমায় দেখে নি। আমার পকেটে ঐ কবচ—কিন্তু যাক্ সে-কথা, আর এখন বলবো না।

—বলুন না।

—না। আমার ঘাড় থেকে এখন ভূত নেমে গিয়েচে, আর সে ছবি মনে করতে পারব না। এখন করলে ভয় হয়। নিজের কাজ করেই কবচ সরে পড়লো সে-রাত্রেই। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ওর প্রতিহিংসা পূর্ণ হোলো বোধহয়—কে বলবে বলুন! স্টীমারে আমায় একজন বারণ করেছিল কিন্তু। আসাম থেকে ফিরবার পথে ব্রহ্মপুত্রের ওপর স্টীমারে একজন বৃদ্ধ আসামী-ভদ্রলোককে ওখানা দেখাই। তিনি আমায় বল্লেন, 'এ কোথায় পেলেন আপনি? এ মিরি আর মিস্‌মিদের কবচ, পশু এখানে মানুষের স্থান নিয়েচে, ওরা যখন অপরের গ্রাম আক্রমণ করতে যেতো—অপরকে খুন-জখম করতে যেতো—তখন দেবতার মন্ত্রপুত এই কবচ পরতো গলায়। এ-আপনি কাছে রাখবেন না, আপনাকে এ অমঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে।' তখনও যদি তাঁর কথা শুনি তাহোলে কি আজ এমন হয়? তাই আপনাকে আমি বলচি, আমি তো গেলামই—ও কবচ আপনি আপনার কাছে কখনো রাখবেন না।

জানকীবাবু চুপ করলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা পূর্ণ হয়েচে। জানকীবাবুর মুখে কবচের ইতিহাসটা শুনবার জন্যেই আসা।

বল্লাম—আমি যা করেচি, কর্ত্তব্যের খাতিরে করেচি। আমার বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখবেন না মনে। আমায় ক্ষমা করবেন। নমস্কার!

বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওঁর কাছ থেকে।

* * * *

যতদূর জানি—এখন তিনি আন্দামানে।

হীরামানিক
জ্বলে

হীরামানিক জ্বলে

ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর।

একটি নদীও আছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে। মহকুমা থেকে বারো তের মাইল, রেল স্টেশন থেকেও সাত আট মাইল।

গ্রামের মুস্তফি বংশ এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, এখন তাঁদের অবস্থা আগের মত না থাকলেও আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে তাঁরাই এখনও পর্য্যন্ত বড়লোক বলে গণ্য, যদিও ভাঙা পূজোর দালানে আগের মত জাঁকজমকে এখন আর পূজো হয় না—প্রকাণ্ড বাড়ীর যে মহলগুলোর ছাদ খসে পড়েছে গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ীর মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরানী পাত্রদের সঙ্গে—অর্থের এতই অভাব।

সুশীল এই বংশের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করে বাড়ী বসে আছে—বড় বংশের ছেলে, তার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনো চাকুরি করেন নি, সুতরাং বাড়ী বসেই বাপের অন্ন ধ্বংস করুক এই ছিল বাড়ীর সকলেরই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

সুশীল তাই করে আসছে অবিশ্যি।

সুন্দরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস খুব বেশি নেই—আগে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, তাদের সবাই এখন বিদেশে চাকুরি করে—বড় বড় বাড়ী জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

মুস্তফিদের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে তাঁদের দৌহিত্র রায় বংশ বাস করে। পূর্ব্বে যখন মুস্তফিদের সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল তখন বিদেশ থেকে কুলগৌরব-সম্পন্ন রায়দের আনিয়ে কন্যাদান করে জমি দিয়ে এখানেই বাস করিয়েছিলেন এঁরা।

কালের বিপর্য্যয়ে সেই রায় বংশের ছেলেরা এখন সুশিক্ষিত ও প্রায় সকলেই বিদেশে ভাল চাকুরি করে। নগদ টাকার মুখ দেখতে পায়—বাড়ী কেউ বড় একটা আসে না—যখন আসে তখন খুব বড়-মানুষি চাল দেখিয়ে যায়। পদে পদে মাতুল বংশের ওপর টেক্কা দিয়ে চলাই যেন তাদের দু-একমাস-স্থায়ী পল্লীবাসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।

আশ্বিন মাস। পূজোর বেশী দিন দেরি নেই।

অঘোর রায়ের বড় ছেলে অবনী সস্ত্রীক বাড়ী এসেছে। শোনা যাচ্ছে, দুর্গোৎসব না করলেও অবনী এবার ধুমধামে নাকি কালী পূজো করবে। অবনী সরকারী দপ্তরে ভাল চাকুরি করে। অবনীর বাবা অঘোর রায় ছেলের কাছেই বিদেশে থাকেন। তিনি এ সময় বাড়ী আসেন নি, তাঁর মেজ ছেলে অখিলের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন। অখিল যেন কোথাকার সাবডেপুটি—পনেরো দিন ছুটি নিয়ে স্ত্রীপুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে।

সুশীল অবনীদের বৈঠকখানায় বসে এদের চালবাজির কথা শুনছিল অনেকক্ষণ থেকে।

অবনী বললে—মামা, তোমাদের বড় শতরঞ্জি আছে ?

—একখানা দালানজোড়া শতরঞ্জি ছিল জানি—কিন্তু সেটা ছিঁড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।

—ছেঁড়া শতরঞ্জি আমার চলবে না। তাহলে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ভাল একখানি বড় শতরঞ্জি কিনে আনি, বন্ধুবান্ধব পাঁচজনে আসবে, তাদের সামনে বার করার উপযুক্ত হওয়া চাই তো!—বড় আলো আছে ?

—বাতির ঝাড় ছিল, এক-এক থাকে কাঁচ খুলে গিয়েছে—তাতে চলে তো নিও।

—তোমাদের তাতেই কাজ চলে ?

—কেন চলবে না ? দেখায় খুব ভাল। তা ছাড়া দুর্গোৎসবের কাজ দিনমানেই বেশি—রাত্রে আরতি হয়ে গেলেই আলোর কাজ তো মিটে গেল।

—আমার ডে-লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। কালীপুজোর রাতে আলোর ব্যবস্থা একটু ভালরকম থাকা দরকার। ইলেকট্রিক আলোয় বারো মাস বাস করা অভ্যেস, সত্যি, পাড়াগাঁয়ে এসে এমন অসুবিধে হয়!

বৃদ্ধ সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী তাঁর ছোট ছেলের একটা চাকুরির জন্যে অবনীর কাছে ক-দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটু—অবিশ্যি খুব সামান্যই একটু—ভরসা পেয়েছিলেন, তিনি অমনি বলে উঠলেন—তা অসুবিধে হবে না ? বলি তোমরা বাবাজী কি রকম জায়গায় থাকো, কি ধরনে থাকো—তা আমার জানা আছে তো! গঙ্গাচানের যোগে কলকাতা গেলেই তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠি, আর সে কী যত্ন! ওঃ, ইলেকটিরি আলো না হলে কি বাবাজী তোমাদের চলে ?

সুশীল কলকাতায় দু-একবার মাত্র গিয়েছে,—আধুনিক সভ্যতার যুগের বহু নতুন জিনিসই তার অপরিচিত—শিক্ষিত ও শহুরে বাবু অবনীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে তাকে কথা বলতে হয়।

তবুও সে বললে—ডে-লাইটের চেয়ে কিন্তু ঝাড়-লণ্ঠন দেখায় ভাল—

অবনী হেসে গড়িয়ে পড়ে আর-কি!

—ওহে যে যুগে জমিদারপুত্রেরা নিষ্কর্মা বসে থাকত আর হাতিতে চড়ে জবরদাবের মত ঘুরে বেড়াতো—ওসব চাল ছিল সেকালের। মডার্ন যুগে ও সব অচল, বুঝলে মামা ? এ হল প্রগতির যুগ—হাতির বদলে ইলেকট্রিক লাইট—সেকালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে ?

বনেদি পুরোনো আমলের চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল। বয়সে যুবক হলেও প্রাচীনের ভক্ত।

সে বললে—কেন, হাতি চড়াটা কী খারাপ দেখলে ?

—রামোঃ! জবড়জং ব্যাপার! হাতির মত মোটা জানোয়ারের ওপর বসে-থাকা পেট-মোটা নাদুস নুদুস—

সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী বললেন—গোবর-গণেশ—

—জমিদারের ছেলেরই শোভা পায়, কিন্তু কাজে যারা ব্যস্ত, সময় যাদের হাতে কম, দিনে যাদের ত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয় নিজের কাজে বা আপিসের কাজে—তাদের পক্ষে দরকার মোটর বাইক বা মোটরকার। স্মার্ট যারা—তাদের উপযুক্ত যানই হচ্ছে—

সুশীল প্রতিবাদ করে বললে—স্মার্ট কারা জানি নে; মোগল বাদশাদের সময় আকবর আওরঙ্গজেবের মত বীর হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত—তারা স্মার্ট হল না—হল তোমাদের কলকাতার আদ্দির-পাঞ্জাবি-পরা চশমা-চোখে ছোকরা বাবুর দল, যারা বাপের পয়সায় গড়ের মাঠে হাওয়া খায়—কিংবা শখে পড়ে দু-দশ কদম মোটর ড্রাইভ করে, তারা? অত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, তারা হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত, পুরুরাজ হাতির পিঠে চড়ে আলেকজাণ্ডারের গ্রীক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল—তারা স্মার্ট ছিল না, স্মার্ট হল সিনেমার ছোকরা অ্যাক্টরের দল?

সুশীল সেখান থেকে উঠে চলে এল। অবনীর ধরন-ধারণ তার ভাল লাগে নি—দূর সম্পর্কের মামাভাগ্নে, কোনকালের দৌহিত্র বংশের লোক, এই পর্য্যন্ত। এখন তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কী যোগ আছে?—কিছুই না। জমিদারের ছেলেদের ওপর অবনীর এ কটাক্ষ, সুশীলের মনে হল তাকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে।

তা করতে পারে—এরা এখন সব হঠাৎ-বড়লোকের দল, পুরনো বংশের ওপর ওদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।

সুশীল জমিদারপুত্রও বটে, নিষ্কর্ম্মাও বটে। বসে খেতে খেতে দিনকতক পরে পেটমোটা হয়েও উঠবে—এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ। অবনী তাকে লক্ষ্য করেই বলেছে নিশ্চয়ই।

বাড়ী এসে সুশীল জ্যাঠামশায়কে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে কখনো কেউ চাকরি করেছে?

জ্যাঠামশায় তারাকান্ত মুস্তফির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি পুজোর দালানের সঙ্গের ছোট কুঠরিতে সারাদিন বৈষয়িক কাগজপত্র দেখেন এবং মাঝে মাঝে গীতা পাঠ করেন। ঘরটার কুলুঙ্গিতে ও দেওয়ালের গায়ের তাকে গত পঞ্চাশ বছরের পুরনো পাঁজি সাজানো। তারাকান্ত বললেন—কেন বাবা সুশীল? এ বংশে কারো কোন ভাবনা ছিল যে চাকুরি করবে?

—ছেলেরা কী করত জ্যাঠামণি?

—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—তবে আজকাল বড় খারাপ সময় পড়েছে, জমিজমাও অনেক বেরিয়ে গেল—তাই যা-হয় একটু কষ্ট যাচ্ছে। কী আবার করবে কে? ওতে আমাদের মান যায়।

সুশীল কথাটা ভেবে দেখলে অবসর সময়ে। অবনীর কথাগুলো হিংসেতে ভরা ছিল এখন

দেখা যাচ্ছে। অবনীদের বাইরে বেরিয়ে চাকুরি না করলে চলে না—আর তাদের চিরকাল চলে আসছে বাড়ী বসে—এতে অবনীর হিংসের কথা বৈকি।

মামার বাড়ী খেয়ে চিরকাল ওরা মানুষ। আজ হঠাৎ বড়লোক হয়ে চাল দেওয়া কথা-বার্ত্তায় সেই-মাতুল বংশকেই ছোট করতে চায়।

সুশীল এর প্রমাণ অন্য একদিক থেকে খুব শিগগিরই পেলে। মুস্তফিদের সাবেক পুজোর মণ্ডপে দুর্গোৎসব টিম্‌টিম্ করে সমাধা হল—লোকের পাতে ছেঁচড়া, কলাইয়ের ডাল, ক্ষেতের রাঙা নাগরা চালের ভাত, পুকুরের মাছ, জোলো দুধোলো দই ও চিনির ডেলা ঘোঙা মোণ্ডা খাইয়ে—কিন্তু অবনীদের বাড়ী যে কালীপূজো হল—সে একটা দেখবার জিনিস!

কালীপূজোর রাত্রে গাঁ-সুদ্ধ পোলাও মাংস, কলকাতা থেকে আনা দই রাবড়ি সন্দেশ খেলে। টিন-টিন দামী সিগারেট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি হ'ল, পরদিন দুপুরে যাত্রা ও ভাসানের রাত্রে প্রীতি সম্মেলনে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অবনীর এক বন্ধু আবার ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতাও করলে। গ্রামের লোক সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল। এ গাঁয়ে এমনটি আর কখনো হয় নি—কেউ দেখেনি। সকলের মুখে অবনীর সুখ্যাতি।

কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, যদি তারা সেই সঙ্গে অমনি মুস্তফি জমিদারদের ছোট করে না দিত।

—নাঃ, মুস্তফিরা কখনো এদের সঙ্গে দাঁড়ায়? বলে কিসে আর কিসে!

—যা বলেচ ভায়া! নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—

—শুধু লম্বা লম্বা কথা আছে—আর কিছু নেই রে ভাই।

এ-ধরনের একটা কথা একদিন সুশীলের নিজের কানেই গেল। নিজেদের পুকুরের ঘাটে বসে সুশীল ছিপে মাছ ধরছে, গাঁয়ের ওর পরিচিত দুটি ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একজন বললেন—মুস্তফিদের ওপর এবার খুব একহাত নিয়েছে অবনী! অপর জন বললে—তার মানে মুস্তফিদের আর কিছু নেই। সব ছেলেগুলো বাড়ী বসে বসে খাবে, আজকালকার দিনে কি আর সেকেলে বনেদি চাল চলে? লেখাপড়া তো একটা ছেলেও ভাল করে শিখলে না—

—লেখাপড়া শিখেও তো ঐ সুশীলটা বাপের হোটেলে দিব্যি বসে খাচ্ছে—ওদের কখনো কিছু হবে না বলে দিলাম। যত সব আল্‌সে আর কুঁড়ে।

কথাটা সুশীলের মনে লাগল। এদিক থেকে সে কোনদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এইরকম হয়ে আসছে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলে নি, আজকাল বলে কেন তবে?

পাশের গ্রামে সুশীলের এক বন্ধু থাকত, সুশীল তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। ছেলেটির নাম প্রমথ, তার বাবা এক সময়ে মুস্তফিদের স্টেটের নায়েব ছিলেন, কিন্তু তারপর চাকুরি ছেড়ে মাল-চালানি ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

প্রমথ বেশ বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ যুবক। সে নিজের চেষ্টায় গ্রামে একটা নৈশ স্কুল করেছে, একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলেছে—তার পেছনে গ্রামের তরুণদের যে দলটি গড়ে উঠেছে—গ্রামের মঙ্গলের জন্যে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। সম্প্রতি প্রমথ বাবার আড়তে বেরুতে আরম্ভ করেছে।

সুশীল বললে—প্রমথ, আমাকে তোমাদের আড়তে কাজ শেখাবে?

প্রমথ আশ্চর্য্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে—কেন বল তো? হঠাৎ এ কথা কেন তোমার মুখে?

—বসে বসে চিরকাল বাপের ভাত খাব?

—তোমাদের বংশে কেউ কখনো অন্য কাজ করেনি, তাই বলছি। হঠাৎ এ মতিবুদ্ধি ঘটল কেন তোমার?

—সে বলব পরে। আপাতত একটা হিল্লে করে দাও তো!

—ওর মধ্যে কঠিন আর কি। যে দিন ইচ্ছে এসো, বাবার কাছে নিয়ে যাব।

মাসখানেক ধরে সুশীল ওদের আড়তে বেরুতে লাগল, কিন্তু ক্রমশ সে দেখলে, ভুষি মাল চালানির কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ নেই। তার বাবা ছেলেকে আড়তে যোগ দিতে বাধা দেন নি, বরং বলেছিলেন ব্যবসার কাজে যদি কিছু টাকা দরকার হয়, তাও তিনি দেবেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আড়তের কাজ কি রকম হচ্ছে?

সুশীল বললে—ও ভাল লাগে না, তার চেয়ে বরং ডাক্তারি পড়ি।

—তোমার ইচ্ছে। তাহলে কলকাতায় গিয়ে দেখেশুনে এস।

কলকাতায় এসে সুশীল দেখলে, ডাক্তারি স্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় এখন নয়। ওদের বছর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে—তার এখনও তিন চার মাস দেরি। সুশীলের এক মামা খিদিরপুরে বাসা করে থাকতেন, তাঁর বাসাতেই সুশীল এসে উঠেছিল—তাঁরই পরামর্শে সে দু-একটা আপিসে কাজের চেষ্টা করতে লাগল।

দিন-পনরো অনেক আপিসে ঘোরাফেরা করেও সে কোথাও কোন কাজের সুবিধে করতে পারলে না—এদিকে টাকা এল ফুরিয়ে। মামার বাসায় খাবার খরচ লাগত না অবিশ্যি, কিন্তু হাত খরচের জন্যে রোজ একটি টাকা দরকার। বাবার কাছে সে চাইবে না—নগদ টাকার সেখানে বড় টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ী ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। অথচ করাই বা যায় কী? সন্ধ্যার দিকে গড়ের মাঠে বসে রোজ ভাবে।

সুশীল সেদিন গড়ের মাঠের একটা নির্জ্জন জায়গায় বসে ছিল চুপ করে। বড্ড গরম পড়ে গিয়েছে—খিদিরপুরে তার মামার বাসাটিও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের চিৎকার ও উপদ্রবে সদা সরগরম—সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন-চারটি আট দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে। সুশীলের ভাল লাগে না আদৌ। তাদের অবস্থা এখন খারাপ হতে পারে, কিন্তু দেশের বাড়ীতে জায়গার কোন অভাব নেই।

ওপরে নিচে বড় বড় ঘর আছে—লম্বা লম্বা দালান, বারান্দা—পুকুরের ধারের দিকে বাইরের মহলে এত বড় একটা রোয়াক আছে যে, সেখানে অনায়াসে একটা যাত্রার আসর হতে পারে।

এমন সব জ্যোৎস্না রাতে কতদিন সে পুকুরের ধারে ওই রোয়াকটায় একা বসে কাটিয়েছে। পুকুরের ওপারে নারিকেল গাছের সারি, তার পেছনে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চুড়োটা, সামনের দিকে ওর ঠাকুরদাদার আমলের পুরনো বৈঠকখানা। এ বৈঠকখানায় এখন আর কেউ বসে না—কাঠ ও বিচুলি, শুকনো তেঁতুল, ভুষি, খুঁটে ইত্যাদি রাখা হয় বর্ষাকালে।

মাঝে-মাঝে সাপ বেরোয় এখানে।

সেবার ভাদ্রমাসে তালনবমীর ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে পুজোর দালানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শোনা গেল পুকুর-পাড়ের পুরনো বৈঠকখানার দিক থেকে।

সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, হরি চাকর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকেছিল বিচালি পাড়বার জন্যে—সে সময় কি সাপে তাকে কামড়েছে।

হৈ-হৈ হল। লোকজন এসে সারা বৈঠকখানার মালামাল বার করে সাপের খোঁজ করতে লাগল। কিছু গেল না দেখা। হরি চাকর বললে সে সাপ দেখে নি, বিচুলির মধ্যে থেকে তাকে কামড়েছে।

ওঝার জন্যে রানীনগরে খবর গেল। রানীনগরের সাপের ওঝা তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত—তারা এসে ঝাড়ফুঁক করে হরিকে সে-যাত্রা বাঁচালে। লোকজনে খুঁজে সাপও বের করলে—প্রকাণ্ড খয়ে-গোখ্‌রো। হরি যে বেঁচে গেল, তার পুনর্জ্জন্ম বলতে হবে।

—বাবু, ম্যাচস্‌ আছে—ম্যাচিস্‌?

সুশীল চমকে মাথা তুলে দেখলে, একটি কালোমত লোক। অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত অবাঙালী লোক বলেই সুশীলের ধারণা হল—কারণ তারাই সাধারণত দেশলাইকে 'ম্যাচিস্‌' বলে থাকে।

সুশীল ধূমপান করে না, সুতরাং সে দেশলাইও রাখে না। সে কথা লোকটাকে বলতে সে চলেই যাচ্ছিল—কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে যেন কি ভেবে ফিরে এল।

সুশীলের একটু ভয় হল। লোকটিকে এবার সে ভাল করে দেখে নিয়েছে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সবল, শক্ত-হাত-পা-ওয়ালা চেহারা—গুণ্ডা হওয়া বিচিত্র নয়। সুশীলের পকেটে বিশেষ কিছু নেই—টাকা-তিনেক মাত্র। সুশীল একটু সতর্ক হয়ে সরে বসল। লোকটা ওর কাছে এসে বিনীত সুরে বললে—বাবুজি, দু-আনা পয়সা হবে?

সুশীল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দুয়ানি পকেট থেকে বের করে লোকটার হাতে দিলে। তাই নিয়ে যদি খুশি হয়, হোক না। এখন ও চলে গেলে যে হয়!

চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ কিন্তু লোকটার মধ্যে দেখা গেল না। সে সুশীলের কাছেই এসে সকৃতজ্ঞ সুরে বললে—বহুৎ মেহেরবানি আপনার বাবু! আমার আজ খাওয়ার কিছু ছিল না—এই পয়সা লিয়ে হুটেলে গিয়ে রোটি খাবো। বাবুজির ঘর কুথায়?

ভাল বিপদ দেখা যাচ্ছে! পয়সা পেয়ে তবুও নড়ে না যে! নিশ্চয় আরও কিছু পাবার মতলব আছে ওর মনে মনে। সুশীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, কাছাকাছি কেউ নেই। পকেটে টাকা তিনটে ছাড়া সোনার বোতামও আছে জামায়, হঠাৎ এখন মনে পড়লো।

ও উত্তর দিলে—কলকাতাতেই বাড়ী, বালিগঞ্জে। আমার কাকা পুলিসে কাজ করেন কিনা, এদিকে রোজ বেড়াতে আসেন মোটর নিয়ে। এতক্ষণে এলেন বলে, রেড রোডে মোটর রেখে এখানেই আসবেন। আমি এখানে থাকি রোজ, উনি জানেন।

—বেশ বাবু, আপনাকে দেখেই বড় ঘরানা বলে মনে হয়।

সুশীলের মনে কৌতূহল হওয়াতে সে বললে—তুমি কোথায় থাক?

—মেটেবুরুজে বাবুজি।

—কিছু করো নাকি?

—জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই। ঘুরি ফিরি কাজের খোঁজে। রোটির যোগাড় করতে হবে তো?

লোকটার সম্বন্ধে সুশীলের কৌতূহল আরো বেড়ে উঠল। তা ছাড়া লোকটার কথাবার্ত্তার ধরণে মনে হয় লোকটা খুব খারাপ ধরনের নয় হয়ত। সুশীল বললে—জাহাজে কতদিন খালাসিগিরি করছ?

—দশ বছরের কুছু ওপর হবে।

—কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছ?

—সব দেশে। যে দেশে বলবেন সে দেশে। জাপান লাইন, বিলেত লাইন, জাভা সুমাত্রার লাইন—এস্. এস্. পেনগুইন, এস্. এস্. গোলকুণ্ডা—এস্. এস্. নলডেরা, পিয়েনোর বড় জাহাজ নলডেরা, নাম শুনেছেন?

'পিয়েনো' কি জিনিস, পল্লীগ্রামের সুশীল তা বুঝতে পারলে না। না, ওসব নাম সে শোনে নি।

—তা বাবুজি, আপনার কাছে ছিপাবো না। সরাব পিয়ে পিয়ে কাজটা খারাবি হয়ে পড়ল, জাহাজ থেকে ডিস্‌চার্জ করে দিলে। এখন এই কোষ্টো যাচ্ছে, মুখ ফুটে কাউকে বলতে ভি পারি নি। কী করবো, নসিব বাবুজি!

—জাহাজে কাজ আবার পাবে না।

—পাবো বাবুজি, ডিস্‌চার্জ সাটিক্-ফিটিক্ ভাল আছে। সরাব-টরাবের কথা ওতে কুছু নেই। কাপ্তানটা ভাল লোক, তাকে কেঁদে গোড়-পাকড়ে বললাম—সাহেব আমার রোটি মেরো না। ওকথা লিখ না!

লোকটি আর একটু কাছে এসে ঘেঁষে বসল। বললে—আমার নসিব খারাপ বাবু—নয় তো আমায় আজ চাকরি করে খেতে হবে কেন? আজ তো আমি রাজা!

সুশীল মৃদু কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম?

লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে স্বর নামিয়ে বললে—আজ আর বলব না। এইখানে কাল আপনি আসতে পারবেন ?

—কেন পারব না ?

—তাই আসবেন কাল। আচ্ছা বাবু, আপনি পুরানো লিখা পড়তে পারেন ?

সুশীল একটু আশ্চর্য্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কী লেখা ?

—সে কাল বাৎলাবো। আপনি কাল এখানে আসবেন, তবে, বেলা থাকতে আসবেন—সুরয ডুববার আগে।

মামার বাসায় এসে কৌতূহলে সুশীলের রাতে চোখে ঘুমই এল না। এক-একবার তার মনে হল, জাহাজী মাল্লা কত দূর কত দেশ ঘুরেছে, কোন এক আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা কি তাকে বলবে ? কোন নতুন দেশের কথা ? পুরনো লেখা কিসের ?...

ওর ছোট মামাতো ভাই সনৎ ওর পাশেই শোয়। গরমে তারও চোখে ঘুম নেই। খানিকটা উশখুশ করার পরে সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। বললে—দাদা চা খাবে ? চা করব ?

—এত রাত্তিরে চা কী রে ?

—কী করি বল। ঘুম আসছে না চোখে—খাও একটু চা।

সনৎ ছেলেটিকে সুশীল খুব পছন্দ করে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, লেখাপড়াতেও ভাল, ফুটবল খেলায় এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে, কলেজ টীমের বড়-বড় ম্যাচে খেলবার সময় ওকে ভিন্ন চলে না।

সনৎ-এর আর একটা গুণ, ভয় বলে কোন জিনিস নেই তার শরীরে। মনে হয় দুনিয়ার কোন কিছুকে সে গ্রাহ্য করে না। দু-বার এই স্বভাবের দোষে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, একবার খেলার মাঠে এক সার্জেণ্টের সঙ্গে মারামারি করে, নিজে তাতে মার খেয়েছিলও খুব—মার দিয়েছিলও। সেবার ওর বাবা টাকাকড়ি খরচ করে ওকে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনেন। আর একবার মাহেশের রথতলায় একটি মেয়েকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডার ছুরিতে প্রায় প্রাণ দিয়েছিল আর-কি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকদল ওকে গুণ্ডাদের মাঝখান থেকে টেনে উদ্ধার করে আনে।

সুশীল বললে—সনৎ, কতদূর লেখা পড়া করবি ভাবছিস ?

—দেখি দাদা। বি. এস্-সি. পর্য্যন্ত পড়ে একটা কারখানায় ঢুকে কাজ শিখব। কল-কব্জার দিকে আমার ঝোঁক, সে তো তুমি জানোই—

—আমি যদি কোন ব্যবসায় নামি, আমার সঙ্গে থাকবি তুই ?

—নিশ্চয়ই থাকব। তুমি যেখানে থাকবে, যা করবে—আমি তাতে থাকি এ আমার বড় ইচ্ছে কিন্তু। কী ব্যবসা করবে ভাবছ দাদা ?

—আচ্ছা, কাউকে এখন এসব কিছু বলিস নে। তোকে আমি জানাবো ঠিক সময়ে। তোকে নইলে আমার চলবে না। চল্ আজ শুয়ে পড়ি—রাত দুটো বাজে—

পরদিন সুশীল গড়ের মাঠে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে একা বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল—তবুও লোকটির দেখা নেই।

অন্ধকার নামল। আসবে না সে লোক ? হয়ত নয়। কি একটা বলবে ভেবেছিল কাল, রাতারাতি তার মন ঘুরে গেছে।

রাত আটটার সময় সুশীল উঠতে যাবে, এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলে।

পরক্ষণেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লোকটা ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে।

—সেলাম, বাবুজি ! মাপ করবেন, বড় দেরি হয়ে গেল। এই দেখুন—

লোকটার পায়ের ওপর দিয়ে ভারী একটা জিনিস চলে গিয়েছে যেন। সাদা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—কিন্তু ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে।

সুশীল বললে—এঃ, কী হয়েছে পায়ে ?

—এই জন্যেই দেরি হয়ে গেল বাবুজি। বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আর একটা ভারি হাতে-ঠেলা গাড়ী পায়ের ওপর এসে পড়ল। দু-জন লোক ঠেলছিল, তাদের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল আমার সঙ্গের লোকদের।

—বসো বসো। তোমার পায়ে দেখছি সাজ্ঘাতিক লেগেছে ! না এলেই পারতে !

—না এলে আপনি তো হারিয়ে যেতেন। আপনাকে আর পেতাম কোথায় ? রিক্শা করে এসেছি বাবুজি, দাঁড়াতে পারছি নে !

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। বললে—আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাবুজি, আজ কোন কাজ হবে না।

লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের আলোর কী দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বললে—কী কথা বলবে বলেছিলে—বলে যাও না ?

লোকটা ধীরে ধীরে চাপা গলায় অনেক কথা বললে—মোটামুটি তার বক্তব্য এই :—

তার বাড়ী আগে ছিল পশ্চিমে। কিন্তু অনেকদিন থেকে সে বাঙলা দেশে আছে এবং বাঙালী খালাসীদের সঙ্গে কাজ করে বাঙলা শিখেছে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলেগু লস্করের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে—ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নারকোল-কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত মাদ্রাজ থেকে। সেই সময় একবার তাদের জাহাজ ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সৌরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানির অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়ে ছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজসুদ্ধ লোকের কলেরা হল।

এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে—সবারই কলেরা হল ?

—কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেত না, পাহাড়ের একটা গর্তে কাঁকড়া

পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরেছিল। ছোট-ছোট—লাল কাঁকড়া।

—তারপর ?

—দু-জন বাদে বাকি সব সেই রাত্রে মারা গেল। বাবুজী, সে রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরো জন দিশি লস্কর আর দু-জন ওলন্দাজ সাহেব—একজন মেট আর একজন ইঞ্জিনীয়ার— সেই রাত্রে সাবাড়। রইলাম বাকি কাপ্তান আর আমি।

তারপর জাহাজের কাপ্তান ওকে বললে—মড়াগুলো টান দিয়ে ফেলে দাও জলে—

ও বললে—আমি মুর্দাফরাশ নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—

সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকোলো ডেকের ঢাকনি খুলে হোল্ডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তান সাহেব খুব মদ খেয়ে চিৎকার করে গান গাইছে—ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামতে গেল।

ডেভিট থেকে বোট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙল না তাই নিস্তার--ডেকের ওপরে তখন দুটো মড়া পড়ে রয়েছে—মরণের বীজ জাহাজের সর্ব্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু খায় নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা দুর্ব্বলও হয়ে পড়েছে।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে ও লক্ষ্য করেছিল। সারা রাত নৌকো বাইবার পরে ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগল। ও নেমে দেখে ডাঙায় ভীষণ জঙ্গল—ওদেশের সব দ্বীপেই এ ধরনের জঙ্গল ও জানত। লোকজনের কোন চিহ্ন নেই কোনদিকে।

বোট ডাঙায় বেঁধে ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দু-দিন হাঁটলে, শুধু গাছের কচি পাতা আর এক ধরনের অম্ল-মধুর ফল খেয়ে। মানুষের বসতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এসে হঠাৎ একেবারে ও অবাক হয়ে গেল।

ওর সামনে প্রকাণ্ড বড় সিংহদরজা—কিন্তু বড় বড় লতাপাতা উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েছে। সিংহদরজার পর একটা বড় পাঁচিলের খানিকটা—আরও খানিক গিয়ে একটা বড় মন্দির, তার চুড়ো ভেঙে পড়েছে—মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বলে তার মনে হল। সে ভারতের লোক, হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি সে চেনে। এ ক্ষেত্রে হয়ত সে ঠিক চিনতে পারে নি—তবে তার ওইরকম বলেই মনে হয়েছিল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলে। জায়গাটা একটা বহুকালের পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপ মনে হল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড় বড় কাছির মত লতার নাগপাশ-বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে। ভীষণ বিষধর সাপের আড্ডা সর্ব্বত্র। একটা বড় ভাঙা মন্দিরে সে পাথরের প্রকাণ্ড বড় মূর্তি দেখেছিল—প্রায় আট দশ হাত উঁচু।

সন্ধ্যা আসবার আর বেশি দেরি নেই দেখে তার বড় ভয় হয়ে গেল। এ সব প্রাচীন কালের নগর শহর—জিন পরীর আড্ডা, তেলেগু লস্করেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে 'বিজ্ঞমুনি'।

বিষ্মমুনি বড় ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিষ্মমুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে গলিতে ঝোপেঝাপে ধূম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বুভুক্ষু বিষ্মমুনির দল সন্ধ্যার অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে হাঁক পাড়ে—ম্যয় ভুখা হুঁ! তাদের হাতের নাগালে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? অতএব এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল এক মনে শুনছিল,—পালিয়ে গেলে কোথায়?

—সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার দু-দিন তিন দিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুলাম। জাহাজে উঠব এসে এই তখন খেয়াল।

—আবার সেই মড়া-ভর্ত্তি জাহাজে কেন?

—বুঝলেন না বাবুজি? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌঁছুবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলি মুলুকে যাবো কোথায়? চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই তবে সেই জংলি মুলুকে না খেয়ে মরতে হবে—নয়তো জংলি লোকেরা খুন করে ফেলবে। বাবুজি, তখন এমন ভয়, যে রাতে ঘুমুতে পারি নে। একদিন প্রকাণ্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম—নসিবের জোর খুব। অমন ধরনের জানোয়ার যে দুনিয়ায় আছে তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল—ধাড়িটা আমায় দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।

সুশীল মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখলে। লোকটা মিথ্যা কথা বলচে না সত্যি বলচে, ওর এই বনমানুষের কথা তার একটা মস্ত বড় পরীক্ষা। সুশীল জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, বাড়ীতে আগে নানা রকম পাখি, বেঁজি, খরগোশ, শজারু ও বাঁদর পুষত। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলত, 'মুস্তফিদের চিড়িয়াখানা'। এ সম্বন্ধে ইংরেজি বইও নিজের পয়সায় কিনেছিল।

ও বললে—কত বড় বনমানুষ?

—খুব বড় বাবুজি। ইন্দোরের পালোয়ান রামনকীব সিং-এর চেয়েও একটা বাচ্চার গায়ে জোর বেশি। নিজের আঁখ্‌সে দেখলাম।

—কী করে দেখলে?

—ডাল ফাঁড়লে হাত আর পা দিয়ে ধরে! আমার মাথার ওপর গাছপালার ডালগুলো তো বনমানুষে বিলকুল ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল।

—তবে তো তুমি সুমাত্রা দ্বীপে কিংবা বোর্নিওতে গিয়েছিলে কিংবা ওর কাছাকাছি কোন ছোট দ্বীপে। তুমি যে বনমানুষ বলছ—ও হচ্ছে ওরাং ওটাং—ও ছাড়া আর কোন বনমানুষ ও দেশে থাকবে না—

লোকটা হঠাৎ অত্যন্ত বিস্ময়ে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—দাঁড়ান—দাঁড়ান, বাবুজি, কী জায়গার নাম করলেন আপনি?

—সুমাত্রা আর বোর্নিও—

—ওঃ, বাবুজি, আপনি বহুৎ পড়ালিখা আদমি! এই নাম কতকাল শুনিনি জানেন? আজ দশ বারো বছর। শেষের নামটা—কী বললেন বাবুজি? বোনিও? ঠিক। স্থলু সাঁ'র নাম জাহাজী চার্টে দেখবেন। স্থলু সাঁ'র কাছাকাছি, এপার ওপার। কেন জানেন বাবুজি? এই নাম শুনলে আমার বহুত কথা মনে পড়ে যায়! তাজ্জব কথা! আজ দেখচেন আমায় এই গড়ের মাঠে বসে দু-একটা পয়সা ভিক্ষে করছি—কিন্তু আমি আজ—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক।

—তারপর কী করলে বল না! জঙ্গল থেকে এসে উঠলে আবার জাহাজে?

—হ্যাঁ, উঠলাম। সেই কাপ্তান তখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে নিজের কেবিনে চাবি দিয়ে ঘুমুচ্ছে—আমি আগে তো ভাবলাম মরে গিয়েছে। মড়াগুলো কতক কাপ্তান ফেলে দিয়েছে—কতক তখনও রয়েচে। ভীষণ বদ গন্ধ—আর সেই গরম! আমি জাহাজের কিছু খেতে পারিনে কলেরার ভয়ে। ডাঙায় গিয়ে মাছ ধরতাম—আর কচ্ছপ।

—কাপ্তেন বেঁচে ছিল?

—বেঁচে ছিল, কিন্তু বেচারির মগজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তখনকার দিনে বেতার ছিল না, আমাদের জাহাজে যে অমন হয়ে গেল, সে খবর কোথাও দেওয়া যায় নি। ওসব দিকের সমুদ্রে জাহাজ বেশি চলাচল করে না—জাহাজের লাইন নয়। এগারো দিন পরে সৌরাবায়া থেকে জাহাজ যাচ্ছিল পাসারাপং,—তারা আমাদের আগুন দেখে এসে জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচায়।

—কিসের আগুন?

—ডুবো পাহাড়ের খানিকটা ভাঁটার সময় বেরিয়ে থাকত। পাটের থলে জ্বালিয়ে সেখানে রোজ আগুন করতাম—অন্য জাহাজের যদি চোখে পড়ে। তাতেই তো বেঁচে গেলাম।

এ পর্য্যন্ত শুনে স্থশীল বুঝতে পারলে না লোকটার ভাগ্য কিসে ফিরেছিল। তবে লোকটা যে মিথ্যা কথা বলছে না, ওর কথার ধরন থেকে স্থশীলের তা মনে হল। কিন্তু এইবার লোকটা যে কাহিনী বললে, তা শেষ পর্য্যন্ত শুনে স্থশীল বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল—অল্পক্ষণের জন্য সারা গড়ের মাঠ, এমন কি বিরাট কলকাতা শহরটাই যেন তার সমস্ত আলোর মালা নিয়ে তার চোখের সামনে থেকে গেল বেমালুম মুছে—বহু দূরের কোন বিপদসঙ্কুল নীল সমুদ্রে সে একা পাড়ি জমিয়েছে বহুকালের লুকোনো হীরে-মানিক-মুক্তোর সন্ধানে—পৃথিবীর কত পর্ব্বতে, কন্দরে, মরুতে, অরণ্যে অজানা স্বর্ণরাশি মানুষের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে—পুরুষ যদি হও! নয় তো আপিসের দোরে দোরে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মত ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিয়ে চাকুরির সন্ধান করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য তার ভাগ্যে—নৈব চ, নৈব চ!

এই খালাসীটা হয়ত লেখাপড়া শেখে নি, হয়ত মার্জ্জিত নয়—কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেছে, দুনিয়ার বড় বড় নগর বন্দর, বড় বড় দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি

রাখে নি—এ একটা পুরুষ মানুষ বটে—কত বিপদে পড়েছে, কত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে!

বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারা জীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের দুঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদের দুঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে—তাদের তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরাম-প্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।

জাহাজ সৌরাবায়া এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু-জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল! সত্যিই ক্লান্তিতে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, অখাদ্য ভক্ষণে ওদের শরীর ভেঙে পড়েছিল। দিন পনেরো হাসপাতালে শুয়ে থাকবার পরে ক্রমশ ওর শরীর ভাল হয়ে গেল—কাপ্তেনের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণও ক্রমে দূর হল।

ওদের জন্যে কিছু টাকা চাঁদা উঠেছিল, ও হাসপাতাল থেকে যেদিন বাইরে পা দিলে, সে দিন এক দয়াবতী মেমসাহেব ওকে টাকাটা দিয়ে গেলেন। দুঃস্থ নাগরিকদের থাকবার জন্যে গভর্মেণ্টের একটা বাড়ী আছে—সেখানে ওকে বিনি খরচায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হল।

এই বাড়ীতে সে প্রায় দু-মাস ছিল, তারপর অন্য জাহাজে চাকরি নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। তারপর পাঁচ-সাত বছর কেটে গেল। ও যেমন জাহাজে কাজ করে তেমনি করে যাচ্ছে। প্রাচ্য-দেশের বড় বড় বন্দরের মদের দোকান ও জুয়ার আড্ডার সঙ্গে তখন সে সুপরিচিত।

একবার তাদের জাহাজ ম্যানিলাতে থেমেছে। ও অন্যান্য লস্করদের সঙ্গে গিয়ে এক পরিচিত জুয়ার আড্ডায় উঠেছে—এমন সময়ে আড্ডাধারী এসে ওকে বললে—একবার এস তো! তোমাদের দেশের একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ও অবাক হয়ে বললে—আমাদের দেশের?

আড্ডাধারী চীনাম্যান হেসে বললে—হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ার। এতকাল দোকান করছি বন্দরে, ইণ্ডিয়ার মানুষ চিনিনে?

ও আড্ডাধারীর পিছু পিছু গিয়ে দেখলে জুয়ার আড্ডার পেছনে একটা পায়রার খোপের মত ছোট্ট ভীষণ নোংরা ঘরে একজন লোক শুয়ে। লোকটার বয়স কত ঠিক বোঝবার জো নেই—চল্লিশও হতে পারে, আবার ষাটও হতে পারে। বিছানার সঙ্গে যেন সে মিশে গিয়েছে বহুদিন ধরে অসুখে ভুগে।

ওকে দেখে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে তেলেগু ভাষায় বললে—দেশের লোককে দেখতে পাইনে। যখন হংকং হাসপাতালে ছিলাম, অনেক দেশের লোক দেখতাম সেখানে। বসো এখানে। আহা, ভারতের লোক তুমি? মুসলমান? তা কী? এতদূর বিদেশে তুমি শুধু ভারতের লোক, যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম, সেই একই দেশের মাটিতে তোমারও জন্ম। এখানে তুমি আমার ভাই।

ও রোগীর বিছানার পাশে বসল। সেই অপরিচিত মুমূর্ষু স্বদেশবাসীকে দেখে ওর মনে একটা গভীর অনুকম্পা ও মমতা জেগে উঠল—যেন সত্যিই কতকালের আপনার জন।

রোগী বললে—আমার নাম নটরাজন, ত্রিবেন্দ্রাম শহর থেকে এগারো মাইল দূরে কেটিউপ্পা বলে ছোট্ট একটি গ্রামে আমার বাড়ী। কোচিন থেকে যে স্টীমলঞ্চ ছাড়ে ত্রিবেন্দ্রাম যাবার জন্যে, সে স্টীমার আমার গ্রামের ঘাট ছুঁয়ে যায়। বেউয়া কাপ্পিয়াম্ নদীর ধারে, চারিধারে ঘন বন আর ছোট ছোট পাহাড়—কেটিউপ্পা গ্রাম তুমি দেখ নি, বুঝতে পারবে না সে কী চমৎকার জায়গা! আমি অনেক দেশ বেড়িয়েছি পৃথিবীর, ভবঘুরে হয়ে চিরদিন কাটিয়ে দিলাম জীবনটা—কিন্তু আমি তোমায় বলছি শোন, ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, এমন কি পৃথিবীর মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর একটি অদ্ভুত সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার দেশের বর্ণনা শোনাবার জন্যে আজ তোমায় আমি ডাকি নি। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, কাল যে সূর্য্যোদয় উঠবে আকাশে, তা আমি চোখে বোধ হয় দেখতে পাব না—তুমি আমার দেশবাসী ভাই, একটা উপকার করবে আমার?

—কি বলুন? আপনি আমার চাচার বয়সী, কী হুকুম করবেন বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।

রোগীর পাণ্ডুর মুখ অল্পক্ষণের জন্যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—নিবু-নিবু প্রদীপের শিখার মত। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—কথা দিলে? কিন্তু ভীষণ লোভ দমন করতে হবে ভাই!

—আল্লার নামে বলছি, যা করতে বলবেন, তাই করব।

—আমার মাথার বালিশের তলায় একটা চামড়ার ব্যাগ আছে, সেটা বার করে নাও। আমার মৃত্যুর পরে ব্যাগটা আমার গ্রামে আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে।

ও রোগীর মাথাটা সন্তর্পণে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বার করলে। ব্যাগের মধ্যে কতকগুলো কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হল না ওর।

বৃদ্ধ নটরাজন বললে—তোমার কাছে আমি কোন কথা লুকোব না। ব্যাগটার মধ্যে একখানা ম্যাপ আছে—জীবনে অনেক সাহসের কাজ করেছি, অনেক বনে জঙ্গলে ঘুরেছি—অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। এই ম্যাপখানা এবং ব্যাগের মধ্যে যা যা আছে—তা আমি সৎপথে থেকে হস্তগত করি নি। সংক্ষেপে কথাটা বলে নি, কারণ বেশি বলবার আমার সময় বা শক্তি নেই। আজ বিশ বাইশ বছর আগে এই ব্যাগ আমার হস্তগত হয়। যে ম্যাপখানা এই ব্যাগের মধ্যে আছে—তার সাহায্যে যে-কোন লোক দুনিয়ায় মহা ধনী লোক হয়ে যেতে পারে। সুলু সী'র একটা খাড়ির ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন আমলের এক নগরের ভগ্নস্তূপ আছে। সেই নগর প্রাচীন যুগের এক হিন্দু রাজ্যের রাজধানী ছিল। তার এক জায়গায় প্রচুর ধনরত্ন লুকোনো আছে। যার কাছ থেকে এ ম্যাপ আমি পাই, সে আমারই বন্ধু, দু-জনে মিলে সুলু সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করেছি দশ বছর ধরে। সে জাতিতে মালয়, ম্যাপ তার তৈরি—সে নিজে ওই শহরের সন্ধান খুঁজে বার করেছিল। সেখানে

নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, সামান্য কিছু পাথর ছাড়া সে বেশি কোন জিনিস আনতে পারে নি সেখান থেকে। তার নিজের লেখা জাহাজের লগ্‌বুকের (Log Book) কয়েকখানা পাতা আমি মালয় ভাষা থেকে নিজের সুবিধার জন্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিই সৌরাবায়াতে এক গরীব মালয় স্কুল মাস্টারকে ধরে। সেই অনুবাদের কাগজখানাও এই ব্যাগের মধ্যে আছে। তারপর ম্যাপখানা হস্তগত করে আমি নিজে অনেক খোঁজাখুঁজি করি—কিন্তু স্থলু সমুদ্রেরও ওদিকে বহুশত বসতিহীন ও বসতিযুক্ত ছোট ও বড় দ্বীপ—তাদের প্রত্যেকটিতে ভীষণ জঙ্গল। ম্যাপও যা আছে, তা খুব নিখুঁত নয়—মোটের ওপর সে দ্বীপ আমি বার করতে পারিনি। দেশের গ্রামে আমার ছেলে আছে, তাকে নিয়ে গিয়ে ম্যাপটা আর ব্যাগ দিও। এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে—আমার বোম্বেটে বন্ধু সেই প্রাচীন শহরে একটা জিনিস পায়। জিনিসটা একটা সীলমোহর বলেই মনে হয়। একখানা গোটা পদ্মরাগ মণির ওপর সীলমোহরটা খোদাই করা। সেটাও এর মধ্যে আছে। সেই মোহরের ওপরে যে অদ্ভুত চিহ্নটি আঁকা আছে—আমার বিশ্বাস ছিল, সেটা একটা বড় হদিস ওই প্রাচীন নগরীর রত্ন-ভাণ্ডারের। তাই ওখানা আমি কবচের মত গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি এতদিন। কিন্তু আজ বুঝেছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। উনিশ বছর আগে গ্রাম থেকে যখন চলে আসি, তখন আমার ছেলে ছিল দু-বছরের—আর আমার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিনি এই উনিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকলে আজ সে একুশ-বাইশ বছরের যুবক। তার হাতে এগুলো সব দিয়ে বলে দিও, বাপের ছেলে যদি হয়, সে যেন খুঁজে বার করে সেই নগরী, তার বাপ যা পারেনি। আর আমার কিছু বলবার নেই। ব্যাগটা নাও হাতে তুলে।

রোগী এই পর্যান্ত বলে ক্লান্তিতে চোখ বুজলো। চীনা আড্ডাধারীর ইঙ্গিতে ও রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুশীল বললে—তারপর ?

—বাবুজি, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, নটরাজন বাঁচল কি মারা গেল সেদিকে কোন খেয়াল করিনি। আমার মাথা তখন ঘুরছে। ব্যাগ খুলে দেখলাম কতকগুলো পুরোনো কাগজপত্র ও ম্যাপখানা ছাড়া আর কিছুই নেই। পদ্মরাগ মণিটা নেড়ে-চেড়ে দেখে কিছু বুঝলাম না—ওসব জিনিসের আমরা কী বুঝি বলুন! কিন্তু তখন আমার আর একটা বড় কথা মনে হয়েছে। নটরাজন যখন ওর গল্প করছিল, আমার মনে পড়ল সাত বছর আগের সেই ঘটনা। জাহাজে সেই কলেরা হওয়া, আমার জাহাজ থেকে পালানো এবং বন জঙ্গলের মধ্যে সেই বিক্ষমুনির দেশের মধ্যে গিয়ে পড়া, বুঝলেন না বাবুজি ?

—খুব বুঝেচি, বলে যাও।

—আমার মনে হল, আমি সেখানেই গিয়ে পডেছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। সে পুরোনো শহর আমি দেখেছি, নটরাজন যা বের করতে পারে নি। আমি সেখানে একটা গোটা দিন কাটিয়েচি। এই জায়গা সুলু সী-র ধারে, তাও আমি জানি। যদিও ঠিক বলতে পারব না হয়ত—কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোধ হয় চিনব।

—ত্রিবাঙ্কুরের সেই গাঁয়ে গেলে না?

লোকটা বললে, প্রথমে ওর লোভ হয়েছিল খুব। পদ্মরাগ মণিটার দাম যাচাই করে দেখা গেল প্রায় দেড় হাজার টাকা দাম সেটার। তা ছাড়া আরও লোভ হল, নটরাজনের ছেলেকে ম্যাপ দেবার কী দরকার? এই ম্যাপের সাহায্যে সে-ই তো জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। বিশেষ করে একবার যখন সেখানে সে গিয়েছিল। কিন্তু তিন চার দিন ভাবার পরে ওর মনে হল মরবার আগে বিশ্বাস করে নটরাজন ওর হাতে জিনিসগুলো সঁপে দিয়েছে তার ছেলেকে দেবার জন্যে। এখন যদি না দেয়, তবে নটরাজনের ভূত ওর পেছনে লেগে থাকবে, হয়ত বা মেরেও ফেলতে পারে। অতএব খানিকটা ইচ্ছা এবং খানিকটা অনিচ্ছাতে সেখানে যেত সে বাধ্যই হল। বড় মজার ব্যাপার ঘটল কিন্তু সেখানে।

সুশীল বললে—কি রকম?

—বাবুজি, অনেক কষ্ট করে বেউয়া কাপ্পিয়াম্ নদীর ধারে সেই কেটিউপ্পা গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম নটরাজন মিথ্যে বলে নি, নদীটা একেবারে ওদের গ্রামের নিচে দিয়েই গিয়েছে বটে। নিজের পকেট থেকে যাওয়ার খরচ করলাম। গাঁয়ে গিয়ে যাকেই জিজ্ঞেস করি, কেউ নটরাজনের ছেলের খোঁজ দিতে পারে না। নটরাজনের কথাই অনেকের মনে নেই। দু-একজন বুড়ো লোক বললে, নটরাজনকে তারা চিনত বটে—তবে অনেকদিন আগে সে নিরুদ্দেশে হয়ে যায়, তার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে তারা জানে না।

—তারপর?

—মানে খানিকটা আনন্দ যে না হল তা নয়! ছেলেকে যদি সন্ধান না করতে পারি তবে আমার দোষ কী! তবুও একে ওকে জিগ্যেস করি। শেষকালে গাঁয়ের কাছারিতে কি ভেবে গিয়ে খোঁজ করলাম। তারা শুনে বললে, অনেকদিন আগে নটরাজনের জায়গা-জমি নীলাম করতে হয়েছিল খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নীলামের নোটিশ তারা পাঠিয়েছিল ত্রিবেন্দ্রাম শহরে।

—পেলে খুঁজে?

—ঠিকানা তো খুঁজে বার করলাম। ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ী, নারকেল গাছের বাগান সামনে। শহরের মধ্যে বাড়ীটা নয়, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে। অনেক ডাকাডাকির পরে এক বুড়ি এসে দোর খুলে দিলে। মাথার চুল সব সাদা হয়েছে, অথচ মুখ দেখে খুব বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না। বললে—কাকে চাও? আমি বললাম—নটরাজনের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বুড়ী আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—ও নাম কোথায় শুনলে? ও নাম তো কেউ জানে না! আমি তখন সব কথা বুড়ীকে বললাম। শুনে বুড়ী কেঁদে ফেললে। বললে—আমার ছেলেও আজ নিরুদ্দেশ, তার বাপের মত সেও বেরিয়েছে—আজ তিন বছর হয়ে গেল! কোন খবর পাই নি।

—তুমি কী করলে?

—এই কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হল, বাবুজি। আমি সেখানে বুড়ীর বাড়ী সাত

আটদিন রইলাম। তাকে মা বলে ডাকি। বুড়ীও আমায় বড় যত্ন করতে লাগল। বুড়ী বড় গরীব—ভাড়াটে ঘরে থাকে। তার ছেলে স্কুলে পড়ত। সে রাঁধুনিগিরি করে ছেলের পড়ার খরচ ও নিজেদের খরচ চালাতো। এখনও সে নারকেল তেলের গুদামের শেঠজীদের বাড়ী রাঁধে। কোনরকমে একটা পেট চলে যায়। বুড়ীকে পদ্মরাগ মণিটা আমি দেখাইনি—

—এত কষ্ট করে গিয়ে ওটার বেলা ফাঁকি দিলে?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল, পদ্মরাগ মণির গায়ে একটা আঁক-জোক আছে—যা হদিস দেবে হীরেজহরতের—ওই হল ওখানা না দেওয়ার গোড়ার কথা। ভাবলাম কী জানেন? ভাবলাম এই, নটরাজনের ছেলে না-পাত্তা—বুড়ীর কাজ নয় ম্যাপ দেখে সুলু সী যাওয়া আর সেই দ্বীপের মধ্যে লুকোনো শহর খুঁজে বার করা। যদি ওকে দিই ওগুলো, এখানে পড়ে নষ্ট হবে। তার চেয়ে যদি আমি নিই, হয়ত চেষ্টা করলে একদিন না একদিন আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেও পারি। যদি হীরে জহরত পাই, বুড়ীকে আমি ভালভাবে খোরপোশ দিয়ে রাখব। কিন্তু যদি পদ্মরাগ মণিখানা দিয়ে দিই—তবে হদিসটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বুড়ী এখুনি অপরকে মণি বিক্রী করবে। যে কিনবে, সে মণির গায়ে আঁকা সীলমোহরের কোন মানেই বুঝবে না। লোহার সিন্দুকে আটকা থাকবে জিনিসটা। তাতে কারো কোনো উপকার নেই। কী বলেন আপনি?

—তোমার যুক্তি মন্দ না। যদিও আমার মনে হয় জিনিসটা দেওয়াই তোমার উচিত ছিল। যাদের জিনিস, তারা সেটা নিয়ে যা খুশি করুক না কেন। তোমার ওপর শুধু পৌঁছে দেওয়ার ভার। সেটা তুমি রাখলে নিজের কাছে?

—হাঁ বাবুজি। এই দেখুন আমার কাছেই আছে। আসুন ওই আলোর কাছে।

সুশীল আলোর নিচে গিয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর প্রসারিত করতলের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল। মস্ত একখানা পাথর, একটু চেপ্টা গড়নের, উজ্জ্বল লাল রঙের—তার ওপর খোদাই-কাজ করা।

সুশীল ওর হাত থেকে সীলমোহরটা নিয়ে দেখলে উল্টেপাল্টে। খোদাই কাজ করা এত বড় পাথর সে কখনও দেখে নি। বড় সাইজের একটা কলার লেবেঞ্চুসের মত। সীলমোহরের মধ্যে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল—বড় একটা ওঁকারের 'ওঁ'র লেজ জড়িয়ে জড়িয়ে পাকিয়েছে একটা বটগাছ কিংবা অন্য কোন গাছকে। তারপর সে আরও ভাল করে চেয়ে দেখলে—আসলে ওটা ওঁকার নয়, যদিও সেইরকম দেখাচ্ছে বটে। কোন নাগ-দেবতার মূর্ত্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। ত্রিভুজাকৃতি কি একটা আঁকা রয়েছে ছবির বাঁ-দিকে। কোন নাম বা সন-তারিখ নেই।

লোকটা বললে—কিছু বুঝলেন বাবু?

—নাঃ, তবে হিন্দুর সঙ্গে এ জিনিসের সম্পর্ক আছে বলে মনে হল। দেড় হাজার টাকার জিনিসটা তুমি যে বড় বিক্রি করে ফেল নি এতদিন?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল এই খোদাই-করা আঁকজোকের মধ্যে আসল মালের হদিস পাওয়া যাবে—সেই লোভেই একে হাতছাড়া করে ফেলি নি।

—নটরাজনের স্ত্রী কোথায়?

—তাকে কেটিউপ্পা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মাসে মাসে টাকা পাঠাই। শহরে খরচ বেশি, গাঁয়ে খরচ কম। ঘর ভাড়া লাগে না। সেই সেদিনও পাঁচ টাকা ডাকে পাঠিয়েছি। এখন চাকরি নেই—নিজের পেটই চলে না।

—কাগজপত্র আর ম্যাপগুলো?

—ওই নটরাজনের স্ত্রী—তাকে আমি মা বলি—সেখানে তার কাছেই আছে। সঙ্গে নিয়ে বেড়াইনে, বড্ড দামী ও দরকারী জিনিস—আমার কাছে থাকলে হারিয়ে যেতে পারে। সে বুড়ি তার বেতের পেঁটরায় তুলে রেখে দিয়েছে, যখন দরকার হবে, নিয়ে আসব গিয়ে।

—এসব আজ কত বছরের কথা হল?

—বেশি দিনের নয়। আজ দু-বছর আগে আমি নটরাজনের গাঁয়ে গিয়ে বুড়ীর সঙ্গে প্রথম দেখা করি।

—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোন। এই মানিকখানা বিক্রী করে ফেলে টাকাটা নট-রাজনের স্ত্রীকে দাওগে। তার জীবনটা একটু ভালভাবে কাটবে। দেড় হাজার টাকা হাতে পেলে সে খুব খুশি হবে। তাদেরই জিনিস ধর্ম্মত দেখতে গেলে, তোমার নিজের কাছে রখা মানে চুরি করা।

—কিন্তু বাবু, তাহলে হদিস চলে গেল যে।

—যাবে না। প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচে ওটা তুলে নিলেই চলে। ওই ছবিটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। মানিকখানা যার জিনিস, তাকে দাও ফিরিয়ে। তুমি যখন মা বলে ডাকো, তখন তার আশীর্ব্বাদ তোমার বড় দরকার। মানিকখানা যদি বুড়ী বিক্রি করে, যে কিনবে সে ওর খোদাই ছবির কোন মানে করতে পারবে না, তার কোন কাজেই লাগবে না।

—বেশ বাবুজি, আপনিই কাজটা করিয়ে দিন না!

—কাল এটা সঙ্গে করে নিয়ে আমার সঙ্গে এখানে দেখা কোরো। আমার একটা জানাশুনো লোক আছে সে এইসব কাজ করে—তাকে দিয়ে করিয়ে দেব।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সুশীল মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে কত কথাই ভাবলে। তার মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মত অদ্ভুত! এমন-ভাবে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একজন মুসলমান লস্করের সঙ্গে দেখা হবে—সে তাকে এমন একটি আজগুবি গল্প বলে যাবে—এ কখনো সে ভেবেছিল? গল্পটা আগাগোড়া গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারত সে, যদি ওই চুনির সীলমোহরখানা সে না দেখত নিজের চোখে।

লোকটার গল্প যে সত্যি, তা ঐ পাথরখানা থেকে বোঝা যাচ্ছে। সন তারিখ ও জায়গা

মিলিয়ে এমনভাবে সে গল্প বলে গেল—যা অবিশ্বাস করা শক্ত। সুশীল ওকে শেষের দিকে যে প্রশ্নটা করেছিল, অর্থাৎ কতদিন আগে বুড়ীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেটা শুধু সময় সম্বন্ধে তাকে জেরা করা মাত্র।

সুশীল বাড়ী গিয়ে সনৎকে বললে—এই কলকাতা শহরেই অনেক মজা ঘটে যায় দেখছি।

সনৎ বললে—কী দাদা?

—সে একটা অদ্ভুত গল্প। যদি বলবার দরকার বুঝি তবে বলব—

পরদিন গড়ের মাঠে আবার সে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে রইল। একটু পরে জামাতুল্লা খালাসী এসে ওর পাশে নিঃশব্দে বসে পড়ল। বললে—আমার কথা ভাবলেন বাবুজী?

—চল আমার সঙ্গে। একটা ছাঁচ তোমাকে করিয়ে দিই। এনেছ ওটা?

—হাঁ বাবুজী। দেখুন, আমি ভিক্ষে করে খাচ্ছি আজ দু-মাস, তবুও এত বড় দামী পাথরটা বিক্রি করি নি শুধু বড় একটা লাভের আশায়। কিন্তু যত দিন যাচ্চে, তত আমার মনে হচ্চে নসিব আমার খারাপ, নইলে সেই জায়গায় গিয়েও তো কিছু করতে—

—জামাতুল্লা, তুমি লেখাপড়া-জানা লোক না হলেও খুব বুদ্ধি আছে। একা তুমি কিছু করতে পারবে না তা বেশ বোঝ। এ কাজে টাকা চাই, লোক চাই, জাহাজ চাই। অনেক টাকার খেলা সে সব। তোমার অত টাকা নেই। মিছে কেন নটরাজনের স্ত্রীর পাওনা জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করবে?

দু-একদিনের মধ্যে প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচটা হয়ে গেল। সুশীল প্রাচীন ধনী বংশের সন্তান, ওর যে ছাঁচ গড়িয়ে দিলে, সে ভাবলে ওদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি এটা। ফেরত দেওয়ার সময় সে বললে—এটা আমার এক বন্ধুকে একবার দেখতে দেবে?

—কেন বল তো?

—আমার সে বন্ধু মিউজিয়মে কাজ করে। পণ্ডিত লোক। যদি গভর্মেণ্টের তরফ থেকে এটা কিনে নেওয়া হয় তাই বলছি।

—তাকে তোমার স্টুডিওতে কাল নিয়ে এসো।

পরদিন জামাতুল্লাকে নিয়ে সুশীল বন্ধুর স্টুডিওতে গিয়ে দেখলে একটি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন।

বন্ধুটি বলে উঠল—এই যে এস সুশীল, ইনি এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন—আলাপ করিয়ে দিই—ডাঃ রজনীকান্ত বসু এম. এ. পি. এইচ. ডি.—মিউজিয়মে সম্প্রতি চাকুরিতে ঢুকেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ বসু পদ্মরাগের সীলমোহরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে বললেন—এ জিনিসটা আপনি পেলেন কোথায়?

সুশীলের আর্টিস্ট বন্ধু বললে—ওটা ওদের বংশের জিনিস। ওরা পল্লীগ্রামের প্রাচীন ধনী বংশ।

ডাঃ বসু সন্দিগ্ধ মুখে বললেন—কিন্তু এ তো তা নয়! এ যে বহু পুরোনো জিনিস! এ আপনারা পেয়েছিলেন কোথায় তার ইতিহাস কিছু জানেন? যদি বলতে বাধা না থাকে—

সুশীল বললে—না ডাঃ বসু, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। আপনি কী আন্দাজ করছেন?

ডাঃ বসু বললেন—দেখুন, সীলমোহরের ওপর এ চিহ্ন আমি নিজে কখনো দেখি নি—তবে এই ধরনের পাথরের ওপর সীলমোহর ওঁকারভাটে পাওয়া গিয়েছে। ফরাসী ইন্দোচীনের জঙ্গলের মধ্যে বহু পুরোনো নগরের ধ্বংসস্তূপে। এর সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছে মোটামুটি খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। আমাদের মিউজিয়ামেও আছে—কাল যাবেন, দেখাবো। কিন্তু আপনার এটা আরো পুরোনো, আমি একে নির্ভয়ে নবম শতাব্দীতে ফেলে দিতে পারি—কিংবা তারও আগে।

সুশীল বললে—আপনার তাই মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। নইলে বলতাম না। আর সেইজন্যেই আপনাকে জিগ্যেস করছি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষে এটা পেলেন কি করে? এ হল সমুদ্রপারের জিনিস। বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে আমগাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার—কিন্তু এ সীলমোহরের পেছনে রয়েছে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দান্ত সাহস, দুর্জ্জয় বিক্রম, যুদ্ধ, রক্তপাত—ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেই সব দিনের ইতিহাস এ সীলমোহরের সঙ্গে জড়ানো। তাই বলছি, এটা আপনারা পেলেন কী করে?

ওখান থেকে বার হয়ে আসবার সময়ে সুশীলের মনে টাকার স্বপ্ন ছিল না।

ছিল যে সুদূরের, দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন—জামাতুল্লা খালাসীর অত বড় পদ্মরাগ মণিখানার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

সে এমন এক দিনের স্বপ্ন—যা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে, তরুণ-দের প্রাণে নতুন আশা, উৎসাহ ও আনন্দের সংবাদ আনে বয়ে—

তবু তা সুশীলের মনে যে ছবি জাগালে তা আদৌ স্পষ্ট নয়—সবই আবছায়া, সবই ধোঁয়া-ধোঁয়া। সুশীল ইতিহাসের ছাত্র নয়। ডাঃ বসুর শেষ কথা-কটির সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শক্তি মেশানো ছিল—তার চোখের সামনে প্রাচীন কালের সুদীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে তলোয়ার হাতে বর্ম্মে চর্ম্মে সুসজ্জিত বীরের দল সারি সারি চলেছে, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না—অজানা সমুদ্রপথে তাদের বিজয় অভিযান নব উপনিবেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে ভাবী-কালের অসহায় ও অকর্ম্মণ্য সন্তানদের শিরায় শিরায় নতুন রক্তের আলোড়ন এনে দেয়!

কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরোনো জমিদার-ঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসী ছেলেটি সেজে—তাদেরই পূর্ব্বপুরুষ একদিন যে অসি হাতে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—তাদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী—আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে ; তেলে জলে, দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে, কোনরকমে পৈতৃক বাঙালী প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায় টায় !

চিরকাল হয়ত এমনি কেটে যাবে তার।

প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করে, পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টেনে আর পাল-পার্ব্বণে গ্রাম্য লোকজনের পাতে দই মোণ্ডা দিয়ে হাততালি অর্জ্জন করবার প্রাণপণ চেষ্টায় মশগুল হয়ে।

তার পর আছে মামলা মোকর্দ্দমার তদারক করতে কোর্টে ছুটোছুটি—ডিক্রি, নালিশ, কিস্তীবন্দী, সইমোহরের নকল, সমন জারি—উঃ! ভাবলে তার গা কেমন করে। প্রাচীন ধনী বংশের লাল খেরো-বাঁধানো রোকড় ও খতিয়ানের চাপে সে নিজের যৌবন ও জীবনকে একদম পিষে মেরে ফেলে শেষের দিকে যখন মহকুমার হাসপাতালে একটি মাত্র রোগী থাকবার স্থানের টাকা জেলাবোর্ডের হাতে দেবে স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি-রক্ষা কল্পে—তখন হয়ত সে পাবে রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর খেতাব।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, এই তো জীবনের পরম সার্থকতা সে পেয়ে গেছে।

না দেখবে দুনিয়া—না দেখবে জীবন, ঠুলিপরা বলদের মত ঘানিগাছের চারিধারে ঘুরেই জীবন কাটাবে।

রাত্রে সে সনৎকে ডেকে বললে সনৎ, তোর সাহস আছে?

—কেন দাদা?

—আমি যদি বিদেশে বেরুই, আমার সঙ্গে যাবি?

—এখুনি—যদি নিয়ে যাও!

—অনেক দূর হলেও?

—যেখানে বল।

—বাড়ীর জন্য মন কেমন করবে না?

—আমি পুরুষ মানুষ না দাদা? ও কথাই ওঠে না!

—আমি এমনি জিগ্যেস করছি—

পরদিন সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়ল পুরোনো দিনের বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। যে সব কথা সে জানত না, কোনদিন শোনে নি—ডাঃ বসুর কথায় তার ইচ্ছে গেল সেগুলো জানবার ও পড়বার।

বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনী, চম্পা রাজ্যের কথা—সুদূর সমুদ্রপারের ভারতীয় উপনিবেশ চম্পা। ভারতবাসী অসির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দিয়ে যে দেশের মাটি-পাথরের গায়ে নাগ-রাজ বাসুকী, শিব-পার্ব্বতী ও বিষ্ণুমূর্ত্তি অমর করে রেখেছে।

জামাতুল্লা খালাসীকে সে একশোবার ধন্যবাদ জানালো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পড়তে।

সে তো এক পাড়াগাঁয়ে অলস জীবন যাপন করছিল—

কোনদিন এসব কথা সে জানতেও পারত না—এত বড় ছবি তার মনে কোনদিন জাগতও না—যদি দৈবক্রমে জামাতুল্লা খালাসী সেদিন তার পাশে এসে বসে দেশলাই না চাইত।

তুচ্ছ এক পয়সার দেশলাই।

পড়ার টেবিলে বসে বসেই সুশীলের হাসি পেল কথাটা ভেবে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বার হয়েই জামাতুল্লা খালাসীর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে আছে। সুশীলকে দেখে সে বললে—আসুন বাবু, কাল রাতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে!—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে—

সুশীল বাধা দিয়ে বললে—কী—কী?

জামাতুল্লা বললে—সে এক আজগুবি কাণ্ড বাবু—

—কী রকম ব্যাপার?

—আপনার সেই বন্ধুর বাড়ী থেকে পাথরখানা নিয়ে কাল ফিরছি বাবু, মেটেবুরুজের কাছে ছোটমোল্লাখালি বলে যে বস্তি—ওই বস্তির কাছে আমার এক দোস্ত থাকে। ভাবলাম, চা খেয়ে যাই। সেখানে একেবারে মানুষ নেই—ফাঁকা মাঠ, সিকিমাইল দূরে ছোটমোল্লা-খালি বস্তি। হঠাৎ বাবু আমার মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কে যেন আমার গলা দু হাত দিয়ে চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে—আমি তো চেঁচিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম—কিন্তু পড়ে গেলাম চিৎপাত হয়ে মাঠের মধ্যে- পেছনে সে সময় পায়ের শব্দ শুনলাম যেন—

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে—পাথরখানা আছে তো?

—শুনুন বাবু, তারপর। আমি এমন কাণ্ড কখনো দেখিনি। চিৎপাত হয়ে পড়ে আর জ্ঞান নেই। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমার চারিপাশে দু-তিন জন লোক দাঁড়িয়ে, তারা কেউ পানি এনে আমার চোখে মুখে দিচ্ছে, কেউ গামছা নেড়ে বাতাস করছে। আমার দোস্তর নাম বলতে তারা আমায় ছোটমোল্লাখালি নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে যখন আমার হুঁশ বেশ ভাল ফিরে এল, আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি পাথরখানা নেই।

—বল কী? নেই! গেল সেখানা!

—শুনুন বাবু আজগুবি কাণ্ড! পাথর নেই দেখে তো আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দোস্তর বাড়ী তো শোরগোল পড়ে গেল। কত লোক দেখতে এল—আমার দোস্ত কতবার মুখে চোখে পানি দিয়ে ডাক্তার ডেকে আমায় চাঙ্গা করলে। আমি সেই রাত্রেই বাড়ী চলে গেলাম—

—তারপর?

—বাবু আপনি বলুন একটা কথা। আমি কাল আপনার দোস্তর কাছে দেখাতে গিয়েছিলাম কী নিয়ে? যে ছাঁচ তৈরি হয়েছিল তাই নিয়ে—না আসল পাথরখানা নিয়ে? আপনার ওই যে দোস্ত খুব এলেমদার লোক, তার কাছে?

—ও, ডাঃ বসুর কাছে তুমি তো আসল পাথরখানা নিয়ে গেছলে।

—ছাঁচখানা নিয়ে যাই নি ঠিক তো? কিন্তু বাবু বাড়ী ফিরে দেখি আসল পাথরখানা পকেটে রয়েছে, ছাঁচখানা নেই।

সুশীল হো-হো করে হেসে বললে—এ কোন আজগুবি কাণ্ড হল না জামাতুল্লা। তুমি দু-খানাই নিয়ে গেছলে। যে তোমার গলা টিপেছিল সে ছাঁচখানাকে ভুল করে নিয়ে গেছে—আসলখানা তোমার পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। কোন্ পকেটে কোন্‌টা রেখেছিলে মনে আছে?

—বাবু আমি ছাঁচটা নিয়েই যাই নি—

—আমি বলছি শোন। তুমি ভুলে দুটোই নিয়ে গেছলে। কিন্তু এ থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। কেউ আমাদের পাথরের খবর পেয়েছে—কলকাতা গুণ্ডা বদমাইশের জায়গা—আমরা ক-দিন ধরে এখানে পাথরের কথা বলেছি, তত সাবধান হইনি। এখানেও শুনতে পারে, সেদিন ডাঃ বসুর ওখানে দুটো আরদালি দাঁড়িয়ে ছিল—আমার সন্দেহ হয় তাদের মধ্যে কেউ শুনতে পারে। যাক্, ভালই হয়েছে যে আসলখানা চুরি যায় নি! আজ তোমার সঙ্গে নেই তো সেখানা?

—না বাবু। আমি কি আর তেমনি উজবুক?

—লোক লেগেছে আমাদের পেছনে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।

জামাতুল্লা হেসে বললে—বাবু, লোক লেগে আমায় হঠাৎ কিছু করতে পারবে না। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি—কত বদমাইশ লোকের সঙ্গে কতবার কারবার করেছি। এই হাত-দুটো যে দেখছেন—এ দুটো ঠিক থাকলে এর সামনে কেউ এগুতে পারবে না জানবেন খোদার দোওয়ায়।

সুশীল একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে—কোনদিকে কোন লোক নেই। সঙ্গীকে চুপি-চুপি বললে—এসব কথা এখন নয়। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

—কোথায় বাবুজি?

—আমার বাসায়। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে সব কথা হবে এখন।

জামাতুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সুশীল তাদের বাসায় এল। আসার পথে কোন কিছু অঘটন ঘটে নি দেখে সুশীলের মন থেকে ভয় ও বিপদাশঙ্কা অনেকখানিই চলে গেল। জামাতুল্লাকে কিছু খেতে দিয়ে ও তার জন্যে বাইরের ঘরের কোণে বিছানা করে দিলে।

জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, বিছানা কেন?

—রাত্রে এখানে তোমায় রাখব। যেতে দেব না মেটেবুরুজে। সাবধানের মার নেই। খিদিরপুরের মাঠ থেকে মেটেবুরুজ পর্য্যন্ত জায়গা বড্ড নির্জ্জন—গুণ্ডা বদমাইশের

আড্ডা। রাত্রে সে পথে গেলে বিপদ আছে। তোমার যত সাহসই থাকুক—রাত্রে যাওয়া হবে না।

সুশীলের এ সতর্কতার জন্যে জামাতুল্লাকে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকতে হয়েছিল।

রাত্রে আহারাদির পরে সুশীল জামাতুল্লাকে বললে—আমার মতলব তোমাকে বলব বলেই তোমায় ডেকেছি। আমার মনে হয়েছে আমরা—যে করেই হোক—চল সেই বনের মধ্যে প্রাচীন নগরের সন্ধানে বেরুই। টাকাকড়ির সন্ধান আমি করছি নে—পাই ভালো, তা আমি একা নেব না—নটরাজনের স্ত্রীর শেষ দিনগুলো যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটে তার ব্যবস্থা করব তা দিয়ে। তারপরে তুমি আছ, আমি আছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার ঘরে খাবার ভাবনা নেই।

জামাতুল্লা খালাসী ঘাড় নেড়ে বললে—সে আমি আগেই জানি বাবু—আপনি রইস্ আদমি—মানুষ দেখেই চিনতে পারি। নইলে আপনাকে এত বিশ্বাস করতাম না। বড় ঘরানা আপনারা, আপনাদের নজর হবে বড়।

—তা ছাড়া কী জানো জামাতুল্লা? এই বয়স হচ্ছে বিদেশ বেড়ানোর সময়। চিরকাল বাড়ী বসে থাকব যদি, তবে দুনিয়া দেখব কবে?...তোমার সাহস আছে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার তো?

—এ বাবুজি সাহসের কথা নয়। জাহাজ চালানো বিদ্যের কথা—কৌশলের কথা। সিঙ্গাপুরে আমার এক দোস্ত আছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সে সুলু সীতে জাহাজ চালিয়েছে অনেক দিন—আপনার কাছে ছিপাবো না, বোম্বেটের কাজ করত সে। এখন বড্ড কড়া শাসন, ওলন্দাজ সরকার আর আমাদের ইংরেজ সরকারের। মানোয়ারী জাহাজ সর্ব্বদা ঘুরছে। বোম্বেটে জাহাজ ধরতে পারলেই ধরে নিয়ে আসবে—আর গুলি করবে। সেজন্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকান করে বসে আছে সিঙ্গাপুরে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

—তাহলে কী রকম ব্যবস্থা করবে যাবার?

—আপনি টাকা কত নিতে পারবেন বলুন।

—শ-পাঁচেক। তার বেশি এক পয়সা নয়।

—তাও নেবেন না। আপনি আমার দোস্ত—দুশো নিয়ে চলুন। আমি পাথর বিক্রি করে ফেলি—সেই টাকায় চালাবো।

—সে টাকা তোমায় আমি নিতে দেব না জামাতুল্লা। নটরাজনের স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সে পাথর নিয়ে আমাদের ফল ভাল হবে না। নটরাজন স্বর্গ থেকে দেখবে আর অভিশাপ দেবে।

—এইজন্যেই তো বলি, রইস্ আদমির বুদ্ধি আর আমাদের বুদ্ধি! আপনি যা বলবেন বাবুজি।

অনেক রাত হয়েছিল। জামাতুল্লার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সুশীল নিজে শোবার

জন্মে চলে গেল বটে—কিন্তু তার সারা রাত ঘুম এল না চোখে। এবার কী ক্ষণে সে বাড়ী থেকে বার হয়েছিল! সাগর-পারের যাত্রী হয়ে যদি সেই অজানা দ্বীপে অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন যুগের হিন্দু-কীর্ত্তি শুধু চোখের দেখা দেখে আসতে পারে—তবেই সে জীবন সার্থক বিবেচনা করবে। চম্পারাজ্যের মত সেখানেও আর এক হিন্দু উপনিবেশ ছিল নিশ্চয়ই—মহাকালের চক্রনেমির আবর্ত্তনে অরণ্য গ্রাস করেছে সে নগরী—তবুও ভারতের সন্তান সে, প্রাচীন যুগের সেই পুণ্যভূমির পবিত্র ধূলি স্পর্শ করে সে ধন্য হতে চায়।

অর্থের জন্যে সে যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে উঠে সুশীল জামাতুল্লাকে চা ও খাবার খেতে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে—এমন সময় কাগজওয়ালা খবরের কাগজ দিয়ে গেল; সুশীল কাগজ খুলে সংবাদ-গুলোর ওপর সাধারণভাবে চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—জামাতুল্লা, আরে, তোমাদের মেটেবুরুজে খুন!...

জামাতুল্লা চা খেতে খেতে চমকে উঠে বললে—কোথায় বাবু, কোথায়?

—দু নম্বর মফিজুল সর্দ্দারের লেন, একটা কুঠুরিতে নূর মহম্মদ নামে একটা লোককে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—

সুশীল কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলে জামাতুল্লা তালপাতার মত কাঁপছে—অতি কষ্টে সে সুশীলকে জিজ্ঞেস করলে—কী নাম লোকটির বাবুজি?

—নূর মহম্মদ—

জামাতুল্লা চা ফেলে উঠে এসে সুশীলের হাত ধরে বললে—আপনি আমার সবচেয়ে বড় দোস্ত—কাল এখানে রেখে আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন! নূর মহম্মদ আমার ঘরেই থাকে। এক বিছানাতে দুজনে শুই—কাল আমি থাকলে আমাকেই মারত, আমি ভেবে ভুল করে ও বেচারিকে খুন করে গিয়েছে—

সুশীল বলে—তুমি এখুনি বাড়ী যাও—সেই জিনিসটা—

—না বাবু, সে আমি অন্য জায়গায় রেখেছি—সেখান থেকে কেউ সেটা বের করতে পারবে না।

সুশীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—তবুও একবার যাও—

—সেটা নিয়ে বাবুজি আপনাদের বাড়ীতে রেখে দিন আপনি—মেহেরবানি করে যদি রেখে দেন!

—নিশ্চয়ই রাখব। তুমি একা যেও না—চল আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আমার ভাই সনৎকে সঙ্গে নেব।

পাথরখানা এনেই সুশীল কয়েকদিনের মধ্যে তার আর-একখানা ছাঁচ করিয়ে নিয়ে সেখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এল। ওসব জিনিস সঙ্গে রাখলেই যত গোলমাল।

কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখবার কয়েকদিন পরেও ঘটে গেল এক বিপদ।

সুশীল তখন হাজার দুই টাকার ব্যবস্থা একরকম করে ফেলেছে। তার কাকাই টাকাটা

তাকে দেবেন—তবে সে বলেছে ব্যবসার জন্যেই ওটা দরকার—বিদেশে যাওয়ার কথা শুনলে কেউ উৎসাহ দিত না। ওর সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যেতে রাজী, সনৎ একথা জানিয়েছে।

সুশীল বৌবাজার দিয়ে গিয়ে জামাতুল্লাকে ট্রামে দিয়ে এল। ট্রাম পরবর্ত্তী থামবার জায়গায় যাবার পূর্ব্বেই ট্রামে এক শোরগোল উঠল।

জামাতুল্লা ট্রামের বেঞ্চিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের একজন লোক নেমে গেল—নেমে যাবার সময় একবার যেন তার হাতখানা জামাতুল্লার পিঠের দিকে ঠেকাল—অন্তত জামাতুল্লার তাই মনে হল। পরক্ষণেই জামাতুল্লা রক্তাক্ত দেহে চিৎপাত ট্রামের মেঝেতে।

লোকজন হৈ-হৈ—পুলিস! পুলিস! সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে নামিয়ে ফেললে।

শেষে দেখা গেল ওর বিশেষ কিছু লাগে নি এবারও। একখানা ধারালো ছুরি দিয়ে বোধ-হয় আততায়ী কোমরের থলে কাটতে চেষ্টা করেছিল। ছুরিখানা দৈবাৎ তলপেটের পাশের দিকে লেগে খানিকটা অগভীর রেখা সৃষ্টি করে লম্বালম্বিভাবে কেটে গিয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক সাতদিন পরে সুশীল, সনৎ ও জামাতুল্লা তিনজনে একখানা রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়ে বসল—আপাতত সিঙ্গাপুর এবং সেখান থেকে ব্যাটেভিয়া যাবে এই হল উদ্দেশ্য ওদের।

মাস দুই পরের কথা। সকালবেলা।

সুশীল সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একটি ছোট শিখ হোটেলের একটা ঘরে বসে সনৎকে বলছিল—আমরা এখানে এসে ভাল করলাম কি মন্দ করলাম এখনও বুঝি নি সনৎ। জামাতুল্লার বোম্বেটে বন্ধু তো দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক—ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। ওকে কি খুব বিশ্বাস করা উচিত হল?

—বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী দাদা? ও ছাড়া সুলু সমুদ্রে জাহাজ চালাবে কে? তবে আমার মনে হয় যখন আমাদের কাছে এমন কোন মূল্যবান জিনিস নেই—তখন সে অনর্থক মানুষ খুনের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যাবে কেন?

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা তার বোম্বেটে বন্ধু মিঃ ইয়ার হোসেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইয়ার হোসেন ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটা চুল-ছাঁটা দোকান করে ভাড়াটে চীনে নাপিত দিয়ে চুল ছাঁটায়—রোজগার মন্দ হয় না। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে, রোগা চেহারা—চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভালমানুষ ও নিরীহ ধরনের বলে মনে হয়—পরনে সাহেবী পোশাক। লোকটা ভারতীয় নয়, মালয়ও নয়—কোন্ দেশের লোক তা কখনো বলে নি। তবে তার কথাবার্ত্তা থেকে মনে হয় ভারতের ওপর টানটা তার বেশি। কথাবার্ত্তা বলে ইংরাজিতে, নয়ত মালয় ভাষায়। তার ভাঙা ইংরেজি জামাতুল্লা বেশ বোঝে।

এ ধরনের লোকের সঙ্গে কখনো সুশীল বা সনৎএর পরিচয় ঘটে নি ইতিপূর্ব্বে। বাইরে মোটামুটি ভদ্রলোক, এমন কি বেশ নিরীহ প্রকৃতির প্রৌঢ় ভদ্রলোক—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইয়ার হোসেন দুর্দ্দান্ত দস্যু। মুহূর্ত্তের মনোমালিন্যের ফলে যারা বন্ধুর বুকে অতর্কিতে তীক্ষ্ণধার কিরীচ বসিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না—এ সেই জাতীয় লোক।

ইয়ার হোসেন ঘরে ঢুকে বললে—বসে আছেন? আমায় আর দুশো টাকা দিতে হবে—দরকার রয়েছে।

সুশীল জামাতুল্লার মুখের দিকে চাইলে অতি অল্পক্ষণের জন্যে। জামাতুল্লা চোখের ইঙ্গিতে তাকে বলে দিলে ইয়ার হোসেনকে যেন সে প্রত্যাখ্যান না করে।

—কত টাকা বললেন মিঃ হোসেন?

—দুশো কি আড়াইশো—

—বেশ, নেবেন। সেদিন নিয়েছেন একশো—

ইয়ার হোসেন যেন খানিকটা উদ্ধত স্বরে বললে—নিয়েছি তো কী হবে? তোড়জোড় করতেই সব টাকা যাচ্ছে—

—জাহাজের কী হল? চার্টার করবেন?

—জাহাজ চার্টার করবার টাকা কোথায়? কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা বলি। আপনারা সে বিন্ধমুনির দেশে যেতে চাইছেন কেন? টাকা-কড়ি হীরে-জহরত সেখানে সত্যি আছে?

—কী করে বলি সাহেব! তবে, তোমার কাছে লুকুব না। খুব বড় রত্নভাণ্ডার সেখানে লুকোনো আছে এই আমাদের বিশ্বাস। ওই মণির ওপর আঁকজোক আছে—ওটাই তার হদিস—অন্তত নটরাজন তাই বলেছিল।

—আমি চেষ্টা করে দেখব—কিন্তু আমার ভাগ ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ চাই। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে। এই হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি, সে কথা কে না জানে? মানুষ মারা যা, আমার কাছে পাখি মারাও তা।

সুশীলের গা যেন শিউরে উঠল। কাজের খাতিরে এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আজ তাকে মিশতে হচ্ছে—ভাগ্য কী জানি কোন্ পথ তাকে নির্দ্দেশ করছে! মুখে বললে—না সাহেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—ফাঁকে তুমি পড়বে না।

ইয়ার হোসেন বললে—একটা গল্প বলি শোন তবে। একবার আমার জাহাজে ছ-সাতজন মাল্লা মদ খেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। তাদের দলে একজন সর্দ্দার ছিল, সে এসে আমায় জানালে, এই-এই শর্ত্তে আমি রাজী না হলে তারা আমার হাত পা বাঁধবে—মেরে ফেলতেও পারে। আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে শর্ত্তে সই করে দিলাম। তারপর ইঞ্জিন রুমের বড় কর্ম্মচারীকে ডেকে বললাম—জাহাজে কয়লা দিয়েই স্টীম বন্ধ করে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখবে।

ইঞ্জিনিয়ার বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কেন কাপ্তেন সাহেব—এ তো বড় বিপজ্জনক ব্যাপার—সেই ভীষণ উত্তাপে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখব?

সে বেচারি আমার মতলব কিছু বুঝলে না। আমি সেই বিদ্রোহী সর্দ্দারকে আর তার চারজন অনুচরকে বললাম ফার্নেসে কয়লা দিতে। এদিকে ইঞ্জিন-রুমে টেলিগ্রাফে ইঞ্জিনিয়ারকে পুরোদমে স্টীম দিতে বলেই ওরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে পুলি ঘুরিয়ে জাহাজ প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি কোণ করে স্টারবোর্ডের দিকে কাত করে ফেললাম। টাল সামলাতে না পেরে ওরা হঠাৎ গিয়ে পড়ল খোলা ফার্নেসের মুখে। লোক ঠিক করা ছিল, তক্ষুণি তারা ওদের ফার্নেসের আগুনে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে ফার্নেসের দরজা ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে বললে—তারপর ?

—তার পর ? তারপর দু-দিন পরে কতকগুলো আধপোড়া হাড় পোড়া কয়লার ছাইয়ের সঙ্গে ফার্নেস-সাফ-করা কুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। মিউটিনির শেষ হয়ে গেল।

—কেউ টের পেলে না ?

—সবগুলো বদমাইশ যখন ও পথে গেল—তখন বাকিগুলো আপনা-আপনিই চুপ করে গেল। ভালমানুষির দিন চলে গিয়েছে জানবেন। নিষ্ঠুর হতে হবে, নির্ম্মম হতে হবে—তবে মানুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

সুশীল বুঝল না এমন নিরীহ ভাল মানুষটির আড়ালে কী করে এমন দৃঢ় ও নির্ম্মম চরিত্র লুকোনো থাকতে পারে।

—আর একটা কথা—অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে আপনাদের ?

—কিছু না, একটি করে অটোম্যাটিক আছে দু-জনের—তার কার্টিজ নেই।

—রাইফেল নেই ?

—ভারত থেকে রাইফেল কেনা ? মিঃ হোসেন, এবার আপনি হাসালেন।

ইয়ার হোসেন দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা বড় রিভলভার নিয়ে এসে সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—পছন্দ হয় ?

—ওঃ, এ তো চমৎকার জিনিস্।

—এই কিনব তিনটি তিনজনের, আর একটা পুরোনো মেশিনগান—

—মেশিনগান কী হবে !

—অনেক দরকার আছে।

সুশীল ও সনৎ দু-জনেই দেখলে সে অনেক রকম জানে শোনে। জাহাজ চালানোর যন্ত্রাদি কিনবার সময়—তার যে কিছু কিছু বিজ্ঞানের জ্ঞানও আছে—এ পরিচয়ও পাওয়া গেল। চাল-চলনে, ধরন-ধারণে—সে সর্ব্বদাই মনে করিয়ে দেয় যে সে সাধারণ নয়।

সুশীল জামাতুল্লাকে বললে—তুমি বলেছিলে দুশো টাকা হলেই হবে—তো এখন দেখছি পাঁচশো টাকাই মিঃ হোসেন নিয়ে নিলে নানা ছুতো করে ; হাতে কিন্তু এক পয়সাও রইল না—

—কোন ভয় নেই বাবুজি, আমি যখন আছি। ও তেমন লোক নয়।

—লোক নয় কী রকম? ভয়ানক লোক, আমরা বুঝেছি। ও দরকার মনে করলে তোমার মত পুরোনো বন্ধুর গলা কাটতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

—বাবুজি দেখছি ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

—তা একটু পেতে হয়েছে। টাকাটা ও মেরে দেবে না তো? তুমি হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে ওর পেছনে।

—বাবুজি আমি হাজার পেছনে থেকেও কিছু করতে পারব না—ও যদি ইচ্ছে করে তবে সিঙ্গাপুর থেকে আজই পালিয়ে যেতে পারে—কেউ পাত্তাই পাবে না। ইয়ার হোসেন ছাঁচটার কথা জিগ্যেস করছিল—

—তুমি কী বললে?

—বললাম, বাবুর কাছে আছে।

—মতলব কী?

—না বাবু খারাপ কিছু নয়—ও একবার দেখতে চায়।

—ওঃ, ভাগ্যিস আসল পদ্মরাগখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়! নইলে, সেই পাথর নিয়ে কলকাতাতেই খুন হয়ে গেল মেটেবুরুজে, এখানে আনলে সে পাথর আমরা হাতে রাখতে পারতাম না!

জামাতুল্লা গলার স্বর নিচু করে বললে—বাবুজি, এখানেও লোক পেছন নিয়েছে।

সুশীল ও সনৎ একযোগে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কী রকম!

—এখন বলব না, আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে দিন দুপুরে মানুষের বুকে ছুরি বসায়—পরে শুনবেন।

সিঙ্গাপুরে যেদিকে বড় ডক তৈরি হয়েছে, ওর কাছে অনেক দূর পর্য্যন্ত সামরিক ঘাঁটি। সাধারণ লোককে সে সব রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। জামাতুল্লাকে পথ-প্রদর্শকরূপে নিয়ে দু'জনে সেই দিকে বেড়াতে বেরুল। সমুদ্রের নীল দিগন্ত-প্রসারী রূপ এখান থেকে যেমন দেখায়, এমন আর কোথাও থেকে নয়। দুপুরের কাছাকাছি সময়টা প্রখর রৌদ্র-কিরণে সমুদ্র-জল ইস্পাতের ছুরির মত ঝক্‌ঝক্ করছে। দু-খানা মানোয়ারী জাহাজ বন্দর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

একজন চীনেম্যান এসে ওদের পিজিন ইংলিশে বললে—টী, স্যর, টী?

—নো টী।

—নো টী স্যর? মাই হাউস হিয়ার স্যর, ভেরি গুড হোম-মেড টী স্যর!

সনৎ বললে—চল দাদা, চল জামাতুল্লা, একটু চা খেয়ে আসি।

সবাই মিলে রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা চীনা বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে একটা অ্যাসবেস্টস-এর ঢেউ-খেলানো পাত দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট বাড়ীতে এল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাঁশের টেবিল পাতা আছে বারান্দায়। তিনজনে সেখানে বসে দূরে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছে—এমন সময় চীনেম্যানটি চা নিয়ে এল। ওরা চা খাচ্ছে, সে লোকটা আবার কিছু কেক নিয়ে এসে ওদের

সামনে রাখলে। ওদের বললে—তোমরা কোথায় যাবে?

সুশীল বললে—বেড়াতে এসেছি।

—কোথা থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—ভেরি গুড। চমৎকার জায়গা সিঙ্গাপুর।—এখান থেকে আর কোথাও যাবে নাকি?

—না, আর কোথাও যাব না।

—ভাল কিউরিও কিনবে?

—কী জিনিস?

—এস না ঘরের মধ্যে।

—ওরা তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বুদ্ধের মূর্ত্তি, মালা, ড্রাগনের মূর্ত্তি, পোর্সিলেনের পেটমোটা চীনে ম্যাণ্ডারিনের মূর্ত্তি—ইত্যাদি সাধারণ শৌখিন জিনিস আলমারিতে সাজানো—ওরা হাতে করে দেখছে, এমন সময় সনৎ একটা জিনিস হাতে নিয়ে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল:

—দাদা ছাখো!

সুশীল ও জামাতুল্লা দু-জনেই চেয়ে দেখলে, একখানা জেড্ পাথরে তৈরি ছুরির গায়ে কি আঁক-জোঁক কাটা। ভাল করে দু-জনেই দেখলে অবিকল সেই আঁক-জোঁক, নটরাজনের পদ্মরাগ মণির গায়ে যে আঁক-জোঁক ছিল।

ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

সুশীল বললে—এ ছুরিখানার দাম কত?

—দু ডলার, মিস্টার।

—এ ছুরি তুমি কোথায় পেলে?

—দেখি ছুরিখানা? ও, এ আমি একজন মালয়ের কাছে কিনেছিলাম।

—এখানেই?

—হ্যাঁ, একজন মাল্লা ছিল সে।

—কোথা থেকে সে ছুরিখানা পেয়েছিল তা কিছু বলে নি?

—না মিস্টার। তবে ছুরিখানা সে ভয়ে পড়ে বিক্রী করে। সে বলেছিল দু-দুবার সে প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে যায়, এ ছুরিখানার জন্যে। তার পেছনে লোক লেগেছিল। লুকিয়ে আমার কাছে বিক্রী করে। কেউ জানে না যে এখানা আমার কাছে আছে।

—আমরা এখানা নেব।

—ওখানা বিক্রী হবে না।

—আমরা তিন ডলার দেব।

—নিয়ে বিপদে পড়বে তোমরা। ও নিও না।

—তোমার দোকানের জিনিস বিক্রী করতে আপত্তি কী?

—আমি আমার খরিদ্দারকে বিপদে ফেলতে চাইনে। শোন মিস্টার, আমি জানি ও ছুরি তুমি কেন নিতে চাইছ। ওই আঁক-জোঁকগুলোর জন্যে—ঠিক কি না? প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে অনেকে জানে ওই আঁকগুলো কোথাকার এক গুপ্ত নগর আর তার ধনভাণ্ডারের হদিস। সকলে জানে না বটে, তবে পুরোনো লোক কেউ কেউ জানে। অনেক পুরোনো জেড্ পাথরের আংটিতে ওই আঁক-জোঁক আমি দেখেছি। ও নিয়ে একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়ের বাইরে আর কারো কাছে এই আঁক-জোঁকওয়ালা আংটি কি ছুরি কি কিরীচ দেখলে তারা তার পেছনে লেগে গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত করে ফেলে—তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে, জিনিসটাকে হস্তগত করা।

—কেন?

—পাছে অন্য কেউ ওই আঁক-জোকের হদিস পেয়ে সেই প্রাচীন নগর আর তার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার আবিষ্কার করে ফেলে। ওরা নিজেরা যখন বের করতে পারলে না—তখন আর কাউকে ওরা খোঁজ করতেও দেবে না। ও চিহ্নের জিনিস কাছে রাখা মানে প্রাণ হাতে করে বেড়ানো। কিন্তু আমার মনে হয় কী জান, মিস্টার? ওরকম নগর কোথাও নেই। ও একটা মিথ্যা প্রবাদের মত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেউ দেখেছে এ পর্য্যন্ত বলতে পার? কেউ বলতে পারে সে দেখেছে? কেউ সন্ধান দিতে পারে? ও একটা ভুয়ো গল্প।

চা খেয়ে বাইরে এসে তিনজনে সমুদ্রের দিকে চলল।

চীনেম্যানটি পিছন থেকে ডেকে বললে—ওদিকে যেও না মিস্টার, সামরিক সীমানা—যাওয়া নিষেধ। সমুদ্রের ধারে এদিকে বসবার জায়গা নেই।

একটু নির্জ্জন স্থানে গিয়ে সুশীল বলাল—জামাতুল্লা, শুনলে সব কথা? এখনো কি তোমার মনে হয় সে নগর আছে কোথাও? আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটছি নে? নটরাজনের গল্প ভুয়ো নয়?

জামাতুল্লা বললে—তবে পদ্মরাগ মণি এল কোথা থেকে?

—আমি তোমায় বলছি নটরাজনের কাহিনী আগাগোড়া বানানো গল্প। পদ্মরাগ মণি-খানা সে কোনপ্রকার অসৎ উপায়ে হস্তগত করে—যার উপরে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী ঐ চিহ্নটি আঁকা ছিল। এ ছাড়া ওর কোন মানে নেই।

জামাতুল্লার মুখচোখের ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেল—কত বৎসর পূর্ব্বের এক স্বপ্নভরা দিন, এক আতঙ্কভরা কৃষ্ণা-রজনীর স্মৃতি তার মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে। সে বললে—কিন্তু বাবুজি, নটরাজন হয়ত দেখেনি, আমি তা দেখেছি। ভীষণ বনের মধ্যে অন্ধকার রাত কাটিয়েছি। আমি কারো কথা শুনিনে।

—খুব সাবধান জামাতুল্লা, আমাদের প্রাণের দাম এক কানা-কড়িও না—যদি একথা কোন রকমে প্রকাশ হয় যে আমরা ওই আঁক-জোঁক-পড়া পাথরের ছাঁচে যার নিশানা সেই নগর খুঁজতে বেরিয়েছি।

—ঠিক বাবুজি। সে কথা আমারও মনে হয়েছে। এই সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে পথে-পথে রাত্রের অন্ধকারে খুন হয়। ভারি সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ইয়ার হোসেনকে সাবধান করে দিতে হবে। মুশ্‌কিল হয়েছে লোকটা মাতাল, মদ খেয়ে কোন কথা প্রকাশ করে না ফেলে। চল, যাওয়া যাক্।

তিনজনে সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বাসার দিকে রওনা হল।

পরদিন ইয়ার হোসেন এসে ওদের বাসায় খুব সকালেই উপস্থিত হল। সনৎ তখন উঠেছিল। চায়ের জন্যে স্টোভ ধরিয়েছে—ইয়ার হোসেনকে দেখে বললে—আসুন মিঃ হোসেন, ঠিক সময়েই এসেছেন—চা তৈরি।

ইয়ার হোসেন রুক্ষ প্রকৃতির লোক। বলে উঠল—চা খাবার জন্যে ঠিক আসি নি। আরো দুশো টাকা চাই।

হঠাৎ সনৎএর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আরও দুশো! তাহলে তো আমাদের হাতে রইল না কিছু!

—তা আমি কী জানি? এ কাজে এসেছেন যখন তখন পয়সার জন্যে হঠলে চলবে না। নয়তো বলুন ছেড়ে দিই।

—না না, দাঁড়ান। আমি দাদা ও জামাতুল্লাকে ডাকি।

সুশীল শুনে বললে—তাই তো, ব্যাপার কী? চল, দেখি ব্যাপার কী।

ইয়ার হোসেন বাইরে বসে আছে। সুশীল গিয়ে বললে—গুড মর্নিং মিঃ হোসেন। কী মনে করে এত সকালে?

—সব ঠিক। আজ রাত্রে রওনা হতে হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে বলে উঠল—কী রকম?

ইয়ার হোসেন গম্ভীর মুখে বললে—সব ঠিক। তার আগে সেই ছাঁচখানা একবার দেখি—এখুনি। আর দুশো টাকা—এখুনি।

সুশীলের ইঙ্গিতে সনৎ বাক্স খুলে প্যারিস-প্লাস্টারের ছাঁচ ওর হাতে দিলে। ইয়ার হোসেন ছাঁচখানা উল্টে-পাল্টে দেখে শুনে বললে—নাও। এ-সব বুজরুকি—অন্য কিছুই না। কিছুই হবে না হয়ত।—টাকা?

সুশীল বললে—টাকা রয়েছে জামাতুল্লার কাছে। সে আসুক।

—কোথায় সে?

—তা তো জানিনে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে।

—আচ্ছা, আমি বসি।

—এখন কী ঠিক করলেন বলুন মিঃ হোসেন।

—এখান থেকে ডাচ্ স্টীমার 'বেন্দা' ছাড়ছে আজ রাত দশটায়। আমাদের নামতে হবে সাঙ্গাপান বন্দরে—সুলু সমুদ্রের ধারে। সাঙ্গাপান মশলার বড় আড়ত—সেখান থেকে চীনে জাঙ্ক্ ভাড়া করে যাব।

—এসব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডাচ্ স্টীমারে উঠতে দেবে ? মেশিন গান কিনেছেন নাকি ?

—সব ঠিক আছে। আপনি শুধু দেখুন ইয়ার হোসেন কী করতে পারে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। জামাতুল্লা আর ফেরে না। সুশীল ও সনৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কাল বিকেলের সেই চীনাম্যানের কথা বার বার মনে পড়ছিল ওদের। কথাটা ইয়ার হোসেনকে বলা ঠিক হবে না হয়ত—ভেবেই ওরা বললে না। কিন্তু জামাতুল্লা সব জেনে-শুনে একা বেরুল কোথায় ?

বেলা প্রায় দশটা। এমন সময় জামাতুল্লা ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে হাজির হল। ওর মুখের চেহারা দেখে তিনজনেই একসঙ্গে বললে—কী হল তোমার ?

জামাতুল্লা ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—কিছুই না।

—কিন্তু তোমার চেহারা দেখে—

—এই রোদে—

সুশীল বললে—জামাতুল্লা, মিঃ হোসেন আরো দুশো টাকা চান।

—ও! তা দিন বাবু। এই নিন চাবি।

—উনি বলছেন আজ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে।

জামাতুল্লা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—টাকাটা দিয়ে দিন ওঁকে আগে।

টাকা নিয়ে ইয়ার হোসেন বিদায় নেবার পর-মুহূর্তেই জামাতুল্লা নিম্নস্বরে বললে—বড় বেঁচে গিয়েছি! ডকের পাশে যে গলি আছে ওখানে দু-জন মালয় গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করেছিল। দুজন দুদিক থেকে কিরীচ হাতে। ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিত আর-একটু হলে। আমি প্রাণপণে ছুটে বেঁচেছি। তোমরা অত ছুটতে পারতে না, মারা পড়তে ওদের হাতে। কালকের সেই চীনেম্যানের কথাই ঠিক। আমরা খুব বিপন্ন এখানে। বাড়ী থেকে কোথাও বেরিও না। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে ওর কথা শুনছিল। কথা শেষ হলে সনৎ তাকে চা ও টোস্ট খেতে দিয়ে বললে—কিছু বলি নি আমরা। ও আজই যেতে বলছে—শুনেছ তো ?

—যাতে হয় আজই আমাদের পালাতে হবে। এখন প্রাণ নিয়ে জাহাজে উঠতে পারলে বাঁচি!

—বল কী জামাতুল্লা ? এত ভয় নেই। চীনেম্যানটার বাজে গল্পটা দেখছি তোমার মনে বড় দাগ কেটে দিয়েছে।

—বাবুজি, মেটেবুরুজের মাঠে খুনের কথাটা ভেবে দেখুন। সে পাথরখানার জন্যে নয়—আকজোঁকের জন্যে। এখন আমার তাই মনে হচ্ছে। অসাবধান হবেন না আজ দিনমানটা। জাহাজে উঠলে কতকটা বিপদ কাটে বটে।

সেদিন বিকেলে ইয়ার হোসেনের লোক আবার এল। একটা সীলমোহর-করা চিঠি সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—এর উত্তর এখুনি চাই। সুশীল চিঠিখানা পড়ে দেখলে, আজ কিভাবে কোথা থেকে রওনা হতে হবে, সেই ব্যবস্থা চিঠিতে লেখা। ইয়ার হোসেন অন্য

পথ দিয়ে যাবে। ওদের যেন চেনে না, এভাবে। জাহাজে না উঠে এদের তিনজনের সঙ্গে সে কথাবার্ত্তা বলবে না।

সুশীল চিঠির উত্তর দিয়ে দিলে। জামাতুল্লা বললে—আমাদের জিনিসপত্র যদি কিনতে হয়, এই সময় কিনে নিয়ে আসি—চলুন।

ওরা বেরিয়ে এল বাসা থেকে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের বড় বাজারে জিনিসপত্র কিনবে এই ওদের ইচ্ছা। জামাতুল্লা বললে—বাবু, কিছু ভাল জিনিস খেয়ে নেওয়া যাক। জানেন, কোন অজানা রাস্তায় অনেক দূর যেতে হলে, ভাল খেয়ে নিতে হয়। অনেকদিন হয়ত ভাল খাবার অদৃষ্টে জুটবে না।

একটা শিখ রেস্টুরেণ্টে ওরা গিয়ে বসল। মাংস, কাটলেট, চা, টোস্ট ইত্যাদি আনিয়ে খাওয়া শুরু করেছে, এমন সময় একজন ইউরোপীয়-পোশাক-পরা মালয় এসে ওদের টেবিলে বসে বিনীতভাবে বললে—সে কি তাদের সঙ্গে বসে খেতে পারে?

সুশীল বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

সে আর কোন কথা না বলে খাবার আনিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে খেতে লাগল। তারপর আবার ওদের দিকে চেয়ে বললে—আপনারা ভারতীয়?

সুশীল ভদ্রভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—এখানে এসেছেন বেড়াতে, না?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগছে সিঙ্গাপুর?

—বেশ জায়গা।

—এখান থেকে দেশে ফিরছেন বোধহয়?

—তাই ইচ্ছে আছে।

—আপনারা তিনজনে বুঝি এসেছেন?

—না, আমরা এখানে এক হোটেলে থাকি—আলাপ হয়ে গিয়েছে।

—বেশ, বেশ।

—তারপর আবার বললে, আপনারা কোন্ হোটেলে উঠেছেন জানতে পারি কি? আমাদের একজন ভারতীয় বন্ধুর একটা ভাল হোটেল আছে, সেখানে খাবার-পত্র সস্তা। ঘরদোরও ভাল। যদি আপনাদের দরকার হয়—

সনৎ হঠাৎ বলে উঠল—না, ধন্যবাদ। আমরা আজই চলে যাচ্ছি।

সুশীল টেবিলের তলা দিয়ে সনৎকে এক রামচিমটি কাটলে। মালয় লোকটার চোখে-মুখে একটা কৌতূহলের ভাব জাগল। সেটা গোপন করে সে বললে—ও! আজই যাবেন? কিন্তু ভারতের জাহাজ তো আজ ছাড়বে না?

সুশীল বললে—না, আমরা রেলে উঠে যাচ্ছি কুয়ালালামপুর।

—ও, কুয়ালালামপুর? দেখে আসুন, বেশ শহর।

আরও কিছুক্ষণ পরে লোকটা বিল চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সুশীল রাগের সঙ্গে সনৎএর দিকে চেয়ে বললে—ছি, ছি, এত নির্ব্বোধ তুমি? ও-কথা কেন বলতে গেলে?

সনৎ অপ্রতিভ মুখে বললে—আমি ভাবলাম ওতেই আপদ বিদেয় হয়ে যাবে। অত জিজ্ঞেস করার ওর দরকার কী? আমরা যদি না যাই, তোর তাতে কিরে বাপু?

—তা নয়। কে কী মতলব নিয়ে কথা বলে, দরকার কী ওদের সঙ্গে সব কথা বলার?

জামাতুল্লা বললে—ঠিক কথা বলেছেন বাবুজি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে দু-একটা জিনিস কেনবার জন্যে বাজারের দিকে চলেছে—এমন সময় জামাতুল্লা নিচু গলায় চুপি চুপি বললে—ওই দেখুন সেই লোকটা!

সুশীল ও সনৎ চেয়ে দেখলে, সেই মালয় লোকটা একটা দোকানে কি একটা জিনিস কিনছে। ওদের দিকে পিছন ফিরে।

সুশীল বললে—চল আমরা এখান থেকে চলে যাই—মোড়ের দোকানে জিনিস কিনিগে।

জিনিস কিনতে একটু রাত হয়ে গেল। ওরা বড় রাস্তা বেয়ে অনেকটা এসে ওদের হোটেল যে গলিটার মধ্যে সে গলিটাতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় কি একটা ভারি জিনিস সুশীলের ঠিক বাঁ হাতের দেয়ালে জোরে এসে লেগে ঠিকরে পড়ল সামনে রাস্তার ওপরে।

ওরা চমকে উঠল। জামাতুল্লা পথের ওপর থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে—সর্ব্বনাশ!

ওরা দুজনে নিচু হয়ে জিনিসটা দেখতে গেল—কিন্তু জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, ছুটে আসুন, এখানে আর দাঁড়াবেন না বলছি!

দুজনে জামাতুল্লার পিছনে পিছনে দ্রুতপদে চলতে চলতে বললে—কী, কী হয়েছে? কী জিনিস ওটা?

মিনিট পাঁচ ছয় ছুটবার পর নির্জ্জন গলিটার শেষ প্রান্তে ওদের হোটেলটা দেখা গেল। জামাতুল্লা হাই ছেড়ে বললে—যাক খুব বেঁচে যাওয়া গিয়েছে! এখানা মালয় দেশের ছুঁড়ে-মারা ছুরি! ওরা দশ বিশ গজ তফাত থেকে এই ছুরি ছুঁড়ে লোকের গলা দুখানা করে কেটে দিতে পারে। আমাদের তাগ্ করেই ছুরিখানা ছুঁড়েছিল—কিন্তু অন্ধকারে ঠিক লাগেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে, যে ছুঁড়েছে তার আর-একখানা ছুরি ছুঁড়তেই বা কতক্ষণ?

সনৎ সেই ভারি ছোরাখানা হাতে করে বললে—ওঃ, এ গলায় লাগলে পাঁঠা কাটার মত মুণ্ডু কেটে ছট্‌কে পড়ত! কানের পাশ দিয়ে তীর গিয়েছে!

সুশীল বললে—এ সেই গুপ্ত সম্প্রদায়ের লোকের কাজ। আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।

জামাতুল্লা বললে—লোক লেগেছে, তবে আমাদের বাসাটা এখনও বার করতে পারে নি। আমি বলি নি যে এখানে আমরা বিপন্ন। আমার না বলবার কারণ আছে।

রাতে ডাচ্ স্টীমার 'বেন্দা' ছাড়ল। ইয়ার হোসেন বড় বড় কেরোসিন কাঠের প্যাকবাক্স ওঠালে গোটাকতক জাহাজে—তাদের বাইরে বিলিতি বিয়ার মদের বিজ্ঞাপন মারা। ওঠাবার সময় অবিশ্যি কোন হাঙ্গামা হল না—কিন্তু সুশীল ও সনৎএর ভয় তাতে একেবারে দূর হয় নি। সিঙ্গাপুরের বন্দর ও প্রকাণ্ড নৌ-ঘাঁটি ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেল—অকূল জলরাশি আলোকোৎক্ষেপী ঢেউয়ে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

চারদিনের দিন সকালে জাহাজ এসে সাঙ্গাপান পৌছল। এখানে এসে ওরা নেমে একটা চীনা হোটেলে আশ্রয় নিলে।

সাঙ্গাপান মশলার খুব বড় আড়ত, কতকগুলো নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, নদীর সেই মোহানাতেই বন্দর অবস্থিত—যেমন আমাদের দেশের চট্টগ্রাম।

ইয়ার হোসেন বাংলা জানে না, উর্দু বা হিন্দুস্থানীও ভুলে গিয়েছে—ও জামাতুল্লার সঙ্গে কথা বলে পিজিন ইংলিশে ও মালয় ভাষায়। বললে—জামাতুল্লা, এবার তুমি তোমার সেই দ্বীপে নিয়ে যেতে পারবে তো?

—পারব বলে মনে হচ্ছে। তবে এখনও ঠিক জানি নে—

সুশীল বললে—শুনুন মিঃ হোসেন। যখন আমার সঙ্গে জামাতুল্লার দেখা হয় গ্রামে, ও বলেছিল ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের একটা দ্বীপে ওর জাহাজ নারকেলের ছোবড়া ও কুচি বোঝাই করতে গিয়ে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়। কেমন, তাই তো জামাতুল্লা? রাস্তার কথাটা একবার ভাল করে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

—ঠিক বাবুজি—

—তারপর বলে যাও—

—তারপর আমরা সাতদিন সেইখানে থাকি।

ইয়ার হোসেন বললে—সেখানে থাকি মানে কী বুঝিয়ে বল। দ্বীপে, না সমুদ্রে?

—না সাহেব, দ্বীপে তো নয়—আমরা যাচ্ছিলাম এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে। মাঝ-দরিয়ায় এ কাণ্ড ঘটে। তারপর সোরাবায়া থেকে জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে।

—কতদিন পরে উদ্ধার করে?

—আট দশ দিন কি ওই রকম।

সুশীল বললে—আগে বলেছিল সাতদিন।

—বাবু, ঠিক মনে নেই। অনেক দিনের কথা। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে। সেই সময় সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে সব কলেরা হয়ে মারা গেল—বাকি ছিলাম কাপ্তান আর আমি। দ্বীপ ছিল নিকটেই—যেখানে ডুবো পাহাড়ে আমাদের জাহাজে ধাক্কা খেয়েছিল, সেখান থেকে ডাঙা নজরে পড়ে। জাহাজের রশির দু রশি কী তিন রশি তফাতে। দ্বীপ

দেখলে আমি চিনতে পারব—তার ধারে একটা পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝর্না পড়েছে সমুদ্রে। বড় বড় পাথর পড়ে আছে, পাথরগুলো সাদা রঙের।

সুশীল হেসে বললে—তোমার সেই বিষ্ণুমুনির দ্বীপ?

জামাতুল্লা গম্ভীর মুখে বললে—হাসবেন না বাবুজি। এসব কাজে নেমে এ দেশের সব দেবতাকে মানতে হবে। না মানলে বিপদ হতে কতক্ষণ? আমি খুব ভাল করেই তা জানি।

ইয়ার হোসেন বললে—বুঝলাম, ও সব এখন রাখো। সাঙ্গাপান থেকে কোন্ দিকে যেতে হবে, কত দূরে? একটা আন্দাজ দাও—একটা নটিক্যাল চার্ট করে নেওয়া যাক।

—আমরা সাঙ্গাপান থেকেই রওয়ানা হয়ে যাই পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে—আন্দাজ দুশো মাইল—সেখান থেকে পূর্ব্বে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যাই আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল। এইখানে সেই ডুবো পাহাড়ের জায়গাটা—যতদূর আমার মনে হচ্ছে—

ইয়ার হোসেন অসহিষ্ণুভাবে বললে—যতদূর মনে হলে তো হবে না! আমাদের সেদিকে যেতে হবে যে। সুলু সমুদ্রের সর্ব্বত্র তো ঘুরে বেড়াতে পারা যাবে না। আচ্ছা তুমি সে দ্বীপ কতদূর থেকে চিনতে পারবে? নেমে, না জাহাজে বসে?

—জাহাজে বসে চিনতে পারব ওই সাদা পাথরের পাহাড় আর ঝর্না দেখে।

—কত সাদা পাথরের পাহাড় থাকে—

—না সাহেব, তা নয়। সে পাথরের পাহাড়ের গড়ন অন্য রকম। দেখলেই চিনব।

ইয়ার হোসেন আর সুশীল দুজনে মিলে মোটামুটি ম্যাপ এঁকে নিয়ে সেদিন রাত্রে আর একবার মিলিয়ে নিলে জামাতুল্লার বর্ণনার সঙ্গে। চীনা জাঙ্ক্ ভাড়া করা হল। দু-মাসের মত চাল, আটা, চা, চিনি বোঝাই করে নেওয়া হল জাঙ্কে—আর রইল বিয়ারের কাঠের বাক্সভর্ত্তি অস্ত্রশস্ত্র মেসিন গান।

ইয়ার হোসেন প্রস্তাব করলে—এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ রাত্রেই যাওয়া যাক—শত্রু লাগতে পারে—

জামাতুল্লা বললে—সে কথা ঠিক। কিন্তু রাত্রে হারবার-মাস্টার জাহাজ কি নৌকো ছাড়তে দেবে না, পোর্ট পুলিসে ধরবে। এসব জায়গায় এই নিয়ম। বোম্বেটে ডাকাতের আড্ডা কিনা সুলু সী! কড়া নিয়ম সব।

—তবে?

—কাল সকালে চলুন সাহেব—

ইয়ার হোসেন দ্বিধার সঙ্গে এ প্রস্তাবে মত দিলে। সুশীলকে ডেকে বললে—রাতের অন্ধকারে যাওয়া ভাল ছিল। দিনের আলোয় সকলের মনে কৌতুহল জাগিয়ে যাওয়া ভাল না। যাই হোক, উপায় কী?

সকাল আটটার পরে সাঙ্গাপান থেকে ওদের নৌকো ছাড়ল। মাত্র দেড় টনের চীনা জাঙ্ক্—সমুদ্রে মোচার খোলার মত। কিন্তু জামাতুল্লা বললে—জাঙ্ক্ হঠাৎ ডোবে না,

এসব তুফানসঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি দিতে চীনা জাঙ্ক-এর মত জিনিস নেই।

জাহাজ ছেড়ে অনেক দূর এল, ক্রমে চারিধারে শুধু সমুদ্রের নীল জলরাশি।

জামাতুল্লা নাবিক ও কর্ণধার—কিন্তু যে বৃদ্ধ চীনাম্যান জাঙ্কের সারেং সেও দেখা গেল বেশ জাহাজ চালাতে জানে। দুদিন জাহাজ চলবার পরে জামাতুল্লার সঙ্গে চীনা সারেং-এর ঝগড়া বেধে গেল।

ইয়ার হোসেন বললে—চেঁচামেচি কেন? কী হয়েছে?

চীনা সারেং বললে—জামাতুল্লা সাহেব জাহাজ চালাতে জানে না—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—

জামাতুল্লা বললে—বিশ্বাস করবেন না ওর কথা! ও লোকটা একেবারে বাজে।

ইয়ার হোসেন ও সুশীল পরামর্শ করে জামাতুল্লার ওপরই কিন্তু জাহাজচালানোর ভার দিলে। একদিন সন্ধ্যার সময় দূরে ডাঙা ও আলোর সারি দেখা গেল।

চীনা সারেং ছুটে গিয়ে বললে—ওহে, বড় যে জাহাজ চালাচ্ছ—ও ডাঙা আর আলো কোথাকার? এদিকে এত বড় ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। চার্ট অনুসারে ওখানে আলো আর ডাঙা দেখবার কথা নয়। চীনা সারেং ইয়ার হোসেনকে আর সুশীলকে ডেকে বললে—ওকে বলতে বলুন স্যর, ও আলো আর ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাকে মাথা চুলকোতে দেখে চীনা সারেং বিজয়গর্ব্বে বললে—আমি বলে দিচ্ছি স্যর—সাণ্ডা প্রণালীর মুখে পিয়েরপং বন্দরের আলো—তার মানে বুঝেছেন? আমরা আমাদের যাবার রাস্তা থেকে একশো মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে হঠে এসেছি—এই রকম করে জাহাজ চালালে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে আমাদের আর বেশি দেরি থাকবে না স্যর!

চীনা সারেং সেদিন থেকে হল কাপ্তেন।

সুশীল বললে—রাগ কোরো না জামাতুল্লা। তুমি অনেকদিন এ কাজ করো নি, ভুলে গিয়েছ হে।

জামাতুল্লা বললে—তা নয় বাবুজি। আমি ভুলি নি জাহাজ চালানো। আমার চার্ট ঠিক ছিল, আমার মনে হয় কি গোলমাল হয়েছে বা চার্টে ভুল করে রেখেছে।

আরো তিনদিন পরে বিকেলের দিকে চীনা কাপ্তেন বললে—পারা নামছে স্যর, দড়িদড়া সামলে আর জিনিস সামলে আপনারা খোলের মধ্যে নেমে যান—ঝড় উঠবে।

তিন ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ ঝড় এল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে। দড়িদড়া ছিঁড়ে পাল উড়িয়ে নিয়ে যায়—জামাতুল্লা চিৎকার করে বললে—সব খোলের মধ্যে যান—ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠেছে—

জাঙ্কের ডেকের ওপর বড় বড় ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়ে—ক্ষুদ্র দেড় টনের জাঙ্‌খানা যে কোন মুহূর্ত্তে ভেঙেচুরে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেবে মনে হল সবারই—কিন্তু দু-তিন বার জাঙ্‌খানা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল—নাকানি-চুবুনি খেয়েও আবার সমুদ্রের ওপর ঠেলে ওঠে। সাবাস মোচার খোলা!

হঠাৎ চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে উঠল—সামনে পাহাড়—সামলাও—

জামাতুল্লা হালে ছিল, ডাইনে সজোরে হাল মারতেই কান ঘেঁষে কতকগুলো বজ্‌বজে সমুদ্রের ফেনা ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল, ফেনাগুলোর মাঝে কালো রঙের কি একটা টানা রেখা যেন ফেনারাশিকে দুভাগে চিরে দিয়েছে। ডুবো পাহাড়!

ঝড়ের শব্দে কে কী বলে শোনা যায় না—তবুও সুশীল শুনলে, চীনা কাপ্তেন চিৎকার করছে—খুব বাঁচা গিয়েছে! আর একটু হলেই সব শেষ হত আমাদের!

ইয়ার হোসেন ও সুশীল বাইরে একচমক দেখতে পেলে—জলের মধ্যে মরণের ফাঁদ পাতাই বটে! সাক্ষাৎ মরণের ফাঁদ!

জামাতুল্লা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হলি ধরে আছে। একটু আল্‌গা হলেই এই ভীষণ জায়গায় জাঙ্ক্ বানচাল হয়ে ধাক্কা মারবে গিয়ে বাঁ দিকের ডুবো পাহাড়ে। খানিকটা পরে জামাতুল্লার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ভয়ে—একি! দু-দিকেই যে ডুবো পাহাড়!—ডাইনে আর বাঁয়ে!

চীনা কাপ্তেনকে হেঁকে বললে—কোথা দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছ গাধার বাচ্চা! পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে যে! মারবে এবার—

ঝড়ের তুফানের মধ্যে চীনা কাপ্তেনের কথাগুলো অট্টহাস্যের মত শোনা গেল। কী যে সে বললে, জামাতুল্লা বুঝতে পারল না।—কিন্তু যারই ভুল হোক, জাহাজ বাঁচাতে হবে।

সে সমানে পিছনে চেয়ে দেখলে—পাহাড়ের কালো রেখা অতিকায় শুশুকের শিরদাঁড়ার মত জলের ওপর স্পষ্ট জেগে, মাস্তুলের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা সারেং সব পাল গুটিয়ে ফেলেছে—কেবল মাঝের বড় মাস্তুলে ষোল ফুট চওড়া বড় পালখানা ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে ফালি-ফালি হয়ে অসংখ্য সাদা নিশানের মত উড়ছে। সে দেখলে নিশানগুলোর জন্যে জাহাজখানা এদিকে ওদিকে হেলছে ঘুরছে। চক্ষের নিমেষে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে পালের মোটা শনের কাছি কাটতে লাগল। একবার করে খানিকটা কাটে, আবার ছুটে গিয়ে হাল টিপে ধরে।

অমানুষিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাঁচ ছ-মিনিটের মধ্যে সে অত বড় মোটা রশিটা কেটে ফেললে। ফেলতেই দড়িদড়া ঢিলে পড়ে পাল সড়াং করে অনেকখানি নেমে এল।

চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে বললে—কে রশি কাটলে?

—আমি।

—খুব ভাল কাজ করেছ! এবার সামলাও ঠ্যালা! যদি জানো না কোন কিছু, তবে সবতাতেই সর্দারি করতে আসো কেন?

চীনা কাপ্তেন মিথ্যে বলে নি। জামাতুল্লা সভয়ে দেখলে পালে ঢিল পড়াতে জাঙ্ক্ এবার জগদ্দল পাথরের মত ভারি হয়ে পড়েছে যেন। পিছন থেকে বাতাস ঠেলা মেরেও তাকে নড়াতে পারছে না—সুতরাং দু-দিকের মরণ ফাঁদকে অতিক্রম করে বাহির সমুদ্রে পড়তে এর

অনেক সময় লেগে যাবে—ইতিমধ্যে বাতাস দিক পরিবর্তন করলেই—বিষম বিপদ।

ইয়ার হোসেন পাকা লোক। সে বুঝেছিল কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। মাথা বার করে বললে—কী হল আবার? জাঙ্ক্ নড়ে না যে!

চীনা সারেং বললে—নড়বে কী স্যর—নড়বার পথ কি আর রেখেছে জামাতুল্লা? এবার বাঁচাতে পারলাম না বোধ হয়!

কিন্তু সুখের বিষয় আধঘণ্টার মধ্যে ভয় কেটে গেল। বাতাস পিছন হতেই বয়ে চলল একটানা—এবং আধঘণ্টার মধ্যে জাঙ্ক্‌কে ডুবো পাহাড়ের ফাঁদ পার করে বাহির সমুদ্রে তাড়িয়ে দিলে।

জামাতুল্লা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

চীনা কাপ্তেন টিটকিরি দিয়ে বললে—বাঁচলে সবাই আজ নিতান্ত বরাতের জোরে! তোমার হাতের গুণে নয়, মনে রেখো।

সমুদ্র শান্ত, জ্যোৎস্না উঠেছে—সুশীলদের দল খোলের ঢাকনি খুলে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে দূরে কি একটা বিরাট কালো জিনিস দেখা গেল—জল থেকে উঁচু হয়ে আছে মাথা তুলে।

ইয়ার হোসেন বললে—কী ওটা?

সুশীল জিনিসটা প্রথমে দেখতে পেলে না—তারপর দেখে বিস্মিত হল—অস্পষ্ট কুয়াশা-মাখা জ্যোৎস্নালোকে কিছু ভাল দেখা যায় না—তবুও একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত আকাশের গায়ে কী ওটা জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে?

সনৎও সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

একমাত্র জামাতুল্লা দু-চোখ বিস্ফারিত করে জিনিসটার দিকে চেয়ে ছিল।

ইয়ার হোসেন কথার উত্তর না পেয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, জামাতুল্লা তাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ডেকের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে কালো জিনিসটা ভাল করে দেখতে লাগল।

চীনা সারেং টিট্‌কিরি দেওয়ার সুরে বললে—দেখছ কী, ওটা ডুবো পাহাড়—বুড়ো বয়সে চোখে ভাল দেখতে পাইনে—তবুও বলছি—

সুশীল বললে—জলের উপর জেগে রয়েছে যে! ডুবো পাহাড় কী করে হল?

চীনা সারেং বললে—ও পাহাড়ের চুড়োটা মাত্র জেগে আছে জলের ওপর, স্যর। প্রকাণ্ড ডুবো পাহাড় ওটা—

জামাতুল্লা এইবার সুশীলকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—সারেং ঠিক বলেছে। এতক্ষণ পরে আমি চিনেছি, এই সেই পাহাড় বাবুজি—এই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েই—

সুশীল অবিশ্বাসের সুরে বললে—চিনলে কী করে?

—আমি এতক্ষণ তাই চেয়ে দেখছিলাম—এবার আমার কোন সন্দেহ নেই—ওই ডুবো পাহাড়ের এক জায়গায় দক্ষিণ কোণে একটা শুয়োরের মুখের মত ছুঁচলো গড়ন দেখেছেন কি? আসুন আমি দেখাচ্ছি—এতকাল আমার মনে ছিল না, কিন্তু এবার দেখেই মনে পড়েছে।

—ইয়ার হোসেনকে বলি?

—কিন্তু ওই হলদেমুখো চীনাটাকে কিছু বলবেন না, বাবুজি। ওটাকে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না—আপনি বলুন হোসেন সাহেবকে—

—যদি ও-ই সেই ডুবো পাহাড়টা হয়, তবে তো ওখান থেকে জমি দেখা যাবে, আর সেই সাদা পাথরের পাহাড়টা—

—সে হল তিন রশি চার রশি তফাতে বাবুজি—চাঁদনি রাতে সাদা পাথরের পাহাড় অত দূর থেকে ভাল দেখা যাবে না। সকাল হোক—

চীনা সারেং চিৎকার করে উঠল—হাল সামলাবে না গল্প করে সময় কাটাবে—ডুবো পাহাড় সামনে, সে খেয়াল আছে?

জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে—আঃ, হলদেমুখো ভূতটা বড্ড জ্বালালে দেখছি—দাঁড়ান বাবুজি—আপনি হোসেন সাহেবকে বলুন, আমি দেখি ওদিকে কি বলে—

সুশীল হাসতে হাসতে বললে—তুমি যাই বলো, ও কিন্তু খুব পাকা জাহাজী—এসব অঞ্চল দেখছি ওর নখদর্পণে—ওস্তাদ জাহাজী—এ বিষয়ে ভুল নেই—

কিছু পরে চীনা সারেং তার নাবিকগিরির সুদক্ষতার এমন একটি প্রমাণ দিলে যাতে জামাতুল্লাকে পর্য্যন্ত তারিফ করতে হল। জামাতুল্লার হাল পরিচালনায় জাঙ্ক্ যখন ডুবো পাহাড়ের একদিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে তখন চীনা সারেং হুকুম দিলে—সামনে এগোও—পাশ কাটাবার চেষ্টা করছ কেন?

—সামনে এগিয়ে ধাক্কা খাবে নাকি?

—এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি করতে এসেছে সুলু সীতে? নিজের দেশে নদী খালে ডোঙা চালাও গে যাও গিয়ে! ওই পাহাড়ের দু-পাশের ভীষণ চাপা স্রোতের মুখে পড়ে জাঙ্ক্ পাহাড়ের গায়ে সজোরে ধাক্কা মারবে—সে খেয়াল আছে? তোমার হালের সাধ্যি হবে না সে স্রোতের বেগ সামলানো—দেখছ না জল কী রকম ঘুরছে?

জামাতুল্লা তখনও ইতস্তত করছে দেখে চীনা সারেং হেঁকে বললে—জামাতুল্লা এবার সবাইকে মারবে স্যার—ওকে বুঝিয়ে বলুন, একবার ওর হাত থেকে ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন—এবার বোধ হয় আর রক্ষে হয় না—

সুশীল আর ইয়ার হোসেন জামাতুল্লাকে বললে—ও যা বলছে তাই কর না জামাতুল্লা—

—ও কী বলছে তা আপনারা খেয়াল করছেন না? ও বলছে ওই ডুবো পাহাড়ের দিকে সোজাসুজি হাল চালাতে—মরব তো তা-হলে—

চীনা সারেং জামাতুল্লার কথা শুনতে পেয়ে বললে—চালিয়ে দেখই না কী করি। মরণের অত ভয় করলে মাল্লাগিরি করা চলে না সাহেব—

জামাতুল্লা চোখ পাকিয়ে বললে—হুঁশিয়ার! আমি আর যাই হই—মরণের ভয় করি তা তুমি বলতে পারবে না, হলদেমুখো বাঁদর—

সুশীল ধমক দিয়ে বললে—ও কী হচ্ছে জামাতুল্লা? এ সময়ে ঝগড়া বিবাদ করে লাভ কী? সারেং যা বলছে তাই কর—

জামাতুল্লা হাতের চাকা ঘোরাতেই জাঙ্ক্ পাহাড়ের একেবারে বিশ গজের মধ্যে এসে পড়ল—ঠিক একেবারে সামনা-সামনি—সবাই দুরু-দুরু বক্ষে চেয়ে আছে, সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ঘাঁটি, এ থেকে কী করে চীনা জাঙ্ক্ বাঁচবে কেউ বুঝছে না—দেখতে দেখতে বিশ গজের ব্যবধান ঘুচে গেল—দশ গজ—

আর বুঝি জাঙ্ক্ রক্ষা হয় না—মতলব কী চীনাটার?—সবাই বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে আছে বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে সবারই—হঠাৎ সারেং ক্ষিপ্রহস্তে প্রকাণ্ড একটা জাহাজী কাছি সুকৌশলে সামনের দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—ডাইনে হাল মার—

সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে গেল যা ইয়ার হোসেন ও জামাতুল্লা তাদের জাহাজী মাল্লা-জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো দেখে নি। জাহাজ ডানদিকে ঘুরে পাহাড়ের গুঁড়িটা পেরিয়ে যেতেই সারেং-এর কাছি গিয়ে পাহাড়ের সরু অংশটা জড়িয়ে ধরল এবং পেছন দিক দিয়ে ঘড়-ঘড় করে নোঙর পড়ার শব্দে সবাই বুঝল বড় সী-অ্যাঙ্কর অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার বড় নোঙর তার সুদৃঢ় আঁকশির মুখ দিয়ে সমুদ্রের তলায় পাথর ও মাটি আঁকড়ে ধরলেই জাহাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

বোঁ করে অত বড় জাঙ্ক্খানা ডিঙি নৌকোর মত ঘুরে গেল আর পরক্ষণেই স্থির, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড় থেকে তিন-চার গজের মধ্যে। জাঙ্ক্ আর পাহাড়ের মধ্যে কেবল একফালি সরু সাগর-জল, একটা বড় হাঙর তার মধ্যে কষ্টে সাঁতার দিতে পারে!

ইয়ার হোসেন বলে উঠল—সাবাস সারেং!

সুশীল ও সনৎ নিশ্বাস ফেলে বললে—খুব বাঁচিয়েছে বটে—

জামাতুল্লা চুপ করে রইল।

চীনা সারেং হলদে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—বিদেশী লোক এখানে জাহাজ চালাতে পারে না, স্যার! জামাতুল্লা মাল্লাগিরি যা জানে, তা খাটে চাটগাঁয়ের বন্দরে—এ সব সে জায়গা নয়—এখানে জাহাজ চালাতে হলে পেটে বিদ্যে চাই অনেকখানি—

ইয়ার হোসেন বললে—এখন কী করা যাবে বস্সো। জাহাজ তো আটকে গেল।

সারেং ওদের অভয় দিয়ে বললে—জাঙ্ক্ আটকায় নি। জোয়ার এলেই সকালে জাঙ্ক্ ছাড়া নিরাপদ।

সকলে দুরু-দুরু বক্ষে সকালের প্রতীক্ষায় রইল। সুশীল আর জামাতুল্লা ভাল করে ঘুমুতেই পারলে না। খুব ভোরে উঠে জামাতুল্লাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে সুশীল বললে—এস, চেয়ে দেখ—চল বাইরে—

জামাতুল্লা বাইরে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—ওই সেই সাদা পাহাড় আর সেই

দ্বীপ! আমি কাল রাত্রেই বুঝেছিলাম বাবুজি, কাউকে বলিনি—

—কেন?

—কী জানি বাবুজি, চীনা সারেংটাকে আর এই হোসেন সাহেবকে আমার তেমন যেন বিশ্বাস হয় না, খোদার দিব্যি বলছি—ওদের সামনে মুখ খোলে না আমার। হোসেন সাহেব আস্ত গুণ্ডালোক, বাধ্য হয়ে ওর সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে ওর নাম শুনে সবাই ভয় পায়।

—সে কথা আর এখন ভেবে লাভ কী বলো! ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে যখন। ইয়ার হোসেনকে বলি কথাটা।

ইয়ার হোসেন সব শুনে জামাতুল্লাকে ডেকে বললে—কোন সন্দেহ নেই তোমার? এই দ্বীপ ঠিক?

—ঠিক।

—আমরা নেমে কিন্তু জাঙ্ক্ ছেড়ে দেব—ঠিক করে ছাখ এখনও।

সুশীল ও জামাতুল্লা আশ্চর্য্য হয়ে বললে—জাঙ্ক্ ছেড়ে দেবেন কেন?

—আমি ওদের অন্য এক গল্প বলেছি। আমি বলেছি জঙ্গলে মাঠের ইজারা নিয়েছি ডাচ্ গবর্মেণ্টের কাছে—এখানে আমরা এখন থাকব কিছুদিন। ওদের বলতে চাই নে—চীনেরা লোক বড় ভাল নয়—

দুপুরের পর জালি বোটে জিনিসপত্র ও দুটি ছোট ছোট তাঁবু সমেত ওদের সকলকে অদূরবর্ত্তী দ্বীপের শিলাবৃত তীরভূমিতে নামিয়ে জাঙ্কের সারেং তার ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুশীল ইয়ার হোসেনকে বললে—ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপ তো এটা? ডাচ্ গবর্মেণ্টের কোন অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু—

—সে সব বড় হাঙ্গামা। ডাচ্ গবর্মেণ্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে তাহলে; কেস যাচ্ছি আমরা—ও দ্বীপে কতদিন আমরা থাকব! হয়ত আমাদের সঙ্গে পুলিস পাহারা থাকত—সব মাটি হত।

জামাতুল্লা দ্বীপের মাটিতে নেমে কেমন যেন স্বপ্নমুগ্ধের মত চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। এতকাল পরে সে যে এখানে আসবে তা মেটেবুরুজের মাল্লাপাড়ার হোটেলে সান্‌কিতে ভাত খেতে বসে কখনও কি ভেবেছিল? সে ভেবেছিল তার দুঃসাহসের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে! সেই বিদ্ধমুনির দ্বীপ আবার!

সুশীল ভাবছিল, কী অদ্ভুত যোগাযোগ! বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে জমিদারের ছেলে সে চিরকাল বসেই খাবে পায়ের ওপর পা দিয়ে, নির্ব্বিঘ্নে জমিজমার খাজনা শোধ, দুপুরে লম্বা ঘুম দেবে, বিকেলে দুপুরে মাছ ধরবে, সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় পৈতৃক তাকিয়া হেলান দিয়ে তাস দাবা খেলবে, রাত্রে পিঠে-পায়েস খেয়ে আবার ঘুম দেবে—এই সনাতন জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোন ব্যতিক্রম হয়নি তার পিতৃপিতামহের বেলায়।—তার বেলাতেও সে ধারা অক্ষুণ্ণই থাকত যদি

দৈবক্রমে সেদিন গড়ের মাঠে জামাতুল্লা খালাসী তার কাছে 'ম্যাচিস্' চাইতে না আসত। কত সামান্য ঘটনা থেকে যে জীবনের কত বৃহৎ ও গুরুতর পরিবর্ত্তন শুরু হয়!

সুশীল ও সনৎ দ্বীপের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ঘন বনানী এ পর্য্যন্ত তারা কোথাও দেখে নি—রীতিমত ট্রপিক্যাল অরণ্য যাকে বলে, তা এতদিন সুশীল ছবিতেই দেখে এসেছে এবং ইংরেজি ভ্রমণের বইয়ে তার বর্ণনাই পড়ে এসেছে—এতকাল পরে তা সে দেখল। জলের ধার থেকেই অপরিচিত গাছপালার নিবিড় বন আরম্ভ হয়েছে—বনস্পতি-মাতার বড় বড় গাছের গায়ে অর্কিডের ফুলগুলি সুগন্ধে প্রভাতের বাতাস মাতিয়েছে—মোটা মোটা লতা দুলছে এ গাছ থেকে ও গাছে। কত রঙের প্রজাপতি উড়ছে—সামনে সুনীল সমুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ তীরভূমিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারছে, একেবারে খোলা জলরাশি থৈ-থৈ করছে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত, একটা ব্রেকওয়াটার পর্য্যন্ত নেই কোথাও—যদি কেউ জলে পড়ে, তবে হাঙরের আহার্য্য হবে এ জানা কথা—এসব সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি, সুশীল আগেই শুনেছে। বনের মধ্যে অনেক জায়গায় এখনও অন্ধকার কাটে নি—কারণ প্রভাতের রৌদ্র তার মধ্যে এখনও অনেক জায়গাতেই ঢোকে নি—দেখে বোধ হয়, দুপুরেও ঢোকে কি না সন্দেহ।

ইয়ার হোসেন দেখে শুনে বললে—এ যে ভীষণ জঙ্গল দেখছি—। জামাতুল্লা বললে—আগে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়েও যেন জঙ্গল বেশি হয়েছে।

সুশীল জানতে চাইলে এ দ্বীপে লোক আছে কি না। ইয়ার হোসেন বললে—ম্যাপে তো কিছু দেয় না—এ দ্বীপের কিছুই দেখিনে ম্যাপে—কী জামাতুল্লা, তুমি কী দেখেছিলে?

—কোথাও কিছু নেই।

—বেশ ভাল জানো?

—আমার যাওয়ার পথে অন্তত তো কিছু দেখি নি—

—এখান থেকে তোমার সে নগর কতদূর হবে আন্দাজ?

—তিন চার দিনের পথ।

—এত কেন হবে? এ দ্বীপের প্রস্থ তো খুব বেশি হবার কথা নয়!

সুশীল বললে—কত বলে আন্দাজ করছেন, মিঃ হোসেন?

—ত্রিশ মাইলের মধ্যে। তবে একটা কথা, এই জঙ্গল ঠেলে যাওয়ায় পথ এগোবে না বেশি। অনেক জায়গায় পথ কেটে করে নিয়ে তবে এগুতে হবে। তিন দিন লাগা বিচিত্র নয়।

সেদিন তাঁবু খাটিয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে দ্বীপের মধ্যে ঢোকবার জন্যে ইয়ার হোসেন সবাইকে তৈরী হতে বললে। মালয় কুলি ওরা এনেছিল সাতজন, জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—এরা সবাই ইয়ার হোসেনের হাতের লোক এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ওদের গতিক বড় সুবিধের বলে মনে হয়নি সুশীলের ও সনৎএর গোড়া থেকেই। দেখে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এরা চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি করে চালিয়ে এসেছে এতদিন। যেমন

দুশমনের মত চেহারা, তেমনি ধূর্ত্ত দৃষ্টি এদের চোখে। ইয়ার হোসেনের কথায় এরা ওঠে বসে। জামাতুল্লা এদের বিশ্বাস করত না। কিন্তু উপায় কী, ইয়ার হোসেনকে যখন দলে নিতে হয়েছে, তখন এদেরও রাখতে হবে।

দুদিন সমুদ্রের ধারে তাঁবু ফেলে থাকবার পরে সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সুশীল সনৎ এমন জঙ্গল কখনও দেখে নি। গাছপালা যে এত সবুজ, এত নিবিড়, এত অফুরন্ত হতে পারে—বাংলা দেশের ছেলে হয়েও এরা এ জিনিসটা এই প্রথম দেখলে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে মাঝে-মাঝে এক-একটা ছোট নদী বা খাড়ি—তার পাশে যেন গাছপালা ও বনঝোপের সবুজ পর্ব্বত—কত ধরনের অর্কিড, কত ধরনের লতা, কত অদ্ভুত ও বিচিত্র ফুল।

একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বন কাটতে কাটতে ওরা মোটে মাইল-তিনেক এগিয়ে যেতে সক্ষম হল।

সন্ধ্যার দিকে ইয়ার হোসেন বললে—এখানে আজ তাঁবু ফেলা যাক।

কিন্তু তাঁবু ফেলবে কোথায়? সুশীল চারদিকে চেয়ে দেখলে ভয়ানক ঘন জঙ্গলের মধ্যে বড়-বড় দোলানো লতার তলায় ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর রাত্রে বাস করতে হবে। আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতায় এরা দেখেছে এখানকার জঙ্গলে তিনরকম জীব যেখানে সেখানে বাস করে—যে তিনটিই মানুষের শত্রু। প্রথম, বড়-বড় রক্ত-শোষক জোঁক; দ্বিতীয়, বিষধর সর্প; তৃতীয়, মৌমাছি। এই তিনটি শত্রুর কোনটাই কম নয়—যে-কোনটার আক্রমণ মানুষের জীবন বিপন্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট।

কোন রকমে তাঁবু খাটানো হল।

ঘুমের মধ্যে কখন ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল—ট্রপিক্যাল অরণ্যের এ অঞ্চলে বৃষ্টি লেগেই আছে, এমন দিন নেই যে বৃষ্টি হয় না। ঘুমের মধ্যে সুশীল দেখলে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কখন বৃষ্টির জলের ধারা গড়িয়ে এসে ওদের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে কোথায় এক গুরুগম্ভীর নিনাদ শোনা গেল—সমস্ত অরণ্য যেন কেঁপে উঠল।

সনৎ চমকে উঠে বললে—কে ডাকে দাদা?

অন্য তাঁবু থেকে ইয়ার হোসেন বলে উঠল—ও কিসের ডাক?

কেউ কিছু জানে না। না জামাতুল্লা না ইয়ার হোসেন—কেবল ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর বললে—ওটা বুনো হাতির ডাক স্যার।

আর একজন অনুচর প্রতিবাদ করে বললে—ওটা গণ্ডারের ডাক।

কিছুমাত্র মীমাংসা হল না এবং আবার সেই ডাক, সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক জানোয়ারের ভীষণ গর্জ্জন। সেটা শুনে অবশ্য সকলেই বুঝতে পারলে—বাঘের গর্জ্জন।

এরই ফাঁকে আবার বন-মোরগও ডেকে উঠল। সময়ে এক-পাল বন্য কুকুরের ডাকও।

সনৎ বললে—ও দাদা, এ যে ঘুমুতে দেয় না দেখছি—

সুশীল উত্তর দিলে—কানে আঙুল দিয়ে থাক—

ইয়ার হোসেন বললে—রাইফেল নিয়ে বসে থাকতে হবে—কেউ ঘুমিও না—

এটা নিতান্ত প্রথম দিন বলে এদের ভয় ছিল বেশি, ছ-একদিনের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ গা-সওয়া হয়ে গেল। নিবিড় ট্রপিক্যাল জঙ্গলের মধ্যে প্রতি রাত্রেই নানা বন্য জানোয়ারের বিচিত্র আওয়াজ—আওয়াজ যা করে, তাঁবুর আশে-পাশেই করে—কিন্তু তাঁবুর লোককে আক্রমণ করে না।

সুশীল ছু-দিন ঘুমোতে পারে নি—কিন্তু তিন রাত্রির পরে সে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারলে।

জঙ্গলের কূল-কিনারা নেই—ওরা পাঁচদিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও কোন কিছুই দেখতে পেলে না সেখানে—ওই বন আর বন।

সূর্য্যের আলো না দেখে সুশীল তো হাঁপিয়ে উঠল। এ জঙ্গলে সূর্য্যের আলো আদৌ পড়ে না।

আগে দেশে থাকতে সে ছু-একখানা ভ্রমণের বইতে পড়েছিল যে মেক্সিকোতে, মালয়ে, আফ্রিকায় এমন ধরনের বন আছে, যেখানে কখনো সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। কথাটা আলঙ্কারিকের অত্যুক্তি হিসেবেই সে ধরে নিয়েছিল, আজ সে সত্যই প্রত্যক্ষ করলে এমন বন, যা চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পড়ন্ত বেলায় কেবল সু-উচ্চ বনস্পতিরাজির শীর্ষদেশ অস্তমান সূর্য্যের রাঙা আলোয় রঞ্জিত হয় মাত্র। ক্বচিৎ নিবিড় লতাঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো চাঁদের আলো সামান্য-মাত্র পড়ে, নতুবা সকল সময়েই গোধূলি দিনমানে। চিরগোধূলির জগৎ এটা যেন।

একদিন সনৎ পড়ে গেল বিপদে।

তাঁবু থেকে বন্দুক হাতে শিকার করতে বার হয়ে সে একটা গাছের ডালে এক ভীষণ অজগর সাপ দেখে সেটাকে গুলি করলে। সাপটা ছুলতে ছুলতে গাছের ডাল থেকে পাক ছাড়িয়ে ঝুপ্ করে একবোঝা মোটা দড়াদড়ির মত নিচে পড়ে গেল।

সনৎ সেটার কাছে গিয়ে দেখলে অজগরের মাথাটা গুলির ঘায়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার ল্যাজটা হঠাৎ এসে সনৎএর পা ছু-খানা জড়িয়ে ধরে শক্ত কাঠ হয়ে গেল। সরীসৃপের হিমশীতল স্পর্শ সনতের স্নায়ুগুলোকে যেন অবশ করে দিলে, নিজের পা ছু-খানাকে সে আর মোটেই নাড়তে পারলে না—হাতছুটোকে যখন কষ্টে নাড়ালে তখন লোহার শেকলের মত নাগপাশের শক্ত বাঁধনে তার পদদ্বয় গতিশক্তিহীন।

অজগর তো মরে কাঠ হয়ে গেল, কিন্তু সনৎ চেষ্টা করেও কিছুতেই নাগপাশ থেকে পা ছাড়াতে পারলে না। পা যেন ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে, এমন কি সনৎএর মনে হল আর কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে সে চিরদিনের মত চলৎশক্তি হারাবে। এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, বেলা ক্রমশ পড়ে আসছে—এরই মধ্যে গোধূলি গিয়ে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বনে। কিছুক্ষণ পরে দিক ঠিক করে তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও কিছুক্ষণ কাটল, শেয়ালের দল বনের মধ্যে ডেকে উঠল—একটু পরেই বন্য হস্তীর

বৃংহিত অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলবে, হায়েনার অট্টহাসিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে দেবে।

সনৎ সবই বুঝছে—কিন্তু কোন উপায় নেই। বন্দুকটার আওয়াজ করলে তাঁবুর লোক-দের তার সন্ধান দেওয়া চলত বটে—কিন্তু বন্দুকে গুলি নেই। শেষ ছুটো টোটা অজগরের দিকে সে ছুঁড়েছে।

তিমিরময়ী রাত্রি নামল।

অসহায় অবস্থায় চুপ করে কাত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। প্রথমটা তার মনে খুব ভয় হল—কিন্তু মরীয়ার সাহসে সাহসী হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সে চুপ করে শুয়েই রইল। মৃত অজগরটাকে অন্ধকারে আর দেখা যায় না—কিন্তু তার হিম-শীতল আলিঙ্গন প্রতি-মুহূর্তে সনৎকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে প্রাণের বদলে সে প্রাণই নিতে চায়।

সারারাত্রি এভাবে কাটলে বোধ হয় সনৎ সে যাত্রা ফিরত না—কিন্তু অনেক রাত্রে হঠাৎ সনৎএর তন্দ্রা গেল ছুটে। অনেক লোক আলো নিয়ে এসে ডাকাডাকি করছে। ইয়ার হোসেনের গলা শোনা গেল—হালু-উ-উ—মিঃ রায়—

সনৎএর সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিল—সে গলা দিয়ে স্বর উচ্চারণ করতে পারলে না। কিন্তু ইয়ার হোসেনের টর্চ্চের আলো এসে পড়ল ওর ওপরে। সবাই এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। পাশের মৃত অজগর দেখে ওরা আগে ভেবেছিল সর্পের বেষ্টনে সনৎও প্রাণ হারিয়েছে—তারপর ওকে হাত নাড়তে দেখে বুঝলে ও মরে নি।

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করতে সনৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ইয়ার হোসেন সেদিন ওদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল।

জামাতুল্লাকে বললে—কই, তোমার সে মন্দিরের বা শহরের ধ্বংসাবশেষ তো দেখি নে কোনদিকে।

জামাতুল্লা বললে—আমি তো আর মেপে রাখি নি মশাই ক-পা গেলে শহর পাওয়া যাবে—সবাই মিলে খুঁজে দেখতে হবে।

সুশীল একটা নক্সা দেখিয়ে বললে—এ ক-দিনে যতটা এসেছি, জঙ্গলের একটা খসড়া ম্যাপ তৈরি করে রেখেছি। এই দেখে আমরা যে-যে পথে এসেছি দেখতে হবে, সে পথে আর যাব না।

আবার ওদের দল বেরিয়ে পড়ল—দু-দিন পরে সমুদ্র-কল্লোল শুনে বনঝোপের আড়াল থেকে বার হয়ে ওরা দেখলে—সামনেই বিরাট সমুদ্র।

সনৎ চিৎকার করে উঠল—আলাট্টা! আলাট্টা!

সুশীল বললে—তোমার এ চিৎকার সাজে না সনৎ। তুমি জেনোফনের বর্ণিত গ্রীক সৈন্য নাও, সমুদ্রের ধারে তোমার বাড়ী নয়—

ইয়ার হোসেন বললে—ব্যাপার কী? আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারছিনে—

সনৎ বললে—জেনোফন বলে একজন প্রাচীন যুগের গ্রীক লেখক—নিজেও তিনি একজন সৈনিক—পারস্য দেশের অভিযান শেষ করে ফিরবার সমস্ত দুঃখ-কষ্টটা 'দশ সহস্রের

প্রত্যাবর্ত্তন' বলে একখানা বইয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন—তাই ও বলছে—

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—ও!

জামাতুল্লা বললে—আমার একটা পরামর্শ শোন। কম্পাসে দিক ঠিক করে চল এবার উত্তর মুখে যাই—ওদিকটা দেখে আসা যাক।

সকলেই এ কথায় সায় দিলে। সূর্য্যের মুখ না দেখে সকলেরই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওরা প্রথম দিনেই সমুদ্রের বালির ওপরে অনেকগুলো বড়-বড় কচ্ছপ দেখতে পেলে। ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর ছুটে গিয়ে একটাকে উল্টে চিৎ করে দিলে, বাকিগুলো তাড়াতাড়ি গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মালয় দেশীয় দায়ের (মালয়েরা বলে 'বোলো') সাহায্যে কচ্ছপটাকে কাটা হল, মাংসটা ভাগ করে রান্না করে সকলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলে। ভাগ করার অর্থ এই যে ইয়ার হোসেনের দল ও জামাতুল্লার রান্না হত আলাদা, সুশীল ও সনৎ-এর আলাদা রান্না সনৎ নিজেই করত।

একদিন সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে কি একটা জানোয়ার দেখে সনৎ ছুটে এসে সবাইকে খবর দিলে।

সকলে গিয়ে দেখলে প্রকাণ্ড বড় শুয়োরের মত বড় একটা জানোয়ার বালির ওপর চুপ করে শুয়ে। তার থ্যাবড়া নাকের নিচে বড় বড় গোঁপ—মুখের দুদিকে দুটো বড়-বড় দাঁত।

ইয়ার হোসেন বললে—এ এক ধরনের সীল—সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে।

সীলের মূল্যবান চামড়ার লোভে সনৎ ওকে গুলি করতে উদ্যত হল।

ইয়ার হোসেন নিষেধ করে বললে—ওটা মেরো না—ও সীলকে বলে সী লায়ন, ও মারলে অলক্ষণ হয়।

পরদিন তাঁবু তুলে সকলে উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করে রওনা হল।

উত্তর দিকের জঙ্গলে সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকটা গেল ওরা। এক গাছ থেকে আর এক গাছে বড়-বড় পুষ্পিত লতা সারা বন সুগন্ধে আমোদ করে ঝুলে পড়েছে—সুবৃহৎ লতা যেন অজগর সাপের নাগপাশে মহীরুহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে—রাশি রাশি বিচিত্র অর্কিড। বিচিত্র ও উজ্জ্বল বর্ণের পাখির দল ডালে ডালে—অদ্ভুত সৌন্দর্য্য বনের। সুশীল বললে—মিঃ হোসেন, ও কী লতা জানেন? যেমন সুন্দর ফুল—আর লতা দেখা যাচ্ছে না ফুলের ভারে—গন্ধও অদ্ভুত। ইয়ার হোসেন লতার নাম জানে না—তবে বললে, সিঙ্গাপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওরকম লতা সে দেখেছে।

সারা দ্বীপে গভীর বন। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন ও অনবরত গাছপালা কেটে যেতে হয় পথ করবার জন্যে—কাজেই ওরা সমুদ্রের ধার বেয়ে চলছিল। এক জায়গায় একটা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে বনের মধ্যে দিয়ে, নদী পার হয়ে যাওয়া কষ্টকর বলে ওরা বাধ্য হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নদী সরু হবার নাম নেই—অনেক দূরে বনের মধ্যে ঢুকে এখনও নদী বেশ গভীর।

সুশীল বললে—ওহে, নদীটা আমাদের দেশের বড় একটা খালের মত দেখছি। এ দ্বীপে এত বড় নদী আসছে কোথা থেকে? তেমন বড় পাহাড় কোথায়?

—নিশ্চয়ই বড় পাহাড় আছে বনের মধ্যে, সেইদিকেই তো যাচ্ছি—দেখা যাক—

আরও আধঘণ্টা সকলে মিলে গভীর জনহীন বনের মধ্যে দিয়ে চলল। বনের রাজ্য বটে এটা—সত্যিকার বন কাকে বলে এতদিন পরে প্রত্যক্ষ করল সুশীল সনৎ।

হঠাৎ এক জায়গায় একটা নাগকেশর গাছ দেখে সুশীল বলে উঠল—এই ছাখ একটা আশ্চর্য্য জিনিস। এই গাছ কোথাও এদিকে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে আমদানি এ গাছটা।

খুঁজতে খুঁজতে আশেপাশে আরও কয়েকটা নাগকেশর গাছ পাওয়া গেল। এই গভীর বনের মধ্যে নাগকেশর গাছ থাকার মানেই হচ্ছে এখানে কোন ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল পুরাকালে।

সনৎ বললে—কিন্তু এ গাছ তো খুব পুরোনো না, দেখেই মনে হচ্ছে। আট ন-শো বছরের নাগকেশর গাছ কি বাঁচে?

—তা নয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের নিজেদের হাতে পোঁতা গাছের চারা এগুলো। বড় গাছগুলোর থেকে বীজ পড়ে পড়ে এগুলো জন্মেছে। এ গাছ অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ আসল গাছের।

সেদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সনৎ বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্ত্তি দেখে চিৎকার করে সবাইকে এসে খবর দিলে। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলে গভীর জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে একটা পাষাণ-মূর্ত্তি—মূর্ত্তির মুণ্ড নেই, তবে হাত পা দেখে মনে হয় শিবমূর্ত্তি ছিল সেটা। দু-হাত উঁচু প্রস্তর-বেদীর ওপর মূর্ত্তিটা বসানো, এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে ডমরু, গলায় অক্ষমালা—এত দূর দেশে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিহ্ন দেখে সুশীল ও সনৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল—সেখান থেকে যেন সরে যেতে পারে না। এই দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুধর্ম্মের বাণী বহন করে এনেছিলেন একদিন এদেশে। সুলু সমুদ্রের ওই ডুবো পাহাড় অতিক্রম করতে চীনা জাঙ্ক্‌ওয়ালা যে কৌশল দেখালে, এই কম্পাস ও ব্যারোমিটারের যুগের বহু বহু পূর্ব্বে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা সে কৌশল একদিন না যদি দেখাতে পারতেন—তবে নিশ্চয়ই এ দ্বীপে পদার্পণ তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। মনে মনে সুশীল তাঁদের প্রণতি জানালে। নমো নমঃ দিগ্বিজয়ী পূর্ব্বপুরুষগণ, আশীর্ব্বাদ কর—যে বল ও তেজ তোমাদের বাহুতে, যে দুর্দ্ধর্ষ অনমনীয়তা ছিল তোমাদের মনে, আজ তোমার অধঃপতিত দুর্ব্বল উত্তরপুরুষেরা যেন সেই বল ও তেজের আদর্শে আবার নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, সার্থক করতে পারে ভারতের নাম বিশ্বের দরবারে!

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেনও চমৎকৃত হল। এ বনেও একদিন মানুষ ছিল তাহলে! এই যে গভীর বন আজ শুধু অজগর আর ওরাং-ওটাংয়ের বিচরণক্ষেত্র, এখানে একদিন সভ্য মানুষের পদশব্দ ধ্বনিত হয়েছে, মন্দির গড়েছে, মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে—এ-ই সকলের চেয়ে

আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলে মনে হল ওদের কাছে।

জামাতুল্লাকে সুশীল বললে—কেমন, এসব দেখেছিলে বলে মনে হয়?

—এসব দেখি নি। তবে এতে বোঝা যাচ্ছে মানুষের বাসের নিকটে এসে পড়েছি।

—সে জায়গাটা কেমন?

—সে একটা শহর বাবুজি। তার বাইরে পাঁচিল ছিল একসময়ে। এখন পড়ে গিয়েছে।

—কম্পাস দেখে দিক ঠিক করেছিলে? ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড ঠিক করেছিলে?

—না বাবুজি, ওসব কিছু করি নি। কম্পাস ছিল না।

সকলের মনে আশার সঞ্চার হল যে এবার নিশ্চয়ই সে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি আসা গিয়েছে। কিন্তু তার পর তিনদিন কেটে গেল, চারদিন গেল, পাঁচদিন গেল—আবার সামনে সমুদ্রের পূর্ব্ব তীর, আবার সুনীল সুলু সী। কোথায় নগর, কোথায়ই বা কী। একখানা ইট বা পাথরও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কারো চোখে পড়ল না আর। আবার হতাশ হয়ে পড়ল সকলে। জামাতুল্লাকে ইয়ার হোসেন বললে—জামাতুল্লা সাহেব, স্বপ্ন দেখো নি তো হিন্দু-মন্দিরের আর শহরের? জামাতুল্লা গেল রেগে। ইয়ার হোসেনের অনুচরেরা নিজেদের মধ্যে কি বিড়-বিড় করতে লাগল।

সুশীল সনৎ ও জামাতুল্লাকে গোপনে ডেকে বললে—ইয়ার হোসেনের ওই লোকগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে যদি কিছু চিহ্ন না পাওয়া যায়—দেখছি ওগুলো ভারী বদমাইশ!

জামাতুল্লা বললে—ভাববেন না বাবুজি, আমি ছুরি চালাব, আপনাদের জন্যে প্রাণ দেব! ওরা কী করবে? কাঠের ভেলা তৈরি করে সুলু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাব—ওই হলদে-মুখো চীনে জাঙ্ক্‌ওয়ালা বড় বাহাদুরি করে গেল আপনাদের কাছে—দেখব ও কত বাহাদুর!

একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে সুশীল বনের মধ্যে পাখি শিকার করতে বেরুল বন্দুক নিয়ে। কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় দূর থেকে একটা লম্বা পাহাড়-মত দেখতে পেলে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখলে পাহাড় ও তার মধ্যে একটা খাল, তাতে জল আছে—গভীর খাল। জলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। ভাল করে চেয়ে দেখে সে বুঝলে ওপারে ওটা পাহাড় নয়, একটা উঁচু পাঁচিল হতে পারে ওটা। খাল নয়, মানুষের হাতে কাটা পরিখা হয়ত। পাঁচিলের ওপর বড় বড় গাছ গজিয়েছে, মোটা মোটা শেকড় পাঁচিলের গা বেয়ে এসে মাটিতে নেমেছে—তাদের ডালপালার ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় পাঁচিলের গায়ের বড়-বড় পাথরের চাঁইগুলো দেখা যাচ্ছে।

সুশীল আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

এই তবে সেই প্রাচীন নগরীর প্রাচীর ও পরিখা। এ বিষয়ে ভুল থাকতে পারে না—তবে, হয়ত সে উল্টোদিক থেকে এটাকে দেখছে। নগরীর সিংহদ্বার অন্যদিকে আছে কোথাও।

সে যখন সকলকে গিয়ে খবর দিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে। ইতিমধ্যেই ওরাং-ওটাং ও শৃগালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-একটা নিশাচর পাখি ছাড়া অন্য পাখির কূজন থেমে গিয়েছে। ডালপালার ফাঁকে ঊর্দ্ধে কৃষ্ণ আকাশে নক্ষত্রাদি দেখা দিয়েছে।

ইয়ার হোসেন বারণ করলে—এখন না, এ রাত্রিকালে তাঁবু ছেড়ে কোথাও যেও না, কাল সকালে দেখা যাবে।

সুশীলের আনা পাখি দিয়ে তাঁবুতে ভোজ হল রাত্রে।

জামাতুল্লা বললে—পাঁচিল যখন বেরিয়েছে—তখন আমায় মিথ্যেবাদী বলে বদনাম আর কেউ দিতে পারবে না।

পরদিন সকলে গিয়ে দেখলে, সত্যই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার অস্তিত্ব ওদের সেখানে কোন প্রাচীন নগরীর অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান।

পরিখার জলে পদ্মফুল দেখে সুশীল ও সনৎ ভাবলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক যেন ঐ ফুল। আট শো বছর আগে যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ প্রথম পদ্মলতা এনে দুর্গ-পরিখার জলে পুঁতে দেয়, তারা আজ কোথায়? কিন্তু জলে একবার শেকড় গেড়ে যে পদ্মলতা বেঁচে উঠেছিল, সে বংশানুক্রমে আজও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে। ইয়ার হোসেনের আদেশে তার দুজন অনুচর জল মেপে দেখলে, এখানে পার হওয়া অসম্ভব। পরিখার জল বেশ গভীর। পরিখার এক বাহু ধরে এক দল ও অন্যদিকে অন্য বাহুর সন্ধানে অন্য দল বার হল।

শেষের দলে গেল সুশীল।

উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা প্রাচীর-পরিখার উত্তর দিকে আধ মাইল-টাক গিয়ে ওদের দল সবিস্ময়ে দেখলে প্রাচীরের এক স্থান ভগ্ন। মাঝখান বেয়ে বেশ একটা রাস্তা যেন ছিল সুপ্রাচীন কালে, এখন অবিচ্ছিন্ন ঘন বন। দেখে মনে হয় শত্রু দ্বারা দুর্গ বা নগর-প্রাচীর হয়ত এখানে ভগ্ন হয়ে থাকবে, নতুবা এর অন্য কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না।

দেখা গেল পরিখার সেইখানে প্রাচীন কালে বোধহয় কাঠের সেতু ছিল, এখন সেটা পড়েছে ভেঙে জলে। জলের গভীরতা সেখানে কম। কাঠের সেতু প্রথমে দেখা যায় নি। ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর প্রথমে জলের ধারে একটা শেকল দেখতে পায়। শেকলটা টেনে জলের মধ্য থেকে একখণ্ড লোহার পাত বেরুল। আন্দাজ করা কঠিন নয় যে এই লোহার পাত কাঠের চওড়া তক্তার গায়ে লাগানো ছিল। অনুমানটুকু ছাড়া কাঠের সেতুর অস্তিত্বের অন্য কোন নিদর্শন এতকাল পরে কিভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে!

ইয়ার হোসেন বললে—এখান দিয়ে পার হওয়া যাক—জল গভীর হবে না।

সুশীল সামান্য একটু আপত্তি করলে—অথচ কেন যে করলে তা সে নিজেই জানে না।

প্রথমে নামল ইয়ার হোসেন নিজে—তার পেছনে নামল সুশীল। হাত তিন চার মাত্র জলে যখন ওরা গিয়েছে তখন ওরা দেখলে সামনে জলের যা গভীরতা, তাতে আর অগ্রসর

হওয়া চলবে না। ঠিক সেই সময় ওদের নিকট থেকে হাত পাঁচ ছয় দূরে ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর—যে শিকল টেনে তুলেছিল জল থেকে—সে নামল, উদ্দেশ্য, ওদের পাশাপাশি সেও পরিখা পার হবে। কিন্তু পরক্ষণেই এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল।

সুশীল চোখের কোণ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে দেখতে পেলে, লোকটার ছ-সাত হাত দূরে ছোট্ট কাঠের মত কালো কি একটা জিনিস যেন ভাসছে। দু-সেকেণ্ড মাত্র, পরেই হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে বিরাট জলোচ্ছ্বাস উঠল, একটা আর্ত্ত চিৎকার-ধ্বনি অল্পক্ষণের মধ্যে শোনা গেল···কিসের একটা প্রবল ঝাপটা এসে ওদের জলের ওপর কাত করে ফেললে··· ওদের দু-জনকে।

পরক্ষণেই ইয়ার হোসেনের সেই অনুচর অদৃশ্য।

কী হল ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারলে না—অবিশ্যি এক মিনিটও হয় নি—এর মধ্যে সব ঘটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় যারা ছিল তারা চেঁচিয়ে উঠল—শয়তান! শয়তান!

ইয়ার হোসেন আকুলভাবে চিৎকার করে বললে—ডাঙায় ওঠো—ডাঙায় ওঠো!

হতভম্ব সুশীল কাদা হাঁচড়ে মরি-বাঁচি ডাঙায় উঠল—পাশাপাশি ইয়ার হোসেন উঠল, জলে চেয়ে দেখলে জল কাদা-ঘোলা হয়েছে, ইয়ার হোসেনের অনুচর নিশ্চিহ্ন।

সুশীল ও ইয়ার হোসেন তখনও হাঁপাচ্ছে; সুশীলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে!

সে ভীত কণ্ঠে বললে—কী হল?

ইয়ার হোসেন বললে—আমাদের সাবধানে জলে নামা উচিত ছিল। এইসব প্রাচীন কালের জলাশয়ে কুমির থাকা সম্ভব, একথা ভুলে গিয়েছিলাম। খোঁজ সবাই—

কুমির! সুশীল অবাক হয়ে গেল। কে জানত নগরীর পরিখায় কুমির থাকতে পারে? দুর্গপরিখার প্রহরী এরা—হয়ত প্রাচীন দিনেই শত্রুরোধকল্পে জলের মধ্যে কুমির ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সুবিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এখনও তারা বাইরের লোকের অনধিকার প্রবেশে বাধাদান করছে।

খুঁজে কিছু হল না—জল কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্য অনুচরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। ইয়ার হোসেন বললে—আজ থামলে আমাদের চলবে না—এগোও। নগরের ফটক খোঁজো—

সুশীল বললে—জলের মধ্যে অজানা বিপদ। জল পার হওয়ার দরকার নেই—হেঁটে বা সাঁতরে। কোথাও সেতু আছে কি না দেখা যাক।

আবার উত্তর মুখে সকলে চলল। মাইল দুই সোজা চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—কারণ ভীষণ জঙ্গল কেটে কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগুন জ্বেলে তাঁবু ফেলে সেদিন সকলে সেখানে রাত্রি কাটাবার আয়োজন করলে। এমন সময় বহু দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল—তার উত্তরে ওরাও একটা আওয়াজ করলে। দুটি দলের মধ্যে যোগসূত্র রাখবার এক-

মাত্র উপায় এই বন্দুকের আওয়াজ—অনেক দূর থেকে দক্ষিণগামী দলের এ হল সংকেতধ্বনি। পরদিন সকালে আরও এক মাইল গিয়ে প্রাচীরের উত্তর দিক থেকে পূর্ব্ব দিকে মুখ ফেরালে। অর্থাৎ এদিকে আর শহর নেই। প্রাচীর ধরে সবাই বাঁকতে গিয়ে দেখলে পরিখার এপারে অনেকগুলো স্তূপ, স্তূপের ওপর বিরাট জঙ্গল। বড় বড় পাথর গড়িয়ে এসে পড়েছে স্তূপ থেকে নিচে—সেগুলো বেশ চৌকশ করে কাটা। সম্ভবত স্তূপের ওপর কোন দুর্গ ছিল যা ঠিক নগর-প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণ পাহারা দিত।

পশ্চিম মুখে কতটা যেতে হবে কেউ জানে না, কারণ তারা দৈর্ঘ্য ধরে যাচ্ছে, না প্রস্থ ধরে যাচ্ছে তা জানবার সময় এখনও আসে নি। সেদিনও কেটে গেল বনের মধ্যে; সন্ধ্যা নামল। সন্ধ্যায় যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, আওয়াজ খুব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

সুশীল বললে—আমরা দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছি—প্রস্থ ধরে চলেছি। বুঝেছেন মিঃ হোসেন?

—এবার বুঝলাম। ওদিকে যে দল গিয়েছে তারা ওদিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বন্দুক ছুঁড়ছে। অন্তত সাত মাইল দূর এখান থেকে।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে নগরীর সিংহদ্বার পাওয়া গেল। সেখানটাতে পরিখার ওপর পাথরের সেতু। এপারে সেতু রক্ষার জন্যে দুর্গ ছিল, বর্ত্তমানে প্রকাণ্ড ভরা ঢিবি।

সকলে ব্যস্ত হয়ে সেতু পার হয়ে সিংহদ্বার লক্ষ্য করে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থেমে গেল।

সিংহদ্বারের খিলান ভেঙে পড়ত—যদি বট-জাতীয় কয়েকটি বৃক্ষের শিকড় আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে না জড়িয়ে ধরে রাখত। সিংহদ্বারের দুপাশে অদ্ভুত দুই প্রস্তর মূর্ত্তি—নাগরাজ বাসুকি ফণা তুলে আছে সামনে, পেছনে তিনমুখ-বিশিষ্ট কোন দেবতার মূর্ত্তি। সূর্য্যের আলো ওপরের বট-বৃক্ষের নিবিড় ডালপালা ভেদ করে মূর্ত্তি দুটির গায়ে বাঁকাভাবে এসে পড়েছে।

গম্ভীর শোভা। সুশীল শুধু নয়, দলের সকলেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই কারু-কার্য্যময় সিংহদ্বার ও প্রাচীন যুগের শিল্পীর হাতের এই ভাস্কর্য্যের পানে।

সুশীল হাত জোড় করে প্রণাম করলে মূর্ত্তি দুটির উদ্দেশ্যে। সে পুরাতত্ত্ব বা দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হলেও আন্দাজ করলে এ দুটি তিন-মুখ-বিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি।

সুলু সমুদ্রের এই জনহীন অরণ্যাবৃত দ্বীপে প্রাচীন ভারতের শক্তি ও তেজ একদিন এই দেবমূর্ত্তিকে স্থাপিত করেছিল। আজ ভারত অধঃপতিত,—দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। হে দেব, তোমার যে ভক্তগণ তোমাকে এখানে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা আজ নেই—তাদের অযোগ্য বংশধরকে তুমি সেই শৌর্য্য ও সাহস ভিক্ষা দাও, তাদের বীরপুরুষদের বংশধর করে দাও, হে রুদ্রভৈরব!

ইয়ার হোসেন পর্য্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এই বিরাট ভাস্কর্য্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বললে—যদি আমার দিন আসে, এই মূর্ত্তি সিঙ্গাপুরের মিউজিয়মে দান করবার ইচ্ছে রইল—

সুশীল বললে—তা কখনো করবেন না মিঃ হোসেন, যেথানকার দেবতা সেইখানেই তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিন। অমঙ্গলকে ডেকে আনবেন না।

সিংহদ্বার অতিক্রম করে ওরা নগরীর মধ্যে ঢুকল। কিন্তু অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখলে, এত দুর্ভেদ্য জঙ্গল যে দশ হাত এগিয়ে যাবার উপায় নেই বন না কাটলে। সিংহদ্বারের সামনেই নিশ্চয় প্রাচীন নগরের রাজপথ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে রাজপথের ওপরেই তিন চারশো বছরের পুরোনো বট-জাতীয় বৃক্ষ, বন্য রবার, বন্য ডুমুর গাছ। এইসব বড় গাছের নিচে আগাছা ও কাঁটালতার জঙ্গল। ওরাং-ওটাংও এই জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে পারে না—মানুষ কোন্ ছার।

ইয়ার হোসেনের হুকুমে মালয় অনুচরেরা 'বোলো' দিয়ে জঙ্গল কেটে কোন রকমে একটু সুঁড়িপথ বার করতে করতে সোজা চলল।

সুশীল বললে—এ জঙ্গল তো দেখছি নগরের বাইরে যেমন ছিল এখানেও তেমনি। কেবল এটা পাঁচিলের মধ্যে এই যা তফাত। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—দেখুন! দেখুন!

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল, সামনে প্রকাণ্ড একটা মন্দিরের চূড়া লতা ঝোপের আবরণ থেকে অনেক উঁচুতে মাথা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের কাছে যাবার কোন উপায় নেই—অনেক দূর থেকে বড় বড় দেওয়ালভাঙা পাথর ছড়িয়ে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে অন্তত দেড়শো হাত পর্য্যন্ত।

ওরা ডিঙিয়ে লাফিয়ে কোন রকমে মন্দিরের সামনে বড় চত্বরের কাছে এল—কিন্তু সামনেই গোপুরমের মত উঁচু পাইলন টাওয়ার। তার সুবিশাল পাথরের খিলান ফেটে চৌচির হয়ে সিংহদ্বারের মতই আষ্টেপৃষ্ঠে বড় বড় শেকড় আর লতার বাঁধনে আজ কত যুগ যুগ ধরে ঝুলছে—তার ঠিকানা কারো কাছে নেই। গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের দেওয়াল, বিকটাকার দৈত্যের মুখের মত সারি সারি অনেকগুলো মুখ দেওয়ালের গায়ে বেরিয়ে আছে—সুশীল আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে বললে—দেখ কী চমৎকার কাজ। হয় পাথরের কড়ি নয়ত পয়োনালি, যাকে ইংরাজিতে বলে গর্গয়েল। অর্থাৎ বিকট জানোয়ারের মুখ বসানো নালি।

সকলেই অবাক হয়ে সেই কল্পনাসৃষ্ট ভীষণ মুখগুলোর দিকে চেয়ে রইল। সুন্দরকে গড়ে তোলে সেও যেমন কৌশলী শিল্পী, ভীষণকে যে রূপ দেয়, সে শিল্পীও ঠিক তত বড়। সুশীলের মনে পড়ল আনাতোল ফ্রাঁসের সেই গল্প, শয়তানকে এমন বিকট করে আঁকলে শিল্পী যে, রাতের অন্ধকারে শয়তান এসে শিল্পীকে জাগিয়ে জিগ্যেস করলে—তুমি আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলে যে অমন করে এঁকেছ? শিল্পী বললে—আপনি কে?

শয়তান বললে—আমি লুসিফার। যাকে তোমরা বল শয়তান। ও নামটায় আমার ভয়ানক আপত্তি তা জানো? তুমি কী বিশ্রী করে এঁকেছ আমায়! আমি কি অত খারাপ দেখতে? দেখ না আমার দিকে চেয়ে!

শিল্পী দেখলে শয়তানের মূর্ত্তি দেখতে বেশ সুন্দর, তবে মুখশ্রী ঈষৎ বিষণ্ণ। ভয়ে ঠক্-ঠক্

করে কাঁপতে কাঁপতে বললে—আমায় মাপ করুন, আমি এর আগে দেখি নি আপনাকে। আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। আমি ভুল শুধরে নেব—

শয়তান হাসতে হাসতে বললে—তাই শুধরে নাও গে যাও—নইলে তোমার কান মলে দেব—

যাক। ওরা সবাই খিলানের তলা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মন্দিরের মধ্যেকার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। শুধু ভীষণ কাঁটাগাছ আর বেত, যা থেকে মলক্কা বেতের ছড়ি হয়।

সনৎ ছেলেমানুষ, ভাল বেত দেখে বলে উঠল—দাদা, একটা বেত কাটব?

ইয়ার হোসেন তাকে ধমক দিয়ে কি বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি সুন্দর পাখি এসে সামনের বন্য রবারের গাছের ডাল থেকে মন্দিরের ভাঙা পাথরের কানিসে বসল। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল পাখিটার দিকে। কী সুন্দর! দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলে পড়েছে কানিস থেকে প্রায় এক হাত—ময়ূরের পুচ্ছের মত। হল্‌দে ও সাদা আঁখি পালকের গায়ে—পিঠের পালক-গুলো ঈষৎ বেগুনি।

ইয়ার হোসেন বললে—টিকাটুরা, যাকে সাহেব লোক বলে বার্ড অব্‌ প্যারাডাইজ—খুব সুলক্ষণ।

সনৎ বললে—বাঃ, কী চমৎকার! এই সেই বিখ্যাত বার্ড অব্‌ প্যারাডাইজ! কত পড়েছি ছেলেবেলায় এদের কথা—

সুশীল বললে—সুলক্ষণ কুলক্ষণ দুরকমই দেখছি। কুমির নিলে একজনকে, আবার বার্ড অব্‌ প্যারাডাইজ দেখা গেল এটা সুলক্ষণ—

মন্দিরের বিভিন্ন কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরির দেওয়ালে সারবন্দী খোদাই কাজ। সুশীল একখানা পাথরের ইট মনোযোগের সঙ্গে দেখলে। একজন ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর পাশে বোধহয় গ্রহবিপ্র পাঁজি পড়ছেন। সামনে একসার লোক মাথা নিচু করে যেন রাজাকে অভিবাদন করছে। রাজার এক হাতে একটা কী পাখি—হয় পোষা শুক, নয়ত শিক্‌রে বাজ।

ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার! তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস-ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দুধর্ম্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে গড়া এই কীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গর্ব্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক দুলে উঠল। বীর তারা, দুর্ব্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরে নি, ধনুকে জ্যা রোপণ করে নি—সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে—এই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল মহাসাগর—হিন্দু-ধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ-দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র-পারে।

পরবর্ত্তী যুগের যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে টোলের ভিটেয় বাঁশবনের অন্ধকারে বসে বলে গিয়েছিল—সমুদ্রে যেও না, গেলে জাতটি একেবারে যাবে, হিন্দুত্ব একেবারে লোপ পাবে, —তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পূর্ব্বপুরুষদের অযোগ্য বংশধর, তাদের আয়ু দুর্ব্বল, মন দুর্ব্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির।

তারা হিন্দু নয়—হিন্দুর কঙ্কাল।

দুদিন ধরে ওরা বনের মধ্যে কত প্রাচীন দেওয়াল, ধ্বংসস্তূপ, দরজা, খিলান ইত্যাদি দেখে বেড়াল। জ্যোৎস্না রাত্রি, গভীর রাত্রে যখন ওরাং-ওটাংয়ের ডাকে চারিপাশের ঘন জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে, অজ্ঞাত নিশাচর পক্ষীর কুস্বর শোনা যায়, বন্য রবারের ডালপালায় বাদুড় ঝটাপটি করে, তখন এই প্রাচীন হিন্দু নগরীর ধ্বংসস্তূপে বসে সুশীল যেন মুহূর্তে কোন্ মায়ালোকে নীত হয়—অতীত শতাব্দীর হিন্দু সভ্যতার মায়ালোক—দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত কবি ও বীন্-বাজিয়ে যে মহাযুগের প্রতীক, হুনবিজেতা মহারথ স্কন্দগুপ্তের কোদণ্ড-টঙ্কারে যে যুগের আকাশ সন্ত্রস্ত।

সুশীল স্বপ্ন দেখে! সনৎকে বলে—বুঝলি সনৎ, জামাতুল্লাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ যে ও আমাদের এনেছে এখানে। এসব না দেখলে ভারতবর্ষের গৌরব কিছু বুঝতাম না!

সনৎ এ কথায় সায় দেয়। টাকার চেয়ে এর দাম বেশি।

ইয়ার হোসেন কিন্তু এসব বোঝে না। সে দিন-দিন উগ্র হয়ে উঠছে। এই নগরীর ধ্বংসস্তূপে প্রায় দশদিন কাটল। অথচ ধনভাণ্ডারের নামগন্ধও নেই, সন্ধানই মেলে না। জামাতুল্লাকে একদিন স্পষ্ট শাসালে—যদি টাকাকড়ির সন্ধান না মেলে তো তাকে এই জঙ্গলে টেনে আনবার মজা সে টের পাইয়ে দেবে।

জামাতুল্লা সুশীলকে গোপনে বললে—বাবুজি, ইয়ার হোসেন বদমাইস গুণ্ডা—ও না কী গোলমাল বাধায়!

সুশীল ও সনৎ সর্ব্বদা সজাগ হয়ে থাকে রাত্রে, কখন কী হয় বলা যায় না। ইয়ার হোসেনের সশস্ত্র অনুচরের দল দিন-দিন অসংযত হয়ে উঠছে।

একদিন জামাতুল্লা বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় একটি বড় পাথরের থাম আবিষ্কার করলে। থামের মাথায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম তৈরি করা হয়েছে। সুশীলকে ডেকে নিয়ে গেল জামাতুল্লা, সুশীল এসব দেখে খুশি হল। সুশীল ও সনৎ দুজনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে থামটা দেখতে গেল।

সেখানে গিয়েই সুশীল দেখলে থামটার সামনে আড়ভাবে পড়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙ্—যেন একখানা চৌরশ করা শানের মেঝে। সুশীল ক্যামেরা এনেছে থামটার ফটো নেবে বলে, পাথরটা সরিয়ে না দিলে পদ্মটির ছবি নেওয়া সম্ভব নয়।

জামাতুল্লা বললে—পাথরখানা ধরাধরি করে এস সরাই—

সরাতে গিয়ে পাথরখানা যেই কাত অবস্থা থেকে সোজা হয়ে পড়ল, অমনি সনৎ চিৎকার করে বললে—দেখ, দেখ—

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, যেখানে পাথরটা ছিল, সেখানে একটা সুড়ঙ্গ যেন মাটির নিচে নেমে গিয়েছে। জামাতুল্লা ও সুশীল সুড়ঙ্গের ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সুড়ঙ্গটা হঠাৎ বেঁকে গিয়েছে, প্রথমটা সেজন্যে মনে হয় গর্তটা নিতান্তই অগভীর।

সুশীল বললে—আমি নামব—

জামাতুল্লা বললে—তা কখনো করতে যাবেন না, বিপদে পড়বেন। কী আছে গর্ত্তের মধ্যে কে জানে!

সুশীল বললে—নেমে দেখতেই হবে। আমি এখানে থাকি, তোমরা গিয়ে তাঁবু থেকে মোটা দড়ি হাত-চল্লিশ, টর্চ আর রিভলবার নিয়ে এস। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সব আনা হল। সুশীল জামাতুল্লা দুজনে সুড়ঙ্গের মধ্যে নামল। খানিক দূর নামলে ওরা। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, পনেরো ষোল ধাপ নেমেই কিন্তু দুজনে হতাশ হল দেখে, সামনে আর রাস্তা নেই। সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে একটা গাঁথা দেওয়ালের সামনে।

সুশীল বললে—এর মানে কী জামাতুল্লা সাহেব?

—বুঝলাম না বাবুজি। যদি যেতেই দেবে না, তবে সিঁড়ি গেঁথেছে কেন?

রাত হয়ে আসছে। ওরা দুজনে টর্চ ফেলে চারিদিক ভাল করে দেখতে লাগল। হঠাৎ সুশীল চেঁচিয়ে উঠে বললে—দেখ, দেখ! দুজনেই অবাক হয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে ওদের পরিচিত সেই চিহ্ন ক্ষোদা—পদ্মরাগ মণির ওপর যে-চিহ্ন ক্ষোদা ছিল। ভারতীয় স্বস্তিক চিহ্ন, প্রত্যেক বাহুর কোণে এক এক জানোয়ারের মূর্ত্তি—সর্প, বাজপাখি, বাঘ ও কুমির।

—এই সেই আঁক-জোঁক বাবুজি! কিন্তু এর মানে কী, সিঁড়ি বন্ধ করলে কেন, বুঝলেন কিছু?

দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেল। সুশীল সামনে পাথরখানাতে হাত দিলে, বেশ মসৃণ; মাপ নিয়ে চৌরশ করে কেটে কে তৈরি করে রেখেছে।

কিছুই বোঝা গেল না—অবশেষে হতাশ হয়ে ওরা গর্ত্ত থেকে উঠে পড়ে তাঁবুতে ফিরে এল সনৎকে নিয়ে। সেখানে কাউকে কিছু বললে না। পরদিন দুপুরবেলা সুশীল একা জায়গাটায় গেল। আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে নামল। ওর মনে একথা বিশেষভাবে জেগে ছিল, লোকে এইটুকু গর্ত্তে ঢোকবার জন্যে এরকম সিঁড়ি গাঁথে না। এ সুড়ঙ্গ নিশ্চয় আরও অনেক বড়। কিন্তু তবে দশ ধাপ নেমেই পাথর দিয়ে এমন শক্ত করে বোজানো কেন?

এ গোলমেলে ব্যাপারের কোন মীমাংসা করা যাবে না দেখা যাচ্ছে। সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে সেই অদ্ভুত চিহ্নটি সুস্পষ্ট ক্ষোদাই করা আছে। এ চিহ্নই বা এখানে কেন? ভাল করে চেয়ে চিহ্নটি দেখতে দেখতে ওর চোখে পড়ল, যে পাথরের গায়ে চিহ্নটি ক্ষোদাই করা তার এক কোণের দিকে আর একটা কি ক্ষোদাই করা আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার খুব না হলেও আলোও তেমন নয়। সুশীল টর্চ ফেলে ভাল করে দেখলে—চিহ্নটি আর কিছুই নয়, ঠিক যেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখবার সামান্য খোল। খোলের চারিপাশে দুটি লতার আকারের বলয় কিংবা অন্য কোন অলঙ্কার পরস্পরযুক্ত। সুশীল কি মনে ভেবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খোলে নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে দেখতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের পাথর যেন কলের দোরের মত সরে একটা মানুষ যাবার মত ফাঁক হয়ে গেল। সুশীল অবাক! এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আলিবাবার গুহা!

সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে। সুশীল সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে উঁকি মেরে চাইলে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। বহু যুগ আবদ্ধ দূষিত বাতাসের বিষাক্ত নিঃশ্বাস যেন ওর চোখে মুখে এসে লাগল। তখন কিন্তু সুশীলের মন আনন্দে কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বসে ভাববার সময় নেই। ও তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেল।

আবার সিঁড়ি বেঁকে গিয়েছে কিছুদূর গিয়ে। এবার আর সামনে পাথর নেই, সিঁড়ি এঁকে বেঁকে নেমে চলেছে। সুশীল একবার ভাবলে তার আর যাওয়া উচিত নয়। কতদূর সিঁড়ি নেমেছে এই ভীষণ অন্ধকূপের মধ্যে কে জানে? কিন্তু কৌতূহল সংবরণ করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। ও আরও অনেকখানি নিচে নেমে গিয়ে দেখলে এক জায়গায় সিঁড়ি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দেখলে, কোন দিকে কিছুই নেই—পাথর-বাঁধানো চাতাল বা মেঝের মত তলাটা সব শেষ, আর কিছু নেই। ইংরাজিতে যাকে বলে dead end, ও সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। সুশীল হতভম্ব হয়ে গেল।

যারা এ সিঁড়ি গেঁথেছিল তারা কী জন্যে এত সতর্কতার সঙ্গে এত কষ্ট করে সিঁড়ি গেঁথেছিল যদি সে সিঁড়ি কোথাও না পৌঁছে দেয়?

চাতালের দৈর্ঘ্য হাত-তিনেক, প্রস্থ হাত আড়াই। খুব একখানা বড় পাথরের দ্বারা যেন সমস্ত মেঝে বা চাতালটা বাঁধানো। তন্ন-তন্ন করে খুঁজে চাতালের কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সুশীল বাধ্য হয়ে বোকা বনে উঠে চলে এসে জামাতুল্লা ও সনৎকে বললে। ওরা পরদিন লুকিয়ে তিনজনে সেখানে গেল, সিঁড়ি দিয়ে নামলে। সামনে সেই চাতাল। সিঁড়ির শেষ।

জামাতুল্লা বললে—এ কী তামাশা আছে বাবুজি—আমি তো বেকুব বনে গেলাম!

তিন জনে মিলে নানাভাবে পাথরটা দেখলে, এখানে টিপলে ওখানে চাপ দিলে—হিমালয় পর্ব্বতের মতই অনড়। কোথাও কোন চিহ্ন নেই পাথরের গায়ে। মিনিট কুড়ি কেটে গেল। মিনিট কুড়ি সেই অন্ধকার ভূগর্ভে কাটানো বিপজ্জনকও বটে, অস্বস্তিকরও বটে।

সুশীল বললে—ওঠ সবাই, আর না এখানে।

হঠাৎ জামাতুল্লা বলে উঠল—বাবুজি, একটা কথা আমার মনে এসেছে।

দুজনেই বলে উঠল—কী? কী?

—গাঁতি দিয়ে এই পাথরখানা খুঁড়ে তুলে দেখলে হয়। কী বলেন?

তখন ওরাও ভাবলে এই সামান্য কথাটা। যে কথা, সেই কাজ। জামাতুল্লা লুকিয়ে তাঁবু থেকে গাঁতি নিয়ে এল। পাথর খুঁড়ে শাবলের চাড় দিয়ে তুলে ফেলে যা দেখলে তাতে ওরা যেমন আশ্চর্য হল তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবার সিঁড়ির ধাপ। কিন্তু দশ ধাপ নেমে গিয়ে সিঁড়ি বেঁকে গেল—আবার সামনে চৌরশ পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গ বোজানো। মাথার ওপরকার পাথরে পূর্ব্ববৎ চিহ্ন পাওয়া গেল। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে আবার সে পাথর ফাঁক হল। আবার সিঁড়ি। কিন্তু কিছুদূর নেমে আবার পাথর-বাঁধানো চাতাল—আবার সেই dead end—নির্দ্দেশহীন শূন্য।

অমানুষিক পরিশ্রম। আবার পাথর তুলে ফেলা হল—আবার সিঁড়ি। সুশীল বললে—যারা এ গোলকধাঁধা করেছিল, তারা খানিকদূর গিয়ে একবার একখানা পাথর সোজা করে পথ বুজিয়েছে, তার পরেরটা সিঁড়ির মত পেতে বুজিয়েছে—এই এদের কৌশল, বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামাতুল্লা ওদের সতর্ক করে দিলে। বললে—বাবুজী, অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। খারাপ গ্যাস থাকতে পারে, দম-বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারি সবাই। তাঁবুতেও সন্দেহ করবে। চলুন আজ ফিরি।

তাঁবুতে ফিরবার পথে জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, ইয়ার হোসেনকে এর খবর দেবেন না।

—কেন ?

—কী জানি কী আছে ওর মনে। যদি রত্নভাণ্ডারের সন্ধানই পাওয়া যায়, তবে ইয়ার হোসেন কী করবে বলা যায় না। ওর সঙ্গে লোক বেশি। প্রত্যেকে গুণ্ডা ও বদমাইস। মানুষ খুন করতে ওরা এতটুকু ভাববে না। ওদের কাছে মশা টিপে মারাও যা, মানুষ মারাও তাই।

ইয়ার হোসেনের মন যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। তাঁবুতে ফিরতে সে বললে—কোথায় ছিলে তোমরা ?

সুশীল বললে—ফটো নিচ্ছিলাম।

ইয়ার হোসেন হেসে বললে—ফটো নিয়ে কী হবে, যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা—তার সন্ধান কর।

ইয়ার হোসেনের জনৈক মালয় অনুচর সেদিন দুপুরে একটা পাথরের বৃষমূর্তি কুড়িয়ে পেলে গভীর বনের মধ্যে। খুব ছোট, কিন্তু অতটুকু মূর্তির মধ্যেও শিল্পীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় বর্তমান।

রাত্রে জ্যোৎস্না উঠল।

সুশীল তাঁবু থেকে একটু দূরে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসল। ভাবতে ভাল লাগে এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপময় রাজ্যের অতীত গৌরবের দিনের কাহিনী। রাত্রের যামঘোষী দুন্দুভি যেন বেজে উঠল—ধারাযন্ত্রে স্নান সমাপ্ত করে, কুঙ্কুমচন্দনলিপ্ত দেহে দিগ্বিজয়ী নৃপতি চলেছেন অন্তঃপুরের অভিমুখে। বারবিলাসিনীরা তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছে এইমাত্র—তারাও ফিরছে তাঁর পিছনে পিছনে, কারো হাতে রজত কলস, কারো হাতে স্ফটিক কলস…

আধো-অন্ধকারে কালো মত কে একটা মানুষ বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে সুশীলের দিকে ছুটে এল আততায়ীর মত—সুশীল চমকে উঠে একখানা পাথর ছুঁড়ে মারল। মানুষটা পড়েই জানোয়ারের মত বিকট চীৎকার করে উঠল—তারপর আবার উঠে আবার ছুটল ওর দিকে। সুশীল ছুট দিলে তাঁবুর দিকে।

ওর চিৎকার শুনে তাঁবু থেকে সনৎ বেরিয়ে এল। ধাবমান জিনিসটাকে সে গুলি করলে। সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দেখা গেল একটা ওরাং-ওটাং।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেন দু-জনে তিরস্কার করলে সুশীলকে।

এই বনে যেখানে-সেখানে একা যাওয়া উচিত নয়, তারা কতবার বলবে একথা? কত জানা-অজানা বিপদ এখানে পদে পদে!

পরদিন ছুতো করে সুশীল ও আমাতুল্লা আবার বেরিয়ে গেল। বনের মধ্যে সেই গুহায়। সনৎকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। কেন না সকলে গেলে সন্দেহ করবে এরা।

আবার সেই পরিশ্রম। আরও দুধাপ সিঁড়ি ও দুটো চাতাল ওরা ডিঙিয়ে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন আর কাজ হয় না। আবার তার পরের দিন কাজ হল শুরু। এই-রকম আরও তিন চার দিন কেটে গেল।

একদিন সনৎ বললে—দাদা, তোমরা আর সেখানে দিনকতক যেও না।

সুশীল বললে—কেন?

—ইয়ার হোসেন সন্দেহ করছে। সে রোজ বলে, এরা বনের মধ্যে কী করে। এত ফটো নেয় কিসের?

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর একদিনের কাজ বাকি। ওর শেষ না দেখে আমি আসতে পারছি নে।

—একা যাও—দু-জনে যেও না। জোট বেঁধে গেলেই সন্দেহ করবে। হাতিয়ার নিয়ে যেও।

—তুই তাঁবুতে থেকে নজর রাখিস ওদের ওপর। কাল খুব সকালে আমি বেরিয়ে যাব।

সুশীল তাই করলে। প্রায় ষাট ফুট নিচে তখন শেষ চাতাল পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেদিন দুপুর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে সে চাতালটা ভেঙে ফেললে।

তারপর যা দেখলে তাতে সুশীল একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ল।

সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে ক্ষুদ্র একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে।

কক্ষের মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য।

টর্চের আলোয় দেখা গেল কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি পাষাণবেদিকার ওপর এক পাষাণ নারীমূর্ত্তি—বিলাসবতী কোন নর্ত্তকী যেন নাচতে নাচতে হঠাৎ বিটঙ্কবেদিকার ওপর পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে কি দেখে।

একি!

এর জন্যে এত পরিশ্রম করে এরা এসব কাণ্ড করেছে!

সুশীল আরও অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পাথরের বেদীর ওপর সেই চিহ্ন আবার খোদাই করা। ঘরের মধ্যে টর্চ ঘুরিয়ে দেখলে। তাকে ঘর বলা যেতে পারে, একটা বড় চৌবাচ্চাও বলা যেতে পারে। স্যাঁতসেতে ছাদ, স্যাঁতসেতে মেঝে—পাতাল-পুরীর এই নিভৃত অন্ধকার গহ্বরে এ প্রস্তরময়ী নারী-মূর্ত্তির রহস্য কে ভেদ করবে?

কিন্তু কী অদ্ভুত মূর্ত্তি! কটিতে চন্দ্রহার, গলদেশে মুক্তমালা, প্রকোষ্ঠে মণিবলয়। চোখের চাহনি সজীব বলে ভ্রম হয়।

সেদিনও ফিরে গেল। জামাতুল্লাকে পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল—তন্ন তন্ন করে চারিদিক খুঁজে দেখলে ঘরের, কোথাও কিছু নেই।

জামাতুল্লা বললে—কী মনে হয় বাবুজি?

—তোমার কী মনে হয়?

—এই সিঁড়ি আর চাতাল, চাতাল আর সিঁড়ি—ষাট ফুট গেঁথে মাটির নিচে শেষে নাচনে-ওয়ালী পুতুল! ছোঃ বাবুজি—এর মধ্যে আর কিছু আছে।

—বেশ, কী আছে, বার কর। মাথা খাটাও।

—তা তো খাটাব—এদিকে ইয়ার হোসেনের দল যে ক্ষেপে উঠেছে। কাল ওরা কী বলেছে জানেন?

—কী রকম?

—আর দুদিন ওরা দেখবে—তারপর নাকি এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে। তা ছাড়া আর এক ব্যাপার। আপনাকেও ওরা সন্দেহ করে। বনের মধ্যে রোজ আপনি কী করেন! আমায় প্রায়ই জিগ্যেস করে।

—তুমি কী বল?

—আমি বলি বাবুজি ফটো তোলে, ছবি আঁকে। তাতে ওরা আপনাকে ঠাট্টা করে। ওসব মেয়েলী কাজ।

—যারা এই নগর গড়েছিল, পুতুল তৈরি করেছিল, পাথরে ছবি এঁকেছিল—তারা পুরুষ মানুষ ছিল জামাতুল্লা। ইয়ার হোসেনের চেয়ে অনেক বড় পুরুষ ছিল—বলে দিও তাকে।

সুশীলকে রেখে জামাতুল্লা ফিরে যেতে চাইলে। নতুবা ইয়ার হোসেনের দল সন্দেহ করবে। যাবার সময় সুশীল বললে—কোন উপায়ে এখানে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পার? টর্চ জালিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? আর কিছু না থাক সাপের ভয়ও তো আছে।

জামাতুল্লা বললে—আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি লণ্ঠন নিয়ে বাবুজি। আপনি ওপরে উঠে বসুন, এ পাতালের মধ্যে একা থাকবেন না—

সুশীল বললে—না, তুমি যাও—আমি এখানেই থাকব। পকেটে একটুকরো মোমবাতি এনেছি—তাই জ্বালাব।

একটুকরো বাতি জালিয়ে সুশীল ঘরটার মধ্যে বসে ভাবতে লাগল। বাইরে এত বড় রাজ্য যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, কোন জিনিস গোপন করবার জন্যেই তারা এই পাতালপুরী তৈরী করেছিল, এত কষ্ট স্বীকার করে নর্তকী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

হঠাৎ নর্তকী পুতুলটার দিকে ওর দৃষ্টি পড়তে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কী ব্যাপার এটা?

এতক্ষণ মূর্তিটার যতখানি তার দিকে ছিল, সেটা যেন সামান্য একটু পাক খেয়ে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুশীল চোখ মুছে আবার চাইলে।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। এই বাতিটার সামনে ছিল ওই পা-খানা—এখন পায়ের হাঁটুর পেছনের অংশ দেখা যায় কী করে? সে তো এতটুকু নড়ে নি নিজে, যেখানে—সেখানেই বসে আছে।

সুশীলের ভয় হল। শ্মশানপুরীর ভূগর্ভস্থ কক্ষ, কত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দৈত্যদানোর দল জমা হয়ে আছে এসব জায়গায়, কে বলতে পারে? কিসে মৃত্যু আর কিসে জীবন, এ বার্ত্তা পৌঁছে দেবার লোক নেই। সরে পড়াই ভাল।

এমন সময় ওপর থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল, পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে ঘরের মধ্যে ওপর থেকে উঁকি মেরে বললে—বাবুজি, ঠিক আছেন?

—তা আছি। ঘরের মধ্যে নামো তো জামাতুল্লা—

জামাতুল্লা ঘরের মেঝেতে নেমে ওর পাশে দাঁড়ালো। সুশীল ওকে মূর্ত্তির ব্যাপারটা দেখিয়ে বললে—এখন তুমি কী মনে কর?

—কিছু বুঝতে পারছি নে বাবুজি—খুব তাজ্জব কথা!

—তুমি থাক এখানে—বোস—

কিন্তু জামাতুল্লা দাঁড়াল না। দুজনে এখানে বসে থাকলে ইয়ার হোসেনের দলের সন্দেহ ঘোরালো রকম হয়ে উঠবে, সে থাকতে পারবে না। জামাতুল্লা চলে যাবার পর সুশীল অনেকক্ষণ মূর্ত্তিটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মূর্ত্তিটা এবার বেশ ঘুরে গিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ওর আগের ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে আসার পর থেকে, এখন ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বেশি।

খুব একটু একটু করে ঘুরছে, ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের মতই, মূর্ত্তির পদতলস্থ বিটঙ্কবেদিকা।

কেন? কী উদ্দেশ্যে? অতীত শতাব্দীগুলো মূক হয়ে রইল, এর জবাব মেলে না। বেলা গড়িয়ে এল, সুশীলের হাতঘড়িতে বাজে পাঁচটা।

হঠাৎ সুশীল চেয়ে দেখলে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

নর্ত্তকী-মূর্ত্তির সরু সরু আঙুলগুলির মধ্যে একটা আঙুল একটি মুদ্রা রচনা করার দরুন অন্য সব আঙুল থেকে পৃথক এবং একদিকে কী যেন নির্দ্দেশ করবার ভঙ্গিতে ছিল। এবার যেন সে আঙুলের ছায়া পড়েছে দেওয়ালের এক বিশেষ স্থানে।

এমন ভঙ্গিতে পড়েছে যেন মনে হয় মূর্ত্তিটি তর্জ্জনী-অঙ্গুলির দ্বারা ভিত্তিগাত্রের একটি স্থান নির্দ্দেশ করছে।

তখনি একটা কথা মনে হল সুশীলের। লণ্ঠনের আলোর দ্বারা এ ছায়া তৈরি হয়েছে, না কোন গুপ্ত ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে?

তা-ই বলে মনে হয়, লণ্ঠনের আলোর কৃত্রিম ছায়া এ নয়। ও লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে দেখলে—তখন অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্যেও তর্জ্জনীর ছায়া ভিত্তিগাত্রে পড়ে একটা স্থান যেন নির্দ্দেশ করছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে উঠে ও জায়গাটা দেখতে গেল।

দেওয়ালের সেই জায়গা একেবারে সমতল, চিহ্নহীন—চারিপাশের অংশের সঙ্গে পৃথক করে নেওয়ার মত কিছুই নেই সেখানে। তবুও সে নিরাশ না হয়ে দেওয়ালের সেই জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখতে গেল।

হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল। ঠিক যেখানে আঙুলের অগ্রভাগ শেষ হয়েছে সেই স্থানের খানিকটা যেন বসে গেল—অর্থাৎ ঢুকে গেল ভেতরের দিকে। একটা শব্দ হল পেছনের দিকে—ও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে বিটঙ্কবেদিকার তলাটা যেন ঈষৎ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও ফিরে এসে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে, গোলাকার বেদিকাটি তার নর্ত্তকী-মূর্ত্তিটা-সুদ্ধ যেন একটা পাথরের ছিপি। বড় বোতলের মুখে যেমন কাঁচের স্টপার বা ছিপি থাকে, এ যেন পাষাণ-নির্ম্মিত বিরাট এক স্টপার। কিসের চাড় লেগে স্টপারের মুখ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও নর্ত্তকী-মূর্ত্তির পাদদেশে এবং গ্রীবায় দুই হাত দিয়ে মূর্ত্তিটাকে একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সেটা সবসুদ্ধ বেশ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। কয়েকবার ঘুরবার পরে ক্রমেই তার তলার ফাঁক চওড়া হয়ে আসতে লাগল। কী কৌশলে প্রাচীন শিল্পী পাথরের উপরটাকে ঘূর্ণ্যমান করে তৈরি করেছিল?

এই মূর্ত্তিসুদ্ধ বেদিকা টেনে তোলা তার একার সাধ্যে কুলুবে না। জামাতুল্লা ও সনৎ দু'জনকেই আনতে হবে কোন কৌশলে সঙ্গে করে, ইয়ার হোসেনের দলের অগোচরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার বিলম্ব নেই। বহু দিন-রাত্রির ছায়া অতীতের এ নিস্তব্ধ কক্ষে জীবনের সুখ ধ্বনিত করে নি, এখানে গভীর নিশীথ রাত্রির রহস্য হয়ত মানুষের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক হবে না, মানুষের জগতের বাইরে এরা।

সুশীল লণ্ঠন হাতে উঠে এল আঁধার পাতালপুরীর কক্ষ থেকে। তাঁবুতে ঢুকবার পথে ইয়ার হোসেন বড় ছুরি দিয়ে পাখির মাংস ছাড়াচ্ছে।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—কোথায় ছিলেন?

—ছবি আঁকতে, মিঃ হোসেন।

—লণ্ঠন কেন?

—পাছে রাত হয়ে যায় ফিরতে। বনের মধ্যে আলো থাকলে অনেক ভাল।

—এত ছবি এঁকে কী হয় বাবু?

—ভাল লাগে।

—আসল ব্যাপারের কী? জামাতুল্লা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। আমি ওকে মজা দেখিয়ে দেব!

—আমরা সকলেই চেষ্টা করছি! ব্যস্ত হবেন না মিঃ হোসেন—

—আমি আর পাঁচদিন দেখব। তারপর এখান থেকে চলে যাব—কিন্তু যাবার আগে জামাতুল্লাকে দেখিয়ে যাব সে কার সঙ্গে জুয়োচুরি করতে এসেছিল!

—জামাতুল্লার কী দোষ ? আপনি বরং আমাকে দোষ দিতে পারেন—

—আরে আপনি তো ছবি-আঁকিয়ে পুরুষ মানুষ। এসব কাজ আপনার না।

সুশীল রাত্রে চুপি চুপি জামাতুল্লাদের নর্ত্তকী পুতুলের ঘটনা সব বললে। ওদের দু-জনকেই যেতে হবে, নতুবা ছিপি উঠবে না।

জামাতুল্লা বললে—কিন্তু আমাদের দু-জনের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয় বাবুজি।

—কেন ?

—জানেন না,—এর মধ্যে নানারকম ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা আপনাদের চেয়ে আমাকেই দোষ দেবে বেশি। আপনাকে ওরা নিরীহ, গোবেচারি বলে ভাবে—

—সেটা অন্যায়।

—আপনারা ভাল মানুষ, আমার হাতের পুতুল—পুতুল যেমন নাচায়, তেমনি আপনারা আমার হাতে—

শেষের কথাটা শুনে সুশীলের আবার মনে পড়ল নর্ত্তকী-মূর্ত্তির কথা। কাল হয়ত বেরুনো যাবে না, ইয়ার হোসেনের কড়া নজরবন্দীর দরুন। আজই রাত্রে অন্য দল ঘুমুলে সেখানে গেলে ক্ষতি কী ?

সনৎকে বললে—সনৎ, তৈরি হও। আজ রাত্রে হয় আমাদের জীবন, নয়তো আমাদের মরণ। পাতালপুরীর রহস্য আজ ভেদ করতেই হবে। আজ আঁধার রাত্রে চুপি চুপি বেরুবে আমার সঙ্গে—দিনের আলোয় সব ফাঁস হয়ে যাবে।

জামাতুল্লা বললে—কেউ টের না পায় বাবুজি, জুতো হাতে করে সব যাবেন কিন্তু।

আহারাদির পর্ব্ব মিটে গেল। দাবানল জ্বলে উঠেছে আজ ওদের মনে, বনের সাময়িক দাবানলকেও ছাপিয়ে তার শিখা সমস্ত মনের আকাশ ব্যেপে বেড়ে উঠল।

দুটো রাইফেল, একটা রিভলভার, একটা শাবল, একটা গাঁতি, খানিকটা দড়ি, চার-পাঁচটা মোমবাতি, কিছু খাবার জল, এক শিশি টিংচার আইডিন, খানকতক মোটা রুটি—তিনজনের মধ্যে এগুলো ভাগ করে নিয়ে রাত একটার পরে ওরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরুল।

ইয়ার হোসেনের একজন মালয় অনুচর উল্টোমুখে দাঁড়িয়ে 'বলো' (রামদাও) হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে এরা বুক ঘেঁষে চলে এল…সে লোকটা টের পেলে না।

সনৎ বললে—আমি সে পুতুলটা একবার দেখব—

অদ্ভুত রাত্রি! বনের মাথায় মাথায় অগণিত তারা, বহুকালের সুপ্ত নগরীর রহস্যে নিশীথ রাত্রির অন্ধকার যেন থম্‌-থম্‌ করছে, সমস্ত ধ্বংসস্তূপটি যেন মুহূর্ত্তে শহর হয়ে উঠতে পারে—ওর অগণিত নরনারী নিয়ে। লতাপাতা, ঝোপ-ঝাপ, মহীরুহের দল খাড়া হয়ে সেই পরম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অন্ধকারে একটা সর-সর শব্দ হতে লাগল সামনের মাটিতে।

সকলে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে টর্চ টিপলে—প্রকাণ্ড একটা

অজগর সাপ আস্তে আস্তে ওদের পাঁচ হাত তফাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলে পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল, সাপটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওরা আবার চলল।

গহ্বরের মুখে ওরা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল, তিনজনে মিলে সেগুলো সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

সনৎ বললে—এ তো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি—

কিন্তু পাতালপুরীর কক্ষের সে নর্ত্তকী-মূর্ত্তিটা দেখে ওর মুখে কথা সরল না। শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পকৌশলের সামনে ও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

সুশীল বললে—শুধু এই মূর্ত্তিটি কিউরিও হিসেবে বিক্রী করলে দশহাজার টাকার যে-কোন বড় শহরের মিউজিয়ম কিনে নেবে—তবে, আমাদের দেশে নয়—ইউরোপে।

জামাতুল্লা বললে- ধরুন বাবুজি নাচনেওয়ালী পুতুলটা সবাই মিলে—পাক খাওয়াতে হবে একে বারকয়েক এখনও।

মিনিট দুই সবাই মিলে পাক দিয়ে মূর্ত্তিটাকে ঘোরালো যেমন স্টপার ঘোরায় বোতলের মুখে। তারপর সবাই সন্তর্পণে মূর্ত্তিটাকে ধরে উঠিয়ে নিলে। স্টপারের মতই সেটা খুলে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিটঙ্কবেদীর নিচের অংশে বার হয়ে পড়ল গোলাকার একটা পাথরের চৌবাচ্চা। সুশীল উঁকি মেরে দেখে বললে—টর্চ ধর, খুব গভীর বলে মনে হচ্ছে—

টর্চ ধরে ওরা দেখলে চৌবাচ্চা অন্তত সাত ফুট গভীর। তার তলায় কী আছে ওপর থেকে ভাল দেখা যায় না।

সনৎ বললে—আমি লাফ দিয়ে পড়ব দাদা?

জামাতুল্লা বারণ করলে। এ সব পুরোনো কূপের মধ্যে বিষধর সর্প প্রায়ই বাসা বাঁধে, যাওয়া সমীচীন হবে না।

দু-একটা পাথর ছুঁড়ে মেরে ওরা দেখলে, কোন সাড়াশব্দ এল না আধ-অন্ধকার কূপের মধ্যে থেকে। তখন জামাতুল্লাই ঝুপ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ওর মধ্যে।

কিছুক্ষণ তার আর কোন সাড়া নেই।

সুশীল ও সনৎ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে বলে উঠল—কী—কী—কী দেখলে?

তবুও জামাতুল্লার মুখে কথা নেই। সে যেন কি হাতড়ে বেড়াচ্ছে চৌবাচ্চার তলায়। একটু অদ্ভুতভাবে হাতড়াচ্ছে—একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছু হঠে আসছে।

সুশীল বললে—কী হল হে? পেলে কিছু দেখতে?

জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, এর মধ্যে কিছু নেই—

—কিছু নেই?

—না বাবুজি। একেবারে ফাঁকা—

—তবে তুমি ওর মধ্যে কী করছ জামাতুল্লা?

—এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। নেমে এসে দেখুন—

সুশীল ও সনৎ সন্তর্পণে একে-একে পাথরের চৌবাচ্চাটির মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। জামাতুল্লা দেখালে—এই দেখুন বাবুজি, এই লাইন ধরে একবার সামনে, একবার পিছনে গিয়ে দেখুন—তা হলেই বুঝতে পারবেন—

—সামনে পেছনে গিয়ে কী হবে?

সুশীল লক্ষ্য করে দেখলে চৌবাচ্চার ডানদিকের দেওয়ালে একটা কালো রেখা আছে, সেইটে ধরে যদি সামনে বা পেছনে যাওয়া যায় তবে চৌবাচ্চার তলাটা একবার নামে, একবার ওঠে। ছেলেদের 'see-saw' খেলার তক্তাটার মত।

সনৎ বললে—ব্যাপারটা কী?

সুশীল বললে—অর্থাৎ এটা যদি কোনরকমে ওঠানো যায়, তবে এর মধ্যে আরো কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

জামাতুল্লা বললে—বাবু, গাঁতি দিয়ে তলা ভেঙে ফেলতে পারি তো—অন্য কোন পথ যদি না পাওয়া যায়। কিন্তু আজ থাকলে হত না বাবুজি? বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ—সকাল হয়-হয়—

হঠাৎ সুশীল চৌবাচ্চার এক জায়গায় টর্চের আলো ফেলে বলে উঠল—এই ছাখ সেই চিহ্ন—

সনৎ ও জামাতুল্লা সবিস্ময়ে দেখলে, চৌবাচ্চার কালো রেখার ওপরে উত্তরদিকের কোণে, দু-খানা পাথরের সংযোগস্থলে তাদের অতিপরিচিত সেই চিহ্নটি আঁকা।

সুশীল বললে—হদিস পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে—

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ এই চিহ্নের ওপর টিপলেই চৌবাচ্চার তলার পাথরখানা একদিকে খুব বেশি কাত হয়ে, ভেতরে কি আছে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল। আজ থাক, চল।

জামাতুল্লাও তাতে মত দিলে। সবাই মিলে তাঁবুতে ফিরে এল যখন, তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্য 'বলো' হাতে তাঁবুর দ্বারে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। জামাতুল্লার ইঙ্গিতে সুশীল ও সনৎ উপুড় হয়ে পড়ে বুকে হেঁটে নিজেদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জামাতুল্লা বললে—ঘুমিয়ে পড়ুন বাবুজিরা—কিন্তু বেশি বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুবেন না, আমি উঠিয়ে দেব সকালেই। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

সুশীল বললে—আমাদের অবর্ত্তমানে ওরা ঘরে ঢোকে নি এই রক্ষে—

সনৎ অবাক হয়ে বললে—কী করে জানলে দাদা?

—দেখবে? এই দেখ! তাঁবুর দোরে সাদা বালি ছড়ানো, যে-কেউ এলে পায়ের দাগ পড়ত। তা পড়ে নি।

ওরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

সুশীলকে কে বললে—আমার সঙ্গে আয়।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষের পিছু পিছু ও গভীর বনের কতদূর চলল। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্যগণ ঘোর তন্দ্রাভিভূত, উষার আলোকের ক্ষীণ আভাসও দেখা যায় না পূর্ব্ব দিগন্তে। বৃক্ষলতা স্তব্ধ, স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। সারি সারি প্রাসাদ একদিকে, অন্যদিকে প্রশস্ত দীর্ঘিকার টলটলে নির্ম্মল জলরাশির বুকে পদ্ম ফুল ফুটে আছে। সেই গভীর বনে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে দেউলে দেউলে ত্রিমূর্ত্তি মহাদেবের পূজা হচ্ছে। সুগন্ধ দীপবর্ত্তিকার আলোকে মন্দিরাভ্যন্তর আলোকিত। প্রাসাদের বাতায়ন বলভিতে শুকসারী তন্দ্রামগ্ন।

সুশীল বললে—আমায় কোথা নিয়ে যাবেন?

—সে কথা বলব না। ভয় পাবি—

—তবুও শুনি, বলুন—

—বহুদিনের বহু ধ্বংস, অভিশাপ, মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাসে এ পুরীর বাতাস বিষাক্ত। এখানে প্রবেশ করবার দুঃসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে।

—কী?

—একজনের প্রাণ। সমুদ্রমেখলা এ দ্বীপের বহু শতাব্দীর গুপ্ত কথা ঘন বন ঢেকে রেখেছিল। ভারত মহাসমুদ্র স্বয়ং এর প্রহরী, দেখতে পাও না?

—আজ্ঞে, তা দেখছি বটে।

—তবে সে রহস্য ভেদ করতে এসেছ কেন?

—আপনি তো জানেন সব।

—সম্রাটের ঐশ্বর্য্য গুপ্ত আছে এর মধ্যে। কিন্তু সে পাবে না। যে অদৃশ্য আত্মারা তা পাহারা দিচ্ছে, তারা অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হিংস্রক। কাউকে তারা নিতে দেবে না। তবে তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না আমি—রহস্য নিয়ে যাও, অর্থ পাবে না। যা পাবে তা সামান্য। তারই জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

—আপনি বিষ্ণুমুনি?

—মূর্খ! আমি এই নগরীর অধিদেবতা। ধ্বংসস্তূপ পাহারা দিচ্ছি শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেকদিন পরে তুমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছ—আটশ বছর আগে তোমাদের সাহসী পূর্ব্বপুরুষরা অস্ত্র হাতে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করেন। দুর্ব্বল হাতে তাঁরা খড়্গ ধরতেন না। তোমরা সে দেশ থেকেই এসেছ কি? দেখলে চেনা যায় না কেন?

—সেটা আমাদের অদৃষ্টের দোষ, আমাদের ভাগ্যলিপি।

তারপরেই সব অন্ধকার। সুশীল সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন চলেছে···চলেছে···মাথার ওপর কৃষ্ণা নিশীথিনীর জলজলে নক্ষত্রভরা আকাশ।

পুরুষটি বললেন—সাহস আছে ? তুমি ভারতবর্ষের সন্তান—

—নিশ্চয়ই, দেব।

নগরী বহুদিন মৃতা, কিন্তু বহু যুগের পুরাতন কৃষ্ণাগুরুর ধূপগন্ধে আমোদিত অরণ্যতরুর ছায়ায় ছায়ায় অজানা পথযাত্রার যেন শেষ নেই।

বিশাল পুরী, প্রেতপুরীর সমান নিস্তব্ধ। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষে, দামী নীলাংশুকের আস্তরণে ঢাকা স্বর্ণ-পর্য্যঙ্ক কোন অপরিচিতের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। সুশীলের বুক গুরুগুরু করে উঠল, গৃহের রক্তপ্রস্তরের ভিত্তিতে যেন অমঙ্গলের লেখা। ভবনদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে এখনি যেন কোন্ বিভীষণা অপদেবীর বিকট মূর্ত্তি।

পুরুষ বললেন—ঐ শোন—

সুশীল চমকে উঠল। যেন কোন নারীকণ্ঠের শোকার্ত্ত চিৎকারে নিশীথ নগরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। সে নারীর কণ্ঠস্বরকে সে চেনে। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর। খুব নিকট-আত্মীয়ার বিলাপধ্বনি। সুশীলের বুক কেঁপে উঠল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে কে ডাকলে—বাবুজি—বাবুজি—

তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ঘামে ভেসে গিয়েছে। জামাতুল্লা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। দিনের আলো ফুটছে তাঁবুর বাইরে।

জামাতুল্লা বললে—উঠুন বাবুজি।

সুশীল বিমূঢ়ের মত বললে—কেন ?

—ভোর হয়েছে। ইয়ার হোসেনের লোক এখনও ওঠে নি—আমাদের কেউ কোন সন্দেহ না করে। সনৎবাবুকে ওঠাই—

একটু বেলা হলে ইয়ার হোসেন উঠে ওদের ডাকালে। বললে—পরশু এখান থেকে তাঁবু ওঠাতে হবে। জাঙ্ক্‌ওয়ালা চীনেম্যান এসে বসে আছে। ও আমার নিজের লোক। ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর থাকতে চাইছে না। এখানে আপনারা এলেন ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে। এত পয়সা খরচ এর জন্যে করি নি।

সুশীল বললে—যা ভাল বোঝেন মিঃ হোসেন।

সনৎ বললে—তাহলে দাদা, আমাদের সেই কাজটা এই দু-দিনের মধ্যে সারতে হবে—

ইয়ার হোসেন সন্দেহের সুরে বললে—কি কাজ ?

সুশীল বললে—বনের মধ্যের একটা মন্দিরের গায়ে পাথরের ছবি আছে, সেটা আমি আঁকছি। সনৎ ফটো নিচ্ছে তার।

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে—ওই করতেই আপনারা এসেছিলেন আর কি ! করুন যা হয় এই দু-দিন।

সনৎ বললে—তাহলে চল দাদা আমরা সকাল-সকাল খেয়ে রওনা হই।

ইয়ার হোসেনের অনুমতি পেয়ে ওদের সাহস বেড়ে গেল। দিন দুপুরেই ওরা দু-জন রওনা হয়ে গেল—শাবল, গাঁতি, টর্চ ওরা কিছুই আনে নি, সিঁড়ির মুখের প্রথম ধাপে

রেখে এসেছে। শুধু ক্যামেরা আর রিভলভার হাতে বেরিয়ে গেল।

জামাতুল্লা গোপনে বললে—আমি কোন ছুতোয় এর পরে যাব। একসঙ্গে সকলে গেলে চালাক ইয়ার হোসেন সন্দেহ করবে। আজ কাজ শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন, হয় এস্পার নয় তো ওস্পার। আর সময় পাব না।

সনৎ বললে—মনে থাকে যেন এ-কথা। আজ আর ফিরব না শেষ না দেখে।

সুশীলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল সনতের কথায়। সনতের মুখের দিকে ও চাইলে। কেন সনৎ হঠাৎ এ কথা বললে?

আবার সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রহস্যময় গহ্বরে সুশীল ও সনৎ এসে দাঁড়াল। আসবার সময় সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে ওরা গাঁতি ও টর্চ নিয়ে এসেছে। পাথরের নর্তকী মূর্ত্তি দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় কাত করে রাখা হয়েছে। যেন জীবন্ত পরী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। সুশীল সেদিকে চেয়ে বললে—আর কিছু না পাই, এই পুতুলটা নিয়ে যাব। সব খরচ উঠে এসেও অনেক টাকা থাকবে—শুধু ওটা বিক্রী করলে।

তারপর দু-জনে নিচের পাথরের চৌবাচ্চাটাতে নামল।

সনৎ বললে—উত্তর কোণের গায়ে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ দাদা!

—এখন কিছু কোরো না, জামাতুল্লাকে আসতে দাও।

সনৎ ছেলেমানুষ, সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাংলা-দেশের পাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে একদিন যে জীবনে এমন একটা রহস্যসঙ্কুল পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে, কবে সে এ কথা ভেবেছিল? সুশীল কিন্তু বসে বসে অন্য কথা ভাবছিল।

গত রাত্রের স্বপ্নের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই, আবছাভাবে যতটুকু মনে আছে, সে যেন গত রাত্রে এক অদ্ভুত রহস্যপুরীর পথে পথে কার সঙ্গে অনির্দ্দেশ যাত্রায় বার হয়েছিল, কত কথা যেন সে বলেছিল, সব কথা মনে হয় না। তবুও যেন কি এক অমঙ্গলের বার্ত্তা সে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কী সে বার্ত্তা, কার সে অমঙ্গল কিছুই স্পষ্ট মনে নেই—অথচ সুশীলের মন ভার-ভার, আর যেন তার উৎসাহ নেই। এ কাজে ফিরবার পথও তো নেই।

ওপরের ঘর থেকে জামাতুল্লা উঁকি মেরে বললে—সব ঠিক।

—এসেছ?

—হাঁ বাবুজি। অনেকটা দড়ি এনেছি লুকিয়ে—

—নেমে পড়।

—আপনার ক্যামেরা এনেছেন?

—কেন বল তো?

—ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি দিতে হলে ক্যামেরাতে ফটো তুলে নিয়ে যেতে হবে—

—সব ঠিক আছে।

জামাতুল্লা ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার অল্পক্ষণ পরেই সনৎ হঠাৎ কি ভেবে দেওয়ালের উত্তর কোণের সে চিহ্নটা চেপে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চৌবাচ্চার তলা একদিকে কাত হয়ে উঠতেই ফাঁক দিয়ে সনৎ নিচের দিকে অতলস্পর্শ অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ল।

সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনেই চমকে চিৎকার করে উঠল। অমন অতর্কিতভাবে সনৎ লাফ মারতে গেল কেন, ওরা ভেবে পেল না।

কিন্তু লাফ মারলে কোথায় ?

জামাতুল্লা সভয়ে বললে—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বাবুজি !

তারপর ওরা দু-জনেই কিছু না ভেবেই পাথরের চৌবাচ্চার তলার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল।

ওরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে।

সনৎ অন্ধকারের ভেতর থেকেই বলে উঠল—দাদা, টর্চ জ্বালো আগে, জায়গাটা কি রকম দেখতে হবে—

ওরা টর্চ জ্বেলে চারদিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে—ঘরের দু-কোণে দুটো বড় পয়োনালীর মত কেন রয়েছে ওরা বুঝতে পারলে না। ছাদের যে জায়গায় কড়িকাঠের অগ্রভাগ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার কথা, সেখানে দুটো বড়-বড় পাথরের গাঁথুনি পয়োনালী, একটা এদিকে, আর একটা ওদিকে। সমস্ত ঘরটায় জলের দাগ, মেঝে ভয়ানক ভিজে ও স্যাঁৎসেঁতে, যেন কিছুক্ষণ আগে এ ঘরে অনেকখানি জল ছিল।

জামাতুল্লা বললে—এ ঘরে এত জল আসে কোথা থেকে বাবুজি ?

সুশীল কিছু বলতে পারলে না ; প্রকাণ্ড ঘর, অন্ধকারের মধ্যে ঘরের কোথায় কি আছে ভাল বোঝা যায় না।

সনৎ বললে—ঘরের কোণগুলো অন্ধকার দেখাচ্ছে, ওদিকে কী আছে দেখা যাক—

টর্চ ধরে তিন জনে ঘরের একদিকের কোণে গিয়ে দেখে অবাক চোখে চেয়ে রইল।

ঘরের কোণে বড়-বড় তামার জালা বা ঘড়ার মত জিনিস, একটার ওপর আর একটা বসানো, ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু। সেদিকের দেওয়ালের গা দেখা যায় না—সমস্ত দেওয়াল ঘেঁষে সেই ধরনের রাশি-রাশি তামার জালা—ওরা এতক্ষণ ভাল করে দেখেনি, সেই তামার জালার রাশিই অন্ধকারে দেওয়ালের মত দেখাচ্ছিল।

জামাতুল্লা বললে—এগুলো কী বাবুজি ?

সুশীল বললে—আমার মনে হয় এটাই ধনভাণ্ডার।

সনৎ বললে —আমরা ঠিক জায়গায় পৌছে গিয়েছি—

জামাতুল্লা হঠাৎ অন্য দেয়ালের দিকে গিয়ে বললে—এই দেখুন বাবুজি—

সেদিকে দেয়ালের গায়ে বড় বড় কুলুঙ্গির মত অসংখ্য গর্ত্ত। প্রত্যেকটার মধ্যে ছোট বড় কৌটোর মত কি সব জিনিস।

সুশীল বললে—যাতে তাতে হাত দিও না; এ সব পাতাল-ঘরে সাপ থাকা বিচিত্র নয়। এই ঘোর অন্ধকারে পাতালপুরী বিষাক্ত সাপের রাজ্য হওয়াই বেশি সম্ভব।

কিন্তু চারিদিকে ভাল করে টর্চ ফেলে দেখেও সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনৎ ও জামাতুল্লা কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটো বার করে দেখলে। ভেতরে যা আছে তা দেখে ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল না। এ কি সম্ভব, এত বড় একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গুপ্ত ধনভাণ্ডারে এত কাণ্ড করে পাতালের মধ্যে ঘর খুঁড়ে তাতে পুরোনো হর্তুকি রাখা হবে?

ওদের হতভম্ব মুখের চেহারা দেখে সুশীল বললে—কী ওর মধ্যে?

সনৎ বললে—পুরোনো হর্তুকি দাদা—

—দূর পাগল—হর্তুকি কী রে?

—এই দেখ—

সুশীল গোল-গোল ছোট ফলের মত জিনিস হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললে—আমি জানি নে এ কী জিনিস, কিন্তু যখন এত যত্ন করে একে রাখা হয়েছে, তখন এর দাম আছে। থলের মধ্যে নাও দু-এক বাক্স—

সব কৌটোগুলোর মধ্যে সেই পুরোনো হর্তুকি!

ওরা দস্তুরমত হতাশ হয়ে পড়ল। এত কষ্ট করে পুরোনো হর্তুকি সংগ্রহ করতে ওরা এত-দূর আসে নি।

হঠাৎ সুশীল বলে উঠল—আমার একটা কথা মনে হয়েছে—

সনৎ বললে—কী দাদা?

—এ জিনিস যাই হোক, এ-ই ছিল পুরোনো সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রা—কারেন্সি—এই আমার স্থির বিশ্বাস। সঙ্গে নাও কিছু পুরোনো হর্তুকি—

জামাতুল্লা অনেক কৌশল করে একটা তামার জালা পাড়লে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার ঢাকনি খোলা গেল না। জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে—এ কি রিবিট করে এঁটে দেওয়া বাবুজি? এ খুলবার হদিস পাচ্ছি নে যে—

টানাটানি করতে গিয়ে একটা ঢাকনি খটাং করে খুলে গেল।

সনৎ বললে—দেখো ওর মধ্যে থেকে আবার পুরোনো আমলকি না বার হয় দাদা—

কিন্তু জালাটা উপুড় করে ঢাললে তার মধ্যে থেকে বেরুলো রাশি রাশি নানা রঙবেরঙের পাথর। দামী জিনিস বলে মনে হয় না। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে যে-কোন নদীর ধারে এমনি নুড়ি অনেক পাওয়া যায়।

জামাতুল্লা বললে—তোবা! তোবা! এসব কী চিজ্ বাবুজি?

কতকগুলো কৌটোর মধ্যে শনের মত সাদা জিনিসের গুলির মত। মনে হয় বহুকাল আগে শনের নুড়িগুলোতে কোন গন্ধদ্রব্য মাখানো ছিল—এখনও তার খুব মৃদু সুগন্ধ শনের নুড়িগুলোর গায়ে মাখানো।

সনৎ বললে—দাদা, এটা ওদের ওষুধ-বিষুদ রাখার ভাঁড়ার ছিল না তো?

জামাতুল্লা বললে—কী দাওয়াই আছে এর মধ্যে বাবুজি?

—তা তুমি আমি কী জানি? প্রাচীন যুগের লোকের কত অদ্ভুত ধারণা ছিল। হয়ত তাদের বিশ্বাস ছিল এই সবই অমর হওয়ার ওষুধ।

হঠাৎ সুশীল একটা জালার মুখ খুলে বলে উঠল—দেখি, বোধ হয় টাকা! জালা উপুড় করলে তার মধ্যে থেকে পড়ল একরাশ বড় বড় চাকতি, বড় বড় মেডেলের আকারের প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু।

সুশীল একখানা চাকতি হাতে করে বললে—সোনা বলে মনে হয় না?

জামাতুল্লা বললে—আলবৎ সোনা—তবে টাকা বা মোহর নয়।

সুশীল বললে—কোন রকম ছাপ নেই। মুদ্রা করবার জন্যে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল—কিন্তু তারপর ছাপ এতে মারা হয় নি। এ অনেক আছে—

সনৎ বললে—সবরকম কিছু কিছু নাও দাদা—

জামাতুল্লা বললে—এ যদি সোনা হয়—এই এক জালার মধ্যেই লাখ টাকার সোনা—

সুশীল আর একটা জালা পেড়ে ঢাকনি খুলে উপুড় করে ঢাললে। তার মধ্যেও অবিকল অমনি ধাতব চাকতি—একই আকারের, একই মাপের।

জামাতুল্লা বললে—শোভানাল্লা! দু-লাখ হল—যদি আমরা দেখি সব জালাতেই এ-রকম—

এই সময় সুশীল প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল—শিগগির এদিকে এস—

ওরা গিয়ে দেখলে অন্ধকার ঘরের কোণে কতকগুলো মানুষের হাড়গোড়—ভাল করে টর্চ ফেলে দেখা গেল, দুটো নরকঙ্কাল!

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে নরকঙ্কাল দুটো যেন ওদের সমস্ত আশা ও চেষ্টাকে দাঁত বার করে উপহাস করছে। কাল রাত্রের স্বপ্নের কথা ওর মনে এল, মৃত্যুর চেয়ে মহা রহস্য জগতে কী আছে? মূঢ় লোকে চারিপাশে মৃত্যু অহরহ দেখছে, অথচ ভাবে না কী গভীর রহস্যপুরীর দ্বারপাল-স্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের পথে মৃত্যু আছে দাঁড়িয়ে।...

নরকঙ্কালটি কী কথা না জানি বলত যদি এরা এদের মরণের ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারত! সে হয়ত দুর্নিবার লোভ ও নৃশংস অর্থলিপ্সার ইতিহাস, হয়ত তা রক্তপাতের ইতিহাস, জীবন মরণ নিয়ে খেলার ইতিহাস, ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসানোর ইতিহাস...

জামাতুল্লা কঙ্কালগুলো সরিয়ে রাখতে গিয়ে বললে—হাড় ভেঙে যাচ্ছে বাবুজি, বহুৎ পুরোনো আমলের হাড়গোড় এ সব। কমসে কম একশো দেড়শো বছরের পুরনো—কিন্তু দেখুন বাবুজি মজা, হাড়ের গায়ে এসব কী?

ওরা হাতে করে নিয়ে দেখলে।

প্রায় এক ইঞ্চি করে লবণের স্তর শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে কঙ্কালের ওপরে। সুশীল ভাল করে টর্চের আলো ফেলে বললে—চোখের কোটরগুলো নুনে বুজোনো—ভাখো চেয়ে!

এর যে কী কারণ ওরা কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

অন্ধকার পাতালপুরীর শহরে ওদের হাড়ে নুন মাখাতে এসেছিল কে?

সে সময়ে সনৎ বললে—ছাখ দাদা, ছাখ জামাতুল্লা সাহেব—এটা কিসের দাগ ?

ওরা পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে সনৎ টর্চ ফেলে দেওয়ালের গায়ের একটা সাদা রেখার দিকে চেয়ে কথা বলছে। রেখাটা লম্বা অবস্থায় দেওয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টানা।

জামাতুল্লা বললে—এ দাগ নোনা জলের দাগ—খুব টাটকা দাগ।

সুশীল ও সনৎ হতভম্ব হয়ে বললে—তার মানে ? জল আসবে কোথা থেকে ?

জামাতুল্লা বললে—বড্ড অন্ধকার জায়গা, ভাল করে কিছুই তো মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একবার ভাল করে ঘরের চারিধারে দেখা দরকার। অজানা জায়গায় সাবধান থাকাই ভাল। এত স্যাঁতসেঁতে কেন ঘরটা, আমি অনেকক্ষণ থেকে তাই ভাবছি।

জামাতুল্লা ও সনৎ হাতড়ে হাতড়ে সোনার চাকৃতি বের করে থলের মধ্যে একরাশ পুরে ফেললে—পাথরের নুড়িও কিছু নিলে—বলা যায় না যদি এগুলো কোন দামী পাথর হয়ে পড়ে! বলা যায় কি! সনৎ ছেলেমানুষ, সে এত সোনার চাকতি দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল—উন্মত্তের মত আঁজলা ভরে চাকতি সংগ্রহ করে তার তামার জালার মধ্যে থেকে, আর থলের ভেতর পুরে নেয়। যেন এ আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প—কিংবা রূপকথার মায়াপুরী —পাতালপুরীর ধনভাণ্ডার! বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বেলা দশটা থেকে বিকেল ছ-টা এস্তক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা ন-আনা রোজগার করতে হয় সারা মাসে। সেই হল রূঢ় বাস্তব পৃথিবী—মানুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়। আর এখানে কী, না—হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হীরে নিয়ে যাও—এ আলাদা জগৎ—পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইন-কানুনের বাইরে।

বহু প্রাচীন কালের মৃত সভ্যতা এখানে প্রাচীন দিনের সমস্ত বর্ব্বর প্রাচুর্য্য ও আদিম অর্থনীতি নিয়ে সমাধিগর্ভে বিস্মৃতির ঘুমে অচেতন—এ দিন বাতিল হয়ে গিয়েছে, এ সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েছে—একে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থ নৈতিক বিভ্রাট ঘটিও না।...

হঠাৎ কিসের শব্দে সুশীলের চিন্তার জাল ছিন্ন হল—বিরাট, উন্মত্ত, প্রচণ্ড শব্দ—যেন সমগ্র নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে ছুটে আসছে কোথা থেকে—কিংবা শিবের জটা থেকে যেন গঙ্গা ভীম ভৈরব বেগে ইন্দ্রের ঐরাবতকে ভাসিয়ে মর্ত্ত্যে অবতরণ করছেন।

জামাতুল্লার চিৎকার শোনা গেল সেই প্রলয়ের শব্দের মধ্যে—জল! জল! পালান—ওপরে উঠুন—

জামাতুল্লার কথা শেষ না হতে সুশীলের হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্য্যন্ত জল উঠল—কোমর থেকে বুক লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে জামাতুল্লা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখুন বাবু!

সুশীল সবিস্ময়ে ও সভয়ে চেয়ে দেখলে ঘরের ছাদের কাছাকাছি সেই দুটো পয়োনালা দিয়ে ভীষণ তোড়ে জল এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে। চক্ষের নিমেষে ওরা ইদুর-কলে আটকা

পড়ে জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মরবে!···কিন্তু উঠবে কোথায়! উঠবে কিসের সাহায্যে? এ ঘরে সিঁড়ি নেই আগেই দেখে এসেছে।

সুশীল চিৎকার করে বললে—সনৎ—সনৎ—ওপরে ওঠ—শিগ্‌গির—

সনৎ বললে—দাদা! তুমি আমার হাত ধর—হাত ধর—

তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল—পুরোনো রাজাদের পোষ-মানা বেতাল যেন কোথায় হা হা করে বিকট অট্টহাস্য করে উঠল—সম্মুখে মৃত্যু! উদ্ধার নেই! উদ্ধার নেই!

এ জলে সাঁতার দেওয়া যাবে না সুশীল জানে—এ মরণের ইঁদুরকল। বুক ছাপিয়ে জল তখন উঠে প্রায় নাকে ঠেকে-ঠেকে—

কে যে অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল—দাদা—দাদা—আমার হাত ধর—দাদা—

একজোড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত ওকে ওপরের দিকে তুললে টেনে। ঘন অন্ধকার। টর্চ কোথায় গিয়েছে সেই উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে। সুশীলের প্রায় জ্ঞান নেই। সে ডাকছে—কে? সনৎ?

কোন উত্তর নেই। কেউ কাছে নেই।

সুশীলের ভয় হল। সে চেঁচিয়ে ডাকলে—সনৎ! জামাতুল্লা!

তার পায়ের তলায় উন্মত্ত গর্জ্জনে যেন একটা পাহাড়ের মাথার হ্রদ খসে পড়েছে! উত্তর দেয় না কেউ—না সনৎ, না জামাতুল্লা।

প্রায় দশ মিনিট পরে জামাতুল্লা বললে—বাবু, জল্‌দি আমার হাত পাকড়ান—

—কেন?

—পাকড়ান হাত—উপরে উঠব—সাবধান।

—সনৎ, সনৎ কোথায়? তাকে রেখে এলে উপরে?

—জল্‌দি হাত পাকড়ান—হুঁ—

কত যুগ ধরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে ওঠা প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে—তারপর কতক্ষণ পরে পৃথিবীর ওপর এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা পাতালপুরীর গহ্বর থেকে! বনের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেছে। সুশীল ব্যগ্রভাবে বললে—সনৎ কই? তাকে কোথায়—

জামাতুল্লা বিষাদ-মাখানো গম্ভীর স্বরে বললে—সনৎবাবু নেই—আমাদের ভাগ্য বাবুজি—

সুশীল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বললে—নেই মানে?

—সনৎবাবু তো পাতালপুরী থেকে ওঠেন নি—তাঁকে খুঁজে পাই নি। আপনাকে তুলে ওপরে রেখে তাঁকে খুঁজতে যাব এমন সময় ঘরের মেঝে দুলে উঠে এঁটে গেল। তিনি থেকে গেলেন তলায়—আমরা রয়ে গেলাম ওপরে। তাঁকে খুঁজে পাই কোথায়?

—সেকি! তবে চল গিয়ে খুঁজে আনি!···

জামাতুল্লা বিষাদের হাসি হেসে বললে—বাবুজির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, এখন কিছু

বুঝবেন না। একটু ঠাণ্ডা হোন, সব বলছি। সনৎবাবুকে যদি পাওয়া যেত তবে আমি তাঁকে ছেড়ে আসতাম না।

—কেন? সনৎ কোথায়? হ্যাঁরে, আমি তোকে ছেড়ে বাড়ী গিয়ে মার কাছে, খুড়ীমার কাছে কী জবাব দেব?—কেন তুমি তাকে পাতালে ফেলে এলে?

জামাতুল্লা নিজের কপালে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—নসীব, বাবুজি—

উদ্‌ভ্রান্ত সুশীলের বিহ্বল মস্তিষ্কে ব্যাপারটা তখনও ঢোকে নি। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে সনৎ ওপরে উঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারে নি। অন্ধকারের মধ্যে জামাতুল্লাও ওকে খুঁজে পায়নি। ওরই হাত ধরে টেনে তুলবার পরে ঘরের মেঝে এঁটে গিয়ে রত্নভাণ্ডারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ওই ঘরে ছাদ পর্য্যন্ত জল ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ—সেখানে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে?…

সুশীল ক্রমে সব বুঝলে ওপরে উঠে এসে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানোর পরে। একটা গভীর শোক ও হতাশায় সে একেবারে ডুবে যেত হয়ত, কিন্তু ঘটনাবলীর অদ্ভুতত্বে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোথায় অন্ধকার পাতালপুরীতে পুরাকালের ধন-ভাণ্ডার, সে ধনভাণ্ডার অসাধারণ উপায়ে সুরক্ষিত…এমন কৌশলে, যা একালে হঠাৎ কেউ মাথায় আনতেই পারত না!

জামাতুল্লা বললে—পানি দেখে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি ভাবছি, এত নোনা পানি কেন ঘরের মধ্যে?

সুশীল বললে—আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল জামাতুল্লা। তাহলে সনৎ আজ এভাবে—

—তখন কী করে জানব বাবুজি? ঐ নালিদুটো গাঁথা আছে—ও দিয়ে জোয়ারের সময় সমুদ্দুরের নোনা পানি ঢোকে—দিনে একবার রাতে একবার। আমার কী মনে হয় জানেন বাবুজি, ওই দুটো নালি এমন ফন্দি করে গাঁথা হয়েছিল যে—

সুশীল বললে—আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে জান? ওই দুটো নরকঙ্কাল যা দেখলে, আমাদেরই মত দুটো লোক কোন কালে ওই ঘরে ধনরত্ন চুরি করতে গিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরেছে। মূর্খের মত ঢুকেছে, জানত না। যেমন আমরা—সনৎ যেমন—

—কী জানত না?

—যে স্বয়ং ভারত মহাসমুদ্র প্রাচীন চম্পারাজ্যের রত্নভাণ্ডারের অদৃশ্য প্রহরী। কেউ কোনদিন সে ভাণ্ডার থেকে কিছু নিতে পারবে না, মানমন্দিরের রত্নশৈল তার একখানি সামান্য নুড়িও হারাবে না।—সুশীল বললে—কিন্তু জল যায় কোথায় জামাতুল্লা? এত জল? আমার কী মনে হয় জান—

—আমারও তা মনে হয়েছে। ওই ঘরের নিচে আর-একটা ঘর আছে, সেটা আসল ধনভাণ্ডার। বেশি জল বাধলে ঘরের মেঝে একদিকে চাল হয়ে পড়ে জলের চাপে—

সব জল ওপরের ঘর থেকে নিচের ঘরে চলে যায়।

সুশীল বললে—স্টীম পাম্প আনলেও তার জল শুকোনো যাবে না, কারণ—তাহলে গোটা ভারত মহাসাগরকেই স্টীম পাম্প দিয়ে তুলে ফেলতে হয়—ওর পেছনে রয়েছে গোটা ভারত সমুদ্র। সে জামাতুল্লার দিকে চেয়ে বিষাদের সুরে বললে—এই হল তোমার আসল বিষ্মমুনি—সমুদ্র, বুঝলে জামাতুল্লা?

ওরা সেই বনের গভীরতম প্রদেশের একটা পুরোনো মন্দির দেখলে। মন্দিরের মধ্যে এক বিরাট দেবমূর্ত্তি, সুশীলের মনে হল, সম্ভবত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

যুগযুগান্ত কেটে গেছে, মাথার ওপরকার আকাশে শত অরণ্যময়ূরীদের নর্ত্তন শেষ হয়ে আবার শুরু হয়েছে, রক্তাশোকতরুর তলে কত সুখসুষুপ্ত হংসমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে—সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ঘৃতপক্ব অমৃতচরুর চারু গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর কতদিন হয়েছে আমোদিত—কত উত্থান, কত পতনের মধ্যে দেবতা অবিচল দৃষ্টিতে বহুদূর অনন্তের দিকে চেয়ে আছেন, মুখে সুকুমার সব্যঙ্গ মৃদু চাপা হাসি—নিরুপাধি চেতনা যেন পাষাণে লীন, আত্মস্থ।

সুশীল সসম্ভ্রমে প্রণাম করল—দেবতা, সনৎ ছেলেমানুষ—ওকে তোমার পায়ে রেখে গেলুম—ক্ষমা কর তুমি ওকে!

* * *

সুশীল কলকাতায় ফিরেছে।

কারণ যা ঘটে গেল, তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ইয়ার হোসেন সন্দেহ করে নি। সনৎ একটা কূপের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছে শুনে ইয়ার হোসেন খুঁজে দেখবার আগ্রহও প্রকাশ করে নি। চীনা মাঝি জাঙ্ক্ নিয়ে এসেছিল—তারই জাঙ্কে সবাই ফিরল সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ান মেলবোট ধরে কলম্বো।

কলম্বোর এক জহুরীর দোকানে জামাতুল্লা সেই হর্তুকির মত জিনিস দেখাতেই বললে—এ খুব দামী জিনিস, ফসিল অ্যাম্বার—বহুকালের অ্যাম্বার কোন জায়গায় চাপা পড়ে ছিল।

ছ-খানা পাথর দেখে বললে—আনকাট্ এমারেল্ড, খুব ভাল ওয়াটারের জিনিস হবে কাটলে। আন্নামালাইয়ের জহুরীরা এমারেল্ড কাটে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে নেবেন। দামে বিকোবে।

সবসুদ্ধ পাওয়া গেল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি না দিয়ে ওরা তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দশ হাজার টাকা পাঠালে—সেই মাদ্রাজী বিধবাকে পাঠালে বিশ হাজার—বাকি টাকা তিন ভাগ হল জামাতুল্লা, সনতের মা ও সুশীলের মধ্যে।

টাকার দিক থেকে এমন কিছু নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকখানি। কত রাত্রি গ্রামের বাড়ীতে নিশ্চিন্ত আরাম-শয়নে শুয়ে ওর মনে জাগে মহাসমুদ্র-পারের সেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের অরণ্যাবৃত ধ্বংসস্তূপ···সেই প্রশান্ত ও রহস্যময় বিষ্ণুমূর্ত্তি···হতভাগ্য সনতের শোচনীয় পরিণাম···অরণ্যমধ্যবর্ত্তী তাঁবুতে সে রাত্রির সেই অদ্ভুত স্বপ্ন। জীবনের গভীর রহস্যের কথা ভেবে তখন সে অবাক হয়ে যায়।

জামাতুল্লা নিজের ভাগের টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল, তার সঙ্গে আর সুশীলের দেখা হয়নি।

অথৈ জল

বাড়ীতে কেউ নেই। ডিস্‌পেনসারির কাজ সেরে এইমাত্র বাজার থেকে ফিরে এসেছি।

পাড়ার সনাতন চক্কত্তি বাইরের বৈঠকখানায় বসে আছে।

বললাম—কি সনাতনদা, খবর কি ?

সনাতন উত্তর দিল—এমনি করে শরীরটা নষ্ট কোরো না। বেলা একটা বেজে গিয়েছে। এখনও খাওয়া-দাওয়া কর নি ?

সনাতনের কথা শুনে হাসলাম একটুখানি। আমি জানি, সনাতন আমার মন যোগাবার জন্যে একথা বলছে; সে ভালই জানে, আমার কেন দেরি হয় ডিস্‌পেনসারি থেকে উঠে আসতে। সকাল থেকে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাই কখন ?

বললাম—রুগীর ভিড় জানো তো কেমন ?

সনাতন মুখখানাতে হাসি এনে উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করে বললে—তা আর জানি নে ? তোমার মত ডাক্তার এ দিগরে ক'টা আছে ? ওষুধের শিশি ধোওয়া জল খেলে রোগ সেরে যায়—

—চা খাবে সনাতনদা ?

—পাগল ? এখন চা খাবার সময় ?

—তা হোক, চলুক একটু।

আমার নিজেরও এখন তাড়াতাড়ি স্নানাহার করবার ইচ্ছে নেই। সনাতনের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে একটু আড্ডা দেওয়া যাক। ডিস্‌পেনসারির চাকর বুধো গোয়ালা চাবি নিয়ে সঙ্গে এসেছিল, তাকে বললাম,—তোর মাকে বল গিয়ে দু' পেয়ালা চা করে দিতে।

সনাতন চক্কত্তি গ্রামের গেজেট। সে কেন এখানে এসেছে এত বেলায়—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

চা খেতে খেতে সনাতন বললে—আব্দুল ডাক্তারের পসার—বুঝলে ভায়া—

হাসি-হাসি মুখে সে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললাম—ব্যাপার কি ?

—আর কি ব্যাপার—একেবারে মাটি !

—কে বললে তোমাকে ?

—আমি বলছি। আমি জানি যে—

—কেন, সে তো ভাল ডাক্তার—

—রামোঃ, তোমার কাছে ? বলে সেই 'চাঁদে আর কিসে'! হোমিওপ্যাথির জল কে খাবে তোমার ওষুধ ছেড়ে। বলে ডাকলে কথা কয়। রামু তাঁতীর বউটার কি ছিল ? হিম হয়ে গিয়েছিল তো। তুমি গা ফুঁড়ে না ওষুধ দিলে এতদিনে দোগেছের শ্মশান-সই হোতে হোত।

নিজের প্রশংসা শুনতে খারাপ লাগে না, তা যেই করুক। তবুও আমি অন্য একজন ডাক্তারের নিন্দাবাদ আমার সামনে হোতে দিতে পারি না। আমাদের ব্যবসার কতকগুলো

নীতি আছে, সেগুলো মেনে চলাতেই প্রকৃত ভদ্রতা। বললাম—ডাক্তার রহিমকে যা-তা ভেবো না। উনি খুব ভাল চিকিৎসা করেন—অবিশ্যি আমি নিজে হয়তো হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনে, কিন্তু—

সনাতন হাত নেড়ে বললে—না রে ভায়া, তুমি যাই বলো, তোমার কাছে কেউ লাগে না। একবার সাইনবোর্ডটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—ডাক্তার বি. সি. মুখার্জ্জি এম বি. মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন—সোনার পদক প্রাপ্ত—

—তুমি বোসো দাদা, আমি খেয়ে নিই—

—বিলক্ষণ! নিশ্চয়ই নেবে। তুমি যাও ভেতরে, আমি এই তক্তাপোশে একটু ঘুম দিই।

—বাড়ীতে কেউ নেই। তোমার বউমা গিয়েছেন রাজু গোঁসাইয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে। কি একটা মেয়েলি ব্রত উদ্‌যাপন। সেই জন্যেই তো এত দেরি করলাম।

একটু পরে স্নান সেরে উঠেছি, গৃহিণী বাড়ী এলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সঙ্গে রাজু গোঁসাইদের বাড়ীর ঝি, তার হাতে একটা পুঁটুলি।

আমায় দেখে সুরবালা বললে—কি গো, এখনও খাও নি?

—কই আর খেলাম।

—দাঁড়াও ভাত এনে দিই, লক্ষ্মী জায়গা করে দে—

—খুব খাওয়ালে রাজু গোঁসাইয়েরা? কিসের ব্রত ছিল?

—এয়োসংক্রান্তির ব্রত। তোমার জন্যে খাবার দিয়েছে—

—আমার জন্যে কেন? আমি কি ওদের এয়ো?

—তা নয় গো। তুমি গাঁয়ের ডাক্তার, ডাক্তারকে হাতে রাখতে সবাই চেষ্টা করে।

—না না, ও আমি ভাল বাসি নে! লোকের অযথা ব্যয় করিয়ে দিতে চাই নে আমি। ও আনা তোমার উচিত হয় নি।

—আহা! কথার ছিরি ছাখো না। আমি বুঝি ছাঁদা বেঁধে আনতে গিয়েছিলাম—ওরা তো পাঠিয়ে দিলে ঝি দিয়ে।

পৈতৃক আমলের দোতলা কোঠা বাড়ী। আহারাদি সেরে পূবদিকের ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম। বড় পালঙ্কখাটে পুরু গদি-তোশক পাতা ভাল বিছানা। সুরবালার নিজের হাতের সূচের কাজের বালিশ-ঢাকা বালিশের-ওয়াড়। খাটের ঝালরও ওর নিজের হাতের। এই একটা বিষয়ে আমার শৌখিনতা আছে স্বীকার করছি, ভাল বিছানা না হোলে ঘুম হবে না কিছুতেই। তা ছাড়া, ময়লা কোনো জিনিস আমি দেখতে পারি নে, দশদিন অন্তর মশারি ধোপার বাড়ী দিতে হবেই। আমার এক রোগীর বাড়ী থেকে পুরনো দামে একখানা বড় আয়না কিনেছিলাম, ওপাশের দেওয়ালে সেটা বসানো, সুরবালার শখের ড্রেসিং টেবিল পালঙ্কের বাঁ ধারে, তিনখানা নতুন বেতের চেয়ার এবার কলকাতা থেকে আনিয়েছি,

সুরবালার ফরমাশ-মত খান-আষ্টেক বৌবাজার স্টুডিওর ছবি—কালীয়-দমন, রাসলীলা, অন্নপূর্ণার শিবকে ভিক্ষাদান, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী, শ্রীশ্রীসরস্বতী ইত্যাদি। আমার পছন্দসই আছে একখানা বিলিতি ল্যাণ্ডস্কেপ—সেও ওই বৌবাজারের দোকানেই কেনা।

জানালার গায়ে জামরুলগাছের ডালটা এসে নুয়ে পড়েছে, তার পেছনেই জাওয়া বাঁশের ঝাড়। শীতের বেলা, এর মধ্যেই বাগানের আমতলায় মুচুকুন্দ চাঁপা গাছটার তলায় ছায়া পড়ে এসেছে, ছাতারে পাখীর দল জামরুল গাছটার ডালে কিচ্ কিচ্ করছে—বাগানের সুদূর পাড়ের ঘাসের জমিতে আমাদের বাড়ীর গরু ক'টা চরে বেড়াচ্ছে।

সুরবালা পানের ডিবে হাতে এসে বললে—একটু ঘুমিয়ে নাও না।

—বাইরে সনাতন চক্কত্তিকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

—সে মিন্‌সের কি যাবার জায়গা নেই, এখানে এসে জুটেছে কেন দুপুরে?

—ঘুমুচ্ছে।

—তবে তুমিও ঘুমোও।

সুরবালাকে বেশিক্ষণ দেখতে পাইনে দিনের মধ্যে, খোকা-খুকিদেরও না। বললাম—বোসো আমার কাছে, আবার হয়তো এখুনি বেরুতে হবে। একটু গল্পগুজব করি।

সুরবালা বালিশে হাত রেখে বসলো পাশেই। বললে—আজ আর বেরিও না—এত বেলায় এলে—

—পাশের গাঁয়ে একটা শক্ত রুগী রয়েছে, তার কথাই ভাবছি—

—যেতে হবে? কল্ না দিলেও?

—আমি তাই তো যাই। ফি নিইনে নিজে গেলে। তুমি তো জানো।

—গরুর গাড়ীতে চলে না। তোমার শরীরের কষ্ট বড় বেশী হয়।

—দেখি একখানা মোটর কিনবার চেষ্টায় আছি! কলকাতায় গেলে এবার দেখবো।

সুরবালা আবদারের সুরে বললে—হ্যাগা, নিয়ে এসো কিনে একখানা—আমাদের একটু চড়ে বেড়াবার ইচ্ছে। আনবে এবার?

—কাঁচা রাস্তা যে! বর্ষাকালে—

—কেন, তোমার ডিস্‌পেনসারিতে রেখে দেবে বর্ষাকালে। বাজারে তো পাকা রাস্তা।

—তোমার ইচ্ছে?

—খু-উ-ব। জয়রাজপুরের মল্লিকবাড়ীতে তাহলে দুর্গা-পুজোয় মোটর চড়ে নেমন্তন্ন খেতে যাই এ বছর।

—এ বছর কি রকম? সামনের বছর বলো—

—ঐ হোল। খুনুকে টুনুকে বেশ করে সাজিয়ে মোটরে উঠিয়ে—

—না না, ওদের মাথায় ওসব ঢুকিও না এ বয়সে। ওদের কিছু বলার দরকার নেই।

—আহা! আমি যেন বলতে যাচ্ছি? তুমি বললে, তাই বললাম।

—বেশ, দেখছি আমি। তোমার হাতে কত আছে?

—গুনে দেখি নি। হাজার চারেক হবে। তুমি কিছু দিও—কিনতে হয় ভাল দেখে একখানা—

—ওতেই ভেসে যাবে।...

আমি সামান্য একটু ঘুমিয়ে নিই।

যখন উঠলাম তখন শীতের বেলা একেবারেই গিয়েছে। সুরবালা চা নিয়ে এল। বললাম —বাইরে সনাতনদা বসে আছে নিশ্চয়। ওকে চা পাঠিয়ে দাও—

সুরবালা বললে—মালিয়াড়া থেকে তোমার কল্ এসেছে, দু'জন লোক বসে আছে। বৃন্দাবন কম্পাউণ্ডার এসেছিল বলতে, আমি বললাম, বাবু ঘুমুচ্ছেন।

—এখন আমার ইচ্ছে নেই যাবার।

—সে তুমি বোঝো গিয়ে। কিছু খাবে?

—নাঃ, এই অবেলার শেষে খিদে নেই এখন। জামাটা দাও, নিচে নামি।

বাইরের ঘরে সনাতনদা ঠিক বসে আছে। আমায় বললে—কি হে, ঘুমুলে যে খুব? এরা এসেছে মালিয়াড়া থেকে তোমায় নিতে।

লোক দুটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। একজন বললে—এখুনি চলুন ডাক্তারবাবু, বীরেশ্বর কুণ্ডুর ছোট ছেলের জ্বর আজ ন'দিন। ছাড়ছে না কিছুতেই—

—কে দেখছে?

—গ্রামেরই শিবু ডাক্তার—

—বসুন। পঞ্চাশ টাকা নেবো এই অবেলায় যাওয়ার দরুন—

—বাবু, আপনার দয়ার শরীর। অত টাকা দেওয়ার সাধ্যি থাকলে শিবু ডাক্তারকে দেখাতে যাবো কেন বলুন।

—কত দিতে পারবেন? দশ টাকা কম দেবেন—

সনাতনদা এই সময় বলে উঠলো—দরদস্তুর করাটা কার সঙ্গে? উনি হাত বুলিয়ে দিলে রুগীর অসুখ সেরে যায়—কোনো কথা বোলো না।

সনাতনের ওপর আমি মনে মনে বিরক্ত হলাম। আমি তাকে দালালি করতে ডেকেছি নাকি। ও রকম ব্যবসাদারি কথা বলা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। সনাতনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশের জন্যেই বললাম—দরদস্তুর আমি পছন্দ করিনে বটে, তবে গরীব লোকের কথা স্বতন্ত্র। যাগ গে, আর দশ টাকা কম দেবেন। কিসে যাবো? নৌকো এনেছেন? বেশ।

সনাতন আমার সঙ্গে নৌকোতে উঠলো।

রাঙা রোদ নদীতীরের গাছপালার মাথায়; সাদা বকের দল শেওলার দামে, ডাঙার সবুজ ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে, শীত আজ ভালই পড়েছে। উপীন জেলে নদীর ধারে দোয়াড়িতে মাছ ধরছে, আমায় দেখে বললে—বাবু, একটা বড় বাটা মাছ প্যালোম এই মাত্তর—আপনার বাড়ী পেটিয়ে দেবো?

সনাতন বললে—কত বড় রে ?

—তা দেড় সের সাত পোয়ার কম হবে না, আন্দাজে বলছি। এখানে তো দাঁড়িপাল্লা নেই।

—বাবুর বাড়ি পাঠিয়ে দিবি নে তো ব্যাটা কোথায় দিবি ? এই অবেলায় সাতপোয়া মাছ নিয়ে দাম দেবার ক্ষ্যামতা আছে ক'জনের এ গাঁয়ে ? দে পাঠিয়ে দে।

আমি মৃদু বিরক্তি জানিয়ে বললাম—কি ওসব বাজে কথা বকো ওর সঙ্গে সনাতনদা। মাছ দিতে বললে, বললে—অত কথার দরকার কি ?

সনাতন অপ্রতিভ হবার লোক নয়, চড়াগলায় বললে—কেন, অন্যায় অন্যায্য কথা নেই আমার কাছে। ঠিকই বলেছি ভায়া। তুমি ছাড়া নগদ পয়সা ফেলবার লোক কে আছে গাঁয়ে ? আসল লোকই তো তুমি—

রোগীর বাড়িতে গ্রামের বৃদ্ধলোকেরা জুটেছে। শিবু ডাক্তারও ছিল। শিবু ডাক্তার সেকেলে আর. জি. করের স্কুলের পাশ গ্রাম্য ডাক্তার। আমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল।

আমি আড়ালে ডেকে বললাম—কি দিয়েছেন ? প্রেসক্রিপ্‌সানগুলো দেখি।

শিবু বললে—কুইনিন দিচ্ছি।

—ভুল করেচেন। যখন দেখলেন জ্বর বন্ধ হচ্ছে না, তখন কুইনিন বন্ধ করা উচিত ছিল। এ হল টাইফয়েড, সেদিকেই যাচ্চে।

—আমিও তা ভেবেচি—অ্যালকালি মিকশ্চার দুদিন দিয়েছিলাম।

—কাগজ আনুন। লিখে দিই।

—একটা ডুশ্‌ দেবো কি ? ভাবছিলাম—

—না। বাই নো মিন্‌স্‌—

গৃহকর্ত্তা কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসে বললেন—আপনি আমাদের জেলার ধন্বন্তরি। ছেলেটা মা-মরা, ছ'মাস থেকে মানুষ করেছি—

আমি আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললাম—ভয় নেই, ভগবানকে ডাকুন। সেরে যাবে, আমরা উপলক্ষ মাত্র। সঙ্গে লোক দিন ওষুধ নিয়ে আসবে।

শিবু ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বললে—ওষুধ সার আমার ডিস্‌পেনসারি থেকে—

—আপনার এখানে সব ওষুধ নেই। আমি সম্প্রতি কলকাতা থেকে আনিয়েচি—সুবিধে হবে।

—যে আজ্ঞে সার।

শিবু একটু দমে গেল। ওষুধের দামে ভিজিটের তিনগুণ আদায় করে থাকে এই সব পল্লীগ্রামের ডাক্তার—আমার জানা আছে, আমি তার প্রশ্রয় দিই নে। পাঁচ আনার ওষুধের দাম আদায় করে দু টাকা।

সন্ধ্যার পর নৌকোতে ফিরলাম। অন্ধকার রাত, ঝোপে-ঝাড়ে শেয়াল ডাকচে,

জোনাকি জ্বলচে। এক জায়গায় শব নিয়ে এসেচে দাহ করতে। নদীতীরে বাবলা তলায় পাঁচ-ছ'জন লোক বসে জটলা করচে, তামাক খাচ্ছে, দুজনে চিতা ধরাচ্চে।

সনাতনদা হেঁকে বললে—কোথাকার মড়া হে?

এরা উত্তর দিলে—বাঁশদ' মানিকপুর—

—কি জাত?

—কর্ম্মকার—

—বুড়ো না জোয়ান?

ধমকের সুরে বললাম—অত খবরে তোমার কি দরকার হে? চুপ করে বোসো। ধরাও একটা সিগারেট, এই নাও।

সনাতন একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—একটা কথা আছে। আমাদের গ্রামের তুমিই এখন মাথা। তোমাকে বলতেই হবে। রামপ্রসাদ চাটুয্যে আমাদের গ্রামের লালমোহন চক্কত্তির মেয়েটার কাছে যাতায়াত করচে অনেকদিন থেকে। এ খবর রাখো?

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—সে কি কথা? শান্তিকে তো খুব ভাল মেয়ে বলেই জানি।

—তুমি ও খবর কি রাখবে? নিজের রুগী নিয়েই ব্যস্ত থাকো। দেবতুল্য মানুষ। এ কথা তোমাকে বলবো বলেই আজ নৌকোতে উঠেচি। এর একটা বিহিত করো।

—তুমি প্রমাণ দিতে পারো?

—চক্কত্তি পাড়ার সব লোক বলবে কাল তোমার কাছে। কালই সব ডাকাও।

—নিশ্চয়ই। এ যদি সত্যি হয় তবে এর প্রশ্রয় আমি দিতে পারি নে গাঁয়ে। আমায় তো জানো—

—জানি বলেই তোমার কানে তুললাম কথাটা—এখন যা হয় করো তুমি।

—শাসন করে দিতে হবেই যদি সত্যি হয়, কাল-সব ডাকি। দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না, দেবোও না কখনো।

—সে আর আমি জানি নে! কুঁদির মুখে বাঁক জব্দ। তুমি ভিন্ন ভায়া এ গাঁয়ে মানুষ কে আছে, কার কাছে বলবো! সবাই ওই দলের।

রাত্রে সুরবালাকে কথাটা বললাম। সে বললে—শান্তি ঠাকুরঝি এদিকে তো ভাল মেয়ে, তবে অল্প বয়সে বিধবা, একা থাকে। তুমি কিছু বলো না আগে—মেয়ে মানুষের ব্যাপার। আগে শোনো। মুখে সাবধান করে দিলেই হবে।

আমি ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম—মুখে সাবধানের কর্ম্ম নয়। দুর্নীতি গোড়া থেকে চেপে মারতে হয়—নইলে বেড়ে যায়। সেবার হরিশ সরকারের বৌটাকে কেমন করে শাসন করে দিয়েছিলুম জান তো? যার জন্যে দেশ ছাড়া হয়ে চলে গেল।

সুরবালা শান্ত সুরে বললে—সেটা কিন্তু তোমার ভাল হয় নি। অতটা কড়া হওয়া কি ঠিক?

—আলবৎ ঠিক। যা-তা হবে গাঁয়ের মধ্যে!

—চিরকাল হয়ে আসচে। ওসব দেখেও দেখতে নেই। নিজের নিয়ে থাকো, পরের দোষ দেখে কি হবে? ভগবান আমাদের যথেষ্ট দিয়েচেন—সবাই মানে চেনে ভয় করে গাঁয়ের মধ্যে। সত্যি কথা বলি তবে, শান্তি ঠাকুরঝি কাল আমার কাছে এসেছিল। এসে আমার হাত ধরলে। বললে, এই রকম একটা কথা আমার নামে দাদার কাছে ওঠাবে লোকে, আমার ভয়ে গা কাঁপচে। তুমি একটু দাদাকে বোলো বৌদি। বেচারী তোমার কাছে নালিশ হবে শুনে—

—ওসব কথার মধ্যে তুমি থেকো না। সমাজের ব্যাপার, গ্রামের ব্যাপার—এ অন্য চোখে দেখতে হয়। শাসন না করে দিলে চলে না—বেড়ে যাবে।

পরদিন গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির সভ্যদের ডাকাই। শান্তির ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্যে।

পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই আমি জানি। এ সমিতির আমিই সব, আমার কথার ওপর কেউ কথা বলবার লোক নেই এই গাঁয়ে। আমিই সমিতির সেক্রেটারী, আমিই সভাপতি—আমিই সব।

সভায় আমি নিজেই প্রস্তাব করলাম, রামপ্রসাদ চাটুয্যেকে ডাকিয়ে এনে শাসন করে দেওয়া যাক। সকলে বললে—তুমি যা ভাল মনে করো।

সনাতনদা বললে—রামপ্রসাদ ইউনিয়ান বোর্ডের টেক্স আদায়কারী বলে ওর বড্ড বাড় বেড়েছে। লোকের যেন হাতে মাথা কাটছে—আরে, সেদিন আমি বললাম, আমার হাত খালি, এখন টেক্সটা দিতে পারচি নে, দুদিন রয়ে সয়ে নাও দাদা। এই বলে, তোমার নামে ক্রোকী পরওয়ানা বের করবো, হেন করবো, তেন করবো—

আমি বললাম—ও সব কথা এখানে কেন? ব্যক্তিগত কোনো কথা এখানে না ওঠানোই ভাল। তুমি টেক্স দাও নি, সে যখন আদায়কারী, তখন তোমাকে বলবে না কি ছেড়ে দেবে?

শম্ভু সরকার বললে—সে তো ন্যায্য কথা।

আমি বললাম—শাসন করবো একটু ভাল করেই। কাল দারোগা আমার এখানে আসচে, দারোগাবাবুকে দিয়েই কথাটা বলাই। তাহোলে ভয় খেয়ে যাবে এখন।

সভা থেকে ফিরবার পথে মুখুয্যে পাড়ার মোড়ে কাঁটালতলায় দেখি কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বোধ হয় আমার জন্যে অপেক্ষা করচে। আমি গাছতলায় পৌছতেই মেয়েটি হঠাৎ আমায় পায়ে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

শশব্যস্তে বলে উঠলাম—কে? কি হয়েচে, ছাড়ো ছাড়ো, পায়ে হাত দেয় যে—

ততক্ষণে চিনেচি, মেয়েটি শান্তি।

শান্তি লালমোহন চক্রবর্ত্তীর মেজমেয়ে। বছর বাইশ-তেইশ বয়েস, আমার চেয়ে অন্তত বারো-তেরো বছরের ছোট, আমাকে পাড়াগাঁ হিসাবে দাদা বলে ডাকে।

কান্না-ধরা গলায় বললে—শশাঙ্কদা আমায় বাঁচাও। তুমি আমার বড় ভাই।

—কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি শুনি।

—আমার নামে নাকি কি উঠেচে কথা। আমায় নাকি পুলিশে পাঠাবে, চৌকিদার দিয়ে ধরে থানাতে নিয়ে যাবে। সবাই বলাবলি করচে। তোমার পায়ে পড়ি দাদা—আমি কোনো দোষী নই—বাঁচাও আমায়।

শান্তিকে দেখে মনে দুঃখ হোল, রাগও হোল। লালমোহন কাকার মেয়ে গাঁয়ে বসে এমন উচ্ছন্ন যাচ্চে। এ যতই এখন মায়া কান্না কাঁদুক—আসলে এ মেয়ে ভ্রষ্টা, কলঙ্কিনী। ওর কান্না মিথ্যে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুঃখ হোল ভেবে, লালমোহন কাকা এক পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে তেরো বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভবের হাটবাজার তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন—দুবছর চলে না যেতে যেতেই জামাই শ্বশুরের অনুসরণ করলেন। পনেরো বছরের মেয়ে চালাঘরে মায়ের কাছে ফিরে এল সিঁথির সিঁদুর মুছে। গরীব মা, নিজের পেট চালায় সামান্য একটু জমি-জমার আয়ে। ভাইও আছে—কিন্তু সে নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আলাদা বাস করে। মাকেই খেতে দেয় না—তার বিধবা বোন!

এ অবস্থায় কেউ যদি মেয়েটিকে প্রলোভন দেখায়—বিপথে পা দিতে সে মেয়ের কতক্ষণ লাগে?

মুখে কড়া স্বরে বললুম—শান্তি, রাস্তাঘাটে সে সব কথা হয় না। আমার বাড়ীতে যেও, তোমার বউদি থাকবেন, সেখানে কথাবার্ত্তা হবে; তবে তোমাকে থানাপুলিশের ভয় যদি কেউ দেখিয়ে থাকে সে মিছে কথা। পুলিশের এতে কি করবার আছে? বাড়ী যাও, ছিঃ!

শান্তি তবুও কান্না থামায় না। আকুল মিনতির স্বরে বললো—একটু দাঁড়াও দাদা, পায়ে পড়ি, একটু দাঁড়াও!

আঃ কি মুশকিল? শান্তির সঙ্গে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলতে দেখলে কেউ কিছু মনেও করতে পারে। ও মেয়ের চরিত্র কেমন জানতে আর লোকের বাকী নেই।

বললাম—বিশেষ কিছু বলবার আছে তোমার?

—শশাঙ্কদা, তুমি আমায় বাঁচাবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—হবে, হবে। কোনো ভয় নেই।

পরক্ষণেই শান্তি এক অদ্ভুত ধরনে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে—সত্যি শশাঙ্কদা? আমি—আমাকে—

আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি ও কি বলতে চাইচে, এইবার ওর কথার সুরে ও মুখের ভাবে বুঝে নিয়ে অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। আমি ডাক্তার, ও সাহায্য চাইচে আমার কাছে, কিন্তু এ সাহায্য আমার দ্বারা হবে ও ভাবলে কেমন করে? আশ্চর্য্য!

শান্তি মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

অবশেষে আমার মুখে কথা ফুটলো। আমি বললাম—তুমি এতদূর নেমে গিয়েচ শান্তি?

তুমি না লালমোহন কাকার মেয়ে? কত ভাল লোক ছিলেন কাকা, কত ধার্মিক ছিলেন—এ সব কথা মনে পড়ে না তোমার?

শান্তি আবার কাঁদতে শুরু করলে।

নাঃ, এ সব ছলনাময়ী ঘ্যানঘেনে প্যানপ্যানে মেয়ের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি জাগে না। পুনরায় কড়া স্বরে বললাম—আমার দ্বারা তোমার কোনো সাহায্য হবে এ তোমার আশা করাই অন্যায়। জানো, এ সবের প্রশ্রয় আমি দিই নে?

—আমার তবে কি উপায় হবে শশাঙ্কদা?

—আমি বলতে পারি নে। আমি চললাম, তোমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় নেই আমার।

বাড়ি এসে সুরবালাকে সব বললাম। সুরবালা বললে—ওই পোড়ারমুখীই যত নষ্টের গোড়া। রামপ্রসাদ ঠাকুরপোর কোন দোষ নেই।

—তোমার এ কথা আমি মানলাম না।

—মেয়েমানুষের ব্যাপার তুমি কি জানো? তুমি শান্তির কান্নাতে গলে গিয়েচো, ভাবচো ও বুঝি নিরীহ, আসলে তা নয়, এই তোমাকে বললাম।

—তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারলাম না।

—পারবেও না। ডাক্তারিই পড়েচ, আর কিছুই জান না সংসারের।

রামপ্রসাদের উপর অত্যন্ত রাগ হোল। আমাদের গ্রামের মধ্যে এমন সব কাজ যে করতে সাহস করে, তাকে ভালভাবেই শিক্ষা দিতে হবে।

দারোগাকে একখানা চিঠি লিখে পাঠালুম। দারোগা লিখলে—একদিন আপনাদের ওখানে গিয়ে লোকটাকে এমন জব্দ করে দেব যে, সে এ মুখে আর কোনদিন পা দেবে না।

রামপ্রসাদ চাটুয্যে লোকটি মদ খায় বলে তার ওপর শ্রদ্ধা কোনদিনই ছিল না। কতদিন তাকে বলেছি—রামপ্রসাদদা, লিভারের অসুখ হয়ে মরবে। এখনো মদ ছাড়ো।

কোনদিন সে কথায় কান দেয় নি। বলতো—কোথায় মদ খাই বেশি? তুমিও যেমন ভাই! হাতে পয়সা কোথায় যে বেশি মদ খাবো?

অথচ সবাই জানে, রামপ্রসাদ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। রামপ্রসাদের বাবা হরিপ্রসাদ আবাদে কোন এক বড় জমিদারের নায়েবী করে অনেক পয়সা রোজগার করে যথেষ্ট জায়গা-জমি রেখে গিয়েছিলেন। হরিপ্রসাদের দুই বিবাহ ছিল, দ্বিতীয় পক্ষের তিনটি ছেলে এখনও নাবালক, বিমাতা বর্ত্তমান—রামপ্রসাদেরও নিজেরও দু-তিনটি মেয়ে। নাবালক বৈমাত্র ভাইগুলির ন্যায্য সম্পত্তির উপস্বত্ব একা রামপ্রসাদই ফাঁকি দিয়ে ভোগ করে। এ নিয়েও ওকে আমি একদিন বলেছিলাম। আমি গ্রামে বসে থাকতে কোন অবিচার হোতে পারবে না। রামপ্রসাদ সে কথাতেও কান দেয় নি।

দারোগা আমার বাড়িতে এল। এসে বললে—আজই আপনাদের সেই লোকটাকে ডাকান তো।

—খাওয়া দাওয়া করে ঠাণ্ডা হোন, ওবেলা সকলের সামনে ওকে ডাকবো।

—বেশ, তাহলে এবেলা আমি এখানে খাবো না, মণিরামপুরে একটা সুইসাইডের কেস আছে, তদন্ত করে আসি, ওবেলা বরং চা খাবো এসে।

দারোগা সাইকেলে চলে গেল।

বিকেলের দিকে দারোগা ফিরে এল। রামপ্রসাদের ডাক পড়লো গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির ঘরের সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র মাঠে। লোকজন অনেক জড় হোল ব্যাপার কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে। রামপ্রসাদ চোখে চশমা দিয়ে ফরসা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সভায় এসে হাজির হোল। গ্রামের সব লোকই আমার পক্ষে। ডাক্তারকে কেউ চটাবে না!

দারোগা রামপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলে—আপনার বিরুদ্ধে গ্রামের লোকের কি অভিযোগ জানেন?

রামপ্রসাদ শুষ্কমুখে বললে—আজ্ঞে—আজ্ঞে—না।

—আপনি গ্রামের একটা মেয়েকে নষ্ট করেছেন!

—আজ্ঞে, আমি!

—হ্যাঁ, আপনি।

আমার ইঙ্গিতে সনাতনদা বললে—উনি সে মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে দিনকতক রেখেছিলেন। উনি বিপত্নীক। আর একটা কথা, বাড়ীতে ওঁর একটা মেয়ে প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে, অথচ সেই মেয়েমানুষটাকে উনি বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখেন।

দারোগা বললে—আমি এমন কথা কখনো শুনি নি। ভদ্রলোকের গ্রামে আপনি বাস করেন, অথচ সেই গ্রামেরই একটি মেয়েকে আপনি এভাবে নষ্ট করেছেন?

সনাতন বললে—সে মেয়েও ভদ্রঘরের মেয়ে, স্যার। উনিই তাকে নষ্ট করেছেন।

—মেয়েটি কি জাতের?

—ব্রাহ্মণ বংশের স্যার। সে কথা বলতে আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে—ওঁর ঘরে সোমত্ত মেয়ে, অথচ উনি—

দারোগা রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললে—একি শুনছি? আপনাকে এতক্ষণ 'আপনি' বলছিলাম, কিন্তু আপনি তো তার যোগ্য নন—'তুমি' বলতে হচ্ছে এইবার। তুমি দেখছি অমানুষ। ভদ্দরলোকের গ্রামের মধ্যে যা কাণ্ড তুমি করছো, ব্রাহ্মণের ছেলে না হলে তোমাকে চাব্‌কে দিতাম! বদমাশ কোথাকার!

রামপ্রসাদের মুখ অপমানে রাঙা হয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে হাজার হোক, গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, চশমা চোখে, ফরসা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বেড়ায়, যদিও লেখাপড়া কিছুই জানে না—এভাবে সর্বসাধারণের সমক্ষে জীবনে কখনো সে অপমানিত হয় নি। লজ্জা ও ভয়ে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। পুলিশকে এই সব পল্লীগ্রামে বিশেষ ভয় করে চলে লোকে, তার সঙ্গে যোগ-সাজস করেছে আমার মত ডাক্তার, এ অঞ্চলে যার যথেষ্ট পসার ও প্রতিপত্তি। ভয়ে ও অপমানে রামপ্রসাদ কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে দারোগার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা বাজখাঁই আওয়াজে ধমক দিয়ে বললে—উত্তর দিচ্ছ না যে বড়, বদমাশ কাঁহাকা!

রামপ্রসাদ আমতা আমতা করে কি বলতে গেল, কেউ বুঝতে পারলে না।

আমি তবুও একটা কথা দারোগাকে এখনো বলি নি। সেটা হোল শান্তির বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার কথা। শান্তি যতই দুশ্চরিত্রা হোক, সে আমার সাহায্য চেয়েছিল চিকিৎসক বলে। রোগীর গুপ্ত কথা প্রকাশের অধিকার নেই ডাক্তারের, সাহায্য আমি তাকে করি না করি সে আলাদা কথা।

বৃদ্ধ চৌধুরী মশাই আমায় বললেন—যথেষ্ট হয়েছে বাবাজী, হাজার হোক ব্রাহ্মণের ছেলে, ওকে ছেড়ে দাও এবার। কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু রামপ্রসাদ কাঁদো কাঁদো হয় নি, ওটা বৃদ্ধের ভুল। ভয়ে ও এমন হয়ে গিয়েছে। বাপের অনেক সম্পত্তি ছিল, তার বলে সে বাবুগিরি করছে, লোকের উপর কিছু কিছু প্রভুত্বও করেছে, কিন্তু লেখাপড়া না শেখার দরুন দারোগা পুলিশকে তার বড় ভয়। পুলিশের দারোগা দিন-দুনিয়ার মালিক এই তার ধারণা। আমি এটুকু জানতাম বলেই আজ দারোগাকে এনে তাকে শাসনের এই আয়োজন। নইলে অনেক ভাল কথা বলে দেখেছি, অনেক শাসিয়েছি, তাতে কোন ফল হয় নি। আমি চৌধুরী মশাইকে বললাম—ওকে ভাল করে শিক্ষা না দিয়ে আজ ছাড়ছি নে। এ ধরনের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারি নে গাঁয়ে।

রামপ্রসাদ হাতজোড় করে বললে—এবারের মত আমায় মাপ করুন দারোগাবাবু—

দারোগা বললে—আমি তোমার কাছে থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেবো—যাতে এমন কাজ আর কখনো ভদ্রলোকের গ্রামে না করো। তাতে লিখে দিতে হবে—

রামপ্রসাদ আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললে—এবারের মত আমায় মাপ করুন দারোগাবাবু।

—মুচলেকা না দিয়েই? কক্ষনো না। লেখো মুচলেকা!

পাড়াগাঁয়ের লোক রামপ্রসাদ, যতই শৌখিন হোক বা বাবু হোক, পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামাকে যমের মত ভয় করে। আমি জানি এ মুচলেকা দেওয়ার কোনো মূল্যই নেই আইনের দিক থেকে, কোনো বাধ্যবাধকতাই নেই এর—রামপ্রসাদ কিন্তু ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল মুচলেকা লিখে দেওয়ার নাম শুনে।

—দাও, দাদা—লেখো আগে।

—এবার দয়া করুন দারোগাবাবু। আমি বরং এ গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, বলুন আপনি—

—কোথায় যাবে?

—পাশের গ্রামে বর্দ্ধমবেড়ে চলে যাই। আপনি যা বলেন।

—সেই মেয়েটিকে একেবারে ছেড়ে চলে যেতে হবে—

—আপনার যা হুকুম।

দারোগা আমার দিকে চেয়ে বললে—তাহলে তাই করো। বছরখানেক এ গাঁ ছেড়ে

অন্যত্র চলে যাও। মেয়েটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না আর, এই বলে দিচ্ছি।

—যে আজ্ঞে—

—ক'দিনের মধ্যে যাবে ?

—পনেরোটা দিন সময় দিন আমায়।

—তাই দিলাম। যাও, এখন চলে যাও।

দারোগাবাবু আমার বাড়ী চা খেতে এসে বললে—কেমন জব্দ করে দিয়েছি বলুন ডাক্তারবাবু ? আর কখনো ও এপথে পা দেবে না। যদি ওর জ্ঞান থাকে। কি বলেন ?

—আমার তাই মনে হয়।

—কবে আমার ওখানে আসছেন বলুন—একদিন চা খাবেন আমার বাড়ী।

—হবে সামনের হপ্তায়।

—ঠিক তো ? কথা রইল কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

দারোগা চলে গেলে সুরবালার সঙ্গে দেখা হোল বাড়ীর ভেতরে। সে বললে—হ্যাগা, আমি কি তোমার জ্বালায় গলায় দড়ি দেবো, না, মাথা কুটে মরবো ?

—কেন, কি হোল ?

—কি হোল ? কেন তুমি রামপ্রসাদবাবুকে আজ অমন করে পাঁচজনের সামনে অপমান করলে বলো তো ? তোমার ভীমরতি ধরবার বয়েস তো এখনও হয় নি ?

—কে বললে তোমাকে এসব কথা ?

সুরবালা ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—আমার কানে কথা যায় না ভাবছো ? সব কথা যায়। নাক-ছেঁদা গিন্নি এসে আমায় সব কথা বলে গেল—বৌমা, এই রকম কাণ্ড। নাক-ছেঁদা গিন্নি অবিশ্যি খুব খুশি। তোমাকে নমস্কার কে না করবে এ গাঁয়ের মধ্যে ? কিন্তু এ কাজটা কি ভাল।

—নাক-ছেঁদা গিন্নি এ সংবাদ এর মধ্যে পেয়ে গিয়েছেন ? বাবাঃ গাঁয়ের গেজেট কি আর সাধে বলে ! তা কি বকবে শুধুই, না, খেতে টেতে দেবে আজ ?

সুরবালা আর এক দফা সদুপদেশ বর্ষণ করলে খাওয়ার সময়। গ্রামের মধ্যে কে কি করছে সে সব কথার মধ্যে আমার দরকার কি ? নিজের কাজ ডাক্তারি, তা নিয়ে আমি থাকতেই তো পারি। সব কাজের মধ্যে মোড়লি না করলে কি আমার ভাত হজম হয় না ?

আমি ধীরভাবে বললাম—তা বলে গাঁয়ে যে যা খুশি করবে ?

—করুক গে, তোমার কি ? যে পাপ করবে, ঈশ্বর তার বিচার করবেন। তোমার সর্দারি করতে যাওয়ার কি মানে ? অপরের পাপের জন্যে তোমায় তো দায়ী হতে হবে না।

—কি জানো, তুমি মেয়েমানুষের মত বলছো। আমি এখন এ গাঁয়ে পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী, পাঁচজনে মানে চেনে। এ আমি না দেখলে কে দেখবে বলো। গ্রামের নীতির জন্যে আমি দায়ী নিশ্চয়ই।

—বেশ, ভাল কথায় বুঝিয়ে বল না, কে মানা করেছে? অপমান করবার দরকার কি?

—বুঝিয়ে বলি নি? অনেক বলেছি। শুনতো যদি তবে আজ আমায় এ কাজ করতে হোত না।

সুরবালা যা-ই বলুক, সে মেয়েমানুষ, বোঝেই বা কি—আমি কিন্তু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম সে রাত্রে। আমি থাকতে এ গ্রামে ও সব ঘটতে দেব না। একটা পুরুষমানুষ ভুলিয়ে একটা সরলা মেয়ের সর্ব্বনাশ করবে, এ আমি কখনই হোতে দিতে পারি নে।

সুরবালা এখানে আমার সঙ্গে এক মত নয়। সে বলে রামপ্রসাদের দোষ নেই। শান্তিই ওকে ভুলিয়েছে। অসম্ভব কথা, শান্তিকে আমি এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি, মাখম মাস্টারের স্কুলে যখন পড়ি, শান্তি তখন ছোট্ট শাড়ি পরে সাজি হাতে পাঠশালার বাগানে ফুল তুলতে আসতো, আঁচলে বেঁধে গুগলি কুড়িয়ে নিয়ে যেতো নাক-ছেঁদা গিন্নিদের ডোবা থেকে—সেই শান্তি কাউকে ভোলাতে পারে!

সকালে উঠে আমি দূরগ্রামে ডাকে চলে গেলাম। ফিরে আসতেই সুরবালা বললে—আজ খুব কাণ্ড হয়ে গেল—কি হাঙ্গামাই তুমি বাধিয়েছ!

—কি হোল?

—শান্তি ঠাকুরঝি সকালে এসে হাজির। কেঁদে কেটে মাথা কুটে সকালবেলা সে এক কাণ্ডই বাধালো। আমার পায়ে ধরে সে কি কান্না, বলে—শশাঙ্কদা এ কি করলেন? আমি তাঁকে বিশ্বাস করে সব কথা বললাম, অথচ তিনি—

সুরবালা সব কথা জানে না, আমি বললাম—ওর ভুল। ওর কোন গোপন কথা সেখানে প্রকাশ করিনি—

সুরবালা অবাক হয়ে বললে—কর নি?

—কক্ষনো না।

সুরবালা আশ্বস্ত হওয়ার সুরে বললে—যাক, এ কথা আমি কালই বলব শান্তিকে।

আমি রেগে বললাম—ওকে আর বাড়ী ঢুকতে দিও না—

—ছিঃ ছিঃ, মানুষের ওপর অত কড়া হতে নেই। তুমি তাকে কিছু বলতে পারো তোমার বাড়ী এলে?

—খুব পারি, যার চরিত্র নেই সে আবার মানুষ?

—আমার একটা কথা রাখবে লক্ষীটি?

—কি?

—থাকগে তোমার ডাক্তারি। চল এ গাঁ থেকে আমরা দিনকতক অন্য জায়গায় চলে যাই।

—কেন বল তো?

—কেন জানি নে। তোমার মোড়লগিরি দিনকতক বন্ধ রাখো। লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে কি লাভ? রামপ্রসাদকে দারোগা গাঁ ছেড়ে যেতে বলেছে—এটা কি ভাল?

—ওই এক কথা পঞ্চাশ বার আমার ভাল লাগে না। যে দুশ্চরিত্র, তাকে কখনো এ গাঁয়ে আমি শান্তিতে থাকতে দেবো না।

—আমার কথা শোনো লক্ষ্মীটি, তোমার ভাল হবে।

কিন্তু ওসব কথায় কান দিতে গেলে পুরুষ মানুষের চলে না। মনে মনে শান্তির ওপর খুব রাগ হোল। আমার বাড়ীতে আসবার কোনো অধিকার নেই তার। এবার ঢুকলে তাকে অপমান হতে হবে।

সনাতনদা বিকেলের দিকে আমার এখানে চা খেতে এসে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বলে—আরে, তুমি যা করলে—বাবাঃ—পেটে খিল ধরে যাচ্ছে হেসে—

—কি, হয়েছে কি সনাতনদা?

সনাতনদা দম নিয়ে বললে—ওঃ! রও, একটু সামলে নিই—

—কি ব্যাপার?

—হ্যাঁ, জব্দ করে দিলে বটে! বাবাঃ, কুঁদির মুখে বাঁক থাকে? কার সঙ্গে লেগেছে রামপ্রসাদ ভেবে দেখেছে কি? পুরুষ মানুষের মত পুরুষ মানুষ বটে তুমি! সমাজে চাই এমনি বাঘের মত মানুষ, নইলে সমাজ শাসন হবে কি করে?

সনাতনদার কথাগুলো আমার ভালোই লাগলো। সনাতনদাকে লোকে দোষ দেয় বটে, কিন্তু ও খাঁটি কথা বলে। বেঁটে খাটো লোক, অপ্রিয় কথাও বলতে অনেক সময় ওর বাধে না। অমন লোক আমি পছন্দ করি।

তবুও আমি বললাম—যাক, পরনিন্দে করে আর কি হবে সনাতনদা, ওতে যদি রামপ্রসাদদা ভাল হয়ে যায়, আমি তাই চাই। ওর ওপর অন্য কোন রাগ নেই আমার।

সনাতনদা গলার সুর নিচু করে বললে—ও কাল কি করেছিল জানো? তোমাদের ওই ব্যাপারের পরে কাল বড় মুখুয্যে মশায়ের কাছে গিয়েছিল। গিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে —আমাকে পাঁচজনের সামনে এই যে অপমানটা করলে, আপনারা এর একটা বিহিত করুন। নইলে গ্রামে বাস করি কি করে?

—কি বললেন জ্যাঠামশায়?

—বললেন, শশাঙ্ক হলো গ্রামের ডাক্তার—শুধু ডাক্তার নয়, বড় ডাক্তার। বিপদে আপদে ওর দ্বারস্থ হতেই হয়। তার বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারবো না। এই কথা বলে বড় মুখুয্যে মশায় বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। সত্যিই তো, ছেলেপিলে নিয়ে সবাই ঘর করে, কে তোমাকে চটিয়ে গাঁয়ে বাস করবে বল তো?

—তা নয় সনাতনদা। এ জন্যে আমায় কেউ খোসামোদ করুক—এ আমি চাই নে। ডাক্তারি আমার ব্যবসা, কিন্তু সমাজের প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে, যেটা খুব বড়। যতই তার ওপর রাগ থাকুক, বিপদে পড়ে ডাকতে এলে বরং শত্রুর বাড়ী আমি আগে

বাবো ! ওই রামপ্রসাদদার যদি আজ কোন অসুখ হয়, তুমি সকলের আগে সেখানে আমায় দেখতে পাবে।

সনাতনদা কথাটা শুনে একটু বোধ হয় অবাক হয়ে গেল, আমার মুখের দিকে খানিকটা কেমন ভাবে চেয়ে রইল। তারপর কতকটা আপন মনেই বললে—শিবচরণ কাকার ছেলে, তুমি, তিনি ছিলেন মহাপুরুষ লোক, এমন কথা তুমি বলবে না তো কে বলবে ?

সনাতনদা আমার মন রাখবার জন্যে বললে। কারণ এ গ্রামে কে না জানে, আমার বাবা তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক উড়িয়েছিলেন মদে আর মেয়েমানুষে। তবে শেষের দিকে হাতে পয়সা যখন কমে এল, তখন হঠাৎ তিনি ধর্ম্মে মন দেন এবং দানধ্যান করতে শুরু করেন। প্রতি শীতকালে গরীব লোকের মধ্যে বিশ-ত্রিশখানা কম্বল বিলি করতেন, কাপড় দিতেন—এসব ছেলেবেলায় আমার দেখা। পৈতৃক সম্পত্তির যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা তিনি উড়িয়ে দেন এই দানধ্যানের বাতিকে। কেবল এই বসত বাড়ীটুকু ঘুচিয়ে দিতে পারেননি শুধু এই জন্যে যে, সেকালে লোকের ধর্ম্ম ছিল, ব্রাহ্মণের ভদ্রাসন কেউ মর্টগেজ রাখতে রাজী হয় নি !

সন্ধ্যার সময় ওপাড়া থেকে ফিরছি, পথে আবার শান্তির সঙ্গে দেখা। দেখা মানে হঠাৎ দেখা নয়, যতদূর বুঝলাম, শান্তি আমার জন্যে ওৎ পেতে এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম—কি শান্তি, ব্যাপার কি ? এখানে দাঁড়িয়ে এ সময় ?

শান্তি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি শশাঙ্কদা।

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম। এ ভাবে নির্জ্জন পথে শান্তির মত মেয়ের সঙ্গে কথা বলা আমি পছন্দ করি নে। বললামও কথাটা। তার দরকার থাকে, আমার বাড়ীতে সে যেতে পারে। তার বৌদির সামনে কথাবার্ত্তা হবে। পথের মাঝখানে কেন ?

শান্তি বললে—শশাঙ্কদা, তোমার ওপর আমার ভক্তি আগেও ছিল। এখন আরও বেশি।

আমি এ কথা ওর মুখ থেকে আশা করি নি, করেছিলাম অনুযোগ—তাও নিতান্ত গ্রাম্য ধরনে, অর্থাৎ গালাগালি। তার বদলে এ কি কথা ! এই কথা শোনাবার জন্যে ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে ! বিশ্বাস হোল না !

বললাম—আসল কথাটা কি শান্তি ?

—আর কিছু না, মাইরি বলচি শশাঙ্কদা—

—বেশ, তুমি বাড়ী যাও—

শান্তি একটু হেসে বললে—আমার একটা কথা রাখবে শশাঙ্কদা ? তোমার ডাক্তারখানা থেকে আমায় একটু বিষ দিতে পারো ?

আমার বড় রাগ হয়ে গেল। বললাম—ঘোর-পেঁচ কথা আমি ভালবাসি নে, যা বলবে সামনা সামনি বলো। ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলাম—কোন্ কথা থেকে এ কোন্

কথার আমদানি করলে ? বিষ কি হবে ? খেয়ে মরবে তো ? তা অনেক রকম উপায় আছে মরবার। আমায় এর জন্যে দায়ী করতে চাও কেন জিজ্ঞেস করি ? ভক্তি আছে বলে বুঝি ?

শান্তি বললে—ঠিক বলেছ দাদা। আর তোমাদের বোঝা হয়ে থাকবো না। দাঁড়াও একটু পায়ের ধুলো দাও দাদা—

কথা শেষ করেই শান্তি আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে দুহাতে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। মনে হোল, ও কাঁদচে, কারণ কথার শেষের দিকে ওর গলা কেঁপে গেল যেন।

পায়ের ধুলো নিয়ে মাথা তুলেই ও আর কোন কথাটি না বলে চলে যেতে উদ্যত হোল।

আমার তখন রাগটা কেটে গিয়ে একটু ভয় হয়েছে। মেয়ে-মানুষকে বিশ্বাস নেই, সত্যি সত্যি মরবে না কি রে বাবা !

বললাম—দাঁড়াও, একটা কথা আছে শান্তি !

শান্তি ফিরে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কি ?

—সত্যি সত্যি মরো না যেন তাই বলে।

—তা ছাড়া আমার কি আছে করবার ? সমাজের পথ আজ বন্ধ হোল, সব পথ বন্ধ হোল, বেঁচে থেকে লাভ কি বলো ?—

—সমাজের পথ কে বন্ধ করলে ? অন্য লোকের দোষ দাও কেন, নিজের দোষ দেখতে পাও না ?

—আমি কারো দোষ দিচ্ছি নে শশাঙ্কদা, সবই আমার এই পোড়া অদৃষ্টের দোষ—অদৃষ্টের দোষ—কথা শেষ করে শান্তি নিজের কপালে হাতের মুঠো দিয়ে মারতে লাগলো, আর থামে না।

ভাল বিপদে পড়ে গেলাম এ সন্ধ্যাবেলায় পথের মধ্যে। বাধ্য হয়ে ওর কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে বললাম—এই ! কি হচ্ছে ও সব ?

শান্তি তবুও থামে না, আমি তখন আর কি করি, ওর হাতখানা ধরে ফেলে বললাম—ছিঃ, ও রকম করতে নেই—যাও, বাড়ী যাও—কি কেলেঙ্কারী হচ্ছে এ সব ?

শান্তি বললে—না দাদা, আর কেলেঙ্কারী করে তোমাদের মুখ হাসাবো না। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছি শীগগির—বলে আবারও সেই রকম অদ্ভুত হাসলে।

—আর যাই করো, আত্মহত্যা মহাপাপ, ও কোরো না—

—কে বললে ?

—আমি বলছি। শাস্ত্রে আছে।

শান্তি হেসে বললে—আচ্ছা দাদা, তোমরা শাস্তর মানো ?

—মানি।

—আত্মহত্যে হলে কি হয় ?

—গতি হয় না।

—বেশ তো, হ্যাঁ দাদা, আমি ম'লে তুমি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসতে পারবে না আমার নামে? বেঁচে থাকতে না পারো পোড়ার মুখী বোনের উপকার সাহায্য করতে—মরে গেলে কোরো।

শান্তির কথা শুনে আমার বড় মমতা হোল ওর ওপর। কেমন এক ধরনের মমতা!

সুর নরম করে বললাম—ও সব কিছু করতে হবে না শান্তি—

—তা হোলে বলো তুমি উপকার করবে?

—তোমার উপকার করা মানে মহাপাপ করা। তুমি যে উপকারের কথা বলছো, তা কখনও ভাল ডাক্তারে করে না। আমি নিরুপায়।

—সত্যি দাদা, সাধে কি ভক্তি হয় আপনার ওপর? আপনার ধূলির যোগ্য কেউ নেই এ গাঁয়ে।

—আমার কথা ছেড়ে দাও শান্তি। আর একজন আছে এ গাঁয়ে—সে সত্যিই কোনো দুর্নীতি দেখতে পারে না সমাজের। সনাতনদা।

শান্তি অবিশ্বাসের সুরে বললে—তুমি এদিকে বড্ড সরল, শশাঙ্কদা, ওকে তুমি বিশ্বাস করো?

—কেন?

—সনাতনদা এসেছে কাজ বাগাতে তোমার কাছে। খোশামোদ করা ছাড়া ওর অন্ত কোনো কাজ নেই—

—যাক্‌গে, ও কথার দরকার নেই, আমার কাছে কথা দিয়ে যাও তুমি আত্মহত্যার কথা ভাববে না।

—আমার উপায় হবে কি তবে?

—সে আমি জানি নে। তার কোন ব্যবস্থা আমায় দিয়ে হবে না।

—তা হলে আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করি, তুমি যখন কিছুই করবে না—

শান্তি চলে গেল বা ওকে আমি যেতেই দিলাম। আর বেশীক্ষণ ওর সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা আমার উচিত হবে না। হয় তো কেউ দেখে ফেলবে, তখন পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করে দেবে, শান্তির যা সুযশ এ গাঁয়ে!

বাড়ী ফিরে সুরবালাকে কথাটা এবার আর বললাম না কি ভেবে, কিন্তু সারা রাত্ত ভাল ঘুম হোল না। সত্যি, শান্তির উপায় কি? একা মেয়েমানুষ, কি করে এ দারুণ অপযশ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে,—আর হয়তো ছমাস পরে সে বিপদের দিন ওর জীবনে এসে পড়বেই। আমার দ্বারা তখন সাহায্য হতে পারে, তার পূর্ব্বে নয়।

কিন্তু সকালবেলা যা কানে গেল তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

বেলা সাড়ে আটটা। সবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, এমন সময় সনাতনদা আর

মুখুয্যে জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে হারাধন হন্তদন্ত হয়ে হাজির। ওদের চেহারা দেখে আমি বুঝলাম, একটা কিছু ঘটেছে! আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই সনাতনদা বললে—এদিকে শুনেছ কাণ্ড?

—কি ব্যাপার?

—শান্তি আর রামপ্রসাদ দুজনে কাল ভেগেছে।

—কে বললে? কোথায় ভাগলো?

—নাক-ছেঁদা গিন্নি ভোরবেলায় পূজোর ফুল তুলতে গিয়েছিলেন বড় মুখুয্যে মশায়ের বাড়ী। তিনি শুনলেন শান্তির মা ঘরের মধ্যে কাঁদছে! শান্তি নেই, তার বাক্সের মধ্যে কাপড় ও দু-একখানা যা সোনার গহনা ছিল, তাও নেই। ওদিকে দেখা গেল রামপ্রসাদও নেই।

—আমি অবাক হয়ে বললাম—বল কি?

সনাতনদা বললে,—তোমার কাছে গাঁ সুদ্ধ সবাই আসছে শান্তির মাকে নিয়ে। এর কি করবে করো।

আমি বললাম—এর কিছু উপায় নেই সনাতনদা। শান্তি নিজের পথ নিজে করেছে। আপদ গেছে গাঁয়ের। এ নিয়ে কোনো গোলমাল হয় এ আমার ইচ্ছে নয়।

সুরবালা বললে—মেয়েমানুষকে চিনতে এখনও তোমার অনেক দেরি। শান্তি ঠাকুর-ঝিকে বড্ড ভাল মানুষ ভেবেছিলে, না?

বর্ষা নেমেছে খুব। দুজায়গায় ডাক্তারখানায় যাতায়াত, জলকাদায় সাইকেল চলে না—গরুর গাড়ী যেখানে চলে সেখানে গরুর গাড়ী, নয়তো নৌকো যেখানে চলে নৌকো। ছইয়ের বাইরে বসে দেখি বাঁকে বাঁকে পাড়-ভাঙা ডুমুর গাছ কিংবা বাঁশ ঝাড়ের নিচে বড় বড় শোল-মাছ ঘোলা জলে মুখ উঁচু করে খাবি খাওয়ার মত ভাসছে, কোথাও ভুস্ করে ডুব দিলে মস্ত বড় কচ্ছপটা।

মঙ্গলগঞ্জের কুঠীঘাটে নৌকো বাঁধা হয়। নেমে যেতে হয় সিকি মাইল দূরে মঙ্গলগঞ্জের বাজারে—এখানেই আমার একটা শাখা ডাক্তারখানা আজ দুমাস হোল খুলেছি। সপ্তাহের মধ্যে বুধবার আর শনিবার আসি। সনাতনদা কোনো কোনো দিন আসে আমার সঙ্গে, কোনো দিন একাই আসি।

ডাক্তারখানা মঙ্গলগঞ্জের ক্ষুদ্র বাজারটির ঠিক মাঝখানে। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে। এখানকার লোকের পীড়াপীড়িতেই এখানে ক্লিনিক খুলেছি, নয়তো রোগীর ভিড় কোনদিনই কম পড়েনি আমার গ্রামে। এখানেও লেখা আছে সমাগত দরিদ্র রোগীগণকে বিনাদর্শনীতে চিকিৎসা করা হয়।

ডাক্তারখানায় পৌঁছবার আগেই সমবেত রোগীদের কলরব আমার কানে গেল।

কম্পাউণ্ডার রামলাল ঘোষ দূর থেকে আমায় আসতে দেখে প্রফুল্লমুখে আবার ডিসপেন্-

সারি ঘরের মধ্যে ঢুকলো। আমার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল অত ভিড় দেখে। ভেবেছিলাম, কাজ সেরে সকাল সকাল সরে পড়ব এবং সন্ধ্যার আগে বাড়ি পৌছে চা খেয়ে সনাতনদার সঙ্গে বসে এক বাজি পাশা খেলবো, তা আজ হল না দেখচি।

—কত লোক?

—প্রায় পঁয়ত্রিশজন ডাক্তারবাবু।

—গরুর গাড়ী?

—ছ'খানা।

—মেয়ে রোগী?

—সাত জন।

—খাতা নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি করো—

রামলাল ঘোষ হেসে বললে—বাবু, তা হবে না। দুটো অপারেশনের রোগী।

অপ্রসন্ন মুখে বললাম—কি অপারেশন? কি হয়েছে?

—একজনের ফোড়া, একজনের হুইটলো।

—দূর ওসব আবার অপারেশন? নরুন দিয়ে চেরা—তুমি আমায় ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। ডাক দাও সব জলদি জলদি—মেঘ আবার জমে আসছে। একটু চা খাওয়াবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় স্টোভটা তো জ্বালতেই হবে, জল গরমের জন্যে। আগে চা করে দিই।

এই সময় বাজারের বড় ব্যবসাদার জগন্নাথ কুণ্ডু এসে নমস্কার করে বললে—ডাক্তারবাবু, ভাল তো?

—নিশ্চয়ই, নয়তো এই দুর্য্যোগে কাজে আসি?

—একটা কথা। কিছু চাঁদা দিতে হবে। সামনের ঝুলনের দিন এখানে ঢপ দেবো ভাবছি।

—তা বেশ। কোথাকার ঢপ?

—এখনো কিছু ঠিক করি নি। কেষ্টনগরের রাধারাণী, রানাঘাটের গোলাপী কিংবা নদে শান্তিপুরের—

—আচ্ছা, আচ্ছা, যা হয় করবেন, আমার যা ক্ষমতা হয় দেবো নিশ্চয়ই। এখন কাজের ভিড়ের সময় বসে বসে বাজে গল্প করবার অবসর নেই আমার।

জগন্নাথ কুণ্ডু যাবার সময় বলে গেল—ওদিকে গিয়ে একবার কাজকর্ম দেখবেন টেকবেন, আপনারা দাঁড়িয়ে হুকুম দিলে আমরা কত উৎসাহ পাই।

অপারেশন করে নৌকোতে ওঠবার যোগাড় করছি, এমন সময় এক নূতন রোগী এল। তার কোমরে বেদনা, আরও সব কি কি উপসর্গ। মুখ খিঁচিয়ে বলি—আজ আর হবে না, একটু আগে আসতে কি হয়?

—বাবু, বাড়িতে কেউ নেই। মোর ছোট ছেলেডা হাতে ধরে নিয়ে এল, তবে এ্যালাম। একটু দয়া করুন—

আবার আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল, যা ভেবেছিলুম সেই সন্ধ্যেই নামলো। এ সময়ে অন্তত জস্তিপুরের ঘাট পেরুনো উচিত ছিল। নৌকোয় উঠে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। রুগীদের বিরক্তিকর এক ঘেয়ে বোকা বোকা কথা, স্টোভের ধোঁয়ার সঙ্গে মেশানো আইডোফরমের গন্ধ, ফিল্‌টার থেকে জল পড়বার শব্দ, সামান্য কুইনিন ইনজেকস্যান করবার সময় চাষীদের ছেলেমেয়েদের বিকট চিৎকার যেন তাদের খুন করা হচ্ছে গলা টিপে—এ সব মানুষের কতক্ষণ ভাল লাগে?

মাঝিকে বললাম—বাপু অভিলাষ, একটু বেশ নদীর মাঝখান দিয়ে চল, হাওয়া গায়ে লাগুক।

—বাবু, কুঁদিপুরের বাঁওড়ের মুখে গল্‌দাচিংড়ি মাছ নেবেন বললেন যে?

—সে তো অনেক দূর এখনো। একটু তো চলো।

সারাদিনের পর যখন কাজটি শেষ করি তখন সত্যিই বড় আরাম পাই। মঙ্গলগঞ্জ থেকে ফেরবার পথে এ নৌকাভ্রমণ আমি বড় উপভোগ করি। সনাতনদা সঙ্গে থাকলে আরও ভালো লাগে। একা থাকলে বসে বসে দেখি, উঁচু পাড়ের গায়ে গাঙ শালিকের গর্ত্ত, খড়ের বনের পাশে রাঙা টুকটুকে মাকাল ফল লতা থেকে ঝুলছে, লোকে পটলের ক্ষেত নিড়ুচ্চে।

ভেবে দেখি, ভগবান আমায় কোন কিছুর অভাব দেন নি। বাবা যা জায়গা জমি রেখে গিয়েছেন, আর আমি যা করেছি তার আয় ভালই, অন্তত ষাট-সত্তর ঘর প্রজা আছে আশে-পাশের গাঁয়ে। আম কাঁঠালের বড় বড় দুটো বাগান, তিনটে ছোট বড় পুকুর, পঁয়ত্রিশ বিঘে ধানের জমিতে যা ধান হয় তাতে বছরের চাল কিনতে হয় না। সুরবালার মত স্ত্রী। পাড়াগাঁয়ে অত বড় বাড়ী হঠাৎ দেখা যায় না—অন্তত আমাদের এ অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে বেশি নেই। নিজে ভাল ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের ভাল ছেলেই ছিলাম। কেষ্টনগরে কিংবা রানাঘাটে ডাক্তারখানা খুলতাম কিন্তু বাবা নিষেধ করেছিলেন। তখন তিনি বেঁচে, আমি সবে পাশ করেছি মাস দুই হোল। খুলনা জেলার জয়দিয়া গ্রামে আমার এক মাসিমা ছিলেন, তিনি আমাকে ছেলের মত স্নেহ করতেন, পরীক্ষা দিয়ে তাঁদের ওখানে মাস-দুই গিয়ে ছিলাম। সেখানেই খবর গেল পাশের। বাড়ি ফিরতেই বাবা জিগ্যেস করলেন—কোথায় বসবে, ভাবলে কিছু?

—তুমি কি বলো?

—আমি যা বলি পরে বলব, তোমার ইচ্ছেটা শুনি।

—আমি তো ভাবছি রানাঘাট কিংবা কেষ্টনগরে—

—অমন কাজও করো না।

—তবে কোথায় বলো?

—এই গ্রামে বসবে। সেই জন্যে তোমাকে চাকরি করতে দিলাম না, তুমি শহরে গিয়ে

বসলে গাঁয়ের দিকে আর দেখবে না, এ বাড়ী ঘর কত যত্নে করা—সব নষ্ট হবে। অশথ গাছ গজাবে ছাদের কার্নিসে, আম-কাঁটালের বাগান বারোভূতে খাবে। পৈতৃক ভিটেয় পিদিম দেবার লোক থাকবে না। গাঁয়ের লোকও ভাল ডাক্তার চেয়েও পাবে না। এদের উপকার করো।

বাবার ইচ্ছার কোনো প্রতিবাদ করি নি। আমার অর্থের কোনো লালসা ছিল না। স্বচ্ছল গৃহস্থ ঘরের ছেলে, খাওয়া পরার কষ্ট কখনো পাই নি। গ্রামে থেকে গ্রামের লোকের উন্নতি করবো—এ ইচ্ছাটা আমার চিরকাল আছে—ছাত্রজীবন থেকেই।

গ্রামের লোকের ভাল করবো এই দাঁড়ালো বাতিক। এর জন্যে যে কত খেটেছি, কত মিটিং করে লোককে বুঝিয়েছি! পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করেছি, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছি, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি।

ঠিক সেই সময় একটি ঘটনা ঘটলো।

হরিদাস ঘোষের স্ত্রীর নামে নানা রকম অপবাদ শোনা গেল। বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী, স্বামী কলকাতায় ঘিয়ের দোকান করে, মাসে দু-একবার বাড়ী আসে কি-না সন্দেহ। পাশের বাড়ীর নিবারণ ঘোষের ভাইপোকে নাকি লোকে দেখেচে অনেক রাত্রে হরিদাসের ঘর থেকে বেরুতে। আমার কাছে রিপোর্ট এল। দুর্নীতির ওপর আমি চিরদিন হাড়ে চটা, মেয়েটিকে কিছু না বলে নিবারণ ঘোষের ভাইপোকে এক দিন উত্তম মধ্যম দেওয়া গেল। হরিদাস ঘোষকেও পত্র লেখা গেল। তারপর কিসে থেকে কি ঘটলো জানি নে, একদিন হরিদাসের স্ত্রীকে রান্নাঘরে ঘরের আড়া থেকে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখা গেল। গোয়ালের গরুর দড়ি দিয়ে একাজ নিষ্পন্ন হয়েচে। তাই নিয়ে হৈ চৈ হোল, আমি মাঝে থেকে পুলিশের হাঙ্গামা মিটিয়ে দিলাম।

লোকের ভালো করতে গিয়ে অপবাদ কুড়ুতেও আমি পেছপাও নই। দুর্নীতিকে কোনো রকমে প্রশ্রয় দেবো না এ হোল আমার প্রতিজ্ঞা। এতে যা হয় হবে। বড় মুখুয্যেমশায় গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রবীণ লোক। কোন মামলা মোকদ্দমা বাধলে মামলা মিটিয়ে দেবার জন্যে উভয় পক্ষ তাঁকে গিয়ে ধরতো। দু পক্ষ থেকে প্রচুর ঘুষ খেয়ে একটা যা হয় খাড়া করতেন। আমি ব্যবস্থা করলাম, পল্লীমঙ্গল সমিতির পক্ষ থেকে গ্রামের ঝগড়া-বিবাদের সুমীমাংসা ক'রে দেওয়া হবে, এজন্যে কাউকে কিছু দিতে হবে না। দু-একটা বিবাদ এভাবে মিটিয়েও দেওয়া গেল। মুখুয্যে জ্যাঠামশায় আমার ওপর বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠচেন শুনতে পেলাম। একদিন আমায় ডেকে বললেন—শশাঙ্ক, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—আজ্ঞে বলুন জ্যাঠামশায়?

—তুমি এসব কি করচো গাঁয়ে?

—কি করচি বলচেন?

—চিরকাল মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে সব ব্যাপারের মুড়ো মরেচে। তোমায় কাল দেখলাম ন্যাংটো হয়ে বেলতলায় খেলে বেড়াতে, তুমি এ সবের কি বোঝো যে মামলার মীমাংসা

করো ? আর যদিই বা করলে তো নমস্কারী বলে কিছু আদায় করো। একদিন লুচি পাঁটা দিক ব্যাটারা। শুধু হাতে ও কাজে গেলে মান থাকে না বাপু। ওটা গ্রামের মোড়ল-মাতব্বরের হক পাওনা। দুটাকা জরিমানা করলে, একটাকা বারোয়ারি ফণ্ডে দিলে, একটাকা নিলে নিজের নজর। এই তো হোল বনেদি চাল। তবে লোকে ভয় করবে, নইলে যত ব্যাটা ছোটলোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে যে !

—আপনাদের কাল চলে গিয়েচে জ্যাঠামশায়। এখন আর ওসব করতে গেলে—

মুখুয্যে জ্যাঠামশায়ের গলার শির ফুলে উঠলো উত্তেজনায়। চোখ বড় বড় হোল রাগে। হাত নেড়ে বললেন—কে বলেচে, চলে গিয়েচে ? কাল এতটুকু চলে যায় নি। তোমরা যেতে দিচ্চ। কলেজে-পড়া চোখে-চশমা ছোকরা তোমরা, সমাজ কি করে শাসনে রাখতে হয় কি বুঝবে ? সমাজ শাসন করবে, প্রজা শাসন করবে জুতিয়ে। তুমি থেকো না এর মধ্যে, শুধু বসে বসে ছাখো, আমার চণ্ডীমণ্ডপে বসে জুতিয়ে শাসন করতে পারি কি না।

আমি হেসে বললাম—সে জানি, আপনি তা পারেন জ্যাঠামশায়। কিন্তু আজকাল আর ওসব চলবে না।

মুখুয্যে জ্যাঠা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললেন—আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে বসে শুধু ছাখো বাবাজি—

কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হোল যুগ সত্যিই বদলে যাচ্চে। নইলে কেউ কি কখনো শুনেচে তাঁর বড় ছেলের চেয়েও বয়সে ছোট কোন এক অর্ব্বাচীন যুবক গ্রামের ও সমাজের মাতব্বর হয়ে দাঁড়াবে তিনি দুচোখ বুজবার আগেই।

শুধু বললেন—এই আমতলার রাস্তা দিয়ে কেউ টেরি কেটে যেতে পারতো না। যাবার হুকুম ছিল না। একবার কি হোল জানো, গিরে বোষ্টমের ভাই নিতাই বোষ্টম গোবরাপুরের মেলা থেকে ফিরচে, দুপুর বেলা, বেশ গুন্ গুন্ করে গান করতে করতে চলেচে, মাথায় টেরি। আমি বসে কাছারির নিকিশি কাজ তৈরি করচি। বললাম—কে ? তো বললে—আজ্ঞে, আমি নিতাই। যেমন সামনে আসা অমনি চটি না খুলে পটাপট্ দু ঘা পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললাম—ব্যাটার হাতে পয়সার গোমর হয়েছে বুঝি ? কাল নাপিত ডাকিয়ে চুল কদম ছাঁট ছেঁটে এখানে দেখিয়ে যাবি। তখন তা করে। রাশ রাখতে হোলে অমনি করতে হয়, বুঝলে ?

আমি মুখুয্যে জ্যাঠার কথার কোনো প্রতিবাদ করি নি। তিনি কিছু বুঝবেন না।

সেদিন চলে এলুম, কিন্তু বড় মুখুয্যেমশায় মনে মনে হয়ে রইলেন আমার শত্রু। বড় ছেলে হারানকে বলে দিলেন, আমার বাড়ীতে যেন বেশি যাতায়াত না করে, আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কয়। এমন কি নাতির অন্নপ্রাশনের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ করবার আগে একটি কথাও জানালেন না। পাড়াগাঁয় সেটা নিয়ম নয়। কোনো বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মের সময় পাড়ার বিশিষ্ট লোকদের ডেকে কি করা উচিত বা অনুচিত সে সম্বন্ধে পরামর্শ করতে হয়, তাদের দিয়ে ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা করাতে হয়। সে সব কিছুই না। শুকনো নেমন্তন্ন

করে গেল তাঁর মেজ জামাই। তাও অন্নপ্রাশনের দিন সকালে। একটা কথাও তার আগে আমায় কেউ বললে না।

সনাতনদা বললে—এর শোধ নিতে হবে ভায়া। আমরা সবাই তোমার দলে। তুমি যদি বলো, এপাড়ার একটি প্রাণীও মুখুয্যে বাড়ী পাত পাড়বে না!

—আমি তা বলচি নে। সবাই খাবে মুখুয্যে-জ্যাঠার বাড়ী।

সনাতনদা অবাক হয়ে বললে—এই অপমানের পরেও তুমি যাবে? না, না, তা আমরা হোতে দেবো না। আমার উপর ভার ছাও, ছাখো কোথাকার জল কোথায় মারি। কে না জানে ওঁর বংশে গোয়ালা অপবাদ আছে? ওঁর মেজ খুড়ী বিধবা হোয়ে ওই নিবারণ ঘোষের কাকা অধর ঘোষের সঙ্গে ধরা পড়েন নি?

—আঃ, কি বলচ সনাতনদা? ওসব মুখে উচ্চারণ কোরো না। আর কেউ যদি না-ও যায়, আমি খেতে যাবো।

—বেশ, তোমার ইচ্ছে। গাঁয়ের লোক কিন্তু তোমার অপমানে ক্ষেপে উঠেছে।

—তাদের অসীম ধন্যবাদ। বাড়ী গিয়ে ডাবের জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোতে বলো।

নিমন্ত্রণের আসরে ভিন্নগ্রামের বহুলোকের সমাগম। দু-তিনটি চাকর অভ্যাগতদের পদধৌত করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করচে। মস্তবড় জোড়া শতরঞ্চি পড়েচে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়। উঠোনজোড়া নীল শামিয়ানা টাঙানো। একপাশে দুটি নতুন জলভরতি জালা, জালার মুখে পেতলের ঘটি, জালার পাশে একরাশ মাটির গেলাস।

আমায় ঢুকতে দেখে মুখুয্যে জ্যাঠামশায় কেমন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তখুনি সামলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—আরে শশাঙ্ক যে! এসো এসো।

—একটু দেরি হয়ে গেল জ্যাঠাবাবু। রুগীপত্তর দেখে আসতে—

—ঠিক ঠিক, তোমার পশার আজকাল—

—আচ্ছা, আমি একবার রান্নাবান্নার দিকে দেখে আসি কি রকম হোল।

—যাও যাও, তোমাদেরই তো কাজ বাবা।

সেই থেকে বিষম খাটুনি শুরু করলাম। মাছের টুকরো কতবড় করে কাটা উচিত, চাটনিতে গুড় পড়বে—না চিনি, বাইরের অভ্যাগতদের নিজের হাতে জলযোগ করানো, খাওয়ার জায়গা করা, বালতি হাতে মাছের কালিয়া ও পায়েস পরিবেশন, আবার এরই মধ্যে ভোজসভায় এক গেঁয়ো ঝগড়া মেটানো। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণভোজন বড় সাবধানের ব্যাপার, পান থেকে চুন খসলে এখানে অঘটন ঘটে। একজন নিমন্ত্রিতের পাতে নাকি মাছ পড়ে নি—দুবার চেয়েচেন তিনি, তবুও কেমন ভুল হয়ে গিয়েচে। এত তাচ্ছিল্য সহ্য হয়? সে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ান আর কি! শামিয়ানার তলায় যত ব্রাহ্মণ খেতে বসেছিল সবাই হাত গুটিয়ে বসলে, কেউ খাবে না। ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হবার উপক্রম হোল! ভোজ্য-বস্তুর বালতি হাতে পরিবেশকেরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে।

আমি ছিলাম ভাঁড়ার ঘরে, একটা হৈ চৈ শুনে ছুটে বাইরে গেলাম। মুখুয্যে জ্যাঠার ছেলে হারান হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে মাছের বালতি, আমায় দেখে বললে—একটু এগিয়ে যান দাদা—আপনি দেখুন একটু—

রণাঙ্গনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। এর সামনে হাতজোড় করি, ওর সামনে মুখ কাঁচুমাচু করে মাপ চাই! মাছ? কে দেয়নি মাছ? অর্ব্বাচীন যত কোথাকার। এই, এদিকে—নিয়ে এসো মাছের বালতি। যত সব হয়েচে—মানুষ চেনো না? রায়মশায়ের পাতে ঢালো মাছ। উনি যত পারেন, দেখছো না খাইয়ে লোক? খান, খান, আজকাল সব কেউ কি খেতে পারে? আপনাদের দেখলেও আনন্দ হয়। নিয়ে এসো, মুড়ো একটা বেছে এই পাতে। সন্দেশের বেলা এই পাত ভুলো না যেন। দয়া করে খান সব। আপনারা প্রবীণ, সমাজের মাথার মণি, ছেলে-ছোকরাদের কথায় রাগ করে? ছিঃ, আপনারা হুকুম করবেন, আমরা তামিল করবো। খান।

দু-একজন ভিন্ন গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ বললেন—এই তো! এতক্ষণ আপনি এলেই পারতেন ডাক্তারবাবু। কেমন মিষ্টি কথাবার্ত্তা ছাখো তো! পেটে বিদ্যে থাকলে তার ধরনই হয় আলাদা।

হেঁকে বললাম—এদিকে মাছ নিয়ে এসো বেছে বেছে। মুড়ো দাও একটা এখানে—

যে বেশি ঝগড়াটে, তার পাতে মাছের মুড়ো দিয়ে ঠাণ্ডা করি। সামাজিক ভোজে মাছের মুড়ো দেওয়া হয় সমাজের বিশিষ্ট লোকদের পাতে। চাঁপাবেড়ের ঈশান চক্কত্তির পাতে কস্মিন্‌কালে ভোজের আসরে মাছের মুড়ো পড়ে নি—কারণ সে ঝগড়াটে ও মামলাবাজ হোলেও গরীব। সে আজ বাধিয়ে তুলেছিল এক কাণ্ড, ওর পাতে মাছের মুড়ো দেওয়ার দুর্লভ সম্মানে লোকটার রাগ একেবারে জল হয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বললে—সন্দেশের সময় তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকো বাবাজি—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এই আমি দাঁড়ালাম, কোথাও যাচ্চি নে।

ভোজনপর্ব্ব সমাধানান্তে যে যার বাড়ী চলে গেল, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি ভাঁড়ার ঘর থেকে ডালঝোলদধিসন্দেশ মাখা হাতে ও কাপড়ে বেরিয়ে নিজের বাড়ী যেতে উদ্যত হয়েছি, মুখুয্যে জ্যাঠা পেছন থেকে ডেকে বললেন—কে যায়?

—আজ্ঞে, আমি শশাঙ্ক।

—খেয়েচ?

—আজ্ঞে না।

—কোথায় যাচ্চ তবে? সোনা ফেলে আঁচলে গেরো?

—সমস্ত দিনের ইয়ে—বাড়ী গিয়ে গা ধুয়ে—

—সে হবে না। গা এখানেই ধোও পুকুরঘাটে। সাবান কাপড় সব দিচ্চে।

—আজ্ঞে তা হোক জ্যাঠামশায়। আমি বরং—

মুখুয্যে জ্যাঠামশায় এসে আমার হাত ধরলেন।

—তা হবে না বাবাজি, তুমি যাচ্চ খাবে না বলে, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি আজ আমার জাত রক্ষে করেছ—তুমি না থাকলে আজ ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়েছিলো। খুব বাঁচিয়ে দিয়েচ বাবাজি। আমি তোমাকে আজ যে কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো, বেঁচে থেকো—দীর্ঘজীবী হও। চললে যে?

—আমি যাই—

—কেন?

—আপনি তো আমায় নেমন্তন্ন করেন নি জ্যাঠাবাবু?

আমার গলার মধ্যে একটু অভিমানের সুর এসে গেল কি ভাবে নিজের অলক্ষিতে।

মুখুয্যে জ্যাঠামশায় কাতরভাবে আমার হাত দুটো ধরে বললেন—আমার মতিচ্ছন্ন। রত্ন চিনতে পারি নি। তুমি আমার কানটা মলে দাও—দাও বাবাজি—

আমি জিভ কেটে হাত জোড় করে বিনীতভাবে বলি—ওকি কথা জ্যাঠামশায়? আমি আপনার ছেলের বয়সী, আমাকে ওকি কথা!

—বেশ, চল আমার সঙ্গে। পুকুরে নাইবে, সাবান দিচ্চি। তোমাকে না খাইয়ে আমি জলস্পর্শ করবো না। চলো—

সনাতনদা সেই রাত্রেই আমার বৈঠকখানায় এল। বললে—খুব ভায়া, খুব! দেখালে বটে একখানা!

—কি রকম?

—আজ তো উল্টে গিয়েছিল সব! তুমি এসে না সামলালে—খুব বাঁচান বাঁচিয়েচ।

আমার কেমন সন্দেহ হোল, আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—তোমার কাজ, সনাতনদা?

—কে বললে?

—তুমি ওদের উসকে দিয়েচ? ঈশান চক্কত্তিকে তুমি খাড়া করেছিলে?

—হ্যাঁ আমি না হতো—

—ঠিক তুমি। আমি নাড়ী টিপে খাই তা তুমি জানো? বলো, হ্যাঁ কি না?

সনাতনদা মুখ টিপে হাসতে লাগলো। বললে—তা তোমার অপমান তুমি তো গায়ে মাখলে না—আমাদের একটা কিছু বিহিত করতে হয়? তবে হ্যাঁ—দেখালে বটে! তুমি অন্য ডালের আম, আমাদের মত নও। যারা যারা জানে, সবাই দেখে অবাক হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ বোকাও বলছে।

আমি তিরস্কারের কড়াসুরে বললাম—এমন করে আমার উপকার করবে না সনাতনদা, অনিষ্টই করবে; আমি তোমাদের দলাদলির মাথায় ঝাড়ু মারি। আমি ওসবের উচ্ছেদ করবো বলেই চেষ্টা করচি। এতে যে আমার দলে থাকবে থাকো, নয়তো দূর হয়ে চলে যাও—গ্রাহ্যও করি নে। কুচুক্কুরেপনা যদি না ছাড়তে পারো—আমার সঙ্গে আর মিশো না।

সনাতনদা খুব দমে গেল, কিন্তু সেটা চাপবার চেষ্টায় সহাস্য স্বরে বললে—হয়েচে, নাও নাও। লেকচার রাখো, একটু চা করতে বলে দাও দিকি বৌমাকে।

মঙ্গলগঞ্জ ডিস্‌পেনসারির কাজ সেরে বার হয়েচি সেদিন, সকাল সকাল বাড়ী ফিরবো, নৌকো বাঁধা রয়েচে বাজারের ঘাটে, এমন সময় ভূষণ দাঁ এসে বললে—আজ যাঁবেন না ডাক্তারবাবু, আজ যে ঝুলনের বারোয়ারি—

—কখন?

—একটু অপেক্ষা করতে হবে, সন্দের পর আলো জ্বেলেই আসর লাগিয়ে দেবো।

—যাত্রা?

—না ডাক্তারবাবু, আজ খেমটা। ভালো দল এসেচে একটি। কেষ্টনগরের। অনেক কষ্টে স্থপারিশ ধরে তবে বায়না বাঁধা।

আমার তত থাকবার ইচ্ছা নেই। খেমটা নাচ দেখবার আমি পক্ষপাতী নই, তবুও ভাবলাম এ সব অজ পাড়াগাঁয়ে আমোদ-প্রমোদের তেমন কিছু ব্যবস্থা নেই, আজ বরং একটু থেকে দেখেই যাই। অনেকদিন কোন কিছু দেখি নি। একঘেয়ে ভাবে ডাক্তারিই করে চলচি।

এ সব জায়গায় খেমটা নাচওয়ালীদের বিশেষ খাতির, সেটা আমি জানি। বাজার সুদ্ধ মাতব্বর লোকেরা স্টেশনে যায় খেমটার দলের অভ্যর্থনা করতে। ওদের বিশ্বাস, খেমটা-ওয়ালীরা সবাই সুশিক্ষিতা ভদ্র ও শহুরে মেয়ে, তারা এ পাড়াগাঁয়ে এসে কোনরকম দোষ না ধরে, আদর যত্ন ও ভদ্রতার কোন খুঁৎ না বের করে ফেলে। ভূষণ দাঁ সব সময় হাত জোড় করে ওদের সামনে ঘুরচে, কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না! শ্রীশ দাঁর আড়তে খেমটার দলের জায়গা দেওয়া হয়েচে—এ গ্রামের মধ্যে ঐটিই সব চেয়ে বড় আর ভাল বাড়ী।

সনাতনদা এলে আজ বেশ হোত। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে, গল্প-গুজব করবার লোক থাকলে আনন্দে কাটে। বর্ষাকাল হলেও আজ দুদিন বৃষ্টি নেই। মঙ্গলগঞ্জের ঘাটের উপরেই একটা কদম গাছে থোকা থোকা কদম ফুল ফুটেচে। সজল মিঠে বাতাস, এখানে বৃষ্টি না হলেও অন্য কোথাও বৃষ্টি হয়েচে।

নেপাল প্রামাণিকের তামাকের দোকান বাজারের ঘাটের কাছেই। আমাকে একা বসে থাকতে দেখে সে এল। বললাম—নেপাল, একটু চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারো?

নেপাল তটস্থ হয়ে পড়লো।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখুনি ক'রে নিয়ে আসছি দোকান থেকে।

আমি বললাম—খেমটা আরম্ভ হতে কত দেরি?

—সন্দের পর হবে ডাক্তারবাবু। কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করবো?

—না, না, শুধু চা করো। আমার এখানেই হবে, স্টোভ আছে, সব আছে, কেবল দুধ নেই।

—দুধ আমি বাড়ী থেকে আনছি। খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে কষ্ট হবে আপনার। কখন খেমটা শেষ হবে, তখন বাড়ী যাবেন—সে অনেক দেরি হয়ে যাবে। খাবেন কখন? সে হয় না।

এখানকার বাজারের মধ্যে ভূষণ দাঁ ও নেপাল প্রামাণিক—এরা সব মাতব্বর লোক। ওরাই চাঁদা ওঠায়, বারোয়ারির আয়োজন করে বছর বছর। পাঁচজনে শোনেও ওদের কথা। আমি যখন এখানে ডাক্তারখানা খুলেছি, সকলকেই সন্তুষ্ট রাখতে হবে আমার। সুতরাং বললাম—তবে তুমি কি করতে চাও?

—খানকতক পরোটা ভাজিয়ে আনি আর একটু আলুর তরকারি।

—তার চেয়ে ডাক্তারখানায় স্টোভে দুটি ভাত চড়িয়ে দিক আমার কম্পাউণ্ডার।

—সে অনেক হাঙ্গামা। কোথায় হাঁড়ি, কোথায় বেড়ি, কোথায় চাল, কোথায় ডাল!

একটু পরে নেপাল চা করে নিয়ে এল, তার সঙ্গে চাল-ছোলা ভাজা। আমি বললাম—তুমিও বসো, এক সঙ্গে খাই।

নেপাল বসে বসে নানারকম গল্প করতে লাগলো। ওর জীবনটা বেশ। শোনাবার মত জিনিস সে গল্প। এ সব বাদলার বিকেলে চালছোলা-ভাজার সঙ্গে মজে ভাল।

বললাম—নেপাল, দুটি বিয়ে করলে কেন এক সঙ্গে?

—একসঙ্গে তো করি নি, এক বছর পর পর।

—কেন?

—প্রথম পক্ষের বৌ আমাকে না বলে বাপের বাড়ী পালিয়ে গেল, সেই রাগে তাকে ত্যাগ করবো বলে যে-ই দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছি, অমনি প্রথম পক্ষের বৌও সুড় সুড় করে এসে ঢুকলো সংসারে। আর নড়তে চাইলে না, সেই থেকেই আছে। দুজনেরই ছেলেমেয়ে হচ্চে। এখন মনে হয়, কি ঝকমারিই করেছি, তখন অল্প বয়স, সে বুদ্ধি কি ছিল ডাক্তারবাবু? এখন পাঁচ পাঁচটা মেয়ে, কি করে বিয়ে দেবো সেই ভাবনাতেই শুকিয়ে যাচ্ছি—আর একটু চা করি?

—বেশ।

দুজনেই সমান চা-খোর। রাত আটটা বাজবার আগে আমাদের দু-তিন বার চা হয়ে গেল। নেপাল বসে বসে অনেক সুখ দুঃখের কাহিনী বলে যেতে লাগলো। কোন্ পক্ষের বৌ ওকে ভালবাসে, কোন বৌ তেমন ভালবাসে না—এই সব গল্প।

—প্রথম পক্ষের বৌটা সত্যিই ভালো। সত্যিই ভালোবাসে। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলাম বটে কিন্তু ও আমার ওপর রাগ করে নি।

—ছোটবউ কেমন?

—ওই অমনি একরকম। সুবিধে না।

—কেন?

—তেমন আটা নেই কারো ওপর। আমার ওপরও না। থাকতে হয় তাই থাকে,

সংসার করতে হয় তাই করে।

—দেখতে কে ভালো ?

—বড়বৌ।

এমন সময় ভূষণ দাঁ নিজে এসে জানালে আসর তৈরী হয়েচে, আমি যেন এখুনি যাই।

নেপাল প্রামাণিক বললে—ডাক্তারবাবু, আপনার খাবার কি ব্যবস্থা হবে ?

—খেমটা দেখে চলে যাবো বাড়ীতে। গিয়ে খাবো।

—খেমটা ভাঙ্গতে রাত একটা। আপনার বাড়ী পৌছতে রাত সাড়ে তিনটে। ততক্ষণ না খেয়ে থাকবেন ? তার চেয়ে একটা কথা বলি।

—কি ?

—বলতে সাহস হয় না। চলুন, আমার বাড়ী। বড় বউকে বলেই এসেচি, আমি খেতে যাবার সময় সে আপনার জন্যে পরোটা ভেজে দেবে। আর যদি না যান, আমি কলাপাতে মুড়ে পরোটা ক'খানা এখানেই নিয়ে আসবো এখন।

—ওসব দরকার নেই, আর একবার চা খেলেই আমার ঠিক হয়ে যাবে।

—চাও করবো এখন আপনার স্টোভে। তার আর ভাবনা কি ? চা যতবার খেতে চান, তাতে দুঃখ নেই ! আপনি বসবেন, না, আসরে যাবেন ?

আসরে গিয়ে বসলাম। নিতাই শীলের কাপড়ের দোকান ও হরি ময়রার সন্দেশ মুড়কির দোকানের পিছনে যে ফাঁকা জায়গা, ওখানটায় পাল খাটানো হয়েচে। তার তলায় বড় আসর। আসরের চারিদিকে বাঁশের রেলিং। চাষাভূষো লোকের জন্যে আসরের বাইরে দরমা পাতা, ভেতরে বড় শতরঞ্চি ও মাদুর বিছানো। চার-পাঁচটা বড় বড় ঝাড় ও বেল ঝুলচে, দুটো হ্যাজাক লণ্ঠন। মোটের উপর বেশ আলো ফুটেচে আসরে। আমি যখন গেলুম, তখন খেমটা নাচ আরম্ভ হয়েচে।

একপাশে খানকতক চেয়ার বেঞ্চি পাতা, স্থানীয় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্যে। আমাকে সবাই হাত ধরে খাতির করে চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসালে।

পাশে বসে আছে মঙ্গলগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রামহরি সরকার—পাশের গ্রামে বাড়ী, জমিজমাযুক্ত পাড়াগাঁয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ। পেটে 'ক' অক্ষর নেই, ধূর্ত ও মামলাবাজ। তার সঙ্গে বসেচে গোবিন্দ দাঁ, ভূষণ দাঁর জ্যেঠতুতো ভাই—কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটে রংয়ের দোকান আছে, পয়সাওয়ালা, মূর্খ ও কিছু অহঙ্কারী। সে নিজেকে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদারদের একজন বলে গণ্য করে, এখানে পাড়াগাঁয়ে এসে এই সব ছোট গানের আসরে ছোটখাটো ব্যবসাদারদের সঙ্গে দেমাকে নাক উঁচু করে বসেছে। আমায় সে চেনে, একবার ওর ছোট নাতির ঘুংড়ি-কাসির চিকিৎসা করেছিলাম এই মঙ্গলগঞ্জে আর-বারে। ওর ওপাশে বসেচে কুঁদিপুর গ্রামের আবদুল হামিদ চৌধুরী, ঐ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও লোকালবোর্ডের মেম্বার। আবদুল হামিদের বাড়ী একচল্লিশ গোলা ধান, এ অঞ্চলের বড় ধেনো মহাজন, দশ-পনেরোখানা গ্রামের কৃষক সব আবদুল হামিদের খাতক প্রজা। তার পাশে বসে আছে

কলাধরপুরের প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, জাতে কলু, তিনপুরুষে ব্যবসাদার। হাতে আগে যত টাকা ছিল, এখন তত নেই, সরষের ব্যবসায়ে ক'বার ধরে লোকসান দিয়ে অনেক কমে গিয়েচে। প্রহ্লাদ সাধুখাঁর ভাই নরহরি সাধুখাঁ তার ডানপাশেই বসেচে। নরহরি এই মঙ্গলগঞ্জে ধানপাটের আড়তদারি করে।

গোবিন্দ দাঁ পকেট থেকে একটি সিগারেট বার করে বললে—আসুন ডাক্তারবাবু!

—ভাল আছেন?

—বেশ আছি। আপনি?

—মন্দ নয়।

—এ পাড়াগাঁ ছেড়ে আর কোথাও জায়গা পেলেন না? কতবার বললাম—

—আপনাদের মত বড়লোক তো নই। অন্য জায়গায় গেলে চলতে পারে কি? কি রকম চলচে আপনাদের ব্যবসা?

—আগের মত নেই, তবুও এক রকম মন্দ নয়।

আবদুল হামিদ চৌধুরী বললে—কতক্ষণ এলেন ডাক্তারবাবু?

—তা দুপুরের পরই এসেচি। এতক্ষণ চলে যেতাম, ভূষণ দাঁ গিয়ে ধরলে গান না শুনে যেতে পারবো না। ভালো সব?

—খোদার ফজলে একরকম চলে যাচ্চে। আমাদের বাড়ীতে একবার চলুন।

—আমি ডাক্তার মানুষ, বাড়ীতে নিয়ে গেলেই ভিজিট দিতে হবে, জানেন তো?

—ভিজিট দিতে হয়, ভিজিট দেওয়া যাবে। একদিন গিয়ে একটু দুধ খেয়ে আসবেন।

কলাধরপুরের প্রহ্লাদ সাধুখাঁ হেসে বললে—সে ভাল তো ডাক্তারবাবু। ট্যাকাও পাবেন, আবার দুধও খাবেন। আপনাদের অদেষ্ট ভাল। যান, যান—

রামহরি সরকার এতক্ষণ কথা বলবার ফাঁক পাচ্ছিল না, সেও একজন যে-সে লোক নয়, মঙ্গলগঞ্জ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। পাড়াগাঁ অঞ্চলে এ সব পদে যারা থাকে, তারা নিজেদের এক একজন কেষ্টবিষ্টু বলে ভাবে, উন্নাসিক আভিজাত্যের গর্ব্বে সাধারণ লোক থেকে একটু দূরে রাখে নিজেকে।

রামহরি এই সময় বললে—ডাক্তার আর এই গিয়ে পুলিশ, এদের সঙ্গে ভাব রাখাও দোষ, না রাখাও দোষ। পরশু আমার বাড়ী হঠাৎ বড় দারোগা এসে তো ওঠলেন। তখুনি পুকুর থেকে বড় মাছ তোলালাম, মাছের ঝোল ভাত হোল।

আবদুল হামিদ চৌধুরীর মনে কথাটা লাগলো। সেও তো বড় কম নয়, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার, পুলিশ কি শুধু রামহরি সরকারের বাড়ীতেই আসে, তার ওখানেও আসে। সুতরাং সে বললে—ও তো আমার বাড়ী দুবেলা ঘটচে। সে দিন বড়বাবু আর মেজবাবু একসঙ্গে এ্যালেন আশুডাঙা খুনী কেসের এন্‌কোয়ারী সেরে। দুপুর বেলা, ভাত খেয়ে চক্ষু একটু বুজেচি, দুই ঘোড়া এসে হাজির। তখুনি খাসি মারা হোল একটা, সরু চালের ভাত আর খাসির মাংস হোল।

রামহরি বললে—রঁাধলে কে ?

—ওই দোবেজি বলে এক কনেস্টবল আছে না ? সে-ই রঁাধলে।

—মাংস রঁাধলে দোবেজি ?

—না, মাংস রঁাধলে বড়বাবু নিজে। ভাল রসুই করেন।

গোবিন্দ দাঁর ভাল লাগছিল না এ সব কথা, সে যে বড় তা দেখানোর ফুরসত সে পাচ্চে না। এরা তো সব পাড়াগাঁয়ে প্রেসিডেন্ট। এরা পুলিশকে খাতির করলেও সে থোড়াই কেয়ার করে। খাস কলকাতা শহরে ব্যবসা তার, সেখানে শুধু ওঁরা জানে লাট সায়েবকে আর পুলিশ কমিশনারকে।

গোবিন্দ বললে—পুলিশের হ্যাপা আমাদেরও পোয়াতে হয়। সেবার হলো কি, আমরা হ্যাবাক জিংকের পিপে কতগুলো রেখেচি দালানে, তাই সার্চ করতে পুলিশ এল।

আমি বললাম—কিসের পিপে ?

—হ্যাবাক জিংকের পিপে। ব্যাপারটা কি জানেন, বিলিতি হ্যাবাক জিংকের হন্দর সাড়ে উনিশ টাকা, আর সেই জায়গায় জাপানী জিংকের হন্দর সাড়ে সাত টাকা। আমরা করি কি, আপনার কাছে বলতে দোষ কি—বিলিতি হ্যাবাক জিংকের খালি পিপে কিনে তাতে জাপানী মাল ভরতি করি।

—কেউ ধরতে পারে না ?

—জিনিস চেনা সোজা কথা না। ও ব্যবসার মধ্যে যারা আছে, তারা ছাড়া বাইরের লোকে কি চিনবে ? চেনে মিস্ত্রিরা, তাদের সঙ্গে—

গোবিন্দ দুই আঙুলে টাকা বাজাবার মুদ্রা করলে।

প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কথাটা মন দিয়ে শুনছিল, লাভের গন্ধ যেখানে, সেখানে তার কান খাড়া হয়ে উঠবেই, কারণ সে তিন-তিন পুরুষ ব্যবসাদার। সে বললে—বলেন কি দাঁ মশায়, এত লাভ ? গোবিন্দ ধূর্ত্ত হাসির আভাস মাত্র মুখে এনে গলার স্বরকে ঘোরালো রহস্যময় করে বললে—তা নইলে কি আজ কলকাতা শহরে টিকতে পারতাম সাধুখাঁ মশাই ? আমার দোকানের পাশে ডি, পাল এ্যাণ্ড সন্—লক্ষপতি ধনী, টালা থেকে টালিগঞ্জ এস্তোক আঠারো-খানা বাড়ী ভাড়া খাটচে, বড়বাবু মেজবাবু নিজের নিজের মোটরে দোকানে আসেন, সে মোটর কি সাধারণ মোটর ? দেখবার জিনিস। তাদের বলা যায় আসল বড়বাবু মেজবাবু। মেয়ের বিয়েতে সতেরো হাজার টাকা খরচ করলে। মোটর গাড়ী থেকে নেমে আমার দোকানে এসে হাতজোড় করে নেমন্তন্ন করে গেলেন। আসল বড়বাবু মেজবাবু তাঁদের বলা যেতে পারে। নইলে আর সব—হুঁ—

আবদুল হামিদ চৌধুরী পুলিশের দারোগাদের বড়বাবু ছোটবাবু বলেছিল একটু আগে। সে এ বক্রোক্তি হজম করবার পাত্র নয়। বললে—তা আমরা পাড়াগাঁয়ে মানুষ, আমাদের কাছে ওঁরাই আসল বড়বাবু, মেজবাবু ? এখানে তো আপনার কলকাতার বাবুরা আসবেন না মুশকিলের আসান করতে ? এখানে মুশকিলের আসান করবে পুলিশই।

প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কুঁদিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বাস করে সুতরাং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ চৌধুরীকে তুষ্ট রাখার তার স্বার্থ আছে। সে আবদুল হামিদকে সমর্থন করে বললে—ঠিক বলেচেন মৌলবী সাহেব, ঠিক বলেচেন। কলকাতার বাবুদের কি সম্পর্ক ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—সে কথা হচ্চে না। আসল বড়লোকের কথা হচ্চে। তোমার এখানে যদি চুনোপুঁটি মাছের টাকা টাকা সের হয়, তবে কি পুঁটি মাছের কদর রুই মাছের সমান হবে ? পাড়াগাঁয়ে সব সমান, বলে, বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। ডাক্তারবাবু কি বলেন ?

এই সময় আমার চোখ পড়লো আসরের দিকে, তুটি সুসজ্জিতা খেমটাওয়ালী লঘু পদ-বিক্ষেপে আসরে ঢুকল। একটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয় বরং বেশি। সমস্ত গায়ে গহনা—গিল্‌টির কি সোনার, বোঝবার উপায় নেই। গায়ের রংয়ের জলুস অনেকটা কমে এসেচে। ওর পেছনে যে মেয়েটি ঢুকল তার বয়স কম, ষোল কি সতেরো কিংবা অতও নয়, শ্যামাঙ্গী, চোখ তুটিতে বুদ্ধি ও তুষ্টুমির দীপ্তি, অত্যন্ত আঁটসাঁট বাঁধুনি, সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোথাও ঢিলেঢালা নেই, মুখশ্রী সুন্দর, সব চেয়ে দেখবার জিনিস তার মাথার ঘন কালো চুলের রাশ—মনে হয় সে চুল ছেড়ে দিলে যেন হাঁটুর নীচে পড়বে। এর গায়ে তত গহনার ভিড় নেই, নীল রঙের শাড়ী ও কাঁচুলি চমৎকার মানিয়েচে নিটোল-গড়ন দেহটিতে।

ওরা নাচ গান আরম্ভ করেচে।

বড় মেয়েটি নাচতে নাচতে আমাদের কাছে আসচে, কারণ সে বুঝেচে এই চাষাভূষোর ভিড়ের মধ্যে আমরাই সম্ভ্রান্ত। সে মেয়েটা বার বার এসে আমাদের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে লাগলো।

আবদুল হামিদ চৌধুরী তুটাকা প্যালা দিলে। প্যালা দিয়ে সে সগর্বে আমাদের দিকে চাইতে লাগলো। গোবিন্দ দাঁ সেটা সহ্য করতে পারলে না, পাড়াগাঁয়ের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কি তাদের মত শাঁসালো ব্যবসাদারের কাছে লাগে ? থাকলেই বা বাড়ীতে একচল্লিশটা ধানের গোলা। অমন ধেনো মহাজনকে ক্লাইভ স্ট্রীট ও রাজা উডমণ্ট স্ট্রীটের রঙ ও হার্ডওয়ারের বাজারে এবেলা কিনে ওবেলা বেচতে পারে, এমন বহুত ধনী সওদাগর তার দোকানে এসে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন করে যায়।

গোবিন্দ দাঁ একটা রুমালে তুটি টাকা বেঁধে খেমটাওয়ালীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

আমি এ পর্যন্ত কিছু দিই নি, শেষ অবধি যখন কৃপণ প্রহ্লাদ সাধুখাঁও একটা টাকা প্যালা দিয়ে ফেললে, তখন আমার কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো। না দিলে এই সব অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে লোক, যারা নিজেদের যথেষ্ট গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত বলে ভাবে, তারা আমার দিকে কৃপার চোখে চাইবে। এরা ভাবে খেমটার আসরে বসে খেমটাওয়ালীকে প্যালা দেওয়াটা খুব একটা ইজ্জতের কাজ বুঝি। এ নিয়ে আবার এদের আড়াআড়ি ও বাদাবাদি চলে। এক রাত্রে আসরে বসে বিশ-চল্লিশ টাকা প্যালা দিয়ে ফেলেছে ঝোঁকের মাথায়, এমন লোকও দেখেচি।

এবারে নাচওয়ালীটি আমার কাছে এসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে লাগলো :

'ও সই পিরিতির পসরা নিয়ে ঘুরে মরি দেশ বিদেশে'—

আমারই সামনে এসে বার বার গায়, ভাবটা বোধ হয় এই, সবাই দিচ্ছে তুমি দেবে না কেন। আমার পকেটে আজকার পাওনা দশ বারোটি টাকা রয়েচে বটে, কিন্তু আমি ভাবছি, ওদের দেখাদেখি আমি যদি এই নর্ত্তকীদের পাদপদ্মে এতগুলো টাকা বিসর্জ্জন দিই তবে সে হবে ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ।

এই সময় আমার নাকের কাছে রুমাল ঘুরিয়ে আবদুল হামিদ চৌধুরী আবার দুটাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলে খেমটাওয়ালীর দিকে। দেখাদেখি আরও দু-তিন জন প্যালা দিলে এগিয়ে গিয়ে।

এইবার সেই অল্পবয়সী নর্ত্তকীটি আমার কাছে এসে গান গাইতে লাগলো। বেশি বয়সের মেয়েটিই ওকে আমার সামনে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলে, সেটা আমি বুঝতে পারলাম। ও তো হার মেনে গেল, এ যদি সফল হয় কিছু আদায় করতে।

আমি প্রথমটা ও মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখি নি। এখন খুব কাছে আসতে ভাল করে চেয়ে দেখলাম যে বেশ দেখতে। রঙ ফরসা নয় বটে কিন্তু একটি অপূর্ব্ব কমনীয়তা ওর সারা দেহে। ভারী চমৎকার বাঁধুনি শরীরের। যতবার আমার কাছে এল, ওর ঢল ঢল লাবণ্য-ভরা মুখ ও ডাগর কালো চোখ দুটি আমার কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠতে লাগলো। গলার স্বরও কি সুন্দর, অমন কণ্ঠস্বর আমি কখনো শুনি নি কোন মেয়ের।

আমাদের গ্রামে শান্তি বেশ সুন্দরী মেয়ে বলে গণ্য, কিন্তু শান্তি এর পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারে না।

আবার মেয়েটি ঠিক আমার সামনে এসেই গান গাইতে লাগলো। আমার দিকে চায়, আবার লজ্জায় মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়, আবার আমার দিকে চায়—সে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গি। আমার মনে হোল, এখনো ব্যবসাদারি শেখেনি মেয়েটি, শুধু অন্য নর্ত্তকীটির শিক্ষায় ও এমনি করচে। বোধ হয় তাকে ভয় করেও চলতে হয়।

হঠাৎ কখন পকেটে হাত দিয়ে দুটি টাকা বার করে আমি সলজ্জ ও সকুণ্ঠভাবে মেয়েটির সামনে রাখলাম। মেয়েটি আমায় প্রণাম জানিয়ে টাকা দুটি তুলে নিলে।

গোবিন্দ দাঁ ও আবদুল হামিদ চৌধুরী একসঙ্গে বলে উঠলো—বলিহারি!

আরও দুবার মেয়েটি আমার কাছে ঘুরে ঘুরে গেল। আমি দুবারই তাকে টাকা দেবার জন্যে তুলেও আবার পকেটে ফেললাম। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগলো, দিতে পারলাম না পাছে আবদুল হামিদ কি গোবিন্দ দাঁ কিংবা প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কিছু মনে করে। কিন্তু কি ওরা মনে করবে, কেন মনে করবে, এসব ভেবেও দেখলাম না।

আবদুল হামিদ আমায় একটা সিগারেট দিলে, অন্যমনস্ক ভাবে সেটা ধরিয়ে আবার নাচের দিকে মন দিলাম।

অনেক রাত্রে নাচ বন্ধ হোল। গোবিন্দ দাঁ বললে—ডাক্তারবাবু, বাকী রাতটুকু গরীবের বাড়ীতেই শুয়ে থাকুন, রাত তো বেশি নেই, সকালে চা খেয়ে—

আমার মন যেন কেমন চঞ্চল। কিছু ভাল লাগচে না। কোথাও রাত কাটাতে আমার ইচ্ছে নেই। মাঝিকে নিয়ে সেই রাত্রেই নৌকো ছাড়লাম। গভীর রাত্রের সজল বাতাসে একটু ঘুম এল ছইয়ের মধ্যে বিছানায় শুয়ে। সেই অল্পবয়সী মেয়েটি আমার চোখের সামনে সারা রাত নাচতে লাগলো। এক একবার কাছে এগিয়ে আসে, আমি রুমাল বেঁধে প্যালা দিতে যাই, সে তখুনি হেসে দূরে সরে যায়, আবার কিছুক্ষণ পরে কাছে এগিয়ে আসে।

মাঝির ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। মাঝি বলছে—উঠুন বাবু নৌকো ঘাটে এসেচে।

উঠে দেখি ওপারের বড় শিমুল গাছটার পিছনে সূর্য্য উঠেছে, বেলা হয়ে গিয়েচে। দীনু বাড়ুই ঘাটের পাশে জেলে-ডিঙিতে বসে মাছ ধরচে, আমায় দেখে বললে—ডাক্তারবাবু রাত্তিরি ডাকে গিয়েছিলেন? কনেকার রুগী?

পরদিন মঙ্গলগঞ্জে যাবার দিন নয়।

সুরবালা বললে—ওগো আজ ও পাড়ার অজিত ঠাকুরপোর মেয়েকে দেখতে আসবে। তোমাকে সেখানে থাকতে বলেচে।

আমি বললাম—আজ আমার থাকা হবে না।

—কেন, আজ আবার সেখানে? শক্ত রোগী আছে বুঝি?

—না। ওদের বারোয়ারি লেগেচে। আমি না থাকলে চলবে না।

মনে মনে কিন্তু বুঝলাম, কথাটা খাঁটি সত্যি নয়! আমার সেখানে না থাকলে খুব চলবে। ওদের আছে প্রেসিডেন্ট রামহরি সরকার, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের রঙের দোকানের মালিক গোবিন্দ দাঁ, কলাধরপুরের প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, কুঁদিপুরের প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ চৌধুরী, আরও অনেকে। আমাকে ওরা যেতেও বলে নি।

এই বোধ হয় জেনে শুনে প্রথম মিথ্যা কথা বললাম সুরবালাকে।

আমায় যেতে হবে কেন তা নিজেও ভাল জানি নে।

মনে মনে ভাবলাম—নাচ জিনিসটা তো খারাপ নয়! ওটা সবাই মিলে খারাপ করেচে। দেখে আসি না, এতে দোষটা আর কি আছে? সকালে সকালে চলে আসবো।

দীনু বাড়ুই আজও জিজ্ঞাসা করলে—বাবু, রুগী দেখতে চললেন বুঝি?

ওর প্রশ্নে আজ যেন বিরক্ত হয়ে উঠি। যেখানেই যাই না কেন তোর তাতে কি রে বাপু? তোকে কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে না কি? মুখে অবিশ্যি কিছু বললাম না।

মাঝিকে বললাম—একটু তাড়াতাড়ি বাইতে কি হচ্চে তোর? ওদিকে আসর যে হয়ে গেল—

খেমটার প্রথম আসরেই আমি একেবারে সামনে গিয়ে বসলাম। আবদুল হামিদ আজও আমার পাশে বসেছে। অন্যান্য সব বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যারা কাল উপস্থিত ছিল, আজও

তারা সবাই রয়েচে, যেমন, প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, ওর ভাই নরহরি সাধুখাঁ, গোবিন্দ দাঁ, ইত্যাদি। আমি যেতেই সবাই কলরব করে উঠলো—আসুন, ডাক্তারবাবু, আসুন।

আবার সেই অল্পবয়সী মেয়েটি ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসে হাজির হোতেই আমি দুটি টাকা প্যালা দিয়ে দিলাম সকলের আগে। পকেট ভরে আজ টাকা নিয়ে এসেছি প্যালা দেওয়ার জন্যে। আবদুল হামিদ যে আমার নাকের সামনে রুমাল ঘুরিয়ে প্যালা দেবে, তা আমার সহ্য হবে না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

আবদুল হামিদের চোখে বড় হবার জন্যেই কি পকেট পুরে টাকা এনেছি প্যালা দেবার জন্যে?

নিজের কাছেই নিজের মনোভাব খুব স্পষ্ট নয়।

আবদুল হামিদ আমার দেখাদেখি দুটাকা প্যালা দিলে।

আমার চোখ তখন কোনো দিকে ছিল না। আমি এক দৃষ্টে সেই অল্পবয়সী মেয়েটিকে দেখচি। কি অপূর্ব্ব ওর মুখশ্রী! টানা টানা ডাগর চোখ দুটিতে যেন কিসের স্বপ্ন মাখা। ওর সারা দেহে কি হাড় নেই? এমন লীলায়িত ভঙ্গিতে দেহ-লতায় হিল্লোল তুলেচে তবে কি করে? নারীদেহ এমন সুন্দরও হয়!

মেয়েটি আমার দিকে আবার এগিয়ে আসচে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে। কিন্তু ওর মুখে চোখে বেপরোয়া ভাব নেই, ব্রীড়া ও কুণ্ঠায় চোখের পাতা দুটি যেন আমার দিকে এগিয়ে আসার অর্দ্ধপথেই নিমীলিত হয়ে আসচে। সে কি অবর্ণনীয় ভঙ্গি!

আর গান?

সে গানের তুলনা হয় না। কিন্নরকণ্ঠ বলে একটা কথা শোনাই ছিল, কখনো জানতাম না সে কি জিনিস। আজ ওর গলা শুনে মনে হোল, এই হোল সেই জিনিস। এ যদি কিন্নরকণ্ঠী না হয়, তবে কার প্রতি ও বিশেষণ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হবে?

আবদুল হামিদ এতক্ষণ কি বলেচে আমি শুনতে পাই নি। সে এবার আমার পা ঠেলতেই আমি যেন অনেকটা চমকে উঠলাম। দুপাটি দাঁত বের করে আমার সামনে একটা সিগারেট ধরে সে বলচে—শুনতে পান না যে ডাক্তারবাবু! নিন্—

আমার লজ্জা হোল। কি ভেবে আবদুল হামিদ একথা বলচে কি জানি। ও কি বুঝতে পেরেচে যে আমি ওই মেয়েটিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখচি? বোধ হয় পারে নি। কত লোকই তো দেখচে, আমার কি দোষ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—একবার কলকাতায় গেলে আমার দোকানে পায়ের ধুলো দেবেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেন যাবো না?

—আমড়াতলা গলির রায় চৌধুরীদের দেখেচেন?

—না।

—মস্ত বাড়ী আমড়াতলা লেনের মুখেই। টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে, যাকে বলে বড়লোক—

—ও!

—সেবার আমাকে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করলে। তা ভাবলাম, অত বড়লোক, কি দিয়ে মুখ দেখি? একটা সোনার কাজললতা গড়িয়ে নিলাম রাধাবাজারে কুণ্ডু কোম্পানীর দোকান থেকে। আর খাওয়ানো কি! এ সব পাড়াগাঁয়ে শুধু কচুঘেঁচু খেয়ে মরে। দেখে আসুক গিয়ে কলকাতায় বড়লোকের বাড়ী—

—ঠিক তো।

আবদুল হামিদ এতক্ষণ নিজের কথা বলতে পায় নি। এবার সে ফাঁক বুঝে বললে—তা ঠিক, দাঁ মশায় যা বলেচেন। সেবার আমার ইউনিয়নের সাতটা টিউবওয়েল বসাবো। বড়বাবু নিজে থেকে টিউবওয়েলের স্যাঙ্কসন করিয়ে দিলেন। গ্যালাম নিজে কলকেতায়। বলি, নিজে নিয়ে এলে দুপয়সা সস্তা হবে। নিজের ইউনিয়নের কাজ নিজের বাড়ীর মত দেখতে হবে। নইলে এত ভোট এবার আমাদের দেবে কেন? সবাই বলে, চৌধুরী সাহেব আমাদের বাপ-মা। তারপর হোল কি—

রামহরি সরকার বড় অসহিষ্ণুভাবে বললে, ভোটের কথা যদি ওঠালেন, চৌধুরী সাহেব, এবার দু নম্বর ইউনিয়ন থেকে আমার ভোট যা হয়েচে—ফলেয়ার হারান তরফদার দাঁড়িয়েছিল কি-না—ফলেয়ার যত ভোট সব তার—তা, ভাবলাম, এবার আর হোল না বুঝি। কিন্তু গাজিপুর, মঙ্গলগঞ্জ, আর নেউলে-বিষ্ণুপুর এই ক'খানা গাঁয়ের একজন লোকও ভোট দিয়েছিল হারান তরফদারকে?

গোবিন্দ দাঁ'র ভাল লাগছিল না। কি পাড়াগাঁয়ের ভোটাভুটির কাণ্ড সে এখানে বসে শুনবে? ছোঃ, কলকাতায় কর্পোরেশনের কোনো ধারণাই নেই এদের।

সেবার—। গোবিন্দ দাঁ গল্পটা কেঁদেছিল সবে, এমন সময় সেই অল্পবয়সী নর্ত্তকীটি ঘুরতে ঘুরতে আবার আমাদের কাছে এল। এবার সত্যিই বুঝলাম, সে আমার মুখের দিকে বার বার চাইচে, চাইচে আর চোখ ফিরিয়ে নিচ্চে। সে এক পরম সুশ্রী ভঙ্গি। অথচ আমি প্যালা দিচ্চি না আর। আবদুল হামিদ এর মধ্যে দুবার টাকা দিয়েচে।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, সেই জন্যেই বা মেয়েটি বার বার আমার কাছে আসচে। আচ্ছা এবারটা দেখি। এক পয়সা প্যালা দেবো না।

এবার রামহরি সরকার ও গোবিন্দ দাঁ এক সঙ্গে প্যালা দিলে।

আমি জানি এসব পল্লীগ্রামের খেমটা বা ঢপকীর্ত্তনের আসরে, প্যালা দেওয়ার দস্তুরমত প্রতিযোগিতা চলে গ্রাম্য বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে। অমুক এত দিয়েচে, আমিই বা কম কিসে, আমি কেন দেবো না—এই হোল আসল ভাব। কে কেমন দরের লোক এই থেকেই নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। আমি সবই জানি, কিন্তু চুপ করে রইলাম। এর কারণ আছে। আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই।

এ সময় নেপাল প্রামাণিক এসে হাজির হোল।

বললে—আজ আমার ওখানে একটু চা খাবেন ডাক্তারবাবু।

—তোমার ওখানে সেদিন চা তো খেয়েছি—আজ আমার ডাক্তারখানায় বরং তুমি আর আবদুল হামিদ চা খেও।

গোবিন্দ দাঁ বললে—আমি বুঝি বাদ যাবো ?

—বাদ যাবে কেন ? চলো আমার সঙ্গে।

—তা হোলে আমার বাড়ীতে আপনি রাতে পায়ের ধুলো দেবেন বলুন ?

—এখন সে কথা বলতে পারি নে। কত রাতে আসর ভাঙবে, কে জানে ?

—সমস্ত রাত দেখবেন ?

—দেখি। ঠিক বলতে পারি নে।

আবার মেয়েটি ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসেচে। কি জানি ওর মুখে কি আছে, আমি যতবার দেখচি, প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু, অপূর্ব্ব কিছু চোখে পড়ছে। অনেক মেয়ে দেখেচি জীবনে, কিন্তু অমন মুখ অমন চোখ আমি কারো দেখেচি বলে মনে তো হয় না।

আমি এবারেও প্যালা দিলাম না।

কিন্তু একবার ওর মুখের দিকে চাইতেই দেখি ও আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে।

আমার অত্যন্ত আনন্দ হোল হঠাৎ! অকারণ আনন্দ।

ওই অপরিচিতা বালিকাটি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, এতে আমার আনন্দের কারণ কি ? কে বলবে ?

সেই আনন্দের অদ্ভুত মুহূর্ত্তে আমার মনে হোল, আমি সব যেন বিলিয়ে দিতে পারি, যা কিছু আমার নিজস্ব আছে। সব কিছু দিয়ে দিতে পারি। সব কিছু। তুচ্ছ পয়সা, তুচ্ছ টাকা-কড়ি।

সেই মুহূর্ত্তে দুটাকা প্যালা হাত বাড়িয়ে দিতে গেলাম, মেয়েটি সাবলীল ভঙ্গিতে আমার সামনে এসে আমার হাত থেকে টাকা দুটি উঠিয়ে নিলে। আমার হাতের আঙুলে ওর আঙুল ঠেকে গেল। আমার মনে হোল ও ইচ্ছে করে আঙুলে আঙুল ঠেকালে। অনায়াসে টাকা দুটি তুলে নিতে পারতো সন্তর্পণে।

চোখ বুজে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলাম।

হঠাৎ এই খেমটার আসর আমার কাছে অসাধারণ হয়ে উঠলো! আমার সাধারণ অস্তিত্ব যেন লোপ পেয়ে গেল। আমি যুগযুগান্ত ধরে খেমটা নাচ দেখচি এখানে বসে। আমি অমর, বিজর, বিশ্বে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। যুগযুগান্ত ধরে ওই মেয়েটি আমার সামনে এসে অমনি নাচচে।

ওর অঙ্গুলির স্পর্শে আমার অতি সাধারণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন জীবন ভূমার আনন্দ আস্বাদ করল। অতি সাধারণ আমি অতি অসাধারণ হয়ে উঠলাম। আরও কি কি হোল, সেসব বুঝিয়ে বলবার সাধ্য নেই আমার। আমি গ্রাম্য ডাক্তার মানুষ, এ গ্রামে ও গ্রামে রোগী

দেখে বেড়াই, সনাতনদা'র সঙ্গে গ্রাম্য-দলাদলির গল্প করি, একে ওকে সামাজিক শাসন করি, আর এই প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, নেপাল প্রামাণিক, ভূষণ দাঁয়ের মত লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়াই। আমি হঠাৎ এ কি পেয়ে গেলাম? কোন্ অমৃতের সন্ধান পেলাম আজ এই খেমটা নাচের আসরে এসে? আমার মাথা সত্যিই ঘুরচে। উগ্র মদের নেশার মত নেশা লেগেচে যেন হঠাৎ। কি সে নেশার ঘোর, জীবনভোর এর মধ্যে ডুবে থাকলেও কখনো অনুশোচনা আসবে না আমার।

নেপাল প্রামাণিক বললে—তাহোলে আমি বাড়ী থেকে দুধ নিয়ে আসি। ক'পেয়ালা চা হবে?

আমি সবিস্ময়ে বললাম—কিসের চা?

—এই যে বললেন আপনার ডাক্তারখানায় চা হবে।

—ও! দুধ?

—হ্যাঁ, দুধ না হোলে চা হবে কিসে!

আবদুল হামিদ মন্তব্য করলে—ডাক্তারবাবুর এখন উঠবার ইচ্ছে নেই।

আমার বড় লজ্জা হোল। ও বোধ হয় বুঝতে পেরেচে আমার মনের অবস্থা। ও কি কিছু লক্ষ্য করেচে?

আমি বললাম—চলো চলো, চা খেয়ে আসা যাক। ততক্ষণ নেপাল দুধ নিয়ে আসুক।

আধঘণ্টা পরে আমার ডাক্তারখানায় বসে সবাই চা খাচ্চি, গোবিন্দ দাঁ বলে উঠলো—ছোট ছুঁড়িটা বেশ দেখতে কিন্তু। না?

আবদুল হামিদ ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে অমনি বললে—আমিও তাই বলতে যাচ্ছি—বড্ড চমৎকার দেখতে। ডাক্তারবাবু কি বলেন?

—কে? হ্যাঁ—মন্দ নয়।

গোবিন্দ দাঁ বললে—মন্দ নয় কেন? বেশ ভালো।

আমি বললাম—তা হবে।

আবদুল হামিদ বললে—ছুঁড়িটার বয়স কত হবে আন্দাজ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—তা বেশি নয়। অল্প বয়েস।

—কত?

—পনেরো কিংবা ষোল। দেখলেই বোঝা যায় তো—

আবদুল হামিদ সশব্দে হেসে বলে উঠলো—হ্যাঁ, ওসব যথেষ্টই ঘেঁটেচেন আমাদের দাঁ মশায়। ওঁর কাছে আর আমাদের—

ওদের কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগছিল না। ওদের এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই বললাম—চলো চা খাইগে। রাত হয়ে যাচ্চে। আমি এখান থেকে অনেক দূর চলে যেতে চাই ওদের সঙ্গ ছেড়ে। ওরা যে মেয়েটির দিকে বার বার চাইবে, এও আমার অসহ্য—

সুতরাং ওদেরও সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

নেপাল প্রামাণিক দুধ নিয়ে এল। আমি সকলকে চা পরিবেশন করলাম।

আবদুল হামিদ বললে—একদিন এখানে ফিস্ট করুন ডাক্তারবাবু, আমি একটা খাসি দেবো।

গোবিন্দ দাঁ পিছপাও হবার লোক নয়, সে বললে—আমি কলকাতা থেকে ভাদুয়া ঘি আনিয়ে দেবো। হুজুরিমল রণছোড়লাল মস্ত বড় ঘিয়ের আড়তদার, পোস্তার খাঁটি পশ্চিমে ভাদুয়া। আমার সঙ্গে যথেষ্ট খাতির। আমাদের দোকান থেকে রঙ নেয় ওরা। সেবার হোল কি—

রামহরি সরকার ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে—কিসের পশ্চিমের ঘি? আমার ইউনিয়নে যা গাওয়া ঘি মেলে, তার কাছে ওসব কি বললে ভাদুয়া মাদুয়া লাগে না। দেড় টাকা সের গাওয়া ঘি কত চাই? এখনি হুকুম করলে দশ সের ঘি নিয়ে এসে ফেলবে। করুন না ফিস্টি।

এরা যে আবার আসরে গিয়ে বসে, এ যেন আমি চাই নে। ছুতো নাতায় দেরি হয়ে যাক এ আমারও ইচ্ছে। সুতরাং আমি এদের ওই স্থূল ধরনের কথাবার্ত্তায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলাম। আরও পাঁচরকম ঘি-এর কথা হোল, কি কি খাওয়া হবে তার ফর্দ্দ হোল, কবে হতে পারে তার দিন স্থির করতে কিছু সময় কাটলো। ওরা আসরে গিয়ে মেয়েটিকে না দেখুক।

নেপাল প্রামাণিক এই সময় আমায় হাতজোড় করে বললে—একটা অনুরোধ আছে, আমার বাড়ীতে লুচি ভেজেচে। বড়বৌ যত্ন করে ভাজচে আপনার জন্যে। একটু পায়ের ধুলো দিতে হবেই।

আমার নিজেরও ইচ্ছে আর আসরে যাবো না। ওর ওখানে খেতে গেলে যে সময় যাবে, তার মধ্যে খেমটার আসর ভেঙ্গে যাবে। বললাম—বেশ, তাতে আর কি হয়েচে? চলো যাই।

নেপাল প্রামাণিকের বড় চৌচালা ঘরের দাওয়ায় আমার জন্যে খাবার জায়গা করা হয়েচে, নেপাল প্রামাণিকের বড় বৌ থালায় গরম লুচি এনে পরিবেশন করলে। বড় ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণের ওপর অমন ভক্তি আজকার কালে বড় একটা দেখা যায় না। আমার সঙ্গে কথা বলে না, তবে আকারে ইঙ্গিতে বুঝতে পারি ও কি বলতে চাইচে। যেমন একবার লুচির থালা নিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আমি বললাম—না মা, আর লুচি দিতে হবে না।

নেপালকে আমার অদূরে খাবার জায়গা করে দেওয়া হয়েচে। সে বললে—নিন নিন ডাক্তারবাবু, ও অনেক কষ্ট করে আপনার জন্যে লুচি ভেজেচে। সন্ধে থেকে আমাকে বলচে ডাক্তারবাবুকে অবিশ্যি করে খেতে বলবা।

বড়বৌয়ের ঘোমটার মধ্যে থেকে মৃদু হাসির শব্দ পাওয়া গেল।

খান-আষ্টেক গরম লুচি চুড়ির ঠুনঠান শব্দের সঙ্গে পাতে পড়লো।

উঁহুঁ হুঁ—এত কেন? কি সর্ব্বনাশ!

বড় বৌ ফিস্ ফিস্ করে অদূরে ভোজনরত নেপালের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কি বললে, নেপাল আমায় বললে—বড়বৌ বলচে ডাক্তারবাবুর ছোকরা বয়েস, কেন খাবেন না এ ক'খানা লুচি—এই তো খাবার বয়েস।

আমি বললাম—আমার বয়েস সম্বন্ধে মায়ের একটু ভুল হচ্চে। ছোকরা বড় নই, পঁয়-ত্রিশের কোঠায় পা দেবো আশ্বিন মাসে।

আবার ফিস্ ফিস্ শব্দ। নেপাল তার অনুবাদ করে বললে—বড়বৌ হাসচে, বলচে, ওর ছোট ভাইয়ের চেয়েও কম বয়েস।

আমি জানতাম নেপালের দুই সংসার। কিন্তু ওর বড় বৌটি সত্যই সুন্দরী, এর আগেও দুবার দেখেচি বৌটিকে। বয়েস চল্লিশের ওপরে হোলেও দীর্ঘকাল নিঃসন্তানা ছিল বলেই হোক বা যে কারণেই হোক, এখনো বেশ আঁটসাঁট গড়ন, দিব্যি স্বাস্থ্যবতী, গায়ের রঙ পঁচিশ বছরের যুবতীর মত। বেশ শান্ত মুখশ্রী।

আমি উত্তর দিলাম—মাকে বল আর দুখানা পটলভাজা দিতে—

বৌটি পটলভাজা পাতে দিলে এনে।

আমি মুখ তুলে তাকেই উদ্দেশ্য করে বললাম—আচ্ছা, এ রকম কেন মা করো, বলো তো? চমৎকার রান্না কিন্তু নুন দাও না কেন? সেবারও তাই, এবারও তাই। সেবার বলে গেলাম তোমায়, তুমি নুন দিও তরকারিতে, ওতে আমার জাত যাবে না। তবুও নুন দাও নি এবার।

বড় বৌ এবার খুব জোরে ফিস্ ফিস্ করলে এবং খানিকক্ষণ সময় নিয়ে।

নেপাল হেসে বললে—বড়বৌ বলচে, ব্রাহ্মণের পাতে নুন দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবো সে ভাগ্যি করি নি। এ জন্মে আর তা হয়ে উঠবে না। নরকে পচে মরবো শেষে? ছোট জাত আমরা—

—ও সব বাজে কথা।

—না ডাক্তারবাবু, আপনাদের মত অন্যরকম। আপনারা ইংরেজী পড়ে এ সব মানেন না, কিন্তু ভগবানের কাছে দোষী হতে হবে তো?

—ইংরেজী পড়ে নয় নেপাল, মানুষের সঙ্গে তফাৎ সৃষ্টি করেচে সমাজ, ভগবানকে টেনো না এর মধ্যে।

—ভগবান নিজেই ব্রাহ্মণের পায়ের চিহ্ন বুকে ধরে আছেন। আছেন কি না আছেন বলুন?

—আমি দেখি নি ভগবানকে, তাঁর বুকে কি আছে না আছে বলতে পারবো না। কিন্তু নেপাল, এটুকু তুমিও জানো আমিও জানি, তাঁর দেওয়া ছাপ কপালে নিয়ে কেউ পৃথিবীতে আসে নি।

—তবে বাবু, কেউ ব্রাহ্মণ কেউ শূদ্দুর হয় কেন ?

—আমি জানি নে, তুমিই বলো।

—কর্ম্মফল। আপনার সুকৃতি ছেল আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেচেন, আমার পুণ্যি ছেল না, আমি শূদ্দুর হয়ে—

এ তর্কের মীমাংসা নেই, বিশেষত এদের বুঝানো আমার সম্ভব নয়, সুতরাং চুপ করে খাওয়া শেষ করলাম।

রাত বেশি হয়েচে। নেপাল বললে—আপনি শোবেন এখানে তো? বড়বৌ বলচে।

—না, আমি ডিসপেন্সারিতে শোবো। রাত বেশি নেই। ভোর রাত্রে নৌকো ছাড়বো।

—কষ্ট করে কেন শোবেন। বড়বৌ আপনার জন্যি পুবির ঘরে তক্তাপোশে বিছেন পেতে রেখেচে।

তখন যদি নেপাল প্রামাণিকের কথা শুনতাম, তার ভক্তিমতী, সতিলক্ষ্মী স্ত্রীর কথা শুনতাম! তারপরে কতবার এ কথা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

আমি নেপালের বাড়ী থেকে চলে এলাম ডাক্তারখানায়। নেপাল লণ্ঠন ধরে এগিয়ে দিয়ে গেল। ডাক্তারখানার ওদিকে বারান্দায় নৌকার মাঝিটা অঘোরে ঘুমুচ্চে। আমি ঘরে ঢুকে নেপালকে বিদায় দিয়ে বিছানা পাতবার যোগাড় করচি, এমন সময় বাইরে গোবিন্দ দাঁ আর আবদুল হামিদের গলা পেলাম।

আবদুল হামিদ বললে—ও ডাক্তারবাবু, আলো জ্বালুন—ঘুমুলেন নাকি ?

বললাম—কি ব্যাপার ?

নিশ্চয়ই এরা চা খেতে এসেচে। কিন্তু এত রাত্রে আমি দুধ পাই কোথায় যে ওদের জন্যে চা করি আবার ? বিপন্ন মুখে দোর খুলে ওদের পাশের ঘরে বসিয়ে শোয়ার ঘর থেকে লণ্ঠন নিয়ে ডিসপেন্সারি ঘরে ঢুকেই আমি দেখলাম একটি মেয়ে ওদের সঙ্গে। স্বভাবতই আমার মনে হোল কারো অসুখ করেচে; নইলে এত রাত্রে ওরা দুজনে ডিসপেন্সারিতে আসবে কেন ?

ব্যস্ত সুরে বললাম—কি হয়েচে বলো তো ? কে মেয়েটি ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—বসুন, ডাক্তারবাবু, বসুন—কথা আছে।

—কে বলো তো, ও মেয়েটি ?

আবদুল হামিদ দাঁত বের করে হেসে বললে—আপনার রুগী। দেখুন তো—

সেই কিশোরী নর্ত্তকীটি। আমার মাথা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। মেয়েটির সলজ্জ দৃষ্টি মাটির দিকে নামানো। মনে হোল, ওর কপাল ঘেমে উঠচে ক্লান্তিতে ও সকরুণ কুণ্ঠায়।

আমি এগিয়ে এসে বলি—কি, কি ব্যাপার? হয়েচে কি?

গোবিন্দ দাঁ হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলো—আবতুল হামিদের হাসির স্বরটা খিক্ খিক্ শব্দে নদীর ধারে পুরোনো শিমুল গাছে শিক্‌রে পাখীর আওয়াজের মত।

বিরক্ত হয়ে বললাম—আঃ, বলি কি হয়েচে শুনি না!

গোবিন্দ দাঁ বললে—মাথা ধরেচে, মাথা ধরেচে—নেচে গেয়ে মাথা ধরেচে, এখন ওষুধ দিন, রোগ সারান।

টেবিলের ওপর থেকে স্মেলিং সল্টের শিশিটা তুলে বললাম—এটা জোরে শুঁকতে বলো, এখুনি সেরে যাবে।

আবতুল হামিদ আর একবার শিক্‌রে পাখীর আওয়াজের মত হেসে উঠলো। গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনি চিকিচ্ছে করুন। আমরা চলি।

—কেন, কেন?

—আমাদের আর এখানে থাকার কি দরকার?

সত্যই ওরা উঠে চলে যেতে উদ্যত হোল দেখে আমি বললাম—বোসো বোসো। কি হচ্চে? ওষুধ শিশিতে দিচ্চি—

গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনি ওষুধ দেবেন, দিন। দিয়ে ওকে পটল কলুর আটচালা ঘরে ওদের বাসা, সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা চলি।

আবতুল হামিদ বললে—ওষুধের দামটা আমার কাছ থেকে নেবেন।

গোবিন্দ দাঁ বললে—কেন, আমি দেবো।

ওদের ইতর ব্যবহারে আমার বড় রাগ হোল। আমি ধমক দেওয়ার স্বরে বললাম—কি হচ্চে সব? ওষুধ যদি দিতে হয় তার দামটা আমি না নিতেও তো পারি। বসো সব। কেউ যেও না। কি হয়েচে শুনি?

গোবিন্দ দাঁ বললে—মাথা ধরেচে বললাম তো। ওগো, বল না গো, তোমার কি হয়েচে, তোমার চাঁদ মুখ দিয়ে কথা না বেরুলে আমাদের ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করচেন না যে! বললে মাথা ধরেচে—নিয়ে এলাম ডাক্তারের কাছে। এখন রুগী-ডাক্তারে কথাবার্ত্তা হোক, আমরা তো বাড়তি মাল—হাবাক্ জিঙ্কের পিপের সোল এজেন্ট—এখানে আর আমরা কেন? ওঠো আবতুল হামি—

সত্যিই ওরা চলে গেল। আমি মেয়েটির মুখের দিকে চাইলাম। দুটি চোখের সলজ্জ চাউনি আমার মুখের দিকে স্থাপিত। এভাবে আমি একা কোন মেয়ের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নই, আমি যেন ঘেমে উঠলাম। তার উপরে অন্য কোন মেয়ে নয়, যে মেয়েটি কাল থেকে আমার একঘেয়ে জীবনে সম্পূর্ণ নতুনের স্বাদ এনে দিয়েচে, সেই মেয়েটি। হঠাৎ আমি নিজেকে দৃঢ় করে নিলাম। আমি না ডাক্তার? আমার গলা কাঁপবে একটি বালিকার সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে কথাবার্ত্তা বলতে?

বললাম—কি হয়েচে তোমার?

মেয়েটি আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি ডাক্তারবাবু?

অদ্ভুত প্রশ্ন। এতটুকু মেয়ের মুখে। গম্ভীর মুখে বলবার চেষ্টা করলাম—তবে এখানে কি জন্য এসেচ? দেখতেই তো পাচ্চ।

আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য। মেয়েটি ফিক্ করে হেসে ফেলে পরক্ষণেই লজ্জায় মুখখানি নীচু করে আঁচল চাপা দিলে—আঁচল-চাপা মুখ আমার দিকে তুলে আবার ফিক্ করে হেসে উঠলো। সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি, সে ভঙ্গির অপূর্ব্ব লাবণ্য আমার বর্ণনা করবার শক্তি নেই। আমার বুদ্ধি যেন লোপ পাবার উপক্রম হোল—এমন ধরনের মেয়ে আমি কখনও দেখি নি। মেয়ে দেখেছি সুরবালাকে—শান্ত, সংযত ভদ্র বড় জোর; দেখেচি শান্তিকে। না হয় নির্জ্জন রাস্তায় অবসর খুঁজে কথা বলে, তাও দরকারী কথা, নিজের গরজে। এমন সাবলীল ভঙ্গি তাদের সাধ্যের বাইরে। তাদের দেহে হয় না, জন্মায় না। ছেলেমানুষ নারী বটে, কিন্তু সত্যিকার নারী।

বললাম—হাসচো কেন! কি হয়েচে?

—মাথা ধরেচে। অসুখ হয়েচে।

—মিথ্যে কথা।

—উহুঁ-হুঁ! ভারী ডাক্তার আপনি!

যেন কত কালের পরিচয়। কোনো সঙ্কোচের বালাই নেই।

ওর সামনের চেয়ারে বসে ওর হাত ধরলাম। ও হাত টেনে নিলে না। নির্জ্জন ঘরে ও আর আমি। রাত একটা কিংবা দুটো। কে জানে, কে-ই বা খবর রাখে। আমার মনে হোল জগতে ঐ মেয়েটি আমার সামনে বসে আছে যুগ যুগ ধরে। সারা বিশ্বে দুটি মাত্র প্রাণী—ও আর আমি।

আমি বললাম—তোমার নাম কি?

—কি দরকার আপনার সে খোঁজে?

—তবে এখানে এসেচ কেন?

—ওষুধ দিন। হাতটা ধরেই রইলেন যে, দেখুন না হাত।

—কিছুই নয় নি তোমার।

—না, সত্যি আমার মাথা ধরেছিল।

—এখন আর নেই।

—কি করে বুঝলেন?

—তুমি একটি দুষ্টু বালিকা। কত বয়েস তোমার? পনেরো না ষোলো।

—জানি নে।

আমি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—তবে, এখুনি যাও।

ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। আমার গলার সুর বোধ হয় একটু কড়া হয়ে পড়েছিল। ভীরু চোখে আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—রাগ করলেন? না, না রাগ

করবেন না। আমার বয়েস ষোলো।

—নাম কি?

—পান্না। ভালো নাম সুধীরাবালা।

—যার সঙ্গে এসেচ ও তোমার কে হয়?

—কেউ নয়। ওর সঙ্গে মুজরো করে বেড়াই, মাইনে দেয়, প্যালার অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হয়।

—কোথায় থাকো তোমরা?

—দমদমা সিঁথি। বাড়ীওয়ালীর বাগানবাড়ীতে।

—সে আবার কে?

—বাড়ীউলী মাসির টাকায় তো খেমটার দল চলে। থাকতে দেয় খেতে দেয়। সেই-ই তো সব।

ওষুধ দেবো? মিথ্যা কথা বলে এসেছ কেন এখানে? ওই তোমার সঙ্গের মেয়েটা এখানে তোমায় পাঠিয়েছে?

—না।

সত্যি বলো। মিথ্যে ভান করচো কেন অসুখের? ও পাঠিয়েচে—না? তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েচে?

মেয়েটি লজ্জায় কেমন যেন ভেঙ্গে পড়ে বললে—তা না।

বলেই মুখ নীচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো ও সত্যি কথা বলচে। ওর সঙ্গিনী পাঠায় নি, ছল করে ও নিজেই এসেচে। স্বেচ্ছায় এসেচে। অসুখ-বিসুখও নয়—কোনো অসুখ নেই ওর।

হঠাৎ মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে কেমন এক রকম অদ্ভুত স্বরে বললে,—আমি চললাম, আপনি বড় খারাপ লোক।

বিস্ময়ের সুরে বললাম—খারাপ? কেন, কি করলাম তোমার?

—আমি বলি নি তো কিছু। আমি যাই, আসর কোন্ দিকে? বাপরে, কত রাত হয়ে গিয়েচে! আমায় একটু এগিয়ে দিন না।

—তা পারবো না। আসরে অনেক লোক, তোমার সঙ্গে আমায় দেখতে পেলে কে কি বলবে! আমি পথ দেখিয়ে দিচ্চি—তুমি যাও। কোনো ভয় নেই, বাজারের মধ্যে চারিদিকে লোক, ভয় কিসের।

মেয়েটি চলে যেতে উদ্যত হলে আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো। আমি খপ করে ওর হাত ধরে ওকে সেই চেয়ারখানাতে আবার বসিয়ে দিয়ে বললাম—কেন এসেছিলে, না বলে যাবার জো নেই পান্না,—না, এই নামই তো? রাগ করলে নাকি—ডাকনাম ধরে ডাকলাম বলে?

মেয়েটি হেসে বললে—ডাকুন না যত পারেন।

—তুমি এখানে এসে বসে আছ, তোমার সঙ্গের মেয়েটা কি ভাববে ?

—ভাবুক সে। আমার তাতে কি ?

—তুমি তো দেখছি খুব ছেলেমানুষ—তোমার কথার সুরেই তার প্রমাণ।

পান্না চোখের ভুরু ওপর দিকে দুবার তুলে আবার নামিয়ে চোখ নাচিয়ে কৌতুকের সুরে বললে—হুঁ-উ-উ ?

শেষের দিকের জিজ্ঞাসার সুরটা নিরর্থক। কি সুন্দর হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে !

আমার হঠাৎ মনে হল ওকে আমি বুকে টেনে নিয়ে ওর ফুলের মতো লাবণ্যভরা দেহটা পিষে দিই বলিষ্ঠ বাহুর চাপে ! মাথার মধ্যে রক্ত চন্ চন্ করে উঠলো। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি। এ অবস্থা ভাল নয়। ও এখান থেকে চলে যাক্। ছিঃ—

—পান্না, তুমি চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।

—আপনি বড় মজার লোক কিন্তু—আমি কেন এসেছিলাম জিজ্ঞেস করলেন না যে ?

—তুমি বললে না তো আবার জিগ্যেস করে কি হবে ? তুমি এক নম্বরের দুষ্টু—পান্না।

—'পান্না' কেন, আমার ভালো নামে ডাকুন না ? সু-ধী-রা বা-লা—

—ওর চেয়ে পান্না ভালো লাগে—সত্যি বলচি।

আমিও সত্যি বলচি আপনাকে আজ রাত্রে—

এই পর্য্যন্ত বলেই কি একটা বলবার মুখে হঠাৎ থেমে গিয়ে ও সলজ্জ হেসে মুখ নীচু করে চুপি চুপি কি কতকগুলো কথা আপনা-আপনি বলে গেল।

—কি বললে ?

—বলচি এই গিয়ে—আপনাকে আজ রাত্তিরে-এ-এ—

আঃ, লজ্জায় তো ভেঙে পড়লে। বলো না কি ?

—আমার লজ্জা করে না বুঝি ! আমি যাই—এগিয়ে দিন।

আমি উঠলাম। আমার সম্বিৎ ফিরে এসেচে। আমি চিকিৎসক, আমার ডাক্তারখানায় সমাগত একটি রোগিণীর সঙ্গে রাতদুপুরে বিশ্রম্ভালাপ শোভা পায় না আমার। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়েচে। বিবাহিত ভদ্রলোক।

বললাম—চলো না, ওঠো। এগিয়ে দিয়ে আসি—

হরি ময়রার দোকান পর্যন্ত এসে দেখি আসরের দিকে তখনও মেলা লোকের ভিড়। কেউ পানবিড়ি খাচ্চে, কেউ জটলা করে গল্প করচে। স্থানীয় বাজারের লোকে এখনও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, পানবিড়ির দোকান এখনও খোলা।

পান্না নিজেই আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ কুণ্ঠায় ভদ্রঘরের বধূটির মত বললে—আপনি যান, লোকের ভিড় রয়েচে। আপনাকে দেখতে পাবে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি, ও চলে যাচ্চে—যেতে যেতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—আজ আমাদের শেষ দিন—জানেন তো ?

—জানি।

—আপনি আসবেন ?

—তা বলতে পারি নে—আজ এত রাত পর্য্যন্ত জেগে। কাল বাড়ীর ডাক্তারখানায় রুগী দেখতে হবে—

—সন্দের পর কাল আরম্ভ হবে তো ? আপনি আসবেন, কেমন তো ? তার পরেই মাথা দুলিয়ে বললে—ঠিক, ঠিক, ঠিক। যাই—

আমি কিছু বলবার আগেই পান্না হরি ময়রার দোকানের ছেঁচতলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিরে চলে এলাম ডাক্তারখানাতে। মাথার মধ্যে কেমন করচে। পান্নার সঙ্গে জীবনের যেন অনেকখানি চলে গেল। জীবনকে এতদিনে কিছুই জানি নি, দেখি নি। শুধু ঘুরে মরেছি পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারি করে আর সনাতনদার মত গেঁয়ো লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে। আজ যেন মনে হল, এ জীবন একেবারে ফাঁকা, এতে আসল জিনিস কিছুই নেই। নিজেকে ঠকিয়েছি এতদিন।

মাঝি বললে—বাবু, বাড়ী যাবেন তো ? নৌকো ছাড়ি ?

—একটা শক্ত কেস্ আছে, যাবো কি না তাই ভাবচি।

—চলুন বাবু, কাল খাওয়া-দাওয়া করে চলে আসবেন।

কাঠের পুতুলের মত গিয়ে নৌকোতে উঠলাম। নৌকো ছাড়লো, আমি শুয়ে রইলাম চোখ বুজে কিন্তু কেবলই পান্নার মুখ মনে পড়ে,—তার সেই অদ্ভুত হাসি, সকুণ্ঠ চাউনি। লাবণ্যময়ী কথাটা বইয়ে পড়ে এসেছি এতদিন, ওকে দেখে এতদিন পরে বুঝলাম নারীর লাবণ্য কাকে বলে। কি যেন একটা ফেলে যাচ্ছি মঙ্গলগঞ্জের বারোয়ারি-তলায়, যা ফেলে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাবো না।

মনে মনে একটা অদ্ভুত কল্পনা জাগলো।

নিজেই অবাক হয়ে গেলাম এ ধরনের কল্পনার সম্ভাব্যতায়—আমার এ ধরনের কল্পনার সম্ভাব্যতায়। ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছি, সংসার ছেড়ে দিয়েছি, পান্না যদি আমাকে চায় তবে ওকে নিয়ে চলে গিয়েছি সুদূর পশ্চিমে কোনো অজ্ঞাত ছোট শহরে। পান্নার সীমন্তে সিন্দুর, মুখে সেই হাসি···আমার সঙ্গে এক নির্জ্জন ছাদে···দুজনে মুখোমুখি···কেউ কোথাও নেই··· কেউ আমাকে ডাক্তারবাবু বলে খাতির করবার নেই। এখানে আমার বংশগৌরব আমার সব স্বাধীনতা হরণ করেচে।···

কিসের বংশগৌরব, কিসের যশমান ?

ওকে যদি পাই ?

হয়তো তা আকাশ-কুসুম। ও সব আলেয়ার আলো, হাতের মুঠোয় ধরা দেয় না কোনো দিন। পান্না আমার হবে, এ কথা ভাবতেই আমার সারা দেহমনে যেন বিদ্যুতের

স্রোত বয়ে গেল। পান্না খাঁটি নারী, আমি এতদিন নারী দেখি নি। ওদের চিনতাম না। আজ বুঝলাম ওকে দেখে।

পান্না আজ আমার ডাক্তারখানায় কেন এসেছিল? ওষুধ নিতে নয়। না, ওষুধ নিতে? কিছুই বুঝলাম না ওর কাণ্ড। অসুখ কিছু ছিল না, মাথা ধরতে পারে হয়তো। কিন্তু যদি এমন হয়, ও ওষুধ নেবার ছল করে এসেছিল অভিসারে আমার কাছে? কিন্তু আবদুল হামিদ আর গোবিন্দ দাঁ সঙ্গে কেন?

নাঃ, কিছুই পরিষ্কার হল না।

আচ্ছা, যদি সত্যিই ও অভিসারে এসেছিল এমন হয়?

কথাটা ভাবতে আমার দেহমনে আবার যেন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। তাও কি সম্ভব? আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ, পান্না ষোল বছরের কিশোরী। অসম্ভব কি খুব? তবে এমন অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে এর চেয়েও বেশি বয়সে কিশোরীর প্রেম লাভ করেছিল, সে সব···

আমার মত গেঁয়ো ডাক্তারের অদৃষ্টে কি ওসব সম্ভব হবে? যা নাটক নভেলে পড়েছি, তা হবে আমার জীবনে মঙ্গলগঞ্জের মত অজ পাড়াগাঁয়ে?

মাথার মধ্যে কেমন নেশা···উঠে নদীর জল চোখে মুখে দিলাম। আমার শরীরের অবস্থা যেন মাতালের মত। মাঝি বললে—ডাক্তারবাবু, ঘুমোন নি?

বললাম—না বাপু, মাথা গরম হয়ে গিয়েচে না ঘুমিয়ে।

—চলুন বাবু, বাড়ী গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুম দেবেন এখন।

আমি তখন ভাবছি, এসে ভুল করেছি। না এলেই হোত।

যদি এমন কিছু ঘটে বাড়ী গিয়ে, কাল সন্দেবেলা মঙ্গলগঞ্জে আসা না ঘটে? পান্নার সঙ্গে আর দেখা হবে না, ও চলে যাবে কলকাতায়। তা হবে না, অমন ভাবে পান্নাকে আমি হারাতে রাজী নই।

বাড়ী এসে স্নান করে একটু মিছরির শরবৎ খেয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছি, এমন সময় বড় মুখুয্যের ছেলে হারান এসে বললে—শশাঙ্কদা, একবার আমাদের বাড়ী যেতে হচ্ছে—

—কেন হে, এত সকালে?

—জামাই এসেচেন, একটু চা খাবে তাঁর সঙ্গে সকালে।

—মাপ করো ভাই, কাল সারারাত ঘুমুই নি। মঙ্গলগঞ্জে শক্ত কেস্ ছিল—

—ভালো কথা, হ্যাঁ হে, মঙ্গলগঞ্জে নাকি বারোয়ারিতে ভালো খেমটা নাচ হচ্চে, কে যেন বলছিল—

আমার বুকের ভেতরটা যেন ধড়াস করে উঠলো। জিব শুকিয়ে গেল হঠাৎ। এর কারণ কিছু নয়, মঙ্গলগঞ্জের কথা উঠতেই পান্নার মুখ মনে পড়লো···ওর হাসি···সেই অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গি মনে পড়ে গেল···

আমি সামলে নিয়ে বললাম—বারোয়ারি? হ্যাঁ, হচ্ছে শুনেছি .....

হঠাৎ আমার মনে হল খেমটা নাচ হচ্ছে শুনে হারান যদি আজ আমার নৌকোতেই (কারণ আমি আজ যাবোই ঠিক করে ফেলেছি) মঙ্গলগঞ্জে যেতে চায় তবে সব মাটি। পান্নার সঙ্গে দেখা করার কোন সুবিধে হবে না ও আপদের সামনে, এমন কি, হয়তো নাচের আসরেই যেতে পারবো না।

সুতরাং ওপরের উক্তিটি শুধরে নেবার জন্যে বললাম—কিন্তু সে কাল বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েচে।

শেষ হয়ে গিয়েচে?

উদাসীন সুরে বলি—তাই শুনছিলাম। আমার তো ওদিকে যাওয়া-টাওয়া নেই—লোকে বলছিল—

হারান বললে—হ্যাঁ, তুমি আবার যাবে খেমটার আসরে নাচ দেখতে! তোমাকে আমি আর জানি নে! তা ছাড়া, তোমার সময়ই বা কোথায়? তাহলে চলো একটু চা খেয়ে আসবে।

—না ভাই, আমায় মাপ করো। হাতে অনেক কাজ আজকে—

একটু পরে সনাতনদা এসে বললে—কাল নাকি সারা রাত কাটিয়েচ মঙ্গলগঞ্জে? কি কেস ছিল?

বিরক্তির সঙ্গে বললাম—ও ছিল একটা—

—আজ যাবে নাকি আবার?

—এত খবর তোমায় দিলে কে? কেন বলো তো? গেলে কি হবে?

সনাতনদা একটু বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাইলে, এই সামান্য প্রশ্নে আমার বিরক্তির কারণ কি ঘটতে পারে, বোধ হয় ভাবলে। বললে—না, না—তাই বলছিলাম—

—হ্যাঁ, যেতে হবে। কেন বলো তো?

যা ভয় করছিলাম, সনাতনদা বলে বসলো—আমাকে নিয়ে যাবে তোমার নৌকোতে? নাকি, ভালো বারোয়ারি গান হচ্ছে মঙ্গলগঞ্জে। একটু দেখে আসতাম—

আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ করে উঠলো। বললাম—কে বললে ভালো? রামো, বাজে খেমটা নাচ হচ্ছে, কলকাতার খেমটা-উলীদের—

সনাতনদা জানে, আমি নীতিবাগীশ লোক, সুতরাং আমার সামনে সে বলতে পারলে না যে খেমটা নাচ দেখতে যাবে। আমিও তা জানতাম। খেমটা নাচের কথা শুনে সনাতনদা তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—খেমটা? ঝাঁটা মারো! ও আবার ভদ্রলোকে দেখে। তুমি গিয়েছিলে নাকি?...নাঃ, তুমি আবার যাচ্ছ ওই দেখতে!

—গিয়েছিলাম একটুখানি।

সনাতনদা সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—তুমি!

হেসে বললাম—হ্যাঁ, গো, আমি।

সনাতনদা ভেবে বললে—তা তোমাকে খাতিরে পড়ে যেতে হয়। পাঁচজনে বলে, তুমি হোলে ডাক্তারমানুষ—

সনাতনদা আর ও সম্বন্ধে কিছু বললে না। অন্য কথাবার্ত্তা খানিকক্ষণ বলে উঠে চলে গেল। আমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে স্নানাহার করে নিয়ে ওপরে শোবার ঘরে যেতেই সুরবালা এসে ঘরের জানালা বন্ধ করে দিয়ে গেল। চোখে আলো লাগলে দিনমানে আমার ঘুম হয় না সে জানে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি নে, উঠলাম যখন তখন বেলা বেশি নেই। তখুনি সুরবালা চা নিয়ে এল, বললে—ঘুম হয়েচে ভালো? এর মধ্যে কাপাসডাঙা থেকে একটা রুগী এসেছিল, বলে পাঠিয়েচি, বাবু ঘুমুচ্চেন। তারা বোধ হয় এখনো বাইরে বসে আছে। শক্ত কেস্।

বললাম—আমাকে আজও মঙ্গলগঞ্জে যেতে হবে।

—আজও? কেন গা?

সুরবালা সাধারণতঃ এরকম প্রশ্ন করে না। খাঁটি মিথ্যে কথা ওর সঙ্গে কখনো বলি নি। সংক্ষেপে বললাম—দরকার আছে। যেতেই হবে।

—কাপাসডাঙায় যাবে না?

—না। যেতে পারা যাবে না।

এদিকে কাপাসডাঙার লোকে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলে। তাদের রুগীর অবস্থা খারাপ, যত টাকা লাগে তা দেবে, অবস্থা ভালো, আমি একবার যেন যাই। ভেবে দেখলাম কাপাসডাঙায় রুগী দেখতে গেলে সারা রাত কাটবে যেতে আসতে।

সে হয় না।

মাঝিকে নিয়ে সন্ধ্যার পরেই রওনা হই। মঙ্গলগঞ্জ পৌছবার আগে আমার বুকের মধ্যে কিসের ঢেউ যেন ঠেলে উঠচে বেশ অনুভব করি। মুখ শুকিয়ে আসচে। হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করচে। এ আবার কি অনুভূতি, আমার এত বয়স হোল, কখনও তো এমন হয় নি।

একটি ভয় মনের মধ্যে উঁকি মারছে। পান্না আজ হয়তো অন্য রকম হয়ে গেছে। আজ সে হয়তো আর আমাকে চিনতেই পারবে না। তা যদি হয়, সে আঘাত বড় বাজবে বুকে।

গোবিন্দ দাঁ দেখি ডাক্তারখানায় বসে।

আমায় দেখেই দাঁত বের করে বললে—হেঁ হেঁ ডাক্তারবাবু যে! এসেচেন?

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছু নয়। ভাগ্যিস আপনি এলেন?

—আমি? কেন অসুখ বিসুখ কারো?

গোবিন্দ দাঁ সুর নিচু করে বললে—অসুখ যার হবার, তার হয়েছে। একজন যে মরে। সকাল থেকে সতেরো বার এনকুয়ারি করচে ডাক্তারবাবু আজ আসবেন তো? আপনি না এলে তার অবস্থা যে কেষ্ট-বিরহে রাধার মত।

রাগের সুরে বললাম—যাও, কি সব বাজে কথা বলো—

গোবিন্দ দা টেবিল চাপড়ে বললে—একটুও বাজে কথা নয়। মা কালীর দিব্যি। আবদুল হামিদকে তো জানেন? ঘোড়েল লোক! ও যতবার সে ছুঁড়ির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছে, ততবার সে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আমি একবার গিয়েছিলাম কখন আসর হবে জিজ্ঞেস করতে। আমাকে বললে—ডাক্তারবাবু আজ আসবেন তো? আমি যেমন বলেছি, তা তো জানি নে আসবেন কি না, অমনি মুখ দেখি কালো হয়ে গেল।

আমার বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়চে। গোবিন্দ দা হ্যাবাক জিংকের ব্যবসা করে, মনের খবর ও কি জানবে। জানলে এ সব কথা কি বলতো?

মুখে বললাম—ও সব কথা আমায় শুনিয়ে লাভ কি? যাও!

গোবিন্দ দাকে হঠাৎ একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বড় ইচ্ছে হল। কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা উচিত কি না বুঝতে না পেরে একটু ইতস্তত করচি, দেখি ধূর্ত্ত গোবিন্দ দা বললে—কিছু বলবেন?

—একটা কথা। কাল রাত্তিরে ওকে তোমরা এনেছিলে কেন? ঠিক কথা বলবে?

—আমি বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও আমাকে বললে, ডাক্তারবাবু কোথায় থাকেন? আবদুল হামিদও ছিল আমার সঙ্গে। তাই নিয়ে এসেছিলাম, হয় না হয় জিজ্ঞেস করে দেখবেন আবদুল হামিদকে। একবার নয়, ও ক'বার জিজ্ঞেস করেচে, আপনি কোথায় থাকেন। তখন বললাম—কেন? ও বললে—হাত দেখাবো, অসুখ করেচে।

—ও কি করে জানলে আমি ডাক্তার? ও আসরে ছাড়া আমায় ভাখে নি?

—তা আমি জানি নে সত্যি বলচি, কাউকে হয়তো জিজ্ঞেস করে থাকবে।

কি একটা কথা বলতে যাবো এমন সময় বাইরে কে ডাকল—কে আছেন?

কম্পাউণ্ডার তখন আসে নি, আমি নিজেই বাইরে গিয়ে দেখি একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বললাম—কোত্থেকে আসচো? মনে হোল ওকে আমি খেমটা নাচের দলেই তবলা বাজাতে দেখেছি।

লোকটা বললে—ডাক্তারবাবু আছেন?

বললাম—কি দরকার?

—দরকার আছে।

কি মনে হোল, বললাম—না, আসেন নি।

—ও! আসবেন কি?

—তা বলতে পারি নে।

গোবিন্দ দা লোকটাকে দেখে নি, ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আমায় জিজ্ঞেস করলে—কে? নেই বলে দিলেন কেন? হয়তো শক্ত রোগ।

—তুমি থামো না ! আমার ব্যবসা আমি ভালো বুঝি।

এমন সময় নেপাল প্রামাণিক এসে হাত জোড় করে বললে—একটা অনুরোধ। বড়বৌ বিশেষ করে ধরেচে, যাও ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসো। রাত্তিরে যদি এখানে থাকতে হয়, তবে চলুন আমার কুটিরে। একটু কিছু খেয়ে আসবেন।

বেশ লোক এই নেপাল ও তার স্ত্রী। কিন্তু আজ আমার যাওয়ার তত ইচ্ছে ছিল না, গোবিন্দ দাঁ বললে—যান না, নাচ শুরু হবে সেই দশটায়। হ্যাঁ, নেপালদা, বলি আমাদের মত গরীব লোকের কি জায়গা হয় না তোমাদের বাড়ী ?

নেপাল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো না, চলো।

আমরা সবাই মিলে নেপালের বাড়ী এসে চা খেলাম ; চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা ও নারকোল কোরা। একটু পরে গোবিন্দ দাঁ উঠে চলে গেল। আমি একাই বসে আছি ; এমন সময়ে গোবিন্দ দাঁ আবার এল, আমায় বললে—একটু বাইরে আসুন।

—কি ?

—আপনি সেই যে লোকটাকে ডাক্তার নেই বলে দিয়েছিলেন, সে কে জানেন ? সে হোল ওদের খেমটার দলের লোক। আপনি আসবেন না শুনে পান্নার মন ভারী খারাপ হয়েছে।

—চুপ চুপ। এখানে কি ওসব কথা ; কে বললে তোমায় ?

—আরে গরীবের কথাটাই শুনুন। তিনি নিজেই আমাকে এই মাত্তর ডেকে বললেন —ডাক্তারবাবু এসেছেন কি না। দেখে আসচি বলে তাই চলে এলাম আপনার কাছে। এখন একটা মজা করা যাক। আমি গিয়ে বলি আপনি আসেন নি।

—তারপর ?

—তারপর আপনি হঠাৎ আসরে গিয়ে বসে প্যালা দিতে যাবেন। বেশ মজা হবে। কেমন ?

—না, ও আমার ভালো লাগে না। ও করে কি হবে ?

—করুন, করুন। আপনার হাতে ধরচি।

—বেশ, যাও, তাই হবে।

নেপালের ভক্তিমতী স্ত্রী খুব যত্ন করে আমাকে খাওয়ালো। বড় ভালো মেয়ে। সামনে বসে কখনো কথা বলে না, কিন্তু আড়াল থেকে সব সুখ-সুবিধে দেখে, গরম গরম লুচি এক একখানা করে ভেজে পাতে দেওয়া, দুধ গরম আছে কিনা দেখা, সব বিষয় নজর। দুদিন এখানে খেলাম, প্রতিদানে কি দেওয়া যায় তাই ভাবছি। একটা কিছু করা দরকার।

আহারাদির ঘণ্টা দুই পরে আসর বসলো। আমাকে গোবিন্দ দাঁ ডাকতে এল। ওর সঙ্গে গিয়ে আসরে বসলাম।

একটু পরে পান্না ও তার সঙ্গিনী সাজসজ্জা করে আসরে ঢুকলো। আমি লক্ষ্য করে দেখচি, পান্না এসেই আসরের চারিদিকে একবার দেখলে। আমি বসেচি আবদুল হামিদের

পেছনে। প্রথমটা আমায় ও দেখতে পেলে না। ওর কৌতূহলী চোখ দুটি যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল, সেটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

পান্না গাইতে গাইতে কখনও পিছিয়ে যায়, কখনো এগিয়ে যায়। একটু পরে আমার মনে হল, ও সামনের দিকে মুখ উঁচু করে চেয়ে চেয়ে দেখচে। গোবিন্দ দাঁ আমাকে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে মৃদুস্বরে কি বললে, ভালো শুনতে পেলাম না। ও কি সত্যি সত্যি আমাকে খুঁজচে? আমার কত বয়স হয়েচে, আর ও কতটুকু মেয়ে। আমার বিরহ অনুভব করবে ও মনের মধ্যে!

আর একটা নেশা আমায় পেয়ে বসলো। মদের নেশার চেয়েও বেশি। নাচের আসরে বসে আমি দুনিয়া ভুলে গেলাম। কেউ কোথাও নেই। আছে পান্না, আছি আমি। ঐ সুন্দরী কিশোরী আমাকে ভালোবাসে! এ বিশ্বাস করি নি এখনও মনে প্রাণে। তবুও ভাবতে ভালো লাগে, নেশা লাগে।

হয়তো এটা আমার দুর্ব্বলতা। আমার বুভুক্ষিত হৃদয়ের আকৃতি। কখনো কেউ আমায় ওভাবে ভালোবাসেনি। সুরবালা? সে আছে, এই পর্য্যন্ত। কখনো তাকে দেখে আমার এমন নেশা আসে নি মনে।

নাচের আসর থেকে উঠে চলে এলাম, গোবিন্দ দাঁর প্রতিবাদ সত্বেও। ওরা কি বুঝবে আমার মনের খবর? ওরা স্থূল জিনিস দেখতে অভ্যস্ত, স্থূল জিনিস নিয়ে কারবার করতে অভ্যস্ত। ওদের ভাষা আমি বুঝি না।

ডাক্তারখানায় এসে দেখি, কেউ নেই। কম্পাউণ্ডার গিয়ে বসেছে খেমটার আসরে। চাকরটাও তাই। নিজে আলো জ্বালি, বসে বসে স্টোভ ধরিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। পুরনো খবরের কাগজ একখানা পড়ে ছিল টেবিলে, তাই দেখি উলটে পালটে। ওই গোবিন্দ দাঁটা আবার এসে টানাটানি না করে। ও কি বুঝবে আমার মনের খবর?

মাঝি কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে বললে—বাবু, চা খাচ্চেন, একটু দেবেন মোরে?

—কিসে করে খাবে? নিয়ে এসো একটা কিছু—

—নারকোলের মালা একটা আনবো বাবু?

—যা হয় করো।

—বাবু, বাড়ী যাবেন না।

—না সকালের দিকে খোঁজ করিস। এখন ঘুমিয়ে নিগে যা—

মাঝির সঙ্গে কথা বলে যেন আমি বাস্তব জগতের সংস্পর্শে এলাম। যে জগতে আমি গ্রাম্য-ডাক্তারি করে খাই, সেখানে প্রেমও নেই, চাঁদের আলোও নেই, কোকিলের ডাকও নেই। কড়া চা খেয়ে ভাবি একটু ঘুমুবো, মাঝিও চলে গেল, সম্ভবত ঘুমুতে গেল। এমন সময় নেপাল দোর ঠেলে ঘরে ঢুকলো।

বললাম—কি নেপাল, এত রাতে?

—বাবু, আপনি শোবেন তা ভাবলাম এখানে মশারি নেই—আমার বাড়ী যদি—বৌ বলে দিলে—

—তোমার বউ কোথায় ? খেমটার আসরে নাকি ?

নেপাল জিভ কেটে বললে—রামোঃ, বড়বৌ কক্ষনো ওসব শুনতে যায় না।

—শুনে বড় সুখী হলাম নেপাল। না যাওয়াই ভালো।

—বাবু, একটা কথা বলি, আবদুল হামিদ আর গোবিন্দ দাঁর সঙ্গে আপনি মিশবেন না। ওরা লোক ভালো না।

—সে আমি জানি !

—বড় বৌও বলছিল—

—কি বলছিলেন ?

—বলছিল, ডাক্তারবাবুকে বলে দিও যেন ওদের সঙ্গে না মেশেন। ওরা কুপথে নিয়ে যাবে তাঁকে। কত লোককে যে ওরা খারাপ করেচে আমার চোখের ওপর, তা আর কি বলবো আপনাকে ডাক্তারবাবু। এই বাজারে ছিল হরি পোদ্দারের ছেলে বিধু, তাকে ওরা মদে মেয়েমানুষে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিল।

—ও সব কিছু নয় নেপাল। নিজের ইচ্ছে না থাকলে কেউ কখনো কোথাও যায় না। ওসব ভুল কথা। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমায় খারাপ করতে পারে না জেনো। আমি যখন ওপথে নামবো, তখন নিজের ইচ্ছেতেই যাবো। লোকে বললেও যাবো, না বললেও যাবো।

—না, আমি এমনি কথার কথা বলচি—মশারি দিয়ে যাই ?

—আনতে পারো।

নেপাল চলে যাবার আধঘণ্টা পরে আবার কে দোর ঠেলচে দেখে খিল খুলে দিতে গেলাম। গিয়ে দেখি পান্না দাঁড়িয়ে বাইরে। আসরের সাজ পরনে। ঝলমল করচে রূপ, মুখে পাউডার, জরিপাড় চাঁপা রঙের শাড়ি পরনে, এক গোছা সোনার চুড়ি হাতে, ছোট্ট একটা মেয়েলি হাত-ঘড়ি চুরির গোছার আগায়, চোখে সুর্মা। সঙ্গে কেউ নেই।

অবাক হয়ে বললাম—কি ?

ও 'কিছু না' বলে ঘরে ঢুকলো। বসলো একখানা চেয়ার নিজেই টেনে। আমার বুকের ভেতর তখন কি রকম করচে। আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়েই আছি। পান্নাও কোন কথা বলে না। আমি একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কেউ নেই।

ফিরে এসে একটু কড়াস্বরে বললাম—কি মনে করে ?

পান্না আমার মুখের দিকে চোখ তুলে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আবার চোখ নিচু করে ঘরের মেঝের দিকে চাইল। কোন কথা বললে না। ঈষৎ হাসির রেখা ওর ওষ্ঠের প্রান্তে।

আমি বললাম—কিছু বললে না যে ?

—এলাম এমনি।

বলেই ও একটু হেসে আবার মুখ নিচু করে মেঝের দিকে চাইলে।

বললাম—তুমি কি করে জানলে আমি এখানে?

—আমি জানি।

—জানো মানে কি? কে বলেচে?

ও ছেলেমানুষের মত দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে—বলব না।

আমি রাগের সুরে বললাম—তুমি না বললেও আমি জানি। আবদুল হামিদ, না হয় গোবিন্দ দাঁ।

পান্না এবার আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললে—না।

ও সত্যি কথা বলচে আমার মনে হল। কৌতূহলের সুরে বললাম—তবে কে আমি জানতে চাই।

পান্না মুষ্টিবদ্ধ হাতে নিজের বুকে একটা ঘুষি মেরে বললে—এই!

—কি এই?

—এইখানে জানতে পারে!

হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনি তা বুঝবেন না। বলেই আবার ও মুখ নিচু করে মেজের দিকে চাইলে। এবার শুধু মুখ নিচু নয় ঘাড় সুদ্ধ নিচু। সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি। ওর অতি চমৎকার সুডোল লাবণ্যময় গ্রীবাদেশে সরু সোনার হার চিক চিক্ করচে, এলানো নামানো খোঁপা থেকে হেলা গোছা চুল এসে ঘাড়ের নিচের দিকে ব্লাউজের কাপড়ে ঠেকেচে। ওর মুখ দেখতে পাচ্চি নে—মনে হচ্চে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী লাবণ্যবতী কিশোরী আমার সামনে। ধরা দেবার সমস্ত লক্ষণ ওর ঘাড় নিচু করার ভঙ্গির মধ্যে সুপরিস্ফুট। অল্পক্ষণের জন্যে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম, কি হোত এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে, মানে আর কিছুক্ষণ স্থায়ী হলে, তা আমি বলতে পারি নে, সে সময় আমার মনে পড়লো নেপাল মশারি নিয়ে যে-কোনো সময়ে এসে পড়তে পারে। আমি ব্যস্তভাবে ওর হাত ধরে চেয়ার থেকে জোর করে উঠিয়ে বললাম—তুমি এক্ষুনি চলে যাও—

ও একটু ভয় পেয়ে গেল। বিস্ময়ের সুরে বললে—এখুনি যাবো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এখুনি।

—আমায় তাড়িয়ে দিচ্চেন?

—এখুনি নেপাল আসবে মশারি নিয়ে। ওর বাড়ী থেকে মশারি আনতে গেল আমার জন্যে।

পান্নার চোখে ভয় ও না-বোঝার দৃষ্টিটা চকিতে কেটে গেল। ব্যাপারটা তখন ও বুঝতে পেরেচে। বললে—আপনি আসরে চলুন।

—না।

—কেন যাবেন না? আমি মাথা কুটবো আপনার সামনে এখুনি। আসুন।

—না।

—তবে দেখবেন? এই দেখুন—

সত্যিই ও হঠাৎ নিজের শরীরকে মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে মেজের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—থাক্ থাক্ যাচ্ছি আসরে—তুমি যাও।

পান্না কোনো কথাটি আর না বলে ভালো মানুষের মত চলে গেল।

একটু পরেই নেপাল মশারি নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

বললে—কোথায় চললেন? ঘরে কিসের গন্ধ!

—কি?

নেপাল মুখ ইতস্তত ফিরিয়ে নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে টেনে বললে—সেণ্ট্ মেখেছেন বুঝি? সেণ্টের গন্ধ।

—তা হবে।

পান্নার কাণ্ড। সস্তা সেণ্ট মেখে এসে ঘরময় এই কীর্তি করে গিয়েছে। তবুও গন্ধটা যেন বড় প্রিয় আমার কাছে। ও যেন কাছে কাছে রয়েছে ওই গন্ধের মধ্যে দিয়ে।

বললাম—শোব না। একটু আসরে যাচ্ছি।

—কি দেখতে যাবেন ডাক্তারবাবু! যাবেন না।

—তা হোক, কানের কাছে গোলমালে ঘুম হয় না। তার চেয়ে আসরে বসে থাকা ভালো।

—চলুন আমার বাড়ী শোবেন। বড়বৌ বড় খুশী হবে এখন।

—না। আসরে যাই একটু—

নেপালের ওপর মনে মনে বিরক্ত হই। তুমি বা তোমার বড়বৌ আমার গার্জ্জেন নয়; আমিও কচি খোকা নই। বার বার এক কথা বলবার দরকার কি?

একটু পরে আমি আসরে গিয়ে বসলাম। সামনেই পান্না। কিন্তু ওর দিকে যেন চাইতে পারচি নে। চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখচি। গোবিন্দ দাঁ, আবদুল হামিদ সবাই বসে। ওদের দলের মাঝখানে বসে আমার লজ্জা করতে লাগলো পান্নার দিকে চাইতে। পান্নাও আমার দিকে চেয়ে প্রথম বার সেই যে একবার মাত্র দেখলে, তারপর সেও আর আমার কাছে এলোও না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না।

অনেকক্ষণ পরে একবার চাইলে, ভীরু কিশোরীর সলজ্জ চাউনি তার প্রণয়ীর দিকে। এই চাউনি আমায় মাতাল করে দিলে একেবারে, আমার অভিজ্ঞতা ছিল না, ভগবান জানেন সুরবালা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে কখনো খারাপভাবে চোখ মেলে চাই নি বা প্রেম করি নি। পাড়াগাঁয়ে ওসব নেইও অতশত। সুযোগ সুবিধার অভাবও বটে, তা ছাড়া আমার মত নীতিবাগীশের এদিকে রুচিও ছিল না। সলজ্জ লুকানো চাউনির অদ্ভুত মাদকতা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই আমার থাকবার কথা নয়। আমার হঠাৎ বড় আনন্দ হল। কেন

আনন্দ, কিসের আনন্দ সে সব আমি ভেবে দেখিনি, ভেবে দেখবার প্রবৃত্তি তখন আমার নেইও। অত্যন্ত আনন্দে গা-হাত-পা যেন বেলুনের মত হাল্‌কা হয়ে গেল। আমি যেন এখনি আকাশে উড়ে যেতে পারি। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ এই মুহূর্ত্তে যদি কেউ থাকে তবে সে আমি। কারণ পান্নার ভালবাসা আমি লাভ করেছি।

ওই চাউনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েচে সে কথা।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাগল করেচে ওই চিন্তা! আমার মনের মধ্যে-আর একটা বুভুক্ষু মন ছিল, তার এতদিন সন্ধান পাইনি, আজ সে মন জেগে উঠেচে পান্নার মত রূপসী কিশোরীর স্পর্শে। আমার মত মধ্যবয়সী লোককে সতেরো-আঠারো বছরের একটি সুন্দরী কিশোরী ভালোবেসে ফেলেচে—এ চিন্তা এক বোতল উগ্র সুরার চেয়েও মাদকতা আনে। যার ঠিক ওই বয়সে ওই অভিজ্ঞতা হয় নি, সে আমার কথা কিছুই বুঝতে পারবে না। জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সে রস যে পায় নি, হাজার বর্ণনা দিলেও সে বুঝতে পারবে না সে রসের ব্যাপার। এই জন্যেই বলেচে, অনধিকারীর সঙ্গে কোন কথা বলতে নেই।

এমন একটি অনধিকারী এই গোবিন্দ দাঁ! আবদুল হামিদটাও তাই। স্থূল মনে ওদের অন্য কোন রসের স্পর্শ লাগে না, স্থূল রস ছাড়া। আবদুল হামিদ দাঁত বের করে বললে —আপনি বড় বেরসিক ডাক্তারবাবু—

আমি বললাম—কেন?

—অমন মাল নিয়ে গেলাম আপনার ডাক্তারখানায়—আর আপনি—

—ওসব কথা এখানে কেন।

—তাই বলচি।

গোবিন্দ দাঁ বললে—ছুঁড়িটা কিন্তু চমৎকার দেখতে, যাই বলুন ডাক্তারবাবু। আর কি ঢং, কি হাসি মুখের, দেখুন না চেয়ে!

আবদুল হামিদ বললে—ডাক্তারবাবু ওর ওপর কেমন চটা। কই, আপনি তো ওর দিকে ফিরেও চাইচেন না? অথচ দেখুন, আসর সুদ্ধ লোক ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে—

আমি যে কেন ওর দিকে চাইচি না, কি করে বুঝবে এই সব স্থূলবুদ্ধি লোক। আমি সব দিকে চাইতে পারি, শুধু চাইতে পারি না পান্নার মুখে। পান্নাও পারে না আমার দিকে চাইতে। এ তত্ত্ব বোঝা এদের পক্ষে বড়ই কঠিন।

আবদুল হামিদকে বললাম—বক্ বক্ না করে চুপ করে থাকতে পারো না?

গোবিন্দ দাঁ বললে—ডাক্তারবাবু আমাদের সাধুপুরুষ কিনা, ওসব ভাল লাগে না ওঁর। ও রসে বঞ্চিত।

আমি উঠেই চলে যেতাম আসর থেকে, শুধু পান্নার চোখের মিনতি আমাকে আটকে রেখেচে ওখানে। ওদের কথাবার্ত্তা আমার ভালো লাগছিল না মোটে।

আবদুল হামিদ আমার সামনে রুমালে বেঁধে দুটাকা প্যালা দিলে—আমাকে দেখিয়ে দিলে। আমি পারলাম না প্যালা দিতে। পান্নার সঙ্গে সেরকম ব্যবসাদারি করতে আমার বাধে।

আমি বললাম—এ ক'দিনে যে অনেক টাকা প্যালা দিলে আবদুল—

আবদুল হামিদ বললে—টাকা দিয়ে সুখ এখানে, কি বলেন ডাক্তারবাবু? কত টাকা তো কতদিকে যাচ্ছে।

—সে তো বটেই, টাকা ধন্য হয়ে গেল।

—ঠাট্টা করচেন বুঝি? আপনিও তো টাকা দিয়েচেন।

—কেন দেবো না?

—তবে আমাকে যে বলচেন বড়?

—কিছু বলচি নে। যা খুশি করতে পারো।

গোবিন্দ দাঁ বললে—ওসব কথা বোলো না ডাক্তারবাবুকে। উনি অন্য ধাতের লোক। রসের ফোঁটাও নেই ওঁর মধ্যে।

আবদুল একচোট হো হো করে হেসে নিয়ে বললে—ঠিক কথা দাঁ মশায়। অথচ বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট। আমাদের এ বয়সে যা আছে, ওঁর তাও নেই।

আমি কাউকে কিছু না বলে ডিস্‌পেন্‌সারিতে চলে গেলাম। মাঝিটা অঘোরে ঘুমুচ্চে। তাকে আর ওঠালাম না। নিজেরও ঘুম পেয়েচে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে এমন একটা গোলমালের সৃষ্টি করেচে যে ঘুম প্রায় অসম্ভব। আমি ব্যাপারটাকে ভালো করে ভেবে দেখবার অবকাশ পেয়েও পাচ্ছিনে। মন এখান থেকে একটা ভালো টুকরো, ওখান থেকে আর এক টুকরো নিয়ে আস্বাদ করেই মশগুল, সমস্ত জিনিসটা ভেবে দেখবার তার সময় নেই।

এমন সময় দোরে মৃদু ঘা পড়লো। আমার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। আমি বুঝেচি কে এত রাত্রে দরজায় ঘা দিতে পারে।

পান্নার গায়ে একখানা সিল্কের চাদর। খোঁপা এলিয়ে কাঁধের ওপর পড়েচে; চোখ দুটোতে উত্তেজনা ও উদ্বেগের দৃষ্টি। সে যেন আশা করে নি আমায় এখন দেখতে পাবে। দেখে যেন আশ্বস্ত হয়েচে। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমি বললাম—কি?

পান্না চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, একবার ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, বললে—এলাম আপনার এখানে।

—তা তো দেখতে পাচ্ছি, কি মনে করে?

—দেখতে এসেছি, মাইরি বলছি।

—বেশ। দেখে চলে যাও—

—তাড়িয়ে দিচ্চেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি বড় নিষ্ঠুর, সত্যি—

আমি হেসে ফেললাম। বললাম—আমি না তুমি? তুমি জান এখানে আসা কত অন্যায়?

—তবুও আসি কেন, এই তো ?

—ঠিক তাই।

—যদি বলি, না এসে থাকতে পারি নে ?

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কি করলে বিশ্বাস হয় ? আমি এই দেয়ালে মাথা কুটবো। দেখুন—

পান্না সত্যিই দেয়ালের দিকে এগিয়ে যায় দেখে আমি গিয়ে ওর হাত ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে কি হোল, তীব্র একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শে যেন আমার সারা দেহ ঝিমঝিমিয়ে উঠলো। সুরবালাকে ছাড়া আমি কোন মেয়েকে স্পর্শ করি নি তা নয়। আমি ডাক্তার মানুষ, ব্যবসার খাতিরে কতবার কত মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে রোগ পরীক্ষা করতে হয়েছে, কিন্তু এমন বৈদ্যুতিক্ তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় নি সারা দেহে।

পান্না ফিক্ করে হেসে বললে—ছুঁলেন যে বড় ?

বললাম—কেন ছোঁব না ? তুমি মেথর নও তো—

—আপনার চোখে তাদের চেয়েও অধম।

—বেশ, যদি তাই হয়, তবে এলে কেন ?

—ওই যে আগে বললাম, আমার মরণ, থাকতে পারি নি।

—কেন, গোবিন্দ দাঁ, আবদুল হামিদ ?

—আমি ঠিক এবার মাথা কুটবো আপনার পায়ে। আর বলবেন না ও কথা।

পান্না খুব দৃঢ়স্বরে এই কথাগুলি বললে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আবার।

আমি বললাম—কি দেখচো ?

—ঘরে কেউ নেই ? আপনি একা ?

—কেন বল তো ?

—তাই বলচি।

—না। মাঝি ঘুমুচ্চে বাইরের বারান্দায়।

—আপনার বাড়ী কোথায় ?

—এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। নৌকো করে যাতায়াত করি।

—আপনার নৌকোর মাঝি ? ওকে বিদায় দিন।

—বা রে, কেন বিদেয় করবো ?

পান্না মুখ নিচু করে রইল। জবাব দিলে না আমার কথার। আমি বললাম—শোনো, তুমি এখান থেকে যাও।

পান্না বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

—দিচ্ছিই তো।

—আচ্ছা, আপনার মনে এতটুকু কষ্ট হয় না যে আমি যেচে যেচে—

এই পর্য্যন্ত বলেই পান্না হঠাৎ থেমে গেল। ওর ব্রীড়ামুচ্ছিত হাসিটুকু বেশ দেখতে।

আমি বললাম—আচ্ছা, বসো পান্না।

পান্না মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসলে। চোখের চাউনিতে আনন্দ। যে চেয়ার-খানা ধরে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই চেয়ারটাতেই বসে পড়লো। ঘরের কোনো দিকে কেউ নেই। নির্জ্জন রাত্রি। বর্ষার মেঘ জমেছে আকাশে শেষ রাতের শেষ প্রহরে, খোলা জায়গা দিয়ে দেখতে পাচ্চি। পান্না এত কাছে, এই নির্জ্জন স্থানে, নিজে সেধে ধরা দিতে এসেছে। আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। বৃদ্ধ হয়ে পড়ি নি এখনো। পান্না চেয়ারে বসে সলজ্জ হাসি হাসলে আবার। ওর মুখে এমন হাসি আমি আজ রাত্রেই প্রথম দেখেচি। পুরুষের সাধ্য নেই এই হাসির মোহকে জয় করে। চেয়ারের হাতলে রাখা পান্নার সুডৌল, সুগৌর, সালঙ্কার বাহু আমার দিকে ঈষৎ এগিয়ে দিলে হয়তো অন্যমনস্ক হয়েই। কেউ কোনো কথা বলচি না, ঘরের বাতাস থম থম করছে—যেন কিসের প্রতীক্ষায়। নাগিনী কুহক দৃষ্টিতে আকর্ষণ করচে তার শিকারকে।

এমন সময়ে বাইরের বারান্দাতে মাঝিটার জেগে ওঠবার সাড়া পাওয়া গেল। সেই হাই তুলে তুড়ি দিচ্চে, এর কারণ ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি এসেচে বাইরে। বৃষ্টির ছাটে মাঝির ঘুম ভেঙেচে।

আমার চমক ভেঙ্গে গেল, মোহগ্রস্ত ভাব পলকে কেটে যেতে আমি চাঙ্গা হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পান্নাও উঠে দাঁড়ালো। শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—ও কে?

—আমার মাঝি। সেই তো যার কথা বলেছিলাম খানিক আগে।

—ও ঘরে আসবে নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—আমি তবে এখন যাই। আপনি যাবেন, না থাকবেন?

—যাবো।

—না, যাবেন না। আজ আমাদের শেষ দিন। কাল চলে যাবো। আপনাকে থাকতে হবে। আমার মাথার দিব্যি। আমি আসবো আবার। কখনো যাবেন না।

হেসে বললাম—তুমি হিপনটিজম্ করা অভ্যেস্ করেচ নাকি? ও রকম বার বার করে একটা কথা বলচো কেন?

—সে আবার কি?

—সে একটা জিনিস। তাতে যে-কোনো লোককে বশ করা যায়।

—সত্যি? শিখিয়ে দেবেন আমাকে সে জিনিসটা?

মনে মনে বললাম—সে আমাকে শেখাতে হবে না। সে তুমি ভীষণভাবে জানো।

পান্না সামনের দোর খুলে বেরিয়ে গেল চট্ করে।

রাত কতটা ছিল আমার খেয়াল হয়নি। সে খেয়াল ছিলও না। পান্না চলে গেলে মনে

হল আমার সমস্ত সত্তা যেন ও আকর্ষণ করে নিয়ে চলে গেল। মেয়েমানুষের আকর্ষণে এমন হয় তা কোনো দিন আমার ধারণা নেই। সুরবালাও তো মেয়েমানুষ, কিন্তু তার আসঙ্গ-লিপ্সা আমাকে এমন কুহকজালে ফেলে নি কোনো দিন। মনের মধ্যে পান্নার চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা স্থান পায় তার সাধ্য কি। জীবনের এ এক অদ্ভুত ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা। আজ মনে পড়লো, রামপ্রসাদ ও শান্তির কথা। বেচারী রামপ্রসাদের বোধ হয় এমনি অবস্থা হয়েছিল, তখন আমার অমন অবস্থা হয় নি, আমি ওর মনের খবর কেমন করে জানবো ?

পান্নার কি আছে তাও জানি না। এমন কিছু অপূর্ব্ব ধরনের রূপসী সে নয়। অমন মেয়ে আর কখনও দেখি নি, এ কথাও অবিশ্বাস্য। সুরবালা যখন নববধূরূপে এসেছিল আমাদের বাড়ী, তখন ওর চেয়ে অনেক রূপসী ছিল, এখন অবিশ্যি তার বয়েস অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে ; এখন আর তেমন রূপ নেই। কিন্তু ওসব কিছু নয় আমি জানি। পান্নার রূপ ওর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, ওর মুখের শ্রীতে, ওর চোখের চাউনিতে, ওর মাথার চুলের ঢেউ-খেলানো নিবিড়তায়, ওর চটুল হাসিতে, ওর হাত-পায়ের লাস্যভঙ্গিতে। মুখে বলা যায় না সে কি। অথচ তা পুরুষকে কি ভীষণভাবে আকর্ষণ করে—আর আমার মত পুরুষকে, যে কখনও ছাত্রবয়সেও মেয়েদের ত্রিসীমানা মাড়ায় নি। মেডিকেল কলেজে পড়বার সময় মিস রোজার্স বলে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্সকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে কত দ্বন্দ্ব, কত নাচানাচি, কত রেষারেষি চলতো। কে তাকে নিয়ে সিনেমাতে বেরুতে পারে, কে তাকে একদিন হোটেলে খাওয়াতে পারে—এই নিয়ে কত প্রতিযোগিতা চলতো—আমি ঘৃণার সঙ্গে দূর থেকে সে সুন্দর-উপসুন্দর যুদ্ধ দেখেচি। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যে কখনও এমন হতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

এখন বুঝেচি, মেয়েদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, সব মেয়ে সব পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। কে কাকে যে টানবে, সে কথা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। আচ্ছা, শান্তিও তো চটুল মেয়ে আমাদের গ্রামের, শুনতে পাই অনেক পুরুষকে সে নাচিয়েচে, কিন্তু একদিনও তাকে বোন ছাড়া অন্য চোখে দেখি নি।

•

মাঝি উঠে এসে বললে—বাবু, বাড়ী যাবেন নাকি ?

—না, আজ আর যাবো না।

—বাড়ীতে ভাববেন।

—তুই যা না কেন, আমি একখানা চিঠি দিচ্চি।

—তার চেয়ে বাবু, আমি বলি, আপনি চলুন না কেন। আমি আবার আপনাকে দুপুরের পর পৌছে দেবো।

—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি, তুই বাইরে বোস্।

ফরসা হয়ে গেল রাত। সঙ্গে সঙ্গে রাতের মোহ যেন খানিকটা কেটে গেল। মনে

মনে ভাবলাম—যাই না কেন বাড়ীতে। সুরবালার সঙ্গে দেখা করে আবার আসবো এখন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না, নিয়তির ফল বোধ হয় খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। যদি যেতাম বাড়ীতে মাঝির কথায়, তবে হয় তো ঘটনার স্রোত অন্য দিকে বইতো। কিন্তু আমি ডাক্তারি পাশ করেছিলাম বটে মেডিকেল কলেজ থেকে, তবুও আমি মূর্খ। ডাক্তারি শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্র আমি পড়ি নি, ভালো কথা কোনো দিন আমায় কেউ শোনায় নি, জীবনের জটিলতা ও গভীরতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমার। সরল ও অনভিজ্ঞ মন নিয়ে পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর রোগীদের হাত দেখে বেড়াই।

যাওয়া হলো না, কারণ গোবিন্দ দাঁ ও আবদুল হামিদ এসে প্রস্তাব করলে আজ একটা বনভোজনের আয়োজন করা যাক। আমি দেখলাম যদি পিছিয়ে যাই তবে ওরা বলবে, ডাক্তার টাকা দিতে হবে বলে পিছিয়ে গেল। ওদের মঙ্গলগঞ্জ থেকে বছরে অনেক টাকা আমি উপার্জ্জন করি, তার কিছু অংশ ন্যায্যত আমোদ-প্রমোদের জন্যে দাবি করতে পারে।

বললাম—কি করতে চাও? যা চাও দেবো।

আবদুল হামিদ বললে—ভালো একটা ফিস্টি।

গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনার নৌকোটা নিয়ে চলুন মহানন্দ পাড়ার চরে। দুটো মুরগি যোগাড় করা হয়েচে, আরও দুটো নেবো। পোলাও, না ঘি-ভাত, না লুচি যা-কিছু বলবেন আপনি।

আমি বললাম—আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি জিনিসপত্তরের। তবে আমাকে জড়িও না।

দুজনেই সমস্বরে হৈ চৈ করে উঠলো। তা কখনো নাকি হয় না। আমাকে বাদ দিয়ে তারা স্বর্গে যেতেও রাজী নয়।

গোবিন্দ দাঁ বললে—কেন, মুরগিতে আপত্তি? বলুন তো বাদ দিয়ে সেখহাটি থেকে উত্তম মণ্ডলের ভেড়া নিয়ে আসি? পনেরো সের মাংস হবে।

আমি বললাম—আমায় বাদ দাও।

—কেন, বলুন।

খুব সামলে গেলাম এ সময়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আর একটু হলে যে, আমার মন ভালো নয়। ভাগ্যিস্ সে কথা উচ্চারণ করি নি। ওরা তখুনি বুঝে নিত। ঘুঘু লোক সব। বললাম—শরীর খারাপ হয়েচে।

গোবিন্দ দাঁ তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—দিন, দিন, দশটা টাকা ফেলে দিন। শরীর খারাপ টারাপ কিছু নয়. আমরা দেখব এখন। মাছের চেষ্টায় যেতে হবে। তা হলে আপনার নৌকো ঠিক রইল কিন্তু!

—মাঝিকে বাড়ী পাঠাবো ভেবেছি। আমি যাচ্চি নে খবরটা দিতে হবে তো।

—কালও তো যান নি।

—যাই নি বলেই আজ আরও বেশি করে খবর পাঠানো দরকার।

গোবিন্দ দাঁ বললে—আমি সাইকেলে লোক পাঠাচ্চি এক্ষুনি।

সব ঠিকঠাক হল। ওদের রুচিমত ওদের পিকনিক হবে, এতে আমার মতামতের কোন স্থান নেই, মূল্যও নেই। কিন্তু আমি ঘোর আপত্তি জানালাম যখন বুঝতে পারলাম যে ওদের নিতান্ত ইচ্ছে, পান্নাকে নিয়ে যাবে আমার নৌকো করে পিকনিকের মাঠে। ওরাও নাছোড়বান্দা। আমি শেষে বললাম, ওরা নিয়ে যেতে চায় পান্নাকে খুব ভালো, আমি যাবো না সেখানে।

গোবিন্দ দাঁ বললে—কেন এতে আপত্তি করচেন ডাক্তারবাবু?

—না। তোমরা পান্নাকে পিকনিক্-সহচরী করতে চাও—ভালো। আমাকে বাদ দাও।

—সে কি হয় ডাক্তারবাবু? তবে পান্নাকে বাদ দেওয়া যাক, কি বল প্রেসিডেণ্ট সাহেব?

প্রেসিডেণ্ট আবদুল হামিদ (নসরাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের) একগাল অমায়িক হাসি হেসে বললে—না, ও পান্না টান্নাকে বাদ দিতে পারি, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে—কক্ষনো না।

আমি কৃতার্থ হই। যথারীতি ওদের স্থূলরুচি অনুযায়ী বনভোজন সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার আগে ওরা তাড়াতাড়ি ফিরলো আসরে যাবে বলে। আমি গেলুম ওদের সঙ্গে। সেই রাত্রে পান্না আবার আমার ডাক্তারখানায় এসে হাজির। আমি জানতাম ও ঠিক আসবে, মনে মনে ওর প্রতীক্ষা করি নি এ কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। আমার সমস্ত মনপ্রাণ ওর উপস্থিতি কামনা করেনি কি?

ও এসেই হাসিমুখে সহজ সুরে বললে—আসরে যাওয়া হয় নি যে বড়?

অদ্ভুতভাবে দুষ্টু মেয়ের মত চোখ নাচিয়ে ও প্রশ্নটা করলে। এখন যেন ও আমাকে আর সমীহ করে না। আমার খুব কাছে যেন এসে গিয়েচে ও। যেন কতদিনের বন্ধুত্ব ওর সঙ্গে, কতকাল থেকে আমাকে চেনে। বললাম বসো।

ও গালে হাত দিয়ে কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বলল—ওমা, কি ভাগ্যি! আমাকে আবার বসতে বলা! কক্ষনো তো শুনি নি।

আমি হেসে বললাম—ক'দিন তোমার সঙ্গে আলাপ, পান্না? এর মধ্যে বসতে বলবার অবকাশই বা ক'বার ঘটলো?

—ভালো, ভালো। আবার নাম ধরেও ডাকা হলো! ওমা, কার মুখ দেখে না জানি আজ উঠেছিলুম, রোজ রোজ তার মুখই দেখবো।

—মতলব কি এঁটে এসেচ বল দিকি?

পান্না হাসিমুখে ঘাড় একদিকে ঈষৎ হেলিয়ে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—ভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে বলবো?

—নির্ভয়ে বলো।

—ঠিক ?

—ঠিক।

—আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন। আজই, এখুনি—

কথা শেষ করে ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে পড়ে ফুলের মত মুখ উঁচু করে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—চলুন।

ওর চোখে মিনতি ও করুণ আবেদন।

অপূর্ব্ব রূপে পান্না যেন ঝলমল করে উঠলো সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে। পান্না যেন সুন্দরী মৎস্যনারী, অনেকদূরের অথৈ জলে টানচে আমাকে ওর কুহক দৃষ্টি।

সেই ভোর রাত্রেই পান্নার সঙ্গে আমি কলকাতা রওনা হই।

পান্না ও আমি এক গাড়ীতে।

ওর সে সহচরী কোথায় গেল তা আমি দেখি নি। তাকে ও তত গ্রাহ্য করে বলে মনেও হল না। তার বয়স বেশি, তাকে কেউ সুনজরে বড় একটা দেখে না।

গাড়ীতে উঠে পান্না আমার সামনের বেঞ্চিতে বসলো। হু হু করে গাড়ী চলেচে, গাছপালা, গরু, পাখী, ঝোপঝাপ সটসট করে বিপরীত দিকে চলে যাচ্চে, স্টেশনের পর স্টেশন যাচ্চে আসচে!

আমার কোনো দিকে নজর নেই।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি, বেশি কথা বলতে পাচ্ছি নে ওর সঙ্গে, কারণ গাড়ীতে লোক উঠচে মাঝে মাঝে। এক একবার খুব ভিড় হয়ে যাচ্চে, এক একবার গাড়ী ফাঁকা হয়ে যাচ্চে। তখন পান্না আমার দিকে অনুরাগ ভরা দৃষ্টি মেলে চাইচে।

মদের চেয়েও তার তীব্র নেশা।

এক স্টেশনে পান্না বললে—তাহোলে ?

ওর সেই বদমাইশ ধরনের চোখ নাচিয়ে কথাটা শেষ করে। আমি জানি, পান্না খুব বদমাইশ মেয়ে, আমি ওকে দেবী বলে ভুল করি নি মোটেই। দেবী হয় সুরবালাদের দল। দেবীদের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই বর্ত্তমানে। দেবীরা এমন চোখ নাচাতে পারে ? এমন বদমাইশির হাসি হাসতে পারে ? এমন ভালমানুষকে টেনে নিয়ে ঘরের বার করতে পারে ? এমন পাগল করে দিতে পারে রূপে ও লাবণ্যের লাস্যলীলায় ?

দেবীদের দোষ, মানুষকে এরা আকৃষ্ট করতে পারে না। শুধু দেবী নিয়ে কি ধুয়ে খাবো ? আমার গোটা প্রথম যৌবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েচে দেবীদের সংসর্গে। দূর থেকে ওদের নমস্কার করি।

পান্না যে প্রশ্ন করলে, তার উত্তর আমি দিলাম না।

আমি এখন ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার অবস্থায় নেই। আমার মন যেন অসীম অনন্ত আকাশে নিরবলম্ব ভ্রমণে বেরিয়েচে। দুরন্ত সে পথ-যাত্রা। কিন্তু পান্না যে আগ্রহ জাগিয়েচে তা পরিতৃপ্ত করতে পারবে কি ?

পান্নার মুখে আবার সেই দুষ্টুমিভরা হাসি। বললে—উত্তর দিলেন না যে ?

আমি বললাম—পান্না, তুমি আমার সঙ্গে কতদূর যেতে পারবে ?

ও হাসি-হাসি মুখে বললে—কেন ?

—কলকাতায় গিয়েও কাজ নেই।

—সে কি কথা, কোথায় যাবো তবে ?

—আমি যেখানে বলবো।

—কলকাতায় যাবো না—তবে আমার বাসাবাড়ী, জিনিসপত্তর কি হবে ? থাকবো কোথায় বলুন ?

—ও সব ভাবনা যদি ভাববে তবে আমায় নিয়ে এলে কেন ?

—আপনার কি ইচ্ছে বলুন।

—বলবো পান্না ? পারবে তা ?

—হ্যাঁ, বলুন।

—আমার সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসতে পারবে ?

পান্না ঘাড় একদিকে বেঁকিয়ে বললে—কোথায় ?

—যেখানে খুশি। যেখানে কেউ থাকবে না, তুমি আর আমি শুধু থাকবো। যেখানে হয়, যত দূরে—

—হুঁ-উ-উ-উ—

—ঠিক ?

—ঠিক।

বলেই ও আবার আগের মত হাসি হাসলে।

ওর ওই হাসিই আমাকে এমন চঞ্চল, এমন ছন্নছাড়া করে তুলেচে। নিরীহ গ্রাম্য ডাক্তার থেকে আমি দুঃসাহসী হয়ে উঠেচি—ওই হাসির মাদকতায়। বললাম—সব ভাসিয়ে দিতে রাজী আছ আমার সঙ্গে বেরিয়ে ?

—সব ভাসিয়ে দিতে রাজী আছি আপনার সঙ্গে।

বলেই ও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

গাড়ীতে এই সময়টায় কেউ নেই। আমি ওর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বললাম—তাহলে কলকাতায় কেন ?

—না। আপনি যেখানে বলেন—

—ভেবে ছাখো। সব ছাড়তে হবে কিন্তু। খেমটা নাচতে পারবে না। টাকাকড়ি

রোজগার করতে পারবে না।

পান্না যদি তখন বলতো, 'খাবো কি'—তবে আমার নেশা কেটে যেতো, শূন্য থেকে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে যেতাম তখুনি। কিন্তু পান্নার মুখ দিয়ে সে কথা বেরুলো না। সে ঘাড় দুলিয়ে বললে—এবং বললে অতি অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত সুরে ; বললে—তুমি আর আমি একা থাকবো। যেখানে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়—মুজরো করতে দাও করবো, না করতে দাও, তুমি যা করতে বলবে করবো—

আমি তখন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেচি, প্রেমের ও মোহের নিষ্ঠুরতায়—ওর মুখে 'তুমি' সম্বোধনে। আমি বলি—যদি গাছতলায় রাখি ? না খেতে দিই ?

—মেরে ফেলো আমাকে। তোমার হাতে মেরো। টুঁ শব্দটি যদি করি তবে .বালো পান্না খারাপ মেয়ে ছিল।

—তোমার আত্মীয় স্বজন ?

—কেউ নেই আমার আত্মীয় স্বজন।

—তোমার মা নেই ?

পান্না তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্‌টে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহের সুরে বললে—ভারী মা !

—বেশ চলো তবে। যা হয় হবে। আমি কিন্তু পয়সা নিয়ে বার হই নি, তা তুমি জানো।

—আবার ওই কথা ?

বেলা তিনটের সময় ট্রেন শেয়ালদ' পৌছুলে স্টেশন থেকে সোজা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ভবানীপুর অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র গলিতে পান্নার বাসায় গিয়ে ওঠা গেল।

রাত্রে আমার ভাল ঘুম হল না। আমি এমন জায়গায় কখনো রাত কাটাই নি। পল্লীটা খুব ভালো শ্রেণীর নয়, লোক যে না ঘুমিয়ে সারা রাত ধরে গান বাজনা করে, এও আমার জানা ছিল না। সকালে উঠে পান্নাকে বললাম—পান্না, আমি এখানে থাকবো না।

পান্না বিস্ময়ের সুরে বললে—কেন ?

—এখানে মানুষ থাকে ?

—চিরকাল তো এখানে কাটালুম।

—তুমি পারো, আমার কর্ম্ম নয়।

—আমি কি করবো তুমিই বলো। আমার কি উপায় আছে ?

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না। একটু পরে বেলা হলে এক প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকে আমার দিকে দু-একবার চেয়ে দেখে আবার চলে গেল। পান্না কোথায় গেল তাও জানি নে, একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

বেলা ন'টার সময় প্রৌঢ়াটি আবার ঘরে ঢুকে আমায় বললে—আপনার বাড়ী কোথায় ?

এ প্রশ্ন আমার ভালো লাগলো না। বললাম—কেন ?

—তাই শুধুচ্চি।

—যশোর জেলায়।

বুড়ী বসে পড়লো ঘরের মেজেতে। সে ঘরের মেজেতে সবটা গদি-তোশক পাতা, তার ওপরে ধবধবে চাদর বিছানো, এক কোণে তুটো রূপোর পরী, তাদের হাতে হুঁকো রাখবার খোল। দেওয়ালে তুটো ঢাকনি-পরানো সেতার কিংবা তানপুরো, ভালো বুঝি না। পাঁচ-ছ'খানা ছবি টাঙানো দেওয়ালে। এক কোণে চৌকি পাতা, তার ওপরে পুরু গদি পাতা বিছানা, ঝালর বসানো মশারি, বড় একটা কাঁসার পিকদান চৌকির তলায়। ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা সত্ত্বেও মনে হয় সবটা মিলে অমার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিচ্চে, গৃহস্থবাড়ীর শান্তশ্রী এখানে নেই।

বুড়ী বললে—তুমি ক'দিন থাকবে বাবা ?

—কেন বলুন তো ?

—পান্না তোমাদের দেশে গান করতে গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—তাই যেন তুমি ওর সঙ্গে এসেচ পৌঁছে দিতে ?

—তাই ধরুন আর কি।

—একটা কথা বলি। স্পষ্ট কথার কষ্ট নেই। এ ঘরে তুমি থাকতে পারবে না। ওকে রোজগার করতে হবে, ব্যবসা চালাতে হবে। ওর এখানে লোক যায় আসে, তারা পয়সা দেয়। তুমি ঘরে থাকলে তারা আসবে না। যা বলো আমি স্পষ্ট কথা বলবো বাপু! এতে তুমি রাগই করো, আর যাই করো। এসেচ দেশ থেকে ওকে পৌঁছে দিতে, বেশ। পৌঁছে দিয়েচ, এখন তু'-একদিন শহরে থাকো, দেখো শোনো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—আমি যা বুঝি। চিড়িয়াখানা দেখেচ ? মুসায়েভ্ দেখেচ ? না দেখে থাকো আজ তুপুরে গিয়ে দেখে এস—

এই সময় পান্না ঘরে ঢুকে বুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—মাসী, ঘরে বসে কি বলচো ওঁকে ?

বুড়ী ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—কি আবার বলবো ? বলচি ভালো মানুষের ছেলে, কলকেতা শহরে এসেচ, শহর দেখে তু'দিন দেখাশুনো করে বাড়ী চলে যাও। পৌঁছে তো দিয়েচ, এখন দেখো শোনো তুদিন, খাও মাখো—আমি তো না বলচি নে বাপু। ও ছুঁড়ি যখনই বাইরে যায়, তখনই ওর পেছনে কেউ না কেউ—সেবার খুলনে গেল, সঙ্গে এল সেই পরেশ-বাবু। পোড়ারমুখো নড়তে আর চায় না। পনেরো দিন হয়ে গেল, তবু নড়ে না—বলে, পান্নার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও মাসী—সে কি কেলেঙ্কারী! তবে পান্না তাকে মোটেই আমল দেয়নি, তাই সে টিকতে পারলো না—নইলে বাপু, তা অমন কত এল, কত গেল।

পান্না বললে—আঃ মাসী, কি বলচো বসে বসে ? যাও—

বুড়া হাত-পা নেড়ে বললে—যাবো না কি থাকতে এসেচি ? তোমার ঘাড়ে বাসা বেঁধে বসেচি ? এখন অল্প বয়েস, বয়েস-দোষ যে ভয়ানক জিনিস। হিত কথা শুনবি

তো এই মাসীর মুখেই শুনবি—বেচাল দেখলে রাশ কে আর টানতে যাবে, কার দায় পড়েচে ?

বুড়ী গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে উঠে চলে গেল।

আমি পান্নাকে অনেকক্ষণ দেখি নি। অনুযোগের সুরে বললাম—আমি বাড়ি চলে যাব আজ, ঠিক বলচি—

—কেন ? কেন ? ওই বুড়ীর কথায় ! তুমি—

—সে জন্যে না। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

—এই !

পান্না মুখে কাপড় দিয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো।

আমি রাগের সঙ্গে বললাম—হাসচো যে বড় ?

ও বললে—তোমার কথা শুনলে না হেসে থাকা যায় না। তুমি ঠিক ছেলেমানুষের মত। আমি এমন মানুষ যদি কখনো দেখেচি !

বলেই হাত দুটো অসহায় হাস্যের ভঙ্গিতে ওপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলবার মত তুলে আবার হাসতে লাগলো।

ওর সেই অপূর্ব ভঙ্গি হাত ছোঁড়ার, সারা দেহের ঝলমলে লাবণ্য, মুখের হাসি আমাকে সব ভুলিয়ে দিলে। ও আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বললে—তুমি চলে গেলেই হল ! মাইরি। পায়ে মাথা কুটবো না ?

আমাকে ও চা দিয়ে গেল। বললে—খাবে কিছু ?

সুরবালার কথা মনে পড়লো। সুরবালা এমন বলতো না, খাবার নিয়ে এসে রাখতো সামনে। আমি জানি এদের সঙ্গে সুরবালাদের তফাৎ কত। না জেনে বোকার মত আসি নি। সুরবালা সুরবালা, পান্না পান্না—এ নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বাক্যবিন্যাস করে কোন লাভ নেই। পান্না খাবার নিয়ে এল। চারখানা তেলেভাজা নিমকি, এক মুঠো ঘুঘনি দানা, দুখানা পাঁপড় ভাজা। এই প্রথম ওর হাতের জিনিস আমাকে খেতে হবে। মন প্রথমটা বিদ্রোহ করে উঠেছিল—কিন্তু তার পরেই শান্ত হয়ে এল। কেন খাবো না ওর হাতে ?

একটা কথা আমার মনে খচ্‌খচ্‌ করে বাজছিল। পান্নার ঘরে লোক আসে রাত্রে, বুড়ী বলছিল। যতবার এই কথাটা মনে ভাবি, ততবার যেন আমার মনে কি কাঁটার মত বাজে।

বললাম কথাটা পান্নাকে।

পান্না বললে—কি করতে বলো আমায় ?

—এ সব ছেড়ে দাও।

হয় পান্না খুব চালাক মেয়ে, নয় আমার অদৃষ্টলিপি—আবার পান্না বললে—যা তুমি বলবে—

সে বললে না, 'খাবো কি' 'চলবে কিসে' প্রভৃতি নিতান্ত রোমান্স-বর্জ্জিত বস্তুতান্ত্রিক কথা। কেন বললে না কতবার ভেবেছি। বললেই আমার নেশা তখুনি সেই মুহূর্ত্তেই ছুটে যেতো। কিন্তু পান্না তা বললে না। প্রতিমার মাটির তৈরী পা ও আমাকে দেখতে দিলে না।

দু-দুবার এরকম হল। অদৃষ্টলিপি ছাড়া আর কি!

আমি বললাম—চলো আমরা—

কিন্তু মাথা তখন ঘুরছে। কোনো সাংসারিক প্ল্যান আঁটবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। ওই পর্য্যন্ত বলে চুপ করলাম। পান্না হেসে বললে—খুব হয়েচে, এখন নাইবে চলো।

—চলো। কোথায়?

—কলতলায়।

—ওখানে বড্ড নোংরা। তা ছাড়া, এ বাড়ীতে চারিদিকে দেখচি শুধু মেয়েছেলের ভিড়। ওদের মধ্যে বসে নাইবো কি করে?

—ঘরে জল তুলে দিই—?

—তার চেয়ে চলো কালীঘাটের গঙ্গায় দুজনে নেয়ে আসি।

পান্নাও রাজী হল। দুজনে নাইতে বেরুবো, এমন সময়ে সেই বুড়ী মাসী এসে হাজির হোল। কড়াস্বরে আমায় বললে—বলি ওগো ভালমানুষের ছেলে, একটা কথা তোমায় শুধুই বাপু—

আমি ওর রকম-সকম দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বললাম—বলুন।

—তুমি বাপু ওকে টুইয়ে কোথায় নিয়ে বের করচো?

—ও নাইতে যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

—ও! আমার ভারী নবাবের নাতি রে। পান্না তোমার ঘরের বৌ নাকি যে, যা বলবে তাই করতে হবে তাকে? ওর কেউ নেই? অত দরদ যদি থাকে পান্নার ওপর, তবে মাসে ষাট টাকা করে দিয়ে ওকে বাঁধা রাখো। ওর গহনা দেও, সব ভার নাও—তবে ও তোমার সঙ্গে যেখানে খুশি যাবে। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?

আমি চুপ করে রইলাম। পান্না সেখানে উপস্থিত ছিল না, সাবানের বাক্স আনতে ঘরের মধ্যে গিয়েছিল। বুড়ী ওর অনুপস্থিতির এ সুযোগটুকু ছাড়লে না। আবার বললে—তুমি এয়েচ ভালোমানুষের ছেলে পান্নাকে পৌঁছে দিতে। মফঃস্বলের লোক। বেশ, যেমন এয়েচ, দুদিন থাকো, খাও মাখো, কলকাতার পাঁচটা জায়গা দেখে বেড়াও, বেড়িয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। পান্নাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবার দরকার কি তোমার? তুমি গেঁয়ো নোক, শহরের রাত্ কি, তুমি তা জানো না। তোমার ভালোর জন্যেই বলচি বাছা—

বুড়ীর সে কথা যদি তখন আমি শুনতাম!

যাক সে কথা।

পান্নাকে আর আমি পীড়াপীড়ি করি নি নাইতে যাবার জন্যে। ওকে কিছু না বলে আমি নিজেই নাইতে গেলাম একা। ফিরে আসতে পান্না বললে—এ কি রকম হল?

—কেন?

—একা নাইতে গেলে?

—আমি গেঁয়ো লোক। কলকাতা দেখতে এসেচি, দেখে ফিরে যাই। দরকার কি আমার রাজকন্যের খোঁজে।

—আমি কি রাজকন্যে নাকি?

—তারও বাড়া।

—কেন?

—সে সব কথা দরকার নেই। আমি আজই বাড়ী চলে যাবো।

—ইশ্! মাইরি? পায়ে মাথা কুটবো না? কি হয়েচে বলো—সত্যি বলবে!

আমি বুড়ীর কথা কিছু বলা উচিত বিবেচনা করলাম না। হয়তো তুমুল ঝগড়া আর অশান্তি হবে এ নিয়ে। না, এ বাড়ীতে আমার থাকা সম্ভব হবে না আর। একদিনও না। নিজের মন তৈরি করে ফেললাম, কিন্তু পান্নাকে সে কথা কিছু বলি নি। বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার নাম করে বেরিয়ে সোজা শেয়ালদ'তে গিয়ে টিকিট কাটবো।

খাওয়ার সময় পান্না নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালে। আগের রাত্রে আমি নিজেই দোকান থেকে লুচি ও মিষ্টি কিনে এনে খেয়েছিলাম। আজ ও বললে—আমি নিজে মাংস রান্না করচি তোমার জন্যে, বলো খাবে? এমন স্বরে অনুরোধ করলে, ওর কথা এড়াতে পারলাম না। বড় এক বাটি মাংস ও নিজের হাতে আমার পাতের কাছে বসিয়ে দিলে, সামনে বসে যত্ন করে খাওয়াতে লাগলো বাড়ীর মেয়েদের মত। কিন্তু একটা কাজ ও হঠাৎ করে বসলো, আমার মাংসের বাটি থেকে একটু মাংস তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে তখন বলচে—খাবো একটু তোমার এ থেকে?

তারপর হেসে বললে—দেখচি কেমন হয়েচে।

আমার সমস্ত শরীর যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, এত কালের সংস্কার যাবে কোথায়? আমি বললাম—ও এঁটো হাত যেন দিও না বাটিতে? ছিঃ—

পান্না দুষ্টুমির হাসি হেসে হাত খানিকটা বাটির দিকে বাড়িয়ে বললে—দিলাম হাত, ঠিক দেবো—দিচ্ছি কিন্তু—

পরে নিজেই হাত গুটিয়ে নিয়ে বললে—না, না, তাই কখনো করি? হয়তো তোমার খাওয়া হবে না—খাও, তুমি খাও—

আমি জানি কোনো মার্জ্জিতরুচি ভদ্রমহিলা অতিথিকে খাওয়াতে বসে তার সঙ্গে এমন

ধরনের ব্যবহার করতো না—কিন্তু পান্না যে শ্রেণীর মেয়ে, তার কাছে এ ব্যবহার পেয়ে আমি আশ্চর্য্য হই নি মোটেই।

পান্না বললে—মাংস কেমন হয়েচে?

—বেশ হয়েচে।

—আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে।

—কোথায়?

—যেখানে তোমার খুশি—

পরে বাঁকা ভুরুর নিচে আড় চাউনি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললো—আমি তোমার, যেখানে নিয়ে যাবে—

সে চাউনি আমাকে কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়ে দিলে, আমি এঁটো হাতেই ওর পুষ্পপেলব হাতখানা চেপে ধরতে গেলাম, আর ঠিক সেই সময়েই সেই বুড়ী সেখানে এসে পড়লো! আমার দিকে কটমট চোখে চেয়ে দেখলে, কিছু বললে না মুখে। কি জানি কি বুঝলে।

আমি লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে ভাতের থালার দিকে চাইলাম। কোনো রকমে দু'চার দলা খেয়ে উঠে পড়ি তখুনি!

কাউকে কিছু না বলে সেই যে বেরিয়ে পড়লাম, একেবারে সোজা শেয়ালদ' স্টেশনে এসে গাড়ী চেপে বসে দেশে রওনা।

সুরবালা আমায় দেখে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলে। তারপর বললে—কোথায় ছিলে?

—কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আসচি।

—তা আমিও ভেবেছি। সবাই তো ভেবে-চিন্তে অস্থির, আমি ভাবলাম ঠিক কোনো দরকারি কাজ পড়েচে, কলকাতায় টলকাতায় হঠাৎ যেতে হয়েচে। একটা খবর দিয়েও তো যেতে হয়! এমন তো কখনো করো নি?

—এমন অবস্থাও তো এর আগে কক্ষনো হয় নি। সবাই ভালো আছে?

—তা আছে। নাও, তুমি গা হাত ধুয়ে নাও, চা করে নিয়ে আসি। খাওয়া হয়েচে?

একটু পরে সুরবালা চা করে নিয়ে এল। বললে—বাবাঃ এমন কখনো করে? ভেবে চিন্তে অস্থির হতে হয়েচে। সনাতনবাবু তো দু'বেলা হাঁটাহাঁটি করচেন। নৌকার মাঝি ফিরে এসে বললে—বাবু, শেষ রাত্তিরে কোথায় চলে গেলেন হঠাৎ—আমাকে কিছু বলে তো যান নি—সনাতনদা আবার যাবেন বলছিলেন মঙ্গলগঞ্জে খোঁজ নিতে। যান নি বোধ হয়—

সনাতনদা ভাগ্যিস মঙ্গলগঞ্জে যায় নি। সেখানে গেলেই সব বলে দিতো গোবিন্দ দাঁ বা আবদুল হামিদ। এখনও ওরা অবিশ্যি জানে না, আমি বাড়ী চলে এসেছিলাম না কলকাতায় গিয়েছিলাম। সনাতনদা অনুসন্ধান করতে গেলেই ওরা বুঝতে পারতো আমি পান্নার সঙ্গেই চলে গিয়েছি।

একজন লোককে পাঠিয়ে দিলাম সনাতনদা'র বাড়ীতে খবর দিতে যে আমি ফিরে এসেছি।

সুরবালার মুখ দেখে বুঝলাম ওর মনে কোন সন্দেহ জাগে নি। ওর মন তো আমি জানি, সরলা শান্ত স্বভাবের মেয়ে। অতশত'ও কিছু বোঝে না। ও আমাকে খাওয়াতে মাখাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

তবুও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ও যেন কি দেখলে।

আমি বললাম—কি দেখচো?

—তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—কেন?

—তোমার মুখ যেন শুকিয়ে গিয়েছে—কেমন যেন দেখাচ্চে—

হেসে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললাম—ও, এই!

সুরবালা উদ্বেগের সুরে বললে—না সত্যি। তোমার মুখে যেন—

—ও কিছু না। একটু ঘুমুই—

—একটু ওষুধ খাও না কিছু? তুমি তো বোঝ—

—কিছু না। মশারিটা ফেলে দিয়ে যাও, ঘুমুই একটু—

সকালে সনাতনদা এসে হাজির হল। বললে—একি হে? তুমি হঠাৎ কোথাও কিছু নয়, কোথায় চলে গেলে? বৌমা কেঁদে কেটে অস্থির।

বললাম—কলকাতায় গিয়েছিলাম!

—কেন, হঠাৎ?

—বিশেষ কারণ ছিল।

—সে আমি বুঝতে পেরেছি। নইলে তোমার মত লোক হঠাৎ অমনি না বলা-কওয়া কলকাতা চলে যাবে? তা কি কারণটা ছিল—

—সে একটা অন্য ব্যাপার।

সনাতনদা আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না। আমার মুশকিল আমি মিথ্যে কথা বড় একটা বলি নে, বলতে মুখে বাধে—বিশেষ কাজে হয়তো বলতে হয় কিন্তু পারতপক্ষে না বলারই চেষ্টা করি। অন্য কথা পাড়লাম তাড়াতাড়ি। সনাতনদা দুতিনবার চেষ্টা করলে কলকাতা যাবার কারণটা জানবার। আমি প্রতিবারই কথা চাপা দিলাম। সনাতন বললে —মঙ্গলগঞ্জে যাবে নাকি?

—যাবো বৈকি। রুগী রয়েচে।

—আমিও চলো যাই—

—তুমি যাবে?

—চলো বেড়িয়ে আসি—

সর্ব্বনাশ। বলে কি সনাতনদা? মঙ্গলগঞ্জে গেলেই ও সব জানতে পারবে হয়তো।

ওর স্বভাবই একে-ওকে জিজ্ঞেস করা। গোবিন্দ দাঁ সব বলে দেবে। কিন্তু আমার এখনও সন্দেহ হয় গোবিন্দ দাঁ বা মঙ্গলগঞ্জের কেউ এখন হয়তো জানে না আমি কোথায় গিয়েছিলাম।

সনাতন বললে—কবে যাবে ?

—দেখি কালই যাবো হয়তো।

সনাতনদা চলে গেল। আমি তখনই সাইকেল চেপে মঙ্গলগঞ্জে যাবার জন্যে তৈরি হলাম। আগে সেখানে গিয়ে আমায় জানতে হবে। নয়তো সনাতনদাকে হঠাৎ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

সুরবালাকে বলতেই সে ব্যস্তভাবে বললে—না গো না, এখন যেও না—

—আমার বিশেষ দরকার আছে। মঙ্গলগঞ্জে যেতেই হবে।

—খেয়ে যাও।

—না, এসে খাবো।

সাইকেলে যেতে তিন চার মাইল ঘুর হয়। রাস্তায় এই বর্ষাকালে জল কাদা, তবুও যেতেই হবে।

বেলা সাড়ে দশটার সময় মঙ্গলগঞ্জের ডিসপেনসারির দোর খুলতেই চাকরটা এসে জুটলো। বললে—বাবু, পরশু এলেন না ? আপনি গিয়েলেন কনে ?

—কেন ?

—আপনার সেই মাঝি নৌকো নিয়ে ফিরে গেল।

—তোর সে খোঁজে কি দরকার ? যা নিজের কাজ দেখগে—

একটু পরে গোবিন্দ দাঁ এল কার মুখে খবর পেয়ে। ব্যস্তভাবে বললে—ডাক্তার, ব্যাপার কি ? কোথায় ছিলেন ?

—কেন ?

—সেদিন গেলেন কোথায় ? মাঝি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। শেষে নৌকো নিয়ে গেল। এখন আসা হচ্ছে কোথা থেকে ?

—বাড়ী থেকেই আসচি। সেদিন একটু বিশেষ দরকারে অন্যত্র গিয়েছিলাম।

—তবুও ভালো। আমরা তো ভেবে চিন্তে অস্থির।

গোবিন্দ দাঁ সন্দেহ করে নি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল ! গোবিন্দই সব চেয়ে ধূর্ত্ত ব্যক্তি, সন্দেহ যদি করতে পারে, তবে ওই করতে পারতো। ও যখন সন্দেহ করে নি, তখন আর কারো কাছ থেকে কোনো ভয় নেই। আমি ভয়ানক কাজে ব্যস্ত আছি দেখাবার জন্যে আলমারি খুলে এ শিশি ও শিশি নাড়তে লাগলাম। গোবিন্দ দাঁ একটু পরে চলে গেল।

ও যেমন চলে গেল আমি একা বসে রইলুম ডিসপেনসারি ঘরে। অমনি মনে হল পান্না ঠিক ওই দোরটি ধরে সেদিন দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হল একা এখানে এসে।

আমি ভুল করেছি। পান্নার অদৃশ্য উপস্থিতিতে এ ঘরের বাতাস ভরে আছে—হঠাৎ তার সেই অদ্ভুত ধরনের দুষ্টুমির হাসিটি ফুটে উঠলো আমার সামনে। মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সে কি সাধারণ চঞ্চলতা?

অমন যে আবার হয় তা জানতাম না।

পান্না এখানে ছিল সে গেল কোথায়? সেই পান্না, অদ্ভুত ভঙ্গি, অদ্ভুত দুষ্টুমির হাসি নিয়ে। তাকে আমার এখুনি দরকার। না পেলে চলবে না, আমার জীবনে অনেকখানি জায়গা যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, সে শূন্যতা যাকে দিয়ে পুরতে পারে সে এখানে নেই—কতদূর চলে গিয়েছে। আর কি তাকে পাবো?

পান্নার অদৃশ্য আবির্ভাব আমাকে মাতাল করে তুলেচে। ওই চেয়ারটাতে সেদিন সে বসেছিল। এখান থেকে ডিস্‌পেনসারি উঠিয়ে দিতে হবে।

পকেট খুঁজে দেখি মোটে দুটো টাকা। বিষ্ণু সাধুখাঁর দোকান পাশেই। তাকে ডাকিয়ে বললাম—দশটা টাকা দিতে পারবে?

—ডাক্তারবাবু, প্রাতঃপ্রণাম। কোথায় ছিলেন?

—বাড়ী থেকে আসচি। টাকা ক'টা দাও তো?

—নিয়ে যান।

তার দোকানের ছোকরা চাকর মাদার এসে একখানা নোট আমার হাতে দিয়ে গেল। আমি সাইকেলখানা ডিস্‌পেনসারির মধ্যে চাবি দিয়ে রেখে স্টেশনে চলে এলাম। আড়াই ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে হল সেজন্যে।

পান্না আমায় দেখে অবাক। সে নিজের ঘরের সামনে চুপ করে একখানা চেয়ারে বসে আছে—কিন্তু সাজগোজ তেমন নেই। মাথার চুলও বাঁধা নয়।

আমি হেসে বললাম—ও পান্না—

—তুমি!

—কেন! ভূত দেখলে নাকি?

—তুমি কেমন করে এলে তাই ভাবছি!

—কেন আসবো না?

—সত্যি তুমি আমার এখানে এসেচ?

পান্না যে আমাকে দেখে খুব খুশী হয়েচে সেটা তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারলাম। ওর এ আনন্দ কৃত্রিম নয়। পান্না আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে একখানা হাতপাখা এনে বাতাস করতে লাগলো। ওর এ যত্ন ও আগ্রহ যে নিছক ব্যবসাদারি নয় এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দিয়েচেন। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম বেশ একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। সে মুখে ব্যবসাদারির ধাঁজও নেই। আমি বিদেশ থেকে ফিরলে সুরবালার মুখ এমনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু সুরবালার

এ লাবণ্যভরা চঞ্চলতা, এত প্রাণের প্রাচুর্য্য নেই। এমন সুন্দর অঙ্গভঙ্গি করে সে হাঁটতে পারে না, এমন বিদ্যুতের মত কটাক্ষ তার নেই, এমন দুষ্টুমির হাসি তার মুখে ফোটে না।

পান্না বললে—দেশে গিয়েছিলে?

—হাঁ।

—তবে এলে যে আবার?

—তোমায় দেখতে।

—সত্যি বলো না?

—বিশ্বাস করো। আজ মঙ্গলগঞ্জ থেকে সোজা তোমার এখানে আসচি।

—কেন? বলো, বলতেই হবে।

—বলবো না।

—বলতেই হবে, লক্ষ্মীটি।

—তোমার জন্যে মন কেমন করে উঠলো। তুমি সেদিন দোর ধরে দাঁড়িয়েছিলে, সে জায়গাটা দেখেই মন বড় অস্থির হল, তাই ছুটে এলাম।

—খুব ভালো করেচ। জানো? আমি মরে যাচ্ছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। তুমি যে দিনটি চলে গেলে, সেদিন থেকে—

—কেন মিথ্যে কথাগুলো বলো? ছিঃ!

পান্না খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কি? আমি তোমার পায়ে মাথা কুটে মরবো দেখো তবে—আমি মিথ্যে কথা বলচি?

আমি সুখের সমুদ্রে ডুবে গেলাম। কি আনন্দ! সে আনন্দের কথা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। এই সুন্দরী লাবণ্যময়ী চঞ্চলা ষোড়শী আমার মত মধ্যবয়স্ক লোককে ভালোবাসে! এ আমার এত বড় গর্ব্ব, আনন্দের কথা, ইচ্ছে হয় এখুনি ছুটে বাইরে চলে গিয়ে দু'পারের দুই পথের প্রত্যেক লোককে ধরে ধরে চীৎকার করে বলি—ওগো শোনো—পান্না আমাকে ভালোবাসে, আমার জন্যে সে ভাবে।…ভালোবাসা! জীবনে কখনো আস্বাদও করি নি। জানি নে ও জিনিসের রূপ কি। এবার যেন ভালোবাসা কাকে বলে বুঝেচি। ভালোবাসা পেতে হয় এরকম সুন্দরী ষোড়শীর কাছ থেকে, যার মুখের হাসিতে, চোখের কোণের বিদ্যুৎ কটাক্ষে ত্রিভুবন জয় হয়ে যায়!

কেন, আমি আজ তেরো বছর হল বিয়ে করেছি। সুরবালা কখনো ষোড়শী ছিল না? সে আমাকে ভালোবাসে না? মেয়েদের ভালোবাসা কখনো কি পাই নি? সে কথার জবাব কি দেবো আমি নিজেই খুঁজে পাই না। কে বলে সুরবালা আমায় ভালোবাসে না? কিন্তু সে এ জিনিস নয়। তাতে নেশা লাগে না মনে। সে জিনিসটা বড্ড শান্ত, স্থির, সংযত, তার মধ্যে নতুন আশা করবার কিছু নেই—নতুন করে দেখবার কিছু নেই—ও কি বলবে আমি তা জানি, বলতেই তাকে হবে, সে আমার বাড়ী থাকে, খায়, পরে। ভালো মিষ্টি

কথা তাকে বলতে হবে। তার মিষ্টি কথা আমার দেহে মনে অপ্রত্যাশিতের পুলক জাগায় না। সুরবালা কোনোকালেই এ রকম সজীব, প্রাণচঞ্চলা সুন্দরী, ষোড়শী ছিল না—তার চোখে বিদ্যুৎ ছিল না।

পান্নার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললাম—বসো, ছেলেমানুষি কোরো না—

—তা হলে বললে কেন অমন কথা?

—ঠাট্টা করছিলাম। তোমার মুখে কথাটা আবার শুনতে চাচ্ছিলাম—

—চা করি?

—তোমার ইচ্ছে—

—কি খাবে বলো?

—আমি কি জানি?

—আচ্ছা বোসো। লক্ষ্মী হয়ে বোসো, ভালো হয়ে বোসো, পা তুলে বোসো, পা ধুয়ে জল দিয়ে মুছিয়ে দেবো, রাজার-ধন-এক-মানিক বসো?

—যাও—

আমি বসে একটা সিগারেট ধরিয়েচি, এমন সময় পান্নার মাসী সেই বুড়ী এসে আমার দিকে কটমট করে চাইলে। আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। যেন প্রাইভেট টিউটর ছাত্রকে দিয়ে বাজারের দোকানে সিগারেট কিনতে পাঠিয়ে ছাত্রের অভিভাবকের সামনে পড়ে গিয়েচে।

বুড়ী আরও কাছে এসে বললে—সেই তুমি না? সেদিন চলে গেলে?

গলা ভিজিয়ে বলি—হ্যাঁ।

—তা আবার এলে আজ?

—একটু কাজ আছে—

—কি কাজ?

—কলকাতার কাজ। এই হাটবাজারের—

—তোমার দোকান-টোকান আছে নাকি?

—হ্যাঁ, ওষুধের দোকান—

—ওষুধ কিনতে এসেচ, তা এখানে কেন?

—পান্নার সঙ্গে দেখা করতে।

—কোথায় গেল সে ছুঁড়ী? দেখা হয়েচে?

—হ্যাঁ।

—তোমরা সবাই মিলে ও ছুঁড়ীর পেছনে পেছনে অমন ঘুরচো কেন বলো তো? তোমাদের পাড়াগাঁ অঞ্চলে মেয়েকে পাঠালেই এই কাণ্ড গা? জলে পুড়ে মনু বাপু তোমাদের জালায়। আবার তুমি এসে জুটলে কি আক্কেলে?

আমি এ কথার কি জবাব দেবো ভাবচি, এমন সময় বুড়ী বললে—তোমাকে সেবার

ভালো কথা বল্লু বাছা তা তোমার কানে গেল না। তুমি বাপু কি রকম ভদ্দর নোক? বয়েস দেখে মনে হয় নিতান্ত তুমি কচি খোকাটি তো নও—এখানে এলেই পয়সা খরচ করতে হয় বলি জানো সে কথা? বলি এনেচ কত টাকা সঙ্গে করে? ফতুর হয়ে যাবে বলে দিচ্চি। শহুরে বাবুদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে টাকা খরচ করতে গিয়ে একেবারে ফতুর হয়ে যাবে, এখনো ভালোয় ভালোয় বাড়ী চলে যাও—

—যাবোই তো। থাকতে আসি নি।

—সে কথা ভালো। তবে এত ঘন ঘন এখানে না-ই বা এলে বাপু? ও ছুঁড়িকেও তো বাইরে যেতে হবে, তোমার সঙ্গে জোড়-পায়রা হয়ে বসে থাকলে তো ওর চলবে না।

এমন সময় পান্না খাবারের রেকাব ও চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকে বললে—কি মাসী, কি বলচো ওঁকে? যাও এখন ঘর থেকে—

বৃদ্ধা আমার দিক থেকে ওর দিকে ফিরে বললে—ছাখ পান্নু, বাড়াবাড়ি কোন বিষয়ে ভালো না। দু'জনকেই হিত কথা শোনাচ্চি বাপু,—কষ্ট পেতে আমার কি, তোরা দুজনেই পাবি—

পান্না ব্যঙ্গের সুরে বললে—তুমি এখন যাবে একটু এ ঘর থেকে? ওঁকে এখন বোকো না। সমস্ত রাত ওঁর খাওয়া হয় নি জানো?

বুড়ী বললে—বেশ তো, আমি কি বল্লু খেয়ো না, মেখো না, খাও দাও, তারপর সরে পড়ে—

—তুমি এবার সরে পড়ো দিকি মাসী, দেখি—

বুড়ী গজ গজ করতে করতে চলে গেল। পান্না আমার সামনে এসে রেকাব নামাল, তাতে একটুখানি হালুয়া ছাড়া অন্য কিছু নেই। এই অবস্থায় সুরবালা কত কি খাওয়াতো। পান্নার মত মেয়েরা সেদিক থেকে বড্ড আনাড়ি, খাওয়াতে জানে না। আমার খাওয়ার সময়ে পান্না নিজেই বললে—বুড়ী বড় খিটখিট করে, না? চলো আজ দু'জনে কালীঘাট ঘুরে আসি, কি কোথাও দেখে আসি—

আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম যেন। ব্যগ্রভাবে বলি—যাবে তুমি? কখন যাবে? উনি বকবেন না? যেতে দেবেন তোমাকে?

পান্না হেসে লুটিয়ে পড়ে বললে—আহা, কথার ।ক ছিরি! ওই জন্যেই তো—হি-হি-হি —যাবে তুমি? কখন যাবে? হি-হি-হি—

এই তো অনুপমা পান্না, অদ্বিতীয়া পান্না, হাস্যলাস্যময়ী আসল পান্না, হাজারো মেয়ের ভিড়ের মধ্যে থেকে যাকে বেছে নেওয়া যায়। এমন একটি মেয়ের চোখে তো পড়ি নি কোনদিন। মন খুশিতে ভরে উঠলো, যার দেখা পেয়েচি, যে আমাকে ভালোবেসেচে পথে ঘাটে দেখা মেলে না তার।

না। পান্না যে আমাকে ভালোবাসে, এ সম্বন্ধে আমি তত নিশ্চিত ছিলাম না। ওর

ভালোবাসা আমাকে জয় করে নিতে হবে এই আমার বড় উদ্দেশ্য জীবনের। এখন যেটুকু ভালোবাসে, ওটা সাময়িক মোহ হয় তো। ওটা কেটে যাবার আগে আমি ওকে এমন ভালোবাসাবো যে আর সমস্ত কিছু বিস্বাদ হয়ে যাবে ওর কাছে। এই আমার সাধনা, এই সাধনায় আমায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। আমাকে পাগল করে দিতে হবে। আমার জন্যে পাগল করে দিতে হবে।

পান্নাকে দেখবার জন্যে ওদের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত করবার সাহস আমার হল না। ওর মাসীর মুখের দিকে চাইলে আমার সাহস চলে যেতো।

একদিন পান্নাকে বললাম—চলো, আমার সঙ্গে।

পান্না হেসে বললে—কোথায় যাবো?

—যে রাজ্যে মাসী পিসীরা নেই।

পান্না খিলখিল করে হেসে উঠে বললে—কোথায়? নদীর ওপারে?

তারপর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলো—বলি—উত্তরপাড়া? কোন্নগর? হুগলী?

—না।

—তবে?

—আমি যেখানে ভালো বুঝবো। যাবে?

—নিশ্চয়ই।

—এখুনি?

—এখুনি।

পান্নাকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি নে বটে কিন্তু আমি মানুষ চিনি। ওর চোখের দিকে চেয়ে বুঝলাম পান্না মিথ্যে কথা বলচে না। ও আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছে, যেখানে ওকে নিয়ে যাবো। শুধু এইটুকু জানা বোধ হয় আমার দরকার ছিল। যে-ই বুঝলাম ও আমার সঙ্গে যতদূর নিয়ে যাবো যেতে পারে, তখনই আমি একটা অদ্ভুত আনন্দ মনের মধ্যে অনুভব করলাম। সে আনন্দ একটা নেশার মত আমাকে পেয়ে বসলো। সে নেশা আমাকে ঘরে থাকতে দিলে না—সোজা এসে বড় রাস্তার ওপর পড়লাম। সেখান থেকে ট্রামে গড়ের মাঠে এসে একটা গাছের তলায় বেঞ্চিতে নির্জ্জনে বসলাম।

হাতে কত টাকা আছে? কুড়ি পঁচিশের বেশি নয়। এই টাকা নিয়ে কতদূর যেতে পারি দু'জনে? কাশী হয় তো! ফিরতে পারবো না। ফিরবার দরকারও নেই। আর আসবো না। সব ভুলে যাবো, ঘর বাড়ী, সুরবালা, ছেলেমেয়ে। ওসবে আমার কোন তৃপ্তি নেই। সত্যিকার আনন্দ কখনো পাই নি। এবার নতুন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করবো পান্নাকে নিয়ে।

আজ রাত্রেই যাবো।

মাতালের মত টলতে টলতে বড় রাস্তায় এসে ট্রাম ধরলাম। এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠলো—কি রে, শোন্, শোন্—

ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। পেছন দিকে চেয়ে দেখি আমার মেডিকেল কলেজের সহপাঠী করালী। অনেক দিন দেখা হয় নি, দেখে আনন্দ হল। ওর সঙ্গে পুরানো কথাবার্ত্তায় অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। করালী ডায়মণ্ডহারবারের কাছে কি একটা গ্রামে প্র্যাক্‌টিস্ করচে। আমায় বললে, চল একটু চা খাই কোনো দোকানে।

—বেশ, চলো।

আমার চা খাবার বিশেষ কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিল স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম স্বাভাবিক অবস্থায় আমি আদৌ নেই। করালী গ্রাম্য প্র্যাক্‌টিসের অনেক গল্প করলে। দু'একটা শক্ত কেসের কথা বললে। আমি একমনে বসে শুনছিলাম। করালীকে বললাম—অমনি একটা নিরিবিলি গ্রামের ঠিকানা আমায় দিতে পারিস?

—কেন রে?

—আমি প্র্যাক্‌টিস করবো তোর মত।

—কেন তুই তো গ্রামেই বসেছিলি—তাই না? চাকরি নিয়েচিস নাকি?

—জায়গাটা বদলাবো।

—বদলাবি বটে কিন্তু একটা কথা বলি। ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নেই গ্রামে বেশি পয়সা হবে না।

—যা হয়।

—আমি দেখবো খোঁজ করে। তোর ঠিকানাটা দে আমাকে।

—তোর ঠিকানাটা দে, আমি বরং তোকে আগে চিঠি দেবো।

করালী বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আমি পান্নার বাড়ীতেই চললাম সোজা। ওর ঘরের বাইরে একটা কাঠের বেঞ্চি আছে, বেঞ্চিটার ঠিক ওপরেই দেওয়ালে একটা পুরানো সস্তা খেলো ক্লকঘড়ি। ঘরের মধ্যে ঢোকবার সাহস আমার কুলালো না, ঘড়ির নীচে বেঞ্চিখানাতে বসে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পরে পান্নাই প্রথম এল ওদিকের একটা ঘর থেকে।

আমায় দেখে অবাক হয়ে বললে—এ কি!

বললাম—চুপ, চুপ।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—কোথায়?

পান্না হেসে বললে—কে? মাসী? হরিসংকীর্ত্তন না কথকতা কি হচ্ছে গলির মোড়ে, তাই শুনতে গিয়েচে! বুড়ীর দল সবাই গিয়েচে। তাই মলিনাদের ঘরে একটু মজা করে চা আর সাড়ে বত্রিশ ভাজার মজলিশ করছিলাম। আনবো আপনার জন্যে? দাঁড়ান—

আমি ব্যস্তভাবে বললাম—শোনো, শোনো, থাক ওসব। কথা আছে তোমার সঙ্গে—

পান্না যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে আবার যেতে যেতে বললে—বসুন ঠাণ্ডা হয়ে।

বুড়ীরা নিশ্চিন্দে হয়ে বেরিয়েচে—রাত ন'টার এদিকে ফিরবে না। চা আর ভাজা খেয়ে কথা হবে এখন বসে বসে।

—বেশ, আমি এত রাত্রে যাব কোথায়?

—এখানে থাকবেন।

—সে সাহস আমার নেই।

পান্না ধমক দিয়ে বললে—আপনি না পুরুষমানুষ? ভয় কিসের। আমি আছি। সে ব্যবস্থা করবো।

—তুমি থাকলে তবু ভরসা পাই।

—বসুন—আসচি—

একটু পরেই পান্না চা আর বাদাম ভাজা নিয়ে ফিরলো। বললে—চলুন ঘরে।

—না, আমি ঘরে যাব না। এখানেই বসো।

পান্না হঠাৎ এসে খপ্ করে আমার হাত ধরে বললে—তা হবে না, আসুন।

আমি কৃত্রিম রাগের সুরে বললাম—তুমি আমার হাত ধরলে কেন?

—বেশ করেচি, যাও।

—জান ওসব আমি পছন্দ করি নে।

—আমি ভয়ও করি নে।

দু'জনে খুব হাসলাম—পান্না তুমি কি আমায় ভালোবাসো? সত্যি জবাব দাও।

পান্না ঘাড় দুলিয়ে বললে—না—

—না, হাসি ঠাট্টা রাখো, সত্যি বলো।

—কখনই না।

—বেশ, আমি তবে এই রাত্তিরে চলে যাবো।

—সত্যি?

—যদি ভালো না বাসো, তবে আর মিথ্যে কেন খয়ে-বন্ধন—

পান্না খিলখিল করে হেসে উঠলো মুখে আঁচল দিয়ে। ততক্ষণ সে আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেচে!

আমি কিন্তু মন ঠিক করে রেখেছি। ফাঁকা কথায় ভুলবার নই আমি। কাল সকালে পান্না আমার সঙ্গে যেতে পারবে কিনা? যেখানে আমি নিয়ে যাবো। সে বিচারের ভার আমার উপর ছেড়ে দিতে পারবে কি ও? আমি জানতে চাই এখুনি।

পান্না সহজ ভাবে বললে—নাও ওগো গুরুঠাকুর, কাল সকালে যখন খুশি তুমি কৃপা করে আমায় উদ্ধার কোরো—এখন চা'টুকু আর ভাজা ক'টা ভাল মুখে খেয়ে নাও তো দেখি?

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। আমি বললাম—এখন?

পান্না হেসে বললে—কি এখন?

—এখন কি করা যাবে?

—এখানে থাকতে হবে রাত্রে, আবার কি হবে?

আমারও তাই ইচ্ছে। পান্নাকে ছেড়ে যেতে এতটুকু ইচ্ছে নেই আমার। ওর মুখের সৌন্দর্য্য আমাকে এত মুগ্ধ করেচে যে ওর মুখের দিকে সর্ব্বদা চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ না দেখলে মনে হয় পান্নার মুখ আমার মনে নেই, আদৌ মনে নেই। আর একবার কখন দেখা হবে? পান্নার মুখ ভুলে গেলাম? ওকে না দেখে থাকতে পারি নে। ওর মুখের নেশা মদের নেশার মতই তীব্র আমার কাছে। বুঝচি মোহ আনচে। সর্ব্বনাশ করচে আমার, অমানুষ করে দিচ্চে আমাকে। কিন্তু ছাড়বার সাধ্য নেই আমার। ছাড়বোই যদি, তবে আর মোহ বলেচে কেন?

মনে মনে ভাবলুম, পান্নার মাসী যে খাণ্ডার, এখানে আমাকে রাত্রে দেখতে পেলে খা খিট্‌খিট্‌ করবে।

পান্নাকে বললাম, কিন্তু তোমার সেই মাসী? যিনি জন্মাতেই তাঁর মা জিবে মধু দিয়েছিলেন?

পান্না খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। আমার মুখের দিকে হাসি-উপছে-পড়া ডাগর চোখে চেয়ে বললে, সে কি? আবার বলুন ত কি বল্লেন?

—তোমার সেই খাণ্ডার মাসী—

—হ্যাঁ, তারপর?

—যিনি জন্মাতেই তাঁর মা জিবে মধু দিয়েছিলেন।

—ওমা! কি কথার বাঁধুনি!

পান্না হেসে আবার গড়িয়ে পড়লো। কি সুন্দর, লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছিল ওকে। হাত দু'টি নাড়ার কি অপূর্ব ভঙ্গি ওর। এ আমি ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসচি। আমার আরও ভাল লাগলো ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে। আমি ঠিক বলতে পারি সুরবালা বুঝতে পারতো না আমার কথার শ্লেষটুকু, বুঝতে পারলেও তার রস গ্রহণের ক্ষমতা এত নয়, সে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারতো না। পান্নাকে নতুন ভাবে দেখতে পেলুম সেদিন। আমি ভোঁতা মেয়ে ভালবাসি নে, ভালবাসি সেই মেয়েকে মনে মনে, যার ক্ষুরের মত ধার বুদ্ধির, কথা পড়বা মাত্র যে ধরতে পারে।

পান্না আমার কথা শুনে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো, ওর চোখের চাউনির ভাষা গেল বদলে। মেয়েদের এ অদ্ভুত খেলা দু' মিনিটের মধ্যে। তবে সব মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয় এ খেলা তাও জানি। সুরবালাদের মত দেবীর দল পারে না।

পান্নাকে বললাম, খাবো কি?

—কেন আমাদের রান্না খাবেন না?

—না।

—তবে?

—হোটেল থেকে খেয়ে আসবো এখন।

সে রাত্রে মাসী আমার দিকেও এলো না। কেন কি জানি। হয়তো পান্না বারণ করে থাকবে। কেবল অনেক রাত্রে পান্না আর আমি যখন গল্প করচি, ওর মাসী বাইরে এসে আমাদের কথা শুনতে পেয়ে বললে—ওমা, ই কি অনাছিষ্টি কাণ্ড! এখনো তোমাদের চোখে ঘুম এলো না? রাত দুটো বেজেচে যে! পান্না চোখ টিপে আমায় চুপ ক'রে থাকতে বললে। দিব্যি গদি-পাতা ধপধপে বিছানা, পান্না ওদিকে আমি এদিকে বালিশ ঠেস দিয়ে গল্প করছি। আমি ওকে যেন আজ নতুন দেখচি। একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারচি নে। কত প্রশ্ন, কত আলাপ পরস্পরে।

এমনি ভাবেই ভোর হয়ে গেল।

পান্না উঠে বললে—ফুলশয্যের বাসর শেষ হল। তুমি চা খাবে তো? মুখ ধুয়ে নাও—আমি চা করি।

—করো। আজ মনে আছে?

—হ্যাঁ মনে আছে।

—কি বলো তো?

—আজ তুমি আমায় নিয়ে যাবে।

—চা খেয়ে আমি একটু বেরুবো। তুমি তৈরী হয়ে থাকবে।

—বেশ।

—মাসীকে কিছু বলো না যেন যাওয়ার কথা। বাইরে দেখে এসো তো কেউ নেই, না আছে?

পান্না মুখ টিপে হেসে বললে—সে আগেই আমি দেখেচি। এখনো কেউ ওঠে নি। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।

চা খেয়ে আমি বাড়ীর বার হয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসলাম। সারারাত ঘুম হয় নি, ঘুমে চোখ ঢুলে পড়েচে, কিন্তু একটা অদ্ভুত আনন্দে মন পরিপূর্ণ। করালী ঠিকানা দিয়েচে, ওকে একটা চিঠি লিখি। ওর দেশেই গিয়ে একটা বাসা নিয়ে প্র্যাকটিস্ করবো।

আপাততঃ কলকাতায় একটা ছোটখাটো বাসা দেখে আসা দরকার।

পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। যখন জেগে উঠলাম তখন বেলা সাড়ে ন'টা। একটা নাপিতকে ডেকে দাড়ি কামিয়ে নিলাম। চায়ের দোকানে আর এক পেয়ালা চা খেলাম। এইবার অবসাদ একটু কেটেচে। তারপর বাসা খুঁজতে বেরুই।

কলকাতায় আমায় কেউ চেনে না। ডাক্তারি পড়বার সময়ে যে মেসে থাকতাম, সেটা কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে। সে মেসে আমাদের সময়কার এখন কেউ নেই—যে যার পাশ করে বেরিয়ে গিয়েচে আট দশ বছর আগে। তাহলেও এই অঞ্চলের অনেক মুদী, নাপিত, চায়ের দোকানী আমায় চেনে হয়তো। ও অঞ্চলেও গেলাম না বাসা খুঁজতে। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে আমাকে কেউ চেনে না। কলকাতা শহর জনসমুদ্র বিশেষ,

এখানে লুকিয়ে থাকলে কার সাধ্য খুঁজে বার করে? কে কাকে চেনে এখানে? অজ্ঞাত-বাস করতে হলে এমন স্থান আর নেই।

বাসা ঠিক হয়ে গেল। লেবুতলা এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যে বাসা। আপাততঃ থাকবার জন্যে, ডাক্তারি এখান থেকে চলবে না, বড় রাস্তার ধারে তার জন্যে ঘর নিতে হবে বা একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসে কোন একটা ডিস্‌পেনসারিতে বসবার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ীটা ভালো, ছোট হলেও অন্য কোন ভাড়াটে নেই এই একটা মস্ত সুবিধে। এই রকম বাড়ীই আমি চেয়েছিলাম। ওপরে দুটি ঘর, দুটিই বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আলো হাওয়া মন্দ নয়।

বাড়ীওয়ালা একজন স্বর্ণকার, এই বাড়ী থেকে কিছুদূরে কেরাণী-বাগান লেনের মোড়ে তার সোনারুপোর দোকান।

বাড়ী আমার দেখা হয়ে গেলে সে আমায় জিজ্ঞেস করলে আমি কবে আসবো। আমি জানালুম আজই আসচি। চাবিটা কোথায় পাওয়া যাবে? সে ওর সোনারুপোর দোকান থেকে চাবিটা নিয়ে আসতে বললে।

এই বাড়ীতে পান্না আর আমি নিভৃতে দু'জন থাকবো?

পান্নাকে এত নিকটে, এত নির্জ্জনে পাবো? ওকে নিয়ে এক বাসায় থাকতে পাবো? এত সৌভাগ্য কি বিশ্বাস করা যায়?

আনন্দে কিসের একটা ঢেউ আমার গলা পর্য্যন্ত উঠে আসতে লাগলো। আজই দিনের কোন এক সময়ে পান্না ও আমি এই ঘরে সংসার পেতে বাস করবো। এই ক্ষুদ্র দোতলা বাড়ীটা—বাইরে থেকে যেটা দেখলে ঘোর অভক্তি হয়—সে সৌভাগ্য বহন করবে এই বাড়ীটাই।

না, হয়তো কিছুই হবে না। পান্না আসবে না, পান্নার মাসী পথ আটকাবে—ওকে আসতেই বাধা দেবে।

বাড়ীওয়ালা আমার দেরি দেখে নিচে থেকে ডাকাডাকি করতে লাগলো। সে কি জানবে আমার মনের ভাব?

বাড়ী দেখে যখন বেরুলাম তখন বেলা একটা। খিদে পেয়েচে খুবই, কিন্তু আনন্দে মন পরিপূর্ণ, খাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই।

বৌবাজারের মোড়ের একটা শিখ-হোটেল থেকে দু'খানা মোটা রুটি আর কলাইয়ের ডাল, বড় এক গ্লাস চা পান করি। চা জিনিসটা আমার সর্ব্বদাই চাই। অন্ন আহার না করলেও আমার কোন কষ্ট হয় না, যদি চা পাই। ঠিক করলাম বাসাতে পান্নাকে এনে আজই ওবেলা সর্ব্বাগ্রে আমার চায়ের সরঞ্জাম কিনে আনতে হবে। পান্না চা করতে জানে না ভালো, ওকে শিখিয়ে নিতে হবে চা করতে।

বেলা তিনটের পর পান্নাদের বাসাতে গিয়ে পৌছুলাম। পান্না অঘোর ঘুমুচ্চে, কাল রাত্রি জাগরণের ফলে। পান্নার মাসীও ঘুমুচ্চে ভিন্ন ঘরে। পান্নাকে আমি ঘুম থেকে

উঠিয়ে বললাম—সব তৈরী। বাসা দেখে এসেচি। কখন যাবে ?

পান্না ঘুমজড়িত চোখে বললে—কোথায় ?

—বেশ! মনে নেই ? উঠে চোখে জল দাও।

—খেয়েচ ?

—না খেয়ে এসেচি ?

—আমি তোমার জন্তে লুচি ভেজে রেখেচি কিন্তু। আমাদের এখানে লুচি খেতে দোষ কি ?

—দোষের কথা নয়। তুমি চল আমার সঙ্গে। সেখানে তুমি ভাত রেঁধে দিলেও খাবো।

—ইস্! মাইরি! আমার কি ভাগ্যি!

—আমি গাড়ী নিয়ে আসি ?

—বোসো। চোখে জল দিয়ে আসি—

—তোমার মাসী ঘুমুচ্চে—এই সবচেয়ে ভাল সময়।

—বোসো। আসচি।

একটু পরে পান্না সত্যিই সেজেগুজে এল।

বললে—কোনো জিনিস নেই আমার, একটা পেঁটরা আছে কেবল। সেটা নিলুম আর এই কাপড়ের বোঁচকাটা।

আমি বললাম—চলো ওই নিয়ে। বাসে উঠবো, আর দেরি করো না।

—দেওয়ালে দু'খানা পিক্‌চার আছে, আমার নিজের পয়সায় কেনা, খুলে নিই—

পান্না ঠকাঠক শব্দ করে পেরেক তুলতে লাগলো দেখে আমার ভয় হল। বললাম—আঃ কি করো ? ওসব থাকগে। তোমার মাসী জেগে কুরুক্ষেত্র বাধাবে এখুনি।

পান্না হেসে বললে—সে পথ বন্ধ। আমি বলেই রেখেচি মুজরো করতে যেতে হবে আমাকে আজ। নীলি সঙ্গে যাবে। নীলি সেই মেয়েটি গো, আমার সঙ্গে যে গিয়েছিল মঙ্গলগঞ্জ।

একটু পরে আমরা দু'জনে রাস্তায় বার হই।

লেবুতলার বাসার সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে কেরাণীবাগান লেনের স্বর্ণকারের দোকানে চাবি আনতে গেলাম। বাড়ীওয়ালা একগাল হেসে বললে—এসেচেন ?—কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—চাবি নিয়ে আসিগে। দাঁড়ান একটু।

—আমি আমার স্ত্রীকে যে রিক্‌শাতে বসিয়ে রেখে এসেছি। ওই বাড়ীর সামনে।

—আপনি মাঠাকুরুনের কাছে চলে যান। আমি চাবি নিয়ে যাচ্ছি—

পান্না নাকি মাঠাকুরুন। মনে মনে হাসতে হাসতে এলাম।

আমার ইচ্ছে নয় যে বাড়ীওয়ালা পান্নাকে দেখে। পান্নার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হঠাৎ মনে পড়লো। পান্নাকে বললাম—তাড়াতাড়ি ঘোমটা দাও। বাড়ীওয়ালা আসচে।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেই পান্না হঠাৎ চুপ করে ঘোমটা টেনে দিল। অভিনয় করতে দেখলুম ও বেশ পটু। যতক্ষণ বাড়ীওয়ালা আমাদের সঙ্গে রইল বা ওপরে নিচের ঘরদোর দেখাতে লাগলো, ততক্ষণ পান্না এমন হাবভাব দেখাতে লাগলো যেন সত্যিই ও নিতান্ত লজ্জাশীলা একটি গ্রাম্যবধূ।

বাড়ীওয়ালা বললে—একটা অসুবিধা দেখচি যে—

—কি ?

—আপনি আপিসে বেরিয়ে যাবেন। মাঠাকরুন একা থাকবেন—

—তা একরকম হয়ে যাবে।

—আমার মেয়ে আছে, না হয় সে মাঝে মাঝে এসে থাকবে।

—তা হবে।

বাড়ীওয়ালা তো চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পান্না ঘোমটা খুলে বললে—বাবাঃ, এমন বিপদেও—দম বন্ধ হয়ে মরেছিলুম আর একটু হলে আর কি।

তারপর বললে—বাসা তো করলে দিব্যিটি। কিন্তু এত বড় বাড়ী নিলে কেন ? একটা ঘর হলে আমাদের চলে যেতো। এত বড় বাড়ী সাজাবে কি দিয়ে ? না আছে একটা মাদুর বসবার, না একখানা কড়া, না একটা জল রাখবার বালতি।

—সব হবে ক্রমে ক্রমে।

—না হলে আমার কি ? আমি মেজেতেই শুতে পারি।

একটি মাত্র পেঁটরা সঙ্গে এসেচে। তার মধ্যে সম্ভবতঃ পান্নার কাপড় চোপড় পেতে বসবার পর্য্যন্ত একটা কিছু নেই। তাও ভাগ্যে বাড়ীওয়ালা ঘরগুলো ধুয়ে রেখেছিল, নতুবা ঘর ঝাঁট দেবার ঝাঁটার অভাবে ধূলিশয্যা আশ্রয় করতে হোত। পান্না বললে—চা একটু খাবে না ? সকাল বেলা চা খাওনি তো।

কথাটা আমার ভালো লাগলো, ও যদি বলতো, চা একটু খাবো তা হলে ভালো লাগতো না। ও যে আমার সুখ-সুবিধে দেখচে, গৃহিণী হয়ে পড়েচে এর মধ্যেই, এটা ওর নারীত্বের স্বপক্ষে অনেক কিছু বললে। সত্যিকার নারী।

আমি বললাম—দোকান থেকে আনি—

—তাও তো পাত্র নেই, পেয়ালা নেই, চা খাবে কিসে ?

—নারকোলের খোলায় !

দু'জনেই হেসে উঠলুম একসঙ্গে। উচ্চরবে মন খুলে, এমন হাসি নি অনেকদিন। পান্না বেশ মেয়ে, সঙ্গিনী হিসাবে আনন্দ দান করতে পারবে প্রতি মুহূর্ত্তে। সুরবালার মত দেবী সেজে থাকবে না।

সকাল ন'টা। রান্নার কি ব্যাপার হবে ওকে জিজ্ঞেস করলাম। দু'জনে আবার পরামর্শ করতে বসি। অমন সাজানো ঘর-সংসার ছেড়ে এসে রিক্ততার আনন্দ নতুন লাগচে। এখানে আমাকে নতুন করে সব করতে হবে। কিছু নেই আমার এখানে।

পান্না বললে—কাছে হোটেল নেই ?

—তা বোধ হয় আছে।

—দু'থালা ভাত নিয়ে এসো আমাদের জন্যে, এবেলা কিছুরই যোগাড় নেই, ওবেলা যা হয় হবে।

—থালা দেবে ?

—তুমি খেয়ে এসো, আমার জন্যে নিয়ে এসো শালপাতা কি কলার পাতা কিনে।

—সে বেশ মজা হবে কি বলো ?

—খুব ভালো লাগবে। তুমি নাইবে, তোমার কাপড় আছে ?

—কিছু না। শুধু-হাতে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি। কাপড় কোথায় ?

—আমার শাড়ী পোরো একখানা। নেয়ে নাও। কলের জল চলে যাবে।

নতুন ঘরকন্না। নতুন সংসারের সহস্র অসুবিধে থাকা সত্বেও এর মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। হোটেলের অখাদ্য ডাল ভাত আর শাক বেগুনের চচ্চড়ি খেয়ে কি খুশী দু'জনে। আমার দিক থেকে এটুকু বলতে পারি, আমার দেশের সংসারের অবস্থা অসচ্ছল নয়, সুরবালা আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকে সর্ব্বদা নজর রাখতো, সুতরাং হোটেলের ডাল-ভাতের মত খাদ্য আমার মুখ জীবনে ক'দিনই বা দিয়েচে। কিন্তু তবুও তো খেলুম, বেশ আনন্দ করেই খেলুম।

পান্না উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলে দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলে। বললে—পান নিয়ে এসো দু পয়সার। পয়সা দিচ্চি—বলেই পেঁটরা খুলতে বসলো। আমি হেসে বললাম—শুধু পানের দাম কেন, তা হলে এক বাক্স সিগারেটের দাম দাও। ওর মুখ দেখে মনে হল ও আমার এ কথাটাকে শ্লেষ বলে ধরতে পারে নি, দিব্যি সরলভাবে একটা টাকা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে—টাকাটা ভাঙিয়ে পান সিগারেট কিনে এনো।

—কত আনবো ?

—এক বাক্স আনবে, না একসঙ্গে দু'বাক্সই না হয় আনো। আবার দরকার হবে তো ?

—যদি কিছু ফেরৎ না দিই ?

—কেন, আর কিছু কিনবে ? তা যা তোমার মনে হয় নিয়ে এসো।

—কত টাকা আছে তোমার কাছে দেখি ?

পান্না তোরঙ্গ থেকে একখানা খাম আর একটা পুঁটুলি বের করে গুনতে আরম্ভ করলে। চল্লিশ টাকা আর কয়েক আনা পয়সা দেখা গেল ওর পুঁজি। আমি বললাম—মোটে ?

ও বেশ সরল ভাবেই বললে—এর মধ্যে আবার মুজরো করতে গেলেই হাতে পয়সা হবে।

—সে কি ! তুমি আবার খেমটা নাচ নাচতে যাবে নাকি ?

—যাবো না ?

—তুমি আমার স্ত্রী পরিচয়ে এখানে এসে আসরে খেমটা নাচতে যাবে ?

পান্না বোধ হয় এ কথাটা ভেবে দেখে নি, সে বললে—তবে আমার টাকা আসবে কোথা থেকে ?

—দরকার কি ?

—তুমি দেবে এই তো ? কিন্তু আমি কত টাকা রোজগার করি তুমি জানো ? দেখেছিলে তো মঙ্গলগঞ্জে ?

—কত ?

—ছ'টাকা করে ফি রাত। নীলি নিত সাত টাকা।

—মাসে ক'বার নাচের বায়না পাও ?

—ঠিক নেই। সব মাসে সমান হয় না। পাঁচ ছ'টা তো খুব। দশটাও হোত কোনো মাসে।

—তার মানে মাসে গড়ে ত্রিশ বত্রিশ টাকা, এই তো ?

—তার বেশি। প্রায় চল্লিশ টাকা।

আমি মনে মনে হাসলাম। পান্না জানে না ডাক্তারিতে একটা রুগী দেখলে অনেক সময় পাড়াগাঁয়ে ওর বেশিও পাওয়া যায়। আমায় ভাবতে দেখে পান্না বললে—ধরো যদি নাচের বায়না না নিতে দাও তবে কলকাতার সংসার চালাবে কি করে ? তোমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, কলকাতার খরচ কি জানো ? ষাট টাকার কমে মাস যাবে না। তুমি একা পারবে চালাতে ?

আমার হাসি পেল। আমি বললাম—আমায় একটা কিছু বাজাতে শেখাবে ?

— কি ?

- এই ধরো বাঁশি কি ডুগি-তবলা।

—গানের দলে তোমার সঙ্গে বেরুতাম। দুজনে রোজগার হোত।

—ইস্! ঠাট্টা হচ্চে বুঝি। গানের দলে ডুগি-তবলা বাজানোর দাম আছে, সে তোমার কর্ম্ম নয়। আমি তো যেমন তেমন, নীলির নাচে বাজাতে পারা যার-তার বিদ্যেতে কুলোবে না। হ্যাঁ গো মশাই, নীলি থিয়েটারে নাচতো তা জানো ?

—সখীর ব্যাচে তো ? সে যে-কোনো ঝি নাচতে পারে। তাতে বিশেষ কি কৌশল বা কারিকুরি আছে ?

পান্না হাসতে হাসতে বললে—তুমি নাচের কি বোঝো যে ওই সব কথা বলচো ? আমরা কষ্ট করে নাচ শিখেছি, কত বকুনি খেয়ে, কত অপমান হয়ে তা জানো ? কিসে কি আছে না আছে তুমি কিছুই জানো না।

—তোমার নাচের সরঞ্জাম সব এখানে আছে?

—নেই? ওমা, তবে করবো কি? সব আছে।

—আজ আমার সামনে নেচে দেখাবে না?

—ওবেলা। রাত্তিরে। একটু ঘুমুই। বড্ড ঘুম পাচ্চে।

পান্না ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ওর নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে থাকি। আমার বয়েস আর ওর বয়েস কত তফাৎ। আমি চল্লিশ, পান্না ষোলো বা সতেরো। এ বয়সের মেয়ে আমার মত বয়সের লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে?

নিশ্চয়ই এ প্রেম। পান্না আমাকে ভালো না বাসলে আমার সঙ্গে ঘর-দোর আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে পালিয়ে এল কেন? তা কখনো আসে? নারীর প্রেম কি বস্তু কখনো জানি নি জীবনে। সুরবালাকে বিবাহ করেছিলুম, সে অন্যরকম ব্যাপার। এ উন্মাদনা তার মধ্যে নেই। অল্পবয়সের বিবাহ, সুরবালা আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট—এ অবস্থায় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এক ধরনের সাংসারিক ভালোবাসা হোতেই পারে, আশ্চর্য্য নয়। একটি পরম বিস্ময়ের বোধ ও তজ্জনিত উন্মাদনা সে ভালোবাসার মধ্যে ছিল না। সে তো আগে থেকেই ধরে নিয়ে বসেছিলাম—সুরবালা আমায় ভালোবাসবেই। ভালোবাসতে বাধ্য। এ রকম মনোভাব প্রেমের পক্ষে অনুকূল নয়। কাজেই প্রেম সেখান থেকে শতহস্ত দূরে ছিল।

কিন্তু জিনিসপত্রের কি করি?

জিনিসপত্র না হলে বড় মুশকিল। পান্না শুয়ে আছে শুধু মেজেতে একখানা চাদর পেতে। শতরঞ্জি নেই, কার্পেট নেই—একখানা মাদুর পর্য্যন্ত নেই। সংসার পাততে গেলে কত কি জিনিস দরকার তা কখনো জানতাম না। সাজানো সংসারে জন্মেছি, সাজানো সংসারে সংসার পাতিয়েছিলাম। এখন দেখছি একরাশ টাকা খরচ হয়ে যাবে সব জিনিস গোছাতে। কিছুই তো নেই। থাকবার মধ্যে আছে আমার এক সুটকেস, পান্নার এক টিনের পেঁটরা, তাতে ওর কাপড় চোপড়। মাথায় দেবার একটা বালিস নেই, জল খাবার একটা গ্লাসও নেই। দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হল না।

পান্না ঘুম থেকে উঠলে আমি ওকে সব খুলে বলি।

পান্নার মুখ কি সুন্দর দেখাচ্চে। অলস, ঢুলুঢুলু, ডাগর ডাগর চোখ দু'টিতে তখনও ঘুম জড়ানো। ও কোনো কিছুই গায়ে মাখে না। হাসিমুখে আমোদ নিয়েই ওর জীবন। হেসে বললে—বেশ মজা হয়েচে, না?

—মজাটা কি রকম? এখুনি যদি জল খেতে চাই, একটা গ্লাস নেই। ভারি মজা!

—একটা কাঁচের গ্লাস কিনে নিয়ে এসো না? বাজারে পাওয়া যাবে তো।

—তবেই সব হল। তুমি কিছু বোঝো না পান্না। ঘরসংসার কখনো পাতাও নি। তোমার দেখছি নির্ভাবনার দেহ।

পান্না হঠাৎ পাকা গিন্নীর মত গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—তাইতো কি করা যায় তাই ভাবচি।

রাত্রে পান্না বড় মজা করলে।

দেওয়ালের কাছে একটা শাড়ী পেতে আমাকে বললে—তুমি এখানে শোবে।

—তুমি ?

—এইখানে দেওয়ালের ধারে।

—মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান। রাত্রে যদি তোমার ভয় করে ?

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে বাপু, ভয় করবে কেন ? কত জায়গাতে ঘুরবো আমি। কত জায়গায় ঘুরেচি মুজরো করতে।

—বড্ড সাহসিকা তুমি।

—নিশ্চয়ই সাহসিকা।

পান্না হেসে উঠলো এবার।

—থাক বাপু, যাতে যার সুবিধে হবে সে তাই করুক।

আমি কিন্তু ঘুমুতে পারলুম না সারা রাত। পান্না আমার এত কাছে থাকবে, একই ঘরে, এ আমার কাছে এতই নতুন যে নতুনত্বের উত্তেজনায় চোখে ঘুম এলো না আমার।

দু'জনেই গল্প আরম্ভ করে দিলাম।

—কি রকম মুজরো করো তোমরা ?

—যেমন সবাই করে। তোমার যেমন কথাবার্ত্তা !

—বাড়ীর জন্যে মন কেমন করচে ?

—কেন করবে ?

—বাড়ী ছেড়ে থেকে অব্যেস হয়ে গিয়েচে কি না।

—আমি আর নীলি কত দেশ ঘুরেচি।

—কোন্ কোন্ দেশ ?

—কেষ্টনগর, দামুড়, হুকো, চাকদা, জঙ্গিপুর আরও কত জায়গা !

—নীলির জন্যে মন-কেমন করচে ?

—কিছু না।

—আমার কাছে থাকবে ?

—কেন থাকবো না ? তবে এলাম কেন ?

আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারচি না, পান্না কি সব দিক দেখে-শুনে আমার কাছে এসেছে ? আমার বয়েস কত বেশি ওর তুলনায়। আমার সঙ্গে সত্যি ওর ভালবাসা হোতে পারে ?

কি জানি, এই রহস্যটাই আমার কাছে সব চেয়ে বেশি রহস্য।

নানা কথাবার্ত্তায় এই কথাটা আমি পান্নার কাছ থেকে জানতে চাই। ওর মনোভাব কি, এ কথা ওই কি আমায় বলতে পারে ?

সকাল হবার আগে পান্না আমায় বললে—একটু ঘুমুই ?

—ঘুম পাচ্ছে ?

—পাবে না ? ফর্সা হয়ে এল যে পূবে।

—ঘুমোও না একটু।

একটু পরে ভোর হয়ে গেল।

পান্না তখন অঘোরে ঘুমুচ্চে। ডান হাতে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমুচ্চে ও, দেখে মায়া হল। মা ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে ও কিসের আশায় চলে এল আমার সঙ্গে ? পান্না ভদ্রঘরের কুলবধূ বা কুমারী নয়, গৃহত্যাগ করে চলে এসেচে আমার সঙ্গে।

আবার যখন অসুবিধে হবে, ও চলে যেতে পারবে, আটকাচ্চে কোথায় ?

আমি চায়ের দোকানে চা খেয়ে পান্নার জন্যে চা নিয়ে এলাম।

পান্না উঠে চোখ মুছচে।

—ও পান্না ?

পান্না এক কাণ্ড করে বসলো। তাড়াতাড়ি উঠে মাথায় আঁচল দিয়ে আমায় এসে এক প্রণাম ঠুকে দিলে।

আমি হেসে উঠলুম। বলি এ কি ব্যাপার ?

—কেন ? নমস্কার করতে নেই ?

—থাকবে না কেন ? হঠাৎ এত ভক্তি ?

—ভক্তি করতে কিছু দোষ আছে ?

—কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো ?

—বলো যেন শীগ্‌গির করে মরে যাই।

—কেন, জীবনে এত অরুচি হোল কবে ?

—বেশিদিন বেঁচে কি হবে ? তুমি তো বামুন ?

—তাতে সন্দেহ আছে নাকি ? তুমি কি জাত ?

—বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ। মায়ের মুখে শুনেছি।

—ওসব ভুল কথা। তোমার মা বংশের কৌলীন্য বাড়াবার জন্যে ওই কথা বলেছেন। আমার বিশ্বাস হয় না।

—ভয় কিসের ? আমি কি বলবো আমায় বিয়ে কর ?

—সে কথা হচ্চে না। আমি বলচি তুমি যে জাতই হও, আমার কাছে সব সমান। বামুনই হও আর তাঁতিই হও—চা খাবে না ?

—চা এনেচ ?

—খেয়ে নাও, জুড়িয়ে যাবে।

এইভাবে সেদিন থেকে আমাদের নতুন জীবনযাত্রা নতুন দিন নতুনভাবে শুরু হল। আমার হাতে নেই পয়সা! বাড়ী থেকে কিছু আনি নি, ভাঁড় নিয়ে এলুম জল খাবার জন্যে। সস্তায় দু'খানা মাদুর কিনে আনলুম। শালপাতা কুড়িদরে কিনে আনি দু'বেলা ভাত খাওয়ার জন্যে। পান্না তাতে এতটুকু অসন্তুষ্ট নয়। যা আনি, ও তাতেই খুশি। আমার কাছে মুখ

ফুটে এ পর্যন্ত একটা পয়সাও চায় নি। বরং দিতে এসেচে ছাড়া নিতে চায় নি। অদ্ভুত মেয়ে এই পান্না।

রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম কেউ কোনো দিকে নেই। কি জানি কেন, আজকাল সর্ব্বদাই আমার কেমন একটা ভয় ভয় হয়, এই বুঝি আমাদের গ্রামের কেউ আমাদের দেখে ফেললে। আমার এ সুখের সংসার একদিন এমনি হঠাৎ, সম্পূর্ণ আকস্মিক-ভাবে ভেঙে যাবে।

আমার বুক সর্ব্বদা ধড়ফড় করে ভয়ে। ভয় নানারকম, পান্নাকে হয়তো গিয়ে আর দেখতে পাবো না। ও যে ভালবাসা দেখাচ্চে হয়তো সব ওর ভান। কোনদিন দেখবো ও গিয়েচে পালিয়ে।

চা নিয়ে ফিরে এলুম। তখনও পান্নার চুলবাঁধা শেষ হয় নি।

পান্না বললে—খাবার কই?

—খাবার আনিনি তো!

—বাঃ, শুধু চা খাবো?

—পয়সাতে কুলোলো কই? চার আনাতে কি হবে।

—পাউডারের কৌটোর মধ্যে যা ছিল সব নিয়ে গেলে না কেন? আবার যাও, নিয়ে এসো। একটা টাকা নিয়ে যাও।

টাকা নিয়ে আমি বেরিয়ে চলে গেলুম এবং গরম গরম কলাইয়ের ডালের কচুরি খান আটদশ একটা ঠোঙায় নিয়ে ফিরলুম একটু পরেই। আমি সচ্ছল গৃহস্থঘরের ছেলে, নিজেও যথেষ্ট পয়সা রোজগার করেছি ডাক্তারি করে, কিন্তু এমন ভাবে মাদুরের ওপর বসে শাল-পাতার ঠোঙায় কচুরি খেয়ে সেদিন যা আনন্দ পেয়েছিলাম, আমার সারা গৃহস্থ-জীবনে তেমন আমোদ ও তৃপ্তি কখনো পাই নি।

পান্নাকে বললাম, পান্না, পয়সা ফুরিয়ে যাচ্চে, কি হবে? বাসাখরচ চলবে কিসে?

ও হেসে বললে—বারে, আমার কাছে ত্রিশ বত্রিশ টাকার বেশি আছে না?

—তুমি নিতান্ত বাজে কথা বলো। খরচের সম্বন্ধে কি জ্ঞান আছে তোমার? ওতে কতদিন চলবে?

—সোনার হার আছে, কানের দুল আছে।

—তাতেই বা ক'দিন চলবে?

পান্না একটু ভেবে বললে—তোমাকে ঠিকানা দিচ্চি, তুমি নীলির কাছে যাও। আমরা দু'জনে মিলে মুজরো করলে আমাদের চলে যাবে।

—সে হবে না।

—কেন?

—নীলির কাছে গেলেই তোমার বা জানতে পারবে।

—নীলিকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো।

—ঠিকানা দাও, আমি এখুনি যাবো।

সন্ধ্যার আগেই ঠিকানা অনুযায়ী নীলিকে খুঁজে বার করলাম। একটা বড় খোলার বস্তির একটা ঘরে নীলিমা ও তার বড় দিদি সুশীলা থাকে। আমাকে দেখে প্রথমতঃ চিনতে পারে নি নীলিমা। আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দেওয়ার পরে সুশীলা এসে আমায় নিয়ে গেল ওদের ঘরের মধ্যে। দু'টো বড় বড় তক্তপোশ একসঙ্গে পাতা, মোটা তোশক পাতা বিছানা, কম দামের একটা ক্লকঘড়ি আছে ঘরের দেওয়ালে এবং যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, খানকতক ঠাকুর-দেবতার ছবি। সুশীলার বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, মুখে বসন্তের দাগ না থাকলে ওর মুখ দেখতে একসময় মন্দ ছিল না বোঝা যায়।

সুশীলা থাকাতে আমার বড় অসুবিধে হল। সুশীলার অস্তিত্বের বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, ওর সামনে সব কথা বলা উচিত হবে না হয়তো। নীলিকে নির্জ্জনে কোনো কিছু বলবার অবকাশও তো নেই দেখছি। মুশকিলে পড়ে গেলাম। সুশীলা ভেবেছে আমি হয়তো ওদের জন্যে কোনো একটা বড় মুজরোর বায়না করতে এসেছি। ও খুব খাতির করে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। বললে—চা খাবেন তো ?

—তা মন্দ নয়।

—বসুন, করে নিয়ে আসি। নীলি, বাবুকে বাতাস কর।

—না না, বাতাস করতে হবে না। বোসো এখানে।

সুশীলা ঘর থেকে চলে গেলেই আমি সংক্ষেপে নীলিমাকে সব কথা বললাম। আমাদের ঠিকানাও দিলাম। নীলিমা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বললে—আপনি তো মঙ্গলগঞ্জের ডাক্তার ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনি ডাক্তারি করবেন না ?

—কোথায় করবো ? সে সুবিধে দেখচিনে।

—তবে চলবে কি করে ?

—সে জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছে পান্না। তুমি গিয়ে দেখা করতে পারবে ? যাবে আমার সঙ্গে ?

—কেন যাবো না ?

—তোমার দিদি কিছু বলবে না তো ?

—না না। দিদি কি বলবে ? আমি এখুনি যাবো। তবে দিদিকে মিথ্যে কথা বলতে হবে। বলবেন, আমি মুজরোর বায়না করতে এসেছি, ওকে একবার পান্নার কাছে নিয়ে যাবো। পান্নাকে দিদি চেনে না।

—মিথ্যে কথা আমি বলতে পারবো না। তুমি যা হয় বলো।

সুশীলা চা নিয়ে এলে নীলিমা বললে—দিদি, বাবুর সঙ্গে আমাকে এখুনি এক জায়গায় যেতে হবে।

—কেন ?

—বাবুর দরকার আছে। মুজরোর বায়না হবে এক জায়গায়। সেখানে যেতে হবে।

—যা। আমি সঙ্গে আসবো ?

—না, তোমায় যেতে হবে না। বাবু আমায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

—আজ রাতেই দিয়ে যাবো। ন'টার মধ্যেই।

—সেজন্যে কিছু নয় বাবু, সে আপনি নিয়ে যান না ? তবে দু'টো টাকা দিয়ে যাবেন। খরচপত্তর আছে তো ? ও গেলে চলে না।

—সে আমি ওর হাতেই দেবো এখন।

—না বাবু, টাকাটা এখুনি আপনি দিয়ে যান।

সুশীলার হাতে আমি টাকা দু'টো দিতে ও খুব অমায়িক ভাবে হাসলে। এরা গরীব, এদের অবস্থা দেখেই বুঝলাম। পান্নারা এদের কাছে বড়লোক। নীলিমা আমাকে বললেও সে কথা রাস্তায় যেতে যেতে। পান্না না হলে ওদের মুজরোর বায়না হয় না। এর প্রধান কারণ পান্না দেখতে অনেক সুশ্রী এর চেয়ে।

বাসায় ফিরে এলুম। নীলিমাকে দেখে পান্না খুব খুশী, আমায় বললে—চা খাবার কিছু নিয়ে এসো। শীগ্‌গির যাও—ওকে পান্না কি বলেচে জানিনে, চা খাবার নিয়ে ফিরে এসে দেখি নীলি কৌতূহলের সঙ্গে বার বার আমার দিকে চাইচে। আমায় বললে—এই অবস্থায় ওকে নিয়ে এসে রেখে দিয়েচেন ?

—কেন ?

—এ অবস্থায় মানুষ থাকে ?

পান্না প্রতিবাদ করে বললে—আমি কিছু বলছিলাম নীলি ? আমি কিছু বলি নি। ও নিজেই ওসব বলচে। আমি বলি, কেন বেশ আছি। তোর ওসব বলবার দরকার কি ?

নীলি বললে—খাবি কি ? চলবে কি করে ?

—সেই জন্যেই তো তোকে ডাকা। মুজরোর যোগাড় কর। সংসার চালাতে তো হবে।

—তবে পুরুষ মানুষ রয়েচে কি জন্যে ? ও মা—

—ওর ওপর কোনো কথা বলবার তোমার দরকার কি নীলি ? ধরো ও পুরুষ মানুষকে আমি নড়তে দেবো না। আমাকে মুজরো করে চালাতে হবে। এখন কি দরকার তাই বলো।

ওর কথা শুনে নীলি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। এমন কথা সে কখনো শোনে নি। আমিও যে শুনেচি তা নয়। এমন ধরনের কথা ওর মুখে। অভিনয় করচে বলেও তো মনে হয় না। বলে কি পান্না! নীলি বললে—বেশ যা ভালো বুঝিস তাই কর। আমার কিছু বলবার দরকার কি ?

—কি করবি এখন তাই বল ?

—মুজরোর চেষ্টা করি। সাজ-পোশাক আছে?

পান্না হেসে বললে—সেজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে সব গুছিয়ে এনেছি। ওই করেই যখন খেতে হবে।

নীলিকে আমি আবার পৌছে দিতে গেলাম। নীলিমা বললে—খুব গেঁথেছেন।

—মানে?

—মানে দেখলেন না? ও কি বলে সব কথা। ওর মুখে অমন কথা। পান্নাকে গেঁথেছেন ভাল মাছ। আমি ওকে জানি। ভারি সাদা মন। নিজের জিনিসপত্তর পরকে বিলিয়ে দেয়।

—তোমাকে কোন কথা বলেচে আমার সম্বন্ধে?

এই কথাটার উত্তর শুনবার জন্যে আমি মরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এ কথার সোজাসুজি উত্তর নীলিমা আমায় দিলে না। বললে—সে কথা এখন বলবো না। তবে আপনার ক্ষমতা আছে। অনেকে ওর পিছনে ছিল, গাঁথতে পারে নি কেউ। আমি তো সব জানি। হরিহরপুরে একবার মুজরো করতে গিয়েছিলাম, সেখানকার জমিদারের ছেলে ওর পেছনে অনেক টাকা খরচ করেছিল। তাকে ও দূর করে দিয়েছিল এক কথায়। তাই তো বলি, আপনার ক্ষমতা আছে।

নীলিমার কথা শুনে আমি যে কোন স্বর্গে উঠে গেলাম সে বলা যায় না—ও অবস্থায় যে কখনো না পড়েছে তার কাছে। জীবনের এ সব অতি বড় অনুভূতি, আমি নিজে আস্বাদ করে বুঝেছি। মন এবং মনের বস্তু। টাকা না কড়ি না, বিষয় আশয় না এমন কি যশমানের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত না। ও সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, নিজের সফল প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে পান্নাকে নিয়ে অকূলে ভেসেচি। ভেসে আজ বুঝতে পেরেচি, ত্যাগ না করলে বস্তুলাভ হয় না। আমার অনুভূতিকে বুঝতে হোলে আমার মত অবস্থায় এসে পড়তে হবে।

পান্না আমায় রাত্রে বললে—নীলি পোড়ারমুখী কত কি বলে গেল আমায়।

—কি?

—বললে, এ সব কি আবার ঢং। ও বাবু কি তোকে চিরকাল এমনি চোখে দেখবে? তুই নিজের পসার নিজে নষ্ট করতে বসেচিস—

—তুমি কি বললে?

—আমি হেসেই খুন।

আমাকে অবাক করে দিয়েচে পান্না। ওর শ্রেণীর মেয়েরা শুনেচি কেবলই চায়, পুরুষের কাছ থেকে শুধুই আদায় করে নিতে চায়। কিন্তু ও তার অদ্ভুত ব্যতিক্রম। নিজের কথা কিছুই কি ও ভাবে না।

আমার মত একজন বড় ডাক্তারকে গেঁথে নিয়ে এল, এসে কিছুই দাবি করলে না তার কাছে, বরং তাকে আরও নিজেই উপার্জ্জন করে খাওয়াতে চলেচে। এমন একটি ব্যাপার

ঘটতে পারে আমি তাই জানতাম না। তার ওপর আমার বয়স ওর তুলনায় অনেক বেশি। দেখতেও আমি এমন কিছু কন্দর্প পুরুষ নয়। নাঃ, অবাক করেই দিয়েচে বটে।

পান্না নীলিমার সঙ্গে মুজরো করতে যাবে বেথুয়াডহরি, আমি বাসা আগলে তিন চার দিন থাকবো এমন কথা হোল।

যাবার দিন হঠাৎ ও আমাকে বললে—তুমি চলো।

—সেটা ভালো দেখাবে ?

—খুব দেখাবে। এই বাসাতে একা পড়ে থাকবে, কি খাবে, কি না খাবে। সেখানে হয়তো কত ভাল ভাল খাওয়া জুটবে। তুমি খেতে পাবে না।

—তাতে কি ?

—তাতে আমার কষ্ট হবে না ?

—সত্যি, পান্না ?

—আহা-হা, ঢং !

পান্না ছাড়লে না। ওদের সঙ্গে আমায় যেতে হল বেথুয়াডহরি। ভাল কাপড় পরে যেতে পারবো না বলে আধময়লা জামা কাপড় পরে ওদের সঙ্গে গেলাম। সারা রাস্তায় ট্রেনে মহাস্ফুর্ত্তি। আমি যে ডাক্তার সে কথা ভুলে গিয়েচি। ওদের দলে এমন মিশে গিয়েচি যেন চিরকাল খেমটাওয়ালীর দলে তল্পিতল্পা আগলেই বেড়াচ্চি।

পান্না বললে—তুমি যে যাচ্ছ, তুমি নিগুর্ণ যদি জানতে পারে ?

—বয়েই গেল।

—ডুগি-তবলা বাজাতেও পারো না ?

—কিছু না।

—তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো। ঠেকা দিয়ে যেতে পারবে তো অন্ততঃ। দলে একটা কিছু বাজাতে না জানলে লোকে মানবে কেন ?

—শিখিও তুমি।

বেথুয়াডহরি গ্রামে বারোয়ারি যাত্রা হচ্চে। সেখানকার নায়েবমশায় উদ্যোগী। নায়েব-মশায়ের নাম বঙ্কুবিহারী জোয়ারদার। বয়েস পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু লম্বা-চওড়া চেহারা, একতাড়া পাকা গোঁফ, বড় বড় ভাঁটার মত চোখ। প্রমথ বিশ্বাস বলে কোন্ জমিদারের এস্টেটের নায়েব। আমাকে বললেন—তোমার নাম কি হে ?

আসল নামটা বললাম না।

—বেশ, বেশ ! তুমি কি করো ?

—আজ্ঞে আমি ভাত রাঁধি।

—ও, তুমি বাজিয়ে টাজিয়ে নও।

—আজ্ঞে না।

সন্ধ্যার আগে আসর হোল। অনেক রাত পর্য্যন্ত পান্না আর নীলি নাচলে। পান্না নাচের ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে এসে কথা বলে। জিজ্ঞেস করলে—কেমন হচ্চে?

—চমৎকার।

—তোমার ভালো লাগচে?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি কিন্তু উঠো না। তা হলে আমার নাচ খারাপ হয়ে যাবে। নীলি কি বলচে জানো? বলচে তোমার জন্যেই নাকি আমার নাচ ভাল হচ্চে।

—ও সব বাজে কথা। ভাত রাঁধবো যে।

—না। ছিঃ, ওসব কি কথা?

—তোমরা নেচে গিয়ে তবে খাবে? ওরা চাল ডাল দিয়েচে। মাছ কিনে দিয়েচে। আমি রাঁধবো।

—কক্ষনো না। তোমায় যেতে দেবো না। নীলি আর আমি, রান্না করবো এর পরে।

নায়েবমশায় সামনেই বসে। আমার দিকে দেখি কটমটিয়ে চাইচেন বোধ হল পান্না যে এত কথা আমার সঙ্গে বলচে এটা তিনি পছন্দ করচেন না। আট দশ টাকা প্যালা দিলেন নিজেই রুমালে বেঁধে বেঁধে—শুধু পান্নাকে।

একটু বেশি রাত হলে আমাকে একজন বরকন্দাজ ডেকে বললে—আপনাকে নায়েববাবু ডাকচেন।

আমি গেলাম উঠে। নায়েবমশায় আসরের বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। আমায় বললেন—এই মেয়েটির নাম কি?

আমি বললাম—পান্না।

—তোমার কেউ হয়?

—না। আমার কে হবে?

নায়েবমশায় দেখি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েচে। আমার চেহারার মধ্যে সে যেন কি খুঁজচে। আমাকে আবার বললে—তুমি এখানে এসেচ রান্না করতে বল্‌ছিলে না?

—হুঁ।

—ক'টাকা পাও?

—এই গিয়ে সাত টাকা আর খোরাকী।

—বামুন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের জমিদারী কাছারিতে রান্না করবে?

—মাইনে কত দেবেন?

—দশটাকা পাবে আর খোরাকী। কেমন ?

—আচ্ছা, আপনাকে ভেবে বলবো।

—এ বেলাই বলবে তো ? এখুনি বলো। আমি বাসা হতে চা খেয়ে ফিরচি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নায়েবের সামনে থেকে চলে এলাম। হাসি পেলেও হাসি চেপে রাখলাম। নায়েব ভেবেচে আমি ওর মতলবের ভেতরে ঢুকতে পারি নি। ও কি চায় আমার কাছে তা অনেকদিন থেকে বুঝেছি। পাচক সংগ্রহে উৎসাহ ও ব্যস্ততা আর কিছুই নয়। ওর আসল মতলবটা ঢাকবার একটা আবরণ মাত্র।

আমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে না এ ক্ষেত্রে। একটু পরে কাছারির একজন বরকন্দাজ এসে বললে—চলো, নায়েববাবু ডাকচেন।

গিয়ে দেখি নায়েবমশায় চা খাচ্চেন, কাছারির কোণের ঘরে তক্তপোশের ওপর বসে। ঘরে আর কেউ নেই। আমায় দেখে বললেন—এসো, বসো। চা খাবে ?

—আজ্ঞে, আপনি খান।

—খাও না একটু ! এই আছে, ঢেলে নাও।

নায়েবমশায়ের হৃদ্যতায় আমার কৌতুক বোধ হলেও কোনমতে হাসি চেপে রাখি। নিত্য থেকে লীলায় নেমে দেখি না ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। সত্যিকার রাঁধুনি বামুন তো নই আমি ! চা খাওয়া শেষ করে নায়েবমশায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখবার জন্য হাত বাড়িয়ে বললাম—দিন আমার হাতে।

নায়েবমশায় সন্তুষ্ট হলেন আমার বিনয়ে। বললেন—না হে, তুমি বামুনের ছেলে, তোমার হাতে এঁটো পেয়ালাটা দেবো কেন ? নাম কি বললে যেন ?

আগে যে নামটা বলেছিলাম, সেটাই বললাম আবার।

—কি, ভেবে দেখলে ? চাকরী করবে ?

—মাইনে কম। আজ্ঞে ওতে—

—দশ টাকা মাইনে, কম হল হে ? যাকৃগে, বারো টাকা দেব দু' মাস পরে। এখন দশ টাকাতে ভর্ত্তি হও। এখানে অনেক সুবিধে আছে হে—জমিদারের কাছারি, হাটে তোলাটা-আসটা, পালপার্ব্বণে প্রজার কাছ থেকে পার্ব্বণী পাবে দু' চার আনা, তা ছাড়া কাছারির রাঁধুনি বামুন, ইজ্জৎ কত ?

অতিকষ্টে হাসি চেপে বললাম—আজ্ঞে, তা আর বলতে—

—রাজী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা কথা—

—কি ?

—শোবো কোথায় ?

নায়েব অবাক হবার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—শোবে কোথায় তার মানে ?

—মানে আমি একা ছাড়া কারো সঙ্গে শুতে পারি নে কিনা তাই বলছি।

—বেশ, সেরেস্তায় শুয়ো। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন একটা কথা বলি। তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান লোক দেখচি। পান্না বলে ওই মেয়েটাকে আজ রাতে এই ঘরে পাঠাতে হবে তোমাকে। রাত দু'টোর পর, আসর ভেঙ্গে গেলে। এজন্যে তোমাকে আমি দু'টাকা বকশিশ করবো আলাদা। দেবে এনে?

—আপনি আমায় ভাবনায় ফেলেছেন বাবু। উনি আমার কথা শুনবেন কেন? তাছাড়া আমি ওদের দলের রসুইয়ের বামুন। একথা বলতে গেলে বেয়াদবি হবে না?

—তোমার সে দোর তো আগেই খুলে রেখে দিলাম বাপু। আমরা জমিদারি চালাই, আট-ঘাট বেঁধে কাজ করি। বেয়াদবি বলেই যদি মনে করে, চাকরিতে রাখবে না এই তো? বেশ, কোন ক্ষতি নেই। চাকরি তোমার হবেই কাল এখানে। আরও উপরি দুটো টাকা। তবে পান্নাকে বলবে, ওকেও আমি খুশী করবো। আচ্ছা, ও কত নেবে বলে তোমার মনে হয়?

—আজ্ঞে; ওসব খবর আমি কিছু রাখিনে। উনি আমার মনিব, ওসব কথা ওঁর সঙ্গে আমার কি হয়?

নায়েবমশায়ের মুখে একটি ধূর্ত্ত লালসার ছাপ উগ্র হয়ে ফুটে উঠলো। চোখ টিপে বললেন—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি? চাকরি হয়েই গেল। কাকে দিয়ে বলাতে হবে বলো না? নিজে একটু চেষ্টা করে দ্যাখো। যাও, বুঝলে? না যদি সহজ হয় তবে—

এই পর্যন্ত বলে জোয়ারদার মশায় চুপ করলেন। একটা হিংস্র পশু-ভাব সে মুখে। আমার মন বললে এ সাপকে নিয়ে আর বেশি খেলিও না, ছোবল বসাবে। পান্নাকে সাবধান করে দিলাম সব কথা খুলে বলে। সে হেসে বললে—ও রকম বিপদে অনেক জায়গায় আমাদের পড়তে হয়েচে। তুমি সঙ্গে রয়েচ—ভয় কি? নীলি দিদিকে বলে দেখচি, ও যায় যাক। যেতে পারে ও, অমন গিয়ে থাকে জানি।

নায়েবকে এসে বললাম। তখনও আসর ভাঙ্গে নি।

তিনি বসে আছেন ছোট্ট কোণের ঘরটাতে। মুখে সেই অধীর লালসার ছাপ! অশান্ত আগ্রহের সুরে জিজ্ঞেস করলেন—কি হলো? এসো ইদিকে।

—সে হোল না।

—কি রকম?

—আপনাকে অন্য মেয়েটি যোগাড় করে দিচ্চি। ওর নাম নীলি, ও আসবে এখন।

—ওসব হবে না। ওকে আমার দরকার নেই। পান্নাকে চাই। দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা দেবো। বলে দিয়ে এসো। না যদি রাজি হয়, তুমি আমায় সাহায্য কর। বরকন্দাজ দিয়ে ধরে এনে কাছারি-ঘরে পুরে ফেলি? পারবে?

—আপনাকে একটা কথা বলি। ও বাজে ধরনের মেয়ে নয়। একটা শেষে কেলেঙ্কারি করে বসবেন? নীলি আসুক ঘরে, মিটে গেল। ওকে ঘাঁটাতে যাবেন না।

এত কথা বললাম—এই জন্যে যে, জোয়ারদার মশায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, পান্নার বাবা কিংবা জ্যাঠামশায়ের বয়সী। এ বয়সে ওর অমন লালসার উগ্রতা দেখে লোকটার ওপর অনুকম্পা জেগেচে আমার মনে। আমার দলের লোক, আমি ত সব ছেড়েচি ওই জন্যে। নেশা এমন জিনিস। তেমনি নেশা তো ওরও লাগতে পারে।

জোয়ারদার মশায় নাছোড়বান্দা। ওর ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বেড়ে গিয়েছে। যেই শুনেচে পান্নাকে পাবে না, অমনি পান্নাকে না পেলে আর চলচে না। ওকেই চাই, রাণী চন্দ্রমণিকে না।

আমি ওঁর সব কথা শুনে বললাম—ওর আশা ছাড়ুন।

—কেন? ও কি? অর্ডিনারি একটা খেমটাওয়ালী তো?

—তাই বটে, তবে ও অন্যরকম।

—কি রকম?

—আপনাকে খুলে বলি। আমি মশাই নিতান্ত রাঁধুনি বামুন নই। আমি ডাক্তার। ওর জন্যে সব ছেড়ে এসেছি। ওর দলে থাকি নে, ওর সঙ্গে এসেছি—

নায়েব অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন—তাই আপনার মুখে অনেকক্ষণ থেকে আমি কি একটা দেখে সন্দেহ করেছিলাম। যাক্ মশাই, আপনি কিছু মনে করবেন না। বয়েস কত মশায়ের?

—চল্লিশ।

—এত?

—তাই হবে।

—আপনি এত বয়সে কি করে ওর সঙ্গে—ওর বয়েস তো আঠারোর বেশি হবে না।

হেসে বললাম, কি করে বলবো বলুন। ওর কথা কি কিছু বলা যায়?

—কি ডাক্তার আপনি? পাশ করা?

—এম. বি. পাশ।

—সত্যি বলচেন?

নায়েবমশায় তড়াক করে চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—মাপ করবেন ডাক্তারবাবু। আমি চিনতে পারি নি। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। একটা কথা বলি, বসুন এখানে। চা খাবেন? ওরে—

—না না, চায়ের দরকার নেই। বলুন কি বলবেন?

—হাত ধরে অনুরোধ করচি—উচ্ছন্ন যাবেন না। ছেড়ে দিন ওকে। ওর আছে কি? একটা বেশ্যা—নাচওয়ালী—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—অমন কথা শুনতে আসি নি, ওকে সমালোচনা করবার দরকার কি আপনার? কি বলছিলেন—তাই বলুন?

—জানি, জানি। ও নেশা আমিও জানি মশাই। এ বুড়ো বয়েসেও এখনো নেশা ছাড়ে

না। ওতেই তো মরেছি। আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে বলতে কি? ও নেশা থাকবে না। ওকে ছেড়ে দিন। প্র্যাকৃটিশ করতে হয় ঘর দিচ্চি, এখানে প্র্যাকৃটিশ করুন। সব জোগাড় করে দিচ্চি।

—আচ্ছা, আপনার কথা মনে রইল। যদি কখনো—

—না না, আপনি থাকুন এখানে। এদেশে ডাক্তার নেই। পান্নাকে নিয়েই থাকুন। আমার আপত্তি নেই।

—তা হয় না। সবাই টের পেয়ে গিয়েছে ও নাচওয়ালী। এখানে প্র্যাকৃটিশ একা হোতে পারে, ওকে নিয়ে হয় না।

—সব হয় মশাই। আমার নাম বঙ্কুবিহারী জোয়ারদার, মনে রাখবেন ডাক্তারবাবু। আপনাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে—আপনার নামটি কি?

—না। সেটা বলবো অন্য সময়ে। বুঝতেই পারচেন।

—আপনাকে বলা রইল। যে পথে নেমেচেন, বিপদে পড়লে চিঠি দেবেন। আমি যা করবার করবো ডাক্তারবাবু।

যাবার সময় শেষ রাত্রে নায়েবমশায় নিজে নৌকোয় এসে দাঁড়িয়ে আমাদের জিনিসপত্র তুলবার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। পান্নার সম্বন্ধে আর কোন কথা মুখেও আনলেন না। আমাকে আর একবার আসতে বললেন, বার বার করে। কার মধ্যে যে কি থাকে!

পান্না নৌকায় বললে—বুড়োটা ক্ষেপেছিল তাহলে?

—সেটা তোমার দোষ। ওর দোষ নয়।

—কি বললে শেষটাতে?

নীলি ঝঙ্কার দিয়ে বললে—তুই ক্ষ্যামা দে বাপু। একটু ঘুমুতে দে। নেকু, ওরা কি বলে তুমি জানো না কিনা? খুকি! চুপ করে থাক।

পান্না হেসে বললে—নীলিদির রাগ হয়েচে—হাজার হোক—

—আবার ওই কথা! ঘুমুতে দে। বক্ বক্ করতে হয় তোমরা নৌকোর বাইরে গিয়ে বকো।

নৌকোতে উঠে সকালের হাওয়ায় আমার ঘুম এল।

অনেকক্ষণ পরে দেখি পান্না আমায় ডেকে তুলচে। বেলা অনেক হয়েচে। নৌকো এসে স্টেশনের ঘাটে পৌচে গিয়েচে।

নীলি হেসে বললে—তাহলেই আপনি মুজরোর দলে থেকেচেন! তিন চার রাত জাগতে হবে অনবরত। ঘুমুতে পারবেন না মোটে, তবেই মুজরো পারা যায়। আমাদের সব অভ্যেস হয়ে গিয়েচে।

গাড়ীতে উঠে নিরিবিলি পেয়ে পান্না আমায় বললে—কত টাকা পেলাম বল তো?

—কি জানি?

—তোমায় দেব না কিন্তু—হুঁ হুঁ—

ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে বলে।

আমিও হেসে বলি—দেখাও না, কেড়ে কি নিচ্চি?

—বিশ্বাস কি?

পান্না একটা রঙীন রুমালের খুঁট খুলে দেখালে একখানা দশটাকার নোট আর খুচরো রুপোর টাকা গোটা বারো, একে একে গুণলে।

আমি বললাম—নীলির ভাগ আছে তো এতে?

—ওর ভাগ ওকে দিয়েচি। এ তো প্যালার টাকা। নীলিকে কেউ প্যালা দ্যায় নি তো।

—দ্যায় নি

—আহা, কবে দ্যায়?

—তার মানে তুমি রূপসী বালিকা, তোমার দিকে সকলের চোখ?

—যাও!

—সত্যি। জানো না কি হয়েছিল কাল? নীলি বলে নি তোমায়?

—না। কি হয়েছিল গো?

—নায়েবের চোখ পড়েছিল তোমার দিকে।

—সে কি রকম?

ওকে সব খুলে বললাম। ও শুনে বললে—কত জায়গায় এ রকম বিপদে পড়তে হয়েচে। তবে তোমাকে নিয়ে এসেছিলুম কেন? সঙ্গে পুরুষ না থাকলে কি আমাদের বেরুনো চলে?

হেসে বললাম—ঢং কোরো না পান্না।

—সে কি?

—সব জায়গায় সতী ছিলে তুমিও? বিশ্বাস তো হয় না।

পান্না গম্ভীর মুখে বললে—না। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না। ভাবনহাটি তালকোলার জমিদার-বাড়ীতে কি একটা বিয়ে উপলক্ষে আমরা গেলুম মুজরোতে। জমিদারের ভাইপোর বিয়ে। সেই বিয়ের নতুন বর ভাইপো ক্ষেপে উঠলো আমায় দেখে সেই রাত্তিরে। আমায় নৌকোতে করে সারা রাত নিয়ে বেড়ালে।

—বলো কি?

—তারপর শোনো। সেই লোক বলে—আমরা চলো যাই কলকাতায় পালিয়ে, নতুন বৌকে ফেলে। বিয়ে হয়েচে, তখনও বুঝি ফুলশয্যে হয় নি। বলো কত টাকা চাও, বলো কত টাকা চাও,—আমাকে হাতে ধরে পীড়াপীড়ি। কত বোঝাই—শেষে না পেরে বলি হাজার টাকা মাসে নেবো। তখন কাঁদতে লাগলো। পুরুষ মানুষের কান্না দেখে আমার আরও ঘেন্না হয়ে গেল। বলচে, আমার তো নিজের জমিদারি নয়, বাবা কাকা বেঁচে।

হাজার টাকা করে মাসে কোথা থেকে দেবো? তবে নতুন বৌয়ের গায়ের তিন হাজার টাকার গয়না আছে, তুমি যদি রাজী হও আজ শেষ রাত্তিরে সব গয়না চুরি করে আনবো। শুনে তো আমি অবাক। মানুষ আবার এমন হয় নাকি? পুরুষ জাঁতের ওপর ঘেন্না হয়ে গেল। নতুন বউ, তার গয়না নাকি চুরি করে আনবে বলেচে। আমি সেই যে ফিরে এলাম, আর ওর সঙ্গে দেখা করি নি। বলে, নিজের গলায় নিজে ছুরি দেবে। আমি মনে মনে বলি, তাই দে।

—চলে এলে?

—তার পরের দিনই।

—অত টাকা তোমার হোত।

—অমন টাকার মাথায় মারি সাত ঝাড়ু। একটা নতুন বৌ, ভাল মানুষের মেয়ে, তাকে ঠকিয়ে তার গা খালি করে টাকা রোজগার? সে লোকটা না হয় ক্ষেপেছে, আমি তো আর তাকে দেখে ক্ষেপি নি? আমি অমন কাজ করবো?

পান্নার মুখে একথা শুনে খুব খুশী হোলাম। পান্না যে আবহাওয়ায় মানুষ, যে বংশে ওর জন্ম, তাতে তিন হাজার টাকার লোভ এভাবে ত্যাগ করা কঠিন। ও যদি আমার কাছে মিথ্যে না বলে থাকে তবে নিঃসন্দেহে পান্না উঁচু দরের জীব।

বৌবাজারের বাসায় এসে নীলি চলে গেল। বিকেল বেলা। পান্না কলে কাপড় কেচে গা ধুয়ে এল। সত্যি, রূপসী বটে পান্না। সাবান মেখে স্নান করে ভিজে চুলের রাশ পিঠে ফেলে একখানা বেগুনি রংয়ের ছাপাশাড়ী পরে ও যখন ঘরে ঢুকলো, তখন তালকোলার জমিদারের ভাইপো তো কোন্ ছার, অনেক রাজা মহারাজের মুণ্ডু সে ঘুরিয়ে দিতে পারতো, এ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

পান্না সেই রঙীন রুমালের খুঁট খুলে টাকাগুলো সব মেজেতে পাতলে। বললে—কত টাকা গো? এই দশ, এই পাঁচ—

—থাক, গুনচো কেন?

—তুমি নেবে না?

—এখন রাখো তোমার কাছে।

—খরচপত্তর তুমিই তো করবে।

—আমার বাক্স নেই। তোমার বাক্সে রাখো।

—তাহোলে এক কাজ করো। টাকা নিয়ে বাজারে যাও, দু'টো চায়ের ডিসপেয়ালা, ভালো চা, চিনি এ বেলার জন্য কিছু মাছ আলু পটল আনো। মাছের ঝোল ভাত করি। একখানা পা-পোশ কিনে এনো তো! যত রাজ্যির ধুলো সুদ্ধ ঘরে ঢোক তুমি।

—তা আর বলতে হয় না।

—না, হয় না, তুমি জুতো ঘরে নিয়ে ঢুকো না। পা-পোশ একখানা এনো, ওখানে থাকবে। আর ধুনো এনো, সন্দেবেলা ধুনো দেবো।

—তুমি যে সাধু হয়ে উঠলে দেখচি। আবার ধুনো?

পান্না বিরক্তমুখে বললে—আহা, কি যে রঙ্গ করো! গা যেন জলে যায় একেবারে। ও মুখ ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গিতে চলে গেল।

কি সুন্দর লাবণ্যময় ভঙ্গি ওর! চোখ ফেরানো যায় না। সত্যি, কোন্ স্বর্গে আমায় রেখেচে ও? ওকে পেয়ে দুনিয়া ভুল হয়ে গিয়েচে আমার। পূর্ব্ব আশ্রমের কথা কিছুই মনে নেই। সুরবালা-টুরবালা কোথায় তলিয়ে গিয়েচে। বাজার করে একটা ছোট পার্কের বেঞ্চির ওপর বসে বসে এই সব ভাবি। এই বেঞ্চিটা আমার প্রিয় ও পরিচিত, অনেকবার ওর কথা ভেবেচি এটাতে বসে।

বাসায় ঢুকতে পান্না বললে—ওগো, আর একবার যেতে হবে বাজারে—

—কেন?

—দইওয়ালী এসেছিল, তোমার জন্যে দই কিনে রেখেচি। পাকা কলা নিয়ে এসো, খাবে।

আবার পাকা কলা কিনতে বেরুই। এতেও সুখ। আমি কত সচ্ছল অবস্থায় মানুষ, পান্না তার ধারণাও করতে পারবে না। সব ছেড়ে ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু'এক টাকার বাজার করচি, পায়ে জুতো ছিঁড়ে আসচে, গায়ে মলিন জামা—যে আমি দিনে তিনবার ধুতি পাঞ্জাবী বদলাতুম, তার এই দশা। কিছু না। সংসার অনিত্য। প্রেমই বস্তু। তা এতদিনে পেয়েছি। বস্তুলাভ ঘটেচে এতকাল পরে। আর কিছু চাই না।

দুপুরবেলা পান্না রেঁধে বললে—খাবে কিসে?

—কেন, শালপাতায়?

—দোহাই তোমার, তোমার জন্যে অন্তত: একখানা থালা কিনে আনো।

—কিছু পয়সা দাও দেখি?

—কত?

—অন্তত: দশটা টাকা। দুখানা থালা কিনে আনি।

—এখন? আমার হাতে এঁটো। বাক্সে আছে। চাবি নিয়ে বাক্স খুলতে পারবে?

আমি হেসে বললাম—না পান্না। আমি নিজেই আনছি কিনে। আমার কাছে আছে। ওর ধরণ আমার খুব ভালো লাগলো। ও পয়সা দিতে চাইলে, কোনো প্রতিবাদ করলে না। ওর তো খরচ করার কথা নয়, খরচ করার কথা আমার। অথচ ও অকাতরে বাক্স খুলে পয়সা বার করে দিলে কেন? পান্না অন্য ধরণের মেয়ে, ওকে যতই দেখচি, ওকে অন্য জাতের মেয়ে বলে মনে হচ্চে। ওদের শ্রেণীর অন্য মেয়ের মত নয় ও।

আমি দু'খানা এনামেলের থালা কিনে আনলাম। হাতে বেশি পয়সা নেই। পান্না দেখে হেসেই খুন। আমি শেষে কিনা এনামেলের থালা কিনে আনলাম? কখনো এ থালায় খেয়েছি আমি?

—হি-হি-হি—

—অত হাসি কিসের ?

—জব্দ গো জব্দ। বড্ড জব্দ হয়েচ এবার।

—কিসের জব্দ ?

—পয়সা ফুরিয়েচে তো হাতে ? এবার নীলিকে খবর দাও। দু'জনে মুজরো করে আনি। না হোলে খাবে কি লবডংকা ?

পান্না দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল তুলে নাচিয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হেসে আবার গড়িয়ে পড়লো।

আমার কি যেন একটা হয়েচে, পান্না যা করে আমার বেশ ভালো লাগে, যে কথাই বলুক বা যে ভঙ্গিই করুক। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর হেসে-লুটিয়ে-পড়া তনুলতার দিকে চেয়ে রইলাম। অপূর্ব্ব সুশ্রী মেয়ে পান্না।

আর একটা কথা ভেবে দেখলাম বিকেলে একটা পার্কে নিরিবিলি বসে। আমার হাতে আর অর্থ নেই বা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি এ জিনিসটা পান্নার পক্ষে আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়। কিন্তু এটাকে ও অতি সহজভাবেই মেনে নিয়ে তার প্রতিকারও করতে চাইলে। ও নিজে উপার্জ্জন করে এনে খাওয়াবে আমাকে ভেবেচে নাকি ? ও অতি সরল। কিন্তু এই সরলতা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। আমি এর আস্বাদ পেয়ে ধন্য হোলাম।

পান্নাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না। কেমন সহজ ভাবে ও আমার নিঃস্বতার বার্ত্তাকে গ্রহণ করলো ? কত সম্ভ্রান্ত ঘরের বিবাহিতা স্ত্রীরা এত সোজাভাবে স্বামীর ব্যাঙ্ক ফেল মারার বার্ত্তাকে পরিপাক করতে পারতো না। পান্নার শালীনতা অন্য রকমের, ও বেশি কখনো পায়নি বলেই বেশি চায় না—তাই কি ? এই অবস্থাটাই বোধ হয় ওর কাছে সহজ।

পান্না আমাকে ভালোবাসে নিশ্চয়ই। ভাল না বাসলে ও এমন কথা বলতে পারতো না। আমার বয়েস হয়েচে, একটি ষোড়শী সুন্দরী কিশোরী আমাকে অমন ভালোবাসবে, এ আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। সত্যি কি পান্না আমাকে ভালোবেসে ফেলেচে ? না, বিশ্বাস করা শক্ত। একবার বিশ্বাস হয়, একবার হয় না।

পার্কের বেঞ্চিটার ও-কোণে একটা চানাচুর-ভাজাওয়ালা এসে বসলো। আমায় বললে—বাবু, দেশলাই আছে ? আমি তাকে দেশলাই দিলাম। চলে যা না কেন বাপু, তা নয়, সে আবার আমার সঙ্গে খোসগল্পে প্রবৃত্ত হয়, এমন ভাব করে তুললে। আমার কি এখন ওই সব বাজে কথা ভাল লাগচে ?

আবার নির্জ্জন হোল পার্কের কোণ। আবার আমি বসে ভাবি।

পান্না আমাকে ভালোবাসে, ভালোবাসে, ভালোবাসে।...

কি এক অদ্ভুত শিহরণ ও উত্তেজনা আমার সর্ব্বদেহে। চুপ করে বসে শুধু ওই কথাটাই ভাবি। শুধু ভেবেই আনন্দ। এত আনন্দ যে আছে চিন্তার মধ্যে, এত পুলক, এত শিহরণ,

এত নেশা, এ কথাই কি আগে জানতাম ? যেন ভাঙ খাওয়ার নেশার মত রঙীন নেশাতে মশগুল হয়ে বসে আছি। জীবনে এরকম নেশা আসে চিন্তা থেকে তাই বা কি আগে জানতাম ?

সুরবালার সঙ্গে এতদিনের ঘরকন্না আমার ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে।

ভালোবাসা কি জিনিস, ও আমাকে শেখায় নি।

যদি কখনো না জানতাম এ জিনিস; জীবনের কটা মস্ত বড় রসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতাম।

সুরবালার চিন্তা আমাকে কখনও নেশা লাগায় নি।

কিন্তু কেন ? সুরবালা সুন্দরা ছিল না, তা নয়। আমাদের গ্রামের বৌদের মধ্যে এখনো সুন্দরী বলে সে গণ্য। এখন তার বয়েস পান্নার ডবল হতে পারে, কিন্তু একসময়ে সেও ষোড়শী কিশোরী ছিল। কিন্নরকণ্ঠী না হোলেও সুরবালার গলার স্বর মিষ্টি। এখনো মিষ্টি। ষোড়শী সুরবালাকে আমি বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু কিসের অভাব ছিল তার মধ্যে ? অভাব কিসের ছিল তখন তা বুঝি নি। এখন বুঝতে পারি, পান্নার ভালোবাসা পেয়ে আমার এই যে নেশার মত আনন্দ, এই আনন্দ সে দিতে পারে নি। নেশা ছিল না ওর প্রেমে। ওর ছিল কি না জানি নে, আমার ছিল না। এত যে নেশা হয় তাই জানতাম না, যদি পান্নার সঙ্গে পরিচয় না হোত। এর অস্তিত্বই আমার অজ্ঞাত ছিল।

রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাচ্চে। পার্কে মেলা লোক বেড়াচ্চে। এদের মধ্যে ক'জন লোক এমন ভালোবাসার আনন্দ আস্বাদ করেছে জীবনে ? ওই যে লোকটা ছাতি বগলে যাচ্চে, ও বোধ হয় একজন স্কুল-মাস্টার। ও জানে ভালোবাসার আস্বাদ ? ওর পাশের বাড়ীর কোনো দুরধিগম্য সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে হয়তো ছাদে ছাদে দেখা হয়—না কি ? হয়তো সেই জন্যে ও ছুটে ছুটে যাচ্চে বাসায় ? .

যদি না জানে ওর আস্বাদ, তবে ওরা বড্ড দুর্ভাগা। অমৃতের আস্বাদ পায়নি জীবনে।

ভালোবেসে আনন্দ নয়, ভালোবাসা পেয়ে আনন্দ। এ কোনো আইডিয়ালিস্টিক ব্যাপার নয়, নিছক স্বার্থপর ব্যাপার। একটু আস্বাদ করে আরও আস্বাদ করতে প্রাণ ব্যগ্র হয়ে পড়ে।

বেলা পড়লে উঠে বাসায় ফিরলুম। পান্না কি সত্যিই আছে ? ও স্বপ্ন না তো ? না, পান্না বসে চুল বাঁধচে। ওর সেই তোরঙ্গটা থেকে আয়না বের করেচে, দাঁত দিয়ে চুলের দড়ির প্রান্ত টেনে ধরেচে, বেশ ভঙ্গিটি করে।

চমকে উঠে বললে—কে ?

পেছন ফিরে চাইতে গেল তাড়াতাড়ি।

আমি বললাম—দোর খুলে রেখেচ কেন ? একলা ঘরে থাকো, যদি চোর ঢোকে ? বন্ধ করে রেখো।

ও অপ্রতিভ হয়ে বললে—আচ্ছা।

—চুল বাঁধচো ?

—দেখতে পাচ্চো না? চা খাবে তো?

—নিশ্চয়ই।

—চা-চিনি নিয়ে এসো। কিছুই নেই।

—পয়সা দাও।

—নিয়ে যাও আমার এই পাউডারের কৌটো খুলে। এই যে—

পয়সা নিয়ে নেমে গেলুম।

দিন কতক বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

কিন্তু আমার মনে কেমন এক ধরণের অস্বস্তি শুরু হয়েচে, আমার নিজের উপার্জ্জন এক পয়সাও নেই, পান্নার উপার্জ্জনের অর্থ আমাকে হাত পেতে নিতে হচ্চে, না নিয়ে উপায় নেই। আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি, এ ভাবে কতদিন চলবে। ও যা মুজরো করে এনেছিল, তা ফুরিয়ে এল। কলকাতার খরচ। ওর মনে ভবিষ্যতের ভাবনা নেই, বেশ হাসি গল্প গান নিয়ে সুখেই আছে—কিন্তু আমি দেখছি আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পান্নার টাকায় সংসার বেশীদিন চলা সম্ভব হবে কি? আমি সে টাকা বেশীদিন নিতেও পারবো না?

পান্নাকে কথাটা বললাম।

ও বুঝতে চায় না। বললে—তাতে কি? আমার টাকা তোমার নিলে কি হবে?

—মানে নিলে কিছু হবে না। কিন্তু ওতে চলবে না।

—কেন চলবে না? বেশ তো চলচে।

—এর নাম চলা?

বলেই সামলে নিলুম। পান্না সরল মেয়ে, তার জীবন-যাত্রার ধারণাও সরল ও সংক্ষিপ্ত ওর মা ছিলো মুজরোওয়ালী, যা রোজগার করেচে তাতেই সেকালে সংসার চলে গিয়েচে বিলাসিতা বাবুগিরি জানতো না। কোনোরকমে খাওয়া পরা চলে গেলেই খুশী। ওরও জীবন-যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে যে সহজ ধারণা আছে, আমি তার অপমান করতে চাইনি।

বললাম—ধরো তুমি যদি দু'দিন বসে থাকো, আসরের বায়না না পাও?

—সে তুমি ভেবো না।

—আমাকে বুঝিয়ে বলো কিসে চলবে? খাবো কি দু'জনে?

পান্না হি হি করে হেসে ওঠে। ঘাড় দুলিয়ে বলে—খেতে পেলেই ত তোমার হোল?

আমি চুপ করে রইলাম। ও সংসারের কোনও খবরই রাখে না। কি কথা বলবো এ সম্বন্ধে ওকে?

ও বললে—তুমি কি ভাবচো শুনি?

—ভাবচি আমাকেও টাকা রোজগার করতে হবে।

—বেশ, পার তো করো। আমি কি বারণ করেছি?

—তুমি জান আমি ডাক্তার। আমাকে কোথাও বসে ডাক্তারখানা খুলতে হবে, তবে রোজগার হবে।

—এই বাসার নিচের তলাতে ঘর খালি আছে, ডাক্তারখানা খোলো।

—তুমি ভারি মজার মেয়ে পান্না! অত সোজা বুঝি! টাকা কই, ওষুধপত্র কিনতে হবে, কত কি চাই। টাকা দেবে?

—কত টাকা বলো?

—হাজার খানেক।

—কত?

—আপাততঃ হাজার খানেক।

—উ রে!

পান্না দীর্ঘ শিস দেওয়ার সুরে কথাটা উচ্চারণ করে চুপ করে গেল।

আমি জানি ও অত টাকা কখনো একসঙ্গে দেখে নি। বল্লাম—তুমি ভাবছিলে কত টাকা?

—আমি? আমি ভাবছিলাম পঁচিশ ত্রিশ।

—দিতে?

—আমার হার বাঁধা দাও, দিয়ে টাকা আনো।

—থাক, রেখে দাও।

সেদিন দু'টি ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে চাকরির চেষ্টা করলাম। কোথাও সুবিধে হোল না। বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম। একটা নির্জ্জন স্থানে বসে।

কিন্তু আসল কাজ হয়ে পড়লো অন্য রকম।

পান্নাও নাচের আসরে বায়না নিতে লাগলো। আমি ওর সঙ্গে সর্ব্বত্রই যাই, বাইজীর পেছনে সারেঙ্গীওয়ালার মত। পরিচয় দিই দলের রসুইয়ে বামুন বলে, কখনো বলি আমি ওর দূর সম্পর্কের দাদা। এ এক নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা; কত রকমের লোক আছে, কত মতলব নিয়ে লোকে ঘোরে, দেখি, বেশ ভাল লাগে। ওরই রোজগারে সংসার চলে। মাঘ মাসের শেষে কেশবডাঙ্গা বলে বড় একটা গঞ্জের বারোয়ারির আসরে পান্নার সঙ্গে গিয়েছি। বেশ বড় বারোয়ারির আসর, প্রায় হাজার লোক জমেচে আসরে। তার কিছু আগে স্থানীয় এক পল্লীকবির 'ভাব' গান হয়ে গিয়েচে। অনেক লোক জুটেছিল 'ভাব' গান শুনতে। তারা সবাই রয়ে গেল, পান্নার নাচ দেখতে। কিছুক্ষণ নাচ হবার পরে দেখলাম পান্না সকলকে মুগ্ধ করে ফেলেচে। টাকা সিকি দুয়ানির প্যালাবৃষ্টি হচ্চে ওর ওপরে। গঞ্জের বড় বড় ধনী ব্যবসাদার সামনে সার দিয়ে বসে আছে আসরে। সকলেরই দৃষ্টি ওর দিকে।

আমি বসেছিলাম হারমোনিয়ম-বাজিয়ের বাঁ পাশে। আমায় এসে একজন বললে—আপনাকে একটু আসরের বাইরে আসতে হচ্চে—

—কেন?

—ঝড়ুবাবু ডাকচেন।

—কে ঝড়ুবাবু?

—আসুন না বাইরে।

লোকটা আমাকে আসর থেকে কিছুদূরে নিয়ে গেল একটা পুরনো দোতলা বাড়ীর মধ্যে। সেখানে গিয়ে দেখি জনকতক লোক বসে মদ খাচ্চে। মদ খাওয়া আমি ঘৃণা করি। আমি চলে আসতে যাচ্চি ঘরে না ঢুকেই—এমন সময় ওদের মধ্যে একজন বললে—শুনুন মশাই, এদিকে আসুন। আমার সঙ্গের লোকটি বললে—উনিই ঝড়ুবাবু।

ঝড়ুটড়ু আমি মানি নে, অধীর বিরক্তির সঙ্গে বললাম—কি বলচেন?

—আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

—কি কথা?

—ওই মেয়েটির সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?

—কেন?

—বলুন না মশাই, আমরা সব বুঝতে পেরেচি।

—ভালোই করেচেন। আমি এখন যাই।

—না না শুনুন। কিছু টাকা রোজগার করবেন?

—বুঝলাম না আপনাদের কথা।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেচি ওরা কি বলবে। আমি বাইরে যাবার জন্যে দরজার কাছে আসতেই একজন ছুটে এসে আমার সামনে হাত জোড় করে বললে—বেয়াদবি মাপ করবেন।

মদের বোতলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—চলে নিশ্চয়ই?

আমি রাগের স্বরে বললাম—না।

—বেশ, বসুন না? কত টাকা চাই বলুন, রাগ করচেন কেন?

ঝড়ুবাবু লোকটি মোটামত, মদ খেয়ে ওর চোখ লাল হয়ে উঠেচে, গলার স্বর জড়িয়ে এসেচে। একটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ছিল। আমার দিকে চেয়ে বললে—কুড়ি টাকা নেবেন? পঁচিশ? ওই মেয়েটিকে চাই।

আমার হাসি পেল ওর কথা শুনে। ও আমাদের ভেবেচে কি?

আমি কি একটা বলতে যাচ্চি, আমাকে যে সঙ্গে করে এনেছিল সে বললে—ইনি পল্লীকবি ঝড়ু মল্লিক। ঝড়ু মল্লিকের 'ভাব' শোনেন নি?

আর একজন পার্শ্বচর লোক বললে—এ জেলার বিখ্যাত লোক। অনেক পয়সা রোজগার। দশে মানে, দশে চেনে।

আমি ভাল করে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলাম। এতক্ষণ ওর দিকে তেমন করে চাইনি, ভেবেছিলাম এই গঞ্জের পেটমোটা ব্যবসাদার। এবার আমার মনে হোল লোকটা সরল প্রকৃতির দিলদরিয়া মেজাজের কবিই বটে।

আমি নমস্কার করে বললাম—আপনিই সেই পল্লীকবি?

ঝড়ু মল্লিক হেসে বললে—সবাই বলে তাই। এসো ভাই বসো এখানে। কিছু মনে করো না।

—আপনার কথা আমি শুনেচি।

—এসো বসো। এ চলে?

—আজ্ঞে না, ওসব খাইনে।

ঝড়ু মল্লিক পার্শ্বচরের দিকে চেয়ে বললে—যাও হে, তোমরা একটু বাইরে যাও—আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলি। সবাই চলে গেল। আমার কাছে ঘেঁষে বসে নীচু স্বরে বললে—তোমার স্ত্রী?

—না।

—সে আমি বুঝেচি। কি সম্পর্ক তাও বুঝলাম। আমি একটা কথা জানতে চাই। তুমি ভাই এর মধ্যে কেন?

—তার মানে?

—তার মানে তুমি ভদ্রলোক। আমি মানুষ চিনি। এর সঙ্গ ছেড়ে দাও। আমি ভুক্তভোগী, বড় কষ্ট পেয়েচি দাদা। কি করতে?

—ডাক্তারি।

—সত্যি? কি ডাক্তারি?

—এম. বি. পাশ ডাক্তার।

ঝড়ু মল্লিক সম্ভ্রমের মুখে বলে উঠলো—বসো, ভালো হয়ে বসো। নাম জিজ্ঞেস করতে পারি? না থাক, বলতে হবে না। এখানে কতদিন?

—তা মাস ছ' সাত হয়ে গেল।

—বড় কষ্ট পাবে। আমিই বা তোমাকে কি উপদেশ দিচ্চি! আমি নিজে কি কম ভোগা ভুগেচি! এখনো চোখের নেশা কাটে নি। মেয়েটির নাম কি?

—পান্না।

—বেশ দেখতে। খুব ভালো দেখতে। আমি ওকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েচি। অমন মেয়ে এ রকম খেমটার আসরে বড় একটা দেখা যায় না। আচ্ছা, আমি তোমাকে কিছু বলবো না আর ও নিয়ে। তুমি এখন ছাড়তে পারবে না তাও জানি। ও বড় কঠিন নেশা, নাগপাশ রে দাদা। বিষম হাবুডুবু খেয়েছি ও নিয়ে। নইলে আজ ঝড়ু মল্লিক সোনার ইট দিয়ে কোঠা গাঁথতে পারতো। এ কি রকম মেয়ে? পয়সাখোর?

—না, তার উল্টো। বরং রোজগার করে ও, আমি বসে বসে খাই। পয়সাখোর মেয়ে ও নয়।

মোটামুটি ঝড়ু মল্লিককে সব কথা বললাম। লোকটাকে আমার ভাল লেগেছিল, লোকটা কবি, এতেই আমি ওকে অন্য চোখে দেখেচি। নইলে এত কথা আমি ওকে বলতাম না।

ঝড়ু মল্লিকের নেশা যেন কেটে গিয়েচে। সব শুনে বললে—এ নিয়ে আমার বেশ ভাবগান তৈরি হয়। আসলে কি জানো ভায়া, ভাবেরই জগৎ। যার মধ্যে ভাবের অভাব,

তাকে বলি পশু। এই যে তুমি, তুমি লোকটি কম নয়, নমস্য। যদি বল কেন, তবে বলি। ডাক্তারি ছেড়ে, ঘরবাড়ী ছেড়ে, স্ত্রী পুত্র ছেড়ে ওই এক ষোলো সতেরো বছরের মেয়ের পেছনে পেছনে কেন ঘুরে বেড়াচ্চ তুমি? সর্ব্বস্ব ছেড়ে ওর জন্যে? সবাই কি পারে? তোমার মধ্যে বস্তু আছে। ভায়া, এসব সবাই বুঝবে না।

আমি নিজের কথা খুব কমই ভেবেছি এ ক'মাস। চুপ করে রইলাম।

ঝড়ু বললে—এ জন্মে এই, আসচে জন্মে এই ভাব দিয়ে তাঁকে পাবে?

—তাঁকে কাকে?

—ভগবানকে?

উত্তরটা যেন তিনি প্রশ্ন করবার সুরে বললেন। আমার বেশ লাগছিল ওর কথা, শুনতে লাগলাম। কবি কিনা, বেশ কথা বলতে পারে। তবে বর্ত্তমানে ভগবানের সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই, এই যা কথা।

ঝড়ু আবার বললে—হ্যাঁ ভায়া, মিথ্যে বলচি নে। এই সর্ব্বস্বত্যাগের অভ্যেস ভাবের খাতিরে, এ বড় কম অভ্যেস নয়, পান্না তোমাকে শেখালে। ও না থাকলে শিখতে পেতে না। অন্য লোকে বলবে তোমাকে বোকা, নির্ব্বোধ, খারাপ, অসৎ চরিত্র বলবে তোমায়।

আমি বললাম—বলবে কি বলচো, গ্রামের লোক এতদিন বলতে শুরু করেচে।

—কিন্তু আমার কাছে ও কথা নয়। আমি ভাবের লোক, আমি তোমাকেও অন্য চোখে দেখবো। তুমি ভাবের খাতিরে ত্যাগ করে এসেচ সর্ব্বস্ব; তুমি সাধারণ লোক নও, জন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বড়। খাঁটি মানুষ ক'টা? জন্তু মানুষই বেশি। পায়ের ধুলো দাও ভায়া—ভাব আছে তোমার মধ্যে—

কথা শেষ না করেই ঝড়ু মদের ঝোঁকে কি ভাবের ঝোঁকে জানিনে, আমার পায়ের ধুলো নিতে এল ঝুঁকে পড়ে। আমি পা সরিয়ে নিয়ে তখনকার মত কবির কাছ থেকে চলে এলাম। মাতালের কাছে বেশীক্ষণ বসে থাকা ভালো নয় দেখচি।

ঝড়ু মল্লিকের কাছ থেকে চলে তো এলাম, কিন্তু ওর কথা আমার মনে লাগলো। নেশায় পড়ে গিয়েছি কথাটা ঠিকই, আমিও তা এক এক সময় বুঝতে পারি।

কিন্তু ঝড়ু মল্লিক কবি যখন, তখন জানে এ নেশার মধ্যে কী গভীর আনন্দ! ছাড়া কি যায়? ছাড়া যায় না।

পান্না সেদিন নাচের আসরের পর এসে ঘুমিয়ে পড়েছে, অনেক রাত—বাইরে চাঁদ উঠেছে, শন্ শন্ করে হাওয়া বইচে—আমি বাইরের বারান্দায় শুয়ে ছিলাম—কিন্তু ও বলেছিল আমার কাছে এসে শোবে রাত্তিরে, নয়তো নতুন জায়গা ভয় ভয় করবে। নীলি এবার আসে নি, ও একাই মুজরো করতে এসেচে। ভয় ওর করতেই পারে, তাই রাত্রে আমি ঘরের মধ্যেই এলাম।

পান্না অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ওর গলায় সোনার হার। মেয়েমানুষ সত্যিই বড় অসহায়। যে কেউ ওর গলা থেকে হার ছিনিয়ে খুন করে রেখে যেতে পারে এ সব বিদেশ-বিভুঁয়ে। আর ওর যখন এ-ই উপজীবিকা, বাইরে না গিয়ে তখন ওর উপায় নেই। আমি ওকে ফেলে অনায়াসে পালাতে পারি, আমার মহাভিনিষ্ক্রমণ এই মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হতে পারে—কিন্তু তা আমি যাবো না। আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে চলে এসেচে, একে আমি অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে পারি?

পান্না আমার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠলো। জড়িত স্বরে বললে—কে?

—আমি।

—শোও নি?

—না। আমি তোমার গলার হার চুরি করবো ভাবছিলাম।

—সত্যি?

—আমি মিথ্যে বলচি?

—বোসো এখানে। হাঁগো, তুমি তা পারো?

—কেন পারবো না। পুরুষ মানুষ সব পারে!

—তোমার মত পুরুষ মানুষে পারে না। শোনো, একবার কি হয়েছিল আমার ছেলে-বেলায়। শশীমুখী পিসি ছিল আমাদের পাড়ায়। পরমা সুন্দরী ছিল সে—আমার একটু একটু মনে আছে। তার সঙ্গে অনেক দিন থেকে রামবাবু বলে একটা লোক থাকতো। তার ঘরেই থাকতো, মদ খেতো, বাজার থেকে হিংয়ের কচুরি আনতো। একদিন রাত্রে, সেদিন সেই কালী পূজোয়, আমার বেশ মনে আছে—শশীমুখী পিসিকে খুন করে তার সর্ব্বস্ব নিয়ে সেই রামবাবু পালিয়ে গেল। সকালে উঠে ঘরের মধ্যে রক্তগঙ্গা।

—ধরা পড়েছিল?

—না। কত খোঁজ করা হয়েছিল, কোন সন্ধান নাকি পাওয়া গেল না।—তারপর শোনো না। ঘরে একটা ক্লকঘড়ি ছিল, তার মধ্যে শশীপিসি জড়োয়ার হার রাখতো। রামবাবু সেটা জানতো না—তার পরদিন সেই হার বেরুলো ঘড়ির মধ্যে থেকে, পুলিশে নিয়ে গেল। কার জিনিস কে খেল! আমাদের জীবনই এইরকম—বুক কাঁপে সব সময়। কখন আছি, কখন নেই। যত পাজী বদমাইস লোক নিয়ে আমাদের চলতে হয়, ভালো লোক ক'টা আসে আমাদের বাড়ী? বুঝতেই পারচো তো।

—অর্থাৎ আমি একজন পাজী লোক?

—ছি, তোমাকে কি বলচি? আমি মানুষ চিনি। তোমার কাছে যতক্ষণ আছি, তত-ক্ষণ কোনো ভয় থাকে না।

—আমায় বিশ্বাস হয়?

—বিশ্বাস হয় কি না বলতে পারি নে। তবে তুমি যদি খুন করেও ফেলো, মনে দুঃখ না নিয়েই মরবো। তোমার ছুরি বুকে বিঁধবার সময় ভয় হবে না এতটুকু।

—আচ্ছা, তুমি এখন ঘুমোও, রাত অনেক হলো। আবার কাল তো সকাল সকাল নাচের আসর।

—ঘুমুই আর তুমি আমাকে মেরে ফেলো গলা টিপে, না?

—তা ইচ্ছে হয় তো গলা টিপে মারবো। ঘুমোও।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি পান্না তখনও অঘোরে ঘুমুচ্চে। আমি উঠে বাইরে গেলাম। একটা কদম গাছ ডালপালা বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সকালের রোদ বাঁকাভাবে গাছটার উপর পড়েচে। গাছটার দৃশ্য আমার মনে এমন এক অপূর্ব্ব ভাব জাগালো যে আমি প্রায় সেখানে বসে পড়লাম। কি যে আনন্দ মনে, আমার এত বৎসরের অভিজ্ঞতায় কখনো আস্বাদ করি নি। আজ আমি পথের ফকির, পসারওয়ালা 'ডাক্তার' হয়ে খেমটাওয়ালীর সারেঙ্গী নিয়ে বেড়াচ্ছি—কিন্তু আমার মনে কোন কষ্ট নেই, কোন খেদ নেই।

ঝড়ু মল্লিক ভাবওয়ালা যে পুরনো দোতলা বাড়িতে থাকে, সেটা একটা পুকুরপাড়ে। সারা রাত ভাল করে ঘুম হয় নি, পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখি ঝড়ু ভাবওয়ালা পুকুরের ওপারে নাইচে।

আমায় দেখে বললে—ডাক্তারবাবু—

—কি বলুন?

—চা খেয়েছেন সকালে? আসুন দয়া করে আমার আস্তানায়।

—চলুন যাচ্চি।

লোকটা আমার জন্য খাবার আনিয়েচে বাজার থেকে। খুব খাতির করে বসালে। লোকটাকে আমারও বড় ভালো লেগেছে, এমন দিলদরিয়া ধরণের লোক হঠাৎ বড় দেখা যায় না। সবিনয়ে আমার অনুমতি প্রার্থনা করে (যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না) একটু মদও সে নিজের চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে। এক চুমুকে চাটুকু খেয়ে নিয়ে আমায় বললে—চলবে?

—না। আপনি খান—

—তুমি ভাই নতুন ধরনের মানুষ। আমরা ভাবওয়ালা কিনা, ধরতে পারি। তোমায় নিয়ে ভাব লিখবো কিনা, একটু দেখে নিচ্চি। তুমি বড় ডাক্তার ছিলে, আজ ভাবের জন্যে সারেঙ্গীওয়ালা সেজেচ—

—তা বলতে পারেন—

—আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কিছু মনে কোরো না। মা লক্ষ্মী বর্ত্তমান?

—হুঁ।

—কোথায়?

—দেশের বাড়িতে আছেন।

ঝড়ু একটু চুপ করে থেকে বললে—তাই তো! ও কাজটা যে আমার তেমন ভালো লাগচে না। মা লক্ষ্মীকে যে কষ্ট দেওয়া হচ্চে! ওটা ভেবে ছাখো নি বোধ হয় ভায়া।

নতুন নেশার মাথায় মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—তোমার দোষই বা কি ? আমারও ওইরকম হয়েছিল ভায়া। তবে আমার স্ত্রী নেই, ঘর খালি, হাওয়া বইচে হু হু করে। কাল তোমায় একবার বলেছিলাম যে তুমি স্ত্রীপুত্র ছেড়ে বেড়াচ্চ পান্নার পেছনে, কিন্তু রাত্রে ভাবলাম মা লক্ষ্মী তো নাও থাকতে পারেন ! তাই জিজ্ঞেস করলাম। আমার ব্যাপার শুনবে ? আজ ঝড়ু সোনার ইট দিয়ে বাড়ী গাঁথতো, তোমাকে বললাম যে—

ঝড়ু একটা লম্বা গল্প ফাঁদলে।

জায়গাটার নাম সোনামুখী, সেখানে বড় আসরে ভাব গাইতে গিয়েছিল ঝড়ু। একজন অগ্রদানী বামুনের বাড়ীতে ওর থাকবার বাসা দেওয়া হয়। বাড়ীতে ছিল সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী, দুই মেয়ে আর এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ। এই বধূটির বয়স তখন কুড়ি একুশ, পরমা সুন্দরী —অন্ততঃ ঝড়ুর চোখে। অনেক রাত্রে ভাবের আসর থেকে ফিরে এলে এই মেয়েটিই তার খাবার নিয়ে আসতো বাইরের ঘরে। ঝড়ু তার দিকে ভাল করে চাইতো না। ঝড়ু ভদ্রলোক, অমন অনেক গেরস্ত বাড়ী তাকে বাসা নিয়ে থাকতে হয় কাজের খাতিরে দেশে বিদেশে। গেরস্ত মেয়েরা ভাত বেড়ে দিয়েচে সামনে, কখনো উঁচু চোখে চায় নি।

—সেদিন মেয়েটি ডালের বাটি সামনে ঠেলে দিতে গিয়ে আমার হাতে হাত ঠেকলো। বুঝলে ? আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—আহা ! মেয়েটি বললে—গরম ? আমি বললাম—না, সে কথা বলি নি। হঠাৎ আপনার হাতে হাত লাগলো, সেজন্যে আমি বড় দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। ডাল গরম নয়, ঠিকই আছে।

—মেয়েটি বললে—আপনি চমৎকার ভাব তৈরী করেন—

—আমি বললাম—আপনার ভালো লেগেচে ?

—মেয়েটি পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করতে লাগলো আমার গানের। এমন নাকি সে কোথাও শোনে নি। রোজ সে আসরে গিয়ে আমার মুখের দিকে অপলক চোখে নাকি চেয়ে থাকে। তারপর বললে, সে নিজেও গান বাঁধে। আমি চমকে উঠলাম। একজন কবি আর একজন কবি পেলে মনে করে অন্য সব জন্তু-মানুষের মধ্যে এ আমার সগোত্র। তাকে বড় ভাল লাগে। আমি সেই মুহূর্ত্তে মেয়েটিকে অন্য চোখে দেখলাম। বললাম—কৈ, কি গান ? দেখাবেন আমায় ? সে লজ্জার হাসি হেসে বললে—সে আপনাকে দেখাবার মত নয়।

—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখালে। সে দিন নয়, পরের দিন দুপুরবেলা। বাইরের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করচি, বৌটি এসে বললে—ঘুমিয়েচেন ? সেই গান দেখবেন নাকি ?

—আমি বললাম—আসুন, আসুন। দেখি—

—মেয়েটি একখানা খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

—আমি বসে বসে সব গানগুলো মন দিয়ে পড়লাম। বেশ চমৎকার ভাব আছে কোনো কোনো গানের মধ্যে। আসলে কি জানেন, মেয়েমানুষের লেখা, যা লিখেচে তাই যেন অসাধারণ বলে মনে হতে লাগলো। আমার মনের রঙে রঙীন হয়ে উঠলো ওর লেখা।

—আধঘণ্টা পরে মেয়েটি আবার ফিরে এল।

—আবার বললে—ঘুমুচ্চেন ?

—না ঘুমুই নি। আসুন—

—দেখলেন ?

—হ্যাঁ সব দেখেচি। ভাল লেগেচে। আপনার বেশ ক্ষমতা আছে।

—হ্যাঁ—ছাই !

—কেমন একটা অদ্ভুত টানা টানা মধুর ভঙ্গিমার সুরে 'ছাই' কথাটা ও উচ্চারণ করলে। কি মিষ্টি সুর। আমি ওর মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্যে চাইলাম। চোখোচোখি হয়ে যেতেই চোখ নামিয়ে নিলাম। তখনও আমি ভদ্রলোক। কিন্তু বেশীদিন আর ভদ্রতা রাখতে পারলাম না। সে আমার দুর্ব্বলতা। লম্বা গল্প করবার সময় এখন নেই। এক মাসের মধ্যে তাকে নিয়ে পথে বেরুলাম।

—বলেন কি—

—আর কি বলি।

—তারপর ?

—তারপর আর কি। তাকে নিয়ে চলে গেলাম নবদ্বীপ। পতিততারণ জায়গা। বহু পতিত তরে যাচ্চে। জলের মত পয়সা খরচ হতে লাগলো। তাকে নিয়ে উন্মত্ত, ভাব গাইতে যেতে মনে থাকে না—

—বলুন, বলুন—

আমি নিজের দলের লোক পেয়ে গিয়েছি যেন এতদিন পরে। কি মিষ্টি গল্প। আমার মনের যে অবস্থা, তাতে অন্য গল্প ভাল লাগতো না। লাগতো এই ধরনের গল্প। আমার মন যে স্তরে আছে, তার ওপরের স্তরের কথা যে যতই বলুক, সে জিনিস আমি নেবো কোথা থেকে ? আমার মনের স্তরে ঝড়ু মল্লিক ভাবওয়ালা আমার সতীর্থ।

ঝড়ু আমাকে একটা বিড়ি দিতে এলো। আমি বললাম—আমি খাই নে, ধন্যবাদ।

ও বিস্ময়ের সুরে বললে—তুমি কি রকম হে ডাক্তার ? মদ খাও না, সিগারেট খাও না, তবে এ দলে নেমেচ কেন ? নাঃ, তুমি দেখছি বড় ছেলেমানুষ। বয়েস কত ? চল্লিশ ? আমার উনপঞ্চাশ। এ পথের রস সবে বুঝতে আরম্ভ করেচ। এর পর বুঝতে পারবে। রসের আস্বাদ যে না জানে, সে মানুষ নয়। রসে আবার স্তর আছে হে, এসব ক্রমে বুঝবে। এই রসই আবার বড় রসে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা রাখে—আমি যে ক'বছর তাকে নিয়ে ঘুরেছিলাম, সেই ক'বছর ভাবের পদ আমার মনে আসতো যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। দিন নেই, রাত নেই, সব সময় ভাবের পদ মনে আসচে, গান বাঁধছি সব সময়, আর দুনিয়া কি রঙীন ! সে ক'বছর কি চোখেই দেখতাম দুনিয়াকে। আকাশ এ আকাশ নয়, গাছপালা এ গাছপালা নয়—আউশ চালের ভাত আর ভিজে ভাত খেয়ে মনে হোত যেন শটীর পায়েস—

—আহা, বেশ লাগচে। বলুন তারপর কি হল—

—পরের ব্যাপার খুব সংক্ষেপ। সে দেশ বেড়াতে চাইলে, আমিও দেখালাম। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে পড়েছিল, কথনো কিছু দেখে নি। আমি না দেখালে ওকে দেখাবে কে?

—আপনাকে বেশ ভালবাসতেন তো?

—খুব। সেকি জিনিস আমাদের চোখে ধরা পড়ে যায়। তার ভালবাসা না পেলে কি আর নেশা জমতো রে ভায়া?

—তারপর দেশ বেড়ালেন?

—হ্যাঁ। কালনা গিয়েচি, মধুমতী নদীতে নৌকা চড়ে কালীগঞ্জের বাজারে, বারোয়ারির আসরে গিয়েচি—ওদিকে বসিরহাট, টাকী—হাসানাবাদ—জ্যোৎস্নারাতে টাকীর বাবুদের বাগানবাড়ীতে দু'জনে বেড়িয়েচি। তার মনে কোন দুঃখু রাখি নি। কলকাতায় নিয়ে যাবো, সব ঠিকঠাক—এমন সময় ভায়া, আঁসমালির বাজারে গেলাম গান গাইতে। ওকে নিয়ে গেলাম। সেখানে হাটে বড় বান মাছ কিনলাম এক জোড়া, রাত্রে সেই মাছ খেয়ে দুজনেরই সকালে ভেদবমি। অনেক কষ্টে আমি বেঁচে উঠলাম, সে দুপুরের পরে মারা গেল। সে কখন গিয়েচে, আমি তা জানি না, আমার তখন জ্ঞান নেই। মানে আমার নিজেরই যাবার কথা তা আমার রোগ-বালাই নিয়ে সে চলে গেল—বড্ড ভালবাসতো কিনা?

ঝড়ু ভাবওয়ালার চোখ দুটো চকচক্ করে উঠলো। আমি আর কোন কথা বললাম না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পরে ঝড়ু বোধ হয় একটু সামলে নিয়ে বললে—পান্নাকে দেখে তার কথা মনে পড়লো, অবিকল ওর মত দেখতে—তাই আমি বলি তোমাকে—কিছু মনে কোরো না ভায়া—

—এখন কি একাই আছেন? ক'বছর আগের কথা তিনি মারা গিয়েছেন?

—ন' বছর যাচ্ছে। না, একা নেই। একা থাকতে পারে আমাদের মত লোক? মিথ্যে সাধুগিরি দেখিয়ে আর কি হবে। আছে একজন, তবে তার মত নয়। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। আর ধরো এখন আমাদের বয়েসও তো হয়েচে? এই বয়েসে আর কি আশা করতে পারি?

বেলা প্রায় দশটা। আমি ঝড়ু মল্লিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় এসে দেখি পান্না কুটনো কুটচে, সেখানে দু'টি মেয়ে বসে আছে ওরই বয়সী। আমায় দেখে মেয়ে দু'টি উঠে চলে গেল। পান্না বললে—বোষ্টমের মেয়ে ওরা, এখানেই বাড়ী। আমি কীর্ত্তন গাই কিনা জিজ্ঞেস করছিল।

—কেন, ঘোমটা ছেড়ে ঢপের দল বাঁধবে নাকি?

—তা নয়, মেয়ে দুটোর ইচ্ছে নাচ গান শেখে। তা আমি বলে দিইচি, গেরস্ত বাড়ীর মেয়েদের এখানে যাতায়াত না করাই ভালো। আমরা উচ্ছন্ন গিয়েচি বলে কি সবাই যাবে?

—খুব ভালো করেচ। আচ্ছা, তোমার মনে হয় তুমি উচ্ছন্ন গিয়েচ?

—বোসো এখানে। মাঝে মাঝে গেরস্ত বাড়ীর বৌ-ঝি গঙ্গাস্নান করতে য়েতো, দেখে হিংসে হোত। এখন আমার যেন আর সে রকমটা হয় না!

—না হওয়ার কারণ কী?

পান্না আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হেসে মুখ নিচু করলে। বললে—চা খাবে না? খাও নি তো সকালে। না, সে তোমাকে বলা হবে না। শুনে কি হবে? চা চড়াবো? খাবার আনিয়ে রেখেচি দিই?

—না, আমি ঝড়ু ভাবওয়ালার বাসায় চা খাবার খেয়ে এলাম। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। সেইখানেই এতক্ষণ ছিলাম।

—ওমা, দ্যাখো দিকি? আমি কি করে জানবো, আমি তোমার জন্যে গরম জিলিপি আর কচুরি আনিয়ে বসে আছি। খাও খাও—

—তুমিও খাও নি তো? সে আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি যখন দেখলে এত বেলা হয়ে যাচ্চে, তোমার ভাবা উচিত ছিল আমার চা খাওয়া বাকি নেই। তুমি খাবারও খাও নি, চাও খাও নি নিশ্চয়ই? ছি, নাও চড়াও চা, আমিও খাবো।

ঝড়ু মল্লিক ভাবওয়ালার ওখানে সন্ধ্যায় আমার নিমন্ত্রণ। পান্নাকেও নিয়ে যেতে বলেছিল।

পান্নাকে বললাম সে কথা, কিন্তু ও যেতে চাইলে না। বললে—মেয়েমানুষের যেখানে সেখানে যেতে নেই পুরুষের সঙ্গে। তুমি যাও—

হেসে বললাম—এত আবার শিখলে কোথায় পান্না?

—কেন, আমি কি মেয়েমানুষ নই?

—নিশ্চয়ই।

—আমাদের এ সব শিখতে হয় না। এমনি বুঝি।

—বেশ ভাল কথা। যেও না।

—খাবার আমার জন্যে আনবে?

—যদি দেয়।

পান্না হাসতে লাগলো। তখন ও চা ও খাবার খাচ্চে। হাসতে হাসতে বললে—বললাম বলে যেন তুমি সত্যি সত্যি আবার তাদের কাছে খাবার চেয়ে বোসো না—

ঝড়ু মল্লিক বসে আছে ফরাস বিছানো তক্তপোশে। লোকটা শৌখিন মেজাজের। আমায় দেখে বললে—এসো, ভায়া, বোসো। একটা কথা কাল ভাবছিলাম। আমার ভাবের দলে তোমরা দু'জনেই কেন এসো না। বেশ হয় তা হোলে। আমি ভাবের গান লিখবো, তোমার উনি গাইবেন। পছন্দ হয়? আধাআধি বখরা।

—কিসের আধাআধি?

—বায়নার। যা যেখানে পাবো, তার আধাআধি।

—আমি এর কিছুই জানি নে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

—পয়সার জন্যে বলচি নে ভায়া। তোমাদের বড় ভালো লেগেচে—ওই যে বললাম—ভাব। ওই ভাবেই মরেছি। নয়তো বলছিলাম না সেদিন, ঝড়ু মল্লিক সোনার ইট দিয়ে বাড়ী করতে পারতো। পয়সার লালসা আমার নেই।

খাবার অনেক রকম যোগাড় করেছে ঝড়ু। দু'জনের উপযুক্ত খাবার। পান্না কেন এলো না এজন্যে বার বার দুঃখ করতে লাগলো খেতে বসে। ও নাকি আমাদের প্রণয়ের ব্যাপার নিয়ে ভাব গান বাঁধবে, আসরে আসরে গাইবে। বললে—ভাই, লজ্জা মান ভয় তিন থাকতে নয়। নেমে পড় ভায়া, আসরে নামতে দোষ কি?

ঝড়ু মল্লিক অসম্ভব রকমের কম খায় দেখলাম। ওর পাশে খেতে বসলে রীতিমত অপ্রতিভ হতে হয়। খাওয়ার আয়োজন করেছিল প্রচুর, দু তিন রকমের মাছ, মাংস, ঘি-ভাত, ডিমের ডালনা, দই, সন্দেশ। ঝড়ু কিন্তু খেল দু'এক হাতা ভাত ও দু টুকরো মাছ ভাজা, একটু দই ও একটা সন্দেশ। সে যা খেলে তা একজন শিশুর খোরাক। আমি বললাম—এত কম খান কেন আপনি?

—আমি গান বাঁধি, বেশী খেলে মন থবু-থবু অলস হয়ে পড়ে। কম খেলে থাকি ভালো। মাছ মাংস আমি কম খাই, তুমি আজ খাবে বলে মাছ মাংস রান্না হয়েচে, নয়তো আমি নিরামিষ খাই।

—মদ খান তো এদিকে।

—ওটা কি জানো ভায়া, না খেলে গান বাঁধবার নেশা জমে না। ছাড়তে পারি কই?

—আমার ইচ্ছে করে আপনার মত দেশ-বিদেশে গান গেয়ে বেড়াই! তবে না পারি বাঁধতে গান, না আছে গানের গলা।

—এর মত জিনিস আর কিছু নেই রে ভায়া। অনেক কিছু করে দেখলাম—কিন্তু সব চেয়ে বড় আনন্দ পেলাম এই আসরে গান গেয়ে বেড়িয়ে। পয়সাকে পয়সা, মানকে মান। সেই জন্যই তো বললাম—এসো আমার সঙ্গে।

—আমি তো জানেন ডাক্তার মানুষ। আপনাদের মত কবি নই। কোনো ক্ষমতা তো নেই ওদিকে। আমাকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে বিপদে পড়ে যাবেন। তার চেয়ে আমার ডাক্তারির একটা সুবিধে করে দিন না?

—সে জায়গা আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু তোমার ওঁকে নিয়ে কি করবে? ছোট্ট সমাজে ঘোঁট পাকাবে, তখন দেশ ছাড়তে হবে। বড় শহরে গিয়ে বোসো।

—হাতে পয়সা নেই। ডিস্পেনসারি করতে হলে এক গাদা টাকা দরকার।

—টাকা আমি যদি দিই? না থাক, এখন কোনো কথা বলো না। ভেবে চিন্তে জবাব দেবে। ওই যে ভাবেই মরেচে ঝড়ু মল্লিক, নইলে সোনার ইট দিয়ে—

পান্না দেখি খেতে বসেচে। রান্না করেচে নিজেই। একটা বাটিতে শুধু ডাল আর কিছুই খাবার নেই। আমি এত রকম ভালমন্দ খেয়ে এলাম, আর ও শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবে?

—শুধু ডাল দিয়ে খাচ্চো কেন পান্না ?

—না, আর কাঁকরোল ভাতে।

—মাছ মাংস পেলে না ?

—তুমি খাবে না, কে ওসব হাঙ্গামা করে। মেয়েমানুষের খাবার লোভ করতে নেই, জানো ?

—লোভের কথা হচ্চে না। মানুষকে খেতে তো হবে, খাটচো এতো—না খেলে শরীর টিকবে ?

পান্না হেসে বললে—তোমাকে আর অত টিকটিক করতে হবে না খাওয়া নিয়ে। পুরুষ মানুষের অন্য কাজ আছে, তাই দেখো গে।

—ঝড়ু ভাবওয়ালা কি বলছিল জানো। বলছিল, আমার সঙ্গে এসে যোগ দাও। চলো একটা দল বেঁধে গান গেয়ে বেড়াই।

—আমিও যাবো ?

—তুমি না হলে তো চলবেই না। তোমাকে নাচতে হবে, ঝড়ুর গান গাইতে হবে। যাবে ?

—না। কি দরকার ? আমি একা কি কম পয়সা রোজগার করতে পারি ? নাচের দলে যোগ দিয়ে পরের অধীন হয়ে থাকার কি গরজ ?

—ঝড়ু বলছিল—ও টাকা দেবে আমার ডিস্‌পেনসারি খুলতে।

—ওতেও যেও না। পরের অধীন হয়ে থাকা।

—তবে কি করে চলবে ?

—তুমি নির্ভাবনায় বসে খাও। আমি থাকতে তোমার ভাতের অভাব হতে দেবো না। তুমি যদি চুপ করেও বসে থাকো তাহলে আমি চালিয়ে যাবো। আমার আয় কত জানো ?

—কত ?

—যদি ঠিক-মত বায়না হয়, খাটি, তবে মাসে নব্বুই টাকা থেকে একশো টাকা। তোমার ভাবনা কি ? তোমার বাবুগিরির জুতো আমি কিনে দেবো, কাঁচি ধুতি আমি কিনে দেবো—

কাঁকরোল ভাতে দিয়ে ভাত খেতে খেতে পান্না ওর আয় আর ঐশ্বর্য্যের কথা যে ভাবে বর্ণনা করলে তা আমার খুব ভালো লাগলো। ওর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই দেখচি। কাকে আয় বলে—ও কিছু জানে না। একটা অপারেশন কেসে আমি আশি টাকা রোজগার করেছি একটিমাত্র বিকেল বেলাতে। পান্না আমায় ওর আয় দেখাতে আসে। আমার হাসি পায়। আসলে বয়েস ওর কম বলেও বটে আর সামান্যভাবেই ওদের জীবন কেটে এসেচে বলেও বটে, বেশী রোজগার কাকে বলে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই ওর। এর আগেও তা আমি লক্ষ্য করেছি। পান্না হাসতে হাসতে বলেচে—বাবুর এক জোড়া ভালো

জুতো চাই বুঝি? চলো এবার কলকাতায় গিয়ে জুতো কিনে দেবো। কাল সতের টাকা প্যালা পেয়েছি আসরে, জানো? ভাবনা কি আমাদের? হি-হি—

ও দেখচি খাঁটি আর্টিস্ট্ মানুষ। ঝড়ু ভাবওয়ালা আর ও একই শ্রেণীর। পান্নাকে এবার যেন ভাল করে বুঝলাম। পান্না সেই ধরণের মেয়ে, যে ভাবের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। সংসারের ধার ধারে না, বেশী খোঁজ-খবরও না। যা আসে, তাতেই মহা খুশী। ঝড়ু মল্লিকের মত পুরুষ আর ওর মত মেয়েকে সাধারণ লোকের পর্য্যায়ে ফেলাই চলে না। আমার তো ওদের মত ভাব নিয়ে থাকলে চলবে না, আমি খাঁটি বাস্তববাদী। পান্না যা-ই বলুক, আমাকে ওর কথায় কান দিলে চলবে না।

কেশবডাঙ্গার বারোয়ারির আসরে পান্নার নাচ আরও দু'দিন হোল। ওর নাম রটে গেল চারি ধারে। সবাই ওর নাচ দেখতে চায়। আমায় বারোয়ারি কমিটির লোকেরা ডাক দিলে। একজন ব্যবসাদারের গদিতে ওদের মিটিং বসেচে। আমায় ওরা বললে—ও ঠাকুর মশাই, আপনাদের কর্ত্রীকে বলুন আরও দু'দিন এখানে ওঁর নাচ হবে—একটু কম করে নিতে হবে। সবাই ধরেচে তাই আমাদের নাচ বেশী দিতে হচ্চে। বারোয়ারি ফণ্ডে টাকা নেই।

—কত বলুন?

—ত্রিশ টাকা দু'দিনে।

—আচ্ছা, জিজ্ঞেস করে আসি।

—আপনি যদি করে দিতে পারেন, আপনি দু'টাকা পাবেন।

—আচ্ছা।

হায়রে! আমার হাসি পেল। দু' টাকা। আমার কম্পাউণ্ডার ঘা ধুতে দু'টাকা ফি চার্জ করতো। পান্নাকে আর কি বলবো, আমি যা করবো তাই হবে। কিন্তু এদের সামনে জানানো উচিত নয় সেটা। আমাকে ওরা দলের রসুইয়ে-বামুন বলে জানে, তাই ভালো।

একজন বললে—তা হোলে আপনি চট করে জিজ্ঞেস করে আসুন।

আমি বাইরে আসতেই একজন লোক বললে—একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনাদের কর্ত্রীকে যদি আমরা দু'তিন জনে আমাদের বাগানবাড়ীতে নেমন্তন্ন করি, উনি যাবেন?

—বাগানবাড়ী আছে নাকি আবার এখানে?

—এখানে নয়। এখান থেকে নৌকো করে যেতে হয় এক ভাঁটির পথ—খোড়গাছির সাঁতরা বাবুদের কাছারি বাড়ী। সেখানকার নায়েব মুরলীধর পাকড়াশী কাল আসরে ছিলেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন। উনি কি নেন?

—তা আমাকে এ কথা বলচেন কেন? আমি তো রসুইয়ে বামুন। উনি কি নেবেন না নেবেন সে কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করলেই ভাল হয়।

—আপনি যা বললেন ঠিকই, তবে কি জানেন আমাদের সাহস হয় না। কলকাতার

মেয়েছেলে, আমরা হচ্ছি পাড়াগাঁয়ের লোক, কথা বলতেই সাহসে কুলোয় না। আপনি যদি করে দিতে পারেন, পাঁচ টাকা পাবেন। নায়েববাবু বলে দিয়েচেন।

—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি এসে বলচি।

পান্নাকে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। পান্না হেসেই খুন। বললে—চলো বাপু, এখান থেকে আমরা চলে যাই। আমায় বুঝি নীলি পেয়েছে এরা? আর তোমায় বলি, তোমার রাগ হয় না এ সব কথা শুনে? তুমি কি রকম লোক বাপু? বারোয়ারিতে নাচের বায়না, দু'দিন বেশী হয় হোক, কিন্তু এ সব কি কথা? ছিঃ—

—নাচের বায়না ত্রিশ টাকাতেই রাজি তো?

—সে তুমি যা হয় করবে। আমি কি বুঝি?

—চল্লিশ বলবো?

—বেশী দেয় ভালো।

আমি ফিরে দেখি সাঁতরাবাবুদের নায়েবমশায়ের চর সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েচে। তাকে বললাম—হোল না মশাই।

—কেন, কেন? কি হোল?

—উনি কারো বাগানবাড়ীতে যান না। ভালো ঘরের মেয়ে।

—তাই নাকি?

—মশাই আমি সব জানি! ওঁর স্বামী আছেন, একজন বড় ডাক্তার। নাচ টাচ উনি শখ করে করেন। সে ধরনের মেয়ে নন।

লোকটা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আমার কথা বিশ্বাস করলে কিনা জানি নে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে চলে গেল। বারোয়ারির কমিটির লোকেরা বললে—কি হোল?

—হোল না মশাই।

—কেন? কি হোল বলুন না?

—চল্লিশ টাকার কমে কর্ত্রী রাজী হবেন না।

—তাই দেবো, তবে আপনার টাকা পাবেন না। ত্রিশ টাকায় রাজি করালে আপনাকে কিছু দিলেও গায়ে লাগতো না আমাদের।

—না দেন, না দেবেন! আমি চেষ্টা করে করিয়ে তো দিলাম।

কে একজন ওদের মধ্যে বললে—দাও, ঠাকুর মশাইকে কিছু দিয়ে দাও হে—বেচারি আমাদের জন্যে খেটেচে তো—

ওরা আমাকে একটা আধুলি দিলে। পান্নাকে এনে দেখিয়ে বললাম—আমার রোজগার। তোমার জন্যে পেলাম।

পান্না খুশী হয়ে বললে—আমি আরও তোমার রোজগারের পথ করিয়ে দেবো দেখো—

হায় পান্না! এত সরলা বলেই তোমায় আমি ছাড়তে পারি নে।

বললাম—সত্যি ?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু হ্যাগো একটা কথা বলি—তুমি নিজে রোজগারের কথা ভাবো কেন ? ও কথা তোলো কেন ? তুমি বার বার ওই কথা আজ ক'দিন ধ'রে বলচো কেন ? তুমি কি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও ?

ওর গলার সুরে আবেগ ও উৎকণ্ঠার সুস্পষ্ট প্রকাশ আমাকে অবাক করে দিলে। পান্না শুধু সুন্দরী নারী নয়, অদ্ভুত ধরণের রহস্যময়ী, দয়াময়ী, প্রেমময়ী। নারীর মধ্যে এমন আমি ক'টিই বা দেখেচি। আমি হেসে চুপ করে রইলাম।

ও আবার বললে—হ্যাঁ গো, চুপ করে রইলে কেন ? বল না গো—

—আমি তো বলি নি।

—তবে ও রকম কথা বলচো কেন আজ ক'দিন থেকে ?

পান্না কুমড়ো কুটচে দা দিয়ে। যেখানে যা লোকে দেয়, এখানে কেউ বঁটি দেয় নি ওকে। আমি সেদিকে চাইতেই ও হেসে ফেললে।

বললে—কি করি বলো—

—বাসার বঁটিখানা সঙ্গে করে আনলে না কেন ?

—হ্যাঁ, একটা ঘর-সংসার আনি সঙ্গে। ফাঁকি দিলে চলবে না বলো, আমি কি তোমাকে কষ্টে রেখেছি ? সুখে রাখতে পারচি নে ? হ্যাঁ গা, সত্যি করে বলো। আমি আরও পয়সা রোজগারের চেষ্টা করবো।

—তুমি তা ভাবো কেন পান্না ? আমিও তো এ ভাবতে পারি আমার রোজগারে তোমাকে সুখী রাখবো ?

—কেন তা তুমি করতে যাবে ? আমি কি সাতপাকের বৌ তোমার ?

—তার মানে ?

—সেখানে তোমাকে সংসার ঘাড়ে নিতেই হবে। এখানে তা নয়। এখানে আমি করবো। তুমি ও সব নিয়ে মাথা ঘামিও না লক্ষ্মীটি। বোলো যখন যা দরকার, আমি চেষ্টা করবো যুগিয়ে দিতে। আমার মাসিক আয় কত বলো দিকি ? আশি নব্বুই কি এক শো টাকা। দু'টো প্রাণীর রাজার হালে চলে যাবে। নীলি কত পায় জানো ? আমার সঙ্গে তো খাটতো। আমার আদ্ধেক রোজগার ওর। মুজরোর বায়নার আদ্ধেক, আসরের প্যালা যে যা পাবে, ওর ভাগ নেই। আমার প্যালা বেশী, ও বিশেষ পেতো না। কিন্তু কলকাতা শহরে ওরা দুই বোন বুড়ো মা—চালাচ্চে তো এক রকম ভালোই। আমাকে বলে, তোমার এত রোজগার তুমি গহনা করলে না দু'খানা। আমি বলি আমার গহনাতে লোভ নেই, তোরা করগে যা। নাচটা আরো ভালো করে শেখবার ইচ্ছে। ভাল পশ্চিমে বাইজীর কাছে সাকরেদী করতে ইচ্ছে হয়। গহনা-টহনার খেয়াল নেই আমার। তুমি ভেবো না, তোমাকে সুখে রেখে দেবো।

ওকে নিয়ে কলকাতা আসবার দিনটা নৌকোতে ও ট্রেনে ওর কি আমোদ। ছেলে-মানুষের মত খুশী। বললে—এবার ক্যাশ ভাঙো। খুব মান রেখেছে কি বল?

—তা তো বটে।

—মোট কত টাকা হয়েচে বলো তো।

—সাতষট্টি টাকা স'দশ আনা।

—আর প্যালা?

—সে তুমি জানো।

—একুশ টাকা।

আমার একটু দুষ্টুমি করবার লোভ হোল।

বললাম—সাঁতরা বাবুদের নায়েবের কথা শুনলে আরও অনেক বেশি হোত—

পান্না শুনে মারমুখী হয়ে বললে—ঠিক মাথা কুটবো তোমার পায়ে, অমন কথা যদি বলবে। আমি তেমন নই। ও সং করুক গে নীলি। ছিঃ—

রাণাঘাটে গাড়ী বদলানোর সময় বললে—একটা ফর্দ্দ করো—কলকাতার বাসায় জিনিস-পত্র কিনতে হবে—

—কি জিনিস?

—কি জিনিস আছে? মাদুরের ওপর তো শুয়ে থাকা—

—আর?

—চায়ের ভালো বাসন তুমি কিনে আনবে ভালো দেখে। ফাটা পেয়ালায় চা খেয়ে তোমার অরুচি হয়ে গেল। আর একজোড়া জুতো নেবে না?

ওকে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম—নেবো না? ভালো দেখে একজোড়া নেবো কিন্তু—

—হি-হি—জুতোর নাম শুনে অমনি লোভ হয়েছে। পুরুষ মানুষের ব্যাপার আমি সব জানি।

—কি জানো?

—জুতোর ওপর বড্ড লোভ—

—নাকি?

—আমি যেন জানি নে আর কি?

কলকাতায় পৌছে তিনচার দিনের মধ্যে যতদূর সম্ভব জিনিসপত্র কেনা-কাটা করা গেল। একজোড়া জুতো কেনবার সময় ও আমার সঙ্গে যেতে চাইলে। আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম না। ওর কষ্টার্জ্জিত টাকায় দামী জুতো কিনতে চাই নে। কিন্তু ও সঙ্গে থাকলে তাই ঠিক কেনাবে। সস্তা দামের একজোড়া খোলা জুতো নিয়ে এসে বললাম—চমৎকার জুতো—এগারো টাকা দাম, তবে আমার এক জানাশুনো লোকের দোকান—

—কত নিলে?

—এই ধরো পাঁচ টাকা—

—মোটে ?

—জুতো জোড়া ত্যাখো না, কি জিনিস। আমার জানা শুনো লোক তাই দিয়েছে।

উল্টো ধরনের কথা বললাম। এরকম কথা বলা উচিত তখন, যখন ব্যয়-বাহুল্য নিয়ে কর্ত্রী অনুযোগ করেচেন। পান্না বলে—পছন্দ হয়েচে ? পরো তো একবার।

—এখন থাক।

—আমি দেখি, পায় দাও না ? পাম্প শু একজোড়া কিনলে না কেন ?

—ও আমি পছন্দ করি না।

—তোমায় মানাতো ভালো।

—এর পরে কিনে দিও— এখন থাক—

—তোমায় সিল্কের জামা কিনে দেব একটা।

—বাঃ চমৎকার। কবে দেবে ?

আমার যে খুব আগ্রহ হচ্ছে, এটা দেখানোই ঠিক। নয় তো ও মনে কষ্ট পাবে।

পান্না হেসে বললে—বড্ড লোভ হচ্ছে, নয় ? আমি জানি, জানি—

—কি জানো ?

—তোমরা কি চাও, আমি সব জানি—

—নিশ্চয়। দিও কিনে ঠিক কিন্তু—

বাড়ীতে তোরঙ্গ বোঝাই আমার কাপড় চোপড়ের কথা মনে পড়লো। সুরবালার যা কাপড় চোপড় আছে, পান্নার তার সিকিও নেই। আমার পয়সা নেই আজ, নাহলে পান্নাকে মনের মতন সাজাতাম। ও বেচারির কিছুই নেই। আসরে মুজরো করবার কাপড় খান-তিনেক আছে। আর আছে কতকগুলো গিল্‌টি সোনার গহনা। ওর মায়ের দেওয়া এক খানা বেনারসী শাড়ী আছে ওর বাক্সে, কিন্তু সেখানা কখনো পরতে দেখিনি।

মাস তিন চার কেটে গেল।

একদিন বাজার করে বাসায় ফিরে দেখি গুরুতর কাণ্ড। দু তিনটি পুলিশের লোক বাড়ীতে। পান্না দেখি ঘরের এক কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপার কি ? পুলিসের লোকরাই বললে। আমায় এখুনি থানায় যেতে হবে। পান্না নাবালিকা, আমি ওকে ওর মায়ের কাছ থেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

পান্নার মা থানায় জানিয়েছিল। এতদিন ধরে পুলিশে খুঁজে নাকি বের করেছে।

এ আবার কি হাঙ্গামায় পড়া গেল।

পান্না বললে, সে নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছে। কোনো কথা টিকলো না। পুলিশে বললে, যদি পান্না সহজে তাদের সঙ্গে ওর মায়ের কাছে ফিরে যেতে রাজি হয়, তবে আমাকে ওরা রেহাই দেবে। ওরা আমাকেই কথাটা বলতে বললে পান্নাকে।

পান্না কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

আমি গিয়ে বললাম—পান্না শুনচো সব? কি করবে বলো, ফিরে যাও লক্ষ্মীটি—

পান্না আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। কথা বললে না।

আবার বললাম—পুলিশের লোক বেশী সময় দিতে চাইচে না। জবাব দাও। আমার কথা শোনো বাড়ী যাও—

—কেন যাবো?

—নইলে ওরা ছাড়বে না। তুমি নাবালিকা। আমার সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় আসতে পারো না ওরা বলছে।

—তাহ'লে ওরা তোমাকে কিছু বলবে না?

—আমায় বলুক, তার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। তোমাকে হায়রানি না করে।

—আমি যাবো, ওদের বলো।

পান্নার মুখ থেকে একথা যেমন বেরুলো, আমি যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, সত্যি বলচি। এ আমি কখনো আশা করি নি। কেন ও যেতে চাইলো এত সহজে? আমি কখনো ভাবি নি ও একথা বলবে।

আমার গলা থেকে কি যেন একটা নেমে বুক পর্যন্ত খালি হয়ে গেল। ভয়ানক হতাশায় এমনতর দৈহিক অনুভূতি হয় আমি জানি।

আমি ওর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বললাম—বেশ, বেশ তাই বলি—

—কোথায় নিয়ে যাবে ওরা?

—তোমার মায়ের কাছে।

পুলিশের লোকেরা আমার কথা শুনে গাড়ী ডাকলো, ওর জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলে দিলাম, কি-ই বা ছিল! গোটা দুই তোরঙ্গ। নতুন কেনা চায়ের বাসন ওর জিনিসের সঙ্গেই গাড়ীতে তুলে দিলাম। বড় আশা করেছিলাম যাবার সময় যখন আসবে ও কখনো যেতে চাইবে না ভীষণ কাঁদবে।

পান্না নিঃশব্দে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

একবার কেবল আমার দিকে একটু একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখে নিলো। তারপর তাড়াতাড়ি খুব হালকা সুরে বললে—চলি।

যেন কিছুই না। পাশের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে, সন্ধ্যের সময় ফিরে আসবে।

চলে গেল পান্না। সত্যিই চলে গেল।

একটা পুলিশের লোক আমায় বললে—মশায়, কি করেন!

রাগের সুরে বললাম—কেন?

—না, তাই বলচি। বলচি, মশায়, এবার পেত্নী ঘাড় থেকে নামলো; বুঝে চলুন। আমরা পুলিশের লোক মশায়। কত রকম দেখলাম, তবু যে যাবার সময় মায়াকান্না কাঁদলো না, এই বাহবা দিচ্ছি। কতদিন ছিল আপনার কাছে?

—সে খোঁজে আপনার কি দরকার?

বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালাম অন্য দিকে। পুলিশের লোকজন চলে গেল।

আমি কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম সামনের জানলাটার দিকে তাকিয়ে।

আমার ভেতরে যেন কিছু নেই, আমি নিজেই নেই।

উঃ, পান্না সত্যি চলে গেল? স্বেচ্ছায় চলে গেল?

যাকগে। প্রলয় মন্থন করে আমি জয়লাভ করবো। ঘর ভাঙুক, দীপ নিবুক, ঘট গড়াগড়ি যাক। ও সব মেয়ের ওই চরিত্র। কি বোকামি করেছি আমি এতদিন।

সামনের দোকান থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে এলুম। চা করতে পারতাম, সবই আছে, কিন্তু পেয়ালা পিরিচ নেই, সেগুলো তুলে দিইচি পান্নার গাড়ীতে। ওরই জন্যে শখ করে কেনা, ওকেই দিলুম। পুরুষ মানুষের প্রেম অত ঠুন্‌কো নয়, ত'ার শক্ত দৃঢ় ভিত্তি আছে। মরুক গে। ও ভাবনাতেই আমার দরকার কি?

যাবার সময় একবার বলে গেল না, বেলা হয়েছে, বাজার করে আনলে ভাত খেও। অথচ—

যাক্—ও চিন্তা চুলোয়।

হোটেল থেকে ভাত খেয়ে এলাম। বাজার থেকে বেছে বেছে মাগুর মাছ কিনে নিয়ে এসেছিলাম দু'জনে খাবো বলে। সেগুলো মরে কাঠ হয়ে গেল। তারপর দেখি বেড়ালে খাচ্চে।

পাশের বাড়ীর শশিপদ সেকরা আমায় ডেকে বললে—ঠাকুর মশায়, তামাক খাবেন?

নাঃ।

—বলি, বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল কেন? .

—তোমার দেখচি কৌতুহল বেশী।

—রাগ করবেন না ঠাকুর মশাই। আমিও ভালো লোকের ছেলে। অনেক কিছু বুঝি। বলুন না আমারে।

—ও চলে গেল।

—মা ঠাকরুন?

তারপর শশিপদ সেকরা একটু নিচুস্বরে বললে—সেজন্য মন খারাপ করবেন না আপনি। ওসব অমনি হয়।

—কি হয়?

—ওই রকম ছেড়ে চলে যায়। ও সব মায়াবিনী।

—তুমি এর কি জানো?

—আমি অনেক কিছু জানি। মানুষ ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে। কিন্তু আমি মশায় ঠেকে শিখেছিলাম। সে গল্প একদিন করবো।···খাওয়া দাওয়া কি করলেন? হোটেলে? আহা বড্ড কষ্ট গেল। আমায় যদি আগে বলতেন! এখন কি করবেন?

—কি করি ভাবচি।

—উনি কি আবার আসবেন বলে মনে হয় ?

—জানি নে।

—র*াধতে পারেন ?

—না।

—তা হোলে তো মুশকিল। আমার বাড়ী যে খাবেন না, তাহ'লে আমিই তো ব্যবস্থা করতাম। আমার বাড়ীও যশোর জেলায়। দেশের লোক আপনার।

—বেশ বেশ।

সারাদিন পথে ঘুরে ঘুরে কাটলো এক রকম। রাত্রে অনেক দেরি করে বাসায় এলুম। কালও বেড়িয়ে ফিরে এলে পান্না বলেছিল,—একদিন চলো আমরা খড়দ যাবো। মায়ের সঙ্গে একবার ফুলদোল দেখতে গিয়েছিলাম জানলে ? বড্ড ভাল লেগেছিল। যাবে একদিন ?

আমি বলেছিলাম, চল, সামনের শনিবার।

ও হেসে বলেছিল—আমাদের আবার শনিবার আর রবিবার। তুমি কি আপিসে চাকরি করো!

কিছু না, শশিপদ সেকরা ঠিক বলেচে ? ওরা মায়াবিনী। রাত্রে ঘুমুতে গেলে ঘুম হয় না। হঠাৎ দেখি যে আমি কাঁদচি। সত্যিই কাঁদচি। জীবনের সব কিছু যেন চলে গিয়েছে। আর কোনো আমার ভরসা নেই। কোনো অবলম্বন পর্য্যন্ত নেই জীবনের। পান্না এত নিষ্ঠুর হতে পারলে ? চলেই গেলে! আচ্ছা, ও কি আমার ওপর রাগ করে, অভিমান করে চলে গেল ?

আমি ঘুম ছেড়ে উঠে ভাবতে বসলাম। যদি কেউ আমাকে ওর মনের খবর এনে দিতে পারতো, যদি বলে দিতে পারতো ও অভিমান করে গিয়েছে, আমি তাকে অন্তর থেকে আশীর্ব্বাদ করতাম। আমি নিঃস্ব, দেওয়ার কিছুই নেই আমার আজ—নইলে অনেক টাকা দিতাম ওই সংবাদ-বাহককে।

কিন্তু খবর কেউ না-ই বা দিল ?

আমি ভেবে দেখলে বুঝতে পারবো নিশ্চয়।

আবার কখন শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি ভাবতে ভাবতে।

স্বপ্ন দেখেছি পান্না এসে বলছে—এত বেলা পর্যন্ত ঘুম, ওঠো চা করচি, খাও। বা রে—

ধড়মড় করে ঠেলে উঠলাম। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন ফেললাম; ঘুমঘোর জড়িত মন যেন আনন্দে নেচে উঠলো তাহ'লে কিছুই হয় নি, পান্না যায় নি কোথাও। মিথ্যা স্বপ্ন ওর যাওয়াটা।

মূঢ়ের মত শূন্য গৃহের চারিদিকে চাইলাম। কপোতী নীড় ছেড়ে পালিয়েছে। কেউ নেই।

ঘুমিয়ে বেশ ছিলাম। ঘুম ভাঙলেই যেন পাষাণ ভার চাপলো বুকে। সারাদিন এ পাষাণের বোঝা বুক থেকে কেউ নামাতে পারবে না।

এই রকম বিভ্রান্তের মত যে ক'টা দিন কাটলো তার হিসেব রাখিনি।

দিন আসে যায়, রাত্রে ঘুমুই, আর কিছু মনে থাকে না।

একা ঘরে শুয়ে কান্না আসে। বুক-ভাঙা কান্না।

দিনমানে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়ে ভুলে থাকি। কিন্তু রাত্রে একেবারে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় শূন্য ঘরে।

আশ্চর্য্যের কথা একটা। পান্না টাকাকড়ি একটাও নিয়ে যায় নি। আমার বালিসের তলায় রেখে দিয়েছে। বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ভুলে গিয়েচে।

এই খবর পাবা জন্যে মরে যাচ্চি। কে দেবে এ সংবাদ?

এ কদিন বসে বসে ভাবলুম। কি আশ্চর্য্য আমার মনের এই তীব্র, তীক্ষ্ণ, উগ্র, অতি ব্যগ্র মনোভাব! এমন মন আমার মধ্যে ছিল তা কখনো আমি জানতে পারি নি। এ মন কোথায় এতদিন ঘুমিয়ে ছিল আমারই মধ্যে, সুরবালা এ ঘুম ভাঙাতে পারে নি—ভাঙিয়েচে পান্নার সোনার কাঠি।

এ মন আমাকে একদণ্ড সুস্থির থাকতে দেয় না। সর্ব্বদা পান্নার কথা ভাবায়। সব সময়, প্রতিটি মুহূর্ত্তে। যে যাকে ভালবাসে, সে তার কথা ছাড়া ভাবতে পারে না। ভাববার সামর্থ্য তার থাকে না। আগে বুঝতাম না এ সব কথা। এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, মন নিয়ে এ কারবার তখন আমার ছিল না। দিন রাত, চন্দ্র সূর্য, সকাল বিকেল, ইহকাল-পরকাল ভাল-মন্দ—সব গিয়ে সেই এক বিন্দুতে মিশচে—পান্না। যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁদের নাকি এমন দশা হয় শুনেচি। ঈশ্বরের বিষয় ছাড়া ভাবতে পারেন না, ঈশ্বরের কথা ছাড়া কইতে পারেন না। ঈশ্বরের বিরহে চৈতন্যদেব নাকি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে যেতেন। বিরহের এ অনুভূতি ভগবান যাকে আস্বাদ করান, সে ভিন্ন করতে পারে না। বিশেষ অবস্থায় পড়তে হয়। সুরবালা বাপের বাড়ী গেলে সে বিরহদশা আসে না। একেবারে হারিয়েচি, এই ভাব আসা চাই। সুরবালা তো কত বার বাপের বাড়ী গিয়েছে, এ দশা কি হয়েচে আমার জীবনে কখনো? তাই বলছিলাম, এখন বুঝছি ঈশ্বরভক্তদের যে তীব্র প্রেমের কথা শুনেচি বা পড়েচি—তা কবি-কল্পনা বা অতিরঞ্জিত নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমার চেয়ে হয় তো আরো বেশি সত্য।

মনের ব্যাপারই। মনের ঠিক অবস্থায় না পড়লে কিছুতেই অন্যের মনের সেই অবস্থা সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা যায় না। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝচি যা, আগে এই সব কথা বললে বিশ্বাস করতাম না। বিশ্বাস হত না। এসব জিনিস অনুমানের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যাপার। আগে থেকে বললে কে বিশ্বাস করবে? পোড় খাওয়া না হোলে পোড়ার জ্বালা কে ধারণা করবে? সাধ্য কি?

ঠিক এই সময় বৌবাজার দিয়ে শেয়ালদ'এর দিকে যাচ্ছি একদিন, উদ্দেশ্য বৈঠকখানার মোড় থেকে এক মালা নারকোল কেনা, হঠাৎ রাস্তার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালাম! সনাতনদা যাচ্ছে ফুটপাতের কোল ঘেঁষে লালবাজার মুখে। সনাতনদাও আমাকে দেখতে পেয়েচে। নইলে আমি পাশ কাটাতুম। আমার পরনে ময়লা জামা, ধুতিও মলিন। পায়ে পান্নার টাকায় কেনা সেই পাঁচটাকা দামের খেলো জুতো জোড়া।

সনাতনদা এগিয়ে এল আমার দিকে। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে এল। যেন বিশ্বাস করতে পারচে না যে আমি।

বলি—কি সনাতনদা যে!

ও বিস্ময়ের স্বরে বললে—তুমি!

—হ্যাঁ। ভালো আছো?

সনাতনদা একবার আমার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিলে। কি দেখলে জানি নে, আমার হাসি পেল।—কি দেখচ সনাতনদা?...ও যেন অবাক-মত হয়ে গিয়েচে।

সনাতনদা এসে আমার হাত ধরলে। আর একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—এসো, চলো কোথাও গিয়ে বসি, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। চলো একটু ফাঁকা জায়গায়।

বললাম—সুরবালা ভালো আছে? ছেলেপিলেরা?

—চলো। বলচি সব কথা। একটা চায়ের দোকানে নিরিবিলি বসা যাক্—

—চায়ের দোকানে নয়, নেবুতলার ছোট্ট পার্কটায় চলো—

তৃণাঙ্কুর

বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে, আমার এই দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতি-বিম্বিত হইয়াছে মাত্র। কখনো অন্ধকারে, কখনো জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে, কখনো সুখে, কখনও দুঃখে, গহন পর্বতারণ্যে বা জনকোলাহলমুখর নগরীতে, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গ—তার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল—এই সব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেইজন্য বহুস্থলে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়াছে যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। লিপিকৌশলের ইচ্ছাও ইহাদের মূলে ছিল না—হয়তো দ্রুত ধাবমান রেলের গাড়িতে, কিংবা পথচারী পথিকের স্বল্প অবসরে, পথিপার্শ্বের কোনো বৃক্ষতলে বা শিলাসনে যে সব রচনার উদ্ভব—লেখকমনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ সেখানে কোথায়? যে অবস্থায় যেটি ছিল, অপরিবর্তিত ভাবেই সেগুলি ছাপা হইয়াছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে। যে সব অবস্থার মধ্যে কখনো পড়িব না, ক্ষণকালের জন্য তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া যাই এগুলি পড়িতে পড়িতে,—ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বাণীমূর্তি দেওয়ার ইহার একটি বড় সার্থকতা বলিয়া মনে করি। আমার জীবনের ও জগতের বহির্দেশে যাঁহারা অবস্থিত—তাঁহারা এগুলি হইতে কি রস পাইবেন আমি জানি না, তবে একথা অনস্বীকার্য যে কৌতুক বা কৌতুহলের মধ্য দিয়া একটি নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি জীবনের সকল দর্শকের পক্ষেই স্বাভাবিক—কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে মানবমনের মূলগত ঐক্য।

লেখক

এক মাস পরে আজ আবার কলকাতায় ফিরেছি। এই এক মাস দেশে কাটিয়েছি অনেককাল পরে। মা মারা যাওয়ার পরে আর এত দীর্ঘদিন একসঙ্গে দেশে কখনো থাকিনি। এই এক মাস আমার জীবনের এক অপূর্ব আনন্দের অধ্যায়। Dean Inge যাকে ঠিক Joy of Life বলেচেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। সেরকম নিভৃত, শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালো জল নদীতীর না হোলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে? শহরের কর্মকোলাহলে ও লোকের ভীড়ে তার সন্ধান কোথায় মিলবে? তাই যখন জটাখালির ভাঙ্গা কাঠের পুলটাতে দুধারের মজা গাঙ ও বাঁওড় এবং মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, নীচে ঘনসবুজ গাছপালা, ধানক্ষেত, বিল, গ্রামসীমার বাঁশবন, মাটির পথের ধারে পুষ্পভারনত বাব্‌লা গাছের সারি, দূরের বটের ডালে বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক—এসবের মধ্যে প্রতি বৈকালে গিয়ে বসতাম, তখন মনে হত আর শহরে ফিরে যাবার আবশ্যক নেই। জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্যকে উপভোগ করায়। সেকথা বুঝেছিলাম সেদিন, তাই সন্ধ্যার কিছু আগে জীবনের এই অনন্ত গতি-পথের কথা ভাবতে ভাবতে অপূর্ব জীবনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাহ্য না করেই কুঠির মাঠের অন্ধকার, ঘন নির্জন ও শ্বাপদসঙ্কুল পথটা দিয়ে একা বাড়ি ফিরলাম। আর নদীর ধারে অপূর্ব আকাশের রং লক্ষ্য করে তার পরদিনও ঠিক সেই মনের ভাব আবার অনুভব করেছিলাম।

এরকম এক একটা সময় আসে, যখন বিদ্যুৎচমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্তে জানতে পারা যায়, বুঝতে পারা যায়। শুধু সৌন্দর্যই এই বিদ্যুৎ,—আলোর কাজ করে মানসিক জীবনে। কিন্তু এই সৌন্দর্য বড় আপেক্ষিক বস্তু। একে সকলে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না। কানকে, চোখকে, মনকে তৈরী করতে হয়, সঙ্গীতের কানের মত সৌন্দর্যের জ্ঞান বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে। শিমুলগাছের মাথাটার উপরকার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙ্গার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই রক্ত-মেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্বতশিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে—তার ওপারে যেন জীবন-পারের বেলাভূমি! আনন্দ আবছায়ার মত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার একটু একটু চোখে পড়ে।

রোজ আমাদের বাড়ির পাশের বাঁশতলার পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাল্যের শত ঘটনা, কল্পনার আশা, দুঃখসুখের স্মৃতি মনে জেগে উঠত—এই সব বনের প্রতি গাছপালায়, পথের প্রতি ধূলিকণায় যে পঁচিশ বৎসর আগের এক গ্রাম্য বালকের সহস্র সুখদুঃখ জড়ানো আছে, কেউ তা জানবে না। আর এক শত বৎসর পরে তার ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে?

কোথায় লেখা থাকবে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরের বালক জীবনে প্রথম গ্রামের উত্তরমাঠে তার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিল? কোথায় লেখা থাকবে তার মায়ের-হাতে-ভাজা তালের পিঠে খাওয়ার সে আনন্দের কাহিনী? সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘাটে স্নান করতে নেমে নতুন-ওঠা চতুর্থীর চাঁদের দিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে এইসব কথা বেশী করে মনে জাগছিল। গোপালনগরের বারোয়ারীর যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়লো যে আজ পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

সে-সব কথা যাক। অদ্ভুত এই জীবন, অপূর্ব এই সৃষ্টির আনন্দ। নির্জ্জনে বসে ভেবে দেখো, মানুষ হয়ে উঠবে।

অনেককাল পরে গরীবপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে খিনু ও তার বোন রাণীর সঙ্গে দেখা হোল। আজ প্রায় যোল বছর আগে ওদের বাসাতে বাড়ির ছেলের মত থাকতুম। তখন আমিও বালক, ওরা নিতান্ত শিশু। সেই খিনুকে যেন আর চিনতে পারা যায় না। এত বড় হয়ে উঠেচে, এত দেখতে সুন্দর হয়েচে। রাণীও তাই। কতক্ষণ তারা আমাকে কাছে বসিয়ে পুরনো দিনের গল্প করতে লাগলো আপনার বোনেদের মত, ছাড়তে আর কিছুতে চায় না। শেষকালে রাণী তার শ্বশুর-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে কলকাতায় গেলেই যেন সে ঠিকানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, এ অনুরোধ বার বার করলে।

এবার আরও সকলের চেয়ে ভাল লেগেচে যেদিন রামপদর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মোল্লাহাটি ছাড়িয়ে পাঁচপোতায় বাঁওড়ের মুখে গিয়েছিলুম। এক তালীবনশ্যাম গ্রামরাজি। আকাশের কি নীল রং, ইছামতীর কি কালো জল! নৌকাতে আসবার সময় জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জ্জন কাশবনের ও জলের ধারের বন্যেবুড়ো গাছের ও মাথার উপরকার নক্ষত্রবিরল আকাশের কি অসীম সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত।

এই আনন্দে দিনের ইতিহাস পাছে ভুলে যাই, তাই লিখে রেখে দিলুম। অনেককাল পরে খাতাখানা খুলে দেখতে দেখতে এইসব আনন্দের কাহিনী মনে পড়বে তাই।

একটা কথা আজকাল নির্জ্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া, আকাশ বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পঁড়ে। এই অপূর্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অণু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এক জটিলতায় আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না। হঠাৎ বোঝা যায় না, কিন্তু কতকগুলি প্রাথমিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে অগ্রসর হোলে আপনা-আপনি গভীর চিন্তার মুখে ধরা দেয়। এক্ষেত্রে একটা ভুল গোড়া

থেকে অনেকে করেন। সেটা এই যে, পূর্বের জ্ঞান মনের মধ্যে এসে পৌঁছলে অনেকে জ্ঞানের চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে বলেন জগৎ মিথ্যা ও মায়াময়।

বেদান্তের পারিভাষিক 'মায়া' ছাড়াও আর একটা লৌকিক বিশ্বাসের 'মায়া' আছে, যেটাকে ইংরেজীতে illusion বলে অনুবাদ করা চলবে। বেদান্তের মায়া illusion নয়, সে একটা দার্শনিক পরিভাষা মাত্র, তার অর্থ স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা লৌকিক অর্থে 'মায়া' শব্দটা গ্রহণ করেন ও অর্থগত তত্ত্বটি মনে মনে বিশ্বাস করে হৃষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁরা ভুলে যান মানুষও তো এই অসীম রহস্যভরা সৃষ্টির অন্তর্গত। তাঁর নিজের মধ্যে যে আরও অনেক বেশী সম্ভাব্যতা, অনেক বেশী আধ্যাত্মিকতা, অনেক বেশী জটিলতা, আরও বেশী রহস্য। নিজেকে দীন বলে 'মায়া' কর্তৃক প্রতারিত দুর্বল জীব মনে করার মধ্যে যে কোনো সত্য নেই, এটা সাহস করে এঁরা মেনে নিতে পারেন না।

নীরদদের বাড়ি কাল সন্ধ্যার সময় বসে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলুম একখানা ইংরেজী পত্রিকাতে। এই কথাই শুধু মনে হোল আমরা জীবনে একটা এমন জিনিস পেয়েচি, যা আমাদের এক মুহূর্তে সাংসারিক শান্তিদ্বন্দ্বের ওপরে এক শাশ্বত আনন্দ-জীবনের স্তরে উঠিয়ে দিতে পারে —অনন্তমুখী চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে দেয়, এক মুহূর্তে সংসারের রং বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। যখনই জগতের প্রকৃত রূপটির যে অংশটুকু আমরা চোখে দেখতে দেখতে যাই তা সমগ্রতার দিক থেকে আমরা দেখতে পাই, পরিপূর্ণ ভাবে জীবনকে আস্বাদ করবার চেষ্টা করি—ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, আকাশ, নীহারিকা, নক্ষত্র, অমরত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য, পদার্থতত্ত্ব, ফুলফল, গাছপালা, অপরাহ্ণ, জ্যোৎস্না, ছোট ছেলেমেয়ে, প্রেম—তখনই বুঝি এই বিশ্বের সকল সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা ও চারিধারে আত্মাকে প্রসারিত করে দেওয়াই জীবনের বড় আনন্দ। 'আনন্দ' উপনিষদের পারিভাষিক শব্দ, লঘু অর্থে সংসারে চলে এসেচে কিন্তু আনন্দ কথার প্রকৃত অর্থ উচ্চ জীবনানন্দ। "আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে" এখানে আনন্দের কোনো বর্তমান প্রচলিত সাধারণ অর্থ নেই।

আজ খুব বেড়ানো হোল। প্রথমে গেলুম বন্ধুর ওখানে। তার মোটরে সে প্রবাসী অফিসে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সেখান থেকে গেলুম সায়েন্স কলেজে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডাঃ রায় এলেন। তিনি সিণ্ডিকেটের মিটিংএ গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তার পর দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল, একেবারে সোজা সারকুলার রোড্ দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে প্রিন্সেপ্ ঘাট। বেশ° আকাশের রংটা, ক'দিন বৃষ্টির জ্বালায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, গঙ্গার ওপারে রামকৃষ্ণপুর ময়দাকলগুলোর ওপরকার আকাশটা তুঁতে রং-এর, পশ্চিম আকাশে কিন্তু অস্তসূর্যের রং কোটেনি—কেন তা জানি না। ডাঃ রায়ের সঙ্গে বর্তমান কালের তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হোল—তাঁর মত

ভারী পাকা ও যুক্তিপূর্ণ। সকালে সকালে ফিরলাম, তিনি আবার বৌবাজারের দোকানটা থেকে খাবার কিনলেন। আমায় বললেন, মাঝে মাঝে দেখা করবার জন্যে।

জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করি, তবে সে এই ডাঃ পি. সি. রায়কে। সত্যিকার মহাপুরুষ। বহু সৌভাগ্যে তবে দর্শনলাভ ঘটে, একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অধিকক্ষণ কথাবার্তা কইবার পরে মনে হয় যে সত্যিই কিছু নিয়ে ফিরচি।

আজ প্রবাসীতে গিয়ে *বইটার প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েচে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু কাল থাকবেন বলেচেন।

সেখান থেকে গেলুম দক্ষিণাবাবুর গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণে কালিঘাটে। সুরেশানন্দের ছোট একবছরের খোকাটি কি সুন্দর হয়েচে! ওকে কোলে নিয়ে চাঁদ দেখালুম—ভারী তৃপ্তি হোল তাতে। এরা সব কোথা থেকে আসে? কোন্ মহান্ আর্টিস্টের সৃষ্টি এরা? অনন্ত আকাশে কালপুরুষের জ্যোতির্ময় অনল জ্বলতে দেখেচি, পূর্ব দিক্‌পালের আগুন অক্ষরে সঙ্কেত দেখেচি, কিন্তু সে রুদ্র বিরাটতার পিছনে এই সব সুকুমার শিল্প কোথায় লুকানো থাকে? কি হাসি দেখলুম ওর মুখে! কি তুলতুলে গাল!···

একটা উপমা মনে আসচে। আমাদের দেশের বারোয়ারীর আসরে কে যেন রবিবাবুর মুক্তধারা থেকে 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র' ওই গানটি আবৃত্তি করচেন। ওর ধ্বনির সঙ্গে ভাবের অপূর্ব যোগ, ওর মধ্যে যে অদ্ভুত ক্ষমতা ও চাতুর্য প্রমাণ পেয়েচে, তা কে বুঝচে? কিন্তু হয়তো এক কোণে এক নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসে আছেন—আসর-ভরা দোকানদার দলের মধ্যে তিনিই একমাত্র নীরব রসগ্রাহী, কবির ক্ষমতা বুঝচেন তিনি। চোখ তাঁর জলে ভাসচে, বুক দুলে উঠচে।

বিশ্ব-সৃষ্টির এই অসীম চাতুর্য, এই বিরাট শিল্প-কৌশল, এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য—ক'জন বুঝবে? দোকানদার দলের মত হাততালি দিচ্চে হয়তো সবাই। কিন্তু কে মন দিয়েচে ওদিকে—কে ভাবচে এই অপূর্ব, অবাচ্য, অভাবনীয়, অদ্ভুত সৃষ্টির কথা!···মানুষের অভিধানে যাকে বর্ণনা করবার শব্দ নেই।

এক-আধজন এখানে ওখানে: Sir Oliver Lodge, Flammarion, Jeans, Swinburne, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের নাম করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "এদের ফাৎনাতে ঠোক্‌রাচ্চে"।

আনন্দ! আনন্দ!

"আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে"

•

কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হোল। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগ করলেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে

* পথের পাঁচালী।

ভুল করেন, দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে।

আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশী।

এবার বাড়ি গিয়ে গত শনিবারে অনেকদিন পরে কি আনন্দই পেলুম। মটর লতা, কাঠবেড়ালী, নাটাফুল—বর্ষাসরস লতাপাতার ভরা সুগন্ধ। কাল প্রবাসী থেকে গিরীনবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে বিন্ সাহেবের কাছে অনেকদিন পরে। বেশ দিনটি কাটলো। বিভূতির সঙ্গেও দেখা।

আজ সকালে উঠে অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই কীর্তনের গানটা মনে পড়ল "…যাত রহি" শেষ দুটো কথা ছাড়া আর আমার কিছু মনে নাই, অথচ গানের ভাবটা আমি জানি। ভারী আনন্দ হোল আজ মনে। শুধুই মনে হচ্ছিল জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখতে শিখিনে বলেই যত গোল বাধে। জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্র হবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।

সেইদিক থেকে দেখলে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, দৈন্য বড় সম্পদ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবন শুধু ধনে মানে সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখে-সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্যের, বিলাসের মেলা—যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র দুধ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ-ধনসম্পদ-ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।

এক-এক সময় মনটা এমন একটা স্তরে নেমে আসে, যখন জীবনের আসল দিকটা বড় চোখে পড়ে যায়, আজ অনেকদিন পরে একটা সেই ধরনের শুভদিন। কলকাতার শহরে এ দিন আসে না।

আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপা হোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি—কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী অফিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক দুমাস লাগলো ছাপতে।

ঘনবর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে-সব কথা এখানে আর তুলবো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে বসে বনাতমোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা—সেই কার্তিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়িটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তাশ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে-সব ছবি—সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ'মাস কি খাটুনিটাই গিয়েচে! জীবনে কখনও বোধহয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত কাটিয়েচি। মাথা ঘুরে উঠেচে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে কেয়াঝোপে বসে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লালফুল-ফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বই-এর শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকুটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক করে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, গা হাত-পা যেন কামড়াচ্চে।

যাক্। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি, তা যে দিইনি, তিনি অন্ততঃ সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কিনা জানি না, আমার কাজ আমি করেচি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরনো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষদিকটাতে পার্কার ফাউন্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান্ নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূরজীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে এই কথাটি শুধু জানাতে চাই—

ভুলিনি। ভুলিনি। যেখানেই থাকি ভুলিনি···তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুরসংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙীন হয়েচে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়। কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সক ্র ব্যর্থতা, বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েচে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে র াত্রে,—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানিনে। কোথায় পাবো ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাবো আজ হিরুকাকাকে, কোথায় পাবো কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্চি।

যারা হয়তো আমার ছাপা-বই দেখলে খুশী হোত, তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হৌক্, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায়নি আজ রাত্রে।

আজই সকালে দেশ থেকে এলুম। কাল বৈকালে গিয়েছিলুম বারাকপুরে। সইমার বড় অসুখ। ষষ্ঠীর হাট বাজার, জেলি গোপালনগর থেকে নিয়ে এল ঘি, ময়দা। নগেন খুড়ো সপরিবারে ওখানেই।

কি সুন্দর বৈকাল দেখলুম! সে আনন্দের কথা আর জানাতে পারি নে—ঝোপে ঝোপে নীল অপরাজিতা, সুগন্ধ নাটাকাঁটার ফুল, লেজ-ঝোলা হলুদডানা পাখীটা—অস্তসূর্যের রাঙা আভা, নীল আকাশ, মুক্তির আনন্দ, কল্পনা, খুশী।

আজ এখন স্যুট্‌কেশ গোছাচ্চি। এই মাত্র আমি ও উপেনবাবু টিকিট করে এলুম, আজ রাত্রের ট্রেনে যাবো দেওঘর। কাল আবার সপ্তমী। ওখান থেকে হাজারিবাগ যাবার ইচ্ছে আছে, দেখি কি হয়।

সেই "রাতের ঘুম ফেলনু মুছে" গানটা মনে পড়ে। সেই অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এ, ১৯১৮ সালে। আজ শ্যামাচরণদাদাদের "মাধবী কঙ্কন" বইখানা এনেচি। সেই কতকাল আগেকার সৌন্দর্য, সেই পূজোর পর বাবার সঙ্গে ম্যালেরিয়া নিয়ে প্রথম বাড়ি যাওয়া,—সেই দিদিমা।

সে সব অপূর্ব স্বপ্ন-ভরা দিনগুলি! জীবনটা যে কি অদ্ভুত, অপূর্ব—তা যারা না ভেবে দেখে তারা কি করে বুঝবে!...কি করে তারা বুঝবে কি মহৎ দান এটা ভগবানের!

সকালে আমরা মোটরে করে বা'র হলুম—আমি, উপেনবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু। ঝরনার কি সুমিষ্ট জল!...একটু একটু বৃষ্টি হোল। কিন্তু পথের দুধারে কি অপূর্ব গাছপালা, লতাপাতা, শালচারা, ঝরনা, বাঁশবন—দুধারের ঘন জঙ্গলে জংলা মেয়েরা কাঠ কাটচে—কি সুন্দর মেঘের ছায়া—ত্রিকুটের দু-এক স্থান থেকে নীচের দৃশ্য বড় মনোরম। একস্থানে বাঁশের ছায়ায় বসে ডায়েরী রাখলুম। বড় সুন্দর দৃশ্য!

অর্ধেকটা উঠে বড় পরিশ্রম হোল বলে—সকলে উপরে উঠতে চাইলেন না। "অগ্নি

কুহকিনী নীলে—কে তোমারে আবরিল।" দিব্য শালবনের ছায়ায় বসে—ডায়েরী রাখলুম। আবার মনে পড়ে—বাড়ির কথা।

আজ বিজয়া দশমী। আকাশও বেশ পরিষ্কার। সকালের দিকে আমরা সকলে মোটরে বা'র হয়ে প্রথমে গেলুম পূর্ণবাবুর বাড়ি। সেখানে আজ ওবেলা কীর্তন হবে, পূর্ণবাবু আসবার নিমন্ত্রণ করলেন। সেখান থেকে বিমানবাবুর বাড়ি। আমি ও করুণাবাবু মোটরে বসে রইলুম—অমরবাবু ও উপেনবাবু নেমে গেলেন। সেখান থেকে কর্ণীবাগে ফকিরবাবুর ওখানে যাওয়া গেল। একটু দূরে মাটির মধ্যে তপোবনের পাহাড়টা চোখে পড়ল। কালকার বালানন্দ স্বামীর আশ্রমটাও পাশেই পড়লো দেখলুম। আজ কিন্তু সেখানে লোকের ভীড় ছিল না—কতকগুলি এদেশী স্ত্রীলোক রঙীন কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিল দেখলুম। সেখান থেকে করুণাবাবুর বাড়ি হয়ে এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে অমরবাবুর কি কাজ ছিল তা সেরে যাওয়া গেল দুর্গামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে। দুর্গাপ্রতিমা ভারী সুন্দর করেচে—অমন সুন্দর প্রতিমার মুখ অনেকদিন দেখি নাই। তারপরে বাঙ্গালীদের পূজামণ্ডপে এসে খানিকক্ষণ থাকতেই তারা খেতে বললে। কিন্তু আমি তখন স্নান করি নাই। কাজেই আমার হোল না।

বৈকালে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। এত সুন্দর স্থান আমি খুব বেশী দেখি নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। পাহাড়ের উপর গাছপালা বেশী নাই, বন্য আতাগাছই বেশী। কিন্তু পিছনে ধূসর ত্রিকূট পাহাড়ের দৃশ্য ও সম্মুখে অস্তরাগ-রক্ত আকাশের তলে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের শান্ত মূর্তি বাস্তবিকই মনে এক অদ্ভুত ভাব আনে। দূরে দূরে শাল মহুয়া বন, শুধু উঁচু-নীচু ভূমি ও বড় বড় পাথর এখানে ওখানে পড়ে আছে। অনেকে পাহাড়ের ওপর বেড়াতে এসেচেন। এত সুন্দর হাওয়া!—একথায় মনে হোল বাল্যকালে মডেল ভগিনী বইয়ে এই নন্দন পাহাড়ের হাওয়ার কথা পড়েছিলুম—চারিধারে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে বসে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের আড়ালে অস্তমান সূর্যের দিকে চোখ রেখে কত কথাই মনে আসছিল। উপেনবাবুর ও দ্বিজেনবাবুর অবিশ্রান্ত বকুনির দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ মনে হোল আজ আমাদের গ্রামেও বিজয়া দশমী। সারা বাংলাতে আজ এসময়টিতে কত নদীতে কত বাচ্ খেলার উৎসব, কত হাসিমুখ। আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারেও এতক্ষণ বিজয়ার আড়ং চলচে—এতক্ষণ বাদা ময়রা তেলেভাজা জিলিপি বিক্রী করচে—সবাই নতুন কাপড় পরে সেজে এসে বাঁওড়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর দেখবার জন্যে। ছেলেবেলার মত বাঁওড়ে বাচ্ হচ্চে। মনে পড়ে অত্যন্ত শৈশবের সেই শালুক ফুল তোলা, তারপরে বড় হয়ে একদিনের সেই বন্ধুর কাছে চার পয়সা ও মুড়কির কাহিনীটা।

ফিরে আসতে আসতে মনে হোল এতক্ষণ আমাদের দেশে পথে পথে নদীর ধারে প্রিয় পাড়াগাঁয়ের সুপরিচিত ভাঁট্-শেওড়ার বনে অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এসেচে, সেই কটুতিক্ত অপূর্ব সুঘ্রাণ উঠচে—সেই পাখীর ডাক—এখানকার মত দূরপ্রসারী উচ্চাবচ পাথুরে জমি ও

শাল মহুয়া পলাশের বন সেখানে নেই, এরকম পাহাড় নেই স্বীকার করি, কিন্তু সে-সব অপূর্ব মধুর আরামই বা এখানে কোথায়? মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে এই সময়েই শৈশবের সেই "মাধবী কঙ্কণ" ও "জীবন প্রভাত"—সেই পাকাটির আঁটি ও ছিরে-পুকুর। বইখানা সেদিন শ্যামাচরণদাদার কাছে চেয়ে নিয়ে এলুম। সে-সব দিনের অপূর্ব মধুর স্মৃতি—সারাজীবন অদৃশ্য ধূপবাসের মত ঘিরেই রইল। এই নিয়েই তো জীবন—এই চিন্তাতে, এই স্মৃতিতে, এই যোগে। এই মনন ও ধ্যান ভিন্ন উচ্চ জীবনানন্দ লাভ করবার কোনো উপায় নেই। এ আমার জীবনের পরীক্ষিত সত্য।

নন্দন পাহাড় থেকে ফিরে এসে দেখলুম অমরবাবুর বাংলোতে ৺বিজয়ার সম্মিলনী বসেচে। গোল চাতালটাতে জ্যোৎস্নার আলোতে চেয়ার পেতে বিমানবাবু, রবিবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু সবাই বসে আছেন। ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ও কুশলাদির আদান-প্রদানের পরে চা ও খাবার খাওয়া হোল। একটু পরে ফকিরবাবু এলেন। অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্যিক আলোচনা চলল। আমি ও বিমানবাবুর জামাতা রবিবাবু অনেকক্ষণ ধরে টলষ্টয় ও রুশীয় সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। রবিবাবু আমার 'পথের পাঁচালী'র প্রশংসা করছিলেন। বললেন, অনেকে বলেচেন, 'পথের পাঁচালী' শেষ হোলে বিচিত্রা ছেড়ে দেবো। আমি ও করুণাবাবু ঘরের মধ্যে এসে বসে সিগারেট খেলুম ও ফকিরবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের ঝাল ঝাড়তে শুরু করলুম। তারপরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে সেটা একটু কমে গেল—বিমানবাবু ও রবিবাবু চলে গেলেন—আমরাও পূর্ণবাবুর বাড়িতে কীর্তন শুনতে গেলুম। দক্ষিণা ঘোষ বলে একজন ভদ্রলোক সেখানে বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলছিলেন —আমার বেশ লাগলো। খুব জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে জোরে মোটর হাঁকিয়ে অনেক রাত্রে বাংলাতে ফেরা গেল। বেশ লাগছিল।

কাল সকালে সম্ভবতঃ গিরিডি হয়ে ঐ পথে মোটর-বাসে হাজারীবাগ ও সেখান থেকে রাঁচী হয়ে কলকাতায় ফিরবো। দেখি কি হয়। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও যাবো না।

অমরবাবুর দৌহিত্র অমিতের কথাগুলি ভারী মিষ্টি। তিন বৎসরের শিশু! বেশ লাগে ওকে।

এইমাত্র সন্ধ্যা ছ'টার দিল্লী এক্সপ্রেসে দেওঘর থেকে ফিরে এলুম। সারা দিনটা কাটল বেশ। বড় রোদ ছিল। করুণাবাবু সারা পথ কেবল গানের বই বা'র করেন আর আমাকে এটা ওটা গাইতে বলেন—করুণাবাবু সম্পূর্ণ বেসুরে গাইতে থাকেন। মধুপুরে আমার নেমে উস্ত্রী জলপ্রপাত দেখতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু উপেনবাবু নামলেন না বলে আমিও আর নামলুম না। তাতে আমার মন খারাপ ছিল, সেটা দূর করে দেওয়ার জন্যে আমার মুখের সামনে একটা সিগারেট ধরলেন।

তারপরে আবার চললো তাঁর সেই বেসুরে গজল গাওয়া। শিশিরকুমার ঘোষের বড়

ছেলেও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন—বেশ লোক। হুগলী ব্রিজ থেকে সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো—আমার মনে হোল সেই এক ফাল্গুন দিনে চুঁচুঁড়ায় শখের থিয়েটার ও গোলাপ ফুলের কথা। সেই দুপুরের ঝম্-ঝম্ রোদে ফাল্গুনের অলস অবশ হাওয়ায় এই স্টেশনের সে প্ল্যাট্‌ফর্মে পায়চারীর কথা কি কখনো ভুলবো!

মধ্যে আবার খুব বৃষ্টি এল। কলকাতায় কিন্তু বৃষ্টি একটু একটু মাত্র। উপেনবাবু বললেন, আমার অনুচরগণ হেরে গিয়েচে।

এইমাত্র মেসের বারান্দাতে নির্জনে জ্যোৎস্নার আলোতে বসে আছি। বেশ লাগচে। মন মুক্ত, কারণ সম্মুখে প্রচুর অবসর।

এরই মধ্যে দেওঘর যেন দূর হয়ে পড়েচে। আজই সকালে উঠে যে সূর্যোদয়ের পূর্বে আমি দেওঘরের পথে পথে বেড়িয়ে বেড়িয়েচি, তা কি স্বপ্ন? আজই তো ভোরে পশ্চিম আকাশে ধূসর ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের রহস্য-ভরা মূর্তি ও ত্রিকূটের পিছনের আকাশের অরুণচ্ছটারক্ত সৌন্দর্য দেখেচি, তা যেন মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

করুণাবাবুকে বড় ভাল লাগলো। কি শান্ত, সরল হাস্যপ্রিয়, সরস স্বভাবের যুবক!··· গান গলায় নেই, তবু অনবরত গান গাইতে গাইতে জোরে চেঁচাতে চেঁচাতে এলেন—সকলে মুচকি হাসচে—গোপনে চোখ ইশারা করচে পরস্পরে, তাঁর দৃক্‌পাতও নেই। তিনি তা বুঝতেও পারচেন না। আপন মনে গান গেয়েই চলেচেন আর আমাকে ডেকে ডেকে বলচেন—আসুন বিভূতিবাবু, এইটে ধরা যাক্ আসুন—আমার সুরও তাঁর গলার বেসুরাতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দৃক্‌পাতও নেই, সুর-বেসুর সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই। শিশুর মত সরল ভদ্রলোক।

'Men such as these are the salt of the Earth.'

পরশু থেকে কি বিশ্রী বাদলা যে চলচে! কাল গেল কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজার দিনটা—কিন্তু সারাদিন কি ভয়ানক বর্ষা আর নিরানন্দের মধ্যে দিয়েই কাটলো! আজও সকাল থেকে শুরু হয়েচে—কাল সারারাতের মধ্যে তো একদণ্ড বিরাম ছিল না বৃষ্টির। কার্তিক মাসে এরকম বাদলা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। এসব সময়ের সঙ্গে তো বাদলার association মনে নেই—তাই অদ্ভুত মনে হয়। অন্ধকার হয়ে এসেচে—টেবিলে বসে কিছু দেখতে পাচ্চি নে, মনে হচ্চে আলো জ্বালতে হবে। কাল যখন গিরিজাবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছিলুম তখন কেবল ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটু ধরেছিল। রেঙ্গুন যাওয়ার কথা উমেশবাবু যা লিখে রেখে গিয়েচেন, তা এ বৃষ্টিতে কি করে হয়? আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও গিয়ে সুখ নেই।

কাল রাত্রে গিয়েছিলুম শিমূলতলা। সেখানে থেকে আজ সকালের ট্রেনে বা'র হয়ে এখানে এসে সন্ধ্যায় পৌছান গেল। ঠিক সন্ধ্যায় গঙ্গার পুলটি পার হবার সময় এই শান্ত হেমন্ত-সন্ধ্যার সঙ্গে কত কথা জড়ানো আছে, যেন মনে পড়ে। সেই হুগলী ঘোলঘাট স্টেশন,

সেই কেওটা, সেই হালিসহর, সেই হুগলী—বহুদূরের বাড়ির সে শান্ত অপরাহ্ন। যেখানে পথের ধারে শ্যামাচরণদাদারা কাঠ কাটিয়েচে, শৈশবের মত সেই কাঠের গুঁড়োগুলো এখনও পথের ধারে যেন রয়েচে—এসব ভাবলে সে এক অপূর্ব, বিচিত্র আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়। জীবনের সেই মধুর-প্রভাত-দিনগুলোর কথা মনে হয়। কাল দিদিমা গল্প করছিল, কবে নাকি সেই জাহ্নবী স্নানে কেওটা গিয়েছিলেন; বাবা সকালে মুখ ধুচ্ছিলেন আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বুড়ি ঠিক মনে করে রেখেচে। সেই দিনটি থেকে জীবন আরম্ভ হয় না?......

এসেই ওদের বাড়ি গেলুম জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে। বিভূতি, ঘণ্টু খুব খেলা করলে। সেখান থেকে এই ফিরচি।

ভারী ঘটনাবহুল দিনটি। ভোরে উঠে প্রথমে গেলুম হেঁটে ইডেন্ গার্ডেনে। শিশিরসিক্ত ঘাসের ধারে ধারে বেড়াতে বেড়াতে খালের জলের রক্ত-মৃণালগুলি দেখছিলুম। দুটি রাঙা ফ্রক পরা ফিরিঙ্গি বালিকা ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল। কেয়াঝোপে খানিকটা বসে বসে *"আলোক-সারথি"র ছক্ কাটলুম। পরে দু'খানা বায়োস্কোপের টিকিট কিনে বাড়ি ফিরবার পথে রমাপ্রসন্নের ওখান হয়ে এলুম।

বৈকালে প্রথম গেলুম প্রবাসী অফিসে। কেদারবাবু মোটরে ঢুকচেন, গেটের কাছে নমস্কার বিনিময় হোল। সজনীর ঘরে গিয়ে দেখি ডাঃ সুশীল দে বসে আছেন। একটু পরে নীহারবাবুও এলেন। খুব খানিক গল্প-গুজবের পর তিনজনে গেলুম সজনীর বাড়ি। উষাদেবী চলে গিয়েচেন। আমার বইখানি গিয়েচেন নিয়ে।

সেখানে "বাঁশি বাজে ফুল বনে" গানটা শুনলুম না বটে, একটা জৌনপুরী টোড়ী রেকর্ড শুনলাম। চা পানের পরে ডাঃ দে বাড়ি চলে গেলেন; আমরা তিনজনে গেলুম বায়োস্কোপে। পথে বার বার চেয়ে দেখছিলুম—আজ পূর্ণিমা, মানিকতলা স্পারের পিছন থেকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে। বহুদূরের আমাদের বাড়িটাতে নারিকেল গাছটার পিছন থেকে চাঁদটা ওই রকম উঠচে হয়ত। সেই সময়টা সেই "আমার অপূর্ব ভ্রমণ," "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"—সেকি অপূর্ব শৈশবের আনন্দ উৎসাহ,—কি অপূর্ব বিচিত্র জীবনটা তাই শুধু ভাবি।

Sunrise filmটা মন্দ নয়। হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে গিরিজাবাবুর সঙ্গে দেখা, নমস্কার বিনিময় ও আলাপ হোল। —বাবু B. P. C. C. থেকে returned হয়েচেন শুনলুম, মনটা একটু দমে গেল। বায়োস্কোপ দেখে ফেরবার পথে দীনেশ দাশের সঙ্গে দেখা। প্রবাসী অফিসে মানিকবাবু জানালে, কেদারবাবু মঙ্গলবারে লেখা চান। আবার প্রবাসীতে যাবার আগে বিচিত্রা অফিসে উপেনবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও খুব শীঘ্র লেখা চান। Sub Editor-এর declarationটা শীঘ্র দিতে হবে তিনি জানালেন।

তারপর বায়োস্কোপ থেকে গেলুম বিভূতিদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে দেখি

* পরে 'অপরাজিত' নামে প্রকাশিত।

বৈঠকখানাতে বায়োস্কোপ হচ্ছে। বিভূতি বসতে বললে। তারপর দেবেন ও হীরুদের সঙ্গে খেতে বসা গেল। অনেকদিন পরে আজ আবার সেই রাস পূর্ণিমা।

বেরিয়ে অনেকদিন আগের মত একখানা রিক্শা করে জ্যোৎস্নায় ও ছাতিম ফুলের গন্ধের মধ্যে দিয়ে বাসায় ফিরলুম। সেই ১৯২৩ সাল ও এই। এই ছয় বৎসরে কত পরিবর্তন।

কে জানত উপরে ডায়েরীটা লিখবার সময় যে এই দিনটাতেই রাসপূর্ণিমার বায়োস্কোপের আসরেই ওদের বাড়ির সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা!

বাসায় এসে বারান্দায় রেলিং ধরে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—যেন এক গ্রহদেব এই অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে হু-হু করে উড়ে চলেছেন ওপরে—ওপরে—সজোরে—সবেগে—পায়ের নীচে পুরাতন পরিচিত পৃথিবীটি রইল পড়ে—।

বহুদূর আকাশে যেখানে পরমাণু তৈরী হচ্চে, উল্কারা ছুটচে, ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে, নক্ষত্র ছুটচে—সেখানে।

বন্ধুর জ্বর হয়েচে—আজ দাদাকে পত্র দিয়েচি। দাদা যেতে বলেচেন, তা কি করে হয়। সেদিন বন্ধুর অত্যাচারের কথা কত শুনলুম। তার স্ত্রীর, বোন ও শাশুড়ীঠাকরুন বললেন। শুনে দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় কি!

জ্যোৎস্নরাত্রে আমাদের বাড়িটা বহুদূরে কেমন দাঁড়িয়ে আছে, কাঠ কাটা হয়েচে, আমাদের বাড়ির সামনে ছেলেবেলাকার মত পথের ওপর তার দাগ রয়েছে। শ্যামাচরণ-দাদাদের কাঠ।

সে এক জীবন!

কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব এই জীবন-ধারা! একে ভোগ করতে হবে।

এই অপূর্ব জ্যোৎস্নায় ইসমাইলপুরের জন্যে মন উদাস হয়ে যায়। যেন তার বিশাল চরভূমি, কালো জঙ্গল, নির্জন বালিয়াড়ি—আমায় ডাক দিচ্চে।

কাল স্কুলে ছ'টায় ম্যানেজিং কমিটির মিটিং, এদিকে আবার তিনটার সময় ডাঃ দের ওখানে চা-পানের নিমন্ত্রণ।

আজ দুপুরে মনে পড়ছিল বোর্ডিং-এ থাকতে Traveller's return গল্পটা কি অপূর্ব emotion নিয়েই পড়তুম। বাল্যের সে সব অপূর্ব emotion মনে পড়লেই মনে হয় কি অপূর্ব, এক বিচিত্র এ জীবনধারা! সেদিনের সন্ধ্যায় নন্দরাম সেনের গলিতে যাওয়া, সেই চাউলের গুদাম—সেই শুভঙ্করী পাঠশালার সামনে আমার সহপাঠির বাড়ি মনে পড়ে।

কি সুন্দর!

এসবের জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেবো?—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

আজ মনের মধ্যে যে তীব্র creative আনন্দ অনুভব করলুম, কলকাতায় এসে পর্যন্ত এক-বছরের মধ্যে তা হয়নি কোন দিন।

আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কি হলো আমার, অকারণে আনন্দে মনের পাত্র উপচে পড়চে, একে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না।

মন যেন কি বলে বুঝতে পারি নে। কত কথা মনে হোল।···সারা জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য আজ আমার মনে ভিড় করেচে···স্মরণীয় দিন, অতি স্মরণীয় দিন, এরকম কিন্তু খুব বেশী দিন আসে না।···

ইন্‌স্টিট্যুটে সেই মহিলা পর্যটকের কথা পড়ছিলুম—তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে উত্তরমেরু প্রদেশের বরফ জমা নদী ও অন্ধকার অরণ্যভূমির মধ্যে তিনি তাঁবু ফেলে রাত্রে বিশ্রাম করতেন, দূরে মেরুপ্রদেশীয় Northern Light জ্বলে, একা তিনি তাঁবুতে—"amidst a waste of frozen river, and dark forests"—সেখানকার নৈশ নীরবতা·· নির্জনতা ··গভীর শান্তি, মাথার উপর হলুদ রং-এর চাঁদ, অবাস্তব, অন্য গ্রহের জ্যোতিষ্কের মত দেখায়···নৈশ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র···আশেপাশে শুভ্রতুষারাবৃত পাইন অরণ্যের অড়ালে লোলুপ নেকড়ের দল—আর ভাবতে পারা যায় না, মনকে বড় মুগ্ধ, অভিভূত করে।

সন্ধ্যাবেলা এসে চেয়ারটাতে বসে চুপ করে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল এই সব শীতের রাত্রে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির পেছনের ঘন বনে শিয়াল ডাকতো গভীর রাত্রে···সেই বিপদের ভয়, অজানার মোহ, গ্রাম্য জীবনের সৌন্দর্য···অদ্ভুত, অপূর্ব···।

আরও মনে পড়লো ইসমাইলপুরের জ্যোৎস্না রাত্রির সে অপাথিব, weird beauty··· সেই এক পূর্ণিমা-রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নার ঢেউয়ের নীচে আকন্দ গাছ ··স্বপ্নে যেন দেখি···

সেই কুমোরদের বাড়ি চাক ঘোরাচ্ছে দাসু·· পঞ্চাননতলায় কালীপূজো ··

ভগবান, কি অসীম বিচিত্রতা দিয়ে এই জীবন, আমার শুধু নয়, সকলের জীবন গড়ে তুলচো—তা কে দেখে? কে বোঝে?

ধন্যবাদ, অগণিত ধন্যবাদ...হে সৌন্দর্যস্রষ্টা মহাশিল্পী, তোমাকে অন্তরের প্রেম কি বলে জানাবো, ভাষা খুঁজে পাই না ·

এ তো শুধু পৃথিবীর সুখদুঃখের কথা লিখচি—তবুও তো আজ নাক্ষত্রিক শূন্যের কথা ভাবি নি, অন্য অন্য জগতের কথা তুলিনি। অন্য গ্রহ-উপগ্রহের কথা ওঠাই নি···

দূর-দূরান্তের কথা তুলি নি ··

নতুন বৎসরের প্রথম দিনটাতে এবার মোটরে করে শ্রীনগর গেলুম। চালকী থেকে খুকীকে তুলে নিলুম, পরে গোপালনগরের বাজারে বন্ধুর ড্রাইভার গৌরকে হরিবোলা ঠিক করে দিলে। ড্রাইভারটা প্রথমটাতে মেঠো পথে যেতে চায় না। অবশেষে অনেক করে রাজী করানো গেল। সিমলাতে গিয়ে কালাকে ডাকতে পাঠানো গেল, সে নাকি ভাত রাঁধচে। একটি ছোট মেয়ে জল নিয়ে এল বালতিতে করে। খাবার খেয়ে নিয়ে আমরা আবার হলুম রওনা। শ্রীনগরের বনের মাথায় মটর ফুলের মত একরকম ফুল অজস্র ফুটে আছে, এত চমৎকার লাগছিল। আসবার সময় ডাইনে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল—আকাশের কি চমৎকার রঙটা যে!

রাত আটটার সময় পৌঁছে গেলুম কলকাতা, ঠিক চারটার সময় সিমলে থেকে ছেড়ে।

এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। Sense of space মানুষের ক্রমেই কেমন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।...এক শত বৎসর পূর্বে যা কিনা পাকা তিন দিনের পথ, গরুর গাড়িতে চার দিনের পথ ছিল!...কে জানে আমাদের পৌত্র বা প্রপৌত্রদের Sense of space আরও কত পরিবর্তিত হবে!—

আজ অনেকক্ষণ কার্জন পার্কে একা একা বেড়ালুম। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা অস্ত যাচ্ছিল,—আমার শুধু মনে যুগ যুগের কল্পনা জাগে। ঐ নক্ষত্রটা যে ওইখানে উঠেছে, ওতেও কত অপূর্ব জীবনলীলা...। মৃত্যু, বিরহ এসব যদি জীবনে না থাকতো তবে জীবনটা একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়তো—হারাবার শঙ্কা না থাকলে প্রেম, স্নেহও হয়তো গভীর ও মধুর হতে পেত না। তাই যেন মনে হয় কোন সুনিপুণ শিল্প-স্রষ্টা এর এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেচেন যেন অতি তুচ্ছ, দরিদ্র লোকেরও জীবনের এ গভীর অনুভূতির দিকটা বাদ না যায়। এ জীবনের অবদানকে খুব কম লোকেই বুঝলে—কেউ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না—সকলেই দৈনন্দিন আহার চিন্তায় ব্যস্ত। কে ভাবে জন্ম নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে, আকাশ, ঈশ্বর, প্রেম, অনুভূতি—এসব নিয়ে কার মাথাব্যথা পড়েচে ?

নুটু ও নায়েব ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম।—Lief Ericsson was space-hungry: So am I.

জানি না কেন আজ ক'দিন থেকে মনটা কেবলই মুক্তির জন্য ছটফট করচে। কি ভাবের মুক্তি ? আমাকে কি কেউ শিকলে বেঁধে রেখেচে ?—তা নয়। কিন্তু কলকাতার এই নিতান্ত মিনমিনে, একঘেয়ে, ঘরোয়া জীবনযাত্রা, আজ পনেরো বৎসর ধরে যে জীবনের সঙ্গে আমি সুপরিচিত,—সেই বহুবার দৃষ্ট, গতানুগতিক, একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা আর আমার ভাল লাগে না।

আজ দুপুরবেলা স্কুলের অবসর ঘণ্টায় চুপি চুপি এসে বাইরের ছাদটাতে বসেছিলুম। আকাশ ঘন নীল, কোথাও এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে—কেবল একটা চিল বহুদূরে একটা কৃষ্ণ-বিন্দুর মত আকাশের গা বেয়ে উড়ে যাচ্ছে—সেদিক চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে আমার মন কোথায় যে উড়ে গেল, কি অপূর্ব প্রসারিত করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে মনে জাগল—সে-সব কথা কি লিখে বলা যায় ? মনের সে উচ্চ আনন্দের বর্ণনা দেওয়ার উপযুক্ত ভাষা এখনও তৈরি হয় নি। কিন্তু কেন সে আনন্দটা এল, তাও বুঝতে পারি—সেটা এল শুধু জগতের বড় বড় মরু, বিশাল অরণ্যভূমি, দিক্‌দিশাহীন সমুদ্র, মাঠ ও বনঝোপ, মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব মুক্ত রূপের কল্পনায়।

বুঝতে পারি এরই জন্যে মনটা হাঁপাচ্চে। প্রকাণ্ড কোনো মাঠের ধারে বন, বনের প্রান্তে একটি বাংলো—কিংবা জঙ্গলে ঘেরা অভ্রের খনি, বালু-মিশ্রিত পাথুরে মাটির গায়ে অভ্রকণা চিক্‌-চিক্‌ করচে, নয়তো উচ্চাবচ পাহাড়ে জমি, যেদিকে চোখ যায় শুধুই বন—এই রকম স্থানেই যেতে চাই—থাকতে চাই। এতটুকু স্থান চায় না মন। চায় আরও অনেক বড়

—জায়গা—অনেকখানি বড়—অচেনা, অজানা, রুক্ষ, কর্কশ ভূমিশ্রী হলেও তা-ই চাইবো, এ একঘেয়ে পোষমানা শৌখীনতার চেয়ে।

সন্ধ্যাবেলা যে ছবিটা দেখতে গেলুম গ্লোবে, সেটাও আমার আজকের মনের ভাবের সঙ্গে এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেল,—'Lief the Viking' গ্রীনল্যাণ্ড ছেড়ে আরও দূরে, অচেনা দেশ খুঁজে বার করতে অজানা পশ্চিম মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়ে চলে গেল—নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না-ঝরা আকাশ-তলায় সন্ত-ফোটা মরসুমী ফুলগুলোর দিকে চোখ রেখে এইমাত্র গোলদীঘির ধারে বসে সেই কথাই আমি ভাবছিলুম।···

ভাবতে ভাবতে মনে হল আমি যেন এই জগতের কেউ নই—আমি যেন বহুদূর কোন নাক্ষত্রিক শূন্যপারের অজানা জগৎ থেকে কয়েক দণ্ডের কৌতূহলী অতিথির মত পৃথিবীর বুকে এসেচি—ও মরসুমী ফুল আমি চিনেও চিনি না, প্রতিবেশী মানুষদের দেখেও যেন দেখি নি, এ গ্রহের বৈচিত্র্যের সবটাই নিয়েচি কিন্তু এর একঘেয়েমিটা আমার মনে বসতে পারে নি এখনও। তার কারণ আমার গতি—স্বর্গীয় গতির পবিত্রতা।

মনে হল এইমাত্র যেন ইচ্ছা মত পৃথিবীটা ছেড়ে উড়ে আলোকের পাখায় চলে যাবো ওই বহুদূরে ব্যোমের গভীর বুকে, যেখানে চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা নির্জন সাথীহীন নক্ষত্র মিট্-মিট্ করে জ্বলচে—ওর চারপাশে হয়তো আমাদের মত কোন এক জগতে অপরূপের বিবর্তনের প্রাণী বাস করে—আমি সেখানে গিয়ে খানিকটা কাটিয়ে আবার হয়তো চলে যাবো কোন্ সুদূর নীহারিকা পার হয়ে আরও কোন্ দূরতর জগতের শ্যামকুঞ্জবীথিতে!

এই সময়ে মৃত্যুর অপূর্ব রহস্য যা সাধারণ চক্ষুর অন্তরাল থেকে গোপন আছে—তার কথা ভেবে মন আবার অবাক হয়ে গেল—সারা দেহ মন কেমন অবশ হয়ে গেল।···

কোন্ বিরাট শিল্প-স্রষ্টার পুণ্য অবদান এ জীবন?···কি অতলস্পর্শ, মহিমময় রহস্য!··· রোমাঞ্চ হয়। মন উদাস হয়ে যায়—যখন বাসায় ফিরলুম, তখন যেন কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব।···

জীবনকে যে চিনতে পেরেছে—এ জগতে তার ঐশ্বর্যের তুলনা নেই—যার কল্পনার পঙ্গুতা ও ভাব-দৈন্য দৈনন্দিন ভোগবিলাসের উর্ধ্বে তাকে উঠতে প্রাণপণে বাধাদান করেচে, সে শাশ্বত-ভিখারীর দৈন্য কে দূর করবে?···

আজ অনেককাল পরে—প্রায় বারো বৎসর পরে—শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখে এইমাত্র ফিরচি। সেই ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেখবার পরে এই আজ দেখা। অভিনয় খুব ভালই হল, কিন্তু আমি, কি জানি কেন, মনের মধ্যে প্রথম যৌবনের সে অপূর্ব উন্মাদনা, নবীন, টাটকা, তাজা মনের সে গাঢ় আনন্দানুভূতিটুকু পেলাম না। দেখে দেখে যেন মনের সে নবীনতাটুকু হারিয়ে ফেলিছি।

আজকাল অন্যদিক দিয়ে মনের মধ্যে সব সময়ই একটা অপূর্ব উৎসাহ পাই—একটা অজ

ধরনের উদ্দীপনা। সেটা এত বেশী যে, তা নিয়ে ভাবতেও পারি না—ভাবলে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মনে হয় এই যে কলকাতার একঘেয়েমি যাকে বলচি—এ-ও চলে যাবে। সে যাত্রার বাঁশি যেন বেজেছে মনে হচ্চে। বহুদূরে যাত্রা। সমুদ্রের পারে—প্রশান্ত মহাসাগরের পারে। নানা দার্শনিক চিন্তা মনে আসচে, কিন্তু রাত হয়েচে অনেক—আর কিছু লিখবো না।

ক'দিন বেশ কাটচে। অনেক দিন পরে ক'দিনের মধ্যে ভোম্বলবাবু, ননী, নান্টু, প্রসাদ—এরা সব এসেছিল। সেদিন অনেকদিন পরে রাজপুরে চললুম। খুকীর সঙ্গে দেখা হল, ভারী আদর করলে। তারপর একদিন গড়িয়ায় জলের ধারের মাঠে, আমি ও ভোম্বল বেড়াতেও গেলুম। কত কি গল্প আবার পুরনো দিনের মতই হল। একদিন আমি অবশ্য একা গিয়েছিলুম,—পূর্ণিমার দিন।

আজ বসে বসে সেই দিনগুলোর কথা ভাবছিলুম। যাত্রাদলের ছেলে ফণি বাড়িতে খেতে এল—বাবা বর্ধমান থেকে এলেন—তারও অনেক আগে যখন বকুলতলায় প্রথম বারোয়ারীর বেহালা বাজানো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম—সে-সব টাটকা—তাজা, আনকোরা আনন্দ এখনও কিন্তু যেন ভাবলে কিছু কিছু পাই। যেদিন সেই প্রথম বেহালা বেজেছিল, যেদিনটা বাবার সঙ্গে নৈহাটী হয়ে সিঙ্গাড়ার আলু খেয়ে কেওটা থেকে বাড়ি আসছিলুম—যেদিন চড়ক তৈরি করলুম—ঠাকুরমাদের বেলতলায় আমি নিজে; ঠাকুরমাদের পড়ো ঘরে পাঠশালা-করা, কড়ি খেলার আমোদ. পুবমুখো যাওয়া, মরাগাঙে মাছ ধরতে যাওয়া—শনিবারে ছুটিতে বাড়ি আসার আনন্দ—কত লিখবো। কে জীবনের এসব মহনীয় অবদান-পরম্পরার কথা লিখতে পারে? আর মনে হয় আমি ছাড়া এসবের আসল মানে আর কেই বা বুঝবে? তা তো সম্ভব নয়—অন্য সকলের কাছে এগুলো নিতান্ত মামুলী কথা মনে হবে। এদের পিছনে যে রসভাণ্ডার লুকানো আছে আমি ছাড়া আর কে তা জানবে?···

অনেকদিন পরে দেশে এসে বেশ আনন্দে দিন কাটচে। রোজ সকালে উঠে ইছামতীর ধারের মাঠটাতে বেড়াতে যাই, ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকে, এত পাখী ডাকে!··· চোখ গেল, বৌ-কথা-ক', কোকিল—কত কি!···বেড়িয়ে এসে ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নামি। ওপারের চরের শিমূলগাছটার মাথায় তরুণ সূর্য ওঠে, দু'পারে কত শ্যামল গাছপালা। সোঁদালি ফুলের ঝাড় মাঝে মাঝে দুলতে দেখলেই আমার মনে কেমন অপূর্ব আনন্দ ভরে ওঠে।···প্রভাতে পাখীরা যে কত সুরে ডাকে,' জলের মধ্যে মাছের ঝাঁক খেলা করে।—জীবনের প্রাচুর্যে, সরসতায়, সৃষ্টির মহিমায় অভিভূত হয়ে যাই। কতদূরের সব জীবনধারার কথা, জগতের কথা মনে হয়—আবার স্নান করতে করতে চেয়ে দেখি নদীর ধারে গোছা চিংড়াছা ঘাস হেলাগোছা ভাবে জলের মধ্যে মাথা দোলাচ্ছে, একটা হয়তো খেজুর গাছ স্নানেরতলার বাঁকে অন্য সব গাছপালার থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অপূর্ব, সুন্দর, হে স্রষ্টা, হে মহিমময়, নমস্কার, নমস্কার। অন্য সব জগতও যে দেখতে ইচ্ছে যায়, দেখিও।

রোজ বৈকালে কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে; মেঘ হয়, রোজ, রোজ। ঠিক তিনটা বেলা বাজতে না বাজতে মেঘ উঠবে, ঝড়ও উঠবে। আর সমস্ত আমবাগানের তলাগুলো ধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরে যায়—সলতে-খাগীতলা*, তেঁতুলতলা, শ্যামাচরণদাদাদের বাগানটা, নেকো, পটুলে, বাঁশতলী—সমস্ত বাগানে যাতায়াতের ধুম পড়ে গিয়েচে—।

সেদিন ঘনমেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার সবাই—স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বালকেরা ধামা হাতে আম কুড়ুচ্চে দেখে আমার চোখে জল এল। জীবনে ও-ই এদের কত আনন্দের, কত সার্থকতার জিনিস।...একটা ছেলে বলচে—ভাই—ওই দোম্‌কাটায় মুই যদি না আসতাম, তবে এত আম পেতাম না!...

কাল সাতবেড়ে মেয়ে দেখতে যাবো।...

সারা গ্রামটাতে বিল্বগাছের ফুলের কি ঘন সুগন্ধ!...অশ্বত্থতলায়, যেখানে সেখানে এত বেলের গাছও আমাদের এখানে আছে!

কাল সাতবেড়ে গ্রামে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এলাম। শশী বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ি খুব আহার হল। গ্রামখানিতে সবই চাষা লোকের বাস, ভদ্রলোকের বাস তত নেই, তবে সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। মাটির-ঘরগুলো সেকেলে ধরনের, কোনো নতুন আলো এখনও ঢোকে নি বলে সেখানের অকৃত্রিম আবহাওয়াটা এখনও আছে। ফণি কাকা ও আমি দুজনে দক্ষিণ মাঠের দায়েমের পুকুরের ধার দিয়ে বেশ ছায়ায় ছায়ায় বৈকালের দিকে চলে এলাম। নফর কামারের কলাবাগানে কামারবুড়ি কি ফলমূল ও কাঁকুড় নিয়ে আসচে দেখলাম। হরিপদ দাদার স্ত্রী বাগানে আম পাড়াচ্চেন।

আজকাল রোজ বৈকালেই মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি হওয়ার দরুন কুঠির মাঠে একদিনও বেড়াতে যাওয়া হয় না। রোজই কালবৈশাখী লেগে আছে। সুন্দর বৈকাল একদিনও পেলাম না। তিনটা বাজতে না বাজতেই রোজ জল আর ঝড়।

আজও সকালে নদীতে স্নান করে এলুম। কি সুন্দর যে মনে হয় সকালে স্নানটা করা, স্নিগ্ধ নদীজল, পাখীর কলকাকলী, মাছের খেলা, নতশীর্ষ গাছপালা, নবোদিত সূর্যদেব।

আজ বেড়াতে গেলুম বৈকালে কাঁচিকাটার পুলটাতে। সকালে অনেকক্ষণ চেয়ার পেতে ওদের বেলতলাটায়, বসেছিলুম, সেখানে কেবল আড্ডাই হল। বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে তখন গেলাম ঠাকুরমাদের বেলতলাটায়, ফিরচি একজন লোক জটেমারীর কুঠি খুঁজচে, আমাদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে। তারপর নিজে গেলাম বেলেডাঙার পুলটায়। একখানা

*'পথের পাঁচালী'তে এই আমগাছটির উল্লেখ আছে।

যেন ছবি, যখন প্রথম অশ্বত্থতলার পথটা থেকে ওপারের দৃশ্যটা দেখলাম—এ রকম অপূর্ব গ্রাম্যদৃশ্য ক্বচিৎ চোখে পড়ে। বেলেডাঙা গ্রামের বাঁশবনের সারি নদীর হওয়ায় মাথা দোলাচ্চে, কৃষক-বধূরা জল নিতে নামচে বাঁওড়ের ঘাটে। দুপারে সবুজ আউসের ক্ষেত, মজুরেরা টোকা মাথায় ক্ষেতে ক্ষেতে ছাটার কাজ করচে, ছোট ডোঙ্গা চেপে কেউবা মাছ ধরতে বেরিয়েচে—যেন ওস্তাদ শিল্পীর আঁকা এক অপূর্ব ভূমিশ্রীর ছবি।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথায় মোট নিয়ে পাঁচপোতা থেকে ফিরচে—গোঁসাইবাড়ির কাছে বাসা করেচে বললে—নাম বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়। দেখে ভারী কষ্ট হল—একা ভাগ্যহীন, অসহায় মানুষ। বললে, শীতলা ঠাকুর নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়াই—যে যা দেয়, তাতেই চলে। বাড়িতে এক ছোট ছেলে আছে, ও দুটি মেয়ে।

বসে বসে অনেকক্ষণ হাওয়া খেলুম, সঙ্গে সঙ্গে কত দেশের জীবনধারার কথা, বিশেষ করে যারা দুঃখ পেয়েচে তাদের কথাগুলো বড় বেশী করে মনে হল। ভরতের মা দিন-রাত দুঃখ করচেন, তাঁর দুঃখ শুনে সত্যি মনে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে জগতের এত আনন্দ-ধারার এক কণাও এরা পাচ্চে না—হয়তো শুধু দেখবার চোখ নেই বলেই।

ফিরবার পথটি আজ এত ভাল লাগল, ওরকম কোনো দিন লাগে না—ডাঁশা খেজুর ও নোনা ডালে ডালে দুলচে—এত পাখীর গানও এদেশে আছে!…কুঠির মাঠটা যে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে—ইতস্তত: প্রবর্ধমান গাছপালা বনঝোপের সৌন্দর্যে বিশেষ করে যেখানে সেখানে, যেদিকে চোখ যায়— ল-ভরা সোঁদালি দোলায়িত। আকাশের রঙটা হয়েচে অদ্ভুত—অপূর্ব নির্জনতা শুধু পাখীদের কল-কাকলীতে ভগ্ন হচ্চে—কেউ কোনো দিকে নেই— ধূসর আকাশতলে গভীর শান্ত ও ছায়ার মধ্যে কেবল আমি ও মুক্ত উদার প্রকৃতি।

কি অপূর্ব আনন্দেই মন ভরে যায়, কত কথাই মনে ওঠে, সাধ্য কি কলকাতায় থাকলে এ সব কথা মনে উঠতে পারে!…

তারপর ওপাড়ার ঘাটটিতে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে নেমে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্যামল, ধূসর বৃক্ষশ্রেণী, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, স্বচ্ছ নদীজল—মাথার ওপরে সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি উঠেচে, ওদিকে চেয়ে কত শত নক্ষত্রমণ্ডলী, বিভন্নমুখী নক্ষত্রস্রোত, অন্য অন্য নীহারিকাদের জগতের কথা মনে হল। বৃহৎ এণ্ড্রোমিডা নীহারিকাদের জগৎ। এই সামান্য, ক্ষুদ্র গ্রহটাতে যদি অস্তিত্বের এত বৈচিত্র্য, এত সরসতা, এত সৌন্দর্য—তবে না জানি সে-সব বিশ্বে কি অপরূপ আনন্দস্রোত!…

সব দুঃখের একটা সুস্পষ্ট অর্থ হয়। জীবনের একটা মহান্, বিরাট অর্থ, একটা সুস্পষ্ট রূপ মনের চোখে ফুটে ওঠে। নির্জন স্থান ভিন্ন, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ভিন্ন,—এ আনন্দ কি সম্ভব?…

…সন্ধ্যার পরে আমি, সইমা, ন'দি অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। আজকার রাতটা কালকার মত গরম নয়, শেষ রাত্রে মেঘ করার দরুন বেশ ঠাণ্ডা। সারারাত লণ্ঠন ধরে ধরে

লোকেরা ও ছেলেদের দল আমাদের বাড়ির পিছনের ঘন জঙ্গলের ওপারের বাগানগুলোতে আম কুড়িয়েচে, সারা রাতটি।

কি সুন্দর বৈকালটি কাল কাটালো যে! কুঠির মাঠে অনেকক্ষণ বসে; পরে নদীজলে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্নান করতে নামা গেল। এত অপূর্ব ভাব এল মনে, ঠাণ্ডা নদীজল, ছিপি-শেওলার পাতার ধারে দাঁড়িয়ে, ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশ ও শ্যামল গাছগুলোর দিকে চোখ রেখে শুধু এদের পিছনে যে বিরাট অবর্ণনীয় শক্তি জাগ্রত আছে, তার কথাই বার বার মনে আসছিল। স্বচ্ছ জলের ভেতরে মাছের দল খেলা করচে—একটা ছোট মাছ তিড়িং করে লাফিয়ে শেওলার দামের গায়ে পড়ল। নদী জলের আর্দ্র, সুগন্ধ উঠচে—ওপারে মাধবপুরের পটোলের ক্ষেতে তখনও চাষারা নিড়েন দিচ্চে—বাদাম গাছের মাথায় একটা নক্ষত্র উঠেচে। সারাদিনের গুমটের পর শরীর কি স্নিগ্ধই হল।···

শেষ রাত্রে বেজায় গুমোট গরমে আইঢাই করচি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি এল। ন'দি, জেলি, বুড়ি-পিসিমা, জেলে পাড়ার ছেলেরা অমনি আম কুড়ুতে ছুটল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠন জেলে সব ছুটল চাটুয্যে বাগানের দিকে। জেলির মা চেঁচিয়ে পিছু ডাকাতে জেলি আবার এল ফিরে।···

সকালটার সিঁদুরে মেঘে অপরূপ শোভা হয়েছিল। পরশু বৈকালটিতে এই রকমই সিঁদুরে-মেঘ করেছিল—আমি সেটা উপভোগ করতে পারি নি, গোপালনগরের হাটে গিয়েছিলাম।

আজ প্রায় বাইশ বছর পরে ভাণ্ডারকোলায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বেলেডাঙার মাঠে যে অদ্ভুত মনের রূপ ও প্রকৃতির রূপ দেখেছিলাম, অমন কখনো দেখি নি। কাঁচিকাটার পুল থেকে ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুড়োর পত্রটা পকেট থেকে পড়চি—প্রমীলা মারা গিয়েচে লিখচে। সামনে অপূর্ব রঙের আকাশটা ঘন হীরাকসের সমুদ্রের মত গাঢ় ময়ূরকণ্ঠী রঙের, পিছনে বর্ণ-সমুদ্র, কোথাও জনমানব নেই—গাছে গাছে পাখীর ডাক, দূরে গ্রামসীমায় পাপিয়া সুর উঠিয়েচে,—জীবনের অপূর্বতা কি চমৎকার ভাবেই···সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হল!···

কাল বৈকালের দিকে বেলেডাঙার বট-অশ্বত্থের পথটা বেয়ে বেড়াবো বলে, কুঠির মাঠের পথটা দিয়ে চললুম সেদিকে—মাঠে পড়েই অবাক হয়ে পশ্চিম আকাশে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলুম। সারা বেলেডাঙার বনশ্রেণীর ওপর ঘন কালো কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘ জমেচে—অনেকটা আকাশ জুড়ে অর্ধচন্দ্রাকার মেঘচ্ছটা—আর তার ছায়ায় চারিধারের বাঁশবন, ঘন সবুজ শিমুল ও বটগাছগুলো, নীচের আউশের ক্ষেত, বাঁওড়—সবটা জড়িয়ে সে এক অপরূপ মূর্তি ধরেচে। বিশেষ করে ছবি দেখতে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েচে এক শিমুল ডালের—তার সোজা মগ্‌ডালটা মেঘের ছায়ায় ও উড়নশীল ঘন কালো-মেঘে ঢাকা

আকাশের পটভূমিতে কোনো দেবশিল্পীর আঁকা মহনীয় ছবির মত অপূর্ব। সেইটি দেখে চোখ আর আমার ফেরে না—কেমন যেন পা আটকে গেল মাটির সঙ্গে, অবশ হয়ে গেলুম, দিশাহারা হয়ে পড়লুম—ওঃ!—সে দৃশ্যটার অদ্ভুত সৌন্দর্যের কথা মনে এলে এখনও সারা গা কেমন করে ওঠে।

তারপরই সাঁ-সাঁ রবে ওপারের দিক থেকে বিরাট ঝড় উঠলো—দৌড়, দৌড়, দৌড়,—হাঁপাতে হাঁপাতে যখন গেঁয়োখালী আমতলাটায় পৌঁছিয়েচি—আমাদের গ্রামের কোলে—তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেচে—জেলি আর প্রিয় জেলের ছেলে আম কুড়ুচ্চে—একটি দরিদ্র যুবককে আগ্রহ সহকারে আম কুড়ুতে দেখে চোখে জল এল। কি দিয়েচে জীবন এদের? অথচ এরা মহৎ, এদের দারিদ্র্যে এরা মহৎ হয়েচে। অতিরিক্ত ভোগে ও সাচ্ছল্যে জীবনের সরল ও বন্ধুর পথটাকে হারায় নি।...

স্নান সেরে এসে বকুলতলার ছায়ায় বসে ওপরের কথাগুলো লিখলাম। মাথার ওপর কেমন পাখীরা ডাকচে—ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল—আর একটা কি পাখী—পিড়িং পিড়িং করে ডাকচে, কত কি অস্ফুট কলকাকলী—কি ভালই লাগে এদের বুলি!...

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম। শিমুল-গাছের এত অপরূপ শোভা তা তো জানতাম না। ঝোপের মাথায় মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্যের ভারে—চারিধারে চেয়ে—এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম-প্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন-বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হল ওদের সঙ্গে কতদিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আতুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুণের,—কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা-পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লীবালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরাজ বালক-বালিকার, গাং-চিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—Cape Wan-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরে-নি—কত কি, কত কি।

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত—শান্ত সন্ধ্যা—কেউ নেই ঘাটে, ওপারের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেচে—একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর—কোনো অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের ঊর্ধ্বে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলচে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি, ইসমাইলপুর, ভাগল-পুর, আজমাবাদ—কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না—বিশেষ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন বৈকালগুলি—যেদিন সূর্য অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোকটুকু পর্যন্ত বড় গাছের মগ্ডালে হালকা সিঁদুরের পোঁচের মত দেখা যায়—সেদিনের বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা-আলো, ডাঁসা

খেজুর ও বিল্বপুষ্পের অপূর্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরনের পাখী-ডাকা, মিষ্ট সে বৈকালগুলিতে এমন সব অদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়, দু-একটা পাখী ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে—কি উদাস, করুণ হয়ে ওঠে তখন চা[illegible]কের ছবিটা, বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুমাদের বেলতলাটায় গিয়ে খ[illegible]নকক্ষণ বসেছিলাম, তখন—তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, কিন্তু এখনও বিল্বপুষ্পের গন্ধ সর্বত্র, পাখীর ডাকের তো কথাই নেই—সোঁদালিফুল এখনও আছে, তবে পূর্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আসবার পথে লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্চে।

এ সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম, যত স্থানে বেড়িয়েচি, আনন্দ সবচেয়ে বেশী গাঢ় ও উদাস ভাবে আমি পাচ্চি শুধু এই এখানে—কোনো Cosmic thoughts আটকায় না, বরং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়—খুব ভাল করে ফোটে। তবে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানে কোনো শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখলুম। বিকেল হতে না হতে কেবল মন আন্‌চান্ করে—রাত্রিতে কাজে মন বসে না—এ যেন Land of Lotus-eaters, কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্চি দু-একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলো একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখীর ডাকে ভরপুর, আর বৈকাল তো ওইরকম স্বর্গীয়, অপরূপ, এ পৃথিবীর নয় যেন—তবে আর লিখি কখন?

মনে মনে তুলনা করে দেখলুম এ ধরনের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখি নি—এই তো পাশেই চালকী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে নেই, এ ধরনের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই, বনজঙ্গল বড় বেশী, কাজেই অন্ধকার—এমন চাপা আলোটা হয় না—এ একটা অপূর্ব সৃষ্টি, এতদিন তত লক্ষ্য করি নি, কাল লক্ষ্য করে দেখে মনে হল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখি নি তো! দেখবোও না—কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইলপুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে—সে অন্য ধরনের প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও কারুকার্য কম—বিপুলতা বেশী, প্রখরতা বেশী।

ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরনের পাখী, বিশেষ ধরনের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরনের গাছপালা থাকাতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরনের বৈকাল সম্ভব হয়েচে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড় সম্পদ, মাঠে, বনে ওর ঝাড় যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়—বনদেবীর সাজির একটা অযত্নচয়িত বনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয়—এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেচে—তা আর কোনো ফুলে দেখলাম না।

এই সুন্দর দেশে বাস করেও যারা মানসিক কষ্ট পাচ্ছে, আমার সইমার মত—তাদের সে কষ্ট সম্ভব হচ্চে শুধু অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জন্য। মনের সাহস এদেশটা হারাতে বসেচে—

কল্পনার উদারতা নেই, সুদৃঢ় বিস্তীর্ণতা নেই—দৃষ্টি সেকেলে ও একপেশে, তার ওপর মনের মধ্যে জ্বলে নি জ্ঞানের বাতি। এত করে সইমাকে বোঝাই, সে শিক্ষা সইমা নেয় না, নিতে পারবেও না—কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝার প্রচলিত কতকগুলা False Philosophy এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদের মনের সর্বনাশ করেচে। জীবনের সহজ দর্শন এদের নেই, বুড়ো বয়সেও ভাল করে এখনও চোখ ফোটেনি—কি করা যায় এদের জন্যে, সর্বদাই সে কথা ভাবি। শিক্ষা দ্বারা মানুষ নিজেকে নিজে পায়, এইটাই জীবনের বড় লাভ। ভগবানকে পাবার আগে নিজেকে লাভ করা যে আবশ্যক তা এরা ভুলে গিয়ে শুধু ভগবান, ভগবান বলে নাকে কাঁদতে থাকে, নিতান্ত দুর্বল জড়মতির মত। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এ কথা এরা শোনেও নি কোনোদিন।

সারা পল্লী-অঞ্চলগুলো এমন হয়ে আছে, এদের দুঃখ দূর করতে গেলে তো জঙ্গল কাটালে হবে না, মশা তাড়ালেও হবে না (সেটা যে অনাবশ্যক, তা আমি বলচি না) মাসিক কিছু অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করলেও হবে না—এর জন্যে চাই জ্ঞানের আলো—উদার, বিপুল, দীপ্ত জ্ঞানের সার্চ লাইট।

আজ অনেকক্ষণ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। সেকালের অনেক কথা হল। ওই সবই আমার জানবার বড় ইচ্ছে। ঠাকুমাদের চণ্ডীমণ্ডপের ভিটাতে দুর্গোৎসব হত, বড় উঠোন ছিল—আন্নাপিসি দুবেলা গোবর দিতেন, খুব লোকজন খেত—নারকেল গাছের পাশে ওই যে সুঁড়ি গলিটা ওইটা ছিল খিড়কির দোর—মেটে পাঁচিল ছিল ওদিকটা। গোলক চাটুয্যে ছিলেন বাবার মামাতো ভাই—পিসিমার মা ছিলেন ব্রজ চাটুয্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুয্যের মেয়ে। প্রসঙ্গত বলা যাক যে আজই রাখালী পিসিমার মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেল। যাবো যাবো করে আর ঘটে উঠল না। পিসিমার শ্বশুরবাড়ি ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ রাখালী পিসিমার ভাই, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল—কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে। সইমাদের বাড়িতে আসার সময় ওই পথটাতে প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ নাকি ছিল—তার তলায় অনেক লোক বসতো। হরি ঠাকুরদাদা তাঁর মাকে খেতে দিতেন না, মায়ের সঙ্গে ভিন্ন ছিলেন, তাঁর দেওর গোঁসাই-বাড়ি ঠাকুর পূজো করে দু-পাঁচ টাকা যা জমাতো, তাই দিয়ে দরিদ্র বৃদ্ধাকে ধান কিনে দিয়ে যেতো।

বৈকালে নলে জেলের নৌকাতে বেড়াতে গেলুম, মোল্লাহাটির দিকে। ছ'টার সময় আমাদের ঘাট থেকে নৌকাখানা ছাড়া হল। নদীর দুধারে অপরূপ শোভা, কোথাও বাবলা গাছ ফুলের ভারে নত হয়ে নদীর ধারে ঝুঁকে আছে, দুধারে ঘাস-ভরা নির্জন মাঠ, ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, গাঙ্ শালিকের দল কিচ্-কিচ্ করচে, বাঁ ধারে ক্রমাগত জলের ধারে ধারে নলবন, ওকড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ—মাঝে-মাঝে চাষীদের পটোল ক্ষেত, বেলেডাঙার ঘোষেরা যে নতুন ক্ষেতটাতে পটোল করেচে, তাতে টোকা মাথায় উত্তুরের মজুরেরা নিড়েন দিচ্ছে, ওদিকে কুমড়োর ক্ষেত—ঢালু সবুজ ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁয়ে আছে, গরু

চরছে, বাঁকের মোড়ে দূরে খাব্‌রাপোতা গ্রামের বাঁশবন, সুবৃহৎ lyre পক্ষীর পুচ্ছদেশের মত নতুন বাঁশের আগা—একটু একটু রোদ মাখা। নদীজলের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বেরুচ্চে, মাথার ওপরকার আকাশ ঘন নীল, কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে গ্র ীমায় শিমুল, কদম গাছের মাথায় মাথায় অপরূপ মেঘস্তূপ, মেঘের পর্বত—মেঘের গিরি ন্ধ্রের ফাঁকটা দিয়ে অস্তসূর্যের ওপারের দেশের খানিকটা যেন দেখা যায়।

খানিকটা গিয়ে একধারের পাড় খুব উঁচু, বন্য নিমগাছের সারি, পাড়ের ধারে গাঙ্‌ শালিকের গর্ত, নীল মাছরাঙা পাখী শেওলার ধারে ধারে মাছ খুঁজতে খুঁজতে একবার ওঠে, একবার বসে—খেজুরগাছ, গাবভেরাণ্ডা, বৈঁচি, ফুলে ভর্তি সাঁই-বাবলা, আকন্দের ঝোপ, জলের ধারের নলবন, কাশ, ষাঁড়া, নোনা, গুলঞ্চলতা-দোলানো শিমুল গাছ, শালিক পাখী, খেঁকশিয়ালী, বাঁশঝাড়, উইঢিবি, বনমূলোর ঝাড়, বকের দল, উঁচু ডালে চিলের বাসা, উলুঘাস, টোপাপানার দাম। সামনেই কাঁচিকাটার খেয়াঘাট, দুখানা ছোট চালাঘর, জনকতক লোক পারের অপেক্ষায় বসে—ডানধারের আকাশটায় অপূর্ব হীরাকসের রঙ ধরেচে—গাঢ়, নীল।

আবার দুপাড় নির্জন, এক এক স্থানে নৌকা তীরের এত নিকট দিয়ে যাচ্ছে যে কেলেকোঁড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। বেলা আরও পড়ে এল, চারিদিকে শোভা অপরূপ, লিখে তা প্রকাশ করা যাবে না, ডাইনে ঘন সবুজ ঘাসের মাঠ, বামে আবার উঁচু পাড়, আবার বাবলা গাছ, শিমুলগাছ, ষাঁড়া গাছ, পাখীর দল শেষ-বেলায় ঝোপে ঝোপে কলরব করচে—দূরে গ্রামের মাথায় মেঘস্তূপটা পেছনে পড়েচে—এক এক স্থানে নদী-জল ঘোর কালো, নিথর কলার পাতার মত পড়ে আছে—দেখাচ্চে যেন গহন, গভীর, অতলস্পর্শ। বাঁকটা ঘুরেই অনেকখানি আকাশ এক সঙ্গে দেখা যাচ্চে, পশ্চিম আকাশের কোলে যেন আগুন লেগেচে—অনেকখানি দূর পর্যন্ত মেঘে, আকাশে, গাছের মাথায় মাথায় যেন সে আগুনের আভা, খাব্‌রাপোতার ঘাটের পাশে কোন দরিদ্র কৃষক-বধূ জলের ধারের কাঁচড়াদাম শাক কোঁচড় ভরে তুলচে আর মাঝে মাঝে সলজ্জভাবে আমাদের নৌকার দিকে চাইচে।

আরও খানিকদূর গেলাম, আবার সেই নির্জনতা, কোথাও লোক নেই, জন নেই, ঘর-বাড়ি নেই, শুধু মাথার ওপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়াছন্ন আকাশ আর নীচে সেই মাঠ ও গাছপালা দুধারে। বুড়ো ছকু মাঝি ছেলে সঙ্গে নিয়ে দুখানা ডিঙি দোয়াড়ি বোঝাই দিয়ে চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে যাচ্চে, তিন দিনে সেখানে নাকি পৌঁছুবে বললে। একদিকে ঘন সবুজ কাঁচা কষাড়ের বন, নীচু পাড়, জলের খানিকটা পর্যন্ত দাম-ঘাসে বোঝাই, কলমী শাক অজস্র, আর কলমীর দামে জলপিপি ও পানকৌড়ী বসে আছে। মাথার ওপরকার আকাশটা বেয়ে সবাইপুরের মাঠটার দিক থেকে খুব বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখী বাসায় ফিরচে, বোধ হয় জটেমারির বিল থেকে ফিরলো, পাঁচপোতার বাঁওড়ে যাবে। সেইখানটাতে আবার নলে মাঝি কাস্তে হাতে ঘাস কাটতে নামলো—কি অপরূপ শোভা, সামনে খাব্‌রাপোতার ঘাটটা—একটা শিমুল গাছের পিছনে আকাশে পাটকিলে রঙের মেঘদ্বীপ, চারিধারে এক অপূর্ব শ্যাম-লতা, কি শ্রী, কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, কি অপূর্ব আনন্দেই মন ভরিয়ে তোলে—নলে কাস্তে

হাতে ঘাস কাটচে—কাঁচা কষাড়ের মিষ্ট, সরস, জোলো গন্ধ বার হচ্চে, আমি শুধু হেলান দিয়ে বসে দূরের আকাশটা ও গাছপালার দিকে চেয়ে আছি।

জীবনটাকে উপভোগ করতে জানতে হয়। মাত্র আট আনা খরচ হল—তাই কি? তার বদলে আজ বৈকালে যে অপূর্ব সম্পদ পেলাম, তার দাম দেয় কে? আমাদের গ্রামের কেউ আসতো পয়সা খরচ করে খামোকা নৌকায় বেড়াতে? কেউ গ্রাহ্য করে এই অপরূপ বনশোভা, এই অস্তদিগন্তের ইন্দ্রজাল, এই পাখীর দল, এই মোহিনী সন্ধ্যা?···কেউ না। এই যে সৌন্দর্যে দিশাহারা হয়ে পড়চি, মুগ্ধ, বিস্মিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচি—এই সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা কেউ চোখ খুলে চায়? ··আমি এসব করি বলে হয়তো আমাকে পাগল ভাবে।···

যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য-বোধ দিন দিন এত কমে যাচ্চে, সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়। শহর-বাজারের কথা বাদ দিলাম, এই সব পাড়াগাঁয়ে যেখানে আসল জাতিটা বাস করে, সেখানকার এই কুশ্রী জীবনযাত্রার প্রণালী, দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা, এই শিল্পবোধের অভাব মনকে বড় পীড়া দেয়।

এবার জ্যোৎস্না উঠলো—আজ শুক্লা একাদশী, নলবন বাতাসে দুলচে, জ্যোৎস্না পড়ে দুপাশের নদীজল চিক্-চিক্ করচে। ঘাসের আঁটি বেঁধে নিয়ে নলে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

এত পাখী, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব সৌন্দর্য এ সব যেন আমারই জন্যে সৃষ্ট হয়েচে। এদেশেই তো এসব ছিল এতদিন, কেউ তো দেখে নি, কেউ তো ভোগ করে নি—কতকাল পরে আমি এদের বুঝলাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম—এই জ্যোৎস্না, এই আকাশ, এই অপূর্ব ইছামতী নদী আমারই জন্য তৈরি হয়েচে।

অনেক দিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এই রৌদ্রদীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু-ডাকা বনানী, উষ্ণমণ্ডলের এই অপূর্ব বন-সম্পদ, স্বচ্ছ জলের মধ্যে সন্তরণশীল মৎস্যরাজি, নির্মেঘ নীল আকাশ—আমার শিরায় শিরায় কেমন একপ্রকার মাদকতার সৃষ্টি করল।

একটি ছেলের ছবি মনে এল—সে এমনি Tropics-এর শ্যামল সৌন্দর্য, রৌদ্রকরোজ্জ্বলা পৃথ্বী, নীল দিক্‌চক্রবালের উদার প্রখরতার মধ্যে এই জলধারা পান ক'রে, দিনরাত গায়ক পাখীদের কাকলী শুনে শৈশবে মানুষ হয়েছিল—গ্রামের কত দুঃখ-দারিদ্র্য, কত বেদনা, কত আনন্দ, কত আশা, কত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। সে মানুষ হয়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছপালা, লতা, পাখী, ফুলফল, সূর্য—এদের,—এরাই তাকে কবি করেছিল।

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়ে এলুম—তারপর গেলুম জটেমারির প্লটাতে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর এক বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, এমন এক অপূর্ব আনন্দে মন ভরে উঠল, সারা গা এমন শিউরে

উঠল—সে পুলকের, সে উল্লাসের তুলনা হয় না—গত কয়েক মাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ওরকম আনন্দ পাই নি।

আজ চলে যাবো, তাই বিদায় নিলুম—বিদায় জ্যাঠামশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইছামতী, আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না, আর দেখা হবে কিনা তাও জানি না, কিন্তু তোমার ফলে জলে পুষ্ট হয়েচি, তোমার অপরূপ সৌন্দর্যে এমন স্বপ্ন-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিলে দশ বৎসরের বালকের চোখে, তোমার গাছপালার ছায়াতলে, তোমার পাখীর কল-কাকলীতে জীবন-নাট্যের অঙ্ক শুরু, বিদায়, বিদায়—যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুলবো ?···

মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্চে, হয়তো দু হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ঈজিপ্টে, যেখানে নলখাগ্ড়ার বনে, শ্যামল নীল (Nile) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবদের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে আবার যাটটি বছরের জন্যে এসেচি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই-বোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে ? এই Cycle of Birth and Death যিনি নিয়ন্ত্রিত কর্চ্চেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি—তিনি এক বড় শিল্পী। এই সকল জন্মের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়তো কোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়বে—সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা।

কে জানে যে আবার এ পৃথিবীতেই জন্মাবো। ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথায় সবে উঠেচে—ওর চারি পাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘুরেচে, তার জগতে যেতে পারি—বহু বছরের Globular cluster-দের জগতে যেতে পারি—কে বলবে এসব শুধুই কল্পনা-বিলাস ? এ যে হয় না তা কে জানে ? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব—বৃহত্তর জীবন-চক্র যুগে যুগে কোন অদৃশ্য দেবতার হাতে এ ভাবেই আবর্তিত হচ্চে।

শত শত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ—জয় হউক সে দেবতার, তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ময় হউক, নিত্যসৃষ্টি জায়মান হউক—তাঁর প্রাণ-চক্রের নিত্য আবর্তনশীল বিশাল পরিধিতে।

গুন্‌গুন্ করে বানিয়ে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল :—

'গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে
হে অজানা অনন্ত—'

নিজেকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় স্রষ্টা।

হঠাৎ সারা দেহ এক অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল—ওপারে মাধবপুরের বটগাছের সারি, বেলেডাঙার গ্রামের বেণুবনশীর্ষ সান্ধ্য বাতাসে দুলচে, আউশধানের ক্ষেতের আইল-পথ বেয়ে

কৃষক-বধূ মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসচে, আইনদ্দি মোড়লের বাড়ির মাথায় শুক্রতারা উঠেচে—মনে হল আমি দীন নয়, দুঃখী নয়, ক্ষুদ্র নয়, মোহগ্রস্ত জড় মানব নয়, আমি জন্ম-জন্মান্তরের পথিক-আত্মা। দূর থেকে কোন সুদূরে নিত্য নূতন পথহীন পথে আমার গতি—এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, এই সহস্র সহস্র শতাব্দী—আমার পায়ে চলার পথ, নিঃসীম শূন্য বেয়ে সে গতি আমার ও সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হোক।

মনে হল আর এক আজন্ম পথিক-দেবতার কথা, তাঁর কথা আমার এক খাতায় লিখেচি। আমার সে কল্পনা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার দৃষ্টিতে আমি তা দেখেচি, আমার কাছে সেটা মহাসত্য—revealation, চিন্তা ও কল্পনার আলোকে যা দেখা যায়—তাকে আমি মিথ্যা বলে ভাবতে পারি না।

বিদায়, বিদায়—আর কখনো অজয়ের সঙ্গে দেখা হল না, গুরুজীর সঙ্গে দেখা হল না, কথক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল না, দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হল না—অনেকদিন পরে অজয়ের সেই শৈশবে-শোনা গানটা যেন কোথায় বসে গাচ্চে মনে পড়ে।

'চরণ বৈ মধু বিন্দতি' চলা-দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।

দেশে থেকে এসে আজ একেবারেই ভাল লাগচে না। বৈকালগুলির জন্যে মন কেমন করচে, কুঠীর মাঠের জন্যে, খুকীর জন্যে, ইছামতীর জন্যে, ফণিকাকার জন্যে—সকলের জন্যেই মন কেমন হয়েচে। ছেলেবেলায় দেশ থেকে বোর্ডিং-এ ফিরলে এমনটি হত, অনেক কাল পরে মানস ইতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

কাল কলকাতাটা যেন নতুন নতুন লাগছিল—যেন এ কোন্ শহর—এর কর্মব্যস্ত চেহারাতে আমিই কেমন অবাক হয়ে গেলাম, আনন্দবাজার পত্রিকার ওই গলিটি, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট সব তাতেই লোকে একটা কিছু করচে—ব্যস্ত, ক্ষিপ্র, ছুটচে, বাস্ থেকে নামচে—দেশের মানুষদের সে মৃতের মত জড়তা, অলস ও কর্মকুণ্ঠতার পরে এসব যেন নতুন লাগল।

দিনটি কাটল বেশ ভালোই। সকালে উঠে সজনীর সঙ্গে গেলুম কাঁচরাপাড়া, সেখান থেকে বড়-জাগুলে হয়ে মরিচা। এত ঘন বন যে কলকাতার এত কাছে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না। সেখানে গিয়ে ঔষধ সংগ্রহ করে কাঁচরাপাড়ায় এলাম। বাস রিজার্ভ করে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আসা গেল কাঁচরাপাড়া মাঠের মধ্য দিয়ে মোহিত মজুমদারের কাছে। মোহিতবাবু শোনা গেল শা'গঞ্জ গিয়েছেন। কাঁচরাপাড়া বাজারে একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে বাসে করে এলুম হালিসহর খেয়াঘাটে। এই ঘাটে অনেক[illegible] আগে দিদিমা থাকতে একবার সর্বপ্রথম এসেছিলুম, কেওটা হালিসহরে থাকতে।

[illegible]বাবুর ওখানে খাওয়া-দাওয়া হল, অনেকক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ করে বর্তমান

তরুণ-সাহিত্য সম্বন্ধে কথাবার্তা হল। ভদ্রলোক প্রকৃত কবি, সাহিত্যই দেখলুম ওঁর প্রাণ, কবিতা পড়তে বসে যখন ছেলেমেয়েরা তাঁর কোল থেকে টানাটানি করে রসগোল্লা খেতে লাগল—তখন সে কি দৃশ্যই হল!

বেরিয়ে আমি আর মোহিতবাবু কেওটায় প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় খুঁজতে খুঁজতে গেলুম। সে জায়গাটা এখন একটা পোড়ো ভিটে ও জঙ্গল—কোণের সে জামরুল গাছটা এখনও আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জামরুল গাছটা চেনা যাচ্ছিল না—মোহিতবাবু কাছে গিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এটা জামরুল গাছই বটে। জামরুল পেকে আছে।

তারপর রাখাল চক্রবর্তীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলুম। পুলিন তাঁর ছেলে। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় পড়েচি—এখন ও হট্‌পা লম্বা, কালো গোঁপ-দাড়িওয়ালা মানুষ। ওর সঙ্গে কথা বললুম প্রায় ত্রিশ বছর পরে। শেষ কবে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কে জানে?···

রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতরের রোয়াক দিয়ে ওদের রান্নাঘরের রোয়াকে বসে মাসিমার সঙ্গে কথা বললুম। শেষ কবে কথা বলেছিলাম, কবে ওদের রোয়াকে পা দিয়েছিলাম, হয়তো তখন আমরা কেওটাতে ছিলাম—তারপর হয়তো শীতলের মায়ের গল্পবলা, কি আতুরীর কাছে ধামা-কুলো বেচার ঘটনাটা—যা আমার কেওটা সম্পর্কে মনে আছে, ঘটেছিল। তারপরে এক বিরাট আনন্দ, আলাপ, রহস্য, উল্লাস, দুঃখ, হর্ষ, শোক, আলোক-পূর্ণ—বিরাট জীবন কেটেচে—পটপটি তলার মেলায়, বকুলতলার দিনগুলোতে, পুব-মুখো যাওয়ায়, ইছামতীর ধারের সে অপূর্ব শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি—সেই কতদিন স্কুল থেকে সপ্তাহ পরে ফিরে এসে মায়ের হাতে চৈত্র মাসের দিনে বেলের পানা খাওয়া, তারপর স্কুল কলেজ, বাইরের জীবনে যা কিছু ঘটেচে সবই ওর পরে। কালকার দিনটিতে আবার এতকাল পরে পা দিলাম রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতরকার রোয়াকে বা পুলিনের সঙ্গে কথা কইলাম।

জীবনের অপূর্বত্ব এই সব মুহূর্তে কি অদ্ভুত, অপরূপ ভাবেই ধরা পড়ে যায়।

করুণা মামার বাবা যোগীনবাবু জানলা খুলে কথা কইলেন। তিনি আমাকে খুব চেনেন দেখলাম।

রাত আটটার বাসে হুগলী ঘাট এলাম। খুব পরিষ্কার আকাশ, খুব নক্ষত্র উঠেচে। রাত এগারোটায় কলকাতা ফেরা গেল।

সেই সকাল ছ'টায় বেরিয়ে কোথায় বড়-জাগুলে, মরিচা, দুধারের ঘন জঙ্গল, কাঁচরাপাড়া বাজার, বাঁশের পুল, হালিসহরের খেয়াঘাট, কেওটা, হুগলী ঘাট, নৈহাটী—সব বেড়িয়ে ঘুরে আবার কলকাতা ফিরলাম সাড়ে এগারোটা রাত্রে। মোটর বাস্ ছিল বলেই একদিনে এত ঘোরাঘুরি, এমন সব অপূর্ব অভিজ্ঞতা সম্ভব হল।

রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির পৈটায় বসে মোহিতবাবু 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কেওটায় সেই অশ্বথ্‌ গাছটার কাছে রাত আটটায় সময় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সাহিত্য-

মণ্ডলী গঠনের ও 'শনিবারের চিঠি' অন্যভাবে বার করার জন্য খানিকটা পরামর্শ করা হল। কাজে কতদূর হয় বলা যায় না।

কাল মোহিতবাবু কলকাতায় এসেচেন, সজনীবাবু লিখে পাঠালেন। বৈকালে গেলাম প্রবাসী আপিসে। সেখান থেকে বার হয়ে সকলে মিলে প্রথমে যাওয়া গেল ডঃ সুশীল দে-র বাড়ি। সেখানে ঢাকার বর্তমান হাঙ্গামা ও ইউনিভার্সিটির গোলযোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল। সজনীবাবুর ব্যক্তিগত কথাও অনেক উঠল—অনেকক্ষণ বসে সেখানে হাসি-গল্প হল, বেশ উপভোগ করা গেল—ডঃ দে আমার ঠিকানা চাইলে বিপদে পড়লুম—এ বাসাটা যদি বদলাই তবে, বদলে ফেললে এ ঠিকানাটা দিয়েই বা লাভ কি ?

সেখান থেকে বার হয়ে সবাই গেলাম কবি যতীন বাগচীর বাড়ি। মনোহরপুকুর রোড তো প্রথমে খুঁজেই বার করা দায়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জ এ্যাভিনিউ বেয়ে আমরা রাত ন'টার সময় একবার এদিক, একবার ওদিক—সে মহামুস্কিল। অনেক কষ্টে রাত দশটার সময় বাড়ি বেরুল। যতীনবাবু আমাদের দেখে খুব খুশী হলেন। মোহিতবাবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ; বললেন, 'অল্পদিনের মধ্যেই ইনি যশস্বী হয়ে উঠেচেন একখানা বই লিখে, luck আছে বলতে হবে।' আমি মনে মনে খুব খুশী হয়ে উঠলাম, যা-ই বলি। তারপর জল-টল খাওয়ার পরে সেখান থেকে অনেক রাত্রে বাসায় ফেরা গেল।

আজও আবার তাই। প্রথমে কেদারবাবুর সঙ্গে এশিয়াটিকদের অকর্মণ্যতা নিয়ে খানিক তর্ক-বিতর্ক হল। উনি বললেন, 'কেন, জঙ্গিস্ খাঁ কি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি ?' আমি বললুম—সেটা one man show মাত্র, কোনো স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন কি ? ...প্রবাসী আপিস থেকে আমরা গেলুম অমল হোমের বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজব ও কবিতা আবৃত্তি হল। অমল হোমের স্ত্রী বললেন, 'একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, আপনার 'অপরাজিত' পড়ে—আমি তাঁকে ডাকি,—কালোর ঘরেই আছেন।'

মেয়রের নির্বাচন সম্পর্কে অনেকগুলো নতুন কথা শুনলাম অমল হোমের মুখে—যতীন সেনগুপ্ত এবার মেয়র না হলে অনেকে দুঃখিত হবে বটে, কিন্তু মেয়র হলে লোকে তার চেয়েও দুঃখিত হবে। বাইরে চেয়ে দেখলাম আকাশে মেঘ করেচে—অনেকটা দূরের আকাশও দেখা যায়—দূরের কথা, দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এঁরা বেশ শিক্ষিতা মেয়ে, ধরণ-ধারণ এত মার্জিত ও মধুর যে এঁদের সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের—সইমা কি বুড়ি পিসিমা—এদের তুলনা করে হতাশ হতে হয়। একটা ভাঙা কুঁড়া এক জায়গায় বসানো ছিল, বেরুবার সময় পায়ে এমন লাগল। ..

সেখান থেকে এলাম সুরেশবাবুর বাড়ি। সেখানে হেম বাগচী ও সুবল বসে আছে। সুরেশবাবুর স্ত্রী চায়ের উদ্যোগ করতে আমরা নিবৃত্ত করলাম—কেননা এইমাত্র অমল হোমের বাড়ি থেকে আমরা চা, পাঁপর ভাজা, বাদাম ভাজা ও রসগোল্লা খেয়ে আসচি। ফরাসী কবি

বোদ্‌লেয়ার সম্বন্ধে খানিকটা কথাবার্তা হল, মোহিতবাবু একটা লেখা পড়লেন—তারপর আমরা সবাই এলাম চলে। মোহিতবাবুর আবৃত্তি কি সুন্দর!

কি সুন্দর সন্ধ্যাটা কাটল!

আজ সকালে ধূর্জটিবাবু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে গল্পগুজবের পর আসাম মেলে রাণাঘাট এলাম ও সেখান থেকে সাড়ে তিনটার ট্রেনে দেশে এলাম। হাজারির মোটরটা দাঁড়িয়েছিল, সহজেই বাজার পর্যন্ত আসা গেল।

এসেই কাপড়-চোপড় ছেড়ে গামছা নিয়ে নদীতে গা ধোবার জন্য গেলাম। ভারি সুন্দর বৈকাল, আকাশের রঙ এমন সুন্দর শুধু বর্ষাকালেই হয়। গাছপালার রঙ কি সবুজ—রৌদ্রের রঙটা কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের, কুঠীর মাঠে গেলাম—সেই শিমুলগাছটার গায়ে কি সুন্দর রৌদ্রই পড়েচে—চারি ধারে আকাশের রঙে বড় মুগ্ধ করলে।

আমাদের ভিটার পাশে যে গাছটা আছে, তার গায়ে খানিকটা হলদে রঙের রোদ লেগে দেখতে হয়েচে অদ্ভুত।

মাঠের চারিধারে সবুজ গাছপালা, আউশ ধানের সবুজ ক্ষেত, সুনীল আকাশ, এখনও বৌ-কথা-ক' ডাকচে—খুব ডাকচে। সোঁদালি ফুল এখনও কিছু কিছু আছে।

কাল বৈকালে প্রথম গেলাম সুবলবাবুদের বাড়ি বাগবাজারে, সেখানে খানিকক্ষণ গল্প-গুজবের পরে বিভূতিদের ওখানে গেলাম। বাগবাজার ট্রামে আসবার সময়ে মনে ভাবছিলাম সাতাশ বছর আগে এই বর্ষাকালে, তবে বোধহয় এর আরও কিছু পরে—এই জায়গাটি দিয়ে ট্রামে করে যেতুম বাবার সঙ্গে। তখন আমি নিতান্ত বালক, আর আজ কেবলই মনে হচ্চে এই সময়ের পরে কলকাতা ছেড়ে দেশে গিয়ে সে কি অপূর্ব জীবন-যাত্রা। কি বৈচিত্র্য! সে শুধু অনুভূতিতে ভরা—নানা ধরনের বিচিত্র বাল্য অনুভূতি!...আসল জীবনটাই তো হল এই অনুভূতি নিয়ে, পুলক নিয়ে, উচ্ছ্বাস নিয়ে। আজও সেই গ্রাম আছে, নদী আছে, কিন্তু সে অপূর্ব অনুভূতি আর নেই।

বিভূতিদের বাড়ি থেকে যখন আসি তখনও কেমন একটা শূন্যতার ভাব, যেন এদের বাড়ির সকলেই আছে—অথচ কি যেন নেই। সবাই কাছে এল, বসলে, গল্পগুজব করলে—কিন্তু কোথায় সেই ভাদ্রমাসের বৈঠকখানা ঘরের দিনগুলা, সেই মক্কা-মদিনা যাত্রী তাকিয়া-বালিশ, সে আনন্দের ঢেউ? Where is that child?...সিধুবাবুও নেই—কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা।

পথে একটা মারামারি হচ্ছিল, পিকেটিং-কারী এক বালককে নাকি পুলিসে খুব মেরেচে, তাই নিয়ে। বাসে করে বায়োস্কোপ দেখতে গেলাম ও সেখান থেকে অনেক রাত্রে এলাম ফিরে।

আজ রবিবাসরের অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আলাপ হল, 'অপরাজিত' তাঁর খুব ভাল লেগেচে বলছিলেন।

আজ ক'দিন থেকে মনে কেমন একটা অপূর্ব ধরনের আনন্দ পাচ্ছি তা বলবার নয়, লিখে প্রকাশ করবার নয়—সে শুধু বুঝতে পারি—বোঝাতে পারি নে।

এইমাত্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দাটাতে একা বসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দু'-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে এই অপূর্ব ভাবটাই মনে আসছিল...আনন্দ মানুষকে এত উচ্চেও ওঠাতে পারে। অমৃত বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে, সত্য বলে মনে হচ্ছিল, বিরাট ও শাশ্বত বলে মনে হচ্ছিল···এক উন্মাদনাময়ী প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি!···মুগ্ধ হয়ে গেলাম...

দু-একটা চরণ গান তৈরি করে গুন্‌গুন্ করে গাইলাম:

মনে আমার রঙ ধরেচে আবার সুরের আসা-যাওয়া,—

আজ ক'দিন থেকেই এরকমটা হচ্চে।

দিনগুলো যে ভয়ানক নিরানন্দ হয়ে উঠেচে একথায় কোনো ভুল নেই। এ শুধু হয়েচে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ভয়ানক খাটুনির জন্যে। অনবরত পরের খাটুনি, নিজের জন্য এতটুকু ভাববার অবকাশ নেই, অবসর নেই, সকাল দশটা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা। মনের অবকাশ মানুষের জীবনের যে কত দরকারী জিনিস তা এই কর্ম-ব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত কর্মঠ, হিসাবী ও সময়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা কিছু বুঝবে কি? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়, ভাল গাড়ি-ঘোড়া চড়ায়—অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে আরও জাগিয়ে নাচিয়ে তোলে—শক্ত করে বাঁচিয়ে রাখে, বেশ সুষ্ঠুভাবে ও কৃতীর সুনামে বাঁচিয়ে রাখে—কিন্তু ভারবাহী চোখে-ঠুলি বলদের থেকে কোনো পার্থক্যের গণ্ডী টেনে দেয় না—জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়,—টাকার গাছের আবাদ। প্রকৃতির শ্যামল বন্য সম্ভার, নীল আকাশ, পাখীর কূজন, নদীর কল মর্মর, অস্ত-দিগন্তের সান্ধ্যমায়া—এ সব থেকে বহুদূরে, এক জনহীন, জলহীন বৃক্ষলতাহীন মরু। এদের দেশ-ভ্রমণেও যেতে দেখেচি ফার্স্টক্লাস কামরায় চেপে, দশদিনের ভ্রমণে দুই হাজার টাকা ব্যয় করে, মোটরে করে যাবতীয় স্থান এক নিশ্বাসে বেড়িয়ে, বিলাতী হোটেলে খানা খেয়ে, হুইস্কি টেনে—সেও ঐ ভেড়ার দলের মত বেড়ানো।

আজ বসে বসে শুধু মনে হচ্ছিল অনেকদিন আগে বাল্যের নবীন মধুর বর্ষার বৈকালগুলি —কি ছায়া পড়তো, কি পত্রপুষ্পের সুগন্ধ বেরুতো কি পাখীর গান হত—জীবনের সম্পদ হল সে সব—এক মুহূর্তে জীবনকে বাড়িয়ে তোলে, বৃদ্ধিশীল করে—আত্মার পুষ্টি ওখানে। ধ্যান অর্থাৎ contemplation চাই, আনন্দের অবকাশ চাই—তবে হল আত্মার পুষ্টি—টাকা রোজগারের ব্যস্ততায় দিনরাত কাটিয়ে দেওয়ার নয়।

মানুষের জীবনে প্রকৃতি একটি মহাসম্পদ, এর সঙ্গে অসহযোগ করলে জীবনটার প্রসারতা কমে যায়, রোমান্স কমে যায়, common place হয়ে পড়ে নিতান্ত।

আমি নিজেই বুঝতে পারি, এই ভাদ্র মাসের ঠিক এই সময়কার ১৯২৭ সালের ডায়েরী-গুলো যদি পড়া যায় তবেই দুই জীবনের আকাশ-পাতাল তফাতটা ভালো করে বোঝা যাবে।

১৯২৫ সালে এই সময়ে বিভূতিকে পড়াতুম মনে আছে, সে এখন কত বড় হয়ে গিয়েছে—এখন আবার অন্য ছেলেদের পড়াই ঠিক এই সময়টিতে, সে-কথা হল আজ। এদের এখানে প্যাক-বাক্সের গন্ধ, ছেলেগুলোও দুষ্টু।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিলুম। একদিন উপেনবাবুকে বলেছিলুম, বাল্যের অমুক দিনটা থেকে যদি জীবন আবার আরম্ভ হত···? আজও তাই ভাবি—জীবনের experience আমাদের খুব বেশী না,—সমৃদ্ধ খুব, একথা বলিতে পারি না, অন্য অনেকের জীবনের তুলনায়। সামান্য একটু ভাগলপুর যাওয়া, সামান্য এক আবেষ্টনী, নতুন ধরনের জীবনের স্পর্শ, বড়লোকের বাড়ি—এই সব। কিন্তু এতেই আনন্দ এত বেশী দিয়েচে যে, এ থেকে এই কথাটাই বার বার মনে হয় যে নির্দিষ্ট পরিমাণের আনন্দ প্রত্যেকের মনেই ভগবান দিয়েচেন, যে কোন জিনিসকে উপলক্ষ করে হোক সেটা ব্যয়িত হবেই হবে।

অনন্ত জীবনে আরও কত অভিজ্ঞতা হবে, সেই কথাই ভাবি। আরও কত উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা, কত অপূর্ব আনন্দের বার্তা!

এ রবিবার দিনটাও একটা ট্রামের সারাদিনের টিকিট বন্ধুর ছেলে তরুকে দিয়ে কিনিয়ে আনালুম শিয়ালদহ থেকে। এদিন বেরোলুম সকাল সাড়ে ছ'টার সময়ে। প্রথমে উপেন-বাবুর বাসা। সেখান থেকে গেলাম ভবানীপুর সোমনাথবাবুর বাড়িতে। খানিকটা গল্প-গুজব করার পরে গেলাম প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি বালিগঞ্জে। তিনি আমার বইখানা পড়ে খুব খুশী হয়ে আমার সহিত পরিচিত হবার ঔৎসুক্য জানিয়েছিলেন, এ কথা সোমনাথবাবু আমাকে লেখেন—তাই এ যাওয়া। তিনি নাকি বলেচেন—In Europe, he could have been a celebrity; কিন্তু এখানে কে খাতির করবে?···তারপর আমার বইখানা সম্বন্ধে প্রমথ-বাবু নানা কথা বললেন—দেখলাম বইখানি খুব ভাল করে পড়েচেন। দুর্গার সিন্দুর-কৌটা চুরি ও সেটা কলসী থেকে বেরুনোর উল্লেখটা বার বার করলেন।

সোমনাথবাবু আমাকে এসে পার্ক সার্কাসে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন—বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে একটা ভারি লাভ হল বলে মনে করচি।'

ওখান থেকে এসে গেলাম রেবতীবাবুদের মেসে—খানিকটা গল্পগুজব করার পরে গেলাম নন্দরাম সেনের গলি ও বাগবাজারে। তারপর হরি ঘোষের স্ট্রীটে কালোদের বাসাতে। দুপুর তখন দুটো, বাইরের ঘরে বুড়ো ছিল, খিনুও এখানে আছে দেখলাম—খিনু কাছে এসে বসলো, অনেক গল্পগুজব করলে। কালোর ছেলে এনে দেখালে। ঠিক যেন মায়ের পেটের বোনের মতো সরল ব্যবহার করলে। ভারি আনন্দ হলো দেখে। ওরা সবাই এল—শরবত করে আনলে খিনু—ভারি ভাল লাগল।

ওখান থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে দক্ষিণাবাবুর বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর জলযোগ হল। চা-পানের পর সেখান থেকে বার হয়ে নিকটেই মহিম হালদার স্ট্রীটে রবি-বাসরের অধিবেশনে যোগ দিলাম—সেখানে বেলা পাঁচটা থেকে রাত ন'টা। অনেক রাত্রে ট্রামে বাসায় ফিরলাম।

আজকাল সেই মধুর দিনগুলি হারিয়ে গেছে—বহুদিন দেশে যাই নি—আজ বিকেলে স্কুলবাড়ির ছাদ থেকে বহুদূরের দিকে চেয়ে কতকাল আগের কথা মনে হচ্ছিল—মনে হচ্ছিল অনেককাল আগের সেই মাকাল ফল, পটুপটি গাছের সময়টা এই—কত নতুন লতাপাতা গজিয়েচে—ভাদ্র দুপুরের খররৌদ্রে জানালার ধারে বসে সে-সব মধুর জীবন-যাত্রার দিনগুলি —কত সুখদুঃখ-ভরা শৈশবের সে জগৎটা।.. কোথায় কতদূরে যে চলে গিয়েচে! আজকাল সময় পাই না, স্কুলের পরই পর পর দুটো ছেলে পড়ানো—একটুখানি ভাববার সময় পাই নে, দেখবার সময় পাই নে, তবু যতটুকু সময় পাই—দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় হাঁ করে যেন আকাশটার দিকে চেয়ে একটুখানি অপরাহ্নকে স্কুলের তেতলার ছাদটা থেকে দেখি—আবার সেই 'জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মাধবী কঙ্কনে'র দিনগুলি আগতপ্রায়। এখন দেশে পাটের আঁটি কাচবে, খুব পাঁকাটি পড়ে থাকবে। সেই জেলেখা, রঙমহাল শিসমহাল, শিবাজীর দিনগুলি আরম্ভ হবে। এই যে অভাব, না দেখতে পাওয়া,—আমাদের মনে হয় এই ভাল। এতে মনের তেজ খুব বাড়ে, দৃষ্টির intensity আরও বেশী হয় এটা বেশ বুঝি।

একটা কথা এই মাত্র ভাবছিলাম, রামায়ণ মহাভারতের যুগের পূর্বে ভারতের বালকেরা, বৃদ্ধেরা কি ভাবতো—তখন জীবনের ভাব-সম্পদ ছিল দীন—সীতার অশ্রুজল তখন ছিল লোকের অজ্ঞাত, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এ সব তো জানতো না। বুদ্ধের কথা বাদ দিলাম, অশোক, চৈতন্য, মোগল বাদশাহ্‌গণ—এই সমস্ত Tragic possibility, ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল লীন—তবে তখনকার লোকে কি ভাবতো,—কবিদের, ভাবুকের, গায়কের, চিত্রকরের উপজীব্য ছিল কী?

আর পাঁচশত বছরের সম্ভাব্যতার কথা মনে উঠচে। আরও কত Tragedyর বিষয়, ভাবুকতার ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এর মধ্যে। সেটা এখনই গড়ে উঠচে, কিন্তু আমরা তার সমস্তটা এক সঙ্গে দেখতে পাচ্চি নে। এই ইংরাজ চলে যাবে একদিন—এই সব স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই গান্ধী, নেহরু, চিত্তরঞ্জন, এই নারী-জাগরণ, কাঁথির এই অশ্রুতীর্থ—ইতিহাসে এসব কথা নব নব ভাবের জন্মদাত্রী হবে। এসব ঘটনা জাতির মনের মহাফেজখানায় অক্ষয় আসনের প্রতিষ্ঠা করবে।

কাল সারা দিনটা খুড় ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটলো—প্রবাসী আপিসে একটা কাজ ছিল। ঠিক বেলা বারোটার সময় সেখান থেকে বার হয়ে গেলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদে। নীহারবাবু বললেন, 'পথের পাঁচালী'কে আমি তরুণ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ আসন দিই।' প্রমথবাবু আবার বইখানির কথা অনেক ছাত্রদের বলছিলেন। প্রতুল গুপ্ত বলে

ছেলেটি বঙ্গ-সাহিত্যের বিজয়ী সেনাপতি বলে অভ্যর্থনা করলে। সোমনাথবাবু বললেন, 'আপনি বর্তমান আধুনিকতম সাহিত্যের বড় ঔপন্যাসিক—আপনাকেও কিছু বলতে হবে।' খুব আনন্দে কাটল।

ওখান থেকে বার হয়ে যাবার কথা ছিল সাহিত্য-সেবক-সমিতির অধিবেশনে, কিন্তু তা আর যাওয়া সম্ভব হল না। প্রমথবাবুর সঙ্গে গল্প করতেই বেজে গেল নটা। অতুল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন—তিনি আমার বইখানার খুব প্রশংসা করলেন। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন ল' কলেজে। তাঁকে বললুম সে-কথা।

আজ একবার দুপুরে কাজে গিয়েছিলাম অক্ষয়বাবুদের বাড়িতে। শীতল একখানা হাতের লেখা মাসিক পত্র বার করচে, তাতে লেখা দিতে বলচে। কাল সে আসবে বেলা তিনটের সময়।

সেখান থেকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে ফিরছিলুম—বৈকাল ছটা। পূর্বদিকের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসচে। শিয়ালদহের কাছটায় ট্রামটা এলেই আজকাল পূর্বদিকে চাই। অন্যদিনও চাই, এমন হয় না—আজ যে কী অপূর্ব মনে হল। ..মাকাল কল, পিসিমা, পুরনো বঙ্গবাসী, দুপুরের রৌদ্র, মাকাল গাছ, ঘুঘু পাখী, বাঁশবন—কত কথা যে এক মুহূর্তে মনে এল! আমি এরকম আনন্দ একদিন মাত্র পেয়েছিলাম,—সেদিনটা স্কুলের ছাদ থেকে বহুদূরের আকাশটার দিকে চেয়েছিলাম এই সন্ধ্যা ছটার সময়ে।

তার পরে সুরি লেনের কাছে নেমে গেলাম রাজকৃষ্ণদের বাড়ি যাব বলে।

আমি শুধু প্রার্থনা করি, আমাকে আগে নিয়ে চল হে ভগবান—যাতে সর্বদা মন গতিশীল থাকে। কিসে মন বর্ধিত হয়, আনন্দ বর্ধিত হয়, তার সন্ধান তোমার জানা আছে, আমাদের নেই—তা ছাড়া আমার শিল্পী মন কি করে আরও পরিপুষ্ট হবে তার সন্ধান তুমিই জানো।

তোমার যে দিকে ইচ্ছা সে দিকেই নিয়ে যেও।

অবশেষে ঘুরিয়া যাওয়াই ঠিক করে কালকার বম্বে মেলে বার হয়ে পড়া গেল। দিনটা ছিল খুব ভাল—বৈকালের দিকে ট্রেনটা ছাড়ল—বর্ষাশেষে বাংলার এ অংশটার শ্যামল-শ্রী দেখে বুঝতে পারলাম বাংলা বাংলা করি বটে, কিন্তু দেশের সমগ্র পরিপূর্ণতাকে কখনো উপভোগ করি নি—কী অপূর্ব অস্ত-আকাশের রঙীন মেঘস্তূপ, কী অপরূপ সন্ধ্যার শ্যামছায়া!···কোলাঘাটের যে এমন রূপ, তা এর আগে কে ভেবেছিল?—পিছন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দেশের ভিটা সেদিন দেখে এসেচি, তারই কথা মনে হল—সেই ঝিকুরে গাছগুলো সন্ধ্যার ছায়ায় বাল্যের আনন্দ-ভরা এক অপরাহ্নের ছায়াপাতে মধুর হয়ে উঠেচে এতক্ষণ—এই তো পূজার সময়, বাবা এতদিন বাড়ি এসেচেন, আমাদের পূজার কাপড় কেনা হয়ে গিয়েচে এতদিন—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রির উৎসবের সে সব আনন্দ—কি জানি কেন এই সব সময়েই তা বেশী করে মনে আসে।

সব সময় এই দেশের ভিটার ছবিটাই মনে উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেরণা দেয়—এ অতি অদ্ভুত ইতিহাস।

বিলাসপুর নেমে ঝড় বৃষ্টি। এখন একটু রৌদ্র উঠেচে—গাড়ির মধ্যে বসে বসে লিখচি—কিন্তু মেঘের ঘোর এখনও কাটে নি।

পরশু বৈকালটি সজনীবাবু, সুবলবাবু ও গোপালবাবুর সঙ্গে বেশ কেটেচে। প্রথমে রেষ্টরেণ্টে কিছু খেয়ে মোটরে করে গেলাম লেকে—সেখান থেকে আউট্রাম ঘাট—সেখানে চা-পানের পর বাসা। ডঃ সুশীল দে-র ওখানেও ঘণ্টা তিন-চার গল্প করে ভারি আনন্দ হল।

কারগী রোডে পৌঁছে দেখলাম কিছুই আসে নি, অতি বর্ষণের ফলে বন্যা হওয়াতে রাস্তা ভেঙে গিয়েচে—গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে দুই-তিন দিন লাগবে—আরও একটি সাহেব আমারই মত বিপন্ন হয়ে পড়েচেন—সুতরাং প্রত্যাবর্তনই যুক্তিযুক্ত মনে হল। একজন বাঙালী ওভারসিয়ার ছিলেন, তাঁর নাম সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য—তিনি সঙ্গে করে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন—বেশ লোক।—ঝিঙে ও ঢেঁড়স ভাজা, ডাল ও ভাত।

ওধারকার রাঙা মাটির দেওয়াল, বেশ দেখতে। মনে হল ওরকম বাড়িতে আমি তো একেবারেই টিকতে পারবো না। সঙ্গে করে দেখালেন, পাশেই জমি কিনেচেন—সেখানে তরকারীর বাগান। একটি গালার কারখানায় নিয়ে গেলেন গালা চোলাই হচ্চে—একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। সেখান থেকে এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে সামনের পাহাড়টাতে ওঠা গেল। ওপারে আর একটা পাহাড়—মধ্যে ঘন শাল পলাশের বন—মহিষের গলায় একটানা ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্চে। ওখানকার একজন খৃষ্টান ডাক্তার জানপান্নার বিবাহ গেল সেদিন, বিবাহ উপলক্ষে অনেকগুলি সাহেব, মেম ও বাঙালী ষ্টান মেয়ে এসেছিলেন—এই ট্রেনে যাচ্চেন।

বিলাসপুরে গাড়ি পেয়ে গেলাম ঠিক মত—ভিড় খুব বেশী ছিল না। বিলাসপুরের ও রায়গড়ের মধ্যেকার আরণ্য ভূভাগের দৃশ্য অতি অপূর্ব—কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে নামবার পরেই অধিকতর অপরূপ এমন আর এক বনভূমির ভিতর দিয়ে ট্রেন যেতে লাগল, যার তুলনায় পূর্বে যতগুলো দেখেছি সব ছোট হয়ে গেল, তুচ্ছ হয়ে গেল—সেটা হচ্ছে রায়গড় ও ঝারসাগুদার মধ্যে—সে অপরূপ আরণ্যভূমির বর্ণনা চলে না। দিবাশেষের ঘন ছায়ার অনতিস্পষ্ট সে দৃশ্যের মত গভীর অন্য কোনো দৃশ্য জীবনে দেখি নি। কখনও—চন্দ্রনাথের পাহাড়ও নয়। কি প্রকাণ্ড পাহাড়টাই বরাবর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চক্রধরপুর পর্যন্ত এলো!…মাঝে মাঝে সাদা মেঘগুলো পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে, যেন কুমোরেরা পণ পুড়ুচ্চে—নীল মেঘের মত পাহাড়টার শোভাই বা কি! লোকে ভেবে দেখে না, মনের সতর্কতা কম, তাই সেদিন সেই লোকটা বললে, 'মশাই এ অঞ্চলে সবই barren'…barren কোথায়? তারা কি চক্রধরপুরের পরের এই গম্ভীর-দৃশ্য বনানী দেখে নি?…

আমি মনে মনে বুঝে নিলাম পিছনের ওই নীল পাহাড়টা, মেঘরাজি যার কোলে—সন্ধ্যাবেলাতে দুষ্টু ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়েচে—ওটা আর রেলের পিছনে মাঠগুলো নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজ তৈরি হয়েচে—দেড়শত দুইশত বর্গ মাইল পরিমাণের এই

ত্রিভুজটার সবটাই বসতিবিরল, স্থানে স্থানে একেবারে জনহীন অরণ্য, পিছনে বরাবর ওই পাহাড়টা। এই অরণ্যভূমির ও শৈলমালার মধ্য দিয়ে রেলপথটা চলে গিয়েচে। সহসা একটা পাহাড়ের মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা শিখরদেশের কি অদৃষ্টপূর্ব শোভা!...গাড়ির সবাই বললে—ছাখো, ছাখো—আমার তো হৃদয় বিস্ফারিত হল, চারিধারে এই অপূর্ব বনভূমির শোভা দেখে অন্ধকার পর্বত-সানুস্থিত অরণ্যের মধ্যে কোথা থেকে সন্থ ফোটা শেফালি ফুলের সুবাস পেলাম—ট্রেনটাও Rock cuttingটা ভেদ করে ঝড়ের বেগে ছুটেচে—চারিধারে রহস্যাবৃত অন্ধকারে ঢাকা সেই শৈলপ্রস্থ ও অরণ্য-ভূভাগ—জীবনে এ ধরনের দৃশ্য ক'টাই বা দেখেচি!...রাত আটটায় এসে বম্বে মেল ঝারসাগুদাতে দাঁড়াল। এখানে চা ও খাবার খেয়ে নিলাম। সেদিনকার মত উদার-হৃদয় সহচর তো আজ সঙ্গে নেই যে খাবার খাওয়াবেন।

ঝারসাগুদা থেকে সম্বলপুরে এক লাইন গিয়েচে। রাত্রে ট্রেনে বেশ ঘুম হল, সকালে এসে কলকাতায় উঠলুম—ছুপুরটা ঘুম হল খুব।

আজ বিজয়া দশমী। কোথায় যাব—ভাবচি—বিভূতিদের ওখানেই যাওয়া যাবে এখন।

আজ সারাদিনটা হৈ হৈ করে কাটল। সকালে উঠেই সজনীবাবুদের বাড়ি—সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর সকলে মিলে হিতেনবাবুদের বেলগেছিয়ার বাগানবাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে হল পিক্‌নিক্—মাংস সিদ্ধ হতে বাজল তিনটে। Living age কাগজখানাতে মেটারলিঙ্ক-এর নতুন বই 'Life of the Ants' সম্বন্ধে একটি ভারি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়ছিলাম —সামনের পাইকপাড়া রাজাদের বাগানটিতে অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ ছায়া বর্ষাশেষের সরস, সবুজ গাছপালার উপর নেমে আসচে, ওধারের তালগাছগুলো মেঘশূন্য নীলাকাশের পটভূমিতে ওস্তাদ পটুয়ার হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবির মত মনোহর হয়ে উঠেচে—কিন্তু আমি এই বৈকালটিকে আমার মনের সঙ্গে কি জানি আজ মোটেই খাপ খাওয়াতে পারচি নে—আমার মনের সুসম্বদ্ধ, সুনির্দিষ্ট অপরাহ্ণের মালায় আজকার বেলগেছিয়া বাগানের ও সুন্দর অপরাহ্ণটি বিস্তৃত শত অপরাহ্ণ-মুক্তাবলীর পাশে কেন যে স্থান দিতে পারলাম না, তা জানি না। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম শাঁখারিটোলায় রাধাকান্তদের বাড়ি, তারপর দক্ষিণাবাবুদের বাড়ি দক্ষিণাবাবু বাড়ি নেই। জ্যোৎস্না আদর-অভ্যর্থনা করলে, কাছে বসে পাওয়ালে। রাত এগারোটার পরে এলেন দক্ষিণাবাবু। গল্পে গুজবে হল রাত আড়াইটা—আজ আবার চন্দ্রগ্রহণ, কিন্তু মেঘের জন্যে কিছু দেখা গেল না। সারারাতের মধ্যে চোখের পাতা বুজানো গেল না মশায় ও গরমে—অনেকরাত্রে দেখি একটু একটু বৃষ্টি পডচে।

এবার কালী পূজাতে দেশে গিয়ে সত্যই বড় আনন্দ পেলাম—এত সুন্দর গন্ধ বন-ঝোপ থেকে ওঠে হেমন্তের প্রথমে, এবার খুঁজে খুঁজে দেখলাম গন্ধটা প্রধানতঃ ওঠে বনমরিচার ফোটা ফুল থেকে ও কেলেকোঁড়ার ফুল থেকে। এবার আনন্দটা সত্যই অপূর্ব ধরনের হল

যা অনেকদিন কলকাতায় থেকে অনুভব করি নি। নৌকার ওপর বসে বসে যেন জীবনটা আর একটা dimension-এ বেড়ে উঠল—ঘন লতাপাতার সুগন্ধে বহু অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে—খুকী দ্বিতীয়ার দিন আমার সঙ্গে আবার গেল বারাকপুরে—সেদিন আবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। জাহ্নবী আমাকে ফোঁটা দিলে—খুকী দিলে খোকাকে। পরে আমরা দুজনে পাকা রাস্তার ওপরে বেড়াবো বলে বেরুলাম—কিন্তু যাওয়া হয়ে গেল একেবারে বারাকপুরে—গাছপালা, প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে যে জীবন—তাই হয় সুখের, পরিপূর্ণ আনন্দের। এ আমি ভাল করে বুঝলাম সেদিন।

কয়দিন এখানে এসেও বেশ আনন্দেই কাটল—উষাদেবী এখানে এসেচেন ঢাকা থেকে, তাঁর ওখানে মধ্যে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করলুম—বেশ মেয়েটি—বেশ শিক্ষা আছে, সাহিত্য বিষয়ে সমঝদারও খুব সুন্দর। সুনীতিবাবুর বাড়িতে একদিন আমি ও সজনীবাবু গিয়ে—অনেকগুলা গ্রীক্ ও শক মুদ্রা, অনেক ছবি, আবুরাজ্যের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলো মূর্তির ফটো—এই সব দেখে এলাম—প্রবাসী আপিসে আড্ডা যা চলচে ক'দিন, তাও খুব।

কাল জগদ্ধাত্রী পূজা—আমাদের চারদিন ছুটি আছে, রাত্রে গেলাম বিভূতিদের বাড়ি, অন্য অন্য বছরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—আজ কোথাও কিছু নেই—রাত ন'টার সময় অক্ষয়বাবু ছোট বৈঠকখানায় রেডিও শুনচেন—অন্য বছর যে সময় আগন্তুক ও নিমন্ত্রিতের ভিড়ে সিঁড়ি দিয়া ওঠা সম্ভব হত না, কোথায় সে উৎসব গেল বাড়ির—যেন দীনহীন, মলিন সব ঘরগুলো, সিঁড়িটা, দালানটা। আমাকে অবশ্য খাওয়ার বিশেষ অনুরোধ করা ছিল—অক্ষয়বাবু ও খগেনবাবু বাইরে নিমন্ত্রণে গেল মেজ খোকাবাবুর বাড়ি। অনেক রাত্রে আমি, শীতল, বিভূতি একসঙ্গে বসে নিরামিষ ভোজ খেলাম। রাত বারোটাতে বাসায় ফিরলাম। শুয়েচি—চারিধার নিস্তব্ধ, নির্জন। চাঁদটা পশ্চিম আকাশে নিষ্প্রভ হয়ে ঢলে পড়েচে—নক্ষত্রগুলো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়েচে, 'অপরাজিত'র অপুর বন্য-জীবনের গোড়াটা লিখচি—তাই বসে বসে ভেবে এই বিচিত্র জীবনধারার কথা মনে হল—ভারি আনন্দ পেলাম।

আজ জগদ্ধাত্রী পূজার সকালবেলাটি ; মনে পড়ে অনেক বছর আগে এই ঘরেই বসে বসে হার্ডির ছোট গল্প পড়তুম এইখানে। আজও সেই ঘরটি তেমনি নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কিন্তু পরিবর্তনও কি কম হয়েচে! তখনকার বিভূতি কত বড় হয়ে গিয়েচে—তখনকার সবাই কে কোথায় চলে গিয়েচে।

আগামী রবিবারে সুনীতিবাবু, অশোকবাবু, আমি ও সজনীবাবু—চারজনে মোটরে 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে যাওয়ার কথা আছে বৈকালের দিকে। দেখি কি হয়।

এইমাত্র মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তাঁর নব প্রকাশিত 'কিশলয়' বইখানা পাঠিয়েচেন, দেখলাম। খুব ভাল লাগল বইটি।

আজকার দিনটি বেশ ভাল কাটল। সকালের দিকে খুব মেঘ ছিল, কিন্তু দুপুরের পরে খুব রৌদ্র উঠল—তখন বেরিয়ে পড়া গেল—প্রবাসী আপিসে গিয়ে দেখি অশোকবাবু ও সজনী দাস বসে। চা পানের পরই সজনীবাবু গিয়ে গাড়ি করে সুনীতিবাবুকে উঠিয়ে নিয়ে এল—পরে আমরা রওনা হলাম আমাদের গ্রামে। সজনীবাবু, অশোকবাবু, সুনীতিবাবু আর আমি। যশোর রোডে এসে ব্যাটারির তারটা জলে উঠে একটা অগ্নিকাণ্ড হত, কিন্তু সুনীতিবাবুর কুঁজোর জল দিয়ে সেটাকে থামানো গেল।

তারপরই খুব জোরে মোটর ছুটল—পথে মাঝে মাঝে রোদ, মাঝে মাঝে ছায়া—রোদই বেশি। আজ রবিবার, সাহেবরা কলকাতা থেকে বেড়াতে বেরিয়ে এক এক গাছতলায় মোটর রেখে ছায়ায় শুয়ে আছে।

তারপর পৌঁছে গেলাম জোড়া-বটতলায়। ওখানেই মোটরখানা রইল, কারণ দিনকয়েক আগে আমাদের গ্রামের দিকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পথে এখনও একটু একটু কাদা। নেমে কাঁচাপথটা বেয়ে বরাবর চললুম, সুনীতিবাবু কাঁচা কোসো কুল ও সেঁয়াকুল খেতে খেতে চললেন, অশোকবাবু ছড়ি কাটবার কথা বলতেই সজনীবাবু চটি ফেলে ছুটল গাড়িতে ছুরি আনতে। গ্রামে ঢুকবার আগে এ-ফুলের ও-ফুলের নাম সব বলে দিলাম—কাঁঠালতলায় হেলা গুঁড়িতে গিয়ে সবাই বসল। তারপরে সইমার বাড়ি গিয়ে কিছু মুড়ির ব্যবস্থা করে একটা আসন পেতে সবাইকে বসালাম। সেখানে খাওয়া ও গল্পগুজবের পরে আমাদের পোড়ো ভিটেটা দেখে রান্নাঘরের পোতা দিয়ে সবাই নেমে ঘন ছায়ায় ছায়ায় এলাম সলতেখাগী আমগাছের তলায়—সেই ময়না-কাঁটা গাছ থেকে ছড়ি কেটে নিলে অশোকবাবু ও সজনীবাবু—পরে তেঁতুলতলীর তলার বনের মধ্যে দেখা গেল একটা খুব বড় ও ভাল ময়না-কাঁটা গাছ—সেখান থেকে আর একটা ছড়ি কাটা হল। তারপর প্রায় বেলা গেল দেখে আমি খুব তাড়াতাড়ি করলাম—ওদের বন থেকে টেনে বার করে নিয়ে গেলুম কুঠিটায়। ছেলেবেলায় গ্রামের জামাইদের ডেকে নিয়ে কুঠি দেখাতুম। তারপর সে কাজটা অনেকদিন বন্ধ ছিল—বহুকাল বন্ধ ছিল। শেষে কাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা তো মনে হয় না—বহুকাল পরে বাল্যের সে কুঠি দেখানো পুনরাবৃত্তিটা করলুম। তখন কুঠিটা আমার কাছে খুব গর্ব ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল—তাই যে কেউ নতুন লোক আসতো, তাকেই নিয়ে ছুটতাম কুঠি দেখাতে। আজ বহুদিন পরে সজনীবাবু, সুনীতিবাবু ও অশোকবাবুকে নিয়ে গেলাম সেখানে। কুঠিতে কিছু নেই। আজকাল এত জঙ্গল হয়ে পড়েচে যে আমি নিজেই প্রথমটা ঠিক করতে পারলুম না কুঠিটা কোন জায়গায়।

তারপর মাঠ দিয়ে খানিকটা ছুটতে ছুটতে গেলাম। রাস্তায় পড়ে কাঁচিকাটার পুলে—এই কার্তিকমাসেও একটা গাছে একগাছ সোঁদালি ফুল দেখে বিস্মিত হলাম। সেইখানে ঝোপটি কি অন্ধকারই হয়েচে! সুনীতিবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন—সবাইকে ডেকে দেখালেন—আমার বেশ মনে হচ্ছিল আমার পরিচিত সলতেখাগী তলায় যেখানে আমিই আজকাল কম যাই সেখানে—আমাদের ভিটেতে—সম্পূর্ণ কলকাতার মানুষ সুনীতিবাবু, অশোকবাবু,

এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগছিল। আমাদের কুঠির মাঠে, আমাদের সইমার বাড়ির রোয়াকে!

সন্ধ্যা হলে তেঁতুলতলায় পথটা দিয়ে সবাই মিলে আবার ফিরলাম—ময়না-কাঁটার ডালগুলো ওখান থেকে আবার নিলাম উঠিয়ে—সইমার বাড়ি এসে দেখি হরেন এসে বসে আছে। সইমার সঙ্গে সুনীতিবাবুর খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল—পরে আমরা বার হয়ে গিরিশদার বাড়ি এসে গেলাম—তখনই ওদের রান্নাঘরের পৈঠাতে জ্যোৎস্না উঠে গিয়েচে।

তারপরে গাজিতলার পথ দিয়ে হেঁটে মোটর ধরলুম—গোপালনগরের হাট-ফেরতা লোক বসে আছে মোটর দেখবার জন্যে। খানকতক স্যাণ্ডউইচ্ ও ডালমুট কিছু খেয়ে নেওয়া গেল—কুঁজোর জল খেয়ে-টেয়ে গাড়ি স্টার্ট দেওয়া হল।

বন্ধুর বাসায় এসে দেখি তরু বেচারীর চোদ্দ পনের দিন জ্বর—বিছানায় শুয়ে আছে, বন্ধু ফোড়ায় শয্যাগত—বন্ধুর বৌ এসেচে, কিন্তু সে বেচারীর দুর্দশার সীমা নেই। সেখানে কিছু চা ও খাবার খাওয়ার পরে আমরা সুন্দর জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তায় সজোরে গাড়ি চালিয়ে রাত্রি সাড়ে ন'টাতে কলকাতার বাসায় এসে পৌছলাম। তখনও বাসায় খাওয়া আরম্ভ হয় নি—ঠাকুর তখনও রুটি গড়চে। আমি এসে টেবিল পেতে লিখতে বসে গেলাম, আর ভাবছিলাম এই খানিক আগে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হল তখন ছিলুম আমাদের বাড়ির পিছনকার গাবতলার পথে—এরই মধ্যে কলকাতার বাসায় ফিরে এত সকাল-রাত্রে বারান্দার আলো জ্বেলে বসে লিখচি, এ কেমন হল?...

যদি মোটর না থাকতো তবে কখন পৌছতাম?...সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে সন্ধ্যার গাড়ি ধরে, বা বনগ্রাম থেকে ট্রেন ধরে, রাত্রি বারোটাতে কলকাতা পৌছতাম।

আমি সত্যই আজ একটা আনন্দ পেলুম। একটা অদ্ভুত—ও সুন্দর ধরনের আনন্দ পেলুম। ওঁরা গিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে—আমি আমার পরিচিত ও প্রিয় স্থানগুলিতে কলকাতার এই প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে বেড়িয়ে আজ সত্যই একটা নতুন ধরনের আনন্দ পেলুম যা আর কখনো কোনো trip-এ পাই নি।

ইচ্ছা আছে বৈশাখ মাসের দিকে একবার এদিকে এসে ওঁদের নিয়ে ইছামতীতে নৌকা ভ্রমণ ও কোনো একটা বনের ধারে বনভোজন করা হবে। সুনীতিবাবুও সে প্রস্তাব করলেন, সবাই তাতে রাজী।

কাল দুপুরে সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঠাকুরবাড়িতে ছিল নিমন্ত্রণ, সেখানে সকলের সঙ্গে গল্পগুজবে বেলা হল তিনটা, সেখান থেকে গেলুম 'গৈরিক পতাকা' দেখতে মনোমোহনে।

এ গেল কালকার কথা, কিন্তু আজ এমন অপূর্ব আনন্দ পেয়েচি বৈকালের দিকে যে, মনে হচ্চে জীবনে ক—ত দিন এ রকম অদ্ভুত ধরনের বিষাদের ও উত্তেজনার আনন্দ হয় নি আমার।

কিসে থেকে তা এল? অতি সামান্য কারণ থেকে। ক্লাসে দেবব্রত নাকি ছোট একটা খড়ি নিয়ে পকেটে রেখেছে, ক্লাসের মনিটার তার হাত মুচড়ে সেটা নিয়েচে কেড়ে। দেবব্রত

এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললে; বললে, দেখুন স্যার, ওরা এত বড় বড় খড়ি নিয়ে যায় বাড়িতে আর আমি এইটুকু নিলাম। আমার হাত মুচড়ে ও কেড়ে নিলে?—হাতে এমন লেগেচে!

ছোট ছেলের এ কান্না মনে বাজল। তখনি অবশ্যি মনিটারকে বকে খড়িটুকু দেবব্রতকে ফেরত দেওয়ালাম, কিন্তু দুঃখটা আমার মনে রয়েই গেল।

সে কি অনমুভূত দুঃখ ও বেদনা বোধ!...দুপুরের রোদে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল ভগবান আমাকে এক অপূর্ব ভাব-জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চান বুঝি। তিনিই হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায়, তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তিনিই জানেন। অনন্ত জীবনের কতটুকু আমাদের সান্ত-দৃষ্টির নাগালে ধরা দেয়? মনে হল বহুকাল আগে শৈশবে হরি ঠাকুরদাদা সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির দরজা থেকে চাল চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েচেন—সেইদিনটিতেই আমার এই ভাব-জীবনের বোধহয় আরম্ভ। এরও আগে মনে আছে—মা যেদিন অতি শৈশবে ছোলা ও মুড়ি খেতে দিয়ে দিদিমার কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তাঁর গুরু এসেছিলে, তিনি যে আমাদের জন্যে গুরুর পাতের মাছের ঝোল ও রুটি তুলে রেখে দিয়েছিলেন, মা তার খবর না জেনেই আমায় দিয়েছিলেন মুড়ি ও ছোলা ভাজা।—সেই ঘটনা থেকে মায়ের উপর এক অদ্ভুত স্নেহ ও বেদনা-বোধ—তার পর আতুরী বুড়ির আমজরানো, পিসিমার শত দুঃখ, কামিনী পিসির কষ্ট, সেই যাত্রার দলের ... শেষ হওয়ার দিনগুলো—কত কি—কত কি, তার পরে বিভূতির কত কষ্ট! আর আবার দেবব্রতের কষ্ট—আমার সমগ্র ভাব-জীবনের সমষ্টি এই সব দুঃখ ও বেদনা. অবশ্য হয়তো অনেক দুঃখ বাস্তব, অনেকটা কাল্পনিক—কিন্তু আমার মনে তাদের জন্য বেদনা-অনুভূতি আদৌ কাল্পনিক নয়—তাদের সার্থকতা সেইখানেই।

যাক। তারপর স্কুলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি ছাদে নীরব সান্ধ্য আকাশের তলে প্রতিদিনের মত পায়চারী করতে লাগলাম—মনে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ-বোধ. সে আনন্দের তুলনা হয় না—ভেবে দেখলাম এই আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। কিসে থেকে তা আসে, সে কথা বিচারে কোনো সার্থকতা নেই আদৌ,—আনন্দ যে এসেচে, সেইটাই বড় কথা ও পরম সত্য। অনেক দিন পরে এ লেখা পড়ে আমারই মনের নিরানন্দ ও ভাবশূন্য মুহূর্তে আমার মনে হতে পারে যে, এ দিনের আনন্দ একেবারেই অবাস্তব ও মনকে চোখ-ঠারা গোছের হয়তো—নিরানন্দের দিনে এ কথা মনে হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এই খাতায় কালির আঁচড়ে তা জানিয়ে দিতে চাই যে তা নয়, তা নয়। এ আনন্দ অপূর্ব অনমুভূত অতীন্দ্রিয়, মহনীয়!—এ ধরনের গভীর বেদনামিশ্রিত ভাবোপলব্ধি জীবনে খুব কম করেচি। করেচি হয়তো সে-দিন মালিপাড়ায় মাজু খাতুনের উপর পুলিসের অত্যাচার করার কথাটা খবরের কাগজে পড়বার দিনটা—তারপর অনেকদিন হয় নি।

সন্ধ্যার নিস্তব্ধ ও ধূসর আকাশের বহুদূর প্রান্তের আমাদের ভিটাটার কথা মনে হল একবার···বেশ দেখতে পেলাম সেখানে ঘন ছায়া পড়ে এসেচে—বনে সুগন্ধ উঠচে হেমন্তের

দিনে—সেই ভিটা থেকে একদিন পথে, ঘাটে, বৈকালের ছায়ায়, দুপুরের রোদে যে আনন্দ-জীবনের শুরু, আমি এই ভেবে মুগ্ধ হই, তা এখনও অটুট, অক্ষুণ্ণ রয়েচে—আরও পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে তার গতি নিত্য নবতর পথে।

আকাশের দিকে চাইলাম—মাথার উপর ধূসর আকাশে একটি নক্ষত্র মিট-মিট করচে। সঙ্গে সঙ্গে কালকার থিয়েটারে শোনা গানটা গাইলাম, 'জনতার মাঝে জনগণ পতি, বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন'। দেবব্রতের মত ক্ষুদ্র ও সুদর্শন এক দেবশিশুর ছবি মনে উঠল, ঐ ছবি বিশ্বের অজানা-অচেনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বালক তার অপূর্ব শৈশব যাপন করচে আনন্দে, সহাস্য কলরবে, দায়িত্বহীন কৌতুকের উচ্ছ্বাসে। তারপরে তার জীবনের সে সব বহুবর্ষব্যাপী বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ, সে গভীর বেদনাপূর্ণ ট্রাজেডি—কত যুগব্যাপী দুঃখ-সুখের শুরু—পৃথিবীর মানুষেরা যা কোনো দিন ধারণাই করতে পারে না। উঃ, সে কি অদ্ভুত অনুভূতিই হল যখন এ ছবি আমার মনে উঠল।

আজ বুঝলাম এই অনুভূতিই আসল জীবন। আমি নিরানন্দ দিনগুলিতে দেখেচি মন কিছুতেই আনন্দ পেতে চায় না—টেনেটুনে কত করে, কত নক্ষত্র জগৎ, এ, ও, নানা ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে জোর করে আনন্দ আনতে হয়, তা যাও বা একটু আধটু আনে—তাতেই তখন মনে হয়, না জানি কত বড় অনুভূতিই বুঝি বা হল। কিন্তু আসল ও সত্যিকার আনন্দের মুহূর্তে বোঝা যায় সে অনুভূতি ছিল অগভীর, মেকি, টেনে-বুনে আনা। আসল আনন্দকে জোর করে, মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আনতে হয় না তা আজ বুঝেচি—সে সহজ—অর্থাৎ spontaneous.

আর ও অনুভূতি যার জীবনে না হয়েচে—অর্থের মানে, যশের প্রাচুর্যে তার দীনতা ঘোচাতে পারে না।

'অপরাজিত' উপন্যাসের বন-ভ্রমণ লিখচি আজ।

কাল স্কুল কমিটির মিটিং-এ ওরা সুবোধবাবুকে নোটিস দিলে—আমি আগে জানলে হতে দিতাম না—আমায় আগে ওরা জানায়ও নি,—যদিও সাহেবের কোনো দোষ ছিল না, সাহেব আমাকে জানাবার কথা বলেছিল সুরেশবাবুকে। শেষকালে চেষ্টা করেও কিছু করা গেল না—বেচারীকে যেতেই হল। এই বেকার-সমস্যার দিনে একজন Young man-এর চাকরি এভাবে নেওয়া বড় খারাপ কাজ, মনে বড় কষ্ট হল···সুবোধবাবু মুখটি চুণ করে বসলো কাল রাত্রে, কি করি আমার তো আর কোনো হাতই নেই।

আশ্চর্যের বিষয় আজ পয়লা অগ্রহায়ণ, কিন্তু এত গরম যে সকালে কার্তিক পূজার ছুটির দিনটা বলে রমাপ্রসন্নর ওখানে বেড়াতে গেলাম। সেখানে সুরেশবাবুর আগ্রা ভ্রমণের গল্প শুনে ফিরে এসে, বেলা আটটার সময় এত গরম বোধ করতে লাগলাম যে, তাড়াতাড়ি নাইতে গেলাম—এবং মনে খুব আনন্দ হল, আরাম পেলুম, বালতির পর বালতি ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে লাগলাম—এত গরম।

এ সময়ে এত গরম আর কখনো কলকাতায় দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

অনেকদিন লিখিনি—বাজে জিনিস না লেখাই ভাল, অন্ততঃ এ-খাতায়। আজ দুপুরটাতে কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, কবিশেখর কালিদাস রায় ও দক্ষিণাবাবুর বাড়ি—সেখান থেকে এসে বারান্দাতে বসেছিলাম, হঠাৎ মনে হল একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে Wide World Magazine দেখে আসি।

শাঁখারীটোলায় ভীমেদের বাড়িতে গেলাম, ওরা আজ নতুন খাতা করতে বেরিয়েচে। মোড়ের মাথায় টাটি একটা মুদীর দোকানে দাঁড়িয়ে হালখাতা করচে—তাকে ডেকে আদর করে ভারি আনন্দ পেলাম—তারপর নিউ মার্কেট ঘুরে এই মাত্র ফিরে আসচি। বেজায় গরম পড়েচে আজ কলকাতায়।

জীবনের সৌন্দর্যের কথাই শুধু আজ ক'দিন ধরে ভাবচি। কি জানি কেন শুধুই মনে পড়চে ছেলেবেলায় যে টক এঁচড়ের চচ্চড়ি ও টক কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতুম রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে—সেই কথা। সেই মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধের কথা। জীবনটার কথা ভাবলেই আনন্দে মুগ্ধ হতে হয়। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্তন, এত রস, এত যাওয়া-আসা—ভেবে অবাক হয়ে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে এই মাত্র ক্যাম্বেল স্কুলটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, মানুষ অনন্তের সন্তান—একথা মিথ্যা নয়, কে বলে মিথ্যা!···সমগ্র নক্ষত্র জগতের জীবন—জরাহীন, মৃত্যুহীন, অপরাজেয় জীবন-ধারা তার নিজস্ব। সকল নক্ষত্রের পাশের দেশে—ওই যে নক্ষত্রটা আমার বারান্দার ওপর মিটিমিটি জলচে—ওদের চারিপাশে আমাদের মত গ্রহরাজি আছে হয়তো—তাতেও জীব আছে, অন্য বিবর্তনের প্রাণী হলেও তাদেরও সুখ-দুঃখ, শিল্প, অনুভূতি, মৃত্যু, প্রেম সবই আছে—দূরের নীহারিকা, Globular Cluster-দের জগৎ, সে সব তো আলাদা বিশ্ব, তাতে তো অপূর্ব অজ্ঞাত সব জীবনধারা—আমার জীবনও তো, কত দূর পথ চেয়ে কত অনন্ত সৌন্দর্যস্তম্ভের মধ্যে দিয়ে কাটবে তা কে জানে?···

এই বড় জীবনটা আমার···

মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পৌছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত। যদি যুগে যুগে আসি যাই তা হলেও তো ওরকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধ, কত টক কলাইয়ের ডাল আমার হবে।

কিন্তু প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনো শুকনো সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী—মৃত, মূর্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।

আইনস্টাইন্ বলেচেন—বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা; যে কোনো কিছু দেখে

বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে মৃত সে বেঁচে নেই। আমাদের দেশের কেউ এ কথা বুঝবেন কি ?

এই জন্মেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায় দেউলে হয়ে পড়ে—নতুন বিস্ময়, নতুন অনুভূতি হয় না, নবতর জীবনের পথ চিরগুপ্ত রয়ে যায় তাদের কাছে—মানুষ দমে যায় জানি—কিছুকাল তার মনে সব শক্তি হয়তো ক্ষীণতর হতে পারে মানি—কিন্তু জীবন্ত যে মানুষ, সে আবার জেগে উঠবে, সে আবার নবতর বংশীধ্বনি শুনবে—নব জীবনের সন্ধান পাবে। অপরাজিত প্রাণ-ধারার কোন্ অদৃশ্য উৎসমুখ তার আবার খুলে যাবে, বি-জর ও বি-মৃত্যু-আনন্দ তার চিরশ্যামল মনে আবার আসন পাতবে। বিহার অঞ্চলে দেখেছি শীতের শেষে বনে আগুন দেয়, সব ঘাস একেবারে পুড়িয়ে ফেলে—কি জন্মে ? যাই জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র পড়বে—ওই দগ্ধ ঝোপ-ঝাপের গোড়া থেকে আবার নবীন, শ্যামল, সুকুমার তৃণরাজি উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রাচুর্যে বেড়ে উঠতে থাকবে—হু-হু করে বাড়ে, পনেরো দিনের মধ্যে সারা কালো গোটা ঘাসের বন ঘন শ্যামশ্রী ধরে—এই তো জীবন, এই তো অমরতা।

তাই ভাবি, মাস বছর ধরে মানুষের বয়স ঠিক করা কত ভুল। ১৩৩৮ সাল পড়ে গেল আজ, আমার বয়স এক বৎসর বেড়ে গেল বটে হিসেব মত—কিন্তু আমি কি দশ বৎসর কিংবা পনেরো বছর আগেকার সেই বালক নেই অল্পবিস্তর ?...

সেদিন গেছলাম রাজপুরে অনেক কাল পরে। খিনুর সঙ্গে দেখা হল। আবার পুরনো পুকুরের পথটা ধরে হাঁটলাম—বাঁশগুলো নীচু হয়ে পড়ে আছে—চড়কের সন্ন্যাসীর দল বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। দুটোর ট্রেনে ফিরে সাড়ে পাঁচটায় স্কুলের মিটিং করলুম। রসিদকে আজ তাড়ানো হল।

পথে কোন্ জায়গায় ফুটন্ত মালতীলতার ফুলের গন্ধ, জারমলীন আপিসের কাছে—গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের স্মৃতিটা হঠাৎ মনে পড়ল।

সেদিন বন্ধু বলছিল—বাঁকি-করিমালি। পরিচিত নাম, বাবার মুখে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম কবে—ভুলে গেছলাম, যুগান্ত পরে যেন কথাটা আবার শুনলাম বলে মনে হল।

অনেকদিন পরে আজ রবিবারটি বেশ কাটলো। শীঘ্রই গরমের ছুটি হবে, কাল রাত্রে বাইরের বারান্দায় বৃষ্টি পড়াতে বিছানা টানাটানি করে ভাল ঘুম হয় নি, উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে কলেজ স্কোয়ারের দোকানটাতে খাবার খেতে গেলুম—ওরা বেশ হালুয়া করে। তারপর গোলদীঘির মধ্যে বসে কামাতে লাগলুম একটা নাপিতের কাছে। ওদিকে অনেকগুলি গাছ, একটা গাছে সোঁদালি ফুল ফুটেচে—এমন একটা অপরূপ আনন্দ ও উত্তেজনা এল মনে ফুটন্ত ফুলেভরা গাছটা দেখে—মনে হল আর বেশী দেরি নেই, এক সপ্তাহ পরে ঐ রকম ফুলেভরা বন-মাঠে গিয়ে 'অপরাজিত'-র শেষ অধ্যায়টা লিখবো—সত্যি, জীবনে দেখেছি ভবিষ্যতের ভাবনায় সব সময়ই এত আনন্দ পাই! ফিরে এসে অনেকক্ষণ বই লিখলুম। দুপুরে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল—ঘুম আদৌ হল না। বেলা আড়াইটায়

সময় দরজায় শব্দ শুনে খুলে দেখি নীরদবাবু। তাঁর গাড়ি নীচেই দাঁড়িয়েছিল—দুজনে উঠে একেবারে দমদমায় সুশীলবাবুর বাগানে। সত্যি, ওদের সাহচর্য এত সুন্দর লাগে আমার—সত্যিকার প্রাণবন্ত সজীব মন ওদের। সেখানে বাইরের মাঠে চেয়ার পেতে বসে নানা বিষয়ের আলোচনা হল—চা-পান সমাপন হল। শান্তিনিকেতন থেকে অমিয় চক্রবর্তী 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লিখেচেন, 'বই পড়ে গ্রামখানি দেখতে ইচ্ছা হয়'—আর লিখেচেন, 'শিল্পীর সৃষ্ট গ্রামখানি শাশ্বতকালের, জানি না ভৌগোলিক গ্রামখানা কি রকম দেখবো।'

ছটার সময় নীরদবাবুর গাড়ি করে ফিরলুম—কারণ রবিবাসর ছিল প্রেমোৎপলবাবুর বাড়িতে। আজ খুব মেঘ করেছে, দমদমা থেকে আসতে মেঘান্ধকার পূব-আকাশের দিকে চেয়ে আমার পুরনো ভিটা ও বাঁশবনের কথা, মায়ের কড়াপানার কথা ভাবছিলুম—কি অদ্ভুত প্রেরণাই দিয়েচে এরা জীবনে—সত্যি!...নীরদবাবুও গাড়িতে বললেন, কড়াপানার দৃশ্য তাঁকে সেদিন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ও অনুভূতি এনে দিয়েছিল মনে—গত রবিবারে সেদিন যখন ওঁরা ওখানে গিয়েছিলেন। তারপর এলুম রবিবাসরে, ওখানে তখন প্রবন্ধ পাঠ শেষ হয়ে গিয়েচে—তরমুজের আইস্‌-ক্রিম ও খাবার খুব খাওয়া গেল। অতুলবাবুর কাছে একটা Spiritual Circle-এর ঠিকানা নিলুম। নীরদ আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত এল—অশোকবাবু ও সজনীবাবুদের সম্বন্ধে নানা কথা। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি যাচ্চেন সুবোধবাবুর পিতৃ-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে। বাড়ি চলে এলুম।

আজ ভাবচি, গ্রাম সম্বন্ধে একটা সত্যকার ভালবাসা ও টান ছিল শৈশব থেকে আমার মনে। কি চোখেই দেখেছিলুম বারাকপুরটাকে—যখন প্রথম মামার বাড়ি থেকে অনেককাল পরে দেশে ফিরি, পিসিমা ওই দিকের বাঁশবাগান দিয়ে আসেন। কাল তাই যখন শাঁখারী-টোলার দখল-করা বাড়িটার সামনে পুরনো জমিদারী কাগজের মধ্যে ১৩১০ সালের একখানা পুরনো চিঠি কুড়িয়ে পেলাম, তখনি মনে হল,—আচ্ছা এমনি দিনে দশ বৎসরের ক্ষুদ্র বালক আমি কি করছিলাম! মনে একটা thrill হল, একটু নেশা-মত যেন!...কোনো সত্যিকার জিনিস মিথ্যে হয় না—সেই বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটের মধ্যে দিয়ে আজ দুপুরে নীরদবাবুর গাড়ি করে গেলাম, যে বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটের বাড়িতে একদিন কত কষ্টে কালযাপন করেচি!...ওখানেই কষ্ট পেয়েচি, ওখানেই ভগবান সুখ দিলেন। সত্যিকার অনুভূতি অমর, তা বৃথা যায় না—আমার শৈশব-মনের সে জীবন্ত, প্রাণবান্‌ ভালবাসা, গ্রামের প্রতিটি বাঁশের-খোলা ও গাবগাছটাকে অতি নিকটে আপনার জন বলে ভাববার অনুভূতি ছিল সত্যিকার জিনিস—তাই আজ বহু সমঝদার মনে, সে অনুভূতিটুকু সঞ্চার করতে কৃতকার্য হয়েচি। সাহিত্য-সৃষ্টি মেকী জিনিস নয়, তার পিছনে যখন সত্যকার প্রেরণা না থাকে, একটা বড় অনুভূতি বা দৃষ্টি বা ভালবাসা না থাকে—সেটা কখনোই বড় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না—খুব কলাকৌশল হয়তো দেখানো চলতে পারে, খুব cleverness-এর পাঁয়তারা ভাঁজা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু তা সত্যিকার বড় জিনিস হয়ে উঠতে পারে না কোনো কালেও।

চারিধারে মেঘান্ধকার আকাশের কি শোভাটা আজ রাত্রে।…ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্চে—আমার বহু বাল্যদিনের অনুভূতি মনে আসচে—I am re-living my childhood days—কোন্ দিনটার কথা মনে আসচে আজ?…যেদিন বাবার সঙ্গে তম্‌রেজ ও আমি দক্ষিণ মাঠের চাটুয্যেদের জমি মাপতে যাই, প্রথম দক্ষিণ মাঠ দেখলাম—কত কুশবন, খোলা মাঠ, আকন্দ গাছ, সেই একদিন আর যেদিন আতরালি কালীদের গরুর লেজ কেটে দিয়েছিল, চণ্ডীমণ্ডপে তার বিচার হল—এই দুটি দিন।

আজ দুপুরে হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা এসেছিল। একখানা বই দিলাম, নিয়ে গেল।

এইমাত্র ভয়ানক দু-ঘণ্টাব্যাপী ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল—এ বছরে এই প্রথম বৃষ্টি—সামনের রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেচে—একটা পাগল কি চীৎকার করে বলতে বলতে যাচ্ছে।

এখনও একটু একটু বৃষ্টি হচ্চে—আর জোর বিদ্যুৎ চমকাচ্চে—মোটরগুলো জল ভেঙে যাচ্চে—কি শব্দটা! রবিবাসরে যে বেলফুলের মালাটা দিয়েচে—তার সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। রাত এগারটা।

আজ রাত্রে ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে না—একটা উত্তেজনা, একটা অপূর্ব অনুভূতির আনন্দ। অনেকদিন পরে মনে পড়ে একটা কথা। বাবা আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কৈ, খোকা—? অথচ তিনি জানতেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেন নি। জীবনের সেই প্রথম শোক। সে কি অপূর্ব অনুভূতির দিনগুলো—তার কি তুলনা আছে? হাজার বছর বাঁচলেও কি সে সব দিনের কথা ভুলবো কখনও!…

এই দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়েই কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েচি!

বাইরের অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। কি অদ্ভুত যে মনে হচ্ছিল! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, কোন্ মহাশক্তির বিরাট কন্দুকক্রীড়া যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার প্রাণীদলের উত্থান-পতনে—যুগ-যুগান্তর ধরে প্রাণীদল তাদের অতি সত্যকার হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখ ধরে, কোথায় ভেসে চলে গিয়েচে—ওপরে সব সময় লক্ষ বৎসর ধরে এই মহাশক্তিটি তার বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, জানা অজানা কত শক্তি নিয়ে কোন্ কাজ করছেন তা বুঝতেও পারচি নে আমরা। মোটে তো পঁয়ত্রিশ বছর এই ব্যাপার দেখচি—তাও না জ্ঞান হয়েচে আজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। লক্ষ বৎসরের তুলনায় সাতাশ বছর কতটুকু?…সত্যিই এমন সব জীব আছেন, যাঁদের তুলনায় এই পঁয়ত্রিশ বছরের আমি—আমার সৃষ্ট বালক অপুর মতই অবোধ, অসহায়, কৃপা ও করুণার পাত্র—নিতান্ত শিশু। কি জানি, কি বুঝি?…কত আবোল তাবোল ভাবি, কোনোটাই হয়তো সত্যি নয় তার।

সত্যি কি অপূর্ব বৈকাল!…আজ অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি। এই দশ-বারো দিন বৃষ্টির জন্যে আর সুবিধা করতে পারি নি। আজ একেবারে মেঘনির্মুক্ত, অদ্ভুত

বৈকালটি। কাল খিনুর বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে পদ্ম-ফোটা নওদার বিলের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরি—ফিরতে দেরি হয়ে গেল। আজ তাই দুপুরে খুব ঘুমিয়েচি। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। সত্যি, এ অপূর্ব দেশ...এ ধরনের অনুভূতি, গহন-গভীর, উদাস, বিষাদমাখা, আমি কোথাও কখনো দেখেচি মনে হয় না—এ সত্যিই Land of Lotos Eaters. এত ছায়া, এত পাখীর গান, এত ডাঁসা খেজুরের সুগন্ধ, এত অতীত স্মৃতি—বেদনা-মধুর ও করুণ, আর কোথায় পেয়েচি কবে?...শরীর অবশ হয়ে যায়, মন অবশ হয়ে যায় অনুভূতির গভীরতায়, প্রাচুর্যে।

এইমাত্র আমাদের ভিটাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—এক টুকরা রেশমী সবুজ চুড়ির টুকরো চোখে পড়ল—কার? হয়তো মনির। মনে হল মায়ের স্মৃতি ভিটার সঙ্গে যেন মাখা। মা এই বৈকালে ঘাট থেকে গা ধুয়ে ফর্সা কাপড় পরে এসে আমাদের খাবার দিচ্চেন—এই ছবিই বার বার মনে আসে। আজ সব জঙ্গল, নিবিড় বনভূমি হয়ে পড়ে আছে! মায়ের সেই সজনে গাছটা আছে, সেই কড়াটা—আশ্চর্য, পাঁচিলের সেই কুলুঙ্গি দুটো চমৎকার আছে, এখনও নতুন।

ভেবেছিলাম এখনি কুঠির মাঠে যাবো। গিয়ে কি করবো? অনুভূতি কি এখানেই কিছু কম যে, আবার সেখানে যাবো? একদিনে কত সঞ্চয় করি, মনে স্থান দিই কোথায়!...

বকুলগাছে পাখী ডাকচে—বৌ-কথা-ক', বৌ-কথা-ক',—অমূল্য জামগাছে উঠে জাম পাড়ছিল—বুড়ি পিসিমা বললে, সে চারটি জাম দিয়ে গেল, তাই এখন খাবো। আজ আবার গোপালনগরের দলের যাত্রা হবে, এখন স্নান করে এসে যাত্রা শুনতে যাবো।

বেলা খুব পড়ে গিয়েছে—ছায়া ধূসর হয়ে এসেচে। এমন বিকাল কোথাও দেখি নি। আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি—মেঘশূন্য সুনীল আকাশে খুব জ্যোৎস্না উঠবে।

আদাড়ি বিল্‌বিলে থেকে জল নিয়ে বাড়ি ফিরচে হরিকাকাদের বাড়ির ওদিকের ঘুঁড়ি পথটায়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে বাল্যে কিসের শব্দটা বেরুতো, সেই শব্দটা বেরুচ্চে। মায়ের কথাই আবার মনে হয়।

অনেক রাত্রে বায়োস্কোপ দেখে ফিরলাম—ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, মেঘান্ধকার আকাশ, রাস্তায় জল জমে গিয়েচে—তার মধ্যে বাস্‌খানা কেমন চলে এল! যেন এরোপ্লেনে উড়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্চি।

বাইরের বারান্দাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—একটা Vision দেখলাম—এক দেবতা যেন এইরকম অন্ধকার আকাশপথে, তুষারবর্ষী-হিমশূন্যে এক হাজার আলোক-বর্ষে চলেচেন অনবরত—দূর থেকে সুদূরে তাঁর গতি। কোথায় যাবেন স্থিরতা নেই—চলেচেন, চলেচেন, অনবরত চলেচেন, হাজার বছর কেটে গেল। বিরাম বিশ্রাম নাই—Greatness of space. Undaunted travels of গ্রহদেব।

সেদিন পাঁচুগোপালের সঙ্গে ভগবতীপ্রসন্ন সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম। ছেলেবেলাকার সে স্থানটি হয়তো আর কখনও দেখতুম না—কিন্তু আবার সেই 'পরশুরামের মাতৃহত্যা' যাত্রাটি হয়েছিল, সেটি আবার দেখলাম—যে ঘরে বসে বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম—ভগবতীবাবু যে রোগীকে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছিলেন কতকাল আগে আমার নয় বছরের শৈশবে—লেখো 'রত্নগর্ভ' বলে, সেই কথাটি মনে পড়ল এতকাল পরে।

সত্যিই জীবনটা অপূর্ব শিল্প—কি বলে প্রকাশ করি এর গভীর অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য, এর নবীনত্ব, এর চারু কমনীয়তা—আবার সেই পথটি দিয়ে ফিরে এলাম, যে পথে বাবার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতুম।...বিজয়রত্ন সেনের সেই বাড়িটা আজ আটাশ বছর পরে আবার দেখলাম।

আজ সকালে উঠে স্নান সেরে রামরাজাতলা গিয়েছিলুম ননীর সঙ্গে দেখা করতে। স্থানটা আমার ভাল লাগে নি আদৌ। পল্লীর শ্রী-সৌন্দর্য নেই, অথচ শহরের মহনীয়তাও নেই—শহরের মধ্যে দীনতা নেই, কুশ্রীতা কম, যেদিকে চাই, বড় বড় সৌধ, বিশাল আকাশ—আর ওখানে পল্লীর অপূর্ব বনসন্নিবেশ নেই, Space নেই—আছে খোলা ড্রেন, দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটির তেলের আলো আর ওলকচুর বর্ষাপ্রবৃদ্ধ ঘেঁষাঘেঁষি। ননীর সঙ্গে অনেক কথা হল। ছেলেটির মধ্যে সত্যিই কিছু ছিল, কিন্তু গেঁয়ো হয়ে খুলতে পারছে না। ওকে কলকাতায় এনে ভাল সমাজে পরিচিত করে দেব।

বিকেলে বাসায় ফিরলাম। কি সুন্দর আকাশ!...বৃষ্টি নেই অনেকদিন, অথচ মেঘের পাহাড় নানা স্থানে আকাশে। কেমন যে মনে হচ্ছিল, তা কি করে বলি।...বেলা পাঁচটাতে রবিবাসর ছিল প্রবাসী আপিসে। হেমেনের গানের কথা ছিল, প্রথমে অনেকক্ষণ সে এল না। আমি, সজনী, অজিত সকলেই ব্যগ্রভাবে তার প্রতীক্ষায় ছিলাম। রবিবাসরে যাবার পথে রাধাকান্তদের মাস্টার সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা।

সুশীলবাবু বিভূতির কথা উল্লেখ করে অনেক দুঃখ করলেন। সত্যিই ছেলেটা খারাপ হয়ে যাচ্চে সবাই বলে। অক্ষয়বাবুর নাকি মধ্যে একদিন ফিট হয়েছিল গাড়িতে—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। ওদের সম্পত্তিটা অভিশপ্ত—সংযম ও উদারতার অভাবে এবং কতকটা কুশিক্ষা ও দাম্ভিকতার ফলেও ওদের সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

এই সব ভাবচি এমন সময় হেমেন এল, গান আরম্ভ হল। শৈলজা বলছিল তাকে কে কে blackmail করেচে। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দলাদলি সত্যিই দুঃখের বিষয়। নীহারবাবু বললে, ওর কে একজন দাদা 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বলেচেন, অমন বই আর হবে না। সজনী 'অপরাজিত' নিতে চাইলে। খুব খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা হল। হেমেন সত্যিই বললে বাঙ্গালীর নিষ্ঠা ও সাধনার অভাব—সস্তা হাততালি ও নাম কিনবার প্রলোভনে আমরা যেতে বসেচি।

হেমেন ও আমি নানা পুরনো কথা বলতে বলতে শেয়ালদ পর্যন্ত এলাম—ওকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে বললুম, পুজোর ছুটিতে লক্ষ্ণৌতে আবার দেখা হবে।

সত্যিই বড় ভালবাসি হেমেনকে।

চাঁদ ওঠে নি, কিন্তু আকাশে খুব মেঘ নেই; খুব হাওয়া।

রাত দশটা—বাসার বারান্দায় বসে লিখ্‌চি। দূরের সেই মাকাল লতা দোলানো ভিটের কথা মনে পড়চে—বর্ষাকালে খুব জঙ্গল বেড়েচে। আজ বৈকালটি কি অপূর্ব হয়েছিল সেখানে ...কেবল সেই কথা ভাবি। সেখান থেকে প্রথম জীবন শুরু করেছিলাম—কত পথে চলেচি, কত আলাপী বন্ধুর হাত ধরে—কিন্তু সে জঙ্গলে-ভরা ভিটেটা কি ভুলেচি!...

ননীকে একদিন সত্যিকার বাংলার রূপ দেখাব।

তারপর সারা রাত আর ঘুম হল না। এত অপূর্ব জ্যোৎস্নাও কলকাতায় আর কখনো দেখি নি যেন—বর্ষাধৌত নির্মল আকাশে সে কি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার খেলা! সারারাতের মধ্যে আমি ঘুমুতে পারলাম না—গুন্‌গুন্‌ করে গাচ্ছিলাম—

"প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে"

—কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা এল—সারারাতের মধ্যে চোখ বুজল না মোটে।

সেদিন নীরদবাবু ও সুশীলবাবুর সঙ্গে মোটরে বহুকাল পরে যশোর গিয়েছিলাম—আবার স্কুলটা দেখলাম,—আবার চাঁচড়া দেখলাম। শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যার মন্দির দেখতে দেখতে কি অদ্ভুত ভাব যে মনে জাগছিল—চারিধারের ঘন সবুজ বেত ঝোপ, পুরনো মজা দীঘি—মহলের পর মহল নির্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথরপুরীর মত দেখাচ্ছিল। পেছনের ঘাট-বাঁধানো প্রকাণ্ড দীঘিটাই বা কি অদ্ভুত!...রাজা রামচন্দ্র খাঁয়ের চাল ধোয়া পুকুরই বা দেখলাম কতকাল পরে। একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেচে।...এই ভাঙা পুরী, বনেদী ঘরের দারিদ্র্য, জীবনের দুঃখ কষ্ট—Back-ground-এ সব সময়ই পুরাতন দিনের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য—সহস্র tradition—এই সব নিয়ে।

সাধনার কথা বলছিলাম কাল কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে। সাধনা চাই। আমি টুইশানি ছেড়ে দেব। অপরাজিত তো শেষ হয়েচে—এইবার ছাপা আরম্ভ হবে—কিন্তু এই সময় সাধনা চাই।

(১) ভাল ভাল উপন্যাসকার ও ছোটগল্প লেখকদের পুস্তক পাঠ।

(২) ইতিহাস, Biology ও Astronomy সম্বন্ধে আরও বই পড়া।

(৩) Philosophy সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাবীরদের বই পড়া।

(৪) Sir Thomas Browne ও Anatole France-এর বই আরও ভাল করে পড়া।

(৫) চিন্তা, ভ্রমণ, গল্প ও আড্ডা—ভাল সম্প্রদায়ে।

(৬) পল্লীতে যাওয়া ও Quaint ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ।

সাধনা ভিন্ন উচ্চ Outlook কি করে develop করে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে—আরও চাই—আরও অনেক চাই।

১৯২৫ সালের, কি ১৯৩২ সালের আমি, আর বর্তমান আমি কি এক? অনেক বেড়েচি—সেটা বেশ বুঝতে পারি—এই দুঃখ, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে-পড়ানোর মধ্যে দিয়েও বেড়ে উঠচি। মানুষ কখন কি ভাবে কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে—তা কেউ জানে না।

ক'টা দিন বেশ কাটল। সেদিন হাওড়ার রায় সাহেব সুরেশ সেনের ওখানে একটা পার্টি ছিল। সুশীলবাবু আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন—রমেশবাবু, নীরদবাবু সবাই সেখানে। তারপর জ্যোৎস্না-রাত্রে গঙ্গার উপর দিয়ে ফেরা গেল। শনিবারে সকালে সকালে কাজ মিটতো, সাহেব এক গোলমাল পাকিয়ে দিলে—বললে, তোমার নাম সিনেট থেকে যায় নি। সিণ্ডিকেটের সেদিনই মিটিং—ছুটির পরে ফণিবাবু ও আমি দুজনে মিলে সুনীতিবাবুর কাছে গেলাম। বাড়িতে দেখা না পেয়ে ইউনিভার্সিটি—সেখানে দেখা হল। তারপর আমরা কলেজ স্কোয়ারে অনেকক্ষণ বসে গল্প করলুম। সেখানে থেকে ইন্স্টিট্যুটে রাগিণী দেবীর নৃত্যকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ফণিবাবু আমাকে Y.M.C.A-এর সামনে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে গেল। আমি X. Libraryতে যাবো। সেখানে সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রয়োজন। যাওয়ার সময় তাকে সেখানে না দেখে সোজা 'শনিবারের চিঠি' আপিসে চলে গেলাম। সেখানে নেই, আবার এলাম ফিরে, আজ নাকি হরতাল—কেউ আসে নি। ওখান থেকে বাস্-এ চেপে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে ভবানীপুরে। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করেই মুরলীবাবুর বাড়ি। তারপর অনেক রাত্রে ট্রামে বাসা।

পরদিন ছুটির পরে সুনীতিবাবুর সঙ্গে engagement. সকালে সজনীর ওখানে গেলাম। লুচি ও চা সজনীর স্ত্রী যত্ন করে খাওয়ালেন। সেখান থেকে দুজনে 'শনিবারের চিঠির' আপিস—আমি খানিকক্ষণ প্রুফ দেখে স্কুলে এলাম ও ছুটির পরে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। প্রথমে এসিস্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলারের আপিসে। কেউ নেই—পরে দেখি সাহেব রেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলুম, একটু পরেই সাহেব বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করা গেল। তারপর হেরম্ববাবু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব, মিঃ বটম্‌লি, একে একে সবাই এলেন। পাঁচটার পরে আমি ওখান থেকে ফিরে সোজা 'শনিবারের চিঠির' আপিসে। গোপাল হালদারের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে সেখানে ঘোর তর্ক। সুনীতিবাবু এলেন—গল্পগুজবের পরে আমি, সুনীতিবাবু ও প্রমথবাবু তিনজনে গল্প করতে করতে বেরুনো গেল।

সুনীতিবাবু 'পথের পাঁচালী' ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রমথবাবু ইটালিয়ানের প্রোফেসর ইউনিভার্সিটিতে, তিনি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি এলেন। আমার বইখানা ইটালিয়ানে অনুবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা হল। ইটালিতে আমায় পাঠানো সম্বন্ধে বললেন।···তিনজন ভদ্রলোক এসে দেখি বাসায় বসে আছেন—তাঁরা কালকের একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে এসেচেন।

সকালে উঠে স্কুলে গেলাম ও শনিবার সকালে ছুটির পরেই বাসায় এলাম। অনেকক্ষণ ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল। আন্দাজ চারটার সময় উঠে হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছি—শীতল পেছন থেকে ডাকলে ও একখানা পত্র দিলে। একটা সভা আছে ওদের বাড়ি—আমি সভাপতি। প্রথমে গেলাম হেঁটে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে—সেখানে Copy দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে (খুকীকে যে পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছলাম সেই পথটা ধরে) বিডন স্কোয়ার। সেখানে একটা বেঞ্চির উপর বসে কত কথা ভাবলাম। মায়ের পোঁতা সেই সজনে গাছটার কথা এত যে মনে হয় কেন? মনে হল, যে জীবনটায় আর কখনো ফিরবো না—যা শেষ হয়ে গিয়েচে, ওই সজনে গাছটা এখনও কার ফিরবার আসায় সেই দিনগুলির মত পাতা ছাড়চে, ফুল ফোটাচ্চে—ডাঁটা ফলাচ্চে—কে এসে ভোগ করবে? সন্ধ্যার ধূসর আকাশ—দু-চারটে তারা—'জনতার মাঝে জনগণ পতি' গানটাও আবার মনে এল—আকাশের তারাদের দিকে চাইলেই ওই অপূর্ব ভাবটা হয়।

তারপর উঠে ওদের বাড়ি গেলাম। মন্মথদের বাড়ি সভা হল। আমায় করলে সেক্রেটারী। সভা ভঙ্গের পরে বিভূতি গলা জড়িয়ে ধরে বললে, এখানে রাত্রে খেয়ে যাবেন। তারপরে লাল ঘরে অনেকক্ষণ আড্ডা হল। পড়বার ঘরে তারপরে বিভূতি কাছে বসে খাওয়ালে। পুরানো দিনের গল্প হল, সব চেয়ে কথা উঠল—'পুত্তলিকা' 'পুত্তলিকা' সে কথা হোল। তারপর রিক্সা করে মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-রাত্রে পুরনো দিনের মত বাসায় ফিরলাম—সেই প্রতাপ ঘোষের বাড়ির সামনে দিয়ে, থানাটার পাশ দিয়ে। একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েচি, আজ বিকালে প্রবাসী আফিসেও Sir P. C. Roy-এর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম।

রবিবারে প্রসাদ এল। বেশ মাথায় বড় হয়েচে—সেই ছোট্ট প্রসাদ আর নেই। তাকে দেখে এমন স্নেহ একটা হল! আমার নাম উঠলেই এখনও সকলে কাঁদে—চাঁপাপুকুরের বড় মাসিমা কাঁদেন, এই সব কথাও বললে। একটা চাকরির কথা বললে। তারপর আমার নাম এখন প্রায়ই সকলে করেন, সে কথাও বললে। তারপর সে চলে গেল।

আমি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি, নীরদবাবু এসে ডাকচেন। দুজনে দমদমা গেলাম—সুশীল-বাবু শান্তিকে পড়াচ্ছিলেন—দুজনেই বাইরে এলেন। গল্পগুজব হল—মাঠে বসে চা খাওয়া গেল। আমরা পাঁচটার সময়ে বেরিয়ে শরদিন্দুবাবু ও করুণাবাবুর পার্টিতে এলাম। নরেন দেব, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্যাল, রমেশ বসু—সবাই এল। খুব খাওয়া-দাওয়া হল। প্রচুর খাওয়া! নরেন দেব সন্দেশ খেতে খেতে মুখ লাল করে ফেলে অবশেষে যখন আরও খেতে অনুরুদ্ধ হলেন—মরীয়া হয়ে বললেন, সন্দেশটা ভালো নয়। আমরা বেরিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে এসে সুশীলবাবুকে তুলে নিয়ে নীরদবাবুর গাড়িতে নিউ মার্কেটে গেলাম। কথা রইল বৃহস্পতিবারে 'অপরাজিত' পড়া হবে দমদমার বাগান-বাড়িতে। Wide World কিনে রাতে বাসায় ফিরলাম।

কিন্তু আজই মনটা কেমন উড়ু উড়ু, মায়ের সেই সজনে গাছটা,—ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ির কথা আজ সারাটা দিন মনে হয়েছে—বিশেষ করে এই জ্যোৎস্না রাত্রে।

এবার সরস্বতী পূজা একটু দেরীতে। কিন্তু ছুটি পাওয়া গেল বেশী। সপ্তাহব্যাপী ছুটি। 'অপরাজিত' প্রায় শেষ হয়ে আসচে—ভাবলাম একবার কেওটা যাবো এসময়ে। নীরদবাবুও রাজী। গত মঙ্গলবার আমি ও নীরদবাবু মোটরে গেলাম দমদমা। সুশীলবাবু যেতে পারবেন না, অতএব আমরা সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে দক্ষিণেশ্বর যাবো বলে বেরিয়ে পড়ি। সুশীলবাবুর স্ত্রীও 'অপরাজিত' শুনবেন বলে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সবাই বেরিয়ে পড়া গেল কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হল না। যশোর রোডের 'পরে একটা নিভৃত বাঁশবনের ছায়ায় বিছানা পেতে বসে আমরা 'অপরাজিত' পড়লাম—তারপর ফিরে এসে চা খেয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। রাত্রে রমেশবাবুর ওখানে নেমন্তন্ন ছিল—সেখানে প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে দেখা।

বুধবার দিনটি কাজ করলাম। বৃহস্পতিবার সকালে বনগ্রামের ট্রেনে চাপলাম—ইন্দুদের বাসায় পৌঁছে দেখি তরু নেই। হেডপণ্ডিতকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে অঞ্জলি দিলাম, দেবেনের বাসায় গেলাম, তারপর ফিরে এসে তরুর সঙ্গে গল্পগুজব করে চাল্‌কী রওনা।

কি অদ্ভুত আমের বউলের সৌরভ, কি শিমুলফুলের শোভা। বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ। কাল পয়লা ফাল্গুন, এমন বসন্তশোভা আমাদের দেশে অনেক-কাল দেখি নি। চাল্‌কী পৌঁছে খাবার খেয়ে খুকী, ভোঁদো সবসুদ্ধ উত্তরমাঠে বেড়াতে গেলাম—রস খাওয়া গেল—অনেকটা বেড়ালাম। তারপর ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি আবার গেলাম উত্তর মাঠে—তখন চারিধার কি নির্জন।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুরে গেলাম। সারা পথে কেমন দক্ষিণা হাওয়া—কি অপূর্ব আমের বউলের গন্ধ! খুকীও সঙ্গে গেল। সকাল সকাল ফিরে স্নান করলাম। তারপর বৈকালে বেরুতে যাবো, বৃষ্টি এল—একটু বসলাম। আবার যাবো—রামপদ এল। তাকে একটু জল খাইয়ে দুজনে একসঙ্গে বার হাওয়া গেল। কি অপূর্ব শান্তির মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছলাম। আমি পটপটি তলায় ঘাটের এপারে এসে দাঁড়ালাম—ওপারের রাঙা-রোদভরা মাঠের দৃশ্যটা কি যে অপরূপ! তারপর মাঠের পথ বেয়ে আমাদের বাড়ির পিছনের পথে আসচি, বেলা পড়ে এসেচে—কি বাঁশের শুকনো খোসা ও ঝরা বাঁশপাতার সুঘ্রাণ!...কতকাল আগের শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয় যে।

রামপদর কাছে বসে একটু তামাক খেয়ে ও গল্পগুজব করে শ্যামাচরণদাদার বাড়ি এলাম। সেখানে অপেক্ষা করলাম। জ্যোৎস্না উঠলে চাল্‌কী চলে এলাম। ছেলেপিলেরা এল গল্প শুনবে বলে। বঙ্কু অনেকক্ষণ ছিল।

আজ সকালে উঠে চলে এলুম।

কাল বিকালে সুশীলবাবুদের বাড়ি গেলাম। কি সুন্দর বসন্ত এবার এখানে! বৃষ্টি নেই। দেশে গিয়েছিলাম—সর্বত্র আমের বউলের গন্ধ। আজ সকালে সজনী দাসের বাড়ি গেলাম—স্নান সেরে। বেজায় কুয়াসা। সজনীর স্ত্রী চা ও লুচি খাওয়ালেন। ২৬ [illegible] মেয়েটি।

'অপরাজিত'র শেষ লেখাটা আজ প্রেসে দিয়ে এসেচি। কিছু করবার নেই। হাত ও মন একেবারে খালি। স্কুল থেকে ফিরে নিউ মার্কেটে গিয়ে 'Wide World' খুঁজে পেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রীটে এসে কাপড় কিনে এই ফিরচি।

'অপরাজিত'র শেষটা ভাল করে লেখবার জন্যে তিনদিন ছুটি নিয়েছিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—ছুটি ভাল লাগে না। স্কুলটাই ভাল লাগে। বেশ ছেলেপুলে নিয়ে থাকা—অমিয়, দেবব্রত, বিমলেন্দু, সত্যব্রত এদের সঙ্গ বেশ লাগে। ওরা সবাই শিশু—নীচু ক্লাসের ছেলে। আমাকে মাস্টার বলে ভয় তত করে না, যণ্টা আপনার লোকের মত ভালবাসে। সব বিষয়ে সাহায্য চায় troubles খুলে বলে, বেশ লাগে। ওদের নিয়ে সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, টেরই পাই না! নিষ্ক্রিয়, Death-in-Life ধরনের existence-এর চেয়ে এরকম স্কুল মাস্টারীও শতগুণে শ্রেয়!

আজ একটা স্মরণীয় দিন। আজ সকালে উঠে সজনী দাসের বাড়িতে চলে গেলাম, না খেয়েই—সে এ কয়দিনই অবশ্য যাচ্ছি। কিন্তু আজ গেলাম 'অপরাজিত'র শেষ ফর্মার প্রুফ দেখবার জন্যে। ওখান থেকে স্কুলে। সেখানে দেবব্রতের পরীক্ষা নিলাম। তারপর ইউনিভার্সিটির সামনে সুধীরদার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হল—সমীর বললে ভালো লিখেচে। শৈলেনবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। তারপর এক কাপ চা খেয়ে আবার গেলাম সজনী দাসের ওখানে। প্রমথবাবু ও সজনী বসে। শেষ ফর্মাটা প্রেসে ছাপতে দিয়েচি। তারপরে কি করে 'পথের পাঁচালী' প্রথম মাথায় এল, সে গল্প করলাম।

আজ তাই মনে হচ্ছে, সত্যিই স্মরণীয় দিনটা। ১২২৪ সালের পূজার সময়টা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সব সময়ই এই বই-এর কথাই ভেবেচি। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩২-এর ১০ই মার্চ পর্যন্ত এমন একটা দিনও যায় নি, যখন আমি এ বইখানির কথা না ভেবেচি—বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মনোভাব নোট করেচি, মনে রেখেচি—কত কি করেচি। ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড় বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধ-ভরা ফাল্গুন-দুপুর, কত চৈত্র-বৈশাখের নিমফুলের গন্ধ-মেশানো অলস অপরাহ্ণ, বড়বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি—অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েচি। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দুখানির খুব যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এ বিষয়ে ভুল নেই—কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা-ভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি

আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।

আজ রাত অনেক হল। এদের সকলের উদ্দেশে বইখানি উৎসৃষ্ট করলাম। যদি সাহিত্যের বাজারে আন্তরিকতার কোনো মূল্য থাকে, তবে আমার ইসমাইলপুরে, ভাগলপুরে বড়বাসার ছাদে আমার বহু বিনিদ্র রজনীযাপনের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেবে যে, বই দুখানি লিখতে আন্তরিকতার অভাব আমার ছিল না বা চিন্তার আলস্য আমি দেখাই নি।

আজ সত্যিই কষ্ট হচ্চে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল। আজ ওবেলাও প্রুফ দেখে'চি, অদলবদল করেচি—কিন্তু এবেলা থেকে তাদের সকলকেই সত্যসত্যই বিদায় দিলাম। আজ রাত্রে যে কতখানি নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করচি, তার সন্ধান তিনিই জানেন, যিনি কখনো এমনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে গুটিকতক চরিত্র সম্বন্ধে সর্বদা ভেবেচেন।—তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুরুদুরু বক্ষে চিন্তা করেচেন।

অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি। তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করচি—তবে সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যে বেশী কষ্ট হচ্চে বিদায় দিতে কাজলকে, লীলাকে, দুর্গাকে, রানুদিকে--এরা সত্যসত্যই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। কোনোদিকে এদের কোনো ভিত্তি নেই এক আমার কল্পনা ছাড়া।

যদি দু-পাঁচজনেরও এতটুকু ভাল লাগে বই দুখানা—তবে আমার পাঁচ বৎসরের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করবো।

সত্যিই মনে পড়ে ইসমাইলপুর থেকে সাবোরে আসচি ঘোড়ায় ভাবতে ভাবতে—নোট করতে করতে। কার্তিক আগুন জ্বাললে সাবোর স্টেশনে। সে জিনিস আজ শেষ হল? যখন 'পথের পাঁচালী' ছাপা হয়েছিল, তখনও 'অপরাজিত' ছিল—বেশীটাই বাকী ছিল—কিন্তু আজ আর কিছু নেই।

রাত্রি অন্ধকার। চাঁদ ডুবে গিয়েচে। শহরের গোলমাল থেমেচে। আমি লিখতে লিখতে বহু দূরের অন্ধকার আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে দেখচি—জীবনদেবতার কি ইঙ্গিত, যেন আগুনের আখরে আকাশের অন্ধকারপটে লেখা।

বিদায়, বন্ধুদল—বিদায়।

আজ সকালে মহিমবাবু এসে অনেকক্ষণ বসেছিল। তারপর স্কুল থেকে গেলাম ইউনিভার্সিটিতে Examiners' Meeting-এ। বেরিয়ে আমি ও সুনীতিবাবু দুজনে গেলাম লিবার্টি অফিসে। টমসন সাহেব সেদিন এলবার্ট হলের বক্তৃতায় 'পথের পাঁচালী'র উল্লেখ করেছেন—নীহার রায়ের মুখে শুনে একখানা কাগজ আনিয়ে নিলাম। তারপর বাসে উঠে সজনীর বাড়ি। সেখান থেকে ফিরে Sample কাগজখানা দেখা এইমাত্র শেষ করলাম।

স্কুলে দেবব্রত খাতা দেখাতে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ওবেলা—তাকে বললাম, তুই আমার ছেলে তো ?

সে বললে একটু সলজ্জ হেসে—হ্যাঁ। ও কখনো একথা বলে নি এর আগে। তাই আজ আনন্দে মনটা পূর্ণ আছে সারাদিন।

আজ রাত্রে 'অপরাজিত' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডটা সজনীর কাছ থেকে আনলাম। আজ সকালেই বই বার হয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত বসে থেকে চা খেয়ে ও গল্প-গুজব করে চলে এলাম।

দ্বিজরাজ জানা মারা গিয়েচে বলে সকালে ছুটি হল। বেরিয়ে আমি যতীনবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ও নিউ মার্কেটে বেড়ালাম। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি গেলাম কাগজের খোঁজে। কাগজ পেলাম না। বীরেনবাবুও ছিল। বেরিয়ে বাসায় এসে একটু ঘুমুনো গেল।

এখন রাত। সিঁদুরে মেঘ হয়েচে। মনটা কেমন একটা বিষাদে পরিপূর্ণ—মনটা শূন্য হয়ে গিয়েচে—অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, কাজল, লীলা, পটু, রিনি—এরা সব আজ মনের বাইরে চলে গিয়েচে, কতকালের সহচর-সহচরী সব—সেই ইসমাইলপুরে এমন সব চৈত্র অপরাহ্নে Wide World-পড়া দিনগুলো থেকে ওরা আমার মনের মধ্যে ছিল—কাল একেবারে চলে গিয়েচে।

ওদের বিরহ অতি দুঃসহ হয়ে উঠেচে।

এর আগে ক'দিন মনটা ছিল নিরানন্দ। কেবল গৌরীপুরের মাঠে যেদিন Picnic করতে যাই আমরা—সেদিনটাতে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই আধ-জ্যোৎস্না আধ-আঁধার রাত্রে তালবনের ধারে পুকুরপাড়ে বসে কত কি গল্প—কতকাল ওসব কথা মনে থাকবে।

কাল রাত্রে সাহিত্য-সেবক-সমিতিতে সভাপতি ছিলাম। অচিন্ত্য একটা গল্প পড়লে—গল্পটা মন্দ হয় নি—সেখান থেকে বেরিয়ে অনাথভাণ্ডারের থিয়েটার দেখতে যাবো কথা ছিল, কিন্তু অবনীবাবু, সুকুমার ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে জমে গিয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত হৃষিকেশ লাহাদের বাড়ির সামনের পার্কটাতে আড্ডা দিলাম। সেখান থেকে বা'র হয়ে বাসায় ফিরলাম অনেক রাতে।

আজ বেলা চারটার ট্রেনে শ্রীরামপুরে গেলাম। সেখানে 'আনন্দপরিষদের' অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে হবে। ছেলেরা ওখান থেকে এসেছিল। অবনীবাবুকে সঙ্গে নেব বলে ডাকতে গেলাম, পেলাম না। ঝম্-ঝম্ করচে দুপুরের রোদ। কিন্তু একটু পরে বেশ মেঘ করে এল। শ্রীরামপুরে শ্রীলীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে গেল। লীলারানী দেবী লেখিকা, 'কল্লোল' ও 'উপাসনা'য় লেখেন। ওপরের বারান্দাতে তিনি বরফ দিয়ে শরবত

তৈরী করে খাওয়ালেন ও জলখাবার দিলেন। তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এঁদের বাড়ির কাছেই খুকীর শ্বশুরবাড়ি। একবার সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ছিল। লোকও পাঠালাম—কিন্তু লোক ফিরে এসে বললে কারুর সঙ্গে দেখা হল না।

সভায় যখন আসচি—ওদের বাড়িটা দেখলাম—ভাঙা দোতলা বাড়ি—একটা কয়লার গোলার পাশ দিয়ে পথ। সভার কার্য শেষে আবার ভুরিভোজনের ব্যবস্থা। সমবেত ভদ্রলোকেরা আমাকে একটা বড়লোকের বাড়ির দোতলার হলে নিয়ে গেলেন—সেখানেই একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে নানারকম ফলমূল, মিষ্টান্ন, শরবৎ সাজানো। এত খাই কি করে? এই শ্রীলীলারানী দেবীর ওখান থেকে খেয়ে আসচি। কে সে কথা শোনে? আনাতোল ফ্রাঁসের Procurator of Judea গল্পটি খেতে খেতে ওঁদের কাছে করলুম—রসের বৈচিত্র্য ও quaintness হিসেবে।

ওরা ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। ট্রেনে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল—বাড়ি জিরেট-বলাগড়, বিড়ি খাওয়ালে, অনেক গল্প-গুজব করলে। হাওড়া স্টেশন থেকে হেঁটে বাসায় এলাম। পথে পানিতরের বামনদাস দত্তের সঙ্গে দেখা। আজ পয়লা মে। একটা স্মরণীয় দিন। আজকার সভার জন্যে বা এসব আদরের জন্যে নয়—আজ ১৩ বৎসর হতে সেই ১লা মে-তে—কিন্তু সেকথা আমিই জানি, আর কেউ জানে না। জানবার কথাও নয়। বোলবও না কাউকেও।

বেশ হাওয়া, বাসায় এসে বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে রইলাম।

আজ মনে একটা অপূর্ব আনন্দ পেলাম—অনেক কাল পরে। মনে পড়ে গেল বাল্যে দুপুরে আহার সেরে এই সব দিনে বাড়ির পেছনে বাঁশবনে মুখ ধুয়ে আসতাম। বাঁশবনে গিয়ে আঁচালে তবে মনে একটা আনন্দ আসত—কত তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু একদিন ও থেকে কি গভীর আনন্দই পেয়েছি!...সেই ভিটে, সেই গ্রাম আজও তেমনি আছে—আমিই কেবল বদলে গিয়েচি। আজ রবিবার ফনিকাকারা তাড়াতাড়ি করচে এত রাত্রে হরি রায়ের বাড়িতে তাস খেলতে যাবে বলে—আনন্দ করচে ঝিট্‌কীপোতার বাঁওড়ে বড় রুই মাছের বাচ হচ্চে বলে—হাটে আজ মাছ সস্তা হয়েচে বলে—আমিও যদি গ্রামে থাকতুম—আমিও ও-থেকে আনন্দ পেতুম ওদেরই মতন—কিন্তু আমি বদলে গিয়েছি একেবারেই। Sophisticated হয়ে পড়েচি, hampered হচ্চি। দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট হয় নি বলে এখনও এসব বুঝতে পারি।

আকাশের অগণ্য তারায় তারায় কত দেবলোক, কত পৃথিবী, কত জগৎ—কত অগণিত প্রাণীকুল, কত দেবশিশু—আনন্দের কি মহান, অসীম ভাণ্ডার! দুঃখও যত বৃহৎ তাদের—আনন্দও তত বৃহৎ। এই ভেবেই, চৈতন্যের এ প্রসারতা শুধু আমার আজ রাত্রে।

আজ সকালে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ কাল অনেক রাত্রে দম্‌দম্‌ থেকে ফিরেচি। সেখানেই রাত্রে খেলাম, আগামী রবিবারে Outing-এর নক্সা করলাম, তারপর

আমি আর নীরদবাবু মোটরে ফিরেছি। আজ এইমাত্র সাহেবের ওখান থেকে আসছি। সাহেব একটু দমে গিয়েচে—আমি ফণিবাবুর সঙ্গে ওটা মিটিয়ে ফেলতে বললুম।

কন্‌ভেণ্ট রোডটা অন্ধকার, এখানে-ওখানে যুঁই ও মালতীর সুগন্ধ, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার, নক্ষত্রে ভরা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম সাহেবের হাঙ্গামাটা যেন মিটে যায়।

একটা কথা মনে হচ্চে। মানুষের মনের ব্যাপকতা যত বাড়বে ততই সে পূর্ণ মনুষ্যত্বকে লাভ করবে। এমন সব মানুষ জীবনে কতই দেখলাম তাদের মনের সতর্কতা, চৈতন্যের ব্যাপকতা বড়ই কম। এত কম যে আহার-বিহার ও অর্থোপার্জনের বাইরে যে আর কিছু আছে, তা তারা ভাবতে পারে না। জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, আর্ট বল, সাহিত্য বল—এ সবের কোনো মূল্য নেই তাদের কাছে। এমন কি স্নেহ, প্রেম, কল্পনা, বন্ধুত্ব, এ সবও তাদের অজ্ঞাত—loyalty-কে তারা ভীরুতা ভাবে, স্নেহকে দুর্বলতা ভাবে। ফণিবাবু একজন এই ধরনের মানুষ। এ সব লোকের নির্বুদ্ধিতা আমি বরদাস্ত করতে পারি নে একেবারেই। মূর্খতারও একটা সীমা আছে, এদের তাও নেই।

সে যাক্। এই চৈতন্যের ব্যাপকতার কথা বলছিলাম। এই মুক্ত প্রকৃতি, সবুজ ঘাসে-মোড়া ঢালু নদীতীর, কাশবন, শিমুলবন, পাখীর ডাক—নীল পর্বতমালা, অকূল সমুদ্র, অজানা মহাদেশ—এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, সুন্দরী তরুণী, স্নেহময়ী পত্নী, উদার বন্ধু, অসহায় দরিদ্রদল,—এই বিরাট মানবজাতির অদ্ভুত ইতিহাস, উত্থানপতন, রাজনীতির ও সমাজনীতির বিবর্তন, এই বিরাট নক্ষত্রজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কা—জানা-অজানা জাগতিক শক্তি,—এই X-ray, বিদ্যুৎ, invisible rays, high penetrating radiation,—ওই মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যুপারের বিরাট জীবন—এই রহস্যে স্পন্দমান, অসীম, অদ্ভুত জীবনরহস্য—এই সৌন্দর্য, এই বিরাটতা, এই কল্পনার মহনীয়তা,—এসবে যারা মুগ্ধ না হয়, গরু-মহিষের মত ঘাস-দানা পেলেই সন্তুষ্ট থাকে, যারা এই রহস্যময় অসীমতার সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিদ্রিত ও উদাসীন রইল—সে হতভাগ্যগণ শাশ্বত ভিখারী—তাদের দৈন্য কে দূর করতে পারবে?

মানুষের মত যত উদার হবে, যত সে নিজের চৈতন্যকে বিশ্বের সবদিকে প্রসারিত করে দিতে পারবে, অণুর চেয়ে অণু, মহানের চেয়েও মহান্ বিশ্ববস্তুর প্রতি আত্মবুদ্ধিকে যত জাগ্রত করে তুলতে পারবে—সে শুধু নিজের উপকার করবে না, নিজের মধ্য-দিয়ে সে শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকারজাল ও জড়তাকে প্রতিভার ও দিব্যদৃষ্টির আলোকে প্রসারিত করে দিয়ে যাবে। সেই সত্য—সত্য নিত্যকালের মর্মলিপি।

সেদিন চারু বিশ্বাসের বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং হল। রাত দশটার পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে আসতে গিয়ে লাউডন স্ট্রীটের মোড়ে একটা টায়ার গেল ফেটে। মৌলালীর মোড়ে আবার মহরমের বেজায় ভিড়। অনেক কষ্টে রাত্রে বাড়ি পৌঁছলাম। ভোরে স্নান সেরে বসে আছি নীরদবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। চা পান করে দমদম্ থেকে

বেরুনো গেল। বনগাঁর পথে এ গাড়িরও একখানা টায়ার গেল। বনগাঁয়ে পৌছে বাজার করে বেলেডাঙ্গা পৌছুতে বেলা নয়টা। বটতলায় গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে সবাই মিলে রেঁধে খেলাম। শ্যামাচরণদাদাদের বাড়ি এলাম—সেখান থেকে নৌকা করে নক্‌-ফুলের ঘাট পর্যন্ত বেড়ালুম—সবাইপুরের ঘাটে স্নান করলুম। তারপরে সেদিন রাত্রে দমদমাতে ফিরে খেয়ে আবার এলুম বাসাতে!

এবার বাড়ি গিয়ে বড় গোলমাল। ক'দিন বেশ কেটেছিল, শ্যামাচরণদাদার স্ত্রীর স্নেহ বড় উপভোগ করেচি—বৌদি বড় ভাল মেয়ে—আমার শ্রদ্ধা হয়েচে। বর্ষা-বাদলার দিনে পুঁটিদিদিদের বাড়ি গরু-বাছুরের সঙ্গে একঘরে বাস করে মনটা খিঁচড়ে উঠেছিল। ওখানে এবার তুফন্ ঠাকরুন মারা গেলেন। আসবার আগের দিন তাঁর শ্রাদ্ধ হল। রোজ বিকেলে বকুলতলায় বসতুম। জগা ছড়া বলত—

> "অশন বসন রণে সদা মানি পরাজয়,
> দুনয়নে বারিধারা গঙ্গা যমুনা বয়—
> কথায় কথায় তুমি যেতে বল যমালয়,"—ইত্যাদি

ছেলেমানুষের মুখে বেশ লাগত।

কিছুদিন কলকাতা গিয়ে রইলাম। একদিন নীহার রায়ের ওখানে গেলাম, সেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব বসে আছে, 'অপরাজিত' সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল। নীহার বললে—'অপরাজিত' একটা Great Book, আমি এঁদের সেই কথাই বলছিলাম, আপনি আসবার আগে। ধূর্জটীবাবুর বাড়িতে একদিন 'অপরাজিত' নিয়ে আলোচনা হল আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক অনেক জায়গা দাগ দিয়ে পড়েচেন, মার্জিনে নোট লিখে। তারপর নীরদের বাড়িতে চা-পার্টি উপলক্ষে সুনীতিবাবু ও রবীন্ হালদারের সঙ্গে সে সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

রবিবারে গেছলাম, আবার পরের রবিবারে ফিরি। সেদিন রাণাঘাটে নেমে কি ভয়ানক বর্ষা। গোপালনগরে নামলাম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। অতি কষ্টে গাড়ি যোগাড় করে ফিরলাম। হাটবার, সুশীলবাবু একটা মোট পাঠিয়েছিলেন শ্যামাচরণদাদাদের জন্যে—সেটা তাঁদের দিলাম।

কাল খুব গুমট হয়েছিল। বৈকালে জেলি, সরলা এরা পড়তে এল—বকুলতলায় চেয়ার পেতে বসে খুকুর সঙ্গে খুব গল্প করলুম। রিমঝিম বর্ষার মধ্যে মেঘভরা আকাশের তলা দিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ওপারে বর্ষাস্রোত বয়, গাছপালা, সবুজ তৃণভূমি—বৃষ্টিতে চারিধারে ধোঁয়া-ধোঁয়া—তারপর গেলাম ওপাড়ার ঘাটে। জল গরম—নেমে স্নান করতে করতে চারিদিকে চেয়ে সে কি আনন্দ পেলাম—মাথার উপর উড়ন্ত সজল মেঘরাশি, জলের রং কাকের চোখের মত, কি সুন্দর কদম গাছটার রূপ—মনে হল ভাগলপুরের সেই অপূর্ব সবুজ কাশবনের চর—সুদূরপ্রসারী প্রান্তরের সেই সুন্দর প্রাণ-মাতানো স্মৃতিটা—সেও এমনি বর্ষা-সন্ধ্যা, এমনি মেঘেভরা আকাশ—হাতীর পিঠে চড়ে আমীনের সঙ্গে সেই বেড়ানোটা। আমি

জলে সাঁতার দিলাম। মনে হল যেন আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা—এই মুহূর্তে পাখা ছেড়ে এই মেঘ-ভরা আকাশ চিরে ওপারে বহুদূরে কোথায় উড়ে যাবো!

এমন আনন্দ সত্যিই অনেকদিন পাই নি।

এখনও সোঁদালিফুল আছে—কিন্তু এবার অতিরিক্ত বর্ষায় অনেক অনিষ্ট করেচে—অনেক ফুলই ঝরে পড়ে গিয়েচে। সোঁদালিফুল এত ভালবাসি যে ঘাটে নাইবার সময় ঘাটের ধারে যে গাছগুলো আছে, ওদিকের ফুলের ঝাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকি—নইলে যেন প্রাণের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। দু-এক ঝাড় যা আছে, তাদেরও চেহারা বড় শ্রীহীন। কি করি, ওদের নিয়েই যা একটু আনন্দ পাই!...

আগের দিন জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে বেলেডাঙার মাঠে গিয়েছিলাম। এ দিন বৃষ্টি ছিল না, সুন্দর মাঠ তৃণাবৃত, সোঁদালিফুল এখনও গাছে গাছে খুব। দুটি রাখাল ছেলের সঙ্গে কতক্ষণ বসে গল্প করলাম, মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়ালাম, নদীজলে সন্ধ্যায় নাইতে নেমে সাঁতার দিলাম খুব। মোড়টা ফিরতে কুঠীর পথে একটা ঝোপের মধ্যে একটা ডালে কি ফুল ফুটে আছে—বাল্যজীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়—এক সময়ে এরাই ছিল সহচর, এদের সব চিনি।...

রোজ খেয়ে উঠে মুখ ধোবার সময় খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশতলার দিকে যাই। ঐ সময়টা বহু পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে যেন—পুরাতন বাল্য-দিনগুলি প্রতিদিন ঐ সময়টাতে ফিরে আসে।

এখনও গ্রীষ্মের ছুটি এবার শেষ হয় নি। পরশু পর্যন্ত আছে। কিন্তু খুলবার সময় হয়েচে। মনটা বড় খারাপ হয়ে আসচে। কত কথা যে মনে আসচে—কত গ্রীষ্মের ছুটি এ রকম করে কাটল। অথচ দেশে তো আমার কেউ নেই—যখন ছিল সে ছিল আলাদা কথা।...

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসটা বড় বর্ষা। যখন বাঁশতলী গাছে আম পেকে টুকটুক্ করছে, যখন যুগল কাকাদের চারা বাগানে আম পাকচে—তখন বর্ষার আকাশ এমন ঘন মেঘাচ্ছন্ন, যেন শ্রাবণ মাস কি আষাঢ় মাস। যে সময়ে কলেজে পড়বার সময়ে আমি বেলেডাঙার পথের বটতলার শান্ত আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার নিরাশ্রয়তার মধ্যে চলে আসতুম। খুব কষ্ট হত। এবারে কিন্তু কত দিন পর্যন্ত আমি রইলাম! কি সুন্দর বর্ষাদৃশ্য এবার দেখলাম ইছামতীর চরে, ইছামতীর কালো জলের ওপরে! কি বড় বড় মেঘের ছায়া!...ঘাটের পথে খেজুর গাছটার খেজুর এখনও বোধ হয় খুঁজলে দু-একটা পাওয়া যাবে।

ওদের নিয়ে রোজ পাঠশালা করতুম, খুকু sentence লিখত, জগা ছড়া বলতো:—

'এঁতল বেঁতল তামা তেঁতল
ধরতো বেঁতল ধরো না'—

কি মানে এর, ও-ই জানে—অথচ কি উৎসাহেই আবৃত্তি করত!...শিবু ও সুরো ধনুক-বাণ নিয়ে যাত্রা করতে আসত, খুকু কত রাত পর্যন্ত বসে আমার কাছে গল্প শুনত,—জ্যোৎস্না

উঠে যেত তবুও সে বাড়ি যেতে চাইত না। এক একদিন আবার দুপুরে এসে বলত, গল্প বলুন। আসবার দিন বকুলতলায় বসে ওকে খাতা বেঁধে দিলাম, sentence করতে দিয়ে বলে এলাম, এসে আবার দেখব।

"মায়ের ভাঙা কড়াখানা উল্টে পড়ে গিয়েছে, ভিটেটাতে বড় বেশী জঙ্গল হয়েচে—অপু" যেমন বইতে লিখেচি।

কুঠীর মাঠে গিয়ে এক-একদিন গামছা পেতে শুয়ে থাকতুম—খুব হাওয়া, বড় চমৎকার লাগত। কিন্তু যখন ইছামতীর জলে নাইতে নামতুম সকালে ও বিকেলে—সেই সময়ই সকলের চেয়ে লাগত ভালো। ও-পাড়ার ঘাটের সামনে সবুজ ঢালু ঘাস-ভরা মাঠ ও আঁকাবাঁকা শিমুলগাছটা যে কি অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলত চোখের সম্মুখে তা কাকে বলি, কে-ই বা বুঝবে? যখন আসি তখনও বৌ-কথা-ক' ছিল, তখনও পাপিয়া, কোকিল ডাকত, অথচ তখন তো আষাঢ় মাস পড়েই গিয়েছিল।

এবার এ-বাড়ি ও-বাড়ি এত নিমন্ত্রণ সবাই করে খাইয়েছে—কেন জানি না, অন্যবার এত নিমন্ত্রণ তো করে না।

দেবব্রতকে কত কাল দেখি নি—তার মুখ ভুলেই গিয়েছি—এতকাল পরে এইবার দেখব।

সেদিন বনগাঁয়ে গেছলাম—সকালে খুকীর সঙ্গে পাকা রাস্তায় সাঁকোয় কত খেলা করলুম। খুকী কত ফুল তুললে, পাতা তুললে, আমিও কত ফল পেড়ে নিয়ে এসেছিলাম; খুকী রাঁধলে। খুকীর সঙ্গে ছেলেমানুষী খেলা খেলে ভারী আনন্দ পাই।* খুকী কিন্তু পড়াশুনো করে না, এই ওর দোষ। খুকু এর মত নয়, খুকু খুব বুদ্ধিমতী, পড়াশুনোয় খুব ঝোঁক।

বনগাঁয়ে সেদিন বোটের পুলে বিশ্বনাথ, দেবেন, সরোজ সবাই বসে গল্প করছিল, আমি যেতে অনেকক্ষণ বসে গল্প হল, বিশ্বনাথ নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালে। রাত্রে এই দিন বন্ধুর বাসায় খাওয়ার পরে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে বেড়াতে বনগাঁ স্কুলের ফটকে ঠেস দেওয়ানো বেঞ্চিটার ওপর গিয়ে বসলাম। কত কথা মনে আসে! চব্বিশ বছর আগে একজন বারো বছরের ক্ষুদ্র বালক একা বাড়ি থেকে ভর্তি হতে এসে ওই জায়গাটাতে লাজুক ভাবে চুপ করে বসে ছিল—কতকাল আগে! সেদিনে আর আজকার মধ্যে কত তফাত তাই ভাবি। হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে বেড়িয়ে এলাম—বোর্ডিং-এর সব ঘরের সামনে বেড়ালাম। কিন্তু পর পর সেদিনের কথাটা মনে আসছিল—একটি ছোট ছেলে বর্ষার জল ও আষাঢ়-শ্রাবণের আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙে এক-গা কাদা মেখে চাদর গায়ে, মায়ের কাছ থেকে ভর্তি হওয়ার সামান্য টাকা ও দুটি পয়সা জলখাবারের জন্যে বেঁধে এনে লাজুক মুখে চুপ করে ওই স্কুলের পৈঠার উপর বসে আছে—এমন মুখচোরা যে, কাউকে বলতে পারচে না ভর্তি কোন্ ঘরে হয়, বা কাকে বলতে হবে?

সেই ছোট ছেলেটি চব্বিশ বছর আগেকার আমি—কিন্তু সে এত দূরের ছবি, যে আজ যেন তার ওপর অলক্ষিতে স্নেহ আসে।

* খুকু এবং খুকী এক নয়,—খুকু থাকে বারাকপুরে, আর খুকী বনগাঁয়ে।

ওঃ, এবার যেন ছুটিটা খুব দীর্ঘ মনে হচ্চে। সেই কবেকার কথা, সুনীলবাবুর স্ত্রী বটতলায় ভাত রেঁধে আমাদের পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন, আমরা কাঠ কুড়িয়েছিলাম, যুগল এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছিল—সে কত দিনের কথা। তারপর গোপালনগরের বারোয়ারী, তুফন্ ঠাকুরুণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, সে সবও কতকালের কথা। বড় চারার আম কেনা, মাঠের চারার আম কেনা, সে সবও আজকার কথা নয়। আঁচানোর সময়ে খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে গাছপালা ও বাঁশবনের দৃশ্যটা এত অদ্ভুত যেন একেবারে শৈশবে নিয়ে যায় এক মুহূর্তে।

জীবনের রূপ ও সৌন্দর্যে ডুবে গেলাম। হে ভগবান্! এর তুলনা দিতে পারি নে।

পঞ্চানন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হল, ইউনিভার্সিটির একটি brilliant ছেলে, রেবতীবাবুর বন্ধু। পথে আসতে আসতে অবনী ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা। তারা মনোজের বাড়ি কাঁঠাল-খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেচে। বৃষ্টি আসচে দেখে আমি দৌড় দিলাম।

বাসায় এসে ঠিক করলুম এই ঘরটা আমি একলা নেব। এ বৎসরটা খুব পড়ব, লিখব, চিন্তা করব। Prescott's Peru, Shackleton's Voyages ও Historiography-র ভালো বই এবার পড়তে হবে—যদিও Prescott আমার পড়া আছে, তবু আর একবার পড়ব। চিন্তায় যে নির্জনতা চাই, তা ঘরে একা না থাকলে হবে না। Crystallography সম্বন্ধে কিছু পড়তে হবে।

এ কয় মাস এই খাতাখানা হারিয়ে গেছল। তাই মাস পাঁচেক ধরে এতে কিছু লেখা হয় নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খাতাখানা ছিল আমার বাক্সটাতে, সে বাক্সটা কতবার খুঁজেচি খাতাখানার জন্যে, তবু সন্ধান পাই নি। আজ পালিতদের তারাপদবাবু এলেন সন্ধ্যার সময়ে। তাঁদের সেই ঠিকুজী-কুষ্ঠীখানা আমার কাছে অনেক দিন পড়ে আছে, তাই ফিরিয়ে নিতে এলেন। বাক্স খুলে ঠিকুজীখানা খুঁজতে খুঁজতে এ খাতাখানাও বার হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে—এই পাঁচ মাসের মধ্যে—আমার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে। সব দিক থেকে পরিবর্তন। জ্ঞান মারা গিয়েচে, ওর সংসার পড়েচে আমার ঘাড়ে, জীবন ছিল দায়িত্বহীন, অবাধ—এখন আমি পুরোদস্তুর ছা-পোষা গেরস্ত মানুষ। বনগাঁয়ে বাসা করে ওদের সব সেখানে এনে রেখেচি। সেটা যখন আমার কর্তব্য, তখন তা আমায় করতেই হবে, স্বার্থপর হতে পারব না কোনদিন।

আরও পরিবর্তন হয়েচে। ক্লারিজ সাহেব চলে গিয়েচে, দেবব্রত চলে গিয়েচে। কোথায় গিয়েচে, বা দেবব্রতের কি হয়েচে তা আমি লিখব না। কিন্তু আমার মনে যে ব্যথা লেগেচে এতে—ভেবে দেখবারও অবকাশ পাই নে সব সময়। এক-একবার গভীর রাত্রে মনে পড়ে, ঘুম আসে না চুপ করে থাকি—অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি—সে ব্যথা বড় সাংঘাতিক—যাক ও-কথা আর লিখে কি হবে!

সেদিন শিবরাত্রি গেল। এই শিবরাত্রির সঙ্গে আমি সেদিন বসে বসে হিসেব করে দেখছিলাম যে, জীবনের কত সুখ-দুঃখের কাহিনীই না জড়িত রয়েচে! মধ্যে একদিন এসেছিল বনগাঁয়ের হরবিলাস—নৃপেন রায়ের নতুন কাগজের জন্যে, (তার নাম আমি আজই করে এসেছি 'উদয়ন')—তাকে বললুম—তোমাদের বাসাটা আমায় দেবে? আমি গভীর রাত্রে বসে-বসে ভাবছিলাম, তা যদি হয়, ওরা যদি বাসাটা ছেড়ে দেয়—তা হলে সেখানে কি করে বাস করব? কত কথাই না মনে পড়বে! মনে পড়বে আমি যখন বালক, কিছুই বুঝি নে—বনগাঁয়ে হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের বেতের বিভীষিকায় দিনরাত কাঁটা হয়ে থাকি—সেই সব দিনের কথা। সেই এক শিবরাত্রি—কিন্তু না তার আগেও শিবরাত্রির কথা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত আছে। ছেলেবেলায় হালিসহর থেকে সেই যে এসেছিলাম—ছোট মামা প্রভাতী গান করত বৈষ্ণবদের সুরে—আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে নদী থেকে নেয়ে আসতুম—জীবনের সেই প্রথম শিবরাত্রি যার কথা মনে আছে। তারপর অবিশ্যি বনগাঁয়ের ঐ শিবরাত্রি। ওঁরা এসে বাইরের ঘর থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন মন্ত্র পড়াতে—বেশ মনে আছে। তাই ভেবেছিলাম এতকাল পরে—জীবনের এত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের পরে আবার হরবিলাসদের বাসায় থাকব কেমন করে?

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাই জানি না। আট মাস বেঁচেছিল—কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্পদিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি? ও আপন মনে হাসত—কিন্তু সবাই বলত "আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখচে?"—ওর অপরাধ—ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যিই ওর হাসি কেউ চাইত না। ওর বাবা তো মারা গেল; ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউ দেখত না—ওর খুড়িমা বললে—টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকোলতলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠানে—আমার কষ্ট হত—কিন্তু আমি কি করব? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারি নে? ওর রিকেট্‌স্ হল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল—তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাসায় বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাসত—সেদিনও তেমনি হাসতে দেখে এসেছি—ও-শনিবারে যখন বাড়ি থেকে আসি। Unwanted smile! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি—এ ছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও রেখে যায় নি ও। Poor little mite! কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত,—এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটুফুলের দলে ফুটেচে, ফুলে ফুলে কত কাল ধরে ফুটে আসচে—কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবনধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নিত্য—খুকীর হাসিও তেমনি।

পার্ক সার্কাস থেকে ট্রামে আসতে আসতে তারাভরা নৈশ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেচে—এই ঘূর্ণ্যমান, বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, এই সৃষ্টিমুখী নীহারিকার প্রজ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের রাশি—এই অনাদ্যন্ত মহাকাল—এরা যেমন নিত্য, যতটুকু নিত্য, যে অর্থে নিত্য,

তার চেয়ে কোন অংশে কম নিত্য নয় আমার অবোধ, অসহায়, রোগশীর্ণ খুকীর দন্তহীন কচি-মুখের অনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন, অকারণ হাসিটুকু। বরং আমি বলচি তা আরও বড়—এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন একটা বিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম নীতি আছে, উদীয়মান সবিতার রক্তরাগের মত তা অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে—এইজন্য অর্থযুক্ত করে যে, যে গৌরবে সৃষ্টির সৌন্দর্য রূপ পেয়েচে, মহিমময় হয়েছে—সেই বর্ণ সবিতার দান, আদিম অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা বসুন্ধরার মুখের আবরণ অপসারিত করেছেন সবিতা তাঁর আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে—তাকে সার্থক করেচেন, জাগ্রত করেচেন, মাটির মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকীর হাসি সবিতার ওই অমৃতজ্যোতির মত, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা বিশ্বের জড়পিণ্ডে প্রাণের সঞ্চার করে, বিপুল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে, গৌরবময় করে।

তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়,—তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা সম্ভব হয়েচে সৃষ্টির ওই অধ্যাত্মনীতির আইনে—ও নীতি অমোঘ—ওর শক্তি ও ওর সত্য, অস্তিত্ব, অন্তরতম অন্তরে অনুভব করতে পারি—কিন্তু ভাষায় বোঝান যায় না।

* বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙামাটির টিলার গায়ে। চারিধার কত নিঃশব্দ—আকাশ কেমন নীল—অনেকদিন এমন মনের আনন্দ পাই নি—কলকাতার মুমূর্ষু নিস্তেজ মন কাল সারা রাত ও আজ সারাদিনের মাঝে বন্য-সৌন্দর্য দেখে, প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশ বনের ও ধাতুপ ফুলের প্রাণবন্ত রূপ দেখে—ইব্ স্টেশনের অরণ্য-নদী-পর্বত সমাচ্ছন্ন বিরাট পটভূমির দৃশ্যে একমুহূর্তে তাজা হয়ে উঠল—কি ঘন শাল-পলাশের বন—কি সুন্দর জনহীন প্রান্তর, দূরে দূরে নির্জন পর্বতমালা—মন অভিভূত হয়ে পড়ে কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে মাথা সতেজ হয়ে ওঠে। রোদ কি অপূর্ব রাঙা হয়ে এসেচে—স্টেশনের পাশের পথটা দিয়ে সোমড়ার হাট থেকে সাঁওতালী মেয়েরা হাট করে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যাচ্চে। হাটটায় এইমাত্র আমি, প্রমোদবাবু ও কিরণবাবু বেড়াতে গিয়েছিলাম—বেগুন, রেড়ির বীজ, কচি ইঁচড়, চিংড়ি, কুমড়ো, খই, মুড়ি বিক্রি করচে। এক জায়গায় একটি সাঁওতালী যুবতী ধান দিয়ে মুড়কী নিচ্চে। এই হাটের সামনে একটা প্রাকৃতিক জলাশয়ে আমরা স্নান করলুম। ভারী আনন্দ পেয়েচি আজ—ভাগলপুর ছেড়ে আসবার পরে এত আনন্দ সত্যই অনেককাল পাই নি।

রোদের রাঙা রং অতি অপূর্ব!

ডাকবাংলো থেকে লোক জিজ্ঞেস করতে এসেচে আমরা রাত্রে কি খাব।

† সকালে আমরা রওনা হলাম। পথে কি সুন্দর একটা পাহাড়ী ঝরনা। সিরসির করে

---

* সম্বলপুর

† বিক্রমখোলের পথে

পাহাড়ী নদী বয়ে চলেচে। কতকগুলি লোক একটা কাঠের পুলের ওপর খড় বিছিয়ে দিচ্ছে। তারা বললে, পাটোয়ারীর ছেলে এ-পথে চলে গিয়েচে। পাহাড়ী করবীর দল জলের ধারে ফুটে রয়েচে। শান্ত শাল-পলাশের বনের ছায়া। এখানেই সবাই উড়িয়া বুলি বলচে। এমন ভাল লাগে!

নীল আকাশের তলে অফুরন্ত বাঁশের জঙ্গল। শাল-পলাশের বনে রোদ ক্রমে হলদে হয়ে আসচে। প্রিংগোলা থেকে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে ৭।৮ মাইল পথ হেঁটে দুপুরে বিক্রমখোলে পৌঁছলাম। বিক্রমখোলের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েচে—তাই দেখবার জন্য আমরা এখানে এসেচি। লেখাটা ভারী চমৎকার জায়গায়—একটা Limestone-crag এর নীচে ছায়াভরা জায়গায় প্রাকৃতিক ছোট একটা গুহা মত—তারই গায়ে লেখাটা। চারিধারের বন যেমন গভীর তেমনি সুন্দর—পথের মধ্যে জঙ্গলে কত ধরনের গাছ। আমলকী ও হরিতকীর বন—আমরা আমলকী ফল কুড়িয়ে খেতে খেতে এলাম। প্রিংগোলা গাঁয়ের পাটোয়ারী আমাদের জন্যে মুড়কী ও দুধ নিয়ে এল। উড়িষ্যার এই গভীর জঙ্গলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেচে।

জায়গাটা অতীব গভীর অরণ্যময়—কি অপূর্ব নীল আকাশ অরণ্যের মাথায়—কি অপূর্ব নিস্তব্ধতা · পাহাড়ের crag, তার ছায়ায় আমরা কতক্ষণ বসে রইলাম—ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে করে না—ইচ্ছা হয় না যে আর বেলপাহাড়ে ফিরি। আবার গাড়িতে উঠি। আবার কলকাতায় যাই।

প্রিংগোলা নামে একটা গাঁ পাহাড়ের পাদদেশে—এইখানা দিয়ে বিক্রমখোল যেতে হয়। আমরা বেলা দশটার সময় এখানে পৌঁছলাম। একটু পরেই পাটোয়ারী গাড়ি করে এল। গাঁয়ের 'গাঁউঠিয়া' অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের নাম বিম্বাধর—সে তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে দুধ ও মুড়কী নিয়ে এল খাবার জন্যে। একটু বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলাম—দেখাশুনো করে ফিরে আবার গাঁয়েই এলাম। ওবেলাকার নাচের দল নাচ দেখালে। আমরা একটা ফটো নিলাম। আমাদের কোন অদৃষ্টপূর্বক জীব ভেবে এখানকার লোকেরা ঝুঁকে পড়েচে—দলে দলে এসে আমাদের চারিপাশে দাঁড়িয়েচে। প্রমোদবাবু মুখে সাবান মেখে দাড়ি কামাচ্ছে—এরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে—এ দৃশ্য আর কখন দেখে নি বোধহয়। ফটোগ্রাফ নেবার সুবিধের জন্য নাচ হল পথের ওপর—ঝন্-ঝন্ করচে রোদ—নাচওয়ালীদের মুখের ওপর বড় রোদ্দুর পড়েচে দেখে আমি পরিমলবাবুকে তাড়াতাড়ি snapটা সেরে নিতে বললুম।

নাচ গান শেষ হল। প্রমোদবাবু, পরিমলবাবু ও কিরণ হেঁটে রওনা হলেন বেলপাহাড়ে। আমার পায়ে ফোস্কা পড়েচে বলে হাঁটতে পারা গেল না। গরুর গাড়িতে ওঁদের জিনিসপত্র নিয়ে আমি ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হলাম। দেখলাম—আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি বাদে ভারতের সবটাই এই ধরনের ভূমি। B. N. R.-ই দেখ না কেন—সেই খড়গপুর থেকে

আরম্ভ হয়েচে রাঙামাটি, পাহাড় ও শালবন—আর বরাবর চলেচে এই চারশ মাইল—এর পরও চলেচে আরও চারশ মাইল—চারশ মাইল কেন, আরও আটশ মাইল বম্বে পর্যন্ত। অরণ্যের দৃশ্য সেখানে যেতে আরও গম্ভীর—সহ্যাদ্রির মহিমময় ঘাটশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যের তুলনা কোথায়। ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি—মালাবার উপকূলের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট—আর্যাবর্তের সমতলভূমি পার হয়েই অতুলনীয় হিমালয়, Alpine meadows, ভারতের প্রকৃত রূপই এই—এই রাঙামাটি, পাহাড়, শালবন—এই আসল ভারতবর্ষের রূপ। বাংলার সমতলভূমিতে সারা জীবন কাটিয়ে আমরা ভারতের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারি নে। অবশ্য বাংলার রূপ অন্য রকম, বাংলা কমনীয়, শ্যামল, ছায়াভরা। সেখানে সবই যেন মৃদু ও সুকুমার—গাছপালা থেকে নারী পর্যন্ত। এ সব দেশের মত রুক্ষভাব ওখানে তো নেই!

মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। কি জলজলে নক্ষত্রগুলো—যেন হীরের টুকরোর মত জলচে!···বিরাট—বিরাট—প্রকৃতি এখানে শিবমূর্তি ধরেচে। কমনীয় নয়, সুষ্ঠু নয়, কিন্তু উদার, মহিমময়, বিরাট। বিরাট is the term for it.

হঠাৎ খুকীটার কথা মনে পড়ে গেল। ওর সেই অবোধ, অনাদৃত হাসিটুকুর কথা মনে পড়ল। এই বিরাট প্রকৃতি, ওই নক্ষত্রজগত, বিশাল উদার Space-এর মধ্যে ওর স্থান কোথায়? মরে সে কোথায় গেল? তার ক্ষুদ্র জীবনীশক্তি নিয়ে ও কি এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত! Poor mite, what chance had she—a helpless thing?

কিন্তু বনের ওই হলদে তিলের ফুলের থোকা—প্রথম বসন্তে যা থোকা থোকা ফুটেচে—তা দেখলে মনে আশা জাগে। আমি বলতে পারি—এই বিরাটতার সঙ্গে মঙ্গল মিশে আছে, এই মহিমময় সন্ধ্যায় আত্মার সত্যদৃষ্টি খুলে যায়। বুদ্ধি দিয়ে সে জিনিস বোঝা যায় না, তর্ক-যুক্তির পথে তা ধরা দেয় না—তা প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি ফুটে ওঠে, নির্জন ধ্যানের মধ্যে দিয়ে—অপূর্ব আনন্দের মধ্যে দিয়ে। মুখে বলে সে সব বোঝান কি যায়?

ফিরে দেখি ডাকবাংলোতে ওরা আসে নি। আমি একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সামনে চাঁদ উঠেচে নক্ষত্র জলচে। অনেকক্ষণ পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে। আমি একটা শালপাতার পিকা আনিয়ে খেলাম।

সারারাত্রি আমরা গল্প করে জাগলাম। শেষ রাত্রে আমি কয়েকবার উঠে এসে এসে বাইরে দাঁড়ালাম—চাঁদ দূরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত গেল। রাঙা হয়ে গেল চাঁদটা—অদ্ভুত দেখতে হয়েচে!···

অনেক রাত্রে আমরা স্টেশনে এলাম। বেজায় শীত। ভোরবেলার দিকে ট্রেনটা এল। রাতে কি কষ্ট—মালের বস্তার ওপর বসে বসে ঢুলছিলাম—পরিমলবাবুকে জায়গাটা ছেড়ে দিলাম।

ভোর হল কুলুজা স্টেশনে। কি অপূর্ব পর্বতের ও জঙ্গলের দৃশ্য। এমন Wilderness আমি খুব কমই দেখেচি। যে স্টেশনে আসি—সেইটাই মনে হয় আগেকার চেয়ে ভাল। নোটবুকে বসে বসে নোট করি, কি কি সেখানে আছে। গোইলকেরা স্টেশনটি বড় সুন্দর

লাগল। শাল জঙ্গল, পাহাড়, স্থানটাও অতি নির্জন। বাংলাদেশের কাছে যত আসি ততই সমতল প্রান্তর বেশী। খড়্গাপুরের ওদিকে কলাইকুণ্ডা জায়গাটি এ হিসাবে বেশ ভাল।

বাংলাদেশে গাড়ি ঢুকল। তখন বেলা একেবারে চলে গেছে। এ আর এক রূপ, অতি কমনীয়, শান্ত শ্যামল। চোখ জুড়িয়ে যায়, মন শান্ত হয় কিন্তু এর মধ্যে বিরাটত্ব নেই, majesty নেই—হৃদয় মন বিস্ফারিত হয় না, কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠে অসীমতার দিকে ছুটে চলে না। এতে মনে তৃপ্তি আসে—ছোটখাটো ঘরোয়া সুখ দুঃখের কথা ভাবায়, নানা পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—মানুষ যা নিয়ে ঘরকন্না করতে চায় তার সব উপকরণ জোগায়। হাসি অশ্রু মাখানো লজ্জাবনতা পল্লীবধূটি যেন—তার সবই মিষ্টি, কমনীয়। কিন্তু মানুষের মন এ ছাড়া আরও কিছু চায়, আরও উদ্দাম, অশান্ত, রুক্ষ, রুদ্র ভাব চায়। বাংলাদেশে তা যেন ঠিক মেলে না। হিমালয়ের কথা বাদ দি—সেটা বাংলার নিজস্ব একচেটে জিনিস নয়—আর তার সঙ্গে সত্যিকার বাংলার সম্বন্ধই বা কি? পদ্মা?…সেও অপূর্ব, সন্দেহ নেই—কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনীবধূ, একগুঁয়ে, তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী, যা-খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না—সবাই ভয় করে চলে—খামখেয়ালী—রূপবতী—তবে মিষ্টি নয়—high-bred রূপ ও চালচলন। ঘরকন্না পাতিয়ে নিয়ে থাকবার পক্ষে তত উপযোগী নয়।

কলকাতা ফিরে পরদিনই নীরদবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ হল সন্ধ্যায়! আমার আবার একটু দেরি হয়ে গেল। সুশীলবাবু মাঝের দিন আমার বাসায় এসেছিলেন—বঙ্গশ্রী আফিসে আমায় Phone করেছিলেন—যাবার সময় পার্ক সার্কাস থেকে ওঁর বাসা হয়ে গেলাম। সতীশের সঙ্গে একটা আফিমের দোকানে আজ আবার দেখা হল। কদিন ধরেই উড়িষ্যা ও মানভূমের সেই স্বপ্নরাজ্য মনে পড়চে—বিশেষ করে মনে পড়চে আসানবলী ও টাটানগরের মধ্যবর্তী সেই বনটা—যেখানে বড় বড় পাথরের চাঁই-এর মধ্যে শালের জঙ্গল—পত্রহীন দীর্ঘ গাছগুলিতে হলদে কি ফুল ফুটে আছে—কেবলই ভাবচি ওইখানে যদি একটা বাংলো বেঁধে বাস করা যায়—ওই নির্জন মাঠ বন, অরণ্যানীর মধ্যে।

অপরাহ্নে ও জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে তাদের রূপ ভাবলেও মন অবশ হয়ে যায়।

সকালে উঠে দীনেশ সেনের বাড়িতে এক বোঝা পরীক্ষার কাগজ পেশ করে এলুম। সারা পথে মুচুকুন্দ চাঁপার এক অদ্ভুত গন্ধ! বিজয় মল্লিকের বাগানে একটা গাছে কেমন থোকা থোকা কাঁচা সোনার রঙের ফুল ধরেচে। বড় লোভ হল—ট্রাম থেকে নেমে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বললাম—ঐ গাছতলাটায় একবার যেতে পারি? সে বললে—নেহি। সংক্ষেপে বললে, আমায় সে মানুষ বলেই মনে করলে না। আবার বললুম—দু একটা ফুল নিয়ে আসতে পারি নে? তলায় তো কত পড়ে আছে। সে এবার অত্যন্ত Contemptuous ভাবে আমার দিকে চেয়ে পুনরায় সংক্ষেপে বললে—নেহি।

ভাল, নেহি তো নেহি—গড়ের মাঠে খিদিরপুর রোডের ধারে অনেক মুচুকুন্দ ফুলের গাছ আছে, ট্রামে আসবার সময় দেখে এসেচি, সেখান থেকে কুড়িয়ে নেব এখন।

তারপর এলাম নীরদবাবুর বাড়ি। সেখানে খানিকটা গল্পগুজব করে গেলাম শ্যামাপ্রসাদ

বাবুর বাড়ি। পাশের বৈঠকখানায় রমাপ্রসাদবাবু আছেন দেখলাম—শ্যামাপ্রসাদবাবুও তাঁর লাইব্রেরী ঘরে কি কাজ করছিলেন। সেখানে খানিকটা থাকবার পরে বাসায় ফিরলাম।

বৈকাল বেলা। আজ রামনবমী। কতদিনের কথা মনে পড়ে। বৈকালে বসে বসে তাই ভাবছিলাম—বেলা পড়ে এসেচে—কত পাপিয়ার ডাকভরা এই সময়ের সেই পুরাতন দুপুরগুলো।...বাঁশের শুকনো পাতার কথা কেন এত মনে হয়, তা বুঝতে পারি নে। সুভদ্রাকে কাল যখন পত্র লিখলুম—তখনও বাঁশবনের কথা ও শুকনো পাতার রাশির কথাই মনে এল। পাপিয়ার গানের কথা বিশেষ করে মনে আছে। এই সব দিনের অতীত দুপুরগুলোর সঙ্গে পাপিয়ার গান জড়ানো আছে, আর জড়ানো আছে অদ্ভুত ধরনের wild আনন্দ।...

বেলা পড়ে এসেচে। গোঁসাই পাড়ার নারকোলতলায় আজও তেমনি মেলা বসেচে, অতীত দিনের মত। বাদা ময়রা মুড়কি ও কদ্‌মা বিক্রী করচে, গোপালনগর থেকে হয়তো যুগল ও হাজরা ময়রা তাদের তেলে-ভাজা জিবে-গজা ও জিলিপীর দোকান নিয়ে এসেচে।

বাবার সেই শ্লোকটা—অনেক কালের সেই আমবনের ছায়ায় উচ্চারিত শ্লোকটা আজও আমার মনে আছে। পুরনো খাতাখানা আজও আছে, নষ্ট হয় নি।

সকালবেলা। নেড়াদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে এসেচি।

বাস্তবিকই গ্রামের লোকের সংকীর্ণতা এত বেশী—মনকে বড় পীড়া দেয়। এদের মন চারিধার থেকে শৃঙ্খলিত—খুলবার অবকাশ নেই। আবালবৃদ্ধ-বনিতার এই দশা দেখচি। এদের আচার শুষ্ক ও সৌন্দর্যবর্জিত—স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

কাল বিকেলে নদীর ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ একলা বসে ছিলাম। বাংলা দেশের, বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের প্রকৃতির এই যে সৌন্দর্য—এ অন্য ধরনের। কিছুদিন আগে আমি উড়িষ্যায় গিয়ে সেখানকার বন পাহাড়ের সৌন্দর্যের কথা যা লিখেছিলাম—এখানে বসে মনে মনে বিচার করে দেখে আমি বুঝলাম তার অনেক কথা আমি ভুল লিখেছিলাম। বাংলার সৌন্দর্য more tropical—এখানে অল্প একটু স্থানের মধ্যে যত বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা ও লতা আছে—ওসব দিকে তা নেই। এখানে বৈচিত্র্য বেশী। নীল আকাশ ওখানেও খোলে —মনে অন্যরকম ভাব আনে, তা মহনীয়, বিরাট—এ কথা ঠিকই। কিন্তু বাংলার আকাশ —বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কি গ্রাম্য নদীর উপরকার যে আকাশ—তার সৌন্দর্য মনে অপূর্ব শিল্পরসের সৃষ্টি করে—মনে বৈচিত্র্য আনে। হয়তো বিরাটতা নেই, ঠিকই—কিন্তু Poetry of Life এতে যেন বেশী। বাঁশগাছে ও শিমুলগাছে এ দেশের, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের, সৌন্দর্যকে এক অভিনব রূপ দিয়েচে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এর সঙ্গে গ্রামে জোটে কচি উলুবন ও আউশ ধানের ক্ষেত। এত সবুজের সমাবেশ আর কোথাও দেখি নি— a feast of green—তবে গ্রামের মধ্যে মুক্ত আকাশ বড় একটা দেখা যায় না,—ওই একটা দোষ। বড় চাপা। কিন্তু মাঠে, নদীর ধারে—মুক্তরূপা প্রকৃতি যেমনি লীলাময়ী তেমনি রূপসী। উদার প্রান্তর, উদার আকাশ—নানাবর্ণের মেঘের মেলা অস্তদিগন্তে, সন্ধ্যার কিছু

পূর্বে মেঘ-চাপা গোধূলির আলোয়, গাছে পালায়, শিমুলগাছের মাথায়, নদীজলে, উলুখড়ের মাঠে কি যে শোভা!...

একথা জোর করে বলতে পারি বিক্রমখোলের পাহাড় ও বনের ওপারে যে আকাশ দেখেছিলাম—মাধবপুরের চরের ওপারের বৈকালের আকাশ তার চেয়ে মনে অনেক বেশী বিচিত্রভাবের সৃষ্টি করে।

এইমাত্র নাগপুর শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী মালভূমিতে মোটরে বেড়িয়ে ফিরে এলাম। একথা ঠিকই যে বাংলার রূপ যতই সুন্দর হোক, বিরাটতায় ও গম্ভীর মহিমায় এসব দেশের কাছে তা লাগে না। উড়িষ্যার বন-পাহাড়ের সৌন্দর্যের চেয়েও এর সৌন্দর্য বিরাট ও majestic। বাংলা দেশের রূপ নিতান্তই নিরীহ পল্লাবধূর মত লাবণ্যময়ী, লাজুক টিপ-পরা ছোট্ট মুখটি। কিন্তু এদেশের highland-এর রূপ গর্বদৃপ্ত সুন্দরী রাজরানীর মত।

"Pure Logical thinking can give us no knowledge whatever of the world of experience. The knowledge of Reality begins with experience and terminates with it. Reason gives the structure to the system and the data of experience and their mental relations are to correspond exactly with the consequences in the theory."

Einstein,
Herbert Spencer Lecture, Oxford, 1933.

Lucian's Satires,
Celsas (178 A.D.) writes :—

"Christians are like a council of frogs in a marsh. Their Teachers are mainly weavers and cobblers, who have no power over men of education and taste. The qualifiation for conversion are ignorance, and childish timidity. Like all quacks they gather a crowd of slaves, children, women and idlers."

Senecca—Economy,

"He is born to serve but few, who thinks only the people of his own age. Many thousands of years, many generatious of men are yet to come : look to these, though from some cause silence has been imposed on all of your own day ; then will come those who may judge without offence and without favour."

[আমি 'অপরাজিত'-র এক স্থানে অবিকল এই ভাবই ব্যক্ত করেছি। অনেক পূর্বেই করেচি—তখন তো আমি সেনেকার এ উক্তিগুলি পড়ি নি—কিন্তু কি চমৎকার মিল হয়েছে !]

অনেকদিন লিখি নি, মনেও ছিল না। হঠাৎ আজ মনে হল তাই সামান্য এতটুকু লিখে রাখলাম। আজকার তারিখটা অন্ততঃ খাতায় থাকুক।

আজ বৈকালে নাগপুর এসে পৌছেচি। এবার পূজোয় এখানেই আসবো ঠিক করে রেখেছিলাম। আজ সারাদিন গাড়ির ঝাঁকুনিতে বড় কষ্ট হয়েচে। গত মাসকয়েক আগে যে বেলপাহাড়ে এসেছিলাম সে স্টেশনটা আজ রাতে—শেষ রাতে বেরিয়ে চলে গেছে, দেখতে পাই নি। বিলাসপুর পর্যন্ত তো বেশ এলাম। বিলাসপুর স্টেশনে আমরা চা খেলাম। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুর পর্যন্ত প্রায় একই একঘেয়ে দৃশ্য—সীমাহীন সমতলভূমি এক চক্রবালরেখা থেকে থেকে অন্য চক্রবালে পর্যন্ত বিস্তৃত। দৃশ্য বড় একঘেয়ে, প্রায়ই ধানের ক্ষেত ও জলাভূমি—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শালবন। রাঙামাটিও সব জায়গায় নেই। বেলপাহাড়ের মত পাহাড় ও জঙ্গল এ পথে কোথাও নেই—এক ডোঙ্গরগড় ছাড়া ! ডোঙ্গরগড় ছাড়িয়ে তিন-চারটা স্টেশন পর্যন্ত দৃশ্য ঠিক আমি যা চাই তাই। উভয় পাশে ঘন অরণ্য, শাল, খয়ের ও বন্যবাঁশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, পর্বতমালা। উড়িষ্যার বনের চেয়েও এ বন অধিকতর গভীর কিন্তু এইটুকু যা, তারপর আবার সেই একঘেয়ে সমতলভূমি—নাগপুর পর্যন্ত। বাংলাদেশে এত অনন্তপ্রসারী দিক চক্রবালদেশের কল্পনাও করতে পারা যায় না।

এই সব স্থানে জ্যোৎস্নারাত্রে ও অল্পরাত্রে যে অদ্ভুত দেখতে হবে তা বুঝতে পারলাম—তবু মনে হল বনভূমির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য যা বাংলাদেশে আছে, তা এসব অঞ্চলে নেই। বাংলার সে কমনীয় আপন-ভোলানো রূপ এদের কৈ ? এখানকার যা রূপ তা বড় বেশী রুক্ষ। অবশ্য ডোঙ্গরগড় স্টেশন ছাড়িয়েই যে পাহাড় পড়ে—এমন অনাবৃত শিলাস্তূপ, অত গম্ভীর-দর্শন উন্নতভূমি বাংলার কোথাও নেই একথা ঠিক—কিন্তু বাংলায় যা আছে, এখানকার লোকে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

বৈকালে নাগপুরে কোতোয়াল সাহেবের বাংলোয় এসে উঠলাম। তারপর চা খেয়ে আমি ও প্রমোদবাবু বেড়াতে বেরুলাম। শহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটা বড় পাহাড় আছে, শালবনে আবৃত, নীচে দিয়ে মোটরের পথ আছে। দুজনে সেখানে একটা শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলাম। হাওয়া কি সুন্দর। দুজন ভদ্রলোক পথে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের চেহারা দেখে আমার মারহাট্টি সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের কথা মনে পড়ল।

সন্ধ্যাতারা উঠেচে। পাহাড়ের বনভূমি অন্ধকার হয়ে এল। দূরে বনের মাথার দিকে চেয়ে দেখলাম—ওদিকে সাতাশ মাইল প্রান্তর, অরণ্য, নদী পার হয়ে তবে বারাকপুর। হাটবার, আজ রবিবার, সন্ধ্যা হয়েচে, কাঁচিকাটার পুল দিয়ে গণেশ মুচি হাট করে ফিরচে, আর বলতে বলতে যাচ্চে—হাটে বেগুন আজ খুব সস্তা।

—এত জায়গা থাকতে ও জায়গার কথা আমার এত মনে হয় কেন ?

আর মনে পড়ে আমাদের পোড়ো ভিটের পশ্চিম ধারের সেই কি অজানা গাছগুলো, যার সঙ্গে বাল্য থেকে আমার কত পরিচয়—ওগুলোর কথা মনে কল্পনা করলেই আবার আমার বারো বছরের মুগ্ধ শৈশব যেন ফিরে আসে।

কাল বৈকালে এখানকার মহারাজবাগ ও মিউজিয়াম দেখলাম। মিউজিয়মে অনেক পুরনো শিলাখণ্ড আছে—কয়েকটি খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর। বিলাসপুর জেলায় একটা ডাকাতের কাছে পাওয়া কতকগুলো তীর দেখলাম, ভারী কৌতূহলপ্রদ জিনিস বটে। একটি জীবন্ত অজগর সাপ দেখা গেল। মহারাজবাগে একটা বড় সিংহ আছে, কিন্তু সে-সব যতই ভাল লাগুক, সে-সব নিয়ে আজ লিখব না। আজ যা নিয়ে লিখতে বসেচি, তা হচ্চে আজকার বিকেলের মোটর ভ্রমণটি।

নাগপুর শহরের চারিধারে যে এমন অদ্ভুত ধরণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিশিষ্ট স্থান আছে সে-সব কথা আমি কখনও জানতুম না। কেউ বলেও নি। শহরের উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপরকার রাস্তা দিয়ে আজ আমরা মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম। যোধপুরী ছাত্রটি আমাদের নিতে এসেছিল। সে যে কি অপূর্ব সৌন্দর্য, তা লিখে প্রকাশ করতে পারি নে। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অন্তদিগন্ত রঙে রঙে রঙীন। বহুদূরে, দূরে, উচ্চ মালভূমির সুদূর প্রান্ত সান্ধ্যছায়াচ্ছন্ন, দিক্‌চক্রবালরেখা নীল শৈলমালায় সীমাবদ্ধ, সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে যেদিকে চাই, ধূ-ধূ বৃক্ষহীন, অন্তহীন উচ্চাবচ মালভূমি, শৈলমালা, শিলাখণ্ড,—দু-চারটা শালপলাশের গাছ। মাথার উপর অপূর্ব নীল আকাশ, ঈষৎ ছায়াভরা কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে—পিছনের পাহাড়টি ক্রমে গাড়ির বেগে খুব দূরে গিয়ে পড়চে, তার ওপরকার বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসচে—সামনের শৈলমালা ফুটে উঠছে—ক্রমে অনেক দূরে সিতাবলডির পাহাড় ও বেতার টেলিগ্রাফের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। তার নীচে চারিদিকের মালভূমি ও পাহাড়ে ঘেরা একটা খাঁজের মধ্যে নাগপুর শহরটা। এমন একটা মহিমময় দৃশ্যের কল্পনা আমি জীবনে কোনদিনই করতে পারি নি—বাংলাদেশ এর কাছে লাগে না—এর সৌন্দর্য যে ধরনের অনুভূতি ও পুলক মনে জাগায়, বাংলাদেশের মত ভূমিসংস্থান যে সব দেশে, সে সব দেশের অধিবাসীদের পক্ষে তা মনে কল্পনা করাও শক্ত। উড়িষ্যার দৃশ্যও এর কাছে ছোট বলে মনে হয়—সেখানে জঙ্গল আছে, বুনো বাঁশের ঝাড় আছে বটে, কিন্তু এ ধরনের অবর্ণনীয় সুমহান, বিরাট, রুক্ষ সৌন্দর্য সেখানকারও নয়। তখন আমি এসব দেখি নি, কাজেই উড়িষ্যাকেই ভেবেছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চরমতম সৃষ্টি। আমি বনশ্রী খুব ভালবাসি, বন না থাকলে আমার চোখে সে সৌন্দর্য সৌন্দর্যই নয়—কিন্তু বন না থাকলেও যে এমন অপূর্ব রূপ খুলতে পারে, এমন Superb অনুভূতি মনে জাগাতে পারে তা আমার ধারণাও ছিল না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেচে। এখানে পাহাড়ের ওপর দুটো বড় হ্রদ আছে, একটার নাম আম্বাজেরী আর একটার নাম কি বললে যোধপুরী ছাত্রটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। দুটোই বড় সুন্দর—অবিশ্যি আম্বাজেরী হ্রদটা অনেক বড় ও সুন্দরতর। হ্রদের সামনে কলকাতার

ঢাকুরে লেককে লজ্জায় মুখ লুকাতে হয়। এর গম্ভীর মহিমার কাছে ঢাকুরিয়া লেক বাল্মীকির কাছে ভারতচন্দ্র রায়। এর কি তুলনা দেব? ম্লান জ্যোৎস্না উঠল। যোধপুরী ছাত্রটি লোক ভাল, কিন্তু তার দোষ সে অনবরত বকচে। প্রমোদবাবু তার নাম রেখেছেন 'মুলো' —সে চুপ করে থাকলে আমরা আরও অনেক বেশী উপভোগ করতে পারতুম।

আসবার পথটিও বড় চমৎকার—পথ ক্রমে নেমে যাচ্ছে—দুধারে সেই রকম immensity। মনে হল আজ পূজার মহাষ্টমী—দূর বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে এখন এই সন্ধ্যায় মহাষ্টমীর আরতি সম্পন্ন হয়ে গেছে, প্রাচীন পূজার দালানে নতুন জামা-কাপড় পরে ছেলেমেয়েরা মুড়ি-মুড়কি, নারকোলের নাড়ু কোঁচড়ে ভরে নিয়ে খেতে খেতে প্রতিমা দেখচে। বারাকপুরের কথা, তার ছায়াঘেরা বাঁশবনের কথাও এ সন্ধ্যায় আজ আবার মনে এল। সজনে গাছটার কথাও—সেই সজনে গাছটা।

মহাষ্টমীতে আজ ক্র্যাডক্-টাউনে প্রবাসী বাঙালীদের দুর্গোৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। নাগপুরে বাঙালী এত বেশী তা ভাবি নি; ওরা প্রসাদ খাবার অনুরোধ করলে—কিন্তু নীরদবাবুকে রুগ্ন অবস্থায় বাসায় রেখে আমরা কি করে বেশীক্ষণ থাকি?

মারাঠী মেয়েরা রঙীন শাড়ি পরে সাইকেলে চেপে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে। আমরা মহারাজবাগের মধ্যের রাস্তা দিয়ে এগ্রিকালচারাল কলেজের গাড়িবারান্দার নীচে দিয়ে ভিক্টোরিয়া রোডে এসে পৌছুলুম। রাত সাড়ে সাতটা, জ্যোৎস্না মেঘে ঢেকে ফেলেচে।

সেদিন বনগাঁয়ে ছকু পাড়ুইর নৌকাতে সাতভেয়েতলা বেড়াতে গিয়েছিলাম—এবার বর্ষায় ইছামতী কূলে কূলে ভরে গিয়েচে—দুধারের মাঠ ছাপিয়ে জল উঠেচে—তারই ধারের বেতবন, অন্যান্য আগাছার জঙ্গল বড় ভাল লেগেছিল। অত সবুজ, কালো রংয়ের ঘন সবুজ,— বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না, বনের অত বৈচিত্র্য ও রূপ কোথাও নেই—নীল আকাশের তলায় মাঠ, নদী, বনঝোপ বেশ সুন্দর লেগেছিল সেদিন। কিন্তু আজ মনে হল সে যত সুন্দর হোক, তার বিরাটত্ব নেই—তা pretty বটে, majestic নয়।

চারিধারে জঙ্গলাবৃত—গাছপালার মধ্যে হ্রদটা। হ্রদের বাংলোতে বসে লিখচি। প্রমোদবাবু বলচেন, সূর্য ঢলে পড়েচে শীগগির লেখা শেষ করুন। এখান থেকে আমরা এখন রামটেক্ যাব। কি গভীর জঙ্গলটাতে এইমাত্র বেড়িয়ে এলাম—বুনো শিউলি, কৈদ, আবলুস, সাঁইবাবলা সব গাছের বন। সামনে যতদূর চোখ যায় নীল পর্বতমালা বেষ্টিত বিরাট হ্রদটা। এমন দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেছি। পাহাড়ে যখন মোটরটা উঠল—তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করবার নয়। সময় নেই হাতে, তাই তাড়াতাড়ি যা-তা লিখচি। সূর্য ঢলে পড়েচে—এখনও এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী রামটেক্ দেখতে যাব। প্রমোদবাবু তাগাদা দিচ্ছেন। বনশিউলি গাছের সঙ্গে বনতুলসী গাছও আছে—কিন্তু তা পাহাড়ের বাইরের ঢালুতে। একটা সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। মোটরওয়ালা কোথায় গিয়েচে—হর্ন দিচ্চি—এখনও খোঁজ পাই নি। পাহাড়ের গায়ে ছায়া পড়ে এসেচে। দূরের পাহাড় নীল হতে নীলতর হচ্চে। এখানে হ্রদের

সাজানো বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বাংলোয় চৌকিদারের কাছ থেকে জল চেয়ে দুজনে খেলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হয় হয়। ড্রাইভারটা কোথায় ছিল—হর্ন দিতে দিতে এল। প্রমোদবাবু ছড়ি ফেলে এসেছেন—হ্রদের ঘাটে নেমে আনতে গেলেন। ফিরে বললেন—ছায়া আরও নিবিড়তর হয়েছে বনের মধ্যে। অপরাহ্ণের ছায়ায় বন আরও সুন্দর দেখাচ্চে। এখান থেকে মোটর ছেড়ে শৈলমালাবৃত সুন্দর পথে রামটেক্ এলাম। রামটেকে যখন এসেচি, তখন বেলা আর নেই, সূর্য অস্ত গেছে। অপরাহ্ণের ছায়ায় রামটেকের সুবৃহৎ উপত্যকা ও ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যাবৃত শান্ত অধিত্যকাভূমির দৃশ্য আমাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দর মনে হল যে, আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে গেলাম—এই সুন্দর গিরিসানুদেশ এখনি জ্যোৎস্নায় শুভ্র হয়ে উঠবে, এই নির্জনতা, সেই প্রাচীন দিনের স্মৃতি—এসব মিলে এখনি একে কি অপরূপ রূপই দেবে—কিন্তু আমরা এখানে পৌছতে দেরি করে ফেলেচি, বেশীক্ষণ এই ছায়াভরা ধূসর সানুশোভা উপভোগ করতে তো পারব না! পথ খুব চওড়া পাথরে বাঁধানো —কিন্তু উঠেই চলেচি, সিঁড়ি আর শেষ হয় না। প্রথমে একটা দরজা, সেটা এমন ভাবে তৈরী যে দেখলে প্রাচীন আমলের দুর্গদ্বার বলে ভ্রম হয়। তারপর একটা দরজা, তারপর আর একটা—সর্বশেষে মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করে বহিরাঙ্গণের প্রাচীরের ওপরকার একটা চবুতারায় আমরা বসলাম। নীচেই বাঁ ধারে কিন্নরী হ্রদ, পূর্বে পূর্ণচন্দ্র উঠচে, চারিধারে থৈ-থৈ করচে বিরাট space, পশ্চিম আকাশ এখনও একটু রঙীন। মন্দিরে আরতির সময়ে এখানে নহবৎ বাজে, এক ছোকরা বাইরে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসে সানাই বাজাতে শুরু করলে। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

একটু পরে জ্যোৎস্না আরও ফুটল। আমাদের আর উঠতে ইচ্ছে করে না, প্রমোদবাবু তো শুয়েই পড়েচেন। দূরে পাহাড়ের নীচে আম্বারা গ্রামের পুকুরটাতে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্ চিক্ করচে। মন্দির দেখতে গেলাম। খুব ভারী ভারী গড়নের পাথরের চৌকাঠ, দরজার ফ্রেম—সেকেলে ভারী দরজা, পেতলের পাত দিয়ে মোড়া মোটা গুল্ বসানো। মন্দিরের দুপাশে ছোট ছোট ঘর, পরিচারক ও পূজারীরা বাস করে। তাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করচে, মেয়েরা রান্নাবাড়া করচে। রামসীতার মন্দিরের দরজার পাশে অনেকগুলি সেকেলে বন্দুক ও তলোয়ার আছে। একজনকে বললুম—এত বন্দুক কার? সে বললে—ভোঁসলে সরকারকা। ১৭৮৩ সালে রঘুজী ভোঁস্‌লা এই বর্তমান মন্দির তৈরী করেন। আম্বারা সরোবরের পাশে ভোঁস্‌লাদের বিশ্রামাবাসের ধ্বংসাবশেষ আছে, আসবার সময় দেখে এসেচি। মন্দিরের পিছনের একটা চবুতারায় দাঁড়িয়ে উঠে নীচে রামটেক্ গ্রামের দৃশ্য দেখলাম—বড় সুন্দর দেখায়! রামটেক্ ঠিক গ্রাম নয়, একটা ছোট গোছের টাউন।

মন্দির প্রদক্ষিণের পর পাহাড় ও জঙ্গলের পথে আমরা নেমে এলাম। জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ায় বনময় সানুদেশ ও পাষাণ বাঁধানো পথটি কি অদ্ভুত হয়েচে। এখানে বসে কোন ভাল বই পড়বার কি চিন্তা করবার উপযুক্ত স্থান। এর চারিধারেই অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যময় গলিঘুঁজি,

উচ্চাবচ ভূমি, ছায়াভরা বনাস্ত দেশ। আমার পক্ষে তো একেবারে স্বর্গ। ঠিক এই ধরনের স্থানের সন্ধানই আমি মনে মনে করেচি অনেকদিন ধরে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের থেকে এর সৌন্দর্য অনেক বেশী, যদিও চন্দ্রনাথের মত এ পাহাড় অতটা উঁচু নয়। আম্বারা গ্রামটি আমার বড় ভাল লাগল—চারিধারে একেবারে পাহাড়ে ঘেরা, অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান, গোলা ঘর, একটা সরাইও আছে। ইচ্ছে হলে এখানে এসে থাকাও যায়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নামতে পারলাম না, যদিও প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, মোটর ড্রাইভার হয়তো কি মনে করবে। বেচারী সারাদিন কিছু খায় নি। আম্বারা গ্রামটা দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি মোটর ছেড়ে সেই পাড়ের মধ্য দিয়ে, কাটা পথটা ঘুরে রামটেক্ টাউনের মধ্যে ঢুকল। পাহাড়ের ঢালুতে বন্য আতাবৃক্ষ অজস্র, এখানে বলে সীতাফল—নাগপুর শহরে যত আতাওয়ালী আতা ফিরি করে—তার সব আতাই ফলে সিউনি ও রামটেক্ পাহাড়ে।

রাত বোধ হয় সাতটা কি সাড়ে সাতটা। মন্দিরের ওপরে চবুতারায় বসে দূরে নাগপুরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখেছিলাম ঠিক সন্ধ্যায়—তাই নিয়ে প্রমোদবাবুর সঙ্গে তর্ক হল, আমি বললুম—ও কাম্‌টির আলো—প্রমোদবাবু বললেন—না, নাগপুরের।

কিন্‌সী হ্রদের বাংলোতে খাবার খেয়েছিলাম, কিন্তু চা খাই নি। রামটেকের মধ্যে ঢুকে একটা চায়ের দোকানে আমরা গাড়িতে বসে চা খেলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—রামটেকের পাহাড়ের ওপর সাদা মন্দিরটা জ্যোৎস্নায় বড় চমৎকার দেখাচ্চে—চা খেতে খেতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, এতক্ষণ বারাকপুরে আমার গাঁয়ে বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজচে। লক্ষ্মীপুজোর লুচিভাজার গন্ধ বার হচ্চে বাঁশবনের পথে—এতদূর থেকে সে-সব কথা যেন স্বপ্নের মত লাগে। রামটেকের পথ দিয়ে মোটর ছুটল। কিন্‌সী হ্রদ থেকে মোটরে আসবার সময়ে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, তেমনি আনন্দ পেলাম। সামনে তখন ছিল আঁক-বাঁকা, উঁচুনীচু পার্বত্য প্রদেশের কঙ্করময় পথ, ডাইনে ছায়াবৃত অরণ্যেভরা শৈলমালা—এখন ঠিক তেমনি পথ দিয়ে মোটর তীরের বেগে ছুটে চলেচে—প্রমোদবাবু বললেন, a glorious drive.

রামটেক্ স্টেশনে নাগপুরের ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুতরাং বোঝা গেল এখনও সাড়ে আটটা বাজে নি। একটু গিয়ে প্রমোদবাবু মাইল স্টোনে পড়লেন—নাগপুর ২৮ মাইল, মান্‌সার ২ মাইল। দেখতে দেখতে ডাইনে মান্‌সারের বিরাট ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় পড়ল—জ্যোৎস্নার আলোতে সুউচ্চ অনাবৃতকায় পাহাড়গুলো যেমনি নির্জন, তেমনি বিশাল ও বিরাট মনে হচ্ছিল। মনে ভাবছিলাম ওই নির্জন শৈলশিখরে, এই ঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ফুট-ফুটে জ্যোৎস্নায় তাঁবু খাটিয়ে যারা রাত্রিযাপন করে একা একা তাদের জীবনের অপূর্ব অনুভূতির কথা। আরও ভাবছিলাম এই জ্যোৎস্নায় বহুদূরের বাংলাদেশের এক ছোট্ট নদীর ধারের গ্রামের একটা দোতালা বাড়ির কথা। ভাবলাম, অনেকদিন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে এখন আরও কাছে কাছে থাকে—যখন খুশি সেখানে যেতে পারে—হয়তো আজ এই

জ্যোৎস্নারাত্রে আমার কাছে কাছেই আছে। মান্‌সারে যেখানে নাগপুর-জব্বলপুর রোড থেকে রামটেকের পথটা বেঁকে এল—সেখানে একটা P.W.D. বাংলো আছে, সামনে একটা পদ্মফুলে ভরা জলাশয়। স্থানটি অতি মনোরম। দুপুরে আজ এই ম্যাঙ্গানিজগুলি আমরা দেখে গিয়েছিলাম—বিরাট পর্বতের ওপর মোটর গাড়ী উঠিয়ে নিয়ে গেল—অনাবৃতদেহ পর্বতপঞ্জর রৌদ্রে চকচক করচে, খাড়া কেটে ধাতুপ্রস্তর বার করে দিয়েচে—সামনে schist ও granite—নীচের স্তরগুলোতে কালো ম্যাঙ্গানিজ। একজন ওদেশী কেরানী আমাদের সব দেখালে, সঙ্গে দু টুকরো ম্যাঙ্গানিজ দিলে কাগজ-চাপা করবার জন্যে। তারই মুখে শুনলাম এই ম্যাঙ্গানিজ স্তর এখান থেকে ২৫।২৬ মাইল দূরে ভাণ্ডারা পর্যন্ত চলে গিয়েছে—মাঝে মাঝে সমতল জমি, আবার পাহাড় ঠেলে ঠেলে উঠেচে। নাগপুর-জব্বলপুর রোডে অনেক পাহাড় পড়ে জব্বলপুরে যেতে। সিউনির দিকেও পাহাড় ও জঙ্গল মন্দ নয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য নাগপুর-অমরাবতী রোডে। নাগপুর শহর থেকে ২৫ মাইল দূরবর্তী বাজারগাঁও গ্রাম থেকে কানহৌলি ও বোরি নদীর উপত্যকাভূমি ধরে যদি বরাবর সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, তা হলে শৈলমালা, মালভূমি ও অরণ্যে-ঘেরা এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে।

মান্‌সার ছেড়ে আমরা নাগপুর-জব্বলপুর রোডে পড়লাম। দুধারে দূরপ্রসারী সমতলভূমি জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ করচে—আকাশে দু-দশটা নক্ষত্র—দূরে নিকটে বৃক্ষশ্রেণী। এখনও নাগপুর ২৫ মাইল। সারাদিন পাহাড়ে ওঠানামা পরিশ্রমের পর, হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস বেশ আরামপ্রদ বলে মনে হচ্চে। ক্রমে কামটি এসে পড়লাম। পথে কান্‌হান্ নদীর সেতুর উপর এসে মোটরের এঞ্জিন কি বিগড়ে গেল। আমরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীবক্ষের দিকে চেয়ে আর একটা সিগারেট ধরালাম। পেছনে রামটেক্ প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা কান্‌হান্ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—আমার ইচ্ছে ছিল ট্রেনে মোটরে একটা রেস হয়—কিন্তু তা আর হল না, ট্রেন ছাড়বার আগেই মোটরের এঞ্জিন ঠিক হয়ে গেল। কামটিতে এঞ্জিন আবার বিগড়ালো একবার, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠিক হল। তারপর আমরা নাগপুরে এসে পড়লাম—দূর থেকে ইন্দোরের আলো দেখা যাচ্চে।

কিন্তু কিন্‌দী হ্রদের তীরের গিরিসাপুর জঙ্গল আমি এখনও ভুলি নি। শরতের নীল আকাশের তলায় সেই নিবিড় ছায়ানিকেতন আরণ্য প্রদেশটি আমার মনে একটা ছাপ দিয়ে গেছে। আহা! ঐ বনের শিউলি গাছগুলোতে যদি ফুল ফুটত, আরও যদি দু-চার ধরনের বনফুল দেখতে পেতুম—তবে আনন্দ আরো নিবিড় হত—কিন্তু এমনি কত দেখেছি, তার তুলনা নেই। বুনো বাঁশের ছোট ছোট ঝাড়গুলির কি শ্যামল শোভা! পুজোর ছুটি ফুরিয়ে যাবে, আবার কলকাতার লোকারণ্যের মধ্যে ফিরে যাব, আবার দশটা পাঁচটা স্কুলে ছুটব, আবার অপকৃষ্ট 'ক্যালকাটা কেবিনে' বসে চা ও ডিমের মামলেট খাব—তখন এই বিশাল পার্বত্যাকার সরোবর, এই শরতের রৌদ্র-ছায়াভরা কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা ঘন অরণ্যানী, এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন গিরিসানু—এই আম্বারা, কিন্‌দী, রামটেকের মন্দির-দুর্গ—এসব বহুকাল আগে দেখা স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে মনের কোণে উঁকি মারবে।

একটা কথা না লিখে পারচি নে। আমি তো যা দেখি, তাই আমার ভাল লাগে—বিশেষ করে যদি সেখানে বন থাকে। কিন্তু তবুও লিখচি আমি এ পর্যন্ত যত পাহাড় ও অরণ্য দেখেচি—চন্দ্রনাথ, ত্রিকূট, কাটনি অঞ্চলের পাহাড়—ডিগরিয়া ও নন্দন পাহাড়ের উল্লেখ করাই এখানে হাস্যকর, তবুও উল্লেখ করচি এইজন্যে যে, এই ডায়েরীতেই কয়েক বছর আগে আমি নন্দন পাহাড়ের সুখ্যাতি করে খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা লিখেচি—এসব পাহাড় কিন্‌সী ও রামটেকের কাছে ম্লান হয়ে যায় সৌন্দর্য ও বিশালতায়।

কাল নাগপুর থেকে চলে যাব। আজ রাত্রে নির্জন বাংলোর বারান্দাতে বসে জ্যোৎস্না-ভরা কম্পাউণ্ডের দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' পড়চি। সেই পুরনো বইখানা, সিদ্ধেশ্বরবাবুদের আফিসে কাজ করবার সময় টেবিলের ড্রয়ারে যেখানা লুকনো থাকত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চট করে একবার বার করে নিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, দূর দেশের বর্ণনা পড়ে ক্লান্ত ও রুদ্ধশ্বাস চেতনাকে চাঙ্গা করে নিতুম। এখনও মনে পড়চে সেই ছোট টেবিলটা, তার ড্রয়ারটা, ডাইনে কাঠের পার্টিসনটা—সেই রোকড় খতিয়ানের স্তূপ, ফাইলের বোঝা।

কাল বৈকালে একা বেড়াতে বার হয়েছিলাম, কারণ সকালের বম্বে মেলে প্রমোদবাবু হাওড়া ফিরলেন। আমি তাঁকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হল, তাঁর বাড়ি খড়্গপুর, তিনি মতিকাকাকে চেনেন। বললুম, মতি-কাকার কাছে আমার নাম বলবেন।

তারপর বৈকালে একা বার হলাম। South Tiger Gap Road দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে একটা মুক্ত জায়গায় শাঁকোর ওপর বসলাম। সামনে ধূ-ধূ প্রান্তর, দূরে দূরে শৈলশ্রেণী—বাঁয়ে সাতপুরা, ডাইনে রামটেকের পাহাড় ও মানসারের ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে। একটু পরে সূর্য ডুবে গেল, পশ্চিম দিগন্তে কত কি রঙ ফুটল। আমার কেবলই মনে আসতে লাগল ঐ শ্লোকটা—'প্রস্থিতা দূরপন্থাণং'···শ্লোকের টুকরোটার নতুন মানে এখানে বসেই যেন খুঁজে পেলাম। ভাবলাম আমার উত্তর-পূব কোণে, আরও অনেক পেছনে কাশী ও বিন্ধ্যাচল, মির্জাপুর ও চুণার পড়ে আছে—পশ্চিম ঘেঁষে প্রাচীন অবন্তী জনপদ - পূর্বে প্রাচীন দক্ষিণ কোশল, সামনের ঐ নীল শৈলমালা—যার অস্পষ্ট সীমারেখা গোধূলির শান্ত ছায়ায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে—ঐ হল মহাভারতের কিংবা নৈষধ চরিতের সেই ঋক্ষবান পর্বত। এই যেখানে বসে আছি, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অমরাবতীর কাছে পদ্মপুর বলে গ্রামে কবি ভবভূতির জন্মস্থান। এ সব প্রাচীন দিনের স্মৃতি জড়ানো প্রান্তর. অরণ্য. শৈলমালা দিগন্তহীন মালভূমির গম্ভীর মহিমা, এই রকম সন্ধ্যায় নির্জনে বসলেই মনকে একেবারে অভিভূত করে দেয়।

পূর্বে চেয়ে দেখি হঠাৎ কখন পূর্ণচন্দ্র উঠে গেছে। তারপর জ্যোৎস্না-শোভিত Tiger Gap Road-এর বনের ধার দিয়ে শহরে ফিরে এলাম। শরতের রাত্রের হাওয়া বন্য শিউলির সুবাসে ভারাক্রান্ত ও মধুর। Lawrence Road-এর মোড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—তিনজন বাঙালী ছোকরার সঙ্গে দেখা—তারা আমায় বাংলোর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি ওখান থেকে চলে গেলাম সীতাবল্‌ডির বাজারে ঘড়ির দোকানে। সেখানে রেডিওতে কলকাতা Short Wave ধরেচে, বাংলা গান বাজচে—একটু পরে রেডিও স্টেশনের বিষ্ণু শর্মা সুপরিচিত গলায় কি একটা গানের ঘোষণা করলে। মনে মনে ভেবে দেখলাম কত পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে ৭৫০ মাইলের ব্যবধান ঘুচিয়ে বিষ্ণু শর্মার গলা এখানে এসে পৌঁছলো—যে মুহূর্তে সে গার্ষ্টিন প্লেসের সেই রাঙা বনাত মোড়া ঘরটায় বসে একথা বললে সেই মুহূর্তেই। রেডিওর অদ্ভুতত্ব এভাবে কখনো অনুভব করি নি—কলকাতায় বসে শুনলে এর গভীর বিস্ময়ের দিকটা বড় একটা মনে আসে না।

তারপর টাঙা নিয়ে নেরুলকরের ওখানে গেলাম। ডাক্তার বেরিয়ে গিয়েচে—বসে বসে 'The Story of the Mount Everest' বইখানা পড়লাম—রাত দশটা বাজে, এখনও ডাক্তার এল না। আমি একটা চিঠিতে লিখে এলাম, কাল সকলে দুবেকে সঙ্গে নিয়ে যেন নেরুলকর আমাদের ওখানে আসে। তারপর একটা টাঙা নিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত স্টেশন দিয়ে ফিরলাম।

সকালে সীতাবল্‌ডির ঘড়ির দোকানে ঘড়ি সারাতে গেলাম—ওখান থেকে গেলাম ডাঃ নেরুলকরের ওখানে ও স্টেশনে বার্থ রিজার্ভ করতে। দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়ে গোঁড় জাতির অস্ত্রশস্ত্র, বালাঘাট পার্বত্যদেশের খনিজ প্রস্তর, fossil, জব্বলপুরের অধুনালুপ্ত অতিকায় হস্তী, নর্মদার উত্তরে অরণ্যের অধুনালুপ্ত সিংহ, বনবিড়াল, ঝিন্দ্‌ওয়ারা জঙ্গলের বাইসন বা সৌর—কত কি দেখলাম। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের চেদীরানী লোহলের প্রস্তরলিপি ও বৌদ্ধ রাজা সূর্য ঘোষের পুত্র রাজপ্রসাদের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে মারা যাওয়াতে ভগবান তথাগতের উদ্দেশে পুত্রের আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি যে মন্দির নির্মাণ করেন—সে লিপিটিও পড়লাম। আজ খুব রোদ, আকাশ খুব নীল, বাংলোর বারান্দায় বসে লিখচি। এখনি চা খেতে যাব।

তারপর আমরা রওনা হলুম। ডাঃ নেরুলকর স্টেশনে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ডুগ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যবর্তী বিখ্যাত সালাকেসা ফরেস্ট দেখব বলে আমরা রাত দেড়টা পর্যন্ত জেগে বসে রইলাম। নাগপুর ছাড়িয়ে ছোট ছোট শালের জঙ্গল অনেক দেখা গেল—জ্যোৎস্না রাত্রে প্রকাণ্ড অরণ্যটার রূপ আমার মনে এমন এক গম্ভীর অনুভূতি জাগালে—সে রাত্রে ঘুম আমার আর এল না—ডোঙ্গরগড় স্টেশনে গাড়ি এসে পড়ল, রাত তিনটে বেজে গেল, ঘুমুবার ইচ্ছেও হল না—জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিতে মন আর সরে না।

নাগপুর থেকে ফিরেই দেশে গিয়েছিলাম। ইছামতী দিয়ে নৌকোতে বিকেলের দিকে গ্রামের ঘাটে পৌঁছুলাম—বাল্যে একটা কি ছেলেদের কাগজে একটা কবিতা পড়েছিলাম—

'ঘাটের বাটে লাগল যবে আমার ছোট তরী,
ঘনিয়ে আসে ধরায় তখন শীতের বিভাবরী।'

এতকাল পরে সেই দুটি চরণই বার বার মনে আসতে লাগল। মাধবপুরের মাঠে সূর্য অস্ত গেল, চালতেপোতার বাঁকের সবুজ ঝোপঝাপ দেখলাম—এবার কিন্তু চোখে লাগল না তেমন। কেন এমন হল কি জানি?

অবশ্য একথা ঠিক, এমন ঘন সবুজ ও নিবিড় বনসম্পদ C. P. অঞ্চলের নেই—সে হিসেবে বাংলাদেশের তুলনা হয় না ওসব দেশের সঙ্গে; কিন্তু ভূমিসংস্থান বিষয়ে বাংলা অতি দীন। জলকাদা, ডোবা, জলা, ugly জঙ্গল,—এ বড় বেশী। লোকেও ভূমিশ্রী বর্ধিত করতে জানে না, নষ্ট করতে পারে। নানা কারণে বর্ষাকালে বাংলাদেশ আদৌ ভাল লাগে না। আবার খুব ঘন বর্ষায় খুব ভাল লাগে—যেমন শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিনগুলিতে, যখন জলে থৈ-থৈ করে চারিধার। শেষ শরতের এসব বর্ষার সৌন্দর্য নেই, কিন্তু অসুবিধে ও শ্রীহীনতা যথেষ্ট। গাছপালায় মনকে বড় চাপা দিয়ে রাখে।

এবার কলকাতায় বড় ভাল লাগচে।

কাল সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েচি সারাদিন। সকালে বিশ্বনাথের মোটরে গোপালনগর গিয়েছিলাম—তারপর লাঙ্গলচষার প্রতিযোগিতা হল, ছেলেদের দৌড় হল—তারপর বিকেলে বেলেডাঙ্গা গেলাম। সেখানে একটা ডাব খাওয়া গেল—স্কুলে যুগল শিক্ষক এল।

দেশ, খয়রামারির মাঠ এত ভাল লাগচে এবার! কাল হারাণ চাকলাদার মহাশয়ের ছেলের কৃষিক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম—মাঠের মধ্যে ফুলের চাষ করেচে—বেশ দেখাচ্চে। একটা ঝাঁড়া গাছের কুঞ্জবন বড় সুন্দর। এবার জ্যোৎস্না খুব চমৎকার, শীতও বেশ। রোজ খয়রামারির মাঠে বেড়াই। আজ একা যাবো। একলা না গেলে কিছু হয় না।

রাজনগরের বটতলায় রোজ বেড়াতে যাই। সামনে অপরূপ রঙে রঙীন সূর্য অস্ত যায় দিগন্তের ওপারে, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ চারিদিক—মাটির সুঘ্রাণ স্মরণ করিয়ে দেয় ইসমাইলপুরের জনহীন চড়ায় এমন সব শীতের সন্ধ্যা, কত সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, কত কৃষ্ণা নিশীথিনীর শেষ যামের ভাঙা চাঁদের জনমানবহীন বনের পেছনে অস্ত যাওয়া, কত নীল পাহাড় ঘেরা দিকচক্রবাল, বিষম শীতের রাত্রে ঘনোরী তেওয়ারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শোনা অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বসে বসে।

সে সব দিন আজকাল কতদূরের হয়ে গেছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটাতে সকালে নীরদবাবুদের সঙ্গে বহুকাল পরে বেলুড় গিয়েছিলাম। পেছনের ছাদটাতে বসে আবার পুরনো দিনের মত কত গল্প করলাম। পেছনের ছাদটা, বেলুড়ের বাড়ির চারিপাশের বাগান এত ভাল লাগল। ভেবেছিলাম এখানে আর আসা হবে না। সেই বেলুড়ে আবার যখন আসা হল,—বিশেষ করে সেই শীতকালেই, যে শীতকালের রাত্রির সঙ্গে বেলুড়ে যাপিত কত রাত্রির মধুর স্মৃতির যোগ রয়েচে—তখন জীবনের অসীম সম্ভাব্যতার উপলব্ধি করে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সবাই মিলে আমরা চড়ুইভাতি করে খেলাম নীচের রান্নাঘরটাতে। পেঁপের ডাল হাতে রদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসলাম মালীর ঘরের সামনে, নীচের ছাদটার ফলসা গাছের ডালে সেই অপূর্ব অবনমন দেখলাম, যা ওই ফলসা গাছটারই নিজস্ব, অন্য গাছের এ সৌন্দর্যভঙ্গি দেখি নি কখনো—বাগানের পাঁচিলের ওদিকে

পাটের কলে নিবারণ মিস্ত্রীর সেই গোলপাতার ঘরখানা, শীতের দিনে গাঁদাফুল-ফোটা নিকানো দুপাশে তকতকে উঠোন,—সব যেন পুরাতন, পরিচিত বন্ধুর মতো আমাদের প্রাণে তাদের স্নেহস্পর্শ পাঠিয়ে দিলে, বড় ভাল লাগল আজ বেলুড়।

সন্ধ্যার আগেই মোটরে চলে এলাম কলকাতায়। কাল গিয়েছে পূর্ণিমা, আজ প্রতিপদের চাঁদ রাত সাড়ে সাতটার পরে উঠল। ধোঁয়া নেই, এই যা সৌভাগ্য।

অনেকদিন পরে আজ আমড়াতলার গলির মুখে গিয়ে পড়েছিলাম—এতদিন চিনি নি—আজ চিনেচি।

এবার ইস্টারের ছুটিটা কাটাতে এলুম এখানে। সেবার এসে নীল ঝরনার যে উপত্যকা দেখে গিয়েছিলাম—আবার জ্যোৎস্না রাত্রে নিমফুল ও শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসের মধ্যে সে সব স্থান দেখলাম। রানীঝরনার পথে পাহাড়ে উঠে গোঁড় জাতির গ্রামে আবার বেড়িয়ে এলাম। আজ বেড়িয়ে এলাম সকালে কাঁকড়গাছি ঘাট। সারা পথের দুধারে বন, তবে এখন শাল ও মহুয়া গাছ প্রায় নিষ্পত্র—তলায় সাদা সাদা মহুয়া ফুল টুপ টাপ ঝরে পড়চে। রাখামাইনস ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে বন বেশ ঘন, বড় বড় ছায়াতরুও আছে। কাঁকড়গাছি ঘাটটা বড় চমৎকার,—এখানে একটা জায়গার চারিধারেই পাহাড়ের শ্রেণী। ছোট একটা ঝরনা আছে—তবে এখন ঝরনাতে জল খুবই কম। ওদিক বনগাছের শোভা এদিকের চেয়ে সুন্দর। অপরাহ্ণে বা জ্যোৎস্নারাত্রে যে এসব স্থানের শোভা অপূর্ব হবে সেটা বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। নীরদবাবুরা গরুর গাড়িতে এলেন—আমি দেখলাম ওর চেয়ে হেঁটে আসা অনেক বেশী আরামের। বাংলোর সামনে ছোট বাঁধটাতে স্নান করে এলাম। জল বেশ ভাল। খুব সম্ভব আজই রাত্রে কলকাতাতে ফিরব।

কাল রাখামাইন্‌স্‌ থেকে বৈকালে হেঁটে আমরা তিনজন চলে এলাম শালবনের মধ্যে দিয়ে অস্তসূর্যের আলোয় রাঙানো সুবর্ণরেখা পার হয়ে। আজ সকালে গালুডির বাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। কাল রাতের চাঁদটা যে কখন কালাঝোর পাহাড় শ্রেণীর পিছন দিয়ে উঠল তা মোটেই টের পাই নি—স্টেশন থেকে এসে দেখি চাঁদ উঠে গিয়েচে। কিন্তু অনেক রাত্রে স্টেশনের পথের ছোট ডুংরিটার সাদা সাদা কোয়ার্টজ পাথরের চাঁইগুলো, ছোট বটগাছটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আজ সকালে গুইরাম গাড়োয়ানের সঙ্গে দেখা, সে বললে ঠিকরী ও ধারাগিরির পথের জঙ্গলে খুব বন, বাঘের ভয়ও আছে। এবার আর যাওয়া হল না, পূজার সময় যাব।

এবার জীবনটা খুব গতিশীল হয়ে উঠেচে। এই তো গত শনিবারের রামনবমী দোলের দিনও বারাকপুরে ছিলাম। দেখলাম আমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশ বনে কিরকম শুকনো পাতার রাশ পড়েচে, নদীর ধারে চটকাতলা খালের উঁচু পাড়ে কিরকম ঘেঁটুফুল ফুটেছে, রঘুদাসীদের বাড়িতে ওরা আবার এসেচে, পথে রঘুদাসীর সঙ্গে দেখা। তারপরে খয়রামারির

মাঠে সেই বেদেদের তাঁবুর ছোট গর্তটা, সেখানে সেদিনও আকন্দ ফুলের শোভা দেখতে গিয়েচি—রাজনগরের বটতলাটা সন্ধ্যাবেলায় একা বেড়িয়ে এসেচি আর ভেবেচি এসব জায়গা কত নিরাপদ, কত নিরীহ—হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে গালুডির বাংলোর পিছনে বসে লিখচি—রানীঝরনা নেকড়েডুংরি সব দেখা হয়েই গেছে। রাখামাইন্‌সে দুরাত্রি যাপন করে এলাম।

কিন্তু একটা দেখলাম ব্যাপার। এসব স্থানে সঙ্গী নিয়ে আসতে নেই। একা থাকলে নিজের মন নিয়ে থাকা যায়। তখন নানা অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত ভাব এসে মনে জোটে। কিন্তু সঙ্গীরা থাকলে তাদের মন আমাকে চালিত করে—আমার মন তখন আর সাড়া দেয় না, কেমন গভীর অতল তলে লাজুক তার মুখ লুকিয়ে থাকে। কাজেই সঙ্গীদের চিন্তা তখন হয় আমার চিন্তা—সঙ্গীদের ভাব তখন হয় আমার ভাব, আমার নিজস্ব জিনিস সেখানে কিছু থাকে না। কাল সুবর্ণরেখার পারের সূর্যাস্তের দৃশ্যটা, কিংবা গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় মহুলিয়ার প্রান্তরের ও নেকড়েডুংরি পাহাড়ের সে অবাস্তব সৌন্দর্য, একা থাকলে এসব দৃশ্যে আমার মন কত অদ্ভুত কথা বলত—কিন্তু কাল শুধু আড্ডা দেওয়াই এবং চা খাওয়াই হল—মন চাপা পড়ে রইল বটে, অর্থহীন প্রলাপ বকুনির তলায়, সম্মিলিত সিগারেট ধূমের কুয়াসার আড়ালে।

তাই বলচি এসব স্থানে আসতে হয় একা। লোক নিয়ে আসতে নেই।

আজই এখান থেকে যাব। এখনি বলরাম সায়েরের ঘাটে নেয়ে আসবো—অনেকদিন পরে ওতে বড় আনন্দ পাব। দূরে কালাঝোর পাহাড়, চারিধারে তালের সারি, স্বচ্ছ শীতল জল—দীঘিটা আমার এত ভাল লাগে!

শালবনে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকচে কালাঝোর পাহাড়ের দিকে। এত ভাল লাগচে সকালটা!

খুড়োদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ি এসেচি। এবার গালুডিতে অনেকদিন থেকে আমার যেন নতুন চোখ খুলেচে, গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য এবার বেশী করে চোখে পড়েচে। সমস্ত প্রাণটা যেন একটা পার্ক—আমার বাড়িতে কোন গাছ থাকুক আর নাই থাকুক, সারা গ্রাম এমন কি কুঠীর মাঠ, ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল বাঁশবন—এসবই আমার। আমি দেখি, আমার ভাল লাগে—আমার না তো কার?

প্রায়ই বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে যাই, এবার একটা নতুন পথ খুলেচে মাঠের মধ্যে দিয়ে, সেটা আরও অপূর্ব। এমন সবুজ মাঠে, উলুফুল ফুটেচে চারিধারে, শিমুলগাছ হাত বেঁকিয়ে আছে, দূর বনান্তশীর্ষে বিরাটকায় Lyre পাখীর পুচ্ছের মতো বাঁশবনের মাথা দুলচে, এমন শ্যামলতা, এমন শ্রী—এ আমাদের এই দেশটা ছাড়া আর কোথাও নেই। দুপুরে আজ বেজায় গরম, কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি বলে অত গরমেও খুব ঘুমুলাম।

উঠে দেখি মেঘ করেচে। উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন নীল-কৃষ্ণ কালবৈশাখীর মেঘ,—তারপর উঠল বেজায় ঝড়। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না, একখানা গামছা নিয়ে তখনি

নদীর ঘাটে চলে গেলাম! পথে জেলি বললে শিগগির নেকো তলায় যান, ভয়ানক আম পড়চে। কিন্তু আজ আর আম কুড়োবার দিকে আমার খেয়াল নেই। আমি নদীর ধারে কালবৈশাখীর লীলা দেখতে চাই। নদীজলে নামবার আগেই বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল—জলে নেমে দেখি জল গরম, যেন ফুটচে। এপার ওপার সাঁতার দিতে লাগলাম কালো জলে ঢেউ উঠেচে, মুখে নাকে মাথায় ঢেউ ভেঙে পড়চে, ওপারে চরের ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, বঙ্কেবুড়ো গাছ ঝড়ে উল্টে উল্টে যাচ্চে, বৃষ্টির ধোঁয়ায় চারিধার অন্ধকার হয়ে গেল, নদীজলের অপূর্ব সুঘ্রাণ বেরুচ্চে, দূর দূর সমুদ্রের কথা মনে হচ্চে। এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা—প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত ধরাধরি করে চলা—ঐ শ্যামল ডালপালা ওঠা শিমুলগাছ, সাঁইবাবলা গাছ—এই তো আমি চাই। এদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করব—ঐ ঝোড়ো-মেঘে আমার ভগবানের উপাসনা, ঐ তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুতে, এই কালো নদীজলের ঢেউয়ে, ঝড়ের গন্ধে, বাতাসের গন্ধে, বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধে, চরের ঘাসের কাঁচা গন্ধে—।

কাল কুঠীর মাঠে বসে এই সব কথা ভাবছিলাম। তারপর নদীজলে নাইতে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব মনে এল। সমস্ত দেহ মন যেন আপনা-আপনি নুয়ে পড়তে চাইল। এ ধরনের ভক্তি একটা বড় bliss, জীবনে হঠাৎ আসে না। যখন আসে, তখন বিরাট রূপেই আসে, আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে প্রাণের তীরে। এ Realisation যেমন দুর্লভ, তেমনি অপূর্ব।

আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তাঁর এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।

এবার মোটে বৃষ্টি নেই—পথঘাট এখনও শুকনো খটখটে, অন্যবার এমন সময় খানা ডোবা জলে ভরে যায়, কুঠীর মাঠের রাস্তায় কাদা হয়। তবে এবার সোঁদালি ফুল কমে আসচে, বেল ফুলের গন্ধেরও তেমন জোর নেই।

কাল বিকেলে পাঁচি এসেচে। সে, আমি, খুকু, রাণু মায় ন'দি ক'জনে কাল বসে কালিদাসের মেঘদূত ও কুমার-সম্ভবের চর্চা করেচি। বিকেলে আমি কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ঘাটে স্নান করতে এসে দেখি ওরা সবাই ঘাটে—খুকু ও রাণু সাঁতার দিয়ে গিয়েচে প্রায় বাঁধালের কাছে। আমি স্নান সেরে উঠে আসচি, কালো তখন গেল শিমুলতলাটার কাছে। আমি বললুম, তোর মা ঘাটে তোকে ডাকচে। সে 'যাই' বলে একটা বিকট চীৎকার করে চলে গেল। একটু পরে দেখি খুকু আমায় ডাকচে—বাঁশবন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেচে —ও ঘাট থেকে আসবার সময় বোধ হয় অন্ধকার দেখে ভয় পেয়েচে। আমি দাঁড়িয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।

আজ ওবেলা স্নানের সময়ে মনে কি যে এক অপূর্ব ভাব এসেছিল! প্রতিদিনের জীবন এই মুক্তরূপা প্রকৃতির মধ্যে সাথক হয় এখানে—এইসব ভাবে ও চিন্তার ঐশ্বর্যে।

আজ অনেক কাল পরে ন'দির কাছ থেকে গৌরীর হাতের লেখা একখানা গানের খাতা পেয়েচি। এতদিন কোথায় এখানা পড়ে ছিল, বা কি করে ন'দির হাতে এল—তার কোন

খবর এরা দিতে পারলে না। Appropriately enough, খাতায় প্রথম গানটিই হচ্চে—

ঐ নীল উজ্জ্বল তারাটি
করুণ, অরুণ তরুণ কিরণ অমিয় মাখান হাসিটি
বহুদূর জগতে গিয়েছে গো চলি প্রণয়বৃন্ত ছিঁড়িয়া
ভালবাসা সব ভুলে গেছে…

চৌদ্দ পনেরো বছর আগের এমনিধারা কত উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত প্রভাত, বর্ষায় কত মেঘমেদুর সন্ধ্যার কথা মনে আনে।..

যাক। কাল আকাশে হঠাৎ বৃশ্চিক নক্ষত্র দেখেচি—একে প্রথম চিনি বেল পাহাড়ের স্টেশনে—পরিমল আমাকে চিনিয়ে দেয়—আমি ওটা চিনতাম না। কাল দেখি শ্যামাচরণ-দাদাদের বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর বিরাট ওর অগ্নিপুচ্ছটা বেঁকে আছে। আকাশের ওদিকটা আলো হয়ে উঠেচে…খুকুকে বললুম, ঐ দ্যাখ বৃশ্চিক নক্ষত্র—

তাকে চিনিয়ে দিলুম। রাণু জিগ্যেস করলে—তবে তার বয়েস যদিও খুকুর চেয়ে অনেক বেশি, সে অত বুদ্ধিমতী নয়—পনেরো মিনিট কঠিন পরিশ্রমের পরে তাকে বোঝাতে পারলুম কোন্‌টাকে আমি বৃশ্চিক রাশি বলতে চাচ্চি।

এদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ঢলে পড়চে ক্রমেই মেজো খুড়ীমাদের রান্নাঘরের ওপরে। রাত অনেক হল, ওরা তবুও তাস খেলবেই। বেগতিক দেখে বললুম, আলোতে তেল নেই।

নইলে ঘুম হবার যো নেই, ওদের খেলার গোলমালে।

লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম, রাত তখন বারোটার কম নয়।

বিকেলে কালো আর আমি মোল্লাহাটির পথে বেড়াতে গেলাম। আজ দুপুরে যখন এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাই, তখনই খুব মেঘ করেছিল—একটু পরে সেই যে বৃষ্টি এল, আর রোদ ওঠে নি। মেঘ ভরা বিকেলে শ্যামল মাঠ ও দূরের বাঁশ বন, বড় বড় বটগাছ, এক রকম কি গাছ আছে, মখমলের মত নরম সবুজ পাতা ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে ঝোপের সৃষ্টি করে—এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মোল্লাহাটি ও পাঁচপোতা বামুনডাঙ্গার পথের মোড়ে গিয়ে একখানা ছই-চাপা গরুর গাড়ির সঙ্গে দেখা হল। তাদের গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে, বাবুর কাছে কি বিড়ি আছে?

—না, নেই। বিড়ি খাই নে—

—আপনারা কোথায় যাবেন?

—কোথাও যাব না, এই পথে একটু বেড়াচ্চি।

ফিরবার পথে মনে হল কলকাতায় থাকবার সময় যখন গাছপালার জন্যে মনটা হাঁপায়, তখন যে কোনো একটু ছবি, একটা বনের ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয়, ওঃ কি বনই এদেশে!

প্রায়ই বিদেশের ফটো—আফ্রিকার, কি দক্ষিণ আমেরিকার—কিন্তু তখন ভুলে যাই যে আমাদের গ্রামের চারিপাশে সত্যিকার বন জঙ্গল আছে অতি অপূর্ব ধরনের—যখন বিলিতি Grand Evening Annual দেখি তখন ভুলে যাই কত ধরনের অদ্ভুত গাছ আছে আমাদের বনে জঙ্গলে—যা বাগানে, পার্কে নিয়ে রোপণ করলে অতি সুদৃশ্য কুঞ্জবন সৃষ্টি করে—যেমন ষাঁড়া, কুঁচলতা, ঐ নাম-না-জানা গাছটা—এরা যে-কোন বিখ্যাত পার্কের সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে।

সেদিন যখন আমি, রাণু, খুড়ীমা, ন'দি নদীতে বিকেলে স্নান করচি তখন একটা অদ্ভুত ধরনের সিঁদুরে মেঘ করলে—ওপারের খড়ের মাঠের উলুবনের মাথা, শিমুলগাছের ডগা, যেন অবাস্তব, অদ্ভুত দেখাল, যেন মনে হচ্ছিল ওখান থেকেই নীল আকাশটার শুরু।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় একা নদীতে নেমে যে অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল তা বোধ হয় জীবনে আর কোনদিন হয় নি। তার মাথায় একটা তারা উঠেচে—দূরে কোথায় একটা ডাহুক পাখী অবিশ্রান্ত ডাকচে। মাধবপুরের চরের দিকে ভায়োলেট রঙের মেঘ করেচে—শান্ত, স্তব্ধ নদীজলে তার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব।

মানুষ চায় এই প্রকৃতির পটভূমির সন্ধান। এতদিন যেন আমার Emerson-এর মতের সঙ্গে খুব মিল ছিল—সেদিনও বঙ্গশ্রী আপিসে কত তর্ক করেচি, আজ একটু মনে সন্দেহ জেগেচে। মানুষ এই সৃষ্টিকে মধুরতর করেচে। ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম, যদি না থাকে, তবে ওর সার্থকতা কিছুই নয়। হৃদয়ের ধর্ম সব ধর্মের চেয়ে বড়।

আজ সকাল থেকে বর্ষা নেমেচে। ঝিম্-ঝিম্ বাদলা, আকাশ অন্ধকার। আজ এই মেঘমেদুর সকালে একবার নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করচে—বাঁওড়ের ধারের বেলে মাটির পথ বেয়ে একেবারে কুঁদীপুরের বাঁওড় বাঁয়ে রেখে মোল্লাহাটির খেয়া পার হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্চে পিসিমার বাড়ি পাটুশিমলে বাগান-গাঁ। কাল সুন্দরপুর পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলুম বৈকালে—ও পথের প্রাচীন বটগাছের সারির দৃশ্য আমি আবাল্য দেখে আসচি, কিন্তু ও পুরনো হল না—যত দেখি ততই নতুন। গাছে গাছে খেজুর পেকেচে, কেঁয়োঝাঁকা গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা গজিয়েচে এই বর্ষায়। আরামডাঙার মাঠে মরগাঙের ওপারে, সবুজ আউশ ধানের ক্ষেত এবং গ্রামসীমায় বাঁশবনের সারি মেঘমেদুর আকাশের পটভূমিতে দেখতে হয়েচে যেন কোন বড় শিল্পীর হাতে-আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ। ক্ষেত্রকলু ওদিক থেকে ফিরচে, হাতে ভাঙা লণ্ঠন একটা। বললে মোল্লাহাটির হাটে পটল কিনতে গিয়েছিল।

—পটল না কিনেই ফিরলে যে?

—কি করব বাবু, ছ'পয়সা সের দর। একটা পয়সাও লাভ থাকচে না। গোপালনগরের হাটেও ওই দর। এবার তাতে আবার পটল জন্মায় নি। যে দুর্বচ্ছর পড়েচে বাবু!

কলকাতাটা যেন ভুলে গিয়েচি। যেন চিরকাল এই বটের সারি, বাঁওড়, সুন্দরপুর, সখীচরণের মুদীখানার দোকানে কাটাচ্চি জীবনটা। এদের শান্ত সঙ্গ আমার জীবনে আনন্দ এনেচে উগ্র দুরাশার মত্ততা ঘুচিয়ে। সে দুরাশাটা কি? নাই বা লিখলাম সেটা।

আজ বিকেলে সারা ঈশান কোণ জুড়ে কালবৈশাখীর মেঘ করল এবং ভয়ানক ঝড় উঠল। হাজারী জেলেনী, জগবন্ধু, কালো, জেলি ওরা আম কুড়ুতে গেল বাগানে—কারণ এখনও আম যথেষ্ট আছে, ঝিনুকে গাছে, চারা বাগানে, মাঠের চারায়।

তারপর ঘন বর্ষা নামলো—আমি আর কালো বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বর্ষাস্নাত গাছ-পালা, বটের সারি, উলুর মাঠের মধ্য দিয়ে বেলেডাঙ্গাতে। সেখান থেকে যখন ফিরি, বর্ষা আরও বেশি, বিদ্যুতের এক একটা শিখা দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী—আকাশে কালো কালো মেঘ উড়ে চলেচে—আমার মনে হল আমিও যেন ওদের সঙ্গে চলেচি মহাব্যোম পার হয়ে চিন্তাতীত কোন্ সুদূর বিশ্বে—আকাশ মহাকাশে আমার সে গতি—পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন, সুখদুঃখ ঘরগৃহস্থালীর বন্ধনমুক্ত আমার আত্মা, সে পায়ের তলায় সারা পৃথিবীর মোহ মাড়িয়ে চলেচে—মহাব্যোমের অন্ধকার, শূন্য, মেঘ, ইথার, সমুদ্র ভেদ করে মুক্তপক্ষ গতিতে অমিত-তেজে চলেচে—দিক্‌পাল বৈশ্রবণের বিশ্ববিদ্রাবণকারী পৌরুষের বীর্যে।

নদীতে স্নান করতে নেমে সাঁতার দিয়ে বৃষ্টি মাথায় চলে গেলুম ওপারে মাধবপুরের চরের ওপর বর্ষা দেখতে—পশ্চিম দিকে পিঙ্গল বর্ণের মেঘ হয়েচে, ওপারের বাঁশবন হাওয়ায় দুলচে—তারপর আমরা আবার এপারে এলাম—ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি এলাম।

আজকার সন্ধ্যাটি ঠিক বর্ষাসন্ধ্যা—কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্চে। যেন আর কেউ থাকলে ভাল হত—কত থাকলেই তো ভাল হত—সব সময় হয় কৈ?

আমার মনে এই যে অনুভূতি—এ অনেক কাল পরে আবার হল। আমি কত নিঃসঙ্গ নির্জন জীবন যাপন করেচি কতকাল ধরে, লোকালয় থেকে কতদূরে। কিন্তু ১৯২৩—২৬ সালের পরে ঠিক এ ধরনের বেদনা-মাখানো নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আর কখনো হয় নি। এই মনের অবস্থা আমি জানি, চিনি একে—এ আমার পুরাতন ও পরিচিত মনোভাব, কিন্তু ১৯২৬ সালের পরে ভুলে গিয়েছিলাম একে—আবার সেই ফিরে এল।

কাল আবার খুব আনন্দ পেয়েচি। মনের ও ভাবটা কাল আর ছিল না। বিকেলে আমরা কাঁচিকাটার পুলের পথে অনেকদূর পর্যন্ত বেড়াতে গেলাম। নীল মেঘে সারা আকাশ জুড়ে ছিল—কাল স্নান করে ফিরবার পথে শিমুল গাছটার ওদিকে আউশ ধানের ক্ষেতের ওপরকার নীল আকাশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—অমনি মনের ভাব বিকেলেও হয়েছিল। আরামডাঙ্গার ওপারে সেই খাবরাপোতার দিকের আকাশে একটা নীল পিঙ্গল বর্ণ-শ্রী, সূর্য বোধহয় অস্ত যাচ্ছিল, আমরা কিন্তু পেয়ারা গাছটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না—আমি আর কালো কত খুঁজলাম, আরামডাঙ্গার পথে মরগাঙের ধারে সেই পেয়ারা গাছটা যে কোথায় গেল!

সন্ধ্যার কিছু আগে কুঠির মাঠে একটা ঝোপেঘেরা নতুন জায়গা আবিষ্কার করা গেল—এদিকটায় কখনো আসি নি—এমন নিভৃত স্থানটা, খুব আনন্দে নদীতে সাঁতার দিলাম।

এবার বারাকপুরে চমৎকার ছুটিটা কাটল। সমস্ত ছুটিটাই তো এখানে রয়েচি। আর

বছর এখানে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলাম—বনগাঁয়ে ছিলাম বেশীদিন। এবার এখান থেকে কোথাও যাই নি। এখান থেকে যেতে মনও নেই। কলকাতার জীবনটা যেন ভুলে যেতে বসেচি।

কাল বিকেলে ঘন কালো মেঘ করে বৃষ্টি এল। আমি আর কালো বৃষ্টিমাথায় বেলে-ডাঙ্গার পুল পর্যন্ত বেড়াতে গেলাম। ঝোপঝাপ ভিজে কেমন হয়ে গিয়েচে—গাছপালার গুঁড়ির রং কালো—ডালপাতা থেকে জল ঝরে পড়ার শব্দ। তারপরে নদীর জলে স্নান করতে নামলাম—সাঁতার দিয়ে বাঁধাল পর্যন্ত গেলাম।

সাঁতার দিয়ে এত আনন্দ পাই নি কোনদিন এবারকার গরমের ছুটির আগে। কুঠীর মাঠের একটা নিভৃত স্থানে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—মাথার ওপর কালো মেঘ উড়ে যাচ্চে—দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের শিখা—শুধু চারিদিকে বৃষ্টির শব্দ,—গাছে পাতায়, ডালপালায়, ঝোড়ো হাওয়া বইচে—নির্জন প্রান্তরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকার সে অনুভূতির তুলনা হয় না। তার প্রকাশের ভাষাও নেই—যা খুব ঘনিষ্ঠ, খুব আপন, তাকে কি আর প্রকাশ করা যায়?

আজ বিকেলে বহুদিন পরে ভারী সুন্দর রাঙা রোদ উঠল। বাঁধালের কাছে নাইতে নেমে মাঝ জলে গিয়ে ওপরের একটা সাঁইবাবলা গাছের ওপর রোদের খেলা দেখছিলাম—কি অদ্ভুত ধরনের ইন্দ্রনীল রং-এর আকাশ, আর কি অপূর্ব সোনার রং রোদের।...সকলের চেয়ে সেই সাঁইবাবলা গাছের বাঁকা ডালপালা ও ক্ষুদে ক্ষুদে সবুজ পাতার ওপর সোনার রংয়ের রোদের খেলা।...তারই পাশে ওপারের কদম্বগাছটাতে বড় বড় কুঁড়ি দেখা দিয়েচে... শ্রাবণের প্রথমেই ফুল্লপুষ্পসম্ভারে নতশাখ-নীপতরুটি বর্ষাদিনের প্রতীক্ স্বরূপ ওই সবুজ উলুখড়ের মাঠে স্বমহিমায় বিরাজ করবে—বর্ষার ঢল নেমে ইছামতী বেড়ে ওর মূল পর্যন্ত উঠবে, ঝরা কেশররাজি ঘোলাজলের খরস্রোতে ভেসে চলে যাবে...উলুবন আরও বাড়বে...আমি তখন থাকবো কলকাতায়, সে দৃশ্য দেখতে আসবো না।

কাল সকালে এখান থেকে যাবো, আজই এখানে থাকার শেষ দিন এ বছরের মতো। এবার ছুটিটা কাটল বেশ—কি প্রকৃতির দিক থেকে, কি মানুষের দিক থেকে, অদ্ভুত ভাবে ছুটিটা উপভোগ করা গেল এবার। কলকাতায় থাকলে আমার যে আফ্রিকা দেখবার ইচ্ছে হয়, পাহাড় জঙ্গল দেখবার ইচ্ছে হয়—এখানে দীর্ঘদিন কাটালে কিন্তু আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। গাছপালায়, নীল আকাশে, নদীর কালোজলে সাঁতার দিতে দিতে দু' পাশের বাঁশবন, সাঁইবাবলার সারি চেয়ে চেয়ে দেখা, সবুজ উলুর মাঠের দৃশ্য, পাখীর অবিশ্রান্ত ডাক—এখানে মনের সব ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়। বসে লিখচি, রাণু এসে বললে—দাদা এক কাপ চা খাবেন কি? সে ওদের রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে এসেচে বয়ে। আর কাল থেকে অনবরত বলচে—দাদা চলে যাবেন না কাল, আর একদিন থাকুন, আপনি চলে গেলে পাড়া আঁধার হয়ে যাবে।

কাল সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিন-চার বার একথা বলেছে—অথচ ওর ওপর কি অবিচার করেচি এবার—ওকে নিয়ে তাস খেলি নি একটি দিনও—ও খেলতে চাইলেও খেলি নি। ভাল করে কথাও বলি নি।

বললে—জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আসবেন তো?

আমি বললাম—যদিই বা আসি, তোর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। তুই তার আগেই তো চলে যাবি।

এদের কথা ভেবে কলকাতায় প্রথম প্রথম কষ্ট হবে।

পূজার ছুটিতে বাড়ি এসেচি। রাখামাইন্স্ গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন একা মেঘান্ধকার বিকালবেলাতে সাটকিটার অরণ্যময় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিলাম। এই পথে একা যেতে ওদেশের লোকেও বড় একটা সাহস করে না—যখন একটা ছোট পাহাড়ী ঝরনায় নেমে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা অংশ সেখানে রেখে দিচ্চি, কাল নীরদবাবুদের বিশ্বাস করাবার জন্যে, তখন সেখানে কুলুকুলু ঝরনার শব্দটি মেঘশীতল বৈকালের ছায়ায় কি সুন্দর লাগছিল! পাহাড়ের saddleটা যখন পার হচ্চি তখন ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নামল, হাজার হাজার বনস্পতির পাতা থেকে পাতায় ঝর্-ঝর্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। দূরের কালাঝোর পাহাড় মেঘের ছায়ায় নীল হয়ে উঠেচে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করচে। কালিদাসের 'সানুমান আম্রকূট' কথাটি বার বার মনে পড়ছিল—একা সেই মহুয়াতলায় শিলাখণ্ডে বসে।

একদিন রাখামাইন্স্-এর বাংলোর পিছনে বনতুলসীর জঙ্গলে ভরা পাহাড়টার মাথায় অস্তগামী সূর্যের আলোতে বসেছিলাম; ওদিকে রাঙা রোদ-মাখানো সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথাটা দেখা যাচ্ছে, এদিকে পাহাড়ের Ledge থেকে দূরে গালুডির চারুবাবুর বাংলো দেখা যাচ্চে—সেদিন কি আনন্দ যে মনে এল—তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না। সেদিন আবার বিজয়া দশমী—নীল ঝরনার ধারে একটা শিলাখণ্ডে একা বসে রইলাম সন্ধ্যাবেলাতে, ক্রমে জ্যোৎস্না উঠল, মহুয়াতলার ঘাট দিয়ে পাহাড়ের দিক দিয়ে ঘুরে আসতে আসতে কুসুমবনীতে উড়িয়া মুদীর দোকানে গেলাম সিগারেট কিনতে। আশ্চর্যের বিষয় এইখানে হঠাৎ নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী Shanger সাহেবের বাংলো থেকে চা খেয়ে ঐ পথে মেঘ-ঢাকা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন—বিজয়ার কোলাকুলি সেই দোকানেই সম্পন্ন হল। ভাবলাম, আজ আমাদের দেশে বাঁওড়ের ধারে বিজয়ী দশমীর মেলা বসেচে।

তার পরদিন আমরা গালুডিতে গেলাম ডোঙাতে সুবর্ণরেখা পার হয়ে—চারুবাবুদের বাংলোতে গিয়ে সুরেনবাবু, আমি নেকড়েডুংরি পাহাড়ে গিয়ে উঠে বসলাম। চা খেয়ে আশাদের বাড়ি গিয়ে গান শুনলাম আশার—সেখানে বিজয়ার মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লে না। ফিরবার পথে সুবর্ণরেখাতে ডোঙা পাওয়া গেল না—অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রে সুবর্ণরেখা

রেলের পুল দিয়ে চন্দ্ররেখা গ্রামের মধ্যে দিয়ে অনেক রাত্রে ফিরলাম রাখামাইন্‌সের বাংলোতে। নদী পার হবার সময়ে সেই ছবিটা—সেই নদীর ওপরে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখা যাচ্চে, নীচে শিলাস্তৃত সুবর্ণরেখা, পশ্চিম তীরে ঘন শাল জঙ্গল, দূরে শ্যামপুর থানার ক্ষীণ আলো, লাইনের বামদিকের গাছগুলো আধ জ্যোৎস্নায় আধ অন্ধকারে দেখা যাচ্চে না, কিন্তু ফুটন্ত ছাতিম ফুলের ঘন সুগন্ধ; বাংলোতে ফিরে এসে দেখি —প্রমোদবাবু এসে বসে আছেন।

পরদিন আমরা সবাই মিলে সাটকিটার জঙ্গলের পথে গেলাম—তারপর দিন গালুডি থেকে চারুবাবু, সুরেনবাবু ও মেয়েরা এলেন। চার নম্বর খাদানের নীচের জঙ্গলের মধ্যে পিক্‌নিক্ হল। ঝুনু, আশা, আমি, চারুবাবু, সুরেনবাবু ও ভিক্টোরিয়া দত্ত বলে একটি মেয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আরোহণ করলাম। একেবারে সিদ্ধেশ্বরের মাথায়। একটা অম্লমধুর বনফলের কাঁচা ডাল ভেঙে নিয়ে পাহাড়ে উঠলাম—তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে।

সেদিন আমি স্টেশনের বাইরে কি একটা গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর বসে রইলাম যেমন সেদিন সকালে আমি ও প্রমোদবাবু পিয়ালতলার ছায়ায় প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে শুয়ে বট-গাছটার দিকে চেয়ে প্রভাতী আলোতে অজানা কত কি পাখীর গান শুনছিলাম।…

বেলা পড়ে এসেচে…বারাকপুরে বসে এইসব কথা লিখতে লিখতে মন আবার ছুটে চলে যাচ্চে সেই সব দেশে। শীতের বেলা এত তাড়াতাড়ি রোদ রাঙা হয়ে গাছের মাথায় উঠে গেল! বকুলগাছের মাথায়, বাঁশগাছের মাথায় উঠে গিয়েচে রোদ একেবারে।

সেই সুন্দর লতাপাতার গন্ধটা এবার ভরপুর পাচ্চি—ঠিক এই সময়ে ওটা পাওয়া যায়। কাল এখানে চড়কতলায় কৃষ্ণযাত্রা হল, জ্যোৎস্নারাত্রে গাছেপালায় শিশির টুপটাপ ঝরে পড়চে—আমি চালতেতলার পথে একা শুধু বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। কি রূপ দেখলাম কাল জ্যোৎস্নাভরা রহস্যময়ী হেমন্ত রাত্রির! কাল নদীর ধারে বিকেলেও অনেকক্ষণ বসেছিলাম।

কাল বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পাটলবর্ণের মেঘস্তূপের দিকে চোখ রেখে একটা জলার ধারে বসলাম—গাছপালার কি রূপ! সেই যে গন্ধটা এই সময় ছাড়া অন্য সময় পাওয়া যায় না—সেই গন্ধ দিন রাত সকাল সন্ধ্যা আমাকে যেন অভিভূত করে রেখেচে।

আজ কদিন বর্ষা পড়েচে—বসে বসে আর কোন কাজ নেই, খুকুদের সঙ্গে গল্প করচি, কাল সারাদিনই এইভাবে কেটেচে, তবুও কাল নদীতে এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিলাম, একটু ব্যায়ামের জন্যে। আজ সকালে নদীর ঘাটে ভোরবেলা গিয়ে মেঘমেদুর আকাশের শোভায় আনন্দ পেলাম। এই শিমুলগাছগুলো আমাদের এদেশের নদীচরের প্রধান সম্পদ! এগুলো আর সাঁইবাবলা না থাকলে ইছামতীর তটশোভা অনেক পরিমাণে ক্ষুন্ন হত।

আজ সকালে নদীর ঘাটে গিয়ে চারিদিকের আকাশে চেয়ে চেয়ে দেখলাম মেঘ অনেকটা

কেটেছে—আকাশের নীচে একটু একটু আলো দেখা যাচ্চে—বোধহয় ওবেলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনটা তপ্ত নির্মল আকাশ ও প্রচুর সূর্যালোকের জন্তে হাঁপাচ্চে—কাকাদের শিউলি গাছটার দিকে চেয়ে দেখছি গাছপালার স্বাভাবিক প্রভাতী রং ফিরে এসেচে—সে ঘষা কাচের মত রং নেই আকাশের।···কিন্তু একটু পরেই ঘন মেঘে সব ঢেকে দিলে।

আমি আবিষ্কার করেচি আমাদের দেশের প্রথম হেমন্তের সে অপূর্ব সুগন্ধটা প্রস্ফুটিত ময়চে-লতার ফুলের গন্ধ। হঠাৎ কাল বিকেলে আমি এটা আবিষ্কার করেচি। কুঠীর মাঠে আজ স্নানের পূর্বে বেড়াতে গিয়ে বনে বনে খানিকটা বেড়ালাম, লক্ষ্য করে দেখলাম এই সময়ে কত কি বনের লতাপাতায় ফুল ফোটে। ময়চে-লতা তো পুষ্পিত হয়েছেই, তা ছাড়া মাখম-সিমের গোলাপী ফুলের দল ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে, কেয়েঁঝাঁকার লতায় ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল ফুটেচে, ফুল বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন হলদে পুষ্পরেণু,—কি ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ, ডালের গায়ে পর্যন্ত ফুল ফুটেছে। ছাতিম ফুলের এই সময়, কুঠীর মাঠের জঙ্গলে একটা নবীন সপ্তপর্ণ তরুর দেখা মিলল, কিন্তু ফুল হয় নি তাতে। মেটে আলু তুলবার বড় বড় গর্ত বনের মধ্যে, এক জায়গায় একটা বড় কেয়েঁঝাঁকার ঝোপকে কেটে ফেলেচে দেখে আমার রাগ ও দুঃখ দুই-ই হল, নিশ্চয় যারা মেটে আলু তুলতে এসেছিল, তাদেরই এই কাজ। সজীব পুষ্পিত গাছ—কারণ এই সময় কেয়েঁঝাঁকার ফুল হয়—কেটে ফেলা যে কতদূর হৃদয়হীন বর্বরতা, তা আমাদের দেশের লোকের বুঝতে অনেকদিন যাবে। সেবার অমনি যুগল কাকাদের বাড়ির সামনের কদমগাছটা কালো বিক্রী করে ফেললে তিন টাকায়, জ্বালানি কাঠের জন্তে। এমন কি কেউ কোথাও শুনেচে? কদমগাছ, যা গ্রামের একটা সম্পদ, যে পুষ্পিত নীপ সকল বৈষ্ণব কবিকুলের আশ্রয় ও উপজীব্য—সামান্ত তিনটে টাকার জন্তে সে গাছ কেউ বেচে? শুধু আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হয়, সুন্দরকে দেখবার চোখ থাকলে, ভালবাসার প্রাণ থাকলে এ সব কি আর হত?

কাল বিকেলে অল্পক্ষণের জন্ত সোনালী রাঙা রোদ উঠল—বেলেডাঙ্গার পথে যেখানে একটা বাবলা গাছের মাথায় একটা বুনো চালকুমড়ো হয়ে আছে, ঐখানটাতে বসলুম—কত দিনের মেঘমেদুর আকাশের পরে আজ রোদ উঠেচে, এ-যেন পরম প্রার্থিত ধন!

এক জায়গায় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকতে দেখলাম মাঠের মধ্যে। কার্তিক মাসে সোঁদালি ফুল, কল্পনা করতেই পারা যায় না। কেলেকোঁড়ার ফুলও এসময়ে হয়।

কাল মেয়েরা চোদ্দ শাক তুললে, চোদ্দ পিদিম দিলে—খুকুদের বোধনতলায় বড় একটা প্রদীপ দিয়েছিল, বিলবিলের ধারে, উঠোনের শিউলিতলায়। বারাকপুরে চোদ্দ পিদিম দেওয়া দেখি নি কতকাল!

আজ বিকেলে খুকুদের কুঠীর মাঠে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। পুরনো কুঠীর হাউজঘরে ঘোর জঙ্গল হয়ে গিয়েচে—কত কি বনের লতা হয়ে আছে—খুকুর তা দেখে আনন্দ উৎসাহ দেখে কে! একটা লতার মধ্যে কি ভাবে ঢুকে সে খানিকটা দুললে, মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করলে—

আমায় কেবল চেঁচিয়ে বলে—দাদা, এটা দেখুন, ওটা দেখুন। তারপর ফিরে এসে ছেলেদের নিয়ে গোপালনগরে গেলাম কালী পুজোর ঠাকুর দেখাতে। হাজারীর ওখানে অনেক রাত হয়ে গেল তাস খেলতে বসে—অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

পরদিনও আবার কুঠীর মাঠে যাওয়ার কথা ছিল—ওরা সবাই গেল, কিন্তু মনোরমার ভাই কালো কুঠীর জঙ্গলে হাঁটুটা বেজায় কেটে ফেললে, তার ফলে সকলেরই বেড়ান বন্ধ হল। রাত্রে খুকুকে অনেক গল্প শোনালাম অনেক রাত পর্যন্ত।

আজ সকালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। রায়বাড়ির পাঁচি কাঁদচে, ওর দাদা আশু মাসখানেক হল মারা গিয়েচে, সেই জন্যে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের ধরনে 'ও ভাই রে, বাড়ি এসো', বলে চেঁচিয়ে কাঁদচে। কিন্তু আমার মনে সত্যিই দুঃখ হল ওর জন্যে। পাঁচিকে এ গাঁয়ের সব লোকেই 'দূর, ছাই' করে, সবাই ঘেন্না করে—আজ পাঁচি ওদের সবারই বড় হয়ে গিয়েচে। তবুও তার প্রতি সহানুভূতি নেই কারুর—কান্না শুনে পিসিমা বলচেন, মুখ বেঁকিয়ে—'আহা! মনে পড়েচে বুঝি ভাইকে।'

নৌকা করে বনগাঁয়ে যাচ্চি সকালবেলা। চাল্‌কীর ঘাটে এসেচি—এবার এদিকের গড় ভেঙেচে। কেমন নীল রং-এর একটি পাখী বাবলা গাছে বসে শিস্ দিচ্চে। নৌকোর দুলুনিতে লেখার বড় ব্যাঘাত হচ্চে। নীল কলমীর ফুল, হলদে বড় বড় বন ধুঁধুলের ফুল ফুটেচে। আর এক রকম কি লতায় কুচো কুচো হলদে ফুল ফুটে চালতেপোতার বাঁকে ঝোপের মাঝে আলো করে রেখেচে—সে যে কি অপূর্ব সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! এই ফুলের নাম জানি নে, যেন হলদে নক্ষত্র ফুটে আছে—ছোট ছোট ক্ষুদে ক্ষুদে, যেন নববধূর নাকছাবি। কার্ত্তিকের শেষে এই ফুলটা ফোটে জেনে রাখলাম, আবার আসচে বছর দেখতে আসবো। এতদিন এ ফুল আমার চোখে পড়ে নি। হেমন্তে এত বনের ফুলও ফোটে এদেশে! ঝোপের মাথা আলো করে সবুজ পাতালতার মধ্যে তিৎপল্লার ফুল, ক্ষুদে ক্ষুদে ঐ অজানা ফুল, মাঝে মাঝে বড় বড় বনকলমীর ফুল—কি রূপ ফুটেচে প্রভাতের। কাশফুল তো আছেই মাঝে মাঝে, নদী তীরের কি অপূর্ব শোভা এখন—তা ছাড়া পুষ্পিত সপ্তপর্ণও মাঝে মাঝে যথেষ্ট।

ঐ অজানা ফুলটা মাঝিকে দিয়ে ঝোপ থেকে পাড়িয়ে আনলাম—দশটি করে ছোট ছোট পাপড়ি—ছ'টা করে পরাগ কোষ বা গর্ভকেশর প্রত্যেকটাতে। জলে কচুরীপানার ফুল ফুটেচে, অনেকটা কাঞ্চন ফুলের রং কিন্তু দেখতে বড় চমৎকার—একটা লম্বা সরস সবুজ ডাঁটার থোকা থোকা অনেকগুলো ফুল—ঐ সুন্দর ফুলের জন্তেই কচুরীপানা সৃষ্টির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে—ভগবানের কাছে সুন্দরের সার্থকতা অমর—তার utility-টা গৌণ। মাঝি গল্প করছিল, এবার অনেকে ইছামতীতে মুক্তা পেয়েছে ঝিনুক তুলে। এ সময়ে বক্তেবুড়ো গাছেও শাল মঞ্জরীর মত দেখতে সবুজ রং-এর ফুল ফুটেছে—আর এক প্রকার জলজ ঘাসের নীল ফুল ফুটেচে—এর রং ঠিক তিসির ফুলের মত নীল। এক একটা ছোট গাছের মাথায় ছোট ঝোপে ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে অজানা ফুল ফুটে আলো করচে।

কাল রাত্রে কি একটা কথা মনে এল—তার শব্দ-পরম্পরায় মনে একটা অপূর্ব অনহুভূত ভাবের উদয় হোল। শব্দেরও ক্ষমতা আছে। প্রমথবাবু বলেন, নেই। এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন তর্ক করেছিলাম।

আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ একেবারে নির্মেঘ, নির্মল। দুঃখ হোল এই ভেবে যে আমিও বারাকপুর থেকে এলাম আকাশও গেল পরিষ্কার হয়ে! আজ এই জন্যে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—বারাকপুরে এমন নীল আকাশটা দেখতে পেলাম না! খুকুর গাওয়া সেদিনকার গানটা বার বার মনে আসতে লাগল—

মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর
নমোনমঃ, নমোনমঃ, নমোনমঃ

কাল কলকাতা থেকে এসেছি, বেশ ভাল লাগল আজ সকালে খয়রামারির মাঠ ও বন। বনে সাদা সাদা সেই কুচো ফুল—শীতকালে অজস্র ফোটে এদেশের বনে জঙ্গলে—নদীয়া ও যশোর জেলার সর্বত্র দেখেছি এ সময়ে। কলেজে পড়বার সময় যখন প্রথম প্রথম মামার বাড়ি যেতাম—তখন ভবানীপুরের মাঠের ওদিকের পথ দিয়ে যাবার সময়ে দেখতাম একটা বড়ঝোপে ঐ ফুলটা ফুটে থাকত। কেলো এসেছিল আমার সঙ্গে আমার বাসায়—এক সঙ্গে বাক্স, বিছানা বেঁধে বাসা থেকে রওনা হলাম। অনেকদিন পরে ওকে দেখে মনে বড় আনন্দ পেয়েছি কাল।

বড়দিনের ছুটিতে অনেককাল বারাকপুরে আসিনি—এবার এলাম। শীতের পল্লীপ্রান্তের কি শোভা, তা এতদিন ভুলে ছিলাম। বিকেলে আজ যখন বেলেডাঙ্গা বেড়াতে গেলাম—বনের কোলে সর্বত্র ফুটন্ত ধুর ফুলের প্রাচুর্য ও শোভা দেখে মনে হোল, সেদিন মনি বোসের আড্ডায় যারা বল্‌ছিল যে, বাংলাদেশের বনে ফুল তেমন নেই, তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কতটুকু জানে? ক্রোকাস, মার্গারেট্‌ কি কর্ণফ্লাওয়ার এখানে ফোটে না বটে—কিন্তু যে দিকে চোখ তাকাই, সে দিকেই এই যে প্রস্ফুট নীলাভ শুভ্রবর্ণের ধুর ফুলের অপূর্ব সমাবেশ—এর সৌন্দর্য কম কিসে? কি প্রাচুর্য এই ফুলের—ঝোপের নীচেও যে ফুল— সেখান থেকে থাকে থাকে উঠেচে ঝোপের মাথা পর্যন্ত, আগা গোড়া ভর্তি। এত নীচু ও অত উঁচুতে ও ফুল কি করে গেল তাই ভাবি। ঋতুতে ঋতুতে কত কি ফুল ফোটে আমাদের দেশের বনে ঝোপে, আমার দুঃখ হয় এর সন্ধানও কেউ রাখে না, নাম পর্যন্ত জানে না। অথচ সুন্দরকে যারা ভালবাসে—তারা বাংলার নিভৃত মাঠ বনঝোপের এই অনাদৃত অথচ এই অপূর্ব সুন্দর ফুলকে কখনো ভুলবে না।

বেলেডাঙ্গায় গিয়ে সেক্‌রার দোকানে বসে গল্প করলাম। ছোট্ট খড়ের ঘরে দোকান। বাঁশের বেড়া। ননী সেক্‌রার মেজছেলে বিড়ি বাঁধ্‌চে—তার দোকান ঘরের সামনে একটা নতুন কামারদোকান হয়েচে—সেখানে হাল পোড়াচ্ছে। হালের চারধারে ঘুঁটের গনগনে আগুনে অনেক লোক বসে আগুন পোয়াচ্চে। দোকানের পিছনের বেড়ায় ধুরফুল ফুটে আছে। যেদিকে চাই সে দিকেই এই ফুল—এক জায়গায় মাঠের মধ্যে থাকে থাকে কতদূর

পর্যন্ত উঠেচে এই ফুলের ঝাড়। রাঙা রোদ ও রাঙা সূর্যাস্ত শীতকালের নিজস্ব। এমন অস্ত-আকাশের শোভা অন্য সময় দেখা যায় না।

যুগল বোষ্টমের সঙ্গে দেখা ফিরবার পথে—সে বল্লে তার চলচে না, আমি তার G. T. পড়বার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিনা।

কাল আবার ক্যাম্প টুলটা নিয়ে কুঠীর মাঠের নিভৃত বনঝোপের ধারে গিয়ে বসলুম। ধুরফুল কি অপূর্ব শোভাতেই ফুটেচে। পাখী এত ভালবাসি কিন্তু কাক ছাড়া কল্‌কাতাতে আর কোনো পাখী নেই—এখানে কত কি অজস্র পাখীর কলকাকলি, গাছপালা বন ঝোপের কি সীমারেখা, যেন নৃত্যশীল নটরাজ, ওপারের কাশচরে শিমুলগাছটা দেখা যাচ্চে, নীলাকাশে রৌদ্র ঝলমল করচে। একটা বাব্‌লাগাছের ফাঁক দিয়ে চাইলে কোন অজানা দেশের কথা মনে আনে—শীতের অপরাহ্ণে বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে যে কি সৌন্দর্য ভরে থাকে, চোখে না দেখলে সে বোধহয় নিজেই বিশ্বাস করতুম না। আর দেখলাম এক জায়গায় বসে থাকলে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। ভাল করে সে জায়গায় রস অনেক বেশী পাওয়া যায়—কোথায় লাগে গালুডি, কোথায় লাগে কাশ্মীর, কোথায় লাগে ইটালি—আমার মনে কতটুকু আনন্দ ও চিন্তা সে জাগাতে পারে·এই যদি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষের পরিমাপক হয় —তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি ইছামতী তীরের এই নিভৃত বনঝোপ, ধুরফুল-ফোটা মাঠের, রাঙা রোদমাখা শিমুলগাছের, বনপাখীর এই কলকাকলির অপরূপ সৌন্দর্যের তুলনা নেই। যে পরিদৃশ্যমান আকাশের এক-তৃতীয়াংশে দেড়লক্ষ Super Galaxy আছে এখানে বসে বসে ভেবে দেখলুম—সে সব বড় বিশ্বের মধ্যে কি আছে না আছে জানিনে—তবে এখানে যা আছে, সেখানেও তাই আছে বলে মনে হয়। What is in microcosm is also in macrocosm—সে সব দার্শনিক আলোচনা এখন থাকুক, বর্তমানে এই সুবৃহৎ বিশ্বের এককোণে ধুরফুল-ফোটা বনঝোপের পাশে ক্যাম্পটুলটা পেতে বসে একটু আনন্দ পাচ্চি পাই।

অনেক বেলা গেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। একটু আগে যেতাম, খুকু বসে ছিল, বল্লে, একটু দেরি করুন, আরও বেলা যাক্। খুব জোর পায়ে হেঁটে পৌছে গেলাম বেলেডাঙার সেক্‌রার দোকানে—মধ্যে এই ধুরফুল-ফোটা বিশাল মাঠটা যেন এক দৌড়ে পার হয়ে গেলাম, তারপর ননী সেক্‌রার কত গল্প শুনলাম বসে বসে। তার ন'টা গরু ছিল, আর বছর ফাগুন মাসে একে একে সব কটা মরে গেল গাল-গলা ফুলে। দোকানের সামনে একজন লোক বসে ছাল পোড়াচ্চে আর অত্যন্ত খেলো ও বাজে সিগারেট টানচে। আমি বল্লাম, ও খেয়ো না, ওতে শরীর খারাপ হয়। বল্লে, আমি খাইনে বাবু,এক পয়সায় সে দিন হাটে কিনলাম ছ'টা—তাই এক একটা খাচ্চি।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েচে—কুঠির মাঠে সুঁড়ি জঙ্গলের পথটা অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, পথ দেখা যায় না। নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম আমাদের ঘাটে—ওপারে একটা নক্ষত্র উঠেচে—সেটার দিকে চেয়ে কত কথা যে মনে পড়ল। ঐ super galaxy-দের কথা—বিরাট

space ও নীহারিকাদের কথা—এই বনফুল ও পাখীদের কথা। কতক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—এই নক্ষত্রটার সঙ্গে যেন আমার কোন্ অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েচে—বসে বসে এই শীতের সন্ধ্যায় এই ইছামতীতে কত কি ঘটেছিল পুরোনো দিনে, সে কথা মনে এলো।

গৌরীর কথা মনে এলো—তারপর অন্ধকার খুব ঘন হয়ে এলো। আমি ধীরে ধীরে উঠে বাঁশবনের পথ দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আজ দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আমার সেই পুরোনো জায়গায় বসলাম—সেই সেখান থেকে কুঠীর দেবদারু গাছটা দেখা যায়—কি অপরূপ শোভা যে হয়েচে সেখানে ফুটন্ত ধুরফুলের, তা না দেখলে শুধু লিখে বোঝানো যাবে না। এই যে আমি লিখচি, আমারই মনে থাকবে না অনেকদিন পরে,—ওই ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে যাবে মনের মধ্যে। এরকম হয় আমি জানি—তবুও আজই দেখেচি, তাই নবীন অনুভূতির স্পর্ধায় জোর করে বলছি বনফুলের শোভার এ প্রাচুর্য আমি দেখিনি। বিহারে নেই, সিংভূমে নেই, নাগপুরে নেই—এই বাংলা দেশের sub-tropical বন জঙ্গল ছাড়া গাছপালার এই ভঙ্গি ও ফুলের এই প্রাচুর্য কোথাও সম্ভব নয়। কেন যে লোকে ছুটে যায় বম্বে, দিল্লী, কাশী, দেওঘর তা বলা কঠিন! বাংলাদেশের এই নিভৃত পল্লী-প্রান্তের সৌন্দর্য তারা কখনো দেখেনি—তাই।

আজ বিকেলে টুনি, কাতু, জগা, বুধো এদের সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে বনঝোপের ধারে টুলটা পেতে বসলাম। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে গেল—একটা ফুল-ফোটা ঝোপের ধারে কতক্ষণ বসে রইলাম। তারপর একটা নরম কচি ঘাসে-ভরা জলার ধারে মুক্ত সান্ধ্য হাওয়ায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করলুম কতক্ষণ—আমি এই সবই ভালবাসি, সাধে কি কলকাতা বিষ লাগে। এই শীতকালের সন্ধ্যায় এতক্ষণ ধোঁয়ায় সারা কলকাতা শহর ভরে গিয়েচে—আর এখানে কত ডাহুক, জলপিপি, দোয়েল, শালিকের আনন্দ কাকলি, কত ফুটন্ত বনফুলের মেলা, কি নির্মল শীতের সন্ধ্যার বাতাস, কি রঙীন্ অন্তদিগন্তের রূপ, শিরীষ গাছে কাঁচা সুঁটি ঝুলচে, তিত্তিরাজ গাছে কাঁচা ফলের থোলো দুলচে, জলার ধারে ধারে নীল কলমী ফুল ফুটেচে। মটর শাক, কচি খেঁসারি শাকের শ্যামল সৌন্দর্য—এই আকাশ, এই মাঠ, এই সন্ধ্যার-ওঠা প্রথম তারাটি—জীবনে এরা আমার প্রিয়, এদেরই ভালবাসি, এরাই আবাল্য আমার অতি পরিচিত সাথী—এদের হারিয়ে ফেলেই তো যত কষ্ট পাই!

বিকেলে আজ বেলেডাঙার মরগাঙের আগাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় এক বোঝা পাকাটির ওপর গিয়ে বসে ওবেলার সেই কথাটা চিন্তা করছিলাম—ভগবান তাঁর পূজো না পেলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠেন না—ওঁর পূজোর সঙ্গে ভয়ের কোন সম্পর্ক নেই—তাঁর যে পূজো, সে শুধু প্রেমের ও ভক্তির, এই পাড়াগাঁয়ে এদের সেকথা বোঝানো শক্ত। পূজোর ঘরে বসে আজ ওবেলা যখন শালগ্রাম পূজো করছিলাম, তখনই আমার মনে হোল,

এই ঘরের বদ্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভগবান নেই, তাঁকে আজ বিকেলে খুঁজবো সুন্দরপুরের কিংবা নতিডাঙ্গার বাওড়ের ধারে মাঠে, নীল আকাশের তলায়, অস্ত-বেলায় পাখীদের কলকাকলির মধ্যে। তাই ওখানে গিয়ে বসেছিলাম।

বসে বসে কিন্তু আজমাবাদের কথা মনে এলো। এই পৌষ মাসে ঠিক এই সময়ে আমি সেখানে যেতুম, ঠিক এই বিকেলে রাঙা রোদের আভা মাখানো তিন টাঙার বনের ভেতর দিয়ে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপারে যেতুম ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে—কলাইক্ষেত থেকে কলাইয়ের বোঝা মাথায় মেয়েরা আসতো, গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকা চলে যেত মুঙ্গেরের দিকে, ভীমদাস টোলায় আগুনের চারিধারে বসে গ্রামের লোকে গল্পগুজব করতো। ফিরবার পথে বাঁধের ওপর ওঠবার সময় দেখতুম চারিধারের মাঠ কুয়াসায় ভয়ে গিয়েচে—সেই ছবিগুলো মনে হলো। তার চেয়ে যে আমাদের দেশের ভূমিশ্রী, এই নির্জন শান্তিতে ভরা অপরূপ সুন্দর পল্লীপ্রান্ত, ওই মরগাঙের শুকনো আগাড়ের নতুন কচি ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্চে যে গরুর দল, ওই দূরের বটগাছটা, মাঠের ওপারের বনফুল ফোটা বনঝোপ, এই ডাহুক পাখীর ডাক, গ্রামসীমার বাঁশবন—এসব যে রূপের বিত্তে নিঃস্ব তা নয়, বরং আমার মনে হয় এরা বিহারের সেই বৃক্ষলতা-বিরল প্রান্তরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধির, কিন্তু সেখানে একটা জিনিস ছিল, যা বাংলাদেশের এ অঞ্চলে অন্ততঃ নেই—Space! Wide open Space! দূরবিসর্পী দিগ্বলয়, দূরত্বের অনুভূতি, একটা অদ্ভুত মুক্তির আনন্দ—এ যেমন পেয়েছিলাম ইসমাইলপুরের দিয়ারাতে ও আজমাবাদে—আর কোথাও তা মিলবে না।

আজ খুকু দুপুরে খানিকটা বসে রইল—আমি মাঠে বেড়াতে যাবো বলে গোপালনগরে গেলাম না। মরগাঙের আগাড়ে আজও অনেকক্ষণ গিয়ে বসেছিলাম। বেলেডাঙ্গার পুলের কাছে ফিরবার পথে কি একটা বনফুলের সুগন্ধ বেরুল—খুঁজে বার করে দেখি কাঁটাওয়ালা একটা লতার ফুল। লতাটা আমি চিনি, নাম জানিনে। ননী সেকরার দোকানের কাছেই ঝোপটা। ননী কাদা দিয়ে রূপো গালাবার মুচি গড়চে। ওদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার পরে নদীর ধারে এসে খানিকটা দাঁড়ালাম—ওপারে কালপুরুষ উঠেচে, নীল Rigel-এর আলো নদীর জলে পড়েছে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে ওপারের তারাটার দিকে চেয়ে থাক্‌বার যে আনন্দ, যে অনুভূতি, তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—কারণ অনুভূতির স্বরূপ তাতে বর্ণিত হয় না, অথচ কতকগুলো অর্থহীন কথা দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে অনুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়। এ অব্যক্ত, অবর্ণনীয়।

আজ এই সন্ধ্যাতেই একটা উল্কাপাত দেখলাম—ওপাড়ার ঘাটের মাঝামাঝি আকাশে—প্রথমে দেখা, তারপর নীল ও বেগ্‌নি রং হয়ে গেল জল্‌তে জল্‌তে—জলে ছায়া পড়ল। আমি অমন ধরনের উল্কাপাত দেখিনি!

আজ এখানে বেশ শীত পড়েচে। দুপুরের আগে ফুল-ফোটা মাঠে বেড়াতে যাওয়া

আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। আজ আকাশ কি অদ্ভুত ধরণের নীল! কুঠীর সেই দেবদারু গাছটা, কানাই ডোঙ্গার গাছ, শিরীষ, তিত্তিরাজ কি সুন্দর যে দেখাচ্চে নীল আকাশের পটভূমিতে! মাঝে মাঝে দু' একটা চিল উড়চে বহুদূরের নীল আকাশের পথে! এসব ছবি মনে করে রাখবার জিনিস। কি আনন্দ দেয়, কত অননুভূত ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত করে এরা। প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্জন স্থানে প্রকৃতির এই রূপ মনে নতুন ধরণের অনুভূতি ও চিন্তা এনে দেয়। এ আমি জীবনে কতবার দেখলাম—তার প্রমাণ পাই প্রতি সন্ধ্যায় আজকাল কুঠীর মাঠ থেকে ফিরবার পথে, নিভৃত সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের চরের আকাশে প্রথম-ওঠা দু'চারটা নক্ষত্রের দিকে যখন চেয়ে থাকি তখনই বুঝতে পারি। যে দেবলোকের সংবাদ তখন আমার মনের নিভৃত কন্দরে ঐ রিগেল্ বা অন্য অজানা নক্ষত্র বহন করে আনে সে গহন গভীর উদাত্ত বাণী অমৃতের মত মনকে বৈচিত্র্যময় করে, সাধারণ পৃথিবীর কত উর্দ্ধলোকের আয়তনে মনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় একমুহূর্তে। এ একটা বড় সত্য। বড় বড় সাধক, কবি, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রকর, শিল্পী—যাদের চিন্তা আর ভাব নিয়ে কারবার, এ সত্যটা তাদের অজ্ঞাত নয়। এজন্যেই এমার্সন বলেচেন, "Every literary man should embrace Solitude as a bride." এসম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল গত জুলাই মাসের Adelphi কাগজে বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। নির্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগন্য তারকালোক'। জার্মান মিষ্টিক্ একহার্ট কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না—তাঁর "Our Heart's Brotherhood" গাথাগুলির মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে এ কথার।

ওকথা যাক্। আমি নিজের একটা ভুল আবিষ্কার করেচি, যাকে এতদিন বলে এসেচি ধুরফুল, তার আসল নাম হোল এড়াঞ্চির ফুল। ধুরফুল লতার ফুল বিলবিলেতে ছিল, সাদা বড় বড় ফুল ফুটত—পুঁটি দিদি বলছিল। আজকাল আর দেখা যায় না। শ্যামলতা, ভোমরালতার ফুলও এসময় ফোটে। আগে নাকি আমাদের পাড়ার ঘাটে শ্যামলতার ফুল ফুটে বৈকালের বাতাসকে মধুর অলস গন্ধে ভরিয়ে দিত—আজকাল সে লতাও নেই, সে ফুলও নেই।

কাল সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কুঠীর মাঠে বেড়াতে বেড়াতে রঙীন্ অস্ত-আকাশের দিকে চেয়ে অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে কত বিচিত্র ধরণের গাছপালার সীমারেখা দেখলাম—এদের এখানে যা রূপ, তা এক যদি ভারতবর্ষের মধ্যে মালাবার উপকূলে এবং আসাম ও হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের অধিত্যকায় থাকে—আর কোথাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

ছোট এড়াঞ্চির ফুল সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েচে। কাল যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে বেলেডাঙ্গার গোয়ালপাড়ায় গেলাম—উঁচুনিচু মাটি ও ডাঙা পাশে রেখে, ফুল ফোটা বড় বড় বনঝোপের নীচে দিয়ে—কত কি পাখী বেড়াচ্চে ঝোপের নীচে শুকনো পাতার রাশির ওপরে। কাঁটাওয়ালা সেই সবুজ লতাটায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে—খুকু বল্লে, বনতারা।—নামটি

ভারি সুন্দর, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা গেল না ও কোন লতার কথা বলচে—আর চারিদিকে অজস্রসম্ভারে ঢেলে দেওয়া ছোট এড়াঞ্চির ফুল। বনে, ঝোপে, বাব্‌লাগাছের মাথায়, কুলগাছের ডালে, বেড়ার গায়, ডাঙাতে যে দিকেই চাই সেই দিকে ওই সাদা ফুলের রাশি। আমি বাংলায়ও বনের এমন রূপ আর কখনো দেখিনি। যদি জ্যোৎস্না রাত্রে এই রূপ দেখতে পেতাম!

এ ক'দিন ছিলাম কল্‌কাতায়। ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির প্রদর্শনীতে এবার নন্দলাল বসুর দু'খানি বড় সুন্দর ছবি দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। খুকু ও জাহ্নবীর মেয়ে খুকী সঙ্গে ছিল—তারাও দেখেছে, তবে নন্দবাবুর ছবির তারা কি বুঝবে? ওদের দেখালুম বায়োস্কোপ, জু, সার্কাস্—আর এখানে ওখানে নিয়ে বেড়ালুম। একদিন সজনীদাসের বাড়ি, একদিন নীরদের বাড়ি, একদিন নীরদ দাসগুপ্তের ওখানে। দুঃখ হোল যে এখানে এসময়ে সুপ্রভা নেই।

কাল নৌকায় বনগাঁ থেকে এলাম। কি অদ্ভুত রূপ দেখলাম সন্ধ্যায় নদীর। শীতও খুব, অন্ধকার হয়ে গেল। কল্‌কাতার হৈ চৈ-এর পরে এই শান্ত সন্ধ্যা, ফুল-ফোটা বন, মাঠ, কালো নিথর নদীজল মনের সমস্ত সংকীর্ণ অবসাদ দূর করে দিয়েছে। চালতেপোতার বাঁকে বনের মাথায় প্রথম একটি তারা উঠেছে—কত দূর দেশের সংবাদ আলোর পাখায় বহন করে আনচে আমাদের এই ক্ষুদ্র, গ্রাম্য নদীর চরে—আমার মনের নিভৃত কোণে।

ঘাটে যখন নামলুম, তখন খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। খুকু ও আমি জিনিসপত্র নিয়ে বাঁশবনের অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে বাড়ি এলুম, খুকু তো একবার ভয়ে চীৎকার করে উঠল কি দেখে। ভয়ের কারণ এই যে, এসময়ে আমাদের দেশে বাঘের ভয় হয়।

দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে কুঠীর এদিকে বনের মধ্যে সেই যে ঢিবিটা আছে, সেখানে খানিকটা বসলুম—তারই পরে একটা নাবাল জমি, আর ওপারে সেই বটগাছটা। আকাশ কি অদ্ভুত নীল! ছোট এড়াঞ্চির ফুল এখনও ঠিক সেই রকমই আছে—ক'দিন আগে যা দেখে গিয়েচি, সে সৌন্দর্য এখনও ম্লান হয় নি। প্রায় পনেরো দিন ধরে এর সৌন্দর্য সমান ভাবে রয়েচে, এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি এ বড় আশ্চর্যের কথা। এমন কোনো বনের ফুলের কথা আমার জানা নেই, যা ফুটন্ত অবস্থায় এতদিন থাকে। বালজ্যাকের গল্পটা (Atheists Mass) তখনই পড়ে সবে বেড়াতে গিয়েচি, আকাশ যেন আরও নীল দেখাচ্ছিল, বনফুল-ফোটা ঝোপ আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। নাইতে গিয়ে বাঁশতলার ঘাট পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে এলাম।

বিকেলে ক্যাম্প-টুলটা নিয়ে গিয়ে কুঠীর সেই ঢিবিটাতেই অনেকক্ষণ বসে রইলুম—রোদ রাঙা হয়ে গেল, ওপারের। শিমুলগাছটার মাথার ওপর উঠে গেল, তখনও আমি চুপ করে বসেই আছি। (কি ভয়ানক শীত পড়েচে এবার, এই যে লিখচি আঙুল যেন অবশ হয়ে আসচে।) আমার সামনে পেছনে ফুল-ফোটা সেই ঝোপ বন, পাশেই নদী। একবার

ভাবলুম বেলেডাঙ্গায় যাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে পারা গেল না এই সৌন্দর্যভূমি ছেড়ে।

নির্জন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মত নদীতীরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর পারের দ্যুতিলোকের দিকে চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ওপারের চরের ওপরে উঠেচে কালপুরুষ, তারপর এখানে ওখানে ছড়ানো দু'চার দশটা তারা। এই নিভৃত সন্ধ্যার আনন্দ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক—আমি দেখচি কুঠীর মাঠের যে আনন্দ তার প্রকৃতি Æsthetic, কিন্তু এই জনহীন নদীতীরে কুঁচঝোপ, বাঁশবন, ওপারের খড়ের মাঠ, এদের সবার ওপরকার ওই দ্যুতিলোক যে বাণী প্রাণে এনে পৌছে দেয়, তা বিশ্বলোকের এবং অন্তরলোকের যিনি অদৃশ্য অধিদেবতা, তাঁর বাণী—আজকাল যেন তার প্রকৃতি একটু একটু বুঝতে পারি। আর আসলে বুঝতে ওইটুকু পারি বলেই তো তা আমার কাছে বাণী এবং পরম সত্য, নইলে তো মিথ্যে হোত। যা ধরতে পারিনে, বুঝতে পারিনে, আমার কাছে তা ব্যর্থ।

কাল দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে অনেকগুলি ভাল ভাল ফরাসী গল্প পড়লাম। তারপর স্নানের পূর্বে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। যে জায়গাটাতে অনেকদিন যাইনি—সেই চারিদিক বনে ঘেরা ধুরফুল-ফোটা ঝোপের বেড়া দেওয়া মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। শীতের দুপুরে নীল আকাশের রূপ, আর সূর্যাস্তের রূপ—এদের অন্য কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। শীতকালে ইসমাইলপুর আর আজমাবাদের দিগন্তব্যাপী মাঠের প্রান্তে রাঙা সূর্যাস্ত দেখে ভাবতাম এ বুঝি বিহারের চরের নিজস্ব সম্পত্তি—কিন্তু এবার দেখলাম বাংলাদেশেও অমনি রক্তাভ অন্তদিগন্ত স্বমহিমায় প্রকাশ পায়। আজ বিকালেও সূর্যাস্তের শোভা দেখবার জন্যে কুঠীর মাঠে গিয়ে এক জায়গায় কটা রোদ-পোড়া ঘাসের ওপর গায়ের আলোয়ানখানা বিছিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ডাইনে একটা বাব্‌লাগাছের শুক্‌নো মগ্‌ডালে অনেক পাখী এসে বসে যেন নামজাদা চীনে চিত্রকরের একটা ছবি তৈরী করেচে। সামনের বনঝোপ, কুঠীর শিরীষ গাছে রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, নীল আকাশের কি রূপ! বারাকপুরে আর হয়তো কখনো আসবো না—কুঠীর মাঠ আর দেখবো কি না কি জানি? আজকার এই অপরাহ্ন যেন চিরদিন মনে থাকে—এর সুখ, আনন্দ ও এর দুঃখ। মাঠ থেকে উঠে গেলাম গঙ্গাচরণের দোকানে—সেখানে সবাই বসে দেশবিদেশের গল্প করচে। অশ্বিনী যাত্রা-দলের বাজিয়ে, এখানেই ঘর বেঁধে বাস করে। তার বাড়ি পূর্ণ গোঁসাই বলে একটা লোক এসেছিল—সে এখানে এসে গল্প করে গিয়েচে যে, সে বিলেত ঘুরে এসেচে। প্রমাণস্বরূপ বলেচে কোথায় নাকি প্রকাণ্ড পিতলের মূর্তি সে দেখেচে—এ দ্বীপে একখানা পা, আর একটা দ্বীপে আর একখানা পা—তার তলা দিয়ে সে জাহাজে ক'রে গিয়েচে। এ একটা অকাট্য প্রমাণ অবিশ্যি যে, সে লোকটা বিলেতে গিয়েছিল।

আজই যাবার কথা ছিল কিন্তু খুকু বল্লে আজ থাকুন। গত শনিবারে খুকুদের বাড়ি বারাকপুরে গিয়েছিলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল পৈঠেতে আসার সময়। সকালে গোঁসাই

বাড়ির পাঠশালা Examine করতে গেলাম। বোষ্টম বুড়ীর বাড়ির সামনে বড় বটগাছের তলায় যুগল বসে কথা বলচে একজন বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে। বৃদ্ধ বলচে, 'আমাদের দিন পার হয়ে গিয়েচে, বেলা চারটে, এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পথ দেখাও, পথ দেখাও।' কথাটা আমার বড় ভাল লাগল। দুপুরে আটির ধারে মাঠে যেমন রোজ বেড়াতে যাই, আজও গেলাম। দুপুরের আকাশ যেমন নীল, অপরূপ নীল—এমন কিন্তু অন্য কোনো সময়ে পাইনি। দুপুরের পরে খুকু এসে অনেকক্ষণ ছিল। তাই দুপুরে কিছু লেখা হয়ে উঠল না। বিকেলে আমি গিয়ে কুঠীর মাঠে একটা নিভৃত স্থানে গায়ের আলোয়ানখানা ঘাসের ওপর বিছিয়ে তার ওপর চুপ করে বসে রইলাম। এতে যে আমি কি আনন্দ পাই! একটা অনুভূতি হোল আজ, ঠিক সেই সময় রাঙা রোদ ভরা আকাশের নিচের গাছপালার আঁকা-বাঁকা শীর্ষদেশ লক্ষ্য করতে করতে।

সকালে উঠে নৌকাতে আবার বনগাঁয়ে যাচ্চি। জলের ধারে ধারে মাছরাঙা পাখী বসে আছে নলবনে। কাঁটাকুমুরে লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরচে। তবে ফুলের শোভা নেই, গন্ধই যা আছে।

বড়দিনের ছুটি শেষ হোল। আবার কল্‌কাতায় ফিরতে হবে। কে জানে, কবে আবার দেশে ফিরতে পারব!

অভিযাত্রিক

আজ চোদ্দ পনেরো বছর আগের কথা। কি তারও বেশি হবে হয়তো। আমার বন্ধু রমেশবাবু আর আমি দুজনে কলকাতার মেসে একঘেয়ে পড়ে আছি বহুদিন। ভালো লাগে না এ রকম কলকাতায় পড়ে থাকা।

দেশেও তখন যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ছিল। কিন্তু একটু বাইরে না বেরুলে ধুলো আর ধোঁয়ায় প্রাণ তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

রমেশবাবুকে বললুম—চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি।

রমেশবাবুর ট্যাঁকের অবস্থাও খুব ভালো নয় আমার চেয়ে। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে বললেন—বেড়াতে যাবো কিন্তু হাতে টাকাকড়ি কই—

—টাকাকড়ি লাগবে না—

—বিনা টিকিটে গিয়ে জেল খাটবো নাকি ?

—রেলে চড়ে নয়, পায়ে হেঁটে—

—কতদূর যাবেন পায়ে হেঁটে ?

তাঁকে বুঝিয়ে বললুম—বেশিদূর মোটেই নয়। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বার হয়ে পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায়। কি করবো যখন হাতে পয়সা নেই, সময়ও নেই, এ ছাড়া তখন উপায় কি ? তিনি কি মনে করে রাজি হয়ে গেলেন।

হাঁটতে হাঁটতে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা বাগানবাড়িতে আমরা কিছুক্ষণ বসি। বাগানের উড়ে মালী এসে আমাদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করে গেল। তাকে দিয়ে আমরা বাগানের গাছ থেকে ভালো কাশীর পেয়ারা পাড়িয়ে আনলুম। সে ডাব পেড়ে দেওয়ারও প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু তাতে দেরি হবে বলে আমরা রাজি হইনি।

ডানদিকের একটা পথ ধরে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে দিলুম। অনেকদিন পরে কলকাতা থেকে বার হয়েচি—কতদূর আর এসেচি, না হয় মাইল পাঁচ ছয় হবে—কিন্তু যেন মনে হচ্চে কতদূর এসে গিয়েচি কলকাতা থেকে—স্বপ্নপুরীর দ্বারে এসে পৌঁছে গিয়েচি যেন। প্রত্যেক বন ঝোপ যেন অপূর্ব, প্রত্যিটি পাখীর ডাক অপূর্ব, ডোবার জলে এক আধটা লালফুল তাও অপূর্ব।

জীবনে একটা সত্য আবিষ্কার করেচি অভিজ্ঞতার ফলে। যে কখনো কোথাও বার হবার সুযোগ পায়নি, সে যদি কালে ভদ্রে একটু-আধটু বাইরে বেরুবার সুযোগ পায়—যতটুকুই সে যাক না কেন, ততটুকুই গিয়েই সে যা আনন্দ পাবে—একজন অর্থ ও বিত্তশালী Blasé ভ্রমণকারী হাজার মাইল ঘুরে তার চেয়ে বেশি কিছু আনন্দ পাবে না। কাজেই আমার সেদিনকার ভ্রমণটা এদিক থেকে দেখতে গেলে তুচ্ছ তো নয়ই—বরং আমার জীবনের মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান সেদিনটির আনন্দ। কারণ, আসলে দেখে চোখ আর মন।

যখন ওই ছুটি ইন্দ্রিয় বহুদিন বুভুক্ষু, তখন যে কোনো মুক্ত স্থান, সামান্য একটা বাঁশঝাড়, একটি হয়তো ধানের মরাইওয়ালা গৃহস্থবাড়ি, আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য নদী, কোথাও একটা বনের পাখীর ডাক—মধুর, স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

পয়সা যাদের আছে, খুব ঘুরে বেড়াতে পারে তারা—ভালো কথাই, কিন্তু Blasé হবার ভয়ও যথেষ্ট। তখন ভীম নাগের সন্দেশও মুখে রোচে না।

পরবর্তী কালে জীবনে অনেক বেড়িয়েচি, এখনও বেড়াই—পাকা Blasé টাইপ অনেক দেখেচি, যথাস্থানে তাদের গল্প করবো।

সেদিনকার প্রভাতের নবীন আলোয় মুখ চিনে Blasé কারা তা ভাববার অবকাশ মাত্র পাইনি—সোজা চলেছিলুম ছুই বন্ধুতে পথ বেয়ে ঘর থেকে বার হবার আনন্দে বিভোর হয়ে।

হঠাৎ একটা গ্রামের পথে উপস্থিত হয়ে গিয়েচি কোন্ সময়, খেয়াল করিনি—সে পথের একদিকে খুব উঁচু লম্বা একটা পাঁচিল। একজন লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিগ্যেস করতে সে বললে, ওটা চাঁদমারির পাঁচিল।

—কোথায় চাঁদমারি ?

—পাশেই মশাই। সোলজারেরা বন্দুক প্র্যাকটিস—

—বুঝেচি—তা এখন করচে না তো ?

—করলেই বা কি। পাঁচিল তো দিয়ে রেখেচে।

—সাম্‌নে ওটা কি গাঁ ?

—নিমৃতে।

কিন্তু নিমৃতে গ্রামে ঢুকবার পূর্বে একটা বাঁশবাগান দেখে বড় ভালো লাগলো। খুব বড় বাঁশবন, অজস্র শুকনো বাঁশপাতা ছড়িয়ে আছে—পা দিয়ে মচ্‌কে যাবার সময় কেমন সুন্দর শব্দ হয়, শুকনো পায়ে-দলা বাঁশপাতার গন্ধ বার হয়, মাথার উপর পাখী ডাকে, সূর্য আলো-ছায়ার জাল বোনে বাঁশগাছের ডালে, পাতায়, তলাকার মাটির ওপর।

সেই বাঁশবনে এক রকমের গাছ দেখলুম। শুধুই একটা করে লম্বা ডাঁটা। তার আগার একটা আফোটা বড় কুঁড়ির মতো ব্যাপারের মধ্যে অনেকগুলো ছোট মটরের মতো দানা। গাছের গায়ে হাত দিলে হাত চুলকোয়।

কি ভালোই লেগেছিল সেই গাছগুলো সেদিন! বাঁশবনের ছায়ায় বনকচু-জাতীয় উদ্ভিদ যেন অমৃতফল প্রসব করেচে।

ছায়া ঘন হয়ে আসচে—বিকেল নেমেচে। বাঁশবন পার হয়ে একটা মাঠে আমরা বসলুম। বন্যফুল ও অন্যান্য লতাপাতার ঝোপ মাঠের ধারে সর্বত্র। ঝোপের মাথায় মাথায় লতাপাতায় আলোকলতার জাল। দূরে ছু'একটা পুরানো কোঠাবাড়ি দেখা গেল। একটা বাড়ির ছাদে একটি পল্লীবধূ চুল শুকোতে বসেচে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সামনের মাঠে হা-ডু-ডু খেলচে।

মাঠ থেকে উঠে নিমৃতে গ্রামের শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলাম আমরা। সেখানে মুচি

বাউরিরা বাস করে, তাদের একটা ছোট পাড়া। কিন্তু এরা সকলেই নিকটবর্তী কলে কাজ করে, শহর এসেচে গ্রামের পাশে, শহরের সভ্যতা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী গ্রামের শান্ত গৃহ-কোণে এনে দিয়েচে ব্যস্ততা কোলাহল ও শৌখিনতার মোহ।

একজন বললে—কাছেই পাষাণকালী মন্দির, দেখবেন না? নিমৃতের পাষাণকালী জাগ্রত দেবতা—ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহটি ভাল চোখে পড়ে না, বড় অন্ধকার ভেতরটাতে। মন্দিরের সামনে একটা পানাভরা পুকুর। পুকুরের ওপারে বাউরিদের ঘাটে বাউরিদের ঝি-বৌয়েরা জল নিতে নেমেচে।

কিছুক্ষণ বাঁধা ঘাটে বসে থাকবার পরে একটি ছোট ছেলে এসে বললে—বাবা আপনাদের ডাকচেন—আসুন আপনারা—

আমরা একটু আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে গেলুম। ইটের দেওয়াল দেওয়া একখানি খড়ের ঘর। দারিদ্র্যের ছায়া সে বাড়ির সারা অঙ্গে। বাড়ির মালিক হলেন ওই পাষাণকালীর পূজারী—তিনিই আমাদের ডেকেচেন তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে।

অনেকদিনের কথা। পূজারী ঠাকুরের বয়েস বা চেহারা আমার মনে নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কোথা থেকে আসচেন?

—কলকাতা থেকে।

—আপনারা?

—আমি ব্রাহ্মণ, আমার এই বন্ধুটি কায়স্থ।

—পূজো দেবেন মায়ের?

আমার মনে হল এখানে দিলে ভালো হয়। লোকটা গরিব, দিলে ওর উপকার করা হয় বটে।

ইতিমধ্যে দেখি একটি বৌ, সম্ভবত পূজারী ব্রাহ্মণটির স্ত্রী, দুখানা আসন আমাদের জন্যে বিছিয়ে দিয়ে গেল। আমার বাস্তবিক কষ্ট হতে লাগলো—এরা ভেবেচে কলকাতা থেকে পয়সাওয়ালা বাবুরা এসেচে—ভালো ভাবেই পূজো দেবে—দু পয়সা আসবে।

কলকাতার বাবু যে দুটি পয়সা অভাবে হেঁটে সারাপথ এসেছে—সে খবর এরা রাখে না। রমেশবাবু পকেট থেকে দুটি পয়সা বার করলেন, আমার পকেট থেকে বেরুলো একটা পয়সা। পূজারী ঠাকুর বেশি কিছু আশা করেছিলেন, তা হল না, তবুও দুটি নারকেলের নাড়ু প্রসাদ দিলেন আমাদের হাতে।

সন্ধ্যা হয়েচে, বাঁশবাগানের তলায় অন্ধকার বেশ ঘন।

আমরা বেলঘরিয়া স্টেশনে এসে কলকাতার গাড়ি ধরলুম।

•

আমার বন্ধু নীরদ আমার সঙ্গেই মেসে থাকে।

দুজনেরই অবস্থা সমান। কলকাতা থেকে বেরুনো হয়নি কোথাও অনেকদিন।

নীরদ বললে—চল, কোথাও রেলে বেড়িয়ে আসি—

রেলে কোথায় যাওয়া যায় বেশ ভেবেচিন্তে দেখলুম। দূরে কোথাও যাওয়া চলবে না, তত পয়সা নেই হাতে। সুতরাং আমি পরামর্শ দিলাম, মার্টিনের ছোট রেলে চলো কোথাও যাওয়া যাক। সে বেশ নতুন জিনিস হবে এখন।

হাওড়া ময়দান স্টেশনে ছোট লাইনে চেপে আমরা জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে রওনা হলুম।

দুধারে যখন পড়লো ফাঁকা মাঠ আর বাঁশবন, আমবন—আমাদের মন যেন মুক্তির আনন্দে নেচে উঠলো।

বেলা তিনটের সময় আমরা নামলুম গিয়ে জাঙ্গিপাড়া। দুজনে গ্রামের মধ্যে ঢুকলুম—বড় বড় বাঁশবন ঝোপঝাড় আর ছোটবড় পানাপুকুর চারিধারে।

বেলা তিনটের মধ্যে এমন ছায়া নেমে এসেচে যেন এখনি সন্ধ্যা হবে হবে। আমরা একটা ময়রার দোকানে বসলুম—ময়রার সম্বল কালো দড়ির জালের পেছনে কলঙ্ক-ধরা পেতলের থালায় সাজানো চিনির ডেলা সন্দেশ, তেলে ভাজা বাসি জিলিপি, কুচো গজা, চিঁড়ে মুড়কি আর বাতাসা।

কলকাতার বাবু দেখে ময়রা খাতির করে বসালে। নীরদ ইংরিজিতে বললে—যেরকম খাতির করলে এরপর নিতান্ত মুড়কি তো কেনা যায় না—উপায় কি?

—এসো একটু চাল দেয়া যাক—তুমিই আরম্ভ করো।

ময়রাকে ডেকে নীরদ বললে—ওহে, ভালো সন্দেশ আছে?

ময়রা করুণদৃষ্টিতে চিনির ডেলা সন্দেশের থালার দিকে চেয়ে বললে—আজ্ঞে খুব ভালো হবে না। একটু চিনি বেশি হবে—আপনাদের তা দেওয়া যায় না।

আমি চুপি চুপি বললুম—ময়রা আমাদের কি ভেবেচে হে? দুজনের পকেট এক করলে খাবার খাওয়ার বাজেট কত?

নীরদ উত্তর দিলে—সাত পয়সা। তার মধ্যে একটা পয়সা পান খাওয়ার জন্যে রাখো—ছ'পয়সা।

আমি তখন তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম—চিঁড়ে মুড়কিই দাও তবে ছ'পয়সার, ও বরং ভালো, এসব জায়গায় বাজে ঘি তেল—

খেতে খেতে ময়রাকে জিজ্ঞেস করা গেল, তোমাদের এখানে এত ডোবা আর জঙ্গল, ম্যালেরিয়া আছে নাকি?

ময়রা আমাদের জন্যে তামাক সাজতে সাজতে বললে—ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন গেল সব বাবু, আর আপনি বলেন আছে নাকি? ভেতরে ঢুকে দেখুন কি অবস্থা গাঁয়ের।

বেলা পড়ে এলে আমরা গ্রামের মধ্যে ঢুকলুম। বাংলার ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত দরিদ্র গ্রামের এমন একখানি ছবি সেই আসন্ন হেমন্তসন্ধ্যায় সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, যা চিরদিন আমার মনে আঁকা রয়ে গেল। ছবি নিরাশার, দুঃখের, অপরিসীম নিঃসঙ্গতার ও একান্ত দারিদ্র্যের।

সেই বনজঙ্গলে ভরা গ্রামখানির ওপর ধ্বংসের দেবতা যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর করাল কালো ডানার ছায়ায় সারা গ্রাম অন্ধকার।

আমাদের মন কেমন দমে গেল—যেন এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। একটা ডোবার ধারে জনৈকা গ্রাম্যবধূকে বাসন মাজতে দেখলুম। পথের ধারে অন্ধকার পুকুরটা—সরু হাতদুটি ঘুরিয়ে মেয়েটি বাসন মাজচে, পরনে মলিন কাপড়, অথচ গায়ের রং দেখে মনে হয় সে উচ্চবর্ণের গৃহস্থের কুলবধূ। বাংলার মেয়েদের শত কষ্টের কথা মনে পড়ে গেল ওকে দেখে—বাংলার সমস্ত নিপীড়িতা অভাগিনী বধূদের ও যেন প্রতিনিধি।

এক জায়গায় একটা পাঠশালা বসেচে। তার একদিকে শিবমন্দির। পাঠশালার ছেলেরা ছুটির আগে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে নামতা পড়চে। একটা ছেলেও স্বাস্থ্যবান নয়, প্রত্যেকের মুখ হলদে, পেট মোটা—কারো গায়ে মলিন উড়ানি, কারো গায়ে ছেঁড়া জামা—প্রায় কারো পায়ে জুতো নেই।

আমরা দাঁড়িয়ে দেখচি দেখে গুরুমশায় নিজে এগিয়ে এসে বললেন—আপনারা কোথেকে আসচেন?

—বেড়াতে এসেচি কলকাতা থেকে।

তিনি খুব আগ্রহের স্বরে বললেন, আসুন না, বসুন, এই বেঞ্চি রয়েচে—

নীরদের বসবার তত ইচ্ছে ছিল না হয়তো—কিন্তু আমার বড় ভালো লাগলো এই গুরু-মশায়টি ও তাঁর দরিদ্র পাঠশালা।

কি জানি, হয়তো আমার বাল্যের সঙ্গে এখানে কোন একটি গ্রাম্য পাঠশালার সম্পর্ক ছিল বলেই। নীরদকে টেনে নিয়ে এসে বসালুম পাঠশালার বেঞ্চিতে।

গুরুমশায়ের বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল প্রায় সব সাদা, শীর্ণ চেহারা। পরনে আধময়লা ধুতি আর গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। তিনি বসেচেন একখানা হাতলহীন চেয়ারে, চেয়ারখানার পিঠটা বেতের কিন্তু বসবার আসনটা কাঠের। মনে হয় সেটাও এক সময়ে বেতেরই ছিল, ছিঁড়ে যাওয়াতে সোজাসুজি কাঠের করে নেওয়া হয়েচে, হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে।

সেদিন ভারি আনন্দ পেয়েছিলুম এই পাঠশালায় বসে।

আমরা বললুম—আপনার পাঠশালায় কত ছেলে?

—আজ্ঞে ত্রিশজন, তবে সবাই আসে না—জনকুড়ি আসে।

—ছেলেদের মাইনে কত?

—চার আনা, আর ছ'আনা—তা কি সবাই ঠিকমত দেয়? তা হলে আর ভাবনা কি বলুন। গভর্নমেণ্টের মাসিক সাহায্য আছে পাঁচ সিকে, তাই ভরসা।

মাসে পাঁচসিকে আয়ের ভরসা কি সেটা ভালো বুঝতে না পেরে আমরা গুরুমশায়ের মুখের দিকে চাইলাম। কিন্তু লোকটা মনে হল তাতেই দিব্যি খুশী—যেন ও জীবনে বেশ একটু পাকাপোক্ত আয়ের দৃঢ় ভিত্তির ওপর বসে আছে নিশ্চিন্ত মনে।

আমি বললুম—আপনার বাড়িতে ছেলেপুলে কি?

গুরুমশায় হেসে বললেন—তা মা ষষ্ঠীর বেশ কৃপা। সাতটি ছেলেমেয়ে—দুটি মেয়ে

বিয়ের উপযুক্ত হয়েচে, বিয়ে না দিলেই নয়। তবুও তো একটি আর বছর ম্যালেরিয়া জ্বরে—সতেরো বছরের হয়েছিল—

বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ কাহিনী। আমরা সেখান থেকে উঠলুম, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে। গুরুমশায় কিন্তু আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না, বললেন—চলুন, আপনাদের গাঁ দেখিয়ে আনি। একটা ছোট্ট মাঠ পেরিয়ে গুরুমশায়ের ঘর। ইটের দেওয়াল, টিনের চালা। বেশ বড় উঠোন, তবে ঘরদোরের অবস্থা খুব ভালো নয়। উঠোনে পা দিয়ে গুরুমশায় বললেন—ওরে হাবু, বাইরে মাদুরটা পেতে দে।

আমরা বললুম—আবার মাদুর কেন, আমরা বসবো না আর।

—না না, তা কখনো হয়? এলেন গরিবের বাড়ি, একটু কিছু মুখে না দিলে—একটু চা।

—ওসব আবার কি, গাঁ দেখাতে নিয়ে বেরুলেন, ওসব কথা তো ছিল না?

আমাদের কোন কথাই শুনলেন না তিনি। মাদুর এল, বসালেনও আমাদের। গুরুমশায় বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

একটু পরে তিনি আবার তামাক সেজে এনে আমাদের হাতে দিতে গেলেন এবং আমরা কেউ তামাক খাইনে শুনে দুঃখিত হলেন। আমরা বললুম—আপনাদের গাঁয়ের ময়রাও ওই ভুল করেছিল, সেও তামাক সাজছিল আমাদের জন্যে।

একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে এই সময় একখানা থালাতে প্রায় আধ কাঠাখানেক মুড়ি, একটা ছোট বাটিতে পোয়াটাক আখের গুড়, অনেকখানি নারকেল কোরা নিয়ে এল। গুরুমশায় বললেন—এই এঁদের সামনে রাখ মা—এই আমার ছোট মেয়ে, এই চোদ্দ হল, এর ওপরে দুই দিদি—যা, চায়ের কতদূর হল দেখ গে—না না ও হবে না—একটু মুখে দিতেই হবে—গরিবের বাড়ি, আপনাদের উপযুক্ত নয়—পাড়াগাঁ জায়গা।

তখন নীরদ মুড়ি নারকেল কোরার বৈজ্ঞানিক ভিটামিনতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, এমন চমৎকার পুষ্টিকর জলযোগ বহুদিন আমাদের অদৃষ্টে জোটেনি। মেয়েটি আবার চা নিয়ে এল।

—এইখানে রাখ মা, হয়ে গেলে অমনি দুটি পান আনবি—আর দুটি মুড়ি···?

—আজ্ঞে না, এই খেয়ে ওঠা দায়, এ কি কম দেওয়া হয়েচে?

জলযোগ সবে শেষ হল। মেয়েটি কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল এতক্ষণ। গুরুমশায় বললেন—এর নাম কমলা—এইটি মেয়েদের মধ্যে খুব বুদ্ধিমতী। বাংলা যে কোনো বই পড়তে পারে, এর দিদিরা লেখাপড়া জানে না—পড়াশুনোর ঝোঁক খুব এর—কেবল বই পড়তে চাইবে, তা আমি কোথা থেকে নিত্যি নতুন বই দিই বলুন।

আমার হাতে একখানা কি মাসিকপত্র ছিল, ট্রেনে পড়বার জন্যে এনেছিলুম—মেয়েটিকে ডেকে সেখানা তার হাতে দিয়ে বললুম—এখানা প'ড়ো তুমি। নীরদ পিতাপুত্রীর অলক্ষিতে আমার গায়ে একবার চিমটি কাটলে। আমার তখন বয়স তেইশের বেশি নয়—মেয়েটি চৌদ্দ বছরের।

মেয়েটি আমার হাত থেকে সেখানা নিয়ে নম্রমুখে একটু হাসলে। তারপর আমাদের থালা ও কাপগুলি নিয়ে চলে গেল।

গুরুমশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—বইখানা দিয়ে দিলেন? বেশ ভালো নতুন বইখানা—অমন বই ও পেয়ে বড় খুশী হয়েচে। এ গাঁয়ে ওসব কে দেবে বলুন।

আমরা গুরুমশায়ের বাড়ি থেকে যখন বার হয়ে পথে পড়লুম তখন বেশ অন্ধকার হয়েচে, বাড়ির সামনে বাতাবী লেবু গাছের ডালে জোনাকি জলচে। গুরুমশায় বললেন—চলুন আপনাদের এগিয়ে দিই। ট্রেনের এখনো দেরি আছে—সাড়ে আটটায়—আমাদের আড্ডাটা দেখে যাবেন না একবার?

কলকাতায় ক্লাব আছে, সিনেমা আছে, ফুটবল আছে, এখানে লোকে অবসর সময় কি করে কাটায় জানবার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি ছিল আমার।

একটা নীচু চালাঘরের সামনে গিয়ে গুরুমশায় বললেন—দেখবেন নাকি? আসুন না?

ঘরের মাটির মেঝেতে আগাগোড়া মাদুর পাতা। জন চারেক লোক বসে আছে মাদুরের ওপর, একজন হুঁকোতে তামাক টানচে। আর তিন জন লোক একেবারে চুপচাপ বসে। আশ্চর্য এই যে, এরা কথাবার্তা বলতে এসে এমনধারা চুপচাপ বসে আছে!

একজন আমার দিকে চেয়ে বললে—কোত্থেকে আসা হচ্চে?

গুরুমশায় বললেন—ওঁরা কলকাতা থেকে এসেচেন আমাদের দেশ দেখতে, তাই আমার ওখানে—

—বেশ বেশ, বসুন। তামাক চলে? চলে না। তা বেশ—

কথাবার্তার ইতি। এ মজলিসে কেউ কথা বলে না দেখচি। আরও তিন চার জন লোক ঢুকলো—একজন বললে—তেঁতুল কি দর বিক্রি করলে চক্কত্তি?

যে লোকটি হুঁকো টানছিল, সে উত্তর দিলে—বিক্রি করিনি। সাড়ে সাতটাকা পর্যন্ত উঠলো, আর উঠলো না। সামনের হাটে আবার দেখি—

বেশ লাগলো ওদের এই গ্রাম্য কথা। কথাও যদি বলে তো বেশ লাগে। এ যেন কাশ্মীর ভ্রমণের চেয়েও কৌতূহলপ্রদ; যদিও কখনো কাশ্মীর ভ্রমণ করিনি, বলতে পারিনে তার আনন্দ কি ধরনের। আর একজন বললে—আর একবার কুতুবপুরে যাই, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ জুটেচে—পাত্র কুতুবপুরের কাছারিতে নায়েবি করে—

—কুতুবপুরেব নায়েব? হাঁ হাঁ, দেখে এসো, বেশ ছেলেটি, বয়েস বেশি না—

এই সময় একজন ঘরে ঢুকে সকলের সামনে কলার পাতায় মোড়া কি একটা জিনিস রাখলে। সবাই ঝুঁকে পড়লো। এসো হরিশ,—কি, কি হে এতে?

আগন্তুক লোকটি হাসিমুখে বললে—খাও না, ছাখো না কি। বাড়ির গাছে কৎবেল পেকেছিল, তারই আচার—বলি, যাই আড্ডার জন্যে একটু নিয়ে যাই—

সকলেই ঝুঁকে পড়লো কলার পাতার ওপর। আমাদের হাতেও ওরা একটু তুলে দিলে জিনিসটা। আমাদের কোন আপত্তি টিকলো না।

বেশ আড্ডা। খুব ভালো লাগলো আমার। আমি ভাবলুম, কাছে, মাঝে এক আধ শনিবার কলকাতা থেকে এখানে এসে এই আড্ডায় যোগ দিয়ে গেলে কলকাতা বাসের একঘেয়েমিটা কেটে যায়। কলকাতায় ফেরবার ট্রেনের সময় প্রায় হল। আমরা ওদের সকলের কাছে বিদায় নিলাম। গুরুমশায়টি সত্যিই বড় ভদ্র, তিনি উঠে এলেন আমাদের সঙ্গে আমাদের স্টেশনের রাস্তায় তুলে দিতে।

—আসবেন আবার—কেমন তো ? বড় কষ্ট হল আপনাদের—

—কি আর কষ্ট—খুব আনন্দ পেয়েচি। আমি তাহলে—

খানিকটা চলে এসেচি—দেখি গুরুমশায় পেছন থেকে আবার ডাকচেন। নীরদ বললে —ছাতি ফেলে এসো নি তো ?

—না, ছাতি আনিই নি—

গুরুমশায় হাঁপাতে হাঁপাতে আসচেন পথের বাঁকে।

—একটা ভুল হয়ে গিয়েচে—আপনাদের ঠিকানাটা ? যদি মেয়েটার বিয়ে টিয়ে দিতে পারি মশায়দের চিঠি লিখবো, আসবেন আপনারা। বড় খুশী হবো। বড় ভালো লেগেচে আপনাদের।

ট্রেনে উঠে নীরদ বললে, বেশ বেড়ানো হল, না ?

—বেশই তো।

—গুরুমশায়ের মেয়েটি বেশ—কি বল ? তোমাদের পালটি ঘর তো—না ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

—তাই বলছিলাম। গরিবের মেয়েটি উদ্ধার করা রূপ মহৎ কাজে—

—কি বাজে কথা বলচো সব ! থাক্ ওকথা।

এরপরে আমরা আর কখনো ওই গ্রামে অবিশ্যি যাইনি—কিন্তু পাঁচ ছ বছর পরে বৌবাজারে এক দরজির দোকানে একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তার বাড়িও জাঙ্গিপাড়া। কথায় কথায় তাকে তাদের বৃদ্ধ গুরুমশায়ের কথা জিজ্ঞেস করে জানি তিনি এখনও বেঁচে আছেন, মেয়েগুলির মধ্যে বড়টিকে অতিকষ্টে পার করেচেন কিন্তু অন্য মেয়েগুলির আজও কোনো কিনারা করতে পারেননি।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হলে জীবন সম্বন্ধে—পাড়াগাঁয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো উচিত কিছুদিন, আমার এইরকম ধারণা। দশদিন কাশ্মীরে ঘূর্ণীঝড়ের মতো ঘুরে আসার চেয়ে তা কম শিক্ষাপ্রদ নয়, আনন্দও তা থেকে কম পাওয়া যায় না। এই ধরনের আর একটা অভিজ্ঞতার কথা এবার বলবো।

•

পিসিমার বাড়ি যাচ্ছিলাম পায়ে হেঁটে।

১৯২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মের ছুটিতে তখন আমি আছি স্বগ্রামে। আম বট তেঁতুলের ছায়াভরা গ্রাম্য পথ। যে গ্রামে যাবো সেখানে এর আগে একটিবার মাত্র গিয়ে-

ছিলাম বছর কয়েক আগে—কাজেই রাস্তা পাছে ভুল হয়, এজন্যে লোকজনকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে করতে চলেচি।

একজন বললে—বাগান গাঁ যাবেন, তা অত ঘুরে যাচ্ছেন কেন বাবু? কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়ে সবাইপুরের মধ্যে দিয়ে চলে যান না কেন?

তার কথা শুনে ভুল করেছিলুম, পরে বুঝলুম। প্রথম তো যে রাস্তায় এসে পড়লুম—সে হচ্ছে একদম মেঠোপথ—তার ত্রিসীমানায় কোনো বসতি নেই। তার ওপর রাস্তার কিছু ঠিক নেই, কখনো মাঠের আলের ওপর দিয়ে সরু পথ, কখনো প'ড়ো জলা আর নলখাগড়ার বন, কখনো শোলা বন।

মাঠের গায়ে রৌদ্রও প্রচণ্ড। খেয়া পার হয়ে ক্রোশ খানেক অতি বিশ্রী পথ হেঁটে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েচি। দূরে একটা বটগাছ দেখে তার তলায় বসে একটু জিরিয়ে নেবো বলে সেদিকে খানিকদূর গিয়ে দেখি আমার আর বটগাছের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জলার ব্যবধান। সুতরাং আবার ফিরলুম।

মাঠের মধ্যে একটা রাখাল ছোকরা গরু চরাচ্চে, তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে। তাকে বললুম—সবাইপুর আর কতদূর রে?

—ওই তো বাবু দেখা যাচ্চে—

সে অনেকদূরে মাঠের প্রান্তে বনরেখার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। আমি খানিকটা এগিয়ে যেতেই সে আবার ডেকে বললে—কোথায় যাবেন বাবু?

—বাগান গাঁ। চিনিস?

—না বাবু। তা আপনি সবাইপুরের খোঁজ কত্তিছেন কেন তবে?

—ওই তো যাবার পথ—

—ও পথে আপনি কি যাতি পারবেন বাবু? সবাইপুরের বাঁওড় পার হবেন কেমন করে?

সবাইপুরের বাঁওড়ের নাম শুনেচি, কিন্তু সে যে এ পথে পড়ে তা জানতুম না। জিজ্ঞেস করে জানা গেল খেয়ার নামগন্ধ নেই—সাঁতার দিয়ে পার হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? ফিরে আসবো ভাবচি, এমন সময় রাখাল ছোকরা আবার বললে—আপনি বাবু এক কাজ করুন, সবাইপুরের বিশ্বেসরা বাঁধল দিয়েচে, সেখেন দিয়ে পার হয়ে যান—

মাছ ধরবার জন্যে বাঁশ বেঁধে যে লম্বা জাল টাঙিয়েছে—বাঁশের ওপর চড়ে অতিকষ্টে বাঁওড় পার হয়ে এপারে এলুম।

কিছুদূরে গাঁয়ের মধ্যে একটা কাদের খড়ের বাড়ি।

আমি গিয়ে বললুম—ওহে একটু জল খাওয়াতে পারো?

একটা লোক বেড়া বাঁধছিল উঠোনের কোণে, সে বললে—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে দুহাত জুড়ে প্রণাম করে বললে—তবে হবে না বাবু। আমরা জেলে—

—জেলে তাই কি ? আমার ওসব—

—না বাবু, আমি হাতে করে দিতি পারবো না—তবে ওই কাঁটাল বাগানের মধ্যে টিউকল আছে—আপনি টিউকলে জল খেয়ে আসুন—একটা ঘটি নিয়ে যান, দিচ্ছি। ঝকঝকে করে মাজা একটা কাঁসার ঘটি লোকটা বাড়ির মধ্যে থেকে এনে দিলে। টিউকল অর্থাৎ টিউবওয়েলে জল খেয়ে আবার রাস্তা হাঁটি।

গ্রাম আর বড় নেই, মাঠ আর বনঝোপ। হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে মেঘ করে এল—নীল কালবৈশাখীর মেঘ—হয়তো ভীষণ ঝড় উঠবে। কিন্তু তখুনি কিছু হল না, মেঘটা থমকে গেল আকাশে। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় পথ বেশ চলতে লাগলুম।

একজায়গায় একটা প্রকাণ্ড জিউলি গাছ। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে এই জিউলি গাছের দৃশ্য আমাকে কি মুগ্ধই করলো! দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে অনেকক্ষণ। প্রকাণ্ড গাছের সারা গা বেয়ে সাদা আঠা গলা-মোমবাতির আকারে ঝুলচে—গাছের তলায় কলকাতার রাস্তার ধারের সাজানো পিচের মতো একরাশি আঠা। যেন আমি বাংলা দেশে নেই, আফ্রিকার মত বন্য মহাদেশের অরণ্যপথ ধরে কোন্ অজ্ঞাত সুদূর গন্তব্যস্থান অভিমুখে যাত্রা করেচি। কি ভালোই যে লাগছিল!

আউশ ধানের ক্ষেতে সবে কচি কচি সবুজ জাওলা দেখা দিয়েচে। চারা ধানগাছের এক ধরণের সুন্দর ঘ্রাণ আসচে বাতাসে।

খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়েচি। বেলা এগারোটার কম হবে না কোন রকমে, কিন্তু সেজন্যে আমার কোন কষ্ট নেই। চারিধারে সবুজ আউশের জাওলা যেন বিরাট সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেচে পৃথিবীর কালো মাটির বুকে। নীলকণ্ঠ আর কোকিলের ডাক আসচে মাঠের চারিদিক থেকে—মেঘ থম্‌কানো আকাশের নীলকৃষ্ণ শোভা আর অবাধ মুক্তির আনন্দ —সব মিলে এরা আমায় যেন মাতাল করে তুলেচে।

বৃষ্টি এল—একটা বড় বটতলায় আশ্রয় নিলুম। টপ্ টপ্ করে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা গাছের ডাল ভেদ করে মাঝে মাঝে গায়ে পড়তে লাগলো। বৃষ্টিতে বড় মাঠগুলো ধোঁয়ার মতো দেখাচ্চে।

বটতলায় একটা ছোট রাখাল ছেলে আমার মতো আশ্রয় নিলে। তার বয়েস দশ বারো বছরের বেশি নয়। হাতে পাঁচন, মাথায় তালপাতার টোকা।

—বড্ড পানি এয়েল বাবু—

—হ্যাঁ, তাই তো—বোস্ ওখানে—বাড়ি কোথায় ?

—সুন্দরপুর বাবু। ওই যে দেখা যাচ্চে—

বৃষ্টি থামলে সুন্দরপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকলাম। গ্রামের মধ্যে দিয়েই পথ। বড় বাড়ি দুচারখানা চোখে পড়লো, খুবই বড় বাড়ি—বর্ত্তমানে লোকজন আর বিশেষ কেউ থাকে না, পোড়ো বাড়িতে পরিণত হয়েচে। গ্রামের চারিদিকেই বড় বাঁশবন আর আমবন, যেমন এ অঞ্চলের সব গ্রামেই দেখতে পাওয়া যাবে।

একটা খুব বড় বাড়ি দেখে তার সামনে দাঁড়ালুম। এক সময়ে খুব ভালো অবস্থার গৃহস্থের বাড়ি ছিল এটা, নইলে আর এত বড় বাড়ি তৈরি করতে পারেনি। এখন যারা থাকে, তাদের অবস্থা যে খুব ভালো নয়, এটা ওদের দোতলার বারান্দাতে পুরোনো চাঁচের বেড়া দেখে আন্দাজ করা কঠিন হয় না। করোগেট টিন জোটেনি তাই বাঁশের চাঁচ দিয়েচে।

একজনকে জিগ্যেস করলুম—এটা কাদের বাড়ি বাপু?

—বাবুদের বাড়ি। এ গাঁয়ের জমিদার ছেলেন ওঁয়ারা—

—এখন কেউ নেই?

—থাকবেন না কেন বাবু, কলকাতায় থাকেন। বাবুদের ছোট সরিকেরা এখন থাকেন এ বাড়িতে। তেনাদের অবস্থা ভালো নয়। বাবুরা সব উকিল, মোক্তাগার, অনেক পয়সা রোজগার করেন, এখানে আর আসেন না।

অথচ যখন সুন্দরপুরের বাইরে এলুম, তখন মুসলমান ও কাওালী পাড়ার অবস্থা দেখে চোখ জুড়ুলো। ওরা প্রায়ই বাস করে ফাঁকা মাঠে, বাড়ির কাছে বনজঙ্গল কম, খড়ের বাড়ি হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধানের গোলা দুতিনটি অনেকের বাড়িতেই চোখে পড়ে, তরিতরকারির বাগান করে রেখেচে বাড়ির পাশেই, দুপাঁচটা গোরু সকলেরই আছে।

এদের স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়—যারা খেটে খায় এমন লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়া হতে বেশি দেখিনি—ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, ব্লাডপ্রেসারের নামগন্ধ নেই সেখানে।

ওরা যখন মরে, তখন বেশির ভাগ মরে কলেরাতে। শীতের শেষে বাংলার পাড়াগাঁয়ে চাষাপাড়া মরে দুলধাবাড় হয়ে যেতে দেখেচি কলেরাতে—অথচ ভদ্রলোকের পাড়ায় এ রোগ খুব কম ঢুকতে দেখেচি।

তবে আজকাল গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসবার ফলে ম্যালেরিয়া যতটা না কমুক, কলেরার মড়ক অনেক কমেচে। নলকূপের জল বারোমাস ব্যবহার করে, অথচ বারোমাস ম্যালেরিয়ায় ভুগে জীর্ণ শীর্ণ, এমন লোক বা পরিবার অনেক দেখেচি।

কিন্তু আমি যা বলতে যাচ্ছিলুম—

পায়ে হেঁটে বাংলার অনেক গ্রামেই ঘুরেচি, সর্বত্রই দেখেচি, সমান অবস্থা—ভদ্রলোকের পতন, মুসলমান ও অনুন্নত জাতির অভ্যুদয়। ভদ্রলোকের পাড়ায় ভগ্ন অট্টালিকা, মজাপুকুর, ভগ্ন দেবালয়, ঘন বনজঙ্গল—আর চাষাপাড়ায় ক্ষেতভরা তরিতরকারি, গোয়ালভরা গোরু, ধানের মরাই, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপক্ষীর পাল। হলফ নিয়ে অবিশ্যি বলতে পারব না যে সব চাষারই এই অবস্থা—তবে অনেকেরই বটে।

ভদ্রলোকদের মধ্যে সাধারণত যারা শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম, তারা থাকে বিদেশে শহরে, আর ঝড়তি-পড়তি মাল যেগুলি, তারা নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকে গ্রামে, শিক্ষিত ও প্রবাসী জ্ঞাতিদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘরে।

এরা বেলা বারোটা পর্যন্ত কোনো গাছতলায় কি কারো বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টানে আর বাজে গল্প ও পরচর্চা করে, সন্ধ্যাবেলা বসে তাস খেলে, কিংবা শখের যাত্রার দলে

আখড়া দেয়। এ অঞ্চলে থিয়েটার বড় একটা দেখিনি কোথাও—ওটা হল কলকাতা-ঘেঁষা জায়গার ব্যাপার।

এই সব ভদ্রবংশের লোকের না আছে খাটবার ক্ষমতা, না আছে উদ্যম উৎসাহ কোনো কাজে। কোনো নবাগত উৎসাহী লোক জনহিতকর কোন কাজ করতে চাইলে এরা তাদের বুঝিয়ে দেবে যে ও রকম অনেক হয়ে গেছে, ও করে কোনো লাভ নেই। কুঁড়ে লোকেরা সর্বজ্ঞ হয় সাধারণত।

শুধু সুন্দরপুর নয়, অন্যান্য গ্রামেও ঠিক এই রকম দেখেচি এবং পল্লীগ্রামের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হয়েচি। আর পঞ্চাশ বছর এইভাবে চললে, গ্রাম থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এখনই যেতে শুরু করেচে।

সুন্দরপুর ছাড়িয়ে একটা বড় বাঁওড় পড়লো সামনে, নদীর মতো চওড়া, জলও বেশ স্বচ্ছ, পার হবো কি করে বুঝতে পারচি নে, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হল। সে নীচু হয়ে জলের ধারের কলমির বন থেকে কচি কলমি শাক তুলে আঁটি বাঁধছিল।

জিগ্যেস করতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে বললে—সামনে দিয়ে যাও বাবা, ওইদিকি আগাড় পড়বে।

বাঁওড়ের আগাড় মানে বাঁওড়ের একদিকের প্রান্তসীমা, যেখানে গিয়ে বাঁওড় শুকিয়ে বা মজে শেষ হয়ে গেল—সুতরাং ঘুরে পার হওয়া যায় সেখানটাতে।

আধ মাইলের কিছু বেশি যেতে আগাড় দেখা গেল—সেখানে একটা বড় বট গাছের তলায় কি একটা হচ্চে দূর থেকেই দেখতে পেলাম।

কাছে গিয়ে দেখি ওপারে বাঁওড়ের ধারে একটা বট গাছের তলায় কারা কলের গান বাজাচ্চে, আর তাই শুনবার লোভে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি ছেলে-মেয়ে ঝি-বৌ একত্র জড় হয়েচে। বাঁওড়ের ঘাটে জল নিতে এসে বউয়েরা শুনচে, সবই চাষা লোক, এ সব গ্রামে ভদ্রলোকের বাস আদৌ নেই।

বেলা প্রায় একটা হবে। আমিও একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্যে বটতলার ছায়ায় গিয়ে বসলুম। কলের-গানওয়ালারা গাছের উঁচু শেকড়ের ওপর বসেচে, আমায় ভদ্রলোক দেখে ওরা লাজুক মুখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

সস্তা খেলো গ্রামোফোনের টিনের লম্বা চোঙের মুখ দিয়ে কর্কশ, উচ্চ, অস্বাভাবিক ধরনের গলার আওয়াজ বেরুচ্চে। বাজে হালকা সুরের গান বা ভাঁড়ামির রেকর্ড সবই—আমি জিজ্ঞেস করলুম—তোমাদের ভালো কিছু আছে?

—বাবু, আপনাদের যুগ্যি কনে পাবো, এ সব এই চাষা-ভুলোনো—

—তোমরা যাবে কোথায়?

—আমাদের বাড়ি ওই নাভারনের কাছে। কুলে রণঘাটের মেলায় কলের গান নিয়ে যাচ্চি বাবু, যদি দু চার পয়সা হয়—আপনাদের শুনবার যুগ্যি এ জিনিস নয়, সে আমরা জানি।

—তোমরা কি এমনি মেলায় মেলায় বেড়াও ?

—হ্যাঁ বাবু, ইদিকির সব মেলা, ওই ডুমোর মেলা, হল্‌দা-সিঁদরিনীর চড়কের মেলা, গাঁড়াপোতায় চড়কের মেলা, গোপালনগরের বারোয়ারির মেলা, বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের মেলা—সব জায়গায় আমরা যাই। আমাদের এতেই পয়সা রোজগার—

—কি রকম রোজগার হয় ?

—তা বাবু আপনার কাছে আর বলতি কি, আগে এক একটা মেলায় ত্রিশ চল্লিশ করে পাতাম। পাটের দর একবারে উঠিছিল আটাশ টাকা। সেবার সব মেলা বেড়িয়ে পাঁচ ছ-শো টাকা পাই। পাটের দর যেবার কম থাকে, সেবার এত দেবে কে। চাষার হাতে পয়সা থাকলি তো দেবে। চাষার হাতেই লক্ষি বাবু—আসুন বাবু একটা বিড়ি খান—শোনবেন গান ? ওরে আলি, একখানা সেই বাজনার রেকর্ট ছেলো যে, সেখানা দে—বাবু ওসব গানের আর কি শোনবেন—

এরা অশিক্ষিত মুসলমান, কিন্তু এদের যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখেচি, শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসন্তানের তার অর্দ্ধেকও থাকলে বেকার সমস্যা এত জটিল হয়ে দেখা দিত না। এদের সঙ্গে মনে মনে হিন্দু ভদ্রসন্তানের তুলনা করবার সুযোগ এবারই আমার ঘটেছিল, সে কথা পরে বলচি। আমি সেখান থেকে উঠে আর মাইল দুই ধানখেতের আলের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে এমন এক জায়গায় পড়লুম, যেখানে কাছে কোন গ্রাম নেই।

মাঠের মধ্যে একটা চমৎকার বটগাছ তার বড় ডালপালা মাটিতে নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো দিকে আছে কিনা দেখে একটা মোটা নীচু ডালে চড়ে বসলুম।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, বেলা দুটো বাজে, এখন পিসিমার বাড়ি গিয়ে পড়লে তিনি রান্না চড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—সে কষ্ট আর কেন তাঁকে দেওয়া—তার চেয়ে আর ঘণ্টাখানেক পরে গেলে বলতে পারবো যে কোথাও থেকে খেয়ে এসেচি।

আধঘণ্টাও হয়নি, এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠলো—এখানে কি কচ্চেন বাবু ?

পেছনে ফিরে চেয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ, তার মাথায় ধামাতে খুব বড় একটা তেলের ভাঁড়।

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হল বৈকি, তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি ডালটা থেকে। একটু হেসে বলি—এই একটু হাওয়া খাচ্চি, বড্ড গরম—

যেন হাওয়া খেতে হলে গাছের ডালে চড়াই প্রশস্ত উপায়।

—কোথায় যাবেন আপনি ?

—বাগান গাঁ—কতদূর জানো ?

—চলুন বাবু, আমি তো সেই গাঁয়েই থাকি—কাদের বাড়ি যাবেন ?

—মুখুজ্জেদের বাড়ি।

লোকটা যে ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলো তাতে আমার মনে হল আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নয়।

এই গ্রামে আমি ছেলেবেলায় একবার এসেছিলুম—তখনই বেশ জঙ্গল দেখে গিয়েচি, সে

জঙ্গল এখন সুন্দরবনকে ছাড়িয়ে যাবার পাল্লায় মেতেচে। এমন বন যে এ'কে অরণ্য নামে অভিহিত করা চলে অনায়াসেই। এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে কি করে মানুষ বাস করে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

দু-তিন দিন সে গ্রামে ছিলুম। তিনঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাস, তিনঘরই ব্রাহ্মণ—তা বাদে কামার, কলু, কাঙালী আজ আছে হিন্দুর মধ্যে—বাকি চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর মুসলমান। সাধারণতঃ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদের স্বাস্থ্য ভালো।

সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা হিন্দুভদ্রলোকের। তাদের স্বাস্থ্য নেই, অর্থ নেই। মুখুজ্জেরা এককালে এ গ্রামের জমিদার ছিলেন—এখন তাঁদের ভাঙা কোঠাবাড়ি আর নারকেল গাছের লম্বা সারি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই—গোলায় পিড়ি পড়ে আছে, গোলা বহুকাল অন্তর্হিত, সংস্কার অভাবে অট্টালিকার জীর্ণ দশা, ফাটলে বট অশ্বত্থের গাছ, সাপের খোলস।

যে ক জন ছেলে-ছোকরা এই তিন বাড়িতে থাকে, সন্ধ্যাবেলায় তারা মুখুজ্জেবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বড় তাসের আড্ডা বসায়—দাবাও চলে। এরা কোনো কাজ করে না, লেখা-পড়ার ধারও ধারে না। অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা এদের মধ্যে যা ছিল, তা ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্চে। দিন কতক পরে এরা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য প্রকৃতির বেকার হয়ে পড়বে।

পল্লীবাসী হিন্দু ভদ্রলোকের এই সমস্যা সর্বত্রই উগ্রমূর্তিতে দেখা দিয়েচে। অর্থ নেই বলেই এদের স্বাস্থ্যও নেই—মনে স্ফূর্তি নেই, পঁচিশ বছরের যুবকের মন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধের মতো নিস্তেজ।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেচি তা এর চেয়েও সর্বনাশজনক। পল্লীগ্রামে এই ধরনের ভদ্রসন্তানদের মধ্যে পানদোষ অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েচে। প্রায় সকলেরই এ দোষটি আছে, যে মদ পয়সা অভাবে না জোটাতে পারে, সে সস্তার তাড়ি খায়। এর সঙ্গে আছে, গাঁজা ও সিদ্ধি।

আমি এই গ্রামেই একটি লোককে দেখলুম সে বর্তমানে একেবারে ঘোর অকর্মণ্য ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েচে। পূর্বে সে কোথায় চাকরি করতো, চাকুরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে বসে প্রথমটাতে মহা উৎসাহে চাষ-বাস আরম্ভ করে। কিন্তু কৃষিকার্যের সাফল্যের মূলে যে কষ্টসহিষ্ণুতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তা তার ছিল না, ফলে হাতের টাকাগুলি নষ্ট হতে দেরি হয়নি। এখন বাড়ি বসে গাঁজা খায় এবং নাকি হরিনাম করে।

এ গেল পুরুষদের কথা। মেয়েদের জীবন আরও দুঃখময়। তাদের জীবনে বিশেষ কোনো আনন্দ-উৎসবের অবকাশ নেই, ধানভানা, রান্না, সংসারের দাসীবৃত্তি এই নিয়েই তাদের জীবন। অবসর সময় কাটে পরের বাড়ির চালচলনের নিন্দাবাদে। এতটুকু বাইরের আলো যাবার ফাঁক নেই ওদের জীবনে কোনো দিক থেকেই। অথচ তারা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়। তারা ভাবচে, তারা বেশ আছে। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা এই বারেই হয়েছিল।

পাশের বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ, পিসিমার সম্পর্কে তাঁরাও আমার আত্মীয়। সেই বাড়িরই একটি বধূ, ত্রিশের মধ্যে বয়স, দেখতে শুনতে নিতান্ত খারাপ নয়—আমার খাবার সময় পরিবেশণ করলে। তারপর বাড়ির ছেলে-দুটি বললে—আসুন একটু দাবা খেলা যাক। আমি দাবা খেলা জানলেও ভালো জানি না, ওরা সে আপত্তি কানে তুললে না—অগত্যা ওদের মধ্যে গিয়ে বসলুম ওদের সঙ্গে।

বধূটি আমায় পান মশলা দিতে এল।

আমি বললাম,—বৌদি, বসুন না—

—না ভাই, বসলে চলে, কত কাজ—তোমরা থাকো শহরে, পাড়া-গাঁয়ের কিই বা জানো—

—আচ্ছা, বৌদি, আপনি কখনো শহর দেখেননি ?

—দেখবো না কেন, কেষ্টনগর গোয়াড়ি দু দুবার গিয়েচি। সে অনেকদিন আগে। ভালো কথা, আমার একটা উপকার করবে ঠাকুরপো ?

—বলুন না—কেন করব না ?

—আমার মেয়ে বীণার একটা পাত্র দেখে দাও না, কত জায়গায় তো ঘোরো—

—সে কি বৌদি, কতটুকু মেয়ে ও! এগারো-বারো বছরের বেশি নয়, এখুনি ওর বিয়ে দেবেন ? ও লেখাপড়া শিখুক তার চেয়ে, কেষ্টনগরে আপনার মামার কাছে ওকে রেখে দিন। এ গাঁয়ে থাকলে তো পড়াশুনোর আশা কিছুই দেখচি নে।

—কি হবে ভালো লেখাপড়া শিখে ? সেই বিয়ে করতেই হবে, শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে—হাঁড়ি ধরতে হবে। মেয়েমানুষের তাই ভালো। এই যে আমি আজ ষোল বছর এই গাঁয়ে এদের বাড়ি এসেচি, খাটচি উদয়াস্ত দেখচো তো—আসবার দশদিনের মধ্যে হেঁসেলের ভার দিলেন শাশুড়ি, তার পর তিনি মারা গেলেন, আর সেই হেঁসেল এখনও আগলে বসে আছি।

—বেশ ভালোই লাগে ?

—কেন লাগবে না ভাই। তোমরা এখন পুরুষমানুষ, উড়ু উড়ু মন। এ আমার নিজের সংসার, নিজের ছেলেমেয়ে, কেন খারাপ লাগবে বলো। লেখাপড়া করে কি দুটো হাত বেরুতো ?

—আচ্ছা কোনো কিছু দেখতে আপনার ইচ্ছে করে না ? কোনো বই পড়তে, কি কোথাও বেড়াতে ?

—তা কেন করবে না—নবদ্বীপে রাসের মেলায় একবার যাবো ভেবে রেখেচি। বই কোথায় পাচ্চি এ পাড়াগাঁয়ে, আর পেলেও পড়বার সময় আমার নেই। আমরা কি মেম-সাহেব যে বসে বসে সব সময় বই পড়বো ?

—বীণাকে একটুও লেখাপড়া শেখাননি ? ক খ জানে তো ?

—তা জানে। ডেকে জিজ্ঞেস করো না! রাঁধতে জানে, ধান ভানতে শিখেচে, চিঁড়ে কুটতে পারে, আমার সঙ্গে থেকে থেকে শিখেচে—সব দিক থেকে মেয়ে আমার—

তবে ওই দোষ, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। এই সেদিন জ্বর থেকে উঠলো—পেটজোড়া পিলে, হাবুল ডাক্তারের ওষুধ দুশিশি খাইয়ে এখন একটু—

বাগান গাঁ থেকে চলে আসবার পথে আমার কত বার মনে হয়েচে পল্লীজীবনের এই সব গুরুতর সমস্যার কথা। এসব নিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলতে পারে কিন্তু এ সমস্যার সমাধান করবে কে? এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

এবারের ভ্রমণ সম্পর্কে আর একটি ঘটনা আমার বড় মনে আছে। ফিরিবার পথে একটা সাঁকোর ওপর বসেচি, বেলা তিনটে—জ্যৈষ্ঠমাসের খর রৌদ্র মুখের ওপর এসে পড়েচে, একটি বৃদ্ধা কাঠ কুড়িয়ে ফিরচে। আমার দিকে চেয়ে সে আমার সামনে দাঁড়ালো। তারপর মায়ের মতো স্নেহসিক্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে—বাবা, বড্ড রদ্দুর লাগচে মুখটাতে, উঠে এসো—

বৃদ্ধার গলার সুরে আন্তরিক স্নেহ ও দরদের পরিচয় পেয়ে আমি চমকে উঠলুম যেন। সে আবার বললে, উঠে এসো বাবা, ওখানডাতে বোসো না—পড়ন্ত রদ্দুরটা—

হয়তো আমি উঠে গিয়েছিলাম অন্যত্র, হয়তো তার সঙ্গে আমার আরও কি কথা হয়ে থাকবে—কিন্তু সে সব আর আমার মনে নেই। সে লিখতে গেলে বানানো গল্প হয়ে যাবে। এতদিন পরেও ভুলিনি কেবল বৃদ্ধার সেই মাতৃমূর্তি, তার সেই দরদভরা উদ্বিগ্ন গলার সুর।

আমি চাকুরি উপলক্ষে একবছর পূর্ববঙ্গ ও আরাকানের মাংড়ু অঞ্চলে যাই। সে সময় রেলে স্টীমারে আমার অনেক অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। অন্য কোনো ভাবে এদের বলা যায় না, এক এই ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া। তাই এখানে সেগুলি লিপিবদ্ধ করবো। গোড়া থেকেই কথাটা বলি।

কলকাতায় বসে আছি, চাকরি নেই—যদিও চাকুরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করি।

একটি মাড়োয়ারী ফার্মের বাইরে দেখলুম বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, দুজন লোক তারা চায়। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঢুকে পড়লুম আপিসের ভেতরে। আপিসটি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের। বিজ্ঞাপন দেখে এসেচি শুনে আপিসের দারোয়ান আমায় একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। সামনেই বসে ছিলেন কেশোরাম পোদ্দার, তখন অবিশ্যি চিনতুম না।

কেশোরাম পোদ্দার হিন্দিতে জিগ্যেস করলেন—আপনি কি পাস?

বললুম, বি এ পাস করেচি ও বছর।

—কি জাতি?

—ব্রাহ্মণ

—বক্তৃতা দিতে পারেন?

কিসের বক্তৃতা? ভালো বুঝতে পারলুম না, কিন্তু চাকুরির বাজার যেমন কড়া, তাতে কোনো কিছুতেই হঠলে বা ভয় খেলে চাকুরি-প্রাপ্তির যা-ও বা সম্ভাবনা ছিল তাও তো গেল। এ অবস্থায় বক্তৃতা তো সামান্য কথা, কেশোরামজি যদি জিজ্ঞেস করতেন "আপনি নাচতে জানেন?" তা হলেও আমার মুখ দিয়ে হাঁ ছাড়া না বেরুতো না।

সুতরাং বললুম, জানি।

—আচ্ছা, আপনার ঠিকানা দিয়ে যান, কাল বেলা দশটার সময় আসবেন।

পরদিন দশটার সময় কেশোরামবাবুর আপিসে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। আমার মতো আরও পঞ্চাশ ষাটটি বেকার কেশোরামবাবু খাস বাইরের হলে অপেক্ষা করচে। এরা সবাই বক্তৃতা দেবে আজ এখানে। বুঝলুম, সবারই মরিয়া অবস্থা। বক্তৃতা বক্তৃতাই সই।

আমার পূর্বে একে একে আট দশ জন লোকের ডাক পড়লো। এদের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে ছোকরা পর্যন্ত সব রকমের লোকই আছে। লক্ষ্য করে দেখলুম কেউ দু'মিনিট পরে ফিরে আসচে, কেউ আসচে পাঁচ মিনিট পরে—কেউ বা ঢুকবা-মাত্র বেরিয়ে আসচে।

অবশেষে আমার ডাক পড়লো। কেশোরামজি দেখলুম তাঁর খাস কামরায় নেই, ওদিকের বারান্দায় দূর কোণে একখানা চেয়ারে তিনি বসে।

কাছে যেতেই বললেন, আপনি কিছু বলুন—

—ইংরিজিতে না বাংলাতে?

—বাংলায় বলুন—

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খানিকটা মুখস্থ করেছিলুম, মনেও ছিল। সামনের থামের দিকে চেয়ে মরিয়ার সুরে তাই আবৃত্তি করে গেলুম। কেশোরাম খুশী হলেন। চাকুরি আমার হয়ে গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে ট্রেনে কুষ্টিয়া গিয়ে নামলুম। কলকাতার কাছে কুষ্টিয়া, নদীয়া জেলার একটা মহকুমা। এখানে কি থাকবে? কিন্তু আমার কাছে একটা দেখবার জিনিস ছিল। আমার মাতামহ সেকালের এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, গোরাই নদীর ওপর রেলওয়ে ব্রিজ তিনি তৈরি করেন এ গল্প অনেকদিন থেকে মাতুলালয়ে শুনে আসচি।

ঘুমের ঘোরে ভালো দেখতে পেলুম না ব্রিজটা।

জীবনে চাকুরি উপলক্ষে সেই প্রথম বিদেশে যাওয়া। ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠলুম, তিন-দিন মাত্র এখানে থাকতে হবে।

পথে বেরিয়েচি, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, কলেজে তার সঙ্গে পড়েছিলুম। সে আমায় দেখে তো অবাক। ধরে নিয়ে গেল তাদের বাসাতে একরকম জোর করেই—আমার কোনো আপত্তি শুনলে না।

আমি তাকে বললুম—ভাই, গোরাই নদীর ব্রিজটা দেখাবি?

—সে আর বেশি কথা কি, চলো আজই।

বনজঙ্গল আর কচুবন ঠেলে ঠেলে গোরাই নদীর ধারে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। গোরাই নদীর উভয় তীরের মাঠে, জঙ্গল বাঁশবনের শোভা দেখে সত্যি আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কত কাল কলকাতায় পড়ে আছি, বেরুতে পারিনি কোথাও।

বন্ধুকে বললুম—ভাই, বসি একটু—

—এখানে কেন? চলো এগিয়ে—

—ভাই, বেশ লাগচে। তুমিও বোসো না—

—নাঃ, এসব কবিদের নিয়ে কোথাও বেরুনোই দেখচি দায়। বোসো তবে।

উঁচু পাড়ের নীচেই বর্ষার গোরাই নদী। সাদা সাদা এক রকম ফুল ফুটে আছে জলের ধারে। গাছপালায় শ্যামলতার প্রাচুর্য দেখে মন যেন আনন্দে নেচে ওঠে। তখনকার দিনে আমার একটা বড় বাতিক ছিল, নতুন জায়গায় নতুন কি কি বনের গাছ জন্মায় তাই লক্ষ্য করা। গোরাই নদীর ধারের মাঠে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম, যশোর জেলাতেও যা, এখানেও প্রায় সেই গাছ, সেই শেওড়া, ভাঁট, কালকাসুন্দে, ওল, বনচালতে। বেশির মধ্যে এখানে দু একটা বেতসঝোপ নদীর ধারে, আমাদের দেশে বেতগাছ চোখে পড়ে না।

বেলা ন টার সময় গোরাই নদীর পুল দেখে বাড়ি ফিরে এলুম। আমার বন্ধু বললে—চলো, এখানকার এক কবির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—

ভদ্রলোকের নাম তাবাচরণবাবু বোধ হয়, আমার ঠিক মনে নেই। গোরাই নদীর ধারেই তাঁর বাড়ি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অমন অমায়িকস্বভাব লোক বেশি চোখে পড়ে না। আমি তখন ছোকরা আর তিনি আমার বাপের বয়সী। কিন্তু তাঁর আচারব্যবহারে কথাবার্তায় এতটুকু পরিচয় দিলেন না যে তিনি বয়সে বা জ্ঞানে আমাব চেয়ে অনেক বড়। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মতো জ্ঞানপিপাসু লোক মফস্বলের ছোট শহরে ক্বচিৎ দু-একটি দেখা যায় কি না যায়। যতক্ষণ রইলুম, তিনি আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাউনিং সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, কিন্তু তা যেন কত সঙ্কোচের সঙ্গে। যেন পাছে আমি একটুও মনে করি যে তিনি আমার সামনে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করচেন। মোহিনী মিল নামক বিখ্যাত কাপড়ের কল এখানেই অবস্থিত, ভেবেছিলুম দেখবো, কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে উঠলো না।

পথে পড়ে গেলুম বিপদে, ট্রেনের যে কামরায় উঠেচি সে কামরায় আর দুজন বন্দুকধারী সেপাই টাকার থলে পাহারা দিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্চে।

আমাকে ওরা প্রথমে বারণ করেছিল সে গাড়িতে উঠতে। কিন্তু গাড়িতে বেজায় ভিড় ছিল বলে আমাকে বাধ্য হয়ে ওদের কামরায় উঠতে হল। গাড়ি তো ছাড়লো—মাঝ রাস্তায় তারা কি বলাবলি করলে। একজন চলন্ত গাড়ির ওদিকের দরজা খুললে—আর একজন আমার হাত ধরে টানতে লাগলো—ওরা গাড়ি থেকে আমায় ফেলে দেবে।

আমি প্রথমটা ওদের মতলব কিছু বুঝতে পারিনি। কারণ এ ধরনের ব্যাপার ধারণা করা শক্ত—আমি নিরীহ রেলযাত্রী, আমাকে তারা কেন ফেলে দেবে, এর যুক্তিসঙ্গত কারণও তো একটা খুঁজে পাইনে।

ওদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমার প্রথম সন্দেহ হল গাড়ির ওদিকের দরজা খুলতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে হাত ধরে টানতে। ওদের সঙ্গে জোরে পারবো না বেশ বুঝলাম—তখন আর একটা স্টেশনে না আসা পর্যন্ত যে ভাবেই হোক আমায় রেলগাড়ির মধ্যে থাকতে হবে।

আমি ওদের বললুম—কেন তোমরা আমাকে এ রকম করচো ?

ওরা সে কথার কোনো জবাব দেয় না, শুধু হাত ধরে টানে। ওরা সে রাত্রে আমার

নিশ্চয়ই ফেলে দিতো—কিন্তু ওদের প্রধান অসুবিধে দাঁড়ালো গাড়ির দরজাটা। দরজা যদি বাইরের দিকে খোলা থাকতো তবে দুজনে মিলে ঠেলতে পারতো বা ওই রকম কিছু। কিন্তু এটা ভিতর দিকে খোলা যায়, সেই ধরনের দরজা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সেটা কেবল ঝুপ ঝুপ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—সুতরাং একজনকে ধরে থাকার দরকার সেটাকে।

আমি ওদের সঙ্গে কোনো চেঁচামেচি কি গোলমাল করচিনে—মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা করে রেখেছি, কারণ আমার মনে হল ক্রমে যে এরা মাতাল হয়েচে—এরা কি করচে এদের জ্ঞান নেই। ঝগড়া কি চেঁচামেচি করলে মাতাল অবস্থায় রেগে চাই-কি আমায় খুন করেও বসতে পারে।

ট্রেনের বেগও কমে না, কোনো স্টেশনেও আসে না। শেকল টানবার উপায়ই নেই—কারণ যে দরজা দিয়ে তারা আমায় ফেলে দেবে, শেকল টানতে গেলে তো সেই দরজার কাছেই যেতে হয়—দরজার মাথার ওপর শেকল টানার হাতল।

আমি ওদের ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা করচি, একজনকে মেরে ফেলে তাদের লাভ কিছু নেই—বরং তাতে পুলিসের ভীষণ হাঙ্গামে পড়ে যেতে হবে। তা ছাড়া, নরহত্যা মহাপাপ, রামচন্দ্রজি ওতে যে রকম চটেন অমন আর কিছুতেই চটেন না। স্বর্গে যাবার অতবড় বাধা আর নেই। তুলসীদাসের দোঁহা এক আধটা মনে আনবার চেষ্টা করলুম—কারণ 'রামচরিত-মানস' আমার পড়া ছিল—কিন্তু বিপদের সময় ছাই কি কিছু মনে আসে!

এমন সময়ে গাড়ির বেগ কমে এল—কোনো এক স্টেশনে আসচে এতক্ষণ পরে। মাঠের মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল, সামনেই কি স্টেশন, লাইন ক্লিয়ার দেওয়া নেই সিগন্যালে। গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমায় ছেড়ে দিলে। আমিও একটি কথাও বললুম না। মাতালকে চটিয়ে কোনো লাভ নেই।

পরের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো একটু পরেই। আমি আমার জিনিসপত্র সামান্য যা ছিল, নিয়ে অন্য কামরায় চলে গেলুম। রাত তখন এগারোটা কি তার বেশি। একবার ভাবলুম গার্ডকে ঘটনাটা জানাই—কিন্তু ছোট স্টেশন, অন্ধকার রাত—গার্ডের গাড়ি অনেক পেছনে, যেতে যেতে ট্রেন ছেড়ে দেবে।

মনে মনে ভাবলুম, রাজবাড়ি স্টেশনে ট্রেন এলে রেলপুলিসকে বলবো—কিন্তু রাজবাড়ি নেমে আর গোলমালের মধ্যে যেতে ইচ্ছে হল না। মাতালদের সঙ্গে একগাড়িতে ওঠা আমারই ভুল হয়েছিল।

এর পরে যেখানে গিয়ে নামলুম, সেটা হল ফরিদপুর।

নাম শুনে আসচি চিরকাল, অথচ কখনো দেখিনি ফরিদপুর—কি ভালো লেগে গেল জায়গাটা।

এখানে পূর্ববঙ্গের মেয়েদের স্নেহস্পর্শ লাভ করবার সৌভাগ্য আমার সর্বপ্রথম ঘটেছিল। কি জানি কেন তখনও মনে হয়েছিল এবং আমার আজও মনে হয় পূর্ববঙ্গের মেয়েরা উদারতায়, নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তায় ও মনের ঐশ্বর্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের চেয়ে অনেক বড়। লেখাপড়ার দিক থেকেও পূর্ববঙ্গের মেয়েরা আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের চেয়ে শিক্ষিতা।

এমন সব পরিবার দেখেছি তারা আর কিছু না পড়ালেও অন্তত ম্যাট্রিক পাস করিয়ে রাখে। ম্যাট্রিক পাস লেখাপড়া শেখার বড় মাপকাঠি না হতে পারে, কিন্তু পিতামাতা যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, এটুকুও তো তা থেকে বোঝা যায়।

ফরিদপুর ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠবার আগে আমার মনে পড়লো আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসে যে অমুক বাবু থাকতো, তার বাড়ি ফরিদপুর. দেখি তো খোঁজ করে।

দেখা পেলাম এবং ভদ্রলোক (বন্ধু ঠিক নন, কারণ এর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল সামান্যই) আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাড়ি যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মা আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এমনভাবে আলাপ করলেন, যেন আমি কত কালের পরিচিত।

তিনদিন সেখানে ছিলুম, কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে স্টীমারে ফরিদপুর থেকে বেরুবো, ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে বাসায় জিনিসপত্র তুলতে এলাম।

বাইরের যে ঘরটাতে থাকি, সেটাতে ঢুকে দেখি বন্ধুটির দিদি আমার বিছানাটা বেশ ভালো করে ঝেড়ে পেতে দিচ্ছেন। মশারিটা টান টান করে টাঙিয়ে দেবার চেষ্টায় আপাতত তিনি খুব ব্যস্ত।

আমি বন্ধুর দিদির সঙ্গে তত বেশি আলাপ করিনি ইতিপূর্বে। তিনি বিধবা, বয়েসও খুব বেশি নয়। তাঁকে দেখে আমি সমীহ করে ঘরের বাইরে চলে যাচ্চি, উনি বললেন—চা না খেয়ে যেন আর কোথাও বেরুবেন না।

আমি বললুম—দিদি, আমি গাড়ি এনেচি ডেকে, টেপাখোলা গিয়ে স্টীমার ধরবো।

তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন—আজই ? কেন ?

হেসে বলি—পরের চাকুরি দিদি, থাকবার কি যো আছে—

দিদি স্নেহের সুরে জোর-গলায় বললেন—আজ ভরা আমাবস্যে, আজ আপনার যাওয়া হতেই পারে না—আজ থাকুন—

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চাইলুম নিজের বোনের মতো সহজ সরল দৃঢ় আত্মীয়-তার সুর।

কোথাকার কে আমি, নাম ধাম জানা নেই, দুদিনের মেসের বন্ধু ওঁর ভাইয়ের—তাও কতদিন আগের !

যেতে মন সরলো না। গাড়ি সেদিন ফিরিয়ে দিলুম।

আর একটি ঘটনা ঘটেছিল মাদারিপুর ডাকবাংলোতে।

ফরিদপুর থেকে গিয়েচি মাদারিপুর। হাতের পয়সা-কড়ি ফুরিয়ে যেতে কেশোরামজিকে পত্র লিখলাম, তিনি কিছু টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন খরচপত্রের জন্যে। ডাক-বাংলোয় থাকি, পাঁচ ছ-দিন মাত্র আছি, কেউ আমাকে চেনে না মাদারিপুরে, পোস্টমাস্টার আমার মনিঅর্ডার বিলি করতে অস্বীকার করলে। যার নামে মনিঅর্ডার, সেই লোক যে আমি, তা সনাক্ত করবে কে ?

এদিকে পাঁচ দিনের ডাকবাংলোর ভাড়া বাকি, হাতে বিশেষ কিছুই নেই, বিষম মুশকিলে পড়তে হল।

সেই সময় ডাকবাংলোয় আমার পাশের কামরায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক কাজ উপলক্ষে এসে দিন-তিনেক ছিলেন। তাঁর নাম আমার মনে নেই—মাদারিপুর থেকে কিছু-দূরে কোনো স্থানের তিনি জমিদার। ডাকবাংলোর চৌকিদারের মুখে তিনি আমার বিপদের কথা সব শুনেছিলেন। একদিন আমায় ডাকিয়ে বললেন—আপনি কলকাতায় থাকেন?

বললাম—হাঁ, তাই বটে, কলকাতায় থাকি।

তিনি বললেন—আমি সব শুনেচি আপনার বিপদের কথা। এখানে আপনাকে টাকা ওরা দেবে না—আমি আপনাকে সনাক্ত করতে পারতাম, কিন্তু তাতে মিথ্যে কথা বলা হবে, সত্যিই আমি আপনাকে চিনি না। আমার প্রস্তাব এই যে, কলকাতার ভাড়া আপনাকে আমি দিচ্চি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না—পথিক ভদ্রলোক বিপদে পড়েচেন, অমন বিপদে সকলেই পড়তে পারে। আপনি আপনাদের আপিস থেকে গিয়ে টাকা নিয়ে আস্থন, আমার নাম-ঠিকানা রাখুন, আমার টাকাটা আমায় স্থবিধে মত পাঠিয়ে দেবেন।

তিনি আমার কলকাতার ভাড়া দিলেন—তাই নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরি। কেশোরামজি শুনে হাসতে হাসতে বললেন—তবেই আপনি আমাদের কাজ করেচেন! মনিঅর্ডার ধরতে পারলেন না, তবে আপনি ফি বারই কি টাকা নিতে কলকাতায় আসবেন নাকি?

আমি বললুম—এবার থেকে নোট রেজেস্ট্রি খামে পাঠাবেন, নইলে বিদেশে এই রকমই কাণ্ড। মুসলমান ভদ্রলোকের ঠিকানাতে কেশোরামজি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেই তাঁর টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন।

কতদিনের কথা, ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত মনে নেই—কিন্তু তাঁর সে উপকার জীবনে কখনো ভুলবো না। বিশেষ করে আজকাল হিন্দু-মুসলমানের এই বিবাদের দিনে সে কথা বেশি করে আমার মনে পড়ে।

বরিশালে গেলুম মাদারিপুর থেকে স্টীমারেই।

আড়িয়ল খাঁ নদীর ওপর দিয়ে স্টীমার কিছুদূর গিয়ে পড়ে কালাবদর নদীতে, তারপর মেঘনার মুখ দিয়ে ঘুরে যায়। পূর্ববঙ্গের নদীপথের শোভা যাঁরা দেখচেন, তাঁদের চোখের সামনে সেই স্থন্দরিবন দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলির ছবি আবার ভেসে উঠবে এ গাঁয়ের কথা উল্লেখ করলেই। আমি সেই একটিবার মাত্র ওপথে যাই, আর কখনো যাইনি—কিন্তু মনের পটে সে সৌন্দর্য আঁকা হয়ে গিয়েচে চিরকালের জন্যে। কত রোমান্সের এরা স্বপ্ন জাগায়—কত নতুন স্থষ্টির সাহায্য করে। মানুষের অন্তরের বিচিত্র অনুভূতিরাজির সন্ধান যেন মেলে এদের শ্যামল পরিবেশের মধ্যে; যত অপরিচয়, ততই স্ফূর্তি, ততই আনন্দ। দিনে রাতে, সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় এদের নিয়েই স্বপ্ন-পসারীর কত কারবার!

তবে কথা এই, সন্ধ্যাবেলায় নৌকা ভিড়লো গ্রামের ঘাটে, বেসাতি করি কখন? কত ধান ক্ষেত, খেজুর গাছ, তারাভরা রাত। সন্ধ্যায় গ্রামের বধূরা কলসী কাঁকে জল নিতে এসে

গা ধুয়ে নিলে, জলের আলপনা এঁকে চলে গেল বাড়ি ফিরে। কত কথা বলে এই মাঠঘাট, কতদিনের জনপদবধূদের চরণচিহ্ন আঁকা নদীর ঘাটের পথটি, বৃদ্ধ বকুল কি বটগাছ—আর এই সুপুরির সারি, অদ্ভুত শোভা এই সুপুরি বাগানের! শুধু চোখ-চেয়ে বসে থাকা স্টীমারের ডেকে, খাওয়া নয়, ঘুমানো নয়, শুধু জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত ডেকে বসে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা।

আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের স্টীমারেই আলাপ হল। তিনি আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে। বরিশালে স্টীমার লাগলো যখন, তখন তাঁর অনুরোধ ক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠলো—তিনি আমার জিনিসপত্র তাঁর কুলির মাথায় চাপিয়ে দিলেন। কাউনিয়াতে তাঁর বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি, জমিদার লোক, দেখেই বোঝা গেল।

ভদ্রলোকের দাদা বাড়ি পৌঁছলে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বরিশালে দুজন লোক আমার বড় ভালো লেগেছিল, তার মধ্যে ইনি একজন। শুধু ভালো লেগেছিল বললে এঁর ঠিক বর্ণনা দেওয়া হল না—ইনি একজন অদ্ভুত ধরনের লোক। পাড়াগাঁয়ের শহরে এমন একজন লোক দেখবো এ আমি আশা করিনি।

তাঁর মস্ত বাতিক শেক্সপিয়ারের ভুল বার করা। এই নাকি তাঁর জীবনের ব্রত। কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য শেক্‌স্‌পিয়ারে, কি চমৎকার পড়াশোনা! কীর্তনখোলা নদীর ঝাউবনের ধারে সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেড়াতে তিনি 'রোমিও জুলিয়েট' অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন এবং ওর মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে কি অসঙ্গতি তাঁর চোখে লেগেচে সেগুলো ব্যাখ্যা করে গেলেন। কখনও 'রোমিও জুলিয়েট', কখনও 'হ্যামলেট', কখনও 'টেম্পেস্ট'—এটা থেকে আবৃত্তি করেন, ওটা থেকে আবৃত্তি করেন—সে এক কাণ্ড আর কি। স্মৃতিশক্তি কি অদ্ভুত!

কিন্তু খানিকটা শুনেই আমার মনে হল শেক্সপিয়ারের সৌন্দর্য উপভোগ করা এঁর উদ্দেশ্য নয়। এমন কি, ভালো সমালোচনাও নয়—শেক্‌স্‌পিয়ারের খুঁত বার করে তিনি একখানা বইও লিখেছিলেন—আমায় একখানা উপহার দিলেন বরিশাল থেকে আসবার সময়। আমার আরও ভালো লাগতো এই ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহার ও ভদ্রতা। আমার তখন বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। তাঁর বয়স তখন অন্ততপক্ষে পঞ্চান্ন। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সতীর্থের মতই কথাবার্তা বলতেন, দোতলার ঘরে আমায় নিয়ে একসঙ্গে খেতে না বসলে তাঁর খাওয়াই হত না।

তিনি খুব হাসাতে পারতেন, সামান্য একটা কি কথার সূত্র ধরে এমন হাসির মশলা তা থেকে বার করতেন, আমার তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার উপক্রম হত। আমার মনে আছে একদিন কে তাঁকে বললে আমার সামনেই—ভেরিওরাম শেক্‌স্‌পিয়ারের নোট-গুলো দেখেচেন?

ভদ্রলোক দুটি আঙুল নিজের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—আরে, ভেরিওরাম লাগবো না (বরিশালের ইডিয়ম), আত্মারাম আছেন, আত্মারাম!

আমি তো হেসে গড়িয়ে পড়ি আর কি! কি বলবার ভঙ্গি, আর কি হাত নাড়ার কায়দা!

বড় শ্রদ্ধা হয়েছিল এই লোকটির ওপর আমার—এমন নির্বিরোধ, নিস্পৃহ, সদানন্দ, জ্ঞানতপস্বী চোখে বড় একটা তখনও পর্যন্ত দেখি নি—বইয়েতে টাইপ হিসেবে অবিশ্যি অনেক পড়েছিলুম। আমার বেশ মনে হয় আজও পর্যন্ত সে ধরনের মানুষ আর দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি।

প্রায়ই বিকেলবেলা আমায় নিয়ে তাঁর বেড়াতে যাওয়া চাই-ই। কোনোদিন কলেজের দিকে, কোনোদিন নদীর দিকে। বরিশাল শহরে আমি নতুন গিয়েচি—আমাকে জায়গা দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন তিনি। আর মুখে মুখে চলত শেক্‌স্‌পিয়ারের শ্রাদ্ধ। শেক্‌স্‌পিয়ার ভুলে ভরা, পাতায় পাতায় ভুল। এতদিন সমালোচকদের চোখে ধুলো দিয়ে লোকটা মহাকবি সেজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু আর চলবে না। শেক্‌স্‌পিয়ারের জারিজুরি সব বেরিয়ে গিয়েচে। মিথ্যে ক-দিন টেঁকে?

আমার খুব ভালো লাগতো এই সদানন্দ বৃদ্ধের সঙ্গ। শেক্‌স্‌পিয়ারের ভ্রম-প্রমাদ সম্বন্ধে তাঁর অত ব্যাখ্যাসহ বক্তৃতা সত্ত্বেও আমি কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করতুম না তাঁর কথা। কলেজ থেকে সবে বেরিয়েচি, বড় বড় শেক্‌সপিয়ারী সমালোচকদের নাম শুনে এসেচি সদ্য, তাঁদের অনেকের কাণ্ড দেখে এসেচি কলেজের লাইব্রেরিতে। তাঁদের বিরুদ্ধে বরিশালে কীর্তনখোলা নদীর ধারে উড়ানি গায়ে দেওয়া বৃদ্ধের মতবাদ আমার কাছে প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তবুও অবিশ্যি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে যেতুম।

আর একজন লোককে এই বরিশালেই দেখেছিলাম।

তাঁর নাম কুঞ্জবাবু। গলির মোড়ে একটি বাড়ির বারান্দায় প্রতিদিন বিকালে কুঞ্জবাবু বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মমূলক গল্প শোনাতেন। আমি একদিন শুনেছিলাম তিনি প্রহ্লাদের গল্প্ শোনাচ্চেন ওদের।

এমন সুন্দর বলবার ক্ষমতা যে, রাস্তার লোক কুঞ্জবাবুর গল্প শোনার জন্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যেতো। সে গল্প শোনবার মতো জিনিস। যখনই আমি কুঞ্জবাবুকে দেখতাম, সব সময়েই একদল ছেলেমেয়ে তাঁকে ঘিরে থাকতো।

কুঞ্জবাবুর সঙ্গে একদিন আলাপ হল অমনি এক রাস্তার ধারে। আমি তাঁকে বললুম—আপনার নাম আমি শুনেচি, বড় ভালো লাগে আপনার গল্প।

কুঞ্জবাবু দেখলুম লজ্জিত হয়ে পড়লেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম—কলকাতা থেকে আপিসের কাজে এসেচি, আবার দু-চারদিন পরে চলে যাবো।

—এখানে আছেন কোথায়?

—কাউনিয়াতে আছি—এক বন্ধুর বাড়িতে—

আমায় সঙ্গে করে তিনি একটি নীচু গোছের গোলপাতার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি ঠিক জানিনে সে ঘরটাতে তিনি সব সময় থাকতেন কিংবা তাঁর আলাদা কোথাও বাসা ছিল। ঘরের মধ্যে বসিয়ে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে অনেক ভক্তিমূলক কথাবার্তা কইলেন। আমায় একটা ছোট্ট রেকাবি করে বাতাসা আর শশাকাটা খেতে দিয়ে বললেন—ঠাকুরের প্রসাদ, মুখে দিন একটু। সরল-বিশ্বাসী ঈশ্বরভক্ত লোক। তাঁর পাণ্ডিত্য ততটা ছিল না, যত ছিল

ভগবানে বিশ্বাস ও ভালোবাসা; যতদিন বরিশালে ছিলাম, মাঝে মাঝে তাঁর সেই ছোট্ট ঘরটাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বড় আনন্দ পেতাম।

দুঃখের বিষয় আমি বরিশাল থেকে চলে আসবার অল্প কয়েক মাস পরেই উপরোক্ত দুই ভদ্রলোকই পরলোকগমন করেন। কলকাতায় বসে এ খবর আমি কার কাছ থেকে যেন শুনেছিলুম। আমার যতদূর মনে আছে শেক্‌সপিয়ারের সমালোচক ভদ্রলোকের নাম অমূল্য-বাবু। অমন আত্মভোলা ধরনের পণ্ডিত লোক আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি।

বরিশাল থেকে খালপথে উজীরপুর বলে একটা গ্রামে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি গেলুম বেড়াতে। একটা খালের মধ্য দিয়ে গিয়ে আর একটা খালে পড়লুম, সেখান থেকে আর একটা খাল—সারা রাত্রিই চলচে নৌকো। রাত এগারোটার সময় ইসলামকাটি বলে একটা বাজারে নৌকো থামিয়ে মাঝিরা খেতে গেল।

বরিশালের মাঝিদের কথা ভালো বুঝিনে। আমি ওদের জিজ্ঞেস করলুম, কত দেরী হবে রে রেঁধে খেতে? ওরা কি একটা বললে, আমি ধরে নিলাম দুঘণ্টা দেরি হবে। অন্ধকার রাত, আমি নৌকো থেকে নেমে ইস্‌লামকাটির বাজারে বেড়াচ্চি, ক্রমে বাজারের পেছনের পথ দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেচি।

আমার মনে তখন নতুন দেশ দেখার তাজা নেশা, যা দেখচি তাই ভালো লাগে। পথের ধারের বন্য শঠি ঝোপ, তাই যেন কি অপূর্ব দৃশ্য! নতুন এক হিসেবে বটে, কারণ শঠিগাছ আমাদের দেশে না থাকায় কখনো চোখে দেখিনি এর আগে।

পূজোর ষষ্ঠী সেদিন, বন্ধুর সঙ্গে কলেজে একত্র পড়তুম, সে আমায় বলেছিল, বরিশালে যদি যাও তবে আমাদের গ্রামে অবিশ্যি করে যেও পূজোর সময়। সেই উপলক্ষে যাওয়া। কখনো এদিকে আসিনি, বরিশাল জেলার নামই শুনে এসেচি এতদিন—কতদূর এসে পড়েচি কলকাতা থেকে, কতদূর এসে পড়েচি নিজের গ্রাম থেকে—জগতে এত আনন্দ ও এত বিস্ময়ও আছে!

কে কবে ভেবেছিল একদিন আবার ইস্‌লামকাটি বলে একটা বহুদূর অজ্ঞাত স্থানে বুনো শঠিগাছের ঝোপ দেখবো রাত্রিবেলা!

বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌছাই সকালবেলা।

সে গ্রাম আমার ভালো লাগেনি—ছোট কর্দমাক্ত খাল বাড়ির সামনে, তার আবার বাঁধা ঘাট, আমাদের দেশের নদীর সৌন্দর্য অন্য ধরনের এবং এর চেয়ে কত ভালো কেবল সেই কথা মনে হচ্ছিল। গ্রামের লোকের কথা ভালো বুঝতে পারিনে—কথার উচ্চারণের মধ্যে মিষ্টত্ব ও সরসতা আদৌ নেই, কতকগুলি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-রীতি কর্ণকে পীড়া দেয়।

এ রকম আমার মনে হবার একটি কারণ, সেই আমার প্রথম পূর্ববঙ্গে যাওয়া—তখন আমি ওখানকার গ্রাম্যকথা শুনতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলাম না—এখন কানে অনেকটা সয়ে গিয়েচে। একটি ব্রাহ্মণ-বাড়িতে পূজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলুম বন্ধুর সঙ্গে। আমাদের

অঞ্চলে শহরের টানে ক্রিয়াকর্মের খাওয়ানো ব্যাপারে যে সব শৌখিনতা ও বিলাসিতা এসে পড়েচে, বরিশাল জেলার একটি সুদূর পল্লীগ্রামে সে সব থাকবার কথা নয়, সন্দেশ রসগোল্লার পরিবর্তে তাই এখানে নারিকেলের নাড়ু আর পক্কান্ন মেঠাই দিলেও নিন্দা হয় না। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম ওখানে, প্রায় সকলেই ছাঁদা নিয়ে যায় এবং যেতে অভ্যস্ত, তাতে কোন সঙ্কোচ নেই কারো—প্রায় প্রত্যেকেই বসে যে পরিমাণ খেলে, সেই পরিমাণ মেঠাই নাড়ু গামছায় কি চাদরে বেঁধে নিয়ে এল।

আমাদের দেশে এ প্রথা আগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, এখন আর কেউ ছাঁদা বাঁধে না—শহরের টানে এ প্রথা একেবারে উঠে গিয়েচে।

পূর্ণিমার রাত্রে আবার খালপথে ওখান থেকে এলুম বরিশালে—সারারাত্রি জ্যোৎস্না-লোকিত মাঠ, তারা আর শঠির বনের শোভা দেখতে দেখতে ফিরলুম।

ঝালকাঠি বলে একটা বড় গঞ্জ আছে বরিশাল জেলার মধ্যে। এখান থেকে একটা স্টীমার ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত যায় সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে। আমার যাওয়ার কথা ছিল মরেলগঞ্জ। অনেকে বললে ওখানে সুন্দরবনের অনেকখানিই দেখা যাবে।

ঝালকাঠিতে এলুম সেই উদ্দেশ্যে। বরিশাল অঞ্চলে এমন জায়গাকে বলে 'বন্দর'। বাংলাদেশের গৃহস্থাপত্য কোনো কালেই ভালো নয় বলে আমার ধারণা, আজকাল কলকাতা বা ছোট-বড় শহরে আধুনিক গৃহ-স্থাপত্যের যে নিদর্শন দেখা যায়, তাদের ছাঁচ এ-দেশী নয় সকলেই জানেন। ঝালকাঠিতে এসে এখানকার বাড়িঘর দেখে মন এমন দমে গেল—এতটুকু সৌন্দর্যবোধ থাকলে কেউ এ ধরনের বাড়ি করে না।

এত বড় গঞ্জ, কিন্তু এখানে প্রায় সব বাড়িই করোগেট টিনের—কি ব্যবসা বাণিজ্যের গুদামঘর, কি গৃহস্থবাড়ি। ফলে দোকান, গুদাম ও ভদ্রাসন বাড়ির একই মূর্তি। তারপর অবিশ্যি লক্ষ্য করেচি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই এই টিনের ছাউনির চলন হয়েছে আজকাল। খড়ের ঘরের যে শান্ত শ্রী আছে, টিনের ঘরের তা নেই, বরং টিনের চেয়ে লাল টালির ঘরও অনেক ভালো দেখতে। ঝালকাঠিতে বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িও দেখেছি টিনের ছাউনি।

বাড়ির সামনে এক-আধটু ফুলের বাগান কি সুদৃশ্য দু-একটা গাছপালাও কেউ শখ করে করেনি। টিনের ঘরের পাশে তা থাকলেও অন্তত বাড়ির কর্কশ রুক্ষতা একটু দূর হয়—কিন্তু ফুলের বালাই নেই কোন বাড়িতে।

এক জায়গায় কেবল আছে দেখেছিলুম, তাও কলকাতার টানে।

নদীর ধারে ভূকৈলাসের জমিদারদের প্রকাণ্ড কাছারিবাড়ি আছে—খুব বড় বড় থামওয়ালা সেনেট হাউসের মত চওড়া ধাপওয়ালা বাড়ি—এই টিনের ঘরের রাজ্যে এ বাড়িখানা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ঝালকাঠি আমার ভাল লেগেছিল অন্য দিক থেকে। আমাদের গ্রামে নেপাল মাঝি বলে একজন লোক ছিল আমার ছেলেবেলার, সে অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসা করে হাতে বিলক্ষণ দুপয়সা করেছিল। তার মুখে ঝালকাঠির কথা খুব শুনতাম।

নেপাল মাঝি একবার ঝালকাঠি বন্দরে নৌকো লাগিয়েছিল, তখন সে অপরের নৌকোতে মাঝিগিরি করতো—সে সময় বন্দরে আগুন লাগে।

একজন লোক একটা কাঠের হাতবাক্স নিয়ে জ্বলন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে বলে—মাঝি, বাক্সটা ধরে রাখো তো—আমি আসচি—

এরপরে লোকটা আর নাকি ঠিক করতে পারেনি কার হাতে বাক্সটা দিয়েছিল, নেপালও স্বীকার করেনি। সেই হাতবাক্সটি সে আত্মসাৎ করে। অনেক টাকা পেয়েছিল বাক্সের ভেতর, সেই টাকায় ব্যবসা করে নেপাল অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিল।

এ গল্প অবিশ্যি নেপাল মাঝির মুখে শুনিনি, নেপালের শত্রুরা বলতো এ কথা। তিনখানা বড় মহাজনী নৌকোতে সুপুরি আর বালাম চাল বোঝাই দিয়ে সে ঝালকাঠি থেকে, আমাদের দেশে যেতো প্রতি বছর।

আমি ঝালকাঠি বাজারের একটা বড় আড়তে নেপালের নাম করতেই আড়তের মালিক তাকে চিনতে পারলে। বললে—সে অনেকদিন আসে না, বেঁচে আছে কি জানেন?

এতদূরে এসে যদি দেশের লোকের কথা শোনা যায় অপরের মুখে, আমার বাল্যকালের নেপাল মাঝির সন্ধান রাখে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তবে সত্যিই বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

তিনদিন পরে স্টীমারে বরিশাল থেকে চাটগাঁ রওনা হই।

ছোট স্টীমার, লোকজনের ভিড়ও বেশি নেই—ডেকচেয়ার পেতে সামনের ডেকে বসে দূরের তীররেখা ও ঘোলা জল দেখে সারাদিন কোথা দিয়ে কেটে যায়! ভোলা বলে বরিশালের একটা বন্দরে স্টীমার লাগলো পরের দিন সকালে।

এই ভোলার নামও করতো আমাদের গ্রামের নেপাল মাঝি। কি দুঃসাহসিক লোকই ছিলো, ধনপতি সদাগর কি ভাস্কো ডা গামা জাতীয় লোক ছিল আমাদের নেপাল, ছেলেবেলায় কি তাকে ভালো করে চিনতাম? কোথায় আমাদের সেই ছোট্ট নদী, নদীতীরে বাঁশবনে ছায়া, কুঁচলতার ঝোপটি—আর কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের বন্দর ভোলা!

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সন্দীপের উপকূলে স্টীমার গিয়ে নোঙর করলে আর স্টীমার থেকে সব লোক নেমে চলে গেল—এমন কি খালাসীগুলো পর্যন্ত নেমে গেল। সন্দীপের উপকূলে এই সন্ধ্যাটি আমার চিরদিন মনে থাকবে।

আমার একদিকে বঙ্গোপসাগর, তার কূলকিনারা নেই—আসলে যদিও এটা সন্দীপের খাঁড়ি, ঠিক বহিঃসমুদ্র নয়, কিন্তু দৃষ্টি যখন কোথাও বাধে না, তখন আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে সমুদ্রের যে রূপ ফুটে উঠেচে তার সঙ্গে কি বঙ্গোপসাগর, কি ভারত মহাসমুদ্র—কারো কোনো তফাতই নেই।

অদূরের তীরভূমি অপূর্ব সুন্দর, তাল আর নারকেল সুপারির বনে ঘন সবুজ। সন্ধ্যায় যখন সবাই নেমে গেল, আমি স্টীমারে একেবারে একা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম শেষ

বৈকালের ক্রমবিলীয়মান রৌদ্র পীত থেকে স্বর্ণাভ, ক্রমে রাঙা হয়ে কি ভাবে তালীবন-রেখার শীর্ষদেশে উঠে গেল, আকাশ কি ভাবে পাটকিলে, তারপর ধূসর, ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল।

অনেক দিন আগের সেই সন্ধ্যায় যে সব কথা আমার মনে এসেছিল—তা আমার আজও মন থেকে মুছে যায়নি, সন্দীপের সমুদ্র-উপকূলের বহুবর্ষ আগেকার সেই সন্ধ্যাটির ছবি মনে এলে, কথাগুলোও কেমন করে মনে পড়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে স্টীমার ছাড়লো।

চট্টগ্রামের যাত্রীদল শেষরাত্রে ডিঙি করে এসে স্টীমারে উঠলো—তাদের হৈ-চৈ আর গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। ডেকে ভিড় জমে গেল খুব, তার ওপর বস্তা বস্তা শুঁটকি মাছ এসে জুটলো, বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো মাছের দুর্গন্ধে।

সকালে যখন সূর্যোদয় হল, তার আগে থেকেই দক্ষিণদিকে কূলরেখাবিহীন জলরাশি, বামে নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের ক্ষীণ তীররেখা আর কিছুদূর গিয়েই নীল শৈলমালা। সন্দীপ চ্যানেল ছেড়ে স্টীমার অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যে বা'র সমুদ্রে পড়ল—তার পরেই কর্ণফুলির মোহনায় ঢুকে ডবল মুরিংস্‌এ নোঙর ফেললে।

চট্টগ্রাম সুন্দর শহর, তবে অত্যন্ত অপরিষ্কার পল্লীও আছে শহরের মধ্যেই। একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, কলকাতার বাইরে সব শহরের এক মূর্তি। সেই সংকীর্ণ ধুলোয় ভর্তি রাস্তা, গলিঘুঁজি, খোলা ড্রেন, টিনের ঘরবাড়ি!

কেন জানিনে, এ সব ছোট শহরে দিনকয়েক থাকলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—দীর্ঘকাল এখানে যাপন করা এক রকম অসম্ভব। তবুও চাটগাঁ বেশ সুদৃশ্য শহর একথা স্বীকার করতেই হবে। শহরের মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় পাহাড়; এর যে কোনো পাহাড়, বিশেষ করে কাছারির পাহাড়ের ওপর উঠলে একদিকে সমুদ্র ও অন্যদিকে বহুদূরে আরাকানের পর্বতমালার নীল সীমারেখা চোখে পড়ে।

এখানে একটি পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে পড়েছিল।

আমি স্টীমার থেকে নেমেই এদের বাড়িতে গিয়ে উঠি। বাড়ির কর্তার নামে আমাদের সমিতির একখানা চিঠি ছিল।

কখনো এদের চিনিনে, চাটগাঁয়ে এই আমার প্রথম আগমন।

বেশ বড় বাড়ি, ঢুকে বাইরের ঘরে দুজন চাকরের সঙ্গে দেখা—জিজ্ঞেস করে জানলুম বাড়ির কর্তা কাছারিতে বেরিয়েচেন, আসতে প্রায় চারটে বাজবে।

সুতরাং বসেই আছি, কাউকেই জানিনে এখানে, কর্তার সঙ্গে দেখা করবার পরে যাবো, না হয় একটু বসি।

বাড়ির মধ্যে থেকে এসে চাকরে জিজ্ঞেস করলে—মা জিজ্ঞেস করচেন, আপনি কি স্নান করবেন?

বললুম—স্নানাহার করবার কোনো দরকার নেই এখন। আমার আসল দরকার শেষ হলে আমি এখান থেকে চলে যাবো।

—না, তা হবে না বাবু, আপনাকে খাওয়া দাওয়া করতে হবে, মা বলে দিলেন।

বাড়ির কর্ত্রীর আদেশ অমান্য করতে মন উঠলো না। স্নানাহার সেখানেই করলুম এবং কর্তা কাছারি করে বাড়ি ফিরে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করবার পরে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন, এখানেই থাকুন না কেন?

আমি আপত্তি করলুম—ডাকবাংলোয় যাবো ভেবেচি, কেন মিছে আপনাদের কষ্ট দেওয়া?

আমার আপত্তি গ্রাহ্য হল না। বৈঠকখানার পাশের ঘরটায় আমার থাকবার জায়গা হল এবং এর পরে দিন দশেক কাজের খাতিরে চাটগাঁয়ে ছিলুম—অন্য কোথাও আমায় ওঁরা যেতে দিলেন না।

বড় উদার পরিবার, দু পাঁচ দিনের মধ্যে আমি যেন তাঁদের বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেলুম। বাড়ির মধ্যে গিয়ে রান্না-ঘরের মধ্যে খেতে বসি, মেয়েরা পরিবেষণ করে, কাউকে দিদি কাউকে মাসিমা বলে ডাকি। তাঁরাও আমায় স্নেহের চোখে দেখেন। বারো দিন পরে যখন আমি চাটগাঁ ছেড়ে কক্সবাজার গেলুম, তখন সত্যিই তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লেন, বার বার বলে দিলেন, আমি যেন ফিরবার সময় আবার এখানে আসি।

কক্সবাজারে যাবার পথে মহেশখালি চ্যানেল নামে ক্ষুদ্র সমুদ্রের খাড়ি পড়ে।

দূরে চর কুতুবদিয়াতে লাইট হাউস ও আদিনাথ পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে আমি এদের কথা কতবার ভেবেচি। এতদূর বিদেশে যে আত্মীয়-বন্ধু লাভ করবো, তাদের ছেড়ে আসতে যে কষ্ট হবে, তারাও চোখের জল ফেলবে আমার আসবার সময়ে—এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে তখন নতুন, তাই বড় আশ্চর্য মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা।

কিন্তু পরবর্তী জীবনে কতবার এ অভিজ্ঞতা আমার যে হয়েচে। পর কতবার আপন হয়েচে, এমন কি আমার বিশ্বাস পর যত সহজে আপন হয়, আপনার লোকে তত সহজেও হয় না এবং তত আপনও হয় না।

কক্সবাজারে একদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

জীবনের সে এক বিপদ্‌জনক অভিজ্ঞতা—প্রাণসংশয়ও ঘটতে পারতো সেদিন।

কক্সবাজারে সমুদ্রের ধারে, সাগরবেলায় জোয়ার নেমে গেলে কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক ইত্যাদি কত পড়ে থাকে; বড় বড় সমুদ্রের ঢেউ এসে কূলে তাল দেয়। জ্যোৎস্না-পক্ষের রাত্রি, কত রাত পর্যন্ত সেখানে একা চুপ করে বসে থাকি, যশোর জেলার একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম থেকে কতদূর যেন চলে এসেচি, সেখানকার ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর কথা মনে পড়ে, ইছামতীর দুপাড়ের বাঁশবনের কথা ভুলতে পারিনে, এত দূরে বসে দেশের স্বপ্ন দেখতে কি ভালোই যে লাগে!

কাউখালি বলে ছোট্ট একটি নদী বা খাল কক্সবাজারের পাশ দিয়ে এসে সমুদ্রে পড়েচে। একদিন একখানা সাম্পান ভাড়া করে কাউখালি থেকে বার হয়ে সমুদ্রে বেড়াতে গেলুম।

মাঝি মাত্র একজন, চাটগাঁয়ের বুলিতে বললে, কতদূর যাবেন বাবু?

—অনেকদূর চলো সমুদ্রের মধ্যে। সন্ধ্যের পর ফিরবো—

—আদিনাথ যাবেন?

একটা ছোট পাহাড় সমুদ্রগর্ভ থেকে খাড়া উঠেছে—তার মাথায় আদিনাথ শিবের মন্দির। এ অঞ্চলের এটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, অনেক দূর থেকে লোকে আসে আদিনাথ দর্শন করতে, শিবরাত্রির সময় বড় মেলা হয়। কাউখালি নদী যেখানে এসে সমুদ্রে পড়লো, তার ডাইনে প্রায় মাইল দুই দূরে আদিনাথ পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠেচে, আর ঠিক সামনে অদূরেই একটা বড় চড়ার মতো কি দেখা যাচ্চে। মাঝিকে বললুম—ওটা কি চড়া পড়েচে?

মাঝি বললে—না বাবু, ওটা সোনাদিয়া দ্বীপ। ভাঁটার পরে ওখানে অনেক কড়ি, শাঁক, ঝিনুক পড়ে থাকে।

শুনে আমার লোভ হল। মাঝিকে সোনাদিয়া দ্বীপে যেতে বললুম।

মাঝি একবার কি একটা আপত্তি করলে, আমি ভালো বুঝলুম না ওর কথা।

সাম্পান সাগর বেয়ে চলেচে, বিকেল পাঁচটা, সমুদ্রের বুকে সূর্য ডুবুডুবু, হু-হু খোলা হাওয়া কাউখালির মোহানা দিয়ে ভেসে আসচে, আদিনাথ পাহাড়ের মাথায় অস্ত-সূর্যের রাঙা রোদ। মনে হয় যেন কত কাল ধরে সমুদ্রের বুকে ভাসচি, দূরের সাউথ সি দ্বীপপুঞ্জের অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাগরবেলা, যা ছবিতে ছাড়া কখনো দেখিনি—তাও যেন অনেক নিকটে এসে পৌঁছেচে—তাদের শ্যাম নারিকেলপুঞ্জের শাখাপ্রশাখার সঙ্গীত যেন শুনতে পাই।

সোনাদিয়া দ্বীপে যখন সাম্পান ভিড়লো তখন জ্যোৎস্না উঠেচে।

ছোট্ট চড়ার মতো ব্যাপারটা, গঙ্গার বুকে বালি হুগলি শহরের সামনে অমন ধরনের চড়া কত দেখেচি ছেলেবেলায়। একটা গাছপালা নেই, বাড়িঘর তো নেই-ই, শুধু একটা বালির চড়া—জল থেকে তার উচ্চতা কোথাও হাত খানেকের বেশি নয়।

কিন্তু সে কি সুন্দর জায়গা! অতটুকু বালির চড়া বেষ্টন করে চারি ধারে অকূল জলরাশি, জ্যোৎস্নালোকে দূরের তটরেখা মিলিয়ে গিয়েচে। আদিনাথ পাহাড়ও আর দেখা যায় না, সুতরাং আমার অনুভূতির কাছে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বুকে যে-কোনো জনহীন দ্বীপই বা কি, আর কক্সবাজারের সমুদ্র-উপকূল থেকে মাত্র দু মাইল দূরের সোনাদিয়া দ্বীপই বা কি, আমাদের গ্রামের মাঠে বসে বৈকালে আকাশের দিকে চেয়ে মেঘস্তূপের মায়ায় রচিত তুষারমৌলী হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ কি ত্রিশূল কতদিন প্রত্যক্ষ করিনি কি!

মনে কল্পনায় এই জগৎকে আমরা অহরহ সৃষ্টি করে চলেচি—আমরা নিজেরাই তার স্রষ্টা। প্রত্যেক মানুষটি স্রষ্টা; যার যেমন কল্পনা, যার যেমন ধারণাশক্তি, যেমন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার—সে তেমনি সৃষ্টি করে।

বই-লেখা, উপন্যাস-লেখাই শুধু সৃষ্টি নয়। প্রতিদিনের ধ্যান ও স্বপ্ন আমাদের চারপাশে মায়াজালের যে বুনুনি রচনা করে তাও সৃষ্টি। তারই বাহ্যপ্রকাশ হয় সঙ্গীতে, কথাশিল্পে, ছবিতে, নাটকে, কথাবার্তার মধ্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে। কোন্ মানুষ স্রষ্টা নয়?

ঝিনুক ও কড়ি যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে আছে সারা চড়ার ওপরে। আর আছে এক ধরনের লাল কাঁকড়া, বালির মধ্যে এরা ছোট ছোট গর্ত করে গর্তের মুখে চুপ করে বসে আছে, মানুষের পায়ের শব্দ পেলে তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বোধ হয় ঘণ্টা খানেক কেটে থাকবে—এমন সময় সাম্‌পানের মাঝি বললে—বাবু, শীগ্‌গির নৌকোয় উঠে বসুন—জোয়ার আসচে।

ওর গলায় ভয়ের সুর। বিস্মিত হয়ে বললুম—কেন, কি হয়েচে?

মাঝি বললে—সোনাদিয়া দ্বীপ জোয়ারের সময় ডুবে যায়—সাঁতার জানলেও অনেকে ডুবে মরেচে। একটু তাড়াতাড়ি করুন কর্তা—

বলে কি! শেষকালে বেঘোরে ডুবে মরতে রাজি নই। একটু বেশি তাড়াতাড়ি করেই সাম্‌পানে উঠলুম। বড় বড় ঢেউ এসে সোনাদিয়ার চড়ায় আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো—তার আগেই আমরা চড়া থেকে দূরে চলে এসেচি।

কিন্তু যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্চি, সেটা ঘটলো এর ঠিক পরেই—জোয়ারে ডুবে মরবার সম্ভাবনার চেয়ে সেটা কম বিপদ্‌জনক নয়।

খানিক দূর এসে সমুদ্রের মধ্যে কুয়াশা নামলো। কোনোদিক দেখা যায় না, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র কুয়াশার বর্ণনা মনে পড়লো। কুয়াশা এমন ঘন যে অত বড় আদিনাথ পাহাড়টা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে পড়েচে।

মাঝে মাঝে সাম্‌পানের দাঁড় ফেলার সময় যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্চে তার মধ্যে অসংখ্য জোনাকি পোকার মতো কি জ্বলে জ্বলে উঠচে—বসে বসে লক্ষ্য করচি অনেকক্ষণ থেকে। সমুদ্রের আলোকোৎক্ষেপী ঊর্মিমালার কথা বইতেই পড়েছিলুম এর আগে, এইবার চোখে দেখলুম।

ঘণ্টাখানেক সাম্‌পান চলেচে—কূলের দেখা নেই।

মাঝি কখনো বলে, ওই সামনে ডাঙা দেখা যাচ্চে—কখনো বলে, আদিনাথ পাহাড়ের দিকে গিয়ে পড়চি। আমার ভয় হল সে দিক ভুলে আদিনাথ পাহাড়ের দিকেই যাচ্চে—আদিনাথের নীচে সমুদ্রের মধ্যে দু-চারটি মগ্নশৈল থাকা অসম্ভব নয়, তাতে ধাক্কা মারলে সাম্‌পান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে বেশি দেরি লাগবে না।

যদি বা'র-সমুদ্রে পড়ি, দিক ভুল হয়ে, তবে বিপদ আরও বেশি। একবার কাগজে পড়েছিলুম, সুন্দরবনের কি একটা জায়গা থেকে কয়েকটি লোক একখানা ডিঙি নৌকো করে কোন্ দ্বীপে কুমড়ো আনতে যায়। ফিরবার পথে তারা দিক ভুল করে বা'র-সমুদ্রে গিয়ে পড়ে—সমুদ্রে কি করে নৌকো চালাতে হয় তাদের তা জানা ছিল না—এগারো দিন পরে ব্রহ্মদেশের উপকূলে যখন তাদের ডিঙি গিয়ে ভাসতে ভাসতে ভিড়লো, তখন মাত্র একজন জীবিত আছে। এ সময় হঠাৎ সে কথাটাও মনে পড়লো।

মাঝিও যেন একটু বিপন্ন হয়ে পড়েচে। সে বললে—বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে? সাম্‌পানে মশাল আছে, একটা ধরিয়ে নিই।

তাকে বললুম, মশাল কি হবে ?

—মশাল জ্বালা দেখে অন্য নৌকো কি স্টীমার আমাদের পাবে। একটা বিপদ আছে বাবু, এই পথ দিয়ে বড় জাহাজ রেঙ্গুন কি মংডু থেকে চাটগাঁ যায়—কুয়াশার মধ্যে যদি ধাক্কা লাগে তবে তো সাম্পান ডুবে যাবে—আর একটা বিপদ বাবু, মাঝে মাঝে বয়া আছে, সমুদ্রের মধ্যে, তাদের মাথায় আলো জ্বলে—যদি কুয়াশার মধ্যে আলো টের না পাই তবে বয়ার গায়েও ধাক্কা লাগতে পারে—

—ঠিক সেই কারণে তো আমাদের মশালও না দেখা যেতে পারে অন্য নৌকো বা স্টীমার থেকে ?

মাঝি সে কথার কোনো উত্তর দিলে না। আমি দেশলাই বার করে মাঝির হাতে দিতে যাবো, এমন সময় কি একটা শব্দে চমকিত হয়ে বলে উঠলুম—কিসের শব্দ মাঝি ?

মাঝির গলার স্বর ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেচে—সে বলে উঠলো, বাবু, সাম্পানের কাঠ আঁকড়ে ধরুন জোর করে—সামনে পাহাড়—

একমুহূর্তে বুঝে ফেললুম আমাদের সঙ্কটের গুরুত্ব। সামনে আদিনাথ পাহাড়, দিক ভুল করে মাঝি সাম্পান নিয়ে এসেচে উত্তর-পূর্ব দিকে—কিছুই চোখে দেখা যায় না, শুধু সাগরের ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছড়ানোর শব্দে বোঝা যায় যে পাহাড় নিকটবর্তী। কিন্তু আরও দশ মিনিট কেটে গেল। পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের শব্দ তখনও সামনের দিকে, কিন্তু সাম্পান যেন সে শব্দকে ছাড়িয়ে আরও উত্তরে চলে যাচ্ছে।

ব্যাপার কি। মাঝিও কিছু বলতে পারে না!

হঠাৎ আমার মনে হল ঠিক সামনেই কাউখালি নদী সমুদ্রে পড়চে ; কুয়াশা তখনও খুব ঘন, এ সব কুয়াশা ক্রমে ক্রমে পাতলা হয় না, অতর্কিতে এক মুহূর্তে চলে যাবে। আমি মাঝিকে বললুম—মাঝি, নদীর মোহানা সামনে—

মাঝি বললে—বাবু, ও কাউখালি নয়, আদিনাথের ঝরনা, কুয়াশার মধ্যে ওই রকম দেখাচ্চে, আমরা উত্তর দিকে যাচ্চি ভেসে। এ জায়গাটা আরও ভয়ানক—

মাঝি আমাকে যাই বলুক, ভয়ের চেয়ে একধরনের অদ্ভুত আনন্দই বেশি করে দেখা দিয়েচে মনে। সমুদ্রে দিক্‌হারা হয়ে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বো এ তো বাল্যকালের স্বপ্ন ছিল ; নাই বা হল খুব বেশি দূর—মাত্র চট্টগ্রামের উপকূল—সমুদ্র, সব জায়গাতেই সমুদ্র, মাথার ওপরকার আকাশ সব জায়গাতেই নীল, কল্পনা সর্বত্রই মনে আনে নেশার ঘোর। কিন্তু আমার অদৃষ্টে বেশি ঘটলো না। আদিনাথের নীচে কয়েকখানা জেলেডিঙি বাঁধা, আমাদের সাম্পানের আলো দেখতে পেয়েছিল। তাদের লোক মাঝিকে ডাক দিয়ে কি বললে, সেখানে অতি সহজেই আমাদের নৌকো ভিড়লো।

আরও আধঘণ্টা পরে কুয়াশা কেটে গেল। সেই জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রবক্ষে সাম্পান ছেড়ে আমরা এসে পৌঁছলুম কাউখালি মোহানায়। দূরের সমুদ্র স্থির নিস্তরঙ্গ, তটভূমির

ঝাউয়ের সারির মধ্যে নৈশ বাতাসের মর্মরধ্বনি; বড় বড় ঢেউ যখন এসে ডাঙায় আছড়ে পড়চে, তখন তাদের মাথায় যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলচে।

কক্সবাজার থেকে গেলুম মংডু।

'নীলা' বলে একখানা ছোট স্টীমার চাটগাঁ থেকে কক্সবাজারে আসে, সেখানা প্রতি শুক্রবারে তখন মংডু পর্যন্ত যেতো। শুঁটকি মাছ স্টীমারের খোলে বোঝাই না থাকলে এ সব ছোট জাহাজের ডেকে যাওয়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক। উপকূল আঁকড়ে জাহাজ চলে, সুতরাং একদিকে সব সময়েই সবুজ বনশ্রেণী, মেঘমালা, জেলেডিঙির সারি, কাঠের বাড়ি, বৌদ্ধ মন্দির, মাঝে মাঝে ছোট নদীর মুখ, কখনো রৌদ্র কখনো মেঘের ছায়া—যেন মনে হয় সব মিলিয়ে সুন্দর একখানি ছবি।

কিছুদূর গিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কিসের কারখানা আছে, চর থেকে কলের চিমনির ধোঁয়া উড়চে দেখা যায়। স্টীমারের লোকে বললে—করাতের কল, বনের কাঠ চিরে ওখান থেকে জাহাজে বিদেশে রওনা করা হয়।

বিকেলে মংডুতে স্টীমার ভিড়লো। মংডু একেবারে ব্রহ্মদেশ। সেখানে পা দিয়েই মনে হল বাংলা দেশ ছাড়িয়ে এসেচি। বর্মী মেয়েরা মোটা মোটা এক হাত লম্বা চুরুট মুখে দিয়ে জল আনতে যাচ্চে, টকটকে লাল রেশমী লুঙি পরা যুবকেরা সাইকেলে চড়ে সতেজে চলাফেরা করচে, পথের ধারে এক এক জায়গায় ছোট ছোট চালাঘর, সেখানে পথিকদের জলপানের জন্যে এক কলসী করে জল রাখা আছে।

এখানে একটি ব্রহ্মদেশীয় পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায় খুব অদ্ভুত ভাবে। একদিন মংডুর পুরনো পোস্টাপিসের পেছনের রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের ধারে যাচ্চি, একটি বৃদ্ধ চাটগেঁয়ে মুসলমান মাল্লা আমায় বললে, বাবু, আমায় মেহেরবানি করে একটা কাজ করে দেবেন, একখানা দরখাস্ত লিখে দেবেন ইংরিজিতে?

তারপর আমাকে সে একটা টিনের বাংলো ঘরে নিয়ে গেল। বাংলোর ভেতরটাতে কারা আছে তখন জানতুম না, বাইরের একসারি ছোট ঘরে অনেকগুলো জাহাজী মাল্লা বাসা করে আছে বলে মনে হল। আমার হাতে তখন পয়সার সচ্ছলতা নেই, দরখাস্ত লিখতে ওরা আট-আনা পারিশ্রমিক দিলে, আমিও তা নিয়েছিলাম।

দরখাস্ত লিখে চলে আসচি, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ মাল্লাটি বললে, বাবু, ওই বর্মী সাহেব আপনাকে ডাকচে, ভেতরের ঘরে থাকে ওরা।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। অপরিচিত স্থানে যেতে মন সরল না, কি জানি কার মনে কি আছে! কিছুক্ষণ পরে একটি বৃদ্ধ বর্মী ভদ্রলোক আমায় হাসিমুখে বাঁকা চাটগাঁয়ের বুলিতে বললেন—আসুন বাবু, আপনাকে একটু দরকার আছে।

যে ঘরে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন, সে ঘরে তিন চারটি সুবেশা তরুণী বসে ছিলেন, সকলেই দেখতে বেশ সুশ্রী। প্রত্যেকের সামনে একটা ছোট বাটি, তাতে সাদা মতো

কি গুঁড়ো, একটু ঢুকেই চোখে পড়লো ; ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলে আমি আর ওঁদের দিকে চাইনি। ভদ্রলোক আমায় বাংলায় বললেন—একটু চা খাবেন? আমার বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটেনি, আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মেয়েরা ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ বললেন, আপনাকে ডেকেচি কেন বলি। আমি কাঠের ব্যবসা করি, বাজারে আমার কাঠের আড়ৎ আছে। একজন বাঙালী বাবু আমার আড়তে ইংরিজি চিঠিপত্র লিখতো আর আমার মেয়ে তিনটিকে ইংরিজি পড়াতো, সে চলে গিয়েচে আজ দুমাস। আর আসে না, চিঠি লিখলে জবাব দেয় না, অথচ আমার জরুরী চিঠি দু-তিনখানার উত্তর না দিলে নয়। আপনি মোবারক খালাসির দরখাস্ত লিখছিলেন শুনে আপনাকে ডাকলুম। যদি দয়া করে লিখে দেন, আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক যা হয় আমি দেবো।

আমি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলুম। আমি যে-কদিন এখানে থাকবো, তিনি আমায় দিয়ে তাঁর চিঠি লিখিয়ে নিতে পারেন। যা ইচ্ছে হয় দেবেন, সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নেই।

একটু পরে ওঁর মেয়েরা চা নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দিলেন, সকলেই বাংলা বলতে পারেন বটে কিন্তু তাঁদের বাংলা বোঝা আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হয়ে উঠেছিল প্রতিবার। কথাটা তাঁদের বিনীত ভাবে বুঝিয়ে বললুম। আমার বাড়ি কলকাতায়, চট্টগ্রামের ভাষা ভাল বুঝি না, তার ওপরে বিকৃত চট্টগ্রামের বুলি তো আমার পক্ষে একেবারেই দুর্বোধ্য। ইংরিজিতে যদি বলেন তবে আমার সুবিধে হয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কথাগুলি বললুম বটে, কিন্তু মেয়েদের উদ্দেশ করে। মেয়েরা আমার বাংলা বোঝেন না, তাঁদের বাবা বর্মিজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন আমার বক্তব্য।

আমি বাটিতে সাদা গুঁড়ো দেখিয়ে বললুম—ওটা কি কোনো খাবার জিনিস?

মেয়েরা ভদ্রতার খাতিরে অতি কষ্টে হাসি চেপে গেলেন, বুঝলুম, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হল।

বড় মেয়েটি বললেন—ওটা তানাখা, চন্দনকাঠের পাউডার, মুখে মাখে।

গম্ভীর ভাবে বললুম—ও!

মেয়েটি আমায় বললেন, তাঁরা ইংরিজি কথা বলতে পারেন না। বাঙালী বাবুরা ইংরিজি বিদ্যের জাহাজ, এমন একটি ইংরিজিতে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সামনে তাঁরা তাঁদের বাজে ইংরিজির নমুনা বার করতে পারবেন না, ভারি লজ্জা করবে।

ওদের বাবা বললেন—আপনি এখানে ক-দিন থাকবেন?

—দিন পনেরো বোধহয় আছি।

—দয়া করে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার এখানে আসুন না কেন? এখানে চা খাবেন আর আমার মেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা কইবেন। ওদের শেখা হয়ে যাবে। আপনাকে দিয়ে আমার আড়তের চিঠিপত্রও তা হলে লিখিয়ে নেবো। এক টাকা করে পাবেন এজন্যে—কি বলেন? আমি আসতে রাজি হলুম। এক টাকাই দেবেন, আমার

কোনো আপত্তি নেই। তবে দু-ঘণ্টার বেশি আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না, কারণ আমার নিজের আপিসের কাজও রাত্রে আমায় করতে হবে।

একদিন খুব বৃষ্টি হল।

আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি চট্টগ্রামবাসী সুকবি ও সুলেখক সুরেন্দ্রনাথ ধর সেখানে আপন মনে এক জায়গায় চুপ করে বসে। সুরেনবাবু আমার বিশেষ বন্ধু, এবার চট্টগ্রামে যে-কদিন ছিলাম, কর্ণফুলির ধারে একসঙ্গে মাঝে মাঝে দুজনে বেড়াতুম।

সুরেন ধর খামখেয়ালী ও ভবঘুরে ধরনের লোক। বললেন—চলো হে আমার সঙ্গে, কাল বন বেড়াতে যাই—

আমারও খুব উৎসাহ, বললুম—বেশ চলুন, কোন দিকে যাবেন?

—আরাকান ইয়োমা রেঞ্জ, যেটা এখান থেকে দেখা যাচ্চে, ওইদিকে নিবিড় টিক-উড ফরেস্ট। চলো ওদিকে যাবো—

সুরেনবাবুর জীবনে পায়ে হেঁটে এরকম বেড়ানো অভ্যেস অনেকদিন থেকেই আছে জানি, তাঁর কথায় তখনি সম্মতি দিলুম। বললুম—এখানে কবে এলেন?

—এখানে আমার এক বন্ধু আছেন ডাক্তার, তাঁর ওখানে বেড়াতে এসেছিলুম, প্রায় দশ দিন আছি। শরীরটা ভালো ছিল না, এখন একটু সেরেচে। যদি বেরুতে হয়, এইবার—এই হপ্তার মধ্যেই।

আমি সন্ধ্যাবেলা বর্মী ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলতে তিনি আমায় অনেক ভয় দেখালেন। আরাকান ইয়োমা পর্বতশ্রেণী বন্যজন্তু-সঙ্কুল, দুষ্প্রবেশ্য ও প্রায় জনহীন। তা ছাড়া, সামনে যে পর্বত দেখা যায়, ওটা আসল রেঞ্জ নয়, ওর ত্রিশ বত্রিশ মাইল পেছনে যে ধোঁয়ার মতো পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্চে, ওখানে তাঁদের ফরেস্ট ইজারা করা আছে, কার্যোপলক্ষে অনেকবার তিনি সেখানে গিয়েচেন, অত্যন্ত দুর্গম জায়গা। দুজন মাত্র লোকের পক্ষে সেখানে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। ভদ্রলোকের নাম মৌংপে। কাঠের ব্যবসা করে দুপয়সা করেচেন, তা তাঁর বাড়ির আসবাবপত্র দেখেই বোঝা যায়।

মৌংপে বললেন—আমার এই বড় মেয়েটি আমার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিল—

আমি বিস্ময়ের সুরে বললুম—গাড়ি যায় নাকি সেখানে? কিসে গেলেন?

—হাতীর পিঠে। কাঠ বয়ে আনবার জন্যে আমাদের হাতী আছে জঙ্গলে, আমার নিজের ছ'টা হাতী আছে—আপনাকে হাতীর সুবিধে করে দিতে পারি, কিন্তু নদী পেরিয়ে সে সব হাতী এদিকে তো আসে না। চিঠি লিখে আনাতে গেলে পনেরো দিন দেরি হয়ে যাবে।

মৌংপের বড় মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। লেখাপড়ায় আগ্রহ তারই বেশি। প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে যে একটা জিনিস আছে—মংডু শহরের মধ্যে সে-ই একমাত্র বর্মী মেয়ে, যে এ খবর রাখে।

তার বাবা উঠে গেলে সে আমায় বললে—আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?

—বেশিদিন না। দশ বারো দিন যদি থাকি খুব বেশি।

—তবে আপনি আরাকান ইয়োমা দেখবার আশা ছাড়ুন—পায়ে হেঁটে যাবেন বলচেন,

তাতে এক মাসের মধ্যে ওখান থেকে ফিরতে পারবেন না। আমি আপনাকে আর একটা পথ বলে দিই—একটা রাস্তা আছে, দেবাং আর আরাকান ইয়োমার মাঝখান দিয়ে চীনদেশ পর্যন্ত গিয়েচে—এ পথে গভর্নমেণ্টের ডাক যায় মংডু থেকে। আপনি মেলভ্যানে সিংজু পর্যন্ত যান, সেখান থেকে হেঁটে যাবেন—আমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারবো। কিন্তু দুজন লোক নেবে না মেলভ্যানে।

আমি বললুম, তাহলে আমারও যাওয়া হবে না, কারণ বন্ধুকে ফেলে তো যেতে পারিনে!

মেয়েটি বড় ভালো। ওর এক মামা ডাক-বিভাগে কাজ করেন, তাঁকে দিয়ে সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মেলভ্যানে নিতে রাজি হল না দুজনকে।

সুরেনবাবুও পিছিয়ে গেলেন। তিনি এগারো টাকা ভাড়া দিয়ে মেলভ্যানে যেতে রাজি নন। হেঁটে যতদূর হয় যেতে পারেন।

এর কিছুদিন পরে সুরেনবাবু মংডু থেকে চলে গেলেন এবং আমি একা মেলভ্যানে সিংজু রওনা হলুম।

মংডু ছাড়িয়ে প্রথম পঞ্চাশ ষাট মাইল যেতে যেতে মনে হয় বাংলাদেশের নোয়াখালি বা ময়মনসিং জেলার ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেচি। এমন কি, আম-কাঁটালের বাগানও চোখে পড়ে। তার পর নিবিড় জঙ্গল, আরাকান ইয়োমা পর্বত-শ্রেণীর বহু নীচু শাখা-প্রশাখা পথের দুপাশে দেখা যেতে থাকে।

ছোটবড় গ্রাম সর্বত্র, নিবিড় বন কোথাও নেই, মাঝে মাঝে ঝোপঝাপ ও সেগুন গাছের সাজানো বাগান। বৌদ্ধমন্দির প্রত্যেক গ্রামেই আছে, আর আছে ছোটখাটো দোকান-পশার-ওয়ালা বাজার। দু তিনটি চা-বাগানও পথে পড়ে।

সিংজু পৌঁছে গেল প্রায় সন্ধ্যার সময়। ডাকগাড়ির চালক হিন্দুস্থানী, তার সঙ্গে ইতিমধ্যে খুব ভাব করে নিয়েছিলুম, রাত্রে তার তৈরী মোটা হাতে-গড়া রুটি খেয়ে তার ঘরেই শুয়ে রইলুম।

পরদিন সে বললে—চলুন বাবুজি, এখান থেকে মেলপিওন ডাকব্যাগ নিয়ে জঙ্গলের পথে অনেকদূর যাবে, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, তার সঙ্গে যাবেন।

সকাল আটটার সময় সিংজু থেকে বার হয়ে আকিয়াব-গামী বড় রাস্তায় পড়লুম। এখান থেকে আরাকান ইয়োমা পর্বতের উচ্চ অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই পর্বতমালা সমুদ্রোপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আকিয়াব থেকে প্রায় রেঙ্গুন পর্যন্ত বিস্তৃত।

সিতাং এ অঞ্চলের একটি বড় নদী, এই নদীর শাখাপ্রশাখা অনেকবার পার হতে হয়, আকিয়াব রোডের ওপর অনেকগুলি সেতু আছে, এই নদীর বিভিন্ন শাখার ওপরে।

এদিকের আরণ্য প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক এক গাছের গুঁড়ির গায়ে এত ধরনের পরগাছার জঙ্গল আর কোথাও কখনও দেখিনি। অনেক পরগাছে অদ্ভুত রঙিন ফুল ফুটে আছে। মাঝে মাঝে পার্বত্য ঝরনা, বড় বড় ট্রি ফার্ন, এ বনের চেহারা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ ধরনের বন বাংলাদেশের কুত্রাপি দেখিনি, কিন্তু বহুদিন পরে আসাম অঞ্চলে

বেড়াতে গিয়ে শিলং থেকে সিলেট যাওয়ার মোটর রোডের দুধারে বিশেষ করে ডাউকি প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চলে, অবিকল অরণ্যের এই প্রকৃতি আমার চোখে পড়েচে।

বাংলাদেশের পরিচিত কোনো আগাছা, যেমন শেওড়া, ভাঁটা, কাল-কাসুন্দে প্রভৃতি এদিকে একেবারেই নেই। এদিকে উদ্ভিজ্জসংস্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাতেই বোধ হয় যা দেখি তাই যেন ছবির মতো মনে জাগায় অপূর্ব সৌন্দর্যের অনুভূতি। সর্বত্র অসংখ্য সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক। বড় বড় বেত-ঝোপ। কাঁটাবনের নিবিড় জঙ্গল মাঝে মাঝে।

এই পথে প্রথম রবারের বাগান দেখি।

আগে রবারের বাগান বলে বুঝতে পারিনি, বড় বড় গাছ, অনেকটা কাঁটাল পাতার মতো পাতা। গাছের গায়ে নম্বর মারা—কোনো কোনো বাগান কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, কোনো কোনো বাগান বেষ্টনীশূন্য ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে—শুনেছিলাম অনেক বাগান পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

এক জায়গায় ডাকপিয়াদার থাকবার জন্যে বনের মধ্যে ছোট খড়ের ঘর।

আমার সঙ্গে যে পিয়াদা এসেছিল, সে এর বেশি আর যাবে না। রাত্রে আমরা সেই খড়ের ঘরেই রইলুম, সকালে অন্যদিকের পিওন এসে এর কাছে থেকে ডাকব্যাগ নিয়ে যাবে, এ পিয়াদা ওর ব্যাগ নিয়ে চলে আসবে সিংজুতে।

আমরা যখন সে ঘরে পৌছুলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে।

ডাকপিয়াদার ঘরে যাপিত সেই রাত্রিটি আমার জীবনে মনে করে রাখবার মতো। দুধারে আরাকান ইয়োমার উন্নতকায় শাখা-প্রশাখা, সারা পর্বত-সানু নিবিড় অরণ্যময়। অরণ্যের সান্ধ্য স্তব্ধতা ভঙ্গ করেচে পার্বত্য ঝরনার কুলকুল শব্দ, অন্ধকার বনের দিক থেকে কত কি পাখীর ডাক আসচে; যদিও স্থানটির মাইলখানেকের মধ্যে খুব বড় একটা রবারের বাগান, তবুও সন্ধ্যায় যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবীর প্রান্তসীমায় এসে পড়েচি দুজনে, জনমানুষ নেই বুঝি এর কোনোদিকে।

বেশি রাত্রে ডাকপিয়াদা এসে পৌছুলো।

নবাগত ডাকপিয়াদার নাম কাচিন, একটু একটু ইংরিজি জানে; লোকটির চেহারা এমন কর্কশ ও রুক্ষ যে পথে-ঘাটে দেখলে ডাকাত বলে ভুল হবার কথা। তার সঙ্গে সারাদিন কাটাতে হবে বলে প্রথমটা ইতস্তত করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত সকালবেলা তার সঙ্গেই নতুন পথে পা দিলাম।

এবার পথ নিবিড় অরণ্যময়।

আমরা ক্রমশ এক মহারণ্যে প্রবেশ করলুম। দুধার বড় বড় বনস্পতিতে সমাচ্ছন্ন। মানুষ নেই, জন নেই, গৃহ নেই, পল্লী, মাঠ নেই, এতটুকু ফাঁকা স্থান নেই। কেবল নিবিড় জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে আকিয়াব থেকে প্রোমে যাবার রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেচে।

ছোটবড় নানা রকমের গাছ, শাখায় শাখায় জড়াজড়ি করে যেন এ ওর গায়ে এলোমেলো ভাবে পড়ে। বড় গাছগুলির মাথা যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে—এক একটা গাছ প্রায় দেড়

শো ফুট উঁচু। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম, এমনটি কোথাও দেখেছি বলে মনে হল না। প্রকৃতি এখানে যেন ভৈরবীর বেশে দর্শকের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেয়।

সম্মুখে একটি নদী। পাহাড়ী নদী, বালুময়, চড়া, ক্ষীণ নদীস্রোত উপলরাশির ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে বইচে, নদীর এপারে ওপারে সুবিশাল অরণ্য, স্তরে-স্তরে ক্রমোন্নত বৃক্ষশ্রেণী। বৃক্ষশ্রেণীর পেছনে সুদূরবিস্তৃত পর্বতশ্রেণী, তাও স্তরে স্তরে সাজানো।

নদী হেঁটে পার হওয়া গেল—হাঁটু পর্যন্ত জল, তার তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ডে পা কেটে যেতে পারে বলে আমরা একটু সাবধানে জল পার হই। আবার ঢুকে পড়ি বনের মধ্যে, বেলা প্রায় দশটা, কিন্তু শাখা-প্রশাখার এমন নিবিড় জড়াজড়ি মাথার ওপরে যে, অত বেলাতেও সূর্যের আলো ঢোকেনি বনের পথে।

এইবার প্রোম রোড পাহাড়ের ওপর উঠেচে। খুব বড় বড় ঘাস, হোগলা বা নল-জাতীয়, তার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথের মতো সরু রাস্তা—মাঝে মাঝে আবার খুব চওড়া হয়ে এসেচে।

আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা বললে—খুব সাবধানে চলো, এখানে বুনো হাতীর ভয় খুব।

ওরই মুখে শুনলুম এই বনের মধ্যে গবর্নমেণ্টের হাতী-খেদা আছে; বছরে অনেক হাতী নাগা পাহাড়ের লিচু উপত্যকা থেকে এখানে আসে ব্রহ্ম ও আসাম সীমান্তের পাহাড়শ্রেণী ডিঙিয়ে—হাতীর নাকি অগম্য স্থান নেই, কোনো উঁচু পাহাড়ই তার পথ রোধ করতে পারে না।

এখান থেকে পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে বনের মধ্যে পেট্রলের খনি আছে, ওরই মুখে শুনলুম। আকিয়াব-প্রোম রোড থেকে তারা রাস্তা বের করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খনিতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচে।

আমি ওকে বললুম—হাতীর কথা তো শুনচি, কিন্তু এ বনে বাঘ থাকা তো বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার নয়—তুমি কি বল?

সে বললে, বাঘের ভয় এখন নয়, সন্ধ্যার পরে। তার আগে আমরা আশ্রয় পাবো। হাতী দিনের আলো মানে না।

বেলা চারটে বাজতে না বাজতে সে বনে সন্ধ্যা হয়ে এল। দুপুর থেকে চারটের মধ্যে আমরা কিন্তু খুব বেশি পথ অতিক্রম করিনি, বড় জোর আট মাইল, সকাল থেকে এ পর্যন্ত পনেরো মাইলের বেশি আসিনি।

খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে বলে বনের মধ্যে পথ মোটে এগোয় না।

পাঁচটার সময় রীতিমত অন্ধকার নামলো। আমাদের খড়ের ঘর এখনও কতদূরে তার ঠিকানা নেই, অথচ ঘণ্টাখানেক আগে থেকে আমার সঙ্গী বলচে সামনেই ঘর।

এ পথে ডাকপিয়াদা সশস্ত্র চলে তাই কতকটা রক্ষে। আমার সঙ্গী দেখতে বেঁটে-খাটো লোকটি, কিন্তু তার দেহ যেন ইস্পাতে তৈরী, যেমন নির্ভীক, তেমনি আমুদে। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কত রকমের হাসির গল্প করতে করতে আসচে সারাপথ।

বনের মধ্যে যখন পথ আর দেখা যায় না, তখন আশ্রয় মিললো।

নিবিড় বনপর্বতের মধ্যে খড়ের ঘর। এত বড় নির্জন বনের মধ্যে আমরা মোটে দুটি প্রাণী।

রাত্রে রান্না হল শুধু ভাত। অন্য কোনো উপকরণ নেই, নুন পর্যন্ত না, এদেশের লোকের দেখলুম নুন না হলেও চলে। এর আগেও অনেক বার দেখেছি, নুনকে এরা রন্ধনের একটা অত্যাবশ্যক উপকরণ বলে আদৌ মনে করে না। সমস্ত দিন পথ হাঁটার পর শুধু ভাতই অমৃতের মতো লাগলো আমাদের মুখে।

বিছানায় শুয়ে পড়বার আগে আমি একবার বাইরে গিয়ে অরণ্যানীর নৈশরূপ দেখতে চাইলুম, ডাকপিয়াদা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করলে।

তারপর সে একটা গল্প বললে।

মান্দালে থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে কোথায় গবর্নমেণ্টের রিজার্ভ ফরেস্ট আছে। সেখানে একজন নতুন ফরেস্ট রেঞ্জার এসে একবার ডাকবাংলোয় উঠলো। ডাকবাংলোটির চারিধারে নিবিড় বন, সঙ্গের কুলিরা বলে দিলে সন্ধ্যা হলেই সাহেব যেন আর বাইরে থাকে না, ডাকবাংলোর দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করে দেয়, আর বেশ ভালো করে রোদ উঠবার আগে যেন দরজা খুলে বারান্দাতে না আসে।

রেঞ্জার ছিল মাদ্রাজী মুসলমান, খুব সাহসী, ত্রিশের মধ্যে বয়স। সন্ধ্যা হবার একটু আগেই সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। কিছুক্ষণ পরেই তার মনে পড়লো তামাক খাওয়ার পাইপটা বারান্দায় টেবিলে ফেলে রেখে এসেচে। তখনও ভালো করে অন্ধকার হয়নি—সাহেবের সঙ্গে যে আরদালি ছিল সেও এ সব অঞ্চলে নতুন লোক। আরদালি ভাবলে চট করে দরজা খুলে পাইপটা নিয়ে আসবে। বাইরে গেল কিন্তু সে ফিরলো না; তার দেরি হতে দেখে সাহেব বারান্দায় গিয়ে কোনোদিকে আরদালির চিহ্ন দেখতে পেলে না। বাংলোর বাইরে কিছু দূরে কুলিদের থাকবার ঘরে আট দশজন কুলি ছিল, সাহেবের চীৎকারে তারা মশাল জ্বালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে জড় হল। বারান্দার ও প্রান্তে দেখা গেল বাঘের পায়ের থাবার দাগ। পরদিন দূর বনের মধ্যে হতভাগ্য আরদালির দেহাবশেষ পাওয়া যায়। এ ধরনের গল্প আমি কিন্তু এর আগে সুন্দরবন সম্বন্ধে শুনেছিলুম। সুতরাং এ গল্পে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে বনের মধ্যে খড়ের ঘরের কোণে শুয়ে মন্দ লাগে না শুনতে এ ধরনের কাহিনী।

আমি ওকে বললুম—তুমি ইংরিজি শিখলে কোথায়?

ডাকপিয়াদা বললে—প্রোমের মিশনারী স্কুলে।

—তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

—কেউ নেই, আজ দশবছর হল মা মারা গিয়েচেন, তারপর বাড়িও নেই। ডাক-পেয়াদার কাজ করি, সিংজুতে বাসা নিয়ে থাকি।

লোকটাকে বেশ লাগলো। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ওর সঙ্গে গল্প করলুম। ওর ইচ্ছে বিয়ে করে, কিন্তু সামান্য মাইনে পায় বলে সাহসে কুলোয় না।

আমি বললুম—কেন, তোমাদের দেশে তো তোমার চেয়ে অনেক কম মাইনে পেয়েও লোকে বিয়ে করচে? মণ্ডুতে তো সামান্ত ফিরিওয়ালাকে সস্ত্রীক জিনিস ফিরি করতে দেখেচি?

—বাবু, ওরা লেখাপড়া জানে না, তাই অমনি করে। আমি ইংরিজি স্কুলে তিন চার বছর পড়ে তো আর ওদের মতো ব্যবহার করতে পারিনে!

আরও জিজ্ঞেস করে জানলুম ওখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব। মেয়েটি সিংজুতে চুরুটের কারখানায় কাজ করে, সপ্তাহে দুটাকা করে মাইনে পায়।

আমি বললুম—সে কি বলে?

—সে বলে বিয়ে করো। আমি সাহস পাইনি কিন্তু, কোথায় রাখবো, কি খেতে দেবো। এই তো সামান্ত মাইনে।

—তার বাপ মা নেই?

—কেউ নেই, আমারই মতো অবস্থা।

ডাকপিয়াদা আসলে বড় প্রেমিক, যেমন তার প্রণয়িনীর কথা উঠলো, সে আর অন্ত কথা বলে না প্রণয়িনীর কথা ছাড়া। মেয়েটি নাকি বড় ভালো, তাকে খুব ভালোবাসে, চুরুটের কারখানায় কাজ করে যা পায়, নিজের খাওয়া পরা বাদে সব জমিয়ে রাখে ওদের ভবিষ্যৎ সংসারের জন্তে, একটি পয়সা বাজে খরচ করে না।

অত বড় বনের মধ্যে কিন্তু রাত্রে কোনো রকম শব্দ শুনলাম না বন্তজন্তুদের। একটি শেয়াল পর্যন্ত ডাকলো না। খানিক রাত্রে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে এদিকের ডাকপিয়াদা এল। ঠিক করাই ছিল যে আমি তার সঙ্গে মোংকেট পর্যন্ত উনিশ মাইল পথ হেঁটে যাবো।

কিন্তু আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা কথায় কথায় রাত্রেই আমায় বলেছিল যে, পাহাড় জঙ্গলের পথ এখানে শেষ হয়ে গেল, এরপর আর বেশি জঙ্গল নেই, কেবল পড়বে রবারের বাগান আর ধান ক্ষেত। আবার জঙ্গল আছে মান্দালে ছাড়িয়ে গোয়েটেক্ সেতু পার হয়ে উত্তর-পূর্ব ব্রহ্ম-সীমান্তে। সেদিকের বন অত্যন্ত নিবিড়, সে পথ অনেক বেশি দুর্গম।

আমি ডাকপিয়াদাকে বললুম, এই নতুন লোকটিকে জিজ্ঞেস করো তো কতদূর আর জঙ্গল পড়বে; ততদূর ওর সঙ্গে যাবো—

নবাগত ডাকপিয়াদা খাস বর্মিজ ছাড়া অন্ত কোনো ভাষা জানে না, তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয় আমার। আমার পূর্ব সাথী বললে—বাবু, ও বলচে সাত মাইল পর্যন্ত এই রকম জঙ্গল আর পাহাড়, তারপরে আবার বর্মা রবার কোম্পানির বড় একটা বাগান পড়বে দুতিন মাইল, তারপরে ধানের ক্ষেত আর বস্তি।

এই সাত মাইল আমি ওর সঙ্গে গেলুম।

প্রভাতের সূর্যালোক বনের ডালে ডালে বাঁকাভাবে পড়েছে কারণ পাহাড়ের পূর্বদিকের অংশটা খুব নীচু।

অনেক রকমের পুষ্পের মধ্যে সাদা সাদা কি এক ধরনের ফুল ছোট-বড় সব গাছের মাথা ছেয়ে রেখেচে ; কোনো লতার ফুল হবে, কিন্তু লতা আমার চোখে পড়লো না। খুব ঘন সুগন্ধ সে ফুলের, যে যে গাছের মাথায় সে ফুলের মেলা, তার তলা দিয়ে যাবার সময় উগ্র সুবাসে মাথার মধ্যে যেন ঝিম ঝিম করে, আমি ইচ্ছে করে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে দেখেচি. মনে হয় যেন শরীর টলচে।

একটি জায়গায় সৌন্দর্যের ছবি মনে গভীর দাগ কেটে রেখে গিয়েচে।

পথের ধারে একটি পাহাড়ী নদী, মাথার ওপর সেখানে আকাশ দেখা যায় না, বড় বড় বনস্পতিদের শাখাপ্রশাখার মেলা, মোটা লতা ঝুলে জলের ওপর পর্যন্ত পৌঁছেচে, বাঁদিকের বন এত ঘন যে কালো-মত দেখাচ্চে, ডানদিকে জলের ওপরে শিলাখণ্ডের অগ্রভাগ জেগে আছে।

রাস্তাটা ওপার থেকে এসেচে টেরচা ভাবে, বনের মধ্যে ঘুরে ফিরে নদীর ধারে এসে যেন হঠাৎ খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে নদীগর্ভে ঢুকেচে। সেই দিকটা এপার থেকে দেখাচ্চে যেন চীনা চিত্রকরের হাতে আঁকা ছবির মতো। একটা শিলাখণ্ডের ওপর বসে সেই দৃশ্য কতক্ষণ উপভোগ করলুম একমনে, আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা এখানে জলে স্নান করতে নামলো।

নদী চওড়া হবে হাত-কুড়ি কি বাইশ। হেঁটে পার হতে হয় অবিশ্যি, হাঁটুজলের বেশি নেই কোথাও। আমরা যখন বসে, তখন ওপার থেকে পাঁচ ছ-জন লোক একজন সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মদেশীয় মহিলাকে সিডান চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এসে জলে নামলো।

আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা সিডান চেয়ার কখনো দেখেনি, হাঁ করে চেয়ে রইল। শুনলুম এদেশে এ জিনিসের প্রচলন নেই, রবার-বাগানওয়ালা ধনী লোকেরা চীন ও মালয় উপদ্বীপ থেকে এর আমদানি করেচে।

মহিলাটি যখন জল পার হলেন চেয়ারে বসে, তখন লক্ষ্য করলুম সাধারণ বর্মিজ মেয়ের তুলনায় তিনি অনেক বেশি সুন্দরী। এমন কি, আমার মনে হল, গায়ের রং বর্মিজদের মতো নয়, গোলাপী আভা ধপধপে সাদার ওপর।

আমার সঙ্গী জলে নেমে স্নান করছিল, সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়লো।

এ ধারে এসে সিডান চেয়ারের বাহকেরা চেয়ার নামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে। মহিলাটি এবার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। আমিও চেয়ে দেখলুম; বেশ সুন্দর মুখশ্রী।

পরে সিংজুতে জিজ্ঞেস করে আমি জেনেছিলুম তিনি বর্মিজ নন, সান্ দেশীয় মেয়ে। সান্ মহিলারা সাধারণত ব্রহ্মদেশীয় মেয়েদের চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দরী। মহিলাটি জনৈক ইউরোপীয় রবার-বাগানের মালিকের বিবাহিতা পত্নী, অনেক টাকার মালিক ওঁর স্বামী।

ওঁরা প্রায় আধঘণ্টা খেয়াঘাটে বসে রইলেন, আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা আরও দূরে গাছ-পালার আড়ালে গিয়ে স্নান সেরে এল।

সেদিনই ওখান থেকে সিংজুর দিকে ফিরলাম।

আবার সেই বনানী, আগের দিনের সেই খড়ের ঘরে রাত্রিযাপন।

মংডুতে ফিরে মিঃ মৌংপের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম সন্ধ্যাবেলা। ওরা সকলেই খুব খুশী হল আমায় দেখে। মেয়ে-দুটি রোজ বর্মিজ গান গাইতেন, বড় মেয়েটির গলা বেশ সুরেলা বলে মনে হত আমার কাছে, যদিও গানের অর্থ এক বর্ণও বুঝতুম না। এদিন ওঁরা দুজনেই অনেকগুলি গান গাইলেন, বনের অনেক গল্প শুনলেন, শেষে রাত্রে তাঁদের ওখানে খেতে বললেন।

ব্রহ্মদেশীয় পরিবারে একটি জিনিস লক্ষ্য করেচি, যাকে তারা একবার বন্ধুভাবে পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করেচে, তার সঙ্গে ওদের ব্যবহার নিঃসঙ্কোচ ও উদার আত্মীয়তাতে ভরা। ব্রহ্মদেশীয় খাদ্য কখনও খাইনি, আমার ভয় ছিল হয়তো এমন সব খাবার জিনিস টেবিলে আসবে যা মুখে তোলা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ওঁদের ব্যবহার এত সুন্দর—এমন কোনো আহার্য তাঁরা আমার সামনে স্থাপিত করলেন না, যা আমার অপরিচিত। মিষ্টি পোলাও, মাংস, মাছ, মংডুর বাঙালী ময়রার দোকানের সন্দেশ ও রসগোল্লা।

আমি বড় মেয়েটিকে বললুম—আপনাদের বাড়ির রান্না ভারি চমৎকার—বাংলাদেশের রান্নার মতই ধরন তো অবিকল।

বড় মেয়ে মৌংকেট হেসে বললে, এ যা খেলেন, আমাদের দেশের খাবার কিন্তু এ নয়। হয়তো সে আপনি খেতে পারতেন না।

—তাই কেন খাওয়ালেন না?

—আপনার মুখে ভালো লাগতো না। আপনি শুটকি মাছ খেয়েচেন কখনো?

—খাইনি কখনো। তবে একবার খেয়ে না হয় দেখতুম। আর নাপ্পি? সেটা বাদ গেল কেন?

—নাপ্পি সব সময় বা সকল ভোজে খায় না। ও একধরনের চাটনি হিসেবেই খাওয়া হয়। নাপ্পি টেবিলে দিলে আপনি উঠে পালাতেন।

—বাঙালী-রান্না আপনারা জানেন?

—আমাদের রান্না একটাও নয়। বাঙালী বাবুর্চি দিয়ে সব রাঁধানো। আমরা পোলাওটা রাঁধতে পারি। মংডু বাংলা দেশের কাছে, অনেক বাঙালী এখানে থাকেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়া অনেকটা বাঙালী ধরনের হয়ে গিয়েচে।

হাসিগল্পের মধ্যে দিয়ে খাওয়া শেষ হল।

পরদিন আমি ওঁদের একটি বাঙালী হোটেলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালুম। ওঁদের সঙ্গে এত আলাপ হয়ে গিয়েছিল এ-কদিনে যে, সাতদিন পরে যখন মংডু ছেড়ে চলে আসি তখন সত্যিই বড় কষ্ট হয়েছিল ওঁদের ছেড়ে আসতে। আসবার সময় মিঃ মৌংপে মেয়েদুটিকে নিয়ে জাহাজঘাটে আমায় বিদায় দিতে এলেন। মৌংকেট একটা সুদৃশ্য চন্দনকাঠের ছোট বাক্স ভর্তি সমুদ্রের কড়ি, ঝিনুক আমায় উপহার দিলেন। দুঃখের বিষয় এই বাক্সটি সেইবারেই ঢাকা আসবার সময় ট্রেনে খোয়া যায়।

মংডু থেকে চাটগাঁ ফিরে আমার পূর্বপরিচিত সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে উঠলুম। এই উপলক্ষে একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। চট্টগ্রাম আমার কাছে তো বহুদূর বিদেশ, কিন্তু যখন ডবল মুরিংস্ জেটি থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে ওদের বাড়ি যাচ্ছি, তখন মনে হল যেন অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরলুম।

ওদের সেই বৈঠকখানার পাশেই মুলী বাঁশের চাঁচে ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানি আমার কত প্রিয় পরিচিত হয়ে উঠেছিল, যেন আমার কতদিনের গৃহ সেটি। উঠানের বাতাবিলেবু গাছের ছায়া যেন কতকালের পরিচিত আশ্রয়।

পথে পথে অনেকদিন বেড়িয়ে এই ব্যাপারটি আমি লক্ষ্য করেছি, মন যেখানে এতটুকু আশ্রয় পায় সেইখানেই তার আঁকড়ে ধরে থাকবার কেমন একটা আগ্রহ গড়ে ওঠে। সে আশ্রয় যখন চলে যায় তখন মন আশ্রয়ান্তরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে অত্যন্ত সহজে ও অবলীলাক্রমে।

একটা ছবি আমার এই সম্পর্কে বহুদিন মনে ছিল।

যখন চাটগাঁ আসচি স্টীমারে, দূর থেকে দেখতে পেলাম কর্ণফুলির মোহনার বাইরে সমুদ্রের মধ্যে একখানা বড় পালতোলা জাহাজ নোঙর করা আছে। নীল সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর থেকে জাহাজখানা দেখাচ্চে যেন একটি দ্বীপের মতো, যেন অকূল সমুদ্রের কূলে দুঃখসুখবিজড়িত একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণ, তার সাদা ভাঁজকরা গোটানো পালগুলো, লম্বা লম্বা মাস্তুলগুলো আর মস্ত বড় কালো খোলটা আমার মনে বহুদিন স্থায়ী রেখাপাত করেছিল।

চাটগাঁয়ে ওদের বাড়ি আসতে ওরা আমাকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা করলে—মুলী বাঁশে ছাওয়া সেই ছোট ঘরটাতে আবার বিছানা পেতে দিলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে মংডু থেকে বর্মিজ পুতুল ও খেলনা এনেছিলুম—তারা সেগুলো পেয়ে খুব খুশী।

একদিন বাড়ির কর্তা বললেন, চলুন সীতাকুণ্ড যাবেন? আপনি তো চন্দ্রনাথ যাননি, অমনি চন্দ্রনাথও ঘুরে আসবেন, এ অঞ্চলে এসে চন্দ্রনাথ না দেখলে বাড়ি ফিরে লোককে বলবেন কি?

পরদিন সকালের ট্রেনে দুজনে গিয়ে নামলুম সীতাকুণ্ডে।

বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম আসবার পথে একদিন এই চন্দ্রনাথ পাহাড়কে দূর থেকে দেখেছিলুম, তখন মনে ভেবেছিলুম চাটগাঁ পৌঁছেই আগে চন্দ্রনাথ দেখতে হবে। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা আর তখন হয়ে ওঠেনি।

আজ দেরাং আর আরাকান ইয়োমা পর্বত-শ্রেণী ও অরণ্যভূমি বেড়িয়ে এসে চন্দ্রনাথ পর্বতকে নিতান্ত উইটিবির মতো মনে হচ্চে। হাজার দেড় কি সতেরো শ' ফুট উঁচু পাহাড় আবার কি একটা পাহাড় নাকি! কিন্তু এ ভুল আমার পরে ভেঙেছিল, সে কথা বলচি।

সীতাকুণ্ড গ্রামের মধ্যে কর্তার পরিচিত এক পাণ্ডার বাড়ি গিয়ে দুজনে উঠলাম। আমার সঙ্গী এ অঞ্চলে একজন বিখ্যাত লোক ও জমিদার, সীতাকুণ্ড গ্রামে তাঁর নিজের একখানা

বাগানবাড়ি আছে, অপরিষ্কার হয়ে পড়ে আছে বলে সেখানে ওঠা হয়নি—এই পাণ্ডাটি এঁর আশ্রিত ও অনুগত ব্যক্তি, তাই এখানেই ওঠা হল—তীর্থ করে পুণ্য অর্জন করবার জন্যে নয়।

পাণ্ডাঠাকুর অবশ্যি বাঙালী ব্রাহ্মণ, আমায় বললে,—পাহাড়ে উঠবেন না? চলুন নিয়ে যাই—

আমার সঙ্গী হেসে বললেন—তোমায় নিয়ে যেতে হবে না ঠাকুর মশাই। উনি নিজেই যেতে পারবেন, অনেক পাহাড় জঙ্গল ঘুরেচেন একা—তোমাদের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একা যেতে আটকাবে না ওঁর!

পাণ্ডাঠাকুরের প্রাপ্য তাহলে মারা যায়—সে তা ছাড়বে কেন। আমাকে নিয়ে সে পাহাড়ে উঠলো। চন্দ্রনাথের বৃক্ষলতার শোভা আমার মন মুগ্ধ করলে ওঠবার পথে, বিরূপাক্ষ মন্দির ছাড়িয়েই। অনেক বড় লোক পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েচে নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়দের স্মৃতিরক্ষার জন্যে, মার্বেল পাথরের ফলকে তাদের নাম ধাম লেখা আছে, আমার তো খুব ভালো লাগছিল প্রত্যেকখানি মার্বেল পাথরের ফলক পড়তে, ওঠবার সময় অনেক দেরি হয়ে গেল সেজন্যে।

বিরূপাক্ষ মন্দির ছাড়িয়ে অনেক দূর উঠে একটা পাহাড়ী ঝরনা নেমে আসচে, সেখান থেকে পথ দুভাগে ভাগ হয়ে দুদিক দিয়ে ওপরে উঠচে। এই পর্বতে উঠে হঠাৎ পিছন ফিরে চেয়েই দেখি নীল সমুদ্র ও সন্দ্বীপের অস্পষ্ট সবুজ তটরেখা।

সেখানে বাঁধানো সিঁড়ির ওপরে বসে রইলুম খানিকটা। সামনের পার্বত্য ঝরনার কুলু কুলু ধ্বনি, বন-ঝোপের ছায়া, বন-কুসুমের সুবাস ও দূরের নীল সমুদ্রের দৃশ্য যেন চোখের সামনে এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে, উঠতে ইচ্ছে হয় না।

পাণ্ডা বললে, বড় দেরি হয়ে যাবে বাবু, চলুন ওপরে।

আবার দুজনে ওপরে উঠতে লাগলুম। নিবিড় মুলী বাঁশের বন, গাছ পাতা ও লতা ঝোপের বিচিত্র সমাবেশ। মাঝে মাঝে ঝরনা নেমে আসচে বড় বড় পাথরের পাশ কাটিয়ে, মাঝে মাঝে বনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্চে, মাঝে মাঝে আড়াল পড়চে বন-ঝোপের।

চন্দ্রনাথে পাহাড়ের দৃশ্য এদিক দিয়ে অন্য অনেক পার্বত্য দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

অন্য সব জায়গায় পাহাড় আছে, কিন্তু হয়তো বনানী নেই; যদিও বন থাকে তবে একঘেয়ে বন। একই গাছের, ইংরেজিতে যাকে বলে homogenous forest, যেমন আছে সিংভুম, মানভুম, সারেণ্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে। সে বনের বৈচিত্র্য নেই, মনকে তত আনন্দ দেয় না, চোখকে তত তৃপ্তি দেয় না।

আরাকান ইয়োমা পর্বতের বনভূমি যে প্রকৃতির, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের বনও সেই একই প্রকৃতির, বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই; কেবল মাত্র এইটুকু যে, পূর্বোক্ত অরণ্যে বনস্পতিজাতীয় ফার্ণ যথেষ্ট, চন্দ্রনাথের বনে ও-জাতীয় ফার্ণ আদৌ নেই।

তাছাড়া এমন পাহাড়, বনানী ও সমুদ্রের একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখা যাবে না

বাংলাদেশে। ভারতবর্ষেও দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ উপকূলের কয়েকটি স্থান ও মালাবার উপকূল ছাড়া আর কোথাও নেই।

অনেকে ভাবেন চন্দ্রনাথ ছোট একটি পাহাড় হয়তো; আসলে চন্দ্রনাথ একটি পাহাড় নয়, পাহাড়-শ্রেণী। দৈর্ঘ্যে ষাট মাইলের কম নয়। পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত এর চারটি থাক্ আছে, সামনের গুলি তেমন উঁচু নয়; সকলের পেছনের থাক্‌টির উচ্চতা গড়ে দেড় হাজার ফুট।

চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণী আসলে পূর্ব হিমালয়ের একটি ক্ষুদ্র শাখা, যেমন আরাকান ইয়োমা বা সমগ্র উত্তরব্রহ্ম, আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরার ছোট-বড় সকল শৈল-শ্রেণীই হিমালয়ের দক্ষিণ বা পূর্বমুখা শাখাপ্রশাখার বিভিন্ন অংশ। সেই একই নগাধিরাজ হিমালয় বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মূর্তিতে পরব্রহ্মের বহু অবতারের মতো এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

এদিন পাণ্ডাঠাকুরের তাড়ায় বেশিক্ষণ পাহাড়ের চূড়ায় বসা সম্ভব হল না। সন্ধ্যা হয়ে যাবে এই বনে, সারা পথে একটাও লোক নেই।

সেদিন নেমে এলুম বিকেলের দিকে।

ওদের সুপুরি বাগানের মধ্যে ছোট্ট চাঁচের আর টিনের বাড়ি, পথের ধারে পাটি-পাতার গাছ আর বেতবন। পাটিপাতার গাছ থেকে শীতল পাটি বোনা হয়—এ অঞ্চলের সর্বত্র এ গাছ বনে-জঙ্গলে দেখা যায়; ঘন সবুজ চওড়া পাতা, অনেকটা আমাদের দেশের বন-চালতে গাছের মতো ডাল-পালার আকৃতি।

সেদিন সন্ধ্যায় সুপুরি বনের মধ্যে, ছোট ঘরে একা চুপ করে বসে আছি, সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলচে, বাইরে তারাভরা আকাশ, দূরে চন্দ্রনাথ পাহাড় শ্রেণীর কৃষ্ণ সীমারেখা।

কতবার দেখেচি এমন সব সময়ে যেন মাটির পৃথিবী আর জ্যোতির্লোকের গ্রহতারা এক হয়ে যায়—স্বপ্ন ভেঙে উঠে চাঁদের বাতির তলায় নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর রূপ দেখে কতবার অবাক হয়ে গিয়েচি—খানিকটা চিনি, খানিকটা চিনি না একে।

কি বিরাট ইঙ্গিত সমগ্র ছায়াপথের, পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনির, শান্ত জ্যোৎস্নালোকের ঝিল্লীমুখর নিশীথরাত্রির!—

পথের ধারে শুধু ওদের ডাক, বহুদূর পথ ব্যেপে। ঘর থেকে অন্য রকম শোনাবে, পথ থেকে অন্য রকম।

তারপর যা বলছিলুম—

ঘরের মধ্যে বসে আছি, এমন সময় একটি তরুণী বধূ ঘোমটা দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার সামনে একবাটি মুগের ডাল আর একটু কি গুড় রাখলেন। কোনো কথা বললেন না। আমি একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না—হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে মুগের-ডাল-ভিজে কি রকম জলখাবার!

ভাবলুম—হয়তো এখানে এইরকমই খায়। পরের বাড়ি অতিথি, আহার্য সম্বন্ধে নিজের মতামত এখানে চলবে না আমার। ডাল-ভিজে কিছু খেয়ে যখন বাটিটা রেখে দিয়েচি, তখন

বধূটি একবাটি গরম দুধ এনে সামনে রাখলেন। এবার আমার সন্দেহ হল, আমি বললুম—এখন দুধ কেন মা? সন্ধ্যেবেলা আমি তো দুধ খাইনে।

পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় নিম্নস্বরে কি বললেন ভালো বুঝলাম না। যাইহোক, ভাবলাম দুধ খাওয়ানোর জন্য যখন এত পীড়াপীড়ি, না হয় দুধটা খেয়েই নিই।

পুনরায় পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী দু-টুকরো হর্তুকি নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলেন। ব্যাপার কি, আমায় কি এরা সন্ন্যাসী ভেবেচে?…সবাই খাচ্চে পান, আমার বেলা হর্তুকি কিসের? রাত্রে আমার সাথীর খাবার ডাক পড়লো, আমায় কেউ ডাকলে না—আমি তো অবাক ব্যাপার, কিছু বুঝতে পারিনে।

আমার সঙ্গী খেতে গেলেন, কারণ তিনি বেড়িয়ে ফিরেছিলেন অনেক রাত্রে, ভাবলেন আমি বোধহয় খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছি।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলুম। খিদে বেশ পেয়েচে, এত লম্বা রাত না খেয়ে কাটাই বা কি করে? বড় মুশকিলে ফেলেচে এরা।

অবশেষে শুয়ে পড়লুম রাত্রে। সকালে উঠে আমার সঙ্গীর চা এল, আমাকে কেউ চা দিলে না। বিরক্ত হয়ে ভাবলুম, এরা বড় অভদ্র, এদের এখান থেকে চলে যাবো, বড়লোক দেখে ওঁর খাতির করচে খুব, আর আমাকে কাল রাত্রে খেতে দিলে না, সকালে একটু চা পর্যন্ত দিলে না—আজই চলে যাবো।

আমার সঙ্গী বললেন, চলুন বেড়িয়ে আসি—

পাণ্ডাঠাকুর ইতিমধ্যে একটা পুঁটুলি, খান-দুই কুশাসন, একটা ঘটি হাতে এসে আমায় বললেন—চলুন যাই, এর পরে বেলা হয়ে যাবে—

আমি অবাক হয়ে বলি, কোথায় যাবো?

—শ্রাদ্ধের কাজগুলো সকাল সকাল সারি—

—কার শ্রাদ্ধ?

—আপনি মা-বাপের শ্রাদ্ধ করবেন তো।

—কে বললে আমি শ্রাদ্ধ করবো?

পাণ্ডাঠাকুরের মুখ দেখে মনে হল জীবনে তিনি কখনো এত বিস্মিত হন নি, আমায় বললেন—সে কি! আপনি কাল রাত থেকে সংযম করে আছেন কেন তবে? আমার স্ত্রী বললেন—

আমার এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল—কাল রাত্রের গোটা ব্যাপারটার অর্থ এতক্ষণে বুঝলুম। আমি ওঁর স্ত্রীর কথা বুঝতে পারিনি, তা থেকেই সমস্ত ভুলটার উৎপত্তি। আমার সঙ্গী সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তো হো হো করে হেসে উঠলেন। পাণ্ডাঠাকুর মহা অপ্রতিভ। তিনি বাড়ির মধ্যে স্ত্রীকে গিয়ে তিরস্কার আরম্ভ করলেন—আমি তাঁকে শান্ত করে বাইরে নিয়ে এলুম।

পাণ্ডাঠাকুর আমার কাছে যথেষ্ট ত্রুটি স্বীকার করলেন, কাল রাত্রে না খেতে দিয়ে রেখে

দিয়েচেন সেজন্যে খুব লজ্জিত হলেন।—সংযম করবেন আপনি সে কথা ভেবেই আমার স্ত্রী দুধ আর মুগের ডাল ভিজে খেতে দিয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলা।

আমার সাথী আমাকে বললেন—আপনিই বা বললেন না কেন, যে আপনি শ্রাদ্ধ করবেন না? আপনি তো দিব্যি শুধু দুধ খেয়েই বসে রইলেন—

আমি বললুম—তা কি করে জানবো? আমি কি ছাই মায়ের কথা কিছু বুঝলুম?

—বেশ, বেশ! কথা না বোঝার দরুন আপনাকে উপোস করতে হল সারারাত—

পাণ্ডাঠাকুর বাঙালী ব্রাহ্মণ, বড় ভালো লোক স্বামী-স্ত্রী দুজনেই; আর বড় নিরীহ। এই ব্যাপারে দুজনে এত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে গেলেন যে তারপরে যে দুদিন ওখানে ছিলাম, ওঁরা যেন নিতান্ত অপরাধীর মতো সঙ্কুচিত হয়ে রইলেন আমার কাছে।

একটু বেলা হলে আমি বললুম—আজ আমি একা বাড়বাকুণ্ড আর সহস্রমায়া যাবো—

পাণ্ডাঠাকুর বললেন—দুটো দুদিকে—আজ একদিকে যান; সহস্রমায়া কিন্তু একা যেতে পারবেন না—বাড়বাকুণ্ড যাওয়া সহজ। রাস্তা বলে দেবো, চলে যাবেন।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথ। এবার সম্পূর্ণ একা চলেচি। লোক সঙ্গে থাকলে প্রকৃতিকে ঠিক চেনা যায় না, বোঝা যায় না আরাকান ইয়োমার পথে দেখেচি, সঙ্গে লোক থাকলে এত বক্ বক্ করে যে মন কিছুতেই আত্মস্থ হতে পারে না।

বাড়বাকুণ্ডের পথের দুধারে ঘন জঙ্গল, সমস্ত পথের পাশে কোথাও একটি লোকালয় নেই। মাঝে মাঝে বন্য পেয়ারা ও বন্য-কদলীর বন, করবীফুলের সমারোহে শৈল সজ্জিত। কোথাও বা একটি পাহাড়ী ঝরনা সংকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে; আশেপাশে বন-ঝোপের শান্ত, শ্যামল সৌন্দর্য।

পথের ধারে দু-জায়গায় পাহাড়ের ফাটল দিয়ে নীলবর্ণ অগ্নিশিখা বার হয়ে সমস্ত শৈলশ্রেণীর আগ্নেয় প্রকৃতি প্রমাণ করে দিচ্চে।

বাড়বাকুণ্ড পৌঁছতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। এর প্রধান কারণ আমি একটানা পথ হাঁটিনি, মাঝে মাঝে বনগাছের ছায়ায় শৈলাসনে বসে বিশ্রামের ছলে চারিপাশের অনুপম গিরিবনরাজির শোভা উপভোগ করছিলুম। এক এক জায়গায় শৈলসানুতে এত বন্য-কদলীর বন, প্রথমটা মনে হয় সেখানে কেউ কলার বাগান করে রেখেচে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মানুষের বসতি নিকটে কোথাও নেই, ওগুলি পাহাড়ী বনকলার গাছ।

পরে এই পাহাড়ী কলা খেয়ে দেখেচি, অনেকটা বাংলাদেশের দয়া কলার মতো বীচি-সর্বস্ব। তেমন সুমিষ্টও নয়। বাড়বাকুণ্ড স্থানটি একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, গরম জলের সঙ্গে সধূম অগ্নিশিখা বার হচ্চে, জলে ও আগুনে ভীষণ গন্ধকের গন্ধ। পাণ্ডাঠাকুরেরা নিজেদের সুবিধের জন্যে জায়গাটা বাঁধিয়ে রেখেচে—যাত্রীরা গিয়ে দাঁড়ালেই তারা নানারকমে পয়সা আদায় করবার চেষ্টা করে, আমাকেও তারা ঘিরে দাঁড়ালো।

আমি বললুম—আমি যাত্রী নই, পথিক, পুণ্য করতে আসিনি, দেখতে এসেচি।

তারা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল, এমন অদ্ভুত কথা যেন জীবনে কোনোদিন শোনেনি।

বললে—কোথা থেকে আসচেন ?

—কলকাতা থেকে—

—হিন্দু না খ্রীষ্টান ?

—হিন্দু।

একটি অল্পবয়সী পাণ্ডাঠাকুর আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—আমি সস্তায় আপনার কাজ করিয়ে দেবো—পাঁচসিকে পয়সা দেবেন আমায়। আমি বড় গরিব, বাবা মারা গিয়েচেন আজ দুবছর হল, সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেচে। আমায় যা দেবেন, তাই নেবো।

ছেলেটির ওপর মমতা হল। আমি বললুম—বেশ, তোমায় আমি একটা টাকা দেবো—কিন্তু কোনো কাজকর্ম করার দরকার নেই আমার। তোমার প্রণামী স্বরূপ টাকাটা নাও—

ও বললে—আমার বাড়ি এবেলা খেয়ে যান—দুপুর ঘুরে গেল, না খেয়ে গেলে কষ্ট হবে।

দরিদ্র পাণ্ডাঠাকুরের ঘরবাড়ি দেখবার আগ্রহেই আমি তার সঙ্গে তার বাড়ি গেলাম। পাহাড়ের একপাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র মুলী-বাঁশের ঘর, তারই একখানাতে সে আর তার বিধবা মা বাস করে।

আমি যেতে ওর মা বার হয়ে এসে হাসিমুখে আমার জন্যে একখানা মোটা বুনুনির শীতল-পাটি পেতে দিলেন।

আমি তাঁকে প্রণাম করে একটা টাকা তাঁর পায়ে রাখলুম।

পাণ্ডাঠাকুরের মায়ের খাঁটি দেহাতী চাটগাঁয়ে বুলি আমার পক্ষে ভীষণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো।

তিনি বললেন—বাবা, তুমি কি চা-পানি খাও ?

—না মা, এত বেলায় আর চা খাব না।

—আমাদের বাড়ি চা নেইও। যদি অসুবিধে হয় তবে দোকান থেকে আনিয়ে দিতাম, তোমরা কলকাতার লোক কিনা, চা না খেলে হয়তো কষ্ট হতে পারে, তাই বলচি।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম, চা খেয়ে আমি সীতাকুণ্ড থেকে রওনা হয়েচি সকালে, এখন না খেলে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তারপর আহারের ব্যবস্থা।

আমি নগদ একটাকা প্রণামী দিয়েচি বলে আমার খাতির করতে তাঁরা বিশেষ ব্যগ্র হয়ে পড়লেন—কিন্তু দরিদ্রের সংসারে অনেক চেষ্টাতেও কিছু যোগাড় করতে পারলেন না। কিছু পরেই সে কথা বুঝলুম।

খাবার এল ভাত আর ডাল, এর সঙ্গে আর কোনো ভাজাভুজি পর্যন্ত নেই। আমি প্রথমে ভাবলুম ডাল দেবার পরে আরও কিছু দেবে। এদেশে তাই করে থাকে। ডালই এদেশে একটা পৃথক তরকারির মধ্যে গণ্য।

বরিশাল থেকে শুরু করে কক্সবাজার পর্যন্ত দেখেচি সর্বত্র এই একই নিয়ম।

প্রথমে বরিশালে যেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে খেতে বসেচি, শুধু দিয়ে গেল ভাত আর এক বাটি ডাল, তখন আমি তো অবাক। অতিথিকে শুধু ডাল দিয়ে ভাত দেওয়ায় আমি প্রথমটা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারিনি, কিন্তু তারপর শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবার পরে অন্যান্য অনেক ব্যঞ্জন একে একে আসতে শুরু করলে। এখানে অবিশ্যি তা হল না।

ডালের পরে অন্য কোনো ব্যঞ্জন এসে পৌঁছলো না দেখে শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল।

সন্ধ্যার দিকে আবার বাড়বাকুণ্ড থেকে চন্দ্রনাথের পথে উঠলুম।

আসবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের মা আমার নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন, পুনরায় আসতে বার বার অনুরোধ করলেন। দেখলুম, তিনি এমন খুশী, যেন খুব একজন বড়লোক যজমান পেয়ে গিয়েছেন, এবার থেকে যেন তাঁর সকল দুঃখ ঘুচবে। কষ্ট হল ভেবে যে এই দরিদ্র পরিবার আমার কাছে যে আশা করেচেন, আমার দ্বারা তা কতটুকু পূর্ণ হবে! হায়রে মানুষের আশা।

সন্ধ্যার কিছু পরে সীতাকুণ্ড গ্রামে ফিরে এসে দেখি আমি যাঁর সঙ্গে এসেছিলুম, তিনি জরুরী চিঠি পেয়ে চাটগাঁ চলে গিয়েচেন। আমায় আরও তিনদিন এখানে থাকতে বলেচেন, তিনি আবার আসবেন তিনদিন পরে। পাণ্ডাঠাকুর আমাকে যত্ন করে ভালো বিছানা পেতে দিয়েচে বাড়ির মধ্যে একটা ঘরে।

আমি যেতেই বললে, বাবু, আপনার জন্যে চায়ের জল চড়ানো রয়েচে, বসুন বেশ আরাম করে। আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েচি, বাবুর সামনে বেরুবে, কথা বলবে, তাতে কি! উনি তো আমাদের যজমান, বাড়ির লোক।

আমি বললুম—ঠিক, উনি তো মায়ের মতো। আমার সামনে আসবেন, এ আর বেশি কথা কি।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বয়েস তেইশ চব্বিশ, একহারা গৌরবর্ণা মেয়ে। মোটা লালপাড় শাড়ি পরনে। আমায় চাটগাঁয়ের বুলিতে যা বললেন তার মর্ম এই যে, আমি রাত্রে ভাত খাই, না রুটি খাই?

আমি বললুম—যা-ইচ্ছে করুন মা, আমার খাওয়ার কিছু বাঁধাবাঁধি নেই।

আর কিছু না বলে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন। যেন কত সঙ্কুচিত, লজ্জিত হয়ে আছেন নিজেদের আতিথ্যের ত্রুটির জন্যে। বাড়বাকুণ্ডতে দেখেচি, এখানেও দেখলুম এই সব দরিদ্র পাণ্ডাঠাকুরেরা অত্যন্ত সৎ ও ভদ্র। সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে বলে এরা নিতান্ত অনাড়ম্বর, সরল। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর এরা রাখে না। একটু পরেই সেটা কি চমৎকার ভাবেই ফুটে উঠেছিল পাণ্ডাঠাকুরের কথাবার্তার মধ্যে।

রাত্রে আহারাদির ব্যবস্থা এ অঞ্চলে সব জায়গায় যেমন দেখেচি তেমনি।

প্রথমে শুধু ভাত আর এক বাটি ডাল। অন্য কিছুই নেই এর সঙ্গে।

ডাল দিয়ে মেখে কিছু ভাত খাওয়ার পরে এল বেগুন ভাজা। শুকনো ভাত দিয়ে বেগুন

ভাজা খেতে হবে। তারপর শুঁড়ি কচুর তরকারি, কিন্তু তাতে এত সাংঘাতিক ঝাল দেওয়া যে আমার পক্ষে তা খাওয়া সম্ভব হল না। খাওয়ার পর্ব এখানেই শেষ।

রাত্রে পাণ্ডাঠাকুর আমার কাছে বসে নানারকম কথা বলছিলেন। আমি কলকাতা থেকে যখন এসেচি, তখন তাঁদের কাছে যেন কোনো অদৃষ্ট-পূর্ব জীব। কলকাতায় যারা বাস করে, তারা সবাই খুব বিদ্বান্ আর খুব ধনী। বোধ হয় আমি কোনো ছদ্মবেশী ক্রোড়পতি হবো।

আমায় বললেন, আপনি কলকাতায় কোন্ জায়গায় থাকেন ?

—শেয়ালদ'র কাছে।

—কোথায় কাজ করেন বাবু ?

—কেশোরাম পোদ্দারের আপিসে।

—কতটাকা মাইনে পান ?

—তিনশো টাকা।

কথার মধ্যে সত্য ছিল না। মাইনে পেতুম পঞ্চাশ টাকা।

—বাবু বেশ বড়লোক।

আমি বিনীত হাস্যের সঙ্গে মাথা নীচু করে রইলাম।

—বাবুর কি কলকাতায় বাড়ি ?

—হুঁ।

—ক-খানা বাড়ি আছে ?

—তা আছে খান পাঁচেক। ভাড়াও পাই মাসে মাসে প্রায় তিনশো টাকা।

—উঃ!

আমার মুখে পুনরায় লজ্জা ও বিনয়ের হাস্যরেখা ফুটে উঠলো।

—বাবু, আপনি যখন আমার বাড়ি এলেন, তখন আপনার চাল-চলন ধরন-ধারন দেখে আমার স্ত্রী বলেছিল, এই বাবু খুব বড়লোকের ছেলে। আমরা বাবু, দেখলেই মানুষ চিনতে পারি।

সে বিষয়ে অবিশ্যি কোনো সন্দেহ রইল না।

—বাবু, আপনি বিয়ে করেচেন ?

—ওঃ, কোন্ কালে। তিন চারটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেল।

—তাহলে খুব অল্প বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছিল ?

—হাঁ, তখন আমার বয়স আঠারো। আমার শ্বশুর একজন বড়লোক। কলকাতায় মস্ত ব্যবসা।

—তা তো হবেই বাবু, তা আপনি যখন আমার যজমান হলেন, যদি কখনো কলকাতায় যাই, আমার একটা থাকবার জায়গা হল।

—নিশ্চয়। আমার বাড়িতে গিয়েই দয়া করে উঠবেন।

পাণ্ডাঠাকুর আমার কথায় খুশী হয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন—ওগো শোনো, বাবু কি বলচেন।

আমি বিপদে পড়লুম, মেয়েদের কাছে বাজে কথা বলি কি করে ? কিন্তু ভগবান আমায় সে-বার দায় থেকে মুক্ত করলেন ; পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী এসেই আমাকে বললে, আপনি যদি কাল কুমারী পূজো করেন তবে আমায় বলবেন, আমি যোগাড় করে রেখে দিয়েচি দুজনকে।

আমি বললুম, কাল আমি বাড়িয়াডাল যাবো, ওদিকের পাহাড় আর জঙ্গলগুলো দেখে আসি, কাল আমার দরকার হবে না।

এদের আমার বড় ভালো লেগেছিল। অত্যন্ত সরল এরা, যা বলেচি, সব এরা বিশ্বাস করে নিয়ে খুশী হয়ে উঠেচে।

প্রতিদিন বেলা পড়লে আমি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তলায় একটি ঝরনার ধারে বেড়াতে যেতুম। সন্ধ্যাবেলায় স্থানটি একটি অপরূপ শ্রী ধারণ করতো। গাছপালার শ্যামলতা, বন-কুসুমের শোভা, সম্মুখের শৈলশ্রেণীর গম্ভীর উন্নত সৌন্দর্য, বনের পাখীর ডাক, ঝরণার কুলু-কুলু শব্দ—আর সকলের ওপরে স্থানটির নিবিড় নির্জনতা আমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টেনে নিয়ে যেতো সেখানটিতে।

চুপ করে বসে থাকবার মতো জায়গা বটে।

দুঘণ্টা বসে থেকেও আমার যেন তৃপ্তি হত না। সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর পর্যন্ত, ঝরনাটার ওপরে একটা ছোট কাঠের পুল আছে সেখানে বসে থাকতুম।

কোনো স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার একটি বিশেষ টেকনিক আছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি সে টেকনিক অর্জন করেচি, তাতে হয়তো অপরের উপকার নাও হতে পারে। আমার মনে হয় প্রত্যেক প্রকৃতি-রসিক ব্যক্তি অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজের টেকনিক নিজেই আবিষ্কার করেন।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতি-রানী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়। চুপ করে বসে থাকতে হয়, একমনে ভাবতে হয়, মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে আপনিই কত ভাবনা এসে পড়ে।

সে সব চিন্তার সঙ্গে কখনোই পরিচয় ঘটে না লোকালয়ের ভিড়ে।

এমন কি, সঙ্গে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।

সন্ধ্যার পরে অস্পষ্ট 'মেটে জ্যোৎস্না উঠে সে বনপর্বতের শোভা শতগুণ বাড়িয়ে তুলতো, কি একটা বনফুলের সুবাস ছড়াতো বাতাসে, মনে হত সমগ্র পৃথিবীতে আমি ছাড়া যেন আর দ্বিতীয় মানুষ নেই, সমস্ত পৃথিবী আমার, গোটা তারাভরা আকাশটা আমার। অলস স্বপ্নাতুর মনের অবকাশ-ভরা এক-একটি দিন, এক-একটি জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যা, যেন সহস্র সহস্র বর্ষজীবী কোনো দেবতার জীবনে এক-একটি পল বিপল।

অন্য সময়ে সেখানে কখনো যাইনি, যেতুম শুধু সন্ধ্যাবেলা—যখন সে পথে লোক চলাফেরা করতো না, মানুষজনের কণ্ঠস্বর কোনোদিকে শোনা যেতো না।

একদিন সেখানে বসে আছি, এমন সময়ে পথের দিকে কাদের কথাবার্তা শোনা গেল।

চেয়ে দেখি কয়েকজন লোক লণ্ঠন জেলে এইদিকেই আসচে। তাদের হাতে বড় বড় লাঠি।

আমাকে দেখে বিস্ময়ের সুরে বললে—এখানে কি করেন বাবু এত রাত্রে ?

আমি বললুম—এই বসে আছি।

তারা দস্তুরমত অবাক হয়ে গেল। বললে—এখানে একা বসে আছেন। বাড়ি কোথায় বাবুর ?

—কলকাতায়—

—আমরাও তাই ভেবেচি, বিদেশী লোক।

—কেন বল তো ?

—বাবু, এখানকার কোনো লোক এখানে এই সময় একা বসে থাকবে ? বিদেশী লোক আপনি, কিছুই জানেন না, তাই দিব্যি বসে আছেন। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বড় বাঘের ভয়। বিশেষ করে এই যে ঝরনার ধারে আপনি বসে আছেন, সন্ধ্যার পরে বাঘে এখানে জল খেতে নামে। প্রতি বছর দু-তিনটি মানুষকে বাঘে নিয়ে থাকে চন্দ্রনাথে। আপনি এখন আমাদের সঙ্গে চলুন—

—কোথায় যাবেন আপনারা ?

—আমরা চন্দ্রনাথের মন্দিরে আরতি করতে যাচ্চি, এই দেখুন আমরা চারজন লোকে আলো নিয়ে লাঠি নিয়ে যাচ্চি—রাত্রে ফিরবো না। সকালে পাহাড় থেকে নেমে আসবো—আপনিও চলুন, একা গাঁয়ে যাবেন না এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

আমি তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলুম। বন পাহাড়ের নৈশ সৌন্দর্য উপভোগ করবার এ সুযোগ কি ছাড়া যায়! তবে আমি ওদের বললুম, যাঁর বাড়ি উঠেচি, সন্ধ্যার পরে না ফিরলে তিনি খুব ভাববেন। তারা বললে—আপনার কোনো বিপদ ঘটলে তাঁকে আরও বেশি ভাবতে হবে, আপনি চলুন। ওদের সঙ্গে উঠতে উঠতে একবার পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলুম—দূরের সমুদ্র জ্যোৎস্নালোকে অতি অস্পষ্ট দেখা যায়, সমুদ্র বলে মনে হয় না, সমুদ্র হতে পারে, মাঠও হতে পারে।

সেই বিশাল বনস্পতিদের তলা দিয়ে পথ, জ্যোৎস্নার আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি, রীতিমত অন্ধকার।

আর, কি জোনাকির মেলা! অন্ধকারে বনের মধ্যে জোনাকির এমন ঘোরাফেরা, এমন ওঠানামা, এমন মেলা আর কখনো দেখেচি বলে মনে হয় না। লক্ষ লক্ষ জোনাকির সে কি বিচিত্র সমারোহ! আরণ্য প্রকৃতিকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি এই ধরনের অন্ধকার রাত্রে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে যদি অরণ্যের নৈশরূপ না দেখে থাকেন, তবে তিনি একটি অদ্ভুত সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত আছেন জীবনে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর শাখাপ্রশাখার অন্ধকার চন্দ্রাতপ, মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁক দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে। সে আকাশকে ঠিক তারা-ভরা বলা চলে না, কারণ, জ্যোৎস্নালোকে নক্ষত্রের ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গিয়েচে। তবুও বহু নক্ষত্র দেখা যায় ডালপালার ফাঁকে।

মাঝে মাঝে মূলী বাঁশের বন। নৈশ বাতাসে বাঁশপাতার মধ্যে সরসর শব্দ। রাত-জাগা কি পাখীর ডাক বাঁশবনের মগডালের দিকে! মাঝে মাঝে দূরের সমুদ্র দেখা যায়—এবার বেশ স্পষ্ট দেখা যায় জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রবক্ষ, তবে সন্দীপের তীররেখা চিনে নেবার উপায় নেই।

চন্দ্রনাথের মন্দিরে আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে চন্দ্রনাথের মন্দির—এখান থেকে একটা দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখলুম এই রাত্রে। মন্দিরের পাদদেশ থেকে ধাপে ধাপে গাছপালার ও বনঝোপের মাথা নেমে গিয়েচে কত নীচে, জ্যোৎস্নামণ্ডিত বনঝোপের মাথাগুলি অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়—তারপর নৈশ-কুয়াশায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে।

মনে হয় আমি একা আছি, আমার পায়ের তলায় সারা বনময় পৃথিবীটা—জ্যোৎস্না-লোকিত সমুদ্র, শৈলশ্রেণী। মন্দিরের চারপাশে বারান্দাতে বসে রইলুম অনেক রাত পর্যন্ত।

চাঁদ অস্ত গেলে আমার পায়ের তলায় বনভূমি গভীর অন্ধকারে ভরে গেল।

সে রকম গম্ভীর দৃশ্য দেখবার সুযোগ জীবনে বেশিবার আমার ঘটেনি—দেখে বুঝেছিলাম মৃত্যুর আগে প্রত্যেক মানুষ যেন গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে আরণ্য-প্রকৃতির অন্ধকার রূপ কোনো উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে বসে দেখে, নতুবা সে বুঝতে পারবে না বিশ্বপ্রকৃতির অসীম ঐশ্বর্য।

মন্দিরের পাশে একটা ছোট ঘরে আমরা শুয়ে রাত কাটাই।

রাত্রে আমার' ভালো ঘুম হল না—একটা বিরাট শৈলারণ্যের মধ্যে আমি শুয়ে আছি এ চিন্তাটা মন থেকে ঘুমের ঘোরেও গেল না, কতবার মনে হয়েচে জানালা দিয়ে চেয়ে বসে থাকি।

নামবার পথে একটা পাহাড়ী ঝরনায় হাতমুখ ধুয়ে নিলাম।

বড্ড শিশির পড়েচে সারারাত ধরে গাছপালায় বনঝোপে। টুপটাপ করে শিশির ঝরে পড়চে, প্রভাতের সূর্যালোক মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাঁধানো সোপানশ্রেণী ওপর আলোছায়ার জাল বুনচে।

পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ি এসে দেখি—যা ভেবেচি তাই।

তাঁরা কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমায় খোঁজাখুঁজি করেচেন। গ্রামের আট-দশজন লোক একত্র হয়ে লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে পাহাড়ের তলায় পর্যন্ত এসে অনুসন্ধান করেচেন। আজ সকালে থানায় খবর দেবার আয়োজন করচেন। আমার আকস্মিক অন্তর্ধানে গ্রামের মধ্যে শোর-গোল পড়ে গিয়েচে। তবে শেষ পর্যন্ত অনেকে নাকি ধরে নিয়েছিলেন যে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে হঠাৎ কোনো কাজে হয়তো চাটগাঁয়ে চলে গিয়েচি।

পাণ্ডাঠাকুরের বাড়িতে অনেকে একসঙ্গে আমায় ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন, আমি কোথায় ছিলুম, রাত্রি কোথায় কাটালুম—ইত্যাদি।

আমি রাত্রের ঘটনা বলতে ওরা সবাই মিলে, যারা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের দোষ দিতে লাগলো। না জানিয়ে তাদের এ রকম নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি পাহাড়ের ওপরে।

আমি বললুম—কেন, বাঘ ?

পাণ্ডাঠাকুর বললে—সেকথা কিন্তু ঠিক। বাঘের ভয় বিলক্ষণ আছে ওখানে। আপনি যে সন্ধ্যার সময় ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে বসে থাকবেন তা আমি কি করে জানবো ? আমি ভেবেচি আপনি ইস্টিশানে বেড়াতে যান সন্ধ্যাবেলা ট্রেন দেখবার জন্তে।

পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী আমায় বললেন এর পরে—আমি আপনার জন্তে ভাত রেঁধে কত রাত পর্যন্ত বসে রইলুম। শেষে রাতে ঘুমুতে পারিনি আপনার কি হল ভেবে।

এতগুলি নিরীহ লোক আশঙ্কা ও উদ্বেগের মধ্যে রাত কাটিয়েচে আমার জন্তে এবং আমিই এ জন্তে মূলত দায়ী, এতে আমি যথেষ্ট লজ্জিত হলুম।

সেদিন দুপুরের ট্রেনে আমি পরের স্টেশনে নেমে বারিয়াডাল রওনা হই।

শুধু বারিয়াডাল নয়, পায়ে হেঁটে এই সময় আমি চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণীর অনেক অংশ দেখে বেড়িয়েছিলুম। বারিয়াডাল একটা গিরিবর্ত্ম, পাহাড়শ্রেণীর যেখানটাতে নীচু খাঁজ, সেখান দিয়ে একটা রাস্তা পাহাড় টপকে ওপারে নেমে গিয়েচে।

বারিয়াডাল অঞ্চলে কয়েকটি বড় বড় ঝরনা ও সহস্রধারা নামে জলপ্রপাত আছে।

আমি সহস্রধারা দেখবার সুযোগ পাইনি—কিন্তু শৈলশ্রেণীর অনেক অংশে প্রায় তিনদিন ধরে ঘুরেছিলুম।

একটা কথা আমার মনে হয়েচে এই শৈলমালা ও অরণ্যের সম্বন্ধে। বাংলাদেশের মধ্যে এমন পাহাড় ও বনের শোভা আর কোথাও নেই। এই বনের প্রকৃতি যেরূপ, আসাম ছাড়া ভারতের কুত্রাপি এ ধরনের বন দেখা যাবে না।

বারিয়াডাল পার হয়ে পাহাড়ের পূর্বে সানুতে এসে বনের শোভা আরও চমৎকার লাগলো। এত বড় বড় ঝোপ, আর বড় বড় লতা চন্দ্রনাথ তীর্থ যেদিকে, সেখানে নেই। এদিকে খুব বড় বড় গাছ যেমন দেখচি, আমার মনে হয় আরাকান-ইয়োমার জঙ্গলেও অত বড় বড় গাছ নেই। গাছের গুঁড়িগুলো সোজা উঠেচে অনেকদূর, যেন কলের চিমনির মতো। একটা গাছের কথা আমার মনে আছে। শিমুল গাছের গুঁড়ির মতো তিন দিকে তিনটি বড় বড় খাঁজ, এক একটা খাঁজের মধ্যে এতটা জায়গা যে সেখানে এক একটি ছোটোখাটো পরিবারের রান্নাঘর হতে পারে। এই জাতীয় গাছ চন্দ্রনাথ পর্বত ছাড়া অন্ত কোথাও দেখিনি—বা এখানে যত অপরিচিত শ্রেণীর গাছ দেখেচি, এমনটিও বাংলাদেশের আর কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না।

এবার একটি beauty spot-এর কথা বলি।

স্থানটি আমার আবিষ্কার, এর বিবরণ কারো মুখে আমি শুনিনি বা কেউ কোথাও লেখেনি। বারিয়াডাল ছাড়িয়ে সাত মাইল উত্তরপূর্ব দিকে পাহাড়ের তলায় তলায় গেলে আওরঙ্গজেবপুর বলে একটা গ্রাম পড়ে। গ্রামটিতে মুসলমানের বাস, হিন্দু আদৌ নেই। আমি যে জায়গাটির কথা বলচি, আওরঙ্গজেবপুর থেকে সেটা আড়াই মাইল কি তিন মাইল দূরে দুটি পাহাড়ের মধ্যে।

আওরঙ্গজেবপুরের মুসলমান গৃহস্থদের অতিথিবৎসলতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আও-

কালকার উগ্র সাম্প্রদায়িকতার যুগে চোদ্দ পনেরো বৎসর পূর্বেকার সে কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়।

এই গ্রামটির পথের ওপর একটা গাছতলায় দুপুরে বসে বিশ্রাম করছিলাম! সারা সকাল লেগে গিয়েছিল বারিয়াডাল থেকে এতদূর আসতে। বনজঙ্গল অঞ্চল, কোথাও খাবারের দোকান নেই, কিছু পাওয়াও যায় না, সকাল থেকে কিছু খাইনি।

কাছেই গ্রাম দেখে সেখানে ঢুকলাম, মুড়ি বা চিঁড়ের সন্ধানে। প্রথমেই একটি লুঙ্গিপরা প্রৌঢ় মুসলমান গৃহস্থের সঙ্গে দেখা। তার ভাষা উৎকট দেহাতী চাটগেঁয়ে। আমার কথার উত্তরে প্রথমেই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে আমায় সেলাম করলে, তারপরে বললে—বাবু কোথা থেকে আসচেন?

তার ভদ্রতা আমায় যেন লজ্জা দিলে। সে আমায় শিষ্ট নমস্কার জ্ঞাপন করলে, আমি তো করলুম না! গ্রাম্য লোক শিষ্টাচারে আমাকে হারিয়ে দিলে।

আমার পরিচয় শুনে সে আমায় তার বাড়ি নিয়ে গেল। তাদের প্রকাণ্ড মূলী-বাঁশের ছাউনি বড় আটচালা ঘর, দাওয়াতে নিয়ে গিয়ে পাটি পেতে বসালে। গ্রামের আরও চার পাঁচজন মাতব্বর লোক এসে আমায় ঘিরে প্রশ্ন করতে লাগল। আর কি সব সরল প্রশ্ন!

—বাবু, ইদিকে কেন আসচেন, জঙ্গল কিনবেন না কি?

—না, বেড়াতে এসেচি তোমাদের দেশে।

—তা বাবু, আপনাদের কলকাতা তো খুব বড় শহর, এখানে কি দেখবারই বা আছে আপনাদের উপযুক্ত!

—কলকাতা দেখা আছে নাকি?

দুজন নীল লুঙ্গি পরা লোক পেছন দিকে বসে ছিল, তাদের দেখিয়ে একজন বললে—এরা বাবু সব জায়গায় গিয়েচে, বম্বে, বিলেত, জাপান—

আমি তো অবাক। বললুম—এরা কি করে গেল?

তখন পেছনের লোক-দুটি বললে—বাবু, আমরা জাহাজে কাজ করি। আমাদের এই গাঁয়ের বারো আনা লোক জাহাজ আর স্টীমারের খালাসী। আমরা এখন ছুটিতে আছি তিন মাস বাড়ি থাকবো, তারপর আবার কলকাতায় গিয়ে জাহাজে উঠবো।

ওদের সঙ্গে বসে অনেক কথা হল। সত্যিই দেখলুম অনেক দেশ বেড়িয়েচে ওরা। রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, কলম্বো, জাপান—এমন কি লণ্ডনের কথা পর্যন্ত ওদের মুখে শোনা গেল।

খানিকটা গল্প-গুজবের পরে ওরা বললে—বাবুর এবেলার খাওয়া-দাওয়া?

—অমনি কিছু মুড়ি বা চিঁড়ে কিনে—

—সে কি কথা, তা হবে না, ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না। হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল সব দেবো, আমাদের গ্রামে এখন আপনি দুদিন থাকুন না! একখানা ঘর দিচ্ছি আপনাকে—

আমার কোনো আপত্তি ওরা শুনলে না। রান্নার যোগাড় ওরা করে দিলে। আবার এমন ভদ্রতা, আমি বললুম রান্না করবার আমার দরকার নেই, ওদের রান্না খেতে আমার

আপত্তি নেই—তা ওরা শুনলে না। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ—কেন তারা আমার সামাজিক প্রথার ও আচারে একদিনের জন্যে হস্তক্ষেপ করবে? ওরা রেঁধে দেবে না। আমাকেই রান্না করতে হবে।

আওরঙ্গজেবপুর হতে বের হয়ে আমি যদৃচ্ছাক্রমে পাহাড়ের ধারে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ সেই অপূর্ব স্থানটিতে এসে পড়লুম।

একদিকে পাহাড়, একদিকে বন, পাহাড় থেকে বন নেমে এসেচে যেন সবুজ জলস্রোতের মতো, একটা অবিচ্ছিন্ন সবুজের প্রবাহের মতো উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যের উল্লাসে নৃত্যশীল সাগরোর্মির মতো।

তারই মধ্যে অনেকগুলি পত্রবিহীন অদ্ভুত ধরনের গাছ—তাদের ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেমন যেন আলুথালু ছন্নছাড়া অবস্থায়, নটরাজ শিবের নৃত্যভঙ্গির মতো।

এক রকম লতা উঠেচে গাছপালার সর্বাঙ্গ বেয়ে, তাদের মগডাল পর্যন্ত সাদা সাদা ফুলে লতাগুলো ভর্তি—গাছের মাথা সেই সাদা ফুলে ছাওয়া। একদিকে একটা ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী ঝরনা সেই অপূর্ব বনভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে, ছোটবড় শিলাখণ্ড বিছানো অগভীর পথে। তার দুধারে জলের ধারে ধারে ফুটে আছে রাঙা বন-করবী।

আমি কতক্ষণ সেখানে একটা পাথরের ওপর বসে রইলুম। একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে দেখেও যেন দেখবার পিপাসা মেটে না। গাছপালা, পুষ্পিত লতা, বনভূমি, দীর্ঘ শৈলমালা ও ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী—সব নিয়ে একটা অতি চমৎকার ছবি, এ ছবির কি একটা অস্ফুট রহস্যময় ভাষা আছে, খানিকটা বা বোঝা যায়, খানিকটা যায় না।

বিকেলে বেশ ছায়া পড়ে এসেচে স্থানটিতে—কতরকমের পাখী ডাকচে, বনলতার ফুলের সুগন্ধ ভুর ভুর করচে বাতাসে। এখানে হঠাৎ যদি কোনো বনদেবীকে আবির্ভূতা দেখতুম, তবে যেন তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, এখানে তো তাঁরা নামতেই পারেন, লোকালয়ের বাইরে এই বিহগকূজিত নির্জন বন-প্রান্তেই তো তাঁদের আসন।

সন্ধ্যার পূর্বে সেখানে থেকে আবার আওরঙ্গজেবপুরে চলে এলুম।

এরা থাকে যে গ্রামে, বাইরের খবর সেখানে যথেষ্ট পৌঁছোয় অন্য অনেক গ্রামের চেয়ে, কারণ এ গ্রামের অধিকাংশ লোক কাজ করে বাইরে। জাহাজে স্টীমারে চড়ে তারা অনেক দূরের সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েচে বহুবার।

শৈলপাদমূলের এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে বসে তাদের মুখে জাপানের, লণ্ডনের, সিংহলের অনেক গল্প শুনলুম। ওরা সে রাত্রে আমার জন্যে একটা খাসি ছাগল মারলে। যার বাড়ি ছিলুম, সে তার অনেক প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করলে ওর বাড়িতে।

আমাকে আলাদা রান্না করতে হল—কিছুতেই ওরা ওদের রান্না আমায় খেতে দিতে রাজি হল না। এদের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ খালাসী ছিল, তার নাম আবদুল লতিফ ভুঁইয়া। আবদুলের বয়স নাকি একানব্বুই বছর, অথচ তার চুলদাড়ি এখনও সব পাকেনি। দেখলে পঞ্চাশ কি

বাট বলে মনে হয় তার বয়স। সে আগে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজে মাল্লার কাজ করেচে এখন তার নাতি সমুদ্রে বার হয়, সে বাড়ি বসে চাষবাস দেখে।

আমি তাকে বললুম—আবদুল, তুমি বিলেত গিয়েচ?

—ও! বিলেতে তো ঘরবাড়ি ছিল।

—কোথায় থাকতে?

—সেলরস্ হোম আছে আমাদের জন্ম। সেখানেই থাকতুম।

—কেমন জায়গা?

—উঃ, পরীর দেশ বাবু, মেয়েমানুষ তো নয়, যেন সব পরী।

—মিশতে ওদের সঙ্গে?

—বাবু, ওসব দেশের তারা আপনি গায়ে এসে পড়ে। তাদের এড়িয়ে আসা যায় না।

তারপর সে তার ডজনখানেক প্রণয়কাহিনী আমার কাছে বলে যেতে লাগলো। লোকটির অভিজ্ঞতা সত্যিই অদ্ভুত, তার সঙ্গে একটি মেমের নাকি বিয়ে হয়। দু বছর তাকে নিয়ে ও ইংলণ্ডের কোনো একটা গ্রামে ছিল, গ্রামের নাম উইটেনহ্যাম। নামটা আবদুল বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিল, যদিও ইংরিজি কিছুই জানে না সে। আমি বললুম, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি-ভাষায় কথা বলতে?

—ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলতুম, আর হাত নেড়ে পা নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দিতুম।

—কি করে চালাতে সে গাঁয়ে? চাকরি করতে?

—না বাবু, জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়াতুম, মাঝে মাঝে আপেল বাগানে চাকরিও করেচি। উইটেনহ্যামে অনেক আপেল বাগান ছিল। বেশ জায়গা বাবু—

—তোমার স্ত্রী বেশ ভালো ছিলেন নিশ্চয়ই—

—ভালো মানুষ ছিল আর খুব ছেলেপুলে ভালোবাসতো। আমার যত্ন করতো খুবই। আমায় বলতো, তোমার দেশে আমায় নিয়ে যাও, কি রকম দেশ দেখবো—

—এনেছিলে নাকি?

—আনতাম হয়তো, কিন্তু বাবু সে দু-বছর পরে মরে গেল। আমার কিছু ভালো লাগলো না, সেখানে থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা দেশে চলে এলুম। সে বাঁচলে উইটেনহ্যামেই বরাবর থাকতুম হয়তো। আপেলের বাগান করবার বড্ড শখ ছিল—

—আচ্ছা এসব কতদিন আগের কথা হবে?

—পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা বাবু, কি তারও আগের কথা। উইটেনহ্যামে একবার ধুমধাম হল, গির্জার গান বাজনা হল, শুনলাম নাকি মহারানীর কত বছর বয়স হল, সেই জন্যে ওরকম হচ্চে। মহারানী তখন বেঁচে—কি ধুমধাম হল পাড়াগাঁয়ে!

আবদুল লোকটা ভিক্টোরিয়ান যুগের লোক, মহারানীর ডায়মণ্ড জুবিলী দেখে এসেচে বিলেতে বসে। কিন্তু ওকে দেখে কে ভাববে সে কথা! আবদুল এখন পাহাড়ের ধারের

ধানের ক্ষেতে ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে বসে পাহারা দেয় আর শীতলপাটি বোনে। বয়স হল এত, তবু সে বসে থাকে না।

আওরঙ্গজেবপুর গ্রামে সবই মুসলমান। আমার বড় ভালো লেগেছিল ওদের, আমাকেও বড় পছন্দ করতো ওরা। যেদিন আসি, অনেক গ্রাম ছেড়ে অনেকদূর পর্যন্ত এসে আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল।

পথ বেয়ে চলেচি। এবার দেখলুম পাহাড়ের নীচে মাঝে মাঝে অনেক গ্রাম পড়ে এ দিকটাতে। পাহাড়ই এসব গাঁয়ের একটা বড় সম্পদ। পাহাড় জোগায় জ্বালানি কাঠ, ঝরা-পাতা; ঝরনা জোগায় জল; তা ছাড়া পাথর কুড়িয়ে এনে এরা ঘরবাড়ির দেওয়াল করেচে, রোয়াক করেচে।

লম্বা টানা চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য এখান থেকে দেখা যায় বড় সুন্দর। বনের শোভাও অদ্ভুত। মনে হয় এ একটা আলাদা জগৎ। যারা এ বনের কোলে গ্রামে বাস করে, এর বিচিত্র বৃক্ষলতার সমাবেশ, বনফুলের শোভা, পাখীর ডাক, ঝরনার কলতানের মধ্যে যাদের শৈশব কেটেচে, তারা একটা বড় সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতাকে লাভ করেচে জীবনে।

তবে মাঝে মাঝে বাঘ আসে এ অভিযোগ সকল গ্রামেই শুনেচি। শীতকালের দিকে বেশি বার হয়, গোরু ছাগল ভেড়া তো নেয়ই, মানুষ পেলেও ছাড়ে না।

গ্রামের লোকদের বিশ্বাস, সন্ধ্যার পরে পাহাড়ে ওঠা-নামা বা জঙ্গলে ঢোকা উচিত নয়। ভূত আছে, অপদেবতা আছে, আরও কত কি আছে। সন্ধ্যার পরে এরা প্রাণান্তেও পাহাড়ে যাবে না।

এখানকার এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণবাড়ি মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। স্থানটি ফেণী সবডিভিসনের অন্তর্গত ধূম স্টেশন থেকে পনেরো ষোল মাইলের মধ্যে। এদের দেশে ভোজের পূর্বে ফল ও মিষ্টান্ন খেতে দেয়, তারপর আনে লুচি, তারপরে ভাত আর তরকারি। মেয়ের বিয়ের ভাত খাওয়ায়, এ অন্য কোথাও দেখিনি।

ধূম স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়ে চলে এলুম আখাউড়া।

এক সময়ে এ অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়—বিশাল সমতলভূমি ক্রমশ নীচু হতে হতে সমুদ্রের জল ছুঁয়েচে। ধানের সময় মনে হয় সবুজের সমুদ্র গোটা দেশটা।

আখাউড়া থেকে আগরতলা মাইল পাঁচ ছয় দূরে। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অনেকদিন ধরে দেখবার বড় শখ ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলচি, তখন মোটর বাস হয়নি, আখাউড়া থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আগরতলা গিয়ে পৌঁছুলাম বেলা প্রায় দশটার সময়।

কোথায় গিয়ে উঠবো কিছু ঠিক ছিল না, গাড়িতে একজন বলেছিল বিদেশী ভদ্রলোক গেলে মহারাজার অতিথিশালায় উঠতে পারে। আমার দেখবার ইচ্ছে হল; সে ব্যাপারটি কি রকম একবার দেখতে হবে। শুনলুম মহারাজের দপ্তরের কোনো একজন কর্মচারীর সই-

করা চিঠি ভিন্ন রাজার অতিথশালায় থাকতে পারা যায় না। আমি রাজদপ্তরের কাউকে চিনতুম না, তবু সাহস করে গেলাম এবং কেশোরাম পোদ্দারের প্রদত্ত পরিচয়-পত্র দেখিয়ে সেখান থেকে একখানা টিকিট যোগাড় করে রাজার অতিথিশালায় এসে উঠলুম।

অতিথিশালায় অনেকগুলো ঘর, মূলী বাঁশে ছাওয়া বেশ বড় বাংলো, দুদিকে বড় বারান্দা, পেছনদিকে রান্নাঘর ও বাবুর্চিখানা। দুরকম থাকার কারণ অতিথিরা ইচ্ছামত ভারতীয় খাদ্য ও সাহেবী-খানা দুরকমই খেতে পারেন। প্রত্যেক ঘরে কলকাতার মেসের মতো তিন চারটি খাট পাতা, তাতে শুধু গদি পাতা আছে, অতিথিরা নিজেদের বিছানা পেতে নেবেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার। সকালে চা, বিস্কুট, টোস্ট দেয়, দুপুরে ভাত, তিন-চারটি ব্যঞ্জন, মাছ, মাংস ও পোয়াটাক দুধ, রাত্রে অতিথির ইচ্ছামত ভাত বা রুটি। শীতকালে ব্যবহারের জন্যে গরম জল দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

যে ক-জন চাকরবাকর আছে, তারা সর্বদা তটস্থ, মুখের কথা বার করতে দেরি সয় না, তখুনি সে কাজ করবে। তিনদিন এখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে স্টেটের খরচে—তারপর থাকতে হলে অনুমতি-পত্রের মেয়াদ বাড়িয়ে আনতে হয় রাজদপ্তর থেকে।

প্রকৃতপক্ষে অনেকে সাতদিন আটদিন কি তার বেশিও থাকে, চাকরবাকরদের কিছু দিলে তারাই ওসব করে নিয়ে এসে দেবে।

আমি গিয়ে দেখি অত বড় বাংলোতে একজন মাত্র সঙ্গী—আর কোনো অতিথি তখন নেই। জিজ্ঞেস করে জানলুম তিনি প্রায় মাসখানেকের বেশি আছেন রাজ অতিথিরূপে। ইনি অদ্ভুত ধরনের মানুষ—একাধারে ভবঘুরে দার্শনিক, কবি ও মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

অনেক দিন হয়ে গেলেও এই ভদ্রলোকের কথা আমার অতি স্পষ্ট মনে আছে। আমার বইগুলির দু একটি চরিত্রের মূলেও ইনি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। পরে এঁর কথা আরও বলচি।

আগরতলা ছোট্ট শহর, রাজপথে বেজায় ধুলো, ঘরবাড়িগুলোও দেখতে ভালো নয়—এ শহরের কথা বলবার মতো নয়। আমার ভালো লেগেছিল মহারাজার নতুন প্রাসাদ, ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানার কয়েকটি বন্যজন্তু, 'কুঞ্জবন' প্রাসাদ ও বড় একটা ফুলের বাগান। আর ভালো লেগেছিল সুলেখক ও সুপণ্ডিত কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্মনকে। ইনি মহারাজের জ্ঞাতি ও খুল্লতাত, রাজদপ্তরে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে সময়ে, বৌদ্ধদর্শন ও ইতিহাসে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনো। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক, যখন আমি তাঁর বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলুম তাঁর সঙ্গে, তখন আমি তরুণ-বয়স্ক, তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বৎসরের কাছাকাছি—কিন্তু আমার সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মতো মিশেছিলেন, কত আগ্রহ করে তাঁর বৌদ্ধগ্রন্থের লাইব্রেরি দেখিয়েছিলেন, সে কথা আমার আজও মনে আছে।

মহারাজার নতুন প্রাসাদের বড় ফটকে বন্দুকধারী গুর্খা বা কুকি পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে। অনুমতি ভিন্ন কাউকে প্রাসাদ দেখতে দেওয়ার নিয়ম নেই।

একদিন আমি নিঃসঙ্কোচে ছড়ি ঘুরিয়ে সহজভাবে ফটকের মধ্যে ঢুকে গেলুম, যেন আমি নতুন লোক নই, মহারাজের প্রাসাদে যাতায়াত করা আমার নিত্যকর্ম। কুকি পাহারাওয়ালা

চেয়ে চেয়ে দেখলে কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না, কেন যে সে কিছু বললে না, তা আমি আজও জানিনে।

একাই প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়লুম—বিভিন্ন ঘর দেখে বেড়ালুম, কেউ কিছুই বললে না। একটা বড় হলঘরে অনেকগুলো বড় বড় বিলিতি ছবি। হল ঘরটিতে সুন্দর সুন্দর কোচ কেদারা পাতা, সুদীর্ঘ ভিনিসিয়ান আয়না দেওয়ালে, সিল্কের কাজ করা পরদা, ভেলভেটে মোড়া গদি, চমৎকার কার্পেট পাতা মেজের ওপর।

একটি ছোট্ট সুন্দরী খুকি ঘরটিতে বসে প্রাইভেট টিউটারের কাছে লেখাপড়া করচে। খুকিটি এত চমৎকার দেখতে! আমি প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে আলাপ করলুম। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলায়, নামটা আমার মনে নেই, আমার সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল।

তিনি বললেন—আপনাকে দরবার-ঘর দেখাই চলুন। ওখানে সকলকে যেতে দেওয়া হয় না—ঘর বন্ধ থাকে, দাঁড়ান চাবিটা আনিয়ে নিই।

দরবার-ঘরে ঢুকে তার ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এককোণে উঁচু বেদীর ওপর হাতীর দাঁতের সিংহাসন, সোনালী ব্রোকেডের কাজকরা লাল মখমলের গদি মোড়া। পাছে ধুলো-বালি জমে নষ্ট হয় বলে সিংহাসনটি তুলো দিয়ে ঢাকা। দুটি প্রকাণ্ড হাতীর দাঁত সিংহাসনের দুদিকে, দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো। মাস্টার মশায় বললেন, হাতীর দাঁত-জোড়া স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল থেকে কোনো কুকি সামন্তসর্দার রাজদরবারে নজর দিয়েছিল।

—কুকি সামন্তেরা কোথায় থাকে?

—পার্বত্য অঞ্চলে ওদের জায়গীর, মহারাজ ওদের ফিউডাল চিফ, দরবারের সময়ে কুকি সামন্ত সর্দাররা তাদের জাতীয় পোশাক পরে যখন আসে, সে একটা দেখবার জিনিস! ওদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে কত অনুচর আসে। সে সময় থাকেন তো দেখতে পাবেন।

—কতজন সামন্ত আছে?

—ঠিক বলতে পারবো না, তবে পনেরো কুড়ি জনের কম নয়। ওদের অঞ্চল ওরা নিজেদের ধরনে শাসন করে, ওদের নিজেদের আইন ও রীতি-নীতি সেখানে চলে।

বিকেলে আমি 'কুঞ্জবন' প্যালেসের দিকে বেড়াতে গেলুম।

পথে এক জায়গায় একটা ছোট চিড়িয়াখানা আছে মহারাজের। তার মধ্যে Ciret Cat জাতীয় একটি বন্যজন্তু আমার বড় ভালো লেগেছিল।

সেটা দেখতে কতকটা বিড়ালের মত—কিন্তু বিড়ালের চেয়ে অনেক বড়। যতবার গায়ে লাঠি দিয়ে খোঁচা দেওয়া যায়, ততবার সেটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে 'ফ্যাঁচ' করে তেড়ে আসে, খাঁচার লোহার ডাণ্ডার গায়ে মারে এক থাবা। এ যেন তার বাঁধা নিয়ম—যতবার খোঁচা দেওয়া যাবে, ততবার সেটা ঠিক ওই একই রকম ভাবে ফ্যাঁচ করে তেড়ে আসবেই।

তার ওই ব্যাপারটা দেখা শেষকালে আমার এমন ভালো লেগে গেল যে অতিথিশালা

থেকে প্রায় আধ মাইল হেঁটে দু-বেলা আমাকে চিড়িয়াখানা যেতে হত, যে ক-দিন আগরতলা ছিলাম।

'কুঞ্জবন' প্যালেস একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পুরনো আমলের তৈরী বলেই দেখতে ঢের ভালো লাগলো, মার্টিন কোম্পানির তৈরী মহারাজের নতুন প্রাসাদের চেয়ে। কুঞ্জবন প্যালেসের একটা ঘরে অনেক প্রাচীন চিত্র, হাতীর দাঁতের শিল্প, ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্বপুরুষদের বড় বড় ছবি ইত্যা দ িছে—এসব খুঁটিনাটি করে দেখতে অনেক সময় গেল।

একটি হাতীর দাঁতের ক্ষুদ্র নারীমূর্তি আমার কি ভালোই লেগেছিল! চার পাঁচ ইঞ্চির বেশি বড় নয়, পুরনো হাতীর দাঁত, হলদে হয়ে গিয়েচে—কি কমনীয়তা আর জীবন্ত লাবণ্য মূর্তিটির সারা গায়ে। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। শুনলুম এক সময়ে এখানে হাতীর দাঁতের জিনিস-পত্রের ভালো শিল্প ছিল। এই ক্ষুদ্র মূর্তিটি কোন্ অজ্ঞাত কারিগরের শিল্পপ্রতিভার অবদান জানিনে, মন কিন্তু তার পায়ে আপনিই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে।

প্রাসাদের ছাদ থেকে সূর্যাস্ত দেখে মনে হল এমন একটা সূর্যাস্ত কতকাল দেখিনি!

গোটা আকাশটা লাল হয়ে এল, যেন পশ্চিম দিগন্তে লেগেচে আগুন, তারই ছোঁয়াচে রক্তশিখা সারা আকাশে হালকা সাদা মেঘে আগুন ধরিয়েচে, প্রকাণ্ড আগুনের গ্লোবের মতো সূর্যটা কুঞ্জবন প্রাসাদের পিছনকার ঢেউ খেলানো অনুচ্চ শৈলমালা ও সবুজ অরণ্যভূমির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

যতদূর চোখ যায়, শুধু উঁচুনীচু পাহাড় আর উপত্যকা, উপত্যকা আর পাহাড়; ঘনবনানী-মণ্ডিত রাঙা সরু পথটি বনের মধ্যে এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ওপর একবার উঠে একবার নেমে, কতদূর চলে গিয়ে ওদিকের দিগন্তে মিশে অদৃশ্য হয়েচে।

একদিন আমি একা এই পথে অনেকদূর গিয়েচি, সেও বিকেল বেলা। কুঞ্জবন প্যালেসের চূড়া আর দেখা যায় না, চারিপাশে শুধু বন আর পাহাড়।

একজন টিপ্রাই লোক তীর ধনুক হাতে সে পথে আসচে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম —এদিকে কি দেখবার আছে? গ্রাম্য টিপ্রাই জাতির কথা বোঝা ভীষণ শক্ত। সে কি বললে প্রথমটা ভালো বুঝতেই পারলুম না, তারপর মনে হল সে বলচে, ও দিকে আর যাবেন না সন্ধ্যার সময়।

—কেন?

—বুনো হাতীর ভয়, এই সব বনে এই সময় আসে।

—তুমি কোথায় থাকো?

—ওদিকে আমাদের গ্রাম আছে এই পাহাড়ের ওপারে—

—তীর ধনুক হাতে কেন?

—তীর ধনুক না নিয়ে আমরা বেরুই না, জঙ্গলের পথে নানা উৎপাত।

—আমাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে চল, দেখবো।

—এখন আর সময় নেই, সেখান থেকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে—

—তুমি আমায় পৌঁছে দিও শহরে, বকশিশ দেবো—

লোকটা রাজি হল না। তার অনেক কাজ আছে, সে যেতে পারবে না।

অতিথিশালায় ফিরে দেখি আমার সঙ্গী টেবিলে আলো জেলে কি লেখাপড়া করচেন। এই ভদ্রলোকটিকে আমার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হত—কি কাজ করে, কি ভাবে, কি ওর জীবন, এসব জানতে আমার খুব আগ্রহ ছিল মনে মনে। কিন্তু কোনো কথা সে সব নিয়ে জিজ্ঞেস করা ভদ্রতাসঙ্গত হবে না বলে তার নিজের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ইতিপূর্বে করিনি।

আজ হঠাৎ কি জানি কেন বললুম—কি লিখচেন ?

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—একটা রিপোর্ট লিখচি—

—কিসের রিপোর্ট ?

—আমি পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে দেখলুম ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায়নি। মহারাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করচি। এমন কি, আমার মনে হয় পেট্রোলিয়ামের সন্ধানও এখানে পাওয়া কঠিন হবে না। সেই সব সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখচি। বসুন আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্চি এখানে পেট্রোলিয়ামের খনি থাকা অসম্ভব নয় কেন।

তারপর ভদ্রলোক আমাকে স্বাধীন ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বোঝাতে শুরু করলেন। অনেক কিছু বললেন, আমি কিছু বুঝলাম, বেশির ভাগই বুঝলাম না। কেমন করে পৃথিবীর স্তর দুমড়ে বেঁকে উৎসের সৃষ্টি করে, পেট্রোলিয়াম আর কয়লা একই পর্যায়ভুক্ত জিনিস, আরও সব কত কি।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা আমার বড় ভালো লাগলো।

আমি তাঁর বিষয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন করিনি, কেবল পূর্বের প্রশ্নটি ছাড়া। তাঁকে দেখে আমার মনে হল লোকটি বৈষয়িক নয়, অর্থোপার্জন এঁর ধাতে নেই, পয়লা নম্বরের ভবঘুরে মানুষ। সে রাত্রে তাঁর কথাবার্তা শুনে আমার সে ধারণা আরও দৃঢ় হল।

আমায় তিনি বড়লোক হবার অনেক রকম ফন্দী বাৎলে দিলেন। সামান্য মাইনের চাকরী করে কোনো লাভ নেই। এই সব অঞ্চলের পাহাড়ে কয়লা আছে, পেট্রোলিয়াম আছে, সোনা আছে, জঙ্গলের কাঠ কেটে চালান দিতে পারলে দু বৎসরে ফেঁপে ওঠা যায়। তিনি মহারাজকে ভজিয়ে সত্বর একটা মাইনিং সিন্‌ডিকেট গড়ে তুলবেন, এই আগরতলাতেই তার হেড আপিস হবে, কোনো বড় বিলিতি কোম্পানীর সঙ্গে তিনি চিঠি চালাচালি করবেন এ নিয়ে—ইত্যাদি অনেক কথা।

আমি বললুম—আপনি আর কতদিন আছেন এখানে ?

—তা কি বলা যায় ? কাজ শেষ না হলে তো যাচ্চিনে। এক মাসের কম নয়, দু মাসও হতে পারে।

—কলকাতায় বুঝি থাকেন আপনি?

—সেখানে ছিলাম কিছুদিন। ঢাকাতেও ছিলাম—আরও অনেক জায়গায় ছিলাম। এখানকার কাজ সেরে রেঙ্গুন যাবার ইচ্ছে আছে। আপার বর্মা অঞ্চলে একবার ঘুরে প্রস্‌পেকটিং করবো। যেতাম এতদিন, শুধু আমার এই শরীরের জন্যে—

—আপনার কি অসুখ?

—হজম হয় না যা খাই। তবু তো আগরতলা এসে অনেক ভালো আছি। দেখেছেন তো কত লেবু খাই, সারাদিনে পনেরো কুড়িটা কাগজি লেবু না খেলে আমার শরীর ভালো থাকে না!

—আপনার দেশ বুঝি কলকাতায়?

এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাড়ি ও আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা। কিন্তু তিনি আমার অযথা কৌতূহলকে তেমন প্রশ্রয় দিলেন না বলেই মনে হল। অন্য কথা পাড়লেন, আবার সেই ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য। ধীরভাবে কিছুক্ষণ তাঁর বক্তৃতা শুনবার পরে গেস্ট হাউসের ভৃত্য নৈশ আহারের জন্যে ডাক দিয়ে আমায় সে-যাত্রা উদ্ধার করলে।

খেতে গেলে চাকর আমায় বললে, বাবু, আপনি সাহেবের খবর কি জিজ্ঞেস করছিলেন। উনি এখানে অনেকদিন আছেন, আমরা ওঁর টিকিট বদলে আনি আপিস থেকে। তিনদিন থাকবার পরে টিকিট না বদলালে এখানে থাকতে দেবার নিয়ম নেই। একটা কথা বলচি বাবু, উনি এতদিন আছেন, কখনও কোনো চিঠি আসেনি ওঁর নামে! কেউ নেই বাবু, থাকলে আর চিঠি দেয় না!

আমি ধমক দিয়ে চাকরটাকে চুপ করালুম। তার অত কথার দরকার কি।

একদিন দেখি ভদ্রলোক গ্যেটের ফাউস্ট-এর ইংরিজি অনুবাদ পড়ছেন। আমায় ডেকে দু-এক জায়গা শোনালেন, গ্যেটে সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। বায়রন যখন যুবক, গ্যেটে তখন বৃদ্ধ, বায়রনের মতো সুশ্রী তরুণ কবিও প্রেমিক গ্যেটের মনে কি রেখাপাত করেছিলেন প্রধানত সেই সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। এই বইখানা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, বহুবার পড়েচেন। সর্বদা সঙ্গে রাখেন।

আমি তাঁর টেবিলে 'ফাউস্ট'-খানা পড়ে থাকতে দেখলুম বিকেলেও, তখন তিনি বেরিয়ে গিয়েচেন। বই দেখে মনে হয় ভদ্রলোকের অবস্থা ভালো নয়। বইয়ের পাতাগুলো ময়লা, বাঁধুনি আলগা, এত প্রিয় বই অথচ এমন অযত্নে রেখেছেন কেন? হাতে পয়সা থাকলে কি আর বই বাঁধাতেন না?

বড় দরের কবিকে ভালোবাসে, এমন লোক দুজন দেখলুম আমার ভ্রমণের মধ্যে, বরিশালের সেই শেক্‌সপিয়ারের ভক্ত ভদ্রলোক, আর ইনি। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা বড় তফাত রয়েছে, বরিশালের সে ভদ্রলোকের অবস্থা সচ্ছল, এমন কি তাঁকে ছোটখাটো জমিদার বলা চলে, কিন্তু ইনি একেবারে নিঃসম্বল। অথচ কি অদ্ভুত কাব্যপ্রিয়তা! বড়

রাত্রেই ফিরতেন, তাঁকে দেখতাম 'ফাউস্ট'-এর কয়েকখানা পাতা না পড়ে কিছুতেই ঘুমোতেন না।

আমি যেদিন 'কুঞ্জবন' প্যালেস দেখতে গেলুম দ্বিতীয় বার, সেদিন সকালবেলা ধোপা তাগাদা করতে এসে ভদ্রলোককে অনেক কড়া কথা শুনিয়ে [illegible]। আমার বড় কষ্ট হল। হিন্দুস্থানী ধোপা, সে গেস্ট-হাউসের অনেক বাবুসাহেবের কাপড় কেচেছে, এমন তাগাদা কাউকে কখনও করতে হয়নি, আজ সাত আট দিন হাঁটাহাঁটি করচে, আর সে কতদিন হাঁটবে? আমার ইচ্ছে হল ভদ্রলোককে বলি, যদি তাঁর কাছে না থাকে, আমার কাছ থেকে কিছু না হয় নিতে কিন্তু তাতে যদি তিনি কিছু মনে করেন?

আগরতলায় আমার থাকবার দিন ফুরিয়ে এল। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্মন মহাশয়ের দুটি তরুণ আত্মীয়-যুবকের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল, এদের যুবক না বলে বালক বলাই সঙ্গত, কারো বয়স সতেরোর বেশি না।

ওরা রোজ গেস্ট-হাউসে আসতো, গল্পগুজব করে চলে যাবার সময় আমায় টেনে নিয়ে যেতো তাদের সঙ্গে। একদিন ওরা বললে, চলুন পিকনিক করা যাক শহরের বাইরে কোথাও—

আমি বললুম, পাহাড়ের দিকে যাওয়া যাক—

আমার গেস্ট-হাউসের সঙ্গীটি তখন ছিলেন না, রাত্রে তাঁর কাছে প্রস্তাব করতেই তিনি তখনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, আমায় কি দিতে হবে?

আমরা হিসেব করে দেখেছিলুম জন-পিছু এক টাকা করে দিলেই চমৎকার পিকনিক হয়ে যায়। সস্তার দেশ, তা ছাড়া সাদাসিদে সাধারণ জিনিস ছাড়া পাওয়াই যখন যায় না। ওঁকে সেকথা বললুম, উনি তখন বললেন, তাহলে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন সকালবেলা।

আমার ইচ্ছে ছিল না টাকার কথা তোলবার, উনিই তুললেন, কাজেই আমায় বলতে হল। রাত্রে শুয়ে কেবলই মনে হতে লাগলো উনি এখন একটা টাকা পাবেন কোথায়? বলে ভালো করিনি। কিন্তু টাকা নিতে না চাইলে ভদ্রলোকের আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হয় এদিকে, সুতরাং টাকা দিতে চাইলে নেবো নিশ্চয়।

ভোরে উঠে দেখি আমার সঙ্গী কোথায় বেরিয়েচেন আর আসেন না। আটটার সময় আমাদের রওনা হবার কথা, ছেলে দুটি আমায় ডাকতে এসে বসে রইল, দশটা বাজে, তখনও দেখা নেই তাঁর। প্রায় সাড়ে দশটার সময় তিনি এলেন, আমাদের দেখে যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমরা বললুম, আপনার জন্যেই বসে আছি। চলুন, বেলা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—হাঁ এই একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। তা এইবার—। খানিক পরে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার তো যাওয়া হবে না বিভূতিবাবু, আমার একটু কাজ আছে আজ—

আমি বললুম, তা কখনো হয়! আপনাকে যেতেই হবে। আপনার জন্যে আমরা বসে আছি দেখুন কতক্ষণ থেকে।

তিনি কিছুতেই যেতে চাইলেন না। তাঁর মুখ দেখে যেন বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ বলে মনে হল। আমার তখন কিছু মনে হয়নি কিন্তু তারপরে আমার এ ধারণা হয়েছিল যে ওঁর যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও চাঁদার একটি টাকা যোগাড় করে উঠতে না পেরে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। হয়তো বা সকালে টাকার চেষ্টাতেই বেরিয়ে থাকবেন।

আমি বিশেষ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম ভদ্রলোক না যাওয়াতে। কিন্তু কি করি, কোনো উপায় ছিল না। কুঞ্জবন প্যালেস ছাড়িয়ে আরও প্রায় দু মাইল পিছনে একটা ভাঙা বাড়ি আছে কাদের। সেখানে চারিদিকে ঘন বন, পাহাড়ী ঝরনা, মুলী বাঁশের ঝাড়, বাঁশবনের আড়ালে টিপ্রাইদের ক্ষুদ্র গ্রাম—চমৎকার নিরিবিলি জায়গা। একটা টিলার মাথায় সেই ভাঙা বাড়িটা। নীচে বাঁশবনের ছায়ায় ঝরনার ধারে রান্নাবান্না করলাম, গান গাইলাম, কবিতা আবৃত্তি করলাম, কাঠ কুড়িয়ে আনলাম রান্নার জন্যে, জল তুললাম। গ্রাম থেকে টিপ্রাইদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে আমাদের কাণ্ড দেখতে লাগলো।

বেলা যখন প্রায় তিনটে বাজে, তখন হঠাৎ 'বিভূতিবাবু! বিভূতিবাবু!' বলে কে যেন ডাকচে—দূর থেকে শুনতে পেলুম। আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বাঁশবনের ওপারের পথে টিলার পাশে দূর থেকে কে যেন ডাকচে ঠিকই। আমরা প্রত্যুত্তরে খুব জোরে হাঁক দিলাম, এই যে এখানে! আমাদের একজন রাস্তার দিকে ছুটে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই দেখি আমার গেস্ট-হাউসের বন্ধুটি লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁশবন ভেঙে হাসিমুখে আমাদের দিকেই আসচেন।

—এলুম আপনাদের কাছে, না এসে কি পারি! কাজটা শেষ হয়ে গেল, তাই বলি, যাই। তারপর, কতদূর হল?

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে পেয়ে আমরা তো অত্যন্ত খুশী। আমার সত্যিই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোক না আসাতে। তিনি বললেন—এসব জায়গা আমার পরিচিত, পায়ে হেঁটে কতবার এসেছি। আপনারা যখন বললেন কুঞ্জবন প্যালেসের উত্তরের পাহাড়ে যাবেন, তখনই ভেবেচি এই জায়গা। একটু চা খাওয়ান তো আগে, উঃ হাঁপিয়ে গিয়েচি—

আমরা তাঁকে পেয়ে যেমন খুশী, তিনিও আমাদের পেয়ে তেমনই খুশী।

একটু পরে আমরা সবাই মিলে গান আরম্ভ করলুম—তার মধ্যে দুজন রান্না করতে লাগলো। আমার সঙ্গীটি তাঁর বয়স ভুলে আমাদের সঙ্গে গানে আমোদে এমন করে যোগ দিলেন সে সেদিন বুঝলুম তাঁর মনের তারুণ্য, যা জীবনের আর্থিক অসাফল্যে বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি।

সেইদিন রাত্রে ফিরে এসে তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু আমায় বললেন। শুনে আমার পূর্বের অনুমান আরও দৃঢ় হল, লোকটি পয়লা নম্বরের ভবঘুরেও বটে, স্বপ্নালুও বটে।

তখন আমার অটোগ্রাফ নেবার বাতিক ছিল—বললুম তাঁকে আমার অটোগ্রাফের খাতায় কিছু লিখে দিতে। আজও আমার কাছে তাঁর লেখা আছে—নামটি প্রকাশ করবার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে আমি নিই নি, কাজেই নাম এখানে দিলাম না। তবে আমার মনে হয় যে প্রকাশ করলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না—আজকাল কেউ তাঁর নাম জানে না।

আগরপাড়া থেকে এলুম ব্রাহ্মণবেড়িয়া।

এখানে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠি, তিনি ওখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জেনেছিলাম।

আমি তাঁর ওখানে গিয়ে পৌঁছুই বিকেল বেলা। সন্ধ্যার কিছু আগে তিনি বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ, আমার বাড়িতে রাঁধুনী ঠাকুর নেই, আপনাকে নিজে কিন্তু রাঁধতে হবে। আমাদের রান্না তো আপনাকে খেতে দিতে পারিনে—

আমার কোনো আপত্তি ছিল না অবিশ্যি—কিন্তু তাঁদের দিক থেকে ছিল।

সেটা বুঝেই আমি রাঁধতে রাজি হয়ে গেলুম।

সন্ধ্যার সময় চাকর এসে আমায় বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেল। আয়োজন দেখে তো আমার চক্ষুস্থির! তিন চার রকমের মাছ, কপি, বেগুন, শাক, আলু, আরও কত কি পৃথক পৃথক থালায় কোটা। হলুদ বাটা, জিরে বাটা, ছোট ছোট পাত্রে সাজানো।

একবার জীবনে নিজে রান্না করে খাওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল—শুধু ভাতে ভাত রাঁধবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম সেই ক-দিন। এত আয়োজনের মহাসমুদ্রে তাতে পাড়ি জমানো যায় না। আমি বিষণ্ণমুখে এটা ওটা নাড়াচাড়া করচি, পাশের ঘর থেকে একটি অল্পবয়সী বিধবা মহিলা এসে আমার রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়ালেন।

বোধ হয় আমার হাতা খুন্তি ধরবার ভঙ্গি দেখেই তিনি এক চমকে আমার রন্ধন-বিদ্যার দৌড় বুঝে নিলেন।

চাকরকে ডেকে আমায় কি বলতে বললেন—চাকর বললে, দিদিমণি বলচেন আপনি রাঁধতে জানেন তো? আমি দেখলাম, যদি বলি রাঁধতে জানিনে এদের মুশকিলে ফেলা হয়। আমার জন্যে এরা কিভাবে কি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবে এই রাত্রিকালে? সেভাবে এদের এখন বিব্রত করা অত্যন্ত অসঙ্গত হবে।

সুতরাং তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললুম—রান্না? কেন জানবো না?—কত রেঁধেছি—

ভাবলুম আর দেরি করা উচিত নয়। যা হয় একটা হাঁড়িতে চড়িয়ে দিই।

কি একটা হাঁড়িতে চড়িয়েচি মহিলাটি আবার এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার রান্নার বহর দেখে তিনি বুঝলেন এভাবে রন্ধনকার্য চললে আমার অদৃষ্টে আজ খাওয়া নেই। অতিথির প্রতি কর্তব্য স্মরণ করেই বোধহয় তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন। বললেন—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনি রাঁধুন তো—হাঁড়িটা নামিয়ে ফেলুন। তারপর তিনি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে দিতে লাগলেন। দুতিন ঘণ্টা লেগে গেল সব জিনিস রাঁধতে।

যখন খেতে বসেচি তিনি একটু দূরে বসে আমায় যত্ন করে খাওয়ালেন। হেসে বললেন —আপনি যে বললেন রাঁধতে জানেন ?

—একটু একটু জানি, সামান্য। মানে খুব ভালোরকম নয়।

—কিছুই জানেন না আপনি রান্নার।

আমি চুপ করে রইলাম। বিদ্যে যেখানে ধরা পড়ে গিয়েচে সেখানে কথা বলা সঙ্গত নয়। দুদিন আমি তাঁদের বাড়ি ছিলাম। ভদ্রমহিলা চারবেলা কেবল আমার রান্নার জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আমায় রান্না দেখিয়ে দিতেন তাই নয়, তিনি শুধু হাঁড়িটা ছুঁতেন না, বাকি কাজ সব নিজের হাতেই করতেন, তরকারিতে মশলা মাখানো, তরকারি হাঁড়িতে ছেড়ে দেওয়া— সব।

তিনি গৃহস্বামীর বিধবা কন্যা, যেমন শান্ত তেমনি স্নেহময়ী ও কর্তব্য-পরায়ণা। আমি তাঁকে দিদি বলে ডেকেছিলুম। তিনিও আমার ওপর ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করেছিলেন যে-দুদিন তাঁদের ওখানে ছিলাম।

আমার ভ্রমণপথে আর একটি মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। সেকথা যথাস্থানে বলবো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নোয়াখালি রওনা হই দুপুরের ট্রেনে।

এখানে এসে স্থানীয় জনৈক উকিলবাবুর বাড়িতে উঠি। এক একটা জায়গা আছে যা মনের মধ্যে অবসাদ ও অস্বস্তির সৃষ্টি করে, নোয়াখালি সেই ধরনের শহর।

হয়তো এখানে একটি দিন মাত্র থেকেই চলে যেতাম কিন্তু যে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলাম তিনি আমায় যেতে দিলেন না। তাঁর আতিথেয়তার কথা আমার চিরদিন স্মরণে থাকবে। ভদ্রলোক নোয়াখালি 'বার'এর একজন বড় উকিল, তাঁর বাড়ি যেন একটি হোটেলখানা। বাইরের দিকে এক সারি টিনের ঘরে কয়েকটি দরিদ্র স্কুলের ছাত্র থাকে, ভদ্রলোক তাদের শুধু যে খেতে দেন তা নয়, ওদের সমুদয় খরচ নির্বাহ করেন। এ ছাড়া আহূত ও অনাহূত কত লোক যে তাঁর বাড়ি দুবেলা পাতা পাতে তার কোনো হিসেব নেই। এই ভদ্রলোকের নাম আমি এখানে উল্লেখ করলুম না, তার কোন প্রয়োজন নেই। আশা করি তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং ভগবানের কৃপায় দীনদরিদ্রের উপকার সমান ভাবেই করে যাচ্চেন।

আমার চেয়ে তাঁর বয়স অনেক বেশি, কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি মিশতেন ঠিক যেন সমবয়সী বন্ধুর মতো। সকালে উঠে আমার ঘরে এসে বসে কত গল্প করতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালো ছিল না তাঁর বাড়ি, অত লোককে খেতে দিতে গেলে রাজভোগ দেওয়া চলে না গৃহস্থের বাড়ি। কিন্তু ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে বসে সেই মোটা চালের ভাত, ডাল আর হয়তো একটা চচ্চড়ি কি ভাজা দিয়ে খেয়ে উঠতেন! তিনি গৃহস্বামী, এত টাকা উপার্জন করেন, নিজের পৃথক ভোগের আয়োজন ছিল না তাঁর।

দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেরিয়েচি ?

চিরযৌবনা নিসর্গসুন্দরী সব কালে সবদেশেই মন ভুলায়, মন ভুলায় তার শ্যামল চেলাঞ্চল, বনময় ফুলসজ্জা, মধুমল্লীর সৌরভভরা তার অঙ্গের সুবাস।

তাকে সব স্থানে পাওয়া যায় না সে রূপে, কিন্তু মানুষ সব জায়গাতেই আছে! প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধহয় কত রকমের মানুষকেই যে দেখালেন জীবনে!

মানুষকে জেনে চিনে লাভই হয়েচে, ক্ষতি হয়নি, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাতত ক্ষতি বলে মনে হলেও, ভবিষ্যতে মনের খাতায় তাদের অঙ্ক পড়ে গিয়েচে লাভের দিকেই। মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সামা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর-দক্ষিণমেরু অভিযানের মতই কষ্ট ও অধ্যবসায়সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি এখানে থাকুন আরও কিছুদিন।

আমি বললুম, আমার থাকবার যো নেই, নইলে নিশ্চয়ই থাকতুম।

—এখন আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না, আবার কবে আসবেন বলুন।

—তার কোনো ঠিক নেই, তবে এদিকে এলেই আপনার এখানে আসবো।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও চেহারা এখনও যুবকের মতো। অমন উদার মুখশ্রী আমি খুব বেশি লোকের দেখিনি। আর সব সময়েই আনন্দ হাসিখুশি নিয়েই আছেন।

আমায় বললেন, দেখুন, আমার ইচ্ছে করে লোকজন নিয়ে খুব আমোদ করি। সকলেই আমার এখানে খাওয়াদাওয়া করুক, সবাইকে নিয়ে থাকি। একবার কি হল জানেন, ক-দিন ধরে একটি পয়সা আর নেই, আমার জমানো টাকা বলে কিছু বড় নেই তো—যা আয়, তাই-ই ব্যয়। একদিন আমার স্ত্রী বললেন, শুধু ডাল আর ভাত ছাড়া আর কিছুর ব্যবস্থা নেই। শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখেই সবাইকে নিয়ে আমোদ করে খাওয়া গেল। আমি একা বসে খেতে পারিনে।

সত্যিই তাই দেখেছি এঁর বাড়ি। দিনমানে সকলের একসঙ্গে খাওয়া বড় একটা হয়ে ওঠে না; কারো কাছারি, কারো স্কুল। কিন্তু রাত্রে ভিতরবাড়ির রান্নাঘরের দাওয়ায় আঠারো উনিশ-খানা পিঁড়ি পড়বে। উকিলবাবুর পিঁড়ি মাঝখানে, তাঁর আশেপাশে তাঁর আশ্রিত দরিদ্র ছাত্রগণ, তাঁর ছেলেমেয়েরা, অতিথি-অভ্যাগতের দল। সবাই যা খাবে তাঁকেও তাই দেওয়া হবে।

খাওয়ার সময় সে একটা মজলিসের ব্যাপার।

উকিলবাবু গল্প করতে ভালোবাসেন, গল্প করতে পারেনও। ছাত্রদের উপদেশ দেন, তাঁর প্রথম জীবনের ছোটখাটো ঘটনা বলেন, হাসির গল্প করেন। আমি এই মজলিসে বিশেষ কোনো আনন্দ পাই নি তার কারণ আমি নবাগত, ওদের কাউকে চিনিনে, অল্পদিনের

পরিচয়। এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয়, উকিলবাবু যখন কথা বলচেন, সেখানে আর কেউ বলতো না কিছু, তিনিই একমাত্র বক্তা। যেমন, আমাকে কখনো তিনি কিছু বলবার অবকাশ দেননি। আমার ইচ্ছে করলেও বলতে পারতাম না। আমার মনে হত ভদ্রলোক খুব ভালো কিন্তু বড় সংকীর্ণ জগতে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন।

ওঁর জগৎ এই নিজের বাড়িটি নিয়ে, এই আশ্রিতজনদের নিয়ে, এদের মধ্যে রাজত্ব করেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। এদের বাইরে অন্য কোনো জগৎ ইনি দেখেচেন কি? কখনও দেখবার তৃষায় ব্যাকুল হয়েচেন কি? না দেখলেও কোনো ক্ষতি নেই, যদি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আকুলতা মনের মধ্যে সদাজাগ্রত থাকে।

বাসনা ও ব্যাকুলতা মনের যৌবন। ও দুটো চলে গিয়েচে যে মন থেকে সে মনে জরা বাসা বেঁধেচে। নিজে তো সুখ পায় না, অপরকেও দিতে পারে না। সব বাসনার অবসান যে মনে, আকুলতা তীব্রতা যে মন থেকে—তৃপ্তিব দ্বারা ভোগের দ্বারাই হোক, বা ক্ষীয়মাণ কল্পনার জন্যেই হোক—চলে গিয়েচে, সে মন স্থবির।

যেখানে গিয়েচি, সেখানেই দেখেচি উর্ণনাভ যেমন নিজের জালের মধ্যে জড়িয়ে বসে থাকে, গুটিপোকা যেমন গুটির মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখে, প্রত্যেকে এক এক নিজস্ব ক্ষুদ্র জগতে নিজেদের বন্দী রেখে হৃষ্টমনে জীবনের পথে চলেচে, এজন্যে তারা অসুখী নয, অতৃপ্ত নয়।

কত জগৎ দেখে বেড়ালে তবে সংকীর্ণতার জ্ঞান মানসপটে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞানটাই বড়, এই জ্ঞান অর্জন করা সময়সাপেক্ষ তাও জানি; মনুষ্যত্বকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে প্রধান সহায় প্রসারতাকে চেনা, তাহলেই সংকীর্ণতাকেও চেনা যায।

নোয়াখালি থেকে আমি গেলুম মেঘনার তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে।

সেখানে কোনো কাজের জন্যে যাইনি, বিস্তৃত মেঘনা নদীর তীরে বসে একটা দিন অলসভাবে কাটাতে গিযেছিলুম। বিদায় নিযেই এসেচি নোয়াখালি থেকে, এখানে দুদিন কাটিয়ে অন্য দিকে চলে যাবো।

আমার কাজ ছিল মেঘনার ধারে একটি ক্ষুদ্র ঝোপের ছায়ায় চুপ করে সারাদিন বসে থাকা। বড় গাছ সেখানটাতে নেই. নদীর ধারে বর্ষার ভাঙনে সব গিয়েচে, আছে এখানে-ওখানে দু-একটা ছোটখাটো ঝোপ।

ভারি আনন্দে কাটিয়েছিলাম এখানে এই দুটি দিন।

এত বড় নদী আমাদের দেশে নেই, মেঘনার বিরাট বিস্তৃতিকে সমুদ্র বলে মনে হত, যেন কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে বসে আছি, আমার সামনে যেন চিরজীবন অবসর, কত স্বপ্নজাল বোনবার অবকাশ, দীর্ঘ, দীর্ঘ অবকাশ। সব চেয়ে ভালো লাগতো বিকেলে।

ধীরে ধীরে ছায়া পড়ে আসতো বড় বড় ধানের মাঠের উপর, মেঘনার বিস্তৃত জলরাশির উপর। জলচর পাখীর বিরাট দল আকাশ অন্ধকার করে যেন কোন্ সুদূর কালের চরের দিকে উড়ে যেতো—সন্ধ্যারাগরক্ত আকাশের আভা পড়ত জলে, দূরের বৃক্ষশ্রেণীর মাথায়; তারপরে

আকাশে নবেন্দুলেখা ফুটে উঠতো আমার মাথার ঠিক উপরে। খুব বড় পাল উড়িয়ে মহাজনী বহর চলে যেতো নদী বেয়ে সন্দীপে কি চাটগাঁয়ে!

যাদের বাড়ি উঠেছিলাম, তারা এখানকার বেশ বড় ধরনের গৃহস্থ। কোনো পুরুষে কেউ কাজ করে না, বিস্তৃত ধানের জমির ফসলে বছর চলে যায়—বাড়িতে অনেক গোরু, হাঁস ও ছাগলের পাল।

আমি থাকতাম বাইরের একটা ঘরে। সেদিন বেড়িয়ে ফিরলে গৃহস্বামী আমার কাছে তামাক টানতে টানতে গল্প আরম্ভ করলেন। আমার কৌতূহল হল ওঁদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানবার।

জিগ্যেস করলাম—আপনাদের এ বাড়ি কতদিনের?

—আজ প্রায় বিশ বছরের, এদিকে ভাঙন ধরেনি অনেক দিন।

—ধানের জমিতেই আপনাদের চলে বোধ হয়?

—তা আড়াইশো বিঘে জমি আছে।

—নিজেরা লাঙলে চাষ করেন, না ভাগে?

—বর্গা দিই, অত জমি কি নিজ লাঙলে চষা যায়।

—ধান ছাড়া অন্য কোনো চাষ আছে?

—আর যা আছে তা সামান্যই। ধানই এদেশের প্রধান ফসল। গোলার ধান বেচে সংসারের কাপড়চোপড়, ওষুদবিষুদ, বিয়ে-থাওয়া সব হয়।

শুধু মাত্র ধানের ফসলের ওপর এখানকার জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত। দেখেছি সকালে উঠে ছেলেমেয়েরা পান্তা ভাত খায়, বড়লোকেরা খায় চিঁড়ে, মুড়ি বা খই। মুড়ির চেয়ে এখানে চিঁড়ে বা খইয়ের চলনই বেশি। দুপুরে গরম ভাত—বিকেলে ছেলেমেয়েদের জন্যে আবার বাসি ভাত বা খই চিঁড়ে। রাত্রে সকলের জন্যে আবার গরম ভাত। ধান থেকে যা পাওয়া যায়—তা ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য এখানে মেলে না, পেতেও এরা অভ্যস্ত নয়। অবিশ্যি তরি-তরকারি মাছ দুধের কথা বাদ দিই। ফলের মধ্যে নারিকেল ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না।

যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি এখান থেকে চলে যাই, সেদিন সকালবেলা গৃহস্বামী বৈষয়িক কাজে কোথায় চলে গেলেন। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রাখলুম; তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন যে, আমার যাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

বাড়িতে পুরুষমানুষের মধ্যে একজন চাকর, ক্ষেত খামারের কাজ দেখে আবার ক্ষেতের তরি-তরকারি হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। আমার খাওয়ার জায়গা বাইরের ঘরের সঙ্গে একটা ছোট কুঠুরিতে হ'ত, এদিন সে-ই খাবার সময় উপস্থিত রইল। মেয়েরা আমার সামনে বেরুতেন না, ভাত দিয়ে তাঁরা চলে যেতেন, খেতে বসে কোনো জিনিসের দরকার হলে ন-দশ বছরের একটি ছোট মেয়ে নিয়ে আসতো।

সন্ধ্যার পূর্বে গরুর গাড়ি এল। আমি জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিতে বললাম। এমন সময় সেই ছোট মেয়েটি এসে বললে—বাড়ির মধ্যে আসুন—ডাকচে মা—

আমি ভাবলাম আমায় ভুল করে ডাকচে, ছেলেমানুষ। আমায় কেন ডাকবেন তাঁরা ?

বললুম—কাকে ডাকচেন খুকি ? আমি নয়, তোমার ভুল হয়েছে।

—না, মা বললেন আপনাকে ডেকে নিয়ে আসতে—

অগত্যা খুকির সঙ্গে আমি বাড়ির মধ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি নীচুমত চালা-ওয়ালা একটা দাওয়ায় একখানা আসন পাতা, তার সামনে থালায় খাবার সাজানো।

খুকি বললে—আপনাকে মা খেতে বলচেন—আপনি গাড়িতে যাবেন, কোথাও খাওয়া হবে কি না, খেয়ে নিন।

আমি সত্যই অবাক হয়ে গিয়েচি তখন।

এখান থেকে চার মাইল দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে রেলে চাপবো এবং প্রায় সারারাতই ট্রেনে কাটাতে হবে—এ অবস্থায় খাওয়া হবে না তো নিশ্চয়ই, কিন্তু মেয়েরা সেকথা আন্দাজ করলেন কি করে—এই ভেবে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না।

খেতে বসে গেলুম অবিশ্যি। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ, সূর্য ডুববার পূর্বে দু বার ভাত খাবো না—বোধ হয় এই কথা ভেবে মেয়েরা খেতে দিয়েচেন চিঁড়ে খইয়ের লাড়ু, নারকোলের লাড়ু, মুড়কি, দুধ, কলা ইত্যাদি।

আমার মনে আছে ছোটবড় নানা আকারের লাড়ু, কতগুলো খেলার মার্বেলের মতো ছোট।

যতক্ষণ থালার সমস্ত খাবার নিঃশেষ না করলাম, ততক্ষণ মেয়েরা ছাড়লেন না—ছোট মেয়েটিকে দিয়ে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন এটা খেতে ওটা খেতে। তাঁদের আগ্রহে ও আন্তরিকতায় আমার মনে যে ভাব জাগলো—তা হল নিছক বিস্ময়ের ভাব।

কেন আমাকে খাওয়ানোর জন্যে এদের এত আগ্রহ ? অতিথি বিদায় নিয়ে গেলে তো ঝামেলা মিটে যায়—সে লোকটা রাত্রে আবার পেট ভরে খেলে না খেলে তার জন্যে মাথাব্যথা করার কার কি গরজ ?

জগতে নিঃস্বার্থ স্নেহ ও সেবা খুব বেশি দেখা যায় না বলেই অনেক বৎসর পূর্বের সেই সন্ধ্যায় সেই অজানা গৃহলক্ষ্মীদের স্নেহের স্মৃতি আমার মন থেকে আজও মুছে যায়নি।

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর পুল পার হয়ে আবার ট্রেন এসে থামলো ঘোড়াশাল স্টেশনে।

ঘোড়াশাল ঢাকা জেলায়—এখান থেকে কিছুদূরে নরসিংদি গ্রামের হাই-স্কুলে আমার এক বন্ধু হেডমাস্টার, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, বিদেশ-ভ্রমণের সময় পরিচিত বন্ধুজনের দেখাসাক্ষাৎ বড় আনন্দদান করে, সেজন্যে ঠিক করেছিলাম ঢাকা যাবার পথে বন্ধুটির ওখানে একবার যাবো।

নরসিংদি বেশ বড় গ্রাম, তবে স্কুলের জায়গাটি কিছু দূরে, গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্যে স্কুল। আমি যখন গিয়ে সেখানে পৌঁছুলাম—তখন বেলা প্রায় এগারোটা। একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতে বললে, হেডমাস্টারবাবু এখন ক্লাসে আছেন।

ছেলেটিকে বললুম, আমি এখানে অপেক্ষা করচি, তুমি হেডমাস্টারবাবুকে গিয়ে বল তাঁর একজন বন্ধু দেখা করতে এসেচে। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার বন্ধু ছেলেটির পিছু পিছু আসচেন। এ ভাবে এই দূর প্রবাসে আমাকে হঠাৎ দেখে তিনি খুব খুশী।

বললেন, তারপর, কোথা থেকে এলে হে?

আমি কি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েচি, তা সব খুলে বললুম। বন্ধু বললেন—বেশ ভালো, ভালো। এখানে যখন এসে পড়েচ, কিছুদিন থাকো। কলকাতা থেকে এসে একেবারে হাঁপিয়ে পড়েচি হে—আজ দু বছর এই 'গড-ফরসেকন্' জায়গায় যে কি কষ্টে আছি তা আর কি বলবো! একটা লোকের মুখ দেখতে পাইনে—

—সুন্দরবনে বাস করচো নাকি? এত লোকের মধ্যে থেকেও লোকের মুখ দেখতে পাও না কি রকম?

অজ পাড়াগাঁয়ের স্কুল। পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম—স্কুলের শিক্ষক যাঁরা সকলেরই বাড়ি এখানে, হেডমাস্টার আর হেডপণ্ডিত এই দুজন মাত্র বিদেশী। আমার বন্ধু ছাত্রজীবনে পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন, খুব স্মার্ট, ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়, চেহারাও খুব সুন্দর।

এহেন স্টাইলবাজ, সুপুরুষ, ইংরেজিতে উঁচু সেকেণ্ডক্লাস পাওয়া ছেলে মাত্র ষাট টাকা মাইনেতে এই সুদূর ঢাকা জেলার এক পাড়াগাঁয়ে এসে আজ তিন বছর পড়ে আছে!

চাকুরির বাজার এমনি বটে।

এই সব কথা মনে মনে ভাবছিলুম সারা পথ আসবার সময়ে।

কিন্তু এখানে এসে মনে হল বন্ধুটি যে জায়গায় আছে, আর কিছু না হোক, অন্তত প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে জায়গাটা ভালো। গ্রামের বাইরে দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ মেঘনার তীর ছুঁয়েচে, তারি মাঝে মাঝে ছোট ছোট বেতঝোপ, মাঝে মাঝে বুনো শঠির গাছ। এদিকে একটা ছোট খাল।

স্কুলের বাড়িটি এই ছোট খালের ধারে, বড় বড় ঘাসের বনের আড়ালে। নিকটে লোকালয় আছে বটে কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার বা দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এসে পড়েচি কোনো মায়াবলে।

স্কুল-বাড়ির পাশে বোর্ডিং। তিনচারটি বড় বড় ঘর, সেগুলির মেজে হয়নি এখনও, সুতরাং মাটির সঙ্গে প্রায় সমতল, অত্যন্ত নীচু ভিতের ওপর বাড়িটা গাঁথা। আমার বন্ধুর কথামত একটি ছেলে আমার সঙ্গে করে এনে বোর্ডিং-এর একটা ঘরে বসিয়ে রেখে গেল।

আমার বন্ধুটি এই ঘরে থাকেন। একটা কাঠের তক্তপোষ, তার ওপর আধময়লা একটা বিছানা, আর তার ওপর খানকতক বই ছড়ানো। অন্যদিকে কতকগুলো চায়ের পেয়ালা, একটা স্টোভ, দুটি টিনের তোরঙ্গ, একজোড়া পুরোনো জুতো ইত্যাদি। হেডমাস্টারের জন্যে বোর্ডিং-এর এই ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হয়েচে বুঝলাম।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেল ঘণ্টা-দুই পরেই।

আমার বন্ধু হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকলেন। আর দুটি আধময়লা কাপড় পরা শিক্ষক তাঁর

সঙ্গে বোর্ডিং-এর দোর পর্যন্ত এসে সম্ভবত হেডমাস্টারকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। আমার বন্ধু তাঁদের বললেন, আপনারা আসবেন কিন্তু এখুনি—বেশি দেরি না হয়, চা খাবার সময় হয়েছে প্রায়।

আমি ভাবলুম আমার বন্ধু বোধ হয় ওই দুটি শিক্ষককে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে। বন্ধুকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—ওদের আবার নেমন্তন্ন করবো কি। ওরা তো দিনরাত এখানে পড়ে থেকে আমায় খোশামোদ করে—আমাদের ড্রইং মাস্টার একজন, আর একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত। ওদের বললাম এসে চা করতে আমাদের জন্যে—ওরা আমার অর্ধেক কাজ করে দেয়।

সেই পুরনো চালবাজ বন্ধু আমার! কিছুই বদলায়নি ওর।

তারপর আমার বন্ধু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন—সব বাঙাল হে, সব বাঙাল! মুখ দিয়ে ভাষা উচ্চারণই হয় না। আমাদের মতো ইংরিজি বাংলা মুখ দিয়ে বেরুবে কোথা থেকে ওদের? আমার ইংরিজি শুনে ওরা সবাই ভারি আশ্চর্য হয়ে যায়। বলে, এমন উচ্চারণ কখনো শুনিনি। তাই সবাই খুব খাতির করে।—বন্ধু গর্বভরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

অনেকদিন পরে সতীর্থের সঙ্গে সাক্ষাতে বড় আনন্দ হল। কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়লো। পটুয়াটোলার একটা মেসের ঘরে বসে বন্ধুটির মুখে এমনি কত চালবাজির কথাই যে শুনেচি!

কিছুক্ষণ পরে সেই দুটি মাস্টার এসে ঘরে ঢুকলেন। আমার বন্ধু মিথ্যা নেহাত বলেনি, ঘরে ঢোকবার মুহূর্ত থেকে আর যতক্ষণ তারা ছিল ততক্ষণ এমন একটা নম্র, লাজুক, নিতান্ত দাস-সুলভ ব্যবহার করলে আমার বন্ধুর সামনে যে দেখে আমার নিতান্ত কষ্ট হল।

এদের কথায় খুব বেশি ঢাকা জেলার টান, কিন্তু আমার কানে বেশ লাগতো। ড্রইং মাস্টারটির বয়স একটু বেশি, তিনি ঢোকবার কিছু পরেই আমার বন্ধুর রূপগুণ ও বিদ্যার প্রশংসা সেই যে শুরু করলেন, আর হঠাৎ সে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আসতেই চান না। আমায় বললেন, বাবুর বাড়ি?

—কলকাতায়—

—আপনি আর হেডমাস্টারবাবু পড়েছিলেন একসঙ্গে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আপনিও এম-এ পাস?

—আমি বি-এ পাস করেছিলুম—আর পড়া ঘটেনি।

—কি করেন এখন বাবু?

—একটা চাকরি করি, তাতে বেড়িয়ে বেড়াতে হয়। সেজন্যেই তো আপনাদের দেশে এসে পড়েচি—

—খুব ভালো হয়েচে এ গরিবদের দেশে এসেচেন। আপনারা কলকাতার কলেজের

ভালো ছেলে, আপনাদের মুখের ভাষাই অন্তরকম। বড় ভালো লাগে হেডমাস্টারবাবুর মুখের বাংলা আর ইংরিজি শুনতে। এ রকম এদেশে কখনও শোনেনি—

এই দুটি শিক্ষক দেখলুম আমার বন্ধুর সমস্ত কাজ করে দেয়। ওরাই চা করে আমাদের খেতে দিলে, আবার তামাক সেজে দিলে, একজন গিয়ে বাজার থেকে পান নিয়ে এল, কারণ পান ফুরিয়ে গিয়েছিল।

ওরা অনেক রাত পর্যন্ত রইল। সন্ধ্যার পরে ওরা আমার বন্ধুকে বললে—মাস্টারবাবু, তাহলে আপনি বসুন, বাবুর সঙ্গে কথা বলুন, আমরা দুজনে খাবারটা তৈরী করে ফেলি।

আমি বললুম, কেন, বোর্ডিং-এর ঠাকুর নেই ?

—আছে, তা উনি ঠাকুরের হাতে খান না। নিজেই রাঁধেন, আমরা যোগাড়-যন্ত্র করে দিই—

—বোর্ডিং-এর চাকরে সে সব কাজ করে না ?

—চাকর নেই এ বোর্ডিংএ। ছেলেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে।

আমি বন্ধুকে বললুম, চলো আমরাও রান্নাঘরে গিয়ে বসি।

রান্নাঘরে আমরা এসে বসলুম বটে, কিন্তু সেখানে আমাদের জন্য ময়দা মাখা, রুটি সেঁকা, তরকারি রাঁধা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করলে শিক্ষক দু'টি।

আমার বন্ধু বেশ চুপ করেই বসে রইলেন—ওদের কাজে এতটুকু সাহায্য করলেন না। এমনভাবে ওদের সেবা নিলেন, যেন এ সে সেবা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। ব্যাপার দেখে মনে হল রোজই এই ব্যাপার চলে—শিক্ষকদুটিই প্রতিরাত্রে হেডমাস্টারের রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়।

আমাদের পরিবেষণও করলে ওরা।

ড্রইং মাস্টারটি আমায় বললে, আপনি কিছু খাচ্ছেন না কেন বাবু ? ভালো করে খান।

কত যত্নে ওরা আমায় বসে খাওয়ালে। হেডমাস্টারের বন্ধু, সুতরাং আমিও ওদের খাতিরের ও খোশামোদের পাত্র—অমন যত্ন আমার আপনার জনও বোধহয় কোনদিন করেনি।

রাত্রে ওরা বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় আমাদের জন্যে পান পর্যন্ত সেজে রেখে গেল। আমি কিছুদূর গেলুম ওদের এগিয়ে দিতে।

ড্রইং মাস্টারটিকে দেখে মনে কেমন অনুকম্পা জাগে। যেমন নিরীহ তেমনি দরিদ্র। কাপড়চোপড় বেশি নেই একটা আধময়লা পিরানের ওপর একটা উড়ুনি, একখানা আধময়লা মোটা ধুতি, এই ওর পরিচ্ছদ।

আমি মাঠের মধ্যে গিয়ে ওকে বললুম—আপনার বাড়ি কোথায় ?

—এই কাছেই, শাটিরপাড়া গ্রাম।

—কতদিন স্কুলে আছেন ?

—তা প্রায় সাত বছর আছি বাবু।

—কিছু মনে করবেন না—এখানে কত পান ?

—পনেরো টাকা—আর হেডমাস্টারবাবু এসে আমায় দিয়ে স্কুলের খাতাপত্র লেখার কাজ কিছু কিছু করিয়ে নিয়ে স্কুল থেকে তিনটাকা মাসে দেওয়ান। বড় উঁচু মন ওঁর।

—বাড়িতে কে কে আছে আপনার?

—বাবা মা, দুই বোন, আর আমার স্ত্রী, আমার একটি ছোট ছেলে।

—মাইনে তো খুব বেশি না। অন্য স্কুলে যান না কেন?

—কে দেবে বাবু? আজকাল চাকরির বাজার যা, বি-এ পাস করে বেকার বসে আছে আর আমি তো মোটে নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস। আমাদের কি চাকরি হঠাৎ জোটে বাবু।

—জমিজমা আছে বাড়িতে?

—সামান্য ধানজমি আছে, তাতে ছ-মাসের খোরাকী চালটা ঘরে আসে। বাকি ছ-মাস টানাটানি করে সংসার চলে। কি করবো বাবু, যখন এর বেশি রোজগারের ক্ষমতা নেই—এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

নর্মাল পাসকরা একজন পণ্ডিত আজ সাত বছর পনেরো টাকায় ঘষচে, কোনোখানে উন্নতির আশা নেই। শেয়ালদা স্টেশনের একজন কুলিও মাসে অন্তত পনেরো টাকার দেড়-গুণ থেকে তিন-চারগুণ রোজগার করে।

এদের দিকে চাইলে কষ্ট হয়, এরা আমাদের ছেলেপুলেকে মানুষ করে দেবার ভার নিয়েচে, পরম নিশ্চিন্তে সে ভার এদের ওপর চাপিয়ে আমরা বসে আছি। একথা কি কখনো ভাবি যে এরা কি খেয়ে আমাদের সন্তানদের মানুষ করে দেবে? হাওয়া খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না।

আবার সকাল হতে না হতে এরা ফিরে এসে জুটলো হেডমাস্টারের ঘরে। সকালের চা এরাই করে দিলে, বোঝা গেল এ কাজ ওরা রোজই করে। আসবার সময় এরা আবার একটা কাঁচকলা ও গোটাকতক ডিম এনেছে। ওদের ওপরওয়ালা হেডমাস্টারকে খুশী রাখবার জন্যে কত না আয়োজন ওদের।

আমার বন্ধুটি আগের মতো পড়াশুনো করেন না। এখানকার এই সব অর্ধশিক্ষিত লোকদের ওপর সর্দারি করে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্চেন।

ইনি এক সময় নিজেকে সচল এন্‌সাইক্লোপিডিয়া করবার দুরূহ প্রচেষ্টায় অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন, বন্ধুবান্ধব মহলে বাজি রেখে পরের ভুল ধরে ছাত্রাবস্থায় আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

এঁকে জিজ্ঞেস করলুম—কি হে এখানে পড়াশুনো কি রকম করচো?

—না ভাই, এখানে কিছু বই নেই, নিজেরও অত পয়সা নেই যে বই আনাই।

—তা হলে কষ্টে আছো বলো?

—তা নয়, আমার মত বদলাচ্ছে ক্রমশ।

—কি রকম, শুনি?

—কতকগুলো ইনফরমেশনের বোঝা মাথার মধ্যে চাপিয়ে নিয়ে আগে ভাবতুম খুব বিদ্যে

হয়েচে আমার। যাদের মাথার মধ্যে এসব থাকতো না, তাদের ভাবতুম মূর্খ, কিছু জানে না। এখন দেখচি জীবনে সব কিছু জানবার প্রয়োজন নেই—কয়েকটি বিষয় বেছে নিয়ে শুধু তাদের সম্বন্ধে জানতেই সারা জীবন কেটে যেতে পারে। অন্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানবার দরকার হয়—রেফারেন্সের বই খোলো, দেখ। মানুষের মস্তিষ্কের ওপর অনাবশ্যক বোঝা চাপিয়ে লাভ নেই।

—সত্যিই তোমার অনেক বদলেচে দেখচি—

—তার মানে কি জানো, তখন ছিলুম সন্থ কলেজের ছোকরা, রক্ত বেজায় গরম, এখন ক্রমশ অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেক বুঝচি। অভিজ্ঞতা না হলে কিছু হয় না জীবনে।

—সে কি হে! জীবনে অভিজ্ঞতা তো হবেই। তাই নিয়েই তো জীবন। এক জায়গায় যদি চুপটি করে বসেও থাকো বেঁচে, তা হলেও অভিজ্ঞতা আটকায় কে। কি বুঝলে অভিজ্ঞতায়?

—বুঝলুম এই, জীবনে যদি কিছু দিতে হয় তবে নির্জনে ভাবার দরকার বড্ড বেশি। পড়ার চেয়েও অনেক বেশি। এখানে এই নির্জন জায়গায় আজ দুবছর একা বাস করে অনেক বদলে গিয়েচি হে—অনেক কিছু বুঝেচি।

—কিন্তু যার মাথায় কিছু নেই—দুনিয়ার কোন খবর রাখে না, তার চিন্তার মূল্য কি দাঁড়াবে?

—অন্তত আমার সম্বন্ধে তুমি একথা বলতে পারো না। আমি এখন যদি চিন্তা করি, তার খানিকটা মূল্য অন্তত আমার কাছেও দাঁড়াবে। আমার নিজের জীবন সম্বন্ধে—পরের কথা আমি ভাবিনে, নিজের জীবনের কথা। অনেক কাজ হয় এতে।

—কোন্ বিষয় ভালো লাগে পড়তে?

—পলিটিক্স্ সম্বন্ধে জানবার বড় ইচ্ছে। আগে এই জিনিসটা ভালো করে পড়িনি—এখন মনে হয়, না পড়ে ভালো করিনি।

—দেশের পলিটিক্স্ না বিদেশের পলিটিক্স্?

—সব দেশেরই—বিশেষ করে নিজের দেশের।

—আমার মত এসব সম্বন্ধে অন্য রকম।

—কি শুনি তোমার মত?

—আমার মতে ইউনিভার্সকে বুঝতে চেষ্টা না করলে মানুষের কিছুই হল না।

—গ্রহ-নক্ষত্র, এই সব?

—শুধু গ্রহনক্ষত্র নয়, সবকিছু। পশুপক্ষী, গাছপালা, পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্র, Space—এক কথায় আমাদের জীবনের গোটা পটভূমিই। ইউনিভার্সকে না বুঝলে তার স্রষ্টার সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যাবে না। ভগবানের বিরাট ঐশ্বর্যরূপটা আগে প্রত্যক্ষ করি—তারপর তাঁর সম্বন্ধে ভাববো।

আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল স্কুলের সামনের ফাঁকা মাঠে একটা বেঞ্চির উপর বসে।

সময়টা ছিল সন্ধ্যার কিছু পরেই। মাঠভরা জ্যোৎস্না সেদিন, এখানে ওখানে দু-একটি ক্ষীণ তারা আকাশের গায়ে, জ্যোৎস্না পড়ে সবুজ বেতের ঝোপ চিক চিক করচে।

অনেকদিন এমন ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিনি। দুজনেরই মনে বোধ হয় একথা উঠেছিল, কারণ আমার বন্ধুটি চারিদিকে চেয়ে বললেন—কেমন জায়গাটা, ভালো নয় হে?

—চমৎকার। এখানে এতদূরে ঢাকা জেলায় চাকরি পেলে কি করে?

—খবরের কাগজে দেখে দরখাস্ত করেছিলুম, আমাকে এরা তখুনি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিলে।

—এখানে কতদিন থাকবে?

—যতদিন না অন্য কিছু একটা পাই। কলকাতার কাছে যাবার বড় ইচ্ছে—

—আমি কিন্তু তোমার এই জায়গা বেশ পছন্দ করেচি। এই রকম ফাঁকা জায়গায় বাস করবার খুব ইচ্ছে আমার মনে, যদিও কখনো হয়নি।

—তুমি ভাই যে সব ভাবনার কথা বললে, Space, God absolute, Stars ইত্যাদি—ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। আমি চাই যাতে দেশের আর দশের উপকার হয়, পলিটিক্স্ ভিন্ন অন্য কিছুর চর্চা ভালো লাগে না। সমাজে বাস করে, মানুষের মধ্যে বাস করে, তাদের কথা ভাবলুম না, তাদের বুঝবার চেষ্টা করলুম না—কিনা কোথাকার নক্ষত্র, কোথাকার Space—এ সব আমায় appeal করে না—

—নানা রকমের মানুষ আছে, নানারকমের মত আছে। তোমার যা ভালো লাগে তোমার কাছে তাই ভালো। তবে আমি যদি থাকতে পেতুম, তবে অন্য কথা চিন্তা করতুম। পলিটিক্সের কথা আমার মনেও উঠতো না।

—তুমি যদি থাকতে এখানে, আমার দলে ভিড়িয়ে নিতুম একমাসে—

—অর্থাৎ পলিটিক্সের দলে? আমার মনে হয় না যে তুমি সাফল্যলাভ করতে সে কাজে। আমি তোমার দলে যেতুম না। এমন মুক্ত মাঠের মধ্যে বসে পলিটিক্সের কথা যদি মনে উঠতো, তবে মেঘনা নদীর পারে অমন সান-সেট হওয়ার সার্থকতা কি রইল?

—থাকো না কেন এখানে? আমি চেষ্টা করবো স্কুলে?

—না ভাই, এখন একটা চাকরি হাতে রয়েচে, এখন থাক্। পরে দরকার হলে জানাবো। কিন্তু তুমিই বা এ অজ পাড়াগাঁয়ে কতকাল পড়ে থাকবে?

—তা তো জানিনে। এখানে থাকলে সব ভুলে যাবো। অলরেডি মনে সন্তোষ এসে গিয়েচে, অর্থাৎ মনে হচ্চে বেশ তো আছি।

—ওই তো Danger signal—পুরুষের পক্ষে নিজের অবস্থায় সন্তোষ বড্ড খারাপ লক্ষণ বলে বিবেচনা করি—

—আমারও ভয় হয়। তবে চাকরির যা বাজার তাতে তো নড়তে পারিনে এখান থেকে। কোথায় যাবো ছেড়ে দিয়ে? অথচ এ যেন মনে হচ্চে কোথায় পৃথিবীর এক কোণে পড়ে আছি, কোনো কিছু খবর রাখচিনে দুনিয়ায়, একেবারে পুরোনো হয়ে গেলুম হে—

—কাণ্টের মতো দার্শনিক একটা ছোট্ট শহরে ছিলেন জার্মানির, এত বড় চিন্তা করবার খোরাক পেয়েছিলেন সেখানে থেকেই। শহরে না থাকলেই লোক পুরোনো হয় বলে মনে কর কেন? নতুন আর পুরোনো অত্যন্ত সাধারণ ধরনের শ্রেণীবিভাগ—নতুন মাত্রেই ভালো নয়, পুরোনো মাত্রেই মূল্যহীন নয়—একথা তোমাকে তো বলবার দরকার করে না।

এই সময় শিক্ষক দুটি এসে পৌছুলো। তারা দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে এই দিকেই এল। ড্রইং মাস্টার বিনীতভাবে বললে—মাস্টার বাবু, চা করে আনি? আর রাত্তিরে আপনারা কি খাবেন?

আমি তাদের বসালুম বেঞ্চিতে। তারা বসতে চায় না—চা করে এনে না হয় বসচে এখন, দেরি হয়ে যাবে চায়ের—আসলে হেডমাস্টারের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করে, আমার অন্তত তাই মনে হল।

আমি বললুম—আচ্ছা, আপনাদের এই গাঁয়ের মাঠ কেমন লাগে আপনাদের কাছে?

ড্রইং মাস্টার বললে—বেশ লাগে, মেঘনার ধারে আরও ভালো। চলুন, যাবেন? জ্যোৎস্না-রাত, ভারি চমৎকার দেখতে হয়েচে। মাস্টারবাবু যদি যান—

আমার সেকথা মনেই ছিল না। সিকি মাইল দূরে মেঘনা, জ্যোৎস্নারাত্রে মেঘনার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখবার লোভ সামলাতে পারা গেল না।

বন্ধুকে নিয়ে আমরা গেলুম মেঘনার ধারে। ওপারে কি একটা গ্রাম, এপারে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বাঁশবন, বনঝোপ। নোয়াখালি জেলার মেঘনা যতখানি চওড়া দেখেছি, এখানে নদী তার চেয়ে ছোট। তবুও আমার মনে হল জলরাশির এমন শোভা দেখেছিলুম শুধু কক্সবাজারের ও মংডুর সমুদ্রতীরে। সন্দীপের তালীবন-শ্যাম উপকূল-শোভা সেই এক সন্ধ্যায় স্টীমারের ডেক থেকে প্রত্যক্ষ করে মনে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, আজও যেন সেই ধরনের আনন্দই আবার ফিরে এল মনে।

আমার বন্ধুটি মেঘনার ধারে বড় একটা আসেন না, তিনিই বললেন। এই সিকি মাইল পথ তিনি হাঁটতে রাজি নন। বললেন—আমার ওসব ভালো লাগে না, জল দেখে তোমাদের যে কি কবিত্ব উথলে ওঠে তোমরাই বলতে পারো।

ড্রইংমাস্টার লোকটি বেশ প্রকৃতি-রসিক—প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার মতো চোখ আছে ওঁর, একথা মনে মনে আমাকে স্বীকার করতেই হল।

আমার বন্ধু বললেন—আসলে তোমরা এতে দেখ কি বলতে পারো?

—কি করে বোঝাবো? এই নদী, জল, জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ—এ বেশ ভালো লাগে, তাই দেখি।

—কোন্ দিক থেকে ভালো লাগে—picture effect of the landscape?

—তাই বটে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি।

—তুমি কি অস্বীকার করতে পারো যে তুমি যাকে একটা মস্ত spiritual আনন্দ বলে মনে করচো, তার সবখানিই sensuous?

—প্রত্যেক ইস্‌থেটিক আনন্দ মাত্রেই sensuous, তবে এ আনন্দ সূক্ষ্মতর শ্রেণীর; spiritual আনন্দের সগোত্র না হলেও নিকটতম আত্মীয় বটে। তবে এর প্রকৃতি চিরে চিরে কেটে কেটে দেখাতে বোলো না। আমার মনে হয় কেউই তা করতে পারবে না। শাস্ত্রে চরম আনন্দকে বলেচে, ব্রহ্মাস্বাদের সমতুল্য—কে ব্রহ্মকে আস্বাদ করেচে যে বিচার করবে? আনন্দের analysis ওভাবে হয় না।

—আমি একটা কবিতা পড়ে এর সমানই আনন্দ পাই যদি বলি?

—এ তর্ক তোমার সঙ্গে করবো না, কারণ আমার ধাত অন্যরকম। আমার মনে হয় বদ্ধ ঘরে বসে হাজার কবিতা পড়লেও সে আনন্দ তুমি কিছুতেই পাবে না।

এখানে আমার মনে পড়লো সন্দ্বীপের তালীবন-শ্যাম উপকূল, আর আওরঙ্গজেবপুরের নিকটে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সেই বনভূমি।

আমার বন্ধু প্রতিবাদ করে বললেন—এ তোমার গা-জুরি কথা হ'ল।

—শোনো, একটা কথা আছে। দু ধরনের লোকের মধ্যে—যারা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালোবাসে আর যারা ভালোবাসে না—এক দলের চোখ আছে, অন্য দলের নেই। চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধ দু দলে তুলনা হয় না, এখানে বিচার হবে চক্ষুষ্মান্ লোক বদ্ধ ঘরে কবিতা পড়ে যে আনন্দ পায়, সেই ধরনের আনন্দ সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে পায় কি না। সুতরাং ভেবে দেখ এ নিয়ে তর্ক হতে পারে কি?

সম্মুখে মেঘনা নদীর বুকে জ্যোৎস্নারাশি এক মায়াপুরীর সৃষ্টি করেচে। আমার মনে হল শুধু এই দৃশ্য প্রতিদিন দেখবার সুযোগ পাবো বলে স্কুলমাস্টারি নিয়ে এখানে থেকে যেতে রাজি আছি।

এক বছর ধরে এই দৃশ্য রোজ দেখলে মনের আয়ু বেড়ে যায়।

আমার বন্ধু বললেন—আমার আরও ভালো লাগে না এতদূরে আছি বলে, দেশের মধ্যে হলে বোধহয় ভালো লাগতো।

—আমার মনে হয় এ তোমার ভুল। দূরে থাকা একটা advantage, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার পক্ষে।

—কি রকম?

—দেশ থেকে দূরে যত যাবে, তত landscape-এর প্রকৃতি তোমার কাছে রোমান্টিক হয়ে উঠবে। ভ্রমণকারী ও explorerরা এটা ভালো বুঝতে পারে। বরফ ইংলণ্ডেও জমে শীতকালে, তবে নর্থ পোলের বরফ মনে অন্য রকম ভাব জাগায়। একই বাঁশবন দেশের খালের ধারে দেখচো অথচ ইরাবতীর পাহাড়ী gorge-এর ধারে সেই একই বাঁশবন দেখো—বুঝতে পারবে কি ভীষণ তফাও। এবারকার ভ্রমণে আমি তা ভালো বুঝতে পেরেচি। কতবার দূরদেশের পাহাড়ের ওপর, সমুদ্রের ধারে, কিংবা বনের ছায়ায় বসে দেশের কথা ভেবে দেখচি—অপূর্ব চিন্তা জাগায় মনে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের প্রকৃতি কি অপূর্ব রূপই না ধরে

চোখের সামনে। এ হল মনের রসায়ন, বোঝাতে পারিনে মুখে। অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে হয়। শুনলে বোঝা যায় না।

আমার বন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বললেন—এ যে তুমি esoteric তথ্যের দলে নিয়ে গিয়ে ফেললে দেখচি। তোমাদের মতো লোককে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' লিখেছিলেন 'মাথার ওপর যে আকাশ নীল তাই দেখতে ছুটে যাই এটোয়া কাটোয়া'—ওই ধরনের কিছু। অস্বীকার করতে পারো?

—এ হল অনুভূতির ব্যাপার, সুতরাং স্বীকার করিনে অস্বীকারও করিনে। যাই হোক, তোমার ভালো লাগচে কি না বলো।

—কেন ভালো লাগবে না? তুমি এখানে থেকে যাও, দিই না আমার স্কুলে একটা মাস্টারি জুটিয়ে।

এ কথায় স্কুলের শিক্ষক দুটি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। খুব ভালো হয় তা হলে, হেডমাস্টারবাবু চেষ্টা করলে এখুনি হয়ে যায়। স্কুলের কমিটি কিছু নয়, সবই হেডমাস্টারবাবুর হাত। আমাকে তারা দুজনে বিশেষ করে অনুরোধ করলে থেকে যাবার জন্যে।

রাত আটটার সময় আমরা সবাই ফিরলুম বোর্ডিংএ।

ড্রইং মাস্টার বললে—তাই তো, আমার সকাল সকাল উঠে আসা উচিত ছিল, এখন দেখচি খেতে আপনাদের অনেক রাত হয়ে যাবে।

ওরা রুটি করতে বসলো রান্নাঘরে। আমরা কাছে বসে আগে এক পেয়ালা করে চা খেলাম। ওরাই করে দিলে। আমার কতবার মনে হল কি সুন্দর লোক এরা! পরের জন্যে অক্লান্ত সেবা করে যাচ্ছে দিনের পর দিন—কোনো দিন এতটুকু বিরক্ত হয় না।

আমার বড় মনে ছিল এই নিরীহ শিক্ষক দুটির কথা। মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেও বোধ হয় এত নিরীহ, ভালোমানুষ, এত বিনয়ী হয় না। যেদিন নরসিংদি ছেড়ে চলে আসি, ওদের দুজনকে ছেড়ে আসবার কষ্টই আমার বড় বেশি হয়েছিল।

আমাকে পরদিন স্কুলের অন্যান্য মাস্টার এবং ছাত্রেরা মিলে নিমন্ত্রণ করলে—আমাকে ও হেডমাস্টারকে নিয়ে তারা একসঙ্গে বসে খাবে।

আবার সেইদিনই ড্রইং মাস্টারটিও আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে তার বাড়ি নিয়ে গেল। আমার বন্ধুকেও বলেছিল, কিন্তু সেই সময়ে স্কুল কমিটির মিটিং ছিল বলে তার যাওয়া হয়নি।

শাটিরপাড়া গ্রামে এই প্রথম ঢুকি। ঢাকা জেলার অজ পল্লীগ্রাম কেমন দেখবার সুযোগ এর আগে কখনো হয়নি। গ্রামের মধ্যে ছোটবড় বেতঝোপ বড্ড বেশি, টিনের ঘরই বারোআনা—দু একটা কোঠাবাড়িও চোখে পড়লো।

আমি গ্রামের মধ্যে বেশি দূর যাইনি।—গ্রামে ঢুকে ড্রইং মাস্টারের বাড়ি বেশি দূর নয়। একটা টিনের ঘরের দাওয়ায় আমায় নিয়ে গিয়ে বসালে। বেশ ফাঁকা জায়গা বাড়ির চারিদিকে।

তক্তপোশের ওপর শতরঞ্জি পাতা। একটি ছোট মেয়ে এসে আমাদের সামনে সাজা পান রেখে গেল। ড্রইং মাস্টার বললে—আমার ভাইঝি—ওর নাম মঞ্জু—

—মঞ্জু? বেশ সুন্দর নামটি! এসো তো খুকি মা এদিকে—

—এসো, বাবু বলচেন, কথা শুনতে হয়—এসো—হ্যাঁ, ভালো কথা—আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল। সে কলকাতার লোক কখনো দেখেনি—বলেন তো আনি—

—বেশ তো, আনুন না তাঁকে।

চা দেবার পূর্বে ড্রইং মাস্টার বাড়ির মধ্যে গিয়ে কি বলে এল। কিছুক্ষণ পরে আধঘোমটা দিয়ে একটি ছিপছিপে গৌরাঙ্গী সুন্দরী বধূ চা ও খাবার নিয়ে তক্তপোশে আমার সামনে রাখলো।

ড্রইং মাস্টার বললে—প্রণাম করো—ব্রাহ্মণ—

মেয়েটি গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে আমি বাধা দেবার পূর্বেই। কিন্তু এক সে ছেলেমানুষ, বয়েস আঠারো-উনিশের বেশি হবে না -তাতে এত লাজুক যে বেচারী আমার দিকে মুখ তুলে ভালো করে চাইতেই পারলে না। আমি তাকে বসতে বললুম তক্তপোশের এক কোণে। তার স্বামীও বসলো। অনেক বলবার পর মেয়েটির মুখ ফুটলো। দু একটি কথা বলতে শুরু করলে আমার কথার উত্তরে। ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের টান এত বেশি যে ভালো করে বোঝাই যায় না। নিকটেই কি এক গ্রামে বাপের বাড়ি।

আমি বললুম—আপনি কখনো কলকাতায় যান নি?

মেয়েটি কিছু বলবার আগে ড্রইং মাস্টার হেসে বললে—ও কখনো শাটিরপাড়া ছেড়ে কোথাও যায়নি, রেল স্টীমার চড়েনি। মেয়েটি মুখ নীচু করে হাসলে। বেশ সুন্দর মুখ, যে কেউ সুন্দরী বলবে মেয়েটিকে। চা খাবার সময়ে আমার দিকে কৌতূহলপূর্ণ ডাগর চোখে চেয়ে দেখতে লাগলো মেয়েটি, যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব জীব দেখচে।

বললুম—সময় থাকলে আপনার হাতের রান্না একদিন খেতুম, কিন্তু কালই চলে যাচ্চি। আর সময় নেই।

ড্রইং মাস্টারের বাডিতে আর কেউ নেই, তার এই স্ত্রী ছাড়া। নিজেই সেকথা বললে।

—দেখুন, স্কুলে সামান্য মাইনে পাই, বাড়িতে একটা ঝি রাখলে ভালো হয় কিন্তু তা পেরে উঠিনে, একা আমার স্ত্রীকে সব কাজকর্ম করতে হয়—ওর আবার শরীর তত ভালো নয়, কি করি, আমার সঙ্গতি নেই বুঝতেই পারচেন।

আমি বললুম—ইনি চমৎকার খাবার-দাবার করতে পারেন তো! এই বয়েসে শিখেচেন অনেক কিছু দেখচি।

মেয়েটি নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করলে।

আমি বললুম—এ গ্রামে বেশ শিক্ষিত লোক আছেন?

ড্রইং মাস্টার বললে—আছেন বটে তবে দেশে থাকেন না। একজন বিখ্যাত লোক আছেন, ঢাকার উকিল; আরও একজন কলেজের প্রোফেসার আছেন। তবে তাঁরা দেশে আসেন খুব কম।

ইতিমধ্যে সেই ছোট মেয়েটি আবার এল—আমি জিজ্ঞেস করলুম, এই মেয়েটি আপনার বাড়ির না?

—না, এটি আমাদের পাশের বাড়ির। ও এসে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে সাহায্য করে আমার স্ত্রীর। বড় ভালো মেয়েটি। ওরও কেউ নেই, দিদিমার কাছে মানুষ হচ্চে— দিদিমার অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়, গ্রামের লোকদের দয়ায় একরকম করে চলে।

বাঙালী পরিবারের দুঃখের কাহিনী সব জায়গাতেই অনেকটা এক রকম, কি আমার নিজের জেলায়, কি সুদূর ঢাকা জেলায়। শুনে দুঃখিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার নেই।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে চলে আসবার পথে সন্ধ্যা হয়ে এল। ড্রইং মাস্টার আমার সঙ্গেই ছিল—কি জানি কেন এই নিরীহ গ্রাম্য ইস্কুলমাস্টারের ওপর আমার একটা অদ্ভুত ধরনের মায়া জন্মেচে। যেন মনে হচ্চে ওকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে। আমার কলেজের সহপাঠী বন্ধুটির চেয়েও এই লোকটি আমার আপনার জন হয়ে উঠেচে এই ক-দিনে।

বললুম—আপনি কলকাতার দিকে আসুন না কেন?

—কি যে বলেন বাবু, খেতেই পাইনে তার কোথা থেকে ভাড়া যোগাড় করে কলকাতায় যাবো। আমার এক মাসের মাইনে। আর কলকাতায় গিয়েই বা আমার মতো নর্মাল পাস পণ্ডিত কত টাকা মাইনে পাবে?

কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল। সুতরাং চুপ করে রইলুম।

আমরা স্কুলের কাছে পৌঁছুতেই কতকগুলি ছেলে আমাদের আলো হাতে এগিয়ে নিতে এল। ওরা আমাদের স্কুলের হলে গেল নিয়ে।

সেখানে গিয়ে দেখি মহাকাণ্ড।

খুব রান্নাবান্না চলচে। বড় ডেকে পোলাও চড়েচে, প্রকাণ্ড দুটো বড় মাছ কোটা হচ্চে, আরও দু ডেক পোলাও রাঁধবার মালমশলা ডালায়। ছেলেদের উৎসাহ ছাপিয়ে উঠেচে মাস্টারদের উৎসাহ—তাঁরা নিজেরাই ছুটোছুটি করে রান্নার তদারক করচেন, কোথায় খাওয়ার পাত পাতা হবে তার ব্যবস্থা করচেন—ইত্যাদি!

আমায় ঘিরে কয়েকজন মাস্টার এসে দাঁড়ালেন।

একজন বৃদ্ধ শিক্ষক বললেন—আপনাকেই খুঁজচি—কোথায় গিয়েছিলেন? ক-দিন এসেচেন, আমাদের মাস্টারবাবুর পরম বন্ধু আপনি, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে—

আমি ড্রইং মাস্টারকে দেখিয়ে বললুম—এঁর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল—

—আমাদের হরনাথের বাড়ি? বেশ—বেশ—

এই রকম একটি অপরিচিত স্থানে আমি সেদিন যে আন্তরিক আপ্যায়ন, হৃদ্যতা ও সমাদর লাভ করেছিলাম, তা জীবনে কখনো ভুলবার নয়। অথচ আমার সঙ্গে তাঁদের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই কোনো দিক দিয়েই—আমায় খাতির করে তাঁদের লাভ কি?

আমায় ও আমার বন্ধুটিকে মাঝখানে নিয়ে ওঁরা খেতে বসলেন। কত রকম গল্পগুজব, হাসিখুশি।

একজন শিক্ষক বললেন—আমাদের দেশ কেমন লাগলো আপনার?

—বড় ভালো লেগেচে, পূর্ববঙ্গের লোকের প্রাণ আছে।

—সত্যিই তাই মনে হয়েচে আপনার নাকি ?

—মনে হয়েচে তো বটেই—আমি সে কথা শুধু মুখে বলচিনে, একদিন লিখবো।

—আপনার লেখাটেখা আছে ?

—ইচ্ছে করে লিখতে, তবে লিখিনি কখনো। আপনাদের এই আদর-আপ্যায়ন কোনো-দিন ভুলবো না, একথা আমার মনে রইল—সুবিধে হলে সুযোগ পেলে লিখবোই।

তাঁরা সবাই মিলে আমার বন্ধুর নানারকম সুখ্যাতি করলেন আমার কাছে। হেডমাস্টার বাবুর ইংরিজি প্রায় সাহেবের মতো—এমন ইংরিজি বলবার বা লিখবার লোক তাঁরা কখনো দেখেন নি—ইত্যাদি। পরদিন আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওখান থেকে চলে এলুম।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, আমার এই বন্ধুটি তারপর ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে বি টি পড়তে আসেন কলকাতায় এবং ভালো করে বি টি পাস করে কি রকম কি যোগাযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভ করে বিলেত যান। বর্তমানে ইনি শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

বছর-দুই পরের কথা।

ভাগলপুরে 'বড় বাসা' বলে খুব বড় একটা বাড়িতে থাকি, কার্যোপলক্ষে, কেশোরামজীর চাকরি তখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি।

'বড় বাসা'তে অন্য কেউ থাকে না—আমি চাকর-বাকর নিয়ে বাস করি, গঙ্গার একেবারে ঠিক ধারেই, ছাদের ওপর থেকে মুঙ্গেরের পাহাড় দেখা যায়। দিনরাত হু-হু খোলা হাওয়া বয়, ওপারে বিশাল মুক্ত চরভূমি—দিনে সূর্যালোকে মরুভূমির মতো দেখায়, কারণ এসব দেশের চর বালুময় ও বৃক্ষলতাহীন, আবার রাত্রের জ্যোৎস্নালোকে পরীর দেশের মতো স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

একদিন লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানলুম কাছে অনেক সব দেখবার জিনিস আছে। আমার বন্ধু সুগায়ক হেমেন্দ্রলাল রায়কে একদিন বললুম, চলো হে, কোথাও একদিন বেরিয়ে আসা যাক—

হেমেন ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, এখানেই ওদের বাড়ি। আমার সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল, বড় বাসার ছাদে বসে আমরা দুজনে প্রায়ই আড্ডা দিতাম রাত্রে।

হেমেন যেতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় ? আমার শোনা ছিল কাজরা ভ্যালি খুব চমৎকার বেড়াবার ও দেখবার জায়গা, ওখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম বলে একটা গ্রানাইট পাহাড়ের গুহায় বৌদ্ধযুগের চিহ্ন পাওয়া যায়।

হেমেন ও আমি দুজনে বেরিয়ে পড়লুম একদিন সকালের ট্রেনে।

জামালপুরে গিয়ে পুরী ও জিলিপি কিনে নেওয়া গেল, সারাদিন খাবার জন্যে। বনজঙ্গলে চলেচি, খাদ্যসংস্থানের যোগাযোগ আগে দরকার।

কাজরা স্টেশনে নেমে কাজরা ভ্যালি ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমে যেতে হয়। জামালপুর ছাড়িয়ে আরও ত্রিশ মাইল পরে কাজরা। স্টেশনের চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড় আর প্রস্তরের টিলা।

স্টেশন থেকে বার হয়ে সোজাপথে দূর পাহাড়শ্রেণীর দিকে চলেচি কোথায় দুজনে।

একজন গ্রাম্যলোককে জিজ্ঞেস করলুম, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম কোথায় জানো?

সে বললে, নেহি জানতা বাবুজি।

সুতরাং মনে হল জায়গাটি নিতান্ত কাছে নয়। কাছাকাছি হলে এরা নিশ্চয়ই জানতো। তবে সামনের ওই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে ছাড়া আর গুহা কোথায় থাকতে পারে? নিকটে আর কোথাও তেমন বড় পাহাড় নেই।

স্টেশন থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে চলেচে, আমরা দুজনে সেই পথেই চললুম। মাঝে মাঝে বিহারী পল্লীগ্রাম, খোলার ঘর, ফণিমনসার ঝোপ, মহিষের দল মাঠে চরচে, দড়ির চারপাই পেতে গ্রাম্য লোকেরা জটলা করচে ঘরের উঠোনে, অত্যন্ত ময়লা ছাপা-শাড়ি পরনে গৃহস্থ-বধূরা ইঁদারা থেকে জল তুলচে।

আবার ফাঁকা মাঠ, জনহীন পথ, মাঝে মাঝে গমের ক্ষেত। পাহাড়শ্রেণীর কাছে আসবার নামও নেই, স্টেশন থেকে যতদূরে দেখাচ্ছিল এখনও ঠিক ততদূরেই মনে হচ্ছে!

হেমেন বললে, পাহাড় বোধ হচ্চে অনেক দূরে।

—চলো, যখন বেরিয়েচি, যেতেই হবে।

—সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরতে হবে মনে আছে?

—যদি ট্রেন না ধরতে পারি, কোথাও থাকা যাবে। এই সব গ্রামে জায়গা মিলবেই একটা রাতের জন্যে।

বেলা বেশ চড়েচে। একটা ইঁদারার পাড়ে আমরা দাঁড়ালুম জল খাবার জন্যে। একটি মেয়ে আমাদের হাতে জল ঢেলে দিলে। আমরা তাকে পয়সা দিতে গেলুম, সে নিলে না।

আরও একখানা গ্রাম ছাড়ালুম। বিহার অঞ্চলের গ্রামে বা মাঠে কোথাও তেমন গাছপালা নেই। গ্রামের কাছে তালগাছ, দু একটা আমবাগান আছে বটে কিন্তু তার তলায় কোনো আগাছা নেই, শুকনো পাতা পর্যন্ত পড়ে নেই, এদেশে জ্বালানি কাঠের অভাব, মেয়েরা ঝুড়ি ভরে জ্বালানির জন্যে শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের শ্যামল বনশোভা এখানে একান্ত দুর্লভ। আছে কেবল বিহারের সেই একঘেয়ে শীসম্ গাছের সারি। পথের দুধারে কোথাও ছায়াতরু নেই, খররৌদ্রে পথ হাঁটতে কেবলই তৃষ্ণা পায়। দুজনে ঠিক করলুম বস্তির ইঁদারা থেকে জল পান করা স্বাস্থ্যসম্মত হবে না, এসব সময়ে বিহারের পল্লীতে কলেরা প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে। সাবধান থাকাই ভালো।

এবার পথের পাশে ছোট ছোট গাছপালা দেখা গেল। একটা কথা বলি, বাংলাদেশে যাকে 'ঝোপ' বলা হয়, সে ধরনের বৃক্ষলতার নিবিড় সমাবেশ বিহারে ক্বচিৎ দেখা যায়,

দক্ষিণ-বিহারে তো একেবারেই নেই, বরং উত্তর-বিহারের বড় নদীর ধারে বাংলাদেশের মতো ঝোপ অনেক দেখেচি।

বাংলাদেশের ঝোপের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমাদের জেলায় আমি জানি এমন অদ্ভুত ধরনের সুন্দর ঝোপ আছে, যার মধ্যেকার নিবিড় ছায়ায় গ্রীষ্মের দিনে সারাবেলা বসে কাটানো যায় নানা অলস স্বপ্নে।

প্রধানত ঝোপ খুব ভালো হয় কেয়োঝাঁকা ও ষাঁড়া গাছের। কেয়োঝাঁকা মোটা কাঠের গুঁড়ি যুক্ত গাছ হলেও লতার মতো এঁকেবেঁকে ওঠে ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে, এর পাতাগুলো মখমলের মতো নরম, মসৃণ শাঁসালো এবং অত্যন্ত সবুজ। কেয়োঝাঁকার স্বভাবই ঝোপ সৃষ্টি করা, যেখানে যে অবস্থাতেই থাক্ জঙ্গলে—কারণ কেয়োঝাঁকা বনের গাছ, যত্ন করে বাড়িতে কেউ কখনো পোঁতে না—এঁকেবেঁকে উঠে ঝোপ সৃষ্টি করবেই। আর কি সে ঝোপের নিবিড়, শান্ত আশ্রয়! ষাঁড়া গাছও এ রকম ঝোপ তৈরি করে, কিন্তু সে আরও উঁচু ছাদওয়ালা বড় ঝোপের সৃষ্টি করে ; ষাঁড়াগাছ উঁচু হয় অনেকখানি, ডালপালাও কেয়োঝাঁকার চেয়ে অনেক মজবুত। শুধু অবিশ্যি এই গাছগুলি ঝোপ তৈরি করে না, যদি গাছের মাথায় অন্য লতা না ওঠে।

কিন্তু বাংলাদেশের জঙ্গলে বন-কলমী, ঢোল-কলমী, কেলে-কোঁড়া, বন-মরচে, বন-সিম, অপরাজিতা, ছোট্ গোয়ালে, বড় গোয়ালে প্রভৃতি লতা সর্বদাই আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্চে অন্য গাছের, অবিবাহিতা মেয়েদের মতো। এদের মধ্যে সব লতারই চমৎকার ফুল ফোটে, কোনো কোনো ফুলের মধুর সুবাসও আছে, যেমন কেলে-কোঁড়া ও বন-মরচে লতার ফুল।

পুষ্পপ্রসবের সময়ে এই সব লতা যখন ছোটবড় ঝোপের মাথা নীল, সাদা, ভায়োলেট রঙের ফুলে ছেয়ে রাখে তখন নদী-প্রান্তবর্তী বন বহুদূরের আভাস এনে দেয় মনে। মুগ্ধ নীল আকাশের তলায় এদের পাশে বসে যেন সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, কত কি স্বপ্ন যে এরা মনে আনে।

বিলেতে আমেরিকায় ঝোপের মূল্য বোঝে, তাই বড় আধুনিক ধরনের বাগানে ঝোপ রচনা করবার মতো গাছপালা পুঁতে দেয়। বাগান আর্টিস্টিক ভাবে তৈরি করবার জন্যে ওদের দেশে একজাতীয় শিল্পী আছেন, তাদের garden architect বলে। এরা মোটা মজুরি নিয়ে অতি চমৎকার ভাবে তোমার আমার বাগান তৈরি করে দেবে। ফলের বাগান নয়, সুদৃশ্য ফুল ও অন্যান্য গাছের বাগান।

এই বাগানে ঝোপের বড় দাম। সাধারণত দু-ধরনের ঝোপ এই সব বাগানে করা হয়, Arbour জাতীয়, Pergola-জাতীয়। শেষোক্ত শ্রেণীকে ঠিক আমাদের পরিচিত ধরনের ঝোপ বলা যায় না, কারণ ওটা হচ্চে লতাপাতা দিয়ে ছাওয়া ভ্রমণপথ, অনেকটা আমাদের লাউ-মাচা, পুঁই-মাচার মতো, তলা দিয়ে পাথর বাঁধানো রাস্তা, খুঁটির বদলে অনেক বাগানে (যেমন কালিফোর্নিয়ায় বিখ্যাত মিসেস্ নাইটের বাগান, ইতালির অনেকগুলি মধ্যযুগের জমিদার বা ডিউকদের বাগান) মার্বেল পাথরের থাম দেওয়া।

সাধারণত ডন রোজ, হনি-সাকল প্রভৃতি লতানে গাছ Pergolaর মাচায় উঠিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল পশ্চিম চীন থেকে আমদানি ক্লিম্যাটিস্ আরামাণ্ডি নামক সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত লতার খুব আদর। তা ছাড়া যাকে বলে স্যাণ্ডউইচ, আইল্যাণ্ড ক্রীপার, সে-জাতীয় পুষ্পিত লতারও খুব চল হয়েচে এই উভয়জাতীয় ঝোপ রচনার কাজে। Beaumontia grandiflora নামক এক প্রকার লতানে গাছও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমি বিখ্যাত উদ্যানশিল্পী সার এডউইন লুটেন্সের রচিত একটি ঝোপের ছবি দেখেছিলুম কয়েক বৎসর পূর্বে, তাতে যে শিল্প-প্রতিভা ও সুকুমার সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় ছিল, মন থেকে সে ছবি কখনও মুছে যাবার নয়।

এই সব বাগানের ঝোপ যত পুরানো হবে, ততই তার দাম হয়। লতা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে, গ্রীষ্মমণ্ডলের বন থেকে আমদানি কাষ্ঠযুক্ত লায়ানাগুলি খুব মোটা হয়, সুন্দরী তরুণীর মুখের আশেপাশের কুঞ্চিত অগোছালো অলকদামের মতো তাদের নতুন গজানো আগডাল-গুলি Pergola ও Arbour-এর মাচা ছাড়িয়ে দুপাশে ঝুলে পড়ে।

অথচ বাংলাদেশে কত নদীতীরের মাঠে, কত বাঁশবনের শ্যামল ছায়ায় অযত্ন-সম্ভূত অদ্ভুত ধরনের ঝোপরাজি কত যে ছড়ানো, প্রকৃতিই স্বয়ং সেখানে garden architect—কত পুরোনো ঝোপও আছে তাদের মধ্যে—আমাদের গ্রামেই আমি এমন সব কেয়োঝাঁকার ঝোপ দেখেচি—যা আমার বাল্য দিনগুলিতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে, কিন্তু কে তাদের মূল্য দেয় এদেশে? আদর তো করেই না, বরং গালাগালি দেয়—ওরাই নাকি ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করচে।

আমার গ্রামে ইছামতী-তীরের মাঠে এ রকম অনেক ঝোপ আছে, শনি রবিবারের অবকাশে কতদিন এ ধরনের ঝোপে বসে মাথার ওপরকার নিবিড় শাখাপত্রের অন্তরালবর্তী নানাজাতীয় বিহঙ্গের কল-কাকলির মধ্যে আপন মনে বই পড়ে বা লিখে সারাদুপুর কাটিয়েচি, দূরপ্রবাসে সে কথা মনে পড়ে দেশের জন্যে মন কেমন করে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে, এইবার পাহাড় নিকটে এল ক্রমশ।

পাহাড়ের ওপরের বন সবুজের ঢেউএর মতো নীচে নেমে এসেচে।

কত রকমের গাছ, প্রধানত শাল ও পড়াশী, আরও অজানা নানা গাছ। মহুয়া গাছ এ অঞ্চলে কোথাও দেখিনি। পাহাড়ের ওপরকার বন বেশ ঘন, বড় বড় পাথরের চাঁই পাহাড়ের পাদদেশে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো, মাঝে মাঝে নেমে এসেচে পাহাড়ী ঝরনা।

আমরা একটা পাহাড়ে উঠলুম—কাঠ কুড়ুতে যায় গ্রাম্য লোকে যে সরু পথে বেয়ে, সেই পথে দুজনে অতি কষ্টে লতা ধরে ধরে উঠি—আবার হয়ত একটা শিলাখণ্ডে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি—আবার উঠি। এ পাহাড়ের কোথাও জল নেই—দুজনেরই ভীষণ পিপাসা পেয়েচে, হেমেনের রীতিমত কষ্ট হচ্চে আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিন্তু কিছুই করবার নেই।

তা ছাড়া বস্তি থেকে অনেকদূরে নির্জন বন-প্রদেশে এসে পড়েচি, লোকজনের মুখ দেখা যায় না, গলার স্বরও শোনা যায় না।

হেমেন বললে—ঠিক পথে যাচ্ছি তো ?

—তা কি করে বলবো ? তবে অন্য পথ যখন নেই—তখন মনে হচ্চে আমরা ঠিকই চলেচি।

—বন যে রকম ঘন, কোনো রকম জানোয়ার থাকা অসম্ভব নয় হে, একটু সাবধানে চলো।

আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি আমাদের সামনে দিয়ে পথটা আবার নীচের উপত্যকায় নেমে গিয়েচে। আমরাও নামতে লাগলুম সে পথ ধরে।

একেবারে উপত্যকার মধ্যে নেমে এলুম যখন, তখন চোখে পড়লো ওদিকে আর একটা পাহাড়শ্রেণী, এর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে গিয়েচে, মধ্যে এই বনাকীর্ণ উপত্যকা—বিস্তৃতিতে প্রায় দু তিনশো গজ হবে।

শালবনের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী নদী রাঙা বালির ওপর দিয়ে বয়ে চলচে—পায়ের পাতা ডোবে না এত অগভীর। হেমেন জল খাবেই, আমি নিষেধ করলুম। বিশ্রাম না করে জলপান করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বরং তার আগে স্নান করে নেওয়া যাক।

কিন্তু স্নান করি কোথায় ?

অত অগভীর নদীর জলে স্নান করা চলে না।

হেমেন বললে—তুমি বোসো, আমি বনের মধ্যে কিছুদূর বেড়িয়ে দেখে আসি, জল কোথাও বেশি আছে কিনা—

বেলা ঠিক একটা, ঝাঁ ঝাঁ করচে খর রোদ, কাঁচা শালপাতা বিছিয়ে বনের ছায়ায় শুয়ে পড়লুম—যেমন ক্ষুধা, তেমনি তৃষ্ণা, দুইই প্রবল হয়ে উঠেচে। অদ্ভুত ধরনের নির্জনতা এ উপত্যকার মধ্যে—এরই নাম কাজরা ভ্যালি বোধ হয়--কেই বা বলবে এর ওই ইংরেজী নাম কি না ? হেমেনকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি, কারণ এমন নির্জন মনুষ্যবসতি শূন্য স্থানে বন্যজন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব বিচিত্র কি !

কেউ কোথাও নেই, এই সময় একা বনচ্ছায়ায় শায়িত অবস্থায় এই উপত্যকার সৌন্দর্য ও নিবিড় শান্তি ভালো করে আমার মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল। এইখানে 'বুদ্ধ নারিকেল' (Starculia Alata) নামে সুবৃহৎ বনস্পতি প্রথম দেখি—তারপর অবিশ্যি মধ্যভারতের অরণ্য-প্রদেশে এই অতি বৃহৎ বৃক্ষ দেখেচি। নাম যদিও 'বুদ্ধ নারিকেল'—এগাছের চেহারা দেখতে অনেকটা বিড়িপাতার গাছের মতো—প্রকাণ্ড মোটা গুঁড়ি, ভীষণ উঁচু, সোজা খাড়া ঠেলে উঠেচে আকাশের দিকে, চওড়া বড় বড় অনেকটা তিত্তিরাজ গাছের মতো পাতা—পত্র-সমাবেশ অত্যন্ত ঘন। বনস্পতিই বটে, এর পাশে শাল গাছকে মনে হয় বেঁটে বক্সু।

অবিশ্যি ও জঙ্গলে কি ভাবে এ গাছের নাম জানলুম তা পরে বলবো।

কিছুক্ষণ পরে হেমেন ফিরে এসে আনন্দের সঙ্গে বললে—খুব ভালো স্নানের জায়গা আবিষ্কার করে এলুম, বেশ একটা গভীর ডোবার মতো—চলো।

আমি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাইলুম। হেমেন বললে—এইখানে থাক্ না পড়ে, তুমিও যেমন, কে নেবে এই জঙ্গলে ?

আমি বললুম—থাক্। তবে খাবারের পুঁটুলিটা নিয়ে যাওয়া যাক্, নেয়ে উঠে সেখানে

বসেই খেয়ে নেবো। পরে দেখা গেল এ প্রস্তাব করে কি ভালোই করেছিলাম! ভাগ্যে খাবারের পুঁটুলি রেখে যাইনি।

গিয়ে দেখি বনের মধ্যে আসলে পাহাড়ী ঝরনাটাই একটা খাতের মতো সৃষ্টি করচে। একটা মানুষের গলা পর্যন্ত জল ডোবাটাতে। স্নান সেরে শালবনের ছায়ায় বসেই আমরা জামালপুর থেকে কেনা পুরী ও জিলিপি খেলাম, তারপর ঝরনার জল খেয়ে নিয়ে আমরা আগের সেই শালবনের তলায় ফিরে এসে দেখি, হেমেন যে ছোট সুটকেসটি ফেলে গিয়েছিল, সেটি নেই।

এই জনহীন বনে সুটকেস চুরি করবে কে? কিন্তু করেচে তো দেখা যাচ্চে। সুতরাং মানুষ নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে। আমরা সে দলের লোক নই, যে দলের একজন চিড়িয়াখানার জিরাফ দেখে বলেছিল—অসম্ভব! এমন ধরনের জানোয়ার হতেই পারে না! এ আমি বিশ্বাস করিনে।

হেমেন বললে—নতুন সুটকেসটা ভাই, সেদিন কিনে এনেচি কলকাতা থেকে—

—কিন্তু নিলে কে তাই ভাবচি—

—আমার মনে হয় বনের মধ্যে রাখাল কি কাঠকুড়ুনি মাগী ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসেছিল—বেওয়ারিশ মাল পড়ে আছে দেখে নিয়ে গিয়েচে—

—জিনিসের আশা ছেড়ে দিয়ে চল এখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমের খোঁজ করি—

আবার সেই 'বৃদ্ধ নারিকেল' পথে পড়লো। এ গাছের দিকে চেয়ে শ্রদ্ধা হয় বটে। এই জাতীয় গাছই বনস্পতি নামের যোগ্য। কলের চিমনির মতো সোজা উঠে গিয়েচে, দেবদারুর মতো কালো মোটা গুঁড়ি—ওপরের দিকে তেমনি নিবিড় শাখা-প্রশাখা; তবে গাছটাতে শাখা-প্রশাখা দূরে ছড়ায় না—অনেকটা ইউক্যালিপটাস গাছের ধরনে ওপরের দিকে তাদের গতি। হেমেন হঠাৎ বললে—দেখ, দেখ—ওগুলো কি হে?

সত্যি, ভারি অপূর্ব দৃশ্য বটে। একটা গাছের ডাল-পালায় কালো কালো কি ফল ঝুলচে, রাশি রাশি ফল, প্রত্যেক ডালে দশটা পনেরোটা—ভারি চমৎকার দেখাচ্চে এখান থেকে।

হেমেন বললে—একটা নয় হে, ও রকম গাছ আরও রয়েচে ওর পাশেই—

এইবার আমি বুঝলাম। দূর থেকে ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। বন্ধুকে বললুম—ওগুলো আসলে বাদুড় ঝুলচে গাছের ডালে—দূর থেকে ফলের মতো দেখাচ্চে—

হেমেন তো অবাক। সে এমন ধরনের বাদুড় ঝোলার দৃশ্য এর আগে কখনো দেখেনি বললে। কাজরা ভ্যালির সে গম্ভীর দৃশ্য জীবনে কখনো সত্যি ভোলবার কথা নয়। দুদিকে ছুটো পাহাড়শ্রেণী, মাঝখানে এই বনময় উপত্যকা, বিশাল-বনস্পতি-সমাকুল, নির্জন, নিস্তব্ধ। আমার কানে ঝরনার শব্দ গেল। দুজনে ঝরনার শব্দ ধরে সামনের দিক দিয়ে দূরে পাহাড়শ্রেণীর তলায় বনের মধ্যে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখতে পেলুম। ওই নিশ্চয়ই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম।

হেমেন বললে—আমার সুটকেস্‌টা আশ্রমের বালক-বালিকারা নেয়নি তো হে?

বনের মধ্য দিয়ে আমরা মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটার দৃশ্য বড় সুন্দর।

একদিকে মন্দিরের কুড়ি হাত দূরে বাঁ পাশে একটা বড় ঝরনা পাহাড়ের ওপর থেকে পড়চে আমাদের সামনে একটা গুহা—গুহায় ঢুকবার জায়গাটাতেই মন্দির, পাহাড়ের একেবারে তলায়।

বহুপ্রাচীন জায়গাটাতেই মন্দির, দেখলেই বোঝা যায়। নির্জন স্থান, দুদিকে পাহাড়-শ্রেণী, মধ্যে এই সুন্দর উপত্যকা—প্রাচীন ভারতের পবিত্র আশ্রমপদের ছবি মনে জাগায় বটে! রোদ তখন পড়ে আসচে, পশ্চিম দিকের পাহাড়শ্রেণীর ছায়া পড়েচে উপত্যকায়—কত কি পাখী ডাকচে চারিদিকের গাছপালায়। হেমেনও বললে—বড় সুন্দর জায়গাটি তো!

আমাদের চোখের সামনে আশ্রমের ছবিকে পূর্ণতা দান করবার জন্যেই যেন এক সন্ন্যাসিনী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা তো অবাক! এই বনের মধ্যে সন্ন্যাসিনী!

সন্ন্যাসিনী আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে এলেন।

তেমন সুন্দরীও নন, বিশেষ তরুণীও নন। বয়স ত্রিশের ওপর, তবে দেহের বর্ণ সুন্দর, অনেকটা গঙ্গাজলী গমের মতো। মাথায় একঢাল কালো চুলে কিছু কিছু জট বেঁধেচে। পরনে গৈরিক বসন। আমাদের হিন্দিতে বললেন—কোথা থেকে আসচ ছেলেরা?

—ভাগলপুর থেকে মাঈজী।

—কি জাত?

—আমরা দুজনেই ব্রাহ্মণ।

—হেঁটে এলে?

—আজ্ঞে। কাজরা স্টেশনে বেলা নটার সময় নেমে হাঁটচি।

—আজ তোমরা ফিরতে পারবে না। এইখানেই থাকো।

আমি হেমেনের মুখের দিকে চাইলুম। তারপর দুজনে মিলে চারিদিকে চাইলুম—থাকবো কোথায়? ঘরদোর তো কোনোদিকে দেখি না। গাছতলায় নিশ্চয়ই রাত্রিযাপন করার প্রস্তাব করেননি মাতাজী।

সন্ন্যাসিনী বললেন—বাবা, তোমরা থাকো, থাকতেই হবে—সন্ধ্যা হবে সামনের পাহাড় পেরিয়ে যাবার আগেই হয়তো। তা ছাড়া, দরকারই বা কি কষ্ট করে যাবার? থাকবার ভালো জায়গা আছে।

কিন্তু কোথায়? চোখে তো পড়ে না কোনোদিকে। হেমেন ও আমি আর একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

হেমেন চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে বললে—মাতাজী, আমরা থাকব কোথায়?

সন্ন্যাসিনী হেসে বললেন—মন্দিরে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গুহার ভেতরে মন্দির বাদে দুই কামরা। কোনো কষ্ট হবে না।

আমরা একবার দেখতে চাইলুম জায়গাটা। মাতাজী আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের গায়ে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি প্রত্যেক পাথরে খোদাই। বৌদ্ধযুগের চিহ্ন মন্দিরের সর্বাঙ্গে—বৌদ্ধমন্দির কবে হিন্দু তীর্থস্থানে পরিণত হয়েচে তার সঠিক ইতিহাস সন্ন্যাসিনী কিছুই

জানেন না বলেই মনে হল। বৌদ্ধধর্ম বলে যে একটি ধর্ম ভারতবর্ষে আছে বা ছিল এসব ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর জানা থাকবার কথা নয়।

কামরা দুটি ছোট বটে, কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা রাত কাটাবার পক্ষে নিতান্ত মন্দ হবে না।

সন্ন্যাসিনী বললেন—বাঙালীরা ডালভাত ভালোবাসে—এখানে কিন্তু তা দিতে পারবো না।

আমরা বললুম—তাতে কি। যা দেবেন, তাতেই চলবে।

হেমেন চুপিচুপি আমায় বললে—বিছানা কোথায়, শুকনো পাতালতা পেতে শুয়ে থাকতে হবে না কি?

কিন্তু শোবার সময়ের এখনও অনেক দেরি—সে ভাবনায় এখুনি দরকার নেই। সন্ধ্যা নেমে আসায় সেই অপূর্ব সুন্দর উপত্যকাটিতে রাঙা রোদ সু-উচ্চ বৃদ্ধ নারকেল বৃক্ষের শীর্ষদেশ স্বর্ণাভ করে তুলেচে—চারিদিকে স্বপ্নপুরীর মতো নিস্তব্ধ শান্তি।

সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞেস করলুম—এই উঁচু গাছটাকে কি বলে?

উনিই বললেন—বৃদ্ধ নারিকেল।

আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিয়ে উপত্যকার পূর্বদিকে বেড়াতে গেলাম। সন্ন্যাসিনী বারণ করে দিলেন সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ার সময় আমরা যেন বাইরে না থাকি এবং বনের মধ্যে বেশিদূর না যাই। ভাল্লুকের ভয় তো আছেই, তা ছাড়া বাঘও মাঝে মাঝে যে বার না হয়, এমন নয়।

ঝরনা পার হয়ে খানিকদূর গিয়ে অরণ্য নিবিড়তর হয়েচে, বড় বড় পাথরের চাঁই এখানে ওখানে গড়িয়ে পড়েচে পাহাড় থেকে। কত কি পাখীর কলরব গাছপালার ডালে ডালে; আমরা বেশিদূর না গিয়ে ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদীর ধারে একখণ্ড পাথরের ওপরে বসে রইলুম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার পূর্বেই আশ্রমে ফিরে এলুম।

মাতাজী আগুন করে আটার লিট্টি সেঁকচেন, আমাদের কাছে বসতে বললেন। আমাদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলেন, ভাগলপুরে কি করি, কে কে আছে, বিবাহ করেচি কিনা ইত্যাদি মেয়েলি প্রশ্ন করতে লাগলেন।

আমি বললুম, এ মন্দির কতদিনের মাতাজী?

—মন্দির অনেক দিনের, তবে লক্ষীসরাই-এর একজন ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসাদার মন্দির নতুন করে সারিয়ে দিয়ে ভেতরের কামরাও করে দিয়েচে।

—আপনি কতদিন আছেন এখানে?

—দশ বারো বছর—

—ভয় করে না একলা থাকতে?

—ভয় কিসের? পরমাত্মার কৃপায় কোনো বিপদ হয় নি কোনোদিন।

দশ বছর আগে এই সন্ন্যাসিনী গৌরাঙ্গী তরুণী ছিলেন, সে কথা মনে হল, আর মনে হল এই নির্জন উপত্যকায় মন্দির মধ্যে একা রাত্রিযাপনের বিপদ সে অবস্থায়।

হেমেন বললে, মাতাজী, আপনার দেশ কোথায় ?

—গৃহস্থ-আশ্রমের নাম বলতে নেই। তবুও বলি আমার বাড়ি ছিল এই বেগুসরাইয়ের কাছেই। আমি এ দেশেরই মেয়ে। আমার চাচা আগে এ আশ্রমের সেবাইত ছিলেন, তারপর থেকে আমি আছি।

এতক্ষণে অনেকখানি ব্যাপার আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এই দেশের মেয়ে এবং সম্ভবত বাল্যকাল থেকে ওঁর চাচাজীর সঙ্গে এখানে অনেকবার গিয়েচেন এসেচেন। অনেকেই চেনে এদেশে।

আমি বললুম, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মাতাজী, মাপ করবেন, আপনি কি বিবাহ করেন নি ?

—আমি বিধবা, তেরো বছর বয়সে স্বামীর মৃত্যু হয়, সেই থেকেই গৈরিক ধারণ করেচি।

তারপর তিনি নিজের জীবনের অনেক কথা বলে গেলেন। ওঁর কথার মধ্যে একটি সতেজ সজীব নারীমনের পরিচয় পেয়ে আমি ও আমার বন্ধু দুজনেই যেন এক নূতন জগৎ আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করলুম, ভেবে দেখলুম এই সন্ন্যাসিনীর যদি বয়স আরও কম হত তবে এঁর জীবনের ইতিহাস শুনে আমরা অন্তত মনে মনেও এঁর প্রেমে না পড়ে পারতুম না—সেই বয়সই ছিল আমাদের।

হেমেন বললে, আপনাকে এ বনে খাবার-দাবার কে এনে দেয় ?

—কিউল থেকে আমার শিষ্যরা আসে, ওরাই নিয়ে আসে, হপ্তায় দুদিন।

—আপনি সত্যিই অদ্ভুত মেয়ে। এ রকম মেয়ের সাক্ষাৎ বেশি পাওয়া যায় না।

—কিছু না, পরমাত্মা যখন ডাকেন, তাঁর সব কাজ তিনিই করিয়ে নেন। আমি বিধবা হয়ে একমনে তাঁকে ডেকেচি, ঘরের বাইরে আসবার চেষ্টা করেচি যে কত! সংসার আদৌ ভালো লাগতো না, বাইরে বেরুতে ইচ্ছে থাকতো কেবল। জপতপ করবার কত বাধা সংসারে। আমি—আমাদের বেগুসরাইয়ের বাড়ির পিছনে ছোট একটি তেঁতুল গাছ আছে—কাছেই কিউল নদী—

আমি বললুম, বেগুসরাই মহকুমা ? সেখানে তো—

—এই লক্ষ্মীসরাইয়ের কাছে বেগুসরাই, ছোট্ট গাঁ—কিউল নদীর ধারে। তারপর শোনো ছেলেরা, কিউল নদীর ধারে সেই তেঁতুল গাছের কাছে বসে বসে কতদিন ভগবানকে ডেকেচি যে, আমার একটা উপায় করে দাও, সংসার আমার বড় খারাপ লাগচে। ভগবানকে ডাকলে তিনি শোনেন।

—কি করে জানলেন ?

—আমি প্রত্যক্ষ ফল পেয়েচি—একমনে ডাকলে না শুনে তিনি থাকতে পারেন না।

আমার একটু আমোদ লাগলো, কারণ সে সময় আমি নিজে ছিলাম ঘোর agnostic, লেস্‌লি স্টিফেনের দার্শনিক মতে অনুপ্রাণিত, ভগবানকে মানি না যে তা নয়, কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের সন্ধান কেউ জানে না, দিতেও পারে না—এই ছিল আমার মত।

আমি বললুম, ভগবানকে কখনো দেখেছেন মাতাজী ?

—না, সেভাবে দেখিনি। কিন্তু মনে মনে কতবার তাঁকে অনুভব করেছি। চোখের দেখার চেয়ে সে আরও বড়। চোখ ও মন দুইই তো ইন্দ্রিয়, ভগবানকে বুঝবার ইন্দ্রিয় হল মন, চোখ নয়। যদি কেউ বলে ফুলের গন্ধ দেখবো—সে দেখতে পাবে না, কারণ গন্ধ অনুভব করবার ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র—চোখ নয়। এও তেমনি—

—তারপর কি করলেন ?

—আমার চাচাজীকে বললুম, নির্জনে থাকবো, আমায় আশ্রমে নিয়ে যাও, সাধন ভজনের ব্যাঘাত হচ্চে সংসারের গোলমালে। তিনি নিয়ে আসতে চাননি প্রথমে। আমি অনাহারে রইলাম তিনদিন, মুখে কেউ এক ফোঁটা জল দিতে পারেনি এই তিনদিনে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলাম পাঁচ বছর—তাঁর মৃত্যুর পরে একাই আছি।

—ভালো লাগে এখানে একা একা ?

—খুব ভালো লাগে। সংসারের গোলমাল সহ্য করতে পারিনে। এখানটা বড় নির্জন, মন স্থির করে থাকতে পারলে গৃহত্যাগীর পক্ষে এমন স্থান আর নেই।

—কিন্তু আপনি মেয়েমানুষ, আপনার পক্ষে ভয়ও তো আছে—

—সে সব ভয় কখনো করিনি। ভগবানের দয়ায় কোনো বিপদও কখনো হয়নি। সবাই মানে, আশপাশের গ্রামে আমার অনেক শিষ্য আছে, তারা প্রায়ই খোঁজ-খবর নেয়। সকালে দেখো এখন—তারা দুধ দিয়ে যায়, আটা দিয়ে যায়, লক্ষ্মীসরাইয়ের একজন শেঠজী চাল আটা পাঠিয়ে দেয় মাসে মাসে।

আমাদের রাত্রের খাবার তৈরী হল। চাপাটি আর ডাল মাতাজী কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ালেন। রাত্রে শোবার বন্দোবস্তও খুব ভালো না হলেও নিতান্ত খারাপ নয় দেখলুম, একপ্রস্থ বিছানা এখানে অতিথিদের জন্য মজুত থাকে, লক্ষ্মীসরাইয়ের শেঠজী তার ব্যবস্থা করেচেন, আমাদের কোনই অসুবিধে হল না।

হেমেন বললে, ভাই, রাত্রে মন্দির থেকে বেরুনো হবে না, বাঘের ভয় আছে ; মাতাজীকে না হয় ভগবান রক্ষা করে থাকেন অসহায় মেয়েমানুষ বলে, আমাদের বেলা তিনি অত খাতির নাও করতে পারেন তো ?

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প-গুজব করলুম। বনানীবেষ্টিত উপত্যকার নৈশ সৌন্দর্য দেখবার লোভ ছিল, কিন্তু হেমেন এ বিষয়ে উৎসাহ দিলে না। মাতাজীও দেননি। তবে ঘুমের মধ্যেও আমরা আশ্রমের পার্শ্বস্থিত ঝরনার বারিপতনের শব্দ শুনেচি সারা রাত।

সকালে আমরা বিদায় নিলুম।

ফিরবার পথে আবার সেই বৃদ্ধ নারিকেলের ছায়াস্নিগ্ধ উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। অপূর্ব দৃশ্য বটে। শুনেছিলুম কাজরা ভ্যালিতে স্লেট পাথরের কারখানা আছে কিন্তু এখানে কোনোদিকে তার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সামনের পাহাড়টা টপকে এপারে আসতে প্রায় বেলা নটা বাজলো।

স্টেশন যখন আরও পাঁচ-ছ মাইল দূরে, তখন ভাগলপুরের ট্রেন বেরিয়ে গেল।

হেমেন বললে, আর তাড়াতাড়ি করে হেঁটে কি লাভ, এসো কোথাও খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক। ট্রেন আবার সেই সন্ধ্যাবেলা।

সামনে একটা ক্ষুদ্র বস্তি পাওয়া গেল, তার নাম গোকর্ণটোলা, সে যুগের নামের মতো শোনায় যেন।

একজন বৃদ্ধ লোক ইঁদারার পাড়ে স্নান করছে, তাকে আমরা বললুম, এখানে কিছু খাবার কিনতে পাওয়া যায়?

বৃদ্ধ ঘাড়-নেড়ে বললে—না।

আমরা চলে যাচ্চি দেখে সে আবার আমাদের পিছু ডাকলে। যদি আমরা কিছু মনে না করি, কোথা থেকে আমরা আসচি, সে কি জিজ্ঞেস করতে পারে?

—কাজরা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে।

—পুণ্য করে আসচেন বলুন—

—হয়তো।

—বেশ ভালো লাগলো আপনাদের?

—চমৎকার।

—ভাগলপুর থেকে বাংগালি বাবুরা আমার ছেলেবেলায় অনেক আসতেন আশ্রম দেখতে। এখন আর আসেন না। আপনারা আসুন, আমার বাড়িতে এবেলা থাকবেন। বড় খুশী হবো।

কারো বাড়ি গিয়ে ওঠা আমাদের ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু যখন এসব স্থানে দোকান-পসার নেই, অগত্যা রাজি না হয়ে উপায় কি।

বস্তির মধ্যে যাবার আগ্রহ আমাদের কারো ছিল না। বিহারের এই সব গ্রাম্য বস্তি অত্যন্ত নোংরা, গায়ে গায়ে চালে চালে বসত, গ্রামের প্ল্যান নেই—দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটুখানি জায়গা নিয়ে কতকগুলো প্রাণী পরস্পরকে জড়াজড়ি করে তাল পাকিয়ে আছে যেন। ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে বাস করার বাধা কিছুই ছিল না, এ রকম অবাধ মুক্ত মাঠের মধ্যে জমির দামও বিশেষ আক্রা নয়—কিন্তু ওদের কুশিক্ষা ও সংস্কার তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েচে।

কারো বাড়ির সামনে একটা ছোট বাগান পর্যন্ত নেই—একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বিহারের এই গ্রাম্য বস্তিগুলি দেখলে বোঝা যায়—সত্যিই দেখলে বোঝা যায় যে, মানুষের সৌন্দর্যজ্ঞান-হীনতা কত নিম্নস্তরে নামতে পারে। এক বাড়ির দেওয়ালে পাশের বাড়ি চালা তুলেচে—অর্থাৎ তিনখানা দেওয়ালে দুইটি পৃথক পৃথক গৃহস্থের বাড়ি। কেন যে ওরা এ রকম করে তা কে বলবে? জায়গার কিছু অভাব আছে এই শহর থেকে বহুদূরে, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে, বুনো জায়গায়?

তা নয়। ওরা লেখাপড়া জানে না, স্বাস্থ্য কি করে বজায় রাখতে হয় জানে না—কেউ

ওদের বলেও দেয় না। চিরকাল যা করে আসচে ওদের গ্রাম্য অঞ্চলে, ওরাও তাই করে। কল্পনাহীন মনে নতুন ছবিও জাগে না। সেই ঠেসাঠেসি খোলার চালা, ফণিমনসার ঝোপ, রাঙা মাটির দেওয়াল, গোরু ও মহিষের অতি অপরিষ্কার ও নোংরা গোয়াল বাড়ির সামনেই—তাল বা শালগাছের কড়িতে খোলার চালের নীচে শুকনো ভুট্টার বীজ ঝুলচে—মেয়েদের পরনে রঙীন ছাপাশাড়ি, যা বোধ হয় তিনমাস জলের মুখ দেখেনি—হাতে রুপোর ভারী ভারী পৈঁছে ও কঙ্কণ, বাহুতে বাজু—পায়ে ততোধিক ভারী কাঁসার মল।

এইসব বস্তি প্লেগ ও কলেরার বিশেষ লীলাভূমি—একবার মহামারী দেখা দিলে সাত-আট দিনের মধ্যে বস্তি সাফ করে দেয়।

আমরা গিয়ে এমনি একটা খোলার ঘরের দাওয়ায় বসলুম একটা দড়ির চারপাইয়ের ওপর। বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একরাশ এসে জুটলো সামনে। তাদের চেহারা দেখে মনে হয় আজন্ম ওরা স্নান করেনি, কাপড়ও কাচেনি।

আমরা জিগ্যেস করলুম—গ্রামে পাঠশালা আছে?

বৃদ্ধ বললে—এ টোলায় নেই—সহদেবটোলায় আছে। প্রাইমারী স্কুল।

—ছেলেরা সব যায় সেখানে?

—সবাই যায় না বাবুজি, বড় হয়ে গেলে ছেলেরা গোরু মহিষ চরায়, ক্ষেত-খামারে কাজ করে—লেখাপড়া করলে কি সকলের চলে বাবুজি!

বৃদ্ধ আমাদের হাতমুখ ধোবার জল নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল ইঁদারার জল। তবুও অনেকটা ভালো। বস্তির মাঝখানে যে ছোট্ট পুকুর দেখে এসেচি তার জল হলে আমাদের জল ব্যবহার স্থগিত রাখতে হত।

—আপনারা আটা খাবেন, না ছাতু?

—যা আপনাদের সুবিধে হয়। তবে আটাই বোধহয়—

—আচ্ছা আচ্ছা, বাবুজি। আপনারা চুপ করে বসে বিশ্রাম করুন—আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। ওরা আমাদের জন্যে রাঁধবার বন্দোবস্ত করে দিলে। সে এক-হিসেবে ভালো বলেই মনে হল আমাদের কাছে। নিজের চোখে জিনিসগুলো দেখে ধুয়ে বেছে তবুও নিতে পারা যাবে।

এদের আতিথ্য অত্যন্ত আন্তরিক ও উদার—এদের সারল্য অন্তরকে স্পর্শ না করে পারে না—কেবল মনে হয়, যদি কেউ এদের স্বাস্থ্যের বিধি-নিষেধগুলো বলে দেওয়ার থাকতো!

আমরা পাশের একটা ছোট চালায় রান্না চড়ালুম। গ্রামের লোকে অনেকে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো আমাদের রান্না। আলু ও লাউএর তরকারি আর আটার রুটি। চাটনির জন্যে ছিল চুকো পালং, কিন্তু আমরা চাটনি কি করে রাঁধতে হয় জানিনে। হেমেন বললে তার অনেক হাঙ্গাম, সুতরাং চাটনি রান্না বন্ধ রইল। দুজনে পরামর্শ করে অতিকষ্টে লাউএর তরকারি নামালুম; এদের কাছে ধরা না পড়ি যে, আমরা রান্না জানি না।

কথাবার্তা চললো খাওয়া-দাওয়ার পরে। এই অঞ্চলের পল্লীজীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ

করা গেল ওদের কাছ থেকে। গ্রামের সব লোকই চাষী—গম ও ভুট্টা এই দুটি প্রধান ফসল। অধিবাসীর সবাই হিন্দু, তার মধ্যে অধিকাংশ দোশাদ অর্থাৎ মেথর, বাকি সকলে কুর্মি—একঘর রাজপুত। লেখাপড়া বিশেষ কেউ কিছু জানে না, ব্যবসা-বাণিজ্য কেউ করে না, বেশিদূর কেউ যায়নি কখনো গ্রাম ছেড়ে। আমাদের গৃহস্বামী ওদের মধ্যে কিছু এলেমদার—জমিজমা-সংক্রান্ত মামলাতে সে গ্রামসুদ্ধ লোকের পরামর্শদাতা ও দলিললেখক। মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে বারকয়েক মুঙ্গের ও পাটনা গিয়েচে।

এদের প্রধান খাদ্য আটার রুটি ও মকাইএর ছাতু। তরকারির মধ্যে জন্মায় রামতরুই, পটল, বেগুন, কয়েক প্রকারের শাক, সকরকন্দ আলু। গোল আলু ও কপি এ অঞ্চলে জন্মায় না—ওসব দুর্মূল্য শৌখিন তরকারি এরা নাকি তত পছন্দও করে না।

প্লেগ গত দুতিন বৎসর দেখা দেয়নি—তার বদলে দেখা দিয়েছিল কলেরা। অনেক লোক মরেছিল।

আমরা বললুম—ডাক্তার নেই এখানে।

—না বাবু, কিউল থেকে আনতে হয়—তা অত পয়সা খরচ করে সবাই তো পারে না।

—কলেরার সময় কি করো?

—গতবার গভর্নমেণ্ট থেকে একজন ডাক্তার পাঠিয়েছিল।

এই ধরনের বহু অশিক্ষিত পল্লী নিয়ে বিহার ও বাংলা। শহরে বাস করে জাতির দুঃখ-দুর্দশা জানা সম্ভব নয়। বাংলা ও বিহারের বহুস্থান এখনও মধ্যযুগের আবহাওয়ায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে—কি শিক্ষায়, কি মতামতে, কি জীবিকার্জনের প্রণালীতে। উড়িষ্যার একটি নিভৃত পল্লী-অঞ্চলে একবার দেখবার সুযোগ ঘটেছিল, সেখানেও এইরকমই দেখেচি। তবে আমার মনে হয়েচে বিহারী পল্লীবাসীরা বেশি অপরিচ্ছন্ন, উড়িষ্যা-বাসীদের অপেক্ষা। উড়িয়া গৃহস্থের বাড়িঘর গোবর-মাটি দিয়ে বেশ লেপামোছা, লোকগুলিও এত অপরিষ্কার নয়। উড়িষ্যার পল্লীগ্রামের কথা পরে বলচি।

আমরা বেলা তিনটের সময় গোকর্ণটোলা থেকে কাজরা স্টেশনের দিকে রওনা হই। বৃদ্ধ গৃহস্বামী গল্প করতে করতে প্রায় এক মাইল রাস্তা আমাদের সঙ্গে এল। আমরা তাকে বার বার বলে এলুম বিদায় নেবার সময়, ভাগলপুরে মামলা করতে আসে যদি কখনো, তবে যেন আমাদের বাসায় এসে ওঠে।

সন্ধ্যার সময় কাজরা থেকে ট্রেন ছাড়লো।

একদিন দুপুরের ট্রেনে আমি ভাগলপুর থেকে গৈবীনাথ দেখতে গেলাম।

সুলতানগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় আধমাইল কি তার কিছু কম হেঁটে গঙ্গার ধার। সেখানে এসে নৌকো করে গৈবীনাথ যেতে হয়—কারণ গৈবীনাথ একটা ছোট পাহাড়, সোজা গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠেচে। পাহাড়ের ওপর গৈবীনাথ শিবের মন্দির।

আমি যেদিন গিয়েছিলুম, সে দিন ওখানে লোকের যাতায়াত ছিল কম। রেলের ধারে

বলে, গৈবীনাথে প্রায়ই শনি বা রবিবার লোকজনের ভিড় একটু বেশিই হয়ে থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম যত ভালো জায়গায় হোক, অতদূর রাস্তা আর বনজঙ্গলের মধ্যে বলে সেখানে বড় একটা কেউ যেতে চায় না, যদিও কিউল থেকে জামুই আসবার সময় বাঁ-দিকে যে পাহাড়-শ্রেণী ও জঙ্গল দূরে দেখা যায়—ওই হল ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের সেই পাহাড়—কিন্তু ই আই রেলওয়ের মেন লাইনের কোনো স্টেশনে নেমে সেখানে যাবার রাস্তা নেই—লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন ছাড়া।

মস্ত বড় একটা তীর্থস্থান না হলে, যে কষ্টটা হবে তার অনুপাতে পুণ্য কতখানি অর্জন করে আনতে পারা যাবে সেটা খতিয়ে না বুঝে—শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার লোভে লোকে অত কষ্ট স্বীকার করে না।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম অত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নয়। কে শুনেচে ওর নাম?

কিন্তু গৈবীনাথে যাতায়াতের সুবিধে খুব—স্টেশন থেকে দু পা হাঁটলেই হল। গঙ্গাগর্ভে পাহাড়, তার ওপরে শিবমন্দির—এর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম-টাশ্রমের তুলনা হয়? বিশেষ করে, যেখানে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে তেরো মাইল রাস্তা ভেঙে? গৈবীনাথ মন্দিরে আমি আরও দুবার গিয়েচি, একবার আমার ভগ্নী জাহ্নবী ও আমার ভাই নুটু সঙ্গে ছিল—ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল দেবতাবাবুও সেবার ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

প্রথমদিন একা গিয়ে যে অনুভূতি ও আনন্দ পেয়েছিলুম—ঠিক সে ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতা অন্য অন্য বার হয়নি।

আমি গিয়ে প্রণাম করে বললুম—বাবাজী, আশীর্বাদ করুন।

সাধু হিন্দীতে বললেন—বেঁচে থাকো বাবা।

—আপনি এখানেই থাকেন?

—না, মাস-দুই এসেচি—

—তবে কোথায় থাকেন?

—কন্যা-কুমারিকা থেকে উত্তরে বদরী-বিশাল পর্যন্ত সব তীর্থস্থানেই আমার যাতায়াত। তেরো বার বদরী-বিশাল গিয়েচি। আমাদের আসবার কি ঠিক আছে কিছু। এখন এখানেই আছি।

পুরুষমানুষ না হলে সন্ন্যাসী সেজে লাভ? এঁকেই বলি প্রকৃত সাধু। এঁর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের সে সন্ন্যাসিনী কিছুই নয়। ঢাকের কাছে টেমটেমি।

ভক্তিতে আমি আপ্লুত হয়ে পড়লুম।

সাধুজী আমায় বললেন—ঘর কোথায়?

—কলকাতায়।

—ব্রাহ্মণ?

—জী হাঁ।

সত্য কথা বলবো, সাধুবাবা আমার কাছে এক পয়সাও চান নি। আমি একটি সিকি

তাঁর পায়ের কাছে রাখলুম। তিনি সেটা হাতে তুলে নিয়ে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হল আমার প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন হয়েচেন।

সাধুজী বেদান্তের ব্যাখ্যা আরম্ভ করে দিলেন—মায়া কি, অধ্যাত্ম কি, ইত্যাদি। আমার সে সব শুনবার আগ্রহের চেয়েও তাঁর মুখে তাঁর ভ্রমণকাহিনী শুনবার আগ্রহই ছিল প্রবলতর। কিন্তু সাধুজীর মনে কষ্ট দিতে পারলুম না—আধঘণ্টা ধরে চুপ করে বসে বেদান্তব্যাখ্যা শুনবার পরে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আবার মন্দিরের পিছনে একখানা পাথরের ওপরে এসে বসলুম। তখন সূর্য অস্ত যাচ্চে। রক্ত সূর্যাস্তের আভা পড়েচে গঙ্গার বুকের বীচিমালায়, গৈবীনাথের মন্দিরচূড়ার ত্রিশূলের গায়ে, এপারের গাছপালায়। জামালপুরের মারফ পাহাড় পশ্চিম আকাশের কোলে নীল মেঘের মতো দেখাচ্চে।

গৈবীনাথের মন্দিরের ঠিক নীচে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গুহা আছে, সেটাও দেখে এসেচি। তার মধ্যে এমন কিছু দেখবার নেই। তবে এই রকম রক্তাভ অপরাহ্নের আকাশতলে পাহাড়ের ওপরে পা ঝুলিয়ে গঙ্গায় এবং গঙ্গার অপর-তীরবর্তী সুবিস্তীর্ণ চরভূমির দিকে চোখ রেখে নিরিবিলি বসে থাকার বিরল সৌভাগ্য ঘটেছিল বলেই গৈবীনাথ-তীর্থদর্শন আমার সফল হয়েছিল।

কতক্ষণ বসে থাকবার পরে হঠাৎ কখন জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব উজ্জ্বলতর হয়েচে দেখে চমক ভাঙলো। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ট্রেন—সেবার যে ট্রেনে কাজরা থেকে এসেছিলাম ভাগলপুরে।

এদিকে মনে প্রবল বাসনা রাত্রিটা এখানে থাকলে ভালো হয়।

অগত্যা সাধুবাবাজীর কাছেই আবার গেলাম। তিনি শুনে বললেন—মন্দিরের মোহান্তজীকে একবার বলে দেখ। আমি তোমাকে বড়জোর একখানা কম্বল দিতে পারি, অন্য কিছুই নেই আমার।

মোহান্তজীকে গিয়ে ধরলাম। আমার আবেদন শুনে তিনি বোধ হয় একটু বিস্মিত হয়েছিলেন—বললেন—থাকবার অন্য জায়গা নেই—রাতে মন্দির বন্ধ থাকে, পাশের বারান্দায় থাকতে পারো। কিন্তু তোমার সঙ্গে বিছানা আছে?

—কিছু নেই, তবে সাধুজী একখানা কম্বল দেবেন বলেচেন।

—এখানে গঙ্গার বুকে রাত্রে বেশ শীত পড়বে, খোলা বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারবে?

—খুব। ও আমার অভ্যেস আছে। আপনি থাকবার অনুমতি দিলেই হয়।

—থাকো, কিন্তু খাবে কি?

—কিছু দরকার নেই।

—তোমার খুশি।

কিন্তু সেখান থেকে জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ দেখা আমার অদৃষ্টে ছিল না—সাধুজীর কাছে আবার ফিরে গিয়ে দেখি মুঙ্গেরের এক শেঠজি সেখানে বসে। আমার প্রস্তাব শুনে শেঠজি আমায় প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনিও স্টেশনে যাবেন, তাঁর

একা এসে আছে গঙ্গার ধারে—সেখানে রাত্রে থাকবার জায়গা নয়, ভীষণ শীত করবে, বিশেষ করে সন্ন্যাসীর কম্বল নিলে ওঁর বড় অসুবিধে হবে রাত্রে।

আসল কথা পরে বুঝেছিলাম—সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধার থেকে সুলতানগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত পথটি খুব নিরাপদ নয়। বেশি দূর নয় যদিও, তবু দু একটা রাহাজানি হয়ে গেছে ইতিপূর্বে। শেঠজির কাছে কিছু টাকা ছিল, তিনি একজন সঙ্গী খুঁজচেন।

সাধুজির সামনে শেঠজি কম্বলের কথা প্রথমে বলেননি—আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন,—আপনি কম্বল নিলে সাধুজি শীতে জমে যাবেন রাত্রে। উনি বুড়ো মানুষ—নেবেন না ওঁর কম্বল। আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

একথা আমার আগে কেন মনে হয়নি ভেবে বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম।

তারপর দুজনে এসে নৌকোয় চড়ে তীরে নামলাম। এক্কা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন আসবার অল্প সময় যখন বাকি, তখন এক্কাওয়ালা আমাদের স্টেশনে পৌছে দিল।

গৈবীনাথ আর যে-দুবার গিয়েচি, তখন এমন নির্জন ছিল না স্থানটি—এবারকারের মতো আনন্দ পাইনি আর সেখানে।

এই সঙ্গে আরও একটি দেবমন্দিরের কথা বলি। আমার খুব ভালো লাগতো জায়গাটি—যদিও স্থানীয় গ্রাম্য লোক ছাড়া সেখানে অন্য লোক কখনও যায়নি।

থানা বিহিপুর স্টেশন থেকে ছ-সাত মাইল দূরে পর্বতা বলে একটি গ্রাম আছে। আমাকে একবার কি কাজে সেখানে যেতে হয়েছিল—স্থানটি উত্তর-বিহারের অন্তর্গত, সুতরাং বাংলা-দেশের মতো অনেকটা শ্যামল প্রকৃতির। এক জায়গায় পথের ধারে এমন নিবিড় বৃক্ষরাজির সমাবেশ যে, সত্যিই বাংলাদেশে আছি বলে ভ্রম হয়। সময় ছিল দুপুরের কিছু পরে। আমি গাছতলায় একটুখানি বিশ্রাম করচি, এমন সময়ে রামশিঙা বেজে উঠলো কোনো দিকে।

আমার সামনে দিয়ে দু-তিনটি গ্রাম্য লোক পেতল ও কাঁসার কানা-উঁচু থালা হাতে বনের ওপারে কোথায় যাচ্চে দেখে তাদের একজনকে বললুম—কোথায় শিঙে বাজচে হে?

একজন আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—রামজীর মন্দিরে। নদীর ধারে—আমরা সেখানে প্রসাদ আনতে যাচ্চি—ভোগের সময় শিঙে বাজে রোজ।

আমিও ওদের সঙ্গে গেলাম। নদীর স্থানীয় নাম বুঢ়ল নদী—আমাদের কাটিগঙ্গার খালের চেয়ে যদি কিছু বড় হয়। তার ধারে অতি সুন্দর স্থানে আশ্রম ও দেবমন্দিরের কারুকার্য সাধারণ গ্রাম্য স্থপতির পরিকল্পিত, এই একই গড়নের মন্দির উত্তর-পূর্ব বিহারের প্রায় অনেক গ্রামেই দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্র মন্দির, কিন্তু মন্দিরসংলগ্ন জমি আছে অনেকটা। নদীর ধারে সুন্দর ফুলবাগান, সমস্ত স্থানটি ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

একজন বৃদ্ধ মোহান্ত মন্দিরে থাকেন, তিনি আমায় প্রসাদ খেতে আহ্বান করলেন। আমি দ্বিরুক্তি না করে সম্মতি জানালাম। তিনি আমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

আমি বললাম—এ মন্দির কতদিনের ?

—অনেক দিনের বাবা, আমিই তো এখানে আছি পঁচিশ বছর।

—কে স্থাপন করেছিল মন্দিরটি ?

—দ্বারভাঙার মহারাজ তাঁর জমিদারি বেড়াতে এসে এই জায়গাটি বড় পছন্দ করেন, শুনেচি তিনিই মন্দির করে দিয়েছিলেন। বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, ওঁদেরই দান।

—আয় কত হবে ?

—বছরে তিন-চারশো টাকা, তবে ঠিকমতো আদায় হয় না সব বছর, লোকজনের প্রণামী ও মানত ইত্যাদির আয়েও কিছুটা ব্যয়নির্বাহ হয়।

আমার জন্যে খাবার এল সরু আতপ চালের ভাত, অড়রের ডাল ও কি একটা তরকারি; এসব দিকে বাংলাদেশের মতো দু-তিন রকম আনাজ মিশিয়ে ব্যঞ্জন রন্ধনের পদ্ধতি প্রচলিত নেই—আলু তো শুধু আলুরই তরকারি, বেগুন তো শুধু বেগুনেরই তরকারি। সে তরকারি বাঙালীর মুখে ভালো লাগে না—কিন্তু ডাল এত চমৎকার রান্না হয় যে বাংলাদেশে কচিৎ তেমনটি মেলে।

মোহান্তজীর মুখে শুনলুম দুবেলা প্রায় পঞ্চাশজন অতিথি-অভ্যাগত ও দরিদ্র গ্রাম্যলোক ঠাকুরের প্রসাদ পায়। দুটি বৃদ্ধশিষ্য আছে মোহান্তজীর, তারাই রান্না করে দুবেলা। কোনো মেয়ে, তা সে যে-বয়সেরই হোক, আশ্রমে রাখবার নিয়ম নেই। বিহারের নির্জন পল্লীপ্রান্তে পর্বতের এই মন্দির মনে একটি উজ্জ্বল নবীনতা ও পরম শান্তির সৃষ্টি করে; এর স্বল্পায়োজন-মাধুর্য মনকে এমন অভিভূত করে যে অনেক বৃহৎ আয়াস তার ত্রিসীমানায় পৌঁছুতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় যখন আশ্রম থেকে চলে আসি, তখন মোহান্তজী আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক দূর এলেন।

তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখলাম মন্দিরের আয় বাড়ানোর দিকে—অবিশ্যি নিজের স্বার্থের জন্যে নয়। গ্রামের অনেক গরিব লোক দুবেলা এখানে প্রসাদ পেয়ে থাকে, আরও কিছু আয় বাড়লে আরও বেশি লোককে খাওয়াতে পারতেন।

মোহান্তজী প্রকৃতই অতি সদাশয় ব্যক্তি এবং বালকের মতো সরল। তাঁর ধারণা এ ধরনের একটা সৎকাজের কথায় যে কেউ টাকা দিতে রাজি হবে। শুধু মুখের কথা খসাবার অপেক্ষা মাত্র।

তাঁর সরলতা দেখে আমার হাসি পেল। বললুম—মোহান্তজী, আপনি একবার ভাগলপুরে আসুন না, আপনাকে দু-এক জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, আপনি নিজেই বুঝবেন কে কেমন দিচ্চে।

চাঁদ উঠেছিল।

চারধারে ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিবির ওপর ক্ষুদ্র বন, দূরে দূরে শীসম্ গাছ—বিহারের শীসম্ গাছ একদিকে একটু হেলে থাকে—অনেকগুলো থাকে এক সারিতে।

যাকে শিশু গাছ বলে, সে সম্পূর্ণ আলাদা গাছ, যদি-চ সীসম্ গাছের কাঠেও বেশ মজবুত তক্তা হয় শুনেচি।

মোহান্তজী বললেন—বাবু, মনে থাকবে আমার কথা?

—খুব থাকবে, তবে আপনি নিজে না এলে কিছু করতে পারবো না।

হঠাৎ আমায় মোহান্তজী বললেন—আসুন, আপনার সঙ্গে পাঁড়েজীর আলাপ করিয়ে দিই।

মাঠের মধ্যে এক জায়গায় অনেকগুলো চালাঘর দেখা গেল। কাছাকাছি অন্য কোনো বাড়ি নেই। দূরে নিকটে অনেকগুলি সীসম্ গাছের সারি।

আমি একটু ইতস্তত করলাম যেতে, কারণ স্টেশনে গিয়ে আমায় ট্রেন ধরতে হবে। মোহান্তজী আমার কোনো আপত্তি শুনলেন না—পরে অবিশ্যি বুঝলাম তিনি আমায় পাঁড়েজীর আশ্রমে রাত্রে রাখবার জন্যে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে সঙ্গেও আসছিলেন। মোহান্তজী বাড়ির কাছে গিয়ে ডাক দিতেই একজন লোক বার হয়ে তাঁকে হাসিমুখে প্রণাম করে বললে—আসুন বাবাজী, ইনি কে?

—ইনি ভাগলপুরের বাংগালি বাবু—আশ্রমের অতিথি—

—আসুন বাবুজি, আমার বড় সৌভাগ্য—উঠে এসে বসুন।

বেশ জ্যোৎস্না উঠেছিল। চারদিকে চেয়ে দেখি বাড়ির উঠানে এবং ঘরের দাওয়ায় বড় বড় জালায় ও হাঁড়িতে কি সব রক্ষিত আছে—কিসের একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্চে চারিদিকে। বাড়িতে আমরা একেবারে ভেতরের উঠোনেই গিয়ে হাজির হয়েচি– পাঁড়েজী একাই থাকেন বলে মনে হল, বাড়িতে কোনো মেয়েমানুষ নেই। বাড়িটা কিসের একটা কারখানা। কিসের কারখানা ভালো বুঝতে পারছিলুম না সন্ধ্যার অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে।

বাড়ির মধ্যেকার উঠানে আরও অনেক বড় বড় হাঁড়ি-কলসী, সেগুলিতেও কি যেন বোঝাই রয়েচে। সেই এক ধরনের উৎকট গন্ধ। কিসের কারখানা এটা?

হঠাৎ আমার মনে হল বে-আইনি মদের চোলাইখানা নয় তো? কিন্তু মোহান্তজীর মতো সাধুপুরুষ কি এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে যোগ রাখবেন?

আমাকে চারিদিকে সন্দেহ ও বিস্ময়ের চোখে চাইতে দেখেই বোধহয় পাঁড়েজী (ওর নাম শ্রীরাম পাঁড়ে) বললে—কি দেখচেন বাবুজি?

আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম—না, ওই কলসীগুলোতে কি তাই দেখচি।

পাঁড়েজী হেসে বললে—কি বলুন তো?

—আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে—কিসের একটা গন্ধ বার হচ্চে—

—আচ্ছা, কাছে গিয়ে দেখুন না বাবুজি—

প্রত্যেক কলসীতে সাদা সাদা কি জিনিস, দুধের মতো। কিন্তু এত দুধ কি হবে এখানে, আর সন্ধ্যাবেলায় এত দুধ কলসীতেই বা কেন? দুধ কি রাত্রিবেলা খোলা উঠানের মধ্যে ফেলে রাখে?

মোহান্তজীও কৌতুকপূর্ণ হয়ে বললেন—কি বাবুজি, কি দেখলেন ?

পাঁড়েজী বললে—বাবু, ও-সব কলসীতে ঘোল বুঝতে পারলেন না ?

এত ঘোলের কলসী একত্র কখনো জীবনে দেখিনি। কি করে বুঝতে পারবো ? কিন্তু এত ঘোল এল কোথা থেকে ?

ওদের ঘরের দাওয়ায় আমাদের জন্যে জলচৌকি পেতে দিল শ্রীরাম পাঁড়ে। আমরা বসলুম—তারপর মোহান্তজীর মুখে ব্যাপারটা শোনা গেল, এটা মাখনের ও ঘিয়ের কারখানা।

দুধ অত্যন্ত সস্তা এসব অঞ্চলে, টাকায় ষোল সের পর্যন্ত বিক্রী হতে দেখেছি ; মহিষের দুধ বরং একটু চড়া দরে বিক্রী হয়, কারণ ঘি করবার জন্যে মহিষের দুধ গোয়ালারা কেনে, কিন্তু গোরুর দুধের দাম নেই এখানে—গোরুর দুধের মাখন ও ঘি করবার রেওয়াজ নেই এখানে।

শ্রীরাম পাঁড়ের বাড়ি ছাপরা জেলায়। সে এক মাখন-তোলা কল নিয়ে এসে এই মাঠেরই মধ্যে প্রথম একখানা চালাঘর তুলে বসে—সে আজ এগারো বছর পূর্বের কথা।

এই এগারো বছরের মধ্যে শ্রীরামের ব্যবসা এত বড় হয়ে উঠেচে যে ওকে মাঠের মধ্যে অনেকখানি জমি নিয়ে ঘিরে বড় বড় দুখানা আটচালা ঘর, আর ছোট ছোট চালাঘর অনেকগুলি করতে হল, মাখন-তোলা কল আরও দুটো এনেচে। তার ব্যবসা খুব জোর চলেচে।

আমার বড় ভালো লাগলো মোহান্তজীর এই গল্প। শ্রীরাম পাঁড়েকে আমি যেন নতুন চোখে দেখলুম। লোকটা খুব নিরীহ ধরনের, মুখে বেশি কথা বলে না—বোধহয় কথা বলে না বলেই কাজ বেশি করে।

—আপনার এখানে কত দুধ লাগে রোজ ?

—তার কিছু ঠিক নেই বাবুজি—পনেরো মণ দুধের মাখন সাধারণত হয়, তবে-একদিন হয়তো বিশ-বাইশ মণ দুধ এল। তিনটে কল হিমশিম খেয়ে যায়।

—কলসীতে অত ঘোল কিসের ? ওতে কি হবে ?

—রোজ পনেরো বিশ মণ দুধের ঘোল তো সোজা নয় বাবু। এত ঘোল সব আমি রেলে চালান দিই। পূর্ণিয়া অঞ্চলে ওর খুব বিক্রী। পড়তে পায় না বাবু।

—মাসে কত ঘি হয় তোমার কারখানায় ?

—আমি ঘি তত করিনি বাবু, মাখন চালানিতে লাভ বেশি। বেশি দুধ হলে খোয়া ক্ষীর করি। তবে চারমণ ঘি মাসে চালান দিই।

—কত লোক খাটে ?

দুধ সংগ্রহ করে আনবার জন্যে আট-দশ জন লোক রাখতে হয়েছে। ওরা রোজ ভোরে উঠে গ্রাম থেকে দুধ নিয়ে আসে। গোয়ালারা নিজেরাও দুধ দিয়ে যায়—সব দাদন দেওয়া আছে। তা ছাড়া কারখানায় আরও দশ বার জন লোক খাটে। ছাপরা জেলা থেকে এসে এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে লোকটা অত্যন্ত সামান্য মূলধন নিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করে এখন বেশ উন্নতি করে তুলেছে—ওর কথা থেকে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা গেল। আমি ভাবলুম আমার দেশের বেকার যুবকদের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বার হয়ে সামান্য

ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরি যোগাড় করতে পারলে আমরা জীবন ধন্য মনে করি—দুঃখের বিষয়, তাও জোটে না। আমাদের মধ্যে দেশবিদেশে গিয়ে নিজেকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার কল্পনাই জাগে না—তাই আমাদের দুঃখ।

শ্রীরাম পাঁড়ে রাত্রে আমায় থাকতে বললে। মোহান্তজীও বললেন—বাবুজি, আমার ওখানে থাকবার জায়গা নেই ভালো—সেইজন্যে এখানে আনলাম। মন্দিরে আপনাদের দরের অতিথি এলেই পাঁড়েজীর বাড়িতে রাখি। পাঁড়েজী বড় ভালো লোক। রাত্রে কোথায় যাবেন—এখানেই থাকুন।

আমারও এত ভালো লেগেছিল পাঁড়েজীকে, তখুনি রাজি হয়ে গেলাম। এর এই ব্যবসার কথা ভালো করে জেনে গিয়ে বাংলা দেশের বেকার যুবকদের যদি একটা পথ দেখিয়ে দিতে পারি, মন্দ কি?

রাত্রে আমার জন্যে উৎকৃষ্ট ঘিয়ে তৈরী পুরী আর হালুয়া, কি একটা তরকারি আর গরম দুধ এনে হাজির করলে পাঁড়েজীর রাঁধুনি ব্রাহ্মণ। সে ধরনের ঘিয়ে তৈরী খাবার বাংলা-দেশে আমি কখনো চোখেও দেখিনি, পশ্চিমেও নয়—কেবল আর দু-একটা জায়গা ছাড়া।

পাঁড়েজীকে বললুম—ভাগলপুরের বাজারেও তো এমন ঘি মেলে না। কি চমৎকার গন্ধ। ভয়সা ঘি কি এমন হয়? পাঁড়েজী হেসে বললে—কোথায় পাবেন বাবুজি? ঘি যা বাজারে আপনারা পান, তা হল পাইল করা, অর্থাৎ অন্য বাজে ঘি বা চর্বি মেশানো। ভেজাল ভিন্ন ঘি বাজারে নেই জানবেন, যে যত বিজ্ঞাপনই দিক। তবে কোনো ঘিয়ে কম, কোনো ঘিয়ে বেশি ভেজাল—এই যা তফাত। আর এ হল আমার কারখানায় সদ্য তৈরী খাঁটি ভঁয়সা। এ কোথায় পাবেন বাজারে?

মোহান্তজীও আমার সঙ্গে ভোজনে বসেছিলেন। দেখলুম যদিও তার বয়স হয়েচে—কিন্তু আমার মতো তিনটি লোকের উপযুক্ত পুরী, তরকারি ও হালুয়া অবাধে উদরসাৎ করলেন। মোহান্তজীকে আমার বড় ভালো লাগলো, এমন নিরীহ সজ্জন মানুষ খুব কম দেখা যায়।

এক এক জায়গায় এক এক ধরনের মানুষের ছাঁচ থাকে—অন্যত্র তা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, বাংলার বাইরে আমি নিছক নিরীহ, সরল ও ভালোমানুষ লোকের যে ছাঁচ দেখেচি, বাংলাদেশে তা দেখিনি।

হয়তো ঠিক ব্যাপারটা বোঝাতে পারচিনে—কিন্তু একথা খুব সত্যি, বাংলার অতি অজ পাড়াগাঁয়েও লোকের খানিকটা কুটিল বুদ্ধি, খানিকটা আত্মসম্মান-জ্ঞান, খানিক চালাক-চতুরতা আছে। এসব থাকলেই আর লোক নিছক সরল টাইপের হল না। তা মেয়েদের কথাই বা কি, আর পুরুষদের কথাই বা কি। এর কারণ বাঙালীর মধ্যে অতিনির্বোধ লোক নেই বললেই হয়—ওদের অনেকখানি জন্মগত শিক্ষা-দীক্ষা আছে—তাতে সংসারের অনেক ব্যাপারে ওদের অভিজ্ঞতা আপনা-আপনি হয়—রেলে বা স্টীমারে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াতের বেশি সুবিধে বাংলাদেশে। তা থেকেও লোকে অনেক বাইরের জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে।

বাংলাদেশে আমি খুব নিরীহ লোক ভেবে যার কাছে হয়তো গিয়েচি, দেখেচি সে আসলে অনেক কিছু জানে বা বোঝে—ফলে তার মনের নিছক সারল্য নষ্ট হয়ে গিয়েচে। কিন্তু বাংলার বাইরে আমি আশ্চর্য ধরনের সরল ও নিরীহ লোক দেখেচি—তাদের শিশুসুলভ সারল্য কতবার আমাকে মুগ্ধ করেচে। আমি আমার জীবনে এ-ধরনের সরল লোক খুঁজে বেড়িয়েচি—আমার আবাল্য ঝোঁক ছিল এদিকে, মানুষের টাইপ খুঁজে বার করবো। আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখেচি বিহার ও সি-পিতে, ছোট নাগপুরে এই সরল টাইপটা বেশ পাওয়া যায়। এখনও পাওয়া যায়। তবে আজকাল নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

মানুষের মনকে বর্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা একটি কলের ছাঁচে গড়চে। সব এক ছাঁচ, রামও যা ভাবে শ্যামও তাই ভাবে, যদু মধুও তাই ভাবে। যে আর একজনের মতো না ভাবে—তাকে লোকে মূর্খ বলে, অশিক্ষিতও বলে—সুতরাং সমাজের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, শ্বশুরবাড়িতে শালীশালাদের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে—লোকে অন্য রকম ভাবতে ভয় পায়। ফলে শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিক রীতিনীতিতে একই ছাঁচের মনের পরিচয় পাওয়া যায় সর্বত্র, অনেক খুঁজেও খাঁটি ওরিজিন্যাল টাইপ বার করা যায় না। শহরে তো যায়ই না, শহর থেকে সুদূরে, নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও বড় একটা দেখা যায় না। তবে বাংলার বাইরে, যেখানে ইউনিভারসিটি, খবরের কাগজ, রেডিও প্রভৃতির উৎপাত নেই, কিংবা শিক্ষিত লোকের যাতায়াত কম, এমন অরণ্য অঞ্চলে—নিকটে যেখানে রেলস্টেশন বা মোটর বাসের চলাচলের পথ নেই—সেখানে দু একটা অতি চমৎকার ছাঁচের মানুষ দেখেচি।

এদের আবিষ্কারের আনন্দ আমার কাছে একটা নতুন দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সমান। মোহান্তজী অনেকটা সেই ধরনের মানুষ।

তিনি রাত্রে মন্দিরে ফিরে যাবার আগে আমায় বিশেষ অনুরোধ করলেন আমি যেন আমার ভাগলপুরস্থ বন্ধুবান্ধবকে বলে তাঁর মন্দির মেরামতের ও মন্দিরের আয় বাড়াবার একটা ব্যবস্থা করে দিই। অনেকখানি সরল আশা-ভরসা তাঁর চোখে মুখে—বহু দূরকালের ছায়া তাঁর জীবনে এমন একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেচে—তা থেকে হুঁশিয়ার ও হিসাব-দুরন্ত বর্তমানে তিনি কোনোদিনই যেন পৌঁছতে পারবেন না, কোনোদিনই বুঝবেন না এর কুটিলতা, আর আত্মস্বার্থবোধ।

আমি বললুম—মোহান্তজী, আপনি চলে আসুন না ভাগলপুরে?

—আপনি যেতে বললেই যাবো, টাকা একসঙ্গে জড় হলে নিয়ে আসব গিয়ে।

তারপর আমায় একান্ত চুপিচুপি বললেন—এই পাঁড়েজী আমায় বড় সাহায্য করে—

—কি রকম?

—ভদ্রলোক এলে ওর এখানে রাখি, ও আমাকেও মাঝে মাঝে রাত্রে এখানে খাওয়ায়, বেশ খাওয়ায়—দেখলেন তো? ওর নিজের কারখানার ঘি মাখন—বাইরে কোথায় এমন পাবেন বলুন। রামচন্দ্রজী ওকে আরও দেবেন, বড় সাত্ত্বিক লোক।

যে নিজে সাত্ত্বিক সে সবাইকে এমনি সাত্ত্বিক ভাবে। আমরা নিজেরাও তত সাত্ত্বিক নই বলেই বোধ হয়, মানুষের খারাপ দিকটা আগে দেখে বসে থাকি।

শ্রীরাম পাঁড়ে সাত্ত্বিক কি না জানি না—কিন্তু সে বেশ ব্যবসা-বুদ্ধিওয়ালা লোক বটে। দুধ এখানে সস্তা, অথচ দুধ চালান দেবার সুবিধে নেই। একটা মাখন তোলা কল নিয়ে এই গ্রামকে কেন্দ্র করে বেশ একটা ঘি মাখনের ব্যবসা গড়ে তুলেচে। এর কারণ আমাদের মতো ওদের চাকুরি-প্রবৃত্তি নেই—চোখ ওদের অন্যদিকে বেশ খোলে—আমরা এসব দেখতে পাইনে। আমরা হলে খুঁজতাম দ্বারভাঙ্গার মহারাজের স্টেটে কোনো চাকুরি যোগাড় করা যায় কাকে ধরাধরি করলে।

পরদিন সকালে আমি ওদের দুজনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম। এর পরে আর একবার আমাকে বিশেষ কাজে ওদিকে গিয়ে শ্রীরাম পাঁড়ের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল, তখন সে আরও উন্নতি করেচে—লেখাপড়ার হিসেব ও চিঠিপত্র লেখবার জন্যে একজন গোমস্তা রেখেচে। মোহান্তজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল—মাত্র একটি দিনের জন্যে। তখন সামনে কুম্ভমেলার সময়, তিনি প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যাবার তোড়জোড় করছিলেন, পাঁড়েজীকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে বললেন। আমাকেও তিনি অনুরোধ করেছিলেন মেলায় যাবার জন্যে—অবিশ্যি আমার যাওয়া ঘটেনি। তাঁরা গিয়েছিলেন কিনা আমি জানি না—আর তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এ হল ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসের কুম্ভমেলা ; তারপর আর কুম্ভমেলা হয়নি এখনো পর্যন্ত।

১৩৩৭ সালের কথা। পূজার ছুটি সেইদিনই হল।

ভাগলপুরে বার লাইব্রেরিতে বসে কথাবার্তা চলচে বন্ধুদের সঙ্গে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়। আমি বললুম—পায়ে হেঁটে কোনোদিকে যদি যাওয়া যায়, আমি রাজি আছি।

প্রবীণ উকিল অবিনাশবাবু বললেন—হেঁটে যাওয়ার বেশ চমৎকার রাস্তা আছে, চলে যান না দেওঘর। সিনারী খুব ভালো।

আমি তখনি যেতে রাজি। একজন মাত্র উকিল-বন্ধু অম্বিকা আমার সঙ্গে যেতে চাইলে। পরদিন সকালে আমরা আমার থাকবার জায়গা থেকে রওনা হলুম খুব ভোরে। তিন-চারজন উৎসাহী বন্ধু ভাগলপুর শহর ছাড়িয়ে দেওঘরের পথে প্রথম মাইল-পোস্ট পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

অম্বিকা খুব সুস্থ সবল, দীর্ঘাকৃতি যুবক। সে ও আমি দুজনেই খুব জোরে হাঁটচি। সাত আটটা মাইল-পোস্ট পর্যন্ত বেশ জোরে চলে এলুম দুজনে। বেলা প্রায় দশটা বাজে।

ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের চওড়া সোজা রাস্তা। পথের দুধারে সবুজ ধান ক্ষেত, মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল বেধে আছে—তাতে কুমুদ ফুল ফুটে আছে—গাছের ছায়া সমস্ত পথেই।

আরও দু তিন মাইল ছাড়ালুম। দুজনেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পেয়েচে—সঙ্গে কোনো ব্যবস্থা নেই—হাঁটবার সুবিধে হবে বলে খালি হাতে পথ চলচি।

পথের ধারে মাঝে মাঝে দেহাতী গ্রাম—সেখানে বিশেষ কিছু খাবার পাওয়া যায় না আমরা জানি—সন্ধান করলে হয়তো চিঁড়ে পাওয়া যেতে পারে বড়জোর।

অম্বিকা বললে—চলো, আগে গিয়ে কোথাও রান্না করে খাওয়া যাবে—

—রান্না করবার জিনিসপত্র তো চাই—তাই বা কোথায় পাবো ?

—চলো যা হয় ব্যবস্থা হবেই।

ব্যবস্থার কোনো চিহ্ন নেই কোনো দিকে। সুদীর্ঘ সোজা পথ, গ্রাম দু-তিন মাইল অন্তর। পুরেনি বলে একটা গ্রাম রাস্তার ধারেই পড়লো—এখানে একটা ডাকঘর আছে, দু-চারখানা দোকান—কিন্তু দোকানের খাবার দেখে কিনতে প্রবৃত্তি হল না আমাদের।

পুরেনি ছাড়িয়ে মাইল-খানেক গিয়েচি, এক জায়গায় পথের ওপর অনেকগুলো কুলি খাটচে—খোয়া ভাঙচে। তাদের কাছে একখানা এক্কা দাঁড়িয়ে। একজন বিহারী ভদ্রলোক কুলিদের তদারক করচেন পায়চারি করতে করতে। আমাদের অদ্ভুত দেখেই বোধহয় তাঁর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। দুজনেরই পরনে খাকীর হাফ-প্যান্ট, গায়ে সাদা টুইলের হাতকাটা শার্ট, মাথায় সোলার টুপি, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উলের মোজা ও বুট জুতো। তার ওপর আবার দুজনেরই চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি।

এ ধরনে সেজেগুজে বিহারের অজ পল্লীপথে চললে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করে পারে না। পথে দেখে এসেচি প্রত্যেক বস্তির লোক আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখচে—পুরেনি বাজারে তো লোকে আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বলাবলি করেচে।

আর কিছু না হই, আমরা যে পুলিসের দারোগা এ ধারণা অনেকেরই হয়েচে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোক বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কোথায় যাবেন ?

ওঁর মুখে বাংলা শুনে আমরা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না। ওঁর চেহারা অবিকল দেহাতী বিহারী ভদ্রলোকের মতই। ভাগলপুর শহর থেকে বারো মাইল দূরে বাঙালীর সঙ্গে এ ধরনের সাক্ষাৎ বড় একটা আশাও করা যায় না।

—মশায় কি বাঙালী ?

—আজ্ঞে, আমার নাম রামচন্দ্র বসু—এই নিকটেই চেরো বলে গ্রাম আছে, ওখানেই আমার বাড়ি।

—এখানে বাড়ি করেচেন ? কতদিন হবে ?

—আমার বাস এখানে প্রায় পনেরো বছর হল—তার আগে আমরা কহলগাঁও থাকতাম। আপনারা কোথায় যাবেন ?

আমাদের গন্তব্যস্থানের কথা শুনে ভদ্রলোক ভাবলেন আমরা পদব্রজে বৈদ্যনাথ ধামে তীর্থ করতে যাচ্চি। বললেন, তা বেশ। আপনাদের বয়সে তো ওসব মানেই না। এসব দেখলেও আনন্দ হয়। তা এবেলা আমার এখানে আহার করে তবে যাবেন।

আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না এ প্রস্তাবে। বোধহয় একটু বেশি সহজেই রাজি হয়েছিলুম।

রামবাবুর বাড়ি গিয়ে, তাঁরা যে প্রবাসী বাঙালী, সেটা ভালো করেই বুঝলুম; ছেলে-মেয়েরা ভালো বাংলা বলতে পারে না, কিন্তু দেহাতী হিন্দী বলে বিহারীদের মতই। তাঁদের বাড়িতে যত্ন আদর আমরা পেলুম কতকালের আত্মীয়ের মতো, রাত্রে থাকবার জন্মে কত অনুরোধ করলেন। আমাদের থাকলে চলে না, যেতে হবে অনেক দূর—পায়ে হেঁটে যাবো বলে বেরিয়ে এত আরাম করবার ইচ্ছে ছিল না মোটেই।

একটা জিনিস তাঁদের বাড়ি খেয়েছিলুম, কখনো ভুলতে পারা যাবে না—করমচার অম্বল। রান্নার গুণে নয়, করমচার অম্বল জীবনে তার আগেও কখনো খাইনি, তারপরেও না, সেই জন্মে।

আমরা আবার যখন পথে উঠলুম, তখন বেলা আড়াইটের কম নয়। শীতের বেলা, ঘণ্টা-দুই হাঁটবার পরে রোদ একেবারে পড়ে গেল।

ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা সোজা তীরের মতো নাকের সামনে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েচে। দু-ধারে ধূ-ধূ করচে জনহীন প্রান্তর, ডাইনে অনেক দূরে মারফ পাহাড় নীল মেঘের মতো দেখা যায়। সূর্য ক্রমে পাহাড়ের পেছনে অস্ত গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে, তখনও রাস্তার দুধারে মাঠ আর মাঠ। অম্বিকা এদেশের লোক। তাকে বললুম—কোথায় থাকবো রাত্রে হে? গ্রামের চিহ্ন তো দেখচিনে—

অম্বিকাও কিছু জানে না। সে এদিকে কখনো আসেনি।

আরও কিছুদূর গিয়ে আমবাগানের আড়ালে একটা বস্তি দেখা গেল—কতকগুলো খোলার ঘর এক জায়গায় তাল পাকানো, এদেশের ধরনে। ঘোর অপরিষ্কার। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, বস্তির নাম রজাউন। একজন লোককে বলা গেল এখানে রাত্রে থাকবার কোথাও একটু স্থান হবে কি না; তারা বললে কাছারি-বাড়িতে দুখানা চারপাই আছে, বিদেশী লোক এলে কাছারি-বাড়িতে থাকে।

কাছারি-বাড়ির অবস্থা দেখে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। ঘোড়ার আস্তাবলও এর তুলনায় স্বর্গ। একটা ভাঙা খোলার ঘর, তার চাল পড়েচে ঝুলে, বাইরের দাওয়ায় দুখানা চারপায়া আছে বটে, কিন্তু তাতে শোওয়া চলে না। কাছারিঘরের মধ্যে এত জঞ্জাল যে সেখানে রাত্রিযাপনের চেষ্টা করলে সর্পাঘাত অবশ্যম্ভাবী। আমরা বললাম—আর কোথাও জায়গা নেই?

—না বাবু, নিজেদের তাই থাকবার জায়গা হয় না—গরিব লোকের বস্তি, আপনাদের জায়গা দেবে কোথায়?

পড়ে গেলুম বেজায় মুশকিলে। সন্ধ্যা হয়েচে, সপ্তমীর জ্যোৎস্না মাঠ-বাট আলো করেচে, নিকটে আর কোনো বস্তিও দেখা যায় না—এখন কি করি?

একজন আমাদের অবস্থা দেখে বললে—বাবু, আপনারা থানায় যান। বস্তির পশ্চিম

দিকে আধ মাইলের মধ্যে একটা বাগান দেখবেন, তার ওপারে থানা। সেখানে থাকবার জায়গা মিলতে পারে।

থানা খুঁজে বার করলুম। থানার দারোগা আরা জেলার লোক, মুসলমান। তাঁর আতিথ্য আমরা কখনো ভুলবো না। আমরা তাঁকে বললুম, আমরা কিছু খাবো না, শুধু একটু আশ্রয় চাই।

তিনি বললেন, তা কখনো হয় না। আমার হেড-কনস্টেবল ব্রাহ্মণ, তাকে দিয়ে রান্না করাবো, আপনাদের কোনো আপত্তির কারণ নেই।

আমরা বললাম—সেজন্যে নয়, আপনার বাসা থেকে রেঁধে পাঠালেও আমাদের কোনো আপত্তি হবে না জানবেন। ভদ্রলোক শুনলেন না। হেড কনস্টেবলকে দিয়ে পুরী-তরকারি আর হালুয়া তৈরি করিয়ে দিলেন—নিজের বাসা থেকে সেরখানেক জ্বাল দেওয়া দুধ পাঠিয়ে দিলেন।

আহারাদির পরে আমাদের জন্যে বিছানা আনিয়ে দিলেন বাসা থেকে। আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্প করলেন—তারপর আমাদের বিশ্রাম করতে বলে বাসায় গেলেন।

আমরা খুব ভোরে উঠে রওনা হবো বলে রাত্রেই তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রেখেছিলুম। সূর্য ওঠবার আগেই পথে বেরিয়ে পড়লুম।

মাইল আট-নয় দূরে বাঁকা—ভাগলপুরের একটা মহকুমা। এক জায়গায় দুটো রাস্তার মোড়, কেউ বলে দেওয়ার লোক নেই কোন্ রাস্তা বাঁকায় গিয়েচে। আমরা আন্দাজ করে নিয়ে অনেকখানি পথ চলে এসেচি, তখন একজন পথিকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেস করলুম ঠিক পথে চলেচি কি না। সে বললে, বড্ড ঘুর-পথে যাচ্চেন বাবুজি, এই মাঠের মধ্যে দিয়ে যান, শীগগির পৌছোবেন।

তার কথা শুনে মাঠের রাস্তায় নেবে আমরা আরও ভুল করলাম। পথ ভীষণ খারাপ, চষা-মাটির ওপর দিয়ে আল ডিঙিয়ে, খানা-ডোবা পার হয়ে মাইল তিনেক এসে আমার দুই পায়ে ফোস্কা পড়লো, আমি আর হাঁটতে পারি নে—অথচ এদিকে দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর সামনে, একটা গোটা টাউন তো দূরের কথা, একখানা খোলার ঘরও নেই মাঠের কোনো দিকে।

আমি বললুম—আর হাঁটতে পারচিনে অম্বিকা—

অম্বিকা ভরসা দিলে, আর একটু পরেই আমরা বাঁকা পৌছে যাবো এবং সেখানে ওর এক উকিল-বন্ধুর বাড়ি আশ্রয় নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরও দু-ঘণ্টা হাঁটবার পরে আমি একটা গাছতলায় বসে পড়লুম। আমার চলবার শক্তি লুপ্ত হয়েচে। আমিই হেঁটে দেশ বিদেশ বেড়াবার বড় উৎসাহ দেখিয়েছিলুম, আমার প্ররোচনাতেই অম্বিকা আমার সঙ্গে হেঁটে বেড়াবার জন্যে বার হয়েচে; এখন দেখা গেল আমি একেবারে হাঁটতে পারিনে, মুখে যত বলি কাজে তার কিছুই করবার সাধ্য নেই আমার।

অম্বিকা পড়ে গেল বিপদে।

সে এখন আমায় নিয়ে কি করে? বেলা প্রায় একটা বাজে। আমায় সে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারে না বাঁকা পর্যন্ত, অথচ সত্যিই পা ওঠাবার শক্তিটুকুও নেই আমার।

আমি বললুম—অম্বিকা, বাঁকা থেকে একখানা গাড়ি নিয়ে এস গিয়ে, আমি এখানেই থাকি।

অম্বিকা যেতে রাজি নয়। আমায় এ অবস্থায় ফেলে সে কোথাও যাবে না। তার চেয়ে আমি বসে বিশ্রাম করি, যদি এর পরে আমি হাঁটতে পারি—সে আমার সঙ্গে এখানেই থাকবে।

বেলা আড়াইটের সময় আমি কিছু সুস্থ হয়ে পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অম্বিকা ঘড়ি দেখে বললে, বেলা ঠিক আড়াইটে—এক ঘণ্টার মধ্যে বাঁকা পৌঁছে যাবো।

আরও দেড় ঘণ্টা চলে গেল, বাঁকার চিহ্ন নেই কোনো দিকে।

আমি বললুম—শর্টকাট্ করতে গিয়ে এই বিপদটি বাধলো। সোজা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে গেলে কোন্ কালে বাঁকা পৌঁছে যেতুম।

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে, তখন আমরা বাঁকা পৌঁছে গেলুম। সেখানে জিজ্ঞেস করে জানা গেল মাঠের মধ্যে আমরা ভুল পথ ধরেছিলুম, তাই আমাদের এত বিলম্ব। যে ভদ্রলোকের বাড়ি আমরা গিয়ে উঠলুম, তাঁরাও বাঙালী কিন্তু অনেকদিন বিহারে বাস করবার ফলে একেবারে বিহারী হয়ে গিয়েচেন। ছেলেমেয়েরা এখন ভালো বাংলা বলতে পারে না। তাঁদের আদর-যত্ন মনে রাখবার জিনিস বটে। রাত্রে আমাদের জন্মে তারা পুরী-তরকারি করে দিলেন, আহারান্তে শয্যা আশ্রয় করে মনে হল তিন দিনের মধ্যে আমি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না।

অম্বিকাকে বললুম—দেওঘর যাওয়া এখানেই ইতি। আমি এক্কা করে কাল সকালে মান্দার হিল যাবো, সেখান থেকে ট্রেনে ভাগলপুর। পায়ে হেঁটে বেড়ানোর শখ আমার মিটেচে।

অম্বিকা আমায় নানারকমে বোঝাবার চেষ্টা করে। এখন ভাগলপুর ফিরলে লোকে কি বলবে, কত জাঁক করে বেরুনো হয়েচে ভাগলপুর থেকে, তুমিই সকলের চেয়ে জোরগলায় চেঁচিয়েছিলে যে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ সব ভ্রমণের সেরা। তোমার এই শোচনীয় পরাভবে—ইত্যাদি।

আমি নাছোড়বান্দা। শরীরের সামর্থ্যে না যদি কুলোয়, আমি কি করবো!

আমার এক পা হাঁটবার ক্ষমতা নেই আর। বন্ধুর বকুনি শেষ হবার পূর্বেই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। কিন্তু ভোরে উঠে দেখি যে আমার পায়ের ব্যথা অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে সেরে গিয়েচে। এদিকে আমার বন্ধু চা পান শেষ করে বললেন—তাহলে একখানা এক্কা ডাকি, এইবেলা মান্দার হিলে রওনা হওয়া যাক।

আমি বললুম, আর মান্দার হিলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, হাঁটতে পারবো এখন, চলো রওনা হই।

দুজনে আবার পথে উঠলুম।

সবে সূর্যোদয় হচ্চে—ডানদিকে কাঁকোয়ারা স্টেটের অনুচ্চ শৈলশ্রেণী, মাঝে মাঝে শালবন। প্রভাতে মুক্ত বায়ুতে জীবনের জয়গান ঘোষণা করচে। পথের নেশায় মন প্রাণ উত্তেজিত হয়ে উঠেচে—কোথায় মান্দার হিল আর কোথায় ভাগলপুর। প্রায় ছ মাইল পথ হাঁটবার পরে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী পার হতে হল। উপলরাশির উপর দিয়ে ঝির ঝির করে নির্ম্মল জলের ধারা বয়ে চলেচে। নদীর দু পাড়ে ছোট ছোট কি ঝোপে সুন্দর ফুল ফুটেচে।

নদী পার হয়ে আরও মাইল-পাঁচেক পথ হেঁটে এসেচি; একজন বিহারী ভদ্রলোক আমাদের পাশ দিয়ে টমটম চড়ে যেতে যেতে আমাদের দেখে গাড়ি থামালেন।

আমার বন্ধুকে নমস্কার করে হিন্দীতে বললেন—আপনি কোথা চলেচেন এ ভাবে?

অম্বিকা বললে—বেশ ভালো আছেন নদীয়াচাঁদবাবু? নমস্কার। দেওঘর চলেচি—

—পায়ে হেঁটে? মান্দার হিল থেকে?

—সোজা ভাগলপুর থেকে। কাল বাঁকাতে রাত কাটিয়েচি—ইনি আমার বন্ধু অমুক—ইনিও যাচ্চেন—

ভদ্রলোক টমটম থেকে নেমে পড়লেন। আমাদের দুজনকে বিশেষ অনুরোধ করলেন তাঁর টমটমে উঠতে। আমার বন্ধু ও আমি দুজনেই বিনীতভাবে বললুম, যখন হেঁটে চলেচি, শেষ পর্যন্ত হেঁটেই যাবো। কেউ দেখচে না বলে এখানে খানিকটা গাড়িতে উঠে শেষে ভাগলপুরে ফিরে পায়ে হেঁটে যাওয়ার বাহাদুরি নেওয়া আমাদের ধাতে সইবে না।

তিনি বললেন—তীর্থ করতে যাচ্চেন নাকি?

আমরা তাঁকে আশ্বস্ত করলুম। পুণ্য অর্জনের লোভ নেই আমাদের। যাচ্চি এমনিই—পথ।

তিনি বললেন—খাওয়া-দাওয়া করবেন এবেলা আমার ওখানে। জামদহ ডাকবাংলোতে আমি কাছারি করবো এবেলা। আমি আগে চলে যাই, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের পথের ধারেই পড়বে জামদহ বাংলো। সেখানে আপনাদের পৌঁছতে আরও ঘণ্টা-দুই লাগবে। আমি লোক দাঁড় করিয়ে রাখবো।

ভদ্রলোক টমটমে উঠে গেলেন।

অম্বিকা বললে—উনি বাবু নদীয়াচাঁদ সহায়। লছমীপুর স্টেটের ম্যানেজার। বড় ভালো লোক। আমার সঙ্গে খুব আলাপ আছে। ভালোই হল, দুপুর ঘুরে গেলে আমরা জামদহ পৌঁছবো, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে এখন।

বেলা প্রায় বারোটার সময়ে আমরা দূর থেকে একটা শালবন দেখতে পেলুম পথের ধারেই। অম্বিকা বললে, ওর মধ্যেই জামদহ ডাকবাংলো—নদীয়াচাঁদবাবু বলেছিলেন। আমাদের জন্যে পথের ওপর লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাদের বাংলোতে নিয়ে গেল।

নদীয়াচাঁদবাবু অনেক প্রজা নিয়ে কাছারি করচেন। আমাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করলেন। বনের মধ্যে একটা ইঁদারা, তার চারিদিকে সিমেণ্ট বাঁধানো—আমরা সেখানে স্নান করে ভারি তৃপ্তি পেলুম।

আহারাদির পরে নদীয়াবাবু বললেন—এখানে এই বনের মধ্যে আমায় তিন দিন থাকতে হবে। আপনারা যখন এসেচেন, তখন একটা রাত অন্তত আমার এখানে কাটিয়ে যান। আজ আর আপনাদের কিছুতেই ছাড়চিনে।

আমাদের কোনো আপত্তি তিনি শুনলেন না। লোকটি বিশেষ ভদ্র ও শিক্ষিত, তাঁর অনুরোধ এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

শালবনের নিস্তব্ধতার মধ্যে কি সুন্দর বৈকাল আর জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো! মন একেবারে মুক্ত, পথের নেশায় মাতাল, কতদূর এসে পড়েচি পরিচিতের সীমা ছাড়িয়ে—এমন একটি সুন্দর রাত্রি জীবনে আর হয়তো না-ও মিলতে পারে। নদীয়াবাবু আমাদের কাছে বসে বসে গল্পগুজব করলেন অনেকক্ষণ। কথায় কথায় বললেন—আপনারা যদি এসেচেন এ পথে, তবে লছমীপুর দেখে যান একবার। চমৎকার দৃশ্য ওখানকার। আপনারা খুশী হবেন।

—এখান থেকে কতটা হবে?

—প্রায় সাত মাইল—তবে পাকা সড়ক ছেড়ে অন্য রাস্তায় যেতে হবে—জঙ্গল পড়বে খুব।

রাত্রে শুনে আমি বন্ধুকে বললুম—জেলাবোর্ডের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলো আমরা আগে লছমীপুর দেখে আসি।

বন্ধু আপত্তি করলে। সে শুনেচে লছমীপুর ছাড়িয়েই দশ-বারো মাইল জঙ্গল, সে পথে হেঁটে যাওয়া বড় বিপজ্জনক, আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।

আমি তার কাছে আরাকান ইয়োমার জঙ্গলের কথা বললুম। তার চেয়ে বেশি জঙ্গল আর কি হবে। লছমীপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা ভাগলপুরে থাকতে অনেকের মুখে শুনেচি। এতদূর যখন এসেচি, লছমীপুর দেখে যাওয়াই ভালো।

অনেক রাত পর্যন্ত কথা-কাটাকাটির পরে অম্বিকাকে রাজি করানো গেল। পরদিন খুব ভোরে উঠে আমরা নদীয়াচাঁদবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে লছমীপুর রওনা হবার জন্যে বাঁ-দিকের বনপথ ধরলুম।

তখন সবে সূর্য উঠেচে। সত্যিই পথটির দৃশ্য চমৎকার। এই প্রথম রাঙা মাটি চোখে পড়লো—উঁচুনীচু জমি, শাল ও পলাশ গাছের সারি, মাঝে মাঝে দু একটা বট গাছ। নানা জায়গায় বেড়িয়ে আমার মনে হয়েচে, বট গাছ যত বেশি বনে, মাঠে, পাহাড়ের ওপর অযত্নসম্ভূত অবস্থায় দেখা যায়, অশ্বত্থ তেমন নয়। বাংলার বাইরে, বিশেষ করে এই সব বন্য অঞ্চলে, অশ্বত্থ তো আদৌ দেখেচি বলে মনে হয় না—অথচ কত বন-প্রান্তরে, কত পাহাড়ের মাথায়, সঙ্গিহীন সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ ও তার মাথায় সাদা সাদা বকের পাল যে দেখেচি, তাদের সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ হবে না।

দক্ষিণ-ভাগলপুরের এই অঞ্চলের জমি গঙ্গা ও কুশীর পলিমাটিতে গড়া উত্তর-ভাগলপুরের

জমি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদিকের ভূমির প্রকৃতি ও উদ্ভিদ্-সমাবেশ সাঁওতাল পরগনার মতো, তেমনি কাঁকরভরা, রাঙা, বন্ধুর—শুধু শাল ও মউল বনে ভরা, ঠিক যেন দেওঘর মধুপুর কি গিরিডি অঞ্চলে আছি বলে মনে হয়। বেলা প্রায় নটার সময় দূর থেকে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখা গেল—কিন্তু চূড়োটা যেন পথের সমতলে অবস্থিত। অম্বিকা বল্লে—ওই লছমীপুর। আমি জানি রাজবাড়ির কালীমন্দির খুব বড়, ওটা তারই চূড়ো।

কিন্তু মন্দিরের চূড়ো পথের সমতলে কি করে থাকে, আমরা দুজনে প্রথমটা বুঝতে পারিনি—বুঝলুম যখন আমরা লছমীপুরের আরও নিকটে পৌঁছেচি।

লছমীপুর একটা নিম্ন উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত, চারিদিক থেকে পথগুলো ঝরনার মতো নীচের দিকে নেমে পড়েচে উপত্যকার মধ্যে। আমাদের পথ ক্রমশ নীচে নামচে, দুপারের শাল বন আরও নিবিড় হয়ে উঠেচে, অথচ কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়ে না—কেবল সেই মন্দিরের চূড়োটা আরও বড় ও স্পষ্ট দেখাচ্চে।

একটা জায়গায় এসে হঠাৎ নীচের দিকে চাইতেই অনেক ঘরবাড়ি একসঙ্গে চোখে পড়ল।

সত্যিই ভারি সুন্দর দৃশ্য।

বনজঙ্গলে ভরা একটা খুব নাবাল জায়গায় এই ক্ষুদ্র গ্রামটির ঘরবাড়ি যেন ছবির মতো সাজানো। গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা সেকেলে ধরনের পুরোনো ইঁটের বাড়ি ও সেই মন্দিরটা।

অম্বিকা বললে—ওই রাজবাড়ি নিশ্চয়।

নদীয়াচাঁদবাবু স্থানীয় কোনো এক কর্মচারীর নামে একখানা পত্র দিয়েছিলেন আমাদের সম্বন্ধে, যার বলে আমরা রাজবাড়ির অতিথিশালায় স্থান পেলুম। অতিথিশালাটি বেশ বড়, খোলার ছাদওয়ালা চারপাঁচটি কামরাযুক্ত বাড়ি। দড়ির চারপাই ছাড়া ঘরগুলিতে অন্য কোনো আসবাব নেই।

এখানে একটি অদ্ভুত বেশভূষাধারী যুবককে দেখে আমরা দুজনেই কৌতূহলী হয়ে পড়লুম তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। যুবকটির বয়স ত্রিশের মধ্যে, রং মিশ্‌কালো, মাথায় লম্বা লম্বা বাবরি চুলে কেয়ারি করে টেরি কাটা, গায়ে সাদা ফুলদার আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় রঙীন রুমাল বাঁধা—আর সকলের চেয়ে যা আমাদের চোখে বিস্ময়কর ঠেকলো, তা হচ্চে এই যে, এই দিন-দুপুরে লোকটার পকেটে একটা পাঁচ ব্যাটারির প্রকাণ্ড টর্চ। বাঙালী নয় যে, তা বুঝতে এতটুকু দেরি হয় না।

অম্বিকা বললে—লোকটাকে কিসের মতো দেখাচ্চে বলো তো? ঠিক যেন যাত্রাদলের বড় কেষ্টঠাকুর; মাথার চাঁচর চিকুর, মায় বাঁশিটা পর্যন্ত হুবহু—না?

—ডেকে নাম জিজ্ঞেস কর না?

কিছু পরেই আমরা অতিথিশালার ম্যানেজারের কাছে যুবকটির পরিচয় পেলুম। সে রাজার শ্যালক, এখানেই সামান্য কিছু কাজ করে রাজ-স্টেটে, বেশ আমুদে লোক—আর নাকি খুব ভালো নাচতে জানে।

আমরা যুবকটির সঙ্গে আলাপ করলুম। আমাদের খুব ভালো লাগলো লোকটিকে। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানে না, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান যে, তা কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমি বললুম—আপনার পৈতৃক দেশ কোথায় ?

—রাজখার্সাওন—বি এন আর এ—তবে এখানেই আছি আজ দশ বছর।

—এই বনের মধ্যে বেশ ভালো লাগে আপনার ?

—খুব শিকার মেলে কিনা! আপনারা থেকে যান, ভালুক শিকার করতে যাবো।

—ভালুক খুব আছে নাকি ?

—এই যে বন দেখচেন, ভালুক আর সম্বর হরিণ এত আছে যে অনেক সময় দিনমানেও লছমীপুর গ্রামের মধ্যে ছটকে এসে পড়ে। আপনারা পায়ে হেঁটে যাবেন না বনের মধ্যে দিয়ে—বড় বিপজ্জনক। আমি ঘোড়া দিচ্চি দুজনকে, সঙ্গে শিকারী গাইড দেবো, তবে যাবেন।

আমরা বলুম, হেঁটে যখন যাবো ঠিক করেচি, তখন ঘোড়ায় চড়বো না, সেটা ঠিকও হবে না।

যুবকটি ভেবে বললে—তীর্থ করতে যাবেন বলে কি আর একটু ঘোড়ায় চড়তে নেই ? বন কতখানি আপনারা জানেন না—বড় দেরি হয়ে যাবে বন পার হতে, যদি পায়ে হেঁটে যান।

—কত বড় বন আপনার মনে হয় ?

—দশ বারো মাইল খুব হবে, লছমীপুরের জঙ্গল দক্ষিণ ভাগলপুরের বিখ্যাত জঙ্গল। ঘোড়ায় যদি না যান, তবে একজন গাইড সঙ্গে নিয়ে যান।

যুবক উঠে চলে গেলে আমরা দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলুম, সঙ্গে লোক নেওয়ারও কোনো দরকার নেই। ওতে আমাদের বাহাদুরি অনেকখানি কমে যাবে।

অতিথিশালার ম্যানেজার বললেন—আপনাদের খাবার-দাবার সব তৈরি। যদি বেরুতেই হয়—তবে আপনারা আর বেশি দেরি করবেন না—কারণ জঙ্গল পার হতে খুব সময় নেবে।

আহারাদির পর অম্বিকা বললে—একবার রাণীমার সঙ্গে দেখা না করে যাবো না হে। একবার আলাপ করে রাখি, পরে কাজ দেবে। তুমিও চল না—আলাপ করা যাক। দরকার অন্য কিছু নয়, উকিল মানুষ, এত বড় স্টেটের কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ রাখলে স্টেটের মামলা মোকদ্দমাগুলো পাবার দিক থেকে অনেক সুবিধে।

লছমীপুর গাড়োয়ালী স্টেট। বার্ষিক আয় খুব বেশি না হলেও নিতান্ত মন্দ নয়। অম্বিকা বলেছিল দু-লাখ টাকা; অত যদিও না হয়, লাখখানেকের কম নয় নিশ্চয়ই। বন থেকেই এদের আয় বেশি। বনের খানিকটা অংশ লাক্ষা-ব্যবসায়ীদের ইজারা দেওয়া হয়, তা বাদে কাঠ ও সম্বর হরিণের শিং আর ছাল বিক্রী করেও যথেষ্ট আয় হয়।

আমরা কালীবাড়ি দেখতে গেলুম। একটি বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ এখানকার পূজারী,

পুত্র-পরিবার নিয়ে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর লছমীপুরে বাস করচেন। তাঁর বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিবিসনে, এখনও তাঁর জ্ঞাতিবর্গ সেখানেই আছে, পৈতৃক বাড়িও আছে, তবে সেখানে এঁদের যাতায়াত নেই বহুকাল থেকে।

আমরা বললুম—এখানে আর কোনো বাঙালী আছেন ?

—পূর্বে দুজন বাঙালী ছিলেন স্টেটের কাছারিতে, এখন আর নেই।

—আপনার কোনো অসুবিধা হয় না থাকতে ?

—এখন আর হয় না, আগে আগে খুবই হত। কি করি বলুন, পেটের দায়ে সবই করতে হয়। এখানে বছরে চার-পাঁচ শো টাকা পাই—বাড়িভাড়া লাগে না, কিছু জমি-জায়গীরও দেওয়া আছে স্টেট থেকে। মরে গেলে বড় ছেলেটাকে বসিয়ে দিয়ে যাবো। ওকে সংস্কৃত পড়তে পাঠিয়েচি নবদ্বীপে ওর মামার বাড়িতে এক মস্ত অসুবিধে মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এখান থেকে হয় না।

—সময় কাটান কি করে এখানে ?

—নিজের কাজ করি, একটা টোল খুলেচি, ছাত্র পড়াই। পাঁচ ছ-জন ছাত্র আছে—
—তার জন্যে স্টেট থেকে বৃত্তি পাই।

অম্বিকার কাছে ইতিমধ্যে রাজবাড়ি থেকে খবর এল, রাণীমা এইবার পূজা সেরে উঠেচেন, এখন দেখা হতে পারে।

অম্বিকা দেখা করতে গেল এবং আধঘণ্টার মধ্যেই বেশ হাসিমুখে ফিরে এল। বললে—রাণীমা বড় ভালো লোক, উনি আমাকে স্টেটের কাজ দিতে চেয়েচেন। খুব খাতির করেচেন আমায়।

—এইবার চলো বেরিয়ে পড়া যাক। বেলা দুটো বাজে, অত বড় বন পার হতে হবে তো।

—আমি জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যাবার কথা বলছিলুম—

—নিশ্চয়ই তুমি বনের কথায় ভয় পেয়ে গিয়েচ—না ?

—রাণীমা বলছিলেন বনে অনেক রকম বিপদ আছে। তবে তুমি না ছাড়ো, অগত্যা বনের পথেই যেতে হয়।

লছমীপুর ছেড়ে আমরা খানিকটা চড়াই পথে উঠেই হঠাৎ একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লুম। জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, প্রধানত কেঁদ, শাল ও পিয়াল গাছ বেশি বনের গাছের মধ্যে। ঝোপ জিনিসটা বিহারে কোথাও দেখিনি এই জঙ্গল ছাড়া।

শরতের শেষ, অনেক রকম বনের ফুল ফুটে আছে, অধিকাংশই অজানা—বাংলা দেশের পরিচিত বনফুল একটাও চোখে পড়লো না কেবল শিউলি ফুল ছাড়া। দু একটা ছাতিম গাছও দেখা গেল, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

বনের মধ্যে পায়ে চলার একটা পথ কিছুদূর পর্যন্ত পাওয়া গেল। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে পথটা তিনটি পথে ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে যাওয়াতে আমরা প্রমাদ গনলাম। সঙ্গে গাইড নেওয়া যে কেন উচিত ছিল, তখন খুব ভালো বুঝলাম। আমাদের চারিধারে শুধু

গাছপালা আর বনঝোপ—শুধু বনস্পতির দল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—আমাদের মাথার ওপর বনগাছের ফাঁকে ফাঁকে শরতের নীল আকাশ। কোনো লোকালয় নেই, একটা লোক নেই যে তাকে জিজ্ঞেস করি পথের কথা।

মনে একটা অদ্ভুত আনন্দ এল হঠাৎ কোথা থেকে।

ঘরে বসে সে আনন্দ কোনোদিন কখনো পাওয়া যায় না। অম্বিকাও দেখলুম পথের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেচে। ও বললে—চলো চোখ বুজে যে পথে হয়, না হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত বনের মধ্যে ঘুরবো, রাত হয় গাছের ওপরে উঠে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

আন্দাজ করে একটা পথ বেছে নিয়ে তাই ধরে চললাম। ক্রমশ বন নিবিড়তর হয়ে উঠেচে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, যে কোনো মুহূর্তে আমরা ভালুক কি বাঘের সামনে পড়তে পারি। এ বনে সে ব্যাপারটা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

অম্বিকা বললে—এসো একটা রাত বনের মধ্যেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

আমারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দুজনে সামনের দিকে এগিয়েই চলেচি, দুজনেরই ঝোঁক বন পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় পড়বার দিকে। বনের মধ্যে কোনো গাছ এমন নেই যার ফল খাওয়া যায়, একমাত্র আমলকি ছাড়া। সেকালের মুনি-ঋষিরা শোনা যায় বনের মধ্যে কুটির নির্মাণ করে নাকি বনের ফল খেয়ে জীবনধারণ করতেন। কথাটার মধ্যে কতদূর সত্যতা আছে জানি না। আমি অনেক স্থানের বন ঘুরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেচি, তাতে আমার মনে হয়েচে মানুষের খাদ্যোপযোগী ফলের গাছ পার্বত্য অরণ্যে কচিৎ দেখা যায়—তাও আম, কলা, বেল, আনারস, লিচু প্রভৃতি ভালো জাতীয় ফল নয়—হয় আমলকি, কেঁদ প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ফল, বড়জোর বুনো রামকলা, বিচি বোঝাই ও মানুষের অখাদ্য। মানুষের খাদ্যোপযোগী বহুপ্রকার ফলবৃক্ষের একত্র সমাবেশ মানুষের হাতে তৈরী ফলের বাগান ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না।

আমি সিংভূম ও উড়িষ্যার অরণ্যাঞ্চলে দেখেচি শুধু শাল, অর্জুন, বন্য আমলকি, কেঁদ, পলাশ ও আসান গাছ ছাড়া অন্য কোনো প্রকার গাছ মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে কোথাও নেই—একমাত্র আমলকি ও কেঁদ ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোনো গাছে মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত ফল ফলে না—হিমালয়ের ও আসামের আরণ্য প্রদেশেও খাদ্যোপযোগী ফলবৃক্ষ বেশি নেই। উড়িষ্যার কোনো কোনো বনে বন্য বিল্ববৃক্ষ দেখা যায় বটে—কিন্তু তার ফলের ভেতরটা আঠা ও বিচিতে ভর্তি, স্বাদ কষা ও ঈষৎ তিক্ত, মানুষের পক্ষে অখাদ্য।

বিশেষ করে আমার বলবার বিষয় এই, সাঁওতাল পরগণা, দক্ষিণ বিহার, সিংভূম ও মধ্য-প্রদেশের আরণ্য প্রদেশ মানুষের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর—এখানে বিচিত্র বন্য পুষ্প নেই, খাওয়ার উপযুক্ত বিশেষ কোনো ফল নেই। মুনি-ঋষিরা আর যে কোনো বনেই বাস করুন, এই সব স্থানের বনে নিশ্চয়ই বাস করতেন না—করলে অনাহারে মারা পড়তেন। অন্য কোনো দেশের অরণ্যে প্রকৃতি মানুষের জন্যে ফলের বাগান সাজিয়ে যদি রেখেই থাকেন—তবে তার সন্ধান আমার জানা নেই।

ফলের কথা বাদ দিয়ে এবার বন্য ফুলের কথা বলি।

বন্য পুষ্পের বিচিত্র শোভার কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু সব অঞ্চলের সব অরণ্যের বেলায় সে কথা খাটে না। সাধারণত ধরে নিতে হবে সুখাদ্য ফলের ন্যায় নয়নানন্দদায়ক পুষ্পের দর্শনও মানুষের তৈরী উদ্যানেই মেলে—প্রকৃতি-রচিত আরণ্য অঞ্চল মানুষের সুখ-সুবিধার দিক থেকে দেখতে গেলে বড় কৃপণ।

অতএব যে কোনো বড় অরণ্যে ঢুকলেই যে বন-পুষ্পের শোভায় মন মুগ্ধ করবে এ যিনি ভাবেন, তিনি অরণ্য দেখে নিরাশ হবেন।

বনের ফুল ফোটে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে, তাও দু এক রকম মাত্র ফুল সেই সেই ঋতুতে দেখা যায়—নানা ধরনের ফুল একসঙ্গে কখনোই দেখা যায় না। সে দেখা যায় মানুষের হাতের ফুলের বাগানে। যিনি বহুবিধ রঙীন পুষ্পের বিচিত্র সমাবেশ দেখতে ভালোবাসেন, তাঁকে যেতে হবে আলিপুরের হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যানে; অন্তত আমি এমন কোনো অরণ্য দেখিনি, যেখানকার বিচিত্র বন্যপুষ্পশোভা তাঁকে অতটা আনন্দ দিতে পারবে।

বসন্তে দেখেছি সিংভূম ও উড়িষ্যার অরণ্যে গোলগোলি ফুলের বড় শোভা। কিন্তু সব বনে এ গাছ দেখা যায় না, কোনো বনে আছে, কোনো বনে আদৌ নেই। এই গাছ দেখতে ঠিক একটি পত্রহীন আমড়া গাছের মতো, কিন্তু কখনোই খুব বড় হয় না। বসন্তে পাতা ঝরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফোটে, ফুলগুলির আকৃতি ও বর্ণ অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মতো। বনের সবুজ পাতার মধ্যে এখানে-ওখানে এক একটা শুভ্রকাণ্ড, নিষ্পত্র, আঁকাবাঁকা গোলগোলি গাছ হলদে ফুলে ভরা দাঁড়িয়ে আছে—এ দৃশ্য যিনি একবার দেখেছেন, তিনি কখনো ভুলবেন না। এ ছবি আরও অপূর্ব হয়, যদি কাছে বড় বড় অনাবৃত শিলাখণ্ড থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ হুকার তাঁর প্রসিদ্ধ 'হিমালয় জার্নাল' নামক গ্রন্থে গোলগোলি ফুলের সৌন্দর্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছেন—তাঁর বইএ নিজের হাতে আঁকা ছবিও আছে এই ফুলের।

বসন্তে আরও দু এক প্রকারের ফুল দেখেছি এই অঞ্চলের বনে, যেমন লোহাজাঙ্গি ও ঝাঁটি ফুল। এদের ফুল হয় অনেকটা চামেলি ফুলের মতো—তবে গন্ধহীন। পলাশ সর্বত্র নেই—যেখানে আছে, যেমন পালামৌ ও রাঁচি অঞ্চলের প্রান্তরে ও বনে, সেখানে রক্ত-পলাশের শোভা বড় অদ্ভুত হয়। কিন্তু প্রান্তর ছাড়া পার্বত্য অরণ্যে পলাশ গাছের ভিড় বড় একটা থাকে না। শাল ফুলের সুগন্ধ আছে—কিন্তু দেখতে বিশেষ কিছু নয়। মহুয়া ফুলের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

কোনো কোনো বনে বর্ষা ঋতুতে কুরচি ফুল যথেষ্ট দেখা যায়—বিশেষ করে সিংভূম অঞ্চলে।

শিমুল ফুল বনের মধ্যে ফুটে গাছ আলো করে থাকলে যে কি শোভা হয়, যাঁরা বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের শৈলবনের স্টেশনঘেরা উভয়পার্শ্ববর্তী আরণ্য অঞ্চলে বসন্তে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন। দুঃখের বিষয় সিংভূমের মাত্র এই স্থানটুকু ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা শিমুল গাছ বনে দেখা যায় না। সাধারণত শিমুল গাছের স্থান বনে নয়, মানুষের

পল্লীতে কিংবা পল্লীর আশপাশের মাঠে। তাই বলছিলুম বন-প্রকৃতি মানুষের সুখ-সুবিধার বড়ই উদাসীন।

মুচুকুন্দ কলকাতার রাস্তার দুধারে যথেষ্ট দেখা যায়, বাংলার পাড়াগাঁয়েও আছে, কিন্তু কোনো বনে কখনো এ গাছ দেখিনি।

বাকি রইল বন্য শেফালি ও সপ্তপর্ণ। বন্য শেফালি অজস্র দেখা যায় নাগপুর অঞ্চলে পার্বত্য অরণ্যে। সিংভূমেও আছে, তবে অত বেশি নয়। সপ্তপর্ণ দক্ষিণ বিহারের বনপ্রদেশে যথেষ্ট আছে—অন্য কোথাও একদম নেই। উড়িষ্যা ও সিংভূমের অরণ্যে সারাদিন খুঁজে বেড়ালেও একটা বন্য সপ্তপর্ণ চোখে পড়বে না—কিন্তু পড়বে যেখানে মানুষের বাসস্থান। কেবলমাত্র বাংলা দেশেই দেখা যায় পল্লীগ্রামের আশেপাশের বনে অযত্নসম্ভূত বহু সপ্তপর্ণ বৃক্ষ হেমন্তের প্রারম্ভে মধুর পুষ্প-সুবাসে পথিকের মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

রক্তকরবীর বন দেখেচি চন্দ্রনাথে, কিন্তু সে গেল বাংলা দেশের মধ্যে। খুব বাহারে ও রঙীন কোনো ফুল সাধারণত রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যে দেখাই যায় না, যদিও থাকলে খুব ভালো হত।

একসময়ে আমরা দূর থেকে কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেলুম। মেঘের মধ্যে নীল-রঙের তিনটি চূড়া, কেঁদ আর শালবনের ফাঁকে অনেক দূরের আকাশের পটে যেন আঁকা রয়েচে। অম্বিকা ও আমি ঠিক করে নিলুম ঐ নিশ্চয়ই ত্রিকূট। অম্বিকা বললে—ও পাহাড় কিন্তু অনেক দূরে।

—মেঘের মধ্যে বলে চোখে ধাঁধা লেগে অমনি হচ্চে। মেঘ সরে গেলে অত দূর বলে মনে হবে না।

বন একেবারে নিবিড়। শুকনো পাতার রাশি গাছতলায় এত জড় হয়েছে যে পায়ে দলে যাবার সময় একটা একটানা মচ মচ শব্দ বহুক্ষণ ধরে শুনচি।

এদিকে বেলা বেশ পড়ে এসেচে, রোদ রাঙা হয়ে বড় বড় কেঁদ গাছের মগডালে লেগেচে। এ জঙ্গলটাতে আবার বন্য বাঁশ, খয়ের ও বহেড়া গাছ খুব বেশি। সন্ধ্যা তো হয়ে এল, যদি জঙ্গল শেষ না হয় তবে কি করা যাবে সে বিষয়ে আমরা আগে থেকে পরামর্শ করলুম।

অম্বিকা বললে, গাছে উঠে রাত কাটানো যাবে, সেই যে-কথা আগে বলেছিলুম।

—তা যদি উঠতে হয় তবে সন্ধ্যার আগেই আশ্রয় নিতে হবে সেখানে, অন্ধকার হলে এ বনে আর এক পা-ও চলা উচিত হবে না।

অম্বিকারও তাই মত। লছমীপুরের জঙ্গলে ভালুক ও বাঘ যথেষ্ট আছে, ভাগলপুরে থাকতে শুনে এসেচি। বন্দুক ও উপযুক্ত গাইড না নিয়ে বনের মধ্যে যাওয়াই উচিত নয়, একথা আমাদের সবাই বলেছিলেন—এমন কি রাণী-সাহেবা পর্যন্ত। আমরা কারো কথা না শুনে যখন এসেচি, তখন এর আনুষঙ্গিক বিপদের জন্যেও আমাদের তৈরী থাকতে হবে বৈকি।

সন্ধ্যা হবার আগে দেখা গেল পথটা উৎরাইয়ের দিকে নামচে। আমরা অনেক দূরে নেমে এলুম, ক্রমশ একটা পাহাড়ী ঝরনা আমাদের পথের ওপর কুলুকুলু রবে চলেচে রাশি রাশি

নুড়ির বাধা অগ্রাহ্য করে। ঝরনা পার হয়ে আবার একটা চড়াইয়ের পথ, খয়ের ও বহেড়ার জঙ্গলও পূর্ববৎ নিবিড়। সম্বর হরিণ নাকি এই জঙ্গলে খুব বেশি, তারা মানুষ দেখলে তেড়ে এসে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে দেয়। এ পর্যন্ত দু-একটা খেঁকশিয়াল ছাড়া অন্য কোন জানোয়ারের টিকি দেখা যায়নি যদিও; এবার কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার সাবধান হয়ে চলাই দরকার।

চড়াইএর জঙ্গলে অনেকটা চলে এলুম। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভালো ভাবেই নামলো, আমরা কি করবো ভাবচি এমন সময়ে একটা কি অদ্ভুত ধরনের শব্দ আমাদের কানে গেল দূর থেকে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলুম। বাঘ বা ওই ধরনের কিছু?

অল্পক্ষণ পরেই বনের নিবিড় অন্তরাল থেকে বার হয়ে এল একটা সাদা কাপড়ের ডুলি। দুজন ডুলি বইচে, পেছনে জন-তিনেক লোক, ওদের সকলের হাতেই লাঠি ও বর্শা।

আমরা ওদের দেখে যতখানি অবাক, ওরাও আমাদের দেখে তার চেয়ে কম অবাক নয়।

আমরা বললুম, কোথায় যাবে তোমরা?

আমাদের প্যাণ্ট-কোট পরা, হ্যাট-মাথায় মূর্তি দেখে ওরা বেশ ভয় খেয়ে গিয়েচে বোঝা গেল। বিনীতভাবে তারা বললে, তারা লছমীপুরে যাবে।

—ডুলির মধ্যে কি?

—একটি মেয়ে আছে বাবুজী—

অম্বিকা উকিল মানুষ, সে এগিয়ে গিয়ে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, কোথাকার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত, আমরা জানতে চাই। কোথা থেকে আনচো?

একটি নিরীহ গোছের দেহাতী লোক এগিয়ে এসে আমাদের আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বললে, গরিব পরওয়ার, আমার আউরৎ আমার বাড়ি থেকে লছমীপুরে ওর বাপের বাড়ি যাচ্চে, আমি ওর স্বামী, নাম বিঠল ভকৎ হুজুর।

আমরা তো অবাক। বিঠল ভকৎ তার স্ত্রীকে নিয়ে এই প্রকাণ্ড বনের মধ্যে দিয়ে রাত্রি-কালে শ্বশুরবাড়ি চলেচে!

আমরা বললুম, বন আর কতটা আছে?

বিঠল ভকৎ বললে, আর এক ক্রোশ, কিন্তু ডানদিক ঘেঁষে যান। বাঁদিকের পথে চললে এখনও দু তিন ক্রোশ বন পাবেন।

—কোনো ভয়-ভীত্ আছে এ বনে?

—জানোয়ার আছে বৈকি। ভালুকের ভয় এই সময়টা খুব।

—তোমাদের খুব সাহস তো! এই রাত্রিকালে বনের মধ্যে দিয়ে বউ নিয়ে যাচ্চ!

—আমাদের এই জঙ্গলের দেশেই বাড়ি বাবুসাহেব, ভয় করলে চলে না। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে।

ওরা চলে গেল। আমাদের সাহস বিঠল ভকৎ অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল সন্দেহ নেই। আমরা দুজনেই তখন এগিয়ে চলেচি ডানদিক ঘেঁষে। জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোছায়ার জাল ক্রমশ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিস্তব্ধ বিজন অরণ্যানী আমাদের চারিদিকে বিস্তৃত, নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কতদূর এসে পড়েচি, কোথায় যেন চলেচি—এ কথা ভাবতে আমার এত আনন্দ হচ্ছিল, নৈশ পাখীর আওয়াজ—আর বনের মধ্যে কোথাও বনশিউলি ফুটেচে, তার গন্ধ সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়েচে। মাঝে মাঝে গন্ধটা খুব ঘন, এক এক জায়গায় বড় পাতলা হয়ে যায়, এক এক জায়গায় থাকেই না—কিন্তু একেবারে কল্পনোই যায় না।

বন ক্রমশ কমে আসচে বোঝা গেল। আর আধঘণ্টা জোর হাঁটবার পরে বন ছাড়িয়ে আমরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে পড়লাম। কিন্তু কোনোদিকে একটা বস্তি নেই। মাঠে শুধু শাল আর মউল গাছ দূরে দূরে, জ্যোৎস্নার আলোতে এই দীর্ঘ অজানা প্রান্তর যেন আমাদের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস্ তৃণভূমি—আকাশের নেশা, পথহীন পথের নেশা, অজানার উদ্দেশে ক্লান্তিহীন যাত্রার নেশা।

অথচ কতটুকুই বা যাবো! আমরা উত্তরমেরু আবিষ্কার করতে যাইনি, যাচ্ছি তো ভাগলপুর থেকে দেওঘর, বড়জোর একশো পঁচিশ কি ত্রিশ মাইল। কিংবা হয়তো তারও কম!

আসল কথা, মনের আনন্দই মানুষের জীবনের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় মাপকাঠি। আমি দশ মাইল গিয়ে যে আনন্দ পেলুম, তুমি যদি হাজার মাইল গিয়ে সেই আনন্দ পেয়ে থাকো তবে তুমি-আমি দুজনেই সমান। দশ মাইলে আর হাজার মাইলে পার্থক্য নেই।

তবে ঘরকে একেবারে মন থেকে তাড়াতে হয়। ঘর মনে থাকলে পথ ধরা দেয় না। ঘর দুদিনের বন্ধন, পথ চিরকালের।

জয়পুর ডাক-বাংলোয় পৌঁছে গেলুম আরও প্রায় একঘণ্টা হেঁটে। এখানে চৌকিদারকে ডেকে বললুম—বাপু, রঘুনাথ পাটোয়ারী কোথায় থাকে, তার হাতে এই চিঠিখানা দিয়ে এসো তো।

চিঠিখানা লছমীপুরের দেওয়ান দিয়েছিলেন পাটোয়ারীর কাছে আমাদের সম্বন্ধে। চৌকিদার চলে যাওয়ার কিছু পরেই দেখি চার-পাঁচজন লাঠি-হাতে লোক সঙ্গে করে জনৈক পাগড়িবাঁধা, মেরজাইআঁটা বৃদ্ধ এদিকেই আসচে। কাছে এসে লোকটি একটা লম্বা সেলাম দিয়ে সামনে দাঁড়ালো। তারই নাম রঘুনাথ, বাবুরা স্বচ্ছন্দে থাকুন ডাকবাংলোয়, সে এখুনি খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। বিশেষ করে ডাকবাংলোতে রাত্রে পাহারার জন্য লোক এনেচে সঙ্গে।

—পাহারার লোক কেন?

—বাবুসাহেব, এই ডাকবাংলো জঙ্গলের ধারে মাঠের মধ্যে। লোকজন নেই কাছে—এখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়। এক মাড়োয়ারী শেঠ এখানে ছিল সে-বছর, তাকে মেরে-ধরে টাকাকড়ি নিয়ে যায়। জায়গা ভালো না।

—আমাদের সে ভয় নেই পাটোয়ারীজী—সঙ্গে কিছু নেই যে নেবে। তবে লোক থাকে

রেখে দাও। আর খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা ক'রো না—কেবল একটু চা যদি হত—

সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি এখুনি। আপনারা স্টেটের অতিথি—খাবেন না তা কি কখনো হয়। দেওয়ানজী লিখেচেন আপনাদের আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। আর টাকাকড়ির কথা বলচেন, এ জংলী দেশে চার আনা পয়সার জন্তে অনেক সময় মানুষ খুন হয়। পাহারা রাখতেই হবে।

রাত্রে পুরী ও হালুয়ার ব্যবস্থা করে দিলে রঘুনাথ পাটোয়ারী। একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, এমন চমৎকার ভঁয়সা ঘি আর কখনো দেখিনি কোথাও—লছমীপুর আর এই জয়পুর ডাকবাংলো ছাড়া। কলকাতার বাজারে আমরা যে জিনিস ভঁয়সা ঘি বলে কিনে থাকি, তা আর যাই হোক, খাঁটি ভঁয়সা ঘি যে নয়, তা বেশ ভালো ভাবেই বুঝলাম। এই রকম ঘি আর দেখেছিলুম বৈকুণ্ঠ পাঁড়ের বাড়িতে। পাটোয়ারীজীকে ডেকে বললুম—পুরী কি ঘিয়ে ভাজা?

—কেন বাবুসাহেব, ভঁয়সা ঘিয়ে।

—একটু নিয়ে এসে দেখাতে পারো?

একটা বাটিতে খানিকটা ঘি ওরা আমাদের কাছে নিয়ে এল—তার রং কলকাতার বাজারের ঘিয়ের মতো সাদা নয়—কটা, মাছের ডিমের মতো দানাদার। সুগন্ধে ঠিক গাওয়া-ঘির মতো—বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই।

পাটোয়ারী বললে—বাবুসাহেব, দেহাত থেকে মাড়োয়ারীরা এই ঘি নিয়ে গিয়ে পাইল করে, মানে চর্বি আর অন্য বাজে তেলের সঙ্গে কিংবা খারাপ ঘিয়ের সঙ্গে মেশায়—তারপর টিন-বন্দী করে বাজারে ছাড়ে। শহর বাজারে সেই জিনিস ভঁয়সা ঘি বলে চলে। খাঁটি ভঁয়সা ঘি কোথা থেকে আপনারা বাজারে পাবেন?

রাত্রে সুনিদ্রা হল, শরীর দুজনেরই ছিল খুব ক্লান্ত। একবার মাঝরাত্রে উঠে বাংলোর বাইরে এসে চেয়ে দেখলুম—দূরে লছমীপুরের জঙ্গলের সীমারেখা আলো-আঁধারে অদ্ভুত দেখাচ্চে। আকাশে বৃহস্পতি ও শনি এক সরলরেখায় অবস্থিত; জলজল করচে বৃহস্পতি, তার নীচে কিছু দূরেই শনি মিটমিট করচে। বিশাল মাঠের সর্বত্র বড় বড় শাল ও মহুয়া ছড়িয়ে আছে দূরে দূরে। অল্পদূরেই ত্রিকূটের দুটি শৃঙ্গ আধো-অন্ধকারে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কি একটা রাত-জাগা পাখী প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে কুস্বরে ডাকচে। ডাকবাংলোর বারান্দায় রঘুনাথ পাটোয়ারীর দরওয়ান তিনটি নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্চে। বনপ্রান্তরে যেন কি একটা অব্যক্ত রহস্য থম্ থম্ করচে—যা মনেই শুধু অনুভব করা যায়—কিন্তু মুখে কখনো প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পরদিন সকালে উঠে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পথে উঠলুম এসে।

দুপুর পর্যন্ত হেঁটে মহিষারডি বলে একটা গ্রামে এক আহীর গোয়ালার বাড়ি একটু জল চাইলুম।

গ্রামখানি ছোট—প্রায় সবই গোয়ালা অধিবাসী গ্রামে। বাড়ির মালিক বললে—কোথা থেকে আসচেন আপনারা?

—ভাগলপুর থেকে।

—কিসে?

—পায়ে হেঁটে, বৈদ্যনাথজী যাচ্ছি।

কথাটা শুনে শ্রদ্ধায় লোকটা অভিভূত হয়ে পড়লো। আমাদের বিশেষ অনুরোধ করলে আমরা যেন সে-বেলা তার আতিথ্য স্বীকার করি। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওবেলা রওনা হলে রাত আটটার মধ্যে আমরা ত্রিকূটের পাদদেশে মোহনপুর ডাকবাংলোয় পৌছে সেখানে রাত কাটাতে পারি।

আমাদের রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। অত রৌদ্রে ক্লান্ত শরীর নিয়ে পথ হাঁটা চলবে না এবেলা।

লোকটির নাম হরবংশ গোপ।

সে বাড়ির সবাইকে ডেকে এনে আমাদের দেখিয়ে বললে—দেখ, কলিকালে ধর্ম নেই কে বলে? বাবুজিরা ভাগলপুর থেকে পাঁওদলে আসচেন বৈদ্যনাথজীর মাথায় জল চড়াতে। অথচ বাবুরা ইংরিজি বিদ্যের জাহাজ—মস্ত বড় এলেমদার লোক। দেখে শেখ্।

আমরা দুজনেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লুম—এ প্রশংসা আমাদের প্রাপ্য নয়। তীর্থ করতে আমরা যাচ্ছিনে এই সওয়া-শো মাইল হেঁটে—এই সরল পল্লীবাসীরা সে কথা বুঝবে না। পুণ্যের আকর্ষণ ভিন্ন আর কিসের আকর্ষণে আমাদের এতখানি পথ টেনে এনেচে, তা এদের বোঝাতে গেলে আমাদের উন্মাদ ঠাওরাবে। অতএব ভক্ত তীর্থযাত্রী সেজে থাকায় জটিলতা নেই ভেবে আমরাও ওদের কথার প্রতিবাদ করে ওদের ভুল ভাঙাবার আগ্রহ দেখালাম না।

ওরা তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে আমরা কি খাবো।

আমরা বললুম—যা হয় খেতে পারি। তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমাদের খাওয়া না হলেও চলবে।

হরবংশ গোপ সে কথা শুনলে না। চাল ডাল বার করে দিলে—আমরা রেঁধে খাবো। ওইখানে পড়ে গেলুম মুশকিলে। পথে বার হয়ে এ পর্যন্ত রান্না করে খেতে হয়নি একদিনও। আমরা ওজর-আপত্তি করলুম—ওরা ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাইয়ে জাত মারতে রাজি নয়।

মহিষারডি গ্রামখানার অবস্থান স্থান বড় চমৎকার। বামে কিছুদূরে ত্রিকূট শৈল; ডাইনে খানিকটা নাবাল জমি, তাতে শুধু বড় বড় পাথর ছড়ানো আর চারা শালের বন—দূরে একটা বড় বনের শীর্ষদেশ দেখা যায়—খুব ফাঁকা জায়গাটা।

তা ছাড়া অনেক আকর্ষণ আছে। এ ধরনের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে ঐশ্বর্যবান গ্রাম রেল-স্টেশনের কাছে থাকলে নিশ্চয়ই সেখানে কলকাতার লোকে বাড়ি না করে ছাড়তো না। গ্রামের যেদিকটা নাবাল জমি, তার বুড় ঢালুতে চারা শালের বনে খুব বড় তিন চারখানা শিলাখণ্ড ঠিক যেন হাতীর মতো উঁচু ও বড়। অন্তত দুখানা এমন শিলার ওপরে দুটি অর্জুন গাছের চারা ঠিক একেবারে পাথর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ও দুটোতে যথেষ্ট ছায়াদান করচে। বেশ ওঠা যায় পাথরে—সকালে, বিকালে, রাত্রে ত্রিকূট শৈল ও পেছনদিকের মুক্ত প্রান্তরের দিকে

চোখ রেখে অনেকক্ষণ বসে আপনমনে কাটানো যায়, বই পড়া যায়—বড় সুন্দর নিভৃত শিলাসন। আশেপাশে নিকটে দূরে অনেকগুলো পলাশবৃক্ষ।

রাঙা সিঁদুরের মতো মাটি, কাঁকরের ডাঙা, ছবির মতো একটি ঝরনা ত্রিকূট থেকে বেরিয়ে গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেচে সেই নাবাল জমিটার পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে।

ছবিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যেই যেন গ্রামের মধ্যে কয়েকঝাড় কাঁটা-বাঁশ রাঙা-মাটির ডাঙার ওপর সাজানো।

অম্বিকাকে বললুম—চেয়ে দেখ গ্রামখানার রূপ! এখানটা বাস করার উপযুক্ত স্থান। আমার যদি কখনো সুবিধে হয়, ঠিক এই মহিষারডি গ্রামে এসে বাস করবো।

অম্বিকাও বললে—সত্যি, এটা একটা বিউটি স্পট। যদি এত দূর আর এমন বেখাপ্পা জায়গায় না হত—আমিও এখানে বাস করতুম।

আমি ভেবে দেখলুম, রেল থেকে এই দূরত্বই (অন্তত বত্রিশ মাইল) ওকে আরও সৌন্দর্য দান করেচে। রেলস্টেশনের কাছে হলে এ গ্রাম যেন সাধারণের উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়তো—এ এখন রূপসী, সরলা বন্যবালা—শুভ্র ও অপাপবিদ্ধ। এই দিশাহীন রাঙামাটির মুক্ত প্রান্তর, অদূরের ওই শৈলচূড়া, হাতীর মতো বড় বড় পাথরের আসনগুলো—নাবাল জমিটার ও ঝরনাটার সৌন্দর্য এ গ্রামকে অদ্ভুত শ্রী দান করেচে—অথচ এখানে কলকাতার কোনো লোক এখনও বাড়ি করেনি—কোনদিন করবেও না—এ গ্রাম এমনি জনবিরল, নিস্তব্ধ ও শান্ত বনপ্রান্তরের মধ্যে চিরদিন নিজের সৌন্দর্য অটুট রেখে চলবে—একথা ভেবেও মনে আনন্দ পেলুম।

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা গুপ্ত-বাসনা অবিশ্যিই থাকে—যদি কখনো সুবিধে হয় তবে এখানে বাড়ি করবো।

—জমির এখানে কি দাম হরবংশ?

—জমির দাম? কি করবেন বাবুসাহেব?

—ধরো যদি বাস করি?

হরবংশ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—বাস করুন না, জমি কিনতে হবে না বাবুজি। ওই মোড়ের ধারে ভালো জমি আমার নিজের আছে—আপনাকে দিচ্চি। আসুন না! যেখানে আপনাদের পছন্দ হবে গাঁয়ের মধ্যে জমি নিন। পনেরো কুড়ি টাকা বিঘে দরে জমি বিক্রী হয়। ওই রাঙা মাটির বড় ডাঙাটা নিন না! বাসের পক্ষে চমৎকার জায়গা। ওটা বাইশ বিঘের ডাঙা—আমি গ্রামের প্রধানকে বলে সস্তায় করে দেবো। দশটাকা বিঘে দরে ডাঙাটা আমি আপনাকে করে দিতে পারি। পড়েই তো রয়েচে আমার জন্ম থেকে। দশটাকা বিঘে পেলে বর্তে যাবে।

মহিষারডি থেকে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম।

যাবার সময় বার বার মনে করলুম, যদি কখনো সুবিধে হয়, আর একবার এই সুন্দর গ্রামখানিতে ফিরে আসবো। অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত সে কল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি—কিন্তু

মাঝে মাঝে প্রায়ই মনে হয় গ্রামখানির কথা। গত বৎসর বড়দিনের পরে কার্যোপলক্ষে একবার দেওঘর যেতে হয়েছিল, কতবার ভেবেছিলুম লছমীপুরের পথে গিয়ে একবার মহিষারডি গ্রামে হরবংশ গোপের সঙ্গে দেখা করে আসি, আবার ওদের রাঙামাটির সেই হাতীর মতো বড় পাথরখানার ওপর বসে আসি।

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা সব সময় পূর্ণ হয় কই!

মোহনপুর ডাকবাংলোয় আমরা পৌছে গেলাম বেলা দশটার মধ্যে। এই স্থানটিও খুব সুন্দর—ত্রিকূট-শৈলের পাদদেশে ডাকবাংলোটি অবস্থিত, দেওঘর থেকে বাউসি দিয়ে যে রাস্তা গেছে, তারই ধারে।

আমরা সেখানে বেশিক্ষণ ছিলাম না। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে বেলা দুটোর সময় সেখান থেকে রওনা হবো ঠিক করেচি, কিন্তু অম্বিকা বললে—এতদূর এসে একবার ত্রিকূট পাহাড়ে ওঠা দরকার। পাহাড়ে না উঠে যাবো না।

দুজনে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলুম।

প্রথম অনেকদূর পর্যন্ত কাঁটা-বাঁশের বন। পাহাড়ে উঠবার পথ বেশ ভালো, বড় বড় পাথরের পাশ বেয়ে ঝরনার জল গড়িয়ে আসচে—কিছুদূর উঠে জন-দুই সাধুর সঙ্গে দেখা হল।

একজন বললেন—বাবুজিরা কোত্থেকে আসচেন?

—ভাগলপুর থেকে, পায়ে হেঁটে দেওঘর যাবো।

—আপনাদের ধর্মে মতি আছে; একালে এমন দেখা যায় না।

সাধু বাবাজিদের কাছে মিথ্যে ভক্ত সেজে কি করব, আমরা খুলেই বললুম সব কথা। আমাদের আসল উদ্দেশ্য পায়ে হেঁটে দেওঘর আসা, বৈদ্যনাথজীদর্শন নয়, যদিও মন্দিরে নিশ্চয়ই যাবো এবং দেবদর্শনও করবো।

ওঁরা আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দিলেন, হালুয়া ও দুটি কলা।

আমরা কিছু প্রণামী দিয়ে সেখান থেকে নেমে এলুম।

বেলা পড়ে এল পথেই—দেওঘর পৌছুতে প্রায় রাত আটটা বাজলো।

১৯৩২ সালে আমার একটি বন্ধু মধ্যপ্রদেশের রেওয়া স্টেটের দারকেশা বলে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রাম থেকে আমায় চিঠি লিখলেন, সেখানে একবার যাবার অনুরোধ করে। তাঁর চিঠিতে স্থানটির অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা পড়ে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। মধ্য প্রদেশের ঘন বন ও পাহাড়ের মধ্যে গ্রামখানি অবস্থিত। তিনি সেখানে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করেন, ইদানীং কাঠের ব্যবসাও আরম্ভ করেছিলেন, দুতিনটি ভালো ঘোড়াও কিনেচেন, অনেক কুলি ও লোকজন তাঁর হাতে, বনে বেড়াতে ইচ্ছা করলে তিনি সেদিকে যথেষ্ট সুবিধে করে দেবেন লিখেচেন।

আমি কখনও মধ্যপ্রদেশে যাইনি তার আগে, বেঙ্গল নাগপুর রেলের গাড়ি চড়ে এমন কি কোনোদিন রামরাজাতলাতেও যাইনি। তিনি লিখলেন, বিলাসপুর থেকে যে লাইন কাটনি

গিয়েচে, তারই ধারে কার্গিরোড বলে একটি ছোট স্টেশন আছে, সেখান থেকে বত্রিশ মাইল ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে তাঁর ওখানে পৌঁছুতে। তিনি স্টেশনে ঘোড়া ও লোক রেখে দেবেন আমার চিঠি পেলে।

আমার সেই বন্ধুটির ছোট ভাই কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। তার সঙ্গে গিয়ে একদিন দেখা করলাম। সে-ও আমায় খুব উৎসাহ দিলে। সে ছুটিতে একবার সেখানে গিয়েছিল, চমৎকার জায়গা, গ্রামের ধারেই বিশাল বনভূমি, হরিণের দল চরে বেড়ায়, ময়ূর তো যথেষ্ট, গ্রামের গাছপালার ডালে বনময়ূর এসে বসে—ইত্যাদি।

আমি বললুম—কোন্ সময় যাওয়া ভালো? এখন তো বর্ষাকাল।

—পূজোর সময় রাস্তাঘাট ভালো হয়ে যায়, পাহাড়ী ঝরনার জল শুকিয়ে যায়—সেই সময়েই যান।

ঠিক হল সে-ও পূজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু মাস-দুই পরে যখন পূজোর অবকাশ এসে পড়লো—সে বললে, তাকে একবার তাদের গ্রামে যেতে হবে, এখন সে যেতে পারবে না।

আমি তাকে বললুম—তোমার দাদাকে চিঠি লিখে দাও আমি ষষ্ঠীর দিন কলকাতা থেকে রওনা হবো, তিনি যেন সব বন্দোবস্ত রাখেন।

সে বললে—ঘোড়া চড়তে পারেন তো? বত্রিশ মাইল ঘোড়ার ওপর যেতে হবে। রাস্তাও খুব ভালো না। উঁচুনীচু পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম, ঘোড়ায় চড়া আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে। ওর চেয়ে বেশি পথও আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েচি। দিন ঠিক করে দুজনেই দুখানা পত্র দিলাম তার দাদার কাছে।

নির্দিষ্ট দিনে জিনিসপত্র নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বম্বে মেলে রওনা হলাম। সেবার সারা বর্ষাকাল ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে দিন-পনেরো কুড়ি আকাশ বেশ নির্মল হয়ে রৌদ্র ফুটেছিল। যাবার সময় দেখলুম রেলের দুধারে যথেষ্ট ধান হয়েচে, ফসল খুব ভালো হবে। বৈকালের ছায়ায় বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল ধানক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কোলাঘাটে পৌঁছে গেলুম। রূপনারায়ণের পুল যখন পার হই, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেচে। বম্বে মেল ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গিধনি, ঘাটশিলা, গালুড়ি পার হয়ে গেল।

রাত হয়েচে বেশ।—আমার মুশকিল হয়েচে খড়্গপুর জংশনে খাবার কিনিনি, ভেবেছিলুম তখনও তত রাত হয়নি—আগের কোনো স্টেশনে কিনবো এখন। বি এন আর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না—এ লাইনে যে ভালো খাবার পাওয়া যায় না, তখন তা জানতুম না। অপকৃষ্ট ঘি-এ ভাজা পুরী ও কুশ্রী তরকারি দেখে খাবার প্রবৃত্তি কমে গেল।

টাটানগরে গাড়ি প্রায় আসে, এক সহযাত্রী ভদ্রলোক পাশ থেকে আমায় বললেন—মশাই, যদি কিছু মনে না করেন—আমার বাড়ির খাবার সঙ্গে আছে, আপনাকে কিছু দিতে পারি?

তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দু-চারটি কথাবার্তা হয়েচে। ভদ্রলোক ডাক্তার, রায়পুর

যাচ্ছেন তাঁর কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়ি—এইটুকু মাত্র তাঁর পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন কথাবার্তার মধ্যে।

ভদ্রলোক দেখি খাবার বার করে দুভাগে ভাগ করচেন।

আমি বিনীত ভাবে তাঁকে বললুম, আমার ক্ষিদে নেই, কিছু খাবো না। শরীর ভালো নয়।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কেন, কি হয়েছে আপনার?

—না, বিশেষ কিছু হয়নি। খাবার ইচ্ছে নেই।

লোকটি অদ্ভুত ধরনের। কতকালের পরিচিতের মতো তিনি আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—বাঃ খাবেন না বললেই হল? এত খাবার দিয়েচে বাড়ি থেকে, আমি কি একলা খাবো, না খেতে পারি? আপনি তো কিছুই খাননি, সারারাত কাটাবেন কি করে? আর এ লাইনে ভালো খাবার পাবেন না যে কিনে খাবেন এরপর খিদে পেলে। ওকথা শুনবো না—খান, খান, আসুন—বলেই তিনি আমার সামনে খাবারের এক ভাগ এগিয়ে দিলেন।

আমি এমন ধরনের মানুষ কখনো দেখিনি, মানুষকে এত অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মীয় ও অন্তরঙ্গদের মতো ভাবতে পারে যে লোক, তার অনুরোধ উপেক্ষা করা বড় সহজ কথা নয়।

অগত্যা খেতে হল।

ভদ্রলোক নিজে খান, আমার পাত্রের দিকে চেয়ে বলেন—বেশ তরকারিটা, না? আমার মা, বুঝলেন না?

আমি সম্ভ্রমের ভাব মুখে এনে বলি—ও!

—বাহাত্তরের ওপর বয়স।

—বলেন কি?

—নিশ্চয়ই। বাহাত্তরের ওপর বয়স।

এর উত্তরে কি বলা উচিত ঠিক বুঝতে পারিনে। খুব খানিকটা বিস্ময় ও সম্ভ্রমের ভাব মুখের ওপর এনে ফেলার চেষ্টা করি—যদিও একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার বয়স বাহাত্তর হওয়ার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার কিছুই নেই।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে সগর্বে বললেন—মা এখনও সংসারের যাবতীয় রান্না সব নিজের হাতে করে থাকেন। এই যা খাচ্ছেন, সব তাঁর নিজের হাতের।

আমি এবার আর নিরুত্তর রইলুম না, উত্তর দেওয়ার পথ খুঁজে পেয়েচি। বললুম—তাই বলুন। এ রকম রান্না কি কখনো একালের মেয়ের হাতে···খেয়েই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এমন রান্না তো অনেকদিন খাইনি—এ না জানি কার হাতের!

ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে বললেন—পারবে কেউ আজকালের মেয়ে? বলুন!

—আরে রামোঃ! একালের মেয়ে—হুঃ—

আমি অবজ্ঞাসূচক হাসি টেনে আনি মুখে।

মনের গোপন তলায় একটা প্রশ্ন বার বার উঁকি মারছিল—ভদ্রলোক অবিবাহিত না বিপত্নীক ? কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই, এমন নয় তো ?

—আর দুখানা পুরী নিন—না না, লজ্জা করবেন না মশাই, লজ্জা করলে ঠকবেন রাত্রে। সেই বিলাসপুরে ভোর, তার আগে কিছু মিলবে না ভালো খাবার—

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল দুজনেরই। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব মাতৃভক্ত, তাঁর মাতৃদেবীর গুণকীর্তন শুনতে হল অনেকক্ষণ বসে। শোবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শয্যা আশ্রয় করতে পারলুম না।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, আমার ঠিক মনে নেই, একটা কি স্টেশনে দেখি ভদ্রলোক আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলচেন—ও মশাই, উঠুন—একটু চা খান—খুব ভালো চা এই স্টেশনের—এই ধরুন কাপটা—

উঁকি মেরে জানালা দিয়ে দেখি স্টেশনের নাম ঝার্সুগুডা।

বললুম, রাত কত মশাই ?

—তিনটে পঁচিশ—

ট্রেন ছাড়লে চেয়ে দেখি রেলের দুধারে শেষরাত্রের অন্ধকারে কেবল বন আর বন। মধ্যপ্রদেশে এসে পড়া গেল নাকি ? আরও অনেক স্টেশন চলে গেল। বন আর পাহাড়, পাহাড় আর বন, শেষ-রাত্রের ঘন অন্ধকারে কেমন অপরূপ মনে হচ্ছে।

কখনো এ লাইনে আসিনি—বনের এমন শোভা যে এ লাইনে আছে তা আমার জানা ছিল না। সেদিক থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ একটি বিশেষ লাইন, যা কিনা চক্ষুষ্মান্ ও প্রকৃতিরসিক যাত্রীর সামনে আদিম ভারতের ছবি ধীরে ধীরে খুলে ধরবে, তার নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলশ্রেণী, কোল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের বস্তির সারি, স্থানের অনার্য নাম ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয় প্রাক্-আর্য যুগের ভারতবর্ষের কথা।

জানালা খুলে অন্ধকারে বনশ্রেণীর দিকে চেয়ে বসে রইলুম। ঘুম আমার চোখ থেকে চলে গেল। পয়সা খরচ করে দেশ বেড়াতে এসেচি, ঘুমোবার জন্যে নয়। আমার সহযাত্রী কিছুক্ষণ বসে ছিলেন, তারপর আবার শুয়ে পড়লেন। ট্রেনের কামরার মধ্যে কোনো শব্দ নেই, সবাই ঘুমুচ্চে, আমার নীরব উপভোগের বাধা জন্মায় এমন কোনো বিবাদী সুর কানে আসে না, মনে হল বহুকাল ধরে চেয়ে থাকলেও চোখ আমার কখনো শ্রান্ত হয়ে উঠবে না, মন তার আনন্দকে হারাবে না।

রাতের অন্ধকারে সে বিশাল বনভূমির দৃশ্য যে না দেখেচে, সে পৃথিবীকে অত্যন্ত মহিমময় একটি রূপে আদৌ প্রত্যক্ষ করেনি, তার শিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বিশালের অনুভূতি মনে জাগায় এমন যে কোনো দৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বক্তৃতার চেয়েও অনেক মূল্যবান জিনিস শিক্ষার দিক থেকে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ এখনও এ বিষয়ে উদাসীন, নতুবা ছুটিতে ছেলেদের নিয়ে দেশ বেড়াবার ব্যবস্থা করতো, পয়সা খরচ করে যদি নাও হয়, পায়ে হেঁটে যতদূর হয় তাও তো করা যেতে পারে।

আমার এই দৃঢ় ধারণা, যে দেশভ্রমণ করেনি প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে দেখেনি, কোথাও বা মোহন, কোথাও বা বিরাট, কোথাও রুক্ষ ও বর্বর—তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে অনেক বাকি।

আমার সহযাত্রী এই সময় ঘুম থেকে উঠে আমায় বললেন—কোন্ স্টেশন গেল?

আমি স্টেশনের নাম পড়িনি, তা জানালুম। তিনি উঠে বসলেন। বাইরের অরণ্যের চেহারা দেখে বললেন—ও, এবার বিলাসপুরের কাছাকাছি এসে পড়েচি, এ সব সম্বলপুরের ফরেস্ট।

—তাই নাকি! আমি জানতুম না। চমৎকার দেখাচ্ছিল।

—ঘুমোননি বুঝি? বসে বসে দেখছিলেন নাকি?

—না, এই ঝার্সুগুডা থেকে একটু অমনি—

—আপনি নতুন আসচেন, আমি বহুবার দেখেচি এ সব। সেই টানেই তো আসি।

—আপনারও খুব ভালো লাগে এসব—না?

—খুব। কালাহাণ্ডি ফরেস্টের নাম শুনেচেন? আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সেখানে শিকারে গিয়েচি—বড় ইচ্ছে করে আবার যেতে।

লোকটিকে এতক্ষণ ভালো চিনতে পারিনি। সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। পিপাসা থাকলেই হল—না দেখলেও ক্ষতি নেই। পিপাসা আত্মার জিনিস—দেখাটা বহিরিন্দ্রিয়ের। মনের বেদীতে হোমের আগুন না নিবে যায়। সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো সে আগুন অতি যত্নে যে রক্ষা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলতে পারে, সে মৃত্যুকেও জয় করবে—কারণ তার চোখ ও মন তৈরী হয়ে গিয়েচে। তার আত্মায় স্পর্শ লেগেচে বিরাটের, অনন্তের।

আমার সহযাত্রী সোৎসাহে কালাহাণ্ডি ফরেস্টে শিকারের কাহিনী বলে যেতে লাগলেন। শুনতে শুনতে আমার কখন নিদ্রাবেশ হয়েচে জানিনে—হঠাৎ কতক্ষণ পরে যেন আমার কানে গেল কে বলচে—উঠুন, উঠুন, বিলাসপুর আসচে—জিনিস গুছিয়ে নিন—ও মশাই—

তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। ট্রেনের বেগ কমিয়েচে, বন পাহাড় অদৃশ্য, অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়ে বেশ দিনের আলো ফুটেচে। দূরে একটা স্টেশনের ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল দেখা গেল। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম, কারণ আমায় বিলাসপুরেই নামতে হবে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ভয়ানক মেঘ করেচে, মন বড় দমে গেল মেঘ দেখে। আবার যদি বৃষ্টি শুরু হয় তবে এবারকারের বেড়ানোটা মাটি করে দেবে।

হলও তাই।

বিলাসপুর রেলওয়ে রেস্তোরাঁতে বসে চা খাচ্চি—এমন সময় ভীষণ বৃষ্টি নামলো। সে বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ দেখলুম না ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেও, অগত্যা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই গিয়ে কাট্‌নি লাইনের ট্রেনে চড়লুম।

আধঘণ্টা পরে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

দু'ধারে শালের বন আর অনুচ্চ পাহাড়। রেলের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি শ্রাবণ মাসের বর্ষাদিনের মতো নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন চেহারাখানা আকাশের—মেঘের

জোড় মিলিয়ে দিয়েচে—দুই মেঘের মধ্যে একচুল ফাঁক নেই আকাশের কুত্রাপি।

প্রমাদ গনলাম মনে মনে।

সূর্যের আলো না দেখতে পেলে মন আমার কেমন যেন মিইয়ে মুষ্‌ড়ে পড়ে। বর্ষাকালে বর্ষা ভালো লাগে না এমন কথা বলচিনে—কিন্তু পয়সা খরচ করে এতদূর বেড়াতে এসে যদি এমন অকালবর্ষা নামে, তবে মন খারাপ হওয়া খুব বেশি অস্বাভাবিক নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

কয়েকটি মাত্র স্টেশন পেরিয়ে এসেই কার্গিরোড—ছোট স্টেশনটা, চারিদিক পাহাড় ও বনে ঘেরা।

একরকম ভিজতে-ভিজতেই নামলুম গাড়ি থেকে। জনপ্রাণী নেই কেউ কোনোদিকে, কোথায় বা বন্ধুর লোক, কোনোদিকে একটা ঘোড়ার টিকিও দেখলুম না। জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের টিকিটঘরের সামনে একটা বেঞ্চির ওপর বসে রইলুম।

হয়তো এমন হতে পারে, বন্ধুর প্রেরিত লোকটা ঘোড়া নিয়ে আসতে আসতে এই ভীষণ বৃষ্টিতে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে—তাই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে বৃষ্টিটা থামলেই সে এসে পড়বে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চললো মুষলধারে, ঘণ্টা দুই কাটলো—বেলা এগারোটা। কাছের একটা পার্বত্য ঝরনা ফুলে ফেঁপে উঠেচে—নালা দিয়ে তোড়ে জল চলেচে—পাহাড় থেকে জলের তোড় নেমে রাস্তায় অনেকখানি ডুবিয়ে দিয়েচে।

বেলা এগারোটার পর বৃষ্টি একটু কম জোরে পড়তে লাগলো, একেবারে থামলো না—কিন্তু বন্ধুর প্রেরিত কোনো লোকের চিহ্ন দেখা গেল না রাস্তার ওপর।

আমি ঠায় বসে আছি বেঞ্চিখানার ওপর, মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টার একবার আমার দিকে চেয়ে দেখে নিজের বাসায় চলে গেল। স্টেশন জনহীন।

আমি পেছনের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। মেঘ যেন পাহাড়ের মাথায় এসে জড়িয়ে আছে—ভারি চমৎকার দেখাচ্চে—ঠিক এমনি দৃশ্য দেখেছিলুম—সেও ঠিক এমনিধারা এক বর্ষণমুখর দিনে—ফতেপুর সিক্রির বিখ্যাত বুলন্দ দরওয়াজার উঁচু খিলানের মাথায়, সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক যেন মেঘের মধ্যে ঢুকচে আর বেরুচ্চে। মেঘের রাশি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে পাক খাচ্চে বুলন্দ দরওয়াজার খিলানের কার্নিসে। এই বনবেষ্টিত নির্জন স্টেশনটিতে বসে কয়েক বৎসর আগে দেখা সে ছবিটা মনে এল।

মুশকিল হয়েচে, ছাতিটা পর্যন্ত আনিনি যে, না হয় জিনিসপত্র স্টেশনঘরে রেখে একটু পাহাড়ের ওপর গিয়ে বেড়িয়ে আসবো!

বেলা দুটো বাজলো স্টেশনের ঘড়িতে, মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টারটি বাসা থেকে ফিরে এল, বোধ হয় খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে উঠে এল এবং পূর্ববৎ একজায়গায় বসে আছি দেখে আমার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে স্টেশনঘরে ঢুকলো। কাট্‌নি থেকে একখানা ডাউনট্রেন কিছু পরেই এল, মিনিট দুই দাঁড়ালো, ছেড়ে বিলাসপুরের দিকে চলে গেল।

চারিদিকে চেয়ে দেখেছি। এ বনের মধ্যে কোথাও একটা দোকান-পসার চোখে পড়েনি যে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাই। কিছু মেলে না এ বনে, নিকটে একটা বস্তি পর্যন্ত নেই। এমন জানলে বিলাসপুর থেকে কিছু খাবার কিনে আনতাম।

স্টেশন-মাস্টারকে জিজ্ঞেস করবো? কোনো দোকান না থাকলে ওরাই বা খাবার কোথা থেকে আনায়! কিন্তু জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগলো। ভাবলুম, লোকটা মনে করতে পারে হয়তো তার বাড়িতেই আমি খেতে চাইচি। না, এ প্রশ্ন ওকে করা হবে না।

বেলা চারটে। তখন আমি সত্যিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েচি। যদি লোক না-ই আসে তবেই বা কি করবো? স্টেশনের দেওয়াল-সংলগ্ন টাইমটেবিল দেখে বুঝলাম রাত সাড়ে সাতটায় বিলাসপুরে ফিরে যাবার আর একখানা ডাউনট্রেন আছে—তাতেই ফিরে যাবো বিলাসপুরে এবং সেখান থেকে কলকাতায়। পয়সা খরচ করে এতদূরে অনর্থকই এলুম! এখানে বসে থেকেও তো আর পারিনে। সেই বেলা ৯টা থেকে আর বেলা চারটে পর্যন্ত না খেয়েদেয়ে ঠায় একখানা বেঞ্চির ওপর বসে আছি, স্টেশনটা মুখস্থ হয়ে গেল; এর কোথায় কি আছে আমি যতকাল বেঁচে থাকবো, ততকাল নিখুঁত ভাবে মনে থাকবে এমন গভীর ভাবে এর ছবি আঁকা হয়ে গিয়েচে আমার মনে। অথচ বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামলেও একেবারে নির্দোষ হয়ে থেমে যায়নি।

এই সময় স্টেশন-মাস্টারটি স্টেশন ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিজের বাসায় ফিরে চললো। যাবার সময় পুনরায় আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে গেল; একবার জিজ্ঞাসাও করে না যে আমি কে, কেন এখানে সেই সকাল থেকে বসে আছি দারুব্রহ্মের মতো অচল অবস্থায়—বেশ লোক যাহোক!

স্টেশন আবার জনহীন। একে মেঘান্ধকার দিন, তায় হেমন্তের ছোট বেলা, এরই মধ্যে যেন বেশ বেলা পড়ে আসে আসে হল, মনে হতে লাগলো সন্ধ্যা হবার আর বেশি দেরি নেই। কি করা যায় এ অবস্থায়? রাত্রি কাটাতে হলে যতদূর বুঝচি, স্টেশন-মাস্টারের স্টেশনের ঘরখানার মধ্যে আমার জায়গা দেবে না, এই বাইরের বেঞ্চিখানাতেই আমায় শুয়ে থাকতে হবে।

এমন সময় দূরে বাজনা-বাদ্যির শব্দ শোনা গেল। চেয়ে দেখি একদল লোক বাজনা বাজিয়ে স্টেশনের দিকে আসচে। কাছে এলে দেখলুম তারা বরযাত্রী, দশ-বারো বছরের একটি বালক বরসাজে ডুলি চেপে এসেচে ওদের সঙ্গে। আশ্বিন মাসে বিবাহ কি রকম? এদেশে বোধহয় হয়ে থাকে।

ওদের মধ্যে তিন-চারজন লোক এসে আমার বেঞ্চিতে বসলো। নিজেদের মধ্যে ওরা খুব গল্প-গুজব হল্লা করচে, একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—কেউ কোনো-রকম ধূমপান করচে না। পরের পয়সায় ধূমপান করবার এমন সুযোগ যখন বরযাত্রী হয়ে এরা ছেড়ে দিচ্চে তখন মনে হল ধূমপানের প্রথা এদেশে কম। পরে জেনেছিলুম, আমার অনুমানের মধ্যে অনেকখানি

সভ্যতা আছে। কাঁচা শালপাতা জড়ানো পিকা ছাড়া এদেশে বিদেশী চুরুট বা সিগারেটের চলন খুব কম।

একজন আমার দিকে চেয়ে হিন্দিতে বললে, বাবু, কোথায় যাবেন?

বাবা! এতক্ষণ পরে মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাঁচলুম। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল কথা না বলে। বললুম, দারকেশা যাবো—

সে বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বললে, দারকেশা! আপনি কোন্ গাড়িতে নেবেচেন? কোথা থেকে আসচেন?

—সকালের গাড়িতে। কলকাতা থেকে আসচি—

—তবে এতক্ষণ বসে আছেন যে?

সব খুলে বললাম। লোকটির চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখে খুব উচ্চবর্ণের বলে মনে হয়নি, এই বরযাত্রীর দলের মধ্যে কেউই উচ্চবর্ণের নয় এই আমার ধারণা, কিন্তু লোকটি ভদ্র ও অমায়িক। সব শুনে সে বললে, আপনার তো বড় কষ্ট হয়েচে দেখচি, সারাদিন বসে এভাবে, খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধহয়। আপনি কি করবেন এখন?

—কি করবো, বুঝতে পারচিনে।

—দারকেশায় যাবেন কেন, সেখানে বড্ড বন, জংলী জায়গা—

শুনে আমার আরও আগ্রহ বাড়লো দারকেশা দেখবার জন্যে। সে জায়গা না দেখে চলে যাবো এত দূর এসে? ওকে বললাম, কোনো ব্যবস্থা হতে পারে সেখানে যাবার?

সে ওদের দলের দু-তিন জনকে ডেকে গোঁড় বুলি মিশ্রিত হিন্দীতে কি পরামর্শ করলে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, সব ঠিক হয়ে গেল। আমাদের দলে যারা এসেচে, তাদের মধ্যে তিনজন ডুলি নিয়ে ফিরে যাবে। আপনি ডুলি চেপে এখান থেকে ন-মাইল দূরে মান্‌সার বলে একটা গাঁয়ে যাবেন। সেখানে রাত্রিটা থাকবেন।

—কোথায় থাকবো? ডাক-বাংলো আছে?

—সে ব্যবস্থা বলে দিচ্চি ডুলিওয়ালাদের। আপনি ওদের ডুলিভাড়া একটা দিয়ে দেবেন সেখানে গিয়ে। ওরা আপনাকে থাকবার জায়গা করে দেবে।

—তারপর আর বাকি পথ? বত্রিশ মাইলের ন-মাইল হল মোটে।

—আজ রাত তো সেখানে থাকুন। কাল সকালে উঠে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই ব্যবস্থাই ভালো। ফিরে যাওয়া বা এখানে স্টেশনের ওজনকলের মতো বসে থাকার চেয়ে এগিয়ে চলাই যুক্তি। ন'মাইল ন'মাইলই সই। লোকটিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমি ডুলি চাপলাম।

উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ, তোড়ে জল চলেচে রাস্তার পাশের নালা দিয়ে। শালগাছ সর্বত্র। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মধ্যপ্রদেশের এই অংশকে Deccantrap-এর অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দেশ করেচেন, শালবৃক্ষ এই অঞ্চলে সকলের চেয়ে বেশি জন্মায়।

স্টেশন ছাড়িয়ে প্রথমটা দু ধারে অনেক পাহাড় পড়লো, তারপর রাস্তা অনেকখানি নীচু

হয়ে গিয়ে একটা ঝরনা পার হয়েচে. তারপর খানিকটা সমতল প্রান্তর, ইতস্তত ছোট-বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো।

সেই মাঠের মধ্যে বেলা পড়ে এল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে নামচে। আমার ডুলির পেছনে পেছনে ওদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি আমার জিনিস-পত্র মাথায় করে নিয়ে আসছিল। তাকে দেখে আমার মনে হল লোকটি নিতান্ত ক্ষীণজীবী, দুর্ভিক্ষের আসামী। ডুলিবাহকদের একজনকে বললুম, এ বেচারী মোট বইতে পারচে না; তোমরা কেউ জিনিস নিয়ে ওর কাঁধে ডুলি দাও।

তারা হেসে বললে—বাবু, চুপ করে বসুন, ও একজন ভালো শিকারী। গায়ে ওর খুব জোর—কোনো ভাবনা নেই।

—কি শিকার করে ?

—হরিণ মারে, ভাল্লুক মারে। সব কিছু মারে—

—কোন্ জঙ্গলে শিকার করে ?

—আপনি যেখানে যাবেন বাবু, সেখানে খুব বড় জঙ্গল আছে। সেখানে ও গিয়েচে অনেকবার।

শুনে লোকটার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হল। ওর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম, গায়ে চর্বি বোধহয় এক আউন্সও নেই, কিন্তু লোহার তারের মতো শক্ত দড়ি-দড়ি হাত-পা। গলাটা যেন একটু বেশি লম্বা, চক্ষুদুটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, গলার হাড় বেরুনো, চেহারায় দস্তুরমত বিশেষত্ব আছে। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

পথে বেশ অন্ধকার হল।

আমার একটু ভয় যে হয়নি, একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। সঙ্গে তিনজন অপরিচিত লোক, সুটকেসে কিছু টাকা-কড়িও আছে, জামায় সোনার বোতাম আছে, হাত-ঘড়ি আছে, এই পাহাড়ী জায়গায় এদের বিশ্বাস কি।

জিজ্ঞেস করলুম—মান্‌সার আর কতদূর হে ?

—আর বাবু তিন মিল।

ওদের তিন মিল আর শেষ হয় না, তারপর দুঘণ্টা কেটে গেল। ডুলির বাইরে বড় অন্ধকার হয়ে এসেচে, কিছু দেখা যায় না, তবে মনে হচ্চে মাঝে মাঝে শালবন, মাঝে মাঝে ছোট বড় পাহাড় পড়চে রাস্তার দু-ধারে, ঝরনার জলের শব্দও পাচ্চি।

আজ দেবীপক্ষের সপ্তমী, অথচ মাঠ বন ঘুট-ঘুটে অন্ধকার।

আরও কিছুক্ষণ পরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে দু একটা আলো দেখা গেল। একটা ছোট-মতো খালের হাঁটুজল পেরিয়ে আমরা মান্‌সারে পৌঁছে গেলুম।

ওরা বললে—বাবু, আপনাকে থাকবার জায়গায় দিয়ে আসি। কাল সকালে এসে আবার আমরা দেখা করবো।

একটা বড় চালাঘরে ওরা আমায় নিয়ে গেল। ঘরের সামনেটা একেবারে ফাঁকা, তিন-

দিকে কিসের বেড়া দেওয়া অন্ধকারে ভালো ঠাওর হল না। একটা আলো পর্যন্ত নেই, ভীষণ অন্ধকার। আমি তো অবাক, এ রকম ঘরে জিনিসপত্র নিয়ে রাত কাটাবো কেমন করে?

বললুম, এ কারো বাড়ি, না কি এটা?

আমাদের মণ্ডপ-ঘর। সাধারণের জন্তে সাধারণের চাঁদায় তৈরী। এখানে থাকুন, কোনো ভয় নেই। আমি খুব আশ্বস্ত হলুম না। আর কোনো কিছুর ভয় না থাকলেও সাপের ভয় যে আছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মধ্যপ্রদেশের এই সব বনাঞ্চলে শুনেচি নাকি শঙ্খচূড় (King Cobra) সাপের খুব প্রাদুর্ভাব।

ওদের বললুম কথাটা। ওরা আমায় নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলে। সাপ কখনো তারা চোখে দেখেনি, সাপ কাকে বলে তারা জানেই না। আমি নির্ভয়ে এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারি।

কিন্তু সাপ যদি না-ও থাকে, এ খোলা জায়গায় চোরের ভয়ও কি নেই? নিশ্চয়ই এখনো এদেশে সত্যযুগ চলচে না।

ওরা আমার কথা শুনে হাসলে। চুরি নাকি এদেশে অজ্ঞাত। তাদের জ্ঞানে কখনো মানসারে চুরি হয়নি। বিশেষ করে বিদেশী লোকের জিনিস কেউ ছোঁবেও না।

আমাকেই রান্না করতে হল রাত্রে। যবের রুটি, ঢেঁড়সের তরকারি ও দুধ। এদেশে আটার রুটি খাওয়ার প্রচলন তত নেই—বাজার থেকে আটা ময়দা এরা বড় একটা কেনে না। নিজেদের ক্ষেত্রোৎপন্ন যব, গম ও মকাই এর রুটিই সারা বছর খায়। গম খুব বেশি হয় না বলেই তার সঙ্গে যব ও মকাই যোগ না করলে বছর কাটে না। অনেক সময় যব, গম ও মকায়ের ছাতু—তিন দ্রব্যের সংমিশ্রণেও রুটি তৈরি করা হয়।

রাত্রে সুনিদ্রা হল। পরদিন সকালে উঠতেই গ্রামের অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের মুখে খবর নিয়ে জানা গেল মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস এ গ্রামে। প্রধান উপজীবিকা চাষ ও লাক্ষা সংগ্রহ। লাক্ষাকীট পোষা ও সংগ্রহ করে মাড়োয়ারী মহাজনদের কাছে বিক্রি করা সারা উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের একটি প্রধান কুটীর বাণিজ্য।

আকাশের দিকে চেয়ে প্রমাদ গনলাম। আবার ভয়ঙ্কর মেঘ জমা হয়েচে, বর্ষা দেখচি নামলো কালকের মত। এই বর্ষার মধ্যে এই আশ্রয় ছেড়ে রওনা হব কিনা ভাবতে ভাবতে বৃষ্টি নামলো সত্যিই।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর মুষলধারায়, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। সেই সময়টা আমার ঘরে কেউ নেই, সবাই গল্প করে উঠে গিয়েচে। একটি বালক ভিজতে ভিজতে এক ঘটি দুধ নিয়ে এল আমার জন্তে।

আমি তাকে বলি—চা পাওয়া যায় না এখানে?

—না বাবু-সাহেব।—এ কথা আমার আদৌ মনে ছিল না যে বন-জঙ্গলের দেশে চা

পাওয়া যাবে না হয়তো। মনে পড়ল বিলাসপুর থেকেও তো নিতে পারতুম। অগত্যা গরম দুধ খেয়ে চায়ের পিপাসা দূর করতে হল। ছেলেটি দুধ জাল দিয়ে দিলে। দুধ এক সেরের কম নয়; আমি ওকে বললুম—কত দাম দেবো?

সে বললে, প্রধান বলে দিয়েচে বাবু-সাহেবের কাছে দুধের দাম নিবিনে।

—তোর দুধ?

—হাঁ বাবুজি, আমাদের বাড়ির দুধ। মা দিয়েচে।

—তোর জল-খাবার বলে দিচ্চি—দুধের দাম না হয় না নিবি!

—না বাবু-সাহেব, পয়সা আমি নিতে পারবো না।

—আমি তোকে বকশিশ দিতে পারিনে?

—না বাবু, আমরা বকশিশ নিইনে। আমরা মাহাতো, গোয়ালা—দুধই বেচি।

না, একে দেখচি কিছু বোঝানো যাবে না। ভিজতে ভিজতেই ছোকরা চলে গেল। দুপুরের আগে সে-ই আবার এল কিছু চাল ও ঢেঁড়শ নিয়ে। নুন তেল কাল রাত্রের দরুন কিছু অবশিষ্ট ছিল। ওর সাহায্য নিয়ে ভাত ও ঢেঁড়শ-ভাতে রান্না করলুম—দুধ ছিল আধ সেরের ওপর, সেটা আর একবার গরম করে নিলাম। খাওয়া শেষ হল; ছোকরাকেও খেতে বললুম, সে আপত্তি করলে।

বেলা দুটোর সময় আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলো। গ্রামের লোক দেখা করতে এল ওদের চাল-ডালের দাম দিতে গেলে কিছুতেই নিলে না। মণ্ডপঘরে যারা আশ্রয় নেয়, তারা গ্রামের অতিথি। প্রধানেরা এ সব ব্যবস্থা করে, গ্রাম-ভাটি থেকে এর খরচ হওয়ার প্রথা এদেশে বহু প্রাচীন।

আমি বললুম—বেশ, গ্রাম ভাটিতে কিছু চাঁদা দিতে কোনো আপত্তি হতে পারে কি?

—না বাবু সাহেব, অতিথির কাছ থেকে কিছু নেওয়া নিয়ম নেই।

সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনতে হলে এ ধরনের গ্রামের, অরণ্যে, পাহাড়-পর্বতে, নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশে পায়ে হেঁটে বেড়াতে হয়। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে বেড়ালে আর যাকেই চেনা যাক, চীরবাসা ভৈরবী ভারত-মাতাকে চেনা যায় না।

বেলা দুটোর পরে ওরা একটা ঘোড়া ভাড়া করে দিলে। ঘোড়ার সহিসই আমার জিনিস-পত্র নিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে যাবে ঠিক হল। দারকেশা পর্যন্ত ঘোড়ার ভাড়া ও সহিসের মজুরি ধার্য হল পাঁচ টাকা।

আমি রওনা হয়ে পথে বেরিয়েচি—মাইল দুই এসে দেখি দুজন লোক আসচে, একটা ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে একজন, ঘোড়ার পেছনে পেছনে আর একজন।

আমাকে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। আমিও ঘোড়া থামালুম।

—তোমরা কোথায় যাচ্চ?

—কার্গি রোড স্টেশনে। প্রতাপবাবু পাঠিয়েচেন। বাবুজি কি কলকাতা থেকে আসচেন? আপনার নাম?

আমি বললুম—এত দেরি করে এলে কেন? তোমাদের জন্যে স্টেশনে বসে বসে কাল হয়রান হয়েচি।

আসলে এদের চিঠি পেতে দেরি হয়েছিল। এ সব জংলী জায়গায় চিঠি বিলি হতে দু-একদিনের এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

আমি আমার আগের ঘোড়াকে বিদায় দিয়ে নতুন ঘোড়ায় চড়লুম। নতুন সঙ্গীদের বললুম—বেলা তো এখুনি যাবো-যাবো হল, রাত্রে কোথায় থাকা যাবে?

ওরা বললে—চোরামুখ গালার কারখানায়।

—সে কতদূর?

—এখনও বাবুজি, আট মাইল। রাত সাতটায় সেখানে পৌছবো।

পথের সৌন্দর্য সত্যিই বড় চমৎকার। পথের বাঁ-পাশে একটা ছোট নদী এঁকে বেঁকে চলেচে, অভ্রকণা মেশানো বড় বড় শিলা দিয়ে তার দুই পাড় যেন মাঝে মাঝে বাঁধানো। এক একটা গাছের কি আঁকা-বাঁকা ভঙ্গি। পড়শী ও ভেলা গাছ এ অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র, কিন্তু কোথাও বেশি বড় বন নেই।

একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্যটা সুন্দর লাগলো। তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে স্থানে স্থানে নীল রং বেরিয়ে পড়েচে। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার হয়ে এল, তারপরেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ফুটলো।

দুতিনটি বস্তি পার হওয়া গেল রাস্তায়। একটা বস্তিতে কি একটা পাঠ হচ্চে। চাঁদোয়ার নীচে বাতি জ্বলচে, অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ পাঠককে ঘিরে দাঁড়িয়ে শুনচে। আমাদের দেশের কথকতার মতো। সন্ধ্যার পর বন আর চোখে পড়ে না, শুধুই একঘেয়ে মোরুম ছড়ানো বড় বড় মাঠ—এ মাঠে যদি ডাকাত পড়ে আমাদের সবাইকে খুন করেও যায়, তাহলেও কেউ দেখবে না। কোনো দিকে লোক নেই, একটা বস্তির আলোও চোখে পড়ে না। আমার মনে হয় পুরো দু ঘণ্টা লাগলো এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হতে, অবিশ্যি ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার উপায় ছিল না আমার—কারণ পথ চিনি না, সঙ্গের দুজন লোক ঘোড়ার পাশে হেঁটে যাচ্চে—তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া চলে না।

প্রায় যখন সাড়ে সাতটা, তখন দূরে আলো দেখা গেল।

ওরা বললে—ওই চোরামুখ বস্তির আলো।

বেশ শীত করচে, বোধ হয় বাদলার হাওয়া আর এই একদম খোলা মাঠের জন্যেই। অগ্রহায়ণের প্রথমে যেমন শীত পড়ে বাংলা দেশে, সেই রকম শীতটা। গরম কাপড় সঙ্গে বিশেষ কিছু আনিনি, মনে হল না-এনে বড় ভুল করেচি।

চোরামুখ পৌছে একটা বড় খোলার কুলি-ধাওড়ার মতো ঘরে ওরা আমায় ওঠালে। সঙ্গে কোনো আলো নেই—আমার সঙ্গেও না। জায়গাটা নিতান্ত অন্ধকার। জিনিসপত্র নামিয়ে বিশ্রাম করচি, এমন সময় আমার নজরে পড়লো ঘরটার সামনের রাস্তা দিয়ে বাঙালী

ধরনের ধুতি-কামিজ পরা একজন লোক যাচ্ছে—কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক চিনতে পারলুম না লোকটি বাঙালী কি না।

আমি ওদের বললুম—এখানে দোকান আছে তো?

—হ্যাঁ বাবু, ছোট একটা বাজার আছে—সব পাওয়া যায়।

ওদের পয়সা দিলুম চাল ইত্যাদি কিনে আনতে। মোমবাতি যদি পাওয়া যায়, তাও আনতে বলে দিলুম। আমি অন্ধকারে বসে আছি চুপ করে—প্রায় মিনিট কুড়ি পরে দেখি আগের সেই বাঙালী-পোশাক পরা লোকটি সামনের রাস্তা দিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে যাচ্ছে। ছু-একবার ডেকে জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে হলেও শেষ পর্যন্ত চুপ করেই রইলুম।

তারপর আমার লোক ছুটি জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল। ওরা মোমবাতি পায়নি—কিন্তু মহুয়ার তেল ও মাটির প্রদীপ কিনে এনেচে। দড়ি দিয়ে সল্‌তে করে মাটির প্রদীপই জ্বালানো গেল। পাথর কুড়িয়ে এনে উনুন করে ঘরের এককোণে রান্না চড়িয়েচি ওদের সাহায্যে—ভাত প্রায় নামে নামে এমন সময় পেছন থেকে কে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলো—মশাই কি বাঙালী?

পিছন দিকে চেয়ে দেখি সেই বাঙালী পোশাক পরা লোকটি। বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঙালীই বটে। কলকাতা থেকে আসচি।

ভদ্রলোক মহা খুশী হলেন মনে হল। বললেন—তা এখানে কি করচেন?

আমি সংক্ষেপে সব ব্যাপার খুলে বললুম। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে উঠলেন—তাও কি কখনো হয়! আপনি বাঙালী, এখানে এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবেন? আসুন, চলুন। ওসব যা রাঁধচেন, আপনার সঙ্গের লোক খাবে এখন। আপনি চলুন আমার বাড়ি।

—আপনি কি করে জানলেন আমার কথা?

—বাজারে শুনলুম। বললে, এক বাঙালী বাবু কলকাতা থেকে এসেচেন, দারকেশ্বা যাচ্ছেন, আপনারই গুদামে আশ্রয় নিয়েচেন। চাল ডাল কিনে এনেচে আপনার লোক তাও জানি।

—এ বুঝি আপনার গুদাম?

—এখানে জংলী গালা রাখা হয়, আমারই ঘরটা বটে।

ভদ্রলোকের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে গেলুম ওঁর সঙ্গে। মিনিট পাঁচ-ছয় সোজা রাস্তায় গিয়ে তারপর একটা সরু পথ গিয়েচে বাঁ-দিকে। সে পথে গিয়ে কাঠের পুলের ওপর দিয়ে বাঁ দিকের সেই যে পাহাড়ী নদী বা ঝরনা, আমাদের সঙ্গে রাস্তার সমান্তরাল ভাবে অনেকদূর থেকে চলে আসচে, সেইটে পার হওয়া গেল। ঝরনাটা পার হয়ে আবার একটু উঁচুদিকে উঠে মাঠের রাস্তায় আরও মিনিট তিন চার হাঁটবার পর একখানা খোলার বাংলো ধরনের পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির সামনে এসে তিনি বললেন, আসুন, এই হলো গরিবের কুঁড়ে। বসুন এখানে। চা খান তো? বাড়িতে বলে আসি। আপনি বাঙালী, বড় আনন্দ হল, বাঙালীর মুখ কতদিন যে দেখিনি।

সত্যই ভদ্রলোককে মনে হচ্ছিল যেন কতকালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়! বিদেশে না যে কখনো বার হয়েচে, সে বুঝবে না দূরদেশে একজন বাঙালীর দেখা পাওয়া কি আনন্দের ব্যাপার।

অল্পক্ষণ পরে ভদ্রলোক এসে বসলেন—চা-ও এল।

আমি বললুম—এখানে কতদিন আছেন?

—তা আজ সতেরো বছর, কি তার কিছু বেশি।

—কি উপলক্ষ্যে থাকা হয় এখানে?

—আমার একটা গালার কারখানা আছে, দেখাবো এখন। তাই নিয়ে পড়ে আছি—এই তো চাকুরির বাজার।

—না না, বেশ ভালো করেচেন। আপনি বাঙালী, এতদূর এসে গালার কারখানা খুলেচেন, এ খুব গৌরবের কথা। চলচে বেশ ভালো?

—আজ্ঞে হাঁ, তা একরকম আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে; তবে কি জানেন, এতদিন যা হয় হয়েচে, মন আর এখন টেঁকে না।

—আপনার বাড়ির সব এখানেই বোধ হয়। তবে আর মন টেঁকাটেঁকি কি, সব নিয়েই যখন আছেন।

ভদ্রলোক তখনকার মতো চুপ করে গেলেন আমার মতে সায় দিয়ে, দুএকবার নিরুৎসাহ-সূচক ঘাড় নেড়ে। রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি বৃদ্ধা মাতা ছাড়া ভদ্রলোকের সংসারে দ্বিতীয় লোক নেই, সম্ভবত আর একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে থাকে, সে তখন পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিল।

ঘরদোরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ও অগোছালো। বাড়ির পেছনে একটা সংকীর্ণ উঠান, তার মধ্যে কিসের একটা মাচা; উঠানটাতে বেজায় কাদা হয়েচে কদিনের বৃষ্টিতে। মাটির কলসীতে জল রাখা মাচাতলার নীচে। ইতিপূর্বে ভদ্রলোকের নাম জেনেছিলাম; তিনি ব্রাহ্মণ, নদীয়া জেলায় বাড়ি একথাও জেনেচি। তাঁর বৃদ্ধা মাকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম।

খাওয়ার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা চালের ভাত, ডাল ও ঢেঁড়শের তরকারি, বড়ি ভাজা। এদেশে কোনো তরি-তরকারি বা মাছ বড় একটা মেলে না—ঢেঁড়শ ও টোমাটো ছাড়া। খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট। এসব কথা শুনলুম ভদ্রলোকের কাছেই।

খাওয়ার পরে যেতে উদ্যত হলুম, ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন—কোথায় যাবেন? সেই খোলা গুদোমে? আপনি বেশ লোক তো! এখানে আপনাকে রাত্রে একটু জায়গা দিতে পারবো না বুঝি?

রাত্রে শোবার আগে উঁর অনেক কথাই বললেন আমার কাছে। ভদ্রলোকের দু-বার স্ত্রীবিয়োগ হয়েচে—এই বয়সে সংসার শূন্য, একটি মাত্র আট বছরের ছেলে আছে। বৃদ্ধা মায়ের কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। নিজের বয়স হয়েচে পঁয়ত্রিশ মাত্র।

ভদ্রলোকের মন বুঝে বললুম—আপনার বিবাহ করা উচিত পুনরায়।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন—তা মশায় হয় কি করে। এখানে থেকে কোনো যোগা-যোগ করা অসম্ভব।

—কেন ?

—সন্ধান পাই কোথা থেকে বলুন। বাঙালীর মুখই দেখিনে। সেই তো হয়েচে মুশকিল।

কিছুক্ষণ একথা-ওকথার পর ভদ্রলোক বললেন—আপনি কতদিন এদেশে থাকবেন ?

—কত আর, দিন কুড়ি কি একমাস।

—ফিরে গিয়ে দয়া করে যদি একটি মেয়ের সন্ধান করে দেন তবে বড়ই···এই দেখুন বুড়ো মা একা সংসারের সব খাটুনি খাটেন, তারপর ছেলেটির যত্ন করা, তাও তেমন হয় না, সংসারের কতদিক একা দেখবো বলুন।

—বেশ, বেশ, আমি ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো—

—আমরা ভট্টাচাজ্যি, রাঢ়ী শ্রেণী। আগের বিয়ে কোথায় করেছিলুম সে ঠিকানাও আপনাকে দিচ্চি। যাঁরা মেয়ে দেবেন, তাঁরা সন্ধান নিয়ে দেখতে পারেন, বংশে কোনো খুঁত নেই আমাদের।

সকালে উঠে আমাকে তিনি গালার কারখানায় নিয়ে গেলেন। বড় বড় মাটির গামলায় বোধহয় গালা ভিজানো আছে, চামড়ার কারখানার মতো ভীষণ দুর্গন্ধ, আর ভারি অপরিষ্কার সমস্ত জায়গাটা। খুব বড় খোলার ঘর, লম্বা ধরনের। যে গুদামটাতে রাত্রে ছিলাম, ঠিক তেমনি ধরনের কুলি-ধাওড়ার মতো সেই ঘরটা।

বললুম—গালা কোথা থেকে কেনেন ?

—জংলী গালা গোঁড় মেয়েরা বিক্রী করতে আসে, তাই কিনি। এখানে আরও দুটো কারখানা আছে মাড়োয়ারীদের।

—কি রকম আয় হয় কারখানা থেকে, যদি কিছু মনে না করেন ?

—মনে করবো কেন বলুন। তা মাসে গড়ে শ-দেড়েক টাকা দাঁড়ায়, খরচ-খরচা সব পুষিয়ে। তবে আরও বাড়াতুম, কিন্তু কাজে মন লাগচে না মশাই।

নিতান্ত খারাপ আয় নয়, একজন বাঙালী ভদ্রলোক এতদূরে এসে স্বাধীন ব্যবসা চালাচ্চেন মাড়োয়ারী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, কেরানিগিরি না করে। এতে আনন্দ হবার কথা বটে। আমি তাঁকে বোঝালুম অনেক, নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি ব্যবসা যেন না ছাড়েন।

সকালে চা খেয়ে ওঁদের কাছে বিদায় নিলুম।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত এলেন। দু তিনবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি কলকাতায় ফিরে সব ভুলে যাবো না তো ? বিশেষ করে তাঁর বিষয়টা। আরও বললেন—যাবার সময় এই পথেই তো ফিরবেন, আমার সঙ্গে না দেখা করে যেন যাবেন না।

বললুম—নিশ্চয়ই, এ পথে ফিরবার সময় মায়ের হাতের রান্না না খেয়ে কি যাবো ভেবেচেন ?

—ওকথাটা তাহলে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমার মনে রইল। বিশেষ চেষ্টা করবো জানবেন।

বন্ধুর পথের বাঁকে আমার ঘোড়া ও লোকজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোক চোরা-মুখ বস্তির শেষপ্রান্তে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, পিছন ফিরে দু একবার রুমালও উড়িয়েচি।

ফিরবার সময় এপথে ফিরিনি, ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখাও হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, দেশে ফিরে ভদ্রলোকের বিবাহের জন্য আমি দু-তিন জায়গায় মেয়ে সন্ধান করেছিলুম—আমার স্বগ্রামস্থ এক প্রতিবেশীর বিবাহযোগ্য কন্যা ছিল, তাদের কাছেও কথা পেড়েছিলুম। ভদ্রলোকের ঠিকানা দিয়ে পত্র ব্যবহার করবার অনুরোধও করি।

কিন্তু যে ক-টি পাত্রীর সন্ধান করেছিলুম, তাদের অভিভাবকদের মধ্যে কেউই অত দূর বলে জঙ্গলের দেশে মেয়ের বিবাহ দিতে রাজি হননি।

আমার স্বগ্রামের পাত্রীটির বাপ একরকম রাজি হয়েছিলেন কারণ তাঁর অবস্থা তত ভালো ছিল না, কিন্তু মেয়ের মা ভয়ানক আপত্তি তোলেন।

আমায় ডাকিয়ে বললেন, অমন সীতা-নির্বাসনে কে মেয়ে দেবে বাপু? আমার মেয়ে তো কেল্‌না নয়, সেখানে গিয়ে কথা বলবার লোক পাবে না, হাঁপিয়ে উঠবে।

যাক্ সে কথা। চোরামুখ ছাড়িয়ে বেলা দশটার সময় আমরা পৌছে গেলুম সালকোণ্ডা বলে একটা ছোট গাঁয়ে। রাস্তার ধারেই একটা চুনের ভাঁটি আছে, আশেপাশে অনেকগুলো বড় ছোট চুনের ভাঁটি। এখানে অনেকগুলি গোঁড় কুলি কাজ করে, তাদের জন্য বড় বড় কুলি ধাওড়া খান পাঁচ ছয় ভাঁটির আশেপাশে ছড়ানো। জায়গাটার দৃশ্য বেশ ভালো লাগলো আমার কাছে। চারিধারে বড় বড় শাল ও ভেলা গাছ, মাঝে মাঝে ধাতুপ ফুলের ঝোপমতো গাছ—একদিকে তো ধাতুপ ফুলেরই বেড়া। শাল গাছের ফাঁক দিয়ে একটা পুকুর দেখা যাচ্চে কিছু দূরে। দূর ও নিকটে শৈলশ্রেণী, প্রকৃতপক্ষে স্থানটির চারিধার ঘিরেই শৈলমালা, মধ্যে যেন একটি বড় উপত্যকা।

এই অঞ্চলের সব বন পাহাড় ও গ্রাম 'ছত্তিশগড়ি' পরগনার মধ্যে পড়ে।

পূর্বে এই দিকের সব স্থান মারহাট্টা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখনও অনেক ছত্তিশগড়ি মারহাট্টা পরিবার এই সব গ্রামের অধিবাসী। তবে স্থানীয় আদিম অধিবাসী গোঁড়দের সংমিশ্রণে এদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক জায়গায় উভয় জাতির আচার ব্যবহার উভয়ের মধ্যে বিস্তৃতি-লাভ করেচে, বিশেষ করে এই সব দুর্গম বন্য-অঞ্চলে।

চুনের ভাঁটির গদিতে বসে কাজ করচেন জনৈক মারাঠী ভদ্রলোক। তাঁর চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদ, মাথার মুরাঠা সবই আমার চোখে অদ্ভুত লাগলো। আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি উঠে এলেন আমার কাছে। হিন্দীতে বললেন—আপনি কোথা থেকে আসচেন? আমি পরিচয় দিতে তিনি যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বললেন—আসুন, আমার গদিতে একটু বসুন।

গিয়ে বসলুম তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোকের চেহারা এমনি যে বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়; সুন্দর বলে ততটা নয়, যতটা কিনা আমার চোখে অপরিচিত সাজপোশাক ও মুখের গড়নের জন্মে।

আমায় বললেন—আজ আমার ওখানে দয়া করে থাকতে হবে। আমার বন্ধু অনেক বাঙালী আছেন, আমি বাঙালীদের বড় ভালোবাসি। আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের মূলে রয়েচে বাঙালী। এই সম্পর্কে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের নাম উল্লেখ করলেন বারবার অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে ছত্তিশগড়ির শৈলারণ্যবেষ্টিত ক্ষুদ্র এক গ্রামে এক চুনের ভাঁটিতে বসে আমার মাতৃভূমির দুজন সুসন্তানের নাম উচ্চারিত হতে শুনে গর্বে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠলো।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক, রংড়ে ব্রাহ্মণ, বাড়ি খাণ্ডোয়া নাগপুরের ওদিকে। এখানে এই চুনাপাথরের খনি ইজারা নিয়ে ভাঁটিতে চুন পুড়িয়ে মোটর লরি করে এগারো ক্রোশ দূরবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে চালান দেন। আমি যে পথে এসেচি, ও পথে বা স্টেশনে নয়, কারণ ওটা মোটর গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নয়।

বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও একটি দশবৎসরের ছেলে থাকে বাসায়। সকলেই আমার সামনে বার হলেন বটে, মেয়েরা কিন্তু কথা কেউই বললেন না।

গৃহস্বামী জিজ্ঞেস করলেন—আপনি স্নান করুন। জল তুলে দেবে, না পুকুরে নাইবেন?

—পুকুরের জল ভালো?

—খুব ভালো, এমন জল কোথাও দেখবেন না।

সত্যিই শালবনের মধ্যে পুকুরটিতে স্নান করে খুব আরাম হল। আজ মেঘ মোটেই নেই আকাশে, বেশ রৌদ্র চড়েচে, এতখানি ঘোড়ায় চড়ে এসে গরম বোধ হচ্ছিল দস্তুরমত। তা ছাড়া, চালবিহীন ঘোড়ার চড়ার দরুন পেটে খিল ধরে গিয়েচে।

বালকৃষ্ণজী বললেন—আমরা কিন্তু মাছমাংস খাইনে বাবুজী—আপনার বড় অসুবিধে হবে খেতে।

আমি শশব্যস্ত হয়ে বললুম—কি যে বলেন! তাতে হয়েচে কি? আমি মাছমাংসের ভক্ত নই তত।

খাবার জিনিস অতি পরিপাটী। 'তুপ' অর্থাৎ ঘিয়ে ডোবানো মোটা আটার রুটি, কুমড়োর ছোঁকা, পাঁপর, ছোলার ডাল, চাটনি ও মহিষের দুধের দই। বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক একা আহার করলেন আমার মতো সাত জনের সমান। সেই মোটা রুটি আমি চারখানার বেশি ওঁদের অত্যন্ত অনুরোধ সত্ত্বেও খেতে পারলুম না, উনি খেলেন কম্‌সে কম ষোলখানি। সেই অনুপাতে ডাল-তরকারি ও দইও টানলেন।

আহারাদির পর তাঁকে বললুম—এদেশে অন্য কি ব্যবসা সুবিধে?

—আপনি যেখানে যাচ্চেন, ওদিকে জঙ্গল বেশি, অনেকে জঙ্গল ইজারা নিয়ে কাঠ বিক্রি করে।

—কোনো বাঙালীকে ব্যবসা করতে দেখেচেন এদিকে ?

—একজন আছেন তাঁর নাম আমি জানিনে, অমর-কণ্টকের কাছে অনেক বন তিনি ইজারা নিয়ে কাঠ চালান দিতেন জানি।

বন কোথাও কেটে ফেলেচে, একথা আমার ভালো লাগে না। অর্থের জন্যে প্রকৃতির হাতে সাজানো অমন সৌন্দর্যভূমি বিনষ্ট করা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু না। এমন একদিন আসবে যেদিন লোকে এ ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু অরণ্য সৌন্দর্য তখন পৃথিবীতে কোথাও অবশিষ্ট থাকবে কিনা কে জানে ?

এখান থেকে দারকেশা মাত্র দশ মাইল। সন্ধ্যার মধ্যে সেখানে পৌঁছনো যাবে। আমি আমার সঙ্গীদের বললুম, কার্গিরোড থেকে মোটে বত্রিশ মাইল শুনেছিলুম দারকেশা, এ তো তার অনেক বেশি হয়ে গেল—

ওরা বললে—বাবু, চল্লিশ মাইলের ওপর ছাড়া কম হবে না, তবুও আপনাকে আমরা খানিকটা সোজা পথ দিয়ে এনেচি। আসল পথটা ঘুরানো, কিন্তু এর চেয়ে ভালো।

সালকোণ্ডা চুনের ভাঁটি ছাড়িয়ে জমি ক্রমশ নীচু হয়ে গেল। যখনই এমন হয় তখনই আমি জানি এবার নিশ্চয়ই কোনো নদী আছে সামনে। হলও তাই, একটা খরস্রোতা পাহাড়ী নদী পড়লো সামনে, তার নামও সালকোণ্ডা। নদীর ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে পুল তৈরি করা, তার ওপর দিয়ে ঘোড়া যাবে না, অথচ নদীর বেগ দেখে মনে হল, না জানি গভীরতাই বা কতটা!

ঘোড়া নামিয়ে দিলুম। দেখি ক্রমশ জল বাড়চে, ক্রমে আমার এমন অবস্থা হল রেকাব থেকে পা তুলে পা দুখানা মুড়ে জিনের দুপাশে নিয়ে এলুম, তখনও জল বাড়চে। পার্বত্য নদীতে বৃষ্টি নামলেই আর দেখতে হবে না কোথা থেকে যে জল বাড়বে! জিনে পর্যন্ত জল ঠেকিয়ে তখন ঘোড়া দেখি আর একটু উঁচু জায়গায় পা পেলে। ডাঙায় উঠে এমন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো বুনো ঘোড়াটা যে, আমায়সুদ্ধ, জিনসুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল আর কি। যে ঘোড়ার চাল থাকে না, সে ঘোড়ার আদব-কায়দা কখনই সুমার্জিত ও ভদ্রতাসঙ্গত হয় না, এ আমি বহুদিন থেকে দেখে আসচি।

এই দশ মাইলের শোভা কিছুই নেই, তবে এক চক্রবাল থেকে অন্য চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উঁচুনীচু মরুম-কাঁকরের ডাঙার যদি কারোর কাছে মূল্য থাকে, সে হিসেবে এ অঞ্চলের তুলনা নেই।

শুধু Space যাদের ভালো লাগে, জনহীন মুক্ত Space, তাদের কাছে এমন স্থান হঠাৎ কোথাও মিলবে না। পৃথিবীর মুক্ত-রূপের মহনীয় সৌন্দর্যে এ স্থান সত্যিই অতুলনীয়।

তবে অনেকে এর মধ্যে গাছপালা হয়তো দেখতে চায়, হয়তো ভাবে, এতটা ফাঁকা কেন রে বাপু, মাঝে মাঝে দু-দশটা শালঝোপ থাকলে এমন বা কি মন্দ হত!

কিংবা যদি থাকতো মাঝে মাঝে শিমুল গাছ বা রক্তপলাশ, তবে ফাল্গুন মাসের প্রথমে ফুল ফুটলে এই অঞ্চল হয়ে উঠতো মায়াময় পরীরাজ্য।

এই সব ভাবতে ভাবতে বেলা প্রায় পড়ে গেল। রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। সেই সময় অপূর্ব দৃশ্য। হঠাৎ আমি ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

বহু দূরে, পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের অনেকটা জুড়ে কালো বনরেখা দেখা দিয়েচে। রেখা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো, তখন বেলা নেই, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো। আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলুম, ওই কি দারকেশা?

ওরা বললে, বন আরও অনেক দূরে, দারকেশা আর বেশি দূর নেই।

একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে অনেকগুলো ঘরবাড়ি দেখা গেল, এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি। ওরা বললে—ওই দারকেশা।

আমার বন্ধুটি এখানে কণ্ট্রাক্টারি করেন। দু পয়সা হাতে যে না করেচেন এমন নয়! অনেক দিন পরে একজন বাঙালী বন্ধু পেয়ে তিনি খুব খুশী।

আমি রোজ সকালে উঠে বনের দিকে বেড়াতে যাই, কখনো ফিরি দুপুরে, কোনদিন সন্ধ্যাবেলা। বন্ধু বললেন—বনে যখন তখন অমন যেও না—বড্ড জন্তু-জানোয়ারের ভয়।

—কি জন্তু?

—ভাল্লুক তো আছেই, বাঘ আছে, বুনো কুকুর আছে।

দারকেশা একটি ছোট বস্তি।

এর পশ্চিম দিকে চক্রবাল জুড়ে অরণ্যরেখা ও শৈলশ্রেণী। গ্রাম থেকে বনের দূরত্ব দু মাইলের বেশী নয় কিন্তু বন এখানে কোণাকুণি ভাবে বিস্তৃত, উত্তরপশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের দিকে চলে গেল লম্বা টানা বনরেখা; যে জায়গাটা খুব নিকটে এসে পড়েচে, সেইটিই দু মাইল।

বনের মধ্যে ছোট বড় চুনাপাথরের টিলা ও অনুচ্চ শিলাশৃঙ্গ। এই বন তেমন নিবিড় নয়। এক ধরনের শুভ্রকাণ্ড, বনস্পতিজাতীয় বৃক্ষ এই বনে আমি প্রথম দেখি। এর গুঁড়ি ও ডালপালা দেখলে মনে হবে কে যেন গাছের গায়ে পঙ্খের কাজ করেচে, চক্‌চকে সাদা। গুঁড়ির গায়ে হাত দিলে হাতে খড়ির গুঁড়োর মতো এক প্রকার সাদা গুঁড়ো লেগে যায়, মুখে মাখলে পাউডারের কাজ করে। এই গাছের নাম রেখেছিলুম শিব গাছ।

দারকেশা একটা উঁচু পাথুরে-ডাঙার ওপর, তিনদিক থেকে ডাঙাটা নীচু হয়ে সমতল জমির সঙ্গে মিশেচে, ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝরনা ডাঙার নীচে বয়ে যাচ্চে ঝিরঝির করে, ঝরনায় দুধারে ছোট ছোট গাছ ও এক প্রকারের লতার ফুল।

এখানে ছত্রিশগড়ি রাজপুত অধিবাসীদের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী আছে, সে আমার বন্ধুর অধীনে কাঠ যোগানোর কাজ করেছিল অনেকদিন।

লোকটার নাম মাধোলাল। আমি তার সঙ্গে অনেক সময় বসে বসে তাদের দেশ সম্বন্ধে গল্প করতুম।

মাধোলাল একদিন আমায় তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে। খাওয়ালে মোটা মোটা যবের আটার রুটি, উচ্ছে ভাজা ও লঙ্কার আচার। এদেশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ খাওয়ানো উচিত বলে আদৌ ভাবে না, যা হয় খাওয়ালেই হল।

মাধোলালের বাড়ি খেয়ে আমার পেট ভরলো না। রুটি দিয়ে উচ্ছে ভাজা কখনো খাইনি, সুখাদ্যের তালিকার মধ্যে অন্তত আমি এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের নাম করতে পারিনে। শেষকালে এল যে জিনিসটা, তাকে আমি নাম দিয়েচি গমের পায়েস।

কাঁচা গমের ছাতুর সঙ্গে দুধ আর ভেলিগুড় গুলে এই জিনিসটি তৈরী, তার সঙ্গে মেথি বাটা ও হিং মিশানো, বাঙালীর মুখে অখাদ্য!

খাওয়ার পরে মাধোলাল আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলে।

—বাবুজি, আপনি এদেশে বাস করুন।

—কেন মাধোলালজি?

—আপনাকে বড় ভালো লাগে। এদেশে বিয়ে করুন না?

—বলো কি মাধোলালজি। আমাদের সঙ্গে গৌড়া ছত্রিশগড়ি সমাজের কে মেয়ের বিয়ে দেবে?

—বাবুসাহেব, বলেন তো যোগাড় করি। কেন দেবে না?

—আছে নাকি সন্ধানে?

—আপনি বললেই সন্ধান করি। আছেও।

—এই গাঁয়েই নাকি?

—হ্যাঁ বাবুজি। ব্রাহ্মণের মেয়ে, দেখতে বেশ সুন্দরী।

—গৌড় সমাজের?

—না বাবু, গৌড়দের জন্যে মিশনে পালিতা মেয়ে। ইংরিজি লেখাপড়া, সূচের কাজ, রান্না—সব জানে।

মনে মনে মাধোলালের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না। মিশনে পালিতা মেয়ে ছত্রিশগড়ি সমাজের কেউ বিয়ে করবে না জেনে শুনে। তবে বাঙালী বাবুদের জাতও নেই, সমাজও নেই, দাও তার ঘাড়ে চাপিয়ে।

আমার বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম মাধোলাল একজন সমাজসংস্কারক। মেয়েটিকে সে এনে নিজের বাড়িতেই রেখে দিয়েচে আজ চার-পাঁচ বছর, তাকে ভালো জায়গায় বিয়ে দেওয়া মাধোলালের একটা সাধ।

মাধোলাল দু তিন-দিন পরে আমায় আর একদিন রাস্তায় পাকড়ালে।

—বাবুজি, আমার সেই কথার কি হল?

—সে হবে না মাধোলালজি।

—কেন বাবুজি, মেয়ে আপনি দেখুন কেমন, তারপর না হয়—

—না মাধোলালজি, মিশনের মেয়ে আমাদের সমাজে চলবে না। আমাদেরও তো সমাজ আছে, না নেই ?

—বাবুজি আপনি না করেন, ওর একটি ভালো পাত্র তবে যোগাড় করে দেবেন ?

—আমি কথা দিতে পারিনে মাধোলালজি, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

দারকেশা থেকে এগারো মাইল দূরবর্তী গভর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ফরেস্ট একদিন দেখতে গেলুম। সেদিন সঙ্গে কেউই ছিল না—আমি ঘোড়া করে বেলা দশটার সময় বার হয়ে বেলা একটার সময় একেবারে পথহীন বিজন বনের মধ্যে গিয়ে পড়লুম।

বড় বড় গাছ, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি—নীচে কোথাও যেন মাটি নেই, শুধুই সাদা পাথরের নুড়ি ছড়ানো—মাঝে মাঝে ঝরনা। এ বনেও অনেক বুদ্ধ-নারিকেলের গাছ দেখা গেল। ঝরনার ধারে ঘন জঙ্গল, অন্যত্র বন এত ঘন নয়। এই বনে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া ফুলের (Lantana Camera) ভিড়, বিশেষ করে ঝরনার ধারে। এই সুদৃশ্য ফুল এখানে ফুটেচে খুব বেশি ও নানা রঙের।

বনের মধ্যে এক জায়গায় বাঘ শিকারের মাচান বাঁধা। দেখে মনে হল কিছুদিন আগে এখানে কেউ শিকার করতে এসেছিল। এই বন যে হিংস্রজন্তু-অধ্যুষিত, তা মনে পড়লো এই মাচান দেখে—আরও গভীরতর অরণ্যে অবেলায় প্রবেশ করা সমীচীন হবে না ভেবে ঘোড়ার মুখ গ্রামের দিকে ফেরালুম।

পথে একজন খাকী পোশাক পরা কালো লোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি গবর্নমেণ্টের অরণ্যবিভাগের জনৈক কর্মচারী। আমায় দেখে বললে—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

আমি বললুম, বনে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

লোকটি বললে—অন্যায় করেচেন, একা যাওয়া আপনার উচিত হয়নি। বনে বাঘের ভয় আছে, এ সব অঞ্চলের বাঘ বড় খারাপ। একটা মানুষ-খেকো বাঘও বেরিয়েচে বলে জানি।

সামনে আসচে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাত্রি। আমার প্রবল আগ্রহ ছিল অমন জ্যোৎস্নারাত্রিটি বনের মধ্যে কোথাও যাপন করা। অনেক বক্তৃতা দিয়েও একজন লোককেও যোগাড় করা গেল না যে আমার সঙ্গী হতে পারে, কারণ মানুষ-খেকো বাঘের কথা কানে শুনে সেখানে একা যেতে চাইবো এমন সাহস আমার ছিল না।

অবশেষে দারকেশার পূর্বপ্রান্তে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর সে রাত্রে খানিকক্ষণ বসে থেকে আমার সাধ খানিকটা মিটলো। আমার সঙ্গে গ্রামের দু-তিন জন লোকের মধ্যে মাধোলালও ছিল।

মাধোলাল এই অরণ্য-অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানে। আমায় বললে, বাবুসাহেব, আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না।

—কেন মাধোজি ?

—মন হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় সব চাপা।

—বনের মধ্যে গিয়েচ রাত্রে ?

—অনেকবার বাবুজি। আমার এক বন্ধু ভালো শিকারী ছিল, সে বনে মাচান বাঁধলে, বাঘ শিকার করবার জন্তে। অনেকদিন আগের কথা।

—তারপর ?

—আমি বললুম আমায় সঙ্গে নাও। সে প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, তারপর রাজি হল একটা শর্তে। বললে—মাচানে তোমায় বেঁধে রাখা হবে। আমি তো অবাক, বেঁধে রাখা হবে কেন ? সে বললে, যখন বাঘ আসবে, তখন তুমি এমন লাফ-ঝাঁপ মারবে ভয়ে যে মাচান থেকে পড়ে যেতে পারো—হয়তো আমারও বিপদগ্রস্ত করতে পারো। আমি রাগ করলুম বটে মনে মনে, কিন্তু রাজি হয়ে গেলুম।

—বেঁধে রাখলে নাকি ?

—মাচানের খুঁটি আর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে রাখলে। পরে বুঝে-ছিলুম এই বেঁধে রাখবার জন্তই সেদিন আমার আর আমার বন্ধুর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। রাত বেশি হল, মাচার ওপর আমরা মাত্র তুজন। এই যে বন দেখচেন, এই বনেরই ব্যাপার। তবে তখন আরও ঘন ছিল, এখন ইজারাদারেরা কেটে কেটে অনেক সাবাড় করে দিয়েচে। অনেক রাত্রে বাঘ এল—প্রকাণ্ড ম্যান-ঈটার। আমার বন্ধু বললে—গুলি করো। আমি জীবনে তখন বন-মুরগী ছাড়া কোনো বড় জন্তু মারিনি—আর বুনো বাঘ কখনো দেখিওনি। তার গর্জন শুনে আর চেহারা দেখে আমার হাত পা কাঁপতে লাগলো। বন্দুক হাত থেকে পড়ে যায় আর কি। তারপর সেই বাঘ যখন আমার বন্ধুর গুলি খেয়ে লাফ মেরে ভীষণ হাঁক দিয়ে দিয়ে সামনে উঠতে গেল—আমি মাচানের পেছন দিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়বার চেষ্টা করলুম।

আমার তখন জ্ঞান নেই, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েচে ভয়ে। তু-তুবার বাঘ লাফ মারলে তু সেকেণ্ডের মধ্যে তুবার, আমি পেছন থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়বার চেষ্টা করলুম সেই তুই সেকেণ্ডের মধ্যে। পারলুম না শুধু গাছের সঙ্গে বাঁধা আছি বলে। তখন বন্ধু বললে, যদি তোমায় না বাঁধতুম, বুঝেচ এখন কি হত ?

—বাঘ মারা পড়লো শেষ পর্যন্ত ?

—নাঃ, সে রাত্রে সেটা পালালো। পরদিন সকালে এক মাইল দূরে এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে বসে আছে, তখন আবার গুলি করা হল। বাঘ চার্জ করলে—তখন তুই ভুরুর মাঝখানে আর এক গুলি। ওই হচ্চে আসল জায়গা, যতক্ষণ ওখানে গুলি না লাগচে, ততক্ষণ বাঘ বা কোনো জন্তু কাবু হবে না। অন্ত যে কোনো জায়গায় গুলি লাগলে, বাঘ জখম হতে পারে বটে, মরবে না।

আমি জানতুম মাধোলাল বড় শিকারী না হলেও ইদানীং জানোয়ার মেরেচে অনেক। আমার বন্ধুর মুখেই ওর শিকারের অনেক গল্প শুনেচি।

বললুম—আচ্ছা মাধোলালজি, অনেক বনে তো বেড়িয়েচ, কখনো কোনও অদ্ভুত ধরনের জানোয়ার, যার কথা কেউ জানে না—এমন কিছু দেখেচ ?

আমার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এমন সুন্দর জ্যোৎস্না-রাত্রিতে এই বৃহৎ অরণ্যের প্রান্তে বসে মনে একটু রহস্য ও ভয়ের ভাব নিয়ে আসা। জীবনকে উপভোগ করবার একটা দিক হচ্চে, যে-সময়ে যে-রসের বা অনুভূতির আবির্ভাব প্রীতিকর—সে সময়ে সেটি মনে আনবার চেষ্টা করতে হবে। দূরে বনরেখা জ্যোৎস্নার আলোয় অস্পষ্ট দেখালেও টানা, সোজা, কোণাকুণি রেখাটি টের্চা ভাবে দূরদিগন্তে যে কোন্ মায়ালোকের সীমা নির্দেশ করচে, আকাশচ্যুত জ্যোৎস্না-রাত্রির দল যেন ওই বনের অন্তরালে দল পাকিয়ে থাকে—আরও কত অজানা সৌন্দর্য, অজানা ভয়, অজানা বিপদের দেশ ওটা।

আমার সামনে বড় একটা শিলাখণ্ড, তার গা ঘেঁষে একটা বাঁকা গাছ। গাছটার বড় বড় পাতা, অনেকটা পেঁপে পাতার মত, পাথরখানার ওপর অনেকগুলো শুকনো পাতা ঝরেও পড়েচে—তার মধ্যে খড় খড় শব্দ করে এদেশী বড় বহুরূপী যাতায়াত করচে।

মাধোলাল আমার কথার উত্তরে বললে—না বাবুজি, তা কখনো দেখিনি।

—দেখ ভেবে। তোমার দেখে আশ্চর্য মনে হয়েছিল, এমন কিছু?

আমি ওকে ছাড়চিনে, ও না বললে কি হবে? এমন সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে ওর মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের গল্প না শুনলেই চলবে না আমার।

কিন্তু মাধোলাল অনেক আকাশপাতাল ভেবেও কিছু বার করতে পারলে না। অদ্ভুত জানোয়ার কিছু দেখেনি, তবে বাঘ তারপর দু-চারটে মেরেচে, ভালুক, শূয়োরও—আর হরিণের তো কথাই নেই।

বললুম—তবে মাধোলাল, আমার একটা আশ্চর্য গল্প শুনবে?

মাধোলাল উৎসাহের সঙ্গে বললে—নিশ্চয়ই, বলুন।

বানিয়ে বানিয়ে ওকে একটা খুব বড় ও অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারের গল্প করলুম—আরাকান ইয়োমোর জঙ্গলে দেখেছিলুম। মাধোলাল বিশ্বাস করলে। আমার উদ্দেশ্য খানিকটা ভয় ও রহস্যের সৃষ্টি করা, এই অরণ্য-প্রান্তের এমন অপূর্ব পূর্ণিমারাত্রিকে আরও নিবিড় ভাবে পাবার জন্যে।

শীত করতে লাগলো। তখন রাত বারোটার কম নয়।

আমি ওকে বললুম—এ বন খুব বড়।

—রেওয়া স্টেট পর্যন্ত চলে গিয়েচে—বেশি নয়, মাইল বাইশ-তেইশ এখান থেকে। ওদিকে অমর-কণ্টক পর্যন্ত চলেচে। খুব বড় বন।

—বেশ দেখবার জায়গা—না? সিনারি ভালো?

—সিনারি আপনারা কাকে বলেন বুঝি না। তবে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে গেলে আর বাড়ি ফিরে আসতে ইচ্ছা করে না, এখানেই থাকি মনে হয়। একটা জায়গার কথা বলি। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই বনের একটা পাহাড়ের নাম ঘোড়াঘাটির পাহাড়। দেখতে চান তো একদিন নিয়ে যাবো। সাদা পাথরের পাহাড়টা, অনেকটা উঁচু, বড্ড কাঁটাগাছের জঙ্গল, আর পাথরের ফাটলে পাহাড়ী মৌমাছির চাক। গ্রামের লোকেরা ঘোড়াঘাটির পাহাড়ে

মধু সংগ্রহ করতে যায় চৈত্র মাসে। সে সময় একরকম সাদা ফুল ফোটে, খুব বড় বড়, ভারি সুগন্ধ। ঘোড়াঘাটির পাহাড়ে ওই ফুলের গাছ অনেক। বেশ বড় গাছ। আপনি গিয়ে দেখবেন, যাকে আপনারা সিনারি বলেন, তা আছে কি না।

—এখান থেকে কতদূর হবে?

—তা তেরো-চোদ্দ মাইল হবে। ঘোড়াঘাটি পাহাড়ের গায়ে দুটো গুহা আছে, একটার মধ্যে একজন সাধু থাকতেন—আজ প্রায় পনেরো বছর ছিলেন। এখন কোথায় চলে গিয়েচেন। আর একটা গুহায় ঢোকা যায় না, মুখটা কাঁটাজঙ্গলে বুজোনো। যাবেন একদিন?

যাবার যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও আমার সেখানে যাওয়া হয়নি।

এর দুদিন পরে আমি এখান থেকে রওনা হই পদব্রজে। বনের মধ্যে দিয়ে উনিশ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে তবে রেওয়া স্টেটের প্রান্তে শালগড়িসান্তারা ডাকবাংলো। বনের বিচিত্র শোভা এই উনিশ মাইল পায়ে হেঁটে না গেলে কিছু বোঝা যেতো না।

আসল ভারতবর্ষের রূপ যেন দেখচি, প্রাচীন ভারতবর্ষ। আর্যাবর্তের বিশাল সমতলভূমি নয়, যা নাকি গঙ্গা ও যমুনার পলি-মাটিতে সেদিন তৈরী হল—কালকের কথা।

এ ভারতবর্ষ যখন হয়েচে তখন হিমালয় পর্বত গজায়নি, বহু প্রাচীন যুগ-যুগান্তের পূর্বের বৃদ্ধতম ভারতবর্ষ এ; এর অরণ্য এক সময় বৈদিক আর্যগণের বিস্ময়, রহস্য ও ভীতির বস্তু ছিল; প্রথম ইউরোপীয় পর্যটকদের কাছে কঙ্গো ও ইউগাণ্ডার আগ্নেয় গিরিশ্রেণী ও ঘনারণ্য যেমন ছিল, ঠিক তেমনটি।

বনের অদ্ভুত রূপ দেখতে হয় যদি তবে পদব্রজে এ পথে অমরকণ্টক পর্যন্ত যাওয়া উচিত। তবে হিমারণ্যের মতো বিচিত্র বনপুষ্পশোভা এ বনে নেই, মধ্যপ্রদেশের বনভূমির রূপ অন্য ধরনের, একটু বেশি রুক্ষ ও অনাড়ম্বর।

বনপুষ্প ও ফার্ন পাওয়া যায় যেখানে আছে বড় বড় পাহাড়ী ঝরনা, তার ধারে বড় বড় আর্দ্র শিলাখণ্ডের গায়ে কত কি ছোট ছোট লতা ও চারাগাছে রঙীন ফুল ফুটে আছে বটে কিন্তু বাইরের বনে এ সময়ে কোনো ফুল দেখিনি, কেবল বন্য শেফালি ছাড়া।

এ বনে বন্য শেফালি গাছ অজস্র। পথের ধারে যা পড়ে, তাতেই আমার মনে হয়েচে এই গাছের সংখ্যা এ অঞ্চলে যথেষ্ট। তবুও আমি গভীর বনের মধ্যে যাইনি, আমার সঙ্গে চার-পাঁচজন অমর-কণ্টকের যাত্রী ছিল, তারাও আমাকে পথ ছেড়ে অরণ্যের অভ্যন্তরপ্রদেশে ঢুকতে দেয়নি।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম পড়ে। গ্রামে ছোট মুদীর দোকান, সেখানে সিজার সিগারেট পর্যন্ত পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় আটা, ডাল, ভেলিগুড়, নুন, মোটা চাল। বিভিন্ন মিশন সোসাইটি এইসব বন্য-পল্লীতে স্কুল বসিয়ে গোঁড়দের শিক্ষাদানে যথেষ্ট সাহায্য করচে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা কোনো কোনো গ্রামে নিতান্ত কম নয়।

দুপুরে নিভৃত কোনো ঝরনার ধার খুঁজে নিয়ে গাছের নিবিড় ছায়ায় আমরা রান্না চড়াতুম। আমাদের দলের পাচক ছিল মান্দারু বলে একটি ছোকরা। সে মাধোলালের

বাড়িতে প্রতিপালিত হয়েছিল ছেলেবেলা, এখন কাঠের মিস্ত্রির কাজ করে। যদিও সে একজন দস্তুরমত ভবঘুরে, কোথাও বেশিদিন থাকা তার ধাতে নাকি একেবারেই সয় না।

আমি বলতুম—আজ কি রান্না হবে মান্দারু?

—আটা আর দাল।

—আর কি রাঁধতে জানো?

—আর আলুর চোখা।

দুবেলা এই একই রান্না, নতুনত্ব নেই। আটার হাতে-গড়া রুটি, অড়রের ডাল আর আলুর চোখা। এমন বিচিত্র রান্না জীবনে কখনো খাইনি। এমন ঘোর আনাড়ি ও প্রতিভা-বিহীন রাঁধুনিও সহজে খুঁজে মিলবে না। এতদিন হাতে-কলমে রান্নার কাজ করা সত্ত্বেও মান্দারু এতটুকু উন্নতি করতে পারেনি ও কাজে, কোনদিন পারবেও না।

বনের মধ্যে যে-কটি অদ্ভুত দিন কেটেছিল, তার কথা জীবনে কখনো ভুলব না। মধ্যপ্রদেশের এইসব বনে যথেষ্ট হিংস্রজন্তুর বাস বটে—কিন্তু আমরা কোনোদিন কিছু দেখিনি। আমার একজন সঙ্গী একরাত্রে বললে, সে নাকি বাইসন দেখেচে—কিন্তু তার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি।

প্রথমে তো, বাইসন মাদ্রাজ অঞ্চলে ছাড়া ভারতের অন্য কোনো বনে দেখা যায় না। মধ্যপ্রদেশে 'গৌর' বা 'গায়ের' বলে যে মহিষজাতীয় জন্তু আছে তাকে অনেকে 'ইণ্ডিয়ান বাইসন' বলেন বটে কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বনে 'গৌর' প্রায় নির্বংশ হয়ে এসেচে। শিকারীরা বন-বাদাড় ঠেঙিয়েও তার সন্ধান পান খুবই কম। দ্বিতীয় কথা, এই বন্যজন্তু অত্যন্ত হুঁশিয়ার, মানুষের সাড়াশব্দ তারা অনেক দূর থেকে পায় এবং সে জায়গার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

তবে শেয়াল প্রায়ই যেতো—আর দেখতুম ময়ূর; প্রায়ই ময়ূর ডাল থেকে উড়ে বসত পথের ওপর। ময়ূর ছাড়া আরও অনেক পাখী ছিল সে বনে; দুপুরে যখন গাছতলায় একটু বিশ্রাম করতুম, তখন বিহঙ্গ-কাকলী আমাদের পথশ্রান্তি দূর করতো।

এই রকম বেড়াবার একটা নেশা আছে—বড় ভয়ানক নেশা সেটি। তা মানুষকে ঘরছাড়া করে ভবঘুরে বানিয়ে দেয়। আমরা যে ক-জন বনের পথে চলেচি, সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করছিলুম সেই অদ্ভুত ও তীব্র আনন্দ, শুধু মুক্ত জীবনেই যার দেখা মেলে।

আমরা সাধারণত রাত্রে কোনো একটা গ্রামে আশ্রয় নিতুম, সকাল হলে হাঁটা শুরু করে দুপুরের মধ্যে দশ-বারো মাইল কি পনেরো মাইল পার হয়ে যেতুম। এই সকালের হাঁটাই হল আসল। বিকেলে বেশিদূর যেতে না যেতে বনের মধ্যে ক্রমশ ঘন ছায়া নেমে অন্ধকার হয়ে আসতো, তখন কোথাও আশ্রয় না নিলে চলতো না।

দুপুরে অনেকখানি পথ হেঁটে একটা সুন্দর জায়গা আমরা বেছে নিতুম যেখানে বড় বড় গাছের ছায়া, ঝরনার জল কাছে, বসবার উপযুক্ত শিলাখণ্ড পাতা, পাখীর কাকলীতে বনভূমি মুখর। তারপর মান্দারু জায়গাটা ডালপালা ভেঙে পরিষ্কার করতো, আমরা কম্বল পেতে

ফেলতুম তিন চারখানা—কখনো বা জোড়া দিয়ে, কখনো আলাদা আলাদা। কতরকমের গল্প হত, চা চড়তো, আমরা চা খেয়ে খুব খানিকটা বিশ্রাম করে ঝরনার জলে নেমে আসতুম—এদিকে মান্দারু রান্না চড়িয়েচে, আরও কিছুক্ষণ বসবার পরে মান্দারু শালপাতায় আমাদের ভোজ্য পরিবেষণ করতো। খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টাখানেক সবাই ঘুমিয়ে নিতো, তারপর আবার উদ্যোগ করে তাঁবু উঠিয়ে সবাই মিলে রওনা হওয়া যেতো।

কোন উদ্বেগ নেই, চিন্তা নেই মনে—দূর কোনো বৃক্ষচূড়ায় ময়ূরের ডাক, বনের ডালপালায় বাতাসের মর্মর শব্দ, ঝরনার কলতান, প্রচুর অবকাশ ও আনন্দ, এ যেন আমরা আবার আমাদের প্রাচীন অরণ্য জীবনে ফিরে গিয়েচি। বিংশ শতাব্দীর কর্মবহুল দিনগুলি থেকে পিছু হেঁটে দায়িত্বহীন মুক্তজীবনের আনন্দে আমাদের মন ভরপুর। তা ছাড়া, এই বিরাট বনপ্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যও আমাদের সকলের মনে কেমন একটা নেশা জাগিয়ে তুলেচে।

আমাদের মধ্যে একজন বললে, তার কোনো এক বন্ধু আলমোড়া থেকে পায়ে হেঁটে হিমারণ্যের বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে ওই পথে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাবার জন্যে বেরিয়েছিল, সে আর ফিরে এল না। এখন ওইখানে কোনো জায়গায় থাকে, সাধুসন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে। হিমালয়ের নেশা তাকে ঘরছাড়া করেচে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটি ক্ষুদ্র গোঁড় বস্তিতে পৌঁছলুম। আমাদের থাকবার উপযুক্ত ঘর নেই সেখানে, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, তাদেরই জায়গা কুলোয় না। অবশেষে একটা গোয়াল ঘরে আমাদের জায়গা করে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বস্তির লোকজন আমাদের ঘিরে গল্প-গুজব করতে এল।

একজন বললে—তোরা ভাল্লুকের ছানা কিনবি ?

আমরা দেখতে চাইলুম। তারা দুটি ছোট লোম-ঝাঁকড়া বিলিতি কুকুরের ছানার মতো জীব নিয়ে এল। মাত্র দুমাস করে তাদের বয়েস, এই বয়সেই বড় কুকুরের মতো গায়ে শক্তি। ওরা বললে, একটা বাঘের বাচ্চাও ছিল, কিছুদিন আগে ডোঙ্গরগড় থেকে এক সাহেব শিকারী এসেছিল, তার কাছে ওরা সেটা বিক্রী করেচে।

আমরা ভালুকের ছানা কিনিনি, বনের মধ্যে কোথায় কি খাওয়াবো, দলের অনেকেই আপত্তি করলে।

বস্তিটাতে ঘর-দশেক লোক বাস করে। আমরা বললুম—তোমরা জিনিসপত্র কেনো কোথা থেকে ?

ওরা বললে—এখানে আমরা ভুট্টা আর দেধানার চাষ করি। নুন কিনে আনি শুধু অমর-কণ্টকের বাজার থেকে। তীরধনুক আছে, পাখী আর হরিণ শিকার করি। অমর-কণ্টকের মেলার সময় হরিণের চামড়া, ভালুকের ছানা, পাখীর পালক ইত্যাদি বিক্রী করি যাত্রীদের কাছে। তা থেকে কাপড় কিনে আনি।

বেশ সহজ ও সরল জীবনযাত্রা। তবে এরা বড় অলস। জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর সরলতাই এদের অলস ও শ্রমবিমুখ করে তুলেচে। পয়সা দিতে চাইলেও কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এরা

সহজে করতে রাজী হয় না। পয়সা রোজগার করবার বিশেষ ঝোঁক নেই। বিনা আয়াসে যদি আসে তো ভালো, নতুবা কষ্ট করে কে আবার পয়সা উপার্জন করতে যায়! সবগুলি বন্ত গ্রামেই প্রায় এই অবস্থা।

কতবার বলে দেখেছি—একবোঝা কাঠ ভেঙে এনে দে না, পয়সা দেবো।

ওরা সোজা জবাব দিয়ে বসে—আমাদের দিয়ে হবে না বাবু, আমরা পারবো না।

—পয়সা পাবি, দে না।

—কি হবে পয়সা বাবু। পারবো না আমরা।

অথচ পয়সা-কড়ি বিষয়ে এরা যে উদাসীন ও সরল, তা আদৌ নয়। সুবিধা পেলে বিদেশীকে ফাঁকি দিতে বা ঠকিয়ে জিনিস বিক্রী করতে ওস্তাদ। আসল কথা, খেটে পয়সা রোজগার করা ওদের ধাতে সয় না।

বেলা আটটার সময় ঘুম ভেঙে উঠে কানে শালপাতার পিকা বা বিড়ি গুঁজে, নিকটবর্তী কোনো জলাশয়ের ধারে সারাদিন বসে হয়তো মাছ ধরছে। মেয়েরা বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে এল, লোকটি চুপ করে ঠায় জলের ধারে অর্জুন গাছের ছায়ায় বসেই আছে। এক জায়গায় এতক্ষণ বসে থাকতেও পারে! দারকেশাতে এ দৃশ্য কতবার দেখেছি।

আর একটা জিনিস, এদের সময়ের জ্ঞান নেই অনেকেরই।

—বয়স কত?

—কি জানি বাবু।

—তবুও আন্দাজ?

—বিশ পঁচাশ হবে।

হয়তো উত্তরদাতার বয়েস ষাট পেরিয়েচে, তবুও তার কাছে বিশও যা পঞ্চাশও তাই। কতদিন আগে একটা ব্যাপার ঘটেছিল তার সঠিক ধারণা এদের একেবারেই থাকে না, অনেককে জিজ্ঞেস করে দেখেছি। সময়ের মাপজোপ সভ্যসমাজেই প্রয়োজন, সভ্যতার সংস্পর্শে যারা আসেনি তাদের সময়-সমুদ্রের উর্মিমালা গণনার প্রয়োজন কি।

আমরা দামুণ্ডি বলে একটা গ্রামে পৌছে দুদিন বিশ্রাম করলুম। এখান থেকে রেলওয়ে স্টেশন মাত্র ন-মাইল। অমর-কণ্টকের যাত্রীরা এখান থেকে হেঁটে অমর-কণ্টক চলে যাবে, আমি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠবো। দামুণ্ডি পৌছবার পূর্বে আমরা যে গ্রাম থেকে রওনা হই, তার অধিবাসীরা আমাদের বারণ করেছিল—বাবুসাহেব, ওপথে যাবেন না, বড় বাঘের ভয়, তিন-চারজন মানুষকে বাঘে নিয়েচে, গোরু-বাছুর তো রোজই নেয় বস্তি থেকে।

আমরা খুব সতর্ক হয়ে পথে হাঁটতুম, অথচ এই পথে বন খুব কম, মোরুম ছড়ানো ডাঙ্গাই প্রায় সবটা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বন-আর পাহাড়। এই ছোট বনের মধ্যেই নাকি বাঘে মানুষ নিয়েচে!

এই সব বন্তগ্রামে বাঘের উৎপাত খুব বেশি।

একজন বৃদ্ধ বললে—এমন গ্রাম নেই, যেখান থেকে বছরে দু-চারটে গোরু-বাছুর না নের, মানুষও নের মাঝে মাঝে।

—বাঘ ছাড়া আর কি জানোয়ারের উৎপাত আছে?

—বাঘের পরেই বুনো মহিষের উপদ্রব। ফসল বড় নষ্ট করে দেয় এরা।

—তোমরা কি কর তখন?

—আমরা আগুন জালি, টিন বাজাই—সারা রাত জাগতে হয় ক্ষেতের মধ্যে মাচা বেঁধে।

—বাঘ মারো না?

—বাবু, সবাই শিকারী নয় তো, বাঘ শিকার করা সহজ নয়। যখন বড্ড উৎপাত হয়, তখন অন্য জায়গা থেকে শিকারী ডেকে আনতে হয়।

—তীরধনুক দিয়ে বাঘ শিকার করে?

—চিরকাল তাই হয়ে এসেচে, যখন কিছুতেই না পারা যায়, তখন বন্দুকওয়ালা সাহেব শিকারীকে আনাতে হয়। তাও একবার এমনি হল, সাহেব শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে জখম হল, শহরের দাওয়াইখানায় নিয়ে যেতে যেতে পথেই মারা পড়লো।

—বড় সাপ দেখেচ কখনো? আছে এ বনে?

—বড় ময়াল সাপ আছে, তবে তাদের বড় একটা দেখা যায় না, পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের খোড়লে লুকিয়ে থাকে। একবার আমি একটা দেখেছিলুম। অনেকদিন আগের কথা, তখন আমার জোয়ান বয়স, পাহাড়ের ধারে ছাগল চরাতে গিয়েচি এমন সময় একটা ছাগল হঠাৎ ব্যা ব্যা করে ডাকতে লাগলো কোন্ দিক থেকে। অনেক ছাগল এদিকে-ওদিকে মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েচে, প্রথমটা তো বুঝতে পারিনি কোথা থেকে ডাক আসচে—

—তারপর?

—তারপর দেখি এক জায়গায় একটা বাবলা গাছ আছে, তার তলায় সামান্য একটু জায়গায় লম্বা ঘাসের বন, সেই বনটার মধ্যে থেকে ছাগলের ডাক আসচে। ব্যাপার কি দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ভীষণ অজগর সাপ ছাগলটার পেছন দিকের দুখানা ঠ্যাং একেবারে গিলে ফেলেচে। বাবলা গাছের গুঁড়িতে সাপটা জড়িয়ে ছিল, একবার একটু একটু করে পাক খুলচে। তখন আমি ছাগলের সামনের পা ধরে টানাটানি আরম্ভ করতেই সাপটা আর পাক না খুলে গাছের গুঁড়ি এমন জড়িয়ে এঁটে ধরলে যে আমি জোর করেও ছাগলটাকে ছাড়িয়ে নিতে পারিনে। ময়াল সাপের গায়ে ভীষণ জোর। তখন গ্রাম থেকে লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে সাপটা মেরে ফেলি।

দামুণ্ডি ছাড়িয়ে মাইল দশেক হেঁটে আমি অমর-কণ্টক রোড স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরলুম।

১৯৩৩ সালে খবরের কাগজে বার হল যে উড়িষ্যার অন্তর্গত সম্বলপুর জেলার বিক্রমখোল

নামক স্থানে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা পাহাড়ের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েচে। অনেক লোক দেখতে যাচ্চে এবং স্থানীয় পুলিসে লোকজন যাবার অনেক সুবিধে করে দিয়েচে। এ-কথাও কাগজে বেরিয়েছিল, স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর এবং হরিণ, বনমোরগ, সম্বর প্রভৃতি বন্যজন্তু যথেষ্ট পাওয়া যায়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক। সজনীবাবু আমাকে 'বঙ্গশ্রী'র তরফ থেকে বিক্রমখোল পাঠাতে সম্মত হলেন—সঙ্গে যাবেন 'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায় ও ফটো-গ্রাফার হিসাবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্তের মধ্যম ভ্রাতা প্রমোদরঞ্জনও আমাদের সহযাত্রী হবেন ঠিক হল।

৩রা মার্চ শুক্রবার আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে রওনা হবো ধার্য ছিল। এদিন বেলার তিনটের সময় আমি 'বঙ্গশ্রী' আপিসে গিয়ে কিরণ ও পরিমলবাবুকে তাগাদা দিলাম। পরিমলবাবু ক্যামেরা ও জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে আমার অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন। আমি বললুম—আপনারা রওনা হয়ে যাবেন সাতটার সময়ে, হাওড়া স্টেশনে বি. এন. আর-এর ইণ্টার ক্লাস টিকিটঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ আমি না যাই।

প্রমোদবাবুকেও ফোন করে সে কথা জানানো হল। বনজঙ্গলের পথে কয় বন্ধুতে মিলে একসঙ্গে যাবো, মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ। নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি শুধু কিরণবাবু দাঁড়িয়ে আছেন টিকিটঘরের সামনে। ট্রেন ছাড়তে মিনিট কুড়ি মাত্র বাকি—আমাদের দুজনেরই মন দমে গেল। বন্ধুরা সব একসঙ্গে গেলে যে আনন্দ হবার কথা, দুজনে মাত্র গেলে সে আনন্দ পাওয়া যাবে না। অনেকবার এ-রকম হয়েচে, যারা যারা যাবে বলেচে কোথাও, শেষপর্যন্ত তাদের অধিকাংশই আসেনি।

কিরণবাবু বললেন—টিকিট করে চলুন আমরা আগে গিয়ে জায়গা দখল করি।

নাগপুর প্যাসেঞ্জারে বেজায় ভিড় হয়, আমরা সবাই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, সুতরাং কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল।

গাড়িতে উঠে আমরা বেপরোয়া ভাবে চারজনের জন্যে চারখানা বেঞ্চিতে বিছানার চাদর, গায়ের কাপড় ইত্যাদি পেতে জায়গা দখল করলুম। তারপর কিরণবাবুকে পাঠিয়ে দিলুম বাকি দুজনের খোঁজে।

গাড়ি ছাড়বার মিনিট দশেক আগে ছুটতে ছুটতে সবাই এসে হাজির। পরিমলবাবু শেষ মুহূর্তে তাঁর ক্যামেরার জন্যে কি একটা জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন—তাই দেরি হল।

একজন রেলওয়ে কর্মচারী বলে গেল—এ গাড়ি সিনি জংশন হয়ে যাবে।

আমরা বললুম—মশাই, বেলপাহাড় যাবে তো?

বেলপাহাড় বহুদূরের স্টেশন। লোকটি খোঁজ রাখে না, নামও শোনেনি। বললে—সে কতদূরে বলুন তো? বিলাসপুরের এদিকে?

—অনেক এদিকে, ঝার্সাগুডার পরে।

—নির্ভাবনায় যান—এ লাইন খারাপ হয়েচে তার অনেক আগে। চক্রধরপুরে গিয়ে আবার মেন লাইনে উঠবেন।

ট্রেন ছাড়লো। আমাদের ঘুম নেই উৎসাহে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত সবাই মিলে বক্‌বক্ করচি। রাত্তে সাড়ে বারোটায় ট্রেন খড়্গপুরে এলে আমরা চা খেলুম। খড়্গপুরের লম্বা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে বেড়ালুম।

চমৎকার জ্যোৎস্না। শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সামনে আসচে পূর্ণিমা।

খড়্গপুর ছাড়িয়ে জমির প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। রাঙা মাটি, উঁচুনীচু পাথুরে জমি, বড় বড় প্রান্তর—জ্যোৎস্নারাত্রে সে সব জায়গা দেখাচ্চে যেন ভিন্ন কোনো রহস্যময় জগৎ, আমাদের বহুদিনের পরিচিত পৃথিবী যেন এ নয়। যেন কোন্ অজানা গ্রহলোকে এসে পড়েচি—যেখানে প্রতিমুহূর্তে নব সৌন্দর্যের সম্ভার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবার সম্ভাবনা।

এ পথে আমার সঙ্গীরা কেউ কোনোদিন আসেনি। বিশেষ করে প্রমোদ ও পরিমল দুজনেই প্রকৃতিরসিক, তারা ঘুমোবার নামটি করে না। আমিও এ পথে একবার মাত্র এসেচি, তাও অন্ধকার রাত্রে, পথের বিশেষ কিছুই দেখিনি—সুতরাং আমিও জেগে বসে আছি।

সর্ডিহা ছাড়িয়ে রেললাইনের দুধারে নিবিড় শালবন, বসন্তে শিমুল ফুল ফুটে আছে শালবনের মাঝে মাঝে—যদিও রাত্রে কিছু বোঝা যায় না, গাছটা শিমুল বলে চেনা যায় এই পর্যন্ত।

গিডনি ছাড়িয়ে গেলে আমি বললুম—এইবার সব ঘুমিয়ে নাও—রাত একটা বেজে গিয়েচে—কাল পরশু কোথায় খাবো, কোথায় ঘুমুবো কিছুই ঠিক নেই। পথে বেরুলে শরীরটাকে আগে ঠিক রাখতে হবে।

সারারাত্রি ট্রেন চললো। আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—কখন যে ঘুম এসেচে, আর কিছুই জানি না। ফিরিওয়ালার চীৎকারে ঘুম ভেঙে দেখি ভোর হয়ে গিয়েচে। একটা বড় স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে—আর সামনের রাস্তা দিয়ে লম্বা মোটরের সারি ক্রমাগত স্টেশনের দিকে আসচে।

তার আগে কখনো টাটানগর দেখিনি—এ বনজঙ্গলের দেশে এত মোটর গাড়ির ভিড় যখন, এ টাটানগর না হয়ে যায় না। আমার নিদ্রিত সঙ্গীদের ঘুম তখনও ভাঙেনি। আমি হাঁক দিয়ে বললাম—ও প্রমোদবাবু, ও কিরণ—ঘুমুতেই এসেচ কি শুধু পয়সা খরচ করে? উঠে টাটানগর দেখ—টাটানগর এসেচে—

পরিমল উঠে চোখ মুছতে মুছতে বললে—কি স্টেশন এটা?

—টাটানগর।

—চা পাওয়া যাচ্চে তো?

—অভাব কি। ওদের সব ঘুম ভাঙিয়ে দাও—চা ডাকি।

প্রমোদবাবু প্ল্যাটফর্মে নেমে বললে—আরে এ টাটানগর কোথায়। লেখা আছে সিনি জংশন।

আমরা সবাই অবাক, এ কি, এত বড় জায়গা—এত মোটরের ভিড় সিনি জংসনে! কখনও তো নামও শুনিনি।

দু-চারজন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এত মোটরের ভিড়ের কারণ, সেরাইকেলার রাজার ছেলের বিয়ে—সিনি জংশন থেকে সেরাইকেলা মাইল পনেরো-কুড়ি পথ—এসব মোটর বরযাত্রী নিয়ে আসচে সেরাইকেলা থেকে।

আমরা চা খেয়ে ট্রেনে উঠে বসলুম। ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমার বন্ধুরা সব জানালার কাছে বসেচে। প্রমোদবাবু কেবল চেঁচিয়ে বলেন—ও বিভূতিবাবু, এমন চমৎকার একটা পাহাড় গেল দেখতে পেলেন না!

ওদিকে কিরণ চেঁচিয়ে ওঠে—কি সুন্দর নদী একটা! দেখুন দেখুন—এই জানলায় আসুন—চট্ করে—

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা স্টেশনে থেকে মনোহরপুর পর্যন্ত দু-ধারের অরণ্য-পর্বতের দৃশ্য অতুলনীয়। গৈলকেরা স্টেশনে এসে পাহাড় জঙ্গলের দৃশ্য দেখে প্রমোদবাবু তো একেবারে নির্বাক! পরিমলবাবু স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে সামনের পাহাড়ের একটা ফটো তুলে নিলেন। তারপর রেলপথের দুধারেই অপূর্ব দৃশ্য—জানালা থেকে চোখ ফেরাতে পারিনে। গৈলকেরা স্টেশনে বড় বড় পেঁপে গোটাকতক কেনা হয়েছিল—কিরণ সেগুলো ছাড়িয়ে ভালো করে কেটে দিলে।

বসন্তকাল, বনে বনে রক্তপলাশের সমারোহ, সারেঙ্গ টানেলের মুখে ধাতুপ ফুলের বন, শালবনে কচি সবুজপত্রের সম্ভার, প্রচুর সূর্যালোক, বনের মাথার ওপরে নীল আকাশ, মাঝে মাঝে বনের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য নদী শীর্ণধারায় সর্পিল গতিতে বয়ে চলেচে, কোথাও একটা বড় নির্জন পথ রেললাইনের দিক থেকে গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কোথাও প্রকাণ্ড কোয়ার্টজ পাথরের পাহাড়টা বনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, কোথাও একটা অদ্ভুতদর্শন বিশাল শিলাখণ্ড বনের মধ্যে পড়ে আছে—প্রমোদবাবু আর কিরণের খুশি দেখে কে! পরিমল বেচারী তো ফটো নেবার জন্তে ছট্‌ফট্ করচে, আর কেবল মুখে বলচে, ওঃ, এইখানে যদি ট্রেনটা একটু দাঁড়াতো! ওখানে যদি ট্রেন একটু দাঁড়াতো!

বেলা দুটোর সময় ঝার্সাগুডা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো। এখানে আমরা চা খেয়ে নিলুম।

প্রমোদবাবু টাইমটেবল দেখে বললেন—বিছানা বেঁধে ফেলুন সবাই, আর দুটো স্টেশন পরেই বেলপাহাড়। ওখানেই নামতে হবে।

ইব বলে একটা ছোট স্টেশন ঘন বনের মধ্যে।

স্থানটায় বড় চমৎকার শোভা। স্টেশনের কাছেই একটা নদী, তার দুপারে ঘন বন, বনের মধ্যে রাঙা ধাতুপ ফুলের মেলা।

একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল নদীর নাম ব্রাহ্মণী বা বাম্‌নী।

বেলপাহাড় স্টেশনে নামবার আগে দেখি ছোট্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অনেকগুলি লোক

সারবন্দী হয়ে কাদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেতেই তারা আমাদের কাছে ছুটে এল—উড়িয়া ভাষায় বললে—বাবুরা কলকাতা থেকে আসচেন?

—হ্যাঁ। তোমরা কাকে খুঁজচো?

—সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমাদের পাঠিয়ে দিয়েচেন। আপনাদের আসবার কথা ছিল, আপনাদের সব বন্দোবস্তের ভার নেবার পরোয়ানা দিয়েচেন আমাদের ওপর।

প্রমোদবাবুর দাদা বন্ধুবর নীরদবাবুর সঙ্গে সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ সেনাপতির আলাপ ছিল, সেই সূত্রে নীরদবাবুকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে এনেছিলুম, আমি ও প্রমোদবাবু কয়েকদিন পূর্বে। চিঠির মধ্যে অনুরোধ ছিল যেন গ্রাম্য পুলিস আমাদের গন্তব্য স্থানে যাবার একটু ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা যে এভাবে অভ্যর্থনায় পরিণত হবে তা আমরা ভাবিনি।

বেলপাহাড় স্টেশন থেকে কিছুদূরে ডাকবাংলোয় তারা নিয়ে গিয়ে তুললে। একটু দূরে একটা বড় পুকুর, আমরা সকলে পুকুরের জলে নেমে স্নান করে সারাদিন রেলভ্রমণের পরে যেন নতুন জীবন পেলাম। পুকুরের পাড়ে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির।

স্থানটি চতুর্দিকে পাহাড়ে ঘেরা—অবিশ্যি পাহাড়শ্রেণী দূরে দূরে।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ডাকবাংলোয় আমাদের জন্যে রান্না করে রেখেচে। স্নান করে এসে আমরা আহারে বসে গেলুম, শালপাতায় আলোচালের ভাত আর কাঁচা শালপাতার বাটিতে ডাল। পাচক ব্রাহ্মণটি যেন সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি, শান্ত নম্রস্বভাব—আমাদের ভয়েই যেন সে জড়সড়। সঙ্কোচের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে আমাদের পরিবেশণ করছিল—যেন তার এতটুকু ত্রুটি দেখলে আমরা তাকে জেলে পাঠাবো। ডেপুটি কমিশনারের বন্ধু আমরা—বলা তো যায় না! তারপর জিজ্ঞেস করে জানা গেল ব্রাহ্মণ পুকুরপাড়ের সেই মন্দিরের পূজারী।

বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙা মাটির টিলার গায়ে।

কি ঘন শালবন, দূরে দূরে নির্জন পর্বতমালা।

ডাকবাংলো থেকে অল্প দূরে একটি গ্রাম্য হাট বসেচে। আমরা হাটে বেড়াতে গেলুম। উড়িয়া মেয়েরা হাট থেকে ঝুড়ি মাথায় বাড়ি ফিরচে। আমরা হাট বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলুম। পরিমল কয়েকটি ফটো নিলে। বেগুন, রেড়ির বীজ, কুচো শুটকি চিংড়ি, কুমড়ো প্রভৃতি বিক্রি হচ্চে। এক দোকানে একটি উড়িয়া যুবতী ধান দিয়ে মুড়কি কিনচে।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দার চেয়ার পেতে বসলুম। পাচক ব্রাহ্মণটি এসে বিনীত ভাবে উড়িয়া ভাষায় জিজ্ঞেস করলে, রাত্রে আমরা কি খাবো। আমাদের এত আনন্দ হয়েচে যে, কত রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে বসে আমরা গল্প করলুম। রাত দশটার সময় আহারাদি শেষ হয়ে গেল—কিন্তু ঘুম আর আসে না কারো চোখে।

পরদিন সকালে আমরা বিক্রমখোল রওনা হই। আমাদের সঙ্গে রইল গ্রাম্য পাটোয়ারী ও দুজন ফরেস্ট গার্ড—একখানা গোরুর গাড়িতে আমাদের জিনিসপত্র চললো, কিন্তু আমরা পায়ে হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করলুম। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম বিক্রমখোল এখান থেকে প্রায় তেরো মাইল।

বেলপাহাড় থেকে বিক্রমখোল পর্যন্ত এই পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনে চিরকালের ছবি এঁকে রেখে দিয়েচে। কতবার অবকাশমুহূর্তে স্বপ্নের মতো মনে হয় সেই নদী-পর্বত-অরণ্য-সমাকুল নির্জন বন্যপথটির স্মৃতি। প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশবনের শোভা ও রাঙা ধাতুপ ফুলের সমারোহ সারাপথে, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীর খাত বেয়ে ঝিরঝির করে জল চলেচে পাথরের নুড়ির রাশির ওপর দিয়ে।

এক জায়গায় বড় বড় গাছের ছায়া। সামনে একটি পাহাড়ী নদীর কাঠের পুলের ওপর ঘাসের চাপড়া বিছিয়ে দিচ্চে। ঝরনার দুধারে পাহাড়ী করবীর গাছ ফুলের ভারে জলের ওপর নুয়ে আছে। প্রমোদবাবু প্রস্তাব করলেন, এখানে একটু চা সেরে নেওয়া যাক বসে।

কিরণ বললে—চা খাওয়ার উপযুক্ত জায়গা বটে। বসুন সবাই।

আমাদের সঙ্গে ফ্ল্যাস্কে চা ছিল, আর ছিল মার্মালেড আর পাঁউরুটি। মার্মালেডের টিনটা এই প্রথম খোলা হল। প্রমোদ ও পরিমল রুটি কেটে বেশ করে মার্মালেড মাখিয়ে সকলকে দিলে—কিরণ চা দিল সবাইকে টিনের কাপে।

কিছুক্ষণ পরে কিরণ রুটি মুখে দিয়ে বললে—এত তেতো কেন ? এঃ—

আমিও রুটি মুখে দিয়ে সেই কথাই বললুম। ব্যাপার কি ? শেষে দেখা গেল মার্মালেডটাই তেতো। মার্মালেড নাকি তেতো হয়, পরিমল বললে। কি জানি বাবু, চিরকাল পড়ে এসেচি মার্মালেড মানে মোরব্বা, সে যে আবার তেতো জিনিস—তা কি করে জানা যাবে ?

এ নাকি সেভিলের তেতো কমলালেবুর খোসায় তৈরী মার্মালেড, টিনের গায়ে লেখা আছে।

পরিমল এটা কিনে এনেছিল—তার ওপর সবাই খাপ্পা। কেন বাপু কিনতে গেলে সেভিলের তেতো কমলালেবুর মার্মালেড। বাজারে জ্যাম জেলি ছিল না ?

হাঁটতে হাঁটতে রৌদ্র চড়ে গেল দিব্যি। বেলা প্রায় এগারোটা।···পথের নব নব রূপের মোহে পথ হাঁটার কষ্টটা আর মনে হচ্ছিল না। এ যেন জনহীন অরণ্যভূমির মধ্যে দিয়ে চলেচি—এতটা পথ চলে এলুম, কোথাও একটা চষা ক্ষেত চোখে পড়লো না। শুধু পাহাড় আর বন, বন আর পাহাড়।

এক জায়গায় পাহাড় একেবারে পথের গা ঘেঁষে অনেক দূর চলেচে। পাহাড়ের ছায়া আগাগোড়া পথটাতে। আমাদের বাঁদিকে জমি ক্রমশ ঢালু হয়ে একটা নদীর খাতে গিয়ে মিশলো। সমস্ত ঢালুটা বন্য-করবী ফুলের বন। পাহাড়ের ওপর বাঁশবন এদেশে এই প্রথম দেখলুম। বন্যবাঁশ আমি চন্দ্রনাথ ও আরাকান-ইয়োমার পাহাড়শ্রেণী ছাড়া ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের আর্দ্রতা-শূন্য আবহাওয়ায় এই বন্যবাঁশ সাধারণত জন্মায় না। বাঁশ যেখানে আছে, তা মানুষের সযত্নরোপিত।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমরা গ্রিগোলা বলে একটি গ্রামে পৌঁছলুম। এই গ্রাম আমাদের গন্তব্যস্থান থেকে মাত্র দু মাইল এদিকে, এখানেই আমরা দুপুরে খাবো-দাবো।

গ্রামে ঢুকবার আগে এক অপূর্ব দৃশ্য। ঢুকবার পথের দুধারে সারবন্দী লোক দাঁড়িয়ে কাদের অপেক্ষা করচে যেন—অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম।

প্রমোদবাবু বললেন—ওখানে অত লোক কিসের হে?

পরিমল বললে—আমি একটা ফটো নেবো।

আমরা কাছে যেতেই তারা আমাদের একযোগে পুলিস প্যারেডের মতো সেলাম করলে। ওদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এসে বললে—আমার নাম বিম্বাধর, আমি এই গ্রামের গ্রামীণ। ডেপুটি কমিশনার সাহেব পরোয়ানা পাঠিয়েচেন কাল আমার ওপর, আপনাদের বিক্রমখোল দেখবার বন্দোবস্ত করতে। সব করে রেখেচি—আসুন বাবুসাহেবরা।

কিরণ বললে—ব্যাপার কি হে?

পরিমল বললে—রাজশক্তি পেছনে থাকলেই অমনি হয়, এমনি আমরা ট্যাং ট্যাং করে এলে কেউ কি পুঁছত? এ ডেপুটি কমিশনারের পরোয়ানা—

আমি বললুম—টুঁ করবার জো-টি নেই।

গ্রামের মাঝখানে মণ্ডপঘর। সেখানে আমাদের নিয়ে গিয়ে সবাই তুললে। রথ-যাত্রার ভিড় লেগেচে সেখানে, গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে জড় হয়েছে কলকাতা থেকে মহাপ্রতাপশালী বাবুরা আসচেন শুনে। ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং যাদের নামে পরোয়ানা পাঠান—তাদের একবার চোখে দেখে আসাই যাক!

বেলপাহাড়ের পাটোয়ারী ইতিমধ্যে জাহির করে দিয়েচে—বাবুরা সাধারণ লোক নয়! গবর্নমেণ্টের খাসদপ্তরের অফিসর সব। ভাইসব, হুঁশিয়ার!

বিম্বাধর আমাদের জন্যে এক ধামা ওকুড়া অর্থাৎ মুড়কি আর এক কড়া ভর্তি গরম দুধ নিয়ে এল। পরামর্শ করে স্থির হল আমরা একটু বিশ্রাম করে নিয়ে এখনি বিক্রমখোল যাবো। সঙ্গে চারজন ফরেস্ট গার্ড এবং বিম্বাধর থাকবে। জঙ্গল বড় ঘন, বাঘ ভালুকের ভয়—বেলাবেলি সেখান থেকে ফিরতে হবে দেখে শুনে। এসে স্নানাহার করা যাবে—নতুবা এখন স্নানাহার করতে গেলে বেলা একেবারে পড়ে যাবে, সে সময় অত বড় জঙ্গলে ঢোকা যুক্তিযুক্ত হবে না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলুম।

গ্রিগোলা ছাড়িয়ে মাইল দুই গিয়েই গভীর অরণ্যভূমি—লোকজনের বসতি নেই, শুধু বস্তবাঁশ আর শাল-পলাশের বন। প্রকাণ্ড বড় বড় লতা গাছের ডালে জড়াজড়ি করে আছে—গাছের ছায়ায় সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক; হরীতকী গাছের তলায় ইতস্তত শুকনো হরীতকী ছড়িয়ে পড়ে আছে—কোথাও আমলকি গাছে যথেষ্ট আমলকি ফলে আছে।

পূর্বে যে শুভ্রকাণ্ড বৃক্ষকে শিববৃক্ষ বলে উল্লেখ করেচি, এ বনে তার সংখ্যা খুব বেশি। এত শিব-বৃক্ষের ভিড় আমি আর কোথাও দেখিনি।

এই বনে আর একটি পুষ্পবৃক্ষ দেখলুম—পরে অবিশ্যি সিংভূম অঞ্চলের পার্বত্য অরণ্যে এই জাতীর গাছ আরও দেখেচি। গাছটার ফুল অবিকল কাঞ্চন ফুলের মতো, গাছটাও দেখতে সেই ধরনের। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে এই বৃক্ষ অজস্র পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

বনের মধ্যে মাইল তুই-তিন হাঁটবার পরে পথ ক্রমে উঁচু দিকে উঠতে লাগলো—এক জায়গায় গিয়ে পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। আমরা যেন একটা পাহাড়ের ওপর থেকে অনেক নীচু উপত্যকার দিকে চেয়ে দেখচি। আমাদের ওই উপত্যকার মধ্যে নামতে হবে সরু পথ বেয়ে, কোনো কোনো জায়গায় পাহাড়ের ফাটল থেকে বেরুনো শেকড় ধরে।

বিম্বাধর আমাদের সঙ্গে ছিল। সে বললে—পুলিসে জঙ্গল কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েচে। নামতে তত অসুবিধে হবে না বাবু।

সবাই মিলে পাহাড়ের গা ধরে সন্তর্পণে অনেকটা নীচে নামলুম, আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে।

তারপর অপর দিকে চেয়ে দেখা গেল অনাবৃত পর্বতগাত্রে লম্বালম্বি-ভাবে খোদাই করা কতগুলি অজ্ঞাত অক্ষর বা ছবি। পরিমল বিভিন্ন দিক থেকে শিলালিপির ফটো নিলে, অক্ষরগুলির অবিকল প্রতিলিপিও এঁকে নিলে। জায়গাটার-প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। আমাদের আরও নীচে উপত্যকার মেজে। যে পাথরের গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ, তাকে পাহাড় না বলে একটা মালভূমির অনাবৃত শিলাগাত্র বলাই সঙ্গত। নিম্নের উপত্যকা নানাজাতীয় বন্যবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন, তার মধ্যে কাঞ্চন ফুলগাছের মতো সেই গাছও যথেষ্ট—ফুলে ভর্তি হয়ে সেই নির্জন পর্বতারণ্যের শোভা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করচে।

উপত্যকার ওদিকে আবার মালভূমির দেওয়াল খাড়া প্রাচীরের মতো উঠে গিয়েচে, সেদিকটাতেও ঘন জঙ্গল। এমন একটি জনহীন ঘন অরণ্যভূমির দৃশ্য কল্পনায় বড় একটা আনা যায় না, একবার দেখলে তারপর তার বন্য বাঁশ ঝোপের ছায়ায় বিচরণকারী মৃগযূথের ছবি মানসচক্ষে দর্শন করা কঠিন হয় না অবিশ্যি।

বেলা পড়ে আসচে। সমগ্র উপত্যকাভূমির অরণ্য ছায়াবৃত হয়ে এসেচে। রৌদ্রতপ্ত বাতাসে শালমঞ্জরীর সুগন্ধ।

বিম্বাধর বললে—এবার চলুন বাবুরা, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। অনেকটা যে ফিরতে হবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা সে স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে পরিমল আমাদের দলের একটা ফটো নিলে।

তারপর আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠলুম সবাই। বনের মধ্যে দিয়ে জোর পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা ত্রিগোলা পৌছলুম।

বিম্বাধরের লোকজন আমাদের জন্যে রান্না করে রেখেছিল। ভাত ও পুরী তুই রকমই ছিল, যে যা খায়। আমরা নিকটবর্তী একটা পুকুরে স্নান করে এসে খেতে বসলুম।

গ্রামের লোকের ভিড় পূর্ববৎ। সবাই উঁকি-ঝুঁকি মেরে ভোজন-রত বাঙালী বাবুদের দেখচে। গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবা কেউ বোধ হয় বাকি নেই। চারিধারে উড়িয়া বুলি।

খাওয়া শেষ হল। একটি গ্রাম্য নাচের দল নাকি অনেকক্ষণ থেকে আমাদের নাচ দেখাবে বলে অপেক্ষা করচে। এখন যদি আমাদের অনুমতি হয় তো তারা আসে। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলুম। গ্রামের মণ্ডপঘরের সামনে রাস্তার ওপরে নাচ আরম্ভ হল। ছোট ছোট ছেলেরা মেয়ে সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচলে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চললো নাচ।

বেলপাহাড়ের আরারী বললে—আর বাবু দেরি করবেন না। বড্ড পাহাড়-জঙ্গলের পথে ফিরতে হবে। এই বেলা রওনা হওয়া উচিত।

সেদিন দশমী তিথি। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো সন্ধ্যার পরই। আমার মনে একটা মতলব জাগলো। এই সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে সামনের সেই পাহাড়জঙ্গলের পথে একা যাবো। নতুবা ঠিক উপভোগ করতে পারা যাবে না।

সন্ধ্যার পরেই সবাই রওনা হল। আমি বললুম—হেঁটে আমি এক পা-ও যেতে পারবো না, পায়ে ব্যথা হয়েচে। আমি গোরুর গাড়িতে যাবো।

কিরণ বললে—বুঝতে পেরেচি, মুখেই শুধু বাগাড়ুরি।

পরিমল বললে—বিভূতি দা'র সব মুখে। আমি ও অনেককাল থেকে জানি।

আমরা এবার রওনা হবো। জনৈক গৃহস্থ আমাদের সামনে এসে বিনীতভাবে জানালে আজ রাত্রে তার মেয়ের বিয়ে—আমরা যদি আজ এখানে থেকে যাই এবং বিবাহ-উৎসবে যোগ দিই—তবে বড় আনন্দের কারণ হবে।

অবিশ্যি থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ওদের ভদ্রতা আমাদের মুগ্ধ করলে। আমরা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বিবাহ-উৎসবে আমাদের যোগ দেওয়ার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলুম। সময়ের অভাব, আজ রাত্রেই আমাদের ফিরতে হবে কলকাতায়।

যাওয়ার সময় বিম্বাধর হঠাৎ হাত জোড় করে বললে—আমার একটা আর্জি আছে বাবুদের কাছে—

—কি ?

—আমাকে একটা বন্দুকের লাইসেন্স করে দিতে হবে। হুজুরদের মেহেরবানি।

গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে উপস্থিত—সবাই আমাদের ঘিরে বিম্বাধরের আর্জির ফলাফল জানবার জন্য আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রমোদবাবু বললে—ব্যাপার কি হে, বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া না দেওয়ায় আমাদের হাত কি তা তো বুঝলাম না। আমাদের ঠাউরেচে কি এরা ?

কিরণ বললে—গবর্নমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী আর তার স্টাফ।

বিম্বাধরকে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারলুম না অতগুলো লোকের সামনে যে, আমাদের কোনো হাত নেই এ ব্যাপারে, গবর্নমেণ্টের ওপর আমাদের এতটুকু জোর নেই।

গম্ভীরভাবে বলতে হল—আমরা বিশেষ চেষ্টা করে দেখবো।

বৃদ্ধকে এ প্রতারণা করতে আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আমাদের মানও তো বজায় রাখতে হবে!

প্রমোদ, পরিমল ও কিরণ হেঁটে রওনা হয়ে গেল। আমি একটু পরে গোরুর গাড়িতে রওনা হলুম। বিম্বাধর অনেকখানি রাস্তা আমার গোরুর গাড়ির পাশে পাশে এল। পথের পাশে শালবনে সেই নাচের দল রেঁধে খাচ্চে—শালপাতায় ভাত বেড়ে নিয়েচে, আর একটা অদ্ভুত গড়নের কাঁসার বাটিতে কি তরকারি।

বেশ জায়গায় বসে খাচ্চে ওরা। গ্রাম সেখানে শেষ হয়ে গিয়েচে, ডাইনে বনশ্রেণী, পেছনের শৈলমালা জ্যোৎস্নায় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্চে। শালমঞ্জরীর গন্ধে-ভরা সান্ধ্য-বাতাস। ইচ্ছে হয় ওদের নাচের দলে যোগ দিয়ে এই সব জংলী গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই।

গ্রাম ছাড়িয়ে চলেচি। বিম্বাধর ও তার দল বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমার দুধারে নির্জন, শিলাখণ্ড-ছড়ানো প্রান্তর, প্রান্তরের মাঝে মাঝে শালপলাশের বন। পথ কখনো নিচে নামচে কখনো ওপরে উঠচে। গাড়োয়ান নীরবে গাড়ি চালাচ্চে, দু একবার কি বলেছিল কিন্তু তার দেহাতী উড়িয়া বুলি আমি কিছুই বুঝলুম না। অগত্যা সে চুপ করে আপন মনে গাড়ি চালিয়ে চলেচে।

সুতরাং এই জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ে, অরণ্যে ও প্রান্তরে আমি যেন একা। জ্যোৎস্না ফুটলে শালবনের রূপ যেন বদলে গেল, পাহাড়শ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠলো। অনেকদিন কলকাতা শহরে বদ্ধ জীবন-যাপনের পরে, এই রোদপোড়া মাটির ভরপুর গন্ধ আমাকে আমার উত্তর-বিহারে যাপিত অরণ্যবাসের দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই রাত্রি, এই জ্যোৎস্না-লোককে আরও মধুময় করে তুলেচে।

দুটো তারা উঠেচে বাঁদিকের পাহাড় শ্রেণীর মাথায়। বৃহস্পতি ও শুক্র। পার্ক সার্কাসে টুইশানি করতে যাবার সময় রোজ দেখতুম তারা দুটো বড় বড় বাড়ির মাথার উপর উঠচে। সেদিনও দেখে এসেচি। চোখ বুজে কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম কোথায় পার্ক সার্কাসের সেই তেতালা বাড়িটা, সেই ট্রাম লাইন, আর কোথায় এই মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্না-ওঠা বনভূমি, ঝরনা, বাঁশবন, পাহাড়শ্রেণী!···কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই। একা যেন আমি এই সৌন্দর্যলোকের অধিবাসী।

মন এ সব স্থানে অন্য রকম হয়ে যায়। প্রত্যেকের উচিত গভীর নির্জন স্থানে মাঝে মাঝে বাস করা। মন অন্যরকম কথা কয় এই সব জায়গায়। মনের গভীরতম দেশে কি কথা লুকোনো আছে, তা বুঝতে হলে নির্জনতার দরকার। ভারতবর্ষের রূপও যেন ভালো করে চেনা গেল আজ। বাংলার সমতলভূমিতে বাস করে আমরা ভারতের ভূমিশ্রীর প্রকৃত রূপটি ধরতে পারি না। অথচ এই রাস্তা, মাটি, পাহাড় আর শালবন—এখান থেকে আরম্ভ করে সমগ্র মধ্য ভারতের এই রূপ।

খড়্গপুর ছাড়িয়েই আরম্ভ হয়েছে রাঙা মাটি, পাহাড় আর শালবন—এই চারশো মাইল বরাবর চলেচে; শুধু চারশো কেন, আটশো মাইল আরও চলেচে সহ্যাদ্রির অরণ্যানী ও ঘাট-শ্রেণী পর্যন্ত।

ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি, মালাবার উপকূলে ট্রপিক্যাল অরণ্য। আর্যাবর্তের সমতলভূমি

পার হয়েই নগাধিরাজ হিমালয়—ভারতের আসল রূপই এই। বাংলা অন্য ধরনের দেশ—বাংলা শ্যামল, কমনীয়, ছায়াভরা; সেখানে সবই মৃদু, সুকুমার, গাছপালা থেকে নারী পর্যন্ত। এখানে যেন শিবমূর্তি ধরেচে—কমনীয়তা নেই, লাবণ্য নেই—শুধু রুক্ষ, বিরাট, উদার। উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের বনের শিববৃক্ষ যেন এখানকার প্রকৃতির রূপের প্রতীক।

অনেকরাত্রে ডাকবাংলোয় পৌঁছলুম। বন্ধুরা তখনও কেউ আসেনি। একাই অনেকক্ষণ বসে রইলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে দেখে এলুম।

—কে মেরেচে?

—রেলের এক সাহেব। দেখে এসো, প্লাটফর্মে মরা হায়েনাটা এনে রেখেচে।

—তার চেয়ে ঠাকুরকে চা করতে বলা যাক, এসো চা খাওয়া যাক। মরা হায়েনা দেখে কি হবে।

সেই পূজারী ঠাকুর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের ভাত বেড়ে দিলে।

এত রাত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের অনেকগুলি লোক ডাক-বাংলোয় এসেছিল আমাদের বিদায় দিতে।

দূরে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ অস্ত গেল।

আমরা স্টেশনে চলে এলুম, রাত দুটোয় ট্রেন, শীত পড়েচে খুব।

পাটোয়ারী হাত জোড় করে বললে—বাবু, বিম্বাধরের আর্জিটা মনে আছে তো? আমায় বার বার করে বলে দিয়েচে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে। আপনারা বড়লোক, একটু বলে দিলেই গরিবের অনেক উপকার হয়।

কথাটা ঠিক, কিন্তু বলি কাকে?

হায় বিম্বাধর!

উৎকর্ণ

উৎকর্ণ

আজ এই ডায়েরীটা প্রথম আরম্ভ করলুম, জানিনে কতদিনে শেষ হবে, কিন্তু এই জন্যে আরম্ভ করলুম যে সব দিক থেকে আজকার দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। দুঃখের বিষয় এই যে এরকম দিন বেশী আসে না জীবনে। আমি এই ডায়েরীটা লিখব এমন ভাবে যে আমার মনের সকল গোপনীয় কথাই এতে থাকবে, কিছু চেপে রাখব না। কাজেই কথাগুলো সব লিখতে হবেই।

অনেককাল আগে, আজ প্রায় আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে পূজোর ছুটি উপলক্ষে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। গিয়েছিলুম অবিশ্যি আগের দিন, কিন্তু দেখা হয়নি, বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল বলে। আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়। সেই পূজোর সময়েই তার বাপের বাড়ি থেকে নিতে এল তাকে, আমরা পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু মাসখানেক পরে বাপের বাড়িতে সে মারা গেল।

সেই জন্যেই আজকার দিনটি* আমার এত মনে আছে, থাকবেও চিরকাল।

আর একটা ব্যাপার, যে জন্যে আজকার দিনটি স্মরণীয়, সে হচ্ছে আজ বহুকাল পরে আমাদের দেশে বন্যার জলে নৌকো করে বেড়িয়ে এসেচি। আমার জ্ঞানে এমন বন্যা কখনও দেখিনি। কুঠির মাঠে সাঁতার-জল, সেখানকার বন-ঝোপের মাথাগুলো মাত্র জেগে আছে, যেখানে আর-বছর ব্যায়াম করতুম বিকেলে, যেখানে বসে কেলেকোঁড়ার ফুলের সুবাস উপভোগ করতুম, সে-সব জায়গা দিয়ে বড় বড় নৌকো চলেছে। আমি এমন কখনও দেখিনি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না হয়তো! ওবেলা আজ আমি, ন-দি, রামপদ, পিসীমা, জগো সবাই মিলে গাবতলার কাছে নৌকোতে উঠে কুঠির মাঠ দিয়ে, বেলেডাঙা নতিডাঙা হয়ে আবার বাঁশতলার ঘাটে ফিরে এলুম। ওরা চলে গেল ঘাটে নেমে বাড়িতে। আমি চালকীর জোলের মধ্যে ঢুকে জোলের ঘাটে নৌকো থেকে নামলুম।

গাবতলা! যেখান থেকে নৌকোয় উঠবার কল্পনা স্বপ্নেও কখনো করতে পারা যেত না!

তারপর বৈকালে খুকুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম আজ চার মাস পরে। সে কি আনন্দ যাবার সময়ে! কত গল্প এই চার মাসে জমা হয়ে রয়েচে, ওকে সেসব গল্প করতে হবে। প্রথমে খুড়ীমা এলেন, তারপরেই খুকু এল। তাকে বই কাপড় দিলুম, সুপুরিগুলো পেয়ে খুব খুশি। শ্রাবণ মাস থেকে সুপুরিগুলো ওর জন্যে রেখে দিয়েচি বাক্সের মধ্যে, দিল্লীর বেশ ভাল মশলা মাখানো সুগন্ধি সুপুরি-কুচোনো। অনেক গল্প-গুজব হোল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। ওরা বারাকপুর যাবে পূজোর পরেই।

আমাদের বাসায় ঢুকবার জো নেই। ভেলা করে গিয়ে খোকা বাসার চাবি খুলে মশারি বার করে নিয়ে এল। কারণ পূজোতে বাইরে বেড়াতে গেলেই মশারি লাগবে।

তারাভরা অন্ধকার আকাশের নীচে দিয়ে রাত্রের non-stop ট্রেনটা ছুটে এল। আমি বসে বসে আজ সারাদিনের কথাটা ভাবছিলুম। সকালে সেই কানু মোড়লের তামাক খাওয়ানো ডেকে, দারিঘাটার পুলের নীচে বন্যার জলের স্রোত, হরিপদদার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ-প্রাপ্তি গ্রামে ঢুকেই, জল, বেড়াতে যাওয়া, চালকী, খুকুর সঙ্গে দেখা—এই সব।

এখন রাত ১২টা। বসে ডায়েরীটা লিখচি। শিলং বেড়াতে যাব বলে গোছগাছ করতে বড় ব্যস্ত আছি। ক'মাস ধরে কি ছুটোছুটিটাই করে বেড়াচ্চি কলকাতায়। এখানে মিটিং ওখানে engagement, এখানে পার্টি, হয়তো আসলে দেখচি যে টাকাকড়ি নিতান্ত মন্দ আসচে

* ২৫শে আশ্বিন

না, কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা ওখানে কৈ? উত্তেজনা থাকে বটে কিন্তু সত্যিকার আনন্দ নেই। এই যে শরতের অপূর্ব্ব রূপ এবার—এমন রূপ দেখতেই পেলুম না, গাছপালার নবীন সরসতা উপভোগ করতেই পেলুম না, কলকাতায় এই হৈ-চৈ গণ্ডগোলপূর্ণ জীবনের জন্যে। তাই কাল সারাদিন এখানে ওখানে শত কাজ ও ব্যস্ততার পরে ফিরে এসে রাত্রে শুয়ে ভাবছিলুম এ হৈ-চৈএর সার্থকতা কি? আমার মনের একটা ব্যাপার আছে বরাবর লক্ষ্য করে দেখে এসেচি—সেটা মাটি ও গাছপালার সাহচর্য্যে বড় ভাল থাকে। সেখানে মন অন্য এক রকমই থাকে, শহরে শত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে তা হয় না। আনন্দ পাইনে, আমোদ পাই। শান্ত অনুভূতি নেই, উত্তেজনার প্রাচুর্য্য আছে। অনেকে বলে—এই তো জীবন! পুতুপুতু মিনমিনে জীবন আবার জীবন নাকি? এই রকমই তো চাই!

অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ শহরের জীবনে অনেক কিছু পাবার ও নেবার আছে বটে স্বীকার করি, কিন্তু মনন ও ধ্যানের অবকাশ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ না রাখলে হয়তো অপরের চলতে পারে, কিন্তু আমার তো একেবারেই চলে না।

কি করচি এসব করে? কার কি উপকার করচি? কারোরই না। আমার আগে কত লোকে এরকম হৈ-চৈ করে বেড়িয়ে গিয়েছে, কত মিটিংএর সভাপতিত্ব করেচে, কত সাহিত্য-সম্মেলনের পাণ্ডা হয়েচে, কত ব্যাঙ্কে কত চেক্ কেটেচে—কোথায় তারা আজ? কে চেনে আজ তাদের!

গভীর অনুভূতির আনন্দ জীবনে সার্থকতা আনে—অন্ততঃ আমার। অপরের কথা জানিনে, কিন্তু আমি ওর চেয়ে বেশী আনন্দ কিছুতেই পাইনে। এত কোলাহলের মধ্যে থেকে বড় কোলাহল-প্রিয় হয়ে উঠেচি বটে, কিন্তু এ আমি সত্যিই ভালবাসিনে। আমার মন ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠচে একটুখানি নীল আকাশের জন্যে, শরতের বনভূমির, মটর লতার ফুল ও বনসিমের ঝোপের জন্যে, কার্ত্তিকের প্রথমে গাছপালার, বনতারা ফুলের সে অপূর্ব্ব সুগন্ধের জন্যে।

কাল যখন আসাম মেলে বেরুতে যাব, তখন কলকাতায় এল ভয়ানক বৃষ্টি। একটা বুড়ো রিক্‌শাওয়ালাকে বললুম আমায় মির্জ্জাপুর স্ট্রীটে নিয়ে চল্। সে কালা ও বোবা। তাকে ধমক দিতে দিতে মেস পর্য্যন্ত নিয়ে এলুম, তারপর মালপত্র নিয়ে স্টেশনে আসতে আসতে তার রিক্‌শার চাকা গেল ভেঙে। তাকে দিলুম মাত্র দু আনা। সে প্রতিবাদ না করে নীরবে চলে গেল। তার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে কতটা অন্যায় করলুম, তা বুঝলুম পরে। যত ভাল দৃশ্য দেখি ততই সকলের আগে আমার মনে পড়ে রিক্‌শাওয়ালার সেই করুণ মুখটা।

আসাম মেলে আসবার সময় দেখলুম আড়ংঘাটা ছাড়িয়ে রেলের দুধারে বহুদূর পর্য্যন্ত বন্যার জলে ডুবে আছে। ঠিক আমাদের দেশের মত বন্যা এসেচে এখানেও, সর্ব্বত্রই এবার বন্যা, এ পথে ১৯২২ সালের পরে আর কখনও আসিনি, এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হইনি ১৯২১ সালের পরে। তিস্তা ব্রিজ পার হইনি ১৯০৬ সালের পরে আর কখনও। সেই এসেছিলুম বাবার সঙ্গে রংপুরে, তখন আমি আট-ন' বছরের বালক। কত জল তার পরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে চলে গিয়েচে! (ইংরীজি ইডিয়মটি বড় লাগসই, ব্যবহার করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলুম না।)

লালমনিরহাটে এলুম রাত তখন ১১টা। এখানে খুকুর খুড়তুতো ভাই থাকে, কিন্তু এত রাত্রে কে তার খোঁজ করে? বেজায় ভিড় ট্রেনে, তবুও শোবার একটু জায়গা পাওয়া গেল। গোপোঁকগঞ্জ স্টেশন, বাংলার সীমানা পার হয়ে আসামে পৌছুলাম। ভোর হোল রঙ্গিয়া

জংশনে। নিম্ন আসামের ভূমি জলমগ্ন, নলখাগড়ার বনে পরিপূর্ণ। আমিনগাঁওতে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পাণ্ডারা এসে জুটলো। কোন রকমে তাদের হাত এড়িয়ে পাণ্ডুঘাটে উঠলুম স্টীমারে। তারপর মোটরে গৌহাটি হয়ে শিলং রওনা হলুম।

এ পথের বন-বনানী ও খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দৃশ্য ভারি সুন্দর। এ পথের উপযুক্ত বর্ণনা কেউ করেনি। শুধু মাইলের পর মাইল দুধারে উজ্জ্বল শৈলমালা, মধ্যে মধ্যে ঝরনা বা পার্ব্বত্য নদী, নদীখাতে ভীষণ ঘন বন, কত বনফুল, কত বিচিত্র গাছপালা, মোটা মোটা লতা গাছে গাছে ঝুলছে, শেওলা জমেচে বড় বড় গাছের গায়ে, নিবিড় অন্ধকার বনানীর তলদেশে সত্যিকার ট্রপিক্যাল জঙ্গল। ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড় এর তুলনায়, উচ্চতায় বা বনশোভায় কিছুই নয়। এরকম নিবিড় ট্রপিক্যাল বন সেখানে নেই, সম্ভবও নয়। আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমাদের কুঠীর মাঠের সেই ছোট এড়াঞ্চির বন এখানে পাহাড়ের সর্ব্বত্র—অন্ততঃ তিন হাজার ফুট উঁচুতেও আমি ঐ গাছের বন দেখেচি। আসামের পাহাড়েই কি ছোট এড়াঞ্চি গাছের আদি বাসস্থান?

বৈকালে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম লাবানে। পথে দেখি অবিকল সুপ্রভার মত একটি মেয়ে যাচ্ছে। ভাবলুম কে না কে! একটু পরে দেখি মেয়েটি পিছন ফিরে আমার দিকে বার বার চাইচে। তারপর সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল—আপনি!

চেয়ে দেখি সুপ্রভা। সে বললে—ওবেলা মোটর-স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলুম আপনার জন্যে—সে ফিরে এসে বল্লে, আপনি আসেননি। আসুন।

'সনৎ কুটীরে' ও থাকে। সেখানে বীণাও এল দেখা করতে। চা খেয়ে ওর সঙ্গে বেড়াতে বেরুই। সঙ্গে রইল তার ভাইপো। প্রথমে ক্রিনোলাইন ফল্‌স্ দেখে ও বল্লে, চলুন Spread Eagle falls দেখিয়ে আনি। তাই দেখাতে গিয়ে ও পথ হারিয়ে ফেললে। কতদূর শহরের বাইরে নিবিড় পাইনবনের দিকে বিজন পথে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। পথে খাসিয়া দস্যুর ভয়। ওর মুখ দেখি শুকিয়ে গিয়েচে, যখন দেখা গেল সত্যিই ষণ্ডামার্কা গোছের দুজন লোক অন্ধকারে আমাদের দিকে এগিয়ে আসচে। ও বল্লে—আমার ভয় করচে। কি বিপদ! ছেলেমানুষের কাণ্ড। তবে বলেছিল কেন যে আমি জানি Spread Eagle falls-এর পথ!

যাই হোক, অবশেষে নিরাপদে শহরে পৌছে ট্যাক্সি করে ওকে লাবানে পৌছে দিয়ে আমি হেঁটে হোটেলে ফিরি। কারণ ও ছেলেমানুষ, আর হাঁটতে পারবে না দেখলুম। শুধু আমায় দৃশ্যাবলী দেখাবার উৎসাহেই ও অতটা গিয়েছিল।

বড় ভাল লাগল এই বেড়ানোটা আজকার। জীবনে এ একটা স্মরণীয় দিন। যেন অন্য জগতে এসে গিয়েচি। শিলংএর শোভা তো অদ্ভুত বটেই—তা ছাড়া সুপ্রভার মত মমতাময়ী মেয়ের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি ক'জন পায়?

হোটেলে এসেই কালকের সেই গরীব রিক্‌শাওয়ালার কথা মনে এসে দুঃখে চোখে জল এল। যদি আবার তার দেখা পাই! আমার নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত করব। বাস্তবিকই অন্যায় হয়ে গিয়েচে।

কিন্তু কী ভালই লেগেছে আজ সন্ধ্যায় বনফুল-ফোটা পাইনবনের পথে সুপ্রভার সঙ্গে বেড়ানোটা। আর কি সুন্দর দৃশ্য চারিধারে, এমন ঢেউখেলানো ঘন সবুজ শৈলশীর্ষ অন্য কোন জায়গায় দেখিনি। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের চেয়ে শিলং-এর পাহাড়রাজি অনেক বেশী সুন্দর। অনেকদিন আগে একবার ডায়েরীতে লিখেছিলুম যে, ছোটনাগপুরের পাহাড় আর বাংলা দেশের

বনানী এই দুটোর একত্র সমাবেশ হয়েচে এমন কোন জায়গা যদি থাকে, তবে তার সৌন্দর্য্যের তুলনা হবে না। আমার একটি স্বপ্ন ছিল, ঐ দুইয়ের একত্র সমাবেশ আছে এমন একটা জায়গা দেখব। কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পেছনের মেঘস্তূপগুলোকে পাহাড় কল্পনা করে কতবার নিজের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু এখানকার বনানী দেখে বুঝলুম স্বপ্নলোকের সন্ধান পেয়েচি। লতা, ঝোপ, জঙ্গল, নিবিড় undergrowth, পরগাছা, চঞ্চল উচ্ছল ঝরণাধারা, শিলাখণ্ড, বিরাট বনস্পতির দল, বড় বড় নদীখাত—সব রয়েচে এখানে, অনেক বেশী রয়েচে—আর কী বাঁশবন, পাহাড়ের সর্ব্বত্র—শুধুই বাঁশ—আর নতুন কোঁড় বেরুচ্চে সোনার সড়কির মত হেমন্তের প্রথমে—কি শোভা সে নবোদ্গত তরুণ বেণুদণ্ডের, কি তার ছায়া, কি তার শন্‌শন মর্ম্মর ধ্বনি, বাংলার গাছগুলোর মত সেই স্নিগ্ধ হৈমন্তী সুঘ্রাণটি পথে পথে। অবিশ্যি তিন হাজার ফুটের ওপরে আর ও-প্রকৃতির ট্রপিক্যাল অরণ্য নেই, শুধুই পাইন আর পাইন।

সকালে উঠেচি, এমন খুব কিছু শীত নয়। বাংলাদেশের পৌষ মাসের শীত এর চেয়েও বেশী হয়। সুপ্রভাদের ওখানে যাব বলে বেরিয়েচি, দেখি সুপ্রভা ও আরও দুটি মেয়ে আসচে, পথে দেখা হোল। একটি মেয়ে আসামী, নাম উষা ভট্টাচার্য্য, ফিলজফিতে এম-এ পাস করেচে। সে প্রথমে বললে—আসামী ভাষা ছাড়া সে জানে না। তার খানিকটা পরে বেশ বাংলা বলতে লাগল। পাইন্ মাউণ্ট স্কুলের পথে আমরা উঠলুম একটা পাহাড়ের মাথায় —সেখানে একটা চমৎকার পাইনবন, ঘন, নির্জ্জন। তারপর নেমে Kench-strasse দিয়ে সরীতলা বেড়াতে গেলুম। নির্জ্জন পাইনবনে আমরা বসে রইলুম বহুক্ষণ। বিকেলে ওরা মোটর নিয়ে এল, সবাই মিলে Elephant falls বেড়াতে গেলুম। নির্জ্জন পাইনবনের মধ্যে দিয়ে পথ—gorgeটার ওপর একটা কাঠের পুল আছে। আমরা তার পাশের পাথরে কাটা সিঁড়ি ধরে ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে একেবারে নীচে দাঁড়ালুম। কত বিচিত্র ফার্ণ ও বন্যপুষ্প পাহাড়ের গায়ে দুধারে। খুব বৃষ্টি এল, আমি একটা পাথরের ছাদের তলায় দাঁড়ালুম। সুপ্রভারা কাঠের পুলটায় দাঁড়িয়েছিল, নেমে দেখতে এল আমি উঠচি না কেন। সবাই বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে মোটরে উঠলুম, তখন আবার বেশ রৌদ্র। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশের নীল ফুটে বেরিয়েচে। সনৎ কুটীরে এসে চা খেয়ে আমি বেরুলুম লেক দেখতে। তারপর চেরাপুঞ্জি যাবার জন্যে মোটর স্টেশনে গেলুম। আসবার পথে ইউনিভার্সিটি থেকে যে ছাত্রদের দল এসেচে, তাদের ওখানে গিয়ে গল্প করলুম।

আপার-শিলংএর যে পথে আজ এলিফ্যাণ্ট্ ফল্‌স্‌-এ গেলুম—সেটি বড় সুন্দর জায়গা। মাঝে মাঝে খুব নীচে পাইনবনে আচ্ছন্ন অধিত্যকা—দূরে দূরে লাবান ও শিলং পাহাড়চূড়ায় ঘন কালো মেঘের কুণ্ডলী—এই রোদ, এই মেঘ, আবার এই রোদ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের মত ছোটখাটো ব্যাপার তো নয় এ, খাসিয়া ও জয়ন্তী শৈলমালার কূলকিনারা পাওয়া যায় না একটা ছোট জায়গা থেকে। এত কতদিকে যে কত কি দেখবার জিনিস আছে, তা তিনদিনের মধ্যে শেষ করা অসম্ভব। তবে জায়গাটা বড় মেঘলা, বৃষ্টি লেগেই আছে, রোদের মুখ কচিৎ দেখা যায়। এত ভিজে জায়গা আমার পছন্দ হয় না। শুকনো খট্‌খটে, নীরস জায়গা আমি বেশী পছন্দ করি, শিলং একটা ভিজে স্যাঁতসেতে ব্যাপার। একঘেয়ে পাইনবনও আমার ভাল লাগে না। এইজন্যে গৌহাটি থেকে শিলং-এর পথে আড়াই হাজার ফুট নীচেকার নিবিড় বনানীর সৌন্দর্য্য যেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এখানকার rolling downs-এর মরকত-শ্যামরূপ

তত ভাল লাগে না। আর সব জায়গাতেই মাটি আর কাদা, কোথাও বসা যায় না, ভিজে— একখানা বসবার পাথর নেই কোথাও। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মত যেখানে সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো নেই, অনাদৃত প্রস্তরময় শৈলগাত্র ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এত ঝর্ণা, এত বন্যপুষ্প সেখানে কোথায়? শিলং শহর অতি সুন্দর, ছবির মত সাদা সাদা বাড়িগুলো পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সাজানো। Kench-strasse-এ ধনী ও শৌখিন বাঙালীদের বাস—বেশ চমৎকার সাজানো বাগান সেদিকে। প্রায় সকলের বাড়িতেই ফুলবাগান। গোলাপ, ডালিয়া, কস্‌মস্, ফর্গেট্-মি-নট্ এসময়ে প্রচুর। বন্যজঙ্গলের মধ্যে এক ধরনের Compositae প্রায় পাইনবনের নীচে সর্ব্বত্র। আর এক রকমের lichen—আমি তার নাম দিয়েছি bird's feather lichen—গাছের ডাল থেকে টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়চে। এলিফ্যাণ্ট ফল্‌স্ যাবার পথে সুপ্রভা একরকম বনের ফল তুলে খাচ্ছিল, আমাকেও খেতে দিলে—রাঙা, ছোট ছোট, যেন কুঁচফলের মত—খেতে টক্। ও ফল আবার খাসিয়া মেয়েরা বাজারে বিক্রী করচে। ও বাজে ফল যে কে পয়সা দিয়ে কিনে খায়! খাসিয়া মেয়েরা দেখতে বেশ, এক-একটা এত সুন্দর ও এমন চমৎকার তাদের মুখশ্রী! ওবেলা 'সনৎ কুটীর' যাওয়ার পথে একটি মেয়ে দেখেছিলুম, সে একেবারে পরীর মত সুন্দরী।

এত ব্যাপার সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে শিলং শহর আমার ভাল লাগেনি। সে প্রাণ-নাচানো সৌন্দর্য্য, বিরাট রুক্ষ রূপ নেই এখানকার প্রকৃতির—যা দেখেচি নাগপুরের রামটেক পাহাড়ে, Highland drive-এ বা নীলঝর্ণার ছোট্ট পাহাড়ে বা সিদ্ধেশ্বর ডুংরীতে। এ বড় বেশী সাজানো—বেশী পুতুপুতু, সাজগোজ পরানো আহ্লাদী পুতুল। দেখতে চমৎকার কিন্তু মনে কোন বড় ভাব জাগায় না।

একথা কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের lower elevation-এর পক্ষে খাটে না—সেখানে যা দেখে এসেচি, তার তুলনা নেই। আমি এখন বলচি শুধু শিলং শহর ও আপার শিলং-এর কথা। আমি যা ভালবাসি, প্রকৃতির সে বর্ব্বর বন্যরূপ এখানে নেই—ঐ যে বললুম, বেশ সাজানো-গোছানো আহ্লাদী পুতুলটি। পাইনবন অবিশ্যি খুব চমৎকার বটে, কিন্তু রোমাণ্টিক্ বৈচিত্র্য নেই ট্রপিক্যাল বনের মত। কিন্তু lower elevation-এ এক জায়গা থেকে স্যার জোসেফ হুকার দু'হাজার নানা শ্রেণীর গাছপালা সংগ্রহ করেছিলেন। শিলংকে রেলওয়ে বিজ্ঞাপনীতে 'প্রাচ্যদেশের স্কট্‌ল্যাণ্ড' বলে কেন জানি নে—এই যদি স্কট্‌ল্যাণ্ড্ হয় তবে স্কট্‌ল্যাণ্ডের ওপরে আমার শ্রদ্ধা কমে গেল।

অথচ যে কেউ শিলং আসবে, সবাই বলবে—উঃ, কি চমৎকার জায়গা মশাই শিলং! একজন যা বলে, সবাই তার ধুয়ো ধরে। এগুলোর চোখ নেই নাকি? এই ভিজে স্যাঁৎসেঁতে একঘেয়ে পাইনবন তাদের ভাল লাগে? কি ভিজে, 'rain, rain, go to Spain'—নীচে নেমে চল মন, শিলং মাথায় থাকুন, বাংলার সমতল জমিতে নেমে রোদের মুখ দেখে বাঁচি।

একটা পাহাড়ের মাথায় প্রস্তরখণ্ডে বসে লিখচি। চারিধারে সোনালী কী ফুল ফুটে আছে। দূরে সমুদ্রের মত সিলেটের সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর পথ! শিলংটা যেমন বাজে, চেরাপুঞ্জি একেবারে স্বর্গ। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথের তুলনা দেব আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ আমি এ ধরণের ল্যাণ্ডস্কেপ্ কখনও দেখিনি। যাঁরা বিলেত বা আয়র্লণ্ডের ঢেউখেলানো সবুজ ঘাসের মাঠ দেখেছেন, তাঁরা হয়তো বলবেন এর দৃশ্য Surrey downs-এর মত, আয়র্লণ্ডের পল্লী অঞ্চলের মত। গৌহাটি থেকে শিলং রোডে যা দেখে

এসেছি, তা থেকে এর দৃশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। বড় বড় চুনাপাথরের শিলাখণ্ড সর্ব্বত্র ছড়ানো—উঁচু-নীচু শৈলমালা সর্ব্বত্র। যেদিকে চোখ যায়—কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প মাঠের মধ্যে। শিলাস্তূপের ধারে ধারে, দূরে দু-চারটে সঙ্গীহারা গাছ হয়তো ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শিলং-এর সেই লাল ফুলটা Compositae, বন্যমল্লিকা জাতীয় একরকম ফুল। করবীফুলের মত কি ফুল—আরও কত কি ধরণের ফুল। চেরাপুঞ্জির থেকে মুশমাই-এর পথে যে জঙ্গল আছে তা দেখায় ঠিক যেন লিচুগাছের বাগানের মত—অথচ তাদের ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিডে ভরা—তলায় নিবিড় undergrowth—অদ্ভুত ধরণের বন। এক এক জায়গায় চুনা পাথরের শৈলসানু ও নদীখাতের বিশাল ঢালু সম্পূর্ণরূপে বন্যপুষ্পে ভরা—কত ধরণের যে ফুল, তাই গুণে সংখ্যা করা যায় না। পাইনবন এদিকে একেবারেই নেই। চেরা বাজারে গাড়িতে বসে লিখচি—সামনে নদীর বিরাট gorgeটা মেঘ ও কুয়াসায় ভরে গিয়েচে, তার ধারে নিবিড় বন। গাড়ি ছাড়ল—এত জোরেও গাড়ি চালায় খাসিয়া ড্রাইভারগুলো! উঁচু-নীচু শুকনো খটখটে রাস্তা দিয়ে তীরবেগে গাড়ি ছুটচে, একদিকে উজ্জ্বল পর্ব্বতচূড়া, বনফুলে ভরা শৈলসানু, অন্যদিকে নদীর বিরাট খাত, কুয়াসা ও মেঘ আটকে রয়েচে। তাতে আবার রামধনুর সৃষ্টি করেচে। এক এক জায়গায় ঘন বন, যেন লিচু বাগানের মত দেখতে। অথচ মধ্যে ঘন অন্ধকার, শাখাপত্রে নিবিড়, ডালে ডালে অর্কিড, নীচে undergrowth-ওয়ালা বন—এ অঞ্চলের কী একটা গাছও চিনিনে! আসামের বন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, না ফার্ণ, না Compositae, না প্রাইমূলা, না মল্লিকা, করবীর মত ফুলগুলো—কিছুই কি বাংলাদেশের মত নয়? ঊনবিংশ মাইল থেকে বড় নদীখাতটা শুরু হোল, প্রায় ৮।১০ মাইল মোটর রোডের সমান্তরাল চলেচে, তবে কুয়াসায় আবৃত বলে ভাল দেখা গেল না। অপর পারের সানুদেশে নিবিড় Temperate forest, ফার্ণ আর শেওলা, থুজা আর প্রাইমূলা অজস্র। যার অভাবে শিলং ভাল লাগছিল না—তা পেলুম আজ চেরার পথে। এত বেশী পরিমাণে পেলুম, যে আর আমার কোন অভিযোগ নেই শিলংএর বিরুদ্ধে। এ এক স্বপ্নলোক আবিষ্কার করেচি চেরার পথে, যে স্বপ্নলোক পাথরে, বনে, ফুলে, মেঘে, ধূ ধূ নির্জ্জনতায়, বিরাটত্বে অভিনবত্বে বিচিত্র। যেখানে আজ মুশমাই গ্রামে চেরা মালভূমির প্রান্তে শিলাখণ্ডে বসে লিখছিলুম, সে সৌন্দর্য্যের তুলনা আছে? ওই তো আমার চিরকালের স্বপ্নের সার্থকতা।

শিলং ফিরে দেখি সুপ্রভা নেই মোটর স্টেশনে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম তারপর লাবান চলে গেলুম। একটা কথা লিখতে ভুলেচি। বড়বাজারের কাছে যখন বাস থেমেচে দুটি সাহেবের ছেলে এসে মোটরে উঠল, কি চমৎকার চেহারা দুটির। বড়টির সঙ্গে আলাপ হোল, বেশ লাজুক, কোন ইংরেজ বালকদের মত উগ্র নয়। বললে তার মা খাসিয়া মেয়ে। মোটরে স্টেশনে সুপ্রভাদের জন্যে অপেক্ষা করে লাবানে গেলুম। ওরা মোটর যোগাড় করতে পারেনি বলে আসতে পারেনি। সেখানে চা খেয়ে বীণা ও সুপ্রভার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। বীণা একটা ফুলের তোড়া দিলে, চমৎকার সাদা গোলাপ ফুলের তোড়াটি। কাল যাওয়ার কথাবার্ত্তা হোল, সাড়ে আটটার সময় গাড়ি আসবে আমার হোটেলে। একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েচে, তিনজনে যাব আমরা। ও বল্লে, কমলা নেব অনেক করে সঙ্গে, গাড়িতে বড় মাথা ঘোরে।

বৃষ্টি নামল সামান্য। আমি হোটেলে ফিরলুম। রাত সাড়ে সাতটা।

কাল সকালে শিলংয়ের ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গেলুম, চারিধারে পাইনবনের সারি, ঘুরে

লাবান হিলের চূড়া, লেকের ধারে শিশির-সিক্ত নানা গাছপালা—বেশ ভাল লাগল শিলং শহরটিকে। কিন্তু সময় নেই, তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। সাড়ে আটটাতে সুপ্রভাদের গাড়ি আসবে, কাজেই রেণুর চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়েই হোটেলে এসে স্নানাহার করে নিয়ে তৈরী হয়ে বসে রইলুম। খানিক পরে সুপ্রভার ভাই শান্তি এসে বললে—এ কি! আপনি রয়েচেন যে! আমি তো অবাক্, রয়েচেন মানে কি! গাড়ি কোথায়? শান্তি বল্লে—গাড়ি তো আপনার এখানে এসেছিল, আপনাকে না পেয়ে চলে গেল! শুনলুম হোটেলের ম্যানেজার ভুল করে বলে দিয়েচে যে, আমি ট্যাক্সি আসার দেরি দেখে বাসে সিলেট্ রওনা হয়েচি। কাজেই ওরা চলে গিয়েচে।

কি বিশ্রী ব্যাপার! রাগে দুঃখে তো আমার চোখে জল এল। আমি হাঁ করে বসে আছি সকাল থেকে সেজেগুজে গাড়ির জন্যে—আর হোটেলের ম্যানেজারটা না জেনেশুনে বলে দিলে আমি সিলেট্ চলে গিয়েচি?···

তখনি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে প্রথম টোল্ গেটে রওনা হলুম—মাত্র ৩২ মিনিট সময় হাতে আছে, এই ৩২ মিনিটের মধ্যে ১৪ মাইল গিয়ে নঙ্মাল্কি গেটে ওদের গাড়ি ধরিয়ে দিতে হবে। গাড়ি ছুটল তীরবেগে—Upper Shillong-এর রাস্তা দিয়ে। মোড়ের মাথায় আমি থামতে দিইনে। ড্রাইভার বলে গাড়ি উল্টে যাবে বাবু। বাঁকের মুখে দশ মাইলের বেশী চালাবার উপায় নাই, তাতে খালি গাড়ি। এলিফ্যাণ্টা ফল্স্-এর কাছে যখন এলুম, তখন ড্রাইভার বল্লে, ভরসা করছি বাবু, ধরিয়ে দিতে পারব।

চালাও চালাও, আরও জোর দাও। ত্রিশ কেন, চল্লিশ করো না! আর কতটা? শুধুই উঁচু-নীচু, বাঁকা আর বাঁকা, খাদের মত রাস্তা চলেচে পাহাড়ের গায়ে। জোর দেয় বা কি করে? নঙ্মাল্কি গেট দূর থেকে দেখা গেল। দুখানা বাস আর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েচে। আমরা পৌছুতে না পৌছুতেই ট্যাক্সিখানা ছেড়ে ঠিক সিলেটের পথে গিয়ে উঠল বাঁদিকে। আমি ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি থামালুম, দেখি তাতে এক সাহেব আর মেম। খবর নিয়ে জানলুম আর একখানা সাদা ট্যাক্সিতে দুটি বাঙালী মহিলা ও এক ভদ্রলোক কিছু আগে চলে গেলেন।

কি আর করি, নিরাশ হয়ে ফিরলুম। শিলং পোস্টাফিসের কাছে দেখি কান্তি দাঁড়িয়ে পথে, তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলুম। সে বল্লে—একটায় সিলেটের ডাক-ভ্যান ছাড়ে, তাতে লোকও নেয়। আমার মন বেজায় খারাপ, শিলং-এ থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই, কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে মেল-ভ্যানে টিকিট বুক্ করে এলুম। পথে সুপ্রভার সেই দাদা মোটরে যাচ্ছিলেন, আমায় দেখে বল্লেন—কি, আপনি যান নি? এখানে যে?

আমি সব বল্লুম। সুপ্রভার বুদ্ধির নিন্দাও করলুম। তিনি বল্লেন—তার কোন দোষ নেই। আমিও ছিলুম তখন, আপনার হোটেলে গিয়ে দশ মিনিট আমরা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। হোটেলের ম্যানেজার বল্লে—গাড়ি না আসাতে আপনি মোটরবাসেই সিলেট চলে গিয়েচেন। পুঁটুর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল তাই শুনে। সে খুব দুঃখিত হয়েচে মনে হোল।

কি আর করব, যা হবার তা হয়েচে। এতদিন থেকে ঠিক করে আসচি যে সিলেটের পথ দিয়ে সুপ্রভার সঙ্গে যাব, তা উভয় পক্ষের সামান্য বুদ্ধির দোষে ঘটল না।

একটার সময় বাস ছাড়ল। নঙ্মাল্কি গেটে গিয়ে আমি টাইমকিপারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম ওবেলা সুপ্রভাদের ট্যাক্সিখানা ৮-৪২ মিনিটে গেট্ পার হয়ে গিয়েচে, আর আমি এসেচি ৮-৫২ মিনিটে। ঠিক দশ মিনিট আগে গিয়েচে ওরা।

সিলেটের পথ অপূর্ব্ব। বেশ বিপজ্জনকও বটে, ডাইনে বাঁয়ে বিরাট বিরাট gorge—তার

ঢালু নিবিড় বনে চাপা। ট্রি ফার্ণ আর কত ধরণের গাছ, কত কি ফুল! চেয়াপুঞ্জির পথের সে gorgeটা এদের তুলনায় কিছু না। কুয়াসা করে আছে gorge-এর মধ্যে। যেন ওর মধ্যে কেউ কাঠখড়ে আগুন দিয়েচে, সাদা ধোঁয়া উঠচে। ডাইনে খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল, মধ্যে সরু পথ, বাঁয়ে গভীর খাদ। খাদের দিকে জানলা দিয়ে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে, নীচু পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঢালুতে কত রকমের গাছপালায় নিবিড় বন। চেরাপুঞ্জির সেই সব ফুল, আরও সংখ্যায় বেশী। খাসিয়া ড্রাইভার প্রাণের মায়া রাখে না। সেই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বেজায় আঁকা-বাঁকা উচু-নীচু সংকীর্ণ পথে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়েচে—যদি স্টীয়ারিং একটু বেগড়ায়, কি গাড়ি স্কিড করে—তবে একেবারে ২০০০ ফুট নীচে পড়ে গাড়িসুদ্ধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।

পাইউম্‌গ্লে গেটে দুদিকের গাড়ি একত্র না হলে মোটর ছাড়ে না। এদিক থেকে শিলংএর, ওদিক থেকে সিলেটের বহু বাস্ ও প্রাইভেট্ কার দাঁড়িয়ে। নেমে বেড়ালুম, দূরে সিলেটের সমতলভূমি মেঘের মত দেখা যাচ্চে। আমি কেবলই ভাবচি—কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে সুপ্রভা এইখান দিয়ে চলে গিয়েচে—এখন যদি সে থাকত, দুজনে কত গল্প করতুম। সত্যি, সারা পথটাতে যখনই সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বতায় বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েচি, তখনই ওর কথা আমার মনে হয়েচে। হর্ষবিষাদে ছুটেছে আজকের গোটা অপরাহ্ণটির এ বিচিত্র যাত্রাপথে। পাইউম্‌গ্লে ছাড়িয়েও কত gorge—নংটু বলে একটা জায়গায় কয়েক মাইল মাত্র আগে একটা সুগভীর নদীখাত, তার মধ্যে কি নিবিড় অরণ্যানী, চেয়ে দেখলুম, অত নীচে তো নজর হয় না, তবুও যতটা দেখলুম, নিবিড় কালো অন্ধকার হয়ে রয়েচে ভেতরটা। শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে সেই ট্রি ফার্ণ শোভিত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। নংটু থেকে পথ অনেক নেমে গেল, গাছ-পালার শোভা আরম্ভ হোল, সত্যিকার বন যাকে বলে তা আরম্ভ হোল। সে বনের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কখনও সে ধরণের নিবিড় বন দেখিনি। সে বন অন্ধকারে নিবিড়, দুষ্প্রবেশ্য, আর্দ্র, কত কি বিচিত্র গাছপালায় ভরা। আসামের এদিকের একটা গাছও আমার পরিচিত নয়। জংলা কলা, সুপুরি, Cycades, বাঁশ, পাম্ এসবও আছে। ফুলই বা কত রকমের! বড় বড় পার্ব্বত্য ঝর্ণা শিখরদেশ থেকে নীচে সবেগে নাম্‌চে। (আর এখন লিখব না, টেপাখোলাতে স্টীমার এল, এর পরেই গোয়ালন্দ, জিনিসপত্র গোছাতে হবে।)

কলকাতায় বসে সেই পথের কথাই মনে পড়ছে।

সেই অপূর্ব্ব পথের সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসে সারাক্ষণ কেবল ভেবেছি—আহা, সুপ্রভা যদি থাকত, তবেই এটা দেখাতুম, ওটা বলতুম, আহা সে নেই, কাকেই বা বলি? আমার পাশে যে কয়েকটি লোক বসে—সবাই লাট-দপ্তরের কেরানী, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে—তারা বসে ঢুলচে, নয়তো গল্প করচে অবিশ্রান্ত, দুজনে বমি করতে শুরু করে দিলে, কেউ চেয়েও দেখছে না সেই বিরাট gorgeগুলোর সৌন্দর্য্য, তার উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈচিত্র্য, কত ট্রি ফার্ণ, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ঝর্ণা, মেঘ উঠছে gorge থেকে, গভীর খাতের নিম্নতল থেকে ওপর পাহাড় পর্য্যন্ত বহু Zone-এ বিভক্ত উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈজ্ঞানিক রূপ। কি বিপজ্জনক সংকীর্ণ রাস্তা পাহাড়ের ওপর; কি রূপ সারাপথের! নংটু থেকে ডাওকি পর্য্যন্ত সে কি নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী গভীর gorge-এর তলদেশে কালো অন্ধকারের মধ্যে, কত জংলী ফল, Cycawers, ফার্ণ, আর ফুল, ফুল, ফুল—পাহাড়ের সানুদেশ আলো করে রেখেছে সেই লাল ফুলটাতে—সুপ্রভা বলেছিল যেটা সিলেটের সমতলভূমিতেও দেখা যায়—দশ-বারোটা বিভিন্ন শ্রেণীর ফুল গুনেচি, বড় বড় লতা, পরগাছা, অনেক নীচে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেচে শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে, সেই

ট্রি-ফার্ণ-শোভিত নিবিড় বনের মধ্যে। সত্যিকার ট্রপিক্যাল প্রকৃতির অরণ্যানী এই প্রথম দেখলাম ডাওকির পথে।

ডাওকিতে যখন মোটর পৌঁছল তখন অস্তদিগন্তের আভায় পর্ব্বত ও অরণ্যানীর শীর্ষদেশ রাঙা হয়ে উঠেচে—নিস্তব্ধ চারিদিক। মধ্যে নীচু উপত্যকায় ঘন ছায়া নেমেচে, গাছপালার সুগন্ধি বেরুচ্ছে, যেমন হেমন্তের অপরাহ্নে আমাদের দেশে বেরোয়। সুন্দর জায়গাটা, দু-একটা ডাকবাংলা আছে টিলার মাথায়। সম্ভবতঃ অস্বাস্থ্যকর স্থান, পাহাড়ের নিম্নসানুতে সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে। এখানে চা খেয়ে নিলুম, তারপর আবার মোটর ছুটল—শৈলমালা চলেচে মোটর রোডের সমান্তরাল ভাবে বাঁদিকে, অনেকগুলো ঝর্ণা নেমে আসচে পাহাড় থেকে নিম্নে বনানীর মাথার ওপর, দুধারে ছেটেখাটো জঙ্গল আর জলাভূমি, বড় বড় নলখাগড়ার বন। মোটর ছুটেচে তীরবেগে, হু-হু হাওয়া বাধচে বুকে, তৃতীয়ার একফালি চাঁদ উঠেচে সামনের আকাশে। সন্ধ্যায় অন্ধকারেই জয়ন্তীপুর বলে একটা গ্রামের ডাকঘর থেকে ডাক তুলে নেওয়ার জন্যে গাড়ি সেখানে দাঁড়াল। সাড়ে সাতটায় সিলেট্ টাউনে এল। টাউনটা আমার ভাল লাগল না—Read huts আর টিনের ঘর, সিনেমা—বেতের ও বাঁশের আসবাব বিক্রী হচ্ছে দোকানে। সময় খুব অল্পই ছিল, সুরমা নদীতে খেয়া পার হয়ে স্টেশনে এসে গাড়িতে চড়লুম। কি ভিড় গাড়িতে, আজই সব আপিস-আদালত বন্ধ হয়েচে, সব লোক ছুটেচে বাড়ি, পা রাখবার জায়গা নেই। কুলাউড়াতে আসবার পর কুলাউড়া আর শ্রীমঙ্গলের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল, চা বাগানও নীচে আছে, কিন্তু অন্ধকারে কোন্‌টা চা বাগান আর কোন্‌টা জঙ্গল এ বোঝা বড়ই শক্ত। কুমিল্লাতে একদল ছেলে উঠল, তারা ময়নামতী সার্ভে স্কুলের ছাত্র, ছুটিতে বাড়ি চলেচে। ঘুম পেল না গাড়িতে, যদিও জায়গা যথেষ্ট ছিল। চাঁদপুরে স্টীমারে পানীয় জলের ট্যাঙ্কের ওপর বসে বেলা একটা পর্য্যন্ত কাটালুম। ডেকে পা রাখবার জায়গা নেই, সর্ব্বত্র লোকে বিছানা পেতে শুয়ে বসে আছে। পদ্মাবক্ষে কাটল প্রায় এগারো ঘণ্টা। ভাগ্যকুলে কিছু খাবার কিনে খাই। গোয়ালন্দ থামবার আগে সে কি ভীষণ বৃষ্টি আর ঝড়! তাতেই স্টীমার দেরি করে ফেললে আসতে। চাটগাঁ মেলে চড়ে বসে ভাবলুম এ তো বাড়ি এসেচি, আমাদের রানাঘাট দিয়ে যে ট্রেন চলে সে তো বাড়িরই সামিল।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হোল। খুব দীর্ঘ হয়তো নয়, কিন্তু দীর্ঘটা relative term, আমার কাছে এই ভ্রমণই খুব দীর্ঘ বটে। তা ছাড়া সুপ্রভাকে কতদিন দেখিনি, ওর আদর-যত্নে এবারকার ভ্রমণের স্মৃতি মধুর হয়ে থাকবে চিরকাল।

ওখান থেকে ফিরে নলহাটি এসেচি কাল রাত্রে। রেল কোম্পানি জায়গাটা ভাল বলে যতই বিজ্ঞাপন দিক, আসলে জায়গাটা ভাল নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে তো কিছুই না—শুধু ধানের ক্ষেত চারিধারে, একটু ডাঙা আছে, এখানকার লোকে বলে 'পাহাড়'—আমার মনে হয় সেটা একটা কাঁকর ও রাঙা মাটির ঢিবি। বৈকালের পড়ন্ত ছায়ায় দূর-প্রসারিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের শোভা দেখা গেল ডাঙাটার ওপর থেকে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত, ওর বেশী আর কিছু নেই এখানে। জগধারী বলে একটা গ্রাম আছে দু'মাইল দূরে, ব্রাহ্মণী নদীর ধারে। সেখানে গুরুপদ সিংহের বাড়ি আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। বীরভূমের এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ির গড়ন আমাদের চোখে ভাল. লাগে না। গৃহ-নির্ম্মাণের শ্রী-ছাঁদ নেই, সৌষ্ঠব নেই, চেরাপুঞ্জিতে খাসিয়াদের পাথরের বাড়িগুলোতেও যে রুচিজ্ঞানের পরিচয় পেয়েচি, এই সভ্য বাংলাদেশে তার নিতান্তই অভাব চোখে পড়ল। জগধারী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি দেখলুম। পটে দুর্গা পূজা হচ্ছে।

সেকালের একখানা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা দেবীর পট টাঙানো, পেছনে রাঙাপাড় কাপড় পরা আগাগোড়া ঘেরাটোপে ঢাকা কলা-বৌ, পূজার উপকরণ যথেষ্টই, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে করলে যেমন হয় তেমনি। আমরা নদীতে স্নান করলুম, হাঁটু পর্য্যন্ত জল, কোন রকমে শুয়ে স্নান করা করা গেল। কাছেই একটা মঠ আছে, সেখানে গিয়ে গুরুপূজার বিধি আছে দেখে এবং একটা মোটা লোকের ফটোগ্রাফের গলায় ফুলের মালা কৌশলে পরিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো হচ্চে দেখে চটে গেলুম এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করলুম। নর-পূজা আমাদের ভাল লাগে না, আমার ধাতে ও বরদাস্ত হয় না।

মুড়াগাছায় গিয়েছিলুম একটা লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবে। লোহারাম মুখুয্যে ওখানকার জমিদার, তাদের বাড়িতে থাকবার জায়গা দিলে। বেশ লোক ওরা, কি খাতির-যত্নটাই করলে! ওদের বাড়ির একটা ছেলে বিলেত-ফেরত, হিসেব শিখতে গিয়েছিল, দেখতে বেশ সুশ্রী, বসে বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত স্পেনের গল্প করলে। সকালে উঠে গ্রামের মধ্যে বেড়িয়ে এলুম— আমাদের দেশের কত গাছপালা, খুব বড় বড় বাড়ি গ্রামের মধ্যে, বড় বড় সেকেলে পূজোর দালান, যেন দিল্লীর মতি মসজিদ কি দেওয়ান-ই-আমের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পূজোর দালানের এই স্থাপত্যটা মুসলমান তথা মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণ, ও বিষয়ে কোন ভুল নেই। হিন্দু স্থাপত্য যে এটা নয়, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের, কোনারকের সূর্য্য মন্দিরের গঠনরীতি দেখলে তা বোঝা যাবে। কাছেই ধর্ম্মদহ গ্রামে বাবা ছেলেবেলায় কথকতা করতে এসেছিলেন, সে কথা মনে পড়ল স্কুলের মাঠে বেড়াতে গিয়ে। বৈকালে অল্পক্ষণই মিটিং-এ ছিলুম, তারপরে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে ট্রেনে উঠলুম—দুধার বন্যার জলে ভেসে গিয়েচে, এখানকারও অবস্থা আমাদের দেশের মতই। ক'দিন কেবলই ট্রেনে ট্রেনে বেড়াচ্ছি, ১৩ই অক্টোবর শুরু হয়েছে, আর আজ ২৮শে—এই ১৫ দিনের মধ্যে কত জায়গায় গেলুম—আর কত বার বেড়ালুম।

আজ ক'দিন এখানে এসেচি। এবার অতিরিক্ত বন্যা আসাতে কুঠীর মাঠের সে শোভা নেই। আমার তেমন ভাল লাগে না—ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো তো জলে হেজে পচে গিয়েচে, যেখানে সেখানে কাদা ও পানা-শেওলার দাম ও কচুরীপানা। খুকু এখানে আছে, ও রোজ সকালে স্নানের আগে ও দুপুরে আসে। আমি সকালে বাঁশবাগানের পথ দিয়ে দিয়ে ঘাটে যাই, বেশী বনের মধ্যে যাই, মাকড়সার জাল এবার চোখে পড়চে না। তা হলেও খুব বড় বড় জাল দেখলুম, শিলং-এ একরকম বড় জাল দেখেছিলুম পোস্টাপিসের কাছে। আমাদের এখানে মাকড়সাদের জালের টানা খুব দূরে দূরে হয়। আবার খুব ছোট টানার জালও দেখিনি যে তা নয়, যেমন কুঠীর মাঠে একটা ঝোপে সেবার দেখেছিলুম, এই গাছপালা, লতাঝোপ, মাকড়সা, পাখী এদের একটা বিভিন্ন জগৎ—সহানুভূতির সঙ্গে ওদের না-দেখলে কি ওদের বোঝা যাবে না চেনা যাবে?

বিকেলে রোজ মাছ ধরতে যাই। অনেককাল পরে আবার কেঁচোর টোপ গেঁথে মাছ ধরতে বসেচি। বোধ হয় বনগাঁ স্কুলে ভর্ত্তি হবার পরে আর কখনও মাছ ধরিনি—দু'একদিন ধরতে বসলেও এত তোড়জোড় করে যে ধরিনি তা ঠিক। এবার ইছামতীতে মাছও হয়েচে বিস্তর। আমার ছোট ছিপে কেবল পুঁটি আর ট্যাংরা ছাড়া পাইনে, কিন্তু ফণি চক্কত্তি ও হরিপদ রোজ সাত-আটটা বড় বড় বান মাছ ধরে। বেলা যত পড়ে আসে, রোদ খুব রাঙা হয়ে ওঠে। ভারী সুন্দর শোভা গাঙের, বকের দল উড়ে যায় জলের ওপর দিয়ে, সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামে—

আমি কাৎনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকব না সন্ধ্যার শোভা দেখব ? চোখ ঠিকরে যায় কাৎনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে। চোখে এত ব্যথা হয় যে মনে হয় যেন খুব বই পড়েচি। সন্ধ্যার সময়টা খুব lovely লাগে, কিন্তু বসে পাঁচীদের সঙ্গে গল্প করি।

আজ সর্ব্বপ্রথম ভাল লাগল কুঠীর মাঠ। বন্যার দরুন এবার কুঠীর মাঠের সে সৌন্দর্য্য ছিল না, ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো সব হেজে পচে গিয়েচে, সে শ্যামলতা আর কোনদিকে চোখে পড়ে না। আজ দুপুরে খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে, তারপর আমার মনে পড়ল যে এবার এসে আইনদ্দির সঙ্গে দেখা করা হয়নি। নব্বই বছর হয়েচে ওর বয়েস, কবে মরে যাবে, যাই একবার দেখা করে আসি। মনে ছিল আনন্দ, কি জানি কেন জানিনে, সেই আনন্দভরা মন নিয়ে গেলুম পড়ন্ত বেলার হল্‌দে রোদমাখানো গাছপালার নীচে দিয়ে কাঁচিকাটা পুলের দিকে। বনের দিক থেকে এক এক জায়গায় কি সুন্দর ফুলের সুবাস ভেসে আসচে, অথচ কি ফুলের যে অত সুঘ্রাণ তা দেখা যায় না। খুঁজে খুঁজে দেখ পথের ধারে এক জায়গায় ঝোপে নাটাকাঁটার ফুল ফুটেচে, তার গন্ধ ঠিক আতরের মত। কিন্তু যে গন্ধটা আগে পেয়েছিলুম, তা নাটা ফুলের গন্ধ নয়। সে গন্ধ অন্য ধরনের। শুধু ফুলের গন্ধ বলে নয়, বনভূমির পাশ দিয়ে যাবার সময় লতাপাতা, ফুলফলের গন্ধ জড়িয়ে মিশিয়ে যে অপূর্ব্ব সুবাসের সৃষ্টি করে গাছপালারাই তার স্রষ্টা, নীলাকাশের তলায় কোটি যোজন দূরের সূর্য্যের রৌদ্রের সঙ্গে পৃথিবীর মাটির রস,, বায়ু-মণ্ডলের অদৃশ্য বাষ্প, এদের সংযোগে ওরা যে রসায়ন প্রস্তুত করে, তাই আমাদের প্রাণীজগতের উপজীব্য। ভূতধাত্রী তরুলতা নির্ম্মমভাবে ছেদন করবার সময় একথা সব সময় আমাদের মনে ওঠে না। তাই আজ সকালে যখন দেখলুম তেঁতুলতলার মাঠের ধারে খানিক করে জমির জঙ্গল কেটে দিয়েচে—তখন এত কষ্ট হোল! ওখানে নাকি ওরা বেগুন করবে। আহা, কি চমৎকার সাঁইবাবলা ও কেঁয়োঝাঁকা গাছগুলো কেটেচে, আজ ত্রিশ বছর ধরে ওই বনভূমি কত বনের পাখীর আহার্য্য যুগিয়েচে, আশ্রয় দিয়েচে। সৌন্দর্য্যে, ছায়ায়, ফুলের সুবাসে আমাদের তৃপ্তি দিয়েচে, তাদের ওভাবে উচ্ছেদ সাধন করে যে কোন্ প্রাণে তাও বুঝিনে। একটা গাছ কেউ কাট্‌লে আমি তা সহ্য করতে পারিনে। কাগজের কলের জন্যে আমাদের দেশ থেকে গাড়ি গাড়ি বাঁশ চালান যাচ্চে, বাঁশবন দেশের একটা শোভা, এবার সর্ব্বত্র দেখচি বাঁশবন ধ্বংসের পথে চলেচে। দাম তো ভারী, পাঁচ টাকা করে একশো—আমার ঝাড়ের বাঁশ আমি বেচিনি। দুপুরে যখন রৌদ্রে মাঠের মধ্যে গামছা পেতে চুপ করে শুয়ে থাকি, দূর গ্রাম-সীমান্তে বাঁশের বনে নতুন বাঁশের দল সোনার সড়কির মত উঁচু হয়ে থাকে, নীল আকাশের তলায় শিমূলের ডাল বাতাসে দোলায়, রঙিন-ডানা প্রজাপতিরা বনের ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, একটা গাঙ্‌চিল ইছামতীর পারের বড় কদম গাছটা থেকে ডাকে—মনে আসে অপার ব্যোমের উদার ইঙ্গিত, বনপুষ্পের বাণী, বনবিহঙ্গের কলতান —যে সৃষ্টিকে যে জগৎকে জানিনে, বুঝিনে, ভাল করে চিনিওনে তার রহস্যে দেহমন সবল হয়ে ওঠে।

তারপর গেলুম আইনদ্দির বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে মরাগাঙের বড় বড় বট গাছের ছায়ায় ছায়ায় সুন্দরপুরের দিকে। আবার সেই বনঝোপের গন্ধ, সেই ছায়া, সেই পাখীর ডাক। এবারকার বন্যায় অনেক গাছপালা নষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও এ পথের সৌন্দর্য্য তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। মনে হোল সেই ডাওকি নদীর দোদুল্যমান সেতু ও সেই gorgeটার কথা।

ঠিক দুপুর বেলা। অপূর্ব্ব পূজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল। নৌকো বেয়ে চলেচি বনগাঁয়ে,

মেঘলোক-শূন্য নীলাকাশের কোলে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। মনে কেমন একটা বিষাদ গ্রাম ছেড়ে যেতে, ইছামতী নদী ছেড়ে যেতে, খুকুকে ছেড়ে যেতে। তার ওপর দেখে এলুম খুকুর জ্বর হয়েচে, আজ সকাল থেকে সে শুয়েই আছে। কিচমিচ পাখী ডাকচে চালতেপোতার বাঁকে ঝোপে ঝোপে। মন উদাস হয়ে রয়েচে আমার, কিছু ভাল লাগচে না। কেন এমন হয়? যাদের ভালবাসি, কাছে রাখতে চাই, তাদের কেন কাছে পাইনে? কোথায় সুপ্রভা পড়ে রইল শিলং-এ, দেখবার ইচ্ছে হলেই কি তাকে দেখবার উপায় আছে? কোথায় পড়ে রইল খুকু! এই যে ওর অসুখ দেখে এলুম, কিছুই করবার নেই আমার—করতে গেলেই যত নিন্দা, যত কানাকানি হবে এই সব পাড়াগাঁয়ে।

খুব বেড়িয়েচি এবার ছুটিতে। সেই ডাওকি নদীর gorge, চেরার পথে সেই প্রাইমুলা ও Compositaeর বন মনে পড়চে। চালতেপোতার বাঁকে এই গাছপালার সৌন্দর্য্যে, খুকুকে ছেড়ে আসবার বিষাদে মনটা পূর্ণ হয়ে আছে। এ সময় শিলং, নংটু থেকে ডাওকি পর্য্যন্ত সেই বিরাট ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

এইমাত্র বারাকপুর থেকে মোটরে ফিরে এলুম। আজ বেলা বারোটার সময় পশুপতিবাবু, বৌঠাকরুণ, নীরদবাবু ও তাঁর স্ত্রী, বগলাবাবু ও আমি গিয়েছিলুম মোটরে বারাকপুরে বেড়াতে। পথে টায়ার খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন এক জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর যখন বনগাঁ এলাম, তখনই বেলা গিয়েচে। জিনিসপত্র কিনে নিতে কিছু দেরি হয়ে গেল। ওখান থেকে বেলা পড়ে গেলে বারাকপুর গেলাম। পুঁটিদিদিদের বাড়ির সামনে মোটর গিয়ে দাঁড়াল। খুকু নিজের বাড়ি কি করছিল, আমি গিয়ে তাকে বল্লুম। সে কাপড় পরে তখনি এল। পশুপতিবাবু খুড়োদের রোয়াকে বসিয়ে তার ফটো নিলেন। আমিও সেখানে পেছন দিকে দাঁড়াই। তারপর বগলাবাবু গান করলেন—'চাঁদ ডুবে যায় ভোর গগনে।' আমি পশুপতিবাবুকে নিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। এসে দেখি শিবুর মা নীরদবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েচে। একটু পরে তিনি এসে খুকুদের বাড়ি বেড়াতে গেলেন। আমিও দেখতে গেলুম। খুকু ডাকলে, আসুন না? আমি ওদের ঘরে গেলুম। তক্তপোশের ওপর উনি আর খুকু বসে আছেন। তারপর খুকু দোরের কাছে এসে বসল। বগলাবাবু গান করলেন—আমিও সেই দোরের বাইরেই বসে। গান খুব ভাল হোল। তারপর সবাই খেতে বসে গেল। ওদিকে খুকু, বেলা ও পশুপতিবাবুর স্ত্রী খেতে বসলেন। খুড়ীমা পরিবেশন করলেন। খাওয়াদাওয়ার পরে খুকু একা এ ঘরের অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করলে বগলাবাবুর গানের বিষয়ে। সুপ্রভার পত্র দেখতে চাইলে, তা ওকে তো না দেখিয়ে পার পাবার জো নেই। বল্লে, আবার কবে আসবেন? বল্লুম, সেই বড়দিনের সময়। বল্লে, এসে বড় খারাপ লাগছিল এ ক'দিন, আজ ভাগ্যিস আপনারা এলেন!

রাত নটার গাড়ি গেলে আমরা রওনা হলুম। খুকু রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছিল। বল্লে—গুড্ বাই। পশুপতিবাবু বকুলতলায় দাঁড় করিয়ে ওর একটা ফটো তুলেছিলেন, আর একটা কোন্ ঝোপের কাছে দাঁড় করিয়ে।

পথে জাহ্নবীর বাসায় খোকাকে নামিয়ে দিয়ে আমরা ওপারে গেলুম তেল কিনতে। বারাসতের কাছাকাছি এসে গাড়ির টায়ার আবার গেল। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করবার পরে একখানা লরি পেয়ে তাতে করে কলকাতা পৌছুলাম।

এ বেড়ানো মনে থাকবে বহুদিন।

চন্দননগরে একটা সভায় আমায় সভাপতিত্ব করতে হবে বলে গিয়েছিল, কিন্তু শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের আজ বার্ষিক উৎসব। পশুপতিবাবু বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন। দুপুরে কিন্তু বাধ্য হয়ে চলে যেতে হল চন্দননগরেই। সুরেন মৈত্র, সুরেন গোস্বামী, বিজয়লাল চাটুয্যে, আমি সকলে বেলা তিনটের সময় গিয়ে নৃত্যগোপালের পুস্তকাগারে উপস্থিত হলাম। ওরা লাইব্রেরীতে বসে কথাবার্ত্তা বলছিল—আমি পেছন দিকের নির্জ্জন ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে শীতের অপরাহ্নের হলদে রোদ-মাখানো রাধালতাফুলের ঝোপ ও বাঁশগাছের দিকে চেয়ে রইলুম। কেবলই মনে হচ্ছে সুপ্রভা আর খুকু আজ এই অপরাহ্নে কি করচে। এক একবার আমাদের গাঁয়ের বকুলতলাটি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম, খুকু এখন পড়ন্ত বেলায় ছায়ায় তাদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা পাঁচীর সঙ্গে গল্প করতে এসেছে এ-বাড়ি। সুপ্রভার আজ ছুটি, হয়তো পাইন মাউণ্ট স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েচে। ওর রুমালখানা সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলুম। বড্ড ময়লা হয়ে গেছে। ওদের দুজনের কথা ভাবছি, এমন সময় সুরেনবাবু ডাক দিলেন লাইব্রেরীতে ব্রাউনিং শোনাবার জন্যে। সুপ্রভা এবার ব্রাউনিংয়ের 'Rudel to the Prince of Tripoli'র অনুবাদ করেছিল 'বিচিত্রা'য়। সুরেনবাবু তার অন্যভাবে অনুবাদ করেচেন—আমার দুটিই ভাল লাগল—তবে সুপ্রভার অনুবাদ খুব literal না হলেও মিষ্টি বেশী। সুপ্রভা যে ছন্দটাকে অবলম্বন করেচে, তার ধ্বনি ও লয়ের অবকাশ সুরেনবাবুর অবলম্বিত ছন্দের চেয়ে বেশী। ব্রাউনিং পড়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের ফটো নেওয়া গেল। মনে পড়ল গোপীর সঙ্গে কুড়ি বছর আগে একবার এসেছিলুম চন্দননগরে তারপর আর কখনও আসিনি। বিয়ে করব বলে মেয়ে দেখতে এসেছিলুম, তখন আমি কলেজে পড়ি, ১৮ বছর বয়স। অবিশ্যি সে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। মনে আছে, মেয়েটি ছিল খুব ছোট, বারো বছর বয়স, অত ছোট মেয়ে আমি পছন্দ করিনি। মেয়েটি বেশ ফর্সা, একহারা চেহারা, তাও আজও মনে আছে। এখন গিন্নীবান্নী হয়ে নিশ্চয়ই কোথাও ঘরসংসার করচে—যদি বেঁচে থাকে।

চন্দননগরে সভার কাজ শেষ হবার আগেই সুরেনবাবুকে সভাপতির আসনে বসিয়ে আমি আর বিজয়লাল চলে এলুম। হাওড়া থেকে বাসে দেশবন্ধু পার্কে এলাম। সেখানে শিশির-কুমার ইনস্টিটিউটের থিয়েটার হচ্চে পার্ক স্কুলের প্রাঙ্গণে। নীরদবাবু, বৌঠাকরুণ, পশুপতিবাবু সবাই আছেন। জাস্টিস্ দ্বারিক মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হল।

সেদিন রাজপুরে গিয়েছিলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। ঢাকুরিয়া, কস্‌বা প্রভৃতি স্থানে রেল-লাইনের ধারে ছোট ছোট গৃহস্থ-বাড়ি। সন্ধ্যার চাপা আলো পড়ে কেমন একটা শ্রী হয়েচে, যেন কত পুঞ্জীভূত শান্তি ও রহস্য, গৃহস্থালির কত স্নেহ ভালবাসা এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে, নারীর মুখের মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে, তার হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয় সে শান্তি ও মাধুর্য্যের নিত্য আরতি চলচে। যেখানেই একটা মেয়ে এঁদো-পড়া পুকুরের ঘাটে বসে এই সন্ধ্যাবেলা বাসন মাজচে, সেখানেই তাকে ঘিরে যেন চারিপাশে গভীর রহস্য। মেয়েরা না থাকলে জগৎটা কি মরুভূমিই হত তাই ভাবি।

রাজপুরে পৌঁছে গল্প করলুম তেঁতুলদের বাড়ি বসে অনেকক্ষণ। ফুলি এল, তেঁতুলের মা বলছিলেন তাঁকে বড়দিনের ছুটিতে হরিদ্বার নিয়ে যেতে। সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত ভ্রমণ সম্বন্ধে পরামর্শ হল—কোথা দিয়ে যাওয়া যাবে, কোথায় নামা যাবে, কি কি সঙ্গে নেওয়া হবে—এই

সব কথা।

কিন্তু আমি দেখলুম গৃহস্থালিতে যে খুব শান্তি আছে, যতটা দূর থেকে ভাবি, তা ঠিক নেই। এ সব বাড়িতে তো ছেলেমেয়েদের সর্ব্বদা কান্নাকাটি লেগেই আছে—যখন ছোট ছেলেমেয়ে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে, তখন প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। আর এ করছে ওর সঙ্গে ঝগড়া, ও করছে এর সঙ্গে ঝগড়া। তেঁতুল তো আপিস থেকে ফিরে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে—তার বৌকে সবাই কেন একলা ওঘরে ফেলে রেখেচে। এ রকম শুধু এদের বাড়ি নয়, সব গেরস্ত বাড়িতেই দেখেচি এই রকম অশান্তি, চীৎকার—চিন্তা ও বিবেচনার সম্পূর্ণ অভাব।

মেয়েরা যদি ভাল হয় তবে সত্যিই সংসারে ওরা শান্তি আনতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা অধিকাংশই অশিক্ষিতা, বিশেষ কিছু জানে না, বোঝে না—তুচ্ছ বিষয়ে বড় বেশী ঝোঁক, তুচ্ছ কথা নিয়ে দিনরাত আছে। মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি কম মেয়েরই আছে। যে ধরণের সদাহাস্যময়ী মেয়ে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমি হাসিখুশি বড় ভালবাসি, যে মন খুলে হাসতে পারে না, আনন্দ করতে পারে না, তাকে নিয়ে সংসারে চলা যায় কি ?

অনেকদিন পরে খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁর গান শুনলুম কাল ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। ভাগলপুরে থাকতে হেমেন রায়ের মুখে আবদুল করিমের খুব প্রশংসা শুনি। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল এঁর গান শুনব। আমি জানতুম না যে এবার All Bengal Music Conference-এ খাঁ সাহেব আসবেন। সেদিন কাগজে নাম দেখেই স্থির করলুম গান শুনতেই হবে। সত্যিই খুব বড় দরের শিল্পী, ত' তাঁর গান শুনে কাল বুঝে নিয়েচি। সত্তর বছরের বৃদ্ধের মুখে এমন চমৎকার মিষ্টি সুর আশা করিনি, যেন সারেঙ্গী বাজ্‌চে।

এবার বড়দিনের ছুটি দেশে বড় আনন্দে কাটিয়েচি। বৈকালে রোজ কুঠীর মাঠে ছোট এড়াঞ্চি ফুলের বনের মধ্যে একটা চাদর পেতে বসে বসে Jeans-এর Universe Around পড়তুম। একদিন চাঁদ উঠেচে ছোট একটা চট্‌কা গাছের পেছনে, বোধ হয় ত্রয়োদশী, বিকেল বেলা, সে একটা অপূর্ব্ব ছবি—কতকাল মনে থাকবে ছবিটা। পরের প্রতিপদেই হালিডাঙ্গার প্রজা-বাড়ি থেকে খাজনা আদায় করে ফিরচি, দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে চাঁদ উঠল, কোনদিকে কোন মানুষ নেই, পশ্চিম আকাশে দপ্‌ দপ্‌ করচে শুকতারা। একটা খেজুর গাছে রসের ভাঁড় পাতা ছিল, ভাঁড়টা নামিয়ে রস খেলাম, কিন্তু গাছে আর সেটা বাঁধতে পারলাম না। তখন আমার মনে হয়নি, তাহলে ভাঁড়টার মধ্যে দুটো পয়সা রেখে এলেই হত।

এবার কি জ্যোৎস্না পেয়েছিলুম দেশে! যেমন দিনে আকাশ সুনীল, মেঘমুক্ত—রাতে তেমনি ফুটফুটে জ্যোৎস্না—অবিশ্যি শীতও অতি ভয়ানক। খুকু ছিল দেশে, সে সর্ব্বদাই এসে গল্প করত, বেশ লাগত তাই।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে উঠে গেলুম, চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার। কেমন একটা মনোভাব হল, খানিকটা বিষাদও তার মধ্যে যে না আছে এমন নয়। এই চারিপাশের বাড়ির কত লোককে জানতুম যখন প্রথম এ মেসে এসেছিলুম, তারা সবাই কোথায় গেল ? কতকাল হল তাদের আর দেখি নে। তাদের কথাই মনে হল এ নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে। দুপুরে স্কুলের ছাদে একা বসে বসে যাদের কথা ভাবি, এরাও তাদের দলে আছে। সত্যি, আমার মনের

এ যে কি অদ্ভুত অবস্থা, কোন পরিচিত বা অর্দ্ধপরিচিত মানুষকে দূরে রাখতে ইচ্ছে হয় না, সকলকে কাছে টেনে রাখতে ইচ্ছে করে যে কেন!

"Space & time, I am learning are merely modes or appearance
Since a corner with thee darling, seems infinite now.—Goethe.

অনেকদিন পরে দেশে গিয়েছিলুম। দুপুরের পরে গিয়ে পৌঁছই। আমার ইচ্ছে, আমি যে গিয়েচি, কেউ যেন না টের পায়। কেননা তাহলে বড় লোকের ভিড় হয়, এপাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দেখা করতে আসে। আমি অত ভিড় পছন্দ করিনে। বিশেষ করে ইন্দুদের বাড়ি জানতে পারলে তো আর রক্ষেই নাই। কিন্তু শ্যামাচরণ দাদাদের টিউবওয়েলের কাছে গোপাল দেখি কি করচে, সে তো গিয়ে বাড়িতে খবর দেবে—সেই ভয়ে চুপি চুপি চলে যাচ্ছিলুম, তবু ও ঠিক টের পেয়েচে। তখন অগত্যা ওদের বাড়ি যেতে হল। তারপর খুকুদের বাড়িতেও গেলুম। খুকুদের বাড়িতে প্রথমটাতে যাইনি। পাঁচীদের বাড়ির উঠোনে আমাকে ঢুকতে দেখেই খুকু ডাকলে, আসুন, আসুন। ওদের দাওয়াতে গিয়ে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। ও বল্লে—আপনি শনিবার না আসাতে ভয়ানক রাগ করেছিলুম। খুকুদের বাড়ি থেকে যখন ফিরি, তখন বিকেল হয়েচে। সাজিতলার পূবে যেখানে ভাঙন ধরেছে নদীর পাড়ে, সেখানে একটা হেলে-পড়া খেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বসে নদীর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলুম। বড় আনন্দ ছিল মনে, আরও বসতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এদিকে আবার সন্ধ্যা হয়ে আসচে দেখে উঠতে হল। চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে আসা আমার বড় ভাল লাগে—শীতের সন্ধ্যায় ফুটন্ত ছোট এড়াঞ্চির ফুলের বন, শুক্‌নো গাছপালার গায়ে রাঙা রোদ, গরীব লোকের কুঁড়েঘর, ওধারেই নদী, নদীর ধারে মাঠ—দেখতে দেখতে আমি আর উমা যে সাঁকোর ধারে বনের মধ্যে খেলা করতুম, সেখানে এসে উঠলুম।

পরদিন যখন কলকাতায় আসি, ট্রেনে সারাপথ কেবল মড্ কস্টেলোর একটা গানের লাইন মনে আসতে লাগল বার বার—আর কি সে আনন্দ মনে! জীবনটাকে এই একমাসের মধ্যে একটা নতুন চোখে যেন দেখেচি। জীবনের যেন নতুন অর্থ হয়। একটি নতুন উপন্যাস শুরু করব ভাবচি এই সম্পূর্ণ নতুন ধারার।

তারপর আজ পাটনা এলুম বহুকাল পরে। ১৯২৭ সালের পরে আজ ৯।১০ বছর পাটনা আসিনি। আমি, নীরদ, ব্রজেনদা, সজনী সবাই একসঙ্গে এলুম। কাল রাত্রে একাদশীর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বর্দ্ধমানের বড় বড় মাঠের দিকে চেয়ে আমার মনে আসছিল একটি প্রবহমান জীবন-ধারার কথা, যা চিরপুরাতন অথচ প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়—সৃষ্টির মধ্যে, রসের মধ্যে যার সার্থকতা। কত সুপ্ত গ্রাম তো এই জ্যোৎস্নায় স্নাত হচ্চে, কিন্তু বহুদূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীনদীর তীরবর্ত্তী এমন একটি গ্রামের ছবি বার বার মনে আসে কেন?

এ কথা আরও মনে এল যখন দুপুরে একাই পাটনাতে ওদের বাড়ির সামনের পার্কটাতে বসেছিলুম। ছোট্ট পার্কটা, বড় বড় ডালিয়া ফুটে আছে, আর ক্যালেণ্ডুলার—সেও আধশুক্‌নো। নীল আকাশের নীচে বসে দুপুরের রোদটি এই ভয়ানক শীতের দিনে কি মিষ্টিই লাগছিল। পাটনায় শীতও প্রচণ্ড।

আজ ন'বছর আগে পাটনা থেকে শেষ যখন চলে গিয়েছিলুম, আমার সে জীবনে এ জীবনে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গিয়েচে। তখন ছিল অন্য ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি, এখন হয়েচে অন্য ধরণের।

এখন যারা এসেচে জীবনে—তখন ওরা ছিল না। ওদের সত্যিই বড় ভালো লাগে। তাই আজ তুপুরে বসে কেবলই কাল রাতের মত ছোট্ট একটি পল্লীনদী, একটি বকুলগাছের ছায়াস্নিগ্ধ গ্রাম-এর কথাই মনে পড়ে। সুপ্রভার কথা সব সময়েই মনে হচ্চে, আহা, কোথায় কতদূরে রয়েচে পড়ে, ওর বাবার আবার করেছে অসুখ—ছেলেমানুষ, তাই নিয়ে ওর মন খুব খারাপ হবারই কথা।

সমস্তদিন যদি এ পার্কটিতে বসে এমনি আপন মনে ভাবতে পারতুম, খুবই ভাল হত। কিন্তু তা হবার নয়, আমরা পাটনা শহরে এসেচি শুনে তাবৎ প্রবাসী বাঙ্গালীরা ভাবচেন আমরা তাঁদের অতিথি, কারণ মাতৃভূমি থেকে এসেচি, একটা প্রীতির চোখে সবাই দেখবেন, ওটা বেশী কথা নয়। বৈকালে একটা চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল—এখানকার পাব্লিক প্রসিকিউটর মিহির-লাল রায়ের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখা বৈকুণ্ঠবাবু এ্যাডভোকেটের সঙ্গে—ভাগলপুর থেকে যখন-তখন আপীলের মোকদ্দমা করতে এসে ওঁর বাসায় উঠতাম। অনেকগুলি ভদ্রলোক এসে-ছিলেন—সবাই যখন চায়ের টেবিলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, বিহারীদের সহানুভূতির অভাব, এমন কি বাঙ্গালীদের প্রতি স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রভৃতি বর্ণনা করছিলেন, আমি তখন আবার অন্যমনস্ক হয়ে জানলার বাইরে অস্তসূর্য্যের রঙে রঙিন আকাশ ও রাঙা-রোদ মাখানো গাছ-পালার দিকে চেয়ে ভাবচি, কত গ্রামের গাছপালার ছায়ায় এই সন্ধ্যায় কিশোরী মেয়েরা গা ধুয়ে চুল বেঁধে নিজেদের ছেলেমানুষি মনে কত কি ভাবচে, কত ভাঙা-গড়া করচে মনে মনে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে, কত স্বপ্ন দেখেচে—তারপর এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পাড়াগাঁয়ে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে সারাজীবন কাটালে।

সন্ধ্যার সময়ে বি-এন্ কলেজের হলে প্রকাণ্ড সভা। নীরদের অভিভাষণ বড় চিন্তাপূর্ণ হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা যখন বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছি, তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, আজ পাটনাতে তেমন শীত নেই, আমার কেবলই বাংলাদেশের কথা মনে হয়।

এতক্ষণ সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েচে?

ওরা সবাই?···

সুপ্রভাও?···

সুশীলমাধব মল্লিক এখানকার বড় এ্যাডভোকেট। আমি তাঁকে এর আগে হাইকোর্টে কয়েকবার দেখেচি। তাঁরই বাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। তাঁদেরই গাড়িতে সবাই গিয়ে পৌছলুম। সেদিন বনগাঁয় যেমন এক সভা বসেছিল মন্মথ রায়ের বাড়িতে—এদিন এখানেও সুশীলমাধববাবুর বৈঠকখানায় রবীনদা, কলেজের জনৈক biology-র অধ্যাপক, নীরদ, সজনী, আমি সবাই মিলে আরম্ভ করলুম। আনাতোলা ফ্রাঁস সম্বন্ধেই তর্কটা গুরুতর। খাওয়ার সময় সুশীলবাবু নিজে বসে এত তদ্বির করতে লাগলেন—বিশেষতঃ বৃদ্ধ বোধহয় সন্ধ্যার পরে দু এক পেগ টেনে একটু খোসমেজাজে থাকেন—যে আমরা না পারি পাতের তলায় সন্দেশ লুকিয়ে ফেলে ফাঁকি দিতে, না পারি মাছ-মাংসের বাটিতে একটুকরো ফেলে রাখতে। পাটনায় এসে কেবলই খাচ্চি, খেয়েই প্রাণ গেল।

রাত অনেক হয়েচে। জ্যোৎস্না আজও ফুটেচে। মণিদের বাড়ি এসে সকলে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে উঠে এখানকার সেসন্স্ জজ শিবপ্রিয় বাঁড়ুয্যের বাড়ি আমি, নীরদ আর ব্রজেনদা গেলুম বিলিতী মিউজিক্ শুনতে। নীরদ ও জিনিসটা বোঝে। আমি ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সাহেবী ধরণের বাড়ি, সবুজ ঘাসে মোড়া লন্, বড় বড় গাছ, ধু ধু করচে সামনে গঙ্গার চর, দূরে ঘাটে স্টীমার পারাপার হচ্ছে। নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে সে কি অদ্ভুত আনন্দ পেলুম পূর্ব্ব দিগন্তের দিকে চেয়ে। Schubert-এর মোজার্টের সুর কতই বাজচে ওদিকে। গানের সঙ্গে নিজের মনের অনুভূতি জড়িয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দের রসায়ন সৃষ্টি হল, বহুদিন আগে ইসমাইলপুরে থাকতে এমন ধরণের আনন্দ মাঝে মাঝে পেতুম, তারপর আর বহুদিন পাইনি।

ওখান থেকে আমরা গোলঘর ও নিতাইবাবুর বাড়ির রাস্তা দিয়ে বাড়ি এলুম। আমাদের গরম জল দিয়ে গেল ওদের বাড়ির একটি মেয়ে। দুপুরে কমলবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেলুম। অনেক ভালো ভালো গোলাপ দেখা গেল তাঁর বাগানে। সতীদেবীর মীরাবাঈয়ের ভজন গানখানা খুব ভাল লাগল।

বরিখে বাদরিয়া শাওন কি
শাওন কি মন ভাবন কি—

বাড়ি আবার এলুম এঞ্জিনিয়ারটির মোটরে। আসবার পথে এরিস্টলোকিয়া লতা দেখাবার জন্যে ট্রেনিং কলেজে নিয়ে গেলেন। অদ্ভুত লতার ফুলটি।

বৈকালে বি-এন কলেজের হোস্টেলের লনে চা-পার্টি। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ফটো নেওয়া হল। এখানে প্রীতি সেন বলে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল—তাকে বেশ ভাল লাগল। সন্ধ্যায় মিটিং বি-এন কলেজের হলে। আমি একটা বক্তৃতা করলুম—'রচনার ওপরে ভূমিশ্রীর প্রভাব'—'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পটি পড়লুম। বহু জনসমাগম—সভার পরে এক গাদা অটোগ্রাফ খাতা সই করতে প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠল। একদল আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাইরে এল। আমার বইয়ের ছোট গল্পের সম্বন্ধে ওদের কি ভয়ানক উৎসাহ! আমার যে এত ভক্ত আছে তা জানতুম না।

আমি এখনই বক্তিয়ারপুর যাব। রভীনদা আমায় তুলে দেবেন বলে মোটরে উঠলেন, আর মণি। এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির মোটর। মণিদের বাড়ি এসে জিনিসপত্র নিয়ে বেরুতে যাব—মোটর স্টার্ট নিলে না। ভদ্রলোক কত চেষ্টা করলেন—হাঁপাতে লাগলেন—আহা! তাঁর কষ্ট দেখে আমার কি কষ্ট! সত্যিই ভেবে এখনও আমার চোখে জল আসচে। মহা অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। মাত্র আর ২০ মিনিট দেরি আছে গাড়ির। একজন লোক ছুটল—একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এল। তাতেই এলুম স্টেশনে। এসে দেখি পাঞ্জাব মেল ৫৫ মিনিট লেট। ওরা কেউ আমায় ফেলে যেতে চাইলে না। আমি একবার সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রে বাঁকীপুর স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। এক একবার মনে হচ্ছিল যেন আমি এখনও ইসমাইলপুরেই আছি। এখান থেকে আজ বা কাল গিয়ে ইসমাইলপুরের সেই প্রান্তরে গিয়ে হাজির হব। কিন্তু কি পরিবর্ত্তনই হয়েচে জীবনে এই ক'বছরে। তখনকার আমি আর বর্ত্তমান আমিতে অনেক তফাৎ। জীবনে তখন সুখ ছিল, সে অন্যরকম। আর এখন, এ অন্যরকম। তখন জীবন ছিল নির্জ্জন, এখন খুকু এসেছে, সুপ্রভা এসেচে। সুপ্রভার কথা অত্যন্ত মনে হচ্ছিল, আমি সেদিন যে পত্র দিয়েচি, তা শিলচরে আজ ঠিক পেয়েচে।

এমন সময় পাঞ্জাব মেল এল। একটি মেয়ে লক্ষ্ণৌ একজিবিশন দেখে ফিরচে, তার সঙ্গে রভীনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বল্লেন—'এই যে বিভূতিবাবু, ইনি বলচেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন বিভূতিবাবুর। আমি খুঁজছিলুম, কোথায় গিয়েছিলেন?' মেয়েটা বেশ ভাল, অমায়িক স্বভাব, সুন্দরীও বটে। জিগ্যেস্ করলুম—লক্ষ্ণৌ এক্‌জিবিশন কেমন দেখলেন? তিনি বল্লেন—বেশ ভালই, আপনি দেখেন নি? বল্লুম—কই আর দেখলুম!

মনে হল আমাদের পাড়ার খুড়ীমা, ন'দি প্রভৃতি মেয়েদের কথা। ওরা পরকে ভাবে

শেয়াল-কুকুর, কিন্তু নিজেরা যে কিসের মত জীবন যাপন করে তা কি ভেবে দেখেচে ? মাঝে পড়ে খুকুটা ওদের মধ্যে পড়ে মারা গেল, একঘেয়েমী ও সঙ্কীর্ণ জীবনের তিক্ততায়।

কি ভয়ানক শীত লাগল ট্রেনে বক্তিয়ারপুর আসতে আসতে। অমন শীত অনেক দিন দেখিনি। রাত বারোটায় এক্সপ্রেস বক্তিয়ারপুর পৌছুল। একটা কুলি নিয়ে কালীদের বাড়ি গেলুম। অনেক রাত পর্য্যন্ত ইরাদিদি ও কালীর সঙ্গে গল্প করলুম।

পাটনা থেকে এসেই জানলুম সুপ্রভা এসেচে কলকাতায়। সেই রাত্রেই তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলুম। গত শনিবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম ওর সঙ্গে। সেদিন কয়েকটি গান করলে—আমি জানতাম না ও এত সুন্দর গান গায়। কি মিষ্টি লাগল ওর গান ক'টি সেদিন! বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরেই গেলাম বনগাঁয় ৬-৫০এর ট্রেনে। স্টেশনে সুবোধ ও যতীনদার সঙ্গে দেখা। রাত ন'টাতে বনগাঁয় পৌছেই দেখি জগদীশদা'র মেয়ে হাসির বিয়ে—সেদিনই। প্রফুল্ল, হরিবাবু প্রভৃতি বরযাত্রীদের খাওয়ানোর কাজে মহাব্যস্ত। আমায় বল্লেন—এত রাত্রে কোথা থেকে ? খেতে বসে যাও। যোগেনবাবুদের বাড়ি খাবার জায়গা হয়েছিল। খেয়ে যখন বাইরে এলুম তখন চাঁদ উঠেচে, অল্প অল্প জ্যোৎস্না, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ।

পরদিন দুপুরের পরে বারাকপুরে গেলুম। যাবার সময় আজকাল চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে বড় চমৎকার লাগে। খুকুদের রান্নাঘরে ওরা খেতে বসেচে। বল্লুম—খুড়ীমা, অতিথি আছে। ওরা অবাক হয়ে গেল। তারপর খুব খানিকটা গল্পগুজব করে বিকেলে ফিরি। ফেরবার পথে গাজিতলা ছাড়িয়ে সেই খেজুর গাছের হেলানো গুঁড়িটায় বসে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি নদীর দিকে, ওপারের মুক্ত তৃণাস্তৃত চরভূমির দিকে চেয়ে রইলুম। সন্ধ্যায় বনগাঁ ফিরে চারুবাবুর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, চা খাওয়া সেরে সাড়ে-আটটার ট্রেনে কলকাতা রওনা হই।

আজ বিকেলে গোলদীঘিতে কতক্ষণ বসে ছিলুম। গৌরীর কথা মনে হল অনেকদিন পরে। এই সময়েই সে মারা গিয়েছিল। সেই শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, সুন্দর ঠাকুরের দোকানে ধাবে লুচি খাওয়া—সেই সব শোকাচ্ছন্ন গভীর দুঃখ ও দুর্দ্দশার দিনগুলো এতকাল পরে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

এরাও তো চলে যাবে। সুপ্রভা পরশু বলচে গঙ্গার ধারে বসে বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আপনি শীগগির কিন্তু একবার শিলং যাবেন। আমি বেশীদিন বাঁচব না, সত্যি আমার আয়ু কম, জ্যোতিষী বলেচে। কবে মরে যাব, আপনি টেরও পাবেন না।

খুকুও তো বিয়ে হলে চলে যাবে বারাকপুর ছেড়ে। তখন আবার যে নির্জ্জন, সে নির্জ্জন।

আজ বিকেলে রেডিও আপিস থেকে ফিরবার পথে লালদীঘিতে একটু বসেছিলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে। যশোর জেলার দূর এক গ্রামে—তাতে সেই মেয়েটি এখন তাদের বাড়ির সামনের বকুলতলাটিতে আপনমনে হয়তো বসে আছে। সুপ্রভা হয়তো পুরীতে সমুদ্রের ধারে বসে কি ভাবচে। কি জানি কেন বসলেই ওদের দুজনের কথা মনে হয়। তাই মনে হল এই সময় একবার জাঙ্গিপাড়া যাব। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে সেই একঘেয়ে দুর্দ্দিনে জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। গৌরী তখন মারা গিয়েচে, আমার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী। তার কথাই তখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ ভরে রেখেচে, সেই সময় গিয়েছিলুম জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরি করতে

১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। সে কত সালের কথা হয়ে গেল। তারপর ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগলপুরে চাকরি নিয়ে যাবার আগে একবার জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। সেও হয়ে গেল ১২।১৩ বছর আগেকার কথা। আর কখনও যাইনি। অথচ এই ১২।১৩ বছরে জীবনে সবদিক দিয়ে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই হয়েচে! এখন জীবনে কত লোক এসেচে, যাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমার কাছে তখন ছিল অজ্ঞাত। আসলে দেখলুম অর্থসম্পদ কিছু নয়। মানুষই মানুষের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। জীবনে যদি প্রেম এসে থাকে, তবে তুমি পার্থিব বিত্তে দীন হলেও মহাধনী—ফোর্ড বা রক্‌ফেলার তোমাকে হিংসা করতে পারেন। আর যদি প্রেম না আসে, যদি কারো স্মিত-হাস্যে-ভরা চোখ দুটি তোমার অবসর মুহূর্ত্তে মনের সামনে ভেসে না ওঠে, যদি মনে না হয় দূরে কোনও পল্লীনদীর তটের ক্ষুদ্র গ্রামে, কি কোনও শৈলশিখরের পাইন বার্চ্চ গাছের বনের ছায়ায় কোন স্নেহময়ী নারী নিশ্চিন্ত নিরালা অবসরে তোমার কথা ভাবে, তবে ফোর্ড বা রক্‌ফেলার হয়েও তুমি হতভাগ্য।

হয়তো একথা Platitude ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু যে Platitude জীবনে অনুভব করে, তখন সে আর Platitude থাকে না, তার জীবনের অভিজ্ঞতায় তা হয়ে দাঁড়ায় পরম সত্য।

জাঙ্গিপাড়া স্কুলে প্রথম চাকরিতে ঢুকি ১৯১৯ সালে। হঠাৎ জাঙ্গিপাড়া যাওয়া ঘট্‌ল এতকাল পরে। ১৯২৪ সালে একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম, আর কখনও যাইনি। স্কুলের দিকে গিয়ে বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। চিনতেও পারলেন। চন্দনপুরের গাঁয়ের পাড়ে সেই তালতলায় তখন কত বসে থাকতুম। পুরোনো জায়গাটা দেখতে গেলুম শ্রীরামপুরের দিদির সঙ্গে—এই সব জায়গার স্মৃতি বড় বেশী জড়ানো—ওখানে গিয়েই সে কথা মনে পড়ল।

তারাজোলের পথেও খানিকটা গেলাম। সে পথটা তেমন ফাঁকা নেই, বড় বড় গাছ হয়ে পড়েচে। বাজারে আমার কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল—যেমন গজেন, ফকির মোদক প্রভৃতি। গজেন এই স্কুলেই এখন মাস্টারী করচে।

বিষ্ণুপুর গেলুম বৃন্দাবনবাবুদের বাড়ি। ওদের সেই পুরোনো রান্নাঘরটা ঠিক আছে, তার দাওয়ায় বসে খেলাম অনেক পরে। রাত্রে অনেক গল্প হল পুকুরের ঘাটে বসে। বিজয়বাবুকে বল্লাম—রাজকুমার ভড় জীবনে বড় বন্ধু ছিল, তার জন্যেই এখান থেকে যাওয়া, সে না থাকলে হয়তো এতদিন পরে এখনও জাঙ্গিপাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে বসে থাকতাম।

পরদিন সকালে উঠে ওদের পুকুরপাড়ে সেই উঁচু জায়গাটি দেখে এলাম—একটা বড় তেঁতুল গাছ আছে সেখানে। বহুদিন আগে চট্টগ্রাম জেটিতে বসে এই জায়গাটার কথা ভাবতাম। হঠাৎ যে আজ এখানে আসব—জাঙ্গিপাড়ায়—এত জায়গা থাকতে তা কি কেউ কখনও ভেবেছিল? থানার পাশ দিয়ে পথটায় হেঁটে যাবার সময় পুরোনো দিনের সব কথা, সব মনের ভাব মনে আসছিল। যে ছোট্ট ঘরটাতে ডাকঘর ছিল, চিঠিপত্রের আশায় বসে থাকতাম—সে ঘরটা এখনও সেই রকমই আছে। আমার ছোট্ট ঘরটাতেও গিয়ে দেখলাম—তবে ঘরটা বন্ধ। পদ্মপুকুরের ঘাটের দিকে বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে রইলুম।

দুপুরে আমার ছাত্র গজেনের বাড়িতে গেলুম। ওর ভাগ্নী পরিবেশন করলে—তার আবার স্বামী এসেচে, বেচারী ঘোমটা দিয়ে লজ্জাতেই জড়সড়। ওদের মাটির ঘরটা কেমন চমৎকার সাজানো—মাটির মাছ, খেলনা, পুতুল, পুঁতির মালা ইত্যাদি কুলুঙ্গিতে বসানো। দুটি তরুণী লাজুক মেয়ে আনাগোনা করচে ঘরে ও বাইরে—খাঁটি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থালি।

এক জায়গায় অনেক গাঁদাফুল ফুটে আছে। একজনের বাগান এটা। সে তার মনের

সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রকাশ করেচে ফুলের গাছ পুঁতে। এক এক ধরণের কাব্য রচনা। মনের সৌন্দর্য্য যাতেই যে ভাবেই প্রকাশ করা যায় তাই তো শিল্প—সেই হিসেবে উদ্যান-রচনা একটা বড় শিল্প।

ভগবান বোধহয় নিজেকে প্রকাশ করেচেন বিশ্ব-রচনার মধ্যে দিয়ে। Analogyটা হয়তো ঠিক হল না, কিন্তু ভাবতে বেশ লাগে।

আর একটা কথা ভাবছিলুম, যাকে ভালোবাসা যায় বেশী, তাকে দুঃখ দিলে ভালবাসা বর্দ্ধিত হয়, আদর দিলে তত হয় না। এ পরীক্ষিত সত্য। এতে যে সন্দেহ করে, সে ভালবাসার ব্যাপার কিছু জানে না। যাকে ভালবাসো, তাকে খুব আদর দিও না, ভালবাসা কমে যাবে। মাঝে মাঝে তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো, ভালবাসার সঙ্গে করুণা ও অনুকম্পা মিশে ভালবাসার ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

ভগবান যাকে বেশী ভালবাসেন, তাকেই কি বেশী কষ্ট দেন—তবে কি এই বুঝতে হবে?

আজ বিকেলে বিশ্রী ঝড়বৃষ্টি, একঘেয়ে বাদলা। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে মিউজিয়মে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী দেখতে গিয়েচি। একদল ঢুকেচে একদল ঢুকতে পারেনি, তাই নিয়ে ওখানকার সেক্রেটারীর সঙ্গে ভীষণ গোলমাল—ছেলেরা হাতাহাতি করতে যায়। আমি তাদের থামিয়ে দিই। সাহেব আমার নাম লিখে নিলে—অর্থাৎ আমার নামে কি যেন রিপোর্ট করবে। করগে যা রিপোর্ট, তোর রিপোর্টকে আমি ভয় করিনে। ওয়াছেল মোল্লার দোকানে জামাকাপড় কিনতে গিয়ে আটকে গেলুম বৃষ্টিতে। তারপর পরেশ খুড়োর সঙ্গে দেখা করে ফিরি।

ক'দিনই বড্ড ছুটোছুটি হচ্চে, কাল পুরী যাব। ঝড়বৃষ্টি পড়ে গেছে, তা কি করব, উপায় নেই। এখন না গেলে ছুটি কৈ আর? কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে বিকেলবেলা। নগেন বাগচীদের পুকুরঘাটে সন্ধ্যায় সকলে দাঁড়িয়ে কত কথা মনে হল—অনেকদিন আগে এদের এই বাড়িতেই ছিলাম। এই পুকুরঘাটে মা নাইতেন। সেই রকমই সব আছে বাড়িটার। কিন্তু এই ১৩।১৪ বছরে আমার জীবনে কি পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে তাই ভাবি। সম্পূর্ণ একটা ওলট-পালট হয়ে গিয়েচে, মনের দিক দিয়ে, সবের দিক দিয়ে। তখনকার আমি আর এই আমি কি এক? মোটেই না—সম্পূর্ণ পৃথক দুই মানুষ।

পুরী যাওয়া হয়নি। ঝড়বৃষ্টি দেখে যাওয়া বন্ধ করিনি। টিকিট কিনে এনেছিলুম, সুপ্রভার পত্র পেলুম, সে ওয়ালটিয়ার গিয়েচে, তাতেই যাওয়া বন্ধ করলুম। দেশে চলে গেলুম সাড়ে ছ'টার গাড়িতে। বেজায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নেমে যদি গাড়ি না পাওয়া যেত, বড় কষ্ট পেতাম। তার পরের দিন সকালে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে গল্প করি। দুপুরে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম সরস্বতী পুজো করব বলে আমার ঘরে। খুকুরা ওখানেই আছে। খুকু একটু পরেই বার হয়ে এল। অল্প গল্পগুজব করলে। এবার চড়কতলার ছেলেরা বারোয়ারীতে সরস্বতী পুজো করচে। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ি চুরি হয়ে গিয়েচে বলে রাত্রে আজকাল সেখানেই শুই। আমার ঘরে তার পরদিন সরস্বতী পুজো করলুম। বাল্যকালে দেশে সরস্বতী পুজো করেচি, আর কখনো থাকিওনি দেশে। এতকাল পরে এই। খুকুরা এসে অঞ্জলি দিলে—পাঁচী ও খুকুকে বল্লুম, তোরা প্রসাদ ভালো করে দে সবাইকে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে একাই গেলুম বেড়াতে। গাছে গাছে কুল খেয়ে বেড়াই ছেলেবেলার মত। চারাগাছে কুল ফলেচে, কিন্তু ছেলেবেলার মত কুলগুলো তেমন মিষ্টি না। শিমূল গাছে

প্রথম ফুল ফুটে রাঙা হয়ে আছে। সন্ধ্যায় রাঙা আকাশের তলায় চারিধারে গাছের মাথাগুলো নানা বিচিত্র-ভঙ্গি ও ছত্রবিন্যাসের সৌন্দর্য্যে ভারী চমৎকার দেখাচ্চে। হঠাৎ পাটনায় মিহির-বাবুর বাড়ির চা-পার্টির কথা মনে হল, সেই যে আমি পর্দ্দার ফাঁকের দিকে রাঙা রোদ লাগানো গাছের দিকে চেয়ে দেশের কথা ভাবছিলুম সেদিন। সে তো এই কুঠীর মাঠের কথাই। খুকুর কথাও। তারপরে বাড়ি ফিরে আসতেই খুকু ছুটে এল—সে ভালো কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল চড়কতলায়। খুড়ীমা বাড়ি নেই—কলে গা ধুতে গিয়েচেন—টিউবওয়েলে।

রাত্রে ইন্দুর বাড়ি বসে ওর মুখে নানারকম গল্প শুনি। ও যশোর জেলায় এক পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারী করতে গিয়েছিল। গ্রামের নাম কোলা বেলপুকুর। সেখানে কেমনভাবে তাকে একটা গৃহস্থবাড়িতে আদর-অভ্যর্থনা করেছিল, আর এক গ্রামে এক গৃহস্থবাড়ি কেমন অনাদর করেছিল এ সব গল্প করে গেল। ওর গল্পে অনেক অজানা পাড়াগাঁয়ের ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এমন গল্প বলার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

পরদিন কালো এল—ওদের বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ। খুকু বসে মাছ কুটচে রান্নাঘরের সামনে উঠোনে, বেলা দশটা, আমি রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ওর দাদা আর মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করলুম। নদীতে কালো আর আমি সাঁতার দিয়ে আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে চলে গেলুম রায়-পাড়ার ঘাটে। বৈকালে খুকু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে প্রায় সন্ধ্যার কিছু আগে পর্য্যন্ত। তারপর আমি একটু কুঠীর মাঠে পথে বেড়িয়ে এসে স্টেশনে রওনা হলুম জিনিসপত্র নিয়ে। আসবার পথে বুড়ীকে দেখতে গেলাম। বুড়ীর হাত ভেঙে গিয়েচে, ময়লা কাঁথা পেতে শুয়ে আছে। আমায় দেখে কি খুশিই হল! বুড়ী সত্যিই আমায় খুব ভালবাসে। এক-সময় ওর অবস্থা ভাল ছিল, ওর স্বামী ছিল জমীর দেওয়ালি। মুসলমানপাড়ার মধ্যে জমীরের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ছেলেবেলায় জমীর দেওয়ালিকে আমি দেখেচি। বুড়ী তারই বউ। এখন আর কেউ নেই ওর, অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েচে। ভিক্ষে করে চালাতে হয় প্রায় এমন অবস্থা। বুড়ীকে কিছু দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বার হলুম, কারণ ট্রেনের বেশী দেরি নেই। অশথতলায় তখনও জ্যোৎস্না ফোটেনি, শেষ বিকেলের ছায়া। হরিবোলার দোকানে এসে ইন্দু ও ফণিকাকাকে পাওয়া গেল। ওরা বসে গল্প করচে। আমার মনে কি অদ্ভুত আনন্দ! সত্যি এমন সব আনন্দের দিন জীবনে ক'বার আসে? এই জ্যোৎস্না, এই শুক্রতারা, আধখানা চাঁদ, সেকরাদের বাড়ির কাছে নেবু ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল—এরই মধ্যে কত কি ভাবনা! এ আনন্দ অনেকদিন ভোগ করলুম বটে। আজ চার বছর এই প্রথম বসন্তের দিনে এখানে ফুল ফোটা দেখি। আজ চার বছর নানা সন্ধ্যায় নানা ছুটির দিনে নানা বিকেলে খুকু আমায় আনন্দ দিয়েচে—কত ভাবে, কত কথায়। ওই ভাবতে ভাবতে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্টেশনে এলুম। গোপালনগর স্কুলে ছাত্রেরা থিয়েটার করচে আজ। আমাদের গাঁ থেকে মেয়েরা দেখতে আসবে। ট্রেনে যখন বনগাঁ আসচি তখনও আমার অদ্ভুত আনন্দ। গাছের সারির ওপর দিয়ে পারঘাটার জলের ওপারে আমাদের গাঁয়ের দিকে চেয়ে ভাবচি, সবাই এখন কি করচে? খুকু এখন কি করচে? হয়তো রান্নাঘরে বসে আছে এতক্ষণ, কারণ আজ কাকার তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়েছিল বাড়িতে ওবেলা, এবেলা বাসি পায়েস, ভাত-তরকারী নিশ্চয়ই আছে, তাই সে বসে আছে। ইন্দু এতক্ষণ বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পেতে একা বসে আছে। ওরা বেশ আছে।

ভাবতে ভাবতে বনগাঁর ট্রেন এসে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্ম্মে আমার কাকার ছেলে লালমোহন লুচি-সন্দেশ বিক্রী করচে। ও এখানে আছে অনেকদিন, লেখাপড়া শেখেনি, গরীবের ছেলে,

ওই কাজই করে।

একটু পরে কলকাতার ট্রেন এল—আমি সারা পথ কেবল ভাবছিলুম এই ক'দিনের কথা, আজ সারাদিনের কথা। খুকু কতবার এল, সেকথা কেবলই শুক্রতারার দিকে চেয়ে ভাবি, ওখানেও কি এমন বনশ্যাম পল্লী আছে, তার ধারে ছোট্ট গ্রাম্য নদী বয়ে যাচ্ছে, কত মাধবী রাত্রে, কত বর্ষামুখর আষাঢ় প্রভাতে, কত বসন্তের দিনে গাছে গাছে প্রথম মুকুল আবির্ভূত হবার সময়ে, ওদের দেশেও চোখে চোখে লোকে কত কথা বলে, কত স্নিগ্ধ মধুর ভাব ও বাণীর বিনিময়! শুক্রতারা নাকি শুধুই বরফের দেশ, সাত হাজার ফুট উঁচু হয়ে গ্লেসিয়ার বরফের স্তর জমে আছে গ্রহের ওপরে।

ভাবতে ভাবতে ট্রেন এসে দাঁড়াল দমদমা গোরাবাজারে। অপূর্ব্ব সরস্বতী পূজার ছুটি শেষ হল। অনেকদিন মনে থাকবে এদিনগুলোর কথা।

সেদিন চন্দননগরে গিয়েছিলুম সাহিত্য-সম্মেলনে। এখান থেকে মোটরে সজনীদের সঙ্গে গেলুম। উত্তরপাড়া, বালি, কোন্নগর প্রভৃতি শহরের মধ্যে দিয়ে—গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে পথ। অনেকদিন এপথে যাওয়া হয়নি, সেই অনেকদিন আগে একবার শ্রীরামপুরে গিয়েছিলুম মোটর-বাসে এপথে। সভামণ্ডপে অনেকের সঙ্গে দেখা হল, নীহার রায় বিলাত থেকে ফিরেচে। সুনীতিবাবু বল্লেন, সেদিন কনভোকেশনের দিন আপনি কোথায় গেলেন? আপনাকে খুঁজলুম, আর দেখা পেলাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটটার কাছে কনভোকেশনের দিন সুনীতি-বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর আমি তাঁকে হারিয়ে ফেললুম। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসভার উদ্বোধন করেই চলে গেলেন। আমি গেলুম আহার করতে। তারপর রবীন্দ্রনাথের বোটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি অমল হোম, নীহার রায় সেখানে বসে। বাগান সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিবাবুর। সার যদুনাথ সরকার এলেন বিকেলের দিকে। রবীন্দ্রনাথের বোটটা বড় চমৎকার। মেঘ করেচে আকাশে। ও-পারের মেঘে-ভরা আকাশটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। অনেক দূরের একটা গ্রাম এই সান্ধ্য আকাশের তলায় কেমন দেখাচ্ছে! ওখান থেকে আমরা মতিলাল রায়ের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে গেলুম। ফাদার দোঁতেন আমাদের সঙ্গে মিশল এসে সজনীদের গাড়িতে। ফাদার দোঁতেন জনৈক পাদ্রী, কেমন বাংলা জানে! সন্ধ্যার পরে আমরা আবার বালি, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়ার মধ্যে দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

আজ মাঘীপূর্ণিমা। টালিগঞ্জের খাল পার হয়ে সেই যে সুশীলেশ্বরী আশ্রমে আর বছর গিয়েছিলুম, এবারও সেখানে গেলুম। গাছে গাছে আমের বউল হয়েচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে জামতলায়, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ পথে, কোকিল ডাকচে। আর বছরের সেই ইন্দুদিদি আছেন, তিনি ঘরের মধ্যে বসিয়ে বাড়ির ছেলের মত যত্ন করে, খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ালেন। বহু মেয়ের ভিড়। কলকাতার উপকণ্ঠে এই নিভৃত পাড়াগাঁয়ের দেবালয়টি আমার বেশ লাগল।

বসন্তের প্রথম দিনগুলিতে আকাশ খররৌদ্র, নতুন ফোটা ফুলের দল মনে কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ দেবার আশা দেয়, বিশেষ করে এই নীল আকাশ! সেদিন দুপুরে খয়রামারির মাঠে একা বসে বসে বসন্ত-দুপুরের নীল আকাশ আর খররৌদ্র ভোগ করছিলুম। মাঠের মধ্যে ফুল ফোটা শিমুলগাছগুলো সমস্ত পটভূমিকে এমন একটা শ্রী দান করে, তা আর কোন্ গাছ পারে না, খানিকটা পারে শীতকালের ছোট এড়াঞ্চির ফুল। আমার মনে হয় ওরা গ্রাম্য প্রকৃতির ঘরোয়া ভাবটা কাটিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর বৃহত্তর ভূমিশ্রীর প্রকৃতির সঙ্গে ওকে এক করিয়ে দেয়

—মনে এনে দেয় আফ্রিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের কথা, দক্ষিণ আমেরিকার আধ-মরু আধ-জঙ্গলে ভরা জায়গার কথা—নানা বিরাট, জনহীন, বহুবিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক রাজ্যের ছবি। ওতেই এত ভাল লাগে দিগন্ত রেখার রাঙা ফুল-ফোটা শিমূল গাছ, অথবা অর্দ্ধ-শুষ্ক খড়ের মাঠে ছোটখাটো ঝোপের মধ্যে থেকে একা উঠেছে একটা বড় শিমূল গাছ—তবে শেষেরটা ভারী অদ্ভুত। মাঠে যদি অমন দেখি, তবে সেখানে বসে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিস। লোকে মুখে যে কথাই বলুক, বা চিঠিতে যে কথাই যাকে লিখুক, তার মন সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। মুখের কথায় আর মনের কথায় এই জন্যেই মিল প্রায় হয় না।

হরিনাভি স্কুলের ছেলেরা ওদের re-unionএ এসেছিল বলতে, ওদিকে মণিবাবুর বাড়িও নিমন্ত্রণ ছিল, দুই কারণে এদিন রাজপুর স্টেশনে নেমে হরিনাভি গেলাম। বসন্তে গ্রাম্যশোভা দেখাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। তাই খররৌদ্র-দুপুরে বেগুনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার মধ্যে দিয়ে যে পথটা গিয়ে হরিনাভি স্কুলের কাছে মিশল, ওই পথটা দিয়ে গেলুম নেমে। খুব আম্র মুকুলের সৌরভ, লেবু ফুলের গন্ধ, ঘেঁটুবনের শোভা, কোকিলের ডাক, মাথার ওপর দুপুরের রোদ ঠিক্‌রে পড়া নীল আকাশ। আপনমনে যাচ্চি, যাচ্চি, কত কালের পুরানো পথ, কতবার এ পথ দিয়ে এসেচি গিয়েচি, যখন হরিনাভি স্কুলে মাস্টারি করতুম। ফণিবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ সেরে স্কুলে এলুম। প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী আমাদের বাল্যকালে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তাঁকে দেখলুম অনেক কাল পরে। স্কুলের ওদিকের আকাশটা আমার তখন-তখন বড় প্রিয় ছিল, আর পাঁচিলের ওদিকের গাছপালা, সভা ছেড়ে আমি তাই দেখতে উঠে গেলাম। তারপর ভোম্বলের সঙ্গে বেরিয়ে বৈকালের ছায়ায় একটা ছায়াভরা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা মাঠের ধারে এসে বসলুম। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে, দুজনে বসে পুরোনো দিনের গল্প কতই করি। ওখান থেকে উঠে আরও কিছুদূর এসে একটা পুরোনো ভাঙা দোলমঞ্চের কার্নিসের ওপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকি। দোলমঞ্চটার চারিধারে ভাঙা মন্দির পাড়ার মধ্যে বলে চারিদিকেই আমবাগান, তার তলায় খুব ঘেঁটু ফুল ফুটেচে, একধারে একটা কামিনী ফুলের ঝাড়। নানা ফুলের সম্মিলিত সৌরভে সন্ধ্যার বাতাস ভরপুর। হুতুম-পেঁচা ডাক্‌চে প্রাচীন গাছের কোটরে। দু-একটা নক্ষত্র উঠেচে আমবনের ওপরে আকাশে। অন্ধকার হয়ে গেল। একটা পুকুরের ধারে এসেও খানিকটা বসি।

কাল সন্ধ্যাবেলা নীরদবাবুর বাড়ি গিয়েছিলুম দুপুরে, প্রমোদবাবু অনেক দিন পরে কলকাতায় এসেচেন। অনেক গল্পগুজব করলুম। একদিন হিজলী যাওয়ার কথাও হল। ওখান থেকে পশুপতিবাবুকে ফোন্ করে জানলুম দিলীপ রায় কলকাতা এসেছে এবং আজ থিয়েটার রোডে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি সন্ধ্যায় গান হবে। হেমেনদা এলেন তাঁর মেয়েদের নিয়ে। ওদেরই মোটরে ওদের সঙ্গে প্রতাপ মজুমদারের বাড়ি গেলুম। দিলীপের সঙ্গেও দেখা গেটের কাছেই। ওর সঙ্গে কখনও চাক্ষুষ আলাপ হয়নি, যদিও চিঠিপত্রে আজ আট ন' বছরের আলাপ। নাম শুনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, কি চমৎকার উদার স্বভাব দিলীপের! বড় ভালো লাগে ওকে। বহু বিশিষ্ট নরনারী এসেচেন দিলীপের গান শুনতে। আজ আট ন' বছর পরে দিলীপ কলকাতায় এল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, জীবনময় রায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ, উমা মৈত্র, 'পরিচয়' কাগজের দল—অনেককেই দেখলুম। কেবল মনি বোসকে পাওয়া গেল না। আব্বাস তায়েবজীর মেয়ের কৃষ্ণ বিষয়ক গানটি আমার সকলের চেয়ে ভাল লাগল। আসল গানটা হিন্দীতে ছিল, দিলীপ বাংলাতে অনুবাদ করেচে। কি চমৎকার গাইচে দিলীপ আজকাল! বাংলা গানের অমন ঢং কোথাও আর কখনও শুনিনি।

কাল দিনটা খুব ছুটোছুটি গিয়েচে। চারুবাবু হাইকোর্টের জজ হয়েচেন বলে তাঁকে স্কুল থেকে অভিনন্দন দেওয়া হল। কালই আবার দিন বুঝে ইউনিভার্সিটিতে Examiner's meeting—স্কুলে ফণিবাবু এসেছিলেন, আমাদের স্কুল ছেড়ে গিয়ে পর্য্যন্ত আসেননি। তাঁর সঙ্গে গল্প করে চলে এলুম ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে মণি বোস, প্রমথ বিশী, জসীমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, মনোজ বসু, বারীন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জনবাবু সকলের সঙ্গে দেখা। সুনীতিবাবু প্রধান পরীক্ষক এবারও। ওখানকার কাজ শেষ করে সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকানে সবাই মিলে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিলাম। তারপর আবার এলুম স্কুলে। চারুবাবুর অভিনন্দন সভা তখন জোর চলচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমরা ছিলুম। তারপর এক মাস্টারমশাই আর আমি এসে সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ারে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে অনেক পুরোনো কথার আলোচনা করলুম। রসিদ কি করে আমাদের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, ক্লারিজ সাহেবকে আমরা কেমন সাবধান করে দিয়েছিলুম এই সব কথা।

ইস্টারের ছুটিতে বারাকপুরে কাটাইনি অনেকদিন। এবার গিয়েছিলুম। আমার যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঘেঁটুফুল দেখা। প্রথম দেখলুম বনগাঁয়ের খয়রামারির মাঠে—কি অজস্র ঘেঁটুবন সেখানে। এর আগের সপ্তাহেও যে তিনদিন ছুটি ছিল, তাতেও বনগাঁ গিয়ে রোজ বিকেলে রাজনগর ও চাঁপাবেড়ের মাঠে যেতুম বেড়াতে। ফিরবার পথে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় একটি ঘেঁটুবনের কাছে বসে থাকতুম। পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করত, তেতো তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধ। পাখী ডাকত, কোকিল ও পাপিয়া। বৌ-কথা-ক'র এখনও আমদানি হয়নি। বারাকপুরে ঘেঁটুধন কোথাও তেমন নেই, কেবল আছে সলতেখাগী জামতলায়, বরোজপোতায় ডোবার গায়ে আর সাজিতলার পথে। সকলের চেয়ে বেশী পেলুম আসবার সময়ে চালকী মুসলমান পাড়ার ওই পথটায়।

ক'দিন চমৎকার কেটেচে। অবিশ্যি ম্যাট্রিকের কাগজ দেখতে ব্যস্ত থাকার দরুন বড় কোথাও বেরুতে পারতুম না। একদিন গোপালনগর হাটে গিয়েছিলুম, সঙ্গে ছিল জগো, গুটকে ও জীবু। ও পথেও কিছু কিছু ঘেঁটুবন আছে বড় আমবাগানের কাছে। বৈকালে প্রায়ই কুঠীর মাঠে বেড়াতে যেতুম বেলা পড়ে গেলে। চাঁদ উঠবার সময়ে নদীর ধারে মাঠে একা একা কত পাত পর্য্যন্ত বসে থাকতুম। জ্যোৎস্নায় নদীজলে নামতুম, স্নান করে আলোছায়ার জালবোনা পথে মেয়েদের পিঠে দেওয়ার ষাঁড়া গাছের তলাটি দিয়ে বাড়ি ফিরতুম। দুপুরে ও বিকেলে কত কি গন্ধ দুধারের মাঠে। রোদপোড়া মাটির গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, শিমুলের গন্ধ, শুকনো পাতালতার গন্ধ, টাটকা-কাটা কাঠের গন্ধ—খয়রামারির মাঠে বনমল্লিকার ঘন সুগন্ধ—প্রভৃতির নানা সুবাসে মন ভরে ওঠে।

কাল মনোরায়দের গাড়িতে বারাকপুর থেকে বনগাঁ ফিরলুম। রাত্রের ট্রেনে কলকাতা।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন গিয়েছিলুম বারাকপুরে। একদিন চাঁপাবেড়ের মাঠে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে ছিলুম, তারপর এসে ফুটবল খেলার মাঠটাতে বসলুম। দুপুরবেলা বারাকপুর গিয়ে পৌছই। ঝম্ ঝম্ করচে রোদ। খুকুরা ঘুমুচ্ছিল। ওদের ওঠালুম, তারপর অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। ফণিবাবু ও যতীনবাবু গাড়ি করে গেল আমাদের গাঁয়ে দেখতে। তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম কুঠীর মাঠ।

এবার শিমুলের গন্ধ বড় ভাল লেগেচে। ঘেঁটুফুল এখনও আছে—তবে খুব কমে গিয়েচে।

কোন কোন বনে কিন্তু নতুন ফুটেচে তাও দেখতে পেলুম।

কাল রাত্রে হেমেন রায়ের বাড়ি দিলীপ রায়ের গান শোনার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই আমরা অনেকে গিয়েছিলুম। গণপতিবাবু ও নীরদবাবুরাও ছিলেন। হেমেনদা অনুযোগ করলেন, মঙ্গলবারে পেনিটির বাগানবাড়িতে আমরা তাঁকে কেন নিয়ে গেলুম না! দিলীপ আসতে বড় দেরি করল। এল যখন প্রায় রাত ন'টা। বড় সুন্দর লাগল আব্বাস তায়েবজীর মেয়ের সেই হিন্দীগানের অনুবাদটা—দিলীপের মুখে সেদিন যেটা থিয়েটার রোডে শুনেছিলুম। কাল ওর মেজাজ আরও ভাল ছিল, কি চমৎকারই গাইলে!

কলকাতায় কিন্তু সব সময়ই থাকা আমার বড় খারাপ লাগচে। চারিদিকে দেওয়াল তুলে এখানে মনে প্রসারতা ও আনন্দ বন্ধ করে দেয়। সব সময়েই কোন না কোন ঘরের মধ্যে আছি, হয় স্কুল, নয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, নয় মেস, নয় কোন বন্ধুর বাড়ি, নয়তো সিনেমা। এত ঘরের মধ্যে থাকতে পারিনে, দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় এতে। সামনে গ্রীষ্মের ছুটি আসচে—এই যা একটা আনন্দের।

কাল কাগজের বোঝা সুনীতিবাবুর বাড়ি গিয়ে নামিয়ে চলে গেলুম দক্ষিণাবাবুর বাড়ি। হেঁটেই গেলুম। মনে ভারী স্ফূর্ত্তি—কাগজগুলো দেখতে সত্যিই এই দেড় মাস কি কষ্টই না গেছে—আর এই রদ্দুরে। ফিরবার সময়ে আলিপুর হয়ে বাসায় ফিরি।

এইমাত্র পানিতর থেকে ফিরে এলুম। প্রসাদের বৌ-ভাত গেল কাল। আজ সকালে আমি কিরণবাবুদের সঙ্গে রওনা হয়েছিলুম। কিছুদূর নৌকো আসতে না আসতেই এল খুব মেঘ, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড়। আমরা নেমে ইটিণ্ডার স্কুলঘরে আশ্রয় নিলুম। কিরণবাবুর মেয়েদের ধরে নামালুম একে একে। তারপর বৃষ্টি থামলে ওখান থেকে বার বয়ে এসে নৌকোয় বসিরহাট পৌঁছেই ট্রেনখানা পাওয়া গেল। পানিতরের খালের ঘাট থেকে নৌকো চড়ে অনেকদিন আসিনি।

ক'দিন বেশ আনন্দে কাটিয়েছি। বুধবার দিন গিয়েছিলুম সকালের ট্রেনে। নৌকো এসেছিল ঘাটে। বাড়ি পৌঁছে দেখি আন্নাদিদি ইত্যাদি এসেচে। সেই সন্ধ্যাবেলা পিসীমা ও সুশীল পিসেমশায় এলেন, আমি তখন নদীর ধারে বসে আছি, সঙ্গে পানিতরের কয়েকটি ছেলে। প্রথম প্রথম যখন পানিতর আসতুম, তখন এসব ছেলে জন্মায়নি। রাত্রে দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী চাতালে বসে পিসীমা, হেনা দিদি ওদের সঙ্গে গল্প ও আড্ডা। প্রসাদ বসে বসে গ্রামোফোন বাজাতে লাগল। অনেক রাত্রে ছাদের ওপর শুই—কারণ কোথাও শোবার জায়গা নেই।

কি বিশ্রী বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে কাল থেকে! কাল সুপ্রভার ওখানে গিয়ে শুনি সে তখন নেই। হাতে কোন কাজ ছিল না। এসে কাউন্সিল হাউসের সিঁড়িতে বসে রইলুম। কিন্তু ভাল লাগে না—অনমনস্ক মন। তখনই স্থির করলুম শিলং থেকে কাল সকালেই চলে যাব। অথচ কালই তো মোটে এসেচি—আর তার ওপর এই বিশ্রী আকাশ। গরম নেই তাই কি? এর চেয়ে গরম ঢের ভালো ছিল যদি রদ্দুর উঠত। যখনকার যা, তাই লাগে ভালো। সুপ্রভাকে চিঠি দেব বলে পোস্টাপিসে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পোস্টমাস্টার আসেই না। একটা

লোক দরজির কাজ করচে, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি বসে। এমন সময় দেখি আমার পুরোনো ক্লাসফ্রেণ্ড্ মনোরঞ্জন যাচ্ছে—তার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় ফার্মেসিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল—আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ও খুব খুশিই হল। কিন্তু আমার মন এই মেঘলায় যেন কিছুতেই ঠিক হয় না! পোস্টাপিস্ থেকে ফিরে শিলং ডেয়ারিতে দুধ খেতে গেলুম। বেশ ভাল দুধ দেয়, পরিষ্কার ঘরটা। জেল রোড আর পুলিস বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেঘাচ্ছন্ন লুম্ শিলং-এর দিকে চেয়ে ভাবলুম আমাদের গ্রামে এতক্ষণ রোদে তেতে উঠেচে চারিদিক। মাঠে সোঁদালি ফুল ফুটেচে, ইছামতী নদীতে এই গরমে নেয়ে খুব তৃপ্তি হবে। তীব্র গরম দূর ক'রে হঠাৎ বেলা তিনটের সময় কালবৈশাখীর মেঘ উঠবে, ঝড় শুরু হবে, গরম পড়ে যাবে, সবাই আম কুড়ুতে দৌড়ুবে।

এই এখন বসে লিখ্‌চি, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়েচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আমার ঘরের দরজা দিয়ে দূরে পাহাড়ের চূড়া, মেঘে ঢাকা কয়েকটি পাইন গাছ সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে, হোটেলের চাকর ৩নং ও ৪নং ঘরের বাবুদের জন্যে গরম জলের বন্দোবস্ত করচে, জোড়হাটে বাড়ি এক আসামী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গল্প করচেন। কি বিশ্রী বৃষ্টি! এখানে বসে রৌদ্রালোকিত বাংলা দেশ, তার মাঠে, কুঠীর মাঠে বিকেলের ছায়ায় সোঁদালি ফুলের মেলা, সারাদিনের গরমের পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ইছামতীর স্নিগ্ধ জলে একা নির্জ্জন ঘাটে নাইতে নামা, খুকুর আস্তে আস্তে আসা ওদের বাড়ির বেড়ার পাশ দিয়ে—এসব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। বৃষ্টি জোরেই নাম্‌ল—শীত বেশ। আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের মত শীত। কলকাতাও এর চেয়ে ঢের ভালো, সেখানে দুপুর রোদে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যাওয়া চল্‌ত একমাস মর্ণিং স্কুলের সময়। বৌঠাকরুণদের বাড়িতে চা পান, কমল সরকারের গান—সেও যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। কাল সন্ধ্যায় একবার ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেই ট্রিফার্ণ দুটো দেখলুম। খাসিয়া মেয়েরা বেড়াতে এসেচে। ওখানে দাঁড়িয়ে কাল কেবলই মনে হয়েছে সুপ্রভা এখানে নেই। একবার মনে হল, সেদিন যে পানিতরে বেশ ক'দিন কাটিয়ে এসেছিলুম সেকথা। সেই চাঁদা কাঁটার বন, সন্ধ্যায় একটা তারা উঠল। তাই নিয়ে ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে সেই নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা।

বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে একঘেয়ে। থামবার নাম নেই। এ যেন শ্রাবণ মাস। গরম আর সূর্য্যের আলোর জন্যে মন হাঁপাচ্ছে। লাইউমক্রাতে সুনীলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেও হত —কিন্তু সুপ্রভা না থাকাতে আমার কোন কাজে উৎসাহ নেই। কে বেরোয় এই বৃষ্টির মধ্যে? ভেবেছিলুম একবার শিলং পিক্-এ উঠব—তাও গেলাম না। মজা এই যে এখানে এতগুলো লোক এসেচে হোটেলে—সবাই কেবল বসে বসে খাচ্চে আর শরীর সারাচ্চে—কোন কিছু দেখবার উৎসাহ নেই ওদের। খাসিয়া ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বড় সাহেবীভাবাপন্ন হয়েচে। ওরা সাহেবদের ধরণে হাত নেড়ে আনন্দ জানায়—কাল সনৎ কুটিরের সামনে এক খাসিয়া ছোকরা তার বন্ধুকে বল্লে—Cheerio! কেন বাবু, তোদের মাতৃভাষায় কোন কথা নেই? গির্জ্জা থেকে কাল রবিবার সন্ধ্যার সময় অনেকগুলো খাসিয়া মেয়েপুরুষ ফিরছিল। নিজের ধর্ম্মও এরা ছেড়েচে।

এই শীত আর বৃষ্টির মধ্যে [illegible]বার উৎসাহ হচ্ছে না। জোড়হাটের ভদ্রলোকটি তেল মাখচেন। আমায় বল্লেন, নাইবেন না? বল্লুম—মাথাটা ধোব মাত্র। আজ এখন চলে যাব— বড্ড ঠাণ্ডা লাগবে সারাদিন।

Rain, Rain, go to Spain—কি একঘেয়ে পাইন বন আর বৃষ্টি, সূর্য্যের আলো নইলে সুন্দর বিকেলের ছায়া নামে না, পাখী ডাকে না, ফুলের সৌন্দর্য্য থাকে না—একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে

মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দূরের পাইনবনাবৃত পাহাড়ের চূড়াটা বৃষ্টিতে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেচে।

এখানে এসেচি অনেকদিন, শিলং থেকে ফিরেই। কিন্তু এতদিন লিখতে পারিনি। এসেই প্রথমে একদিন পায়ে হেঁটে গিয়েছিলুম বাগানগাঁয়ে পিসীমার বাড়ি। কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়ে সেদিন গেলুম গাড়া-পোতার বাজারে, গিয়ে একটা দোকানে খানিকটা বসে রইলুম, কারণ সে সময়টা বড় বৃষ্টি এল। তারপর চলে গেলুম পাট্‌শিমূলে। সন্ধ্যার আগে বাগানগাঁ। ফিরবার দিন খুব বেলা থাকতেই মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে এসে পৌছে গেলাম। জামদা'র বাঁওড় পার হলুম দড়াটানার খেয়ায়। পার হয়েই—এপারটা বেশ ছায়াভরা চমৎকার জায়গা—খানিকক্ষণ বসে তারপরে রওনা হই। সন্ধ্যার আগে এসেই বাড়ি পৌছে গেলুম। একটা বটগাছের তলায় অনেকক্ষণ বসেছিলুম মোল্লাহাটির ওপারে—সেটা বড় ভালো লেগেছিল।

দিন বেশ কাট্‌চে। গোপালনগরের বারোয়ারী দেখচি প্রতি-বৎসরের মত—কাল রাত্রেও হয়ে গেল। কাল অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেচি। একদিন খিনুদের ওখানেও গিয়েছিলুম।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এবার যেন বেশীদিন এখানে ভাল লাগচে না। মন উড়ু উড়ু করচে, কেন তা কি জানি। জীবন এখানে অনেকটা একঘেয়ে, সেইজন্যই কি? কিন্তু নির্ম্মলতা ও প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যে এর তুলনা নেই বলেই তো এখানে আসা। এবার সেটাও যেন ভাল লাগচে না অন্য অন্য বছরের মত—তার একটা প্রধান কারণ আমি বুঝতে পেরেচি। কলকাতায় যে কর্ম্ম-বহুল জীবন কাটিয়ে এসেচি এবার, তার তুলনায় এখানকার অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রা মনকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। আমি মাঠের মধ্যে থাকতে ভালবাসি। তবে মোটে সেদিন কলকাতা থেকে এসেচি বলে এই রকম লাগচে—দীর্ঘদিন কাটালে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এসব। কথা বলবার লোকের অভাব সকলের চেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানে। শ্যামাচরণদা'র ছেলেটি সেদিন মারা গেল, আমরা সবাই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম তাকে বাঁচাবার। সেজন্যেও মনে একটা কষ্ট আছে।

বিকেলের দিকে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। আজ খুব বৃষ্টি হয়েছিল দুপুরে। তাই পথে একটু বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছিল—এত ফুল এত গাছপালাও কুঠীর মাঠে! সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য। এখান থেকে আরম্ভ করে বাগানটা পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গাটাই একটা প্রকাণ্ড বড় পার্ক। কত বিচিত্র লতাবৃক্ষগুল্মের সমাবেশ, কত বিচিত্র বনফুলের সমারোহ—কত কি পাখীর ডাক, বাঁশ-গাছের সারি, প্রাচীন বট-অশ্বত্থ—সবই সুন্দর। মনটা ভার ছিল, একটা ছোট বাব্‌লাগাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। আমার চারিপাশে সোঁদালি ফুল ঝুলচে, একদিকের গাছপালার ফাঁকে কি সুন্দর ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের নীল আকাশ, বসে কত কী ভাবলুম। এই যে বিরাট বিশ্ব-চরাচর, এতে কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত নীহারিকা-রাজি, কত Globuler cluster, কত নাক্ষত্রিক বিশ্ব, এদের মধ্যে কত আমাদের মত প্রাণী রয়েচে। Jeans-এর দল যাই বলুন, আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে শুধু আমাদের এই পৃথিবীতেই বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, আর কোথাও নেই। তা যদি থাকে, ধরেই নেওয়া যাক্, তবে তাদের মধ্যে অনেকে কষ্ট পাচ্ছে—আজ আমি তাদের দলের একজন। দুঃখে তাদের সঙ্গে আমি এক হয়ে গিয়েছি।

সকালবেলা কি বিশ্রী বর্ষা নেমেছে। আমার ঘরের বাইরে বড় বড় পাতাওয়ালা গোঁড়ালেবুর গাছটাতে থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটেচে। মনটা ভাল না, বসে বসে লিখছিলুম বাইরে বসে,

হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আসাতে ঘরের মধ্যে এসে বসেচি। বিলবিলের দিকে জলের তোড় ছুটচে কলকল শব্দে। ন'দিদি ও বড় খুড়ীমা ওদের ভুতোতলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে জলে ভিজে। খুতুকে বড় একটা দেখা যাচ্ছে না আমতলায়।

বিকেলে মেঘ-থম্‌কানো আকাশের তলা দিয়ে বেড়াতে গেলুম সুন্দরপুরে প্রমথ ঘোষের বাড়ি। সারা পথটা আকাশে মেঘের কি শোভা! কত পাহাড়পর্ব্বত, আকাশের কি চোখ-জুড়ানো অদ্ভুত নীল রং! নীচে বর্ষাসতেজ শ্যামল গাছপালা, নতুন আউশ ধানের কচি জাওলা বেরিয়েচে মাঠে মাঠে মরাগাঙের ধারে, বাঁওড়ের ওপারে! আষাঢ় মাসে এদিকে প্রকৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করে, তার তুলনা কোথাও বুঝি নেই। শিলংএর পাইন বন এর তুলনায় নিতান্ত এক-ঘেয়ে। জ্যোৎস্না বেশ যখন ফুটেচে, তখন নদীর জলে এসে নামলুম। জ্যোৎস্না চিকচিক করচে জলে, চাঁদ হাজার টুকরো হয়ে জলের মধ্যে খেলা করচে—এখনও নদীপারে বনে কোথায় বৌ-কথা-ক' ডাকচে, নদীর ধারের সোঁদালি গাছগুলোতে এখনও ফুলের ঝাড় ঝরে পড়েনি। কত গাছ, কত লতা, কত ফুল, কত পাখীর খেলা, আকাশে রঙের মেলা, কি ঘন সবুজ চারিধার। নক্ষত্র চোখে পড়ে না আকাশে, হালকা মেঘের পরদার আড়ালে দ্বাদশীর চাঁদখানি মাত্র দেখা যাচ্ছে।

এতদিন পরে এবার বারাকপুর বড় ভাল লাগচে। মানুষ এখানে তেমন নেই বটে কিন্তু প্রকৃতি এখানে অপূর্ব্ব লীলাময়ী। প্রকৃতিকে নিয়ে থাকতে পার তো এমন জায়গা আর নেই। কলকাতার কাজ আর মানুষ—এখানকার প্রকৃতি, এই দুইয়ের সম্মিলন যদি সম্ভব হত! রোজ কাজকর্ম্ম সেরে কলকাতা থেকে দ্রুতগামী মোটরে বেলা ৫টার সময় যদি বেলডাঙার পুলের মুখে ফিরে আসা সম্ভব হত এই আষাঢ় মাসের দীর্ঘ দিনের শেষে, জীবনটা সত্যি উপভোগ করতে পারতুম। নিজের একখানা এরোপ্লেন থাকলে চমৎকার হত। সমস্তদিনের হৈ-চৈ ও কর্ম্মক্লান্তির পরে শান্ত অপরাহ্নে বর্ষণক্ষান্ত আকাশের তলে কাঁচিকাটার পুলের কাছে মরাগাঙের এপারে সবুজ ঘাস ভরা মাঠে উড়ি ধানের ক্ষেতের ধারে বসে থাকতে পারতুম—তবে contrast-এর তীক্ষ্নতায় প্রকৃতিকে ভাল করে বুঝবার সুযোগ হত—একে উপভোগও করতে পারা যেত আরও গভীর ভাবে।

আজ বৈকালের দিকে খুব ঝম্‌ঝম্ বর্ষা। আমার একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল। সন্ধ্যার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে যেন মনে হল এই আকাশ, রঙীন্ মেঘরাজি, সবুজ বাঁশবন—এদের সবটা জড়িয়ে যে বিরাট বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি, তা হৃদয়হীন নয়। তা ভালবাসে, দয়া করে। দুঃখে সহানুভূতি দেখায়। আজ কোন একটি বিষয়ে সেটা আমার অভিজ্ঞতা ঘটেচে। সে অভিজ্ঞতা সত্যিই অপূর্ব্ব।

আষাঢ় মাসের এ দিনগুলো আমার বড় পরিচিত। বাল্যকাল থেকে চিনে এসেচি ওদের। মেঘান্ধকার আকাশ, আর্দ্র বাতাস, বাঁশবনে পিপুললতা ও অনন্তমূলের নূতন চারা বার হয়েচে, ওলের চারা বার হয়েচে, যখনই এমন হয়, তখনই আমার গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে যায়, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। কিন্তু একটা তফাৎ ঘটেচে, আগে এই নবোদ্গত পিপুলচারার সঙ্গে একটা দুঃখ ও বিরহের অনুভূতি জড়ানো থাকত—এখন আর সেটা হয় না। এখন মনে হয় কলকাতা গেলেই ভাল হয়, অনেকদিন তো দেশে কাটল।

কতবার এই নব বর্ষা, এই আষাঢ় মাস আসবে যাবে। যেমন আমার জীবনে এরা কত বার

এসেচে গিয়েচে। কতবার কাঁটাল পাকবে, বাঁশবনে অনন্তমূলের চারা বেরুবে, ফলবিরল আম-বাগানে হাজারী জেলে ও হাজু কামারনী আম কুড়িয়ে বেড়াবে ভোরে। এসব সুপরিচিত দৃশ্য আরও কতবার দেখব। আমাদের গ্রামটুকু নিয়ে যে জগৎ, এ দৃশ্য তারই। অন্য কোথাকার লোকের কাছে এসব হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত তাও জানি, তারা কখনও পিপুললতাই দেখেনি হয়তো।

তারপর আমি চলে যাব, হাজারী জেলেনী চলে যাবে, আমার সমসাময়িক সকল লোকই চলে যাবে, তখনও এমনি আষাঢ়ের নতুন মেঘ জমবে মাধবপুরের ঘরের ওপরে, আর্দ্র বাঁশবনে এমনিধারা পিপুলচারা বেরুবে, বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক বিরল হয়ে আসবে বকুলগাছটাতে, গাঙের জলে ঢল নামবে—শুধু আমার এই আবাল্য সুপরিচিত জগৎ তখন আর আমার চৈতন্যের মধ্যে থাকবে না।

সবদিনে মানুষের মনে সমান আনন্দ থাকে না জানি, কিন্তু আজকার দিনের মত আনন্দ আমি কতকাল যে জীবনে পাইনি! প্রথম তো সকালে উঠেই দেখলুম আকাশ ভারী পরিষ্কার—নিজের ঘরের দাওয়ায় খানিকটা বসে মুসলমান মাস্টারটির সঙ্গে গল্প করে বাঁওড়ের ধারের বট-তলার পথে একটু বেড়াতে গেলুম। এমন নীল আকাশ অনেকদিন দেখিনি। জেলেপাড়া ছাড়িয়েই ঐ সরু পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাঁশঝাড় থেকে একটা সরু কঞ্চি বেছে নিলাম হাতে নেবার জন্যে। বাঁশের কঞ্চির জন্যে এ আগ্রহটা আমার চিরকাল সমান রইল সেই বাল্যকাল থেকে। যেতে যেতে আমাদের মাথার ওপরকার নীল আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হল আষাঢ় মাসের দিনে আকাশ এত নীল, এত নির্মেঘ, এ সত্যিই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। রোদের কি রং। বাঁওড়ের ওপারের আকাশ নিবিড় বট-অশ্বত্থের আড়ালে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এই বাঁওড়ের ধারের বটতলার পথটা দিয়ে আজ আঠারো-উনিশ বছর কি তারও বেশী এমনি সকালে হাঁটিনি। বটগাছের একটা ডালে কাল খানিকক্ষণ বসেছিলুম, আজ সে ডালটায় বসব বলে গেলাম, কিন্তু আজ একটু বেলা হয়ে গিয়েচে বলে রোদ এসে পড়েচে সেখানে। একটা বাঁশের মাচা করেচে বটতলায় বাঁওড়ের ধারের দিকে। সেখানে বসে কি আনন্দ! আমায় এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে থাকতে দেখে কিন্তু কেউ কিছু ভাবে না—সবাই খুব ভালবাসে দেখলুম। আমি অনেককে চিনি নে, ওরা আমায় চেনে। একজন কাল বলচে—দাদাবাবু আমাদের দেখ বসে আছেন বটের শেকড়ে। দাদাবাবুর অঙ্খার নেই গা। আজ একজন পথ-চলতি লোক, তার বাড়ি আরামডাঙায় পরে জানতে পারলুম, আমায় বসে থাকতে দেখে পাশে এসে বসল। বল্লে—বাবু, একটা ব্যারামে বড় কষ্ট পাচ্ছি। প্যাটের মধ্যে ভাত খেয়ে উঠলি এমনি শূলোয় যে আপনাকে কি বলব! কি করি বলুন দিকি বাবু?

সে এমন বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে প্রশ্ন করলে যেন আমি স্বয়ং ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী।

কি করি আমার কোন ওষুধই জানা নেই—তাকে পরামর্শ দিলুম রাণাঘাটে গিয়ে আর্চ্চার সাহেবকে দেখাতে। মিশনারী হাসপাতালে পয়সা-কড়ি লাগবে না। মনে এমন দুঃখ হল, একটু হোমিওপ্যাথি জানলেও এই সব গরীব লোকের উপকার করা যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আমি ওর রোগ সারানোর জন্যে আর কি করতে পারি!

ওখান থেকে উঠে মাঠের মধ্যে গেলাম। এক জায়গায় একটা কি চমৎকার লতাবিতান, ওপরে ডালপালায় ছাওয়া, মোটা লতায় গুঁড়ি কাঠের মত শক্ত হয়ে তার খুঁটি তৈরী করেচে। ওর মধ্যে বসে একটু পাখীর ডাক শুনলুম, তারপর মাটির মধ্যে এসে বাবলাগাছের মাথার ওপর-

কার আকাশের অপূর্ব্ব নীল রং দেখে সেখানটায় গামছা পেতে ঘাসের ওপর কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। সে যে কি আনন্দ, তা হয়তো আমি নিজেই কিছুকাল পরে অবিশ্বাস করব, কারণ ওসব অনুভূতি মানুষের চিরকাল বজায় তো থাকে না, পরে শুধু স্মৃতিটা থাকে মাত্র। মাথার ওপরকার ঐ ময়ূরকণ্ঠি রংয়ের আকাশ, ঘাসের নীচে এই বিচরণশীল পোকামাকড়, ছোট ছোট ঘাসের ফুল, ঐ উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো ঐ বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক, কত বিচিত্র বন-লতা, বনফুল—ঐ সূর্য্য থেকে পাচ্চে এদের জীবন, রং ও আলো। কিন্তু এই সবের পিছনে, সূর্য্যেরও পিছনে, এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে যে বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা—তার কথা কেবলই এমনি দুপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে। ভেবে কিছু ঠিক করতে হবে তার কোন মানে নেই, এই ভাবনাতেই আনন্দ। তখন যেন মনে হয় এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক তারে গাঁথা—অদৃশ্য যে লতায় এই সব ফুল নিয়ে মালা গাঁথা হয়েচে, আমি তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন—বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে।

মনকে এভাবে তৈরী করে নেওয়ায় সার্থকতা আছে, কারণ মনই সব, মন যে ভাবে পৃথিবীকে দেখায়, জীবনকে দেখায়—মানুষে সেভাবেই দেখে। মন দুঃখ দেয়, সুখ দেয়—মনকে তৈরী করে যে না নিতে পেরেচে, তার দুঃখ অসীম।

ঐ লতাবিতানের মধ্যে আজ সকালে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলুম—ভারী নিভৃত, ছায়া-ঘন স্থানটি। প্রকৃতি অনেক যত্নে একে যেন নিজের হাতে গড়েচে। কাঠবিড়ালী খেলা করচে, কত কি পাখী ডাকচে, পত্রান্তরাল থেকে একটু একটু রোদ এসে পড়েচে, ঠাণ্ডা মাটিতে বড় চমৎকার ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, কেয়োঝাঁকা, ষাঁড়া, ডুমুর, কুঁচকাঁটার লতার সমাবেশে এই ঝোপটা তৈরী—দুপুরের রোদে এই নিস্তব্ধ ঝোপের ছায়ানিবিড় আশ্রয়ে বসে বই পড়া কি লেখা বড় ভাল লাগে।

এবেলা থেকে বর্ষা নেমেচে। ইছামতীর ওপরকার আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। আজ কলকাতায় রওনা হব ভেবেছিলুম—কিন্তু এরকম বাদলা দেখে পিছিয়ে গেলাম।

আজ সারাদিন মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ—কাল চলে যাব, গ্রীষ্মের ছুটি তো ফুরিয়ে গেল। যা দেখচি, সবাই বড় ভাল লাগচে। খুকু বার বার আসচে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে, নানা ছুতোয় নানা ফাঁকে। সারা দিন আজ ভয়ানক বর্ষা—বৃষ্টির বিরাম নেই একদণ্ড। দুপুরের সময় যে বৃষ্টি নামল, তা ধরল বিকেল চারটের পরে। খানা-ডোবা ভরে গিয়েচে। আমন ধানের মাঠে যোয়ার জল হয়েচে। বিলবিলে তো জলে টইটুম্বুর। মেঘমেদুর বিকেলে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে জলের উপর পা ফেলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে গেলুম আইনদ্দির বাড়ি—ওর সঙ্গে আমার জীবনের আনন্দময় দিনগুলোর যোগ আছে—যখনই খুব আনন্দ পেয়েচি, তখনই ওর বাড়িতে গিয়ে বসেচি এই ক' বছরের মধ্যে। আজও গেলাম। ওর বাড়ির দাওয়ায় বসে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের ঘন সবুজ আউশের ক্ষেত ও প্রাচীন বটের সারির দিকে চোখ রেখে ওর সঙ্গে কত গল্প করলুম। বয়স হয়েছে ৯৮ বছর, কিন্তু আইনদ্দি কখনও শুধু-হাতে বসে থাকে না। আমি যখনই গিয়েচি, তখনই দেখেচি ও কোন না কোনও একটা কাজ নিয়ে আছে—এখন সে একটা তল্‌তা বাঁশের পাশ চাঁচছিল—বল্লে—মাছ-ধরার ঘুনি বুনব।

ওর উঠোনের দক্ষিণ ধারে একটা বাবলার গাছ, তার জিরজিরে সরু পাতাভরা ডালগুলোর দিকে চেয়ে মনে যে কি আনন্দ পেলাম—তার যেন তুলনা নেই। ওখান থেকে বার হয়ে কাঁচি-কাটা পুলের ওপর এসে দাঁড়ালুম—বর্ষাক্লান্ত বৈকালে দিগন্তে মেঘের যে শোভা হয় ইছামতীর ওপরে, মাধবপুরের চরের মাথায়, বাঁওড়ের শেষ সীমানার দিকে—এদের দেখে তুষারমণ্ডিত হিমালয়শৃঙ্গের কথা মনে পড়ে।

ঘোষেদের দোকানে এসে বসেচি। একটা লোক মাথায় একটা পুঁটুলি নিয়ে ঢুকে বল্লে—মুসুরি নেবা?

ওরা বল্লে—নেবো।

—এর বদলে কিন্তু চাল দিতি হবে।

ওরা তাতেই রাজী হল।

তারপর সে বসে বসে গল্প করতে লাগল। চৈত্র মাসে আউশ ধানের বীজ ছড়িয়েছিল বলে তার ক্ষেতে ধান এখন খুব বড় বড় হয়েচে। বাড়ি তার খাব্‌রাপোতায়। খাবার ধান এখন আর ঘরে নেই, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে এখন সে নিঃস্ব, অথচ এগারো জন লোক তার পরিবারে, দু'বেলা বাইশ জন খেতে। সামান্য কিছু মুসুরী ছিল তাই ভরসা। তাই বদলে চাল নিতে এসেচে।

ফিরবার পথে অস্ত-দিগন্তের মেঘস্তূপে অপূর্ব্ব রাঙা রঙ ফুটল, দেখে দেখে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেচে প্রায় মাসখানেক হল। কলকাতায় এসে পুরোনো হয়ে গেল। এর মধ্যে একদিন বরাসাত গিয়েছিলুম পশুপতিবাবুদের সঙ্গে, একদিন রাজপুর গিয়েছিলুম। একদিন ডাঃ মহেন্দ্র সরকারের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল, অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা গভীর বিষয়ে আলোচনা শুনলুম তাঁর মুখে। আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছে আর একবার ইছামতীতে স্নান করবার জন্য। এরই মধ্যে যেন মনে হচ্চে কতকাল এসেচি।

গত শুক্রবার বারাকপুর গিয়েছিলুম। পরিপূর্ণ বর্ষার শোভা অনেক দেখা হয়নি—এবার এই বারাকপুরে থাকব বলেই গিয়েছিলুম। ইছামতীর জল ঘোলা হয়ে এসেচে। দু'দিনই বাঁওড়ের তীরে বটতলার পথে সকালবেলা বেড়াতে গেলুম—দু'দিনই ঘোলা গাঙে খুকুদের সঙ্গে স্নান করলুম। রৌদ্রে নতুন ওঠা কচি ঘাসের ওপর খানিকটা করে শুয়ে ঘাসের সাদা সাদা ছোটো ফুল লক্ষ্য করলুম। বটগাছের তলায় গাছের গুঁড়ি ঠেস্‌ দিয়ে আজই সকালে কতক্ষণ বসে রইলুম। বিশেষ করে শনিবার বিকেলে ন'দিদির কাছে নতুন বইখানার প্রথম দিকের গোটাকতক অধ্যায় শুনিয়ে যখন ইন্দু গাছ ধরতে বসেছিল তাই দেখতে গেলুম—তখন যেন একটা নতুন দৃশ্য দেখলুম। নকুলের নৌকোতে বেলেডাঙার মাঠে নতুন জায়গায় নেমে নীল আকাশের কোলে রঙীন্ মেঘস্তূপ দেখে মনে হল এমন দৃশ্য ফেলে কেন কলকাতায় পড়ে থাকি!

রাণাঘাট হয়ে কলকাতা ফিরলুম বিকেলে। বেশ লেগেচে শ্রাবণ মাসে দেশে গিয়ে। অনেক-দিন যাইনি এ সময়। কাল দুপুরের পরে ন'দিদিদের দালানে বসে যখন পুষ্পের কথা পড়ে শোনালুম নতুন বই থেকে, খুকু খুবই খুশি। ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল, বল্লে—সব বইতে কেবল তুমি আর আমি, ওই নিয়েই গল্প—এটা নতুন ধরণের হয়েচে।

নকুলের নৌকোয় যখন যাচ্চি, নদীর ধারে এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বাব্‌লাগাছ থেকে

কত কি বন্যলতা ঝুলচে, ডাইনে রঙীন্ মেঘস্তূপ, আবার একটা জায়গায় আধভাঙা একটা রামধনু। বেলেডাঙার মাঠে নেমে সবুজ ঘাসের একধারে বড় সুন্দর একটা ঝোপ। এদিকটা কখনও আসিনি। কতক্ষণ মাঠের মধ্যে ঘাসের ওপর শুয়ে রইলুম। মটরলতা তো যেখানে সেখানে—নতুন পাতার সম্ভার নিয়ে দুলচে, প্রতি ঝোপের মাথা থেকে—আমার কি জানি কেন ভারী আনন্দ হয় নতুন কচি মটরলতা দেখলে। ওর সঙ্গে যেন কিসের যোগ আছে আমার। আজ সকালে জগো আর শুটকে যখন কুঠীর মাঠের গাছটাতে পেয়ারা পাড়চে আমি একটা মটরলতার ঝোপের তলায় বসলুম—নতুন এক ধরণের চওড়া পাতা নরম ঘাসের ওপরে। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—মনের আনন্দই তার চরম প্রকাশ।

আমি ডায়েরীতে অনেক বারই লিখি—"এ আনন্দের তুলনা নেই।" হয়ত একঘেয়ে হয়ে যায় কথাটা, কিন্তু আনন্দটা যে একঘেয়ে হয় না। যে আনন্দ মনকে ভরিয়ে দেয়, তা সব সময়ে, সর্ব্বকালে এক। যখনই পাই, তখনই মনে হয় এ বুঝি নতুন, এমনটা আর কখনও বুঝি হয়নি। সেই যে নিত্যনূতন চির অক্ষয় আনন্দ, তার কি ভাবে বর্ণনা দেব একমাত্র ঐ কথা ছাড়া যে 'এর তুলনা নেই'। জীবন যে বহু আনন্দমুহূর্ত্তের সমষ্টি, তাদের পৃথক পৃথক বর্ণনা নেই, তারা চির নবীন, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়—কাজেই তাদের তুলনা নেই। সত্যিই তো তাদের তুলনা আর কিসের সঙ্গে দিতে পারি? অন্য অন্য দিনের আনন্দের সঙ্গে? কিন্তু তারা তো তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত—বর্ত্তমানে যা পাচ্চি, তাই তখন বড়।

এত শীগ্‌গির যে আমায় আবার শিলং আসতে হবে, তা ভাবিনি। কিন্তু সুপ্রভা আসতে লিখলে, আর আমারও একটা সুযোগ উপস্থিত হল আসবার। কাজেই চলে এলুম।

কাল বিকেলে ট্রেনে সময়টা কি চমৎকার কেটেচে! কত নতুন অনুভূতি, কত নতুন চিন্তা! নৈহাটির কাছাকাছি যখন গাড়িখানা এল, তখন মনে হল, এখান থেকে সোজা বারাকপুর কতটুকুই বা আর, এখন দুপুরবেলা, আমাদের বকুলতলায়, বিলবিলের ধারে ছায়া পড়ে গিয়েচে, খুকু এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে, বৃহস্পতিবার আজ গোপালনগরের হাট, সব লোক হাট করতে যাচ্চে, কত গ্রামে বাঁশবনের ছায়ায় ঢাকা কত পল্লীকুটিরে কিশোরী মেয়েরা প্রেমের রঙীন স্বপ্নজাল বুনে ঘুরে বেড়াচ্চে; খুঁটির কাছে বসে চলে যাবার সময় চেয়ে বসে থাকার, নদীর ধারে কত বন-সিমলতার আড়ালে চোরা চাউনি ও হাসির কত ঢেউ—এই সব ছবি মনে আসে। বিকেলে তারা জলে নেমেচে গা ধুতে। পার্ব্বতীপুর এসে এসে যেন সব চেনা পুরোনো হয়ে গিয়েচে। গাড়িতে বেশ জায়গা ছিল। ট্রেনে ঘুমও হল খুব। লালমণিরহাটে নেমে জেলি ও পাগলার খোঁজ করলুম। অত রাত্রে কোথায় পাব?

ভোর হল রঙ্গিয়া জংশনে, এখানেই প্রতিবারে ভোর হয়। আর যখনই এপথে এখানে এসেচি, বৃষ্টিছাড়া দেখিনি কখনও। ভিজে স্যাঁতসেঁতে জলাভূমি আর ফার্ণ গাছের বন, কাদাভরা মাটির পথ-ঘাট, কলার ঝাড়, নীচু নীচু খড়ের বাড়ি।

ব্রহ্মপুত্র কূলে কূলে ভরা। কি ঠাণ্ডা জল! জলে নেমে মুখে মাথায় জল দিয়ে তৃপ্তি হল ভারী। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে, মেঘমেদুর আকাশ, ওপারের পাহাড়ে কুয়াসার মত মেঘ জমে রয়েচে।

গৌহাটি-শিলং মোটরবাসে ত্রিপুরার মহারাণীর একদল পরিচারিকা উঠল—তাদের কথাবার্ত্তা বিন্দুবিসর্গও বুঝিনে—মোটর যেমন পাহাড়ের পথে উঠল—অমনি ওরা সবাই সামনের বেঞ্চিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল—সবারই নাকি মাথা ঘুরচে। বেশ গরম, নংপোতে এলুম তখনও

এতটুকু ঠাণ্ডা নয়, এমন কি শিলংএও নয়। বরপানি নদীতে বর্ষার পরিপূর্ণ যৌবনের জোয়ার এসেচে—শিলাখণ্ড থেকে আর এক শিলাখণ্ডে লাফিয়ে আছড়ে পড়ে কি তার উদ্দাম মাতন!

আমার পুরোনো স্নো-ভিউ হোটেলে এসেই উঠলুম। ওদের কলটার কাছে সেই গোলাপ-গাছটা তেমনি আছে, থোকা থোকা রাঙা গোলাপ ফুটেচে।

বড় মেঘ আর বৃষ্টি শিলং-এ। পাইন বনে মেঘ জমে আছে শাশ্বত, আর টিপটিপে জল, রৌদ্র দেখলুম না কখনও শিলং-এ।

লাবানে যাবার সময় গোটা পথটাতেই বৃষ্টি। আজ আসামের ভূতপূর্ব্ব গবর্নর সার মাইকেল কিনের মৃত্যু উপলক্ষে স্কুল কলেজ আপিস সকালে ছুটি হয়ে গিয়েচে। তাই ভাবলুম সুপ্রভাদের কলেজও নিশ্চয়ই বন্ধ হওয়াতে সে সনৎ কুটিরেই ফিরে এসেচে। ওকে পেলামও তাই। হঠাৎ আমায় দেখে খুব খুশি হল। আমিও বড় আনন্দ পেলাম অনেকদিন পরে ওকে দেখে। ওর দিদির দুই মেয়ে রেবা ও সেবাকেও দেখলুম। কমলা সেনের সঙ্গে আলাপ হল। অনেকক্ষণ বসে ওদের সঙ্গে গল্প করে সাড়ে ছ'টায় উঠে গবর্নরের বাড়ির পেছন দিয়ে সুশীলবাবুদের বাড়ি Heath Back Cottage-এ গেলুম। সুশীলবাবু তো আমায় দেখে অবাক! আমি কোথা থেকে এলুম শিলংএ! শঙ্কর এল ফুটবল খেলে সন্ধ্যার সময়। সে বড় হয়ে গিয়েচে, আর যেন চেনা যায় না।

লুম্ শিলংএর পাইনবনে মেঘ জমেচে! এই সন্ধ্যায় আমি দূর বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র পল্লীর কথা ভাবচি।

সুপ্রভা বলছিল, কাল আপনি ডাউকি পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসুন। শঙ্করও বল্লে, সে কাল সকালে এখানে আসবে। দেখি কোথায় পাওয়া যায়।

সকালে শঙ্কর এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালে। তার সঙ্গে ওয়ার্ড লেক্ ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়িয়ে মৌখ্‌রা গেলুম ডাউকির মোটর কখন ছাড়ে দেখতে। শুনলুম ও পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিট দেয় না—সুতরাং চেরাপুঞ্জি রওনা হলাম। আবার সেই আপার শিলংএর রাস্তা! সেই পাইনবন পথে তিন চার রকমের বন্যফুল ফুটে আছে প্রান্তরে, একটা হলদে, একটা ভায়োলেট, একটা লাল, একটা সাদা। ঠিক যেন মরসুমী ফুলের ক্ষেত। সর্ব্বত্র অজস্র ফুটে রয়েচে—চেরার একটু আগে পর্য্যন্ত। চেরাতে নেই, মুস্‌মাইতেও নেই। যাবার সময় Gorge-এ খুব মেঘ করেছিল, খানিকদূর পর্য্যন্ত মনে হল যেন আকাশ এরোপ্লেনে চলেচি। চেরার কাছে অদ্ভুত আকৃতির জঙ্গল আছে—তার প্রত্যেক গাছটাতে অসংখ্য পরগাছা, শেওলা ঝুলচে, ফার্ণ হয়ে আছে—কি ঘন কালো জঙ্গলের তলাটা। আনারস কিনে খেলুম চারপয়সা দিয়ে একটা। খাসিয়া দোকানদার কেটে প্লেটে করে দিল। বেশ মিষ্টি আনারস। একজন ডাক্তার তার ডাক্তার-খানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর মুস্‌মাই পর্য্যন্ত গেলুম বাসে। চমৎকার দিন আজ, মুস্‌মাইএর পথে নীল আকাশ একটুখানি দেখা গেল। সবাই বল্লে, এত ভাল দিন অনেকদিন হয়নি। মুস্‌মাই জলপ্রপাতের এপারে একটা পাথরে কতক্ষণ বসে রইলুম—একধারে সিলেটের সমতলভূমি ঠিক যেন সমুদ্রের মত দেখাচ্চে। একসময়ে তো ওখানে সমুদ্রই ছিল, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় ছিল প্রাচীন যুগের সমুদ্রতীরে। ঢেউ এসে তাল মারত পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে। চেরা থেকে ফিরবার পথে আবার সেই ফুলের ক্ষেত—মাঠের সর্ব্বত্র ওই চার রকম ফুলের বাগান। একটা খাসিয়া গ্রামে বাংলা দেশের গোয়ালের মত একখানা অপকৃষ্ট ভাঙা খড়ের ঘরে টুপিপরা ছেলেমেয়ে, ফর্সা মেয়েরা। বেড়ার ফর্গেট্-মি-নটের বাহার দেখে মনে হল

এ কোন্ দেশে আছি! চেরা থেকে এসে চা খেয়ে ওয়ার্ড লেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। খুকু এতক্ষণ ঘোলার গাঙে গা ধুতে নেমেচে। আমাদের দেশে নাটাকাঁটার ফুল ফুটেছে—সে এক দেশ আর এই এক দেশ! অনেককাল আগে এই গোধূলিতে একটা স্মৃতি জড়ানো আছে, পাইনবনের মধ্যে বসে সেটা মনে আনতে বেশ লাগে। সুপ্রভাদের ওখানে গিয়ে দেখি সুপ্রভার বাবা এসেচেন সিলেট থেকে। আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্মে অপেক্ষা করছিলেন। ভারী চমৎকার লোক, এমন সরল, সদানন্দ, অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোক আমি কমই দেখেছি। অনেকদিন পরে সুপ্রভার ছোট বৌদিদির হাতের তৈরী ভ্যানিলা দেওয়া নারকোলের সন্দেশ খাওয়া গেল।

সন্ধ্যার দেরি নেই। লুম শিলংএর পাইনবনে মেঘ জমেচে। পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু অল্প একটু নীল আকাশের আঁচ—মেঘে রং লেগেচে, ওয়ার্ড লেকের ওপারে পূবদিকের বহু দূরের আকাশে জমেচে অন্ধকার। কেবল শুনি মোটরের ভেঁপু, কত গাড়ি যে যাচ্চে সামনে দিয়ে। খাসিয়া মেয়েরা গল্প করতে করতে যাচ্ছে। গির্জ্জায় প্রার্থনা হচ্চে, সম্মিলিত ইংরিজী গানের সুর কানে ভেসে আসচে। আমি কাউন্সিল হাউসের সোপানে বসে আছি। কি জানি কেন এই সন্ধ্যায় কেবল আমাদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। এ যেন কোথায় এসেচি, কতদূর—সুপ্রভা না থাকলে একটুও ভাল লাগত না। আমরা যখন পৃথিবীকে ভালবাসি বলি—তখন ভেবে দেখিনে, অনেকেই ভালবাসি খুব সংকীর্ণ অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত একটা জায়গা। সেখানকার গাছপালা, নদী, মাটি, লোকজন আমার কাছে বড় আদরের—তাই তাদের পেয়ে ও ভালবেসে মনে হয় এই পৃথিবীকে বড় ভালবাসি। আসলে সেই গ্রাম বা নগরটাই আমার পৃথিবী। এমন কি রোদ বা জ্যোৎস্না সেখানে যত মিষ্টি, অন্য জায়গায় ঠিক ততটা নয়।

আজ সকাল থেকে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, বেলা ১০টায় বৃষ্টি ধরেচে। সুপ্রভাদের হোস্টেলে গিয়ে বল্লুম—আজই চলে যাব! সুপ্রভা যেতে বারণ করলে, তবুও বলে এলুম, না আজই যাব। কিন্তু হোটেলে এসে আর যেতে ইচ্ছে হল না। ভাবলুম, সুপ্রভা বারণ করলে, আজ থেকেই যাই। দুপুরে সুপ্রভার বাবা, সুপ্রভা, বীণা, রেবা দেখি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে উপস্থিত—আমায় মোটরে উঠিয়ে দিতে। রেবা চকোলেট ও ফুল এনেচে। ওদের সবাইকে দেখে এত আনন্দ পেলুম। তারপর সকলে মিলে গেলুম সুপ্রভাদের কলেজ ও হোস্টেল দেখতে। নতুন তৈরী বিরাট কাঠের বাড়ি, দেখবার মত জিনিস বটে। ওখান থেকে বীণাদের বাড়ি গিয়ে চা, তালের ক্ষীর, তালের বড়া, লুচি কতরকম খাবার খেলুম। সুপ্রভার মাকে দেখে বড় কষ্ট হল। আহা, এই বয়সে এই শোক পেয়েছেন, তাতে মেয়েমানুষ, মনকে বোঝানো ওঁদের পক্ষে খুবই শক্ত। সুপ্রভার বাবাকে যতই দেখেছি, ততই মুগ্ধ হচ্চি তাঁর মনের স্থৈর্য্যে ও প্রসারতায়। তিনি যত সহজে শোক জয় করতে পারচেন, সুপ্রভার মা তা পারচেন না। কাজেই তাঁর মনে কষ্ট হয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। চাঁদ উঠেছে মেঘের ফাঁকে, দক্ষিণ বনের মাথায়। একটা সীমাহীন নক্ষত্র মিটমিট করচে লুম শিলংএর ওপারের আকাশে। গির্জ্জা থেকে দলে-দলে খাসিয়া মেয়ে-পুরুষ উপাসনান্তে বাড়ি ফিরচে। অনেকগুলি খাসিয়া মেয়ের বাঙালীদের ধরনে কাপড় পরা। তাদের দেখাচ্ছে ভালো।

শিলংএ একটা জিনিস নেই। এখানে কোন সৎপ্রসঙ্গের চর্চ্চা দেখলুম না কোথাও। না সাহিত্য, না গান, না অন্য কোন শিল্প। লোকেরা সব চাকুরিবাজ, নয়তো স্বাস্থ্যান্বেষী হাওয়া-

খোর। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক কিম্ভূতকিমাকার ধরনের জীব। রোগের কথা, পথ্যের কথা, শরীরের উন্নতি কার কতটুকু হয়েছে, এ ছাড়া অন্য বিষয়ে তারা interested নয়। আর এরা প্রায়ই ত্রিকালোত্তীর্ণ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এদেরই বড় ইচ্ছা বাঁচবার। যেন তারা বেঁচে দেশে ফিরে গেলে সোনার দেউল ওঠাবে।

পরীতলা জায়গাটা পাইন বনের মধ্যে একটা ভ্যালি। ছোট্ট ভ্যালিটা যদিও, চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট পাইন শ্রেণী, মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে, বেশ সুন্দর জায়গাটা। এদিন সকালে লাবানে যাবার পথে একটা উঁচু পাহাড় টপকে পাইন বনের ছায়ায় ছায়ায় সোজা রাস্তাটা দিয়ে যাবার সময় দূরে লাবান হিলের মাথায় ওধারকার পাইন বনগুলো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। মর্নিং গ্লোরি ফুল থোকা থোকা ফুটেছে লোকের বাড়ির বেড়ার গায়ে, মাকড়সায় বিচিত্র জাল বুনেচে।

সুপ্রভাদের বাড়ি গিয়ে রেবাকে একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করে ঠকিয়েছিলাম। যীশুখৃষ্ট কতদিন মারা গিয়েচেন, এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারলে না। ওকে দেশলায়ের বাক্সের ম্যাজিকটা দেখিয়ে বাক্সটা দিয়ে দিলুম। বেলা সাড়ে ন'টা। সুপ্রভার সঙ্গে পরীতলা বেড়াতে গেলুম। একটা নদীর ধারে মাঠের মধ্যে পাইন বনে ঘেরা নির্জ্জন স্থানটিতে বসে গান শোনা গেল। তারপরে ওখান থেকে চলে এসে সেই পাহাড়টার উপর দিয়ে আসছি, রেবার দাদা আসচে, বল্লে—কাউন্সিলে গিয়েছিল অর্থাৎ শিলং লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লিতে। একটা টিকিট দিলে আমায়। আমি গিয়ে কাউন্সিল হাউসে ঢুকলাম। একজন পুলিস দেখিয়ে দিলে ওপরের সিঁড়িটা। ওপরের গ্যালারিতে লোকে লোকারণ্য। আইন সভার অধিবেশন হচ্ছে নীচের হলটাতে। বসন্তকুমার দাস নিচেকার উঁচু চেয়ারে ডবল কলার পরে গম্ভীর মুখে বসে। তার সামনে, ওপরে, দোতলায়, পেছনে উঁচু চেয়ারে আসামের গভর্নর রিড্‌ বসে। একজন কংগ্রেস-সদস্য মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। রাজস্ব-সদস্য স্যার আবদুল্লা তার জবাব দিতে উঠলেন। একপক্ষ যখন বক্তৃতা করতে ওঠে, অপর দল দেখলুম হাসি, টিটকিরি সব রকম চালায়—এ বিষয়ে আইন সভা সাধারণ স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের চেয়েও অধম।

কাউন্সিল হাউস থেকে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে মোটর স্টেশনে এলুম। ত্বটোর সময় মোটর ছাড়ল—অপরাহ্নের ছায়ায় মোটর-রাস্তার দুধারে অরণ্য-দৃশ্য অতি সুন্দর—পাহাড়ী নদীটাই কি অদ্ভুত! ফিরে আসতে আসতে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে দেখলে মায়ের সেই কড়াখানার কথা মনে হয়। সন্ধ্যায় গৌহাটিতে নামবার পথে মণি ডাক্তারের কথা ভেবে দেখলুম। গাঁয়ের হাটতলায় সে এতক্ষণ সেই মুদীর দোকানটাতে বসে গান করচে। হয়তো বেচারা এবারও বাড়ি যেতে পারে নি। সামনে সূর্য্যাস্তকে লক্ষ্য করেই যেন মোটর ছুটেচে, সামনে কামাখ্যা দেবীর মন্দির পড়ল একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়। খুকু এতক্ষণ হয়তো গাঙ্‌ থেকে গা ধুয়ে ফিরে এল। জঙ্গলে ভরা পোড়ো-ভিটেটাতে ছায়া পড়ে এসেছে। স্টীমারে এসে ওপারের ডেক থেকে পাহাড়ে ঘেরা আধ-অন্ধকার বৃক্ষপত্রের দিকে চেয়ে রইলাম কতক্ষণ, কত চিন্তা যে মনে আসে এই সন্ধ্যায়! ট্রেনে উঠে তাড়াতাড়ি শোবার ব্যবস্থা করিনি—রপেটা স্টেশন পর্য্যন্ত বসে আসামের সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি ও ছোট ছোট গ্রাম দেখতে দেখতে এলুম। কেবলই মনে হয় ওবেলা পরীতলা ভ্যালিতে বসে সেই যে গানটা সুপ্রভা গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের—

যৌবন সরসীনীরে
মিলন শতদল
কোন চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল

আর একটা গান—'রোদন ভরা এ বসন্ত'—চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্যের গানটা।

কামরূপ জেলার দিগন্তব্যাপী প্রান্তর ও জলার ওপর আকাশের ছায়া পড়েচে, সন্ধ্যা হয়ে এলেও সূর্য্যাস্তের after glow এখনও আকাশে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে বনে বনে, সুপ্রভা ও শিলং অনেক দূরে গিয়ে পড়েচে।

মণি ডাক্তার এতক্ষণ বাসা পৌঁছে তার সেই ছোট চালাঘরখানায় ভাত চড়িয়ে দিয়েচে। আহা, গরীব বেচারা! কত গ্রাম, কত মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, এখান থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে কত গ্রামের কত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা দ্বন্দ্বের মধ্যে একখানি মাত্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘরের জন্যে আমার সহানুভূতি এত বেশি কেন?

রাণাঘাট স্টেশনে পরদিন দুপুরে পৌঁছে যেন মনে হল বাড়ি এসেচি। এখান থেকে আমার সুপরিচিত সব কিছুই। মনে হল নিবারণ গোয়ালা এতক্ষণ ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নেমেচে—কি জানি কেন এই চিন্তাটা মনে হয়ে বড় আনন্দ পেলাম।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে দেশে যাওয়া আমার পক্ষে একটা আনন্দজনক ব্যাপার। এই জন্মাষ্টমীর সঙ্গে আমার জীবনে অনেক শুভদিন, বিশেষ করে একটি অতীব শুভদিনের স্মৃতি জড়ানো। তাই জন্মাষ্টমী এলেই মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে দেশে যাওয়ার জন্যে। এই ক'বছর তার সুবিধা ও সুযোগও ঘটেচে—১৯৩৪ সাল থেকে। এবারও কাল গিয়েচে জন্মাষ্টমী, আজ নন্দোৎসব। বনগাঁয়ে গিয়েছিলুম শনিবারে। সেদিন কি ভয়ানক বর্ষা! থানাডোবা জলে ভর্ত্তি হয়ে থৈ থৈ করচে! ওদিন দুপুরে খুব জল হয়ে গিয়েচে ওখানে। গিয়েই শুনি ফণিবাবু ওভারসিয়ারের মেয়েটি সেই বিকেলে নিমোনিয়ায় মারা গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় আমরা অনেকে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সেখানে গিয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে রইলুম। পরদিন খয়রামারির মাঠে আমার সেই প্রিয় স্থানটাতে দুপুরে গিয়ে দেখি মটরলতার ঝাড় তখনও টাট্‌কা রয়েচে, ছোট এড়াঞ্চির ঝোপগুলো বর্ষার জল পেয়ে বিষম বাড় বেড়েচে। বিকেল ছ'টায় গেলুম। যাবার পথটি বড় সুন্দর লাগল সেই ছায়াভরা বিকেলে। খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। সন্তু এসেও বসল। কালোর মেয়েকে এনে খুকু আমার কোলে দিলে। সন্তুকে জিজ্ঞেস করলুম সিলেগুাইন্ মানে কি? খুকু বল্লে—আহা, ওকথা আর জিগ্যেস করতে হবে না। মিনুতা বাংলাদেশের রাজধানী বলতে পারলে না—বলে খুকু তো হেসেই খুন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওদের ওখানে ছিলাম, তারপর চলে এলুম। দেবেনের ডাক্তারখানার সামনে বিশ্বনাথ আর সরোজ বসে গল্প করচে অন্ধকারে। আমি সেখানে একটু বসে চলে এলুম ডাক্তারবাবুর বাড়ি গান শুনতে। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় কি ভাবে, খুকু সেই গল্পটা করলে সন্তুকে। ১৯১৮ সালের জন্মাষ্টমী ছুটিতেও এই বাসাতে এসেছিলুম সকালে। তখন খিনুরা থাকত, খিনুর মা তখনো বেঁচে। সরকারী ডাক্তারখানার কোয়ার্টারে তখন ওরা থাকত।

আজ সকালে ছায়াভরা পথ বেয়ে একা হেঁটে যাই বারাকপুরে। বর্ষায় বনস্থলীর শোভা আরও বেড়েচে। কোথাও তেলাকুচো পেকে টুক্ টুক্ করচে, নাটাকাঁটার ফুল ফুটেচে, বনকলমীর ফুল ঝোপের মাথায় ক্বচিৎ দৃশ্যমান, 'ক্বচিৎ' এইজন্যে বললুম যে এই ফুলটা এবার যেন দেশে একটুকু কম, ঢোলকলমীর ফুল খুব ফুটেচে, কিন্তু বনকলমী তেমন দেখা যায় না। জগোর

সঙ্গে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে যাই বাড়ি পৌঁছে। . বড় আমবাগানের পথে সইমার সঙ্গে দেখা বাঁশতলায়, তিনি হরিপদর বিরুদ্ধে কি একটা নালিশ করলেন আমার কাছে। সেই গাছতলায় গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসি, সেবার যেখানটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আইনদ্দির নাতি স্কুলে যাচ্ছে পথ দিয়ে, আমায় দেখে হাসচে। তাকে ডেকে বাড়ির কে কেমন আছে জিগ্যেস করলুম। আজ সোমবার, ভাবছিলুম যে ও সোমবারের আগের সোমবারে ঠিক এ সময়টা আমি আর সুপ্রভা পরীতলায় বসে আছি শিলংএ পাইনবনে ঘেরা সেই ছোট্ট উপত্যকাটিতে, ছোট্ট নদীটার ধারে।

তারপর জগো আর আমি মাঠে রৌদ্রে একটু নরম ঘাসের উপর শুয়ে থেকে আমাদের ঘাটে নাইতে নামি। ভারী তৃপ্তি হয় ঘোলা জল ইছামতীতে এই সময়টা স্নান করে। একটা ঝোপ থেকে একটা বনসিমের ফুলের ছড়া তুলে নিলাম। দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম দস্তুরমত যে, এই ভাদ্র মাসেও কুঠীর মাঠে দুটো গাছে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে রয়েচে।

খুকুদের বাড়িটাতে কেউ নেই। দাওয়ায় গরু উঠেচে, ভাঙাচোরা পৈঠে। একবারটা সেইদিকে গেলুম। দুপুরে আমার ঘরটাতে শুয়েচি—ইন্দু এসে খানিকটা গান করলে, আমাদের ভিটের দিকে গিয়ে দেখি ঘন জঙ্গল হয়েচে, মায়ের সেই ভাঙা কড়াখানা জঙ্গলে ঢেকে ফেলেচে। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল, যাকে অনেকদিন আগে এই দিনটিতে এখানে দেখা যেত।

নৌকো করে বনগাঁয়ে এলুম বিকেলে। ইছামতীর জল খুব বেড়েছে—জলের ধারে উলুটি বাচ্ড়া, নরম সবুজ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে বনকলমীতে ছাওয়া ঝোপ। বিকেলের ছায়ায় নদীবক্ষের কি শান্ত শোভা!

ক'দিন থেকে পূজোর আগে বড় কাজকর্ম্ম চলেছে। স্কটিশচার্চ্চ কলেজে বক্তৃতা ছিল, সেখান থেকে সেদিন বার হয়ে ডি এম লাইব্রেরীতে এলুম। এবার প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে দেখলাম না, অন্য অন্য বার দেখি। প্রমোদবাবু এসেছিলেন শনিবারে। ঠিক করা গেল এবার পুজোয় কোথায় যাওয়া যাবে, অনেকটা ঠিক হল—হয় চাটগাঁয়ে, নয়তো রাখামাইন্‌সে। আজ সকালে সাঁতরাগাছি হয়ে গেলুম শ্রীরামপুরে। বর্ষার সবুজ বনরাজির শোভা দেখতে দেখতে আমি ও সুরেন মৈত্র গিয়ে উঠলুম শ্রীরামপুর টাউনহলে। কে একজন বল্লে—আপনার বদ্দিবাটি আসবার কথা ছিল না? বলতে বলতে হরিদাস গাঙ্গুলী এলেন, তাঁরই বাড়িতে ছিল খাওয়ার কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। বাইরে আকাশ আজ বড় নীল। তালগাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে অনেকদূরের আকাশে। একটা খড়ের বাড়ি পড়ে আছে, দাওয়ায় গরুবাছুর উঠেছে। বাড়িটাতে কেউ নেই। দিদিদের বাড়িও গেলাম, আগেকার দিনের মত কি আর আছে? আগে ট্রেনে যেতে যেতে দানিবাবু আমাকে সাহস দিতেন, তবে যেন শ্রীরামপুরের মাটিতে পা দিতে পারতুম।

আজ সারাদিন ভীষণ দুর্য্যোগ, যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। সকালে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে গিয়ে রমাপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করলুম। তারপর স্কুল গেল ছুটি হয়ে। বৃষ্টির মধ্যে গেলুম ক্ষেত্র-বাবুর সঙ্গে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সেখান থেকে প্রবোধ সরকারের দোকান হয়ে গুরুদাস চাটুয্যে এণ্ড সন্‌স ও কাত্যায়নী বুক স্টল। ওখানে আমার একখানা উপন্যাস 'আরণ্যক'-এর আজ কণ্ট্রাক্ট হওয়ার কথা। হয়েও গেল। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সুধীর সরকারের বইয়ের দোকানে এলুম ট্রামে, সেখান থেকে রমাপ্রসাদের বাসায় এসে খানিকটা গল্প করি।

কি দুর্য্যোগ আজ! রাত্রে এখন যেন ঝড় বেড়েচে। আজ সারাদিন এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েচি।

রাত্রি ১০টা। বৃষ্টি সমানে চলচে, গোঁ গোঁ করে ঝড় বইচে। আমি ভাবচি বহুদিন আগে ১৯২৭ সালে ঠিক এই রাত্রিটিতে এই সময়ে আমি আর অম্বিকা ভাগলপুর থেকে পায়ে হেঁটে দেওঘর যেতে জামদহ ডাকবাংলোতে কাটিয়েছিলুম। এখনও মনে পড়চে নির্জ্জন শালবনের মধ্যে চানন নদীর ধারে সেই বাংলোটি—আমি এদিকে কোণের ঘরে টেবিলের ওপর বসে ডায়েরি লিখ্‌চি আর বাংলোর ওদিকে লছ্‌মীপুর স্টেটের ম্যানেজার নদীয়াচাঁদ সহায় প্রজাপত্তর নিয়ে কাছারী করচেন। এই রাত্রেই শোবার সময় আমি অম্বিকাকে বলি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নিরাপদ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কাল লছ্‌মীপুর হয়ে কানিবেলের জঙ্গলের পথে দেওঘর যেতে হবে। তাতে প্রথমে সে ঘোর আপত্তি জানায়, শেষে রাজী হল।

সেই ১৯২৭ সালের এই দিনটি—আর ১৯৩৭ সালের এই দিন! কত পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে জীবনে সব দিক থেকে···যদি ধরা যায় তারও আগে ১৯১৭ সালের এই সময়ের কথা··সেই মামার বাড়িতে থিয়েটার করলুম আমি ও মেজমামা মিলে করুণা গান গাইলে:—

আমি না তোর জান্ কলিজা
ভালবাসা গেছে বোঝা

তবে তো পরিবর্ত্তনের অনন্ত অকূলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে।

১৯২৭ সালে আমি মুক্ত পথিক, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই অপ্রত্যাশিত অজানার সন্ধানে—চোখে মায়ার ঘোর, সৌন্দর্য্যের ঘোর, এখনও আমার সে ঘোর কাটেনি, বরং অনেক—অনেক ঘনীভূত হয়েচে। জীবনে তখন ছিলুম একা, এখন আরও সব অনেক এসেছে। যেমন সুপ্রভা খুকু, মিনু, রেণু,—এরা সব। এই সামনের রবিবারে তো খুকুর সঙ্গে দেখা হবে ছ'ঘরেতে—তারপর ৯ই অক্টোবর সুপ্রভা আসবে শিলং থেকে। ওর মায়ের সঙ্গে কাশী যাচ্ছে পুজোয় বেড়াতে—ওর সঙ্গেও দেখা হবে তারপর আমি চাটগাঁ যাব ইচ্ছে আছে, সেখানে রেণুর সঙ্গে দেখা হবেই। এরা এখন জীবনে এসে আমায় খুব আনন্দ দিয়েচে—তবুও দশ-এগারো বছর আগেকার সেই বনে, পথে, প্রান্তরে, অরণ্যসীমায় যাপিত দিনরাত্রিগুলির স্মৃতি ফিরে এলে মনটা কেমন হয়ে যায়···

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান, উভয় দিনের মধ্যে আমায় কত বিচিত্র অমূল্য অভিজ্ঞতা বহন করে এনে দিয়েচে। আমি সেদিক থেকে ধনী, তবুও আজ কেউ যদি বলে—সে জীবন চাও না এ জীবন? আমি সেই জীবনে আবার এখুনি ফিরে যেতে চাই, যদি কেউ দিনগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে।

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকব কি? কি লিখব সে দিনটিতে? তখন কোথায় থাকবে আজকের দিনের সঙ্গীরা? কোথায় থাকবে খুকু সুপ্রভা?···রেণু-মা?

কে বলবে?

ভীষণ ঝড়ের রাত্রি। ঝড়ে বিরাট সোঁ সোঁ শব্দ। রাত্রে ভয়ে ঘুম হল না মেসসুদ্ধ। রাত দেড়টা। মনে হচ্চে যেন মেসের বাড়িটা দুলচে। এমন ভীষণ ঝড় ১৩১৬ সালের পরে আর দেখেচি বলে মনে পড়চে না তো। সারা আকাশ রাঙা ধূসর মেঘে উগ্রমূর্ত্তি, রুদ্র প্রকৃতির রক্তচক্ষু যেন মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারচে।

কাল স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েচে। অন্য অন্য বার এ সময় বাইরে যাবার জন্যে কত আগ্রহ থাকে,

কত উদ্যোগ আয়োজন করি। এবার অন্য অন্য দিক থেকে আমার ব্যাপার মন্দ নয়, কিন্তু বাঁ পা-খানা হঠাৎ সেদিন বনগাঁয়ে মুচকে গিয়ে এক রকম শয্যাগত হয়ে আছি—কোথাও দূরে বেড়াতে যাওয়া অসম্ভব। সেজন্য মন ভাল নয়। ভাল লাগে কি এ সময় কোথাও বাইরে যেতে না পারলে? সবাই দূরে কোথাও যাবার পরামর্শ আয়োজন করচে, সজনী ও ব্রজেনদা আজ সন্ধ্যায় চলে গেল ভাগলপুরে। সুধীরবাবু কাল রাত্রের এক্সপ্রেসে যাচ্ছেন হরিদ্বার ও মুসৌরী, অপূর্ব্ববাবু আজ সকালে চলে গেছেন শিমূলতলা, নীরদ চৌধুরী গেছে রাঁচী, অশোক গুপ্ত যাচ্চে বেনারস, শচীন সরকার কাল সকালে চট্টগ্রাম যাবে, নীরদ দাশগুপ্ত তো সস্ত্রীক আগেই চলে গেছে চট্টগ্রাম—আজ সুধীরবাবুদের দোকানে দুপুরবেলা বসে কেবলই শুনি ওদের টিকিট কেনার, বার্থ রিজার্ভ করার, হাওড়া স্টেশনের এন্‌কোয়ারী আপিসে ফোন্ করার বিপুল ব্যস্ততা। হৈ-চৈএর মধ্যে ওরা নিজেদের ডুবিয়ে রেখেচে—কোথাও যাবে এ আমোদটা কোথাও গিয়ে পৌঁছানোর আমোদের চেয়ে বেশী—কিন্তু আমি শুধু বিষণ্নমুখে বসে বসে ওদের আয়োজন দেখচি আর ভাবচি এবার আমার আর কোথাও যাওয়া হল না। সুপ্রভা লিখেছিল ৯ই তারিখে ওরা এখানে আসবে কাশী যাবার পথে—তাও সে চিঠি লিখেছে এবার তার যাওয়া হল না। আমার যাওয়ার মধ্যে দেখচি খালি মজিলপুরে দত্তদের বাড়ি সাহিত্য-সেবক সমিতির নিমন্ত্রণ আছে, তারা আমাকে বিশেষ করে ধরেচে যাওয়ার জন্যে—ঐ একমাত্র জায়গা যেখানে যাওয়া ঘট্‌তে পারে, কারণ তারা মোটর পাঠাবে।

হায়, হায়, কি বিভ্রাট এবার—শিলং গেল, চট্টগ্রাম-চন্দ্রনাথ গেল, কাশী গেল, হরিদ্বার গেল, মুসৌরী-দেরাদুন গেল—শেষকাল কি না পূজোতে বেড়াতে যাব জয়নগর-মজিলপুর? আরো না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

অথচ মজা এই, সকলেই বলচে আমাদের সঙ্গে এস। সুধীরবাবু বলচেন, চলুন আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার, নীরদ দাশগুপ্ত তো কাল স্টেশনে লোক পাঠাবে চট্টগ্রাম স্টেশনে—কারণ কাল সকালের ট্রেনে আমার সেখানে পৌঁছনোর কথা পূর্ব্ব ব্যবস্থামত—অপূর্ব্ববাবু তো কাল কলেজ স্কোয়ারে সাধাসাধি—আমার সঙ্গে শিমুলতলা চলুন। সজনী বলচে—আসুন দু'দিনের জন্যেও ভাগলপুরে।

এমন সময়েও পা ভাঙে মানুষের?

পূজোটা এবার একেবারে মাটি হল। অগত্যা কাল দেশেই চলে যেতে হবে।

কাল পর্য্যন্ত ভেবেছিলুম কোথাও যাওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পা অনেকটা সেরে উঠল। রাত্রিটা বসে বসে ভাবলুম কোথাও যাব না, এটা কি ঠিক? চাটগাঁতেই যাওয়া যাক্। সকালে উঠে স্টেশনে এসে দেখি চাটগাঁয়ের একটা স্পেশাল ট্রেন ছাড়চে। শচীনবাবুও যাচ্চে সেটিতে। বেজায় ভিড় এমন কিছু নয়—তবে ভিড় দেখলুম স্টীমারে ও চাঁদপুর ট্রেনে বসে, শোওয়া তো দূরের কথা কাৎ হবার জায়গা নেই। তার ওপরে এক এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় আর ছাড়তে চায় না—বিষম বিরক্তির ব্যাপার। চাটগাঁয়ে এসে নীরদবাবুর বাসা খুঁজে না পেয়ে রেণুদের বাড়িতে এলুম। রেণু তো অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখে খুব খুশি। ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে। রেণুর দাদা এল মা এলেন। সবাই খুশি আমায় দেখে। রেণু বাক্স থেকে কাপড় বের করে কুঁচিয়ে নীচে নিয়ে গেল স্নানের জায়গায়। স্নান করে খেয়ে ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা গল্প করি। ষোল বছর আগে এদের বাড়িতে এসেছিলুম—আর এই এখন ষোল বছর পরে। আজ চাটগাঁয়ে বড় গরম, হাভন্ পার্কে আমি রেণুর দাদার সঙ্গে গিয়ে বসলুম

—বেজায় ধুলো চাটগাঁয়ের রাস্তায়। নবগ্রহ বাড়িতে সপ্তমী পূজোর ঢাক বাজচে। একটা বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করলুম। এবার আর হবে কি না কে জানে?

সন্ধ্যার সময় রেণু এসে বসে কত গল্প করলে।

ওবেলা দুপুরে খাওয়ার পরে একটু ঘুমুব বলে শুয়েছি—রেণু এসে গল্প করতে লাগল, ঘুম চটে গেল। ও চলে গেলে ঘুমুবার চেষ্টা করতেই ঘুম এল। ও কখন চা এনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমায় ডাকে নি। সেই সময় আমায় একটু নড়তে দেখে বল্লে—উঠবেন না? চা এনেচি, কিন্তু আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আমি আর ডাকিনি। চা খাবেন আসুন উঠে।

নীরদবাবুদের বাসা খুঁজে পেলুম না বটে, কিন্তু সেজন্য আমার কোন কষ্ট নেই। এদের আতিথ্যে যত্নে, সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েচে।

সকালে রেণুদের বাড়িতে যখন আজ ঘুম ভাঙল তখন জানলার ধারে শুয়ে দেখি রাঙা রোদের আভাস পুব আকাশে। পরিষ্কার দিনের অগ্রদূত এই অরুণ বর্ণ উদয় দিগন্তের। ভাবচি আমি কি বনগাঁর বাসায়? চাটগাঁয়ে এদের বাড়িতে ষোল বছর পরে এসেচি, এ যেন স্বপ্ন। সেবার যে সেই এদের বাড়ি থেকে অন্নদাবাবুর সঙ্গে ফেণী চলে গিয়েছিলুম—তারপর পৃথিবীতে যুগ পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে। হাওড়ার পুলের নীচে দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে। তখনকার দিনের জীবন আর এখনকার জীবন! সেই আমি আর এই আমি? তারপর ঘটেচে ঢাকা, বর্দ্ধমান, বিভূতি, হরকু, চরি, ইসমাইলপুর, গোটা ভাগলপুরের জীবনটাই। তারপর আমার সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ—স্কুল, কত নতুন বন্ধু লাভ, সুপ্রভা, খুকু ওরা সব। জীবনের চলমান স্রোতে কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে এনে ফেলেছে দ্যাখো!···

রেণু চা নিয়ে এল। বুদ্ধু বল্লে—আজ চন্দ্রনাথে চলুন।

বেশ যাব। কখন গাড়ি আছে দ্যাখো।

সাড়ে দশটায় গাড়ি।

সওয়া দশটা বেজে গেল বুদ্ধুর দেখা নেই। কোথায় বাইরে গেছে।

আমি একলা স্টেশনে এলুম। ফেরিওয়ালা বিক্রী করচে—চাই বনরুটি, কেক—বলবাশিংসু! আমি ভাবি 'বলবাশিংসু'টা কি জিনিস? চাটগাঁয়ে কোন খাবারের নাম নাকি?

চাই বলবাশিংসু···বলবাশিংসু ··

কান পেতে শুনে বুঝলুম লোকটা আসলে বলচে—ভাল পাশিং শো। চাটগাঁয়ে 'ও'-কারান্ত শব্দের উচ্চারণ করে 'উ'-কারান্ত শব্দের মত। জ্যোৎস্নাকে বলে জ্যুৎস্না। 'শো' হয়ে গিয়েচে 'শু'।

যাক্। চন্দ্রনাথে এসে নামলুম বেলা বারোটা তখন। ঝম্‌ঝম্ করছে দুপুরের রোদ। নীল ইস্পাতের মত আকাশ। একা হেঁটে ভাঙা পা নিয়ে পাহাড়ে উঠচি। পায়ের ব্যথা এখনও সারেনি—এখনও বেশ খচ্ খচ্ করে হাঁটতে গেলে। বিরুপাক্ষ মন্দির থেকে যাত্রীদের দল নামচে। দুপুরে ঘেমে নেয়ে উঠচি। বিরুপাক্ষ মন্দিরে উঠতে বাঁ ধারে বনের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ আছে—সেইটে ধরে চললুম। বড় নির্জ্জন রাস্তাটা। হঠাৎ বাঁ দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্র দেখা যাচ্চে। পাহাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে সরু পথটা বনস্পতি-সমাকুল ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে উঠে নেমে উনকোটি শিবের গুহা বলে একটা ছোট্ট গুহার কাছে গিয়ে শেষ হয়েচে। ঘামের উপদ্রবে দুবার এর মধ্যে গাছের ছায়ায় শিলাখণ্ডে বসেচি। একটা বনকলার পাঁতা হাতে নিয়েচি—যেখানে সেখানে সেটা পেতে বসচি। উনকোটির শিবের গুহা দেখে ফিরবার সময়

একটা ছোট ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। পেছনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, ঘন জঙ্গলাবৃত —ঝর ঝর ঝরণার জলের তোড়ের শব্দ পাচ্চি। একটা কি পাখী ডাকচে, ঠিক যেন ঘণ্টা বাজচে। সামনে সমুদ্রের দৃশ্য। সমুদ্রের দিক থেকে মাঝে মাঝে বেশ হাওয়া বইচে—এই ভীষণ গরমে ও রোদে সে ঝিরঝিরে হাওয়াতে যেন সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। ডাইনে একটা উঁচু চূড়ায় একটি মাত্র নির্জ্জন বনস্পতি অত উঁচুতে সুনীল আকাশের নীচে একটা অসাধারণ ছবির স্থষ্টি করেচে। সুন্দর, কিন্তু যেন অবাস্তব। অত উঁচুতে কি গাছ থাকে?

ফিরবার পথে সেই ঝরণার ধারে বসলুম। যেমন বড় বড় গাছ জায়গাটাতে, তেমনি বড় বড় শিলাখণ্ড। সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠলুম—ওপরে বিশাল অরণ্য—regular mountain forest—বেশীদূর উঠতে সাহস হল না এই মচকানো পা নিয়ে—পথটাও জনহীন, শুনেচি চন্দ্রনাথে বাঘ আছে। নেমে আসবার পথে প্রথমে বসলুম সিঁড়িটার ওপরে—মাথার ওপরে চূড়ার পাশে বনের গাছপালা—তার মাথায় চিল উড়চে, দূরে সমুদ্র বেঁকে গিয়েচে। ওই সমুদ্রের দূর গায়ে বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামের কত প্রতিমা, কত উৎসব!

সমুদ্রকে সামনে করে একটা আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে পড়ন্ত বেলায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। চন্দ্রনাথ পাহাড়কে কতভাবে যে দেখলুম আজ! এক এক জায়গায় এর এক এক স্বরূপ, নামবার পথে সেই ঝরণাটার ধারে ঘন ছায়ায় আর একবার খানিকটা বসলুম, বিকেলের ঘন ছায়ায় এই বনের দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে। সেই যে নীচের পুলটাতে ষোল বছর আগে রোজ সন্ধ্যায় বসতুম এখানে থাকতে—সেইটাতে ঠিক সন্ধ্যার সময়েই আজ বসলুম। আবার এই ষোল বছরের অতীত ঘটনাবলী মনের মধ্যে একে একে উদিত হল। পরিবর্ত্তন·· পরিবর্ত্তন··· একেবারে আমি নতুন মানুষ এখন। সে আমিই নেই। শম্ভুনাথের মন্দিরের ডাইনের ঘন বনের রাস্তাটি দিয়ে নামলুম। বনের মাথায় সাদা সাদা যেন অনেকটা কাপাস তুলোর ফুলের মত ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। আরও অনেক ফুল দেখলুম।

ফেরবার পথে অখিল চক্রবর্ত্তীর এক ভাই-এর সঙ্গে দেখা। অখিল সেবার আমার পাণ্ডা ছিল—ষোল বছর আগে যখন চাটগাঁ এসেছিলুম। তাদের সে বাড়িটাও দেখলুম। একটা ছোট্ট মেটে বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করলুম। তখন ছায়া ঘন হয়ে এসেচে। মাটির উঠান ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, পেছনে বাঁশের ছেঁচার বেড়া ও বেতবন, ছোট্ট প্রতিমাটি, কতকগুলি গ্রাম্য নরনারী প্রতিমা দেখতে এসেচে, ট্যাং ট্যাং করে ঢোল বাজচে! ওখান থেকে বার হয়ে স্টেশনের কাছে এক বড় পূজার বাড়িতে মহাষ্টমীর আরতি দেখলুম। সুপ্রভাদের বাড়ি পূজো আছে, সে-ও এমন সময় হয়তো আরতি দেখচে দাঁড়িয়ে—খুকুও।

ট্রেন এল। অখিল চক্রবর্ত্তীর ভাই আমার টিকিট কিনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। কত কথা ভাবতে ভাবতে চাটগাঁয়ে এলুম। এসে ওপরে বসেচি, রেণু তখনি এক গ্লাস শরবৎ নিয়ে এসে হাতে দিলে। তারপর চন্দ্রনাথ ভ্রমণের গল্প করি বসে। সবাই একসঙ্গে খেতে বসলুম রান্নাঘরে নেমে—রেণু, আমি, বুদ্ধু ও বুদ্ধুর মামা। বুদ্ধুর মামা চন্দ্রনাথের এক পাণ্ডার কীর্ত্তি-কলাপ বলতে লাগল।

ডায়েরী লিখবার সময় বসে বসে ভাবলুম দশমীর দিন দেশে কাটাব।

এবার পাঁচ দিন পুজো—তাই আজও মহাষ্টমী। আজ সন্ধিপূজা। কাল রাত্রে সঙ্কল্প করেচি যে যখন এবার পাঁচ দিন পূজো—তখন দেশে বিজয়া দশমী কাটাতে হবে। সকালে উঠে বাইরের ঘরে বসেচি—রেণু এসে বল্লে, বাতাবি নেবু খাবেন? একটা ফিরিওয়ালার কাছে

বাতাবি লেবু কিনে বাড়ির মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল একটা প্লেটে করে। বল্লে—লেকে বেড়াতে যাবেন তো? আমি যাবো আপনাদের সঙ্গে।

দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠলুম আজ রাত্রে ট্রেনে জাগতে হবে বলে। মোটর এল, রেণুর দাদা, আমি, রেণু বেরিয়ে পড়লুম। শহর ছাড়িয়ে ছোট ছোট পাহাড়, বন্য কাঁটাল গাছ—কেলে কোঁড়া লতা এত দূরেও দেখে অবাক হয়ে গেলুম। হ্রদটি জঙ্গলে ভরা, পাহাড় বেষ্টিত, বৃষ্টি পড়তে লাগল—রেণুকে ছাতি দিলুম, সে কিছুতেই খুলবে না। জোর করে খোলালুম। একটা পাহাড়ের ওপর উঠলুম সমুদ্র দেখব বলে, কিন্তু সামনে আর একটা পাহাড় দৃষ্টি আটকেচে।

বাড়ি ফিরে আমি বিছানাপত্র বেঁধে নিলুম। আমি, বুদ্ধু, রেণু একসঙ্গে খেতে বসলুম ওদের রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে। গাড়ি এল। রওনা হলুম স্টেশনে। সঙ্গে একজন লোক এল, বুদ্ধু তাকে পাঠিয়ে দিলে। তাকে কিছু বখশিশ দিলুম। ফেরিওয়ালা হাঁকচে—চাই বলবাশিংস্কু···

ঘুম হয়নি ট্রেনে, যদিও শুয়েই এসেছিলুম। লাক্‌সাম জংশন ছাড়িয়ে একটুখানি শুয়েচি—অমনি উঠে দেখি চাঁদপুর ঘাট। স্টীমারে এসে বেশ জায়গা পেলুম। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। রাজাবাড়ি, তারপাশা, মৈনট্‌ কত কি স্টেশন। ওই ঝড়-বৃষ্টিতে যখন নৌকা করে খাবার বিক্রী করতে আসচে, জলের ঝাপটায় ওদের ধারে যাবার জো নেই। বড় বড় নৌকা করে যাত্রীরা বাক্স-বিছানা, মোট-পুঁটুলি নিয়ে ছাতি মাথায় ভিজতে ভিজতে তীরে যাচ্চে স্টীমার থেকে। বড় বড় চর, কাশবন। চরের মধ্যে লোক বাস করচে। স্টীমার খুব বেগে যাচ্চে। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে বৃষ্টি থামল না। একঘেয়ে বসে বসে ভাল লাগচে না। বেলা চারটার সময় গোয়ালন্দ ঘাটে স্টীমার এসে লাগল। ভাবলুম নিজের দেশেই যেন এলুম। এই তো গোয়ালন্দ পোড়াদহ এলুম—তো নিজের দেশ আর কতটুকু?

কলকাতা নেমে দেখি টক্কু আমার ঘরে বসে আছে। সে কলকাতা বেড়াতে এসেচে। আমি ট্রামে বিভূতিদের বাড়ি গেলুম। মন্মথ এসে বল্লে, না খেয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু। খেতে রাত বারোটা হয়ে গেল। তখন পথেঘাটে মেয়েছেলের হাত ধরে লোকে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্চে।

সকালে উঠে বাগবাজারে গেলুম পশুপতিবাবুদের বাড়ি নীরদবাবুদের কি হল সে সন্ধানে। বাড়ি তো গেলুম, গিয়ে শুনি নীরদবাবুরা গিয়েচেন গালুডি। সেখানে চা খেয়ে বৌঠাকরুণের সঙ্গে গল্প করি। বৌঠাকরুণ ৺বিজয়ার প্রণাম সারলেন বিসর্জ্জনের আগেই পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে। আমিও তাই করি। বগলা এল, তার সঙ্গে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব দেখতে গেলুম বাগবাজারে। প্রতিমা বড় সুন্দর হয়েচে। দুজন ছেলের সঙ্গে বগলা আলাপ করে দিলে এবং তাদের দেখিয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, তাকে কমল যেতে লিখচে ঘাটশিলায়। তার সঙ্গে সুবর্ণরেখার ধারে বসে কাব্যালোচনা করবে বলে মহা উৎসাহে চলেছিল, কিন্তু ট্রেন ফেল করলে। আমি ওখান থেকে বাসায় এসেই ট্রেনে বনগাঁ রওনা হলুম।

দুপুরের পরে এসে বনগাঁয়ে পৌছুই। প্রফুল্লদের বাড়ি ঠাকুর বরণ হচ্ছে। আমি, বীরেশ্বরবাবু, যতীনদা, মনোজ সবাই সেখানে গিয়ে বসি। একটু পরে বেলা পড়লে আমি ঘোড়ার গাড়ি করে বারাকপুর গেলুম বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখব বলে। কতকাল দেখিনি গ্রামের মেলাটা। এবার যখন আছি দেশে, তখন একবার দেখার খুব ইচ্ছে হল। পথে খুব ভিড়, চালকীপোতা চাঁপাবেড়ে থেকে বিজয়ার মেলা দেখতে আসচে লোকে বনগাঁ। চাষার মেয়ে-ছেলেরা রঙিন কাপড় পরে আসচে। এই জোড়া বটতলা, এই রায়দের বড় বাগান—গ্রামে

পৌঁছে গিয়েছি, আমাদের গাঁ !···কোথা থেকে কোথায় এসেছি ছাখ !

বাঁওড়ের ধারে ছেলেবেলাকার মতই মেলা বসেচে। গোপালনগরের হাজারি ময়রা পাঁপর ভাজচে, বাসন-বেচা কুণ্ডু পানের দোকান খুলেচে, গ্রাম্য নরনারী ছেলেমেয়েদের ভিড় খুবই। বাঁওড়ে দশ পনেরো খানা নৌকার বাচ্ খেলা হচ্চে। শ্যামাচরণদা, ফণিকাকা, সাতুকাকা, বৃন্দাবন—এদের সঙ্গে দেখা হল। অমূল্য কামারের ছেলে এসে হাত ধরে বল্লে—কাকা, একটা পয়সা দিন না, পাঁপর ভাজা কিনব। রায়দের বাড়ির ছেলেরা অমনি ঘিরে দাঁড়াল—আমাদেরও দিন। প্রকাণ্ড বড় বটতলায় মেলা হয়। ছায়া পড়ে এসেচে ঘন হয়ে। আমি যেন স্বপ্ন দেখচি। কোথায় চট্টগ্রাম, রেণু—কোথায় মেঘনা আর পদ্মা, কুমিল্লা জেলা, নোয়াখালি জেলা, আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছি একেবারে আমাদের গ্রামে, বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখচি।

সন্ধ্যা হয়ে আসচে, মেলার জায়গা থেকে বুড়ীর বাড়ি এলুম। বুড়ীকে কিছু দিলাম বিজয়ার দিন—সে তো আমায় দেখে কেঁদেই আকুল। এখন যেন আর ভাল চোখে দেখতে পায় না—বড্ড বয়েস হয়ে গিয়েচে। পুঁটি দিদিদের বাড়ি এসে দেখি বিলবিলের ধারে বসে পুঁটিদিদি বাসন মাজচে। খুকুদের বাড়িটা শূন্য পড়ে রয়েচে। ন'দিদিদের সঙ্গে দেখা করলুম—তারপর সকলকে বিজয়ার প্রণাম করে কিশোর-কাকার বাড়ি এলুম। কিশোর-কাকা কিছুতেই ছাড়লেন না, বসিয়ে একটু জলযোগ করালেন। কতদিন কিশোর-কাকার বাড়ি বসে বিজয়ার দিন জলযোগ করিনি। তারপর অশথতলাটায় দাঁড়িয়ে একবার ভাবতে চেষ্টা করলুম—কালও ছিলুম পদ্মার ওপরে স্টীমারে—রাজাবাড়ি, বিক্রমপুর এপারে—ওপারে ফরিদপুর, কোথায় সেই চন্দ্রনাথে পাণ্ডার বাড়িতে সেই ছোট্ট প্রতিমাখানা, সেই আমলকী গাছে ঠেস্ দিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকা—আর কোথায় আমার বারাকপুরের হেলা কাঁটালতলা !

চলে এলুম গাড়ি করে বনগাঁয়ে। হরিবাবুর বাড়ি, পটলের বাড়ি, বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি বিজয়ার প্রণাম, আলিঙ্গন সেরে ফেললুম। সুপ্রভাদের বাড়িতে তারাও আজ এমনি বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ করচে পরস্পরে। খুকু—সুপ্রভা—রেণু—ওদের সকলকেই মনে মনে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিই।

এবার ভারী চমৎকার পুজো কাটল। সপ্তমীতে প্রতিমা দেখলুম চট্টগ্রামে, অষ্টমীতে চন্দ্রনাথে, নবমীতে কলকাতায় বিভূতিদের বাড়ি, দশমীর প্রতিমা বনগাঁয়ে ও বারাকপুরে। আর কোথাও যাব না। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে—ঘোড়ার গাড়ি যেন চলেচে ঘন বনবীথির মধ্যে দিয়ে বনগাঁয়ে। আমি বসে বসে চাটগাঁয়ের কথা পথের কথা ভাবচি। সুপ্রভার কথা ভাবচি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না, কি সুন্দর রাত্রি ! বনপুষ্পের জ্যোৎস্নামাখা সুবাস সন্ধ্যার হিম বাতাসে।

আজ দিন-দশ বারো এখানে এসেচি। ক'দিন খুবই ভাল লেগেছিল—এখনও লাগচে মন্দ নয়। বৈকালে কুঠীর মাঠের সেই জলাটার ধারে বেড়াতে যাই—বনে ঝোপে সর্ব্বত্র বনমরচে ফুলের সুগন্ধ। ওইখানের ঝোপগুলোতে কেলেকোঁড়া আর কেঁয়োঝাঁকার ফুল ফুটে গন্ধে আমোদ করচে—বিশেষ করে কেঁয়োঝাঁকার ফুল। কুঠীর মাঠের দিকে বনমরচে লতা বেশী নেই। রোদ রাঙা হয়ে আসে, তখনও পর্য্যন্ত বসে থাকি, আজ আবার এক রাখাল ছোঁড়া জুটে গল্প করে আমার চিন্তার ব্যাঘাত করতে লাগল। ফিরবার সময় আটির মাঠ দিয়ে গিয়ে বাঁওড়ের ধারের পথে পড়ি ও গোসাঁইবাড়ির সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি। আজ কি চমৎকার রাঙা মেঘ করেছিল সন্ধ্যার কিছু আগে ! আমি গায়ের চেক্ চাদরখানা পেতে কতক্ষণ মাঠের মধ্যে বসে রইলুম ভূষণো জেলের কলাবাগানের পাশের জমিতে। এক পাশে আটির ডাঙায় নিবিড় বন,

সামনে মুক্ত মাঠে বৈকালের ঘন ছায়া, মাথার ওপরে আকাশে ময়ূরকণ্ঠী রং, চারিধারে রাঙা মেঘের পাহাড়পর্ব্বত—যেন উঠতে ইচ্ছা করে না। সুপ্রভা কাল যে রুমাল ও বালিশ ঢাকনিটা পাঠিয়েছে, তার সঙ্গে চিঠি ছিল, কাল তো নদীর ধারে মাঠে বসে হাট থেকে এসে পড়েছিলুম, কিন্তু সন্ধ্যার ধূসর আলোয় ভাল পড়তে পারি নি, আজও সেখানা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম। খুকু এবার এখানে নেই, সদাসর্ব্বদাই তার কথা মনে হয়—দুপুরে সে যেন পাশের পথটা দিয়ে আসচে। এসেই বলচে—কি করচেন? চার পাঁচ বছর পরে এই প্রথম দীর্ঘ অবসর আমি বারাকপুরে কাটাচ্চি, যখন ও এখানে নেই। সেই জন্তই এখনও ওর অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি মন।

ন'টার গাড়ি যাওয়ার শব্দ পাচ্চি, নিজের খড়ের ঘরটায় বসে আলো জ্বেলে ডায়েরীটা লিখ্‌চি। এখনও মশারির মধ্যে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বাললে গরম বোধ হয়—অথচ মশা এমন যে মশারি না খাটিয়ে লেখাপড়া করার জো নেই রাত্রে। দিনটা এখানে বেশ কাটে, রাত্রে অন্ধকার আর নির্জ্জনতায় যেন হাঁপ লাগে। কারো বাড়ি গিয়ে একটু দুদণ্ড গল্প করব এমন জায়গা নেই। পচা রায় ছিল, সে ডাক্তারী করতে গিয়েচে শুনচি আমডোবে।

আমাদের বাড়ির পেছনের ওই বাঁশবাগানটায় যে ডোবা আছে, আজ দুপুরে শুকনো বাঁশের খোলা পেতে রোদে ওখানে খানিকটা বসে ভারী ভাল লাগল। ঘন বাঁশবন, চারিদিকে বনমরচে ফুলের ঘন সুগন্ধে আমোদ করেছিল দুপুরের বাতাস—বরোজপোতার ডোবার ওপারে কখনো বসে দেখিনি কেমন লাগে। জায়গাটা বড় চমৎকার।

কুঠীর মাঠের অনেক বন কেটে ফেলেচে বেলেডাঙার চাষীরা। ওরা এবার অনেক জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করচে। কুঠীর মাঠের বন আমাদের এ অঞ্চলের একটা অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু কাকে তা বোঝাব!

আজকাল বনে-জঙ্গলে মাকড়সার নানা রকম জাল পাতা দেখি। দু'তিন বছর থেকে আমি এটা লক্ষ্য করচি। জাল গড়বার কৌশল ও বৈচিত্র্য আমায় বড় আনন্দ দেয়—কিন্তু আজ সকালে কুঠীর মাঠে একটা জাল দেখেছি, যা একেবারে অপূর্ব্ব। ঘাসের মধ্যে দুটি দূর্ব্বাঘাসের পাতায় টানা বাঁধা ঠিক একটি এক-আনির মত একটা মাকড়সার জাল। মাকড়সাটা প্রায় আণুবীক্ষণিক, তাকে খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব—একটা ঘাসের পাতা ধরে একটুখানি নাড়া দিতে এক দিকের জাল যেন একটু নড়ে উঠল—কি যেন একটা প্রাণী নড়াচড়া করচে সেখানটাতে। ওই এক আনির মত ছোট জালটুকুই ওর জগৎ।

ন'টার গাড়িতে রাণাঘাট গেলুম অবনীবাবুদের বাড়ি। অমৃত-কাকা সঙ্গে গেলেন। বৈকালে ওখান থেকে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি। বন্ধুর স্ত্রী এখানেই আছে। রেলবাজারে নীরুর সঙ্গে দেখা, তার মুখে শুনলুম খিনু এখানে নেই। গোপালনগর নেমে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমি ও নন্দ ঘোষ বাজার পর্য্যন্ত এলুম। যুগলের দোকানে ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে লণ্ঠনটা রেখে গিয়েছিলুম ওবেলা!

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে সেই ঝোপটার পাশে ঘন অপরাহ্নের ছায়ায় ঘাসের ওপর একটা মোটা চাদর পেতে বসে, 'কেঁয়োঝাঁকা' ফুলের সুঘ্রাণের মধ্যে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায়ের খসড়া করছিলুম। কি নীরব শান্তি, কি পাখীর কাকলী, কি বনফুলের ঘন সুবাস! নানারকম চিন্তা মনে আসে ওখানে নির্জ্জনে বসলে, আমি দেখেছি ঘরের মধ্যে বসে সেরকম খুব

কম হয়। মনের আনন্দই তো সৃষ্টির গোড়ার কথা—দুঃখও বটে—কারণ আসলে অনুভূতির গভীরতাটাই আসল, দুঃখেরই হোক বা আনন্দেরই হোক। আজ সকালেও বেলেডাঙার বটতলার পথটাতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, মাঠের মধ্যে সেই যে একটা ঝোপ আবিষ্কার করেছিলাম সেবার—তার পথটা বুজে গিয়েচে শেঁয়াকুলকাঁটায়, ঢুকতে পারা গেল না। নদীতে নেমে সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলাম রায়পাড়ার ঘাটে।

সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে বসে লিখচি, শিবুদের বাড়ি কলের গান হচ্চে দেখে শুনতে গেলাম। এইমাত্র ফিরচি। অন্ধকার রাত, অন্ধকার আকাশে কি অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়। কত জগৎ, কত পৃথিবী—Jeans, Eddington-দের ও কথাই মানিনে যে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও মানুষের বাসের উপযুক্ত গ্রহ বা নক্ষত্র নেই। এই রকম পরিচিত গ্রামের পথ, ওই যে বকুল-তলাটা, শিউলিতলাটা—যা কত দিনের স্মৃতিতে মধুর—আর কোথাও বিশ্বে এমন নেই—স্রষ্টা বুঝি দেউলে হয়ে পড়েছিলেন কায়ক্লেশে পৃথিবীকে তৈরী করেই!

সে অনন্ত, বিরাট দেবতাকে প্রণাম করি। কে-ই বা তাঁকে চেনে, বোঝে বা জানে! যাঁরা জেনেছিলেন, তাঁরা কাউকে বলে বোঝাতে পারেননি বা সে চেষ্টাও বোধ হয় করেননি—অসম্ভব বলেই করেননি—সাধারণ লোকের জন্যে কতকগুলো মিথ্যে মনগড়া ফাঁকি সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

আজও বিকেল তিনটার সময় কুঠীর মাঠের জলার ধারে সেই ঝোপটাতে এসে বসে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায় লিখচি। লেখবার জন্যেই এই জায়গাটাতে এসেচি। ভারী সুন্দর বনকুসুমের গন্ধটা—চাঁপা ফুলের গন্ধটাই বেশী। আমার মাথার উপরে থোকা থোকা ফুলে ভরা ডালটা দুলচে, এখন রোদ রাঙা হয়ে এসেচে যখন এটা লিখচি, জলার পাখীর দল কি অবাধ কূজন শুরু করেচে, গন্ধটা আরও ঘন হয়েচে। ওপারে গাছগুলোর বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের শীর্ষদেশে রাঙা রোদ পড়ে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে! পাখীর দল উড়ে যাচ্ছে। এইখানে বসে সুপ্রভার ৺বিজয়ার চিঠিখানা পড়ছিলুম আজ। এখানেই লেখা বন্ধ করি। সন্ধ্যা হয়ে এল। জগোদের নিয়ে হাজারির ওখানে গোপালনগরে কালীপূজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে সন্ধ্যার পরেই।

উঠে বাড়ি এসে জগো ও জিবুকে নিয়ে প্রথমে গেলুম বুড়ীর বাড়ি। বুড়ী উঠতে পারে না, তাকে দেখেশুনে গোপালনগর গেলুম। দারিঘাটা পুলটার ওপর থেকে ছায়াপথটা কি চমৎকার দেখাচ্ছিল। কত নক্ষত্র, অসংখ্য অসীম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম পুলের ওপরে। হাজারিদের বাড়িতে কালীপূজোতে প্রতি বৎসরই আনন্দ উৎসব হয়। এবার জিতেন সুধীরদা ছিল—চট্টগ্রাম ভ্রমণের গল্প করলুম ওদের কাছে। বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল রাত এগারোটা। নক্ষত্রদের জ্যোতি আরও ফুটেচে। কালপুরুষ ন'দিদিদের উঠোনের ওপারেই উঠে এসেচে। আজ যে নক্ষত্রসংস্থান এই কালীপূজোর রাতে, পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি উঠত, আমার ঠাকুরদাদা যখন শিশু তখনও এমনি উঠেচে, দুশো বছর আগে যখন শাঁখারী পুকুরের ধারে বর্দ্ধিষ্ণু শাঁখারীর বাস ছিল তখনও এমনি উঠত। আবার পঞ্চাশ বছর কি দুশো বছর পরে ঠিক এমনি দিনে এমনি কালীপূজোর রাতে ওরায়ন ন'দিদিদের বাড়ির উঠোনের ওপরে এমনি উঠবে—কিন্তু তখন পাশের বাড়ির পথটা দিয়ে বিলবিলের পাশ দিয়ে খুকুও অমন আসবে না—কে কোথায় চলে যাবে। নতুন দল তখন আসবে পৃথিবীতে—তাদের হাসি কান্না প্রেম ভালবাসায় মুখর হয়ে থাকবে গ্রামের বাতাস।

কাল এখান থেকে চলে যাব। পূজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল এবার খুকু ছিল না, তা হলেও কেটেছিল বেশ। বৈকালে প্রায়ই কুঠির মাঠে বনে ঝোপের ধারে বসে বিকেলটা কাটাতুম—ভারী আনন্দ পেতাম। এখন রাত্রি দশটা, আমার ঘরে নির্জ্জনে বসে লিখচি। পুঁটি দিদি মাঝের গাঁ থেকে এসেচে, আমার জন্মে একটা ভাণ্ডীর ফুলের ডাল এনেচে ফুলসুদ্ধ। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ি বসে একটু গল্প করে এলুম। কাল গ্রাম ছেড়ে যাব, সকলের জন্মেই কষ্ট হচ্চে। গঙ্গাচরণ মন্নু রায়দের বাড়ি বসে ভাঙা হারমোনিয়ম বাজিয়ে বেসুরো গলায় সেকেলে যাত্রা দলের গান গাইচে; মনে হচ্চে, আহা, ওই একটু গিয়ে বসে শুনে আসি। এদের সকলের জন্মেই কষ্ট হয়। গ্রামের এই সব লোক দরিদ্র, অশিক্ষিত—ওদের জীবনে কোন আমোদ-প্রমোদ নেই—জগতের কিছু দেখেও নি, শোনেও নি। সকলের জন্মেই মন কেমন করে। মন্নু রায়দের বাড়ির মেয়েরা বাঘ-আঁচড়ায় গিয়েছিল কালীপূজো দেখতে—এখন সব গরুর গাড়ি করে বাড়ি এল।

শীতে জেলের নৌকোয় বিকেলে বনগাঁ এলুম। বেলা তিনটার সময় বেরিয়েচি, গাজন বাঁশতলার ঘাটে মাছ ধরচি, ফণিকাকা মাছ ধরচে চট্‌কাতলার নীচে। চালকীর ঘাটে একটা লোক ছিপে প্রকাণ্ড কাছিম বাধিয়েছিল, আমরা নৌকো নিয়ে কাছে গেলাম, সুতো কেটে নিয়ে কাছিমটা গেল পালিয়ে। সীতানাথ মাঝি বিশ বছর আগে নেপাল মাঝির নৌকোয় ভোলা ও বরিশালে গিয়েছিল—সে গল্প করতে লাগল, ওরা নৌকোতে কাজ করত, বাদুড়ে থেকে খাবার জন্মে চাল ডাল কিনত। নলচিটিতে সুপুরি কিনে বিক্রী করতে করতে বনগাঁ পর্য্যন্ত আসত—ওখানে সব বিক্রী হয়ে যেত। নৌকোতে মধু ছিল—চালতেপোতার বাঁকে ছায়াভরা সেই সুন্দর বনঝোপের কাছে এসে সে নৌকোর দাঁড় বাওয়া রেখে তামাক সাজতে বসল। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, দুধারে বড় ঝোপ, সাঁইবাবলা বনের অপূর্ব্ব শোভা। পূজোর ছুটিটা বারাকপুরে বেশ কেটেচে, বরোজপোতার ডোবার ও পাড়ের কথা এখনও ভুলতে পারচি নে। এই বাঁশবাগানটায় কি যে একটা মায়া আছে। তারপর সাজিতলার বনগাঁ এবার নতুন আবিষ্কার। সকলের চেয়ে আমার ওইটাই লেগেচে ভাল। কুঠীর মাঠের জলার ধারে ওই ডাঙাটা। সবই ভাল, কেবল সন্ধ্যার পরে লোক অভাবে বড় নির্জ্জন লাগে। নয়তো এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশ কোথায় আছে কলকাতার এত কাছে? সুপ্রভাকে পাঠাব বলে কিছু বনের ফুল সংগ্রহ করেছিলুম। কাল পাঠাব।

কাল বৈকেলে খুকুদের ওখানে দেখাশুনো করে এলুম। বেশ কাটল বিকেলটা। যতীনদার বাড়ির ধারের ডোবাটাতে সকালে উঠে যেতে গিয়ে দেখি সাদা সাদা কচুরির ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। কি যে তার শোভা! আবার বেড়িয়ে ফিরবার সময় ঘণ্টা-দুই পরে দেখি সূর্য্যের কিরণে ফুলগুলোর রঙ এর মধ্যেই নীলাভ হয়ে উঠেচে। সূর্য্যের আলোয় কি যে রসায়ন বুঝলুম না—ফুলগুলির কাছে ঘাসপাতায় কি ল্যাবোরেটরি নিহিত, তাই বা কে বলবে? আমি দেখে ভারি মুগ্ধ হয়েচি!

আজ সকালে রাম অধিকারী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে। সে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ি। সেখান থেকে গল্পগুজব করে এসে বাড়িতে অভিভাষণের শেষটুকু লিখি। দুপুরের

পরে গেলুম সজনীর বাড়ি। ছেলেবেলায় রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্য-মহাভারত একবার পড়েছিলুম, গ্রামে তখন কি একটা নিমন্ত্রণ ছিল। মা এক বাটি সুজি করে দিলেন খেতে অনেক দেরি হবে বলে, আর চালভাজা। আমি খেতে খেতে মহাভারতখানা পড়তে লাগলুম রান্নাঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু সেদিন আর দেরি হয়নি, অল্প পরেই খাবার ডাক এসেছিল। আজ সেই মহাভারতখানা সকালে পড়তে পড়তে ছেলেবেলার সেই কথাই মনে পড়েছিল।

সজনীর বাড়ি অমিয় মোটর নিয়ে এল আমাদের নিয়ে যেতে। মনোজ বসু আমাদের সঙ্গে যাবে বলে এসেচে। ওকে দেখে খুব খুশি হলুম। প্রেমেনকে তুলে নিলাম বরানগর থেকে বালী ব্রিজ পার হয়ে। আজকাল দক্ষিণেশ্বর একটা রেলওয়ে স্টেশন হয়েচে জানতুম না। শ্রীরামপুরে টাউন হলে যখন আমরা পৌঁছুলাম তখন চারটে বেজেচে। লোক আসতে শুরু হয়েচে। সভার কাজ আরম্ভ হল। প্রথমেই কথাসাহিত্য শাখার কাজ আরম্ভ করবার জন্যে সবাই মত দিলে। কাজেই আমার অভিভাষণ প্রথমেই পাঠ করতে হল। তারপরে প্রেমেনের। বেশ বিকেলটা। সভার কাজ করতে করতে ডাইনের বড় জানলা দিয়ে অপরাহ্ণের আকাশ ও একটা তালগাছের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল আগে শ্রীরামপুরে আসতুম জ্ঞানবাবুর সঙ্গে—সে এক ধরণের দিন ছিল। আমাদের গ্রামে আমার খড়ের ঘরখানার কথাও মনে হল। বকুলতলায়ও এমনি ছায়া পড়ে এসেচে, এই তো সেদিন ছেড়ে এসেচি, কিন্তু তাদের কথা মনে হচ্ছে।

সভার কাজ শেষ হবার কিছু আগে আমি চলে এলুম বিনয়দাদের বাড়ি। হরিহাস গাঙ্গুলী সামনের রবিবার শেওড়াফুলি যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। দিদিদের বাড়ি দেখলুম শান্তি এসেচে, মানুও আছে। শান্তি আমার অনেক বই পড়েচে, বলতে লাগল। ওখান থেকে উঠে লীলা দিদিদের বাড়ি এলাম। লীলা দিদি না খাইয়ে ছাড়লেন না। তারপর ট্রেনে আমি প্রেমেন, সুরেন গোস্বামী একসঙ্গে এলুম। মনোজদের দল আগের ট্রেনে চলে গিয়েচে সভা ভাঙতেই। বেশ কাটল রবিবারটা। কাল স্কুল খুলবে। পূজোর ছুটি আজই শেষ হল।

ঘুমিয়ে উঠেই মনে পড়ল বহুদিনের কথা—যখন আমরা কেওটা থেকে ফিরচি—আমার বয়স ছ'বছর—রাজি ও পটীদিদি আমাদের বাড়ির সামনের পথে বাঁশের খোলা ও ধুলো নিয়ে খেলা করচে। ওরাও তখন নিতান্ত বালিকা। আজ এতক্ষণ পাগলা জেলে গিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসেচে। কারণ সাড়ে এগারোটার ট্রেনে সে গিয়েচে—ওর কথা ভাবতেই মনে পড়ল।

বারাকপুরকে মধুর করে গিয়েচে কত লোক। পিসীমা ছেলেবেলায়। মা, চক্কত্তি-খুড়ীমা, জ্যাঠাইমা, সইমা, মণি আর একটু বেশী বয়সে। প্রথম যৌবনে গৌরী। এদের দান কত বড় তাই ভাবছিলুম। সেই পিসীমার উঠোন ঝাঁট দেওয়া, হেমন্তের এক বিকেলে হঠাৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান। সেই গৌরী তাকের কোণে কি একটা নিতে এল। সদ্যস্নাতা কিশোরী, ভিজে চুল পিঠে তুলচে। আমি কাছেই তক্তপোশে বসে পড়চি পুরানো বই—আমার দিকে চেয়ে লাজুক-চোখে হাসলে। তারপর সেও কোথায় গেল চলে। মার কত দিনের কত ভালবাসা মনের মধ্যে গাঁথা রয়েচে।

এখন যারা বারাকপুরে বাস করে তারা জানে না বারাকপুর কি। এখানে যে দেবী বাস করেন, সৌন্দর্য্যময়ী রহস্যময়ী গ্রাম্যদেবী—বরোজপোতার বাঁশবন রাঙা-রোদ সন্ধ্যাবেলায় তাঁর আসন পাতা, আমি যেন কতবার একলা সেখানে বেড়াতে গিয়ে দেখেচি। আর কেউ দেখেনি।

একসঙ্গে সবাই দেহ ধরে পৃথিবীতে এসেচি এ্যাড্‌ভেঞ্চারের জন্যে। সবাই, পৃথিবীসুদ্ধ নর-নারী একই সময়ে যারা পৃথিবীতে এসেচে—পরস্পরের আত্মীয়। তাদের উচিত পরস্পরকে

সাহায্য করা, পরস্পরকে elevate করা। কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে থাকার জন্যেই পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করে। নইলে কি স্পেনে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে অসহায় শিশু ও নারীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারত আজ ?

মনে পড়ল, পিসীমা শীতের বদলে 'জাড়' কথাটা ব্যবহার করতেন, ছেলেবেলায় শুনেচি। এখন আর কারো মুখে আমাদের গাঁয়ে ও কথাটা শুনিনে।

আজ বিকেলে P. E. N. Club-এর একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, সরোজিনী নাইডু ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন—তাই এই বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সকালে আজ কলেজ স্কোয়ারে যখন বেড়াতে যাই, তখনও আমি জানতুম না যে ব্যাপারটা আজই হবে। সরোজ ও গিরিজাদা ছিল স্কোয়ারে, আমি আর রামপ্রসন্ন তো আছিই। ওখানেই সরোজ কথাটা বল্লে, কারণ আমি তখনও পর্য্যন্ত চিঠি পাইনি—তারপর বেড়িয়ে এসে পত্র পেলাম।

নীরদবাবুর সঙ্গে গেলাম, চৌরঙ্গীতে একটা রেস্তরাঁতে হচ্ছে। খুব বেশী লোক হয়নি, জন চল্লিশ। মেয়েদের মধ্যে শান্তা ও সীতা দেবী। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সুরেশ বাঁড়ুয্যে, সরোজ চৌধুরী, সুধীরবাবু—মণি বোস—এই জনকতক। খগেন মিত্র ও হুমায়ুন কবীর একটু দেরি করে এলেন।

সরোজিনী নাইডু দেখলুম অদ্ভুত কথা বলতে পারেন। মেয়েদের মধ্যে অমন সুবক্তা আর অমন নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ মেয়ে আমি খুব কমই দেখেচি। ইংলণ্ডের নানা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তরুণ বয়সে কি ভাবে ওঁর প্রথমে আলাপ হয়, সে বিষয়ে অনেক গল্প করলেন, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের কথা এত ভাল লাগছিল আমার যে আরও দু ঘণ্টা বল্লে যেন ভাল হয়, এমন মনে হচ্ছিল।

ওখান থেকে সোমনাথবাবুর ও সুশীলবাবুর বাড়ি হয়ে ফিরলুম নীরদবাবুর বাড়িতে। ওরা 'বিচিত্রা' সম্পাদক হওয়ার জন্যে আমায় বিশেষ অনুরোধ করচে, কিন্তু আমি রাজী হইনি। সুশীলবাবু আজ বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন। আমার তো ইচ্ছে নয়।

ঈদের ছুটিতে শুক্রবারে বনগাঁ এসেচি। একদিন রাজনগরের মাঠে গিয়ে বিকেলে বসি। ঠিক যেন ইসমাইলপুরের সেই সোঁদামাটির ও কাশের গন্ধ। পরদিন চলে গেলুম বারাকপুরে। পুঁটিদিদি একা বাড়ি আছে। বরোজপোতার ডোবার ধারের বাঁশবাগান শীতের দুপুরে কি সুন্দরই হয়েচে। দুপুরের পরে গেলুম কুঠীর মাঠে ইন্দুদের বাড়ি খেয়ে। ছোট এড়াঞ্চির গাছে মুকুল ধরেছে—নির্জ্জন মাঠ, ভূষণ জেলের পুরোনো কলা বাগানের পাশেই। ভারী সুন্দর লাগছিল। রোদ রাঙা হয়ে গেলে উঠে এলুম বরোজপোতার বাঁশবনে আবার। তারপর হেঁটে বনগাঁয় এলুম সন্ধ্যার পরে।

আজই সকালে দেশ থেকে ফিরেচি। দেশে ভারী চমৎকার কাটল, যদিও খুকু ছিল না, কেউ ছিল না। একাই পুঁটিদিদির ঘরে থাকতুম, সকালে বিকেলে নিজে খাবার তৈরী করে খেতুম, কঞ্চি কাটতুম, জল আনতুম, কাঠ ও বাঁশের শুক্‌নো খোলা কুড়িয়ে আনতুম। আর রোয়াকে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, খুকুদের বাড়ির দিকের নেবুতলার ঘাটে ফিরে সেই মেয়েটি

আসচে না বসে বসে ভাবতুম। এবার বারাকপুর একেবারেই শূন্য। তবুও বেশ লেগেচে। দুপুরের পরে ভূষণ মাঝির জমিতে একটা খেজুর গাছে ঠেস্ দিয়ে বসে লিখতুম কি পড়তুম। ছোট এড়াঞ্চি ফুলের কি শোভাই হয়েচে চারিধারে। একদিন বেলেডাঙার পথে আমি ও ইন্দু বসে কতক্ষণ গল্প করি। নীল আকাশের তলায় বটতলার কোলে সাদা বক উড়চে। আমি বসে ভাবচি কে বলেচে আপনার সুখ্যাতি শুনতে বেশ ভাল লাগে। তাই তো শুনতে চাই।

একদিন চালকী গেলুম শিবে বাগ্‌দীর বাগানে রস খেতে। বড় বটগাছটার তলায় সে বসে বসে ভূতের গল্প করলে। একদিন আইনদ্দির বাড়ি গেলুম বিকেলে—তার এক ছোট নাতি বই নিয়ে আমার কাছে এল। বাড়ির মেয়েরা দেখতে লাগল, বনগাঁয়েও খুব হৈ হৈ করা গেল। রোজ রোজ ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আড্ডা। একদিন দেবেনের মোটরে সুপ্রভার চিঠি আনতে গোপালনগর গেলুন বনগাঁ থেকে—সেদিন হাজারীর বাড়ি কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার গিয়েচে অনুকূলের মেয়ের চিকিৎসা করতে। তাদের সঙ্গে খুব আনন্দ হল। এক মুচি বুড়ীকে কাপড় দিতে আসবার আগের দিন সর্ব্ব পরামাণিকের বাগান দিয়ে নেমে ওর বাড়ি গেলুম। বেশ লাগল সে সকালটা। ইন্দুর বাড়ি সন্ধ্যায় বসে নানা গল্প হল—আগুন করে আমতলায় ন'দি ও খুড়িমা পোয়াত।

কিন্তু সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুসলমান বুড়ী মারা গেল, আমি তখন ওখানে। তার কবর দেওয়ার সময়ে আমি কতক্ষণ আমতলায় বসে কালু মুসলমানের সঙ্গে গল্প করলুম। আর রাধাবল্লভ বোষ্টমের বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে এলুম কতকাল পরে এক সন্ধ্যায় বুড়ীকে দেখতে। তখনো সে বেঁচে ছিল—পরদিন সকালে মারা গেল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন।

সেনেটে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ক্লিওরের বক্তৃতা ছিল—সেখানে খুব ভিড় হয়েচে শুনতে গিয়ে দেখি। আগের বেঞ্চিগুলো প্রতিনিধিদের জন্যে রিজার্ভ আছে, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে অধ্যাপককে দেখা—কাজেই আমি এগিয়ে প্রতিনিধিদের বেঞ্চি দখল করে বসলুম। কি আর করি! আমার আসনের পেছনে মেয়েদের আসন, সেখানে একটি মেয়েকে যেন সেদিন ইন্দিরা দেবীর ওখানে দেখেছি। বক্তৃতা তো শেষ হল, ভিড়ের মধ্যে আমি সেনেটের পূবদিকের হলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় তিনটি লম্বা-চওড়া সাহেব হলে ঢুকতে গিয়ে ঢুকবার জায়গা না পেয়ে একটা চেয়ার পেতে একপ্রান্তে বসল। আমার মনে হল এদের মধ্যে একজন সাহেব Sir James Jeans, মূল সভাপতি।

গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি স্যার জেমস্ জিন্‌স্?

—হাঁ।

—আপনার বক্তৃতা কবে হবে? আমি আপনার বইয়ের একজন ভক্ত। আপনার অধিকাংশ বই পড়েচি।

—বক্তৃতা হবে বুধবারে।

—বিষয় কি?

—নেবুলা।

—দার্জিলিং ও হিমালয় আপনার কেমন লাগল?

—চমৎকার।

—আপনাকে আর একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করব। আমাকে সময় দেবেন কি?

—আমার গলা ধরেচে ঠাণ্ডা লেগে। কথা বলতে কষ্ট হয়।

আমি নাছোড়বান্দা। বল্লুম—দয়া করে এক মিনিট সময় দেবেন ?

—কি বল ?

—আপনার নাম কি ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর সাইকিক্ রিসার্চেসের সঙ্গে জড়িত আছে ?

—না, কখনো না। আমি ও জিনিস বিশ্বাস করি না।

ইতিমধ্যে একটি মেমসাহেব অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এগিয়ে এল দেখে আমিও আমার পকেট থেকে মোহিত মজুমদারের পাটনার অভিভাষণখানা বার করলুম—এই একমাত্র কাগজ যা আমার পকেটে ছিল। স্যার জেম্‌স্ মেমটির অটোগ্রাফ লেখা শেষ করে তাকে জিগ্যেস করলেন—আমি কি তোমার এই পেনটি ব্যবহার করতে পারি ?

তারপর আমাকে অটোগ্রাফ দিলেন।

সেনেট হলের মধ্যে আমিও ঢুকলুম স্যার জেমস্ জিন্‌সের পিছু পিছু। ওঁদের কাউন্সিলের মিটিং বসবে—ডাঃ শিশির মিত্র মঞ্চ থেকে লোকের ভিড় সরাতে ব্যস্ত। শিশিরবাবুকে বল্লুম—এঁদের মধ্যে এডিংটন আছেন ? শিশিরবাবু বল্লেন—না।

ডাঃ কালিদাস নাগ আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ডাঃ এ্যালবার্ট ডেভিস মিড-এর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। দুজনের সঙ্গে করমর্দ্দন করলুম ও কার্ড বিনিময় হল। আমি তাঁরও অটোগ্রাফ নিলুম।

ভুলে আমার ফাউণ্টেন পেনটা ডাঃ মিড-এর কাছে রেখে গিয়েছিলুম, সেনেট্ হল থেকে বার হয়ে ট্রাম লাইনের কাছে গিয়ে মনে পড়ল। ফিরে এসে সেটা আবার নিলুম।

স্যার জেমস্ জিন্‌স্-এর সঙ্গে আলাপ করেছি! স্মরণীয় দিন না জীবনের ?

আজ সারাদিনটি কি অপূর্ব্ব আনন্দে কাটল! এমন দিন কটাই বা আসে জীবনে! প্রথমে তো সকালে বিশ্বনাথ এসে বনগ্রাম সাহিত্যসম্মেলনের কথা বল্লে। দেশে এমন একটা সাহিত্য-সভা হবে শুনে খুবই আনন্দ হল। সেই আনন্দ নিয়েও যদি কমল সরকার আমাদের দেশে যায়, তবে সে কেমন গান গাইবে পুঁটিদিদিদের ভাঙা রোয়াকে বসে বসে—সে কথা ভাবতে ভাবতে তো স্কুলে গেলুম। স্কুল থেকে বিকেলে সুধীরবাবুর দোকানে গিয়ে শুনি আজ স্যার জেমস্ জিন্‌সের বক্তৃতা শোনা যাবে না। কার্ড বিলি করা হয়েচে, বিনা কার্ডে ঢুকতে দেবে না, মণীন্দ্রলাল বসু ওদের নাকি বলেচে। আমি মনে ভাবলুম, এই কল্‌কাতা শহরে এমন কোন লোক নেই যে আজ আমায় Jeans-এর বক্তৃতা শুনতে বাধা দেয়। দেখি ঢুকতে পারি কিনা!

গিয়ে দেখি সেনেটের সব দরজা বন্ধ। পেছন দিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে গিয়ে দেখি সেদিকেরও দরজা বন্ধ। তখন পূর্ব্বদিকের দালানের কোণের দরজা খোলা দেখে সেখান দিয়ে ঢুকলুম। দেখি অত বড় হলে মাত্র ছ'জন প্রাণী উপস্থিত। একজন তার মধ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান জগতের লোক সুধাংশু। সে আমায় ডাকলে। তার কাছে গিয়েই বসলুম। কিছু পরে সোমনাথবাবু সস্ত্রীক এলেন। ডাঃ সুশোভন সরকার এলেন, আমাকে দেখে পাশে এসে বসলেন। একটু পরে ভীষণ ভিড় জমে গেল। দরজা সব বন্ধ, দরজায় লোক ধাক্কা মারতে লাগল। ভিড় ঠেলে দেখি নুটু আসচে। নুটু সামনের দিকে গেল। বি. এম. সেন মাইক্রো-ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—Ladies & Gentlemen, Sir James Jeans has arrived and I am only testing the microphone—একটা খুব হাসির রোল উঠল। একটু পরে জিন্‌স্ বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। যখন সে স্লাইড্‌খানা পড়ে পর্দ্দায় আমি অমনি বলি ওরায়ণ, নেবুলা, এটা এড্রোমিডা, সিফিড্ ভেরিয়েবল্‌স্-এর কথা Jeans তুলতেই সুশোভনবাবুকে

বল্লুম। নিজের ওপর নিজের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পেছনের সন্ধ্যার আকাশে দূরে একটা গ্রামের এক মেয়ে বলেছিল—আপনার সুখ্যাতি শুনতে ভাল লাগে—সেই কথা, সেই বাঁশবন, সেই বকুলতলা, সেই ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা নির্জ্জন মাঠ—বার বার মনে হচ্ছিল—আর মনে হচ্ছিল শিবুর বাবাকে। আজ ফি-এর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি—শিবুর ম্যাট্রিকের ফি, গরীব লোক, কাল হাটবেলা, পিয়নে যখন টাকা দেবে, কি খুশিই হবে। পশুপতিবাবু যে কাল ফোনে বলেছিল—আপনি মিডিয়ম ভালোই, তামার তার ভিন্ন কি বিদ্যুৎ চলে? খুব ভাল কথা।

বক্তৃতা অন্তে কালিদাস নাগ ও সেই পরশুকারের এ্যাল্‌বার্ট ডেভিস্ মিডের সঙ্গে দেখা। কালিদাসবাবু বল্লেন—রবিবার দুপুরে কোন এনগেজমেণ্ট নেবেন না, বিভূতিবাবু।

আমার বোধ হয় উনি কোন পার্টি দেবেন বৈদেশিক ডেলিগেটদের।

বাইরে আসবার পূর্ব্বে ডাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দেখা। বল্লুম—মেঘনাদদা, ময়দান ক্লাবের কথা মনে আছে? ১৯১৪ সালের?

ট্রাম লাইনের কাছে সেনেটের সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়েই দেখি জিন্‌স্-এর বক্তৃতার সেই কালপুরুষ উঠেচে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির মাথার ওপরকার আকাশে। এই পাশের কার্নিসে বসে মাধববাবুর বাজার থেকে ফুলুরি কিনে খেতুম যখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র—সে কথা মনে পড়ল। সেও এই শীতকালে। তখন কোথায় কি? কোথায় সুপ্রভা, কোথায় খুকু, কোথায় আমি! সুপ্রভার কথা বড্ড মনে হচ্ছে। যদি এ সময়ে সে আসত! যখন যে মেয়ে হলে ঢোকে, তখনই আমি দেখি সুপ্রভা যদি তাদের মধ্যে থাকে!

নীরদবাবু ও কান্তিবাবু রাস্তা পার হচ্ছেন, বল্লেন—কত খুঁজলাম আপনাকে। সোমনাথবাবুর মুখে শুনলুম আপনি এসেচেন। কাল যাবেন ঠিক সাড়ে চারটার সময়—'বিচিত্রা' সম্পর্কে পরামর্শ আছে।

সুধীরবাবুর দোকান হয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়িতে বসে আশু সান্যাল ও রমাপ্রসন্নের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে বাসায় এসে দেখি সুপ্রভা পত্র লিখেচে। সে আসচে ২৫শে জানুয়ারী কল্‌কাতায়। কি আনন্দ যে হল! এখন যদি আসে তবে তো! তার কথার কোন ঠিক নেই।

Eddington-এর বক্তৃতায় সেনেটে বড় কড়া ব্যবস্থা ছিল। ও দুদিন খুব ভিড় ছিল বলে এ ব্যবস্থা এরা করেচে। দিনগুলো বড় ব্যস্ততা ও engagement-এর মধ্যে দিয়ে কাটচে। Dr. Fisher-এর সঙ্গে সত্যেন বোসের তর্কযুদ্ধ সেদিন বেশ উপভোগ করা গেল বেকার ল্যাবরেটরিতে। আজ সকালে সজনীর বাড়ি থেকে সাড়ে ন'টার সময় আসচি, দেখি খুব ভিড় সেনেটে। ঢুকে দেখি লর্ড হারবার্ট স্যামুয়েলের বক্তৃতা হচ্চে, বিষয় 'Basis of Philosophy', Sir James Jeans সভাপতিত্ব করচেন—তারপর জিন্‌স্‌কে ভলাণ্টিয়ারেরা ঘিরে নিয়ে এসে গাড়িতে উঠিয়ে দিলে—ওদিকে বক্তৃতা-মঞ্চে লর্ড স্যামুয়েলকে বহুলোক ঘিরেচে বক্তৃতা-মঞ্চের ওপরে, অটোগ্রাফের জন্যে। জিন্‌স্ অনেকক্ষণ মোটরে বসে ডাঃ কমল মুখার্জ্জির সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলবার পরে মোটর থেকে নেমে লর্ড স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লর্ড স্যামুয়েলকে বল্লেন—I will see you after lunch, এইটুকু মাত্র আমার কানে গেল। তারপর লর্ড স্যামুয়েল গবর্নরের মোটরে চলে গেলেন। বহু লোক জড় হয়েছিল সেনেটের সামনের রাস্তায় এঁদের দেখবার জন্যে।

দুটো বিষয়ে দুটো অদ্ভুত গোলযোগ ঘটল দিন কয়েকের মধ্যে, তাই সেটা এখানে লিখে

রাখলাম। প্রথম কথাটা আগে বলি। . ১৯১৩ সালে যখন আমি বনগাঁয়ে বিধুবাবুর ওখানে থাকি, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, তখন নতুন 'ভারতবর্ষ' বেরুল। মন্মথবাবু মোক্তার আমাকে তখন 'ভারতবর্ষ' পড়তে দিতেন। 'ভারতবর্ষ-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন নতুন লেখকের গল্প পড়ে অল্প বয়সেই মোহিত হয়ে যাই। ভাবি, এমনধারা লেখক তো কখনো দেখি নি—কত তো গল্প পড়েছি। তারপর বহুদিন কেটে গিয়েচে, যাক্।

গত রবিবার সেই বনগাঁয়ে সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায় বসে গল্প করচি অনেকে—এমন সময় অপূর্ব্বর ছেলে অরুণ একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা হাতে দিয়ে বল্লে—শরৎবাবু মারা গিয়েচেন, এই যে কাগজ।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কাগজখানায় বেরিয়েচে, রবিবারে তিনি বেলা দশটার সময় মারা গিয়েচেন।

কি যোগাযোগ তাই ভাবি। কত জায়গায় বেড়ালুম, কত দেশে গেলুম, কত লোকের বৈঠকখানায় বসলুম—কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কোথায় পেলুম—না সেই বনগাঁয়ে, সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায়, যে আমায় অত বছর আগে শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিল!

ভাববার কথা নয়?

এইবার অন্যটার কথা বলি। সেটা ঘটলো আজ এখুনি, এই সন্ধ্যার সময়।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমি মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের একটা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে দিনকতক খেতুম। উড়ে ঠাকুরটার নাম সুন্দর ঠাকুর। সে এখনও আছে বেঁচে, তবে ওখানকার হোটেল সে আজ ১৫।১৬ বছর উঠিয়ে দিয়েচে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখাশোনা হয়।

এখন এই ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমার জীবনে বড় শোকাবহ দুর্দ্দিন—হাতে নেই পয়সা, মনেও যথেষ্ট অবসাদ ও হতাশা। গৌরী সেবার মারা গিয়েচে। সুন্দর ঠাকুরের দোকানে রাত্রে গিয়ে লুচি খেতুম—কোথা থেকে যে দাম দেব না ভেবে খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি।

তারপর সুন্দর ঠাকুরের হোটেল উঠে গেল, সেখানে অন্য কি দোকান হল। আমিও চলে গেলুম কলকাতার বাইরে। জাঙ্গিপাড়া, হরিনাভি, চাটগাঁ, কুমিল্লা, ভাগলপুর, মুঙ্গের নানাস্থানে—কোথায় বা না গিয়েচি চাকরি নিয়ে? বহুকাল পরে কলকাতায় ফিরে আবার যখন এইখানেই চাকরি নিলুম, মীর্জ্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় সুন্দর ঠাকুরের হোটেলের ঘরটা প্রায়ই চোখে পড়ত। ভাবতুম পুরোনো দুর্দ্দিনের কথা। ওই ঘরটায় সেদিন আমার সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলির স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো—না ভেবে পারিনে।

আজ একটা বালিশের খোলে তুলো ভর্ত্তি করার দরকার হল। পাটনায় বক্তৃতা আছে শনিবার, সেখানে যেতে হবে, অথচ বালিশ নেই। মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটে এক জায়গায় একটা তুলোর দোকান। দোকানে বসে তুলো ভর্ত্তি করে উঠতে যাচ্ছি এমন সময়ে নজর করে দেখলুম এটা সেই পুরোনো দিনের সুন্দর ঠাকুরের সেই হোটেলের ঘরটা। আজ সেখানে তুলোর দোকান হয়েচে।

মনে পড়ল এও জানুয়ারী মাস এবং ১৯১৯ সালের পরে আজ এই প্রথম আবার সেই ঘরটাতে ঢুকে বসলুম। তারপর ফিরে আসচি হঠাৎ মনে পড়ল বালিশের খোলটা সুপ্রভা তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। কি অভাবনীয় যোগাযোগ।

কাল হাওড়া স্টেশনে ট্রেন অত্যন্ত দেরিতে এল। রাত্রে ঘুম ভাল হয় নি। একে তো বেজায় শীত, তার ওপর কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠেছে দূর মাঠের মাথায়। ট্রেনের জানালা খুলে সেই শীতের মধ্যেও হাঁ করে চেয়ে আছি। সৌভাগ্যের বিষয় একটা কামরা আমরা একেবারে খালি পেয়েছিলুম, অরবিন্দ গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক (অত্যন্ত সুপুরুষ লোক, আমি অমন সুপুরুষ খুব কমই দেখেছি) সপরিবারে পশ্চিমের দিকে যাচ্চেন, তাঁরাই কেবল ছিলেন আমার কামরাতে, আর কেউ নয়। একখানা পুরোনো ডায়েরী ছিল আমার কাছে বাবার, তাতে পড়ে দেখা যায় —বাবা ১২৮৭ সালের দিকে পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে এই পাটনা, মুঙ্গের, আগ্রাতে এসেছিলেন।

ভোর হল শিমূলতলা স্টেশনে। আর বছর যখন পাটনা আসি, আমি, সজনী, নীরদ, ব্রজেনদা—ভোর হয়েছিল কিউল স্টেশনে। অরবিন্দবাবুটি অতি ভদ্রলোক, আমাকে খাবার খেতে দিয়ে বল্লেন—একটু মিষ্টিমুখ করুন। অথচ তিনি আমায় জানেন পর্যন্ত না।

রৌদ্র উঠল কিউলে। বিহারের দূরবিপর্সী প্রান্তর, অড়রের ক্ষেত, সরিষার ক্ষেত, খোলার বাড়িওয়ালা গ্রাম, চালে চালে বসতি, ইঁদারা, ফণি-মনসার ঝোপ, মহিষের দল আরম্ভ হয়ে গিয়েচে। শিমূলতলায় পাহাড়ের শোভা যদিও তেমন কিছু দেখলুম না, তবুও শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সাঁওতাল পরগণার উচ্চাবচ প্রান্তর ও ছোটখাটো পাহাড়রাজি দেখতে দেখতে এত বিভোর হয়ে গেলুম যে ঘুম কিছুতেই এল না।

পাটনা স্টেশনে মণি ও কলেজের ছাত্রেরা নামিয়ে নিতে এসেচে। তার আগে বক্তিয়ারপুর স্টেশনে কালা ও পশুপতি প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে ছিল দেখা করবার জন্যে। অনেকদিন পরে ওদের সঙ্গে দেখা হল। মণিদের বাড়ি আসবার কালে মোটরটা বড় ঘুরে এল—কারণ এক জায়গায় রাস্তায় পিচ্ দেওয়া হয়েচে নতুন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আজকাল পাটনাতেই রয়েচে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বল্লে, এ জায়গা ভাল লাগচে না, বাংলাদেশে ফিরতে চায়। তারাশঙ্কর একজন সত্যিকার ক্ষমতাবান লেখক, বাংলার মাটি থেকে ও প্রাণরস সঞ্চয় করেচে, ওর কি ভাল লাগে এসব জায়গা?

মণিদের ছাদের ওপরে দুপুরের নীল আকাশের তলায় বসে এই অংশ লিখচি। সুপ্রভাকে একটা চিঠি দেব। দূরে তালের সারির মাথায় অনেকটা দূর দেখা যাচ্চে, এই নিস্তব্ধ দুপুরে সুদূর বাংলার একটি সজ্‌নে ফুল বিছানো পল্লীপথের কথা মনে পড়চে, একটি সরলা পল্লী বালিকা এ সময়ে কি করচে সে কথাও ভাবচি।

ছাদের ওপর যোগীনবাবুর দুই নাতনী খেলতে এসেচে আর বলচে—

চু কপাটি আইয়া
যাকে পাবে ভাইয়া···

এ কি রকম খেলার ছড়া? বাংলাদেশে তো এ ছড়া কোন ছেলেমেয়ের মুখে শুনিনি!

পাটনা কলেজের হলে মিটিং। সেখানে অনেকদিন পরে অমরবাবুকে দেখে বড় আনন্দ পেলুম। সেই ভাগলপুরের অমরবাবু! ইনি শুনলুম এখন এখানে রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী, কিছুদিন আগে এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ ছিলেন। তারাশঙ্করও উপস্থিত ছিল, ও আজকাল এখানেই থাকে মামার বাড়িতে। সভার টেবিলে বাবার পুরোনো ডায়েরীখানা পড়ে দেখছিলুম তিনি পাটনায় এসেছিলেন কবে। ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়ে সভা থেকে উঠতে হল, তারাশঙ্করকে সভাপতির আসনে বসিয়ে চলে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে এলেন অমরবাবু। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার পিছু পিছু এসে বল্লেন—একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্চে, আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ,

আপনারা কলকাতা থেকে এসে বক্তৃতাটি দিয়েই পালান, এতে এখানকার লোকে দুঃখিত।··· একটি ছেলে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে, একবার দুবার। একবার যখন করলে, তখন আমি ওর দিকে চাই নি। আবার যখন করলে, তখন আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে বাইরে নিয়ে গেলুম। বল্লুম—তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? ও বল্লে—বাড়ি ভাগলপুরে। আমি নবীন গাঙ্গুলীর নাতি। তখন তো আমি অবাক্। ওদের বাড়ি কত গিয়েচি ভাগলপুরে থাকতে সে কথা বলি। তিনকড়িকে চেন? বলতেই বল্লে—হঁা, তিনি আমার মেসোমশায়।

অমরবাবুর মোটরে মণিকে তুলে নিয়ে চলে এলুম মণিদের বাড়িতে। ইন্দু যে কোথায় ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে আছে, খুকু যে ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে ভুগচে, কেবল এই সব কথা মনে পড়ে। মণির বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে অমরবাবুর সঙ্গে ভাগলপুরের দিনের গল্প করি। মোটরে আসতে আসতে তিনি মণিকে ক্ষীরোদবাবুর অশরীরীরূপে ঘরে উপস্থিত থাকার সেই পেটেণ্ট গল্পটি করলেন। আমি তো শুনে অবাক যে গত বছরের সেই সুদর্শন যুবক প্রীতি সেনই ক্ষীরোদবাবুর ছেলে। কি সব অভাবনীয় যোগাযোগ! এবার প্রীতি সেনকে না দেখে দুঃখিত হয়েচি।

অমরবাবুর গাড়িতেই স্টেশনে এলুম। মণি শেষ পর্য্যন্ত রইল। কত পুরোনো দিনের গল্প হল অমরবাবুর সঙ্গে। ওর সাদর আলিঙ্গনটি বড় বন্ধুত্বের চিহ্ন।

ট্রেনে বক্তিয়ারপুর নেমে কালীদের বাড়ি এসে দেখি সে কোথায় থিয়েটারের রিহার্সেলে গিয়েচে। একটু পরেই এল। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প হল। ঠিক হল কাল রাজগীর যাওয়া হবে সকালের ট্রেনে।

কালী ও কালীর মামাশ্বশুর আমার সঙ্গেই ছিল। শো স্টেশনের একটা জায়গা দেখিয়ে কালী বল্লে—ওখানে আমাদের 'রসচক্র' সভা হয়েছিল, আমি একটা কবিতা পড়লুম। আমি বল্লুম—তুমি কবিতা লেখো নাকি? বল্লে—শোনাব এখন। বাড়িতে আছে। আহা, ওরা সভা-সমিতিতে যেতে পারে না, এক-আধটু হলে কি খুশিই হয়।

Ignominy thirsts for respect—কি কথাই বলেচে ভিক্টর হিউগো!

চেরো, হরনৌৎ—এই সব স্টেশনের নাম। অপকৃষ্ট ও নোংরা বিহারের বস্তি। ধুলো, ধুলো—সর্ব্বত্র ধুলো। ধুলো-পড়া পেঁড়া, খোয়া ক্ষীর (এদেশে বলে মেওয়া) ও তিলুয়া বিক্রী হচ্চে দোকানে। এক ঘরের দেওয়ালের গায়ে আর এক ঘর বাড়ি তুলেচে।

শো স্টেশনে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ বলে একজন হিন্দি গ্রাম্য কবির সঙ্গে আলাপ হল। লোকটিকে এখানে সবাই পাগল বলে—তা তো বলবেই। কবিকে চিনবার মত লোক এ সব পাড়াগাঁয়ে কে আছে? কবি আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। আসবার সময়ে তিনি দয়া করে শো স্টেশনে আবার আমাদের কামরাতেই উঠে দেখা করে-ছিলেন।

রাজগীরের শৈলমালা দূর থেকে ধোঁয়ার মত দেখা গেল। কিছু পরেই বিহার-শরিফ্ ও নালন্দা। নালন্দা থেকে ট্রেন ছাড়লে দূর থেকে স্তূপ ও বাড়িঘর দেখা গেল। এবার আর নালন্দা যাওয়ার সময় হল না।

রাজগীর নেমে পাহাড় জঙ্গলের পথে সোন ভাণ্ডার গুহায় চলে গেলুম। বুদ্ধের চরণরজপূত এই স্থান। ঐ গুহায় বুদ্ধদেব সমাধিস্থ ছিলেন, পাশের গুহায় তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ ধ্যানস্থ ছিলেন।

এই পাহাড়টার নামই গৃধ্রকূট। গৃধ্রকূটের ওপরে কাঁটাগাছপালা ঠেলে অনেকটা উঠলুম। এক জায়গায় পাথর ঠেস্ দিয়ে যুৎ করে বসলুম। ঠিক দুপুর, নির্ম্মেঘ, নীল আকাশ। দূরে প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারা খোদিত একটা স্তূপ বা চৈত্য দেখা যাচ্ছিল। পাহাড় থেকে নেমে আমি সেটা দেখতে পেলুম, কালী পাথরের নুড়ি কুড়ুতে লাগল। আমি চৈত্যটি দেখে ফিরবার সময় বাঁশবনের ছায়ায় ঝরণার স্রোতের ধারে খানিকক্ষণ বসলুম। ওরা ততক্ষণে চলে গিয়েচে। এখানেই সেই করন্ত বেণুবন, যেখানে বুদ্ধদেব মহানির্ব্বাণ সূত্র বিবৃত করেন আনন্দকে। কালের কুয়াসায় সব ঢেকে মুছে একাকার হয়ে গিয়েচে···কোথায় কি আজ! আড়াই হাজার বছর আগেকার মত বেণুবন কিন্তু রাজগীরের উপত্যকায় অজস্র। ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে স্নান করে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হল। তারপর আমি একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে ছায়ায় বসে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম—হঠাৎ মনে পড়ল আজ গোপালনগরের হাট, বেলা তিনটে, সাড়ে-তিনটে—এতক্ষণ বটতলা দিয়ে কত লোক হাটে চলেচে।

ফিরবার পথে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে এসেচে বড় বড় মাঠে। একজন চৈনিক লামা আর একজন লামাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে কি একটা বাজনা বাজাচ্চে ট্যাং ট্যাং করে, আর কেবল ঘাড নীচু করে প্রণাম করচে। সে ভারী সুন্দর দৃশ্য! ট্রেন ছেড়ে গেলেও অনেকদূর পর্য্যন্ত বাজাতে বাজাতে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে এল।

বক্তিয়ারপুর পৌঁছে একটি ছোক্‌রা তার কবিতা শোনাতে বসল। গাড়িতে তার লেখা কবিতা দু'তিনটা শোনালে। সাহিত্যপ্রীতি ওদের বেশ প্রশংসনীয়—তবে দূর বিহারের দেহাতে কে ওদের উৎসাহ দিচ্ছে আর কে-ই বা ওদের কবিতা ছাপাচ্ছে!

রাত্রের ট্রেনেই কল্‌কাতা রওনা হলুম, দানাপুর এক্সপ্রেসে। সারা রাত্রি ঘুম এল না। একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—উঠে দেখি জসিডি স্টেশন। তারপর আবার শুয়ে পড়লুম —ভাঙা কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেচে, বেজায় ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বইচে, জানালা দিয়ে মুখ বার করলে মুখে যেন লক্ষ ছুঁচ ফোটে। কুয়াসা হয়েচে, বনগুলো যেন ঠিক ইসমাইলপুরের সেই বন—অনেক রাত্রে উঠে এই শীতের সময় ইসমাইলপুর কাছারীতে ঠিক যেমন বন দেখতুম, তেমনি দেখাচ্চে।

পাটনা থেকে এসে মধ্যে অনেক ব্যাপার হয়ে গেল। মধ্যে সুপ্রভা কলকাতা এল ওর মা-বাবার সঙ্গে। একদিন ওর সঙ্গে 'মুক্তি' দেখতে গেলুম 'চিত্রা'তে। ভাল লাগল না কারো, সেবা ও রবি ছিল সঙ্গে। তারপর আমার পড়ে গেল বনগ্রামে সাহিত্য-সম্মেলনের হুজুগ। বিশ্বনাথ এখানে খুব যাতায়াত করলে। খগেন মিত্র মহাশয় সভাপতি হয়ে গেলেন এখান থেকে, রমাপ্রসন্ন ও গৌর পাল গেল, খুব হৈ হৈ কাণ্ড হয়ে গেল সরস্বতী পূজোর সপ্তাহে। সাহিত্য-সম্মেলন থেকে আমায় আবার দিলে একটা মানপত্র ও অভিনন্দন।

পরের সপ্তাহেই পড়ে গেল কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলন। আমি ঈদের ছুটিতে বাড়ি গেলুম। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, কোকিল ডাকচে, শীত যদিও বেশ, কিন্তু বসন্তের আমেজ দিয়েচে। বাড়ি গেলুম, পাড়ায় কেউই নেই এক ন'দি ছাড়া। নিজের খড়ের ঘরটিতে দুপুরে শুয়ে খুব ঘুম দিই। আগের রাত্রে যতীনকাকার মেয়ে উষার গিয়েচে বিয়ে। তখনও বরযাত্রীরা রয়েচে। যতীনকাকার মেয়ের বিয়ে দেখচি চিরকাল। ঐ একই চণ্ডীমণ্ডপে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে গাছে গাছে পাকা কুল খেয়ে বেড়াই। ভূষণ জেলের ছেলের জমিতে খেজুর গাছটা ঠেস দিয়ে বসে 'আরণ্যক' উপন্যাসের এক অধ্যায় লিখি। সন্ধ্যাবেলায় ইন্দুর

বাড়িতে সেদিনকার মিটিং ও আমার মানপত্র দেওয়া সম্বন্ধে খুব কথাবার্ত্তা হল। ইন্দু বল্লে—আজ যদি আপনার বাবা-মা বেঁচে থাকতেন!

সকালে টুকোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ছেলেবেলায় টুকো খেলত আমার ছোট বোন মণির সঙ্গে। সে আজ ১৫।১৬ বছর পরে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেচে। এসে আমায় নমস্কার করলে—ওর মুখ ভুলেই গিয়েছিলুম—এখন দেখে মনে হল—হাঁ, এ মেয়েকে আগে দেখেছিলুম বটে।

পরদিন সকালে নটার ট্রেনে কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলনে গেলুম। গাছে গাছে শিমূলফুল ফুটে লাল হয়ে আছে। সজনী, অমল বোস, স্নুনীতি বস্থ, প্রবোধ সান্যাল, বিজয়লাল সকলের সঙ্গে কৃষ্ণনগর স্টেশনে দেখা। অতুল গুপ্ত ও যামিনী গাঙ্গুলী একখানা মোটরে আসছিলেন, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাতেই আমায় উঠিয়ে দিলেন। মনোমোহন ঘোষের যে বাড়িতে আজকাল কলেজিয়েট স্কুল, ওখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢুকেই দেখি প্রবোধ সান্যাল বসে খাচ্চে। আমি ও ইউনিভার্সিটির প্রিয়রঞ্জনবাবু একসঙ্গে খেতে বসে গেলুম। খেয়েই সভাস্থলে যাই। প্রমথ চৌধুরী সভাপতি। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাটমন্দিরে সভা বসেচে। কখনও এর আগে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকিনি—যদিও এর আগে বাল্যকালে একবার কৃষ্ণনগর এসেছি। তার অভিজ্ঞতা খুব অদ্ভুত। আর বছর-দুই আগে কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে এসেছিলুম আমার ছোট ভাইয়ের জন্যে পাত্রী দেখতে, সে কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

কৃষ্ণনগরে বাবার সেই মা—আমাদের আলুভাতে ভাত খাওয়ানো—আমার হতাদর—কত কথাই মনে পড়ে। সেই আর এই! সে গল্প আর একদিন করব।

কৃষ্ণনগর থেকে সেই রাত্রে রাণাঘাটে এসে খগেনমামার বাড়িতে রইলুম—তাও সেই বাল্যে ওদের বাড়ি শুয়েছিলুম, আর কখনও থাকিনি। একটা সরস্বতীঠাকুর বিসর্জ্জন দিতে গেল শোভাযাত্রা করে অনেক রাত্রে। বেজায় শীত পড়ল রাত্রে!

পরদিন এলুম এগারোটার ট্রেনে গোপালনগরে। স্টেশনে আবার খগেন মিত্র ও প্রভাত-কিরণ বস্থর সঙ্গে দেখা। রেস্তোরাঁতে বসে চা খেতে খেতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল অনেকক্ষণ।

দেশে গিয়ে বেশ লাগল। তখনি ন'দির কাছে একটু তেল চেয়ে নিয়ে নদীতে স্নান করে এলুম। ওপাড়ার সেই কুমুরণী ক্ষার কাচছে। শুক্‌নো ফুল পড়ে আছে কত বনসিমতলার ঘাটে। পরশু কতক্ষণ ঘাটে বসেছিলুম, বনের কুল পেকেচে একটা ডালে, দরিদ্র পল্লীজননী আর কি দিয়েই বা আদর করবেন? তবুও কত স্মৃতি জড়ানো রয়েচে এই বনসিমতলার ঘাটের সঙ্গে! খুকু ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করত নেয়ে উঠে—এই তো সেদিনও।

সেদিন এসে খুব ঘুমুলাম দুপুরে। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। চড়কতলায় এসে বসলুম, মুসলমান মাস্টারটি কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে এসে পড়েচে অম্‌নি। চাচা এসে আগুন করলে ও বক্‌ বক্‌ শুরু করলে। ইন্দু রাত্রে একটি বিদেশী পথিক সেদিন কেমন করে শিঙেতলার মাঠে বেঘোরে মারা গিয়েছিল—সে গল্প করলে। সে কাহিনী বড়ই করুণ।

পরদিন সকালে সীতানাথ জেলের নৌকাতে বনগাঁয়ে চলে এলুম। ভেবেছিলুম খুকুদের সঙ্গে দেখা করতে যাব—কিন্তু ঘটে উঠল না। রাত্রে খুব চমৎকার জ্যোৎস্নায় মন্মথবাবুর বাড়ি বসে হরিবাবু, যতীনদা, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া গেল। বিপ্রদাসবাবুর বাড়ি সত্যনারায়ণের সিন্নীর প্রসাদ পাওয়া গেল।

সেখান থেকে এসে কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে।

নগেন বাগচীদের যে বাড়িটাতে থাকতুম—অনেক দিন সে বাড়ির সে ঘরটার পথ বন্ধ ছিল। আজ দুলির ছোট ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে ঘরটার সে বারান্দাতে গিয়ে বসি। এইখানেই আমার মা মারা যান। তারপর কতকাল এ বাড়িটাতে আসিই নি। এইখানেই বালাক কবি পাঁচুগোপালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সতেরো বছর আগে—যে আমায় প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

ফিরে এসে ফুলিদের উঠোনে মাচাতলার উনুনে ওরা পরোটা ভাজতে বসল—আমি এক-খানা বেলে দিতে গেলুম—হল না। ফুলি ও বৌমা তো হেসেই কুটিপাটি। তারপর বৌমা বেলে দিতে লাগল—আমি শুধু নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। সুন্দর লেবুফুলের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

জ্যোৎস্নার মধ্যে কাল রাত্রেই কলকাতায় ফিরি। বেগুন আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল একেবারে মেস্ পর্য্যন্ত। কত ধরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে এ দিনগুলো কাটল!··· না?···

সাধে কি বলি ভগবানের দান এ জীবন, যে জানে ঠিক মত এর স্বাদ গ্রহণ করতে, সে জানে এ কি মধু!

আর বছর ঠিক এইদিনে পুরী যাওয়া হল না বলে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এবার ঠিক এব দিনেই বেশ কাটল। শনিবার সুপ্রভা আসবে বলে পত্র পেলুম, বিকেলে বেড়িয়ে এসে একটা কাগজ পেলুম তাতে জানা গেল ওরা কাছাকাছি একটা হোটেলে এসে উঠেছে। দেখা করতে গেলুম ও তারপর কার্জন পার্কে বেড়াতে গেলুম ওকে নিয়ে। পরের দিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হয়ে ইডেন গার্ডেনে খানিকটা বসে কত গল্প করলুম। কিন্তু সকলের চেয়ে আনন্দ হল ওকে তুলে দিতে গিয়ে স্টেশনে। কেউ জানত না যে আমি স্টেশনে যাব—আমি একটি অদ্ভুত আনন্দ পেলুম। ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেলেও কতকক্ষণ বেঞ্চিতে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কত ধরণের সূক্ষ্ম অনুভূতি! ভাবুকতা জীবনের খুব বড় একটা সম্পদ। এ যার নেই, সে সত্যিই দরিদ্র। টাকায় কি করে?

শেয়ালদ' স্টেশনে আমার কল্যকার সেই দশ মিনিটের দাম অর্থে নিরূপিত হবার নয়।

বসন্তটা এমনভাবে ভাল করে দেখিনি অনেকদিন। শিবরাত্রির ছুটিতে এবার গেলুম বারাকপুরে। কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে চালকীর মুসলমান পাড়ার ওই কাঁচা রাস্তাটার ধারে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের! তার ওপর নদীর ওপারে, ঠিক গাজিতলার পথের বাঁকে একটা চারা শিমুলগাছে ফুল ফুটেচে, আমি যখন বারাকপুরে যাচ্চি তখন দুপুর রোদ। কি অদ্ভুত যে দেখাতে লাগল সেই ঝম্ ঝম্ দুপুরে ওপারের সেই ফুলে ভর্ত্তি শিমুলচারাটা! অপ্রত্যাশিতভাবে গিয়ে দেখি খুকুরা ওখানেই আছে। অনেক দিন পরে এখানে ওদের পেয়ে মন খুশি হয়ে উঠল। আমি ন'দিদিদের রান্নাঘরের দাওয়ায় জল খেতে গিয়েচি, ও দাঁড়িয়ে আছে পুঁটিদিদিদের উঠোনে। বল্লুম—কি রে! তারপর ওদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম। দুপুরে ওদের রান্নাঘরে বসে পোলাও বিষয়ে একদিন বল্লুম। শিবরাত্রির দিন ন'দিদিদের ঘরে ওদের কাছে শিবরাত্রি ব্রতকথা শোনালুম। ট্যাংরার মাঠে ইন্দুর সঙ্গে একদিন কুল খেতে গেলুম—বড় খোলা মাঠ, দিক্‌চক্রবাল বড় দূরবিসর্পী, একটা ঢিবির কাছে বসে সেদিন সূর্য্যাস্ত দেখলুম। ঘেঁটুফুল এখনও খুব ফুটেচে। গণেশ মুচি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েচে, ট্যাংরার ধারে গরু চরাচ্ছিল। লেবুতলার ওই পথে অনেকদিন কেউ আসেনি, যখন রোয়াকে বসে থাকি, এইদিন দেখলাম নীল

শাড়ি পরে আসতে ওই পথটাতে বহুদিন পরে!

গত শনিবার সাউথ গড়িয়া গ্রামে বেড়াতে গেলাম বোধহয় পনেরো বছর পরে। ভূতনাথ এখানে থাকতে আমি এখানে এসেছিলুম, সে কি আজকার কথা? বড় রোদ পড়েচে, বারোটার ট্রেনে ওখান থেকে রাজপুর এলুম। তুলিদের বাড়ির পিছনে বাঁশবনের তলায় কেমন ছোট ছোট ঘেঁটুগাছ। বেশ লাগে ওই বাঁশবনের মধ্যের জায়গাটা।

আজ গিয়েছিলুম নীরদবাবুদের মোটরে গড়িয়া গ্রামের একটা ভাঙা শিবমন্দিরের ধারে। জ্যোৎস্না উঠেচে খুব, ভাঙা মন্দির আর একটি প্রাচীন বটগাছ—পটভূমিকা বেশ চমৎকার। বেশ লাগল আজ জ্যোৎস্নাটা। কতক্ষণ বসে গল্প করলুম।

গত সপ্তাহের শুক্রবার থেকে আরম্ভ করে কি ঘোরাই গেল ক'দিন! প্রথম তো শুক্রবার আসাম মেলে রংপুর রওনা হলুম সেখানে সারস্বত-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে। দুপুরের রোদ বেশ বাড়চে—পথে পথে ঘেঁটুফুলের শোভা—সারা পথেই ঘেঁটুফুল দেখতে দেখতে চলেছি। নৈহাটির কাছাকাছি এসে মনে হল আমাদের গ্রাম এখান থেকে বেশী দূর নয়—সোজা গেলে হয়তো বিশ মাইলের মধ্যে। এই দুপুর রোদে আমাদের পাড়ার সবাই যে যার ঘরে ঘুম দিচ্চে হয়তো। রাণাঘাট স্টেশনে ইসাহাক মাস্টার উঠল ট্রেনে, ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত গল্প করতে করতে গেল। ক্রমে বেলা পড়তে লাগল। আমি দূরে এক গ্রামের একটি মেয়ের জীবনযাত্রার ছবি দেখি এই ছায়াস্নিগ্ধ অপরাহ্নে, হয়তো তাদের শিউলিতলা দিয়ে পাড়া বেড়াতে চলেছিল, হয়তো নিজেদের দাওয়ায় বসে গল্প করে, কি বই পড়ে। কোথায় সার্কাস হয়েছিল। সার্কাস উঠে গিয়েচে আজ ৩।৪ মাস—বলে, একবার ভেবেছিলুম খুব বেড়িয়ে আসা যাক্ সার্কাসে—তা সার্কাস গেল উঠে। ওদের কথা দুঃখ হয় ভাবলে। শিলং মেলে সুধাংশু ডাক্তারের দাদা হিমাংশুর সঙ্গে দেখা, সে থাকে কুড়িগ্রামে। চমৎকার জ্যোৎস্না রাত—এবার আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল এই পক্ষের জ্যোৎস্নাটুকু নিংড়ে খালি করে উপভোগ করব। রংপুর স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে প্রবোধবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠলুম। গিয়ে শুনি ওঁরা আমায় স্টেশনে নিতে এসেছিলেন, কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি নাকি। পরদিন সকালে সভার অধিবেশন হল টাউন হলে। প্রিন্সিপ্যাল ডি. এন. মল্লিকের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। কলকাতা ছাড়বার পরে তাঁর সঙ্গে আর কখনো দেখা হয় নি—সে আজ চোদ্দ-পনেরো বছরের কথা। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গিয়েচে—এখন এখানে কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। সভার পর দুপুরবেলা প্রবোধবাবুর সঙ্গে মোটরে বার হয়ে কলেজ বেড়িয়ে এলাম। অত বড় কলেজের বাড়িটা বাংলাদেশের অন্য কোন কলেজে নেই বলেই আমার ধারণা। ছাদে উঠে দুপুরবেলা চারিদিকে চেয়ে বেশ লাগল। কলেজ কমপাউণ্ড খুব ফাঁকা। তাজহাট রাজবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাদের বড় বৈঠকখানায় আমরা সবাই বসে রইলুম—অনেকগুলো ভারী সুন্দর হাতীর দাঁতের চেয়ার দেখলুম—যেমন অনেক বছর আগে আগরতলার রাজপ্রাসাদে দেখেছিলুম—আমার তখন চব্বিশ বছর বয়স—প্রায় আজ চৌদ্দ বছর আগেকার কথা। আবার বিকেলে টাউন হলে সভায় আসবার আগে মাহিগঞ্জে ৺রবি মৈত্রের বাড়ি যাওয়া গেল। রবি থাকতে কতবার আসতে বলেছিল, কখনো যাওয়া হয় নি, আজ সে নেই ভেবে কষ্ট হল। রবির দুই দাদাকে দেখতে অনেকটা তারই মত যেন। মাহিগঞ্জ থেকে আসতে পথের দুধারে বড় বড় পাতাওয়ালা গাছ—এখানে 'চোৎরা গাছ' বলে—বিছুটি গাছ, পাতা গায়ে লাগলে সাংঘাতিক জ্বলে।

বৈকালে সভার সময়ে যখন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, আমি, জনৈক অধ্যাপক অমূল্য

বসু টাউন হলের সামনে মাঠে ঘাসের ওপরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বসেছিলুম—আমি তো দূরের আকাশ দিয়ে পূর্ব্বদিকে সব সময়ই চেয়ে। কতদূরে কোথায় কে কি করচে, সেই চিন্তাতেই ভরপুর। সভান্তে জ্যোৎস্নারাত্রে রায় বাহাদুর বসন্ত ভৌমিকের বাড়ি চা-পার্টি। খুব গোলাপ ফুটেচে বসন্তবাবুর বাগানে। তিনি আমাকে তাঁর পড়ার ঘর দেখালেন—বেশ সাজানো, আর অনেক বই আছে। এদেশে ঘর তৈরী করার পদ্ধতি আমার বেশ সুদৃশ্য লাগল। প্রবোধবাবুর বাড়িতেও আবার অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করে বসন্তবাবু মজ্‌লিশ জমিয়ে রাখলেন। পরদিন সকালে আবার সভা। দুপুরে একটু ঘুমুই। বৈকালের দিকে শহরের কয়েকটি গণ্যমান্য ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। বৈকালে সভার সময় মোটর থেকে নেমেই দেখি ভিড়ের মধ্যে থেকে জেলি ও পাগ্‌লা আমাদের গাঁয়ের দেখা করতে ছুটে এল। ওরা এখানে লালমনিরহাটে রেলে কাজ করে, আমি এখানে এসেচি শুনে লালমনিরহাট থেকে দেখা করতে এসেচে। সভার পরে প্রবোধবাবুর বাড়িতে চা খেয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্টেশনে রওনা হলুম। শহরের কয়েকটি ভদ্রলোক আমায় তুলে দিতে এলেন। খুব জ্যোৎস্না, পূর্ব্বদিকের আকাশও খুব উজ্জ্বল। গরম একেবারেই নেই। পার্ব্বতীপুরে গাড়ি বদল করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে চড়ে বসলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মা দেখে বড় ভাল লাগল। ভোর হল রাণাঘাট স্টেশনে—তখনও আকাশে নক্ষত্র রয়েচে।

কলকাতার বাসায় গিয়ে স্নান করে বসে আছি, এমন সময় নীরদবাবুর ড্রাইভার এসে খবর দিলে গাড়ি এসেচে। নীরদবাবু সস্ত্রীক গালুডি যাচ্ছেন, আমায় সেই সঙ্গে যেতে হবে। তখনি জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে আবার রওনা। নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা তিনটার সময় গালুডি পৌছলো। পথে খড়্গ্‌পুরের পরে উঁচু ডাঙ্গা ও শালবনের দৃশ্য দেখবার লোভে দুপুরে একটু ঘুম এল না চোখে।

বহুদিন পরে আবার নামলুম গালুডি—আজ বছর তিন-চার আসিনি—১৯৩৪ সালের পুজোর পর আর কখনো আসিনি। তবে সে গালুডি এখন অনেক বদলে গিয়েচে। নেক্‌ড়েডুংরি পাহাড়টা ন্যাড়া, তার নীচেকার সে চমৎকার শালচারার জঙ্গলটা অদৃশ্য। কে পাথর কেটে নিয়ে যাচ্চে পাহাড়টা থেকে, রোজ সকালে একদল গরুর গাড়ি এসে পাথর কেটে বোঝাই করে নিয়ে যায়—পাহাড়টা এবার গেল। এদিকে কারো জ্ঞান নেই যে ওটা চলে গেলে গালুডির একটা beauty spot চলে যাবে।

অপরাহ্নে সুবর্ণরেখা পার হয়ে কুমীরমুড়ি গ্রামের জঙ্গলে বসে রইলুম কতক্ষণ। প্রথমে যাচ্ছিলুম রাখা মাইন্‌স্‌-এ। কিন্তু বেলা গিয়েচে দেখে ভরসা হল না। এক জায়গায় ধাতুপ ফুলের ঝাড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম—কাছেই একখানি বড় পাথর। হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে একটা গোলগোলি ফুলের গাছে হলদে ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। সেখানে ঢুকে দেখি বনে লতানে পলাশ গাছে পলাশ ফুটেচে, তা ছাড়া এক রকম বন যুঁই-এর মত কি ফুল ফুটেচে কামিনী ফুল গাছের মত গাছে। মোরাম্‌ ছড়ানো মাটি—ঠিক যেন কয়লার টুকরো ছড়ানো পড়ে রয়েচে। বসে বসে মনে হল কাল ঠিক এ সময় রংপুরে টাউনহলের ক্লাবঘরে বসে চা খাচ্চি—আর আজ এ সময় সুবর্ণরেখার ধারের বনে! কোথায় ছিলুম কোথায় এসেচি! চাঁদ উঠেছে ঠিক সেই গোলগোলি ফুলগাছের পেছনে। প্রকাণ্ড গাছটা—আমাদের দেশের একটা মাঝারি গোছের আমড়া গাছের মত। ফুলগুলো অনেকটা দূর থেকে দেখতে সূর্য্যমুখী ফুলের মত। কতক্ষণ বসে রইলুম, তারপর জ্যোৎস্না ফুটবার পূর্ব্বেই লতানো পলাশের একটা গুচ্ছ তুলে নিয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডি চলে এলুম।

বড় সুন্দর জ্যোৎস্না! বাংলার বাইরে ভিন্ন এ ধরণের ছায়াহীন অদ্ভুত ধরণের জ্যোৎস্না বড় একটা দেখা যায় না। বাদলবাবুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে চোখ ফেরানো যায় না যেন—জ্যোৎস্নারাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে যদিও; তবুও কি তার চেহারা!

হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েচি। চা খেয়ে ওপারের বনে বেড়াতে যাওয়ার পূর্ব্বে গালুডির হাটে বেড়াতে গেলুম। ১৯৩৪ সালের গুডফ্রাইডের ছুটির পরে এই হাট আমি আর কখনো দেখিনি। সেই পুরানো দিনের মত টোমাটো, শুট্‌কি মাছ, মহুয়ার তেল, বাজে লাড্ডু আর তেলের খাবার বিক্রী করচে। সাঁওতাল মেয়েরা গল্প করচে, পাঁচগ্রামের লোকের সঙ্গে আলাপ করচে। কাল ঠিক এই সময়ে কিন্তু রংপুরের সভাতে বসে আছি।

পরদিন ভোর ছ'টাতে আমরা চারখানা গরুর গাড়ি করে দীঘাগড়া পাথর খাদানে রওনা হই। প্রথমে তো যাবার রাস্তা এরা ভুল করলে। ফুলকাল ও বনকাটি দিয়ে না গিয়ে প্রায় চলে গেল ঘাটশিলার কাছাকাছি। কালাঝোর পাহাড়টা প্রায় সেখানে শেষ হয়েচে। বাদল-বাবু কেবলই বলে, এখনো পথটা আসেনি, আরও আছে। এমনি করে অনেকটা গিয়ে তারপর বাঁ-ধারে পথ পাওয়া গেল। ঝাঁপড়ি শোল বলে একটা সাঁওতালি গ্রামের প্রান্তে গাছতলায় সবাই শতরঞ্চি বিছিয়ে চা খেতে বসা গেল। মেয়েরা চা করতে লাগলেন। ভিক্টোরিয়া দত্ত খাবার দিলেন সবাইকে। বেলা ন'টা। সামনে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে ঘন বন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরের গ্রামের এক পল্লীবালিকা এতক্ষণ বকুলতলায় কি করচে মনে হল। চা খাওয়া শেষ করে একটা সাঁওতাল ছোকরার সঙ্গে দেখা। আমি তখন গরুর গাড়ি ছেড়ে একটু এগিয়ে চলেছি। সে বল্লে—দীঘার চেয়ে বাসাডেরার বন খুব বেশী। কিছু পয়সার লোভে সে আমাদের বাসাডেরা নিয়ে যেতে রাজী হল। নীরদবাবু কেবলই কালকার জ্যোৎস্নারাত্রির কথা বলছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি আমার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন আর একদিন জ্যোৎস্নায় আমরা আবার এখানে আসব। বনের শোভা বড় সুন্দর। প্রথম বসন্তে শৈলসানুর বনে অজস্র গোলগোলি ফুলের গাছে ফুল ফুটেচে, পলাশ ফুটেচে, সাদা সাদা এক ধরণের ফুল, গাড়োয়ানেরা বললে, বুররা। লোহাজালির ফুলে বেশ সুগন্ধ—আর যেখানে সেখানে প্রস্ফুটিত শালমঞ্জরীর তো কথাই নেই—সুবাসে দুপুরের বাতাস মাতিয়েচে। বনের মধ্যে একটু কুয়া এক জায়গায়, সাঁওতালেরা জল নেয়। আমরা সেই কুয়ার জল খেয়ে নিলাম। ডাইনে বেঁকে বনের মধ্যে বুরুডি গ্রাম। একটা পাথরের কারখানাতে পাথরের গেলাস, থালা, বাটি, খোরা তৈরী হচ্ছে, মেয়েরা নেমে কারখানা দেখতে গেলেন—আমরাও গেলুম সঙ্গে। বেলা সাড়ে দশটা। খুকু এতক্ষণ ওদের রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে রাঁধতে বসেচে। ক্রমশঃ বন গভীর হয়ে এল। পথের ধারে বন্য হস্তীর পদচিহ্ন গাড়োয়ানেরা দেখালে। গাইড্ ছোক্‌রা বল্লে, বনে খুব মজুর আছে। মজুর? মজুর কি? একজন গাড়োয়ান্ বল্লে, বাবু, আপনারা যাকে ময়ূর বলেন। এ বনে যেখানে সেখানে পলাশ গাছ, লতার মত জড়িয়ে উঠেছে অন্য বড় গাছের গায়ে—ফুল ফুটে রয়েচে। গোলগোলি গাছটা এ বনে তত দেখচিনে। এক-স্থানে উঁচু ঘাট, অনেকটা শিলং-সিলেট্ রোডের মত, ডাইনে নীচু খাদ—গরুর গাড়ি খুব কষ্টে উঠতে লাগল। বাসাডেরা গ্রামের চারিধারেই পাহাড়, মধ্যে একটা উপত্যকায় একটি সাঁওতালি বস্তি। গ্রামের লোকেরা আমাদের গাড়ির দিকে অবাক চোখে চেয়ে দেখচে। বাসাডেরা গ্রাম পার হয়ে কি একটা বেগুনি রংয়ের বড় ফুলগাছ দেখলুম জঙ্গলে—খুব জঙ্গল এদিকটাতে। এখানে ঝাটি-ঝর্ণা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে জঙ্গল আরও অনেক বেশী। ঘন জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কত গ্রাম রয়েচে। পাহাড়ী ঝর্ণা তাদের জল যোগাবার একমাত্র স্থান। বাসাডেরা

গ্রাম ছাড়িয়ে এমন হল যে জল কোথাও পাওয়া যায় না—আমি একটি উপলাকীর্ণ শুষ্ক নদী খাতের পাশের জঙ্গলে একটা মোটা লতার উপর উঠে বসে রইলুম। একটু পরে গাইড্ এসে জলের সন্ধান দিলে। পাহাড়ী ঝর্ণা বেয়ে এক জায়গায় জলাশয় সৃষ্টি করেচে। আমি সাঁতার দিয়ে সেই জলাশয়ে স্নান করলুম। মেয়েরা রান্না চড়িয়ে দিলেন। আমি ও কনক ডান দিকের পাহাড়টাতে উঠলুম। কনক কিছুদূর গিয়ে আর উঠতে সাহস করলে না—আমি একটা মসৃণ পাথর বেয়ে উঠে গেলুম। খুব ওপরে প্রায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকের পাহাড়-গুলো চেয়ে দেখলুম। সব পাহাড়ের মাথাতেই বন। বনে আগুন লেগেছিল কিছুদিন আগে, এখনও এ পাহাড়ে একটা মোটা শেকড় ধোঁয়াচ্ছে। একটা শিবগাছের রেণু হাতে মেখে মুখে দিলাম, যেন পাউডার মুখে মাখচি এমনি সাদা হয়ে গেল। নামবার সময় মসৃণ পাথরখানা বেয়ে আর নামতে পারিনে, মাঝামাঝি এসে আটকে গেলাম—অবশেষে একটা শেকড় ধরে এসে নামলুম কনক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অবস্থা দেখে কনকের ভয় হয়ে গিয়েছিল। আরও নেমে এসে তবে সেই জলাশয় ও সেই প্রস্তরাকীর্ণ উপত্যকা, যেখানে মেয়েরা রান্না করবেন। নেমে এসে দেখি রান্না হয়ে গিয়েচে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে ও বিশ্রাম করতে বেলা গেল। রওনা হবার সময়ে দেখি আমার পায়ের আঙুলে পাহাড়ে ওঠবার সময়ে যে চোট লেগেছিল, তার দরুণ দস্তুরমত ব্যথা হয়েচে। সুতরাং গরুর গাড়িতে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে এমন সুন্দর অপরাহ্ণ নষ্ট করে ফেলতে হল বাধ্য হয়ে—কেবল পাহাড়ের ঘাট পার হয়ে ঘন জঙ্গলের পথে খানিকটা খালি পায়ে হেঁটে এসেছিলুম। পথে জ্যোৎস্না উঠল। এক জায়গায় বনের মধ্যে গাছতলায় আমরা শতরঞ্জি পেতে বসে চা করে খেলাম, গল্পসল্প করলাম। তারপর ক্রমেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটল। অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। আর সেই বনভূমি, অজস্র গোলগোলি ও পলাশ যেখানে ফুটে রয়েচে, যদিও জ্যোৎস্না রাত্রে এমন ফুল আদৌ দেখা যাচ্চে না। বন-কাটি নামে একটা খুব বড় সাঁওতালি গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা বড় শাল-বনের পাশ কাটিয়ে রাত এগারোটার সময়ে গালুডি এলাম। আমরা যখন এলুম, তখন মেল ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল স্টেশনে।

পরদিন দোল। ভিক্টোরিয়া দত্তদের বাড়ি রং খেলা হল—আমি শালমঞ্জরী ভেঙে নিয়ে আজ প্রায় চার বৎসরের পরে বলরাম সায়েবের ঘাটে নাইতে গেলাম। বিষ্ণু প্রধান নাইচে, দোল খেলার রং সাবান দিয়ে তুলে ফেলচে। স্নান করবার সময়ে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য আর সেই একটা গাছের আঁকা-বাঁকা সীমারেখা যেন ঠিক একটা ছবির মত মনে হচ্ছিল। দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠে চা খেয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে ওপারের জঙ্গলে বেড়াতে গেলুম। একটা গাছ ঠেস দিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পায়ে ব্যথা ছিল। কিন্তু বেশী হাঁটতে হয় নি। কালকার গাড়োয়ান সুজন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, তার আগে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল পঞ্চুবাবুর বাংলোয় আমাদের পুরোনো চাকর কেষ্ট। সুজন আমায় গাড়িতে উঠিয়ে নিলে—তারা পাথর আনতে যাচ্চে সুবর্ণরেখার ওপারে।

কতক্ষণ বসে থাকার পরে চাঁদ উঠল। ছোট শাল-চারার জঙ্গল—অপূর্ব্ব শোভা হল চাঁদের আলোতে! কতক্ষণ জঙ্গলে এখানে ওখানে বসি, কখনও বা শুক্‌নো শাল পাতার রাশির ওপর শুই। সুবর্ণরেখার নদীগর্ভে কতক্ষণ ওপারের পাহাড়ের আলোর মালার দিকে চেয়ে বসে রইলুম। জ্যোৎস্না পড়ে নদীখাতের শুক্‌নো বালির রাশি চক্‌চক্ করচে, দূরে মৌভাণ্ডার-এর আলো—ডাইনে টাটার আলো। ওপারের জঙ্গলের রেখা মুসাবনীর দিকে বিস্তৃত—অল্পক্ষণের জন্তে মনে হল ঠিক যেন ইসমাইলপুরে ঘোড়া করে জ্যোৎস্নারাত্রে বনঝাউয়ের বনের পাশ দিয়ে

কাছারী ফিরচি ভাগলপুর থেকে। বাড়ি ফিরে এসে দেখি গালুডি সুদ্ধ মেয়ে পুরুষ একত্র হয়েচে—দোলের ভোজ হচ্চে, মাংস পোলাও কত কি আয়োজন। আমায় দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠল—Leader-এর এ কি ব্যাপার! এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন?···ইত্যাদি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত বারোটায় রাঁচী এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হই। আজ এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে জেগে বসে থেকে জ্যোৎস্নাময়ী মুক্ত প্রান্তর ও দূরবর্ত্তী শৈলমালার কি শোভাই যে দেখলুম, তা বর্ণনা করতে গেলেই ছোট হয়ে পড়ে। সে মহিমা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে বোঝাবার না। রাত্রে সারারাতই জ্যোৎস্নালোকিত শালবনের শোভা দেখতে দেখতে এলাম। খড়্গাপুর ছাড়িয়ে একটু ঘুমিয়েছিলাম।

সেদিনই স্কুলের পর ভাটপাড়া গেলাম। রাত আটটার সময় ঘোড়ার গাড়ি করে ঘোষ-পাড়ায় দোল দেখতে গেলুম—সঙ্গে ছোট মামীমা ও মাসীমা। বাল্যদিনে গরিফা হয়ে হালিশহর হেঁটে দু'একবার গিয়েছি, সে অনেককালের কথা। তারপর কতকাল পরে আবার গরিফা দেখলুম, হাজিনগর মিল দেখলুম, হালিশহরে পাম্প-ওয়ালা বাঁধা ঘাট ও ৺ঈশান মিত্রের বাড়ি দেখলুম। হালিশহরের বাজারের সেই সব সুপরিচিত গলি ও রাস্তা দেখতে দেখতে বাস্ ও কাঁচড়াপাড়া ছাড়িয়ে রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় ঘোষপাড়ার মেলাস্থানে পৌছে গেলাম। মেলার স্থান, ডালিমতলা ইত্যাদি হয়ে পালেদের বাড়ির মধ্যে গেলুম, গোপাল পাল সেখানে মোহান্ত সেজে বসে যাত্রীদের কাছে পয়সা আদায় করচে। নলে পালের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম—সে এক সাহার কাপড় সংক্রান্ত কি মোকদ্দমার মীমাংসা আমায় করতে দিলে। আমি বল্লুম—ও সব এখন পারব না।

মামার বাড়ি গিয়ে নিচুতলার দিকে দরজা খুলে ছাদের ওপর গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না ফুট্ ফুট্ করচে ছাদের ওপরে। নীচের ছোট ঘরটা বা যে ঘরে গৌরী বসে পান সাজত—সে সব ঘর বেড়িয়ে এলুম। খুকুদের বাড়ির ছাদের মত—এই তো সবে রাত দশটা—হয়তো ন'দিদিদের বাড়ি সবাই গল্প করচে, কি তাস খেলচে। ছোট মামীমা চা করচে, আমরা গল্প করতে করতে চা পান করলুম। পটলমামার এক ছোট মেয়ে বেড়াতে এল। রাত এগারোটার সময় মেয়েদের আলাপ শেষ হল, সবাই মিলে আবার এলুম দোলতলায়। কোথায় কাল এ সময়ে গালুডিতে দোলের ভোজ চলচে, দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি ও কালাঝোর শৈলমালা ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট দেখাচ্চে—আর আজ কোথায় কোন পুরোনো স্মৃতি জড়ানো রাজ্যের বুকের মধ্যে এসে পড়েছি! রাত অনেক হয়েচে। শান্তিদের দোকানে গিয়ে ওকে জাগিয়ে কদ্‌মা কিনে সবাই ঘোড়ার গাড়িতে এসে উঠলুম। রাত দুটোতে ভাটপাড়া পৌছাই।

ভাটপাড়া থেকে এলুম শুক্রবার সকালে, শনিবার গেলুম বনগাঁ। এই সপ্তাহটা অদ্ভুত ধরনের বেড়ানো হল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। বনগাঁ পৌছেই চলে গেলুম খয়রামারির মাঠে ও রাজনগরের বটতলাটাতে। মনে পড়ল আজ যখন বটতলার ঝুরি ঠেস্ দিয়ে বসে, সেদিন এম্‌নি সময় কুমীরমুড়ির জঙ্গলে সুবর্ণরেখার ওপারে ঠিক এম্‌নি একটা গাছ ঠেস্ দিয়ে বসেছিলুম—কিংবা তারও আগের দিন বাসাডেরার বন্য পথ দিয়ে গরুর গাড়ি করে গালুডি ফিরচি। ওখানে কতক্ষণ বসে তারপর মাঠের মধ্যে এসে বসলুম। হু হু হাওয়া বইচে, রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধে বাতাস ভরপুর।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুর চলে গেলুম। খুকু রান্নাঘরে রাঁধচে, বেলা দশটা, আমি ইন্দুদের বাড়ি একটু বেড়িয়ে তারপর খুকুদের রান্নাঘরে গিয়ে ডাকচি, ও খুড়ীমা, খুড়ীমা!—খুকু

আমায় দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েচে। বল্লে—আপনি কখন এলেন? বললুম, এই তো খানিক আগে আসচি। দুজনে গল্প করচি, তখন খুড়ীমা এলেন। আমি একটু পরে বরোজপোতার বাঁশবনে ঘেঁটুফুলের বন দেখে স্নান করতে গেলুম আমাদের ঘাটে। তিত্তিরাজ ফলের বীচির গন্ধ, মাটির গন্ধ, শুক্নো পাতা ও ডালের গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, কঞ্চির গন্ধ—নানা প্রকার জটিল ও বহুদিনের সুপরিচিত, বহুদিনের কত পুরোনো-কথা-মনে-আনিয়ে দেওয়া গন্ধের সমাবেশ। তাই আমাদের ঘাটে স্নান করে উঠে বকুলতলাটা দিয়ে যখন আসি, মন যেন এক মুহূর্ত্তে নবীন হয়ে বাল্যদিনে চলে গেল বাল্যদিনের পরিচিত গন্ধে। গালুডি ও সিংভূমের বনের সঙ্গে কোন স্মৃতি নেই কাজেই তা রুক্ষ ও বন্য—বাংলাদেশের এই প্রকৃতি মায়ের মত নিতান্ত আপন, নিতান্ত ঘরোয়া এর প্রতি ভঙ্গিটি আমার পরিচিত ও প্রিয়।

চলে আসবার সময়—সন্ধ্যার গাড়িতে চলে এলুম—খুকু ওদের দাওয়ার পৈঠেতে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। চুমরি বাগানে কি অজস্র ঘেঁটুবন, আর কি তার মিষ্টি গন্ধ! আমার মনে ভারী আনন্দ, আর তার সঙ্গে ঘেঁটুফুলের গন্ধটা মিশে আনন্দ ঘনীভূত করে তুললে। বেলা পড়ে এসেচে, হাট থেকে লোক ফিরচে। নানা রকম গাছ, লতাপাতার সুগন্ধ বেরুচ্চে—শুক্নো জিনিসের গন্ধই বেশী, শুক্নো ফল, শুক্নো মাটি, শুক্নো রড়া-ফলের বীজ, শুক্নো ডাল পাতা—এই সব গন্ধ।

রাত সাড়ে দশটায় এসে কলকাতায় পৌঁছাই, গত শুক্রবার রংপুর যাওয়া থেকে আরম্ভ করে নানা রকম বেড়ানোর অভিজ্ঞতা এ সপ্তাহে যা হল, সচরাচর ঘটে না। রংপুর থেকে এসেই গালুডি ও বাসাডেরার জঙ্গল—অমনি সেখান থেকে ফিরেই পুরোনো বাল্যদিনের হালিশহর, শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, বল্‌দেকাটা বাগ ও কাঁচড়াপাড়ার মধ্যে দিয়ে ঘোষপাড়ার দোল ও মুরারিপুরের বাড়ির ছাদে জ্যোৎস্নারাত্রে বসে চা খাওয়া—অমনি সেখান থেকে পরদিন রাজ-নগরের বটতলা ও বরোজপোতার বাঁশবন ও ঘেঁটুবন, এ সত্যিই অতি দুর্লভ আনন্দ!

প্রায় একমাস লিখিনি। অনেক রকম ব্যাপার গেল মধ্যে। একদিন রাজপুর রিপন লাইব্রেরীর উৎসবে কৃষ্ণধন দে, অপূর্ব্ব বাগচি, রমাপ্রসন্ন ও গৌরকে নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। ভাঙা রাসমঞ্চে বসে ভদ্রলের সঙ্গে সেদিন খুব আনন্দ করা গিয়েছিল। মাচাতলায় বসে ফুলির সঙ্গে অনেক গল্প করি। ফুলিদের বাড়ি আবার ওরা চা খেলে। জ্যোৎস্নারাত্রে ওদের বাড়ির সামনে মাঠে বসে বেশ লাগছিল।

তারপর ইস্টারের ছুটির আগে একটা শনিবারে বনগ্রামে গেলুম এবং ছোটমামার ছেলের পৈতের জন্যে বৈকালের ট্রেনে রানাঘাট হয়ে এলুম। সেদিনটাতে নিজের মনের চিন্তা নিয়ে ভারী আনন্দ পেয়েছিলুম। মামার বাড়িতেও সন্ধ্যার সময় অনেকের সঙ্গে আলাপ হল।

ইস্টারের ছুটিটাও এবার বেশ কেটেচে। খুকুরা ওখানে আছে। আমি বসে কাগজ দেখতুম, খুকু এসে ডাকত ওদের উঠোন থেকে—বলত, এদিকে আসুন না? গিয়ে গল্প করতুম। ওদের রান্নাঘরে বসে কত গল্প করেচি।

বনগাঁয়ের সরকারী ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী একদিন গ্রামোফোন নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ি হাজির। খুব গান হল। খুকুরা ছাদ থেকে শুনলে।

আমি ও ইন্দু জ্যোৎস্নারাত্রে রোজ নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম—একদিন তেঁতুলের নৌকোতে পার হয়ে ওপারের উলুটি বাচড়ায় বসে কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করি।

খুকু একদিন বল্লে—চা খাওয়াব, সন্দেবেলা আসবেন। গেলুম সন্দেবেলা, কিন্তু সেদিন কি

একটা কাজ পড়াতে চা খাওয়া আর হল না।

সেদিন মরগাঙের ধারে বেলেডাঙায় পাঠশালার নীচে গিয়ে বসেছিলুম ইন্দুর সঙ্গে। ইস্টার-মন্ডের দিন রত্নাদেবী দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে টাওয়ার হোটেলে খুব গল্প-গুজব করি। তিনি তাঁর হাতে আঁকা ছবি একখানা দিলেন আমায়।

আজ বহুদিন পরে গিয়েছিলুম নন্দরাম সেনের গলিতে সেই প্রসন্নদের বাড়ি। বাল্যে এখানে কিছুকাল কাটিয়েচি। আমার তরুণী মায়ের মুখের শাঁখ যেন এই সন্ধ্যায় এ অঞ্চলে কোথায় আজও বাজচে। প্রসন্ন বসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। প্রসন্নের মা মারা গিয়েছেন গত ফাল্গুন মাসে। সেই মাখম বুড়ী এখনও বেঁচে আছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে এসেচি। বেশ লাগচে এবার। ছুটি হবার দুদিন আগেই এসেছিলুম, বনগাঁয়ে প্রথমদিন দুপুরবেলা খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গিয়ে বিল্বফুলের সুগন্ধ আর দুপুরের খর রৌদ্র, নীল আকাশ আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে একঘেয়ে কলকাতার সংকীর্ণ জীবন ছেড়ে মুক্ত প্রকৃতির কোলে এসেচি। দু'দিন পরেই বারাকপুর এলুম, খুকু এখানেই আছে, সে সকালে শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে গল্প করে—বনসিমতলার ঘাটে আবার সেদিন ওর সঙ্গে দেখা নাইবার সময়ে, আজ দুপুরে যখন ঝড় উঠল, ও এলো ছুটে আম কুড়ুতে, আমি বিল্‌-বিলের ধারের আম গাছটার দুটো আম ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলুম—দুটো মোটে পেয়েছিল—দুটোই দিয়ে দিল আমাকে। স্নান করে এসে রোয়াকে দাঁড়াতেই ছুটে ওদের সামনের উঠোনে এসে জিগ্যেস করলে—বনগাঁয়ে যে বিয়েতে গিয়েছিলেন—বর কেমন হল তাদের ?…এসব ১৯৩৪-৩৫ সালের সুন্দর গ্রীষ্মাবকাশ মনে এনে দেয়।

সত্যিই এবার ভারী ভাল লাগচে এখানে এসে। একদিন কুঠীরে মাঠে বৈকালে বেড়াতে গিয়েচি, দেখি দুজন লোক খাঁচা নিয়ে ফাঁদ পেতে ডাক পাখী আর গুড়গুড়ি পাখী ধরচে। গুড়গুড়ি পাখী ডাকে কেমন সুন্দর! আমি ও-ডাক অনেক শুনেচি, কিন্তু ও যে গুড়গুড়ি পাখীর ডাক তা জানতুম না।

কাল বৈকালে আদিত্যবাবুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে বিকেলে গেলুম বনগাঁ। সঙ্গে ইন্দুর ছেলে গুটুকে গেল। চাল্‌কীপাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কি চমৎকার গ্রাম্য-ছবি—চাষার মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাইয়ে হাত মুখ ধুইয়ে দিচ্চে, কেউ বা কাঁথা সেলাই করচে ঘরের দাওয়ায় বসে। সারা পথ বেশ ঝড়ের মত হাওয়া—দুপুরের অসহ্য গুমটের পরে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। চাঁপাবেড়ের কাছে ভীষণ মেঘ ও কালবৈশাখীর ঝড়। ডালপালা, ধুলোকুটো উড়িয়ে নিয়ে আসচে—পথ দেখবার জো নেই—ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল। আমি একটা শিশু-গাছের গুঁড়িতে ছেলেটাকে নিয়ে বসি। বাসায় পৌঁছে ওকে কিছু খাবার খাওয়ালুম। মন্মথ-বাবুর লিচুতলার আড্ডায় খুব গল্প করে আদিত্যবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খাই। গরমে কিন্তু রাত্রে ঘুম হল না। জলপাইগুড়ি ছাত্র-সমিতি থেকে সেখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েচি, কিন্তু এখন যাওয়া অসম্ভব।

আজ সকালে দুজনে দিব্য হেঁটে বারাকপুর এলুম। পথে চালকি দিদির বাড়ি গেলুম। দিদি যত্ন করে বেলের পানা, চা, ক্ষীর, কাঁটাল খাওয়ালেন।

বাড়ি আসবার একটু পরেই নামল বৃষ্টি। সেই থেকেই বাদলা চলচে—এখন বেলা পাঁচটা, বৃষ্টি গুঁড়িগুঁড়ি পড়চে। কাল গিয়েচে যেমন অসহ্য গরম, আজ তেমনি ঠাণ্ডা।

সুপ্রভাকে পত্র দিয়েচি, তার চিঠিও এরই মধ্যে পাব আশা করচি। ইতিমধ্যে পিরোজপুর

থেকে যে নিমন্ত্রণ এসেচে, তারই কি করা যায় ভাবচি। সভাসমিতি করে বেড়ানো এ সময়টা মোটেই ভাল লাগে না।

আজ সকালে গোপালনগরে গিয়ে অনেকগুলো চিঠি ডাকে দিলুম। বাড়ি এসে আমতলায় চেয়ার পেতে বসে অনেকদিন পরে Cleopetra পড়চি, এমন সময় খুকু আমার কাছ দিয়ে ন'দিদিদের বাড়ি থেকে গেল। ইচ্ছে করেই গেল, কারণ সুপ্রভাকে চিঠি লিখতে চাইনি। সেই রাগটা নরম করাতে যে এল, এটি বেশ বোঝাই যায়। ওদের দাওয়ার এধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত গল্প করলে।

বিকালে আমি The Croxley Master বলে Conan Doyle-এর একটা গল্প পড়তে পড়তে বেলা গড়িয়ে ফেললাম। উঠতে আর পারিনে—এমন কৌতূহল। Conan Doyle ছোট গল্পে ভালো শিল্পী ছিলেন। তাঁর A Struggle of 15 এবং আরও দু'একটা গল্পের মধ্যে দেখেচি, বড় শিল্পীর কৌশল বর্ত্তমান। এত খুঁটিনাটি বর্ণনার ওপর দখল (অদ্ভুত দখল!) নিম্নশ্রেণীর শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সামান্য একটু আধটু সেকেলে claptrap টেক্‌নিক্ আছে—তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

তারপর কুঠীর মাঠ দিয়ে আইনদ্দির বাড়ির পেছনকার উঁচু মরাগাঙের পাড় পর্য্যন্ত গিয়ে সেখানে খানিকটা বসে রইলুম। বেলা একেবারে গিয়েচে। সেই যে রাখাল ছোঁড়া আমায় তামাক খাওয়াত, গত কার্ত্তিক মাসে যখন কুঠীর পেছনের বন-ঝোপের ধারে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম—সেই ছোক্‌রা দেখি পুলের নীচের ঘাট থেকে নেয়ে উঠচে। বল্লে—ভাল আছেন দাদাবাবু? কবে এলেন?

একটু পরে প্রমথ ও তার ভাই-এর সঙ্গে দেখা। সাইকেলে গোপালনগর থেকে ফিরচে। সে বনগাঁ স্কুলের মাস্টার। তার জানবার একমাত্র দরকার দেখলুম ওদের স্কুলের ছেলেরা বাংলায় কত নম্বর পেয়েচে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বেলেডাঙায় গোয়ালাদের দোকানে বসে একটু গল্প করে মাঠের মধ্যে দিয়ে এসে যখন আমাদের ঘাটে নাইতে নামলুম—তখন অন্ধকার আকাশ তারায় তারায় ভরে গিয়েচে। সাঁতার দিয়ে গেলুম ওপারে। এপারের ঘন অন্ধকার বন-ঝোপে কি জোনাকি পোকার মেলা!

ফিরে এসে খুকুদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম—হীরাবাঈ ও কেশরীবাঈ-এর গানের সম্বন্ধে, 'Life of Emile Zola' ফিল্ম সম্বন্ধে। খুকু বল্লে—সেই যে কি একটা ফিল্ম দেখে-ছিলেন—পাহাড় থেকে পড়ে গেল, কি একটা চমৎকার কথা আছে তাতে?

আমি তখনই বুঝতে পেরেচি, ও 'A Tale of Two Cities'-এর কথা বলচে।

বল্লুম—কথাগুলো কি? 'I am the life and the Resurrection. He who believeth in Me'—এই পর্য্যন্ত বলতে বলে উঠল—হাঁ, হাঁ—ঠিক।

বল্লুম—পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া তো নয়—গিলোটিনে যখন ওদের প্রাণদণ্ড হচ্ছে—সে সময়।

ও বল্লে—ঠিক, এবার সব মনে হয়েচে।

মনে এবার কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও উত্তেজনা।

কাল পচার সঙ্গে বিকেলে কুঠীর মাঠের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে যখন বেলেডাঙায় কামার

দোকান পর্য্যন্ত গিয়েচি, আইনদ্দির চাচা ডাক দিলে।

—কি চাচা, কেমন আছ?

চাচা বিদ্যাসুন্দর ও মহাভারত দিব্যি মুখস্থ বলে গেল। বল্লে, একখানা বিদ্যাসুন্দর আমার ছেল, কে যে নিয়ে গেল!

তারপর আমরা গিয়ে কলাতলার দোয়াতে বসলুম। ভারী সুন্দর জায়গা। অনেকখানি জল আছে। জলের একধারে ফুল ফোটা হিঞ্চের ক্ষেত। জলের ধারে দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাস। বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা জায়গা। দূরে বট-অশ্বত্থের সারি।

আজ বৈকালে কলাতলার দোয়াতে বেড়াতে গেলুম। চমৎকার ঝিঙের ফুল ফুটেচে। অনেকক্ষণ কাটালুম বৈকালে—এদের সকলের কথাই মনে হল। ঘর সংক্রান্ত একটা গোলমাল হয়েচে, মট্‌কা কাল ঝড়ে উড়ে গিয়েচে—ভগবান এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

অনেকগুলো চিঠি নানা জায়গা থেকে আজ এসেচে। প্রকাশকদের নিকট থেকে, সভা-সমিতি সংক্রান্ত ইত্যাদি। সুপ্রভার চিঠিও ছিল। কলাতলার দোয়াতে জলের ধারে বসে কত কথা মনে এল। রেণুর একখানা পত্রও পেয়েছি আজ অনেকদিন পরে। চাটগাঁয়ে গিয়েছিলুম সেই কতদিন আগে—এখন আমাদের দেশের এই খেজুরের কাঁদিভরা খেজুর গাছ, ওল গাছ, ঝিঙের ক্ষেত, ধানক্ষেত, বট-অশ্বত্থের গাছ, ওপারে আরামডাঙ্গার বাঁশবনে অস্তসূর্য্যের হল্‌দে রোদের দিকে চেয়ে সে কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

গোপালনগর যাচ্চি, দারিঘাটার পুল থেকে বাঁওড়ের ওপারের কি একটা গাছ, অনেকখানি নীল আকাশ—দেখে মনে হল এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের পিছনে যে শক্তি আছেন, সেই শক্তি মানুষের সুখ-দুঃখে সাড়া দেন এবং benevolent নিশ্চয়ই—ওবেলা একটা বিশেষ ঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েছি। মনে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগলো এই কথাটি ভেবে। বস্তুতঃ এই ভাগবতী শক্তি—যে মুহূর্ত্তে আমরা জীবনের পথে মেনে নেব—এর বাস্তবতা অনুভব করব—সেই মুহূর্ত্তে আমরা আধ্যাত্মিক নবজীবন লাভ করব।

সন্ধ্যার পরে ইন্দুদের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। ফণিকাকা ছিল বসে—১৩০৫ সালে রামচাঁদ মারা যান, সে কথা হল। যুগলকাকার মা আর সরোজিনী পিসীদের, ত্রিনয়নী পিসীমা (তখন বালিকা) ফণিকাকাদের বাড়ি থাকত সারাদিন, খেত—কারণ খুব গরীব তখন ওরা—সেইসব গল্প শুনলুম।

রোয়াকে বসেচি। তারা ভরা আকাশ। গভীর রাত্রি। পাশের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে। আবার সেই সক্রিয়, হৃদয়বান, (পার্থিব ভাষায়) benevolent শক্তির কথা মনে এল। এই শক্তিই ভগবান। যে মনে মনে একে মানে, এই শক্তির বাস্তবতা অনুভব করে প্রাণে প্রাণে, সে সকল বিপদ, দুঃখ, সংকীর্ণতা, মলিনতাকে জয় করে।

বৈকালে সাজিতলার ঘাটে টিনের চালায় আমি আর পচা গিয়ে বসলুম। সারাদিন ঝড় চলচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসচে।

বাল্যে আমি আর ভারত এমন দিনে এই গ্রীষ্মের ছুটিতে দিগম্বর পাটনীর খেয়া নৌকোতে মাধবপুরের হাটুরে লোকদের পার করতুম—সে কথা মনে পড়ল। একবার আমার পাঠশালার সহপাঠী বন্ধু পার্ব্বতী আর তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কি আনন্দের দিনই গিয়েচে!

শম্ভু কি করে মারা গেল ইন্দু সেই গল্প করছিল। ওখান থেকে উঠে আমরা কুঠীর মাঠের দিকে গেলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে মেঘান্ধকার আকাশের নীচে এপার ওপারের শ্যামল মুক্ত মাঠ ও বনানীর, ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর কি শোভা! পচাকে আর সঙ্গে নিয়ে যাব না—কথা বলে সব মাটি করে দেয়।

ভীষণ ঝড়বৃষ্টি সকাল থেকে। এক মুহূর্ত্তের জন্যে বিরাম নেই। খুড়ীমা এলেন বৃষ্টি মাথায় চা নিয়ে। বল্লেন—খুকু করেচে, বলছিল, বিভূতিদা'কে একদিন চা করে খাওয়াব বলেছিলাম, তা আজ করি। একটু পরে চায়ের বাটি ওদের বাড়ী দিতে গিয়েচি, খুকু বল্লে—জল খাবেন না? মা জিগ্যেস করল। অর্থাৎ মুড়ি দিয়েছিল চায়ের সঙ্গে তাই জল খাব কিনা জিগ্যেস করচে। জলের ঘটি ওর কাছেই ছিল, নিয়ে জল খেলাম। তারপর গোপালনগর এলাম 'আরণ্যক'-এর প্রুফ্ ডাকে দিতে। মাঝের গাঁয়ের জিতেন সাধু দেখি তেরোখানা মোটর নিয়ে চলেচেন। চালকীর জিতেনদা' একখানা মোটরে ছিলেন—সেখানায় দেখি মোটেই স্থান নেই। কাজেই তখন রেল লাইন দিয়ে হেঁটেই পাঁচ মাইল রাস্তা চলে গেলুম। পূর্ব্ব দিকের আকাশ চমৎকার নীল দেখতে হয়েচে। আমি স্টেশনে পৌঁছেচি, অন্ধকারও নামল। অমূল্যবাবুদের বাড়ি গিয়ে সারারাত জাগা, বিজয় মুখুজ্যে আর অনাথ বোসের গান হল। রাত চারটে যখন বেজেচে তখন বীরেন সামনের একটা বাড়ির দোতলায় শোয়াতে নিয়ে গেল আমায়। তখন ঘুম হওয়া সম্ভব নয়, একটু পরেই ফর্সা হয়ে গেল। আমি মিনুদের বাড়ি চলে এলুম। সেখানে ওরা ছাড়লে না—খাওয়া-দাওয়া করিয়ে তবে ছেড়ে দেয় বেলা দুটোর পরে। আড়াইটার ট্রেনে জিতেন ঠাকুরের দলবলের সঙ্গে গোপালনগরে নামি। ওরা মোটরে কলকাতা চলে গেল। তারপর নামল ঘোর বৃষ্টি। আমি এখানে ওখানে বসে গল্প করে সন্ধ্যার আগে বাড়ি এলুম। খুড়ীমা ডাকছেন ও-বাড়ি থেকে, বিভূতি এলে নাকি? বল্লুম—হ্যাঁ খুড়ীমা। তারপরে ওদের ওখানে ঘরে গিয়ে কাল রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করি।

সকালে বিশেষ কাজে গোয়াড়ী যেতে হয়েছিল। একটা বড় চমৎকার অভিজ্ঞতা হোল। আজ প্রায় ৩৩ বছর পরে আমাদের বাল্যের চাটুয্যে বাড়ির ঠাকুরমায়ের নাতনী লীলাদিদির সঙ্গে দেখা হল। গোয়াড়ীর মধ্যে এক সময়ে যদু চাটুয্যে বিখ্যাত উকিল ছিলেন, লীলাদিদির সঙ্গে তাঁর বড়ছেলে হরি চাটুয্যের বিবাহ হয়েছিল। লীলাদিদি এক সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন—আমি ৩৩ বছর পূর্ব্বে বাবার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিলাম, বছর সাতেক বয়স তখন। লীলাদি কড়ায় করে মাছ ভাজছিলেন—সেকথা আমার মনে আছে। এখন তিনি বৃদ্ধা।

কাল ওঁদের বাড়ি গিয়ে দেখি যদুবাবুর বাড়ির পূর্ব্বের সে সমৃদ্ধি কিছুই নেই। চাকরে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা বসে আছেন—এই বৃদ্ধা যে ৩৩ বছর পূর্ব্বের সেই সুন্দরী লীলাদিদি (এখনও আমার একটু একটু মনে আছে বাল্যে দৃষ্ট তাঁর সে অপূর্ব্ব রূপ), তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও মন দিয়ে গ্রহণ করা শক্ত।

লীলাদিদির এক ছোট বোন, তার নাম যোগমায়া—ছেলেবেলায় আমার খেলার সাথী ছিল। লীলাদিদিই বল্লেন—যোগমায়া আমার মেজমেয়ের বয়সী। সুতরাং যোগমায়া লীলা-দিদির চেয়ে অনেক ছোট। আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিল যোগমায়া। খুকুদের বাড়িতে বাঁশের ও থলের দোলায় করে খেলা করেছিলুম মনে আছে। কার কাছে যেন শুনে-ছিলুম—সেও আজ ১৫।২০ বছর আগে, যে যোগমায়া মারা গিয়েচে। মনে দুঃখ হয়েছিল।

কাল হঠাৎ লীলাদিদির কাছে যোগমায়ার নাম করতেই তিনি বল্লেন—যোগমায়াও এখানে আছে, খোড়োর ধারে তার বাসা।

আমি তো অবাক।

সেই যোগমায়া!···বিশ বছর আগে শুনেছিলুম যে মরে গিয়েচে—আজ বিশ বছর ধরেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যোগমায়া নেই। সে যদি হঠাৎ আজ বেঁচে আছে শোনা যায় তবে সেটা যেন পুনর্জ্জন্মের মত রহস্যময় শোনায়।

যোগমায়ার সঙ্গে দেখা করা কিন্তু ঘটে উঠল না। ট্রেনের সময় ছিল না। লীলাদি চা ও খাবার খাওয়ালেন। দেখা করে বিদায় নিলুম।

এই তো গোয়াড়ী—একদিন দেখা করব যোগমায়ার সঙ্গে।

সুপ্রভার পত্র শ্যামাচরণদাদা দিলে হাজারির দোকানে, আমি তখন স্টেশনে যাচ্ছি। ট্রেনে পত্রখানা পড়তে পড়তে গেলুম। বেশ আনন্দ পাওয়া গেল পত্রখানা পড়ে।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল, কারণ অনেকদিন পরে মেঘ দূর হয়ে রৌদ্র উঠেছিল। খুকু কতকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের শিউলিতলায় বন্দী করলে। বল্লে, ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কষ্ট হয়, না? আমি বল্লুম—সময়ের সার বর্ত্তমান। ভবিষ্যতের ভাবনা মিথ্যে!

বৈকালে পরিষ্কার আকাশের তলা দিয়ে পচার সঙ্গে কলাতলার দোয়া পার হয়ে সুন্দরপুরের কাছাকাছি গেলুম বেড়াতে—এক জায়গায় জলের ধারে দুজনে বসে ওর পঞ্চানন মামা কি করে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিল সে গল্প শুনি। এক গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে ছিল পরমা সুন্দরী, তার বাপকে ওদের সে বখাটে মামা শোনালে যে পচাদের বিষয়ের আট আনার অংশীদার। বিয়ে হয়ে গেল—তারপর মেয়েটার কি দুর্দ্দশা! গল্পটা শুনে মনে বড়ই কষ্ট হল।

জলের ধারে ঝিঙের ফুল ফুটেচে। পরিষ্কার আকাশ, খেজুর গাছে গাছে স্বর্ণবর্ণ খেজুরের কাঁদি। একপাশে সবুজ উলুটি বাচ্‌ড়া বড় বড় বট-অশ্বত্থ, শিমুলগাছ। ওর মুখে গল্প শুনি আর ওবেলার মনের সে আনন্দটা আবার মনে আনবার চেষ্টা করি। কত গাছ, লতা মোটা —একটাতে কেমন দুলবার সুবিধে আছে। বিল্বপুষ্পের বাস এখনও আছে দু-একটা গাছে। বাঁওড়ের ওপারে কি সুন্দর ইন্দ্রনীল রংয়ের আকাশ হয়েচে!

আইনদ্দি চাচার বাড়ি এসে বসি। আমার মনের আনন্দের সঙ্গে আইনদ্দির বাড়ির একটা যোগ আছে। চাচা বসে খালুই বুনচে। ওর সেই নাতি বসে বসে গল্প করতে লাগল। বেশ ছেলেটি। আমি বসে বসে ওপারের বট-অশ্বত্থের সারির দিকে চেয়ে রইলুম। কি সুন্দর আকাশ, কি চমৎকার সবুজ বনশোভা, কত কথা মনে আসে, সুপ্রভার কথা, সে লিখেচে, এবার আর দেখা হবে কবে? সে কথা।

দেখা ওর সঙ্গে করব শ্রাবণ মাসে, ঠিক করেই রেখেছি। সে সময় চেরাপুঞ্জিতে আনারস খুব সস্তা হবে, সে সময় চেরাপুঞ্জির বাজারের সেই খাসিয়া মেয়েটার দোকান থেকে আর বছরের মত আর একটা গোটা আনারস কিনে খেতে পারব, সে সময় যাব শিলং।

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যেমন অপূর্ব্ব দিনগুলো কাটচে, এমন সত্যিই অনেক দিন কাটেনি। সেবারের বড়দিনকেও ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, রসের ও আনন্দের অভিনবত্বে ও প্রাচুর্য্যে।

এদিন বিকেলে পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাইনি। ওর সঙ্গে বেরুলে কেবল বাজে বকে।

প্রকৃতির মধ্যে কিছুক্ষণ নিরিবিলি চুপচাপ বসে চিন্তার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে একাই গিয়ে মরাগাঙের উঁচু পাড়ে আইনদ্দির বাড়ির পিছন দিকে রাস্তার ধারে বসলুম। সঙ্গে সুপ্রভার চিঠিখানা ছিল। ডাইনে মরাগাঙের বাঁকে বাঁশঝাড় ও নতুন পাড়ায় গোয়ালাদের বাড়ি, ওপারে আরামডাঙায় ঝিঙেফুল দু'একটা ঝিঙে ক্ষেত পেছনে একটা কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে, খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর—সত্যিকার ট্রপিক্যাল দেশের দৃশ্য! কলকাতা থেকে কত দূরে, কত নিভৃত, শান্ত পল্লী অঞ্চল আমাদের এ দেশ—কেমন একটা অপরূপ শান্তি মাখানো। ভগবান যে Romance ও poetry-র উৎসমূল, তাঁর মধ্যে যে শুধুই poetry ও Romance এ আমি বেশ অনুভব করলুম। কোথায় বিরাট দ্যুতিলোকের সৃষ্টি, আর কোথায় এই কাঁদি কাঁদি খেজুর, ওই বেগুনী রংএর জলকচুরির ফুল, সুগন্ধ বেলফুল সবই তাঁর মধ্যে কল্পনারূপে একদিন নিহিত ছিল। "কল্পনা সৃষ্টি বীজঞ্চ"। কল্পনাই সৃষ্টির বীজ। "যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা:"—কালিদাস কবি হলেও দার্শনিকের দৃষ্টি তাঁর ছিল। আমরা সকল কবিই অল্প-বিস্তর ভাবে দার্শনিক তো বটেই। অনেক সময় তাঁরা যা দেখেন দার্শনিকেরাও তা দেখতে পান না।

এখানে ক'দিন ভয়ানক বর্ষা চলচে। সকালে উঠে বেড়াতে বার হয়েচি মাছিনপুর বলে একটা গ্রামের দিকে। পাশে একটা ছোট খাল। বাঙাল মাঝিরা নৌকো চালাচ্চে। নারিকেল সুপারির বাগান চারিদিকে প্রত্যেক লোকের বাড়ির উঠানে, ঝুপসি বনে অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে মাটি। টিনের চালা-ওয়ালা দরমার বেড়া দেওয়া সব ঘর—তার বাইরে টিনের সাইনবোর্ড ঝুলচে, "মোজাহার আলি মোক্তার" কিংবা "আজাদ আলি, বি-এল, প্লীডার।" বাড়ির পাশে ছোট ছোট ডোবা মত পুকুর—সুপুরির বাগানটা দিয়ে ঘেরা বেড়ার আবরু। আবর্জ্জনা, পচা-পাতার জঞ্জাল বাড়ির পাশেই, নীচু আর্দ্র উঠোনে বা মেজেতে। এক জায়গায় লেখা আছে 'রসিক-লাল সেন নায়েবের বাসা'। তারপর একটা সরু খালের ধারে ধারে নারিকেল সুপুরির ছায়ায় ছায়ায় কতদূর বেড়াতে গেলুম, ফিরে এসে একটা কাঠের পুলের ওপরে বসলুম। দুটি ছোট ছোট মেয়ে মাছ ধরচে। কতক্ষণ পুলটাতে বসে রইলুম। কি বিশ্রী জায়গা এই পিরোজপুর! পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে যদি কেউ বলে তুমি এখানে এক বছর থাক—তা আমি কখনো থাকিনে। এমন জায়গায় মানুষ থাকতে পারে? রত্না দেবী ও তাঁর স্বামী সত্যিই বড় কষ্টে থাকেন, অমন আমুদে লোক বেশী দেখা যায় না। রত্নাদেবী বড় গল্পপ্রিয়—দিনরাত মুখের বিরাম নেই। আর কি সেবাযত্ন ক'দিন? নিত্য নতুন খাবার তৈরী হচ্চে আমায় খাওয়ানোর জন্যে। বৈকালে বার-লাইব্রেরিতে মিটিং হল, আমার সাহিত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একঘণ্টা বক্তৃতা করা গেল। জ্যোৎস্নারাত্রে বাইরে বসে গল্প করি রত্নাদেবীর সঙ্গে।

পিরোজপুর থেকে এসে মনে কোথায় একটা অযুক্তির দৈন্য ছিল। সেখানকার সেই নারকোল সুপুরি বনের ঝুপ্‌সি ছায়ায় স্যাঁতসেঁতে ভিজে উঠোন আর সুপুরির বাস্‌লোর আবরুর কথা, সেই রসিকলাল সেন নায়েবের বাসার কথা মনে হলেই মনে একটা অস্বস্তি আসত। আমাদের দেশে আসবার সময় ঝিকরগাছা ঘাটে পৌছেই মনে হল স্বদেশে পৌছে গেচি। নাভারনের কাছে যশোর রোড ও বিলিতী চট্‌কার ছায়া দেখে মনে হল আমরা একেবারে বাড়ি পৌছে গেচি। বাড়ি এলুম ন'টার গাড়িতে। এসেই খুকুর সঙ্গে দেখা। ও দেখি ওদের দাওয়ায় বেড়াচ্চে, আমায় দেখে প্রথমটা পিছু হটে সরে গেল, তারপরই চিনতে পেরে

ছুটে এল। পিরোজপুরের গল্প হল অনেকক্ষণ। ওর জন্যে যে কেক্ পাঠিয়েছিল তা দিয়ে এলুম।

পরদিন এল সুধীরবাবুরা। ওদের নিয়ে হৈ হৈ করে দিন কেটে গেল। মোটরখানা ওদের রইল আমাদের আমতলায়। আমাদের ঘাটে স্নান করিয়ে আনলুম সবাইকে। নদীতে স্নান করে সব খুব খুশি।

ওরা চলে গেল বৈকালে। পরদিন এল কালী চক্রবর্ত্তীর ঘোড়া আমাকে সিমলে নিয়ে যাবার জন্যে—অনেকদিন পরে ঘোড়ায় চড়া গেল। গোপালনগর স্টেশনের কাছে ছাতি সারিয়ে নিলুম —তারপর গণেশপুরের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা থেকে মাঠের রাস্তায় নেমে সোজা হাতীবাঁধা বিলের পাশ দিয়ে চললুম। কত গাছপালা, বটতলা, ঝোপঝাপ পার হয়ে যে চলেচি! আসবার সময়েও তাই। তখন বৈকালের ছায়া পড়ে এসেচে, হাতীবাঁধা বিলের চমৎকার শোভা হয়েচে—কতদূর জুড়ে প্রশান্ত চক্রবালরেখা দূরত্বের কুয়াসায় অস্পষ্ট। হে ভগবান, আমি আপনার এই মুক্ত রূপের উপাসক। যদি কখনো আসেন, তবে এই রূপেই আসবেন। নভোনীলিমা যেখানে মেঘলেশশূন্য, দিকচক্রবাল যেখানে মুক্ত, উদার—ধরার অরুণোদয় যেখানে নিবিড় রাগরক্ত, সে রূপেই আপনি দেখা দিন—রসিকলাল সেন নায়েবের বাসা থেকে আমায় মুক্তি দেন যেন।

সিমলে থেকে ফিরে যখন নদীতে যাচ্চি গা ধুতে—বেলা খুব পড়ে গিয়েচে, ছায়ানিবিড় হয়েচে বাঁশবন। খুকু ওদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘাট থেকে ফিরচে, বাঁশবনের পথে দেখা ঠিক পুঁটিদিদিদের বাড়ি থেকে নেমেই। ওরা সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে দাঁড়াতে যাচ্চে, বল্লুম—চলে আয়। ও আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে গেল, কি সুন্দর হাসতে পারে! এক তরুণ মুখের প্রসন্ন হাসিতে সারাদিনের মানসিক দৈন্য যেন এক নিমেষে ঘুচে গেল।

গিরীনদাদাদের কলাবাগানের মাঠে কতক্ষণ বসলুম, আকাশ রঙীন্ মেঘ-স্তূপে ভরা—সবুজ মাধবপুরের চর, বাঁশবনের দুলুনি কেমন সুন্দর! কত বছর চলে যাবে, ঐ বনসিমতলার ঘাটে অনাগত দিনের তরুণীবধূ ও মেয়েদের জলসিক্ত পদচিহ্নে আঁকা থাকবে একটি অপূর্ব্ব প্রণয়-কাহিনী—হয়তো কেউ কখনো বলবে, ছিল এরা দুজন অতি প্রাচীনকালে—গ্রামের স্নিগ্ধ বসন্ত দিনের বাতাসে তার মূর্চ্ছনা থেকে যাবে।

সকালে যখন বসে লিখচি, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, একটু পরেই এল বৃষ্টি। একবার দেখি খুকু বিলবিলে থেকে উঠে গেল, কিন্তু বোধ হয় খুবই ব্যস্ত ছিল, তাই চেয়ে দেখল না এদিকে। স্নান সেরে এসে যখন গেল, তখন বোধ হয় মনে পড়ল, তাই চেয়ে হেসে গেল। কালোর সঙ্গে বাঁওড়ের ধারের বটতলায় বেড়াতে গেলুম। একটা গাছে উঠে বসেচি, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলেকে নিয়ে বেলেডাঙায় কুটুমবাড়ি যাচ্চে। আমার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গল্প করে গেল। স্নান করতে জলে নেমে দেখি ভারী চমৎকার দৃশ্য ওপারের মাধবপুরের সবুজ উলুবনের চরে। দুপুরে যখন ঘরে শুয়ে আছি, তখন খুব বৃষ্টি এল। বৈকালে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙার জলে—আবার ওবেলার সেই বেলেডাঙার ছেলেটার সঙ্গে দেখা। নদীজলে স্নান করে আনন্দ হল, জ্যোৎস্না এসে পড়েচে নদীজলে। চমৎকার দেখাচ্চে।

রোয়াকে খুব জ্যোৎস্না। চেয়ার পেতে বসেচি, খুকু ডাকলে—প্রথমে ওদের শিউলিতলার উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসচে হি হি করে, তারপর ডাকলে—বল্লে, আসুন না? গিয়ে বসেচি, ও উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করচে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এল শুনে বলচে—আমিও ছ'ঘরে যাব। মা এখানেই থাকবে। আপনি আর সেখানে যেতে পারবেন না, মজা হবে।

বল্লুম—মজা বেরিয়ে যাবে। বুঝবি তখন।

বল্লে—তা বটে।

বসে গল্প করচি, একবার বৃষ্টি এল। আমার চেয়ার পাতা রয়েচে রোয়াকে, উঠতে যাচ্ছি, ও উঠতে দেবে না। বল্লে—বসুন, বসুন, বৃষ্টি ঐ থেমে গেল। বল্লে, কা'ল অত সকালে উঠে গেলেন কেন? বল্লুম—পাঁচু কাকার ছেলের আশীর্ব্বাদ হচ্ছিল, তাই। একটা ছোট গল্প বলতে বল্লে। কিন্তু সাধক-দাদার বাড়িতে একজন গায়ক এসেছিল, তার গান শুনতে বড় ইচ্ছে হল বলে চলে এলুম।

বনগাঁয়ে যেতে হল নৌকোতে পচা রায় ও তাদের দুই ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে। বার-লাইব্রেরীতে প্রফুল্লের কাছে বিশেষ দরকার ছিল, সেখান থেকে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করে মন্মথবাবুর লিচুতলা ক্লাবে বসে পিরোজপুর ভ্রমণের গল্প করি। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর নৌকো ছাড়া হল। মেঘলা আকাশে চাঁদ উঠেচে, ঝিরঝিরে বাতাস, পচা বেশ নানারকম গল্প করতে করতে এল। সুখপুকুরের ঘাট থেকে সয়ারামকে উঠিয়ে নেওয়া হল।

খুকু আজ এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে ওদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে। আমি তখন স্নান করে এসে সবে বসেচি, ঝম্‌ঝম্ রোদে ও খাড়া দাঁড়িয়ে রইল উঠোনে, আমিও রোয়াকে চেয়ার পেতে বসে রইলুম। একবার দুপুরের পরে খুড়োদের বাড়ির দিক থেকে এল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে। তারপর আমি Cleopetra পড়ে, তাতেই মশগুল হয়ে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙায় বড় বটতলা ছাড়িয়ে সুন্দরপুরের পথে। রাত্রে খুকুদের দাওয়ায় বসে Cleopetra-র ইতিহাস বলি। ওর ভারী ভাল লেগেচে। বললে,—আজ এত দেরি করে এলেন যে? বল্লুম—খুড়ো এসে বসে গল্প করছিল, তা কি করি? পরদিনও Cleopetra-র গল্প শুনে খুকু ভারী খুশি, হেসে বলচে—আহা, বলবার কি ভঙ্গি! কচুকাটা করচে! ওর হাসি আর থামে না যখন বলেচি হারম্যাকিম্ কি করে মার্ক এণ্টনির সেনাপতিদের Caesar-এর দলে যোগ দেওয়ালে।

সন্ধ্যার জলে নেমে বড়সিমতলার ঘাটের দিকে চেয়ে, পয়লা আষাঢ়ের নবনীলনীরদমালার দিকে চেয়ে ওপারের শ্যামমাধবপুরের চরের দিকে চেয়ে আনন্দে মন ভরে উঠল। এই বনসিম-তলার ঘাট কত ভাবে সার্থক হল!

এবারকার গ্রীষ্মের ছুটির মত আনন্দ কোনবার হয়নি।

বনসিমতলার ঘাট থেকে যখন স্নান করে আসচি, গুয়োথলী আমগাছটার তলায় মাথা মুছবার জন্যে দাঁড়িয়েচি, ঘন মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অস্তমেঘের রাঙা আভা ভূষণ জেলের জমির একটা ময়নাকাঁটা গাছের গুঁড়িতে পড়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েচে!

বাদলা বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মশা বেড়ে গেচে। বিলবিলে জলে টইটুম্বুর, বকুলগাছ ও আমগাছ-গুলোর ভিজে ভিজে কালো গুঁড়ি, কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে। এই আর্দ্র, মশকসঙ্কুল, অতি নিরানন্দ স্থান কিন্তু অপূর্ব্ব কবিতাময়। অন্ততঃ আমার কাছে এ সমস্তটা মিলে এক অফুরন্ত, চিরনূতন কবিতা।

বসে পড়চি রোয়াকে, চেয়ারটা বুড়োদের বাড়ির দিকে ফেরানো, হঠাৎ যেন মনে হল বিলবিলের জলে ঝপ করে একটা আম পড়ল। তাকিয়ে দেখচি, আর একটা ঝুপ করে শব্দ হল। তারপর আবার একটা।

আশ্চর্য্য হয়ে ভাবচি এত আম পড়চে কোথা থেকে, তখন দেখি কে যেন বিলবিলের ও ঘাট থেকে কি একটা ডাল ছুঁড়ে জলে মারচে।

আমি চেয়ে দেখতেই খুকু হাসতে হাসতে উঠে এল—বল্লে, কবির তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে কি

খারাপ কাজই করেচি!

…সুন্দর কবিতা।

কিংবা এ যদি কবিতা না হয়; তবে কবিতা কি, তা আমার জানা নেই।

যেখানে জীবন, যেখানে আনন্দ, যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য্য ও নবীনতা—তাই Testament of Beauty—কবিতা।

একদিন বিকেলের দিকে মেঘের সৌন্দর্য্য ভারী চমৎকার ফুট্‌চে সূর্য্য অস্ত যাবার সময়ে। পচা রায় মাছ ধরতে বসেচে কুঠীর নীচে—তার ওখানে গিয়ে বসে গল্প করি। আর এপার ওপারের শ্যামল সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে দেখি—কয়টি উলুবন, খেজুর গাছ, পটল ক্ষেত, ঝিঙের ক্ষেত, শান্ত কালো নদীজল, কাঁটাশেওলার দাম, নলে জেলের ডিঙি-নৌকা—ওপরে নীল আকাশ, রাঙা মেঘ—সব সুদ্ধ মিলিয়ে চমৎকার ছবি।

আজ দিনটা বেশ চমৎকার। সারা ছুটির মধ্যে এমন পরিষ্কার দিন আসে নি। বল্লার ভাঙনের কাছে একটা চারা শিমুল গাছ আছে, তার চারিপাশে সবুজ কচি ঘাস বন, নিকটে উলুখড়ের রাশি রাশি ফুল ফুটেচে, ঝলমলে রোদ, নীল আকাশ। রৌদ্রে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে বেশ মজা। স্নান করে এসে বসেচি, খুকু এসে অনেক গল্পগুজব করলে। বিকেলে কি চমৎকার রোদ! এমন রোদ এবার সারা জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখিনি। পচা রায় মাছ ধরতে গেল। কুঠীর নীচেই জলের ধারে ঘন বন, তার মধ্যে ঢুকে খানিকটা বসি। এমন ঘন বন যে এদিকে আছে তা জানা ছিল না আমার। জলের ধারে কতক্ষণ বসে গল্প করি পচার সঙ্গে। আকাশের বড় বড় মেঘস্তূপ ক্রমে রাঙা হয়ে এল বেলা পড়লে। আমি উঠে মাঠের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। এদিকের মাঠ ওদিকের চেয়ে অনেক ভালো। কুঠীর নীচে সেই জলাটার চারিপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর। আমাদের ঘাটের ওপরে ডাক্তারদের কলাবাগানে একদল গোয়ালা গরু চরাতে এসে রান্নাবাড়া করচে। তাদের কাছে বসে খানিকটা গল্প করলুম। ওদের বাড়ি ঝিকরগাছার কাছে। ও-দেশ জলে ডুবে গিয়েচে বলে এখানে গরু চরাতে এসেচে।

আজ আকাশের রং অদ্ভুত রকমের নীল, এমন নীল রং সেই আর বছর আষাঢ় মাসের পরে আর কখনো দেখিনি, বৃষ্টি-ধৌত আকাশ না হলে এমন নীল রং বুঝি ফোটে না। মদের নেশার মত কেমন নেশা লাগিয়ে দিল এই আকাশের নীল রংটা। রোদের রং হয়েচে অদ্ভুত—প্রখর সাদা নয়, যেন হলদে ধরনের। গাছপালা ঘাসের রং যেন হয়েচে হলদে। আমাদের ঘাটে নাইতে যাবার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে দূরের বাঁশবন, কাঁদি কাঁদি খেজুর ঝোলানো খেজুর গাছ, অন্যান্য গাছগুলোর রৌদ্রালোকিত পত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে চোখ আর ফেরাতে পারিনে। আমাদের ঘাটের ধারে ফুলভর্ত্তি বাব্‌লা গাছ, সাদা-ডানা প্রজাপতি উড়চে—সে দৃশ্যটা মনে অপূর্ব্ব ভাব নিয়ে এল। এই নীল আকাশ থাকবে আরও ষাট বছর পরে, এই বনসিমতলার ঘাট থাকবে তখনও, ওপারের চরে এমনি উলুর ফুল ফুটবে, এমনি সাঁইবাবলার পত্রশীর্ষ বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশের তলে সূর্য্যের আলোর দিকে খাড়া হয়ে রইবে, কত অনাগত তরুণী বধূরা জলসিক্ত পদচিহ্ন অঙ্কিত করে ঘাটের পথে যাওয়া আসা করবে। আমি তখন আর থাকব না এ গ্রামে জানি—তবুও আমার কথা গাঁয়ের এমনি আষাঢ় দিনের হাওয়ায়, নির্ম্মল নীল আকাশের আনন্দের মধ্যে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে, সেই দূর ভবিষ্যতের কথা মনে হয়ে

চলমান জগতের রূপ আমার মনে আনন্দের বাণী বহন করে আনলে।

আজ সন্ধ্যায় কি অপূর্ব্ব শ্রী! অস্তমান সূর্য্যের রঙে সমস্ত মাঠ, বন মায়াময় হয়ে গিয়েচে—সারা পৃথিবীটা কি অপরূপ শিল্প তাই ভাবি। আকাশের রং নীল নয়—সে কি রং তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন—ওরকম রংএর কি নাম তা আমার জানা নেই। সন্ধ্যায় নদীজলে নেমে স্নান তো যেন দৈনন্দিন উপাসনা।

আজ এখানে বেড়াবার শেষ দিন। কারণ কাল শুঁটোর বিয়েতে যদি বরযাত্রীদের সঙ্গে যেতে হয়, তবে কাল আর আসতে পারব না। পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাব, তার একটু আগে খুকু উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করে গেল, তাতে হয়ে গেল একটু দেরি। আমি পচাদের বাড়ি গিয়ে দেখি সে নেই। গাজিতলার পথে সে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, তাকে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে গেলুম বেলেডাঙার বাঁধের মাথায়। কতক্ষণ সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মরাগাঙের ওপারের চর, খেজুর গাছ, বাঁশবন, জলি ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে বসে পচা রায়ের সঙ্গে গল্প করি। বেলা যখন যায় যায়, তখন উঠে আইনদ্দির বাড়িতে এসে দেখি সে বাড়ি নেই। বেলেডাঙার স্কুলের ওপর কতক্ষণ বসে রইলাম শ্যামল সবুজের বন্যার দিকে চেয়ে! কি দিগন্তপ্রসারী ধান-ক্ষেত, বট-অশ্বত্থের বীথি, নতিডাঙার গ্রামপ্রান্তর, বাঁশবনের সারি, কি বিচিত্র মেঘস্তূপ নীল আকাশে! সন্ধ্যা প্রায় যখন হয়ে এল, তারপরে আমরা ওখান থেকে উঠে আসি। পচা একটা কলার বাগান থেকে কলা সংগ্রহ করলে। আমি বনসিমতলার ঘাটে এসে নাইলুম। আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে, বনের মধ্যে জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে; অন্যদিনের চেয়ে আজ বেলা গিয়েচে। সন্ধ্যায় খুকুদের বাড়ি বসে অনেক রকম গল্প করলুম, তারপর উঠে গেলুম পাঁচু-কাকাদের বাড়ি, ওদের বাড়ি কাল বিয়ে, অনেক কুটুম্ব-কুটুম্বিনী এসেচে—পাঁচুকাকার ভাই ফণিকাকা এসেচেন জলপাইগুড়ি থেকে—একবার সব দেখাশুনো করে সামাজিকতা রক্ষা করতে যাওয়া দরকার।

আজ চলে যাব। বেলা তিনটের সময় আমার ঘরে ঘুম ভেঙে উঠলুম—তারপর বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে। বেজায় গুমট গরম, আকাশে সাদা মেঘ। একটু পরে পাঁচুকাকার ছেলে শুঁটো বিয়ে করে নববধূ নিয়ে গ্রামে ঢুকল। সানাই বাজচে, ঢোল-বাজনার শব্দ শুনে কল্যাণী, খুড়ীমা, খুকু এরা সেজেগুজে ছুটল। আমতলায় দেখি সব চলেচে। খুকু একবার চেয়ে দেখলে আমার দিকে। ঐ ঘোড়ার গাড়িতেই আমি চলে এলুম বনগাঁ স্টেশনে। সারা পথ ট্রেনে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল কি অপূর্ব্ব সুন্দর গ্রীষ্মের ছুটিই আজ শেষ হয়ে গেল!

কলকাতায় এসে কদিন বড় ব্যস্ত ছিলুম। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বেড়াচ্ছি—সাঁতরাগাছি ও রাজপুরেও গিয়েছিলুম। পরশু হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে ঊষা এসেছিল—দেখা করতে এসেছিল মেসে। আমি তখন সবে চুল কাটতে বসেচি। তাড়াতাড়ি যেতেও পারিনে—বসতে বলে যত শীঘ্র হয় চুল ছেঁটে দেখা করে এলুম। ঊষার নির্দ্দেশমত বালিগঞ্জে গেলুম দুপুরের পর। অনেকগুলি মহিলা ছিলেন সেখানে—সাহিত্যিক আলোচনা হল অনেকক্ষণ ধরে—সকাল থেকে বার হয়ে বিকেলের দিকে ইন্দিরা দেবীর বাড়ি গেলুম রেডিওর বক্তৃতার নকল-টিকে আনতে। কাল রাত্রে রাজপুরে বেণুন, আমি ও ক্ষুদির দুই ছেলে এক মশারীর মধ্যে

শুয়ে প্রাণ যায় আর কি গরমে আর মশায়! সারারাত চোখের পাতা বোজেনি!

এরই মধ্যে একদিন আয়েলীর সঙ্গে দেখা হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গত মঙ্গলবারে। আমি আয়েলীর কথা বলচি নীরদবাবুদের বাড়ি, যে ওই একটি মেয়ে, যার সঙ্গে আর দেখা হবে না—কারণ ওর মা ওকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে বাপের বাড়ি চলে গিয়েচে। হঠাৎ সেদিন প্রবাসী অফিসে গিয়েচি, সেখানে দেখা ডাঃ প্রমথ রায়ের সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা, কেউ কাউকে ছাড়তে পারিনি। অনেকক্ষণ ওখানে থেকে বার হয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প হল পুরোনো দিনের—যখন 'শনিবারের চিঠি' আপিস ছিল মানিকতলায়। প্রমথ এখন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক—ভারী বন্ধুবৎসল, ছেড়ে দিতে আর চায় না।

প্রমথ এসে আমায় উঠিয়ে দিয়ে গেল হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত। আমি কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলরের লিস্ট দিতে গেলুম নীরদবাবুর বাড়ি—সেখানে ড্রয়িংরুমে ঢুকবার আগেই মেমসাহেবের গলা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবচি কোন্ মেমসাহেব এখানে এল! ঢুকেই দেখি আয়েলী ও মিসেস এণ্টনি বসে। আয়েলীও আমায় দেখে খুব খুশি হল—ওরা সিঙ্গাপুর থেকে দু'একদিন হল এসেচে শুনলুম। এখন কলকাতাতেই থাকবে। ভারী আনন্দ পেলাম ওকে দেখে—আয়েলী বড় ভালো মেয়ে। ও এখানে পড়ত লা মার্টিনিয়ারে। এতদিন পড়া বন্ধ ছিল, সেইজন্যেই ওর মা মিসেস্ এণ্টনি ওকে আর ওর ছোট ভাই পিটিকে এখানে এনেচে।

কাল বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোকের ওখানে রাত্রে ছিল নিমন্ত্রণ। মিসেস্ দে বলে যে মহিলাটির সঙ্গে উষার ওখানে সেদিন দেখা হয়েছিল—তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাতে আমার আলাপ হয় তাঁর খুব ইচ্ছা। ভদ্রলোকটির নাম কে সি দে—কিরণচন্দ্র দে। কাল সন্ধ্যাবেলা তাঁদের বাড়ি অনেকক্ষণ কাটানো গেল। বড় অমায়িক লোক স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। ভূরিভোজন হল অবিশ্যি, আইসক্রীম পর্য্যন্ত বাদ গেল না। মনীষা সেনগুপ্তা বলে একটি মেয়ে উপস্থিত ছিল, মেয়েটি ছেলেমানুষ। এবার বি-এ অনার্সে ইংরিজীতে প্রথম হয়েচে, কিন্তু এত লাজুক ও মুখচোরা—রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে বললুম। সবাই পড়চে—মেয়েটি লজ্জায় একেবারে দুমড়ে পড়ল—কিছুতেই পড়বে না। তারপর মিসেস্ দে অনেক করে একটা ছোট কবিতা পড়ালেন।

বেশ কাটল সন্ধ্যাটি, সাহিত্যিক আলোচনাতে, গল্পে, আবৃত্তিতে, খাওয়া-দাওয়ায়। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

পরশু ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে হেস্টিংসে গিয়েছিলুম। কলকাতার মধ্যে অমন চৎমকার ফাঁকা জায়গা বেশী দেখিনি। ওর সন্ধান পেয়ে মনে আনন্দ হল। নীল আকাশ, ফাঁকা সবুজ মাঠ, দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মার্ব্বেল চূড়াটা দেখা যাচ্ছে নীল আকাশের পটভূমিতে, যেন আকাশে ভাসচে বলে মনে হচ্ছে। কূলে কূলে ভরা গঙ্গা, সবুজ ঘাসে ঢাকা তীরগুলি জল ছুঁয়েচে। জলের ধারে নাটা ঝোপ, কালকাসুন্দা ও বনবেড়ালী—ঠিক যেন পাড়াগাঁ। অথচ জলের ধারে ছোট বড় ছায়াতরু, সেখানে বেঞ্চি ফেলা রয়েচে—সত্যিই বড় ভালো জায়গা—অথচ বেশ নির্জ্জন—খুব লোকজন বা মোটরগাড়ির ভিড় নেই।

বাড়ি এসেই সেদিন উষার পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। সুরেশবাবু বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বড় যদিও, কিন্তু ভাগলপুরে থাকবার সময়ে মিশতেন ঠিক যেন সমবয়সীর মত। অমরবাবুর বাড়ির আড্ডাতে দিনের পর দিন আমাদের কত চা-পানের

মজলিশ বসত। সুরেশবাবু একজন ভালো শিকারীও ছিলেন। শিকারের গল্প করে জমিয়ে রেখে দিতেন। একবার বাবারিঘাটে আমি স্টীমার থেকে নামচি—আজিমগঞ্জ থেকে আসচি অনেককাল পরে ভাগলপুরে—সেই স্টিমারে সুরেশবাবুও আসচেন—উনি তখন বনেলি রাজ স্টেটের এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার—আমায় দেখে বল্লেন—এই যে ম্যানেজারবাবু, কোথা থেকে আসচেন? আর কি সে হাসি, কি সে মনখোলা বন্ধুত্বের স্পর্শ!

পরশু বাড়ি ফিরে উষার চিঠিতে জানলুম সুরেশবাবু আর ইহলোকে নেই। উষারা যেদিন এখান থেকে গেল মজঃফরপুরে, তার পরদিনই সুরেশবাবু মারা গিয়েচেন বলে উষা লিখেচে। অত্যন্ত দুঃখ হয়েচে চিঠিখানা পড়ে। ভগবান তাঁর আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

কাল সায়েন্স কলেজের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আচার্য্য পি. সি. রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম অনেককাল পরে। বয়স হয়েচে, কোন্ দিন মারা যাবেন—আর অনেকদিন যাওয়া হয়নি—এইসব ভেবেই দেখা করতে গেলাম। ভারী আনন্দ পেলাম বসে কথা কয়ে ওঁর সঙ্গে। বললুম—মাঠে যান এখনও? বল্লেন—ও বাবা, না গেলে কি বাঁচি?···বল্লুম—ফিলজফার আসেন? বল্লেন—রোজ আসেন, তোমার কথা যে সেদিন বলছিলেন, তুমি আর যাও না কেন? তারপর আলামোহন দাস বলে একজন বড় ব্যবসায়ীর গল্প করতে লাগলেন—তিনি নাকি প্রথম জীবনে মুড়ি-মুড়কি বিক্রি করতেন। এখন ক্রোড়পতি লোক। চার-পাঁচটা মিল আছে।

বললেন—গ্রিন্ বোট করেচি, শ্রীপুরের ঘাটে বাঁধা রয়েচে। একবার তোদের বারাকপুরে যাব গ্রিন্ বোটে করে ইছামতী দিয়ে।

বললুম—বেশ, আসুন না!

অনেকদিন পরে বুড়োর সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দ পেলুম। বুড়ো কবে মরে যাবে, একটা অনুতাপ থেকে যাবে মনে।

গত শুক্রবার অর্থাৎ ২৯শে জুলাই গ্রীষ্মের ছুটির পরে প্রথম বাড়ি গিয়েছিলুম। ভারী ভালো লেগেচে এবার। খুকুদের দাওয়ায় বসে ক'দিনই সন্ধ্যার সময় কত গল্পগুজব করি। ওরা একদিন খাওয়ালো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খুকু রান্নাঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এল। আমি গেলেই শতরঞ্জিখানা ঘরের মধ্যে থেকে এনে বড় করে পেতে দেবে—আর ওর মা বলবে, ছোট করে পাত। ছোট করে পাত। কালিঘাটা বেড়াতে গেলুম পচা রায়ের সঙ্গে। রবিবার হাটে গেলুম। বকুলতলা দিয়ে হাট করে ফিরি। খুকু দাঁড়িয়ে আছে, আমি বলচি, খুড়ীমা, কাউকে তো দেখতে পাচ্চি নে? ও বলচে, কেন হাতীর মত দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্চেন না? তাড়াতে পারলে তো সব বাঁচেন!

আমি তারপর নদীর জলের একেবারে ধারে গিয়ে বসলুম। লম্বা শীষ্ ও ফুল ফুটেচে, এপারে ঘন সবুজ গাছপালা, নদীর জল আবর্ত্ত করে ঘুরচে—বেশ লাগচে। দিলীপের সঙ্গে সেদিনকার সেই তর্ক মনে পড়ল। থিয়েটার রোডে ওর বাড়ি বসে তর্ক করেছিলুম ওর বই নিয়ে। একজন চাষা আজ হাট থেকে ফিরবার পথে গল্প করছিল—নতা যদি বেশি হয়েচে, তবে আর ঝিঙে তাতে ফলবে না। তার সেই গল্পটা মনে করচি। এই গ্রামের সত্যিকার জীবন—মাটির সঙ্গে সব সময়েই এদের যোগ। মাটির সঙ্গে যোগ হারালে, গাছপালার সঙ্গে যোগ হারালে এরা বাঁচবে না।

বড় বড় বাঁশঝাড়, কত কি বৃক্ষলতা, ষাট বছর পরে যখন আমি থাকব না, তখনও ওরা

থাকবে, হয়তো খুকুও অতি বৃদ্ধা অবস্থায় থাকতে পারে। তখনও ইছামতীতে এমনি ঘোলার ঢল নামবে, বনসিমতলার ঘাটে নতুন মেয়েছেলে কত ফুল নিতে আসবে, হাসবে, খেলবে, জল ছুঁড়বে—যেমন একদিন আমরাও করেছিলুম।

খুকুদের হাসাতুম 'ভাল কি মন্দ? মন্দ হইলে তো গন্ধ হইত' এই কথাটা পূর্ব্ববঙ্গের সুরে বলে। এবার গিয়ে মনে হল এমন বর্ষা-সজল দিনের গভীর আনন্দ কোন বছর এর আগে পাই নি। এ যেন একটা স্বপ্নের মত কেটে গেল—এত সুন্দর সকাল-সন্ধ্যা!

ফাল্গুন মাসে যখন শালমঞ্জরী নিয়ে গিয়েছিলুম, বা যেবার গিয়ে দেখি উড়েরা তত্ত্ব বয়ে নিয়ে গিয়ে ভাত খাচ্ছে, সেসব দিনের ঘটনা তো এখন পুরোনো মনে হয়—Fresh, ever young! দিনগুলির মধ্যে তাজা আনন্দ তো থাকা চাই-ই, আনন্দের নব নব সৃষ্টি স্রষ্টামনের প্রাণ-শক্তিরই পরিচয় দেয়।

এই সব দিনের সঙ্গে দশ-বিশ বছর আগেকার পুরোনো, ছাতা-পড়া, ভঙ্গুর দিনগুলির যদি প্রতিযোগিতা হয়, তবে স্মৃতির ও আশার দরবারে সম্মান লাভ করতে পারে না। তা হেরে যেতে বাধ্য। সেইজন্যেই সেই সব অসহায়, নিরপরাধ, নিরুপায় দিনগুলির জন্যে মমতা আসে।

নিজের ঘরে বারাকপুরে সেদিন শুয়েচি, শুক্রবার রাত্রে। শুন্‌চি ন'দিদিদের ঘরে খুব গল্প ও হাসির শব্দ। বোধহয় খুকু কোন গল্প করচে ওদের কাছে। এই ঘরে শুয়ে শুয়ে ১৯২৪ সাল থেকে, আজ ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত এই গল্প তো শুনে আস্‌চি—এ একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। তাই কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে একরাত্রে বারাকপুরের খড়ের ঘরে নির্জ্জন রাত্রে শুয়ে সে অভিজ্ঞতাটি হঠাৎ হওয়াতে খানিকটা এমন অবাস্তব বলে মনে হল যে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চৈতন্যটাকে এর মাটিতে নামিয়ে এনে তবে সে অভিজ্ঞতাটুকু গ্রহণ করতে পারলুম।

তারপর আর একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

অনেক রাত্রে চৌকিদার হাঁকতে বেরিয়ে আমার ঘরের মধ্যে লণ্ঠন বাড়িয়ে দেখচে। আমি বল্লুম—কিরে, ভাল আছিস? চৌকিদার বল্লে—হাঁ বাবু, আছি। কবে আলেন বাবু?

তারপর, সে নিজের নিমোনিয়া হয়েছিল, সে গল্প বলতে শুরু করলে। আমার তখন সত্যই মনে হল আমি এই গ্রামেরই লোক—থাকি প্রবাসে কলকাতায়। আসলে আমার বাড়ি এখানেই। সে যে কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি! গ্রামের মাটির সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে সেই গভীর রাত্রে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়ে গেল সুরেন চৌকিদারের একটা কথায়—বাবু বাড়ি আলেন কবে?

রবিবার (১৫ই শ্রাবণ) হাট করতে গিয়ে গোপালনগরের দোকানে দোকানে বেড়িয়েও ঠিক ওই রকম অনুভূতি হল। একজন লোকে তো বল্লে—আপনি কি সেই থেকেই বাড়ি আছেন?

বর্ষা-সজল প্রাতে সোমবারে হেঁটে বনগাঁ এসেও কি তৃপ্তি! ওদের উঠোনে খুকু দাঁড়িয়ে রইল। যখন আসি দরজার কাছেও দাঁড়াল একবার।

বনগাঁয়ে খয়রামারির মাঠে যেখানে সেই মটরলতার ঝোপ, সেখানে-এ বছর প্রথম বেড়াতে গেলুম এদিন। ছোট এড়াঞ্চির জঙ্গল বড্ড বেশী বেড়েচে।

সত্যিই, অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েছিলুম দেশে গিয়ে এই বর্ষণমুখর শ্রাবণ দিনে। শুক্রবার দিন ছিল ১৩ই শ্রাবণ, আমার ছেলেবেলার ওই দিনটি আমার কাছে ছিল একটা বড় উৎসবের দিন, মনসার ভাসান বসত ওই দিনটিতে, আর তিন চার দিন ধরে চলত জেলেপাড়ায় পুরোনো

মনসাতলায়। বন্য মটরলতার সবুজ ফলের খোলো যখন দুলত ঝোপে ঝোপে এই শ্রাবণ মাসে, তখনকার দিনগুলির সঙ্গে মনসার ভাসানের সুরেন জেলের নাচ আর গান জড়িয়ে রয়েচে আমার মনে—কতকাল পরে আবার সেই তেরই শ্রাবণ, সেই মনসার ভাসানের উৎসবের সময় বাড়ি গিয়েচি, ঝোপে ঝোপে তেমনি দুলচে মটরলতার কচি সবুজ ফল, মেয়েরা তেমনি নতুন শাড়ি পরে নাগ পঞ্চমীর উৎসবে যোগ দিতে চলেছে নৈবিদ্যির রেকাবি হাতে—কেমন করে বাল্যের সেই স্বপ্নজগতে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলুম অতর্কিতে! কিন্তু স্বপ্ন সেটা নয়, কারণ খুকু ছিল। আর হলই বা স্বপ্ন, জীবনের কতখানি স্বপ্ন দিয়ে গড়া তা কি সবাই জানে?

বাংলা দেশের মর্ম্মকাহিনী লুকোনো আছে এই সব নিভৃত পল্লী প্রান্তের আম-বকুল-বাঁশ-বনের আড়ালে, যিনি লেখক হবেন, যিনি লেখনী ধারণ করবেন বাংলার কথা শোনাবার জন্যে তাঁকে আসতে হবে এখানে, মিশতে হবে এদের সঙ্গে, যোগ দিতে হবে এদের এই সব শান্ত উত্তেজনাহীন, তুচ্ছ, অনাড়ম্বর, অখ্যাত গ্রাম্য জীবনের উৎসবে, এদের বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে। খ্যাতি-যশের জন্যে বা টাকার জন্যে কেউ লেখে না জানি—Jules Lemaitre-এর সেই কথা—The end is nothing, the road is all—প্রত্যেক আর্টিস্টের মনে রাখা উচিত।

হাঁ, পচা রায়ের সঙ্গে শনিবারের বিকেলে (১৪ই শ্রাবণ) কাঁচিকাটার পুলে বেড়াতে গিয়েছিলুম—কি অজস্র সোঁদালি ফুল কুঠীর মাঠের প্রায় প্রত্যেক গাছে! আমি তো অবাক্, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সোঁদালি ফুল জীবনে তো কখনো দেখিনি।

ভালবাসা জিনিসটা কখনো কখনো কারো গায়ে পড়ে করার মত ভুল আর কিছু নেই। কারণ যাকে তুমি ভালবাসচো অত করে, সে তোমার ওই ভালবাসাকে 'ভালবাসা' বলে গ্রহণ যদি করতে না পারে, তবে তোমার ভালবাসার ফল কি? ভালবাসা pity নয়, করুণা নয়, charity নয়, সহানুভূতি নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়—ভালবাসা ভালবাসা। এখন সেই জিনিসের সূক্ষ্ম মহিমা ও রসটুকু না বুঝে যে নষ্ট করে ফেলে অযাচিত ভাবে দিয়ে, অপাত্রে দিয়ে—তার চেয়ে মূর্খ আর কে?

যারা বলে, "এ তো স্বার্থপর ভালবাসা হল"—শ্রীধর কথকের সেই গান বাবা গাইতেন—"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" ইত্যাদি—এ সব কথার কোন মানে হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই, না পেলে দেওয়া যায় না, বা না দিলে পাওয়াও যায় না। এখানে এই কথায় খুব গভীর অর্থ আছে। ভালবাসা না পেয়ে যে ভালবাসা দেওয়া—যে পেলে তার কাছে তা আর ভালবাসা রইল না, সে তার উপযুক্ত মূল্য দেবে না—গভীর, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অপরূপ আনন্দ পাবে না ভালবাসা থেকে, পাবে একটা সাময়িক উত্তেজনা বা egoistic satisfaction, তাতে ভালবাসার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হল। আর না দিলে নেওয়াও যাবে না—আমি যাকে ভালবাসিনে, তার কাছে যদি আমি ভালবাসা পাই তাকে আমি ঘাড়ে-পড়া বালাই বলে ভাবি। তার উপযুক্ত মূল্য ও সম্মান আমি দিতে কখনোই পারব না। সে যত গভীরভাবে আমায় ভালবাসবে, আমার দিকে attention দেবে—তত আমি ভাবব আমার দিকে ঝুঁকচে, বিরক্ত হয়ে উঠব। সে প্রাণপণে ভালবাসচে, অথচ যাকে ভালবাসচে, সে এ থেকে কিছুই আনন্দ পাচ্চে না—এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে? ভালবাসা পাওয়ায় যে সত্যিকার অপূর্ব্ব অনুভূতি যা এ ধরনের পাওয়ার মধ্যে থাকে না—সুতরাং এ রকম ভালবাসা এ ক্ষেত্রে না দেখানোই ভালো।

ভালবাসা জিনিসটা দেওয়া নেওয়ার, আমি যে অর্থে ভালবাসা ব্যবহার করচি সে অর্থে।

যারা ভালবাসা কি কখনো জানে না, সত্যিকার ভালবাসা কি কখনো পায় নি—তারা 'নিঃস্বার্থ' ইত্যাদি বাজে কথা ব্যবহার করে।. ভালবাসা মনের এক অদ্ভুত রসায়ন—উভয় মনের সমান যোগ ভিন্ন এ দিব্য, অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয়, দুর্ল্লভ রসায়ন তৈরী হয় না। যে হতভাগ্য এ আস্বাদ করে নি—সে শাস্ত্র থেকে, দর্শন থেকে, পাঁজিপুঁথি থেকে বড় বড় নিঃস্বার্থতার বুলি আওড়ায় গিয়ে —কিন্তু যে জীবনে এর আস্বাদ পেয়েছে সে জানে, ওসব লম্বা লম্বা কত অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁকা, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ভগবান এইজন্যই বোধহয় মানুষকে ধরা দেন না—অনেক সাধনা যে করে সে তাঁর ধরা দেওয়ার মূল্য দেয়—সহজভাবে ভগবান আমাদের গায়ে এসে ঢলে পড়লে, তাঁর চেয়ে মহকুমার তুলসী দারোগার বন্ধুত্বের মূল্য আমাদের কাছে বেশী দাঁড়াত।

ওপরের কথা যে বলা হল এটা কিন্তু ভালবাসার অবস্থার প্রথম দিকের কথা নয়—অত্যন্ত প্রাইমারী স্টেজে আলাদা কথা। সেখানে অনেক সময় ভালবাসা দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুকে পাবার চেষ্টা করতে হয়—সে অন্য কথা। যখন কেউ কাউকে ভালো জানে না, সে অবস্থায় কেউ কাউকে খুব খারাপ বা গায়ে পড়াও ভাবে না—তখন দুজনেই দুজনের কাছে খানিকটা রহস্যমণ্ডিত থাকে কিনা—কেউ কাউকে খুব খারাপ ভাবতে পারে না। কিন্তু খানিকটা ভালবাসার পরে যখন দেখবে যে সে তোমার ভালবাসা নিতে পারচে না, নানা রকম চেষ্টা করেও যখন তার মধ্যে ভালবাসার প্রেরণা দিতে পারবে না তখন তার ঘাড়ে পড়ে ভালবাসা দিতে যেও না—তাতে সে বিরক্ত হয়ে উঠবে, তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার ভালবাসার মূল্য সে দিতে পারবে না বরং উল্টোই হবে—তখন তাকে ছেড়ে দিও।

[এই ডায়েরীটা লিখলাম কেন ? কোন ব্যক্তিগত কারণ আছে। কিন্তু সেটা আজ আর লিখলুম না।]

বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলুম অনুকূলবাবুর নিমন্ত্রণে। কি অমায়িক ভদ্রলোক! কি আতিথেয়তা ও সৌজন্য! সত্যি, অমন ব্যবহার, অমন একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতার আবহাওয়া কতকাল ভোগ করিনি!

বিষ্ণুপুরে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন মন্দিরগুলি আমার মনে এক অদ্ভুত ভাব জাগিয়েচে। প্রসিদ্ধ দলমাদল কামান এখন লালবাঁধ বলে প্রকাণ্ড দীঘির একপাশে বসানো আছে। অনুকূলবাবুর কাছারীর জনৈক পেয়াদা আমায় নিয়ে গিয়ে দেখালে। জোড়াবাংলা বলে একটি মন্দিরের পাথর বাঁধানো চাতালে আমি ও অনুকূলবাবু বসে রইলুম সূর্য্যাস্তের সময়ে। বড় ভালো লাগল।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মাটি রাঙা, সব শাল ও কেঁদো বন—বড় চমৎকার দৃশ্য, কাঁকুরে মাটি, কাদা নেই—খটখটে শুকনো।

দেখি ফিরবার সময়ে দূরপ্রসারী সবুজ মাঠের প্রান্তে দিকচক্রবালের শোভায় বৈকালের দিকে কত কথাই মনে এল! দূরে আমার গ্রাম—আজ রবিবার, এতক্ষণে সকলে হাটে যাচ্চে। যুগল ময়রার দোকানের সামনে ফণিকাকা দাঁড়িয়ে আছে, খাজনা আদায় করচে—এই ছবিই কেবল যেন মনের চোখে ভাসছিল।

বন্যার জল অতি ভীষণভাবে আমাদের গ্রামের চারিদিক ঘিরচে। আজই সকালে চালকী থেকে এখানে এসেচি। প্রথমে মধু পাগলা (আদাড়ি জেলেনীর নাতি) মাছ ধরচে পাকা রাস্তার ধারে। সে পথ দেখিয়ে দিলে। সাজিতলার বাঁকে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য যেন পদ্মা কি সমুদ্রের

মত। থৈ থৈ করচে জলরাশি। আমাদের পাড়ায় রামপদর ঘরে বন্যাপীড়িত মানুষেরা আশ্রয় নিয়েচে। ন'দিদি তেল দিলে—আমাদের বাড়ির পিছনে শ্যামাচরণ দাদাদের চারা গাবতলায় স্নান করলাম। বরোজপোতার ডোবা দিয়ে তর তর করে স্রোত চলেচে। ইন্দু রায়ের সঙ্গে সঙ্গে জেলের নৌকো করে খুকুদের চারা আমবাগান দিয়ে গেলুম বেলেডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ি। সেখানে একটু গল্প করে এপারে এলুম। বট অশ্বত্থের শ্যামবীথির কি শোভা! সর্ব্বত্র জল, বট-তলায় সাঁতার-জল, কিন্তু অপূর্ব্ব শোভা হয়েচে বটে!

চড়কতলার বাগানে নৌকো চড়ে গোসাঁই বাড়ির রাস্তা দিয়ে পাকা রাস্তায় এসে নামলুম। হেঁটে সাড়ে তিনটার সময় বনগাঁ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুকুদের বাসায় বসে গল্প করি।

পূর্ণিমার রাত্রে ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, সজনী, আমি, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং সুবল একসঙ্গে বম্বে মেলে খড়্গাপুর এলুম। হাওড়া স্টেশনে প্রথমেই হাসির ব্যাপার। একজন উঠে বল্লে, আপনারা কে লণ্ডন যাবেন? আমরা তো হেসে বাঁচিনে। যাচ্চি মেদিনীপুর বলে কে যাবে লণ্ডনে! সজনী তো হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি!

খড়্গাপুর নেমে মোটরে মেদিনীপুর গেলাম কাঁসাই নদী পার হয়ে। S.D.O. ধীরেনবাবু এসেছিল আমাদের নামিয়ে নিতে। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন সভাপতি, তিনি ও অমূল্য বিদ্যাভূষণ এক গাড়িতে গেলেন—আমি, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর এক গাড়িতে।

গিয়েই জ্ঞান চৌধুরী উকিলের বাড়ি ডিনারের নিমন্ত্রণ। প্রায় আশি জন লোক নিমন্ত্রিত। ডিনারের পরে ধীরেনবাবুর বাড়িতে আমরা অতিথি হয়ে রইলুম।

সকালে সভা হল। রাধাকৃষ্ণণ বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন, আমি সে সময় একটা তেঁতুল গাছতলার ছায়ায় বসেছিলুম। তারপর দেবপ্রসাদবাবু ও চৈতন্যদেবের সঙ্গে নাড়াজোল রাজার গোপপ্রাসাদ দেখে পুরোনো গোপপ্রাসাদে একটা প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। বেশ সুন্দর জায়গা এই গোপ, খুব উঁচু মালভূমির মত স্থান, সেগুন ও কেলি-কদম্বের বন, বেশ ভাল লাগল। ওখান থেকে কাঁসাই নদীর এনিকাট্ দেখতে গিয়ে আমাদের ফটো নেওয়া হল।

ধীরেনবাবুর বাড়ি দুপুরে ব্রজেনবাবু, সজনী সবারই নিমন্ত্রণ। বৈকালে আবার মিটিং—তারপর বার হয়ে ঝুণু দাশগুপ্ত বলে একটি মেয়ের গান শুনতে যাওয়া গেল ওদের বাড়িতে। ঝুণুর বাবা এখানকার D. S. P.

রাত্রি দুটোর ট্রেনে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলুম, ধীরেনবাবু ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন।

মহালয়ার আগের সোমবারে রেজেষ্ট্রি আপিসে বারাকপুরের বাড়িটা রেজেষ্ট্রি করে নিলাম। রামপদ ও পুঁটিদিদি এসেছিল। মহালয়ার দিন খুকু ও খুড়ীমাকে কলকাতায় আনলুম। অন্নপূর্ণার ঘাটে নেমে মদনমোহন ঠাকুর দেখে, Zoo, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও রূপবাণী দেখে রাত দশটার গাড়িতে ওদের নিয়ে ফিরলুম। সেই শনিবারে আবার বাড়ি গেলুম—খুকুদের বাসায় রাত্রে খেয়ে সকালে চালকী। ইন্দু এল। তার সঙ্গে বারাকপুর যাই। এখনও বন্যার জল থৈ থৈ করচে। সমুদ্রের মত। এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

একমাসে অনেক ঘটনা ঘট্‌ল। আমি গালুডি গেলুম পুজোর ছুটিতে, সেখান থেকে জর নিয়ে ফিরলুম। বারাকপুর গিয়ে আট-নয় দিন ছিলুম। বড় নির্জ্জন, বিশেষ করে আমাদের

পাড়াটা। সেখান থেকে রোজ মাছ ধরা দেখতে যেতুম নদীর ধারে। ইন্দু মাছ ধরত—ওর একটা ভাঁড় আছে, সেটাতে রোজ মাছ পড়বেই পড়বে। গুটকে থাকত। মাছ খুব সস্তা হয়েছিল। সম্প্রতি কালীপুজোর আগে কলকাতায় এসেচি।

চূড়ামণি যোগ গেল গত সপ্তাহে। রাত তিনটের সময় উঠে জগন্নাথ ঘাটে ও তারাসুন্দরী পার্কে গিয়ে ভলান্টিয়ারী করলুম। কত ছেলেমেয়ে হারিয়ে যেতে লাগল, তাদের যথাস্থানে পাঠালুম। আমাদের স্কুলের রামচন্দ্র দত্ত তার সেবা-সমিতির সেক্রেটারী, সে-ই আমায় যেতে বলেছিল।

সকালে ফিরে বনগাঁ গেলুম। খুকুদের বাসায় গিয়ে দেখি খুড়ীমা গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন—খুকুর সঙ্গে গল্প-গুজব করলুম, প্রায় সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত, খাওয়া-দাওয়া করলুম ওখানে।

সম্প্রতি নুটু চাকরি পেয়ে কাল রাত্রে বেলডাঙ্গা চলে গেল। জাঙ্গিপাড়ার বৃন্দাবনবাবু অনেক দিন পরে এসেছিলেন—কাল তাঁর সঙ্গে বসে অনেক কথা হয়, অনেক কাজ করা গেল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসে।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলুম, পরশু এসেছি। প্রথমে খুকুদের নতুন বাড়িতে গিয়ে দেখি ওরা সেই দিনই এসেচে। ও ঘর ঝাঁট দিতে এল আমার ঘরে—কত গল্প হল। রাত্রে অন্নদাশঙ্করের স্ত্রী লীলার গল্প ও চিরপ্রভা সেনের গল্প করলুম। ভোরে উঠে চাল্‌কী। সেখান থেকে বারাকপুর ইন্দুদের বাড়ি। হরিপদদাদা সেখানে উপস্থিত, সে কাঠের ব্যবসা করচে। ইন্দু গল্প-গুজব করলে, সে কচুগাছ পুঁতছিল। আমার বাড়ি গিয়ে চাবি খুলে জিনিসপত্র রেখে স্নান করতে গেলুম। অনেকদিন পরে কুঠীর মাঠে ভূষণের ক্ষেত্রে বেড়াতে গিয়ে ভারী আনন্দ হল। তবে বন্যার জলে ছোট এড়াঞ্চির গাছ সব মরে গিয়েছে দেখলুম। স্নান করে বাড়ি গিয়ে রোয়াকে বসে লিখলুম হোটেলের গল্পটা। গুট্‌কে এল—সে ভারি খুশি আমি যাওয়াতে। তাকে নিয়ে বিকেলে হাটে যাই। বিজনের ডাক্তারখানায় গল্প করলুম, নুটুর চাকরির কথা বলি। তারপর মাছ কিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে চাল্‌কী এলুম। পথে লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিলুম একজন লোককে দিয়ে। বনের মধ্যে সাঁইকাটাতে কতক্ষণ বসে। চাল্‌কী এসে তারাপদর সঙ্গে গল্প—দিদির বাড়ি গিয়ে কতক্ষণ কথা বলি। সকালে উঠে লিখি। দুপুরের পরে বনগাঁ খুকুদের বাসায় এলুম। খুকু একটু পরে এসে বল্লে—একেবারে গা ধুয়ে এলুম—আপনার পাল্লায় পড়লে আর তো যেতে পারব না। তারপর কমলের চিঠি, সুপ্রভার কবিতা পড়লে। বেলা পড়ে এল। বল্লে—চলুন, ছাদে যাই, দেখিয়ে আনি। ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বললুম। মেরী এণ্টয়নেট ছবির গল্প করি। নিস্তব্ধ বৈকাল, ছায়া পড়ে আসচে খয়রামারির দিকে। বেশ লাগল। চোদ্দ বছর বয়সে কি দেখেছিল সে সম্বন্ধে কথা। তারপর চা খেয়ে ওখান থেকে বার হয়ে লিচুতলায় এলুম। আগের দিন যখন রাত্রে থাকি, বেরুবার সময় বল্লে—সকাল করে আসবেন, দেরি করবেন না। লিচুতলায় বিশ্বনাথের সঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা, রাত আটটার ট্রেনে কলকাতা।

আজ নীরদবাবুর বাড়িতে সোমনাথবাবুর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা হল। তারপর পার্ক ষ্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত হেঁটে এলুম। বেশ লাগছিল শহরের এই জনস্রোত। মেট্রোর সামনে খুব ভিড়, Marie Antoinete ছবি দেখানো হচ্ছে, নর্ম্মা শিয়ারার নেমেচে প্রধান ভূমিকায়। রাস্তায় রাস্তায় সাধনা বোস, কাননবালার ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন।

পঞ্চাশ বছর পরের কলকাতা কল্পনা করলুম। কেউ নেই এরা। কেউ নেই আমরা। সাধনা বোস প্রাচীনা বৃদ্ধা হয়ে হয়তো বেঁচে আছে। তখন নতুন একদল উঠেচে, তাদের নাম কেউ জানে না। জীবনে চিত্র্য-নাট্যপটে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। গিরিশ ঘোষের স্কুলের প্রবীণা অভিনেত্রী বিনোদিনী আজও আছে। গঙ্গার ধারে বসে মালা জপ করে।

এই তো জীবন—এই যাওয়া, এই আসা, এই পরিবর্ত্তন। দেখতে বেশ লাগে।

আমি সবটা মিলিয়ে দেখি—একটি চমৎকার সিনেমার ছবি।

এই খুকু, এই সুপ্রভা, বনসিমতলার ঘাট, আমি—কে কোথায় মিলিয়ে যাব।

হুটুর বিয়ে হয়ে গেল গত বুধবারে ১৬ই অগ্রহায়ণ। জাহ্নবীকে আনতে গিয়েছিলুম—খুকুদের বাড়িতে গেলুম, কতক্ষণ গল্প করার পর বাইরে জ্যোৎস্না উঠেচে দেখে বাইরে এলুম—ও বল্লে, ছাদে চলুন। ছাদে গেলুম, খুড়ীমা এল না দেখে ও বল্লে—মা এল না। দুজনে কত গল্প করলুম, নতুন ব্লাউজের গল্প, কি করে সেটা ছিঁড়ে গেল তাই নিয়ে হাসাহাসি। পরদিন দুপুরে গিয়েচি, কত গল্প, কেবল বলে, 'বসুন বসুন'। তারপর গাড়ি এসেচে, জাহ্নবীকে নিয়ে যাচ্চি, ও দেখি ছাদের ওপরে উঠেচে। আমি ওদের বাড়ি যাচ্চি দেখে নেমে এল। বাইরের দোর খুলে দিয়ে চলে গেল। তারপরেই পান হাতে করে এল। চায়ের কাপ যে আলমারিতে থাকে, সেখান থেকে টাকা দিলে। ও খুঁজে পায় না—আমি খুঁজে বার করলুম।

সারাপথ ট্রেনে কি আনন্দেই গেলুম। আনন্দেই ভোর। সে আনন্দের ভাবনা আর শেষ হয় না। জ্যোৎস্না-ভরা গত রাত্রির ছাদে কথা, ইছামতীর দৃশ্য, ওর সেই নতুন ব্লাউজের গল্প কেবলই মনে হয়।

মামার বাড়ি যাবার আগে জাহ্নবীদের কলকাতা নিয়ে ঘোরালুম। মামার বাড়ি গেলুম সন্ধ্যার সময়। ভোর রাত্রে দধি-মঙ্গল হল। তখনও ঘুম ভেঙে উঠেই কি সুন্দর ভাবনা! আনন্দের চিন্তাতেই ভোর। সারাদিন ওই একই চিন্তা। অন্য চিন্তাই নেই। সেই রাত্রি, সেই জ্যোৎস্না-ভরা ছাদ, সেই ব্লাউজের গল্পের স্মৃতি। বিয়ে হয়ে গেল। তার পরদিন এক রকম কাটল। শুক্রবারে বৌ-ভাত। খুব জাঁক-জমকেই বৌ-ভাত হল। বিভূতির মা এলেন, বিষ্ণু এল বারাকপুর থেকে। শনিবার ওদের নিয়ে আবার বনগাঁ। আবার কত কথা, কত গল্প। ও বল্লে, যা কিছু শিখেছি আপনারই জন্যে, আপনি কত বিদ্বান, আমি তো কিছুই জানিনে কি করে যে আপনার সঙ্গে এমন হল! দেখুন, সংসারের কোন কাজে মন বসাতে পারিনে—মন হু হু করে, কেবল ওই সব কথা ভাবি।

আমি দেখলুম—আমারও তো ওই রোগ। অদ্ভুত! অদ্ভুত! বল্লে, কোথাও তার আগে নিয়ে চলুন। জীবনে অনেক বেড়াব কিন্তু আপনার সাহচর্য্য তো আর পাব না।...

ভগবানের অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ দান এই জীবনের অমৃত-ধারা। পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে তা অনুভব করচি—আজ সাত বছর ধরে, ১৯৩৪ সাল থেকে। এর তুলনা নেই। এ আনন্দের বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষা নেই। কতকাল চলে যাবে—তখন খুকুও থাকবে না, আমিও থাকব না—কে জানবে ইছামতী তীরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে শেফালি-বকুল গাছের নিবিড় ছায়ায় ছায়ায়, কত হেমন্তের দিনের সন্ধ্যায়, কত শীতের দিনের জ্যোৎস্নায় দুটি প্রাণীর মধ্যে কি নিবিড় প্রীতির বন্ধন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল!

আকাশে তার বার্ত্তা লেখা থাকবে, সে গ্রামের বাতাসে তার গানের ছন্দ অশ্রুত সুরে ধ্বনিত হবে, সেখানকার মাটির বুকে তাদের চরণচিহ্ন অদৃশ্য রেখায় আঁকা থাকবে চিরকাল অনাগত

যুগের প্রণয়ীদের উৎসাহ ও আনন্দ যোগাতে।

কাল বৈকালে বিশ্বনাথ ও আমি বৈকালের ট্রেনে এলাম। এসেই সারারাত মিউজিক কনফারেন্সে গান শুনেচি। এসেচি রাত চারটার সময় বিখ্যাত কেশরী বাঈ ও বরোদার লছমী বাঈয়ের গান শুনে। বেনারসের পুরস্কার মিশ্র ও বিলায়তুর সানাই বাজনা সত্যিকার উপভোগ করবার জিনিস। কেশরী বাঈ যখন বসন্ত-বাহার আলাপ আরম্ভ করলে তখন আমাতে যেন আমি নেই মনে হল—যেন শৈশবে আমাদের গ্রামে শতমধুর বাল্যস্মৃতির মধ্যে ফিরে গেলুম এক মুহূর্ত্তে। কত মধুর অপরাহ্ণের ছায়ায় অতীত দিনের জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে আমার অতি প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান যেন অস্পষ্ট হয়ে এল—বুঝলুম না কোনটা অতীত, আর কোনটা বর্ত্তমান। কেবল এইটুকু বুঝলুম, গান শুনতে শুনতে আমার মন আরও একজনের জন্যে খুব খারাপ হয়ে উঠল—আজই তাকে ছেড়ে এসেচি, কেবলই মনে হচ্ছিল এত মেয়ের মধ্যে কন্‌ফারেন্সের সভায়, আমার যেন কেবল তার কথাই মনে পড়েচে, অবশ্য সেই বয়সের মেয়ে দেখলে। এবার বড়-দিনের ছুটি কি আনন্দেই কেটেচে—ওকে নানা রকম গল্প করে ও কত রকমের কথা বলে। সে সব এমন চমৎকার যে সারা বড়দিনের ছুটি কেমন যেন নেশার মত আনন্দের ঘোরে কেটেচে। সকালে দেখা করতে যেতুম—একদিন 'বাজার করব' বলে তাড়াতাড়ি করচি, বল্লে—কেন এখুনি যাবেন? বল্লুম—বাজার না করলে বাড়িতে বকবে জাহ্নবী। ও বল্লে—আপনি একটু বকুনি সহ্য করতে পারেন না? আর আমি যে আপনার জন্যে কত বকুনি সহ্য করেচি মার কাছে! আপনার তো ছোট বোনের বকুনি!

খুড়ীমা দুদিন ভাগবত শুনতে গেলেন—আমি ওর সঙ্গে বসে গল্প করলুম কত ধরণের। বেশ কাটল ছুটিটা। কোন ছুটি এত আনন্দে কেটেচে কিনা এর আগে বলতে পারি নে। ভাল-বাসার প্রকৃত রূপ কি তার কতটা যে বুঝলুম!

হাওড়া টাউন হলে ওঁরা আমায় এক সম্বর্দ্ধনা করে মানপত্র দিয়েছিল ছুটির আগেই, তাতে রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

একদিন আশীষ গুপ্তের মোটরে রাজপুরে ফুলিদের ওখানে গিয়েছিলুম, সেও বড়দিনের আগে। ১৯৩৮ সালটা সবদিক দিয়ে বড় অদ্ভুত বছর আমার জীবনে।

এবারকারের আর একটি চমৎকার ঘটনা, ভাগলপুরে সুরেন গাঙ্গুলী মশায়ের সেই চেকভের Cook's Wedding বইখানা—যা পড়ে মুঙ্গেরে কোম্পানীর বাগানে, বড় বাসায় গঙ্গার ধারে আজ চোদ্দ বছর আগে কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েছিলুম—তা পড়লাম বসে—সেই বইখানাই (সুরেন গাঙ্গুলীর কাছ থেকে এনেছি, বইখানা শরৎচন্দ্রের) বারাকপুরের বাড়ির রোয়াকে বসে পড়লুম। আশ্চর্য্য—না!

সুপ্রভা এবার একটা ভালো ক্যালেণ্ডার পাঠিয়েচে।

মনে আছে এই শীতকালে পাটনার ডিস্ট্রিক্ট জজের বাড়ি গঙ্গার ধারে বেঠোফোনের মিউজিক শুনতে গিয়েছিলুম গ্রামোফোন রেকর্ডে, নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে সকাল বেলা। ওপারে ধু ধু গঙ্গার চর, শীতের নদী, বড় বটগাছটা—আমাকে কেবলই মনে এনে দিয়েছিল একটি মেয়ের কথা। সে যেন কোথায় দূরে আছে, শিউলি বকুলের ছায়ায় ছায়ায় তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় দুপুরে, সকালে, বৈকালে, সন্ধ্যায় ছায়া ঘন হয়ে যখন নামে। যখন চা-পার্টি বসল পাটনায় গবর্নমেণ্ট উকিলের বাড়ি সন্ধ্যাবেলা—তখনও রাঙা রোদ মাখানো বাইরের গাছপালার দিকে চেয়ে ওর কথাই ভেবেচি। আর কি আনন্দেই মন ভরে উঠত!

বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হল পরশু, সরস্বতী পূজোর দিন। সজনীবাবু, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর সবাই গিয়েছিল আমার বাসায়। সজনীবাবুর সঙ্গে খুকুর দেখা করিয়ে দিলাম। তুলুর মা, মাধব ঘোষাল, রমাপ্রসন্ন, গৌরবাবু, সব সকালে গিয়েছিল মোটরে। ওদের নিয়ে গেলুম বারাকপুরে। খুকুদের বাসায় চা খেয়ে গেল সবাই। বারাকপুরের আমার ঘরের মধ্যে বসল। ইন্দুদের বাড়ি সব গেল চা খেতে। আমাদের পুরোনো ভিটে দেখলে। মায়ের কড়াখানা দেখলে—তারপর বরোজপোতার বাঁশবাগানে গিয়ে সবাই পড়ল শুয়ে। কিছুক্ষণ পরে মোটর মেয়েদের নিয়ে এসে পৌছল। তুলুর মা আর খুকু দেখি বাঁশবাগান দিয়ে চলেচে নদীর ঘাটে। তুলুর মা বাঁশবাগানে এসে দাঁড়াল। তারপর আমরা যখন নদীর ঘাটে যাচ্চি, তখন দেখি খুকু আর তুলুর মা আর উমা আসচে। আমরা কুঠীর মাঠে গেলুম, ভাঙা কুঠীটা দেখলুম। তারপর মেয়েদের রেখে প্রথম আমরা এলুম বনগাঁয়ে। মেয়েরা পরে এলেন। সজনী, ব্রজেনদাকে নিয়ে গেলুম খুকুদের বাড়ি। খুকুর সঙ্গে কথা হল। তারপরে বিরাট সাহিত্য-সম্মেলন স্কুলের হলে। সত্যবাবুর পার্টির পরে সবাইকে রওনা করে দিয়ে খুকুদের বাড়ি এসে গল্প করলুম। খুকু কাছের চেয়ারে বসে কাদম্বরী পড়লে। ও আর আমি দুজনে গ্রামে কেমন বেড়ালুম।

বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনে তারাশঙ্করদের বাড়ি এসে ক'দিন বেশ কাটালুম। কাল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে বীরভূমের উদার, উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। জ্যোৎস্নালোকিত মাঠের মধ্যে বসে দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খুকুর কথা ভাবলুম। ওর দ্বারা আমাদের যে অভাব পূরণ হয়, তা আর কারো দ্বারা যে হয় না তা বলাই বাহুল্য। ওর স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, হাসি, চোখের চাহনি, ছাদে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা—এ সবই আমার জীবনের একটা মস্ত অভাব পূর্ণ করেচে। এই কথাটাই লাভপুরে এসে পর্য্যন্ত মনে হয়েচে—বিশেষ করে কাল ওই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে বসে দূর দিগন্তের জ্যোৎস্না-প্লাবিত তালীবনের দিকে চেয়ে চেয়ে —আজ শুষ্ক রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়ে—ওই কথাই মনে হয়েচে বা কাল নির্ম্মলশিববাবুদের বাড়ির পেছনে সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে একা বসে ওর যে ছবিটি মনে এসেচে সেটি হচ্চে—এই শনিবার, ছাদে দাঁড়িয়ে ও প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়িখানা সাগ্রহদৃষ্টিতে দেখচে।

মধ্যে এখানে সুপ্রভা এসেছিল—তার সঙ্গে একদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গেলুম। তারপর সে চলে গেল। একদিন আমার মেসে এল সকালে প্রীতি সেন বলে একটি মেয়ের সঙ্গে। ওকে শেয়ালদ' স্টেশনে তুলে দিয়ে এলুম। তারপর বাড়ি গিয়ে খুকুদের সঙ্গে এসব গল্প করি। খুড়ীমার অসুখ হয়েচে। খুকু ও আমি বসে অনেক গল্প করি। মনোরমা ও তার বরের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে বারাকপুর গেলুম। প্রচুর আমের বউল হয়েচে দেশে, বউলের ঘন গন্ধ সর্ব্বত্র। ন'দিদির সঙ্গে গল্প করি। কিশোর বোষ্টম রোয়াকটা ঝাঁট দিয়ে দিলে। বরোজ-পোতার বাঁশবনে ডোবার ওপারে কি চমৎকার একটা চারা শিমুল গাছে শিমুল ফুল ফুটেচে। শ্যামাচরণদা'র সঙ্গে গল্প করি। খুকুদের বাড়ির দিকে কেউ নেই—যেন শূন্য! খুকুর কাছে সে গল্প করি দুপুরে গিয়ে। খুকু বলে, 'বসুন, জিরিয়ে যাবেন।' তারপর মাধব ঘোষাল একদিন তার বৌদিদি, মাসীমাকে নিয়ে বারাকপুরে গিয়ে বাঁশবনে বসল—মায়ের কড়াখানা দেখে এল। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে একদিন Salt Lake দেখতে গেলুম।

পরশু গিয়েছিলুম ছুটুর কর্ম্মস্থলে বেলডাঙা। আজ ফিরেচি। কাল এমনি সময় মাসীমা,

বৌমাকে নিয়ে বহরমপুর গিয়েছিলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গার ধারে ঠিক যেন ইসমাইলপুরের মত মনে হল। তারপর জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে ভাবলুম!

আজ ফিরেচি তিনটের ট্রেনে। দুপুর রোদে সারাপথ ঘুমিয়েচি—তবে, বীরনগরের কাছে ঘেঁটুফুল দেখেচি খুব। দূরে এই ফাগুন দুপুরে একটি মাত্র গ্রাম এত গ্রামের মধ্যে, যেখানে একটি মাত্র মেয়ের কথা মনে হয়। শিউলিতলায় ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুল কমিটির মিটিং ছিল, মিটিংএর পর স্কুলের ছাদ থেকে বড় অনুভূতি হল অনেক দিন পরে। 'জনতার মাঝে জনগণপতি' গানটি বহুদিন পরে গাইলুম—সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি আবার মনের মধ্যে ফিরে পেলুম। তখন খুকু ছিল না—যখন গাইতুম পঞ্চানন মান্নাকে পড়াবার সময়ে।

ট্রামে আসতে আসতে ভাবছিলুম, সেই যে নাগপঞ্চমীর দিন শ্রাবণ মাসে বারাকপুরে গিয়েছিলুম, খুকুদের বাড়ি যেতুম, ওদের হাসাতুম, 'ছোড় দি, ভাল কি মন্দ' বলে—তারপর যেন আর কখনো বারাকপুর যাইনি—ওকে আর দেখিওনি। ও চলে যেন কাছ দিয়ে, আমি হাত বাড়িয়ে চালের বাতা থেকে কাপড়ের ফালি পাড়তুম—ও বলত, মা রেখেচে তুলে, হাত দেবেন না। তারপর যেন এই দীর্ঘ সাত-আট মাস ওর সঙ্গে দেখা হয় নি।

খুকু একরকম ঠেলেই বারাকপুরে পাঠালে এবার। মহরম ও দোলের ছুটি আর বছর কেটেছিল গালুডি, এবার বনগাঁ। খুব আনন্দে কাটিয়েচি। চারদিন খুকু ও আমি একবার সকালে একবার সন্ধ্যায় বসে গল্প করতুম। একদিন ওকে নক্ষত্র সম্বন্ধে আমার Radio talk-টা পড়ে শোনালুম।

ঝম্‌ঝম্‌ দুপুরে গেলুম বারাকপুরে। সারাপথ ঘেঁটুফুলের কি সুগন্ধ! বিশেষ করে চাল্‌কী আর বনগাঁ থেকে বার হয়েই। চাল্‌কী মুসলমান পাড়ার মধ্যে, গাজিতলার রাস্তায় বাঁশবনে একা চুপ করে মাঝের বাড়িখানার সামনে বসে রইলুম। বাঁশপাতায় আগুন ধরিয়ে দিলুম। কোকিল ডাকচে অনবরত। সেদিন মাধব ঘোষালেরা মোটরে বেড়াতে এসে ওর বৌদিদি ও মাসীমাকে নিয়ে এই বরোজপোতার বাঁশবনে বসেছিল।

কাল শনিবার বেলডাঙা গিয়েছিলুম নুটুর কাছে। সারাপথ ঘেঁটুফুলের শোভা যা দেখলুম, তাতে মন মুগ্ধ হয়ে গেছে। এই ফুলটা বেশী আছে মদনপুর ও শিমুরালি স্টেশনের কাছে এবং রাণাঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইনের দু-ধারে, আর আছে বীরনগরে স্টেশনের সামনের মাঠে। কেমন একটা মিষ্টি অথচ ঈষৎ তেতো গন্ধ বার হয় ফুল থেকে! মুর্শিদাবাদ লাইনে ঘেঁটুফুল নেই, বেলডাঙা ছাড়িয়ে বহরমপুরের পথে কিছু আছে, আর আছে 'পাগলাচণ্ডী' বলে স্টেশনের কাছে।

সন্ধ্যার আগেই বেলডাঙা থেকে ফিরলুম মামীমাদের নিয়ে, সারাপথ দূরে একটি গ্রামের ঘেঁটুফুলের বনের কথা চিন্তা করেচি, তার বনসিমতলার ঘাট, তার শিউলিতলা, আমতলা এই বসন্তে কি মধুর হয়েচে! একটি মেয়ের কথা মনে হয় ঝম্‌ঝম্‌ দুপুরে তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধের মধ্যে, সে শিউলিতলার পথ দিয়ে লেবুতলার পাশ দিয়ে আমতলার উঠানে আসচে চুপি চুপি! …এ একটা ছবি, যা এ সময় বড় মনে আসে…

গত শনিবারের আগের শনিবার মাধব ঘোষাল একটা গ্রামোফোন দিলে। তাই নিয়ে বনগাঁ গেলুম। খুকুকে খুব গান শোনালুম, 'খনা' ছবি দেখাতে নিয়ে গেলুম ওদের সকলকেই।

খুকু একখানা পাপোশ বুনেছে দড়ির। সেখানা আমায় হাসিমুখে নিয়ে এসে দেখাতে লাগল —দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

—দেখুন, কেমন বুনেছি, ভালো না?

—বেশ ভালো, চমৎকার।

—না সত্যি বলুন!

—না না, বেশ!

তবুও যায় না। পাপোশখানা হাতে নিয়ে সাগ্রহ মুখে দাঁড়িয়েই রইল দরজার কাছে।

তার সেই হাসি-হাসি মুখখানা বেশ মনে পড়ছে এখনও। সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানা।

গতকাল রামনবমীর হাফ্ ছুটি পেয়ে রাজপুরে ফুলিদের বাড়ি গেলুম। ওরা সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়িতে আছে। অনেকদিন পরে সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়িতে গেলুম। সেই পুকুরধারটিতে কতকাল পরে আবার দাঁড়ালুম। আমার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ হয় এই পুকুর-পাড়ের ঐ দেবদারু গাছটা দেখে। কি অপূর্ব্ব ভাবই হত মনে!

এই শনিবারে (২রা) বাড়ি গিয়ে মুখুজ্যেদের ওখানে খুব গ্রামোফোন বাজানো গেল। গত ঈস্টারের ছুটিতে খুকুকে গ্রামোফোন শোনাব বলে বনগাঁয়ের ডাক্তারবাবুকে কত বলে বারাকপুরে নিয়ে গিয়েছিলুম। এবার ও নিজেই একটা গ্রামোফোন পেয়েচে মাধব ঘোষালের কাছ থেকে। আমায় রেকর্ড চেয়ে আনতে বলেছিল। ওরাও দেখি, দিলীপ রায়ের আর বছরের ভাল গান 'এই পৃথিবীর পথের পরে' প্রভৃতি ভাল গানগুলো পেয়েচে। সেদিন রবিবারে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত আমায় উঠতে দেয় না—কেবল বলে—"এইটে শুনে যান না! লাইলি মজ্নুর পালাটা শুনে যান।" বহু লোক এসেচে, চা করচে খুব, আর বলচে—"রবিবার দিনটাই কি সব যত ভিড়! অন্য দিনও তো আসলে পারত গান শুনতে।" ওর জন্যে প্রাণপণে ঘুরে রেকর্ড সংগ্রহ করেচে ওর দাদা, বনগাঁর সব জায়গা ঘুরেচে! আমায় বলেছিল—আমিও অপূর্ব্ববাবুর বাড়ি থেকে, দেবাশীষের কাছ থেকে, গণপতিবাবুকে বলে নানা জায়গা থেকে অনেক রেকর্ড যোগাড় করেচি। বীণা চৌধুরীর গান, দিলীপের, জ্ঞান গোঁসাই-এর গান ইত্যাদি। ভারী উৎসাহ লেগেচে রেকর্ড সংগ্রহ নিয়ে ও গান বাজানো নিয়ে। সেদিন বল্লে—এবার টিপ আনবেন আমার জন্যে!

বল্লুম—বেশ।

—আর কি আনবেন?

—বল না।

—কলকাতায় আর একবার যেতে হবে।

—যেও, ভালই তো।

—টিপ আনবেন ঠিক।

মধ্যে গেলুম রাজসাহী নওগাঁ। রাত্রে মোটর নিয়ে গেলুম মহাদেবপুর জমিদার বাড়ি। সেখান থেকে পাহাড়পুর। প্রায় সত্তর মাইল মোটরে বেড়ানো গেল। এ শনিবারে বনগাঁ গিয়েচি—পান্নারা নিয়ে গেল বাসে। যখন যাচ্ছি তখন খুকু দেখি জানলার কাছে বসে গ্রামোফোন বাজাচ্চে। সকালে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করেছিল—আমায় বল্লে, টিপ ফুরিয়ে গিয়েচে, টিপ আনবেন কিন্তু।

আজ একুশ বছর পরে বারাকপুরে কালীর সঙ্গে বেলডাঙা বেড়াতে গিয়ে মরগাঙের ধারে সেই উঁচু জায়গাটাতে বসলুম। ১৯১৮ সালের মে মাসে প্রথম শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে ওকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে বসে গল্প করেছিলুম। আজ আবার এত বৎসর পরে ওর সঙ্গে মরগাঙের ধারে বসেচি সেই মে মাসেই। জীবনের কত ঘটনা তারপর ঘটে গেল—গৌরী এখানে এল, তাকে নিয়ে পানিতরে গেলুম—সে মারা গেল—তারপর জব্বলপুর, হরিনাভি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, আবার কলকাতা, ভাগলপুর—আবার কলকাতা, (১৯৩৩—৩৯)—কত কি, কত কি। আবার এতকাল পরে ও এসেচে, ওর সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে এসেচি বেলডাঙায়। ওর সঙ্গে অনেক গল্প করে আইনদ্দির বাড়ি গিয়ে দুজনে বসি। ওবেলা আমগাছে পরগাছা হয়েছিল তাই তুলে এনেছিলুম। খুকু তাই পরে এসে দেখালে কেমন দেখাচ্চে।

গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয়ে গিয়েচে—এতদিন পরে বেশ লাগচে। আবার শুরু হয়েচে শিউলি-তলার উঠোনে আসা-যাওয়া—নারকোল গাছের পাতায় লণ্ঠনের আলো পড়া—সেই সব প্রতি বছরের মত।

বিকেলে একটা সোঁদালি গাছে ঠেস্ দিয়ে কুঠীর মাঠে অনেকক্ষণ বসেছিলুম। তারপর বনসিমতলার ঘাটে এসে দেখি খুকু ঘাট থেকে পথে উঠেচে। খুড়ীমা তখনও জলে। ওরা উঠে চলে গেল, আদাড়ি এসে নামল জলে। আজ কি চমৎকার কালবৈশাখীর কালো মেঘ করে এল কাঁচিকাটার দিকে। জলে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। তারপরে শিমুলতলায় এসে দেখি উত্তর মাঠে কালবৈশাখী আরও নিবিড় হয়ে আসচে। কত কথা মনে করিয়ে দেয় এই বারাকপুরের কালবৈশাখী—এমন আর কোথাও যেন দেখিনি। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে আসা সার্থক এই কাল-বৈশাখীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া যায় বলে। বারাকপুরে আজকাল জীবনটা নানা সুখেদুঃখে হর্ষবেদনায় স্পন্দমান, পুরোনো দিনের স্মৃতির পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়—তাই হয়েছিল কিন্তু দিনকতক, ১৯২৩—১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত। অদ্ভুত ধরনের জীবন্ত দিন আজকাল—তবে বোধহয় এইবার যেন আরও বেশী। পরশু সুপ্রভার পত্র পেয়েচি—রত্নাদেবীর চিঠিতে তিনি লিখচেন তাঁদের ওখানে যেতে। দেখি কতদূর কি হয়।

আজ সকালে যখন কুঠীর মাঠে গিয়েচি, তখনই দূরে কোথাও আকাশের কোলে মেঘ ডাকচে। কি সোঁদালি ফুলে-ভরা মাঠের শোভা! ওপাড়ার ঘাটে যখন নেমেচি জলে, তখন মেঘের কি শোভা! ঘন কালো মেঘপুঞ্জ ঘুরে ঘুরে ওলট-পালট খেতে খেতে মাধবপুরের মাঠের দিকে উড়ে চলেছে—তারপরেই এল ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। খানিক পরে উঠল রোদ। খুকু ওই অত বেলায় উঠে যাচ্চে ন'দিদির বাড়ি থেকে—আমি বলতেই হেসে চলে গেল। তারপর সারাদিনের মধ্যে কতবার এল গেল—নানা ছুতোয়। আমতলায় চেয়ার পেতে বসে আছি—দুবার এসে খানিকক্ষণ করে রইল। বলে—এক পা এগিয়ে যাই তো দু' পা পিছুই। কেন তা কি জানি। সে কথাটা ওদের দাওয়া থেকে নেমে ছুটে এসে আমতলায় বলে চলে গেল। বিকেলে গোপাল-নগর থেকে এসেচি—ও অমনি এল শিউলিতলায়। খানিকটা পরে নাপিত-বৌ আসাতে আমি চলে গেলুম গা ধুতে। ভূষণ মাঝির জমির ওপারে সোঁদালি ফুল ফুটেচে—সে দিকে চেয়ে আমার কি আনন্দ—এমন অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি কোথাও হয় না কেন তাই ভাবি। জলে গা ধুতে নেমেও যেন আর উঠতে ইচ্ছে করে না। বনসিমতলার ঘাট, একফালি চাঁদ আকাশে,

কুঁচ-কাঁটার জঙ্গল—ঘাটে স্নানরত খুকুর দিদি—বিশেষতঃ ঘাটের পথে—এই সব মিলে কি আনন্দই এল মনে! অপূর্ব্ব আনন্দে কাটচে গ্রীষ্মের ছুটিটা। রোজ সকালে উঠে মনে হয় আজ না জানি কি ঘটবে। খুকু থাকে বলেই আনন্দটা ঘনীভূত হচ্চে। আনন্দের উৎসমূল তো ওই-ই।

আজ ভারী চমৎকার কালবৈশাখী হয়ে গেল বিকেলটাতে। কালবৈশাখীর যে অপূর্ব্ব প্রকাশ এখন সন্ধ্যার কিছু আগে। একটা চাপা রাঙা মেঘ হয়েচে এমন অপরূপ। কাল চাটগাঁ থেকে রেণুর পত্র পেয়েচি। সে লিখেচে—বাবা আপনি একবার এখানে চলে আসুন। লিখতে লিখতে মেঘটা অতি অপরূপ রাঙা রং ধরেচে। বারাকপুরে এবার অতি সুন্দর কাটচে—তবে ঝড়-বৃষ্টি অতি কম—ক'দিন তো বেশ গরম গেল।

আমি আর কালী, কুঠীর গাছে ডুমুর পাড়লুম। তারপর বেলডাঙা যেতে যেতে ভীষণ কাল-বৈশাখীর ঝড় পেলুম। ঘোষেদের দোকানের মধ্যে আমি, কালী, আইনদ্দির নাতি আর দোকানদার মনু ঘোষ। ঝড়ের বেগে দোচালা জীর্ণ ঘর উড়ে যায় আর কি—সবাই মিলে বাঁশ ধরে থাকি—তবে রক্ষা হয়। তারপর দেখি বড় অশ্বত্থ গাছটা পড়ে গিয়েচে। আমার নারকোল গাছটাও পড়েচে। খুকুরা নারকোল কুড়িয়ে রেখেচে সব। খুকু সন্ধ্যার সময় আমায় লণ্ঠন ধরে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। বল্লে, আজ খুব ভালো গল্পের দিন। যাবেন না আমাদের বাড়ি? ও রোজ সন্ধ্যার সময় আমায় নিতে আসে—ছুতো করে ন'দিদিদের বাড়ি আসে আমায় নিয়ে নেতে। যাবার সময় বলে—যাবেন কি?

আর বিকেলের দিকে অপূর্ব্ব কাজল মেঘ করে এল—থমকে রইল, বৃষ্টি হয় না। খুকু আজ সকাল থেকে কতবার যে এল! আমি বেলডাঙ্গায় বেড়াতে গেলুম, পুলের এধারে ঘাসের ওপরে বসি। খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি খেজুর, শিমুল বাঁশ বনের মাথায় কালো কাজল মেঘ (খুকুকে দুপুরে বলছিলুম আমতলায় যখন সে দিলীপ রায়ের 'তরঙ্গ রোধিবে কে?' বইখানা দিতে এল—তুই বলতিস—কা-লো-কাজল মেঘ) সব সুদ্ধ মিলে বড় অপূর্ব্ব লাগল।

এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজেয় শোভা এমনি ধারা দেখা যায়—ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে—কত বনসিমতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি কান্না প্রেম বিরহ—এই রকম চলবে। এদের নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লিখব আজ মাথায় এসেছে। পৃথিবীর উর্দ্ধে এই শ্যামল মেঘ-স্তূপ যেমন শান্ত, স্থির তেমরি নির্ব্বিকার। মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি—নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য নরনারী। Da Vinci-র শেষ জীবনের মত গম্ভীর তার আকৃতি। সন্ধ্যায় স্নান করে ফিরে এলুম—খুকু মনোরমার মার সঙ্গে বাঁশতলার পথে ঘাটে যাচ্চে। তাকেও এই উপন্যাসের মধ্যে স্থান দেব।

আজ দিনটি সব দিক দিয়ে ভারী চমৎকার। বেশ মেঘ করে এল, ঘন আমতলায় চেয়ার পেতে বসে দাওয়ার কোণে দণ্ডায়মান খুকুর সঙ্গে কথা বলচি। দুপুরের পর ইন্দু, আমি, গুটকে কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে মোল্লাহাটি গেলুম। ইন্দু গেল আমডোবে। আমি ও গুটকে মোল্লাহাটি কুঠী ও নীলের হাউজঘর দেখি এতকাল পরে। কি সুন্দর শ্যাম শোভা, অত্যুন্নত খেজুর গাছ, জলি ধানের ক্ষেত পথের দু পাশে, একটা সমাধি দেখলুম বাঁওড়ের ধারে মোল্লাহাটিতে। ফিরবার পথে খুব জামরুল পাড়লুম দুধারের গাছ থেকে। বেলা পাঁচটায় সময় ফিরে রোয়াকে এসে বসেচি, খুকু

এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

আজ সকালে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েচি, অপরূপ নীল মেঘ ওপারের চরের ওপরে ঝুলে পড়েচে। তাড়াতাড়ি এসে খুকুকে ডাকলুম—খুকু, খুকু, উঠে মেঘের অপূর্ব্ব রূপ দেখে যা—ও ঘুম ভেঙে উঠে ঘুম-চোখে মশারীর বাইরে মুখ বার করে বলল, আজ এত কাল পরে বর্ষা নামল বোধ হয়। পথঘাটে কালো এত ধুলো—যে একখানা গরুর গাড়ি গেলে ধুলোয় সর্ব্বাঙ্গ ভরে যায়। শেষ জ্যৈষ্ঠে এমন শুকনো খট্‌খটে রাস্তা, এমন ধুলো কখনো দেখিনি। আজও ধুলো ভেজেনি পথের। এ বৃষ্টিতে দিনটা ঠাণ্ডা হল মাত্র।

এবার গ্রীষ্মে ছুটির প্রতিদিনটি যে আনন্দ বহন করে আনে, তা মনের আয়ুকে যেন বাড়িয়ে দিয়েচে। দেহের যৌবনের ন্যায় মনের একটা যৌবন আছে, মনের যৌবন চায় নব আনন্দ, নব নব ভাবরাজি, আশা, উৎসাহ, সৌন্দর্য্যময় চিন্তা, কল্পনা, ভক্তি, বিরাটত্বের স্বরূপ উপলব্ধি। এবারকার মত সোঁদালি ফুলের মেলা, তুঁত ফুলের ও বিল্বপুষ্পর সুগন্ধ অন্যবার দেখা যায় নি, কারণ এবার ঝড়-বৃষ্টি বাদলা নেই বল্লেই হয়—খুকু এখানেই আছে, সে সর্ব্বদাই আসচে, গল্প করচে, গোপালনগরে বারোয়ারীর যাত্রা হবে, আমার বাল্যবন্ধু কালী অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছিল, এই সব নানা কারণে গ্রীষ্মের ছুটিতে এমন আমোদ অনেক দিন হয় নি। খুকু এই সবে ন'দিদির ঘর খুলবার ছুতো করে এসে গল্প করে গেল উঠোনে দাঁড়িয়ে। এই সব বিরাট আকাশের তলে, বন-গাছের ছায়ায় যে সব সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র প্রবাহ চলেচে—তার সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েচি যেন, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম আসি বারাকপুরে, এটি ১৯৩৯ সাল। এই এগারো বছর কি চমৎকার কাটল! কত বর্ষার শ্যামল-মেদুর আকাশ, কত হেমন্ত-জ্যোৎস্না রাত্রি, কত শীতের অপূর্ব্ব সন্ধ্যা নানা অনুভূতিতে মধুর হয়ে উঠল। আমার জীবনের ১৯২৯-১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই যে সময়টা চমৎকার সময়।

ছুটি ফুরিয়ে এল। আর দশ-এগার দিন। কিন্তু এবার যেমন বৃষ্টি একদিনও হয়নি—ব্যাঙ-ডাকানি বর্ষা, সারারাত ধরে বৃষ্টি-ঝড়; সে সব হয়নি বা নাইবার সময়ে ঘাটের পথে খাপরা কুচির ওপর দিয়ে জলের তোড় চলে যায়—কেঁচোর দল জলে বুকে হেঁটে যায় এ-ও এবার হয়নি। মাস ফুরিয়েচে। হাজ্‌রী পাগলার মাকে সেদিন পর্য্যন্ত আমবাগানে আম কুড়ুতে দেখেচি—আজকাল আর দেখিনে।

ক'দিন বারোয়ারির আসরে গোপালনগরে গণেশ অপেরা পার্টির গান হল। রোজ শুনতে যেতুম—একদিন তো বনগাঁ থেকে ন'টার ট্রেনে নেমে যাত্রা শুনে রাত দু'টোতে ফিরি। শেষদিন যাত্রা হল হাজারি প্রামাণিকদের বাড়ি। সুধীরদা, জিতেন, আমি—তাস খেলা হল সন্ধ্যাবেলা। কারণ খুব মেঘ ছিল আকাশে, টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল বলে যাত্রা আরম্ভ হতে পারেনি।

ছুটি শেষ হয়ে এল প্রায়। বাঁশবনে পিপুল লতার বন দেখা দিয়েছে। ভেদ্‌লো ঘাসের কুচো, সাদা ফুল মাঠে অজস্র ফুটতে শুরু করেচে। কোকিলের ডাক অনেক কমে এসেচে—তবে বৌ-কথা-কও ডাকুচে বেশী। এই যে লিখচি, জানালার উপরে বসে—হরি রায়ের বড় খেজুর গাছটা থেকে ডাঁসা খেজুরের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আজ ও-বেলা খুকুকে একটা কবিতা লিখে শোনালুম সকালে।

আজও সকালে বাঁওড়ের ধারের বট-অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেলডাঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়েচি।

ছুতোর ঘাটার কাছে দেখি, রাখাল বাঁড়ুয্যের স্ত্রী স্নান করে আসচেন। বল্লুম, ও খুড়ীমা, আপনার ভাই চলে গিয়েচে? উনি বল্লেন, সে তো সেদিনই গিয়েচে। আমিও যাব। এদেশে আবার মানুষে বাস করে? বল্লুম, কেন, এদেশের ওপর হঠাৎ অত চটে গেলেন যে! কোথায় যাবেন? বল্লেন, ভাইয়েদের কাছে চলে যাব। তারপর ওঁর ভাইদের গুণ-কাহিনী আমার কাছে সবিস্তারে বলতে লাগলেন। আমি তাঁর হাত এড়িয়ে খানিকটা এসে দেখি পথের ধারে পাতাল-কেঁড়ে হয়ে আছে। আদাড়ির নাতি মধুকে ডাকলুম, সেও বল্লে,—এগুলো পাতাল-কেঁড়ে। তারপর ভেদ্‌লো ঘাসের শয্যায় মাঠের মধ্যে গামছা পেতে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। বেশ লাগে! স্নান করে বড় আনন্দ পেলুম আজ—নদীর জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি যেন কাকের চোখের মত স্বচ্ছ! বাড়ি এসে শুনি ওগুলো নাকি পাতাল-কেঁড়ে নয়।

সকালে ভাণ্ডারখোলা গেলুম, কাকার মেয়ে শৈলর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে গেল গুটকে। রাস্তা বেজায় খারাপ—যাবার সময় রোদ ছিল খুব—পাল্লা ছাড়িয়ে বড় মাঠ—গাছপালা কম—কেবল একটা বড় বটগাছ আছে—হরিশপুরের মধ্যেও গাছ নেই—ভাণ্ডারখোলা গিয়ে পৌছুলাম বেলা তখন দশটা। ওদের চণ্ডীমণ্ডপে আগে একবার গিয়েছিলুম, দেবব্রতের কথা ভাবতুম তখন। শৈলর সঙ্গে দেখা হল—অনেক দুঃখ করলে সে। ভাইয়েরা দেখে না, নিয়ে যায় না। আসবার সময় বাড়ির বাইরে তেঁতুল-তলার পথে দাঁড়িয়ে রইল—প্রণাম করে বল্লে, আপনি এসেচেন বড় শান্তি হয়েচে আমার। আমি যদি মরেও যাই—আমার মেয়ে দুটোকে দেখবেন আপনারা। বড় কষ্ট হল মেয়েটাকে দেখে—ভালো ঘরেই বিয়ে হয়েছিল, খুব অবস্থাপন্ন ঘরে। কিন্তু ওর কপালক্রমে অল্প বয়সে বিধবা হল—এখন ভাসুর-দেওরেরা ওকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে আসবার সময় হরিশপুর ছাড়িয়েই কালো কাজল মেঘ বারাকপুরের দিকে জুড়ে যাচ্ছে—মাদেলার বিলের ওপর দিয়ে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। একটা বটগাছতলায় আশ্রয় নিলুম—ততক্ষণে বসে 'War and peace' পড়লুম গাছতলায়। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামল।

রাস্তায় হয়ে গেল ভয়ানক কাদা। পথ হাঁটা যায় না—কেবল পা পিছলে যাচ্ছে।

কাউকে পাড়ায় বলে যাইনি। এসে রোয়াকে বসেচি—খুকু ন'দিদিদের ঘরে কলের গান বাজিয়ে পাড়ার মেয়েদের শোনাচ্ছিল—নন্দর মার মুখে শুনলে আমি এসেচি। বার হয়ে এসে চুপি চুপি বললে—কোথায় গিয়েছিলেন?

—ভাণ্ডারখোলা।

ও গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর খুড়ীমা ঘাটে গেলে, ও এসে অনেকক্ষণ রইল। বল্লে,—মাকে পঞ্চাশবার জিগ্যেস করেচি,—মা, বিভূতিদা গেল কোথায়? একবার ভাবলুম বনগাঁ! কিন্তু বলে যেতেন তাহলে।

এই দিনই খুকু রাত্রে প্রস্তাব করলে কোথাও বেড়ানো যায় কি না। বল্লে, নৌকোয় করে বনগাঁ ওরা যাবে ৫ই আষাঢ়। তারপর সব ঠিক করা হবে। খুব উৎসাহ মনে।

একদিন সকালে পা মচ্‌কে গিয়ে ব্যথায় সারাদিন কষ্ট। কোথাও নড়তে চড়তে পারিনি। রাত্রে গোপাল ভাত দিয়ে গেল আমার বাড়ি।

এদিন নৌকো করে খুড়ীমা, আমি এবং খুকু বনগাঁ এলুম সন্ধ্যার সময়। বনুসিমতলার ঘাট থেকে বিকেলে আমরা বিদায় নিলাম, ও রেকর্ডের বাক্স বইচে, বল্লাম—রেকর্ডগুলো দে।

ও বল্লে—আচ্ছা, খোঁড়া পীর! থাক—আমিই বইচি!

গল্প করতে করতে আর কলের গান বাজাতে বাজাতে নদীর ওপর দিয়ে আসা গেল। এক একটা নৌকো আসে, আর বলি, খুকু, ভদ্রলোকের নৌকো আসচে—একটা ভালো গান দে।

ও ওমনি (এই পর্য্যন্ত লিখে রেখেছিলুম, তারপর তিনমাস বড় ঝঞ্ঝাটে কাটল বলে লিখতে পারিনি, আজ আবার লিখচি পূজোর ছুটির মধ্যে, আজ ১৪ই অক্টোবর) একখানা ভালো রেকর্ড দেয়। এমনি করে বনগাঁ এসে পৌছানো গেল। সেই রাত্রে লণ্ঠন ধরে আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকি—আর কুলিতে জিনিস বয়ে নিয়ে যায় খুকুদের বাসায়!

তার পরদিনের পরের দিন আমরা এলুম কলকাতায়—সেখানে থেকে আসাম মেলে রওনা। পদ্মার পুল দেখে খুকু খুব খুশি। পার্ব্বতীপুর স্টেশনে আমরা প্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে গেলুম। রাত্রিতে খুকু কেবল আমায় জাগায় আর বলে দেখুন দেখুন—কত বড় নদী চলে গেল!

সকালে নেমে গৌহাটি। তখনই মোটর বাসে বশিষ্ঠ আশ্রম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে থেকে দুপুরে পাহাড়ে উঠি। সেইদিনই আমরা রওনা হই। বিকেলে পাণ্ডুঘাটে একটা খাবারের দোকানে খাওয়ার সময় খুকু বল্লে—দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওরা বিল দেবে তো! কথাটা আমার বড় ভালো লাগল। এরা আবার খাবার দোকানে বিল দেয় নাকি!

সকালে পার্ব্বতীপুরে আবার চা খেলুম সকলে। সেই দিনই বৈকালের ট্রেনে বনগাঁ।

খুকুর বিয়ে হল এই দিনে। আমি বিকেলের গাড়িতে বনগাঁ গেলুম। আমার হাতে ছিল একখানা 'লিপিকা', আমার কাগজ নতুন বার হয়েচে। সেখানা ওর হাতে নিয়ে গিয়ে দিলুম। ও এল বাইরের ঘরে। বল্লে—এত দেরিতে এলেন যে বড়! বিবাহ চুকে গেলে রাত তিনটের মেলে কলকাতা এলুম।

এদিন পাবনা গেলুম সভাপতিত্ব করতে। আর বছর এই দিনে নাগপঞ্চমীর দিন বাড়ি গিয়েছিলুম—খুকুর বাড়ি খেয়েছিলুম সেকথা মনে পড়ল। সৎসঙ্গ আশ্রমে গিয়ে নতুন মেজ বৌদিদির সঙ্গে আলাপ হয়। মেজ-বৌদিদির দুই বোন গান করলে বেশ।

খুকুর পত্র পেলুম মানকুণ্ডু থেকে। ও লিখেচে যেতে। বিকেলের গাড়িতে মানকুণ্ডু গেলুম। আমি, দেবু ও খুকু বেড়াতে গেলুম খাঁ-দের বাগানে। খুব যত্ন করলে। অনেক কথা বল্লে। তার পরদিন চলে এলাম।

৺পূজার ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এল। বনগাঁতেই ছিলুম সারা ছুটি। খুকুও আছে বনগাঁয়ে। ওদের বাড়ি প্রায়ই দুবেলা বেড়াতে যাই। একদিন যাইনি, সেদিন সপ্তমী পূজোর দিন, হাজারির বাড়ি গোপালনগর গেলুম বেড়াতে। অল্পদিন হল বর্ষা থেমেচে, শ্যামলী লতায় ফুল ধরেচে, আরও নানা বনফুলের সুগন্ধ সকালের বাতাসে। আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। হাজারি ওখানে খেতে বল্লে। সুধীরদা, জিতেন, আমি, বিজন—সবাই মিলে খুব আড্ডা দেওয়া গেল। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে একদিন রাত্রে বারাকপুরের বাড়িতে যে লোকটি আমায় কবিতা শুনিয়েছিল, সেই কুণ্ডুমশায় আমাকে নিভৃতে ডেকে তার নতুন লেখা কবিতা শোনালে। গৌর কলুর দোকানে বসে অল্পক্ষণ গল্প করি। এসব জায়গায় আসিনি আজ চার মাস—সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটির পর আর আসিনি। এসব জায়গায় যেন বারাকপুরের জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের ছুটির আব-হাওয়া মাখানো, খুকু মাখানো, বকুলতলা মাখানো—আমার হাট করে নিয়ে যাওয়া, "ও খুকু,

হাট নিয়ে যা, খুড়ীমা কোথায় ?" সেই সব দিনের শত স্মৃতি জড়ানো গৌর কলুর দোকানের সঙ্গে। ফিরবার পথে গাজিতলায় ভাঙনের ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। ওই দূরে বন-সিমতলার ঘাট, কে একটি ছোট মেয়ে যেন এখনও স্নান করে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে বনসিমতলায় ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার চকিত নয়নে পিছন দিকে চাইলে। বনগাঁয়ে ফিরে সার্ব্বজনীন পূজার আরতি দেখতে গিয়েছি প্রফুল্লদের বাড়ি। আজ দুবেলাই খুকুদের বাড়ি যাইনি। একটু পরে ভিড়ের মধ্যে খুকু এসে দাঁড়াল, চারিদিকে চেয়ে দেখলে—তারপর চৌকির ওপর উঠে ঠাকুর দেখতে লাগল আর মাঝে মাঝে এদিকে চাইচে। বেজায় রাগ করেচে আজ সারাদিন যাইনি বলে। পরদিন সকালে ভয়ানক অনুযোগ ও অভিমানের পালা।

তারপর একদিন নকফুল হরিপদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি নৌকো করে নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম—আমি, মন্মথদা, বিভূতি। আমাদের ঘাটে নেমে গুটকেকে ডাকতে গেলুম, আমি, বিভূতি ও মন্মথদা। গুটকে ইন্দুর ছেলে, গরীব বাপ, ভাবলুম নিয়ে যাই, ভালো-মন্দটা খেতে পাবে এখন। গিয়ে শুনি তার জ্বর।

সন্ধ্যার সময় নকফুল থেকে যখন ফিরচি, তখন দেখি দেবু একখানা নৌকো থেকে বলচে—ও বিভূতিদা!...দুজনে বেড়াতে বার হয়েচ মহাষ্টমীর দিনটা!

বনগাঁতেই ছিলুম। খয়রামারির মাঠে বেড়াতে যেতুম। একদিন গিয়েছিলুম চাল্‌কী। নরেনদা এসে নিমন্ত্রণ করেছিল। অজস্র বন-তারার ফুল ফুটেচে বনে ঝোপে, ছাতিম ফুল ফুটেচে—বৃষ্টি থেমে যাওয়ার দরুন পথঘাট খট্ খট্ করচে শুকনো, বেশ লাগল। চাল্‌কীতে খেয়ে দেয়ে গেলুম বারাকপুর। আমার রোয়াকে চেয়ার পেতে বসলুম সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পরে। মনে হল এক্ষুনি খুকু যেন আঁচল উড়িয়ে আসচে পাশের বাড়ির শিউলিতলা থেকে। আর তার সঙ্গে ওভাবে জীবনে কখনই হয়তো দেখা হবে না। আর কোনদিন সে আঁচল উড়িয়ে পাশের উঠোনের পথটি চেয়ে আসবে না আগের মত। মনে পড়ল ওদের উঠোনের ওই বড় শিউলি গাছটায় ফুল ফুটত এই পূজোর সময়—আমি বসে বসে এইখানে 'আইভান্‌হো'র অনুবাদ করতুম, আমার কাছে রোজ সন্দে-বেলা আসাই চাই ওর—ভোটের গাড়িতে নানা ছুতো করে আমার বনগাঁ থেকে আসা—সেসব দিনের কথা কোনদিন ভোলা যাবে না। তারপর ঘাটের ধারে গুটকের সঙ্গে মাছ ধরা দেখতে গেলুম। সতুকাকা, ইন্দু, শ্যামাচরণদা মাছ ধরচে। ইন্দু গল্প করতে করতে পাকা রাস্তায় এল। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত বাড়িতে শুয়ে থেকে মন্মথদার বাড়ি এসে চা খেলুম। তারপর ক্রমে ক্রমে ওখানে খুব আড্ডা হত। সন্ধ্যে-বেলা খুকুদের বাড়ি যেতুম—ও গ্রামোফোন বাজালে একদিন। আমার জন্যে জরদার কৌটো এনে বল্লে—পারতি খাবেন। পারতি?

তারপর গত শনিবারে বনগাঁ থেকে চলে এলুম কলকাতা এবং সেইরাত্রেই ঘাটশীলা রওনা হই। ঘাটশীলার বাড়িটা বেশ হয়েচে। কমল খুব যত্ন করলে। যেদিন সকালে গেলুম ঘাট-শীলা—সেদিনই দুপুরের গাড়িতে গালুডি গেলুম নীরদবাবুদের বাড়ি। শ্যামবাবুর সঙ্গে গেলুম আর বছর যে ঘরে জ্বর হয়ে পড়ে থাকতুম, সেই ঘরটা। চিত্তবাবুর বাড়িতে পার্টি হল খুব। মেয়েরা যথেষ্ট যত্ন করে খাওয়ালেন, অটোগ্রাফ খাতায় সই করিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যার ছায়ায় কালাঝোর ও সিদ্ধেশ্বর ডুংরি গম্ভীর দেখাচ্ছে। পশুপতিবাবু ও কমল বেড়াতে এল আমার বাসায়। আমি রোজ সুবর্ণরেখার তীরের চারা শাল ও ভেদবনের মধ্যে রাঙামাটির ওপর দুপুর রোদে চুপ করে বসে থাকতুম। এই বেড়ানোর আনন্দটা যেখানে নেই সেখানে আমার ভাল লাগে না। গালুডি আগে এমনি ছিল, আজকাল সেখানে না আছে বন, না আছে

নির্জ্জনতা।

পশুপতিবাবু, নুটু ও আমি কমলদের বাড়ির সামনের শালবনটাতে বসে অনেক গল্প করি। পেছনের শালবনেও গিয়েছিলুম—আমি একটা গাছে উঠে বসলুম—কমল হাসতে লাগল। বৈকালে সুবর্ণরেখার তীরে একটা বড় শিলার ওপর সবাই মিলে গিয়ে বসলুম। ছুটি মেয়ে বেড়াতে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে—একটি কোথাকার স্কুলের মাস্টারনী, বেশ গান গাইলে।

পরদিন আবার গেলুম গালুডি। মহুলিয়ার হাট, সোমবার সেদিন। মহুলিয়ার হাট দেখতে গেলুম। নানা গ্রাম থেকে সাঁওতাল মেয়েরা সব জড় হয়েচে, মাথার চুলে ফুল গুঁজেচে, দিব্যি নিটোল কালো চেহারা, বেশ লাগে দেখতে। আমি মুক্ত শিলায় বসে বসে ভাবছিলুম অনেক দূরের একটি মেয়ের কথা। যখন শ্যামবাবুর বাড়িতে সেই কোণের ঘরটাতে বসে চা খাই, তখনও মনে হয়েচে অনেকদিন পরে কার্ত্তিক মাসে চূড়ামণি যোগের দিন ওদের বাড়ি গেলুম। যেখানে বন্যায় ছিল এক বুক জল—সেখানে এখন শুকনো খটখটে। ও চা দিতে গিয়ে বলেছিল—এই কাপ না এই ভাঁড়?

অনেক রাত্রের গাড়িতে নেমে ঘাটশীলা বাংলোতে একা আসচি। তারাভরা অন্ধকার আকাশ—শালবনের মাথায় বৃহস্পতি জ্বলচে। অনেক দূরে এক নদীর ধারে তেতলা বাড়ি ছিল একটা, বহুদিন আগের কথা। হয়তো এখন সেখানে কেউ থাকে না।···গৌরী। অনেকদিন পরে ওর কথা মনে হল।

ভাবলুম কাল আবার এই কাঁকর মাটি ছেড়ে বাড়ি যাব। বনময় যে ফুলের সুগন্ধ ও শ্যামলীলতার ফুলের গন্ধ পাব! কল্‌কাতা এলুম—আমার সঙ্গে চন্দননগরের সেই মেয়ে ছুটি। কাল যাব বনগাঁ। ভাবচি হাজারির বাড়ি যাব। কালীপূজোর দিনটা। বেশ কাটল পূজোর ছুটিটা। ওবেলা মাধব বলেচে রেকর্ড দেবে খুকুর জন্যে। ওর জন্যে কিছু টিপও নিতে হবে।

আবার এই ক'দিনের জন্যে দেশে গিয়েছিলুম। খুকু ওখানেই আছে। রোজই যেতুম ওর ওখানে। আসবার দিন অনেক কথা বল্লে। আজ মন্মথদের বাড়িতে কার্ত্তিক পূজোর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম প্রতি বৎসরের মত। সেখানে অরুণ বল্লে, এলাহাবাদে ঊষার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছিল—আমার নাম করেচে ঊষা। বনগাঁয়ে ভূপেনের সঙ্গে একদিন বিভূতি ও আমি রাজনগরের বটতলায় বেড়াতে গিয়েছিলুম।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল—গত ডায়েরী লেখবার পরে। বনগাঁর বাসা উঠিয়ে দিয়েচি—এখন ঘাটশীলাতেই আমার বাড়ি। সেখানে নুটু, বৌমা, খোকা, খুকী সকলেই রয়েচে। ষোড়শীবাবু বলে বনগাঁয়ে একজন আবগারী বিভাগের ইন্‌সপেক্টর এসেচে—অতি ভদ্রলোক। ওঁর পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়ে গিয়েচে। কালু বলে সে বাড়ির একটি ছেলে ঘাটশীলা যাবার সময় আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেচে।

সুপ্রভা এসেছিল। তার পত্র পেয়ে গত সপ্তাহে দেওঘর যাই। কি যত্নই করলে ও! জামার হাতটা ছিঁড়ে গিয়েছিল—কাছে বসে বসে সেলাই করলে, ওর এ রকম সেবাযত্ন পাওয়ার সুযোগ কখনো ঘটেনি জীবনে।

তারপর ওর কথা বড় মনে হচ্ছে। ক'দিন মনে হচ্ছে। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওর কথা ভেবেচি। খুকুর সঙ্গে দেখা হয়নি সেই পূজোর ছুটির পর থেকে—বোধ হয় আর দেখা হবেও না, কারণ বনগাঁর সঙ্গে আমার কোন যোগই আর রইল না।

এক মাসে আরও কি পরিবর্ত্তন। সুপ্রভাকে কি দুঃখুই দিলুম। আজও সে একখানা চিঠি পেয়েচে আমার। তার কথা সর্ব্বদাই মনে হচ্চে। শিলং একবার যেতে হবে শীগগির। গত সরস্বতী পূজোর দিন ঘাটশীলা গিয়ে তিনু, শান্ত, অমরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠলুম সুবর্ণ-রেখা পার হয়ে।

ভোরে ডাকলে এসে হরবাবু। তারপর মোটরে আমরা অর্থাৎ বুদ্ধদেব, আমি, রমাপ্রসন্ন, তিনু ও বাসু গেলাম বনগাঁ। অজিতবাবুর বাড়ি চা খাবার সময়ে S.D.O.ও মুন্সেফ এবং মনোজ বসু সেখানে। তারপর ঘেঁটুফুল ফোটার পথের মধ্যে দিয়ে আমরা বনগাঁ গেলুম। একবার মনে হল যেন আমার বাসা আছে এখানে—জাহ্নবী রান্না করচে, স্নান করে গিয়েই খাব।

বারাকপুর এলুম। পঞ্চবটীতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই ফণিকাকা, খাঁদু, হরিপদদা এল। এদের দেখে কষ্ট হয়। কি সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই পড়ে রয়েচে। পূর্ণতর জীবন অনুভব করলে না। ফণিকাকা বল্লে—আজ গোপালনগরে বড় মারামারি হবে ভোট নিয়ে—দেখতে যাবে না। As if I care for votes! আমার বাড়ি গিয়ে ওরা বসল—তারপর নদীর ধারে যেতে ওরা সব মায়ের কড়াখানা দেখলে। সত্য কি শুভক্ষণে কড়াখানা কেনা হয়েছিল! আজ কত বছর হয়ে গেল। কত লোক দেখে গেল ওখানা।

বনসিমতলায় ওরা বসল, আমি ও রমাপ্রসন্ন বনের মধ্যে তুঁততলায় বসলুম। সুপ্রভার পত্রখানা পড়লুম—ইস্টারে শিলং যেতে লিখেচে। সত্যি, কি ভালো মেয়ে ও!

ভূষণ মাঝি ঘাটে নাইচে। স্নানের সময় সাঁতার দিয়ে ওপারে গেলুম। তারপর এলুম বাড়ি, খুকুদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার দাঁড়াই। কতবার এমনি ঘেঁটুফুল-ফোটা চৈত্র দিনে বনগাঁ থেকে দুপুর রোদে বারাকপুর হেঁটে এসে ওকে ডেকেচি ওদের রান্নাঘরে গিয়ে—আজ কোথায় কে? সব শূন্য।

ইন্দু এসে গল্প করলে, আমাদের সঙ্গে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেল। তারপর আমরা মোটরে গোপালনগরে এসে দুর্গা ময়রার দোকানে লুচি ভাজিয়ে খেলুম। আজ হাটবার, তবে ভোটের জন্যে অমৃত কাকা, চালকীর বিভূতি সবাই যাচ্ছে। হরিহর সিং তার দোকানে ডাকলে। মনে পড়ল গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাণ্ডারকোলা থেকে ফিরবার দিনে এর দোকানে বসেছিলাম। আর বসলুম এই।

তখনি বনগাঁ—সেখান থেকে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি। এই ছ'ঘরের পথেও এই চৈত্র মাসে এই তিনটের সময় কত গিয়েচি। পাটবাড়িতে কতক্ষণ বসে আবার বনগাঁ।

মন্মথবাবুর বাড় সেই বিকেলে সেই রকম বসে সুপ্রভার গল্প করি। সুপ্রভার প্রশংসা শতমুখে করেও আমি যেন ফুরোতে পারিনে।

পথে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা রাণাঘাট গেটের কাছে—আমি ডাকলুম, তিনি চাইলেন, কথা হল না। মুন্সেফ সস্ত্রীক মোটরে যাচ্চে—চেয়ে হাসলে।

সুপ্রভার পত্রখানা কাল রাত্রে লিখেছিলুম—বনগাঁ থেকে টিকিট কিনে সকালে পোস্ট করেচি ওবেলা।

কাল ইউনিভার্সিটি থেকে কাগজ আনব। সেদিন ইউনিভার্সিটির মিটিং-এ অজয় ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলাপ হল। প্রমথ, বিজয়, পরিমল, গোপাল হালদার আমরা সব একসঙ্গে বেরিয়ে একটা

চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে চা খাই। সেই দিনই রাত ন'টার কমলরাণীর নিমন্ত্রণে ওদের সঙ্গে 'বিশ বছর আগে' দেখে এলুম রঙ্‌মহলে। মন্মথ রায়ও একদিন 'কুম্‌কুম্‌' দেখবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েচে এই দেড় মাসের মধ্যে। সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে ঈস্টারে শিলং গেলুম। সেখানে জর্জ্জিনা ও সেবা প্রথমে এসে বল্লে, সুপ্রভা ছুটিতে মিরালী চলে গিয়েচে। তারপর হাসতে হাসতে সুপ্রভা এল। ক'দিন খুব বেড়ানো গেল। ওখান থেকে চলে আসার কিছুদিন পরে ঘাটশীলা গেলুম—এবং সেখান থেকে এসে ঢাকা গেলুম রেডিওতে বক্তৃতা দিতে। রম্ভা দেবীর বাবার বাড়ি গিয়ে উঠলুম। বেশ কাটল সেখানে। ইতিমধ্যে সুপ্রভার বিবাহ হয়ে গেল গত ১৫ই বৈশাখ। আমি গত শনিবারের সাহিত্য-বাসর উপলক্ষ্যে মুন্সেফবাবুর বাড়িতে গেলুম। মায়া ও কল্যাণী ছাড়লে না—ওদের বাড়িতে রইলুম। রাত্রে ওদের ছাদে গল্প। পরদিন আমাদের পুরোনো বাসায় গেলুম। সেই জানলার ধারে দাঁড়াই। পাঁচী এসেচে, দেখা হল।

আজ দেশ থেকে ফিরলুম। ঘাটশীলা যাব গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে গেল। খুকু বনগাঁয়ে এসেছিল অনেকদিন পরে, ওর সঙ্গে দেখা হল দু'তিনদিনের জন্যে। কল্যাণী খুব সেবাযত্ন করেছিল। গ্রীষ্মের ছুটিটা এবার কি আনন্দেই কাটল! রোজ নদীজলে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! বিশেষ করে একদিন অনেক রাত্রে বনগাঁ খুকুদের বাড়ি থেকে ফিরে। আর একদিন কুঠীর মাঠের আঘাটার পাশে নেমে। সেই রকম আম কুড়ুচ্চে পাগলার মা, হাজারী—আজও দেখে এসেচি। এখনও খুব আম। এবার আদৌ বৃষ্টি হয়নি। আজ আষাঢ় মাস, দেশের পথে সর্ব্বত্র ধুলো, খানা-ডোবা সব শুকনো, ভীষণ গরম, এমন কখনো দেখিনি। সুপ্রভা লুকিয়ে পত্র লিখেছিল, বেলডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ির পিছনে বসে তা পড়েছিলুম—আর চিঠি লিখেছিল জর্জ্জিনা। কাল ন'দি চলে গেল গোপালনগর স্টেশনে কলকাতার গাড়িতে, খুকুর সঙ্গে ওরা যাবে মানকুণ্ডু। কাল খুকুও চলে গেল বনগাঁ থেকে। পরশু সাব্‌ডেপুটি অজিত বসু, মুন্সেফ্‌ হরিবাবু, সবাই গিয়ে ছিলেন আমার বাড়িতে। আমাদের ভিটেতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখলেন। তেঁতুল গাছের ওপর আমায় বসিয়ে ফটো নিলেন। বাবার স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হল।

কাল সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকে বেলডাঙ্গা থেকে বেরিয়ে আসবার পর কুঠীর মাঠের আঘাটায় স্নান করে ফিরচি, আমাদের বাড়ির পেছনের বাঁশবনে কোথাও জ্যোৎস্না, কোথাও জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে—থম্‌কে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। এক অদৃষ্ট অনুভূতি! আবার যেন আমি বালক হয়ে গিয়েচি, এইমাত্র ভরতদের সঙ্গে সলতেখাগি আমতলাটার ময়না গাছের ধারে আম কুড়িয়ে ফিরচি—সারা গাঁ আমার শৈশবের পরিবেশ অনুযায়ী বদলেচে—জ্যেঠাইমা, সইমা, হরিকাকা—সেই সময়ের মনোভাব—সংকীর্ণতা, দারিদ্র্য, অথচ কি মহার্ঘ আনন্দ···তা বর্ণনা করা যায় না—সে এক জগৎ—যেমন এবার আমি বিলবিলের ধারে বসে বসে কত মেয়েদের জলে ওঠা নামা করতে দেখতুম, ওরা কাপড় কাচছে, বাসন মাজচে, পরস্পরের সঙ্গে গল্প করচে—ওদের এই এক জগৎ···the little pool in the woods—বেশ নামটি দিয়েচি ওই বিলবিলের ডোবাটার। ও নিয়ে একটা গল্প লিখব। এরা এই ক্ষুদ্র জগতে সবাই কিন্তু যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছে—এর বেশী এরা চায়ও না, বোঝেও না কিন্তু। পাগলার মা আম কুড়িয়ে সন্তুষ্ট, নেলির মা থালা থালা আমসত্ত্ব দিয়ে সন্তুষ্ট, হরিপদদা গাঁয়ের মোড়লী করে সন্তুষ্ট। এর বেশী

এরা কিছু চায় না।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল। কাল ঘাটশীলা থেকে ফিরেচি। সঙ্গে ছিল হরিবোলার ছেলে মাদার। ও ফিরে গেল দেশে। ঘাটশীলায় বড় গরম পড়েছিল, দুদিন কেবল বৃষ্টি হয়েছিল। রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতুম গালুডি রোডে সেই শাল বনটার মধ্যে, সেখান থেকে বনমাটির পথ যেখান দিয়ে পার হয়ে গেল সেই উঁচু জায়গায়। দূরের দিক্‌চক্রবালে নীল শৈলশ্রেণী মুক্ত ভূপৃষ্ঠের আভাস এনে মনকে বন্ধনশূন্য করে দিত অপরাহ্নের ছায়াভরা আকাশতলে, সেখানে বসে বসে সুপ্রভার চিঠি, খুকুর চিঠি পড়তুম। কোথায় রায়গড়, কোথায় মিরালী, সে এখন হয়তো এই বিকেলে বসে চুল বাঁধছে, এমনি সব কত ছবি মনে পড়ত। একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি এল, রাস্তার ধারের ছোট্ট সাঁকোর মধ্যে ঢুকে অতি কষ্টে বৃষ্টির ধারা থেকে নিজেকে রক্ষা করি।

পরশু বসে ছিলুম কত রাত পর্য্যন্ত ফুলডুংরি পাহাড়ের নীচে। একে একে দুটি একটি করে কত তারা উঠল অন্ধকার আকাশে—আমি যেন বিরহী তরুণ দেবতা, যুগান্তের পর্ব্বত শিখরে বসে কত জন্মের প্রণয়িনীর কথা ভাবচি।

কোথায় এক ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরে বনসিম তলার ঘাট, সেখানে যে বালিকা ছিল, সে আর সেভাবে কখনো ও ঘাটে থাকবে না—কত বছর চলে যাবে, বালিকার দেহে নামবে জরা, কত-কাল পরে বৃদ্ধা যখন একা একা ঘটি হাতে ঘাটের পাড় বেয়ে উঠবে, তখন সে কি ভাববে না তার অতীত কৈশোরের কথা—কত প্রণয়-লীলার স্থান—বনসিমতলার ঘাটটার কথা!

গৌরীর কথা মনে হল। অনেক দূরে আর এক গ্রাম্য নদী, তার ধারে একটা দোতলা বাড়ি—কতকাল আগে সেখানে যে মেয়েটি ছিল, তার দেহের নশ্বর রেণু হয়তো ওই নদী-তীরের মৃত্তিকাতেই মিশিয়ে আছে এই কুড়ি বছর। সে জীবনে কিছুই পায়নি—সে বঞ্চিতার কথা আজ এই সন্ধ্যায় বিশেষ করে মনে এল।

আর এক বঞ্চিতা হতভাগী মিনতি। ওকে কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু ওর নাম শুনেচি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওর দুঃখ দূর হোক।

কিন্তু সুপ্রভার দুঃখ কে দূর করবে? তার মন তো সাধারণ মেয়ের মন নয়—সে যে চির-জীবন কাঁদবে, তার কি উপায় করব? ওর জন্যে মন যে কি ব্যাকুল হয়েচে আজ ক'দিনই। নির্জ্জনে বসলেই ওর কথা সারা মন জুড়ে থাকে। ওর সঙ্গে দেখা করাই চাই, মন বড় ব্যাকুল হয়েচে দেখবার জন্যে।

কাল বনগাঁ থেকে এলাম। অজিতবাবুর বদলি উপলক্ষে সাহিত্যসভা ছিল। অজিতবাবু লিখেছিলেন, যাবার সময়ে আসবেন। ক'দিন বেশ কাটল। এবার ওদের পাড়াসুদ্ধ সকলে ডেকে ডেকে আনন্দ করলে, গল্প করলে। সুনীতিদিদি, শুকুর মা সবাই। বাস্তবিক মেয়েরা কি ভালো তাই ভাবি! ওদের মধ্যে খারাপও আছে জানি, নিজেই তার অনেক পরিচয় অনেক জায়গায় পাইনি কি আর? কিন্তু ভালো যখন হয় ওরা তখন তার তুলনা পুরুষদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। গৌরী, সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, অন্নপূর্ণা—এদের প্রত্যেককে আমি জেনেচি—এরা দেবীর মত।

কি যত্ন-আদর করত সুপ্রভা! তার কথা আজকাল সর্ব্বদা মনে আছে। ভোলা কি যায়? না তা সম্ভব? এই তো জীবন!

কল্যাণী ছোট মেয়ে অবিশ্যি। কিন্তু সে এরই মধ্যে মেয়েদের স্বাভাবিক সেবাপ্রবৃত্তি আয়ত্ত করে নিয়েছে। ক'দিন বড় যত্ন করলে। বাইরের ঘরটাতে টেবিল-ঢাকা পেতে, পরিপাটী করে

পান সেজে, বিছানা করে কেমন করে রাখত! কাছে বসে গল্প শুনতে চাইত। একদিন হঠাৎ 'চম্পক জাগো জাগো' গানটার এক কলি গাইতেই আমার শিলং-এর কথা মনে পড়ল। সেই ঈস্টারের ছুটি, শিলং, কলেজের হোস্টেলে আমায় নিমন্ত্রণ করেচে—সুপ্রভার অসুখ, তবুও সে উঠে এল, আমি আমার রেডিওর নাটকটা পড়ব—জর্জ্জিনা ঘন ঘন ঘরে ঢুকচে, বার হচ্ছে—এমন সময় ওরা গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপালে, আমার মনের মধ্যে সত্যি কি যেন হয়ে গিয়েছিল গানের প্রথম কলিটা শুনেই—'চম্পক জাগো জাগো'। কল্যাণীকে বল্লুম—গানটা শোনাও না। গানটা সে গাইলে। আমি বসে বহুদূরের কোন্ পাইনবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। সুপ্রভা—পাইনবন, লুম্ শিলং-এর মেঘাবৃত শিখরদেশ।

কল্যাণী ছেলেমানুষ কিনা, বলচে—আপনি চলে গেলে আমি বিছানা বাইরের ঘর থেকে উঠিয়ে ফেলব। মন কেমন করে, আপনার জায়গায় সেবার ছোট মামাকেও শুতে দিইনি—বলি, ছোট মামা ওঠ, অন্য জায়গায় গিয়ে শোও—এসব আমি তুলব। এই সময় গৌরীকে এনেছিলুম বারাকপুরে ১৯১৮ সালে। কতকাল আগে। সেই বাঁশ-বাগানে নিভৃত সন্ধ্যা নামত, বর্ষার দিনে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ত, বেশ মনে আছে। 'বানের জলে দেশ ভেসেছে, রাখাল ছেলে তুই কোথা' গানটা করতুম ইছামতী থেকে স্নান করে উঠে সকালে।

সময়ের দীর্ঘ বীথিপথ বেয়ে কত এল কত গেল! গৌরী···১৯১৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষে তাকে নিয়ে এলুম বারাকপুর। রজনী মামার সঙ্গে বসে তাসখেলা হরিপদ দাসের চণ্ডী-মণ্ডপে। "বানের জলে দেশ ভেসেচে রাখাল ছেলে তুই কোথা, রাঘব বোয়াল মাছের সাথে সুখ-দুঃখের কই কথা"···এই গানটা ছিল দিনরাত আমার মুখে। আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে সকাল বেলা বর্ষা-স্নাত ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে আসতে (যে ঝোপ থেকে এ বছর সুপ্রভার চিঠির জন্যে কত বনমল্লিকা তুলেছি এবং যে ঘাটটার নাম অনেক দিন পরে হয়েছিল বনসিমতলার ঘাট) ওই গানটা গাইতুম।

তারপর সে সব দিন চলে গেল। অনেক মাস কেটে গেল। তারপর আবার বহু লোকের ভিড় গেল লেগে।

কত লোক এল। তাদের কথা মনে হয় আজ। এসেচে, কিন্তু ওদের মধ্যে চলে যায় নি কেউ—আছে সবাই। অন্নপূর্ণা আছে, সুপ্রভা আছে, খুকু আছে। অদ্ভুতভাবে এরা সব এসেছিল। যায়নি কেউই। মন থেকে নয়, বার থেকেও নয়।

১৯৪০ সালে তাই আজ ১৯১৮ সালের কথা ভাবচি। আজ সুপ্রভার পত্র পেলাম। কত ভালো মেয়ে সে, আজও মনে রেখেচে। আর বছরে এ সময়ে মনে বড় কষ্ট ছিল।

জীবনের মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি হর্ষোজ্জ্বল, হাসি অশ্রু ছলছল দিন আসে, যাদের কথা চিরকাল মনে তো থাকেই, এমন কি একটু নির্জ্জনে একমনে ভাবলে সেদিনের অনুভূতিগুলো পর্য্যন্ত এখনি আবার মনে আসে—অতি সুস্পষ্টভাবে মনে আসে, যেমন সেদিনের বিস্মৃত গন্ধরাজি আবার আঘ্রাণ করি, আবার সে সব দিনের জীবনের কুশীলবদের চোখের সামনে দেখতে পাই।

এই রকম দিন আমার জীবনে যেগুলি এসেচে—তা চিন্তা করে দেখলুম কাল বসে। গোলমালে ওদের কথা মনে না থাকলেও দু'দশ বছর অন্তর মনে আসে হঠাৎ। সে সব দিনের আর একটা মজা আছে, তারা মস্ত বড় আশার বাণী, অজানার আনন্দ নিয়ে আসে—একটা কিছু যেন ঘটবে, দিনগুলি বৃথায় যাবে না—একটা এমন কিছু ঘটবে, যা জীবনে কখনো ঘটে নি

—মনে হয়।

তারপর দেখা যায় কিছুই ঘটল না—দিনগুলো চলে গেল, কিন্তু আনন্দ রেখে গেল, স্মৃতি রেখে গেল।

যেমন প্রথম যাত্রার দল আমাদের গাঁয়ে এসেছিল আমার বাল্যকালে, নলে নাপিতের বাড়ি সন্ধ্যাবেলায় আমায় বলেছিল 'তুমি যাবে খোকা ?' সেই সন্ধ্যা, সেই সুশ্রী যাত্রাদলের নটের দল —সে কথা জীবনে আর কখনো ভুললাম না। ভুললাম না মানে ভুলেই তো থাকি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একমনে বসে ভাবলেই আবার মনে হয়।···

সুরেনের যখন পৈতে হয়, তুধুমামা থাকত, আমি দণ্ডী ঘরে গিয়ে সন্ধ্যাসেবা করাতুম—সেই একদিন যুগলকাকাদের বাড়িতে বাল্যে এমন ক'দিন কেটেচে বেশ মনে হয়—সুবাসিনীর সামনে. যখন আমি অকারণে ছুটোছুটি করে বেড়াতুম বাল্যে, বকুলতলায় খেলা করতুম, নাগ পঞ্চমীর দিন ভরত ও আমি মনসাতলায় গিয়েছিলুম।

তারপর বহুকাল কেটে গেল। আর তেমন কোন দিনের কথা আমার মনে হয় না। এল গৌরী, ওকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে প্রথম যখন বারাকপুরে আনলুম, আষাঢ় ও প্রথম শ্রাবণের সেই দিনগুলির কথা···রজনীকাকার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে সেই অধীর ভাবে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে বাঁশবনে, মাটির প্রদীপের আলোয় আমি ও গৌরী, তখন সে মাত্র চৌদ্দ বছরের বালিকা—এই ছবিটি, এই দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি, চিরদিন—চিরদিন মনে থাকবে।

সে গেল চলে। দিনগুলি নিরানন্দময় হয়ে গেল, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রহরগুলি মৃত।

আনন্দ পেলাম চাটগাঁয় মণিদের বাড়ি গিয়ে। মণির সঙ্গে বসে গল্প করতুম, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম, ওই দিনগুলি।

ওখান থেকে গিয়ে এসে বিভূতিদের বাড়ি এলাম। ও দিনগুলোর মধ্যে আমার মনে আছে, আমার জ্বর হল, কামাই করলাম দিনকতক, গেলাম না—বিভূতিকে ফোন করলাম, ঐ একদিন।

ভাগলপুরে এমন অনেকদিন গিয়েচে ইসমাইলপুর দ্বিয়ায়। পুরোনো কথা ভাবতাম শ্রাবণ মাসে রাসের সময় বড় বাসায় বসে, রঘুনাথবাবুর ঠাকুরবাড়িতে হেমেন রায় এসে নিয়ে গেল, আমি Koith-এর প্রাচীন দিনের মানুষ সম্বন্ধে বইখানা পড়তুম—কিংবা আমি Astronomy পড়তুম ভাদ্র মাসে বাইরের ঘরে শুয়ে, বীরভূমের সেই পণ্ডিতটা এসে গল্প করত—সেই সব দিন ভারি চমৎকার কেটেচে।

একখানা বই হয় এ সব দিনের আনন্দের কথা লিখলে—নতুন টেক্‌নিকে, নতুন ভাবে লিখতে হয়—একখানা ভালো উপন্যাস হয়।

তারপর এল খুকু। তার সাহচর্যে যে দিন কেটেচে—তার মধ্যে যখন আমি 'আইভ্যানহো' অনুবাদ করছিলুম, শিউলি গাছে ফুল ফুটত—সেই দিনগুলি আর বনগাঁয়ে ছাদে বেড়ানোর দিনটি, আর গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বারাকপুরে গ্রামোফোন নিয়ে কাটানোর দিনগুলির কথা ভুললে চলবে না। চিরকাল মনে থাকবে এগুলিও।

সুপ্রভার সঙ্গেও এমন অনেকদিন আনন্দে কেটেচে। বিশেষ করে এবার দেওঘরে ও ইস্টারের ছুটিতে শিলংএ বেড়াতে যাওয়ার দিনগুলি। অনেক দিনের কথা হয়তো ভুলে যাব—কিন্তু শিলংএ যাপিত গত ইস্টারের ছুটির দিনগুলোর কথা চিরদিন মনে থাকবে।

আর সর্ব্বশেষে এবার যে অজিতবাবু বনগাঁ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন—কল্যাণীদের বাড়ি রইলাম আমি—কল্যাণীর সেবাযত্ন আমার বড় ভালো লেগেছে, সুপ্রভা ছাড়া অন্ত কোন মেয়ের মধ্যে এ ধরণের সেবা করার প্রবৃত্তি দেখি নি আমি। কল্যাণী যখন শচীনবাবুদের বাড়ির সামনের পুকুরঘাটে বসে রইল—সে কথাই আমার মনে পড়ে এখনও।

এই তো সবে সেদিন। আর এক সপ্তাহ পুরল। এই দিনটি আবার কত কাল আগের-কার বলে মনে হবে একদিন। একদিনের ডায়েরিটা পড়ে অবাক হয়ে ভাবব সেইদিনের সুপ্রভা, সেদিনের কল্যাণী, সেদিনের খুকু—কতকালের হয়ে গেছে!

বাসা বদলে বহু বছর পরে আবার ৪১, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের এ দিকটাতে এলুম। অনেকদিন আগে এদিকটাতেই ছিলাম—আবার সেদিকেই এলুম। মন কেমন বড় খারাপ হয়ে গেল বিকেলে, অনেক পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত পুরোনো কথা সব মনে পড়ল। বাবার জন্যে মন যেন কেমন করে উঠল, আর করে উঠল সুপ্রভার জন্যে। বারবেলা ক্লাবে যাবার আগে এই কথা কতবার মনে হল, সুপ্রভা আজ এতক্ষণ আমার চিঠি পেয়েছে।

বনগাঁ থেকে আজই এলুম। এই শ্রাবণ মাস, আজ ১লা, মটরলতা দোলানো খয়রামারির মাঠের সেই ঝোপটায় অন্য অন্য বছরের মত কালও বেড়াতে গেলুম। এ বছর সব বদলে গিয়েচে। সুপ্রভা নেই, খুকু নেই, জাহ্নবী নেই, বনগাঁর বাসা নেই, ৪১নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সে মেস নেই।

নাগপঞ্চমীর ছুটিতে সেই শ্রাবণ মাসে বারাকপুর যাওয়া, খুকুদের দাওয়ায় বসে নলে নাপিতের ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া, খুকুর কত কথাবার্ত্তা—The apple tree, the singing and the gold!—কোথাও কি চলে গিয়েচে!

এবারও কল্যাণী বড় আনন্দ দিয়েচে। দেখ, অদৃষ্টে কি অদ্ভুত যোগাযোগ, এ স্নেহশীলা মেয়েটি আবার কোথা থেকে এসে জুটল বল তো! কোথায় ছিল ও আর বছর এমন সময়? অথচ এ বছর ওদের বাড়ির সঙ্গে কেমন একটা আত্মীয়তা হয়ে গিয়েচে—যেন কত কালের আলাপ! আমি কলকাতায় আসি-না-আসি তাতে কল্যাণীর কি? অথচ সে আমায় আসতে দেবে না—এই মধুর শাসনটুকু করত সুপ্রভা, করত খুকু—আবার এ এল কোথা থেকে কে বলবে!

কাল (২৯শে জুলাই) আবার বনগাঁ থেকে এলুম। এবারও ওদের ওখানেই ছিলুম গিয়ে। কল্যাণীর যত্ন সমানই। কাল কিছুতেই আসতে দেবে না কলকাতায়—সোমবার থাকব, মঙ্গলবার থাকতে হবে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার জো নেই—মন্মথদা কিম্বা মুন্সেফের বাড়ি গিয়ে যে একটু গল্প করব, তাতে ঘোর আপত্তি ওঠাবে।

—গা ছুঁয়ে বলে যান ঠিক সাতটার সময় আসবেন! যদি না আসেন তবে আমি কিন্তু মরে যাব! তাতেই বা কি, আমি মরে গেলে, জগতের কার কি ক্ষতি!

মুন্সেফবাবুর বাড়ি গিয়ে দুবেলা আড্ডা দিই। বার্ণিয়ার সম্বন্ধে অনেক রকম কথা হল।

আবার ১১ই আগস্ট বনগাঁ থেকে এলুম। বেলুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ ছিল, তা ছাড়া ছিল মাসিক সাহিত্য-বাসর। মায়াও ছিল এবার, গল্প-গুজবে বেশ কাটল। নদীতে ঘোলা এসেচে, *এদিন যখন স্নান করতে গেলুম তখন জল খুব ঘোলা।*

কল্যাণীর আসবার কথা বলে এলুম কলকাতায়।

কাল শনিবার বারাকপুরে গিয়েছিলুম। আর বছর তো সারা বর্ষাকাল ও শরৎকাল দেশে যাই নি। গোপালনগরের বাজারে প্রথমেই গুট্‌কের সঙ্গে দেখা। শ্যামাচরণদাদা দেখি বাজারে আসচে, তার মুখে শুনলুম কালী এসেচে। ভাদ্র মাসের বৈকাল, শুকনো পথ-ঘাট, বৃষ্টি নেই এবার, আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। বাড়ি গিয়ে দেখি বলা বোষ্টম আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েচে। আমি ইছামতীর ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলাম, ঘোলা জল ঘাসভরা মাঠ ছুঁয়েচে। ওপারের মাঠে ষাঁড়া ঝোপে সন্ধ্যার ছায়া নামল, আকাশে কত রকম রঙিন রঙের খেলা দেখা গেল, আমি জলে নেমে স্নান করলাম।

আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে—পাকা তালের গন্ধ পাওয়া যাচ্চে শ্যামাচরণদাদাদের বাগান থেকে। একটা তাল পড়ার শব্দ পেলুম। বাড়ি এসে খানিকটা বসে আছি, মনে হচ্ছে খুকু যেন এবার এল বিলবিলের ধারের পথটা দিয়ে। এবার ওদিকে বড় বন। সন্ধ্যার পরে খুব জ্যোৎস্না উঠল। এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না শুধু কোজাগরী পূর্ণিমার কথা মনে এনে দেয়, আর মনে আনে খুকুর কথা, ন'দিদিদের বাড়ি থেকে এসে আমার উঠোনে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে গল্প করত! কালী এসেচে, ওদের বাড়ি কতক্ষণ কালীর সঙ্গে, সুপ্রভার সঙ্গে গল্প করলুম। সুপ্রভার বিষয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করল।

আজ রবিবার সকালে কালী ও আমি প্রথমে গিয়ে বসলুম বাঁওড়ের ধারে ছুতোরঘাটার বটতলায়। কলকাতা থেকে অনেকদিন পরে গ্রামে গিয়ে বনঝোপ দেখে বাঁচলাম। এ সব না দেখে আমি থাকতে পারিনে—সকালের বাতাসে নাটাকাঁটা ফুলের সুগন্ধ, বনটিয়া ডাকচে, কলামোচা পাখী ঝোপের মাথায় খেলা করচে। সইমা যাচ্ছেন নাইতে,আমায়বল্লেন—কবে এলে বিভূতি? তাঁর সঙ্গে গল্প হল খানিকক্ষণ। তারপর আমি আর কালী বেলডাঙা হয়ে মরগাঙের ধারে বাবলা তলায় কতক্ষণ বসলুম, কালী ঘোঙা কুড়োলে, কুঠীর মাঠের জলার ধারে একটা নিবিড় ঝোপে দুজনে বসলুম। আর সব জায়গাতেই সুপ্রভার পত্রখানা পড়চি—একবার, দুবার কতবার যে পড়া হল! দুজনে আবার আমাদের ঘাটে নাইতে এলুম, কালী সিট্‌কি জালে চিংড়ি মাছের বাচ্চা ধরলে। আমি যখন রোয়াকে বসে থাকি, তখন যেন আবার মনে হল খুকু আসচে …এখুনি তেলাকুচো ঝোপের আড়ালে গিয়ে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে সে আসবে…

ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে কালীর বাড়ি গেলুম। ওরা হাটে গেল, আমি আমাদের ঘাটে এসে বসলুম—ওখান থেকে নৌকো করে কুঠীর মাঠে এসে ঘাসের ওপর বনসিম ঝোপের ছায়ায় বসে সুপ্রভার পত্রখানা আবার পড়ি। সুপ্রভা কোথায় কতদূরে আজ।

কল্যাণী…ওর কথাও মনে হয়। এরা সব চলে গেল, তাই ভগবান যেন এই স্নেহময়ী মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার দু' শনিবার পরে তবে ওর সঙ্গে দেখা হবে। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলা যাব। সুপ্রভাকে লিখেছি সেদিন সেখানে পত্র দিতে।

সন্ধ্যার ট্রেনে চলে আসব। হাট থেকে বৃদ্ধ মুসলমানেরা ফিরচে আমাদের গাঁয়ে। কারো মাথায় ধামা, কারো মাথায় ঝুড়ি। সবাই জিগ্যেস করে—বাবু কবে আলেন? আরামডাঙার আবদুল, মুটুর সয়া—সবাই। গোপালনগর স্টেশনে অনেকক্ষণ বসলুম। কত নক্ষত্র উঠচে—আজ সারাদিন পরিপূর্ণ শরতের রৌদ্র। বনগাঁয়ের কাছে ট্রেন আসতেই কল্যাণীর কথা মনে হল। একবার মনে হল নেমে ওর সঙ্গে দেখা করে কাল ট্রেনে যাব। মেসে এসে সেবার পত্র পেলুম।

এবার ভাল লেগেচে বাঁওড়ের ধারে বটতলার বসা, কুঠীর মাঠে ছায়াস্নিগ্ধ ঝোপটি, মরগাঙের

পাতা, এবেলার বনসিম ঝোপের ছায়ায় ঘাসের মাঠে বসা, সুপ্রভার চিঠি পড়া, কল্যাণী ও খুকুর চিন্তা। আর কলকাতার রাত্রির সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কাল কত রাত পর্য্যন্ত চড়কতলার মাঠে ছিলাম ; ফণি কাকা, গজন, কালো পাঁচু, ফকিরচাঁদ সবাই গল্প করলুম। কাল রাত্রে জেলেপাড়ায় কৃষ্ণ-যাত্রা হবার কথা ছিল, সকলে জিগ্যেস করচে—কখন বসবে যাত্রা? ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র আমোদ-প্রমোদ। খুব রাত্রে নাকি যাত্রা হয়েছিল—দেখতে পেলে না বলে আজ সকালে পিসীমা ও ন'দিদির কি দুঃখ!

খুকুর স্মৃতি সারা বারাকপুরকে, তার মাঠ, ঘাট, নদীর তীর সব আচ্ছন্ন করে রেখেছে—এবার গিয়ে বুঝলুম। নদীর ধারে সুপ্রভার, কারণ চিরকাল নদীর ধারে বসে সুপ্রভার পত্র পড়া আমার অভ্যাস।

অনেকদিন পরে ভাদ্রমাসে বাড়ি গিয়েছিলুম। ভারি আনন্দ নিয়ে ফিরলুম। কালী এসেচে, তাই আরও আনন্দ। সুপ্রভার অমন সুন্দর পত্রখানা সে আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিলে। যে পৃথিবীতে সুপ্রভা আছে, সেখানে আমার ভাবনা কি? তারপর কল্যাণী যেখানে আছে, সেখানেই বা ভাবনা কি?

আমি যেটাকে মটরলতা বলতুম, কাল বেলডাঙা যেতে বটতলার পথে কালী ওটাকে বল্লে—বড় গোয়ালে লতা। কিন্তু বড় গোয়ালে লতার ফল হয় সাদা, আর এক রকমের লতা আছে খাঁজকাটা আঙুরের পাতার মত দেখতে, আঙুরের মতই থোলো বাঁধে।

আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানটার পথে কাল বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠে যাচ্ছি, তখন মনে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। যেন কি সব শেষ হয়ে গেছে, কি যাচ্চে, এই ধরণের একটা উদাস মনোভাব। প্রতিবারই এই স্থানটি আমাদের মনে অদ্ভুত ভাব জাগায়। বঙ্গবাসীর কথা, বাবার কথা, চীন ভ্রমণের কথা কত কি মনে আসে। দরিদ্র সংসারে তালের বড়া খাওয়ার দিন সে কি উৎসব···সেও এই ভাদ্রমাসে। পিসীমা কাল তালের বড়া খাইয়েছিলেন কিন্তু।

১৯৩৭ সালেও ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখনও খুকু গ্রামে ছিল না।

আমাদের গ্রামের ক্ষুদ্র জগৎটাতে ওরা বেশ আছে, কৃষ্ণ-যাত্রা শুনচে, দলাদলি করচে, গোপালনগরে হাট করচে, নদীতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরচে, চড়কতলায় বসে রাত্রে আড্ডা দিচ্চে—বেশ আছে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলার বাড়িতে এসেচি। বাড়ি এসেই সুপ্রভার চিঠি পেলাম। কি ভাল মেয়ে ও, তাই ভাবি। Always a loyal friend—ভারি আনন্দ হয়েচে ওর চিঠি পেয়ে। পরদিন সকালে উঠে কমলদের বাড়ি গেলুম—কমল মাছের সিঙাড়া ও চা খাওয়ালে। বৈকালে বাঁধের পেছনে শালবনে দিব্যি সবুজ ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ঘাসের ফুল ফুটেচে সাদা সাদা—রোদ রাঙা হয়ে আসচে, মিষ্টি শরতের রোদ—মনে পড়ল সুপ্রভার কথা···কতদূরে আছে শিলংএ, কি করছে এখন তাই ভাবি! সুবর্ণরেখার ওপরকার পাহাড়-শ্রেণী বড় চমৎকার দেখাচ্চে। আর মনে হল খুকুর কথা, কল্যাণীর কথা। যাদের যাদের ভালবাসি, এ অপূর্ব্ব অপরাহ্ণে সকলের কথাই মনে পড়ে।

রাত্রে ভট্‌চাজ সাহেবের বাড়ি সভা হল—বৌমা, উমা ওরাও গেল। অনেক রাত্রে আবার মোটরেই ফিরে এলুম।

গত রবিবার ঠিক এই বৈকাল বেলা বারাকপুরে—নদীর ধারে বনসিমতলার ঝোপের ছায়ায় বসে সুপ্রভার চিঠি পড়চি, কালীও এসেচে অনেকদিন পরে—ওর সঙ্গে গল্প করচি—সে কথা

মনে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে আমি বাসাডেরা ম্যাঙ্গানীজ কোম্পানীর পথটা দিয়ে ফুলডুংরির পেছন দিয়ে দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললুম। মেঘান্ধকার সকাল, সজল হাওয়া বইচে, দু ধারে বন সবুজ হয়ে উঠেচে বর্ষায়, পাথরগুলো কালো দেখাচ্ছে গাছপালার তলায়। সেবার সেখানে ভিক্টোরিয়া দত্ত, আমি, নীরদবাবু, সুবর্ণ দেবীর চা খেয়েছিলুম, সেই উঁচু পাহাড়ের কাটিংটা দিয়ে বড় বড় গাছের তলা দিয়ে সোজা চললুম—দুধারে কি নিবিড় বন, পাথরের স্তূপ ছড়ানো, বড় একটা বটগাছ। এটা যেখানে নীচু হয়ে গেল, তার বাঁ দিকে একটা নিবিড় কুঞ্জবন ও লতাবিতান—বসবার ইচ্ছে থাকলেও বসতে পারলুম না, বেলা হয়ে গেল। একটা পাহাড়ী ঝর্ণা পার হয়ে (দুধারে কি শোভা সেখানে!) ওপারে গেলুম। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সুঁড়ি পথ ধরে কিছুদূর গিয়েই দেখি সেই ঝর্ণাটা রাস্তা আটকেচে। আর না গিয়ে সেই ঝর্ণার ধারে যেখান দিয়ে খুব তোড়ে জলটা বইচে কুলুকুলু শব্দে—সেখানে জলে পা ডুবিয়ে বসে রইলুম। সুপ্রভার ও কল্যাণীর চিঠি দুখানা সেই ঘন বনের মধ্যে ঝর্ণার ধারে জনহীন আরণ্য প্রকৃতির নীরবতার মধ্যে বসে কতবার পড়ি। হাতীর ভয় করছিল বড়। এ সময় বুনো হাতীর সময়।

বৃষ্টি এল। একটা পথিক লোক কাছে এসে বসল। ও বল্লে—এখানে হাতীর ভয় নেই—তবে সকাল সকাল চলে যান বাবু।

কুরুডির পথ দিয়ে ঘুরে আবার সেই ঝর্ণাটা পার হয়ে চলে এলুম। একটা ছোট ফর্সা মেয়ে কপালে সিঁদুর দিয়েচে—আমি যেমন বললুম, "তোর নাম কি খুকি?" অমনি ছুটে পালাল।

আমি কত কি গাছপালার মধ্যে দিয়ে গ্রাম পার হয়ে এসে ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানীর পথটা ধরলুম। বড় বৃষ্টি পড়চে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ ঘুরে ঘুরে উড়চে পাহাড়ের চূড়ায় নীল বনরেখাকে বেষ্টন করে। বেলা দুটোর সময় ঘাটশিলায় পৌছলুম—বৌমা ভাত নিয়ে বসে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি বাঁধের জলে স্নান সেরে এসে খেয়ে সকলকে উদ্ধার করলুম।

দুপুরে খুব ঘুমুই। তুলসীবাবু মোটর নিয়ে এসে ফিরে গেল। রাত্রে দ্বিজুবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ। অমরবাবু ও বাসার চাকর বিনোদ রাত ১২টায় নাগপুর প্যাসেঞ্জারে উঠিয়ে দিয়ে গেল।

অনেককাল আগে এই সময় আমি আজমাবাদের কাছারীতে ছিলুম ভাগলপুরে।

জন্মাষ্টমীর ঠিক তেমনি মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অনেক বছর আগে বারাকপুরের বাড়িতে যে রকম ছিল ১২ ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন। মণি চালে প্রদীপ দেখাচ্ছিল, গৌরী আমায় বললে—এসো, এসো, ও কিছু না—কোথায় আজ ওরা সব?

আজ ১১ই ভাদ্র। কতকাল আগে এমনি বেলাটিতে আমি কত আগ্রহের সঙ্গে বাড়ি গিয়েছিলুম সে কথা মনে পড়ল। আবার এই সময়ে এমন বর্ষার দিনে আমি আজমাবাদ কাছারীতেও ছিলুম। এ সময় আমি এক পয়সার খড়িমাটি কিনে কত আগ্রহ নিয়ে ট্রেনে চলেচি।

পূজোর ছুটি এসে গেল। মধ্যে G. B. Association থেকে আমায় একটা অভিনন্দন দিলে—পশুপতিবাবু, জ্যোৎস্না বৌমা, শৈলদা, তারাশঙ্কর—আরও অনেকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। এবার বড় লিখবার তাগিদ, কাল রাত্রে একটা গল্প লেখা শেষ হয়েচে—আজ থেকে লেখা বন্ধ। এবার রাঁচি হতে সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এসেচে। এবার চাটগাঁ যাবার ইচ্ছেও আছে।

আজকাল শরতের বৈকালে স্কুলের ছাদ থেকে কিম্বা পথে যাবার সময়ে দূর আকাশের দিকে

চেয়ে চেয়ে বহুদিন আগেকার বারাকপুরে যাপিত বাল্যদিনগুলির কথা—বিশেষতঃ পুজোর সময়কার কথা মনে পড়ে। বাবার এই সময়ে প্রতি বৎসর জ্বর হত—ঘরে ধুনোর গন্ধ বেরুতো সন্ধ্যার সময়, বাবা জ্বরের ঘোরে অস্ফুট কাতর শব্দ করতেন—আর আমরা ছেলেমানুষ তখন, ভাবতুম—এবার পূজোর সময় আমাদের কাপড় হল না—(বালকবালিকারা বড় স্বার্থপর হয়) মায়ের হাতে একদম টাকা পয়সা থাকত না—১৯১৩ সালের পূজোর সময় বাবা কলকাতা না কোথায় ছিলেন, এক পয়সাও পাঠান নি, আমাদের সে কি কষ্ট, মা আমাকে তক্তপোশখানার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় কি কথা বলেছিলেন সংসার ও বাবা সম্বন্ধে—সে-সব কথা মনে আসে কেবলই।

সুপ্রভার চিঠি আজও আসে নি, মন সেজন্যে ব্যস্ত আছে। এরকম তো কখনও হয় না!

খুকুর জন্যেও গত একমাস রোজই ভাবি—হয়তো পুজোর সময় দেখা হবে, নয়তো হবে না—কত ভাবে এর কথা যে মনে হয়। বারবেলা ক্লাবে অভিনন্দনের দিন গভীর রাত্রে জ্যোৎস্না-ভঙ্গ ছাদে ওর মুখখানি মনে হয়ে মন কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল! তারপর মনে হয়েছিল সুপ্রভার কথা—কল্যাণীর কথা।

কি জানি কারও সঙ্গে দেখা হবে কি না। রেণু লিখেচে অবিশ্যি করে যাবার জন্যে এবার। দেখি কি হয়।

৺পূজো ফুরিয়ে গেল। ঘাটশিলাতে ছিলুম সপ্তমী পর্য্যন্ত। সেখানে গিয়েই সুপ্রভার হাতের একখানা রুমাল পেলুম। ক'দিন বেশ আনন্দ উপভোগ করা গেল ঘাটশিলায়। তুলসী-বাবুর গাড়িতে সপ্তমীর দিন বৌমা, নীরদবাবু, রেখা, সুবর্ণ দেবী সবাই মিলে মৌভাণ্ডার আরতি দেখতে যাওয়া গেল। বেশী শীত পড়েছিল, সেখানে বাঁধের পাশে শালবনে বেড়াতে যেতুম—কি চমৎকার লাগত। মহাষ্টমীর দিনে দুপুরের গাড়িতে আমি আর কমল কলকাতায় এলুম। গত পূজার কত কথা মনে হয়! জাহ্নবী নেই এ বছর। আর বছর কত প্রসাদ খাওয়া বনগাঁয়ে, ভেবে কি কষ্ট হয়! খুকুর কথাও মনে হয়েছিল সপ্তমীর আরতির সময়—সেদিন দুপুরে গালুডিতে নীরদবাবুর বাড়ির বটতলায় পাথরে ঠেস্ দিয়ে বসে কেবল সুপ্রভা, সুপ্রভা—ও, কি ভাবেই ওর কষ্ট মনে হয়েছিল সেদিন। সেই দুপুরের রোদে কালাজোর পাহাড়ের দিকে থেকে সুপ্রভা—খুকু—এদের কথন ভেবেচি।

বনগাঁয়ে এসে খুব আমোদ করা গেল। আর বছরের মত এবারও প্রফুল্লদের বাড়িতে সার্ব্বজনীন পূজো দেখলুম। একদিন বারাকপুরে গেলুম কল্যাণী ও নব—ওদের নিয়ে। বনসিম-তলার ঘাটে ওরা সবাই বনসিমের ফুল তুললে—গান করলে আমার বাড়ি বসে ন'দিদি, মেজ-খুড়ীমার সামনে। তারপর ওরা হরিপদদার বাড়ি গেল। ফিরে এসেই সেদিন আবার বিজয়া সম্মেলন গেল প্রফুল্লর বাড়ি। আজ বনগাঁ থেকে এলুম—রাত্রে চাটগাঁ থেকে ময়মনসিং হয়ে। কতকাল ধরে পশ্চিমে যাই নি—বারো-তেরো বছর আগে। কেবলই যাচ্চি, অথচ পূব দিকে।

খুকু আসে নি, যদিও আসবার কথা ছিল।

এইমাত্র সকালের ট্রেনে চাটগাঁ থেকে এলাম। ১৯৩৭ সালের পরে আর যাই নি। রম্ভা দেবীর স্বামী সমরবাবু ওখানে মুন্সেফ। রেণুরা হয়তো শহরের বাড়িতে নেই ভেবে ওঁর ওখানে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ি—অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় সাততলার ওপর থেকে —কর্ণফুলির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। পরদিন সকালে রেণুদের বাড়ি গিয়ে দেখা করলুম।

রেণু বল্লে—এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল। আমার হাতের নখ কেটে দিলে বসে বসে। কতক্ষণ ধরে কত গল্প হল। সুপ্রভার কথা উঠল—খুকুর কথা উঠল। আসবার দিন ভৈরব-বাজারে মেঘনা নদী পার হবার সময় ট্রেনে সুপ্রভার কথা আমার কি ভীষণভাবেই মনে এসেছিল। যাবার দিন সব গ্রামের ছায়ায় সুপুরি বনের ছায়ায় কল্যাণীকে কতবার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ কতকাল থেকে—সুপ্রভা, সেবা, রেণু, কল্যাণী, মায়া—সবাই পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে। ওদের টানেই কতবার এখানে এলুম। সারাদিন কল্যাণী আর কল্যাণী···কত গ্রামে ওকে কল্পনা করলুম—বিদ্যাময়ী কলেজের হোস্টেল দেখে মনে হল এখানে ওরা ছিল। রত্না দেবীর সাততলায় একদিন গানের আসর হল—কোজাগরী পূর্ণিমা সেদিন। গোপালবাবু গান গাইলে—কবীরের ও মীরার ভজন। আমার মনে হল তাদের কথা, যারা আনন্দ চেয়েও পায় নি—কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ পেয়ে তাতেই খুশি হয়ে জীবন কাটিয়ে গেল। জাহ্নবী নবদ্বীপে গিয়েছিল গঙ্গাস্নান করতে, সেকথা—খুকু ডাকবাংলোর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল—কল্যাণীরা সেদিন ঘোড়ার গাড়ি করে বারাকপুরে বেড়াতে গিয়েছিল—সে সব কথা। চোখে যেন জল এসে পড়ে। আমি ছোটবেলা থেকে কত আনন্দই পেলুম—কিন্তু আমার পরিবারের আর কেউ অত আনন্দ কোনদিন কল্পনাও করলে না। কক্সবাজারের তরুণী বধূ গাড়িতে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। আমি তাঁকে 'মা' বলে ডাকলুম! পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে ভিন্ন এভাবে কেউ আলাপ করত না।

রেণু, কল্যাণী ও খুকুর সঙ্গে একদিন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। ওদের সীতাকুণ্ডু গ্রামে যে বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে উঠলুম। মধুর মা বলে একজন ব্রাহ্মণ বিধবা আমাদের আদর-যত্ন করলেন। সুপুরির গুঁড়ির সাঁকো দিয়ে পার হয়ে রেণু ও আমি অতি কষ্টে মধুর মার বাড়ি গিয়ে পৌছুই। আমি তামাক খাচ্চি হুঁকোয় (মধুর মা সেজে দিল) দেখে রেণু তো হেসেই অস্থির। বুদ্ধু তার ক্যামেরাতে সেই অবস্থায় আমার ফটো নিলে। আরও অনেক ফটো নেওয়া হল পাহাড়ে উঠবার পথে। রেণু কেবল বলে—আপনার জন্যে আমার ভয়। আমি বলি—আর কোন ভয় নেই—চল উঠে। কি সুন্দর দৃশ্য, কি শ্যামল বনানী, বিরাট বন-স্পতিদের ভিড়। শম্ভুনাথের মন্দিরের কাছে রেণু, কল্যাণী ওরকে চঞ্চু জল খেয়ে নিল। যেমন আমি বলি চঞ্চু, রেণু অমনি বলে, 'বাহির হইল! চঞ্চলা বাহির হইল!' অর্থাৎ আমার গ্রাম্য-জীবনের লেখক হবার সেই আশ্চর্য্য ঘটনাটির কথা। একটা গাছের ফটো নিতে গিয়ে ওদের জোঁকে ধরলে। জোঁক অবশ্যি আমাকেও ধরেছিল। আসবার পথে ওরা তেঁতুল পাড়লে একটা গাছ থেকে—তারপর ওদের বাড়ি এসে সবাই ভাত খাওয়া গেল সন্ধ্যাবেলা। রেণু বল্লে —আপনার সঙ্গে এ সম্পর্ক আর কখনও জীবনে পাব না! কত গল্প করতে করতে রাত্রি ন'টার সময় চাটগাঁ এলুম। রত্না দেবী খাবার করে নিয়ে বসে আছেন—ভাগ্যে আজ সীতাকুণ্ডে থাকি নি!

তার পরদিন সকালে উঠে কেশব জিনিস নিয়ে স্টেশনে এল। রেণুর বই কেশবের হাতে দিয়ে দিলুম। চন্দ্রনাথের পাহাড় ধুম স্টেশন থেকে বেঁকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে একে-বারে হিমালয় পর্য্যন্ত। কি নিবিড় ঘন বনানী পাহাড়ের মাথায়। ওই একটা বিভিন্ন জগৎ যেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া স্টেশনে আসবার সময় মনে হল অনেক আগে একবার এ পথে গিয়েছিলুম —তখন আমার কি ছিল? এখন কত কে আছে—সুপ্রভা আছে, কল্যাণী আছে, খুকু আছে। ময়মনসিং স্টেশনে আসবার আগে এল বৃষ্টি। আজ কিন্তু ময়মনসিং ·স্টেশন ছাড়তেই গারো পাহাড় বেশ দেখা যায়—বিদ্যাগঞ্জ বলে একটা স্টেশন থেকে চমৎকার দেখা গেল!

স্টীমারে যখন পার হচ্ছি, ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার পিংনা বলে একটা স্টেশনে এসে স্টীমার দাঁড়াল। আমি কল্পনা করলুম সন্ধ্যায় নেমে আমি অনেকদিন পরে যেন কল্যাণীদের বাড়ি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

হরেন ঘোষ আমার সঙ্গে ময়মনসিং স্টেশনে দেখা করলে। আবার বিদ্যাময়ী হোস্টেলটা ভাল করে দেখলুম। মায়া ও কল্যাণী এখানে পড়ত। হরেন ঘোষকে রমা দেবীর দেওয়া খাবার খাওয়ালুম। সিরাজগঞ্জে ট্রেনে উঠেই শুয়ে পড়লুম। ঘুম ভেঙে একেবারে দেখি ঈশ্বরদি। তারপরেই ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি রাণাঘাট। ভোর হবার দেরি নেই। আবার ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি নৈহাটি। দেশে এসে গিয়েচি। স্টীমারের এঞ্জিনের কল প্রতিবারই দেখি—এবারও দেখলুম। পূজোতে খুব বেড়ানো গেল এবার। ঘাটশিলা, বনগাঁ, বারাকপুর, চাটগাঁ, ময়মনসিং—বহু জায়গা। কলকাতায় নেমে দেখি শ্রাবণ মাসের মত মেঘাচ্ছন্ন দিনটা। বৃষ্টিও বেশ নামল দুপুরে। আজই বনগাঁ হয়ে বারাকপুর যাব।

আনন্দের বিষয় এই যে, ১৯১২ সালে ব্রাহ্মণবেড়িয়া হয়ে চাটগাঁ থেকে যখন কলকাতায় ফিরি, তখন আমি ৪১নং মীর্জ্জাপুরের যে দিকের মেসটায় থাকতুম—এবারেও সেইখানে এসে উঠেচি।

আজ স্কুল খুলেচে। বনগাঁ থেকে এলুম। আগের লেখাটা লিখবার পরে বারাকপুরে দু'দিন ছিলুম। আমার উঠোনের গাছে খুব শিউলিফুল ফুটেচে। খুকুর কথা কেবলই মনে হল সেখানে গিয়ে। কুঠীর মাঠে যেখানে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, সেখানটাতে বসে কতক্ষণ কাটালুম। নৌকো করে বিকেলে খুকুর মার সঙ্গে বনগাঁ আসবার সময় মনে পড়ল—১৯৩৯ সালের আষাঢ় মাসে খুকুর মা, খুকু এবং আমি বনগাঁয়ে এসেছিলুম। কল্যাণীর সঙ্গে দু'দিন কাটিয়ে গেলুম ঘাটশিলা। সেখানে এল বিভূতি মুখুজ্যে। তাঁকে নিয়ে ভট্চাজ সাহেবের মোটরে গালুডি। প্রোফেসার বিশ্বাসের বাড়িতে মেয়েদের পার্টিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হল। সেই রাত্রেই রাঁচি রওনা হই বিভূতিকে নিয়ে। মুরী জংশন থেকে রাঁচি যাওয়ার রেলপথের দু'ধারে অরণ্য সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। পরদিন রাঁচি থেকে অনেকগুলি মেয়ে ও কলেজের ছেলেদের সঙ্গে হুড্রু ও জোনা জলপ্রপাত দেখতে গেলুম। জোনাতে সন্ধ্যার আগে একখানা পাথরে বসে কত কি ভাবলুম। হুড্রুর চেয়ে জোনা ভালো লাগলো। কি জনহীন নিস্তব্ধতা চারিদিকের! মেয়েদের আসতে দেরি হতে লাগল, আমি ও বিভূতি ঘাসের উপর শতরঞ্চ পেতে শুয়ে রইলুম কতক্ষণ। সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, গৌরী—সবার কথাই মনে হয়। ওদের সবাইকে আমার প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি মনে মনে। সুপ্রভার চিঠি পেয়েছি রাঁচি এসেই। জোনাতে সে চিঠিখানা আমার পকেটে। জঙ্গলের মধ্যে বসে কতবার পড়ি। কল্যাণীর চিঠিখানাও। রাঁচি শহরটি বেশ সুন্দর! সুনির্ম্মল বসু ওখানে বেড়াতে গিয়েচে, তার সঙ্গে একদিন মাঠের ধারে বেড়াতে গেলুম। রাঁচি থেকে ফিরে ঘাটশিলা এসে দেখি ছোটমামা এবং নুটুর শ্বশুর সেখানে। কমল একদিন বেড়াতে এল। চলে এলুম কলকাতা। সেইদিন ছিল সকালে হাওড়ার পুল খোলা। স্টীমারে গঙ্গা পার হই। ন'টার ট্রেনে মানকুণ্ডু। খুকু আমাকে দেখে কি খুশি! কত গল্প, কত কথা। বাইরের দরজায় খিল দিয়ে এসে বসল। এতদিন পরে ও স্বীকার করলে, ছাদ থেকে রাঙা গামছা ও-ই উড়িয়েছিল। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। দেখে কষ্ট হল বড়। আসবার সময় বল্লে—চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। সত্যি দাঁড়িয়েই রইল। সুপ্রভার কথা কত হল। কল্যাণীর কথাও

বল্লুম। সেই দিনই রাত সাড়ে আটটার ট্রেনে বনগাঁ। 'বঙ্গশ্রী'র সুধাংশু যাচ্ছিল, তাকে ডেকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে গল্প করি আমার ভ্রমণের। বনগাঁ পৌঁছে সুন্দর জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে চললুম। বাড়ির সব দরজা বন্ধ করে ওরা ঘুম দিচ্চে। সুনীতিদের বাড়ি এসে বসলুম। সুধীরবাবু গিয়ে ডেকে তুল্লে। পরে একদিন কল্যাণীদের সঙ্গে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম পিক্‌নিক করতে। আমাদের পাড়ার ঘাটে বনসিমতলায় কল্যাণী রান্না করলে। গ্রামের ঝি-বৌয়েরা আলাপ করতে এল। ওরা আমার বাড়িতে বসে গান করলে। সব এল শুনতে। ইন্দু রায়ের বাড়ি গেল সবাই মিলে। জ্যোৎস্না রাত্রি, বাঁশবনের মাথায় আমাদের বাড়ির পিছনে বৃহস্পতি ও শনি জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও যেন জ্বল্‌জ্বল্ করচে। নৌকো ছাড়লুম। কল্যাণী আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে নৌকোর বাইরে বসে। ঘাট-বাঁওড়ের এপারে জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে চা করলে। কি চমৎকার লাগছিল! একটা বড় উল্কা সে সময় বেগনি ও নীল রংঙের আলো জ্বালিয়ে আকাশের জ্যোৎস্নাজাল চিরে প্রজ্বলন্ত হাউইবাজির মত জ্বলতে জ্বলতে মিলিয়ে গেল।

সুন্দর কাটল এবার পুজোর ছুটি। গাড়িতে গাড়িতে কাটল সারা ছুটিটা। কোথায় চাটগাঁ, কোথায় রাঁচি। আজ ফিরেচি কলকাতায় বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ থেকে।

জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল ওপরের ওটা লিখবার পরে। গত অগ্রহায়ণ মাসে আমি বিবাহ করেচি। সম্প্রতি স্ত্রীকে নিয়ে ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। একদিন সুবর্ণরেখা পার হয়ে পাহাড়-জঙ্গলের পথে চললুম ওকে নিয়ে। বনের মধ্যে একটা ঝর্ণা আছে, তার ধারে বড় বড় পাথর পড়ে আছে—এক ধরণের কি ঘাস গজিয়েচে। গোলগোলি ফুল (coclo sperma Govripium) ফুটেচে তামাপাহাড়ে। দুজনে একটা পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট পাথরে বসলুম ছায়ায়। তারপর ঝর্ণার জল খেয়ে চললুম পাহাড়ের দিকে। ওপরে যখন উঠেচি, তখন বেলা দুটো। ও গোলগোলি ফুল নিয়ে খোঁপায় পরলে। আমরা নেমে এলুম, তখন বেলা তিনটে।

তারপর শিবরাত্রির ছুটিতে ওকে আনতে গিয়ে বৈকালে দুজনে গেলুম ফুলডুংরিতে। চারিধারের পাহাড়ের শোভা এই বৈকালে অপূর্ব্ব হয়েচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থাকার পরে ফিরে গেলুম।

গত মঙ্গলবারে ওকে নিয়ে বারাকপুরে গিয়েছিলুম। ও মায়ের ভাঙা কড়াখানার ওপরে ফুল দিলে, বড় ভালো লাগল আমার। বেশ মেয়ে কল্যাণী।

আমরা কুঠীর মাঠে গিয়ে কুল পাড়লুম সবাই মিলে। গুট্‌কে, ইন্দু রায়, সত্য সবাই ছিল। সন্ধ্যার সময় চলে এলুম।

কাল ছিল স্কুলের ছুটি। সকাল বেলা বনগাঁ থেকে বেরুলাম আমি, কল্যাণী, বেণু ও যাদু। বসন্তে ঘেঁটুফুল দেখব এই ছিল আশা, প্রথমে গেলুম চাঁপাবেড়ের রাস্তার ধারের পুকুর পাড়ে। সেখান থেকে শুকনো পুকুরটার মধ্যে দিয়ে আমরা গেলুম ওপারে। তারপর গ্রামের পথে একটা তিত্তিরাজ গাছের তলায় ঘেঁটুবনের ধারে চাদর পেতে বসলুম। তিত্তিরাজের ফল পেকে ফেটে আছে গাছে—কেমন গন্ধ।

যেতে যেতে চড়কতলার বনের একটা অংশের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বেতগাছ ও কয়েক প্রকার নতুন ধরনের গাছপালা দেখলুম। একটা কাঙ্গালীদের বাড়ি কুল পেড়ে খেলাম। তামাক সেজে দিলে।

তখন বেলা প্রায় ১১টা। ওখান থেকে সোজা হেঁটে এলুম চাল্‌কী। পথে কত ঘেঁটুবনের শোভা—উঁচু পুকুরের পাড়টাতে চাল্‌কীর। ছেলেবেলায় যেখানে বসে কলের গান শুনেছিলুম, সেই দালানটা ভাঙা অবস্থায় দেখলুম। মিত্তেদের বাড়ির ওপর দিয়ে জাহ্নবীর বাড়ি এলুম। জাহ্নবীর ঘরে এসে কল্যাণীকে নিয়ে দাঁড়ালুম। কতদিন পরে আবার দাঁড়ালুম এসে জাহ্নবীর ঘরে।

ওরা ডাব খাওয়ালে, ভাত খাওয়ালে। দুপুরের পরে সকলে হেঁটে চলে এলুম বনগাঁ। চাঁপাবেড়ের পথে এল বৃষ্টি। একটা গাছের খোড়লে সবাই ঢুকে বসি। বৃষ্টি গেল কেটে খানিকটা পরে।

বেলা চারটাতে বনগাঁ ফিরি।

কাল জাহ্নবীর বনগাঁর বাসায় গিয়েচি, পাঁচী ডেকে নিয়ে গিয়ে চা করে দিলে, পায়েস খাওয়ালে। অনেকদিন পরে ওদের বাড়িতে গেলুম।

তার আগে মানকুণ্ডু খুকুর সঙ্গে গিয়েছিলুম একদিন। খুকু পুকুরের ধার দিয়ে আমাকে আসতে দেখেই ছুটে এল। ছাড়তে চাইলে না—তখুনি চা করে, খাবার করে খাওয়ালে।

গত রবিবারে বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন হয়ে গেল। তার আগের দিন আমি, কল্যাণী, কানু, বেণু সব বেরিয়ে চাঁপাবেড়ের ঘেঁটুফুল দেখতে গেলুম—ওরা সব খাবার তৈরী করে নিয়ে গেল। কি সুন্দর ঘেঁটুফুল ফুটেচে চাঁপাবেড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে মাঠের ধারে। বিকেল বেলা, আমরা বিলের মধ্যে দিয়ে মাঠের বনের ছায়ায় বসলুম। সবাই মিলে চা ও খাবার খেলুম। ওরা সব ছুটোছুটি করলে। কোকিল ডাকচে বনে, নীল আকাশ, ভারী আনন্দ পেলুম সেদিন। সাহিত্য-সম্মেলন তার পরদিন। গজেন, হরিপদদা ও খুকু এল—ওদের চা ও খাবার খেতে দিলুম।

নববর্ষের আজ প্রথম দিন। গত বর্ষে অনেক ঘটনা ঘটে গেল। সুপ্রভার বিবাহ ও আমার বিবাহ তাদের মধ্যে দুটি প্রধান ঘটনা। পূর্ব্বের জীবন একেবারে বদলে গিয়েচে।

আজ বনগাঁ থেকে এলুম রাত ন'টার ট্রেনে। কাল বারাকপুরে চড়ক দেখতে গিয়েছিলুম অনেক দিন পরে। আমি, গুট্‌কে ও নন্তু—তিন জনে যাই। অনেকদিন আগের মত চড়কতলায় কাদামাটি দেখলুম। শিবের জন্যে ধান ছড়ানো। বাড়ির পেছনে বাঁশতলায় বেড়াতে গিয়ে তেমনি শুকনো ফলের বীজের বন্ধ, পাখীর ডাক। তেমনি কোকিল ডাকচে—যেন গোটা জীবনটা সামনে পড়ে আছে মনে হল। বাবা ও মাও যেন আছেন!

বার্ণপুরে সাহিত্য-সম্মেলনে ও-সপ্তাহে কল্যাণীকে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে একদিন ওরা মোটর নিয়ে রতিবাটি কয়লার খাদ দেখাতে নিয়ে গেল আমাদের। জীবনে এই প্রথম কয়লার খাদ দেখা হল, বিভূতি মুখুয্যেও সঙ্গে ছিল।

১লা বৈশাখ খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল আজ বনগাঁয়ে। দুটি লোক হাটে গাছ-চাপা পড়ে মারা গেল।

কচা মারা গিয়েচে, বারাকপুরে গিয়ে সকলের মুখে সে বিবরণ শুনলাম। বড়ই শোচনীয় মৃত্যু।

কতদিন পরে আবার দেখলুম চড়ক—সেই কথাই বার বার মনে হচ্চে—এমন ধরণের লাঠি খেলা সেই দেখতুম বাল্যকালে, আবার কতকাল পরে যেন মনে দেশের আমাদের ঘরবাড়ি ঠিক তেমনি আছে, তেমনি পক্ষী-কাকলী-মুখরিত, শুক্‌নো ফলের বীজের গন্ধামোদিত আমার বাল্য-

দিনগুলি। বাবা যেন এখনও বসে গান গাইচেন আমাদের ঘরের দাওয়ায়—আবার কবে যাত্রা বসবে—সেই আনন্দে দিনরাত চোখে নেই ঘুম।

তার অনেকদিন পরে, মনে আছে যেবার আমি ম্যাট্রিক দিই—সেই শেষ বার কাদামাটির সময় চড়কতলার রৌদ্রে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, পরের বছর আসি নি—থার্ড ইয়ারে এসেছিলুম, কিন্তু সে কথা মনে নেই। আজ কত বছর পরে আবার এলুম সেই কাদামাটি দেখতে।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেচে। অনেক কিছু ঘটে গেল গ্রীষ্মের ছুটিতে। দার্জ্জিলিং গিয়েছিলুম কল্যাণীকে নিয়ে—সেখানে অবজারভেটরি হিল থেকে নামচি—সুপ্রভা ও সেবার সঙ্গে দেখা। সুপ্রভার বাবাও ছিলেন। একদিন ওদের হোটেলে গিয়ে চা খাওয়া গেল। তারপর সেদিনই ঘুম থেকে আমি হেঁটে আসচি জলাপাহাড় রোড হয়ে—দেখি নীচে থেকে কে ডাকাডাকি করচে। চেয়ে দেখি সেবা ও বিপুল দাঁড়িয়ে। নেমে এলুম। কালিম্পং রোডের মোড়ে গাড়ির মধ্যে সুপ্রভা বসে আছে। পান দিলে খেতে। গল্প করে তখনি জলাপাহাড় রোড ধরে চলে এলুম দার্জ্জিলিং-এ। পথের দৃশ্য অপূর্ব্ব। কি হিমারণ্যের শোভা! কত কি ফুল ফুটে রয়েচে। অনেক ফুল তুলে আনলুম কল্যাণীর জন্যে। M. S. M. আপিসে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করলুম, সেদিন ট্রেনে যে সন্দেশ দিয়েছিল কড়াপাকের। কল্যাণী ধর্ম্মশালায় শুয়ে আছে—তাকে নিয়ে গিয়ে উঠলুম অকল্যাণ্ড রোডে। সেখান থেকে দার্জ্জিলিং-এর দৃশ্য কি সুন্দর দেখা যায়—বিশেষ করে আলো জ্বালবার দৃশ্য। নামবার দিন তরাইএর ঘন অন্ধকার অরণ্য ও অসংখ্য জলপ্রপাত আমার মনে পূর্ব্ব-দৃষ্ট কত দৃশ্যকে তুচ্ছ করে দিলে। বনগাঁ এসে একদিন বারাকপুর গিয়েছিলুম। ইন্দুর সঙ্গে নদীর ধারে বসে গল্প করলুম, হাজারি সিংয়ের দোকানে বসে রেজিনা গুহের গল্প হল। হাজারি সিং বল্লে—সে দেখ নি তোমরা, সাক্ষাৎ সরস্বতী! অথচ ও কখনো নিজেই দেখে নি। হাভাক জিঙ্কের গল্পও হল—যেমনি আজ গত ১৫।১৬ বছর কি তারও বেশি হয়ে আসচে। গাড়ি পাঠিয়ে ওঁরা জামাইষষ্ঠীতে নিয়ে গেলেন। তারপর ষষ্ঠীর দিন হঠাৎ প্রশান্ত মহলানবীশ, কাননবালা ও মিসেস্ মহলানবীশ গেলেন বনগাঁয়ে। সেখান থেকে গেলেন বারাকপুরে। আমার রোয়াকে গিয়ে বসলেন। শ্যামাচরণদা চা ও খাবারের ব্যবস্থা করলে।

আমি আষাঢ় মাসে একদিন গেলুম পাটশিমলে। পথে ভীষণ কাদা—বলদে-ঘোঁড়ামারি এক গ্রাম্য পাঠশালায় বসে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে গল্প করি। সেখানে জল খেয়ে আবার রওনা হই। একটা বটগাছের তলায় বসি। তারপর আসসিংড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে জামাদা বিলের আগাড়ের সেই শিকড়-তোলা বটগাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। পাটশিমলে পৌঁছে পিসীমার মুখে কত পুরোনো কথা শুনি। পেছনের বাঁওড়ে বর্ষার দিনে হিজল গাছের ঘাটে কত তৃপ্তি! সন্ধ্যাবেলা ডাভা-উঁচু বনের মধ্যে দিয়ে প্যাটাভির দিকে হাজরাতলার ধারে বেড়াতে গেলুম। সেই জামগাছের শেকড়টাতে বসলুম। তার পরদিন আবার সেই পথেই ফিরি।

ঘাটশিলাতেও গিয়েছিলুম দ্বিজুবাবুর ওখানে, সন্ধ্যায় বসে রোজ গল্প হত। একদিন খুব বর্ষা। সন্ধ্যার আগে আমি সুনীলদের বাড়িতে এক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ফিরবার সময়ে নদীর ধারের পথ হয়েই ফিরলুম। এক জায়গায় নাবাল জমিতে অনেকখানি জল বেধেছিল। বৌমা ও উমাকে নিয়ে একদিন ফুলডুংরির পেছনকার শালবনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর কুরচি ফুল ফুটেচে বনে। একটা ঝর্ণা বর্ষার জলে ভরপুর, এঁকে বেঁকে চলেচে বনের মধ্যে দিয়ে। ফুলডুংরি পাহাড়ে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতুম। একদিন

ঘন বর্ষার সন্ধ্যার সময় একা কতক্ষণ পাহাড়ের ওপর বসে বসে ভাবলুম এ ফুলডুংরি কতদিনের। পলাশীর যুদ্ধের দিনেও এমনি ছিল, আকবর যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনও এমনি ছিল, বুদ্ধদেব যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন তখনও এমনি ছিল, যখন মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা বর্ত্তমান, যেদিন সম্রাট টুটেনখামেনের মৃতদেহ সাড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হয়েছিল—সেদিনও এই ফুলডুংরি এমনই ছিল, আজ যার ওপর ধলভূম রাজার পার্ক তৈরী হচ্চে।

বনগাঁয়ে এবার খুকু ছিল অনেকদিন। সেই ১৯৩৯ সালের খুকু আর নেই! প্রায়ই সন্ধ্যায় কল্যাণীকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম। ও গেল ৪ঠা আষাঢ়, সেদিন কল্যাণীকে সঙ্গে করে ওদের ছাদে বসে গল্পগুজব করা গেল। সন্তুও ছিল, রামদাসের মেয়ে।

খয়রামারি শ্মশানের পাশে মন্মথদা, যতীনদা, বিভূতিকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে যেতুম। ওটা নতুন আবিষ্কার। ইছামতীর জলে স্নান করে কি তৃপ্তিই পেতুম। এবারে কি ভীষণ গরম গেল। নেয়ে তৃপ্তি নেই ঘাটশিলায়। ইছামতীতে সন্ধ্যার সময়েও নাইতুম। শরীর যেন জুড়িয়ে যেত ঘাটশিলার পরে দেশে এসে। ঘাটশিলাতে নাইবার কি কষ্টই গেল ক'দিন। একে গরম, তাতে ভাল করে স্নান করবার মত পুকুর নেই। দ্বিজুবাবুর পুকুরের ঘোলা জলে একদিন নেয়েছিলুম।

যতীনদাকে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা খুব বলতাম। Jean's ও Eddington-এর Astronomy টা এ ছুটিতে খুব পড়া গিয়েচে ও আলোচনা করাও গিয়েচে। রোজ তিনটের সময় কল্যাণীকে লুকিয়ে ও তার বকুনি সহ্য করেও ওদের আড্ডায় চলে যেতুম। যতীনদা দেখতুম বসে আছে। দুজনে আরম্ভ করতুম গ্রহ-নক্ষত্রের গল্প। কল্যাণী সন্ধ্যার সময় পারতপক্ষে বেরুতে দিত না। অন্ধকারে পালালে ছুটে গিয়ে ধরে আনত। ছাদে শুতাম প্রায়ই গরমে। মাঝরাত্রিতে দুজনে নেমে আসতাম। সকালে খুকুর বাড়ি যেতামই।

ভালো কথা রেণুর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল এই ছুটিতে। যেদিন ঘাটশিলা যাই, তার আগের রাত্রে। বিভূতি মুখুয্যে, মনোজ এবং আমি বনগাঁ এলুম। গোপাল নিয়োগীর বাসায় যেতে ফুলির ছেলের সঙ্গে দেখা, সে নিয়ে গেল ওদের বাসায়। সেখানে ফুলির মার কাছে রেণুর ঠিকানা নিয়ে চলে গেলাম ক্যাম্বেলের সামনে দেখা করতে। রেণুই এসে দোর খুলে দিলে। খুব খুশি আমায় দেখে। সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে গেল। একখানা চিঠিও দিয়েছিল পুরী থেকে—হুটু নিয়ে গিয়েছিল ঘাটশিলাতে—বৌমা ছিলেন।

চমৎকার গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হল।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বাড়ি আড্ডা দিতে গেলুম সজনী, মোহিতদা, বিভূতি মুখুয্যে ও আমি। কলকাতার রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। অনেক রাত পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করে ফিরলুম। ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট হিউজেস্ সাহেবও সেদিন সেখানে ছিল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। বহুকাল পরে আজ আমার বহুকালের পরিচিত আবাস ৪১, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেস ছেড়েচি। সেই হরিনাভি স্কুলের থেকে আজ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকে ওই মেসটাতে ছিলাম। এতকাল পরে আজ ছেড়ে অন্যত্র আসতে হল, কারণ মেসটা গেল উঠে। বিভূতি, দেবব্রত, খুকু, সুপ্রভা, রেণু—কত লোকের সঙ্গে ও-মেসের স্মৃতি সুখেদুঃখে ছিল জড়ানো।

গত রবিবার ৬ই জুলাই নড়াইল সাহিত্য-সম্মেলনে আমি ছিলুম সভাপতি—বনগাঁ থেকে যতীনদা, মন্মথদা, মিতে এদের নিয়ে গিয়েছিলুম। সিঙ্গে স্টেশনে নেমে একটা দোকানে খাবার তৈরী করতে বলে আমরা ভৈরবের ওপরে কাঠের পুলে গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাঞ্ছানিধি বলে জনৈক উড়িয়া ওপারে জঙ্গলবাধাল গ্রামে থাকে—সে তার মনিবের কত নিন্দে করলে। তারপর ময়রার দোকানে এসে লুচি সন্দেশ খেয়ে একখানা এক ঘোড়ার গাড়িতে এলুম আফ্রার ঘাটে। সেখান থেকে নৌকো করে ক' বন্ধুতে বসে গল্প করতে করতে জ্যোৎস্নারাত্রি ভাল করেই উপভোগ করা গেল। মিতে ও আমি নৌকোর ছই-এর ওপর গিয়ে বসে যতীনদাকে বার বার ডেকে ও ছইয়ে ঘা মেরে তার ঘুমের ব্যাঘাত করছিলাম। ভোরে পিয়েরের খালের ধারে নৌকো লাগল। সেখান থেকে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলুম রতনগঞ্জ। একটা দোকানে খেলুম খাবার। তারপর টাকুরে নৌকোতে উঠে, নড়াইল গিয়ে অজিতবাবুর বাসায় গিয়ে হাজির হই বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে। বৈকালে সভা সেরে চা-পার্টিতে স্থানীয় S.D.O. মুন্সেফ প্রভৃতির সঙ্গে গল্প। একটা নাটকাভিনয় দেখতে গেলুম টাউন হলে—তারপর অনেক রাত্রে খেয়ে গোরুর গাড়িতে রওনা। বেশ জ্যোৎস্না-রাত্রি। খুব ঘন ঘন বন, বেত ঝোপ পথের ধারে। আবার পিয়েরের খালে নৌকোয় উঠলুম। যতীনদাকে সবাই মিলে উত্ত্যক্ত করে তোলা গেল, কেন অজিতবাবুর সামনে ভাড়া চেয়েছিল, এই কথা বলে। রাত্রে নৌকো থেকে পড়ে যাবার মত হয়েছিল যতীনদা। ভোরে আফ্রার ঘাট থেকে হেঁটে সিঙ্গে স্টেশন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র রেখে স্নান করে নিয়ে চা ও সন্দেশ খাওয়া গেল। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ এসে নামলাম। কল্যাণী খুব খুশি। আহা, আসবার সময় রসমুণ্ডি নিয়ে আমার হয়ে ঝগড়া করে বকুনি খেলো রেণু খুকুর কাছে। আমায় বল্লে—আমার মরা মুখ দেখবেন, আজ যদি যাবেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'র মত চলেই তো আসতে হল।

সামনের রবিবারে নীরদবাবু, সুবর্ণ দেবী, পশুপতিবাবু যাবে মোটরে বনগাঁ picnic করতে —সম্ভবত চালকী বিভূতিদের বাড়ি হবে রান্নাবান্না।

জীবন আবার কি ভাবে কোনদিক থেকে পরিবর্ত্তন হয়ে গেল তাই ভাবি। ৪১, মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের মেসে সেই পুরোনো ঘর আমার জন্যে রেখে দিয়ে ওরা আমায় সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে ডাকলে—কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হল না। মেসের মায়া এবার কাটাতে হবে—কল্যাণী খুব ধরেচে এবার ওকে নিয়ে বাসা করতে হবেই। ভেবেচি কলকাতা ছেড়ে বারাকপুরে থাকব। গ্রামের জীবন, ইছামতীর ঘোলা জল, মটরলতার দুলুনি—কতকাল ভোগ করি নি। জীবনে কোনদিনই গৃহস্থ হয়ে বারাকপুরে থাকি নি। এবার গার্হস্থ্য জীবন যাপন করবার বড় আগ্রহ হয়েচে। জীবনে যা কখনো হয়নি—এবার তা করেই দেখি। কেন! মুক্ত ও স্বাধীন জীবন দুদিন দেখি কাটিয়ে।

কাল রবিবারে নীরদবাবু ও সুবর্ণ দেবীরা এলেন বনগাঁ। আমি, কল্যাণী, মায়াদি, বেলু সবাই মোটরে চালকী বিভূতির বাড়ি গিয়ে বসা গেল। ডাব খেলাম। তারপর সুধাংশুদের বাড়ির রান্নাঘরে খিচুড়ি রান্না হল। ইতিমধ্যে যূথিকা দেবী ও পশুপতিবাবু গিয়ে হাজির। সবাই মিলে আনন্দ করে খাওয়া ও গল্প করা গেল। জাহ্নবীর ঘরে ওদের নিয়ে গেলাম—বেচারী জাহ্নবী যদি আজ থাকত! ওর অদৃষ্ট নিয়ে ও এসেছিল—চলে গেল নিজের অদৃষ্ট নিয়েই।

গোপালনগরের হাটে সবার সঙ্গে দেখা। কল্যাণী, মায়াদি, সুবর্ণ দেবী সবাই হাট করচে। গজেন, ফণিকাকা, নলে নাপিত, শুটকে, শ্যামাচরণদা—সবাই দেখলে। শ্যামাচরণদা সুবর্ণ

দেবীদের হাট করে দিলে। আমরা আবার ফিরে এলুম বনগাঁ। সেখান থেকে চা খেয়ে ওরা চলে গেল। কল্যাণীকে আজকাল বড় ভালো লাগচে। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ছাড়ে না—যেমন এসেচি কলকাতায় অমনি এক চিঠি—এ শনিবার না এলে মরে যাব। বড় ভালবাসে।

আজ একটি মহা স্মরণীয় দিন বাঙালীর। সকালে উঠে লেখাপড়া করচি, বিশ্ব বিশ্বাস এসে বল্লে, রবীন্দ্রনাথ আর নেই। শুনেই তখনি রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চলে গেলুম। বেজায় ভিড় —ঢোকা যায় না। সেখানে গিয়ে শোনা গেল রবীন্দ্রনাথ মারা যান নি, তবে অবস্থা খারাপ। ওখান থেকে এসে স্কুলে গেলুম। স্কুলে শুনলাম তিনি মারা গিয়েছেন ১২টা ১৩ মিনিটের সময়। স্কুল তখুনি বন্ধ হল। আমি ও অবনীবাবু, ক্ষেত্রবাবু, স্কুলের ছেলের দল কলেজ স্কোয়ার দিয়ে হেঁটে গিরীশ পার্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে বিরাট শবযাত্রার জনতা আমাদের ঠেলে নিয়ে চলল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বেয়ে। রমেন সেনের ভাই সুরেশের সঙ্গে আগের দিন প্রমোদবাবুর বাড়ি দেখা হয়েছিল—আমরা হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে যাই নীরদবাবুকে। সে আর আমি কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের মধ্যে দিয়ে সেনেটের সামনে এসে আবার পুষ্পমালা শোভিত শবাধারের দর্শন পেলুম। পরলোকগত মহামানবের মুখখানি একবার মাত্র দেখবার সুযোগ পেলুম সেনেটের সামনে। তারপর ট্রেনে চলে এলুম বনগাঁ। শ্রাবণের মেঘনির্ম্মুক্ত নীল আকাশ ও ঘন সবুজ দিগন্ত বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল—

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নবীন জনম লভি—

অনেকদিন আগে ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন পত্র' পড়তে পড়তে বারাকপুরে ফিরেছিলুম—মায়ের হাতের তালের বড়া খেয়েছিলুম, সে কথা মনে পড়ল।

কল্যাণীকে শবাধারের শ্বেত-পদ্ম দিলুম, সে শুনে খুব দুঃখিত হল। তারপর হরিদার মেয়ের বিয়েতে গেলুম তাঁর বাড়ি। খেতে বসে খুব বৃষ্টি এল।

তারপর ক'দিন ছিলাম বনগাঁ। খুকু এল অসুস্থ অবস্থায়। রাত্রে কল্যাণীকে নিয়ে দেখা করতে গেলুম ওর সঙ্গে। আবার পরদিন নিশিদার বাড়িতে বৌভাত তাঁর ছেলের। সেখানেও গেলুম—যাবার আগে খুকুদের বাড়ি গিয়ে গল্প করলুম।

কিন্তু মনে কেমন যেন একটা শূন্যতা—রবীন্দ্রনাথ নেই! একথা যেন ভাবতেও পারা যাচ্চে না।

গত জন্মাষ্টমীর দিন বিকেলে এখানে এলো বিভূতি, মন্মথদা। ওদের নিয়ে প্রথমে গেলাম শিবপুর লাইব্রেরীতে—তারপর রাত ন'টার ট্রেনে রওনা হয়ে নামলাম গালুডিতে। ভোরের দিকে সুবর্ণরেখার পুল পার হয়ে শাল-জঙ্গলের পথে উঠলুম এসে কারখানার চিমনিটার কাছে। কতকালের পরিত্যক্ত তামার কারখানা—লোকও নেই, জনও নেই। গুররা নদীতে স্নান সেরে সবাই মিলে পিয়ালতলায় শিলাখণ্ডে বসে জলযোগ সম্পন্ন করলুম—তারপর তামাপাহাড় পার হয়ে নীলঝর্ণায় নামলুম। সেখান দিয়ে আসবার পথে একটা ঝর্ণার জল পান করে আমরা একটা ছোট্ট দোকানে কিছু চিঁড়ে ও চা কিনি। একটি ছোট্ট মেয়ে দোকানে ছিল, সে চা'র জল গরম করে দিলে। তারপর ঘন বনের পথে হেঁটে পাটকিটা গ্রামে পৌছে গেলুম। গ্রামের বাইরে যে ছোট্ট ঝর্ণাটি, সেখানে বসে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর আবার হেঁটে রাণীঝর্ণার পাহাড় পার হয়ে ওপরে উঠলুম—দূরে সুবর্ণরেখা আবার দেখা যাচ্ছে—বেলা তখন তিনটে।

মুশাবনী রোডে নেমে কেঁদাড়ি গ্রামে পল্লীকবি বিষ্ণুদাসের বাড়ি এলুম। তারপর চা খেয়ে তিমুঝর্ণা পার হয়ে আমরা সুবর্ণরেখার খেয়া ঘাটে ডোঙায় নদী পার হলাম। ভট্টাচার্য্য সাহেবের বাংলোয় বসে গল্প করে ঘাটশিলার বাড়ি এলুম। রাত্রে সেখানে বিধায়ক, কমল, অমর প্রভৃতির সঙ্গে খাওয়া গেল।

পরদিন সকালের ট্রেনে চলে আসি কলকাতায় ও রাত সাড়ে-আটটার ট্রেনে বনগাঁ। কল্যাণীর সঙ্গে ভ্রমণের গল্প করি। খুকু এখানে এসেচে, তার সঙ্গে গিয়ে গল্প করি একদিন কল্যাণীকে নিয়ে ছাদে বসে।

এবার পূজোর ছুটি কাছে এসেচে। কি ভীষণ পরিশ্রম গিয়েচে—গ্রীষ্মের পরে এই ক'টা মাস—বিশেষ করে গত এক মাস। সর্ব্বদা লেখা আর লেখা।···খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই! রোজ ভোরে উঠে কলঘরে যাই স্নান করতে, তখন ভাল করে অন্ধকার কাটে না, পাশের বাড়ির রান্নাঘরে আলো জ্বলে—এসে সেই যে লিখতে বসি—একবারে দশটা। আর তিনটি দিন পরে ছুটি—কাল দুপুরের পর থেকে খাটুনির অবসান হয়েচে। সব লেখা দিয়ে দিয়েচি—হাতে আর কোন কাজ নেই। আজ তো একেবারেই ছুটি। ওবেলা বিদ্যাসাগর কলেজে Study Circle-এ এক বক্তৃতা আছে—তাহলেই হয়ে গেল।

পূজোর পরে ছেড়েই দেব স্কুল। অবকাশ ও অবসরে ভাল ভাবে লেখা যাবে। জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। ঘড়ি-ধরা সময় অনন্তকে কি করেই আটকেচে! বিশ্বের ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ বৎসরের সময় অতি তুচ্ছ—কিছুই না—আমার মেসের ছোট্ট ঘরটিতে সাড়ে ন'টা যেই বাজল আমার হাতঘড়িতে—অমনি সময় গেল ফুরিয়ে। আমি জীবনে অবকাশ ভোগ করতে চাই এবার—আর চাই বারাকপুরে ছেলেবেলার মত বাস করতে দু'দিন। দেখি এসব সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা!

বনগাঁ যাই নি অনেকদিন। ও শুক্রবারে যশোরে পূর্ণিমা-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের শোকসভা ছিল। মনোজ, মহীতোষদা, আমি ও নীরদবাবু গিয়েছিলুম। আমি ও সুরেন ডাক্তার উঠেছিলুম অবিশ্যি বনগাঁ থেকে। সভাতে কল্যাণীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার জ্বর হয়েছিল বলে নিয়ে যেতে পারি নি। সভার পরে মণি মজুমদারের বাড়ি আমরা আহারাদি করলুম ও গিরীনদার সঙ্গে দেখা করে রাত্রের মেলে কলকাতা ফিরি—তারপর আর বনগাঁ যাওয়া ঘটে নি।

পূজো এসে গিয়েচে। কলকাতা থেকে শুক্রবার বনগাঁ যাব মহালয়ার ছুটিতে—পরের সোমবারে স্কুল হয়ে পূজোর ছুটি হয়ে যাবে। কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাবার ইচ্ছে আছে।

মনে আজ কেমন আনন্দ, এমন ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দের দিন জীবনে ক'টাই বা আসে? আজ পূজোর আগে মহালয়ার ছুটি। সোমবারে একেবারে ছুটি হচ্চে পূজোর। অনেকদিন বনগাঁ যাই নি—আজ ও-বেলা যেতে পারব ভেবে অত্যন্ত আনন্দ হচ্চে। গতকাল সকালে যশোর থেকে এসেচি সাহিত্য-সম্মেলন করে—বনগাঁ যখনই ট্রেনখানা গেল তখনই যেন মনে হল নেমে পড়ি। অনেকদিন পরে ইছামতী দেখলুম সেদিন। এমন আনন্দের দিনে পেছনে যদি বহু নিরানন্দপূর্ণ দিন না থাকে, তবে এমন দিন কখনই হতে পারে না। নিরানন্দের কঠিন, ধূসর মরুভূমি পার না হয়ে এলে আনন্দের মরুদ্বীপে পৌছুনো যায় না—দস্যুবৃত্তি করে যে আনন্দ লুটতে আসবে—রোজ যারা আনন্দ খুঁজে বেড়ায়—আনন্দ খুঁজে বেড়ানোই যাদের পেশা—তারা সত্যকার আনন্দ কি বস্তু—তার সন্ধান রাখে না। আনন্দের পেছনে আছে সংযম, ভোগের

অভাব, আনন্দের দৈন্য—এসব অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে এসে তবে প্রকৃত আনন্দ রসের সন্ধান মেলে। আমি জীবনে অনেকবার এ ধরণের আনন্দ ভরা দিনের আস্বাদ করেচি—যেমন এক-দিন জাজিপাড়ায়—যখন বিজয় জ্যোৎস্নারাত্রে একটা হেনাফুলের ডাল হাতে নিয়ে দেখা করলে—তারপর ইসমাইলপুরে সেই অপূর্ব্ব আনন্দের দিন—অনেককাল পরে যখন কলকাতায় আসব সদরের হুকুম পেলুম—সেই বাঁকে সিং, সেই দিগন্ত বিস্তীর্ণ কাশবনের প্রান্তে আমাদের খড়ের কাছারী ঘর! এখনও চোখের সামনে দেখচি।

অবকাশ পেলে ইসমাইলপুর অঞ্চলে একবার যেতে হবে—এ বছরই যাব ভেবেচি।

৺পূজার ছুটি হল আজ—আজই বনগাঁ থেকে এসেচি—কল্যাণীর মনে দুঃখ হয়েচে হয় তো। কাল সে বলেছিল, যাবেন না খয়রামারি বেড়াতে বিকেলে, কিছুতেই যাবেন না। 'যেতে নাহি দিব'—কিন্তু ও বলে ছোট মেয়ের মত জোর করে, আমি ওর কোন কথাই রাখি নে, ওর কথা ঠেলে জোর করে চলে যাই। ও আবার বলে তবুও, বোঝে না যে ওর কথা রাখচি নে—অন্য মেয়ে হলে অভিমান করে আর বলে না। কিন্তু রোজই বলে, রোজই কথা অবহেলা করি—অথচ ও বলতে ছাড়ে না একদিনও—সেই পুরোনো সুরে 'যেতে নাহি দিব'—ও বড় সরলা! অমন সরলা মেয়ে আমি কোথাও দেখি নি।

আজ ছুটি হলে শুনলুম স্কুলে শারদীয় উৎসব হবে। কিন্তু সে উৎসবে আমি থাকতে পারি নি—বড় দেরি হয়ে গেল বলে যোগ দিতে পারলুম না।

এলুম এম. সি. সরকার, মিত্র ও ঘোষ, 'দেশ' আপিস, ফুলুর মায়ের বাড়ি, ক্ষিতীশ ভট্‌চাজের 'মাসপয়লা' আপিস ও তারপর বাসা।

কল্যাণীর কথা কিন্তু বড় মনে হচ্চে আজ সারাদিন। তার চোখে জল দেখে এসেচি ভোরবেলা।

বারাকপুরে গ্রাম্যজীবন কিছুদিনের জন্যে যাপন করবার বড় ইচ্ছে—কত দিন যে এ ধরণের জীবন কাটাই নি—মাটির সঙ্গে যোগ থেকে···গ্রাম্য গৃহস্থ সেজে। আবার সেই শৈশবের জগৎটা আবিষ্কার করব—এই মনে আকাঙ্ক্ষা। আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনে, এই শরৎ-কালের দুপুরে গাছপালায়, ঘুঘুর ডাকে কি যেন মায়া মেশানো ছিল—বনভূমি যেন স্বপ্নমাখা, ১৯৩৪ সালের দোলের সময়েও আমি তেমনি স্বপ্নমাখা দেখেছি বনভূমিকে—মাত্র সাত বছর আগে। কিন্তু শহরের কলকোলাহলময় ব্যস্তসমস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে যে স্মৃতি আমার মনে ক্ষীণ হয়ে আসচে, যে জীবনকে ভুলে যাচ্চি, আবার সে জীবনকে আস্বাদ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েচি—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আমার তা করতে হবে। অন্য লোকে সে কথা কি বুঝবে?

কল্যাণী কাল বলছিল আর বছরের মত—আমার গা ছুঁয়ে বলে যান, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন!

তা এলুম না। ওর মনে দুঃখ হল। পা ছুঁয়ে বল্লে, তাই যদি না করা যায়, তবে মানুষ মরে যায় জানেন? এও আপনি করলেন! লোকের জীবন-মরণটাও দেখলেন না? এই সন্ধ্যায় সেকথা ভেবে মনে কষ্ট হচ্চে—ওর কথাটা শুনলেই হোত ছাই। মিথ্যে ওর মনে কেন কষ্ট দেওয়া?

ওর তরুণ মনের স্নেহ ও আগ্রহকে বার বার করে ঠেলে গেলাম অবহেলায়—তবুও ও বোঝে না, মনে কিছু ভাবে না—আবার সেই রকমই বলে।

কাছের মসজিদে আজান দিচ্চে। ক'দিন খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে আজানের শব্দ শুনে

ভাবলুম—এবার রাত ভোর হয়ে এসেচে। আর সে কি আনন্দ! সেই নীচের কলতলায় গিয়ে স্নান করে আসব।

৺পুজোর ছুটি আজ শেষ হয়ে স্কুল খুলেচে। আজ এসেচি বনগাঁ থেকে। পরশু ঘাটশিলা থেকে যাই বারাকপুরে। মহাষ্টমীর দিন কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাব পূর্ব্ব থেকেই ঠিক ছিল—সপ্তমীর দিন নকফুলে জয়গোপাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে পরদিন সকালেই রওনা। শেষরাত্রে ঘাটশিলা পৌছব। মেসে ওকে নিয়ে এসে দেখি দার্জ্জিলিং-এ দেখা সেই ছেলেটি ও স্কুলের ছুটি ছাত্র উপস্থিত। ওদের সাথে গল্পগুজব করে কেটে গেল সময়টা। তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ি নিয়ে গেলুম। তারা জলটল খাওয়ালে। ফিরেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে খানিকটা অপেক্ষা করার পরে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরলুম। মিতে আছে ওখানে—শেষরাত্রে আমাকে ঘাটশিলা পৌছুতেই সে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর ভোর হতেই বেড়াতে বেরুই আমরা।

গালুডিতে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে হেঁটে যাবার দিন যথেষ্ট আমোদ পেয়েছিলাম—আর আমোদ পেয়েছিলাম নোয়ামুণ্ডি লাইনে বেড়াতে যাবার দিন। গালুডিতে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন নীরদবাবু, মিস্ দাস, প্রোফেসর বিশ্বাস সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' অভিনয় হল। তারপর ঘাটশিলার ভট্‌চাজ সাহেবের বাড়িতে একদিন পার্টি উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম—সেদিনও খুব আনন্দ করা গেল!

নোয়ামুণ্ডি যাবার দিন ভোররাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরে মিতে ও আমি ঘাটশিলা থেকে প্রথমে যাই টাটা। সেখান থেকে একখানা Special Train ধরে চাঁইবাসা। চাঁইবাসা বেশ সুন্দর জায়গা—অনেক এ্যাকোসিয়া গাছ রাস্তার দুধারে। বাজারে বড় বড় আতা বিক্রি হচ্চে, আমরা দু'তিন পয়সার আতা কিনে রাস্তার সাঁকোতে বসে পেট ভরে খেলুম—তারপর রেল লাইন ধরে স্টেশনে হাজির। ঝিনকিপানি স্টেশনে থৈ থৈ করচে মুক্ত দিগন্ত—অমন মুক্তরূপা ভূমিশ্রী আমি বড় ভালবাসি—বেশী দেখি নি অমন দৃশ্য—এটা নিশ্চয়ই। কেন্দপোসি ছাড়িয়ে দুধারে বিজন অরণ্যভূমি, বনে সহস্র টগর (micalia champak) ফুলের গাছ—আর শেফালী—কি একটা ফুলের ঘন সুগন্ধে ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রাস্তার প্রতি মুহূর্ত্তটি রেলের কামরা আমোদ করে রেখেচে। নোয়ামুণ্ডি ছাড়িয়ে বন আরও বেশী—সত্যিই সে বনের শোভা ও গাম্ভীর্য্য মনে অন্য ভাব জাগায়—তা শুধু কমনীয় সৌন্দর্য্যের ভাব নয়—যা জাগায় বাংলাদেশের বনঝোপ, সে যেন চৌতালের ধ্রুপদ—মনে গম্ভীর ভাব জাগায়। ফিল্মের অভিনেত্রীর হালকা প্রেমের মিষ্টি সুরের গান নয়—ফৈয়াজ খাঁর মালকোষ কিংবা পুরিয়া। গাম্ভীর্য্য আছে, উদাত্ত ভাব জাগায়—অথচ মিষ্টত্ব বলতে সাধারণতঃ লোকে যা বোঝে তা কম।

যখন ফিরি তখন চারিধারে লৌহ-প্রস্তরের ছড়াছড়ি দেখে ভগবান সম্বন্ধে বড় একটা অদ্ভুত ভাব মনে এসেছিল—পদার্থ, নক্ষত্র জগৎ, বিশ্বের বিরাটত্ব প্রভৃতি নিয়ে। জঙ্গলের মাথায় পশ্চিম আকাশে শুকতারা, মাঝ-আকাশে বৃহস্পতি। রাত ১২টার ট্রেনে ঘাটশিলা এসে নামলুম।

তারপর আর একদিন গালুডি যেতে হল নীরদবাবুর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে। সেদিন মিতে, মিতের স্ত্রী, বৌমা, কল্যাণী সবাই গিয়েছিল। পশুপতিবাবুর স্ত্রীকে সেখানে দেখলুম। খুব খাওয়া-দাওয়া হল।

আসবার আগের দিন সৌরীন মুখুয্যের ভাইপো এসে বল্লে—ধারাগিরি আমরা যাব কি না। আমি ফুলডুংরি পাহাড়ের কোলে গালুডি রোডের ধারে যে আম গাছ, ওখানে বসে রইলুম—

ছেলেটি এসে আমায় খবর দিলে। গাড়ি ঠিক হয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরা তিনখানা গাড়ি করে সবাই মিলে (বৌমা ও মুটু তখন ওখানে নয়) রওনা হই। ধারাগিরির পথের শোভা, বিশেষতঃ পাশটার শোভা দেখে আমার দার্জ্জিলিং অকল্যাণ্ড রোডের কথা মনে পড়ল। তবে অকল্যাণ্ড রোড শহরের মধ্যে—আর এর চারিধারে শ্বাপদ অধ্যুষিত বিজন আরণ্যভূমি—এই যা পার্থক্য। সেখানে ঝর্ণার ধারে বসে কল্যাণী যখন রান্না করচে—তখন আমি 'পথের দাবী' পড়চি। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগল যে গত ১৯২৬ সালে ভাগলপুরে থাকতে সুরেন গাঙ্গুলীর পল্লী-ভবনে বসে আমি প্রথম 'পথের দাবী' পড়ি। সেও বিহারে, এবারও পড়লাম বিহারে। তখন এও জানতুম না আমায় আবার বিয়ে করতে হবে। জীবনের জটিল রহস্যের সন্ধান কে কবে দিতে পেরেচে ?

খাওয়া-দাওয়ার পরে কল্যাণী, উমা, আমি ও সৌরীনবাবুর ভাইপো পাহাড়ে উঠে ধারাগিরি ঝর্ণার ওপরের অংশে গিয়ে কতক্ষণ বসলুম। ফিরবার পথে শালবনে কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠল !

গত সোমবারে ওখান থেকে দুপুরের ট্রেনে রওনা হয়ে মেসে এলুম সন্ধ্যার সময়। নাকি জগদ্ধাত্রী পূজার দু'দিন বন্ধ। সময় নষ্ট করি কেন ? তখুনি ট্রেনের খোঁজে শেয়ালদ' গিয়ে দেখি সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ছাড়ছে। তাতে উঠে চলে গেলুম রাণাঘাট—খিনুদের বাড়ি গিয়ে উঠি। তারা চা খাওয়ালে। খিনু অনেকক্ষণ গল্প করলে। পরদিন ভোরের ট্রেনে গোপালনগরে এসে নামলুম—নিজের দেশের মাটিতে পা দিতেই যেন শরীর শিউরে উঠল। সেই আবাল্য পরিচিত প্রথম কার্ত্তিকের বনঝোপের সুগন্ধ, বনমরচে লতায় থোকা থোকা ফুল ফোটা, সেই স্নিগ্ধ হেমন্তের ছায়া। গোপালনগর বাজারে রায় সাহেব হাজারি প্রথমে ডাক দিলে, তারপর পাঁচু পরামাণিকের দোকানে সেই কুণ্ডুমশায়—যুগল ময়রার দোকানে বসে টাটকা তেলেভাজা কচুরী কিনে খেলুম—বিষ্ণু জল দিলে খেতে। বাড়ি আসতে আটটা বেজে গেল। বুড়ী পিসীমার বাড়ি ন'দি বসে গল্প করচে—ওদের দাওয়ায় গিয়ে বসি—ঘাটশিলা ও কল্যাণীর পাহাড়ে ওঠার গল্প হয়। নদীতে স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ নদীজলের স্নেহস্পর্শে যেন সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। নদীর তীরে বন-ঝোপের কি মায়া, বনসিমলতার ঝোপের কি ঘন ছায়া, থোকা থোকা বেগুনি রংয়ের বনসিমলতার ফুল ফুটেছে—বনমরচে ফুলের সুবাস সর্ব্বত্র। মন ভরে গেল আনন্দে, এমন আনন্দ আর কোথাও পাই নি মুক্ত কণ্ঠে তা স্বীকার করি। বাল্যের কত স্মৃতি মিশিয়ে আছে এই সুবাসের সঙ্গে—তা কত গভীর, কত করুণ ! জিতেন কামারের বাড়িতে সুরপতি মিস্ত্রী রোয়াক গাঁথচে—সেখানে ইন্দু রায় নিয়ে গিয়ে বসালে পরদিন সকালে। মুচুকুন্দ চাঁপার তলায় পতিত, গজন, মনো রায়, ফণি কাকা মিটিং বসিয়েচে। সেখানে এলো হাজারি ঘোষের জামাই লালমোহন। তার সঙ্গে ওরা স্কুলের মাস্টার বরখাস্ত করা নিয়ে বাধালে ঝগড়া। আমি সরে পড়লুম বেগতিক দেখে। বৈকালে নৌকোয় গুটুকে ও আমি বনগাঁ এলুম—যেন জাহ্নবীর বাসা এখনো আছে—ছুটির পরে সেখানে যাচ্চি। লিচুতলায় এসে মনোজ, জয়কৃষ্ণ, যতীনদার সঙ্গে বসে ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করি। বিকেলে শুধু ছিলুম সরোজ ও আমি, মন্মথদাও। সন্ধ্যাবেলায় গোপালদা, যতীনদা, জয়কৃষ্ণ, মনোজ, মন্মথদা ও বিনয়দা। খুব জ্যোৎস্না। কাল গেল ৺জগদ্ধাত্রী পূজা। আজ সকালে বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতা এসেচি। আজ বৃহস্পতিবার, এই মাত্র বারবেলা থেকে এলুম—আর কেউ ছিল না, রাম, বুদ্ধদেববাবু ও আমি।

এইমাত্র ঘাটশিলা থেকে এলুম ফিরে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে বারাকপুর গিয়েছিলুম আবার। ফুটো স্টেশনে এসেছিল—ছটা ডিম নিয়ে রাঁধতে দিলুম মানুকে বাড়ি পৌছে। খুব

জ্যোৎস্না। পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এসে ন'দির সঙ্গে একটু বসে গল্প করি। শিউলি ফুলের সুবাসের সঙ্গে বনমরচে ফুলের গন্ধ মিশিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি মধুর করে তুলেচে শত অতীত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনে। ফণি রায়ের পরিবারবর্গ থাকে বন্ধুদের বাড়ি। কতদিন পরে ওদের বাড়ি বসে চা খেলুম। তারপর গদা কামারের বাড়ি গিয়ে ইন্দু, গজন, অমূল্য কামার প্রভৃতির সঙ্গে গান করি ও শুনি। পরদিন সকালে হয়তো বনগাঁ থেকে সবাই পিক্‌নিক্ করতে আসবে। ন'দি ও বুড়ী পিসীমার সঙ্গে গল্প করি মানুদের দাওয়ায়। পরদিন সকালে এলো খোকা ও সুরেন। স্নান সেরে বনমরচে ফুলের সুগন্ধের মধ্যে রইলুম বসে কতক্ষণ। তারপর চলে আসি বনগাঁ।

শুক্রবার মন্মথদার আড্ডা।

আজ ফিরিচি ঘাটশিলা থেকে এইমাত্র। গত রবিবারে আবার ধারাগিরি গিয়েছিলুম—মিতেরা ও আমরা। এবার pass-এর নীচে সেই খরস্রোতার খাদ থেকে কুলুকুলু নদীজলের সঙ্গীত আমাদের কানে মধু বর্ষণ করলে। বন্য পিটুলিয়া, শিউলি—আরও কত কি বন্য ফুল ফুটেচে বনে। ধারাগিরি যাওয়ার পথে গ্রাম ঝর্ণার কাছে আমরা চা খাচ্চি বসে—এমন সময় নুটু আর সুরেশ সাইকেলে করে এসে যোগ দিলে আমাদের সঙ্গে। তারপর ধারাগিরি পৌঁছে কল্যাণী, মিতের বৌ ওরা চড়ালে খিচুড়ি—আমরা উঠলুম পাহাড়ে—মিতে ও আমি। ওপরের সেই দুরারোহ পথ ধরে আমরা গেলুম ধারাগিরির স্রোত ধরে আরও নিবিড় বনের মধ্যে। বড় বড় শাল, আম ও মোটা মোটা লতা—বন্য বিহঙ্গের কাকলি এখানে অপূর্ব্ব। মিতে একমনে শুনতে লাগল। কত বন্য কুসুমের সৌরভ—আর সর্ব্বোপরি অসীম নিস্তব্ধতা। সোরুঝর্ণায় শিখী-নৃত্য—জ্যোৎস্নারাত্রে শিলাখণ্ডে ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বনদেবীরা বাস করেন এ বনে। এসে খিচুড়ি খাওয়ার পূর্ব্বে ঝর্ণায় স্নান সমাপন করি। তারপর খাওয়া সেরে গরুর গাড়িতে রওনা। আবার সেই ঘাটটা সন্ধ্যার ছায়ায় অতিক্রম করি। ঘন বন নীচে, হাতী তাড়াবার জন্যে স্থানে স্থানে গাছের ওপরে মাচা। ভাত রেঁধে খাচ্চে বনের মধ্যে। আমরা আগে আগে—মিতেদের গাড়ি পেছনে। মিতে সকলের পিছনে হেঁটে আসচে। কল্যাণীর সঙ্গে আমি আসচি। নুটু ও সুরেশ সাইকেলে সবার পেছনে। দ্বিতীয় ঝর্ণা পার হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্রমে নক্ষত্র উঠল—ছায়াপথ জম্ জম্ করতে লাগল। এখানে ওখানে উল্কা খসে পড়তে লাগল। রাত ন'টায় আমরা বাড়ি ফিরে ওবেলার রান্না খিচুড়ি খাই। উমা ও শান্তি এবার যায় নি।

মধ্যে আবার ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। সাদা পাথরের স্তূপটার ওপরে বসে কল্যাণীকে নিয়ে গল্প করেছিলুম জ্যোৎস্নারাত্রে। তবে এবার বিশেষ দূর কোথাও বেড়ানো হয় নি—মিতের সঙ্গে ফুলডুংরির নীচের বনটায় একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে বসেছিলাম। গত সপ্তাহে গিয়েছিলুম বনগাঁ, বাড়ি বদল করে আমরা গিয়েচি বিনয়দার শ্বশুর নুটু মুন্সেফ যে বাসায় থাকত—সেই বাসাটায়।

কাল রাত্রে শৈলজার 'নন্দিনী' বইখানা দেখে এলাম। বাঙালীর মনে যে কান্নার ফোয়ারা যোগাতে পারবে, সেই হাততালি পাবে। এ ছবিখানাতেও অনেকদিন পরে পুনর্মিলনের প্যাঁচ কষে দর্শকের চোখে জল আনার যথেষ্ট সুব্যবস্থা। তবে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েচে ছবিখানা, এটা বলতেই হবে। কথাবার্ত্তাও স্বাভাবিক। সুকৃতি ও আমি গিয়েছিলাম 'রূপবাণী'তে, শৈলজা আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলে, গল্প করলে অনেকক্ষণ কাছে বসে। ছবি ভাঙলে

বাসে চলে এলুম। মিতে কাল বিকেলে এসেছিল, আজ ঘাটশিলা এতক্ষণ গিয়ে পৌঁছেচে।

•

আজ কোন কাজ ছিল না, ওবেলা বসে বসে পরীক্ষার কাগজগুলো দেখলুম স্কুলের (Class) ছেলেদের—তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ি বসে খুব আড্ডা দেওয়া গেল গৌর পালের সঙ্গে। স্কুল ও কলকাতা দুইই ছাড়ব শিগগির। যেখানে যা আগে আগে করতাম—তা আর একবার ঝালিয়ে নিচ্চি। যেমন, আজ এবেলা গেলুম সাঁত্‌রাগাছি ননীর বাড়ি, জতু নেই, তার মার সঙ্গে বার হয়ে গিয়েচে। ননীর কাছে বসে বসে ঘাটশিলা ও কল্যাণীর গল্প করলুম, ধারাগিরির বর্ণনা করলুম—মাস্টার মশাইও ছিলেন। তিনি আবার কোথায় যাত্রা হচ্চে বলে উঠে চলে গেলেন—আমরা বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করি, কল্যাণীর চিঠি ওকে পড়িয়ে শোনাতে হল। ননী বড় প্রকৃতিরসিক, বল্লে—আমি ঘাটশিলা যাব বেড়াতে। আমি ওকে যেতে বলেচি।

একটা নতুন জীবনের শুরু। এখনও চাকরিতে আছি, কিন্তু ১লা জানুয়ারী ১৯৪২ থেকে চাকরি ছেড়ে দেব। সেটা কাগজে কলমে অবিশ্যি, আসলে ছেড়েই দিয়েচি। বেশ স্বাধীন জীবনের আস্বাদ এখন থেকেই পাচ্চি। ঘাটশিলাতে এসেচি—কলকাতা থেকে আসবার সময় জাপানী বোমার ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নরত জনতার ভিড়ের মধ্যে অতি কষ্টে ইণ্টার ক্লাসে একটু জায়গা করে নিলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল জায়গা পাব না—সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটব।

অনেক পরে মেস্ ছেড়ে দিলুম এবার। রাত্রে আমার এক ছাত্র এসে মেসেই শুয়ে রইল—শেষ রাত্রে উঠে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারের মধ্যেই দু'খানা রিক্‌শা করে ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌছানো গেল। ১৯২৩ সালে কলকাতায় মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের মেসে ঢুকেছিলাম—সেই থেকে ওই একই মেসে, একই অঞ্চলে কাটিয়েচি। কতকাল পরে মেসের জীবন ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। বহুদিনের পুরোনো কাগজপত্র বিক্রি করে ফেললাম। বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি! পুরোনো কাগজপত্রের ওপর মায়াবশতই তাদের এতদিন ছাড়তে পারি নি—আজ জাপানী বোমার হিড়িকে যে সেগুলো ছেড়ে এলুম তা নয়—আনবার জায়গা নেই—এনে ঘাটশিলায় এই ছোট বাড়িতে রাখি কোথায়?

রোজ সকালে শালবনে এসে বসে লেখাপড়া করি। মিতেরা এখানে ছিল, ভয় পেয়ে চলে গিয়েচে। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেচে, দিগন্তনীল শৈলশ্রেণী ও প্রান্তরে অপূর্ব্ব শোভা। এই সব পরিপূর্ণ আকাশের মধ্যে দিয়ে চমৎকার ভাবে উপভোগ করি—অবশ্য অবকাশের সময় এখনও ঠিক আসে নি—কারণ এ সময় তো বড়দিনের ছুটি আছেই—চাকরি যে ছেড়ে দিয়েচি—সে জ্ঞানটা এখনও এসে পৌছয় নি মনে। তার ওপর জাপানী বোমার ভয়। মৌভাণ্ডার কারখানা আছে—সবাই বলচে, এখানে কি বোমা না পড়ে যায়!

অনেকদিন পরে আমার রিপন কলেজের সহপাঠী বন্ধু কল্যাণীর সঙ্গে সেদিন দেখা হল নদীর ধারে স্বামীজীর আশ্রমে। তাকে বাড়ি নিয়ে এসে চা খাইয়ে দিলাম। বিকেলে তার পরদিন ওকে নিয়ে বেড়িয়ে এলাম 'বিজয় কুটির' পর্য্যন্ত ও মুটুর ডাক্তারখানা।

দেশে এসে বহুদিন পরে বারাকপুরে বাড়ি সারিয়ে বাস করচি। বৈশাখ মাসের প্রথমে এখানে এলুম—এর আগে চালকীতে ছিলাম। বেশ লাগচে—গোপালনগরে স্কুল-মাস্টারি করি। রোজ মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে নদীতে স্নান করে আসি। বেশ লাগে।

আজ সকালে প্রায় দু'মাস পরে এই ডায়েরী লিখচি। ক'দিন খুব বর্ষা গেল—আজ পরিষ্কার আকাশে ঝল্‌মলে রোদ। আকাশের কি অপূর্ব্ব নীল রং! আমি রোয়াকের ঠেস্ বেঞ্চিটাতে বসে লিখচি। সবুজ গাছপালার ডালের ওপরে অয়স্কান্ত মণির মত উজ্জ্বল নীল আকাশ। আজ 'অনুবর্ত্তন' বইখানা লেখা শেষ করে কপি পাঠিয়ে দিলাম।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম দিন দশ-বারো। রোজ ফুলডুংরিতে বেড়াতে যেতুম। একদিন শালবনের মধ্যেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুবোধবাবু একদিন এসে রাখা-মাইন্‌স্ পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। সুবর্ণরেখা পার হয়ে ধন্‌করি পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে বসলুম, কি অদ্ভুত শোভা! হেঁটে গালুডি এলুম, প্রোফেসর বিশ্বাসের বাড়ি খেয়ে চলে এলুম বাড়ি।

বারাকপুরে কল্যাণী ও আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দু'বেলা। ওপারে মাধবপুরের চরের দৃশ্য বড় সুন্দর। অস্তদিগন্তের নানা রঙে রঙিন মেঘস্তূপ ভরা আকাশ যখন মাধবপুরের চরের ওপর ঝুঁকে থাকে, তখন সত্যই অদ্ভুত শোভা হয়।

এ সময় এখানে আর এক দৃশ্য। বিলবিলের জলে সকালে ন'দিদি কাপড় কাচচে, খয়ের-খাগী গাছে কাঁঠাল পাড়া হচ্চে খুড়ীমাদের, সাদা সাদা তেলাকুচো ফুল ফুটেচে খুকুদের লেবু গাছটায়, আমার ঠেস্ বেঞ্চির পাশে—বেশ পরিচিত দৃশ্য। তবে এ সময় আষাঢ় মাসের ২১শে পর্য্যন্ত কখনো বারাকপুরে আসি নি। ৭।৮ই আষাঢ় চলে যাই ফি-বছর। ১৯২৮ সালে কেবল ছিলাম—তারপর আর থাকি নি। যে বছর বোর্ডিংয়ে যাই, তার আগের বছর ছিলাম। বারাকপুরে বর্ষা দিন যাপনের সৌভাগ্য এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো হয় নি।

গৌরীর কথা কাল রাত্রে মনে পড়ল। কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম। এই সময় আমরা কি করতাম, কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহুকাল আগে আমি মাঝের গাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে।

কল্যাণীকে কোলাঘাটে নিয়ে যাব সামনের শনিবারে। ও এখন চার-পাঁচ মাস সেখানে থাকবে।

অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি। বাল্যদিনের পরে এই আবার। এখানে সংসার করচি বহুদিন পরে। নতুন সংসার নতুন ঘরকন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে। এখন আমি জীবনে দর্শকমাত্র নই, জনৈক অভিনেতাও বটে।

ওগো সখি, ওগো মোর প্রিয়া, তব স্মৃতিখানি
মধুমাখা আঁকা রবে মম হৃদিতলে
চিরদিন। বহু প্রীতি ভালবাসা দিয়ে
এ জীবনে রাঙাইলে স্বপ্নমাধুরিমা,
ভুলিবার নহে যাহা কভু। নিশীথের মর্ম্মর
বাতাসে, অবিশ্রান্ত বিহগ-কূজনসনে—
কত নিশা, কত জ্যোছনা-যামিনী,
শরতের শান্ত সন্ধ্যা—পউষের স্বর্ণরাঙা মধুর বৈকাল
আমারে হেরিয়া প্রীতিপূর্ণ হাসিমাখা ডাগর নয়নে
সিঞ্চিয়াছ স্বর্গের অমৃত। কত ঢিল
ফেলা অতর্কিতে মোর ঘরে, কিশোরীর
কত চঞ্চলতা মাঝে মন মম
ঘুরিয়া ফিরিবে। বকুলের তলে কত গল্প

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে। যবে ঘাট
থেকে সিক্তদেহে, আসিতে উঠিয়া—
আমি কত ছল করি লোভাতুর
দৃষ্টি মেলে রহিতাম চাহি—
বলিতাম—বড় ভাল দেখি তোরে স্নানার্দ্র বসনে।
তুমি হেসে শাসনের ছলে তর্জ্জনী
তুলিয়া চলে যেতে দ্রুতপদে। সিক্ত
চরণের দুটি চিহ্ন বহু যুগ ধরি
আঁকা রবে সে ঘাটের মৃত্তিকার পথে।

হে অরণ্য কথা কও

বড় রচনার ফাঁকে ফাঁকে—দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এমন কিছু লিখতে ইচ্ছে করে যার সঙ্গে প্রতিদিনকার ইতিহাসের কিছু যোগ থাকে, অথচ যা খুশি তাই লেখা যায়, মনের মধ্যে যখন যে ভাব ফেনিয়ে ওঠে—ভাল সাহিত্যের দরবারে যে সব কথার জবাবদিহি করতে হয় না। তাই থেকেই ডায়েরী লেখার শুরু—এগুলো যে কোন দিন ছাপার মুখ দেখবে তা মনে ছিল না। প্রকাশকের চাপে হঠাৎ একখণ্ড ছাপা হল—তারপর আরও, তৃণাঙ্কুর, ঊর্ম্মিমুখর, উৎকর্ণ। পাঠকরা আগ্রহ করে পড়েন এর স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই ডায়েরীর এই ক-টা পাতা ছাপতে সাহস পাওয়া গেল।…অরণ্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেখানটায় বেশী, বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই সব অংশগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। ইতি—

কাল বারাকপুরে ফিরে এসেচি সুদীর্ঘ ন' মাস পরে। আগের ডায়েরী লেখার পর দশ-এগারো মাস কেটে গিয়েচে। গত আষাঢ় মাসেই কল্যাণী অসুখে পড়ে, ভাদ্র মাসে একটি কন্যাসন্তান হয়ে মারা যায়—তারপর কল্যাণী একটু সেরে উঠলে গত ১৫ই ভাদ্র ওকে নিয়ে যাই কোলাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। শ্বশুরমশায় তখন ছিলেন কোলাঘাটে, গত ৺পূজার সময় যে ভীষণ ঝড় হয় সে সময় আমি তখন ওখানেই। তারপর ওঁরা চলে গেলেন ঝাড়গ্রামে, কল্যাণীও সঙ্গে গেল, সেখান থেকে আমরা গেলুম ঘাটশিলা গত কার্ত্তিক মাসে। এতদিন ওই অঞ্চলেই ছিলুম, কাল এসেচি এখানে।

মঙ্গলবার দিন যখন গাড়ী এসেচে খড়গপুর, তখন বাংলা দেশের সবুজ ঘাসভরা মাঠ, টল-টলে জলে ভর্ত্তি মেদিনীপুর জেলার খাল বিল দেখে আমাদের ইছামতীর কথা মনে পড়লো। খড়গপুর থেকে তখন সবে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছেড়েচে, কল্যাণী বলে উঠলো—"আজই চলো বারাকপুব যাই, ইছামতী টানচে।"

আমারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামটির জন্যে। যত দেশ-বিদেশেই বেড়াই, যত পাহাড়-জঙ্গলের অপূর্ব্ব দৃশ্যই দেখি না কেন, বাল্যের লীলাভূমি, সেই ইছামতীর তীর যেমন মনকে দোলা দেয়—এমন কোথাও পেলাম না আর। কিন্তু সেদিন আসা হোলো না, এই ক'দিন কাটলো কলকাতা ও ভাটপাড়ায়। তারপর কাল বনগাঁ হয়ে বাড়ী এসেচি কতকাল পরে।

চোখ জুড়িয়ে গেল বাংলার এই বন-ঝোপের কোমল শ্যামলতায়, তৃণভূমির সবুজত্বে, পাখীর অজস্র কলরোলে। সিংভূমের রুক্ষ, অনুর্ব্বর বৃক্ষ-বিরল মরুদেশে এতকাল কাটিয়ে, যেখানে একটা সবুজ গাছের জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে উঠতো, মনে আছে কাশিদার সেই বাঁধের ধারে খানিকটা সবুজ ঘাস দেখে ও সেদিন রাজবাড়ী যাবার পথে একজনদের বাড়ী একটা ঝাঁকড়া পত্রবহুল বৃক্ষ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে ছিলাম—সেই সব প্রস্তরময় ধূসর অঞ্চল থেকে এসে এই পাখীর ডাক, এই গাছপালার প্রাচুর্য্য কি সুন্দর লাগছে! যেন নতুন কোন দেশে এসে পড়েচি হঠাৎ, বাল্যের সেই মায়াময় বনভূমি আমার চোখের সামনে আবার নতুন হয়ে ফিরে এসেচে, সব হয়ে উঠেচে আজ আনন্দ-তীর্থের পুণ্য বাতাস-স্পর্শে আনন্দময়, নতুন চোখে সব আবার দেখচি নতুন করে। আজ ওবেলা ইছামতীতে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! ও পারের সেই সাঁইবাবলা গাছটা, আর বছর আমি আর কল্যাণী নাইতে নেমে যে গাছটার ডালপালার মধ্যে আটকে-পড়া অস্ত-সূর্য্যের রাঙা রোদের অপূর্ব্ব শ্রী মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখতাম—সে গাছটা তেমনি আছে। তারপর বিকেলে নগেন খুড়োর ছেলে ফুচুর সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই নাবাল জমিটার ধারে নরম সবুজ ঘাসের উপর বসে ভাব-ছিলাম গত মার্চ মাসে দেখা মানভূমের সেই নাকটিটাঁড় বনের কথা, মানভূমের বৃক্ষলতাহীন পথের কাঁকর ছড়ানো টাঁড়ের কথা, বামিয়াবুরু ফরেস্টে উনিশ শো ফুট উঁচু পাহাড়ে সেই রাত্রিযাপনের কথা, চাইবাসাতে ভবানী সিং ফরেস্ট অফিসারের বাড়ীর বিস্তৃত কম্পাউণ্ডে বসে গত চৈত্র সংক্রান্তির দিন অপরাহ্ণে চা খেতে খেতে দূরবর্ত্তী বরকেলা শৈলমালার আড়ালে সূর্য্য

অস্ত যাওয়ার সে দৃশ্যের কথা—মাঠাবুরু পাহাড়ে শালবনের মধ্যের উঁচু পথ দিয়ে কাঠ-কয়লা মাথায় করে বয়ে নামাচ্চে যে হো মেয়েরা, যাদের মজুরী চার বার দুর্গম পথে ওঠানামা করলে মাত্র সতেরো পয়সা, তাদের কথা—গত পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমায় বহরাগড়া থেকে কেন্তুর-দা রিজার্ভ (বাঁশের) ফরেস্ট দেখতে যাওয়া ও বগরাচোড়া গ্রামের সেই উড়িয়া ব্রাহ্মণ ও গ্রাম্য স্বর্গ বাউড়ি দেবীর মন্দিরের পাশে স্তূপীকৃত প্রাচীন পাথরের দেব-দেবীর হাত-পা ভাঙা মূর্ত্তিগুলির কথা। বাঘমুণ্ডী পাহাড়ের মাথায় সেদিন দুপুরে আমি, সুবোধ ও সিন্‌হা সাহেব বসে ছিলাম, শৈলসানুতে বসন্তের পুষ্পিত লতা, পলাশ ও গোলগোলি, নীচের উপত্যকায় অজস্র ঘেঁটু ফুল। সুবোধ ঘোষ 'আরণ্যক' পড়ে শোনাচ্ছে সিন্‌হা সাহেবকে, আমি বসে বসে একদৃষ্টে বাঘমুণ্ডী শৈলারণ্যের সে সুন্দর রূপ দর্শন করচি, সেই শঙ্খ ও শোভা নদীর কথা (কি চমৎকার নাম দুটি! শঙ্খ ও শোভা!)—এই সব কত কি ছবি গত ক'মাসের স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে হাতড়ে বার করে দেখচি মনের চোখে আর চোখ চেয়ে দেখচি বাংলা দেশের যশোর জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীর মাঠে সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্যের সামনে বসে, সামনে আমার শৈলমালার ampitheatre-এ ঘেরা ভাল্‌কী ফরেস্ট নয়, (হঠাৎ মনে পড়লো ভাল্‌কী ফরেস্টের মধ্যে আমার আবিষ্কৃত সেই অপূর্ব্ব বন্য সরোবর "লিপুদারা"র কথা, সেই উত্তুঙ্গী চুনা পাথরের শৈল-গাত্র, সেই নটরাজ শিবের মত দেখতে সাদা গাছটা যার নাম আমি রেখেছিলুম শিববৃক্ষ, সেই লিপুকোচা গ্রামের লোকদের সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্য হস্তীর ভয়ে মশাল জ্বালিয়ে আমাকে ও ফরেস্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হাকে আমাদের বনমধ্যস্থ তাঁবুতে পৌঁছে দেওয়া) এ হোল আসসেওড়া, যাঁড়া, শিমুল, কেঁয়োঝাঁকা গাছের বন, চারিদিকে ছায়াভরা অপরাহ্নে কোকিল-কূজনে চমক ভেঙে যায় যেন, ভাবি এ বাংলা দেশ, বাংলা, চিরকালের বাংলা মা। নতুবা এত বিশ্বপুষ্পের সুগন্ধ কোথায়? এত পাখীর ডাক কোথায়? যারা চিরদিন গ্রামে পড়ে থাকে, তারা কি বুঝবে এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মহনীয় রূপ, তাদের মন তো আকুল হয়ে ওঠেনি বাংলার বাঁশবনের ছায়ায় ঘাটের ধারের মাটির পথে বেড়াবার জন্যে, চোখ পিপাসিত হয়ে ওঠেনি একটু সবুজ বনশ্রী দেখবার জন্যে?

রাত অনেক হয়েচে। আমি ডায়েরী লিখচি, কল্যাণী পাশে শুয়ে বই পড়চে। অনেক দিন পরে দেশে এসে ও খুব খুশি। আজ বলচে ওবেলা, "আমাদের এ বাড়ীটা কেমন ভালো, কেমন ছাদ—না? সত্যি, বাড়ীটা আমারও ভাল লাগচে। ঘন ছায়াভরা বাগান ও বনে ঘেরা. ঐ বড় বকুল-গাছটায় বাল্যদিনের মত জোনাকীর ঝাঁক জ্বলচে জানালা দিয়ে দেখচি, বিলবিলের ডোবায় কট্‌কটে ব্যাঙ ডাকচে আর বনে ঝোপে কত কি কীটপতঙ্গ যে কুস্বর করচে তার ইয়ত্তা নেই।

আবার মনে পড়চে সেই কতদূরের শঙ্খ ও শোভা নদীর তীর, গভীর নাকটিটাঁড়ের বন-মধ্যস্থ কৃষ্ণ প্রস্তরের সেই গণ্ডশৈল ও আদিম মানবের চিহ্নযুক্ত গুহা, ভাল্‌কী জঙ্গলে বন্য বরমকোচা গ্রামের সেই মুণ্ডা যুবতীটি, যে আমায় বলেছিল—"তুই কি করচিস এ বনে আমাদের? ভালো ভালো জায়গা দেখে বেড়াচ্ছিস্ বুঝি?" অবিশ্যি এত ভাল বাংলায় বলেনি।

আর মনে পড়চে নিমড়ির বনে সেই পলাশ ফুলের শোভা গত বসন্তে ও মাঠা গ্রামের সাঁওতালের মত চেহারা সেই ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যের কথা। সুদূর নাকটিটাড়ের বন ও বক্ত শঙ্খ নদীর তীরবর্তী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শিলাসন। সাঁওতালের মত দেখতে, মিশ কালো—নাম বল্লে, ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যে। আমি চমকে উঠেছিলাম। বাইরে হঠাৎ গিয়ে দেখি কৃষ্ণা চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ উঠেচে—বাইরে জ্যোৎস্না। কল্যাণীকে ডেকে বাইরে গিয়ে বসলুম। খুব বৌ-কথা-কও পাখী ডাকচে। বাঁশবনে রাতজাগা আর একটা কি পাখী ঠক্ ঠক্ শব্দ করচে। বাংলা-পল্লীর জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ প্রাণ ভরে দেখি কত রাত পর্য্যন্ত বসে বসে।

খুকু নেই ব্যারাকপুরে, বিয়ে হয়ে এখান থেকে চলে গিয়েচে কোথায় তার শ্বশুরবাড়ী—সেখানে। বহুদিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

জীবনই এ রকম, এক যায়, আর আসে।

মহাকালের বিরাট পটভূমি নিত্য শাশ্বত—তার সামনে জগতের রঙ্গমঞ্চে কত নরনারীর আসা যাওয়া!

ভালো কথা, গত মাঘ মাসে কলকাতায় সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার একটি খুকী হয়েচে, নাম তার রেখেছে রাখী, বেশ খুকীটি। সুপ্রভা আমার খুকীর কথা কত জিজ্ঞেস করলে।

রেণুর সঙ্গেও এবার কলকাতায় দেখা, সে বেথুনে পড়চে সেকেণ্ড ইয়ারে। বোমা পড়বার তৃতীয় দিনে তারা পালিয়ে গেল কলকাতা থেকে তাদের দেশে। এখনও ফেরেনি দেখে এলুম।

এখানে এসে জীবন আরম্ভ করেছি আট মাস পরে। আজ সকালে ইছামতীতে নাইতে নেমেছি, বেলা ৮॥টা হবে, শান্ত নদীজল, ওপারে সবুজ ঘাসেভরা মাঠ ও ঝিঙে-পটলের ক্ষেত, এপারে ফণি চক্কত্তির জমির বাগান, সাঁইবাবলা ও শিরীষ গাছের আঁকা-বাঁকা ডাল-পালার সৌন্দর্য্য। কোকিলের ছেদহীন কূজন সকালের আকাশ যেন ভরিয়ে রেখেচে, প্রস্ফুট তুঁত ফুলের সুবাস বাতাসে। কালু মোড়লের ছেলে গনি ও নগেন খুড়োর ছেলে ফুচু ঘাটে নাইচে। গনি আমের চালান নিয়ে গিয়েছিল নফর কোলের বাজারে। একচল্লিশ দিন কলকাতায় ছিল, আজ এসেচে। দেশে এসেচি আজ চারদিন, এখনও এখানকার নতুনত্ব কাটেনি। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে যে কত সৌন্দর্য্য তা দেখবার সুযোগ ও সুবিধা কি সকলের ঘটে? চৈতন্যকে প্রসারিত করে দেওয়া চাই, নতুবা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে কিছুই হয় না। মনকে তৈরি করে নিতে হয় এজন্যে, এর সাধনা চাই। বিনা সাধনায় কিছু হয় না। উচ্চতর অনুভূতির জন্যে মনের আকূতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আকূতি থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি।

আজ হাওড়া সঙ্ঘ থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এল।

কলকাতা থেকে ফিরেচি কাল বৈকালে। ইউনিভারসিটি মিটিংএ সেখানে অনেকদিন পরে সুনীতিবাবু ও বহু পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা। মায়াদি ও বেলুকে নিয়ে রাত ৯টার সময়ে বাণী রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কলকাতার অন্ধকার ভরা রূপের সঙ্গে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। গ্রামে ফিরলুম রবিবার বৈকালে, বেশ একটু মেঘবৃষ্টি দেখা দিলে, সামান্য একটু কাল-বৈশাখী বৈশাখের বিকেলে। তারপরেই আকাশে দেখা দিলে রাঙা মেঘস্তূপ, আমি বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে, গাছপালার কি চমৎকার সৌন্দর্য্য। মুগ্ধ করে দেয় আমাকে, চেয়ে দেখে সত্যিই বিস্ময় লাগে। কত কি গাছ, কত ধরনের পাতা! বিশ্বরূপের কত কি রূপ! যেদিকে চোখ পড়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকি। বরোজপোতার বাঁশের বনে কচু ঝাড়, বেত গাছের মত পাতা কি একটা গাছ, তারই পাশে বাঁশের ডগা নত হয়ে আছে—নিভৃত নিরালা বনভূমি, কোথায় সেই নাকটিটাঁড়ের শালবন করন্ধা পুষ্প-সুবাসিত অপরাহ্ণের বাতাস, মাঠাবুরু পাহাড়ের শিখররাজি। বিবাট হস্তীমুণ্ডের মত পরিদৃশ্যমান কাঁড়দাবুরুর শিখর—আর কোথায় বাংলার শ্যাম সৌন্দর্য্য। নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর একটি রূপসৃষ্টি।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।

পরশু এলুম উত্তরপাড়া রাজবাড়ীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব সম্পন্ন করে। মাস্টার মশায় অতুল গুপ্ত, সজনী, বুদ্ধদেব, বাণী রায় সবাই একসঙ্গে যাওয়া গেল। বেশ মজা করে মিটিং করা গেল —ভাটপাড়ার আশালতার সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পরে—প্রায় আঠারো বছর পরে। ঘটে গেল জিনিসটা আমার সেই গল্পটির মত। একটি ছোট ছেলে এসে বল্লে, "আপনাকে আমার মা ডাকচেন।"

গেলুম একটা পুরোনো দোতলা বাড়ী—রাজা জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদের সামনে।

একটি মেয়ে এসে ঝুপ্ করে নীচু হয়ে পায়ের জুতোর উপর দুহাত বুলিয়ে বল্লে—"দাদা, কেমন আছেন? কি ভাগ্যি যে আপনি এলেন এখানে!"

—"ও, আশা না?"

—"হ্যাঁ দাদা। এখন বড়-মানুষ হয়ে গিয়েচেন—আপনি কি এখন গরীব বোনকে চিনতে পারবেন?"

ঠিক একটি ছোট গল্প। কিছুদিন আগেই এ গল্প আমি লিখেচি কি একটা কাগজে।

পরদিন ফিরলুম বনগাঁয়ে। স্টেশনে নেমে—অম্বরপুরের একখানা গরুর গাড়ী যাচ্ছে, তাতেই চড়ে বসলুম—প্রথম শেওড়া গাছ ভাট গাছ দেখে কি আমার আনন্দ!

এবার বিভূতিদের বাড়ী গিয়ে উঠেছিলাম।

সিংভূমের ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হা হঠাৎ এসে হাজির। পচা রায় ও আমি ওঁকে নিয়ে বেলেডাঙ্গার পুলে গেলাম। চাঁদ উঠেচে, আজ পূর্ণিমা। ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল মাঠে। কত ঝোপে ঝোপে পাকা বৈঁচি তুলে খেতে খেতে আমরা গেলুম। ক্লান্ত দেহে জ্যোৎস্নালোকে ইছামতীর জলে এসে নামি আমাদের বনসিমতলার ঘাটে। মিঃ সিন্‌হা সাঁতার দিয়ে একেবারে ওপারে—তিনুও ছিল। উঠে মাধবপুরের সবুজ ঢেউ-খেলানো ঘাসের মাঠ দেখে এল ওরা। পরদিন S. D. O.কে আনালুম, হাট থেকে ফিরে এসে দেখি S. D. O. ও সুরেন বসে। তাদের চা খাওয়ানো গেল—নিগ্রোর প্রতি আমেরিকানদের অত্যাচারের কত কাহিনী বর্ণনা করলেন মিঃ সিন্‌হা।

তার আগের দিন ঊষা চৌধুরী এসে হাজির। আমি নারাণদা'র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেতে সবে বসেচি—এমন সময় কল্যাণী চিঠি লিখে পাঠালে—মিসেস্ চৌধুরী এসেচেন। উনি এখুনি চলে যাবেন। তখুনি এসে দেখি ঊষা সত্যিই খাটের ওপর বসে আছে। ওকে নিয়ে আমরা সবাই গেলুম নদীর ধারে। ঊষা নদী দেখে খুব খুশি—বালিকার মত খুশি।

অতএব বোঝা গেল বিদেশাগত ছুটি লোকেরই ভাল লেগেচে আমাদের স্বচ্ছসলিলা ইছামতী—পুলিনশালিনী ইছামতী।

আবার কাল কলকাতা গিয়ে সজনীর সঙ্গে ঊষাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বহুকাল পরে অশ্বিনী—আমাদের ৬০, মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের সেই বাল্যবন্ধু অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা।

অনেকে গল্প করচি—ঊষারা কাল চলে যাচ্ছে লাহোরে—অনেকে দেখা করতে এসেচে—হঠাৎ ওর মধ্যে একটি লোক বল্লে—বিভূতি না?

অবাক হয়ে বললুম—চিনতে পারচি নে তো?

—তা চিনতে পারবে কেন? আমি অশ্বিনী।

তখুনি আমি তার শার্ট ধরে টেনে আনতে আনতে বললুম—দাও দিকি আমার প্রথম বিয়ের সেই ঘড়িটা—। আজ ২৭ বছর পরে দেখা—সেই সময়ই ও আমার ঘড়িটা নিয়ে গিয়েছিল—গৌরীর বাপের দেওয়া সেই পকেট ঘড়িটা! কত বছর আগে!

মহাদেব রায়কে নিয়ে গেলুম শ্রীমতী বাণী রায়ের বাড়ী। চা খেয়ে কত গল্প। বেশ ভাল বেলফুল ফুটেছিল, তুলে দিলেন ওঁরা। ওঁর মা সুলেখিকা গিরিবালা দেবী ছুখানা বই উপহার দিলেন।

মহাদেববাবুর সঙ্গে পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ৬ই মে রওনা হবো হাওড়া থেকে।

রোজ নদীর কালো জলে গিয়ে সন্ধ্যায় নামি। কালও কুঠীর মাঠ বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় স্নান করতে নামলাম আমরা ছুজনে। রাঙা মেঘ করেচে সারা আকাশময়, ওপারের সাঁইবাবলা গাছটার ফাঁকে ফাঁকে রাঙা আলো যেন আটকে আছে। কি কালো জল! ভগবান যেন অত্যন্ত শান্ত রূপ ধরে আছেন—যেমন তাঁর অত্যন্ত অপরূপ মূর্ত্তি দেখেছিলাম সেদিন নতিডাঙার মরাগাঙের ধারে বসে। পাশে নতিডাঙার প্রকাণ্ড বটগাছটা, ওপারে

আরামডাঙার মাঠে আউশ ধানের কচি সবুজ জাওলা ও খেজুর গাছের সারি। সাদা সাদা বক চরচে ঘন সবুজ কচুরিপানার দামে। এ জগতে যেন যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই, চালের দোকানের দীর্ঘ শ্রেণী নেই, উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ নেই।

আম কুড়োনো এ সময় একটা আনন্দের ব্যাপার। আজ সকালে নদীর ধারে যাচ্চি, তেঁতুলতলী আম গাছটার তলায় দেখি হাজরি জেলেনী আম কুড়ুচ্চে। আমি যেতে না যেতে থপ্ করে একটা আম তুলে নিলে তলা থেকে। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। পাগলা জেলের মা আর হাজরি জেলেনী এই দুজন আম কুড়ুবার উদ্বেগে বোধ হয় রাত্রে ঘুমোয় না—নইলে অত সকালে ওঠে কি করে? সেদিন পাগলা জেলের মা ওর ঝুড়ি থেকে একটা পাকা আম আমায় দিয়ে গিয়েছিল। এইমাত্র একটা মশা মারলুম।

আজ কল্যাণীকে নিয়ে ফুচু, হর, বুধো প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেরা নৌকো নিয়ে বেড়াতে গেল বিকেলে, আমিও সঙ্গে গেলুম। অনেক দিন ওপারে যাইনি—মাঠ ছাড়িয়ে যে একটা পথ আছে, সেটা ভুলে গিয়েছিলুম। সেই পথ পর্য্যন্ত গিয়ে একটা নিমগাছ থেকে ডাল ভেঙে নেওয়া হোল দাঁতনের জন্যে। আমি নিজে নৌকো বেয়ে ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম—যেমন ও-বেলা তেঁতুলতলা ঘাট থেকে সাঁতার দিয়ে এসেছিলুম আমাদের ঘাটে। জলে নামলুম দুজনে, জল খুব বেড়েচে। আর বর্ষার আকাশে মেঘের দৃশ্য অদ্ভুত। সেই সাঁইবাবলা গাছটার ডালে ডালে রাঙা আলো। দেখে একটা অনুপ্রেরণা মনে জাগলো—বিশ্বের মহাশিল্পীর পরিকল্পনার মহনীয়তা আমার চোখের সামনে সুপরিস্ফুট। নীল আকাশের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করি—এই পটভূমি নিয়ে এদেশের একখানা Epic উপন্যাস লিখবো আমি। নীল কুঠীর পুল থেকে শুরু করবো।

গত ৫।৬ দিন ভীষণ বর্ষার পর আজ প্রথম রোদ উঠেচে। এখনও অনেক আম—তেঁতুল-তলীতে আম কুড়ুই রোজ। গাছতলায় পাকা আম কুড়ুই। আজ ভোরে মুখ ধুয়ে ফিরচি নদীর ঘাট থেকে, বাঁশতলীর একটি টুকটুকে আম টুপ্ করে পড়লো আমার সামনে—কুড়িয়ে নিয়ে এলুম। কল্যাণী সেটি লক্ষ্মীকে দিলে।

বিকেলে শ্যামাচরণ দা'র ছেলে হর বল্লে, নৌকো বেড়াতে যাবেন না? আমি তখন বেরিয়ে গিয়েছি বাঁশ-বাগানের পথে গাব গাছটার কাছে। অনেকদিন যাইনি নৌকোতে—কেবল যা গিয়েছিলুম কাল না পরশু। নলে জেলের নৌকো ছাড়া হোল। বেশ মেঘমুক্ত বিকেলটি, না গরম, না ঠাণ্ডা। দুধারে দীর্ঘ দীর্ঘ নলখাগড়ার শ্যামল সবুজ ঝোপ, ছোয়ারা লতা, বন্তেবুড়ো গাছের সারি, জলজ ঘাসের ঝোপ—সবুজ, সবুজ, এত সবুজও আছে এদেশে; সবুজ সৌন্দর্য্যের ফুলঝুরি যেন চারিধারে। ক্রমে কুঠী ছাড়িয়ে গেল। নীলকুঠী এখন আর নেই, ভাঙা হাউজ ঘর আছে—এমন ঘন বন সেখানে যে দিনমানেই বাঘ লুকিয়ে থাকে। ঐ সেই ঝিনুকের স্তূপ নদীর ধারটাতে, গত ফাল্গুনমাসে ছেলেরা ঝিনুক তুলেচে—তার পচা গন্ধ

আকাশ বাতাস ভরিয়েচে, কাছে যাওয়া যায় না। কুঠী ছাড়ালুম, আবার নদীর দুধারে ঘন সবুজ উলুবন, জলের পাড়ে জলজ ঘাস ও বন্যেবুড়োর গাছ, উচ্ছে পটলের ক্ষেত, কুমড়োর ক্ষেত—শান্ত স্তব্ধ পল্লীশ্রী, এতদিন ছোটনাগপুরের ঊষর কাঁকর ও পাথরের দেশে বাস করে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল, মন জুড়িয়ে গেল।

সবাইপুরের কাছে এসে ইছামতীর তীরের সৌন্দর্য্য আরও রহস্যময় হয়ে উঠলো। যেন তীরভূমির এই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা, ওই প্রাচীন ষাঁড়া গাছগুলো আমায় চেনে আমার বাল্যকাল থেকে। যেন এখনি বলবে—এই ত্যাখো সেই খোকা কত বড় হয়েচে। সবাইপুরের বাঁক ছাড়িয়ে অদূরে কাঁচিকাটার খেয়ায় কারা পার হচ্চে। একটি ছোকরা, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া, দুটি ছেলেমেয়ে, একখানা সাইকেল। ছোকরা বল্লে, আগুর হাটে তাদের বাড়ী। পাশেই মরগাঙের খাল, বহুদিন পরে আমি ঢুকলাম নৌকো করে এই খালের মধ্যে। ছোট একটা বাঁশের পুলের তলা দিয়ে বাঁ ধারে আরামডাঙার বাঁশবন খেজুর বাগানের তলা দিয়ে ঐ গ্রামের একটা ঘাটে পৌঁছুই। ছোট্ট খালের এই ঘাটটি ঠিক যেন একটি ছবি। ছায়ানিবিড় স্নিগ্ধ অপরাহ্ন, নীল-আকাশ, ঘন সবুজ জলজ ঘাস ও দূর্ব্বাস্তৃত তৃণক্ষেত্র—সামনে কতকগুলি প্রাচীন গাছের আধ অন্ধকার তলায় একটা পুরোনো ইটের দরগা। কত কাল এদিকে আসিনি, আমারই গ্রামের পেছনে আরামডাঙার এই ঘাট কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না—হয়তো কখনো আসিই নি—অথচ কোথায় লিপুদারায় সেই বন্য সরোবর, ভালকীর সেই ঘন অরণ্য, মানভূমের মাঠাবুরু শৈলশ্রেণী, বামিয়াবুরু ও চিটিমাটি, রাঁচির পথে হিনি জলপ্রপাত ও পোড়াহাট রিজার্ভ ফরেস্ট। কোথায় দিল্লী, কোথায় আগ্রা, কোথায় চাটগাঁ, কোথায় শিলং, দার্জ্জিলিং কোথায় না গিয়েচি! অথচ জীবনে কখনো আসিনি আমার গ্রাম থেকে মাত্র দু মাইল দূর আরামডাঙার এই ছবিটির মত সুন্দর, তীরতরু-শ্রেণীর নিবিড় ছায়াতলে অবস্থিত প্রাচীন পীরের দরগা ও ছোট্ট ঘাটটিতে। একটা বড় জিউলি গাছ, আমগাছ, বড় একঝাড় জাওয়া বাঁশ ওপারের, সামনে ছোট্ট খালের ঘাটটি—হাত দশ-বারো চওড়া মরগাঙের খালের এপারেই বর্ষা-সতেজ উলুবন, দূরবিস্তৃত মাঠ বেলেডাঙার সীমানায় মিশে গিয়েচে। সূর্য্যাস্তের রাঙা রং আকাশে।

পরদিন বিকেলে গেলুম আরামডাঙার এপারে 'কলাতলার দোয়া'তে। নতিডাঙার বড় বট-গাছটা ছাড়িয়ে ওপথে কতদূর গেলুম। এ পথে কত কাল আসিনি। ডাঁশাখেজুর তলা বিছিয়ে পড়ে আছে পথের ধারে খেজুর গাছের। মোল্লাহাটির পথে শুধুই ঝুরি নামানো প্রাচীন বটের ছায়া, ঘন পত্রপল্লবের আড়ালে পড়ন্ত বেলায় বৌ-কথা-কও ডাকচে।

আজ নৌকো বেড়াতে গিয়ে একেবারে মাধবপুর। অনেককাল আগে এই রকমই নৌকো বেড়াচ্ছিলুম আমি আর ভরত। বহুকাল আগে আমার বাল্যকালে, দিগম্বর পাড়ুইয়ের একখানা খেয়া নৌকোতে আমি আর ভরত হাটবারের দিন লোক পারাপার করতাম রায়পাড়ার ঘাটে। এক মেঘাবৃত সন্ধ্যায় মাঠ ভেঙে গিয়েছিলুম মাধবপুরে পার্ব্বতীদের বাড়ী। পার্ব্বতী বিশ্বাস

জাতে কাপালী, গোপালনগরের হাটে বেগুন বেচে, আমার সঙ্গে ছেলেবেলায় রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় পড়তো। সেই আর এই।

তারপর কত জায়গায় বেড়ালুম জীবনে—এই সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরের মধ্যে কিন্তু মাধবপুর আর কখনো আসিনি। গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই গোয়ালপাড়া—একটা লোক গাড়ু হাতে পথে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করতে বল্লে, ঋষি ঘোষের বাড়ী। একটা বড় কাঁঠাল বাগান, অনেক কাঁঠাল ঝুলছে, জেলি বল্লে—দেখুন দাদা, কত আম পেকে!

চাষা গাঁ মাধবপুর। সব খড়ের ঘর, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে উঠোনে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া চলে। গোলাপালা, ছোট ডোবা, বাঁধানো মনসাতলা ইত্যাদি মাটির পথের দুধারে। একটা চালাঘরে কয়েকখানা বেঞ্চি পাতা। সেটা নাকি গ্রাম্য পাঠশালা। কয়েকটি লোক সেখানে বসে আছে। একটি ছোকরার বাড়ী বসিরহাট—সে নানু প্রসাদকে চেনে।

সামনে মনসা সিজের বেড়া দেওয়া একটা পুরানো কোঠা বাড়ী—নগেন রায় বলে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী। তিনি ছ বছর হোল বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গিয়েচেন—তাঁর স্ত্রী থাকেন বাড়ীতে, ছেলেপুলে নেই।

এই মাধবপুর, ক্ষুদ্র কৃষকদের গ্রাম মাত্র—কিন্তু আমার মনে চিরকাল রহস্যময় হয়ে ছিল। ভালো করে আজই দেখলুম এ গ্রামকে, বত্রিশ বছর আগে সেই যে ভরতের সঙ্গে এসেছিলুম, সে অতি অল্পক্ষণের জন্যে এবং শুধু পার্ব্বতীদের বাড়ীতেই। গ্রামটা ভাল করে বেড়িয়ে দেখলুম এত কাল পরে—আজ প্রথম।

মনে পড়লো সংসারের টানাটানি হোলে বাবা আসতেন এই মাধবপুরে এক এক বিকেল বেলায় নৌকায় পার হয়ে—আমার বাল্যকালে। বাবার পুণ্যচরণ-ধূলিপূত-মাধবপুর!

পরদিন বিকেলে বেড়াতে গিয়ে নতিডাঙার বটতলা পেরিয়ে মরাগাঙের ধারের সেই জালি ধানের ক্ষেতটাতে বসি। কি শান্তি, কি শ্যামলতা এই দৃশ্যটার। ওপারে আরামডাঙার মাঠ, খেজুর চারা—গরু চরচে, মরাগাঙের ঘন সবুজ কচুরীপানার দামের ওপর শুভ্রপক্ষ বক বেড়াচ্ছে মাছ খুঁজে খুঁজে—পাশের বাবলা কাঁটার বেড়া দেওয়া একটা ঝিঙে ক্ষেতে হলদে ঝিঙের ফুল ফুটে আছে এই মেঘভরা বিকেলে। যিনি সূর্য্যে, নক্ষত্রে নিওন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন গ্যাস ও নানা ধাতুর আগুন জেলে রেখেচেন তিনিই এই শ্যামল সবুজ শান্ত তৃণতরু, এই সৌন্দর্য্যভরা পল্লীদৃশ্যের সৃষ্টি করেচেন, তিনিই আগুনে, তিনিই জলেতে—অদ্ভুত **contrast**! সূর্য্যের বিশাল অগ্নিকটাহের সৃষ্টি শুধু এই শ্যাম বনশোভার, এই তৃণাবৃত প্রান্তরকে সম্ভব করবার, রূপ দেবার প্রাক্‌-আয়োজন মাত্র। আগুন কেন? জল সম্ভব হবে বলে।

হঠাৎ দেখি মেঘ করে আসচে। কালবৈশাখী নিশ্চয়—ছুটতে ছুটতে একমাইল এসে নদীতে আমাদের বনসিমতলার ঘাটে নামি। কি চমৎকার নদীজল, পুণ্য-সলিলা ইছামতী প্রতি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় গত দশ পনেরো বছর ধরে আমায় কত কি শিখিয়েচে। ভগবানের

কত রূপই প্রত্যক্ষ করেছি ইছামতীতে সাঁতার দিতে দিতে এমনি কত নিদাঘ সন্ধ্যায়, বর্ষা অপরাহ্ণের বৃষ্টিধারামুখর নির্জ্জনতায়। আজ দেখলুম, কুঠীর দিকে কি অদ্ভুত কালো মেঘসজ্জা—উড়ে আসচে ভাঙা নীল কুঠীটার জঙ্গলের দিক থেকে আমাদের ঘাটের দিকে। কি সে অদ্ভুত রূপ! বিশ্বরূপের এ সব রূপ—এ পটভূমিতে, এমন অবস্থায় দেখবার সৌভাগ্য আমায় দিয়েচেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনিই দয়া করে যাকে দেখতে দেন, সে-ই দেখে।

সারাদিন কাটলো ট্রেনে। তিন বার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলাম—একবার ব্রাহ্মণী নদীর সেতুর কাছে বিস্তৃত কটা রংয়ের বালুরাশির ওপর দিয়ে শীর্ণকায় দ্বিধারা ব্রাহ্মণী বয়ে চলেচে —দূরে নীল পর্ব্বতমালা, ঘন সবুজ বনানী। বাংলাদেশের বন অথচ তার পেছনে আকাশের গায়ে সিংভূমের চেয়ে শ্যামলতর শৈলশ্রেণী। আর একবার এই রকম দৃশ্য দেখলাম কটকের এপাশে মহানদীর সেতু থেকে এবং ওপাশে কাটজুড়ির সেতু থেকে। ট্রেন যত পুরীর কাছাকাছি আসতে লাগলো বনবনানী ততই শ্যামলতর, নারিকেল কুঞ্জ ততই ঘনতর, দোলায়মান বেণুবনশ্রেণী ততই নবতর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো। ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে অনেকদূর পর্য্যন্ত মাকড়া পাথরের মালভূমি বা টাঁড় এবং এক প্রকারের সাদা ফুল-ফোটা ঝুপি গাছের ঘন সবুজ বন। বাংলাদেশের চেয়েও শ্যামল এসব অঞ্চলের তৃণভূমি ও বনানী। বনপুষ্পের বৈচিত্র্য তেমন চোখে পড়লো না। বর্ষার দিন, ভুবনেশ্বরের এদিক থেকে বর্ষা শুরু হয়েচে, ক্রমেই বৃষ্টি বাড়চে বই কমচে না। পুরীর ঠিক আগের স্টেশন হোল মালতীপাতপুর। উড়িষ্যার এই ক্ষুদ্র পল্লী যে একটি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যভূমি শুধু তার ঘন নারিকেলকুঞ্জ ও শ্যাম বন-শোভায়—এ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

পুরী স্টেশনে গজেনবাবু ও সুমথ এসে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গল্প করচে—হঠাৎ সামনে দেখি অকুল সমুদ্রের নীল জলরাশি! সে কি পরম মুহূর্ত্ত জীবনের! সমস্ত দেহে যেন কিসের বিদ্যুৎ খেলে গেল। কল্যাণী দেখি হঠাৎ অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। সমুদ্র দেখেছিলুম বহুকাল আগে কক্সবাজারে—আর এই ২০।২১ বছর পরে আজ পুরীর সমুদ্র দেখলুম।

সন্ধ্যায় ৺জগন্নাথের মন্দির দেখে এলুম। শ্রীচৈতন্য যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সর্ব্বশরীর যেন অবশ হয়ে গেল। আধ অন্ধকার গর্ভদেউলে বহু নরনারী দাঁড়িয়ে জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করচে—ভক্তবৃন্দের মুখে হরিধ্বনি, নানা মন্দিরের গর্ভগৃহ, সেখানে ধাঁধা প্রদীপের মিটমিটে আলোয় কত কি দেবদেবীর বিগ্রহ, যুঁই ফুল ও পদ্মমালার সুগন্ধ বাতাসে, বিরাটকায় পাষাণ দেউল, কোথাও সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারিত হচ্চে পাণ্ডাদের মুখে—আমাদের সঙ্গী পাণ্ডা বলচে এই নীলাচল, এখানে শুধু নীলমাধবের মন্দির তৈরি হয়েচে—বাইরের আনন্দবাজারে নারিকেলের তৈরি নানা রকম মিষ্টান্ন ভোগ ও তাদের সংস্কৃত নাম, প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ যেন এখানে বাঁধা পড়ে আছে।

সকাল থেকে দুর্য্যোগ চলচে। পুরীর বীরেন রায় একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ। তিনি এবং কয়েকটি ভদ্রলোক এলেন গজেনবাবুর ওখানে, আমার সঙ্গে দেখা করতে। ধার্য্য হলো ওবেলা আমায় নিয়ে নাকি সম্বর্দ্ধনা করবেন, সেকথা বলে গেলেন।

বেরিয়ে ফিরবার পরেই অত্যন্ত বৃষ্টি শুরু হোল। এদিকে পাণ্ডাঠাকুরের ছড়িদার বলে গেল যে একটার সময় মহাপ্রসাদ পাঠাবে। ক্ষিদেতে নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে, বাইরে ভীষণ দুর্য্যোগ, মহাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেই। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলো, প্রায় সাড়ে চারটে বিকেল—তখন 'কণিকা' প্রসাদ এল।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করতে যাবার পূর্ব্বে কল্যাণী আমি উমা সবাই মিলে সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলুম। কল্যাণী বহু ঝিনুক কুড়ুলে। অনেকদিন আগে এই দিনটিতে বারাকপুরে খুকু আমার সঙ্গে নাইতে গিয়ে 'মাটি আনি' বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে ডাঙায় উঠে ছুট দিয়েছিল। তখন সে ব্যাপারটাতে কি দুঃখই হয়েছিল মনে। পায়ে হেঁটে চালকী চলে গিয়েছিলুম জাহ্নবীর ওখানে, মনে কষ্ট নিয়ে। আজ কোথায় জাহ্নবী, কোথায় সে খুকু, কোথায় বা সে দিনের মনের কষ্ট! জীবনে এক যখন চলে যায়, তখন বড়ই কষ্ট হয় প্রথম প্রথম, কিন্তু শীঘ্রই অপরদল এসে তাদের স্থান পূর্ণ করে—তারাই আবার হয়ে দাঁড়ায় কত প্রিয়।

গজেনবাবুদের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখতে গেলুম। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে ছিলেন আঠারো বছর—তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হরিদাস ঠাকুর যখন মারা যান, তখন তিনি নিজে তাঁকে কাঁধে নিয়ে এসে এখানে সমুদ্রতটে বালুকা খুঁড়ে সমাধিস্থ করেন। কালক্রমে এখন সেখানে বড় বড় বাড়ী হয়ে উঠেচে চারধারে। স্থানটি অতি শান্তিপ্রদ, মনে একটি উদাস পবিত্র ভাব এনে দেয়। দুটি বালক শিষ্য হাতে ঝুলি নিয়ে মালা-জপ করচে, তারাই সব দেখালে।

সেই পথেই পুরুষোত্তম মঠে গিয়ে পেছনের একটি অতি সুন্দর স্থানে বসলুম। ডাইনে দূরপ্রসারী ঝাউবন, পাশেই টোটা গোপীনাথের বাগানে অজস্র কাঁঠালগাছ, সামনে বিস্তৃত বালুচরের পারে অপার নীলাম্বুরাশি সফেন উর্ম্মিমালা বুকে নিয়ে তটভূমিতে আবার আছড়ে পড়চে। সে দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই তো বিশ্বরূপের মন্দির, এই আকাশ, এই ঝাউবন, এই অপার নীল সমুদ্র। এ ছেড়ে কোথায় যাবো?

গজেনবাবু কেবল বলে, চলুন বিভূতিবাবু, সভার সময় হোল। সাতটাতে সভা।

সুমথবাবু বল্লে—আপনাকে দেখচি ওঠানো দায়, সভার সব লোক এসে যে হাঁ করে বসে থাকবে—চলুন।

১০৮শ্রী তীর্থপতি মহারাজ এই পুরুষোত্তম মঠের মোহান্ত। তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রচার করতে। তাঁর সঙ্গে বহু আধ্যাত্মিক আলোচনা হোল। বৈষ্ণবদের কি বিনয় ও ভক্তি। অত বড় পণ্ডিত বল্লেন হাত জোড় করে, আমি আপনাদের দাসানুদাস

হতে চাই। আবার কবে দেখা পাবো?

ওখান থেকে এসে সবাই গেলুম সভাস্থলে। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করলেন। আমার গলায় ফুলের মালা দিয়ে আমার রচনা সম্বন্ধে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা অনেকে বল্লেন। গজেনবাবু ও মিঃ পালিত বল্লেন, আমার 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' নাকি রোমা রোঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর চেয়েও বড়।

দিব্যি জ্যোৎস্নারাত্রে কল্যাণী, উমা, বীরেন রায়, গজেনবাবু, সুমথবাবু সবাই মিলে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে এলুম। উত্তাল সমুদ্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে, হু হু হাওয়া বইচে, যাকে বলে সত্যিকারের 'sea breeze' বা ডাচ 'Zee brugge' অর্থাৎ সমুদ্রের হাওয়া।

রাত্রে আবার ভীষণ বৃষ্টি। সকালে উমা ও কল্যাণী সমুদ্রে স্নান করতে গেল। ওরা সমুদ্রে স্নান করে খুব খুশি হয়ে এল।

একটু পরে বৃষ্টি কেটে গিয়ে বেশ রোদ উঠলো—উমাকে রেখে কল্যাণীকে নিয়ে আমি শ্রীমন্দির দর্শন করতে যাচ্চি, পথে ছাতার মঠ ও রাধাকান্ত মঠ দেখে বার হচ্চি, এমন সময় মহাদেববাবু পেছন থেকে ডাকচেন। সঙ্গে প্রতাপবাবু। আমরা গিয়ে এমার মঠ দেখি। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মঠটি সবচেয়ে বিত্তশালী। কেমন নীচু-নীচু ঘরগুলি, দেওয়ালে নানারকম quaint ছবি আঁকা, পাথরের কাজকরা থাম, খাঁচায় টিয়া ময়না পাখী, শান্ত পরিবেশ—যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো রাজপ্রাসাদ। তারপর গেলুম মন্দির দেখতে। গজেনবাবুর মা সেখানে উপস্থিত, তিনি বল্লেন, রত্নবেদী দেখবার দেরি আছে একটু, বৌমাকে নিয়ে একটু বোসো। একটি সাধু ভাগবত পাঠ করচেন, সেখানে খানিকটা বসি। তারপর মন্দিরের সব দিক ঘুরে ঘুরে দেখলুম বেলা বারোটা পর্য্যন্ত। মন্দির তো নয়, পাহাড়। ঐ আবার সেই কথা মনে পড়ে—প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ সেখানে যেন অচল হয়ে বাঁধা পড়েছে পাথরের বাঁধনে। গগনচুম্বী গম্ভীরা কি অসাধারণ শক্তি ও বিরাটত্বের পরিচয় দিচ্ছে! জগমোহনের কি গঠনভঙ্গি! নাটমন্দিরের সরল ও সহজ স্থাপত্যের মধ্যে একটি সখ্য ভাব জড়ানো। ভোগগৃহের সামনে সেই স্তম্ভ বর্ত্তমান আজও, যে স্তম্ভটিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করতেন। পাণ্ডারা এক জায়গায় তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখায়—আমার বিশ্বাস হোল না যে সে তাঁর আঙুলের ছাপ—আর দেখালেই বা কি। শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন অধ্যাত্ম বিষয়ে পথ দেখাতে, ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে। তাঁর প্রচারিত নাম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যদি কেউ ভাল না বোঝে, তবে তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখে সে কোন্ স্বর্গে যাবে?

মন্দির দেখতে বেজে গেল সাড়ে বারোটা। কিছু কিছু মিষ্টান্ন ভোগ কিনে উমার জন্যে বাড়ী আনা গেল। ভোগ আসতে বড় দেরি হয়, আজও হোল—বেলা সাড়ে চারটার সময় ভোগ এল।

আজ সমুদ্রের উত্তাল রূপ। ঝড়বৃষ্টি কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, সুনীল সমুদ্র

যেন নিজের আনন্দে নিজে মত্ত হয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে কূলে আছড়ে আছড়ে পড়চে। দীর্ঘ টানা ঢেউয়ের রাশি মাথায় সাদা ফেনার পুঞ্জ নিয়ে বহুদূরব্যাপী একটি রেখার সৃষ্টি করেচে। দুপুর বেলায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সেই রূপ দর্শন করলুম! সুমথবাবু এসে বল্লে, চলুন চা খেয়ে আসি আর সস্তায় জুতো নিয়ে আসি মুচিপাড়া থেকে। ওর সঙ্গে বেরিয়ে হঠাৎ আবার সমুদ্রের সঙ্গে দেখা। আর আমি যেতে পারলুম না কোথাও। অবাক হয়ে চেয়ে বসে পড়লাম। কি বিরাটত্বের আভাস ওই দূরবিসর্পী নীল রূপের মধ্যে, উর্ম্মিমালার সফেন আকুলতায়, তটরেখার বিলীয়মান শ্যামলিমায়। স্থলভূমির শেষ হয়ে গেল এখানে, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই নীলাম্বুরাশির ওপার নেই, আবার এপারে এই এসিয়া মহাদেশের উত্তর প্রান্ত, ইনিসে ও লেনা নদীর মুখ। অবিশ্যি দক্ষিণ মেরু মহাদেশের তুষারাবৃত নির্জ্জন ভূভাগের কথা তুলচি নে এখানে। নুলিয়ারা সেই বিক্ষুব্ধ বীচিমালা পার হয়ে ডিঙিতে মাছ ধরে আনচে—একটা sword fish দেখলুম আনচে—প্রকাণ্ড করাতখানা ঝক ঝক করচে।

মুচিপাড়ার জুতো দেখতে গিয়ে একটা দোকানে বসে সবাই গল্প করচি। একটি পথ-চলতি লোক এসে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ দেখি সে গালুডির সেই হরিপদ ডাক্তার। অনেকদিন পরে দেখে খুব খুশি হই। বল্লে—বেড়িয়ে বেড়িয়েই জীবনটাকে নষ্ট করলুম বিভূতিবাবু।

সন্ধ্যাবেলা আমার এখানে আড্ডা বসলো—অনেকগুলি ভদ্রলোক এলেন আড্ডা দিতে—যদু মল্লিকের পৌত্র বৃন্দাবন মল্লিক প্রভৃতি। জ্যোৎস্নারাত্রে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে কতক্ষণ গল্প-গুজব করি।

সন্ধ্যায় আজ বীরেন রায়, বৃন্দাবন মল্লিক, গজেনবাবু, সুমথ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে চক্রতীর্থে সমুদ্রতীরে বালির ওপর গিয়ে কতক্ষণ বসে ছিলাম। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না সমুদ্রের উপর পড়ে তার তরঙ্গরাজির রূপ বদলে দিয়েচে, ধূ ধূ নির্জ্জন বালুচরের গায়ে আছড়ে এসে পড়চে উর্ম্মিমালা—চৈতন্যদেব চক্রতীর্থে সমুদ্রের এই রূপ দেখেই নাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন—আজ ৪৫০ বছর আগের কথা। সেই সমুদ্র এখনও ঠিক তেমনি আছে, সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ, সেই নির্জ্জন বালুতট, সেই ঝাউবনশ্রেণী, সেই উদাস অস্পষ্ট চক্রবালরেখা।

বীরেন রায় আজ সকালে প্রাচীন তোসালি নগরের অনেক পুরোনো পুঁথি, পোড়ামাটির খেলনা, পাথরের মালা ইত্যাদি দেখালেন। উড়িষ্যার প্রাচীন শিলা সংগ্রহ ইনি করে এসেচেন চিরকাল ধরে। কত টাকা নষ্ট করেচেন এদের পেছনে অথচ ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড মিউজিয়ম থেকে যখন ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ওঁর সংগৃহীত জিনিসগুলি কিনতে চাইলে, তখন উনি তাদের না দিয়ে সামান্য ছ'হাজার টাকা নিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে দান করলেন। আজ গালুডির সেই হরিপদ-বাবু ভোরে আমার এখানে এসেছিলেন।

সবাই মিলে খুব আড্ডা দিয়ে চা খাওয়া গেল 'আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ—তারপর ওরা

সব মুচিপাড়ায় গিয়ে জুতো দেখলে। বৃন্দাবন মল্লিক এসে রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে নিয়ে গেল। চক্রতীর্থে জ্যোৎস্নায় বেলাভূমির বালুর ওপর বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পরে ফিরে এলুম আমার বাসায়। কত রাত পর্য্যন্ত সেখানে আড্ডা। বীরেন রায় একবার এক বড় বুদ্ধমূর্ত্তি জঙ্গলের মধ্যে কি ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, সে গল্প করলেন। হঠাৎ বুদ্ধের ধ্যান-প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখে বলে উঠলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। ঢেন্‌কানল স্টেটে এক প্রাচীন মন্দির দেখতে গিয়ে উনি পড়েছিলেন king cobra-র হাতে। ভগবান সর্ব্বভূতে আছেন ভেবে হঠাৎ নাকি মহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন চোখ বুজে। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখলেন সর্প অদৃশ্য হয়েচে।

দুপুরের পরে শঙ্কর মঠে গিয়ে একটি চমৎকার গোপালমূর্ত্তি দর্শন করলুম। দোর বন্ধ রয়েচে দেখে আমি দোর খুলে গিয়ে মেজেতে চুপ করে বসলুম—কেমন একটি সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে পুষ্প ও চন্দনের। শ্বেত প্রস্তরের মেজেতে ঠাণ্ডা ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে গোপালের মূর্ত্তির সামনে বসে রইলুম কতক্ষণ।

সকালে উঠে সামনের ঘরের বুড়ো-বুড়ীকে নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের মঠে গেলুম ও পুরুষোত্তম মঠে অনেকক্ষণ ধরে ধর্ম্ম-উপদেশ শুনলুম।

'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী'। সর্ব্বদা জেগে থাকতে হবে। আলস্যই পাপ। আসবার সময় শঙ্কর মঠের শ্রীগোপাল বিগ্রহ দেখে চলে এলুম। ছোট্ট ঘরটিতে পুষ্প চন্দনের সুবাস। আহারের পর একটু বিশ্রাম করে কল্যাণী ও উমাকে নিয়ে যাচ্ছি—একটি বাড়ীতে কথকতা হচ্চে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'-এর। অনেকক্ষণ বসে শুনলুম। মন্দিরের কাছে হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধ বকুল দেখতে গেলুম। ৫০০ বছরের পুরোনো বকুল গাছ আজও দাঁড়িয়ে! মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ হোল। কলকাতার একটি সুন্দরী মহিলাকে 'মা' বলে মনটাতে বড় ভক্তি হোল।

আজ সকালে বীরেন রায়ের বাড়ী বসে তাঁর দুর্লভ প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহাবলী দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হোল, আজ না পয়লা আষাঢ়। চলুন গিয়ে কালিদাস উৎসব করা যাক্। এমন সময়ে এল বৃন্দাবন মল্লিক, বল্লে—আপনি বলেছিলেন 'দেবযান' পাঠ করবেন লাইব্রেরীতে—অনেক লোক এসে বসে আছে।

গেলুম। যাবার আগে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ী 'রমা ভিলা'তে গিয়ে খানিকটা বসলাম। ১৯২৩ সালে একবার সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ী থেকে এখানে আসবার কথাবার্ত্তা সব ঠিক, আমি আমার মেস্ থেকে বাক্সবিছানা সব বেঁধে নতুন একটা শতরঞ্চি কিনে (যখন কিনি সুপার কাকা আবার তখন সেখানে উপস্থিত) মুটের মাথায় চাপিয়ে ওদের বাড়ী এসে দেখি সিদ্ধেশ্বরবাবুর জ্বর হয়েচে, যাওয়া হবে না। ১৯২৪ সালের পৌষ মাসে আর একবার ওরা

পুরী আসে, আমি যাই ভাগলপুরে। বরেন এসেছিল আমার স্থানে। ১৯৩৪ সালে সুপ্রভা ও তাঁর বাবা যখন আসেন, তখনও আমার আসবার সমস্ত ঠিক, সুপ্রভা চিঠি লিখলে, আমি পুরীর টিকিট পর্য্যন্ত কিনে আনলাম। সমুদ্রস্নানের জন্যে একটা কোমরবন্ধ পর্য্যন্ত কিনলাম কিন্তু আসা হোল না।

এতদিন পরে 'রমা ভিলা'তে এসে সেই সব পুরোনো কথাই মনে পড়ছিল। আজ আর কেউ নেই—কোথায় বা সেই সিদ্ধেশ্বরবাবু, কোথায় বা অক্ষয়বাবু। এত সাধ করে 'রমা ভিলা'র সদর ফটক সেবার ১৯২৩ সালে করানো হোল—ওরা কোথায় চলে গেল! গেটটি আজও আছে দেখে এলুম।

লাইব্রেরীতে কালিদাস উৎসব সম্পন্ন হোল। প্রিয়রঞ্জন সেনের দাদা কুমুদবন্ধু সেন বক্তৃতা দিলেন। আমি কিছু বললাম সভাপতি হিসাবে। মনে পড়লো বারাকপুরে গ্রীষ্মের ছুটি অতিবাহিত করবার সময়ে প্রতি বৎসর খুকুর কাছে বলতাম—আজ ১লা আষাঢ়, খুকু এসো কালিদাসকে স্মরণ করি। এতকাল পরে ভাল করেই স্মরণ করা হোল কালিদাসকে। বিকেলে আবার খুরদারোড থেকে আমাকে নিতে এল—সেখানেও ওবেলা 'বর্ষা-মঙ্গল' অনুষ্ঠিত হবে। পুরী থেকে তো কাল চলেই যাবো। খুরদারোড পর্য্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে গেল রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে, তুষারকান্তি ঘোষকে এবং আমাকে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, গুমট বেশ। ডাঃ সরকারের বাংলোর বাইরের মাঠে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হোল। রাধাকুমুদবাবু ও তুষারকান্তিবাবু ভূতের গল্প আরম্ভ করলেন—রাত সাড়ে দশটায় সভা। আমার প্রথম বক্তৃতা—সবাই খুব হাততালি দিলে। মহাদেব রায়ের বক্তৃতা অতি চমৎকার হয়েছিল।

পরদিন সকাল আটটার সময় থেকে সারাদিন ট্রেনে। মহানদী ও কাটজুড়ি নদীদ্বয়, দূরের নীল শৈলমালা, কাটজুড়ির বিস্তীর্ণ বালুচর ও তার ধারে সুদৃশ্য কটক শহরটি বেশ লাগলো। সারাদিন চলেচে ট্রেন, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বাংলাদেশে পড়লাম। অমরদা' রোড্ স্টেশন থেকে কয়েকটি গোরা সৈনিক উঠলো এবং সারারাত গানে-গল্পে তাদের সঙ্গে বেশ কাটানো গেল।

ভোরে সাঁতরাগাছি। টিকিট নিয়ে নিলে এখানে এবং হাওড়া নেমেই সোজা শেয়ালদ' হয়ে বারাকপুরে চলে এলুম। এতদিন পরে ইছামতীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি হোলো। কোথায় ভুবনেশ্বরের কুচিলা বন, খণ্ডগিরি উদয়গিরির গুহাবলী, পাথার তীর্থ পুরীর নীলাম্বুরাশি—আর কোথায় নলখাগড়া বন্যেবুড়ো গাছের সারি ও ইছামতী নদী।

বিকেলে নদীর ধারে নিবারণের পটলের ভুঁইয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। শান্ত বর্ষা, শ্যামল গাছপালা। বিশ্বরূপের আর এক রূপ এখানে। কুঠীর মাঠে সেই জায়গাটায় গেলুম যেখানে খুকুর আমলে একটা বালির টিবি ছিল, খেঁকশেয়ালীতে গর্ত্ত করেছিল—আমি গিয়ে বসতুম।

বাদলা নেমেছে—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ইন্দু রায় ও হাবু-ফুচুকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে যাই। হাবু ও ফুচুর সঙ্গে কালও গিয়ে কাঁচিকাটার পুলের নীচে কচুরিপানার জড়ো করা স্তূপের উপর বসে আরামডাঙার শ্যামল মাঠ ও খেজুর গাছের সারিরদিকে চেয়ে মনে হলো এ যেন ঠিক সেই বিলিতি ছবিতে South-sea Island-এর দৃশ্য দেখচি। বর্ষা-সতেজ কচি চোঁচরা ঘাসগুলো জলের ধারে কেমন বেড়ে উঠেচে আর তার কি শোভা। একটা রাখাল ছোঁড়া মরাগাঙের ধারের ক্ষেত থেকে কাঁকুড় তুলে খাচ্চে দেখে হাবু তাকে কেবল বলতে লাগলো—ও ভাই, একটা কাঁকুড় দে না তুলে ক্ষেত থেকে।

অনেক অনুরোধ উপরোধে সে একটা মাঝারি সাইজের কাঁকুড় তুলে নিয়ে আসতেই হাবু ও ফুচু সেটার ভাগ নিয়ে ঝগড়া বাধালে। প্রবহমান ক্ষীণকায়া তটিনীর কূলে বসে পুঁটিমাছ ধরা ছোট্ট ছিপ ফেলে মাছ ধরি আর কাঁচা কাঁকুড় খাই—বেশ লাগে এ জীবন!

আজ বেলা তিনটের সময় ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে ঝড়। ঝড়বৃষ্টির কোনো কামাই নেই আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত। দিনগুলি ঠাণ্ডা, সজল বাতাস বয় সারাদিন। আজ মেঘবৃষ্টির পরে বেড়াতে বার হই বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে নতিডাঙার সেই বটগাছটা পর্য্যন্ত। সেই বিশাল প্রাচীন মহীরুহ তার ঘন সবুজ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আছে মজা নদীর ধারে, দূর বিস্তৃত মাঠে আউশ ধানের জাওলা বেড়ে উঠেচে, যেদিকে চাই সেদিকেই ঘন শ্যাম ভূমিশ্রী—আর সকলের ওপর উপুড় হয়ে আছে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। কি নব নীল নীরদ-মালা, দেখে মনে হল তখুনি বিশ্বশিল্পীর এ শিল্প আমি যদি না দেখি, তবে এ পাড়াগাঁয়ের কেউই আর দেখবে না। শিল্পী হিসাবে, কবি হিসাবে আমার কর্ত্তব্য হচ্চে এই অদৃশ্য সৌন্দর্য্যের অপরাজিত আয়তনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হওয়া। মেঘের কোলে এক জায়গায় সাদা বক উড়চে—ঠিক বেলে-ডাঙার পুলটার কাছে। খেজুর গাছ আছে একটা সেইখানে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। অবাক হয়ে গেলুম উড়ন্ত বক দুটিকে সেই বর্ষার মেঘ থম্‌কানো অপরাহ্ণে কাজল কালো মেঘের গায়ে উড়তে দেখে। জগতে এত সৌন্দর্য্যও আছে। কোথায় এর তুলনা? ধন্যবাদ হে মহাশিল্পী, তুমি আজ আমাকে তোমার সৃষ্ট রূপজগৎকে দেখবার সুযোগ দিলে। এর ভাষা সৌন্দর্য্যের ভাষা, কি বলতে চায় এ মুখর প্রকৃতি—এই বন, মেঘ, তৃণাবৃত প্রান্তর, উড়ন্ত বক, খেজুর গাছের সারির মধ্যে দিয়ে নীরব গম্ভীর ভাষায়, তা যে কান পেতে শুনতে চায় সে শুনতে পাবে। কিন্তু ঐ যে বাগ্‌দীরা মরগাঙের ধারে বসে মাচা বেঁধে সারি সারি জলি ধান পাহারা দিচ্চে—ওরা কেউ শুনতে চায়ও না, পায়ও না।

সকালবেলা আজ বাঁওড়ের ধারের পথে বেড়াতে গেলুম। নীল আকাশ, গাছপালার প্রাচুর্য্য, বনবিহঙ্গের কূজন আমার মনকে অপূর্ব্ব আনন্দ রসে অভিষিক্ত করে রাখলে। একস্থানে বসে চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখি—কি চমৎকার অপরূপ সৌন্দর্য্যশিল্প ভগবানের। কুঠীর মাঠে পেয়ারা গাছটার তলায় এসে বসলুম নরম সরস সবুজ ঘাসের ওপর গামছা পেতে। যেন কত বন, এমন সবুজ তেলাকুচা লতার সাদা সাদা ফুল ও ঝলমলে সূর্য্যালোকে প্রজাপতির

আনন্দ-নৃত্য দেখে দেখে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেও আমার আনন্দ কখনও পান্‌সে হয়ে যাবে না—এই রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতের আনন্দ, এই তরুলতার শ্যামল রূপের আনন্দ, নীল আকাশের আনন্দ।

বিষম বর্ষা কমেচে আজ ক'দিন। বিরাম-বিশ্রামহীন বর্ষা, মেঘমেদুর আকাশ। কাল আমরা (কল্যাণী, তিনু ও আমি) বিকেলে কুঠির মাঠ দিয়ে মরগাঙের খাল পার হয়ে আরাম-ডাঙা বলে ছোট মুসলমানের গ্রামটিতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা বাড়ীতে বৌয়েরা কল্যাণীকে খুব যত্ন করে পিঁড়ি পেতে দিলে, পান সেজে দিলে, একটা কাদের ছোট ছেলে এনে ওর কোলে দিয়ে আপ্যায়িত করলে। বেশ লাগলো ওদের সরলতা। মরগাঙের ধারে যখন বসেচি, তখন সবুজের কি বিপুল সমারোহ চারিদিকে! সামনে আরামডাঙা, ওদিকে বেলেডাঙা যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। যখন আমাদের ঘাটের কাছাকাছি এসেচি, তখন মেঘের ফাঁকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র একটু'একটু উঁকি মারচে—মেঘভাঙা সেই জ্যোৎস্নাতেই আমরা নদীজলে স্নান করতে নামলুম। সন্ধ্যায় ট্রেন যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। কিন্তু গতকাল রাত্রে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব্ব শোভা রাত দশটার পর দেখা দিল সারাদিনের বৃষ্টিস্নাত আকাশে। বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখি আনন্দ পাতা, সজ্‌নে গাছ, বাঁশঝাড়, বনকাপাসের ডাল—এ সবের ওপর সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার কি শোভা—বিশ্বরূপকে একেবারে প্রত্যক্ষ করলুম সামনে। ছেলেবেলা যখন পাঁচড়া হয়েছিল—তখন এ সময় দেশে ছিলুম, আর কথনো থাকিনি।

আজ বড় সুন্দর শরতের রোদ। নাইবার পূর্ব্বে পেয়ারাতলায় গিয়ে বসি কুঠীর মাঠে, প্রজাপতি উড়চে ফুলে ফুলে। শ্যামল বনঝোপ কি সুন্দর চারিদিকে। কে যেন এসে পেছন দিক থেকে চোখ টিপে ধরবে সব সময়েই মনে হয়। উঠে আসতে ইচ্ছে করে না—কি সৌন্দর্য্য! ঘাটে এসে যখন স্নান করতে জলে নামি—তখন নদীর ওপারের নীল শোভা হৃদয় মুগ্ধ করে দিলে। কাল বনগাঁ থেকে জমি কিনে ফিরে আসবার পথে ইন্দু বারিক, আমি ও সন্তোষ খুব ভিজে গেলুম ঝড়-বৃষ্টিতে।

পরশু হুটু ধলভূমগড়ে ফিরে গেল। অনেকদিন পরে সে দেশে এসেছিল—দিন চারেক ছিল। একদিন ইন্দুর সঙ্গে বেলেডাঙার ধারের সেই সুন্দর জায়গাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—একদিন মরগাঙে আমাদের কেনা জমিগুলোতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পরশু বিকেলে ইন্দু, মধু কামার ও খুড়ো মাছ ধরচে—আমি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির। আকাশের এই অদ্ভুত রং ও রচনার তলায় দলে দলে মানুষে এই রকম মরগাঙের ধারের মত জাল ফেলচে, ছিপে মাছ ধরচে, যুগল ঘোষের মত গরু চরাচ্চে, তামাক খাচ্চে, পটলের ভুঁই নিড়ুচ্চে—এমনি ঝিঙের ক্ষেতে হলুদ ফুল ফুটচে, কত শত বছর থেকে ভরসন্ধ্যেবেলা—এমনি

শান্ত, অনাড়ম্বর জীবনধারা চলচে।

কাল উষার পত্র পেলুম লাহোর থেকে, ম্যাট্রিক পাশ করেচে খবর দিয়েচে। সুখী হলুম খবর পেয়ে। সামনের শনিবারে পাথুরেঘাটার অক্ষয় ঘোষের ছোট মেয়ে বুড়ির বিয়ে। সেখানে নিমন্ত্রিত আছি, যেতে হবে শনিবারে।

ক'দিন ভীষণ বৃষ্টির পরে আজ দুদিন আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েচে। গত শনিবার ২৬শে শ্রাবণ অক্ষয়বাবুর মেয়ে ছোট বুড়ির বিয়ে হয়ে গেল—সেখানে রামজোড়, ছটু্ সিং, সরণপ্রসাদ, যুগল তাদের সঙ্গে দেখা। বহুদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই আবহাওয়া যেন ফিরে এল। আগামী শনিবারে এখান থেকে ঘাটশিলা যাবো, হুটু চিঠি লিখেচে।

পরশু ফণি কাকা মাছ ধরতে গিয়েছিল সুন্দরপুরের নীচে মরগাঙে, আমি তার খোঁজে সুন্দরপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। ওপথে অত দূর অনেকদিন যাইনি। বন কলমীর ফুল ফুটেচে ঝোপের মাথায়, চারিধার ভরপুর সবুজ, কি অদ্ভুত শোভা ঝোপগুলির। এই ঝোপ-ঝাপ এ অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য—এর সৌন্দর্য্য বর্ষাকালে যে দেখবে সে মুগ্ধ হবে। আর আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা। সেখানে ছোট ছোট পাতাওয়ালা ভ্যাদ্‌লা-ঘাস্ হয়েচে, যেন সবুজ মখমলের আসন বিছানো, মাথার ওপর নত হয়ে আছে পেয়ারা ডালটি। সুরেনদের বাড়ীর পেছনে আর একটা ঝোপে বনকলমী ফুটেচে দেখে সেদিন আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। বিশ্বশিল্পীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মনের গভীর অন্তস্তলে সচেতন ভাবে গ্রহণ যে করতে পারে, এ পৃথিবী, ফুলফল, নীল আকাশ, উদার ভূমিশ্রী তার কাছে আপনরূপে ধরা দেয়।

কাল কলকাতা গিয়েছিলুম—সকালে গিয়ে রাত ন'টায় ফিরি। আজ ক'দিন থেকেই আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে সাঁতার দিয়ে চলে যাই, কূলে কূলে ভরা নদীর ধারে বনঝোপ, সাঁইবাবলা গাছ, নীল আকাশ, শরতের রোদ, ঘুঘুর ডাক—সত্যিই যেন বহুকাল পূর্ব্বেরই বিস্মৃত বাল্যদিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সাঁতার দিয়ে বাঁশতলায় উঠি, তারপর নিভৃত বনচ্ছায়ায় একস্থানে একটি বনকলমী ফুলের ঝোপের কাছে বসে রইলুম, ওদিকে কি একটা গাছের মাথায় মাকাল লতা উঠে কেমন একটা চমৎকার ঝোপের সৃষ্টি করেচে। রোদ না থাকলে, নীল আকাশ না থাকলে কি শরৎ মানায়? এতদিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি! গরম রোদ হবে, লতা-পাতার কটুতিক্ত গন্ধ বার হবে, তবে শরতের স্বপ্নলোক নামবে নীল আকাশের অনন্ত মুক্তির চন্দ্রাতপতলে।

আজ কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই পেয়ারা গাছটার তলায় চুপ করে বসি—গাছে উঠিও। গাছে উঠলে যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতে হয়—বন্য-প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ যেন আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিবারণের ভুঁই থেকে জলে নামলুম ও সাঁতার দিতে দিতে কত নল-খাগড়ার বন, ভাসমান কচুরিপানার দাম, কলমীলতার পাশ কাটিয়ে

দোদুল্যমান কত বাবুই পাখীর বাসা, নীল আকাশের তলায় শরৎ মধ্যাহ্নের শুভ্র মেঘস্তূপের দিকে চেয়ে চেয়ে এসে পৌছুলাম বনসিমতলার ঘাটে।

অভিলাষ জেলে ওপারে দোয়াড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে বলচে—বাবু খোলার গাঙে এমন ভেসে বেড়াচ্চেন কেন? কত আপদ বালাই থাকে, বিপদের কথা কি বলা যায় বাবু? অমন বেড়াবেন না।

অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ পাই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে এমনি ধারা মিশিয়ে দিয়ে।

বিকেলে আজ বাঁওড়ের ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই অশ্বত্থ গাছটার ওপর উঠে বসলুম খানিকক্ষণ। দূরে বাঁওড়ের নির্ম্মল জল, আমার চারিপাশে নিস্তব্ধ বনানী। এক জায়গায় কি অজস্র বনকলমী ফুলই ফুটেচে! জেলেপাড়ার ঠিক পেছনের মাঠটাতে। শাঁকারীপুকুরের রাস্তা দিয়ে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম।

আজ দুপুরে তুলা সাঁওতালের সঙ্গে হেঁটে এলুম বরাজুড়ি। শরতের নীল আকাশ, দূরে দূরে নীল শৈলশ্রেণী, বাটাইজোড় পার হয়ে ঢ্যাংজুড়ি সারাডোবা প্রভৃতি সাঁওতালী গ্রাম পার হয়ে গেলুম অবশেষে বরাজুড়ি বলে গ্রামে, খোলার অর্ডার দিতে। খোলা অর্থাৎ চাল ছাইবার খাপরা। কি সুন্দর গ্রামটি, ঢুকেই আমার ভাল লাগলো, ছায়া নেমে এসেচে শরৎ অপরাহ্নের মৌলবনে ও শালবনে, দীঘিতে রক্ত মৃণাল ফুটেচে, শ্যাম ধানের ক্ষেত ঠেকচে সুদূরের নীল শৈলমালায়। কার্ত্তিক গোরাই বলে একজন দোকানদার আমাকে খাতির করে চা খাওয়ালে—বল্লে, ধানের জমি বড় সস্তা। দোকানে লোকে এ বিশ্বব্যাপী দুর্দ্দশার দিনে ঘটি বাটি বাঁধা রেখে ছোলা, কলাই (এ দেশে বলে বিরি) নিয়ে যাচ্চে। সন্ধ্যার আগে চলে এলুম। তখন বেশ ছায়া নেমেচে, গুট্‌কে কেবলই মংলার নিন্দে করচে সারাপথ। আজ এসে পড়লুম সেই চমৎকার কথাটি—

"On the contrary, the wise man is conscious of himself, of God. If the road I have shown to lead to this is very difficult, it can yet be discoverd. And clearly it must be very hard when it is so seldom found. For how could it be that it is neglected practically by all, if salvation were close at hand and could be found without difficulty? But all excellent things are as difficult as they are rare,

Ethics—Spinoza.

"The really valuable things in human life are individual—what is of most value in human life is more analcgous to what all the great religious teachers have spoken of."

Power—Bertrand Russel.

"The ultimate realities of the universe are at present quite beyond

the reach of science, and probably are for ever beyond the comprehension of the human mind." —Sir James Jeans.

"There can never be any real opposition between religion and science; for the one is the complement of the other…It was not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply religious souls."

Max Planck.

ওপরের কথাগুলো সমর্থন করে আমারই অনুভূতির, যে অনুভূতির কথা আমি এই ডায়েরীর নানা স্থানে নানা আকারে লিখেচি। সেই স্তব্ধ চিন্ময় ভাবলোক যার সন্ধান মেলে নদীতীরে নেমে-আসা অপরাহ্নের নির্জ্জনতায়, বনঝোপে ফোটা বনকলমী ফুলের উদাস শোভায়, আঁধার নিশীথে মাথার ওপরকার জলজলে নক্ষত্র ছিটানো ছায়াপথের বিরাট ইঙ্গিতে। যে জীবনরহস্যের মূল উর্দ্ধাকাশে, শাখা প্রশাখা ধরণীর ধূলিতে।

মিঃ সিন্‌হার মোটরে আমি ও কল্যাণী ধলভূমগড়ে সুটুর বাসায় এসে দেখি গুটুকে, মংলা ও গোপাল উপস্থিত। ওখানে বিকেলের দৃশ্যটি বেশ চমৎকার হয়েচে; চা খেয়ে চলি আবার মোটরে, চাকুলিয়া থেকে বর্ষাস্নাত বনের দৃশ্য দেখতে দেখতে মান সমুড়িয়া হয়ে বহরাগড়া ডাক-বাংলো পৌঁছে গেলুম। সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করি। পরদিন অর্থাৎ গতকাল খাড়া মৌদা হয়ে বম্বে রোড দিয়ে দুধকুণ্ডী রিজার্ভ ফরেস্টের বাংলোতে। খড়ের ঘাটোয়ালি বাংলো, চারিধারে আম ও ফলবান বৃক্ষের কুঞ্জ। নিকটেই বন আরম্ভ হয়েচে, জানালা দিয়ে চোখে পড়চে—এতোয়া বৃষ্টিস্নাত বনভূমি থেকে বন্য শনের ফুল ও বন্য কলাফুলের মত কি ফুল নিয়ে এল। বৃষ্টি পড়চে—কল্যাণী রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' পড়চে, আমি টেবিলে বসে ভাবচি, এ যেন আমার ক্রীত মৌজা, ওই বন আর এই ঘাটোয়ালি বাংলো যদি আমার থাকতো এমন নির্জ্জন স্থানে তবে লিখবার কত সুবিধাই না হোত। কতক্ষণ পরে মিঃ সিন্‌হা বন তদারক করে ফিরে এলেন, আমরাও একটা বনের মধ্যে যেতে যেতে বনবিভাগের রোপিত বোনা গাছ ও শিশুগাছ দেখলাম। বিকেলে বাংলোতে বেড়াতে এলেন হেডমাস্টার মহাশয়। কাল এখানে মিটিং আছে। কি থৈ থৈ করচে space এখানে ডাকবাংলোর আশেপাশে। অস্ত আকাশের রং অতি অদ্ভুত। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে দেখি আশ্রমটা একেবারে ভেঙে পড়ে গিয়েচে, চালের খড় খসে পড়চে, আমরা সন্ধ্যার পরে আসবার সময় দুটি ছোকরাকে সেখানে দেখলুম—সেই অন্ধকারে ঘরের মধ্যে তারা কি করচে? ওরা নাকি ওখানে আমোদ করতে এসেচে। এই ভাঙা বাড়ীতে এরা গল্প করে বসে। আমাদের তখনই মনে সন্দেহ হোল—পরে শুনলুম ওরা ওখানে বসে গাঁজা খায়। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে কতক্ষণ সাঁকোর ওপর বসে ভগবদ্বিষয়ে চর্চ্চা করি। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করলুম বাংলোতে বসে।

সকালে মেঘ ও ঠাণ্ডা দিন। মোটরে কল্যাণী, আমি ও মিঃ সিন্‌হা চলে গেলুম কেশরদা বাঁশবনে। এই বিরাট বাঁশবনের রোপণ ইত্যাদি কাজ বনবিভাগ থেকে করা হয়েচে। মুরুল হক Ranger বল্লে—হুজুর, দু'হাজার কাঁটালের চারা পোঁতা হয়েচে।

আমরা কেশরদা গ্রামে চলে গেলুম। এই গ্রামটি বাঙালী ও উড়িয়া অধিবাসীদের গ্রাম। কথার মধ্যে অনেক উড়িয়া শব্দ মেশানো। আমাদের মোটর যেতে অনেক লোক এল—বল্লে, এবার খাদ্যের অভাবে বড়ই কষ্ট হয়েচে লোকের। কল্যাণীকে নিয়ে গ্রাম্যদেবী স্বর্ণ বাউড়ীর মন্দির দেখি। বহু পুরোনো মূর্ত্তি—নাকমুখ ভাঙা, মন্দিরের আশে পাশে অমন ছোট-বড় কত মূর্ত্তি পড়ে আছে। কৃষ্ণ পাণ্ডা বলে ওই মন্দিরের পূজারীর বাড়ী আমরা গিয়ে বসলুম। ওরা কল্যাণীকে নামিয়ে নিয়ে গেল। মাটির ঘর, দেওয়ালে সুভাষ বসু ও গান্ধীর ছবি। একটা লোকের বোধ হয় জ্বর হয়েচে, সে খাটিয়ায় শুয়ে আছে—বল্লে, ম্যালেরিয়া নয়, কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর এখানে নেই। কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এল ২৫।৩০টি, এরা নাকি ডোমদের ছেলে, সারাদিন ভিক্ষে করে বেড়ায়; এক এক মুঠো সবাই দেয়। চিন্তামণি পাণ্ডা এক ধামা মুড়ি নিয়ে ছেলেদের এক এক মুঠো মুড়ি সবাইকে দিলে, তারপর তারা কাঠ ও গরু চরানো নিয়ে দুঃখ করলে। আমাকে পাণ্ডাঠাকুর বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে চিঁড়ে, দই ও দুধ খাওয়ালে। একটা ঘরে নিয়ে গেল, বেতের ঝাঁপি যে কত রয়েচে সারি সারি—৺পুরীর দোকানেই সেই বেতের ঝাঁপির মতো। কোনো ঘরে একটা দরজা জানালা নেই, অন্ধকার সব ঘর। বেলা একটার সময় ওখান থেকে ডাকবাংলো গিয়ে স্নানাহার সেরে নিই। তখনই একটা স্কুলের ছেলে ডাকতে এল, আমরা গেলুম মিটিং এ। হেডমাস্টারের বাড়ীতে চা ও খাবার খেলুম সাহিত্য সভার পরে। গ্রীক যুবক হেলিওডোরাসের যেন আবির্ভাব হোল বহু শতাব্দী পরে।

সন্ধ্যার সময় কল্যাণীকে নিয়ে সুবর্ণরেখার এপারে বোনালি ঘাটে গিয়ে বসলুম। ওপারে ময়ূরভঞ্জের শৈলমালা, বড় একটা শৈলমালার ওপর প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ ঝুঁকে পড়ে আছে। এপারে মাঠে নিসিন্দে গাছের বেড়াব ধারে বসে আছি। ভগবানের উপাসনা করলুম সেখানে। কল্যাণী গাইলে, যো দেবাগ্নৌ যোঽপ্সু ইত্যাদি উপনিষদের সেই গম্ভীর বাণী।

জ্যোৎস্না উঠেছে—চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ। কিন্তু থৈ থৈ করচে মুক্ত space বহরাগড়া ডাক-বাংলোর সামনে। কত রাত পর্য্যন্ত আমরা জেগে বসে থাকি রোজ রোজ—এমন দূরপ্রসারী space আর কোথায়? জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা বেড়াতে গেলাম সেই সন্ন্যাসীর ভাঙা আশ্রমটির কাছে।

সকালে বহরাগড়া থেকে বেরিয়ে ধলভূমগড়ে হুটুর মেডিক্যাল ক্যাম্পে এলুম। সেখানে ভাত খেয়ে আবার মোটরে বার হই। একটা কুলীর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েচে ডিনামাইট ফাটাতে গিয়ে। কল্যাণী তাকে দেখে বড় কাতর হয়ে পড়লো। ধলভূমগড়ের ক্যাম্পটি

বেশ জায়গায় ! সামনে দূরবিস্তৃত শালবন ও সবুজ ধানবন। আজ চাকুলিয়ার হাট, সাঁওতাল মেয়েরা ঝাঁটা নিয়ে বিক্রি করতে আসচে চাকুলিয়ার হাটে। কল্যাণী কেবল বলচে, ঝাঁটা কিনলে হোত !

ওখান থেকে এলুম ঘাটশিলা। বেলা ৫টার সময় চা খেয়ে আবার মোটরে বার হই এবং সুবর্ণরেখা সেতু পার হয়ে রাখা মাইন্‌স্ মিলিটারী ক্যাম্পে লেফ্‌টেনান্ট জহুরী ও বোসের আতিথ্য গ্রহণ করি।

সকালে রাখা মাইন্‌স্ থেকে চা খেয়ে বার হয়ে কালিকাপুর রোড আপিসে এসে গল্পগুজব করি। সেখানে হেলিওডোরাসের গল্পটি পাঠ করি। বেশ জায়গা কালিকাপুর। চাঁইবাসা এলুম বেলা বারোটার সময়ে। দ্বিজুবাবু এলেন ঘাটশিলা থেকে—খুব মিটিং হোল। সারা রাত্রি কোলহান পার্কে রাত জেগে আবৃত্তি ইত্যাদি করা গেল ও শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চলে এলুম মোটরে চক্রধরপুর। দ্বিজুবাবুকে ন্যামিয়ে দিয়ে আমরা সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে পোড়াহাট পাহাড় ও বনানীর মধ্যে দিয়ে হেসাডি বাংলোতে পৌঁছুলুম। মোটরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল আজ আমাদের দেশের হাটবার ছিল।

মোটরেই ঘুমিয়ে নিলাম। ভোর হোল—চা খেয়ে চলে এলুম হিড্‌নি falls-এ। স্থানটির কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য। উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়চে—চারিপাশে ঘন বনানী, চুণা পাথরের ধ্বসে পড়া চাঁই। স্নান করার সময়ে রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ বেয়ে আমি, সুবোধবাবু, মিঃ সিন্‌হা ও পরেশ সান্ন্যাল চলে এলুম। জলপ্রপাতের এপারে পাথরের আসনে বসে লিখচি। জলপ্রপাতের গভীর শব্দ বনের বনস্পতিতে প্রতিধ্বনিত হচ্চে যুগ-যুগান্তের বাণীর মত। কি গভীর শোভা! এক ধারে বনে অসংখ্য Lantana Camera ফুটে আছে। কানের কাছে সুবোধ কেবল বলচে, চলুন ফিরে যাই, চলুন ফিরে যাই। এই নির্জ্জন বনের মধ্যে এই অপূর্ব্ব গম্ভীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে সেই সৌন্দর্য্য-স্রষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করি। এই স্থানে বনের পরিবেশের মধ্যে বসে তাঁর কথাই আগে মনে পড়ে। ওপরে নীল আকাশ, চারিদিকে বনশ্রেণীর নির্জ্জনতা—সত্যিই হরি রায়ের কথা, আমাদের গ্রামের বহু হতভাগ্যের কথা এখানে না মনে হয়ে পারে ?

এবার এই ক'দিনের মধ্যে কত জায়গায় বেড়ালুম। বহরাগড়ার সেই মুক্ত space, কেশরদা গ্রামের সেই উড়িয়া পাড়ার বাড়ী, ধলভূমগড়ের মুক্ত সবুজ ধানের ক্ষেত্র ও শালবন, রাখা মাইন্‌স্-এর মিলিটারি ক্যাম্পে চাঁদ ওঠা রাত্রে বোসের সঙ্গে গল্প করচি। সকালে এলুম কালিকাপুর, সেখান থেকে চাঁইবাসা, আবার কল্যকার মত শেষরাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চাঁইবাসা থেকে ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী হেসাডি বাংলোতে মোটরে আগমন পোড়াহাট অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—তারপর আজ এই হিড্‌নি জলপ্রপাতের স্নান সকালবেলা !

চলার গান সার্থক হোক জীবনে। চরৈবেতি।

সামনে চেয়ে দেখি উত্তুঙ্গ শৈলগাত্রের গায়ে থাকে থাকে ঘনশ্যাম বনানী, রাঙা পাথর ও মাটির ক্ষয়িত পর্ব্বতগাত্র, অনেক উঁচুতে বড় বড় বট অশ্বত্থের মত বনস্পতি, তার ওপরে শরৎ দুপুরের নীল আকাশ, পাশেই বিশাল হিড্‌নি প্রপাতের তুলোর বস্তার মত দ্রুত নীয়মান জলধারা, তার ডানপাশে আবার বন, তার নীচে ল্যাণ্টানা ক্যামেরার জংলী রঙীন ফুল। ছায়া পড়েচে মেঘের—অন্য কোনো শব্দ নেই, শুধু জলপতন ধ্বনি দ্বারা বিখণ্ডিত নৈঃশব্দ্য আর বনবিহঙ্গ কাকলী। প্রকৃতির এমন নিভৃত লীলা নিকেতনে মন সৃষ্টিমুখী হয়ে ওঠে, বিশ্বের স্রষ্টার অপূর্ব্ব রহস্যের দিকে মন যায় চলে—এখানে মানুষ ছোট হয়ে গেছে—এই আকাশ, এ কোয়ার্টজাইটের চাঁই বাঁধানো সুবিশাল শিলাসন, এই বনানী, এই ফেনপুঞ্জবাহী দ্রুতপতনশীল জলধারা—এরাই বড়।

পরেশবাবু সেখানে বসে গান গাইছেন। মিঃ সিন্‌হা ডায়েরী লিখচেন—সুবোধ সর্ব্বদা ব্যস্ত, সে চলে গিয়েচে মোটরে। কল্যাণীকে একবার আনতে হবে এখানে। কতদূর এখান থেকে বারাকপুর, কুঠীর মাঠের আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা, ফুলে ফুলে ভরা ইছামতী ও তার তীরে কাশের ফুল ফোটা চরভূমি! সেই আমাদের নৌকো করে বনগাঁয়ে যাওয়া আজ যেন স্বপ্ন বলে মনে হয় না কি!

সত্যিই মনে হচ্চে কে যেন আমার হাত ধরে দেশে বিদেশে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন নতুবা তো গ্রামে বসে বারিক মণ্ডল ও ফণিকাকার সঙ্গে ধান বোনার গল্প করতাম, হরিপদদার সঙ্গে মোকদ্দমার ষড়যন্ত্র করতাম।

ভগবানকে এজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারপর কি চমৎকার রাস্তা দিয়ে মোটরে এসে বসলুম। সুবোধবাবু যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে রাস্তা এটা নয়, এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া—এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো, একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। যেন ঋষির পবিত্র তপোবনের স্থান। তারপর চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের শোভাও অদ্ভুত। মোটর চললো কালকার রাত্রের বনভূমি ভেদ করে। বনকলমী ফুল আরও কত কি ফুল বনের মধ্যে ফুটেচে এই বর্ষা শেষে। ২০০০ হাজার ফুট উঁচু টেবো বাংলোর ধার দিয়ে গাড়ী চলেচে—পাশে বর্ষার উদ্দাম এক পাহাড়ী নদীর গৈরিক জলধারা। শিউলি গাছ মুকুলিত হয়েচে এ বনেও। সুবোধকে বলি—সাহিত্যিকদের জন্য আপনারা P. W. D. থেকে এখানে একটা বাংলো তৈরি করে দিন না!. যেখান থেকে সমতলভূমির দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়, সেখানেই এ কথা উঠলো। জলতেষ্টা পেয়েছিল, রাঁচি রোডে নেমে নাকৃটি বাংলোতে এসে গাড়ী থামিয়ে জলের সন্ধানে গেল ড্রাইভার। বেলা তখন একটা, কিন্তু ডাকবাংলোর চৌকিদারের টিকি দেখা গেল না কোথাও। তখন জলের আশা ছেড়ে দিয়ে চক্রধরপুরে এসে জল খাওয়া গেল, নগেনবাবুর ছেলে জল নিয়ে এল।

রাত্রে সুবোধবাবুর বাড়ী দু'চারটি ভদ্রলোকের সামনে গল্পপাঠ করলুম।

আজ দিনটি বেশ পরিষ্কার। পরশু রাত্রে সারারাত্রি হৈ হৈ-এর পরে খুব আরামের ঘুম হয়েচে। সুবোধ ও অবিনাশবাবু এসে চা খাওয়ার সময়ে গল্প করলেন—চালের দর, ট্রেনে ভীষণ ভিড়। প্রেমচাঁদের গল্প 'বেটি কা ধন' ও 'সুহাগ কী শাড়ী' দুটি হিন্দীতে পাঠ করা হোল চায়ের টেবিলে। এখানে বেশ সাহিত্যিক আবহাওয়া। মনে পড়চে কাল এ সময় সৌন্দর্য্যময় বনভূমির মধ্যে বসে ছিলাম। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র, রাঙা মাটি ও চুণা পাথরের ধ্বস নামা খাড়া দেওয়াল, সেই অজস্র Lantana পুষ্প। আজ আকাশ খুব নীল, হেসাডি ডাকবাংলোতে কাটানোর উপযুক্ত দিন যেন এগুলি।

সন্ধ্যায় সুবোধবাবুর বাড়ীতে চায়ের আসরে আমার গল্প দুটি পড়া হোল—গ্রীক যুবক হেলিও-ডোরাস কি করে বাসুদেবের ভক্ত হোল ও 'ভিড়'। রাত্রে ফিরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়ি। কোল্‌হান্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে মিত্র, আরও কয়েকটি উকীল উপস্থিত ছিলেন।

ভোরে উঠে আমি ও মিঃ সিন্‌হা চা খেয়ে হিন্দি সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের বই পড়ি। জগৎ সিং এসে ভাঙে ভাঙে অর্থাৎ 'আমি বার বার বলচি' গল্পটি করেন। এই গল্পটি ওঁর মুখে কতবার শুনেচি—যতবার শুনি, নতুন লাগে প্রতিবার। সুবোধবাবু এসে বল্লে—সে ডেপুটি কমিশনার মিঃ কেম্পের গাড়ীতে টাটা চলে যাচ্ছে। একটু পরে ঘাটশিলা থেকে মুকুল চক্কত্তি এল। তার-পর আমরা মোটরে বার হয়ে ভবানী সিংয়ের বাড়ী যাই। গত ৩০শে চৈত্র এঁর বাড়ীতে কম্পাউণ্ডে বসে আমরা চা খেয়েছিলাম—চাঁইবাসার বাইরে অপূর্ব্ব মুক্ত space-এর বাহার, একদিকে নীল শৈলমালা—বরকেলা ও সেরাইকেলা। আমার মনে হল সেরাইকেলা শৈলমালাই বরাবর গিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরার পাহাড়ে শেষ হয়েচে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম। মস্ত বড় হাট বসেচে চাঁইবাসায়—বাসমতী চাল বিক্রি হচ্ছে ৩২৲ টাকা মন। কিন্তু অতি সুন্দর চাল।

সেই সন্ধ্যায় ট্রেনে এসে টাটানগর পৌছে গেলুম ও বাদাম পাহাড়ের যে গাড়ীখানা প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে, তাতেই শুয়ে রইলুম। ছোটনাগপুরের অধিবাসী হয়ে গিয়েচি আজকাল। বরকাকানা ও মূরী থেকে রাঁচি এক্সপ্রেস আসবে তারই সন্ধানে বার বার গাড়ী থেকে নামচি কিন্তু গাড়ী পেলুম না। ভোরে বম্বে মেল ধরে ঘাটশিলা পৌছুই। আসানবনী ছাড়িয়ে দূর থেকে আমাদের অতি পরিচিত সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশ দেখে মনে কি আনন্দ! বাড়ী এসেচি মনে হোল বহুদিন প্রবাস যাপনের পর। ওই সেই মিলিটারি ক্যাম্প রাখা মাইন্‌স্-এর—শনিবার রাত্রে যেখানে লেফটেনাণ্ট জহুরী ও বোসের অতিথি হয়ে রাত কাটিয়ে-ছিলাম। গালুডির বিষ্ণু প্রধান যাচ্ছে এ গাড়িতে, সে নমস্কার করে বল্লে, কোথায় নামবেন? আমি বল্লাম, ঘাটশিলায়।

রেডিও বক্তৃতা দিয়ে ব্যারাকপুর গিয়েছিলুম একদিনের জন্যে। শিউলি ফুল ফুটচে দেখে

এসেচি। বেশ লাগলো একটা দিন। তবে ম্যালেরিয়াতে সবাই ভুগচে। ফণি রায় ও আমি একসঙ্গে বেলা দুটোর গাড়ীতে চলে এলুম। ঘাটশিলা যেদিন এলুম, সেদিন সুরেশ বাবুও এলেন আমার সঙ্গে।

ক'দিন খুব জ্যোৎস্না। আজ চতুর্দ্দশী, কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। রাত ৮॥টা পর্য্যন্ত দ্বিজেন মল্লিকের বাড়ী বসে গল্প করলুম—তারপর মনে হোল আজ জ্যোৎস্নাটি মাটি করবো? কোথাও যাবো না? অত রাত্রে সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাতে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলুম ফুলডুংরি।

রাত ন'টা। বেশি রাত্রির জ্যোৎস্না। আমার সেই প্রিয় স্থানটিতে পাথরের ওপর গিয়ে যোগাসনে বসলুম। দূরে বুরুডি ও বাসাডেরা পাহাড় ও বনানীর মাথায় একটি নক্ষত্র অনন্তের হৃদ্‌স্পন্দনের মত টিপ টিপ করে জ্বলচে। জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমি ও ফুলডুংরি পাহাড়ের সে রূপে মন মুগ্ধ, স্তব্ধ ও বিস্মিত হয়ে উঠেচে। মুখে কথা বলতে পারি নে—এমন একটি অবশ, আড়ষ্ট ভাব। ভগবানের উপাসনা এখানে নীরব ও ভাবঘন, সমাহিত। বিশাল প্রান্তরের যে দিকে চাই—জ্যোৎস্নালোকিত ধরিত্রী যেন জন্মমরণ-ভীতি-ভ্রংশী কোন্ মহা-দেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের আনন্দে নিস্পন্দ সমাধিতে অন্তর্মুখী। শুধু দেখা যায় বসে বসে এর অপূর্ব্ব রূপ, শুধু অনুভব করা যায় গোপন অন্তরে এর সে নীরব বাণী। চারি-দিকে নিঃশব্দ; এক তো নির্জ্জন প্রান্তর—এত রাত্রে এখানে কেউ আসে না—ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোক এদিকে নাকি থাকে না বেশি রাত্রে—মানুষের গলার সুর এতটুকু কানে গেলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় আমার—সুতরাং প্রাণভরে এই নির্জ্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের বাণী শুনলাম বসে বসে কত রাত পর্য্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা এখানে বসলে ভয় হয়—এই বুঝি কোন কলকাতার চেন্‌জার বাবুরা পুত্রপরিবারসহ হাওয়া খেতে এসে পড়ে কলকোলাহল করতে করতে! এত রাত্রে মন একেবারে নিরুদ্বেগ সেদিক থেকে। বেশ জানি এ সময় জনপ্রাণী আসবে না এদিকে। মন শঙ্কাশূন্য ও নিরুদ্বেগ না হোলে কি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসুধা উপভোগ করা যায় ঠিকমত?

আমি ক'দিন ধরে ভাবচি এমনি সব নির্জ্জন স্থানের কথা। সেদিন পাঠকবাবু বলছিল, রাইপুর (C. P.) থেকে ১৮৪ মাইল দূরে রাস্তার স্টেটের রাজধানী জগৎদলপুরের গল্প। ধাম্-তারি ছাড়িয়ে (রাইপুর থেকে ৫০ মাইল দূর) ঘন বন পথের দুধারে—এমন এক বনের মধ্যে মানব বসতি থেকে বহুদূরে খুব বড় বড় গাছের ছায়ায় শিলাসনে বসে আছি, সকাল বেলাটি, অসংখ্য পক্ষীকুলের কলরব, অদূরে স্নিগ্ধ সলিলা গোদাবরী (ওখানে অবিশ্যি গোদাবরী নেই, আমার কল্পনা) কুলুকুলু রবে উপলবন্ধুর পথে বনপাদপের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে চলেছে। নির্ভয়ে বিচরণশীল মৃগযূথ আমার শিলাসনের কাছে কাছে তৃণ আহরণ করচে—এমন একটি ছবি প্রায়ই মনে আসে।

কাল বিকেলে ফণি এল—ওর সঙ্গে অমরবাবু এসেচেন কিনা দেখতে গেলুম। পথে ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে দেখা—ব্রাউন বল্লে, অমরবাবু আসেনি। তারপর রেলের বাঁধের ওপর

দুজনে বসলুম, বেশ চাঁদ উঠেচে। পরশু কল্যাণী, উমা ও বৌমাকে নিয়ে ফুলডুংরি বেড়াতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম।

আজ মিঃ সিন্‌হা চিঠি লিখেচেন তাঁর সঙ্গে সারেণ্ডা বেড়াতে যাবার জন্যে। ৮ই তারিখে এখান থেকে চাঁইবাসা যাবো—সেখান থেকে সারেণ্ডা রওনা হবো। সারেণ্ডা বিখ্যাত অরণ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি অপূর্ব্ব। সিংহভূমের বিখ্যাত বন। ওখানে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

ঘাটশিলা থেকে বন ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে রাত ১১টার গাড়ীতে চাঁইবাসা রওনা হই। সঙ্গে রইল ওভারসিয়ার নসিরাম। বেশ শীত রাত্রে। সিন্‌হা সারেণ্ডা-বনের ভার পেয়েছিলেন এ মাসে। গোটা বনটা ঘুরে আসবেন, আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন। তাঁরই আহ্বানে আসা।

চাঁইবাসাতে সুবোধবাবুর আপিসে বসে সকালে চা খেলুম ও অনেক গল্পগুজব হোল। কাল বেলা একটার সময় চাঁইবাসা থেকে রওনা হয়ে এলুম হাটগামারিয়ায় পরেশ সান্যালের ওখানে। তারপর বনপথে মোটর ছুটলো। টক্‌টকে লাল মাটির পথ ও দুধারে ঘন জঙ্গল। আগে নোয়ামুণ্ডী, পরে এলুম গুয়া। দুই জায়গাতেই টাটা ও আর একটি কোম্পানীর লৌহ সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েচে—লোহার পাহাড় কেটে লৌহ প্রস্তর টন টন গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে চলেচে। গুয়াতে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী চা পানান্তে আবার ঘনতর জঙ্গলের পথে এলুম কুম্‌ডি বাংলোতে। নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে পথ, কারো নদী পার হয়ে অদ্ভুত বনশোভা—ফুটন্ত পিটুনিয়া ও বন্য কাঞ্চনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সন্ধ্যায় গাড়ী কুম্‌ডি পৌঁছে গেল। ডাকবাংলোর কাছেই বনের ভেতর দিয়ে কোইনা নদী কলকল শব্দে বয়ে চলেচে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী—কাল রাসপূর্ণিমা। জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা পায়ে হেঁটে কোইনা নদী পার হয়ে বনের মধ্যে কতদূর বেড়াতে গেলুম। লোকালয় নেই কোথাও—গুয়া ছাড়িয়ে ষোল মাইল অবিচ্ছেদে অরণ্যপথ দিয়ে এসে বন বিভাগের এই বাংলো। বনের পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখলুম সেই বিরাট অরণ্যের প্রাচীন বনস্পতি শ্রেণীর মধ্যে শুক্লা চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্নার রূপ। জ্যোৎস্নাস্নাত বিশাল অরণ্যানী যেন প্রাচীন ঋষির মত শান্ত, সমাহিত। এক-একটা গাছ নাকি ১৫০।১৬০ বছরের। আমার প্রপিতামহের শৈশবেও এ সব গাছ এমনিই ছিল।

বড় ঠাণ্ডা। শিশির পড়চে। কারো নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে তারপর বাংলোতে ফিরে এলুম। বন্য হস্তীর ভয়ে বেশিক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে বসতে সাহস হোল না।

আজ বেলা ১২টার সময়ে মোটরে রওনা হয়ে মাইল চারেক গিয়ে এক বনের মধ্যে গাড়ী রেখে শশাংদা বুরু আরোহণ শুরু করলাম। শশাংদা বুরু সারাণ্ডা অরণ্যের সর্ব্বোচ্চ পাহাড় —উচ্চতা ৩০৩৮ ফুট। প্রায় কালিম্পং-এর উচ্চতা। মোটর ছেড়ে ৫।৬ জন লোক বনপথে পাহাড়ের গা কেটে বনবিভাগের তৈরি রাস্তা বেয়ে চলেচি। একদিকে শৈলগাত্রে নিবিড় অরণ্য, দুটি ঝর্ণা বনের মধ্যে কলধ্বনি করে নেমে চলেচে। বনের মধ্যে বন্য কদলী-বৃক্ষ—

ঠিক যেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মত। একটা স্থানে এসে পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করলুম। খাড়া উঠেচে, অতি দুরারোহ শৈলগাত্র, নিবিড় বনের মধ্যে সোজা হয়ে উঠে চলেচে। একটা বনমোরগ আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে বনের মধ্যে পালালো। বড় বড় মোটা মোটা শাল, ধ, করম, আসান, লুদাস, পানজন, আন্দী, বন্য কাঞ্চন, টাঁহড় লতা আরও শ' দুশো রকমের গাছ ও লতাপাতা। ৬০।৭০ বছরের পুরোনো টাঁহড় লতা (bohinia vallai) গাছের মাথার কাছে ঠেলে উঠেচে। এক এক জায়গায় পাহাড়ের ও বনের ফাঁকে দূরের ছোট বড় পাহাড় চোখে পড়ে। চাড্ডা গাঢ়া নামক পার্ব্বত্য ঝর্ণার কলকল জলপতন ধ্বনি বনে বনে, স্তরে স্তরে যেন নেমে চলেচে নীচের দিকে—উপত্যকার নিবিড় অরণ্যে এ গম্ভীর শব্দ একটি উদাত্ত সঙ্গীতের সৃষ্টি করেচে। বড় ক্লান্তি হচ্চে। এত দুরারোহ পাহাড়—শেষের দিক যেন আরও বেশি। পা যদি সামান্য একটু পাথরেও আটকে যায়—তাও যেন তুলে ফেলতে কষ্ট হচ্চে। ঘন ঘন হাঁপাচ্চি—মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে এক রকম যন্ত্রণা হচ্চে। ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম। সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে সঙ্গের বনবিভাগের গার্ড কুড়ুল দিয়ে bohinia vallai-র একটা মোটা লতা কেটে দিলে। Forest Officer ও রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্তকে একটি গল্প শোনালুম। দুজনেই শুনে খুব খুশি। যেখানে চাড্ডা ঝর্ণা পড়চে—সেখানে নালা পার হবার সময়ে মিঃ সিন্‌হা বললেন—Take courage in both hands, দাদা। আমি ববলুম—একটা হাত আটকানো—লাঠি ধরে আছি যে! প্রকাণ্ড আম গাছ বনের মধ্যে এই স্থানে দেখলুম। আজ গোপালনগরের হাট, এতক্ষণ হাটে চলেচে লোকে।

ওপরে উঠে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ তৃণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে এলুম। সেখানে নরম কাদায় কত রকম পশুর পদচিহ্ন। হো ফরেস্ট গার্ডকে আমরা ডেকে বললুম—কি কি জঙ্গলের জানোয়ারের পায়ের দাগ আছে দেখ। সে দেখে বল্লে—হুজুর হাতী, বাইসন, সম্বর বুনো শূওর বেশি। আমি বললুম—বাঘের পায়ের দাগ?

—নেই হুজুর। বাঘ এখন এখানে জল খেতে আসবে না। একটা গাছের ছায়ায় গাছের ডাল-পালা বিছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। চা পান করে বেলা ৪টার সময় রাসবিহারীবাবু বল্লেন—চলুন, বড্ড হাতীর ভয় বেলা পড়লে। তারপর এখানে কি ভাবে একটা বাঘের গর্জ্জন শুনেছিলেন, সে গল্প করলেন। হো কুলী বললে—বাবু রাৎ আনা—উনি বুঝতে পারেন না। শেষে দেখলেন কুলী পিছিয়ে পড়চে। তখন শুনলেন বাঘ ডাকচে বনের মধ্যে। আর একবার একটা হাতীর হাতে পড়েছিলেন, কুলী ছিল সঙ্গে। সে ওঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঢালুর দিকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গেল। আসবার সময় আরও অদ্ভুত দৃশ্য। হল্‌দে রোদ দূর পাহাড়ের মাথায়, অরণ্যবনস্পতি-শীর্ষে। নামচি, নামচি—সেই দুরারোহ পথে হড়কে পড়ে যাওয়ার ভয় প্রতি মুহূর্ত্তে। রোদ কমে এল। বনের ছায়া নিবিড়তর হচ্চে। এক জায়গায় barking deer ডাকচে, ঠিক কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করে। বনের

আমলকী পাড়িয়ে নিয়ে খেতে খেতে এলুম। বনের মধ্যে কামিনী ফুলের গাছ দেখলুম এক স্থানে।

নীচে নেমে বনের মধ্যে দিয়ে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে এসে আমাদের মোটরের কাছে এলুম। গুয়া রেল স্টেশন থেকে শশাংদাবুরু প্রায় ১৬॥ মাইল। এ অপূর্ব্ব বনশোভা যদি কেউ দেখতে যান তবে হেঁটে তাকে আসতে হবে এই ১৬॥ মাইল পথ। কোথাও কোনো লোকালয় নেই—শশাংদাবুরু মালভূমি বা তার আশপাশে কোথাও একখানা বন্যগ্রাম পর্য্যন্ত নেই। পথে যথেষ্ট বন্য হস্তীর ভয়। আমরা মোটরে আসচি কুম্‌ডিতে শশাংদাবুরু থেকে নেমে—হঠাৎ ফরেস্ট গার্ড হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—হাতী! হাতী!

আমরা সকলে চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে শৈলসানুর বনে একটা লাল রংএর ধুলো মাখা হাতী বনের মধ্যে আমাদের দিকে পিছন ফিরে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কেবলই ভাবচি শশাংদাবুরুর ওপরে কেউ যদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বেশ হয়।

আজ আবার রাসপূর্ণিমা। সন্ধ্যায় বাংলোর বারান্দাতে বসে চা খাচ্চি—পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের মাথায়। গোপালনগরের হাট করে বাড়ী ফিরচে পঞ্চা মাস্টার ওর গরুর গাড়ীতে। বাংলোটি চমৎকার স্থানে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, ঘন বন। পাশেই দিনরাত শুনচি কোইনা নদীর কুলুকুলু শব্দ বনের মধ্যে। জ্যোৎস্নারাত্রে নদীর ধারে একটা শালগাছের শুক্‌নো গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলুম। আমি ও মিঃ সিন্‌হা। জল চক্ চক্ করচে জ্যোৎস্নায়।

আজ ভগবানের বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করেচি শশাংদাবুরুর শৈলারণ্যে—তিনিই সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েচেন। প্রাচীন বনস্পতিতে তাঁর গম্ভীর রূপ—আবার বন্য লুদাম, বন্য চিরেতার অতি সুন্দর পুষ্পে তাঁর কমনীয় রূপ। তিনি অব্যক্ত, অনন্ত।

আমার মনে হয় সারেণ্ডা ভ্রমণের মন ছিল আমার বহু দিনের। তাই তিনিই দয়া করে যোগাযোগ ঘটালেন। এ এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জীবনের। সেই শৈলশীর্ষে রাঙা রোদ, ঘন বনে সেই চাড্‌ডা ঝর্ণার জলপতন ধ্বনি, সেই প্রাচীন বনস্পতি-শ্রেণী, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালার সমারোহ—সেই সুগন্ধি বন্য কুসুমরাজি—এ সব যদি আমি না দেখতুম মনের মধ্যে এর ছবি যদি না এঁকে রাখতুম—তবে আমার জীবন ফাঁকা থেকে যেতো। হে বিশ্বশিল্পী, তোমাকে এই করুণার জন্য ধন্যবাদ।

কি চমৎকার কমলালেবু কুমডি বনবিভাগের বাংলো-সংলগ্ন বাগানে। ফলভারে গাছ অবনত হওয়া বলে—সত্যিই তাই। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সকালে খেয়ে দেয়ে আমরা বনপথে থলকোবাদ রওনা হলুম। সারাণ্ডা অঞ্চলের বনের মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই—৩৩০ বর্গ মাইল (ছয় লক্ষ একর) ব্যাপী ছেদহীন নিবিড় অরণ্য। কোইনা নদী পার হয়ে কিছুদূরে বড় বড় শাল গাছ দেখা গেল। পথে বনে সত্যিই চাঁপাফুলের গাছ দেখা গেল—ভেড্‌লেডিয়া নয়, সত্যিই চাঁপা। কোদলিবাদ নামক বন্য গ্রামে একটি বনান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ছিলেন ১৯২৬ সালে—যখন তিনি প্রথম বনবিভাগে ঢোকেন। আমরা

সেই কুটিরে গেলুম—বন এসে পৌঁছেচে ঘরের উঠানে। চারিধারে বন ও পাহাড়। মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—অদূরে বনে barking deer ডাকতো—কত শুনেছি। বিকেল ৪টার সময় থলকোবাদ বাংলোতে এসে গাড়ী থেকে নামলুম। জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র শৈলোপরি এই অতি সুন্দর বাংলোটি অবস্থিত। আমরা পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডে বসে চা খাচ্চি, নিকটেই শৈলারণ্যে কর্কশ স্বরে একটা পাখী ডেকে উঠলো। বিজয় আরদালী বল্লে—ময়ূর। সে এই সারাণ্ডা বিভাগে অনেকদিন আছে। তারপর একটা গম্ভীর শব্দ শোনা গেল—মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বর। আমি বাংলোর পিছনে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে খানিকটা বসলুম। পাথর বেরিয়ে আছে, শুকনো খটখটে জায়গা। অজস্র বনতুলসীর গাছ। সন্ধ্যার আগে আমরা থলকোবাদ গ্রাম ছাড়িয়ে বনের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। আমি, রাসবিহারী গুপ্ত ও মিঃ সিন্‌হা। ঘন বন, অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকচে। ওঁরা প্রথমটা যেতে চাননি হাতীর ভয়ে। সারেণ্ডা অরণ্য বন্য হস্তীতে পরিপূর্ণ। একজন কর্ম্মচারী বলছিল বাংলোর কম্পাউণ্ডে রোজ রাত্রে হাতী আসে। যেখানে সাইন-বোর্ডটা আছে, সেখানে তিন দিন আগে হাতী এসে সাইনবোর্ডখানা উপড়ে ফেলেছিল খুঁটিসুদ্ধ। আবার পোঁতা হয়েচে। বনের মধ্যে আমরা বসে আছি, সেই ঘন-অন্ধকারে ভরা বনভূমির কি রূপ! ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে, এই সময়ে। চাঁদ উঠলো একটু পরে দূরে বনের মাথায়। রাসবিহারীবাবু বল্লেন—আজ দেখচি পূর্ণিমা। আমিও লক্ষ্য করলুম পূর্ণচন্দ্রই বটে। যদিও ভেবেছিলুম কালই পূর্ণচন্দ্র উঠেছিল। দুটি লোক বনের মধ্যে শুঁড়ি পথ বেয়ে অন্ধকারে আসছিল—আমাদের দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়ালো। কাছে এলে বল্লুম—কোথায় গিয়েছিলি? তারা বল্লে—বাজারে।

—কোথায় বাজার?

—বালজুড়ি।

—কতদূর?

—পাঁচ ক্রোশ বাবু। বোনাইয়ের মধ্যে।

শুনলুম এই অরণ্যের দক্ষিণে কেউনঝর ও বোনাই স্টেট্—পশ্চিমে গাংপুর। উড়িষ্যার বনপর্ব্বত-সঙ্কুল দুটি রাজ্য। কি চমৎকার পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের ফাঁক দিয়ে। পেছন দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি বনের গাছের গায়ে জ্যোৎস্না পড়ে অদ্ভুত শোভা হয়েচে। এ বারাকপুরের বাঁশবন নয়—শ্বাপদসঙ্কুল বন্যগজ-অধ্যুষিত ময়ূর-নিনাদিত অরণ্যভূমি—সারাণ্ডা। সিংভূমের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, নিবিড়তম ও ঘনতম অরণ্য।

কয়েকটি গাড়োয়ান Bengal Timber Co-'র কাঠ বোঝাই করে থলকোবাদ গ্রামে সন্ধ্যাবেলায় গাছতলায় রেঁধে খাচ্চে। আমরা গিয়ে আলাপ করলুম। তাদের নাম বিরসা, নীলা সব মাহাতো। বাড়ী জেরাইকেলা। দিন এক টাকা হিসাবে পায় গাড়ী-ভাড়া বাবদ। ঘন-জঙ্গলের পথে প্রত্যেক মাসে তিনবার আসে ভাড়া বইতে। ছ'দিন করে থাকে।

আমরা বল্লুম—কি রাঁধচিস ?

—ভাত আর দাল।

—আর কিছু ?

—না বাবু।

বনের মধ্যে রওনা হবে শেষ রাত্রে উঠে। এই ভীষণ শীতে শালগাছের তলায় মুক্ত হাওয়ায় শুয়ে রাত কাটাবে। বিছানা নেই—একখানা বন্য খেজুরের ছেঁড়া চেটাই ও আধ-ছেঁড়া পাতলা মলিন কাঁথা সম্বল। শুনলুম পথে বাঘের উপদ্রব আছে। গত বছর চলন্ত গাড়ী থেকে বাঘে অনেক বলদ নিয়ে পালিয়েছিল। রাসবিহারীবাবু এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বলপুরের অরণ্যে সকাল আটটার সময় গরুর গাড়ী থেকে বলদ নিয়ে গিয়েচে বাঘে—তিনি জানেন, স্বচক্ষে দেখেছেন।

ভাবলুম—এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণবস্তু। অথচ কি দুঃখপূর্ণ জীবন এদের! নিরাবরণ আকাশতলে হিমবর্ষী রাত্রে কাঁথা গায়ে শোবে, বাঘের মুখে রাত্রে গাড়ী চালাবে—মজুরি কত, না দৈনিক একটাকা!

অনেক রাত্রে বাংলোর বাইরে চেয়ার পেতে বসলুম। অদূরে গম্ভীর শৈলারণ্যের জ্যোৎস্নাস্নাত রূপ কি বর্ণনা করা যায় ? ভগবানকে যদি ঠিকমত উপলব্ধি করতে চাও, তবে এইখানে এই পট-ভূমিতে সেই বিরাটের রূপ ধ্যান কর—লোকালয়ের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে ময়ূর-নিনাদিত অরণ্যভূমির প্রান্তে। এই হিমবর্ষী আকাশতলে ঐ দরিদ্র গাড়োয়ানদের ছেঁড়া চেটাইতে শুয়ে রাত কাটাও। একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ব, প্রবন্ধটার নাম দেবো—'বনান্তে সন্ধ্যা'। ভগবানের সৌন্দর্য্য যে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করচি—যেদিকে চাই, সেদিকেই বিরাটের আসন পাতা, সেই মহাশিল্পীর হাতের কাজ চারিদিকে ছড়িয়ে। জয় হোক তাঁর।

এক জায়গায় পাতার কুঁড়ে বেঁধে জনকতক লোক রেঁধে খাচ্চে সন্ধ্যাবেলা। ওদের হো ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে রাসবিহারীবাবু। ওরা হো ভাষাতেই জবাব দিলে। শুনলাম ওদের বলে 'মারাকাশি', বোনাই ও গাংপুর স্টেট্ থেকে আসে আমের কাঠ চেরাই করতে। ওদের পাতার কুঁড়ের কাছে একটা বিরাট আট ফুট পরিধি-বিশিষ্ট শালগাছ, উচ্চতায়ও প্রায় ৫০।৬০ ফুট। বনস্পতি একেই বলে—বৃক্ষ-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা হয় দেখলে।

গভীর রাত্রি। আমরা বাংলোর বাইরে ত্রিশ গজ আন্দাজ গেলুম। রাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মাথার ওপর উঠেচে। একটা উঁচু টিলা—অথবা সেটা এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া—সেখানে ঘাস নেই, শুকনো খটখটে জায়গা—মাঝখান দিয়ে পথ, দুধারে শাল ও আমলকী বন, আজ বৈকালে যেখানে গিয়ে বসেছিলুম সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়াই। জ্যোৎস্নার বর্ণনা নেই—এ জ্যোৎস্না-স্নাত বনভূমি ও অদূরবর্ত্তী শৈলমালার বর্ণনা নেই। কে দিতে পারে এর বর্ণনা ? গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ ঘন বনের মধ্যে কোথায় অবিশ্রান্ত জল-পতনধ্বনি। এ ধ্বনি বনের মধ্যে চাড্‌ডা ঝর্ণায় শুনেছি শশাংদাবুরু আরোহণের সময়, এ শব্দ শুনেছি কাল ও পরশু রাত্রে কোইনা নদীতে ঘন বনে—কুম্‌ডি বাংলোতে—আবার

থলকোবাদ বাংলোতেও শুনেচি। কোথায় একটা সম্বর হরিণ পূর্ব্বদিকের পাহাড়ে গম্ভীর আওয়াজ করলে। মাথার ওপরে দু-চারটে নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্চে।

টিলার দক্ষিণে যে শালবন, তার শিশিরসিক্ত পত্রপুঞ্জ জ্যোৎস্নায় চক্‌চক্ করচে। ডাইনে একটা গাছের গায়ে বন্যহস্তী তাড়ানোর উঁচু মাচা। এই গভীর রাত্রে অরণ্য-নিঃশব্দতার মধ্যে—দূরবর্ত্তী অপরিচিত পাহাড়ী ঝর্ণার জল-পতনধ্বনি ও দু-একটা নৈশপাখীর কূজন দ্বারা বিখণ্ডিত যে গম্ভীর নৈঃশব্দ্য, এর মধ্যে কান পেতে থাকলে যেন কার বাণী শুনতে পাওয়া যায়। শুনলামও তাঁর বাণী, শুনে সারা হৃদয় মন জয়ধ্বনি করে উঠলো সেই বিরাট স্রষ্টা, সেই সৌন্দর্য্যশিল্পী, সেই রহস্যময় অনন্তের উদ্দেশে! মুখে কিছু বলা যায় না। পনেরো মিনিট বাইরে ছিলাম এই পৌর্ণমাসী রজনীর মায়াময় জ্যোৎস্নালোকে বাংলো থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে বাংলোর সাদা বাড়ীটা বা কোনো লোকালয়ের চিহ্ন চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় একা একা আমি এই জনহীন গভীর বনভূমিতে এই গভীর রাত্রে আকাশ ও বনের দিকে চেয়ে আছি —এই পনেরো মিনিটে পনেরো বছরের জ্ঞান সঞ্চার হোল। চোখ যেন খুলে গেল। তাঁর জয় হোক।

সকালে উঠেচি—মিঃ সিন্‌হা ডেকে বল্লেন—ময়ূর দেখুন! পাশের উপত্যকায় মাঠের মধ্যে ছ-সাতটি বড় বড় ময়ূর দেখে বড় খুশি হই। বেলা দশটার সময় মোটরে বার হয়ে আমরা 'কোদলিবাদ ১৫-এর' ঘন জঙ্গলে গেলুম। কায়াউলি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রথমে পেলুম। বড় বড় পাথর বাঁধানো জায়গা। পাথরের ওপর দিয়ে নদী বয়ে চলেচে। বনের পথে নামচি উঠচি—দুধারে শৈলশ্রেণী—আবার এক ঝর্ণা। তারপর কোইনা নদী ঘন বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। কোইনা নদীর পাষাণময় তীরের ঘন বনের ধারে বসে আমি ১৯৩১ সালের ব্ল্যাকউড্‌স ম্যাগাজিনে 'Cast adrift in the woods' বলে একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে লাগলুম। মাঝে মাঝে মুখ তুলে চেয়ে দেখি ঝোপ ও লতা দিয়ে তৈরি নিবিড় বন যেন বাংলা-দেশের বনের পদ্ধতি-বিশিষ্ট—যেন কুঠী মাঠের বন—শুধু শাল আসান নয়। পথে তিন রকমের ফুল অজস্র ফুটে—দেবকাঞ্চন, বন্য পিটুনিয়া ও ঈষৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট এক রকমের হলদে ফুল, বেশ দেখতে। কামিনী ফুলের গাছ জঙ্গলের মধ্যে যথেষ্ট। সকালে চমৎকার আলোছায়ার খেলা জঙ্গলে—নিবিড় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোক এসে পড়েছে, বন্য-পক্ষীর কূজন, কোইনা নদীর মর্ম্মর কলতান, বামে নদীর ওপারে প্রায় দুশো গজ দূরে পাহাড়শ্রেণী কি সুন্দর লাগছিল। ভগবানকে মন থেকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। আরও কিছুদূরে গিয়ে কোইনা নদী আর একবার ঘুরে আমাদের পথে এসে পড়ল—এখানে একদিকের পাড় উঁচু ও প্রস্তরময়, নিবিড় বনাবৃত। এখানে অনেকক্ষণ বসলুম। কমলালেবু দিলেন মিঃ গুপ্ত। কি পাখীর গান। কি বনানীশোভা! ভূতধাত্রী ধরিত্রী অপূর্ব্বরূপে সজ্জিতা এই ঘনবন পর্ব্বতান্তরালে।

আজ সকালে উঠে ঘন বনের পথে মিঃ সিন্‌হা, মিঃ গুপ্ত ও আমি রওনা হই বোনাই

স্টেটের সীমানা দেখতে। পথে গভীর অরণ্যের মধ্যে কোইনা নদী (যার সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েচে কুম্‌ডি বাংলোর পাশে) কুলুকুলু তানে বয়ে চলেচে, হঠাৎ আমার নজর পড়লো প্রস্তরবহুল একটি চমৎকার জায়গা কোইনা নদীর মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বনের মধ্যে যেখানেই এসব দেশে নদী বয়ে যায়, সেখানে গতিপথে নানা সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেই অগ্রসর হয় নদী, পদে পদে রমণীয় শোভা বিতরণ করতে করতে চলে। পাথরের বড় বড় চাঁই, গাছপালা, বিহঙ্গ-কাকলী, সুস্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া, মর্ম্মর জল-কলতান—যাকে বলে বিউটি স্পট্ (beauty spot) তার আর বাকী রইল কি? কিন্তু এ জায়গার বিশেষত্ব এই, এখানে নদীর মধ্যে যে চড়াসৃষ্টি হয়েচে, যেখানে বালি, বড় জোর পাথরের নুড়ি কি দু-দশখানা পাথরের চাঁই থাকা উচিত ছিল, সেখানে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান মাকড়া পাথর (Labrite) দিয়ে যেন বাঁধানো। কত হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোইনা নদী এমনি বয়ে চলে মাটি ক্ষইয়ে তুলে ফেলে তলাকার পাথর বার করে ফেলেচে, সে পাথরেরও নানাস্থানে মৌচাকের মত অসংখ্য গর্ত্ত সৃষ্টি করেচে। তার প্রায় ৫০।৬০ হাত চওড়া, ১৫০ হাত লম্বা এক সমতল পাষাণের চত্বর-মত নদীর খাতের মধ্যে, কে যেন পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেচে। ঘন বন এর উভয় পাশে, থলকোবাদ নিজেই বনের মধ্যে—সেখান থেকে ছ' মাইল এসেচি মোটরে ঘনতর অরণ্যের মধ্য দিয়ে—তারপর এই সুন্দর ছায়াভরা, পাষাণময় জলকলতান-মুখর, জনহীন স্থানটি। আরও কিছুদূরে একটি বন্যগ্রাম, নাম করমপদা, তার ওধারে সুন্নাগাঁও ও বনগাঁও ব'লে আরও দুটি গ্রাম। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা এসব নয়, বনবিভাগ থেকে এদের বিনাখাজনায় চাষের জমি দেওয়া হয়। ফসল করে তুলতে পারে না বন্যহস্তী ও সম্বর হরিণের উপদ্রবে। বনগাঁও গ্রামের দৃশ্যটি ছবির মত। গাড়ী থেকে নেমে আমরা একটা ছোট্ট টিলার ওপরে বসলুম শালগাছের ছায়ায়, আমাদের সামনে ক্ষুদ্র কোইনা নদী সরু নালার মত বয়ে চলেচে, কারণ এই নদীর উৎপত্তি স্থান অদূরবর্ত্তী বোনাই সীমান্তেব শৈলমালা, এখান থেকে মাইল খানেক মাত্র দূর। নদীর ওপারে ঢেউ-খেলানো জমি পাহাড়ের মত উঠে গিয়েচে, তার গায়ে হরিৎবর্ণ ফুলে ভরা সরগুঁজা ক্ষেত, সবুজ কুরথীর ক্ষেত, দশটা খড় ও মাটির কুটির, গরু-মহিষ চরচে মাঠে, মেয়েরা কাজ করচে ক্ষেতে, ওদের সকলের পেছনে কেউনঝর রাজ্যের ঘনবনাবৃত শৈলমালা। স্থানটি গভীর অরণ্যের মধ্যে এবং চারিদিকে দূরে দূরে পাহাড়। আরও এগিয়ে গেলুম বোনাই রাজ্য ও সারেণ্ডা বনের সীমান্তে। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাঁচশ' ফুট জায়গা ফাঁকা, সব গাছ কেটে সীমা চিহ্নিত করা হয়েচে। তারপর আমরা নেমে গেলুম—ভাবলুম, বোনাই স্টেট্ একবার বেড়িয়ে আসা যাক না। রাস্তা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গিয়েচে ঘনবনের মধ্য দিয়ে—কোনোই পার্থক্য নেই সারেণ্ডা অরণ্যের সঙ্গে। মোটা মোটা লতা বড় বড় প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণীকে পরস্পর সংযুক্ত করেচে, ফাঁক রাখেনি কোথাও, কালকার সেই হলুদ ফুল পথের ধার আলো করে ফুটে আছে, নিস্তব্ধতা তেমনি গভীর, যেমন কিছু পূর্ব্বে সারেণ্ডাতে দেখেচি।

নেমে যেতে আমাদের সামনে পড়লো একটা সংকীর্ণ উপত্যকা, দুদিকে পাহাড়শ্রেণী দ্বারা

ঘেরা। শুধুই বনস্পতির সমারোহ, শুধুই বনশীর্ষ, শুধুই সবুজের মেলা ; একটা কুসুম গাছের তলায় আমরা বসলুম। বনের মধ্যে কর্কশস্বরে কি পাখী ডাকচে। ফরেস্ট গার্ডকে বললুম—ময়ূর ? সে বল্লে—নেহি হুজুর, ধনেশ পাখী। বড় বড় ঠোঁটওয়ালা ধনেশ পাখী দেখেচি বটে, কিন্তু দেখেচি কলকাতার খাঁচায় বন্দী অবস্থায়। এমন ঘন বনে তার আদিম বাসস্থানে, উড়িষ্যার বোনাই স্টেটের অরণ্যে ওর ডাক শুনবো, এ ভাগ্য কখনো হয়নি। ভেবে দেখলুম যেখানে বসে আছি, নিকটতম রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৭০ মাইল—এও জীবনে কখনো ঘটেনি ! কলকাতায় যেতে হোলে এখান থেকে কদিনের হাঁটাপথে গুয়া বা জেরাইকেলা গিয়ে ট্রেনে চড়তে হবে।

বসে আছি, আমাদের সামনের সরু পায়ে-চলা পথ দিয়ে এক কৃষ্ণকায় তরুণ দেবতার মত যুবক, হাতে-বোনা খাটো মোটা কাপড় পরনে, এক হাতে তীরধনু, অন্য হাতে একটা পুঁটুলিতে কি বাঁধা—মাথায় লম্বা লম্বা কালো চুলে কাঠের চিরুনি গোঁজা—ব্যস্ত ও চঞ্চলভাবে কোথায় চলেচে। আমরা ডাকলুম ওকে। সে বল্লে, গির্জ্জায় যাচ্চে, বড় ব্যস্ত। হো ভাষায় বল্লে—মিঃ গুপ্ত তার সঙ্গে কথা বল্লেন এবং সে কি বলচে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। নাম তার মসি, কি তার হাসি, কি তার মুখের সুন্দর ভঙ্গি। তাকে না দেখলে এই গভীর অরণ্য-প্রদেশ যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো না। প্রাচীন দিনের মৌন অরণ্য যেন মুখর হয়ে উঠলো ওর মুখের ভাষায়। ভাল লেগেচে সেই বন্য যুবকের আনন্দ-চঞ্চল গতি, হাসিমাখা মুখ, সরল চোখের চাহনি। নিকটেই কুন্তী বলে একটা গ্রাম আছে বোনাই স্টেটের। পথে টেতী নায়েক বল্লে—গাঁয়ের লোককে বাঘে মেরেচে, পাঁচ বছর আগে সে নাকি দেখেচে। এক বৃদ্ধ লোককে আমরা মোটরে উঠিয়ে নিলাম, তার নাম শামো, তার ভাইয়ের নাম কামো। উড়িয়া ভাষায় কথা বল্লে।

তারপর রাত্রে ও-বেলার সেই কোইনা নদীর সুন্দর জায়গাটাতে এসেচি। ঘন বনের মধ্যে চাঁদ উঠেচে, আমরা মোটরে এসে পৌঁছুলাম। শামো (কামোর ভাই—সে নিজের পরিচয় দিতে গেলে সর্ব্বদাই ভাইয়ের উল্লেখ করে।) এবং কয়েকটি লোক এই বনের মধ্যে আগুন করে বসে আছে। আমাদের জন্যে তাদের এখানে থাকতে বলা হয়েছিল।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনভূমি। রাত্রি দেড়টা। বিশাল সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে পার্ব্বত্য কোইনা নদীর কলতানের মধ্যে বসে আছি, কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর এসেচে। মহামৌন অরণ্যানী যেন এই জল-কলতানের মধ্যে দিয়ে কথা বলচে। সে কি অদ্ভুত, রহস্যময় সৌন্দর্য্য—এর বর্ণনায় কি ভাষা আছে ? যে কখনো এমন হাজার বর্গমাইল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে বন্য নদীর পাষাণ-তটে জ্যোৎস্নালোকিত গভীর নিশীথে না বসে থেকেচে, তাকে এ গভীর সৌন্দর্য্য বোঝাবার উপায় নেই। এই বন্যহস্তী-ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্যে এই কোইনা নদী হাজার হাজার বছর এমনি বয়ে চলেচে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায়, প্রতি শুক্লপক্ষে, চাঁদ এমনি উঠে বনভূমি পরিপ্লাবিত করেচে, এই কোইনা নদীর এই সুন্দর স্থানটিতে আলো-ছায়ার জাল বুনেচে, এমনি সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেচে—কিন্তু কেউ দেখতে আসেনি এর

অদ্ভুত রূপ। নদীর মধ্যে ক্ষুদ্র যে একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েচে, সেই জলটি অনবরত পড়ে পড়ে এক ক্ষুদ্র সরোবরের মত হয়েচে······ওপারের বিরাট বনস্পতিশ্রেণীর ছায়া এখনও তার ওপর থেকে অপসারিত হয় নি—যদিও চাঁদ মাথার ওপরে, জলপ্রপাতের জলধারা চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করচে, শিকররাশি গভীর শীতের রাত্রের ঠাণ্ডায় জমে ধোঁয়ার মত উড়চে—ওর পাষাণময় তটে বসে মনে হোল, বনের মাথায় ওই যে দু'চারটি নক্ষত্র দেখা যায়, ওই নক্ষত্রলোক থেকে অপরিচিত রূপসী দেববালাগণ অদৃশ্য চরণে নেমে আসেন এমনি জ্যোৎস্নাশুভ্র নিশীথ রাত্রে ওই গভীর অরণ্যানী-মধ্যস্থ সরোবরে জলকেলি করতে ইতর চক্ষুর অন্তরালে। মহাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ, মৌন বনস্পতিশ্রেণীর মত ধ্যান-সমাহিত। এই আকাশ, এই নির্জ্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে—সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠচে প্রতি ক্ষণে—কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্চে। চুপ করে বসে জলের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদের দিকে চেয়ে, বনস্পতি-শ্রেণীর মধ্যে জ্যোৎস্নালোকিত শীর্ষদেশের দিকে চেয়ে সে বাণীর জন্য চোখ বুজে অপেক্ষা করো—শুনতে পাবে। সে বাণী নৈঃশব্দ্যের বটে, কিন্তু অমরতার বার্ত্তা বহন করে আনচে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েচে এই আরণ্য-শান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েচে এখানে—এই সমাহিত স্তব্ধতায়—নগরীর কলকোলাহলের মধ্যে নয়। আজ এখানে এসে মনে হচ্চে, অশোকের সময়েও এই কোইনা নদী ঠিক এমনি বয়ে চলতো এই গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—এই অরণ্য আরও গভীরতর ছিল—তারও পূর্ব্বে আর্য্যদের ভারতবর্ষ প্রবেশের দিনও এই নদী এখানে এমনি চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসে নৃত্যশীলা বালিকার নূপুরবাজানো পা-দুটির মত নৃত্যভঙ্গীতে ছুটে চলতো, উদাসীন প্রকৃতি এমনি সাজিয়েছিল এ বনভূমিকে কিন্তু কেউ কখনো দেখুক না দেখুক—প্রশ্নও করেনি। আজ আমরা এসেচি, করুণাময় বিশ্বশিল্পী যেন প্রসন্ননেত্রে হাসিমুখে নীরবতার মধ্যে দিয়ে ওই জলকলতানের মধ্যে দিয়ে বলচেন—কেউ দেখে না, কত যুগ-যুগান্তর থেকে এমনি সাজিয়ে দিই—প্রতি দিনে, সন্ধ্যায়, প্রতি রজনীতে—আজ এলে তোমরা এতদিনে? বড় আনন্দ হচ্চে আমার। দেখ, ভাল করে দেখ।

জয় হোক তাঁর, জয় হোক সে মহাদেবতার!

তারপর শামোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি। ওর ভাই কামো কেমন আছে? সত্তর বছরের বৃদ্ধ, এই করমপদা নামক বন্য গ্রামেই তার জন্ম, আর কোথাও যায়নি—যাবেও না। পঞ্চাশ বছর আগে একবার চাঁইবাসা গিয়েছিল—রেলগাড়ী জীবনে কখনো চড়েনি। তাকে আমরা মোটরে জাতিসিয়াং পর্য্যন্ত নিয়ে এলুম।

তারপর সেই নিবিড় অরণ্যের শিশিরসিক্ত গাছপালায় গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নালোক পড়েচে—সে কি চমৎকার রূপ। মোটরে ফিরবার সময় চেয়ে দেখি কত গাছ, কত পাথর, কত নিবিড় বনঝোপ—আমার ঠাকুরদা সেদিন ছেলেমানুষ ছিলেন—এসব বনে তখনও ঠিক

এমনি জ্যোৎস্না পড়তো—হে প্রাচীন অরণ্যানী, এই অঞ্চলের যে ইতিহাস তুমি জানো, কেউ তা জানে না।

পরদিন সকালে চা পান করে মোটরে বেরুলাম আমি ও মিঃ সিন্‌হা। সুন্দর পাহাড় ও বনের পথে খুব উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এক জায়গায় বনের মধ্যে O. T. T. কোম্পানী রেলওয়ে স্লিপার চেরাই করচে। আজই সকালে একদল ময়ূর দেখেছিলুম থলকোবাদ বাংলো থেকে। লৌহপ্রস্তর ছড়িয়ে পড়ে আছে বনের মধ্যে, কোনো কোনটি বেশ ভারী, প্রায় ৫০ ভাগ লোহা আছে শতকরা। ওখান থেকে আর এক জায়গায় এসে শৈলচূড়ার ওপারের রাস্তা দিয়ে যাচ্চি—দূরে দূরে আরও পাহাড় দেখতে পেলাম। কিন্তু নেমে দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে গিয়ে আর কিছুই দেখতে পাইনে, বড় বড় গাছে চোখের দৃষ্টি আটকেচে। কমলালেবু খেলুম বসে। একটা পাইথনের খোলস পড়ে আছে পথে, মুড়ে দিলেন কাগজে মিঃ গুপ্ত। তারপর দূর দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে, পাশের চওড়া বনাবৃত উপত্যকাভূমির দিকে চোখ রেখে নামচি—ওপর থেকে দেখতে পাচ্চি পথ নেমে নেমে চলেচে এঁকেবেঁকে পর্ব্বতের গা দিয়ে। হঠাৎ একটি সুন্দর স্থানে এলুম, বাংকিগাড়া বা ওরেপুরা বলে একটি নদী বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে। ওপরের টিলার বড় বড় শাল গাছের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কুটির! পথে একটা শালগাছ দেখেছিলুম একশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো, দশ ফুট বেড় গুঁড়ির। আমার ঠাকুরদাদা যখন জন্মাননি, প্রপিতামহ ঠাকুর যখন যুবক, তখন এই শাল ছিল ক্ষুদ্র চারা, কি শক্তি ছিল ওর মধ্যে যে এই ক্ষুদ্র ২ ইঞ্চি চারা এই বিশাল বনস্পতিতে পরিণত হয়েচে, এখনও নাকি বাড়চে। ব্রহ্মশক্তি রয়েচে বিশ্বের সব তাতে। এই সব না দেখলে শুধু 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু' আওড়ালে কি হবে। উপলব্ধি করা চাই। ব্রহ্মশক্তিকে উপলব্ধি করা চাই। বাবুডেরাতে চা পান করে আমরা রওনা হলুম—বেলা সাড়ে তিনটা। তারপরেই ঘন বনের পথ, নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন, ডিকেন্‌ড্রাম ফুল ফুটে আছে—ফুল নয়, কচি পাতা, দেখতে ফুলের মত। একদিকে ওরেবুরা বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে। আসাম অঞ্চলের মত অরণ্য। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। একস্থানে মোটরের পথে আবার এই সুন্দরী পর্ব্বতদুহিতা আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। কুলুকুলু তানে ওর সানুনয় অনুরোধ, আমাকে ভাল করে দেখ। চলে যেও না। এই স্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত, নদীর মধ্যেই। সুনিবিড় বনস্পতিশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় নদী বয়ে চলেচে, এক পাড়ে দুটি তিনটি কুটির বনের মধ্যে। সাবাই ঘাস বিছানো। তার ওপর বসে ভগবানের সৌন্দর্য-সৃষ্টি মনে মনে উপভোগ করলুম। চমৎকার স্থান বটে। পেছনের বড় বড় গাছে অপরাহ্ণের রাঙা রোদ। যেন মুনিঋষিদের আশ্রম, মনে হয় পুরাকালে কোনো উপনিষদের কবি ও দার্শনিক ঋষি এমনই সুন্দর, নিভৃত, শান্ত বনঝর্ণার তীরের কুটিরে পার্ব্বত্য অরণ্যের ঘন ছায়ায় বনকুসুমের সুগন্ধ, চঞ্চল উচ্ছ্বাসময়ী বন্য নদীর নৃত্যছন্দের নূপুর-ধ্বনি ও বিহঙ্গের কলতানের মধ্যে বসে সমাহিত মনে উপনিষদ রচনা করেছিলেন, বিশ্বদেবের উপাসনা আপনা-আপনি

সরল ও সহজ আনন্দের মধ্যে দিয়েই এখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তাঁর উদ্দেশে মনের কৃতজ্ঞতাই তাঁর পূজার অর্ঘ্য। এই স্থানটির নাম দিলুম বনশ্রী।

জেরাইকেলা থেকে আট মাইল এ স্থান, সোজা রাস্তা, চলেচে জেরাইকেলা স্টেশন।

আবার চলেচি, পথে জেরাইকেলা থেকে পাঁচ মাইলে পড়লো সাম্‌টা নালা। এমন চমৎকার নদীগুলির নাম এদেশে মোটেই সুন্দর নয়—বড় কর্কশ নাম দেয় হো ভাষায়। আমাদের বাংলা দেশের অনেক বাজে নদীরও নাম এদের চেয়ে কত ভাল। এই সাম্‌টা নালা পার হয়েই এক রাস্তার মোড়—এক রাস্তা গিয়েচে থলকোবাদ তিরিলপোসি হয়ে। সাম্‌টা নালা বেয়ে কিছুদূর এসে গাছপালার প্রকৃতি যেন বাংলা দেশের মত। ঘন নিবিড় বনানী, বনকলা গাছ, ঝোপঝাপ লতাপাতা, ঠিক যেন বাংলা দেশ। আমার ভিটেতে ব্যারাকপুরে যে গাছ আছে, যার চটিজুতোর মত ফল হয়, এখানে ছোটনাগপুর ইন্‌ডাষ্ট্রিস থেকে যেখানে গাছ কেটেচে সেখানে অবিকল এমনি গাছপালা। শালগাছ নেই, বাংলার মত আরণ্য গাছ। দশ মাইল দূরে একটি অতি সুন্দর উচ্চ স্থান থেকে ঠিক যেন হিমালয়ের দৃশ্য—সামনে সংকীর্ণ উপত্যকায় সাম্‌টা সাপের মত কুণ্ডলী নিয়ে বেঁধে কুণ্ডলীর বেষ্টনীর মধ্যে সবুজ একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেচে—সামনে স্তরে স্তরে পাহাড় উঠেচে, তার ওপর দিয়ে রাস্তা একে বেঁকে চলেচে—দূরে একটি কুটির দেখা যাচ্চে উপত্যকার ওপরে সবুজ বনানীর মধ্যে ডুবে আছে। শুনলাম নিকটেই কোথায় বনের মধ্যে একটি জলপ্রপাত ও একটি গুহা আছে। "In the mountain fastnesses of Hazaribag" ভাগলপুরের সেই উকীল বাবুর কথা মনে পড়লো। সে পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখবার বাসনা ১৯২৬ সাল থেকেই আছে, তহশিলদারের ভাইয়ের মুখে সাতনামা পাহাড়ের বর্ণনা শুনে যা দেখবার বাসনা জেগেছিল। ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো এই তো চাই। তারপর আমার মুক্তি হোক না হোক, আমি স্বর্গে যাই না যাই—এসব ভাবনা আমার নেই। আমি না থাকলেই বা কি? সেই অপূর্ব্ব শিল্পী যিনি এই দৃশ্য সৃষ্টি করেচেন—যুগে যুগে তিনি থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনি সুন্দর ভাবে কল্প থেকে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে, রূপে রূপে তিনি লোকলোকান্তর পূর্ণ করে মহাকালের পথহীন পথে অনন্তকাল একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সরল, চপল, আনন্দোজ্জ্বল নৃত্যচ্ছন্দে হেসে গেয়ে। তিনি দীর্ঘজীবী হোন, চিরজীবী হোন।

ফরেস্টার বুড়ীউলি হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ওই হেন্দেকুলি B. T. T. কোম্পানীর কুলীর তাঁবু। আমরা চলে এলুম পাহাড়ের পথ ঘুরে ঘুরে শুধু বনফুলের শোভা দেখতে দেখতে হেন্দেকুলি তাঁবুতে। এখানে বন বিভাগের একটা ছোট্ট বাংলো আছে পথের পাশের উঁচু টিলাতে। নিচেকার জমিতে সাম্‌টা নালার ধারে অনেক কুলি মেয়ে-পুরুষ সন্ধ্যায় সারি সারি আগুন জেলে ভাত রাঁধছে। ওরা গাঙপুর স্টেট থেকে এসে 'আরাকাশি' অর্থাৎ কাঠ চেরাইয়ের কুলীর কাজ করচে। সেই বনের মধ্যে সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় জন কুড়ি-ত্রিশ মেয়ে-পুরুষকে ভাত রেঁধে খেতে দেখে এমন ভালো লাগলো। ওপরে পাতা-ছাওয়া কুঁড়েঘরে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করি আগুনের পাশে বসে। ওদের টিলার বাংলো থেকে সামনের

পাহাড়ের ও চারিপাশের বনের দৃশ্য অতি গম্ভীর। এই হেন্দেকুলি ক্যাম্প জেরাইকেলা স্টেশন থেকে দশ মাইল। বেড়াতে এসে এখানেও একদিন থাকা যায়। হেন্দেকুলি ছাড়িয়ে জঙ্গল আবার নিবিড়তর, সাম্‌টা নালার দিকে পথ ঘুরে ঘুরে নামতে লাগলো হেন্দেকুলি থেকে—ক্রমেই ঘন জঙ্গল, এখানে দুটি তিনটি রঙীন বন-মোরগকে পথের এপাশ থেকে ওপারে জঙ্গলের মধ্যে উড়ে যেতে দেখলুম—তখন সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অন্ধকারে অরণ্যপথ নিবিড় হয়ে গম্ভীর শোভা ধরেচে। ফরেস্টার বলচে, এ পথে বড় বাঘ আর হাতীর ভয়। গাড়োয়ানদের গরু প্রায়ই বাঘে মারে। হাতী তো এখন এই সন্ধ্যায় বার হয়। বাঘও এই সময় পাওয়া যায়। দুদিকের কালো অন্ধকারে ঢাকা বন যেন চেপে ধরেচে ক্ষুদ্র মোটরখানা। ভয় করচে দস্তুরমত। আমরা অবিশ্যি থলকোবাদ পৌঁছবার আগে একটা Barking deer (কোৎরা) ছাড়া কিছুই দেখলুম না। চা খেয়ে বাংলোতে আগুনের ধারে বসে গল্প করলুম, তারপর আমার বাংলোর কাছেই অন্ধকারে একটু বেড়িয়েও এলুম। কাল সারারাত্রি কেটেছে জাতি সিরাং-এ কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ভে। আজ ঘুমুতে হবে সকাল সকাল। কোৎরা ডাকচে গভীর বনে। ভাঙা চাঁদ উঠেছে বনের মাথায়। রাত ভোর হোল ঘুমিয়ে।

পরদিন সকালে উঠলুম। খুব ভোর। অদূরবর্ত্তী শৈলচূড়ার বনানীশীর্ষে এখনও প্রাতঃ-সূর্যের আলো পড়েনি। যেখানে জল গরম করা হচ্ছে, সেখানে আগুন পোয়াতে গেলুম। Ada Cambridge-এর 'The Restrospect' বইখানা পড়লুম রোদে বসে। আজ এখুনি থলকোবাদ থেকে চলে যাবো তিরিলপোসি। কল্যাণীকে ও মন্মথদাকে পত্র দিয়েচি। কল্যাণীর জন্যে মন কেমন করচে।

ভাবলুম, ওকে আনলে হোত। এই দৃশ্য দেখে কি খুশিই হোত।

ব্যারাকপুরের লোক এখন কি করচে? আমাদের মোটর বারান্দার সামনে এনে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। দুপুরবেলা। ১২॥ হবে, সামনে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পার্ব্বত্য অরণ্যের পটভূমিতে শুভ্রকাণ্ড শিমুল গাছটার দিকে চেয়ে কত কথাই মনে হয়। বারাকপুর, সেই ইছামতী তীরের বনঝোপ থেকে এ সময় বনমরচে ফুলের সুগন্ধ উঠচে—কত দিন দেখিনি। বিরাট সারেণ্ডা অরণ্যানীর মধ্যে বসে প্রকৃতির মনোহর রূপ, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, এই বনানী, এই শৈলমালা দেখতে দেখতে বহুদূরের সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটির সেয়াকুল-ঝোপের কথা কেন বার বার মনে পড়চে। কেন পড়চে কে বলবে?

থলকোবাদ বাংলো থেকে বের হয়ে বাংলোর সামনে পয়োপ্রণালী দেখতে ঢুকলুম জঙ্গলের মধ্যে। এমন জঙ্গল যে ভয় হোল এই দুপুরেই বুঝি বাঘে ধরে। মোটর ছেড়ে গিয়েছিলুম, আবার চলে এলুম গাড়ীতে। ছোট্ট যে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে থলকোবাদের সামনে, জেলার গেজেটিয়ারে তার উল্লেখ আছে। সারেণ্ডার ও সাধারণতঃ সিংভূমের সব পার্ব্বত্য নদী ও ঝর্ণা সম্বন্ধেই কর্ণেল ডালটনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:—"In the reserved forests

the wooded glens and valleys, traversed by rivers and hill streams, have a peculiar charm. Here will be found pools, shaded and rock-bound in which Diana and her nymphs might have deported themselves."

থলকোবাদ বাংলোর নিকটে যে ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলুকুলু শব্দে বনের নীরবতা ভঙ্গ করে আপন মনে নেচে চলেচে, তার সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। যদিও ওয়েবুরা ও সামটা নালা সম্বন্ধে এবং কোইনা নদী সম্বন্ধে এ কথা বেশি খাটে।

কর্ণেল ডাল্টনের উক্তি আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বসে পড়ি বোধ হয় ১৯৩৪ সালে। তখন থেকেই সারেণ্ডা ফরেস্ট দেখবার ইচ্ছে ছিল। কে জানতো তা এভাবে পূর্ণ হবে একদিন, ন বছর পরে সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে তিরিলপোসি বন্য গ্রামের বনবিভাগের বাংলোতে বসে একথা লিখবো।

আরও কিছুদূর এসে এক জায়গায় বনের মধ্যে ঢুকে আমরা শিশিরদা বলে একটা জলাভূমি দেখতে গেলুম। সুনিবিড় বনানী, ঢুকতে যাচ্চি এমন সময় ভীষণ চীৎকারে বনভূমি কাঁপিয়ে কি জানোয়ার ডেকে উঠলো। সঙ্গের ফরেস্টার বল্লে—কোৎরা অর্থাৎ Barking deer—কিন্তু সামান্য হরিণে যে এত শব্দ করতে পারে প্রথমে এ বিশ্বাস হচ্ছিল না। বনের চেহারা দেখে ভয় হয়ে গেল। ডানদিকে পাহাড়ের সানুদেশে নিবিড় অরণ্য, বাঁয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা জলাভূমি, শুধু দামদলে পূর্ণ, জল দেখা যায় না—অজস্র কাশফুল ফুটেচে—এই পাহাড়ী পাথরের দেশে এমন জলাভূমি আর কোথাও দেখিনি—সারা সিংভূমে আছে কিনা সন্দেহ। সারেণ্ডাতে তো নেইই।

আমরা পাঁচ-ছজন যাচ্ছি—মিঃ সিন্‌হা তিরিলপোসির ফরেস্টার, একজন হো, দুজন গার্ড। কিন্তু ওরাই বলেচে বুনো হাতীর বড় ভয় এখানে, যেতে যেতে জলার ধারে হাতীর পায়ের চিহ্ন দেখলাম অনেক জায়গায়। একটা প্রকাণ্ড আমগাছকে কি একটা শক্ত লতায় এমনি জড়িয়ে ধরেচে যে দেখে কেমন যেন বিস্ময় বোধ হোল। কখনো দেখিনি এমন, আমগাছের পাতা দেখা যায় না নীচের দিকে, যা কিছু পাতা সবই সেই লতাটার। তারপর একটা নরম মাটি-ওয়ালা জমি পড়লো। সেখানকার বড় গাছগুলো কাটা হয়েছে বনবিভাগ থেকে—ফলে এক প্রকার কাঁটাওয়ালা ফলের গাছ হয়েচে আমাদের দেশের ওকড়া ফলের মত। পা রাখবার স্থান নেই এতটুকু।

ফরেস্টার বল্লে—এই জায়গায় একটা 'খো' আছে পাহাড়ের গায়ে।

—'খো' কি?

—কেভ্।

আমরা তো তখনি কৌতুহলী হয়ে উঠলুম। দেখতেই হবে গুহা। মিঃ সিন্‌হা একবার বল্লেন—চলুন, বেলা যাচ্ছে, জায়গাটা ভাল নয়। ফরেস্ট গার্ড কিছুক্ষণ আগে হাতীর গল্প বলছিল। একজন ফরেস্টারকে কি ভাবে বেলা চারটার সময় তিরিলপোসি থেকে আসবার সময় হাতীতে তাড়া করেছিল, কি ভাবে সে সাইকেল ফেলে পালালো। এই বনের মধ্যে

এ গল্প সাহসপ্রদ নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে বুনো হাতীর ও বাঘের গল্প সারেণ্ডার সর্ব্বত্র এ ক'দিন শুনে শুনে খানিকটা অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছি।

বল্লুম—চলুন, দেখেই আসা যাক একবার।

সেই কাঁটাওয়ালা ফলগুলো কাঁটার মত কাপড়ে ও জামায় বিশ্রীভাবে বিঁধে যেতে লাগলো। এক জায়গায় সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় নরম মাটিতে কি দেখে ফরেস্টার হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বল্লে—বাঘের পায়ের দাগ। বড় বাঘ।

—ঠিক তো?

—একেবারে ভুল নেই—

ফরেস্ট গার্ডও বল্লে—বড় বাঘের পায়ের দাগ। আর দেখুন, হুজুর, এগুলো বাইসনের—

তা বলে তো ফেরা যায় না। বল্লুম।

এক জায়গায় বন্য অশ্বগন্ধার পাতা তুলে দেখালে ফরেস্টার। আর একটা পরিষ্কার স্থান দেখিয়ে বল্লে—সম্বর এখানে রোদ পোয়ায়। সম্বরের পায়ের দাগ দেখুন কত—

সত্যি, অনেক জানোয়ারের পায়ের দাগ বটে। সম্বর কিনা জানি না, গরু বা মহিষের পায়ের দাগের মত—তবে তার চেয়ে কিছু ছোট। বাইসনের পায়ের দাগ ঠিক মহিষের মত।

ফাঁকা জায়গা পার হতে পনেরো মিনিট সময় লাগলো। স্থানটি অতীব wild—তিনদিকে বনাবৃত পাহাড়ে গোল করে ঘিরেচে, জলাভূমির দিকে সংকীর্ণ ফাঁক। লোহা-চোঁয়ানো রাঙা জলের একটা ঝর্ণা ফাঁকা মাঠ দিয়ে জলাভূমির দামদলের মধ্যে প্রবেশ করলো। রাস্তা থেকে অনেকদূর, প্রায় এক মাইলের বেশি। লোকালয়ের তো চিহ্নই নেই এসব অঞ্চলে। তার ওপর কাঁটাওয়ালা ফলের নীচু আগাছার জঙ্গলের মধ্যে বাইসন, হাতী ও বাঘের পায়ের দাগ। বেলা পড়ে এসেচে। জানোয়ারে তাড়া করলে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু গুহা না দেখে ফিরচি না। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম মাঠ পেরিয়ে—সামনে যে পাহাড় তারই নীচে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড গুহা, মুখের দিকে প্রায় মাটি থেকে ন'ফুট উচু, লম্বায় পঁচাত্তর ফুট। গুহার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিক থেকে ক্ষুদ্র একটি লোহা-চোঁয়ানি রাঙা জলের ঝর্ণা বেরুচ্চে। ভেতরের দিকে উচ্চতা ক্রমশঃ কমে কমে এক-ফুট দেড়-ফুট দাঁড়িয়েচে, যেখান থেকে রাঙা ঝর্ণা বেরুচ্চে সেখানে।

কি গম্ভীর দৃশ্য!

ঘন ছায়া বনে, ঘন অন্ধকার গুহার ভেতরের দিকে। গুহা ওখানে শেষ হল না, ভেতরের দিকে আরও আছে, দেখাই যায় না। গুহার সামনে ঠিক গুহার ছাদ ছুঁয়ে মোটা মোটা প্রাচীন ধাওড়া ও আমগাছ। আমগাছ ও ধাওড়া গাছে কাছির মত লতা উঠেচে জড়িয়ে জড়িয়ে—গুহার মধ্যে বসে শুধু দেখা যাচ্চে সামনের নিবিড় সুপ্রাচীন জঙ্গল। অন্ধকার নামচে বনস্পতির ভিড়ে। রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনায় কবি বাল্মীকি প্রাচীন ভারতবর্ষের বনের যে চিত্র দিয়েচেন, সেই বর্ব্বর অরণ্য-প্রকৃতি এই গুহার সামনে, আশে-

পাশে, সর্ব্বত্র বহু মাইল নিয়ে। দেখলে ভয় হয়, কৌতুহল হয়, বিস্ময় হয়—আবার কি জানি কেন শ্রদ্ধাও হয়।

হঠাৎ ফরেস্টার বল্লে—পাশে আর একটা গুহা আছে—

—কতদূরে ?

—এই পাশেই হুজুর।

দুর্গম লৌহপ্রস্তরের boulder ও জলা, নরম মাটি ঘন জঙ্গলে। জমি উপরের দিকে উঠচে। পাশের পাহাড়ের ছাদটা ক্রমনিম্ন হয়ে এসে এই গুহা তৈরি করেচে বেশ বোঝা যাচ্চে। কিন্তু ক্ষইয়ে গুহা তৈরী হোল কি ভাবে ? ঐ লোহা-চোঁয়ানো ঝর্ণা কি এর হাতিয়ার ?

পাশেই সে গুহা দেখলুম। ঢুকলাম তার মধ্যে। এটা আরও বড়, বাঁদিকে উঁচু ঢিবি মত, লোহা-চোঁয়ানি জল রাঙা পলি ফেলে আন্দাজ লক্ষ বৎসরে এই মাটির স্তূপ তৈরি করেচে। ফরেস্টার দেখালে—আবার একটা বাঘের পায়ের দাগ দেখুন হুজুর—

সত্যি, ঠিক গুহার মুখে লোহা-চোঁয়ানো রাঙা মাটিতে।

—আর দেখুন, শাহী আর হরিণের পায়ের দাগ—বহুৎ।

—শাহী কি ?

মিঃ সিনহা বল্লেন—পর্কুপাইন—

ভাবলুম বাঘ আর অন্যান্য বন্য জন্তুর আড্ডা তো হবেই এমন গুহাতে। এরও সামনে তেমান ঘন জঙ্গল, খুব মোটা একটা জংলি আম গাছ। নিবিড়, দুর্ভেদ্য জঙ্গল চারিপাশে।

কত কথা মনে আসে।

প্রাগৈতিহাসিক মানব কি এ গুহায় বাস করতো ? মেঝের মাটি খুঁড়লে বোধ হয় তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। কত লক্ষ বছরের মৌন ইতিহাস এই গুহার মেজেতে আঁকা আছে—ওই সব বন্য জন্তু-জানোয়ারের মত। কতকাল আগে, পৃথিবীর কোন্ আদিম শৈশবে এ গুহা তৈরী হয়েচে আপনা-আপনি—কোন্ আদিম মানববংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অরণ্যানীর মধ্যে এখানে বাস করতো, কত লক্ষ লক্ষ বৎসর দূরে মন চলে যায় মহাকালের বীথি-পথ বেয়ে। বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায়।

বেশি ভাবতে পারা যায় না। ঐ বনানী-শীর্ষে রাঙা রোদ যেমন আজ, তেমনি কত লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যোদয়, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি পূর্ণিমা অমাবস্যা দেখেচে এই সুপ্রাচীন পার্ব্বত্য-গুহা—যার তুলনায় বেদ-গাথা রচয়িতা ঋষিরা, উপনিষদের কবিদার্শনিকেরা, বেদব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, কপিলাবাস্তু, অশোক কলিঙ্গযুদ্ধ—কালকার কথা।

আচ্ছা, কেউ থাকতে পারে এখানে একা ? উপনিষদের ঋষিরা কি এমনি নিবিড় বনের গুহায় একা থাকতেন ? এখনও কি সাধুসন্ন্যাসীরা ঠিক এমনি নির্জ্জন অরণ্যে এমনি গুহায় একা থাকেন ?

এসবের উত্তর কে দেবে ? মাথা ঘুরে ওঠে যেন ভাবলে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা মনে জাগে। মানুষের যাতায়াত নেই এ গুহায়, তাই এত অদ্ভুত লাগচে, ভয় হচ্চে। এস্থান যদি

লোকালয়ের মধ্যে হোত, রেল স্টেশন থেকে এক মাইল হোত, সাধু-সন্নিসিরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতেন, দেওঘরের তপোবনের গুহার মত—তবে কি এমন অদ্ভুত লাগতো? মোটেই না।

ফরেস্টার বল্লে—চলিয়ে হুজুর। বহুৎ জানোয়ার রহ্‌তা হ্যায় হিঁয়া—চলিয়ে হিঁয়াসে—

মিঃ সিনহা বল্লেন—বেলা প্রায় চারটা, চলুন, এখানে আর থাকা ঠিক হবে না—

আবার সেই কাঁটাওয়ালা ফলের জঙ্গলের মাঠ ও নিবিড় বন পার হয়ে তিরিলপোসি—খলকোবাদ রোডে গাড়ীর কাছে এলুম। আসবার সময় আবার হাতীর গল্প উঠলো—কে যেন বল্লে—এখানে হাতী তাড়া করলে পালাবার পথ নেই—সত্যিই বটে। একদিকে জলা, অন্যদিকে পাহাড়ী ঢাল, বনে ভরা। পেছনে সেই কাঁটাওয়ালা বাঁচির জঙ্গল। কি একটা বোটকা গন্ধ পেলুম এক জায়গায়।

ফরেস্টার বল্লে—সেও পেয়েচে বটে। যাবার সময় এত ভয় হয়নি, আসবার সময় বোধ হয় বাঘ আর হাতীর পায়ের দাগ দেখবার দরুনই মনের মধ্যে এই ছায়ানিবিড় অপরাহ্ণে বিশেষ সাহস খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বেলা সাড়ে পাঁচটায় তিরিলপোসি বাংলোয় পৌঁছে গেলুম।

আজ সকালে চা খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে অনেকদূর গেলুম পায়ে হেঁটে। সিংলুম নালা বলে একটি অতি চমৎকার ঝর্ণা বা পাহাড়ী নদী থেকে খানা কেটে জল আনা হচ্ছে তিরিলপোসি গ্রামের শস্য-ক্ষেত্রে। সেটা দেখতে গেলুম আমরা। সিংভূম বা সারেণ্ডাতে যেখানে বনের মধ্যে পাহাড়ী ঝর্ণা সেখানেই সৌন্দর্য্য—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুন্দর পাথর-বিছানো ঠাণ্ডা জায়গায় জলে পা ডুবিয়ে নিবিড় বনছায়ায় বসে ঝর্ণার মর্ম্মরধ্বনি শুনতে লাগলুম একা একা। চোখে পড়চে শুধু গভীর নিস্তব্ধ অরণ্য, যেদিকে চাই। বেলা বারোটায় ফিরে এলুম। বিকেলে বোনাই স্টেটের বালজুড়ির দিকে যে রাস্তা গিয়েচে পর্ব্বত ও অরণ্য ভেদ করে সেদিকে চললুম। সামনে ঘোর জঙ্গলের দিকে রাস্তা নেমে গিয়েচে দেখে মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সন্ধ্যে হয়েচে, আর এখন জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হবে না। এই তো জানোয়ারদের বেরুবার সময়। যদি হাতী তাড়া করে ওপরের দিকে উঠে পালাতে গেলেই হাতীতে ধরবে, বড় বিপজ্জনক। মাকড়সার জাল বনে সর্ব্বত্র।

সুতরাং ফিরলুম। একটা বড় পাথর-বিছানো স্থানে গাছের তলায় বসলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, সামনের জমি ঢালু হয়ে গিয়ে সিংলুম নালার খাতের দিকে চলেছে। তার ওধারে ঘোর বনে সমাচ্ছন্ন শৈলমালা অন্ধকার দেখাচ্ছে। একটা গাছের ডাল মাথার অনেক ওপরে নত হয়ে আছে। মন এসব স্থানে সম্পূর্ণ অন্যদিকে যায়। কত ধরনের চিন্তা মনে আসে। জীবনের রহস্যের গভীরতার দিকে আপনা-আপনি ছুটে চলে।

কল্যাণীর কথা আজ সারাদিন মাঝে মাঝে মনে হচ্চে। হয়তো আমার চিঠি ও পাবে কাল।

ঠিক সন্ধ্যায় হয়তো বনগাঁ লিচুতলা ক্লাবে যতীনকা, মন্মথদা, সুবোধদা সব বসে গল্প করচে, আজ বিশ বছর রোজ যে ভাবে গল্প করে, তার ব্যতিক্রম নেই।

খুব ভোরে উঠেছিলুম, বেশ জ্যোৎস্নায় নীরব সামনে পর্ব্বত ও অরণ্য। শুকতারা জ্বলজ্বল করচে পূবদিকের আকাশে। খলকোবাদ থেকে কাঠবোঝাই গরুর গাড়ীর দল শেষরাত্রি আড়াইটায় উঠে চলেচে জেরাইকেলা। এখন পাঁচটা হবে। সকালে বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে বসি, বড় বড় শালগাছ, ওদিকে বনাবৃত পর্ব্বত, চারিদিকেই পাহাড় ও বন, মাঝে ফাঁকা ক্রমনিম্ন একটু মাঠমত—সেখানে মোটা মোটা শালগাছ ও শালচারা। ঘন বনে ঘেরা পর্ব্বতের পটভূমিতে শৈলচূড়ার একটি বড় গাছ ছোট্ট দেখাচ্ছে। বিশ্বদেবের উপাসনা এখানেই সার্থক ও সম্পূর্ণ।

চা-পানান্তে অপূর্ব্ব বনপথে গাংপুর স্টেট্ ও সারেণ্ডার সীমানায় অবস্থিত টিকালিমারা নামক গ্রামে চললুম। এ পথ তৈরী হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় কথনো মোটর আসেনি, গরুর গাড়ীও চলে না, সবুজ ঘাসবনে ঢাকা রাস্তা কোন্‌টা বন কোন্‌টা রাস্তা চিনবার জো নেই। মনে হচ্চে যেন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলেচে। দুধারে নিবিড় বন, অনেক ভাল দৃশ্য খলকোবাদ থেকে জেরাইকেলা রাস্তার চেয়ে। গরুর গাড়ীর চাকার দাগ নেই পথে, জন নেই, প্রাণী নেই, সকালের আলো এসে পড়েছে সুদীর্ঘ ও প্রাচীন শাল, আমলকী, পাঠডুমুর, ধওড়া গাছের শীর্ষভাগে—কোথাও মোটা মোটা লতায় জড়াজড়ি করে বেঁধেছে ডালে ডালে, গুঁড়িতে গুঁড়িতে, দেবকাঞ্চন ফুল ফুটেচে সর্ব্বত্র, শিউলি গাছের কত জঙ্গল, এত শিউলি গাছ এদিকের বনে যে এমন অন্য কোথাও দেখিনি, কোথাও ফলে ভরা আমলকীর ডাল পথিপার্শ্বের বিশাল গাছ থেকে রাস্তার ওপর নত হয়ে আছে ছবির মত, কোথাও পাহাড়ী ঝর্ণা বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে ছায়ানিবিড় সুঁড়ি-পথে কুলুকুলু বয়ে চলেচে, কোথাও বা একটা বন-মোরগ মোটরের শব্দে রাস্তার ওপর থেকে ওপাশের বনে উড়ে পালালো, কোথাও রাস্তা ক্রমে নামচে, নামচে, সামনে উচ্চ-বনাবৃত শৈলমালা—আমরা ঠিক যেন চলেচি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মারবার জন্যে ব'লে মনে হচ্চে, কোথাও রাস্তা ও মোটর একেবারে ডুবে যাচ্চে গভীর বনের মধ্যে সমতল উপত্যকায়, সেখানে চারিদিকে বন ও পাহাড়ের সবুজ দেওয়াল কিছু দেখা যায় না—আবার কোথাও পাহাড়ের গায়ে উঠে চলেচি, কোথাও সুদীর্ঘ বনস্পতিশ্রেণী ছায়াভরা বনবীথির সৃষ্টি করেচে, গাছে গাছে চীহড়ের লতা দুলচে।

অবশেষে আমরা বিটকেলসোয়া গ্রামে পৌঁছে গেলুম। চারিদিকে উঁচু পাহাড়, ছোট ছোট ছেলে-পিলে মোটরের শব্দ শুনে ছুটে এল। প্রেমানন্দ নামে একজন মুণ্ডা খ্রীষ্টান আমাদের সব দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। একটা কাঠের ও খোলার ঘরে গ্রাম্য গীর্জ্জা। শুনলাম এ গ্রামের বেশির ভাগ অধিবাসী মুণ্ডা খ্রীষ্টান। মনোহরপুর থেকে জন নামে এক 'খ্রীষ্ট' (এখানে পাদ্রীকে এই বলে) এসে রবিবারে এদের উপাসনা করায়। প্রেমানন্দ এক সময়ে প্রচারকের কাজ করবার জন্যে এই গ্রামে এসে এখানেই রয়ে গিয়েচে। বেশ

বড় খোলার বাড়ী করেচে, লাউ কুমড়া লতা উঠিয়েছে। একটি গৃহস্থের নাম ফিলিপ টোপনো। ঘন্‌শা মুচির মত চেহারা। এত খ্রীষ্টান এখানে কেন? এ কথার উত্তরে ফরেস্টার খুন্টিয়া বল্লে—পালকোটের রাজা এক সময়ে হো-দের ওপর বড্ড অত্যাচার করে। তখন এরা খ্রীষ্টান হয়। মিশনারীদের প্ররোচনায়।

বাঘের অত্যাচার এই সব বন্য গ্রামে। তিনমাস আগে একজনকে বাঘে ধরেছিল। ওরা গরু চরাচ্ছিল বনের ধারে, বাঘে এসে ওকে ধরে। সঙ্গের লোকেরা টাঙি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেয়। বেলা বারোটার সময় ওকে বাঘে ধরে। লোকটার নাম সামুয়েল মান্‌কি। আমাদের বারাকপুরের গ্রামের বাসানে পাড়ার যে কোনো মুসলমান ছোকরার মত চেহারাটা। গাছের ছায়ায় বসে লোকটাকে ডেকে আমরা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলুম—কত বড় বাঘ রে?

—খুব বড় বাঘ হুজুর।

—তোর কোনো হুঁশ ছিল?

—না, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা বাড়ীতে মস্ত বড় একটা শুক্‌নো পাতার টোকা ঝুলছে। দেখতে চাইলাম, নিয়ে এসে দিলে। বোহিনিয়া ভ্যালাইয়ের বড় বড় পাতা দিয়ে করে।

এক স্ত্রীলোক পাতার কুঁড়েঘরে বসে কাঁদচে। তার স্বামী মারা গিয়েচে শুনলুম। তার কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। মানুষের দুঃখের প্রকাশ যেমন বাংলাদেশে, এখানেও এই সুদূর বন্যগ্রামেও তেমনি। কোনো তফাৎ নেই।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ওপারে গাংপুর স্টেট। দক্ষিণ-পূর্ব্বে বোনাই স্টেট্। যে রাস্তায় আমরা এলুম এই রাস্তা চলেচে বোনাই স্টেটের বালজুড়ি গ্রামে, এখান থেকে পাঁচ মাইল। নিভৃত বনের মধ্যে বালজুড়ির পথে এক জায়গায় খ্রীষ্টান মুণ্ডা কুলীরা কাজ করচে। তাদের হাজিরা নেওয়া হোল ঘন বনের ছায়ায় বসে। এই পথে আজ মাস দুই আগে প্রকাণ্ড নরখাদক রয়েল বেঙ্গল ব্যাঘ্র একটি মানুষ মেরেচে।

কুলীদের নাম :—

নান্দী কুই

সুনি কুই

রাইমতী কুই

চাম্পু কুই

রাহিল কুই

ক্রিষ্টিনা কুই

যশোমনি কুই

বোবাস মুণ্ডা

ইলিসারা কুই

বাইবেলের বহু চরিত্রই এই ঘন জঙ্গলে মাটি কাটচে, সবাই মেয়েছেলে। 'কুই' এদেশে হো ভাষায় কুমারী মেয়ের নামের শেষে বলে।

বর্ষাকালে দু'মাস গ্রামের লোক জংলী ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। এখানে বলে "কান্দা"। নানারকম মিষ্ট কন্দও নাকি আছে। তাছাড়া জংলি আম, বেল ও কাঠডুমুরের পাকা ফলও বনে মেলে। কাঠডুমুর (Ficus Cunia) বাংলাদেশে নেই—এই অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখিনি। প্রেমানন্দ গ্রামের মুণ্ডারি বা সর্দ্দার। বল্লে—এখানে চালের বড়ই কষ্ট, বোনাই স্টেটে ৵৬ সের চাল টাকায়, কিন্তু এখানে আনতে দেয় না হুজুর। পথের মধ্যে বোনাই আর সারেণ্ডার সীমানায় সিপাই বসিয়ে রেখেচে।

চলে এলুম। একটা ঝর্ণা গ্রামের মধ্যে দিয়ে বইচে—এর নাম বিটকেল সোয়া নালা, আসলে এই গ্রামের নামেই এর নাম। স্বচ্ছন্দগতি নৃত্যপরায়ণা বন্য নদীর নাম আর কি ক'রে হবে! এই একমাত্র লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে আবার নাচতে নাচতে ঢুকে পড়লো বোনাই স্টেটের অরণ্যভূমিতে। তার এই নাম!

বেলা বারোটা। আমরা ফিরলুম, চমৎকার শান্ত গ্রামখানি। এই ঘন বনের মধ্যে এর জন্ম ও মরণ। বিস্রার বাজার থেকে চিনি, আটা, তেল আনে। বিস্রা ষোল মাইল দূর এখান থেকে। মহুয়ার তেল খায়, ও নাকি ঘি'র মত, শ্যামুয়েল মান্‌কি বল্লে। খ্রীষ্টান হয়েচে বটে কিন্তু অসুখ হোলে বনে গিয়ে লুকিয়ে বোংগা পুজো করে।

ফিরে এলুম বনের পথ দিয়ে। স্নান করেই খেয়ে তখুনি আবার মোটরে বার হই টোয়েবু নামে একটি নিবিড় বনে অবস্থিত একটি জলপ্রপাত দেখতে। তিরিলপোসি বাংলো থেকে থলকোবাদের পথে চার মাইল গিয়ে গাড়ি রেখে হেঁটে চল্লুম বনের মধ্যে। সঙ্গে ফরেস্টার খুণ্টিয়া, দুজন ফরেস্ট গার্ড, মিঃ সিন্‌হা। বনে অত্যন্ত আগাছা, বিশেষতঃ সেদিনকার সেই ওকড়া জাতীয় ফল। ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর বনে ঢুকে গেলুম। এমন বনের চেহারা এই সারেণ্ডাতেও আর দেখিনি। কিন্তু অদ্ভুত সৌন্দর্য্য সে ঘোর বনের। বিশাল বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রামের সাদা পাতা গজিয়ে ঠিক ফুলের মত দেখাচ্ছে, এ লতা যে অত উঁচুতে উঠতে পারে তা জানতাম না। একস্থানে সুঁড়িপথের দুধারে নদী কাঁঠান নামক এদেশী গাছের জঙ্গল, বড় বড় আমগাছ, শালগাছ, মোটা মোটা লতা ডালে পালায় জড়িয়ে দুর্ভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ্য করে রেখেচে বনভূমি। ভয় হয় এ বনে ঢুকতে, বিশেষত যে রকম হাতী আর বাঘের ভয় বনে। এক এক স্থানে সুঁড়িপথটুকু ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে কিছুই দেখা যায় না। চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। ওকড়া জাতীয় শুকনো ফল সারা গা এমন কি মাথার চুলে পর্য্যন্ত আটকে যাচ্চে। কোথাও নিবিড় সেগুন বন, কোথাও জলাভূমি, কোথাও কাঁটাবন, পথ নেই বল্লেই হয়। একস্থানে নরম মাটিতে মস্ত বড় বাঘের পায়ের থাবা আঁকা। হাতীর নাদ আর পায়ের দাগ তো সর্ব্বত্র। বাইসনের পায়ের দাগও আছে। এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড দুটি দাঁড়িয়ে বনের দিকে চেয়ে আপনাদের মধ্যে কি বলতে লাগলো। কি ব্যাপার? বাঘ দেখেচে নাকি,

না হাতী? মিঃ সিন্‌হা ধমক দিয়ে বল্লেন—আরে ক্যা হায় বোলো না। ওরা বল্লে—বানর, হুজুর।

ক্রমে একটা প্রস্তরময় স্থানে এলুম। একটি পাহাড়ী ঝর্ণা পাথরের ওপর দিয়ে চলেচে। আমি ভাবলুম, এই বুঝি সেই জায়গা। কিন্তু ফরেস্ট গার্ড থামে না। চলেচে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, শুধু তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাচ্চি। এই সরু বনপথ নাকি বোনাই স্টেট্‌ থেকে আসবার শর্ট-কাট্‌—তাই ওদিকের বালাজোড় প্রভৃতি স্থান থেকে এ পথে পথিক লোক আসে। কিন্তু কেমন সে পথিক যে এই বন্য গজ ও ব্যাঘ্র অধ্যুষিত নিবিড় ও দুর্ভেদ্য বনপথ দিয়ে শর্ট-কাট্‌ করে সোজা সড়ক ছেড়ে, কত বড় তার বুকের পাটা তা বুঝতে পারলুম না। আবার কিছুদূর গিয়ে আর একটি প্রস্তরময় স্থানেও পাহাড়ী নদী। এখানে ক্ষুদ্র একটি cascade-এর সৃষ্টি করে ঝর্ণাটি চলেচে বয়ে। বেশ জায়গাটি, ভাবলুম, পৌঁছে গিয়েছি বুঝি—এই সেই টোয়েবু ঝর্ণা। দু-চারটি বন্যঘাসে ছাওয়া কুটির এখানে রয়েচে বনস্পতিদের ছায়ায়, বনবিভাগের কুলীরা গত বর্ষাকালে লতা কাটতে এসে এখানে ছিল; তারাই তৈরি করে রেখেচে—এখন কে আর থাকবে এখানে? শুনেছিলুম মাত্র দু'মাইল, অথচ তিন মাইল এসে গিয়েচি, আন্দাজে মনে হচ্চে, একঘণ্টা ধরে অনবরত হাঁটচি, অথচ টোয়েবু জলপ্রপাতের শব্দও তো শুনচিনে কোথাও। আবার পাহাড়ের মত উঁচুপথে পাথর ডিঙিয়ে চড়াইয়ের পথে উঠি, আবার উৎরাইয়ের পথে নামি—একস্থানে ফণি-মনসার গাছ অনেক, কালো পাথরের রুক্ষ জমিতে যথেষ্ট জন্মেচে। এবার বাঁদিকে জলের শব্দ পেলুম—আমাদের হাত-পাঁচেক নীচে অনেকখানি স্থানে পাথর বেরিয়ে আছে, তার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে। এ ছাড়িয়েও ফরেস্ট গার্ড চলে যাচ্চে।

আমরা বলি—আর কতদূর?

—এই হুজুর, তবে নামতে হবে নীচে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওপরের পথটা ছেড়ে মালভূমির নীচের দিকে নামতে লাগলুম উপত্যকার সমতলে। কাঁটায় কণ্টকময় বনফুলে এই চার মাইল আসতে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ঝি ঝি করে জ্বলচে। কিন্তু নেমে গিয়ে হঠাৎ যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভরা দৃশ্য ক্লান্ত চক্ষুর সামনে খুলে গেল, তার বর্ণনা দেওয়া বড় কঠিন। সেই ছায়ানিবিড় অপরাহ্ণ, সেই বাঘের পায়ের থাবা-আঁকা ঘোর জঙ্গলের পথে না হেঁটে এলে, সেই জনমানবের চিহ্নহীন বনানীর গোপন অন্তরালে লুকানো গম্ভীরদর্শন জলপ্রপাতের কথা কি করে বোঝাবো?

অনেক বড় বড় চৌরস পাথরের বড় বড় boulder ঝর্ণার মুখে পড়ে আছে, তারই একটার ওপরে গিয়ে বসলুম। বেলা তিনটা বাজে, এখুনি সেখানে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমার সামনে একটা জলাশয়, ঘন কালো ঈষৎ সবুজাভ তার জল। এই জলাশয় নাকি অত্যন্ত গভীর, জলের চেহারা দেখলে তা বোঝা যায় বটে—'টোয়েবু' মানে 'মোচড়ানো ঘাড়'। এক হো জাতীয় লোক এখানে মাছ ধরতে এসেছিল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। মাছ ধরে ধরে সে স্ত্রীকে ডাঙার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, স্ত্রী লুফে লুফে নিচ্চে—একবার হঠাৎ বিস্মিতা স্ত্রীর হাতে

এল তার স্বামীর মণ্ড-মোচড়ানো ঘাড়টা। সেই থেকে বন্য অপদেবতার ভয়ে এখানে কেউ মাছ ধরতে আসে না। অথচ মাছ নাকি খুব আছে।

আমাদের সামনে জলাশয়ের ওপারে প্রায় সত্তর আশি ফুট লৌহ-প্রস্তরের (Hematite quartzite) অনাবৃত দেয়াল খাড়া উঠেচে, তার শীর্ষে অপরাহ্ণের হল্‌দে রোদ, তার গায়ে গাছের মোটা মোটা শেকড় ঝুলচে। বড় বড় ঝুলন্ত পাথরের চাঁই জায়গায় জায়গায় যেন মোটা শেকড়ের বাঁধনে আটকে আছে ফাটলের গায়ে। এই পাহাড়ের দেয়ালের বাঁদিকে প্রায় সাত আট ফুট চওড়া জলধারা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সশব্দে প্রায় ২৫ ফুট ওপর থেকে নীচের বন্য অপদেবতার লীলাভূমি সেই সরোবরটাতে পড়চে। এই স্থানটি নিবিড় বনে ঘেরা, একটা সংকীর্ণ গহ্বরের বা বড় ইঁদারার মত—যেন ইঁদারার মধ্যে বসে মাথার দিকে চেয়ে আছি। বড় বড় আম, গাচাকেন্দ্‌ বা গাবগাছ, বেত, ফার্ণ, লম্বা লম্বা তৃণ, লুদাম, করঞ্জ আরও অসংখ্য বন্য গাছে ছায়ানিবিড়। জলপতনধ্বনি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর অরণ্যনিঃশব্দতা সুদূর অতীতের কথা, অন্তরের কথা, বিশ্বদেবের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কথাই কানে কানে বলে, সমাহিত মনে শুনতে হয়। এই রকম জলাশয় সম্বন্ধেই কর্ণেল ডলটনের সেই উক্তিটি খাটে:—"Pools, shaded and rock-bound in which Diana and nymphs might have deported themselves."

অনন্তের মৌন ইতিহাস এখানে আঁকা আছে পাথরের দেওয়ালের স্তরে স্তরে। বৈদিক আর্য্য ঋষিদের আমলেও এই ঝর্ণা ঠিক এমনি পড়তো ঘোর বনের মধ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এখানে লক্ষ লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে, লক্ষ লক্ষ অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার হয়েচে, বন্য-জন্তুর বংশের পর বংশ নির্ভয়ে জলপান করেচে—রেল হবার আগে, বন বিভাগের সৃষ্টি হওয়ার আগে বন্য লোক ছাড়া অন্য কারো চোখেই পড়েনি এ সৌন্দর্য্যভূমি। কে আসবে মরতে পথহীন জঙ্গলে, জানেই বা কে, খোঁজই বা করত কে? এই বিংশ শতাব্দীতেও এ স্থান নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশন থেকে বনপথে একুশ মাইল। তার মধ্যে তেরো মাইল নিবিড় বনানী, শেষের চার মাইল নিবিড়তর বন, যার মধ্যে দিয়ে কোন সময়েই দলবদ্ধ না হয়ে বা উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক না নিয়ে কখনই আসা উচিত নয়। পথ হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা, একবার পথ হারিয়ে গেলে জনমানবের চিহ্নহীন এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বন্যহস্তীর পদতলে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখে প্রাণ হারাতে হবে। অথচ কি সৌন্দর্য্য-ভূমিই লুকিয়ে রেখেচে প্রকৃতিদেবী মানবচক্ষুর অন্তরালে। হলদে রোদ রাঙা হয়ে আসচে, আর থাকা ঠিক নয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিবিড় পথে চার মাইল গিয়ে মোটরে উঠতে হবে। এই পড়ন্ত বেলাতে হাতী বাঘ বেরিয়ে থাকে সাধারণত। রওনা হয়ে ঝর্ণার ওপারের দিকটাতে চওড়া পাথরের ওপর অনেকটা বসলুম। কতদূর লৌহপ্রস্তরের তৈরী ঢালু পর্ব্বতগাত্র বেয়ে ঝর্ণাটা নীচে নেমে ওই জলপ্রপাতের ও ঝর্ণার সৃষ্টি করচে। এ আর একটি অপূর্ব্ব স্থান কিন্তু আর বসা চলে না। আবার সেই দুর্গম পথে রওনা হলাম। পথে সেই ঘাসের কুটিরগুলির স্থানে এসে মনে হোল বড় চমৎকার, এখানেই থেকে যাই। সেগুনের জঙ্গলের মধ্যে নরম

মাটিতে আমি একটা নরম পায়ের দাগ দেখিয়ে বল্লাম—দেখুন আর একটা।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—বহুৎ বড় পায়ের দাগ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার—

তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। বনানী অন্ধকার হয়ে এসেচে—হঠাৎ মনে পড়ল আজ আমাদের দেশে গোপালনগরের হাট, পঞ্চামাস্টার বেগুন বিক্রি করচে, মনো খুড়ো পানের দোকানে পান বিক্রি করচে। ওরা সেই ক্ষুদ্র স্থানে জন্মে চিরকাল ওখানেই আনন্দে আছে, জগতের কি-ই বা দেখলে?

এক জায়গায় বড় বড় আমগাছ, কি ফুলের সুগন্ধ বাতাসে, ঠাণ্ডা সন্ধ্যাবাতাসে বনানী থেকে বারাকপুরের পল্লী প্রান্তে এ সময় যেমন সুগন্ধ ওঠে তেমনি পাচ্চি। রাধালতার ফুল এখানেও দেখলাম ঝোপের মাথায়। ঝন্দী কাঁটালের কালো পাতার রাশি অন্ধকার আরও কৃষ্ণতর করে তুলেচে। ওই ফুটন্ত বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রাম লতার ফুল শোভা পাচ্ছে। ঘন গম্ভীর দৃশ্য বনানীর। সন্ধ্যায় সারেণ্ডা ফরেস্টের নিভৃত বনপথ দিয়ে যাওয়ার এ অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না।

ফরেস্টার এক জায়গায় এসে বললে—ঠিক এখানে মল্লিকবাবু ফরেস্ট রেন্‌জার মস্ত বড় রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখেছিল—রাস্তা পার হয়ে বনের দিক থেকে ওদিকেই যাচ্ছিল, মল্লিকবাবু বলে—চাকরি ছেড়ে দেবো, সারেণ্ডায় আর চাকরি করবো না।

প্রতিপদে ভয় হচ্ছে। একবার ফরেস্ট গার্ড বনের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠলো—কি রে! দাঁড়ালি কেন? সে বল্লে—জংলী মোরগ হুজুর।

ধড়ে প্রাণ এল যেন—চলো বাপু। বন-মোরগ দেখে আর এখন কাজ নেই। এই সুনিবিড় অরণ্যে হাতী ও বাঘ হায়েনা চলাফেরা করচে, মানুষ মারচে—তার গল্প থলকোবাদে শুনেচি, কুমড়িতে শুনেচি, বনগাঁয়ে শুনেচি আবার আজ বিটকেলসোয়াতেও শুনেচি। নিজের চোখে দু-তিন দিন বড় বাঘের থাবার দাগ দেখলুম মাটিতে—এবং তা হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের। আজই দেখেচি এক জায়গায় হাতী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েচে তার দাগ। হাতীর বাইসনের ও সম্বরের পায়ের দাগ তো সর্ব্বত্র—ওর হিসেব কে রাখে। সুতরাং বন পেরিয়ে যাওয়াই ভালো।

ফরেস্টার বলচে—কাছেই এসেচি মোটরের। দু'রশি আছে। তখন একবার বনের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে নিলুম। কি গম্ভীর দৃশ্য অরণ্যানীর, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কত উঁচুতে রাধালতার আর কম্‌প্রিটাম লতার কচি পাতা। ঘন বনে অন্ধকার হয়ে এসেচে। লোকালয় থেকে বহুদূরে সারেণ্ডা ফরেস্টের অভ্যন্তরভাগে দাঁড়িয়ে গোপালনগর হাটের কথা ভাবচি।

বাড়ী এসে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে এই ডায়েরী লিখচি। খেয়েদেয়ে একবার বাইরে গেলুম, কি ঝক্ ঝক্ করচে নক্ষত্রগুলি পাহাড়ের মাথায়, অনন্ত ব্যোমে মহারুদ্রের জ্যোতিঃ-ত্রিশূলের মত Orion জ্বলছে—এখানে ওখানে কত তারা, বিরাট ছায়াপথ জ্বলজ্বল করচে—বিশ্বদেবের ভাণ্ডারে কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কোটি beauty spot—তাঁর অনন্ত

দৃষ্টি কি করে আমরা বুঝব—শুধু মনে মনে তাঁর জয়গান করেই বিস্ময়ের অবসান করি।

রাত সাড়ে চারটায় উঠলুম, বাইরে গেলুম। জ্যোৎস্না উঠেছে, কালকের মত শুকতারা জলজল করচে, দূরের পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে বাল্যের বারাকপুরের বাঁশবনে বাঁড়ী, বাবা মার কথা মনে এল। শৈশবের সমস্ত অবস্থা—আমাদের দারিদ্র্য, বালক হয়ে আমার সমস্ত মনের ভাব যেন আমাকে পেয়ে বসলো শেষরাত্রে। জীবন কি অপূর্ব্ব! কি অমৃতময়—জন্মে জন্মে শত শত বারাকপুরের মধ্যে দিয়ে শত বৈচিত্র্য, পিতামাতার কোলে বার বার আসি যাই ক্ষতি কি? শুধু যেন বিশ্বদেবকে মনে রাখি, তার অনন্ত রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য দেখবার চোখ যেন পাই।

সকালে শালবনে বেড়াতে গেলুম। দূরে পাহাড়ের মাথায় কাল যেমন দেখেছিলুম একটা গাছ—বড় বড় বনস্পতি চারিধারে, বনের শান্ত শ্যামল সমারোহ। প্রাণভরে দেখি। চেয়ে থাকি।

শেষরাত্রে কালীর বোন পুঁটি দিদিকে স্বপ্ন দেখলুম, আশ্চর্য্য! পুঁটি দিদি যেন মার মত স্নেহে আমায় কি খেতে দিলেন। অল্প বয়সের পুঁটি দিদি।

আজ সকাল ন'টায় তিরিলপোসি থেকে স্নানাহার করে বার হয়েচি। সারেণ্ডা অরণ্যে ফাঁক কোথাও নেই—শুধুই চলেচে জঙ্গল। এক জায়গায় নেমে আমরা পাৎলা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম, সেখানে কাঠকয়লার ভাঁটা করে কয়লা পুড়ুচ্চে। তারপর কিছুদূর এসে এক জারগায় দীঘা নামক বন্যগ্রাম। তার প্রান্তভাগে 'বিরহেরি' নামক যাযাবর বন্য জাতির আবাস, নেমে দেখতে গেলুম। অনেক ছেলেমেয়ে ও পুরুষ রোদে বসে চীহড় লতার দড়ি পাকাচ্চে। এই ওদের উপজীবিকা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেচে দড়ি, শিকা—সব তৈরি করে চীহড়ের বাকল থেকে। খুব শক্ত দড়ি হয়। এক গ্রামে সপ্তাহ দুই থাকে, তারপর অন্য গ্রামে চলে যায়। কোথাও নির্দ্দিষ্ট জায়গা নেই থাকবার। একটি রূপী বাঁদর নিয়ে এল বিক্রি করতে। আমরা নিলাম না। বেশ সুন্দর পাথরে-কোঁদা চেহারা ওদের।

দীঘা ছেড়ে সামটা গ্রামের পথে আমরা চললুম। আবার জঙ্গল, পাশে একটা ঝর্ণা ও গভীর খাদ। এক এক সময় মনে হয় সরু পথে গাড়ীগুলি উল্টে যাবে। তেমনি গভীর অরণ্য। এপথে অনেক বাঁশ দেখলুম পাহাড়ী ঢালুর জঙ্গলে, এক জায়গায় বন্যকদলীও দেখা গেল।

সামটা গ্রাম বনের বাইরে। খ্রীষ্টান ও হিন্দুর বাস, তবে হো-দের বাসই বেশী। একটি ছেলের নাম বল্লে, চন্দন তাঁতি। একটু সভ্য কাপড় পরা ওরই মধ্যে। বল্লাম—তুমি খ্রীষ্টান?

—না, আমি হিন্দু।

—কালী-দুর্গা পূজা কর, না বোঙ্গা পূজা কর—

—বোঙ্গা পুজো করি।

একটা গাছের নীচে এরা মুরগী বলি দেয় ও আতপ চাউল নৈবেদ্য হিসেবে দেয়। সিং-বোঙ্গা এদের পরম দেবতা—সূর্য্যদেব। আরও বিভিন্ন বোঙ্গা আছে—এক এক রোগের এক এক বোঙ্গা।

গ্রামটা থেকে এলুম জেরাইকেলা। এখানে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হোল Range আপিসে। বাড়ী খুলনায়, এখন এখানেই দু-তিন বৎসর জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করে বাস করচে। রেঞ্জ্ আপিসে দেখা করতে এস—শুনলাম এখানে বেশ ম্যালেরিয়া।

জেরাইকেলা থেকে রওনা হয়ে তিন মাইল যেতে গভীর অরণ্য শুরু হোল। একদিকে গভীর অরণ্যভরা নদীখাত, অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। পোঙ্গা পর্য্যন্ত সমানই অরণ্য, এক্সপোর্ট নাকা নামক বনবিভাগের কর্ম্মচারীর আবাসস্থানের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, একজন লোককে ডুলি করে নিয়ে যাচ্চে, জঙ্গলে B. T. T. কোম্পানীর কাজ করছিল, ম্যালেরিয়া ধরেচে।

আবার জঙ্গল। পোঙ্গা এলুম বেলা আড়াইটাতে। আগে এখানে B. T. T. কোম্পানীর আপিস ছিল, এখন কিছু নেই। পোঙ্গা থেকে মনোহরপুরের পথে রওনা হই—মিঃ সিন্‌হা ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে বনবিভাগের শিক্ষানবীশী করতে এই পথে একা সাইকেলে আসেন, অতি দুরারোহ ও জঙ্গলাকীর্ণ পথ—এর আগে বনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। কি ভাবে একা এখানে এলেন, আজ তাঁর মুখে শোনা পর্য্যন্ত এই পথ দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল—এবার সে পথও দেখলুম এবং কোলবোংগা নামক গ্রামে যে কুটিরে তিনি রাত্রি কাটিয়েছিলেন, সেটাও দেখলুম। কুলিরা সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে আর তাঁর জিনিস নিয়ে যেতে চাইল না। এখন সে কুটিরের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে, পূর্ব্বে আঠারো বছর আগে বন এখানে ঘনতর ছিল। কোলবোংগার প্রান্তে এক পাহাড়ের ওপর একটি ছোট্ট কুটিরে এক গোসাঁই জাতীয় কৃষক বাস করে। বৃদ্ধ গোসাঁই ধান ঝাড়চে পাহাড়ের ওপরে খামারে। সেখান থেকে সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে এবং খুব উঁচু পর্ব্বতমালা ও শিখরদেশ। সভ্যতার চিহ্ন কিছু কিছু দেখা গেল এর পরে, খিনডুং নামক স্থানে—এক্সপোর্ট নাকার আপিসের সামনে কয়েকটি বালক স্কুল থেকে আসচে। তাদের কাছে ডাকলুম, ওরা মনোহরপুর ইউ. পি. স্কুলে পড়ে, দু'মাইল দূরবর্ত্তী কোলবোংগা গ্রাম থেকে মনোহরপুরে পড়তে যায়।

মনোহরপুর এলুম—দূর থেকে রেলের ধোঁয়া দেখে মনে আনন্দ হোল। কোইনা নদী পার হয়ে মনোহরপুর বাজারে এলাম—চায়ের দোকান, খাবারের দোকান—কি আশ্চর্য্য জিনিস যেন। চোখে চশমা ভদ্রলোক ছড়ি হাতে বেড়াচ্চে, এ যেন এক নতুন দৃশ্য আজ আট-ন'দিনের জঙ্গলের গভীর নির্জ্জনতার পরে। দোকান বলে জিনিস আছে দুনিয়ায়, সেখানে পয়সা দিলে তুমি সিগারেট, খাবার, চা কিনে খেতে পারো—ডাকঘর আছে, ইচ্ছামত চিঠি লিখে ফেলতে পারো, এ যেন নতুন অভিজ্ঞতা।

মনোহরপুর বাংলো স্টেশনের কাছে একটি পাহাড়ের ওপরে। বেলা পাঁচটায় সেখানে

পৌঁছে গেলাম। চারিদিকের দৃশ্য ও দূরের শৈলশ্রেণী দেখা যায় এই পাহাড়ের ওপরে বসে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে, আমি বাংলোর কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবচি ঐ ঘন শৈল্যারণ্য থেকে এসেচি, ওরই মধ্যে কোথায় সেই শিশিরদা জলাভূমি, গুহা, ওরই দুর্গম প্রদেশে সেই অপূর্ব্ব সুন্দর টোয়েবু জল-প্রপাত, জাতিসিরাং, বাঘের থাবা আঁকা সেগুন বন।

বনের দেবতা মারাং বোংগাকে প্রণাম।

আজ সকালে উঠে একটু বেড়াতে গেলুম। বাঙালীর মুখ অনেকদিন দেখিনি। মনোহরপুর বাজারের পথে সুধীর ঘোষ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে উঠলুম। তাঁর বাড়ী খুলনায়। আনন্দ হওয়াতে তিনি চা খাওয়ালেন, ভাত খেতে বল্লেন। বড় ভদ্রলোক। সেখানে বসে সারেণ্ডা ফরেস্টের গল্প করলুম। এসে চা খেয়ে 'দেবযান' লিখতে বসি। মিঃ সিন্‌হা আপিস তদারক করতে গেলেন। রেনজ অফিসারের নাম সুলেমান কারকাট্টা, হো খ্রীষ্টান। রোদ পিঠে দিয়ে বসে লিখলুম অনেকক্ষণ। তারপর তেল মাখলুম রোদে বসে। মনে পড়চে নদীর ধারের কথা বারাকপুরের, হয়তো ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে এতদিন। ফণিকাকা তামাক খেতে খেতে গল্প করচে বারিকের সঙ্গে। সামান্য বিশ্রাম করলাম খাওয়ার পরে, তারপর ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন শ্যামাচরণদা'র বোন পুঁটিদিদিকে স্বপ্ন দেখেছিলুম, যেন মায়ের মত যত্ন করচে। কল্যাণীর কথা ভাবচি, এতক্ষণে সে কি করচে?

বাইরে চেয়ে দেখচি, রোদ পড়েচে পাহাড়ের শালগাছের গায়ে। বিকেলের রোদ, হঠাৎ মনে পড়লো বাসান গাঁয়ে মোহিনী কাকার চণ্ডীমণ্ডপের কথা। কে আছে সেখানে এখন? কি করচে তারা? মুরাতিপুরে আমার মামার বাড়ীর সেই ছাদটি, সেই শৈশবের লীলাভূমি কলামোচা আমতলা—এত স্থানে বেড়ালুম, এখনও যেন মামার বাড়ীর পিছনের বাঁশবন রহস্যময় মনে হচ্ছে। শৈশবের মতই। বারাকপুরের তেঁতুলগাছটার তলায় আমাদের বাড়ীর পাঁচিলের পিছনে কখনো যাইনি, বাগানে পাড়ার বহুস্থানে কখনো যাইনি আমাদের গাঁয়ে। উঠে পাহাড়ের ওপরে রোদে একটা পাথরে বসলুম। বাংলোর ঠিক পিছনেই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ অংশ। তার একটু নীচের অংশে আমাদের বাংলো। এক মিনিটেই পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বসলুম। আমার সামনে বিস্তৃত সারেণ্ডা ও কোলহান শৈলমালা, আংকুয়া লৌহখনি বহুদূর থেকে লাল দেখাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের মাথায়। সারেণ্ডা পর্ব্বতমালা ও ছোটনাগপুর মালভূমির সংযোগস্থলে সারেণ্ডা টানেলের মধ্যে দিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ চলে গিয়েচে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। ঐ পর্ব্বতমালার ওপারে বহুদূরে ঘাটশিলা, যেখানে কল্যাণী রয়েচে। তারও বহুদূরে ওধারে বারাকপুর, আমার উঠানে ছায়া পড়েচে, কুটির মাঠের সেই জলাভূমিটি, তিন্তু যেখানে ধান কাটচে, তার ধারে জেলেরা জমি চষেচে এবার দেখে এলাম—ওদের কথা মনে পড়ে গেল। ঐ পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে ঐদিকে কোথায় সেই বনমধ্যস্থ গুহা, ঐ দিকে কোথায় সেই অতি সুন্দর টোয়েবু জলপ্রপাত কোথায় সেই বাঘের পায়ের থাবা আঁকা সেগুনবন, কোইনা নদীর

গর্ভস্থ পাষাণময় স্থান জাতিসিরাং, দেবকাঞ্চনফুলের মেলা। বিশ্বদেবের উপাসনা এমন স্থানেই সম্ভব ও সার্থক।

চা খেয়ে বেড়াতে বার হই। গিরিনবাবুর সঙ্গে দেখা, দেবীবাবুর শ্বশুর। অনেকদিন আগে পোসোইতা স্টেশনে দেখা হয়েছিল। ইনি আমায় জঙ্গল দেখাবেন, এক সময় ধারণা ছিল। হরজীবন পাঠক এখানকার একজন লক্ষপতি কাষ্ঠব্যবসায়ী। মোটা মোটা শাল কাঠ পড়ে আছে বহুদূর পর্য্যন্ত স্টেশন ইয়ার্ডে। বনস্পতি উচ্ছেদ করে এ ব্যবসা আমার পোষাবে না। যিনি বনস্পতিতে আছেন, আমি তাঁকে মানি। মনে হবে প্রাণীহত্যা করচি। অরণ্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করচি। তবে কথা এই—B. T. T. কোম্পানী জঙ্গল উজাড় করে পয়সা লুটে ইংলণ্ডে পাঠাচ্চে। আমাদের দেশের লোক হরজীবন পাঠক কিছু খায় তো ভালই।

কোইনা ও কোয়েল নদীর সঙ্গমস্থান দেখতে গিয়ে বেলা গেল। প্রকাণ্ড বড় খ্রীষ্টান মিশন নদীর ধারে। তারপর নৃসিংহ দাস সাধুজীর আশ্রমে গিয়ে বসলুম; বেশ শান্তিপূর্ণ স্থান, দক্ষিণ কোয়েল নদীর তীরে। নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি আছে মন্দিরে, সাধুজীর এক চেলা এখন মোহান্ত, উনি মারা গিয়েছেন এক-দেড় বৎসর। আরা জেলার এক পণ্ডিতজী— বড় দীন, বিনয়ী—হরজীবন পাঠককে খুব খাতির করলে। জী সরকার, বৈঠিয়ে, জী সরকার, দেখিয়ে।

এত ভাল লাগলো কেন পণ্ডিতজীকে? বল্লে—সাধুজী যব রহতে তব মেজাজ একদম গদ্ গদ্ হো যাতা। বহুৎ রঙ্গিলা সাধু থে। পণ্ডিতজী খোশামোদ করচে পুনঃপুনঃ লক্ষপতি ধনী হরজীবন পাঠক ও মোহান্তজী দুজনকেই। রোজ সন্ধ্যাবেলা পণ্ডিত সম্ভবতঃ আশ্রমে এসে বসে, গল্প করে, প্রসাদ-ট্রসাদ পায়।

নৃসিংহ দাস সাধুর ইষ্টদেবতা এক ক্ষুদ্র শিলামূর্ত্তি। তিনি নাকি সব বাড়ী বাগান তাকে করে দিয়েচেন। সুন্দর ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে বাগানে। চাঁপা, মল্লিকা, আম, হেনা, দারুচিনি, এলাচ—সব গাছ আছে এ বাগানে। সাধুজী আমাদের পানজেরি ও কলা দিলেন প্রসাদ-স্বরূপ। পানজেরি কখনো খাইনি, দেখলুম ধনের গুঁড়ো আর চিনি। আশ্রমটি সত্যিই ভাল লাগলো।

বাড়ী এসে উঠলুম, রাত আটটা। মন্মথদা আজ আমার চিঠি পেয়েচে, কল্যাণীও পেয়েচে মন্মথদার বাইরের ঘরে দরজা বন্ধ করে নিশ্চয়ই সব বসে গল্প করচে, আমার চিঠিখানাও পড়চে।

আজ সকালে উঠে রোদে বসে খানিকটা লিখি 'দেবযান'। তারপর কোলবোংগার পথে যেতে পাকেমণ্ডটু বলে একটি গ্রামে পাহাড়ের ওপর কিছুক্ষণ বসলুম। সুলেমান কারকাট্টা ও মিঃ সিন্‌হা বস্তী তদারক করছিলেন, সেই সময় আমি পাশের পাহাড়টাতে গাছের ছায়ায় বসি। সামনে বেশ সুন্দর দৃশ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়। একটা গাছ ঠিক চাঁপাগাছের মত, কিন্তু একটি ছেলে বল্লে ওতে ফুল হয় না, ছোট ছোট বীচিমত হয়—অর্থাৎ

mendcandia exerta, এই গাছই এ দেশে সর্বত্র, দেখতে চাঁপা গাছের মত। ছেলেটির নাম দিবাকর দাস, হিন্দিতে কথা বলে, জাতে তাঁতি। এদেশে হিন্দু হোলেই তাঁতি হবে, নয়তো গোসাঁই হবে। বাকী সব হো আর মুণ্ডা। ভাষা হো ছাড়া আর কিছু নেই—তবে একটু শিক্ষিত লোকে হিন্দী জানে। ছোকরা চাকুরী চায় এক্সপোর্ট নাকার গার্ড। বলে দিলুম চাকুরীর জন্যে। যদি ওর হয় বড় আনন্দ হবে আমার।

কোলবোংগা গ্রামে সেই গোসাঁই-এর বাড়ীটা ওই পাহাড়ের মাথায়। তারপর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেকদূর গেলুম। সেদিন যে নদীগর্ভে বসে চা খেয়েছিলুম পাথরের ওপর, তার নামটি বেশ ভাল—'মহাদেব শাল'। ওটা পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে ঘন লতা-দোলানো নিবিড় জঙ্গলের পথে আবার দুটি নদী পার হলুম—বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে গভীর বনচ্ছায়ায় কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেচে। সকালে কত কি পাখী ডাকচে বনে বনে। নিস্তব্ধ বনানী, একই দৃশ্য সারেণ্ডার ঘনজঙ্গলে। সাড়ে পাঁচ মাইল মাত্র দূর মনোহরপুর স্টেশন থেকে অথচ কি নিবিড় বন। ধলভূমে এমন বন নেই কোথাও।

ফিরে আসতে কোইনা নদীর ধারে এক্‌স্‌পোর্ট নাকার আপিসে তদারক করতে দেরি হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে স্নান করে কিছু বিশ্রাম করলুম। পাহাড়ের ওপর বাংলোর পিছনে গিয়ে বসি রাঙা রোদভরা বিকেলে। চারিদিকে স্তরে স্তরে ঘন নীল শৈলশ্রেণী, একটার পেছনে আর একটা, তার পেছনে আর একটা, থৈ থৈ করচে শুধুই পাহাড়। ডাইনে খুব উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে রাঙা লৌহপ্রস্তর বার হয়ে আছে—ঐ হোল চিড়িয়া খনি। বেঙ্গল স্টীল কোম্পানী ওখান থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে এনে রেলযোগে মনোহরপুর এনে ফেলচে স্টেশনের পাশে। কত কথা মনে পড়লো পড়ন্ত রোদে দূরের শৈল-শ্রেণীর দিকে চেয়ে। কল্যাণী রয়েচে কতদূরে, কি এখন করচে, ওর জন্যে মন হয়েছে ব্যস্ত। আর পাঁচদিন কোনরকমে কাটালে হয়। গৌরীর কথা—আজ ২১শে নভেম্বর, সেই ২০ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এই সময় প্রথম গিয়েচি, সেই উদ্বেগ, 'যতবার আলো জ্বালাইতে যাই' সেই গানটার কথা। এই সময়েই সে মারা যায়। জাহ্নবীর কথা—সেও এই সময়, বোধ হয় আজই হবে। আজই আবার গোপালনগরের হাট, এতক্ষণে পঞ্চামাস্টার বেগুন বিক্রী করচে, মনো খুড়োর দোকানে লেগেচে ভিড়। সেই ছায়াভরা বনপথে ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে হয় তো। ১৯৩৫ সালে আজকার দিনে আশুতোষ হলে কবি নোগুচির বক্তৃতা শুনেছিলুম আর ভেবেছিলুম গ্রামের নাজন হয়তো নদীর ধারে মাঠে কলা-বেগুনের ক্ষেতে গরু চরাচ্চে। আজও তাই ভাবচি, দূরে গেলেই দেশের কথা আমার মনে পড়ে। কল্যাণী দেশে যেতে চায়, ওকে নিয়ে যাবো।

বিকেলে মিঃ সিন্‌হা, আমি ও হরজীবন পাঠক আশ্রমে বেড়াতে গেলুম। সুন্দর লতা-বিতান, কত ফুল ফলের গাছ। নদীর ধারে নিভৃত কুটির-মধ্যে বিশ্রামের জন্য বেদী, হেনা ফুলের সৌরভ। পবিত্র পুরনো তপোবনের শান্ত পরিবেশ। খাঁটি ভারতীয় সভ্যতা ও আবহাওয়া। নৃসিংহ দাস বাবাজির সমাধি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেচে, সেখানে তার চেলা

বসে গাঁজা খাচ্ছে সন্ধ্যায়। নদীর ধারে লতাকুঞ্জ, মধ্যে ক্ষুদ্র শিবমন্দির। মন আপনিই অন্তর্মুখী হয়ে যায় এই জায়গায় এসে। সাধুজির কাছে বসলুম, তিনি আসনে বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়চেন, ধুনি জলছে সামনে। ইনিই বর্ত্তমান মোহান্ত।

ওখান থেকে বেরিয়ে সুধীর চাটুয্যের বাড়ী এলুম আমরা সবাই। সুধীরবাবু অতি বিনয়ী, আমরা গিয়েচি বলে বড় খুশি। চা এনে দিলেন, ঘন ঘন পান ও সিগারেট দিলেন। সরল, অমায়িক ভদ্রলোক—আমাদের দেশের মত কথার টান।—বল্লেন—একসঙ্গে বসে দুটি খাবো বড্ড ইচ্ছে ছিল, তা হোল না। আপনি দয়া করে আমার এখানে এসেছেন।

অনেকদূর পর্য্যন্ত উনি আর হরজীবনবাবু আর একটি ছোকরা সঙ্গে এলেন। সুধীরবাবু পানিতরের কথাও জানেন, আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ী। বল্লেন—'পান্‌তর', বাবা যেমন বলতেন। কতকাল পরে ঐ গ্রামের ঐ উচ্চারণ শুনলুম এতদূরে বসে।

বিশ্বদেবের জয় হোক।

•

সকালে মনোহরপুর থেকে এখানে আসবো, হরজীবন পাঠক ও সুধীরবাবু এসে খুব গল্পগুজব করলেন। আমি আর কখনো মনোহরপুর আসি না আসি, বাংলোর পেছনের পাহাড়টাতে উঠে বসে রইলুম পুবদিকে চেয়ে।

খেয়ে বেলা দুপুরের পর মোটরে উঠে কোলবোংগার পথে পোংগা আসবো, এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড আমাদের অতি দুর্গম ও ভীষণ কাঁটাজঙ্গলের পথে বাঁশবন দেখাতে নিয়ে গেল পাহাড়ের ওপারে লুবড়া নালা ভ্যালিতে। অতি কষ্টে সেখানে গিয়ে পৌঁছে আমি বনের মধ্যে উপত্যকার দিকে মুখ করে বসলুম, মিং সিন্‌হা, রেন্‌জার সুলেমান কারকাট্টা ও ফরেস্টার —ওরা সব নীচে গেল। সুলেমান বল্লে—বহুৎ steep নালা, আপ তো উতারনে নেহি· সকেঙ্গে—

আমি বসে দূরের পাহাড়শ্রেণীর শোভা দেখচি সামনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে। এমন সময় ওরা ফিরে এল, আমার জেদ ধরে গেল যে ওরা যা করেচে আমিও তা পারবো। এই জেদ থেকেই সারেণ্ডা পর্ব্বতারণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর এমন কি সুন্দরতম স্থানের আবিষ্কার করা সম্ভব হোল।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—আসুন, আসুন—দেখুন কেমন সিনারি। আমি গিয়ে চেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। মাত্র চল্লিশ ফুট নেমেচি যেখানে বসে ছিলুম সেখান থেকে। একখানা চওড়া পাথর যেন শূন্যে ঝুলচে, তার নীচে আরও কয়েক থাক প্রস্তরের সোপান, মাত্র হাত ছ-সাত —তারপরই প্রায় ন'শো ফুট খাড়া নীচু উৎরাই—পাথর ফেলে দেখলুম চার পাঁচ সেকেণ্ড পরে তবে প্রথম পতনের শব্দ পাওয়া যায়, তারপরে গুরুগম্ভীর শব্দে গড়াতে গড়াতে যেন কোন অতলস্পর্শ গহ্বরে গিয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা হয় না, মাথা ঘুরে পড়ে যাবো ঐ অত্যন্ত নীচে উপত্যকায় মেজেতে, যেখানে বন্য বাঁশঝাড়, আরও কত কি গাছের মাথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মত দেখা যাচ্চে। আমাদের এই পাহাড়টার উচ্চতা

২২২৬ ফুট,-১৫০ ফুট আর উঠতে হয়তো বাকী, সবটুকুই উঠেচি তা ছাড়া। সামনে ৯০০ ফুট খাড়া নীচু উৎরাই সরল রেখায় নেমে গিয়েচে। আমাদের সামনে ১৬৫৬ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথা—আমাদের নীচে একটু ডানদিকে ঘেঁষে। সামনের উপত্যকাভূমি নিবিড় সবুজ, মেষলোমের মত বৃক্ষশীর্ষে ভর্ত্তি। তার ওপারে স্তরে স্তরে উঠচে শৈলশ্রেণীর পেছনে শৈলশ্রেণী, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত। আমাদের এই Vantage point-টি একটি খাঁজে অবস্থিত, দুদিকে চলে গিয়েচে বনাবৃত দুই শৈলবাহু বহুদূর পর্যন্ত। বাঁদিকের বাহুতে অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে বহু স্থানে, একটা বটগাছ হয়েচে, আরও অনেক বড় বড় গাছ থাকে থাকে নেমে হঠাৎ যেন শূন্যে ঝুলচে। ঐ একটা শিববৃক্ষ আমাদের কত নীচে ডান দিকে, ঐ মনোহরপুর টাউনের অস্পষ্ট সাদা সাদা বাড়ীগুলি দেশলাইয়ের বাক্সের মত দেখাচ্ছে, কোলবোংগার পাহাড়টা সমতলভূমির সঙ্গে মিলে সমান হয়ে গিয়েচে এতদূর থেকে। বনভূমি নিনাদিত হচ্ছে ময়ূরের কেকারবে, নিম্নের উপত্যকার জঙ্গলে। এই নির্জ্জন গহনারণ্যে ময়ূরের কেকারব, ওপরে দ্বিপ্রহরের নীলাকাশ, বহু বহু নিম্নে সংকীর্ণ উপত্যকায় পাৰ্ব্বত্য ঝর্ণা লুবড়া নালার কালো খাত—আমাদের আশেপাশে বিশাল বনস্পতিশ্রেণী, আমলকী গাছ, বাঁশঝাড়, পাহাড়ের অনাবৃত প্রস্তরময় অংশ, চীহড় লতা, রামদাঁতনের কাঁটা লতা, শূন্যে ঝোলা একটি কি গাছ আমাদের সামনে—এক ধরনের লজ্জাবতী ফুলের মত বনফুল—পৰ্ব্বতসানুতে, যেন এক বিরাট চিত্রকরের বিরাট ছবি। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সামনে মুক্ত হল! না দেখলে এ দৃশ্যের বিরাট মহনীয়তা, গাম্ভীর্য্য, ভয়, বিস্ময়, সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝানো যাবে না। আমাদের কত নীচে বাঁশবনে পাখী উড়ছে একদল। ন'মাইল এ স্থান মনোহরপুর থেকে। তারপর অতি কষ্টে বহু দুর্গম কাঁটাবন ভেঙে আবার মোটরের কাছে পৌছলাম। পথপ্রদর্শক না থাকলে অসম্ভব নামা পুনরায় পথে। ফরেস্ট রেনজার পথ হারিয়ে গেল। আমরা অন্যদলে অন্যপথে ভুলে চলে গেলুম। নামচি, নামচি—রাস্তা আর আসে না। তেমনি রামদাঁতনের কাঁটালতা সৰ্ব্বত্র—পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল কাঁটায়। এই স্থানে কখনো কেউ আসেনি আমি বলতে পারি।

মিঃ সিন্‌হা এ পথে এসেছিলেন ১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসে—ঠিক এমনি সময় কোল-বোংগা থেকে সাইকেলে। যতই অগ্রসর হই বোংগায় দিকে, সেই ঘোর জঙ্গলের মূর্ত্তি দেখে মনে হয় এ দেখচি ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। এই পথে একটি তরুণ যুবক একা কি ভাবে এসেছিল তাই ভাবি। তিনি তখন নববিবাহিত, পথের চেহারা দেখে ভয়ে উইল করতে চাইলেন, এক এক স্থানে এমন জঙ্গল যে চারিধার থেকে চেপে ধরচে ঘোর জঙ্গলে। ঝর্ণার জল খেতে খেতে অগ্রসর হয়ে এই পোংগায় এসে পৌছোন। একদিকে একটা ঝর্ণা, বড় বড় পাথর—অবশেষে আমরা পৌছে গেলুম একটা খোলা জায়গায়। সুরগুজার ক্ষেতে ফুল ফুটে আছে দেখে মনে হোল লোকের বাস দেখচি রয়েচে এখানে। এইখানে B. T. T. কোম্পানীর করাতের কারখানা ছিল আগে। জায়গাটার নাম হোল পোংগা। এই ব্রিটিশ কোম্পানী সিংভূমের এ অঞ্চলের বনভূমির যাবতীয় কাঠ কেটে চালান দিচ্চে আজ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর

ধরে। এদের শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার পর্য্যন্ত আছে। একটা খুব বড় চালাঘরে এদের ফরেস্ট ম্যানেজার মিঃ লক্‌নার থাকে। কেরানীদের থাকবার জন্য একটা খাওড়া ঘর আছে। ' দু-একজন বাঙালী মেয়েকে যেন দেখলাম, তবে ঠিক বলতে পারি না।

তারপর মাইল খানেক এগিয়ে এসে আমরা উস্থরিয়া বলে একটা জায়গায়, মিঃ সিন্‌হা যে ঘরে থাকতেন ১৯২৫ সালে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি সেখানে বসবাস নেই। কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দর স্থান। উস্থরিয়া বলে একটি পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে খুব শব্দ করে, বেশ চওড়া নদী—অসংখ্য পাথর ছড়ানো। একদিকে কি সুন্দর বনের বড় বড় গাছ ও পাষাণময় উচ্চ তীর। অপরাহ্নের ছায়া পড়ে এসেচে, রোদ হলদে হয়েচে—পানিতরের তেতলা বাড়ীর ছোট্ট ঘরটা যেন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ নদীর ধারে বঁসে রইলুম, কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গীত। যেদিন ভারতে প্রথম বেদগাথার উদাত্ত স্বর ধ্বনিত হয় উস্থরিয়া ঝর্ণা তখন বহু. বহু প্রাচীন। বেদপারগ ও রচয়িতা ঋষিদের অতি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের শৈশবেও এ এমনি বয়ে চলতো ঘনতর বনানীর মধ্যে আপনাকে আপনি মত্ত, চপল খুশিতে ভরা বন্য মেয়ের মত প্রাণোচ্ছল নৃত্যচ্ছন্দে ছুটে ছুটে, আজকার দিনের মত তখনও তার দুধারে ফুটতো দেবকাঞ্চনের ফুল, বন্য শেফালী, পাষাণের তটে কত শরৎ ও হেমন্ত সকালে ঝরা ফুলের রাশি ছড়িয়ে দিত আজও যেমন দেয়, কত চাঁদ উঠেচে, কত পাখী গেয়েচে ওর দুধারের শৈলারণ্যে। সে কি প্রাণ-মাতানো কুহুকুহু ধ্বনি, বাঁদিকের বাঁকে বড় বড় গাছের মাথায় কম্‌প্রিটাম ডিকেন-ড্রাম লতার কচি পাতায় হলদে রোদ মাখা সে কি সৌন্দর্য্য, কি শান্তি, কি নিস্তব্ধতা—কাদা নেই, ধুলো নেই—শুধু পাষাণময় তীর, উপলবিছানো নদীগর্ভ। এইসব স্থানে প্রাচীন দিনে তপোবন ছিল, নইলে আর কোথায় থাকবে?

এরই কাছে ঘন বনের মধ্যে বনবিভাগের সংরক্ষিত অঞ্চলে (preservation plot) ১৮০।২০০ বছরের পুরনো শালগাছ দেখলুম। আমার ঠাকুরদাদা যখন বালক, তার আগে থেকেও এ গাছ এখানে রয়েচে—তবে তখন ছিল চারা মাত্র। বনস্পতিদের যারা দেখেনি, তারা উপনিষদের ঋষিদের মন্ত্র 'যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু' একথার মর্ম্ম বুঝবে না।

সন্ধ্যার আগে আমরা অপূর্ব্ব সুন্দর বনপথে ছোটনাগরা এলুম। সামনে গুয়ায় উঁচু পাহাড়, আগে ভেবেছিলুম সলাইয়ের চিড়িয়া খনির। রাঙা পাথর বার করা জায়গাটা যেমন মনোহরপুর বাংলোর পাহাড় থেকে দেখা যায় তেমনি। সুন্দর জায়গাটি—স্টেশন থেকে কুড়ি বাইশ মাইল দূরে চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা বনে ঘেরা স্থানটি—তবে একটা বন্য গ্রাম আছে, তারা বাজরা সরগুঁজা ইত্যাদি বুনেচে ক্ষেতে। পোংগা থেকে ছোটানাগরার এই রাস্তাটির অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য, একদিকে বড় বড় পাথর ও নির্জ্জন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পদে পদে সৌন্দর্য্যভূমি সৃষ্টি করতে করতে ছুটে চলেচে উস্থরিয়া নদীটি—বাঁদিকে ঘন বন, কম্‌প্রিটাম্ ডিকেনড্রামের মোটা মোটা লতা গাছের মাথায় ঠেলে উঠে এদিকে ওদিকে নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে দুলচে, যেমন উস্থরিয়া নদীর দুধারে উঁচু মাস্তুল-সমান বনস্পতিদের মাথায় এমনি লতা দুলছিল, সাদা সাদা কচি পাতার সম্ভার নিয়ে, যেন সাদা ফুল ফুটেচে ঝোপের মাথায়। রোদ

রাস্তা হয়ে এসেচে গুয়া পাহাড়ের মাথায়। আমরা ওদিকে দিয়ে ঘুরে আবার এদিকে এসে পড়েচি। এই পাহাড়ের ওপারে গুয়া, steep রাস্তা দিয়ে উঠে বনের মধ্যের পথে সাড়ে ছ' মাইল মাত্র, কিন্তু মোটরের রোড দিয়ে বাইশ মাইল।

আমি বললুম—তবে শশাংদাবুরু এখান থেকে কেন দেখা যাবে না? তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়—সেদিন শশাংদাবুরুর মাথা থেকে আমরা ছোটানাগরা দেখেছিলুম—এখান থেকে কেন শশাংদাবুরু দেখা যাবে না?

গুয়ার সমশ্রেণীতে যে পাহাড় টানা চলে গিয়েচে—তারই এক জায়গায় শশাংদাবুরু, খুব উঁচু—আমরা ঠিক করলুম।

সন্ধ্যায় একটি ঝর্ণার ধারে নিবিড় অন্ধকার বনে, গ্রাম থেকে কিছুদূরে বসি। সারেণ্ডার সব স্থানই ভাল, কত সহস্র beauty spot যে এর মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো—তা কে বলবে? আমার আবার সব জায়গাই ভাল বলে মনে হয়, সুতরাং চারিদিকেই beauty spot-এর ভিড়ে দিশাহারা হয়ে আছি। নক্ষত্র উঠেচে অন্ধকার আকাশে বনস্পতি-শীর্ষে। চলে এলুম তাড়াতাড়ি, কি জানি হাতীটাতী আসতে পারে।

বড় শীত। আগুনের পাশে বসে সারদানন্দের 'রামকৃষ্ণদেবের জীবনী' পড়ি।

আজ সকালে উঠেচি খুব ভোরে। সূর্য্য তখনও ওঠেনি। বেশ শীত। চা খেয়ে বসে লিখচি। তার পরে মালাইয়ের পথে পাঁচ মাইল গিয়ে বাঁদিকে জঙ্গলের গায়ে হেন্দেসিরি পাঠকজির saw-mill দেখতে গেলুম। কাছেই একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে, নির্জ্জন বনে ঘেরা beauty spot, তার মধ্যে ছোট্ট কারখানাটি। একটা পাহাড়ের ওপরে মালিকের জন্যে এক ছোট্ট বাংলো করে রেখেচে, মাটির মেজে গোবর দিয়ে রেখেচে। এখানে বসে লেখা-পড়ার কাজ বেশ চলে!

বেলা একটার সময় ফিরে তেন্‌তারি ঘাটে গিয়ে কোইনা নদীতে পার হওয়া যায় কিনা দেখে এলুম। কোইনা নদীর সঙ্গে বার বার দেখা হচ্চে, প্রত্যেক বাংলোতে থাকতে। কেবল দেখা হয়নি তিরিলপোসি থাকতে। অপূর্ব্ব শোভা এই বন্য নদীর, তেন্‌তারি ঘাটেও তাই, বড় বড় পাথর বাঁধানো তটভূমি বনস্পতিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে। এক জায়গায় চুপ করে বসে রইলাম।

Range Officer বল্লে, 'ছোটানাগরা' নামের অর্থ এখানে একটা লোহার নাগরা বা ঢোল আছে বনের মধ্যে পড়ে, প্রাচীন দিনে মানুষের চামড়া দিয়ে ঢাকা হোত এবং বাজানো হোত।

পথে আসতে মোটরের স্প্রিং ভেঙে গেল, বেলা তখন দু'টো। এসে স্নানাহার করে কিছু বিশ্রাম করলুম। 'দেবযান' লিখি।

তারপর বেলা পড়লো—পশ্চিম দিকের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, চারিধারে পাহাড়ে-ঘেরা জায়গাটার কি চমৎকার শোভা হোল। আমরা একটু বেড়িয়ে এলুম পথ দিয়ে। একটা ঘাসওয়ালা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে কাপড়ে ঘাসের বিচি লেগে গেল।

বাংলোর পেছনে ছোট্ট টিলাটার পাথরের ওপরে বসলুম সন্ধ্যায়। আকাশে নক্ষত্র উঠেচে, বনের মাথায়, পুবদিকে একটা গাছের আড়ালে পড়েচে সেই জলজলে নক্ষত্রটা, ফুলডুংরি থেকে সেদিন রাত্রে যেটা দেখেছিলুম। পশ্চিম আকাশে বনের পাথরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত দিগন্তের রাঙা আভা।

অসীম নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত সৃষ্টি। একমনে বসে যোগাসনে সেই বিশ্বস্রষ্টার কথা যাঁরা চিন্তা করেন, এইসব সন্ধ্যায়, এই সব বনানীর শান্ত পবিত্রতায়—তাঁরা সাধু, যোগী। তাঁদের কথা জানি না, তবে চারিদিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় মন ভরে উঠলো বটে। বিশ্বদেবের উদ্দেশে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। দূরের ক্ষুদ্র বারাকপুর গ্রামে এখন নদীতীরে ছায়া পড়েচে, দূরে মাঠে পড়েচে, লিচুতলা ক্লাবে মন্মথদা ও যতীনদা বসে গল্প জুড়েচে—কল্যাণী ঘাটশিলায় সন্ধ্যাদীপ দেখাচ্চে, কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

জীবনের কত অদ্ভুত রহস্য—অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এমন স্থানে এমন সময়ে জীবনটাকে ভেবে দেখবার অবকাশ পায় ক'জন? কর্ম্মকোলাহলমুখর শহুরে মানুষ নিজেকে বুঝতে জানতে পায় না। এই নিস্তব্ধ গভীর বনপ্রান্ত, ঐ শৈলমালা, অগণ্য নক্ষত্রদল মাথার ওপরে, সন্ধ্যার মায়া—আলো-মাখানো দিগন্ত, বনশীর্ষ শৈলচূড়া, ঝিঁঝিঁর ডাক—সবই মনকে অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করে।

আজ শীত কম। অনেকক্ষণ বসে রইলুম পাহাড়টাতে। তারপর অন্ধকার ঘনীভূত হোল। মিঃ সিন্‌হা বাংলোর টেবিলে বসে লিখচেন দেখতে পাচ্ছি, হাতীর বা বাঘের ভয়টা তত নেই এখানে।

উনি ডাকলেন—দাদা—

আমি বল্লাম যাই—

আজ সকালে উঠে আমরা মোটরে সলাই বাংলোতে এলুম। পথে ছোটানাগরা গ্রাম ছাড়িয়ে একটা লতা-ঝোপের মধ্যে দুটি লোহার ঢোল পড়ে আছে। একটা ছোট, এক ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, অন্যটি আড়াই ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। এই জঙ্গলে এক রাজা ছিল—তার নাম অভিরাম টুং। তার আমলে এখানে বাড়ী ছিল। ছোট ঢোলটা মানুষের চামড়া দিয়ে ছাওয়া হোত ও বাজানো হোত।

সলাই বাংলোটি বড় চমৎকার স্থানে অবস্থিত। বামে, সম্মুখে, অতি নিকটেই ঘন বনাবৃত পর্ব্বতমালা দু'হাজার ফুট উঁচু। পর্ব্বতের পটভূমিতে সামনেই খুব বড় মোটা প্রায় দশ ফুট ব্যাস্-যুক্ত গুঁড়িওয়ালা এক শিমুলগাছ। তার পেছনে অসংখ্য বনপাদপ, নটরাজের মত তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গীতে শাখাবাহু ছড়িয়ে কি একটা গাছ বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েচে। প্রভাতের শিশিরসিক্ত নিস্তব্ধ বনস্থলীতে কতপ্রকার বনবিহঙ্গের অদ্ভুত কূজন। বারান্দায় চেয়ার পেতে শুনচি একটা পাখী টুং টুং টুং টুং করে ডাকচে, আর একটা পোকা টিয়ার মত যেন বুলি বলচে, চোখ বুজে কান পেতে শুনচি ও পক্ষীকূলের কলতান। বাম

দিকের খুব উচ্চ পাহাড়ের এক জায়গায় অনেকখানি অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। ঈষৎ কুয়াশা লেগে আছে সামনের পর্ব্বতগাত্রে—যেন মনে হচ্চে নীচেকার বনে বুঝি কেউ আগুন দিয়েচে, তারই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠচে পাহাড়ের গায়ে। বাঁদিকে পাহাড়ের নীচে কোইনা নদী বইচে পদে পদে সৌন্দর্য্যভূমি রচনা করে। ট্রলি করে লো যেতে যেতে ঘন বনের ডান দিকে দু জায়গায় এমন সুন্দর চওড়া পাষাণময় নদীগর্ভ বনের ফাঁকে চোখে পড়লো। তার ওপারে কম্প্রিটাম লতার ফুল-ফোটা বিশাল শৈলসানুর অরণ্যানী। কি গম্ভীর শোভা! সিংভূমের ও সারেণ্ডার বনান্তরালে কত স্থানে কত সৌন্দর্য্যভূমি ভগবান যে ছড়িয়ে রেখেচেন, কৃপণের মত দু'একটাকে গুনেগেঁথে রাখেন নি—ধনী দাতার মত দু'হাত পুরে ছড়িয়েছেন হাজারে হাজারে। এই পথ দিয়ে ট্রলিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরবার সময় রাঙা রোদ মাখানো পর্ব্বত ও বনানীশীর্ষে সামনের দুইয়া লৌহখনির অনাবৃত রক্তবর্ণ লৌহপ্রস্তরের পর্ব্বতগাত্রে বহু উচ্চ শৈলশিখরে মোটা মোটা লতা-দোলানো, অসংখ্য দেবকাঞ্চন ফুল-ফোটা, ময়ূর ও ধনেশ পাখীর ডাকে মুখর অরণ্যানী দেখতে দেখতে ওই কথাই বার বার মনে পড়ছিল। সন্ধ্যায় ফিরবার পথে ঘন ছায়া পড়েচে বনে বনে, চারিধারে পাহাড়ের ছায়া—কোনো অজানা বনপুষ্পের সুবাস অপরাহ্ণের শীতল বাতাসে। আমি মিঃ সিন্‌হাকে বল্লুম—কিসের বেশ গন্ধ পেয়েছেন? Range Officer সুলেমান কারকাট্টা ছিল ট্রলিতে, সেও কিছু বুঝতে পারলে না। আংকুয়া জংশন থেকে চিড়িয়া মাইন্‌স্ পর্য্যন্ত একটা লাইন গিয়েচে, একটা গিয়েচে দুইয়া মাইন্‌সে। এ দুটিই বেঙ্গল আয়রণ ও স্টীল কোম্পানীর খনি। মনোহরপুর থেকে এই পনেরো মাইল এরা ঘন বন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ছোট লাইন পেতেচে এ দুই লৌহপ্রস্তরের পর্ব্বত থেকে ore নিয়ে যাবার জন্যে, মনোহরপুর রেলওয়ে সাইডিং-এ। কলকাতার ক'জন এই সুন্দর রেলপথটির খবর রাখে? আংকুয়া জংশনে একটা সেলুন পেলুম, তাতে চিড়িয়া মাইন্‌সের বড় সাহেব মিঃ মেরিডিথ যাচ্ছে। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গেলুম। সে বল্লে, চিড়িয়াতে ফুটবল আছে, টেনিস আছে, রেডিয়ো আছে। আবার চলেচি ছোট্ট ট্রেনে বনপথে, বাঁদিকে হামশাদা নদী বনের পথে মর্ম্মর শব্দে বয়ে গিয়ে কোইনাতে মিশেচে। চিড়িয়াতে পৌঁছে দেখি সামনের বহু উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া রেলপথ উঠেচে পর্ব্বতশিখরে। Skip উঠেচে মোটা তারের বন্ধনে—রাঙা ধুলোমাখা হো কুলী মেয়েরা সর্ব্বত্র কাজ করচে। আমাদের Skip দিয়ে ওপরে উঠবার সময়ে বেশ লাগলো, কখনো উঠিনি—কিন্তু ভয়ও করলো খুব। কল্যাণী কখনো উঠতে পারতো না এ পথে—ও যা ভীতু! ওপরে উঠে নীচে চেয়ে সমতলভূমির অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়লো। ১৪৩০ ফুট ওপর থেকে নীচের দিকে দেখচি এমন ভাবে, ঠিক যেন একটা উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে আছি। এ সব দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না।

এই লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলমালা লেদাবুরু, অজিতাবুরু ও বুদ্ধাবুরু এই তিনটি নামে অভিহিত। এর সর্ব্বোচ্চ শিখর হোল বুদ্ধাবুরু ২৭০০ ফুট উঁচু। অনাবৃত লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলগাত্র সেদিন পনেরো মাইল দূর মনোহরপুর বাংলো থেকে দেখেছিলাম। সৃষ্টির আদিম

যুগে এত লোহা পৃথিবীর উষ্ণ গলিত ধাতুস্রাব থেকে তৈরী হয়েছিল কিংবা ফুটন্ত গর্ভকেন্দ্র থেকে ঠেলে উঠেছিল—কে বলবে! মাথা ঘুরে যায় এই বিরাট বস্তুপুঞ্জ এক জায়গায় পর্ব্বতাকারে জমাট বাঁধা অবস্থায় দেখলে। কি সে মহাশক্তি, কোন সে মহাদেবতা—এই সব বস্তুপিণ্ড যিনি লীলাচ্ছলে সাজিয়ে গিয়েচেন, কোন্ প্রচণ্ড শক্তির বলে এই বিশাল লৌহপর্ব্বত পৃথিবীগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েচে, এসব ভূতত্ত্ববিদেরা বলবেন, আমরা শুধু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়েই আছি।

আমরা চলেচি আসলে 'আংকুয়া ২৯' নামক বনবিভাগের চিহ্নিত অংশে, একটি নাকি জলপ্রপাত আছে, তাই দেখতে। খনির খাদ হচ্ছে পাহাড়ের ওপারে, আমাদের সামনে আবার প্রায় ৪০০।৫০০ ফুট উঁচু খাড়া রেলপথে Skip উঠেচে আরও উচ্চতর পর্ব্বত শিখরাঞ্চলে। রাঙা লৌহপ্রস্তরের ধূলিমাখা হো কুলি মেয়েরা হাসিমুখে কাজ করচে। এদের মধ্যে অনেকে দেখতে বেশ সুন্দর।

মাইল দেড় খনির করা workings-এর মধ্য দিয়ে হাঁটবার পরে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলুম—এসব রিজার্ভ ফরেস্ট। ধনেশপাখী ডাকচে বনে। সেই যে একপ্রকার কাঁটাওয়ালা ফল, ওকড়া ফলের মত, যা কাপড়ে লেগে সেদিন টোয়েবু যাবার পথে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তা এখানেও লাগতে লাগলো। অতি দুর্গম পথ—একটি নালা ধরে নালার খাতের পাষাণ বাঁধানো—একদম লৌহপ্রস্তর বাঁধানো—গর্ভ দিয়ে বড় ছোট পাথর ডিঙিয়ে নামচি, নামচি, নামচি। ফরেস্ট গার্ডকে বলচি আমরা, ও Falls কেত্না দূর?

সে প্রথমে বল্লে—এক মাইল। এখন বলচে দেড় মাইল। তারপর পথ যতই দুর্গম হয়ে আসে, ও ততই বলে, দু' ফার্লং।

কিন্তু একেবারে বিরাট wilderness-এর মধ্যে দিয়ে ক্রমনিম্ন পাহাড়ী ঝর্ণার পাষাণময় গতিপথ বেয়ে নামচি, নামচি—আশেপাশে চেয়ে দেখচি তৃণ, পান্‌জন, বট, আসান, শিববৃক্ষ (sterculia urens), পান, আরও কত মোটা মোটা লতা, কম্‌প্রিটাম লতা, বন্যকন্দ, বন্য অশ্বগন্ধা—কত কি গাছপালা। এক জায়গায় বড় বড় পাথর বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে, ঝর্ণার জল পড়ে একটা গর্ত্ত মত সৃষ্টি করেচে পাথরের ওপর। ছোট্ট একটি গুহাও।

ফরেস্ট গার্ড একটা জায়গায় এসে বল্লে—আওর তিন ফার্লং।

সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েচে। নালাটা হঠাৎ চল্লিশ ফুট ওপর থেকে নীচে পড়ে একটা গভীর খাতের সৃষ্টি করেচে এবং গভীর থেকে গভীরতর খড্ কেটে ক্রমনিম্ন খাড়া ঢালু পথে বহু, বহুদূরে নেমে গিয়েচে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে—দূরে জলপতনধ্বনি শুনতে পেলুম বটে।

অদ্ভুত, গম্ভীর এই স্থানের দৃশ্য। বর্ণনা করা যায় না। আমরা দেখলুম আরও তিন ফার্লং গিয়ে আজ আর ফিরতে পারবো না। চিড়িয়া খনির Skip বন্ধ হয়ে যাবে। তখন দুর্গম ঢালুপথে হেঁটে নিচে নামবে কে?

ফরেস্ট গার্ড বল্লে—জলপ্রপাত ওখান থেকে দেখা যাবে না। ঢালুপথে অনেকটা নামতে হবে—তিন ফার্লং গিয়ে, তবে দেখা যাবে।

তিনটে বেজেচে—'আংকুয়া, ২৯' Falls মাথায় থাকুক্। ১৭৬০ ফুট পর্ব্বতশিখর যেখানে বসে আছে, পার্ব্বত্য ঝর্ণা সেই গভীর খাতের একেবারে প্রান্তে। সুলেমান কারকাট্টা বল্লে ম্যাপ দেখে—এ জায়গাটা ১৭৬০ ফুট উঁচু।

সেখানে বসে টিফিন বক্স্ থেকে বার করে পুরী, কাটলেট, কলা ইত্যাদি খেলুম। ফরেস্ট গার্ড দুটি খড়কুটো জালিয়ে চা করলে। মহিষের দুধের মাখন জমে গিয়েচে শীতে, মাখন-চা হোল।

খেয়ে সেই বনের পথে আবার ফিরলুম। কি ভীষণ নিস্তব্ধ জনহীন wilderness! যে এসব না দেখেচে, তাকে এর গাম্ভীর্য্য কিছুই বোঝানো যাবে না। সারেণ্ডা অরণ্যের অন্তরালে হাজারো সৌন্দর্যভূমি ছড়ানো—আমি আফ্রিকায় যেতে চেয়েছিলুম বন দেখতে! আবার সেই কাঁটাওয়ালা ফল—এদেশী নাম 'মিন্‌ডো জোটো', কাপড়ে জামায় লেগে ভারি হয়ে গেল। উঠচি, উঠচি—চড়াইয়ের দুর্গম পার্ব্বত্যপথ। অতিকষ্টে চলেচি, ঘন ঘন হাঁপাচ্চি। কক্ কক্ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের বন-মোরগ পালিয়ে গেল।

খনিতে এলুম, বেলা পড়েচে, কি সুন্দর সমতলের দৃশ্য। অনাবৃত লৌহ প্রস্তরের শৈলগাত্রেরই বা কি ভীমদর্শন চেহারা। এক জায়গায় অনেকখানি কোয়ার্টজাইট পাথর বেরিয়ে আছে অনেক ওপরে—যেমন নিচের ঝর্ণার দুধারে অনেক জায়গায় অতি অদ্ভুতভাবে ছিল। Skip দিয়ে একটি তরুণী হো মেয়ে উঠে এল বেশ শান্তভাবে। যারা কখনো skip-এ ওঠেনি তাদের মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা। আমরা নামচি, অনেকগুলি রাঙা ধূলিমাখা কুলি-মেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে দেখচে, এঞ্জিন-ড্রাইভারকে বলচে—ঠারো, ঠারো।

নামবার সময়ে ঢালুর দিকে চেয়ে ভয় করলো—যেন কোন্ নরকে নেমে চলেচি। যদি শেকল ছিঁড়ে যায়, তবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে। ট্রেনে এলুম আংকুয়া জংশন—ট্রলিতে সেই অপূর্ব্ব বনপথে এলুম সবাই। বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস লাগচে সামনে থেকে ট্রলির বেগে, বনপুষ্পের সুবাস বাতাসে, দুপাশে বনে বনে অজস্র দেবকাঞ্চন (bohinia purpuria) ফুল ফুটে। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। বাঁদিকে কোইনা নদীর ওপারে পর্ব্বত-শীর্ষেও বনস্পতি-শীর্ষে রাঙা রোদ। সলাই বাংলো তিন মাইল, এখানে আমাদের মোটর আছে।

ওই সামনে দুইয়া খনির শিখরদেশ দেখা যাচ্চে রাঙা দগ্‌দগে ঘার মত সবুজ শৈলগাত্রে—ঠিক সবুজ নয়, ধূসর শৈলগাত্রে।

এ বনে যজ্ঞডুমুর ও শিমুল, আম ও পান্‌জন গাছ অনেক, আলোকলতা ও চটি জুতোর মত ফলবিশিষ্ট সেই গাছটাও যথেষ্ট। শেষোক্ত গাছটা আমাদের বারাকপুরের ভিটেতে আছে।

মনেও পড়লো বারাকপুরের কথা—কুঠির মাঠে শীতের অপরাহ্ণ নেমেচে, আলকুশীর লতা দুলচে বনে-ঝোপে, ইন্দু রায় তার বাড়ীতে বসে ফণিকাকার সঙ্গে গল্প করচে,—বেশ দেখতে পাচ্চি।

সলাই থেকে তখনি মোটর ছাড়া হোল। সুলেমান কারকাট্টাকে আমরা মোটরে

উঠিয়ে নিলুম—নতুবা সাইকেলে এই সন্ধ্যায় সলাই থেকে ছোটানাগরা সাড়ে সাত মাইল ভীষণ বনের পথে যেতে হবে। হাতীর বড় ভয় এ সময়। বাঁদিকে সেই সুউচ্চ প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু পর্ব্বতমালার দিকে চেয়ে আছি। মোটর ছুটচে বেগে, কখনো ঘন বনে ঢুকচে কম্‌প্রিটাম লতার শাদা কচি পাতা দোলানো ঝোপের মধ্য দিয়ে, কখনো উঠচে, কখনো নেমে পার্ব্বত্য নদী পার হচ্চে। আমি দেখচি বাঁদিকের পাহাড়ে কোথাও খানিকটা অনাবৃত পর্ব্বতগাত্র, কোথাও একটা গাছ। এই সন্ধ্যায় কল্যাণীর কথা বড় মনে হচ্চে, ওকে হয়তো কাল দেখবো।

অনেক দূরে ইছামতীর পারে একটি তেতলা বাড়ীর ওপরের ঘরটিতে—সেখানে এখন কেউ থাকে না—যে ছিল, অনেক কাল আগে সে কোথায় গিয়েচে। গৌরী—তার কথা মনে হচ্চে আজ সন্ধ্যায়। এই সময়ে সে মারা গিয়েছিল আজ বিশ বৎসর আগে।

ভগবান তার মঙ্গল করুন।

দুদিকের বন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবিড়তর দেখাচ্চে, সেদিনকার সেই ছোট্ট ঝর্ণাটি পার হলুম, যার ধারে লতাকুঞ্জে রাজা অভিরাম টুংয়ের ঢোল পড়ে আছে।

অনেক রাত্রে একবার আমি বাইরে এলুম, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি নক্ষত্রসমূহ ঠিক হীরকখণ্ডের মত জ্বলচে, গুয়ার পাহাড়ের মাথায় একটা নক্ষত্র দপ দপ করচে, একবার নিবচে আবার জ্বলচে যেন। আকাশে নক্ষত্রসমূহের এমন দীপ্তি বাংলা দেশে তো দেখিই নি, এমন কি মনে হয় ঘাটশিলাতেও দেখিনি।

একটা সারেণ্ডা বা সিংভূম দর্শনেই আমি মুগ্ধ, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অমন কত অনন্ত কোটি beauty spot ছড়ানো রয়েচে, ঐ সব নক্ষত্রে কি বিচিত্র জীবনধারা, আত্মার অনন্ত গতিপথে ওদের নিয়েও তাঁর লীলা। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বনপাহাড়ের মাথার ওপরে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লীলা, শুধু তাঁর কথাই মনে আনে।

সকালে উঠে দেখি খুব কুয়াশা হয়েছে, সাদা ধোঁয়ার মত কুয়াশার রাশি উপত্যকা থেকে উঠচে ওপরে, গুয়ার পাহাড় ঢেকে দিলে। বড্ড শীত। পাহাড়ের নীচে বনশ্রেণী কুয়াশায় ঢাকা, ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠলো। সূর্য্যদেবকে প্রণাম করলুম।

আজ এখান থেকে চলে যাবো। সারেণ্ডা অরণ্যের কাছে বিদায় নিলুম, হে সুপ্রাচীন অরণ্য, তোমায় প্রণাম করি। শত বিস্ময়ের সৌন্দর্য্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার বৎসর ধরে লুকানো ছিল, কেউ আসেনি দেখতে—এতদিনে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। আজ ষোল দিন ধরে বনপুষ্প সুবাস উপভোগ করেচি তোমার বনে বনে, তোমার বনবিহঙ্গের কলগীতি শুনে কান জুড়িয়েচি শহরের কলকোলাহলের পরে, তোমাকে প্রণাম করি। কত দেবকাঞ্চন ফুল, কত লুদাম, কত অপরিচিত নাম-না-জানা ফুল, কেকাধ্বনি, জলপ্রপাতের জলপতনধ্বনি জনহীন গহন বনে, সেই গুহা দুটি, কত বন্যলতার অদ্ভুত মনোরম ভঙ্গি, ধনেশ পাখীর কর্কশ চীৎকার, ক্ষুদ্র barking deerএর ঘেউ ঘেউ শব্দ, বন্য বানরের ডাক (যেমন কাল ডাকছিল আংকুয়া

জলপ্রপাতের বনে), অপূর্ব্বদর্শন বনাবৃত শৈলমালা, লৌহপ্রস্তরের বিশালকায় খনি—এ সব দেখবার শুনবার, উপভোগ করবার অভিজ্ঞতা যে কত দুর্লভ তা আমি জানি। সেইজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, যিনি আমাকে এখানে এনেচেন।

আজ সকালে চা খেয়ে মোটরে রওনা হই গুয়াতে। গাড়ীর স্প্রিং ভেঙে গিয়েচে বলে জিনিস-পত্র কুলির মাথায় পাঠানো হোল গুয়াতে। মোটর ছেড়ে আসচি, পথে ঝর্ণার পথে কিছুদূরে আমাদের পাচক বিরশা চলেচে হেঁটে। কার্ডিনাল উল্‌সির কথা মনে হোল ওকে দেখে। আজ বনের পথে মোটর চলেচে, আমি ভাবছি প্রায় চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে চাঁইবাসা গিয়ে ট্রেন ধরে আজই হয়তো রাত একটা-দেড়টায় বাড়ী পৌঁছে যাবো। খুব আনন্দ হচ্চে আজ সারা পথটি। তেনতারি ঘাটে কোইনা নদী পার হলুম। এখানে সাত-আটজন কুলি আমাদের গাড়ী ঠেলবার জন্যে অপেক্ষা করচে।

ঘন জঙ্গলের পথে যাবার দিনের সেই কুম্‌ডি রাস্তার মোড়ে এলুম। বরাইবুরু বলে যে গ্রামটি কারো নদীর ধারে সেটি ছাড়ালুম। গুয়া এলুম মিঃ রাসবিহারী গুপ্তের বাড়ী, সেখানে মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশা দেবী ও আরও কয়েকটি মহিলা দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। মিসেস্ গুপ্ত পরিতোষ করে আমাদের খাওয়ালেন। অনেকদিন পরে যেন সভ্যজগতে এসেচি বলে মনে হচ্চে। আমরা তিনটের সময়ে মোটরে রওনা হই, বরাইবুরুতে কারো নদী পার হয়ে জামদার পথে চল্লুম হাটগামারিয়া। আজ হাটবার গোপালনগরের, জগন্নাথপুরের হাট দেখে আমার সেকথা মনে পড়লো। পঞ্চা মাস্টার বেগুন বিক্রি করচে ইঁদারার ওপরে বসে। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। পিছনে দেখা যাচ্চে কেউন্‌ঝর রাজ্যের পাহাড় ও বন, বামে কোল্‌হান ও সারেণ্ডার শৈলমালা। হাটগামারিয়া এসে পরেশবাবুর আপিসে আমরা চা খেলুম—তারপর কেঁদ্‌পোসি স্টেশনে এলুম ট্রেন ধরতে। আমি এখান থেকেই যাবো ঘাটশিলায়। আজই যাবার জন্যে মন উদ্বিগ্ন। মণীন্দ্র নন্দীর নাতি আলাপ করলেন। তিনি এখানে চীনামাটির খনির ম্যানেজার। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাকি তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

ট্রেনে উঠলুম, লেখা আছে ইণ্টার ক্লাস, কিন্তু কাজে সেকেন্ ক্লাস। বেশ আরামে বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' পড়তে পড়তে এলুম—মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে ধুসর দিগন্তের দিকে চেয়ে ভাবি। এতক্ষণ হাট শেষ হয়ে গেল, লোকেরা সব বাড়ী ফিরচে। লিচুতলায় আড্ডা বসেচে। বিরশার সঙ্গে আবার দেখা চাঁইবাসা স্টেশনে। ডাক-আরদালি কামরায় এসে সেলাম করে বকশিশ চাইলে।

বড্ড দেরি করে ট্রেন টাটায় এল। রাঁচি এক্সপ্রেস ছেড়ে গিয়েচে—সারা রাত্রি ওয়েটিং রুমে চেয়ারে বসে কাটালুম। নৈহাটির এক গার্ড এখানে কি করচে, তার সঙ্গে সারারাত গল্প করি। দুজন ছোকরা ওয়েটিং রুমে আমায় চিনতে পেরে বসবার জায়গা করে দিলে।

রাত শেষ হয়ে গেল। ৬টায় ট্রেন এল, ভীষণ শীত। ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাটশিলায় এলুম। মনে খুব আনন্দ। ষোল দিন পরে বাড়ী ফিরচি, ঘি ও ধুনো হাতে ঝুলিয়ে চলেচি। শান্ত এসেচে বম্বে থেকে, প্ল্যাটফর্মে দেখা। ও গেল পুঁটুর কাছে। কল্যাণীয়া ঘি দেখে খুব খুশি।

বাড়ী আসতে সবাই খুশি।

ঊষা চিঠি দিয়েচে কাশ্মীর থেকে, অজিতবাবু চিঠি দিয়েচেন রাঙামাটি (চট্টগ্রাম) থেকে —বাড়ী এসে পেলুম।

পরের দিন সন্ধ্যায় শচীন ও ফণির সঙ্গে বসে বসে চালভাজা খাচ্ছিলাম। সারেণ্ডাতে কত ভাল জায়গা দেখেছি তার একটি তালিকা ওদের কাছে বল্লাম। প্রথমে ধরি কুমডির পাশে কোইনা নদী। ২য়, শশাংদাবুরু ; ৩য়, থলকোবাদ বাংলো ; ৪র্থ, জাতি-সিয়াং (Mat-Rock) ; ৫ম, ভানগাঁও ও বোনাই সীমান্ত ; ৬ষ্ঠ, বাবুডেরা ; ৭ম, বনশ্রী ও বাবুডেরা থেকে সাম্‌টার তেমাথার পথ, ৮ম, হেন্দেকুলি ক্যাম্প ও তৎপূর্ব্বের সামটা নালার loop ; ৯ম, শিশিরদা জলা ও গুহাদ্বয় ; ১০ম, থলকোবাদ বাংলো থেকে বনপথে কোইনা নদী ও তীরবর্ত্তী বনভূমিতে কোইনা নদীর loop ; ১১শ, টোয়েবু জলপ্রপাত ও সেখানে যাবার বনপথটি ; ১২শ, বিট্‌কেলসোয়া গ্রাম ও সেখানে যাওয়ার পথটি ; ১৩শ, মহাদেবশাল ঝর্ণা ও কোল বোংগা গ্রাম ; ১৪শ, নৃসিংহদাস বাবাজীর আশ্রম, মনোহরপুর ; ১৫শ, হেন্দেসিরি ; ১৬শ, ছোটনাগরা বাংলো ; ১৭শ, সলাই বাংলো ; ১৮শ, সলাই থেকে আংকুয়া যাবার পথ ও পাশে কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ত্ত ; ১৯শ, চিড়িয়া খনি ; ২০শ, Lyall's look-out, রামদাঁতনের কাঁটালতা ভেঙে সেখানে গিয়েছিলাম ; ২১শ, উম্বুরিয়া ঝর্ণা ; ২২শ, বড় বড় শালের preservation plot ; ২৩শ, আংকুয়া জলপ্রপাত, ২৪শ, সেচনের পয়োপ্রণালী, ২৫শ, বড়ানাগরা ও ছোটানাগরা (ঢোল ডুটি ও অভিরাম টুং রাজার ভগ্ন মন্দির), ২৬শ, কোদলীবাদে যে কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ১৯২৫ সালে ছিলেন।

অনেকদিন লিখিনি। কাল সন্ধ্যায় ইন্দুবাবুর গাড়ীতে ধলভূমগড় থেকে ফিরে এসেচি। ৫ই জানুয়ারী তারিখেও একবার গিয়েছিলুম। বড় ভাল লাগে ও জায়গাটা। মুক্তপ্রান্তরের মধ্যে এখানে ওখানে খড়ের ঘরের সারি—এরোড্রোমের লোকদের বাসস্থান। শাল, মহুল, হরীতকী ছাড়া বিদেশী কোন রোপিত ফুল-ফলের বৃক্ষ নেই, কোঠাবাড়ী এক-আধখানা ছাড়া বেশি নেই। বাঁদিকে দূরে চারচাকীর জঙ্গল দেখা যায়। শুকনো শালপাতার বেড়ার গন্ধ রোদ ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চারচাকার বনটি অতি চমৎকার, সেদিন যখন জ্যোৎস্না উঠলো আর কোনো বাড়ী-ঘর দেখা যায় না—অত বড় বিরাট মুক্ত space যেন মায়াময় হয়ে উঠলো। যে কোনো সময় ঘরে বা বারান্দাতে বসে সামনে চোখে পড়ে তালকী পাহাড় ও তার পটভূমিতে ঋজু ঋজু সুদীর্ঘ শাল তরুশ্রেণী—কাল আবার মেঘ করাতে দৃশ্যটি এত সুন্দর হয়েছিল। নীল হয়ে উঠেচে শৈলমালা। এখানে যদি কলকাতার শৌখীন লোকেরা বাড়ী করে টাউন বানাতো, বাড়ীর নাম দিতো 'সন্ধ্যানিবাস' 'অলকা' 'বনবীথি' 'Hill view' 'অমুক নিলয়' 'Forest side' ইত্যাদি, বালিগঞ্জী ফ্যাশানে সামনে ঢাকা টানা বারাণ্ডা করতো কাঁচের প্যানেল বসানো, লম্বা জানালায় ফ্রেম বসানো, লতাপাতা আকারের লোহার রেলিং বসানো গেট্ বসাতো—তাহলেই এই শালবন ও শৈলশ্রেণী, লাল

মাটি ও কাঁকরের উচ্চাবচ টিবির সঙ্গে, এই রৌদ্রস্নাত দূর দিগন্তের সঙ্গে, এই লাল ধূলো মাখা সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে আর কোনো যোগ থাকতো না। সে হয়ে উঠতো একটা টাউন—বালিগঞ্জের অক্ষম ও সক্ষম অনুকরণে। যেমন নষ্ট হয়েচে দেওঘর বা মধুপুর বা শিমূলতলায়। এবং নষ্ট হয়েচে খানিকটা ঝাড়গ্রামও।

ব্যারাকপুর গিয়েছিলুম ধান চাল গোছাতে। গেলুম সেদিন গুটুকের সঙ্গে রাঁচী প্যাসেঞ্জারে। যাবার পূর্ব্বে দ্বিজুবাবুর বাড়ীতে বেদান্ত ও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে কত আলোচনা করি—ফিরে এসে আর দেখা হয়নি। কলকাতায় যাবার বুকিং বন্ধ, অতি কষ্টে ব্রেকভ্যানে একটু জায়গা করে নিলুম। সকালে কলকাতায় পৌঁছে—রমেশ ঘোষালের বাড়ী গিয়ে 'তালনবমী' পুস্তকের contract হোল। সেখানে দেখলুম 'Indian arts and Letters' বলে পত্রিকা, যাতে আমার কথা লিখেচে। সেদিনই তিনটার ট্রেনে বনগ্রামে গিয়ে বন্ধুর বাসায় থাকি। টরু আছে এখানেই। ভীষণ শীত রাত্রে। লিচুতলায় মনোজবাবু, যতীনদা', মন্মথদার সঙ্গে জমাট আড্ডা। মিতে এসে বল্লে 'স্বপ্ন বাসুদেব' বড় ভাল লেগেচে। অন্ধকারে মনোজবাবু ও

হে অরণ্য কথা কও ৪৫১

মাটি ও কাঁকরের উচ্চাবচ টিবির সঙ্গে, এই রৌদ্রস্নাত দূর দিগন্তের সঙ্গে, এই লাল ধূলো মাখা সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে আর কোনো যোগ থাকতো না। সে হয়ে উঠতো একটা টাউন—বালিগঞ্জের অক্ষম ও সক্ষম অনুকরণে। যেমন নষ্ট হয়েচে দেওঘর বা মধুপুর বা শিমূলতলায়। এবং নষ্ট হয়েচে খানিকটা ঝাড়গ্রামও।

ব্যারাকপুর গিয়েছিলুম ধান চাল গোছাতে। গেলুম সেদিন গুটুকের সঙ্গে রাঁচী প্যাসেঞ্জারে। যাবার পূর্ব্বে দ্বিজুবাবুর বাড়ীতে বেদান্ত ও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে কত আলোচনা করি—ফিরে এসে আর দেখা হয়নি। কলকাতায় যাবার বুকিং বন্ধ, অতি কষ্টে ব্রেকভ্যানে একটু জায়গা করে নিলুম। সকালে কলকাতায় পৌঁছে—রমেশ ঘোষালের বাড়ী গিয়ে 'তালনবমী' পুস্তকের contract হোল। সেখানে দেখলুম 'Indian arts and Letters' বলে পত্রিকা, যাতে আমার কথা লিখেচে। সেদিনই তিনটার ট্রেনে বনগ্রামে গিয়ে বন্ধুর বাসায় থাকি। টরু আছে এখানেই। ভীষণ শীত রাত্রে। লিচুতলায় মনোজবাবু, যতীনদা', মন্মথদার সঙ্গে জমাট আড্ডা। মিতে এসে বল্লে 'স্বপ্ন বাসুদেব' বড় ভাল লেগেচে। অন্ধকারে মনোজবাবু ও

হে অরণ্য কথা কও ৪৫১

মাটি ও কাঁকরের উচ্চাবচ টিবির সঙ্গে, এই রৌদ্রস্নাত দূর দিগন্তের সঙ্গে, এই লাল ধূলো মাখা

১৯০৪ সালের সেই ৺সরস্বতী পূজা। আমার একেবারে শৈশব তখন—অস্পষ্ট মনে হয় একটু একটু। কুঠীর মাঠের গাছপালা বনঝোপের কি চমৎকার শোভা। পেয়ারাতলায় বসে ভগবানের কথা চিন্তা করলুম। কাছিম কাটচে সাঁইবাবলা তলার ঘাটে। ওপারের ঘাটে গিয়ে স্নান করলুম। তারপর বুধো ঘোষের খামারে আমার ধান ঝাড়া ও মাড়া হচ্চে, সেখানে গেলুম। একজন হ্যাটপরা লোক যাচ্চে হরিপদদার বাড়ীতে—তাকে ডেকে এনে বসালুম। হাটে গেলুম বিকেলে—লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ ব্যথা!

তিনটি ঘটনা বড় ভাল লাগলো এবার গ্রামে। বড় চারা আমগাছ তলায় নিবিড় ঝোপে শুধু পত্ররাশির ওপর একা বসে বনপুষ্প সুবাসের মধ্যে রোজ দুপুরে কত কথা চিন্তা করতুম, কত কি পাখি ডাকত বনে, ভগবানের দানের মত কোথাও আমড়া পড়তো, গান গাইতুম 'তব আসন পাতা এ বনতলে'—আমারই তৈরী গান, এবং ওর ওই একটিই লাইন। গান তৈরী করতে তো জানি না!

দ্বিতীয় ঘটনা—বিকেলে গিয়েচি ঘুমিয়ে উঠে বরোজপোতার বাঁশবাগানে বেড়াতে। শুকনো বাঁশের পাতা পড়ে আছে সর্ব্বত্র। হঠাৎ দেখি এক অপূর্ব্ব ছবি—সিঁদুর-কোটো আমগাছটার পাশে একটা চারা সজনে গাছের একটা মাত্র ডালে থোলো থোলো সজনে ফুল ফুটেচে, তারই পাশে সিঁদুর-কোটো আমডালে একটা চিল বসে আছে—ওদের ওপরে নীল আকাশ। যেন চীনা চিত্রকরের ছবি একখানা। কতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, পা আর ওঠে না। ফিরে এসে ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে আবার বারিকের বাড়ী গেলুম চালকীতে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে, আমি ওর উঠোনে গরুর গাড়ীর ওপর বসে তামাক খাচ্চি কল্‌কে হাতে। তারপরে পাকা রাস্তার ওপরে মুচিপাড়ায় সজনে সাঁকোতে গিয়ে বসে আমডোবের গল্প শুনি ইন্দুর মুখে। তৃতীয় ঘটনা এইটিই। কোথায় টাটানগরের সভা সেদিনকার, কোথায় সারেণ্ডা বন কান্তারের শৈলমালা—আর কোথায় চালকী গ্রামে আমার প্রজা বারিকের বাড়ীতে গরুর গাড়ীর ওপর বসে তামাক খাওয়া!—

পরদিনও বিকেলে বারিকের বাড়ী যাবার আগে প্রমোদের বাবার সঙ্গে কথা বলি। তিনি তামাক খাওয়ালেন। অম্ল বলে মেয়েটির শ্বশুর। কত নিন্দে করলেন কুটুম্ব-বাড়ীর। উনি জ্বরে পড়ে আছেন, ওঁকে দেখে না—ইত্যাদি। বারিকের বাড়ী গিয়ে খুব বকাবকি করলুম ধান দিচ্ছে না বলে। ওখান থেকে সোজা চলে এলুম কুঠীর মাঠে অপূর্ব্ব বনপথে, কণ্টক-লতার পুষ্পের সুগন্ধের মধ্যে। আগে বসলুম নদীর তীরে নিবারণ ঘোষের বেগুন ক্ষেতের জমিতে, যেখানে আর বছর আমি আর কল্যাণী নতি শাক তুলতে আসতুম। তারপর এখান থেকে মাঠের মধ্যে জলার ধারে। রোদ একেবারে রাঙা হয়ে এসেচে, শিমুল গাছে মুকুল দেখা দিয়েচে, শীত আজ অনেক কম। কুল পেকেচে গাছে গাছে—অনেক পেড়ে খেলুম—কিছু নিয়ে এলুম ইন্দু রায়ের ছেলেমেয়েদের জন্যে। ফিরবার পথে অন্ধকার সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালুম—ওপারে একটি মাত্র তারা জল্ জল্ করচে সন্ধ্যা আকাশে। যেন আমি ১৯৩৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে বারাকপুর এসেচি, খুকু রোজ সন্ধ্যায় আমার

কাছে স্লেট্ পেন্সিল বই নিয়ে পড়তে আসে—আমি বসে বসে মেটে প্রদীপের আলোয় 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখতুম।

শ্যামাচরণ দা'র বাড়ী বসে গল্প করে এদিন ওদের বাড়ীর খিড়কির পথে আমাদের পুরোনো ভিটের সামনে দিয়ে ফিরি। যেমন ফিরতুম বাল্যকালে, যখন মা ছিলেন, বাবা ছিলেন—আমাদের পুরোনো ভিটের বাড়ীটা বজায় ছিল। সে সব কত কালের কথা!

পরদিন আবার সকালে বড় চারা আমতলায় বসলুম বনের মধ্যে শুষ্ক পাতার রাশির ওপর গামছা পেতে। এই বনের মধ্যে নিভৃতে চুপ করে বসে বন-বিহঙ্গের কাকলী শুনতে আমার যে কি ভাল লাগে। জীবনকে গভীর ভাবে অনুভব করি এই নির্জ্জন বনতলে একা বসে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে"—উপনিষদের বাণীর সার্থকতা ও সত্যতা এখানে বসে বুঝতে পারি।

হাটে গিয়ে পাটালি কিনলাম। ফিরে এসে সেদিন সন্ধ্যায় যে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হোল—তা এ ক'দিনের সব অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল। সন্ধ্যায় বনভূমিপ্রান্তে ক্ষীরপুলি গাছের পেছনটাতে একা বসেচি চুপ করে—সামনে ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা ঝোপ-ঝাপ, সাঁই বাবলা গাছের পত্রশীর্ষ, বনপুষ্প-সুবাস, পাখীর ডাক—সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসচে, বনভূমি আজও তেমনি স্বপ্নমাখা—কি সুন্দর মধুমাখা সন্ধ্যা! কল্যাণী আমায় বলতো—মানুকু, এখানে বসবো!

এই মাঠে।

সেকথা মনে পড়লো এই সন্ধ্যায়। তার চোখে অসীম নির্ভরতার দৃষ্টি।

কলকাতায় এলুম পরদিন গরুর গাড়ীতে। তিনু আমার সঙ্গে এল রানাঘাট স্টেশনে কচু কুমড়ো নিয়ে ওর দাদার শ্বশুরবাড়ীর জন্যে। মাঝের গাঁয়ে মহীতোষ দা'র সঙ্গে স্টেশনে দেখা অনেকদিন পরে।

কলকাতা থেকে আমতায় গেলুম শ্বশুরবাড়ী। সেই জাঙ্গিপাড়া স্কুলে যখন কাজ করতুম, গৌরী মারা গিয়েছিল—সেই সব শোকাচ্ছন্ন দিনের ছাপ আছে এই সব লাইনের গাছেপালায় মাঠে। সেই পথ দিয়েই আবার শ্বশুরবাড়ী যাচ্চি এতকাল পরে। খুব আশ্চর্য্য না?

কলকাতায় এবার দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল বহুকাল পরে। খেলাত স্কুলের পুরোনো হেড্‌মাস্টার ক্লারিজ সাহেব—আজকাল সে একজন ইহুদী স্কুলের হেড্‌মাস্টার বউবাজারে। একেই নিয়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের সৃষ্টি 'অনুবর্ত্তন'এ। আর ভাগলপুরের অম্বিকা ঘোষ যার সঙ্গে অনেকদিন আগে ভাগলপুর থেকে দেওঘর হেঁটে গিয়েছিলাম। 'অভিযাত্রিক'এ এ ঘটনার উল্লেখ করেচি। অম্বিকাকে একখণ্ড 'অভিযাত্রিক' উপহার দিলুম। ওর সঙ্গে ১৪/১৫ বছর পরে দেখা হোল—ও দেখতে তেমনিই আছে।

আজ সবাই মিলে চারখানা গরুর গাড়ী করে বনের পথে ধারাগিরি যাওয়া গিয়েছিল। সারাপথ এমন enjoy করেছি কি বলবো! কাশিদা ছাড়িয়ে লাল শালুক ফোটা সেই বড়

বিলটা, যেখানটার নাম ঢ্যাং-জোড়া, সেটা ছাড়িয়ে ধবলীর বন, তারপর বুরুডি গ্রাম, তা ছাড়িয়ে বুরুডি ঘাট অর্থাৎ পাস্, তারপর বাসাডেরা গ্রাম—একেবারে চতুর্দ্দিকে বন সমাচ্ছন্ন উপত্যকায় ঘেরা, সেখানে মুকুলবাবুর কর্ম্মকর্ত্তা শিরীশ বেশ চমৎকার একটি ঘর বানিয়েচে দেখলুম, দেখলে থাকতে লোভ হয় এই নির্জ্জন বনাবৃত উপত্যকায়। এই ঘরের সামনে দিয়ে মুকুলবাবুর তৈরি রাস্তা পাহাড়ের ওপর চলে গিয়েচে, নিশ্চয়ই জ্যোৎস্নারাত্রে বা ছায়াস্নিগ্ধ বৈকালে এই পথের বন্য আমলকী, আম, পিয়াল ও তেঁতুল তলায় বেড়ানো বড় মনোরম হবে। একদিন যাবো ওখানে ও রাত কাটাবো রমাপ্রসন্ন ও গৌর এখানে এলে।

আমরা ঘাট অর্থাৎ পাস্ পার হয়ে গেলুম পদব্রজে। সবাইকে গরুর গাড়ী থেকে নামতে বাধ্য করলুম। এই রাস্তাটার একটা নিবিড় বন্য সৌন্দর্য্য আছে, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে, ডাইনে ৬০০।৭০০ ফুট গভীর খাদ, তার তলা দিয়ে খরস্রোতা (নদীর নাম, বিশেষণ নয়) নদী উপলাস্তৃত বন্ধুর পথে বয়ে চলেচে, চারিধারে কত রকমের গাছপালা, কত মোটা মোটা লতা, বনফুলের মধ্যে এক রকমের কুচো কুচো নীল ফুল আর হুট্‌বা (Indigofera Pulchera) ফুটেচে। বাঁদিকের পাথরের দেওয়ালের গায়ে—বনবিহঙ্গের কাকলী বনের শাখায় শাখায়, ঘাট অতিক্রম করে বাসাডেরা উপত্যকায় এসেই মুকুল চক্কত্তি কন্‌ট্রাক্টরের ওই ছোট্ট খড়ের ঘরটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সুন্দর শান্ত, নিভৃত শৈলমালা ও বনানী বেষ্টিত উপত্যকায় থাকে কিনা মুকুল চক্কত্তির কর্ম্মচারী শিরীশ? শিরীশকে আমি জানি, সে কি বুঝবে এই বনভূমির সৌন্দর্য্য? সে সকালে উঠে বনের মধ্যে চলে যায় কাঠ কাটানোর জন্যে, কাঠ চেরাই করবার জন্যে—তারপর গাড়ী বোঝাই দিয়ে শাল-বল্লা পাঠায় ঘাটশিলা স্টেশনে—যে বনের গাছ কেটে ব্যবসা করে, বনলক্ষ্মী কি তার সামনে মুখাবগুণ্ঠন অপসারিত করেন?

বেলা দেড়টার সময় আমরা ধারাগিরি পৌঁছে গেলুম। সঙ্গে এতগুলো মেয়েমানুষ ছিল, সবাই বড়লোকের বাড়ীর বৌ-ঝি, একবার কি কেউ বল্লে—জায়গাটা বেশ ভালো, কি বেশ, কি চমৎকার! কিছু না, পয়সাই আছে, কিন্তু চোখ নেই। মেয়েমানুষগুলোর হাতে এক গোছা করে সোনার চুড়ি, কানে কানপাশা, কত রকমের সেজেছে—কিন্তু এসেই 'ওরে, অমুক ওদিকে যাস্‌নি', 'অমুক তোর ঠাণ্ডা লাগবে'—হৈ চৈ চীৎকার, গোলমাল, 'বকা কোথায় গেল ছাখ্ ছাখ্' (কুকুরের নাম)—এই সব ব্যাপার! অমন চমৎকার বনপাহাড়ের সৌন্দর্য্যের দিকে কেউ চেয়েও দেখলে না, কেবল আমি আর প্রভাত দুজনে মুগ্ধ হয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। তারপর খিচুড়ি রান্না হোল, বটতলায় বসে ডাক্তার রক্ষিত, আমি ও প্রভাতকিরণ—তিনজনে খিচুড়ি খাওয়া গেল, তাস খেলা গেল, গল্পগুজব করা গেল। তারপর বেলা পড়লে ছায়াভরা বিকেলে সবাই পাহাড় থেকে ফিরলুম।

কাল বিকেলে ডুবলাবেড়া এলুম হলুদপুকুর থেকে। রাত্রে টাটানগরে ছিলুম, মিঃ ভর্ম্মার বাড়ীতে। অনেকে দেখা করতে এল। রাত দেড়টা পর্য্যন্ত 'দেবযান' সম্বন্ধে গল্প।

সুশীলবাবুর মোটরে স্টেশনে এলুম ভোর ছ'টাতে। হলুদপুকুর স্টেশনে নেমে এক মাড়োয়ারি দোকানে চা ও খাবার খেয়ে বারোজ সাহেবের মোটর লরির জন্যে অপেক্ষা করলুম। বারোজ সাহেবের লোক বল্লে—রাত্রে যা বৃষ্টি হয়েচে, ও রাস্তায় গাড়ী আসা মুশ্‌কিল। শোনা গেল ডুবলাবেড়া এখান থেকে ষোল মাইল। দিনটি মেঘাচ্ছন্ন ও ঠাণ্ডা। হেঁটে বেরিয়ে পড়ি আমি ও মিঃ ভর্ম্মা। কেমন কাঁকরের পথটি এঁকে বেঁকে আমাদের সামনে দূর থেকে বহুদূরে সুদূরে নীল শৈলমালা ও বনপ্রান্তরের দিকে চলে গিয়েচে। ঐ হোল রাইরক্ষপুরের পথ—এ পথ চলে গেল বারিপদা হয়ে বালেশ্বর ও কটক। আমরা বনের দিকে অগ্রসর হচ্চি—ঐ শৈলমালার মধ্যে কোন এক অনাবৃত ছায়াভরা উপত্যকায় ডুবলাবেড়া গ্রাম। সেখান থেকে ভ্যালেডিয়ম ore আসচে।

প্রথমে পড়লো নড়সা নদী। পথের দুধারে কালো পাথরের পাহাড়, যেন পাথুরে কয়লার স্তূপ, এসব পাহাড় প্রায়ই অনুর্ব্বর, বৃক্ষলতাহীন—ক্বচিৎ কোন পাহাড়ে এক-আধটা শিববৃক্ষ দণ্ডায়মান। হাঁড়িয়ালি বলে একটা গ্রামে এক বাড়ী থেকে শাঁকের আওয়াজ শুনে এক ছোকরাকে বল্লুম—এদের বাড়ীতে শাঁক বাজচে কেন?

—সত্যনারায়ণ পূজো হচ্চে।

—কি জাত এরা?

—মহারাণা।

—সে কি?

—জ্যোতিষ।

—ব্রাহ্মণ?

—ওই।

এদেশে হাঁ বলতে জানে না, বলে—'ওই'।

এ গ্রামের নিচেই হাঁড়িয়ালি বলে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। হেঁটে পার হয়ে গেলুম। রাস্তা হাঁটতে কি আনন্দই হচ্চে সকাল বেলাটা। ধূ ধূ করচে মুক্ত উচ্চাবচ ভূমিভাগ, যেন space-এর সমুদ্র, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, ছোট বড় কালো পাথরের পাহাড়, পলাশ, শিববৃক্ষ, মহুল ও আসান। শালগাছ বেশী চোখে পড়লো না। একস্থানে পথের ধারে বড় গাছের তলায় একটা চওড়া পাথরে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে—

মৃত্যু বাসেয়া সর্দ্দার।

সাং চাকড়ি, সন ১৩৪৩।

অর্থাৎ উক্ত গ্রামের ৺বাসেয়া সর্দ্দারকে অমর করবার চেষ্টা। এই গ্রাম পার হয়ে একটা পার্ব্বত্য নদী—নদীর নাম লুপুং, কিছুদূরে এই নামের একটা গ্রাম। পথের দুধারে আমের গাছ—এমন অদ্ভুত ধরনের বউল ধরেচে, আর তার কি ভরপুর সুবাস! একটা চারা আমগাছ দেখে মনে হোল গাছটাতে ফুল ধরেচে। নদীটার ধারে এক বিশাল সুপ্রাচীন অর্জ্জুন গাছের শাখা-প্রশাখার তলে আম্রমুকুলের সৌরভের মধ্যে কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

বেলা হয়েচে, পথ হেঁটে খিদেও পেয়েচে। কয়রাসাই গ্রামের পাশে একটা কালো পাথরের পাহাড়ের নিচে একটা কুলগাছ, অনেক কুল পেকেচে দেখে সেখানে কুল কুড়ুতে গেলাম। পথে কতকগুলি ছেলে স্কুলে যাচ্চে, কয়রাসাই গ্রামে একটা পাঠশালা দেখে এসেচি বটে পথের ধারে। আমরা ছেলেদের নাম জিজ্ঞাসা করলুম। একজন বল্লে—তার নাম দিবাকর তাঁতি। একজনের নাম ধনুর্ধর বাস্কে।

—কি জাত ?

—বাস্কে জাত।

এই সময়ে একটু একটু বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আমাদের সামনে ডানদিকে জোজুড়ি শিখরদেশ (২০০০ ফুট) দেখা যাচ্চে, দূরে নারদা (১৭০৬ ফুট) শিখর। সামনের শৈলমালার ওপারেই ময়ূরভঞ্জ, অগণ্য বন্যহস্তী ঐ সব পাহাড়ে। দিন থাকতে থাকতে দুবলাবেড়া পৌঁছুলে বাঁচি। কোয়ালি গ্রামে পৌঁছে গেলুম তখন বেলা একটা। এক কুম্ভকারের বাড়ীতে আশ্রয় নিলুম বৃষ্টির সময়। তাদের খোলার চাঁলা, মাটির দেওয়াল। মেয়েদের হাতে রূপোর অলংকার। কপালে সিঁদুর। কথা বাংলাই—তবে বড্ড বাঁকা বাঁকা এবং একটু উড়িয়া-ঘেঁষা। ওরা মুড়ি খাওয়ালে তেলনুন দিয়ে মেখে এনে। হঠাৎ এক বৃদ্ধ উড়িয়া ব্রাহ্মণ এসে ভিক্ষা চাইলো। তার নাম বাইধর মিশ্র, বাড়ী পুরীর কাছে মালতী-পাতপুর। ওর বারো বছরের ছেলে বাড়ী থেকে আজ দু-তিন মাস ভিক্ষে করতে বেরিয়েচে এবং খবর পাওয়া গিয়েচে ছোকরা সিংভূমে এসেচে। তাই বাইধর খুঁজতে বেরিয়েচে ছেলেকে। হলুদপুকুর স্টেশনে গিয়ে নেমে গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়াচ্চে। উড়িয়া ভাষায় বল্লে—কাল রাতে এক মণ্ডলের বাড়ী উঠেছিলুম, এমন ঝড়বৃষ্টি এল, ভাত রান্না করতে পারলুম না। কিছু খাইনি রাত্রে। ওকে আমরা কিছু পয়সা ও মুড়ি দিলাম। একটু তেল দিলাম, ও একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির' মধ্যে তেলটুকু পুরে নিলে। কি সুন্দর সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হেসে বল্লে—বাবু, বাড়িকে বাড়ি, চুঙ্গাকে চুঙ্গা। খুব খুশী।

আমরা কোয়ালি থেকে বৃষ্টি থামলে বেরিয়ে গুবরা নদী পার হলুম। (রাখা মাইনসের সেই গুবরা নদী, এখানে ছাৎনা পাহাড় থেকে বেরিয়েচে) তারপর বন ও জঙ্গলের পথে এলুম হরিনা গ্রামের মহাদেব স্থানে। এই বনের মধ্যে এক ভাঙা মন্দির, চারিদিকে বট, আমলকী, পলাশ, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষরাজি, মানুষের হাতের নয়, স্বাভাবিক বন। দেবস্থান বলে লোকে কাটেনি। ওখানে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার পথে বেরুই। পথ চলার আনন্দ এমন একটা নেশা আনে মনে, ছোট্ট একটা বন দেখলেও মনে হয় অদ্ভুত জিনিস দেখচি। বাহ্যজগৎকে গ্রহণ করে যে মন, সে শুধু উপভোগ করে ক্ষান্ত থাকে না, সৃষ্টিও করে। গুবরা. নদী পার হবার পরে আর একটা ক্ষুদ্র নদী পেলুম, সেটা পার হয়ে বেগনাড়ি গ্রাম। সামনের পাহাড়ে খাড়িয়া জাতিরা জুম্ চাষ করচে বন কেটে, বোধ হয় সে বাঁকা জায়গাতে খড় হয়েচে, শুষ্ক খড়ের ক্ষেত রাঙা রাঙা দেখাচ্চে, বেগনাড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে পাহাড়, অনেকগুলো বড় বড় গাছ পথের ধারে, বাঁশঝাড়, তেঁতুল, মহুয়া, অর্জুন। এতক্ষণ

দেখছিলুম মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ী—এখানে দেখলুম মেয়েদের মোটা হাত-বোনা কাপড় দু'টুকরো জড়ানো—হো বা সাঁওতালদের ধরনে। অনেক টোমাটো ক্ষেত পথের পাশে।

একটি বৃদ্ধ মহিষ চরাচ্চে, তাকে বল্লাম—তুবলাবেড়া কতদূর?

সে বল্লে—সামনে মাগুরু আর নেংগাম লাগালাগি, নেংগাম আর তুবলাবেড়া ভিড়াভিড়ি।

নতুন ভাষা শিখলাম। 'ভিড়াভিড়ি' মানে কাছাকাছি, কিন্তু এখানেই গোলমাল। ১৪ মাইল পথ তখন হাঁটা হয়ে গিয়েচে, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্তও বটে—সে অবস্থায় এ দেশের লোকের মুখে 'ভিড়াভিড়ি' শুনে খুব আশ্বস্ত হলুম না। এরা তিন মাইলকেও কাছাকাছি বলতে পারে। একটা পাহাড় দেখিয়ে বল্লে—ঐ পাহাঁড়টা দেখচিস্, ঐ পাহাড়টা ঘুরে যেতে হবেক। এ জায়গাটি চেয়ে দেখি বড় চমৎকার। তিনদিকে শৈলমালা ও নিবিড় বন আমাদের পথকে ঘিরেচে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, অবিশ্যি দূরে দূরে। জোজুড়ি শিখরদেশ আর দেখা যায় না, নারদা peak ডাইনে বহু পিছনে অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে, রোদ ফুটেচে পশ্চিম গগনে, অথচ বাঁদিকের ছাৎনা ও আটকুশী শৈলমালা সাদা কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা। যেন দার্জ্জিলিংয়ের কুয়াশা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে সেদিক থেকে।

একদিকে শাল কেঁদবন পথের পাশেই। বড় বড় শিলাখণ্ড সর্ব্বত্র। পাহাড়টা খুব উঁচু, ঘরে যাবার সময় বাঁ পাশে পর্ব্বতসানুতে বনশোভা বেশ দেখালো পড়ন্ত রোদে। পাকা কুল খেতে খেতে যাচ্চে একদল বন্য মেয়ে। তুবলাবেড়া তাঁবুতে পৌছুলাম বেলা পাঁচটাতে। পাহাড়ের নিম্নসানুর বন যেখানে শেষ হয়েচে, সেইখানেই তাঁবু পাতা। মিঃ বারোজ্ তাঁবুতে বসে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে গল্প করচে। বল্লে—পথে বৃষ্টির জন্যে মোটর পাঠাতে পারিনি, এখন পাঠাচ্ছিলাম। চা ও খাবার খেয়ে ধড়ে প্রাণ এল।

রাত্রে একটু জ্যোৎস্না উঠলো। কি শোভাই হোল তাঁবুর পেছনের পর্ব্বতসানুর বনের। শালগাছ নেই এ বনে। কেঁদ, পড়াশি, শিবগাছ, কুল, কম্‌প্রিটাম লতা, বড় বড় বিরাটকায় শিলাখণ্ডের ওপর টেরি লতা ও মোটা মোটা চীহড় লতার ঘন ঝোপ, আমলকী, নিম ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গলটা। বৈচিত্র্য আছে এ বনে, একঘেয়ে শালবন বড় খারাপ।

মিঠাই ঝর্ণার ওপারে লথাইডি গ্রামে খাড়িয়া জাতির বাস। তাদের মাদল বাজচে জ্যোৎস্না রাত্রে। এ একেবারে বন্য জায়গা, বারোজ বল্লে, বড় বুনো হাতীর উপদ্রব। গত বৎসর বন্য হস্তীতে নিকটের কেরু-কোচা গ্রামের একটা লোককে মেরে ফেলেছিল।' কি সুন্দর বনশোভা। জ্যোৎস্না পড়েচে উপত্যকার ওপারের আটকুশী শৈলশ্রেণীর একদিকের ঢালুতে—এ যেন বনপরীর দেশটি। শিউলি গাছের জঙ্গল তাঁবুর পেছনে শৈলসানুতে। শরৎকাল হলে প্রস্ফুটিত শেফালীর সৌরভ ভেসে আসতো শীতল নৈশ বাতাসে।

এই যে লিখচি, সামনে পাহাড়ের মাথায় বর্ষার সাদা মেঘপুঞ্জ জমেচে। তাঁবুর দোর থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে গাছগুলোকে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের একটি কথা মনে পড়ে গেল, "A nation's history has three stages. Success, then as a

consequence of success, arrogance and injustice; then as a consequence of these, downfall."

কাল সারাদিন বৃষ্টিতে তাঁবুতে বসে। কোথাও বেরুতে পারিনি। তাঁবুর পেছনে লুদাম, করম ও ধ গাছ, একটা ধাতুপ ফুলগাছে প্রথম বসন্তের রাঙা রাঙা ফুল ফুটেচে। পাহাড়ের সানুতে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় শিলাখণ্ড। যে কোনোটাতে আরাম করে বসে চিন্তা করা যায় বা লেখা যায়। কিন্তু বাদলাবৃষ্টিতে সব ভিজে। সন্ধ্যায় বারোজ সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে গিয়ে বসলুম খানিকক্ষণ। পূর্ব্ব আকাশে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভাঙা মেঘের ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠলো। মিসেস্ বারোজ বন্য হস্তীর গল্প করলে। এক পেয়ালা কোকো পান করে এই শীতে বেশ আরাম করে বুনো হাতী ও মাতাল ভালুকের গল্প শোনা গেল। আর বছর মাগড়ু গ্রামের নিকটবর্ত্তী পথে একটা ভালুক পেট ভরে মহুয়া ফুল খেয়ে যখন গাছ থেকে নামলো—তখন সে ঘোর মাতাল, টলতে টলতে চলেচে।

রাত্রে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হোল। সারারাত্রি বৃষ্টি।

আজ সকালেও বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা হলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা বিকেলে মাগড়ু ও চেংশম গ্রামে বেড়াতে গেলুম। ডাইনের প্রকাণ্ড পাহাড়শ্রেণীর পাশ দিয়ে আসান পড়াশির বনের ছায়ায় পথ, বনে পিয়াল গাছে মুকুল ধরেচে, বাতাসে আম্র ও পিয়াল মুকুলের সৌরভ, কালোকালো পাথরের স্তূপের ওপর টেরির জঙ্গল, বামে পোটরী ও কুন্দরুকোটা পাহাড়—ওখানে নাকি একটা সোনার খনি ছিল, বিলিংহাম নামে এক সাহেবের। এখন খনির কাজ বন্ধ শুনলুম। ওই পাহাড়ের ওপর দিয়ে অস্ত আকাশের তলায় তলায় ময়ূরভঞ্জ যাবার পথ। আমরা যখন ফিরলুম তখন বেলা পড়ে এসেচে, বন্য কুক্কুট ডাকচে ডানদিকের শৈলসানুর গহন অরণ্যের মধ্যে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠলো। আমরা তাঁবুর পিছনের শৈলশ্রেণীর ওপরে একটা পাথরের চাতালে রাত দুটো পর্য্যন্ত বসে আগুন জ্বালিয়ে গল্প করলুম। ভালুক ও বন্য হস্তীর ভয়ে (এবং শীতের জন্যেও বটে) আগুন জ্বালানোটা নিতান্ত দরকার। আজ বিকেলেই দেখে এসেচি মাগড়ু গ্রামে লাখন মাঝি বলে একটা সাঁওতাল যুবকের একটা চোখ ভালুকে একেবারে উপড়ে দিয়েচে—অবিশ্যি ঘটনাটা ঘটেছিল মাগড়ু থেকে তুবলাবেড়া যাবার পথে জঙ্গলের ধারে। লাখন টাঙি হাতে যাচ্ছিল তুবলাবেড়া, ভালুক মহুয়াগাছ থেকে নেমে ওর ওপর এসে পড়ে, উভয়ে জড়াজড়ি ধস্তাধস্তি হয়, তার ফলে লাখনকে একটা চক্ষুর মায়া কাটাতে হয়েচে। পরশু রাত্রে বারোজ সাহেবের মুরগীর ঘরে বাঘ এসেছিল, সকালে আবার দাগ দেখা গিয়েচে। এই সব শুনে নির্জ্জন পাহাড়ের ওপর গভীর রাত্রে আমরা তিনটি প্রাণী বসে থাকবার সময় যে খুব নিরাপদ ভাবছিলুম নিজেদের এমন কথা বল্লে মিথ্যে বলা হবে।

কিন্তু সব বিপদকে অগ্রাহ্য করা যায় সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রির শোভা দেখবার জন্যে। পাহাড়ের ওপরে শুকনো শালগা, দোকা (Odina wodier), অজস্র বন্য শিউলি, শিববৃক্ষ,

গোলগোলি, পড়াশি, বনতুলসী ও করম (Adina cordifolia) গাছের জঙ্গলে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্না পড়েচে, সামনের উপত্যকা ও ওপারের আটকুশি ও পোটরা পাহাড়শ্রেণীতে বনে বনে সেই জ্যোৎস্না এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে—যেন এই জনহীন নিশীথে বনদেব ও দেবীরা এখানে নামেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে, তাঁদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় বিশ্বের অধিদেবতার নীরব জয়গান।

এই বনে (এ পাহাড়টি ছাড়া, এর ওপর বেশির ভাগ শুধুই শেফালি গাছ) এ সব গাছ তো আছেই আরও আছে তুন, লতা, পলাশ Butea Superba, বোংগা, সর্জ্জম লতা, শাল. আসান, পিয়াল, মহুয়া, অর্জ্জুন, বট, কদম্ব, কুসুম, ধওড়া, রাজ জেহুল, কুজরি, রোহান (Soymida Febrifuga), বাঁশ, পিয়াশাল, চীহড়লতা, বেল প্রভৃতি গাছ আছে। অবিশ্যি কোনো একটা জায়গায় এত রকমের বৃক্ষ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে না বা নেই ও মানুষের তৈরি বাগান ছাড়া। অরণ্যের প্রকৃতিই তেমন নয়, যেখানে যে গাছ আছে সেখানে সেটাই বেশি। শাল তো শালই, অর্জ্জুন তো অর্জ্জুনই—এমন রকম।

আজ সকালে তাঁবু থেকে বার হয়ে ডুবলাবেড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে উঠলুম। সুন্দর বনপথে উঠলুম। ঘাটশিলা থেকে ষোল মাইল হবে। দূরে ভাল্‌কি পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্চে। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। এখানে বসে এইমাত্র চা ও খাবার খেয়েচি। দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, সামনে সমতলভূমি নীল কুয়াসায় অস্পষ্ট। একটা শিলাখণ্ডে বসে থাকবার সময় গাছপালার ছায়ায় বসে মনে হোল হিমালয়ের পর্ব্বতারণ্যে বসে আছি। পড়াশি বাঁশ, সোঁদাল প্রভৃতি গাছ। কাল সকালে আমাদের তাঁবুর পেছনে পাহাড়টার বড় পাথরের চাতালটাতে কতক্ষণ কাটিয়েচি। আকাশ ছিল সুনীল, তার তলায় শুকনো শালগাছ ও দোকা গাছের আঁকা-বাঁকা ডালপালার ভঙ্গি—সে একটা দেখবার জিনিস। একটা শিলাখণ্ডে রৌদ্রে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। রৌদ্রস্নাত দ্বিপ্রহরে চারিদিকে সে বন্য সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করে তুললে। সত্যিই এ সৌন্দর্য্য যেন সহ্য করা শক্ত। প্রাণভরে ভগবানের শিল্প রচনা দেখি। বিকেলে আমরা ঘাটডুয়ার বলে একটি অতি চমৎকার স্থানে গেলুম, তাঁবু থেকে ৪ মাইল দূরে মুসাবনীর পথে। ছাতনাকোটা ও রাঙামাটিয়া নামে দুটি সাঁওতালি গ্রাম পথেই পড়ে—সাঁওতালদের মাটির ঘরগুলি দেখবার জিনিস বটে, পরিষ্কার-ভাবে লেপা-মোছা, রাঙা ও কালো মাটি দিয়ে চিত্তির করা দেওয়ালের গায়ে আলনার মত পাখি আঁকা, গাছপালা আঁকা। ঘাটডুয়ার জায়গাটাতে দুদিক থেকে দুটি শৈলমালা এসে ক্রমনিম্ন হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে—মধ্যে হাত পাঁচেক চওড়া সমতলভূমি, এক পাশে একটা পার্ব্বত্য নদী বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে। ঘন বন দু পাশে, ঝর্ণার ওপরে অনাবৃত শিলাস্তর থাকে থাকে কাৎ-ভাবে এসে পড়েচে—প্রায় একশো ফুট কি দেড়শো ফুট উঁচু। স্তরগুলো একটার পরে একটা সাজানো, একটি থেকে আর একটি গুনে নেওয়া যায়। দুটি গুহা আছে জলের ওপরেই, গত বৎসর নাকি এক খাড়িয়া পরিবার ওতে বাস কর্‌তো।

আমরা যখন ফিরলুম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, সম্মুখে আঁধার রাত। বিভিন্ন পার্ব্বত্য নালায় ওপরকার পাথর চোখে দেখা যায় না, কোনোরকমে হোঁচট খেতে খেতে পথ চলি। কিন্তু ঝক্‌ঝকে তারাভরা আকাশের মহিমময় রূপ দেখে সব কষ্ট ভুলে গেলুম। এদিকে বারোজ সাহেবের বাংলোতে ডিনার খাওয়ার কথা, রাত হোল প্রায় সাড়ে আটটা তাঁবুতে পৌঁছতে। ডিনার খেয়ে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। বারোজ বল্লে, সন্ধ্যাবেলা তোমরা বাঘের ডাক শুনতে পেলে না সামনের পাহাড়ে! সাড়ে ছ'টার সময়ে খুব ডাকছিল বাঘ।

আজ সকালে উঠে চা খেয়ে মিঠাই ঝর্ণার কাছে চুকলু বাগাল গ্রামে খাড়িয়া জাতি দেখতে গিয়েছিলুম। ঢুবলাবেড়া ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে পথ উঠেচে পাহাড়ের ওপরে। ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ, একটা কি গাছের ডালে দুটো চিল বসে আছে। ওপরে উঠতে উঠতে পা ধরে গেল—তখন একটা বড় পাথরের ওপরে বসলুম. একটা বড় মহুয়া গাছ সোজা উঠেচে দূরের পাহাড় ও সমতলভূমির পটভূমিতে। ভগবানের নৈকট্য এসব জায়গায় যত অনুভব করা যায়, এত কি কলকাতা কি টাটানগরে বসে সম্ভব? টাটানগর কেন বললুম, সিংভূমের বনে বাস করে তাঁবুতে, টাটানগরের নাম করবো না এটা অন্যায়। আমরা চড়াইপথে চলেচি, বুনো বাঁশ, আমলকী, পাপড়া, কর্কট, পড়াশি, মহুয়া গাছের তলা দিয়ে, কোথাও পথের পাশে কুঁচ ফলে আছে ঝোপে, কোথাও এক রকম হলদে ঘাসের ফুল ফুটে আছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইচে, আকাশে কালো মেঘ।

পাহাড়ের ওপর উঠে দুজন খাড়িয়ার বাড়ী—তাদের মেয়েরা শুধু আছে, আমাদের দেখে সোজা পালালো। তারপর আমরা গেলুম চুকলু বাগালের বাড়ী। খড়ের ছাউনি, নিচু মাটির ঘর, এমন চমৎকার দৃশ্য চারিদিকে, শিলং কি কার্সিয়ং এর বড় লোকের বাড়ীও এমন জায়গায় হলে গর্ব্বের বিষয় হতে পারে। চুকলুর ছেলে আনন্দপুর স্কুলে পড়ে। কাল রাত্রে চুকলুর গরুটা নাকি বাঘে মেরেচে সামনের পাহাড়ে। সবটা খেয়েচে? আমরা জিগ্যেস্ করি।

সে বলে—উয়াকার মুড়িটা নিয়ে গেছে। বাকিটা ডুংরিটাতে রাখি গেলো!

এটার নাম চরাই পাহাড়, ২১০৬ ফুট উঁচু। হিমালয়ের মত দৃশ্য চারিদিকে। একটা উঁচু ডুংরির ওপর গিয়ে আমরা বসলুম, গ্রানিটের সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার চারিপাশে ভাঙা ভাঙা গ্রানিটের boulder—ফাঁকে ফাঁকে খড়, দু-চার ঝাড় বন্যবাঁশ, একটা সাথীহীন মহুয়া। সামনের সমতল-ভূমির দৃশ্য এত উঁচু থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে।

একটি সাঁওতাল তীরধনুক হাতে হঠাৎ এসে হাজির। তার নাম জিগ্যেস করলে নাম বলে না। জিগ্যেস করে জানা গেল ওর বাড়ী রাঙামাটিয়া গ্রামে, সে এবং তার দুজন সঙ্গী এসেচে বাঘে-মারা গরুটার অর্দ্ধভুক্ত দেহটা খুঁজে নিতে। এই গ্রানিট পর্ব্বতচূড়ায় আসলে সেটাই সে খুঁজতে এসেচে। আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করবার অবকাশ নেই ওর।

আমরা বল্লাম—গরু খাস্ তোরা?

—ওই।

একটু পরে আমরা আমাদের গ্রানিট চূড়ায় বসে দেখচি, তিনজন সাঁওতাল অথবা হো নীচের বনে শুষ্ক শালের পাতার রাশির ওপর দিয়ে মচ্‌মচ্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে বনের সর্ব্বত্র আতিপাতি করে খুঁজচে কালকার সেই বাঘে-খাওয়া গরুর মৃতদেহটার জন্যে। ঘণ্টাখানেক খুঁজবার পরে ওদের অধ্যবসায় সার্থক হোল, দেখি আমাদের চূড়া থেকে সামান্য উঁচু আর একটা ডুংরির মাথায় দুটি লোক মরা গরু বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্চে।

আমাদেরও চা ও খাবার এই সময় ডুবলাবেড়া থেকে এসে পৌঁছুলো। চা খেয়ে নিয়ে আমরা রওনা হই। নিচে নেমে একটা খাড়িয়ার কুটির। ওর মধ্যে আমরা ঢুকে দেখি—একটা মলিন চেটাই, কয়েকটি হাঁড়ি-কলসী, লাউ কেটে তৈরী একটা হাতা, চীহড় পাতার একটা ঠোঙা, দুটো শুকনো ধুঁধুল, একটা উদুখল—এই তার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি।

ঢুকলু বাগাল বল্লে—হাতীর ভয়ে আমরা হিই রাতে বাইরে শুই আজ্ঞে। নইলে ঘর ভাঙি দিবেক।

—তোরা হাতী এলে কি করিস?

—হাতী খেদবো।

এই গ্রামের নাম গামীরকোচা। আমার মনে হোল পড়ন্ত হল্‌দে রোদে এই বন পর্ব্বত, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালা ও গ্রানিট শিখর, অরণ্যাবৃত সানুদেশ ও নিচেকার সমতলভূমির কিছু অংশ দেখে—যে, এই খাড়িয়া অধিবাসীরা খুবই গরীব হয়তো—কিন্তু অনেক শহুরে বড়লোকের চেয়ে ভাল জায়গায় বাস করে এরা। দার্জ্জিলিং, কার্সিয়াং বা শিলংএর চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয় এদের বাড়ীর মাটির নিচু দাওয়া থেকে চতুষ্পার্শ্বের পার্ব্বত্যদৃশ্য। যেদিকেই চাই—সামনের ময়ূরভঞ্জের দিকেই হোক্ বা বামে ভাল্‌কি ও মুসাবনীর দিকেই হোক—শৈলমালার পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে আবার উচ্চতর শৈলমালা—সজল নীল কুয়াশায় অস্পষ্ট, কোনোটাতে হল্‌দে রোদ, কোনোটার মাথায় মেঘের ছায়া, কোনোটা কুয়াশায় ধোঁয়া ধোঁয়া। এই সব দেখতে দেখতে ঘন বনের পথে নামলুম।

সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, তাঁবুতে এলুম। একটু পরে শুনি সামনে পাহাড়ে বাঘের 'হাঁকোর হাঁকোর' আওয়াজ। দুবার তিনবার শুনলাম। একটু পরে বারোজ সাহেব তাঁবুতে বেড়াতে এল—সে বল্লে, কাল সন্ধ্যায় এমনি ডাকছিল বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া এমন আওয়াজ করবেনা। নির্জ্জন বন পাহাড়ের ধারে তাঁবু, অন্ধকার রাত্রি, এমনি বাঘের ডাকে ভয় যে না হোল মনে, তা বলতে পারিনে।

বারোজ বল্লে—খাড়িয়ারা সপ্তাহে একবার মাত্র ভাত খেয়ে থাকে গরমকালে। আর কিছু জোটে না। খাড়িয়া কুলি মেয়েরা পয়সা নিয়ে গেল মজুরির, তার পরদিন এল না ওরা খনিতে কাজ করতে। টাকা হাতে পেয়ে ভয় পেল।

বল্লে—এ সব টাকা আমাদের?

—হ্যাঁ।

—কত আছে ?

—দু টাকা। গুনতে জানিস না ?

—নেই জানি।

এত গরীব কিন্তু এত সরল !

ধলভূমের দৃশ্য যে এত wild ও এত ভালো তা আগে জানতুম না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি দেখবার সুযোগ দিয়েচেন।

রাত্রি দশটা। ডায়েরী লিখতে লিখতে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি কৃষ্ণা তৃতীয়ার ভাঙা চাঁদ অনেকটা উঠে গিয়েচে আকাশে—পেছনের পর্ব্বতসানুর দোকা, শালগা ও পাষড়া গাছ-গুলো ঈষৎ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কি সুন্দর দেখাচ্চে—মায়াময়, অপরূপ। এই সরু সংকীর্ণ উপত্যকার সবটা চাঁদের আলোতে আলো হয়ে উঠেচে। কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরে, কখনও চাই তারা-ভরা আকাশের দিকে, কখনও চাই জ্যোৎস্নাস্নাত দোকা ও শালগা গাছ গুলির দিকে।

আজ সকালে চা খেয়ে স্নান করে তাঁবুর সামনে পাহাড়টিতে উঠে সেই শিলাখণ্ডে বললুম —এখুনি আজ চলে যাচ্ছি এই সুন্দর বনভূমি ছেড়ে। আবার কবে আসবো কে জানে ? একটু রোদ উঠেচে, এ পাহাড়ের মাথায় সব শুকনো গাছ, শিউলি বন শুকনো, দোকা গাছ-গুলো শুকনো শিউলি কি আমড়া গাছের মত, শুকনো বনতুলসীর জঙ্গল, নিষ্পত্র শিববৃক্ষ, নিষ্পত্র গাছে হলুদরঙের গোলগোল ফুল ফুটে আছে, কালো পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো খড় বন। কি একটা শুকনো কাঁটা গাছ অজস্র—সব শুকনো গাছ এখানে, ভারি চমৎকার লাগে কালো পাথরের ওপর নিষ্পত্র শুকনো গাছের বন। ভগবানের আশ্চর্য্য শিল্প কি সুন্দর ভাবে এখানে ফুটেচে !

বেলা এগারোটাতে মোটর ছেড়ে প্রথমে পৌঁছুলাম মহাদেব শাল। বননিকুঞ্জের অন্তরালে পাপিয়া ও কত কি বনপাখীর কলকাকলি। বহুকালের পুরোনো পাথরের কালী প্রতিমা। একটা খড়ের চালাঘরে শিবলিঙ্গ পোঁতা আছে—গর্ত্তের মধ্যে মাথাটুকু মাত্র দেখা যায়। বড় একটা বট গাছ, অনেক আসান ও পলাশ গাছ, কোথা থেকে আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসছে, প্রাচীন দিনের মুনি-ঋষিদের তপোবন যেন। মেঘমেদুর প্রভাতের স্নিগ্ধ আকাশের তলে কি মনোরম ছবিই এঁরা রচনা করেছে ! মনে হোল আরও অনেকক্ষণ বসে থাকি এখানে—কিন্তু সময় ছিল না।

মহাদেব শাল থেকে বার হয়েই দেখি বারোজ সাহেব ওর মোটরে ফিরচে। আমাদের দেখে নামলো। ও বল্লে, মহাদেব শাল খুব পুরোনো স্থান, বারোজ এ অঞ্চলের অনেক সংবাদ রাখে। ওকে বিদায় দিয়ে আমরা আবার গাড়ীতে উঠলুম,—কোয়ালি গ্রামে সেদিনকার সেই বাড়ীটা দেখলুম, সেদিন যেখানে বসে মুড়ি খেয়েছিলুম। হলুদপুকুর পার হই। কালিকাপুর রেন্‌জ্‌ আপিসে মিসেস ভর্ম্মার সঙ্গে দেখা হোল। কাপড়গাদি ঘাটের

কাছে দৃশ্য বড় সুন্দর—দুধারে পাহাড় ও জঙ্গল, বাঁদিক দিয়ে একটা পাৰ্ব্বত্য ঝর্ণা বয়ে চলেচে। সামনের পাহাড়ে আর বছর একদল হাতী দেখেছিলেন মিঃ সিন্‌হা বল্লেন। মিঃ সইয়ারের বাংলোটা পড়ে আছে রাখা মাইন্‌সে—ভূতের বাড়ী হয়ে। একটা কুল গাছ থেকে পাকা কুল পেড়ে খেলুম ভাঙা ক্লাব-বাড়ীটার পেছনে।

বাড়ী পৌঁছে চা খেয়ে দুটু, উমা ও বৌমাকে নিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরা ঘাটের (hill pass) বনের মধ্যে মোটরে গেলুম বেড়াতে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে বনে, গম্ভীর দৃশ্য চারিদিকে। খডের গভীরতা প্রায় ৫০০।৬০০ ফুট—সেখানে বহু নিচে দিয়ে খরস্রোতা নদী (খরস্রুতি নদী, এখানকার ভাষায়) বয়ে চলেচে, আমি, দুটু, বৌমা খরস্রোতার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি- ওপারের পৰ্ব্বতারণ্যে ময়ূর ডাকচে। সন্ধ্যা হোল, আমরা পাহাড় থেকে নেমে শালবনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম, দুটুকে গান গাইতে বল্লেন মিঃ সিন্‌হা। আমরা সবাই সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম ও গান শুনলুম। তারপর ডাকবাংলোতে এসে চা খাই বৌমা, দুটু ও আমি।

পরদিন সন্ধ্যায় বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা রাজবাড়ীতে। আমি বল্লাম, হরিনা গ্রামের গভীর বনের মধ্যে যে মহাদেব শাল আছে, সেখানটা বড় সুন্দর তপোবনের মত। কিন্তু যাত্রীদের বসবার জায়গা নেই, ভাঙা মন্দিরেরও সংস্কার দরকার। আপনি রাজসরকার থেকে ওটা করে দিন।

অমরবাবুর বাড়ী গিয়ে গল্পগুজব করলুম রাত্রে।

কোথায় ডুবলাবেড়া, ঘাটশিলা—আর কোথায় বারাকপুর! এক দিনের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েচি—কোথায় চাকৃড়ি গ্রামে বাসেয়া সর্দ্দারের স্মৃতি-প্রস্তর, কোথায় চরাই পাহাড়ের শিখর! কোথায় দোকা ও শালগা বন! আজ এ বারাকপুরে আম্রমুকুলের ঘন সুবাস ভরা অপরাহ্নের বাতাসে জানালা খুলে দেখছি সামনের খুড়ীমাদের বাঁশঝাড়ের মাথায় রাঙা রোদ, কোকিল ও কত কি পাখী ডাকচে—আমি একা ঘরে বসে লিখচি। শুকনো বাঁশপাতা-ঝরা পথের ওপর বৈকালের ছায়া নেমে এসেচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে আমার উঠোনে, ওদের বাঁশতলায়, আমি বসে বসে দেখচি। কল্যাণী গিয়েচে ফকিরচাঁদের বাড়ী বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেতে, মানু ও নগেন খুড়োর বৌয়ের সঙ্গে। এমন চমৎকার পরিপূর্ণ বসন্তের মধ্যে বারাকপুরে আসতে পারা একটা সৌভাগ্য। এত সুগন্ধ বাতাসে, এত ঘেঁটুফুল, শুকনো পাতা ছড়ানো বাঁশঝাড়ের তলায়। সকালের ঈষৎ শীতল বাতাসে যখন আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসে, পাখী ডাকে—তখন মনে হয় একটা যেন কিছু হবে, এমন দিনের শেষে বৃহত্তর কিছু, মহত্তর কিছু অপেক্ষা করে আছে যেন—আমার ছেলেবেলাতে ঠিক এই সময় মনের অকারণ উল্লাস অনুভব করতুম এমনি ধারা।

কাল বিকেলে কুঠীর মাঠের রাস্তা ধরে আসতে আসতে হঠাৎ এসে পড়লুম শাখারিপুকুরে বাঁশবনের ধারে। নক্ষত্র উঠেচে আকাশে, আকাশের শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ জলজল করচে,

আম্রমুকুলের ঘন সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে। কতকাল আসিনি শাঁখারিপুকুরের বাঁশবাগানে—ছিরেপুকুরের ওপাড়ের পথে—সেই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের পুরাতন বাল্যদিনগুলি ছাড়া। বিশ্ব-শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর বসন্ত, এই মানুষের মন। আমি না যদি থাকতুম, এ বসন্ত শোভা, এ শুক্লাপঞ্চমীর জ্যোৎস্না কে আস্বাদন করতো? মানুষের মনের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টির লীলারস আস্বাদ করচেন। যে সমজদার, যে রসিক শিল্পীমনের অধিকারী সে ধন্য—কারণ ভগবান তার চোখ দিয়ে, মন দিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। সুতরাং সমজদারের চোখ ভগবানের চোখ, সমজদার রসিকের মন ভগবানের মন—যা সৃষ্টিমুখী হোলে একটা গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করে ফেলতে পারে চক্ষের পলকে।

কি চমৎকার রাঙা ফুলে-ভর্ত্তি শিমূল গাছটার শোভা নদীর ধারে, ফণি চক্কত্তির জমিতে। দুপুরে নীল আকাশের তলায় রোজ রাঙা ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখি স্নান করতে যাওয়ার সময়ে। চোখ ফেরাতে পারিনে। কাল আবার দুটো প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসচে অত উঁচু গাছটার ফুলে ফুলে। প্রজাপতি—যার জন্ম শুঁয়োপোকা থেকে। শুঁয়োপোকাজীবন পরিত্যাগ করে প্রজাপতি জন্ম পরিগ্রহ করেচে, নীল আকাশের তলায় সৌন্দর্য্যলোকে বিচরণের অবাধ অধিকার লাভ করেচে। ঐ রাঙা ফুলে ভরা শিমূল গাছ, ঐ নীল আকাশ, ঐ উড্ডীয়-মান রঙীন প্রজাপতি এসব যেন একটা বড় দর্শনের গ্রন্থ—শুধু যে ভাষায় ঐ গ্রন্থ লেখা তা সবাই পড়তে পারে না, বুঝতে পারে না। গভীর দর্শন-তত্ত্ব ও বইয়ে লেখা রয়েচে—লেখা রয়েচে আত্মার অমরত্বের গোপন বাণী, লেখা রয়েচে তার কামচর শক্তির অলেখা ইতিহাস। যে ঐ ভাষা বুঝতে পারে সে জানে।

কাল দুপুরে ছিরেপুকুরের ওপারের রাস্তা দিয়ে শাঁখারিপুকুরের মধ্যে দিয়ে স্নানের পূর্ব্বে খানিকটা বসলুম, তারপর বাঁশবনের ছায়ায় ঝরা-বাঁশপাতার পথ দিয়ে পুকুরের একস্থানে এসে দাঁড়ালুম, সেখানে ঘেঁটু ফুলের একেবারে নিবিড় ভিড়। তেতো সুবাস ছড়াচ্চে দুপুরের বাতাসে। ওখানে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে চাইতেই সেই উত্তর মাঠের রাঙা ফুলে-ভর্ত্তি বড় শিমূল গাছটা চোখে পড়লো। আমি সৌন্দর্য্যে যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়লুম, আর নড়তে পারিনে, অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারিনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হোল—সে অনুভূতি এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, তার কথা আমি কাল সারাদিন ভুলিনি। এবং সেকথা' এখানেও লিখে রাখলুম এজন্য যে এইসব দুর্ল্লভ অনুভূতিরাজি যখন অস্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন এই ক'টি লাইন পড়লে কালকার অনুভূতির বাণী আমার মনে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অনুভূতির প্রথম কথা হোল—মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—অভীঃ, ভয় নেই।

কিসের ভয় নেই? কোনো কিছুরই না। "ন মৃত্যু ন শঙ্কা" ভগবান যুগ-যুগান্তরে, কল্প থেকে কল্পান্তরে আমার এবং তোমার হাত ধরে চলেচেন, আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্যে দিয়ে। সকল 'জন্ম-মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেচেন। জরা নেই, মৃত্যু নেই। এমন

কত বসন্ত দ্বিপ্রহরে কত ঘেঁটুফুল সুবাস বিতরণ করবে অনাগত জীবনদিনে কত গ্রামে— কত মাতা-পিতার স্নেহ আদর পরিবেশিত হবে, কত ভবিষ্যৎ রাত্রির জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হবে সেই সুমধুর আয়ুকালগুলি, কত কোকিল ডাকবে, কত রক্তশিমুল-ফুল ফুটবে। জীবন ও জন্ম দুদিনের, ভগবান সখা ও সাথী অনন্ত কালের। জীবের ভয় কি? অবিনশ্বর তুমি, অবিনশ্বর আমি—আমরা ভগবানের চিরদিনের লীলাসহচর, ভগবান চিরদিন আমাদের লীলাসহচর।

কাল দুপুরে চিল-ওড়া নীল আকাশ থেকে এই আনন্দের বাণী নিঃশব্দে নেমে এল সেই ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ভগবানের নীরব আশীর্ব্বাদের মত। মন অমৃতে পূর্ণ হয়ে গেল। শিরায় শিরায় সে কি জীবনস্রোত! কি উচ্ছল রস ও আনন্দের প্রবাহ।

কথাটা লিখেই রাখলুম, যদি ভুলে যাই। অন্য কেউ যদি এর পরে পড়ে, আশা করি সে এই নৈঃশব্দ্যের বাণীর গভীরত্ব বুঝতে পারবে, তারও জীবনে এই বাণী দেবে অমৃতের সন্ধান। জয়যুক্ত হোক আম্রমুকুল ও ঘেঁটুফুল সুবাসিত এই কাননের শান্ত দ্বিপ্রহরটি।

সকালে শাঁখারিপুকুরের ধারে বাঁশবনে ঝরা পাতার ওপর বসে ছিলুম। বাঁশবনের নিচে ছায়ায় ঘেঁটুফুল ফুটেচে, আম্র-মুকুলের সুবাসে বাতাস মদির, এখানে ওখানে মাঠে শিমুল ফুলের কি শোভা! চুপ করে বসে নলে নাপিতের আমবাগানের পুষ্পভারনত শাখা-প্রশাখাগুলির দিকে চেয়ে রইলুম। কোকিল ডাকচে, উষ্ণ মাটির গন্ধ বেরুচ্চে, শুকনো বাঁশপাতা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে পড়চে, যেমন পড়তো আমার বাল্যকালে। ঘেঁটুফুলের তেতো সুবাসে মনের মধ্যে আমার কেমন একটা আনন্দ আনে। ত্রিনয়নী পিসিমার সঙ্গে খেলা-ঘরের মধুর বসন্ত-মধ্যাহ্নগুলির কথা মনে হয়—ত্রিশ বৎসর আগেকার সেই অতীত ফাল্গুন দিনের বার্ত্তা এই ঘেঁটুফুলের সুবাসে খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে ফিরে আসে, আমি বাঁশগাছে হেলান দিয়ে বসে অবাক ভাবে দূর রোদ-ভরা মাঠের দিকে চেয়ে থাকি।

দুপুরে বসে 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের একটা অধ্যায় লিখি। কল্যাণী গিয়েচে ও-পাড়ায় পাঁচী যুগিনীর কালীমার মন্দিরে। সঙ্গে গিয়েচে বুড়ী পিসিমা ও মান্টু।

কাল পাঁচী এসে কতক্ষণ গল্পগুজব করলে। আমি এর কয়েকদিন আগে দোলের দিন রেডিও বক্তৃতা দিতে কলকাতা গিয়েছিলুম। সেখানে সুনীতি বাবু, মিঃ সিং প্রভৃতির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কাল জগো ও ফুচুর সঙ্গে বেলডাঙায় একটা বাবলার ডাল আনতে গিয়েছিলাম। ঘোষেদের বাড়ীর পিছনে কি অপূর্ব্ব ঘেঁটুফুলের সমাবেশ ও কি ওদের সম্মিলিত সুগন্ধ। এই ঘেঁটুফুল কেন যে আমাকে মাতিয়ে দেয়, তা কি করে বলবো। অমন ঘেঁটুফুলের সুবাস আমি এ বছর অন্ততঃ আর কোথাও দেখিনি। কোথায় লাগে সিনেমা থিয়েটার দেখার আনন্দ! ভগবানের কথা কেন যে এত মনে হয়! আইনদ্দির নাতি এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলে, সেই ছোকরা, যে স্কুলে আমার ছাত্র ছিল, সম্প্রতি

শুরু ট্রেনিং পাশ করেচে। বড় চমৎকার লাগলো আজ ঐ ঘেঁটুফুলের শোভা। দুঃখের বিষয় কেউ এ সব দেখতে আসে না।

আজ অপরাহ্ণে ছিরেপুকুরের ওপারে আমবাগানের তলায় ঘেঁটুফুলের ঘন বনের মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলুম। এমন ফাল্গুন দিনে এমন ঘেঁটুফুলের সমারোহের মাঝখানে জীবন কোনদিন কাটাইনি। চিরকালই বিদেশে কাটিয়ে এসেচি। হয় ভাগলপুরে নয় কলকাতায়, কিংবা মানভূমে, ঘাটশিলায়, ঝাড়গ্রামে। আজ বসে আছি, ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ফুলের ঘন সুবাসের মধ্যে। ফুলে ভর্ত্তি ঘেঁটুবন আমার চারপাশে ঘিরে, লতাপাতার সুগন্ধ, সামনে গাছে তিত্তিরাজের আধ-কাটা ফলের থোলো ঝুলচে, কোকিল ডাকচে। ধন্য হোক ভগবানের নাম। ধন্য হোক সেই মহাশিল্পীর শিল্পসৃষ্টি।

ক'দিন ধরে গণি ও সয়ারামের মোকর্দ্দমার বিচার করচি পল্লীমঙ্গল সমিতির অধিবেশনে। কাল রাত্রেও চড়কতলায় অধিবেশন হয়ে গেল। এ গ্রামের ঝগড়াবিবাদ মিটবে না। যত চেষ্টা করি বিবাদ থামাতে, তত আরো বেড়ে যায়। কাল বিকেলে কুঠীর বাঁধানো গাঁথুনিতে কতক্ষণ বসে রইলুম—সব শুকনো লতা, পাতা, কাঠ, ডাল, তুঁতফল ইত্যাদির গন্ধ বেরোয় এ সময়। ভারি আরামের গন্ধটা। এ পারের মাঠে কতক্ষণ বসে একটা মূর্ত্তি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম নির্জ্জনে। সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে গিরীনদার বাড়ী এসে দেবপ্রয়াগের কথা হয়। সে শুধু খাবার জিনিসের গল্প। খোয়ার লাড্ডু বানিয়ে কি ভাবে উনি পাণ্ডাদের খাইয়েছিলেন —সে গল্প। উনি বল্লেন—আবার চলো তুমি আমি বেরুই। আমি হবো স্বামীজী, তুমি প্রধান শিষ্য। ইন্দুর বাড়ীতে ইন্দু সুবর্ণপুরের দাসুবাবুর গল্প করলে। দাসুবাবু বলতো—আর কি খাই আজকাল ? একটি রুই মাছের মুড়ো ও গাওয়া ঘি রোজ খাদ্য ছিল—ইত্যাদি। চড়কতলায় খুব মিটিং। মুসুরি ডালের ক্ষেতে কতটা মুসুরি খেয়েচে, তাই নিয়ে ঘোর তর্ক। সয়ারাম বলে—আড়াই মন মুসুরি হবে। ঘোর বিবাদ।

গভীর রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি। কল্যাণী বলচে, ওগো, জানালা বন্ধ করো, ভেঙে যাবে যে!

ঘুমের ঘোরে ভয়ে বলচে।

কাল খুব ঝড়বৃষ্টি বিকেলে। রাধাবল্লভের জামাই কেষ্টর বাড়ী সন্ধ্যার পরে উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা হোল। অনেক লোক শুনতে এসেছিল, সতীশ ঘোষ, মতি দাঁ'র ছেলে যুগল, ললিত, লালমোহন, ফণিকাকা, গজেন, ফকিরচাঁদ ইত্যাদি। শান্তিপুরের এক অদ্বৈত বংশের গোস্বামী মশায়ও উপস্থিত ছিলেন। লালমোহনের বাড়ীর পিছনের যে পথটা দিয়ে আমি সকালে গেলাম সে পথে জীবনে কখনো যাইনি—নতুন দেখলাম। বারাকপুরেও এমন সব জায়গা জঙ্গলে আছে যা আমি জীবনেও কখনো দেখিনি।

রাত এগারোটার সময় ফিরে এলুম। অনেক রাত্রে ভীষণ মেঘ গর্জ্জন, তার সঙ্গে

মুষলধারে বৃষ্টি। কল্যাণী চমকে উঠেচে ঘুমের ঘোরে।

এ খাতায় অনেকদিন পরে আবার 'বনগ্রাম' কথাটি লিখচি। পাঁচ বৎসর পরে আবার বনগ্রামে বাসা করেচি—জাহ্নবীর বাসার কাছেই। আবার পুরোনো দিনের মত সকালে উঠে খয়রামারি বেড়াতে যাই, সেই গাছপালার বাঁকে বসে দাঁতন করি। পুরোনো দিনের পুনরাবৃত্তি বড় ভাল লাগে। কোথায় ঘাটশিলায় বনমধ্যস্থ হ্রদে সকালে স্নান করতে যাওয়া এই সময়ে, কোথায় নাকটিটাঁড়ের বন, ১লা বৈশাখ বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সামনে ভবানী সিংয়ের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে বসে চা খাওয়া, বোরো নদীতে একসঙ্গে স্নান—হরদয়াল, আমি, ভবানী, সুবোধ ঘোষ, যোগীন্দ্র সিনহা—আর বছরই তো। সে কি মজা! চাঁইবাসার সে ঘরদোর এখনও মনে পড়চে। কোল্‌হান পার্ক, মাঠা পাহাড়ের বাংলো—ইত্যাদি। কোথায় সেই চরাই পাহাড়ের শিখরদেশ। এসব থেকে কোথায় আবার সেই বনগাঁর বাসা। ঘড়ি বাজে ঢং ঢং করে, যতীন দা'র ও মন্মথ দা'র বাসায় আড্ডা দিচ্চি—ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে উঠে বাজার করচি, ওপারের হাট থেকে গুড় কিনে আনচি, কয়লার দোকানে কয়লা কিনচি। এ সব জিনিস বহুদিন বনগাঁয়ে করিনি।

কাল কাপ্তেন চৌধুরীর মোটরে বিকেলে বিশ্বনাথ ও যতীন দা'কে নিয়ে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের মঠে বেড়াতে গেলুম। আজ পাচ বছর আগে একবার এখানে এসেছিলুম। বুদ্ধদেব বাবুর সঙ্গে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, মন্দিরের চাতালে বসে আমরা হরিদাসের কাহিনী পাঠ শুনচি, প্রদীপের আলোয় বিশ্বনাথ পড়চে, ওদিকে চাঁদ উঠেচে, মন্দিরের চারিপাশে ঘন বনে শান্ত স্তব্ধতা নেমে এসেচে—বড় ভাল লাগছিল। হীরা নটীর মূর্ত্তির সামনেও আরতির পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানো দেখে আমি বিস্মিত ও অভিভূত হোলাম। কার কৃপায় পতিতা আজ দেবী হয়েচে? সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক ভগবানের ছাড়া আবার কার কৃপায়? এক বুড়ী আছে, সে প্রণাম করে বলে—জীবই শিব। এখানে বুড়ী আছে আজ যোল বছর। ১৩১০ সালে এই মঠ ও মন্দির তৈরি হয়। ভোলানাথ গোস্বামী বলে এক সাধক ভক্ত, বাড়ী তাঁর বাড়ী মামুদকাটি, স্বপ্নে আদেশ পান এখানে হরিদাসের সাধনকুঞ্জের পুনরুদ্ধারের। এখানে এসে স্থানীয় নায়েব মহাশয়ের সাহায্যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই তুলসী জঙ্গল ও আটখানা ইট আবিষ্কার করেন। তখন এখানে বাঘের আড্ডা ছিল। বুড়ীটি বড় অদ্ভুত, সে-ই এসব গল্প করলে। বড় ভক্তিমতী আর বড় বিনয়ী—বৈষ্ণব ধর্ম্ম এদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেচে, 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই কথার সত্য ওরা জীবনে আঁকড়ে ধরেচে, পালনও করেচে।

আজ বিকেলে পাঁচটার সময় কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতে গেলুম বারাকপুর। মিতে, মন্মথ দা, যতীন দা আমার সঙ্গে। কাপ্তেন চৌধুরী পথের পাঁচালীর দেশ দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বকুলতলা, সলতেখাকীতলা, ছিরেপুকুর, পুরোনো, ভিটে, বরোজপোতা, হরি রায়ের

পাঠশালা—সব দেখালুম। দেখে ভদ্রলোক খুব খুশি। তারপর ফণিকাকার বাড়ী এসে দেখি চড়কের 'শয়াল খাটা' হচ্চে। বাল্যকালে আমার মনে কি উন্মাদনার সৃষ্টি করতো এই 'শয়াল খাটা'। রামনবমী থেকে শুরু হোত, সেটা যেন একটা ফাঁকতাল্লা, তারপর চড়ক তার আনুষঙ্গিক কাঁটাভাঙ্গা, 'শয়াল খাটা' নীলপুজো, মেলা, গোষ্ঠবিহার, সং—পরে সকলের শেষে যাত্রা বারোয়ারী। এ আনন্দের তুলনা ছিল? আজও সেই 'শয়াল খাটচে' সন্ন্যাসীর দল, গ্রামের ছেলেমেয়ে সেই ভাবে জড় হয়েচে—কিন্তু আমার মধ্যে সে আনন্দ আজ নেই। মীনা, কেতো —সবাই দেখচে বসে দেখলুম। চড়কগাছ হবে বলে একটা কি গাছও কাটা হয়েচে চড়কতলার মাঠে। বেলা পড়ে গিয়েচে। ওখান থেকে বেরিয়ে গাঙের ধার দিয়ে কুঠীর কাছে এলুম। ভাঙা কুঠী দেখালুম কাপ্তেন চৌধুরীকে, যেমন বাল্যকালে আমাদের গ্রামে যে কেউ আসুক, তাকে কুঠী দেখাবোই। রামপদকে দেখিয়েছিলুম, বামনদাস মুখুয্যেকে দেখিয়েছিলুম। আজও দেখাচ্চি ১৩১০ সাল ১৩১১ সালের পরেও। কুঠী হয়ে গেলুম মোল্লাহাটি—বেলেডাঙা, নতিডাঙার পথ দিয়ে। অনেকদিন—প্রায় ৫।৬ বছর মোল্লাহাটি আসিনি। ডাকবাংলোটাতে গিয়ে বসলুম, মেমসাহেবের গোর দেখলুম—সাহেবদের নীলকুঠীর ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম—কোথায় আজ সেই লালমুরা, ফালমান সাহেবের দল, কোথায় তাদের বলদর্পিতা, গর্ব্বিতা মেমের দল। মহাকাল অন্ধকার আকাশে বিষান বাজিয়ে সব অবসান করে দিয়েচে।

সন্ধ্যায় ফিরে এলুম। মালপাড়ার কাছে হরিপদদা'র সঙ্গে দেখা। এসে রাত্রে আবার আড্ডা।

কাল সামটাতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম সতীনাথ মিত্রদের বাড়ী। প্রায় একমাস লিখিনি এ খাতায়। এর মধ্যে আমার স্ত্রী একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করলে, তার শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। এই সব কারণে লেখা হয়নি অনেকদিন।

কাল সামটায় যাবার পথে উলুসী গেলুম। কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতেই গেলুম। যে উলুসীতে মধুকানের বাড়ী, সেই উলুসী। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রভাতী বায়ু বাংলার পল্লী-অঞ্চলের নানা পুষ্প-সুবাসে সুরভিত। বিল্বপুষ্প, তুঁতগাছের ছোট ছোট ফুল। পথের দুধারে ফুলে ভরা সোঁদালি গাছ যেন নুয়ে পড়চে।

কতকাল আগে মধুকান মারা গিয়েচেন, আজ এতকাল পরে তাঁর জঙ্গলে-ভরা ভিটে দেখতে প্রায় একশ বছর পরে আমরা এসেচি।

আমরা পল্লীকবির ভিটেতে দাঁড়িয়ে আছি, বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাকের মধ্যে—একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জল নিয়ে যাচ্চে। সে মধুকানের বংশের মেয়ে। তার মুখে আমরা মধুকানের গান শুনতে চাইলুম। সে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল আমাদের। আমরা বল্লুম—মধুকানের কোনো খাতা আছে ঘরে?

সে বল্লে—হ্যাঁ।

[illegible] দুখানা খাতা। ১২৭৪ সালে মধুকান মারা গিয়েচেন। সেই সময়ের খাতা।

তিনি মদ খেয়ে পড়ে থাকতেন—সেই সময় মুখ দিয়ে যা বলে যেতেন—মুহুরীরা লিখে নিত। একটি বৃদ্ধ মধুসূদনের একটি গান গাইলে।

ওখান থেকে বেলা সাড়ে বারোটার সময় চলে এলুম সামটাতে। রাধানাথ দা, ব্রজ এরা ছিল। ডাকবাংলোয় মোটর পাঠিয়েছিল বল্লে আমার জন্যে। দুটি নিদ্রিত সুন্দর মুখের ছবি আমাকে সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি মনে করিয়ে দিল।

ওদের বাড়ীর নীচে কচুরিপানায় বোজানো ব্যাত্না বা বেত্রবতী নদী বয়ে গিয়েছে। এ নদী এখন একেবারে মজা। একসময়ে নাকি স্টীমার চলতো। বিকেলে নাতারণ ডাক-বাংলোতে ফিরে হাট দেখতে গেলুম বিজয়কে নিয়ে। বেত্রবতী নদীর পুলটার ওপর বসে বসে ভগবান সম্বন্ধে কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি হোল। সেই নিদ্রিত দুটি সুন্দর মুখের ছবি।

ক'দিন অতি ভীষণ গরম গিয়েচে। কাল যখন রাত্রে মন্মথ দা'র বাড়ীর আড্ডা থেকে ফিরি, তখন হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে যে কি ভয়ংকর গুমট দেখা দিলে! আমার মনে হোল এ গুমটে রাত্রে মশারির মধ্যে কেমন করে শোবো। কিন্তু যেমন বাড়ী এসেছি—অমনি আকাশে মেঘ জমে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হোল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ জোলো বাতাসে। কল্যাণী বল্লে—বাদলা হবে। আমি বল্লাম—তা হোলে তো বাঁচি। কিন্তু আসলে বাদলা হোল না। আধ-ঘণ্টাটাক বৃষ্টি হয়েই থেমে গেল।

সকাল তখনও ভাল করে হয়নি, ভাইজাগ প্যাসেঞ্জার এসে ভুবনেশ্বরে দাঁড়ালো। আমি অন্ধকারের মধ্যে নেমে গিয়ে গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরদস্তুর চুক্তি করে মহাদেববাবুকে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুললাম। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলচে, পথের দুধারে নক্তমিকার জঙ্গল। একটু পরে ফর্সা হোল, গাড়োয়ান বল্লে—এই নালাটা ছাড়িয়ে এক মাইল গেলেই উদয়গিরি খণ্ডগিরি। একটু পরেই সাদা জৈন মন্দিরটি চোখে পড়লো সামনের পাহাড়টির ওপরে। গরুর গাড়ীও গিয়ে দাঁড়ালো পাহাড়ের তলায়। ঘড়িতে দেখলাম ভোর সাড়ে পাঁচটা।

সুন্দর পরিবেশটি। সামনে বনাবৃত পাহাড়, মাটির রং লাল, বড় বড় প্রস্তর যেন মাকড়া পাথরের চত্বর। পথের ধারে একটি জৈন ধর্ম্মশালা। নিচে থেকেই দেখলুম পাহাড়ের গায়ে কাটা সরু সরু থামওয়ালা দর-দালান মত—অনেকদিন আগে নির্ম্মল বসুর তোলা ফটো এ্যালবামে উদয়গিরির এই সব গুহার ছবি যেমন দেখেছিলুম। কিন্তু পাহাড়ের ওপর গিয়ে চারিদিকে চেয়েই মনে হোল এ পাহাড় দুটির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাকে কেউ কোনো কথা বলেনি এর আগে। পাহাড়ের ওপরটা সমতল পাষাণ বেদিকার মত। বনে বনে পাখী ডাকচে, বড় যূথিকা ফুটে সুবাস বিতরণ করচে, মেঘমেদুর আকাশ, দূরপ্রসারী প্রান্তর, দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়। কত মুনিঋষির তপস্যাপূত মনোরম স্থানটি। ব্যাঘ্রগুম্ফাটি বড় চমৎকার, ঠিক

একটি বাঘের মুখ খুদে বার করেচে আস্ত পাহাড় কেটে। আমরা অনেকক্ষণ একটা পাথরের চাতালে বসে তারপর নেমে এলাম নীচে। একটা বৃদ্ধা বসে আছে একটা বাড়ীতে, ধর্ম্মশালার পাশে, সে বল্লে, "আমি আচার, মুড়ি বিক্রি করি।

বল্লাম—কুলের আচার আছে ?

—আছে।

তারপর যে আচার আনলে তা নুন মাথানো শুকনো কুল—তাকে আচার বলা চলে না। নিলুম না সে কুলের আচার। খণ্ডগিরিতে উঠলাম তারপরে—সেখানে নামবার পথে বনের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য। ডাকবাংলোর বারান্দায় খেতে বসেচি, এমন সময় এল ঝড়বৃষ্টি। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল খুব। জৈন ধর্ম্মশালায় চা বিক্রি হয় জানতাম না—সেখানে কয়েকটি লোককে চা খেতে দেখে গিয়ে বসলাম—চা-ও পাওয়া গেল।

আবার ভুবনেশ্বর রওনা হলাম গরুর গাড়ীতে। পথের ধারে শুধুই নব্রভমিকার বন, আর একটা গাছ—তার নাম মহীগাছ। সেই বনযূথিকার নাম নাকি আঁধি কলি, এখানে ও-ফুল খায়। অবাধ দৃষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, থৈ থৈ করচে space-এর সমুদ্রে দূরের ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির চূড়া যেন ডুবে আছে। মাটির রং রাঙা, তার পাষাণ বাঁধানো ওপরটা। গরুর গাড়ীর চাকা গিয়ে গিয়ে পাথর কেটে গিয়ে চাকার লিকের সৃষ্টি হয়েচে।

ভুবনেশ্বর পৌঁছতেই ছোট বিশ্বনাথ পাণ্ডার খপ্পরে পড়ে গেলুম। সে বিন্দু সরোবরের ধার থেকে আমাদের নিয়ে এল, তুললে এক ধর্ম্মশালায়। গৌরীকুণ্ডে আমাদের স্নান করাতে নিয়ে গেল—স্নানান্তে দুধকুণ্ডের জল পান করে যেমন পিছু ফিরেছি, অমনি পাণ্ডার দল ফেউয়ের মত পিছু লাগলো। কোনক্রমে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধর্ম্মশালায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। তারপর মন্দির দেখতে বার হই। বহু অতীত দিনের আনন্দচ্ছন্দ যেন পাথর হয়ে জমে আছে সে বিশালকায় পাষাণ দেউলের বুকে। একটি নর্ত্তকী মূর্ত্তির কি ত্রিভঙ্গ দেহ, কি মুদ্রার সুষমা! পাষাণে খোদাই লিরিক কবিতা। নব্র-ভমিকার জঙ্গলে অতীতের ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। ঝম্পা সিং, উদো গজ সিংয়ের কথা জানি নে।

স্টেশনে ফিরবার পথে আবার ভিখিরির দল গরুর গাড়ীর পিছু পিছু করুণ সুরে প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ করতে করতে ছুটলো প্রায় এক মাইল রাস্তা। ট্রেন আসতে দেরি ছিল। হু হু সমুদ্রের হাওয়া বইচে, আমরা শুয়ে রইলুম প্ল্যাটফর্ম্মে। চারটের সময় গাড়ী এল। ঐ দূরে উদয়গিরি, ঐ খণ্ডগিরির ওপর জৈন মন্দির। গাড়ী চলেচে—গাড়োয়ান ওবেলা দেখিয়েছিল খুরদা রোডের দুটি রাঙা কাঁকরের পাহাড়, তার ওপর দুটি গাছ—সে পাহাড় দুটো কাছে এল। খুরদা রোড স্টেশনে আর বছরে 'ডিটেকটিভ' নাটকের অভিনয়ে যে কেল লাভ করেছিল সেই ইন্দুবাবু এসে আলাপ করলেন। আবার সেই মালতীপাটপুরের নারিকেলকুঞ্জ। যেন পাপুয়া নিউ হেব্রাইডিস্-এর বেলাভূমির ছবি। পুরী স্টেশন থেকে

ফিরবার পথেই বনগাঁর হরিবাবু ও তার ছেলে বামনের সঙ্গে দেখা হোল। আমরা ধর্মশালায় জিনিসপত্র রেখে জগন্নাথের মন্দিরে গেলুম দর্শন করতে। ঠাকুরের সিঙার বেশ দেখলুম। মন্দিরে বাইরের চত্বরে খোলা হাওয়ায় সুমথবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। আর বছর আর এ বছর। সেই মন্দিরের নানাস্থানে ধর্মগ্রন্থ পাঠকের সম্মুখে কৌতুহলী ও ধর্মপিপাসু শ্রোতার ভিড়। এ দোকান ও দোকান ঘুরে সুমথবাবু খাবার জিনিস কিনতে লাগলো। রাত ন'টার পর ফিরি। একসঙ্গে খেতে বসি—গৌরীশঙ্কর, সুমথ ও মহাদেববাবু। ওরা রাত্রেই চলে গেল।

নীল সমুদ্র! আবার সেই উত্তালতরঙ্গময় নীলসমুদ্রের গর্জ্জন!

সকালে উঠে প্রথমেই গেলুম হরিদা'র বাড়ী। বামন বল্লে, তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি আর বছরের সেই বালিয়াড়ি ও শাল গাছ দুটির পাশ দিয়ে কতবার মঠে গেলুম, সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আবার দর্শন করলুম। পুরুষোত্তম মঠে সেই স্বামীজীর ধর্মোপদেশ শুনলুম। ফিরবার পথে ভুপেন সান্যালের বাড়ী গেলুম। তাঁর স্ত্রী জলখাবার খাইয়ে তবে ছাড়লেন।

বড় রোদ চড়েচে। বালিয়াড়ির পথে আবার যাত্রা। সেই পলং গাছ পথে পড়লো। ধর্মশালায় ফিরে আর বছরের মত খিদেতে ছট্‌ফট করি। একটা বাজে, তিনটে বাজে, কোথায় মহাপ্রসাদ? এই আসে, এই আসে—কিছুই না। বীরেন রায় মশায় এলেন—আমরা আহারান্তে বসে গল্প করি। জানালা দিয়ে দেখি বাঁদিকের জানালায় ঢেউ-সঙ্কুল নীল সমুদ্র, ডানদিকের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দিরের চূড়া—পুরীর দুই বিরাট বস্তু।

'কাকে ফেলে কাকে রাখি কেহ নহে উন।'

বিকেলে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াজেদ আলি ও অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে সমুদ্র-তীরে অনেকক্ষণ বসে বসে হরিদা ও বীরেনবাবুর সঙ্গে চীনাবাদাম খেতে খেতে জ্যোৎস্নালোকে গল্প করি। ওখান থেকে উঠে ধর্মশালায় এসে দেখি 'দেশ' সম্পাদক বঙ্কিম সেন ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। হরিদা'কে নিয়ে এসে বসালুম সভায়।

অনেক রাত পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রের শোভা দেখি ছাদ থেকে। জগবন্ধু আশ্রমের স্বামীজী পরিমল দাস ও আর একটি ছাত্র এসে গল্প করলেন। স্বামীজী একখানা বই দিলেন পড়তে—প্রভু জগবন্ধুর জীবনী। পুরীতে একটা সুবিধে, সব সময়েই ভগবানের কথা বলবার লোক মেলে। অনেক রাত হয়েচে, ঘুম আসে না চোখে। গরম নেই, হু-হু সমুদ্রের হাওয়া, শেষরাত্রে বেশ শীত ধরিয়ে দিলে।

সকালে উঠে হরিদাস মঠে গেলুম ও মলয়াবাস বলে একটা বাড়ীতে হরিদা'র সঙ্গে বসে চা খাই। প্রসাদ আসে না তখনো, সবাই খোঁজ নেয় কেন প্রসাদ এল না। বেনারাস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক বেশি রকম খবর করলেন। ভোগ কিনে খেলুম আনন্দবাজার

থেকে। পুরীর বাসনের দোকান থেকে একটি ঘটি কিনে পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে সভা করি। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন। চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল। সুখময়-বাবুর বাড়ী চা খেতে গিয়ে নিরাশ হলুম। সেইসময় এল ঝড়বৃষ্টি। শেষরাত্রে ফস্‌ফরাসের দীপ্তিবিশিষ্ট আলোকোৎক্ষেপী ঢেউ যেন জ্বলচে অন্ধকারে। আমরা বিছানা ঘাড়ে করে স্টেশনে এলুম। ভোরবেলা ট্রেন ছাড়লো।

সারাদিন ট্রেনে, মাঝে মাঝে ভিড় হয়, মাঝে মাঝে ভিড় চলে যায়। কটক স্টেশনে কতকগুলি রাজবন্দী নেমে গেলেন, এঁরা বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আসচেন। একজনের নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, এঁরা ন' পুরুষ হোল উড়িষ্যায় বাস করচেন, পূর্ব্বে বাংলা দেশে বাড়ী ছিল। ভদ্রক স্টেশনে স্নান করলুম কলের জলে, তখন বেলা সাড়ে তিনটা। ধানমণ্ডল স্টেশন ছাড়িয়ে কেবল পাহাড়, সামনে ও দূরে। মাটির রং লাল, অনেক মনসাগাছ জঙ্গলে, ঝাটিজঙ্গলের বড় শোভা। যাজপুর রোডের কাছে এসে আমার মনে হোল এবার চক্রধরপুরের সমান্তরাল রেখায় এসে পৌঁছেচি—তখুনি একটা লোক বল্লে—এখান থেকে চাঁইবাসা চক্রধরপুর রোড আছে—এই দেখুন সেই রাস্তা। একটু পরে বৈতরণী নদী পার হলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখাও পার হওয়া গেল। এই শেষ বড় নদী এ লাইনে। আগে সুবর্ণ-রেখা, তারপর বৈতরণী, তারপরে ব্রাহ্মণী, তারপরে মহানদী, তারপরে কাটজুড়ি। আর কোন নদী নেই এদিকে। আর যা আছে সে সব অনেক দূরে—যেমন গোদাবরী রাজ-মাহেন্দ্রিতে।

খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন এল রাত এগারোটা। মেচেদা স্টেশনে এল বৃষ্টি। ভোরবেলা আবার বৃষ্টি এল সাঁতরাগাছি স্টেশনে। ননীর সঙ্গে দেখা করবো বলেই এখানে নামলাম।

পুরী থেকে এলুম শুক্রবার, গেলুম গোপালনগরে হাজারি প্রামাণিকের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের নিমন্ত্রণে। শশীর মুহুরী ও আমি একসঙ্গে বসলাম বাড়ীর ভেতরে। জিতেন দফাদার বল্লে—কি রকম, পুরীর লোক এখানে কেন? এখানে কেমন বারোয়ারী যাত্রা হয়ে গেল, আপনি ছিলেন না।

ওরা ভাবলে আমি না জানি কতদিন পুরী গিয়েছিলাম।

বৌভাতের নেমন্তন্নে বেশ ভালই খাওয়ালে এ বাজারে। লুচি, পোলাও, মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, ছ্যাচড়া, চাটনী, দই, পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা, আম, কাঁটাল। হাজারি বল্লে—তোমায় বরযাত্র নিয়ে যাবার বড় ইচ্ছা ছিল ভাই। আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। পুরীতে ছিলাম, কি করবো। খাওয়ার পরে সেকেন পণ্ডিত ও মন্ন বাইরে এসে বসে কতক্ষণ গল্পগুজব করলে। স্কুলের চাকুরীর নিয়োগপত্র দিলে মন্ন। ২৬শে জুন চাকুরীতে যোগ দিতে হবে। আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু ওরা ছাড়ে না, কি করি।

বাহাদুর ও আমি হেঁটে চলে এলুম বেলা তিনটের সময়। কাল গিয়েছিলুম আবালুর

হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে বেনাপোলে। কাপ্তেন চৌধুরী ডাকবাংলো থেকে লোক পাঠিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন। ওঁর জিপ গাড়ী কাল কলকাতা পাঠানো হচ্চে সারানোর জন্তে, তাই আজ আমাকে নিয়ে চল্লেন হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে। আশ্চর্য্য ঠিক সেদিন যে সময় ভদ্রক যাচ্চি বালেশ্বর থেকে, আজ সেই সময় বনগাঁ থেকে বেনাপোলে চলেচি। পুরীতে দেখে এসেছি সেদিন এই মহাপুরুষের সমাধি, আজ যশোর জেলার একটা অজ পাড়াগাঁয়ে বাঁশবন ঘেরা ক্ষুদ্র জায়গাটিতে তাঁর সাধনস্থান দর্শন করলুম। সন্ধ্যায় চাঁদ উঠলো, আরতি আরম্ভ হয়েচে, গুমট গরম। বেশ লাগচে এই পবিত্র নিভৃত তপোবনটি। যশোর জেলার গৌরব যে অত বড় মহাপুরুষ একদিন এখানকার মাটিতে জন্মেছিলেন, এখানকার জলে বাতাসে পুষ্ট হয়েছিলেন। নদীয়ায় যেমন শ্রীচৈতন্য, ঠিক তেমনি সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী জেলায় হরিদাস ঠাকুর।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে লিচুতলায় জ্যোৎস্নায় বসে মিতে, যতীনদা, শিবেনদার সঙ্গে আড্ডা দিলুম।

•

গোপালনগর থেকে প্রতিদিন মাঠের পথ ধরে যাতায়াত করি। আউশ ধানের ক্ষেতে বড় বড় ধানের সবুজ গোছা, গাছের মাথায় মাকাল লতার বড় ঝোপ, পাখীর ডাক—এসবের মধ্যে দিয়ে বিকেলে স্কুল থেকে ফিরি। সেদিন মেঘমেদুর সন্ধ্যায় নদীর জলে গা ধুতে নেমেছি, সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই, কুঠির দিকে চেয়ে দেখি যতদূর চোখ যায়, মেঘলা আকাশ নেমে উবুড় হয়ে রয়েচে সবুজ মাঠের ওপরে।

কিন্তু যে দৃশ্যটা আমায় মুগ্ধ করলে, সেটা হচ্চে এই—সাঁইবাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকী পোকা জলচে নিবুচে। তখনও রাতের অন্ধকার নেমে আসেনি, অথচ জোনাকির হুল থেকে বেশ আলো ফুটেচে। সে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভগবানের হাতের শিল্প আই-ডিয়ারূপী ব্রহ্মের প্রকাশ এর প্রতি রেণুতে রেণুতে…এ সত্যি দেখবার মত জিনিস। কতক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। আজ পাড়াগাঁয়ের অখ্যাত, নিভৃত কোণে, এই মেঘভরা বাদল সন্ধ্যায় এতবড় সৌন্দর্য্য কারও দেখবার অপেক্ষা রাখচে না। এ আপনাতে আপনি মহান। এ জানিয়ে দেয় যে বিশ্বশিল্পীর চিত্রের পটভূমি হিসেবে বিশ্বের সকল স্থানই মহিমময় পবিত্র, —তাঁর নীরব বাণী এদের বাতাসে, ধূলিতে, পত্রের মর্ম্মরে, এই জোনাকী পোকাগুলোর জলন্ত নিবন্ত আলোকপুঞ্জে…

সেই বারাকপুরের মেঘমেদুর দিনগুলি। বড় ভাল লাগে এরকম দিন। ঝোপে ঝোপে মটর লতার থোলো থোলো বুনো আঙুরের মত মটরফল ঝুলচে। ওপাড়ার ঘাটে ঘোলা নদীজল যেখানে তীরের ঘাসবন ছুঁয়েচে, সেখানে এমনি এক ঝোপে কি সুন্দর সাদা সাদা ঈষৎ সুগন্ধ ফুল ফুটে আছে, তার পাশেই সেই মটর ফল দুলচে। কয়েকদিন ধরে সকালে ওপাড়ার ঘাটে বেড়াতে যাই খুব ভোরে। রোজ সকালে সেই ফুলে-ভর্ত্তি ঝোপটির

সামনে দাঁড়িয়ে ওপারের সবুজ ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি। ভগবানের আবির্ভাব এই নব প্রভাতের সজল বর্ষাশ্যামল বননিকুঞ্জে, ঐ দূরবিস্তৃত বননীল দিগন্তরে মেঘলা সকালে শাখায় শাখায় বনবিহঙ্গের কলকাকলীতে।

কলকাতায় মেসে থেকে যখন চাকুরী করি স্কুলে, তখন সুদীর্ঘ তেরো বছরের মধ্যে এই সব দিনে বারাকপুরের বর্ষাসিক্ত বনঝোপের বিরহ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো। বাল্যে কত খেলা করেছি আমি কালী, ভরত, কচা এই বনতলে ঝোপের ছায়ায় ছায়ায়। কত কি পাখীর গান শুনেছি। কত পাকা মাকালফল তুলে এনেছি উত্তর মাঠের বন থেকে,—শাঁখারিপুকুরের ধারের গাছপালার ওপরে-ওঠা মাকাললতা থেকে—মনে হোত সেই রহস্যময় বিচিত্র বাল্য মনোভাব, সেই ঝোপের তলায় বেড়ানো, তখন বোধ হয় বনপরীরা সঙ্গে নিয়ে খেলে বেড়াতো—বুঝতাম না সংসারের কিছু, বুঝতাম শুধু তেলাকুচোর ফুল, বনকলমীর ফুলের বাহার হয়েচে কোন ঝোপে, কোথায় টুকটুকে মাকাল ফল ঝুলচে কোন গাছে—এই সব। বন-পরীদের সঙ্গী ছিলাম তখন। মনে এতটুকু ধুলো মাটি লাগেনি সংসারের। কি অপূর্ব্ব আনন্দে মন মেতে উঠতো যখন দেখতাম গ্যাছে থোলো থোলো পটপটির ফল ফলে আছে। এ সব ফল খাওয়া যায় না, পাখীরও অখাদ্য কোনো কোনো ফল। সুতরাং রসনা তৃপ্তির লোভ নয়—এ সব ফলে খেলা হয় এইটেই ছিল তখন বড় কথা। দেখতে ভাল লাগে এইটেই ছিল বড় আনন্দের উৎস। খেলা আর আনন্দ। লীলাই সবচেয়ে বড় কথা। শেক্সপীয়র বুঝেছিলেন, তাই বলেচেন, "The play is the thing"···play! লীলা, খেলা। সংসার শাশ্বত মানবাত্মার লীলাভূমি। এখানে তারা আসেনি ঘরবাড়ী বানাতে, আসেনি ব্যাঙ্কে অর্থ জমাতে, আসেনি রায়বাহাদুর হয়ে, 'স্যার' হয়ে মোটর চড়ে বড় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেকটর হতে। ওসব তাদের মনের ভুল, মায়া অথবা মোহ। নিজের রূপটি ভুলে যায় তাই ওসব করে।

তারপর যা বলছিলুম। ওই সব বাল্যসঙ্গী, বননিকুঞ্জ, ফুলফল, নদীতীরের সাঁইবাবলা ও কুঁচলতার ঝোপ, সূর্য্যাস্তের আভা-পড়া বেলেডাঙার মরগাঙ, বিলের টলটলে জল—এদের ছেড়ে কলকাতার অপকৃষ্ট এঁদো-পড়া মেসবাড়ীর নোংরা ঘরে বিদ্যার্জ্জন ও চাকুরীর জন্যে বাস করে কি কষ্টই না পেতুম। মনপ্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। ভাবতাম, এমন দিন কি কখনো আসবে না যখন আবার দেশে ফিরে যাবো? গ্রামে বর্ষাকাল কখনো কাটাইনি। বাল্যদিনের পরে চিরকালই স্কুল বোর্ডিংয়ে, কলেজ হোস্টেলে ও মেসে কাটচে ১৯১২ সালের পর থেকে। কখনো কি আবার ঢল-নামা বর্ষায় ইছামতীর ধারে কালো বনসিম-লতার ঝোপের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসবো না মনের আনন্দে, আর কি কখনো শুনবো না কুজে কুজে পত্রমর্ম্মর, গাঙশালিক ও কুকো পাখীর ডাক, বাঁশঝাড়ে জড়াপটি পাকানো বাঁশের কটকট্ শব্দ?

এতকাল পরে সে স্বপ্ন আবার সার্থক হয়েচে, ফিরে পেয়েছি বাল্যকালের সেই বর্ষাসজল,

শ্যামল দিনরাতের স্বপ্ন……স্বপ্ন…। আজও তেমনি মটরলতা ঝোলে ইছামতীর তীরের বনে বনে, তেমনি পাখী ডাকে, তেমনি সুবাস বেরোয় নাটাকাঁটার হলুদ রংয়ের ফুলের থোকায় থোকায়। বিশ্বের অধিদেবতা যেমন সত্যি, এরাও তেমনি সত্যি, শাশ্বত সুন্দর। মরে না, ঋতুতে ঋতুতে পনরাবর্ত্তিত হয়, নবরূপে ফিরে আসে—যুগ যুগ ধরে চলেচে ওদেরও লীলা।

"The play is the thing…"

ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো—নাম দেবো তার 'ইছামতী'। বড় উপন্যাস। তাতে থাকবে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব্ব জীবন-প্রবাহের ইতিহাস—বননিকুঞ্জের মরা-বাঁচার ইতিহাস, কত সূর্য্যোদয়, কত সূর্য্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন, শান্ত ইতিহাস—

কালই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কলকাতায় গিয়েছিলুম, অতুলকৃষ্ণ কুমার মহাশয়ের মোটরে কাল সারা সকাল ঘুরে বেড়িয়েছি। বাণী রায়দের বাড়ী গেলুম, দেবেন ঘোষ রোডের মেস থেকে পুত্র-শোকাতুর ভদ্রলোকটিকে নিয়ে মোটরে করে দু-এক জায়গায় ঘুরলুম। কলকাতায় বেশিদিন আর থাকতে পারিনে—ভাল লাগে না।

সজনী দাস এখানে নেই, ভাগলপুরে গিয়েচে বেড়াতে।

কাল স্কুল থেকে ফিরলুম মাঠের পথ দিয়ে। কি কালো নিবিড়কৃষ্ণ মেঘ করেচে সেই অপূর্ব্ব ঝোপটির পেছনে মুচিপাড়ার দিকের আকাশে! একটা তেলাকুচো পাতার মস্ত বড় সবুজ ঝোপ আছে এ মাঠে। মস্ত তেঁতুল গাছ বেয়ে ঝোপটা উঠে গাছের মাথা ঢেকে দিয়েচে ঘন সবুজ উত্তরচ্ছদে।

আমি যখনই এপথে স্কুলে যাই, তখন দেখি এই ঝোপটা। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি একদিন এই ঝোপের মাথাটা সাদা সাদা ফুলে ভরে দিও, আমি দুবেলা স্কুলে যাওয়া আসার পথে দেখতে দেখতে যাব। কি সুন্দর দেখাবে তখন, ভাবলেও আনন্দ হয়। কাল কোথায় যেন দেখলুম রেললাইনের ধারে কোন ঝোপে বনকলমী ফুল ফুটেচে। কিন্তু আমাদের গ্রামের মধ্যে যে যে ঝোপে বনে বনকলমীর ফুল ফোটে সেখানে গিয়ে দেখেচি, কোথাও ফোটেনি। এই শ্রাবণের শেষের দিকেই কিন্তু ও ফুল ফোটে।

আজ দেখি একটা বনবিড়াল ঝোপের তলা দিয়ে কালু মোড়লের ধানক্ষেতের দিকে যাচ্ছে। বেশ বড় বনবিড়াল, লেজের দিকটা ডোরাকাটা। আমি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, একদৃষ্টে দেখতে লাগলুম, সাড়া পেলেই লেজ তুলে এখুনি দৌড় দেবে। মিনিট খানেক পরে দিলেও তাই, কি করে আমার উপস্থিতি অনুভব করতে পেরেচে। এক দৌড়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হোল।

বাড়ী এসে চা খেয়ে মেঘলা বিকেলে বাঁশবনের দিকে বারান্দায় ইজি-চেয়ার পেতে আরাম করে বসে প্রিষ্টলির 'Good Companions' পড়ি। কয়েক পাতা পড়তে না পড়তে বৃষ্টি এলে আর কোথায় আছি। সেই যে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, চললো সারারাত।

আজ খুব ভোরে কল্যাণী ও আমি বৃষ্টির মধ্যে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। শ্রাবণ মাসের ঘন বর্ষার প্রাতঃকাল, সে কি শোভা হয়েচে উত্তর মাঠে, কি কালো কালো মেঘ বড় শিমুল গাছটার মাথায়, মাঠ ভরে গিয়েচে বৃষ্টির জলে, মাঠের ধারের ঝোপে ঝোপে নাক-জেঁায়াল ফুল (gladiolus lily) ফুটে আলো করে আছে। এই বর্ষা ভেজা হাওয়ায় মুক্তির স্বপ্নলোকে মন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে···যে মুক্তি মেলে এমনি মেঘকজ্জল শ্রাবণদিনে টুপটাপ জল-ঝরা ছাতিম বনে, নটকান ফুলের বনে, পাপিয়ার ডাকে, দোয়েলের ডাকে। (আজ ভোরে যখন শুয়ে আছি বিছানায়, কি চমৎকার পাপিয়া ডাকছিল !) সেই বৃষ্টির একহাঁটু জলে আকাশ-ভরা কালো মেঘের তলে দাঁড়িয়ে মনে হোল ঋষিদের সেই পবিত্র গাথা :—

স্বজিয়া বিশ্ব করিয়া পালন প্রলয়ে নাশেন যিনি
শোভনা বুদ্ধি আমা সবাকার প্রদান করুন তিনি।

ছুটির দিনটা। সারাদিন বৃষ্টি হয়নি। হাজরী জেলেনী সকালে টাটকা রিটে মাছ দিয়ে গেল গাঙের। এখন ঘোলা জলে অনেক মাছ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেলে মাছ আর চিংড়িই বেশি। রিটে মাছ খুব তেলালো সুস্বাদু মাছ, ইছামতী ছাড়া অন্য কোন নদীতে বড় একটা পাওয়া যায় না। দেড় টাকা সের। যুদ্ধের আগে যে মাছ ছিল পাঁচ আনা সের, এখন তাই দেড় টাকায় পাওয়া ভার। কল্যাণী কাঁচা মাছ তেলঝোল করে বড় চমৎকার। আজও তাই করলে, আর ঢেঁড়স ভাতে। সাড়ে বারোটার সময়ে কল্যাণী ও আমি নদীতে স্নান করতে নামলাম। কি সুন্দর মাকাললতার ঝোপটা জলের ধারে। নাটাকাঁটার একটা সুগন্ধি ফুল তুলে কল্যাণীর হাতে দিলুম, ও খোঁপায় গুঁজলে।

বিকেলে হাবু ও ফুচুকে নিয়ে অপূর্ব্ব রঙীন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের বট অশথ গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলে গেলুম মরগাঙে। অনেকদিন এদিকে আসেনি। পথে পথে সবুজ ঝোপ-ঝাপের কি ভরপুর সৌন্দর্য্য। বাঁওড়ে জল বেড়েচে অনেক, ডাঙার কাছে জলি ধানের ক্ষেতে বকের দল চরচে, ওপারের অস্তদিগন্তের পটভূমিতে পাটক্ষেতে চাষারা পাট কাটচে, কোথাও কোথাও জলিধান কাটচে, মাড়ল-গাজিপুরের কাওরারা শুওরের পাল চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বাঁওড়ের কাঁদায় কাঁদায় (কাঁদা = তীর), শুওরের পাল মাটি খুঁড়ে মুথো ঘাস তুলে খাচ্চে, টাটকা মুথো ঘাসের শেকড়ের সুগন্ধ বেরুচ্চে।

মরগাঙের ধারে গিয়ে দেখি ফণিকাকা ইন্দু রায় মাছ ধরে ফিরচে। আমরা বল্লাম, কি পেলে ? ওরা ভাঁড় দেখালে। কিছুই পায়নি। কাঠের বড় কষ্ট হয়েচে, আমি এক বোঝা শুকনো কাঠ কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করলাম। শুকনো বটের ডাল, ষাঁড়ায় ডাল, তিত্তিরাজের ডাল। কুঠীর মাঠের পথে এসে নিবারণের বেগুনক্ষেতের নীচে নদীতে স্নান করতে নামলুম। মাধবপুরের চরের ওপর আকাশের কি অদ্ভুত ইন্দ্রনীল রং ! তারই পটভূমিতে বড় একটা শিমুল গাছ, কাশবন, আউশ ধানের ক্ষেত মায়াময় দেখাচ্চে। নদীজলে সেই অদ্ভুত নীল রংয়ের প্রতিচ্ছায়া।

চাটগাঁ থেকে রেণুর পত্র পেয়েছি কাল। ওর সঙ্গে যোগ এতদিন পরেও ঠিক বজায় আছে। কোথায় চলে গিয়েচে খুকু, কোথায় গিয়েচে সুপ্রভা।

•

দুদিন মোটে বৃষ্টি নেই। খরতর রোদে পুড়ছি। কাল বহুকাল পরে নদীর ধারে পুরনো পটপটিতলায় বেড়াতে গিয়ে জলে নেমে কলমীশাক তুলে আনলুম। আমার বাল্যকালে এখানে সায়ের ছিল, আইনদ্দি কয়াল ধান মাপতো। তারপর বহুদিন মনু রায় এ জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এখানে পটলের ক্ষেত করে। নদীর বাঁকের এ জমির সে অপূর্ব্ব শোভা নষ্ট করেচে, বাল্যের সে মটরলতা দোলানো শোভাময় ঝোপঝাপ, সে নিভৃত স্বপ্নভরা লতাবিতান কুড়ুলের মুখে অন্তর্হিত হয়েচে বহুকাল, কেন? না, মনু রায় বা তার পুত্রপরিবার পটলভাজা খাবে। এখন আর সে পটলের ক্ষেত নেই। তাই বেড়াতে গিয়েছিলাম। নদীর ধারে (একটা ছোট বিছে যাচ্চে, দেওয়াল বেয়ে উঠচে, কেন ওটা মারবো?) গিয়ে দাঁড়াই। ওপারে পাটকিলে ও খাঁটি সিঁদুরে রঙের মেঘের ছটা ঠিক সূর্য্যকিরণের ছটার মত অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে বিরাজ করচে। যেন কোনো বিরাট পুরুষ অনন্ত, অসীম বিরাট বাহু প্রসারিত করে সারা ব্যোম ছেয়েচেন। সেই অনাদ্যন্ত বিরাট পুরুষ যেমনি ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পিত লতার মধ্যে প্রাণরূপী, তেমনি আবার ধারণাতীত বিরাটত্বের, বিশালত্বের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। তেঁতুল-তলার ঘাটে নদীর দিকের ঝোপটাতে সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল দুলচে, মটরতলায় ফলের থোলো ঝুলচে —শ্রীঅরবিন্দের কথায় "সচ্চিদানন্দ যেমন বল্মীকস্তূপে তেমনি সূর্য্যমণ্ডলে।" 'সূর্যমণ্ডলে' কথাটা তিনি বলেন নি, বলেচেন "in the system of suns" অর্থাৎ বহু বিরাট সূর্য্যাকার নক্ষত্রসমূহ-দ্বারা গ্রথিত বিশ্বে।

মুক্তি! মুক্তি! মনের মুক্তি! আত্মার মুক্তি! এই সন্ধ্যায় সীমাহীন আকাশের দিগন্তলীন অভ্র-বাহু যে দেবতার ছবি মনে আনে, তিনি আর তাঁর এই শ্যামল বর্ষাপুষ্ট বনকুঞ্জ সুবাসিত লতাপুষ্প মুক্তি দিতে সমর্থ। কিন্তু মুক্তি নিচ্ছে কে? সবাই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। হে বদ্ধ জীব, সন্ধ্যার আকাশতলে দাঁড়িয়ে সেই পরিপূর্ণ, অবাধ সেই মুক্তির বাণী শ্রবণ কর। একমুহূর্ত্তে বদ্ধতা ছুটে যাবে (অর্থাৎ দূরে যাবে), অমরত্ব নেমে আসবে প্রাণে-মনে।

কাল রাত্রের ভীষণ গুমট গরমের পরে আজ নদীতে নামলুম স্নান করতে। অমনি ওপারের চরের দিকে চেয়ে দেখি নবনীল নীরদপুঞ্জ দিগন্তের নিচে থেকে ঠেলে উঠে ঝড়ের বেগে উড়ে আসচে এপারের দিকে, ভগবানের স্নিগ্ধ করুণার মতো। কেউ কি দেখেচে এমন কাজল কালো মেঘের সজল অভিযান, ঘন মেঘমালার এলোমেলো আলুথালু হয়ে উড়ে আসার এ অপূর্ব্ব দৃশ্য? আমার মনে পড়লো ভাগলপুরের আজমাবাদ কাছারিতে ওই ভাদ্রমাসেই আমি একবার এ দৃশ্য দেখেছিলাম, সেও এই রকম সকালবেলা। বেনোয়ারী মণ্ডল পাটোয়ারীকে ডেকে তাড়াতাড়ি দেখালাম সে দৃশ্য। আর কাকে দেখাই? সেখানে আর কেউ ছিল না। বেনোয়ারী মণ্ডলকে প্রকৃতি-রসিক বলে আমি ডাকিনি, কাউকে ডেকে ভালো জিনিসের

ভাগ দেবো বলেই ডেকেছিলাম, মনে আছে বেনোয়ারী উড়ন্ত মেঘপুঞ্জের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বল্লে—হাঁ, বাবুজি, আচ্ছা হ্যায়। এই মাত্র সংক্ষিপ্ত comment করে সে এই বাতুল বাংগালী বাবুর পাশ কাটিয়ে কাছারি ঘরে খতিয়ান লিখতে ঢুকলো।

আজ কেন ওই মেঘপুঞ্জের দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এল তা কে বলবে? ভগবানের কথা মনে করেই চোখে জল এল কি? তাঁর অসীম দয়ার কথা স্মরণ করেই কি?

হয়তো হবে…

কিন্তু এ সম্পূর্ণ অকারণ। আমি কি জানি নে এমন ঘর, উষর মরুভূমির দেশের কথা যেখানে মাসের পর মাস কেটে যায় ১২০°।১২৫° ডিগ্রী উত্তাপের মধ্যে, যেখানে একবিন্দু বারিপাতের সুদূর সম্ভাবনাও থাকে না।

তবু ভগবানের দান, ভগবানের দান। সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে তাঁর অসীম করুণার দানকে যেন মাথা পেতে নিতে পারি। প্রাকৃতিক কারণে মেঘ সঞ্চিত হয়েচে আকাশে, উড়ে আসচে উর্দ্ধস্তরের বায়ুস্রোতে—এর মধ্যে 'ভগবানের দান' কি আবার রে বাপু? যতো সব সেণ্টিমেণ্টাল ন্যাকামি।

হে অনন্ত, হে অসীম, হে দয়াল তোমার বহু দূত, বিশ্বের সব দেশে কত চর—সব কিছুর পেছনে তোমার প্রকাশ, তোমার মহান অভ্যুদয়—এ সত্যকে যেন না ভুলি। সব রকম দানকে যেন তোমার হাতের অমৃত পরিবেশন বলে মেনে নিতে পারি।

আজ সকালে উঠলাম। মনে খুব আনন্দ। হয়তো বা শরতের রোদ ফুটবে খুব। পটুপটি-তলার সায়েরে গেলুম নদীর ধারে, পূর্ব্বদিকে সামান্য কিছু মেঘ, আকাশ মোটামুটি বেশ পরিষ্কার। ওপাড়ার ঘাটে মুখ ধুয়ে ওপারের শোভা দেখি একমনে। সেই সাঁইবাবলা গাছ থেকে মটরলতা দুলচে, সেই সাদা ফুলে ভরা লতায় কিছু কিছু ফুল এখনও দেখা যাচ্চে। একটা নৌকো এসে লেগেচে—ছইওয়ালা নৌকো।

বল্লাম—কোথাকার নৌকো গো?

—আজ্ঞে বাবু, বাজিতপুরের।

—সে কোথায়?

—মাজদে'র সন্নিকটে।

—কি কিনবে?

—কাপড় কিনতে এসেচি গোপালনগরের বাজারে।

—কবে সেখানে গিয়ে পৌঁছোবে?

—আজ বেলা বারোটায় ছাড়লে কাল সন্দের সময় নৌকো আমাদের ঘাটে লাগবে।

বাড়ী আসতেই বৃষ্টি নামলো। সে কি ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি! দুটি ঘণ্টা ধরে একঘেয়ে অবিরাম ভন্না বৃষ্টি! 'ভন্না' মানে অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি। হরিবোলার ছেলে নীলু এল একটা পাকা

তাস নিয়ে। বেশ সুন্দর তালটা। হাবু বসে 'ঊর্মিমুখর' পড়তে লাগলো। নীলু পড়তে লাগলো 'পথের পাঁচালী'।

আজ ওবেলা কলকাতায় যেতুম ১১টার ট্রেনে। কিন্তু যে বৃষ্টি! তা ছাড়া গুরুদাস ঘোষের ছেলের বিয়ের বৌভাতে নিমন্ত্রণ আছে দুপুরে। সে বিশেষ করে ধরেচে, না গেলে চলবে না।

কল্যাণী চিঁড়ে দই আমসত্ত্ব দিয়ে কলা দিয়ে ফলার মেখে নিয়ে এল। এর যা আস্বাদ, কলকাতায় এ রকম পাওয়া যাবে না। ঘরের পাতা দইও নেই সেখানে। টাটকা চিঁড়েও পাওয়া যায় না সেখানে। এখানে গোলার ধানের চিঁড়ে, যত ইচ্ছে খাও।

•

কাল বিকেলে চারটার সময় উড়ে-আসা নীল মেঘের কোলে কোনো সাদা মেঘখণ্ডের দৃশ্য আর তার নিচে মেঘের ছায়ায় কালো গোপালনগরের বাঁওড়ের দৃশ্য আমায় একেবারে মুগ্ধ করেছিল। তারপর কাল রাত্রি থেকে নেমেছে ভীষণ বৃষ্টি। সারারাত ঘুমের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে শুনেচি ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়চে…পড়চে। আজ সকালে ওপাড়ায় ঘাটে বেড়িয়ে এলাম—মন্থ রায়ের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। সর্ব্বত্র জল আর জল—খানা, ডোবা, বিল, বাঁওড় জলে থৈ থৈ করচে। ইছামতী কূলে কূলে ভরা, সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল ফুটেচে—ভরপুর বর্ষার দৃশ্য! কতকাল দেখিনি এ সব, কতকাল দেখিনি এই বর্ষণমুখর মেঘান্ধকার প্রভাতে ওপারের জলে-ভেজা নলখাগড়া বন, বন্যেবুড়োর বন, কতকাল দেখিনি বর্ষা-প্রভাতে ভাদ্র মাসের ইছামতীর কূলে কূলে ভরা অপরূপ রূপ! তার বদলে দেখে এসেচি মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের বাড়ীর তেতলা থেকে নিচের রাস্তার একহাঁটু জলের মধ্যে দিয়ে পাউরুটিওয়ালা ভোরে অদ্ভুত সুর করতে করতে চলেচে। "এক এক পয়সার রুটি লেও, দু' দু' পয়সার রুটি লেও—বোম্বাইয়ে রুটি লেও, বোম্বাইয়ে রুটি!" জল ছিটিয়ে বাস চলেচে একহাঁটু জলের মধ্যে, যেন স্টীমার চলেচে জলের মধ্যে দিয়ে। সারি সারি ট্রাম মৌলালির মোড়ে আটকে আছে… কিংবা সারারাত্রি বৃষ্টির দরুন ট্রাম বেরোয়নি।…বাবুরা প্রাণের দায়ে আপিসে চলেচেন জুতো-জোড়া খবরের কাগজ মুড়ে বগলে নিয়ে হাঁটুর কাপড় তুলে…ট্রামে বাসে জানালা বন্ধ, লোক-জন বাদুড়ঝোলা হয়ে চলেচে, ভেতরে বাইরে অসম্ভব ভিড়। বহুক্ষণ ধরে দেখে দেখে ও দৃশ্য চোখ ক্লান্ত হয়ে গিয়েচে…আর ভাল লাগে না ওসব। এমন ভাদ্র মাসের মেঘ-কালো প্রভাত তার ভরা নদীজল ও বৃষ্টিস্নাত সাঁইবাবলার ও মাকাললতার ঝোপ এবং চরের নলখাগড়ার বন নিয়ে অক্ষয় হয়ে থাক জীবনে, মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের ফিরিওয়ালা জলে ভিজে যত খুশি 'বোম্বাইয়ে রুটি' বিক্রি করুক গে।

ঠিক আজ তেমনি প্রভাত—তেমনি মেঘান্ধকার, শীতল, বর্ষণমুখর ভাদ্রের প্রভাত। ৭টা বেজেচে অথচ আমি ভাল করে খাতার লেখা দেখতে পাচ্ছি নে আধ-অন্ধকারে। যেমন কতকাল আগে আজমাবাদ কাছারীতে আমি সেই নকছেদী ভকতের দেওয়া বেলফুলের

ঝাড়ের পাশের চেয়ারে বসে 'পথের পাঁচালী' লিখতাম, মুহুরী গোষ্ঠবাবু বসে হিসেব বোঝাতো, উত্তর বিহারের বন্যার জলে-ডোবা মকাইয়ের ক্ষেত আর কাশবন—সেই উদ্দাম ঘোড়ায় চড়া, সেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের নীল দৃশ্য, সেই দিগন্তলীন মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট—সেই সব দূর অতীতের ছবি আজকার দিনে মনে জাগে। সে হোল আজ আঠারো বছর আগের কথা, মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে আঠারো বছর—কত কাল!

কিন্তু এ দিনে আর একটি অদ্ভুত স্মৃতি জড়ানো আছে জীবনে। ১২ই ভাদ্র সেবার ছিল জন্মাষ্টমী, মনে পড়ে? মনে পড়ে সেই আকুল আগ্রহে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা, সেই মাটির প্রদীপ হাতে একটি কিশোরীর ছবি খড়ের দাওয়ায়? নাঃ—এসব কথা মনের গভীর গহনে সুগোপনেই থাকুক, এখানে লিখবো না কিছু।

শুধু সেই অপূর্ব্ব দিনটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজকার এই ক'টি কথা লিখে রাখলাম।

পুরীতে যে মেয়েটি এই খাতাখানি আমায় দিয়েছিল, আজ ঘন সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে বসে তার সে খাতাটিতে লিখচি। আজ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সাল। বেশ শীত, থলকোবাদ বন-বিভাগের বাংলোতে বসে আছি, আগুন জ্বলছে ঘরে। আজ সকালে মোটরে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে সুরাগাঁও গিয়েছিলাম। পথে পড়লো জাটিসিরিং বলে একটা অপূর্ব্ব সুন্দর জায়গা, কোইনা নদীর গর্ভে। তিন বৎসর আগে জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে এসেছিলুম, এমনি শীতের দিনে, রাত ১০টার পরে। এখানে বসে কিছু লিখেছিলুম মনে আছে। চারিদিকে ঘন অরণ্যভূমি, সামনে কেউনঝর স্টেটের পাহাড় ও বন, পেছনে বোনাইগড়ের বন, প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী বন অরণ্য ঘিরে রেখেচে আমাদের।

বড়দিনের ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছি। মনোহরপুরের পাহাড়ের ওপর যে সুন্দর বাংলোটি আছে বনবিভাগের, সেখানে ছিলাম দুদিন। তারপর এলুম এখানে। নির্জ্জন বনপথে সেবার যেখানে বনমুরগী দেখেছিলাম, এবারও সেখানে সন্ধ্যার আগে বনমুরগী দেখা গেল। বাড়ীর পাশে চরে বেড়াচ্ছিল, মোটরের শব্দ শুনে উড়ে গেল। থলকোবাদ আসবার কিছু আগে বন্য ময়ূর দেখলাম, রাস্তার এ পারের বন থেকে ওপারের বনে ঢুকলো। আবার সেই থলকোবাদ বাংলো! সেই অরণ্যের সুগন্ধ, সেই নির্জ্জনতা।

কাল বাবুডেরা ও বলিবা থেকে ফিরবার পথে এই নির্জ্জনতা আমার বুকে এত বেশি যেন একটা গুরুভারের মত চেপে ধরছিল। শুধুই গাছ আর বন, আর লতা আর পাথর, আর পাহাড়। লোক নেই, জন নেই, লোকালয় নেই। আমি এখানে কতদিন একা থাকতে পারি? যদি ধরো বাবুডেরার পথে সেই পাহাড়টার ওপরকার তৃণভূমিতে, যেখানে মাদুর পেতে বসে আমি আর সিন্‌হা দুঘণ্টা গল্প করলুম ও লিখলুম—সেখানে আমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছু দিন থাকতে হয়, একটিও মানুষের মুখ না দেখে, একজনের সঙ্গেও একটি কথা না বলে? শুধু অন্ধকার বা আধ-জ্যোৎস্না রাত্রে মাথার ওপরকার আকাশে দেখবো পরিচিত কালপুরুষ বা সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল, তাদের চারিপাশে ছড়িয়ে আছে অগণ্য তারা, আর

নিচে আমার সামনে, পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্যের সীমারেখা, কচিৎ বা শুনবো বন্য হস্তীর বৃংহিতধ্বনি, বন্য কুকুরের ডাক, কখনো বা কোৎরার (barking deer) বিকট চীৎকার।

ওপরে বিরাট নীচেও বিরাট। ওপরে, নীচে, তোমার চারিপাশে বিরাটের গম্ভীর মূর্ত্তি থম্‌থম্ করচে। বাংলা দেশের মাঠে মাঠে এ সময়ে ফুটেচে বনধুঁধুলের হল্‌দে ফুল, ছোট এড়াঞ্চির সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল—সেগুলো মিষ্টি, চমৎকার লিরিক কবিতা। মনকে মুগ্ধ করে, আনন্দ দেয়। এখানে প্রকৃতি এপিক কাব্য লিখে রেখেচে গম্ভীর অরণ্যাবৃত শৈলশিখরে, লৌহ-প্রস্তর দিয়ে বাঁধানো নদীকূলে, তারা-ভরা বিশাল আকাশপটে, বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য অন্ধকারে। সে গম্ভীর এপিক কাব্য সকলের জন্যে নয়—কাল রাত দুটোর সময় বাংলোর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ বনানী ও শৈলমালার দিকে তাকিয়ে দেখেচি—সে দৃশ্য সহ্য করতে পারা যায় না—মনকে স্তব্ধ করে, অভিভূত করে, ভয় এনে দেয়। বিরাটের উপাসনা সকলের জন্যে নয়, বাংলার পল্লী প্রকৃতি যেখানে ঠুংরি এখানে তা চৌতালের ধ্রুপদ—সকলের জন্যে নয় এ সব।

ওই বন ওদিকে পাথর বাৎনী, জেরাইকেলা থেকে আরম্ভ করে এদিকে ঝিনডুং, লোরো কোদালিবাদ, ধরমপকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কি ঘন বন, কত মোটা মোটা শাল গাছ কোথায় কোন্ শূন্যে ঠেলে উঠেচে—কলের চিমনির মত। ১৫০।২০০ বছরের প্রাচীন বনস্পতি। এসব অঞ্চলে যখন সভ্য মানুষে পদার্পণ করেনি, রেল হয়নি, মোটর ছিল না, পথ ঘাট তৈরি হয়নি—তখন সেই সব বনস্পতি ঘন বনের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল। আমার প্রপিতামহ যখন শিশু তখন এই সব গাছ হয়তো ছিল সরু-শাল-রলা। আমার মায়ের যেদিন বিয়ে হয়েছিল সে-দিনটিতে এই গাছ এত বড়ই ছিল। এই সব ভেবে আমার মনে যে কি আনন্দ পাই, থলকো-বাদ গ্রামের পাশে বোনাইগড় আর রঙ্গনগাড়ার পথের ধারে যে বিশাল শালবৃক্ষটি আজ সন্ধ্যায় দেখলুম যার তলায় শাদ-বেড়ার সেই গাড়োয়ান ক'টি ভাত আর কচু দিয়ে কলাইয়ের ডাল রেঁধে খাচ্ছিল—দণ্ডের পর দণ্ড আমি ঐ গাছটির দিকে চেয়ে এই রকম চিন্তায় মশগুল হয়ে আপনহারা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে পারি।

ইসমাইলপুর দিয়ারার খড়ের কাছারিঘর থেকে যার হয়ে এমনি শীতের রাত্রে হঠাৎ বাইরে গিয়ে দাঁড়াতুম মনে পড়ে। সেখানেও ছিল সামনে পিছনে নির্জ্জন বনভূমি আর ছিল সে কি ভীষণ শীত। হাতের আঙুলগুলো জমে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো—এতকাল পরে আবার এই ক'দিন সেই হারানো অনুভূতিগুলো ফিরিয়ে পাই রোজ রাত্রে। সেই নির্জ্জন, অন্ধকার আরণ্য-ভূমি, সেই ভীষণ শীত, সেই সীমাহীন বিরাটের মুখোমুখি হওয়া, সেই স্তব্ধ ও মৌন বিস্ময়-ভরা আনন্দ! জয় হোক সে বিশ্বদেবতার যিনি আমাকে আবার এখানে এনেচেন!

ক'দিন থেকে বন্যহস্তীর উপদ্রবে এখানকার আরাকুলি অর্থাৎ কাঠচেরাইয়ের কুলিরা বড় বিব্রত হয়ে পড়েচে। কাল সন্ধ্যায় বনতুলসীর শুকনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের ওপরের

একটা ঝর্ণা পার হয়ে বোনাইগড়ের পথে এদের কাছে গিয়েছিলাম। একটা বিশাল শাল গাছের তলায় এরা বসে ডাল রান্না করছিল ঘটিতে। ভাত আগেই রান্না হয়ে গিয়েছিল। চারিধারে নির্জ্জন জঙ্গল। ভীষণ শীত।

জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম? কোথা থেকে আসচো?

ওরা বাংলা বোঝে না। হো ভাষার মধ্যে উড়িয়া ভাষার ক্রিয়াপদ মিলিয়ে এদের কথা ভাষা। যা বল্লে, তার মানে যে তারা গাড়োয়ান, কাঠ বইবার জন্যে যদি গাড়ীর দরকার হয়, সেজন্যে জঙ্গলে কাজ খুঁজতে এসেচে।

সঙ্গে ওদের দেখলুম শুধু একখানা করে খেজুর পাতার বোনা চেটাই, একখানা পাত্‌লা রেজাই, একটা হাঁড়ি আর একটা ঘটি।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় শোবে রাত্রে?

—এইখানে। গাছতলায়।

—হাতীর ভয় আছে এখানে জানো? কাল রাত্রে আরাকুসিদের বড় বিব্রত করেচে।

—আগুন আছে বাবু।

—আগুন তো আরাকুসিদেরও ছিল, বুনো হাতী আগুন মানেনি। দাঁত দিয়ে ও-বছর একটা লোককে গিঁথে ফেলেছিল মাটির সঙ্গে। সাবধানে থাকাই ভালো।

—না বাবু, হাতীর ভয় করলে আমাদের চলবে না। কোথায় যাবো বাবু?

—এই ভীষণ শীতে শোবে এই গাছতলায়!

—আমরা চিরকালই তাই করি। আগুনের ধারে শুলে শীত লাগবে না।

এরা কিছুই গ্রাহ্য করে না, না বুনো হাতী, না এই দুর্দ্দান্ত শীত, না এই অন্ধকারে আরণ্য-রজনীর নির্জ্জনতা। এই সব বন্য অঞ্চলে এরা মানুষ, আজন্ম যাতায়াত করচে এই বনপথে, বৃক্ষতলে নিশি যাপন এদের দৈনন্দিন অভ্যেস। ওদের ডাল নামলো! শুধু ডাল আর ভাত শালপাতায় ঢেলে খেতে লাগলো। ডালের মধ্যে সাদা সাদা কি ভাসচে দেখে বল্লাম—ওগুলো কি ডালে?

—পেক্‌চি।

—সেটা কি?

—কান্দা।

—তাই বা কি?

বুঝলাম না জিনিসটা। মনে হোল কোনো জংলী ফলটল হবে। পরে বনবিভাগের হিন্দি-জানা কর্ম্মচারী নিকোডিম হো-কে জিজ্ঞেস করতে জানলুম, জিনিসটা হোল মানকচু।

এই হোল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে বুঝতে হোলে এই সব লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। কি সামান্য এদের খাওয়া, কত তুচ্ছ এদের শোওয়া, শীতকে এরা শীত জ্ঞান করে না, বুনো-হাতী মানে না, বাঘ মানে না—যদি দুটাকা কি দেড় টাকা গাড়ীর ভাড়া মেলে। তবুও খায় মানকচু সিদ্ধ আর ভাত।

গাছের মাথায় সন্ধ্যা নামলো ফিরবার পথে। একফালি চাঁদ উঠেছে শালগাছের মাথায়। বনতুলসীর জঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসচে ঠাণ্ডা বাতাসে। নিকটে পাহাড়ী উমুরিয়া নালার মর্ম্মর শব্দ। বোনাই গড়ের পথ ঘন জঙ্গলের বাঁকে যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠচে। বোধ হয় ওখানে আরাকুসি বা গাড়োয়ানেরা রাত্রিযাপন করচে।

পথের ধারে গাছের তলায় তলায় কত লোক আগুন জ্বেলেচে, রান্না করচে। এরা সবাই সেরাইকেলা কিংবা বিসবা থেকে কাজ খুঁজতে এসেচে। কারণ এই জঙ্গলের মধ্যে এই গ্রামেই ছুটি কাঠ-ব্যবসায়ীদের আড্ডা আছে। কাঠ কেটে ও চেরাই করে ২৫/২৬ মাইল দূরবর্ত্তী রেলস্টেশনে পাঠাবার জন্য 'আরাকুসি' দরকার, কুলি দরকার, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান দরকার। তাই এখানে এত লোক আসে।

ওরাই আসবার সময় বলেছিল, রোজ রাত্রে হাতীতে তাদের বড় জ্বালাতন করে। হাতীর উপদ্রবে ওরা পালিয়ে ফরেস্ট বাংলোর কম্পাউণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিল পরশু রাত্রে।

গ্রামের লোকে বলেছিল হাতীর উপদ্রবে গাছের কলা থাকে না, ক্ষেতের কোনো ফসল থাকে না। সব খেয়ে যাবে। উঁচু মাচা করে তাই ওরা সারারাত ফসলের ক্ষেতে চৌকি দেয়। শীতকালে এখন ক্ষেতে কোনো ফসল নেই, কাটা হয়ে গিয়েচে, আছে কেবল কুরথি। যেখানেই পাহাড়ের তলায় কুরথি ক্ষেত, সেখানেই উঁচু কোনো গাছের ওপরে মাচা বাঁধা। রাত্রে ফসল পাহারা দিতে হবে।

থলকোবাদ বাংলোর পেছনে যে ছোট পাহাড়ী বন আর উঁচু রাঙামাটির ডাঙ্গা তাতে শীতের দিনে একরকম ঘাস হয়েচে, খুব নরম, সরু সরু সাবাই ঘাসের মত। এই ঘাসের মাঝে মাঝে শুকিয়ে গিয়ে সোনালি রং ধরেচে।

আজ দুপুরের পর বাংলো থেকে বার হয়ে এই নির্জ্জন পাহাড়ে উঠে ঘাসের উপর একা বসলুম। আমার পেছনের ঢালুতে আসান, অর্জ্জুন, ধ, করম, শাল, পিয়াল, আমলকী গাছের বন। ওদিকে বনের মাথা ছাড়িয়ে আর একটা পাহাড় ঠেলে উঠেচে। কি যে অনুভূতি হয় এখানে বসে চুপ করে চোখ বুজে থাকলে। শুকনো ঘাসের ভরপুর গন্ধ। সোনালি রোদ। কত কি পাখীর ডাক। কান পেতে শুনলে শোনা যাবে পাহাড়ের বনে বনে এদিকে ওদিকে কত অজানা পাখীর ডাক। বাংলা দেশের পরিচিত পাখী এরা নয়। আমি এদেশের পাখীর স্বর চিনি না। কেবল চিনি বনটিয়া আর ধনেশ পাখীর ডাক। পাহাড় ও বনের পটভূমিতে বুনো পাখীদের সঙ্গীত এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে শুধু মনকে বিরাটের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কথাই এখানে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে। ধ্যানস্তিমিত নেত্র সেই মহান শিল্পীকে একদিন প্রত্যক্ষ করেছিল প্রাচীন ভারতের কোন অরণ্যের অভ্যন্তরে। এমনি নির্জ্জন দুপুরে।

একটু পরে মোটরে গেলুম বেড়াতে থলকোবাদ বাংলো থেকে চার মাইল দূরে একটা ঝর্ণা দেখতে। সন্ধ্যার দেরি নেই। মোটরের রাস্তা থেকে কিছুদূরে সেই ঝর্ণাটা। মস্ত বড় শিলাস্তৃত চাতাল সেখানে। কত লক্ষ বৎসর ধরে এই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি ওপরের নরম রাঙা মাটি

কেটে shale ও greisen পাথরের এই চাতাল তৈরি করেছে। কত লক্ষ বৎসর ধরে এই ঝর্ণা চলেচে এখান দিয়ে। সময়ের বিরাট ব্যাপ্তির কথা ভাবলে আমরা ক্ষুদ্র মানুষ আমাদের মাথা ঘুরে যায়।

সামনে সেই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলকুল করে পাথরের ওপর দিয়ে বইচে। আমি ঘন বনের মধ্যে মোটা লতা দোলানো একটা বটগাছের তলায় শিলাসনে বসে আর একটা মস্ত বড় মসৃণ পাথর ঠেস দিয়ে লিখচি। সেই সব পাখীর ডাক। এ জায়গাটা বড় বেশি ঘন বনের মধ্যে। একে তো এই সারেণ্ডা অরণ্যই নির্জ্জন ও বহু বন্যজন্তু-অধ্যুষিত। তাতে এ জায়গাটা আবার থলকোবাদ থেকে চার মাইল দূরে বনের মধ্যে। বাঘ ও হাতীর ভয় এখানে খুব। মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিতে পেছন দিকে চাইচি, শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ শব্দ হোলেই, মিঃ সিন্‌হা অদূরে আর একটা গাছের তলায় বসে আছেন।

এসব স্থানে বসে শুধু বিরাটের চিন্তা মনে আসে। লক্ষ্য বৎসর এখানে মাপকাঠি বিরাট আকাশ, অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্য, মহাকালের অনন্ত পথযাত্রা…মনের মধ্যে যে সুর বেজে ওঠে, পৃথিবীর ভাষায় সে সুর বোঝানো যায় না, সে অনুভূতি অমরত্বের আস্বাদ বহন করে আনে, তুলনা নেই সে ecstasyর—

আর শুধুই ছবি মনে আসে সে বিরাট দেবতার, কত ভাবে, কত দিক থেকে। বহু প্রাচীন দিনে ভারতবর্ষের এমনি কোন অরণ্যের শিলাতলে বসে ব্রহ্মসূত্রকার মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন 'রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্'—বিশ্ব রচনা দেখে মনে হয় এর মধ্যে কোন বিরাট শিল্পচেতনা সব সময়ে সক্রিয়।

সেই মহান, বিরাট শিল্পীকে বন্দনা করি। জয় হোক বিশ্বের সে অধিদেবতার। মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকামণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গকাকলীতে, জাতির উত্থানে পতনে, চাঁদের আলোয়, তরুণীর নির্ম্মল প্রেমের ব্যথায়, শোকে, বিরহের গানে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতুদলের যাতায়াতে, দেশ ও মহাদেশের অবনমন পুনরুত্থানে তিনি আপন মনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেচেন। কিন্তু অত বড় মহাকাব্য পাঠ করবার মত শক্তিধর পাঠক কোথায়? দু-একটা সর্গের এক-আধ পংক্তি কেউ হয়তো পড়ে, কেউ বোঝে কেউ বোঝে না।

আকাশে গোধূলি নেমেচে। বনের মধ্যে দিয়ে আমার এই বটতলায় শিলাসনে ওর রাঙা আলো এসে পড়েছে। জলের মর্ম্মর কলতান যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে চোখে। শীতও নেমেচে খুব।

বিজয় ড্রাইভার এসে বলচে—যাবেন না বাবু?

বুনোহাতী কিংবা বাঘ আর একটু পরে জলপান করতে আসবে এই ঝরণায়। যাওয়াই ভালো।

বাংলোয় ফিরলুম অন্ধকার গিরি-বনপথ ধরে। আশপাশের অন্ধকার জলের দিকে চাইলে প্রাণে ভয় আসে। এ এক অদ্ভুত জগৎ।

বাংলোয় ফিরে পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডে বসে আছি। আমার সামনে অনেক নীচে উপত্যকাভূমি, তার ওপারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বনাবৃত শৈলমালা। বাঁ দিকে কম্পাউণ্ডের বড় তুন গাছের মাথায় অষ্টমীর চাঁদ উঠেচে—দূরের অন্ধকার শৈলমালার ওপরে একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করচে। সেদিকে চেয়ে মন আমার কোথায় কতদূরে চলে গেল। ওই তারার চারিপাশে কি আমাদের মত গ্রহরাজি কিছু আছে—যেখানে বাস করে আমাদের মত জীবকুল? এই রকম বনানীর সৌন্দর্য কি ওদের মধ্যে আছে? আমাদের মত সুখ দুঃখ, প্রেম বিরহের লিপি কি ওখানেও লেখা?

সেকথা জানি না জানি—এই কথাটা জানি যে বিরাটের আসন ওখানেও পাতা। তাঁর মহাকাব্যের ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে ওদেরও স্থান রয়েচে।

Out beyond the shining of the furthest star
Thou art ever stretching infinitely far,
Yet the hearts of children hold, what worlds can not,
And the God of glory loves the lowly spot,

আমাদের গ্রামের ইছামতীর নদীর ধারে বন্যার ভাঙনে সেই হলদে তিৎপল্লা ফুলের মধ্যেও তিনি, বনসিমতলায় মাঠের সেই মাকাল লতার ঝোপে পাকা টুকটুকে মাকাল ফলের মধ্যেও তিনি।...

অনেক রাত্রে চাঁদ ফুটফুটে আলো দিচ্চে।

আবার পাহাড়ের ধারে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। দূরের সেই পাহাড়শ্রেণী, তার মাথার ওপরকার আকাশে অগণ্য তারা। কি মহিমা বিরাটের। তুমি আমাকে ভালবেসে এখানে এনেচ, তোমার এ বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়েচ। কিন্তু আমি তোমার এ রূপের সামনে দিশাহারা হয়ে যাই, দেবতা। আমার সেই তিৎপল্লা ফুলের ঝোপই ভালো। বনসিমতলা ঘাটের সেই মাকাল ফলই ভালো। তোমার এ রূপ দেখে আমি ভয় পাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল।

নদীর ধারের ঘন নিবিড় বন সেকেলে প্রাচীন আমগাছের তলায়। কুঁচলতা বেয়ে উঠেচে বৃদ্ধ আমগাছের ডাল। বাঁশগাছের আগা থেকে নেমে এসেচে বড়-গোয়ালে লতার কচি ডগা, এবার বোশেখ মাসের শেষে দিনকয়েক বৃষ্টি হওয়াতে লতাপাতা চারাগাছের এত বৃদ্ধি। যেখানে কিছুদিন আগে পরিষ্কার তৃণলতাশূন্য ভূমি দেখেছি—এখন সেখানে দশ বর্গহাত জমিতে গজিয়ে উঠেচে বুনো উচ্ছে, বুনো করলা, বড়-গোয়ালে লতা, করমচা লতা, বুনো সূর্য্যমনি ফুলের চারা, জামের চারা, তরমুজের চারা, আরও কত কত জানা অজানা বুনো গাছপালার চারা।

এখন বৃষ্টি নেই। আজ ক'দিন খুব গরম, খরসূর্য্য উঠেছে মেঘলেশশূন্য নীল আকাশে, দিক্‌দিগন্ত প্রখর রৌদ্রে জ্বলেপুড়ে যায়, অপরাহ্ণে কিন্তু গহন ছায়া নেমে আসে মাঠে ঘাটে

পথে, বনষুঁইয়ের সুগন্ধে বাতাস হয় সুরভিত, বাঁশঝাড়ের মগডাল দুলিয়ে, আম্রবন-শীর্ষ কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে নদীর বাঁক থেকে, নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ঢেউ উঠে পানকলস শেওলার কুচো সাদা ফুলের সারিকে নাড়িয়ে দেয় ডাঙার দিকে, পানকৌড়িকে উড়িয়ে দেয় সাঁইবাবলার ডাল থেকে, শেফালি ফুলের হলুদ পাপড়ি ঝরিয়ে দেয় নিবিড় বনের তলায়, বর্ষাপুষ্ট তৃণভূমির তলে কিংবা নবোদ্গত চারা গাছের মাথায়। গোধুলির রাঙা আলো বনে, মাঠে, চরে, জলে, নলখাগড়া আর কষাড় ঝোপে, উড়ন্ত বকের সারির পাখায়। এই নিস্তব্ধ অপরাহ্নে ছায়াগহন প্রাচীন আমবাগানে ঢুকে দেখছি বনের কোন্ কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে দেখেছিলাম এই নির্জ্জনে।

আমি অবিশ্বি দূর থেকে দেখেছি, কাছে যাইনি।

ছায়া-ঝোপের নিবিড় আশ্রয়ে তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। নারীর মত সুকুমার কমনীয় মুখে এক অপার্থিব ভাব মাখা, দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ দুটি নিমীলিত দীর্ঘ কালো জোড়া ভুরুর তলায়। সুন্দরী নারীর মত লাবণ্যভরা মুখ। মুখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে ওঁর। ঝুর ঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়চে সোঁদালি ফুলের ওঁর শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্চে, কত কি বন্যলতার গাছ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলচে ওঁর বুকের কাছে, মুখের কাছে। তিৎপল্লা ফুল ফুটে আছে একটু দূরে একটা ঝোপে, রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, পিড়িং পিড়িং দুর্গাটুনটুনি ডাকচে, উঁচু গাছের মগডালে ডাকচে কুল্লো, কি সুন্দর গোধুলির রাঙা রোদ সাজানো বনকুঞ্জ, কি স্নিগ্ধ ছায়ানিবিড় বীথিতল!

কিন্তু হঠাৎ মনে হোলো তিলপল্লা ফুল তো এখন ফোটে না, ও ফোটে শীতের প্রথম মাসে দুপুরবেলা।

এখন ও ফুল কেন?

তা না, মনে হোলো মহাশিল্পী, মহাকবি উনি, নিজের অনন্ত শয্যার অস্তনিদ্রার স্থানটি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে বোসবেন আমি যে সব ফুল ভালবাসি বা দেখেছি তাই দিয়ে। শুধু কি ফুল? কত কি সুদর্শন, সুকুমারাগ্র বন্যলতা, যা নিতান্ত এই বাংলার পল্লীপ্রান্তরে সুপরিচিত। নেই সেখানে অর্ক ও কোবিদার। নেই কুরুবক, অশোক পুন্নাগ ও চম্পক, বর্ষা-সাথী নীপও চোখে পড়ে না। হে পূর্ব্বাচলের সবিতা, তোমার জবাকুসুম-সঙ্কাশ রশ্মির বিকীরণও এখানে তপস্যার অভাবে প্রবেশ লাভ করেনি। কি পুণ্য করেছিল এই প্রাচীন দিনের গাঙ্গুলী বংশের আমবাগান, কি তপস্যা করেছিল ইছামতীর তীর-তরুশ্রেণী?

ভালো করে চেয়ে দেখবার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই বনে।

কি সুন্দর অপরূপ স্নিগ্ধ ছবিখানা আমার সামনে।

বিপুল মহাসাগরে ইথারের মহাসমুদ্র, যেখানে কোটি তারা ডোবে জলে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সবুজ খড়ের দ্বীপ পৃথিবী।

বিশ্বের রাজাধিরাজ পরম সৌম্য, পরম প্রেমী অধিদেবতা, যাঁর তৈরী আব্রহ্মস্তম্ব এই জগৎ,

এই মহাজগৎ, সেই পরম রহস্যময় দেবতা আজ কেন শায়িত এই আমবাগানে! সোঁদালি ফুল ঝরচে তাঁর সুকুমার লাবণ্য-মাখা মুখের ওপর, সে মুখ দেখে তখনি ভালবাসতে ইচ্ছা করে—বিশেষ করে যখন মনে হয় জগতে ক'জনই বা ওঁকে জানে বা ওঁকে ভালবাসে বা ওঁর কথা ভাবে। উনি সব চেয়ে বেশি অবহেলিত জগতের মধ্যে। কচি কচি লতা দুলচে, একটু দূরে রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, আবার নীল বনকলমি ফুলে ভর্ত্তি একটা লতা উঠেছে যাঁড়াগাছের মাথায়, অকালে একটা শিমুলের শাখায় রাঙা রাঙা ফুল ফুটে আছে, টুকটুকে মাকালফল ঝুলচে, লেজ-ঝোলা হল্‌দে পাখী বসে আছে, যে ফুল কেউ দেখে না ও কেউ আদর করে না, তেমন ফুল ফুটে আছে তাঁর বনতলে, তাই দিয়ে রচিত হবে তাঁর পত্রশয্যা।

প্রণাম, হে খেয়ালী দেবতা, প্রণাম।

ছোট একটা লতা উঠেচে আমার রোয়াকের ঠেস্-দেওয়ালের পাশের নারিকেল গাছটা বেয়ে। আমার বাড়ীর ওদিকটাতে ঘন বনঝোপ। আগে যুগল কাকার ভিটে ছিল ওখানটাতে. ছেলে-বেলায় তাঁর কাছে আমি কিছুদিন অঙ্ক কষতাম, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পরে তাঁর ছেলেরা এ গ্রাম থেকে উঠে অন্যত্র বাস করচে, এখন সেখানে ঘন ছোট এড়াঞ্চি, গোয়ালে লতা, সোঁদালি গাঁধালে শাক, বনমৌরি ও আদাড়ে কাশের জঙ্গল।

আমি ঠেস্-দেওয়ালটাতে বসে বসে লিখি। হঠাৎ দেখলাম একদিন নারকোল গাছের গা বেয়ে একটা লতা উঠেচে। ভালো করে চেয়ে দেখলাম, বুনো তিৎপল্লার লতা, যারা জানে না তারা বলে তেলাকুচো। কিন্তু তেলাকুচো লতা একটু অন্য রকমের। ফুলের গড়ন তো সম্পূর্ণ আলাদা।

দিনে দিনে পাতাটি বেড়ে উঠে নারকোল গাছ বেয়ে ঠেলে উঠতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে রোজ রোজ চেয়ে দেখি। ক্রমে তার ফুল হোল, যে ফুলের কুঁড়ি এ সব অঞ্চলের দুলে মেয়েরা নাকে নোলক করে পরে। আমরাও বাল্যে পরেছি। ফুলের সময়টাতে রঙবেরঙের কত প্রজাপতির বাহার। সুকুমার লতাগ্রভাগ নারকোলগুঁড়ি ছেড়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে দুলচে বাতাসে, তাদের গাঁটে গাঁটে সাদা সাদা ফুল আর ফুলে ফুলে হলদেডানা নীলডানা প্রজাপতিকুলের মুক্তপক্ষ-সঞ্চরণ। এরা বনান্তস্থলী একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুখরিত করে রাখে সারা সকালবেলাটা। আমি লেখা ছেড়ে মাঝে মাঝে সেদিকে একদৃষ্টের চেয়ে থাকি।

একদিন ওর ফলের জালি পড়লো। জালি পুষ্ট হয়ে তেলাকুচো আকারের ফলে পরিণত হোল। ক্রমে একদিন ফল পেকে টুকটুকে লাল দেখালো। ছোট্ট একটা দুর্গা-টুনটুনি পাখি এক শ্রাবণ অন্ধকারের মেঘমেদুর শ্যামলতা ও অতলস্পর্শ শান্তির মধ্যে দেখি ফলটার পাশের লতার ডগায় বসে মহা আনন্দে রাঙা ফলটি ভোজন করচে। কি অপূর্ব্ব আনন্দই না সেটুকু পুঁচকে পাখির খাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে। তখনও দুলচে উপরের দিকের লতাগ্রভাগে কত

সাদা কুচো কুচো ফুল নোলকের মত, কত সবুজ কচি ফলের জালি।

ওর পিছনে বিশাল, প্রাচীন বকুল গাছটা। বর্ষার দিনে মেঘের ঘন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে ওর তলা। আর্দ্র লতাকোণে কি সুগন্ধ ফুল ফুটেছে—জলভরা বাতাসে তার সুবাস। এই শ্যামল বনানীর নিবিড় পটভূমিতে সেই তিৎপল্লার লতাটা কি সুন্দর দেখায়। ঠেস্‌-দেওয়ালে বসে বসে চেয়ে দেখতে দেখতে এক-একদিন কি আনন্দ যে পাই।

শুধু ঐ ক্ষুদ্র তিৎপল্লার লতা আর তার ফুল নয়, এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য জিনিস দেখি ওর মধ্যে। এ সামান্য বনলতা নয়। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে সন্ধ্যায় একমনে ওর দিকে চেয়ে থেকে দেখো। অসীমের মহিমময় বাণী এসে পৌঁছবে তোমার মনে।

কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েচে ওই বুনোলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে, ওর ফুল ফোটাতে, ওর ফল পাকাতে। সূর্য্যের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটা আকাশের দূর প্রান্তে বসাতে হয়েচে ওর জন্যে, কত কি গ্যাস, কত রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে হয়েছে ওর জন্যে, কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্য্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েচে ওকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যগ্র আগ্রহে। তবে আজ ওর ফুল ফুটেচে, ওর ফল পেকে লাল টুকটুক করচে।

ক্ষর-ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্ত্তা বহন করে এনেচে ওই বন্য লতা লোকলোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের ও অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় তুলুনিতে। ওর মধ্যে দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ কর।

ঘাটশিলা থেকে আমি মনোহরপুর রওনা হই বেলা তুটোর ট্রেনে। গত পূজোর ছুটিতে দেশ থেকে ঘাটশিলায় এসেছিলাম বেড়াতে। বন্ধুবর অমর মিত্রের বাসার সামনে মাঠে একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে বসে গল্পসল্প করছি, এমন সময়ে খবর পেলাম আমাদের দেশের স্কুল থেকে একটি ছেলে বেড়াতে এসে আমাদের বাসায় উঠেছে।

রাত্রে ছেলেটির সঙ্গে কথা হোল, সে এসেচে বন ও পাহাড় দেখতে। কখনো দেখেনি একটা বড় রকমের বন, বড় একটা পাহাড়। সেই রাত্রেই ভাবলাম ওকে সিংভূমের সব চেয়ে বড় বনের অথাৎ সারেণ্ডা অরণ্যের একটা অংশ দেখিয়ে দেবো।

অনেকে হয়তো জানে না, সিংভূমের অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ছোটনাগপুরের মধ্যে তুটি বৃহৎ অরণ্যানী বর্ত্তমান। প্রথমে এ কথা বলা উচিত, ছোটনাগপুরের এ অংশকে প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে ঝাড়খণ্ড বা 'ঝারিখণ্ড বলা হোত অর্থাৎ বনময় দেশ। এখন সভ্যতা বা রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সিংভূমের বন প্রায় নিঃশেষ হয়ে সেই জায়গায় হয়েছে স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙালীদের উপনিবেশ, কল-কারখানা (যেমন টাটা, মৌভাণ্ডার) বা ফসলের ক্ষেত। বন যা এখনো পূর্ব্ব সিংভূমে আছে, তাও থাকতো না, যদি গভর্ণমেণ্ট থেকে বনকে কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা না হোত। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে আইনের গণ্ডী দিয়ে বনকে রক্ষা না করলে ছ'বছরের মধ্যে (গড়পড়তা হিসাবে অবিশ্যি) একটা দশবর্গ মাইল ব্যাপী বনভূমি কাবার হয়ে যায় মানুষের কুঠারের সামনে।

পূর্ব্ব সিংভূমের মধ্যে কয়েকটি বড় উপনিবেশ গড়ে উঠেচে—ঘাটশিলা, গালুডি, চাকুলিয়া ও টাটা। শেষটির নাম জগৎ-বিখ্যাত। কারখানার জন্যেই এখানে অন্নসংস্থানের উপনিবেশ।

পূর্ব্ব সিংভূমে প্রকৃতির পূজারী-ভক্তেরা বন দেখতে পাবে না বিশেষ, যা দেখতে পাবে তা এমন কিছু নয়। ক্বচিৎ দু-একটি স্থান ছাড়া। এমন একটি স্থান হোল ঘাটশিলার সাত মাইল উত্তরে ধারাগিরি নামক একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত ও আশপাশের পাহাড় বনানী। আর একটি স্থান সুবর্ণ-রেখার ওপারের তামাপাহাড় ও সানুদেশ। এই সব বনেই অল্পবিস্তর বন্যহস্তী, নেকড়েবাঘ, ভালুক, ময়ূর ইত্যাদি দেখা যাবে। তবে এদের সংখ্যা এত কম যে পাঁচ বছর বনে বেড়িয়েও আমি এ পর্য্যন্ত একটা জ্যান্ত জানোয়ারকে আঁমার দৃষ্টি পথের পথিক করাতে সমর্থ হইনি—দুটি একটি শেয়াল বা কাঠবেড়ালি ছাড়া।

তা সত্ত্বেও আমি জানি জানোয়ার এখানে আছে।

আমার দু-একটি শিকারী বন্ধু এ বিষয়ে দুঃখময় অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন করেছেন। যেমন গালুডির লুনা নার্সারির মোহিনী বিশ্বাস মহাশয়। ইনি ভালুক শীকার করতে গিয়ে রীতিমত জখম হয়েছিলেন ভালুকের হাতে। বেঁচে গিয়েছিলেন কোন রকমে কিন্তু একখানা হাত অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে চিরকালের জন্য।

এখন বলবো পশ্চিম সিংভূমের কথা।

বন যা আছে, এখনো পশ্চিম সিংভূমেই আছে। এ অঞ্চলের বড় বন দুটি। সারেণ্ডা ও কোল্‌হান। দুটিই রিজার্ভ ফরেস্ট। সারেণ্ডা অরণ্যানী বৃহত্তর, প্রায় ৪০০ শত বর্গ মাইল। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বনানী হচ্ছে এই সারেণ্ডা। আমি তিন বৎসর আগে একবার এই দুটি বনভূমি দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলুম বনবিভাগের বড় কর্ম্মচারী জে. এন. সিন্‌হার সমভিব্যাহারে ও তাঁর মোটরে।

সে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করেছে আমার মনে যে তিন বৎসরেও তা এতটুকু ম্লান হয়নি। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে কতবার ভাবতাম সারেণ্ডা বনের নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যভূমির কথা, নানা জল-প্রপাতের কথা, নানা পাথরের বাঁধানো বন্য নদী ও ঝর্ণার কথা, নানা বনপুষ্পের সুরভিবাহী দক্ষিণ বায়ুর কথা, শিলাতলে বিছিয়ে থাকা বন্য শিউলির কথা, গভীর রাত্রে বন্য বিভাগের বাংলোঘরে শুয়ে আশপাশের বনে কোথাও বন্য হস্তীর বৃংহিত-ধ্বনি শুনবার কথা।

তাই ভাবলুম ছেলেটিকে নিয়ে এই সুযোগে আর একবার সারেণ্ডা অরণ্য দেখতে বেরুবো।

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে।

পশ্চিম সিংভূমের এই অরণ্য-অঞ্চল মোটরযোগে ভিন্ন দেখা প্রায় অসম্ভব। চার শত বর্গ-মাইল-ব্যাপী এই বনভূমির কোথায় কি আছে তা সাধারণের জানবার কথাও নয়। সুতরাং বন-বিভাগের কর্মচারীদের সাহায্যও নিতান্ত প্রয়োজন। ট্রেনে উঠে এ বন দেখবার

সুযোগ প্রায় নেই, কেবল একটি উপায় ছাড়া।

সেই উপায়টি অবলম্বন করা গেল।

মনোহরপুরের স্টেশন থেকে একটা লাইট রেলওয়ে চলে গিয়েছে চোদ্দ মাইল দূরে চিড়িয়া পাহাড়ে। এই পাহাড় থেকে ইণ্ডিয়ান স্টীল করপোরেশন লৌহপ্রস্তর সংগ্রহ করে বার্ণপুরের কারখানায় চালান দেয়। রেল-লাইনটা ওদেরই। এই রেলপথ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে প্রায় আট নয় মাইল কিম্বা আর একটু বেশি। এইটি সারেণ্ডা অরণ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশে।

সুতরাং যদি মনোহরপুর থেকে চিড়িয়া খনির রেলে চড়া যায় তাহলে বিনা মোটরে সাত-আট মাইল বন অনায়াসে দেখা যেতে পারে। চিড়িয়া রেললাইন খনিওয়ালাদের নিজেদের তৈরী, যাত্রী-বহনের উদ্দেশ্যে তা তৈরী হয়নি, বাইরের কোন লোককে উঠতে দেয়ও না। এজন্য বন-বিভাগের লোকের সাহায্য দরকার।

বেলা তিনটের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা ঘাটশিলা থেকে উঠে সন্ধ্যের সময়ে চক্রধরপুর গিয়ে নামলুম। এই পর্য্যন্তই টিকিট করা হয়েছিল। এর পরেই পাহাড় জঙ্গলের বেশ ভাল দৃশ্য রেলপথের দুধারে পড়বে, কিন্তু নৈশ অন্ধকারে আমরা সে সব কিছুই ভালো করে দেখতে পাবো না। তার চেয়ে রাত্রিটা চক্রধরপুর স্টেশনে কাটিয়ে পরদিনের ভোরবেলা যে নাগপুর প্যাসেঞ্জার আসে, তাতে ওঠাই যুক্তিযুক্ত। সবটা দিনের আলোয় দেখতে পাওয়া যাবে।

চক্রধরপুর স্টেশনে ওয়েটিংরুমে গিয়ে বিছানাপত্র বিছিয়ে দিয়ে আমরা সটান্ শুয়ে পড়লাম। আদ্রা প্যাসেঞ্জার এল একটু পরে। কয়েকটি ভদ্রলোক ওই ট্রেনে রাঁচি ও পুরুলিয়া থেকে এলেন। একটি ভদ্রলোকের নাম মিঃ দুবে। রেলপুলিসে কি কাজ করেন। আমার সঙ্গে দু-এক কথায় খুব আলাপ জমে গেল। পথে কি চমৎকার ভাবেই আলাপ জমে। আমি অনেকবার দেখেছি রেলে দূরদেশে বেড়াবার সময় রেল-কামরার মধ্যেকার যাত্রীরা পরস্পর আত্মীয় হয়ে গিয়েছে। এ ওকে জলপাত্র দিচ্ছে ব্যবহার করতে, ও ওকে সিগারেট দিচ্ছে, এ খাওয়াচ্ছে ওকে—ওদের মধ্যে শিখ আছে, পাঞ্জাবী আছে, বিহারী আছে, বাঙালী আছে। একটি সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে ওদের মধ্যে, দেড়দিন বা দুদিনের জন্যে। এমন কি বিদায় নেবার সময় কষ্ট হয়, সবাই পরস্পরের ঠিকানা নেয় চিঠি দেবে বলে।

যদিও শেষ পর্য্যন্ত হয়তো চিঠি দেওয়া হয় না।

এখানে মিঃ দুবের সঙ্গে আমার এই ধরনেরই আলাপ হয়ে গেল। তিনি আমার সুবিধা দেখবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কি করে বলবো।

অনেক রাত্রে দেখি মিঃ দুবে আমায় ডাকাডাকি করচেন।

—ঘুমুলেন নাকি ?

—না! কি বলুন।

—একটা পথের কথা আপনাকে বলে দিই। যখন আপনি পাহাড় জঙ্গল বেড়াতে ভালোবাসেন, রাঁচি থেকে একটি পথ লোহারডগা হয়ে যশপুর স্টেটের মধ্যে দিয়ে সম্বলপুর জেলার ঝার্সাগুড়া পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই পথে রাঁচি থেকে মোটরবাস যায় যশপুর স্টেটের রাজধানী যশপুর নগর পর্য্যন্ত। সেখান থেকে অন্য এক মোটরবাসে কুন্তীগড় হয়ে ঝার্সাগুড়া আসা যাবে। কখনো যাননি এ পথে ?

যাওয়া তো দূরের কথা নামই শুনিনি, সন্ধানই জানিনে।

সেই রাতটি আমার কাছে বড় মূল্যবান। মিঃ দুবে আমার উপকার করেছিলেন এ পথের সন্ধান আমায় দিয়ে। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা স্থানে কত সৌন্দর্য্যস্থলী বিদ্যমান, কত নিবিড় পর্ব্বতকন্দরের অভ্যন্তরে, কত অরণ্যভূমির নিভৃত অন্তরালে, কত গোপন বন্যনদীর শিলাবৃত তটদেশে কে তাদের খবর রাখে ! পথের কথা যে বলে দেয়, জীবনের বড় উপকারী বন্ধু সে।

আমি জানি হাওড়া স্টেশন থেকে দুশো মাইলের মধ্যে কত সুন্দর স্থান আছে, সেখানে নিবিড় বন আছে, পাহাড়ী ঝর্ণা আছে, বনলতার সৌন্দর্য্য আছে, জলজ লিলির ভিড় আছে ছায়াবৃত বন্যনদীতটে। দেখে অনেক সময় নিজেরই অবিশ্বাস হয়েছে কলকাতার এত কাছে এমন সুন্দর স্থান থাকতে পারে !

রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরেই নাগপুর প্যাসেঞ্জার এল। আমরা তাতেই উঠে মনোহরপুরের দিকে রওনা হলাম। চক্রধরপুর ছাড়িয়ে তিনটি স্টেশনের পরেই পোসাইতা স্টেশনের কাছে ঘন বন। এখানে একটা টানেল আছে, তাকে ভুলক্রমে রেলওয়ে গাইড বইয়ে বলা হয় 'সারেণ্ডা-টানেল'। কিন্তু প্রকৃত সারেণ্ডার সঙ্গে এই টানেলের পাহাড় ও বনভূমির কোনো সম্পর্ক নেই। এ স্থানটি কোলহান বিভাগের অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সারেণ্ডা অরণ্য কোনো রেলপথের নিকটে নয়, ট্রেনে বসে এ লাইন থেকে সাধারণতঃ যে বনানী দেখা যায় তা হোল এই কোলহান অরণ্যভূমি, তারও খুব সামান্য অংশই রেলে চড়ে দেখা সম্ভব। আরও পশ্চিমে গিয়ে যে বন পর্ব্বত দেখা যায় সেগুলো হলো বামড়া, আনন্দগড় ও বোনাইগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। তার পরেই পড়ে সম্বলপুর জেলার রিজার্ভ ফরেস্টের পূর্ব্ব-উত্তর অংশ। তার পরে এল বিলাসপুর। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুরের পথে অনেক দূর পর্য্যন্ত রুক্ষ, ঊষর, সমতল প্রান্তরের একঘেয়ে দৃশ্য চক্ষুকে পীড়া দেয়। তার পরে আসে দ্রুগ বা দুর্গ। এখান থেকে পুনরায় বন পর্ব্বতের দৃশ্য শুরু হলো, এই পথেই কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বহু-বিজ্ঞাপিত সালকেশা অরণ্যভূমি। আমি একবার জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রিতে আর একবার অস্তসূর্য্যের বিলীয়মান আলোয় এই বন-প্রদেশ দর্শন করি। নিঃসন্দেহে বলা যায় ট্রেনে বসে যে কেউ দুর্গ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যে একটু কষ্ট করে চোখ মেলে চেয়ে থাকবেন, তাঁর কষ্ট সার্থক হবে।

তবে এখানে একটা কথা, সকলে কি সব জিনিস ভালবাসে ! যার চোখ যে জন্যে তৈরী হয়ে গিয়েছে ! সেজন্যে দোষ কাউকে দেওয়া যায় না।

বনানী ও পাহাড়পর্ব্বতের দৃশ্য, মুক্ত space-এর দৃশ্য যাঁর ভালো লাগে না—তাঁর সঙ্গে কি তা বলে ঝগড়া করতে হবে? তাঁর হয়তো যা ভালো লাগে, আমার তা ভালো লাগে না, সুতরাং তিনিও তো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন তা নিয়ে।

মনোহরপুর নামলাম বেলা দশটার সময়।

একটা কুলীকে জিজ্ঞেস করলাম—ডাকবাংলো কোথায়?

—পাহাড়ের ওপরে। কিন্তু সে ডাকবাংলো নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো।

—সে আমি জানি, তুমি পথ দেখিয়ে দিতে পারো?

—সোজা পশ্চিম দিকে চলে যান।

পাহাড়ের ওপরে উঠতে গিয়ে ডানদিকে দেখি বনবিভাগের আপিস। ভাবলাম চিড়িয়া পাহাড়ে যাবার একমাত্র উপায় হলো রেল। সে রেলে চড়তে হলে খনিওয়ালাদের অনুমতি দরকার। বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ভেবে আমি আপিসের দিকেই গেলাম। তা ছাড়া বনবিভাগের অনুমতি ব্যতীত তো পাহাড়ের ওপরের বাংলোতেও থাকা যাবে না। আপিসে জিজ্ঞেস করে জানা গেল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুপ্ত বর্ত্তমানে এখানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। রাসবিহারীবাবুকে আমি জানতাম খুবই, ১৯৪৩ সালে সারেণ্ডা বন পরিভ্রমণের সময়ে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন।

বল্লাম—রাসবিহারীবাবু আছেন?

একজন আরদালী বল্লে—না বাবুজী। তিনি বনের কোনো কাজে বেরিয়ে গিয়েচেন।

—কখন আসবেন?

—ঠিক নেই। দেরি হবে।

আমি তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়া লাইট রেলের সাইডিংএ যাবো ভাবচি এমন সময়ে রাসবিহারীবাবুর বাসা থেকে একজন চাকর এসে বল্লে—আপনাকে মাইজী নিয়ে যেতে বলেচেন বাসাতে—

—কোন মাইজী?

—রাসবিহারীবাবুর স্ত্রী।

বাসাতে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও আমাকে জানতেন। চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমি এখুনি চিড়িয়া রেলে যেতে উদ্যত হয়েছি শুনে বল্লেন—এখন কেন যাবেন? সে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। এখান থেকে সাইডিং একমাইল দূরে। গিয়ে গাড়ী পাবেন না। তার চেয়ে ধীরেসুস্থে স্নান করে নিয়ে বিশ্রাম করুন।

কথা শুনলাম না। আমার বন-ভ্রমণের তৃষ্ণা তখন অত্যন্ত বলবতী। মাইল খানেক ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমরাও যেই সাইডিংএ পৌঁচেছি ট্রেনও ছেড়ে দিলে। বাধ্য হয়ে ফিরলাম। এসে দেখি রাসবিহারীবাবু কাজ থেকে ফিরেছেন। আমাকে দেখে খুব খুশি। দুজনে গল্প করতে করতে স্নান করে এলাম নদীতে। ওঁদের অতিথিপরায়ণতার কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

বিকেলে তিনজনে বেরুলাম বেড়াতে।

রেলপথের ওপারে সুধীরবাবুর বাসা। সেবার এসে ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। রাসবিহারীবাবুকে নিয়ে সুধীরবাবুর বাসায় গেলাম। তিনিও আমায় দেখে খুব খুশি। বিদেশে বাঙালীদের মধ্যে খুব হৃদ্যতা। আমাদের সন্ধ্যাবেলা চা খেতে বল্লেন, রাত্রেও তাঁর ওখানে না খেলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন জানিয়ে দিলেন।

সুধীরবাবুর বাসা থেকে আমরা গেলাম নৃসিংহ বাবাজীর আশ্রম দেখতে। এই স্থানটি অতি মনোরম। কোয়েল নদীর পাষাণময় তটের ওপরে একটি শ্যাম কুঞ্জবিতান। কত কি ফুলফলের গাছ এখানে যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে ফুলের গাছ। বকুল, নাগকেশর, চাঁপা থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র সন্ধ্যামণি পর্য্যন্ত সব রকমের পুষ্প এখানে দেখা যাবে। ফুলের বাগান বলে মনে হয় না, মনে হয় ছায়ানিবিড় এক বনানী, মধ্যে মধ্যে ঘন বনের বুক চিরে পাথরের নুড়ি বিছানো সরু পায়ে চলার পথ পরস্পরকে কাটাকাটি করে সুবিন্যস্ত ভাবে সোজা এদিকে ওদিকে চলে গিয়েছে। আশ্রমের ফটক ছাড়িয়ে প্রথমেই একটা পাথর বাঁধানো চত্বরের চারিপাশে কতকগুলো ছোট বড় পাকাবাড়ী। সাধুসন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য বড় বড় ঘর ও বারান্দা। এই ঘর বাড়ীর পেছনে আর কোন মানুষের বাসের ঘর নেই, ঘন বননিকুঞ্জের মাঝে মাঝে লতাপাতা ঢাকা ছোট ছোট দেবমন্দির, তার কোনোটায় রামসীতা, কোনটাতে শ্রীকৃষ্ণ, কোনোটাতে শিবলিঙ্গ। অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরটি নৃসিংহদেবের। বনের মাঝে মাঝে পুষ্পবিতানের আড়ালে পাথরের আসন। বোধ হয় সাধুদের ধ্যানধারণার জন্যে, কিংবা যে কেউ বসে বিশ্রাম বা চিন্তা করতে পারে। সাধুর খুব ভিড় আছে বলে মনে হোল না, বরং মনে হয়েছিল সমস্ত আশ্রমটিতে লোক খুবই কম। এত নির্জ্জন যে বাগানের মধ্যে ঢুকলে ভয় করে, পথ হারিয়ে গেলে কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। সমস্ত আবহাওয়াটি অতি শান্ত ও পবিত্র। একটি সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন এক জায়গায়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

নৃসিংহদেবের ঘণ্টাধ্বনি আশ্রমের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে। মন্দিরে দীপ জ্বলছে। অনেকগুলি হারিকেন লণ্ঠন এখানে ওখানে গাছের গায়ে ঝুলছে। আমার প্রথমেই মনে হলো এত কেরোসিন তেল আসে কোথা থেকে?

সাধুজী বোধ হয় আশ্রমের মোহান্ত।

আমরা সামনে গিয়ে বল্লাম—প্রণাম মহারাজ।

সাধুজী আমাদের আশীর্ব্বাদ করে বসতে বল্লেন। কিছু ধর্ম্মকথা শোনালেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে কিছু বাণী উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় সকলের হাতে হাতে প্রসাদ দিলেন, কলা আর কচুরি—আর একটা জিনিস এদেশে দেবমন্দিরে ভেট হিসেবে খুবই ব্যবহৃত হয়। এর নাম 'পান্‌জেরি'—জিনিসটা হলো ধনেভাজার গুঁড়ো আর চিনি একসঙ্গে মেশানো।

সুধীরবাবুর বাড়ীতে খেয়ে ফিরবার পথে রাসবিহারীবাবু সাইডিং-এ ফোন করলেন স্টেশন থেকে। পরদিন সকালে ট্রেন ছাড়বে, তাতে একটা সেলুন জুড়ে দিতে বলে দিলেন। সকালে গাড়ীতে চড়বার সময় 'সেলুন' এর অবস্থা দেখে আমার চক্ষুস্থির। একখানা মালগাড়ী, যাকে বলে covered wagon, তবে দুখানা কাঠের বেঞ্চি পাতা আছে তার মধ্যে এই যা।

পাঁচ মাইল গিয়েই ছোট গাড়া নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো। আমি বড় ভালবাসি সারেণ্ডার এই অপরূপ নির্জ্জনতা। এত বড় বড় শাল ও আসান গাছও সিংভূমের অন্য অঞ্চলে দেখা যায় না। মোটা মোটা কাছির মত লতা এ গাছ থেকে ও গাছে জড়াজড়ি করে রয়েছে। বড় বড় কুরচি ফুলের গাছ। এত বড় কুরচি গাছ আমি তো কোথাও দেখিনি। বন্য শণের বড় বড় হল্‌দে ফুল রেললাইনের দুধারে যেদিকে চোখ যায়, সেদিকে ফুটে আছে। বাঁ দিকে একটা পাহাড়ের সারি, হঠাৎ পাহাড়শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে কখন পার্ব্বত্য নদী কোয়েল এসে মিশলো রেললাইনের পাশে। দুই তট শিলাস্তৃত, মাঝে মাঝে সাদা লিলির সঙ্গে মিশেছে হলুদ রং এর বন্য শণের (wild flax) ফুল, পাহাড়ের ওপারে বেগুনি রঙের দেবকাঞ্চন।

আমাদের গাড়ী এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গেল। স্থানটি বড় বড় বনপাদপে ছায়ানিবিড়।

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, আসুন বনের মধ্যে।

—কোথায় ?

—আপনাকে আমাদের শিমুল গাছের নার্সারি দেখিয়ে আনি।

—গাড়ী কতক্ষণ থাকবে ?

—সে ভয় নেই। যতক্ষণ আমরা ফিরে না আসি।

অনেকদূর চললাম বনের মধ্যে। এক জায়গায় অনেকগুলো শিমুলের চারা সার দিয়ে পোতা। বনবিভাগ থেকে এখানে শিমুল গাছের আবাদ করা হয়েছে তাই একে বলা হয় শিমুল-চারার নার্সারি। এখান থেকে চারা তুলে অন্য জায়গায় রোপণ করা হবে। রাসবিহারীবাবু আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেন। শিমুলগাছ নাকি বেশ দামে বিক্রী হয় দেশলাইএর কারখানার মালিকদের কাছে।

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, সাবধানে থাকবেন, বড় বড় বাঘ আছে সারেণ্ডা ফরেস্টে।

—দিনমানে বেরোবে?

—সব সময় বেরুতে পারে।

—লেপার্ড, না 'দি রয়েল বেঙ্গল' ?

—রয়েল বেঙ্গলই বটে।

—আপনি কখনো বাঘের হাতে পড়েছেন ?

—দুবার পড়েও বেঁচে গিয়েছি। চলুন সে গল্প আংকুয়া বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে করা যাবে।

গাড়ী আবার ছাড়লো। আবার চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে।

বন যেন নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। কোনো লোকালয় নেই। বনের মধ্যেই ছোট্ট একটা স্টেশন। তার নাম লেরো জংসন। এখান থেকে ঘনতর বনের মধ্যে একটা লাইন বেঁকে পূর্ব্বদিকে অদৃশ্য রহস্যপথে অন্তর্হিত হোল, না জানি ওদিকে আবার কত বন, কত ঝর্ণা, কত বিচিত্র লতার দুলুনি, কত সৌন্দর্য্যময়ী বনস্থলী। মন যেন নেচে ওঠে, চোখ পিপাসিত দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে।

—ও লাইনটি কোথা গেল ?

—রাসবিহারীবাবু বল্লেন—ঘুধিয়া মাইন্‌স্।

—সে কতদূর ?

—তা এখান থেকে ন' মাইল।

—ওপথে যাওয়ার উপায় কি ?

—হেঁটে বা ট্রলিতে যাবেন ?

—নিশ্চয়ই যাবো। আপনি ব্যবস্থা করবেন ?

—যখন বলবেন, করে দেবো।

বেলা ন'টার সময় ট্রেন চিড়িয়াতে পৌছল। রেল লাইনের বাঁদিকে ৩০০০ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় বুদ্ধবুরু ও অজিতাবুরু। বুদ্ধদেবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এদের, এদেশী ভাষার নাম। পাহাড়ের ওপর থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে নামানো হচ্ছে, পাহাড়ের ওপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত ট্রলি লাইন আছে। ছোট লাইনটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। আশপাশের ছোটখাটো পাহাড়ের ওপর খনির ম্যানেজার, ওভারসিয়ার প্রভৃতির বাংলো। একজন বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি এই খনির ডাক্তার, নাম ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী। ভদ্রলোক অতি অমায়িক, প্রথম আলাপেই আত্মীয়তা প্রদর্শন করে তাঁর বাংলোতে সেদিন আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের সময় কম ছিল বলেই তাঁর এ সদয় প্রস্তাবে আমরা রাজি হতে পারিনি।

বনপথে হেঁটে একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ক্ষুদ্র একটি বনগ্রাম পার হয়ে আমরা আংকুয়া ফরেস্ট বাংলোতে এসে পৌছলাম।

কি সুন্দর এই আংকুয়া বাংলোটি, কি মনোরম এর পরিবেশ।

একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এই বাংলো, পাহাড়ের পাদমূল ধৌত করে বইচে একটি পাহাড়ী নদী, বাংলোর সামনে পাহাড়ের মাথায় সমভূমিতে চেয়ার পেতে আমরা বসলাম। ছোট টেবিল সামনে পেতে চা দিয়ে গেল বাংলোর চৌকিদার। সঙ্গে আমাদের খাবার ছিল। অমন জায়গায় বসে চা খাওয়ার অভিনবত্ব আমি ভালভাবে উপভোগ করবো বলে অদূরবর্ত্তী গম্ভীর বনভূমির দিকে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই। কত রকমের গাছ চারিদিকে—অর্জ্জুন, আসান, শাল, ধ ও পিয়াসাল। বাতাসে বনভূমির স্নিগ্ধ গন্ধ।

ডাকবাংলোর চৌকিদারের বৌ, একটি স্বাস্থ্যবতী হো রমণী, আমাদের জলটল এনে

দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল মেয়েটি মিশনারী স্কুলে দিনকতক পড়েছিল, স্থতরাং শাড়ী-ব্লাউজ পরে। সামান্ত একটু ইংরিজীও জানে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ হো ও মুণ্ডা জাতীয় লোক খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেচে, অনেকে রাঁচি মিশনারী স্কুলের ফেরৎ।

আংকুয়া বাংলো থেকে যেন উঠতে ইচ্ছে করছিল না। এমন চমৎকার কানন-ভূমিতে এমন বাংলোতে বাস করা একটি বিশেষ সৌভাগ্য। তবে অরণ্যকে ভাল না বাসলে কেউ এখানে বাস করতে পারবে না। বাংলোর চৌকিদারকে বল্লাম—রাত্রে এখানে বাঘ আসে ?

—রোজই হুজুর।

—হাতী ?

—ওভি। ভালুক ভি বহুৎ আসে।

—তোমরা থাকো কি করে ?

—কাঁড় নিয়ে বসে থাকি হুজুর। আগুন করি।

এই তো অবস্থা। যত বড় প্রকৃতির রসিকই হোক না কেন, এ নির্জ্জন অরণ্যভূমিতে কিছু-দিন বাস করতে হোলে নিছক প্রকৃতিরসিকতা ছাড়াও আর কিছু থাকা দরকার। সেটা হোল নির্ভীকতা, নির্জ্জনবাসের শক্তি, নিত্য নূতন বিলাসের লোভ-সম্বরণ। জীবন হবে এখানে সব রকম উপকরণের বাহুল্য-বর্জ্জিত, austere, অন্তর্মুখী। তবে এখানে আনন্দ, নতুবা একদিনের মধ্যে পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হবে।

ফিরবার পথে চিড়িয়া থেকে ট্রেন পেলাম না। খনির লোকেরা আমাদের জন্যে ট্রলি করে দিলেন, চোদ্দ-পনেরো মাইল পথ বিকেলের ঘন ছায়ায় দুধারের বনভূমির মধ্যে দিয়ে ট্রলি করে আসার সে কি আনন্দ ! এই আসার পথে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা ভুলবার নয়। সারাপথ বাতাসে যেন গাজিপুরের দামী আতরের গন্ধ ভুরভুর করচে। বাড়িয়ে এতটুকু বলচি না। ট্রলির একজন কুলীকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি কানে আতরমাখা তুলো গুঁজেছে ? সে তো অবাক। রাসবিহারীবাবুকে বল্লাম, তিনি কোন তেল মেখেচেন ? রাসবিহারীবাবু বল্লেন, গন্ধটা তেল বা আতরের নয়, নানা বনকুসুমের সম্মিলিত স্থবাস।

—কি ফুলের ?

ট্রলি থামিয়ে থামিয়ে আমরা রেল লাইনের কাছাকাছি যত রকমের ফুল ফুটেছিল, সব তুলিয়ে আনিয়ে দেখলাম। ও-সব কোন ফুলেরই স্থবাস নয়। দেবকাঞ্চন গন্ধহীন, বন্য শণের ফুল গন্ধহীন, অর্কিডের দু-একটা ফুল, যা চোখে পড়লো, গন্ধহীন। তবে কোন্ ফুলের গন্ধ ? শালের ফুল এখন ফোটে না। কুরচি ফুলও তাই।

অথচ গোটা চোদ্দটি মাইল পথ সে স্থবাসে আমোদ করতে লাগলো। ঘন, মিষ্ট, তীব্র স্থবাস।

রাসবিহারীবাবু এর কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

বন ছেড়ে আমাদের ট্রলি যখন মুক্ত প্রান্তরে বের হোল, তখন দূর দিগন্তে বোনাইগড় রাজ্যের শৈলশ্রেণীর পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

ইছামতি

ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্ততঃ যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙ্গর সংকুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুন্দরবনে সুঁদ্রি গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েচে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোন লোকই রাখে না।

ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, সে অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করছেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।

মড়িঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত— দেখতে পাবে দুধারে পলতে মাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপাপানার দাম, বুনো তিৎপল্লা লতার হল্‌দে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি-বাচড়া-বৈঁচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিখের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম, শুধুই দূর্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধুই চখা বালির ঘাট, বনকুসুমে ভর্তি ঝোপ, বিহঙ্গ-কাকলী-মুখর বনান্তস্থলী। গ্রামের ঘাটে কোথাও দু'দশখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েচে। ক্বচিৎ উঁচু শিমূল গাছের আঁকাবাঁকা শুক্‌নো ডালে শকুনি বসে আছে সমাধিস্থ অবস্থায়—ঠিক যেন চীনা চিত্রকারের অঙ্কিত ছবি। কোনো ঘাটে মেয়েরা নাইচে, কাঁখে কলসী ভরে জল নিয়ে ডাঙায় উঠে, স্নানরতা সঙ্গিনীর সঙ্গে কথাবার্তা কইচে। এক-আধ জায়গায় গাঙের উঁচু পাড়ের কিনারায় মাঠের মধ্যে কোনো গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুল ; লম্বা ধরনের চালাঘর, দরমার কিংবা কঞ্চির বেড়ার ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ; আসবাবপত্রের মধ্যে দেখা যাবে ভাঙা নড়বড়ে একখানা চেয়ার দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, আর খানকতক বেঞ্চি।

সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্মদিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথ-যাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরনো পোড়ো ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা, বর্তমানে হয়ত আকন্দঝোপে ঢেকে ফেলেচে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু-একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েচে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এইসব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না-পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে।

সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।

১২৭০ সালের জল সরে গিয়েচে সবে।

পথঘাট তখনও কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখী বসে আছে বাবলা গাছের ফুলে-ভর্তি ডালে।

নালু পাল মোল্লাহাটির হাটে যাবে পানসুপুরি নিয়ে মাথায় করে। মোল্লাহাটি যেতে নীলকুঠির আমলের সাহেবদের বটগাছের ঘন ছায়া পথে পথে। শ্রান্ত নালু পাল মোট নামিয়ে একটা বটতলায় বসে গামছা ঘুরিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো।

নালুর বয়স কুড়ি-একুশ হবে। কালো রোগা চেহারা। মাথার চুল বাবরি-করা, কাঁধে রঙিন্ রাঙা গামছা—তখনকার দিনের শৌখিন বেশভূষা পাড়াগাঁয়ের। এখনো বিয়ে করে নি, কারণ মামাদের আশ্রয়ে এতদিন মানুষ হচ্ছিল, হাতেও ছিল না কানাকড়ি। সম্প্রতি আজ বছর খানেক হোল নালু পাল মোট মাথায় করে পান-সুপুরি বিক্রি করে হাটে হাটে। সতেরো টাকা মূলধন তার এক মাসীমা দিয়েছিলেন যুগিয়ে। এক বছরে এই সতেরো টাকা দাঁড়িয়েছে সাতান্ন টাকায়। খেয়ে দেয়ে। নিট লাভের টাকা।

নালুর মন এজন্যে খুশি আছে খুব। মামার বাড়ির অনাদরের ভাত গলা দিয়ে ইদানীং আর নামতো না। একুশ বছর বয়সের পুরুষমানুষের শোভা পায় না অপরের গলগ্রহ হওয়া। মামীমার সে কি মুখনাড়া একপলা তেল বেশী মাথায় মাখবার জন্যে সেদিন।

মুখনাড়া দিয়ে বললেন—তেল জুটবে কোত্থেকে অত? আবার বাবরি চুল রাখা হয়েছে, ছেলের শখ কত—অত শখ থাকলে পয়সা রোজগার করতে হয় নিজে।

নালু পাল হয়তো ঘুমিয়ে পড়তো বটগাছের ছায়ায়, এখনো হাট বসবার অনেক দেরি, একটু বিশ্রাম করে নিতে সে পারে অনায়াসে—কিন্তু এই সময় ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক যেতে যেতে ওর সামনে থামলো।

নালু পাল সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—রায় মশায়, ভালো আছেন? প্রাতোপেন্নাম—

—কল্যাণ হোক। নালু যে, হাটে চললে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটু সোজা হয়ে বসো। শিপ্‌টন্ সাহেব ইদিকি আসছে—

—বাবু, রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে যাবো? বড্ড মারে শুনিচি।

—না না, মারবে কেন? ও সব বাজে। বোসো এখানে।

—ঘোড়ায় যাবেন?

—না, বোধ হয় টমটমে। আমি দাঁড়াবো না।

মোল্লাহাটি নীলকুঠির বড় সাহেব শিপ্‌টন্‌কে এ অঞ্চলে বাঘের মত ভয় করে লোকে। লম্বাচওড়া চেহারা, বাঘের মত গোল মুখখানা, হাতে সর্বদাই চাবুক থাকে। এ অঞ্চলের লোক চাবুকের নাম রেখেছে 'শ্যামচাঁদ'। কখন কার পিঠে 'শ্যামচাঁদ' অবতীর্ণ হবে তার কোন স্থিরতা না থাকাতে সাহেব রাস্তায় বেরুলে সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

এমন সময়ে আর একজন হাটুরে দোকানদার সতীশ কলু, মাথায় সর্ষে তেলের বড় ভাঁড় চ্যাঙারিতে বসিয়ে সেখানে এসে পড়লো। রাস্তার ধারে নালুকে দেখে বললে—চলো, যাবা না?

—বোসো। তামাক খাও।

—তামাক নেই।

—আমার আছে। দাঁড়াও, শিপ্‌টন্‌ সাহেব চলে যাক আগে।

—সায়েব আসচে কেডা বললে?

—রায় মশায় বলে গ্যালেন—বোসো—

হঠাৎ সতীশ কলু সামনের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখে ষাঁড়া আর শেওড়া ঝোপের পাশ দিয়ে নিচের ধানের ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল। যেতে যেতে বললে—চলে এসো, সায়েব বেরিয়েচে—

নালু পাল পানের মোট গাছতলায় ফেলে রেখেই সতীশ কলুর অনুসরণ করলে। দূরে ঝুম্‌ঝুম্‌ শব্দ শোনা গেল টমটমের ঘোড়ার। একটু পরে সামনের রাস্তা কাঁপিয়ে সাহেবের টমটম কাছাকাছি এসে পড়লো এবং থামবি তো থাম একেবারে নালু পালের আশ্রয়স্থল ওদের বটতলায়, ওদের সামনে।

বটতলায় পানের মোট মালিকহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সাহেব হেঁকে বললে—এই! মোট কাহার আছে?

নালু পাল ও সতীশ কলু ধানগাছের আড়ালে কাঠ হয়ে গিয়েচে ততক্ষণ। কেউ উত্তর দেয় না।

টমটমের পেছন থেকে নফর মুচি আরদালি হাঁকল—কার মোট পড়ে রে গাছতলায়? সাহেব বললে—উট্টর ডাও—কে আছে?

ন্যালু পাল কাঁচুমাঁচু মুখে জোড় হাতে রাস্তায় উঠে আসতে আসতে বল্‌লে—সায়েব, আমার।

সাহেব ওর দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। কোনো কথা বললে না।

নফর মুচি বললে—তোমার মোট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করছিলে ধানক্ষেতে?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

সাহেব বললে—আমি জানে। আমাকে ডেখে সব লুকায়। আমি সাপ আছি না বাঘ আমি হ্যাঁ?

প্রশ্নটা নালু পালের মুখের দিকে তাকিয়েই, সুতরাং নালু পাল ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—না সায়েব।

—ঠিক। মোট কিসের আছে?

—পানের, সায়েব।

—মোল্লাহাটির হাটে নিয়ে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—কি নাম আছে টোমার?

—আজ্ঞে, শ্রীনালমোহন পাল।

—মাথায় করো। ভবিষ্যতে আমায় ডেখে লুকাবে না। আমি বাঘ নই, মানুষ খাই না। যাও—বুঝলে!

—আজ্ঞে—

সাহেবের টমটম চলে গেল। নালু পালের বুক তখনো ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে। বাবাঃ, এক ধাক্কা সামলানো গেল বটে আজ। সে শিস দিতে দিতে ডাকলো—ও সতীশ খুড়ো!

সতীশ কলু ধানগাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তা থেকে আরও দূরে চলে গিয়েছিল। ফিরে কাছে আসতে আসতে বললে—যাই।

—বাবাঃ কতদূর পালিয়েছিলে? আমায় ডাকতে দেখে বুঝি দৌড় দিলে ধানবন ভেঙে?

—কি করি বলো। আমরা হলাম গরীব-গুরবো নোক। শ্যামচাঁদ পিঠে বসিয়ে দিলে করচি কি ভাই বলো দিনি। কি বললে সায়েব তোমারে?

—বললে ভালোই।

—তোমারে রায় মশাই কি বলছিল?

—বলছিল, সাহেব আসচে। সোজা হয়ে বসো।

—তা বলবে না? ওরাই তো সায়েবের দালাল। কুটি-র দেওয়ানি করে সোজা রোজগারটা করচে রায় মশাই! অতবড় দোমহলা বাড়িটা তৈরী করেছে সে বছর।

রায় মশায়ের পুরো নাম রাজারাম রায়। মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবের খয়েরখাঁই ও প্রজাপীড়নের জন্যে এদেশের লোকে যেমন ভয় করে, তেমনি ঘৃণা করে। কিন্তু মুখে কারো কিছু বলবার সাহস নেই। নিকটবর্তী পাঁচপোতা গ্রামে বাড়ি।

বিকেলের সূর্য বাগানের নিবিড় সবুজের আড়ালে ঢলে পড়েচে, এমন সময় রাজারাম রায় নিজের বাড়িতে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামলেন। নফর মুচির এক খুড়তুতো ভাই ভজা এসে ঘোড়া ধরলে। চন্ডীমন্ডপের দিকে চেয়ে দেখলেন অনেকগুলো লোক সেখানে জড়ো হয়েচে। নীলকুঠির দেওয়ানের চন্ডীমন্ডপে অমন ভিড় বারো মাসই লেগে আছে। কত রকমের দরবার করতে এসেচে নানা গ্রামের লোক, কারো জমিতে ফসল ভেঙে নীল বোনা হয়েচে জোর-জবরদস্তি করে, কারো নীলের দাদনের জন্যে যে জমিতে দাগ দেওয়ার কথা ছিল তার বদলে অন্য এবং উৎকৃষ্টতর জমিতে কুঠির আমীন গিয়ে নীল বোনার জন্যে চিহ্নিত করে এসেচে—এই সব নানা রকমের নালিশ।

নালিশের প্রতিকার হোত। নতুবা দেওয়ানের চন্ডীমন্ডপে লোকের ভিড় জমতো না রোজ রোজ। তার জন্যে ঘুষ-ঘাষের ব্যবস্থা ছিল না। রাজারাম রায় কারো কাছে ঘুষ নেবার পাত্র ছিলেন না, তবে কার্য অন্তে কেউ একটা রুই মাছ, কি বড় একটু মানকচু কিংবা দুভাঁড় খেজুরের নলেন্ গুড় পাঠিয়ে দিলে ভেটস্বরূপ, তা তিনি ফেরত দেন বলে শোনা যায় নি।

রাজারামের স্ত্রী জগদম্বা এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন, পরনে লালপেড়ে তাঁতের কোরা শাড়ি, হাতে বাউটি পৈঁছে, লোহার খাড়ু ও শাঁখা, কপালে চওড়া করে সিঁদুর পরা, দোহারা চেহারার গিন্নিবান্নি মানুষটি।

জগদম্বা এগিয়ে এসে বললেন—এখন বাইরে বেরিও না। সন্দে-আহ্নিক সেরে নাও আগে। রাজারাম হেসে স্ত্রীর হাতে ছোট একটা থলি দিয়ে বললেন—এটা রেখে দাও। কেন, কিছু জলপান আছে বুঝি?

—আছেই তো। মুড়ি আর ছোলা ভেজেচি।

—বাঃ বাঃ, দাঁড়াও আগে হাত পা ধুয়ে নিই। তিলু বিলু নিলু কোথায়?

—তরকারি কুটচে।

—আমি আসচি। তিলুকে জল দিতে বলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রাজারাম আহ্নিক করতে বসলেন রোয়াকের একপ্রান্তে। তিলু এসে আগেই সেখানে একখানা কুশাসন পেতে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করলেন—ঘন্টাখানেক প্রায়। অনেক কিছু স্তব-স্তোত্র পড়লেন।

এত দেরি হওয়ার কারণ এই, সন্ধ্যা-গায়ত্রী শেষ করে রাজারাম বিবিধ দেবতার স্তবপাঠ করে থাকেন। দেবদেবীর মধ্যে প্রতিদিন তুষ্ট রাখা উচিত মনে করেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, রক্ষাকালী, সিদ্ধেশ্বরী ও মা মনসাকে। এঁদের কাউকে চটালে চলে না। মন খুঁতখুঁত করে। এঁদের দৌলতে তিনি করে খাচ্ছেন। আবার পাছে কোন দেবী শুনতে না পান, এজন্যে তিনি স্পষ্টভাবে টেনে টেনে স্তব উচ্চারণ করে থাকেন।

তিলু এসে বললে—দাদা, ডাব খাবে এখন?

—না। মিছরির জল নেই?

—মিছরি ঘরে নেই দাদা।

—ডাব থাক, তুই জলপান নিয়ে আয়।

তিলু একটা কাঁসার জামবাটিতে মুড়ি ও ছোলাভাজা সর্ষের তেল দিয়ে জবজবে করে মেখে নিয়ে এলো—সে জামবাটিতে অন্তত আধ কাঠা মুড়ি ধরে। বিলু নিয়ে এলো একটা কাঁসার থালায় একথালা খাজা কাঁটালের কোষ। নিলু নিয়ে এলো এক ঘটি জল ও একটা পাথরের বাটিতে আধ পোয়াটাক খেজুর গুড়।

রাজারাম নিলুকে সস্নেহে বললেন—বোস নিলু, কাঁটাল খাবি?

—না দাদা। তুমি খাও, আমি অনেক খেয়েচি।

—বিলু নিবি?

—তুমি খাও দাদা।

জগদম্বা আহ্নিক সেরে এসে কাছে বসলেন—তুমি সারাদিন খেটেখুটে এলে, খাও না জলপান। না খেলে বাঁচবে কিসে? পোড়ারমুখো সায়েবের কুঠিতে তো ভূতোনন্দী খাটুনী।

রাজারাম বললে—কাঁচালঙ্কা নেই? আনতে বলো।

—বাতাস করবো? ও তিলু, তোর ছোট বৌদিদির কাছ থেকে কাঁচালঙ্কা চেয়ে আন—ডালে ধরা গন্ধ বেরুলো কেন দ্যাখো না, ও নেত্যপিসি? ছোট বউ, গিয়ে দ্যাখো তো—

জগদম্বা কাছে বসে বাতাস করতে করতে বলেন—ওগো, জলপান খেয়ে বাইরে যেও না, একটা কথা আছে—

—কি?

—বলচি। ঠাকুরঝিরা চলে যাক।

—চলে গিয়েচে। ব্যাপার কি?

—একটি সুপাত্র এসেচে এই গ্রামে। ঠাকুরঝিদের বিয়ের চেষ্টা দ্যাখো।

—কে বলো তো?

—সন্নিসি হয়ে গিইছিল। বেশ সুপুরুষ। চন্দ্র চাটুয্যের দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। সে কাল চলে যাবে শুনচি—একবার যাও সেখানে—

—তুমি কি করে জানলে?

—আমাকে দিদি বলে গেলেন যে। দুবার এসেছিলেন আমার কাছে।

—দেখি।

—দেখি বললে চলবে না। তিলুর বয়েস হোল তিরিশ। বিলুর সাতাশ। এর পরে আর পাত্তর জুটবে কোথা থেকে শুনি? নীলকুঠির কিচিরমিচির একদিন বন্ধ রাখলেও খেতি হবে না।

—তাই যাই তবে। চাদরখানা দ্যাও। তামাক খেয়ে তবে বেরুবো।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে গেলেন না, যাওয়ার উপায় থাকবে না। মহ্‌রালি মণ্ডলের সম্পত্তি ভাগের দিন, তিনিই ধার্য করে দিয়েচেন। ওরা এতক্ষণ ঠিক এসে বসে আছে—রমজান, সুকুর, প্রহ্লাদ মণ্ডল, বনমালী মণ্ডল প্রভৃতি মুসলমান পাড়ার মাতব্বর লোকেরা। ও পথে গেলে এখন বেরুতে পারবেন না তিনি।

চন্দ্র চাটুয্যে গ্রামের আর একজন মাতব্বর লোক। সত্তর-বাহাত্তর বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমির আয় থেকে ভালো ভাবেই সংসার চলে যায়। পাঁচপোতা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার কেউই চাকরি করেন না। কিছু না কিছু জমিজমা সকলেরই আছে। সন্ধ্যার পর নিজ নিজ চণ্ডীমণ্ডপে পাশা-দাবার আড্ডায় রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাটানো এঁদের দৈনন্দিন অভ্যাস।

চন্দ্র চাটুয্যে রাজারামকে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করে বললেন—বাবাজি এসো। মেঘ না চাইতেই জল! আজ কি মনে করে? বোসো বোসো। একহাত হয়ে যাক।

নীলমণি সমাদ্দার বলে উঠলেন—দেওয়ানজি যে, এদিকে এসে মন্ত্রীটা সামলাও তো দাদাভাই—

ফণী চক্কত্তি বললেন—আমার কাছে বোসো ভাই, এখানে এসো। তামাক সাজবো?

রাজারাম হাসিমুখে সকলকেই আপ্যায়িত করে বললেন—বোসো দাদা। চন্দর কাকা, আপনার এখানে দেখচি মস্ত আড্ডা—

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আসো না তো বাবাজি কোনোদিন! আমরা পড়ে আছি একধারে, দ্যাখো না তো চেয়ে।

রাজারাম শতরঞ্চির ওপর পা দিতে না দিতে প্রত্যেকে আগ্রহের সঙ্গে সরে বসে তাঁকে জায়গা করে দিতে উদ্যত হোল। নীলমণি সমাদ্দার অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থার গৃহস্থ, সকলের মন রেখে কথা না বললে তাঁর চলে না। তিনি বললেন—দেওয়ানজি আসবে কি, ওর চণ্ডীমণ্ডপে রোজ সন্দেবেলা কাছারি বসে। আসামী ফরিয়াদীর ভিড় ঠেলে যাওয়া যায় না। ও কি দাবার আড্ডায় আসবার সময় করতে পারে?

ফণী চক্কত্তি বললেন—সে আমরা জানি। তুমি নতুন করে কি শোনালে কথা।

নীলমণি বললেন—দাবায় পাকা হাত। একহাত খেলবে ভায়া?

রাজারাম এগিয়ে এসে হুঁকো নিলেন ফণী চক্কত্তির হাত থেকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ চন্দ্র চাটুয্যের সামনে তামাক খাবেন না বলে চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরের ঘরে হুঁকো হাতে ঢুকে গেলেন এবং খানিক পরে এসে নীলমণির হাতে হুঁকো দিয়ে পূর্বস্থানে বসলেন।

দাবা খেলা শেষ হোল। রাত দশটারও বেশি। লোকজন একে একে চলে গেল।

চন্দ্র চাটুয্যেকে রাজারাম তাঁর আগমনের কারণ খুলে বললেন। চন্দ্র চাটুয্যের মুখ উজ্জ্বল দেখালো।

রাজারামের হাত ধরে বললেন—এইজন্যে বাবাজির আসা? এ কঠিন কথা কি! কিন্তু একটা কথা বাবা। ভবানী সন্নিসি হয়ে গিইছিল, তোমাকে সে কথাটা আমার বলা দরকার।

—বাড়ি গিয়ে আপনার বৌমাদের কাছে বলি। তিলুকে জানাতে হবে। ওরাই জানাবে—

—বেশ।

পরে সুর নিচু করে বললেন— একটা কথা বলি। ভবানীকে এখানে বাস করাবো এই আমার ইচ্ছে। তুমি গিয়ে তোমার তিনটি বোনের বিয়েই ওর সঙ্গে দ্যাও গিয়ে—বালাই চুকে যাক। পাঁচবিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি যতুক দেবে। এখুনি সব ঠিক করে দিচ্চি—

রাজারাম চিন্তিত মুখে বললেন—বাড়ি থেকে না জিগ্যেস করে কোনো কিছুই বলতে পারবো না কাকা। কাল আপনাকে জানাবো।

—তুমি নির্ভয়ে বিয়ে দাও গিয়ে। আমার ভাগনে বলে বলচিনে। কাটাদ' বন্দিঘাটির বাঁরুরি, এক পুরুষে ভঙ্গ, ঘটকের কাছে কুলুজি শুনিয়ে দেবো এখন। জ্বলজ্বলে কুলীন, একডাকে সকলে চেনে।

—বয়েস কতো হবে পাত্তরের?

—তা পঞ্চাশের কাছাকাছি। তোমার বোনদেরও তো বয়েস কম নয়। ভবানী সন্নিসি না হয়ে গেলি এতদিনে সাতছেলের বাপ। দ্যাখো আগে তাকে—নদীর ধারে রোজ এক ঘন্টা সন্দে-আহ্নিক করে, তারপর আপন মনে বেড়ায়, এই চেহারা! এই হাতের গুল্!

—ভবানী রাজী হবেন তিনটি বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করতে?

—সে ব্যবস্থা বাবাজী, আমার হাতে। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।

একটু অন্ধকার হয়েছিল বাঁশবনের পথে। জোনাকি জ্বলছে কুঁচ আর বাবলা গাছের নিবিড়তার মধ্যে। ছাতিম ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে বনের দিক থেকে।

অনেক রাত্রে তিলোত্তমা কথাটা শুনলে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেচে নদীর দিকের বাঁশঝাঁড়ের পেছন দিয়ে। ছোট বোন বিলুকে ডেকে বললে—ও বিলু, বৌদিদি তোকে কিছু বলেচে?

—বলবে না কেন? বিয়ের কথা তো?

—আ মরণ, পোড়ার মুখ, লজ্জা করে না?

—লজ্জা কি? ধিঙ্গি হয়ে থাকা খুব মানের কাজ ছিল বুঝি?

—তিনজনকেই একক্ষুরে মাথা মুড়তে হবে, তা শুনেচ তো?

—সব জানি।

—রাজি?

—সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে আমার কথা এই যে হয় তো হয়ে যাক্।

—আমারও তাই মত। নিলুর মতটা কাল সকালে নিতে হবে।

—সে আবার কি বলবে, ছেলেমানুষ, আমরা যা করবো সেও তাতে মত দেবেই।

তিলু কত রাত পর্যন্ত ছাদে বসে ভাবলে। ত্রিশ বছর তার বয়েস হয়েচে। স্বামীর মুখ দেখা ছিল অস্বপনের স্বপন। এখনো বিশ্বাস হয় না; সত্যিই তার বিয়ে হবে? স্বামীর ঘরে সে যাবে?

বোনেদের সঙ্গে, তাই কি? ঘরে ঘরে তো এমনি হচ্চে। চন্দ্রকাকার বাপের সতেরোটা বিয়ে ছিল। কুলীন ঘরে অমন হয়েই থাকে। বিয়ের দিন কবে ঠিক করেচে দাদা কে জানে। বরের বয়স পঞ্চাশ তাই কি, সে নিজে কি আর খুকি আছে এখন?

উৎসাহে পড়ে রাত্রে তিলুর ঘুম এল না চক্ষে। কি ভীষণ মশার গুঞ্জন বনে ঝোপে!

তিলু যে সময় ছাদে একা বসে রাত জাগছিল, সে সময় নালু পাল মোল্লাহাটির হাট থেকে ফিরে নিজের হাতে রান্না করে খেয়ে তবিল মিলিয়ে শুয়ে পড়েচে সবে।

নালু এক ফন্দি এনেচে মাথায়।

ব্যবসা কাজ সে খুব ভাল বোঝে এ ধারণা আজই হল। সাত টাকা ন' আনার পান-সুপুরি বিক্রি হয়েচে আজ। নিট লাভ এক টাকা তিন আনা। খরচের মধ্যে কেবল দু'আনার আড়াই সের চাল, আর দু'পয়সার গাঙের টাট্‌কা খয়রা মাছ একপোয়া। আধসের মাছই নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অত মাছ ভাজবার তেল নেই। সর্ষের তেল ইদানীং আক্রা হয়ে পড়েচে বাজারে, তিন আনা সের ছিল, হয়ে দাঁড়িয়েচে চোদ্দ পয়সা; কি করে বেশি তেল খরচ করে সে?

হাতের পুঁজি বাড়াতে হবে। পান-সুপুরি বিক্রি করে উন্নতি হবে না। উন্নতি আছে কাটা কাপড়ের কাজে। মুকুন্দ দে তার বন্ধু, মুকুন্দ তাকে বুঝিয়ে দিয়েচে। ত্রিশ টাকা হাতে জম্‌লে সে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করে দেবে।

নালু পালের ঘুম চলে গেল। মামার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকার দায় থেকে সে বেঁচেছে! এখন সে আর ছেলেমানুষ নয়, মামীমার মুখনাড়ার সঙ্গে ভাত হজম করবার বয়েস তার নেই। নিজের মধ্যে সে অদম্য উৎসাহ অনুভব করে। এই ঝিঁঝিঁপোকার-ডাকে-মুখর জ্যোৎস্নালোকিত ঘুমন্ত রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত যেন সে দেখতে পাচ্চে। জীবনের কত দূরের পথ।

রাজারাম সকালে উঠেই ঘোড়া করে নীলকুঠিতে চলে গেলেন। নীলকুঠি যাবার পথটি ছায়াস্নিগ্ধ, বনের লতাপাতায় শ্যামল। যজ্ঞিডুমুর গাছের ডালে পাখীর দল ডাকচে কিচ্‌ কিচ্‌ করে, জ্যৈষ্ঠের শেষে এখনো ঝাড়-ঝাড় সোঁদালি ফুল মাঠের ধারে।

নীলকুঠির ঘরগুলি ইছামতী নদীর ধারেই। বড় থামওয়ালা সাদা কুঠিটা বড়সাহেব শিপ্‌টনের। রাজারাম শিপ্‌টনের কুঠির অনেক দূরে ঘোড়া থেকে নেমে ঝাউগাছে ঘোড়া বেঁধে কুঠির সামনে গেলেন, এবং উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে পায়ের জুতো জোড়া খুলে রেখে ঘরের মধ্যে বড় হলে প্রবেশ করলেন।

শিপ্‌টন্ ও তাঁর মেম বাদে আর একজন কে সাহেব হলে বসে আছে। শিপ্‌টন্ বললেন—দেওয়ান এডিকে এসো—Look here, Grant, this is our Dewan Roy—

অন্য সাহেবটি আহেলা বিলিতি। নতুন এসেচেন দেশ থেকে। বয়েস ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, পাদ্রিদের মত উঁচু কলার পরা, বেশ লম্বা দোহারা গড়ন। এঁর নাম কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট, দেশভ্রমণ করতে ভারতবর্ষে এসেচেন। খুব ভালো ছবি আঁকেন এবং বইও লেখেন। সম্প্রতি বাংলার পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে বই লিখচেন। মিঃ গ্র্যান্ট মুখ তুলে দেওয়ানের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—Yes, he will be a fine subject for my sketch of a Bengalee gentleman, with his turban—

শিপ্‌টন্ সাহেব বললেন—This is a Shamla, not turban—

—I would never manage it. Oh!

—You would, with his turban and a good bit of roguery that he has—

—In human nature I believe so far as I can see him—no more.

—All right, all right—please yourself—

—মিসেস্ শিপ্‌টন্—I am not going to see you fall out with each other—wicked men that you are!

মিঃ গ্র্যান্ট হেসে বললেন—So I beg your pardon, madam!

এই সময় ভজা মুচির দাদা শ্রীরাম মুচি বেয়ারা সাহেবদের জন্যে কফি নিয়ে এল। সাহেবদের চাকর বেয়ারা সবই স্থানীয় মুচি বাগ্‌দী প্রভৃতি শ্রেণী থেকে নিযুক্ত হয়। তাদের মধ্যে মুসলমান নেই বললেই হয়, সবই নিম্নবর্ণের হিন্দু। দু-একটি মুসলমান থাকেও অনেক সময়, যেমন এই কুঠিতে মাদার মন্ডল আছে, ঘোড়ার সহিস।

রাজারাম দাঁড়িয়ে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছিলেন। শিপ্‌টন্ বললেন—টুমি যাও ডেওয়ান। তোমাকে ডেখে ইনি ছবি আঁকিটে ইচ্ছা করিটেছেন। টোমাকে আঁকিটে হইবে।

—বেশ হুজুর।

—ডাডন খাটাগুলো একবার ডেখে রাখো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দপ্তরখানায় কার্যরত রাজারামকে শ্রীরাম মুচি এসে ডাকলে—রায় মশায়, আপনাকে ডাকছে। সেই নতুন সায়েব আপনাকে দেখে ছবি আঁকবে—ওই দেখুন দুপুরে রোদে নদীর ধারে বিলিতি গাছতলায় কি সব টেঙিয়েছে। গিয়ে দেখুন রগড়! রায় মশায়, বড় সায়েবকে বলে মোরে একটা ট্যাকা দিতে বলুন। ধানের দর বেড়েচে, ট্যাকায় আট কাঠার বেশি ধান দেচ্ছে না। সংসার চলচে না।

—আচ্ছা, দেখবো এখন। বড় সাহেবকে বল্লি হবে না। ডেভিড সাহেবকে বলতি হবে।

রাজারাম রায় বিপন্ন মুখে নদীর ধারে গাছতলায় এসে দাঁড়ালেন। গাছটা হোল ইন্ডিয়ান-কর্ক গাছ। শিপ্‌টন্ সাহেবের আগে যিনি বড় সাহেব ছিলেন, তিনি পাটনা জেলার নারাণগড় নীলকুঠিতে প্রথমে ম্যানেজার ছিলেন। শখ করে এই গাছটি সেখান থেকে এনে বাংলার মাটিতে রোপণ করেন। সে আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। এখন গাছটি খুব বড় হয়েচে, ডালপালা বড় হয়ে নদীর জলে ঝুঁকে পড়েচে। এ অঞ্চলে এ জাতীয় বৃক্ষ অদৃষ্টপূর্ব, সুতরাং জনসাধারণ এর নাম দিয়েচে বিলিতি গাছ।

রাজারাম তো বিলিতি গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। নাঃ, মজা দ্যাখো একবার। এ সব কি কান্ড রে বাপু। ওটা আবার কি খাটিয়েচে? ব্যাপার কি? রাজারাম হেসে ফেলতেন, কিন্তু শিপ্‌টন্ সাহেবের মেম ওখানে উপস্থিত। মাগী কি করে এখানে, ভালো বিপদ!

কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট এক টুকরো রঙিন পেন্সিল হাতে নিয়ে টাঙানো ক্যানভাসের এপাশে ওপাশে গিয়ে দুবার কি দেখলেন। মেমসাহেবকে বললেন—Will he be so good as to stand erect and stand still, say for ten minutes, madam?

মেম বললেন—সোজা হইয়া ডাঁড়াও ডেওয়ান!

—আচ্ছা হুজুর।

রাজারাম কাঁচুমাচু মুখে খাড়া হয়ে পিঠ টান করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেই গ্র্যান্ট সাহেব বললেন—No, no, your Dewan wears a theatrical mask, madam. Will he just stand at ease?

মেমসাহেব হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—অটখানি লম্বা হয় না। বুক ঠিক করো।

রাজারাম এ অদ্ভুত বাংলার অর্থগ্রহণ করতে না পেরে আরও পিঠ টান করে বুক চিতিয়ে উল্টোদিকে ধনুক করে ফেলবার চেষ্টা করলেন দেহটাকে।

গ্র্যান্ট সাহেব হেসে উঠলেন—Oh, no, my good man! This is how—বলে নিজেই রাজারামের কাছে গিয়ে তাকে হাত দিয়ে ঠেলে সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকিয়ে সিধে করে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

—I hope to goodness, he will stick to this! God's death!

তখনি মেমসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—I ask your pardon madam, for my words a moment ago.

মেমসাহেব বললেন—Oh, you wicked man!

রাজারাম এবার ঠিক হয়ে দাঁড়ালেন। ছবিওয়ালা সাহেবটা প্রাণ বের করে দিয়েছেন, মেমসাহেবের সামনে, বাবাঃ! আবার ছুঁয়ে দিল! ভেবেছিলেন আজ আর নাইবেন না। কিন্তু নাইতেই হবে। সাহেব-টায়েব ওরা ম্লেচ্ছ, অখাদ্য কুখাদ্য খায়। না নাইলে ঘরে ঢুকতেই পারবেন না।

ঘন্টাখানেক পরে তিনি রেহাই পেয়ে বাঁচলেন। বা রে, কি চমৎকার করেচে সাহেবটা। অবিকল তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এখনো মুখ চোখ হয় নি। ওবেলা আবার আসতে বলেচে। আবার ওবেলা ছোঁবে নাকি? অবেলায় তিনি আর নাইতে পারবেন না।

কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট বিকেলে পাঁচ-পোতার বাঁওড়ের ধারের রাস্তা ধরে বড় টম্‌টমে বেড়াতে বার হলেন। সঙ্গে ছোট সাহেব ডেভিড ও শিপ্‌টন্‌ সাহেবের মেম। রাস্তাটি সুন্দর ও সোজা। একদিকে স্বচ্ছতোয়া বাঁওড় আর একদিকে ফাঁকা মাঠ, নীলের ক্ষেত, আউশ ধানের ক্ষেত। গ্র্যান্ট সাহেব শুধু ছবি-আঁকিয়ে নয়, কবি ও লেখকও। তাঁর চোখে পল্লী-বাংলার দৃশ্য এক নতুন জগৎ খুলে দিলে। বন্ধনহীন উদাস মাঠের ফুলভর্তি সোঁদালি গাছের রূপ, ফুল ফোটা বন-ঝোপে অজানা বন-পক্ষীর কাকলী—এসব দেখবার চোখ নেই ওই হাঁদামুখো ডেভিডটার কি গোঁয়ার-গোবিন্দ শিপ্‌টনের। ওরা এসেচে গ্রাম্য ইংলন্ডের চাষাভুষো পরিবার থেকে। ওয়েস্টান মিডল্যান্ডের ব্লাই ও ফেয়ারিংফোর্ড গ্রাম থেকে। এখানে নীলকুঠির বড় ম্যানেজার না হোলে ওরা পানটকস্‌ ম্যানরের জমিদারের অধীনে লাঙল চযতো নিজের নিজের ফার্ম হাউসে। দরিদ্র কালা আদমীদের ওপর এখানে রাজা সেজে বসে আছে। হায় ভগবান! তিনি এসেছেন দেশ দেখতে শুধু নয়, একখানা বই লিখবেন বাংলা দেশের এই জীবন নিয়ে। এখানকার লোকজনের, এই চমৎকার নদীর, এই অজানা বনদৃশ্যের ছবি আঁকবেন সেই বইতে। ইতিমধ্যে সে বইয়ের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসে গিয়েচে। নাম দেবেন, "Anglo-Indian life in Rural Bengal"। অনেক মাল-মশলা যোগাড়ও করে ফেলেচেন।

ঠিক সেই সময় নালু পাল মোল্লাহাটির হাট থেকে মাথায় মোট নিয়ে ফিরচে। আগের

হাটের দিন সে যা লাভ করেছিল, আজ লাভ তার দ্বিগুণ। বেশ চেঁচিয়ে সে গান ধরেছে—

'হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে—'

এমন সময় পড়ে গেল গ্র্যান্ট সাহেবের সামনে। গ্র্যান্ট সাহেব ডেভিডকে বললেন—লোকটাকে ভাল করে দেখি। একটু থামাও। বাঃ বাঃ, ও কি করে?

ডেভিড সাহেব একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েচে কথাবার্তার ধরনে। ঠিক এ দেশের গ্রাম্য লোকের মত বাংলা বলে। অনেকদিন এক জায়গাতে আছে। সে মেমসাহেবের দিকে চেয়ে হেসে বললে—He can have his old yew cut down, can't he, madam ?

পরে নালু পালের দিকে চেয়ে বললে—বলি ও কর্তা, দাঁড়াও তো দেখি—

নালু পাল আজ একেবারে বাঘের সামনে পড়ে গিয়েচে। তবে ভাগ্যি ভালো, এ হলো ছোট সায়েব, লোকটি বড় সায়েবের মত নয়, মারধোর করে না। মেমটা কে? বোধ হয় বড় সায়েবের।

নালু পাল দাঁড়িয়ে পড়ে বললে—আজ্ঞে, সেলাম। কি বলচেন?

—দাঁড়াও ওখানে।

গ্র্যান্ট সাহেব বললেন—ও কি একটু দাঁড়াবে এখানে? আমি একটু ওকে দেখে নিই।

ডেভিড বললে—দাঁড়াও এখানে। তোমাকে দেখে সাহেব ছবি আঁকবে।

গ্র্যান্ট সাহেব বললে—ও কি করে? বেশ লোকটি? খাসা চেহারা। চলো যাই।

—ও আমাদের হাটে জিনিস বিক্রি করতে এসেছিল। You won't want him any more?

—No, I want to thank him David, or shall I—

গ্র্যান্ট সাহেব পকেটে হাত দিতে যেতেই ডেভিড তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে নালু পালের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—নাও, সাহেব তোমাকে বক্‌শিশ করলেন—

নালু পাল অবাক হয়ে আধুলিটা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে—সেলাম, সায়েব! আমি যেতে পারি?

—যাও।

সুন্দর বিকেল সেদিন নেমেছিল পাঁচপোতার বাঁওড়ের ধারে। বন্যপুষ্প-সুরভিত হয়েছিল ঈষত্তপ্ত বাতাস। রাঙা মেঘের পাহাড় ফুটে উঠেছিল অস্ত আকাশপটে দূরবিস্তৃত আউশ ধানের সবুজ ক্ষেতের ও-প্রান্তে। কিচমিচ করছিল গাঙশালিক ও দোয়েল পাখীর ঝাঁক। কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট কতক্ষণ একদৃষ্টে অস্তদিগন্তের পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে একটি শান্ত গভীর রসের অনুভূতি জেগে উঠলো। বহুদূর নিয়ে যায় সে অনুভূতি মানুষকে। আকাশের বিরাটত্বের সচেতন স্পর্শ আছে সে অনুভূতির মধ্যে। দূরাগত বংশীধ্বনির সুস্বরের মত করুণ তার আবেদন।

গ্র্যান্ট সাহেব ভাবলেন, এই তো ভারতবর্ষ। এতদিন ঘুরে মরেচেন বোম্বাই, পুনা ক্যান্টনমেন্টের পোলো খেলার মাঠে আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ক্লাবে। এরা এক অদ্ভুত জীব। এদেশে এসেই এমন অদ্ভুত জীব হয়ে পড়ে যে কেন এরা! যে ভারতবর্ষের কথা তিনি 'শকুন্তলা' নাটকের মধ্যে পেয়েছিলেন (মনিয়ার উইলিয়ামসের অনুবাদে), যে ভারতবর্ষের খবর পেয়েছিলেন এডুইন আর্নল্ডের কাব্যের মধ্যে, যা দেখতে এতদূরে তিনি এসেছিলেন—এতদিন

পরে এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীতীরের অপরাহ্ণটিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মহাকবিত্বময় সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েছেন। সার্থক হোল তাঁর ভ্রমণ।

রাজারামের ভগ্নী তিনটির বয়স যথাক্রমে ত্রিশ, সাতাশ ও পঁচিশ। তিলুর বয়স সবচেয়ে বেশি বটে কিন্তু তিন ভগ্নীর মধ্যে সে-ই সবচেয়ে দেখতে ভালো, এমন কি তাকে সুন্দরী-শ্রেণীর মধ্যে সহজেই ফেলা যায়। রঙ অবিশ্যি তিন বোনেরই ফর্সা, রাজারাম নিজেও বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তিলুর মধ্যে পাকা সবরি কলার মত একটু লাল্‌চে ছোপ থাকায় উনুনের তাতে কিংবা গরম রৌদ্রে মুখ রাঙা হয়ে উঠলে বড় সুন্দর দেখায় ওকে। তন্বী, সুঠাম, সুকেশী—বড় বড় চোখ, চমৎকার হাসি। তিলুর দিকে একবার চাইলে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। তবে তিলু শান্ত পল্লীবালিকা, ওর চোখে যৌবনচঞ্চল কটাক্ষ নেই, বিয়ে হোলে এতদিন ছেলেমেয়ের মা ত্রিশ বছরের অর্ধ-প্রৌঢ়া গিন্নী হয়ে যেতো তিলু। বিয়ে না হওয়ার দরুন ওদের তিন বোনেই মনে-প্রাণে এখনো সরলা বালিকা।—আদরে-আবদারে, কথাবার্তায়, ধরণ-ধারণে—সব রকমেই।

জগদম্বা তিলুকে ডেকে বললেন—চাল কোটার ব্যবস্থা করে ফেলো ঠাকুরঝি।

—তিল?

—দীনু বুড়িকে বলা আছে। সন্দেবেলা দিয়ে যাবে। নিলুকে বলে দাও বরণের ডালা যেন গুছিয়ে রাখে। আমি একা রান্না নিয়েই ব্যস্ত থাকবো।

—তুমি রান্নাঘর ছেড়ে যেও না। যজ্ঞিবাড়ির কাণ্ড। জিনিসপত্তর চুরি যাবে।

তিন বোনে মহাব্যস্ত হয়ে আছে নিজেদের বিয়ের যোগাড় আয়োজনে। ওদের বাড়িতে প্রতিবেশিনীরা যাতায়াত করচেন। গাঙ্গুলীদের মেজ বৌ বল্লে—ও ঠাকুরঝি, বলি আজ যে বড্ড ব্যস্ত, নিজেরা বাসরঘর সাজিও কিন্তু। বলে দিচ্ছি ও-কাজ আমরা কেউ করবো না। আচ্ছা দিদি, তিলু-ঠাকুরঝিকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে! বিয়ের জল গায়ে না পড়তেই এই, বিয়ের জল পড়লে না জানি কত লোকের মুন্ডু ঘুরিয়ে দেয় আমাদের তিলু-ঠাকুরঝি!

গাঙ্গুলীদের বিধবা ভগ্নী সরস্বতী বললে—বৌদিদির যেমন কথা। মুন্ডু ঘুরিয়ে দিতে হয় ওর নিজের সোয়ামীরই ঘোরাবে, অপর কারে আবার খুঁজে বার করতে যাচ্চে ও?

সবাই হেসে উঠলো।

পরদিন ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে শুভ গোধূলি-লগ্নে তিন বোনেরই একসঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, পাত্রও সুপুরুষ বটে। বয়স পঞ্চাশই বোধ হয় হবে কিন্তু মাথার চুলে পাক ধরেনি, গৌরবর্ণ সুন্দর সুঠাম সুগঠিত দেহ। দিব্যি একজোড়া গোঁফ। কুস্তীগিরের মত চেহারার বাঁধুনি।

বাসরঘরে মেয়েরা আমোদ-প্রমোদ করে চলে যাওয়ার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—তিলু, তোমার বোনেদের সঙ্গে আলাপ করাও।

তিলোত্তমার গৌরবর্ণ সুঠাম বাহুতে সোনার পৈঁছে, মণিবন্ধে সোনার খাড়ু, পায়ে গুজরীপঞ্চম, গলায় মুড়কি মাদুলি—লাল চেলি পরনে। পৈঁছে নেড়ে বললে—আপনি ওদের কি চেনেন না?

—তুমি বলে দাও নয়!

—এর নাম স্বরবালা, ওর নাম নীলনয়না।

—আর তোমার নাম কি?

—আমার নাম নেই।

—বলো সত্যি। কি তোমার নাম?

—তি-লো-ত্ত-মা।

—বিধাতা বুঝি তিলে তিলে তোমায় গড়েচেন?

তিলু, বিলু ও নীলু একসঙ্গে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো। তিলু বললে—নাগো মশাই, আপনি শাস্তরও ছাই জানেন না—

বিলু বললে—বিধাতা পৃথিবীর সব সুন্দরীর—

নিলু বললে—রূপের ভাল ভাল অংশ—

তিলু বললে—নিয়ে—একটু একটু করে—

ভবানী হেসে বললেন—ও বুঝেচি! তিলোত্তমাকে গড়েছিলেন।

তিলু হেসে বললে—আপনি তাও জানেন না।

নিলু ও বিলু একসঙ্গে বলে উঠলো—আমরা আপনার কান মলে দেবো—

তিলু বোনেদের দিকে চেয়ে বললে—ও কি? ছিঃ—

বিলু বলে—"ছিঃ" কেন, আমরা বলবো না? সতীদিদি তো কান মলেই দিয়েছে আজ। দেয়নি?

ভবানী গম্ভীর মুখে বল্লেন—সে হলো সম্পর্কে শ্যালিকা। তোমরা তো তা নও। তোমরা কি তোমাদের স্বামীর কান মলে দেবার অধিকারী? বুঝেসুজে কথা বলো।

নিলু বললে—আমরা কি, তবে বলুন।

তিলু বোনের দিকে চোখ পাকিয়ে বললে—আবার!

ভবানী হেসে বল্লেন—তোমরা সবাই আমার স্ত্রী। আমার সহধর্মিণী।

বিলু বললে—আপনার বয়েস কত?

ভবানী বললেন—তোমার বয়েস কত?

—আপনি বুড়ো।

তিলু চোখ পাকিয়ে বোনের দিকে চেয়ে বললে—আবার!

ভবানী বাঁড়ুয্যে বাস করবেন রাজারাম-প্রদত্ত জমিতে। ঘরদোর বাঁধবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েচে, আপাতত তিনি শ্বশুরবাড়িতেই আছেন অবিশ্যি। এ এক নূতন জীবন। গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে, কত তীর্থে তীর্থে ঘুরে এসে শেষে এমন বয়সে কিনা পড়ে গেলেন সংসারের ফাঁদে।

খুব খারাপ লাগচে না! তিলু সত্যি বড় ভালো গৃহিণী, ভবানী ওর কথা চিন্তা করলেই আনন্দ পান। তাঁকে যেন ও দশ হাত বাড়িয়ে ঘিরে রেখেচে জগদ্ধাত্রীর মত। এতটুকু অনিয়ম, এতটুকু অসুবিধে হবার জো নেই।

রোজ ভবানী বাঁড়ুয্যে একটু ধ্যান করেন। তাঁর সন্ন্যাসী-জীবনের অভ্যাস এটি, এখনো বজায় রেখেচেন। তিলু বলে দিয়েচে,—ঠাণ্ডা লাগবে, সকাল করে ফিরবেন। একদিন ফিরতে দেরি হওয়াতে তিলু ভেবে নাকি অস্থির হয়ে গিয়েছিল। বিলু নিলু ছেলেমানুষ ভবানী বাঁড়ুয্যের

চোখে, ওদের তিনি তত আমল দিতে চান না। কিন্তু তিলুকে পারবার জো নেই।

সেদিন বেরুতে যাচ্চেন ভবানী, নিলু এসে গম্ভীর মুখে বললে—দাঁড়ান ও রসের নাগর, এখন যাওয়া হবে না—

—আচ্ছা, ছ্যাবলামি করো কেন বলো তো? আমার বয়েস বুঝে কথা কও নিলু।

—রসের নাগরের আবার রাগ কি!

নিলু চোখ উল্টে কুঁচকে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করলে।

ভবানী বললেন—তোমাদের হয়েচে কি জানো? বড়লোক দাদা, খেয়ে-দেয়ে আদরে-গোবরে মানুষ হয়েচো। কর্তব্য-অকর্তব্য কিছু শেখোনি। আমার মনে কষ্ট দেওয়া কি তোমার উচিত? যেমন তুমি, তেমনি বিলু। দুজনেই ধিঙ্গি, ধুরন্ধর। আর দেখ দিকি তোমাদের দিদিকে?

—ধিঙ্গি, ধুরন্ধর—এসব কথা বুঝি খুব ভালো?

—আমি বলতাম না। তোমরাই বলালে!

—বেশ করেচি। আরও বলবো।

—বলো। বলচই তো। তোমাদের মুখে কি বাধে শুনি?

এমন সময়ে তিলু একরাশ কাপড় সাজিমাটি দিয়ে কেচে পুকুরঘাট থেকে ফিরচে দেখা গেল। পেয়ারাতলায় এসে স্বামীর কথার শেষের দিকটা ওর কানে গেল। দাঁড়িয়ে বললে—কি হয়েচে?

ভবানী বাঁড়ুয্যে যেন অকূলে কূল পেলেন। তিলুকে দেখে মনে আনন্দ হয়। ওর সঙ্গে সব ব্যাপারের একটা সুরাহা আছে।

—এই দ্যাখো তোমার বোন আমাকে কি-সব অশ্লীল কথা বলচে!

তিলু বুঝতে না পারার সুরে বললে—কি কথা?

—অশ্লীল কথা। যা মুখ দিয়ে বলতে নেই এমনি কথা।

নিলু বলে উঠলো—আচ্ছা দিদি, তুইই বল্। পাঁচালির ছড়ায় সেদিন পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীতে বলেনি 'রসের নাগর'? আমি তাই বলেছি। দোষটা কি হয়েচে শুনি? বরকে বলবো না?

ভবানী হতাশ হওয়ার সুরে বল্লেন—শোন কথা!

তিলু ছোটবোনের দিকে চেয়ে বললে—তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি কবে হবে নিলু?

ভবানী বললেন—ও দুই-ই সমান, বিলুও কম নাকি?

তিলু বললে—না, আপনি রাগ করবেন না। আমি ওদের শাসন করে দিচ্চি। কোথায় বেরুচ্চেন এখন?

—মাঠের দিকে বেড়াতে যাবো।

—বেশিক্ষণ থাকবেন না কিন্তু—সন্দের সময় এসে জল খাবেন। আজ বৌদিদি আপনার জন্যে মুগতক্তি করচে—

—ভুল কথা। মুগতক্তি এখন হয় না। নতুন মুগের সময় হয়, মাঘ মাসে।

—দেখবেন এখন, হয় কি না। আসবেন সকাল সকাল, আমার মাথার দিব্যি—

নিলু বললে—আমারও—

তিলু বললে—যা, তুই যা।।

ভবানী বাড়ির বাইরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। শরৎকাল সমাগত, আউশ ধানের ক্ষেত শূন্য পড়ে আছে ফসল কেটে নেওয়ার দরুন। তিৎপল্লার হলদে ফুল ফুটেচে বনে বনে ঝোপের মাথায়। ভবানীর বেশ লাগে এই মুক্ত প্রসারতা। বাড়ির মধ্যে তিনটি স্ত্রীকে নিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে হয়। তার ওপর পরের বাড়ি। যতই ওরা আদর করুক, স্বাধীনতা নেই—ঠিক সময়ে ফিরে আসতে হবে। কেন রে বাবা!

ভবানী অপ্রসন্ন মুখে নদীর ধারে এক বটতলায় গিয়ে বসলেন। বিশাল বটগাছটি, এখানে-সেখানে সব জায়গায় ঝুরি নেমে বড় বড় গুঁড়িতে পরিণত হয়েচে। একটা নিভৃত ছায়াভরা শান্তি বটের তলায়। দেশের পাখী এসে জুটেছে গাছের মাথায়; দূরদূরান্তর থেকে পাখীরা যাতায়াতের পথে এখানে আশ্রয় নেয়, যাযাবর শামকুট, হাঁস ও সিল্লির দল। স্থায়ী বাসস্থান বেঁধেচে খোড়ো হাঁস, বক, চিল, দু'চারটি শকুন। ছোট পাখীর ঝাঁক—যেমন শালিক, ছাতারে, দোয়েল, জলপিপি—এ গাছে বাস করে না বা বসেও না।

ভবানী এ গাছতলায় এর আগে এসেচেন এবং এসব লক্ষ্য করে গিয়েচেন। দু-একটা সন্ধ্যামণির জংলা ফুল ফুটেচে গাছতলায় এখানে-ওখানে। ভবানী এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছতলায় গিয়ে চুপচাপ বসলেন। একটু নির্জন জায়গা চাই। চাষীলোকেরা বড় কৌতূহলী, দেখতে পেলে এখানে এসে উঁকিঝুঁকি মারবে আর অনবরত প্রশ্ন করবে, তিনি কেন এখানে বসে আছেন। তিনি একা বসে রোজ এ-সময়ে একটু ধ্যান করে থাকেন—তাঁর সন্ন্যাসী-জীবনের বহুদিনের অভ্যাস।

আজও তিনি ধ্যানে বসলেন। একটা সন্ধ্যামণি ফুলগাছের খুব কাছেই। খানিকটা সময় কেটে গেল। হঠাৎ একটা অপরিচিত ও বিজাতীয় কণ্ঠস্বরে ভবানী চমকে উঠে চোখ খুলে তাকালেন। একজন সাহেব গাছের গুঁড়ির ওদিকে একটা মোটা ঝুরি ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাহেবটি আর কেউ নয়, কোল্স্ওয়ার্দি গ্র্যান্ট—তিনি বটগাছের শোভা দূর থেকে দেখে ভাল করে দেখবার জন্যে কাছে এসে আরও আকৃষ্ট হয়ে গাছের তলায় ঢুকে পড়েন এবং এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ ধ্যানরত ভবানীকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, An Indian Yogi!

সাহেবের টম্‌টম্ দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে; সঙ্গে কেউ নেই। ভজা মুচি সহিস টম্‌টমেই বসে আছে ঘোড়া ধরে।

কোল্স্ওয়ার্দি গ্র্যান্ট ভবানীর সামনে এসে আশ্বাসের সুরে বললেন—Oh, I am very sorry to disturb you. Please go on with your meditations. ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছুই না বুঝে অবাক হয়ে সাহেবের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি সাহেবকে দু'একদিন এর আগে যে না দেখেচেন এমন নয়, তবে এত কাছে থেকে আর কখনো দেখেননি।

—I offer you my salutations—I wish I could speak your tongue.

বটতলায় কি একটা ব্যাপার হয়েচে বুঝে ভজা মুচি টম্‌টমের ঘোড়া সামলে ওখানে এসে হাজির হোল। সেও ভবানীকে চেনে না। এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—পেরনাম হই বাবাঠাকুর! ও সাহেব ছবি আঁকে কিনা, তাই দেখুন সক্কালবেলা কুঠি থেকে বেরিয়ে মোরে নিয়ে সারাদিন বন-বাদাড় ঘোরচে। আপনাকে দেখে ওর ভাল লেগেচে তাই বলচে। ভবানী হাত জুড়ে সাহেবকে নমস্কার করলেন ও একটু হাসলেন।

গ্র্যান্টও দেখাদেখি সেভাবে নমস্কার করবার চেষ্টা করলেন, হোল না! বল্লেন—Let me not disturb you—I sincerely regret, I have trespassed into your nice sanctuary. May I have the permission to draw your sketch ? —You man, will you make him understand ? ভজা মুচিকে গ্র্যান্ট সাহেব হাত-পা নেড়ে ছবি আঁকার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ভজা মুচি ভবানীর দিকে চেয়ে বলল—ও বলচে আপনার ছবি আঁকবে। মুই জানি কি না, এই সাহেবটা ওই রকম করে—একটুখানি চুপটি মেরে বসুন—

কি বিপদ! একটু ধ্যান করতে বসতে গিয়ে এ আবার কোন্ হাঙ্গামা এসে হাজির হোল দ্যাখো। কতক্ষণ বসতে হবে? মরুক গে, দেখাই যাক্ রগড়। ভবানী বসেই রইলেন।

গ্র্যান্ট সাহেব ভজা মুচিকে বললেন—Don't you stand agape, just go on and bring my sketching things from the cart—

পরে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—যাও—

এতদিনে ঐ কথাটি গ্র্যান্ট ভালো করে শিখেচেন।

দেরি হোল বাড়ি ফিরতে, সুতরাং ভবানী নিজের ঘরটিতে ঢুকে দেখলেন তিলু দোরের চৌকাঠে কি একটা নেকড়া দিয়ে পুঁছচে। ভবানী বললেন—কি ওখানে?

তিলু মুখ না তুলেই বললে—রেড়ির তেল পড়ে গেল, পিদিমটা ভাঙলো,—জল পড়লো মেজেতে।

এ-সময়ে সমস্ত পল্লীগ্রামে দোতলা প্রদীপ বা সেজ ব্যবহার হোত—তলায় জল থাকতো, ওপরের তলায় তেল। এতে নাকি তেল কম পুড়তো। ভবানী দেখলেন তাঁর খাটের তলায় দোতলা পিদিমটা ছিট্‌কে ভেঙে পড়ে আছে।

—সবই আনাড়ি! ভাঙলে তো পিদিমটা?

—আমি ভাঙিনি।

—কে? নিলু বুঝি?

—আজ্ঞে মশাই, না। চুপ করুন। কথা বলবো না আপনার সঙ্গে।

—কেন, কি করিচি?

—কি করিচি, বটে! আমার কথা শোনা হোল? সন্দের সময় এসে জল খেতে বলেছিলুম না?

—শোনো, আসবো কি, এক মজা হয়েচে, বলি। কি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম যে!

তিলু কৌতূহলের দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি বিপদ? সাপটাপ তাড়া করেনি তো? খড়ের মাঠে বড্ড কেউটে সাপের ভয়—

—না গো। সাপ নয়, এক পাগলা সায়েব। টম্‌টমের সইস বললে নীলকুঠির সায়েবদের বন্ধু, দেশ থেকে বেড়াতে এসেচে। আমি বটতলায় বসে আছি, আমার সামনে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়েছে। কি সব হিট্ মিট্ টিট্ বলতে লাগলো। সইসটা বললে—আপনার ছবি আঁকবে—

—ও, সেই ছবি-আঁকিয়ে সায়েব! হ্যাঁ হ্যাঁ, দাদার মুখে শুনেচি বটে। আপনার ছবি আঁকলে?

—আঁকলে বইকি। ঠায় বসে থাকতে হোল এক দণ্ড।।

—মাগো!

—এখন বোঝো কার দোষ।

পরক্ষণেই তিলুর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে! নিখুঁত সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু অপূর্ব রূপ ওর। যেমন হাসি-হাসি মুখ, তেমনি নিটোল বাহুদুটি। গলায় খাঁজকাটা দাগগুলি কি চমৎকার—তেমনি গায়ের রঙ। সন্দেবেলা দেখাচ্ছে ওকে যেন দেবীমূর্তি।

বললেন—তোমার একটা ছবি আঁকতো সহেব, তবে বুঝতো যে রূপখানা কাকে বলে।

—যান্। আপনি যেন—

পরে হেসে বললে—দাঁড়ান, খাবার আনি—সন্দে-আহ্নিকের জায়গা করে দিই?

—হুঁ।

—ও নিলু, শোন্ ইদিকি—আসনখানা নিয়ে আয়—

নিলু এসে আসন পেতে দিলে। গঙ্গাজলের কোশাকুশি দিয়ে গেল। তিলু যত্ন করে আঁচল দিয়ে সন্দে-আহ্নিকের জায়গাটা মেজে দিলে।

ভবানী মনে মনে যা ভাবছিলেন, আহ্নিকের সময়েও ভাবছিলেন, তা হচ্চে এই; কাওও সাহেব তাঁকে বটতলায় যেতে বলেচে। সাহেবের হুকুম, যেতেই হবে। রাজার মত ওরা। তিলুকে নিয়ে গেলে কেমন হয়? অপূর্ব সুন্দরী ও। ওর একটা ছবি যদি সায়েব আঁকে, তবে বড় ভালো হয়। কিন্তু নিয়ে যাওয়াই মুশকিল। যদি কেউ টের পেয়ে যায়—তবে গাঁয়ে শোরগোল উঠবে। একঘরে হতে হবে সমাজে তাঁর শ্যালক রাজারাম রায়কে।

তিলু একখানা রেকাবীতে খাবার নিয়ে এল, নারকেলের সন্দেশ, চিঁড়েভাজা আর মুগতক্তি। হেসে বললে—কেমন! মুগতক্তি যে বড় হয় না এ সময়ে! এখন কি দেবেন তাই বলুন—

নিলু বললে—এখন কান মলে দেবো যে—

—দূর! তুই যে কি বলিস কাকে, ছি! ও-কথা বলতে আছে?

বিলু আড়াল থেকে বার হয়ে এসে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। ভবানী বিরক্তির সুরে বললেন—আর এই এক নষ্টের গোড়া! কি যে সব হাসো! যা-তা মুখে কথাবার্তা তোমাদের দুজনের, বাধে না। ছিঃ—

বিলু বললে—অত ছিঃ ছিঃ করতে হবে না বলে দিচ্চি—

নিলু বললে—হ্যাঁ। আমরা অত ফেল্‌না নই যে সব্বদা ছিছিক্কার শুনতে হবে।

তিলু বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না। ওরা বড্ড আদুরে আর ছেলেমানুষ—দাদা ওদের কক্ষনো শাসন করতেন না। আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেচেন—

নিলু বললে—হ্যাঁ গো বৃন্দে। তোমাকে আর আমাদের ব্যাখ্যানা কত্তে হবে না, থাক্।

বিলু বললে—দিদি সুয়ো হচ্চে ভাতারের কাছে, বুঝলি না?

ভবানী বললেন—ছিঃ ছিঃ, আবার অশ্লীল বাক্য!

বিলু রাগের সুরে বললে—হ্যাঁ গো, সব অশ্লীল বাক্য আর অশ্লীল বাক্য! তবে কি কথা বলবে শুনি? দুটো কথা বলেচো কি না, অমনি অশ্লীল বাক্য হয়ে গেল। বেশ করবো আমরা অশ্লীল বাক্য বলবো—আপনি কি করবেন শুনি?

তিলু ধমকে বললে—যা এখান থেকে। দুজনেই যা। পান নিয়ে এসো।—আর মুগতক্তি দেবো? কেমন লাগলো? বৌদিদি আপনার জন্যে মুগতক্তি রসে ফেলচে। ভাত খাবার সময় দেবে।

—একটা কথা বলি তিলু—

—কি?

—কেউ নেই তো এখানে? দেখে এসো।

—না, কেউ নেই। বলুন—

—কাল একবার আমার সঙ্গে বটতলায় যেতে পারবে?

—কেন?

—সায়েবকে দিয়ে তোমার ছবি আঁকাবো। ঢাকাই শাড়ীখানা পরে যেও। পারবে?

—ও মা!

— কেন কি হয়েচে?

—সে কি হয়? দিনমানে আপনার সঙ্গে কি করে বেরুবো? এই দেখুন আপনার সামনে দিনমানে বার হই বলে কত নিন্দে করচে লোকে। গাঁয়ে সেই রাত্তির ছাড়া দেখা করার নিয়ম নেই। আমাকে বেরুতে হয় বাধ্য হয়ে, বৌদিদি পেরে ওঠেন না একা সবদিক তাংড়াতে।

—শোনো। ফন্দি করতে হবে। আমাকে যেতে হবে বিকেলে। আজ যে সময় গিয়েছিলুম সে সময়। তুমি নদীর ঘাটে গা ধুতে যেও ঘড়া গামছা নিয়ে। ওখান থেকে নিয়ে যাবো, কেউ টের পাবে না। লক্ষ্মীটি তিলু, আমার বড্ড ইচ্ছে।

—আপনার আজগুবী ইচ্ছে। ওসব চলে কখনো সমাজে? আপনি সন্নিসি হয়ে দেশ-বিদেশে বেড়িয়েচেন বলে সমাজের কোনো খবর তো রাখেন না। আমার যা ইচ্ছে করবার জো নেই—

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিলুকে যেতে হোল। স্বামীর মনে ব্যথা দেওয়ার কষ্ট সে সইতে পারবে না। ঢাকাই শাড়ি পরে ঘড়া নিয়ে ঘাটের পথ আলো করে যাবার সময় তাকে কেউ দেখেনি, কেবল বাদা বোষ্টমের বৌ ছাড়া।

বোষ্টম-বৌ বললে—ও দিদিমণি, এ কি, এমন সেজেগুজে কোথায়? রূপে যে ঝলক তুলেচো?

—যাঃ, ঘাটে গা ধোবো। শাড়িখানা কাচবো। তাই—

তিলুর বুকের মধ্যে দুরদুর করছিল। অপরাধীর মত মিথ্যা কৈফিয়ৎটা খাড়া করলে। ভাগ্যিস যে বোষ্টম-বৌ দাঁড়ালো না, চলে গেল। আর ভাগ্যিস, ঘাটে শেষবেলায় কেউ ছিল না।

গ্র্যান্ট সাহেব দূর থেকে তিলুকে দেখে তাড়াতাড়ি টুপি খুলে সামনে এসে সম্ভ্রমের সুরে বললেন—Oh, she is a queenly beauty! Oh! I am grateful to you, sir,—

তারপর তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিলুর সলজ্জ মুখের ও অপূর্ব কমনীয় ভঙ্গির একটা আল্‌গা রেখাচিত্র আঁকতে চেষ্টা করলেন।

১৮৬৪ সালে প্রকাশিত কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্টের 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান লাইফ ইন্ রুর‍্যাল বেঙ্গল' নামক বইয়ের চুয়ান্ন ও সাতান্ন পৃষ্ঠায় 'এ বেঙ্গলী উম্যান' ও 'অ্যান ইন্ডিয়ান ইয়োগী ইন্ দি উড্‌স্' নামক দুখানা ছবি যথাক্রমে তিলু ও ভবানী বাঁড়ুয্যের রেখাচিত্র।

গ্রামে কেউ টের পায়নি। মুশকিল ছিল, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। এ মাঠ দিয়ে ও মাঠ দিয়ে ঘুরে তিলু স্বামীকে নিয়ে এল; ভবানী বিদেশী লোক, গ্রামের রাস্তাঘাট চিনতেন না। ভজা মুচি

সইস্‌কে ভবানী সব খুলে বলে বারণ করে দিয়েছিলেন। তিলু বল্লে—বাবা, কি কান্ড আপনার! শিশির পড়চে! ঠান্ডা লাগাবেন না। সায়েবটা বেশ দেখতে! আমি এত কাছ থেকে সায়েব কখনো দেখিনি। আপনি একটি ডাকাত।

—ও সব অশ্লীল কথা স্বামীকে বলতে আছে, ছিঃ—

রাজারাম রায়কে ছোট সাহেব ডেকে পাঠিয়েচেন। কেন ডেকে পাঠিয়েছেন রাজারাম তা জানেন। কোন প্রজার জমিতে জোর করে নীলের মার্কা মেরে আসতে হবে। রাজারাম দুর্ধর্ষ দেওয়ান, প্রজা কি করে জব্দ করা যায় তাঁকে শেখাতে হবে না। আজ আঠারো বছর এই কুঠিতে তিনি আছেন, বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়েচেন শুধু এই প্রজা জব্দ রাখবার দক্ষতার গুণে।

পাঁচু সেখের বাড়ি তেঘরা সেখহাটি। সেখানকার প্রজারা আপত্তি জানিয়ে বলেচে,—দেওয়ানজি, আপনাদের খাসের জমিতে নীল বুনুন, প্রজার জমিতে এবার আমরা নীল বুনতি দেবো না।

রাজারাম জোর করে নীলের দাগ মেরে এসেচেন পাঁচু সেখের ও তার শ্বশুর বিপিন গাজি ও নবু গাজির জমিতে। এরা সে গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, বিপিন গাজির বাড়িতে আটটি ধান-বোঝাই গোলা, বিশ-পঁচিশটি হালের বলদ, ছ'জোড়া লাঙল। তার ভাই নবু গাজি তেজারতি কারবারে বেশ ফেঁপে উঠেচে আজকাল। কম পক্ষেও একশো বিঘে আউশ ধানের চাষ হয় দুই ভায়ের জোতে। গ্রামের সব লোকে ওদের সমীহ করে চলে, এরাও বিপদে-আপদে সব সময় বুক দিয়ে পড়ে।

নবু গাজি আজ ছোট সাহেবের কাছে এসে নালিশ করেচে। তাই বোধ হয় ছোট সাহেব ডেকেচেন। কি জানি। রাজারাম ভয় খান না। নবু গাজি কি করতে পারে করুক।

ছোট সাহেব অনেকদিন এদেশে থেকে এদেশের গ্রাম্যলোকের মত বাংলা বলতে পারে। রাজারামকে ডেকে বললে—কি বলছিল নবু গাজি, ও রাজারাম!

—কি বলুন হুজুর—

—ওর তামাকের জমিতে নাকি দাগ মেরে এসেচ।

—না মারলি ও গাঁ জব্দ রাখা যাবে না হুজুর।

—ও বলচে ওদের পীরির দরগার সামনের জমিও নিয়েচ?

—মিথ্যে কথা হুজুর। আপনি ডাকান ওকে।

নবু গাজি বেশ জোয়ান মর্দ লোক, ঠান্ডা প্রকৃতির লোকও সে নিতান্ত নয়। কিন্তু ছোট সাহেব ও দেওয়ানজির সামনে সে নিরীহের মত এসে দাঁড়ালো। নীলকুঠির চতুঃসীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে কথা বলবার সাধ্য নেই কোনো রায়তের।

ছোট সাহেব বললে,—কি নবু গাজি, এবার গুড়-পাটালি করেছিলে?

নবু গাজি বিনম্রসুরে বললে—না সায়েব, মোরা এবার গাছ ঝুড়িনি এখনো।

—পাটালি হলি খাতি দেবা না?

—আপনাদের দেবো না তো কাদের দেবো বলুন।

—দেবা ঠিক?

—ঠিক সায়েব।

—রাজারাম, তুমি এদের দরগাতলার জমিতে দাগ মেরেচ?

—না হুজুর। জমির নাম দরগাতলার জমি, এই পর্যন্ত। পুরানো খাতাপত্রে তাই আছে। সেখানে পীরের দরগা বা মসজিদ আছে কি না ওকেই জিগ্যেস করুন না। আছে সেখানে তোমাদের দরগা?

—ছেল আগে। এখন নেই দেওয়ানবাবু।

—তবে? তবে যে বড্ড মিথ্যে কথা বললে সায়েবকে?

—বাবু, আপনি একটু দয়া করুন ও জমিতি মোরা হাজৎ করি। অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তির দিন পীরের নামে রেঁধে বেড়ে খাই। হয়-না-হয় আপনি একদিন দেখে আসবেন। মুই মিথ্যে কথা কেন বলবো আপনারে, আপনারা হলেন দেশের রাজা। আমার জমিটা ছেড়ে দ্যান দয়া করে।

ছোট সাহেব রাজারামের দিকে চেয়ে সুপারিশের সুরে বললে—যাক গে, দাও ছেড়ে জমিটা। ওরা কি যে করে বলচে—

নবু গাজি বললে—হাজৎ।

—সেটা কি আবার?

—ওই যে বললাম সায়েব, খোদার নামে ভাত-গোস্ত রেঁধে ফকির মিচকিনিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যা থাকে মোরা সবাই মেলে খাই।

ছোট সাহেব খুশি হয়ে বলে উঠলো—বেশ, বেশ। আমারে একদিন দেখাতি হবে।

—তা দেখাবো সায়েব।

—বেশ। রাজারাম, ওর জমিটা ছেড়ে দিও। যাও—

নবু গাজি আভূমি সেলাম করে চলে গেল। কিন্তু সে বোকা লোক নয়, দেওয়ান রাজারামকে সে ভালোভাবেই চেনে। বাইরে গিয়ে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলো।

রাজারাম ছোট সাহেবকে বললেন—হুজুর, আপনি কাজ মাটি করলেন একেবারে।

—কেন?

—ও জমি এক নম্বরের জমি। বিঘেতে সাড়ে তিনমণ গুঁড়ো পড়তা হবে। ও জমি ছেড়ে দিতে আছে? আর যদি অমন করে আস্কারা দ্যান প্রজাদের, তবে আমারে আর কি কেউ মানবে?—না কোনো কথা আমার কেউ শুনবে?

ছোট সাহেব শিস্ দিতে দিতে চলে গেল। রাজারাম রাগে অভিমানে ফুলে উঠলেন। তখনি সদর আমিন প্রসন্ন চক্কত্তির ঘরে গিয়ে কি পরামর্শ করলেন দুজনে। প্রসন্ন চক্কত্তির বয়েস চল্লিশের ওপরে, বেশ কালো রং, দোহারা গড়ন, খুব বড় এক জোড়া গোঁফ আছে, চোখগুলো গোল গোল ভাঁটার মত। সকলে বলে অমন বদমাইশ লোক নীলকুঠির কর্মচারীদের মধ্যে আর দুটি নেই। হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করার ওস্তাদ। আমীনদের হাতে অনেক ক্ষমতাও দেওয়া আছে। সরল গ্রাম্য প্রজারা জরিপ কার্যের জটিল কর্মপ্রণালী কিছুই বোঝে না, রামের জমি শ্যামের ঘাড়ে এবং শ্যামের জমি যদুর ঘাড়ে চাপিয়ে মিথ্যে মাপ মেপে নীলের জমি বার করে নেওয়াই আমীনের কাজ। প্রজারা ভয় করে, সুতরাং ঘুষও দেয়। রাজারামের অংশ আছে ঘুষের ব্যাপারে। প্রসন্ন চক্কত্তি থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে বললেন—এ রকম কল্লি তো আমাদের কথা কেউ শোনবে না, ও দেওয়ানজি!

রাজারাম সেটা ভালই বোঝেন। বললেন—তা এখন কি করা যায় বলো, পরামর্শ দাও।

—বড় সায়েবকে বলুন কথাটা।

—সে বাঘের ঘরে এখন যাবে কেডা?

—আপনি যাবেন, আবার কেডা?

বড় সাহেব শিপ্‌টন্ বেজায় রাশভারী জবরদস্ত লোক। ছোট সাহেবের মন একটু উদার, লোকটা মাতাল কিনা। সবাই তো তাই বলে। বড় সাহেবের কাছে যেতে সাহস হয় না যার তার। কিন্তু মানের দায়ে যেতে হোল রাজারামকে। শিপ্‌টন্ মুখে বড় পাইপ টানছেন বসে, হাতখানেক লম্বা পাইপ। কি সব কাগজপত্র দেখচেন। তক্তপোশের মত প্রকাণ্ড একটা ভারী টেবিলের ধারে কাঁটাল কাঠের একটা বড় চেয়ার। সাতবেড়ের মুসাব্বর মিস্ত্রিকে দিয়ে টেবিল চেয়ার বড় সাহেবই তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন, নিজের হাতে পালিশ আর রং করেচেন। টেবিলের একধারে মোটা চামড়া-বাঁধানো একরাশ খাতা। দেওয়ালে অনেকগুলো সাহেব-মেমের ছবি। এই ঘরের এক কোণে ফায়ার-প্লেস, তেমন শীত না পড়লেও কাঠের মোটা মোটা ডালের আগুন মাঘের শেষ পর্যন্ত জ্বলে।

বড় সাহেব চোখ তুলে দেয়ালের দিকে চেয়ে বললেন—গুড্ মর্ণিং।

রাজারাম পূর্বে একবার সেলাম করেছেন, তখন সাহেব দেখতে পাননি ভেবে আর একবার লম্বা সেলাম করলেন। জিভ শুকিয়ে আসচে তাঁর। ছোট সাহেবের মত দিলখোলা লোক নয় ইনি। মেজাজ বেজায় গম্ভীর, দুর্দান্ত বলেও খ্যাতি যথেষ্ট। না-জানি কখন কি করে বসে। সাহেবসুবো লোককে কখনো বিশ্বাস করতে নাই। ভালো ছিল সেই ছবি আকিঁয়ে পাগলা সাহেবটা। তিলুর ও ভবানী ভায়ার ছবি এঁকে ছিল লুকিয়ে। যাবার সময় সেই কথার উল্লেখ করে রাজারাম পাগলা সাহেবটার কাছে পঁচিশ টাকা বক্‌শিশ আদায় করেও নিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভবানী তার কিছু জানে না। যেমন সেই পাগলা সাহেব, তেমনি ভবানী, দুই-ই সমান। আপন খেয়ালমত চলে দুজনেই।

রাজারাম বললেন—আপনার আশীর্বাদে হুজুর ভালোই আছি।

—কি ডরকার আছে এখানে? বিশেষ কোনো কাজ আছে? আমি এখন খুব বিজী আছি। সময় কম আছে।

—অন্য কিছু না হুজুর। আমি তেঘরার একটা প্রজার জমিতে দাগ মেরেছিলাম, ছোট সায়েব তাকে মাপ করে দিয়েচেন।

শিপ্‌টন্ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—যা হুকুম ডিয়াছেন, টাহাই হইবে। ইহাটে টোমার কি অমান্য আছে।

বড় সাহেব এমন উল্টোপাল্টা কথা বলে, ভালো বাংলা না জানার দরুন। ভালো বালাই সব! রাজারামের হয়েছে মহাপাপ, এই সব অদ্ভুত চীজ নিয়ে ঘর করা। সাহেবের ভুল সংশোধন করে দেওয়া চলবে না, চটে যাবে। বালাইয়ের দল যা বলে তাই সই। তিনি বললেন—আজ্ঞে না, অন্যায় আর কি আছে? তবে এমন করলে প্রজা শাসন করা যায় না।

—কি হবে না?

—প্রজা জব্দ করা যাবে না। নীলের চাষ হবে না হুজুর।

—নীলের চাষ হবে না টবে টোমাকে কি জন্য রাখা হইল?

—সে তো ঠিক হুজুর। আমাকে প্রজাদের সামনে অপমান করা হোলে আমার কাজ কি করে হয় বলুন হুজুর—

—অপমান? ওহো, ইউ আর ইন্ ডিস্‌গ্রেস ইউ ওল্ড স্কাউন্ড্রেল, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। টোমাকে কি করিতে হইবে?

—আপনি বুঝুন হুজুর। নবু গাজি বলে একজন বদমাইশ প্রজার জমিতে দাগ মেরেছিলাম, উনি হুকুম দিয়েচেন জমি ছেড়ে দিতে। ও গাঁয়ে আর কোনো জমিতে হাত দেওয়া যাবে না। নীলের চাষ হবে কি করে?

—কটো জমি এ বছর ডাগ দিয়াছ, আমাকে কাল ডেখাটে হইবে। ইমপ্রেশন্ রেজিস্টার টৈরি করিয়াছ?

—হ্যাঁ হুজুর।

—যাও। না ডেখাইতে পারিলে জরিমানা হইবে। কাল লইয়া আসিবে।

বাস্, কাজ মিটে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তির কাছে মুখ ভারী করে ফিরে গেলেন রাজারাম।—না কিছুই হোল না। ওরা নিজের জাতের মান-অপমান আগে দেখে। পাজি শূওরখোর জাত কিনা। তোমার আমার অপমানে ওদের বয়েই গেল।

প্রসন্ন চক্কত্তি ঘুঘু লোক। আগেই জানতেন কি হবে। তামাক টানতে টানতে বললেন—অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে—ছেলেবেলায় চাণক্যশ্লোকে পড়েছিলাম দেওয়ানজি। ওদের কাছে এসে মান-অপমান দেখতে গেলে চলবে না। তা যান, আপনি আপনার কাজে যান—

—আবার উল্টে জরিমানার ব্যবস্থা—

—সে কি! জরিমানা করে দিলে নাকি?

—সেজন্যে জরিমানা নয়। দাগের খতিয়ান হাল সনের তৈরি হয়েচে কিনা, কাল দেখাতি হবে, না দেখাতি পারলে জরিমানা করবে।

—ভালো, ওদের অমনি বিচার।

—উল্টে কচু গাল লাগলো—

রাজারাম অপ্রসন্ন মুখে বার হয়ে গিয়েই দেখলেন নবু গাজি দলবল নিয়ে সদর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে কারকুন রামহরি তরফদারের সঙ্গে একগাল হেসে কি বলচে। রাজারামকে সে এখনও বুঝতে পারেনি। স্বয়ং সাহেবও বোঝেন না। রাজারাম গম্ভীর স্বরে হাঁক দিয়ে বললেন—এই নবু গাজি, ইদিকি শুনে যাও।

নবু গাজির হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সে আজকের ব্যাপার নিয়ে হাসছিল না। সে সাহস তার নেই। তার একটা গোরু চুরি করে নিয়ে গিয়ে তারই জনৈক অসাধু কৃষাণ ন'হাটার হাটে বিক্রি করে, কি ভাবে সেই গোরুটা আবার নবু গাজি উদ্ধার করেছিল, তারই গল্প ফেঁদে নিজের কৃতিত্বে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছিল সে। রাজারামের স্বরে তাঁর প্রাণ উবে গেল। তাড়াতাড়ি এসে সামনে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সুরে বললে—কি বাবু?

—যে জমিতে দাগ মেরেচি, সেটাতেই নীলের চাষ হবে। বুঝলে?

নবু গাজি বিস্ময়ের সুরে বললে—সে কি বাবু, ছোট সায়েব যে বললেন—

—ছোট সায়েব বলেচেন বলেচেন। বাবার ওপরে বাবা আছে। এই বড় সায়েবের হুকুম।

এই আমি আসচি বড় সায়েবের দপ্তর থেকে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া চলে না, বুঝলে নবু গাজি? তোমাকে নীলকুটির চুনের গুদোমে পুরে ধান খাওয়াবো, তবে আমার নাম রাজারাম চৌধুরী, এই তোমায় বলে দিলাম। তুমি যে কি রকম—তোমার ভিটেতে ঘুঘু যদি না চরাই—

নবু গাজি ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। দেওয়ান রাজারামকে ভয় করে না এমন রায়ত নীলকুঠির সীমানা সরহদ্দের মধ্যে কেউ নেই। তিনি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন। সে হাতজোড় করে বললে—মাপ করুন দেওয়ানজি, ক্ষ্যামা দ্যান। আপনি মা-বাপ, আপনি মারলি মারতে পারেন রাখলি রাখতে পারেন। মুই মুরুক্ষু মানুষ, আপনার সন্তানের মত। মোর ওপর রাগ করবেন না। মরে যাবো তা হলি—

—এখনই হয়েচে কি? তোমার উঠোনে গিয়ে নীলের দাগ মারবো। তোমার সায়েব বাবা যেন উদ্ধার করে তোমায়। দেখি তোমার কতদূর—

নবু গাজি এসে রাজারামের পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

রাজারাম রুক্ষ সুরে বললেন—না, আমার কাছে নয়। যাও তোমার সেই সায়েব বাবার কাছে।

নবু গাজি তবুও পা ছাড়ে না।

রাজারাম বললেন—কি?

—আপনি না বাঁচালি বাঁচবো না। মুরুক্ষু মানুষ, করে ফেলেছি এক কাজ। ক্ষ্যামা দ্যান বাবু। আপনি মা-বাপ।

—আচ্ছা, এবার সোজা হয়ে এসো। তোমার জমি ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু—

—বাবু সে আমায় বলতি হবে না। আপনার মান রাখতি মুই জানি।

—যাও, জমি ছেড়ে দিলাম। কাল আমীনবাবু গিয়ে ঠিক করে আসবে। তবে মার্কাতোলার মজুরিটা জরিপের কুলীদের দিয়ে দিও। যাও—

নবু গাজি আভূমি সেলাম করলে পুনরায়। চলে গেল সে কাঁটাপোড়ার বাঁওড়ের ধারে ধারে। দেওয়ান রাজারাম রায় ও সদর আমীন প্রসন্ন চক্কত্তির মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

এই রকমই চলচে এদের শাসন অনেকদিন থেকে। বড় সাহেব ছোট সাহেব যদি বা ছাড়ে, এরা ছাড়ে না। চাষীদের, সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থদের ভালো ভালো জমিতে মার্কা দিয়ে আসে, সে জমিতে নীল পুঁততেই হবে। না পুঁতলে তার ব্যবস্থা আছে।

বড় সাহেব এ অঞ্চলের ফৌজদারি বিচারক। সপ্তাহে তিন দিন নীলকুঠিতে কোর্ট বসে। গোরু চুরি, মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগের বিচার হবে এখানেই। বড় কুঠির সাদাঘরে এ সময় নানা গ্রাম থেকে মামলা রুজু করতে লোক আসে। তেমাথার মোড়ে সনেকপুরের মাঠে একটা ফাঁসিকাঠ টাঙানো হয়েচে সম্প্রতি। রাজারাম বলে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে যে এবার বড় সায়েব ফাঁসির হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা পেয়েচেন। গভর্ণমেন্ট থেকে।

বড় সাহেব কিন্তু সুবিচারক। খুব মন দিয়ে উভয় পক্ষ না শুনে বিচার করে না। রায় দেবার সময় অনেক ভেবে দ্যায়। অপরাধীর যম, লঘুপাপে গুরুদণ্ড সর্বদাই লেগে আছে। নীলকুঠির কাজের একটু ত্রুটি হলে স্বয়ং দেওয়ানেরও নিষ্কৃতি নেই। তবু ছোট সাহেবের চেয়ে বড় সাহেবকে পছন্দ করে লোকে। দেওয়ানকে বলে—টোমাকে চুনের গুডামে পুরিয়া রাখিলে তুমি জব্‌ড হইবে।

রাজারাম বলেন—আপনার ইচ্ছা হুজুর। আপনি করলি সব করতি পারেন।

—You have a very oily tongue I know, but that wouldn't cut ice this time—টোমাকে আমি জব্‌ড করিটে জানে।

—কেন জানবেন না হুজুর। হুজুর মা-বাবা—

—মা-বাবা! মা-বাবা! চুনের গুডামে পুরিলে টোমার জব্‌ড ঠিক হইয়া যাইবে।

—হুজুরের খুশি।

—যাও, ডশ টাকা জরিমানা হইল।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

রাজরামের কাজ এ ভাবেই চলে।

কুঠিতে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর আসবেন। দেওয়ান রাজারাম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন আজ সকাল থেকে। ভেড়া, মাছ, ভালো আম ও ঘি যোগাড় করবার ভার তাঁর ওপর। মাঝে মাঝে এ রকম লেগেই আছে, সাহেবসুবো অতিথি যাতায়াত করচে মাসে দু'বার তিনবার!

মুড়োপোড়ার তিনকড়িকে ডাকিয়ে এনেচেন তার একটি নধর শুওরের জন্যে। তিনকড়ি জাতে কাওরা, শুওরের ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে। দোতলা কোঠাবাড়ি, লোকজন, ধানের গোলা, পুকুর। অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাকে খাতির করে চলে। রাজারামকে উপহার দেওয়ার জন্যে সে বাড়ি থেকে ঘানি-ভাঙ্গা সর্ষের তেল এনেছিল প্রায় দশ সের, কিন্তু রাজারাম তা ফেরত দিয়েচেন, কাওরার দেওয়া জিনিস তাঁর ঘরে ঢুকবে না।

তিনকড়ি বল্লে—একটা আছে পাঁচ মাসের আর একটা আছে দু'বছরের। যেটা পছন্দ করেন বলে দেবেন। তবে বলতি নেই, আপনারা ওর সোয়াদ জানেন না, দেওয়ানবাবু, একবার খেলি আর ভুলতি পারবেন না। ওই পাঁচ মাসের বাচ্চাডা শুধু ভেজি খাবেন ঘি দিয়ে—

রাজারাম হেসে বল্লেন—দূর ব্যাটা, কি বলে! বামুনদের অমন বলতি আছে? তোদের পয়সা হলি কি হবে, জাতের স্বধম্মো যাবে কোথায়?

—বাবু, ঐ যা! আপনারা যে খান না, সে কথা ভুলে গিইচি, মাপ করবেন।

—না না, তোর কথায় আমার রাগ হয় না। তা হলি শুওরের সরবরাহ করতি হবে তোমাকেই, এই মনে রাখবা।

—মনে রাখারাখি কি, কালই আমি পাঁচ মাসের বাচ্চা আর দু'বছরেরডা পেঠিয়ে দেবো এখন। কোথায় পেঠিয়ে দেবো বলুন, এখানেই আপনার বাড়ি আমার নোকে নিয়ে আসবে?

—না না, আমার বাড়ি কেন? কুঠিতে পাঠিয়ে দেবা। ব্রাহ্মণের বাড়ি শুওর? ব্যাটাকে কি যে করি—

তিনকড়ি বিদায় নেবার উদ্যোগ করতেই রাজারাম বললেন—ব্রাহ্মণবাড়ি এসেচ, পেরসাদ না পেয়ে যাবে, না যেতি আছে? পয়সা হয়েচে বলে কি ধরাকে সরা দেখচো নাকি?

তিনকড়ি জিভ কেটে বললে—ও কথাই বলবেন না। বেরাহ্মণের পাত কুড়িয়ে খেয়ে মোরা মানুষ দেওয়ানজি। মুখ থেকে ফেলে দিলি সে ভাতও মাথায় করে নেবো। তবে মোর মনটাতে আজ আপনি বড্ড কষ্ট দেলেন।

—কেন, কেন?

—ভালো তেলটা এনেলাম আপনার জন্যি আলাদা ক'রে, তেলডা নেলেন না।

—নিলাম না মানে, শুদ্দুরের দান নিতি নেই আমাদের বংশে, সেজন্যে মনে দুঃখু করো না তিনকড়ি। আচ্ছা তুমি দুঃখিত হচ্চ, কিছু দাম দিচ্চি, নিচে তেলটা রেখে যাও—

—দাম? কত দাম দেবেন?

—এক টাকা।

—তাহলে তো পাঁচসের তেলের দাম দিয়েই দেলেন কত্তা। মুই কি তেল বিক্রি করতি এনেলাম বাবুর কাছে? এট্টু দয়া করবেন না? আছিই না নয় ছোটনোক—

—না তিনকড়ি। মনে করো না সেজন্যি কিছু। একটা টাকাই তোমারে নিতি হবে। তার কম নিলি আমি পারব না। ওরে, কে আছিস্। সীতেনাথ—বাবা ইদিকি তিনকড়ির কাছ থেকে তেলের ভাঁড়টা নাও—

এই সময়ে ছোটসাহেব ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হোলো। রাজারামকে দেখে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনকড়িকে দেখে থেমে গেল।

রাজারাম দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—পাঁচ মাসের শুওরের বাচ্চা একটা যোগাড় করা গেল হুজুর—

—Oh, the sucking pig is the best. পাঁচ মাসের বাচ্চা বড় হলো। মাই খায় এমন বাচ্চা দিতে পারবা না তুমি?

—না, তেমন নেই সায়েব। এত ছোট বাচ্চা কনে পাবো?

—জেলা থেকে হাকিম আসচে, এখানে খাবে। বাচ্চা হলি খাবার জুৎ হোত।

—এবার হলি রেখে দেবো। সায়েব, সেলাম। মুই চল্লাম। পেরনাম হই দেওয়ানজি।

রাজারাম সাহেবকে দেখেই বুঝেছিলেন একটা গুরুতর ব্যাপারের খবর নিয়ে সে এখানে এসেচে। তিনকড়ি বিদায় নেবার পরক্ষণেই তিনি সাহেবকে জিগ্যেস করলেন—কি হয়েচে সায়েব?

—খুব গোলমাল। রসুলপুর আর রাহাতুনপুরির মুসলমান চাষীরা ক্ষেপে উঠেছে নীল বুনবে না।

—কে বললে?

—কারকুন গিয়েছিল নীলির দাগ মারতি—তারা দাগ মারতি দেয়নি, লাঠি নিয়ে তাড়া করেচে—

—এতবড় আস্পদ্দা তাদের?

—তুমি ঘোড়া আনতি বলো। চলো দুজনে ঘোড়া করে সেখানে যাবো। বড় সাহেবকে কিছু বলো না এখন।

—যদি সত্যি হয় তখন কি করা যাবে সে আমাকে বলতি হবে না সায়েব। আপনি দয়া করে শুধু ফজদুরি মামলা থেকে আমারে বাঁচাবেন।

—না না, তুমি বড্ড rash, কিছু করে বস্‌বা। ওই জন্যি তোমারে আমার বিশ্বেস হয় না।

একটু পরে দুটো ঘোড়ায় চড়ে দুজনে বেরিয়ে গেল। কখন দেওয়ান ফিরে এসেছিলেন কেউ জানে না। পরদিন সকালে চারিধারে খবর রটে গেল রাত্রে রাহাতুনপুর গ্রাম একেবারে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। বড় বড় চাষীদের গ্রাম, কারো বাড়ি বিশ-ত্রিশটা পর্যন্ত ধানের

গোলা ছিল—আর ছিল ছ'চালা আটচালা ঘর, সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। কি ভাবে আগুন লেগেছিল কেউ জানে না, তবে সন্ধ্যারাত্রে ছোট সাহেব এবং দেওয়ানজি রাহাতুনপুরের মোড়লের বাড়ি গিয়েছিলেন; সেখানে প্রজাদের ডাকিয়ে নীল বুনবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। তারা রাজী হয়নি। ওঁরা ফিরে আসেন রাত এগারোটার পর। শেষরাত্রে গ্রামসুদ্ধ আগুন লেগে ছাইয়ের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সকলে সন্দেহ করচে।

পরদিন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডঙ্কিন্‌সন্ নীলকুঠির বড় বাংলোতে সদলবলে এসে পৌঁছুলেন। তিনি যখন কুঠির ফিটন্ গাড়ি থেকে নামলেন, তখন শুধু বড় সাহেব ও ছোট সাহেব সদর ফটকে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন—দেওয়ান রাজারাম নাকি চুরুটের বাক্স এগিয়ে দেওয়ার জন্যে উপস্থিত ছিলেন বৈঠকখানায় টেবিলের পাশে। ডঙ্কিন্‌সন্ এসেছিলেন শুধু নীলকুঠির আতিথ্য গ্রহণ করতে নয়, বড় সাহেব একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ম্যাজিস্ট্রেটকে এখানে এনেছিলেন।

রাজারামকে ডেকে বড় সাহেব বল্লেন—টুমি কি ডেখিলে ইঁহাকে বলিটে হইবে। ইনি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আছে—this man is our Dewan, Mr Duncinson, and a very shrewd old man too—go on, বলিয়া যাও—রাহাটুনপুরে কি ডেখিলে—

রাজারাম আভূমি সেলাম করে বললেন—ওরা ভয়ানক চটেচে। লাঠি নিয়ে আমাকে মারে আর কি! নীল কিছুতেই বুন্‌বে না। আমি কত কাকুতি করলাম—হাতে পায়ে ধরতে গেলাম। বললাম—

ডঙ্কিন্‌সন্ সাহেব বড় সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—What he did, he says ?

—Entreated them—

—I understand. Ask him how many people were there—

—কটো লোক সেখানে ছিল?

—তা প্রায় দুশো লোক সায়েব। সব লাঠি-সোঁটা নিয়ে এসেছিল—

—Came with lathis and other weapons.

—Oh,, they did, did they ? The scoundrels!

—টারপরে টুমি কি করিলে?

—চলে এলাম সায়েব। দুঃখিত হয়ে চলে এলাম। ভাবতি ভাবতি এলাম, এতগুলো নীলির জমি এবার পড়ে রইলো। নীলচাষ হবে না। কুঠির মস্ত লোকসান।

কিছুক্ষণ পরে সদর-কুঠির সামনের মাঠ জনতায় ভরে গেল। ওরা এসেচে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নালিশ জানাতে—দেওয়ানজি ওদের গ্রাম রাহাতুনপুর একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এসেচেন।

ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ান রাজারামকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—টুমি কি করিয়াছে? আগুন ডিয়াছে?

রাজারাম আকাশ থেকে পড়লেন। চোখ কপালে তুলে বললেন—আগুন! সে কি কথা সায়েব! আগুন।

আগুন জিনিসটা কি তাই যেন তিনি কখনও শোনেন নি।

ম্যাজিস্ট্রেটের সন্দেহ হোল। তিনি রাজারামকে অনেকক্ষণ জেরা করলেন। ঘুঘু রাজারাম অমন অনেক জেরা দেখেচেন, ওতে তিনি ভয় পান না। রাহাতুনপুর গ্রামের লোকদের অনেককে ডাক দিলেন, তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু কুঠির সীমানায় দাঁড়িয়ে বেশি কিছু বলতে ভয় পেলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আজ এসেচে, কাল চলে যাবে, কিন্তু ছোট সায়েব আর দেওয়ানজি চিরকালের জুজু। বিশেষত দেওয়ানজি। ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁদের বিরুদ্ধে কথা বলতে যাওয়া—সে অসম্ভব। রাহাতুনপুর গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং গেলেন দেখতে। সঙ্গে বড় সাহেব ও ছোট সাহেব। মস্ত বড় হাতী তৈরী হোল তাঁদের যাবার জন্যে দু-দুটো। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল রাহাতুনপুরের মাঠ।

খুব বড় গ্রাম নয় রাহাতুনপুর, একপাশে খড়ের মাঠ, খড়ের মাঠের পূর্বদিকে এই গ্রামখানি—একখানাও কোঠাবাড়ি ছিল না। চাষী গৃহস্থদের খড়ের চালাঘর গায়ে গায়ে লাগা। পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েচে। কোনো কোনো ভিটেতে পোড়া কালো বাঁশগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মাটির দেওয়াল পুড়ে রাঙ্গা হয়ে গিয়েচে, কুমোর বাড়ির হাঁড়ি-পোড়ানো পনের মত দেখতে হয়েচে তাদের রং। কবীর সেখের গোয়ালে দুটো দামড়া হেলে গোরু পুড়ে মরেচে। প্রত্যেকের উঠানে আধ-পোড়া ধানের গাদা, পোড়া ধানের গাদা থেকে মেয়েরা কুলো করে ধান বেছে নিয়ে ঝাড়ছিল—মুখের ভাত যদি কিছুটা বাঁচাতে পারা যায়।

অনেকে এসে কেঁদে পড়লো। দেওয়ানজির কাজ অনেকে বললে, কিন্তু প্রমাণ তো তেমন কিছু নেই। কেউ তাঁকে বা তাঁর লোককে আগুন দিতে দেখেচে এটা প্রমাণ হোল না। ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত ভালোভাবেই করলেন। বড় সাহেবকে ডেকে বললেন—আই অ্যাম রিয়্যালি সরি ফর দি পুওর বেগার্স—উই মাস্ট ডু সামথিং ফর দেম।

বড় সাহেব বললে—আই ওয়ানডার হু হ্যাজ কমিটেড্ দিস ব্ল্যাক্ ডিড্—আই সস্‌পেক্ট মাই অয়েলি-টাংড্ দেওয়ান।

—ইউ থিংক ইট ইজ এ কেস্ অফ্ আর্সন?

—আই কান্ট টেল—ইয়ার্স এগো আই স এ কেস্ লাইক দিস্, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াস এ কেস্ অফ আর্সন—মাই ডেওয়ান ওয়াজ রেস্‌পন্‌সিবল ফর দ্যাট্—দি ডেভিল্।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একশো টাকা মঞ্জুর করলেন সাহায্যের জন্য, বড় সাহেব দিলেন দুশো টাকা। সাহেবদের জয়জয়কার উঠলো গ্রামে।

সকলে বললে—না, অমন বিচারক আর হবে না। হাজার হোক রাঙা মুখ।

সেই রাত্রে কুঠির হলঘরে মস্ত নাচের আসর জমলো। রাঙামুখ সাহেবরা সবাই মদ খেয়েচে। মেমদের কোমর ধরে নাচচে, ইংরিজি গান করেচ। সহিস ভজা মুচি উর্দি পরে মদ পরিবেশন করচে। নীলকুঠিতে কোনো অবাঙালী চাকর বা খানসামা নেই। এই সব আশপাশের গ্রামের মুচি, বাগদি, ডোম শ্রেণীর লোকেরা চাকর খানসামার কাজ করে। ফলে সাহেব মেম সকলেই বাংলা বলতে পারে, হিন্দি কেউ বলেও না, জানেও না।

আমীন প্রসন্ন চক্রবর্তী বার-দেউড়িতে তাঁর ছোট কুঠুরিতে বসে তামাক টানছিলেন। সামনে বসে ছিল বরদা বাগদিনী। বরদার বয়স প্রসন্ন চক্রবর্তীর চেয়ে বেশি, মাথার চুল শণের দড়ি। বরদাকে প্রসন্ন চক্রবর্তী মাঝে মাঝে স্মরণ করেন নিজের কাজ উদ্ধারের জন্যে।

প্রসন্ন বললেন--গয়া ভালো আছে?

—তা একরকম আছে আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

—বড় ভালো মেয়ে, এমন এ দিগরে দেখিনি। একটা কথা বরদা দিদি—

—কি বলো—

—এক বোতল ভাল বিলিতি মাল গয়াকে বলে আনিয়ে দাও দিদি। আজ অনেক ভালো জিনিসের আমদানি হয়েচে। সায়েব-সুবোর খানা, বুঝতেই পারচো। অনেক দিন ভালো জিনিস পেটে পড়েনি—

—সে বাপু আমি কথা দিতে পারবো না। গয়া এখন ইদিকি নেই—সায়েবদের খানার সময় গয়া সেখানে থাকে না—

—লক্ষ্মী দিদি, শোনবো না, একটু নজর করতিই হবে—উঠে যাও দিদি। দ্যাখো, যদি গয়াকে বলে নিদেনে একটা বোতল যোগাড় করতি পারো—

বরদা বাগদিনী চলে গেল। এ অঞ্চলে বরদার প্রতিপত্তি অসাধারণ, কারণ ও হোল সুবিখ্যাত গয়া মেমের মা। গয়া মেমকে মোল্লাহাটি নীলকুঠির অধীন সব গ্রামের সব প্রজা জানে ও মানে। গয়া বরদা বাগদিনীর মেয়ে বটে, কিন্তু বড় সাহেবের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, এই জন্যেই ওর নাম এ অঞ্চলে গয়া মেম।

গয়া খারাপ লোক নয়, ধরে পড়লে সাহেবকে অনুরোধ করে অনেকের ছোটবড় বিপদ সে কাটিয়ে দিয়েছে। মেয়েমানুষ কিনা, পাপপথে নামলেও ওর হৃদয়ের ধর্ম্ম বজায় আছে ঠিক। গয়ার বয়স বেশি নয়, পঁচিশের মধ্যে, গায়ের রং কটা, বড় বড় চোখ, কালো চুলের ঢেউ ছেড়ে দিলে পিঠ পর্যন্ত পড়ে, মুখখানা বড় ছাঁচের কিন্তু এখনো বেশ টুলটুলে। সর্বাঙ্গের সুঠাম গড়নে ও অনেক ভদ্রঘরের সুন্দরীকে হার মানায়। পথ বেয়ে হেঁটে গেলে ওর দিকে চেয়ে থাকতে হয় খানিকক্ষণ।

গয়া মেমকে কিন্তু বড় সাহেবের সঙ্গে কেউ দেখেনি। অথচ ব্যাপারটা এ অঞ্চলে অজানা নয়। সে হোল বড় সাহেবের আয়া, সর্বদা থাকে হল্‌দে কুঠিতে, যেটা বড় সাহেবের খাস কুঠি। ফরসা কালাপেড়ে শাড়ী ছাড়া সে পরে না, হাতে পৈঁছে, বাজুবন্ধ, কানে বড় বড় মাকড়ি—ঘন বনের বুকচেরা পাহাড়ী পথের মত বুকের খাঁজটাতে ওর দুলছে সরু মুড়কি-মাদুলি, সোনার হারে গাঁথা।

ডোমবাগ্‌দির মেয়েরা বলে—গয়া দিদি এক খেলা দেখালো ভালো।

ওদের মধ্যে ভালো ঘরের ঝি-বৌয়েরা নাক সিঁটকে বলে—অমন পৈঁছে বাজুবন্ধের পোড়া কপাল।

নিশ্চয় ওদের মধ্যে অনেকে ঈর্ষা করে ওকে। এর প্রমাণও আছে। অনেকে প্রতিযোগিতায় হেরেও গিয়েছে ওর কাছে। ঈর্ষা করবার সঙ্গত কারণ বৈকি!

আমীন প্রসন্ন চক্কত্তির ঘরে এহেন গয়া মেয়ের আবির্ভাব খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। প্রসন্ন চক্কত্তি চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—এই যে গয়া। এসো মা এসো—বসতি দিই কোথায়—

গয়া হেসে বললে—থাক্ খুড়োমশাই—আমি ঝন্‌কাঠের ওপর বসচি—তারপর কি বললেন মোরে?

—একটা বোতল যোগাড় করে দিতি পারো মা?

—দেখুন দিকি আপনার কান্ড। মা গিয়ে মোরে বললে, দাদাঠাকুরকে একটা ভালো বোতল না দিলি নয়। এই দেখুন আমি এনিছি—কেমন ধারা দেখুন তো?

গয়া কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা সাদা পেটমোটা বেঁটে বোতল বার করে প্রসন্ন চক্কত্তির সামনে রাখলো। প্রসন্ন চক্কত্তির ছোট ছোট চোখ দুটো লোভে ও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বোতলটা ধরে বল্লে—আহা, মা আমার—দেখি দেখি—কি ইংরিজী লেখা রয়েছে পড়তে পারিস?

—না খুড়োমশাই, ইঞ্জিরি-ফিঞ্জিরি আমরা পড়তি পারিনে।

প্রসন্ন চক্কত্তি গয়ার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাইলেন। কিঞ্চিত মুগ্ধ দৃষ্টিতেও বোধ হয়। গয়া মেমের সুঠাম যৌবন অনেকেরই কামনার বস্তু। তবে বড্ড উঁচু ডালের ফল, হাতের নাগালে পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে কি?

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—হাঁরে গয়া, সাহেব মেমের নাচের মধ্যি হোল কি? দেখেচিস্ কিছু?

—না খুড়োমশাই। মোরে সেখানে থাকতি দ্যায় না।

—শিপ্‌টন্ সায়েবের মেম নাকি ছোট সাহেবের সঙ্গে নাচে?

—ওদের পোড়া কপাল। সবাই সবার মাজা ধরে নাচতি নেগেছে। ঝাঁটা মারুন ওদের মুখি। মুই দেখে লজ্জায় মরে যাই খুড়োমশাই।

—বলিস্ কি!

—হ্যাঁ খুড়োমশাই, মিথ্যে বলচিনে। আপনি না হয় গিয়ে একটু দেখে আসুন, বড় সায়েবের চাপরাসী নফর মুচি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

—ভজা মুচি কোথায়? ও আমার কথা একটু-আধটু শোনে।

—সেও সেখানে আছে।

—বড় সায়েবও আছে?

—কেন থাকবে না। যাবে কনে?

—ভেতরে ভেতরে কেমন লোক বড় সায়েব?

গয়া সলজ্জ চোখ দুটি মাটির দিকে নামিয়ে বললে—ওই এক রকম। বাইরে যতটা গোঁয়ারগোবিন্দ দেখেন ভেতরে কিন্তু ততটা নয়। বাবাঃ, সব ভালো কিন্তু ওদের গায়ে যে—

—গন্ধ?

—বোটকা গন্ধ তো আছেই। তা নয়, গায়ে বড্ড ঘামাচি। ঘামাচি পেকে উঠবে রোজ রাত্তিরি। মোর মাথার কাঁটা চেয়ে নিয়ে সেই ঘামাচি রোজ গালবে। কথাটা বলে ফেলেই গয়ার মনে পড়লো, বৃদ্ধ প্রসন্ন আমীনের কাছে, বিশেষত যাকে খুড়োমশাই বলে ডাকে তাঁর কাছে, এ কথাটা বলা উচিত হয়নি। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা হলো বড্ড—সেটা ঢাকবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি উঠে বললে—যাই খুড়োমশাই, অনেক রাত হোল। বিস্কুট খাবেন? খান তো এনে দেবো এখন। আর এক জিনিস খায়—তারে বলে চিজ। বড্ড গন্ধ। মুই একবার মুখি দিয়ে শেষে গা ঘুরে মরি। তবে খেলি গায়ে জোর হয়।

গয়া মেম চলে গেলে প্রসন্ন আমীন মনের সাধে বোতল খুলে বিলিতি মদে চুমুক দিলেন। হাতে পয়সা আসে মন্দ নয় মাঝে মাঝে, দেওয়ানজির কৃপায়। কিন্তু এসব মাল জোটানো শুধু পয়সা থাকলেই বুঝি হয়? হদিস জানা চাই। দেওয়ানজির এসব চলে না, একেবারে কাঠখোট্টা

লোক। ও পারে শুধু দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে। কি ভাবেই রাহাতুনপুরটা পুড়িয়ে দিলে রাত্তিরে। এই ঘরে বসেই সব সলাপরামর্শ ঠিক হয়, প্রসন্ন আমীন জানে না কি। ম্যাজিস্ট্রেটই আসুক আর যেই আসুক, নীলকুঠির সীমানার মধ্যে ঢুকলে সব ঠান্ডা।

তা ছাড়া রাজার জাত রাজার জাতের পক্ষে কথা বলবে না তো কি বলবে কালা আদমিদের দিকে?

খাও দাও, মেমেদের মাজা ধরে নাচো, ব্যস্, মিটে গেল।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বেশ সুখে আছেন।

দেওয়ান রাজারাম রায়ের বাড়ি থেকে কিছুদূরে বাঁশবনের প্রান্তে দুখানা খড়ের ঘর তৈরি করে সেখানেই বসবাস করচেন আজ দু'বছর; তিলুর একটি ছেলে হয়েচে। ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছু করেন না, তিন-চার বিঘে ধানের জমি যৌতুক স্বরূপ পেয়েছিলেন, তাতে যা ধান হয়, গত বছর বেশ চলে গিয়েছিল। সে বছর সেই যে সায়েবটি তাঁদের ছবি এঁকে নিয়ে গিয়েছিল, এবার সে সাহেব তাঁকে একখানা চিঠি আর একখানা বই পাঠিয়েচে বিলেত থেকে। রাজারাম নীলকুঠি থেকে বই আর চিঠি এনে ভবানীর হাতে দেন। হাতে দিয়ে বলেন—ওহে ভবানী, এতে তিলুর ছবি কি করে এল? সাহেব এঁকেছিল বুঝি? চমৎকার এঁকেচে, একেবারে প্রাণ দিয়ে এঁকেচে। কি সুন্দর ভঙ্গিতে এঁকেচে ওকে। ওর ছবি কি করে আঁকলে সাহেব? থাক্ থাক্, এ যেন আর কাউকে দেখিও না গাঁয়ে। কে কি মনে করবে। ইংরিজি বই। কি তাতে লিখচে কেউ বলতে পারে না, শুধু এইটুকু বোঝা যায় এই গাঁ এবং যশোর অঞ্চল নিয়ে অনেক জায়গার ছবি আছে। সাহেবটা ভালো লোক ছিল।

তিলু হেসে বললে—দেখলেন, কেমন ছবি উঠেচে আমার।

—আমারও

—বিলু-নিলুকে দেখাবেন। ওরা খুশি হবে।.ডাকি দাঁড়ান—

নিলু এসে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে। সব তাতেই দিদি কেন আগে? তার ছবি কি উঠতে জানে না? দিদির সোহাগ ভুলতে পারবেন না রসের গুণমণি—অর্থাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যে।

তবে আজকাল ওদের অনেক চঞ্চলতা কমেচে। কথাবার্তায় ছেলেমিও আগের মত নেই। বিলুর স্বভাব অনেক বদলেচে, দু'এক মাস পরে তারও ছেলেপুলে হবে।

তিলু কিন্তু অদ্ভুত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরের আদুরে আবদেরে মেয়ে হয়ে সে ভবানী বাঁড়ুয্যের খড়ের ঘরে এসে কেমন মানিয়ে নিয়ে ঘর আলো করে বসেচে। এখানে কুলুঙ্গি, ওখানে তাক তৈরি করচে নিজের হাতে। নিজেই ঘর গোবর দিয়ে পরিপাটি করে নিকুচ্চে, উনুন তৈরি করচে পুকুরের মাটি এনে, সন্ধ্যের সময় বসে কাপাস তুলোর পৈতে কাটে। একদন্ড বসে থাকবার মেয়ে সে নয়। চরকির মত ঘুরচে সর্বদা।

বিলুও অনেক সাহায্য করে। দিদি রাঁধে, ওরা কুটনো কুটে দেয়। বিলু ও নিলু দিদির নিতান্ত অনুগত সহোদরা, দিদি যা বলে তাই সই। দিদি ছাড়া ওরা এতদিন কিছু জানতো না—অবিশ্যি আজকাল স্বামীকে চিনেচে দুজনেই। স্বামীর সঙ্গে বসে গল্প করতে ভারি ভালো লাগে।

বৌদিদি জগদম্বা বলেন—ও নিলু, আজকাল যে এ-বাড়ি আর আসিস নে আদপে?

নিলু সজ্জলসুরে বলে—কত কাজ পড়ে থাকে ঘরের। দিদি একা আমরা না থাকলি—

—তা তো বটেই। আমাদের তো আর ঘর সংসার ছিল না, কেবল তোদেরই হয়েছে, না?

—যা বলো।

—তিলুকে ওবেলা তাই বলছিলাম—

—ও বাবা, দিদি তোমার জামাইকে ফেলি আর খোকনকে ফেলি স্বগ্‌গে যেতি বল্লিও যাবে না।

—তা জানি।

—দিদি একা পারে না বলে খোকনকে নিয়ে আমাদের থাকতি হয়।

—বড্ড ভালো মেয়ে আমার তিলু। সন্দের পর একটু পাঠিয়ে দিস্। উনি কুঠি থেকে আগে আগে ফিরে এলে তিলুই ওঁর তামাক সেজে দিতো জানিস তো। উনি রোজ ফিরে এসে বলেন, তিলু বাড়ি না থাকলি বাড়ি অন্ধকার।

—দিদিকে বলবো এখন।

—খোকাকে নিয়ে যেন আসে না, সন্দের পর।

—তোমাদের জামাই না ফিরে এলি তো দিদি আসতে পারবে না। তিনি গুণমণি ফেরেন রাতে।

—কোথা থেকে?

—তা বলতে পারিনে।

—সন্ধান-টন্ধান নিবি। পুরুষের বার-দোষ বড্ড দোষ—

—সে-সব নেই তোমাদের জামাইয়ের বৌদি। ও অন্য এক ধরনের মানুষ। সন্নিসি গাছের লোক। সন্নিসি হয়েই তো গিয়েছিল জানো তো। এখনো সেই রকম। সংসারে কোনো িছুতেই নেই। দিদি যা করবে তাই।

—আহা বড্ড ভালোমানুষ। আমার বড্ড দেখতি ইচ্ছে করে। সন্দের সময় আজ দুজনকেই কটু আসতি বলিস। এখানেই আহ্নিক করে জল খাবেন জামাই।

ভবানী নদীর ধার থেকে সন্দের পর ফিরে আসতেই নিলু বললে—শুনুন, আপনাকে আর দিকে জোড়ে যেতি হবে ও-বাড়ি—বৌদিদির হুকুম—

—আর, তুমি আর বিলু?

—আমাদের কে পোঁছে? নাগর-নাগরী গেলেই হোল—

—আবার ওই সব কথা?

—ঘাট হয়েচে। মাপ করুন মশাই।

এমন সময়ে তিলু এসে দুজনকে দেখে হেসে ফেললে। বললে,—বেশ তো বসে গল্পগুজব র' হচ্চে। আহ্নিকের জায়গা তৈরি যে—

ভবানী বললেন—নিলু বলচে তোমাকে আর আমাকে ও বাড়ি যেতে বলেচে বৌদিদি।

তিলু বললে—বেশ চলুন। খোকনকে ওদের কাছে রেখে যাই।

দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে সন্ধ্যার পরেই। শীত এখনো সামান্য আছে, গাছে গাছে আমের কুল ধরেচে, এখনো আম্রমুকুলের সুগন্ধ ছড়াবার সময় আসেনি। দু'একটি কোকিল এখনো ডকে ওঠে বড় বকুল গাছটায় নিবিড় শাখা-প্রশাখার মধ্যে থেকে।

ভবানী বললেন—তিলু, বসবে? চলো নদীর ধারে গিয়ে একটু বসা যাক্।

তিলুর নিজের কোনো মত নেই আজকাল। বললে—চলুন। কেউ দেখতি পাবে না তো?

—পেলে তাই কি?

—আপনার যা ইচ্ছে—

—রায়দের ভাঙাবাড়ির পেছন দিয়ে চলো। ও পথে ভূতের ভয়ে লোক যায় না।

নদীর ধারে এসে দুজনে দাঁড়ালো বাঁশঝাড়ের তলায়, শুকনো পাতার রাশির ওপরে; তিলু বললে—দাঁড়ান, আঁচলটা পেতে নিচে বসুন—

—তুমি আঁচল খুলো না, ঠান্ডা লাগবে—

—আমার ঠান্ডা লাগে না, বসুন আপনি—

—বেশ লাগচে, না?

তিলু হেসে বললে—সত্যি বেশ, সংসার থেকে তো বেরুনোই হয় না আজকাল—কাজ আর কাজ। বিলু নিলু সংসারের কি জানে? ছেলেমানুষ। আমি যা বলে দেবো, তাই ওরা করে। সব দিকেই আমার ঝক্কি।

তিলুর কথার সুরে যশোর জেলার গ্রাম্য টানগুলি ভবানী বাঁড়ুয্যের এত মিষ্টি লাগে! তিনি নিজে নদীয়া জেলার লোক, সেখানকার বাংলার উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি সুমার্জ্জিত। এদেশে এসে প্রথমে শুনলেন এই ধরনের কথা।

হেসে বল্লেন—শোনো, তোমাদের দেশে বলে কি জানো? শিবির মাটি, পূবির ঘর—মুগির ডালি ঘি দিলি ক্ষীরির তার হয়—

—কি, কি?

—মুগির ডালি মানে মুগের ডালে, ঘি দিলি মানে ঘি দিলে—

—থাক্ ও, আপনার মানে বলতি হবে না। ও কথা আপনি প্যালেন কোথায়?

—এই দেখচি দেশের বুলি ধরেচ, বলতি হবে না, প্যালেন কোথায়! তবে মাঝে মাঝে চেপে থাকো কেন?

—লজ্জা করে আপনার সামনে বলতি—

ভবানী তিলুকে টেনে নিলেন আরো কাছে। জ্যোৎস্না বাঁকা ভাবে এসে সুন্দরী তিলুর সমস্ত দেহে পড়েচে, বয়স ত্রিশ হোলেও স্বামীকে পাবার দিনটি থেকে দেহে ও মনে ও যেন উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী হয়ে গিয়েচে। বালিকাজীবনের কতদিনের অতৃপ্ত সাধ, কুলীনকুমারীর অতি দুর্লভ বস্তু স্বামী-রত্ন এতকালে সে পেয়েছে হাতের মুঠোয়। তাও এমন স্বামী। এখনো যেন তিলুর বিশ্বাস হয় না। যদিও আজ দু'বছর হয়ে গেল।

তিলু বল্লে—আমার মনে হয় কি জানেন? আপনি আসেন নি বলেই আমাদের এতদিন বিয়ে হচ্ছিল না—কুলীনের মেয়ের বিয়ে—

—আচ্ছা, একটা কথা বুঝলাম না। রায় উপাধি তোমাদের, রায় আবার কুলীন কিসের! রায় তো শ্রোত্রিয়—

—ওকথা দাদাকে জিজ্ঞেস করবেন। আমি মেয়েমানুষ, কি জানি। আমরা কুলীন সত্যিই। আমার দুই পিসি ছিলেন, তাঁদের বিয়ে হয় না কিছুতেই। ছোট পিসি মারা যাওয়ার পরে বড় পিসিকে বিয়ে করে নিয়ে গেল কোথায় অজ বাঙাল দেশে-ভালো কুলীনের ছেলে—

—আহা, তোমরা আর বাঙাল দেশ বোলো না। যশুরে বাঙাল কোথাকার! মুগির ডালি ঘি দিলি ক্ষীরির তার হয়। শিবির মাটি, পূবির ঘর—

—যান আপনি কেবল ক্ষ্যাপাবেন—আর আপনাদের যে গেলুম মলুম হালুম হুলুম—হি হি—হি হি—

—আচ্ছা থাক্! তারপর?

—তখন বড় পিসির বয়েস চল্লিশের ওপর। সেখানে গিয়ে আগের সতীনের বড় বড় ছেলেমেয়ে, বিশ-ত্রিশ বছর বয়েস তাদের। সতীন ছিল না। ছেলেমেয়েরা কি যন্ত্রণা দিতো! সব মুখ বুজে সহ্যি করতেন বড় পিসি। নিজের সংসার পেয়েছিলেন কতকাল পরে। একটা বিধবা বড় মেয়ে ছিল, সে পিসিকে কাঠের চ্যালার বাড়ি মারতো, বলতো— তুই আবার কে? বাবার নিকের বৌ, বাবার মতিচ্ছন্ন হয়েচে তাই তোকে বিয়ে করে এনেচে। তাও পিসি মুখ বুজি সয়ে থাকতো। অবশেষে বুড়ো বাহাত্তরে স্বামী তুললো পটল।

—তারপর?

—তারপর সতীনপো সতীনঝিরা মিলে কী দুর্দশা করতে লাগলো পিসির! তারপর তাড়িয়ে দিলে পিসিকে বাড়ি থেকে। পিসি কাঁদে আর বলে—আমার স্বামীর ভিটেতে আমাকে একটু থান দ্যাও। তা তারা দিলে না। পথে বার করে দিলে। সেকালের লজ্জাবতী মেয়েমানুষ, বয়েস হয়েছিল তা কি, কনেবৌয়ের মত জড়োসড়ো। একজনেরা দয়া করে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিলে। কি কান্না পিসির! তারাই বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। তখনো স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান। বাড়ি এসে পিসিকে একাদশী করতে হয় নি বেশিদিন। ভগবান সতীলক্ষ্মীকে দয়া করে তুলে নিলেন।

—এ কতদিন আগের কথা?

—অনেক দিনের। আমি তখন জন্মিচি কিন্তু আমার জ্ঞান হয়নি। পিসিমাকে আমি মনে করতে পারিনে, বড় হয়ে মার মুখে বৌদির মুখে সব শুনতাম। বৌদি তখন কনে-বৌ, সবে এসেচে এ বাড়ি।

তিলু চুপ করল, ভবানী বাঁড়ুয্যেও কতক্ষণ চুপ করে রইলেন। ভবানী বাঁড়ুয্যের মনে হোল, বৃথাই তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সমাজের এই অত্যাচারিতদের সেবার জন্যে বার বার তিনি সংসারে আসতে রাজী আছেন। মুক্তি-টুক্তি এর তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ।

কতদিন আগের সেই অভাগিনী কুলীন-কুমারীর স্মৃতি বহন করে ইছামতী তাঁদের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে, তাঁরই না-মেটা স্বামী-সাধের পুণ্য-চোখের জল ওর জলে মিশে গিয়েচে কতদিন আগে। আজ এই পানকলস ফুলের গন্ধ মাখানো চাঁদের আলোয় তিনিই যেন স্বর্গ থেকে নেমে বললেন—বাবা, আমার যে সাধ পোরে নি, তোমার সামনে যে বসে আছে এই মেয়েটির তুমি সে সাধ পুরিও। বাংলাদেশের মেয়েদের ভালো স্বামী হও, এদের সে সাধ পূর্ণ হোক আমার যা পুরলো না—এই আমার আশীর্বাদ!

ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।

যখন ওরা দেওয়ানবাড়ি পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েচে, একদণ্ড রাত্রিও কেটে গিয়েচে। জগদম্বা বললেন—ওমা, তোরা ছিলি কোথায় রে তিলু? নিলু এসেছিল এই

খানিক আগে। বললে, তারা কতক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েচে। আমি জামাইয়ের জন্যে আহ্নিকের জায়গা করে জলখাবার গুছিয়ে বসে আছি ঠায়, কি যে কান্ড তোদের—

তিলু বলে—কাউকে বোলো না বৌদিদি, উনি নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ওঁকে জলখাবার খাইয়ে দাও। আমার মন কেমন করচে খোকনের জন্যে। কতক্ষণ দেখি নি। নিলু কী বললে, খোকন কাঁদচে না তো।

—না, খোকন ঘুমিয়ে পড়েচে নিলু বলে গেল। তুই খেয়ে নে—

—উনি আহ্নিক করুন আগে। দাদা আসেন নি?

—তাঁর ঘোড়া গিয়েচে আনবার জন্যি।

জলখাবার সাজিয়ে দিলেন জগদম্বা জামাইয়ের সামনে। শালাজ-বৌ হোলেও ভবানী তাঁকে শাশুড়ীর মত সম্মান করেন। জগদম্বা ঘোমটা দিয়ে ছাড়া বেরোন না জামাইয়ের সামনে। মুগের ডাল ভিজে, পাটালি, খেজুরের রস, নারকেল নাড়ু, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ এবং ফেণী বাতাসা। তিলু খেতে খেতে বললে—বিলু-নিলুকে দিয়েচ?

—নিলু এসে খেয়ে গিয়েচে, বিলুর জন্যি নিয়ে গিয়েচে।

—এবার যাই বৌদি। খোকন হয়তো উঠে কাঁদবে।

—জামাইকে নিয়ে আবার পরেও আসবি। দুখানা আঁদোসা ভেজে জামাইকে খাওয়াবো। খেজুরের রসের পায়েস করবো সেদিন। আজ মোটে এক ভাঁড় রস দিয়ে গেল ভজা মুচির ভাই, নইলে আজই করতাম।

—শোনো বৌদি। তোমাদের জামাই বলে কি না আমার বাঙালে কথা। বলে—শিবির মাটি, পূবির ঘর। আবার এক ছড়া বার করেচে—মুগির ডালি ঘি দিলি নাকি ক্ষীরির তার হয়—হি হি—

—আহা, কি শহুরে জামাই! দেবো একদিন শুনিয়ে। তবুও যদি দাড়িতে জট না পাকাতো! আমি যখন প্রথম দেখি তখন এত বড় দাড়ি, যেন নারদ মুনি।

—তোমাদের জামাই তোমরাই বোঝো বৌদি। আমি যাই, খোকন ঠিক উঠেচে। আবার আসবো পরশু।

পথে বার হয়ে ভবানী আগে আগে, তিলু পেছনে ঘোমটা দিয়ে চলতে লাগলো। পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ। এখানে ওদের একত্র ভ্রমণ বা কথোপকথন আদৌ চলবে না।

চন্দ্র চাটুয্যের চন্ডীমন্ডপের সামনে দিয়ে রাস্তা। রাত্রে সেখানে দাবার আড্ডা বিখ্যাত। সম্পর্কে চন্দ্র চাটুয্যে হোলেন তিলুর মামাশ্বশুর। তিলুর বুক টিপ্ টিপ করতে লাগলো, যদি মামাশ্বশুর দেখে ফেলেন? এত রাতে সে স্বামীর সঙ্গে পথে বেরিয়েচে!

চন্ডীমন্ডপের সামনাসামনি যখন ওরা এসেচে তখন চন্ডীমন্ডপের ভিড়ের মধ্যে থেকে কে জিগ্যেস করে উঠল,—কে যায়?

ভবানী গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমি।

—কে, ভবানী?

—হ্যাঁ।

—ও।

লোকটা চুপ করে গেল। তিলু আরও এগিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে—কে ডাকলে?

—মহাদেব মুখুয্যে।

—ভালো জ্বালা। আমাকে দেখলে নাকি?

—দেখলে তাই কি? তুমি আমার সঙ্গে থাক, অত ভয়ই বা কিসের?

—আপনি জানেন না এ গাঁয়ের ব্যাপার। ঐ নিয়ে কাল হয়তো রটনা রটবে। বলবে, অমুকের বৌ সদর রাস্তা দিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল গট্ গট্ করে।

—বয়েই গেল। এসব বদলে যাবে তিলু, থাকবে না, সেদিন আসচে। তোমার আমার দিন চলে যাবে। ঐ খোকন যদি বাঁচে, ওর বৌকে নিয়ে ও পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবে এ গাঁয়ের পথে—কেউ কিছু মনে করবে না।

নালু পাল একখানা দোকান করেচে। ইছামতী থেকে যে বাঁওড় বেরিয়েচে, এটা ইছামতীরই পুরনো খাত ছিল একসময়ে। এখন আর সে খাতে স্রোত বয় না, টোপা পানার দাম জমেচে। নালু পালের দোকান এই বাঁওড়ের ধারে, মুদির দোকান একখানা ভালোই চলে এখানে, মোল্লাহাটির হাটে মাথায় করে জিনিস বিক্রি করবার সময়ে সে লক্ষ্য করেছিল।

নালু পালের দোকানে খদ্দের এল। জাতে বুনো, এদের পূর্বপুরুষ নীলকুঠির কাজের জন্যে এদেশে এসেছিল সাঁওতাল পরগণা থেকে। এখন এরা বাংলা বেশ বলে, কালীপূজো মনসাপূজো করে, বাঙালী মেয়ের মত শাড়ী পরে।

একটি মেয়ে বললে—দু'পয়সার তেল আর নুন দ্যাও গো। মেঘ উঠেচে, বিষ্টি আসবে—

একটি মেয়ে আঁচল থেকে খুললে চারটি পয়সা। সে কড়ি ভাঙাতে এসেচে। এক পয়সায় পাঁচগন্ডা কড়ি পাওয়া যায়—আজ সবাইপুরের হাট, কড়ি দিয়ে শাক বেগুন কিনবে।

নালু পাল আজ বড় ব্যস্ত। হাটবারের দিন আজ, সবাইপুর গ্রাম এখান থেকে আধমাইল, সব লোক হাটের ফেরত ওর দোকান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে যাবে। পয়সার বাক্স আলাদা, কড়ির বাক্স আলাদা—সে শুধু জিনিস বিক্রি করে নির্দিষ্ট বাক্সে ফেলচে।

এখানে বসে সে সস্তায় হাট করে। একটি মেয়ে লাউশাক বিক্রি করতে যাচ্ছে, নালু পাল বললে—শাক কত?

—আট কড়া।

—দূর ছ'কড়া কালও কিনিচি। শাক আবার আটকড়া! কখনো বাপের জন্মে শুনিনি। দে ছ'কড়া করে।

—দিলি বড় খেতি হয়ে যায় যে টাটকা শাক, এখুনি তুলি নিয়ে অ্যালাম।

—দিয়ে যা রে বাপু। টাটকা শাক ছাড়া বাসি আবার কে বেচে?

দুটি কচি লাউ মাথায় একটা ঝুড়িতে বসিয়ে একজন লোক যাচ্ছে। নালুর দৃষ্টি শাক থেকে সেদিকে চলে গেল।

—বলি ও দবিরুদ্দি ভাই, শোনো শোনো ইদিকি—

—কি? লাউ তুমি কিনতি পারবা না। ছস্তায় দিতি পারবো না!

—কত দাম?

—দু'পয়সা এক একটা।

দোকানের তাবৎ লোক দর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। সকলেই ওর দিকে চাইতে লাগল। একজন বললে—ঠাট্টা করলে নাকি?

দবিরুদ্দি মাথার লাউ নামিয়ে একজনের হাত থেকে কল্কে নিয়ে হেসে বললে—ঠাট্টা করবো কেন! মোরা ঠাট্টার যুগ্যি নোক?

নালু হেসে বললে—কথাটা উল্টো বলে ফেললে। আমরা কি তোমার ঠাট্টার যুগ্যি লোক? আসল কথাটা এই হবে। এখন বল কত নেবা?

—এক পয়সা দশ কড়া দিও।

—না, এক পয়সা পাঁচ কড়া নিও। আর জ্বালিও না বাপু, ওই নিয়ে খুশি হও। দুটো লাউই দিয়ে যাও।

বৃদ্ধ হরি নাপিত বসে তামাকের গুল একটা পাতায় জড়ো করছিল। তাকে জিগ্যেস করলে ভূধর ঘোষ—ও কি হচ্চে?

—দাঁত মাজবো বেন্ বেলা। লাউ একটা কিনবো ভেবেলাম তা দর দেখে কিনতি সাহস হোল না। এই মোল্লাহাটির হাটে জন্সন্ সাহেবের আমলে অমন একটা লাউ ছ'কড়া দিয়ে কিনিচি। দশ কড়ায় অমন দুটো লাউ পাওয়া যেত। আমার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, পার্শ্বনাথ ঘোষের বাড়ি ওর বড় ছেলের বৌভাতে একগাড়ি তরকারি এয়েল, এক টাকা দাম পড়ল মোটমাট। অমন লাউ তার মধ্যি পনেরো-বিশটা ছিল। পটল, কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙে, থোড়, মোচা, পালংশাক, শসা তো অগুন্তি। এখন সেই রকম একগাড়ি তরকারি দু'টাকার কম হয়?

অক্রূর জেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—নাঃ, মানুষের খাদ্যখাদক কেরমেই অনাটন হয়ে ওঠেছে। মানুষের খাবার দিন চলে যাচ্চে, আর খাবে কি? এই সবাইপুরে দুধ ছিল ট্যাকায় বাইশ সের চব্বিশ সের। এখন আঠারো সেরের বেশি কেউ দিতি চায় না।

নালু পাল বললে—আঠারো সের কি বলচো খুড়ো? আমাদের গাঁয়ে যোল সেরের বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। একটু সন্দেশ করবো বলে ছানা কিন্তি গিয়েছিলাম অঘোর ঘোষের কাছে, তা নাকি দু'আনা করে খুলি! এক খুলিতে বড্ড জোর পাঁচপোয়া ছানা থাকুক—।

অক্রূর জেলে হতাশভাবে বললে—নাঃ—আমাদের মত গরীবগুরবো না খেয়েই মারা যাবে। অচল হয়ে পড়লো কেরমেশে।

—তা সেই রকমই দাঁড়িয়েচে।

দবিরুদ্দি নিজেকে যথেষ্ট তিরস্কৃত বিবেচনা করে এক একটা লাউ এক এক পয়সা হিসাবে দাম চুকিয়ে নিয়ে হাটের দিকে চলে গেল। নালু পাল তাকে একটা পয়সা দিয়ে বললে—অম্নি এক কাজ করবা। এক পয়সার চিংড়ি মাছ আমার জন্যি কিনে এনো। লাউ দিয়ে চিংড়ি দিয়ে তবে মজে। বেশ ছট্কালো দেখে দোয়াড়ির চিংড়ি আনবা।

হরি নাপিত বললে—চালখানা ছেয়ে নেবো বলে ঘরামির বাড়ি গিইছিলাম। চার আনা রোজ ছেল বরাবর, সেদিন সোনা ঘরামি বললে কিনা চার আনায় আর চাল ছাইতে পারবো না, পাঁচ আনা করি দিতি হবে। ঘরামি জন পাঁচ আনা আর একটা পেটেল দু'আনা—তাহলি একখানা পাঁচ-চালা ঘর ছাইতে কত মজুরি পড়লো বাপধনেরা? পাঁচ-ছ টাকার কম নয়।

বর্তমান কালের এই সব দুর্মূল্যতার ছবি অক্রূরকে এত নিরাশ ও ভীত করে তুললো যে

সে বেচারী আর তামাক না খেয়ে কল্কেটি মাটিতে নামিয়ে রেখে হন্‌হন্ করে চলে গেল।

কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার তাকে ফিরতে হোল। অক্রূর জেলের বাড়ি প্যাশের গ্রাম পুস্তিঘাটায়। তার বড় ছেলে মাছ ধরার বাঁধাল দিয়েচে সবাইপুরের বাঁওড়ে। হঠাৎ দেখা গেল দূরে ডুমুরগাছের তলায় সে আসচে, মাথায় চুপড়িতে একটা বড় মাছ।

অক্রূর চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। অত বড় মাছটা কি তার ছেলে পেয়েছে নাকি? বিশ্বাস তো হয় না! আজ হাট করবার পয়সাও তার হাতে নেই। যত কাছে আসে ওর ছেলে, তত ওর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওঃ, মস্ত বড় মাছটা দেখচি।

দূর থেকে ছেলে বললে—কনে যাচ্চ বাবা?

—বাড়ি যাচ্ছিলাম। মাছ কাদের?

—বাঁধালের মাছ। এখন পড়লো।

—ওজন?

—আট সের দশ ছটাক। তুমি মাছটা নিয়ে হাটে যাও।

—তুমি কনে যাবি?

—নৌকো বাঁওড়ের মুখে রেখে অ্যালাম যে। ঝড় হলি উড়ে বেরিয়ে যাবে। তুমি যাও।

নালু পালের দোকানে খদ্দেরের ভিড় আরম্ভ হবে সন্দে বেলা। এই সময়টা সে পাঁচজনের সঙ্গে গল্পগুজব করে দিন কাটায়। অক্রূর জেলেকে দোকানের সবাই মিলে দাঁড় করালে। বেশ মাছটা। এত বড় মাছ অবেলায় ধরা পড়ল?

নালু বললে—মাছটা আমাদের দিয়ে যাও অক্রূরদা—

—ন্যাও না। আমি বেঁচে যাই তা হলি। অবেলায় আর হাটে যাই নে।

—দাম কি?

—চার টাকা দিও।

—বুঝে-সুজে বল অক্রূরদা। অবিশ্যি অনেকদিন তুমি বড় মাছ বিক্রি করনি, দাম জানো না। হরি কাকা, দাম কত হতে পারে?

হরি নাপিত ভালো করে মাছটা দেখে বললে—আমাদের উঠতি বয়েসে এ মাছের দাম হোত দেড় ট্যাকা! দাও তিন ট্যাকাতে দিয়ে যাও।

—মাপ করে দাদা, পারবো না। বড় ঠকা হবে।

—আচ্ছা, সাড়ে তিন ট্যাকা পাবা। আর কথাটি বোলো না, আজ দু'ট্যাকা নিয়ে যাও। কাল বাকিটা নেবে।

মাছ কিনে কেউ বিশেষ সন্তুষ্ট হোল না, কারণ অক্রূর মাঝিকে এরা বেশি ঠকাতে পারেনি। ন্যায্য দাম যা হাটেবাজারে তার চেয়ে না হয় আনা-আটেক কম হয়েচে।

নালু পাল বললে—কে কে ভাগ নেবা, তৈরী হও। নগদ পয়সা। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?

পাঁচ-ছ'জন নগদ দাম দিয়ে মাছ কিনতে রাজী হোল। সবাই মিলে মাছটা কেটে ফেললে দোকানের পেছনে বাঁশতলার ছায়ায় বসে। এক-একখানা মানকচুর পাতা যোগাড় করে এনে এক এক ভাগ মাছ নিয়ে গেল প্রত্যেকে।

নালু পাল নিলে এক ভাগের অর্দ্ধেকটা।

অক্রূর জেলে বললে—পাল মশায়, অর্ধেক কেন, পুরো নিলে না?

—না হে, দোকানের অবস্থা ভালো না। অত মাছ খেলেই হোল!

—তোমরা তো মোটে মা ছেলে, একটা বুঝি বোন। সংসারে খরচ কি?

—দোকানটাকে দাঁড় না করিয়ে কিছু করচি নে দাদা।

—বৌ নিয়ে এসো এই সামনের অঘ্রাণে। আমরা দেখি।

—ব্যবসা দাঁড় করিয়ে নিই আগে। সব হবে।

নালু পাল আর কথা বলতে সময় পেলে না। দোকানে ওর বড় ভিড় জমে গেল। কড়ির খদ্দের বেশী, পয়সার কম। টাকা ভাঙাতে এলো না একজনও। কেউ টাকা বার করলে না। অথচ রাত আটটা পর্যন্ত দলে দলে খদ্দেরের ভিড় হোল ওর দোকানে। ভিড় যখন ভাঙলো তখন রাত অনেক হয়েচে।

এক প্রহর রাত্রি।

তবিল মেলাতে বসলো নালু পাল। কড়ি গুনে গুনে একদিকে, পয়সা আর একদিকে। দু'টাকা সাত আনা পাঁচ কড়া।

নালু পাল আশ্চর্য হয়ে গেল। এক বেলায় প্রায় আড়াই টাকা বিক্রি। এ বিশ্বাস করা শক্ত। সোনার দোকানটুকু। মা সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় এখন এই রকম যদি চলে রোজ রোজ তবেই।

আড়াই টাকা এক বেলায় বিক্রি। নালু পাল কখনো ভাবে নি। সামান্য মশলার বেসাতি করে বেড়াতো হাটে হাটে। রোদ নেই, বর্ষা নেই, কাদা নেই, জল নেই—সব শরীরের ওপর দিয়ে গিয়েচে। গোপালনগরের বড় বড় দোকানদার তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতো না। জিনিস বেসাতি করে মাথায় নিয়ে, সে আবার মানুষ!

আজ আর তার সে দিন নেই। নিজের দোকান, খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল। দোকানে তক্তপোশের ওপর বসে সে বিক্রি করে গদিয়ান চালে। কোথাও তাকে যেতে হয় না, রোদবৃষ্টি গায়ের ওপর দিয়ে যায় না। নিজের দোকানের নিজে মালিক। পাঁচজন এসে বিকেলে গল্প করে বাইরে বাঁশের মাচায় বসে। সবাই খাতির করে, দোকানদার বলে সম্মান করে।

আড়াই টাকা বিক্রি। এতে সে যত আশ্চর্যই হোক, এর বেশি তাকে তুলতে হবে। পাঁচ টাকায় দাঁড় করাতে যদি পারে দৈনিক বিক্রি, তবেই সে গোবর্ধন পালের উপযুক্ত পুত্র। মা সিদ্ধেশ্বরী সে দিন যেন দেন।

নালু পাল কিছু ধানের জমির চেষ্টায় ঘুরচে আজ কিছুদিন ধরে। রাত্রে বাড়ি গিয়ে সে ঠিক করলে সাতবেড়ের কানাই মন্ডলের কাছে কাল সকালে উঠেই সে যাবে। সাতবেড়েতে ভাল ধানী জমি আছে বিলের ধারে, সে খবর পেয়েছে।

—বিয়ে?

ও কথাটা হরি নাপিত মিথ্যে বলে নি কিছু। বিয়ে করে বৌ না আনলে সংসার মানায়?

তার সন্ধানে ভালো মেয়েও সে দেখে রেখেছে—বিনোদপুরের অম্বিক প্রামাণিকের সেজ মেয়ে তুলসীকে।

সেবার তুলসী জল দিতে বেলতলায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়েছিল। দু'বার চেয়েছিল, নালু লক্ষ্য করেচে। তুলসীর বয়স এগার বছরের কম হবে না, শ্যামাঙ্গী মেয়ে, বড় বড় চোখ—

হাতপায়ের গড়ন কি চমৎকার যে ওর, চোখে না দেখলে বোঝানো যাবে না। বিনোদপুরের মাসির বাড়ি আজকাল মাঝে মাঝে যাতায়াত করার মূলেই যে মাসিদের পাড়ার অম্বিক প্রামাণিকের এই মেয়েটি—তা হয়তো স্বয়ং মাসিও খবর রাখেন না। কিন্তু না, কথা তা নয়।

বিয়ে করতে চাইলে, তুলসীর বাবা হাতে স্বর্গ পাবেন সে জানে। বিয়ে করতে হলে এমন একটি শ্বশুর দরকার যে তার ভাল অভিভাবক হতে পারে। সে নিজে অভিভাবকশূন্য, তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহ দেবার কেউ নেই, বিপদে আপদে পরামর্শ করবার কেউ নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর একা তাকে যুঝতে হচ্ছে সংসারের মধ্যে। বিনোদ প্রামাণিক ওই গ্রামের ছোট আড়তদার, সর্ষে, কলাই, মুগ কেনাবেচা করে, খড়ের চালা আছে খান-দুই বাড়িতে। এমন কিছু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ নয়, হঠাৎ হাত পাতলে পঞ্চাশ-একশো বার করবার মত সঙ্গতি নেই ওদের। নালুর এখন কিন্তু সেটাও দরকার। ব্যবসার জন্যে টাকা দরকার। মাল সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, এখুনি বায়না করতে হবে—এ সময়ে ব্যবসা আরো বড় করে ফাঁদতে পারতো। ব্যবসা সে বুঝেছে—কিন্তু টাকা দেবে কে?

নালুর মা ভাত নিয়ে বসেছিল রান্নাঘরের দাওয়ায়। ও আসতেই বললে—বাবা নালু এলি? কতক্ষণ যে বসে ঢুলুনি নেমেচে চকি।

—ভাত বাড়ো। খিদে পেয়েচে।

—হাত পা ধুয়ে আয়। ময়না জল রেখে দিয়েচে ছেঁচতলায়।

—ময়না কোথায়?

—ঘুমুচ্ছে।

—এর মধ্যি ঘুম?

—ওমা, কি বলিস? ছেলেমানুষের চকি ঘুম আসে না এত রাত্তিরি?

—পরের বাড়ি যেতে হবে যে। না হয় আর এক বছর। তারা খাটিয়ে নেবে তবে খেতে দেবে। বসে খেতে দেবে না। চকি ঘুম এলি তারা শোনবে না।

নালু ভাত খেতে বসলো। উচ্ছেচচ্চড়ি আর কলাইয়ের ডাল। ব্যস, আর কিছু না। রাঙা আউস চালের ভাত আর কলাইয়ের ডাল মেখে খাবার সময় তার মুখে এমন একটি তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠলো যা বসে দেখবার ও উপভোগ করবার মতো।

ময়না এসে বললে—দাদা, তামাক সাজি?

—আন।

—তুমি নাকি আমায় বক্‌ছিলে ঘুমুইচি বলে, মা বলচে।

—বক্‌চিই তো। ধাড়ী মোষ, সংসারে কাজ নেই—এত সকালে ঘুম কেন?

—বেশ করবো।

—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—আ মোলো যা—

—গাল দিও না দাদা বলে দিচ্ছি। তোমার খাই না পরি?

—তবে কার খাস পরিস, ও পোড়ারমুখী?

—মার।

—মা তোমাকে এনে দেয় রোজগার করে! বাঁদ্‌রি কোথাকার, ধুচুনি মাথায় দোজবরে বুড়ো বর যদি তোর না আনি—

—ইস বুঁটি দিয়ে নাক কেটে দেবো না বুড়ো বরের? হাঁ দাদা, তুমি আমাদের বৌদিদিকে কবে আনচো?

—তোমায় আগে পার করি। তবে সে কথা। তোমার মত খান্ডার ননদকে বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে—

—আহাহা! কথার কি ছিরি! খান্ডার ননদ দেখো তখন বৌদিদির কত কাজ করে দেবে। আমার পাল্‌কি কই?

—পাল্‌কি পাই নি। পোড়ানো থাকে না তো। সুরো পোটোকে বলে রেখেছি। রথের সময় রং করে দেবে।

—পুতুলের বিয়ে দেব আষাঢ় মাসে। তার আগে কিনে দিতে হবে পাল্‌কি। না যদি দাও তবে—

—যা যা, তামাক সেজে আন। বাজে বকুনি রেখে দে।

ময়না তামাক সেজে এনে দিল। অল্প কয়েক টান দিয়েই নালু পাল একটা মাদুর দাওয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

গ্রীষ্মকাল। আতা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে। আকাশে সামান্য একটু জ্যোৎস্না উঠেছে কৃষ্ণাতিথির।

নন্দীদের বাগানে শেয়াল ডেকে উঠলো। রাত হয়েচে নিতান্ত কমও নয়। এ পাড়া নিষুতি হয়ে এসেছে।

ময়না আবার এসে বললে—পা টিপে দেবো?

—না না, তুই যা। ভারি আমার—

—দিই না।

—রাত হয়েচে। শুগে যা। কাল সকালে আমায় ডেকে দিবি। সাতবেড়েতে যাবো জমি দেখতি।

—ডাকবো। পা টিপতি হবে না তো?

—না, তুই যা।

নালু পাল বাড়ি ফিরবার পথে সন্নিসিনীর আখড়ায় একটা ক'রে আধলা পয়সা দিয়ে যায় প্রতি রাত্রে। দেবদ্বিজে ওর খুব ভক্তি, ব্যবসায় উন্নতি তো হবে ওঁদেরই দয়ায়। সন্নিসিনীর আশ্রম বাঁওড়ের ধারের রাস্তার পাশে প্রাচীন এক বটবৃক্ষতলে, নিবিড় সাঁই-বাবলা বনের আড়ালে, রাস্তা থেকে দেখা যায় না। সন্নিসিনীর বাড়ি ধোপাখোলা, সে নাকি হঠাৎ স্বপ্ন পেয়েছিল, এ গ্রামের এই প্রাচীন বটতলার জঙ্গলে শ্মশানকালীর পীঠস্থান সাড়ে তিনশো বছর ধরে লুকোনো। তাই সে এখানে এসে জঙ্গল কেটে আশ্রম বসিয়েছিল বছর সাতেক আগে। এখন তার অনেক শিষ্যসেবক, পূজো-আচ্চা ধন্না দিতে আসে ভিন্ন গ্রামের কত লোক।

সন্ধ্যার পরে যারা আসে, বৈঁচি গাছের জঙ্গল ঘেঁষে যে খড়ের নীচু ঘরখানা, যার মাথার উপর বটগাছের ডালটা, যেখানে বাসা বেঁধেচে অজস্র বাবুই, যেখানে ঝোলে কলাবাদুড়ের পাল, রাত্রের অন্ধকারে সেই ঘরটির দাওয়ায় বসে ওরা গাঁজার আড্ডা জমায়।

নালুকে বললে ছিহরি জেলে,—কেডা গা? নালু?

—হ্যাঁ।

—কি করতি এলে?

—মায়ের বিত্তিটা দিয়ে যাই। রোজ আসি।

—বিত্তি?

—হ্যাঁ গো।

—কত?

—দশকড়া। আধপয়সা।

—বসো। একটু ধোঁয়া ছাড়বা না?

—না, ওসব চলে না। বোসো তোমরা। আর কে কে আছে?

—নেই এখন কেউ। হরি বোষ্টম আসে, মনু যুগী আসে, দ্বারিক কর্মকার আসে, হাফেজ আসে, মনসুর নিকিরি আসে।

নালু কি একটা কথা বলতে গিয়ে বড় অবাক হয়ে গেল। তার চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে উঠলো। দেওয়ানবাড়ির জামাই বাঁড়ুয্যে মশাইকে সে হঠাৎ দেখতে পেলে অশ্বত্থতলার দিকে আসতে। উনিও কি এখানে গাঁজার আড্ডায়—?

নালু দাঁড়ালো চুপ করে দাওয়ার বাইরে ছেঁচ্‌তলায়।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে বটতলায় বসলেন আসনের সামনে। মূর্তি নেই, ত্রিশূল বসানো সিঁদুরলেপা একটি উঁচু জায়গা আছে গাছতলায়, আসন বলা হয় তাকেই। ভবানী বাঁড়ুয্যে একমনে বসে থাকবার পরে সন্নিসিনী সেখানে এসে বসলো তাঁর পাশেই। সন্নিসিনীর রং কালো, বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, মুখশ্রী তাড়কা রাক্ষসীকে লজ্জা দেয়, মাথার দুদিক থেকে দুটি লম্বা জট এসে কোলের ওপর পড়েচে।

ভবানী বললেন—কি খেপী, খবর কি?

—ঠাকুর, কি খবর বলো।

—সাধনা-টাধনা করচো?

—আপনাদের দয়া। জেতে হাড়িডোম, কি সাধনা করবো আমরা ঠাকুর? আজও আসনসিদ্ধি হোল না দেবতা।

—আমি আসবো সামনের অমাবস্যেতে দেখিয়ে দেবো প্রণালীটা।

—ওসব হবে না ঠাকুর। আর ফাঁকি দিও না। আমাকে শেখাও।

—দূর খেপী, আমি কি জানি? তাঁর দয়া। আমি সাধন-ভজন করিও নে, মানিও নে—তবে দেখি তোমাদের এই পর্যন্ত।

—আমায় ঠকাতে পারবে না ঠাকুর। তুমি রোজ এখানে আসবে, সন্দের পর। যত সব অজ্ঞান লোকেরা ভিড় করে রাত দিন; নিয়ে এসো ওষুধ, নিয়ে এসো মামলা জেতা, ছেলে হওয়া—

—সে তোমারই দোষ। সেটা না করতেই পারতে গোড়া থেকে। ধন্না দিতে দিলে কেন?

—তুমি ভুলে যাচ্চ। এ জায়গাটা গোরাসাহেবের বাংলা নয়—তবে এত লোক আসে কেন? ধর্মের জন্যে নয়। অবস্থা ঘোরাবার জন্যে। মামলা জেতবার জন্যে!

—সে তো বুঝি।

—একটু থেকে দেখবেন না দিনের বেলায়। এত রাতে আর কি আছে? চলে গেল সবাই।

কি বিপদ যে আমার। সাধন-ভজন সব যেতে বসেচে, ডাক্তার বদ্যি সেজে বসেচি। শুধু রোগ সারাও, আর রোগ সারাও।

নালু পাল এ সব শুনে কিছু বুঝলে, কিছু বুঝলে না। ভবানী বাঁড়ুয্যেকে সে অনেকবার দেখেচে, দেওয়ান মহাশয়ের জামাই সুচেহারার লোক বটে, দেখলে ভক্তি হয়। বাড়ি ফিরে মাকে সে বল্লে—একটা চমৎকার জিনিস দেখলাম আজ! সন্নিসিনির গুরু হলেন আমাদের দেওয়ানজির ভগ্নিপতি বড়দিদি-ঠাকরুণের বর। তিনি দিদি-ঠাকুরণেরই বর। সব কথা বোঝলাম না, কি বল্লেন, কিন্তু সন্নিসিনী যে অত বড়, সে একেবারে তটস্থ।

তিলু বললে—এত রাত করলেন আজ! ভাত জুড়িয়ে গেল। নিলু ইদিকি আয়, জায়গা করে দে—বিলু কোথায়?

নিলু চোখ মুছতে মুছতে এল। রান্নাঘরের দাওয়া ঝাঁট দিতে দিতে বললে—বিলু ঘুমিয়ে পড়েচে। কোথায় ছিলেন নাগর এত রাত অব্‌ধি? নতুন কিছু জুটলো কোথাও?

ভবানী বাঁড়ুয্যে অপ্রসন্ন মুখে বললেন—তোমার কেবল যতো—

—হি, হি হি—

—হ্যাঁঃ—হাসলেই মিটে গেল।

—কি করতি হবে শুনি তবে।

—দ্যাখো গে লোকে কি করচে। মানুষ হয়ে জন্মে আর কিছু করবে না? শুধু খাবে আর বাজে বকবে?

—ওগো অত শত উপদেশ দিতি হবে না আপনার। আপনি পরকালের ইহকালের সর্বস্ব আমাদের। আর কিছু করতি হয়, সে আপনি করুন গিয়ে। আমরা ডুমুরের ডালনা দিয়ে ভাত খাবো আর আপনার সঙ্গে ঝগড়া করবো। এতিই আমাদের স্বগ্‌গো। খেয়ে উঠে খোকাকে ধরুন।

ভবানী খেয়ে উঠে খোকনকে আদর করলেন কতক্ষণ ধরে। আট মাসের সুন্দর শিশু। তিলুর খোকা। সে হাব্‌লার মত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর অকারণে একগাল হাসি হাসে দন্তবিহীন মুখে, বলে ওঠে—গ্‌-গ-গ্‌-গ—

ভবানী বলেন—ঠিক ঠিক।

—হেঁ—এ—এ—ইয়া। গ্‌-গ্‌-গ্‌-গ্‌-গুঁ—

—ঠিক বাবা।

খোকা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নিজের হাতখানা নিজের চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে—যেন কত আশ্চর্য জিনিস। ভবানীর সামনে অন্তত আকাশের এক ফালি। বাঁশবনে জোনাকি জ্বলচে। অন্ধকারে পাকা ফলের গন্ধের সঙ্গে বনমালতী ও ঘেঁট্‌কোল ফুলের গন্ধ। নক্ষত্র উঠেচে এখানে ওখানে আকাশে। কত বড় আকাশ, কত নক্ষত্র—চাঁদ উঠেচে কৃষ্ণা তৃতীয়ার, পূর্ব দিগন্ত আলো হয়েচে। এই ফুল, এই অন্ধকার, এই অবোধ শিশু, এই নক্ষত্র-ওঠা-আকাশ সবই এক হাতের তৈরি বড় ছবি। ভবানী অবাক হয়ে যান ওর খোকার মতই।

তিলু বললে—খোকনের ভাত দেবেন কবে?

—ভাত হবে উপনয়নের সময়।

—ওমা, সে আবার কি কথা! তা হয় না, আপনি অন্নপ্রাশনের দিনক্ষ্যাণ দেখুন। ও বললি চলবে না।

—তোমাদের বাঙালদেশে এক রকম, আমাদের আর এক রকম। ওসব চলবে না আমাদের নদে-শান্তিপুরের সমাজে। তুমি ওকে একটু আদর কর দিকি?

তিলু তার সুন্দর মুখখানি খোকনের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে কানের মাকড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে অনবদ্য ভঙ্গিতে আদর করতে লাগলো—ও খোকন, ও সন্‌লু, তুমি কার খোকন? তুমি কার সন্‌লু, কার মান্‌কু? সঙ্গে সঙ্গে খোকা মায়ের চুল ক্ষুদ্র একরত্তি হাতের মুঠো দিয়ে অক্ষম আকর্ষণে টেনে এনে, মায়ের মাথার লুটন্ত কালো চুলের কয়েক গাছি নিজের মুখের কাছে এনে, খাবার চেষ্টা করলে। তারপর দন্তবিহীন একগাল হাসি হাসলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে একবার আকাশের দিকে চাইলেন, নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ—নিচে এই মা ও ছেলের ছবি। অমনি স্নেহময়ী মা আছেন এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে, নইলে এই মা, এই স্নেহ এখানে থাকতো না—ভবানী বাঁড়ুয্যে ভাবেন।

ভবানী কত পথে পথে বেড়িয়েচেন, কত পর্বতে সাধু-সন্নিসির খোঁজ করেচেন, কত যোগাভ্যাস করেচেন, আজকাল এই মা-ছেলের গভীর যোগাযোগের কাছে তাঁর সকল যোগ ভেসে গিয়েচে। অনুভূতি সর্বাশ্রয়ী, সর্বমঙ্গলকর সে অনুভূতির দ্বারপথে বিশ্বের রহস্য যেন সবটা চোখে পড়লো। ক্ষণশাশ্বতীর অমরত্ব আসা-যাওয়ার পথের এই রেখাই যুগে যুগে কবি, ঋষি ও মরমী সাধকেরা খোঁজেন নি কি?

তিনি আছেন তাই এই মা আছে, ছেলে আছে, ফুল আছে, স্নেহ আছে, আত্মত্যাগ আছে, সেবা আছে, প্রেমিকা আছে, প্রেমিক আছে।

ভবানীর মনে আছে তিনি একবার কানপুরে একজন প্রসিদ্ধ খেয়াল-গায়কের গান শুনেছিলেন, তাঁর নাম ছল কানহাইয়া লাল সান্তারা, প্রসিদ্ধ গায়ক হনুমানদাসজীর তিনি ছিলেন গুরুভাই। স্থায়ীর বাণীটি শ্রোতাদের সামনে নিখুঁত পাকা সুরে শুনিয়ে নিয়ে তারপর এমন সুন্দর অলঙ্কার সৃষ্টি করতেন, এমন মধুর সুরলহরী ভেসে আসতো তাঁর কণ্ঠ থেকে সুরপুরের বীণানিক্কণের মত—যে কতকাল আগে শুনলেও আজও যখনি চোখ বোজেন ভবানী শুনতে পান ত্রিশ বছর আগে শোনা সেই অপূর্ব দরবারী কানাড়ার সুরপুঞ্জ।

বড় শিল্পী সবার অলক্ষ্যে কখন যে মনোহরণ করেন, কখন তাঁর অমর বাণী দরদের সঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দেন মানুষের অন্তরতম অন্তরটিতে!

ভবানী বিস্মিত হয়ে উঠলেন। এই মা ও শিশুর মধ্যেও সেই অমর শিল্পীর বাণী, অন্য ভাষায় লেখা আছে। কেউ পড়তে পারে, কেউ পারে না।

বাইরে বাঁশগাছে রাতচরা কি পাখী ডাকচে, জিউল গাছের বউলের মধু খেতে যাচ্ছে পাখীটা। জেলেরা আলোয় মাছ ধরছে বাঁওড়ে, ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে তার। আলোয় মাছ ধরতে হোলে নৌকার ওপর ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে হয়—এ ভবানী বাড়ুয্যে এদেশে এসে দেখেচেন। বেশ দেশ। ইছামতীর স্নিগ্ধ জলধারা তাঁর মনের ওপরকার কত ময়লা ধুয়ে মুছে দিয়েচে। সংসারের রহস্য যারা প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছে করে, তারা চোখ খুলে যেন বেড়ায় সব সময়। সংসার বর্জন করে নয়, সংসারে থেকেই সেই দৃষ্টি লাভ করতে পারার মন্ত্র ইছামতী যেন তাকে

দান করে। কলস্বনা অমৃতধারাবাহিনী ইছামতী!...যে বাণী মনে নতুন আশা আনন্দ আনে না, সে আবার কোন্ ঈশ্বরের বাণী?

তিলু বললে—সত্যি বলুন, কবে ভাত দেবেন?

—তুমিও যেমন, আমরা গরীব। তোমার বাপের বাড়ির মান বজায় রেখে দিতে গেলে কত লোককে নেমন্তন্ন করতে হবে। সে এক হৈ-হৈ কান্ড হবে। আমি ঝামেলা পছন্দ করিনে।

—সব ঝামেলা পোয়াবো আমি। আপনাকে কিছু ভাবতি হবে না।

—যা বোঝো করো। খরচ কেমন হবে?

—চালডাল আনবো বাপের বাড়ি থেকে। দু'টাকার তরকারি একগাড়ি হবে। পাঁচখানা গুড় পাঁচসিকে। আধ মণ দুধ এক টাকা। দেড় মণ মাছ পনের টাকা। আবার কি?

—কত লোক খাবে?

—দু'শো লোক খাবে ওর মধ্যে। আমার হিসেব আছে। দাদার লোকজন খাওয়ানোর বাতিক আছে, বছরে যজ্ঞি লেগেই আছে আমাদের বাড়ি। তিরিশ টাকার ওপর যাবে না।

—তুমি তো বলে খালাস। তিরিশ টাকা সোজা টাকা! তোমার কি, বড় মানুষের মেয়ে। দিব্যি বলে বসলে।

তিলু রাগভরে ঘাড় বাঁকিয়ে বললে—আমি শুনবো না, দিতিই হবে খোকার ভাত।

নিলু কোথা থেকে এসে বললে—দেবেন না ভাত? তবে বিয়ে করবার শখ হয়েছিল কেন?

ভবানী তিরস্কারের সুরে বললেন—তুমি কেন এখানে? আমাদের কথা হচ্চে—

নিলু বললে—আমারও বুঝি ছেলে নয়?

—বেশ। তাই কি?

—তাই এই—খোকনের ভাত দিতে হবে সামনের দিনে।

ভবানী বাঁড়ুয্যের নবজাত পুত্রটির অন্নপ্রাশন। তিলু রাত্রে নাড়ু তৈরি করলে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পুরো পাঁচ ঝুড়ি। খোকা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, যে দেখে সে-ই ভালবাসে। তিলু খোকার জন্য একছড়া সোনার হার গড়িয়ে দিয়েছে দাদাকে বলে। রাজারাম নিজের হাতে সোনার হারছড়া ভাগ্নের গলায় পরিয়ে দিলেন।

তিলুদের অবস্থা এমন কিছু নয়, তবুও গ্রামের কাউকে ভবানী বাঁড়ুয্যে বাদ দিলেন না। আগের দিন পাড়ার মেয়েরা এসে পর্বতপ্রমাণ তরকারি কুটতে বসলো। সারারাত জেগে সবাই মাছ কাটলে ও ভাজলে।

গ্রামের কুসী ঠাকুরুণ ওস্তাদ রাঁধুনী, শেষরাতে এসে তিনি রান্না চাপালেন, মুখুয্যেদের বিধবা বৌ ও ন'ঠাকরুণ তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

ভাত রান্না হোল কিন্তু বাইরে লম্বা বান্ কেটে। আর ছিরু রায় এবং হরি নাপিত বাকী মাছ কুটে ঝুড়ি করে বাইরের বানে নিয়ে এল ভাজিয়ে নিতে। ভাত যারা রান্না করছিল, তারা হাঁকিয়ে দিয়ে বললে—এখন তাদের সময় নেই। নিজেরা বান্ কেটে মাছ ভাজুক গিয়ে। এই কথা নিয়ে দুই দলে ঘোর তর্ক ও ঝগড়া, বৃদ্ধ বীরেশ্বর চক্কত্তি এসে দু'দলের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন শেষে।

রাজারামের এক দূরসম্পর্কের ভাইপো সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেচে। সেখানে সে আমুটি কোম্পানীর কুঠিতে নকলনবিশ। গলায় পৈতে মালার মত জড়িয়ে রাঙা গামছা কাঁধে সে রান্নার তদারক ক'রে বেড়াচ্ছিল। বড় চালের কথাবার্তা বলে। হাত পা নেড়ে গল্প করছিল—কলকাতায় একরকম তেল উঠেচে, সায়েবরা জ্বালায়, তাকে মেটে তেল বলে। সায়েবরা জ্বালায় বাড়িতে। বড় দুর্গন্ধ।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—পিদিম জ্বলে?

—না। সায়েব বাড়ির বাতিতে জ্বলে। কাঁচ বসানো, সে এখানে কে আনবে? অনেক দাম।

হরি রায় বললেন—আমাদের কাছে কল্‌কেতা কল্‌কেতা করো না। কল্‌কেতায় যা আছে তা আগে আসবে আমাদের নীলকুঠিতে। এদের মতো সায়েব কল্‌কেতায় নেই।

—নাঃ নেই! কলকাতার কি দেখেচ তুমি? কখনো গেলে না তো? নৌকা করে চলো নিয়ে যাবো।

—আচ্ছা, নাকি কলের গাড়ি উঠেচে সায়েবদের দেশে? নীলকুঠির নদেরচাঁদ মন্ডল শুনেচে ছোট সায়েবের মুখে। ওদের দেশ থেকে নাকি কাগজে ছেপে ছবি পাঠিয়েচে। কলের গাড়ি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে কোলে নিয়ে পাড়া প্রদক্ষিণ করতে চললেন, পেছনে পেছনে স্বয়ং রাজারাম চললেন ফুল আর খই ছড়াতে ছড়াতে। দীনু মুচি ঢোল বাজাতে বাজাতে চললো। বাঁশি বাজাতে বাজাতে চললো তার ছেলে। রায়পাড়া, ঘোষপাড়া ও পুবেরপাড়া ঘুরে এলেন ভবানী বাঁড়ুয্যে অতটুকু শিশুকে কোলে করে নিয়ে। বাড়ি বাড়ি শাঁখ বাজতে লাগলো। মেয়েরা ঝুঁকে দেখতে এল খোকাকে।

ব্রাহ্মণভোজনের সময় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা হতে লাগলো।। কে কত কলাইয়ের ডাল খেতে পারে। কে কত মাছ খেতে পারে। মিষ্টি শুধু নারকোল নাড়ু। খেতে বসে অনেকে বললেন এমন নারকোলের নাড়ু তাঁরা অনেককাল খান নি। অন্য কোন মিষ্টির রেওয়াজ ছিল না দেশে। এক একজন লোক সাত আট গন্ডা নারকোলের নাড়ু, আরো অতগুলো অন্নপ্রাশনের জন্য ভাজা আনন্দনাড়ু উড়িয়ে দিলে অনায়াসে।

ব্রাহ্মণভোজন প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় কুখ্যাত হলা পেকে বাড়িতে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে। ভবানী ওকে চিনতেন না, নবাগত লোক এ গ্রামে। অন্য সকলে তাকে খুব খাতির করতে লাগলো। রাজারাম বললেন—এসো বাবা হলধর, বাবা বসো—

ফণি চক্কত্তি বললেন—বাবা হলধর, শরীর গতিক ভালো?

দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার, রণ-পা পরে চল্লিশ ক্রোশ রাস্তা রাতারাতি পার হওয়ার ওস্তাদ, অগুন্তি নরহত্যাকারী ও লুটেরা, সম্প্রতি জেল-ফেরত হলা পেকে সবিনয়ে হাতজোড় করে বললে—আপনাদের ছিচরণের আশিব্বাদে বাবাঠাকুর—

—কবে এলে?

—এ্যালাম শনিবার বেন্‌বেলা বাবাঠাকুর। আজ এখানে দুটো পেরসাদ পাবো ব্রাহ্মণের পাতের—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা বোসো।

হলা পেকে নীলকুঠির কোর্টের বিচারে ডাকাতির অপরাধে তিন বৎসর জেলে প্রেরিত হয়েছিল। গ্রামের লোকে সভয়ে দেখলে সে খালাস পেয়ে ফিরেচে। ওর চেহারা দেখবার মত বটে। যেমন লম্বা তেমনি কালো দশাসই সাজোয়ান পুরুষ, একহাতে বন্‌বন্ করে ঢেঁকি ঘোরাতে পারে, অমন লাঠির ওস্তাদ এদেশে নেই—একেবারে নির্ভীক, নীলকুঠির মুডি সাহেবের টম্‌টম্ গাড়ী উল্টে দিয়েছিল ঘোড়ামারি মাঠের ধারে। তবে ভরসা এই দেবদ্বিজে নাকি ওর অগাধ ভক্তি, ব্রাহ্মণের বাড়ি সে ডাকাতি করেছে বলে শোনা যায় নি, যদিও এ-কথায় খুব বেশী ভরসা পান না এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা।

হলা পেকে খেতে বসলে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই বলতে লাগলো, বাবা হলধর, ভালো ক'রে খাও।

হলধর অবিশ্যি বলবার আবশ্যক রাখলে না কারো। দু'কাঠা চালের ভাত, দু'হাঁড়ি কলাইয়ের ডাল, একহাঁড়ি পায়েস, আঠারো গণ্ডা নারকেলের নাড়ু, একখোরা অম্বল আর দুঘটি জল খেয়ে সে ভোজন-পর্ব সমাধা করলে।

তারপর বললে—খোকার মুখ দেখবো।

তিলু শুনে ভয় পেয়ে বললে—ওমা, ও খুনে ডাকাত, ওর সামনে খোকারে বার করবো না আমি।

শেষ পর্যন্ত ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজে খোকাকে কোলে নিয়ে হলা পেকের কোলে তুলে দিতেই সে গাঁট থেকে একছড়া সোনার হার বের ক'রে খোকারে গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে—আমার আর কিছু নেই দাদা-ভাই, এ ছেল, তোমারে দিলাম। নারায়ণের সেবা হলো আমার!

ভবানী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে হারছড়ার দিকে চেয়ে বললেন—না, এ হার তুমি দিও না। দামী জিনিসটা কেন দেবে? বরং কিছু মিষ্টি কিনে দাও—

হলা পেকে হেসে বললে—বাবাঠাকুর, আপনি যা ভাবচেন, তা নয়। এ লুটের মাল নয়। আমার ঘরের মানুষের গলার হার ছেল, তিনি স্বগ্‌গে গিয়েচে আজ বাইশ-তেইশ বছর। আমার ভিটেতে ভাঁড়ের মধ্যে পোঁতা ছেল। কাল এরে তুলে তেঁতুল দিয়ে মেজেচি। অনেক পাপ করেছি জীবনে। ব্রাহ্মণকে আমি মানিনে বাবাঠাকুর। সব দুষ্টু। খোকাঠাকুর নিষ্পাপ নারায়ণ। ওর গলায় হার পরিয়ে আমার পরকালের কাজ হোল। আশীর্ব্বাদ করুন।

উপস্থিত সকলে খুব বাহবা দিলে হলা পেকেকে। ভবানী নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেন বড়। তিলুকে নিয়ে এসে দেখাতে তিলুও বললে—এ আপনি ওকে ফেরত দিন। খোকনের গলায় ও দিতি মন সরে না।

—নেবে না। বলিনি ভাবচো? মনে কষ্ট পাবে। হাত জোড় করে বললে।

—বলুক গে। আপনি ফেরত দিয়ে আসুন।

—সে আর হয় না, যতই পাপী হোক, নত হয়ে যখন মাপ চায়, নিজের ভুল বুঝতে পারে, তার ওপর রাগ করি কি করে? না হয় এর পরে হার ভেঙে সোনা গলিয়ে কোন সৎকাজে দান করলেই হবে।

তিলু আর কোন প্রতিবাদ করলে না। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হোল, সে মন খুলে সায় দিচ্ছে না এ প্রস্তাবে।

হলা পেকে সেই দিনটি থেকে রোজ আসতে আরম্ভ করলে ভবানী বাঁড়ুয্যের কাছে। কোন কথা বলে না, শুধু একবার খোকনকে ডেকে দেখে চলে যায়।

একদিন ভবানী বললেন—শোনো হে, বোসো—

সামান্য বৃষ্টি হয়েছে বিকেলে। ভিজে বাতাসে বকুল ফুলের সুগন্ধ। হলা পেকে এসে বসে নিজের হাতে তামাক সেজে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে দিলে। এখানে সে যখনই এসে বসে, তখন যেন সে অন্যরকম লোক হয়ে যায়। নিজের মুখে নিজের কৃত নানা অপরাধের কথা বলে—কিন্তু গর্বের সুরে নয়, একটি ক্ষীণ অনুতাপের সুর বরং ধরা পড়ে ওর কথার মধ্যে।

—বাবাঠাকুর, যা করে ফেলিচি তার আর কি করবো। সেবার গোসাঁই বাড়ির দোতলায় ওঠলাম বাঁশ দিয়ে। ছাদে উঠি দেখি স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে। স্বামী তেমনি জোয়ান, আমারে মারতি এলো বর্শা তুলে। মারলাম লাঠি ছুঁড়ে, মেয়েটা আগে মলো। স্বামী ঘুরে পড়লো, মুখি থান-থান রক্ত উঠতি লাগলো। দুজনেই সাবাড়।

—বলো কি?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর। যা করে ফেলিচি তা বলতি দোষ কি? তখন যৈবন বয়েস ছেল, ত্যাতো বোঝতাম না। এখন বুঝতে পেরে কষ্ট পাই মনে।

—রণ-পা চড়ো কেমন? কতদূর যাও?

—এখন আর তত চড়িনে। সেবার হলুদপুকুরি ঘোষেদের বাড়ি লুঠ করে রাত-দুপুরির সময় রণ-পা চড়িয়ে বেরোলাম। ভোরের আগে নিজের গাঁয়ে ফিরেলাম। এগারো কোশ রাস্তা।

—ওর চেয়ে বেশি যাও না?

—একবার পনেরো কোশ পজ্জন্ত গিইলাম। নন্দীপুর থেকে কামারপেঁড়ে। মরুশিদ মোড়লের গোলাবাড়ি।

—এইবার ওসব ছেড়ে দাও। ভগবানের নাম করো।

—তাই তো আপনার কাছে যাতায়াত করি বাবাঠাকুর, আপনাকে দেখে কেমন হয়েচে জানিনে। মনডা কেমন ক'রে ওঠে আপনাকে দেখলি। একটা উপায় হবেই আপনার এখানে এলি, মনডা বলে।

—উপায় হবে। অন্যায় কাজ একেবারে ছেড়ে না দিলে কিন্তু কিছুই করতে পারা যাবে না বলে দিচ্চি।

হলা পেকে হঠাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যের পা ছুঁয়ে বললে—আপনার দয়া, বাবাঠাকুর। আপনার আশীর্ব্বাদে হলধর যমকেও ডরায় না। রণ-পা চড়িয়ে যমের মুণ্ডু কেটে আনতি পারি, যেমন সেবার এনেলাম ঘোড়ের ডাঙ্গায় তুষ্টু কোলের মুণ্ডু—শোনবেন সে গল্প—

হলা পেকে অট্টহাস্য করে উঠলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে দেখতে পেলেন পরকালের ভয়ে কাতর ভীরু হলধর ঘোষকে নয়, নির্ভীক দুর্জয়, অমিততেজ হলা পেকেকে—যে মানুষের মুন্ডু নিয়ে খেলা করেচে যেমন কিনা ছেলেপিলেরা খেলে পিটুলির ফল নিয়ে! এ বিশালকায়, বিশালভুজ হলা পেকে মোহমুদ্গারের শ্লোক শুনবার জন্যে তৈরি নেই—নরহন্তা দস্যু আসলে যা তাই আছে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে দেড় বছরের মধ্যেই এ গ্রামকে, এ অঞ্চলকে বড় ভালোবাসলেন। এমন

ছায়াবহুল দেশ তিনি কোথাও দেখেন নি জীবনে। বৈঁচি, বাঁশ, নিম, সোঁদাল, রড়া, কুঁচলতার বনঝোপ। দিনে রাতে শালিখ, দোয়েল, ছাতারে আর বৌ-কথা-ক পাখীর কাকলী। ঋতুতে ঋতুতে কত কি বনফুলের সমাবেশ। কোন মাসেই ফুল বাদ যায় না—বনে বনে ধুন্দুলের ফুল, রাধালতার ফুল, কেয়া, বিল্বপুষ্প, আমের বউল, সুঁয়ো, বনচট্‌কা নাটা-কাঁটার ফুল।

ইছামতীর ধারে এদেশে লোকের বাস নেই, নদীর ধারে বনঝোপের সমাবেশ খুব বেশী। ভবানী বাঁড়ুয্যে একটি সাধন কুটির নির্মাণ করে সাধনভোজন করবেন, বিবাহের সময় থেকেই এ ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু ইছামতীর ধারে অধিকাংশ জমি চাষের সময় নীলকুঠির আমীনে নীলের চাষের জন্য চিহ্নিত করে যায়। খালি জমি পাওয়া কঠিন। ভবানী বাঁড়ুয্যেও আদৌ বৈষয়িক নন, ওসব জমিজমার হাঙ্গামে জড়ানোর চেয়ে নিস্তব্ধ বিকেলে দিব্যি নির্জনে গাঙের ধারে এক যজ্ঞিডুমুর গাছের ছায়ায় বসে থাকেন। বেশ কাজ চলে যাচ্চে। জীবন ক'দিন? কেন বা ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। ভালোই আছেন।

তাঁর এক গুরুভ্রাতা পশ্চিমে মির্জাপুরের কাছে কোন পাহাড়ের তলায় আশ্রমে থাকেন। খুব বড় বেদান্তের পন্ডিত—সন্ন্যাসাশ্রমের নাম চৈতন্যভারতী পরমহংসদেব। আগে নাম ছিল গোপেশ্বর রায়। ভবানীর সঙ্গে অনেকদিন একই টোলে ব্যাকরণ পড়েচেন। তারপর গোপেশ্বর কিছুকাল জমিদারের দপ্তরে কাজ করেন পাটুলি-বলাগড়ের সুপ্রসিদ্ধ রায় বাবুদের এস্টেটে। হঠাৎ কেন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে চলে যান, সে খবর ভবানী জানেন না, কিন্তু মির্জাপুরের আশ্রমে বসবার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে দু'চারখানা চিঠি দিতেন।

সেই সন্ন্যাসী গোপেশ্বর তথা চৈতন্যভারতী পরমহংস একদিন এসে হাজির ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়ি। একমুখ আধ্-পাকা আধ্‌কাঁচা দাড়ি, গেরুয়া পরণে, চিমটে হাতে, বগলে ক্ষুদ্র বিছানা। তিলু খুব যত্ন আদর করলে। ঘরের মধ্যে থাকবেন না। বাইরে বাঁশতলায় একটা কম্বল বিছিয়ে বসে থাকেন সারাদিন। ভবানী বললেন—পরমহংসদেব, সাপে কামড়াবে। তখন আমায় দোষ দিও না যেন।

চৈতন্যভারতী বলেন—কিছু হবে না ভাই। বেশ আছি।

—কি খাবে?

—সব।

—মাছমাংস?

—কোনো আপত্তি নেই। তবে খাই না আজকাল। পেটে সহ্য হয় না।

—আমার স্ত্রীর হাতে খাবে?

—স্বপাক।

—যা তোমার ইচ্ছে।

তিলুকে কথাটা বলতেই তিলু বিনীতভাবে সন্ন্যাসীর কাছে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে বললে—দাদা—

পরমহংস বললেন—কি?

—আপনি আমার হাতের রান্না খাবেন না?

—কারো হাতে খাইনে দিদি। তবে ইচ্ছে হয়ে থাকে রেঁধে দিতে পারো। মাছমাংস কোরো না

—মাছের ঝোল?

—না।

—কই মাছ, দাদা?

—তুমি দেখচি নাছোড়বান্দা। যা খুশি কর গিয়ে।

সেই থেকে তিলু শুচিশুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর রান্না রাঁধে। বিলু নিলু যত্ন করে খাবার আসন ক'রে তাঁকে খেতে ডাকে। তিন বোনে পরিবেশন করে ভবানী বাঁড়ুয্যে ও সন্ন্যাসীকে।

ইছামতীর ধারে যজ্ঞিডুমুর গাছতলায় সন্ধ্যার দিকে দুজনে বসেচেন। পরমহংস বললেন—হ্যাঁ হে, একে রক্ষা নেই, আবার তিনটি!...

—কুলীনের মেয়ের স্বামী হয় না জানো তো? সমাজে এদের জন্যে আমাদের মন কাঁদে। সাধনভজন এ জন্মে না হয় আগামী জন্মে হবে। মানুষের দুঃখ তো ঘোচাই এ জন্মে। কি কষ্ট যে এদেশের কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ের।

—মেয়ে তিনটি বড় ভালো। তোমার খোকাকেও বেশ লাগলো।

—আমার বয়েস হোল বাহান্ন। ততদিন যদি থাকি, ওকে পণ্ডিত করে যাবো।

—তার চেয়ে বড় কাজ—ভক্তি শিক্ষা দিও।

—তুমি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। ভূতের মুখে রামনাম?

—বৈদান্তিক হওয়া সহজ নয় জেনো। বেদান্তকে ভালো ভাবে বুঝতে হোলে আগে ন্যায়-মীমাংসা ভালো ক'রে পড়া দরকার। নইলে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিকমত বোঝা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করা বড় কষ্টসাধ্য।

—আমাকে পড়াও না দিনকতক?

—দিনকতকের কর্ম নয়। ন্যায় পড়তেই অনেকদিন কেটে যাবে। তুমি ন্যায় পড়, আমি এসে বেদান্ত শিক্ষা দেবো। তবে সাধনা চাই। শুধু পড়লে হবে না। সংসারে জড়িয়ে পড়েচ, ভজন করবে কি ক'রে? এ জন্মে হোল না।

—কুছ্ পরোয়া নেই। ওই জন্যেই ভক্তির পথ ধরেচি।

—সেও সহজ কি খুব? জ্ঞানের চেয়েও কঠিন। জ্ঞান স্বাধ্যায় দ্বারা লাভ হয়, ভক্তি তা নয়। মনে ভাব আসা চাই, ভক্তির অধিকারী হওয়া সবচেয়ে কঠিন। কোনটাই সহজ নয় রে দাদা।

—তবে হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকবো?

—তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্—গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁতে চিত্ত নিযুক্ত রাখলে তিনিই তাঁকে পাবার বুদ্ধি দান করেন—দদামি বুদ্ধিযোগং তং—

—তুমিই তো আমার উত্তর দিলে।

—বিয়েটা করে একটু গোলমাল করে ফেলেচো। জড়িয়ে পড়বে। একেবারে তিনটি—একেই রক্ষা থাকে না।

—পরীক্ষা করে দেখি না একটা জীবন। তাঁর কৃপায় দৌড়টাও তো বোঝা যাবে। ভাগবতে শুকদেব বলেচেন—গৃহৈর্দারাসুতৈষণাং—গৃহস্থের মত ভোগ দ্বারা পুত্র স্ত্রী নিয়ে ঘর করবার বাসনা দূর করবে। তাই করচি।

—তা হোলে এতকাল পরিব্রাজক হয়ে তীর্থে বেড়ালে কেন? যদি গৃহস্থ সাজবার বাসনাই

মনে ছিল তোমার? •

—ভেবেছিলাম বাসনা ক্ষয় হয়েচে। পরে দেখলাম রয়েচে। তবে ক্ষয়ই করি।। শুকদেবের কথাই বলি—ত্যক্তৈষণাঃ সর্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্—সকল বাসনা ত্যাগ করে পরে তপোবনে যাবে। কিন্তু বাসনা থাকতে নয়। সংসার করলে ভগবানকে ডাকতে নেই তাই বা তোমায় কে বলেচে?

—ডাকতে নেই কেউ বলে নি। ডাকা যায় না এই কথাই বলেচে। জ্ঞানও হয় না, ভক্তিও হয় না।

—বেশ দেখবো। ভগবান তোমাদের মত অত কড়া নয়। অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি না যে সংসারে থাকলে ভক্তি লাভ হয় না। সংসার তবে ভগবান সৃষ্টি করলেন কেন? তিনি প্রতারণা করবেন তাঁর অবোধ সন্তানদের? যারা নিতান্ত অসহায়, তিনি পিতা হয়ে তাদের সামনে ইচ্ছে করে মায়া ফাঁদ পেতেছেন তাদের জালে জড়াবার জন্যে? এর উত্তর দাও।

—এষাবৃতির্ণাম তমোগুণস্য—তমোগুণের শক্তিই আবরণ। বস্তু যথার্থ ভাবে প্রতিভাত না হয়ে অন্য প্রকারে প্রতিভাত হয়—এই জন্যেই তমোগুণের নাম বৃতি। ভগবানকে দোষ দিও না। ওভাবে ভগবানকে ভাবচো কেন? বেদান্ত পড়লে বুঝতে পারবে। ওভাবে ভগবান নেই। তিনি কিছুই করেন নি। তোমার দৃষ্টির দোষ। মায়ার একটা শক্তির নাম বিক্ষেপ, এই বিক্ষেপ তোমাকে মোহিত করে রেখে ভগবানকে দেখতে দিচ্চে না।

—তাঁর শরণাগত হয়ে দেখাই যাক না। তাঁর কৃপার দৌড়টা দেখবো বলিচি তো। মায়াশক্তি-ফক্তি যত [illegible]ই হোক, তাদের চেয়ে তাঁর শক্তি বড়। মায়াশক্তি কি ভগবান ছাড়া? তাঁর সংসারে [illegible] তাঁর জিনিস। তিনি ছাড়া আবার মায়া এল কোথা থেকে? গোঁজামিল হয়ে যাবে যে।

—গোঁজামিল হয় নি। আমার কথা তুমি বুঝতেই পারলে না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলেচে 'অজামেকাং' অজ্ঞান কারো সৃষ্টি নয়। যিনি সমষ্টিরূপে ঈশ্বর, তিনিই ব্যষ্টিতে কার্যরূপে জীব। অদ্বৈত বেদান্ত বলে, সমষ্টিতে বর্তমান যে চৈতন্য তাই হোল কার্য। অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তা, জীব কার্য। কিন্তু স্বরূপে উভয়েই এক। কেবল উপাধিতে ভিন্ন। তুমিই তোমার ঈশ্বর। আবার ঈশ্বর কে?

—একবার এক রকম বল্লে, গীতার শ্লোক ওঠালে—আবার এখন অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে এসে ফেল্লে?

—গীতার শ্লোক ওঠানোতে কি অন্যায় করলাম?

—গীতা হোল ভক্তিশাস্ত্র। অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানের শাস্ত্র। দুয়ে মিলিও না।

—ও কথাই বলো না। বড় কষ্ট হোল একথা তোমার মুখে শুনে। বেদান্তে ব্রহ্মই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্য সব দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকারই করে নি। একমাত্র বেদান্তেই ব্রহ্মকে খাড়া করে বসেচে। সেই বেদান্ত নিরীশ্বরবাদী!

—নিরীশ্বরবাদী বলিনি। ভক্তিশাস্ত্র নয় বলিচি।

—তুমি কিছুই জানো না। তোমাকে এবার আমি 'চিৎসুখী' আর 'খণ্ডনখণ্ড খাদ্য' পড়াবো। তুমি বুঝবে কি অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা ব্রহ্মকে সন্ধান করেছেন। তবে বড় শক্ত দুরবগাহ গ্রন্থ। তর্কশাস্ত্র ভালো করে না পড়লে বোঝাই যাবে না। দেখবে বেদান্তের মধ্যে অন্য কোনো

কুতর্কের বা বিকৃত ভাষ্যের ফাঁক বুজিয়ে দিয়েছে কি ভাবে। আর তুমি কি-না বলে বসলে—

—আমি কিছুই বলে বসিনি। তুমি আর আমি অনেক তফাৎ। তুমি মহাজ্ঞানী—আমি তুচ্ছ গৃহস্থ। তুমি যা বলবে তার ওপর আমার কথা কি? আমার বক্তব্য অন্য সময়ে বলবো।

—বোলো, তুমি অনুরাগী শ্রোতা এবং বক্তা। তোমাকে শুনিয়ে এবং বলে সুখ আছে।

—তোমার সঙ্গে দুটো ভাল কথা আলোচনা করেও আনন্দ হোল। এ গ্রাম একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু আছে নীলকুঠি আর সায়েব আর জমি আর জমা আর ধান আর বিষয়—এই নিয়ে। আমার শ্যালকটি তার মধ্যে প্রধান। তিনি নীলকুঠির দেওয়ান। সায়েব তাঁর ইষ্টদেব। তেমনি অত্যাচারী। তবে গোবরে পদ্মফুল আমার বড় স্ত্রী।

—ভালো?

—খুব, অতিরিক্ত ভালো।

—বাকী দুটি?

—ভালো, তবে এখনো ছেলেমানুষি যায় নি। আদুরে বোন কিনা দেওয়ানজির! এদিকে সৎ।

ভবানী বাঁড়ুয্যে আর পরমহংস সন্ন্যাসীকে দিনকতক প্রায়ই নদীর ধারে বসে থাকতে দেখা যেতো। ঠিক হোল যে সন্ন্যাসী তিলু বিলু নিলুকে দীক্ষা দেবেন। তিলু রাত্রে স্বামীকে বললে—আপনি গুরু করেচেন?

—কেন?

—দীক্ষা নেবেন না?

—কি বুদ্ধি যে তোমার! আহা মরি! এই সন্নিসি ঠাকুর আমার গুরুভাই হোল কি ক'রে যদি আমার দীক্ষা না হয়ে থাকে?

—ও ঠিক ঠিক। আমি ও দীক্ষা নেবো না।

—কেন? কেন?

তিলু কিছু বললে না। মুচকি হেসে চুপ করে রইল। প্রদীপের আলোর সামনে নিজের হাতের বাউটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেই দেখতে লাগলো। একটা ছোট ধুনুচিতে ধুনো গুঁড়ো করে দিতে লাগলো। এটি ভবানীর বিশেষ খেয়াল। কোনো শৌখিনতা নেই যে স্বামীর, কোনো আকিঞ্চন নেই, কোনো আবদার নেই—স্বামীর এ অতি তুচ্ছ খেয়ালটুকুর প্রতি তিলুর বড় স্নেহ। রোজ শোবার সময় অতি যত্নে ধুনো গুঁড়ো ক'রে সে ধুনুচিতে দেবে এবং বার বার স্বামীকে জিগ্যেস করবে—গন্ধ পাচ্ছেন? কেমন গন্ধ—ভালো না?

তিলুকে হঠাৎ চলে যেতে উদ্যত দেখে ভবানী বললেন—চলে যাচ্চ যে? খোকা কই?

তিলু হেসে বললে—আহা, আজ তো নিলুর দিন। বুধবার আজ যে—মনে নেই? খোকা নিলুর কাছে। নিলু আনবে।

—না, আজ তুমি থাকো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—বা রে, তা কখনো হয়। নিলু কত শখের সঙ্গে ঢাকাই শাড়ীখানা পরে খোকাকে কোলে ক'রে বসে আছে।

—তুমি থাকলে ভালো হোত তিলু। আচ্ছা বেশ। খোকনকে নিয়ে আসতে বলো।

একটু পরে নিলু ঘরে ঢুকলো খোকনকে কোলে নিয়ে। ওর কোলে ঘুমন্ত খোকন।

খোকনের গলায় হলা পেকের উপহার দেওয়া সেই হার ছড়াটা। অতি সুন্দর খোকন। ভবানী বাঁড়ুয্যে এমন খোকা কখনো দেখেন নি। এত সুন্দর ছেলে এবং এত চমৎকার তার হাবভাব। এক এক সময় আবার ভাবেন অন্য সবাই তাদের সন্তানদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলবে না কি? এমন কি খুব কুৎসিত সন্তানদের বাপ-মাও? তবে এর মধ্যে অসত্য কোথায় আছে? নিলু খোকাকে সন্তর্পণে শুইয়ে দিলে, ভবানী চেয়ে চেয়ে দেখলেন—কি সুন্দর ভাবে ওর বড় বড় চোখ দুটি বুজিয়ে ঘুমে নেতিয়ে আছে খোকন। তিনি আস্তে আস্তে সেই অবস্থায় তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতেই খোকা নিমীলিত চোখেই বুদ্ধদেবের মত শান্ত হয়ে রইল, কেবল তার ঘাড়টি পিছন দিকে হেলে পড়তে দেখে ভবানী পিছন থেকে একটা হাত দিয়ে ওর ঘাড় ধরে রাখলেন। নিলু তাড়াতাড়ি এসে বললে—ওকি? ওর ঘাড় ভেঙে যাবে যে! কি আক্কেল আপনার?

ভবানীর ভারি আমোদ লাগলো, কেমন সুন্দর চুপটি করে চোখ বুজে একবারও না কেঁদে কেষ্টনগরের কারিগরের পুতুলের মতো বসে রইল।

নিলুকে বললেন—দ্যাখো দ্যাখো কেমন দেখাচ্ছে—তিলুকে ডাকো—তোমার দিদিকে ডাকো—

নিলু বললে—আহা-হা মরে যাই! কেমন ক'রে চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে, কেন ওকে অমন কষ্ট দিচ্ছেন? ছি ছি—শুইয়ে দিন—

তিলু এসে বললে—কি?

—দ্যাখো কেমন দেখাচ্চে খোকনকে?

—আহা বেশ!

—মুখে কান্না নেই, কথা নেই।

—কথা থাকবে কি? ও ঘুমে অচেতন যে। ও কি কিছু বুঝতে পাচ্চে. ওকে বসানো হয়েছে, কি করা হয়েচে?

নিলু বললে—এবার শুইয়ে দিন।। আহা মরে যাই, সোনামণি আমার—শুইয়ে দিন, ওর লাগচে। দিদি কিছু বলবে না আপনার সামনে।

খোকাকে শুইয়ে দিয়ে হঠাৎ ভবানীর মনে হলো, ঠিক হয়েছে, শিশুর সৌন্দর্য বুঝবার পক্ষে তার বাপ-মাকে বাদ দিলে চলবে কেন? শিশু এবং তার বাপ-মা একই স্বর্ণসূত্রে গাঁথা মালা। এরা পরস্পরকে বুঝবে। পরস্পর পরস্পরকে ভালো বলবে—সৃষ্টির বিধান এই। নিজেকে বাদ দিলে চলবে না। এও বেদান্তের সেই অমর বাণী, দশমস্তমসি। তুমিই দশম। নিজেকে বাদ দিয়ে গুনলে চলবে কেন?

তার পরদিন সকালে এল হলা পেকে, তার সঙ্গে এল হলা পেকের অনুচর দুর্ধর্ষ ডাকাত অঘোর মুচি। অঘোর মুচিকে তিলুরা তিন বোনে দেখে খুব খুশি। অঘোর ওদের কোলে ক'রে মানুষ করেচে ছেলেবেলায়।

তিলু বললে—এসো অঘোর দাদা, জেল থেকে কবে এলে?

অঘোর বললে—কাল এ্যালাম দিদিমণিরা। তোমাদের দেখতি এ্যালাম, তার বলি সন্নিসি ঠাকুরকে দেখে একটা পেরণাম করে আসি। গঙ্গাচ্যানের ফল হবে। কোথায় তিনি?

—তিনি বাড়ি থাকেন কারো? ওই বাঁশতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন দ্যাখো গিয়ে।

অঘোর দাদা বোসো, কাঁঠাল খাবা। তোমরা দুজনেই বোস।

—খোকনকে দেখবো দিদিমণি। আগে সন্নিসিঠাকুরকে দণ্ডবৎ করে আসি।

বাঁশতলার আসনে চৈতন্যভারতী চুপ করে বসে ছিলেন। ধুনি জ্বালানো ছিল না। হলা পেকে আর অঘোর মুচি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

সন্ন্যাসী বললেন—কে?

—মোরা, বাবা।

হলা পেকে বললে—এ আমার শাকরেদ, অঘোর। গারদ থেকি কাল খালাস পেয়েচে। এই গাঁয়েই বাড়ি।

—জেল হয়েছিল কেন?

—আপনার কাছে নুকুবো কেন বাবা। ডাকাতি করেলাম দুজনে। দুজনেরই হাজত হয়েল।

—খুব শক্তি আছে তোমাদের দুজনেরই। ভালো কাজে সেটা লাগালে দোষ কি?

—দোষ কিছু নেই বাবা। হাত নিস্‌পিস্ করে। থাকতি পারিনে।

চৈতন্যভারতী বললেন—হাত নিস্‌পিস্ করুক। যে মনটা তোমাকে ব্যস্ত করে, সেটা সর্বদা সৎকাজে লাগিয়ে রাখো। মন আপনিই ভালো হবে।

হলা পেকে বসে বসে শুনলে। অঘোর মুচির ওসব ভালো লাগছিল না। সে ভাবছিল তিলু দিদিমণির কাছ থেকে একখানা পাকা কাঁটাল চেয়ে নিয়ে খেতে হবে। এমন সময় নিলু সেখানে এসে ডাকলে—ও সন্নিসি দাদা—

চৈতন্যভারতী বললেন—কি দিদি?

—পাকা কলা আর পেঁপে নিয়ে আসবো? ছ্যান্ হয়েচে?

—না হয়নি। তুমি নিয়ে এসো, ওতে কোনো আপত্তি নেই। আচ্ছা এ দেশে ছ্যান্ করা বলে কেন?

—কি বলবে?

—কিছু বলবে না। তুমি যাও, যশুরে বাঙাল সব কোথাকার! নিয়ে এসো কি খাবার আছে।

—অমনি বললি আমি কিন্তু আনবো না সেটুকু বলে দিচ্চি, দাদা।

হলা পেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—তাহলে মুই রণ-পা পরি?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন—রণ-পা পরে কি হবে?

—আপনার জন্যি কলা-মূলো সংগেরো ক'রে নিয়ে আসি। নিলু দিদি তো চটে গিয়েচে।

অঘোর মুচি বললে—মোর জন্যি একখানা পাকা কাঁটাল। ও দিদিমণি, বড্ড খিদে নেগেছে।

নিলু বললে—যাও বাড়ি গিয়ে বড়দিদি বলে ডাক দিয়ো। বড়দি দেবে এখন।

—না দিদি, তুমি চলো। বড়দি এখুনি বকবে এমন। গারদ খেটে এসিচি—কেন গিইছিলি, কি করিছিলি, সাত কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আর সবাই তো জানে, মুই চোর ডাকাত। খাতি পাইনে তাই চুরি ডাকাতি করি, খাতি পেলি কি আর করতাম। গেরামে এসে যা দেখচি। চালের কাঠা দু' আনা দশ পয়সা। তাতে আর কিছুদিন গারদে থাকলি হোত ভালো। খাবো কেমন করে অত আক্রা চালের ভাত? ছেলেপিলেরে বা কি খাওয়াবো। কি বলেন বাবাঠাকুর?

সন্নিসি বললেন—যা ভালো বোঝো তাই কররে বাবা! তবে মানুষ খুন কোরো না। ওটা করা ঠিক নয়।

হলা পেকে এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিল। মানুষ খুনের কথায় সে এবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। হলা আসলে হল খুনী। অনেক মুন্ডু কেটেছে মানুষের। খুনের কথা পাড়লে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

চৈতন্যভারতীর সামনে এসে বল্লে—জোড়হাত করি বাবাঠাকুর। কিছু মনে করবেন না। একটা কথা বলি শুনুন। পানচিতে গাঁয়ের মোড়ল-বাড়ি সেবার ডাকাতি করতে গেলাম। যখন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠচি, তখন ছোট মোড়ল মোরে আটকালে। ওর হাতে মাছমারা কোঁচ। এক লাঠির ঘায়ে কোঁচ ছুঁড়ে ফেলে দেলাম—আমার সামনে লাঠি ধরতি পারবে কেন ছেলেছোকরা? তখন সে ইট তুলি মারতি এল। আমি ওরে বললাম—আমার সঙ্গে লাগতি এসো না, সরে যাও। তা তার নিয়তি ঘুনিয়ে এসেচে, সে কি শোনে? আমায় একটা খারাপ গালাগালি দেলে। সঙ্গে সঙ্গে এক লাঠিতে ওর মাথাটা দোফাঁক করে দেলাম। উল্টে পড়লো গড়িয়ে সিঁড়ির নিচে, কুমড়ো গড়ান দিয়ে।

নিলু বললে—ইস্ মাগো!

চৈতন্যভারতী মশায় বললেন—তারপর?

—তারপর শুনুন আশ্চয্যি কান্ড। বড় মোড়লের পুতের বৌ, দিব্যি দশাসই সুন্দরী, মনে হোল আঠারো-কুড়ি বয়স—চুল এলো করে দিয়ে এই লম্বা সড়কি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দোতলার মুখি সিঁড়ির নিচে, যেখান থেকে চাপা সিঁড়ি ফেলবার দরজা।

ভারতী মশাই অনেকদিন ঘরছাড়া, জিজ্ঞেস করলেন—চাপা সিঁড়ি কি?

নিলু বললে—চাপা সিঁড়ি দেখেন নি? আমার বাপের বাড়ি আছে দেখাব। সিঁড়িতে ওঠবার পর দোতলায় যেখানে গিয়ে পা দেবেন, সেখানে থেকে চাপা সিঁড়ি মাথার ওপর দিয়ে ফেলে দেয়। সে দরজার কবাট থাকে মাথার ওপর। তাহোলে ডাকাতেরা আর দোতলায় উঠ্‌তি পারে না।

—কেন পারবে না?

হলা পেকে উত্তর দিলে এ কথার। বললে—আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌তি পারলে না দিদিমণি। চাপা সিঁড়ি চেপে ফেলে দিলি আর দোতলায় ওঠা যায় না। বড্ড কঠিন হয়ে পড়ে। এমনি সিঁড়ি যা, তার মুখের কবাট জোড়া কুড়ুল দিয়ে চালা করা যায়, চাপা সিঁড়ির কবাট মাথার ওপর থাকে, কুড়ুল দিয়ে কাটা যায় না! বোঝলেন এবার?

—যাক, তারপর কি হোল?

—তখন আমি দেখচি কি বাবাঠাকুর সাক্ষাৎ কালী পির্‌তিমে। মাথার চুল এলো, দশাসই চেহারা, কি চমৎকার গড়ন-পেটন, মুখচোখ—সড়কি ধরেচে যেন সাক্ষাত্ দশভুজা দুগ্‌গা। ঘাম-তেল মুখে চক্‌চক্ করচে, চোখ দুটোতে যেন আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্চে। সত্যি বলচি বাবাঠাকুর, অনেক মেয়ে দেখিচি, অমন চেহারা আর কখনো দেখিনি। আর সড়কি চালানো কি? যেন তৈরি হাত। ব্যাঁকা করে খোঁচা মারে, আর লাগলি নাড়িভুঁড়ি নামিয়ে নেবে এমনি হাতের ট্যার্চা তাক্। মনে মনে ভাবি, সাবাস্ মা, বলিহারি! দুধ খেয়েলে বটে!

—তারপর? তারপর?

চৈতন্যভারতী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সোজা হয়ে উঠে বসলেন ধুনির সামনে।

—একবার ভাবলাম যা থাকে কপালে, লড়ে দেখবো। তারপর ভাবলাম, না, পিছু হটি। গতিক আজ ভাল না। আমি পিছিয়ে পড়িচি, বীরো হাড়ি বললে,—

পরক্ষণেই জিভ্ কেটে ফেলে বললে—ওই দ্যাখো দলের লোকের নাম করে ফেলেলাম। কেউ জানে না যে ব্যাটা আমাদের সাংড়ার লোক ছিল। যাক্, আপনারা আর ওর কথা বলে দিতি যাচ্ছেন না নীলকুঠির সায়েবের কাছে—

ভারতী মশায় বললেন—নীলকুঠির সায়েব কি করবে?

—সে কি বাবাঠাকুর? এদেশে বিচের-আচার সব তো কুঠির সায়েবেরা করেন। আমার আর অঘোরের গারদ হয়েল, সেও বিচার করেন ওই বড়সায়েব। তারপর শুনুন। বীরো হাড়ি ব্যাটা এগিয়ে গেল। আমাদের বললে, দুয়ো! মেয়েলোকের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গেলি এম্নি মরদ?— সিঁড়ির ওপরের ধাপে দুপ্ দুপ্ করে উঠে গেল। আমি ঘুরে দাঁড়িইচি,—মেয়েলোকের গায়ে হাত দিলি বীরো হাড়ির একদিন না আমার একদিন—মুই দেখে নেবো। এমন সময়—'বাপরে'! বলে বীরো হাড়ি একেবারে চিৎ হয়ে সিঁড়ির মুখে পড়ে গেল। তারপরই উঠে দু হাত তলপেটে দিয়ে কি একটা টানচে দড়ির মত—আমি ভাবচি ওটা আবার কি? কাছে গিয়ে দেখি তলপেট হাঁ হয়ে ফুটো বেরিয়েছে, সেই ফুটো দিয়ে পেটের রক্তমাখা নাড়ি দড়ির মতো চলে গিয়েচে ওপরে সড়কির ফলার আলের সঙ্গে গিঁথে।—সড়কি যত টান দিচ্চে বৌমা, ওর পেটের নাড়ি ততই হড় হড় করে বেরিয়ে বেরিয়ে চলেছে ওপর-বাগে। আর বেশীক্ষণ না, চোখ পাল্টাতি আমি গিয়ে ওরে পাজাকোলা করে তুলি বাইরে নিয়ে এসে বসলাম। এট্টু জল পাইনে যে ওর মৃত্যুকালে মুখে দিই, কারণ আমি তো বুঝচি ওর হয়ে এল—

ভারতী মশাই বললেন—সেই সড়কিতে গাঁথা নাড়িটা?

—লাঠির এক ঝটকায় নাড়ি ছিঁড়ে দিইচি, নইলে আনচি কোথা থেকে? তা বড্ড শক্ত জান হাড়ির পোর। মরে না। শুধু গোঙায় আর বোধ হয় জল জল করে,—বুঝতি পারি না। ইদিকে নোক এসে পড়বে, তখন বড্ড হৈ-চৈ হচ্চে বাইরে। কি করি, বাড়ির পেছনে একটা ডোবা পর্যন্ত ওরে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গ্যালাম, তখনো ও গোঁ গোঁ করে হাত নেড়ে কি বলে। রক্তে ধরণী ভাসচে বাবাঠাকুর। লোকজন এসে পড়বার আর দ্রিং নেই। তখন বেমো মুচির কাতানখানা চেয়ে নিয়ে এক কোপে ওর মুন্ডুটা ঝট্‌কে ফেলে ধড়টা ডোবায় টান্ মেরে ফেলে দেলাম—মুন্ডুটা সাথে নিয়ে এ্যালাম। কেননা তাহলি লাশ সেনাক্ত করতি পারবে না—ব্যাটা বীরো হাড়ির মুন্ডু চোখ চেয়ে মোর দিকি চেয়ে বলে—যেন আমারে বকুনি দেচ্চে—এখনো যেন চোখ দুটো মুই দেখতি পাই, যেন মোর দিকি চেয়ে কত কি বলচে মোরে—

—তারপর সে বৌটির কি হোল?

—কিছু জানি নে। তবে দু'মাস পরে ফকির সেজে আবার গিয়েলাম মোড়লবাড়ি সেই বৌটারে দেখবো বলে।—দুটো ভিক্ষে দাও মা ঠাকরুণ, যেমন বলিচি অমনি তিনি এসে মোরে ভিক্ষা দেলেন। বেলা তখন দুপুর, রাত্তিরি ভালো দেখতি পাইনি; মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, জগদ্ধাত্তিরি পিরতিমে। দশাসই চেহারা, হর্তেলের মত রং, দেখে ভক্তি হোল। বললাম—মা খিদে পেয়েচে।

—মা বললেন—কি খাবা?

বললাম—যা দেবা। তখন তিনি বাড়ির মধ্যি গিয়ে আধ-খুঁচি চিঁড়ে-মুড়কি এনে আমার ঝুলিতে দেলেন। মুই মোছলমান সেজেচি, গড় হয়ে পেরণাম করলি সন্দেহ করতি পারে, তাই হাত তুলে বললাম—সালাম, মা—বলে চলে এ্যালাম। কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিল দু'পায়ের ধুলো

মাথায় নিয়ে লুটিয়ে পেরণাম করি। তারপর চলে এ্যালাম—

নিলু এতক্ষণ কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে শুনছিলো, এইবার বললে—সে যদি মরেই গিয়েচে দাদা, তবে আবার তোমাদের দলের লোক বলে জিভ কাটলে কেন? সে কিসে মরেচে তা আজো কেউ জানে না।

—দিদিমণি তুমি কি বোঝো। নীলকুঠির লোক গিয়ে তার দুটো ছেলেকে উস্তোন-কুস্তোন করবে। বলবে, তোর বাবা কনে গিয়েচে। এ আজ ছ'সাত বছরের কথা। লোক জানে বীরো হাড়ি গঙ্গার ধারে আর একটা বিয়ে ক'রে সেখানেই বাস করচে। মোর সাংড়ার লোক রটিয়ে দিয়েচে। ওর ছেলে দুটো এখন লাঙল চষতি পারে। বড় ছেলেডা খুব জোয়ান হবে ওর বাবার মত।

—বৌটিকে আর দ্যাখো নি?

—না, তারপরই দু'বছর গারদ বাস। সে অন্য কারণে। এ ডাকাতির কিনারা হয় নি! চৈতন্যভারতী বললেন—তোমার মুখে এ কাহিনী শুনে ভাবচি বৌমার সঙ্গে আমি দেখা করে আসবো। তারা কি জাত বললে?

—সদ্‌গোপ।

—আমি যাবো সেখানে। শক্তিমতী মেয়েরা জগদ্ধাত্রীর অবতার। তুমি ঠিকই বলেচ।

—বাবাঠাকুর, আপনি বোধ হয় ইদিকি আর কখনো আসেন নি, থাকেনও না। অমন কিন্তু এখানে আরো দু-চারটে আছে। তবে ভদ্দর গেরস্ত বাড়িতে আর দেখি নি ওই বৌটি ছাড়া। বাগদি, দুলে, মুচি, নমশুদ্দুরের মধ্যে অনেক মেয়ে পাবেন যারা ভাল সড়কি চালায়, কোঁচ চালায়, ফালা চালায়, কাতান চালায়।

নিলু বললে—আমি জানি। সেবার নীলকুঠির দাঙ্গায় দাদা স্বচক্ষে দেখেচেন, খড়ের ছোট্ট চালাঘরের মধ্যে থেকে দুটো দুলেদের বৌ এমন তীর চালাচ্চে, নীলকুঠির বরকন্দাজ হটে গেল।

—বাঃ বাঃ, বড় খুশি হলাম শুনে দিদি। ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ হয় যদি এই শক্তিমতী মায়েদের একবার সাক্ষাৎ পাই। জয় মা জগদম্বা।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এই সময় গাড়ু হাতে কোথা থেকে আসছিলেন, সেখান থেকে বলে উঠলেন—আরে, ও কি ভায়া! একেবারে মা জগদম্বা! নাঃ, বৈদান্তিক জ্ঞানীর ইয়েটা একেবারে নষ্ট করে দিলে?

—ভাই, নিত্য থেকে লীলায় নামলেই মা বাবা। বৈদান্তিকের তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! বলেচি তো তোমাকে সেদিন। বেদান্ত অত সোজা জিনিস নয়। অদ্বৈত বেদান্ত বুঝতে বহুদিন যাবে।। জীব গোস্বামীর বেদান্ত বরং কিছু সহজ।

—ও কথা থাক্। কি নিয়ে কথা বলছিলে?

—লীলার কথা। এদেশের মেয়েদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা। সবই মায়ের লীলা।

নীলু বলে উঠল—হ্যাঁ, ভালো কথা—বড়দি ভালো ঢাল আর লাঠির খেলা জানে। একবার আকবর আলি লেঠেলের সঙ্গে লড়ি চালিয়েছিল ঢাল আর লড়ি নিয়ে। নীলকুঠির বড় লেঠেল আকবর আলি। বড়দি এমন আগ্‌লেছিল, একটা লড়ির ঘাও মারতি পারে নি ওর গায়ে। শরীরে শক্তিও আছে বড়দির। দুটো বড় বড় ক্ষিত্তুরে ঘড়া কাঁকে মাথায় ক'রে নিয়ে আসতে পারে। এখনও পারে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হলা পেকে ও অঘোর মুচিকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে ডাক দিলেন—ও তিলু, শুনে যাও—ও তিলু, ও বড় বৌ—

তিলু খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। একটু পরে খোকাকে কোলে ক'রে এসে বললে—বাপরে, এসব ডাকাতের দল কেন আমার বাড়িতে।

হলা পেকে উত্তর দিলে—বড়দি, পেটের জ্বালায় এইচি। খাতি দ্যাও, নইলে লুঠ হবে।

তিলু হেসে বললে—আমি লাঠি ধরতি জানি।

—সে তো জানি।

—বার করি ঢাল লড়ি?

—কিসের লড়ি?

—ময়না কাঠের।

অঘোর মুচি বললে—সত্যি বড়দি, হাত বজায় আছে তো?

—খেলবি নাকি এক দিন? মনে আছে সেই রথতলার আখড়াতে? তখন আমার বয়েস কত—সতেরো-আঠারো হবে—

—উঃ, সে যে অনেকদিনের কথা হয়ে গেল। তখন রথতলার আখড়াতে মোদের বড্ড খেলা হোত। মনে আছে খুব।

—বসো, আমি আসচি।

একটু পরে দুটি বড় কাঁঠাল দু'হাতে বোঁটা ঝুলিয়ে নিয়ে এসে তিলু ওদের সামনে রাখলে। বললে—খাও ভাই সব, দেখি কেমন জোয়ান—

হলা পেকে বললে—কোন্ গাছের কাঁটাল দিদি?

—মালসি।

—খাজা না রসা?

—রস খাজা। এখন আষাঢ়ের জল পেলে কাঁটাল আর রসা থাকে? খাও দুজনে।

মিনিট দশ-বারের মধ্যে অঘোর মুচি তার কাঁটালটা শেষ করলে। হলা পেকের দিকে তাকিয়ে বললে—কি ওস্তাদ, এখনো বাকি যে?

—কাল রাত্তিরি খাসির মাংস খেয়েলাম সের দুয়েক। তাতে করে ভাল খিদে নেই।

তিলু বললে—সে হবে না দাদা। ফেলতি পারবে না। খেতে হবে সবটা। অঘোর দাদা, আর একখানা দেবো বার করে? ও গাছের আর কিন্তু নেই। খয়েরখাগীর কাঁটাল আছে খান চারেক, একটু বেশি খাজা হবে।

—দ্যাও, ছোট দেখে একখানা।

হলা পেকে বললে—খেয়ে নে অঘ্রা, এমন একখানা কাঁটালের দাম হাটে এক আনার কম নয়, এমন অসময়ে। মুই একখানা শেষ করে আর পারবো না। বয়েসও তো হয়েচে তোর চেয়ে। দ্যাও দিদিমণি, একটু গুড় জল দ্যাও—

তিলু বললে—তা হোলে সাক্‌রেদের কাছে হেরে গেলে দাদা। গুড় জল এমনি খাবে কেন, দুটো ঝুনো নারকোল দি, ভেঙে দুজনে খাও গুড় দিয়ে। তবে বেশি গুড় দিতি পারবো না। এবার সংসারে গুড় বাড়ন্ত। দশখানা কেনা ছিল, দুখানাতে ঠেকেচে। উনি বেজায় গুড় খান।

দিনটা বেশ আনন্দে কাটল।

হলা পেকে এবং অঘোর মুচি চলে যাওয়ার সময় চৈতন্যভারতী মহাশয়কে আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে গেল।

ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুকে নিয়ে রোজ নদীতে নাইতে যান সন্ধ্যাবেলা, আজও গেলেন। ইছামতীর নির্জন স্থানে নিবিড় নল-খাগড়ার ঝোপের মধ্যে দিয়ে মুক্তো খোঁজা জেলেরা (কারণ ইছামতীতে বেশ দামী মুক্তাও পাওয়া যেত) গত শীতকালে যে সুঁড়ি পথটা কেটে করেছিল, তারই নীচে বাব্‌লা, যজ্ঞিডুমুর, পিটুলি ও নটকান গাছের তলায় ভবানী ও তিলু নিজেদের জন্যে একটা ঘাট করে নিয়েচে, সেখানে হলদে বাব্‌লা ফুল ঝরে পড়ে টুপটাপ করে স্বচ্ছ কাকচক্ষু জলের ওপর, গুলঞ্চের সরু ছোট লতা নট্‌কান ডাল থেকে জলের ওপরে ঝুলে পড়ে, তেচোকো মাছের ছানা স্নানরতা তিলু সুন্দরীর বুকের কাছে খেলা করে, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়; ঘনান্তরাল বনকুঞ্জের ছায়ায় কত কি পাখী ডাকে সন্ধ্যায়। ওদের কেউ দেখতে পায় না ডাঙার দিক থেকে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে জলে নেমে বললেন—চলো সাঁতার দিয়ে ওপারে যাই—

তিলু বললে—চলুন, ওপারের ক্ষেত থেকে পটল তুলে আনি—

—ছিঃ চুরি করা হয়। পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি তোমার—চুরি বোঝ না?

—যা বলেন। আমরা কত তুলে আনতাম।

—দেবে সাঁতার?

—চলুন। গো-ঘাটার দিকে যাবেন? মাঠের বড় অশথতলার দিকে?

তিলু অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সাঁতার দেয়। সুন্দর, ঋজু তনুদেহটি জলের তলায় নিঃশব্দে চলে, পাশে পাশে ভবানী বাঁড়ুয্যে চলেন।

হঠাৎ এক জায়গায় গহিন কালো জলে ভবানী বাঁড়ুয্যে বলে ওঠেন—ও তিলু, তিলু!

তিলু এগিয়ে চলেছিল, থেমে স্বামীর কাছে ফিরে এসে বললে—কি? কি?

ভবানী দু হাত তুলে অসহায়ের মত খাবি খেয়ে বললেন—তুমি পালাও তিলু। আমায় কুমীরে ধরেচে—তুমি পালাও! পালাও! খোকাকে দেখো!...

তিলু হতভম্ব হয়ে বললে—কি হয়েচে বলুন না! কি হয়েচে? সে কি গো!

জল খেতে খেতে ভবানী দু'হাত তুলে ডুবতে ডুবতে বললে—খো-কা-কে দেখো! খোকাকে দেখো-খো-ও-ও—

তিলু শিউরে উঠলো জলের মধ্যে, বর্ষা-সন্ধ্যার কালো নদীজল এক্ষুনি কি তার প্রিয়তমের রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে? এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল জীবনের সব কিছু সাধ-আহ্লাদ?

চক্ষের নিমেষে তিলু জলে ডুব দিলে কিছু না ভেবেই।

স্বামীর পা কুমীরের মুখ থেকে ছাড়িয়ে নেবে কিংবা নিজেই কুমীরের মুখে যাবে। ডুব দিয়েই স্বচ্ছ জলের মধ্যে সে দেখতে পেলে, প্রকান্ড এক শিমুলগাছের গুঁড়ি জলের তলায় আড়ভাবে পড়ে, এবং তারই ডালপালার কাঁটায় স্বামীর কাপড় মোক্ষম জড়িয়ে আটকে গিয়েছে! হাতের এক এক ঝটকায় কাপড়খানা ছিঁড়ে ফেললে খানিকটা। আবার জলের ওপর ভেসে স্বামীকে বললে—ভয় নেই, ছাড়িয়ে দিচ্ছি, শিমুল কাঁটায় বেধেচে—

আবার দম নিয়ে আরো খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে ফেললে। জলের মধ্যে খুব ভাল দেখাও

যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে জলের তলায়, কি ক'রে কাপড় বেধেচে ভালো বোঝাও যায় না। আবার ও ডুব দিলে, আবার ভেসে উঠলো। তিন-চার বার ডুব দেওয়ার পর স্বামীকে মুক্ত করে অবসন্নপ্রায় স্বামীকে শক্ত হাতে ধরে ভাসিয়ে ডাঙার দিকে অল্প জলে নিয়ে গেল।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হাঁপ নিয়ে বললেন—বাবাঃ! ওঃ!

তিলুর কাপড় খুলে গিয়েছিল, চুলের রাশ এলিয়ে গিয়েছিল, দু'হাতে সেগুলো এঁটেসেঁটে নিলে, চুল জড়িয়ে নিলে, সেও বেশ হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তার সতর্ক দৃষ্টি স্বামীর দিকে। আহা, বয়েস হয়ে গিয়েচে ওঁর, তবু কি সুন্দর চেহারা! আজ কি হোত আর একটু হোলে?

হেসে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে—বাপরে, কি কাণ্ডটা করে বসেছিলেন সন্দেবেলায়!

ভবানী বাঁড়ুয্যেও হাসলেন।

—খুব সাঁতার হয়েচে, এখন চলুন বাড়ি—

—তুমি ভাগ্যিস ডুব দিয়ে দেখেছিলে! কে জানত ওখানে শিমুলগাছের গুঁড়ি রয়েছে জলের তলায়। আমি কুমীর ভেবে হাত পা ছেড়ে দিয়েছিলাম তো—

প্রায়ন্ধকার নির্জন পথ দিয়ে দুজন বাড়ি ফিরে চলে।

তিলু ভাবছিল—উঃ, আজ কি হোত, যদি সত্যি সত্যি ওঁর কিছু হোত।

তিলু শিউরে উঠলো।

স্বামী চলে গেলে সে কি বাঁচতো?

নীলকুঠির বড় সাহেবের কামরায় দেওয়ান রাজারামের ডাক পড়েছিল। সম্প্রতি তিনি হাতজোড় করে বড়সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে।

বড় সাহেব কাঠে-খোদা পাইপ খেতে খেতে বলেন—টোমার কাজ ঠিকমট হইটেছে না।

—কেন হুজুর?

—নীলের চাষ এবার এট লো ফিগার—কম হইল কি ভাবে?

—হুজুর, মাপ করেন তো ঠিক কথা বলি। সেবার সেই রাহাতুনপুরির কাণ্ডকারখানার পর—

জেন্ বিল্স্ শিপ্টন্ হঠাৎ টেবিলের ওপর দুম্ করে ঘুষি মেরে বললে—ও সব শুনিটে চাই না—আই ডোন্ট উইশ ইউ স্পিন দ্যাট রিগম্যারোল ওভার হিয়ার এগেন—কাজ চাই, কাজ। ডুশো বিঘা জমিতে এ বছর নীল বুনিটে হইবে। বুঝিলে? বাজে কঠা শুনিটে চাই না।

—হুজুর।

—মিঃ ডঙ্কিন্সন্ বদলি হইয়া গেলো। নটুন ম্যাজিস্ট্রেট আসিল। এ আমাদের ডলে আছেন। নীলের ডাডন এ বছর ব্রিস্ক্‌লি আরম্ভ করিটে হইবে, ফিগার চাই। ডাডনের খাটা রোজ আমাকে ডেখাইবে।

—হুজুর।

শ্রীরাম মুচি এ সময়ে সাহেবের কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে রাজারাম বললেন—হুজুর, এ লোককে জিজ্ঞেস করুন। এদের চরপাড়া গ্রামের মুচিপাড়ার লোকে কিছুতে নীল বুনতি দেবে না, আপনি জিগ্যেস করুন ওকে—

সাহেব শ্রীরাম মুচিকে বললে—কি কঠা আছে?

শ্রীরাম বড় সাহেবের পেয়ারের খানসামা, বড়সাহেবকেও সে ততটা সম্ভ্রম ও ভয়ের চোখে দেখে না, অন্য লোকের কথা বলাই বাহুল্য। সে বললে—কথা সবই ঠিক।

—কি ঠিক?

—গলু আর হংস দল পেকিয়েছে হুজুর। নীলের দাগ মারতি দেবে না।

জেন্ বিল্‌স্ শিপ্‌টন্ রেগে উঠে দেওয়ানের দিকে চেয়ে বললেন—ইউ আর নো মিল্কসপ—মুচিপাড়ার জমি সব ডাগ লাগাও-টো ডে—আজই। আমি ঘোড়া করিয়া দেখিটে যাইব। শ্যামচাঁদ ভুলিয়া গেলো? রামু মুচি লিডার হইয়াছে—টাহাকে সোজা করিবে।

এই সময়ে শ্রীরাম মুচি হাতজোড় ক'রে বললে—সায়েব, আমার তিন বিঘে মুসুরি আছে, রবিখন্দ। আমার ওটা দাগ যেন না দেন দেওয়ানজি। রামু সর্দারের বাড়ি আমি যাইনে, তার ভাত খাইনে।

—আচ্ছা, গ্র্যান্টেড, মঞ্জুর হইল। ডেওয়ান, ইহার জমি বাদ পড়িল।

রাজারাম বললেন—হুজুরের হুকুম।

—আচ্ছা যাও।—দ্যাট ডেভিল অফ্ এ্যান আমীন শ্যুড গো উইথ ইউ—প্রসন্ন আমীন টোমার সাথে যাইবে। হরিশ আমীন নয়।

—হুজুরের হুকুম।

প্রসন্ন চক্রবর্তী নিজের ঘরে ভাত রাঁধছিল। দেওয়ান রাজারাম ঘরে ঢুকতেই প্রসন্ন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। তবু ভালো, কিছুক্ষণ আগে তার এই ঘরেই নবু গাজিদের দল এসেছিল। নীলের দাগ কিছু কম করে যাতে এ বছর তাদের গাঁয়ে দেওয়া হয়, সেজন্যে অনুরোধ জানাতে।

শুধু হাতেও তারা আসে নি।

আর একটু বেশিক্ষণ ওরা থাকলে ধরা পড়ে যেতে হোত। ঘুঘু রাজারামের চোখ এড়াত না কিছু।

রাজারাম বললেন—কি? ভাত হচ্ছে?

—আসুন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শিগ্‌গির চলো চক্কত্তি, মুচিদের আজ শেষ করে আসতি হবে। বড় সায়েব রেগে আগুন। আমারে ডেকে পাঠিয়েছিল।

—একটা কথা বলবো? রাগ করবেন?

—না। কি?

—দাগ শেষ।

—সে কি?

প্রসন্ন চক্রবর্তী ভাতের হাত ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে ঘরের কোণের টিনের ক্ষুদ্র পেঁটরাটা খুলে দাগ-নক্সার বই ও ম্যাপ বার করে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—সাত পাখী জমি এই, দু পাখী জমি এই—আর এই দেড় পাখী—একুনে তিরিশ বিঘে সাত কাঠা।

রাজারাম প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললেন—বাঃ, কবে করলে?

—রবিবার রাত দুপুরের পর।

—সঙ্গে কে ছিল?

—করিম লেঠেল আর আমি। পিন্‌ম্যান ছিল সয়ারাম বোষ্টম।

—রিপোর্ট কর নি কেন? আগে জানাতি হয় এ সব কথা। তাহলি বড় সায়েবের কাছে আমাকে মুখ খেতি হোত না। যাও—

—কিছু মনে করবেন না দেওয়ানজি। কেন বলি নি শুনুন, ভরসা পাই নি, ঠিক বলচি। রাহাতুনপুরির সেই ব্যাপারের পর আর কিছু—

—সে ভয় নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বদলে গিয়েচে। বড় সায়েব নিজে বললে আমাকে।

রাজারাম রায় বড় সাহেবকে কথাটা জানালেন না।

প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন যে কাজ একা করে এসেচে, তাতে দেওয়ান রাজারাম নিজেও কিছু ভাগ বসাতে চান, রিপোর্ট সেইভাবেই লিখছিলেন, প্রসন্ন চক্রবর্তীকে অবিশ্যি হাওয়া করে দিচ্ছিলেন একেবারে।

কিন্তু সেদিন সকালেই চরপাড়ায় গোলমাল বাধলো।

দেওয়ানজির দূর সম্পর্কের সেই ভাইপো রামকান্ত রায়, যে কলকাতায় আমুটি কোম্পানীর হৌসে নকলনবিসি করে এবং যে অদ্ভুত কলের গাড়ি ও জাহাজের কথা বলেছিল, সে নীলকুঠিতে এসেছিল দেওয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। পাইক এসে খবর দিলে চরপাড়ার প্রজারা দাগ উপড়ে ফেলেচে।

রাজারাম তখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে বেরুলেন চরপাড়ার দিকে। সেখানে এক বটতলায় বসে একে একে সমস্ত মুচিদের ডাকালেন। যার যত জমিতে আগে দাগ ছিল, তার চেয়ে বেশি দাগ স্বীকার করিয়ে টিপসই নিলেন প্রত্যেকের। কারো কিছু কথা শুনলেন না।

রামু সর্দারকে বললেন—এবার পাঁচপোতার বাঁওড়ে বাঁধাল দিইছিলে তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ রায়মশাই। ফি বছর মোর বাঁধাল পড়ে।

—হুঁ।

রামু সর্দারের বুক কেঁপে গেল। দেওয়ানজিকে সে চেনে। ঘোড়ায় উঠবার সময় সে দেওয়ানকে বললে—মোর কি দোষ হয়েচে? অপরাধ নেবেন না, যদি কেউ কিছু বলে থাকে।

দেওয়ানজি ঘোড়ায় চেপে উড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যের পর পাঁচপোতার বাঁওড়ের বাঁধালে রামু সর্দার বসে তামাক খাচ্ছে আর চার-পাঁচজন নিকিরি ও চাষীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলচে, এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে আট-দশজন লোক এসে ওর বাঁধাল ভাঙতে আরম্ভ করলে।

রামু সর্দার খাড়া হয়ে উঠে বললে—কে? কে? বাঁধালে হাত দেয় কোন সুমুন্দির ভাই রে?

করিম লাঠিয়াল এগিয়ে এসে বললে—তোর বাবা।

—তবে রে—

রামু সর্দার বাগ্‌দি পাড়ার মোড়ল। দুর্বল লোক নয় সে। লাঠি হাতে সে এগিয়ে যেতেই করিম লাঠিয়ালের লাঠি এসে পড়লো ওর মাথায়। রামু সর্দার লাঠি ঠেকিয়ে দিতেই করিম হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—সামলাও!

আবার ভীষণ বাড়ি।

রামু সর্দার ফিরিয়ে বাড়ি দিলে।

—সাবাস! সামলাও।

রামু সর্দার ফাঁক খুঁজছিল। বিজয়গর্বে অসতর্ক করিম লাঠিয়ালের মাথার দিকে খালি ছিল, বিদ্যুৎ বেগে রামু সর্দার লাঠি উঠিয়ে বললে—তুমি সামলাও কর্‌মে খানসামা।

সঙ্গে সঙ্গে রামুর লাঠি ঘুরে গেল বোঁ করে ওর বাঁকা আড়-করা লাঠির ওপর দিয়ে, বেল ফাটার মত শব্দ হোল। করিম পেঁপে গাছের ভাঙা ডালের মত পড়ে গেল বাঁধালের জালের খুঁটির পাশে। কিন্তু রামু সামলাতে পারলে না। সেও গেল হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অমনি করিম লাঠিয়ালের সঙ্গী লাঠিয়ালরা দুড়দাড় করে লাঠি চালালে ওর উপর যতক্ষণ রামু শেষ না হয়ে গেল। রক্তে বাঁধালের ঘাস রাঙা হয়ে ছিল তার পরদিন সকালেও। চাপ চাপ রক্ত পড়ে ছিল ঘাসের ওপর—পথযাত্রীরা দেখেছিল। বাঁধালের চিহ্নও ছিল না আর সেখানে। বাঁশ ভেঙেচুরে নিয়ে চলে গিয়েছিল লাঠিয়ালের দল।

এই বাঁধালের খুব কাছে রামকানাই চক্রবর্তী কবিরাজ একা বাস করতেন একটা খেজুর গাছের তলায় মাঠের মধ্যে। রামকানাই অতি গরীব ব্রাহ্মণ। ভাত আর সোঁদালি ফুল ভাজা, এই তাঁর সারা গ্রীষ্মকালের আহার—যতদিন সোঁদালি ফুল ফোটে বাঁওড়ের ধারের মাঠে। কবিরাজি জানতেন ভালোই, কিন্তু এ পল্লীগ্রামে কেউ পয়সা দিত না। খাওয়ার জন্য ধান দিত রোগীরা। তাও শ্রাবণ মাসে অসুখ সারলো তো আশ্বিন মাসের প্রথমে নতুন আউস উঠলে চাষীর বাড়ি বাড়ি এ গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ঘুরে সে ধান নিজেই সংগ্রহ করতে হোত তাঁকে।

রামকানাই খেজুরতলায় নিজের ঘরটিতে বসে দাশু রায়ের পাঁচালি পড়ছিলেন, এমন সময় হৈ-চৈ শুনে তিনি বই বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর আরও এগিয়ে দেখতে পেলেন, নীলকুঠির কয়েকজন লাঠিয়াল বাঁধালের বাঁশ খুলচে। একটু পরে শুনতে পেলেন কারা বলচে খুন হয়েচে। রামকানাই ফিরে আসচেন নিজের ঘরে, তাঁর পাশ দিয়ে হারু নিকিরি আর মনসুর নিকিরি দৌড়ে পালিয়ে চলে গেল।

রামকানাই বললেন—ও হারু, ও মনসুর, কি হয়েচে? কি হয়েচে?

তাদের পেছনে অন্ধকারে পালাচ্ছিল হজরৎ নিকিরি। সে বললে—কে? কবিরাজ মশায়? ওদিকি যাবেন না। রামু বাগ্‌দিকে নীলকুঠির লেঠেলরা মেরে ফেলে দিয়ে বাঁধাল লুঠ করচে।

রামকানাই ভয়ে এসে ঘরের দোর বন্ধ করে দিলেন।

একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো এই উপলক্ষে। খুনের চেয়েও বড়, হাঙ্গামার চেয়েও বড়।

পরদিন সকালে চারিদিকে হৈ-চৈ বেধে গেল—নীলকুঠির লোকেরা পাঁচপোতার বাঁধাল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েচে, রামু সর্দারকে খুন করেচে। দলে দলে লোক দেখতে গেল ব্যাপারটা কি। অনেকে বললে—নীলকুঠির সাহেব এবার জলকর দখল করবে বলে এ রকম করচে।

অনেকে রাজারামের বাড়ি গেল। দেওয়ান রাজারাম আশ্চর্য হয়ে বললেন—খুন? সে কি কথা? আমাদের কুঠির কোন লোক নয়। বাইরের লোক হবে। রামু বাগ্‌দি ছিল বদমাইশের নাজির। তার আবার শত্রুর অভাব! তুমিও যেমন। যা কিছু হবে, অমনি নীলকুঠির ঘাড়ে চাপালেই হোল। কে খুন করে গেল, নীলকুঠির লোকে করেচে—নাও ঠ্যালা।

বড় সাহেব রাজারামকে ডেকে বললে—খুনের কঠা কি শুনিটেছি? কে খুন করিল?

রাজারাম বললেন—আমাদের লোক নয় হুজুর। তার শত্রু ছিল অনেক—রামু বাগ্‌দির। কে খুন করেচে আমরা কি জানি?

—আমাদের লাঠিয়াল গিয়াছিল কি না?

—না হুজুর।

—পুলিসের কাছে এই কঠা প্রমাণ করিটে হইবে।

ছোট সাহেবকে বললে—আই থিঙ্ক দ্যাট ম্যান হ্যাজ ওভারশট হিজ মার্ক দিস টাইম। আই ডোন্ট এ্যাপ্রিসিয়েট দিস মার্ডার বিজনেস, ইউ সী? টু মাচ অফ এ ট্রাব্‌ল—হোয়েন আই এ্যাম দি এনকোয়্যারিং ম্যাজিস্ট্রেট।

—আই অডার্‌ড্‌ ওনলি দি ফিস ব্যান্ড টু বি সোয়েপট্‌ এ্যাওয়ে সার।

—আই নো, গেট রেডি ফর দি ট্রাব্‌ল দিস টাইম।

পুলিস তদন্তের পূর্বে রামকানাই কবিরাজের ডাক পড়লো রাজারামের বাড়ি। রাজারাম তাঁকে বলে দিলেন, এই কথা তাঁকে বলতে হবে—বুনোপাড়ার লোকদের রামুকে খুন করতে দেখেচেন।

রামকানাই চক্রবর্তী বললেন—একেবারে মিথ্যে কথা কি করে বলি রায়মশাই?

—বলতি হবে। বেশি ফ্যাচফ্যাচ করবেন না। যা বলা হচ্ছে তাই করবেন।

—আজ্ঞে এ তো বড় বিপদে ফেললেন রায়মশাই।

—আপনাকে পান খেতে দেবো কুঠি থেকে।

—রাম রাম! ও কথা বলবেন না। পয়সা নিয়ে ও কাজ করবো না।

তদন্তের সময় রামকানাইয়ের ডাক পড়লো। দারোগা নীলকুঠির অনেক নুন খেয়েচে, সে অনেক চেষ্টা করলে রামকানাইয়ের সাক্ষ্য ওলটপালট করে দিতে।

রামকানাইয়ের এক কথা। নীলকুঠির লাঠিয়ালদের তিনি বাঁধাল থেকে পালাতে দেখেচেন। রামু সর্দারের মৃতদেহও তিনি দেখেচেন, তবে কে তাকে মেরেচে, তা তিনি দেখেন নি।

দারোগা বললে—বুনোপাড়ার সঙ্গে ওর বিবাদ ছিল জানেন?

—না দারোগা মশাই।

—বুনোপাড়ার কোন লোককে সেখানে দেখেছিলেন?

—না।

—ভালো করে মনে করুন।

—না দারোগা মশাই।

যাবার সময় দারোগা রাজারাম রায়কে ডেকে বলে গেল—দেওয়ানজি, কবিরাজ বুড়ো বড় তেঁদড়। ওকে হাত করার চেষ্টা করতে হবে। ডাবের জল খাওয়ান বেশি করে।

রামকানাইকে নীলকুঠিতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল পাইক দিয়ে। প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন বললে—কবিরাজ মশাই—বড় সায়েব বাহাদুর বলেচেন আপনাকে খুশী করে দেবেন। শুধু কি চান বলুন—বড় সন্তুষ্ট হয়েচেন আপনার ওপর।

—আমি আবার কি চাইবো? গরিব বামুন, আমীনমশাই। যা দেন তিনি।

—তবুও বলুন কি আপনার—মানে ধরুন টাকাকড়ি কি ধান—

—ধান দিলে খুব ভালো হয়।

—তাই আমি বলচি দেওয়ানজির কাছে—

রামকানাই চক্রবর্তীকে তারপর নিয়ে যাওয়া হোল ছোট সাহেবের খাস কামরায়। রামকানাই গরীব ব্যক্তি, সাহেবসুবোর আবহাওয়ায় কখনো আসেন নি, কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলেন। ছোটসাহেব পাইপ মুখে বসে ছিল। কড়া সুরে বললে—ইদিকি এসো—

—আজ্ঞে সায়েব মশাই—নমস্কার হই।

—তুমি কি কর?

—আজ্ঞে, কবিরাজি করি।

—বেশ। কুঠিতে কবিরাজি করবে?

—আজ্ঞে কার কবিরাজি সায়েব মশাই?

—আমাদের।

—সে আপনাদের অভিরুচি। যা বলবেন, তাই করবো বই কি!

—তাই করবা?

—আজ্ঞে কেন করবো না?

—মাসে তোমায় দশ টাকা করে দেওয়া হবে তাহলি।

রামকানাই চক্রবর্তী নিজের কানকে বিশ্বাস কতে পারলেন না। দশ টাকা! মাসে দশ টাকা আয় তো দেওয়ান মশায়দের মত বড়মানুষের রোজগার! আজ হঠাৎ এত প্রসন্ন হোলেন কেন এঁরা?

রামকানাই কবিরাজ বললেন—দশ টাকা সায়েব মশাই?

—হ্যাঁ, তাই দেওয়া হবে।

রাজারামকে ডেকে ধূর্ত ছোট সাহেব বলে দিলে—এই লোকের কাছে একটা চুক্তি করে লেখাপড়া হোক। দশ টাকা মাসে কবিরাজির জন্যে কুঠির ক্যাশ থেকে দেওয়া হবে।

দশটা টাকা দিয়ে দ্যাও এক মাসের আগাম।

—বেশ হুজুর।

পরদিন রামকানাইয়ের আবার ডাক পড়লো নীলকুঠিতে। তার আগের দিন বিকেলে টাকা নিয়ে চলে এসেচেন হৃষ্ট মনে। আজ সকালে আবার কিসের ডাক? দেওয়ান রাজারামের সেরেস্তায় গিয়ে হাজিরা দিতে হোল রামকানাইকে। দেওয়ান বললেন—তা হোলে তো আপনি এখন আমাদের লোক হয়ে গেলেন?

রামকানাই বিনীতভাবে জানালেন, সে তাঁদের কৃপা।

—না না, ওসব নয়। আপনি ভাল কবিরাজ। আমাদেরও দরকার। দশ টাকা পেয়েচেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটা কথা। সব তো হোলো। নীলকুঠির নুন তো খ্যালেন, এবার যে তার গুণ গাইতি হবে।

—আজ্ঞে মহানুভব বড় সায়েব, ছোট সায়েব, আর দেওয়ানজির গুণ সর্বদাই গাইবো। গরীব ব্রাহ্মণ, যা উপকার আপনারা করলেন—

—ও কথা থাক্। সেই খুনের মোকদ্দমায় আপনাকে আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিতি হবে। এই উপকারডা আপনি করুন আমাদের।

রামকানাই আকাশ থেকে পড়লেন।—সে কি? সে তো মিটে গিয়েচে, যা বলবার পুলিসের কাছে বলেচেন, আবার কেন?

—তা নয়, আদালতে বল্তি হবে। আপনাকে আমরা সাক্ষী মানবো। আপনি বলবেন—বুনোপাড়ার ভন্তে বুনো, ন্যাংটা বুনো, ছিকৃষ্ট বুনো আর পাতিরাম বুনোকে আপনি লাঠি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেচেন?

—কিন্তু তা তো দেখি নি দেওয়ানমশাই?

—না দেখেচেন না-ই দেখেচেন। বোকার মত কথা বলবেন না। নীলকুঠির মাইনে করা বাঁধা কবিরাজ আপনাকে করা হোল। সায়েব-মেমের রোগ সারালে বক্শিশ পাবেন কত। দশ টাকা মাসে তো বাঁধা মাইনে হয়েচে। একটা ঘর কাল আপনার জন্যি দেওয়ানো হবে, বড় সায়েব বলেচে। আপনি তো আমাদের নিজির লোক হয়ে গ্যালেন। আমাদের পক্ষ টেনে একটা কথা—ওই একটা কথা—বাস হয়ে গেল! আপনাকে আর কিছু বলতি হবে না। ওই একটা কথা আপনি বলবেন, অমুক অমুক বুনোকে দৌড়ে পালাতে আপনি দেখেচেন।

রামকানাই বিষণ্ণ মুখে বললেন—তা—তা—

—তা-তা নয়, বলতি হবে। আপনি কি চান? বড় সায়েব বড্ড ভালো নজর দিয়েছে আপনার ওপর। যা চান, তাই দেবে। আপনার উন্নতি হয়ে যাবে এবার।

রাজারাম আরও বললেন—তা হোলে যান এখন। নীলকুঠির ঘোড়া দিতাম, কিন্তু আপনি তো চড়তি জানেন না। গরুর গাড়িতে যাবেন?

রামকানাই খুব বিনীতভাবে হাত জোড় করে বললেন—দেওয়ান মশাই, আমি বড্ড গরীব। আমারে মুশকিলে ফ্যালবেন না। আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ করে তবে সাক্ষী দিতি হয় শুনিচি। আজ্ঞে, আমি সেখানে মিথ্যে কথা বলতি পারবো না। আমায় মাপ করুন দেওয়ান মশাই, আমার বাবা ত্রিসন্ধ্যা না করে জল খেতেন না। কখনো মিথ্যে বলতি শুনি নি কেউ তাঁর মুখে। আমি বংশের কুলাঙ্গার তাই কবিরাজি করে পয়সা নিই। বিনামূল্যে রোগ আরোগ্য করা উচিত। জানি সব, কিন্তু বড্ড গরীব, না নিয়ে পারিনে। আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা আমি বলতি পারবো না দেওয়ান মশাই!

দেওয়ান রাজারাম রেগে উত্তর দিলেন—এডা বড্ড ধড়িবাজ। এডারে চুনের গুদামে পুরে রেখো আজ রাত্তিরি। চাপুনির জল খাওয়ালি যদি জ্ঞান হয়। তাতেও যদি না সারে, তবে শ্যামচাঁদ আছে জানো তো?

পাইক নফর মুচি কাছে দাঁড়িয়ে, বললে—চলুন ঠাকুরমশায়।

—কোথায় নিয়ে যাবা?

—চুনের গুদোমে নিয়ে যাতি বলচেন দাওয়ানজি, শোনলেন না? আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা, গায়ে হাত দেবো না, দিলি আমার মহাপাপ হবে। আপনি চলুন এগিয়ে।

—কোন দিকি?

—আমার পেছনে পেছনে আসুন।

কিছুদূর যেতেই রাজারাম পুনরায় রামকানাইকে ডেকে বললেন—তাহলি চুনের গুদোমেই

চললেন? সে জায়গাটাতে কিন্তু নাকে কাঁদতি হবে গেলে। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে তাই বললাম।

—তবে আমারে কেন সেখানে পাঠাচ্চেন দেওয়ান মশাই, পাঠাবেন না।

—আমার তো পাঠানোর ইচ্ছে নয়। আপনি যে এত ভদ্রলোক হয়ে, কুঠির মাইনে বাঁধা কবিরাজ হয়ে, আমাদের একটা উপ্‌গার করবেন না—

—তা না, হলপ ক'রে মিথ্যে বলতি পারবো না। ওতে পতিত হতে হয়।

—তবে চুনের গুদামে ওঠো গিয়ে ঠেলে। যাও নফর—চাবি বন্ধ করে এসো।

রাত প্রায় দশটা। দেওয়ান রাজারাম একা গিয়ে চুনের গুদামের দরজা খুললেন। রামকানাই কবিরাজ ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েচেন। নীলকুঠির চুনের গুদাম শয়নঘর হিসেবে খুব আরামদায়ক স্থান নয়। 'চুনের গুদাম'-এর সঙ্গে চুনের সম্পর্ক তত থাকে না, যত থাকে বিদ্রোহী প্রজা ও কৃষকের। বড় সাহেবের ও নীলকুঠির স্বার্থ নিয়ে যার সঙ্গে বিরোধ বা মতভেদ, সে চুনের গুদোমের যাত্রী। এই আলো-বাতাসহীন দুটো মাত্র ঘুলঘুলিওয়ালা ঘরে তাকে আবদ্ধ থাকতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ বড় সাহেব বা ছোট সাহেবের অথবা দেওয়ানজির মরজি। চুনের গুদামের বাইরে একটা বড় মাদার গাছ ছিল। একবার রাসমণিপুরের জনৈক দুর্দান্ত প্রজা ঘুলঘুলি দিয়ে বার হয়ে মাদার গাছের নিচু ডাল ধরে ঝুলে পালিয়ে গিয়েছিল বলে তৎকালীন বড় সাহেব জন সাহেবের আদেশে গাছটা কেটে ফেলা হয়। চুনের গুদামে ইতিপূর্বে একজন প্রজা নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ভূত দেখে।

রাজারামের মনে ভূতের ভয়টা একটু বেশি। একলা কখনো তিনি এত রাত্রে চুনের গুদামে আসতেন না। আসবার আগে তাঁর গা-টা ছম্‌-ছম্‌ করছিল, এখন রামকানাইকে দেখে তিনি মনে একটু সাহস পেলেন। হোক না ঘুমন্ত, তবুও একটা জলজ্যান্ত মানুষ তো বটে। দেওয়ানজি ডাক দিলেন—ও কবরেজ মশাই—ও কবরেজ—

রামকানাই চমকে ধড়মড় করে উঠে বললেন—এ কে? ও দেওয়ান মশাই—আসুন আসুন—বলেই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁকে বসবার ঠাঁই দিতে, যেন রাজারাম তাঁর বাড়িতে আজ রাতের বেলা অতিথি রূপে পদার্পণ করেচেন।

রাজারাম বললেন—থাক থাক। বসবার জন্যি আসি নি, আমার সঙ্গে চলুন।

—কোথায় দেওয়ান মশাই?

—চলুন না।

—তা চলুন। তবে এমন ঘরে আর আমায় পোরবেন না দেওয়ান মশাই, বড্ড মশা। কামড়ে আমারে খেয়ে ফেলে দিয়েচে একেবারে।

—আপনার গেরোর ফের। নইলে আজ আপনি নীলকুঠির কবিরাজ, আপনাকে এখানে আসতি হবে কেন! যাক যা হবার হয়েচে এখন চলুন আমার সঙ্গে।

—যেখানেই নিয়ে যান, একটু যেন ঘুমুতি পারি।

—মত বদলেচে।

—না দেওয়ান মশাই, হাত জোড় করে বলচি, আমারে ও অনুরোধ করবেন না। আমি কবিরাজ লোক, কারো অসুখ দেখলি নিজে গাছগাছড়া তুলে এনে বড়ি করে দোবো, নিজের

হাতে পাঁচন সেদ্ধ করবো, সে কাজে ত্রুটি পাবেন না। কিন্তু ওসব মামলা-মকদ্দমার কাজে আমারে জড়াবেন না। দোহাই আপনার—

রামকানাই সরল লোক, নীলকুঠির সাহেবদের ক্রিয়াকলাপ কিছুই জানতেন না—বা সাহেবদের চেয়েও তাদের এইসব নন্দীভৃঙ্গির দল যে এককাঠি সরেস, তারা যে রাতদুপুরে সাহেবদের হুকুমে ও ইঙ্গিতে বিনা দ্বিধায় অম্লান বদনে জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে লাশ গাজিপুরের বিলে পুঁতে রেখে আসতে পারে তাই বা তিনি কোন্ চরক-সুশ্রুতের পুঁথিতে পড়বেন?

ছোট সাহেব একটা লম্বা বারান্দায় বসে নীলের বান্ডিলের হিসেব করছিলো। এই সব বান্ডিল-বাঁধা নীল কলকাতা থেকে আমুটি কোম্পানীর বায়না করা। দিন তিনেকের মধ্যে তাদের তরফ থেকে হৌস ম্যানেজার রবার্টস্ সাহেব এসে নীল দেখবে। ছোট সাহেব নীলের বান্ডিলের তদারক করচে এই জন্যই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রসন্ন আমীন, সে খুব ভালো নীল চেনে, এবং জমানবিশ কানাই গাঙ্গুলি। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সহিস ভজা মুচি।

দেওয়ানকে দেখে ছোট সাহেব বলে উঠলো—আরে দেওয়ান, এসো এসো। তুমি বললো তো তিনশো তেষট্টি নম্বর আকাইপুরির নীলের বান্ডিলের সঙ্গে দেউলে, ঘোঘা, সরাবপুরির নীল মেশবে?

আসল কথা এরা নীল ভালোমন্দতে মেশাচ্চে। সব মাঠের নীল ভালো হয় না। যারা এদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ তারা নীল দেখে বলে দেবে তার শ্রেণী। বলে দেবে, এ নীলের সঙ্গে ও নীল মিশিও না, আমুটি কোম্পানীর দালাল ধরে ফেলে দেবে।

দেওয়ান বললে—খুব মিশবে। এ বছর আর কালীবর দালাল আসবে না, রবার্ট সাহেব কিছু বোঝে না—ঘোঘা আর আমাদের মোল্লাহাটি, পাঁচপোতার নীল মিশিয়ে দিলি কেউ ধরতে পারবে না। এই এনিচি হুজুর, আমাদের সেই কবিরাজ।

ছোট সাহেব রামকানাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—চুনের গুদাম কি রকম লাগলো?

রামকানাই হাত জোড় করে বললে—সায়েব মশায়, নমস্কার আজ্ঞে।

—চুনের গুদাম কেমন জায়গা?

দেওয়ান রাজারাম জিভে একটা শব্দ করে হাত দু'খানা তুলে বললে—হুজুর, আপনি বললেন কি রকম জায়গা। কবিরাজ তার কি জানে? সেখানে ঢুকে ঘুমুতি লেগেচে।

—অ্যাঁ। ঘুমুচ্ছিলে? তা হোলে খুব আরামের জায়গা বলে মনে হয়েচে দেখচি। আর ক'দিন থাকতি চাও?

—আজ্ঞে? সায়েব মশায় কি বলচেন, আমি বুঝতি পারচি নে।

—খুব বুঝেচ। তুমি ঘুঘু লোক, ন্যাকা সাজ্‌লি জন ডেভিড্ তোমায় ছাড়বে না। মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবে কি না বলো। যদি দ্যাও, তোমাকে আরও দশ টাকা এখুনি মাইনে বাড়িয়ে দেবো। কেমন রাজী? কোনো কথা বলতি হবে না, তুমি বুনোপাড়ার ছিকৃষ্ট বুনো আর দু'একজন লোককে লাঠি হাতে চলে যেতি দেখেচ বলবে। রাজী?

—আজ্ঞে সায়েব মশায়?

—ও সায়েব মশায় বলা খাটবে না। করতি হবে, সাক্ষী দিতি হবে। তোমার উন্নতি করে দেবো। এখানে বাঁধা মাইনের কবরেজ হবে। কুড়ি টাকা মাইনে ধরে দিও দেওয়ান জুন মাস থেকে।

দেওয়ান রাজারাম তখুনি পড়া পাখীর মত বলে উঠলেন—যে আজ্ঞে হুজুর।

—বেশ নিয়ে যাও। কবিরাজ রাজী আছে। নিয়ে যাও ওকে। প্রসন্ন আমীন, তোমার ঘরে শোবার জায়গা করে দিতি পারবা না কবিরাজের?

প্রসন্ন আমীন তটস্থ হয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে—হাঁ হুজুর। আমার বিছানা পাতাই আছে, তাতেও উনি শুতে পারেন না হয়—

রামকানাইয়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, জল-তেষ্টায় তাঁর জিভ জড়িয়ে এসেচে, কিন্তু নীলকুঠিতে সায়েবের ও মুচির ছোঁয়া জল তিনি খাবেন না, কারণ এইমাত্র দেখলেন বেহারা শ্রীরাম মুচি ছোট সায়েবের জন্যে কাঁচের বাটি ক'রে মদ (মদ নয় কফি, রামকানাই ভুল করেচেন) নিয়ে এল—সত্যিক জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি এখানে—নাঃ, এই সব ব্রাহ্মণেরও দেখচি এখানে জাত নেই।। এখানে কবিরাজি করতে হোলে জল খাবেন না এখানকার, শুধু ডাব খেয়ে কাটাতে হবে।

প্রসন্ন আমীন বললে—তাহোলে চলুন কবিরাজ মশাই—রাত হয়েচে।

দেওয়ান রাজারাম পাকা লোক, তিনি এই সময় বললেন—তাহোলে কবিরাজ মশাইয়ের সাক্ষী দেওয়া ঠিক হোলো তো?

প্রসন্ন আমীন রামকানাইয়ের দিকে চাইলে। রামকানাই বললে—সায়েব মশাই, তা আমি কেমন করে দেবো? সে আগেই বললাম তো দেওয়ান মশাইকে।

ছোট সাহেব চোখ গরম করে বললে—সাক্ষী দেবে না?

—না, সায়েব মশাই। মিথ্যে কথা বলতি আমি পারবো না। দোহাই আপনার। হাত-জোড় করচি আপনার কাছে। আমার বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—

—ও, তুমি এমনি সায়েস্তা হবে না। তোমার মাথার ঠিক এমনি হবে না। ভজা, নফরকে ডাক দ্যাও। দশ ঘা শ্যামচাঁদ কষে দিক।

নফর মুচি লম্বা জোয়ান মিশকালো লোক। সে অনেক লোককে নিজের হাতে খুন করেচে। কুঠির বাইরে আশপাশ গ্রামে নফরকে সবাই ভয় করে। নফর বোধ হয় ঘুমুচ্ছিল। ভজার পেছনে পেছনে সে চোখ মুছতে মুছতে এল।

ছোট সাহেব রামকানাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—কেমন? লাগাবে শ্যামচাঁদ?

—আজ্ঞে সায়েব মশাই—তাহলি আমি মরে যাবো। আমারে মারতি বলবেন না। আষাঢ় মাসে বাত শ্লেষ্মা হয়ে আমার শরীর বড় দুর্বল—

—মরে গেলে তাতে আমার কিছুই হবে না। নিয়ে যাও নফর—

নফর বললে—যে আজ্ঞে হুজুর।

নফর এসে রামকানাইয়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো। যাবার সময় দেওয়ানজির দিকে তাকিয়ে বললে—তাহোলি আস্থাবলে নিয়ে যাই?

এই সময় দেওয়ানের দিকে সে সামান্যক্ষণের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দেওয়ান বললেন—নিয়ে যাও—

রামকানাই বলিদানের পাঁঠার মত নফরের সঙ্গে চললেন। লোকটা স্বভাবত নির্বোধ, এখুনি, যে নফর মুচির জোরালো হাতের শ্যামচাঁদের ঘায়ে তাঁর পিঠের চামড়া ফালা ফালা হয়ে যাবে সে সম্ভাবনা কানে শুনলেও বুদ্ধি দিয়ে এখনো হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন নি।

আস্তাবলে দাঁড় করিয়ে নফর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে রামকানাইয়ের দিকে ভালো করে চেয়ে বললে—ক'ঘা খাবা!

—আমারে মেরো না বাবা। আমার বাত শ্লেষ্মার অসুখ আছে, আমি তাহলি মরি যাবো।

—মরে যাও, বাঁওড়ের জলে ভাসিয়ে দেবানি। তার জন্যে ভাবতি হবে না। অমন কত এ হাতে ভাসিয়ে দিইচি। পেছন ফিরে দাঁড়াও।

দু'ঘা মাত্র শ্যামচাঁদ খেয়ে রামকানাই মাটিতে পড়ে গিয়ে ছট্‌ফট করতে লাগলেন। নফর কোথা থেকে একটা চটের থলে এনে রামকানাইয়ের গায়ে ফেলে দিলে। তার ধুলোয় রামকানাইয়ের মুখের ভিতর ভর্তি হয়ে দাঁত কিচ্ কিচ্ করতে লাগলো। পিঠে তখন ওদিকে নফর সজোরে শ্যামচাঁদ চালাচ্চে ও মুখে শব্দ করচে—রাম, দুই, তিন, চার—

দশ ঘা শেষ করে নফর বললে—যাও, বেরাহ্মণ মানুষ। সায়েব বললি কি হবে, তুমি মরে যেতে দশ ঘা শ্যামচাঁদ খেলে। রাত্তিরি এখান থেকে নড়বা না। সামনে এসে ছোট সায়েব দেখলি ছুটি।

রামকানাই বাকি রাতটুকু মড়ার মত পড়ে রইলেন আস্তাবলের মেঝেতে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে সকালে বাড়ির সামনে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছেন, আজ হাটবার, চাল কিনবেন। নিলু বলে দিয়েচে একদম চাল নেই! এমন সময় তিলু এক বছরের খোকাকে এনে তাঁর কাছে দিতে গেল। ভবানী বললেন—এখন দিও না, আমি একটু মামার কাছে যাবো। যাও, নিয়ে যাও।

খোকা কিন্তু ইতিমধ্যে মার কোল থেকে নেমে পড়ে ভবানীর কোলে যাবার জন্যে দু'হাত বাড়াচ্চে। তিলু নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে সে কাঁদতে লাগল ও ছোট্ট ডান হাতখানা বাড়িয়ে বাবাকে ডাকতে লাগলো।

—দিয়ে যাও, দিয়ে যাও! দাঁড়াও, ঐ তো দীনু বুড়ি আসচে। দেখে নাও তো চালটা—ভবানী ছেলেকে কোলে করলেন। খোকা আনন্দে তাঁর কান ধরে বলতে লাগল—ই—গুল্‌ল্‌ন—আঙুল দিয়ে পথের দিকে দেখিয়ে দিলে।

ভবানী বললেন—না, এখন তোমার বেড়াবার সময় নয়। ওবেলা যাবো।

খোকা ওসব কথা বোঝে না। সে আবার আঙুল দিয়ে পথের দিকে দেখিয়ে বললে—ইঃ।

—না এখন না।

তিলু বললে—যাচ্চেন তো মামাশ্বশুরের ওখানে। নিয়ে যান না সঙ্গে।

খোকা ততক্ষণে আবার পৈতের গোছ ছোট্ট মুঠোতে ধরে পথের দিকে টানচে, আর চেঁচিয়ে বলচে—অ্যাঃ—নোবল্ নোবল্—উঁ—

পরেই কান্নার সুর।

তিলু বললে—যাও, যাও। আহা, আপনার সঙ্গে বেড়াতে ভালোবাসে।

—কেন, ওর তিন মা! আমি না হোলে চলে না?

—না গো। রান্নাঘরে যখন থাকে, তখন থাকে থাকে কেবল আঙুল তুলে বাইরের দিকে দেখাচ্চে, মানে আপনার কাছে নিয়ে যেতে বলচে—

এমন সময় দীনু বুড়ি চালের ধামা কাঁখে করে নিয়ে ওদের কাছাকাছি এসে পড়তেই ওরা বললে—দেখি কি চাল?

দীনু বুড়ির বয়স আশীর ওপর, চেহারা ভারতচন্দ্র বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নদার মত। এমন কি হাতের ছোট্ট লড়িটি পর্যন্ত। ওদের কাছে এসে একগাল হেসে ধামা নামিয়ে বললে—ডবল নাগরা দিদিমণি। আর কে? জামাই?

তিলু বললে—হ্যাঁ গো। দর কি?

—ছ'পয়সা।

—না, এক আনা করে হাটে দর গিয়েচে।

—না দিদিমণি, তোমাদের খেয়ে মানুষ, তোমাদের ফাঁকি দেবানি? ছ'পয়সা না দ্যাও, পাঁচ পয়সা দিও। এক মুঠো নিয়ে চিবিয়ে দ্যাখো কেমন মিষ্টি। আকোরকোরার মত।

—চল বাড়ির মধ্যি। পয়সা কিন্তু বাকি থাকবে।

—ঐ দ্যাখো, তাতে কি হয়েচে? ওবেলা দিও।

—ওবেলা না। মঙ্গলবারের ইদিকি হবে না।

—তাই দিও।

এই ফাঁকে খোকা খপ্ করে একমুঠো চাল ধামা থেকে উঠিয়ে নিয়েই মুখে পুরে দিলে। কিছু কিছু পড়ে গেল মাটিতে। ভবানী ওর হাত থেকে চাল কেড়ে নিয়ে কোলে নিয়ে বললেন—হাঁ করো—হাঁ করো খোকা—

খোকা অমনি আকাশ-পাতাল বড় হাঁ করলে, এটা তিলু খোকাকে শিখিয়েচে। কারণ যখন তখন যা-তা সে দুই আঙুলে খুঁটে তুলে সর্বদা মুখে পুরচে, ওর মা বলে—হাঁ কর খোকন্—নক্ষি ছেলে। কেমন হাঁ করে—

অমনি খোকা আকাশ-পাতাল হাঁ করে অনেকক্ষণ থাকবে, সেই ফাঁকে ওর মা মুখে আঙুল পুরে মুখের জিনিস বার করে ফেলবে।

আজকাল সে হাঁ করে বলে—আঁ—আ—আ—আ—

—ওর মা বলে—থাক—থাক। অত হাঁ করতি হবে না—

ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকনের মুখ থেকে আঙুল দিয়ে সব চাল বের করে ফেলে দিলেন। এমন সময় পথের ওদিক থেকে দেখা গেল ফণি চক্কত্তি আসচেন, পেছনে ভবানীর মামা চন্দ্র চাটুয্যে। ভবানী বললেন—তিলু, তুমি দীনু বুড়িকে নিয়ে ভেতরে যাও—খোকাকেও নিয়ে যাও—

ওঁরা দুজন কাছে আসচেন, তিলু খোকাকে নিতে গেল, কিন্তু সে বাবার কোল আঁকড়ে রইল দু'হাতে বাবার গলা জাপটে ধরে। মুখে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো।

তিলু বললে—ও আপনার কোল থেকে কারো কোলে যেতে চায় না, আমি কি করবো?

ভবানী হাসলেন। এ খোকাকে তিনি কত বড় দেখলেন এক মুহূর্তে। বিজ্ঞ, পণ্ডিত ছেলে টোল খুলে কাব্য, দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র পড়াচ্চে ছাত্রদের। সৎ, ধার্মিক, ঈশ্বরকে চেনে। হবে না? তাঁর ছেলে কিনা? খুব হবে। দেশে দেশে ওকে চিনবে, জানবে।

সেই মুহূর্তে তিলুকেও দেখলেন—দীনু বুড়ির আগে আগে চলে গিয়ে বাড়ির ছোট্ট দরজার মধ্যে ঢুকে চলে গেল। কি নতুন চোখেই ওকে দেখলেন যেন। মেয়েরাই সেই দেবী,

যারা জন্মের দ্বারপথের অধিষ্ঠাত্রী—অনন্তের রাজ্য থেকে সসীমতার মধ্যেকার লীলাখেলার জগতে অহরহ আত্মাকে নিয়ে আসচে, তাদের নবজাত ক্ষুদ্র দেহটিকে কত যত্নে পরিপোষণ করচে, কত বিনিদ্র উদ্বিগ্ন রাত্রির ইতিহাস রচনা করে জীবনে জীবনে, কত নিঃস্বার্থ সেবার আকুল অশ্রুরাশিতে ভেজা সে ইতিহাসের অপঠিত অবজ্ঞাত পাতাগুলো।

ভবানী বললেন—শোনো তিলু—

—কি?

—খোকাকে নেবে?

—ও যাবে না বললাম যে!

—একটু দাঁড়াও, দেখি। দাঁড়াও ওখানে।

—আহা-হা! ঢং!

মুচকে হেসে সে হেলেদুলে ছোট্ট দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলো। কি শ্রী! মা হওয়ার মহিমা ওর সারা দেহে অমৃতের বসুধারা সিঞ্চন করেচে।

ফণি চক্কত্তি বললেন—বোসো বাবাজি।

সবাই মিলে বসলেন। ভবানী বাঁড়ুয্যে তামাক সেজে মামা চন্দ্র চাটুয্যের হাতে দিলেন। ফণি চক্কত্তি বললেন—বাবাজি, তোমাকে একটা কাজ করতি হবে—

—কি মামা?

—তোমাকে একবার আমার বাড়ি যেতি হবে। আমি একবার গয়া-কাশী যাবো ভাবচি। তোমার মামাও আমার সঙ্গে যাবেন। তুমি তো বাবা সব জানো ওদিকির পথঘাট! কোথা দিয়ে যাবো, কি করবো!

—হেঁটে যাবেন?

—নয়তো বাবা পাল্‌কি কে আমাদের জন্যি ভাড়া করে নিয়ে আসচে? হেঁটেই যাবো।

—এখান থেকে যাবেন—

—ওরকম করে বললি হবে না। ঈশ্বর বোষ্টম সেথো আমাদের সঙ্গে যাবে। সে কিছু কিছু জানে, তবে তুমি হোলো গিয়ে জাহাজ। তোমার কথা শুনলি—তুমি ওবেলা আমাদের বাড়ি গিয়ে চালছোলাভাজা খাবে। অনেকে আসবে শুনতি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ির মধ্যে এসে তিলুকে বললেন—ওগো, ভূতের মুখে রামনাম!

—কি গা?

—ফণি চক্কত্তি আর মামা চন্দ্র চাটুয্যে নাকি যাচ্চেন গয়া-কাশী। এবার তোমার দাদা না বলে বসেন তিনিও যাবেন।

তিলুর পেছনে পেছনে নিলু বিলুও এসে দাঁড়িয়েছিলো। নিলু বললে—কেন, দাদা বুঝি মানুষ না! বেশ!

—মানুষ তো বটেই। তবে আমি আর সকালবেলা গুরুনিন্দেটা করবো? আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা না-ই বেরুলো।

বিলু বললে—আহা রে, কি যে কথার ভঙ্গি! কবির গুরু, ঠাকুর হরু—হরু ঠাকুর এলেন। দিদি কি বলো?

তিলু চুপ করে রইল। স্বামীর সঙ্গে তার কোন বিষয়ে দুমত নেই, থাকলেও কখনো প্রকাশ

করে না। গ্রামের লোকেও তিলুর স্বামীভক্তি নিয়ে বলাবলি করে। এমনটি নাকি এদেশে দেখা যায় নি। দু'একজন দুষ্ট লোকে বলে—আহা, হবে না? বলে,

কুলীনের কন্যে আমি নাগর খুঁজে ফিরি—
দেশ-দেশান্তরে তাই ঘুরে ঘুরে মরি—

কুলীন কন্যের ভাতার জুটলো বুড়োবয়সে। তাই আবার ছেলে হয়েচে। ভক্তি কি অমনি আসে? যা হোত না, তাই পেয়েচে। ওদের বড় ভাগ্যি, বুড়ো ধুম্‌ড়ি বয়েসে বর জুটেচে।

শ্রোতাগণ ঘাঁটিয়ে আরও শোনবার জন্যে বলে—তবুও বর তো?

—হ্যাঁ, বর বইকি। তার আর ভুল? তবে—

—কি তবে—

—বড্ড বেশি বয়েস।

—যাও, যাও, কুলীনের ছেলের আবার বয়েস।

সবাই কিন্তু এখানে একমত হয় যে ভবানী বাঁড়ুয্যে সত্যই সুপাত্র এবং সৎ ব্যক্তি। কেউ এ গাঁয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যের সম্বন্ধে নিন্দের কথা উচ্চারণ করে নি, যে পাড়াগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসি ঘোঁটে ব্রহ্মাবিষ্ণু পর্যন্ত বাদ যান না, সেখানে সবার কাছে অনিন্দিত থাকা সাধারণ মানুষ পর্যায়ের লোকের কর্ম নয়।

ভবানী বাঁড়ুয্যে সন্ধ্যের আগেই ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসলেন। কার্তিক মাস। বেলা পড়ে একদম ছায়ানিবিড় হয়ে এসেচে, ভেরেন্ডাগাছের বেড়া, চারাবাগানের শেওড়া আকন্দের ঝোপ। বনমরচে লতার ফুলের সুগন্ধ বৈকালের ঠাণ্ডা বাতাসে। ফণি চক্কত্তির বেড়ার পাশে তাঁরই ঝিঙে ক্ষেতে ফুল ফুটেচে সন্ধ্যেতে। শালিকের দল কিচ্‌কিচ্‌ করচে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনে কার্তিকশাল ধানের গাদার ওপরে।

ফণি চক্কত্তির সেকেলে চণ্ডীমণ্ডপ। একটা বাহাদুরি কাঠের খুঁটির গায়ে খোদাইকরা লেখা আছে—"শ্রীশিবসত্য চক্কবর্তী কর্তৃক সন ১১৭২ সালে মাধব ঘরামি ও অক্রূর ঘরামি তৈরি করিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ইহা ঠাকুরের ঘর ইহা জানিবা"—সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপের বয়স প্রায় একশত বছর হোতে চলেচে। অনেক দূর থেকে লোকে এই চণ্ডীমণ্ডপ দেখতে আসে। খড়ের চালের ছাঁচ ও পাট, রলা ও সলা বাখারির কাজ, ছাঁচপড়নের বাঁশের কাজ, মটকায় দুই লড়ায়ে পায়রার খড়ের তৈরী ছবি দেখে লোকে তারিফ করে। এমন কাজ এখন নাকি প্রায় লুপ্ত হতে বসেচে এদেশে।

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—আরে এখন হয়েচে সব ফাঁকি। সায়েবসুবোয় বাংলা করেচে নীলকুঠিতে, তাই দেখি সবাই ভাবে অমনডা করবো। এখন যে খড়ের ঘরের রেওয়াজ উঠেই যাচ্চে। তেমন পাকা ঘরামিই বা আজকাল কই?

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—সেদিন রাজারামের এক ভাইপো বলেচে সায়েবদের দেশে নাকি কলের গাড়ি উঠেচে। কলে চলে। কাগজে ছাপা করা ছবি নাকি সে দেখে এসেচে!

দীনু বললেন—কলে চলে বাবাজি?

—তাই তো শুনলাম। কালে কালে কতই দেখবো। আবার শুনেচ খুড়ো, মেটে তেল বলে একরকম তেল উঠেচে, পিদিমে জ্বলে। দেখে এসেচে সে কলকেতায়।

—বাদ দ্যাও। বলে কলির কেতা, কলকেতা। আমাদের সর্ষে তেলই ভালো, রেড়ির তেলই ভালো, মেটে তেল, কাঠের তেলে আর দরকার নেই বাবাজি। হ্যাঁ, বলো ভবানী বাবাজি, একটু রাস্তাঘাটের খবর দ্যাও দিনি। বলো একটু। তুমি তো অনেক দেশ বেড়িয়েচ। পাহাড়গুলো কিরকম দেখতি বাবাজি?

রূপচাঁদ মুখুয্যে দীনুর হাত থেকে হুঁকো নিতে নিতে বললেন—থাক, পাহাড়ের কথা এখন থাক। পাহাড় আবার কি রকম? মাটির ঢিবির মত, আবার কি? দেবনগরের গড়ের মাটির ঢিবি দ্যাখোনি? ওই রকম। হয়তো একটু বড়।

ভবানী বললেন—দাদামশাই, পাহাড় দেখেচেন কোথায়?

—দেখিনি তবে শুনেচি।

—ঠিক।

ভবানী এতগুলি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সামনে তামাক খাবেন না, তাই হুঁকো নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন—কোথায় আপনারা যেতে চান?

ফণি চক্কত্তি বললেন—আমরা কিছুই জানিনে। ঈশ্বর বোষ্টম সেথোগিরি করে, সে নিয়ে যাবে বলেচে। সে আসুক, বোসো। তাকে ডাকতি লোক গিয়েচে।

ফণি চক্কত্তির বড় মেয়ে বিনোদ এই সময়ে চালছোলাভাজা তেলনুন মেখে বাটিতে করে প্রত্যেককে দিয়ে গেল। তারপর নিয়ে এলো প্রত্যেকের জন্যে এক ঘটি করে জল। এঁর বাড়িতে সন্ধ্যের মজলিসে চালছোলাভাজার বাঁধা ব্যবস্থা। দা-কাটা তামাক অবারিত, রোজ দেড়সের আন্দাজ তামাক পোড়ে। ফণি চক্কত্তির চন্ডীমন্ডপের সান্ধ্য আতিথেয়তা এ গাঁয়ে বিখ্যাত।

ঈশ্বর বোষ্টম এসে পৌঁছুলো। ভবানী তাকে বললেন—কোন্ পথ দিয়ে এঁদের নিয়ে যাবে গয়া কাশী?

ঈশ্বর গড় হয়ে প্রণাম করে বললে—আজ্ঞে তা যদিস্যাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তবে বলি, বর্ধমান ইস্তক বেশ যাবো। তারপর রাস্তা ধরে সোজা এজ্ঞে গয়া।

—বেশ। কি রাস্তা?

—এজ্ঞে ইংরেজি কথায় বলে গ্যাং ট্যাং রাস্তা। আমরা বলি অহিল্যেবাইয়ের রাস্তা।

—কতদিন ধরে সেথো-গিরি করচো?

—তা বিশ বছর। একা তো যাইনে, সেথোর দল আছে, বর্ধমান থেকে যায়, চাকদহ থেকে, উলো থেকে যায়। এক আছে ধীরচাঁদ বৈরিগী, বাড়ি হুগলী। এক আছে কুমুদিনী জেলে, বাড়ি হাজরা পাড়া, ঐ হুগলী জেলা।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—কুমুদিনী জেলে, মেয়েমানুষ?

—এজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি মেয়েমানুষ হলি কি হবে, কত পুরুষকে যে জব্দ করেচেন তা আর কি বলবো। রূপও তেমনি, জগদ্ধাত্রী পিরতিমে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—ও ঠিকই বলচে। বর্ধমান দিয়ে গিয়ে ওখানে শের শা'র বড় রাস্তা পাওয়া যায়। অহল্যাবাই-টাই বাজে, ওটা নবাব শের শা'র রাস্তা।

—কোথাকার নবাব?

—মুরশিদাবাদের নবাব। সিরাজদৌলার বাবা।

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—হাঁ বাবাজি, এখনো নাকি সায়েব কোম্পানী মুরশিদাবাদের নবাবকে খাজনা দেয়?

ভবানী বললেন—তা হবে। ওসব আমি তত খোঁজ রাখিনে। আজ দুজন সন্নিসির কথা বলবো আপনাদের, শুনে বড় খুশি হবেন।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তাই বলো বাবাজি। ওসব নবাব-টবাবের কথায় দরকার নেই। আমি তো কুয়োর মধ্যি যেমন ব্যাঙ আছে, তেমনি আছি পড়ে। পয়সা নেই যে বিদেশে যাবো। বাবাজি ভয়ও পাই। কোথাও চিনি নে, গাঁ থেকে বেরুলি সব বিদেশ-বিভূঁই। চাকদা পজ্জন্ত গিইচি গঙ্গাস্তানের মেলায়—আর ওদিকি গিইচি নদে-শান্তিপুর। ইছামতী দিয়ে নৌকা বেয়ে রাসের মেলায় নারকেল বিক্রি করতে গিইছিলাম বাবাজি। বেশ দু'পয়সা লাভ করেছিলাম সেবার।

সবাই ভবানীকে ঘিরে বসলেন। দীনু ভট্‌চাজ এগিয়ে এসে একেবারে সামনে বসলেন।

ভবানী বললেন—আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমার একজন গুরুভাই এসেছিলেন। ওঁর আশ্রম হোল মীর্জাপুর।

দীনু ভট্‌চাজ বলেন—সে কোথায় বাবাজি?

—পশ্চিমে, অনেকদূর। সে আপনারা বুঝতে পারবেন না। চমৎকার পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সেখানে এক সাধু থাকেন, আমাদের বাঙালি সাধু, তাঁর নাম হৃষীকেশ পরমহংস। ছোট একখানা ঝুপড়িতে দিনরাত কাটান। নির্জন বনে শিরীষ ফুল আর কাঞ্চন ফুল ফোটে, ময়ূর বেড়ায় পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে, আমলকী গাছে আমলকী পাকে—

রূপচাঁদ মুখুয্যে আবেগভরে বললেন—বাঃ বাঃ—আমরা কখনো দেখি নি এমন জায়গা—

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—পাহাড় কাকে বলে তাই দ্যাখলাম না জীবনে বাবাজি, তার আবার ঝর্ণা!

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—পড়ে আছি গু-গোবরের গর্তে, আর দেখিচি কিছু, তুমিও যেমন! বয়েস পঁয়ষট্টির কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। তুমি সেখানে গিয়েচ বাবাজি?

ভবানী বললেন—আমি পরমহংস মহারাজের কাছে ছ'মাস ছিলাম। তিনিই আমার গুরু। তবে মন্ত্র-দীক্ষা আমি নিই নি, তিনি মন্ত্র দ্যান না কাউকে।

—মহারাজ কোথাকার?

—তা নয়। ওঁদের মহারাজ বলে ডাকা বিধি।

—ও। সেখানে জঙ্গলে খেতে কি?

—আমলকী, বেল, বুনো আম। আর এত আতার জঙ্গল পাহাড়ে! দু'ঝুড়ি দশঝুড়ি পাকা আতা জঙ্গলের মধ্যে গাছের তলায় রোজ শেয়ালে খেতো। সুমিষ্ট আতা। তেমন এখানে চক্ষেও দেখেন নি আপনারা।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তাই বলো বাবাজি, ঈশ্বর বোষ্টমকে সেই হদিসটা দ্যাও দিকি। খুব করে আতা খেয়ে আসি—

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আরে দূর কর আতা! ওই সব সাধু-সন্নিসির দর্শন পেলে তো ইহজন্ম সার্থক হয়ে গেল। বয়েস হয়েচে আর আতা খেলি কি হবে ভায়া? তারপর বাবাজি—?

—তারপর সেখানে কাটালুম ছ'মাস। সেখান থেকে গেলাম বিঠুর। বাল্মীকি আশ্রমে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—বাল্মীকি মুনি? যিনি মহাভারত লিখেছিলেন?

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—তবে তুমি সব জানো! বাল্মীকি মুনি মহাভারত লিখতি যাবেন কেন? লিখেছিলেন রামায়ণ।

—ঠিক। তারপর সে আশ্রমেও এক সাধুর সঙ্গে কিছুদিন কাটালাম।

রূপচাঁদ বললেন—সেখানে যাবার হদিসটা দ্যাও বাবাজি।

—সে গৃহীলোকের দ্বারা হবে না। বিশেষ করে ঈশ্বর বোষ্টমের সঙ্গে গেলে হবে না। ও আর কতদূর আপনাদের নিয়ে যাবে? বর্ধমান গিয়ে বড় রাস্তা ধরে আপনারা চলে যান গয়া, সেখান থেকে কাশী। কাশী থেকে যাবেন প্রয়াগ।

মুনি ভরদ্বাজ বসহিঁ প্রয়াগা
যিন্‌হি রামপদ অতি অনুরাগা

প্রয়াগে সাবেক কালে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল। কুম্ভমেলার সময় সেখানে অনেক সাধু-সন্নিসি আসেন। আমি গত কুম্ভমেলার সময় ছিলাম। কিন্তু যাওয়া বড় কষ্ট। হেঁটে যেতে হবে আমাদের এতটা পথ। শের শা' নবাবের রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে সরাই খানা আছে, সেখানে যাত্রীরা থাকে, রেঁধে বেড়ে খায়।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—চালডাল?

—সব পাবেন সরাইতে। দোকান আছে। তবে দল বেঁধে যাওয়াই ভালো। পথে বিপদ আছে।

—কিসের বিপদ?

—সব রকম বিপদ। চোর ডাকাত আছে, ঠগী আছে। বর্ধমান ছাড়িয়ে গয়া পর্যন্ত সারা পথে দারুণ বন পাহাড়। বড় বড় বাঘ, ভাল্লুক এ সব আছে।

—ও বাবা!

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—উনি ঠিকই বলেচেন। সেবার খাব্‌রাপোতা থেকে একজন যাত্রী গিয়েছিল গয়ায় যাবে বলে। ওদিকের এক জায়গায় সন্দেবেলা তিনি বললেন, হাতমুখ ধুতি যাবো। আমার কথা শোনলেন না। আমরা এক গাছতলায় চব্বিশজন আছি। তিনি মাঠের দিকে পলাশ গাছের ঝোপের আড়ালে ঘটি নিয়ে চললেন। বাস্! আর ফিরলেন না। বাঘে নিয়ে গেল।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন—বলো কি!

—হ্যাঁ। সে রাত্তিরি কি মুস্কিল। কান্নাকাটি পড়ে গেল। সকালে কত খুঁজে তেনার রক্তমাখা কাপড় পাওয়া গেল মাটির মধ্যে। তাঁরে টান্‌তি টান্‌তি নিয়ে গিইছিল, তার দাগ পাওয়া গেল।

রূপচাঁদ বললেন—সর্বনাশ!

এমন সময় দেখা গেল নালু পাল এদিকে আসচে। নালু পালকে একটা খেজুর পাতার চাটাই দেওয়া গেল বসতে, কারণ সে আজকাল বড় দোকান করেচে, ব্যবসাতে উন্নতি করেচে, বিয়ে-থাওয়া করেচে সম্প্রতি। তার দোকান থেকে ধারে তেলনুন এঁদের মধ্যে অনেককেই আনতে হয়। তাকে খাতির না করে উপায় নেই।

দীনু বললেন—এসো নালু, বোসো, কি মনে করে?

নালু গড় হয়ে সবাইকে একসঙ্গে প্রণাম করে জোড়হাতে বললে—আমার একটা আবদার আছে, আপনাদের রাখতি হবে। আপনারা নাকি তীথি যাচ্চেন শোনলাম। একদিন আমি ব্রাহ্মণ-তীথিযাত্রী ভোজন করাবো। আমার বড় সাধ। এখন আপনারা অনুমতি দিন, আমি জিনিস পাঠিয়ে দেবো চক্কত্তি মহাশয়ের বাড়ি। কি কি পাঠাবো হুকুম করেন।

চন্দ্র চাটুয্যে আর ফণি চক্কত্তি গাঁয়ের মাতব্বর। তাঁদের নির্দেশের ওপর আর কারো কথা বলার জো নেই এই গ্রামে—এক অবিশ্যি রাজারাম রায় ছাড়া। তাঁকে নীলকুঠির দেওয়ান বলে সবাই ভয় করলেও সামাজিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব নেই। তিনিও কাউকে বড় একটা মেনে চলেন না, অনেক সময় যা খুশি করেন। সমাজপতিরা ভয়ে চুপ করে থাকেন।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—কি ফলার করাবে?

নালু হাতজোড় করে বললে,—আজ্ঞে, যা হুকুম।

—আধ মণ সরু চিঁড়ে, দই, খাঁড়গুড়, ফেনি বাতাসা, কলা, আখ, মঠ আর—

ফণি চক্কত্তি বললেন—মুড়কি।

—মুড়কি কত?

—দশ সের।

—মঠ কত?

—আড়াই সের দিও। কেষ্ট ময়রা ভালো মঠ তৈরী করে, ওকে আমাদের নাম করে বোলো। শক্ত দেখে কড়াপাকের মঠ করে দিলে ফলারের সঙ্গে ভালো লাগবে।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—দক্ষিণে কত দেবে ঠিক কর।

—আপনারা কি বলেন?

—তুমি বল ফণি ভায়া। সবই তো আমি বললাম, এখন তুমি কিছু বলো।

ফণি চক্কত্তি বললেন—এক সিকি করে দিও আর কি।

নালু বললে—বড্ড বেশি হচ্চে কর্তা। মরে যাবো। বিশজন ব্রাহ্মণকে বিশ সিকি দিতি হলি—

—মরবে না। আমাদের আশীর্বাদে তোমার ভালোই হবে। একটি ছেলেও হয়েচে না?

—আজ্ঞে সে আমার ছেলে নয়, আপনারই ছেলে।

চন্দ্র চাটুয্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। নালু পাল শেষে একটি দুয়ানি দক্ষিণেতে রাজী করিয়ে বাইরে চলে গেল। বোধ হয় তামাক খেতে।

এইবার চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—হ্যাঁ ভায়া, নালু কি বলে গেল?

—কি?

—তোমার স্বভাব-চরিত্তির এতদিন যাই থাক, আজকাল বুড়ো বয়েসে ভালো হয়েচে বলে ভাবতাম। নালুর বৌয়ের সঙ্গে ভাবসাব কতদিনের?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। রাগে ফণি চক্কত্তি জোরে জোরে তামাক টানতে টানতে বললেন—ওই তো চন্দরদা, এখনো মনের সন্দ গেল না—

চন্দ্র চাটুয্যে কিছুক্ষণ পরে ভবানীকে বললেন—বাবা, নালু পালের ফলার কবে হবে তুমি দিন ঠিক করে দাও।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—নালু পালের ফলারের কথায় মনে পড়লো মামা একটা কথা।

ঝাঁসির কাছে ভরসুৎ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে অম্বিকা দেবীর মন্দিরে কার্তিক মাসে মেলা হয় খুব বড়। সেখানে আছি, ভিক্ষে করে খাই। কাছে এক রাজার ছেলে থাকেন, সাধুসন্ন্যিসির বড় ভক্ত। আমাকে বললেন—কি করে খান? আমি বললাম, ভিক্ষে করি। তিনি সেদিন থেকে দুজনের উপযুক্ত ভাত, রুটি, তরকারি, দই, পায়েস, লাড্ডু পাঠিয়ে দিতেন। যখন খুব ভাব হয়ে গেল তখন একদিন তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বললেন আমার কাছে। জয়পুরের কাছে উরিয়ানা বলে রাজ্য আছে, তিনি তার বড় রাজকুমার। তাঁর বাপের আরও অনেক ছেলেপিলে। মিতাক্ষরা মতে বড় ছেলেই রাজ্যের রাজা হবে বুড়ো রাজার পরে। তাই জেনে ছোটরাণী সৎ ছেলেকে বিষ দেয় খাবারের সঙ্গে—

দীনু ভট্চাজ বলে উঠলেন—এ যে রামায়ণ বাবাজি!

—তাই। অর্থ আর যশ-মান বড় খারাপ জিনিস মামা। সেই জন্যেই ওসব ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর শুনুন, এমন চক্রান্ত আরম্ভ হোলো রাজবাড়িতে যে সেখানে থাকা আর চললো না। তিনি তাঁর স্ত্রীপুত্র নিয়ে ভরসুৎ গ্রামে একটা ছোট বাড়িতে থাকেন, নিজের পরিচয় দিতেন না কাউকে। আমার কাছে বলতেন, রাজা হোতে তিনি আর চান না। রাজরাজড়ার কান্ড দেখে তাঁর ঘেন্না হয়ে গিয়েচে রাজপদের ওপর!

ফণি চক্কত্তি বললেন—তখনো তিনি রাজা হন নি কেন?

—বুড়ো তখনো বেঁচে। তাঁর বয়েস প্রায় আশি। এই ছেলেই আমার সমবয়সী। আহা, অনেক দিন পরে আবার সেকথা মনে পড়লো। অম্বিকা দেবীর মন্দিরে পূর্বদিকের পাথর-বাঁধানো চাতালে বসে জ্যোৎস্নারাত্রে দুজনে বসে গল্প করতাম, সে-সব কি দিনই গিয়েচে! সামনে মস্ত বড় পুকুর, পুকুরের ওপারে রামজীর মন্দির। কি সুন্দর জায়গাটি ছিল। তাঁর ছোট সৎমা বিষ দিয়েছিল খাবারের সঙ্গে, কেবল এক বিশ্বস্ত চাকর জানতে পেরে তাঁকে খেতে বারণ করে। তিনি খাওয়ার ভান করে বলেন যে তাঁর শরীর কেমন করচে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করচে, এই বলে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েন গিয়ে। ছোট সৎমা শুনে হেসেছিল, তাও তিনি শুনেছিলেন সেই বিশ্বস্ত চাকরের মুখে। সেই রাত্রেই তিনি রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে আসেন, কারণ শুনলেন ভীষণ ষড়যন্ত্র চলেচে ভেতরে ভেতরে। ছোট রাণীর দল তাঁকে মারবেই। বুড়ো রাজা অকর্মণ্য, ছোটরাণীর হাতে খেলার পুতুল।

দীনু ভট্চাজ বললেন—না পালালি, মঘা এড়াবি ক'ঘা—অমন সৎমা সব করতি পারে। বাবাঃ, শুনেও গা কেমন করে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তারপর?

—তারপর আর কি। আমি সেখানে দু'মাস ছিলাম। এই দু'মাসের প্রত্যেক দিন দুটি বেলা অম্বিকা-মন্দিরের ধর্মশালায় আমার জন্যে খাবার পাঠাতেন। কত জ্ঞানের কথা বলতেন, দুঃখু করতেন যে রাজার ছেলে না হয়ে গরীবের ঘরে জন্মালে শান্তি পেতেন। আমার সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করতেন। তাঁর স্ত্রীকেও আমি দেখেচি, অম্বিকা মন্দিরে পূজো দিতে আসতেন, রাজপুত মেয়ে, খুব লম্বা আর জোয়ান চেহারা, নাকে মস্ত বড় [illegible] নথ। একদিন দেখি ফর্সি টেনে তামাক খাচ্চেন—

রূপচাঁদ মুখুয্যে অবাক হয়ে বললেন—মেয়েমানুষে?

—ওদেশে খায়, রেওয়াজ আছে। বড় সুন্দর চেহারা, যেন জোরালো দুর্গাপ্রতিমা, অসুর

মারলেই হয়। আমি ভাবতাম, না-জানি এঁর সেই সৎশাশুড়ীটি কেমন, যিনি এঁকেও জব্দ করে রেখেচেন। মাস দুই পরে আমি ওখান থেকে বিঠুর চলে এলাম, কানপুরের কাছে। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈকে একদিন দেখেছিলাম অম্বিকা পূজো করতে। তারপর শুনেছিলাম ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ঝাঁসির রাণী মারা পড়েচেন—পরমা সুন্দরী ছিলেন—তবে ও দেশের মেয়ে, জোয়ান চেহারা—

—বল কি বাবাজি, এ যে সব অদ্ভুত কথা শোনালে। মেয়েমানুষে যুদ্ধ করলে কোম্পানীর সঙ্গে, ওসব কথা কখনো শুনি নি—কোন্ দেশের কথা এ সব?

—শুনবেন কি মামা, গাঁ ছেড়ে কখনো কোথাও বেরুলেন না তো। কিছু দেখলেনও না। এবার যদি যান—।

এই সময় নালু পাল আবার ব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকল। সে বাড়ি চলে যাবে, হাটবার, তার অনেক কাজ বাকি। দিনটা ধার্য করে দিলে সে চলে যেতে পারে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—সামনের পূর্ণিমার রাত্রে দিন ধার্য রইল। কি বলেন মামা? সেদিন কারো অসুবিধে হবে?

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—আমার বাতের ব্যামো। পুন্নিমেতে আমি লক্ষ্মীর দব্যি খাবো না, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, ফল, দুধ, মঠ, এসব খাবো। ওই দিনই রইল ধার্য।

ঈশ্বর বোষ্টম এতক্ষণ চুপ করে ভবানীর গল্প শুনছিল, কোনো কথা বলে নি। এইবার সে বলে উঠলো—আপনারা কোথাকার রাণীর কথা বললেন, লড়াই করলেন কাদের সঙ্গে। ও কথা শুনে আমার কেবলই মনে পড়ছে কুমুদিনী জেলের কথা—

দীনু ভট্‌চাজ বললেন—বোসো! কিসি আর কিসি! কোথায় সেই কোথাকার রাণী লক্ষ্মীবাঈ, আর কোথায় কুমুদিনী জেলে! কেডা সে?

ঈশ্বর বোষ্টম একেবারে উত্তেজনার মুখে উঠে দাঁড়িয়েচে। দু' হাত নেড়ে বললে—আজ্ঞে ও কথা বলবেন না, খুড়ো ঠাকুর। আপনি সেথো কুমুদিনী জেলেকে জানেন না, দ্যাখেন নি, তাই বলচেন। তারে যদি দ্যাখতেন, তবে আপনারে বলতি হোত, হ্যাঁ, এ একখানা মেয়েছেলে বটে! এই দশাসই চেহারা, দেখতিও দশভুজো পিরতিমের মত। তেমনি সাহস আর বুদ্ধি। একবার আমাদের মধ্যি দুজনের ভেদবমির ব্যারাম হোল গয়া যাবার পথে, নিজের হাতে তাদের কি সেবাটা করতি দ্যাখলাম! মায়ের মত। একবার গয়ালি পান্ডার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করলেন, যাত্রীদের ট্যাকা মোচড় দিয়ে আদায় করা নিয়ে। সে কি চেহারা? বললে, তুমি জানো আমার নাম কুমুদিনী, আমি ফি বচ্ছর দু'শো যাত্রী গয়ায় নিয়ে আসি। গোলমাল করবা তো এই সব যাত্রী আমি অন্য গয়ালি পান্ডার কাছে নিয়ে যাবো। পান্ডা ভয়ে চুপ। আর কথাটি নেই। সেথোদের মান না রাখলি যাত্রী হাতছাড়া হয়—বোঝলেন না? অমন মেয়েমানুষ আমি দেখি নি। কেউ কাছে ঘেঁষে একটা ফষ্টিনাষ্টি করুক দেখি? বাব্বাঃ, কারু সাধ্যি আছে? নিজের মান রাখতি কি করে হয় তা সে জানে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—একবার নিয়ে এসো না এখানে। দেখি।

ভবানীর কথায় সবাই সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আনো না। তোমার তো জানাশুনো। আমরা দেখি একবার—

ঈশ্বর বোষ্টম চুপ করে রইল। দীনু ভট্‌চাজ বললেন—কি? পারবে না?

ঈশ্বর বোষ্টম—আজ্ঞে, তাঁর মান বেশি। সেথোদের তিনি মোড়ল। আমার কথায় তিনি এখানে আসবেন না। বাড়িও অনেক দূর, সেই হুগলী জেলায়। গাঁ জানিনে, আমরা সব একেস্তার হই ফি কার্তিক মাসে বর্ধমান শহরে কেবল চক্কত্তির সরাইয়ে। আপনারা যদি তীথি যান, তবে তো তেনার সঙ্গে দেখা হবেই। চললাম এখন তাহ'লি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—এখানে জঙ্গলের মধ্যে এক যে সেই সন্নিসিনী আছে, খেপী বলে ডাকে, আপনারা কেউ গিয়েচেন? গিয়ে দেখবেন, ভালো লাগবে আপনাদের।

ফণি চক্কত্তি বললেন—ও সব জায়গায় ব্রাহ্মণের গেলে মান থাকে না। শুনিচি সে মাগী নাকি জাতে বুনো। তুমিও বাবাজি সেখানে আর যেও না।

—মাপ করবেন মামা। ওখানে আপনাদের মান আমি রাখতে পারবো না। ভগবানের নাম করলে সব সমান, বুনো আর ব্রাহ্মণ কি মামা?

ফণি চক্কত্তি আশ্চর্য হয়ে বললেন—বুনো আর ব্রাহ্মণ সমান!

সবাই অবাক চোখে ভবানীর দিকে চেয়ে রইল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—ওই দুঃখেই তো রাজা না হয়ে ফকির হয়ে রইলাম বাবা।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো তাঁর কথায়।

ফণি চক্কত্তি বললেন—দাদার আমার কেবল রগড় আর রগড়! তারপর আসল কথার ঠিকঠাক হোক। কে কে যাচ্চ, কবে যাচ্চ। নালু পাল কবে খাওয়াবে ঠিক কর।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তুমি আর চন্দ্র ভায়া তো নিশ্চয় যাচ্চ?

—একবারে নিশ্চয়।

—আর কে যাবে ঈশ্বর?

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—জেলে পাড়ার মধ্যি যাবে ভগীরথ জেলের বড়বৌ, পাগলা জেলের মা, আমাদের পাড়ার নরহরির বৌ, ব্রাহ্মণপাড়ায় আপনারা দুজন—হামিদপুর থেকে সাতজন—সব আমাদের খদ্দের। পুন্নিমের পরের দিন রওনা হওয়া যাবে। আমাকে আবার বর্ধমানে বীরচাঁদ বৈরাগী আর কুমুদিনী জেলের দলের সঙ্গে মিশতে হবে কার্তিক পূজোর দিন। রাণীগঞ্জে এক সরাই আছে, সেখানে দু'দিন থেকে জিরিয়ে নিয়ে তবে আবার রওনা। রাণীগঞ্জের সরাইতে দু'তিন দল আমাদের সঙ্গে মিলবে। সব বলা-কওয়া থাকে।

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—আমি বড় ছেলেডারে বলে দেখি, সে আবার কি বলে। আমার আর সে যুৎ নেই ভায়া। ভবানীর মুখে শুনে বড্ড ইচ্ছে করে ছুটে চলে যাই সে সন্নিসি ঠাকুরের আশ্রমে। অই সব ফুল ফোটা, আমলকী গাছে আমলকী ফল, ময়ূর চরচে—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। কখনো কিছু দ্যাখলাম না বাবাজি জীবনে।

ঈশ্বর বোষ্টম বললে—যাবেন মুখুয্যে মশায়। আমার জানাশুনা আছে সব জায়গায়, কিছু কম করে নেবে পান্ডারা।

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—তাই চলো ভায়া। আমরা পাঁচজন আছি, এক রকম করে হয়ে যাবে, আটকাবে না।

ধার্মিক নালু পালের তীর্থযাত্রীসেবার দিন চন্দ্র চাটুয্যের বাড়িতে খাঁটি তীর্থযাত্রী ছাড়া

আরও লোক দেখা গেল যারা তীর্থযাত্রী নয়—যেমন ভবানী বাঁড়ুয্যে, দেওয়ান রাজারাম ও নীলমণি সমাদ্দার। শেষের লোকটি ব্রাহ্মণও নয়। খোকাকে নিয়ে তিলু এসেছিল ভোজে সাহায্য করতে। ভবানী নিজের হাতে পাতা কেটে এনে ধুয়ে ভেতরের বাড়ির রোয়াকে পাতা পেতে দিলেন, তিলু সাত-আট কাঠা সরু বেনামুড়ি ধানের চিঁড়ে ধুয়ে একটা বড় গামলায় রেখে দিয়ে মুড়কি বাছতে বসলো। পৃথক একটা বারকোশে মঠ ও ফেনিবাতাসা স্তূপাকার করা রয়েচে, পাঁচ-ছ পাত্‌লে হাঁড়িতে দই বারকোশের পাশে বসানো। রূপচাঁদ মুখুয্যে একগাল হেসে বললেন—নাঃ, নালু পাল যোগাড় করেচে ভালো—মনটা ভালো ছোকরার—

তিলু এ গ্রামের মেয়ে। ব্রাহ্মণেরা খেতে বসলে সে চিঁড়ে মুড়কি মঠ যার যা লাগে পরিবেশন করতে লাগলো।

চন্দ্র চাটুয্যে নিজে খেতে বসেন নি, কারণ তাঁর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হচ্চে, তিনি গৃহস্বামী, সবার পরে খাবেন। আর খান নি ভবানী বাঁড়ুয্যে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে এমন সুন্দরভাবে ওরা পরিবেশন করলে যে সকলেই সমানভাবে সব জিনিস খেতে পেলে—নয়তো এসব ক্ষেত্রে পাড়াগাঁয়ে সাধারণতঃ যার বাড়ি তার নিভৃত কোণের হাঁড়িকলসীর মধ্যে অর্ধেক ভালো জিনিস গিয়ে ঢোকে সকলের অলক্ষিতে।

ফণি চক্কত্তি বললেন—বেশ মঠ করেচে কড়াপাকের। কেষ্ট ময়রা কারিগর ভালো—ওহে ভবানী, আর দুখানা মঠ এ পাতে দিও—

রূপচাঁদ মুখুয্যে বললেন—তবে ওই সঙ্গে আমাকেও একখানা—

তিলু হেসে বললে—লজ্জা করচেন কেন কাকা—আপনাকে ক'খানা দেবো বলুন না? দু'খানা না তিনখানা?

—না মা, দু'খানা দাও। বেশ খেতে হয়েচে—এর কাছে আর খাঁড় গুড় লাগে?

—আর একখানা?

—না মা, না মা—আঃ—আচ্ছা দাও না হয়—ছাড়বে না যখন তুমি!

রূপচাঁদ মুখয্যে দেখলেন তিলুর সুগৌর সুপুষ্ট বাউটি ঘুরানো হাতখানি তাঁর পাতে আরও দু'খানা কড়াপাকের কাঁচা সোনার রংয়ের মঠ ফেলে দিলে। অনেক দিন গরীব রূপচাঁদ মুখুয্যে এমন চমৎকার ফলার করেন নি, এমন মঠ দিয়ে মেখে।

এই মঠের কথা মনে ছিল রূপচাঁদ মুখুয্যের, গয়া যাবার পথে গ্যাং ট্যাং রোডের ওপর বারকাট্টা নামক অরণ্য-পর্বত-সঙ্কুল জায়গায় বড্ড বিপদের মধ্যে পড়ে একটা গাছের তলায় ওদের ছোট্ট দলটি আশ্রয় নিয়েছিল অন্ধকার রাত্রে—ডাকাতেরা তাঁদের চারিধার থেকে ঘিরে ফেলে সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল, ভাগ্যে তাঁদের বড় দলটি আগে চলে গিয়ে এক সরকারী চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাই রক্ষে, দলের টাকাকড়ি সব ছিল সেই বড় দলের কাছে। কেন যে সে রাত্রে অন্ধকার মাঠের আর বনপাহাড়ের নির্জন, ভীষণ রূপের দিকে চেয়ে নিরীহ রূপচাঁদ মুখুয্যের মনে হঠাৎ তিলুর বাউটি-ঘোরানো হাতে মঠ পরিবেশনের ছবিটা মনে এসেছিল—তা তিনি কি করে বলবেন?

তবুও সেরাত্রে রূপচাঁদ মুখুয্যে একটা নতুন জীবন-রসের সন্ধান পেয়েছিলেন যেন।

এতদিন পরে তাঁর ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে বহুদূরে, তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের জীবন থেকে বহুদূরে এসে জীবনটাকে যেন নতুন ক'রে তিনি চিনতে পারলেন।

স্ত্রী নেই—আজ বিশ বৎসরের ওপর মারা গিয়েচে। সেও যেন স্বপ্ন, এতদূর থেকে সব যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। ইছামতীর ধারের তাঁর সেই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে এখনি নিবারণ গয়লার বেগুনের ক্ষেতে হয়তো তাঁর ছাগলটা ঢুকে পড়েচে, ওরা তাড়াহুড়ো করচে লাঠি নিয়ে, তাঁর বড় ছেলে যতীন হয়তো আজ বাড়ি এসেচে, পূবের এড়ো ঘরে বৌমা ও দুই মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে—বেচারী খোকা! মাত্র পাঁচ টাকা মাইনেতে সাতক্ষীরের ন'বাবুদের তরফে কাজ করে, দু'তিন মাস অন্তর একবার বাড়ি আসতে পারে, ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে মনটা কেমন করলেও চোখের দেখা দেখতে পায় না। গরীবের অদৃষ্টে এ রকমই হয়।

বড় ভালো ছেলে তাঁর।

যখন কথাবার্তা সব ঠিকঠাক হোলো গয়াকাশী আসবার, তখন বড় খোকা এসে দাঁড়িয়ে বললে—বাবা তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে?

—আছে কিছু।

—কত?

—তা—ত্রিশ টাকা হবে। ছোবায় পুঁতে রেখে দিয়েছিলাম সময়ে অসময়ের জন্যি। ওতেই হবে খুনু।

—বাবা শোনো—ওতে হবে না—আমি তোমায়—

—হবে রে হবে। আর দিতি হবে না তোরে।

জোর করে পনেরোটি টাকা বড় খোকা দিয়েছিল তাঁর উড়ুনির মুড়োতে বেঁধে। চোখে জল আসে সে কথা ভাবলে। কি সুন্দর তারাভরা আকাশ, কি চমৎকার চওড়া মুক্ত মাঠটা, একসারি ভূতের মত অন্ধকার গাছগুলো...চোখে জল আসে খোকার সেই মুখ মনে হলে...

মন কেমন করে ওঠে গরীব ছেলেটার জন্যে, একখানা ফরাসডাঙার ধুতি কখনো পরাতে পারেন নি ওকে...সামান্য জমানবীশের কাজে কিই বা উপার্জন। বায়ুভূত নিরালম্ব কোন ভাসমান আত্মার মত তিনি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন অন্ধকার জগতের পথে পথে—কোথায় রলি খোকা, কোথায় রলি নাতনী দুটি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার চন্দ্র চাটুয্যের চন্ডীমন্ডপে নালু পালের ব্রাহ্মণভোজন হচ্চে। যারা তীর্থ থেকে ফিরেচে, সেই সব মহাভাগ্যবান লোকের আজ আবার নালু পাল ফলার করাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর।

নালু পাল গলায় কাপড় দিয়ে হাত জোড় করে দূরে দাঁড়িয়ে সব তদারক করচে। আম কাঁঠাল জড়ো করা হয়েচে ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে।

সকলেই এসেচেন, ফণি চক্কত্তি, চন্দ্র চাটুয্যে, ঈশ্বর বোষ্টম, নীলমণি সমাদ্দার— নেই কেবল রূপচাঁদ মুখুয্যে। তিনি কাশীর পথে দেহ রেখেছেন, সে খবর ওঁরা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন কিন্তু যতীন সে চিঠি পায় নি।

নীলমণি সমাদ্দারের কাছে চন্দ্র চাটুয্যে তীর্থভ্রমণের গল্প করছিলেন, গ্যাং ট্যাং রোডের এক জায়গায় কি ভাবে ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন, গয়ালি পান্ডা কি অদ্ভুত উপায়ে তাদের

খাতা থেকে তাঁর পিতামহ বিষ্ণুরাম চাটুয্যের নাম উদ্ধার করে তাঁকে শোনালে।

নীলমণি সমাদ্দার বললেন—রূপচাঁদ কাকার কথা ভাবলি বড় কষ্ট হয়। পুণ্যি ছিল খুব, কাশীর পথে মারা গেলেন। কি হয়েছিল?

চন্দ্র চাটুয্যে বললেন—আমরা কিছু ধরতে পারি নি ভায়া। বিকারের ঘোরে কেবলই বলতো—খোকা কোথায়? আমার খোকা কোথায়? খোকা, আমি তামাক খাবো—আহা, সেদিন যতীন শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

নীলমণি বললেন—যতীন বড় পিতৃভক্ত ছেলে।

—উভয়ে উভয়কে ভালো না বাসলি ভক্তি আপনি আসে না ভায়া। রূপচাঁদ কাকাও ছেলে বলতি অজ্ঞান। চিরডা কাল দেখে এসেচি।

নালু পাল খুব আয়োজন করেছিল, চিঁড়ে যেমন সরু, জ্যৈষ্ঠ মাসে ভালো আম-কাঁঠালও প্রচুর।

ফণি চক্কত্তি ঘন আওটানো দুধের সঙ্গে মুড়কি আর আম-কাঁঠালের রস মাখতে মাখতে বললেন—চন্দরদা, সেই আর এই! ভাবি নি যে আবার ফিরে আসবো। কুমুদিনী জেলের দলের সেই সাতকড়ি আমাদের আগেই বলেছিল, বর্ধমান পার হবেন তো ডাকাতির দল পেছনে লাগবে। ঠিক হলো কি তাই!

—আমার কেবল মনে হচ্চে সেই পাহাড়ের তলাডা—ঝর্ণা বয়ে যাচ্চে, বড় বড় কি গাছের ছায়া রূপচাঁদ কাকা যেখানে দাহ রাখলেন। অমনি জায়গাডা বুড়ো ভালোবাসতো। আমাকে কেবল বলে—এ যেন সেই বাল্মীকি মুনির আশ্রম—

নালু পাল হাত জোড় করে বললে—আমার বড্ড ভাগ্যি, আপনারা সেবা করলেন গরীবের দুটো ক্ষুদ। আশীব্বাদ করবেন, ছেলেডা হয়েচে যেন বেঁচে থাকে, বংশডা বজায় থাকে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে ফিরে এলে বিলু বললে—আপনার সোহাগের ইস্ত্রী কোথায়? এখনো ফিরলেন না যে? খোকা কেঁদে কেঁদে এইমাত্তর ঘুমিয়ে পড়লো।

—তার এখনো খাওয়া হয়নি। এই তো সবে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হোলো—

নিলু শুয়ে ছিল বোধ হয় ঘরের মধ্যে, অপরাহ্ণ বেলা, স্বামীর গলার সুর শুনে ধড়মড় ক'রে ঘুমের থেকে উঠে ছুটে বাইরে এসে বললো—এসো এসো নাগর, কতক্ষণ দেখি নি যে! বলি কি দিয়ে ফলার করলে? কি দিয়ে ফলার করলে?

ভবানী মুখ গম্ভীর করে বললেন—বয়েসে যত বুড়ো হচ্চো, ততই অশ্লীল বাক্যগুলো যেন মুখের আগায় খই ফুটচে। কই, তোমার দিদি তো কখনো—

বিলু বললে—না না, দিদির যে সাত খুন মাপ! দিদি কখনো খারাপ কিছু করতে পারে? দিদি যে স্বগ্গের অপ্সরী। বলি সে আমাদের দেখার দরকার নেই, আমাদের খাবার কই? চিঁড়ে-মুড়কি? আমরা হচ্চি ডোম ডোকলা, ছেচতলায় বসে চিঁড়ে-মুড়কি খাবো, হাত তুলি বলতি বলতি বাড়ি যাবো। সত্যি না কি?

নিলু মুখ টিপে টিপে হাসছিল। এবার সামনে এসে বললে—থাক গো, নাগরের মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, আর বলো না দিদি। আমারই যেন কষ্ট হচ্চে। উনি আবার যা তা কথা শুনতি পারেন না। বলেন—কি একটা সংস্কৃতো কথা, আমার মুখ দিয়ে কি আর বেরোয় দিদি?

ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়িতে একখানা মাত্র চারচালা ঘর, আর উত্তরের পোতায় একখানা ছোট দু'চালা ঘর; ছোট ঘরটাতে ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজে থাকেন এবং অবসর সময়ে শাস্ত্রপাঠ করেন বসে। তিলু এই ঘরেই থাকে তাঁর সঙ্গে, বিলু আর নিলু থাকে বড় চারচালা ঘরটাতে। খোকা ছোট ঘরে তার মার সঙ্গে থাকে অবিশ্যি। নিলু হঠাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বড় ঘরটাতে। খোকা সেখানে শুয়ে ঘুমুচ্চে। ভবানী দেখলেন খোকা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, টানা টানা চোখ দুটি নিদ্রিত নারায়ণের মত নিমীলিত। ভবানী বাঁড়ুয্যে শিশুকে ওঠাতে-গেলে নিলু বলে উঠলো—ফুন্টকে উঠিও না বলে দিচ্ছি। এমন কাঁদবে তখন, সামলাবে কেডা?

ভবানী তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় উঠিয়ে বসালেন, খোকা চোখ বুজিয়েই চুপ করে বসে রইল,নড়লেও না চড়লেও না—কি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। কি নিষ্পাপ মুখখানা! সমগ্র জগৎ-রহস্য যেন এই শিশুর পেছনে অসীম প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। মহর্লোক থেকে নিম্নতম ভূমি পর্যন্ত ওর পাদস্পর্শের ও খেয়ালী লীলার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে, তারায় তারায় সে আশা-নিরাশার বাণী জ্যোতির অক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

নিলু বললে—ওর ঘাড় ভেঙে যাবে—ঘাড় ভেঙে যাবে—কি আপনি? কচি ঘাড় না?

বিলু ছুটে এসে খোকাকে আবার শুইয়ে দিলে। সে যেমন নিঃশব্দে বসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘুমুতে লাগলো।

বিলু ও নিলু স্বামীর দু'দিকে দুজন বসলো। বিলু বললে—পচা গরম পড়েচে আজ, গাছের পাতাটি নড়চে না! জানেন, আমাদের দু'খানা কাঁটালই পেকে উঠেচে?

পাকা কাঁটালের গন্ধ ভুর ভুর করছিল ঘরের গুমট বাতাসে। বিলুর খুশির সুরে ভবানীর বড় স্নেহ হোল ওর ওপরে। বললেন—দুটোই পেকেচে? রস না খাজা?

—বেলতলী আর কদমার কাঁটাল। একখানা রসা একখানা খাজা। খাবেন রাত্তিরি?

—আমি বুঝি বকাসুর? এই খেয়ে এসে আবার যা পাবো তাই খাবো?

বিলু বললে—আপনি যদি না খান, তবে আমরা খেতে পাচ্ছিনে। অমন ভালো কাঁটালটা নষ্ট হয়ে যাবে পাক ওজর হয়ে। একটাই কোষ খান।

—দিও রাত্রে।

—না, এখুনি খেতে হবে, নিলু এখনই কাঁটাল খাবার জন্যি আমারে বলেচে। ছেলেমানুষ তো নোলা বেশি।

—ছেলেমানুষ আবার কি। ত্রিশের ওপর বয়স হতে চললো, এখনো—

—থাক, আপনার আর তন্তর-শাস্তর আওড়াতে হবে না। আমাদের সব দোষ, দিদির সব গুণ।

ভবানী হেসে বললেন—আচ্ছা দাও, এক কোষ কাঁটাল খেলেই যদি তোমাদের খাওয়ার পথ খুলে যায় তো যাক।

সন্ধ্যার পর তিলু এল ছোট ঘরখানাতে। বিলু দিয়ে গেল খোকাকে ওর মায়ের কাছে এ ঘরে। ভবানী বললেন—কেমন খেলে?

—ভালো। আপনি?

—খুব ভালো। তোমার বোনদের রাগ হয়েচে আমরা খেয়ে এলাম বলে। কিছু আনলাম না, ওরা রাগ করতেই পারে।

—সে আমি ঠিক করে এনেচি গো, আপনারে আর বলতি হবে না। দুটো সরু চিঁড়ে ওদের

জন্যি আনি নি বুঝি মামীমার কাছ থেকে চেয়ে? ওগো, আজ আপনি ওদের ঘরে শুলে পারতেন।

—যাবো?

—যান। ওদের মনে কষ্ট হবে। একে তো খেয়ে এলাম আমরা দুজনে খোকাকে ওদের ঘাড়ে ফেলে। আবার এ ঘরে যদি আপনি থাকেন, তবে কি মনে করবে ওরা? আপনি চলে যান।

—তোমার পড়া তা হোলে আর হবে না। ঈশোপনিষদ আজ শেষ করবো ভেবেছিলাম।

—চোদ্দর শ্লোকটা আজ বুঝিয়ে নেবো ভেবেছিলাম—হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে—

—হে পূষন্, অর্থাৎ সূর্যদেব, মুখের আবরণ সরাও, যাতে আমরা সত্যকে দর্শন করতে পারি। সোনার পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ আবৃত—তাই বলচে। বেদে সূর্যকে কবির জ্যোতিস্বরূপ বলেচে। করি স্বর্গীয় জ্যোতির স্বরূপ হচ্ছে সূর্যদেব।

—আমি আজ বসে বসে চোদ্দর এই শ্লোকটা পড়ি। নারদ ভক্তিসূত্র ধরাবেন বলেছিলেন, কাল ধরাবেন। বসুন, আর একটুখানি বসুন—আপনাকে কতক্ষণ দেখিনি।

—বেশ। বসি।

—যদি আজ মরে যাই আপনি খোকাকে যত্ন কোরবেন?

—হুঁ।

—ওমা, একটা দুঃখের কথাও বলবেন না, শুধু একটু হুঁ—ও আবার কি?

—তুমি আর আমি এই গাঁয়ের মাটিতে একটা বংশ তৈরী ক'রে রেখে যাবো—আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, এই আমাদের বাঁশবাগানের ভিটেতে পাঁচপুরুষ বাস করবে, ধানের গোলা করবে, লাঙল-খামার করবে, গরুর গোয়াল করবে।

তিলু স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—আপনারে ফেলে থাকতি চায় না আমার মন। মনডার মধ্যি বড্ড কেমন করে। আপনার মন কেমন করে আমার জন্যি? অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতং, আপনি ভাবচেন আমি সামান্য মেয়েমানুষ? আপনি মূঢ় তাই এমনি ভাবচেন? কে জানেন আমি?

ভবানী তিলুর রঙ্গভঙ্গিমাখানো সুন্দর ডাগর চোখ দুটিতে চুম্বন ক'রে ওর চুলের রাশ জোর ক'রে মুঠো বেঁধে ধরে বললেন—তুমি হোলে দেবী, তোমাকে চিনতে আমার দেরি নেই। কি মোচার ঘন্টই করো, কি কচুর শাকই রাঁধো—ঝালির পাক মুখে দেবার জো নেই, যেমন বর্ণ তেমনি গন্ধ, আকারোসদৃশ প্রাজ্ঞঃ—

তিলু রাগ দেখিয়ে স্বামীর কোল থেকে মাথা তুলে নিয়ে বললে—বিশ্ব সঘাতকং স্ত্বং—আমার রান্না কচুর শাক খারাপ? এ পর্যন্ত কেউ—

—ভুল সংস্কৃত হোল যে। কান মলা খাও, এর নাম ব্যাকরণ পড়া হচ্চে, না? কি হবে ও কথাটা? কি বিভক্তি হবে?

—এখন আমি বলতে পাচ্চিনে। ঘুম আসচে। সারাদিনের খাটুনি গিয়েছে কেমন ধারা। অতগুলো লোকের চিঁড়ে একহাতে ঝেড়েচি, বেছেচি, ভিজিয়েচি। আম-কাঁঠাল ছাড়িয়েচি।

—তুমি ঘুমোও, আমি ও ঘরে যাই।

বিলু নিলু স্বামীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। নিলু বললে—নাগর যে পথ ভুলে? কার মুখ দেখে আজ উঠিচি না জানি।

বিলু বললে—আপনাকে আজ ঘুমুতে দেবো না। সারারাত গল্প করবো। নিলু কি বলিস?

—তার আর কথা? বলে—

কালো চোখের আঙরা
কেন রে মন ভোমরা?

কাঁটাল খাবেন তো? খাজা দুটো কাঁটালই পেকেচে। দিদির জন্যি পাঠিয়ে দিই। আজ কি করবেন শুনি।

নিলু বললে—দিদিকে রোজ রাত্তিরে পড়ান, আমাদের পড়ান না কেন?

—পড়বো কি, তুমি পড়তে বসবার মেয়ে বটে। জানো, আজকাল কলকাতায় মেয়েদের পড়বার জন্যে বেথুন বলে এক সাহেব ইস্কুল করে দিয়েচে। কত মেয়ে সেখানে পড়চে।

—সতি?

—সত্যি না তো মিথ্যে? আমার কাছে একখানা কাগজ আছে—সর্ব শুভকারী বলে। তাতে একজন বড় পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই সব লিখেচেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার দরকার। শুধু কাঁটাল খেলে মানবজীবন বৃথায় চলে যাবে। না দেখলে কিছু, না বুঝলে কিছু।

বিলু বললে—কাঁটাল খাওয়া খুঁড়বেন না বলে দিচ্চি। কাঁটাল খাওয়া কি খারাপ জিনিস?

নিলু বললে—খেতেই হবে আপনাকে দশটা কোষ। কদমার কাঁটাল কখনো খান নি, খেয়েই দেখুন না কি বলচি।

—আমি যদি খাই তোমরা লেখাপড়া শিখবে? তোমার দিদি কেমন সংস্কৃত শিখেচে কেমন বাংলা পড়তে পারে। ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা মুখস্থ করেচে। তোমরা কেবল—

নিলু কৃত্রিম রাগের সুরে হাত তুলে বললে—চুপ! কাঁটাল খাওয়ার খোঁটা খবরদার আর দেবেন না কিন্তু—

—স্বাধ্যায় কাকে বলে জানো? রোজ কিছু কিছু শাস্ত্র পড়া। ভগবানের কথা জানবার ইচ্ছে হয় না? বৃথা জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে লাভ কি? কাঁ—

—আবার!

—আচ্ছা যাক। ভগবানের কথা জানবার ইচ্ছে হয় না?

—আমরা জানি।

—কি জানো? ছাই জানো।

—দিদি বুঝি বেশি জানে আমাদের চেয়ে?

—সে উপনিষদ পড়ে আমার কাছে। উপনিষদ কি তা বুঝতে পারবে না এখন। ক্রমে বুঝবে যদি লেখাপড়া শেখো।

—আপনি এ সব শিখলেন কোথায়?

—বাংলা দেশে এর চর্চা নেই। এখানে এসে দেখচি শুধু মঙ্গলচন্ডীর গীত আর মনসার ভাসান আর শিবের বিয়ে এই সব। বড্ড জোর ভাষা রামায়ণ মহাভারত। এ আমি জেনেছিলাম হৃষিকেশ পরমহংসজির আশ্রমে, পশ্চিমে। তাঁর আর এক শিষ্য ওই যে সেবার এসেছিলেন তোমরা দেখেচ—আমার চোখ খুলে দিয়েচেন তিনি। তিনি আমার গুরু এই জন্যেই। মন্ত্র

দেননি বটে তবে চোখ খুলে দিয়েছিলেন। আমি তখন জানতাম না, কলকাতায় রামমোহন রায় বলে একজন বড় লোক আর ভারী পণ্ডিত লোক নাকি এই উপনিষদের মত প্রচার করেছিলেন। তাঁর বইও নাকি আছে। সর্ব শুভকারী-কাগজে লিখেচে।

—ওসব খৃষ্টানী মত। বাপ-পিতেমো যা করে গিয়েচে—

—নিলু, বাপ-পিতামহ কি করেছেন তুমি তার কতটুকু জানো? উপনিষদের ধর্ম ঋষিদের তৈরি তা তুমি জানো? আচ্ছা, এসব কথা আজ থাক। রাত হয়ে যাচ্চে।

—না বলুন না শুনি—বেশ লাগচে।

—তোমার মধ্যে বুদ্ধি আছে, তোমার দিদির চেয়েও বেশি বুদ্ধি আছে। কিন্তু তুমি একেবারে ছেলেমানুষি করে দিন কাটাচ্চ।

বিলু বললে—ওসব রাখুন। আপনি কাঁটাল খান। আমরা কাল থেকে লেখাপড়া শিখবো। দিদির সঙ্গে একসঙ্গে বসে কিন্তু বলবেন আপনি। আলাদা না।

নিলু ততক্ষণে একটা পাথরের খোরায় কাঁটাল ভেঙে স্বামীর সামনে রাখলো।

ভবানী বললেন—এতগুলো খাবো?

নিলু মাত্র দুটি কোষ তুলে নিয়ে বললে—বাকিগুলো সব খান। কদমার কাঁটাল। কি মিষ্টি দেখুন। নাগর না খেলি আমাদের ভালো লাগে, ও নাগর? এমন মিষ্টি কাঁটালডা আপনি খাবেন না? খান খান, মাথার দিব্যি।

বিলু বললে—কাঁটাল খেয়ে না, একটা বিচি খেয়ে নেবেন নুন দিয়ে। আর কোন অসুখ করবে না। ওই রে! খোকন কেঁদে উঠলো দিদির ঘরে। দিদি বোধ হয় সারাদিন খাটাখাটুনির পরে ঘুমিয়ে পড়েচে—শীগ্‌গির যা নিলু—

নিলু ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। ঘেঁটুফুলের পাপড়ির মত সাদা জ্যোৎস্না বাইরে।

রামকানাই কবিরাজ গত এক বছর গৃহহীন, আশ্রয়হীন হয়ে আছেন। সেবার তিনদিন নীলকুঠির চুনের গুদামে আবদ্ধ ছিলেন, দেওয়ান রাজারাম অনেক বুঝিয়েছিলেন, অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে রাজী করাতে পারেন নি রামকানাইকে। শ্যামচাঁদের ফলে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন চুনের গুদামে। নীলকুঠির সাহেবদের ঘরে বসে কি তিনি জল খেতে পারেন? জলস্পর্শ করেন নি সুতরাং ক'দিন। মর-মর দেখে তাঁকে ভয়ে ছেড়ে দেয়। নিজের সেই ছোট্ট দোচালা ঘরটাতে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, ঘরটা আছে বটে কিন্তু জিনিসপত্তর কিছু নেই, হাঁড়িকুড়ি ভেঙেচুরে তচ্‌নচ্ করেচে, তাঁর জড়িবুটির হাঁড়িটা কোথায় ফেলে দিয়েচে—তাতে কত কষ্টে সংগ্রহ করা সোঁদালি ফুলের গুঁড়ো, পুনর্ণবা, হলহলি শাকের পাতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নালিমূলের লতা এইসব জিনিস শুকনো অবস্থায় ছিল। দশ আনা পয়সা ছিল একটা নেকড়ার পুঁটুলিতে, তাও অন্তর্হিত। ঘরের মধ্যে যেন মত্ত হস্তী চলাফেরা করে বেড়িয়ে সব ওলট-পালট, লন্ডভন্ড করে দিয়ে গিয়েচে।

চাল ডাল কিছু একদানাও ছিল না ঘরে। বাড়ি এসে যে এক ঘটি জল খাবেন এমন উপায় ছিল না,—না কলসী, না ঘটি।

রামু সর্দারের খুনের মামলা চলেছিল পাঁচ-ছ'মাস ধরে। শেষে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে তার কি একটা মীমাংসা করে দিয়ে যান।

রামকানাই আগে দু'একটা রোগী যা পেতেন, এখন ভয়ে তাঁকে আর কেউ দেখাতো না। দেখালে দেওয়ান রাজারামের বিরাগভাজন হতে হবে। রামকানাইকে তিন-চার মাস প্রায় অনাহারে কাটাতে হয়েছে। পৌষ মাসের শেষে রামকানাই অসুখে পড়লেন। জ্বর, বুকে ব্যথা। সেই ভাঙা দোচালায় একা বাঁশের মাচাতে পড়ে থাকেন, কেউ দেখবার নেই, নীলকুঠির ভয়ে কেউ তাঁর কাছেও ঘেঁষে না।

একদিন ফর্সা শাড়ি-পরা মেমেদের মত হাতকাটা জামা গায়ে দেওয়া এক স্ত্রীলোককে তাঁর দীন কুটিরে ঢুকতে দেখে রামকানাই রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

—এসো মা বোসো। তুমি ক'নে আসচো? চিনতি পারলাম না যে।

স্ত্রীলোকটি এসে তাঁকে দূর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। বললে—আমারে চিনতে পারবেন না, আমার নাম গয়া।

রামকানাই এ নাম শুনেছিলেন, চমকে উঠে বললেন—গয়া মেম?

—হাঁ বাবাঠাকুর, ঐ নাম সবাই বলে বটে।

—কি জন্যি এসেচো মা? আমার কত ভাগ্যি।

—আপনার ওপর সায়েবদের মধ্যি ছোটসায়েব খুব রাগ করেচে। আর করেচে দেওয়ানজি। কিন্তু বড়সাহেব আপনার ওপর এ-সব অত্যাচারের কথা অনাচারের কথা কিছুই জানে না। আপনি আছেন কেমন?

—জ্বর। বুকে ব্যথা। বড় দুর্বল।

—আপনার জন্যি একটু দুধ এনেছিলাম।

—আমি তো জ্বাল দিয়ে খেতি পারবো না। উঠতি পারচি নে। দুধ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও মা।

—না বাবাঠাকুর, আপনার নাম করে এনেলাম—ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না। আপনি না খান, বেলগাছের তলায় ঢেলি দিয়ে যাবো। আমার কি সেই ভাগ্যি, আপনার মত ব্রাহ্মণ মোর হাতের দুধ সেবা করবেন!

রামকানাই শঠ নন, বলেই ফেললেন—আমি মা শূদ্রের দান নিই না।

গয়া চতুর মেয়ে, হেসে বললে—কিন্তু মেয়ের দান কেন নেবেন না বাবাঠাকুর? আর যদি আপনার মনে হ্যাচাং-প্যাচাং থাকে, মেয়ের দুধির দাম আপনি সেরে উঠে দেবেন এর পরে। তাতে তো আর দোষ নেই?

—হ্যাঁ, তা হতি পারে মা।

—বেশ। সেই কথাই রইল। দুধ আপনি সেবা করুন।

—জ্বাল দেবে কে তাই ভাবচি। আমার তো উঠবার শক্তি নেই।

গয়া মেম ভয়ে ভয়ে বলল—বাবাঠাকুর, আমি জ্বাল দিয়ে দেবো?

—তা দ্যাও। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই মা। দান না নিলিই হোলো। তাতেও তুমি দুঃখিত হয়ো না, আমার বাব-ঠাকুরদা কখনো দান নেন নি, আমি নিলি পতিত হবো বুড়োবয়সে। তবে কি জানো, খেতি হবে আমায় তোমাদের জিনিস। পাড়ু হয়ে পড়লাম কিনা? কে করবে বলো? কে দেবে?

—মুই দেবানি বাবাঠাকুর। কিছু ভাববেন না। আপনার মেয়ে বেঁচে থাকতি কোনো ভাবনা নেই আপনার।

বড়সাহেব শিপ্‌টন সেইদিন সন্ধ্যার সময় ছোটসাহেবকে ডেকে পাঠাল।

ছোটসাহেব ঘরে ঢুকে বললেন—Good afternoon, Mr. Shipton.

—I say, good afternoon, David. Now, what about our Kaviraj ? I hear there's something amiss with him ?

—Good heavens ! I know very little about him.

—It is very good of you to know little about the poor old man ! My Ayah Gaya was telling me, he is down with fever and of course she did her best She was very nice to him. But how is it you are alone ? Where is our percious Dewan ?

—There. Speeding up Mark Khatians. Shall I send for him ?

—No. And, after the rather unsatisfactory experience you had of his ways and things, see that he does not get a free hand in chastising and chastening people. You understand ?

—Yes, Mr. Shipton.

—Well, what have you been up to all day ?

—I was checking up audit accounts and—

—That's so. Now, listen to my words. Our guns were intact but they ceased fire while you were standing idly by with your wily Dewan waiting for orders. No, David, I really think, the way you did it was ever so odd and tactless. Mend up your ways to Kaviraj. I mean it. You know, there aren't any secrets. You see ?

—Yes Mr. Shipton.

—Now you can retire, I am dreadfully tired. Things are coming to a head. If you don't mind, I will rather dine in my room with Mrs.

—Please yourself Mr. Shipton. Good night.

ছোটসাহেব ঘর থেকে বারান্দায় চলে যেতে শিপ্‌টন সাহেব তাকে ডেকে বললেন—Look here David, there's a funny affair in this week's paper. Ram Gopal Ghosh that native orator who speaks like Burke, has spoken in the Calcutta Town Hall last week in support of Indians entering the Civil Service! What the devil the government is up to I do not know, David. Why do they allow these things to go on, beyond me. Things are not looking quite as they ought to. Here's another—you know Harish Mookherjee, the downy old bird, of the Hindu Patriot ?

—Yes, I think so.

—He led a deputation the other day to our old Guv'nor against us, planters. You see?

—Deputation! I would have scattered their deputation with the toe of my boot.

—But the old man talked to them like a benevolent blooming father. That is why I say David, things are coming to a head. Tell your precious old Dewan to carb his poop. Shall I order a tot of rum?

—No, thank you, Mr. Shipton. Really I've got to go now.

দেওয়ান রাজারাম অনেক রাত্রে কুঠি থেকে বাড়ি এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে হাঁক দিলেন—গুরে !

গুরুদাস মুচি সহিস এসে লাগাম ধরলে ঘোড়ার। ঘরে ঢোকবার আগে স্ত্রীর উদ্দেশে ডেকে বললেন—গঙ্গাজল দাও, ওগো! ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন জগদম্বা পূজোর ঘরের দাওয়ায় বসে কি পূজো করচেন যেন। রাজারামের মনে পড়লো আজ শনিবার, স্ত্রী শনির পূজোতে ব্যস্ত আছেন। রাজারাম হাত মুখ ধুয়ে আসতেই জগদম্বা সেখান থেকে ডেকে বললেন—পুঁথি কে পড়বে?

—আমি যাচ্চি দাঁড়াও। কাপড় ছেড়ে আসচি।

দেওয়ান রাজারাম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। গরদের কাপড় পরে কুশাসনে বসে তিনি ভক্তি সহকারে শনির পাঁচালি পাঠ করলেন। শনি পূজোর উদ্দেশ্য শনির কুদৃষ্টি থেকে তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ রক্ষা পাবেন, ঐশ্বর্য বাড়বে, পদবৃদ্ধি হবে। শনি পুঁথি শেষ করে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করলেন, যেমন তিনি প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকেন। সাহেবদের সংসর্গে থাকেন বলে এটা তাঁর আরও বিশেষ করে দরকার হয়ে থাকে—গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ঢোকেন না পর্যন্ত।

জগদম্বা তাঁর সামনে একটু শনিপূজোর সিন্নি আর একবাটি মুড়কি এনে দিলেন। খেয়ে এক ঘটি জল ও একটি পান খেয়ে তিনি বললেন—আজ কুঠিতে কি ব্যাপার হয়েচে জানো?

জগদম্বা বললেন—বেলের শরবত খাবা?

—আঃ, আগে শোনো কি বলচি। বেলের শরবত এখন রাখো।

—কি গা? কি হয়েচে?

—বড়সায়েব ছোটসায়েবকে খুব বকেচে।

—কেন?

—রামকানাই কবিরাজকে আমরা একটু কচা-পড়া পড়িয়েছিলাম। ওর দুষ্টুমি ভাঙতি আর আমারে শেখাতি হবে না। নীলকুঠির মুখ ছোট করে দিয়েছে ওই ব্যাটা সেই রামু সর্দারের খুনের মামলায়। জেলার ম্যাজিস্টার ডঙ্কিন্‌সন্ সায়েব যাই বড়সায়েবকে খুব মানে, তাই এযাত্রা আমার রক্ষে। নইলে আমার জেল হয়ে যেতো। ও বাঞ্চৎকে এমন কচা-পড়া দিইছিলাম যে আর ওঁকে এ দেশে অন্ন করি খেতি হোতো না। তা নাকি বড়সায়েব বলেচে, অমন কোরো

না। নীলকুঠির জোরজুলুমের কথা সরকার বাহাদুরের কানে উঠেচে। কলকাতায় কে আছে হরিশ মুখুয্যে, ওরা বড্ড লেখালেখি করচে খবরের কাগজে। খুব গোলমালের সৃষ্টি হয়েচে। এখন অমন করলি নীলকর সাহেবদের ক্ষেতি হবে। আমারে ডেকি ছোটসায়েব বললে—গয়া মেম এই সব কানে তুলেছে বড়সায়েবের। বিটি আসল শয়তান।

—কেন, গয়া মেম তোমাকে তো খুব মানে?

—বাদ দ্যাও। যার চরিত্তির নেই, তার কিছুই নেই। ওর আবার মানামানি। কিছু যে বলবার যো নেই, নইলে রাজারাম রায়কে আর শেখাতি হবে না কাকে কি করে জব্দ করতি হয়।

—তোমাকে কি ছোটসায়েব বকেচে নাকি?

—আমারে কি বকবে? আমি না হলি নীলের চাষ বন্ধ! কুঠিতি হাওয়া খেলবে—ভোঁ ভোঁ। আমি আর প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন না থাকলি এক কাঠা জমিতেও নীলির দাগ মারতি হবে না কারো! নালু গাজিকে কে সোজা করেছিল? রাহাতুনপুরির প্রজাদের কে জব্দ করেছিল? ছোটসায়েব বড়সায়েব কোনো সায়েবেরই কর্ম নয় তা বলে দেলাম তোমারে। আজ যদি এই রাজারাম রায় চোখ বোজে—তবে কালই—

জগদম্বা অপ্রসন্ন সুরে বললেন—ও আবার কি কথা? শনিবারের সন্ধ্যেবেলা? দুর্গা দুর্গা—রাম রাম। অমন কথা বলবার নয়।

—তিলুরা এসেছিল কেউ?

—নিলু খোকাকে নিয়ে এসেছিল। খোকা আমাকে গাল টিপে টিপে কত আদর করলে। আহা, ওই চাঁদটুকু হয়েচে, বেঁচে থাক। ওদের সবারি সাধ-আহ্লাদের সামগ্রী। একটু ছানা খেতি দেলাম, বেশ খেলে টুক্ টুক্ করে।

—ছানা খেতি দিও না, পেট কামড়াবে।

কথা শেষ হবার আগেই তিলু খোকাকে নিয়ে এসে হাজির। খোকা বেশ বড় হয়ে উঠেচে। ওর বাবার বুদ্ধি পেয়েচে। রাজারামকে দু'হাত নেড়ে বললে—বড়দা—

রাজারাম খোকাকে কোলে নিয়ে বললেন—বড়দা কি মণি, মামা হই যে?

খোকা আবার বললে—বড়দা—

তার মা বললে—ঐ যে তোমাকে আমি বড়দা বলি কিনা? ও শুনে শুনে ঠিক করেচে এই লোকটাকে বড়দা বলে।

খোকা বলে—বড়দা।

রাজারাম খোকার মুখে চুমু খেয়ে বললেন—তোমার মা'রও বড়দা হলাম, আবার তোমারও বড়দা বাবা? ভবানী কি করচে?

তিলু বললে—উনি আর চন্দর মামা বসে গল্প করচেন, আমি কাঁটাল ভেঙ্গে দিয়ে এলাম খাবার জন্যি। নিতে এসেছিলাম একটা ঝুনো নারকোল। ওঁরা মুড়ি খেতি চাইলেন ঝুনো নারকোল দিয়ে—

—নিয়ে যা তোর বৌদিদির কাছ থেকি। একটা ছাড়া দুটো নিয়ে যা—

এই সময়ে জগদম্বা জানালার কাছে গিয়ে বললেন—ওগো, তোমারে কে বাইরে ডাকচে—

—কেডা?

—তা কি জানি। গোপাল মাইন্দার বলচে।

রাজারাম খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন বাইরে যে এসেছিল তাকে দেখে। সে হোল বড়সায়েবের আরদালি শ্রীরাম মুচি। এমন কি গুরুতর দরকার পড়েচে যে এত রাত্রে সায়েব আরদালি পাঠিয়েচে!

—কি রে রেমো?

—কর্তামশায়, দু'সায়েব এক জায়গায় বসে আছে বড় বাংলায়। মদ খাচ্চে। কি একটা জরুরী খবর আছে। আমারে বললে—ঘোড়ায় চড়ে আসতি বলিস্। এখুনি যেন আসে।

—কেন জানিস?

—তা মুই বলতি পারবো না কর্তামশায়। কোনো গোলমেলে ব্যাপার হবে। নইলি এত রাত্তিরি ডাকবে কেন? মোর সঙ্গে চলুন। মুই সড়কি এনিচি সঙ্গে করে। মোদের শত্তুর চারিদিকে। রাতবেরাত একা আঁধারে বেরোবেন না।

রাজারাম হাসলেন। শ্রীরাম মুচি তাকে আজ কর্তব্য শেখাচ্চে। ঘোড়ার চড়ে তিনি একটা হাঁক মারলে দু'খানা গাঁয়ের লোক থরহরি কাঁপে। তাঁকে কে না জানে এই দশ-বিশখানা মৌজার মধ্যে। আধঘন্টার মধ্যে রাজারাম এসে সেলাম ঠুকে সায়েবদের সামনে দাঁড়ালেন। সাহেবদের সামনে ছোট টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস। বড়সায়েব রূপোর আলবোলাতে তামাক টানচে—তামাকের মিঠেকড়া মৃদু সুবাস ঘরময়। ছোটসাহেব তামাক খায় না, তবে পান দোক্তা খায় মাঝে মাঝে, তাও বড়সাহেব বা তার মেমকে লুকিয়ে। বড়সাহেব ছোটসাহেবের দিকে তাকিয়ে কি বললে ইংরেজিতে। ছোটসাহেব রাজারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—দেওয়ান ভারি বিপদের মধ্যি পড়ে গেলাম যে! (সেটা রাজারাম অনেক পূর্বেই অনুমান করেচেন)।

—কি সায়েব?

—কলকাতা থেকে এখন খবর এল, নীল চাষের জন্যি লোক নারাজ হচ্চে। গবর্ণমেন্ট তাদের সাহায্য করচে। কলকাতায় বড় বড় লোকে খবরের কাগজে হৈ-চৈ বাধিয়েচে। এখন কি করা যায় বলো। শুলকো, শুভরত্নপুর, উলুসি, সাতবেড়ে, ন'হাটা এই গাঁয়ে কত জমি নীলির দাগ মারা বলতি পারবা?

রাজারাম মনে মনে হিসাব করে বললেন—আন্দাজ সাতশো সাড়ে সাতশো বিঘে।

এই সময় বড়সাহেব বললে—কট জমিটে ডাগ আছে?

রাজারাম সসম্ভ্রমে বললেন—ওই যে বললাম সায়েব (হুজুর বলার প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না)—সাতশো বিঘে হবে।

এই সময় বিবি সিপ্‌টন্ বড় বাংলার সামনে এসে নামলেন টম্‌টম্ থেকে। ভজা মুচি সহিস পেছন থেকে এসে মেমসাহেবের হাত থেকে লাগাম নিলে এবং তাঁকে টম্‌টম্ থেকে নামতে সাহায্য করলে। ঘোর অন্ধকার রাত—মেমসাহেব এত রাতে কোথায় গিয়েছিল? রাজারাম ভাবলেন কিন্তু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেলেন না।

মেমসাহেব ওদের দিকে চেয়ে হেসে কি ইংরেজিতে বললে। ও হরি! এটা কি? ভজা মুচি একটা মরা খরগোশ নামাচ্চে টম্‌টমের পাদানি থেকে। মেমসাহেবের হাতের ভঙ্গিতে সেটা ভজা সসম্ভ্রমে এনে সাহেবদের সামনে নামালে। মেমসাহেবের হাতে বন্দুক। অন্ধকার মাঠে নদীর ধারে খরগোশ শিকার করতে গিয়েছিল মেমসাহেব তাহলে!

মেমসাহেব ওপরে উঠতেই এই দুই সাহেব উঠে দাঁড়ালো। (যত্তো সব।) ওদের মধ্যে

খানিকক্ষণ কি বলাবলি ও হাসাহাসি হোলো। মেমসাহেব রাজারামের দিকে তাকিয়ে বললে—কেমন হইল শিকার?

বিনয়ে বিগলিত রাজারাম বললেন—আজ্ঞে, চমৎকার।

—ভালো হইয়াছে?

—খুব ভালো। কোথায় মারলেন মেমসায়েব?

—বাঁওড়ের ধারে—এই ডিকে—খড় আছে।

—খড়?

ভজা মুচি মেমসাহেবের কথার টীকা রচনা করে বলে—সবাইপুরির বিশ্বেসদের খড়ের মাঠে।

—ওঃ, অনেকদূর গিয়েছিলেন এই রাত্তিরি।

—আমার কাছে বন্দুক আছে। ভয় কি আছে? ভূটে খাইবে না।

—আজ্ঞে না, ভূত কোথা থেকি আসবে?

—নো, নো, ভজা বলিটেছিল মাটে ভূট আছে। আলো জ্বলে। যায় আসে, যায় আসে—কি নাম আছে ভজা? আলো ভূট?

ভজা উত্তর দেবার আগে রাজারাম বললেন—আজ্ঞে আমি জানি। এলে ভূত। আমি নিজে কতবার মাঠের মধ্যি এলে ভূতের সামনে পড়িচি। ওরা মানুষেরে কিছু বলে না।

বড়সাহেব এই সময় হেসে বললেন—টোমার মাথা আছে। ভূট আছে! উহা গ্যাস আছে। গ্যাস জ্বলিয়া উঠিল টো টুমি ভূট দেখিল।...(এর পরের কথাটা হোলো মেমসাহেবের দিকে চেয়ে ইংরিজিতে। রাজারাম বুঝলেন না)...খরগোশ কেমন?

—আজ্ঞে খুব ভালো।

—টুমি খাও?

—না সাহেব, খাইনে। অনেকে খায় আমাদের মধ্যি, আমি খাইনে।

এই সময় প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন ও গিরিশ সরকার মুহুরী অনেক খাতাপত্র নিয়ে এসে হাজির হোলো। রাজারাম ঘুঘু লোক। তিনি বুঝলেন আজ সারারাত কুঠির দপ্তরখানায় বসে কাজ করতে হবে। আমীন দাগ-মার্কার খতিয়ান এনে হাজির করচে কেন? দাগের হিসেব এত রাত্রে কি দরকার?

ছোটসাহেব কি একটা বললে ইংরিজিতে। বড়সাহেব তার একটা লম্বা জবাব দিলে হাত-পা নেড়ে—খাতার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে। ছোটসাহেব ঘাড় নাড়লে।

তারপর কাজ আরম্ভ হোলো সারারাত-ব্যাপী। ছোটসাহেব, প্রসন্ন আমীন, তিনি, গিরিশ মুহুরী ও গদাধর চক্রবর্তী মুহুরীতে মিলে। কাজ আর কিছুই নয়, মার্কা-খতিয়ান বদলানো, যত বেশি জমিতে নীলের দাগ দেওয়া হয়েচে বিভিন্ন গ্রামে, তার চেয়ে অনেক দাম দেখানো। জরীপের আসল খতিয়ান দৃষ্টে নকল খতিয়ান তৈরী করার নির্দেশ দিলে ডেভিড্ সাহেব।

রাজারাম বললেন—সায়েব একটা দরকারী জিনিসের কি হবে?

ডেভিড্—কি জিনিস?

—প্রজাদের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ? তার কি হবে? দাগ খতিয়ানে আমাদের সুবিধের জন্যে আঙ্গুলের ছাপ নিতি হয়েছিল। এখন তারা নকল খাতায় দেবে কেন? যে সব বদমাইশ প্রজা।

নবু গাজির মামলায় রাহাতুনপুর শুদ্ধ আমাদের বিপক্ষে। রামু সর্দারের খুনের মামলায় বাঁধালের প্রজা সব চটা। কি করতি হবে বলুন।

—বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ জাল করতি হবে।

—সে বড় গোলমেলে ব্যাপার হবে সায়েব। ভেবে কাজ করা ভালো।

—তুমি ভয় পেলি চলবে কেন দেওয়ান? ডঙ্কিন্‌সনের কথা মনে নেই? এক খানা আর দু'পেগ হুইস্কি।

—এক খানা নয় সায়েব, অনেক খানা। আপনি ভেবে দেখুন। ফাঁসিতলার মাঠের সে ব্যাপার আপনার মনে আছে তো? আমরাই গিরিধারী জেলেকে ফাঁসি দিয়েছিলাম। তখনকার দিনে আর এখনকার দিনে তফাৎ অনেক। শ্রীরাম বেয়ারাকে এখন সড়কি নিয়ে রাত্রে পথ চলতি হয় সায়েব। আজই শোনলাম ওর মুখি।

ভোর পর্যন্ত কুঠির দপ্তরখানায় মোমবাতি জ্বেলে কাজ চললো। সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েচে ভোরবেলার দিকে। ডেভিড্ সাহেবও বিশ্রাম নেয়নি বা কাজে ফাঁকি দেয়নি। সূর্য ওঠবার আগেই বড়সাহেব এসে হাজির হোলো। দুই সাহেবে কি কথাবার্তা হোলো, বড়সাহেব রাজারামকে বললেন—মার্কা খতিয়ান বদল হইল?

—আজ্ঞে হাঁ।

—সব ঠিক আছে?

—এখনো তিন দিনির কাজ বাকি সায়েব। টিপ-সইয়ের কি করা যাবে সায়েব? অত টিপ-সই কোথায় পাওয়া যাবে দাগ খতিয়ানে আপনিই বলুন।

—করিটে হইবে।

—কি ক'রে করা যাবে আমার বুদ্ধিতে কুলুচ্চে না। শেষ কালডা কি জেল খেটি মরবো? টিপসই জাল করবো কি করে?

—সব জাল হইল টো উহা জাল হইবে না কেন? মাথা খাটাইতে হইবে। পয়সা খরচ করিলে সব হইয়া যাইবে। মন দিয়া কাজ করো। টোমার ও প্রসন্ন আমীনের দু'টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িল এ মাস হইটে।

মাথা নিচু করে দুই হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন রাজারাম—আপনার খেয়েই তো মানুষ, সায়েব। রাখতিও আপনি মারতিও আপনি।

কি একটা ইংরিজি কথা বলে বড়সাহেব চলে গেল ঘর থেকে বেরিয়ে।

দুপুর বেলা।

প্রসন্ন আমীন কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেচে। গিরিশ মুহুরী গদাধর মুহুরীকে নিচু সুরে বললে—খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা, ও গদাধর?

গদাধর চোখের চশমার দড়ি খুলে ফেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বললে—রাজারাম ঠাকুরকে বলো না।

—আমি পারবো না। আমার লজ্জা করে।

—লজ্জার কি আছে? পেট জ্বলচে না?

—তা তো জ্বলচে।

—তবে বলো। আমি পারবো না।

এমন সময় নরহরি পেশকার বারান্দার বাহির থেকে সকলকে ডেকে বললে—দেওয়ানজি। আমীনবাবু। সব চান হয়েচে? ভাত তৈরী। আপনারা নেয়ে আসুন।

দেওয়ান রাজারাম বললেন—আমার এখনো অনেক দেরি। তোমরা খেয়ে নেও গিয়ে।

শেষ পর্যন্ত সকলেই একসাথে খেতে বসলেন—দেওয়ানজি ছাড়া। তিনি নীলকুঠিতে অন্নগ্রহণ করেন না। স্নানাহ্নিক না করেও খান না। এখানে সে সবের সুবিধে নেই তত।

নরহরি পেশকার ভালো ব্রাহ্মণ, সে-ই রান্না করেচে, যোগাড় দিয়েচে গোলাপ পাঁড়ে। তা ভালোই রেঁধেচে। না, সাহেবদের নজর উঁচু, খাটিয়ে নিয়ে খাওয়াতে জানে। মস্ত বড় রুই মাছের ঝোল, পাঁচ-ছখানা করে দাগার মাছ ভাজা, অম্বল, মুড়ি-ঘন্ট ও দই।

গদাধর মুহুরী পেটুক ব্যক্তি, শেষকালে বলে ফেললে—ও পেশকারমশায়, বলি সব করলেন, একটু মিষ্টির ব্যবস্থা করলেন না?

সে সময় রসগোল্লার রেওয়াজ ছিল না। এ সময়ে, মিষ্ট বলতে বুঝতো চিনির মঠ, বাতাসা বা মন্ডা। নরহরি পেশকার বললে—কথাটা মনে ছিল না। নইলি ছোটসায়েব দিতি নারাজ ছিল না।

গদাধর মুহুরী ভাতের দলা কোঁৎ করে গিলে বললে—না, সায়েবরা খাওয়াতে জানে, কি বলো প্রসন্নদাদা?

প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন ক'দিন থেকে আজ অন্যমনস্ক। তার মন কোনো সময়েই ভালো থাকে না। কি একটা কথা সে সব সময়েই ভাবচে...ভাবচে। গদাধরের কথার উত্তর দেবার মত মনের সুখ নেই। এই যে কাজের চাপ, এই যে বড় মাছ দিয়ে ভাতের ভোজ—অন্য সময় হোলে, অন্য দিন হোলে তার খুব ভালো লাগতো—কিন্তু আজ আর সে মন নেই। কিছুই ভালো লাগে না, খেতে হয় তাই খেয়ে যাচ্চে, কাজ করতে হয় তাই কাজ করে যাচ্চে, কলের পুতুলের মত। আর সব সময়ে সেই এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান।

সে কি ব্যাপার? কি ধ্যান, কি জ্ঞান?

প্রসন্ন আমীন গয়া মেমের প্রেমে পড়েচে।

সে যে কি টান, তা বলার কথা নয়। কাকে কি বলবে? গয়া মেম বড্ড উঁচু ডালের পাখি। হাত বাড়াবার সাধ্য কি প্রসন্ন চক্কত্তির মত সামান্য লোকের? গয়া মেম সুদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েচে এই একটা মস্ত সান্ত্বনা। সুদৃষ্টিতে চাওয়া মানে গয়া মেম জানতে পেরেচে প্রসন্ন আমীন তাকে ভালোবাসে আর এই ভালোবাসার ব্যাপারে গয়া অসন্তুষ্ট নয় বরং প্রশ্রয় দিচ্চে মাঝে মাঝে।

এই যে বসে খাচ্চে প্রসন্ন চক্কত্তি—সে মানসনেত্রে কার সুঠাম তনুভঙ্গী, কার আয়ত চক্ষুর বিলোল দৃষ্টি, কার সুন্দর মুখখানি ওর চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠচে? ভাতের দলা গলার মধ্যে ঢুকচে না চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার জন্যে। সে কার কথা মনে হয়ে...ছোটসাহেবের মদগর্বিত পদধ্বনিও সে তুচ্ছ করেচে কার জন্যে? প্রসন্ন আমীন এতদিন পরে সুখের মুখ দেখতে পেয়েচে। মেয়েমানুষ কখনো তার দিকে সুনজরে চেয়ে দেখেনি। কত বড় অভাব ছিল তার জীবনে। প্রথমবার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, গোঙা, গেঙিয়ে গেঙিয়ে কথা বলতো, নাম যদিও ছিল সরস্বতী। গোঙা হোক, সরস্বতী কিন্তু বড় যত্ন করতো স্বামীকে।

তখন সবে বয়েস উনিশ-কুড়ি। প্রসন্নর বাবা রতন চক্কত্তি ছেলেকে বড় কড়া শাসনে রাখতেন। বাবা দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলেন, বলবার জো ছিল না ছেলের। সাধ্য কি?

সরস্বতী রাত্রে পান্তাভাত খেতে দিয়ে লেবু কেটে দিত, তেঁতুলগোলা, লঙ্কা আর তেল দিত মেখে খাবার জন্যে। চড়কের দিন একখানা কাপড় পেয়ে গোঙা স্ত্রীর মুখে কি সরল আনন্দ ফুটে উঠতো। বলতো, আমার বাপের বাড়ি চলো, উচ্ছে দিয়ে কাঁটালবীচি চচ্চড়ি খাওয়াবো। আমাদের গাছে কত কাঁটাল! এত বড় বড় এক একটা! এত বড় বড় কোয়া!

হাত ফাঁক করে দেখাতো।

আবার রসকলির গান গাইতো আপন মনে গোঙানো সুরে। হাসি পায়নি কিন্তু সে গান শুনে কোনো দিন। মনে বরং কষ্ট হোতো। না দেখতে শুনতে ভালো না। বরং কালো, দাঁত উঁচু। তবুও পুষলে বেড়াল-কুকুরের ওপরও তো মমতা হয়।

সরস্বতী পটল তুললো প্রথমবার ছেলেপিলে হতে গিয়ে। আবার বিয়ে হোলো রাজনগরের সনাতন চৌধুরীর ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে। অন্নপূর্ণা দেখতে শুনতে ভালো এবং গৌরবর্ণের মেয়ে বলেই বোধ হয় একটু বেশ গুমুরে। সে এখনো বেঁচে আছে তার বাপের বাড়িতে। ছেলেমেয়ে হয়নি। কোনোদিন মনে-প্রাণে স্বামীর ঘর করেনি। না করার কারণ বোধ হয় ওর বাপের বাড়ির সচ্ছলতা। অমন কেলে ধানের সরু চিঁড়ে আর শুকো দই কারও ঘরে হবে না। সাতটা গোলা বাপের বাড়ির উঠোনে।

অন্নপূর্ণা বড় দাগা দিয়ে গিয়েছিল জীবনে। পয়সার জন্য এতো? ধানের মরাইয়ের অহঙ্কার এতো? সনাতন চৌধুরীরই বা ক'টা ধানের গোলা। যদি পুরুষমানুষ হয় প্রসন্ন চক্কত্তি, যদি সে রতন চক্কত্তির ছেলে হয়—তবে ধানের মরাই কাকে বলে সে দেখিয়ে দেবে—ওই অন্নপূর্ণাকে দেখাবে একদিন।

একদিন অন্নপূর্ণা তাকে বললে, বেশ মনে আছে প্রসন্ন চক্কত্তির, চৈত্র মাস, গুমোট গরমের দিন, ঘেঁটুফুল ফুটেচে বাড়ির সামনের বাঁশনি বাঁশের ঝাড়ের তলায়, বললে—আমার নারকোল ফুল ভেঙে বাউটি গড়িয়ে দেবা?

প্রসন্ন চক্কত্তির তখন অবস্থা ভালো নয়, বাবা মারা গিয়েচেন, ও সামান্য টাকা রোজগার করে গাঁড়াপোতার হরিপ্রসন্ন মুখুয্যের জমিদারী কাছারীতে। ও বললে—কেন, বেশ তো নারকোল ফুল, পর না, হাতে বেশ মানায়।

—ছাই! ও গাঁথা যায় না। বিয়ের জিনিস, ফঙ্গবেনে জিনিস। আমায় বাউটি গড়িয়ে দ্যাও।

—দেবো আর দুটো বছর যাক।

—দু'বছর পরে আমি মরে যাবো।

—অমন কথা বলতে নেই, ছিঃ—

—এক কড়ার মুরোদ নেই, তাই বলো। এমন লোকের হাতে বাবা আমায় দিয়ে দিল তুলে! দোজবরে বিয়ে আবার বিয়ে? তাও যদি পুষতো তাও তো বুঝ দিতে পারি মনকে। অদৃষ্টের মাথায় মারি ঝ্যাঁটা সাত ঘা।...

এই বলে কাঁদতে বসলো পা ছড়িয়ে সেই সতেরো বছরের ধাড়ী মেয়ে। এতে মনে ব্যথা লাগে কি না লাগে? তার পরের বছর আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি চলে গেল, আর আসেনি।

সে আজ সাত-আট বছরের কথা।

এর পরে ও রাজনগরে গিয়েচে দু'তিনবার বৌকে ফিরিয়ে আনতে। অন্নপূর্ণার মা গুচ্ছির কথা শুনিয়ে দিয়েচে জামাইকে। মেয়ে পাঠায়নি। বলেচে—মুরোদ থাকে তো আবার বিয়ে কর গিয়ে। তোমাদের বাড়ি ধানসেদ্ধ করবার জন্যি আর চাল কুটবার জন্যি আমার মেয়ে যাবে না। খ্যমতা কোনোদিন হয়, পালকি নিয়ে এসে মেয়েকে নিয়ে যেও।

আর সেখানে যায় না প্রসন্ন চক্কত্তি।

বিলের ধারে সেদিন বসেছিল প্রসন্ন আমীন।

গয়া মেম আর তার মা বরদা বাগ্‌দিনী আসে এই সময়। শুধু একটি বার দেখা। আর কিছু চায় না প্রসন্ন চক্কত্তি।

আজ দূরে গয়া মেমকে আসতে দেখে ওর মন আনন্দে নেচে উঠলো। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

গয়া একা আসচে। সঙ্গে ওর মা বরদা নেই।

কাছে এসে গয়া প্রসন্নকে দেখে বললে—খুড়োমশায়, একা বসে আছেন!

—হ্যাঁ।

—এখানে একা বসে?

—তুমি যাবে তাই।

—তাতে আপনার কি?

—কিছু না। এই গিয়ে—তোমার মা কোথায়?

—মা ধান ভানচে। পরের ধান সেদ্দ শুকনো করে রেখেচে, যে বর্ষা নেমেচে, চাল দিতি হবে না পরকে? যার চাল সে শোনবে? বসুন, চললাম।

—ও গয়া—

—কি?

—একটু দাঁড়াবা না?

—দাঁড়িয়ে কি করবো? বিষ্টি এলি ভিজে মরবো যে!

প্রসন্ন চক্কত্তি মুগ্ধ দৃষ্টিতে গয়ার দিকে চেয়ে ছিল।

গয়া বললে—দ্যাখচেন কি?

প্রসন্ন লজ্জিত সুরে বললে—কিছু না। দেখবো আবার কি? তুমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলি আবার কি দেখবো?

—কেন, আমি থাকলি কি হয়?

—ভাবচি, এমন বেশ দিনটা—

গয়া রাগের সুরে বললে—ওসব আবোল-তাবোল এখন শোনবার আমার সময় নেই। চললাম।

—একটু দাঁড়াও না গয়া? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে দাঁড়ালি?

—না, আমি সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতি পারবো না এখানে। ঐ দেখুন, দেয়া কেমন ঘনিয়ে আসচে।

ঘাট বাঁওড়ের বিলের ওপারে ঘন সবুজ আউশ ধানের আর নীলের চারার ক্ষেতের ওপর ঘন, কালো শ্রাবণের মেঘ জমা হয়েচে। সাদা বকের দল উড়চে দূর চক্রবালের কোলে, মেঘপদবীর নিচে নিচে, হু হু ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক বয়ে এক শ্যামল প্রান্তরের দিক থেকে, সোঁ সোঁ শব্দ উঠলো দূরে, বিলের অপর প্রান্ত যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেচে বৃষ্টির ধারায়। রথচক্রের নাভির মত দেখাচ্চে স্বচ্ছজল বিল বৃষ্টিমুখর তীরবেষ্টনীর মাঝখানে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—গয়া ভিজবে যে, বৃষ্টি তো এল। চলো, আমার বাসায়।

—না, আমি কুঠিতে চললাম—

—ও গয়া, শোনো আমার কথা। ভিজবা।

—ভিজি ভিজবো।

—আচ্ছা গয়া আমি ভালোর জন্যি বলচি নে? কেউ নেই আমার বাসায়। চলো।

—না, আমি যাবো না। আপনাকে না খুড়োমশায় বলে ডাকি?

—ডাকো তাই কি হয়েচে? অন্যায় কথাডা কি বললাম তোমারে? বিষ্টিতে ভিজবা, তাই বলচি আমার ঘরটা নিকটে আছে—সেখানে আশ্রয় নেবা। খারাপ কথা এডা?

—না, বাজে কথা শোনবার সময় নেই। আপনি ছুট দিন, ওই দেখুন তাকিয়ে বিলির ওপারে—

—আমার ওপর রাগ করলে না তো, ও গয়া, শোনো ও গয়া, মাথা খাও, ও গয়া—

গয়া ছুটচে ছুটতে হেঁকে বললে—না, না। কি পাগল! এমন মানুষও থাকে?

মিনতির সুরে প্রসন্ন চক্কত্তি হেঁকে বললে—কাউকে বলে দিও না যেন; ও গয়া! মাইরি!...

দূর থেকে গয়া মেমের স্বর ভেসে এল—ভেজবেন না—বাড়ি যান খুড়োমশাই—ভেজবেন না—বাড়ি যান—

বিলের শামুক আবার কতটুকু সুধা আশা করে চাঁদের কাছে?

ওই যথেষ্ট না?

রামকানাই কবিরাজ আশ্চর্য না হয়ে পারেন নি যে আজকাল নীলকুঠির লোকেরা তাঁকে কিছু বলে না।

আজ আবার গয়া মেম এসে তাঁকে দুধ দিয়ে গিয়েচে, এটা ওটা সেটা প্রায়ই নিয়ে আসে। রামকানাই দাম দিতে পারবেন না বলে আগে আগে নিতেন না, এখন গয়া মেয়ে সম্পর্ক পাতিয়ে দেওয়ায় পথটা সহজ ও সুগম করেচে। আবার লোকজন ডাকে কবিরাজকে। ঝিঙে, নাউ, দু'আনিটা সিকিটা (ক্বচিৎ)—এই হোল দর্শনী ও পারিশ্রমিক।

নালু পালের স্ত্রী তুলসীর ছেলেপিলে হবে, পেটের মধ্যে বেদনা, কি কি অসুখ। হরিশ ডাক্তার দিনকতক দেখেছিল, রোগ সারেনি। লোকে বললে—তোমার পয়সা আছে নালু, ভালো কবিরাজ দেখাও—

রামকানাই কবিরাজ ভালোর দলে পড়েন না, কেননা তিনি গরীব। অর্থেরই লোকে মান দেয়, সততা বা উৎকর্ষের নয়। রামকানাই যদি আজ হরিশ ডাক্তারের মত পালকিতে চেপে রুগী দেখতে বেরুতো, তবে হরিশ ডাক্তারের মত আট আনা ভিজিট তিনি অনায়াসেই নিতে পারতেন।

নালু পাল কি মনে ভেবে রামকানাই কবিরাজকে ডাক দিলে। রামকানাই রোগী দেখে বললে, ওষুধ দেবো কিন্তু অনুপান যোগাড় করতি হবে, কলমীশাকের রস, সৈন্ধব লবণ দিয়ে সিদ্দ। ভাঁড়ে করে সে রস রেখে দিতে হবে সাতদিন।

নালু পাল আর সেই নালু পাল নেই, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে ব্যবসা করে। আটচালা ঘর বেঁধেচে গত বৎসর। আটচালা ঘর তৈরী করা এ সব পাড়াগাঁয়ে বড়মানুষির লক্ষণ, আর চরম বড়মানুষি অবিশ্যি দুর্গোৎসব করা! তাও গত বৎসর নালু পাল করেচে। অনেক লোকজনও খাইয়েচে। নাম বেরিয়ে গিয়েচে বড়মানুষ বলে। ওর ঘরের মধ্যে নতুন কড়ি-বাঁধানো আলমারী, নক্সাকরা হাঁড়ির তাক রঙিন দড়ির শিকেতে ঝুলানো, খেরোমোড়া শীতলপাটি কাঁসার পানের ডাবর, ঝকঝকে করে মাজা পিতলের দীপগাছা—সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির সমস্ত উপকরণ আসবাব বর্তমান। রামকানাইয়ের প্রশংসমান দৃষ্টি রোগিণীর ঘরের সাজসজ্জার ওপর অনেকক্ষণ নিবদ্ধ আছে দেখে নালু পাল বললে—এইবার ঘূর্ণীর কুমোরদের তৈরী মাটির ফল কিছু আনবো ঠিক করিচি। ওই কড়ির আলনাটা দ্যাখচেন, আড়াই ট্যাকা দিয়ে কিনেচি বিনোদপুরের এক ব্রাহ্মণের মেয়ের কাছে। তাঁর নিজের হাতে গাঁথা।

—বেশ, চমৎকার দ্রব্যটি।

—অসুখ সারবে তো কবিরাজমশাই?

—না সারলি মাধবনিদান শাস্তরডা মিথ্যে। তবে কি জানো, অনুপান আর সহপান ঠিকমত চাই। ওষুধ রোগ সারাবে না, সারাবে ঠিকমত অনুপান আর সহপান। কলমীশাকের রস খেতি হবে—সেটি হোলো অনুপান। বোঝলে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

জলযোগ ব্যবস্থা হলো শসাকাটা, ফুলবাতাসা, নারকোল কোরা ও নারকোল নাড়ু। আচমনী জিনিস অর্থাৎ কোনো কিছু শস্যভাজা খাবেন না রামকানাই শূদ্রের গৃহে। এককাঠা চাল, মটরডালের বড়ি ও একটা আধুলি দর্শনী মিললো।

পথে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—কবিরাজমশাই—নমস্কার হই।

—ভালো আছেন জামাইবাবু?

—আপনার আশীর্বাদে। একটু আমার বাড়িতে আসতি হবে। ছেলেটার জ্বর আর কাসি হয়েচে দু'তিন দিন, একটু দেখে যান।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

খোকা ওর মামীমার বুনুনি নক্সা-কাটা কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। রামকানাই হাত দেখে বললেন—নবজ্বর। নাড়িতে রস রয়েচে। বড়ি দেবো, মধু আর শিউলিপাতার রস দিয়ে খাওয়াতি হবে।

ওর মা তিলু এবং ওর দুই ছোট মা উৎসুক ও শঙ্কিত মনে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ওরা এ গ্রামের বধূ নয়, কন্যা। সুতরাং গ্রাম্য প্রথানুযায়ী ওরা যার তার সামনে বেরুতে পারে, যেখানে সেখানে যেতে পারে। কিন্তু যদি এ গ্রামের বধূ হতো, অন্য জায়গার মেয়ে—তাহলে অপরিচিত পরপুরুষ তো দূরের কথা, স্বামীর সঙ্গে পর্যন্ত যখন তখন দিনমানে সাক্ষাৎ করা বা বাক্যালাপ করা দাঁড়াতো বেহায়ার লক্ষণ।

তিলু কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে—খোকার জ্বর কেমন দেখলেন, কবিরাজ মশাই।

—কিছু না মা, নবজ্বর। এই বর্ষাকালে চারিদিকি হচ্ছে। ভয় কি?

—সারবে তো?

—সারবে না তো আমরা রইচি কেন?

নিলু বললে—আপনার পায়ে পড়ি কবিরাজমশাই। একটু ভালো করে দেখুন খোকারে।

—মা, আমি বলচি তিন দিন বড়ি খেলি খোকা সেরে ওঠবে। আপনারা ভয় পাবেন না।

—ওর গলার মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয় কেন?

—কফ কুপিত হয়েচে, রসস্থ নাড়ী। ও রকম হয়ে থাকে। কিছু ভেবো না। আমার সামনে এই বড়িটা মেড়ে খাইয়ে দাও মা। খল আছে?

—খল আনচি সিধু কাকাদের বাড়ি থেকে।

তিলু বললে—কবিরাজমশাই, বেলা হয়েচে, এখানে দুটি খেয়ে তবে যাবেন। দুপুরবেলা বাড়িতি লোক এলি না খাইয়ে যেতি দিতি আছে? আপনাকে দুটো ভাত গালে দিতিই হবে এখানে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে হাত জোর করে বললেন—শাক আর ভাত। গরীবের আয়োজন।

রামকানাই বড় অভিভূত ও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন এদের অমায়িক ব্যবহারে ও দীনতা প্রকাশের সম্পদে। কেউ কখনো তাঁকে এত আদর করেনি, এত সম্মান দেয়নি। তাতে এরা আবার দেওয়ানজির ভগ্নিপতি, ওদের বাড়ির জামাই।

তিলু দুখানা বড় পিঁড়ি পেতে দুজনকে খেতে দিলে।—এটা নিন, ওটা নিন, বলে কাছে বসে কখনো কি রামকানাই কবিরাজকে কেউ খাইয়েচে? মনে করতে পারেন না রামকানাই। মুগের ডাল, পটল ভাজা, মাছের ঝাল, আমড়ার টক আর ঘরে-পাতা দই, কাঁটাল, মর্তমান কলা। নাঃ, কার মুখ দেখে আজ যে ওঠা! অবাক হয়ে যান রামকানাই।

খাওয়ার পরে রামকানাই একটি গুরুতর প্রশ্ন করে বসলেন ভবানী বাঁড়ুয্যেকে।

—আচ্ছা জামাইবাবু, আপনি জ্ঞানী, সাধু লোক। সবাই আপনার সুখ্যেত করে। আমরা এমন কিছু লেখাপড়া শিখিনি। সামান্য সংস্কৃত শিখে আয়ুর্বেদ পড়েছিলাম তেঘরা সেনহাটির ঁপতিতপাবন (হাতজোড় করে প্রণাম করলেন রামকানাই) কবিরাজের কাছে। আমরা কি বুঝি-সুজি বলুন! আচ্ছা আদি সংবাদটা কি। আপনার মুখি শুনি।

—কি বললেন? কি সংবাদ?

—আদি সংবাদ?

—আজ্ঞে—ভালো বুঝতে পারলাম না কি বলচেন।

—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি মিলি তো জগৎটা সৃষ্টি করলেন।...এখন এর ভেতরের কথাটা কি একটু খুলে বলুন না। অনেক সময় শুয়ে শুয়ে ঘরের মধ্যে এসব কথা ভাবি। কি করে কি হোলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিপদে পড়ে গেলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জগৎটা সৃষ্টি করেননি, ভেতরের কথা তিনি কি করে বলবেন? কথা বলবার কি আছে। পতঞ্জলি দর্শন মনে পড়লো, সাংখ্য মনে পড়লো, বেদান্ত মনে পড়লো—কিন্তু এ গ্রাম্য কবিরাজের কাছে—না! অচল! সে সব অচল। তাঁর হাসিও পেল বিলক্ষণ। আদি সংবাদ!

হঠাৎ রামকানাই বললেন—আমার কিন্তু একটা মনে হয়—অনেকদিন বসে বসে ভেবেচি,

বোঝলেন? ও ব্রহ্মা বলুন, বিষ্ণু বলুন, মহেশ্বর বলুন—সবাই এক। একে তিন, তিনি এক। তা ছাড়া এ সবই তিনি। কি বলেন?

ভবানী বাঁড়ুয্যের চোখের সামনে যদি এই মুহূর্তে রামকানাই কবিরাজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হয়ে ওপরের দুই হাতে বরাভয় মুদ্রা রচনা করে বলতেন—বৎস, বরং বৃণু—ইহাগতোহস্মি। তা হোলেও তিনি এতখানি বিস্মিত হতেন না। এই সামান্য গ্রাম্য কবিরাজের মুখে অতি সরল সহজ ভাষায় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের কল্যাণময়ী বাণী উচ্চারিত হোলো এই সংস্কারবদ্ধ, অশিক্ষিত, মোহান্ধ, ঈর্ষাদ্বেষসঙ্কুল, অন্ধকার পাড়াগেঁয়ে এঁদো খড়ের ঘরে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি মানুষ চেনেন। অনেক দেখেচেন, অনেক বেড়িয়েচেন। মুখ তুলে বললেন—কবিরাজমশাই, ঠিক বলেচেন। আপনাকে আমি কি বোঝাবো? আপনি জ্ঞানী পুরুষ।

—হ্ঃ, এইবার ধরেচেন ঠিক জামাইবাবু! জ্ঞানী লোক একডা খুঁজে বার করেচেন—

তিলুও খুব অবাক হয়েছিল। সেও স্বামীর কাছে অনেক কিছু পড়েচে, অনেক কিছু শিখেচে, বেদান্তের মোটা কথা জানে। এভাবে সেকথা রামকানাই কবিরাজ বলবে, তা সে ভাবেনি। সে এগিয়ে এসে বললে—আমি অনেক কতা শুনেচি আপনার ব্যাপারে। যথেষ্ট অত্যাচার আপনার ওপর বড়দা করেচেন, নীলকুঠির লোকেরা করেছে—আপনি মিথ্যে সাক্ষী দিতে চাননি বলে টাকা খেয়ে সায়েবদের পক্ষে। অনেক কষ্ট পেয়েচেন তবু কেউ আপনাকে দিয়ে মিথ্যে বলাতি পারেনি রামু সর্দারের খুনের মামলায়। আমি সব জানি। কতদিন ভাবতাম আপনাকে দেখবো। আপনি আজ আমাদের ঘরে আসবেন, আপনারে খাওয়াবো—তা ভাবিনি। আপনার মুখির কথা শুনে বুঝলাম, আপনি সত্যি আশ্রয় করে আছেন বলে সত্যি জিনিস আপনার মনে আপনিই উদয় হয়েছে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে জানতেন না তিলু এত কথা বলতে পারে বা এভাবে কথা বলতে পারে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—ভালো।

তিলু হেসে বললে—কি ভালো?

—ভালো বললে। আচ্ছা কবিরাজমশাই, আপনার বয়েস কত?

—১২৩৪ সালের মাঘ মাসে জন্ম। তাহলি হিসেব করুন। সতোরই মাঘ।

—আপনি আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। দাদা বলে ডাকব আপনাকে।

তিলু বললে—আমিও। দাদা, মাঝে মাঝে আপনি এসে এখানে পাতা পাড়বেন। পাড়বেন কিনা বলুন?

রামকানাই কবিরাজ ভাবচেন, দিনটা আজ ভালো। এদের মত লোক এত আদর করবে কেন নইলে?

—পাতা পাড়বো বৈকি। একশো বার পাড়বো। আমার ভগ্নীর বাড়ি ভাত খাবো না তো কম্‌নে খাবো? আচ্ছা, আজ যাই দিদি। আরো একটা রুগী দেখতি হবে সবাইপুরে। খোকারে যা দেলাম, বিকেলের দিকি জ্বর ছেড়ে যাবে। কাল সকালে আবার দেখে যাবো।

নিলু সুক্তুনিতে ফোড়ন দিয়ে নামিয়ে নিলে। খোকনকে ওর কাছে দিয়ে ওর মা গিয়েচে বড়দার বাড়ি। বড়দা বড় বিপদে পড়ে গিয়েচেন, তাঁকে নাকি কোথায় যেতে হবে সাহেবদের সঙ্গে সে কথা শুনতে গিয়েচে বড়দি।

খোকন বলছে—ছো মা—ছো মা—

—কি?

—দে।

—কি দেবো? না, আর গুড় খায় না।

খোকন বড় শান্ত। আপন মনে খেলতে খেলতে একটা তেলসুদ্ধ বাটি উপুড় করে ফেললে—তারপর টলতে টলতে আসতে লাগলো উনুনের দিকে।

—নাঃ, এবার পুড়ে ঝলসে বেগুনসেদ্ধ হয়ে থাকবি। আমি জানিনে বাপু! রাঁধবো আবার ছেলে সামলাবো, তিনি রাজরাণী আর ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি যেতি পারলেন না! ও মেজদি—মেজদি—কেউ যদি বাড়িতি থাকবে কাজের সময়! বোস এখানে—এই!...দাঁড়া দেখাচ্চি মজা আবার তেলের বাটি হাতে নিইচিস?

খোকন বললে—বাটি।

—বাটি রাখো ওখানে।

—মা।

—মা আসচে বোসো। ঐ আসচে।

খোকন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে বললে—নেই।

তারপর হাত দুটি নেড়ে বললে—নেই নেই—যা—আঃ—

—আচ্ছা নেই তো নেই। চুপটি করে বোসো বাবা আমার—

—বাবা।

—আসচেন। গিয়েচেন নদীতে নাইতি।

—মা।

—আসচে।

—মা।

—বাবা রে বাবা, আর বক্‌তি পারিনে তোর সঙ্গে! বোসো—এই! গরম—গরম—পা পুড়ে যাবে! গরম সুক্তুনির ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়চে। ও মেজদি—

এইবার খোকন কান্না শুরু করলে। নিলুর গলায় তিরস্কারের আভাসে, কান্নার সুরে বলে—মা—আঁ—আঁ—

নিলু ছুটে এসে খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে বললে—ও আমার মানিক, কাঁদে না সোনামণি—রামমণি—শ্যামমণি—চুপ চুপ। কে কেঁদেচে? আমার সোনার খোকন কেঁদেচে। কেন কেঁদেচে? মেজদি—যা মর্ সব, জমের বাড়ি যা—আমার খোকনের খোয়ার করে পাড়া বেরুনো হয়েচে!

খোকন ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বললে—মা—

—কেঁদো না। আমি তোমায় বকিনি। আমি বক্‌লি বাবা আমার আর সহ্যি করতি পারেন না। আমি বকিনি। কি দিই হাতে? ওমা ওটা কি রে? পাখী?...

এমন সময় তিলু দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—এই যে সোনামণি—কাঁদচে কেন রে?

—তোমার আদুরে গোপাল একটা উঁচু সুর শুনলি অমনি ঠোঁট ওল্‌টান। চড়া কথা বলবার জো নেই।

নিলু বললে—দাদা কোথায় গিয়েচেন দেখে এলে?

—দাদা গিয়েচেন সায়েবদের কাজে। কোথায় তিতু মীর বলে একটা লোক, মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করচে সেই লড়াইতে নীলকুঠির সায়েবরা লোকজন নিয়ে গিয়েচে, দাদাকেও নিয়ে গিয়েচে।

—তিতু মীর?

—তাই তো শুনে এলাম। বৌদিদি কেঁদে-কেটে অনথ করচে। লড়াই হেন ব্যাপার, কে বাঁচে কে মরে তার ঠিকানা কি আছে?

নিলু হঠাৎ চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো পা ছড়িয়ে। তিলু যত বলে, যত সান্ত্বনা দেয়—নিলু ততই বাড়ায়—খোকা অবাক হয়ে ক্রন্দনরতা ছোট মা'র মুখের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে নিজেও চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হোলো বিলু। সে নিলুর ও খোকার কান্নার রব শুনে ভাবলে বাড়িতে নিশ্চয় একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেচে। সে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—কি হোলো দিদি? নিলুর কি হোলো?...

তিলু বললে—দাদা তিতু মীরের লড়াইয়ে গিয়েচে শুনে কাঁদচে। তুই একটু বোঝা। ছেলেমানুষের মতো এখনো। দাদা ওকে ভালোবাসে বড়, এখনো ছেলেমানুষের মতো আবদার করে দাদার কাছে।

বিলু নিলুর পাশে বসে ওঁকে বোঝাতে লাগলো—যাঃ, ও কি? চুপ কর। ওতে অমঙ্গল হয়। কুঠিসুদ্ধ কত লোক গিয়েচে, ভয় কি সেখানে? ছিঃ, কাঁদে না। তুই না থামলি খোকনও থামবে না। চুপ কর।

তিলু বললে—হ্যাঁ রে, আমাদের দাদা নয়? আমরা কি কাঁদচি? অমন করতি নেই। ওতে অমঙ্গল ডেকে আনা হয়, চুপ কর। দাদা হয়তো আজই এসে পড়বে দেখিস এখন। থাম বাপু—

তিলুর মুখের কথা শেষ হতে না হতে ভবানী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। প্রথম কথাই বললেন—দাদা এসেচেন তিতু মীরের লড়াই ফেরতা। দেখা করে এলাম। এ কি? কাঁদচে কেন ও? কি হয়েচে?

—ও কাঁদচে দাদার জন্যি। বাঁচা গেল। কখন এলেন?

—এই তো ঘোড়া থেকে নামচেন।

নিলু কান্না ভুলে আগেই উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনেছিল। কথা শেষ হতেই বললে—চলো মেজদি, আমরা যাই বড়দাদাকে দেখে আসি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—যেও না।

যাবো না? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করচে।

—আমি নিজে গিয়ে তত্ত্ব নিয়ে আসচি। তুমি গেলে তোমার গুণধর দিদি যেতে চাইবে। খোকাকে রাখবে কে?

তিলুও বললে—না যাস নে, উনি গিয়ে দেখে আসুন, সেই ভালো।

ওদের একটা গুণ আছে, ভবানী বারণ করলে আর কেউ সে কাজ করবে না। নিলু বললে—আপনার মনটা বড্ড জিলিপির পাক, জানলেন? আমার দাদার জন্যি আমার কি যে হচ্চে, আমিই জানি। দেখে আসুন, যান—

আধঘন্টা পরে দেওয়ান রাজারামের চন্ডীমন্ডপে অনেক লোক জড়ো হয়েচে। তার মধ্যে ভবানী বাঁড়ুয্যেও আছেন।

ফণি চক্কত্তি বললেন—তারপর ভায়া, কোন চোট লাগে নি তো!

রাজারাম রায় বললেন—না দাদা, তা লাগে নি, আপনাদের আশীর্ব্বাদে যুদ্ধই হয় নি। এর আগে ওরা অনেক লোক নাকি মেরেছিল, সে হোলো নিরীহ গাঁয়ের লোক।

—তিতু মীর কেডা?

—মুসলমানদের মোড়লপানা, যা বোঝলাম ওদের কথাবার্তার ভাবে। সেদিন বসে আছি হঠাৎ বড়সায়েবের কাছে চিঠি এল, তিতু মীর বলে একটা ফকির মহারাণীর সঙ্গে লড়াই বাধিয়েচে। নীলকুঠির লোকদের ওপর তার ভয়ানক রাগ। লুঠপাঠ করেচে, খুনখারাবি হচ্চে।

—চিঠি দিলে কে বড়সায়েবের কাছে?

—ডঙ্কিন্‌সন্ সায়েবের জায়গায় যে নতুন ম্যাজিস্টর এসেচেন, তিনি লিখেচেন, তোমরা লোকজন নিয়ে এসো—যেখানে যত নীলকুঠির সায়েব ছিল, গিয়ে দেখি যমুনার ধারে আমবাগানে তাঁবু সব সারি সারি। লোকজন, ঘোড়া, আসবাব, বন্দুক। ওদিকে সরকারী সৈন্য এসেচে, তাদের তাঁবু। সে এক এলাহি কান্ড, দাদা। আমার তো গিয়ে ভারি মজা লাগতি লাগলো। প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন গিয়েছিল, সে বড় দুঁদে। বললে, আমি দেখে আসি তিতু মীর কোথায় কি ভাবে আছে। আমাদের কারো ভয় হয় নি। যুদ্ধই তো হোলো না, একটা বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়েচে যমুনার ধারে।

—অনেক সায়েব জড়ো হয়েছিল?

—বোয়ালমারি, পানচিতে, রঘুনাথগঞ্জ, পালপাড়া, দীঘড়ে-বিষ্ণুপুর সব কুঠির সায়েব লোকজন নিয়ে এসেচে। বন্দুক, গুলি, বারুদ। মুরগি, হাঁস, খাসি যোগাচ্চে গাঁয়ের লোক। একটা মেয়েছেলেকে এমন মার মেরেচে তিতু মীরের লোক যে, তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝোঁঝালি দিয়ে পড়ছিল। তিতু মীরের কেল্লা ছিল এককোশ তিনপোয়া পথ দূরি। আমরা ছিলাম একটা আমবাগানে।

—যুদ্ধ কেমন হোলো।

—তিতু মীর বলেছিল তার লোকজনদের, সায়েবদের গোলাগুলিতি তার কিছুই হবে না। সরকারের সেপাইরা প্রথমবার ফাঁকা আওয়াজ করে। তিতু মীর তার লোকজনদের বললে—গোলাগুলি সে সব খেয়ে ফেলেচে। তখন আবার গুলি পুরে বন্দুক ছোঁড়া হোলো। বাইশজন লোক ফৌৎ। তখন বাকি সবাই টেনে দৌড় মারলে। তিতু মীরকে বেঁধে চালান দিলে কলকেতা। মিটে গেল লড়াই। তার পর আমরা সব চলে এলাম।

নীলমণি সমাদ্দার তামাক খেতে খেতে বললেন—আমরা সব ভেবে খুন। না জানি কি মস্ত লড়াইয়ের মধ্যি গেল রাজারাম দাদা। আরে তুমি হোলে গিয়ে গাঁয়ের মাথা। তুমি গাঁয়ে না থাকলি মনডা ভালো লাগে? শাম বাগদির বড় মেয়ে কুসুম বেরিয়ে গেল ওর ভগ্নিপতির সঙ্গে। মামুদপুর থেকে ওর বাবা ওরে ধরে নিয়ে এল। তার বিচের ছিল পরশু। তুমি না থাকতি হোলো না। আজ আবার হবে শুনচি।

সন্ধ্যাবেলা এল শাম বাগ্‌দি ও তার মেয়ে কুসুম।

রাজারাম বললেন—কি গা শাম?

—মেয়েডারে নিয়ে এ্যালাম কর্তাবাবুর কাছে। যা হয় বিচের করুন।

রাজারাম বিজ্ঞ বিষয়ী লোক, হঠাৎ কোনো কথা না বলে বললেন—তোর মেয়ে কোথায়?

—ওই যে আড়ালে দাঁড়িয়ে। শোন ও কুসী—

কুসুম সামনে এসে দাঁড়ালো, আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়েস, পূর্ণযৌবনা নিটোল, সুঠাম দেহ—এক ঢাল কালো চুল মাথায়, কালো পাথরে কুঁদে তৈরি করা চেহারা, আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটি। মুখখানি বেশ, রাজারাম কেবল গয়া মেমকেই এত সুঠাম দেখেচেন। মেয়েটার চোখে ভারি শান্ত, সরল দৃষ্টি।

রাজারাম ভাবলেন, বেশ দেখচি যে! ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল। বড়সায়েব যদি একবার দেখতে পায় তাহলে লুফে নেয়।

—নাম কি তোর?

—কুসুম।

—কেন চলে গিইছিলি রে?

কুসুম নিরুত্তর।

—বাবার বাড়ি ভালো লাগে না কেন?

কুসুম ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে রাজারামের দিকে চেয়ে বললে—মোরে পেট ভরে খেতি দেয় না সৎমা। মোরে বকে, মারে। মোর ভগিনপোত বললে—মোরে বাড়ি কিনে দেবে, মোরে ভালোমন্দ খেতি দেবে—

—দিইছিল?

—মোরে গিয়ে ধরে আনলে বাবা। কখন মোরে দেবে?

—আচ্ছা ভালোমন্দ খাবি তুই, থাক আমার বাড়ি। থাকবি?

—না।

—কেন রে?

—মোর মন কেমন করবে।

—কার জন্যি? বাবাকে ছেড়ে তো গিইছিলি। সৎমা বাড়িতি। কার জন্যি মন কেমন করবে রে?

কুসুম নিরুত্তর।

ওর বাবা শাম বাগ্‌দি এতক্ষণ দেওয়ান রাজারামের সামনে সমীহ করে চুপ করে ছিল, এইবার এগিয়ে এসে বললে—মুই বলি শুনুন কর্তাবাবু। আমার এ পক্ষের ছোট ছেলেটা ওর বড্ড ন্যাওটো। তারি জন্যি ওর মন কেমন করে বলচে।

—তাই যদি হবে, তবে তারে ছেড়ে পালিয়েছিলি তো? সে কেমন কথা হোলো? তোদের বুদ্ধি-সুদ্ধিই আলাদা। কি বলে কি করে আবোল-তাবোল, না আছে মাথা না আছে মুন্ডু। থাকবি আমার বাড়ি। ভালোমন্দ খাবি। বেশি খাটতি হবে না, গোয়ালগোবর করবি সকালবেলা।

শাম বাগ্‌দি বলচে—থাক কর্তাবাবুর বাড়ি, সব দিক থেকেই তোর সুবিধে হবে।

রাজারাম জগদম্বাকে ডেকে বললেন—ওগো শোনো, এই মেয়েটি আমাদের এখানে থাকবে আজ থেকে। ও একটু ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে। মুড়কি আছে ঘরে?

জগদম্বা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়েছিলেন। বললেন—ও তো বাগ্‌দি পাড়ার কুসী না? ও ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে কত এসেচে ওর দিদিমার সঙ্গে—মনে পড়ে না, হাঁরে?

কুসুম ঘাড় নেড়ে বললে—মুই তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। মোর মনে নেই।

—থাকবি আমাদের বাড়ি?

—হাঁ।

—বেশ থাক। চিঁড়ে মুড়কি খাবি? আয় চল রান্নাঘরের দিকি।

রাজারাম বললেন—মেয়ের মত থাকবি। আর গোয়াল পস্কার-মস্কার করবি। তোর মা'র কাছে চাবি যা যখন খেতি ইচ্ছে হবে। নারকোল খাবি তো কত নারকোল আছে, কুরে নিয়ে খাস্। মুড়কি মাখা আছে ঘরে। খাবার জন্যি নাকি আবার কেউ বেরিয়ে যায়? আমার বাড়ির জিনিস খেয়ে গাঁয়ের লোক এলিয়ে যায় আর আমার গাঁয়ের মেয়ে বেরিয়ে যাবে পেট ভরে খেতি পায় না বলে? তোর এ পক্ষের বৌটাকেও বলবি শাম, কাজডা ভালো করেনি। বলি, ওর মা নেই যখন, তখন কেডা ওরে দেখবে বল্।

শাম বিরক্তি দেখিয়ে বললে—বলবেন না সে সুমুন্দির ইস্ত্রীর কথা! মোর হাড় ভাজা ভাজা করে ফেললে—মুই মাঠ থেকে ফিরলি মোরে বলে না যে দুটো চালভাজা খা। রোজ পান্তভাত, রোজ পান্তভাত। মুই বলি দুটো গরম ভাত মোরে দে, সেই সূর্যি ঘুরে যাবে তখন দুটো ঝিঙে ভাতে দিয়ে ভাত দেবে। মরেও না যে, না হয় আবার একটা বিয়ে করি।

কুসুম মুখ টিপে হাসচে। বাবার কথায় তার খুব আমোদ হয়েচে বোধ হয়।

রামকানাই কবিরাজ খেজুরপাতার চট পেতে দিলেন ভবানী বাঁড়ুয্যেকে। বললেন—জামাইবাবু! আসুন, আসুন।

—কি করছিলেন?

—ঈষের মূল সেদ্ধ করবো, তার যোগাড় করচি। এত বর্ষায় কোত্থেকে?

সন্ধ্যা হবার দেরি নেই। অঝোরে বৃষ্টিপাত হচ্চে শ্রাবণের মাঝামাঝি। এ বাদলা তিন দিন থেকে সমানে চলচে। তিৎপল্লা গাছের ঝোপ বৃষ্টিতে ভিজে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মাটির পথ বেয়ে জলের স্রোত চলেছে ছোট ছোট নালার মত। বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না। বাগদিপাড়ার নলে বাগ্‌দি, অধর সর্দার, অধর সর্দারের তিন জোয়ান ছেলে, ভেঁপু মালি—এরা সব ঘুনি আর পোলো নিয়ে বাঁধালে জলের তোড়ে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করচে। বৃষ্টির গুঁড়ো ছাঁটে চারিধারে ধোঁয়া-ধোঁয়া। রামকানাইয়ের ঘরের পেছনে একটা সোঁদালি গাছে এখনো দু'এক ঝাড় ফুল দুলচে। মাঠে ঘাসের ওপর জল বেধে ছোট পুকুরের মত দেখাচ্চে। পথে জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে। ঘরের মধ্যে চালের ফাঁক দিয়ে একটা নতুন তেলাকুচোর লতা ঢুকেচে, নতুন পাতা গজিয়েচে তার চারু কমনীয় সবুজ ডগায়।

—তামাক সাজি বসুন। ভিজে গিয়েচেন যে! গামছাখানা দিয়ে মুছে ফেলুন—

—এ বর্ষায় তিন দিন আজ বাড়ি বসে। একটু সৎ চর্চা করি এমন লোক এ গাঁয়ে নেই—সবাই ঘোর বৈষয়িক। তাই আপনার কাছে এলাম।

—আমার কত বড় ভাগ্যি জামাইবাবু। দুটো চিঁড়ে খাবেন, দেবো? গুড় আছে কিন্তু।

—আপনি যদি খান তবে খাবো।

—দুজনেই খাবো, ভাববেন না। অতিথি এলেন ঘরে, দেবার কি আছে, কিছুই নেই। যা আছে তাই দেলাম। শিশিনিতি একটু গাওয়া ঘি আছে, মেখে দেবো?

—দেখি, আপনি কিনেচেন না নিজে করেন?

রামকানাই একটা ছোট্ট শিশি কাঠের জলচৌকি থেকে নিয়ে ভবানীর হাতে দিলেন। বললেন—নিজে তৈরি করি। গয়া মেম একটু করে দুধ দেয়, আমারে বাবা বলে। মেয়েডা ভালো। সেই মেয়েডা এই শিশিনি এনে দিয়েচে সায়েবদের কুঠি থেকে। যে সরটুকু পড়ে, তাই জমিয়ে ঘি করি। ঘি আমাদের ওষুধে লাগে কিনা। অনেকে গব্য ঘৃত না মিশিয়ে বাজারের ভয়সা ঘি মেশায়—সেটা হোলো মিথ্যে আচরণ। জীবন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে শঠতা, প্রবঞ্চনা যারা করে, তারা তেনার কাছে জবাবদিহি দেবে একদিন কি ক'রে?

—আর কবিরাজ মশাই! দুনিয়াটা চলচে শঠতা আর প্রবঞ্চনার ওপরে। চারিধারে চেয়ে দেখুন না। আমাদের এ গাঁয়েই দেখুন। সব ক'টি ঘুণ বিষয়ী। শুধু গরীবের ওপর চোখরাঙানি, পরের জমি কি ক'রে ফাঁকি দিয়ে নেবো, পরনিন্দা, পরচর্চা, মামলা এই নিয়ে আছে। কুয়োর ব্যাং হয়ে পড়ে আছে এই মোহগর্ভে।

রামকানাই ততক্ষণে গাওয়া ঘি মাখালেন চিঁড়েতে। গুড় পাড়লেন শিকেতে ঝুলোনো মাটির ভাড় থেকে। পাথরের খোরাতে ঘি-মাখা কাঁচা চিঁড়ে রেখে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে খেতে দিলেন।

ভবানীকে বললেন—কাঁচা লঙ্কা একটা দেবো?

—দিন একটা—

—আচ্ছা, একটু আদি সংবাদ শোনাবেন? ভগবান কি রকম? তাঁকে দেখা যায়? আপনারে বলি, এই ঘরে একলা রাত্তিরি অন্ধকারে বসে বসে ভাবি, ভগবানডা কেডা? উত্তর কেডা দেবে বলুন। আপনি একটু বলুন।

ভবানী বাঁড়ুয্যে নিজেকে বিপন্ন বিবেচনা করলেন। রামকানাই কবিরাজ সৎ লোক, সত্যসন্ধ লোক। তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। এত বড় গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন? এই বৃদ্ধের পিপাসু মনের খোরাক যোগাবার যোগ্যতা তাঁর কি আছে? বিশেষ ক'রে বিশ্বের কর্তা ভগবানের কথা। যেখানে সেখানে যা তা ভাবে তিনি তাঁর কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন। বড্ড শ্রদ্ধা করেন ভবানী বাঁড়ুয্যে যাঁকে, তাঁর কথা এভাবে বলে বেড়াতে তাঁর বাধে। উপনিষদের সেই বাণী মনে পড়লো ভবানীর—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।

নানাপ্রকার অজ্ঞানতায় ও মূঢ়তায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেও অজ্ঞানী ব্যক্তি ভাবে, "আমি বেশ আছি, আমি কৃতার্থ!"

তিনিও কি সেই দলের একজন নন?

এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক নয়? এ কি সে দলের একজন নয়, যাঁরাঃ—

তপঃশ্রদ্ধে য হ্যপবস্যারণ্যে
শান্তা বিদ্বাংশো ভৈক্ষাচর্য্যাং চরন্ত
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যথামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অরণ্যে বাস করেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন, সেই সব নিরাসক্ত নির্লোভ ব্যক্তি সূর্যদ্বারপথে সেইখানে যান, যেখানে সেই অব্যয়াত্মা অমৃতময় পুরুষ বিদ্যমান।

ভবানী বাঁড়ুয্যে কি কামারের দোকানে ছুঁচ বিক্রি করতে আসেন নি!

তিনি বিনীতভাবে বললেন—আমার মুখে কি শুনবেন? তিনিই বিরাট, তিনিই এই সমুদয় বিশ্বের স্রষ্টা। তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্য, তিনিই মন।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদুবাঙ মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্যবিদ্ধি—

রামকানাই কবিরাজ সংস্কৃতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নন, কথা শুনতে শুনতে চোখ বুজে ভাবের আবেগে বলতে লাগলেন—আহা! আহা! আহা!

তিনি ভবানীর হাত দুটি ধরে বললেন—কি কথাই শোনালেন, জামাইবাবু। এ সব কথা কেউ এখানে বলে না। মনডা আমার জুড়িয়ে গেল। বড্ড ভালো লাগে এসব কথা। বলুন, বলুন।

ভবানী বাঁড়ুয্যে নম্রভাবে সশ্রদ্ধ সুরে বলতে লাগলেন ঃ

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান—
আস্য জন্তো র্নিহিতং গুহায়াং।

তিনি ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্রতর, মহৎ থেকেও মহৎ। ইনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যেই বাস করেন। আসীনো দূরং ব্রজতি, উপবিষ্ট হয়েও তিনি দূরে যান, শয়ানো যাতি সর্বতঃ—শুয়ে থেকেও তিনি সর্বত্র যান।

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোহণু চ
যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।

যিনি দীপ্তিমান, যিনি অণুর চেয়েও সুক্ষ্ম। যাঁর মধ্যে সমস্ত লোক রয়েচে, সেই সব লোকের অধিবাসীরা রয়েচে—

রামকানাই চিঁড়ে খেতে খেতে চিঁড়ের বাটিটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখেচেন। তাঁর ডান হাতে তখনো একটা আধ-খাওয়া কাঁচা লঙ্কা, মুখে বোকার মত দৃষ্টি, চোখ দিয়ে জল পড়চে। ছবির মত দেখাচ্চে সমস্তটা মিলে।...ভবানী বাঁড়ুয্যে বিস্মিত হোলেন ওঁর জলে-ভরা টসটসে চোখের দিকে তাকিয়ে।

খালের ওপারে বাবলা গাছের মাথায় সপ্তমীর চাঁদ উঠেছে পরিষ্কার আকাশে। হুতুম প্যাঁচা ডাকচে নলবনের আড়ালে।

ভবানী অনেক রাত্রে বাড়ি রওনা হোলেন। শরতের আকাশে অগণিত নক্ষত্র, দূরে বনান্তরে কাঠঠোকরার তন্দ্রাস্তব্ধ রব, ক্বচিৎ বা দু'একটা শিয়ালের ডাক—সবই যেন তাঁর কাছে

অতি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল। আজ নিভৃত, নিস্তব্ধ রসে তাঁর অন্তর অমৃতময় হয়েচে বলে তাঁর বার বার মনে হতে লাগলো। রহস্যময় বটে, মধুরও বটে। মধুর ও রহস্যময় ও বিরাট ও সুন্দর ও বড় আপন সে দেবতা। একমাত্র দেবতা, আর কেউ নেই। যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস ও অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত, তাঁর অপূর্ব আবির্ভাবে নৈশ আকাশ যেন থমথম করচে। এ সব পাড়াগাঁয়ে সেই দেবতার কথা কেউ বলে না। বধির বনতলে ওদের পাশ-কাটিয়ে চলে যায়। নক্ষত্র ওঠে না, জ্যোৎস্নাও ফোটে না। সবাই আছে বিষয়সম্পত্তির তালে, দু'হাত এগিয়ে ভেরেণ্ডার কচা পুঁতে পরের জমি ফাঁকি দিয়ে নেবার তালে।

হে শান্ত, পরমব্যক্ত ও অব্যক্ত মহাদেবতা, সমস্ত আকাশ যেন অন্ধকারে ওতপ্রোত, তেমনি আপনাতেও। তুমি দয়া করো, সবাইকে দয়া কোরো। খোকাকে দয়া কোরো, তাকে দরিদ্র কর ক্ষতি নেই, তোমাকে যেন সে জানে। ওর তিন মাকে দয়া কোরো।

তিলু স্বামীর জন্যে জেগে বসে ছিল। রাত অনেক হয়েচে, এত রাত্রে তো কোথাও থাকেন না উনি? বিলু ও নিলু বার বার ওদের ঘর থেকে এসে জিগ্যেস করচে। এমন সময় নিলু বাইরের দিকে উঁকি মেরে বললে—ঐ যে মূর্তিমান আসচেন।

তিলু বললে—শরীর ভালো আছে দেখচিস তো রে?

—ব'লে তো মনে হচ্চে। বলি ও নাগর, আবার কোন্ বিন্দেবলীর কুঞ্জে যাওয়া হয়েছিল শুনি? বড়দিকে কি আর মনে ধরচে না? আমাদের না হয় না-ই ধরলো—

ভবানী এগিয়ে এসে বললেন—তোমরা সবাই মিলে এমন করে তুলেচ যেন আমি সুন্দরবনের বাঘের পেটে গিয়েচি। রাত্রে বেড়াতে বোরবোর জো নেই? রামকানাই কবিরাজের বাড়ি ছিলাম।

বিলু বললে—সেখানে কি আজকাল গাঁজার আড্ডা বসে নাকি?

নিলু বললে—নইলি এত রাত অবধি সেখানে কি হচ্ছিল?

তিলু বোনেদের আক্রমণ থেকে স্বামীকে বাঁচিয়ে চলে।—কোনোরকমে ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে স্বামীর হাত-পা ধোবার জল এনে দিলে। বললে—পা ধুয়ে দেবো? পায়ে যে কাদা!

—ওই মাল্‌সি কাঁটালতলার কাছে ভীষণ কাদা।

—কি খাবেন?

—কিছু না। চিড়ে খেয়ে এসেচি কবিরাজের বাসা থেকে।

—না খেলি হবে না। ওবেলার চালকুমড়োর সুক্তুনি রাখতি বলেছিলেন—রয়েচে। সে কে খাবে? এক সরা সুক্তুনি রেখে দিইছিল নিলু। ও বড্ড ভালোবাসে আপনাকে—

—আচ্ছা, দাও। খোকনকে কি খাইয়েছিলে?

—দুধ।

—কাসি আর হয়নি?

—শুঁঠ গুঁড়ো গরমজলে ভিজিয়ে খেতি দিইচি।

ভবানী বাঁড়ুয্যে খেতে বসে তিলুকে সব কথা বললেন। তিলু শুনে বললে—উনি অন্যরকম লোক, সেদিনও ঐ কথা জিগ্যেস করেছিলেন মনে আছে? আপনি সেদিন পড়িয়েছিলেন—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ—তাঁর চেয়ে বড় আর কিছু নেই, এই তো মানে?

—ঠিক।

—আমিও ভাবি—ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকি, সব সময় পেরে উঠিনে। আপনি আমাকে আরও পড়াবেন। ভালো কথা, আমাদের দু'আনা ক'রে পয়সা দেবেন।

—কেন?

—কাল তেরের পালুনি। বনভোজনে যেতি হবে।

—আমিও যাবো।

—তা কি যায়? কত বৌ-ঝি থাকবে। আচ্ছা, তেরের পালুনির দিন বিষ্টি হবেই, আপনি জানেন?

—বাজে কথা।

—বাজে কথা নয় গো। আমি বলচি ঠিক হবে।

—তোমারও ঐ সব কুসংস্কার কেন? বৃষ্টির সঙ্গে কি কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে বনে বসে খাওয়ার?

—আচ্ছা, দেখা যাক। আপনার পণ্ডিতি কতদূর টেঁকে।

ভাদ্র মাসের তেরোই আজ। ইছামতীর ধারে 'তেরের পালুনি' করবার জন্যে পাঁচপোতা গ্রামের বৌ-ঝিরা সব জড়ো হয়েচে। নালু পালের স্ত্রী তুলসীকে সবাই খুব খাতির করচে, কারণ তার স্বামী অবস্থাপন্ন। তেরের পালুনি হয় নদীর ধারের এক বহু পুরানো জিউলি গাছের আর কদম গাছের তলায়। এই জিউলি আর কদম গাছ দুটো একসঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে আছে যে কতদিন ধরে, তা গ্রামের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে কেউ বলতে পারে না। অতি প্রাচীন লোকদের মধ্যে নীলমণি সমাদ্দারের মা বলতেন, তিনি যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে, তখনও তিনি তাঁর শাশুড়ী ও দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে এই গাছতলায় তেরের পালুনির বনভোজন করেছিলেন। গত বৎসর পঁচাশি বছর বয়সে নীলমণির মা দেহত্যাগ করেচেন।

মেয়েরা পাড়া হিসেবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বনভোজনের আয়োজন করচে। এখানে আর রান্না হয় না, বাড়ি থেকে যার যার যেমন সঙ্গতি—খাবার জিনিস নিয়ে এসে কলার পাতা পেতে খেতে বসে, মেয়েরা ছড়া কাটে, গান গায়, উলু দেয়, শাঁখ বাজায়। এই বনভোজনের একটি চিরাচরিত প্রথা এই, তুমি সম্পন্ন গৃহস্থঘরের বৌ, তুমি ভালো জিনিস এনেচ খাবার জন্যে—যারা দারিদ্র্যের জন্যে তেমন কিছু আনতে পারেনি, তাদের তুমি ভাগ করে দেবে নিজের আনা ভালো খাবার। এ কেউ বলে দেয় না, কেউ বাধ্যও করে না—এ একটি অলিখিত গ্রাম্য-প্রথা বরাবর চলে আসচে এবং সবাই মেনেও এসেচে।

যেমন আজ হোলো—তুলসী লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরে যতীনের বৌ আর বোন নন্দরাণীর কাছে এসে দাঁড়ালো। আজ মেলামেশা ও ছোয়াছুঁয়ির খুব কড়াকড়ি না থাকলেও বামুনবাড়ির ঝি-বৌরা নদীর ধার ঘেঁষে খাওয়ার পাত পাতে, অন্যান্য বাড়ির মেয়েরা মাঠের দিকে ঘেঁষে খেতে বসে। যতীনের বৌ এনেচে চালভাজা, দুটি মাত্র পাকা কলা ও একঘটি ঘাল। তাই খাবে ওর ননদ নন্দরাণী আর ও নিজে। তুলসী এসে বললে—ও স্বর্ণ, কেমন আছ ভাই?

—ভালো দিদি। খোকা আসেনি?

—না, তাকে রেখে এ্যালাম বাড়িতি। বড্ড দুষ্টুমি করবে এখানে আনলি। কি খাবা ও স্বর্ণ?

—এই যে। ঘোলটুকু আমার বাড়ির। আজ তৈরী করিচি সকালে। তিন দিনের পাতা সর। একটু খাস তো নিয়ে যা দিদি।

তুলসী ঘোল নেওয়ার জন্যে একটা পাথরের খোরা নিয়ে এল, ওর হাতে দু'খানা বড় ফেনি বাতাসা আর চারটি মর্তমান কলা।

—ও আবার কি দিদি?

—নাও ভাই, বাড়ির কলা। বড় কাঁদি পড়েল আষাঢ় মাসে, বর্ষার জল পেয়ে ছড়া নষ্ট হয়ে গিয়েল।

তিলু বিলু খেতে এসেচে বনে, নিলু খোকাকে নিয়ে রেখেচে বাড়িতে। ওদের সবাই এসে জিনিস দিচ্চে, খাতির করচে, মিষ্টি কথা বলচে। দুধ, চিনির মঠ, আখের গুড়ের মুড়কি, খই, কলা, নানা খাবার। ওরা যত বলে নেবো না, ততই দিয়ে যায় এ এসে, ও এসে। ওরাও যা এনেছিল, নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূর (ওদের অবস্থা গ্রামের মধ্যে বড় হীন) সঙ্গে সমানে ভাগ করেচে।

—ও দিদি, কি খাবি ভাই?

—দুটো চালভাজা এনেলাম তাই। আর একটা শসা আছে।

—দুধ নেই?

—দুধ ক'নে পবো? গাই এখনো বিয়োয়নি।

—এখনো না? কবে বিয়োবে?

—আশ্বিন মাসের শেষাগোসা।

তিলুর ইঙ্গিতে বিলু ওদের দুজনকে চিঁড়ে, মুড়কি, বাতাসা, চিনির মঠ এনে দিলে। ষষ্ঠী চৌধুরীর স্ত্রী ওদের পাকাকলা দিয়ে গেলেন ছ'সাতটা।

ফণি চক্কত্তির পুত্রবধূ বললে—আমার অনেকখানি খেজুরের গুড় আছে, নিয়ে আসচি তাই।

তিলু বললে—আমি নেবো না ভাই, ওই ছোট কাকীমাকে দাও। অনেক মঠ আর বাতাসা জমেচে। বিধুদিদি, এবার ছড়া কাটলে না যে? ছড়া কাটো শুনি।

বিধু ফণি চক্কত্তির বিধবা বোন, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস—একসময়ে সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল এ গ্রামে। বিধু হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করলে ঃ—

আজ বলেচে যেতে
পান সুপুরি খেতে
পানের ভেতর মৌরি-বাটা
ইস্কে বিস্কে ছবি আঁটা
কলকেতার মাথা ঘষা
মেদিনীপুরের চিরুনি
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো
চাঁপাফুলের গাঁথুনি
আমার নাম সরোবালা
গলায় দেবো ফুলের মালা—

বিলু চোখ পাকিয়ে হেসে বললে—কি বিধুদিদি, আমার নামে বুঝি ছড়া বানানো হয়েচে? তোমায় দেখাচ্চি মজা—বলে,

চালতে গাছে ভোমরার বাসা
সব কোণ নেই তার এক কোণ ঠাসা—

তোমারে আমি—আচ্ছা, একটা গান কর না বিধুদিদি? মাইরি নিধুবাবুর টপ্পা একখানা গাও শুনি—

বিধু হাত-পা নেড়ে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলো—

ভালোবাসা কি কথার কথা সই, মন যার সনে গাঁথা
শুকাইলে তরুবর বাঁচে কি জড়িতা লতা
মন যার সনে গাঁথা

ও পাড়ার একটি অল্পবয়সী লাজুক বৌকে সবাই বললে—একটা শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে। বৌটি ভজগোবিন্দ বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ, কামদেবপুরের রত্নেশ্বর গাঙ্গুলীর তৃতীয়া কন্যা, নাম নিস্তারিণী। রত্নেশ্বর গাঙ্গুলী এদিকের মধ্যে একজন ভালো ডুগিতবলা বাজিয়ে। অনেক আসরে বৃদ্ধ রত্নেশ্বরের বড় আদর। নিস্তারিণী শ্যামবর্ণা, একহারা, বড় সুন্দর ওর চোখ দুটি, গলার সুর মিষ্টি। সে গাইলে বড় সু-স্বরে—

নীলবরণী নবীনা বরুণী নাগিনী-জড়িত জটা-বিভূষিণী
নীলনয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী।

গান শেষ হোলে তিলু পেছন থেকে গিয়ে ওর মুখে একখানা আস্ত চিনির মঠ গুঁজে দিলো। বৌটির লাজুক চোখের দৃষ্টি নেমে পড়লো, বোধ হয় একটু অপ্রতিভ হোলো অতগুলি আমোদপ্রিয় বড় বড় মেয়েদের সামনে।

বললে—দিদি, ঠাকুরজামাইকে দিয়ে যান গে—

—তোর ঠাকুরজামাইকে তুই দেখেচিস নাকি?

বিলু এগিয়ে এসে বললে—কেন রে ছোটবৌ, ঠাকুরজামাইয়ের নাম হঠাৎ কেন? তোর লোভ হয়েচে নাকি? খুব সাবধান। ওদিকি তাকাবি নে। আমরা তিন সতীনে ঝ্যাঁটা নিয়ে দোরগোড়ায় বসে পাহারা দেবো, বুঝলি তো? ঢুকবার বাগ পাবি ক্যামন করে?

কাছাকাছি সবাই হি-হি করে হেসে উঠলো।

এমন সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল—ঠিক কি সেই সময়েই দেখা গেল স্বয়ং ভবানী বাঁড়ুয্যে রাঙা গামছা কাঁধে এবং কোলে খোকাকে নিয়ে আবির্ভূত।

নালু পালের স্ত্রী তুলসী বললে—ঐ রে! ঠাকুরজামাই বলতে বলতেই ওই যে এসে হাজির—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কাছে এসে বললেন—বেশ! আমাদের ঘাড়ে ওকে চাপিয়ে দিয়ে—বেশ! ও বুঝি থাকে? ঘুম ভেঙেই মা-মা চীৎকার ধরলো। অতিকষ্টে বোঝাই—তাই কি বোঝে?

খোকা জনতার দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বললে—মা—

বিলু ছুটে গিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে বললে—কেন, নিলু কোথায়? আপনার ঘাড়ে চাপানো হয়েচে কে বললে? নিলুর কোলে বসিয়ে দিয়ে আমি—

—বৌদিদিরা ডেকে পাঠালেন নিলুকে। বড়দাদার শরীর অসুখ করেচে—ও চলে গেল আমার ঘাড়ে চাপিয়ে—

বৌ-ঝিরা ভবানীকে দেখে কি সব ফিস্‌ফিস্ করতে লাগলো জটলা করে, কেউ কথা বলবে না। সে নিয়ম এসব অঞ্চলে নেই। প্রবীণা বিধু এসে বললে—ও বড়-মেজ-ছোট জামাইবাবু, সব বৌ-ঝিরা বলচে, ঠাকুরজামাইকে আজ যখন আমরা পেয়ে গিইচি তখন আজ আর ছাড়চি নে—আমাদের—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কথা শেষ করতে না দিয়েই তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললেন—না, মাপ করুন বিধুদিদি, আমি একা পেরে উঠবো না—বয়েস হয়েচে—

এই কথাতে একটা হাসির বন্যা এসে গেল বৌ-ঝিদের মধ্যে। কারো চাপা হাসি, কেউ খিলখিল করে হেসে উঠলো, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ওদিকে, কেউ ঘোমটার আড়ালে খুক্ খুক্ করে হাসতে লাগলো—হাসির সেই প্লাবনের মধ্যে ভাদ্র অপরাহ্নে নদীর ধারের কদম ডালে রাঙা রোদ আর ইছামতীর ওপারে কাশফুলের দুলুনি। কোথাও দূরে ঘুঘুর ডাক। নিস্তারিণীর কোলে খোকার অর্থহীন বকুনি। সব মিলিয়ে তেরের পালনি আজ ভালো লাগলো নিস্তারিণীর। ঠাকুরজামাই কি আমুদে মানুষটি! আর বয়েস হোলেও এখনো চেহারা কি চমৎকার!

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নীলকুঠি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। মিঃ ডঙ্কিন্‌সন্ বদলি হয়ে যাওয়ার পর অনেক দিন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট নীলকুঠিতে পদার্পণ করেন নি। কাজেই অভ্যর্থনার আড়ম্বর একটু ভালো রকমই হোলো। খুব খানাপিনা, নাচ ইত্যাদি হয়ে গেল। যাবার সময় নতুন ম্যাজিস্ট্রেট কোলম্যান্ সাহেব বড়সাহেবকে নিভৃতে কয়েকটি সদুপদেশ দিয়ে গেলেন।

—Do you read native newspapers ? You do ? Hard times are ahead, Mr. Shipton. Stuff some wisdom into the brains of your men. You understand ? I hope you will not mind my saying so ?

—Explain that to me.

—I will, presently.

আসল কথা ক্রমশঃ দিন খারাপ হচ্চে। দেশী কাগজওয়ালারা খুব হৈ-চৈ আরম্ভ করেচে, হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে হরিশ মুখুয্যে গরম গরম প্রবন্ধ লিখচে, রামগোপাল ঘোষ নীলকরদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করচে, নেটিভরা মানুষ হয়ে উঠলো, সে দিন আর নেই, একটু সাবধানে সব কাজ করে যাও। আমাদের ওপর গবর্ণমেন্টের গোপন সার্কুলার আছে নীলসংক্রান্ত বিবাদে আমরা যেন, যতদূর সম্ভব, প্রজাদের পক্ষে টানি।

কোলম্যান্ সাহেবের মোট বক্তব্য হোলো এই।

পরদিন বড়সাহেব ডেভিড্ সাহেবকে ডেকে বললে সব কথা। ডেভিড্ বোধ হয় একটু অসন্তুষ্ট হোলো। বললে—You see, I can work and I can do with very little sleep and I have never wasted time on liking people. Perhaps I am not clever enough—

—No David, we have a stake down here, in this godforsaken land, you see ? What I want to drive at is this—

এমন সময়ে শ্রীরাম মুচি এসে বললে—সায়েব, বাইরে দপ্তরখানায় প্রজারা বসে আছে। খুব হাঙ্গামা বেধেচে। হিংনাড়া, রসুলপুরের বাগদিরা খেপেচে। তারা নাকি নীলের মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে নীলির চারা খেইয়ে দিয়েচে—

ডেভিড্ লাফিয়ে উঠে বললে—কনেকার প্রজা? হিংনাড়া? সাদেক মোড়ল আর ছিহরি সর্দার ওই দুটো বদমাইশের দিকি আমার অনেকদিন থেকে নজর আছে ; শাসন কি করে করতি হয় তা আমি জানি।

শিপ্‌টন্ সাহেব ভয়ানক রেগে বলে উঠলেন—The devil that is! I will come in with you this time. Will you like to come on a mouse-hunt tomorrow morning ?

—Sure I will.

—I wonder whether I ever told you these thieving people drove off some of our horses from the village ?

—My stomach! You never did.

—Well, be ready to-morrow morning. May be we would kill off the mice right away.

—Sure.

পরদিন সকালে এক অভিনব দৃশ্য দেখা গেল।

দুই ঘোড়ায় দুই সাহেব, পিছনে আর এক সাদা বড় ঘোড়ায় দেওয়ান রাজারাম রায়, আর একটা বাদামী রংয়ের ঘোড়ায় প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন এক লম্বা সারিতে চলেচে—ওদের পিছনে কুঠির লাঠিয়ালদের সর্দার রসিক মল্লিক। লোকে বুঝলে আজ একটা ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপার না হয়ে আর যায় না। হঠাৎ একস্থানে প্রসন্ন আমীন টুক করে নেমে পড়লো। হেঁকে রাজারামকে বললে—দেওয়ানজি, একটু এগিয়ে যান, ঘোড়ার জিন্‌টা ঢল হয়ে গেল, কষে নি—

তারপর মুখ উঁচু করে দেখলে, ওরা বেশ দু'কদম দূরে চলে গিয়েচে। প্রসন্ন চক্কত্তি ঘোড়াটা কাদের একটা সোঁদালি গাছে বেঁধে রাস্তা থেকে সামান্য কিছু দূরে অবস্থিত একখানা চালাঘরের বাইরে গিয়ে ডাকলে—গয়া, ও গয়া—

ভিতর থেকে গয়ার মা বরদা বাগ্‌দিনীর গলা শোনা গেল—কেডা গা বাইরে?

প্রসন্ন চক্কত্তি প্রমাদ গনলো। এ সময়ে বুড়ী থাকে না বাড়িতে, কুঠিতে মেমসাহেবদের কাজ করতে যায়—ছেলে ধরা, ছেলেদের স্নান করানো এই সব। ও আপদ আজ এখন আবার—আঃ যতো হাঙ্গাম কি—প্রসন্ন চক্কত্তি গলা ছেড়ে বললে—এই যে আমি, ও দিদি—

—কেডা গা? আমীনবাবু? কি—এমন অসময়ে?

বলতে বলতে বরদা বাগ্‌দিনী এসে বাইরে দাঁড়ালো, বোধ হয় ধানসেদ্ধ করছিল—ধানের হাঁড়ির কালি হাতে মাখানো। মাথায় ঝাঁটার মত চুলগুলো চুড়োর আকারে বাঁধা। মুখ অপ্রসন্ন।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—কে? দিদি? আঃ, ভালোই হোলো। ঘোড়াটার পায়ে কি হয়েচে, হাঁটতে পারচে না। একটু নারকোল তেল আছে?

—না, নেই। নারকোল তেল বাড়ন্ত—

—ও! তবে যাই।

বরদা বাগ্‌দিনী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রসন্ন আমীনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। প্রসন্ন চক্কত্তির কৈফিয়ৎ সে বিশ্বাস করেচে কিনা কে জানে। মেয়ের পেছনে যে লোকজন ঘোরাফেরা করে তা বুঝি সে জানে না? কত অবাঞ্ছিত আবেদন ও প্রার্থনার জঞ্জাল সরিয়ে রাখতে হয় ঝাঁটা হাতে। কচি খুকি নয় বরদা বাগ্‌দিনী। আমীন মশায় বলে সন্দেহের অতীত এরা নয়, বয়স বেশি হয়েচে বলেও নয়। অনেক প্রৌঢ়, অনেক অল্পবয়সী, অনেক আত্মীয়কে সে দেখলো। কাউকে বিশ্বাস নেই।

প্রসন্ন চক্কত্তি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল।

হিংনাড়া গ্রামের বাইরে চারিধারে নীলের ক্ষেত। এমন সময় নীলের চারা বেশ বড় বড় হয়েচে। বড়সাহেবকে ছোটসাহেব ডেকে দেখিয়ে বললে—See what they are up to.

এমন সময়ে দেখা গেল লাঠি হাতে একটি জনতা বাগ্‌দিপাড়া থেকে বেরিয়ে মাঠের আলে আলে ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসচে।

দেওয়ান রাজারাম বললেন—সায়েব, ওরা ঘিরে ফেলবার মতলব করচে। চলুন আরও এগিয়ে—

ডেভিড্ বললে—তুমি ফিরে যাও, এদের ঘরে আগুন দিতি হবে, লোকজন নিয়ে এসো।

রসিক মল্লিক লাঠিয়াল বললে—কিছু লাগবে না সায়েব। মুই এগিয়ে যাই, দাঁড়ান আপনারা

বড়সাহেব বললে—You stay. আমি আর ছোটসায়েব যাইবেন। সড়কি আনিয়াছ?

—না, সায়েব, সড়কি লাগবে না। মোর লাঠির সামনে একশো লোক দাঁড়াতে পারবে না। আপনি হঠে আসুন।

দেওয়ান রাজারাম ততক্ষণ ঘোড়া এগিয়ে হিংনাড়া গ্রামের উত্তর কোণের দিকে ছুটিয়েচেন। বড়সাহেব চেঁচিয়ে বললেন—রসিক, তোমার সহিট যাইবে ডেওয়ান—

কিছুক্ষণ পরে খুব একটা চীৎকার ও আর্তনাদ শোনা গেল। বাগ্‌দিপাড়ার ছোট ছেলেমেয়ে ও ঝি-বৌয়েরা প্রাণপণে চেঁচাচ্চে ও এদিক-ওদিক দৌড়চ্চে। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রামধন বাগ্‌দি রাস্তার ধারের একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে তামাক খাচ্ছিল, তার মাথায় লাঠির বাড়ি পড়তেই চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল, তার স্ত্রী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো, লোকজন ছুটে এল, হৈ-চৈ আরম্ভ হোলো।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল বাগ্‌দিপাড়ায় আগুন লেগেচে। লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগলো। লাঠি হাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড় দিল নিজের নিজের বাড়ি অগ্নিকান্ডের হাত থেকে সামলাতে। এটা হোলো দেওয়ান রাজারামের পরামর্শ। বড়সাহেবকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে জনতা আগেই পলায়নপর হয়েছিল, কারণ বড়সাহেবকে সবাই যমের মত ভয় করে। ছোটসাহেব যতই বদমাইশ হোক, অত্যাচারী হোক, বড়সাহেব শিপ্‌টন হোলো আসল কূটবুদ্ধি শয়তান। কাজ উদ্ধারের জন্য সে সব করতে পারে। জমি বেদখল, জাল, ঘরজ্বালানি, মানুষ খুন কিছুই তার আটকায় না। তবে বড়সাহেবের মাথা হঠাৎ গরম হয় না। ছোটসাহেবের মত সে কান্ডজ্ঞানহীন নয়, হঠাৎ যা-তা করে না। কিন্তু একবার যদি সে বুঝতে পারে যে এই

পথে না গেলে কাজ উদ্ধার হবে না, সে পথ সে ধরবেই। কোনো হীন কাজই তখন তার আটকাবে না।

আগুন তখুনি লোকজন এসে নিভিয়ে ফেললে। আগুন দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা, সে উদ্দেশ্য সফল হোলো। রসিক মল্লিককে সকলে বড় ভয় করে, সে জাতিতে নমঃশূদ্র, দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও সড়কি-চালিয়ে। আজ বছর আট-দশ আগে ও নিজের এক ছেলেকে শিয়াল ভেবে মেরে ফেলেছিল সড়কির খোঁচায়। সেটা ছিল পাকা কাঁটালের সময়। ওদের গ্রামের নাম নূরপুর, মহম্মদপুর পরগণার অধীনে। ঘরের মধ্যে পাকা কাঁটাল ছিল দরমার বেড়ার গায়ে ঠেস দেওয়ানো। ন' বছরের ছোট ছেলে সন্দেবেলা ঘরের বেড়ার বাইরে বসে বেড়া ফুটো করে হাত চালিয়ে কাঁটাল চুরি করে খাচ্ছিল। রসিক খস্‌খস্ শব্দ শুনে ভাবলে শিয়ালে কাঁটাল চুরি করে খাচ্চে। সেই ছিদ্রপথে ধারালো সড়কির কাঁটাওয়ালা ফলার নিপুণ চালনায় অব্যর্থভাবে লক্ষ্যবিদ্ধ করলো। বালকণ্ঠের মরণ-আর্তনাদে সকলে তেলের পিদীম হাতে ছুটে গেল। হাতে-মুখে কাঁটালের ভুতুড়ি আর চাঁপা মাখা ছোট্ট ছেলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠে মাটি ভাসিয়ে দিচ্চে। চোখের দৃষ্টি স্থির, হাতের বাঁধন আল্‌গা। কেবল ছোট্ট পা দুখানা তখনো কোনো কিছুকে বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্চে আবার পিছিয়ে যাচ্চে। সব শেষ হয়ে গেল তখুনি।

রসিক মল্লিক সে রাত্রের কথা এখনো ভোলেনি। কিন্তু আসলে সে দস্যু, পিশাচ। টাকা পেলে সে সব করতে পারে। রামু সর্দারকে সে-ই সড়কির কোপে খুন করেছিল বাঁধালের দাঙ্গায়। নেবাজি মন্ডলের ভাই সাতু মন্ডলকে চালকী গ্রামের খড়ের মাঠে এক লাঠির ঘায়ে শেষ করেছিল।

এ হেন রসিক-মল্লিক ও বড়সাহেবকে একত্র দেখে বাগ্‌দিপাড়ার লোক একটু পিছিয়ে গেল।

রসিক হাঁক দিয়ে ডেকে বললে—কোথায় রে তোদের ছিহরি সর্দার! পাঠিয়ে দে সামনে। বড়সায়েবের হুকুম, তার মুন্ডুটা সড়কির আগায় গিঁথে কুঠিতে নিয়ে যাই। মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস তো সামনে এসে দাঁড়া ব্যাটা শেয়ালের বাচ্চা! এগিয়ে আয় বুনো শূওরের বাচ্চা! এগিয়ে আয় নেড়ি কুকুরের বাচ্চা! তোর বাবারে ডেকে নিয়ে আয় মোর সামনে, ও হারামজাদা!

ছিহরি সর্দার লাঠি হাতে এগিয়ে আসছিল, তার বৌ গিয়ে তাকে কাপড় ধরে টেনে না রাখলে সে এগিয়ে আসতে ভয় পেতো না— তবে খুব সম্ভবতঃ প্রাণটা হারাতো। রসিক মল্লিকের সামনে সে দাঁড়াতে পারতো না। খুন জখম যার ব্যবসা, তার সামনে নিরীহ গৃহস্থ লাঠিয়াল কতক্ষণ দাঁড়াবে?

ছোটসাহেব বললে—রসিক, ব্যাটা ছিহরি আর সাদেককে ধরে আনতি পারবা?

বড়সাহেবের মেজাজ এতক্ষণে কিছুটা ঠান্ডা হয়ে থাকবে, সে বললে—I am afraid that would not be quite within the bounds of law. Let us return.

পরে হেসে বললে—Sufficient unto the day—the evil thereof...

ছোটসাহেব মনে মনে চটলো বড়সাহেবের ওপর—ভাবলে সে বড় সাহেবের কথার শেষে বলে—Amen। কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠল না।

দেওয়ান রাজারাম ততক্ষণে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েছেন কুঠির দিকে। প্রসন্ন চক্কত্তিও সেই সঙ্গে ফিরছিল, কিন্তু সে একটি সুঠাম তন্বী যোড়শী বধূকে আলুথালু অবস্থায় বাঁশবনের

আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখে সেখানে ঘোড়া দাঁড় করালে। কাছে লোকজন ছিল না কেউ। বৌটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বাঁশবনের ওদিকে ঘুরে যাবার চেষ্টা করতে, প্রসন্ন চক্কত্তি গলার সুরকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে জিগ্যেস করলে—কেডা গা তুমি?

উত্তর নেই।

—বলি, ভয় কি গা? আমি কি সাপ না বাঘ! তুমি কেডা?

উত্তর নেই। আর্ত কান্নার শব্দ শোনা গেল।

প্রসন্ন আমীন চট্ করে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে ঘোড়াটা বাঁশঝাড়ের ওপারে বৌটির কাছে ঠেসে চালিয়ে দিলে। কিন্তু সেও বাগ্‌দিপাড়ার বৌ, বেগতিক বুঝে সে এক মরীয়া চীৎকার ছেড়ে দৌড়ে বেশি জঙ্গলের দিকে পালালো। সেই কাঁটাবনের মধ্যে ঘোড়া চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং ফিরতেই হোল প্রসন্ন চক্কত্তিকে। বাগ্‌দিপাড়ার বৌ-ঝি এমন সুঠাম দেখতে কেন যে হয়! ওদের মধ্যে দু'একটা যা চোখে পড়ে এক এক সময়! না সত্যি, ভদ্রলোকের মধ্যে অমন গড়ন-পিটন—হ্যাঁ, ঢাকের কাছে টেমটেমি!

বড়সাহেব ছিহরি সর্দারকে বললে—টোমার মতলব কি আছে?

—নীল মোরা আর বোনবো না সায়েব। মোদের মেরেই ফেলুন আর যে সাজাই দ্যান।

—ইহার কারণ কি আছে?

—কারণ কি বলবো, মোদের ঘরে ভাত নাই, পরনে বস্তর নেই, ঐ নীলির জন্যি। মা কালীর দিব্যি নিয়ে মোরা বলিচি, নীল আর বোনবো না!

—কি পাইলে নীল বুনিটে ইচ্ছা আছে?

—নীল আর বোনবো না, ধান করবো। যত ধানের জমিতি আপনাদের আমীন গিয়ে দাগ মেরে আসবে, মোরা ধান বুনতি পারিনে। আপনারা নিজেদের জমিতে লাঙ্গল গরু কিনে নীলের চাষ করো—কেউ আপত্য করবে না। প্রজার জমি জোর করে বেদখল করে নীল করবা কেন সায়েব?

—টোমারে পাঁচশো টাকা বকশিস ডিবো। তুমি নীল বুনিটে বাধা দিও না। প্রজা হাট করিয়া ডাও।

—মাপ করবেন সায়েব। মোর একার কথায় কিছু হবে না। মুই আপনারে বলচি শুনুন, তেরোখানা গাঁয়ের লোক একস্তার হয়ে জোট পেকিয়েচে। ভবানীপুর, নাটাবেড়ে, হুদো-মানিককোলির নীলকুঠির রেয়েতেরাও জোট পেকিয়েচে। হাওয়া এসেচে পূবদেশ থেকে আর দক্ষিণ থেকে।

বড়সাহেব এ সমস্ত সংবাদ জানেন। সেদিনকার সেই অভিযানের পর তাই তিনি আজ ছিহরি সর্দারকে কুঠিতে ডেকেছিলেন অনেক কিছু আশ্বাস দিয়ে। ছিহরি এরকম বেঁকে দাঁড়াবে তা বড়সাহেব ভাবেন নি।

তবু বললেন—টুমি আমার কাছে চলিয়া আসিবে। চেষ্টা করিয়া ডেখো। অনেক টাকা পাইবে। কাছারিতে চাকুরি করিতে চাও?

—না সায়েব। মোরা সাত পুরুষ কখনো চাকরি করি নি। আর আপনারে এট্টা কথা বলি সায়েব—মুই একা এ ঝড় সামলাতি পারবো না। জেলা জুড়ে ঝড় উঠেছে, একা ছিহরি সর্দার

কি করবে? আপনি বুঝে দ্যাখো সায়েব—একা মোরে দোষ দিও না। মুই কুঠির অনেক নুন খেইচি—তাই সব কথা খুলে বললাম।

ডেভিড্ সাহেবকে ডেকে বড়সাহেব বললে—I say, David, this man swims in shallow water. Let him go safely out and see that no harm is done to him. Not worth the trouble.

সেদিন সন্ধ্যার পরে নীলকুঠিতে একটি গুপ্ত বৈঠক আহূত হোলো।

অনেক খবর এনে দিয়েচে নীলকুঠির চরের দল। জেলার প্রজাবর্গ ক্ষেপে উঠেচে, তারা নীলের দাদন আর নেবে না। সতেরোটা নীলকুঠি বিপন্ন। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের সভা হচ্চে, পঞ্চায়েৎ বৈঠক বসচে। কোনো কোনো মৌজায় নীলের জমি ভেঙে প্রজারা ডাঁটাশাক আর তিলু বুনেচে—এ খবরও পাওয়া গিয়েচে। বৈঠকে ছিলেন কাছাকাছি নীলকুঠির কয়েকজন সাহেব ম্যানেজার, এ কুঠির শিপ্টন্ আর ডেভিড্। কোনো গোপনীয় ও জরুরী বৈঠকে ওরা কোনো নেটিভকে ডাকে না। ম্যালিসন্ সাহেব বলেচে—No native need be called, we shall make our decision known to them if necessary.

কোল্ডওয়েল্ সাহেব বললে—ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আরো বন্দুকের জন্যে বলো। এ সময়ে বেশী আগ্নেয়াস্ত্র রাখা উচিত প্রত্যেক কুঠিতে অনেক বেশি করে।

কোল্ডওয়েল্ ভবানীপুর নীলকুঠির অতি দুর্দান্ত ম্যানেজার। প্রজার জমি বেদখল করবার অমন নিপুণ ওস্তাদ আর নেই। খুন এবং বেপরোয়া কাজে ওর জুড়ি মেলা ভার। তবে কিছুদিন আগে ওর মেম চলে গিয়েচে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে, তার কোনো পাত্তাই নেই, সেজন্য ওর মন ভালো নয়।

শিপ্টন্ সাহেব বললে—These blooming native leaders should be shot like pigs.

কোল্ডওয়েল্ বললে—I say, you can go on with your pig sticking afterwards. Now decide what we should do with our Impression Registers. That is why we have met to-day.

এই সময়ে শ্রীরাম মুচি বেয়ারা শেরির বোতল ও অনেকগুলো ডিক্যান্টার ট্রেতে সাজিয়ে এনে ওদের সামনে রেখে দিলে।

কোল্ডওয়েল্ বললে—No sheery for me. I will have a peg of neat brandy. Now, Shipton, old boy, let us see how you keep your Impression Registers. This man of your is reliable? Now-a-days, walls have ears, you see!

শিপ্টন্ শ্রীরামের দিকে চেয়ে বললে—Oh, he is all right.

দাদন খাতা নীলকুঠির অতি দরকারী দলিল। সমস্ত প্রজার টিপসই নিয়ে অনেক যত্নে এই খাতা তৈরি করা হয়। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট এসে এই দাদন খাতা পরীক্ষা করে থাকেন। অধিকাংশ কুঠিতে দাদন খাতা দু'খানা করে রাখা থাকে, ম্যাজিস্ট্রেটকে আসল খাতাখানা দেখানো হয়।

শিপ্টন্ দাদন খাতা পূর্বেই আনিয়ে রেখেছিল টেবিলে, খুলে সবাইকে দেখালে।

ম্যালিসন্ বললে—This is your original Register?

—Yes. The other one is in the office. This I keep always under lock and key.

—Sure. You have got this weeks Englishman ?

—Sure I have.

কোল্ডওয়েল্ বললে—It is funny, a deputation waited on the Lieutenant Governor the other day. The blooming old fellow has given them a benediction.

শিপ্‌টন্ বললে—As he always does, the old padre !

তারপর খুব জোর পরামর্শ হোলো সাহেবদের। পরামর্শের প্রধান ব্যাপার হোলো, প্রজাবিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েচে—সাহেবদের নীলকুঠি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কতটা। হোলে স্ত্রীলোক ও শিশুদের চুয়াডাঙ্গার বড় কুঠিতে রাখা হবে, না কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হবে।

শিপ্‌টন্ বললে—I don't think the beggars would dare as much, I will keep them here all right.

কোল্ডওয়েল্ বললে—Please yourself, old boy. You are the same bullheaded Johnny Shipton as ever. Pass me a glass of sherry Mallison, will you ?

ম্যালিসন্ ভুরু কুঁচকে হেসে বললে—Funny, is it not ? You said you would have to do nothing with sherry, did you not ?

—Sure I did. I was feeling out of sorts with the worries and troubles and also with the long ride through drenching rain. বেয়ারা, ইধারে আইসো। লেবো আনিটে পারিবে?

শিপ্‌টন্ শ্রীরাম মুচির দিকে চেয়ে বললে—বাগান হইটে লেবো লইয়া আসিবে সায়েবের জন্য। এক ডজন, দশটা আর দুইটা, লেবো লইয়া আসিবে, বুঝিলে?

—হ্যাঁ, সায়েব।

শ্রীরাম মুচি চলে গেলে সাহেবদের আরো কিছুক্ষণ পরামর্শ চললো। ঠিক হোলো চুয়া-ডাঙ্গার বড় কুঠির ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠানো হবে কাল সকালেই। আগ্নেয়াস্ত্র সেখানে কি পরিমাণে আছে। সকল কুঠির মেম ও শিশুদের সেখানে পাঠানো ঠিক হয়েচে, সে কথা জানিয়ে দিতে হবে—সেজন্যে যেন বড় কুঠির ম্যানেজার তৈরি থাকে।

ম্যালিসন্ শিপ্‌টন্‌কে বললে—You oughtn't to be alone at present.

শিপ্‌টন্ মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললে—What do you mean ? Alone ? Why, haven't I my own men ? I must fight this out by myself. Leave everything to me.

—Well all right then.

সেদিন রাত্রে সায়েবেরা সকলেই কুঠিতে থাকলো। অন্য সময় হোলে চলে যেতো যে যার ঘোড়ায় চড়ে—কিন্তু এসময় ওরা সাহস করলে না একা একা যেতে।

শেষরাত্রে খবর এল রামনগরের কুঠি লুঠ করতে এসেচিল বিদ্রোহী প্রজার দল। বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়াতে না পেরে হটে গিয়েচে। রামনগরের কুঠি এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে, তার ম্যানেজার অ্যানড্র সায়েব কত মেয়ের যে সতীত্ব নষ্ট করেচে তার ঠিক নেই। স্বজাতি

মহলেও সেজন্যে তাকে অনেকে সুনজরে দেখে না। ম্যালিসন্ শুনে মুখ বিকৃত করে ভুরু কুঁচকে বললে—Oh the old beggar!

শিপ্‌টনের দিকে তাকিয়ে বললে—You don't see anything significant in that?

শিপ্‌টন্ বললে—I don't see what you mean, I cannot carry on this indigo business here without my men, without that wily old dewan to help us, you see? They will not fail me at least, I know.

—Very kind of them, if they dont.

সাহেবরা ছোট-হাজারি খেলে বড় অদ্ভুত ধরণের। এক এক কাঁসি পান্তা ভাত এক ডজন লেবুর রস মেখে। রাত্রের টেবিলের ঠাণ্ডা হ্যাম। একটা করে আস্ত শশা জন পিছু। চার-পাঁচটা করে খয়রা মাছ সর্ষের তেলে ভাজা। বহুদিন বাংলা দেশের গ্রামে থাকবার ফলে ওদের সকলেরই আহারবিহার এদেশের গ্রাম্য লোকের মত হয়ে গিয়েচে। ওরা আম-কাঁটালের রস দিয়ে ভাত খায়। অনেকে হুঁকোয় তামাক খায়। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মেশে, অনেককে ঘরেও রাখে। ওদের দেখে বিলেত থেকে নবাগত বন্ধু-বান্ধবেরা মুখ বেঁকিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—'Gone native!' ওরা গ্রাহ্যও করে না।

বেলা বাড়লে সাহেবেরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। দিন চারেকের মধ্যে সংবাদ এল, আশপাশের কুঠির সহ সাহেব স্ত্রীপুত্রদের সরিয়ে দিয়েচে চুয়াডাঙ্গার কুঠিতে অথবা কলকাতায়। দেওয়ান রাজারাম সর্বদা ঘোড়ায় করে কুঠির চারিদিকের গ্রামে বেড়িয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনিই একদিন সন্ধান পেলেন আজ সাতখানা গ্রামের লোক একত্র হয়ে নীলকুঠি লুঠ করতে আসবে গভীর রাত্রে। খবরটা তাঁকে দিলে নবু গাজি। একসময়ে সে বড়সাহেবের কাছ থেকে সুবিচার পেয়েছিল, সেটা সে বড় মনে রেখেছিল। বললে—দেওয়ানবাবু, আর যে সায়েবের যা খুশি হোক গে, এ সায়েব লোকটা মন্দ নয়। এর কিছু না হয়—

দেওয়ান সাহেবদের বলে লোকজন তৈরি করে রাখলেন। দুই সাহেব বন্দুক নিয়ে এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। থানায় কোনো সংবাদ দিতে বড়সাহেবের হুকুম ছিল না। সুতরাং পুলিস আসে নি।

রাত দশটার পরে ইছামতীর ধারের পথে একটা হল্লা উঠলো। সাহেবরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলো। দেওয়ান রাজারাম দাঁড়িয়েছিলেন বালাখানা ও সমাধিস্থানের মাঝখানের ঝাউগাছের শ্রেণীর অন্ধকারে, সঙ্গে ছিল সড়কি হাতে রসিক মল্লিক ও তার দলবল।

রসিক মল্লিক বললে—দোহাই দেওয়ান মশাই, এবার আমারে একটু দেখতি দ্যান। ওদের একটু সাম্বপানা করি। ওদের চুলুকুনি মাঠো যদি না করি এবার, তবে মোর বাবার নাম তিরভঙ্গ মল্লিক নয়—

—দূর ব্যাটা, থাম্। কতকগুলো মানুষ খুন হোলেই কি হয়? অন্য জায়গায় হলি চলতো, এ যে কুঠির বুকির ওপরে। পুলিস এসে তদন্ত করলি তখন মুশকিল।

—লাস রাতারাতি গুম্ করে ফেলে দেবানি। সে ভারটা মোর ওপর দেবেন দেওয়ানমশাই—

—আচ্ছা, থাম্ এখন—যখন হুকুম দেবো, তার আগে সড়কি চালাবি নে—

দিব্যি জ্যোৎস্নারাত। রাজারামের মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব। কখনো তাঁর হয় না। ঝাউগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েচে মাটির রাস্তার বুকে। তিলু বিলু নিলুর বিয়ে দিয়েচেন, ভাগ্নের মুখ দেখেছেন। জীবনের সব দায়িত্ব শেষ করেচেন। আজ যদি এই

দাঙ্গায় এ পথের ওপর তাঁর দেহ সড়কি-বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে, কোনো অপূর্ণ সাধ থাকবে তাঁর মনে? কিছু না। জগদম্বার ব্যবস্থা তিনি যথেষ্ট করেচেন। তালুক, বিষয়, ধানীজমি যা আছে, একটা বড় সংসার চলে। জমিদারির আয় বছরে—তা তিনশো-চারশো টাকা। রাজার হাল। নির্ভাবনায় মরতে পারবেন তিনি। সাহেবদের এতটুকু বিপদ আসতে দেবেন না। অনেক দিনের নুন খেয়েচেন।

বললেন—রসিক, ব্যাটা তৈরি থাক। তবে খুনটা, বুঝলি নে—যখন গায়ের ওপর এসে পড়বে।

ঝাউতলার অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার জালবুনুনি পথে অনেক লোকের একটা দল এগিয়ে আসচে, ওদের হাতে মশাল—সড়কি ও লাঠিও দেখা যাচ্চে। রসিক হাঁকার দিয়ে বললে—এগিয়ে আয় ব্যাটারা—সামনে এগিয়ে আয়—তোদের ভুঁড়ি ফাঁসাই—

কতকগুলো লোক এগিয়ে এসে বললে—কেডা? রসিকদাদা?

—দাদা না, তোদের বাবা—

—অমন কথা বলতি নেই—ছিঃ, এগিয়ে এসো দাদা—

রসিককে হঠাৎ দেওয়ান রাজারাম আর পাশে দেখতে পেলেন না, ইতিমধ্যে সে কখন অদৃশ্য হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারে। অল্পক্ষণ পরে দেখলেন সামনের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ছুটচে—আর ওদের মাঝখানে চর্কির মত কি একটা ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্চে, কিসের একটা ফলকে দু'চারবার চকচকে জ্যোৎস্না খেলে গেল! কি ব্যাপার? রসিক মল্লিক নাকি? ইস্! করে কি?

খুব একটা হল্লা উঠলো কুঠির হাতার বাইরে। তারপরেই সব নিস্তব্ধ। দূরে শব্দ মিলিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। সাহেবদের ঘোড়ার শব্দ একবার যেন রাজারাম শুনলেন বালাখানার উত্তরের পথে। এগিয়ে গেলেন রাজারাম। ঝাউতলার পথে, এখানে ওখানে লোক কি ঘাপ্‌টি মেরে আছে নাকি? না। ওগুলো কি?

মানুষ মরে পড়ে আছে। এক, দুই, তিন, চার পাঁচ। রসিক ব্যাটা এ করেচে কি! সব সড়কির কোপ। শেষ হয়ে গিয়েচে সব ক'টা।

—ও রসিক? রসিক?

রাজারামের মাথা ঝিম-ঝিম করে উঠলো। হাঙ্গামা বাধিয়ে গিয়েচে রসিক মল্লিক। এই সব লাস এখনই গুম করে ফেলতে হবে। সায়েবদের একবার জানানো দরকার।

আধঘন্টা পরে। গভীর পরামর্শ হচ্চে দেওয়ান ও ছোটসাহেবের মধ্যে।

ডেভিড্ বললে—পাঁচটা লাস? লুকুবে কনে? সেটা বোঝো আগে। বাঁওড়ের জলে হবে না। বাঁধালের মুখে লাস বাধবে এসে।

—তা নয়, সায়েব। কোথাও ভাসাবো না। হীরে ডোম আর তার শালা কালুকে আপনি হুকুম দিন। আমি এক ব্যবস্থা ঠিক করিচি—

—কি?

—আগে করে আসি। তারপর এত্তেলা দেবো। আপনি ওদের হুকুম দিন। রাত থাকতি থাকতি কাজ সারতি হবে। ভোরের আগে সব শেষ করতি হবে। রক্ত থাকলি ধুয়ে ফেলতি হবে পথের ওপর। রসিক ব্যাটাকে কিছু জরিমানা করে দেবেন কাল।

সেই রাত্রেই সব কাজ মিটিয়ে ভোরের আগে রাজারাম বাড়ি এসে শুয়ে রইলেন। জগদম্বা জিগ্যেস করলেন—বাবা, এত কাজের ভিড়? রাত তো শেষ হতি চললো—

রাজারাম বললেন—হিসেব-নিকেশের কাজ চলচে কিনা। খাতাপত্তরের ব্যাপার। এ কি সহজে মেটে?

ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে নিয়ে পাড়ায় মাছ খুঁজতে বার হয়েছিলেন। খোকা বেশ সুন্দর ফুটফুটে দেখতে। অনেক কথা বলে, বেশ টরটরে।

ভবানী খোকাকে বলেন—ও খোকন, মাছ খাবি?

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে—মাছ।

—মাছ?

—মাছ।

আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যদু জেলে মাছ নিয়ে আসছে। যদু তাঁকে দেখে প্রণাম করে বললে—মাছ নেবেন গা?

—কি মাছ?

—একটা ভেটকি মাছ আছে, সের দেড়েক হবে।

—কত দাম দেবো?

—তিন আনা দেবেন।

—বড্ড বেশি হয়ে গেল!

যদু জেলে কাঁধ থেকে বোঠেখানা নামিয়ে বললে—বাবু, বাজারডা কি পড়েছে ভেবে দেখুন দিকি। ছেলেবেলায় আউশ চালের পালি ছেল দু'পয়সা। তার থেকে উঠলো এক আনা। এখন ছ'পয়সা। মোর সংসারে ছ'টি প্রাণী খেতি।। এককাঠা চালির কম এক বেলা হয় না। দু'বেলা তিন আনা চালেরই দাম যদি দিই, তবে নুন তেল, তরকারি, কাপড়, কবিরাজ, এসোজন, বোসোজন কোত্থেকে করি? সংসার আর চালাবার জো নেই জামাইঠাকুর, আমাদের মত গরীব লোকের আর চলবে না—

ভবানী বাঁড়ুয্যে দ্বিরুক্তি না করে মাছটা হাতে নিয়ে ফিরলেন বাড়ির দিকে। বিলু ও নিলু আগে ছুটে এল। বিলু স্বামীর হাত থেকে মাছটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—কি মাছ? ভেটকি না চিতল? বাঃ—

নিলু বললে—চমৎকার মাছটা। ও খোকা, মাছ খাবি? আয় আমার কোলে—

খোকা বাবার কোলেই এঁটে রইল। বললে—বাবা—বাবা—

সে বাবাকে বড্ড ভালোবাসে। বাবার কোলে সব সময় উঠতে পারে না বলে বাবার কোলের প্রতি তার একটি রহস্যময় আকর্ষণ বিদ্যমান। বিলু চোখ পাকিয়ে বললে—আসবি নে?

—না।

—থাক তোর বাবা যেন তোরে খেতি দ্যায় ভাত রেঁধে।

—বাবা।

—মাছ খাবি নে তো?

—খাই।

—খাই তো আয়—

খোকা আবেদনের সুরে কাঁদো কাঁদো মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই দ্যাখো—

অর্থাৎ আমায় জোর করে নিয়ে যাচ্চে তোমার কোল থেকে। ভবানী জানেন খোকা এই কথাটি আজ অল্পদিন হোলো শিখেচে, এ কথাটা বড্ড ব্যবহার করে। বললেন—থাক আমার কাছে, ওকে একটু বেড়িয়ে আনি মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে।

নিলু বললে—মাছটার কি করবো বলে যান—

—যা হয় কোরো। তিলু কোথায়?

—বড়ি দিতি গিয়েচে বড়দার বাড়ির ছাদে। আপনার বাড়ির তো আর ছাদ নেই, বড়ি দেবে কোথায়? কবে কোঠা করবেন?

—যাও না দাদাকে গিয়ে বলো না, কুলীন কুমারী উদ্ধার করেচি, কিছু টাকা বার করতে লোহার সিন্দুক থেকে। দোতলা কোঠা তুলে ফেলচি। বিয়ে যদি না করতাম, থাকতে থুবড়ি হয়ে, কে বিয়ে করতো?

—এর চেয়ে আমাদের দাদা গলায় কলসী বেঁধে ইছামতীর জলে ডুবিলে দিলি পারতেন। কি বিয়েই দিয়েচেন—আহা মরি মরি! বুড়ো বর, তিন কাল গিয়েচে, এককালে ঠেকেচে—

—বিয়ে দিলেই পারতেন তো যুবো বর ধরে। তবে থুবড়ি হয়ে ঘরে ছিলে কেন এতকাল? উদ্ধার হোলেই তো পারতে। আমি পায়ে ধরে তোমাদের সাধতে গিয়েছিলাম?

—কান মলে দেবো আপনার—

বলেই নিলু ক্ষিপ্রবেগে হাত বাড়িয়ে স্বামীর কানটার অস্বস্তিকর সান্নিধ্যে নিয়ে এসে হাজির করতেই বিলু ধমক দিয়ে বলে—এই! কি হচ্চে?

নিলু ফিক ক'রে হেসে মাছটা নিয়ে ছুটে পালালো। ভবানী খোকাকে নিয়ে পথে বার হয়েই বললেন—কোথায় যাচ্চি বল তো?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—যাই—

—কোথায়?

—মাছ।

মহাদেব মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে যাবার পথে একটা বাবলাগাছের ওপর লতার ঝোপ, নিবিড় ছায়া সে স্থানটিতে, বাবলাগাছের ডালে কি একটা পাখী বাসা বেঁধেচে। ভবানী গাছতলার ছায়ায় গিয়ে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন।

—ঐ দ্যাখ খোকা, পাখী—

খোকা বলে—পাখী—

—পাখী নিবি?

—পাখী—

—খুব ভালো। তোকে দেবো।

খোকা কি সুন্দর হাসে বাবার মুখের দিকে চেয়ে। না, ভবানীর খুব ভালো লাগে এই নিষ্পাপ সরল শিশুর সঙ্গ। এর মুখের হাসিতে ভবানী খুব বড় কি এক জিনিস দেখতে পান।।

—নিবি খোকা?

—হ্যাঁ—

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে। ভবানীর খুব ভালো লাগলো এই 'হ্যাঁ' বলা ওর। এই প্রথম ওর মুখে এই কথা শুনলেন। তাঁর কানে প্রথম উচ্চারিত ঋক্‌মন্ত্রের ন্যায় ঋদ্ধিমান ও সুন্দর।

—কটা নিবি?

—আক্‌খানা—

—বেশ একখানাই দেবো। নিবি?

খোকা ঘাড় দুলিয়ে বলে—হ্যাঁ।

পরক্ষণেই বলে—বাবা।

—কি?

—মা—

—তার মানে?

—বায়ি—

—এই তো এলি বাড়ী থেকে। মা এখন বাড়ী নেই।

খোকা যে ক'টি মাত্র শব্দ শিখেচে তার মধ্যে একটা হোলো 'ওখেনে'। এই কথাটা কারণে অকারণে সে প্রয়োগ ক'রে থাকে। সম্প্রতি সে হাত দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে বললে—ওখেনে—

—ওখেনে নেই। কোথাও নেই।

—ওখেনে—

—না, চল বেড়িয়ে আসি—কোল থেকে নামবি? হাঁটবি?

—আঁটি—

খোকা ভবানীর আগে আগে বেশ গুট্‌গুট্ ক'রে হাঁটতে লাগলো। খানিকটা গিয়ে আর যায় না। ভয়ের সুরে সামনের দিকে হাত দেখিয়ে বললে—ছিয়াল!

—কই?

শিয়াল নয়, একটা বড় শামুক রাস্তা পার হচ্চে। ভবানী খোকার হাত ধরে এগিয়ে চললেন—চলো, ও কিছু নয়। খোকা তখনও নড়ে না, হাত দুটো তুলে দিলে কোলে উঠবে বলে। ভবানী বললেন—না, চলো, ওতে ভয় কি? এগিয়ে চলো—

খোকার ভাবটা হোলো ভক্তের অভিযোগহীন আত্মসমর্পণের মত। সে বাবার হাত ধরে এগিয়ে চললো শামুকটাকে ডিঙিয়ে, ভয়ে ভয়ে যদিও, তবুও নির্ভরতার সঙ্গে। ভবানী ভাবলেন—আমরাও যদি ভগবানের ওপর এই শিশুর মত নির্ভরশীল হতে পারতাম! কত কথা শেখায় এই খোকা তাঁকে। বৈষয়িক লোকদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে তাঁর যেন ভালো লাগে না আর।

এক মহান শিল্পীর বিরাট প্রতিভার অবদান এই শিশু। ওপরের দিকে চেয়ে বিরাট নক্ষত্রলোক দেখে তিনি কত সময় মুগ্ধ হয়ে গিয়েচেন। সেদিকে চেয়ে থাকাও একটি নীরব ও অকপট উপাসনা। পশ্চিমে তাঁর গুরুর আশ্রয়ে থাকবার সময় চৈতন্যভারতী মহারাজ কতবার আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতেন—ঐ দেখ সেই বিরাট অক্ষয় পুরুষ—

অগ্নির্মূর্দ্ধা চাক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগবৃত্তাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—

অগ্নি যার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য চক্ষু, দিকসকল কর্ণ, বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, পাদদ্বয় পৃথিবী—ইনিই সমুদয় প্রাণীর অন্তরাত্মা।

তিনিই আকাশ দেখতে শিখিয়েছিলেন। তিনি চক্ষু ফুটিয়ে দিয়ে গিয়েচেন। তিনি শিখিয়েছিলেন যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বার হয় তেমনি সেই অক্ষর পুরুষ থেকে অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয় এবং তাঁতেই আবার বিলীন হয়।

উপনিষদের সেই অমর বাণী।

এই শিশু সেই অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ, সুতরাং সেই অগ্নিই নয় কি? তিনি নিজেও তাই নয় কি? এই বনঝোপ, এই পাখীও তাই নয় কি?

এই নিষ্পাপ শিশুর হাসি ও অর্থহীন কথা অন্য এক জগতের সন্ধান নিয়ে আসে তাঁর কাছে। এই শিশু যেমন ভালোবাসলে তিনি খুশি হন, তিনিও তো ভগবানের সন্তান, তিনি যদি ভগবানকে ভালোবাসেন, ভগবানও কি তাঁর মত খুশি হন না?

তিনি বহুদিন চলে এসেছেন সাধুসঙ্গ ছেড়ে, সেখানে অমৃতনিস্যন্দিনী ভাগবতী কথা ব্যতীত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্য প্রসঙ্গ ছিল না, অসীম তারাভরা যামিনীর বিভিন্ন যামগুলি ব্যেপে, বিনিদ্র জ্ঞানী ও ভক্ত অপ্রমত্ত মন সংলগ্ন করে রাখতেন বিশ্বদেবের চরণকমলে। হিমালয়ের বনভূমির প্রতি বৃক্ষপত্রে যুগযুগান্তব্যাপী সে উপাসনার রেখা আঁকা আছে, আঁকা আছে তুষারধারার রজতপটে। তাঁদের অন্তর্মুখী মনের মৌন প্রশান্তির মধ্যে যে নিভৃত বনকুঞ্জ, সেখানে সেই পরম সুন্দর দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেমার্ঘ্য নিবেদিত হোতো আকুল আবেগের সুরভিতে।

আরও উচ্চ স্তরের ভক্তদের স্বচক্ষে তিনি দেখেন নি, কিন্তু তাঁদের সন্ধান নেমে এসেচে তুষার-স্রোত বেয়ে বেয়ে উচ্চতর পর্বত শিখর থেকে, সে গম্ভীর সাধন-গুহার গহনে রথনাভির মত অবিচলিত ও সংযম আত্মা সকল অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করেচেন জ্ঞানের শক্তিতে, প্রেমের শক্তিতে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিশ্বাস করেন তাঁরা আছেন। তিনি সাধুদের মুখে শুনেচেন।

তাঁরা আছেন বলেই এই জুয়াচুরি, শঠতা, মিথ্যাচার, অর্থাসক্তি ভরা পৃথিবীতে আজও পাপপুণ্যের জ্ঞান আছে, ভগবানের নাম বজায় আছে, চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, বনকুসুমের গন্ধে অন্ধকার সুবাসিত হয়।

এই সব পাড়াগাঁয়ে এসে তিনি দেখচেন সবাই জমিজমা, টাকা, খাজনা, প্রজাপীড়ন পরচর্চা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কখনো ভগবানের কথা তাঁকে জিজ্ঞেসও করে না, কেউ কোনোদিন সৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করে না। ভগবান সম্বন্ধে এরা একেবারে অজ্ঞ। একটা আজগুবী, অবাস্তব বস্তুকে ভগবানের সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করে কিংবা ভয়ে কাঁপে, কেবলই হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে, এ দাও, ও দাও—সেই পরমদেবতার মহান সত্তাকে, তাঁর অবিচল করুণাকে জানবার চেষ্টাও করে না কোনদিন। কার বৌ কবে ঘোমটা খুলে পথ দিয়ে চলেচে, কোন্ ষোড়শী মেয়ে কার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলেচে—এই সব এদের আলোচনা। এমন একটা ভালো লোক নেই, যার সঙ্গে বসে দুটো কথা বলা যায়—কেবল রামকানাই কবিরাজ আর বটতলার সেই সন্ন্যাসিনী ছাড়া। ওদের সঙ্গে ভগবানের কথা বলে সুখ পাওয়া যায়, ওরা তা শুনতেও ভালোবাসে। আর কেউ না এ গ্রামে। কখনো কোনো দেশ দেখে নি, কূপমণ্ডুকের

দর্শন ও জীবনবাদ কি সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েচে এদের হাব-ভাবে, আচরণে, চিন্তায়, কার্যে।

এই শিশুর সঙ্গ ওদের চেয়ে কত ভালো, এ মিথ্যা বলতে জানে না, বিষয়ের প্রসঙ্গ ওঠাবে না। পরনিন্দা পরচর্চা এর নেই, একটি সরল ও অকপট আত্মা ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এসে সবেমাত্র ঢুকেচে কোন্ অনন্তলোক থেকে, পৃথিবীর কলুষ এখনো যাকে স্পর্শ করে নি! কত দুর্লভ এদের সঙ্গ সাধারণ লোকে কি জানে?

রাস্তার দু'দিকে বেশ বনঝোপ। শিশু গুট গুট করে দিব্যি হেঁটে চলেচে, এক জায়গায় আকাশের দিকে চেয়ে কি একটা বললে আপনার মনে।

ভবানী বললেন—কি রে খোকা, কি বলচিস?

—আচিনি।

—কি আসিনি রে? কি আসবে?

—চান।

—চাঁদ এখন কি আসে বাবা? সে আসবে সেই রাত্তিরে। চলো।

খোকা ভয়ের সুরে বললে—ছিয়াল।

—না, কোনো ভয় নেই—শেয়াল নেই।

—ও বাবা!

—কি?

—মা—

—চলো যাবো। মা এখন বাড়ী নেই, আসুক। আমরা যেখানে যাচ্চি, সেখানে কি খাবি রে?

—মুকি।

—বেশ চলো—কি খাবি?

—মুকি।

মহাদেব মুখুয্যের চন্ডীমন্ডপে অনেক লোক জুটেচে, ভবানীকে দেখে ফণি চক্কত্তি বলে উঠলেন—আরে এসো বাবাজী, সকালবেলাই যে! খোকনকে নিয়ে বেরিয়েচ বুঝি? একহাত পাশা খেলা যাক এসো—

ভবানী হাসতে হাসতে বললেন—বেশিক্ষণ বসব না কাকা। আচ্ছা, খেলি এক হাত। খোকা বড্ড দুষ্টুমি করবে যে! ও কি খেলতে দেবে?

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—খোকাকে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্চি দাঁড়াও, ও মুংলি—মুংলি—

—না থাক, কাকা। ও অন্য কোথাও থাকতে চাইবে না। কাঁদবে।

চন্ডীমন্ডপ হচ্চে পল্লীগ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান। এইখানেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিষ্কর্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের দল জুটে কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা (তাসের প্রচলন এ সব পাড়াগাঁয়ে আদৌ নেই, ওটা বিলিতি খেলা বলে গণ্য) চালে। প্রত্যেক গৃহস্থের একখানা করে চন্ডীমন্ডপ আছে। সকাল থেকে সেখানে আড্ডা বসে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের চন্ডীমন্ডপে আড্ডা জোর বসে থাকে, কারণ সারাদিনে অন্ততঃ আধসের তামাক যোগাবার ক্ষমতা সব গৃহস্থের নেই। গ্রামের মধ্যে চন্দ্র চাটুয্যে ফণি চক্কত্তি ও মহাদেব মুখুয্যের চন্ডীমন্ডপই

প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, রাজারাম রায় যদিও সম্পন্ন গৃহস্থ, তিনি নীলকুঠির কাজে অধিকাংশ সময়েই বাড়ীর বাইরে থাকেন তাঁর চন্ডীমন্ডপে আড্ডা বসে না।

এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা দাবা খেলে। জীবনসংগ্রাম এদের অজ্ঞাত, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম কাঁটালের বাগান আছে, লাউ কুমড়োর মাচা আছে, আজ মাছ ধারে কিনে গ্রামের জেলেদের কাছে, দু'মাস পরে দাম দেওয়াই বিধি। সুতরাং ভাবনা কিসের? গ্রাম্য কলু ধারে তেল দিয়ে যায় বাখারির গায়ে দাগ কেটে। সেই বাখারির দাগ গুনে মাসকাবারি দাম শোধ হয়। এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবনযাত্রা, সেখানে অবকাশ যাপনের এই সব অলস ধারাই লোক বেছে নিয়েছে। আলস্য ও নৈষ্কর্ম্য থেকে আসে ব্যর্থতা ও পাপ। পল্লীবাংলার জীবনধারার মধ্যে শেওলার দাম আর ঝাঁজি জমে উঠে জলের স্বচ্ছতা নেই, স্রোতে কলকল্লোল নেই, নেই তার নিজের বক্ষপটে অসীম আকাশের উদার প্রতিচ্ছবি।

ভবানী এসব লক্ষ্য করেছেন অনেকদিন থেকেই। এখানে বিবাহ করার পর থেকেই। তিনি পরিচিত ছিলেন না এমন জীবনের সঙ্গে। জানতেন না বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের মানুষের জীবনধারাকে। চিরকাল তিনি পাহাড়ে প্রান্তরে জাহ্নবীর স্রোতোবেগের সঙ্গে, পাহাড়ী ঝর্ণার প্রাণচঞ্চল গতিবেগের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের আনন্দে কাল কাটিয়েচেন—পড়ে গিয়েচেন ধরা এখানে এসে বিবাহ করে। বিশেষ করে এই কূপমন্ডুকদের দলে মিশে।

এদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, অন্ধকারে আবৃত এদের সারাটা জীবনপথ। তার ওদিকে কি আছে, কখনও দেখার চেষ্টাও করে না।

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—ও খোকন তোমার নাম কি?

খোকা বিস্ময় ও ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে মহাদেব মুখুয্যের দিকে বড় বড় চোখ তুলে চাইলে। কোনো কথা বললে না।

—কি নাম খোকন?

—খোকন।

—খোকন? বেশ নাম। বাঃ, ওহে, এবার হাতটা আমার—দানটা কি পড়লো?

কিছুক্ষণ খেলা চলবার পরে সকলের জন্যে মুড়ি ও নারকোলকোরা এল বাড়ীর মধ্যে থেকে। খাবার খেয়ে আবার সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে খেলায় মাতলো। এমন ভাবে খেলা করে এরা, যেন সেটাই এদের জীবনের লক্ষ্য।

এমন সময় সত্যস্বর চাটুয্যের জামাই শ্রীনাথ ওদের চন্ডীমন্ডপে ঢুকলো। সে কলকাতায় চাকুরি করে, সুতরাং এ অঞ্চলের মধ্যে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। এ গ্রামের কোনো ব্রাহ্মণই এ পর্যন্ত কলকাতা দেখেন নি। এমন কি স্বয়ং দেওয়ান রাজারাম পর্যন্ত এই দলের। কেননা কোনো দরকার হয় না কলকাতা যাওয়ার, কেন যাবেন তাঁরা একটি অজানা শহরের সাত অসুবিধা ও নানা কাল্পনিক বিপদের মাঝখানে! ছেলেদের লেখাপড়ার বালাই নেই, নিজেদের জীবিকার্জনের জন্যে পরের দোরে ধন্না দিতে হয় না।

ফণি চক্কত্তি বললেন—এসো বাবাজি, কলকেতার কি খবর?

শ্রীনাথ অনেক আজগুবী খবর মাঝে মাঝে এনে দেয় এ গাঁয়ে। বাইরের জগতের খানিকটা হাওয়া ঢোকে এরই বর্ণনার বাতায়ন-পথে। সম্প্রতি এখনি সে একটা আজগুবী খবর দিলে।

বললে—মস্ত খবর হচ্চে, আমাদের বড়লাটকে একজন লোক খুন করেচে।

সকলে এক্সঙ্গে বলে উঠলো—খুন করলে? কে খুন করলে?

—একজন ওহাবি জাতীয় পাঠান।

মহাদেব মুখুয্যে বললেন—আমাদের বড়লাট কে যেন ছিল?

—লাড মেও।

—লাড মেও?

চন্ডীমন্ডপে পাশাখেলা আর জমলো না। লর্ড মেয়ো মরুন বা বাঁচুন তাতে এদের কোনো কিছু আসে-যায় না—এই নামটাই সবাই প্রথম শুনলো। তবে নতুন একটা যা-হয় ঘটলো এদের প্রাত্যহিক একঘেয়েমির মধ্যে—সেটাই পরম লাভ। শ্রীনাথ খুব সবিস্তারে কলকাতার গল্প করলে—আপিস আদালত কিভাবে বন্ধ হয়ে গেল সংবাদ আসা মাত্রই।

বেলা দুপুর ঘুরে গেল, খোকাকে নিয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ী ফিরতেই তিলুর বকুনি খেলেন।

—কি আক্কেল আপনার জিজ্ঞেস করি? কোথায় ছিলেন খোকাকে নিয়ে দুপুর পজ্জন্ত! ও খিদেয় যে টা-টা করচে? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

খোকা দু'হাত বাড়িয়ে বললে—মা, মা—

ভবানী বললেন—রাখো তোমার ওসব কথা। লাড মেও খুন হয়েছেন শুনেচ?

—সে আবার কে গা?

—বড়লাট। ভারতবর্ষের বড়লাট।

—কে খুন করলে?

—একজন পাঠান।

—আহা কেন মারলে গো? ভারী দুঃখু লাগে।

লর্ড মেয়ো খুন হবার কিছুদিন পরেই নীলকরদের বড় সংকটের সময় এল। নীলকর সাহেবদের ঘন-ঘন বৈঠক বসতে লাগলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজের আরদালি পাঠিয়ে যখন তখন পরোয়ানা জারি করতে লাগলেন।

রাজারাম ঘোড়ায় করে যাচ্ছিলেন নীলকুঠির দিকে, রামকানাই কবিরাজ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে, বললে—একটু দাঁড়াবেন দেওয়ানবাবু?

রাজারাম ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—কি?

—একটু দাঁড়ান। একটা কথা শুনুন। আপনি আর এগোবেন না। কানসোনার বাগ্‌দিরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ষষ্ঠীতলার মাঠে। আপনাকে মারবে, লাঠি নিয়ে তৈরী আছে। আমি জানি কথাটা তাই বললাম। অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্যি দাঁড়িয়ে আছি।

—কে কে আছে দলে?

—তা জানিনে বাবু। আমি গরীব লোক। কানে আমার কথা গেল, তাই বলি, অধর্ম করতি পারবো না। ভগবানের কাছে এর জবাব দিতি হবে তো একদিন? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে সাবধান করে দেবার ভার তিনিই দিয়েচেন আমার ওপর।

তবু রাজারাম ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যেতে উদ্যত হয়েচেন দেখে রামকানাই কবিরাজ

হাতজোড় করে বললে—দেওয়ানবাবু, আমার কথা শুনুন—বড্ড বিপদ আপনার। মোটে এগোবেন না—বাবু শুনুন—ও বাবু কথাটা—

ততক্ষণে রাজারাম অনেকদূর এগিয়ে চলে গিয়েচেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, রামকানাই লোকটা মাথা-পাগল নাকি? এত অপমান হোলো নীলকুঠির লোকের হাতে, তিনিই তার মূল—অথচ কি মাথাব্যথা ওর পড়েছিল তাঁকেই সাবধান করে দিতে? মিথ্যে কথা সব।

ষষ্ঠীতলার মাঠে তাঁর ঘোড়া পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ শুরু হোলো। মস্ত বড় একটি দল লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে। রাজারাম দেখলেন এদের মধ্যে বাঁধালের দাঙ্গায় নিহত রামু বাগ্‌দির বড় ছেলে হারু আর তার শালা নারান বড় সর্দার।

পলকে প্রলয় ঘটলো। একদল চেঁচিয়ে হেঁকে বললে—ও ব্যাটা, নাম এখানে। আজ তোরে আর ফিরে যেতি হবে না।

নারান বললে—ও ব্যাটা সাহেবের কুকুর—তোর মুন্ডু নিয়ে আজ ষষ্ঠীতলার মাঠে ভাঁটা খেলবো দ্যাখ্—

অনেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে—অত কথায় দরকার কি? ঘাড় ধরে নামা—নেমিয়ে নিয়ে বুকে হাঁটু দিয়ে জেঁকে বসে কাতানের কোপে মুন্ডুটা উড়িয়ে দে—

হারু বললে—তোর সর্—মুই দেখি—মোর বাবারে ওই শালা ঠেঙিয়ে মেরেল লেঠেল পেটিয়ে—

একজন বললে—তোর সেই রসিকবাবা কোথায়? তাকে ডাক—সে এসে তোকে বাঁচাক—যমালয়ে যে এখুনি যেতে হবে বাছাধন।

সাঁই করে একটা হাত-সড়কি রাজারামের বাঁ দিকের পাঁজরা ঘেঁষে চলে গেল। রাজারামের ঘোড়া ভয় পেয়ে ঘুরে না দাঁড়ালে সেই ধাক্কাতেই রাজারাম কাবার হয়েছিলেন। তাঁর মাথা তখন ঘুরচে, চিন্তার অবকাশ পাচ্চেন না, চোখে সর্ষের ফুল দেখচেন, নারকোল গাছে যেন ঝড় বাধচে, কি যেন সব হচ্চে তাঁর চারিদিকে। রামকানাই কবিরাজ গেল কোথায়? রামকানাই?

তাঁর মাথায় একটা লাঠির ঘা লাগলো। মাথাটা ঝিম ঝম করে উঠলো।

আবার তাঁর বাঁ দিকের পাঁজরে খুব ঠাণ্ডা তীক্ষ্ম স্পর্শ অনুভূত হোলো। কি হচ্চে তাঁর? এত জল কোথা থেকে আসচে? কে একজন যেন বললে—শালা, রামুর কথা মনে পড়ে?

রাজারাম হাত উঠিয়েচেন সামনের একজনের লোকের লাঠি আটকাবার জন্যে। এত লোকের লাঠি তিনি ঠেকাবেন কি করে? এত জল এলো কোথা থেকে? অতি অল্পক্ষণের জন্যে একবার চেয়ে দেখলেন নিজের কাপড়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজারামের যেন বমির ভাব হোলো। খুব জ্বর হোলে যেমন মাথা ঘোরে, দেহ দুর্বল হয়ে বমির ভাব হয়, তেমনি। পৃথিবীটা যেন বন্ বন্ করে ঘুরছে!...

তিলুর সুন্দর খোকাটা দূর মাঠের ওপ্রান্তে বসে যেন আনমনে হাসচে। কেমন হাসে! রাজারাম আর কিছু জানেন না। চোখ বুজে এল।

অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এসেছে গোটা দুনিয়াটায়।...

রামকানাই কবিরাজের ভীত ও আকুল আবেদনে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা যখন লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে গেল ষষ্ঠীতলার মাঠে, তখন রাজারামের রক্তাপ্লুত দেহ ধুলোতে লুটিয়ে পড়ে আছে। দেহে প্রাণ নেই।

বছর খানেক পরে।

রাজারামের খুন হওয়ার পর এ অঞ্চলে যে হৈ-চৈ হয়েছিল, দিনকতক তা থেমে গিয়েচে। রাজারামের পরে জগদম্বা সহমরণে যাবার জন্য জিদ ধরেছিলেন, তিলু, বিলু, ও নিলু অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু তিনি বেশিদিন বাঁচেন নি। ভেবে ভেবে কেমন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এ অবস্থায় খুব সেবা করেছিল তিন ননদে মিলে। গত দুর্গোৎসবের পর তিন দিনের মাত্র জ্বর ভোগ করে জগদম্বা কদমতলার শ্মশানে স্বামীর চিতার পাশে স্থানগ্রহণ করেচেন। নিঃসন্তান রাজারামের সমুদয় সম্পত্তির এখন তিলুর খোকাই উত্তরাধিকারী। গ্রামের সবাই এদের অনুরোধ করেছিল রাজারামের পৈতৃক ভিটেতে উঠে গিয়ে বাস করতে, কেন ভবানী বাঁড়ুয্যে রাজী হননি তিনিই জানেন।

অতএব রাজারাম প্রদত্ত সেই একটুকরো জমিতে, সেই খড়ের ঘরেই ভবানী এখনো বাস করচেন। অবশেষে একদিন তিলু স্বামীকে কথাটা বললে।

ভবানী বললেন—তিলু, তুমিও কেন এ অনুরোধ কর।

—কেন বলুন বুঝিয়ে? কেন বাস করবেন না আপনার নিজের শ্বশুরের ভিটেতে?

—না। আমার ছেলে ঐ সম্পত্তি নেবে না।

—সম্পত্তিও নেবে না?

—না, তিলু রাগ কোরো না, বহু লোকের ওপর অত্যাচারের ফলে ঐ সম্পত্তি গড়ে উঠেছে—আমি চাইনে আমার ছেলে ওই সম্পত্তির অন্ন খায়। শোনো তিলু, আমি অনেক ভালো লোকের সঙ্গ করেছিলাম। এইটুকু জেনেচি, বিলাসিতা যেখানে, বাড়তি যেখানে, সেখানেই পাপ, সেখানেই আবর্জনা। আত্মা সেখানে মলিন। চৈতন্যদেব কি আর সাধে রঘুনাথ দাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "ভালো নাহি খাবে আর ভালো নাহি পরিবে!"

—আপনি যা ভালো বোঝেন—

—আমি তোমাকে অনেকদিন বলেচি তো, আমি অন্য পথের পথিক। তোমার দাদার—কিছু মনে করো না—কাজকর্ম আমার পছন্দ ছিল না কোনোদিন। রামু বাগ্‌দিকে খুন করিয়েছিলেন উনিই। রামকানাই কবিরাজের ওপর অত্যাচার উনিই করেন। সেই রামকানাই কিন্তু তাঁকে বিপদের ইঙ্গিত দেয়। ভবিতব্য, কানে যাবে কেন? যাক গে ওসব কথা। আমার খোকা যদি বাঁচে, সে অন্যভাবে জীবনযাপন করবে। নির্লোভ হবে। সরল, ধার্মিক, সত্যপরায়ণ হবে। যদি সে ভগবানকে জানতে চায়, তবে সরলতা ও দীনতার মধ্যে ওকে জীবনযাপন করতে হবে। মলিন, বিষয়াসক্ত মনে ভগবদ্দর্শন হয় না। আমি ওকে সেইভাবে মানুষ করবো।

—ও কি আপনার মত সন্নিসি হয়ে যাবে?

—তুমি জানো, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নি। আমার গুরুদেব মহারাজ (ভবানী যুক্তকরে প্রণাম করলেন) বলেছিলেন—বাচ্চা, তেরা আবি ভোগ হ্যায়। সন্ন্যাস দেন নি। তিনি আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন ছবির মত। তবে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, সংসারে থেকেও আমি যেন ভগবানকে ভুলে না যাই। অসত্য পথে, লোভের পথে, পাপের পথে পা না দিই। শ্রীমদ্ভাগবতে যাকে বলেছে 'বিত্তশাঠ্য নো', অর্থাৎ বিষয়ের জন্যে জালজুয়োচুরি, তা কোনো দিন না করি! আমার ছেলেকে আমি সেই পথে পা দিতে এগিয়ে ঠেলে দেবো? তোমার দাদার সম্পত্তি ভোগ করলে তাই হবে।

—তবে কি হবে দাদার সম্পত্তি?

—কেন তুমি?

—আমার ছেলে নেবে না, আমি নেবো? আমাকে কি যে ভেবেচেন আপনি?

—তবে তোমার দুই বোন?

—তাদেরই বা কেন ঠেলে দেবেন বিষয়ের পথে?

—যদি তারা চায়?

—চাইলেও আপনি স্বামী, পরমগুরু তাদের। তারা নির্বুদ্ধি মেয়েমানুষ, আপনি তাদের বোঝাবেন না কেন?

—তা হয় না তিলু। তাদের ইচ্ছে যদি থাকে, তারা বড় হয়ে গিয়েচে, ভোগের ইচ্ছে যদি থাকে তবে ভোগ করুক। জোর করে নিবৃত্ত করা যায় না।

—জোর করবেন কেন, বোঝাবেন। আমিই আগে তাদের মন বুঝি, তারপর বলবো আপনাকে।

—বেশ তো, যদি কেউ না নেয়, ও সম্পত্তি গরিবদুঃখীর সেবায় অর্পণ কর গে তোমার দাদার নামে, বৌদিদির নামে। তাঁদের আত্মার উন্নতি হবে, তৃপ্তি হবে এতে।

সেই দিনেই বিকেলে হঠাৎ হলা পেকে এসে হাজির। দূর থেকে ডেকে বললে—ও বড়দি, খোকা কই?

খোকাকে ডেকে তিলু বললে—ও কে রে?

খোকা চেয়ে বললে—দাদা—

—দাদা না রে মামা।

—মামা।

হলা পেকে দু'গাছা সোনার বালা নিয়ে পরাতে গেল খোকার হাতে, তিলু বললে—না দাদা, ও পরাতি দেবো না।

—কেন দিদি?

—উনি আগে মত না দিলি আমি পারিনে।

—সেবারেও নিতি দ্যাও নি। এবার না নিলি মোর মনে কষ্ট হবে না দিদিমণি?

—তা কি করব দাদা। ও সব তুমি আন কেন?

—ইচ্ছে করে তাই আনি। খোকন, তোর মামাকে তুই ভালবাসিস্?

খোকা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হলা পেকের মুখের দিকে চেয়ে বললে—হাঁ।

—কতখানি ভালোবাসি?

—আক্খানা।

—একখানা ভালবাসিস্! বেশ তো।

খোকা এবার হাত বাড়িয়ে হলা পেকের বালা দুটো দু'হাতে নিলে। হলা পেকে হাততালি দিয়ে বললে—ওই দ্যাখো, ও নিয়েচে। খোকামণি পরবে বালা, তুমি দেবা না, বুঝলে না?

ঠিক এই সময় ভবানী বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে হলা পেকেকে দেখে বলে উঠলেন—আরে তুমি কোথা থেকে?

হলা পেকে উঠে ভবানীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। ভবানী হেসে বললেন—খুব ভক্তি

দেখচি যে! এবার কি রকম আদায় উশুল হোলো? ও কি, ওর হাতে ও বালা কিসের?

তিলু বললে—হলা দাদা খোকনের জন্যে এনেচে—

হলা পেকের মুখ শুকিয়ে গেল। তিলু হেসে বললে—শোনো তোমার খোকার কথা। হ্যাঁরে, তোর মামাকে কতখানি ভালোবাসিস্ রে?

খোকা বললে—আক্‌খানা।

—তুই বুঝি বালা নিবি?

—হ্যাঁ।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—না না, বালা তুমি ফেরত নিয়ে যাও। ও আমরা নেবো কেন?

হলা পেকে ভবানীর সামনে কথা বলতে সাহস পেলে না, কিন্তু তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। তিলু বললে—আহা, দাদার বড় ইচ্ছে। সেবারও এনেছিল, আপনি নেন নি। ওর অন্নপ্রাশনের দিন।

ভবানী বললেন—আচ্ছা, তুমি এসব কেন নিয়ে এসে বিপদে ফেল বল তো?

হলা পেকে নিরুত্তর। বোবার শত্রু নেই।

—যাও, রেখে দাও এ যাত্রা। কিন্তু আর কক্ষনো কিছু—

হলা পেকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল দেখালো। সে ভবানীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আচ্ছা, আর মুই আনচি নে কিছু। মোর আক্কেল হয়ে গিয়েচে। তবে এ সে জিনিস নয়। এ আমার নিজের জিনিস।

ভবানী বললেন—আক্কেল তোমাদের হবে না—আক্কেল হবে মলে। বয়েস হয়েচে, এখনো কুকাজ কেন? পরকালের ভয় নেই?

তিলু বললে—এখন ওকে বকাঝকা করবেন না। ওর মুখ খিদেতে শুকিয়ে গিয়েচে। এসো তুমি দাদা রান্নাঘরের দিকি।

হলা পেকে সাহস পেয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে গিয়ে বসলো তিলুর পিছু পিছু।

এই দুর্দান্ত দস্যুকে তিলু আর তার ছেলে কি ক'রে বশ করেছে কে জানে। পোষা কুকুরের মত সে দিব্যি তিলুর পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগলো সসঙ্কোচ আনন্দে।

বেশ নিকানো-গুছানো মাটির দাওয়া। উচ্ছে লতার ফুল ফুটে ঝুলছে খড়ের চাল থেকে। পেছনে শ্যাম চক্কত্তিদের বাঁশঝাড়ে নিবিড় ছায়া। শালিখ ও ছাতারে পাখী ডাকচে। একটা বসন্তবৌরি উড়ে এসে বাঁশগাছের কঞ্চির ওপরে দোল খাচ্ছে। শুকনো বাঁশপাতায় বালির সুগন্ধ বরেুচ্ছে। বনবিছুটির লতা উঠেছে রান্নাঘরের জানালা বেয়ে। তিলু হলা পেকের সামনে রাখলে এক খুঁচি চালভাজা, কাঁচা লঙ্কা ও একমালা ঝুনো নারকোল। এক থাবা খেজুরের গুড় রাখলে একটা পাথরবাটিতে।

হলা পেকের নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। সে এক খুঁচি চালভাজা নিমেষে নিঃশেষ করে বললে—থাকে তো আর দুটো দ্যান, দিদিঠাকরুণ—

—বোসো দাদা। দিচ্ছি। একটা গল্প করো ডাকাতির, করবে দাদা?

হলা পেকে আবার একধামি চালভাজা নিয়ে খেতে খেতে গল্প শুরু করলে, ভাণ্ডারখোলা গ্রামের নীলমণি মুখুয্যের বাড়ী অঘোর মুচি আর সে রণ-পা পরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ী গিয়ে দেখলে বাড়ীতে তাদের চার-পাঁচজন পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষও আট-দশটা।

দুজন বাইরের চাকর, ওদের একজন আবার স্ত্রীপুত্র নিয়ে গোয়ালঘরের পাশের ঘরে বাস করে। ওদের মধ্যে পরামর্শ হোলো বাড়ীতে চড়াও হবে কিনা। শেষ পরে 'লুঠ' করাই ধার্য হোলো। ঢেঁকি দিয়ে বাইরের দরজা ভেঙে ওরা ঘরে ঢুকে দ্যাখে পুরুষেরা লাঠি নিয়ে, সড়কি নিয়ে তৈরি। মেয়েরা প্রাণপণে আর্তনাদ শুরু করেছে।

তিলু বললে—আহা!

—আহা নয়। শোনো আগে দিদিমণি। প্রাণ সে রাত্রে যাবার দাখিল হয়েছিল। মোরা জানিনে, সে বাড়ীর দাক্ষায়ণী বলে একটা বিধবা মেয়ে গোয়ালঘর থেকে এমন সড়কি চালাতে লাগলো যে নিবারণ বুনোকে হার মানাতি পারে। একখানা হাত দেখালে বটে! পুরুষগুলোকে মোরা বাড়ীরি বার হতি দেখলাম না।

—ওমা, তারপর?

—পুরুষগুলো দোতলার চাপা সিঁড়ি ফেলে দেলে, তারপর ওপর থেকে ইট ফেলতে লাগলো আর সড়কি চালাতে লাগলো। মোদের দলের একটা জখম হোল—

—মরে গেল?

—তখন মরে নি। মোল মোদের হাতে। যখন দাক্ষায়ণী অসম্ভব সড়কি চালাতি লাগলো, মোরা দ্যাখলাম ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালি মোরা দাঁড়িয়ে মরবো সব ক'টা, তখন মুখে ঝম্প বাজিয়ে দেলাম—

—সে আবার কি?

—এমন শব্দ করলাম যে মেয়েমানুষের পেটের ছেলে পড়ে যায়—করবো শোনবা? না থাক, খোকা ভয় পাবে। পুরুষ ক'টা যাতে ছাদ থেকে নামতি না পারে সে ব্যবস্থা করলাম। সাপের জিবের মত লিকলিকে সড়কির ফলা একবার এগোয় আর একবার পেছোয়—এক এক টানে এক একটা ভুঁড়ি হস্‌কে দেওয়া যাচ্ছে—ওদের তিন-চারটে জখম হোলো। মোদের তখন গাঁয়ের লোক ঘিরে ফেলেচে, পালাবার পথ নেই—ওদিকে দাক্ষায়ণী গোয়ালঘর থেকে সড়কি চালাচ্চে। অঘোর পালাবার ইশারা করলে—কিন্তু তখন পালাই মোরা কোন্ রাস্তা দিয়ে। তখন মোদের শেষ অস্ত্র চালালাম—দুই হাত্তা বলে লাঠির মার চালিয়ে তামেচা বাহেরা শির ঠিক রেখে পন্ পন্ ক'রে কুমোরের চাকের মত ঘুরতি ঘুরতি ভিড় কেটে বার হয়ে এসে পথ ক'রে দিই দলের সবাইয়ের। মোদের দলের যে লোকটা জখম হয়েল, তার মুন্ডুটা কেটে নিয়ে সরে পড়ি—আহা লোকটার নাম বংশীধর সর্দার, ভারি সড়কিবাজ ছেল—

—সে আবার কি কথা? নিজেরা মারলে কেন?

—না মারলি সনাক্ত হবে লাশ দেখে। বেঁচে থাকে তো দলের কথা ফাঁস করে দেবে।

—কি সর্বনাশ!

—সর্বনাশ হোতো আর একটু হলি। তবে খুব পালিয়ে এয়েলাম। সোনার গহনা লুঠ করেলাম ত্রিশ ভরি।

—কি ক'রে? কোথা থেকে নিলে? মেয়েমানুষদের তো ওপরের ঘরে নিয়ে চাপা সিঁড়ি ফেলে দিল?

—তার আগেই কাজ হাসিল হয়েল। ডাকাতি করতি গেলে কি বিলম্ব করলি চলে? যেমন

দেখা, অমনি গহনা ছিনিয়ে নেওয়া। তারপর যত খুশি চেঁচাও না—সারা রাত্তির পড়ে আছে তার জন্যি।

—এ রকম কোরো না দাদা। বড্ড পাপের কাজ। এ ভাত তোমাদের মুখি যায়? কত লোকের চোখের জল না মিশিয়ে আছে ঐ ভাতের সঙ্গে। ছিঃ ছিঃ—নিজের পেটে খেলেই হোলো?

হলা পেকে খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—পাপ-পুণ্যির কথা বলবেন না। ও আমাদের হয়ে গিয়েচে, সে রাজাও নেই, সে দেশও নেই। জানো তো ছড়া গাইতাম আমরা ছেলেবেলায় ঃ—

ধন্য রাজা সীতারাম বাংলা বাহাদুর
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর
বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে
রামী শামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গাস্তানে যাবে।

তিলু হেসে বললে—আহা, ও ছড়া আমরা যেন আর জানিনে! ছেলেবেলায় দীনু বুড়ি বলতো শুনিচি—

—জানবা না কেন, সীতারাম রাজা ছেলো নলদী পরগণার। মাসুদপুর হোলো তাঁর কেল্লা—মোর মামার বাড়ী হোলো হরিহরনগর, মাসুদপুরির কাছে। মুই সীতারামের কেল্লার ভাঙা ইট পাথর, সীতারামের দীঘি, তার নাম সুখসাগর, ওসব দেখিচি। এখন অরুণ্যি-বিজেবন, তার মধ্যি বড় বড় সাপ থাকে, বাঘ থাকে—এট্টা পুরনো মস্ত মাদার গাছ ছেল জঙ্গলের মধ্যি, তার ফল খেতি যাতাম ছেলেবেলায়—ভারি মিষ্টি—

খোকা বললে—মিট্টি। আমি খাই—

—যেও বাবা খোকা—এনে দেবানি—আম পাকলে দেবানি—

—আম খাই—

—খেও। কেন খাবা না?

ভবানী বাঁড়ুয্যে স্নান ক'রে আহ্নিক করতে বসলেন। তিলু দু'চারখানা শসাকাটা আধমালা নারকোলকোরা ও খানিকটা খেজুরের গুড় তাঁর জন্যে ওঘরে রেখে এল। হলা পেকে এক কাঠা চালের ভাত খেলে ভবানীর খাওয়ার পরে। খেতেও পারে। ডাল খেলে একটি গামলা। খেয়েদেয়ে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে একটা কান্নাকাটির শব্দ পাওয়া গেল মুখুয্যেপাড়ার দিকে। তিলু হলা পেকের দিকে তাকিয়ে বললে—দেখে এসো তোঁ পেকে দা, কে কাঁদচে?

ভবানীও তাড়াতাড়ি দেখতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন—ফণিকাকার বড় জ্যাঠাই জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গিয়েচেন, গণেশ খবর নিয়ে এল—

তিলু বললে—ওমা, সে কি? জাহাজ-ডুবি?

—হাঁ। সার জন লরেন্স বলে একখানা জাহাজ—

—জাহাজের আবার নাম থাকে বুঝি?

—থাকে বৈকি। তারপর শোনো, সেই সার জন লরেন্স জাহাজ ডুবেচে সাগরে, পুরীর পথে। বহু লোক মারা গিয়েচে।

—ওগো এ গাঁয়েরই তো লোক রয়েচে সাত-আটজন। টগর কুমোরের মা, পেঁচো গয়লার শাশুড়ী আর বিধবা বড় মেয়ে ক্ষেন্তি, রাজু সর্দারের মা, নীলমণি কাকার বড় বৌদিদি। আহা, পেঁচো গয়লার মেয়ে ক্ষেন্তির ছোটো ছেলেটা সঙ্গে গিয়েচে মায়ের—সাত বছর মাত্তর বয়েস—

গ্রামে সত্যিই একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। নদীর ঘাটে, গৃহস্থদের চন্ডীমন্ডপে, চাষীদের খামারে, বাজারে, নালু পালের বড় মুদিখানার দোকানে ও আড়তে 'সার জন লরেন্স' ডুবি ছাড়া আর অন্য কথা নেই।

বাংলার অনেক জেলার বহু তীর্থযাত্রী এবার এই জাহাজ ডুবে মারা গিয়েছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সার জন লরেন্স জাহাজ-ডুবির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ-জন্যে।

গয়ামেম সবে বড় সাহেবের কুঠি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসেছে, এমন সময় প্রসন্ন আমীন তাকে ডেকে বললে—ও গয়া, শোনো—ও গয়া—

গয়া পেছন দিকে চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললে—আমার এখন ন্যাকরা করবার সময় নেই।

—শোনো একটা কথা বলি—

—কি?

—ওবেলা বাড়ী থাকবা?

—থাকি না থাকি আপনার তাতে কি?

—না, তাই এমনি বলচি।

—এখানে কোনো কথা না। যদি কোনো কথা বলতি হয়, সন্দের পর আমাদের বাড়ী যাবেন, মার সামনে কথা হবে—

প্রসন্ন চক্কত্তি এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলে—না না, আমি এখানে কি কথা বলতি যাচ্ছি—বলচি যে তুমি কেমন আছ, একটু রোগা দেখাচ্চে কিনা তাই।

—থাক, পথেঘাটে আর ঢঙ করতি হবে না—

না, এই গয়াকে প্রসন্ন চক্কত্তি ঠিকমত বুঝে উঠতেই পারলে না। যখন মনে হয় ওর ওপর একটু বুঝি প্রসন্ন হোলো-হোলো, অমনি হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। প্রসন্ন হতবুদ্ধি হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

পেছনদিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে প্রসন্ন চেয়ে দেখল বড় সাহেব শিপ্‌টন্ কোথায় বেরিয়ে যাচ্চে। বড় ভয় হোলো তার। বড় সাহেব দেখে ফেললে নাকি, তার ও গয়ামেমের কথাবার্তা? নাঃ—

সন্দে হবার এত দেরিও থাকে আজকাল! বাঁওড়ের ধারে বড় চটকা গাছে রোদ রাঙা হয়ে উঠলো, চড়ার ক্ষেতে ক্ষেতে ঝিঙের ফুল ফুটলো, শামকুট্ পাখীর ঝাঁক ইছামতীর ওপর থেকে উড়ে আকাইয়ের বিলের দিকে চলে গেল, তবুও সন্দে আর হয় না। কতক্ষণ পরে বাগ্‌দিপাড়ায়, কলুপাড়ায় বাড়ী বাড়ী সন্দের শাঁক বেজে উঠলো, বটতলার খেপী সন্নিসিনীর মন্দিরে কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেল।

প্রসন্ন চক্কত্তি গিয়ে ডাকলে একটু ভয়ে ভয়ে—ও বরদা দিদি—

প্রথমেই গয়ার নাম ধরে ডাকতে সাহস হয় না কিনা!

মেঘ না চাইতেই জল। প্রসন্ন চক্কত্তিকে মহাখুশি করে গয়ামেম ঘরের বাইরে এসে বললে—কি খুড়োমশাই?

—বরাদাদিদি বাড়ী নেই?

—না, কেন?

—তাই বলচি।

গয়ামেম মুখ টিপে হেসে বললে—মার কাছে আপনার দরকার? তাহ'লি মাকে ডেকে আনি? যুগীদের বাড়ী গিয়েচে—

—না, না। বোসো গয়া, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি—

—কি?

—আচ্ছা আমাকে তোমার কেমনডা লাগে?

—বুড়োমানুষ, কেমন আবার লাগবে?

—খুব বুড়ো কি আমি? অন্যাই কথাডা বোলো না গয়া। বড় সায়েবের বয়স হয়নি বুঝি?

—ওদের কথা ছাড়ান দ্যান। আপনি কি বলচেন তাই বলুন—

—আমি তোমারে না দেখি থাকতি পারিনে কেন বলো তো?

—মরণের ভগ্নদশা। এ কথা বলতি লজ্জা হয় না আমারে?

—লজ্জা হয় বলেই তো এতদিন বলতি পারি নি—

—খুব করেলেন। এখন বুঝি মুখি আর কিছু আটকায় না।

—না সত্যি গয়া, এত মেয়ে দ্যাখলাম কিন্তু তোমার মত এমন চুল, এমন ছিরি আর কোনোডা চকি পড়লো না—

—ওসব কথা থাক। একটা পরামর্শ দিই শুনুন—

—কি?

—কাউকে বলবেন না বলুন?

প্রসন্ন চক্কত্তির মুখ উজ্জ্বল দেখালো। এত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে কোনদিন গয়া কথা বলে নি। কি বাঁকা ভঙ্গিমা ওর কালো ভুরু জোড়ার! কি মুখের হাসির আলো! স্বর্গ আজ পৃথিবীতে এসে ধরা দিল কি এই শরৎ দিনের অপরাহ্নে?

কি বলবে গয়া? কি বলবে ও?

বুক ঢিপ ঢিপ করে প্রসন্ন আমীনের। সে আগ্রহের অধীরতায় ব্যগ্রকণ্ঠে বললে—বলো না গয়া, জিনিসটা কি? আমি আবার কার কাছে বলতে যাচ্ছি তোমার আমার দুজনের মধ্যেকার কথা?

শেষদিকের কথাগুলো খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে প্রসন্ন চক্কত্তি। গয়া কিন্তু কথার ইঙ্গিতটুকু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সহজ সুরেই বললে—শুনুন বলি। আপনার ভালোর জন্যি বলচি। সায়েবদের ভেতর ভাঙন ধরেচে। ওরা চলে যাচ্চে এখান থেকে। বড় সায়েবের মেম এখান থেকে শীগগির চলে যাবে। মেম লোকটা ভালো। যাবার সময় ওর কাছে কিছু চেয়ে নেন গিয়ে। দেবে। লোক ভালো। কথাডা শোনবেন।

প্রসন্ন চক্কত্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে আগে থেকে কিছু-কিছু এ সম্বন্ধে যে অনুমান না করেছিল এমন নয়। সায়েবরা চলে যাবে...সায়েবরা চলে যাবে...জানে সে কিছু কিছু। কিন্তু গয়া

এভাবের কথা তাকে আজ এতদিন পরে বললে কেন? তার সুখ-দুঃখে, উন্নতি-অবনতিতে গয়ামেমের কি? প্রসন্ন চক্কত্তির সারা শরীরে পুলকের শিহরণ বয়ে গেল, সন্দেবেলার পাঁচমিশেলি আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ এতকাল পরে জীবনের শেষ প্রহরের দিকে যেন কি একটা নতুন জিনিসের সন্ধান পেলে প্রসন্ন।

সে বললে—সায়েবরা চলে যাচ্চে কেন?

গয়া হেসে বললে—ওদের ঘুনি ডাঙায় উঠে গিয়েচে যে খুড়োমশাই! জানেন না?

—শুনিচি কিছু কিছু।

—সমস্ত জেলার লোক ক্ষেপে গিয়েচে। রোজ চিঠি আসচে মাজিস্টর সায়েবের কাছ থেকে। সাবধান হতি বলচে। হাজার হোক সাদা চামড়া তো। মেমদের আগে সরিয়ে দেচ্চে। আপনারেও বলি, একটু সাবধান হয়ে চলবেন। খাতক প্রজার ওপর আগের মত আর করবেন না। করলি আর চলবে না—

—কেন, আমি মলি তোমার কি গয়া?

প্রসন্ন চক্কত্তির গলার সুর হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠলো।

গয়া খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—নাঃ, আপনারে নিয়ে আর যদি পারা যায়! বলতি গেলাম একটা ভালো কথা, আর অমনি আপনি আরম্ভ করে দেলেন যা তা—

—কি খারাপ কথাডা আমি বললাম গয়া?

কণ্ঠস্বর পূর্ব্ববৎ গাঢ়, বরং গাঢ়তর।

—আবার যতো সব বাজে কথা! বলি যে কথাডা বললাম, কানে গেল না? দাঁড়ান—দাঁড়ান—

বলেই প্রসন্ন চক্কত্তিকে অবাক ও স্তম্ভিত করে গয়া তার খুব কাছে এসে তার পিঠে একটা চড় মেরে বললে—একটা মশা—এই দেখুন—

সমস্ত দেহ শিউরে উঠলো প্রসন্ন আমীনের। পৃথিবী ঘুরছে কি বন্ বন্ করে? গয়া বল্লে—যা বললাম, সেইরকম চলবেন—বুঝলেন? কথা কানে গেল?

—গিয়েচে। আচ্ছা গয়া, না যদি চলি তোমার কি? তোমার ক্ষেতিডা কি?

গয়া রাগের সুরে বললে—আমার কলা! কি আবার আমার? না শোনেন মরবেন দেওয়ানজির মত।

—রাগ করচো কেন গয়া? আমার মরণই ভালো। কে-ই বা কাঁদবে মলি পরে!... প্রসন্ন চক্কত্তি ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

—আহাহা! ঢঙ! রাগে গা জ্বলে যায়। গলার সুর যেন কেষ্টযাত্রা—বললাম একটা সোজা কথা, না—কে কাঁদবে মলি পরে, কে হেন করবে, তেন করবে! সোজা পথে চললি হয় কি জিগ্যেস করি?

—যাকগে।

—ভালোই তো।

—আমাকে দেখলি তোমার রাগে গা জ্বলে, না?

—আমি জানিনে বাপু। যত আজগুবী কথার উত্তর আমি বসে বসে এখন দিই! খেয়েদেয়ে আমার তো আর কাজ নেই—আসুন গিয়ে এখন, মা আসবার সময় হোলো—

—বেশ চললাম এখন গয়া।

—আসুন গিয়ে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ক্ষুণ্নমনে কিছুদূর যেতেই গয়া পেছন থেকে ডাকলে—ও খুড়োমশাই—প্রসন্ন ফিরে চেয়ে বললে—কি?

—শুনুন।

—বল না কি?

—রাগ করবেন না যেন!

—না। যাই এখন—

—শুনুন না।

—কি?

—আপনি একটা পাগল!

—যা বলো গয়া। শোনো একটা কথা—কাছে এসো—

—না, ওখান থেকে বলুন আপনি।

—নিধুবাবুর একটা টপ্পা শোনবা?

—না আপনি যান, মা আসচে—

প্রসন্ন চক্কত্তি আবার কিছুদূর যেতে গয়া পেছন থেকে বললে—আবার আসবেন এখন একদিন—কানে গেল কথাডা? আসবেন—

—কেন আসবো না! নিশ্চয় আসবো। ঠিক আসবো।

দূরের মাঠের পথ ধরলো প্রসন্ন চক্কত্তি। অনেক দূর সে চলে এসেচে গয়াদের বাড়ী থেকে। বরদা দেখে ফেলে নি আশা করা যাচ্চে। কেমন মিষ্টি সুরে কথা কইলে গয়া, কেমন ভাবে তাকে সরিয়ে দিলে পাছে মা দেখে ফেলে!

কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত, তার চেয়েও আশ্চর্য, সব চেয়ে আশ্চর্য হচ্চে—ওঃ, ভাবলে এখনো সারাদেহে অপূর্ব আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়, সেটা হচ্চে গয়ার সেই মশা মারা।

এত কাছে এসে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। অমন সুন্দর ভঙ্গিতে।

সত্যিই কি মশা বসেছিল তার গায়ে? মশা মারবার ছলে গয়া কি তার কাছে আসতে চায় নি?

কি একটা দেখিয়েছিল বটে গয়া, প্রসন্ন চক্কত্তির তখন কি চোখ ছিল একটা মরা মশা দেখবার? সন্দে হয়ে এসেছে। ভাদ্রের নীল আকাশ দূর মাঠের উপর উপুড় হয়ে আছে। বাঁশের নতুন কোঁড়াগুলো সারি সারি সোনার সড়কির মত দেখাচ্ছে রাঙা রোদ পড়ে বনোজোলার যুগীপাড়ার বাঁশবনে-বনে। ওখানেই আছে গয়ার মা বরদা। ভাগ্যিস বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল! নইলে বরদা আজ উপস্থিত থাকলে গয়ার সঙ্গে কথাই হোতো না। দেখাই হোতো না। বৃথা যেতো এমন চমৎকার শরতের দিন, বৃথা যেতো ভাদ্রের সন্ধ্যা...

সারা জীবনের মধ্যে এই একটি দিন তার। চিরকাল যা চেয়ে এসেছিল, আজ এতদিন পরে তা কি মিললো? নারীর প্রেমের জন্য সারা জীবনটা বুভুক্ষু ছিল না কি ওর?

প্রসন্ন চক্কত্তি অনেক দেরি করে আজ বাসায় ফিরলো। নীলকুঠির বাসা, ছোট্ট একখানা ঘর,

তার সঙ্গে খড়ের একটা রান্নাঘর। সদর আমীন নকুন ধাড়া আজ অনুপস্থিত তাই রক্ষে, নতুবা বকিয়ে বকিয়ে মারতো এতক্ষণ। বকবার মেজাজ নেই তার আজ। শুধু বসে বসে ভাবতে ইচ্ছে করছে...গয়া তার কাছ ঘেঁষে এসে মশা মারলে...হয়, হয়। ধরা দেয়। স্বর্গের উর্বশী মেনকা রম্ভাও ধরা দেয়, সে চাইছে যে...

বর্ষা নামলো হঠাৎ। ভাদ্রসন্ধ্যা অন্ধকার ক'রে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি নামলো। খড়ের চালার ফুটো বেয়ে জল পড়ছে মাটির উনুনে। ভাত চড়িয়েছে উচ্ছে আর কাঁচকলা ভাতে দিয়ে। আর কিছু নেই, আর কিছু রান্না করবার দরকার কি? খাবার ইচ্ছে নেই। শুধু ভাবতে ভালো লাগে...শুধু গয়ামেমের সেই অদ্ভুত ভঙ্গি, তার সে মুখের হাসি...গয়া তার কাছ ঘেঁষে এসে একটা চড় মেরেছে তার গায়ে মশা মারতে...

মশা কি সত্যই তার গায়ে বসেছিল?

আচ্ছা, এমন যদি হোতো—

সে ভাত রান্না করচে, গয়া হাসি-হাসি মুখে উঁকি দিয়ে বলতো এসে—খুড়োমশাই, কি করচেন?

—ভাত রাঁধচি গয়া।

—কি রান্না করচেন?

—ভাতে ভাত।

—আহা, আপনার বড় কষ্ট।

—কি করবো গয়া, কে আছে আমার? কি খাই না-খাই দেখচে কে?

—আপনার জন্যি মাছ এনেচি। ভালো খয়রা মাছ।

—কেন গয়া তুমি আমার জন্যি এত ভাবো?

—বড্ড মন কেমন করে আপনার জন্যি। একা থাকেন কত কষ্ট পান...

ভাত হয়ে গেল। ধরা গন্ধ বেরিয়েচে। সর্ষের তেলে ভাতে ভাত মেখে খেতে বসলো প্রসন্ন চক্কত্তি। রেড়ির তেলের জল-বসানো দোতলা মাটির পিদিমের শিখা হেলছে দুলছে জোলো হাওয়ায়। খাওয়ার শেষে—যখন প্রায় হয়ে এসেচে, তখন প্রসন্ন আবিষ্কার করলে পাতে সে নুন নেয় নি, উচ্ছে ভাতে কাঁচকলা ভাতে আলুনি খেয়ে চলেছে এতক্ষণ।

আচ্ছা, মশাটা কি সত্যি ওর গায়ে বসেছিল?

রামকানাই কবিরাজ সকালে উঠে ইছামতীতে স্নান ক'রে আসবার সময় দেখলেন কি চমৎকার নাক-জোয়ালে ফুল ফুটেছে নদীর ধারের ঝোপের মাথায়। বেশ পূজো হবে। বড় লোভ হোলো রামকানাইয়ের। কাঁটার জঙ্গল ভেদ করে অতি কষ্টে ফুল তুলে রামকানাইয়ের দেরি হয়ে গেল নিজের ছোট্ট খড়ের ঘরে ফিরতে।

রামকানাই রোজ প্রাতঃস্নান করে এসে পূজো ক'রে থাকেন গ্রাম্য-কুমোরের তৈরি রাধাকৃষ্ণের একটা পুতুল। ভালো লেগেছিল বলে ভাসানপোতার চড়কের মেলায় কেনা। বড় ভালো লাগে ঐ মূর্তির পায়ে নাক-জোয়ালে ফুল সাজিয়ে দিতে, চন্দন ঘষে মূর্তির পায়ে মাখিয়ে দিতে, দু'একটা ধূপকাঠি জ্বেলে দিতে পুতুলটার আশেপাশে। নৈবেদ্য দেন কোনো দিন পেয়ারা কাটা, কোনো দিন পাকা পেঁপের টুকরো, এক ডেলা খাঁড় আখের গুড়।

পূজো শেষ করবার আগে যদি কেউ না আসে তবে অনেকক্ষণ ধরে পূজো চলে রামকানাইয়ের। চোখ চেয়ে এক-একদিন জলও পড়ে। লাজুক হাতে মুছে ফেলে দেন রামকানাই।

কে বাইরে থেকে ডাকলে—কবিরাজ মশাই ঘরে আছেন?

—কে? যাই।

—সবাইপুরির অম্বিকা মন্ডলের ছেলের জ্বর। যেতি হবে সেখানে।

—আচ্ছা আমি যাচ্ছি—বোসো।

পূজো-আচ্চা শেষ করে প্রসাদ নিয়ে বাইরে এসে রামকানাই সেই লোকটার হাতে কিছু দিলেন।

—কি অসুখ?

—আজ্ঞে, জ্বর আজ তিন দিন।

—তুমি চলে যাও, আমি আরো দুটো রুগী দেখে যাব এখন—

রামকানাই দু'টুকরো শসা খেয়ে রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়েন। নানা জায়গা ঘুরে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সবাইপুর গ্রামের অম্বিকা মন্ডলের বাড়ি গিয়ে ডাক দিলেন। অম্বিকা মন্ডল বেগুনের চাষ করে, অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেটির আজ কয়েকদিন জ্বর, ওষুধ নেই, পথ্য নেই। রামকানাই কবিরাজ খুব যত্ন ক'রে দেখে বললেন—এ নাড়ির অবস্থা ভালো না। একবার টাল খাবে—

বাড়ীসুদ্ধ সকলে মিলে কবিরাজকে সেদিনটা সেখানে থাকতে বললে। তখনো যে তাঁর খাওয়া হয় নি সেকথা কেউ জানে না, কেউ কিছু বললেও না। রামকানাই কবিরাজ না খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বালকের শিয়রে বসে রইলেন। তারপর বাড়ি এসে সন্ধ্যা-আরাধনা ও রান্না করে রাত এক প্রহরের সময় আবার গেলেন রোগীর বাড়ি।

রামকানাইয়ের নাড়িজ্ঞান অব্যর্থ। রাতদুপুরের সময় রোগী যায়-যায় হোলো। সূচিকাভরণ প্রয়োগ ক'রে টাল সামলাতে হোলো রামকানাইয়ের। ওদের ঘরের মধ্যে জায়গা নেই, পিঁড়েতে একটা মাদুর দিলে বিছিয়ে। ভোর পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে তিনি পুনরায় রোগীর নাড়ি দেখলেন। মুখ গম্ভীর করে বললেন—এ রুগী বাঁচবে না। বিষম সান্নিপাতিক জ্বর, বিকার দেখা দিয়েছে। আমি চললাম। আমাকে কিছু দিতে হবে না তোমাদের।

এতটা পরিশ্রমের বদলে একটি কানাকড়িও পেলেন না রামকানাই, সেজন্য তিনি দুঃখিত নন্, তার চেয়ে রোগীকে যে বাঁচাতে পারলেন না, বড় দুঃখ হ'লো তাঁর সেটাই।

আজকাল একটি ছাত্র জুটেছে রামকানাইয়ের। ভজন-ঘাটের অক্রূর চক্রবর্তীর ছেলে, নাম নিমাই, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। সে ঘরের বাইরে দূর্বাঘাসের ওপরে মাধব-নিদানের পুঁথি হাতে বসে আছে। অধ্যাপক আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে।

রামকানাই তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন—বাপ নিমাই, বোসো। নাড়ির ঘা কি রকম রে?

—আজ্ঞে নাড়ির ঘা কি, বুঝতে পারলাম না।

—ক'ঘা দিলে সঙ্কটের নাড়ি?

—তিন-এর পর এক ফাঁক, চারের পর এক ফাঁক।

—তা কেন? সাত-এর পর, আটের পর হলি হবে না?

—আজ্ঞে তাও হবে।

—তাই বল। আজ একটা রুগী দেখলাম, সাতের পর ফাঁক। সেখান থেকেই এ্যালাম।

—বাঁচলো?

—স্বয়ং ধন্বন্তরির অসাধ্য—কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্য—সুশ্রুতে বলচে। বাবা, একটা কথা বলি। কবিরাজি তো পড়বার জনি এসেচ। শরীরে কোনো দোষ রাখবা না। মিথ্যে কথা বলবা না। লোভ করবা না। অল্পে সন্তুষ্ট থাকবা। দুঃখী গরিবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করবা। ভগবানে মতি রাখবা। নেশাভাঙ করবা না। তবে ভালো কবিরাজ হতি পারবা। আমাদের গুরুদেব (উদ্দেশে প্রণাম করলেন রামকানাই) মঙ্গলগঞ্জের গঙ্গাধর সেন কবিরাজ সর্বদা আমাদের একথা বলতেন। আমি তাঁর বড় প্রিয় ছাত্র ছেলাম কিনা। তাঁর উপযুক্ত হই নি। আমরা কুলাঙ্গার ছাত্র তাঁর। নাড়ি ধরে যাকে যা বলবেন তাই হবে। বলতেন মনডা পবিত্র না রাখলি নাড়িজ্ঞান হয় না। কিছু খাবি?

ছাত্র সলজ্জমুখে বললে—না, গুরুদেব।

—তোর মুখ দেখে মনে হচ্চে কিছু খাস নি। কিবা খেতি দি, কিছু নেই ঘরে—একটা নারকোল আছে, ছাড়া দিকি!

—দা আছে?

—ঐ বটকৃষ্ণ সামন্তদের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়, ওই নদীর ধারে বাঁশতলায় যে বাড়ি, ওটা। চিনতি পারবি, না সঙ্গে যাবো?

—না, পারবো এখন—

গুরুশিষ্য কাঁচা নারকোল ও অল্প দুটি ভাজা কড়াইয়ের ডাল চিবিয়ে খেয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কাজে মন দিলে—বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, ছাত্রের যদি বা হুঁশ থাকে তো গুরুর একেবারে নেই। 'মাধব নিদান' পড়াতে পড়াতে এল চরক, চরক থেকে এল কলাপ ব্যাকরণ, অবশেষে এসে পড়ে শ্রীমদ্ভাগবত। রামকানাই কবিরাজ ভালো সংস্কৃতজ্ঞ, ব্যাকরণের উপাধি পর্যন্ত পড়েছিলেন।

ছাত্রকে বললেন—অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদার ধী।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেতঃ পুরুষং পরং।।

অকাম অর্থাৎ বিষয়কামনাশূন্য হয়ে ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে ভজনা করবে। বুঝলে বাবা, তাঁর অসীম দয়া—চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার নিধান—

তিনিই কৃপা করেন—একবার তাঁর চরণে শরণ নিলেই হোলো। মানুষের অজ্ঞতা দেখে তিনি দয়া না করলি কে করবে?

শিষ্য কাঠ সংগ্রহ করে আনলে বাঁশবন থেকে। গুরু বললেন—একটা ওল তুলে আনলি নে কেন বাঁশবন থেকে? আছে?

—অনেক আছে?

—নিয়ে আয়। বটকৃষ্টদের বাড়ি থেকে শাবল একখানা চেয়ে নে, আর ওদের দাখানা দিয়ে এসেচিস? দিয়ে আয়। বড় দেখে ওল তুলবি, খাবার কিছু নেই ঘরে। ওল-ভাতে সর্ষেবাটা দিয়ে আর—ওরে অমনি দুটো কাঁচা নংকা নিয়ে আসিস বটকেষ্টদের বাড়ি থেকে—

—মুখ চুলকোবে না, গুরুদেব?

—ওরে না না। সর্ষেবাটা মাখলি আবার মুখ চুলকোবে—

—ওল টাটকা তুলে খেতি নেই, রোদে শুকিয়ে নিতি হয় দু'একদিন—

—সে সব জানি। আজ ভাত দিয়ে খেতি হবে তো? তুই নিয়ে আয় গিয়ে, যা—তুইও এখানে খাবি—

ওল-ভাতে ভাত দিয়ে গুরুশিষ্য আহার সমাপ্ত ক'রে আবার পড়াশুনো আরম্ভ ক'রে দিলে। বিকেলবেলা হয়ে গেল, বাঁশবনে পিড়িং পিড়িং ক'রে ফিঙে পাখী ডাকচে, ঘরের মধ্যে অন্ধকারে আর দেখা যায় না, তখন গুরুর আদেশে শিষ্য নিমাই চক্রবর্তী পুঁথি বাঁধলে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে—তাহোলে যাই গুরুদেব।

—ওরে, কি ক'রে যাবি? বাঁশবনের মাথায় বেজায় মেঘ করেচে—ভীষণ বৃষ্টি আসবে—ছাতিটাও তো আজ আনিস নি—

—বাঁটটা ভেঙে গিয়েচে। আর একটা ছাতি তৈরি করচি। ভালো কচি তালপাতা এনে কাদায় পুঁতে রেখে দিইচি। সাত-আট দিন পেকে যাবে। সেই তালপাতায় পাকা ছাতি হয়—

—কেন, কেয়াপাতায় ভালো ছাতি হয়—

—টেকে না গুরুদেব। তালপাতার মত কিছু না—

—কে বললে টেকে না? কেয়াপাতার ছাতি সবাই বাঁধতি জানে না। আমি তোরে বেঁধে দেবো একখানা ছাতি—দেখবি—

শিষ্য বিদায় নিয়ে চলে যাবার কিছু পরেই গয়ামেম ঘরে ঢুকলো, হাতে তার একছড়া পাকা কলা। সে দূর থেকে রামকানাইকে প্রণাম করে দোরের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। রামকানাই বললেন—এসো মা, বোসো বোসো, দাঁড়িয়ে কেন? হাতে ও কি?

গয়া সাহস পেয়ে বললে—এক ছড়া গাছের কলা। আপনার চরণে দিতি এ্যালাম—আপনি সেবা করবেন।

—ও তো নিতি পারবো না—আমি কারো দান নিই নে—

—এক কড়া কড়ি দিয়ে নিন—

—রুগীদের বাড়ি থেকে নিই। ওতে দোষ হয় না। বটকেষ্ট সামন্ত আমার রুগী। হাঁপানিতে ভুগচে, ওর বাড়ি থেকে নিই এটা-ওটা। তুমি তো আমার রুগী নও মা—অবিশ্যি আশীর্বাদ করি রুগী না হতি হয়।

—রোগের জন্যি তো এ্যালাম, জ্যাঠামশাই—

—কি রোগ?

গয়া ইতস্তত করে বললে—সর্দিমত হয়েচে। রাত্রিরে ঘুম হয় না।

—ঠিক তো?

—ঠিক বলচি বাবা। আপনি সাক্ষাৎ শিবতুল্য লোক। আপনার সঙ্গে মিথ্যে বললে নরকে পচে মরতি হবে না?

রামকানাই দুঃখিত সুরে বললেন—না মা, ওসব কথা বলতি নেই। আমি তুচ্ছ লোক। আচ্ছা একটু ওষুধ তোমারে দিই। আদা আর মধু দিয়ি মেড়ে খাবা।

—আচ্ছা, বাবা—

—কি?

—সব লোক আপনার মত হয় না কেন? লোকে এত দুষ্টু বদমাইশ হয় কেন?

—আমিও ওই দলের। আমি কি করে দলছাড়া হলাম? এ গাঁয়ে একজন ভালো লোক আছে, দেওয়ানজির জামাই ভবানী বাঁড়ুয্যে। মিথ্যা কথা বলে না, গরীবের উপকার করে, লক্ষ্মীর সংসার, ভগবানের কথা নিয়ে আছে।

—আমি দেখিচি দূর থেকি। কাছে যেতি সাহসে কুলোয় না—সত্যি কথা বলচি আপনার কাছে। আমাদের জন্মো মিথ্যে গেল। জানেন তো সবি জ্যাঠামশাই—

—তাঁকে ডাকো। তাঁর কৃপা হোলি সবই হয়। তুমি তো তুমি, কত বড় বড় পাপী তরে গেল।

—জ্যাঠামশাই এক এক সময়ে মনে বড্ড খেদ হয়। ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে-ছুড়ে বেরিয়ে যাই—মার জন্যি পারিনে। মা-ই আমাকে নষ্ট করলে। মা আজ মরে গেলি আমি একদিকে গিয়ে বেরোতাম, সত্যি বলচি, এক এক সময় হয় এমনি মনটা জ্যাঠামশাই—

রামকানাই চুপ করে রইলেন। তার মন সায় দিল না এসময়ে কোনো কথা বলতে।

গয়া বললে—কলা নেবেন?

—দিয়ে যাও। ওষুধটা দিয়ে দিই মা, দাঁড়াও। মধু আছে তো? না থাকে আমার কাছে আছে, দিচ্ছি—

গয়া প্রণাম করে চলে গেল ওষুধ নিয়ে। পথে যেতে যেতে প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে হঠাৎ দেখা। গয়ার আসবার পথে সে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

—এই যে গয়া, কোথায় গিয়েছিলে? হাতে কি?

—ওষুধ খুড়োমশাই। এখানে দাঁড়িয়ে?

—ভাবচি তুমি তো এ পথ দিয়ে আসবে!

—আপনি এমন আর করবেন না—সরে যান পথের ওপর থেকে—

—কেন, আমার ওপর বিরূপ কেন? কি হয়েচে?

—বিরূপ-সরূপের কথা না। আপনি সরুন তো—আমি যাই—

গয়া হনহন ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তি তেমন সাহস সঞ্চয় করতে পারলে না যে পেছন থেকে ডাকে। ফিরেও চাইলে না গয়া।

নাঃ, মেয়েমানুষের মতির যদি কিছু—

নীলবিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল সারা যশোর ও নদীয়া জেলায়। কাছারীতে সে খবরটা নিয়ে এল নতুন দেওয়ান হরকালী সুর।

শিপ্‌টন্ সাহেব কুঠির পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসে বন্দুকের নল পরিষ্কার করছিল। হরকালী সুর সেলাম করে বললে—তেরোখানা গাঁয়ের প্রজা ক্ষেপেচে সায়েব। ছোটলাট আসচেন এই সব জায়গা দেখতে। প্রজারা তাঁর কাছে সব বলবে—

শিপ্‌টন্ মাথা নাড়া দিয়ে বললে—**Hear me**, দেওয়ান! প্রজাশাসন কি করিয়া করিটে হয় টাহা আমি জানে! আগের দেওয়ানকে যাহারা খুন করিয়াছিল, টাহাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া

দিয়াছি—these people want a revolt—do they? সব নীলকুঠির সায়েব লোক মিলিয়া সভা হইয়াছিল, টুমি জানে?

—জানি হুজুর। তখন আমি রণবিজয়পুরের কুঠিতে—

—ও, that রণবিজয়পুর! যেখানে জেফ্রিস সায়েব খুন হইলো?

—খুন হয় নি হুজুর। মদ খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেলেন—

—ওসব নেটিভ আমলাদের কারসাজি আছে। It was a plot against his life—আমি সব জানে। কে ম্যানেজার ছিল? রবিন্‌সন?

—আজ্ঞে হুজুর।

—এখন কান পাতিয়া শোনো, I want a very intrepid দেওয়ান, যেমন রাজারাম ছিলো। But—

নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—He was not a brainy chap—something wrong with his think-box—বুড্‌টি ছিলো না! সাবধান হইয়া চলিটে জানিট না, সেজন্য মরিলো। বন্ডুক দেখিলে?

—হাঁ হুজুর।

—সাতটা নতুন গান্‌ আসিয়াছে। আমার নাম শিপ্‌টন্‌ আছে—কি করিয়া শাসন করিটে হয় তাহা জানে—I will shoot them like pigs.

—হুজুর!

—আমাদের সভাতে ঠিক হইয়াছে, আমরা হঠিব না। গভর্ণমেন্টের কঠা শুনিব না। প্রয়োজন বুঝিলে খুন করিবে। মেমসায়েবদের এখানে রাখা হইবে না—আমি মেমসায়েবকে পাঠাইয়া ডিটেছি—

—কবে হুজুর?

—Monday next, by boat from here to মঙ্গলগঞ্জ। সোমবারে নৌকা করিয়া যাইবেন, নৌকা ঠিক রাখিবে।

—যে আজ্ঞে হুজুর। সব ঠিক থাকবে—সঙ্গে কে যাবে হুজুর?

—কি প্রয়োজন? I don't think that is necessary—

দেওয়ান হরকালী সুর ঘুঘু লোক। অনেক কিছু ভেতরের খবর সে জানে। কিন্তু কতটা বলা উচিত কতটা উচিত নয়, তা এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। মাথা চুলকে ললে—হুজুর, সঙ্গে আপনি গেলে ভালো হয়—

শিপ্‌টন্‌ ভুরু কুঁচকে বললে—She can take care of herself—তিনি নিজেকে রক্ষা করিটে জানেন। আমার যাইটে হইবে না—টুমি সব ঠিক কর।

—হুজুর, করিম লাঠিয়ালকে সঙ্গে দিতে চাই—

—What? Is it as worse as that? কিছু ডরকার নাই। টুমি যাও। অত ভয় করিলে নীলকুঠি চালাইটে জানিবে না। ঠিক আছে।

—যে আজ্ঞে হুজুর—

—একটা কঠা শুনিয়া যাও। Are you sure there's as much as that ? খবর লইয়া কি জানিলে ?

—সাহস দেন তো বলি হুজুর—মেমসায়েবের সঙ্গে করিম লাঠিয়াল আর পাইক যেন যায়। ষড়যন্ত্র অনেক দূর গড়িয়েচে—

সাহেব শিস্ দিতে দিতে বললে—ও, this I never imagined possible! It will make me feel different—ইহা বিশ্বাস করা শক্ট। আচ্ছা, টুমি যাও। Leave everything to me—আমি যা-যা করিটে হইবে, সব করা হইবে, বুঝিলো ?

হরকালী সুর বহুদিন বহু সাহেব ঘেঁটে এসেচে, উলটো-পালটা ভুল বাংলা আন্দাজে বুঝে বুঝে ঘুণ হয়ে গিয়েচে।

বললে—একটা কথা বলি হুজুর। আমার বন্দোবস্ত আমি করি, আপনার বন্দোবস্ত আপনি করুন। সেলাম, হুজুর—

তিন দিন পরে বড় সাহেবের মেম নীলকুঠির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুলতলার ঘাটে বজরায় চাপলো। সঙ্গে দশজন পাইকসহ করিম লাঠিয়াল, নিজে হরকালী সুর পৃথক নৌকায় বজরার পেছনে।

পুরানো কর্মচারীদের মধ্যে প্রসন্ন চক্রবর্তী আমীন হাতজোড় করে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—মা, জগদ্ধাত্রী মা আমার! আপনি চলে যাচ্চেন, নীলকুঠি আজ অন্ধকার হয়ে গেল।...

প্রসন্ন আমীন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে।

মেমসাহেব বললে—Don't you cry my good man—আমীনবাবু, কাঁদিও না—কেন কাঁদে ?

—মা, আমার অবস্থা কি করে গেলে ? আমার গতি কি হবে মা ? কার কাছে দুঃখ জানাবো, জগদ্ধাত্রী মা আমার—

চতুর হরকালী সুর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি চেপে রাখলে।

মেমসাহেব দ্বিরুক্তি না করে নিজের গলা থেকে সরু হারছড়াটা খুলে প্রসন্ন আমীনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রসন্ন শশব্যস্ত হয়ে সেটা লুফে নিলে দু'হাতে।

সকলে অবাক। হরকালী সুর স্তম্ভিত। করিম লেঠেল হাঁ ক'রে রইল।

বজরা ঘাট ছেড়ে চলে গেল।

প্রসন্ন আমীন অনেকক্ষণ বজরার দিকে চেয়ে চেয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর উড়ানির খুঁটে চোখের জল মুছে ধীরে ধীরে ঘাটের ওপরে উঠে চলে গেল।

বড় সাহেবের মেম চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলকুঠির লক্ষ্মী চলে গেল।

গয়ামেম হাসতে হাসতে বললে—কেমন খুড়োমশাই ? আদ্দেক ভাগ কিন্তু দিতি হবে—

দুপুর বেলা। নীল আকাশের তলায় উঁচু গাছে গাছে বহু ঘুঘুর ডাকে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ঘনতর ক'রে তুলেচে। শামলতার সুগন্ধি ফুল ফুটেচে অদূরবর্তী ঝোপে। পথের ধারে বটতলায় দুজনের দেখা। দেখাটা খুব আকস্মিক নয়, প্রসন্ন চক্কত্তি অনেকক্ষণ থেকে এখানে অপেক্ষা করছিল। সে হেসে বললে—নিও, তোমার জন্যেই তো হোল—

—কেমন, বলেছিলাম না?

—তুমি নাও ওটা। তোমারেই দেবো—

—পাগল! আমারে অত বোকা পালেন? সায়েবসুবোর জিনিস আমি ব্যাভার করতি গেলে কি বলবে সবাই? ওতে আমি হাত দিই কখনো?

—তোমারে বড় ভালো লাগে গয়া—

—বেশ তো।

—তোমারে দেখলি এত আনন্দ পাই—

—এই সব কথা বলবার জন্যি বুঝি এখানে দাঁড়িয়ে ছেলেন?

—তা—তা—

—বেশ, চললাম এখন। শুনুন আর একটা কথা বলি। আপনি অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা করুন—

—সে আমি সব বুঝি। এদের দাপট কমেচে তা আমি দেখতে পাচ্চিনে, এত বোকা নই। শুধু তোমারে ফেলে কোনো জায়গায় যেতি মন সরে না—

—আবার ওই সব কথা!

—চলো না কেন আমার সঙ্গে?

—কনে?

—চলো যেদিকি চোখ যায়—

গয়া খিল্ খিল্ করে হেসে বললে—এইবার তা'হলি ষোলকলা পুণ্ণ হয়। যাই এবার আপনার সঙ্গে যেদিকি দুই চোখ যায়—

প্রসন্ন চক্কত্তি ভাব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। গয়া হাসিমুখে বললে—কথা বলচেন না যে? ও খুড়োমশাই?

—কি বলবো? তোমার সঙ্গে কথা বলতি সাহস হয় না যে।

—খুব সাহস দেখিয়েচেন, আর সাহসে দরকার নেই। আপনাকে একটা কথা বলি। মা'রে ফেলে ক'নে যাব বলুন! এতদিনে যাদের নুন খেলাম, তাদের ফেলে কোথায় যাবো? ওরা এতদিন আমারে খাইয়েচে, মাখিয়েচে, যত্ন-আত্যি কম করে নি—ওদের ফেলে গেলি ধম্মে সইবে না। আপনি চলে যান—ভাত খাচ্চেন ক'নে আজকাল? রেঁধে দিচ্চে কেডা?

প্রসন্ন চক্কত্তি কথার উত্তর দিতে পারে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। এসব কি ধরনের কথা? কেউ তাকে এমন ধরনের কথা বলেচে কখনো?... আবার সেই আনন্দের শিহরণ নেমেচে ওর সর্বাঙ্গে। কি অপূর্ব অনুভূতি। গা ঝিম ঝিম করে ওঠে যেন। চোখে জল এসে পড়ে। অন্যমনস্কভাবে বলে—ভাত? ভাত রান্না...ও ধরো...না, নিজেই রাঁধি আজকাল।

—একবার দেখতি ইচ্ছে হয় কি রকম রাঁধেন—

—প্রসাদ পাবা?

—সে আপনার দয়া। কি রান্না করবেন?

—বেগুন ভাতে, মুগির ডাল। খয়রা মাছ যদি খোলার গাঙে পাই তবে ভাজবো—

—আপনি সত্যি সত্যি এত বেলায় এখনো খান নি?

—না। তোমার জন্যি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। কুঠি থেকে কখন বেরুবে তাই দাঁড়িয়ে আছি—

গয়া রাগের সুরে বললে—ওমা এমন কথা আমি কখনো শুনি নি! সে কি কথা? আমি কি আপনার পায়ে মাথা কুটবো? এখুনি চলে যান বাড়ি। কোনো কথা শুনচিনে। যান—

—এই যাচ্চি—তা—

—কথা-টথা কিছু হবে না! চলে যান আপনি—

গয়া চলে যেতে উদ্যত হোলে প্রসন্ন চক্কত্তি ওর কাছ ঘেঁষে (যতটা সাহস হয়, বেশি কাছে যেতে সাহসে কুলোয় কৈ?) গিয়ে বললে—তুমি রাগ করলে না তো? বল গয়া—

—না রাগ করলাম না, গা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—এমন বোকামি কেন করেন আপনি? যান এখন—

—রাগ কোরো না গয়া, তুমি রাগ করলি আমি বাঁচবো না।

ওর কণ্ঠে মিনতির সুর।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বিকেলে বেড়াতে বেরুবেন, খোকা কাঁদতে আরম্ভ করলে—বাবা, যাবো—

তিলু ধমক দিয়ে বললে—না, থাকো আমার কাছে।

খোকা হাত বাড়িয়ে বললে—বাবা যাবো—

ভবানী বাঁড়ুয্যের ছাতি দেখিয়ে বলে—কে ছাতি?

অর্থাৎ কার ছাতি?

ভবানী বললেন—আমার ছাতি। চল, আবার বিষ্টি হবে—

খোকা বললে—বিষ্টি হবে।

—হাঁ, হবেই তো।

ভবানীর কোলে উঠে খোকা যখন যায়, তখন তার মুখের হাসি দেখে ভাবেন এর সঙ্গ সত্যই সৎ সঙ্গ। খোকাও তাঁকে একদণ্ড ছাড়তে চায় না। বাপছেলের সম্বন্ধের গভীর রসের দিক ভবানীর চোখে কি স্পষ্ট হয়েই ফুটলো!

কোলে উঠে যেতে যেতে খোকা হাসে আর বলে—কাণ্ড! কাণ্ড!

এ কথার বিশেষ কি অর্থ সে-ই জানে। বোধ হয় এই বলতে চায় যে কি মজার ব্যাপারই না হয়েছে। ভবানী জানেন খোকা মাঝে মাঝে দুই হাত ছড়িয়ে বলে—কাণ্ড!

কাণ্ড মানে তিনিও ঠিক জানেন না, তবে উল্লাসের অভিব্যক্তি এটুকু বোঝেন। কৌতুকের সুরে ভবানী বললেন—কিসের কাণ্ড রে খোকা?

—কাণ্ড! কাণ্ড!

—কোথায় যাচ্ছিস রে খোকা?

—মুকি আনতে!

—মুড়কি খাবে বাবা?

—হুঁ।

—চল কিনে দেবো।

ইছামতী নদী বর্ষার জলে কূলে-কূলে ভর্তি। খোকাকে নিয়ে গিয়ে একটা নৌকোর ওপর বসলেন ভবানী। দুই তীরে ঘন সবুজ বনঝোপ, লতা দুলচে জলের ওপর, বাবলার সোনালী ফুল ফুটেছে তীরবর্তী বাবলা গাছের নত শাখায়। ওপার থেকে নীল নীরদমালা ভেসে আসে, হল্‌দে বসন্তবৌরি এসে বসে সবুজ বননিকুঞ্জের ও ডাল থেকে ও ডালে।...

ভবানী বাঁড়ুয্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কোন্ মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প! এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই বিপুল কাকলীপূর্ণ অপরাহ্ণে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে, স্থলে, ঊর্ধ্বে, অধে, দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে, পুবে। যেখানে তিনি সেখানে এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি হাসে, অমন সুন্দর বসন্তবৌরি পাখীর হলুদ রঙের দেহে ঝলক ফুটে ওঠে। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বনকলমী ফুল ওইরকম ফোটে জলের ধারে ঝোপে ঝোপে। তাঁর বাইরে কি আছে? জয় হোক তাঁর।

খোকা হাত ছাড়িয়ে বলে—কি জল! কি জল!

এগুলো সে সম্প্রতি কোথা থেকে যেন শিখেছে—সর্বদা প্রয়োগ করে।

ভবানী বললেন—খোকা, নদী বেশ ভালো?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—ভালো।

—বাড়ি যাবি?

—হুঁ।

—তবে যে বললি ভালো?

—মার কাছে যাবো...

অন্ধকার বাঁশবনের পথে ফিরতে খোকার বড় ভয় হয়। দু'বছরের শিশু, কিছু ভালো বুঝতে পারে না...সামনের বাঁশঝাড়টার ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ বড় ভয় হয়। বাবাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরে বলে—বাবা ভয় করচে, ওতা কি?

—কই কি, কিছু না।

খোকা প্রাণপণে বাবার গলা জড়িয়ে থাকে। তাকে ভয় ভুলিয়ে দেবার জন্যে ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—এগুলো কি দুলচে বনে?

খোকা চোখ খুলে চাইলে, এতক্ষণ চোখ বুজিয়ে রেখেছিল ভয়ে। চেয়ে দেখে বললে—জোনা পোকা।

ভবানী বললেন—কি পোকা বললি? চেয়ে দেখে বল—

—জোনা পোকা।

—মাকে গিয়ে বলবি?

—হুঁ।

—কোন্ মাকে বলবি?

—তিলুকে।

—কেন, নিলুকে না?

—হুঁ।

—আর এবং মায়ের নাম কি?

—তিলু।

—তিলু তো হোলো, আর?

—নিলু।

—আর একজন?

—মা।

—আর এক মায়ের নাম বল—

—তিলু মা—

—দূর, তুই বুঝতে পারলি নে, তিলু মা হোলো, নিলু মা হোলো—আর একজন কে?

—বিলু।

—ঠিক।

এখনো সামনে অগাধ বাঁশবনের মহাসমুদ্র। বড্ড অন্ধকার হয়ে এসেছে, আলোর ফুলের মতো জোনাকী পোকা ফুটে উঠচে ঘন অন্ধকারে এ বনে ও বনে, এ ঝোপে ও ঝোপে। একটা পাখী কুস্বরে ডাকচে জিউলি গাছটায়। বনের মধ্যে ধুপ করে একটা শব্দ হোলো, একটা পাকা তাল পড়লো বোধ হয়। ঝিঁ ঝিঁ ডাকচে নাটা-কাঁটার বনে।

খোকা আবার ভয়ে চুপ করে আছে...

এমন সময় কোথায় দূরে সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠলো। খোকা চোখ ভালো করে না চেয়ে দেখেই বললে—দুগ্‌গা দুগ্‌গা—নম নম—

ওর মায়েদের দেখাদেখি ও শিখেচে; একটুখানি চেয়ে দেখলে চারিদিকের অন্ধকার নিবিড়তর হয়েচে। ভয়ের সুরে বললে—ও ভবানী—

—কি বাবা?

—মার কাছে যাবো—ভয় করবে।

—চলো যাচ্চি তো—

—ভবানী—

—কি?

—ভয়!

—কিসের ভয়? কোনো ভয় নেই।

এই সময়ে কোথায় আবার শাঁখ বেজে উঠলো। খোকা অভ্যাসমত তাড়াতাড়ি দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললে—দুগ্‌গা দুগ্‌গা, নম নম।

ভবানী হেসে বললেন—দ্যাখো বাবা, এবার দুর্গানামে যদি ভয় কাটে...

সত্যি দুর্গানামে ভয় কেটে গেল। বনবাদাড় ছাড়িয়ে পাড়া আরম্ভ হয়ে গেল। ঘরে-ঘরে প্রদীপ জ্বলচে, গোয়ালে-গোয়ালে সাঁজাল দিয়েচে, সাঁজালের ধোঁয়া উঠচে চালকুমড়োর লতাপাতা ভেদ করে, ঝিঙের ফুল ফুটেচে বেড়ায় বেড়ায়।

ভবানী বললেন—ওই দ্যাখো আমাদের বাড়ি—

ঠিক সেই সময় আকাশের ঘন মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে। ঠাণ্ডা বাতাস বইলো। নিলু ছুটে এসে খোকাকে কোলে নিলে।

—ও আমার সোনা, ও আমার মানিক, কোথায় গিইছিলি রে? বৃষ্টিতে ভিজে—আচ্ছা আপনার কি কাণ্ড, 'এই ভরা সন্দে মাথায়' মেঘে অন্ধকার বনবাদাড় দিয়ে ছেলেটাকে কি বলে

নিয়ে এলেন? অমন আসতি আছে? তার ওপর আজ শনিবার—

খোকা খুব খুশি হয়ে মায়ের কোলে গেল একগাল হেসে।

তারপর দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে—কাণ্ড কাণ্ড!

আজ বিলুর পালা। রাত অনেক হয়েছে। তিলু লালপাড় শাড়ি পরে পান সেজে দিয়ে গেল ভবানীকে। বললে—শিওরের জানলা বন্ধ করে দিয়ে যাবো? বড়ো হাওয়া দিচ্চে বাদলার—

—তুমি আজ আসবে না?

—না, আজ বিলু থাকবে।

—খোকা?

—আমার কাছে থাকবে।

ভবানীর মন খারাপ হয়ে গেল। তিলুর পালার দিনে খোকা এ ঘরেই থাকে, আজ তাকে দেখতে পাবেন না—ঘুমের ঘোরে সে তাঁর দিকে সরে এসে হাত কি পা দু'খানা ওঁর গায়ে তুলে দিয়ে ছোট্ট সুন্দর মুখখানি উঁচু ক'রে ঈষৎ হাঁ ক'রে ঘুমোয়। কি চমৎকার যে দেখায়!

আবার ভাবেন, কি অদ্ভুত শিল্প! ভগবানের অদ্ভুত শিল্প!

বিলু পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে এসে বিছানার একপাশে বসলো। হাতের পানের ডিবে।

ভবানী বললেন—এসো বিলুমণি, এসো।

বিলুর মুখ যেন ঈষৎ বিষণ্ণ। বললে—আমারে তো আপনি চান না!

—চাই নে?

—চান না, সে আমি জানি। আপনি এখুনি দিদির কথা ভাবছিলেন।

—ভুল। খোকনের কথা ভাবছিলাম।

—খোকনকে নিয়ে আসবো?

—না। তোমার কাছে সে রাতে থাকতে পারবে?

—দাঁড়ান, নিয়ে আসি। খুব থাকতি পারবে।

একটু পরে ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়ে বিলু ঘরে ঢুকলো। হেসে বললো—দিদি ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার পাশ থেকে খোকাকে চুরি করে এনেচি—

—সত্যি?

—চলুন দেখবেন। অঘোরে ঘুমুচ্চে দিদি।

—ঘর বন্ধ করে নি?

—ভেজিয়ে রেখে দিয়েছে—নিলু যাবে বলে। নিলু এখনো রান্নাঘরের কাজ সারচে। নিলু তো দিদির কাছেই আজ শোবে—দিদি ওবেলা বড়ির ডাল বেটে বড় নেতিয়ে পড়েচে। সোজা খাটুনিটা খাটে—

—খাটতে দ্যাও কেন? ও হোলো খোকার মা। ওকে না খাটিয়ে তোমাদের তো খাটা উচিত।

—খাটতি দেয় কিনা! আপনি জানেন না আর! আপনার যত দরদ দিদির জন্যি। আমরা কেডা? কেউ নই। বানের জলে ভেসে এসেছি। নিন, পান খাবেন?

—খোকনের গায়ে কাঁথাখানা বেশ ভালো করে দিয়ে দাও। বড্ড ঠাণ্ডা আজ। পান সাজলে কে?

—নিলু। জানেন আজ নিলুর বড্ড ইচ্ছে ও আপনার কাছে থাকে।

—বাঃ, তুমি দিলে না কেন?

—ঐ যে বললাম, আপনি সবতাতে আমার দোষ দেখেন। দিদির সব ভালো, নিলুর সব ভালো। আমার মরণ যদি হোতো—

ভবানী জানেন, বিলু এরকম অভিমান আজকাল প্রায়ই প্রকাশ করে।

ওর মনে কেন যে এই ধরনের ক্ষোভ! মনে মনে হয়তো বিলু অসুখী। খুব শান্ত, চাপা স্বভাব—তবুও মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় মনের দুঃখ। তাই তো, কেন এমন হয়? তিনি বিলুকে কখনো অনাদর করেন নি সজ্ঞানে। কিন্তু মেয়েমানুষের সূক্ষ্ম সতর্ক দৃষ্টি হয়তো এড়ায় নি, হয়তো সে বুঝতে পেরেচে তাঁর সামান্য কোনো কথায়, বিশেষ কোনো ভঙ্গিতে যে তিনি সব সময় তিলুকে চান। মুখে না বললেও হয়তো ও বুঝতে পারে।

দুঃখ হোলো ভবানীর। তিন বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করে বড় ভুল করেচেন। তখন বুঝতে পারেন নি—এ অভিজ্ঞতা কি করে থাকবে সন্ন্যাসী পরিব্রাজক মানুষের! তখন একটা ভাবের ঝোঁকে করেছিলেন, বয়স্থা কুলীন কুমারীদের উদ্ধার করবার ঝোঁকে। কিন্তু উদ্ধার করে তাদের সুখী করতে পারবেন কিনা তা তখন মাথায় আসে নি।

মনে ভেবে দেখলেন, সত্যি তিনি বিলুকে অনাদর করে এসেচেন। সজ্ঞানে করেন নি, কিন্তু যে ভাবেই করুন বিলু তা বুঝেচে। দুঃখ হয় সত্যিই ওর জন্যে।

ভবানী দেখলেন, বিলু দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে কাঁদচে।

ওকে হাত ধরে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ছিঃ বিলু, ও কি? পাগলের মত কাঁদচ কেন?

বিলু কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার মরণই ভালো সত্যি বলচি, আপনি পরম গুরু, এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি পথের কাঁটা সরে যাই, আপনি দিদিকে নিয়ে, নিলুকে নিয়ে সুখ হোন।

—ও রকম কথা বলতে নেই, বিলু। আমি কবে তোমার অনাদর করিচি বলো?

—ও কথা ছেড়ে দিন, আমি কিছু বলচি নে তো আপনাকে! সব আমার অদেষ্ট। কারো দোষ নেই—সরুন তো, খোকার ঘাড়টা সোজা করে শোয়াই—

ভবানী বিলুর হাত ধরে বললেন—হয়তো আমার ভুল হয়ে গিয়েচে বিলু। তখন বুঝতে পারি নি—

বিলু সত্যি ভবানীর আদরে খানিকটা যেন দুঃখ ভুলে গেল। বললে—না, অমন বলবেন না—

—না, সত্যি বলচি—

—খান একটা পান খান। আমার কথা ধরবেন না, আমি একটা পাগল—

এত অল্পেই বিলু সন্তুষ্ট! ভবানীর বড় দুঃখ হল আজ ওর জন্যে। কত হাসিখুশি ওর মুখ দেখেছিলেন বিয়ের সময়ে, কত আশার ফুল ফুটে উঠেছিল ওর চোখের তারায় সেদিন। কেন এর জীবনটা তিনি নষ্ট করলেন?

ইচ্ছে করে কিছুই করেন নি। কেন এমন হোলো কি জানি!

বিলুকে অনেক মিষ্টি কথা বলেন সেরাত্রে ভবানী। কত ভবিষ্যতের ছবি এঁকে সামনে

ধরেন। তিনি যা পারেন নি, খোকা তা করবে। খোকা তার মা'দের সমান চোখে দেখবে। বিলু মনে যেন কোনো ক্ষোভ না রাখে।

মেঘভাঙ্গা চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়েচে। অনেক রাত হয়েচে। ডুমুর গাছে রাত-জাগা কি পাখী ডাকচে।

হঠাৎ বিলু বললে—আচ্ছা আমি যদি মরে যাই, তুমি কাঁদবে নাগর?

—ও আবার কি কথা?

হেসে বিলু খোকার কাছে এসে বললে—কেমন সুন্দর দেয়ালা করচে দেখুন—স্বপ্ন দেখে কেমন সুন্দর হাসচে!...

সেবার পূজার পর বর্ষাশেষে কাশফুল ফুটেচে ইছামতীর দু'ধারে, গাঙের জল বেড়ে মাঠ ছুঁয়েচে, সকালবেলার সূর্যের আলো পড়েচে নাটা-কাঁটা বনের ঝোপে।

ছেলেমেয়েরা নদীর ধারে চোদ্দ শাক তুলতে গিয়েচে কালীপূজোর আগের দিন। একটি ছোট মেয়ে ভবানীর ছেলে টুলুর কাছে এসে বললে—তুই কিছু তুলতে পারচিস নে—দে আমার কাছে—

টুলু বললে—কি দেব? আমিও তুলবো। কৈ দেখি—

—এই দ্যাখ কত শাক, গাঁদামনি, বৌ-টুনটুনি, সাদা নটে, রাঙা নটে, গোয়াল নটে, ক্ষুদে ননী, শান্তি শাক, মটরের শাক, কাঁচড়াদাম, কলমি, পুনর্ণবা—এখনো তুলবো রাঙা আলুরশাক, ছোলারশাক, আর পালংশাক—এই চোদ্দ। তুই ছেলেমানুষ শাকের কি চিনিস্?

—আমায় চিনিয়ে দ্যাও, বাঃ—ও সয়ে দিদি—

অপেক্ষাকৃত একটি বড় মেয়ে এসে টুলুকে কাছে নিয়ে বললে—কেন ওকে ওরকম করচিস বীণা? ও ছেলেমানুষ, শাক চিনবে কি করে? আয় আমার সঙ্গে রে টুলু—

ফণি চক্কত্তির নাতি অন্নদা বললে—এত লোক জমচে কেন রে ওপারে? এই সকালবেলা?

সত্যিই, সকলে চেয়ে দেখলে নদীর ওপারে বহুলোক এসে জমেচে, কারো কারো হাতে কাপড়ের নিশেন। দেখতে দেখতে এপারেও অনেক লোক আসতে আরম্ভ করলে। অন্নদা ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটু বড়, সে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলে—ও কাপালী কাকা, আজ কি এখানে?

যারা জমেচে এসে তারা সবাই চাষী লোক, বিভিন্ন গ্রামের। ওদের অনেককে এরা চেনে, দু'দশবার দেখেচে, বাকি লোকদের আদৌ চেনে না। একজন বললে—আজ ছোটলাটের কলের নৌকো যাবে নদী দিয়ে—নীলকুঠির অত্যাচার হচ্চে, তাই দেখতি আসচে। সব পেরজা খেপে গিয়েছে, যশোর-নদে জেলায় একটা নীলির গাছ কেউ বুনবে না। তাই মোরা এসে দাঁড়িয়েচি ছোটলাট সায়েবরে জানাতি যে মোরা নীলচাষ করবো না—

টুলু শুনে অবাক হয়ে নদীর দিকে চেয়ে রইল। খানিকটা কি ভেবে অন্নদাকে জিগ্যেস করলে—নীল কি দাদা?

—নীল একরকম গাছ। নীলকুঠির সায়েব টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যায় দেখিস নি?

—কলের নৌকো দেখবো আমি—টুলু ঘাড় দুলিয়ে বললে।

—চোদ্দ শাক তুলবি নে বুঝি? ওরে দুষ্টু—

অন্নদা ওকে আদর করে এক টানে এতটুকু ছেলেকে কোলে তুলে নিলে।

কিন্তু শুধু টুলু নয়, চোদ্দশাক তোলা উল্টে গেল সব ছেলেমেয়েরেই। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল নদীর দু'ধার। দুপুরের আগে ছোটলাট আসচেন কলের নৌকোতে। চাষী লোকেরা জিগীর দিতে লাগলো মাঝে মাঝে। গ্রামের বহু ভদ্রলোক—নীলমণি সমাদ্দার, ফণি চক্কত্তি, শ্যাম গাঙ্গুলী, আরও অনেকে এসে নদীর ধারের কদমতলায় দাঁড়ালো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে ছেলেকে ডাকলেন—ও খোকা—

টুলু হাসিমুখে বাবার কাছে ছুটে গিয়ে বললে—এই যে বাবা—

—চোদ্দ শাক তুলেচিস? তোর মা বলছিল—

—উঁহু বাবা। কে আসচে বাবা?

—ছোটলাট সার উইলিয়াম গ্রে—

—কি নাম? সার উইলিয়াম গ্রে?

—বাঃ, এই তো তোর জিবে বেশ এসে গিয়েচে!

—আমি এখন বাড়ি যাবো না। ছোটলাট দেখবো।

—দেখিস এখন। বাড়ি যাবি, তোকে মুড়ি খাইয়ে আনি।

—না বাবা। আমি দেখি।

বেলা অনেকটা বাড়লো। রোদ চড়-চড় করচে। টুলুর খিদে পেয়েচে কিন্তু সে সব কষ্ট ভুলে গিয়েচে লোকজনের ভিড় দেখে।

খোকা বললে—ও বাবা—

—কি রে?

—কলের নৌকো কি রকম বাবা?

—তাকে ইস্টিমার বলে। দেখিস এখন। ধোঁয়া ওড়ে।

—খুব ধোঁয়া ওড়ে?

—হুঁ।

—কেন বাবা?

—আগুন দেয় কিনা তাই।

এমন সময় বহুদূরের জনতা থেকে একটা চীৎকার শব্দ উঠলো। টুলু বললে—বাবা আমাকে কোলে কর—

ভবানী খোকাকে কাঁধে বসিয়ে উঁচু করে ধরলেন। বললেন—দেখতে পাচ্চিস? খোকা ঘাড় দুলিয়ে চোখ সামনে থেকে আদৌ না ফিরিয়ে বললে—হু—উ—উ—

—কি দেখচিস?

—ধোঁয়া উঠচে বাবা—

—কলের নৌকো দেখতে পেলি?

—না বাবা, ধোঁয়া—ওঃ, কি ধোঁয়া!

অল্পক্ষণ পরে টুলুকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে মস্ত বড় কলের নৌকোটা একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওর সামনে এসে উপস্থিত হোলো। জনতা "নীল মোরা করবো না লাটসায়েব, দোহাই মা মহারাণীর।" বলে চীৎকার ক'রে উঠলো। কলের নৌকোয় সামনে কাঠের কেদারায় বসে

আছে অনেকগুলো সাহেব। নীলকুঠির যেমন একটা সাহেব নদীর ধারে পাখী মারছিল সেদিন অমনি দেখতে। ওদের মধ্যে একটা সাহেব ও কি করচে?

টুলু বললে—বাবা—

—চুপ কর—

—বাবা—

—আঃ, কি?

—ও সায়েব অমন করচে কেন?

—সবাইকে নমস্কার করচে।

—ও কে বাবা?

—ওই সেই ছোটলাট। কি নাম বলে দিয়েচি?

—মনে নেই বাবা।

—মনে থাকে না কেন খোকা? ভারি অন্যায়। সার—

টুলু খানিকটা ভেবে নিয়ে বললে—উলিয়াম গ্রে—

—উইলিয়াম গ্রে—চলো এবার বাড়ি যাই—

—আর একটু দেখি বাবা—

—আর কি দেখবে? সব তো চলে গেল।

—কোথায় গেল বাবা?

—ইছামতী বেয়ে চূর্ণীতে গিয়ে পড়বে, সেখান থেকে গঙ্গায় পড়বে। তারপর কলকাতায় ফিরবে।

টুলু বাবার কাঁধ থেকে নেমে গুটগুট ক'রে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি চললো। সামনে পেছনে গ্রাম্যলোকের ভিড়। সকলেই কথা বলতে বলতে যাচ্চে। টুলু এমন জিনিস তার ক্ষুদ্র চার বছরের জীবনে আর দেখে নি। সে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েচে আজকার ব্যাপার দেখে। কি বড় কলের নৌকোখানা। কি জলের আছড়ানি ডাঙার ওপরে, নৌকোখানা যখন চলে গেল, কি ধোঁয়া! কেমন সব সাদা সাদা সায়েব!

তিলু বললে—কি দেখলি রে খোকা?

খোকা তখন মার কাছে বর্ণনা করতে বসলো। দু'হাত নেড়ে কত ভাবে সেই আশ্চর্য ঘটনাটি মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে।

নিলু বললে—রাখ্—এখন চল আগে গিয়ে খেয়ে নিবি—আয়—

বিলু নেই। গত আষাঢ় মাসের এক বৃষ্টিধারামুখর বাদলরাত্রে স্বামীর কোলে মাথা রেখে স্বামীর হাত দুটি ধরে তিন দিনের জ্বরবিকারে মারা গিয়েচে।

মৃত্যুর আগে গভীর রাত্রে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—তুমি কে গো?

ভবানী মাথায় বাতাস দিতে দিতে বললে—আমি। কথা বোলো না। চুপটি করে শুয়ে থাকো, লক্ষ্মী—

—একটা কথা বলবো?

—কী?

—আমার ওপর রাগ করনি? শোনো—কত কথা তোমায় বলি নাগর—

—কাঁদচ নাকি? ছিঃ, ও কি?

—খোকনকে আমার পাশে নিয়ে এসে শুইয়ে দ্যাও। দ্যাও না গো?

—আনচি, এই যাই—তিলু তো এই বসে ছিল, দুটো ভাত খেতে গেল এই উঠে—তুমি কথা বোলো না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থাকার পর ভবানীর মনে হোলো বিলুর কপাল বড় ঘামচে। এখন কপাল ঘামচে, তবে কি জ্বর ছেড়ে যাচ্চে? তিলু খেয়ে এলে রামকানাই কবিরাজের কাছে তিনি একবার যাবেন। খানিক পরে বিলু হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে বললে—ওগো, কাছে এসো না—আপনারে তুমি বলচি, আমার পাপ হবে? তা হোক্ বলি, আর বলতি পারবো না তো? তুমি আবার আমার হবে, সামনের জন্মে হবে?—হয়ো, হয়ো—খোকাকে দুধ খাওয়ায় নি দিদি, ডাকো—

—কি সব বাজে কথা বকচো? চুপ ক'রে থাকতে বললাম না?

—খোকন কই? খোকন?

এই তার শেষ কথা। সেই যে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল, যখন খোকনকে নিয়ে এসে তিলু-নিলু ওর পাশে শুইয়ে দিলে, তখন আর ফিরে চায় নি। ভবানী বাঁড়ুয্যে রামকানাই কবিরাজের বাড়ি গেলেন তাঁকে ডাকতে। রামকানাই এসে নাড়ি দেখে বললেন—অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েচে—খোকাকে তুলে নিন মা—

নীলবিদ্রোহ তিন জেলায় সমান দাপটে চললো। সার উইলিয়াম গ্রে সব দেখে গিয়ে যে রিপোর্ট পাঠালেন, নীলকরদের ইতিহাসে সে একখানা বিখ্যাত দলিল। তিন জেলার বহু নীলকুঠি উঠে গেল এর দু'বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ নীলকর সাহেব কুঠি বিক্রি করে কিংবা এদেশী কোনো বড়লোককে ইজারা দিয়ে সাগর পাড়ি দিলে। দু'একটা কুঠির কাজ পূর্ব্ববৎ চলতে লাগলো তবে সে দাপটের সিকিও কোথাও ছিল না।

শেষোক্ত দলের একজন হচ্ছে শিপ্‌টন্ সাহেব। ডেভিড্ সাহেব চলে গিয়েছিল স্ত্রীপুত্র নিয়ে, কিন্তু শিপ্‌টন্ ছাড়বার পাত্র নয়—হরকালী সুরের সাহায্য নিয়ে মিঃ শিপ্‌টন্ কুঠি চালাতে লাগলো আগেকার মত। পুরাতন কর্ম্মচারীরা সবাই আগের মত কাজ চালাতে লাগলো।

নীলকর সাহেবদের বিষদাঁত ভেঙে গিয়েচে আজকাল। আশপাশে কোনো নীলকুঠিতে আর সাহেব নেই, কুঠি বিক্রি করে চলে গিয়েচে। দু'একটা কুঠিতে সাহেব আছে, কিন্তু তারা নীলচাষ করে সামান্য, জমিদারি আছে—তাই চালায়।

এই পল্লীর নিভৃত অন্তরালে পুরনো সাহেব শিপ্‌টন্ পূর্ব্ববৎ দাপটেই কিন্তু কাজ চালাচ্ছিল, ওকে আগের মত ভয়ও করে অনেকে। নীলবিদ্রোহের উত্তেজনা থেমে যাবার পরে সাহেবের প্রতি ভয়-ভক্তি আবার ফিরে এসেছিল। হরকালী সুরও গোঁপে চাড়া দিয়েই বেড়ায়। সাহেব টম্‌টম্ হাঁকিয়ে গেলে এখনো লোক সম্ভ্রমের চোখে চেয়ে দেখে। একদিন শিপ্‌টন্ তাকে ডেকে বললে—ডেওয়ান, এবার ডুর্গা পূজা কবে হইবে?

হরকালী সুর বললেন—আশ্বিন মাসের দিকে, হুজুর।

—এবার কুঠিতে পূজা করো—

—খুব ভাল কথা হুজুর। বলেন তো সব ব্যবস্থা করি—

—যা টাকা খরচ হইবে, আমি দিবে। কবির গান দিটে হইবে।

—আজ্ঞে গোবিন্দ অধিকারীর ভালো যাত্রার দল বায়না ক'রে আসি হুকুম করুন।

—সে কি আছে?

—যাত্রা হুজুর। সেজে এসে, এই ধরুন রাম, সীতা, রাবণ—

—Oh understand, like a theatre. বেশ টুমি ঠিক কর—আমি টাকা দিবে।

—কোথায় হবে?

—হলঘরে হইটে পারে।

—না হুজুর, বড় মাঠে পাল টাঙিয়ে আসর করতে হবে। গোবিন্দ অধিকারীর দল, অনেক লোক হবে।

—টুমি লইয়া আসিবে।

সেবার পূজোর সময় এক কাণ্ডই হোলো গ্রামে। নীলকুঠিতে প্রকাণ্ড বড় দুর্গাপ্রতিমা গড়া হোলো। মনসাপোতার বিশ্বম্ভর ঢুলি এসে তিন দিন বাজালে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা শুনতে সতেরোখানা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়লো।

তিলু স্বামীকে বললে—শুনুন, নিলু যাত্রা দেখতে যাবে বলচে কুঠিতি।

—সেটা কি ভালো দেখায়? মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েচে কিনা—গাঁয়ের আর কেউ যাবে?

—নিস্তারিণী যাবে বলছিল। নালু পালের বৌ তুলসী যাবে ছেলেমেয়ে নিয়ে—

—তারা বড়লোক, তাদের কথা ছেড়ে দাও। নালু পালের অবস্থা আজকাল গ্রামের মধ্যে সেরা। তারা কিসে যাবে?

—বোধ হয় পালকিতি। ওর বড় পালকি, নিলু ওতে যেতে পারে।

—গরুর গাড়ি ক'রে দেবো এখন। তুমিও যেও।

—আমি আর যাবো না—

—না কেন, যদি সবাই যায় তুমিও যাবে—

খোকার ভারি আনন্দ অত বড় ঠাকুর দেখে অমন সুন্দর যাত্রা দেখে। গাঁয়ের মেয়েরা কেউ যাবার অনুমতি পায় নি সমাজপতি চন্দ্র চাটুয্যের ছেলে কৈলাস চাটুয্যের।

হেমন্তের প্রথমে একদিন বিকালে শিপ্‌টন্ সাহেব ডাকালে হরকালী সুরকে। বললে—ডেওয়ান গোলমাল হইলো—

—কি সায়েব?

—এবার নীলকুঠি উঠিলো—

—কেন হুজুর? আবার কোনো গোলমাল—

—কিছু না। সে গোলমাল আছে না। না, এ অন্য গোলমাল আছে। এক ডেশ আছে জার্মানি, টুমি জানে? ও ডেশ হইটে নীল রং ইণ্ডিয়ায় আসিলো, সব দেশে বিক্রয় হইলো।

—সে দেশে কি নীলের চাষ হচ্ছে হুজুর?

—সে কেন? টুমি বুঝিলে না। কেমিক্যাল নীল হইটেছে—আসল নীল নয়, নকল নীল। গাছ হইটে নয়—অন্য উপায়ে—by synthetic process—টুমি বুঝিবে না।

—ভালো নীল?

—চমট্‌কার। আমি সেইজন্যই টোমাকে ডাকাইলাম—এই ডেখো—

হরকালী সুরের সামনে শিপ্‌টন্ একটা নীলরংয়ের বড়ি রেখে দিলে। অভিজ্ঞ হরকালী সেটা নেড়েচেড়ে দেখে সেটার রং পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বললে না।

—ডেখিলে—

—হাঁ সাহেব।

—এ রং চলিলে আমাদের নীল রং কেন লোক কিনিবে?

—এর দাম কত?

শিপ্‌টন্ হেসে বললে—টাহা আগে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন? আমি ভাবিটেছি দেওয়ানের কি মাথা খারাপ হইলো? কত হইটে পারে?

—চার টাকা পাউণ্ড। .

—এক টাকা পাউণ্ড, জোর ডেড় টাকা পাউণ্ড। হোলসেল হাণ্ড্রেড-ওয়েট নাইনটি রুপীজ—নববুই টাকা। আমাদের ব্যবসা একদম gone waste—মাটি হইলো। মারা যাইলো।

হরকালী সুর এ ব্যাপারে অনেকদিন লিপ্ত আছে। নীল সংক্রান্ত কাজে বিষম ঘুণ। সে বুঝে-সুজে চুপ করে গেল। সে কি বলবে? সে ভবিষ্যতের ছবি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

চাষের নীল বাজারে আর চলবে না। খরচ না পোষালে নীলচাষ অচল ও বাতিল হয়ে যাবে। সে ভাবলে—এবার ঘুনি ডাঙায় উঠে যাবে সায়েবের!

সেদিন হেমন্ত অপরাহ্নে বড় সাহেব জেন্‌কিন্‌স্ শিপ্‌টন্ সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিল। রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা, হরিশ মুখুয্যের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ, পাদ্রি লংয়ের আন্দোলন (দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এ সময়ের পরের ব্যাপার), নদীয়া যশোরের প্রজাবিদ্রোহ, সার উইলিয়ম গ্রে'র গুপ্ত রিপোর্ট যে কাজ হাসিল করতে পারে নি, জার্মানি থেকে আগত কৃত্রিম নীলবড়ি অতি অল্প দিনের মধ্যেই তা বাস্তবে পরিণত করলে। কয়েক বছরের মধ্যে নীলচাষ একদম বাংলাদেশ থেকে উঠে গিয়েছিল।

শিপ্‌টন্ সাহেবের মেম বিলাতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। একটিমাত্র মেয়ে, সে সেখানেই তার ঠাকুরদাদার বাড়ি থাকে। শিপ্‌টন্ সাহেব এ দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইলে না।

একদিন নীলকুঠির বড় বারান্দার পাশে ছোট ঘরটাতে শুয়ে শুয়ে ইণ্ডিয়ান কর্ক গাছের সুগন্ধি শ্বেত পুষ্পগুচ্ছের দিকে চেয়ে সে পুরনো দিনের কথা ভাবছিল। অন্য দিনের কথা।

অনেক দূর ওয়েস্টমোর-ল্যাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র পল্লী। কেউ নেই আজ সেখানে। বৃদ্ধা মাতা ছিলেন, কয়েক বৎসর আগে মারা গিয়েছেন। এক ভাই অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, ছেলেপুলে নিয়ে।

তাদের গ্রামের সেই ছোট হোটেল—আগে ছিল একটা সরাইখানা, উইলিয়ম রিটস্‌ন্ ছিল ল্যাণ্ডলর্ড তখন—কত লোকের ভিড় হোতো সেখানে! ল্যাণ্ডেল পাইক্‌স আর গ্রেট গেবল্

সামনে পড়তো... পনেরোশো ফুট উঁচু পাহাড়...ঐ সরাইখানায় কি ভিড় জমতো যারা পাহাড় দুটোতে উঠবে তাদের...

জলের ধারে উইলো আর মাউন্টেন সেজ—বরোডেল গ্রামের পাশ কাটিয়ে বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে চলে গেল পথটা—কতবার ছেলেবেলায় মস্ত একটা বড় কুকুর সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে একা গিয়েচে বেড়াতে।—একটা বড় জলাশয়ে মাছ ধরতেও গিয়েচে কতদিন—এল্‌টার ওয়াটার—নামটা কত পুরনো শোনাচ্চে যেন। এল্‌টার ওয়াটার—এত বড় বড় পাইক আর স্যামন মাছ—কি মজা করেই ধরতো—রাইনোজ পাস যখন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েচে, তখন মাছ ঝুলিয়ে হাতে করে আসচে এল্‌টার ওয়াটার থেকে—পেছনে পেছনে আসচে ভালো ব্রীডের গ্রেট ডেন কুকুরটা, মনে পড়ে—The eagle is screamin' around us, the river's a-moanin' below—

গ্রাম্য ছড়া। এ্যান্ডি গাইত ছেলেবেলায়। মাছ ধরতে বসে এল্‌টার ওয়াটারের তীরে সে নিজেও কতবার গেয়েচে!

পুরানো দিনের স্বপ্ন—

—গয়া, গয়া?

গয়া এসে বলে—কি সায়েব?

—কাছে বসিয়া থাকো ডিয়ারি—what have you been up to all day ? কোথায় ছিলে? কি করিটেছিলে?

—বসে আছি তো। কি আবার করবো।

—If I die here—যদি মরিয়া যাই টুমি কি করিবে?

—ও কি কথা? অমন বলে না, ছিঃ—

—টোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই কিন্টু রাখিবে কোথায়? চুরি ডাকাটি হইয়া যাইবে।

শিপ্‌টন্ সাহেব হিঃ হিঃ ক'রে হেসে উঠলো, বললে—একটা গান শোনো গয়া—listen carefully to the word—কঠা শুনিয়া যাও। Modern, you know ?

গয়া বললে—আঃ, কি গাও না? কটর-মটর ভালো লাগে না—

—Well, শোনো—

Yes, Yes, the arm-y
How we love the arm-y
When the swallows come again
See them fly—the arm-y

গয়া কানে আঙুল দিয়ে বললে—ওঃ বাবা, কান গেল, অত চেঁচায় না। ওর নাম কি সুর!

সাহেব বললে—ভালো লাগিল না! আচ্ছা টুমি একটা গাও—সেই যে—টোমার বডন চাঁদে যদি ঢরা নাহি পাবো—

—না সায়েব। গান এখন থাক।

—গয়া—

—কি?

—আমি মরিলে টুমি কি করিবে?

—ওসব কথা বলে না, ছিঃ—

—No, I am no milksop, I tell you—আমি কাজ বুঝি। নীলকুঠির কাজ শেষ হইলো। আমি চলিয়া যাইব, না এখানে ঠাকিব?

—কোথায় যাবে সায়েব? এখানেই থাকো।

—টুমি আমার কাছে ঠাকিবে?

—থাকবো সায়েব।

—কোঠাও যাইবে না?

—না, সায়েব।

—ঠিক? May I take it as a pledge? ঠিক মনের কঠা বলিলে?

—ঠিক বলচি সাহেব। চিরকাল তোমার কাছে আছি, অনেক খাইয়েচ মাখিয়েচ—আজ তোমার অসময়ে তোমারে ফেলে কনে যাবো? গেলি ধম্মে সইবে, সায়েব!

গয়ামেমকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শিপ্‌টন্ বললে—Oh, my dear, dearie—you are not afraid of the Big Bad Wolf—I call it a brave girl!

নিস্তারিণী নাইতে নেমেছিল ইছামতীর জলে। কূলে কূলে ভরা ভাদ্রের নদী, তিৎপল্লার বড় বড় হলুদ ফুল ঝোপের মাথা আলো করেচে, ওপারের চরে সাদা কাশের গুচ্ছ দুলচে সোনালী হাওয়ায়, নীল বনকলমীর ফুলে ছেয়ে গিয়েচে সাঁইবাবলা আর কেঁয়ে-ঝাঁকার জঙ্গল, জলের ধারে বনকচুর ফুলের শিষ, জলজ চাঁদা ঘাসের বেগুনী ফুল ফুটে আছে তটপ্রান্তে, মটরলতা দুলচে জলের ওপরে, ছপাৎ ছপাৎ করে ঢেউ লাগচে জলে অর্ধমগ্ন বন্যেবুড়ো গাছের ডালপালায়।

কেউ কোথাও নেই দেখে নিস্তারিণীর বড় ইচ্ছে হোলো ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে। খরস্রোতা ভাদ্রের নদী, কুটো পড়লে দুখানা হয়ে যায়—কামট কুমীরের ভয়ে এ সময়ে কেউ নামতে চায় না জলে। নিস্তারিণী এসব গ্রাহ্যও করে না, ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দেওয়ার আরাম যে কি, যারা কখনো তা আস্বাদ করে নি, তাদের নিস্তারিণী কি বোঝাবে এর মর্ম? তুমি চলেচ স্রোতে নীত হয়ে ভাটির দিকে, পাশে পাশে চলেচে কচুরিপানার ফুল, টোকাপানার দাম, তেলাকুচো লতার টুকটুকে পাকা ফল সবুজের আড়াল থেকে উঁকি মারচে, গাঙশালিখ পানা-শেওলার দামে কিচকিচ করচে—কি আনন্দ! মুক্তির আনন্দ! নিয়ে যাবে কুমীরে, গেলই নিয়ে! সেও যেন এক অপূর্বতর, বিস্তৃততর মুক্তির আনন্দ!

অনেকদূর এসে নিস্তারিণী দেখলে গাঁয়ের ঘাটগুলো সব পেরিয়ে এসেচে। সামনের কিছুদূরে পাঁচপোতা গ্রাম শেষ হয়ে ভাসানপোতা গ্রামের গয়লাপাড়ার ঘাট। ডাইনে বনাবৃত তীরভূমি, বাঁয়ে ওপারে পটলের ক্ষেত, ঝিঙের ক্ষেত—আরামডাঙার চাষীদের। সে ভুল করেচে, এতদূর আসা উচিত হয় নি একা একা। কে কি বলবে! এখন খরস্রোতা নদীর উজানে স্রোত ঠেলে সাঁতার দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় আর এগনোও উচিত নয়। দক্ষিণ তীরের বনজঙ্গলের মধ্যে নামা যুক্তিসঙ্গত হবে কি? হেঁটে বাড়ি যেতে হবে ডাঙায় ডাঙায়। পথও তো সে চেনে না।

সাঁতার দিয়ে ডাঙার দিকে সে এল এগিয়ে। বন্যেবুড়ো গাছের সারি সেখানে নত হয়ে

পড়েচে নদীর জলের উপর ঝুঁকে, গাছপালায় লতায় পাতায় নিবিড়তর জড়াজড়ি, বন্য বিহঙ্গের দল জুটে কিচ্ কিচ্ করচে ঝোপের পাকা তেলাকুচো ফল খাওয়ার লোভে। বনের মধ্যে শুকনো পাতার ওপর কিসের খস্‌খস্ শব্দ—কি একটা জানোয়ার যেন ছুটে পালালো, বোধ হয় খেঁকশিয়ালী।

ডাঙায় ওঠবার আগে হাতে বাউটি জোড়া উঠিয়ে নিলে কব্জির দিকে, সিক্ত বসন ভালো ক'রে এঁটে পরে, কালো চুলের রাশ কপালের ওপর থেকে দু'পাশে সরিয়ে যখন সে ডান পা-খানা তুলেচে বালির ওপর, অমনি একটা ঝিনুকের ওপর পা পড়লো ওর। ঝিনুকটা সে পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে শক্ত ক'রে মুঠি বেঁধে নিলে। তারপর ভয়ে ভয়ে বনের মধ্যেকার সুঁড়ি-পথ দিয়ে বিছুটিলতার কর্কশ স্পর্শ গায়ে মেখে, সেয়াকুল-কাঁটায় শাড়ির প্রান্ত ছিঁড়ে অতিকষ্টে এসে সে গ্রাম-প্রান্তের কাওরাপাড়ার পথে পা দিলে। কাওরাদের বাড়ির ঝি-বৌয়ের দল ওর দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলে। খানিকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতেও বটে। ব্রাহ্মণপাড়ার বৌ, একা কোথায় এসেছিল এতদূর? ভিজে কাপড়, ভিজে চুলে?

বাড়ি পৌঁছে নিস্তারিণী দেখলে বাড়িতে ও পাড়ায় গোলমাল চলেচে, কান্নাকাটির রব শোনা যাচ্চে তার শাশুড়ীর, পিসশাশুড়ীর। সে জলে ডুবে গিয়েচে বা তাকে কুমীরে নিয়ে গিয়েচে এই হয়েচে সিদ্ধান্ত। ফিরতে দেরি হচ্চে দেখে যারা স্নানের ঘাটে ওকে দৌড়ে দেখতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে বলেচে কোনো চিহ্নই ওর নেই কোনো দিকে। ওকে দেখে সবাই খুব খুশি হোলো। শাশুড়ী এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন। প্রতিবেশিনীরা এসে স্নেহের অনুযোগ করলে কত রকম।

ভাত খাওয়ার পরে ননদ সুধামুখীকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের পেছনের কুলতলায় সেই ঝিনুকখানা খুললে নিস্তারিণী। ঝিনুকের শাঁক দুজনে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে লাগলো। এসব গাঁয়ের সকলেই দেখে ঝিনুক পেলে। কুলের বীচির মত জিনিস হাতে ঠেকলো ওর।

—কি রে ঠাকুরঝি, এটা দ্যাখ তো?

—ওরে, এ ঠিক মুক্তো।

—দূর—

—ঠিক বলচি বৌদিদি। মাইরি মুক্তো।

—তুই কি করে জানলি মুক্তো?

—চ দেখাবি মাকে।

—না ভাই ঠাকুরঝি, এসব কাউকে দেখাস নে।

—চল না, তোর লজ্জা কিসের?

পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল এ বাড়ির বৌ ইছামতীতে দামী মুক্তো পেয়েচে ইছামতীর জলে। চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে দিনকতক এ কথা ছাড়া আর অন্য কথা রইল না। একদিন বিধু স্যাকরা এসে মুক্তোটা দেখেশুনে দর দিলে ষাট টাকা। নিস্তারিণীর স্বামী কখনো এত টাকা একসঙ্গে দেখে নি। বিধু স্যাকরা মুক্তোটা নিয়ে চলে যাবার কিছু আগে নিস্তারিণীর কি মনে হোলো, সে বললে—এ মুক্তো আমি বেচবো না—

সেইদিনই একজন মুসলমান ওদের বাড়ি এসে মুক্তোটা দেখতে চাইলে। দেখেশুনে দাম দিলে একশো টাকা। নিস্তারিণী তবুও মুক্তো বিক্রি করতে চাইলে না।

এদিকে গাঁয়ের মধ্যে হুলুস্থূল। অমুকের বৌ একশো টাকা দামের মুক্তো পেয়েছে ইছামতীর জলে। একশো টাকা একসঙ্গে কে দেখেছে পাঁচপোতা গ্রামের মধ্যে? ভাগ্যিটা বড় ভালো ওদের। বৌয়ের দল ভিড় ক'রে ওর কপালে সিঁদুর দিতে এল, ওর শাশুড়ী নরহরিপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরে মানতের পূজো দিয়ে এল। এ পাকা কলা পাঠিয়ে দেয়, ও পেঁপে পাঠিয়ে দেয়।

তিলুর সঙ্গে একদিন নিস্তারিণী দেখা করতে এলো। মুক্তোটা সে নিয়েই এসেছে। খোকা সেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি এটা?

—মুক্তো।

—মুক্তো কি মা?

—ঝিনুকের মধ্যি থাকে।

নিস্তারিণী খোকাকে কোলে নিয়ে বললে—ওকে আমি এটা দিয়ে দিতে পারি, দিদি।

—না, ও কি করবে ওটা ভাই?

—সত্যি, দেবো? ওর মুখ দেখলি আমি যেন সব ভুলে যাই।

তিলু নিস্তারিণীকে অতি কষ্টে নিবৃত্ত করলে। নিস্তারিণী খুব সুন্দরী নয় কিন্তু ওর দিক থেকে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। গ্রাম্যবধূর লজ্জা ও সংকোচ ওর নেই, অনেকটা পুরুষালি ভাব, ছেলেবেলায় গাছে চড়তে আর সাঁতার দিতে পটু ছিল খুব। ওর আর একটা দোষ হচ্ছে কাউকে বড় একটা ভয় করে না, শাশুড়ীকে তো নয়ই, স্বামীকেও নয়।

তিলু ওকে ভালবাসে। এই সমস্ত গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্খ, ভীরু গতানুগতিকতা এই অল্পবয়সী বধূকে তার জালে জড়াতে পারে নি। এ যেন অন্য যুগের মেয়ে, ভুল ক'রে অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে এসে জন্মেছে।

তিলু বললে—কিছু খাবি?

—না।

—খই আর শসা?

—দ্যাও দিনি। বেশ লাগে।

এই নিস্তারিণীকেই একদিন তিলু অদ্ভুতভাবে নদীর ধারে আবিষ্কার করলে ঝোপের আড়ালে রায়পাড়ার কৃষ্ণকিশোর রায়ের ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে গোপনীয় আলাপে মত্ত অবস্থায়।

তিলু গিয়েছিল খোকাকে নিয়ে নদীতে গা ধুতে। বিকেলবেলা হেমন্তের প্রথম, নদীর জল সামান্য কিছু শুকুতে আরম্ভ করেছে, শুকনো কালো ঘাসের গন্ধে বাতাস ভরপুর, নদীর ধারের পলিমাটির কাদায় কাশফুল উড়ে পড়ে বীজসুদ্ধ আটকে যাচ্ছে, নদীর ধারে ছাতিম গাছটাতে থোকা থোকা ছাতিম ফুল ফুটে আছে, সপ্তপর্ণ পুষ্পের সুরভি ভুর ভুর করচে হেমন্ত অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ও একটুখানি ঠাণ্ডার আমেজ লাগা বাতাসে।

এই সময় ভবানী স্ত্রী ও খোকার সঙ্গে নদীর ধারে প্রায়ই যান। নদীতে এই শান্ত, শ্যাম পরিবেশের মধ্যে ভগবানের কথা খুব জমে। সেদিনও ভবানী আসবেন। তাঁর মত এই, খোকাকে নির্জনে এই সময় বসে বসে ভগবানের কথা বলতে হবে। ওর মন ও চোখ ফোটাতে হবে, উদার নীল আকাশের তলে বননীল দিগন্তের বাণী শুনিয়ে। ভবানী এলেন একটু পরে।

তিলু বললে—এই শ্লোকটা বুঝিয়ে দিন।

—সেই প্রশ্নোপনিষদেরটা? সে এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি?

—হুঁ।

—তিনি যজমানকে প্রতিদিন ব্রহ্মভাব আস্বাদ করান।

—তিনি কে?

—ভগবান।

—যজমান কে?

—যে তাঁকে ভক্তিপূর্বক উপাসনা করে।

—এখানে মনই যজমান, এরকম একটা কথা আগে আছে না?

—আছেই তো—ও কারা কথা বলচে? ঝোপের মধ্যে? দাঁড়াও—দেখি—

—এগিয়ে যাবেন না। আগে দেখুন কি—আমিও যাবো?

ওরা গিয়ে দেখলে নিস্তারিণী আর গোবিন্দ ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে একমনে আলাপে মত্ত—এবং দেখে মনে হচ্ছিল না যে ওরা উপনিষদ বা বেদান্তের আলোচনা করছিল নিভৃতে বসে। কারণ গোবিন্দ ডান হাতে নিস্তারিণীর নিবিড়কৃষ্ণ কেশপাশ মুঠি বেঁধে ধরেচে, বাঁ হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি বলছিল। নিস্তারিণী ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে ওর মুখের দিকে হাসি-হাসি মুখে চোখ তুলে চেয়েছিল।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে নিস্তারিণী মুখ ফিরিয়ে ওদের দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। গোবিন্দ বনের মধ্যে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। ভবানী বাঁড়ুয্যে পিছু হঠে চলে এলেন। নিস্তারিণী অপরাধীর মত মুখ নীচু করে রইল তিলুর সামনে। তিলু বনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—কে ওখানে চলে গেল রে? এখানে কি করচিস?

নিস্তারিণীর মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। সে কোনো উত্তর দিলে না।

—কে গেল রে? বল্ না?

—গোবিন্দ।

—তোর সঙ্গে কি?

নিস্তারিণী নিরুত্তর।

—আর বাড়ি থেকে এতখানি এসে এই জঙ্গলের মধ্যি—বাঃ রে মেয়ে!

—আমার ভালো লাগে।

নিস্তারিণী অত্যন্ত মৃদুস্বরে উত্তর দিলে।

তিলু রাগের সুরে বললে—মেরে হাড় ভেঙে দেবো, দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! ভালো লাগাচ্চি তোমার? উনি এসেছেন নদীর ধারে এই বনের মধ্যি আধকোশ তফাত বাড়ি থেকে—কি, না ভালো লাগে আমার! সাপে খায় কি বাঘে খায়, তার ঠিক নেই। ধিঙ্গি মেয়ে, বলতি লজ্জা করে না? যা—বাড়ি যা—

ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুর ক্রোধব্যঞ্জক স্বর শুনে দূর থেকে বললেন—ওগো চলে এসো না—

তিলু তার উত্তর দিলে—থামুন আপনি।

নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে বললে—তোর একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই, এখুনি যে গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাবে! মুখ দেখাবি কেমন করে, ও পোড়ারমুখী?

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

—আয় আমার সঙ্গে—চল্—পোড়ারমুখী কোথাকার! গুণ কত? সে মুক্তোটা আছে, না এর মধ্যি গোবিন্দকে দিয়েছিস?

—না। সেটা শাশুড়ীর কাছে আছে।

—আয় আমার সঙ্গে। বিছুটির লতার মধ্যি এখানে বসে আছে দুজনে! তোর মতো এমন নির্বোধ মেয়ে আমি যদি দুটি দেখেচি—কুন্তীঠাকরুন যদি একবার টের পায়, তবে গাঁয়ে তোমারে তিষ্ঠুতে দেবে?

—না দেয়, ইছামতীর জল তো তার কেউ কেড়ে নেয় নি!

—আবার সব বাজে কথা বলে! মেরে হাড় ভেঙে দেবো বলে দিচ্চি—মুখের ওপর আবার কথা? চল—ডুব দিয়ে নে নদীতে একটা। চল, আমি কাপড় দেবো এখন।

তিলু ওকে বাড়ি নিয়ে এসে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কাপড় পরালে। কিছু খাবার খেতে দিলে। ওকে কথঞ্চিৎ সুস্থ ক'রে বললে—কতদিন থেকে ওর সঙ্গে দেখা করচিস?

—পাঁচ-ছ' মাস।

—কেউ টের পায় নি?

—নুকিয়ে ওই বনের মধ্যি ও-ও আসে, আমিও আসি।

—বেশ কর! বলতি একটু মুখি বাধচে না ধিঙ্গি মেয়ের? আর দেখা করবি নে বল্?

—আর দেখা না করলি ও থাকতি পারবে না।

—ফের্! তুই আর যাবি নে, বুঝলি?

—হুঁ।

—কি হুঁ? যাবি, না যাবি নে?

নিস্তারিণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বললে—গোবিন্দ আমাকে একটা জিনিস দিয়েচে—

—কি জিনিস?

—নিয়ে এসে দেখাবো? কানে পরে, তাকে মাক্‌ড়ি বলে—

—কোথায় আছে?

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বললে—আমার কাছেই আছে—আঁচলে বাঁধা আছে আমার এই ভিজে শাড়ির। আজই দিয়েচে নতুন গয়না। ওরকম এ গাঁয়ে আর কারো নেই। কলকেতা শহরে নতুন উঠেচে। ও গড়িয়ে এনে দিয়েচে। ওর মামাতো ভাই—কলকেতায় কোথায় যেন কাজ করে।

নিস্তারিণী নিয়ে এসে দেখালে নতুন গয়না ভিজে কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে এনে। তিলু উল্টেপাল্টে দেখে বললে—নতুন জিনিস, ভালো জিনিস। কিন্তু এ জিনিস নিতি পারবি নে। এ তোকে ফেরত দিতি হবে। ফেরত দিয়ে বলবি, আর কখনো দেখা হবে না। এবার আমি এ কথা চেপে দেবো। আর তো কেউ দেখে নি, আমরাই দেখেচি। কারুরি বলতে যাবো না আমরা। কিন্তু তোমারে একরম মহাপাপ করতি দেবো না কিন্তু। স্বামীকে ভালো লাগে না তোমার?

স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে—

নিস্তারিণী মুখ নিচু ক'রে বললে—সে আমায় ভালোবাসে না—

—মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো। ভালোবাসবে কি ক'রে? উনি এখানে ওখানে—

—তা না। আগে থেকেই। সে এ সব কিছু জানে না।

—স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে এসব করতি মনে মায়া হয় না?

—তুমি দিদি স্বামী পেয়েচ শিবির মত। অমন শিবির মত স্বামী আমরা পেলি আমরাও অমন কথা বলতাম। আহা—তিনি যে গুণবান! একখানা কাপড় চেয়েছিলাম বলে কি বকুনি, যেমন শাশুড়ীর, তেমনি সেই গুণবানের। বাপের বাড়ির একজোড়া গুজরীপঞ্চম ছিল, তা সেবার বাঁধা দিয়ে নালু পালের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল—আজও ফিরিয়ে আনার নাম নেই। এত বলি, কথা শোনে না। আনবে কোথা থেকি? ঐ তো সংসারের ছিরি! ধান এবার হয় নি, যা হয়েছিল তিনটে মাস টেনেটুনে চলেছিল। ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে দিয়ে কোমরে বাত ধরবার মত হয়েচে। এত করেও মন পাবার জো নেই কারো। কেন আমি থাকবো অমন শ্বশুরবাড়ি, বলে দাও তো দিদি।

সুন্দরী বিদ্রোহিনীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেচে। মুখে একটি অদ্ভুত গর্ব ও যৌবনের দীপ্তি, নিবিড় কেশপাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে সারা পিঠ জুড়ে। বড় মায়া হোলো এই অসমসাহসী বধূটির ওপর তিলুর। গ্রামে কি হুলুস্থূল পড়ে যাবে জানাজানি হয়ে গেলে এ কথা...তা এ কিছুই জানে না।

অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে তিলু ওকে সন্দের আগে নিজে গিয়ে ওদের বাড়ি রেখে এল। বলে এল, তার সঙ্গে নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিল, এতক্ষণ তাদের বাড়ি বসেই গল্প করছিল। শাশুড়ী সন্দিগ্ধ সুরে বললেন—ওমা, আমরা দু'দুবার নদীর ঘাটে খোঁজ নিয়ে এ্যালাম—এ পাড়ার সব বাড়ি খোঁজলাম...বৌ বটে বাবা বলিহারি! বেরিয়েচে তিন পহর বেলা থাকতি আর এখন সন্দের অন্ধকার হোলো, এখন ও এল। আর কি বলবো মা, ভাজা ভাজা হয়ে গ্যালাম ও বৌ নিয়ে। আবার কথায় কথায় চোপা কি!

নিস্তারিণী সামান্য নিচু সুরে অথচ শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—হ্যাঁ, তোমরা সব গুণের গুণমণি কিনা? তোমাদের কোনো দোষ নেই...থাকতি পারে না—

—শুনলে তো মা, শুনলে নিজের কানে? কথা পড়তি তস্ সয় না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চোপা!

বৌ বললে—বেশ।

তিলু ধমক দিয়ে বললে—ও কি রে? ছিঃ—শাশুড়ীকে অমন বলতি আছে?

সন্দের দেরি নেই। তিলু বাড়ি চলে গেল। বাঁশবনের তলায় অন্ধকার জমেচে, জোনাকী জ্বলচে কালকাসুন্দে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।

এসে ভবানীকে বললে—দিন বদলে যাচ্চে, বুঝলেন? নিস্তারিণীর ব্যাপার দেখে বুঝলাম। কখনো শুনি নি ভদ্দরঘরের বৌ বনের মধ্যে বসে পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করে। আমাদের যখন প্রথম বিয়ে হোলো, আপনার সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম ছিল না দিনমানে। এ গাঁয়ে এখনো তা নিয়ম নেই। অল্পবয়সী বৌরা দুপুর রাত্তিরি সবাই ঘুমুলি তবে স্বামীর ঘরে যায়—এখনো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—আমি বলেছিলাম না তোমাকে, খোকা তার বৌ নিয়ে এই গাঁয়ের রাস্তায় দিনমানে পাশাপাশি বেড়াবে—

—ওমা, বল কি?

—ঠিক বলচি। সেদিন আসচে। তোমাদের ওই বৌটিকে দিয়েই দেখলে তো। দিনকাল বড্ড বদ্‌লাচ্চে।

প্রসন্ন চক্কত্তি আজকাল গয়ামেমের দেখা বড় একটা পায় না। মেমসাহেব চলে যাওয়ার পরে গয়া একরকম স্থায়ীভাবেই বড় সাহেবের বাংলোয় বাস করচে। যদি বা বাইরে আসে, পথেঘাটে দেখা মেলে কখনো-সখনো, আগের মত যেন আর নেই। আবার কখনো কখনো আছেও। খামখেয়ালী গয়া-মেমের কথা কিছু বলা যায় না। মন হোলো তো প্রসন্ন চক্কত্তির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কত গল্পই করলে! খেয়াল না হোলো, ভালো কথাই বললে না।

নীলকুঠির কাজ খুব মন্দা। নীলের চাষ ঠিকই হচ্চে বা হয়ে এসেচেও এতদিন। প্রজারা ঠিক আগের মতই মানে বড় সাহেবকে বা দেওয়ানকে। কিন্তু নীলের ব্যবসাতে মন্দা পড়েচে। মজুদ নীল বাইরের বাজারে আর তেমন কাটে না। দাম এত কম যে খরচ পোষায় না। আর বছরের অনেক নীল গুদামে মজুদ রয়েছে কাটতির অভাবে। নীলকুঠির চাকরিতে আর আগের মত জুত নেই, কিন্তু এরা এখন নতুন চাকরি পাবেই বা কোথায়। বড় সাহেব নীলকুঠি থেকে একটি লোককেও বরখাস্ত করে নি, মাইনেও ঠিক আগের মত দিয়ে যাচ্চে কিন্তু তেমন উপরি পাওনা নেই ততটা, হাঁকডাক কমে গিয়েচে, নীলকুঠির চাকরির সে জলুস অন্তর্হিতপ্রায়।

শ্রীরাম মুচি একদিন প্রসন্ন চক্কত্তিকে বললে—ও আমীনবাবু, আমার জমিটা আমাকে দিয়ে দিতি বলেন সায়েবকে।

—বলবো। সব চাকরদের জমি দিচ্চে নাকি?

—বড় সায়েব বলেচে, ভজা, নফর আর আমাকে জমি দিতি। আপনি মেপে কুঠির খাসজমি থেকে বিঘে করে জমি এক এক জনকে দিয়ে দেবেন।

—সায়েবের হুকুম পেলেই দেবো। আমরা পাবো না?

—আপনি বলে নিতি পারেন সায়েবকে। শুধু চাকর-বাকরকে দেবে বলেচে। আপনাদের দেবে না, গয়ামেমকে দেবে পনেরো বিঘে।

—অ্যাঁ, বলিস কি?

—সে পাবে না তো কি আপনি পাবা? সে হোলো পেয়ারের লোক সায়েবের।

ঠিক দুদিন পরে দেওয়ান হরকালী সুর পরোয়ানা পেলেন বড় সাহেবের—গয়ামেমের জমি আমীনকে দিয়ে মাপিয়ে দিতে। আমীনকে ডাকিয়ে বলে দিলেন। গয়ামেম নিজের চোখে গিয়ে জমি দেখে নেবে।

—কোন্ জমি থেকে দেওয়া হবে?

—বেলেডাঙার আঠারো নম্বর থাক নক্সা দেখুন। ধানী জমি কতটা আছে আগে ঠিক করুন।

—সেখানে মাত্র পাঁচ বিঘে ধানের জমি আছে দেওয়ানজি। আমি বলি ছুতোরঘাটার কোল থেকে নতিডাঙার কাঠের পুল পজ্জন্ত যে টুকরো আছে, শশী মুচির বাজেয়াপ্তী জমির দরুন—

তাতে জলি ধান খুব ভালো হয়। সেটা ও যদি নেয়—

হরকালী সুর চোখ টিপে বললেন—আঃ, চুপ করুন!

—কেন বাবু?

—খাসির মাথার মত জমি। সায়েব এর পরে খাবে কি? নীলকুঠি তো উঠে গেল। ও জমিতি ষোল মণ আঠারো মণ উড়ি ধানের ফলন। সায়েব খাসখামারে চাষ করবে এর পরে। গয়াকে দেবার দায় পড়েছে আমাদের। না হয়, এর পর আপনি আর আমি ও জমি রাখবো।

হায় মূর্খ বৈষয়িক হরকালী সুর, প্রণয়ের গতি কি ক'রে বুঝবে তুমি?

তার পরদিনই নিমগাছের তলায় দুপুরবেলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রসন্ন চক্কত্তি গয়ামেমের সাক্ষাৎ পেলে। গয়া কোনো দিন সাহেবের বাংলোয় ভাত খায় না—খাওয়ার সময় নিজেদের বাড়িতে মায়ের কাছে গিয়ে খায়। আর একটা কথা, রাতে সে কখনো সাহেবের বাংলোয় কাটায় নি, বরদা নিজে আলো ধরে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যায়।

গয়া বললে—কি খুড়োমশাই, খবর কি?

—দেখাই তো আর পাই নে। ডুমুরের ফুল হয়ে গিয়েচ।

গয়ামেম হেসে প্রসন্ন আমীনের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—কেন এমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন এখেনে দুপুরের রদ্দুরি?

—তোমার জন্যি।

—যান, আবার সব বাজে কথা খুড়োমশায়ের।

—পাঁচ দিন দেখি নি আজ।

—এ পোড়ারমুখ আর নাই বা দেখলেন।

—তার মানে?

—আপনাদের কোন্ কাজে আর লাগবো বলুন।

—আচ্ছা গয়া...

—কি?

বলেই গয়া মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে চলে যেতে উদ্যত হোলো।

প্রসন্ন ব্যস্ত হয়ে বললে—শোনো শোনো, চললে যে? কথা আছে।

গয়া যেতে যেতে থেমে গেল, পেছন ফিরে প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে চেয়ে বললে—আপনার কথা খুড়োমশাই শুধু হেনো আর তেনো। শুধু তোমাকে দেখতি ভালো লাগে আর তোমার জন্যি দাঁড়িয়ে আছি আর তোমার কথা ভাবছি—এই সব বাজে কথা। যত বলি, খুড়োমশাই বলে ডাকি, আমারে অমন বলতি আছে আপনার? অমন বলবেন না। ততই মুখির বাঁধন দিন দিন আলগা হচ্চে যেন!

প্রসন্ন চক্কত্তি হেসে বললে—কোথায় দেখলে আলগা? কি বলিচি আমি?

—শুধু তোমারে দেখতি ভালো লাগে, তোমাকে কতকাল দেখি নি, তোমারে না দেখলি থাকতি পারি নে—

—মিথ্যে কথা একটাও না।

—যান বাসায় যান দিনি। এ দুপুরবেলা রদ্দুরি দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভারি দুক্‌খু হবে আমার—

—সত্যি গয়া, সত্যি তোমার দুক্‌খু হবে? ঠিক বলচো গয়া?

—হ্‌বে, হবে, হবে। বাসায় যান, পাগলামি করবেন না পথে দাঁড়িয়ে—

—একটা কথা—

—আবার একটা কথা আর একটা কথা, আর ও গয়া শোনো আর একটু, ও গয়া এখানটায় বসে একটু গল্প করা যাক—

—না। ও কথা না—

—কি তবে? হাতী না ঘোড়া?

—ও সব কথাই না। মাইরি বলচি গয়া। শোনো খুব দরকারি কথা তোমার পক্ষে। কিন্তু খুব লুকিয়ে রাখবে, কেউ যেন না শোনে—

এই দেখাশোনার কয়েক দিনের মধ্যে প্রসন্ন চক্কত্তি শশী মুচির বাজেয়াপ্তী জমির মধ্যে উৎকৃষ্ট জলি ধানের পনেরো বিঘে জমি গয়ামেমকে মেপে শ্রীরাম মুচিকে দিয়ে খোঁটা পুতিয়ে সীমানায় বাবলা গাছের চারা পুঁতে একেবাতে পাকা ক'রে গয়াকে দিয়ে দিলে। গয়া মাঠে উপস্থিত ছিল। একটা ডুমুর গাছ দেখে গয়া বললে—খুড়োমশাই, ওই ডুমুর গাছটা আমার জমিতি ক'রে দ্যান না? ডুমুর খাবো—

—যদি দিই, আমার কথা মনে থাকবে গয়া—

—হি হি—হি হি—ওই আবার শুরু হোলো।

—সোজা কথাডা বললি কি এমন দোষ হয়ে যায়? কথাডার উত্তর দিতি কি হচ্ছে? ও গয়া—

—হি হি হি—

—যাক গে। মরুক গে। আমি কিছুটি আর বলচি নে। দিলাম চেন ঘুরিয়ে, ডুমুর গাছ তোমার রইল।

—পায়ের ধুলো নেবো, না নেবো না? বেরাহ্মণ দেবতা, তার ওপর খুড়োমশাই। কত পাপ যে আমার হবে।

গয়া এগিয়ে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে দূর থেকে। কি প্রসন্ন হাসি ওর মুখের! কি হাসি! কচি ডুমুর গাছটা এখনো কতকাল বাঁচবে। প্রসন্ন চক্কত্তি আমীনের আজকার সুখের সাক্ষী রইল ওই গাছটা। প্রসন্ন আমীন মরে যাবে কিন্তু আজ দুপুরের ওই কচিপাতা-ওঠা গাছটার ছায়ায় যাদের অপরূপ সুখের বার্তা লেখা হয়ে গেল, চাঁদের আলোয় যাদের চোখের জল চিকচিক করে, ফাল্গুন-দুপুরে গরম বাতাসে যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়—তাদের মনের সুখ-দুঃখের কথা পঞ্চাশ বছর পরে কেউ আর মনে রাখবে কি?

মাস কয়েক পরের কথা।

ভবানী ছেলেকে নিয়ে ইছামতীর ধারে বনসিমতলার ঘাটের বাঁকে বসে আছেন। বেলা তিন প্রহর এখনো হয় নি, ঘন বনজঙ্গলের ছায়ায় নিবিড় তীরভূমি পানকৌড়ি আর বালিহাঁসের ডাকে মাঝে মাঝে মুখর হয়ে উঠচে। জেলেরা ডুব দিয়ে যে সব ঝিনুক আর জোংড়া তুলেছিল গত শীতকালে, তাদের স্তূপ এখনো পড়ে আছে ডাঙায় এখানে ওখানে। বন্যলতা দুলচে জলের ওপর বাবলাগাছ ও বন্য যজ্ঞিডুমুর গাছ থেকে। কাকজঙ্ঘার থোলো থোলো রাঙা ফল সবুজ

পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে।

ভবানী বললেন—খোকা, আমি যদি মারা যাই, মাদের তুই দেখবি?

—না বাবা, আমি তাহলে কাঁদবো।

—কাঁদবি কেন, আমার বয়েস হয়েছে, আমি কতকাল বাঁচবো।

—অনেকদিন।

—তোর কথায় রে? পাগলা একটা—

খোকা হি হি ক'রে হেসে উঠলো। তারপরেই বাবাকে এসে জড়িয়ে ধরলে ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে। বললে—আমার বাবা—

—আমার কথা শোন। আমি মরে গেলে তুই দেখবি তোর মাদের?

—না। আমি কাঁদবো তাহলে—

—বল দিকি ভগবান কে?

—জানি নে।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—উই ওখেনে—

খোকা আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলে।

—কোথায় রে বাবা, গাছের মাথায়?

—হুঁ।

—তাঁকে ভালোবাসিস?

—না।

—সে কি রে! কেন?

—তোমাকে ভালোবাসি।

—আর কাকে?

—মাকে ভালোবাসি।

—ভগবানকে ভালোবাসিস্ নে কেন?

—চিনি নে।

—খোকা, তুই মিথ্যে কথা বলিস নি। ঠিক বলেচিস। না চিনে না বুঝে কাউকে ভালোবাসা যায় না। চিনে বুঝে ভালোবাসলে সে ভালোবাসা পাকা হয়ে গেল। সেই জন্যেই সাধারণ লোকে ভগবানকে ভালোবাসতে পারে না। তারা ভয় করে, ভালোবাসে না। চিনবার বুঝবার চেষ্টা তো করেই না কোনদিন। আচ্ছা, আমি তোকে বোঝাবার চেষ্টা করবো। কেমন?

খোকা কিছু বুঝলে না, কেবল বাবার শেষের প্রশ্নটির উত্তরে বললে—হুঁ-উ-উ।

—খোকন, ওই পাখী দেখতে কেমন রে?

—ভালো।

—পাখী কে তৈরি করেচে জানিস? ভগবান। বুঝলি?

খোকা ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ-উ।

—তুই কিছু বুঝিস নি। এই যা কিছু দেখছিস, সব তৈরি করেচেন ভগবান।

—বুঝেচি বাবা। মা বলেচে, ভগবান নক্ষত্র করেচে।

—আর কি?

—আর চাঁদ।

—আর?

—আর সূর্যি।

—হুঁ, তুই এত কথা কার কাছে শিখলি? মা'র কাছে? বেশ! চাঁদ ভালো লাগে?

—হুঁ-উ।

—তবে দ্যাখ তো, এমন জিনিস যিনি তৈরি করেচেন, তাঁকে ভালোবাসা যায় না?

—আমি ভালোবাসবো।

—নিশ্চয়। কিছু কিছু ভালোবেসো।

—তুমি ভালোবাসবে?

—হুঁ।

—মা ভালোবাসবে?

—হুঁ।

—আমি ভালোবাসবো?

—বেশ।

—ছোট মা ভালোবাসবে?

—হুঁ।

—তাহলে আমি ভালোবাসবো।

—নিশ্চয়। আজ আকাশের চাঁদ তোকে ভালো করে দেখাবো।

—চাঁদের মধ্যে কে বসে আছে?

—চাঁদের মধ্যে কিছু নেই রে। ওটা চাঁদের কলঙ্ক।

—কনঙ্ক কি বাবা? কনঙ্ক?

—ওই হোলো গিয়ে পেতলে যেমন কলঙ্ক পড়ে তেমনি।

ছেলে অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকায়। কি সুন্দর, নিষ্পাপ অকলঙ্ক মুখ ওর। চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু খোকার মুখে কলঙ্কের ভাঁজও নেই।

ভবানী বাঁড়ুয্যে অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকান।

কোথায় ছিল এ শিশু এতদিন?

বহুদূরের ও কোন্ অতীতের মোহ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে। যে পৃথিবী অতি পরিচিত, প্রতিদিন দৃষ্ট—যেখানে বসে ফণি চক্কত্তি সুদ কষেন, চন্দ্র চাটুয্যের ছেলে কৈলাস চাটুয্যে সমাজপতিত্ব পাবার জন্যে দলাদলি করে—অজস্র পাপ, ক্ষুদ্রতা ও লোভে যে পৃথিবী ক্লেদাক্ত —এ যেন সে পৃথিবী নয়। অত্যন্ত পরিচিত মনে হোলেও এ অত্যন্ত অপরিচিত, গভীর রহস্যময়। বিরাট বিশ্বযন্ত্রের লয় সঙ্গতির একটা মনোমুগ্ধকর তান।

পিছনকার বাতাস আকন্দ ফুলের গন্ধে ভরপুর। স্তব্ধ নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যানে মগ্ন।

আজকার এই যে সঙ্গীত, জীবজগতের এই পবিত্র অনাহত ধ্বনি আজ যে সব কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্চে, পাঁচশত কি হাজার বছর পরে সে সব কণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে যাবে! ইছামতীর জলের স্রোতে নতুন ইতিহাস লেখা হবে কালের বুকে।

আজ এই যে ক্ষুদ্র বালক ও পিতা অপরাহ্নে নদীর ধারে বসে আছে, কত স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ওদের মধ্যে—সে কথা কেউ জানবে না।

কেবল থাকবেন তিনি। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়, সমস্ত গতির মধ্যে স্থিতিশীল তিনি। ঈশ্বর ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ এ মানুষের মন-গড়া কথা। সেই জিনিস যা এমন সুন্দর অপরাহ্নে, ফুলে-ফলে, বসন্তে, লক্ষ-লক্ষ জন্ম-মৃত্যুতে, আশায়, স্নেহে, দয়ায়, প্রেমে আবছায়া, আবছায়া ধরা পড়ে, জগতের কোনো ধর্মশাস্ত্রে সেই জিনিসের স্বরূপ কি তা বলতে পারে নি: কোনো ঋষি, মুনি, সাধু যদি বা অনুভব করতে পেরেও থাকেন, মুখে প্রকাশ করতে পারেন নি...কি সে জিনিস তা কে বলবে?

তবু মনে হয় তিনি যত বড় হোন, আমাদের সগোত্র। আমার মনের সঙ্গে, এই শিশুর মনের সঙ্গে সেই বিরাট মনের কোথায় যেন যোগ আছে। ভগবান যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তা নয়—আমি তাঁর আত্মীয়—খুব আপন ও নিকটতম সম্পর্কের আত্মীয়। কোটি কোটি তারার দ্যুতিতে দ্যুতিমান সে মুখের দিকে আমি নিঃসঙ্কোচে ও প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবার অধিকার রাখি, কারণ তিনি যে আমার বাবা। হাতে গড়া পুতুলই নয় শুধু তাঁর—তাঁর সন্তান। এই খোকা তাঁরই এক রূপ। এর অর্থহীন হাসি, উল্লাস তাঁরই নিজের লীলা-উজ্জ্বল আনন্দের বাণীমূর্তি।

এই ছেলে বড় হয়ে যখন সংসার করবে, বৌ আনবে, ছেলেপুলে হবে ওদের তখন ভবানী থাকবেন না। দশ বছর আগে বিস্মৃত কোনো ঘটনার মত তিনি নিজেও পুরনো হয়ে যাবেন এ সংসারে। ঐ বেতসকুঞ্জ, ঐ প্রাচীন পুষ্পিত সপ্তপর্ণটা হয়তো তখনও থাকবে—কিন্তু তিনি থাকবেন না।

জগতের রহস্যে মন ভরে ওঠে ভবানীর, ঐ সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা...নিস্তারিণীর বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল কৌতুকদৃষ্টি,...তিলুর সপ্রেম চাহনি, এই কচি ছেলের নীল শিশুনয়ন—সবই সেই রহস্যের অংশ। কার রহস্য? এই মহারহস্যময়ের গহন গভীর শিল্পরহস্য।

তিলু পিছন থেকে এসে কি বলতেই ভবানীর চমক ভাঙলো। তিলুর কাঁধে গামছা, কাঁকে ঘড়া—নদীতে সে গা ধুতে এসেচে।

হেসে বললে—আমি ঠিক জানি, খোকাকে নিয়ে উনি এখানে রয়েচেন—

ভবানী ফিরে হেসে বললেন—নাইতে এলে?

—আপনাদের দেখতিও বটে।

—নিলু কোথায়?

—রান্না চড়াবে এবার।

—বসো।

—কেউ আসবে না তো?

—কে আসবে সন্দেবেলা?

তিলু ভবানীর গা ঘেঁষে বসলো। ঘড়া অদূরে নামিয়ে রেখে এসে স্বামীকে প্রায় জড়িয়ে ধরলে।

ভবানী বললেন—খোকা যেন অবাক হয়ে গিয়েচে, অমন কোরো না, ও না বড় হোলো?

তিলু বললে—খোকা, ভগবানের কথা কি শুনলি?

খোকা মায়ের কাছে সরে এসে মা'র মুখের দিকে চেয়ে বললে—মা, ওমা, আমি চান করবো, আমি চান করবো—

—আমার কথার উত্তর দে—

—আমি চান করবো।

তিলু এদিক ওদিক চেয়ে হেসে বললে—খোকাকে গা ধুইয়ে নেবো, আমরাও নামি জলে। আসুন সাঁতার দেবো।

ভবানী বললেন—বসো তিলু। আমার কেমন মনে হচ্ছিল আজ। খোকাকে ভগবানের কথা শোনাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল এই আকাশ বাতাস নদীজলের পেছনে তিনি আছেন। এই খোকার মধ্যেও। ওকে আনন্দ দিয়ে আমি ভাবি তাঁকেই খুশী করছি।

তিলু স্বামীর কথা মন দিয়ে শুনলে, বেশ গভীর ভাবে। ও স্বামীর কোনো কথাই তুচ্ছ ভাবে না। ঘাড় হেলিয়ে বললে—আপনার ব্রহ্মের অনুভূতি হয়েছিল?

—তুমি হাসালে।

—তবে ও অনুভূতিটা কি বলুন।

—তাঁর ছায়া এক-একবার মনে এসে পড়ে। তাঁকে খুব কাছে মনে হয়। আজ যেমন মনে হচ্ছিল—আমরা তাঁর আপন, পর নই। তিনি যত বড়ই হোন, বিরাটই হোন, আমাদের পর নয়, আমাদের বাবা তিনি। 'দিব্যোহ্যমূর্ত পুরুষঃ'—মনে আছে তো?

—ওই তো ব্রহ্মানুভূতি। আপনার ঠিক হয়েচে আমি জানি। যাতে ভগবানকে অত কাছে বলে ভাবতি পারলে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি বলতি হবে বই কি?

—রোজ নদীর ধারে বসে খোকাকে ভগবানের কথা শেখাবো। এই বয়েস থেকে ওর মনে এসব আনা উচিত। নইলে অমানুষ হবে।

—আপনি যা ভালো বোঝেন। চলুন, এখন নেয়ে একটু সাঁতার দিয়ে ফিরি। খোকা ডাঙায় বোসো—

খোকা খুব বাধ্য সন্তান। ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ।

—জলে নেমো না।

—না।

স্বামী স্ত্রী দুজনে মনের আনন্দে সাঁতার দিয়ে স্নান ক'রে খোকাকে গা ধুইয়ে নিয়ে চাঁদ-ওঠা জোনাকি-জ্বলা সন্ধ্যার সময় মাঠের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরলো।

চৈত্রমাস যায়-যায়। মাঠ বন ফুলে ফুলে ভরে গিয়েচে। নির্জন মাঠের উঁচু ডাঙায় ফুলে-ভরা ঘেঁটুবন ফুরফুরে দক্ষিণে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। স্তব্ধ, নীল শূন্য যেন অনন্তের ধ্যানমগ্ন—ভবানী বাঁড়ুয্যের মনে হোলো দিকহারা দিক্‌চক্রবালের পেছনে যে অজানা দেশ, যে অজ্ঞাত জীবন, তারই বার্তা যেন এই সুন্দর নির্জন সন্ধ্যাটিতে ভেসে আসচে। তিনি গুরুর আশ্রয় পেয়েও ছেড়েচেন ঠিক, সন্ন্যাসী না হয়ে গৃহস্থ হয়েচেন, তিনটি স্ত্রী একত্রে বিবাহ ক'রে জড়িয়ে পড়েছিলেন একথাও ঠিক—কিন্তু তাতেই বা কি? মাঠ, নদী, বনঝোপ, ঋতুচক্র, পাখী, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রির প্রহরগুলির আনন্দবার্তা তাঁর মনে এক নতুন উপনিষদ রচনা করেচে।...এখানেই তাঁর জীবনের সার্থকতা। এই খোকার মধ্যে তাঁকে তিনি দেখতে পান।

নদীর ঘাট থেকে মেয়েরা এইমাত্র জল নিয়ে ফিরে গেল, মাটির পথের ওপর ওদের

জলসিক্ত চরণচিহ্ন এই খানিক আগে মিলিয়ে গিয়েচে, নদীর ধারের বনে বনে গাঙশালিকের আর দোয়েলের দল এই খানিক আগে তাদের গান গাওয়া শেষ করেচে। ঘাটের ওপরকার নাগকেশর গাছের ফুলে ভরা ডালটি নুইয়ে কোন রূপসী গ্রামবধূ সন্ধ্যার আগে বোধ হয় ফুল পেড়ে থাকবে, গাছতলায় সোনালি রংয়ের গর্ভকেশরের বিচ্ছিন্ন দল ছড়ানো, মরকত মণির মত ঘন সবুজ রং-এর পাতা তলা বিছিয়ে পড়ে আছে—

হঠাৎ বিলুর কথা মনে পড়ে মনটা উদাস হয়ে যায় ভবানীর। হয়তো তিনি খানিকটা অবহেলা করে থাকবেন তবে জ্ঞাতসারে নয়। মেয়েদের মনের কথা সব সময়ে কি বুঝতে পারা যায়? দুঃখকে বাদ দিয়ে জগতে সুখ নেই—প্রকৃত সুখের অবস্থা গভীর দুঃখের পরে...দুঃখের পূর্বের সুখ অগভীর, তরল, খেলো হয়ে পড়ে। দুঃখের পরে যে সুখ—তার নির্মল ধারায় আত্মার স্নানযাত্রা নিষ্পন্ন হয়, জীবনের প্রকৃত আস্বাদ মিলিয়ে দেয়। জীবনকে যারা দুঃখময় বলেছে, তারা জীবনের কিছুই জানে না, জগৎটাকে দুঃখের মনে করা নাস্তিকতা। জগৎ হোলো সেই আনন্দময়ের বিলাস বিভূতি। তবে দেখার মত মন ও চোখ দরকার। আজকাল তিনি কিছু কিছু বুঝতে পারেন।

খোকা হাত উঁচু ক'রে বললে—বাবা, ভয় করচে!

—কেন রে?

—শিয়াল! আমাকে কোলে নাও—

—না। হেঁটে চলো—

—তাহলে আমি কাঁদবো—

তিলু বললে—বাবা, ভিজে কাপড় আমাদের দুজনেরই। সর্বশরীর ভেজাবি কেন এই সন্দেবেলা। হেঁটে চলো।

নিলু সন্দে দেখিয়ে বসে আছে। ভবানীর আহ্নিকের জায়গা ঠিক ক'রে রেখেছে। নিকোনো গুছোনো ওদের ঝকঝকে তকতকে মাটির দাওয়া। আহ্নিক শেষ করতেই নিলু এসে বললে—জলপান দিই এবার? তারপর সে একটা কাঁসার বাটিতে দুটি মুড়কি আর দু'টুকরো নারকোল নিয়ে এসে দিলে, বললে—আমার সঙ্গে এবার একটু গল্প করতি হবে কিন্তু—

—বোসো নিলু। কি রাঁধচ?

—না, আমার সঙ্গে ও রকম গল্প না। চালাকি? দিদির সঙ্গে যেমন গল্প করেন—ওই রকম।

—তোমার বড্ড হিংসে দিদির ওপর দেখচি। কি রকম গল্প শুনি—

—সমস্কৃতো-টমস্কৃতো। ঠাকুরদেবতার কথা। ব্রহ্ম না কি—

ভবানী হো হো ক'রে হেসে উঠে সস্নেহে ওর দিকে চাইলেন। বললেন—শুনতে চাও নি কোনোদিন তাই বলি নি। বেশ তাই হবে। তুমি জানো, কার মত করলে? প্রাচীন দিনে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর দুই স্ত্রী—গার্গী আর মৈত্রেয়ী—তুমি করলে গার্গীর মত, সতীন-কাঁটা যখন ভূমা চাইবে, তখন বুঝি আর না বুঝি, আমাকে সেই ভূমাই নিতে হবে—এই ছিল গার্গীর মনে আসল কথা—তোমারও হোলো সেই রকম।

এমন সময়ে খোকা এসে বললে—বাবা কি খাচ্ছ? আমি খাবো—

—আয় খোকা—

ভবানী দুটি মুড়কি ওর মুখে তুলে দিলেন। খোকা বাটির দিকে তাকিয়ে বললে—নারকোল!

—না। পেট কামড়াবে।

—পেট কামড়াবে?

—হ্যাঁ, বাবা।

—ও বাবা—বাবা—পেট কামড়াবে?

—হ্যাঁ রে বাবা।

—বাবা—

—কি?

—পেট কামড়াবে?

নিলু ধমক দিয়ে বললে—থাম রে বাবা। যা একবার ধরলেন তো তাই ধরলেন—

খোকা একবার চায় নিলুর দিকে, একবার চায় বাবার দিকে অবাক দৃষ্টিতে। বাবার দিকে চেয়ে বললে—কাকে বলচে বাবা?

নিলু বললে—ওই ও পাড়ার নীলে বাগ্‌দিকে। কাকে বলা হচ্চে এখন বুঝিয়ে দাও—বলেই ছুটে গিয়ে খোকাকে তুলে নিলে। খোকা কিন্তু সেটা পছন্দ করলে না, সে বার বার বলতে লাগল—আমায় ছেড়ে দাও—আমি বাবার কাছে যাবো—

—যায় না।

—না, আমায় ছেড়ে দাও—আমি বাবার কাছে যাবো—

ভবানী বললেন—দাও, নামিয়ে দাও—এই নে, একখানা নারকোল—

খোকা বাবার বেজায় ন্যাওটা। বাবাকে পেলে আর কাউকে চায় না। সে এসে বাবার হাত থেকে নারকোল নিয়ে বাবার কোলে মাথা রেখে বলতে লাগলো বাবার মুখের দিকে চেয়ে—ও বাবা, বাবা!

—কি রে খোকা?

খোকা বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—ও বাবা, বাবা!

—এই তো বাবা।

এমন সময়ে প্রবীণ শ্যামচাঁদ গাঙ্গুলী এসে ডেকে বললেন—বাবাজি বাড়ি আছ?

ভবানী শশব্যস্তে বললেন—আসুন মামা, আসুন—

—আসবো না আর, আলো আমার আছে। চলো একবার চন্দর-দাদার চণ্ডীমণ্ডপে। ভানী গয়লানীর সেই বিধবা মেয়েটার বিচার হবে। শক্ত বিচার আজকে।

—আমি আর সেখানে যাবো না মামা—

—সে কি কথা? যেতেই হবে। তোমার জন্যি সবাই বসে। সমাজের বিচার, তুমি হোলে সমাজের একজন মাথা। তোমরা আজকাল কর্তব্য ভুলে যাচ্চ বাবাজি, কিছু মনে করো না।

নিলু খোকাকে নিয়ে এর আগেই রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। শ্যামচাঁদ গাঙ্গুলীকে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না, দুর্বাসা প্রকৃতির লোক। এখনই কি বলতে কি বলে বসবেন।

রান্নাঘরে ঢুকে তিলু-নিলুকে কথাটা বলতে গেলেন ভবানী, জটিল গ্রাম্য হাঙ্গামা, ফিরতে রাত হবে। খোকা এসে মহাখুশীর সঙ্গে বাবার হাত ধরে বললে—বাবা এসো, খাই—

—কি খাবো রে?

—এসো বাবা, বসো—মজা হবে।

—না রে, আমি যাই, দরকার আছে। তুমি খাও—

—আমি তাহলে কাঁদবো। তুমি যেও না, যেও না—বোসো এখানে। মজা হবে।

খোকার মুখে সে কি উল্লাসের হাসি। বাবাকে সে মহা আগ্রহে হাত ধরে এনে একটা পিঁড়িতে বসিয়ে দিলে। যেটাতে বসিয়ে দিলে সেটা রুটি বেলবার চাকি, ঠিক পিঁড়ি নয়।

—বোসো এখেনে। তুমি খাবে?

—হুঁ।

—আমি খাবো।

—বেশ।

—তুমি খাবে?

কিন্তু দুর্বাসা শ্যাম গাঙ্গুলী বাইরে থেকে হেঁকে বললেন ঠিক সেই সময়—বলি, দেরি হবে নাকি বাবাজির?

আর থাকা যায় না। দুর্বাসা ঋষিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা চলে না। ভবানীকে উঠতে হোলো। খোকা এসে বাবার কাপড় চেপে ধরে বললে—যাস নে, ও বাবা। বোসো, ও বাবা। আমি তাহোলে কাঁদবো—

খোকার আগ্রহশীল ছোট্ট দুর্বল হাতের মুঠো থেকে তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে ভবানীকে চলে যেতে হোলো। সমস্ত রাস্তা শ্যাম গাঙ্গুলী সমাজপতি বক বক বকতে লাগলেন, চন্দ্র চাটুয্যের চন্ডীমন্ডপে কাদের একটি যুবতী মেয়ের গুপ্ত প্রণয় ঘটিত কি বিচার হোতে লাগলো—এসব ভবানী বাঁড়ুয্যের মনের এক কোণেও স্থান পায় নি—তাঁর কেবল মনে হচ্ছিল খোকার চোখের সেই আগ্রহভরা আকুল সপ্রেম দৃষ্টি, তার দুটি ছোট্ট মুঠির বন্ধন অগ্রাহ্য ক'রে তিনি চলে এসেচেন। মনে পড়লো খোকনের আরো ছেলেবেলার কথা।...কোথায় যেন সেদিন তিনি গিয়েছিলেন, সেদিন অনেকক্ষণ খোকাকে দেখেন নি ভবানী বাঁড়ুয্যে। মনে হয়েছিল সন্দেবেলায় হয়তো বাড়ি ফিরে দেখবেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ সারারাতে আর সে জাগবে না। তাঁর সঙ্গে কথাও বলবে না।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখলেন সে ঘুমোয় নি। বাবার জন্যে জেগে বসে আছে। ভবানী বাঁড়ুয্যে ঘরে ঢুকতেই সে আনন্দের সুরে বলে উঠল—ও বাবা, আয় না—ছবি—

—তুমি শোও। আমি আসচি ওঘর থেকে—

—ও বাবা, আয়, তাহলে আমি কাঁদবো—

ভবানীর ভালো লাগে বড় এই শিশুকে। এখনো দু'বছর পোরেনি, কেমন সব কথা বলে এবং কি মিষ্টি সুরে, অপূর্ব ভঙ্গিতেই না বলে!

শিশুর প্রতি গাঢ় মমতারসে ভবানীর প্রাণ সিক্ত হোলো। তিনি ওর পাশে শুয়ে পড়লেন। শিশু ভবানীর গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

—সে কি রে?

—আমার বড়দা—

—আমি বুঝি তোর বড়দা? বেশ বেশ।

শ্বশুরবাড়ির গ্রামে বাস করার দরুণ এ গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের এবং অধিকাংশ লোকেরই তিনি ভগ্নিপতি সম্পর্কের লোক। তাঁরা অনেকেই তাঁকে 'বড়দা' কেউবা 'মেজদা' বলে ডাকে।

শিশু সেটা শুনে শুনে যদি ঠাউরে নেয়, যে লোকটাকে বাবা বলা হয়, তার অন্য নাম কিন্তু 'বড়দা', তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না।

ভবানী ওকে আদর করে বললেন—খোকন, আমার খোকন—

—আমার বড়দা—

ভবানীর তখুনি মনে হোলো এ এক অপূর্ব প্রেমের রূপ দেখতে পাচ্চেন এই ক্ষুদ্র মানবকের হৃদয়রাজ্যে। এত আপন তাঁকে এত অল্পদিনে কেউ করে নিতে পারে নি, এত নির্বিচারে, এত নিঃসঙ্কোচে। আপন আর পরে তফাতই এই।

তিনি বললেন—তোকে একটা গল্প করি খোকন, একটা জুজুবুড়ি আছে ওই তালগাছে—কুলোর মত তার কান, মূলোর মত—

এই পর্যন্ত বলতেই খোকা তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমার ভয় করবে—আমার ভয় করবে—তাহলে আমি কাঁদবো—

—তুমি কাঁদবে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা থাক থাক।

খানিকটা পরে খোকা বড় মজা করেচে। ছোট্ট মাথাটি দুলিয়ে, দুই হাত ছড়িয়ে ক্ষুদ্র মুঠি পাকিয়ে সে ভয় দেখানোর সুরে বললে—একতা জুজুবুড়ি আছে—মট্ট বড় কান—

—বলিস কি খোকন?

—ই-ই-ই! একতা জুজুবুড়ি আছে।

—ভয় পেয়েচে খোকা। বলিস নে, বলিস নে! বড্ড ভয় করচে—

—হি হি—

—বড্ড ভয় করচে—

—একতা জুজুবুড়ি আছে—

—না না, আর বলিস নে, বলিস নে—

খোকার সে কি অবোধ আনন্দের হাসি। ভবানীর ভারি মজা লাগলো—ভয়ের ভান করে বালিসে মুখ লুকুলেন। বাবার ভয় দেখে খোকা বাবার গলা জড়িয়ে মমতার সুরে বললে—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

—হ্যাঁ, আমায় আদর কর, আমার বড্ড ভয় করচে—

—আমার বড়দা—

—শোও খোকন, আমার কাছে শোও—

—জন্তি গাছটা বলো—

ভবানী ছড়া বলতে লাগলেন—

ও পারের জন্তি গাছটি জন্তি বড় ফলে
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে
প্রাণ করে আইঢাই গলা করে কাঠ
কতক্ষণে যাব রে এই হরগৌরীর মাঠ।

হঠাৎ খোকা হাত দুটো ছড়িয়ে চোখ বড় বড় করে বললে—একতা জুজুবুড়ি আছে—

—ও বাবা—

—মট্ট বড় কান—একতা জুজুবুড়ি আছে—

—আর বলিস নে—খোকন, আর বলিস নে—

—হি হি—

—বড্ড ভয় করচে—খোকন আমায় ভয় দেখিও না—

—আমার বড়দা, আমার বড়দা—

আজ সন্ধ্যাবেলায় শ্যাম গাঙ্গুলীর মান রাখতে গিয়ে খোকনকে বড় অবহেলা করেচেন তিনি।

গ্রামে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। নালু পাল বেশী অর্থবান হয়ে উঠলো। সামান্য মুদীখানার দোকান থেকে ইদানীং অবিশ্যি সে বড় গোলদারী দোকান খুলেছিল এবং ধান, সর্ষে, মুগকলাইয়ের আড়ত ফেঁদে মোকাম ও গঞ্জ থেকে মাল কেনাবেচা করত।

একদিন ফণি চক্কত্তির চণ্ডীমণ্ডপে সংবাদটা নিয়ে এলেন দীনু ভট্‌চাজ। শিবসত্য চক্রবর্তীর আমলে তৈরী সেই প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপ দা-কাটা তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকারপ্রায় হয়ে গিয়েচে। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণের দল সবাই নিষ্কর্মা, জীবনে মহকুমার বাইরে কেউ কখনো পায় দেয় নি—কারণ দরকারও হয় না, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রায় সব ব্রাহ্মণেরই আছে, ধানের গোলা প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই, দু'পাঁচটা গরুও আছে, আম কাঁটাল বাঁশঝাড় আছে। সুতরাং সকাল-সন্দে ফণি চক্কত্তি, চন্দর চাটুয্যে কিংবা শ্যাম গাঙ্গুলীর চণ্ডীমণ্ডপে এই সব অলস, নিষ্কর্মা গ্রাম্য ব্রাহ্মণদের সময় কাটাবার জন্যে তামাকু সেবন, পাশা, দাবা, আজগুবী গল্প, দুর্বলের বিরুদ্ধে সামাজিক ঘোঁট ইত্যাদি পুরোমাত্রায় চলে। মাঝে মাঝে এর ওর ঘাড় ভেঙে খাওয়া চলে কোন সমাজবিরুদ্ধ কাজের জরিমানা স্বরূপ।

সুতরাং দীনু ভট্‌চায যখন চোখ বড় বড় ক'রে এসে বললে—শুনেচ হে আমাদের নালু পালের কাণ্ড?

সকলে আগ্রহের সুরে এগিয়ে এসে বললে—কি, কি হে শুনি?

—সতীশ কলু আর নালু পাল তামাক কিনে মোটা টাকা লাভ করেচে, দু'দশ নয়, অনেক বেশি। দশ বিশ হাজার!

সকলে বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলো—সে কি? সে কি?

দীনু ভট্‌চায বললেন—অনেকদিন থেকে ওরা তলায় তলায় কেনাবেচা করচে মোকামের মাল। এবার ধারে ভাজনঘাট মোকাম থেকে এক কিস্তি মাল রপ্তানি দেয় কলকাতায়। সতীশ কলুর শালা বড় আড়তদারি করে ওই ভাজনঘাটেই। তারই পরামর্শে এটা ঘটেচে। নয়তো এরা কি জানে, কি বোঝে? ব্যস, তাতেই লাল।

ফণি চক্কত্তি বললেন, হ্যাঁ, আমিও শুনিচি। ও সব কথা নয়। সতীশ কলুর শালা-টালা কিছু না। নালু পালের শ্বশুরের অবস্থা বাইরে একরকম ভেতরে একরকম। সে-ই টাকাটা ধার দিয়েচে।

হরি নাপিত সকলকে কামাতে এসেছিল, সে গ্রাম্য নাপিত, সকালে এখানে এলে সবাইকে একত্র পাওয়া যায় বলে বারের কামানোর দিন সে এখানেই আসে। এসেই কামায় না, তামাক

খায়। সে কল্কে খেতে খেতে নামিয়ে বললে—না, খুড়োমশাই। বিনোদ প্রামাণিকের অবস্থা ভালো না, আমি জানি। আড়তদারি করে ছোটখাটো, অত পয়সা ক'নে পাবে?

—তলায় তলায় তার টাকা আছে। জামাইকে ভালোবাসে, তার ওই এক মেয়ে। টাকাটা যে কোরেই হোক, যোগাড় ক'রে দিয়েচে জামাইকে। টাকা না হলি ব্যবসা চলে?

জিনিসটার কোনো মীমাংসা হোক আর না হোক নালু পাল যে অর্থবান হয়ে উঠেচে, ছ'মাস এক বছরের মধ্যে সেটা জানা গেল ভালোভাবে যখন সে মস্ত বড় ধানচালের সায়ের সবালে পটপটিতলার ঘাটে। জমিদারের কাছে ঘাট ইজারা নিয়ে ধান ও সর্ষের মরসুমে দশ-বিশখানা মহাজনী কিস্তি রোজ তার সায়েরে এসে মাল নামিয়ে উঠিয়ে কেনাবেচা করে। দুজন কয়াল জিনিস মাপতে হিমশিম খেয়ে যায়। অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা সে মুনাফা করলে এই এক মরসুমে পটপটিতলার সায়ের থেকে। লোকজন, মুহুরী, গোমস্তা রাখলে, মুদীখানা দোকান বড় গোলদারী দোকানে পরিণত করলে, পাশে একখানা কাপড়ের দোকানও খুললে।

আগের নালু পাল ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ, এখন সে হোলো ধনী মহাজন।

কিন্তু নালু পালকে দেখে তুমি চিনতে পারবে না। খাটো ন' হাত ধুতি পরনে, খালি গা, খালি পা। ব্রাহ্মণ দেখলে ঘাড় নুইয়ে দুই হাত জোড় ক'রে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নেবে। গলায় তুলসীর মালা, হাতে হরিনামের ঝুলি—নাঃ, নালু পাল যা এক-জীবনে করলে, অনেকের পক্ষেই তা স্বপ্ন।

যদি তুমি জিজ্ঞেস করলে—পালমশায়, ভালো সব?

বিনীত ভাবে হাত জোড় ক'রে নালু পাল বলবে—প্রাতোপেন্নাম হই। আসুন, বসুন। না ঠাহুরমশাই, ব্যবসার অবস্থা বড্ড মন্দা। এসব ঠাটবাট তুলে দিতে হবে। প্রায় অচল হয়ে এসেচে। চলবে না আর। মুখের দীনভাব দেখলে অনভিজ্ঞ লোকে হয়তো নালু পালের অবস্থার বর্তমান অবনতির জন্যে দুঃখ বোধ করবে। কিন্তু ওটা শুধু বৈষ্ণব-সুলভ দীনতা মাত্র নালু পালের, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। সায়েরেই বছরে চোদ্দ-পনেরো হাজার টাকা কেনাবেচা হয়। ত্রিশ হাজার টাকা কাপড়ের কারবারে মূলধন।

নালু পালের একজন অংশীদার আছে, সে হচ্ছে সেই সতীশ কলু। দুজনে একদিন মাথায় মোট নিয়ে হাটে হাটে জিনিস বিক্রী করতো, নালু পাল সুপুরি, সতীশ কলু তেল। তারপর হাতে টাকা জমিয়ে ছোট এক মুদির দোকান করলে নালু পাল। সতীশের পরামর্শে নালু তেঘরা-শেখহাটি আর বাঁধমুড়া মোকাম থেকে সর্ষে, আলু আর তামাক কিনে এনে দেশে বেচতে শুরু করে। সতীশ এতে শূন্য বখরাদার ছিল, মোকাম সন্ধান করতো। কাঁটায় মাল খরিদ করতে ওস্তাদ ঘুঘু সতীশ কলু। কৃতিত্ব এই, একবার তাকালে বিক্রেতা মহাজন বুঝতে পারবে, হাঁ, খদ্দের বটে। সতীশ কলুর কৃতিত্ব এই উন্নতির মূলে—নালু পাল গোড়া থেকেই সততার জন্যে নাম কিনেছিল। দুজনের সম্মিলিত অবদানে আজ এই দৃঢ় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেচে।

স্বামী বাড়ি ফিরলে তুলসী বললে—হ্যাঁগা, এবার কালীপূজোতে অমন হিম হয়ে বসে আছ কেন?

—বড্ড কাজের চাপ পড়েচে বড়বৌ। মোকামে পাঁচশো মণ মাল কেনা পড়ে আছে, আনবার কোনো বন্দোবস্ত ক'রে উঠতি পাচ্চিনে—

—ও সব আমি শুনচি নে। আমার ইচ্ছে, গাঁয়ের সব বেরাহ্মণদের এবার লুচি চিনির

ফলার খাওয়াবো। তুমি বন্দোবস্ত করে দাও। আর আমার সোনার যশম চাই।

—বাবা, এবার যে মোটা খরচের ফর্দ!

—তা হোক। খোকাদের কল্যেণে এ তোমাকে কত্তি হবে। আর ছোট খোকার বোর, পাটা, নিমফল তোমাকে ওই সঙ্গে দিতি হবে।

—দাঁড়াও বড়বৌ একসঙ্গে অমন গড়গড় ক'রে বলো না। রয়ে বসে—

—না, রতি বসতি হবে না। ময়না ঠাকুরঝিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনাতি হবে—আমি আজই সয়ের মাকে পাঠিয়ে দিই।

—আরে, তারে তো কালীপূজোর সময় আনতিই হবে—সে তুমি পাঠিয়ে দাও না যখন ইচ্ছে। আবার দাঁড়াও, ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা কোথায় ফলার খাবেন তার ঠিক করি। চন্দর চাটুয্যে তো মারা গিয়েচেন—

—আমি বলি শোনো, ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়ি যদি করতি পারো! আমার দুটো সাধের মধ্যি এ হোলো একটা।

—আর একটা কি শুনতি পাই?

—খুব শুনতি পারো। রামকানাই কবিরাজকে তন্ত্রধার করে পূজো করাতি হবে। অমন লোক এ দিগরে নাই।

—বোঝলাম—কিন্তু সে বড্ড শক্ত বড়বৌ। পয়সা দিয়ে তেনারে আনা যাবে না, সে চীজ না। ও ভবানী ঠাকুরেরও সেই গতিক। তবে তিলু দিদিমণি আছেন সেখানে সেই ভরসা। তুমি গিয়ে তেনারে ধরে রাজী করাও। ওঁদের বাড়ি হলি সব বেরাহ্মণ খেতি যাবেন।

স্বামী-স্ত্রীর এই পরামর্শের ফলে কালীপূজার রাত্রে এ গ্রামের সব ব্রাহ্মণ ভবানী বাঁড়ুয্যের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হোলো। তিলুর খোকা যাকে দ্যাখে তাকেই বলে—কেমন আছেন?

কাউকে বলে—আসুন, আসুন। তুমি ভালো আছেন?

তিলু ও নিলু সকলের পাতে নুন পরিবেশন করচে দেখে খোকা বায়না ধরলে, সেও নুন পরিবেশন করবে। সকলের পাতে নুন দিয়ে বেড়ালে। দেবার আগে প্রত্যেকের মুখের দিকে বড় বড় জিজ্ঞাসু চোখে চায়। বলে—তুমি নেবে? তুমি নেবে?

দেখতে বড় সুন্দর মুখখানি, সকলেই ওকে ভালোবাসে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, তা হবে না, মাও সুন্দরী, বাপও সুপুরুষ। লোকে ঘাঁটিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আর সুন্দর মুখখানি দেখবার জন্যে অকারণে বলে ওঠে—খোকন, এই যে ইদিকি লবণ দিয়ে যাও বাবা—

খোকা ব্যস্ত সুরে বলে—যা-ই—

কাছে গিয়ে বলে—তুমি ভালো আছেন? নুন নেবে?

রামকানাই কবিরাজ কালীপূজার তন্ত্রধারক ছিলেন। তিনিও এক পাশে খেতে বসেচেন। তিলু তাঁর পাতে গরম গরম লুচি দিচ্ছিল বার বার এসে। রামকানাই বললেন—নাঃ দিদি, কেন এত দিচ্চ? আমি খেতে পারিনে যে অত।

রামকানাই কবিরাজ বুড়ো হয়ে পড়েচেন আগেকার চেয়ে। কবিরাজ ভালো হোলে কি হবে, বৈষয়িক লোক তো নন, কাজেই পয়সা জমাতে পারেন নি। যে দরিদ্র সেই দরিদ্র। বড় সাহেব শিপ্‌টন্ একবার তাঁকে ডাকিয়ে পূর্ব অত্যাচারের প্রায়চিত্ত স্বরূপ কিছু টাকা দিতে

চেয়েছিল, কিন্তু ম্লেচ্ছের দান নেবেন না বলে রামকানাই সে অর্থ প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছিলেন।

ভোজনরত ব্রাহ্মণদের দিকে চেয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিল লালমোহন পাল। আজ তার সৌভাগ্যের দিন, এতগুলি কুলীন ব্রাহ্মণের পাতে সে লুচি-চিনি দিতে পেরেচে। আধমণ ময়দা, দশ সের গব্যঘৃত ও দশ সের চিনি বরাদ্দ। দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপার। দেখেও সুখ।

—ও তুলসী, দাঁড়িয়ে দ্যাখোসে—চক্ষু সার্থক করো—

তুলসী এসে লজ্জায় কাঁটালতলায় দাঁড়িয়েছিল—স্ত্রীকে সে ডাক দিলো। তুলসী একগলা ঘোমটা দিয়ে স্বামীর অদূরে দাঁড়ালো। একদৃষ্টে স্বামী-স্ত্রী চেয়ে রইল নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের দিকে। নালু পালের মনে কেমন এক ধরনের আনন্দ, তা বলে বোঝাতে পারে না। কিশোর বয়সে ও প্রথম যৌবনে কম কষ্টটা করেছে মামার বাড়িতে? মামীটা একটু বেশী তেল দিত না মাখতে। শখ করে বাব্‌রি চুল রেখেছিল মাথায়, কাঁচা বয়সের শখ। তেল অভাবে চুল রুক্ষ থাকতো। দুটি বেশী ভাত খেলে বলতো, হাতীর খোরাক আর বসে বসে কত যোগাবো? অথচ সে কি বসে বসে ভাত খেয়েচে মামারবাড়ির? দু' ক্রোশ দূরবর্তী ভাতছালার হাট থেকে সমানে চাল মাথায় করে এনেচে। মামীমা ধানসেদ্ধ শুকনো করবার ভার দিয়েছিল ওকে। রোজ আধমণ বাইশ সের ধান সেদ্ধ করতে হোতো। হাট থেকে আসবার সময় একদিন চাদরের খুঁট থেকে একটা রূপোর দুয়ানি পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। মামীমা তিনদিন ধরে রোজ ভাতের থালা সামনে দিয়ে বলতো—আর ধান নেই, এবার ফুরলো। মামার জমানো গোলার ধান আর ক'দিন খাবা? পথ দ্যাখো এবার। সেদিন ওর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

সেই নালু পাল আজ এতগুলি ব্রাহ্মণের লুচি-চিনির পাকা ফলার দিতে পেরেচে!

ইচ্ছে হয় সে চেঁচিয়ে বলে—তিলু দিদি, খুব দ্যাও, যিনি যা চান দ্যাও—একদিন বড্ড কষ্ট পেয়েছি দুটো খাওয়ার জন্যি।

ব্রাহ্মণের দল খেয়েদেয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তুলসী আবার গিয়ে ঘোমটা দিয়ে দূরে কাঁটালতলায় দাঁড়ালো। লালমোহন হাত জোড় ক'রে প্রত্যেকের কাছে বললে-ঠাকুরমশাই, পেট ভরলো?

গ্রামের সকলে নালু পালকে ভালোবাসে। সকলেই তাকে ভালো ভালো কথা বলে গেল। শম্ভু রায় (রাজারাম রায়ের দূরসম্পর্কের ভাইপো, সে কলকাতায় আমুটি কোম্পানীর হৌসে নকলনবিশ) বললে—চলো নালু আমার সঙ্গে সোমবারে কলকাতা, উৎসব হচ্ছে সামনের হপ্তাতে—খুব আনন্দ হবে দেখে আসবা—এ গাঁয়ের কেউ তো কিছু দেখলে না—সব কুয়োর ব্যাং-রেলগাড়ি খুলেচে হাওড়া থেকে পেঁড়ো বর্ধমান পজ্জন্ত, দেখে আসবা—

—রেলগাড়ি জানি। আমার মাল সেদিন এসেচে রেলগাড়িতে ওদিকের কোন্ জায়গা থেকে। আমার মহুরী বলছিল।

—দেখেচ?

—কলকাতায় গেলাম কবে যে দেখবো?

—চলো এবার দেখে আসবা।

—ভয় করে। শুনিচি নাকি বেজায় চোর-জুয়োচোরের দেশ।

—আমার সঙ্গে যাবা। তোমরা টাকার লোক, তোমাদের ভাবনা কি, ভাল বাঙালী সরাইখানায় ঘরভাড়া করে দেবো। জীবনে অমন কখনো দেখবা না আর। কাবুল-যুদ্ধে জিতে সরকার থেকে উৎসব হচ্চে।

এইভাবে নালু পাল ও তার স্ত্রী তুলসী উৎসব দেখতে কলকাতা রওনা হোলো। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আপত্তি উঠেছিল নালু পালের পরিবারে। সাহেবরা খৃষ্টান করে দেয় সেখানে নিয়ে গেলে গোমাংস খাইয়ে। আরও কত কি। শম্ভু রায় এ গ্রামের একমাত্র ব্যক্তি যে কলকাতার হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সে সকলকে বুঝিয়ে ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

কলকাতায় এসে কালীঘাটে ছোট্ট খোলার ঘর ভাড়া করলে ওরা, ভাড়াটা কিছু বেশি, দিন এক আনা। আদিগঙ্গায় স্নান করে জোড়া পাঁঠা দিয়ে সোনার বেলপাতা দিয়ে পূজো দিলে তুলসী।

সাত দিন কলকাতায় ছিল, রোজ গঙ্গাস্নান করতো, মন্দিরে পূজো দিত।

তারপর কলকাতার বাড়িঘর, গাড়িঘোড়া—তার কি বর্ণনা দেবে নালু আর তুলসী? চারঘোড়ার গাড়ি ক'রে বড় বড় লোক গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে আসে, তাদের বড় বড় বাগানবাড়ি কলকাতার উপকণ্ঠে, শনি রবিবারে নাকি বাইনাচ হয় প্রত্যেক বাগানবাড়িতে। এক-একখানা খাবারের দোকান কি! অত সব খাবার চক্ষেও দেখে নি ওরা। লোকের ভিড় কি রাস্তায়, যেদিন গড়ের মাঠে আতসবাজি পোড়ানো হোলো! সায়েবেরা বেত হাতে ক'রে সামনের লোকদের মারতে মারতে নিজেরা বীরদর্পে চলে যাচ্ছে। ভয়ে লোকজন পথ ছেড়ে দিচ্চে, তুলসীর গায়েও এক ঘা বেত লেগেছিল, পেছনে চেয়ে দেখে দুজন সাহেব আর একজন মেম, দুই সায়েব বেত হাতে নিয়ে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মারতে মারতে চলেচে। তুলসী 'ও মাগো' বলে সভয়ে পাশ দিয়ে দাঁড়ালো। শম্ভু রায় ওদের হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে এল। নালু পাল বাজার করতে গিয়ে লক্ষ্য করলে, এখানে তরিতরকারী বেশ আক্রা দেশের চেয়ে। তরিতরকারী সের দরে বিক্রয় হয় সে এই প্রথম দেখলে। বেগুনের সের দু পয়সা। এখানকার লোক কি খেয়ে বাঁচে! দুধের সের এক আনা ছ পয়সা। তাও খাঁটি দুধ নয়, জল মেশানো। তবে শম্ভু রায় বললে, এই উৎসবের জন্য বহু লোক কলকাতায় আসার দরুণ জিনিসপত্রের যে চড়া দর আজ দেখা যাচ্ছে এটাই কলকাতায় সাধারণ বাজার-দর নয়। গোল আলু যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সস্তা। এই জিনিসটা গ্রামে নেই, অথচ খেতে খুব ভালো। মাঝে মাঝে মুদিখানার দোকানীরা শহর থেকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে বটে, দাম বড্ড বেশি। নালু পাল তুলসীকে বললে—কিছু গোল আলু কিনে নিয়ে যেতি হবে দেশে। পড়তায় পোষায় কিনা দেখে আমার দোকানে আমদানি করতি হবে।

তুলসী বললে—ও সব সায়েবদের খাবার, হাঁড়িতে দেওয়া যায় না সব সময়।

—কে তোমাকে বলেচে সায়েবদের খাবার? আমাদের দেশে চাষ হচ্ছে যথেষ্ট। আমি মোকামের খবর রাখি। কালনা কাটোয়া মোকামের আলু সস্তা, অনেক চাষ হয়। আমাদের গাঁ ঘরে আনলি তেমন বিক্রি হয় না, নইলে আমি কালনা থেকে আলু আনতে পারিনে, না খবর রাখিনে। শহরে চলে, গাঁয়ে কিনবে কেডা?

তুলসী বললে—ঢেঁকি কিনা! স্বগ্‌গে গেলেও ধান ভানে। ব্যবসা আর বেনা-বেচা। এখানে এসেও তাই।

এই তাজ্জব ভ্রমণের গল্প নালু পালকে কতদিন ধরে করতে হয়েছিল গ্রামের লোকদের কাছে। কিন্তু এর চেয়েও একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল একদিন। শীতকালের মাঝামাঝি একদিন দেওয়ান হরকালী সুর আর নরহরি পেশ্‌কার এসে হাজির হোলো ওর আড়তে। নালু পাল ও সতীশ কলু তটস্থ হয়ে শশব্যস্ত হয়ে ওদের অভ্যর্থনা করলে। তখনি পান-তামাকের ব্যবস্থা হোলো। নীলকুঠির দেওয়ান, মানী লোক, হঠাৎ কারো কাছে যান না। একটু জলযোগের ব্যবস্থা করবার জন্যে সতীশ কলু নবু ময়রার দোকানে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেওয়ানজী তাঁর আসার কারণ প্রকাশ করলেন, বড় সাহেব কিছু টাকা ধার চান। বেঙ্গল ইন্ডিগো কন্‌সারন্‌ মোল্লাহাটির কুঠি ছেড়ে দিচ্ছে, নীলের ব্যবসা মন্দা পড়েছে বলে তারা এ কুঠি রাখতে চায় না। শিপ্‌টন্‌ সাহেব নিজ সম্পত্তি হিসেবে এ কুঠি রাখতে চান, এর বদলে পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে বেঙ্গল ইন্ডিগো কন্‌সারন্‌কে। এই কুঠিবাড়ি বন্ধক দিয়ে বড় সাহেব নালু পালের কাছে টাকা চায়।

নরহরি পেশ্‌কার বললে—কুঠিটা বজায় রাখার এই একমাত্র ভরসা। নইলে চৈত্র মাস থেকে নীলকুঠি উঠে গেল। আমাদের চাকুরি তো চলে গেলই, সাহেবও চলে যাবে।

দেওয়ান হরকালী বললেন—বড় সায়েবের খুব ইচ্ছে নিজে কুঠি চালিয়ে একবার দেখবেন। এতকাল এদেশে কাটিয়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। দেশে কেউ নেইও তো, মেমসায়েব তো মারা গিয়েছেন। একটা মেয়ে আছে, সে এদেশে কখনো আসে নি।

নালু পাল হাত জোড় ক'রে বললে—এখন কিছু বলতে পারবো না দেওয়ানবাবু। ভেবে দেখতি হবে—তা ছাড়া আমার একার ব্যবসা না, অংশীদারের মত চাই। তিন-চারদিন পরে আপনাকে জানাবো।

দেওয়ান হরকালী সুর বিদায় নিয়ে যাবার সময় বললেন—তিন দিন কেন, পনেরো দিন সময় আপনি নিন পালমশাই। মার্চ মাসে টাকার দরকার হবে, এখনো দেরি আছে—

তুলসী শুনে বললে—বল কি!

—আমিও ভাবচি। কিসে থেকে কি হোলো!

—টাকা দেবে?

—আমার খুব অনিচ্ছে নেই। অত বড় কুঠিবাড়ি, দেড়শো বিঘে খাস জমি, বড় বড় কলমের আমের বাগান, ঘোড়া, গাড়ি, মেজ কেদারা, ঝাড়লণ্ঠন সব বন্দক থাকবে। কুঠির নেই-নেই এখনো অনেক আছে। কিন্তু সতে কলুর দ্যাখলাম ইচ্ছে নেই। ও বলে—আমরা আড়তদার লোক, হ্যাংগামাতে যাওয়ার দরকার কি? এরপর হয়তো ওই নিয়ে মামলা করতি হবে।

সমস্ত রাত নালু পালের ঘুম হোলো না। বড় সাহেব শিপ্‌টন্‌...টম্‌টম্ করে যাচ্ছে...কুঠির পাইক লাঠিয়াল...দব্‌দবা রব্‌রবা...মারো শ্যামচাঁদ...দাও ঘর জ্বালিয়ে... সে মোল্লাহাটির হাটে পানসুপুরির মোট নিয়ে বিক্রি করতি যাচ্ছে।

টাকা দিতে বড্ড ইচ্ছে হয়।

এই বছরে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল। আফগান যুদ্ধজয়ের উৎসব ছাড়াও।

মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে বড় সাহেব হঠাৎ মারা গেল মার্চ মাসের শেষে।

সাহেব যে অমন হঠাৎ মারা যাবে তা কেউ কল্পনা করতে পারে নি।

অসুখের সময় গয়ামেম যেমন সেবা করেচে অমন দেখা যায় না। রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই সে রোগীর কাছে সর্বদা হাজির থাকে। জ্বরের ঝোঁকে শিপ্‌টন্ বকে, কি সব গান গায়! গয়া বোঝে না সাহেবের কি সব কিচির মিচির বুলি।

ওকে বললে—গয়া শুনো—

—কি গা?

—ব্র্যান্ডি ডাও। ডিটে হইবে টোমায়।

গয়া ক'দিন রাত জেগেচে। চোখ রাঙা, অসম্বৃত কেশপাশ, অসম্বৃত বসন। সাহেবের লোকলস্কর দেওয়ান আরদালি আমীন সবাই সর্বদা দেখাশুনা করচে তটস্থ হয়ে, কুঠির সেদিন যদিও এখন আর নেই, তবুও এখনো ওরা বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর বেতনভোগী ভৃত্য। কিন্তু গয়া ছাড়া মেয়েমানুষ আর কেউ নেই। সে-ই সর্বদা দেখাশুনো করে, রাত জাগে। গয়া মদ খেতে দিলে না। ধমকের সুরে বললে—না, ডাক্তারে বারণ করেচে—পাবে না।

শিপ্‌টন্ ওর দিকে চেয়ে বললে—Dearie, I adore you, বুঝলে? I adore you.

—বকবে না।

—ব্র্যান্ডি ডাও, just a little, won't you ? একটুখানা—

—না। মিছরির জল দেবানি।

—Oh, to the hell with your candy water! When I am getting my peg ? ব্র্যাণ্ডি ডাও—

—চুপ করো। কাশি বেড়ে যাবে। মাথা ধরবে।

—শিপ্‌টন্ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। দু'দিন পরে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো। দেওয়ান হরকালী সুর সাহেবকে কলকাতায় পাঠাবার খুব চেষ্টা করলেন। সাহেবের সেটা দেখা গেল একেবারেই ইচ্ছে নয়। মহকুমার শহর থেকে প্রবীণ অক্ষয় ডাক্তারকে আনানো হোলো, তিনিও রোগীকে নাড়ানাড়ি করতে বারণ করলেন।

একদিন রামকানাই কবিরাজকে আনালে গয়া মেম।

রামকানাই কবিরাজ জড়িবুটির পুঁটলি নিয়ে রোগীর বিছানার পাশে একখানা কেদারার ওপর বসেছিলেন, সাহেব ওঁর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—Ah! The old medicine man! When did I meet you last, my old medicine man ? টোমাকে জবাব দিতে হইতেছে—আমি জবাব চাই—

তারপর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—you will not be looking at the moon, will you ? Your name and profession ?

গয়া বললে—বুঝলে বাবা, এই রকম করচে কাল থেকে। শুধু মাথামুন্ডু বকুনি।

রামকানাই একমনে রোগীর নাড়ী দেখছিল। রোগীর হাত দেখে সে বললে—ক্ষীণে বলবতী নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা—একটু মৌরির জল খাওয়াবে মাঝে মাঝে। আমি যে ওষুধ দেবো, তার সহপান যোগাড় করতি হবে মা, অনুপানের চেয়ে সহপান বেশি দরকারী—

আমি দেবো কিছু কিছু জুটিয়ে—আমার জানা আছে—একটা লোক আমার সঙ্গে দিতি হবে।

শিপ্‌টন্ সাহেব খাট থেকে উঠবার চেষ্টা ক'রে বললে—You see, old medicine man, I have too many things to do this summer to have any time for your rigmarole—you just—

শ্রীরাম মুচি ও গয়া সাহেবকে আবার জোর ক'রে খাটে শুইয়ে দিলে।

গয়া আদরের সুরে বললে—আঃ, বকে না, ছিঃ—

সাহেব রামকানাইয়ের দিকে চেয়েই ছিল। খানিকটা পরে বলে উঠলো—Shall I get you a glass of vermouth, my good man—এক গ্লাস মড্ খাইবে? ভাল মড্—oh, that reminds me, when I am going to have my dinner? আমার খানা কখন ডেওয়া হইবে? খানা আনো—

পরের দু'রাত অত্যন্ত ছট্‌ফট করার পরে, গয়াকে বকুনি ও চীৎকারের দ্বারা উত্ত্যক্ত ও অতিষ্ঠ করার পরে, তৃতীয় দিন দুপুর থেকে নিঃঝুম মেরে গেল। কেবল একবার গভীর রাত্রে চেয়ে চেয়ে সামনে গয়াকে দেখে বললে—Where am I?

গয়া মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে—কি বলচো সায়েব? আমায় চিনতি পারো?

সাহেব খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে বললে—What wages do you get here?

সেই সাহেবের শেষ কথা। তারপর ওর খুব কষ্টকর নাভিশ্বাস উঠলো এবং অনেকক্ষণ ধরে চললো। দেখে গয়া বড় কান্নাকাটি করতে লাগলো। সাহেবের বিছানা ঘিরে শ্রীরাম মুচি, দেওয়ান হরকালী, প্রসন্ন আমীন, নরহরি পেশ্‌কার, নফর মুচি সবাই দাঁড়িয়ে। দেওয়ান হরকালী বললে—এ কষ্ট আর দেখা যায় না—কি যে করা যায়!

কিন্তু শিপ্‌টন্ সাহেবের কষ্ট হয় নি। কেউ জানতো না সে তখন বহুদূরে স্বদেশের ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের অ্যাল্ডরি গ্রামের ওপরকার পার্বত্যপথ রাইনোজ পাস্ দিয়ে ওক্ আর এল্‌ম্ গাছের ছায়ায় ছায়ায় তার দশ বছর বয়সের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলেছিল খরগোশ শিকার করতে, কখনো বা পার্বত্য হ্রদ এল্‌টার-ওয়াটারের বিশাল বুকে নৌকোয় চড়ে বেড়াচ্ছিল, সঙ্গে ছিল তাদের গ্রেট ডেন কুকুরটা কিংবা কখনো মস্ত বড় পাইপ আর কার্প মাছ বঁড়শিতে গেঁথে ডাঙায় তুলতে ব্যস্ত ছিল...আর সব সময়েই ওর কানে ভেসে আসছিল তাদের গ্রামের ছোট্ট গির্জাটার ঘন্টাধ্বনি, বহুদূর থেকে তুষার-শীতল হাওয়ায় পাতা ঝরা বীচ্ গাছের আন্দোলিত শাখা-প্রশাখার মধ্যে দিয়ে দিয়ে...

তিলু ডুমুরের ডালনার সবটা স্বামীর পাতে দিয়ে বললে—খান আপনি।

ভিজে গামছা গায়ে ভবানী খেতে খেতে বললেন—উঁহু উঁহু কর কি?

—খান না, আপনি ভালোবাসেন!

—খোকা খেয়েচে?

—খেয়ে কোথায় বেরিয়েচে খেলতে। ও নিলু, মাছ নিয়ে আয়। খয়রা ভাজা খাবেন আগে, না চিংড়ি মাছ?

—খয়রা কে দিলে?

—দেবে আবার কে? রাজারা সোনা কোথায় পায়? নিমাই জেলে আর ভীম দিয়ে গেল।

দু'পয়সার মাছ। আজকাল আবার কড়ি চলচে না হাটে। বলে, তামার পয়সা দাও।

—কালে কালে কত কি হচ্চে! আরও কত কি হবে! একটা কথা শুনেচো?

—কি?

এই সময় নিলু খয়রা মাছ ভাজা পাতে দিয়ে দাঁড়ালো কাছে। ভবানী তাকে বসিয়ে গল্পটা শোনালেন। তাদের দেশে রেল লাইন বসেচে, চুয়োডাঙা পর্যন্ত লাইন পাতা হয়ে গিয়েচে। কলের গাড়ি এই বছর যাবে কিংবা সামনের বছর। তিলু অবাক হয়ে বাউটিশোভিত হাত দুটি মুখে তুলে একমনে গল্প শুনছিল, এমন সময় রান্নাঘরের ভেতর ঝন্‌ঝন্ ক'রে বাসনপত্র যেন স্থানচ্যুত হবার শব্দ হোলো। নিলু খয়রা মাছের পাত্রটা নামিয়ে রেখে হাত মুঠো ক'রে চিবুকে দিয়ে গল্প শুনছিল, অমনি পাত্র তুলে নিয়ে দৌড় দিলে রান্নাঘরের দিকে। ঘরের মধ্যে গিয়ে তাকে বলতে শোনা গেল—যাঃ যাঃ বেরো আপদ—

তিলু ঘাড় উঁচু ক'রে বললে—হ্যাঁরে নিয়েচে?

—বড় বেলে মাছটা ভেজি রেখেছি ওবেলা খোকাকে দেবো বলে, নিয়ে গিয়েচে।

—ধাড়িটা না মেদিটা?

—ধাড়িটা।

—ওবেলা ঢুকতি দিবিনে ঘরে, ঝ্যাঁটা মেরে তাড়াবি।

ভবানী বললেন—সেও কেষ্টর জীব। তোমার আমার না খেলে খাবে কার? খেয়েচে বেশ করেচে। ও নিলু, চলে এসো, গল্প শোনো। আর দু'দিন পরে বেঁচে থাকলে কলের গাড়ি শুধু দেখা নয়, চ'ড়ে শান্তিপুরে রাস দেখে আসতে পারবে।

নিলু ততক্ষণ আবার এসে বসেছে খালি হাতে। ভবানী গল্প করেন। অনেক কুলি এসেচে, গাঁইতি এসেচে, জঙ্গল কেটে লাইন পাতচে। রেলের পাটি তিনি দেখে এসেচেন। লোহার ইঁটের মত, খুব লম্বা। তাই জুড়ে জুড়ে পাতে।

তিলু বললে—আমরা দেখতে যাব।

—যেও, লাইন পাতা দেখে কি হবে? সামনের বছর থেকে রেল চলবে এদিকে। কোথায় যাব বলো।

নিলু বললে—জষ্ঠি যুগল। দিদিও যাবে।

যুগল দেখিলে জষ্ঠি মাসে
পতিসহ থাকে স্বর্গবাসে—

—উঃ বড্ড স্বামীভক্তি যে দেখচি!

—আবার হাসি কিসের? খাড়ু পৈঁছে আর নোয়া বজায় থাকুক, তাই বলুন। মেজদি ভাগ্যিমানি ছিল—একমাথা সিঁদুর আর কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে চলে গিয়েচে, দেখতি দেখতি কতদিন হয়ে গেল!

তিলু বললে—ওঁর খাবার সময় তুই বুঝি আর কথা খুঁজে পেলি নে? যত বয়স হচ্চে, তত ধাড়ি ধিঙ্গি হচ্চেন দিন দিন।

বিলুর মৃত্যু যদিও চার-পাঁচ বছর হোলো হয়েচে, তিলু জানে স্বামী এখোনো তার কথায় বড় অন্যমনস্ক হয়ে যান। দরকার কি খাবার সময় সে কথা তুলবার!

নিস্তারিণী ঘোমটা দিয়ে এসে এই সময় উঠোন থেকে ব্যস্তসুরে বললে—ও দিদি,

বট্‌ঠাকুরের খাওয়া হয়ে গিয়েচে?

—কেন রে, কি ওতে?

—আমড়ার টক আর কচুশাকের ঘণ্ট। উনি ভালোবাসেন বলেছিলেন, তাই বলি রান্না হোলো নিয়ে যাই। খাওয়া হয়ে গিয়েচে—

—ভয় নেই। খেতে বসেচেন, দিয়ে যা—

সলজ্জ সুরে নিস্তারিণী বললে—তুমি দাও দিদি। আমার লজ্জা—

—ইস! ওঁর মেয়ের বয়স, উনি আবার লজ্জা—যা দিয়ে আয়—

—না দিদি।

—হ্যাঁ—

নিস্তারিণী জড়িতচরণে তরকারির বাটি নামিয়ে রাখলে এসে ভবানী বাঁড়ুয্যের থালার পাশে। নিজে কোনো কথা বললে না। কিন্তু ওর চোখমুখ আগ্রহে ও উৎসাহে এবং কৌতূহলে উজ্জ্বল। ভবানী বাটি থেকে তরকারি তুলে চেখে দেখে বললেন—চমৎকার কচুর শাক। কার হাতের রান্না বৌমা?

নিস্তারিণী এ গ্রামের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের বৌ। সে একা সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যায়; অনেকের সঙ্গে কথা কয়, অনেক দুঃসাহসের কাজ করে—যেমন আজ এই দুপুরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে তরকারি আনা ওপাড়া থেকে। এ ধরনের বৌ এ গ্রামে কেউ নেই। লোকে অনেক কানাকানি করে, আঙুল দিয়ে দেখায়, কিন্তু নিস্তারিণী খুব অল্প বয়সের বৌ নয়, আর বেশ শক্ত, শ্বশুর শাশুড়ী বা আর কাউকেও তেমন মানে না। সুন্দরী এক সময়ে বেশ ভালোই ছিল, এখন যৌবন সামান্য একটু পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

ভবানীর বড় মমতা হয়। প্রাণের শক্তিতে শক্তিময়ী মেয়ে, কত কুৎসা, কত রটনাই ওর নামে। বাংলাদেশের এই পল্লী অঞ্চল যেন ক্লীবের জগৎ—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শক্তিমতী মেয়ে যে সৃষ্টির কি অপূর্ব বস্তু, মূর্খের ক্লীবের দল তার কি জানে? সমাজ সমাজ করেই গেল এ মহা-মূর্খের দল।

দেখেছিলেন এদেশে এই নিস্তারিণীকে আর গয়ামেমকে। ওই আর একটি শক্ত মেয়ে। জীবন-সাধনার বড় অভিজ্ঞান ওর চরিত্র।

রামকানাই কবিরাজের কাছে গয়ার কথা শুনেছিলেন ভবানী। নীলকুঠির বড় সাহেবের মৃত্যুর পরে রোজ সে রামকানাই কবিরাজের বাড়ি এসে চৈতন্যচরিতামৃত শুনতো। পরের দুঃখ দেখলে সিকিটা, কাপড়খানা, কখনো এক খুঁচি চাল দিয়ে সাহায্য করতো। কত লোক প্রলোভন দেখিয়েছিল, তাতে সে ভোলে নি। সব প্রলোভনকে তুচ্ছ করেছিল নিজের মনের জোরে। বড় নাকি দুরবস্থাতে পড়েছিল, গ্রামে ওর জাতের লোক ওকে একঘরে করেছিল ওর মুরুব্বী বড় সাহেব মারা যাওয়ার পর—অথচ তারাই এককালে কত খোশামোদ করেছিল ওকে, যখন ওর এক কথায় নতুন দাগ-মারা জমির নীলের মার্কা উঠে যেতে পারতো কিংবা কুঠিতে ঘাস কাটার চাকরি পাওয়া যেতো। কাপুরুষের দল!

সন্ধ্যার সময় খেপীর আশ্রমে গিয়ে বসলেন ভবানী। খেপী ওঁকে দেখে খুব খাতির করলে। কিছুক্ষণ পরে ভবানী বললেন—কেমন চলচে?

এই আর একটি মেয়ে, এই খেপী। সন্ন্যাসিনী বেশ, বছর চল্লিশ বয়েস, কোনো কালেই সুন্দরী ছিল না, শক্ত-সমর্থ মেয়েমানুষ। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা থাকে। বাঘ আছে, দুষ্ট লোক আছে—কিছু মানে না। ত্রিশূলের এক খোঁচায় শক্ত হাতে দেবে উড়িয়ে—যে-ই দুষ্ট লোক আসুক এ মনের জোর রাখে।

খেপী কাছে এসে বললে—আজ একটু সৎকথা শুনবো—

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন হেসে—অসৎ কথা কখনো বলেচি?

—মা-রা ভালো?

—হুঁ।

—খোকা ভালো?

—ভালো। পাঠশালায় গিয়েচে। সে এখানে আসতে চায়।

—এবার নিয়ে আসবেন।

—নিশ্চয় আনবো।

—আচ্ছা, আপনার কেমন লাগে, রূপ না অরূপ?

—ও সব বড় বড় কথা বাদ দাও, খেপী। আমি সামান্য সংসারী লোক। যদি বলতে হয় তবে আমার গুরুভাই চৈতন্যভারতীর কাছে শুনো।

—একটু বলতি হবে পশ্চিমির কথা। সেই বিষ্টির দিন বলেছিলেন, বড্ড ভালো লেগেছিলো।

ভবানী বাঁড়ুয্যে এখানে মাঝে মাঝে প্রায়ই আসেন। দ্বারিক কর্মকার এখানকার এক ভক্ত, সম্প্রতি সে একখানা চালাঘর তৈরি করে দিয়েচে, সমবেত ভক্তবৃন্দের গাঁজা সেবনের সুবিধার জন্যে। এখানকার আর একজন ভক্ত হাফেজ মন্ডল নিজে খেটেখুটে ঘরখানা উঠিয়েচে, খড় বাঁশ দড়ির খরচ দিয়েচে দ্বারিক কর্মকার। ওরা সন্দের সময় রোজ এসে জড়ো হয়, গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায় অশ্বথ্তলা। ভবানী বাঁড়ুয্যে এলে সমীহ করে সবাই, গাঁজা সামনে কেউ খায় না।

ভবানী বললেন—শালবনের মধ্যে নদী বয়ে যাচ্চে, ওপরে পাহাড়, পাহাড়ে আমলকীর গাছ, বেলগাছ। দুটো একটা নয়, অনেক। আমার গুরুদেব শুধু আমলকী বেল আর আতা খেয়ে থাকতেন। অনেকদিনের কথা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তোমাদের দেশেই এসেছি আজ প্রায় বারো-চোদ্দ বছর হয়ে গেল। বয়েস হোলো ষাট-বাষট্টি। খোকার মা তখন ছিল ত্রিশ, এখন চুয়াল্লিশ। দিন চলে যাচ্চে জলের মত। কত কি ঘটে গেল আমি আসবার পরে। কিন্তু এখনো মনে হয় গুরুদেব বেঁচে আছেন এবং এখনো সকাল সন্দে ধ্যানস্থ থাকেন সেই আমলকীতলায়।

খেপী সন্ন্যাসিনী একমনে শুনতে শুনতে বললে—তিনি বেঁচে নেই?

—চৈতন্যভারতী বলে আমার এক গুরুভাই এসেছিলেন আজ কয়েক বছর আগে। তখন বেঁচে ছিলেন। তারপর আর খবর জানিনে।

—মন্ত্রদাতা গুরু?

—এক রকম। তিনি মন্ত্র দিতেন না কাউকে। উপদেষ্টা গুরু।

—আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল দেখতি যাই। তা বয়স বেশি হোলো, অত দূর দেশে হাঁটা কি এখন পোষায়?

—আমাদের দেশে রেলের গাড়ি হচ্চে শুনেচ?

—শোনলাম। রেলগাড়ি হলি আমাদের চড়তি দেবে, না সায়েবসুবো চড়বে?

—আমার বোধ হচ্চে সবাই চড়বে। পয়সা দিতে হবে।

—আমার দেবতা এই অশ্বথ্‌তলাতেই দেখা দেন ঠাকুরমশাই। আমরা গরীব লোক, পয়সা খরচ করে যদি না-ই যেতে পারি গয়া কাশী বিন্দাবন, তবে কি গরীব বলে তিনি আমাদের চরণে ঠাঁই দেবেন না? খুব দেবেন। রূপেও তিনি সব জায়গায়, অরূপেও তিনি সব জায়গায়। এই গাছতলার ছায়াতে আমার মত গরীবির কুঁড়েতে তিনি বসে গাঁজা খান আমাদের সঙ্গে—

—অ্যাঁ!

—বললাম, মাপ করবেন ঠাকুরমশাই। বলাডা ভুল হোলো। এ সব গুহ্য কথা। তবে আপনার কাছে বললাম, অন্য লোকের কাছে বলিনে।

ভবানী হেসে চুপ করে রইলেন। যার যা মনের বিশ্বাস তা কখনো ভেঙে দিতে নেই। ভগবান যদি এদের সঙ্গে বসে গাঁজা খান বিশ্বাস হয়ে থাকে, তিনি কে তা ভেঙে দেবার? এই অল্পবুদ্ধি লোক আগে বিরাটকে বুঝতে চেষ্টা করে না, আগে থেকেই সেই অনন্তের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে থাকে। অসীমের ধারণা না হোক, সেই বড় কল্পনাও তো একটা রস। রস উপলব্ধি করতে জানে না—আগেই ব্যগ্র হয় সেই অসীমকে সীমার গন্ডিতে টেনে এনে তাঁকে ক্ষুদ্র করতে।

খেপী বললে—রাগ করলেন? আপনারে জানি কিনা, তাই ভয় করে।

—ভয় কি? যে যা ভাবে ভাববে। তাতে দোষ কি আছে। আমার সঙ্গে মতে না মিললে কি আমি ঝগড়া করবো? আমি এখন উঠি।

—কিছু ফল খেয়ে যান—

—না, এখন খাবো না। চলি—

এই সময়ে দ্বারিক কর্মকার এল, হাতে একটা লাউ। বললে—লাউয়ের সুক্ত রাঁধতে হবে।

ভবানী বললেন—কি হে দ্বারিক, তুমি খাবে নাকি?

দ্বারিক বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে তা কখনো খাই? ওঁর হাতে কেন, আমি নিজের মেয়ের হাতে খাই নে। ভাজন্‌ঘাটে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গিইচি তা বেয়ান বললে, মুগির ডাল লাউ দিয়ে রেঁধিচি, খাবা? আমি বললাম, না বেয়ান, মাপ করবা। নিজির হাতে রেঁধে খালাম তাদের রান্নাঘরের দাওয়ায়।

দ্বারিক কর্মকার এ অঞ্চলের মধ্যে ছিপে মাছ মারার ওস্তাদ। ভবানী বললেন—তুমি তো একজন বড় বর্শেল, মাছ ধরার গল্প করো না শুনি।

দ্বারিক পুনরায় বিনীতভাবে বললে—জামাইঠাকুর, হবো না কেন? আজ দু'কুড়ি বছর ধরে এ দিগরের বিলি, বাঁওড়ে, নদীতি, পুকুরি ছিপ বেয়ে আসচি। কেন বর্শেল হবো না বলুন। এতকাল ধরে যদি একটা লোক একটা কাজে মন দিয়ে নেগে থাকে, তাতে সে কেন পোক্ত হয়ে উঠবে না বলুন।

খেপী বললে—এতকাল ধরে ভগবানের পেছনে নেগে থাকলি যে তাঁরে পেতে। মাছ ধরে অমূল্য মানব জন্মো বৃথা কাটিয়ে দিলে কেন?

দ্বারিক অত্যন্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে গেল এ কথা শুনে। এসব কথা সে কখনো ভেবে দেখে নি। আজকাল এই পয়ষট্টি বছর বয়সে নতুন ধরনের কথা যেন সবে শুনচে। লাউটা

সে নিরুৎসাহভাবে উঠোনের আকন্দগাছের ঝোপটার কাছে নামিয়ে রেখে দিলে। ভবানীর মমতা হোলো ওর অবস্থা দেখে। বললেন—শোন খেপী, দ্বারিকের কথা কি বলচো! আমি যে অমন গুরু পেয়েও এসে আবার গৃহী হোলাম, কেন? কেউ বলতে পারে? যে যা করচে করতে দাও। তবে সেটি সে যেন ভালো ভাবে সৎ ভাবে করে। কাউকে না ঠকিয়ে, কারো মনে কষ্ট না দিয়ে। সবাই যদি শালগ্রাম হবে, বাটনা বাটবার নুড়ি কোথা থেকে আসবে তবে?

খেপী বললে—আমি মুক্‌খুমি সহ্য করতে পারিনে মোটে। দ্বারিক যেন রাগ কোরো না। কোথায় লাউটা? সুক্তনি একটু দেবানি, মা কালীর পেরসাদ চাক্‌লি জাত যাবে না তোমার।

ভবানী থাকলে সকলেই একটু অস্বস্তি বোধ করে, কারণ গাঁজাটা চলে না। হাফেজ মন্ডল এসে আড়চোখে একবার ভবানীকে দেখে নিলে, ভাবটা এই, জামাইঠাকুর আপদটা আবার কোথা থেকে এসে জুটলো দ্যাখো। একটু ধোঁয়া-টোঁয়া যে টানবো, তার দফা গয়া।

খেপী বললে—ঐ দেখুন, আপদগুলো এসে জুটলো, শুধু গাঁজা খাবে—

—তুমি তো পথ দেখাও, নয়তো ওরা সাহস পায়?

—আমি খাই অবিশ্যি, ওতে মনডা একদিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

এই সময় যেন একটু বৃষ্টি এল। ভবানী উঠতে চাইলেও ওরা উঠতে দিলে না। সবাই মিলে বড় চালাঘরে গিয়ে বসা হোলো। ভবানীর মুখে মহাভারতের শঙ্খ-লিখিতের উপাখ্যান শুনে ওরা বড় মুগ্ধ। শঙ্খ ও লিখিত দুই ভাই, দুইজনেই তপস্বী, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রম স্থাপন করে বাস করেন। ছোট ভাই লিখিত একদিন দাদার আশ্রমে বেড়াতে গিয়ে দেখে দাদা আশ্রমে নেই, কোথাও গিয়েচেন। তিনি বসে দাদার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, এমন সময়ে তাঁর নজরে পড়লো, একটা ফলের বৃক্ষের ঘন ডালপালার মধ্যে একটা সুপক্ক ফল দুলছে। মহর্ষি লিখিত সেটা তখনি পেড়ে মুখে পুরে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দাদা আসতেই লিখিত ফল খাওয়ার কথাটা বললেন তাঁকে। শুনে শঙ্খের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কি কথা! তপস্বী হয়ে পরস্বাপহরণ? হোলোই বা দাদার গাছ, তাহোলেও তাঁর নিজের সম্পত্তি তো নয়, একথা ঠিক তো। না বলে পরের দ্রব্য নেওয়া মানেই চুরি করা। সে যত সামান্য জিনিসই হোক না কেন। আর তপস্বীর পক্ষে তো মহাপাপ। এ দুর্মতি কেন হোলো লিখিতের?

শঙ্কিত স্বরে লিখিত বললেন—কি হবে দাদা?

শঙ্খ পরামর্শ দিলেন রাজার নিকট গিয়ে চৌর্যাপরাধের বিচার প্রার্থনা করতে। তাই মাথা পেতে নিলেন লিখিত। রাজসভায় সব রকমের ত্রস্ত আহ্বান, আপ্যায়নকে তুচ্ছ করে, সভাসুদ্ধ লোকদের বিস্মিত করে লিখিত রাজার কাছে অপরাধের শাস্তি প্রার্থনা করলেন। মহারাজ অবাক। মহর্ষি লিখিতের চৌর্যাপরাধ? লিখিত খুলে বললেন ঘটনাটা। মহারাজ শুনে হেসে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। লিখিত কিন্তু অচল, অটল। তিনি বললেন—মহারাজ, আপনি জানেন না, আমার দাদা জ্ঞানী ও দ্রষ্টা। তিনি যখন আদেশ করেচেন আমাকে শাস্তি নিতে হবে, তখন আপনি আমাকে দয়া করে শাস্তি দিন। লিখিতের পীড়াপীড়িতে রাজা তৎকালপ্রচলিত বিধান অনুযায়ী তাঁর দুই হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। সেই অবস্থাতেই লিখিত দাদার আশ্রমে ফিরে গেলেন—ছোট ভাইকে দেখে শঙ্খ তো কেঁদে আকুল। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ভাই, কি কুক্ষণেই আজ তুই এসেছিলি আমার এখানে! কেনই বা লোভের বশবর্তী হয়ে তুচ্ছ একটা পেয়ারা পেড়ে খেতে গিয়েছিলি!

ঠিক সেই সময়ে সূর্যদেব অস্তাচলগামী হোলেন। সায়ং-সন্ধ্যার সময় সমুপস্থিত। শঙ্খ বললেন—চল ভাই, সন্ধ্যাবন্দনা করি।

লিখিত অসহায়ভাবে বললেন—দাদা, আমার যে হাত নেই।

শঙ্খ বললেন—সত্যাশ্রয়ী তুমি, ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছিলে, তার শাস্তিও নিয়েচ। তোমার হাতে যদি সূর্যদেব আজ অঞ্জলি না পান তবে সত্য বলে, ধর্ম বলে আর কিছু সংসারে থাকবে? চলো তুমি।

নর্মদার জলে অঞ্জলি দেবার সময়ে লিখিতের কাটা হাত আবার নতুন হয়ে গেল। দুই ভাই গলা ধরাধরি করে বাড়ি ফিরলেন। পথঘাট তিমিরে আবৃত হয়ে এসেচে। শঙ্খ হেসে সস্নেহে বললেন—লিখিত, কাল সকালে কত পেয়ারা খেতে পারিস দেখা যাবে!

দ্বারিক কর্মকার বললে—বাঃ বাঃ—

হাফেজ মন্ডল বলে উঠল—আহা-হা, আহা!

খেপী পেছন থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদেই উঠলো।

প্রাচীন ভারতবর্ষের হেমধূমাচ্ছন্ন আশ্রমপদ যেন মূর্তিমান হয়ে ওঠে এই পল্লীপ্রান্তে। মহাতপস্বী সে ভারতবর্ষ, সত্যের জন্যে তার যে অটুট কাঠিন্য, ধর্মের জন্যে তার যথাসর্বস্ব বিসর্জন।—সকলেই যেন জিনিসটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে। রক্তাপ্লুতদেহ, ঊর্ধ্ববাহু লিখিত ঋষি চলেচেন 'দাদা' 'দাদা' বলে ডাকতে ডাকতে বনের মধ্যে দিয়ে রাজসভা থেকে দাদার আশ্রমে।

সেদিনই একখানা কাস্তে বাঁধানোর জন্যে একটা খদ্দেরকে এক আনা ঠকিয়েছে— দ্বারিক কর্মকারের মনে পড়ে গেল।

হাফেজ মন্ডলের মনে পড়লো গত বুধবারের সন্ধ্যেবেলা সে কুড়নরাম নিকিরির ঝাড় থেকে দু'খানা তলদা বাঁশ না বলে কেটে নিয়েছিল ছিপ করবার জন্যে। সে প্রায়ই এমন নেয়। আর নেওয়া হবে না ওরকম। আহা-হা কি সব লোকই ছিল সেকালে। জামাইঠাকুরের মুখে শুনতে কি ভালোই লাগে!

খেপী দুটো কলা আর একটা শসার টুকরো ভবানী বাঁড়ুয্যের সামনে নিয়ে এসে রেখে বললে—একটু সেবা করুন। ভবানী খেতে খেতে বলছিলেন—ভগবানের শাসন হোলো মায়ের শাসন। অন্যের ভুল ত্রুটি সহ্য করা চলে, কিন্তু নিজের সন্তানেরও সব আব্দার সহ্য করে না মা। তেমনি ভগবানও। ছেলেকে কেউ নিন্দে করবে, এ তাঁর সহ্য হয় না। ভক্ত আপনার জন তাঁর, তাকে শাসন করেন বেশি। এ শাসন প্রেমের নিদান। তাঁকে নিখুঁত করে গড়তেই হবে তাঁকে। যে বুঝতে পারে, তার চোখের সামনে ভগবানের রুদ্র রূপের মধ্যে তাঁর স্নেহমাখা প্রেমভরা প্রসন্ন দক্ষিণ মুখখানি সর্বদা উপস্থিত থাকে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে ফেরবার পথে দেখলেন নিস্তারিণী একা পথ দিয়ে ওদের বাড়ির দিকে ফিরচে। ওঁকে দেখে সে রাস্তার ধারে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। রাত হয়ে গিয়েচে। এত রাত্রে কোথা থেকে ফিরচে নিস্তারিণী? হয়তো তিলুর কাছে গিয়েছিল। অন্য কোথাও বড় একটা সে যায় না।

এসব ভবিষ্যতের মেয়ে, অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের আগমনী এদের অলক্তরাগরক্ত চরণধ্বনিতে বেজে উঠেচে, কেউ কেউ শুনতে পায়। আজ গ্রাম্য সমাজের পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে এইসব

সাহসিকা তরুণীর দল অপাংক্তেয়—প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম্য বৃদ্ধদের মধ্যে ওদের বিরুদ্ধে ঘোঁট চলচে, জটলা চলচে, কিন্তু ওরাই আবাহন করে আনচে সেই অনাগত দিনটিকে।

দূর পশ্চিমাঞ্চলের কথাও মনে পড়লো। এ রকম সাহসী মেয়ে কত দেখেচেন সেখানে, ব্রজধামে, বিঠুরে, বাল্মীকি-তপোবনে। সেখানে কেলিকদম্বের চিরহরিৎপল্লবদলের সঙ্গে মিশে আছে যেন পীতাভ নিম্বপত্রের বর্ণমাধুরী, গাঢ় নীল কন্টকদ্রুমযুক্ত লাল রংয়ের ফুলে ফুলে ঢাকা নিবিড় অতিমুক্তলতাঝোপের তলে ময়ূরেরা দল বেঁধে নৃত্য করচে, কালিন্দীর জলরাশিতে গাছের ছায়ায় ঘাগরাপরা সুঠামদেহা তরুণী ব্রজরমণীর দল জলকেলি-নিরতা। মেয়েরা উঠবে কবে বাংলা দেশের? নিস্তারিণীর মত শক্তিমতী কন্যা, বধূ কবে জন্মাবে বাংলার ঘরে ঘরে?

তিলু বললে রাত্রে—হ্যাঁগো, নিস্তারিণী আবার যে গোলামাল বাধালে?

—কি?

—ও আবার কার সঙ্গে যেন কি রকম কি বাধাচ্চে—

—গোবিন্দ?

—উঁহু। সে সব নয়, ওর সঙ্গে দেখা করতি আসে মাঝে মাঝে, ওর বাপের বাড়ির লোক।

—কিছু হবে না, ভয় নেই। বললে কে এসব কথা?

—ও-ই বলছিল। সন্দের অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত বসে নিলু আর আমার সঙ্গে সেই সব গল্প করছিল। খোলামেলা সবই বলে, ঢাক-ঢাক নেই। আমার ভালো লাগে। তবে আগে ছিল, এখন বয়েস হচ্চে। আমি বকিচি আজ।

—না, বেশি বোকো না। যে যা বোঝে করুক।

—আবার কি জানেন, বড্ড ভালোবাসে আপনাকে—

—আমাকে?

—অবাক হয়ে গেলেন যে! পুরুষ জাতকে বিশ্বাস নেই। কখন কোন্ দিকে চলেন আপনারা। শুনুন, আপনার ওপর সত্যিই ওর খুব ছেদ্দা। ও বলে, দিদি, আপনার মত স্বামী পাওয়া কত ভাগ্যির কথা। যদি বলি বুড়ো, তবে যা চটে যায়। বলে, কোথায় বুড়ো? উনি বুড়ো বই কি! ঠাকুরজামাইয়ের মত লোক যুবোদের মধ্যি ক'টা বেরোয় দ্যাখ্যাও না?...এই সব বলে—হি হি—ওর আপনার ওপর সোহাগ হোলো নাকি? আপনাকে দেখতিই আসে এ বাড়ি।

—ছিঃ ওকথা বলতে নেই, আমার মেয়ের বয়সী না?

—সে তো আমরাও আপনার মেয়ের বয়সী। তাতে কি? ওর কিন্তু ঠিক—আপনার ওপর—

—যাক সে। শোনো, খোকা কোথায়?

—এই খানিকটা আগে খেলে এল। শুয়ে পড়েচে। কি বই পড়ছিল। আমাকে কেবল বলছিল, মা, আমি বাবার সঙ্গে খেতি বসবো। আমি বললাম, আপনার ফিরতি অনেক রাত হবে। জায়গা করি?

—করো—কিন্তু সন্দে-আহ্নিকটা একবার করে নেবো। নিলুকে ডাকো—

নীলমণি সমাদ্দার পড়ে গিয়েচেন বিপদে। সংসার অচল হয়ে পড়েচে। তিন আনা দর উঠে গিয়েচে এক কাঠা চালের। তাঁর একজন বড় মুরুব্বী ছিলেন দেওয়ান রাজারাম। রাজারামের খুন হয়ে যাওয়ার পরে নীলমণি বড় বেকায়দায় পড়ে গিয়েচেন। রাজারামদাদা লোক বড় ভালো ছিল না, কূটবুদ্ধি, সাহেবের তাঁবেদার। তাই করতে গিয়েই মারাও পড়লো। আজকাল একথা সবাই জানে এ অঞ্চলে, শ্যাম বাগ্দীর মেয়ে কুসুমকে তিনি বড় সাহেবের হাতে সমর্পণ করতে গিয়েছিলেন রাতে চুপিচুপি ওকে ভুলিয়ে-টুলিয়ে ধাপ্পা-ধুপ্পি দিয়ে। কুসুমকে তার বাবা ওঁর বাড়ি রেখে যায় তার চরিত্র শোধরাবার জন্যে। বড় সাহেব কিন্তু কুসুমকে ফেরত দিয়েছিল, ঘরে ঢুকতেও দ্যায় নি। রাজারামকে বলেছিল—এখন সময় অন্যরকম, প্রজাদের মধ্যে গোলমাল দেখা দিয়েচে, এখন কোনো কিছু ছুতো পেলে তারা চটে যাবে, গভর্ণমেন্ট চটে যাবে, নতুন ম্যাজিস্ট্রেটটা নীলকর সাহেবদের ভালো চোখে দেখে না, একে নিয়ে চলে যাও। কে আনতে বলেছিল একে?

রাজারাম চলে আসেন। কুসুম কিন্তু সে কথা তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রকাশ করে দেয়—সেজন্যে বাগ্দী ও দুলে প্রজারা ভয়ানক চটে যায় দেওয়ান রাজারামের ওপর। রাজারাম যে বাগ্দিদের দলের হাতেই প্রাণ দিলেন, এও তার একটা প্রধান কারণ।

গ্রামে কোনো কথা চাপা থাকে না। এসব কথা এখন সকলেই জানে বা শুনেচে। নীলমণি সমাদ্দার শুনেচেন কানসোনার বাগ্দিরা এ অঞ্চলের ওদের সমাজের প্রধান। তারাই একজোট হয়ে সেই রাত্রে রাজারামকে খুন করে। বড় সাহেব যে কুসুমকে গ্রহণ না করে ফেরত দিয়েছিল, একথাও সবাই জেনেছিল সে সময়। সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণও করেছিল সেজন্যে বড় সাহেব। যাক সে সব কথা। এখন কথা হচ্চে, নীলমণি সমাদ্দার করেন কি? স্ত্রী আন্নাকালী দুবেলা খোঁচাচ্চেন,—চাল নেই ঘরে। কাল ভাত হবে না, যা হয় করো, আমি কথা বলে খালাস।

দুপুরের পর নীলমণি সমাদ্দার সেই কানসোনা গ্রামেই গেলেন। সেই অনেকদিন আগে কুঠির দাঙ্গায় নিহত রামু বাগ্দির বাড়ি। রামু বাগ্দির ছেলে হারু পাটের দড়ি পাকাচ্ছিল কাঁটালতলায় বসে। আজকাল হারুর অবস্থা ভালো, বাড়িতে দুটো ধানের গোলা, একগাদা বিচুলি।

হারু উঠে এসে নীলমণি সমাদ্দারকে অভ্যর্থনা করলে। নীলমণি যেন অকূলে কূল পেলেন হারুকে পেয়ে। বললেন—বাবা হারু, একটু তামাক খাওয়া দিকি।

হারু তামাক সেজে নিয়ে এসে কলার পাতায় কল্কে বসিয়ে খেতে দিলে। বললে—ইদিকি কনে এয়েলেন!

ততক্ষণে নীলমণি সমাদ্দার মনে মনে একটা মতবল ঠাউরে ফেলেচেন। বললেন—তোমার কাছেই।

—কি দরকার?

—কাল রাত্তিরি একটা খারাপ স্বপ্ন দ্যাখলাম তোর ছেলেডার বিষয়ে, নারায়ণ বাড়ি আছে? তাকে ডাক দে।

একটু পরে নারাণ সর্দার এল থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে। এ নারাণ সর্দারই রাজারাম রায়কে খুন করবার প্রধান পান্ডা ছিল সেবার।

দেখতে দুর্ধর্ষ চেহারা, যেমনি জোয়ান, তেমনি লম্বা। এই গ্রামের মোড়ল।

নীলমণি বললেন—এসো নারায়ণ। একটি খারাপ স্বপ্ন দেখে তোমাদের কাছে এ্যালাম। তোমাদের আপন বলে ভাবি, পর বলে তো কখনো ভাবি নি। স্বপ্নটা হারুর ছেলে বাদলের সম্বন্ধে। যেন দ্যাখলাম—

এই পর্যন্ত বলেই যেন হঠাৎ থেমে গেলেন।

হারু ও নারাণ সমস্বরে উদ্বেগের সুরে বললেন—কি দ্যাখলেন!

—সে আর শুনে দরকার নেই। আজ আবার অমাবস্যে শুক্কুরবার। ওরে বাবা! বলেচে, তদর্ধং কৃষি কর্মণি। সব্বনাশ। সে চলবে না।

নারাণই গ্রামের সর্দার, গ্রামের বুদ্ধিমান বলে গণ্য। সে এগিয়ে এসে বললে—তাহলি এর বিহিত কি খুড়োমশাই?

নীলমণি মাথা নেড়ে বললেন—আরে সেইজন্যি তো আসা। তোমরা তো পর নও। নিতান্ত আপন বলে ভেবে এল্যাম চেরডা কাল। আজ কি তার ব্যত্যয় হবে? না বাবা। তেমনি বাপে আমার জম্মো দ্যায় নি—

এই পর্যন্ত বলেই নীলমণি সমাদ্দার আবার চুপ করলেন। নারাণ সর্দার ন্যায়পক্ষেই বলতে পারতো যে, এর মধ্যেই বাপের জন্ম দেওয়ার কথা কেন এসে পড়লো অবান্তর ভাবে, কিন্তু সে সব কিছু না বুঝে সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললে—তাহলি এখন এর বিহিত কত্তি হবে আপনারে। মোদের কথা বাদ দ্যান, মোরা চকিও দেখিনে, কানেও শুনিনে। যা হয় কর আপনি।

নীলমণি বললেন—কিন্তু বড্ড গুরুতর ব্যাপার। যড়ঙ্গ মাতৃসাধন করতি হবে কিনা। আজ কি বার? রও। শুক্কুর, শনি, রবিবারে হোলো দ্বিতীয়ে। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ে। ঠিক হয়ে গিয়েচে—দাঁড়াও ভেবে দেখি—

নীলমণির মুখখানা যেন এক জটিল সমস্যার সমাধানে চিন্তাকুল হয়ে পড়লো। তাঁকে নিরুপদ্রব চিন্তার অবকাশ দেওয়ার জন্যে দুজনে চুপ করে রইল, মামা ও ভাগ্নে।

অল্পক্ষণ পরে নীলমণির মুখ উজ্জ্বল দেখালো। বললেন—হয়েচে। যাবে কোথায়?

—কি খুড়োমশাই?

—কিছু বলবো না। খোকার কপালে ঠেকিয়ে দুটো মাসকলাই আমাকে দাও দিকি?

হারু দৌড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে দুটি মাসকলাইয়ের দানা নিয়ে এসে নীলমণির হাতে দিল। সে-দুটি হাতে নিয়ে নীলমণি প্রস্থানোদ্যত হলেন। হারু ও নারাণ ডেকে বললে—সে কি! চললেন যে?

—এখন যাই। বুধবার অষ্টোত্তরী দশা। ষড়ঙ্গ হোম করতি হবে এই মাসকলাই দিয়ে। নিঃশ্বেস ফ্যালবার সময় নেই।

—খুড়োমশাই, দাঁড়ান। দু'কাঠা সোনামুগ নিয়ে যাবেন না বাড়ির জন্যি?

—সময় নেই বাবা। এখন হবে না। কাল সকালে আগে মাদুলি নিয়ে আসি, তারপর অন্য কথা।

পথে নেমে নীলমণি সমাদ্দার হনহন ক'রে পথ চলতে লাগলেন। মাছ গেঁথে ফেলেচেন এই করেই তিনি সংসার চালিয়ে এসেচেন। আজ এ-গাঁয়ে, কাল ও-গাঁয়ে। তবে সব জলে ডাল সমান গলে না। গাঁয়ের ধারের রাস্তায় দেখলেন তাঁদের গ্রামের ক্ষেত্র ঘোষ এক ঝুড়ি বেগুন

মাথায় নিয়ে বেগুনের ক্ষেত থেকে ফিরচে। রাস্তাতে তাঁকে পেয়ে ক্ষেত্র বেগুনের বোঝা নামিয়ে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললে—বড্ড খরগোশের উপদ্রব হয়েচে—বেগুনে জালি যদি পড়েচে তবে দ্যাখো আর নেই। দু'বিঘে জমিতে মোট এই দশ গন্ডা বেগুন। এ রকম হলি কি করে চলে! একটা কিছু করে দ্যান দিনি, আপনাদের কাছে যাবো ভেবেলাম।

নীলমণি বললেন—তোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একটা হত্তুকি নিয়ে আমার বাড়ি যাবা আজ রাত্তির দু'দন্ডর সময়। আজ অমাবস্যে, ভালোই হোলো।

—বেশ যাবানি। হ্যাদে, দুটো বেগুন নিয়ে যাবা?

—তুমি যখন যাবা, তখন নিয়ে যেও। বেগুন আর আমি বইতি পারবো না।

বাড়ির ভেতরে ঢুকবার আগে কাদের গলার শব্দ পেলেন বাড়ির মধ্যে। কে কথা বলে? উঁহু, বাড়ির মধ্যে কেউ তো যাবে না।

বাড়ি ঢুকতেই ওঁর পুত্রবধূ ছুটে এল দোরের কাছে। বললে—বাবা—

—কি? বাড়িতি কারা কথা বলচে বৌমা?

—চুপ, চুপ। সরোজিনী পিসি এসেচে ভাঁড়ারকোলা থেকে তার জামাই আর মেয়ে নিয়ে। সঙ্গে দুটো ছোট নাতনী। মা বলে দিলেন চাল বাড়ন্ত। যা হয় করুন।

—আচ্ছা, বলগে সব ঠিক হয়ে যাচ্চে। ওদের একটু জলপান দেওয়া হয়েচে?

—কি দিয়ে জলপান দেওয়া হবে? কি আছে ঘরে?

—তাই তো! আচ্ছা, দেখি আমি।

নীলমণি সমাদ্দার বাড়ির বাইরের আমতলায় এসে অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কি করা যায় এখন? সরোজিনীরও (তাঁর মাসতুতো বোন) কি আর আসবার সময় ছিল না! আর আসার দরকারই বা কি রে বাপু? দুটো হাত বেরুবে! যত সব আপদ! কখনো একবার উদ্দেশ নেয় না একটা লোক পাঠিয়ে—আজ মায়া একেবারে উথলে উঠলো।

একটু পরেই ক্ষেত্র ঘোষ এসে হাজির হলো। তার হাতে গন্ডা পাঁচেক বেগুন দড়িতে ঝোলানো, একছড়া পাকা কলা আর একঘটি খেজুরের গুড়। তাঁর হাতে সেগুলো দিয়ে ক্ষেত্র বললে—মোর নিজির গাছের গুড়। বড় ছেলে জ্বাল দিয়ে তৈরী করেচে। সেবা করবেন। আর সেই দুটো হত্তুকি। বলেলেন আনতি। তাও এনিচি।

—তা তো হোলো, আপাতোক ক্ষেত্তোর, কাঠাদুই চাল বড্ড দরকার যে। বাড়িতি কুটুম্ব এসে পড়েচেন অথচ আমার ছেলে বাড়ি নেই, কাল আসবার সময় চাল কিনে আনবে দু মণ কথা আছে। এখন কি করি?

—তার আর কি? মুই এখনি এনে দিচ্চি।

চালের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ক্ষেত্র ঘোষ চাষী গৃহস্থ, তার সংসারে কোনো জিনিসের অভাব নেই। তখুনি সে দু'কাঠা চাল নিয়ে এসে পৌঁছে দিলে ও নীলমণি সমাদ্দারের হাতে হত্তুকি দুটোও দিলে। নীলমণি হত্তুকি নিয়ে ও চাল নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। বাইরে আসতে আধঘন্টা দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে সেই হত্তুকি দুটো ক্ষেত্র ঘোষের হাতে দিয়ে বললেন—যাও, এই হত্তুকি দুটো বেগুন ক্ষেতের পূবদিকের বেড়ার গায়ে কালো সূতো দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দেবা। ব্যস্! মন্তর দিয়ে শোধন করে দেলাম। খরগোসের বাবা আসবে না।

পরদিন সকালে কানসোনা গেলেন। একটি পুরোনো মাদুলি পুত্রবধূ খুঁজেপেতে কোথা

থেকে দিয়েচে, উনি সেটা জিউলি গাছের আঠা আর ধুলো দিয়ে ভর্তি করে নিয়েচেন। একটু সিঁদুর চেয়ে নিয়েচেন বাড়ি থেকে। পথে একটা বেলগাছ থেকে বেলপাতা পেড়ে সিঁদুর মাখালেন বেশ ক'রে।

হারু ও নারাণ উদ্বিগ্নভাবে তাঁরই অপেক্ষায় আছে। হারুর তো রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি বললে।

নারাণ সর্দার বললে—তবু তো বাড়ির মধ্যি বলতি বারণ করেলাম। মেয়ে মানুষ সব, কেঁদেকেটে অনথ বাধাবে।

নীলমণি সমাদ্দার সিঁদুরমাখানো বেলপাতা আর মাদুলি ওর হাতে দিয়ে বললেন—তুমি গিয়ে হোলে খোকার দাদু। তুমি গিয়ে তার গলায় মাদুলি পরিয়ে দেবা আর এই বেলপাতা ছেঁচে রস খাইয়ে দেবা। কাল সারারাত জেগে ষড়ঙ্গ হোম করি নি? বলি, না, ঘুম অনেক ঘুমোবো। হারু আমার ছেলের মত। তার উপকারডা আগে করি। বড্ড শক্ত কাজ বাবা। এখন নিয়ে যাও, যমে ছোঁবে না। আমার নিজেরও একটা দুর্ভাবনা গেল। বাবাঃ—

এরপর কি হোলো, তা অনুমান করা শক্ত নয়। হারুর কৃষাণ গুপে বাগ্‌দি এক ধামা আউশ চাল আর দু'কাঠা সোনা মুগ মাথায় করে বয়ে দিয়ে এল নীলমণি সমাদ্দারের বাড়ি।

নীলমণির সংসার এই রকমেই চলে।

গয়ামেম সকালে সামনের উঠোনে ঘুঁটে দিচ্ছিল, এমন সময়ে দূরে প্রসন্ন আমীনকে আসতে দেখে গোবরের ঝুড়ি ফেলে কাপড় ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রসন্ন চক্কত্তি কাছে এসে বললে, কি হচ্চে? বলে দিইচি না, এসব কোরো না গয়া। আমার দেখলি কষ্ট হয়। রাজরাণী কি না আজ ঘুটেকুড়ুনি!

গয়া হেসে বললে—যা চিরডা কাল করতি হবে, তা যত সত্বর আরম্ভ হয়, ততই ভালো।

—আহা! আজ তোমার মাও যদি থাকতো বেঁচে। হঠাৎ মারা গেল কিনা। মরবার বয়েস আজও তা'বলে হই নি ওর।

—সবই অদেষ্ট খুড়োমশাই। তা নলি—

গয়ামেম বিষণ্ন মুখে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

প্রসন্ন চক্কত্তি ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলে। দুখানা খড়ের ঘর, একখানাতে সাবেক আমলে রান্না হতো—হুঁশিয়ার বরদা বাগ্‌দিনী মেয়ের কুঠিতে খুব পসার-প্রতিপত্তির অবসরে রান্নাঘরখানাকে বড় ঘরে দাঁড় করায়—কাঁঠালকাঠের দরজা, চৌকাঠ, জানালা বসিয়ে। এইখানাতেই এখন গয়ামেম বাস করে মনে হোলো, কারণ জানালা দিয়ে তক্তপোশের ওপর বিছানা দেখা যাচ্চে। কিন্তু অন্য ঘরখানার অবস্থা খুব খারাপ, চালের খড় উড়ে গিয়েচে, ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেচে দাওয়ায়, গোবর দিয়ে নিকোনো হয় নি। দেওয়ালে ফাটল ধরেচে।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—ঘরখানার এ অবস্থা কি করে হোলো?

—কি অবস্থা?

—পড়ে যায়-যায় হয়েচে!

—গেল, গেল। একা নোক আমি, ক'খানা ঘরে থাকবো?

প্রসন্ন চক্কত্তি কতকটা যেন আপন মনেই বললে—সায়েব-টায়েব কি জানো, ওরা হাজার হোক ভিন্‌দেশের—আমার সুখদুক্‌খু ওরা কি বা বোঝবে? তোমারও ভুল, কেন কিছু চাইলে না সেই সময়ডা? তুমি তো সব সময় শিওরে বসে থাকতে—কিছু হাত ক'রে নিতি হয়।

গয়ামেম চুপ করে রইল, বোধ হোল ওর চোখের জল চিক চিক করচে।

প্রসন্ন চক্কত্তি ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললে—নাঃ, তোমার মত নির্বোধ মেয়ে গয়া আজকালকারের দিনি—ঝাঁট্টা মারোঃ।—একথা বলবার, এবং এত ঝাঁজের সঙ্গে বলবার হেতুও হচ্চে গয়ামেমের ওপর প্রসন্ন চক্কত্তির আন্তরিক দম। গয়ার চেয়ে সেটুকু কেউ বেশি বোঝে না, চুপ করে থাকা ছাড়া তার আর কি করবার ছিল?

এমন সময় ভগীরথ বাগ্‌দীর মা কোথা থেকে উঠোনে পা দিয়ে বললে—আমীনবাবু না? এসো বোসো। আপনার কথা আমি সব শুনলাম দাঁড়িয়ে। ঠিক কথা বলেচ। গয়ারে দু'বেলা বলি, বড় সায়েব তো তোরে মেম বানিয়ে দিয়ে গেল, সবাই বললে গয়ামেম—মেমের মতো সম্পত্তি কি দিয়ে গেল তোরে? মাডা মরে গেল, ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নেই—হাতে একটা কানাকড়ি নেই, কুঠির সেই জমিটুকু ভরসা। আর বছর দুটো ধান হয়েচে, তবে এখন খেয়ে বাঁচ্ছ, নয়তো উপোস করতি হোতো না আজ? ইদিকি বাগ্‌দিদের সমাজে তুই অচল। তোরে নিয়ে কেউ খাবে না। তুই এখুন যাবি কোথায়? ছেলেবেলায় কোলে-পিঠে করিচি তোদের, কষ্ট হয়। মা নেই আর তোরে বলবে কে? সে মাগী সুদ্দু মনের দুঃখি মরে গেল। আমারে বলতো, দিদি, মেয়েডার যদি একটু জ্ঞানগম্যি থাকতো, তবে মোদের ঘরে আজ ও তো রাজরাণী। তা না শুধু হাতে ফিরে আলেন নীলকুঠি থেকে—

গয়া যুগপৎ খোঁচা খেয়ে একটু মরীয়া হয়েও উঠলো। বললে, আমি খাই না খাই তাতে তোমাদের কি? বেশ করিচি আমি, যা ভালো বুঝিচি করিচি—

ভগীরথের মা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হোলো, যাবার সময়ে বললে—মনডা পোড়ে, তাই বলি। তুই হলি চেরকালের একগুঁয়ে আপদ, তোরে আর আমি জানি নে? যখন সায়েবের ঘরে জাত খোয়ালি সেই সঙ্গে একটা ব্যবস্থাও করে নে। ওর মা কি সোজা কান্না কেঁদেচে এই একটা বছর। তোর হাতের জল পজ্জন্ত কেউ খাবে না পাড়ায়, তুই অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে এক ঘটি জল তোরে কেডা দেবে এগিয়ে? আপনি বিবেচনা করে দ্যাখো আমীনবাবু—নীলকুঠি তো হয়ে গেল অপর লোকের, সায়েব তো পটল তুললো, এখন তোর উপায়!

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—জমিটুকু যাই করে দিইছিলাম, তবুও মাথা রক্ষে। নয়তো আজ দাঁড়াবার জায়গা থাকতো না। তাও তো ভাগ দিয়ে পাঁচ বিঘে জমির ধান মোটে পাবে।

ভগীরথের মা বললে—ভাগের ধান আদায় করাও হ্যাংনামা কম বাবু? সে ওর কাজ? ও সে মেমসায়েব কিনা? ফাঁকি দিয়ে নিলি ছেলেমানুষ তুই কি করবি শুনি?

ভগীরথের মা চলে গেল। গয়ামেম প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে তাকিয়ে বললে—খুড়োমশাই কি ঝগড়া করতি এ্যালেন? বসবেন, না যাবেন?

—না, ঝগড়া করবো কেন? মনডা বড্ড কেমন করে তোমাকে দেখে, তাই আসি—

গয়ামেম সাবেক দিনের মত হাসতে লাগলো মুখে কাপড় দিয়ে। প্রসন্ন চক্কত্তি দেখলে ওর

আগের সে চেহারা আর নেই—সে নিটোল সৌন্দর্য নেই, দুঃখে কষ্টে অন্যরকম হয়ে গিয়েচে যেন। তবুও জমিটা সে দিতে পেরেছিল যে নিজের হাতে মেপে, মস্ত বড় একটা কাজ হয়েচে। নইলে না খেয়ে মরতো আজ।

প্রসন্ন চক্কত্তি বসলো গয়ার দেওয়া বেদে চেটায়ে অর্থাৎ খেজুর পাতার তৈরী চেটায়।

—কি খাবেন?

—সে আবার কি?

—কেন খুড়োমশাই, ছোট জাত বলে দিতি পারি নি খেতি? কলা আছে, পেঁপে আছে—কেটেও দেব না। আপনি কেটে নেবেন। সকালবেলা আমার বাড়ি এসে শুধু মুখে যাবেন?

সত্যিই গয়া দুটো বড় বড় পাকা কলা, একটা আস্ত পেঁপে, আধখানা নারকোল নিয়ে এসে রাখলে প্রসন্ন আমীনের সামনে। হেসে বললে—জলডা আর দিতি পারবো না খুড়োমশাই।

তারপরে ঘরের দিকে যেতে উদ্যত হয়ে বললে—দাঁড়ান, আর একটা জিনিস দেখাই—

—কি?

—আনচি, বসুন।

খানিক পরে ঘর থেকে একখানা ছোট ছাপানো বই হাতে নিয়ে এসে প্রসন্ন আমীনের সামনে দিয়ে বললে—দেখুন। দাঁড়ান, ও কি? একখানা দা নিয়ে আসি, বেশ করে ধুয়ে দিচ্চি। ফল খান।

—শোনো শোনো। এ বই কোথায় পেলে? তোমার ঘরে বই? কি বই এখানা?

—দেখুন। আমি কি লেখাপড়া জানি?

—সেই কবিরাজ বুড়ো দিয়েচে বুঝি? পড়তে জানো না, বই দিলে কেন?

—দেচে নিয়ে এ্যালাম। কৃষ্ণের শতনাম।

প্রসন্ন আমীন বিস্মিত হয়ে গেল দস্তুরমত। গয়ামেমের বাড়ি ছাপানো বই, তাও নাকি কৃষ্ণের শতনাম!...নাঃ!

বসে বসে ফলগুলো সে খেলে দা দিয়ে কেটে। আধখানা পেঁপে গয়ার জন্যে রেখে দিলে। হেসে বললে—এখানডায় আসতি ভালো লাগে। তোমার কাছে এলি সব দুক্‌খু ভুলে যাই, গয়া।

—ওই সব বাজে কথা আবার বকতি শুরু করলেন! আসবেন তো আসবেন। আমি কি আসতি বারণ করিচি?

—তাই বলো। প্রাণডা ঠাণ্ডা হোক।

—ভালো। হলেই ভালো।

—কৃষ্ণের শতনাম বই কি করবে?

—মাথার কাছে রেখে শুই। বাড়িতি কেউ নেই। মা থাকলি কথা ছিল না। ভূতপ্রেত অবদেবতার ভয় কেটে যায়। একা থাকি ঘরে।

—তা ঠিক।

—ইদিকি পাড়াসুদ্দু শত্তুর। কুঠির সায়েব বেঁচে থাকতি সবাই খোশামোদ করতো, এখন রাতবিরাতে ডাকলি কেউ আসবে না, তাই ঐ বইখানা দিয়েচেন বাবা, কাছে রেখে শুলি

ভয়ভীত থাকবে না বলি দিয়েছেন। বড্ড ভাল লোক।...আজ ধান ভানতি না গেলি খাওয়া হবে না, চাল নেই। তাও কেউ ঢেঁকি দেয় না এ পাড়ায়। ওপাড়ায় কেনারাম সর্দারের বাড়ি যাব ধান ভানতি। তারা ভালো। জাতে বুনো বটে, কিন্তু তাদের মধ্যি মানুষেতা আছে খুড়োমশাই।

প্রসন্ন চক্কত্তি সেদিন উঠে এল একটু বেশি বেলায়। তার মনে বড় কষ্ট হয়েছে গয়াকে দেখে। একটা মাদার গাছতলায় বসলো খানিকক্ষণ গণেশপুরের মাঠে। গণেশপুর হোলো গয়ামেমদের গ্রামের নাম, শুধুই বাগ্‌দী আর ক'ঘর জেলে ছাড়া এ গ্রামে অন্য জাতের বাসিন্দা কেউ নেই। রোদ বড্ড চড়েচে। তবু বেশ ছায়া গাছটার তলায়।

প্রসন্ন ভাবলে বসে বসে—গয়া বড্ড বেকায়দায় পড়ে গিয়েচে। আজ যদি আমার হাতে পয়সা থাকতো, তবে ওরে অমনধারা থাকতি দেতাম? যেদিকি চোখ যায় বেরোতাম দুজনে। সে সাহস আর করতি পারিনে, বয়েসও হয়েচে, ঘরে ভাত নেই।

গাছটায় মাদার পেকেচে নাকি?...

প্রসন্ন মুখ উঁচু করে তাকিয়ে দেখলে। না, পাকে নি।

বিকেলের দিকে ভবানী ভাগবত পাঠ করে উঠলেন। তিনি জানেন, ভাগবত অতি দুরূহ ও দুরবগাহ গ্রন্থ। যেমন এর চমৎকার কবিত্ব, তেমনি অপূর্ব এর তত্ত্ব। অনেকক্ষণ ভাগবত পাঠ করে পুঁথি বাঁধবার সময় দেখলেন ওপাড়ার নিস্তারিণী এসে উঠানে পা দিলে। নিস্তারিণী আজকাল ভবানীর সঙ্গে কথা বলে। অবশ্য এই বাড়ির মধ্যেই, বাইরে কোথাও নয়।

নিস্তারিণী কাছে এসে বললে—ও ঠাকুরজামাই?

—এস বৌমা। ভালো?

—যেমন আশীর্ব্বাদ করেচেন। একটা কথা বলতে এইলাম।

—কি বলো?

—বুড়ো কবিরাজমশাইয়ের বাড়ি ধম্ম-কথা হয়, গান হয়, আমি যেতি পারি? আমার বড্ড ইচ্ছে করে।

—না বৌমা। সে হোলো গাঁয়ের বাইরে মাঠে। সেখানে কেউ যায় না।

—আচ্ছা, দিদি গেলি?

—তোমার দিদি যায় না তো।

—যদি আমি তার ব্যবস্থা করি?

—সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে?

—আমার ভালো লাগে। দুটো ভাল কথা কেউ বলে না এ গাঁয়ে, তবুও একটু গান হয়, ভালো বই পড়া হয়, আমার বড্ড ভালো লাগে।

—তোমার শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ী কি তোমার স্বামীর মত নিয়েচ?

—উনি মত দেবেন। মা মত দেন কি না দেন। বুড়ী বড় ঝানু। না দিলে তো বয়েই গেল, আমি যাবো ঠিক।

—ছিঃ, ওই তো তোমার দোষ বৌমা! অমন করতে নেই।

—আপনার মুখে শাস্তর পাঠ শুনবার বড্ড ইচ্ছে আমার।

পরে একটু অভিমানের সুরে বললে—তা তো আপনি চান নি, সে আমি জানি।

—কি জানো?

—আপনি পছন্দ করেন না যে আমি সেখানে যাই।

—সে কথা আবার কি করে তুমি জানলে?

—আমি জানি।

—আচ্ছা, তোমার দিদি যদি কখনো যায় তবে যেও।

—যা মন যায় তা করা কি খারাপ?

প্রশ্নটি বড় অদ্ভুত লাগলো ভবানীর। বললেন—তোমার বয়েস হয়েচে বৌমা, খুব ছেলেমানুষ নও, তুমিই বোঝো, যা ভাবা যায় তা কি করা উচিত? খারাপ কাজও তো করতে পারো।

—পাপ হয়?

—হয়।

—তবে আর করবো না, আপনি যখন বলচেন তখন সেটাই ঠিক।

—তুমি বুদ্ধিমতী, আমি কী তোমাকে বলবো!

—আপনি যা বলবেন, আমার কাছে তাই খুব বড় ঠাকুরজামাই। আমি অন্য পথে পা দিতি দিতি চলে এ্যালাম শুধু দিদির আর আপনার পরামর্শে। আপনি যা বলবেন, আমার দুঃখু হলিও তাই করতি হবে, সুখ হলিও তাই করতি হবে, আমার গুরু আপনি।

—আমি কারো গুরু-ফুরু নই বৌমা। ওসব বাজে কথা।

—আপনি খো-ভাজা চিঁড়ে খাবেন নারকেলকোরা দিয়ে? কাল এনে দেবো। নতুন চিঁড়ে কুটিচি।

—এনো বৌমা।

এই সময়ে খোকা খেলা করে বাড়ি ফিরে এল। মাকে বললে—মা নদীতে যাবে না?

ওর মা বললে—তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—কপাটি খেলছিলাম হাবুদের বাড়ি। চলো যাই। আমি ছুটে এলাম সেই জন্যি। এসে ইংরিজি পড়বো। পড়তি শিখে গিইচি।

প্রায়ই সন্ধ্যার আগে ভবানী দুই স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে নদীর ঘাটে যান। সকলেই সাঁতার দেয়, গা হাত পা ধোয়। তারপর ভগবানের উপাসনা করে। খোকা এই নদীতে গিয়ে স্নান ও উপাসনা এত ভালোবাসে, যে প্রতি বিকেলে মাদের ও বাবাকে ও-ই নিয়ে যায় তাগাদা দিয়ে। আজও সে গেল ওঁদের নিয়ে, উপরন্তু গেল নিস্তারিণী। সে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লো, তাকে নিয়ে যেতেই হবে।

ভবানী নিয়ে যেতে চান না বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে, তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। ভগবানের উপাসনা এক হয় নিভৃতে, নতুবা হয় সমধর্মী মানুষদের সঙ্গে। তিলু বিশেষ করে তাঁকে অনুরোধ করলে নিস্তারিণীর জন্যে।

সকলে স্নান শেষ করলে। শেষ সূর্যের রাঙা আলো পড়েচে ওপারের কাশবনে, সাঁইবাবলা ঝোপের মাথায়, জলচর পক্ষীরা ডানায় রক্ত-সূর্যের শেষ আলোর আবির মাখিয়ে পশ্চিমদিকের কোনো বিল-বাঁওড়ের দিকে চলেচে—সম্ভবতঃ নাকাশিপাড়ার নিচে সাম্‌টার বিলের উদ্দেশে।

ভবানী বললেন—বৌমা, এদের দেখাদেখি হাত জোড় কর—তারপর মনে মনে বা মুখে বলো—কিংবা শুধু শুনে যাও।

ওঁ যো দেবা অগ্নৌ যো অপ্‌সু, যো বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ।
যঃ ওষধিষু যো বনস্পতিষু, দেবায় তস্মৈ নমোনমঃ।

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে
যিনি শোভনীয় ক্ষিতিতলেতে
যিনি তৃণতরু ফুলফলেতে
তাঁহারে নমস্কার।
যিনি অন্তরে যিনি বাহিরে
যিনি যে দিকে যখন চাহিরে
তাঁহারে নমস্কার।

খোকাও তার মা-বাবার সঙ্গে সুললিত কণ্ঠে এই মন্ত্রটি গাইলে।

তারপর ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—খোকা, এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেচে?

খোকা নামতার অঙ্ক মুখস্থ বলবার সুরে বললে—ভগবান।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—সব জায়গায়, বাবা।

—আকাশেও?

—সব জায়গায়।

—কথা বলেন?

—হ্যাঁ বাবা।

—তোমার সঙ্গেও বলবেন?

—হ্যাঁ বাবা, আমি চাইলে তিনিও চান। আমি ছাড়া নন তিনি।

এসব কথা অবিশ্যি ভবানীই শিখিয়েচেন ছেলেকে।

ছেলেকে বিশেষ কোনো বিত্ত তিনি দিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর বয়েস হয়েচে, এই ছেলেকে নাবালক রেখেই তাঁকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে মহাপ্রস্থানের পথে। কি জিনিস তিনি দিয়ে যাবেন একে—আজকার অবোধ বালক তার উত্তরজীবনের জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে একদিন পিতৃদত্ত যে সম্পদকে মহামূল্য বলে ভাবতে শিখবে, চিনতে শিখবে, বুঝতে শিখবে?

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ।

এর চেয়ে অন্য কোনো বেশি মূল্যবান সম্পদের কথা তাঁর জানা নেই।

খুব বেশি বুদ্ধির প্যাঁচের দরকার হয় না, সহজ পথে সহজ হয়েই সেই সহজের কাছে পৌঁছানো যায়। দিনের পর দিন এই ইছামতীর তীরে বসে এই সত্যই তিনি উপলব্ধি করেচেন। সন্ধ্যায় ওই কাশবনে, সাঁইবাবলার ডালপালায় রাঙা ঝোপটি ম্লান হয়ে যেতো, প্রথম তারাটি দেখা দিত তাঁর মাথার ওপরকার আকাশে, ঘুঘু ডাকতো দূরের কাশবনে, বনসিমফুলের সুগন্ধ ভেসে আসতো বাতাসে—তখনই এই নদীতটে বসে কতদিন তিনি আনন্দ ও অনুভূতির পথ দিয়ে এসে তাঁর মনের গহন গভীরে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন এই সত্যকে—এই চির পুরাতন

অথচ চির নবীন সত্যকে। বুঝেচেন এই সত্যটি যে, ভগবানের আসল তত্ত্ব শুধু স্বরূপে সীমাবদ্ধ নয়, স্বরূপ ও লীলাবিলাস দুটো মিলিয়ে ভগবত্তত্ত্ব। কোনোটা ছেড়ে কোনোটা পূর্ণ নয়। এই শিশু, এই নদীতীর সেই তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত জিনিস। সে থেকে পৃথক নয়—সেই মহা-একের অংশ মাত্র।

নিস্তারিণী খুব মুগ্ধ হোলো। তার মধ্যে জিনিস আছে। কিন্তু গৃহস্থঘরের বৌ, শুধু রাঁধা-খাওয়া, ঘরসংসার নিয়েই আছে। কোনো একটু ভালো কথা কখনো শোনে না। এমন ধরনের ব্যাপার সে কখনো দেখে নি। তিলুকে বললে—দিদি, আমি আসতে পারি?

—কেন পারবি নে?

—ঠাকুরজামাই আসতে দেবেন?

—না, তোকে মারবে এখন।

—আমার বড্ড ভালো লাগলো আজ। কে এসব কথা এখানে শোনাবে দিদি? আমার জন্যে শুধু ঝ্যাঁটা আর লাথি। শুধু শাশুড়ীর গালাগাল দু'বেলা। তাও কি পেট ভরে দুটো খেতি পাই? হ্যাঁ পাপ করিচি, স্বীকার করচি। তখন বুদ্ধি ছিল না। যা করিচি, তার জন্যি ভগবানের কাছে বলি, আমারে আপনি যা শাস্তি হয় দেবেন।

—থাক ওসব কথা। তুই রোজ আসবি যখন ভালো লাগবে।

—ঠাকুরজামাই দেবতার তুল্য মানুষ। এ দিগরে অমন মানুষ নেই। আমার বড্ড সৌভাগ্যি যে তোমাদের সঙ্গ প্যালাম। ঠাকুরজামাইকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতি বড্ড ইচ্ছে করে।

—তা খাওয়াবি, ওর আর কি?

—আমার যে বাড়ি সে রকম না। জানোই তো সব। লুকিয়ে লুকিয়ে একটু তরকারি নিয়ে আসি—কেউ জানতি পারে না। জানলি কত কথা উঠবে।

—আমাকে কি নিলুকে সেই সঙ্গে নেমন্তন্ন করিস, কোনো কথা উঠবে না।

ওরা ঘাটের ওপর উঠেচে, এমন সময়ে দেখা গেল সেই পথ বেয়ে রামকানাই কবিরাজ এদিকে আসচেন। রামকানাই ভিন্ গাঁ থেকে রোগী দেখে ফিরচেন, খালি পা, হাঁটু অবধি ধুলো, হাতে একটা জড়িবুটি-ওষুধের পুঁটুলি। তিলু পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে, দেখাদেখি নিস্তারিণীও করলে। রামকানাই সঙ্কুচিত হয়ে বললেন—ওকি, ওকি দিদি? ও সব কোরো না। আমার বড্ড লজ্জা করে। চলো সবাই আমার কুঁড়েতে। আজ যখন বাঁড়ুয্যে মশাইকে পেইচি তখন সন্দেটা কাটবে ভালো।

রামকানাই চক্রবর্তী থাকেন চরপাড়ায়, এই গ্রামের উত্তর দিকের বড় মাঠ পার হলেই চরপাড়ার মাঠ। তিলু নিস্তারিণীকে বললে—তুই ফিরে যা বাড়ি—আমরা যাচ্চি চরপাড়ার মাঠে—

—আমিও যাবো।

—তোর বাড়িতি কেউ বকবে না?

—বকলে তো বয়েই গেল। আমি যাবো ঠিক।

—চলো। ফিরতি কিন্তু অনেক রাত হবে বলে দিচ্চি।

—তোমাদের সঙ্গে গেলি কেউ কিছু বলবে না। বললিও আমার তাতে কলা। ওসব

মানিনে আমি।

অগত্যা ওকে সঙ্গে নিতেই হোলো। রামকানাইয়ের বাড়ি পৌঁছে সবাই মাদুর পেতে বসলো। রামকানাই রেড়ির তেলের দোতলা পিদিম জ্বালালেন। তারপর হাত-পা ধুয়ে এসে বসে সন্ধ্যাহ্নিক করলেন। ওদের বললেন—একটু কিছু খেতি হবে—কিছুই নেই, দুটো চালভাজা। মা লক্ষ্মীরা মেখে নেবে না আমি দেবো?

সামান্য জলযোগ শেষ হোলে রামকানাই নিজে চৈতন্যচরিতামৃত পড়লেন এক অধ্যায়। গীতাপাঠ করলেন ভবানী। একখানা হাতের লেখা পুঁথি জলচৌকির ওপর সযত্নে রক্ষিত দেখে ভবানী বললেন—ওটা কিসের পুঁথি? ভাগবত?

—না, ওখানা মাধব নিদান। আমার গুরুদেবের নিজের হাতে নকল-করা পুঁথি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রডা যে জানতি চায়, তাকে মাধন নিদান আগে পড়তি হবে। বিজয় রক্ষিত কৃত টীকাসমেত পুঁথি ওখানা। বিজয় রক্ষিতের টীকা দুষ্প্রাপ্য। আমার ছাত্র নিমাইকে পড়াই। সে ক'দিন আসচে না, জ্বর হয়েচে।

পুঁথিখানা রামকানাই ভবানীর সামনে মেলে ধরলেন। মুক্তোর মত হাতের লেখা, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার তুলট কাগজের পাতায় এখনো যেন জ্বলজ্বল করচে। পুঁথির শেষের দিকে সেকেলে শ্যামাসঙ্গীত। ওগুলি বোধ হয় গুরুদেব মহানন্দ কবিরাজ স্বয়ং লিখেছিলেন। ভবানীর অনুরোধে তা থেকে একটা গান গাইলেন রামকানাই খুব খারাপ গলায়—

ন্যাংটা মেয়ের এত আদর জটে ব্যাটা তো বাড়ালে
নইলে কি আর এত করে ডেকে মরি জয় কালী বলে।

তারপর ভবানীও গাইলেন একখানা কবি দাশরথি রায়ের বিখ্যাত গান ঃ—

শ্রীচরণে ভার একবার গা তোলো হে অনন্ত।

রামকানাই কবিরাজের বড় ভালো লাগলো গান শুনে। চোখ বুজে বললেন—আহা কি অনুপ্রাস! উঠে বার ভুবন জীবন, এ পাপ জীবনের জীবনান্ত, আহা-হা!

উৎসাহ পেয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে তিলুকে দিয়ে আর একখানা গান গাওয়ালেন দাশরথি রায় কবির ঃ— 'ধনী আমি কেবল নিদানে'

তিলুর গলা মন্দ নয়। রামকানাই কবিরাজ বললেন—আজ্ঞে চমৎকার লিখচে দাশরথি রায়। কোথায় বাড়ি এঁর? না, এমন অনুপ্রাস, এমন ভাষা কখনো শুনি নি—বাঃ বাঃ

ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক
আমারি সৃষ্টি করা চতুর্মুখ
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে।

আমাকে লিখে দেবেন গানটা? ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা না থাকলে এমন লেখা যায় না—আহা-হা!

ভবানী বললেন—বাড়ি বর্ধমানের কাছে কোথায়। ওবছর পাঁচালী গাইতে এসেছিলেন উলোতে বাবুদের বাড়ি। এ গান আমি সেখানে শুনি। খোকার মাকে আমি শিখিয়েচি।

আর দু-একখানা গানের পর আসর ভেঙে দিয়ে সকলে জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে পাঁচপোতা গ্রামের দিকে রওনা হোলো। চরপাড়ার বড় মাঠটা জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েচে, খালের জল

চকচক করচে চাঁদের নিচে। ভবানী বাঁড়ুয্যে খালটা দেখিয়ে বললেন—ওই দ্যাখো তিলু, তোমার দাদা যখন নীলকুঠির দেওয়ান তখন এই খালের বাঁধাল নিয়ে দাঙ্গা হয়, তাতে মানুষ খুন করে নীলকুঠির লেঠেলরা। সেই নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয় সেবার।

হঠাৎ একটা লোককে মাঠের মধ্যে দিয়ে জোরে হেঁটে আসতে দেখে নিস্তারিণী বলে উঠলো—ও দিদি; কে আসচে দ্যাখো—

ভবানী বললেন—বড্ড নির্জন জায়গাটা। দাঁড়াও সবাই একটু—

লোকটার হাতে একখানা লাঠি। সে ওদের দিকে তাক করেই আসচে, এটা বেশ বোঝা গেল। সকলেরই ভয় হয়েচে তখন লোকটার গতিক দেখে। খুব কাছে এসে পড়েচে সে তখন, নিস্তারিণী বলে উঠলো—ও দিদি, খোকার হাত ধরো—ঠাকুরজামাই। এগোবেন না—

লোকটা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। পরক্ষণেই ওদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেই বিস্ময় ও আনন্দের সুরে বলে উঠলো—এ কি! দিদিমণি? ঠাকুরমশায় যে! এই যে খোকা...

তিলুও ততক্ষণে লোকটাকে চিনেচে। বলে উঠলো—হলা দাদা? তুমি কোত্থেকে?

হলা পেকে কি যেন একটা ভাব গোপন করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে। ইতস্তত করে বললে—ওই যাতিছেলাম চরপাড়ায়—মোর—এই—তো। দাঁড়ান সবাই। পায়ের ধুলো দ্যান একটুখানি।

হলা পেকের কিন্তু সে চেহারা নেই। মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েচে কিছু কিছু, আগের তুলনায় বুড়ো হয়ে পড়েচে। তিলু বললে—এতকাল কোথায় ছিলে হলা দাদা? কতকাল দেখি নি!

হলা পেকে বললে—সরকারের জেলে।

—আবার জেলে কেন?

—হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ি ডাকাতি হয়েল, ফাঁড়ির দারোগা মোরে আর অঘোর মুচিকে ধরে নিয়ে গেল, বললে তোমরা করেচ।

—কর নি তুমি সে ডাকাতি? কর নি?

হলা পেকে চুপ করে রইল। তিলু ছাড়বার পাত্রী নয়, বললে—তুমি নিদ্দুষী?

—না। করেলাম।

—অঘোর দাদা কোথায়?

—জেলে মরে গিয়েচে।

—একটা কথা বলবো?

—কি?

—আজ কি মনে করে লাঠি হাতে আমাদের দিকি আসছিলে এই মাঠের মধ্যি? ঠিক কথা বলো? যদি আমরা না হোতাম?

হলা পেকে নিরুত্তর।

তিলু মোলায়েম সুরে বললে—হলা দাদা—

—কি দিদি?

—চলো আমাদের বাড়ি। এসো আমাদের সঙ্গে।

হলা পেকে যেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বললে—না, এখন আর যাবো না দিদি। তোমার

পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই মুই। মরে গেলি মনে রাখবা তো দাদা বলে?

খোকার কাছে এসে বললে—এই যে, ওমা, এসো আমার খোকা ঠাকুর, আমার চাঁদের ঠাকুর, আমার সোনার ঠাকুর, কত বড়ডা হয়েচে? আর যে চিনা যায় না। বেঁচে থাকো, আহা, বেঁচে থাকো—নেকাপড়া শেখো বাবার মত—

খোকাকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলে হলা পেকে। তারপর আর কোনা কিছু না বলে কারো দিকে না তাকিয়ে মাঠের দিকে হন্‌হন্‌ করে যেতে যেতে জ্যোৎস্নার মধ্যে মিলিয়ে গেল। খোকা বিস্ময়ের সুরে বললে—ও কে বাবা? আমি তো দেখিনি কখনো। আমায় আদর করলে কেন?

নিস্তারিণীর বুক তখনো যেন ঢিপ ঢিপ করছিল। সে বুঝতে পেরেচে ব্যাপারটা। সবাই বুঝতে পেরেচে।

নিস্তারিণী বললে—বাবাঃ, যদি আমরা না হতাম! জনপ্রাণী নেই, মাঠের মধ্যি—

সকলে আবার রওনা হোলো বাড়ির দিকে। কাঠঠোকরা ডাকচে আম-জামের বনে। বনমরচের ঘন ঝোপে জোনাকি জ্বলচে। বড় শিমূল গাছটায় বাদুড়ের দল ডানা ঝটাপট করচে। দু'চারটে নক্ষত্র এখানে ওখানে দেখা যাচ্চে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে। ভবানী বাঁড়ুয্যে ভাবছিলেন আর একটা কথা। এই হলা পেকে খারাপ লোক, খুন রাহাজানি ক'রে বেড়ায়, কিন্তু এর মধ্যেও সেই তিনি। এ কোন্ হলা পেকে? এরা খারাপ? নিস্তারিণী খারাপ? এদের বিচার কে করবে? কার আছে সে বিচারের অধিকার? এক মহারহস্যময় মহাচৈতন্যময় শক্তি সবার অলক্ষ্যে, সবার অজ্ঞাতসারে সকলকে চালনা করে নিয়ে চলেচেন। কিলিয়ে কাঁটাল পাকান না তিনি। যার যেটা সহজ স্বাভাবিক পথ, সেই পথেই তাকে অসীম দয়ায় চালনা ক'রে নিয়ে যাবেন সেই পরম কারুণিক মাতৃ-পিতৃরূপা মহাশক্তি। এই হলা পেকে, এই নিস্তারিণী, কাউকে তিনি অবহেলা করবেন না। সবাইকে তাঁর দরকার।

জন্মজন্মান্তরের অনন্ত পথহীন পথে অতি নীচ পাপীরও হাত ধরে অসীম ধৈর্যে অসীম মমতায় তিনি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন। তাঁর এই ছেলের প্রতি যে মমতা, তেমনি সেই মহাশক্তির মমতা সমুদয় জীবকুলের প্রতি। কি চমৎকার নির্ভরতার ভাব সেই মুহূর্তে ভবানী বাঁড়ুয্যে মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন সেই মহাশক্তির ওপর। কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। মাভৈঃ। স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতানাং মকরন্দপানে—নেই কি তিনি সর্বত্র? নেই কোথায়?

দেওয়ান হরকালী সুর লালমোহন পালের গদিতে বসে নীলকুঠির চাষকাজের হিসেব দিচ্ছিলেন। বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। লালমোহন পাল বললেন, খাস খামারের হিসেবটা ওবেলা দেখলে হবে না দেওয়ানমশাই? বড্ড বেলা হোলো। আপনি খাবেন কোথায়?

—কুঠিতে।

—কে রাঁধবে?

—আমাদের নরহরি পেশ্‌কার। বেশ রাঁধে।

কথায় কথায় লালমোহন পাল বলেন,—ভালো কথা, আমার স্ত্রী আর ভগ্নী একদিন কুঠি দেখতে চাচ্চে, ওরা ওর ভেতর কখনো দেখে নি।

—যাবেন, কালই যাবেন। আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। কিসি যাবেন?

—গরুর গাড়িতি।

—কেন, কুঠির পাল্কী আছে, তাই পাঠাবো এখন।

আজ দু'বছর হোলো বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানী সাড়ে এগারো হাজার টাকায় তাদের কর্মকর্তা ইনিস্ সাহেবের মধ্যস্থতায় মোল্লাহাটির কুঠি লালমোহন পাল ও সতীশ সাধুখাঁর কাছে বিক্রি করে ফেলেচে। শিপ্‌টনের মৃত্যুর পরে ইনিস্ সাহেব এই দু'বছর কুঠি চালিয়েছিল, শেযে ইনিস্ সাহেবই রিপোর্ট করে দিলে এ কুঠি রাখা আর লাভজনক নয়। নীলকুঠির খাস জমি দেড়শো বিঘেতে আজকাল চায হয় এবং কুঠির প্রাঙ্গণের প্রায় তেরো বিঘে জমিতে আম, কাঁটাল, পেয়ারা প্রভৃতির চারা লাগানো হয়েচে। অর্থাৎ কৃষিকার্যই হচ্চে আজকাল প্রধান কাজ নীলকুঠির। চাযটা বজায় আছে এই পর্যন্ত। দেওয়ান হরকালী সুর এবং নরহরি পেশ্‌কার এই দুজন মাত্র আছেন পুরনো কর্মচারীদের মধ্যে, সব কাজকর্ম দেখাশুনো করেন। প্রসন্নন চক্কত্তি আমীন এবং অন্যান্য কর্মচারীর জবাব হয়ে গিয়েচে। নীলকুঠির বড় বড় বাংলা ঘর ক-খানার সবগুলিই আসবাবপত্র সমেত এখনো বজায় আছে। না রেখে উপায় নেই—ইন্ডিগো কোম্পানী এগুলি সুদ্ধ বিক্রি করেচে এবং দামও ধরে নিয়েচে। অবিশ্যি জলের দামে বিক্রি হয়েচে সন্দেহ নেই। এ অজ পল্লীগ্রামে অত বড় কুঠিবাড়ি ও শৌখীন আসবাবপত্রের ক্রেতা কে? গাড়ি করে বয়ে অন্যত্র নিয়ে যাবার খরচও কম নয়, তার হাঙ্গামাও যথেষ্ট। ইন্ডিগো কোম্পানীর অবস্থা এদিকে টলমল, যা পাওয়া গেল তাই লাভ। ইনিস্ সাহেব কেবল যাবার সময় দুটো বড় আলমারি কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল।

দেওয়ান হরকালী সুর বাড়ি এসে বুঝিয়েছিলেন—খাসজমি আছে দেড়শো বিঘে, একশো বিয়াল্লিশ বিঘে ন' কাটা সাত ছটাক, ঐ দেড়শো বিঘেই ধরুন। ওটবন্দি জমা বন্দোবস্ত নেওয়া আছে সত্তর বিঘে। তা ছাড়া নওয়াদার বিল ইজারা নেওয়া হয়েছিল ম্যাকনিল্ সায়েবের আমলে নাটোর রাজাদের কাছ থেকে। মোটা জলকর। চোখ বুজে কুঠি কিনে নিন পাল মশায়, নীলকুঠি হিসেবে নয়, জমিদারি হিসেবে কিনে নিন, জমিদারি আমি দেখাশুনা করবো, আরও দু'একটি পুরনো কর্মচারী আপনাকে বজায় রাখতে হবে, আমরাই সব চালাবো, আপনি লাভের কড়ি আমাদের কাছ থেকে বুঝে নেবেন।

লালমোহন পাল বলেছিল—কুঠিবাড়ি আসবাবপত্তর সমেত?

—বিলকুল।

—যান, নেবো।

এইভাবে কুঠি কেনা হয়। কেনার সময় ইনিস্ সাহেব একটু গোলমাল বাধিয়েছিল, ঘোড়ার গাড়ি দু'খানা ও দু'জোড়া ঘোড়া দেবে না। এ নিয়ে লালমোহন পালের দিক থেকে আপত্তি ওঠে, অবশেযে আর সামান্য কিছু বেশি দিতে হয়। কুঠি কেনার পরে রায়গঞ্জের গোসাঁইবাবুদের কাছে গাড়িঘোড়াগুলো প্রায় হাজার টাকায় বিক্রি করে ফেলা হয়। খাসজমি ও জলকর ভালোভাবে দেখাশুনো করলে যে মোটা মুনাফা থাকবে, এটা দেওয়ান হরকালী বুঝেছিলেন। সামান্য জমিতে নীলের চাযও হয়।

কুঠি কেনার পরে তুলসী একদিন বলেছিল—দেওয়ানমশাইকে বলো না গো, সায়েবের

ঘোড়ার টমটম গাড়ি আমাদের পাঠিয়ে দেবেন, একদিন চড়বো!

লালমোহন বলেছিলেন—না বড়বৌ। বড় সায়েব ঐ টমটমে চড়ে বেড়াতো, তখন আমরা মোট মাথায় ছুটে পালাতাম ধানের ক্ষেতি। সেই টম্‌টমে তুমি চড়লি লোকে বলবে কি জানো? বলবে ট্যাকা হয়েছে কিনা, তাই বড্ড অংখার হয়েচে। আমারেও একদিন দেওয়ান বলেছিলেন—টমটম পাঠিয়ে দেবো, কুঠিতি আসবেন। আমি হাতজোড় ক'রে বললাম—মাপ করবেন। ওসব নবাবী করুক গিয়ে বাবুভেয়েরা। আমরা ব্যবসাদার জাত, ওসব করলি ব্যবসা ছিকেয় উঠবে।

অবশেষে একদিন একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে লালমোহনের বড় মেয়ে সরস্বতী, তার মা তুলসী, বোন ময়না ছেলেপিলে নিয়ে কুঠি দেখতে গেল। দেওয়ান হরকালী, প্রসন্ন আমীন ও নরহরি পেশ্‌কার এদের এগিয়ে নিয়ে এসে সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালো। সবাই নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো—

—ও দেওয়ান কাকা, এ ঘরটা কি?

—এখানে সায়েবেরা বসে খেতো, মা।

—এত বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন কেন?

—এখানে ওদের নাচের সময় আলো জ্বলতো।

—এটা কি?

—ওটা কাঁচের মগ, সায়েবরা জল খেতো। এ দ্যাখো এরে বলে ডিক্যান্টার, মদ খেতো ওরা।

তুলসী ছেলেমেয়েদের ডেকে বললে—ছুঁস নে ওসব। ওদিকি যাস্ নে, সন্দে বেলা নাইতি হবে—ইদিকি সরে আয়।

কুঠির অনেক চাকরবাকর জবাব হয়ে গিয়েচে, সামান্য কিছু পাইক-পেয়াদা আছে এই মাত্র। লাঠিয়ালের দল বহুদিন আগে অন্তর্হিত। ওদিকের বাগানগুলো লতাজঙ্গলে নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য। দিনমানেও সাপের ভয়ে কেউ ঢোকে না। সেদিন একটা গোখুরা সাপ মারা পড়েছিল কুঠির পশ্চিম দিকের হাতার ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে।

পুরানো চাকর-বাকরদের মধ্যে আছে কেবল কুঠির বহু পুরনো রাঁধুনি ঠাকুর বংশীবদন মুখুয্যে—দেওয়ানজি ও অন্যান্য কর্মচারীর ভাত রাঁধে।

ময়নার মেয়ে শিবি বললে—ও দাদু, ও দেওয়ানদাদু, সায়েবদের নাকি নাইবার ঘর ছিল? আমি দেখবো—

তখন দেওয়ান হরকালী সুর নিজে সঙ্গে ক'রে ওদের সকলকে নিয়ে গেলেন বড় গোসলখানায়। সেখানে একটা বড় টব দেখে তো সকলে অবাক। ময়নার মেয়ের ইচ্ছে ছিল এই টবে সে একবার নেমে দেখবে কি ক'রে সায়েবরা নাইতো—মুখ ফুটে কথাটা সে বলতে পারলে না। অনেকক্ষণ ধরে ওরা আসবাবপত্তর দেখলে, হাতে করে নাড়লে, টিপে টিপে দেখলে।

সায়েবরা এত জিনিস নিয়ে কি করতো?

বেলা পড়লে ওরা যখন চলে এসে গাড়িতে উঠলো, কুঠির কর্মচারীরা সসম্ভ্রমে গাড়ি

পর্যন্ত এসে ওদের এগিয়ে দিয়ে গেল।

রাত্রে খেটেখুটে এসে লালমোহন পাল পশ্চিম দিকের চার-চালা বড় ঘরের কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোশে শুয়েচে, তুলসী ডিবেভর্তি পান এনে শিয়রের বালিশের কাছে রেখে দিয়ে বললে—কুঠি দেখে এ্যালাম আজ।

লালমোহন পাল একটু অন্যমনস্ক, আড়াইশো ছালা গাছতামাকের বায়না করা হয়েছিল ভাজনঘাট মোকামে, মালটা এখনো এসে পৌঁছোয় নি, একটু ভাবনায় পড়েচে সে। তুলসী উত্তর না পেয়ে বলে—কি ভাবচো?

—কিছু না।

—ব্যবসার কথা ঠিক!

—ধরো তাই।

—আজ কুঠি দেখতি গিয়েছিলাম, দেখে এ্যালাম।

—কি দেখলে?

—বাবাঃ, সে কত কি! তুমি দেখেচ গা?

—আমি? আমার বলে মরবার ফুর্সুৎ নেই, আমি যাবো কুঠির জিনিস দেখতি! পাগল আছো বড়বৌ, আমরা হচ্ছি ব্যবসাদার লোক, শখ-শৌখিনতা আমাদের জন্যি না। এই দ্যাখো, ভাজনঘাটের তামাক আসি নি, ভাবচি।

—হ্যাঁগা, আমার একটা সাধ রাখবা?

তুলসী ন'বছরের মেয়ের মত আব্‌দারের সুরে কথা শেষ ক'রে হাসি-হাসি মুখে স্বামীর কাছে এগিয়ে এল।

লালমোহন পাল বিরক্তির সুরে বললে—কি?

অভিমানের সুরে তুলসী বলে—রাগ করলে গা? তবে বলবো নি।

—বলোই না ছাই!

—না।

—লক্ষি দিদি আমার, বলো বলো—

—ওমা আমার কি হবে! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, ও আবার কি কথা! অমন বলতি আছে? ব্যবসা ক'রে টাকা আনতিই শিখেচো, ভদ্দরলোকের কথাও শেখো নি, ভদ্দরলোকের রীতনীত কিছুই জানো না। ইস্ত্রিকে আবার দিদি বলে কেডা?

লালমোহন বড় অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে সত্যিই অন্যমনস্ক ছিল, বললে—কি করতি হবে বলো বড়বৌ—

—জরিমানা দিতি হবে—

—কত?

—আমার একটা সাধ আছে, মেটাতি হবে। মেটাবে বলো?

—কি?

—শীত আসচে সামনে, গাঁয়ের সব গরীব দুঃখী লোকদের একখানা করে রেজাই দেবো আর বামুনঠাকুরদের সবাইকে জোনাজাৎ একখানা ক'রে বনাত দেবো। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন।

—গরীবদের রেজাই দেওয়া হবে, কিন্তু বামুনরা তোমার দান নেবে না। আমাদের গাঁয়ের ঠাকুরদের চেনো না? বেশ, আমি আগে দেখি একটা ইস্টিমিট ক'রে। কত খরচ লাগবে। কলকাতা থেকে মাল আনাতি লোক পাঠাতি হবে, তার পরে।

—আর একটা কথা—

—কি?

—এক বুড়ো বামুনের চাকরি ছাড়িয়ে দিয়েচে দেওয়ানমশাই কুঠি থেকে। তার নাম প্রসন্ন চক্কত্তি। বলেচেন, তোমার আর কোনো দরকার নেই।

—এসে ধরেচে বুঝি তোমায়? এ তোমার অন্যায় বড়বৌ। কুঠির কাজ আমি কি বুঝি? কাজ নেই তাই জবাব হয়ে গিয়েচে। কাজ না থাকলি বসে বসে মাইনে গুনতি হবে?

—হ্যাঁ হবে। এ বয়সে তিনি এখন যাবেন কোথায় জিগ্যেস করি? কে চাকরি দেবে?

নালু পাল বিরক্তির সুরে বললে—ছেলেমানুষ তুমি, এসবের মধ্যি থাকো কেন? তুমি কি বোঝো কাজের বিষয়? টাকাটা ছেলের হাতের মোয়া পেয়েচ, না? বললিই হোলো! কেন তোমার কাছে সে আসে জিগ্যেস করি? বিটলে বামুন!

তুলসী ধীর সুরে বললে—দ্যাখো, একটা কথা বলি। অমন যা-তা কথা মুখে এনো না। আজ দুটো টাকা হয়েচে বলে অতটা বাড়িও না।

লালমোহন পাল বললে—কি আর বাড়ালাম আমি? আমি তোমাকে বললাম, নীলকুঠির কাজ আমি কি বুঝি! দেওয়ান যা করেন, তার ওপর তোমার আমার কথা বলা তো উচিত নয়। তুমি মেয়েমানুষ কি বোঝো এ সবের? কাজের দস্তুর এই।

—বেশ, কাজ তুমি দ্যাও আর না দ্যাও গিয়ে—যা-তা বলতি নেই লোককে। ওতে লোকে ভাবে আঙুল ফলে কলাগাছ হয়েচে, আজ তাই বড্ড অংখার। ছিঃ—

তুলসী রাগ ক'রে অপ্রসন্ন মুখে উঠে চলে গেল।

এ হোলো বছর দুই আগের কথা। তারপর প্রসন্ন চক্কত্তি আমীন কোথায় চলে গেল এতকালের কাছারী ছেড়ে। উপায়ও ছিল না। হরকালী সুর কর্মচারী ছাঁটাই করেছিলেন জমিদারের ব্যয়সঙ্কোচ করবার জন্যে। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো তার ঠিক ছিল না। ভজা মুচি সহিস ও বেয়ারা শ্রীরাম মুচির চাকরি গেলে চাষবাস করতো। এ বছর শ্রাবণ মাসে মোল্লাহাটির হাট থেকে ফেরবার পথে অন্ধকারে ওকে সাপে কামড়ায়, তাতেই সে মারা যায়।

নীলকুঠির বড় সাহেবের বাংলোর সামনে আজকাল লালমোহন পালের ধানের খামার। খাস জমির দেড়শো বিঘের ধান সেখানে পৌষ মাসে ঝাড়া হয়, বিচালির আঁটি গাদাবন্দি হয়, যে বড় বারান্দাতে সাহেবরা ছোট হাজরি খেতো সেখানে ধান-ঝাড়াই কৃষাণ এবং জন-মজুরেরা বসে দা-কাটা তামাক খায় আর বলাবলি করে—সুমুন্দির সায়েবগুলো এ ঠানটায় বসে কত মুরগির গোস্ত ধুনেছে আর ইঞ্জিরি বলেচে। ইদিকি কোনো লোকের ঢোকবার হুকুম ছেলো না—আর আজ সেখানডাতে বসে ওই দ্যাখো রজবালি দাদ চুলকোচ্ছে!...

বিকেলবেলা খোকাকে নিয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে গেলেন রামকানাই কবিরাজের ঘরে।

খোকা তাঁকে ছাড়তে চায় না, যেখানে তিনি যাবেন, যাবে তাঁর সঙ্গে। বড় বড় বাবলা

আর শিমূল গাছের সারি, শ্যামলতার ঝোপ, বাদুড় আর ভাম হুটপাট করচে জঙ্গলের অন্ধকারে। উইদের ঢিপিতে জোনাকী জ্বলচে, ঠিক যেন একটা মানুষ বসে আছে বাঁশবনের তলায়। খোকা একবার ভয় পেয়ে বললে—ওটা কি বাবা?

চরপাড়া মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে রামকানাই কবিরাজের মাটির ঘর। দোতলা মাটির প্রদীপে আলো জ্বলচে। ওদের দেখে রামকানাই কবিরাজ খুশী হোলেন। খোকার কেমন বড় ভালো লাগে কবিরাজ বুড়োর এই মাটির ঘর! এখানে কি যেন মোহ মাখানো আছে, ওই দোতলা মাটির পিদিমের স্নিগ্ধ আলোয় ঘরখানা বিচিত্র দেখায়। বেশ নিকনো-পুঁছানো মাটির মেঝে। কাছেই বাগ্‌দিপাড়া, বাগ্‌দিদের একটি গরীব মেয়ে বিনি পয়সায় ঘর নিকিয়ে দিয়ে যায়, তাকে শক্ত রোগ থেকে রামকানাই বাঁচিয়ে তুলেছিলেন।

দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে কি একটি ঠাকুরের ছবি, ফুল দিয়ে সাজানো। ঘরের মধ্যে তক্তপোশ নেই, মেঝেতে মাদুর পাতা, বই কাগজ দু'চারখানা ছড়ানো, তিন-চারটি বেতের পেঁটারি, তাতে রামকানাইয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ বা সম্পত্তি নেই, আছে কেবল কবিরাজি ওযুধ ও গাছগাছড়া চূর্ণ।

ভবানীরও বড় ভালো লাগে এই নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাটির ঘরে সন্ধ্যাযাপন। এ পাড়াগাঁয়ে এর জুড়ি নেই। রামকানাই চৈতন্যচরিতামৃত পড়েন, ভবানী একমনে শোনেন। শুনতে শুনতে ভবানী বাঁড়ুয্যের পরিব্রাজক দিনের একটা ছবি মনে পড়ে গেল। নর্মদার তীরে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর তাঁর এক পরিচিত সন্ন্যাসীর আশ্রম। সন্ন্যাসীর নাম স্বামী কৈবল্যানন্দ—তিনি পুরী সম্প্রদায়ের সাধু। শ্রীশ্রী১০৮ মাধবানন্দ পুরীর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। একাই থাকতেন ওপরকার কুটিরে। নিচে আর একটা লম্বা চালাঘরে তাঁর দু'তিনটি শিষ্য বাস করতো ও গুরুসেবা করতো। একটা দুগ্ধবতী গাভী ছিল, ওরাই পুষতো, ঘাস খাওয়াতো, গোবরের ঘুঁটে দিত।

সাধুর কুটিরের বেড়া বাঁধা ছিল শনের পাকাটি দিয়ে। পাহাড়ী ঘাসে ছাওয়া ছিল চাল দুখানা। কি একটা বন্যলতার সুগন্ধী পুষ্প ফুটে থাকতো বেড়ার গায়ে। বনটিয়া ডাকতো তুন্ গাছের সু-উচ্চ শাখা-প্রশাখার নিবিড়তায়। ঝর্নার কুলুকুলু শব্দ উঠতো নর্মদার অপর পারের মহাদেও শৈলশ্রেণীর সানুদেশের বনস্থলী থেকে। নিচের কুটিরে বসে ভজন গাইতেন কৈবল্যানন্দজীর শিষ্য অনুপ ব্রহ্মচারী। রাত্রে ঘুম ভেঙে ভবানী শুনতেন করুণ তিলককামোদ রাগিণীর সুর ভেসে আসচে নিচের কুটির থেকে, গানের ভাঙা ভাঙা পদ কানে আসতো—

"এক ঘড়ি পলছিন কল না পরত মোহে।"

সকালে উঠে দাওয়ায় বসে দেখতেন আরো অনেক নিচে একটা মস্ত বড় কুসুম গাছ, তার পাশে তেঁতুলগাছ। বড় বড় পাথরের ফাটলে বাংলাদেশের দশবাইচন্ডী জাতীয় একরকম বনফুল অসংখ্য ফুটতো। এগুলোর কোন গন্ধ ছিল না, সুগন্ধে বাতাস মদির করে তুলতো সেই বন্যলতার হলুদ রংয়ের পুষ্পস্তবক। কেমন অপূর্ব শান্তি, কি সুস্নিগ্ধ ছায়া, পাখীর কি কলকাকলী ছিল বনে, নদীতীরে। কেউ আসত না নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে, অবিচ্ছিন্ন নির্জনতার মধ্যে ভগবানের ধ্যান জমতো কি চমৎকার। নেমে এসে নর্মদায় স্নান ক'রে আবার পাহাড়ে উঠে যেতেন পাথরে পা দিয়ে দিয়ে।

সেই সব শান্তিপূর্ণ দিনের ছবি মনে পড়ে কবিরাজ মশাইয়ের ঘরটাতে সে বসলে। কিন্তু ফণি চক্কত্তির চন্ডীমন্ডপে গেলে শুধু বিষয়-আশয়ের কথা, শুধুই পরচর্চা। ফণি চক্কত্তি একা নয়, যার কাছে যাবে, সেখানেই অতি সামান্য গ্রাম্য কথা। ভালো লাগে না ভবানীর।

আর একটা কথা মনে হয় ভবানীর। ঠাকুরের মন্দির হওয়া উচিত এই রকম ছোট পর্ণকুটিরে, শান্ত বন্য নির্জনতার মধ্যে। বড় বড় মন্দির, পাথর-বাঁধানো চত্বর, মার্বেল বাঁধানো গৃহতলে শুধু ঐশ্বর্য আছে, ভগবান নেই। অনেক ঐ রকম মন্দিরের সাধুদের মধ্যে লোভ ও বৈষয়িকতা দেখেছেন তিনি। শ্বেত পাথর বাঁধানো গৃহতল সেখানে দেবতাশূন্য।

রামকানাই জিগ্যেস করলেন—বাঁড়ুয্যেমশাই, বৃন্দাবন গিয়েচেন?

—যাই নি।

—এত জায়গায় গেলেন, ওখানডাতে গেলেন না কেন?

—বৃন্দাবন লীলা আমার ভালো লাগে না।

—আমার আর কি বুদ্ধি, কি বোঝাবো! সংসারের নানা ঝন্‌ঝাটে ভক্ত আশ মিটিয়ে ভগবানের প্রেমকে উপভোগ করতে পারে না, তাই একটা চিন্ময় ধামের কথা বলা হয়েচে, সেখানে শুধু ভক্ত আর ভগবানের প্রেমের লীলা চলচে। এডাই বৃন্দাবন লীলা।

—খুব ভালো কথা। যে বৃন্দাবনের কথা বললেন, সেটা বাইরে সর্বত্রই রয়েচে। চোখ থাকলে দেখা যাবে ওই ফুলে, পাখীর ডাকে, ছেলেমানুষের হাসিতে তিনিই রয়েচেন।

—ওই চোখডা কি সকলে পায়?

—সেজন্যে হাতড়ে বেড়ায় এখানে ওখানে। প্রাচীন শাস্ত্র বেদ, যে বেদ প্রকৃতির গায়ে লেখা আছে। আমার মনে হয় ফুল, নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড় ধর্মগ্রন্থ। এদের মধ্যে দিয়ে তাঁর লীলাবিভূতি দর্শন হয় বেশি ক'রে। পাথরে গড়া মন্দিরে কি হবে, যার ভেতর তিনি নিজে থাকেন সেটাই তাঁর মন্দির। ওই চরপাড়ার বিলে আসবার সময় দেখলাম কুমুদ ফুল ফুটে আছে, ওটাই তাঁর মন্দির। বাইরের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতির তালে তালে চলে, তাকে ভালোবেসে সেই প্রকৃতিরই সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান শক্তির কাছে পৌঁছতে হবে।

—একেই বলেচে বৈষ্ণব শাস্ত্রে 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

—ঠিক কথা, শুধু একটা মন্দিরে বা তীর্থস্থানে তিনি আছেন? পাগল নাকি! 'বনস্পতৌ ভূভৃতি নির্ঝরে বা কূলে সমুদ্রস্য সরিৎতটে বা' সব জায়গায় তিনি। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, অথচ চোখ খুলে না যদি আমি দেখি, তবে তিনি নাচার। তিনি শিশুবেশে এসে আমার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, আমি 'মায়ার বন্ধন' বলে আঁৎকে উঠে ছুটে পালালুম—এ বুদ্ধি নিয়ে, এ চোখ দিয়ে কি ভগবান দর্শন হয়? তাঁর হাতের বন্ধনই তো মুক্তি। মুক্তি-মুক্তি বলে চীৎকার করলে কি হবে? কি চমৎকার মুক্তি!

—আচ্ছা ভগবান কি আমাদের প্রেম চান বাঁড়ুয্যেমশাই? আপনার কি মনে হয়?

—আজকাল যেন বুঝতে পারি কিছু কিছু। ভগবান প্রেম চান, এটাও মনে হয়। আগে বুঝতাম না। জ্ঞানের ওপরে খুব জোর দিতাম। এখন মনে হয় তিনি আমার বাবা। তাঁর বংশে আমাদের জন্ম। সেই রক্ত গায়ে আছে আমাদের। কখনো কোনো কারণে তিনি আমাদের

অকল্যাণের পথে ঠেলে দেবেন না, দিতে পারেন না। তিনি বিজ্ঞ বাবার মতো আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন। তিনি যে আমাদের বহু বিজ্ঞ, বহু প্রাচীন, বহু অভিজ্ঞ, বহু জ্ঞানী, বহু শক্তিময় বাবা। আমরা তাঁর নিতান্ত অবোধ, কুসংস্কারগ্রস্ত ভীরু, অসহায় ছেলে। জেনেশুনে কি আমাদের অমঙ্গলের পথে ঠেলে দিতে পারেন? তা কখনও হয়?

রামকানাই উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—বাঃ, বাঃ—

ভবানী বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, যেন পরের কথাটা বলতে ইতস্তত করছেন। তারপরে বলেই ফেললেন কথাটা। বললেন—এ আমার নিজের অনুভূতির কথা কবিরাজ মশাই। আগে এসব বুঝতাম না, বলেচি আপনাকে। আসল কথা কি জানেন, অপরের মুখে হাজারো কথার চেয়ে নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া এককণা সত্যের দাম অনেক বেশি। নিজে বাবা হয়ে, খোকা জন্মাবার পরে তবে ভগবানের পিতৃরূপ নিজের মনে বুঝলাম ভালো ক'রে। এতদিন পিতার মন কি জিনিস কি ক'রে জানবো বলুন!

রামকানাই কবিরাজ হেসে বললেন—তাহলি দাঁড়াচ্চে এই খোকা আপনার এক গুরু।

—যা বলেন। কে গুরু নয় বলতে পারেন? যার কাছে যা শেখা যায়, সেখানে সে আমার গুরু। তিনি তো সকলের মধ্যেই। একটা গানের মধ্যে আছে না—

জনকরূপেতে জন্মাই সন্তান
জননী হইয়া করি স্তনদান
শিশুরূপে পুনঃ করি স্তনপান
এ সব নিমিত্ত কারণ আমার—

—কার গান? বাঃ—

—এও এক নতুন কবির। নামটা বলতে পারলুম না। গোড়াটা হচ্চে—

আমাতে যে আমি সকলে সে আমি
আমি সে সকল সকলই আমার।

রামকানাই কবিরাজ অতি চমৎকার শ্রোতা। খোকাও তাই। খোকা কেমন এক প্রকার বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে চুপটি ক'রে। রামকানাই উৎসাহের সুরে বললেন—বেশ গান। তবে বড্ড উঁচু। অদ্বৈত বেদান্ত। ও সব সাধারণের জন্যে নয়।

—আপনি যা বলেন। তবে সত্যের উঁচু নিচু নেই। এ সব গুরুতত্ত্ব। আমার গুরু বলতেন—অদ্বৈতবাদী হওয়া অত সহজ নয়। প্রকৃত অদ্বৈতবাদী জীবের আনন্দকে নিজের আনন্দ বলে ভাববে। জীবের দুঃখ নিজের দুঃখ বলে ভাববে। জীবের সেবায় ভোর হয়ে যাবে। সকলের দেহই তার দেহ, সকলের আত্মাই তার আত্মা। আপন পর কিছু থাকে না সে অবস্থায়। নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে জীবের পায়ে এতটুকু কাঁটা তুলতে। তার কাছে জাগ্রত দশায় 'অতো মম জগৎ সর্বং', জগতের সবই আমার, সবই আমি—আবার সমাধি অবস্থায় 'অথবা ন চ কিঞ্চন', কিছুই আমার নয়। কিছুই নেই, এক আমিই আছি। জগৎ তখন নেই। বুঝলেন কবিরাজ মশাই?

—বড্ড উঁচু কথা। কিন্তু বড্ড ভালো কথা। হজম করা শক্ত আমার পক্ষি। বড়ি বেটে রোগ সারাই, আমি ও বেদান্ত-টেদান্ত কি করবো বলুন? সে মস্তিষ্ক কি আছে? তবে বড়ো ভালো লাগে। আপনি আসেন এ গরীবের কুঁড়েতে, কত যে আনন্দ দ্যান এসে সে মুখি আর কি বলবো

আপনারে? দাঁড়ান, খোকারে কি এট্টু খেতি দিই। বড় চমৎকার হোলো আজ।

—এই বেশ কথা হচ্চে, আবার খাওয়া কেন? উঠলেন কেন?

—একটুখানি খেতি দিই ওরে। ছানা দিয়ে গিয়েছিল একটা রুগী। তাই একটু দি —এই নাও খোকা—

খোকা বললে—বাবা না খেলি আমি খাবো না। বাবা আগে খাবে।

রামকানাই হাততালি দিয়ে বললে—বাঃ, ও-ও বাপের বেটা! কেডা গা বাইরি?

ঠিক সেই সময়ে গয়ামেম এসে ঘরে ঢুকলো, তার হাতে একছড়া কলা, ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁদের প্রণাম করে কলাছড়া এগিয়ে দিয়ে বললে—বাবা খাবেন।

ভবানী ওকে দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। বললেন—এখানে আস নাকি?

গয়া বিনীত সুরে বললে—মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসি। তবে আপনার দেখা পাবো এখানে তা ভাবি নি।

—অতদূর থেকে আস কি ক'রে?

—না বাবা, এখানে যেদিন আসি, চরপাড়াতে আমার এক দূর-সম্পর্কো বুনের বাড়ি রাতি শুয়ে থাকি।

হঠাৎ তার চোখ গেল কোলে উপবিষ্ট খোকার তন্ময় মূর্তির দিকে। ওর কাছে গিয়ে বললে—এ খোকা কাদের? আপনার? সোনার চাঁদ ছেলেটুকুনি। বেশ বড়সড় হয়ে উঠেচে। আহা বেঁচে থাক—দেওয়ানজির বংশের চূড়ো হয়ে বেঁচে থাকো বাবা—

ভবানী বললেন—কি কর আজকাল?

—কি আর করব বাবা! দুঃখু-ধান্দা করি। মা মারা যাওয়ার পর বড্ড কষ্ট। এখানে তাই ছুটে ছুটে আসি বাবার কাছে, একটু চৈতন্যচরিতামৃত শুনতি।

—বল কি! তোমার মুখে যা শুনলাম, অনেক ব্রাহ্মণের মেয়ের মুখে তা শুনি নি!

—সে বাবা আপনাদের দয়া। মা মরে যেতি সংসারডা বড্ড ফাঁকা মনে হোলো—তারপর খুব সঙ্কুচিত ভাবে নিতান্ত অপরাধিনীর মতো বললে আস্তে আস্তে—বাবা, কাঁচা বয়সে যা করি ফেলিচি, তার চারা নেই। এখন বয়েস হয়েচে, কিছু কিছু বুঝতি পারি। আপনাদের মত লোকের দয়া একটু পেলি—

—আমরা কে? দয়া করবারই বা কি আছে? তিনি কাউকে ফেলবেন না, তা তুমি তো তুমি! তুমি কি তাঁর পর?

রামকানাই কবিরাজের দিকে চেয়ে বললেন—ওহে কবিরাজ মশাই, আপনি যে দেখছি ভবরোগের কবিরাজ সেজে বসলেন শেষে। দেখে সুখী হলাম।

রামকানাই বললে—ভবরোগটা কি?

—সে তো ধরুন, গানেই আছে—

ভবরোগের বৈদ্য আমি
অনাদরে আসিনে ঘরে।

...াগ মানে অজ্ঞানতা। অর্থের পেছনে অত্যন্ত ছোটাছুটি। কেন,

ঘরে দুটো ধান, উঠোনে দুটো ডাঁটা শাক—মিটে গেল অভাব, আপনার মতো। এখন হয়ে দাঁড়াচ্চে মায়ের পেটের এক ভাই গরীব, এক ভাই ধনী।

—আমার কথা বাদ দ্যান। আমার টাকা রোজগার করার ক্ষমতা নেই তাই। থাকলি আমিও করতাম।

—করতেন না। আপনার মনের গড়ন আলাদা। বৈষয়িক কূটবুদ্ধি লোক আপনি দেখেন নি তাই এ কথা বলচেন। কি জানেন, তত্ত্বকে একটু বেশি সামনে রাখেন তিনি। তাকে আপনার জন ভাবেন। এ বড় গূঢ় তত্ত্ব।

—ও কথা ছেড়ে দ্যান জামাইবাবু। যার যা, তার সেটা সাজে। আমার ভালো লাগে এই মাটির কুঁড়ে, তাই থাকি। যার না লাগে, সে অন্য চেষ্টা করে।

—তারা কি আপনার চেয়ে আনন্দ পায় বেশি? সুখ পায় বেশি? কখনো না। আনন্দ আত্মার ধর্ম, মন যত আত্মার কাছে যাবে, তত সে বেশি আনন্দ পাবে—আত্মার থেকে দূরে যত যাবে, বিষয়ের দিকে যাবে, তত দুঃখ পাবে। বাইরে কোথাও আনন্দ নেই, আনন্দ শান্তির উৎস রয়েচে মানুষের নিজের মধ্যে। মানুষ চেনে না, বাইরে ছোটে। নাভিগন্ধে মত্ত মৃগ ছুটে ফেরে গন্ধ অন্বেষণে। তারা সুখ পায় না।

—সে তারা জানে। আমি কি বলবো? আমি এতে সুখ পাই, আনন্দ পাই, এইটুকু বলতে পারি। আনন্দ ভেতরেই, এটুকু বুঝিচি। নিজের মধ্যিই খুব।

খোকা পুনরায় একমনে বসে এই সব জটিল কথাবার্তা শুনছিল। ওর বড় বড় দুই চোখে বুদ্ধি ও কৌতূহলের চাহনি।

গয়ামেমের কি ভালোই লাগলো ওকে! কাছে এসে ডেকে চুপি চুপি বললে—ও খোকা, তোমার নাম কি?

—টুলু।

—মোর সঙ্গে যাবা?

—কোথায়?

—মোর বাড়ি। পেঁপে খেতি দেবানি।

—বাবা বললি যাবো।

—আমি বলিল যেতি দেবেন না কেন?

—হুঁ, নিয়ে যেও। অনেকদূর তোমার বাড়ি?

—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। যাবা ও বাবা? যাবা ঠিক?

খোকা ভেবে ভেবে বললে—পেঁপে আছে?

—নেই আবার! এই এত বড় পেঁপে—

গয়া দুই হাত প্রসারিত ক'রে ফলের আকৃতি যা দেখালে, তাকে লাউ কুমড়োর বেলায় বিশ্বাস হোতো, কিন্তু পেঁপের ক্ষেত্রে যেন একটু অতিরঞ্জিত বলে সন্দেহ হয়।

খোকা বললে—বাবা, ও বাবা, মাসীমার বাড়ি যাব? পেঁপে দেবে—

বাবার বিনা অনুমতিতে সে কোন কাজ করে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে চেয়ে রইল।

গয়ামেম রাত্রে এসে রইল চরপাড়ায় ওর দূর-সম্পর্কের এক ভগ্নীর বাড়ি। সকালে উঠে

সে চলে যাবে মোল্লাহাটি। ঠিক মোল্লাহাটি নয়, ওর গ্রাম গয়েসপুরে। ওর দূর সম্পর্কের বোনের নাম নীরদা, নীরি বাগ্‌দিনী বলে গ্রামে পরিচিতা। তার অবস্থা ভালো না, আজ সন্ধ্যাবেলা গয়া এসে পড়াতে এবং রাত্রে থাকবে বলাতে নীরি একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিল। কি খাওয়ায়? এক সময়ে এই অঞ্চলের নামকরা লোক ছিল গয়ামেম। খেয়েচে দিয়েছেও অনেক। তাকে যা-তা দিয়ে ভাত দেওয়া যায়? কুচো চিংড়ি দিয়ে ঝিঙের ঝোল আর রাঙা আউশ চালের ভাত তাই দিতে হোলো। তারপর একটা মাদুর পেতে একখানা কাঁথা দিলে ওকে শোওয়ার জন্যে।

গয়ার শুয়ে শুয়ে ঘুম এল না।

ওই খোকার মুখখানা কেবলই মনে পড়ে। অমন যদি একটা খোকা থাকতো তার?

আজ যেন সব ফাঁকা, সব ফুরিয়ে গিয়েচে, এ ভাবটা তার মনে আসতো না যদি একটা অবলম্বন থাকতো জীবনের। কি আঁকড়ে সে থাকে?

আজ ক'বছর বড় সাহেব মারা গিয়েচে, নীলকুঠি উঠে গিয়ে নালু পালের জমিদারী কাছারী হয়েচে। এই ক'বছরেই গয়ামেম নিঃস্ব হয়ে গিয়েচে। বড় সাহেব অনেক গহনা দিয়েছিল, মায়ের অসুখের সময় কিছু গিয়েচে, বাকি যা ছিল, এতদিন বেচে বন্ধক দিয়ে চলচে। সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

পুরনো দিনগুলোর কথা যেন স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে। অথচ খুব বেশি দিনের কথাও তো নয়। এই তো সে দিনের। ক'বছর আর হোলো কুঠি উঠে গিয়েচে। ক'বছরই বা সাহেব মারা গিয়েছে।

এ কঠিন সংসারে কেউ যে বড় একটা কাউকে দেখে না, তা এতদিনে ভালোই বুঝতে পেরেচে সে। আপনার লোক ছিল যে ক'জন সব চলে গিয়েচে।

নীরি এসে কাছে বসলো। দোক্তাপান খেয়ে এসেচে, কড়া দোক্তাপাতার গন্ধ মুখে। ওসব সহ্য করতে পারে না গয়া। ওর গা যেন কেমন করে উঠলো।

—ও গয়া দিদি—

—কি রে?

—ঘুমুলি ভাই?

—না, গরমে ঘুম আসচে না।

নীরি খেজুরের চাটাই পেতে ওর পাশেই শুলো। বললে—কি বা খাওয়ালাম তোরে! কখনো আগে আসতিস নে—

এটাও বোধ হয় ঠেস দিয়ে কথা নীরির। সময় পেলে লোকে ছাড়বে কেন, ব্যাঙের লাথিও খেতে হয়। নীরি তো সম্পর্কে বোন।

গয়া বললে—একটা কথা নীরি। আমার হাত অচল হয়েচে, কিছু নেই। কি করে চালাই বল দিকি?

নীরি সহানুভূতির সুরে বললে—তাই তো দিদি। কি বলি। ধান ভানতি পারবি কি আর? তা হলি পেটের ভাতের চালডা হয়ে যায় গতর থেকে।

—আমার নিজের ধান তো ভানি। তবে পরের ধান ভানি নি। কি রকম পাওয়া যায়?

—পাঁচাদরে।

—সেটা কি? বোঝলাম না।

—ভারি আমার মেমসায়েব আলেন রে!

সত্যি, গয়ামেম এ কখনো শোনে নি। সে চোদ্দ বছর বয়স থেকে বড় গাছের আওতায় মানুষ। সে এসব দুঃখু-ধান্ধার জিনিসের কোনো খবর রাখে না। বললে—সেডা কি, বুঝলাম না নীরি। বল না?

নীরি হি-হি ক'রে উচ্চরবে যে হাসিটা হেসে উঠলো, তার মধ্যেকার শ্লেষের সুর ওর কানে বড় বেশি ক'রে যেন বাজলো। কাল সকালে উঠেই সে চলে যাবে এখান থেকে।

দুঃখিত হয়ে বললে—অত হাসিডা কেন? সত্যি জানি নে। আমি মিথ্যে বলবো এ নিয়ে নীরি?

নীরি তাকে বোঝাতে বসলো জিনিসটা কাকে বলে। বড় পরিশ্রমের কাজ, সকালে উঠে ঢেঁকিতে পাড় দিতে হবে দুপুর পর্যন্ত। ধান সেদ্ধ করতে হবে। তার জন্যে কাঠকুটো কুড়িয়ে জড়ো করতে হবে। চৈত্র মাসে শুকনো বাঁশপাতা কুমোরদের বাজরা পুরে কুড়িয়ে আনতে হবে বাঁশবাগান থেকে। সারা বছর উনুন ধরাতে হবে তাই দিয়ে। চিঁড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে দু'হাত ব্যথায় টনটন করবে। কথা শেষ করে নীরি বললে—সে তুই পারবি নে, পারবি নে। পিসিমা তোরে মানুষ করে গিয়েল অন্যভাবে। তোর আখের নষ্ট ক'রে রেখে গিয়েচে। না হলি মেমসায়েব, না হলি বাগ্‌দিঘরের ভাঁড়ারী মেয়ে! কি ক'রে তুই চালাবি? দুকূল হারালি।

গয়া আর কোনো কথা বললে না।

তার নিজের কপালের দোষ। কারো দোষ নয়। এরা দিন পেয়েচে, এখন বলবেই। আর কারো কাছে দুঃখু জানাবে না সে। এরা আপনজন নয়। এরা শুধু ঠেস্ দিয়ে কথা বলে মজা দেখবে।

নীরি বললে—দোক্তা খাবি?

—না ভাই।

—ঘুম আসচে?

—এবার একটু ঘুমুই।

—তোমার সুখের শরীল। রাত জাগা অভ্যেস থাকতো আমাদের মত তো ঠ্যালাটি বুঝতে! পূজোর সময় পরবের সময় সারারাত জেগে চিঁড়ে কুটিচি, ছাতু কুটিচি, ধান ভেনেচি। নইলে খদ্দের থাকে? রাত একটু জাগতি পারো না, তুমি আবার পাঁচাদরে ধান ভানবা, তবেই হয়েচে!

গয়া খুব বেশি ঝগড়া করতে পারে না। সে অভ্যাস তার গড়ে ওঠে নি পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত। নতুবা এখুনি তুমুল কাণ্ড বেধে যেতো নীরির সঙ্গে। একবার ইচ্ছে হলো নীরির কুটুনির সে উত্তর দেবে ভালো করেই। কিন্তু পরক্ষণেই তার বহুদিনের অভ্যস্ত ভদ্রতাবোধ তাকে বললে, কেন বাজে চেঁচামেচি করা? ঘুমিয়ে পড়ো, ও যা বলে বলুক গে। ওর কথায় গায়ে ঘা হয়ে যাবে না। নীরি কি জানবে মনের কথা?

প্রসন্ন খুড়োমশায়ের সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নি। কোথায় চলে গিয়েচেন নীলকুঠির কাছারীতে বরখাস্ত হয়ে। তবুও একজন লোক ছিল, অসময়ে খোঁজখবর নিত। আকাট নিষ্ঠুর

সংসারে এই আর একজন যে তার মুখের দিকে চাইতো। অবহেলা হেনস্থা করেচে তাকে একদিন গয়া। আজ নীরির মুখের দোক্তাতামাকের কড়া গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কেবলই মনটা হু-হু করচে সেই কথা মনে হয়ে। আজ তিনিও নেই।

কবিরাজ ঠাকুরের এখানে এসে তবু যেন খানিকটা শান্তি পাওয়া যাচ্চে অনেকদিন পরে। কারা যেন কথা বলে এখানে। সে কথা কখনো শোনে নি। মনে নতুন ভরসা জাগে।

তুলসী সকালে উঠে ছেলেমেয়েদের দুটো মুড়ি আর নারিকেলনাড়ু খেতে দিলে। ঝি এসে বললে—মা, বড় গোয়াল এখন ঝাঁটপস্কার করবো, না থাকবে?

—এখন থাক গো। দুধ দোওয়া না হলি, গরু বের না হলি গোয়াল পুঁছে লাভ নেই। আবার যা তাই হবে।

ময়না এখানে এসেছে আজ দু'মাস। তার ছোট ছেলেটার বড্ড অসুখ। রামকানাই কবিরাজকে দেখাবার জন্যেই ময়না এখানে এসে আছে ছেলেপুলে নিয়ে। ময়নার বিয়ে অবস্থাপন্ন ঘরে দিতে পারে নি লালমোহন, তখন তার অবস্থা ভালো ছিল না। সেজন্যে ময়নাকে প্রায়ই এখানে নিয়ে আসে। দাদার বাড়িতে দু'দিন ভালো খাবে পরবে। তুলসী ভালো মেয়ে বলেই আরও এসব সম্ভব হয়েচে বেশি করে। ময়না বেশি দিন না এলে তুলসী স্বামীকে তাগাদা দেয়—হ্যাঁগা, হিম হয়ে বসে আছ (এ কথাটা সে খুব বেশি ব্যবহার করে) যে! ময়না ঠাকুরঝি সেই কবে গিয়েচে, মা-বাপই না হয় মারা গিয়েচে, তুমি দাদা তো আছ—মাও তো বেশি দিন মারা যান নি, ওকে নিয়ে এসো গিয়ে।

ময়নার মা মারা গিয়েছিলেন—তখন নালুর গোলাবাড়ি, দোকান ও আড়ত হয়েচে, তবে এমন বড় মহাজন হয়ে ওঠে নি। নালু পালের একটা দুঃখ আছে মনে, মা এসব কিছু দেখে গেলেন না। তুলসী এখানে এলে ময়নাকে আরো বেশি করে যত্ন করে, শাশুড়ীর ভাগটাও যেন ওকে দেয়। বরং ময়না খুব ভালো নয়, বেশ একটু ঝগড়াটে, বাল্যকাল থেকেই একটু আদুরে। পান থেকে চুন খসলে তখুনি সতেরো কথা শুনিয়ে দেবে বৌদিকে।

কিন্তু তুলসী কখনো ব্যাজার হয় না। অসাধারণ সহ্যগুণ তার। যেমন আজই হোলো। হঠাৎ মুড়ি খেতে খেতে তুলসীর মেয়ে হাবি ময়নার ছোট ছেলের গালে এক চড় মারলে। ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া, তাতে ময়নার যাবার দরকার ছিল না। সে গিয়ে বললে—কি রে, কেষ্টকে মারলে কেডা?

সবাই বলে দিলে, হাবি মেরেচে, মুড়ি নিয়ে কি ঝগড়া বেধেছিল দুজনে।

ময়না হাবিকে প্রথমে দুড়দাড় ক'রে মারলে, তারপর বকতে শুরু করলে—তোর বড্ড বাড় হয়েচে, আমার রোগা ছেলেটার গায়ে হাত তুলিস, ওর শরীলি আছে কি? ও মরে গেলে তোমাদের হাড় জুড়োয়! এতে মায়েরও আস্কারা আছে কিনা, নইলে এমন হতি পারে?

তুলসী শুনে বাইরে এসে বললে—হ্যাঁ ঠাকুরঝি, আমার এতে কি আস্কারা আছে? বলি আমি বলবো তোমার ছেলেকে মারতি, কেন সে কি আমার পর?

ময়না ইতরের মত ঝগড়া শুরু করে দিলে। শেষকালে রোগা ছেলেটাকে ঠাস ঠাস ক'রে গোটাকতক চড় বসিয়ে বললে—মর না তুই আপদ। তোর জন্যিই তো দাদার পয়সা খরচ হচ্চে বলে ওদের এত রাগ। মরে যা না—

তুলসী অবাক হয়ে গেল ময়নার কাণ্ড দেখে। সে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বললে—খেপলে না পাগল হ'লে? কেন মেরে মরচিস রোগা ছেলেটাকে অমন ক'রে? আহা, বাছার পিঠটা লাল হয়ে গিয়েচে!

ময়নাও সুর চড়িয়ে বলতে লাগলো—গিয়েচে যাক। আর অত দরদ দেখাতি হবে না, বলে মা'র চেয়ে যার দরদ তারে বলে ডান!...দ্যাও তুমি ওকে নামিয়ে—

তুলসী বললে—না, দেবো না। আমার চকির সামনে রোগা ছেলেডারে তুমি কক্ষনো গায়ে হাত দিতি পারবা না—ছেলেটাকে কোলে ক'রে তুলসী নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিল।

বেশি বেলায় লালমোহন পাল আড়ত থেকে বাড়ি ফিরে দেখলে তুলসী রান্না করচে, ছেলেপুলেদের ভাত দেওয়া হয়েচে। দাদাকে দেখে ময়না পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ির সাধ তার খুব পুরেচে। যেদিন মা মরে গিয়েচে, সেই দিনই বাপের বাড়ির দরজায় খিল পড়ে গিয়েছে তার। ইত্যাদি।

লালমোহন বললে—হ্যাঁগা, আবার আজ কি বাধালে তোমরা? খেটেখুটে আসবো সারাডা দিন ভূতির মতো। বাড়িতি এসে একটু শান্তি নেই?

তুলসী কোনো কথা বললে না, কারো কোনো কথার জবাব দিলে না। স্বামীর তেল, গামছা এনে দিলে। ঝিকে দিয়ে জলচৌকি পাতিয়ে দু'ঘড়া নাইবার জল দিয়ে বললে—স্নান ক'রে দুটো খেয়ে নাও দিকি।

—না, আগে বলো, তবে খাবো।

—তুমিও কি অবুঝ হলে গা? আমি তবে কার মুখির দিকি তাকাবো! খেয়ে নাও, বলচি।

সব শুনে লালমোহন রেগে বললে—এত অশান্তি সহ্য হয় না। আজই দুটোরে দু'জায়গায় করি। যখন বনে না তোমাদের, তখন—

তুলসী সত্যি ধৈর্যশীলা মেয়ে। বোবার শত্রু নেই, সে চুপ ক'রে রইল। ময়না কিছুতেই খাবে না, অনেক খোসামোদ ক'রে হাত জোড় ক'রে তাকে খেতে বসালে। তাকে খাইয়ে তবে তৃতীয় প্রহরের সময় নিজে খেতে বসলো।

সন্ধ্যার আগে ওপাড়ার যতীনের বোন নন্দরাণী এসে বললে—ও বৌদিদি, একটা কথা বলতি এসেছিলাম, যদি শোনো তো বলি—

তুলসী পিঁড়ি পেতে তাকে বসালে। পান সেজে খেতে দিলে নিজে। নন্দরাণী বললে—একটা টাকা ধার দিতি হবে, হাতে কিছু নেই। কাল সকালে কি যে খাওয়াবো ছেলেটাকে—জানো সব তো বৌদি! বাবার খ্যামতা ছিল না, যাকে তাকে ধরে বিয়ে দিয়ে গ্যালেন। তিনি তো চক্ষু বুজলেন, এখন তুই মর—

তুলসী যাচককে বিমুখ করে না কখনো। সেও গরীব ঘরের মেয়ে। তার বাবা ৺অম্বিক প্রামাণিক সামান্য দোকান ও ব্যবসা ক'রে তাদের কষ্টে মানুষ ক'রে গিয়েছিলেন। তুলসী সেকথা ভোলে নি। নন্দরাণীকে বললে—যখন যা দরকার হবে, আমায় এসে বলবেন ভাই। এতো লজ্জা করবেন না। পর না ভেবে এসেচেন যে, মনডা খুশি হোলো বড্ড। আর একটা পান খান—দোক্তা চলবে? না? স্বর্ণদিদি ভালো আছেন?...

নন্দরাণী টাকা নিয়ে খুশি মনে বাড়ি চলে গেল সেদিন সন্দের আগেই। ঝিকে তুলসী

বললে—ষষ্ঠীতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয় দিদিকে—

তিলু ও নিলু তেঁতুল কুটছিল বসে বসে। চৈত্র মাসের অপরাহ্ন। একটা খেজুরপাতার চেটাই বিছিয়ে তার ওপর বসে নিলু তেঁতুল কুটছিল, তিলু সেগুলো বেছে বেছে একপাশে জড়ো করছিল।

—কোন্ গাছের তেঁতুল রে?

—তা জানিনে দিদি। গোপাল মুচির ছেলে ব্যাংটা পেড়ে দিয়ে গেল।

—গাঙের ধারের?

—সে তো খুব মিষ্টি। খেয়ে দ্যাখ্ না!

তিলু একখানা তেঁতুল মুখে ফেলে দিয়ে বললে—বাঃ, কি মিষ্টি! গাঙের ধারের ওই বড় গাছটার!

—তাড়াতাড়ি নে দিদি। খোকা পাঠশালা থেকে এল বলে। এলেই মুখি পুরবে।

—হ্যাঁরে, বিলুর কথা মনে পড়ে? তিনজনে বসে তেঁতুল কুটতাম এরকম, মনে পড়ে?

—খুব?

দুই বোনই চুপ ক'রে রইল। অনেক কথাই মনে পড়ে। এই তো কয়েক বছর হোল বিলু মারা গিয়েচে। মনে হচ্চে কত দিন, কত যুগ। এই সব চৈত্র মাসের দুপুরে বাঁশবনের পত্র-মর্মরে, পাপিয়ার উদাস ডাকে যেন পুরাতন স্মৃতি ভিড় ক'রে আসে মনের মধ্যে। বাপের মত দাদা—মা-বাবা মারা যাওয়ার পরে যে দাদা, যে বৌদিদি বাবা-মায়ের মতই তাদের মানুষ করেছিলেন, তাঁদের কথাও মনে পড়ে।

পাশের বাড়ির শরৎ বাঁড়ুয্যের বৌ হেমলতা পান চিবুতে চিবুতে এসে বললে—কি হচ্চে বৌদিদি? তেঁতুল কুটচো?

তিলু বললে—এ আর কখানা তেঁতুল। এখনো দু'ঝুড়ি ঘরে রয়েচে। তালপাতার চ্যাটাইখানা টেনে বোসো।

—বসবো না, জানতি এয়েলাম আচ কি তিরোদশী? বেগুন খেতি আছে?

—খুব আছে। দোয়াদশী পুরো। রাত দু'পহরে ছাড়বে। তোমার দাদা বলছিলেন।

—দাদা বাড়ি?

—না, কোথায় বেরিয়েচেন। দাদা কেমন আছেন?

—ভালো আছেন। বুড়োমানুষের আর ভালো-মন্দ! কাশি আর জ্বরডা সেরেচে। টুলু কোথায়?

—এখনো পাঠশালা থেকে ফেরে নি বৌদি।

—অনেক তেঁতুল কুটচিস্ তোরা। আমাদের এ বছর দুটো গাছের তেঁতুল পেড়ে ন দেবা ন ধম্মা। মুড়ি মুড়ি পোকা তেঁতুলির মধ্যি। দুটো কোটা তেঁতুল দিস্ সেই শ্রাবণ মাসে অম্বলতা খাবার জন্যি। খয়রা মাছ দিয়ে অম্বল খেতি তোমার দাদা বড্ড ভালোবাসেন।

বেলা পড়ে এসেচে। কোকিল ডাকচে বাঁশঝাড়ের মগডালে। কোথা থেকে শুকনো কুলের আচারের গন্ধ আসচে। কামরাঙা গাছের তলায় নলে নাপিতদের দুটো ছেলে গরু চরে বেড়াচ্চে।

ওপাড়ার সতে চৌধুরীর পুত্রবধূ বিরাজমোহিনী গামছা নিয়ে নদীতে গা ধুতে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে।

নিলু ডেকে বললে—ও বিরাজ, বিরাজ—

বিরাজমোহিনী নথ বাঁ হাতে ধরে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কি?

—দাঁড়া ভাই।

—যাবে ছোড়দি?

—যাবো।

বিরাজের বাপের বাড়ি নদে শান্তিপুরের কাছে বাঘআঁচড়া গ্রামে। সুতরাং তার বুলি যশোর জেলার মত নয়, সেটা সে খুব ভালো ক'রে জাহির করতে চায় এ অজ বাঙলাদেশের ঝি-বৌদের কাছে। ওর সঙ্গে তিলু নিলু দুই বোনই গেল ঘরে শেকল তুলে দিয়ে।

এ পাড়ায় ইছামতীতে মাত্র দুটি নাইবার ঘাট, একটার নাম রায়পাড়ার ঘাট, আর একটার নাম সায়েবের ঘাট। কিছুদূরে বাঁকের মুখে বনসিমতলার ঘাট। পাড়া থেকে দূরে বলে বনসিমতলার ঘাটে মেয়েরা আদৌ আসে না, যদিও সবগুলো ঘাটের চেয়ে তীরতরুশ্রেণী এখানে বেশি নিবিড়, ধরার অরুণোদয় এখানে অবাচ্য সৌন্দর্য ও মহিমায় ভরা, বনবিহঙ্গকাকলী এখানে সুস্বরা, কত ধরনের যে বনফুল ফোটে ঋতুতে ঋতুতে এর তীরের বনে বনে, ঝোপে ঝোপে! চাঁড়াগাছের তলায় কী ছায়াভরা কুঞ্জবিতান, পঞ্চাশ-ষাট বছরের মোটা চাঁড়াগাছ এখানে খুঁজলে দু'চারটে মিলে যায়।

তিলু বললে—চল না, বনসিমতলার ঘাটে নাইতে যাই—

বিরাজ বললে—এই অবেলায়?

—কদ্দূর আর!

—যেতুম ভাই, কিন্তু শাশুড়ী বাড়ি নেই, দুটি ডাল ভেঙে উঠোনে রোদে দিয়ে গ্যাছেন, তুলে আসতে ভুলে গেলুম আসবার সময়। গোরু-বাছুরে খেয়ে ফেললে আমাকে বুঝি আস্ত রাখবেন ভেবেচ!

নিলু বললে—ও সব কিছু শুনচি নে। যেতেই হবে বনসিমতলার ঘাটে। চলো।

বিরাজ হেসে সুন্দর চোখ দুটি তেরচা ক'রে কটাক্ষ হেনে বললে—কেন, কোনো নাগর সেখানে ওৎ পেতে আছে বুঝি?

তিলু বললে—আমাদের বুড়োবয়সে আর নাগর কি থাকবে ভাই, ওসব তোদের কাঁচা বয়সের কাণ্ড। একটা ছেড়ে ঘাটে ঘাটে তোদের নাগর থাকতি পারে।

—ইস্! এখনো ওই বয়সের রূপ দেখলে অনেক যুবোর মুণ্ডু ঘুরে যাবে একথা বলতে পারি দিদি। চলো, চলো, দেখি কোন্ ঘাটে নিয়ে যাবে! নাগরের চক্ষু ছানাবড়া ক'রে দিয়ে আসি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রায়পাড়ার ঘাটেই ওদের যেতে হোলো, পথে নামবার পরে অনেক ঝি-বৌ ওদের ধরে নিয়ে গেল। ঘাটে অনেক বৌ, হাসির ঢেউ উঠচে, গরম দিনের শেষে ঠাণ্ডা নদীজলের আমেজ লেগেচে সকলের গায়ে, জলকেলি শেষ ক'রে সুন্দরী বধূকন্যার দল কেউ ডাঙায় উঠতে চায় না।

সীতানাথ রায়ের পুত্রবধূ হিমি ডেকে বললে—ও বড়দি, দেখি নি যে কদ্দিন!

তিলু বললে—এ ঘাটে আর আসি নে—

—কেন? কোন্ ঘাটে যান তবে?

বিরাজ বললে—-তোরা খবর দিস তোদের লুকোনো নাগরালির? ও কেন বলবে ওর নিজের? আমি তো বলতুম না!

হিমি বললে—বড়দিদির বয়েসটা আমার মা'র বয়সী। ওকথা আর ওঁকে বোলো না। তোমার মুখ সুন্দর, বয়েস কচি, ওসব তোমাদের কাজ। ওতে কি?

—এতে ভাই খোল। গা-টায় ময়লা হয়েচে, ক্ষারখোল মাখবো বলে নিয়ে এলুম। মাখবি?

—না। তুমি সুন্দরী, তুমি ওসব মাখো।

সবাই খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। এতগুলি তরুণীর হাসির লহরে, কথাবার্তার ঝিলিকে স্নানের ঘাট মুখর হয়ে উঠেছে, আর কিছু পরে সপ্তমীর চাঁদ উঠবে ঘাটের ওপরকার শিরীষ আর পুয়োঁ গাছের মাথায়। পটপটি গাছের ফুল ঝরে পড়চে জলের ওপর, বিরাজের মনে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দের ভাব এল, যেন এ সংসারে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, তার রূপের প্রশংসা সব স্থানে শোনা যাবে, বড় পিঁড়িখানা এয়োস্ত্রী সমাজে তার জন্যেই পাতা থাকবে সর্বত্র। ফেনি বাতাসার থালা তার দিকে এগিয়ে ধরবে সবাই চিরকাল, কোন কুয়াসা-ছাড়া পাখী-ডাকা ভোরে শাঁখ বাজিয়ে ডালা সাজিয়ে জল সইতে বেরুবে তার খোকার অন্নপ্রাশনে কি বিয়ে-পৈতেতে, শান্তিপুরী শাড়ী পরে সে ফুলের সাজি আর তেলহলুদের কাঁসার বাটি নিয়ে ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে, গুজরীপঞ্চম আর পৈঁছে পরে সেজেগুজে চলবে এয়োস্ত্রীদের আগে আগে...আরও কত কি, কত কি মনে আসে...মনের খুশিতে সে টুপ টুপ ক'রে ডুব দেয়, একবার ডুব দিয়ে উঠে সে যেন সামনের চরের প্রান্তে উদার আকাশের কোণে দেখতে পেলে তার মায়ের হাসিমুখ, আর একবার দেখলে বিয়ের ফুলশয্যার রাতে ছোবা খেলা করতে করতে উনি আড়চোখে তার দিকে চেয়েছিলেন, সেই সলজ্জ, সসঙ্কোচ হাসি মুখখানা।...

জীবনে শুধু সুখ! শুধু আনন্দ! শুধু খাওয়া-দাওয়া, জলকেলি, হাসিখুশি, কদম্বকেলি, তাস নিয়ে বিন্তি খেলার ধুম! হি হি হি—কি মজা!

—হ্যাঁরে, ওকি ও বিরাজদিদি, অবেলায় তুই জলে ডুব দিচ্ছিস্ কি মনে ক'রে?

অবাক হয়ে হিমি বললে কথাটা।

নিলু বললে—তাই তো, দ্যাখ বড়দি, কাণ্ড। হ্যাঁরে চুল ভিজুলি যে, ওই চুলডার রাশ শুকুবে? কি আক্কেল তোর?

বিরাজের গ্রাহ্য নেই ওদের কথার দিকে। সে নিজের ভাবে নিজে বিভোরা, বললে—এই। একটা গান গাইবো শুনবি?

মনের বাসনা তোরে সবিশেষ শোন রে বলি—

হিমি বললে—ওরে চুপ, কে যেন আসচে—ভারিক্কি দলের কেউ—

নিস্তারিণী গুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ঘাটের ওপর এসে হাজির হোলো। সবাই একসঙ্গে তাকে দেখলে তাকিয়ে, কিন্তু কেউ কথা বললে না। এ গাঁয়ের ঝি-বৌদের অনেকেই ওর সঙ্গে কথা বলে না, ওর সম্বন্ধে নানারকম কথা রটনা আছে পাড়ায় পাড়ায়। কেউ কিছু

দেখে নি, বলতে পারে না, তবুও ওর পাড়ার রাস্তা দিয়ে একা একা বেরুনো, যার তার সঙ্গে (মেয়েমানুষদের মধ্যে) কথা বলা—এ সব নিয়ে ঘরে ঘরে কথা হয়েচে। এই সব জন্যেই কেউ ওর সঙ্গে হঠাৎ কথা বলতে চায় না সাহস করে, পাছে ওর সঙ্গে কথা কইলে কেউ খারাপ বলে।

তিলু ও নিলুর সাতখুন মাপ এ গাঁয়ে। তিলু কোনো কিছু মেনে চলার মত মেয়েও নয়, সবাই জানে। কিন্তু মজাও এই, তার বা তাদের ক'বোনের নামে কখনো এ গাঁয়ে কিছু রটে নি। কেন তার কারণ বলা শক্ত। তিলু মমতাভরা চোখের দৃষ্টি নিস্তারিণীর দিকে তুলে বললে—আয় ভাই আয়। এত অবেলা?

নিস্তারিণী ঘাটভরা বৌ-ঝিদের দিকে একবার তাচ্ছিল্যভরা চোখে চেয়ে দেখে নিয়ে অনেকটা যেন আপন মনে বললে, তেঁতুল কুটতে কুটতে বেলাডা টের পাই নি!

—ওমা, আমরাও আজ তেঁতুল কুটছিলাম রে। নিলু আর আমি। আমাদের ওপর রাগ হয়েচে নাকি?

—সেডা কি কথা? কেন?

—আমাদের বাড়িতে যাস্ নি ক'দিন।

—কখন যাই বলো ঠাকুরঝি। ক্ষার সেদ্ধ করলাম ক্ষার কাচলাম। চিঁড়ে কোটা ধান ভানা সবই তো একা হাতে করচি। শাশুড়ী আজকাল আর লগি দ্যান না বড় একটা—

নিস্তারিণী সুরূপা বৌ, যদিও তার বয়েস হয়েচে এদের অনেকের চেয়ে বেশি। তার হাত পা নেড়ে ঠোঁটের হাসি ঠোঁটে চেপে কথাটা বলবার ভঙ্গিতে হিমি আর বিরাজ একসঙ্গে কৌতুকে হি হি ক'রে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথাকার একটা বাঁধ খুলে গেল, হাসির ঢেউয়ের রোল উঠলো চারিদিক থেকে।

হিমি বললে—নিস্তারদি কি হাসাতেই পারে! এসো না, জলে নামো না নিস্তারদি।

বিরাজ বললে—সেই গানটা গান না দিদি। নিধুবাবুর—কি চমৎকার গাইতে পারেন ওটা! বিধুদিদি যেটা গাইতো।

সবাই জানে নিস্তারিণী সুস্বরে গান গায়। হাসি গানে গল্পে মজলিস জমাতে ওর জুড়ি বৌ নেই গাঁয়ে। সেই জন্যেই মুখ ফিরিয়ে অনেকে বলে—অতটা ভালো না মেয়েমান্ষের। যা রয় সয় সেডাই না ভালো।

নিস্তারিণী হাত নেড়ে গান ধরলে—

ভালবাসা কি কথার কথা সই
মন যার মনে গাঁথা
শুকাইলে তরুবর বাঁচে কি জড়িত লতা—
প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা—

সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল।

কেমন হাতের ভঙ্গি, কেমন গলার সুর! কেমন চমৎকার দেখায় ওকে হাত নেড়ে নেড়ে গান গাইলে! একজন বললে—নীলবরণী গানটাও বড় ভালো গান আপনি।

নিস্তারিণীও খুশী হোলো। সে ভুলে গেল সাত বছর বয়েসে তার বাবা অনেক টাকা পণ

পেয়ে শ্রোত্রিয় ঘরে মেয়েকে বিক্রি করেছিলেন—খুব বেশী টাকা, পঁচাত্তর টাকা। খোঁড়া স্বামীর সঙ্গে সে খাপখাইয়ে চলতে পারে নি কোনোদিন, শাশুড়ীর সঙ্গেও নয়। যদিও স্বামী তার ভালোই। শ্বশুর ভজগোবিন্দ বাঁড়ুয্যে আরো ভালো। কখনো ওর মতের বিরুদ্ধে যায় নি। ইদানীং গরীব হয়ে পড়েচে, খেতে পরতে দিতে পারে না, ছেলেমেয়েদের পেটপুরে ভাত জোটে না—তবুও নিস্তারিণী খুশী থাকে। সে জানে গ্রামে তাকে ভালো চোখে অনেকেই দেখে না, না দেখলে—বয়েই গেল! কলা! যত সব কলাবতী বিদ্যেধরী সতীসাধ্বীর দল! মারো ঝাঁটা।

ও জলে নেমেচে। বিরাজ ওর সিক্ত সুঠাম দেহটা আদরে জড়িয়ে ধরে বললে—নিস্তারদিদি, সোনার দিদি!...কি সুন্দর গান, কি সুন্দর ভঙ্গি তোমার! আমি যদি পুরুষ হতুম, তবে তোর সঙ্গে দিদি পীরিতে পড়ে যেতুম—মাইরি বলচি কিন্তু—একদিন বনভোজন করবি চল্।

কেন হঠাৎ নিস্তারিণীর মনে অনেকদিন আগেকার ও ছবিটা ভেসে উঠলো? মনের অদ্ভুত চরিত্র। কখন কি ক'রে বসে সেটা কেউ বলতে পারে? সেই যে তার প্রণয়ীর সঙ্গে একদিন নদীর ধারে বসেছিল—সেই ছবিটা। আর একটা খুব সাহসের কাজ ক'রে বসলো নিস্তারিণী। যা কখনো কেউ গাঁয়ে করে না, মেয়েমানুষ হয়ে। বললে—ঠাকুরজামাই ভালো আছেন, বড়দি?

পুরুষের কথা এভাবে জিগ্যেস করা বেনিয়ম। তবে নিস্তারিণীকে সবাই জানে। ওর কাছ থেকে অদ্ভুত কিছু আসাটা সকলের গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে।

পূজো প্রায় এসে গেল। ফণি চক্কত্তির চন্ডীমন্ডপে বসে গ্রামস্থ সজ্জনগণের মজলিস চলচে। তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার হবার উপক্রম হয়েচে চণ্ডীমন্ডপের দাওয়া। ব্রাহ্মণদের জন্যে একদিকে মাদুর পাতা, অন্য জাতির জন্যে অপর দিকে খেজুরের চ্যাটাই পাতা। মাঝখান দিয়ে যাবার রাস্তা।

নীলমণি সমাদ্দার বললেন—কালে কালে কি হোলো হে!

ফণি চক্কত্তি বললেন—ও সব হোলো হঠাৎ-বড়লোকের কাণ্ড। তুমি আমি করবোডা কি? তোমার ভালো না লাগে, সেখানে যাবা না। মিটে গেল।

শ্যামলাল মুখুয্যে বললেন—তুমি যাবা না, আবাইপুরের বামুনেরা আসবে এখন। তখন কোথায় থাকবে মানডা?

—কেন, কি রকম শুনলে?

—গাঁয়ের ব্রাহ্মণ সব নেমন্তন্ন করবে এবার ওর বাড়ি দুর্গোৎসবে।

—স্পদ্ধাডা বেড়ে গিয়েচে ব্যাটার। ব্যাটা হঠাৎ-বড়লোক কিনা!

লালমোহন পাল গ্রামের কোনো লোকের কোনো সমালোচনা না মেনে মহাধুমধামে চন্ডীমণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমা তুললে। এবার অনেক দুর্গাপূজা এ গ্রামে ও পাশের সব গ্রামগুলিতে। প্রতি বছর যেমন হয়, গ্রামের গরীব দুঃখীরা পেটভরে নারকোলনাড়ু, সরু ধানের চিঁড়ে ও মুড়কি খায়। নেমন্তন্ন ক'বাড়ীতে খাবে? সুক্তুনি, কচুরশাক, ডুমুরের ডালনা, সোনামুগের ডাল,

মাছ ও মাংস, দই, রসকরা সব বাড়িতেই। লালমোহন পালের নিমন্ত্রণ এ গাঁয়ের কোনো ব্রাহ্মণ নেন নি। এ পর্যন্ত নালু পাল ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে এসেচে পরের বাড়িতে টাকা দিয়ে...কিন্তু তার নিজের বাড়িতেই ব্রাহ্মণভোজন হবে, এতে সমাজপতিদের মত হোলো না। নালু পাল হাত জোড় ক'রে বাড়ি বাড়ি দাঁড়ালো, ফণি চক্কত্তির চন্ডীমণ্ডপে একদিন এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে ফুলবেঞ্চের বিচার চললো। শেষ পর্যন্ত ওর আপীল ডিস্‌মিস হয়ে গেল।

তুলসী এল যষ্ঠীর দিন তিলু-নিলুর কাছে। কস্তাপেড়ে শাড়ি পরনে, গলায় সোনার মুড়কি মাদুলি, হাতে যশম। গড় হয়ে তিলুর পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে বললে—হ্যাঁ দিদি, আমার ওপরে গাঁয়ের ঠাকুরদের এ কি অত্যাচার দেখুন!

—সে সব শুনলাম।

—ভাত কেউ খাবেন না। আমি গাওয়া ঘি আনিয়েচি, লুচি ভেজে খাওয়াবো। আপনি একটু জামাইঠাকুরকে বলুন দিদি। আপনাদের বাড়িতি তো হয়ই, আমার নিজের বাড়িতি পাতা পেড়ে বেরাহ্মণরা খাবেন, আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ুক আমার বাড়িতি, এ সাধ আমার হয় না? লুচি-চিনির ফলারে অমত কেন করবেন ঠাকুরমশাইরা?

ভবানী বাঁড়ুয্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিলুর মুখে সব শুনে তিনি বললেন—আমার সাধ্য না। এ কুলীনের গাঁয়ে ও সব হবে না। তবে আংরালি গদাধরপুর আর নসরাপুরের ব্রাহ্মণদের অনেকে আসবে। সেখানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বেশি। নালু পালকে তিনি সেইরকম পরামর্শ দিলেন।

নালু পাল হাত জোড় ক'রে বললে—আপনি থাকবেন কি না আমায় বলুন জামাইঠাকুর!

—থাকবো।

—কথা দেচ্চেন?

—নইলে তোমার এখানে আসতাম?

—ব্যাস। কোনো ব্রাহ্মণ-দেবতাকে আমার দরকার নেই, আপনি আর দিদিরা থাকলি ষোলকলা পুন্ন্য হোলো আমার।

—তা হয় না নালু। তুমি ওগাঁয়ের ব্রাহ্মণদের কাছে লোক পাঠাও, নয়তো নিজে যাও। তাদের মত নাও।

আংরালি থেকে এলেন রামহরি চক্রবর্তী বলে একজন ব্যক্তি আর নসরাপুর থেকে এলেন সাতকড়ি ঘোষাল। তাঁরা সমাজের দালাল। তাঁরা সন্ধির শর্ত করতে এলেন নালু পালের সঙ্গে।

রামহরি চক্রবর্তীর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। বেঁটে কালো, একমুখ দাড়ি গোঁফ। মাথার টিকিতে একটি মাদুলি। বাহুতে রামকবচ। বিদ্যা ঐ গ্রামের সেকালের হরু গরুমশায়ের পাঠশালার নামতার ডাক পর্যন্ত। তিনি ছিলেন ঘোষার সর্দার। অর্থাৎ নামতা ঘোষবার বা চেঁচিয়ে ডাক পড়াবার তিনিই ছিলেন সর্দার।

রামহরি সব শুনে বললেন—এই সাতকড়ি ভায়াও আছে। পালমশায়, আপনি ধনী লোক, আমরা সব জানি! কিন্তু আপনার বাড়িতে পাতা পাড়িয়ে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো, এ কখনো এ দেশে হয় নি। তবে তা আমরা দুজনে করিয়ে দেবো। কি বল হে সাতকড়ি?

সাতকড়ি ঘোষাল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের লোক, তবে বেশ ফর্সা আর একটু দীর্ঘাকৃতি। কৃশকায়ও বটে। মুখ দেখেই মনে হয় নিরীহ, ভালোমানুষ, হয়তো কিছু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, সাংসারিক দিক থেকে।

সাতকড়ি মাথা নেড়ে বললেন—কথাই তাই।

—তুমি কি বলচ?

—আপনি যা করেন দাদা।

—তা হোলে আমি বলে দিই?

—দিন।

নালু পালের দিকে ফিরে রামহরি ডানহাতের আঙুলগুলো সব ফাঁক ক'রে তুলে দেখিয়ে বললেন—পাঁচ টাকা ক'রে লাগবে আমাদের দুজনের।

—দেবো।

—ব্রাহ্মণদের ভোজন-দক্ষিণে দিতি হবে এক টাকা।

—ওইটে কমিয়ে আট আনা করতি হবে।

—আর এক মালসা ছাঁদা দিতি হবে—লুচি, চিনি, নারকেলনাড়ু। খাওয়ার আগে।

—তাও দেবো, কিন্তু দক্ষিণেটা আট আনা করুন।

—আমাদের পাঁট টাকা করে দিতে হবে, খাওয়ার আগে কিন্তু। এর কম হবে না।

—তাই দেবো। তবে কম্‌সে কম একশো ব্রাহ্মণ এনে হাজির করতি হবে। তার কম হলি আপনাদের মান রাখতি পারবো না।

রামহরি চক্রবর্তী মাথার মাদুলিসুদ্ধ টিকিটা দুলিয়ে বললে—আলবৎ এনে দেবো। আমার নিজের বাড়িতিই তো ভাগ্নে, ভাগ্নীজামাই, তিন খুড়তুতো ভাই, আমার নিজের চার ছেলে, দুই ছোট মেয়ে—তারা সবাই আসবে। সাতকড়ি ভায়ারও শত্তুরের মুখি ছাই দিয়ে পাঁচটি, তারাও আসবে। একশোর অর্ধেক তো এখেনেই হয়ে গেল। গেল কিনা?

ক্ষমতা আছে রামহরি চক্রবর্তীর। ব্রাহ্মণভোজনের দিন দলে দলে ব্রাহ্মণ আসতে লাগলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাত ধরে। বড় উঠোনে সামিয়ানার তলায় সকলের জায়গা ধরলো না। "দীয়তাং ভূজ্যতাং" ব্যাপার চললো। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি আর চিনি এক এক ব্রাহ্মণে যা টানলে! দেখবার মত হোলো দৃশ্যটা। কখনো এ অঞ্চলে এত বৃহৎ ও এত উচ্চশ্রেণীর ভোজ কেউ দেয় নি। যে যত পারে পেট ভরে গরম লুচি, মালপুয়া, চিনি ও নারকোলের রসকরা দেওয়া হোলো—তার সঙ্গে ছিল বৈকুণ্ঠপুরের সোনা গোয়ালিনীর উৎকৃষ্ট শুকো দই, এদেশের মধ্যে নামডাকী জিনিস। ব্রাহ্মণেরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো খেতে খেতেই। কে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললে—বাবা নালু, পড়াই ছিল কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে—

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু'চারি আদার কুচি।
কচুরি তাহাতে খান দুই—

খাই নি কখনো। কে খাওয়াচ্চে এ গরীব অঞ্চলে? তা আজ বাবা তোমার বাড়ী এসে খেয়ে—

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—যা বললেন, দাদামশাই। যা বললেন—

দক্ষিণা নিয়ে ও ছাঁদার মালসা নিয়ে ব্রাহ্মণের দল চলে গেলে, দালাল রামহরি চক্রবর্তী নালু পালের সামনে এসে বললেন—কেমন পালমশাই? কি বলেছিলাম আপনারে? ভাত ছড়ালি কাকের অভাব?

নালু পাল সঙ্কুচিত হয়ে হাত জোড় ক'রে বললে—কি ছি, ও কথা বলবেন না। ওতে

আমার অপরাধ হয়। আমার কত বড় ভাগ্যি আজকে, যে আজ আমার বাড়ি আপনাদের পায়ের ধুলো, পড়লো। আপনাদের দালালি নিয়ে যান। ক্ষ্যামতা আছে আপনাদের।

—কিছু ক্ষ্যামতা নেই। এ ক্ষ্যামতার কথা না পালমশাই। সত্যি কথা আর হক কথা ছাড়া রামহরি বলে না। তেমন বাপে জন্মো দেয় নি। লুচি চিনির ফলার এ অঞ্চলে ক'দিন ক'জনে খাইয়েচে শুনি? ঐ নাম শুনে সবাই ছুটে এসেচে। এ গাঁয়ের কেউ বুঝি আসে নি? তা আসবে না। এদের পায়া ভারি অনেক কিনা!

—একজন এসেচেন, ভবানী বাঁড়ুয্যে মশায়।

রামহরি আশ্চর্য হয়ে বললেন—কি রকম কথা! দেওয়ানজির জামাই?

—তিনিই।

—আমার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দ্যান না পালমশাই?

সব ব্রাহ্মণের খাওয়া চুকে যাওয়ার পরে ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে নিয়ে নিরিবিলি জায়গায় বসে আহার করছিলেন। খোকা জীবনে লুচি এই প্রথম খেলে। বলছিল—এরে নুচি বলে বাবা?

—খাও বাবা ভাল ক'রে। আর নিবি?

বালক ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ।

ভবানীর ইঙ্গিতে তিলু খানকতক গরম লুচি খোকার পাতে দিয়ে গেল। ভবানীকে তিলু ও নিলুই খাবার পরিবেশন করছিল। এমন সময় নালু পাল সেখানে রামহরি চক্রবর্তীকে নিয়ে ঢুকে ভোজনরত ভবানীর সামনে অথচ হাতদশেক দূরে জোড়হাতে দাঁড়ালো।

—কি?

—ইনি এসেচেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতি।

রামহরি চক্রবর্তী প্রণাম ক'রে বললেন—দেখে বোঝলাম আজ কারমুখ দেখেই উঠিচি।

ভবানী হেসে বললেন—খুব খারাপ লোকের মুখ তো?

—অমন কথাই বলবেন না জামাইবাবু। আমি যদি আগে জানতাম আপনি আর আমার মা এখেনে এসে খাবেন, তবে পালমশায়কে বলতাম আর অন্য কোনো বামুন এল না এল, আপনার বয়েই গেল। এমন নিধি পেয়ে আবার বামুন খাওয়ানোর জন্যি পয়সা খরচ? কই, মা কোথায়? ছেলে একবার না দেখে যাবে না যে, বার হও মা আমার সামনে।

তিলু আধঘোমটা দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেই রামহরি হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বললেন—যেমন শিব, তেমনি শিবানী। দিনডা বড্ড ভালো গেল আজ পালমশাই। মা, ছেলেডারে মনে রেখো।

ভবানীকে তিলু ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—পুন্নিমের দিন আমাদের বাড়িতি দেবেন পায়ের ধুলো? খোকার জন্মদিনের পরবন্ন হবে। এসে খাবেন।

এই রকমই বিধি। পরপুরুষের সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম নেই, এমন কি সামনেও কথা বলবার নিয়ম নেই। একজন মধ্যস্থ ক'রে কথা বলা যায় কিন্তু সরাসরি নয়। ভবানী বুঝিয়ে বলবার আগেই রামহরি চক্রবর্তী বললেন—আমি তাই করবো মা। পরবন্ন খেয়ে আসবো। এ আমার ভাগ্যি। এ ভাগ্যির কথা বাড়ি গিয়ে তোমার বৌমার কাছে গল্প করতি হবে।

—তাঁকেও আনবেন না?

—না মা, সে সেকেলে। আপনাদের মত আজকালের উপযুক্ত নয়। সে পুরুষমানুষের সামনে বেরুবেই না। আমিই এসে আমার খোকন ভাইয়ের সঙ্গে পরবন্ন ভাগ করে খেয়ে যাবো আর আপনাদের গুণ গেয়ে যাবো।

নীলমণি সমাদ্দারের স্ত্রী আন্নাকালী তাঁর পুত্রবধূ সুবাসীকে বললেন--হ্যাঁ বৌমা, কিছু শুনলে নাকি গাঁয়ে? ও দিকির কথা?

পুত্রবধূ জানে শাশুড়ী ঠাকরুণ বলচেন, বড়লোকের বাড়ীর দুর্গোৎসবে জাঁকালী নেমতন্নটা ফস্‌কে যাবে, না টিকে থাকবে! ওদের অবস্থা হীন বলে এবং কখনো কিছু খেতে পায় না বলে ক্রিয়াকর্মের নিমন্ত্রণের আমন্ত্রণের দিকে ওদের নজরটা একটু প্রখর।

সুবাসী ভালোমানুষ বৌ। লাজুক আগে ছিল, এখন ক্রমাগত পরের বাড়িতে ধার চাইতে গিয়ে গিয়ে লজ্জা হারিয়ে ফেলেচে। খবরাখবর সেও কিছু সংগ্রহ করেচে। যা শুনেচে তাই বললে। গাঁয়ের ব্রাহ্মণেরা কেউ খাবে না নালু পালের বাড়ি।

আন্নাকালী বললে—যাও দিকি একবার স্বর্ণদের বাড়ি।

—তুমি যাবে মা?

—আমি ডাল বাটি। ডাল ক'টা ভিজতি দিয়েলাম, না বাটলি নষ্ট হয়ে যাবে, বচ্ছরের পোড়ানি তো উঠলোই না। শোন্ তোরে বলি বৌমা—

—কি মা?

আন্নাকালী এদিক ওদিক চেয়ে গলার সুর নিচু ক'রে বললেন—স্বর্ণকে বলে আয়, আর যদি কেউ না যায়, আমরা দু'ঘর নুকিয়ে যাবো একটু বেশী রাত্তিরি। তুই কি বলিস?

—ফণি জ্যাঠামশাই কি ওঁর বৌ দেখতি পেলি বাঁচবে?

—রাত হলি যাবো। কেডা টের পাচ্চে!

এ গাঁয়ে গাছপালার কান আছে।

—তুই জেনে আয় তো।

সুবাসী গেল যতীনের বৌ স্বর্ণের কাছে। এরাও গাঁয়ের মধ্যে বড্ড গরীব। একরাশ থোড় কুটছে বসে বসে স্বর্ণ। পাশে দুটো ডেঙো ডাঁটার পাকা ঝাড়। সুবাসী বললে—কি রান্না করচো স্বর্ণদিদি?

—এসো সুবাসী। উনি বাড়ি নেই, তাই ভাবলাম মেয়েমান্‌ষির রান্না আর কি করবো, ডাঁটা শাকের চচ্চড়ি করি আর কলায়ের ডাল রাঁধি।

—সত্যি তো।

—বোস্ সুবাসী।

—বসবো না দিদি। শাশুড়ী বলে পাঠালে, তোমরা কি তুলসীদিদিদের বাড়ি নেমন্তন্নে যাবা?

—ননদ তো বলছিল, যাবা নাকি বৌদিদি? আমি বললাম, গাঁয়ের কোনো বামুন যাবে না, সেখানে কি করে যাই বল। তোরা যাবি?

—তোমরা যদি যাও, তবে যাই।

—একবার নন্দরাণীকে ডেকে নিয়ে আয় দিকি।

যতীনের বোন নন্দরাণীকে ফেলে ওর স্বামী আজ অনেকদিন কোথায় চলে গিয়েচে। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। যতীনের বাবা রূপলাল মুখুয্যে কুলীন পাত্রেই মেয়ে দিয়েছিলেন অনেক যোগাড়যন্ত্র করে। কিন্তু সে পাত্রটির আরো অনেক বিয়ে ছিল, একবার এসে কিছু প্রণামী আদায় করে শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে যেতো। নন্দরাণীর ঘাড়ে দু'তিনিটি কুলীন কন্যার বোঝা চাপিয়ে আজ বছর চার-পাঁচ একেবারে গা-ঢাকা দিয়েচে। কুলীনের ঘরে এই রকমই নাকি হয়।

নন্দরাণী পিঁড়ি পেতে বসে রোদে চুল শুকুচ্ছিল। সুবাসীর ডাকে উঠে এল। তিন জনে মিলে পরামর্শ করতে বসলো।

নন্দরাণী বললে—বেশি রাতে গেলি কেডা দ্যাখচে?

স্বর্ণ বললে—তবে তাই চলো। তুলসীকে চটিয়ে লাভ নেই। আপদে বিপদে তুলসী বরং দেখে, আর কেডা দেখবে? একঘরে করার বেলা সবাই আছে।

অনেক রাত্রে ওরা লুকিয়ে গেল তুলসীদের বাড়ি। তুলসী যত্ন করে খাওয়ালে ওদের। সঙ্গে এক এক পুঁটুলি ছাঁদা বেঁদে দিলে। যতীন সে রাত্রেই বাড়ি এল। স্বর্ণ এসে দেখলে, স্বামী শেকল খুলে ঘরে আলো জ্বেলে বসে আছে। স্ত্রীকে দেখে বললে—কোথায় গিইছিলে? হাতে ও কি? গাইঘাটা থেকে দু'কাঠা সোনা মুগ চেয়ে আনলাম এক প্রজা-বাড়ি থেকে। ছেলেপিলে খাবে আনন্দ ক'রে। তোমার হাতে ও কি গা?

—সে খোঁজে দরকার নেই। খাবে তো?

—খিদে পেয়েচে খুব। ভাত আছে?

—বোসো না। যা দিই খাও না।

স্বামীর পাতে অনেকদিন পরে সুখাদ্য পরিবেশন করে দিতে পেরে স্বর্ণ বড় খুশী হোলো। দরিদ্রের ঘরণী সে, শ্বশুর বেঁচে থাকতেও দেখেচে মোটা চালভাজা ছাড়া কোনো জলপান জুটতো না তার। ইদানীং দাঁত ছিল না বলে স্বর্ণ শ্বশুরকে চালভাজা গুঁড়ো করে দিত।

যতীন বললে—বাঃ, এ সব পেলে কোথায়?

—কাউকে বোলো না। তুলসীদের বাড়ি। তুলসী নিজে এসে হাত জোড় করে সেদিন নেমন্তন্ন করে গেল। বড্ড ভালো মেয়ে। ঠ্যাকার অংকার নেই এতটুকু।

—কে কে গিয়েছিলে?

—নন্দরাণী আর সুবাসী। ছেলেমেয়েরা। তুলসী দিদি কি খুশী! সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়ালে। আসবার সময় জোর করে এক মালসা লুচি চিনি ছাঁদা দিলে।

—ভালো করেচ। খেতে পায় না কিছু, কেডা দিচ্চে ভালো খেতি একটু?

—যদি টের পায় গাঁয়ে?

—ফাঁসি দেবে, না শূলে দেবে? বেশ করেচ। নেমন্তন্ন করেছিল, গিয়েচ? বিনি নেমন্তন্নে তো যাও নি।

—ঠাকুরজামাই ছিলেন। তিলুদিদি নিলুদিদি ছিল।

—ওদের কেউ কিছু বলতি সাহস করবে না। আমরা গরীব, আমাদের ওপর যত সব দোষ এসে পড়বে। তা হোক। পেট ভরে লুচি খেয়েচ? ছেলেমেয়েদের খাইয়েচ? ওদের জন্যে রেখে দাও, সকালে উঠে খাবে এখন। কাউকে গল্প করে বেড়িও না যেখানে সেখানে। মিটে গেল। তুমি বেশ করে খেয়েচ কিনা বলো।

—না খেলি তুলসীদিদি শোনে? হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। সুদ্ধু বলবে, খ্যালেন না, পেট ভরলো না—

খোকার জন্মতিথিতে রামহরি চক্রবর্তী এলেন ভবানীর বাড়িতে। সঙ্গে তাঁর দুটি ছেলে। সঙ্গে নিয়ে এলেন খোকনের জন্যে স্ত্রীর প্রদত্ত সরু ধানের খই ও ক্ষীরের ছাঁচ। ভবানীর বাড়ির পশ্চিমপোতার ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছানো রয়েচে অতিথিদের জন্যে। বেশি লোক নয়, রামকানাই কবিরাজ, ফণি চক্কত্তি, শ্যাম মুখুয্যে, নীলমণি সমাদ্দার আর যতীন। মেয়েদের মধ্যে নিস্তারিণী, যতীনের স্ত্রী স্বর্ণ আর নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূ সুবাসী।

ফণি চক্কত্তি বললেন—আরে রামহরি যে! ভালো আছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রণাম দাদা। আপনি কেমন?

—আর কেমন! এখন বয়েস হয়েচে, গেলেই হোলো। বুড়োদের মধ্যি আমি আর নীলমণি দাদা এখনো ভালোই আছি, এবং টিকে আছি। আর তো একে একে সব চলে গেল।

—দাদার বয়েস হোলো কত?

—এই ঊনসত্তর যাচ্চে।

—বলেন কি? দেখলি তো মনে হয় না। এখনো দাঁত পড়ে নি।

—এখনো আধসের চালির ভাত খাবো। আধ কাঠা চিঁড়ের ফলার খাবো। আধখানা পাকা কাঁটাল এক জায়গায় বসে খাবো। দু'বেলা আড়াইসের দুধ খাই এখনো, খেয়ে হজম করি। সেই খাওয়ার ভোগ আছে বলে এখনো এমনডা শরীল রয়েচে। নইলি—

—আচ্ছা, একটা কথা বলি রামহরি। সেদিন কি কান্ডটা করলে তোমরা! আঙরালি আর গদাধরপুরির বাঁওনদের কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? নেমন্তন্ন করেচে বলেই পাতা পাড়তি হবে যেয়ে শুদ্দুর বাড়ি! ছিঃ ছিঃ, ব্রাহ্মণ তো? গলায় পৈতে রয়েচে তো? নাই বা হোলো কুলীন। কুলীন সকলে হয় না, কিন্তু মান অপমান জ্ঞান সবার থাকা দরকার।

কথাগুলোতে নীলমণি সমাদ্দার বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূও সেদিন যে বেশি রাত্রে লুকিয়ে ওদের বাড়ি গিয়ে ভোজ খেয়ে এসেচে এ কথা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। পড়লেই বড় মুস্কিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ঠিক সেই সময় ভবানী বাঁড়ুয্যে এসে ওদের খাবার জন্যে আহ্বান করলেন। কথা চাপা পড়ে গেল।

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রামহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ফণি চক্কত্তি ও এঁরা খাবেন না। অন্য জায়গায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে খাওয়ানো হোলো এবং শুধু তাই নয়, খোকাকে তার জন্মদিনের পায়েস খাওয়ানোর ভার পড়লো তাঁর ওপর। রামহরি চক্রবর্তীর পাশেই খোকার পিঁড়ি পাতা। ঘোমটা দিয়ে তিলু ওদের দুজনকে বাতাস করতে লাগল বসে।

রামহরি বললেন—তোমার নাম কি দাদু?

খোকা লাজুক সুরে বললে—শ্রীরাজ্যেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—কি পড়?

এবার উৎসাহ পেয়ে খোকা বললে—হরু গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ি। কলকাতায় থাকে শম্ভুদাদা, তার কাছে ইংরিজি পড়তি চেয়েচি, সে শেখাবে বলেছে।

—বাঃ বাঃ, এইটুকু ছেলে নাকি ইঞ্জিরি পড়বে! তবে তো তুমি দেশের হাকিম হবা। বেশ

দাদু বেশ। হাকিম হওয়ার মত চেহারাখানা বটে।

—মা বলচে, আপনি আর কিছু নেবেন না?

—না, না, যথেষ্ট হয়েচে। তিনবার পায়েস নিইচি, আবার কি? বেঁচে থাকো দাদু।

বামুন ভোজনের দালাল রামহরি চক্রবর্তীকে এমন সম্মান কেউ দেয় নি কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। বিদায় নিয়ে যাবার সময়ে রামহরি তিলুকে প্রণাম করে বললেন— চলি মা, চেরডা কাল মনে থাকবে, আজ যা করলে মা আমার। এ যত্ন কখনো ভোলবো না। আজ বোঝলাম আপনারা এ দিগরের রামা শামার মত লোক নন। দু' হাত দু' পা থাকলি মানুষ হয় না মা। গলায় পৈতে ঝোলালি কুলীন ব্রাহ্মণ হয় না—

কত কি পরিবর্তন হয়ে গেল গ্রামে। রেল খুললো চাকদা থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত। একদিন তিলু ও নিলু স্বামীর সঙ্গে আড়ংঘাটায় ঠাকুর দেখতে গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে। ওরা গরুর গাড়ি করে চাকদা পর্যন্ত এসে গঙ্গাস্নান করে সেখানে রেঁধেবেড়ে খেলে। সঙ্গে খোকা ছিল, তার খুব উৎসাহ রেলগাড়ি দেখবার। শেষকালে রেলগাড়ি এসে গেল। ওরা সবাই সেই পরামাশ্চর্য জিনিসটিতে চড়ে গেল আড়ংঘাটা। ফিরে এসে বছরখানেক ধরে তার গল্প আর ফুরোয় না ওদের কারো মুখে।

খোকা এদিকে পাঠশালার পড়া শেষ করলে। ভবানী একদিন তিলুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন ওকে ছাত্রবৃত্ত পড়িয়ে মোক্তারী পড়াবেন, না টোলে সংস্কৃত পড়তে দেবেন। মোক্তারী পড়লে সতীশ মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

তিলু বললে—নিলুকে ডাকো।

নিলুর আর সে স্বভাব নেই। এখন সে পাকা গিন্নী। সংসারের সব কাজ নিখুঁতভাবে খুঁটিয়ে করতে ওর জুড়ি নেই। সে এসে বললে—টুলুকে জিগ্যেস করো না? আহা, কি সব বুদ্ধি!

টুলুর ভালো নাম রাজ্যেশ্বর। সে গম্ভীর স্বভাবের ছেলে, চেহারা খুব সুন্দর, যেমন রূপ তেমনি বুদ্ধি। বাবাকে বড় ভালোবাসে। বিশেষ পিতৃভক্ত। সে এসে হেসে বললে—বাবা বলো না? আমি কি জানি? আর ছোট মা তো কিছু জানেই না। কলের গাড়িতে উঠে সেদিন দেখলে না? পান সাজতে বসলো। রানাঘাট থেকে কলের গাড়ি ছাড়লো তো টুক করে এলো আড়ংঘাটা। আর ছোট মা'র কি কষ্ট! বললে, দুটো পান সাজতি সাজতি গাড়ি এসে গেল তিনকোশ রাস্তা! হি-হি—

নিলু বললে—তা কি জানি বাবা, আমরা বুড়োসুড়ো মানুষ। চাকদাতে আগে আগে গঙ্গাস্নান করতি য্যাতাম পানের বাটা নিয়ে পান সাজতি সাজতি। অমন হাসতি হবে না তোমারে—

—আমি অন্যায় কি বল্লাম? তুমি কি জানো পড়াশুনোর? মা তবুও সংস্কৃত পড়েচে কিছু কিছু। তুমি একেবারে মুক্‌খু।

—তুই শেখাস আমায় খোকা।

—আমি শেখাবো? এ বয়সে উনি ক, খ, অ, আ—ভারি মজা!

—তোরে ছানার পায়েস খাওয়াবো ওবেলা।

—ঠিক?

—ঠিক।

—তাহলি তুমি খুব ভালো। মোটেই মুক্‌খু না।

ভবানী বললেন—আঃ, এই টুলু! ওসব এখন রাখো। আসল কথার জবাব দে।

—তুমি বলো বাবা।

—কি ইচ্ছে তোমার?

এই সময় নিলু আবার বললে—ওকে মোক্তারি-টোক্তারি করতি দিও না। ইংরিজি পড়াও ওকে। কলকেতায় পাঠাতি হবে। ওই শম্ভু দ্যাখো কেমন করেচে কলকেতায় চাকরি করে। তার চেয়ে কম বুদ্ধিমান কি টুলু?

ভবানী বাঁড়ুয্যে বললেন—কি বলো খোকা?

—ছোট মা ঠিক বলেচে। তাই হোক বাবা। মা কি বলো? ছোট মা ঠিক বলে নি?

নিলু অভিমানের সুরে বললে—কেন মুক্‌খু যে? আমি আবার কি জানি?

টুলু বললে—না ছোট মা। হাসি না। তোমার কথাডা আমার মনে লেগেচে। ইংরিজি পড়তি আমারও ইচ্ছে—তাই তুমি ঠিক করো বাবা। ইংরিজি শেখাবে কে?

নিলু বললে—তা আমি কি করে বলবো? সেডা তোমরা ঠিক কর।

—তাই তো, কথাডা ঠিক বলেচে খোকা। ইংরিজি পড়বে কার কাছে খোকা। গ্রামে কেউ ইংরিজি জানে না, কেবল ইংরিজি-নবিশ শম্ভু রায়। সে বহুকাল থেকে আমুটি কোম্পানীর হৌসে কাজ করে, সায়েব-সুবোদের সঙ্গে ইংরিজি বলে। গাঁয়ে এজন্যে তার খুব সম্মান—মাঝে মাঝে অকারণে গাঁয়ের লোকদের সামনে ইংরিজি বলে বাহাদুরি নেবার জন্যে।

তিলু হেসে বললে—এই খোকা, তোর শম্ভুদাদা কেমন ইংরিজি বলে রে?

—ইট্ সেইস্ট মাট্ ফুট্—ইট সুনটু-ফুট্-ফিট্—

ভবানী বললেন—বা রে! কখন শিখলি এত?

টুলু বললে—শুনে শিখিচি। বলে তাই শুনি কিনা। যা বলে, সেরকম বলি।

ভবানী বললেন—সত্যি, ঠিক ইংরিজি শিখেচে দ্যাখো। কেমন বলচে।

নিলু বললে—সত্যি, ঠিক বলচে তো!

তিনজনেই খুব খুশি হোলো খোকার বুদ্ধি দেখে। খোকা উৎসাহ পেয়ে বললে—আমি আরো জানি, বলবো বাবা? সিট্ এ হিপ্-সিট-ফুট-এ পট-আই-মাই—ও বাবা এ দুটো কথা খুব বলে—আর মাই—সত্যি বলচি বাবা—

নিলু অবাক হয়ে ভাবলে—কি আশ্চর্য বুদ্ধিমান তাদের খোকা।

প্রসন্ন চক্রবর্তী নীলকুঠির চাকরি যাওয়ার পরে দু'বছর বড় কষ্ট পেয়েচে। আমীনের চাকরি জোটানো বড় কষ্ট। বসে বসে সংসার চলে কোথা থেকে। অনেক সন্ধানের পর বর্তমান চাকরিটা জুটে গিয়েছে বটে কিন্তু নীলকুঠির মত অমন সুখ আর কোথায় পাওয়া যাবে চাকরির? তেমন ঘরবাড়ি, তেমন পসার-প্রতিপত্তি দিশী জমিদারের কাছারীতে হবে না, হতে পারে না। চার বছর তবু কাটলো এদের এখানকার চাকরিতে। এটা পাল এস্টেটের বাহাদুর পুরের কাছারী। সকালে নায়েব ঘনশ্যাম চাকলাদার পাল্‌কি করে বেরিয়ে গেলেন চিতলমারির খাসখামারের তদারক করতে। প্রসন্ন আমীন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। এরা নতুন মনিব, অনেক বুঝে চলতে

হয় এদের কাছে, আর সে রাজারাম দেওয়ানও নেই, সে বড়সাহেবও নেই। নায়েবের চাকর রতিলাল নাপিত ঘরে ঢুকে বললে—ও আমীনবাবু, কি করচেন?

—এই বসে আছি। কেন?

—নায়েববাবুর হাঁসটা এদিকি এয়েল? দেখেচেন?

—দেখি নি।

—তামাক খাবেন?

—সাজ্ দিকি এট্টু।

রতিলাল তামাক সেজে নিয়ে এল। সে নিজে নিয়ে না এলে নায়েবের চাকরকে হুকুম করার মত সাহস নেই প্রসন্ন চক্রবর্তীর।

রতিলাল বললে—আমীনবাবু, সকালে তো মাছ দিয়ে গেল না গিরে জেলে?

—দেবার কথা ছিল? গিরে কাল বিকেলে হাটে মাছ বেচছিল দেখিচি। আড় মাছ।

—রোজ তো দ্যায়, আজ এলো না কেন কি জানি? নায়েবমশায় মাছ না হলি ভাত খেতি পারেন না মোটে। দেখি আর খানিক। যদি না আনে, জেলেপাড়া পানে দৌড়ুতি হবে মাছের জন্যি।

রতিলালের ভ্যাজ ভ্যাজ ভালো লাগছিল না প্রসন্ন চক্কত্তির। তার মন ভালো না আজ, তাছাড়া নায়েবের চাকরের সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করবার প্রবৃত্তি হয় না। আজই না হয় অবস্থার বৈগুণ্যে প্রসন্ন চক্কত্তি এখানে এসে পড়েচে বেঘোরে, কিন্তু কি সম্মানে ও রোবদাবে কাটিয়ে এসেচে এতকাল মোল্লাহাটির কুঠিতে, তা তো ভুলতে পারচে না সে।

আপদ বিদায় করার উদ্দেশ্যে প্রসন্ন আমীন তাড়াতাড়ি বললে—তা মাছ যদি নিতি হয়, এই বেলা যাও, বেশি বেলা হয়ে গেলি মাছ সব নিয়ে যাবে এখন সোনাখালির বাজারে।

—যাই, কি বলেন?

—এখুনি যাও। আর দ্রিং কোরো না।

রতিলাল চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সে মাছের খাড়ুই হাতে বার হয়ে গেল কাছারীর হাতা থেকে। প্রসন্ন চক্কত্তির মন শান্ত হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। রোদে বসে তেল মেখে এইবার নেয়ে নেওয়া যাক। কাঁঠাল গাছতলায় রোদে পিঁড়ি পেতে সে রাঙা গামছা পরে তেল মাখতে বসলো। স্নান সেরে এসে রান্না করতে হবে।

কত বেগুন এ সময়ে দিয়ে যেতো প্রজারা। বেগুন, ঝিঙে, নতুন মূলো। শুধু তাকে নয়, সব আমলাই পেতো। নরহরি পেশ্কার তাকে সব তার পাওয়া জিনিস দিয়ে বলতো,—প্রসন্নদা, আপনি হোলেন ব্রাহ্মণ মানুষ। রান্নাডা আপনাদের বংশগত জিনিস। আমার দুটো ভাত আপনি রেঁধে রাখবেন দাদা।

সুবিধে ছিল। একটা লোকের জন্যে রাঁধতেও যা, দুজন লোকের রাঁধতেও প্রায় সেই খরচ, টাকা তিন-চার পড়তো দুজনের মাসিক খরচ। নরহরি চাল ডাল সবি যোগাতো। চমৎকার খাঁটি দুধটুকু পাওয়া যেতো, এ ও দিয়ে যেতো, পয়সা দিয়ে বড় একটা হয় নি জিনিস কিনতে। আহা, গয়ার কথা মনে পড়ে।

গয়া!...গয়ামেম!

না। তার কথা ভাবলেই কেন তার মন ওরকম খারাপ হয়ে যায়? গয়ামেম তার দিকে ভালো চোখে তাকিয়েছিল। দুঃখের তো পারাপার নেই জীবনে, ছেলেবেলা থেকেই দুঃখের পেছনে ধোঁয়া দিতে দিতে জীবনটা কেটে গেল। কেউ কখনো হেসে কথা বলে নি, মিষ্টি গলায় কেউ কখনো ডাকে নি। গয়া কেবল সেই সাধটা পূর্ণ করেছিল জীবনের। অমন সুঠাম সুন্দরী, একরাশ কালো চুল। বড় সায়েবের আদরিণী আয়া গয়ামেম তার মত লোকের দিকে যে কেন ভালো চোখে চাইবে—এর কোন হেতু খুঁজে মেলে? তবু সে চেয়েছিল।

কেমন মিষ্টি গলায় ডাকতো—খুড়োমশাই, অ খুড়োমশাই—

বয়েসে সে বুড়ো ওর তুলনায়। তবু তো গয়া তাকে তাচ্ছিল্য করে নি। কেন করে নি? কেন ছলছুতো খুঁজে তার সঙ্গে গয়া হাসিমস্করা করতো, কেন তাকে প্রশ্রয় দিত? কেন অমন ভাবে সুন্দর হাসি হাসতো তার দিকে চেয়ে? কেন তাকে নাচিয়ে ও অমন আনন্দ পেতো? আজকাল গয়া কেমন আছে? কতকাল দেখা হয় নি। বড় কষ্টে পড়েচে হয়তো, কে জানে? কত দিন রাত্রে মন-কেমন করে ওর জন্যে। অনেক কাল দেখা হয় নি।

—ও আমীনমশাই, মাছ প্যালাম না—

রতিলালের মাছের খাড়ুই হাতে প্রবেশ। সর্বশরীর জ্বলে গেল প্রসন্নন চক্কত্তির। আ মোলো যা, আমি তোমার এয়ার, তোমার দরের লোক? ব্যাটা জল-টানা বাজন-মাজা চাকর, সমানে সমানে আজ খোশগল্প করতে এসেচে একগাল দাঁত বার করে তার সঙ্গে। চেনে না সে প্রসন্ন আমীনকে? দিন চলে গিয়েচে, আজ বিষহীন ঢোঁড়া সাপ প্রসন্ন চক্কত্তি এ কথার উত্তর কি করে দেবে? সে মোল্লাহাটির নীলকুঠি নেই, সে বড়সায়েব শিপ্টন্‌ও নেই, সে রাজারাম দেওয়ানও নেই।

নীলকুঠির আমলে শাসন বলে জিনিস ছিল, লোকে ভয়ে কাঁপতো লাল মুখ দেখলে, এসব দিশী জমিদারের কাছারীতে ভূতের কেত্তন। কেউ কাকে মানে? মারো দুশো ঝাঁটা।

বিরক্তি সহকারে আমীন রতিলালের কথার উত্তরে বললে—ও। নীরস কণ্ঠেই বলে।

রতিলাল বললে—তেল মাখচেন?

—হুঁ।

—নাইতি যাবেন?

—হুঁ।

—কি রান্না করবেন ভাবচেন?

—কি এমন আর? ডাল আর উচ্ছেচচ্চড়ি। ঘোল আছে।

—ঘোল না থাকে দেবানি। সনকা গোয়ালিনী আধ কলসী মাঠাওয়ালা ঘোল দিয়ে গিয়েচে। নেবেন?

—না, আমার আছে।

বলেই প্রসন্ন চক্কত্তি রতিলালকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি গামছা কাঁধে নিয়ে ইছামতীতে নাইতে চলে গেল। কি বিপদই হয়েছে। ওর সঙ্গে এখন বক্ বক্ করো বসে বসে। খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। ব্যাটা বেয়াদবের নাজির কোথাকার।

রান্না করতে করতেও ভাবে, কতদিন ধরে সে আজ একা রান্না করচে বিশ বছর? না,

তারও বেশি। স্ত্রী সরস্বতী সাধনোচিত ধামে গমন করেচেন বহুদিন। তারপর থেকেই হাঁড়িবেড়ি হাতে উঠেচে। আর নামলো কই? রান্না করলে যা রোজই রেঁধে থাকে প্রসন্ন, তার অতি প্রিয় খাদ্য। খুব বেশি, কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাসকলাইয়ের ডাল, উচ্ছেভাজা। ব্যস! হয়ে গেল। কে বেশি ঝঞ্ঝাট করে। আর অবিশ্যি ঘোল আছে।

—ডাল রান্না করলেন নাকি?

জলের ঘটি উঁচু করে আলগোছে খেতে খেতে প্রায় বিষম খেতে হয়েছিল আর কি! কোথাকার ভূত এ ব্যাটা, দেখচিস একটা মানুষ তেতপ্পরে দুটো খেতে বসেচে। এক ঘটি জল খাচ্ছে, ঠিক সেই সময় তোমার কথা না বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, না তোমার বাপের জমিদারি লাটে উঠেছিল, বদমাইশ পাজি? বিরক্তির সুরে জবাব দেয় প্রসন্ন চক্কত্তি—হুঁ। কেন?

—কিসের ডাল?

—মাসকলাইয়ের।

—আমারে একটু দেবেন? বাটি আনবো?

—নেই আর। এক কাঁসি রেঁধেছিলাম, খেয়ে ফেললাম।

—আমি যে ঘোল এনিচি আপনার জন্যি—

—আমার ঘোল আছে। কিনিছিলাম।

—এ খুব ভাল ঘোল। সনকা গোয়ালিনীর নামডাকী ঘোল। বিষ্টু ঘোষের বিধবা দিদি। চেনেন? মাঠাওয়ালা ঘোল ও ছাড়া কেউ কত্তি জানেও না। খেয়ে দ্যাখেন।

নামটা বেশ। মরুক গে। ঘোল খারাপ করে নি। বেশ জিনিসটা। এ গাঁয়ে থাকে সনকা গোয়ালিনী? বয়েস কত?

এক কল্কে তামাক সেজে খেয়ে প্রসন্ন একটু শুয়ে নিলে ময়লা বিছানায়। সবে সে চোখ একটু বুজেচে, এমন সময় পাইক এসে ডাক দিলে—নায়েবমশাই ডাকচেন আপনারে—

ধড়মড় করে উঠে প্রসন্ন চক্কত্তি কাছারীঘরে ঢুকলো। অনেক প্রজার ভিড় হয়েচে। আমীনের জরীপী চিঠার নকল নিতে এসেচে আট-দশটি লোক। নায়েব ঘনশ্যাম চাকলাদার রাশভারি লোক, পাকা গোঁপ, মুখ গম্ভীর, মোটা ধুতি পরনে, কোঁচার মুড়ো গায়ে দিয়ে ফরাসে বসেছিলেন আধময়লা একটা গির্দে হেলান দিয়ে। রূপো-বাঁধানো ফর্সিতে তামাক দিয়ে গেল রতিলাল নাপিত।

আমীনের দিকে চেয়ে বললেন—খাসমহলের চিঠা তৈরি করেচেন?

—প্রায় সব হয়েচে। সামান্য কিছু বাকি।

—ওদের দিতি পারবেন? যাও, তোমরা আমীনমশাইয়ের কাছে যাও। এদের একটু দেখে দেবেন তো চিঠাগুলো। দূর থেকে এসেচে সব, আজই চলে যাবে।

প্রসন্ন চক্কত্তি বহুকাল এই কাজ করে এসেচে, গুড়ের কলসীর কোন্ দিকে সার গুড় থাকে আর কোন্ দিকে ঝোলাগুড় থাকে, তাকে সেটা দেখাতে হবে না। খাসমহলের চিঠা তৈরী থাকলেই কি আর সব গোলমাল মিটে যায়? সীমানা সরহদ্দ নিয়ে গোলমাল থাকে, অনেক কিছু গোলমাল থাকে, চিঠাতে নায়েবের সই করতে হবে—অনেক কিছু হাঙ্গামা। এখন অবেলায় অতশত কাজ কি হয়ে উঠবে? বলা যায় না। চেষ্টা করে অবিশ্যি দেখা যাক।

নীলকুঠির দিনে এমন সব ব্যাপারে দু'পয়সা আসতো। সে সব অনেক দিনের কথা হোলো। এখন যেন মনে হয় সব স্বপ্ন।

প্রজাদের তরফ থেকে একজন লোক এগিয়ে এসে বললে—করে দ্যান আমীনবাবু। আপনারে পান খেতি কিছু দেবো এখন—

—কিছু কত?

—এক আনা করে মাথা পিছু দেবো এখন।

প্রসন্ন চক্কত্তি হাতের খেরো বাঁধা দপ্তর নামিয়ে রেখে বললে—তাহলি এখন হবে না। তোমারা নায়েব মশাইকে গিয়ে বলতি পারো। চিঠে তৈরি হয়েচে বটে, এখনো সাবেক রেকর্ডের সঙ্গে মেলানো হয় নি, সই হয় নি। এখনো দশ পনেরো দিন কি মাস খানেক বিলম্ব। চিঠে তৈরি থাকলিই কাজ ফতে হয় না। অনেক কাঠখড় পোড়াতি হয়।

প্রজাদের মোড়ল বিনীত ভাবে বললে—তা আপনি কত বলচো আমীনবাবু?

সেও অভিজ্ঞ লোক, আইন আদালত জমিদারি কাছারীর গতিক এবং নাড়ী বিলক্ষণ জানে। কেন আমীনবাবু বেঁকে দাঁড়িয়েছে তাকে বোঝাতে হবে না।

প্রসন্ন চক্কত্তি অপ্রসন্ন মুখে বললে—না না, সে হবে না। তোমরা নায়েবের কাছেই যাও—আমার কাজ এখনো মেটে নি। দেরি হবে দশ-পনেরো দিন।

মোড়ল মশাই হাত জোড় করে বললে—তা মোদের ওপর রাগ করবেন না আমীন মশাই। ছ' পয়সা করে মাথা-পিছু দেবানি—

—দু' আনার এক কড়ি কম হলি পারবো না।

—গরীব মরে যাবে তাহলি—

—না। পারবো না।

বাধ্য হয়ে দশজন প্রজার পাঁচসিকে মোড়ল মশাইকে ভালো ছেলের মত সুড়সুড় করে এগিয়ে দিতে হোলো প্রসন্ন চক্কত্তির হাতে। পথে এসো বাপধন। চক্কত্তিকে আর কাজ শেখাতি হবে না ঘনশ্যাম চাকলাদারের। কি করে উপরি রোজগার করতে হয়, নীলকুঠির আমীনকে সে কৌশল শিখতে হবে পচা জমিদারি কাছারীর আমলার কাছে? শাসন করতে এসেছেন! দেখেচিস শিপ্‌টন্ সায়েবকে?

বেলা তিন প্রহর। ঘনশ্যাম চাকলাদার আবার ডেকে পাঠালেন প্রসন্ন চক্কত্তিকে। ঘনশ্যাম নায়েব অত্যন্ত কর্মঠ, দুপুরে ঘুমের অভ্যেস নেই, গির্দে বালিশ বুকে দিয়ে জমার খাতা সই করবেন, পেশ্‌কার কাছে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টে দিচ্চে। ফর্সিতে তামাক পুড়চে।

প্রসন্ন চক্কত্তির দিকে চেয়ে বললে—ওদের চিঠা দিয়ে দেলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ঘোড়া চড়তে পারেন?

—আজ্ঞে।

—এখুনি একবার রাহাতুনপুর যেতি হচ্চে আপনাকে। বিলাতালি সর্দার আর ওসমান গনির মামলায় আপনি প্রধান সাক্ষী হবেন। সরেজমিন দেখে আসুন। সেখানে নকুড় কাপালী কাছারীর পক্ষে উপস্থিত আছে। সে আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবে। ওসমান গনির ভিটের পেছনে যে শিমূলগাছটা আছে—সেটা কত চেন রাস্তা থেকে হবে মেপে আসবেন তো।

—চেন নিয়ে যাবো?

—নিয়ে যাবেন। আমার কানকাটা ঘোড়াটা নিয়ে যান, ছাড় তোক দেবেন না, বাঁ পায়ে ঠোকা মারবেন পেটে। খুব দৌড়ুবে।

এখন অবেলায় আবার চল রাহাতুনপুর! সে কি এখানে! ফিরতে কত রাত হবে কে জানে। নকুড় কাপালী সেখানে সব শেখাবে প্রসন্ন চক্কত্তিকে! হাসিও পায়। সে কি জানে জরীপের কাজের? আমীনের পিছু পিছু খোঁটা নিয়ে দৌড়োয়, বড়সায়েব যাকে বলতো 'পিনম্যান', সেই নকুড় কাপালী জরীপের খুঁটিনাটি তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবে তাকে, যে পঁচিশ বছর এক কলমে কাজ চালিয়ে এল সায়েব-সুবোদের কড়া নজরে! শালুক চিনেচেন গোপাল ঠাকুর। নকুড় কাপালী।

ঘোড়া বেশ জোরেই চললো যশোর চুয়াডাঙ্গার পাকা সড়ক দিয়ে। আজকাল রেল লাইন হয়ে গিয়েচে এদিকে। ক্রোশ খানেক দূর দিয়ে রেল গাড়ি চলাচল করচে, ধোঁয়া ওড়ে, শব্দ হয়, বাঁশি বাজে। একদিন চড়তে হবে রেলের গাড়িতে। ভয় করে। এই বুড়ো বয়েসে আবার একটা বিপদ বাধবে ও সব নতুন কান্ডকারখানার মধ্যে গিয়ে? মানিক মুখুয্যে মুহুরী সেদিন বলছিল, চলুন আমীন মশাই, একদিন কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান করে আসা যাক রেলগাড়িতে চড়ে। ছ' আনা নাকি ভাড়া রানাঘাট পর্যন্ত। সাহস হয় না।

বড় বড় শিউলি গাছের ছায়া পথের দু'ধারে। শ্যামলতা ফুলের সুগন্ধ যেন কোন বিস্মৃত অতীত দিনের কার চুলের গন্ধের মত মনে হয়। কিছুই আজ আর মনে নেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে। হাতও খালি। সামনে কতদিন বেঁচে থাকতে হবে, কি ক'রে চলবে, অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকলে—কে দেবে খেতে? কেউ নেই সংসারে। বুড়ো বয়েসে যদি চেন টেনে জমি মাপামাপির খাটাখাটুনি না করতে পারে মাঠে মাঠে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, তবে কে দু'মুঠো ভাত দেবে? কেউ নেই। সামনে অন্ধকার। যেমন অন্ধকার ওই বাঁশঝাড়ের তলায় তলায় জমে আসবে আর একটু পরে।

রাহাতুনপুর পৌঁছে গেল ঘোড়া তিন ঘন্টার মধ্যে। প্রায় এগারো ক্রোশ পথ। এখানে সকলেই ওকে চেনে। নীলকুঠির আমলে কতবার এখানে সে আর কারকুন আসতো নীলের দাগ মারতি। এখানে একবার দাঙ্গা হয় দেওয়ান রাজারাম রায়ের আমলে। খুব গোলমাল হয়, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন প্রজাদের দরখাস্ত পেয়ে।

বড় মোড়ল আবদুল লতিফ মারা গিয়েচে, তার ছেলে সামসুল এসে প্রসন্ন চক্কত্তিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। বেলা এখনও দণ্ড-দুই আছে। বড় রোদে ঘোড়া ছুটিয়ে আসা হয়েচে।

সামসুল বললে—সালাম, আমীনমশায়। আজকাল কনে আছেন?

—তোমাদের সব ভালো? আবদুল বুঝি মারা গিয়েচে? কদ্দিন? আহা, বড্ড ভালো লোক ছিল। আমি আছি বাহাদুরপুরি। বড্ড দূর পড়ে গিয়েচে, কাজেই আর দেখাশুনো হবে কি করে বলো।

—তামাক খান। সাজি।

—নকুড় কাপালী কোথায় আছে জানো? তাকে পাই কোথায়?

—বাঁওড়ের ধারে যে খড়ের চালা আছে, জরীপির সময় আমীনের বাসা হয়েল, সেখানে আছেন। ঠেকোয়।

প্রসন্ন চক্কত্তি অনেকক্ষণ থেকে কিন্তু একটা কথা ভাবচে। পুরনো কুঠিটা আবার দেখতে

ইচ্ছে করে।

বেলা পড়ে এসেচে। সন্ধ্যার দেরি নেই। মোল্লাহাটির নীলকুঠি এখান থেকে তিন ক্রোশ পথ। ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে এক ঘণ্টা। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে ঘোড়া। খানিক ভেবেচিন্তে ঘোড়ায় চড়ে সে রওনা হোলো মোল্লাহাটি। অনেকদিন সেখানে যায় নি। ধুঁধুঁল বনে হলদে ফুল ফুটেচে, জিউলি গাছের আঠা ঝরচে কাঁচা কদমার শাকের মত। হু-হু হাওয়া ফাঁকা মাঠের ওপার থেকে মড়িঘাটার বাঁওড়ের কুমুদ ফুলের গন্ধ বয়ে আনচে। শেয়াকুল কাঁটার ঝোপে বেজি খস খস করচে পথের ধারে।

জীবনটা ফাঁকা, একদম ফাঁকা। মড়িঘাটার ওই বড় মাঠের মত। কিছু ভালো লাগে না। চাকরি করা চলচে, খাওয়া-দাওয়া চলচে, সব যেন কলের পুতুলের মত। ভালো লাগে না। করতে হয় তাই করা। কি যেন হয়ে গিয়েচে জীবনে।

সন্ধ্যা হোলো পথেই। পঞ্চমীর কাটা চাঁদ কুমড়োর ফালির মত উঠেচে পশ্চিমের দিকে। কি কড়া তামাক খায় ব্যাটারা। ওই আবার দেয় নাকি মানুষকে খেতে? কাসির ধাক্কা এখনো সামলানো যায় নি।

দিগন্তের মেঘলা-রেখা বন-নীল দূরত্বে বিলীন। অনেকক্ষণ ঘোড়া চলচে। ঘেমে গিয়েচে ঘোড়ার সর্বাঙ্গ। এইবার প্রসন্ন চক্কত্তির চোখে পড়লো দূরে উঁচু সাদা নীলকুঠিটা দীর্ঘ দীর্ঘ ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে। প্রসন্ন আমীনের মনটা ফুলে উঠলো। তার যৌবনের লীলাভূমি, তার কতদিনের আমোদ-প্রমোদ ও আড্ডার জায়গা, কত পয়সা হাতফেরতা হয়েচে ওই জায়গায়। আজকাল নিশাচরের আড্ডা। লালমোহন পাল ব্যবসায়ী জমিদার, তার হাতে কুঠির মান থাকে?

প্রসন্ন চক্কত্তির হঠাৎ চমক ভাঙলো। সে রাস্তা ভুল করে এসে পড়েচে কুঠি থেকে কিছুদূরের গোরস্থানটার মধ্যে। দু'পাশে ঘন ঘন বাগান, বিলিতি কি সব বড় বড় গাছ রবসন্ সায়েবের আমলে এনে পোঁতা হয়েছিল, এখন ঘন অন্ধকার জমিয়ে এনেচে গোরস্থানে। ওইটে রবসন্ সায়েবের মেয়ের কবর। পাশে ওইটে ডানিয়েল সায়েবের। এসব সায়েবকে প্রসন্ন চক্কত্তি দেখে নি। নীলকুঠির প্রথম আমলে রবসন্ সায়েব ঐ বড় সাদা কুঠিটা তৈরি করেছিল গল্প শুনেচে সে।

কি বনজঙ্গল গজিয়েচে কবরখানার মধ্যে। নীলকুঠির জমজমাটের দিনে সায়েবদের হুকুমে এই কবরখানা থেকে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যেতো, আর আজকাল কেই বা দেখচে আর কেই বা যত্ন করচে এ জায়গার?

ঘোড়াটা হঠাৎ যেন থমকে গেল। প্রসন্ন চক্কত্তি সামনের দিকে তাকালে, ওর সারা গা ডোল দিয়ে উঠলো। মনে ছিল না, এইখানেই আছে শিপ্‌টন্ সায়েবের কবরটা। কিন্তু কি ওটা নড়চে সাদা মতন? বড়সায়েব শিপ্‌টনের কারখানায় লম্বা লম্বা উলুখড়ের সাদা ফুলগুলোর আড়ালে?

নির্জন কুঠির পরিত্যক্ত কবরখানা, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার ঢাকা। প্রেত-যোনির ছবি স্বভাবতই মনে না এসে পারে না, যতই সাহসী হোক আমীন প্রসন্ন চক্রবর্তী। সে ভীতিজড়িত আড়ষ্ট অস্বাভাবিক সুরে বললে—কে ওখানে? কে ও? কে গা?

শিপ্‌টন্ সায়েবের সমাধির উলুখড়ের ফুলের ঢেউয়ের আড়াল থেকে একটি নারীমূর্তি চকিত ও ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে রইল অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় পাথরের মূর্তিরই মত।

—কে গা? কে তুমি?

—কে? খুড়োমশাই! ও খুড়োমশাই!

ওর কণ্ঠে অপরিসীম বিস্ময়ের সুর। আরও এগিয়ে এসে বললে—আমি গয়া।

প্রসন্নর মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোনো কথা বার হোলো না বিস্ময়ে। সে তাড়াতাড়ি রেকাবে পা দিয়ে নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে, আহ্লাদের সুরে বললে—গয়া! তুমি! এখানে? চলো চলো, বাইরে চলো এ জঙ্গল থেকে—এখানে কোথায় এইছিলে?

জ্যোৎস্নায় প্রসন্ন দেখলে গয়ার চোখের কোণে জলের রেখা। এর আগেই সে কাঁদছিল ওখানে বসে বসে এই রকম মনে হয়। কান্নার চিহ্ন ওর চোখেমুখে চিকচিকে জ্যোৎস্নায় সুস্পষ্ট।

প্রসন্ন চক্কত্তি বললে—চলো গয়া, ওই দিকে বার হয়ে চলো—এঃ, কি ভয়ানক জঙ্গল হয়ে গিয়েচে এদিকটা!

গয়ামেম ওর কথায় ভালো করে কর্ণপাত না করে বললে—আসুন খুড়োমশাই, বড়সায়েবের কবরটা দেখবেন না? আসুন। আলেন যখন, দেখেই যান—

পরে সে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। শিপ্‌টনের সমাধির ওপর টাটকা সন্ধ্যা-মালতী আর কুঠির বাগানের গাছেরই বকফুল ছড়ানো। তা থেকে এক গোছা সন্ধ্যামালতী তুলে নিয়ে ওর হাতে দিয়ে বললে—দ্যান, ছড়িয়ে দ্যান। আজ মরবার তারিখ সায়েবের, মনে আছে না? কত নুনডা খেয়েছেন একসময়। দ্যান, দুটো উলুখড়ের ফুলও দ্যান তুলে টাটকা। দ্যান ওই সঙ্গে—

প্রসন্ন চক্কত্তি দেখলে ওর দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে নতুন করে।

তারপর দুজনে কবরখানার ঝোপজঙ্গল থেকে বার হয়ে একটা বিলিতি গাছের তলায় গিয়ে বসলো। খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। দুজনেই দুজনকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে বেজায় খুশি যে হয়েচে, সেটা ওদের মুখের ভাবে পরিস্ফুট। কত যুগ আগেকার পাষাণপুরীর ভিত্তির গাত্রে উৎকীর্ণ কোন্ অতীত সভ্যতার দুটি নায়ক-নায়িকা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেচে আজ এই সন্ধ্যারাত্রে মোল্লাহাটির পোড়ো নীলকুঠিতে রবসন্ সাহেবের আনীত প্রাচীন জুনিপার গাছটার তলায়। গয়া রোগা হয়ে গিয়েচে, সে চেহারা নেই। সামনের দাঁত পড়ে গিয়েচে। বুড়ো হয়ে আসচে। দুঃখের দিনের ছাপ ওর মুখে, সারা অঙ্গে, চোখের চাউনিতে, মুখের ম্লান হাসিতে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল গয়া।

—কেমন আছ গয়া?

—ভালো আছি। আপনি কনে থেকে? আজকাল আছেন কনে?

—আছি অনেক দূর। বাহাদুরপুরি। কাছারীতে আমীনি করি। তুমি কেমন আছ তাই আগে কও শুনি। চেহারা এমন খারাপ হোলো কেন?

—আর চেহারার কথা বলবেন না। খেতি পেতাম না যদি সায়েব সেই জমির বিলি না করে দিত আর আপনি মেপে না দেতেন। যদ্দিন সময় ভালো ছেল, আমারে দিয়ে কাজ আদায় করে নেবে বুঝতো, তদ্দিন লোকে মানতো, আদর করতো। এখন আমারে পুঁচবে কেডা? উল্টে আরো হেনস্থা করে, একঘরে করে রেখেচে পাড়ায়—সেবার তো আপনারে বলিচি।

—এখনো তাই চলচে?

—যদ্দিন বাঁচবো, এর সুরাহা হবে ভাবচেন খুড়োমশাই? আমার জাত গিয়েচে যে! একঘটি জল কেউ দেয় না অসুখে পড়ে থাকলি, কেউ উঁকি মেরে দেখে না। দুঃখির কথা কি বলবো। আমি একা মেয়েমানুষ, আমার জমির ধানডা লোকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায় রাত্তিরবেলা কেটে। কার সঙ্গে ঝগড়া করবো? সেদিন কি আমার আছে।

প্রসন্ন চক্কত্তি চুপ করে শুনছিল। ওর চোখে জল। চাঁদ দেখা যাচ্ছে গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে। কি খারাপ দিনের মধ্যে দিয়ে জীবন তার কেটে যাচ্চে। তারও জীবনে ঠিক ওর মতনই দুর্দিন নেমেচে।

গয়া ওর দিকে চেয়ে বললে—আপনার কথা বলুন। কদ্দিন দেখি কি আপনারে। আপনার ঘোড়া পালালো খুড়োমশাই, বাঁধুন—

প্রসন্ন চক্কত্তি উঠে গিয়ে ঘোড়াটাকে ভালো করে বেঁধে এল বিলিতি গাছটার গায়ে। আবার এসে বসলো ওর পাশে। আজ যেন কত আনন্দ ওর মনে। কে শুনতে চায় দুঃখের কাহিনী? সব মানুষের কাছে কি বলা যায় সব কথা? এ যেন বড্ড আপন। বলেও সুখ এর কাছে। এর কানে পৌঁছে দিয়ে সব ভার থেকে সে যেন মুক্ত হবে।

বললেও প্রসন্ন। হেসে খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—বুড়ো হয়ে গিইচি গয়া। মাথার চুল পেকেচে। মনের মধ্যি সর্বদা ভয়-ভয় করে। উন্নতি করবার কত ইচ্ছে ছিল, এখন ভাবি বুড়ো বয়েস, পরের চাকরিডা খোয়ালি কে একমুঠো ভাত দেবে খেতি? মনের বল হারিয়ে ফেলিচি। দেখচি যেমন চারিধারে, তোমার আমার রুক্ষু মাথায় একপলা তেল কেউ দেবে না, গয়া।

—কিছু ভাববেন না খুড়োমশাই। আমার কাছে থাকবেন আপনি। আপনার মেপে দেওয়া সেই ধানের জমি আছে, দুজনের চলে যাবে। আমারে আর লোকে এর চেয়ে কি বলবে? ডুবিচি না ডুবতি আছি। মাথার ওপরে একজন আছেন, যিনি ফ্যালবেন না আপনারে আমারে। আমার বাবা বড্ড সন্ধানডা দিয়েচেন। আগে ভাবতাম কেউ নেই। চলুন আমার সঙ্গে খুড়োমশাই। যতদিন আমি আছি, এ গরীব মেয়েডার সেবাযত্ন পাবেন আপনি। যতই ছোট জাত হই।

এক অপূর্ব অনুভূতিতে বৃদ্ধ প্রসন্ন চক্কত্তির মন ভরে উঠলো। তার বড় সুখের দিনেও সে কখনো এমন অনুভূতির মুখোমুখি হয় নি। সব হারিয়ে আজ যেন সে সব পেয়েচে ওই জনশূন্য, পোড়ো কবরখানায় বসে। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আচ্ছা, চললাম এখন গয়া।

গয়া অবাক হয়ে বললে—এত রাত্তিরি কোথায় যাবেন খুড়োমশাই?

—পরের ঘোড়া এনিচি। রাত্তিরিই চলে যাবো কাছারীতি। পরের চাকরি করে যখন খাই, তখন তাদের কাজ আগে দেখতি হবে। না যদি আর দেখা হয়, মনে রেখো বুড়োটারে। তুমি চলে যাও, অন্ধকারে সাপ-খোপের ভয়।

আর মোটেই না দাঁড়িয়ে প্রসন্ন চক্কত্তি ঘোড়া খুলে নিয়ে রেকাবে পা দিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠলো। ঘোড়ার মুখ ফেরাতে ফেরাতে অনেকটা যেন আপন মনেই বললে—মুখের কথাডা তো বললে গয়া, এই যথেষ্ট, এই বা কেডা বলে এ দুনিয়ায়, আপনজন ভিন্ন কেডা বলে? বড্ড আপন বলে যে ভাবি তোমারে—

ষষ্ঠীর চাঁদ জুনিপার গাছের আড়াল থেকে হেলে পড়েচে মড়িঘাটার বাঁওড়ের দিকে। ঝিঁঝি পোকারা ডাকচে পুরনো নীলকুঠির পুরনো বিস্মৃতি সাহেব-সুবোদের ভগ্ন সমাধিক্ষেত্রের বনেজঙ্গলে ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে।...

ইছামতীর বাঁকে বাঁকে বনে বনে নতুন কত লতাপাতার বংশ গজিয়ে উঠলো। বলরাম ভাঙনের ওপরকার সোঁদালি গাছের ছোট চারাগুলো দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়ে ওঠে, কত অনাবাদী পতিত মাঠে আগে গজালো ঘেঁটুবন, তারপর এল কাকজঙ্ঘা, কুঁচকাঁটা নাটা আর বনমরিচের জঙ্গল, ঝোপে ঝোপে কত নতুন ফুল ফুটলো, যাযাবর বিহঙ্গ কুলের মত কি কলকূজন। আমরা দেখেচি জলিধানের ক্ষেতের ওপরে মুক্তপক্ষ বলাকার সাবলীল গতি মেঘপদবীর ওপারে মৃণালসূত্র মুখে। আমরা দেখেছি বনসিমফুলের সুন্দর বেগুনী রং প্রতি বর্ষাশেষে নদীর ধারে ধারে।

ঐ বর্ষাশেষেই আবার কাশফুল উড়ে উড়ে জল-সরা কাদায় পড়ে বীজ পুঁতে পুঁতে কত কাশঝাড়ের সৃষ্টি করলো বছরে বছরে। কাশবন কালে সরে গিয়ে শেওড়াবন, সোঁদালি গাছ গজালো—তারপরে এল কত কুমুরে লতা, কাঁটাবাঁশ, বনচালতা। দুললো গুলঞ্চলতা, মটরফলের লতা, ছোট গোয়ালে, বড় গোয়ালে। সুবাসভরা বসন্ত মূর্তিমান হয়ে উঠলো কতবার ইছামতীর নির্জন চরের ঘেঁটুফুলের দলে...সেই ফাল্গুন-চৈত্রে আবার কত মহাজনী নৌকা নোঙর করে রেঁধে খেল বনগাছের ছায়ায়, ওরা বড় গাঙ বেয়ে যাবে এই পথে সুন্দরবনে মোমমধু সংগ্রহ করতে, বেনেহার মধু, ফুলপটির মধু, গেঁয়ো, গরান, সুঁদুরি, কেওড়াগাছের নব প্রস্ফুটিত ফুলের মধু। জেলেরা সলা-জাল পাতে গলদা চিংড়ি আর ইটে মাছ ধরতে।

পাঁচপোতার গ্রামের দু'দিকের ডাঙাতেই নীলচাষ উঠে যাওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বন্যেবুড়ো, পিটুলি, গামার, তিত্তিরাজ গাছের জঙ্গল ঘন হোলো, জেলেরা সেখানে আর ডিঙি বাঁধে না, অসংখ্য নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়িতে আর সাঁইবাবলা, শেঁয়াকুল কাঁটাবনের উপদ্রবে ডাঙা দিয়ে এসে জলে নামবার পথ নেই, কবে স্বাতী আর উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জল পড়ে ঝিনুকের গর্ভে মুক্তো জন্ম নেবে, তারই দুরাশায় গ্রামান্তরের মুক্তো-ডুবুরির দল জোংড়া আর ঝিনুক স্তূপাকার করে তুলে রাখে ওকড়াফলের বনের পাশে, যেখানে রাধালতার হলুদ রঙের ফুল টুপটাপ করে ঝরে ঝরে পড়ে ঝিনুকরাশির ওপরে।

অথচ কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায় আবার ভাঁটায় উজিয়ে আসে, এমনি বার বার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে। যে কত আশা করে কলাবাগান করেছিল উত্তরমাঠে, দোয়াড়ি পেতেছিল বাঁশের কঞ্চি চিরে বুনে ঘোলডুবরির বাঁকে, আজ হয়তো তার দেহের অস্থি রোদবৃষ্টিতে সাদা হয়ে পড়ে রইল ইছামতীর ডাঙায়। কত তরুণী সুন্দরী বধূর পায়ের চিহ্ন পড়ে নদীর দু'ধারে, ঘাটের পথে, আবার কত প্রৌঢ়া বৃদ্ধার পায়ের দাগ মিলিয়ে যায়...গ্রামে গ্রামে মঙ্গলশঙ্খের আনন্দধ্বনি বেজে ওঠে বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, দুর্গাপূজোয়, লক্ষ্মীপূজোয়...সে সব বধূদের পায়ের আলতা ধুয়ে যায় কালে কালে, ধূপের ধোঁয়া ক্ষীণ হয়ে আসে...মৃত্যুকে কে চিনতে পারে, গরীয়সী মৃত্যুমাতাকে? পথপ্রদর্শক মায়ামৃগের মত জীবনের পথে পথে দেখিয়ে নিয়ে চলে সে, অপূর্ব রহস্যভরা তার অবগুণ্ঠন কখনো খোলে শিশুর কাছে, কখনো বৃদ্ধের কাছে... তেলাকুচো

ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে...কানে আসে বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে, প্রথম হেমন্তে বা শেষ শরতে। বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে কূলে ভরা ঢল ঢল রূপে সেই অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখতে পায় কেউ কেউ...কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস মাখানো ঐ সব মাঠ, ঐ সব নির্জন ভিটের ঢিপি—কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়ের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়তো।

ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলেচে বড় লোনা গাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহানা পেরিয়ে, রায়মঙ্গল পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে।.....

সমাপ্ত